হিন্দু-পত্রিকা।

১৩০৭ সালের সূচীপত্র।

মঙ্গলাচরণ।

যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবন্তদুসুপ্তস্যতথৈবৈতি।
দূরঙ্গমজ্যোতিষাঞ্জ্যোতিরেকন্তন্মেমনঃশিবসঙ্কল্পমস্তু ॥১

যেনকর্ম্মাণ্যপসো মনীষিণোযজ্ঞেকৃণ্বন্তিবিদথেষুধীরাঃ।
যদপূর্ব্বংযজ্ঞমন্তঃ প্রজানান্তন্মেমনঃশিবসঙ্কল্পমস্তু॥২

যৎপ্রজ্ঞানমুতচেতোধৃতিশ্চযজ্জ্যোতিরন্তরমৃতম্প্রজাসু।
যস্মান্নঋতেকিঞ্চনকর্ম্মক্রিয়তেতন্মেমনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥৩

যেনেদম্ভূতম্ভুবনম্ভবিষ্যৎ পরিগৃহীতমমৃতেন সর্ব্বম্।
যেনযজ্ঞস্তায়তেসপ্তহোতাতন্মেমনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥৪

যস্মিন্নৃচঃ সামযজুংষিয়স্মিন্প্রতিষ্ঠিতারথনাভাবিবারাঃ।
যস্মিঁশ্চিত্তং সর্ব্বমোতম্প্রজানান্তন্মেমনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥

সুষারথিরশ্বানিব যন্মনুষ্যান্নেনীয়তেভীশুভির্ব্বাজিনইব।
হৃৎপ্রতিষ্ঠংযদজিরঞ্জবিষ্ঠন্তন্মেমনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥

যাহা হইতে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, ও প্রলয় হইতেছে, সেই পরমাত্মাকে আমরা [illegible]র বার নমস্কার করি। জ্ঞানের যতই বিকাশ হয়, মানব ততই বুঝিতে পারে যে, [illegible]ই বিশ্বের অন্তরালে যে অদৃশ্য, অব্যক্ত, অচিন্ত্য শক্তি বিদ্যমান রহি[illegible], সেই মহা-[illegible]ক্তির নিকট তাহার ক্ষুদ্র শক্তি অতি অকিঞ্চিৎকর। মানবের ক্ষুদ্র-শক্তি, যদি [illegible]সই মহাশক্তি লক্ষ্য করিয়া, তাহাকে আদর্শ করিয়া আপনাকে গঠিত করে, [illegible]াহা হইলে ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রত্ব থাকে না; বিশ্ব সংসার তাহার করতলস্থ হয়। মানব কিন্তু [illegible]ই মহাশক্তির শক্তিতে শক্তিমান্ হইবার চেষ্টা না করিয়া, অহঙ্কার-প্রভাবে স্বীয় [illegible]ক্তিকে প্রাধান্য দিয়া, সেই মহাশক্তিকে তাহার অধীন করিতে চাহে। মানব যখন [illegible]রূপ করিতে যায়, তখনই তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। বিকৃত আত্ম-শক্তিতে [illegible]ধান্য দেওয়াতেই, সংসারে এত অশান্তি। বিশ্বনিয়ন্তা যে মূলমন্ত্র দ্বারা এই [illegible]শ্বর পরিপালন করিতেছেন, সেই মন্ত্রই মানবের ইষ্ট-মন্ত্র হওয়া আবশ্যক, এবং যে [illegible]ক্তি সেই মন্ত্রকে যতদূর স্বীয় ইষ্ট-মন্ত্র করিতে পারে, তাহার জীবন ততদূর ফল-[illegible]হয়। বিগত ৬ ছয় বৎসর ধরিয়া আমরা হিন্দু ধর্ম্ম, হিন্দু-শাস্ত্র, এবং হিন্দু-[illegible]জর পরিচর্য্যা করিয়া আসিতেছি। আমাদের বিকৃত ব্যক্তিগত ইচ্ছা আপনাকে [illegible]সামান্যভাবেও বিশুদ্ধ বিশ্বজনীন-ইচ্ছার অধীন করিতে পারিয়াছে কিনা

মহাশক্তি আমাদের জীবনের একমাত্র আদর্শ। কার্য্য-সফলতা ভগবানের হস্তে, কর্ম্ম সম্পাদনই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য; এবং সেই কর্ত্তব্য হইতে আমরা কখন ভ্রষ্ট না হই, ইহাই ভগবানের নিকট আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

হিন্দু-জাতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া অনেক সময়ে নৈরাশ্য-তিমিরে হৃদয় আচ্ছন্ন হয়, কিন্তু আশা-রবি ক্ষণকাল মধ্যে উহা ধ্বংশ করিয়া হৃদয় আনন্দে উদ্ভাসিত করে। যখনই দিশা হারা হইয়া, "কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়" হই, যখনই সহস্র সহস্র বিপদ আসিয়া চিত্তকে ব্যাকুল করে, তখনই যেন হৃদয়াকাশে "দৈব-বানী" নির্ঘোষিত হয় "ভয় নাই; এ প্রাচীন জাতি বিলুপ্ত হইবে না"। ভারতের ধর্ম্মনিষ্ঠাই উক্ত দৈব-বাক্যের প্রতি আস্থা স্থাপন করায়। ভারতবর্ষ যতই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হউক না কেন, ভারতবর্ষ এখনও ঈশ্বরকে বিস্মৃত হয় নাই, এবং নানাবিধ অবর্ম্মাচরণের মধ্যেও এই জ্বলন্ত জাতীয় আস্তিকতা এই জাতির ভবিষ্যৎ অভ্যুত্থানের একমাত্র আশা ও অবলম্বন; এবং সেই আশা-সূত্র ধরিয়াই হিন্দু-পত্রিকা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণা। দিন দিন হিন্দু-পত্রিকার কার্য্য-ক্ষেত্রও প্রসারিত হইতেছে। হিন্দু-পত্রিকার পাঠক, গ্রাহক, অনুগ্রাহকগণ সকলের নিকটেই আমরা ঋণী; তাঁহাদের অনুগ্রহে হিন্দু-পত্রিকা নানাবিধ বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া, আপাতঃ নীরস কেবল মাত্র শাস্ত্রাদির বিষয় আলোচনা করিয়াও ৬ষ্ঠ বর্ষ অতিক্রম করতঃ, ৭ম বর্ষে পদার্পন করিল।

হিন্দু-পত্রিকাই ব্রহ্মচারি-আশ্রম এবং ব্রহ্মচারিন্ নামক ইংরেজী ধর্ম্ম বিষয়ক মাসিকপত্রের প্রসূতি, এবং ভগবৎ কৃপায় নবজাত শিশুদ্বয়ও এই অল্পকাল মধ্যে স্বদেশ-সেবায় স্বীয় জননীর ন্যায় দেশের সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতেছেন। ব্রহ্মচারি-আশ্রমের গতবর্ষের বিস্তৃত কার্য্য-বিবরণ শীঘ্র স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়া, সাধারণ্যে প্রচারিত হইবে।

হিন্দু-পত্রিকার পাঠকগণের নিকট প্রার্থনা যে, তাঁহারা যেন ব্রহ্মচারি-আশ্রমের প্রতিও কৃপা-কটাক্ষ পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ন রাখেন।

উপসংহারে ভগবানের নিকট আমরা এই প্রার্থনা করি, যে তাঁহার কৃপায় যেন হিন্দু-পত্রিকা ও হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহকগণ স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের সেবায় পূর্ব্ববৎ নিযুক্ত থাকেন।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২৫ আইন মতে রেজিষ্টীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা। | বৈশাখ। | ১৩০৭ সাল, ১৮২২ শকাব্দা।

তত্ত্বান্বেষণ।

(সূচনা).

সনাতন আর্য্যসম্প্রদায়ের কিয়দংশ শাখানদীর ন্যায় মাতৃ-ক্রোড়চ্যুত হইয়া দিগ্দিগন্তে প্রধাবিত হইয়াছে; কিন্তু পুনরায় জননীর পবিত্র অঙ্কে স্থান না পাইয়া, নূতন সম্প্রদায়ের সুখ-সমৃদ্ধি অনুভব করিয়াও, মাতৃদ্রোহী পরশুরামের ন্যায় সন্তপ্ত হৃদয়ে কাল যাপন করিয়া আসিতেছে। ধর্ম্মবিশেষাবলম্বীর স্বীয় ধর্ম্মমতের গূঢ় মর্ম্ম অজ্ঞাত থাকাই ধর্ম্ম-বিপ্লবের মূল। আজকাল আর্য্য-ধর্ম্ম-তত্ত্ব শিক্ষিতমণ্ডলী-মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে আলোচিত ও অনুশীলিত হওয়াতেই, পূত-জাহ্নবী-বারি-বিধৌত—প্রাচীন ব্রহ্মনিষ্ঠ আর্য্যঋষিগণ-পরিসেবিত ভারতবর্ষে ধর্ম্ম-বিপ্লবের বিকট মূর্ত্তি ক্রমশঃ প্রশান্তভাব অবলম্বন করিতেছে। সমাজের উপস্থিত অবস্থায় যাজক ও অধ্যাপক-পরিষদ যদি ধর্ম্মের নিগূঢ় আলোচনায় প্রবৃত্ত ও সমাজ মধ্যে তদ্বিবরণে বদ্ধপরিকর হন, তাহা হইলে আশা করা যায়, ধর্ম্মতত্ত্বের বিমলালোকে সমুদ্ভাসিত আর্য্যসন্তানের হৃদয়-দর্পণ হইতে ধর্ম্ম-সংশয়ের ভীষণ ছায়া নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া, ধর্ম্মানুশীলন তাঁহাকে নব-জীবনে অনুপ্রাণিত করিয়া, সমাজের আদর্শ-স্থানীয় করিয়া তুলিবে।

সূচিভেদ্য ঘনান্ধকারে দিঙ্মণ্ডল কিয়ৎ-কাল পর্য্যন্ত সমাচ্ছন্ন থাকিলে, ক্ষণস্থায়ী ক্ষণপ্রভার ক্ষীণালোক-রেখাতেও চিত্ত যেরূপ প্রসন্ন ভাব অবলম্বন করে, জটিল সংশয়জালে জড়িত মানব-হৃদয়ও সংশয়-বিশেষের আংশিক নিরাসেও তদনুরূপ প্রসন্নতা অবলম্বন করে। মনুষ্য-জগতে একের প্রতি অপরের সাপেক্ষত্বই সমাজ-বৃক্ষের বীজ, সুখ-সৌকার্য্য তাহার ফল মাত্র। (সমাজ গঠনের মূল তত্ত্ব নির্ব্বাচন করা উপস্থিত প্রবন্ধের উদ্দেশ্য না হইলেও, উদ্দিষ্ট প্রস্তাবের বোধ-সৌকর্য্যার্থে কথাটা একটু বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক). মনুষ্য-জীবন

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত পরনির্ভরতার একটী বিস্তৃত আখ্যায়িকা মাত্র। সামাজিক মানুষ যতই কেন চেষ্টা করুন না, এরূপ সময় তাঁহার জীবনে কখনও আসিবে কিনা জানি না, যে সময়ে তিনি মুহূর্ত্তের জন্য ভাবিতে পারিবেন, "আমি অন্যের অপেক্ষা রাখিনা'। নিরপেক্ষ স্বাবলম্বন আমাদিগের মতে কবি-কল্পনা মাত্র। এই অন্তর্নিহিত অপরিহার্য্য পরাপেক্ষিণীবৃত্তিই আমাদিগকে প্রভুভক্ত ভৃত্যের ন্যায় পরতুষ্টি-সাধনরূপ মহৎ ব্রতে ব্রতী করিয়াছে। মানব যখন ধর্ম্মবিপ্লবের উদ্বেল তরঙ্গে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্যমান বা কূট ধর্ম্মতত্ত্বের মীমাংসায় অসমর্থ হইয়া চিত্ত-ক্ষোভকর সংশয়-দোলায় দোদুল্যমান, যখন একটি মাত্র সংশয়-বিমোচনে তাঁহার হৃদয় পবিত্র স্বর্গীয়সুখে সমুল্লাসিত হয়, সমাজের এই অবস্থায় সামাজিক ভ্রাতার নিকট ধর্ম্মতত্ত্বের নিগূঢ় অর্থ বিজ্ঞাপিত করিয়া, পরম পবিত্র লোকহিতকর ব্রতসম্পাদনে তৎপর হওয়া প্রত্যেক মনুষ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্ত্তব্য।

সংশয়-বৃক্ষ মানব-হৃদয়-ক্ষেত্রে নানা কারণে পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে। শোক-তাপ-দুঃখ-দারিদ্র্যদগ্ধ মানবহৃদয়ে ধর্ম্ম-সংশয়ের অঙ্কুর স্বতঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ব্যক্তিবিশেষের ধর্ম্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞতার সে তাহাতে কাণ্ড-প্রকাণ্ড সমু-বিশেষে ধর্ম্মদ্বেষীর পৌনঃপুনিক ক্রমশঃ বর্দ্ধিত কলেবরে ভীব-হীরুহ রূপে পরিণত হয়। পুষ্ট হইয়া এই বিষবৃক্ষের প্রসারিত না হয়, তদ্বিষয়ে সতত সচেষ্ট থাকা প্রত্যেক মানবেরই একান্ত কর্ত্তব্য। নচেৎ ভীষণ ধর্ম্ম-সংশয়ের মর্ম্মস্পর্শী দংশনে জর্জ্জরীভূত হইয়া জীবন অশান্তির ক্রীড়াস্থল হইয়া উঠে।

আজকাল ধর্ম্ম সম্বন্ধে দুই একটি কথা লোকমুখে প্রায়ই শুনা যায়; তাহাতে মনে স্বতঃই আশার সঞ্চার হয়, বুঝি সমাজ মধ্যে ধর্ম্মালোচনা বহুল পরিমাণে আরব্ধ হইয়াছে। কিন্তু সমাজের প্রতি একটু সতর্কদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই, আশা-কুহকিনীর সে কুহক অচিরেই ভাঙ্গিয়া যায়। কোন কোন উচ্চ শিক্ষিতের সহিত ধর্ম্মের স্থূল বিষয়ের আলাপ করিয়াও তাঁহাদিগের অনভিজ্ঞতা দর্শনে মর্ম্মাহত হইতে হয়। ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ভগবদ্গীতা ও ভাগবত, এই দুইখানি প্রসিদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে কোন পার্থক্য আছে কিনা, তাহা পর্য্যন্ত অবগত নহেন, গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য বিষয় ত দূরের কথা! চিত্তের সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ সাধনকে যদি যথার্থ শিক্ষা বলা যায়, তাহা হইলে ঈদৃশ অপুষ্ট ধর্ম্মপ্রবৃত্তিমান্ উচ্চশিক্ষিতের শিক্ষাকে অপশিক্ষা বা অসম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যতীত আর কি বলিব? আমাদিগের শিক্ষা যে সমস্ত বিদ্যালয়ে সম্পাদিত হইয়া থাকে, সেখানে ধর্ম্মানুশীলনের কোনও বিধান নাই। পিতামাতাও বিদ্যালয়ের উপর শিক্ষাবিষয়ক সমস্ত ভার ন্যস্ত করিয়া সন্তানের প্রতি ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া হইতে বিরত থাকেন; সুতরাং আমাদিগের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি পরিপুষ্ট না হইয়া, দিন দিন ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিয়া, আমাদিগকে কতকটা নাস্তিক ও [illegible]

করিয়া দেয়। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আন্দোলনে প্রায়শঃ যে উচ্চশিক্ষিতদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করিতে দেখা যায়, প্রাথমিক ধর্ম্মানুশীলনের অভাবই ইহার মূল কারণ। সামাজিক জীবের সমস্ত বিষয়ে সহানুভূতিই সমাজের জীবন; কিন্তু ধর্ম্ম-বিষয়ে শিক্ষিতসম্প্রদায়ের সহানুভূতির অভাবই সমাজের অঙ্গহানি সম্পাদন করিয়া, সমাজ-শরীরে নানাবিধ ভ্রষ্টাচার প্রবেশ করাইতেছে। তাহাতে সমাজবন্ধন দিন দিন যেরূপ শিথিল হইয়া আসিতেছে, সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই তাহা অনুভব করিতেছেন। এক ধর্ম্মানুশীলনের অভাবেই সামাজিক জীবনের সহিত আমাদের নৈতিক জীবনও দিন দিন ভ্রষ্ট হইয়া যাইতেছে।

ধর্ম্মবিধি যে রাজ ও সমাজবিধি অপেক্ষা প্রবলতর, তাহা প্রত্যেক মানবেরই অনুভব-সিদ্ধ। রাজা ও সমাজের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, কিন্তু ধর্ম্মের সূক্ষ্ম-দৃষ্টি সর্ব্বব্যাপক; সুতরাং সে চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ মনুষ্য-চেষ্টায়ত্ত নহে। কথাটা একটু বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। কেহ রাজবিধি অতিক্রম করিয়াছে, জানিতে পারিলেই, রাজা তাহার সমুচিত দণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন; এবং যাহাতে কোন অপরাধী তাঁহার চক্ষু অতিক্রম করিতে না পারে, এইজন্য তিনি বহু-সংখ্যক রাজপুরুষ ও বিচারালয়ে দেশ সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু এত সতর্কতা, এত দূরদৃষ্টি সত্ত্বেও অপরাধী দিন দিন বিচার-মঞ্চ হইতে সানন্দে অবতরণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। আবার শত শত রাজবিধিলঙ্ঘনকারীকে রাজপুরুষের চক্ষুগোচর হইতে পর্য্যন্ত দেখা যায় না। পক্ষান্তরে, সমাজই আমাদিগের নৈতিক জীবনের নেতা; অতএব নৈতিক পদস্খলনের প্রতি সমাজ খড়্গহস্ত। কিন্তু সমাজের সাগ্রহ দৃষ্টিও অতিক্রম করিয়া দিন দিন কত শত নীতিবিগর্হিত আচরণ সংসাধিত হইতেছে, তাহা সামাজিক মাত্রেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। কিন্তু ধর্ম্মবিধির সীমা অতিক্রম করিয়া, ধর্ম্মনিয়ন্তার চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করতঃ সেই অপরাধোচিত দণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভ করা কোন মতেই যুক্তি বা অনুভবসিদ্ধ নহে। ধর্ম্ম-জগতের নিয়ামক অচিন্ত্যশক্তি বিশ্বপাতা স্বয়ং জগদীশ্বর। পরম কারুণিক এই শাসনভার সমাজ বা রাজশক্তির ন্যায় অসম্যগ্দর্শীর হস্তে অর্পণ না করিয়া, নিজের সর্ব্বব্যাপকতা ও সর্ব্বজ্ঞতাশক্তির অধীন রাখিয়াছেন। তিনি জাগতিক কার্য্য-পরম্পরা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিয়া পরিমাণানুযায়ী সুকৃত বা সৎকার্য্যের পুরস্কার ও দুষ্কৃত বা পাপের দণ্ডবিধান করিয়া, অনতিক্রমনীয় অভ্রান্ত-বিচারে বিশ্বসংসারের শাসন-দণ্ড পরিচালিত করিতেছেন। দণ্ড-পুরস্কারের ভোগ জীবন-ব্যাপক সময় মধ্যে শেষ না হইলে, পরলোক বা পরজন্মেও কৃতকার্য্যের অবশ্যম্ভাবী ফল প্রসারিত হইয়া থাকে। এই অতিক্রম সম্ভাবনার অভাববশতই ধর্ম্মবন্ধন একইভাবে জগৎ-সূচনা হইতে আজ পর্য্যন্ত অপ্রতিহত প্রভাবে মনুষ্যহৃদয়ে বিরাজমান। সুতরাং আমাদিগের জীবন সৎপথে পরিচালিত করিতে, কি রাজবিধি, কি সামাজিক বা নৈতিকবিধি, সকলেই ইহার নিকট পরাস্ত

এইরূপ বিচারপরম্পরা দ্বারা আমরা ধর্ম্মানুশীলনের অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। এক্ষণে বিবেচ্য, কি উপায় অবলম্বনে ধর্ম্ম সুচারুরূপে অনুশীলিত হইয়া, মনুষ্যজীবনকে সম্পূর্ণ ধর্ম্মজীবনে পরিণত করিতে পারে। আমাদিগের শিক্ষারম্ভের প্রথম বিদ্যালয় মাতৃক্রোড়। সর্ব্বপ্রথমে মাতা, পরে পিতা, অর্থাৎ সেই জগৎপূজ্য সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপ আদিগুরু জনক-জননী দ্বারা শিক্ষা-বীজ আদৌ উপ্ত হইয়া অঙ্কুরিত হয়; কালে তাহাই সমাজ-সাহায্যে ও ব্যক্তিগত চেষ্টায় বহুদূর প্রসারিত হইয়া জগৎপাতার স্বর্গস্থিত-চরণ-স্পর্শনোম্মুখ হয়। যাহাতে আমাদিগের চিরজীবন সুখে অতিবাহিত হয়, পিতামাতা আমাদিগকে তদনুরূপ শিক্ষা দিয়া থাকেন। অনেকে ধর্ম্ম-শিক্ষার অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি না করিয়া ভ্রান্তিবশতঃ শিক্ষার বিভিন্ন পথ অবলম্বন পূর্ব্বক ফল-বৈপরীত্যদর্শনে অনুতপ্ত হন। অপরাপর শিক্ষাদানের মধ্যে, পিতামাতার প্রধান কর্ত্তব্য, সন্তানকে ধারণার উপযুক্ত ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া, তাহার পরিণাম-জীবনকে সুখময় ও শান্তিময় করিয়া দেন। মাতৃস্তন্যের সহিত শিশুহৃদয়ে ধর্ম্মশিক্ষা প্রবেশ লাভ করিলে, সে শিক্ষা ক্রমে সুবদ্ধমূল হওয়ায় তাহার জীবন শান্তিদেবীর লীলাক্ষেত্র হইয়া উঠে।

আমাদিগের শিক্ষার দ্বিতীয়স্থল বিদ্যামন্দির। বিদ্যালয়ে অন্যান্য শিক্ষার সহিত ধর্ম্মশিক্ষা একান্ত বাঞ্ছনীয় হইলেও, আক্ষেপের বিষয় [illegible] ধর্ম্মানুশীলন সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়া থাকে; আজকাল অধিকাংশ বিদ্যালয়ই দেশীয়দিগের অধ্যক্ষতায় পরিচালিত। তাঁহাদিগের দ্বারা অনায়াসে ছাত্রবর্গের ধর্ম্মানুশীলনের সুবিধি সংস্থাপিত হইতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিতে দেখিয়া, আমরা মর্ম্মাহত হই। আমরা বালক-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মানুশীলনের প্রয়োজনীয়তাবিষয়ে তাঁহাদিগকে গূঢ়রূপে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। আশা করি, এই চিন্তার ফলে, ধর্ম্মানুশীলন অচিরেই তাঁহাদিগের বিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করিয়া সমাজের মহদুপকার সাধনে তৎপর হইবে। *

আমাদিগের শিক্ষার তৃতীয়স্থল সমাজ। প্রথম হইতেই সমাজ আমাদিগের শিক্ষাকার্য্যে সহায়তা করিলেও, এই সময়ই শিক্ষাদানের সমস্ত ভারই নিজে গ্রহণ করেন। সমাজে ধর্ম্ম-শিক্ষার ভার সর্ব্বদেশেই ধর্ম্মযাজকের উপর ন্যস্ত। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে যাজকেরা রাজকোষ হইতে বৃত্তি পান, তাই তাঁহারা জীবনযাত্রা বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিয়া স্বদেশে বিদেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন। আমরা খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী নহি, সুতরাং আমাদিগের অভাব তাঁহাদিগের দ্বারা পূরিত হওয়া দূরে থাকুক, বিদ্বেষবুদ্ধিবশতঃ বরং তাঁহারা আমাদিগের ধর্ম্মমতের উপর কতকগুলি কাল্পনিক দোষারোপ করিয়া আমাদিগের মস্তিষ্ক বিলোড়িত করিয়া দেন। দেশীয় ভূস্বামী ও

* বারাণসীর সেণ্ট্রাল হিন্দু-কলেজ ও কলিকাতার আর্য্যমিশন-ইন্‌ষ্টিটিউশনকে এ বিষয়ে অগ্রণী হইতে দেখিয়া আমরা আনন্দিত। [illegible]

ধনাঢ্যব্যক্তিগণ ধর্ম্মালোচনার অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা অবধারণে সম্পূর্ণ উদাসীন। নচেৎ আমরা তাঁহাদিগকে যাজকদিগের বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া ধর্ম্মানুশীলন বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিতে দেখিতাম। এবম্বিধ নানারূপ অসুবিধা সত্ত্বেও আমাদিগকে ধর্ম্মচর্চ্চা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। সমাজ মধ্যে সামাজিকগণের সমবায়-সংগঠিত সভা-সংস্থাপন ধর্ম্মালোচনার প্রধান সুযোগ। এ রীতি কতকটা বৈদেশিক হইলেও, আমাদিগের উপস্থিত সামাজিক অবস্থায় ধর্ম্মানুশীলনের উপায়ান্তর অভাবেই নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ সভার অন্ততঃ সাপ্তাহিক অধিবেশনেও ব্যক্তিগত ধর্ম্মপ্রবৃত্তি পরিমার্জ্জিত হইয়া স্বাধীন ধর্ম্মচিন্তার উপযোগী হইয়া উঠে। ধর্ম্মসমিতির ঈদৃশী লোকহিতৈষিণীশক্তি অনুভব করিয়া, সমাজ-শুভানুধ্যায়ী মাত্রেই বোধহয় ইহার বৈদেশিক-জাতীয়ত্ব ক্ষমা করতঃ সাদরে সমাজমধ্যে স্থান দিয়া সমাজের পুষ্টি ও ধর্ম্মালোচনার প্রসার সম্পাদন করিতে উদাসীন থাকিবেন না। এইরূপ সমিতি সংগঠিত হইলে, ধর্ম্ম সংশয়ের নিরাস ও মতপার্থক্যের মীমাংসা করিবার জন্য একজন ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ শাস্ত্রদর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তিকে আচার্য্যপদে সংস্থাপন করিলে ধর্ম্ম-চিন্তার পথ ক্রমশঃ সুগম হইয়া আইসে, এরূপ আশা করা যায়। আমাদিগকে এইরূপ মতের পোষকতা করিতে দেখিয়া, হয়ত অনেক পুরাতন-প্রিয় স্থিতিশীল সমাজনেতা আমাদিগের উপর বিরক্ত হইতেছেন। আমরা তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি যদি তাঁহারা ধর্ম্মানুশীলনের ইহা অপেক্ষাও সুখসাধ্য রীতি সমাজমধ্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া ধর্ম্মালোচনা অপ্রতিহতরূপে প্রবহমান রাখিতে পারেন, তাঁহারা লোক-সাধারণের ধন্যবাদভাজন ও পূজ্যস্থানীয় হইবেন। আমরাও সমাজের ঈদৃশ সংস্কৃত অবস্থা দেখিবার জন্য একান্ত ব্যগ্র।

ধর্ম্মের উৎকর্ষসাধনেই মানব-জীবনের পূর্ণতা সম্পাদিত হয়, এবং এইরূপ সম্পূর্ণ মানবই ঈশ্বর-সামীপ্যলাভে সমর্থ হন;—অর্থাৎ ঈশ্বরে ও তাঁহাতে আর বহুদেশ-ব্যাপী ব্যবধান থাকে না। তিনি জগতের প্রত্যেক কার্য্যেই জগৎকর্ত্তার সত্তা অনুভব করিয়া বিমলানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। আমাদিগের আর্য্যশাস্ত্রকারেরা এই অবস্থাকে মুক্তির অবস্থা-বিশেষ বলিয়াছেন—

যংলব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা; ৬ অঃ ২২।

বলা বাহুল্য, মানব-প্রাণ এই অবস্থায় উপনীত হইবার জন্য লালায়িত। এই অন্তর্দ্দাহী তৃষ্ণাবেগ সহনে অক্ষম হইয়াই, ইহারই পরিতৃপ্তিবাসনায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্যমান হওয়ায়, নয়নাকর্ষক মরীচিকার মোহজাত প্রবর্দ্ধিত-পিপাসা মানবগণকে জীবন-কালব্যাপী হতাশায় নিক্ষেপ করিতেছে। তাই বলিতেছিলাম, সমাজ সেই ধর্ম্ম-প্রস্রবণ-ক্ষরিত জ্ঞানবারি পরিপূরিত শান্তি-হ্রদের পথপ্রদর্শক হইয়া, শত শত হৃদয়ের উৎকট তৃষ্ণা অপনয়ন করিয়া, যথার্থ লোকহিতসাধনে তৎপর হন, ইহাই আমাদিগের ঐকান্তিক প্রার্থনা এবং [illegible]ই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের

অবতারণা। দীর্ঘতার আশঙ্কায় বক্তব্য বিষয়ে কেবল ইঙ্গিত মাত্র করা হইয়াছে, স্থানবিশেষে অপেক্ষাকৃত অল্প চিন্তাশীল পাঠকদিগের জন্ত নিতান্ত আবশ্যক বোধে একটু বিবৃত করিতে হইয়াছে। প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া, পাঠকগণ বোধহয় এ দোষগুলি ক্ষমা করিবেন।

শ্রীললিত মোহন মুখোপাধ্যায়। বারাণসী।

ভূ-গোলপরিচয়।

উপক্রমণিকা।

অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্ত-জগদাধার-মূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥

ব্রহ্মচারিগণ! তোমরা বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছ। কেহবা বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নের সোপানে দণ্ডায়মান। তোমরা জানিতেছ—

শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং
জ্যোতিষন্তথা।
ছন্দশ্চেতি ষড়ঙ্গানি বেদানাং বৈদিকা বিদুঃ॥
শব্দরত্নাবলী।

শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, নিরুক্ত এবং জ্যোতিষ, বেদের অঙ্গভূত এই ছয়টি শাস্ত্র বেদের সঙ্গে সঙ্গে অধ্যয়ন করিতে হয়। ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না যে, ষড়ঙ্গশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা ব্যতীত বেদার্থ বোধে অধিকার জন্মে না। তোমরা জানিতেছ—

যথা শিখা ময়ূরাণাং নাগানাং মণয়ো যথা।
তদ্বদ্বেদাঙ্গ শাস্ত্রাণাং গণিতং মূর্দ্ধনিস্থিতং॥
মনুঃ।

মহর্ষি মনুর মতে ষড়ঙ্গ মধ্যে গণিত বা জ্যোতিষশাস্ত্রই প্রধান।

তোমরা জানিতেছ—

বেদস্য নির্ম্মলং চক্ষুঃ জ্যোতিঃশাস্ত্রমকল্মষং
বিনৈতদখিলং শ্রৌতং স্মার্ত্তং কর্ম্ম ন সিদ্ধ্যতি॥
তস্মাজ্জগদ্ধিতায়েদং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা
অতএব দ্বিজৈরেতদধ্যেতব্যং প্রযত্নতঃ।
নারদঃ

দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন, জ্যোতিষ পাঠ দ্বিজগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। জ্যোতিষ বিনা বেদবিহিত ও স্মৃতিবিহিত ক্রিয়াকলাপ কদাচ নিষ্পন্ন হইতে পারে না; এজন্য স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মসিদ্ধান্ত নামক জ্যোতিষ-গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

তোমরা জানিতেছ—

জ্যোতিশ্চক্রন্তু যো বেদ স যাতি
পরমাং গতিং। গর্গঃ

মহর্ষি গর্গ বলিয়াছেন, জ্যোতিষজ্ঞ পণ্ডিত পরম গতি লাভ করেন। সুতরাং জ্যোতিষ পাঠ যে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, তাহা বিস্তারিত বলিবার প্রয়োজন নাই।

প্রাচীন গণিত বা সিদ্ধান্ত কতগুলি ছিল, তাহার নির্ণয় করা কঠিন। যে ২১৪ খানি প্রচলিত আছে বা উদ্ধরণ উপলক্ষ্যে যাহাদের নাম উল্লেখ গ্রন্থান্তরে দৃষ্ট হয়, তাহাদের সংখ্যা বিংশতির অধিক নহে; যথা—

১। ব্রহ্মসিদ্ধান্ত। ২। নারদসিদ্ধান্ত।
৩। মরিচ সিদ্ধান্ত। ৪। কশ্যপসিদ্ধান্ত।
৫। সূর্য্যসিদ্ধান্ত। ৬। মনুসিদ্ধান্ত।
৭। অঙ্গিরা সিদ্ধান্ত। ৮। বৃহস্পতিসিদ্ধান্ত।
৯। অত্রিসিদ্ধান্ত। ১০। সোমসিদ্ধান্ত।
১১। পুলস্ত্যসিদ্ধান্ত। ১২। বশিষ্ঠসিদ্ধান্ত।

১৩। পরাশরসিদ্ধান্ত। ১৪। ব্যাসসিদ্ধান্ত
১৫। ভৃগুসিদ্ধান্ত। ১৬। চ্যবনসিদ্ধান্ত।
১৭। গর্গসিদ্ধান্ত। ১৮। পুলিশসিদ্ধান্ত।
১৯। লোমশসিদ্ধান্ত। ২০। যবনসিদ্ধান্ত।

আধুনিক সিদ্ধান্ত।

১। আর্য্যভট্টকৃত আর্য্যসিদ্ধান্ত।
২। বরাহমিহিরকৃত পঞ্চসিদ্ধান্তিক।
৩। ব্রহ্মগুপ্ত-কৃত ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত।
৪। মুনীশ্বর কৃত সিদ্ধান্ত সার্ব্বভৌম।
৫। মাধবাচার্য্য কৃত সিদ্ধান্তচূড়ামণি।
৬। ভাস্করাচার্য্য কৃত সিদ্ধান্তশিরোমণি।
৭। কালিদাস কৃত রাশিচক্রনিরূপণ।
৮। ... ... রত্নমালা।

টীকাকার জ্যোতিষিক।

পৃথুদকস্বামী, নৃসিংহ দৈবজ্ঞ, শ্রীধর, বিশ্বনাথ, কেশব, গণেশ, শ্রীপতি।

১ম পাঠ। ১ম প্রপাঠক।

জ্যোতিষ শাস্ত্র।

যে শাস্ত্রে বিশ্ব-গোলকের গঠন ও গোলক-ব্রহ্মাণ্ডের জ্যোতিষ্কগণের সংখ্যা, আকার প্রকার, অণুরাশি (Mass), আকর্ষণ, স্থিতি আদি বর্ণিত হয়—এবং যে শাস্ত্রবলে জ্যোতিষ্কগণের দৃশ্য ও প্রকৃত স্থিতি, দূরত্ব, গতি ও কক্ষাদি গণনা দ্বারা নির্ণীত হয়, যে শাস্ত্রবলে সময় গণনা ও কালনির্ণয় হয়—যে শাস্ত্রবলে অন্তরীক্ষের দৃশ্য ঘটনাগুলির কারণ নির্ব্বাচিত হয় এবং যে শাস্ত্রবলে জ্যোতিষ্কগণের পরস্পরের সম্বন্ধ ও প্রকৃতির উপর জ্যোতিষ্কগণের ক্রিয়া মীমাংসিত হয়, সেই শাস্ত্রকে "জ্যোতিষশাস্ত্র" বলে এবং যে শাস্ত্রে জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের গতির ও ঘটনার মূল কারণ আলোচিত হয়, সেই শাস্ত্রকে জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত বলে। (১)

১ম পাঠ, ২য় প্রপাঠক।

ভূ-গোল।

দিবাভাগে নির্ম্মল প্রশস্ত প্রান্তরে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিবে, পৃথিবী-পৃষ্ঠ একটী চক্রাকার সীমা দ্বারা পরিবেষ্টিত; এবং তোমার মস্তকের উপরে কটাহ-আকারের আকাশ ঝুলিয়া ঐ সীমা পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। ঐ চক্রাকার ভূমিস্থলকে চক্রবাল (Sensible Horizon) বলে, এবং ঐ কটাহ মধ্যগত বিন্দু ঠিক্ তোমার মস্তকের উপরিভাগে আছে: ঐবিন্দু তোমার "খ" বিন্দু (Zenith) তোমার চক্রবালের উত্তরবিন্দু ও দক্ষিণবিন্দু এবং খ বিন্দু সংযোগ করিয়া একটী রেখা টানিলে দেখিবে, রেখাটি একটি বৃত্তপরিধির অর্দ্ধভাগ, এবং ঐ রেখার নাম তুঙ্গরেখা (Meridian)। পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে তোমার সমসূত্রে দণ্ডায়মান দর্শক দেখিতেছেন যে, পৃথিবী-পৃষ্ঠে তাঁহার দৃষ্টিস্থল ঐরূপ চক্রাকার সীমাদ্বারা পরিবেষ্টিত, এবং তাহার মস্তকের উপরে কটাহ আকারের আকাশ ঝুলিয়া ঐ সীমা পর্য্যন্ত পড়িয়াছে, এবং সেই দর্শকের চক্রবালের উত্তরবিন্দু, দক্ষিণ বিন্দু এবং সেই দর্শকের খ বিন্দু সংযোগ করিয়া তুঙ্গরেখা টানিলে, ঐ তুঙ্গরেখা

---

(১) হিন্দুগণ জ্যোতিষশাস্ত্র ৩ভাগে বিভক্ত করেন)
প্রশ্নরত্ন টীকাকার বলেন—
পঞ্চস্কন্ধমিদং শাস্ত্রং হোরাগণিত সংহিতা।
কেরলি শকুনকৈর প্রবদন্তি মনীষিণঃ।

বৃত্তপরিধির অর্দ্ধেক হইবে। তোমার আকাশ-কটাহ ও অপর দর্শকের আকাশ যোড়া দিলে একটী বৃত্তময় বর্ত্তুলাকার গোলক হইবে(১) এই গোলকের নাম বিশ্বগোলক বা গোলক-ব্রহ্মাণ্ড (Celestial Sphere) এবং ঐ গোলকের কেন্দ্রে গোলাকার পৃথিবী শূন্যে অবস্থিত। (২) ঐ গোলকের পৃষ্ঠদেশ চন্দ্র সূর্য্য-তারাগণ প্রভৃতি অগণ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলে পরিবৃত ও পরিশোভিত। ঐ জ্যোতিষ্ক পরিশোভিত গোলক-পৃষ্ঠকে ভ-গোল বলে। সূর্য্যের উদয়ে আকাশ-কটাহের তারাগণ অদৃশ্য হয়; কেবল সূর্য্যকেই দেখা যায়।

ভ-গোলের দৃশ্যগতি।

দিবাভাগে আকাশ-কটাহ পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিবে, সূর্য্য সকালে পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া উঠিতে থাকে; ক্রমে মধ্যদিনে সূর্য্য তোমার তুঙ্গরেখায় উপনীত হইবে এবং বিকালে সূর্য্য ক্রমে নামিয়া অবশেষে সায়ং-সন্ধ্যাকালে সূর্য্য পশ্চিম দিকে অস্ত যাইবে।

সায়ংসন্ধ্যাকালে যথাস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া আকাশ-কটাহ পর্য্যবেক্ষণ করিলে, শুক্ল পক্ষে দেখিবে, অগ্রে চন্দ্র দৃষ্টিগোচর হইবে; তারপর ১৮।২০টী বড় বড় তারা, তৎপরে ২৫। ৩০টী মধ্যম আকারের তারা, পরে তিন সহস্রাধিক ছোট তারা আকাশে ফুটিবে, পরে ক্ষুদ্র২ অগণ্য তারা উঠিয়া পড়িবে। ক্রমে দেখিবে, সচন্দ্র তারাগণ ক্রতগমনে পশ্চিমাভিমুখে চলিতেছে। তোমার পশ্চিম চক্রবালের সন্নিহিত তারাগণ ক্রমে অস্তগত হইতেছে এবং তোমার পূর্ব্বচক্রবালের নিম্নদেশ হইতে তারাকুল চক্রবালের উপরে ক্রমে উঠিতেছে। কেবল উত্তর চক্রবালের উপরিস্থ একটী তারা অচল—অটল স্থিরভাবে রহিয়াছে। তোমার সমসূত্রস্থ এক দর্শকও পশ্চিমবাহিনী তারাস্রোত দেখিতেছেন এবং তাঁহার দক্ষিণ চক্রবালের উপরেও ঐরূপ অচল অটল স্থির এক তারা তিনি দেখিতেছেন। তুমি যে অচল তারা দেখিতেছ, ঐ তারা উত্তর-ধ্রুবতারা, দর্শক যে অচল তারা দেখিতেছেন, ঐ তারা দক্ষিণ-ধ্রুবতারা। তোমার চক্রবালের উত্তর-বিন্দু হইতে উত্তরধ্রুবতারা যত উচ্চ, দর্শকের চক্রবালের দক্ষিণ-বিন্দু হইতে দক্ষিণধ্রুব-তারা ঠিক তত উচ্চ। তুমি দেখিতেছ, যেন সমস্ত তারাগণ উত্তর বা ধ্রুবতারাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। দর্শক দেখিতেছেন যে, সমস্ত তারাগণ দক্ষিণ বা যাম্য ধ্রুবতারা প্রদক্ষিণ করিতেছে। তোমরা উভয়ে দেখিতেছ যে তারা ধ্রুবতারার যত নিকটস্থ, সেই তারার গতি তত মৃদুমন্দ। তোমরা উভয়ে দেখিতেছ যে, চক্রবাল হইতে আপন২ ধ্রুবতারা যত দূর, তাহা অপেক্ষা ধ্রুব হইতে কম দূরে স্থিত তারা অস্ত যাইতেছে না। এবং যে তারাগণ অস্ত যাইতেছে, পরদিন সায়ংসন্ধ্যার সময়ে প্রায় স্ব স্ব স্থানে দৃষ্ট হইতেছে। তোমাদের উভয়ের পর্য্যবেক্ষণের ফল এই দাঁড়াইল, যেন ভ-গোল উভয় [illegible]

(১) কটাহ দ্বিতয়স্যেব সম্পুটং গোলকাকৃতিঃ।
সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১২। ১৯

কটাহ দ্বয়ের সম্পুট গোলকের আকৃতি।

(২) মধ্যে সমন্তাদণ্ডস্য ভূ-গোলো ব্যোম্নি তিষ্ঠতি
সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১২। ৩২

ব্রহ্মাণ্ডের ঠিক মধ্যস্থলে পৃথিবী শূন্যে অবস্থিত।

আবদ্ধ হইয়া ক্রমাগত প্রতিদিন এক এক বার ঘুরিতেছে (১) এবং তোমরা উভয়ে পৃথিবী-পৃষ্ঠে স্থির ভাবে রহিয়াছ (১) কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ভ-গোলের কোন দৈনিক গতি নাই, ভ-গোল স্থির। দ্রুত-গামী মেল ট্রেনে গমন কালে আরোহী যেমন পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষাদির গতি দর্শন করেন, এবং আপনাকে অচল স্থির জ্ঞান করেন, তোমরা অবিরত দ্রুত ঘূর্ণায়মান পৃথিবী-পৃষ্ঠে থাকিয়া সেইরূপ ভ-গোলস্থ জ্যোতিষ্ক-গণকে গতিশীল দেখিতেছ, অথচ পৃথিবী প্রতি বিপলে প্রায় ৮ মাইল হিসাবে হোরায় ৬৪৮০০ মাইল চলিতেছে। পৃথিবীর এই দ্রুত দৈনিক আবর্ত্তন বশতঃ ভ-গোলের জ্যোতিষ্কগণের দৈনিক উদয়-অস্ত দেখিতেছ মাত্র। ২।

---

(১) সূর্য্য সিদ্ধান্তে ভ-গোলের দৃশ্য গতি সম্বন্ধে লিখিত আছে যে—ভ-চক্রং ধ্রুবয়োর্ব্বদ্ধমাক্ষিপ্তং প্রবহানিলৈঃ।

পর্য্যেত্যজস্রং। সূর্য্যসিদ্ধান্ত ।১২।৭৩

ভ-চক্র সৌম্য ও যাম্য ধ্রুব দ্বয়ে আবদ্ধ থাকিয়া প্রবহ নামক বায়ু দ্বারা তাড়িত হইয়া সতত ঘূর্ণায়মান হইতেছে।

(২) সূর্য্য সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা স্থলে জ্যোতির্বিবর আর্য্যভট্ট বলিয়াছেন, ভ-পঞ্জরঃ স্থিরঃ। ভূঃ এব আবৃত্য আবৃত্য প্রাতি দৈবসিকং উদয়াস্তং ইষং সম্পাদয়তি গ্রহ-নক্ষত্রাণাং।

ভ-গোল স্থির। পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তন দ্বারা গ্রহ নক্ষত্রগণের দৈনিক উদয় ও অস্ত প্রদর্শিত হয়। ইটালিবাসী সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিবদ্ গেলিলিও (খৃঃ অঃ ১৫৬৪) মহাত্মার বহু পূর্ব্বে মহাত্মা আর্য্যভট্টের আবিষ্কার হয়।

১ম পাঠ।

৩য় প্র-পাঠক।

ভূগোল।

পৃথিবীর উত্তর সীমান্ত বিন্দু হইতে দক্ষিণ সীমান্ত বিন্দু পর্য্যন্ত যে কল্পিত রেখা ভূগোলের কেন্দ্র ভেদ করিয়া অবস্থিত, ঐ রেখার নাম মেরুদণ্ড (axis), মেরুদণ্ড পৃথিবীর কটি দেশস্থ প্রকৃত ব্যাসের সমদীর্ঘ, সুতরাং ৭৯২৬ মাইল লম্বা; পৃথিবীর উত্তর সীমা বিন্দুর নাম উত্তর মেরু, এবং দক্ষিণ সীমা বিন্দুর নাম দক্ষিণ মেরু। পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ প্রান্ত কিঞ্চিৎ চাপা এবং পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ সীমা বিস্তৃত ব্যাস পরিমাণ ৭৯০০ মাইল; সুতরাং মেরুদণ্ড পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ সীমায় ১৩ মাইল হিসাবে ২৬ মাইল বিনির্গত পৃথিবীর এই উত্তরস্থিত বিনির্গত মেরুদণ্ডাংশকে সুমেরু ও দক্ষিণস্থিত মেরুদণ্ডাংশকে কুমেরু পর্ব্বত বলে। (১) এবং উহার বর্ণনায় যথেষ্ট কবিকল্পনা আছে।

---

(১) সূর্য্যসিদ্ধান্তে দেখিবে,

অনেক রত্ন নিচয়ো জাম্বুনদ ময়োগিরিঃ।
ভূ-গোল মধ্যগো মেরুরুভয়ত্র বিনির্গতঃ ॥১২।৩৪

পৃথিবীর উত্তর সীমান্ত বিন্দু হইতে দক্ষিণ সীমান্ত বিন্দু পর্য্যন্ত ভূগর্ভ ভেদ করিয়া পৃথিবীর সারাংশ বা অস্থির ন্যায় যে সুবর্ণ শৈল বাহির হইয়াছে, তাহার নাম মেরু বা মেরুদণ্ড।

এই কনকাচলের নাম লোকালোক পর্ব্বত।

শ্রীমদ্ভাগবত মতে সুমেরু, মন্দর, মেরু মন্দর, সুপার্শ্ব ও কুমুদ, এই চারি পর্ব্বতে পরিবেষ্টিত।

উপরিষ্টাৎ স্থিতাঃ তস্য সেন্দ্রা দেবা মহর্ষয়ঃ।
অধস্তাদসুরাস্তদ্বৎ ॥১।৩৫

ঐ মেরু পর্ব্বতের ঊর্দ্ধ বা উত্তর ভাগকে সুমেরু বলে এবং ঐ সুমেরু ইন্দ্রাদিদেবগণ এবং মহর্ষিগণের নিকেতন, এজন্য সুমেরুর অপর নাম ভূস্বর্গ এবং ঐ মেরু পর্ব্বতের নিম্ন বা দক্ষিণ ভাগস্থ প্রদেশে অসুরগণের আবাসভূমি।

ভূগোলের, যে পরিধি উভয় মেরুর সমদূরে স্থিত, ঐ পরিধিকে নিরক্ষ-রেখা (Equator) বলে। নিরক্ষ-রেখা, ভূগোল উত্তর-দক্ষিণ সমার্দ্ধখণ্ডে বিভক্ত করিতেছে। উত্তর খণ্ডকে উত্তর গোলার্দ্ধ বলে এবং দক্ষিণ খণ্ডকে দক্ষিণ গোলার্দ্ধ বলে (২)।

অবন্তি নগরের দক্ষিণে ঐ নিরক্ষ রেখায় যে বিন্দু, ঐ বিন্দুকে কীলক ধরিয়া, নিরক্ষ-রেখা সম ৪ খণ্ডে বিভক্ত কর এবং ঐ প্রত্যেক খণ্ডের বিবরে এক একটী নগর কল্পনা কর। প্রথম বিন্দু কীলকে ভারত-বর্ষে লঙ্কানগর, লঙ্কানগরের পূর্ব্বে ২য় কীলকে ভদ্রাশ্ববর্ষে যমকোটি নগর। লঙ্কা নগরের পশ্চিমে ৩য় বিবরে কেতুমালবর্ষে রোমক পত্তন এবং লঙ্কানগরের সমসূত্র ৪র্থ বিবরে কুরুবর্ষে সিদ্ধপুর। এই চারি নগরের উত্তরে সুমেরু, দক্ষিণে বড়বানল, মধ্যে কুমেরু। মলদ্বীপের সন্নিহিত লঙ্কানগর, সোসাইটী দ্বীপের নিকট যমকোটি, সেণ্টটমাস দ্বীপের সন্নিহিত রোমক পত্তন এবং কুইটোনগর সন্নিহিত সিদ্ধপুর। ভূপরিধির এক এক পদ অন্তরে গোলবিদ্‌গণ এই ৪টী বিন্দু স্থাপন করিয়াছেন (৩)।

ভ-গোলে সূর্য্য যে চক্রাকার পথে এক বৎসরে একবার পরিভ্রমণ করেন, ঐ পথকে রবিমার্গ বলে। রবিমার্গ বৃত্তের কেন্দ্র ভেদ করিয়া রবিমার্গ-বৃত্তের সমকোণে যে যষ্টি কল্পনা করা যায়, ঐ যষ্টি ভ-গোলের উত্তর ভাগে যে বিন্দু স্পর্শ করে, ঐ বিন্দুকে কদম্ব বলে। এবং ঐ যষ্টি ভ-গোলের দক্ষিণ ভাগে যে বিন্দু স্পর্শ করে, ঐ বিন্দুকে পরকদম্ব বলা যাইতে পারে এবং ঐ যষ্টিকে কদম্ব-যষ্টি বলা যাইতে পারে।

ভ-গোলের যে কটিবন্ধ চক্রাকার রবিমার্গের উত্তর-দক্ষিণ উভয় পার্শ্বে ১০ অংশ করিয়া বিস্তৃত। ঐ চক্রাকার কটিবন্ধরূপ ভ-গোলাংশকে ভ-চক্র বলে। রবি-মার্গ সহ ভ-চক্রকে সমদ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত করিলে, প্রত্যেক খণ্ডকে রাশি বলে। ঐ-রূপ রবিমার্গ সহ ভ-চক্রকে ২৭ ভাগে বিভক্ত করিলে, প্রত্যেক ভাগকে নক্ষত্র বলে। (৪)

কল্পনা দ্বারা পৃথিবীর মেরুদণ্ড উত্তরে ও দক্ষিণে প্রসারিত করিলে, প্রসারিত পার্থিব মেরুদণ্ড ভ-গোলের যে ২

---

(২) ততঃ সমন্তাৎ পরিধিঃ ক্রমেন অয়ং মহার্ণব মেখলে অবস্থিতো ধাত্র্যা দেবাসুর বিভাগকৃৎ ॥১২।৩৬ উত্তর ও দক্ষিণ মেরু হইতে সমদূরে স্থিত মহার্ণব বা সাগর মালা ক্রমে পৃথিবীর পরিধিরূপে মেখলার ন্যায় ভূগোল বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং দেব ও অসুর বংশের অধিকারের সীমান্ত রেখা রূপে বিরাজমান আছে। পৃথিবীর এই সাগর মধ্যস্থ পরিধির নাম নিরক্ষ রেখা। নিরক্ষ রেখার উত্তরস্থ ভূগোলার্দ্ধকে দেবভাগ বলে, এবং দক্ষিণ ভূগোলার্দ্ধকে অসুর ভাগ বলে।

(৩) লঙ্কাকুমধ্যে যমকোটি অস্যাঃ প্রাক পশ্চিমে রোমকপত্তনঞ্চ।

অধস্ততঃ সিদ্ধপুরং সুমেরুঃ সৌম্যে অথ যাম্যে বড়বানলশ্চ ভাস্কর ৩।১৭

কুবৃত্ত পাদান্তরিতানি তানি স্থানানি ষট্ গোল বিদো বদন্তি। ভাস্কর ৩।১৮

(৪) পুরর্ক্ষাদিশুধাম্নাং বিভক্তরাশি সজ্ঞকং। নক্ষত্র রূপিণং ভূয়ঃ সপ্ত বিংশাত্মকং বশী ॥১২।৪৫

বিপরীত বিন্দু স্পর্শ করিবে, ঐ দুই বিন্দুকে ধ্রুব বিন্দু বলে। উত্তরস্থ বিন্দুকে উত্তর বা সৌম্য ধ্রুব বিন্দু বলে এবং দক্ষিণস্থ বিন্দুকে দক্ষিণ বা যাম্য ধ্রুব বিন্দু বলে, এবং উত্তর বিন্দুর সন্নিহিত তারাকে উত্তর ধ্রুব তারা বলে। এবং দক্ষিণ ধ্রুব বিন্দুস্থিত বা দক্ষিণ ধ্রুব বিন্দুর সন্নিহিত তারাকে দক্ষিণধ্রুব তারা বলে। দক্ষিণ ধ্রুব তারা ভারতবাসীগণের দর্শনাতীত বলিয়া ভারতবাসীগণ উত্তর ধ্রুবতারাকে খালি ধ্রুব বলেন।

কদম্ব বিন্দুর ২১° ৩০´ দূরে উত্তর ধ্রুব বিন্দু অবস্থিত, এবং পর কদম্ব বিন্দুর ৩২° ৩০´ দূরে দক্ষিণ ধ্রুব বিন্দু অবস্থিত (১)

আবার ঐরূপে পৃথিবীর পরিধিভুক্ত নিরক্ষ রেখার ক্ষেত্র বা বৃত্ত প্রসারিত করিলে, ঐ বৃত্ত ভ-গোল স্পর্শ করিয়া একটী গোলাকার রেখা ভ-গোলে উৎপন্ন করিবে। ভ-গোলস্থ ঐ গোলাকার রেখাকে বিষুবমণ্ডল বলে। বিষুব রেখা ভ-গোলকে সম দুই খণ্ডে বিভক্ত করিবে। বিষুব রেখার উত্তরস্থিত ভ-গোলার্দ্ধকে উত্তর ভ-গোলার্দ্ধ বলে এবং বিষুব রেখার দক্ষিণস্থিত ভ-গোলার্দ্ধকে দক্ষিণ ভ-গোলার্দ্ধ বলে। বুঝিতে হইবে যে, রবিমার্গের অর্দ্ধভাগ বিষুব রেখার উত্তরে পড়িবে এবং রবিমার্গের অপর অর্দ্ধভাগ বিষুব রেখার দক্ষিণে পড়িবে, এবং রবিমার্গ বিষুব রেখাকে ২ বিন্দুতে কাটিয়া সমদ্বিখণ্ডে বিভক্ত করিবে এবং বিষুব রেখা রবিমার্গকে সেই দুই বিন্দুতে কাটিয়া সমদ্বিখণ্ডে বিভক্ত করিবে। এই দুই বিন্দুকে বিষুববিন্দু বা ক্রান্তিপাত বলে এবং রবিমার্গের উত্তরার্দ্ধের মধ্যবিন্দুকে কর্কট ক্রান্তি বলে এবং রবিমার্গের দক্ষিণার্দ্ধের মধ্য-বিন্দুকে মকরক্রান্তি বলে। পৃথিবী হইতে দর্শক দেখিবেন যে, বিষুবরেখা ভ-গোলে সরলভাবে বিরাজমান, কিন্তু রবিমার্গ সর্পাকৃতি বক্র ও জটিলভাবে বিষুব রেখাকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে।

(১) একটি বৃত্তের পরিধিকে ৩৬০ ভাগে বিভক্ত করিলে, প্রত্যেক ভাগকে অংশ বলে। এবং এক অংশকে ৬০ ভাগ করিলে, প্রত্যেক ভাগকে কলা বলে, ° চিহ্ন অংশ বাচক, ´ চিহ্ন কলা বাচক। " চিহ্ন বিকলা বাচক।

চিন্তা-লহরী।

কি করিতে এলে, কি করিয়া গেলে,
কি ধন লভিলে হায়!
শুধু কি হাসিতে——শুধু কি কাঁদিতে,
এসেছিলে এ ধরায়?
জীবন-যজ্ঞের, চরম-আহুতি,
অপূর্ণ রাখিয়া গেলে;
কু-কাচ-ভরমে, সিতাংশু-উপল,
হায়রে ত্যজিলে হেলে!
কতটুকু প্রাণ, কতটুকু জ্ঞান,
কতটুকু তার বাসা?
তারি' মাঝে হেন "আমিত্ব"-তিমির,
এ হেন মহতী আশা?
না না—রে অবোধ, ও তো আশা নয়,
ও যে মরীচিকা-ধাঁধা;
অই তো পাপের পয়োধি-লহরী,
সংসার-পারের বাধা!

অই যে পাপের পিপাসা প্রবল—
চাপিয়া রেখেছ বুকে।
ভেবে দেখ দেখি, ওর সহবাসে,
আছ কি সুখে না দুখে!
এ মর-জগতে অমরতা-সুখ
পাইতে যে রস-পানে,
সে রস নির্ম্মল হারে ভ্রান্ত! তুমি
ত্যজিলে পঙ্কিল জ্ঞানে!!
দু'দিনের তরে ধরায় আসিয়া,
ভুলিলে পূর্ব্বের স্মৃতি!
মুকুতা-ভরমে বদরী লভিয়া,
পাইলে পরম প্রীতি!!
কালের করাল চরম বিষাণ
এখনো বাজেনি' হায়!
যতনে রক্ষিত এখনো ও দেহ
মিশেনি' ধরার গায়।
এখনো জরায় শিথিল-শকতি
হয়নি তোমার কায়;
এখনো অমল নয়ন-কমলে
পড়েনি' সমল ছায়া;
এখনো হৃদয় করেনি ত্যেয়াগ
সুখের সম্ভোগ-কাম।
এখনো ও মুখ হয়নি বিমুখ
নিতে সে মধুর নাম!
তাই বলি ওরে! যায়নি সময়,
এখনো হইতে পারে।
অমর-বাঞ্ছিত সে রস বারেক
মাখরে প্রাণের তারে;—
রাখি' সযতনে, নিভৃত গুহায়
বসিয়া, খুলিয়া প্রাণ,—
হৃদয়-সেতার বাঁধিয়া পঞ্চমে,
গাওরে তুলিয়া তান,—

"জীবন যৌবন, দারা-পরিজন,
নিশার স্বপন সম;
জাগিলে হতাশ, ঘুমন্ত জীবনে
অনন্ত মানস-রম"!!
আবার যখন উদিবে মানসে
পাপের পঙ্কিল ছায়া,
মোহ চিত্রপট ধরিবে সমুখে
দুরাশা বিথারি মায়া।
গাহিও তখন "হরি হরি হরি"
মিশা'য়ে নয়ন-জলে,
"জীবন-কমল সতত চঞ্চল
সময়-সরসী-কোলে।
না ছিঁড়িতে এই সরোজ কোমল,
মধুটুকু লও তুলি।"
ছিন্ন কোকনদ মধুহীন, তাহে
ভ্রমে না ভ্রমর ভুলি'—
অথবা সঙ্গীতে কি কাজ, ভাবিয়া
দেখনা বারেক মনে,
দেখতো কি আঁকা, চাওত বারেক
বিবেক-মুকুর পানে।
এত যে "আমার" "আমার" বলিয়া
মরিলে বিলাপ করে।
নিয়তির সহ এত যে সমর
করিলে যা'দের তরে!
তোমার লাগিয়া হৃদয়ে তা'দের
কতটুকু আছে স্থান!
তোমার যেমতি, তেমতি তা'দের
কাঁদে কি নিয়ত প্রাণ?
তুমি যথা সদা পাপ আচরিছ,
হায়রে তা'দের তরে;
দূরে আচরণ, বারেক কি তারা
তব তরে পাপ স্মরে?

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ।

স্বমত ও পরমত।

—:০:—

ধর্ম্মের মূল শিক্ষা অনুসন্ধান করিতে গিয়া প্রমাণ সমাধান বিষয়ে মনু বলেন,- "আত্মনস্তুষ্টিরেব চ"—"স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ" ইত্যাদি। যাহা স্বাভিমত-শুদ্ধ, তাহাই স্বীকার্য্য ও গ্রাহ্য। স্বাভিমত বা স্বমতের অনুমোদন (Self sanction) ভিন্ন সমস্ত জগতের সাক্ষ্যও অগ্রাহ্য বা ত্যাজ্য। হিন্দু যে বেদ-বাক্য মানেন, তাহা বেদ-বাক্য মানার ঔচিত্য-বোধরূপ স্বতঃস্বমতশুদ্ধি তাহার মূলে আছে বলিয়া। পরমত-বেদ-বাক্য-প্রসূত কোন তত্ত্বই মানিনা। সে স্থলে বেদ-বাক্যের ব্যাখ্যাই সেই পর-মতানুরূপ নয় বলিয়া মনে হয়। গুরু-দেবের আদেশ-উপদেশ যে আমরা মানি, তাহার কারণও সেইরূপ বেদ-বাক্য মানার ন্যায় স্বতঃ-স্বমত-শুদ্ধির ফল মাত্র। ফলি-তার্থে শাস্ত্রাদির শিক্ষাতেই স্বমত গঠিত, আবার স্বমতের প্রেরণানুসারেই শিক্ষার গতি সাধিত ও শাস্ত্রার্থ পরিগৃহীত হয়।

এই স্বমতরূপ মানব-জীবনের বাহনটি কেবল ইহজন্মের শিক্ষা-সংস্কারেই হৃষ্টপুষ্ট হয় না; জন্মান্তরীয় কর্ম্ম ইহার প্রধান উপাদান। এই ভাবে বলিতে হয়, স্বমতের মূল বড় দৃঢ়; উহা জন্ম-জন্মান্তর-ভেদী! এ হেন স্বমত জীবের জীবন-গতি বা পুরুষকার-রতির সর্ব্বস্ব। পরমতের অতি সহজ ও সামান্য কার্য্যও ত্যাজ্য, কিন্তু স্বমতের অতি দুষ্কর ও দুরূহ কার্য্যও গ্রাহ্য। ভগবানের অন্যতম যুগাব-তার পরশুরাম যে মাতৃহত্যা করিয়াছিলেন, তাহা কেবল পিতৃআজ্ঞা বলিয়াই নহে; পরন্তু পিতৃআজ্ঞা প্রতিপালনের অবশ্যঔচিত্য-বোধে উহা স্বমত সম্মত হইয়াছিল বলিয়া।

পিতা পরম গুরু, কিন্তু স্বমত-বিরুদ্ধতা জন্য পিতা হিরণ্যকশিপুর হরি ভজন ত্যাগের আদেশ পুত্র প্রহ্লাদ মানেন নাই। মাতা কৌশল্যার বন-গমন-নিষেধক আদেশ পুত্র শ্রীরামচন্দ্র মানিতে পারেন নাই। শাস্ত্র বলেন "জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সমঃ পিত্রা"। সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণের রাম-প্রতিপক্ষাবলম্বনের আদেশ বিভীষণ মানেন নাই। বামনরূপী ভগবানকে ত্রিপাদভূমি-দান নিষেধক গুরু শুক্রাচার্য্যের আদেশ শিষ্য বলিরাজ মানেন নাই। গুরু-আজ্ঞা অবহেলার এই সব পৌরাণিক উজ্জ্বল উদাহরণ কেবল স্বমত-বিরুদ্ধতার ফল মাত্র। স্বমতই অসম্ভব-সম্ভাবক, অসাধ্য-সাধক, পুরুষকারের প্রয়োজকরূপে জীব-জীবনের সর্ব্বক্রিয়া-সম্পাদক।

সংসার-কার্য্যালয়ের সকল কার্য্যের শেষ মঞ্জুরী (Sanction) আপনারই পড়ে। এ ক্ষেত্রে নিজের মনই সামান্য অর্থী-প্রত্যর্থী, আবার নিজের মনই সর্ব্বশেষনিষ্পত্তি-নিষ্পাদক প্রধানতম কার্য্যাধ্যক্ষ। পরমত-পরিচালনে আমরা যাহা কিছু করি, তাহাও স্বমত সম্মত বুঝিয়াই করি। স্বমতের নিকষে না কষিয়া আমরা কদাপি পরমত লইনা। কয়েদী যে ঘানী ঘুরায়, সেই ঘানী-ঘুরাইবার কষ্ট অপেক্ষা প্রহরীর বেত্রা-ঘাত-কষ্ট তীব্রতর, এই জ্ঞান-জনিত স্বমত-সম্মতিই তাহার প্রয়োজক। স্বমত মুখ বাঁকাইলে সহস্র পরমত—সহস্র শাস্ত্র-শাসন

ভাসিয়া যায়; আচার্য্যোপদেশ, পিতৃ-মাতৃ-গুরু-আদেশও অবহেলিত হয়। স্বমতই সংসার-সম্বন্ধের অন্ন, স্বমতই ভবের বাজারের কড়ী, এক কথায়—স্বমতই সর্ব্বস্ব। পরমত স্বমতের বিপরীত। আমরা যখন স্বমত-বোধে পরমত আত্মসাৎ করি, তখন তাহা স্বমতই হইয়া যায়। তখন তাহাকে পর-মত বলাই ভুল। যতক্ষণ "পরমত" শব্দের সার্থকতা, ততক্ষণ তাহা স্বমত-বিরুদ্ধ বিষয় বলিয়াই বোধ্য।

তথাপি পরমত একেবারে অবজ্ঞাত বা অনাদৃত হওয়া শিষ্টতা-সঙ্গত নহে। হৃদয়ে স্বমতের আসন অটল থাকুক, প্রকাশ্যে পরমতাবলম্বী'র বা পরের মতের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, কুৎসা, কোপ, কুভা-ষণ প্রভৃতির সংযম সযত্নে সাধিতব্য। যে দাম্ভিক স্বমতসর্ব্বস্ব তাহা ভুলিয়া যায়, বিজ্ঞজন-বিচারণায় সে "অসভ্য" বিশেষণের বিষয়ীভূত। অসভ্যতা মাত্রই অবোধ পর-মতোপেক্ষা ও স্বমতান্ধতার ফল। আমরা অনেক সময়ে চিত্তসংযমের অভাবে এ সত্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, বাহিরে "সভ্য" সংজ্ঞায় সুপরিচিত থাকিয়াই অন্তরে সজ্ঞান-অসভ্য হইতেছি।

পরমতের প্রতিকূলে বিশেষ বাড়াবাড়ি করিতেই নাই। পরমত কখন স্বমত হইয়া দাঁড়ায়, তাহারইবা ঠিক কি? আবার অদ্যকার স্বমত কল্য পরমতে পরিণত হও-য়াই বা বিচিত্র কি? মানুষের বহুরূপী-সাজ কেবল বিকৃতিতে নহে, প্রকৃতিতেও বটে। আজ যে হিন্দু থাকিয়া পর-মত বোধে ব্রাহ্ম-মতকে ব্যঙ্গ করিতেছে, কাল সেই ব্রাহ্ম হইয়া বেদ-বেদান্ত কর্ম্ম-নাশার জলে নিক্ষেপ করিতেছে। আবার চাইকি—পরশু হয়ত খ্রীষ্টান হইয়া পাদ্রী সাহেবের পুস্তকবাহক সাজিতেছে! বিজ্ঞ-জনের দৃষ্টিতে এইরূপ মুখস-বদল সংসার-রঙ্গালয়ের প্রহসনাভিনয় মাত্র।

স্বমতের স্বতঃপ্রিয়তার কুসুম শয়নে নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাওয়া সুবিবেচনা-সূচক নহে। পরমতের সংঘর্ষে স্বমতের পরীক্ষা ও পরিমার্জ্জনা প্রকৃতই প্রয়োজনীয়। কোন্ স্বমতটি আমরণ অব্যাহত থাকিবে পরমতের অপরিশ্রান্ত প্রতিঘাত পৌনঃ-পুন্যেই তাহা প্রতীত হয়। তাই বলি-তেছি, পরমত লইয়া বিরুদ্ধ ব্যাপকতা বাঞ্ছনীয় নহে। আবার স্বমত মাথায় করিয়া "লম্ফঝম্প ভূমিকম্প" করাও সুবুদ্ধি-সঙ্গত নহে। অধুনা অস্মদীয় সভ্যতাভিমানী—শিক্ষাভিমানী সমাজেও সময়ে সে সুবুদ্ধির শোচনীয় সংহার পরিলক্ষিত হয়।

একটি দৃষ্টান্ত দেখুন, ইদানীং যে সংবাদ-পত্র মাজের পবিত্র আসন সময় সময় কবির আসরে পরিণত হইতেছে, সে গরলোদ্গা-রের ঝাঁজে সাহিত্যের সাত্ত্বিক সজীবতাও ঝলসিয়া যাইতেছে, স্বদেশসেবী বিজ্ঞজন-মণ্ডলী কি তাহা বুঝিবেন না? নিরপেক্ষ সমাজ-সেবা সংবাদ-পত্রের পবিত্র ব্রত; তাহাতে এরূপ স্বমত-পরমত-বিদ্রোহের অবাধ-প্রশ্রয় বড়ই নৈরাশ্যপ্রদ। সংবাদপত্র সমাজের মুখ স্বরূপ; সেই মুখ যদি কেবল মনুক্তি মত—

"পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ। অসম্বদ্ধ প্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্ব্বিধম্॥"

এই পারুষ্য, অনৃত, পৈশুন্য, অসম্বন্ধপ্রলাপ রূপ চারি বাক্যের পাপেই অবিরত ক্রমাগত কলুষিত হইতে থাকে, তবে মনের দুঃখে সে মুখের "মুখে আগুন" বলিতে ইচ্ছা করে। যে ক্ষেত্রে মনে মনে "আপনার জন" ভাবিয়া, আব্দার করিয়া—দুঃখ করিয়া—দুটা মনের কথা বলিতে ইচ্ছা হয়, আবার হয়ত সেই ক্ষেত্রেই—কখনবা মনের অর্দ্ধ-অজ্ঞাতসারে একটু তোষামোদের—একটু 'মুখ-সামালের' দুর্ব্বলতাও আসিয়া পড়ে। বলিতে কি, বর্ত্তমান "মান-নাশ" বিভীষিকার বিকট তাণ্ডবের সময়ে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া লেখনী চালন করিতে হয়। যে কোন সামাজিক বা ঘটনার সমালোচনার স্থলে দু-কথা লিখিতে হইলে, লেখনীর মুখ সংযম, শিষ্টতা, বিনয়, মাধুর্য্য দ্বারা সংমার্জ্জনের একান্ত প্রয়োজন। ফলে আমাদের অধিক কথা বলিবার নাই। দেশের সাধারণ নৈতিক "আব-হাওয়া" সংবাদপত্র ইত্যাদি দ্বারাই অধিকাংশতঃ পরিচালিত ও পরিবর্ত্তিত হয়। অতএব তাহাতে নৈতিক স্বাস্থ্য-সংহারক স্বমত-পরমতের বিরোধ-বিপ্লব-জনিত বিষাক্ত আত্মদ্রোহ বিসর্পিত হওয়া একান্তই আপত্তিজনক।

আমি যাহাতে স্বদেশ-হিতৈষিতা ভাবি, তুমি তাহাতে ব্যক্তিগত স্বার্থ ভাব। আমি যাহা সমাজ-সংস্কার ভাবি, তুমি তাহা সমাজ-সংহার ভাব। আমি যাহাকে রাজ-ভক্তি বলি, তুমি তাহাকে রাজ-তোষামোদ বল। আবার আমি যাহাকে রাজ-সাহায্য বিশ্বাস করি, তুমি তাহাকে রাজ-দ্রোহ সন্দেহ কর। হায়! আমার মতে যাহা স্বরূপবাদিতা, তোমার মতে তাহা দুর্ম্মুখতা। বিলোমভাবেও ঐরূপ। তুমি ভাব তেজস্বিতা, আমি ভাবি ধৃষ্টতা। তুমি সহৃদয়তা, আমি দুরাশয়তা; তুমি পরের দুখ, আমি আপন সুখ; তোমার আত্মপ্রসাদটুক, আমার মহারাণীর মুখ; তোমার হিতবাদ, আমার অহেতুবাদ; তোমার অমৃত, আমার গরল; তোমার আনন্দ, আমার বিষাদ। অধিক উদাহরণ অনাবশ্যক। ফলে এই ভাবেই স্বমত-পরমতের প্রবল প্রতিযোগ-প্রবাহ বহিয়া থাকে।

দেশের বিদ্বজ্জন-সমাজই দেশের বল। সেই বিদ্বজ্জন-মণ্ডলে ঐ প্রবাহের এরূপ পূতিপঙ্কিল-প্রবহন নিতান্তই বিধাতার নিদারুণ অভিসম্পাত, সন্দেহ নাই। সবল, সমুন্নত ও সজীব দেশে ইহা তত অনিষ্ট কর নহে; বরং স্থলবিশেষে ঐহিক উন্নতির আংশিক আলম্ব স্বরূপই হয়; কিন্তু এই দীন দুর্ব্বল দলিত দেশে মত-বিরোধের অন্তর্বিবাদ ও উৎকট অসূয়তা একান্তই অহিতকর।

এই মত-বিরোধ-জনিত লজ্জাজনক আত্মদ্রোহে সমাজ-শান্তির হানি, সভ্যতার হানি, জাতীয় স্বার্থ ও সম্মানের হানি, অবশেষে সাহিত্যের হানি; হানি সর্ব্বদিকে। আমরা যদি এইরূপ অবোধ আত্মদ্রোহে ফেরু কুক্কুরেরও অধঃস্থানীয় হই, তবে আর আমাদের এই অধঃপতিত সমাজের কথঞ্চিৎ পুনরভ্যুদয়ের আশাও দুরাশা মাত্র। অনসূয়তাই উন্নতি ও আনন্দের নিদান; এই সারতম শিক্ষাতত্ত্ব আমাদের গীতাদি শাস্ত্রে ভগবদুক্তিতেই বিঘোষিত; অথচ

ভাগ্যদোষে—কর্ম্মবশে আমরাই অধুনা সে শিক্ষায় শোচনীয়ভাবে বঞ্চিত। ভগবান কৃপা করিয়া তাঁহার পতিত ভারতকে আবার সেই শিক্ষার বল দিয়া উদ্ধার করিবেন, এই আশা লইয়া মরিতে পারিলেই কৃতার্থ হইব।

শ্রী শঃ—

গণেশ-প্রাতঃস্মরণ-স্তোত্রম্।

১

প্রাতঃ স্মরামি গণনাথমনাথবন্ধুং
সিন্দূরপূরপরিশোভিতগণ্ডযুগ্মম্।
উদ্দণ্ডবিঘ্ন-পরিখণ্ডন-চণ্ডদণ্ড-
মাখণ্ডলাদি-সুরনায়ক-বৃন্দবন্দ্যম্॥

অনাথ জনের যিনি বন্ধু অবিরল,
সিন্দূরে শোভিত যাঁর দুটী গণ্ডস্থল,
প্রবল বিঘ্নের যিনি বিনাশ কারণ,
ইন্দ্রাদি দেবতা যাঁর করেন বন্দন,
প্রাতঃকালে শয্যা হ'তে গাত্রোত্থান করি,
সেই দেব গণেশের শ্রীচরণ স্মরি।

২

প্রাতর্নমামি চতুরাননবন্দ্যমান-
মিচ্ছানুকূলমখিলং চ বরং দদানম্
তং তুন্দিলং দ্বিরসনপ্রিয়যজ্ঞসূত্রং
পুত্রং বিলাসচতুরং শিবয়োঃ শিবায়॥

ব্রহ্মাও করেন যাঁর চরণ বন্দনা,
পূরণ করেন যিনি মনের বাসনা,
প্রদান করেন যিনি যত কিছু বর,
যাঁর মত কেহ আর নাই লম্বোদর,
সর্প যজ্ঞসূত্র যাঁর অতি প্রিয় ধন,
বিবিধ বিলাসে যিনি দক্ষ বিচক্ষণ,
শঙ্কর জনক যাঁর, শঙ্করী জননী,
সুতরাং শিবময় বলি যাঁরে গণি,
প্রাতঃকালে শয্যা হ'তে উঠিয়াই আমি
সেই গণেশের পদ ভক্তিভরে নমি।

৩

প্রাতর্ভজাম্যভয়দং খলুভক্তশোক-
দাবানলং গণ-বিভুং বরকুঞ্জরাস্যম্
অজ্ঞানকাননবিনাশনহব্যবাহ-
মুৎসাহবর্দ্ধনমহং সুতমীশ্বরস্য॥

করেন অভয় দান যিনি অবিরল,
দহিতে ভক্তের শোক যিনি দাবানল,
যিনি দেব গণপতি, যিনি গজানন,
নরের উৎসাহ যিনি করেন বর্দ্ধন,
ঘোর অজ্ঞানতা-বন দাহনের তরে
অগ্নি সম একমাত্র যিনি এ সংসারে,
শিবের পরম প্রিয় পুত্র যিনি হন,
প্রাতঃকালে বন্দি সেই গণেশ-চরণ।

শ্লোকত্রয়মিদং পুণ্যং সদা সাম্রাজ্য-দায়কম্।
প্রাতরুত্থায় সততং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ পুমান্।
লভতে সকলান্ কামান্ ব্রহ্ম-লোকে মহীয়তে॥

প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া যে জন
এই তিন পুণ্য শ্লোক করে উচ্চারণ,
সাম্রাজ্যাদি কাম্য বস্তু ভাগ্যে তার রয়,
ব্রহ্মলোকে সমাদর তাহার নিশ্চয়।

চণ্ডী-প্রাতঃস্মরণ-স্তোত্রম্।

১

প্রাতঃস্মরামি শরদিন্দুকরোজ্জ্বলাভাং
সদ্রত্নবৎসকলকুণ্ডলহারশোভাম্।
দিব্যায়ুধোর্জ্জিতসুনীলসহস্রহস্তাং
রক্তোৎপলাভচরণাং ভবতীং-পরেশাম্॥

স্বর্ণ-কুণ্ডল আর রতনের হার—
কর্ণে আর গলে যাঁর শোভে অনিবার;
ধারণ করিয়া নিত্য দিব্যাস্ত্র সুন্দর,
সুনীল সহস্র কর যাঁর মনোহর;
শরচ্চন্দ্র সম যাঁর উজ্জ্বল বরণ,
রক্তপদ্ম সম যাঁর সুন্দর চরণ,
প্রাতঃকালে উঠি সেই পরম-ঈশ্বরী
চণ্ডিকার শ্রীচরণ মনে মনে স্মরি।

২

প্রাতর্নমামি মহিষাসুরচণ্ডমুণ্ড-
শুম্ভাসুরপ্রমুখদৈত্যবিনাশদক্ষাম্।
ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রমুনিমোহনশীললীলাং
চণ্ডীং সমস্তসুরমূর্ত্তিমনেকরূপাম্॥

কিবা সে মহিষাসুর, কিবা চণ্ডমুণ্ড,
কিবা শুম্ভ, কি নিশুম্ভ অসুর প্রচণ্ড,
কিবা আর আর যত দুষ্ট দৈত্যগণ,
করিলেন রণে যিনি সবারি নিধন;
কিবা ব্রহ্মা, কিবা ইন্দ্র, কিবা মহেশ্বর,
কিবা এই ত্রিভুবনে যত মুনিবর,
পরম বিচিত্র লীলা করিয়া ধারণ,
করেন তাঁদের যিনি মানস রঞ্জন,
যিনিই ধরেন সর্ব্বদেবের মূরতি,
নানাকালে নানারূপে যাঁর অবস্থিতি,
প্রাতঃকালে শয্যা হ'তে উঠিয়াই আমি
সেই চণ্ডিকার পদ ভক্তিভরে নমি।

৩

প্রাতর্ভজামি ভজতামভিলাষদাত্রীং
ধাত্রীং সমস্তজগতাং দুরিতাপহন্ত্রীম্।
সংসারবন্ধনবিমোচনহেতুভূতাং
মায়াং পরাং সমধিগম্য পরস্য বিষ্ণোঃ॥

করেন ভক্তের যিনি অভীষ্ট সাধন,
ধারণ করেন যিনি এই ত্রিভুবন,
সমস্ত পাপের যিনি নিধন কারণ,
সংসার-বন্ধন যিনি করেন ছেদন,
স্বয়ং বিষ্ণুও যাঁর পড়ি মায়াজালে—
হইয়াছিলেন বদ্ধ এই ভূমণ্ডলে,
প্রাতঃকালে উঠি সেই ত্রিলোকতারিণী—
পূজি আমি চণ্ডিকার চরণ দুখানি।

৪

শ্লোকত্রয়মিদং দেব্যাশ্চণ্ডিকায়াঃ পঠেন্নরঃ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥

দেবী চণ্ডিকার এই পুণ্য-শ্লোকত্রয়
পাঠ করে যেই জন হইয়া তন্ময়,
সমস্তই ভোগ্য বস্তু ভাগ্যে তার রয়,
বিষ্ণুলোকে সমাদর তাহার নিশ্চয়।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি, এ।

বৈশেষিক দর্শন।

প্রথমাধ্যায়, প্রথম আহ্নিক।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

জাগতিক পদার্থসমূহ দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব, এই সাত ভাগে বিভক্ত বলিয়া ব্যখ্যাত হইয়াছে। এই বিভাগে অনেকে বিরুদ্ধবাদী আছেন। তাঁহারা শক্তি কিম্বা সাদৃশ্য প্রভৃতিকে অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া থাকেন। অগ্নি মধ্যে তৃণাদি প্রক্ষিপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু ঐ অগ্নির সহিত যদি কোন মণি-বিশেষের যোগ করা হয়, তাহা হইলে তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত বস্তুর আর দাহ হইতে দেখা যায় না; এ নিমিত্ত বলিতে হইবে যে, বহ্নিতে দাহের অনুকূল কোন শক্তি-বিশেষ আছে। মণি-বিশেষের সম্পর্কে ঐ শক্তির বিনাশ হয়। আবার যখন ঐ মণি-বিশেষকে অগ্নি হইতে অপসারিত করা হয়, তখন দাহিকাশক্তির পুনরুৎপত্তি হইয়া থাকে। এই শক্তি অবশ্য কোন অতিরিক্ত পদার্থ। পদার্থ, দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম ও জাতি, ইহাদের প্রত্যেকেই এইরূপ সাদৃশ্য আছে। 'চন্দ্র সদৃশ মুখমণ্ডল' বলিলে মুখ রূপ দ্রব্যে চন্দ্রের সাদৃশ্য বুঝায়। ঐরূপ কস্তুরীর গন্ধের ন্যায় গোলাপফুলের ঘ্রাণ অতি মনোহর, এস্থলে গন্ধস্বরূপ গুণে, বাত-মৃগগণ বায়ুর গতির ন্যায় দ্রুতগমন করে, এখানে গমন রূপ কর্ম্ম পদার্থে এবং গোত্বের ন্যায় অশ্বত্বজাতি নিত্য, এস্থানে জাতি পদার্থে, সাদৃশ্য-প্রতীতি সকলেরই হইয়া থাকে। বিশেষ, সমবায় ও অভাব পদার্থেও নিত্যত্বাদিরূপে সাদৃশ্য প্রতীত হওয়া অননুভূত নহে। ঐ সাদৃশ্য যে অভাব নয়, অর্থাৎ ভাব পদার্থ, তাহা অনুভবসিদ্ধ, অথচ উল্লিখিত ভাব পদার্থের মধ্যে কোনটাই সকল জাতীয় পদার্থে থাকে না; এবিধায় সাদৃশ্য উহাদের কাহারও স্বরূপ নহে, সুতরাং অতিরিক্ত। এই আশঙ্কার সমাধান এই—দাহের প্রতি মণি-বিশেষ প্রতিবন্ধক—অর্থাৎ দাহের প্রতি যেমন বহ্নি একটী কারণ, ঐরূপ মণি-বিশেষের অভাবও আর একটী কারণ; সুতরাং যে স্থলে বহ্নি আছে, অথচ মণি-বিশেষ নাই, সেই স্থলেই উক্ত কারণ দ্বয় থাকে বিধায়, দাহরূপ কার্য্যটী জন্মে। আর যে স্থলে মণি-বিশেষ রহিয়াছে, সে স্থানে মণ্যভাব রূপ কারণ না থাকাতে দাহ জন্মে না। বহ্নিতে দাহিকা শক্তি আছে বলিয়া যে ব্যবহার হয়, তাহা ঐ দাহের কারণতা মাত্র, নতুবা মণি-সমবধানে একবার দাহিকা-শক্তির নাশ হয়, মণির অপসারণে শক্ত্যন্তরের উৎপত্তি হয়, পুনর্ব্বার মণি-বিশেষ যোগে ঐ শক্তির ধ্বংস হয়, পুনশ্চ মণ্যপসারণে শক্ত্যন্তর জন্মে, এইরূপে অনন্ত শক্তির উৎপত্তি ও ধ্বংস কল্পনায় অতিশয় গৌরব হয়। সাদৃশ্যও অতিরিক্ত পদার্থ নহে, "তদ্ভিন্নত্বে সতি তদ্গত ভূয়ো ধর্ম্মবত্বং সাদৃশ্যং" মুখমণ্ডলে চন্দ্রমার ভেদ এবং চন্দ্রগত আহ্লাদকত্বরূপ ধর্ম্ম আছে, ঐ আহ্লাদজনকত্বরূপ ধর্ম্মই 'চন্দ্রবন্মুখ' ইত্যাদি স্থলে মুখে চন্দ্রের সাদৃশ্য; ইহা সর্ব্বত্র এক নহে, স্থলভেদে পৃথক্ পৃথক্। যাঁহারা সাদৃশ্যকে অতিরিক্ত পদার্থ বলিতে

চাহেন, তাঁহাদেরও উহা দ্রব্য-গুণ-কর্ম্মাদি আশ্রয় ভেদে বিভিন্ন বলিতে হইবে, অন্যথা সকল পদার্থেই সকলের সমানভাবে সাদৃশ্য-ব্যবহারের আপত্তি হইতে পারে।

পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরাকাশং কালোদিগাত্মা মন ইতি দ্রব্যাণি ॥ ৫ ॥

পদব্যাখ্যা। পৃথিবী—ক্ষিতির ভাগ··· অর্থাৎ যাহাতে গন্ধ আছে। আপঃ-জল, যাহা স্বতঃসিদ্ধ দ্রব পদার্থ। তেজঃ—বহ্নি, সূর্য্য-কিরণ ইত্যাদি—যাহাতে উষ্ণ স্পর্শ থাকে। বাতাস, যাহা হইতে শ্বাস-প্রশ্বাসাদি ক্রিয়া হয়। আকাশং—গগন, যাহার গুণ শব্দ। কালঃ—সময়, যাহা হইতে জ্যেষ্ঠত্ব-কনিষ্ঠত্ব ব্যবহার হয়। দিক্—পূর্ব্ব-দক্ষিণ ইত্যাদি ব্যবহার সিদ্ধ, যাহা হইতে দূরত্ব নিকটত্ব ব্যবহার হয়। আত্মা—জ্ঞানের আশ্রয়—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। মনঃ—অন্তঃকরণ, অন্তরিন্দ্রিয়, সুখ-দুঃখাদি প্রত্যক্ষের কারণ। ইতি—ইহাই। দ্রব্যাণি—দ্রব্য পদার্থ।

বঙ্গার্থ। দ্রব্য পদার্থ সকল—ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন, এই নয় ভাগে বিভক্ত; অর্থাৎ ক্ষিতিত্ব, জলত্ব, তেজস্ত্ব, বায়ুত্ব, গগনত্ব, কালত্ব, দিকৃত্ব, আত্মত্ব, ও মনস্ত্ব, এই নয়টীকে দ্রব্য বিভাজক ধর্ম্ম বলে। তন্মধ্যে গগনত্ব, কালত্ব ও দিকৃত্ব, এই তিনটী এক ব্যক্তিতে মাত্র থাকে, এ জন্য ইহারা জাতি নহে; গগনাদি আশ্রয়ের স্বরূপ ধর্ম্ম বিশেষ। অবশিষ্ট ছয়টী জাতি পদার্থ।

তাৎপর্য্যার্থঃ। পৃথ্ব্যাদি নববিধ পদার্থের মধ্যে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ গুণের উৎপাদনে প্রাধান্য (সমবায়িকারণত্ব) আছে। ঐ প্রাধান্য সূচনা করিবার মানসে সূত্রে পদ সকলের অসমস্ত (সমাস না করিয়া) নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইতি শব্দের অর্থ—অবধারণ। পৃথিবীত্ব প্রভৃতি নয়টী ধর্ম্মই দ্রব্যের বিভাজক, তদপেক্ষায় ন্যূনও নহে, অধিকও নহে, ইহাই অবধারণের বিষয়। যেখানে বিভাগ সূত্রে ইতি শব্দের প্রয়োগ নাই, সেস্থলে তাহার অধ্যাহার করিয়া অবধারণ অর্থ বুঝিতে হইবে।

পৃথিবী বলিলে, সাধারণতঃ যাহার উপর আমরা বসতি করি, তাহাকে বুঝায়; কিন্তু এখানে কেবল স্থূলভাগই পৃথিবী-পদবাচ্য নহে। যাহাতে পার্থিব পরমাণু-সমষ্টি আছে, অর্থাৎ যে দ্রব্যে গন্ধ আছে, তাহার নাম পৃথিবী। পাষাণে সহজতঃ কোন গন্ধের উপলব্ধি হয় না সত্য, কিন্তু তাহাকে দগ্ধ করিলে, তদীয় ভস্ম হইতে গন্ধ বহির্গত হইয়া থাকে, সুতরাং পাষাণে গন্ধ আছে বলিয়া অনুমিত হইবে। যাহাতে গন্ধের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ অথবা অনুমিতি হয়, যথা মৃত্তিকা, প্রস্তর, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তরু, লতা, ফল, পুষ্প, বস্ত্র ইত্যাদি পার্থিব পরমাণু-সমুদ্ভূত দ্রব্য। জল পরিষ্কৃত অবস্থায় থাকিলে, তাহাতে কোন গন্ধের উপলব্ধি হয়না। পরিষ্কৃত সলিলে কোন সুগন্ধি দ্রব্য প্রক্ষিপ্ত হইলে, যেমত তাহা হইতে সুগন্ধের অনুভব হইয়া থাকে, ঐরূপ পচা মৃত্তিকা প্রভৃতির সম্পর্কে দুর্গন্ধেরও উপলব্ধি হয়। বাস্তব জলে গন্ধ নাই।

এই প্রকার তেজ ও বায়ু গন্ধবিহীন পদার্থ। বায়ু গন্ধবিশিষ্ট পার্থিব অংশকে বহন করিয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে যোগ করাইয়া দেয়, এজন্য গন্ধবহ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব গন্ধ স্বরূপ গুণই ক্ষিতির একমাত্র পরিচায়ক বুঝিতে হইবে। অপ শব্দের অর্থ জল। যে সমস্ত বাষ্পরাশি গগন-মণ্ডলে মেঘাকারে পরিণত হয়, ঐ বাষ্প এবং শিশির, তুষার ও করকা, নিশ্চয় এ সমস্তও জলীয় পদার্থ। স্নেহ নামে জলে একটি বিশেষ গুণ আছে। ঐ স্নেহ দ্বিবিধ, প্রকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট। জলাশয়গত জলে অপকৃষ্ট স্নেহ থাকাতে, ঐ জল অগ্নির নির্ব্বা-পক হয়। আর তৈল মধ্যে প্রকৃষ্ট স্নেহ আছে, এ নিমিত্ত দহনের অনুকূল হয়। অগ্নি, সূর্য্য, সুবর্ণ, প্রভৃতি তৈজস পদার্থ শুক্ল ভাস্বর (বিজাতীয় শুক্ল) রূপই তেজের পরিচায়ক। তেজের অপর একটী বিশেষ গুণ উষ্ণ-স্পর্শ। সুবর্ণ-মধ্যে ঐ উষ্ণস্পর্শ সুবর্ণ সম্মিষ্ট পার্থিব অংশ দ্বারা স্তম্ভিত থাকায়, সম্যক্ উপলব্ধ হয় না। তেজ পদার্থে গুরুত্ব (ভারত্ব) নাই। সুব-র্ণের গুরুত্ব প্রতীতি হয়, তাহা তদ্গত পার্থিব অংশের বুঝিতে হইবে। যেমন অল্প পরিমাণে কর্দ্দম কিম্বা মসী মিশ্রিত থাকিলে, জলের জলত্ব ব্যবহারের ব্যাঘাত হয় না, তদ্রূপ অত্যল্প পার্থিব অংশ সংমিশ্রণেও সুবর্ণের তৈজসত্ব ব্যাহত হইতে পারে না। সুবর্ণে যে অতিরিক্ত পরিমাণে তৈজস-অংশ রহিয়াছে, তাহার প্রমাণ এই যে, দীর্ঘকাল-পর্য্যন্ত অগ্নি সংযোগ করিলেও তাহার প্রথমতঃ অগ্নি-সংযোগোৎপন্ন তারল্যের অপগম হয় না; পার্থিব পদার্থ শর্করাদি সেরূপ নহে। শর্করাকে কোন পাত্রে সংস্থাপন করিয়া নিম্নদেশে বহ্নি সংযোগ করিলে, প্রথমতঃ তরল হয়, সত্য, কিন্তু দীর্ঘকাল অগ্নি সংযোগে সেই তরলতা আর থাকে না, শেষে দগ্ধ হইয়া বিকৃত অবস্থা ধারণ করে। এইরূপ জলকে বিশেষ তাপ প্রদান করিলে, ক্রমশঃ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়; পরন্তু সুবর্ণের তাদৃশী অবস্থা ঘটেনা, এজন্য উহা যে তৈজস পদার্থ, ইহা নিশ্চিত। পার্থিব, জলীয় ও তৈজস পদার্থে উদ্ভূত (প্রত্যক্ষ বিষয়) রূপ ও স্পর্শ, এই দুই শ্রেণীর গুণ থাকাতে, উহারা চক্ষু ও ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে, সুতরাং পৃথিব্যাদি ভূতত্রয়ে প্রত্যক্ষই প্রমাণ রহিয়াছে, তবে ইহাদের অণুভাগে মহত্ত্ব না থাকায় প্রত্যক্ষ হয় না। প্রত্যক্ষের প্রতি মহত্ত্বও একটী কারণ। বায়ু (বাতাস) পদার্থ অস্মদাদির জীবন, অতএব বায়ু 'জগৎপ্রাণ' নামে অভিহিত হয়। বাতাসে শ্বেত-পীতাদি কোন রূপ নাই, এজন্য উহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে; তবে ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা বায়ুর স্পর্শের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে এবং বৃক্ষশাখাদির পরিচালন দেখিয়া বায়ুর অনুমান করা হয়, ঐ অনু-মানই বায়ুতে প্রমাণ। আকাশ শব্দে নভোভাগকে বুঝায়। 'নভঃ' বলিলে সাধা-রণতঃ আমাদের ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি পড়ে, কিন্তু আকাশ যে কেবল ঊর্দ্ধদেশ অবলম্বন করিয়া অবস্থিত, তাহা নহে, উহা ভূভাগের উপরি-অধঃ-মধ্য-পার্শ্ব-সমস্ত-স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এই আকাশ একমাত্র পদার্থ হইয়াও উপাধি-

(স্থান) ভেদে ঘটাকাশ—মঠাকাশ প্রভৃতি নানাবিধ আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়া থাকে। কর্ণ-শষ্কুলীরূপ উপাধ্যভ স্তবস্থ আকাশভাগ শ্রবণেন্দ্রিয়রূপে পরিণত হইয়া স্বকীয় বিশেষগুণ শব্দের শ্রাবণিক প্রত্যক্ষ জন্মাইতেছে। শব্দাত্মক বিশেষ গুণই আকাশ-পদার্থের অনুমাপক। অনেকে হয়ত শব্দকে বায়ুর বিশেষ গুণ বলিতে চাহেন: বস্তুতঃ শব্দের উৎপত্তিতে ও তাহার শ্রবণে বায়ুর উপযোগিতা রহিয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা বলিয়া শব্দকে বায়ু-সমবেত গুণ বলা যায়না। দেখা যায়, ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকের এক একটী ইন্দ্রিয় আছে। পার্থিব ইন্দ্রিয় নাসিকা হইতে গন্ধের প্রত্যক্ষ হয়। জলীয় ইন্দ্রিয় রসনা রস গ্রহণ করে। তৈজস ইন্দ্রিয় নয়ন রূপ-প্রত্যক্ষের সাধক হয়। বায়বীয় ইন্দ্রিয় ত্বক্ স্পর্শের প্রত্যক্ষ জন্মায়। ঐরূপ আকাশের ইন্দ্রিয় শ্রবণ শব্দের প্রত্যক্ষানুভূতি জন্মাইয়া থাকে। ঘ্রাণ-রসনা প্রভৃতি বাহ্যেন্দ্রিয়গণ প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ ভূতোপজীবী হইয়া পৃথক্ পৃথক্ গুণের প্রত্যক্ষ জন্মাইতেছে। নাসিকা যেমত রসের গ্রহণ করেনা, অথবা রসনার গন্ধ গ্রহণে সামর্থ্য নাই, সেইপ্রকার বায়বীয় ত্বগিন্দ্রিয় কখনও শব্দের প্রত্যক্ষ করিতে পারেনা, কিম্বা শ্রবণেন্দ্রিয়েরও স্পর্শের প্রত্যক্ষে অধিকার নাই, সুতরাং শ্রবণেন্দ্রিয় বায়বীয় নহে, এবং শব্দ-গুণও যে বায়ুর নহে, ইহা অনুভবসিদ্ধ। আকাশ পদার্থের অস্তিত্ব বিষয়ে যুক্তি-প্রমাণাদি উত্তর গ্রন্থে বিশেষ রূপে প্রকটিত হইবে। কাল নামক পদার্থ হইতে মনুষ্যাদির পরস্পর জ্যেষ্ঠত্ব-কনিষ্ঠত্ব ব্যবহার হয়। জগতের আধার স্বরূপ এক-মাত্র কালকে উপাধি স্বর্গীয় ক্রিয়াদি) ভেদে ক্ষণ, দণ্ড, দিবা, রাত্রি, মাস, সম্বৎসর প্রভৃতি নানারূপে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। দিক্ পদার্থ থাকাতে দ্রব্যাদির অপেক্ষাকৃত দূরত্ব নিকটত্ব ব্যবহার হয়। কলিকাতা হইতে বৈদ্যনাথ অপেক্ষা করিয়া কাশীক্ষেত্র অতিদূরে অবস্থিত, অথবা কাশী হইতে কলিকাতা অপেক্ষা করিয়া বৈদ্যনাথ সমী-পবর্ত্তিস্থান, এই প্রকার ব্যবহারের প্রতি দিক্ই কারণ। এই দিক্পদার্থ প্রাচী, অবাচী, প্রতীচী, উদীচী (অর্থাৎ পূর্ব্ব-দক্ষিণ-পশ্চিম-উত্তর) প্রভৃতি নানা আখ্যায় (স্থানভেদে) আখ্যায়িত হইয়া থাকে।

আত্মা দ্বিবিধ, জীবাত্মা ও পরমাত্মা। উভয় আত্মাই জ্ঞানের আশ্রয়। তন্মধ্যে পরমাত্মার জ্ঞান নিত্য। জীবাত্মা নানা, মনুষ্যাদি প্রত্যেক শরীরে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থিত। এই জীবাত্মা সকল প্রত্যেকে নিজ নিজ শরীরস্থ ইন্দ্রিয়াদির পরিচালক হইয়া ঐ ইন্দ্রিয়াদি জনিত ক্ষণিক জ্ঞানের আশ্রয় হইয়া থাকে। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে ঈশ্বর পদ বাচ্য পরমাত্মাই জগতের সৃষ্টি স্থিতি-বিনাশের একমাত্র কর্ত্তা। কুলালের কৃতি (যত্ন) হইতে যেমত ঘটের উৎপত্তি হয় কিম্বা তন্তুবায়ের কৃতি হইতে বস্ত্র জন্মে, সেইরূপ ঈশ্বরের কৃতি হইতে ক্ষিত্যঙ্কুর বিশেষের (যাহা অস্মদাদি জীব-কৃতি-সমুদ্ভূত নহে, অথচ জন্য, তাহাদের) উৎপত্তি হইয়া থাকে। ঈশ্বর ও জীবের অস্তিত্ব, ঈশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্ব ও জীবের দেহাদ্যতিরিক্তত্বাদি বিষয়ে অগ্রিম গ্রন্থে

বিচার পূর্ব্বক অনুমানাদি প্রমাণ প্রদর্শিত হইবে। মনকে অন্তরিন্দ্রিয় বলে। চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় হইতে যেমত বাহ্য ঘট-পটাদি দ্রব্যজাত ও তাহার রূপাদি গুণের প্রত্যক্ষ হয়, সেইরূপ অন্তরিন্দ্রিয় মন হইতে শরীরাভ্যন্তরস্থ জীবগত সুখ দুঃখাদি গুণের আশ্রয় রূপে জীবাত্মার মানস-প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। মন অতি সূক্ষ্ম দ্রব্য, উহা প্রত্যেক জীব-শরীরে ভিন্ন ভিন্ন। জীব যখন স্বকীয় কর্ম্ম ফল (অদৃষ্ট) বশতঃ এক শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরীরান্তর গ্রহণ করে, তখন মন জীবের অনুবর্ত্তী হইয়া দেহান্তরে প্রবেশ করতঃ সেই নূতন দেহে জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি জন্মাইয়া থাকে। পৃথিবী হইতে মন পর্য্যন্ত যে নয় প্রকার দ্রব্যের এ স্থানে উল্লেখ করা হইল, ইহাদের বিস্তারিত বিবরণ উত্তরোত্তর প্রকাশিত হইবে। সাংখ্যাচার্য্যগণ দ্রব্য পদার্থের উপরোক্ত নয় ভাগে বিভাগ করাকে অসঙ্গত বোধ করেন। তাঁহাদের মতে তমঃ (অন্ধকার) নামে আর একটী দশম দ্রব্য আছে। অন্ধকারে কালিমা রূপ আছে বলিয়া প্রতীতি হয় এবং দূর হইতে আলোক আসিতেছে দেখিলে, প্রতীত হয় যে, অন্ধকার রাশি দূরে সরিয়া যাইতেছে। কালিমা, বর্ণ ও চলন ক্রিয়া দ্রব্যে ভিন্ন অন্যত্র থাকে না, এ নিমিত্ত অন্ধকারকে অবশ্য দ্রব্য বলিতে হইবে, কিন্তু উহা ক্ষিতি নহে, যেহেতু অন্ধকারের কোন গন্ধ নাই। তাহা জল নহে, কারণ রস উহাতে নাই। উহা তৈজস নহে; কারণ তৈজস পদার্থ হইলে, উহাতে শুক্ল-ভাস্বর রূপ ও উষ্ণ স্পর্শ থাকিত এবং উহা বায়ুও নহে, কারণ বায়ুর কোন রূপ নাই। কালিমা বর্ণ থাকাতে, অন্ধকার আকাশাদি দ্রব্যান্তর্গতও হইতে পারে না; সুতরাং অতিরিক্ত দশম দ্রব্য, ইহাই সাংখ্যাচার্য্যদিগের সিদ্ধান্ত। এই স্থলে ন্যায় ও বৈশেষিক আচার্য্যেরা বলেন যে, কৢপ্ত পদার্থের দ্বারা উপপত্তি হইলে, অতিরিক্ত পদার্থ কল্পনা করা কদাচ সঙ্গত হইতে পারে না। যে স্থলে তেজের একান্ত অসদ্ভাব, সেই স্থানেই বস্তুতঃ অন্ধকার-প্রতীতি হইয়া থাকে, এ নিমিত্ত অন্ধকার তেজের অভাব মাত্র, অতিরিক্ত পদার্থ নহে। রাত্রিকালে গৃহ হইতে যখন আলোকমালাকে অপসারিত করা হয়, তখন বোধ হয়, যেন অন্ধকাররাশি আসিয়া গৃহ-প্রাঙ্গন আবৃত করিল। ইহা বস্তুতঃ অন্ধকারের গতি নহে। যেমত নৌকার গতি হইতে নৌকাস্থ পুরুষের নিকট তীরস্থিত পদার্থ নিচয়ের চলন প্রতীত হয়, সেইরূপ বাস্তবিকপক্ষে আলোকের অপসারণ প্রযুক্ত অন্ধকারের আগমন প্রতীত হইয়া থাকে। এই প্রকারে অন্ধকারে কালরূপ আছে বলিয়া জন-সাধারণের ভ্রান্তি-বুদ্ধি জন্মে, নতুবা যখন নয়নদ্বয়কে মুদ্রিত করা যায়, তখনও কি এক বিজাতীয় অন্ধকার পদার্থ স্বীকার করিতে হইবে। চক্ষুর মুদ্রিতাবস্থায় ঐ অন্ধকার পদার্থ আমাদের কোন্ ইন্দ্রিয়ের গোচর? অবশ্য বলিতে হইবে যে, কোন ইন্দ্রিয়েরই নহে, অথচ এক প্রকার অন্ধকার প্রতীত হওয়া অনুভবসিদ্ধ; সুতরাং উহা ভ্রম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। অতএব স্থির

হইতেছে যে, দীপালোক, সূর্য্যকিরণ, চন্দ্রের জ্যোৎস্না প্রভৃতি তেজোরাশি নিজের প্রকাশক হইয়া অন্য পদার্থেরও প্রকাশক হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত স্ব-পর-প্রকাশক তেজের সামান্যাভাবই বস্তুতঃ অন্ধকার পদার্থ। কান্দলীকার নামে প্রসিদ্ধ পুরাতন গ্রন্থকার, অন্ধকারকে ক্ষিতি পদার্থের অন্তর্ভূত বলেন। তাঁদের মতেও দ্রব্য পদার্থের পৃথিব্যাদি নববিধত্বের ব্যাঘাত নাই। সূত্রোক্ত পৃথিবী প্রভৃতি মনঃ পর্য্যন্ত নববিধ পদার্থের উপর দ্রব্যত্ব নামক একটী জাতি আছে, তাহাতে উক্ত সকলেই দ্রব্য বলিয়া ব্যবহৃত হয়। সকল দ্রব্যই সংযোগ ও বিভাগের সমবায়িকারণ হইয়া থাকে। এমন কোন দ্রব্য নাই, যাহাতে কোন সময়ে সংযোগ কিম্বা কোন সময়ে বিভাগের উৎপত্তি না হয়; এ নিমিত্ত যাবতীয় দ্রব্যে যে সমবায়িকারণতা আছে, দ্রব্যত্ব জাতি ঐ কারণতার অবচ্ছেদক। কারণতার অবচ্ছেদক বলিলে, কোন ধর্ম্মবিশেষকে বুঝিতে হইবে। যে ধর্ম্মবিশিষ্টটী থাকিলে কার্য্য জন্মে এবং যে ধর্ম্মবিশিষ্টটী না থাকিলে কার্য্য জন্মেনা, সেই ধর্ম্মের নাম কারণতাবচ্ছেদক। দ্রব্য (দ্রব্যত্ববিশিষ্ট) থাকিলে সংযোগ জন্মিতে পারে, না থাকিলে সংযোগও জন্মেনা, এনিমিত্ত সংযোগ রূপ কার্য্যের প্রতি দ্রব্য কারণ এবং দ্রব্যত্ব, কারণতার অবচ্ছেদক হইয়াছে; এই অবচ্ছেদকতা জাতি পদার্থে স্বীকার করা সম্ভব হইলে লাঘব হয়। কারণ এইটী দ্রব্য, এইরূপ জ্ঞান হইতে গেলে, দ্রব্যে দ্রব্যত্বের স্বরূপতঃ জ্ঞান হয়; অর্থাৎ দ্রব্যত্বের উপর আর কোন ধর্ম্মের ভান হয় না। এই স্বরূপতঃ ভানটী জাতি পদার্থে হইয়া থাকে; সুতরাং জাতির যে কারণতাবচ্ছেদকতা থাকে, তাহা নিরবচ্ছিন্ন হয়; এ নিমিত্ত সংযোগ কিম্বা বিভাগের সমবায়ি কারণতাবচ্ছেদক হইয়াছে বিধায়, দ্রব্যত্ব নামক জাতি সিদ্ধ হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

সাংখ্যদর্শন।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

(ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত কারিকা।)

২৫

সাত্ত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ত্ততে-
বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ।
ভূতাদেস্তন্মাত্রঃ সতামসস্তৈজ-
সাদুভয়ং॥

পদপাঠঃ। সাত্ত্বিকঃ। একাদশকঃ। প্রবর্ত্ততে। বৈকৃতাৎ। অহঙ্কারাৎ। ভূতাদেঃ তন্মাত্রঃ। সঃ। তামসঃ। তৈজসাৎ। উভয়ং।

ব্যাখ্যা। সাত্ত্বিকঃ—সত্ত্বাংশকার্য্য। (সত্ত্বগুণসম্পন্ন।) একাদশকঃ—এগারটী-ইন্দ্রিয়। (পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, ও মন।) প্রবর্ত্ততে—উৎপন্ন হয়। বৈকৃতাৎ—বৈকৃত অর্থাৎ সাত্ত্বিক হইতে। অহঙ্কারাৎ—অহঙ্কার হইতে। ভূতাদেঃ—তামসভাগ হইতে। (ভূতগণের আদি অর্থাৎ কারণ অহঙ্কারের তামসাংশ হইতে। তন্মাত্রঃ—সূক্ষ্ম পঞ্চভূত। স—সে। (তন্মাত্রপঞ্চক।)

তামসঃ—"তামস"নামে পরিচিত। তৈজসাৎ রাজস (অহঙ্কার) হইতে। উভয়ং—পূর্ব্বোক্ত দ্বয়। (জন্মিয়াছে)।

বঙ্গার্থ। একাদশেন্দ্রিয় অহঙ্কারের সাত্ত্বিকাংশ-কার্য্য; সুতরাং তাহারা সাত্ত্বিক। তামসাংশ হইতে পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। তাহারাও তামস নামে বিখ্যাত। রাজস অহঙ্কারের কার্য্যদ্বয়। (পূর্ব্বোক্ত সত্ত্বাংশ কার্য্য এবং তামসাংশকার্য্য, এতদুভয়ই রাজসাংশের কার্য্য।)

বিশদব্যাখ্যা। এই জড়জগৎ কেবল মাত্র গুণত্রয়ের বহুবিধ বিকার বই আর কিছুই নয়। জগতের মূলকারণ অব্যক্তকে যখন সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ, এই তিন-ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, তখন সমগ্র সংসার তিনভাগে বিভক্ত হইল, একথা বলিবার বিশেষ আবশ্যকতা দেখিনা। অহঙ্কারের ভাগত্রয় আছে, কেননা উহা প্রাকৃত। তিনভাগের কার্য্য আবার তিনজাতীয়। সাত্ত্বিকাংশের ও তামসাংশের দ্বারা আমরা জাগতিক জিনিষের সংখ্যা একরূপ শেষ করিতেই পারিলাম। আণবিক জগৎ তন্মাত্র হইতেই আবিষ্কৃত হইল। অপর মনঃশক্তি ও ইন্দ্রিয়শক্তি থাকিলেই সংসার-রচনা ও ব্যবহার নিষ্পত্তি অব্যাহত। রাজসাংশের স্বতন্ত্র কার্য্য নাই। সত্ত্বাংশ ও তমোংশ-কার্য্যে সহায়তা করাই রাজসাংশের কার্য্য। সত্ত্ব ও তমঃ অক্রিয়, রজোগুণ উহাদিগকে চালিত করে। অতএব উভয়ের কার্য্যই রজোংশের বলা যাইতে পারে। এখানে "সাত্ত্বিক একাদশকঃ" শব্দের বিজ্ঞানভিক্ষুর অভিমত অর্থ মন। তিনি বলেন, একাদশের পূরণ মন একাদশক এবং সত্ত্বাংশ কার্য্য। যাহাদ্বারা ইন্দ্রিয়গণের একাদশ সংখ্যাপূর্ণ হইয়াছে, তাহা মন ভিন্ন আর অন্য হইতে পারে না। অথবা "একাদশকঃ" অর্থ এগারটী, কিন্তু তাহা দশেন্দ্রিয় ও মন, এই কয়টী নয়। দশেন্দ্রিয়ের দশটী অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ও মনঃ, এই এগার। তিনি ইন্দ্রিয়কে সাত্ত্বিক কার্য্য বলেন না, কেবল মনকেই বলেন। "তৈজসাদুভয়ং" ইহার অর্থ তিনি বলেন, রাজসাহঙ্কারের কার্য্য; দশেন্দ্রিয়, জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয় ভেদে দুই প্রকার, তাঁহার পক্ষে "রাজসানীন্দ্রিয়াণ্যেব সাত্ত্বিকা-দেবতামনঃ", এই বাক্য প্রমাণ। বাগাদি দশেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবতা দশজন, যথা,

দিগ্বাতার্কপ্রচেতোঽশ্বিবহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রমিত্রকাঃ"। তাঁহারা সাত্ত্বিকাহঙ্কারের কার্য্য হইতে বাধা নাই। দশেন্দ্রিয়ের রাজসভাব অনুভব-বিরুদ্ধও নহে। বাচস্পতি মহাশয় স্বমতের ব্যাখ্যায় কোনও শাস্ত্রীয় প্রমাণ অথবা উপযুক্ত অনুভব পাইয়াছেন কিনা, জানা যায় না, তবে তিনি সে কথার কোন উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার ব্যাখ্যায় আমাদিগকে চিন্তিত করিয়াছে, সন্দেহ নাই।

২৬

বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চক্ষুঃ শ্রোত্র-
ঘ্রাণরসন ত্বগাখ্যানি।
বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থানি
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণ্যাহুঃ।

পদপাঠঃ। বুদ্ধি—ইন্দ্রিয়াণি। চক্ষুঃ—শ্রোত্র—ঘ্রাণ—রসন—ত্বক্—আখ্যানি। বাক্—পাণি—পাদ—পায়ু—উপস্থানি। কর্ম্ম-ইন্দ্রিয়াণি। আহুঃ।

ব্যাখ্যা। বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি—বুদ্ধি জনক অর্থাৎ জ্ঞানোৎপাদক ইন্দ্রিয়। চক্ষুঃশ্রোত্র ঘ্রাণ রসনত্বগাখ্যানি—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক্ নামে অভিহিত। বাক্‌পাণিপাদ-পায়ূপস্থানি—মুখ, হস্ত, পদ, মলাপসারক ও প্রস্রাবনিঃসারক। (ইহাদিগকে) কর্ম্মে-ন্দ্রিয়াণি--কর্ম্মেন্দ্রিয় অর্থাৎ (বাক্যকথন, চলন, মলত্যাগ, মূত্রত্যাগ, এই পঞ্চকর্ম্ম করে বলিয়া) কার্য্যজনকেন্দ্রিয়। (ইহারা চক্ষু-রাদির ন্যায় দর্শনাদিজ্ঞান নিষ্পাদন করে না।) আহুঃ—বলিয়া থাকেন। (প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রাভিজ্ঞ বিদ্বজ্জনগণ।)

বঙ্গার্থঃ। চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্ত, পদ, মুখ, পায়ু, উপস্থ, ইহারা কর্ম্মেন্দ্রিয়।

বিশদব্যাখ্যা। দর্শনাদি জ্ঞানবিশেষ এবং আদানাদি ক্রিয়াবিশেষ বলিয়াই জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়ের পার্থক্য-প্রতীতি হয়। সাত্ত্বিক একাদশটীর কথা (বাচস্পতিমতে) বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে এই কারিকায় বাহ্যেন্দ্রিয় দশটীকে দেখাইয়া, পর কারিকায় মনের বিষয় ও তাহার ধর্ম্মাদি বিস্তারিত-রূপে প্রদর্শিত হইবে।

২৭

উভয়াত্মকমত্র মনঃ সঙ্কল্পকমিন্দ্রিয়-ঞ্চসাধর্ম্ম্যাৎ।
গুণপরিণাম-বিশেষান্নানাত্বং বাহ্য-ভেদাশ্চ॥

পদপাঠঃ। উভয়—আত্মকং। অত্র। মনঃ। সঙ্কল্পকং। ইন্দ্রিয়ং। চ। সাধর্ম্ম্যাৎ। গুণপরিণাম-বিশেষাৎ। নানাত্বং। বাহ্য-ভেদাঃ। চ॥

ব্যাখ্যা। উভয়াত্মকং—জ্ঞানসাধন ও কর্ম্মসাধন, এই উভয় প্রকার। অত্র—এখানে (একাদশটীর মধ্যে) মনঃ—অন্তঃ-করণ। সঙ্কল্পকং—সঙ্কল্পধর্ম্মক। ইন্দ্রিয়ং ইন্দ্রিয়—অর্থাৎ জ্ঞান-ক্রিয়ার কারণ। চ—ও। সাধর্ম্ম্যাৎ—সামান্য-ধর্ম্মতা হেতু। গুণ-পরিণাম-বিশেষাৎ—গুণগণের--পরিণামের ভেদ নিবন্ধন। নানাত্বং—বহুত্ব। বাহ্যভেদাঃ—(যেমন) ঘটঃপটাদি বহুবিধ ভেদ। চ—এবং।(বাহ্য ভেদাঃ এই অংশটুকু দৃষ্টান্তার্থ।) যদ্রূপ গুণপরিণামবিশেষ বশতঃ ঘট-পটাদি-নানা প্রকার বাহ্যভেদ অনুভূত হয়, এখানেও তাহাই, অর্থাৎ এক সাত্ত্বিকাহঙ্কারের একাদশটী কার্য্য (বাচস্পতি-মতে একা-দশেন্দ্রিয় ও বিজ্ঞানাচার্য্যের মতে দশ দেবতা ও মন) হইতে পারিয়াছে।

বঙ্গার্থঃ। মন, জ্ঞান ও কর্ম্ম, এই উভয় নিষ্পাদক। সঙ্কল্প তাহার অসাধারণ ধর্ম্ম। অপরাপর ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্মে-ন্দ্রিয়ের সহিত (জ্ঞান-করণত্ব ও কর্ম্মসম্পা-দকত্ব, এই ধর্ম্মদ্বয়) সমান বলিয়াও উহা ইন্দ্রিয়। গুণের পৃথক্ পৃথক্ পরিণাম বশতঃ যেমন বাহ্য ঘটাদি পদার্থের নানাপ্রকারতা সিদ্ধ হয়, একই মনের সাত্ত্বিকাংশের সেই রূপ বহু কার্য্য অর্থাৎ এগারটী কার্য্য হইতে পারিল।

বিশদব্যাখ্যা। জ্ঞানেন্দ্রিয়ই হউক, আর কর্ম্মেন্দ্রিয়ই হউক, সকলেরই স্বকার্য্য সাধনে মন মহাশয়ের অনুগত প্রার্থনা করিতে হয়। যদি কখনও চিন্তাকুল-চিত্তে কোনও ব্যক্তি চাঁদের দিকে চাহিয়া থাকেন, তবে তিনি চন্দ্রের দর্শনজ্ঞান সম্পূর্ণপ্রকারে

লাভ করিতে পারিবেননা। বাহ্যেন্দ্রিয়বর্গ মনের নিকট পদার্থ-প্রতিবিম্ব উপস্থিত করে, মন তাহা বুদ্ধির কাছে, ইত্যাদি প্রকারে সম্পূর্ণ জ্ঞান হয়। মন যদি অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, তবে সে ঐ প্রতিবিম্ব গ্রহণ করেনা। অনুভব আছে, সকলেই বলেন, অন্যমনস্ক ছিলাম বলিয়া দেখি-নাই, শুনি নাই, ইত্যাদি। অতএব উভয় কার্য্য মন সহকারেই হইতে থাকে, সুতরাং মন উভয়াত্মক। সংকল্প মনের অসাধারণ ধর্ম্ম; অন্তঃকরণ সঙ্কল্প-বলেই স্বীকৃত হয়, অর্থাৎ সৎকার্য্যবাদী সাংখ্যাচার্য্যগণের নিকট বেদবাক্য ব্যতীত, মনঃসাধক প্রমাণ সংকল্পই আছে। পূর্ব্বকালের পণ্ডিতেরা পদার্থতত্ত্বনির্ণয় করিতে গেলে সঙ্কল্পকে মনোধর্ম্মই বলিয়াছেন। বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে কবি-কোকিল বাল্মীকি মহোদয় পঞ্চমে তান তুলিয়া প্রাণের প্রবল আবেগ জানাইতে গাহিয়াছেন, যথা—

সঙ্কল্পনং মনোবিদ্ধি সঙ্কল্পাত্তু বিভিদ্যতে।
যত্র সংকল্পনং তত্র মনোঽস্তীত্যবগম্যতাং॥

আচার্য্যগণের হৃদয়ের ধন অনন্ত জ্ঞানের আকর বেদ গভীর শান্ত-স্বরে প্রচার করিতেছেন,—"কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব।" সকল ইন্দ্রিয়ই মনের সমান ধর্ম্মবিশিষ্ট। এই সাধর্ম্ম্য বাচস্পতি মিশ্র মহাশয়ের মতে সাত্ত্বিকাহঙ্কার কার্য্যত্ব; অপরের অভিপ্রায়ানুসারে জ্ঞান-কর্ম্মলিপ্সা-জনকত্ব। সাংখ্যশাস্ত্রকারগণের মতে মন মধ্যম-পরিমাণ এবং পারমার্থিক অনিত্য। এই মনকেই নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা অপ-রিমাণ ও নিত্য বলেন। তাঁহারা অনুমানাদি যুক্তির সাহায্যাবলম্বন পূর্ব্বক ঐরূপ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। কপিলের মতে পরম প্রমাণ শ্রুতি।

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপশ্চ পৃথ্বী বিশ্বস্য ধারিণী॥
মুণ্ডকোপনিষৎ, ২। মু ১ থ ৩ শ্লোক।

বেদান্তবাদীরাও মনকে অনিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নহেন। বস্তুতঃ সে সকল সাম্প্রদায়িকতায় আমাদের সম্বন্ধ নাই। এক মৃত্তিকা হইতে শরাব-ঘট-প্রাকারাদি নানাবিকার প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

২৮

শব্দাদিষু পঞ্চানামালোচন-
মাত্রমিষ্যতে বৃত্তিঃ।
বচনাদানবিহরণোৎসর্গানন্দাশ্চ-
পঞ্চানাং॥

পদপাঠঃ। শব্দাদিষু। পঞ্চানাং আলোচনমাত্রং। ইষ্যতে। বৃত্তিঃ। বচন-আদান-বিহরণ-উৎসর্গ-আনন্দাঃ। চ। পঞ্চানাং।

ব্যাখ্যা। শব্দাদিষু—শব্দস্পর্শরূপরস-গন্ধ, এই পাঁচ পদার্থে। পঞ্চানাং—পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অর্থাৎ যথাক্রমে শ্রোত্র-ত্বক চক্ষু-রসনা ও নাসিকা, ইহাদের। আলোচনমাত্রং-আলোচনা অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে অনিশ্চিত ভাবের জ্ঞানবিশেষ। ইষ্যতে—ইচ্ছা করেন। বৃত্তিঃ—বৃত্তি বলিয়া। বচনাদানাহরণোৎ-সর্গানন্দাঃ-কথাবলা, গ্রহণকরা, মলপরিত্যাগ-করা ও রতিসুখসম্ভোগ, এই সকল। চ—ও। পঞ্চানাং—অপর পাঁচটীর অর্থাৎ কর্ম্মে-ন্দ্রিয়ের। (ক্রমিঃ)

বঙ্গার্থঃ। শব্দাদিপঞ্চকের আলোচন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও বচনাদি কর্ম্মপাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বৃত্তি।

বিশদব্যাখ্যা। এ শ্লোকের বিষয়গুলি বারম্বার বলা হইয়াছে। এখানে আলোচন জ্ঞানের কথা বিশদরূপে বলা উচিত।

অস্তিহ্যালোচনং জ্ঞানং প্রথমং নির্ব্বিকল্পকং।
বালমূকাদিবিজ্ঞান সদৃশং মুগ্ধ বস্তুজং॥
ততঃপরং পুনর্ব্বস্তুধর্ম্মৈর্জাত্যাদিভির্যয়া।
বুদ্ধ্যাঽবসীয়তে সাহি প্রত্যক্ষত্বেন সম্মতা॥

ইহাই পূর্ব্বাচার্য্য কথিত আলোচন-জ্ঞানের স্বরূপ। আলোচন-জ্ঞানে বস্তুর জাতিধর্ম্মাদি বিশিষ্ট প্রতীতি জন্মে না। জাতি অথবা অপরাপর বস্তুধর্ম্মগুলি এখানে একই জ্ঞানে আভাত হয়, কিন্তু পরস্পরের বিশিষ্ট-বৈশিষ্টভাব অবগাহন করে না। এই জ্ঞানকে ন্যায়াচার্য্যেরা নির্ব্বিকল্পক বলিয়া থাকেন। ইহাতে বিকল্প অর্থাৎ জাতি-ব্যক্ত্যাদির বিশিষ্টভাব অনুভবগোচর হয় না। বিশিষ্টজ্ঞান হইতে গেলে বিশেষণজ্ঞান থাকা চাই, সুতরাং বিশিষ্ট প্রতীতির পূর্ব্বে ঐরূপ নির্ব্বিকল্পক স্বীকার করিতে হয়। ঐ জ্ঞান অস্ফুট, উহাতে অনুভব এই যে, অনেক সময় আমাদের এরূপ অনেক জ্ঞান হইতে পারে, যাহার প্রকারাদি আমরা বিশেষরূপে বলিয়া উঠিতে পারিনা। বিশেষ কোনও কারণে ঐ জ্ঞান সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই। ঐ জ্ঞানের পদার্থ সম্মুগ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানে প্রতিভাসিত হইবার প্রকৃষ্ট যোগ্যতারহিত—বালকের জ্ঞানের মত। অতি বালকের জ্ঞান এরূপ হয়, সে তাহার প্রকার অর্থাৎ বিশেষণাংশাদি স্ফুটরূপে অবগত হইতে পারে নাই। এই জ্ঞান যে নির্ব্বিকল্পস্থানীয় অথবা নির্ব্বিকল্পক, তাহার প্রমাণ শ্লোকস্থ "নির্ব্বিকল্পক" এই অংশটুকু। ঐ জ্ঞান যে সবিকল্পক জ্ঞানের পূর্ব্বে জন্মে, তাহার যুক্তি পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, বর্ত্তমানে শাস্ত্রীয় প্রমাণও দেওয়া যাইতেছে; যথা,—

সম্মুগ্ধং বস্তু মাত্রন্তু প্রাগ্‌গৃহ্নন্ত্যবিকল্পিতং।
তৎ সামান্য বিশেষাভ্যাং কল্পয়ন্তি মনীষিণঃ॥

এখানে সম্মুগ্ধবস্তুগ্রহণই আলোচন। "অবিকল্পিতং" এই পদদ্বারা ইহার নির্ব্বিকল্পকতাও বলা হইয়াছে। সামান্য জাতি ও বিশেষ ব্যক্তি, ইহাদের বিশিষ্ট বোধই সবিকল্পক। জাতি বলাতে সবিকল্পকে অপর গুণ-ক্রিয়াদির কথাও বলা হইয়াছে। বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন "বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং সম্মুগ্ধ-বস্তুদর্শনমালোচনং" শব্দাদি বিষয়ের এই সম্মুগ্ধ গ্রহণই আপাততঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য। পরে মনের ও বুদ্ধির কার্য্য হইলে সম্পূর্ণ নিশ্চয় জ্ঞান জন্মে। কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটীকে অনেকে ইন্দ্রিয় বলেন না তাঁহাদের মতে ইন্দ্রিয় ৬টী। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন। তদনুসারেই তাঁহারা ষড়্‌বিধ প্রত্যক্ষের কথা বলিয়াছেন। কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি ত্বগিন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত নহে, ইহা অনেকের অভিপ্রায়। এমতে অঙ্গীকৃত একাদশেন্দ্রিয়েরই কার্য্যাদি বলা হইল।

২৯

স্বালক্ষণ্যং বৃত্তিস্ত্রয়স্য সৈষাভবত্যসামান্যা।
সামান্য করণ বৃত্তিঃ প্রাণাদ্যাবায়বঃ পঞ্চ॥

পদপাঠঃ। স্বালক্ষণ্যং। বৃত্তিঃ। ত্রয়স্য। সৈষা (সা-এষা)। ভবতি। অসামান্যা। (ন-সামান্যা।) সামান্য করণ বৃত্তিঃ। প্রাণাদ্যাঃ। বায়বঃ। পঞ্চ।

ব্যাখ্যা॥ স্বালক্ষণ্যং—(ভাব প্রত্যয় স্বার্থিক এই হেতু) স্ব অর্থাৎ স্বীয় অসাধারণ লক্ষণ। (মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও মন, ইহাদের অসামান্য ব্যাপার অধ্যবসায়, অভিমান ও সংকল্প, ইহারাই।) বৃত্তিঃ—ব্যাপার। ত্রয়স্য—তিনটীর (তিন সংখ্যকগণ অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও মন, এই অন্তরিন্দ্রিয়ত্রয়ের।) সা—সেই। এষা—এইটী। অসামান্যা—অসাধারণী। সামান্যকরণ-বৃত্তিঃ—করণ অর্থাৎ অন্তঃকরণত্রয়ের সামান্য অর্থাৎ সাধারণী বৃত্তি। প্রাণাদ্যা—প্রাণ আদি (প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, এই পাঁচটি।) বায়বঃ—বায়ু সকল। (বায়ুতুল্য সঞ্চারি ও বায়ুদেবতাধিষ্ঠিত বলিয়া বায়ু সংজ্ঞা—বস্তুতঃ বায়ু নহে) পঞ্চ—পাঁচটী।

বঙ্গার্থঃ। অন্তরিন্দ্রিয়ত্রয়ের অসামান্য বৃত্তি অধ্যবসায়াদি ও সামান্য বৃত্তি প্রাণাদি পাঁচটী।

বিশদ ব্যাখ্যা॥ সামান্য অসামান্য ভেদে দুই প্রকার বৃত্তি। অধ্যবসায়াদি যে বুদ্ধ্যাদির অসাধারণ ব্যাপার, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, সম্প্রতি অনাবশ্যক। বুদ্ধি আদি পঞ্চবায়ুকে (প্রাণাদিকে) আশ্রয় করিয়াই স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করে; তাহাদের অভাবে সকলেরই অভাব ঘটে; সুতরাং উহা বুদ্ধ্যাদির সাধারণ ব্যাপার। প্রাণাদিকে কেহ কেহ (সাংখ্যকারেরা) বায়ু বলেন না, তাঁহাদের অভিপ্রায় "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণিচ খং বায়ুঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে বায়ু এবং প্রাণ পৃথক্ বলা হইয়াছে, সুতরাং প্রাণ বায়ু নহে। প্রাণের অভাবে শরীর চালন সম্ভব নহে বলিয়া, চালক প্রাণে বায়ুর ধর্ম্ম চালনাদি রহিল, সুতরাং বায়ু ধর্ম্মবৎ বলিয়া তাহাতে বায়ু নামের ব্যবহার। প্রাণাদির গণনা ও স্থান নির্দ্ধারণের সংগ্রাহক শ্লোক, যথা,—

হৃদে প্রাণোগুদেঽপানঃ সমানো নাভিমণ্ডলে।
উদানঃ কণ্ঠদেশেচ ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ॥

কেহ কেহ বলেন নাসাগ্রে প্রাণবায়ুর স্থান। "প্রাণো নাসাগ্রস্থানবর্ত্তী প্রাগ্ গমনবান" ইত্যাদি তথাকার প্রয়োগ। "নাসাগ্রাদ্দ্বাদশাঙ্গুল পর্য্যন্তং প্রাণঃ প্রচরতি" এইরূপ যোগশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। বাচস্পতি মিশ্র বলেন "প্রাণো নাসাগ্রহৃন্নাভিপাদাঙ্গুষ্ঠবৃত্তিঃ।" "অপানঃ কৃকাটিকাপৃষ্ঠপাদপায়ূপস্থ পার্শ্ববৃত্তিঃ" "সমানোহৃন্নাভি সর্ব্বসন্ধিবৃত্তিঃ" "উদানো হৃৎকণ্ঠতালুমূর্দ্ধভ্রূমধ্যবৃত্তিঃ।" "ব্যানস্ত্বগ্‌বৃত্তিঃ॥" এইরূপ স্থাননির্দ্দেশ সম্বন্ধে তাহার কোনও আচার্য্য-বচন-প্রমাণ আছে কিনা, জানা যায়না; তবে তিনি তাহার উল্লেখ করেন নাই, ইহাই সন্দেহজনক। এই প্রাণাদির মধ্যে নাগ কূর্ম্ম-কৃকর-দেবদত্ত-ধনঞ্জয় সংজ্ঞক পঞ্চবায়ুর অন্তর্ভাব বুঝিতে হইবে। নাগাদির কার্য্যসংগ্রাহক শ্লোক, যথা,—

উদ্গারো নাগ আখ্যাতঃ কূর্ম্মস্তূন্মীলনে স্মৃতঃ।
কৃকরঃ ক্ষুৎকরোজ্ঞেয়ো দেবদত্তো বিজৃম্ভণে।
ন জহাতি মৃতঞ্চাপি সর্ব্বব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ॥

ইহাদের যথাযুক্ত অন্তর্ভাব স্বীকার করিলে,

প্রাণাদি পঞ্চকের দ্বারাই উপপত্তি হইল, অতিরিক্ত কল্পনা করিতে হইলনা। এই প্রাণাদি পঞ্চককই কারিকায় অন্তঃকরণ-ত্রয়ের সাধারণ বৃত্তি বলা হইল। অন্তঃকরণত্রয়ের মধ্যে প্রত্যেকের ইহারা বৃত্তি। অসাধারণ বৃত্তি একটী অপরের নহে, এইটুকু পার্থক্য। বুদ্ধির বৃত্তি অধ্যবসায়—বুদ্ধিরই, মনেরও নয়, অহংকারেরও নয়। এই-রূপ অহঙ্কারের অভিমান ও মনের সংকল্প অপরের নহে; এইটুকু ইহাদের অসাধারণতা।

৩০

যুগপচ্চতুষ্টয়স্যবৃত্তিঃ ক্রমশশ্চ
তস্য নির্দ্দিষ্টা।
দৃষ্টে তথাপ্যদৃষ্টে ত্রয়স্য
তৎপূর্ব্বিকাবৃত্তিঃ ॥

পদপাঠ। যুগপৎ। চতুষ্টয়স্য। বৃত্তিঃ। ক্রমশঃ। চ। তস্য। নির্দ্দিষ্টা। দৃষ্টে। তথা। অপি। অদৃষ্টে। ত্রয়স্য। তৎপূর্ব্বিকা। বৃত্তিঃ।

ব্যাখ্যা। যুগপৎ সমসময়ে চতুষ্টয়স্য চারিটীর। (ইন্দ্রিয়সহকৃত মন, কেবল মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি, ইহাদের) বৃত্তিঃ - ব্যাপার। ক্রমশঃ—ক্রমে ক্রমে অর্থাৎ পারম্পর্য্যানুসারে। চ- ও। তস্য তাহার। (পূর্ব্বোক্ত—চারিটীর) নির্দ্দিষ্টা নিরূপিত আছে। দৃষ্টে—প্রত্যক্ষে। তথা—সেইরূপ। অপি ও। অদৃষ্টে—পরোক্ষে। ত্রয়স্য (অহঙ্কার-মন-বুদ্ধি এই) তিনটীর। তৎপূর্ব্বিকা দৃষ্টপূর্ব্বিকা (বৃত্তিঃ)-বৃত্তি (হইয়া থাকে)।

বঙ্গার্থ। ইন্দ্রিয় সহিত মন, কেবল মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি, ইহাদের যুগপৎ বৃত্তি হইয়া থাকে, এবং ক্রমশঃও হইতে পারে, ইহা প্রত্যক্ষ বিষয়ক। অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মন, এই তিনটীর অদৃষ্ট ও দৃষ্টপূর্ব্বক বৃত্তি হয়।

বিশদব্যাখ্যা। প্রত্যক্ষজ্ঞানের সম্পূর্ণতা অধ্যবসায়ে। ইন্দ্রিয়গণ মনের সাহায্যে আলোচনা করিল, মন সঙ্কল্প করিল, অহঙ্কার অভিমান করিল, তদন্তর বুদ্ধির অধ্যবসায় হইল। এখানে জ্ঞান সম্পূর্ণ হইল। অন্তরিন্দ্রিয়ত্রয়ের এবং ইন্দ্রিয়-সহকৃত মনের বৃত্তিগুলি যুগপৎ এবং ক্রমশঃ এই উভয় প্রকারেই হইতে পারে। নৈ-য়ায়িক মহাশয়দিগের মতে বৃত্তির যৌগপদ্য স্বীকার নাই। তাঁহাদের মতে মন অণু-পরিমাণ, সুতরাং একদা একাধিক ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হওয়া মনের ক্ষমতায় কুলায়না। বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন—

অযৌগপদ্যাজ্‌ জ্ঞানানাং তস্যাণুত্বমিহেষ্যতে।
ভাষাপরিচ্ছেদে।

এই মত সাংখ্য-বেদান্ত-সম্প্রদায়ের নিকট স্বীকৃত হয় নাই। ইঁহারা বলেন, এককালে একাধিক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞান হইতে পারে। যখন দেখিতেছি, তখনই শুনিতেছি, আবার স্পর্শ করিতেছি, ইত্যাদি অনুভব এ অংশে প্রমাণ। প্রাচীন-বুদ্ধ ন্যায়াচার্য্যগণ বলেন, অলাতচক্রভ্রমণের ন্যায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে মন এক ইন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত হইয়া আবার অন্য ইন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত হয়, আবার সেই ইন্দ্রিয়ে আসে ইত্যাদি। এত সূক্ষ্ম সময়ের মধ্যে ঐ কার্য্য সম্পাদিত হয় যে উহা আপাততঃ অনুভবে আসেনা, বোধহয় যুগপৎই হইতেছে। এখানে প্রত্যুত্তরে যৌগপদ্যবাদীরা বলেন, যদি সামান্য সময়ের জন্যও মনের বিচ্ছেদ কোনও ইন্দ্রিয় প্রাপ্ত হয়, তবে ঐ ইন্দ্রিয়-জনিত জ্ঞানে

অবিচ্ছিন্ন ভাবে হয় বলিয়া অনুভব করি কেন? যাহা অনুভবে পাইনা, এরূপ স্বল্প সময়ের কল্পনা করিয়া অনুভব-সিদ্ধ যৌগপদ্য জ্ঞানের অঙ্গীকার করা অসঙ্গত। সম্প্রদায়সিদ্ধ ভিন্নমততায় আমাদের বলিবার কিছুই নাই। ইউরোপীয় দার্শনিকগণ অনেকে জ্ঞানের যৌগপদ্য মানেন। এক সময়ে লোকের কতগুলি জ্ঞান হইতে পারে, তাঁহারা তাহার সংখ্যা করিয়াছেন। তাহার অল্পাধিক্যানুসারে মস্তিষ্কের সামর্থ্যের পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। অমা-রজনীর নিবিড় অন্ধকারে পথভ্রান্ত পথিক অরণ্যে উপস্থিত হইয়া, চপলাবালার সুমধুর হাসির সাহায্যে সম্মুখে বিকট ব্যাঘ্র দর্শন করিয়া সহসাই পশ্চাৎ প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। এখানে বিদ্যুল্লতাসঞ্চারের ন্যায় সহসাই আলোচন, সঙ্কল্প, অভিমান ও অধ্যবসায়, এই বৃত্তি কয়টীর উদয় হইয়া পরে অপসরণ কার্য্য সম্পাদিত হইল। যৌগপদ্যের এই দৃষ্টান্ত বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন। অবিস্পষ্ট-জোৎস্নায় দূরে একটা কিছু দেখা গেল, ঐ জ্ঞান মুগ্ধভাবে অর্থাৎ অস্পষ্টরূপে জন্মিল। তৎপরে প্রণিহিত চিত্তে স্থির করা গেল—করাল কালসর্প। তৎপরে অভিমান হইল—আমার দিকে আসিতেছে। পরে অধ্যবসায় হইল—অপসৃত হই। এরূপ ক্রমে ক্রমেও কার্য্য দেখা যায়। পরোক্ষে অর্থাৎ অনুমানাদিস্থলে যে দৃষ্টপূর্ব্বক বৃত্তি হয়, তাহা অনুমানাদির স্বরূপ বুঝিলে আর বুঝিতে বাকী থাকেনা।

৩১

স্বাং স্বাং প্রতিপদ্যন্তে পরস্পরাকূত
হেতুকাং বৃত্তিং।
পুরুষার্থএব হেতুর্ন কেনচিৎ
কার্য্যতে করণম্ ॥

পদপাঠঃ। স্বাংস্বাং। প্রতিপদ্যন্তে। পরস্পর আকূত হেতুকাং। বৃত্তিং। পুরুষার্থঃ। এব। হেতুঃ। ন। কেনচিৎ। কার্য্যতে। করণং। 32,042

ব্যাখ্যা। স্বা স্বাং—স্বীয় স্বীয়। প্রতিপদ্যন্তে প্রাপ্ত হয়। পরস্পরাকূতহেতুকাং—পরস্পরের অভিপ্রায় হেতুক। বৃত্তিং—ব্যাপার। (ক) পুরুষার্থঃ—পুরুষ-প্রয়োজন (ভোগমোক্ষ)। এব-(নিশ্চয়ার্থে।) হেতুঃ—কারণ। ন—না। কেনচিৎ—কাহারও দ্বারা। কার্য্যতে—কারিত হয়। করণং—ইন্দ্রিয়াদি।

বঙ্গার্থঃ। করণগণ পরস্পরের অভিপ্রায় হেতুক স্বীয় স্বীয় বৃত্তি প্রাপ্ত হয়। পুরুষার্থ হেতুক করণগণের প্রবৃত্তি অন্য কাহারও দ্বারা হইতে পারেনা।

বিশদব্যাখ্যা। ক্রমশঃ এবং যুগপৎ, এই উভয় প্রকারের বৃত্তির বিষয় বলা হইয়াছে। কিন্তু এই বৃত্তি কেবল করণ মাত্রের অধীন নয়। যদি করণ থাকিলেই বৃত্তি হওয়া আবশ্যক হয়, তবে সর্ব্বদাই বৃত্ত্যুদয় সম্ভব। যদি অকস্মাৎ হয়, তবে পরস্পর সাঙ্কর্য্য উপস্থিত হয়। এই অনিষ্টাশঙ্কা পরিহারের জন্য লিখিত হইতেছে। উহারা পুরুষার্থ হেতুক স্বীয় স্বীয় বৃত্তি প্রাপ্ত হয়। যৌদ্ধ্ সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু, পদাতিক, অনেক অশ্বারোহী ও গজারোহী

সৈন্য যথাক্রমে অসি, ভল্ল ও বাণ লইয়া যুদ্ধকরে। যখন তাহাদের অধিনায়কের আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, তখন অসিধারী সৈন্য চিরাগত অভ্যাসানুসারে অসিই গ্রহণ করে, বাণ গ্রহণ করেনা। অপরেও ঐরূপ। তাহাদের যেরূপ গ্রহণ-সাঙ্কর্য্য ঘটেনা, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি-সাঙ্কর্য্য হয়না। এখানে অপরাপরের অভিপ্রায় অবগত হইয়াই অপর প্রবর্ত্তিত হয়। যেমন বাণধারী বাণই গ্রহণ করিবে, অতএব আমি আমার অসিই গ্রহণ করি, ইত্যাদি। সৈন্যগণ চেতন, তাহারা পরস্পরের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইতে পারে, ইন্দ্রিয় অচেতন, তাহাদের সামর্থ্য কি? এ প্রশ্নে উত্তর এই যে, অচেতনও প্রয়োজন-বলে কার্য্য করিয়া থাকে; যেমন গোবৎসের ভোগের জন্য অচেতন দুগ্ধ আপনিই ক্ষরিত হইয়া থাকে। পুরুষার্থনিমিত্ত অচেতন করণের বৃত্তিপ্রাপ্তিও তদ্রূপ। এখানে একটী স্বতন্ত্রকর্ত্তা স্বীকার করিতে যাওয়া কাপিলমতে দেখা যায়না।

৩২

করণং ত্রয়োদশবিধং তদাহরণ-
ধারণ-প্রকাশকরং।
কার্য্যং চ তস্য দশধাহার্য্যং ধার্য্যং
প্রকাশ্যঞ্চ॥

পদপাঠঃ। করণং। ত্রয়োদশবিধং। তৎ। আহরণ ধারণ প্রকাশকরং। কার্য্যং। চ। তস্য। দশধা। আহার্য্যং। ধার্য্যং। প্রকাশ্যং। চ।

ব্যাখ্যা। করণং—অসাধারণ কারণ। ত্রয়োদশবিধং—তের প্রকার। তৎ—তাহা আহরণ-ধারণ-প্রকাশকরং—আহরণ, ধারণ ও প্রকাশকর। কার্য্যং—কার্য্য। চ—ও। তস্য—তাহার। দশধা—দশপ্রকার। আহার্য্যং—আহার্য্য অর্থাৎ আহরণযোগ্য। ধার্য্যং—ধারণযোগ্য। প্রকাশ্যং—প্রকাশযোগ্য। চ—এবং।

বঙ্গার্থঃ। করণ তের প্রকার—দশেন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি। তাহারা আহরণ, ধারণ, প্রকাশকর। তাহাদের কার্য্য দশ প্রকার, আহার্য্য, ধার্য্য, প্রকাশ্য।

বিশদব্যাখ্যা। ত্রয়োদশবিধ করণের কার্য্য—দশবিধ আহার্য্য, দশবিধ ধার্য্য, দশবিধ প্রকাশ্য। করণ বলিলেই ব্যাপার বলা দরকার হয়, তাহাই বলা হইয়াছে, আহরণ, ধারণ, প্রকাশ। বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ আহরণ করে, অর্থাৎ স্ব স্ব বিষয়ে ব্যাপ্ত হয়। বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন, ইহারা—প্রাণাদিরূপ সামান্য বৃত্তিদ্বারা ধারণ করে। জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয় প্রকাশ করে। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বচন, আদান, বিহরণ—উৎসর্গ ও আনন্দ, এই গুলি কার্য্য। ইহারা দিব্য এবং অদিব্য ভেদে দুই প্রকার, সুতরাং দশবিধ। প্রাণাদির ধার্য্য শরীর, তাহা আবার পঞ্চভূতের সমষ্টি মাত্র। ভূত পাঁচটী দিব্যাদিব্য ভেদে দশ প্রকার হইল। অতএব ধার্য্যকে দশবিধ বলা অযুক্ত হয় নাই। বুদ্ধীন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দস্পর্শরসরূপগন্ধ। তাহারা দিব্যাদিব্য ভেদে দশ প্রকার; অতএব প্রকাশ্যও দশধা সিদ্ধ হইল।

৩১

অন্তঃকরণং ত্রিবিধং দশধা বাহ্যং
ত্রয়স্য বিষয়াখ্যং।
সাম্প্রতকালং বাহ্যং ত্রিকালমা-
ভ্যন্তরং করণং॥

পদপাঠ। অন্তঃকরণং। ত্রিবিধং। দশধা। বাহ্যং। ত্রয়স্য। বিষয়াখ্য। সাম্প্রতকালং। বাহ্যং। ত্রিকালং। আভ্যন্তরং। করণং।

ব্যাখ্যা। অন্তঃকরণং—অন্তরিন্দ্রিয়। ত্রিবিধং—ত্রিপ্রকার। দশধা—দশপ্রকার। বাহ্যং—বহিরিন্দ্রিয়। ত্রয়স্য—তিনটী অন্তঃকরণের। বিষয়াখ্যং—সঙ্কল্প, অভিমান, ও অধ্যবসায়ের দ্বারীভূত হয়। সাম্প্রতকালং—বর্ত্তমান কাল বিষয়। বাহ্যং—বহিরিন্দ্রিয়। ত্রিকালং—বর্ত্তমান-ভূত ভবিষ্যৎ, এই তিন কাল বিষয়ক। আভ্যন্তরং—অন্তরস্থ। করণং—(জ্ঞানের) অসাধারণ কারণ।

বঙ্গার্থঃ। অন্তঃকরণ ত্রিবিধ; বাহ্যেন্দ্রিয় দশটী অন্তঃকরণ তিনটীর সঙ্কল্পাদি ব্যাপারে সহায়তা করে। (দ্বারীভূত হইয়া) বাহ্যেন্দ্রিয় বর্ত্তমানকাল বিষয়ক, অন্তরিন্দ্রিয় তিন কাল বিষয়ক।

বিশদব্যাখ্যা। বুদ্ধীন্দ্রিয়গণ আলোচনদ্বারা ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ যথাযথ ব্যাপার দ্বারা সঙ্কল্প, অভিমান ও অধ্যবসায়ের দ্বারীভূত হয়। বাহ্যেন্দ্রিয় বর্ত্তমান কালের বস্তুকে গ্রহণ করে, অতীত কালের ঘটকে চক্ষু দেখেনা ইত্যাদি। বাক্য ত্রিকালবিষয়ক হয় বলিয়া বাগিন্দ্রিয়কে বর্ত্তমান বিষয় বলা অসঙ্গত হয় নাই; কেননা যুধিষ্ঠির ছিলেন এবং কল্কি হইবেন, ইত্যাদিও বর্ত্তমান সামীপ্য বশতঃ বর্ত্তমান কাল বিষয়ক প্রয়োগ বলা অনেকের অভিপ্রায়। মন-বুদ্ধ্যাদির ত্রিকালতা অনুমানে দৃষ্ট হয়। নদীকূল ভাঙ্গিয়াছে, অতএব বৃষ্টি হইয়াছিল, এই অতীত কালের অধ্যবসায়। ধূম দেখা যাইতেছে, অতএব অগ্নি আছে, ইহা বর্ত্তমানকাল বিষয়ক ও পিপীলিকারা অণ্ড লইয়া বিচরণ করিতেছে, অতএব বৃষ্টি হইবে, এই ভবিষ্যৎকাল বিষয়ক অধ্যবসায়াদি দৃষ্টান্তরূপে উদ্ধৃত হইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ। | ১৩০৭ সাল, ১৮২২ শকাব্দা।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অজামেকাম্ লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাম্
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাম্।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥

অন্বয়ঃ— একঃ হি অজঃ লোহিত শুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং, সরূপাম্ একাম্ অজাম্ (প্রকৃতিম্) জুষমাণঃ অনুশেতে। অন্যঃ অজঃ ভুক্তভোগাম্ (সতীম্) এনাম্ (প্রকৃতিম্) জহাতি।

বিষমপদব্যাখ্যা—অজঃ—ন জায়তে ইতি শাশ্বতঃ পুরুষঃ, নিত্য আত্মা। লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাম্—তেজঃ, অপ্, অন্নঞ্চ ইতি ত্রিবিধলক্ষণাম্, যথা—"লোহিতম্" রজঃ, "শুক্লম্"—সত্বম্, "কৃষ্ণম্"—তমঃ, এতেষাম্ ত্রয়াণাম্ আধার ভূমিঃ ত্রিগুণাত্মিকা ইত্যর্থঃ। তেজঃ, অপ্ এবং অন্নরূপিণী অথবা সত্ব, রজঃ, তমঃ, এই ত্রিগুণাত্মিকা। সরূপাম্—বিকারমনাপদ্যমানাং—অবিকৃতা।

জুষমাণঃ—সেবমানঃ—সেবা করিতে করিতে অর্থাৎ সেবকরূপে। অনুশেতে—অনুচরতি, ভজতে—ভজনা করিতেছে। অন্যঃ অজঃ—ভোগ লালসা-পরিশূন্যঃ অপরঃ সাক্ষি-স্বরূপঃ পুরুষঃ। "ভুক্ত-ভোগাম্ এনাম্"—বিষয়-ভোগেন চরিতার্থবতীম্ আসক্তিশূন্যাম্। এনাম্—পূর্ব্বোক্তাং ভোগ-লালসাবতীম্ (ভোগাদিভিঃ পশ্চাৎ বিগতাসক্তিম্ ইতি কেচিৎ ব্যাচক্ষতে) জহাতি—পরিত্যজতি।

বঙ্গার্থ—অনাদি আত্মা, অগ্নি, জল এবং অন্নরূপিণী অথবা সত্ব, রজঃ এবং তমো-গুণশালিনী, অনন্ত প্রজার উৎপাদিনী অবিকৃত এক অনাদি প্রকৃতিকে ভজনা করিয়া থাকেন। আর ভোগলালসা-পরি-শূন্য অন্য আত্মা এই বিষয়-ভোগ-সঙ্কীর্ণা

প্রকৃতিকে পরিহার করেন, অর্থাৎ প্রকৃতির নৈসর্গিক আকাঙ্ক্ষিত ভোগের অবসানে তত্ত্ব-জ্ঞান উপস্থিত হওয়ায়, জটিল বিষয়াসক্তি দূরীভূত হয়।

বিশেষব্যাখ্যা—প্রকৃতি এবং পুরুষ (আত্মা) এতদুভয়ই অনাদি। শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি-বিকার এবং সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই গুণত্রয়, ইহারা সকলেই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। কার্য্য-কারণ এবং ইহাদের কারকত্বের অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বের একমাত্র হেতুই প্রকৃতি। পুরুষ সুখ দুঃখ ভোগের হেতু, কেননা পুরুষ প্রকৃতিস্থিত হইয়া প্রকৃতি-জাত গুণসমূহ ভোগ করিয়া থাকেন। যখন আত্মা প্রকৃতিস্থ হইয়া গুণযুক্ত হয়েন, তখন "মন" উপাধি গ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখ প্রভৃতি ভোগ করেন এবং জীবরূপে নানাবিধ সদসৎ যোনিতে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। আত্মা অর্থাৎ পুরুষই "মন"রূপে যাবতীয় ভোগ্যবিষয় ভোগ করিয়া থাকেন, আবার যখন ক্রমে ক্রমে ভোগ-লালসা ক্ষীণ হইয়া "মন" এই উপাধি দূরীভূত হয়, তখন আর ভোগাদির অনুভূতি কিছুই থাকেনা। ভোগী আত্মা এবং ভোগশূন্য আত্মা, এই লৌকিক সংস্কার তিরোধান হয়, উভয় এক হইয়া যায়। এই অনুশাসনই অন্যভাবে গীতায় উক্ত হইয়াছে। গীতার শ্লোক কএকটি আপাততঃ ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও, ফলতঃ ইহাদের তাৎপর্য্য এবং উপনিষদের এই সূত্রের তাৎপর্য্য এক, কোন তারতম্য নাই। গীতায় ভগবদ্বাক্য কএকটি এই—

"প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি-সম্ভবান্॥ ১৩—১৯।
কার্য্য-কারণ কর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখ-দুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥ ১৩—২০।
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদ্‌যোনি জন্মসু॥ ১৩—২১।
উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন পুরুষঃ পরঃ॥ ১৩—২২

৬

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষম্ পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য
নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥

অন্বয়ঃ—(রূপকেণ আহ) দ্বা (দ্বৌ) সযুজা (সযুজৌ) সখায়া (সখায়ৌ) সুপর্ণা (সুপর্ণৌ) সমানম্ বৃক্ষম্ পরিষস্বজাতে। তয়োঃ অন্যঃ (সুপর্ণঃ) স্বাদু পিপ্পলম্ অত্তি। অন্যঃ (সুপর্ণঃ) অনশ্নন্ অভিচাকশীতি (কেবলম্ সাক্ষিরূপেণ পশ্যতি)।

বিষমপদব্যাখ্যা॥ দ্বা-দ্বৌ—দুই। সযুজা—সযুজৌ সহচরৌ-একত্র বিহারকারী। সখায়া সখায়ৌ সখ্যভাববিশিষ্ট। সমানম্—এক। বৃক্ষম্—শরীর। পরিষস্বজাতে—আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। সুপর্ণা—সুপর্ণৌ—শোভনৌ পর্ণৌ যয়োঃ তৌ পক্ষিণৌ—জীব এবং ঈশ্বর রূপ পক্ষিদ্বয়। তয়োঃ অন্যঃ—

তাহাদের উভয়ের মধ্যে জীব রূপ এক পক্ষী স্বাদু পিপ্পলম্ অত্তি—মিষ্ট ফল ভক্ষণ করিতেছে। অন্যঃ—অন্য অর্থাৎ ঈশ্বর। অনশ্নন্‌—ভোগ না করিয়া। অভিচাকশীতি—কেবল সাক্ষিরূপে দেখিতেছেন। নির্লিপ্ত থাকিয়া মাত্র অবলোকন করিতেছেন। (ছান্দসং)।

বঙ্গার্থ—পরস্পর মিত্রতাপন্ন নিয়ত একত্র বিহরণশীল জীব ও ঈশ্বররূপ দুইটি পক্ষী দেহরূপ বৃক্ষে একত্রে বসিয়া থাকে। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে জীবরূপ পক্ষী মিষ্ট ফল—অর্থাৎ বিষয়াদিরূপ আপাততঃ মিষ্টবৎ আভাসমান ফল ভক্ষণ করিতেছেন, আর ঈশ্বররূপী অন্য পক্ষী ফল ভক্ষণ না করিয়া মাত্র সাক্ষীর ন্যায় ঐ জীবাভিধেয় পক্ষীর ভক্ষণ ব্যাপারাদি ক্রিয়া দর্শন করিতেছেন। জীবপক্ষী, আসক্ত, লিপ্ত এবং ভোগরত, আর ঈশ্বরাখ্যাত পক্ষী অনাসক্ত, নির্লিপ্ত ও ভোগলালসাশূন্য। জীব অর্থাৎ জীবাত্মা এবং পরমাত্মা, উভয়েই দেহে বিরাজ করিতেছেন। তন্মধ্যে জীবাত্মা ভোগরত, পরমাত্মা ভোগাদিবিহীন। সাধারণতঃ মনে এবম্বিধ বিতর্ক উপস্থিত হইতে পারে যে, দুঃখাদি ক্লেশময় দেহে থাকিয়াও পরমাত্মা নির্লিপ্ত বা সুখ-দুঃখাদি-অনুভূতি-বিহীন, ইহা কি প্রকারে সম্ভবপর? ইহাতে যে আধার-আধেয়তা গুণের ব্যত্যয় হয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এস্থলে আমরা ভগবদ্বাক্যের স্মরণ করিলেই প্রকৃত তথ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব।

"অনাদিত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ। শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥ যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাৎ আকাশং নোপলিপ্যতে। সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥ যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ। ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি, ভারত॥ গীতা।—১৩—৩১,৩২,৩৩।

৭

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো
অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য
মহিমানমিতি বীত-শোকঃ॥

অন্বয়ঃ—পুরুষঃ—সমানে বৃক্ষে—নিমগ্নঃ (সন্) অনীশয়া মুহ্যমানঃ শোচতি। (সঃ) যদা অন্যজুষ্টম্ ঈশম্ (তথা) অস্য ইতি (ইমম্) মহিমানং (চ) পশ্যতি, (তদা) বীত-শোকঃ (ভবতি)।

বিষমপদব্যাখ্যা—পুরি শেতে ইতি—পুরুষঃ। জীবঃ—জীব। "সমানে বৃক্ষে"—একস্মিন্ এব বৃক্ষে—দেহ-রূপ এক মাত্র বৃক্ষে। অর্থাৎ দেহকেই এক মাত্র অবলম্বনীয় মনে করিয়া। অনীশয়া—শক্তি বিরহেণ—শক্তিহীনতা নিবন্ধন। মুহ্যমান বিমূঢ় হইয়া অর্থাৎ অংশ ভাবে বিমোহিত হইয়া। "শোচতি" শোক করিয়া থাকেন। যদা অন্যং জুষ্টং ঈশম্ পশ্যতি—যে সময়ে সেই জীব সাধক-জুষ্ট—অর্থাৎ তত্ত্ব-নিষ্ঠ কর্ত্তৃক সেবিত—পরমাত্মাকে দেখেন। "তথা অস্য ইমম্ মহিমানম্ চ"—এবং এই পরমাত্মার অখণ্ডনীয় মহিমাদি বিলোকন করেন। তদা বীত-শোকঃ সে সময়ে শোকমুক্ত হয়েন।

বঙ্গার্থ। পুরুষ অর্থাৎ দেহাভ্যন্তরশায়ী-জীবদেহরূপ বৃক্ষকেই আত্মার

প্রধান অবলম্ব মনে করিয়া নিজের অজ্ঞতা এবং শক্তিহীনতা বশতঃ বিমুগ্ধভাবে প্রতিনিয়ত শোক করিতেছেন। আবার যখন তত্ত্বজ্ঞান-সেবিত পরমাত্মার প্রতি এবং তদীয় বিশ্বব্যাপী অখণ্ড সত্তার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন, তখন আত্মার ভ্রান্তি দূর হইয়া যাইতেছে। এই অনুশাসনের প্রতি দৃষ্টি করিলে—প্রাচীন সাধকের নিম্নোদ্ধৃত কএক পংক্তি মনে পড়ে—

হৃদয় মন্দির মাঝে মুগ্ধ তামসিক সাজে
ভ্রান্তজীব সদা নিদ্রাগত।
মোহ অবসানে হায়! কখনো বারেক চায়
আবার অমনি জ্ঞান-হত!

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ।

—:*:—

চাই কি?

সংসারের অধিকাংশ লোক জানেনা যে তাহারা কি চায়। অভাবের রবে সংসার প্রপূরিত, কিন্তু অভাব কি, অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যায় যে, ব্যক্ত অভাবটি বস্তুতঃ অভাব নয়। রুগ্ন ব্যক্তি যেরূপ কোন বস্তুবিশেষ তাহার মুখরোচক হইবে, বিবেচনা করিয়া, তদভ্য প্রার্থনা করে এবং তাহা প্রাপ্ত হইবামাত্র বস্তন্তরের প্রতি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে, ভ্রান্ত মানবও তদ্রূপ বস্তু হইতে বস্তন্তর-প্রত্যাশী হয়, কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তিবোধ করেনা। পুত্র অভাবে বন্ধ্যার কতই মনোবেদনা, পুত্র হইলে যেন কতই আনন্দ-উপভোগ করিবে, পুত্রার্থে কতই শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি করিল; পুত্র চাই!—সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও পুত্র চাই! পুত্র পাইল; কিন্তু পুত্র প্রাপ্তির পর দেখা গেল যে, তাহাতেও তাহার তৃপ্তি হয় নাই; তাহার হৃদয় আরো কিছু চায়। দরিদ্র সর্ব্বদাই ধনাকাঙ্ক্ষা, ধনের জন্য কতই ক্লেশ, কতই চেষ্টা, কতই বা অপকর্ম্ম করিল; ধন আসিল। দরিদ্রের গৃহে ধন আসিল বটে, কিন্তু তৃপ্তি আসিলনা। রোগগ্রস্ত ব্যক্তির যেমন কোন বস্তুই প্রকৃত মুখরুচিকর হয়না, সেইরূপ সংসারী ব্যক্তিরও কোন সাংসারিক কার্য্যেই তৃপ্তিলাভ হয় না। সুস্থ শরীরে কদন্নও অতি তৃপ্তিকর, কিন্তু অসুস্থ শরীরে অতিস্বাদু বস্তুও মুখ-রুচিকর নহে। সুতরাং রোগীর যে "চাই—চাই"—তাহা ভ্রান্ত-বাসনা মূলক। রোগী হয়ত মনে করিল, তিক্ত বস্তু আমার রুচিকর নহে, মিষ্ট বা অম্ল রস আমার তৃপ্তিকর হইবে, কিন্তু মিষ্ট বা অম্লাদি রস আস্বাদ করিয়াও রোগীর আকাঙ্ক্ষিত তৃপ্তিলাভ হইলনা; কারণ স্বাদুত্ব বা রুচিকরত্ব শুধু দ্রব্যে নাই; উহার মূল যন্ত্র ভোক্তার রসনা; কিন্তু রোগে এই রসনা-যন্ত্রের বিকৃতি উৎপাদন করায়, রোগীর আকাঙ্ক্ষিত কোন সুস্বাদু বস্তুরই স্বাদ গ্রহ হইলনা; কিন্তু

রোগী রোগমুক্ত হইলে, তাহার রসনা-যন্ত্রের অবিকৃতি সম্পাদিত হইলে, তখন তিক্ত-মিষ্ট-নির্ব্বিশেষে সকল বস্তুই রুচিকর ও তৃপ্তিজনক বোধ হইবে। রুচির আধার মানুষের অবিকৃত রসনা। তৃপ্তির আধার অবিকৃত স্বাস্থ্য। যাহাহউক, এইরূপে পুনঃ২ বিড়ম্বিত হইয়া রোগী বুঝিতে পারে যে, তাহার স্বাস্থ্য লাভ না হইলে, কোন বস্তুই তাহার আশা পূরণে সমর্থ হইবেনা। এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে, সে আহার্য্য বস্তুর প্রতি উদাসীন হইয়া, সর্ব্ব প্রথম স্বাস্থ্য লাভের চেষ্টা করে, এবং স্বাস্থ্য লাভ হইলে, আর তাহার এইরূপে অতৃপ্তি-তাড়িত হইয়া বস্তু হইতে বস্তন্তরের অভিলাষ থাকেনা। তখন সকল বস্তুই যথাযথ ভাবে তাহাকে প্রীতি দিতে সক্ষম হয়। তত্ত্বজ্ঞানবিহীন ব্যক্তির পক্ষেও সাংসারিক কোন বস্তুতেই সুখ দিতে পারেনা। সে ইহা চায়, উহা চায়, কিন্তু যাহা চায়, তাহা পাইয়াও তাহার তৃপ্তি হয় না। স্ত্রী-পুত্র কন্যা, গো-অশ্ব যান, ধন-মান-যশ ইত্যাদি কোন বস্তুতেই তাহার তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়না। যাহা যতক্ষণ না পাই, তাহা ততক্ষণ চাই, কিন্তু পাইলেও তাহাতে তৃপ্ত নাই, আবার অন্য জিনিস চাই! এইরূপ 'চাই চাই' করিয়া যখন, কোন বস্তুতেই আশা পূর্ত্তি হয় না, তখনই আমাদের বিবেকবুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং তখনই বুঝিতে পারি যে, আমার আত্মা রোগগ্রস্ত, সুতরাং তখনই রোগোপশমনের চেষ্টা হয়। কাহারও ভাগ্যে এই বিবেক অতি অল্প বিড়ম্বনার পরেই উপস্থিত হয়, কাহারও বা জন্মজন্মান্তরে বহু লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়।

এক্ষণ আলোচ্য, আত্মার রোগ কি? নির্ম্মল সচ্চিদানন্দ—নিত্য পদার্থের আবার রোগ কি? রোগের সাধারণ লক্ষণ নির্ণয়-স্থলে আয়ুর্ব্বেদ বলেন, "রোগস্তু দোষবৈষম্যং দোষসাম্যমরোগতা"। দোষের অর্থাৎ বায়ু-পিত্ত-কফের বৈষম্যই রোগ এবং উহাদের সাম্যই অরোগতা। সত্ত্ব-রজ-তমোময়ী প্রকৃতির বৈষম্যেই আত্মা রোগগ্রস্ত হন। এই সত্ত্ব-রজ-তমোগুণেরই ভৌতিক পরিণতি আয়ুর্ব্বেদের বায়ু-পিত্ত কফ। যতক্ষণ প্রকৃতি গুণত্রয়ে সাম্যবর্ত্তী, ততক্ষণ আত্মা নীরোগ। অসীম আকাশ যেরূপ গুহাবদ্ধ হইয়া সসীমে পরিণত হয়, তদ্রূপ অসীম নির্গুণ আত্মাও মায়া-প্রকৃতির পরিবেষ্টনে সসীম জীবাত্মায় পরিণত হইয়া, প্রকৃতির গুণত্রয়-বৈষম্যজনিত ভবরোগে আক্রান্ত হন। প্রকৃতির গুণ-বৈষম্য হেতুই ভেদ বা দ্বৈতজ্ঞান। এই ভেদ বা দ্বৈতজ্ঞান হইতেই কামনা বা বাসনা। এই বাসনাই তাবত্ রোগের মূল। এই রোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ না হইলে, মানব কিছুতেই প্রীতি প্রাপ্ত হইতে পারেনা। এই রোগ হইতে মুক্ত হইলেই মানব "যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীত বিমৎসরঃ" হইতে পারেন। যতক্ষণ রোগ থাকে, ততক্ষণই মানবের অতৃপ্তিজনিত "চাই চাই" থাকে। পাইলেও "চাই চাই" ফুরায় না। উহা বস্তু হইতে বস্তন্তর ক্রমে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঘুরিয়া বেড়ায়; কিন্তু নীরোগতা লাভ না হইলে, তৃপ্তিলাভ কিছুতেই হইবার নহে। নীরোগতা ভিন্ন সে নিরবচ্ছিন্ন "চাই চাই"র বিড়ম্বনা

কদাপি বিদূরিত হইবার নহে। অতএব আমরা চাই আরোগ্য। আরোগ্যেই নিত্য তৃপ্তি। নিত্য তৃপ্তিতেই অভাব বোধের নিবৃত্তি; সুতরাং চাওয়ারও নিবৃত্তি। ফলিতার্থে আমরা চাই না-চাওয়া। নিরাকাঙ্ক্ষতাই মানব-আত্মার যথার্থ আকাঙ্ক্ষার বিষয়। নিষ্কামতাই পারমার্থিক কাম্য। সকামতায় যাঁহার ঔদাসীন্য, তিনিই অভাববোধশূন্য। তিনিই "সন্তুষ্টো যেনকেনচিৎ।" তাঁহা-রই "নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টো-পপত্তিষু।" তিনিই "ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্যচাপ্রিয়ং।" সুতরাং তাঁহার পক্ষে "চাই কি?" প্রশ্নের আর অবসর নাই। তিনি পূর্ণ, সুতরাং প্রার্থনা-প্রভৃতি অপূর্ণতার সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই।

"চাই কি" প্রশ্নের যথার্থ উত্তর যদি হয় না-চাওয়া, তবে আবার সেই 'না চাওয়া' পাওয়ার জন্য কি চাই, তাহাও অবশ্য আলোচ্য। শাস্ত্র বলেন, বিনা সাধনে নিষ্কামতা-লাভের অধিকার জন্মে না। যিনি ইহজন্মে সহজে নিষ্কাম ধর্ম্মে অধিকারী হয়েন, তিনি বহুজন্মের সাধন-সাধিত বলে বলী, বুঝিতে হইবে। এই সাধন চতুর্ব্বিধ। নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক, ইহামুত্রার্থ—ফল-ভোগ-বিরাগ, শম-দম তিতিক্ষা-উপরতি-শ্রদ্ধা-সমাধানরূপ ষট্‌সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব। এই সাধন-চতুষ্টয় * সম্পন্ন "প্রমাতা"ই বেদান্তবেদ্য অদ্বৈতজ্ঞান বলে যথার্থ নিষ্কা-মতা লাভ পূর্ব্বক চরমে পরমপদ প্রাপ্ত হন।

(কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য।)

* বারান্তরে প্রবন্ধান্তরে এই সাধন-চতুষ্টয় সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।

(শ্রীম-কথিত)

(শ্রীবিবেকানন্দ, গিরীশ ঘোষ ইত্যা-দির সহিত অবতার সম্বন্ধে কথা ও ঠাকুর রামকৃষ্ণের নানাবিধ ভাবাবেশ।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

(রাজপথে)

গিরীশের নিমন্ত্রণ। রাত্রেই যেতে হবে। এখন রাত্র ৯টা হবে। বলরামও ঠাকুর খাবেন বলে রাত্রের খাবার প্রস্তুত করে-ছেন। পাছে বলরাম মনে কষ্ট করেন, ঠাকুর গিরীশের বাড়ী যাইবার সময় তাই বুঝি বলিলেন—বলরাম, তুমি খাবার পাঠিয়ে দিও।

দুতালা হইতে নীচে নামিতে নামিতেই ভগবদ্ভাবে বিভোর! যেন মাতাল! সঙ্গে—নারায়ণ, মাষ্টার। পশ্চাতে রাম, চুনী ইত্যাদি অনেক। একজন ভক্ত বলিলেন, সঙ্গে কে যাবে? ঠাকুর বলিলেন, একজন হলেই হলো।

নামিতে নামিতেই বিভোর। নারায়ণ

হাত ধরিতে গেলেন, পাছে পড়িয়া যান। ঠাকুর বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নারায়ণকে বলিলেন, হাত ধর্‌লে লোকে মাতাল মনে কর্‌বে। আমি অমনি চলে যাব।

বোস-পাড়ার তেমাতা পার হলেন—কিছুদূরেই শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষের বাড়ী।

এত শীঘ্র চল্‌ছেন কেন? ভক্তেরা পশ্চাতে পড়ে থাকচে। না জানি হৃদয়-মধ্যে কি অদ্ভুত দেব-ভাব হইয়াছে। বেদে যাহাকে বাক্য-মনের অতীত বলিয়াছেন, তাঁহাকে চিন্তা করিয়া কি পাগলের মত পাদবিক্ষেপ করিতেছেন? এইমাত্র যে বলরামের বাড়ীতে বলিলেন যে, সেই পুরুষ বাক্য-মনের অতীত নহেন; তিনি শুদ্ধ মনের, শুদ্ধ বুদ্ধির, শুদ্ধ আত্মার গোচর। তবে বুঝি সেই পুরুষকে সাক্ষাৎকার করেছেন। এই কি দেখ্‌ছেন—"যো কুচ্ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়্।

এই যে নরেন্দ্র আসিতেছেন। নরেন্দ্র নরেন্দ্র বলিয়া পাগল। কৈ, নরেন্দ্র তো সম্মুখে আসিলেন, ঠাকুর তো কথা কহিলেন না! লোকে বলে এর নাম ভাব। এইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের হইত। কে এ ভাব বুঝিবে?

গিরীশের বাড়ী প্রবেশ করিবার গলির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে ভক্তগণ। এইবার নরেন্দ্রকে সম্ভাষণ করিলেন।

নরেন্দ্রকে বলিলেন, "ভাল আছ বাবা? আমি তখন কথা কইতে পারি নাই।"—কথার প্রতি অক্ষর করুণা-মাখা। তখনও দ্বারদেশে উপস্থিত হন নাই, হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, একটী কথা—এই একটী (দেহী) একটী জগৎ!

জীবজগৎ—এসব কি ভাবে দেখিতেছিলেন, তিনিই জানেন। অবাক্ হয়ে দেখ্‌ছিলেন। দু-একটী কথা উচ্চারিত হইল—যেন বেদবাক্য—যেন দৈববাণী—অথবা, যেন অনন্ত সমুদ্রের তীরে গিয়াছি ও অবাক্ হয়ে দাঁড়ায়েছি, আর যেন অনন্ত তরঙ্গমালোত্থিত অনাহত শব্দের একটী দুটী ধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(ভক্ত-মন্দিরে।)

দ্বারদেশে গিরীশ; ঠাকুর রামকৃষ্ণকে গৃহ মধ্যে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে যেই নিকটে এলেন, অমনি গিরীশ দণ্ডের ন্যায় সম্মুখে পড়িলেন। আজ্ঞা পাইয়া উঠিলেন, ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করিলেন; সঙ্গে করিয়া দুতালার বৈঠকখানার ঘরে লইয়া বসাইলেন। ভক্তেরা শশব্যস্ত হয়ে আসন গ্রহণ করিলেন—সকলের ইচ্ছা, তাঁহার কাছে বসেন ও তাঁহার মধুর কথামৃত পান করেন।

(সংবাদপত্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ)

আসন গ্রহণ করিতে গিয়া ঠাকুর দেখিলেন, একখানা খবরের কাগজ রহিয়াছে। খবরের কাগজে বিষয়ীদের কথা, বিষয়-কথা, পরচর্চ্চা, তাই অপবিত্র—তাঁহার চক্ষে। তিনি ইসারা করিলেন, ওখানা যাতে স্থানান্তরিত করা হয়। কাগজখানা সরানো হবার পর আসন গ্রহণ করিলেন।

(নৃত্যগোপাল)

নৃত্যগোপাল প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নৃত্যগোপালের প্রতি)। ওখানে—

নৃত্য। হাঁ, দক্ষিণেশ্বরে যাইনি, শরীর খারাপ, ব্যথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেমন আছিস্?

নৃত্য। ভাল নয়——

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুই এক গ্রাম নীচে থাকিস্।

নৃত্য। লোক ভাল লাগে না। কত কি বলে—ভয় হয়।—এক এক বার খুব সাহস হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাহবে বৈ কি। তোর সঙ্গে কে থাকে!

নৃত্য। তারক; ও সর্ব্বদা আমার সঙ্গে থাকে; ওকেও সময়ে সময়ে ভাল লাগে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ন্যাংটা বল্‌তো, তাদের মঠে একজন সিদ্ধ ছিল,—সে আকাশ তাকিয়ে চলে যেতো—গণেশগর্জ্জী—সঙ্গে যেতে বড় দুঃখ—অধৈর্য্য হয়ে গিছ্‌লো।

বলিতে বলিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাবান্তর হইল। আবার কি ভাবে অবাক হয়ে রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে বলিলেন, "তুই এসেছিস? আমিও এসেছি!" এ সব কথা কে বুঝিবে? এই কি দেব-ভাষা?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:○•○:—

[পার্ষদ-সঙ্গে।]

ভক্তেরা অনেকেই উপস্থিত—শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বসিয়া আছেন। নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ), গিরীশ, রাম, হরিপদ, চুনী, বলরাম, মাষ্টার ইত্যাদি অনেকে ছিলেন।

(অবতার সম্বন্ধে বিচার)

নরেন্দ্র মানেন না যে মানুষে ঈশ্বর অবতার হন্। এদিকে গিরীশের অনন্ত বিশ্বাস, যে তিনি যুগে যুগে অবতার হন্, আর মানব-দেহ ধারণ করে মর্ত্ত্যলোকে আসেন। ঠাকুরের ভারি ইচ্ছা, যে এ সম্বন্ধে দুজনে বিচার হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি) একটু ইংরাজিতে দুজনে বিচার করো—আমি দেখ্‌বো।

বিচার আরম্ভ হইল। ইংরাজিতে হইল না—বাঙ্গালাতেই হইল—মাঝে মাঝে দু-একটা ইংরাজি কথা। নরেন্দ্র বলিলেন, ঈশ্বর অনন্ত। তাঁকে ধারণ করা আমাদের সাধ্য কি? তিনি সকলের ভিতরই আছেন—শুধু একজনের ভিতর এসেছেন, এমন নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)। ওরও যা মত, আমরাও তাই মত। তিনি সর্ব্বত্র আছেন, তবে একটা কথা আছে—শক্তি-বিশেষ। কোন খানে অবিদ্যা-শক্তির প্রকাশ, কোন খানে বিদ্যাশক্তির। কোন আধারে শক্তি

বেশী, কোন আধারে শক্তি কম। তাই সব মানুষ সমান নয়।

রামদত্ত। এ সব মিছে তর্কে কি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। (বিরক্তভাবে) না, ওর একটা মানে আছে।

গিরীশ। (নরেন্দ্রের প্রতি) তুমি কেমন করে জান্‌লে, তিনি দেহধারণ করে আসেন না?

নরেন্দ্র। তিনি অবাঙ্‌মনসোগোচরঃ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না; তিনি শুদ্ধবুদ্ধির গোচর। শুদ্ধবুদ্ধি শুদ্ধআত্মা একই। ঋষিরা এই শুদ্ধবুদ্ধি শুদ্ধআত্মা দ্বারা সেই শুদ্ধ আত্মাকে সাক্ষাৎকার করেছিলেন।

গিরীশ। (নরেন্দ্রের প্রতি) মানুষে অবতার না হলে কে বুঝিয়ে দেবে? মানুষকে জ্ঞান-ভক্তি দেবার জন্য তিনি দেহ ধারণ করে আসেন। না হলে কে শিক্ষা দেবে?

নরেন্দ্র। কেন? তিনি অন্তরে থেকে বুঝিয়ে দেবেন।

শ্রীরামকৃ। (সস্নেহে) হাঁ, হাঁ, অন্তর্যামীরূপে তিনি বুঝাবেন। তারপর ঘোরতর তর্ক হ'তে লাগলো। Infinity, তার কি অংশ হয়? অমুখ বিষয়ে Hamilton কি বলেন? Herbert Spencer কি বলেন, Tyndall, Huxley বা কি বলে গেছেন, এই সব কথা হ'তে লাগলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মাষ্টারের প্রতি) দেখ, ইগুণ আমার ভাল লাগ্‌ছে না। আমি তাই সব দেখ্‌ছি! বিচার আর কি কর্‌বো? দেখ্‌ছি তিনিই সব হয়েছেন।

(রামানুজ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাও বটে, আবার তাও বটে। এক অবস্থায়, অখণ্ডে—মন-বুদ্ধি হারা হয়ে যায়। নরেন্দ্রকে দেখে আমার মন অখণ্ডে লীন হয়—তার কি কল্লে বল দেখি?—

গিরীশ। (হাসিতে হাসিতে) ঐটে ছাড়া প্রায় সব বুঝেছি কিনা! (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আবার দু' থাক্ না নাম্‌লে কথা কইতে পারিনা।

"বেদান্ত—শঙ্কর যা বুঝিয়েছেন, তাও আছে, আবার রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও আছে।

নরেন্দ্র। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। (নরেন্দ্রের প্রতি) বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আছে—রামানুজের মত। কি না, জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। সব জড়িয়ে একটী।

যেমন একটী বেল্। এক জন খোলা আলাদা, বীজ আলাদা, আর শাঁস আলাদা করেছিল। বেলটী কত ওজনে, জান্‌বার দরকার হয়েছিল; এখন শুধু শাঁসে ওজন পাওয়া যায়? খোলা, বীচি, শাঁস, সব এক সঙ্গে ওজন কর্‌তে হবে। প্রথমে খোলা নয়, বীচি নয়, শাঁসটিই সার পদার্থ বলে বোধ হয়। তার পর বিচার ক'রে দেখ যে, যে বস্তুর শাঁস, সেই বস্তুরই খোলা আর বীচি। আগে নেতি নেতি করে যেতে হয়;—জীব নেতি, জগৎ নেতি, এইরূপ বিচার কর্‌তে হয়; ব্রহ্মই বস্তু, আর সব অবস্তু। তারপর অনুভব হয়, যারই শাঁস, তারই খোলা-বীচি। যা থেকে ব্রহ্ম ব্রহ্ম বল্‌ছো, তাই থেকেই জীব-জগৎ।

যারই নিত্য (Absolute), তারই লীলা (Relative)। তাই রামানুজ বল্‌তেন, জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। এরই নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

[ঈশ্বর-দর্শন (God-vision)]

(মাষ্টারের প্রতি) "আমি তাই দেখ্‌ছি সাক্ষাৎ—আর কি বিচার কর্‌বো? আমি দেখ্‌ছি, তিনিই এই সব হয়েছেন—তিনিই জীব, তিনিই জগৎ হয়েছেন!

"তবে চৈতন্য না লাভ কর্‌লে চৈতন্য জানা যায় না। বিচার কতক্ষণ? যতক্ষণ না তাঁকে লাভ করা যায়। শুধু মুখে বল্লে হবে না, এই আমি দেখ্‌ছি, তিনি সব হয়েছেন। তাঁর কৃপায় চৈতন্য লাভ করা চাই। চৈতন্য লাভ কর্‌লে সমাধি হয়; মাঝে মাঝে দেহ ভুল হয়ে যায়; কামিনী-কাঞ্চনের উপর আসক্তি থাকে না; ঈশ্বর-কথা বই আর কিছু ভাল লাগে না; বিষয়-কথা শুন্‌লে কষ্ট হয়। চৈতন্য লাভ কর্‌লে, তবে চৈতন্যকে জান্‌তে পারা যায়।

(অবতারবাদ ও প্রত্যক্ষ Revelation)

বিচারান্তে ঠাকুর রামকৃষ্ণ মাষ্টারকে বলিলেন—

"দেখ্‌ছি, বিচার করে এক রকম জানা যায়, তাঁকে ধ্যান করে এক রকম জানা যায়। আবার তিনি যখন দেখিয়ে দেন, সে এক। তিনি যদি দেখিয়ে দেন—এর নাম অবতার,—তিনি যদি তাঁর মনুষ্য-লীলা দেখিয়ে দেন, তাহলে আর বিচার করতে হয় না, কারুর বুঝিয়েও দিতে হয় না। কি রকম জান? যেমন অন্ধকারের ভিতর দেশলাই ঘষ্‌তে ২ দপ্ করে আলো হয়। সেই রকম দপ্ করে আলো যদি তিনি দেন, তা হলে সব সন্দেহ মিটে যায়। এরূপ বিচার করে কি তাঁকে জানা যায়?

(কালী * ও ব্রহ্ম †)

তখন ঠাকুর নরেন্দ্রকে কাছে ডাকিয়া বসাইলেন ও কুশল-প্রশ্ন ও কত আদর করিলেন।

নরেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) কৈ, কালী-ধ্যান তিন চার দিন কর্‌লুম, কিছুই তো হলো না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ক্রমে হবে। কালী আর কেউ নয়, যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই কালী। কালী আদ্যাশক্তি। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন ব্রহ্ম বলে কই। যখন সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করেন, তখন শক্তি বলে কই, কালী বলে কই। যাঁকে তুমি ব্রহ্ম বল্‌চো, তাঁকেই কালী বল্‌ছি।

"ব্রহ্ম আর কালী অভেদ। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি। অগ্নি ভাব্‌লেই দাহিকাশক্তি ভাব্‌তে হয়, দাহিকাশক্তি ভাব্‌লেই অগ্নি ভাব্‌তে হয়। কালী মান্‌লেই ব্রহ্ম মান্‌তে হয়, আবার ব্রহ্ম মান্‌লেই কালী মান্‌তে হয়।

"ব্রহ্ম ও শক্তি (কালী) অভেদ। ঐ শক্তিই ঐ কালী, আমি বলি।"

---

* কালী—God in his relations to the conditioned.

† ব্রহ্ম—The unconditioned, the Absolute

এদিকে রাত হয়ে গেছে। গিরীশের থিয়েটারে যেতে হবে। তাই হরিপদকে বলিলেন, 'ভাই একখান গাড়ী যদি ডেকে দিস্, থিয়েটর্ যেতে হবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিতে হাসিতে) দেখিস্ যেন আনিস্।

হরিপদ। (হাসিতে হাসিতে) আমি আন্‌তে যাচ্চি—আর আন্‌ব না?

(ঈশ্বরলাভ ও কর্ম্ম; 'বাম ও কাম')

গিরীশ। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) আপনাকে ছেড়ে আবার এখন থিয়েটর্ যেতে হবে—

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, ইদিক্-উদিক্—দুদিক্ রাখ্‌তে হবে, জনক রাজা ইদিক্ উদিক্ দুদিক্ রেখে খেয়েছিল দুধের বাটী।

(সকলের হাস্য।)

গিরীশ। থিয়েটর্ গুলো ছোঁড়াদেরই ছেড়ে দিই, মনে কর্‌ছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, না, ও বেশ আছে, অনেকের উপকার হচ্চে।

নরেন্দ্র। এইতো—ঈশ্বর বল্‌ছে, অবতার বল্‌ছে; আবার থিয়েটরে টানে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(সমাধি-মন্দিরে)

ঠাকুর রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে কাছে বসাইয়া এক দৃষ্টে দেখিতেছেন, হঠাৎ তাঁহার সন্নিকটে আরো সরিয়া গিয়া বসিলেন। নরেন্দ্র অবতার মানেন নাই—তায় কি এসে যায়? ঠাকুরের ভালবাসা যেন আরো উথলিয়া পড়িল। গায়ে হাত দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)। "মান কর্‌লে তো কর্‌লি, আমরাও তোর মানে আছি (রাই)।"

(বিচার ও ঈশ্বর-লাভ)

(নরেন্দ্রের প্রতি) যতক্ষণ বিচার, ততক্ষণ তাঁকে পায় নাই। তোমরা বিচার কর্‌ছিলে, আমার ভাল লাগে নাই।

নিমন্ত্রণ-বাড়ীর শব্দ কতক্ষণ শুনা যায়? যতক্ষণ লোকে খেতে না বসে। যাই লুচি-তরকারী পড়ে, অমনি বারআনা শব্দ কমে যায়। (সকলের হাস্য), আরো কম্‌তে থাকে। দই পাতে পড়্‌লে কেবল সুপ্ সাপ্। ক্রমে ক্রমে খাওয়া হয়ে গেলেই নিদ্রা।

"ঈশ্বরকে যতটুকু লাভ হবে, ততই বিচার কম্‌বে। তাঁকে লাভ হলে আর শব্দ—বিচার—থাকে না। তখন নিদ্রা—সমাধি!

এই বলিয়া, নরেন্দ্রের গায়ে হাত বুলাইয়া, মুখে হাত দিয়া, আদর করিতে লাগিলেন ও বলিতে লাগিলেন, 'হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ।'

কেন এরূপ করিতেছিলেন? ঠাকুর রামকৃষ্ণ কি নরেন্দ্রের মধ্যে সাক্ষাৎ নারায়ণ দর্শন করিতে ছিলেন? এরই নাম কি মানুষে ঈশ্বর-দর্শন?

কি আশ্চর্য্য! দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের সংজ্ঞা যাইতেছে। ঐ দেখ, বহির্জগতের হুঁস চলিয়া যাইতেছে। এরি নাম বুঝি অর্দ্ধবাহ্যদশা—যাহা শ্রীগৌরাঙ্গের হইত? এখনো নরেন্দ্রের পায়ের উপর হাত—যেন ছল করিয়া নারায়ণের পা টিপিতেছেন—

আবার গায়ে হাত বুলাইতেছেন! এত গা টেপা, পা টেপা কেন? এ কি নারায়ণের সেবা কর্‌ছেন না শক্তি-সঞ্চার কর্‌ছেন?

দেখিতে দেখিতে আরো ভাবান্তর হইল। এই আবার নরেন্দ্রের কাছে হাত যোড় করে কি বল্‌ছেন!

বল্‌ছেন,—"একটা গান (গা)—তাহলে ভাল হব; নাহলে উঠ্‌তে পার্‌বো কেমন করে?—গোরা প্রেমে গর্গর—মাতোয়ারা—(নিতাই আমার)"---

কিয়ৎক্ষণ আবার অবাক্ চিত্রপুত্তলিকার মত চুপ করে রহিলেন। আবার ভাবে মাতোয়ারা হয়ে বল্‌ছেন,—

"দেখিস্ রাই যমুনায় যে পড়ে যাবি—কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মাদিনী।"

আবার ভাবে বিভোর। বলিলেন,

সখি! সে বন কত দূর?
(যে বনে আমার শ্যামসুন্দর)
(ঐ যে কৃষ্ণ-গন্ধ পাওয়া যায়)
(আমি চলিতে যে নারি)"

এখন জগৎ ভুল হয়েছে—কাহাকেও মনে নাই—নরেন্দ্র সম্মুখে, কিন্তু নরেন্দ্রকে মনে নাই—কোথায় বসে আছেন, কিছুই হুঁস্ নাই। এখন মন-প্রাণ ঈশ্বর-গত হয়েছে। "মদ্গত অন্তরাত্মা"।

'গোরা প্রেমে গর্গর মাতোয়ারা'—এই কথা বলিতে ২ হঠাৎ হুঙ্কার দিয়া দণ্ডায়মান! আবার বসিলেন; বসিয়া বলিতেছেন—

"ঐ একটা আলো আস্‌চে দেখ্‌তে পাচ্ছি; কিন্তু কোন্ দিক্ দিয়ে আলোটা আস্‌চে, এখনো বুঝ্‌তে পার্‌ছিনা।

এইবার নরেন্দ্র গান গাইলেন—

সব দুখ দূর করিলে দরশন দিয়ে। মোহিলে প্রাণ॥
সপ্ত লোক ভুলে শোক, তোমারে পাইয়ে কোথায় আমি অতি দীন হীন॥

গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণের আবার বহির্জগৎ ভুল হইয়া আসিতে লাগিল। আবার নিমীলিত নেত্র। স্পন্দহীন দেহ। সমাধিস্থ।

সমাধি ভঙ্গের পর বলিয়া উঠিলেন "আমাকে নিয়ে যাবে?" বালক যেমন সঙ্গী না দেখ্‌লে অন্ধকার দেখে, সেইরূপ

অনেক রাত হইয়াছে। ফাল্গুন-কৃষ্ণা দশমী—অন্ধকার-রাত্রি। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে সেই কালী-বাড়ীতে যাইবেন—গাড়ীতে উঠিলেন। ভক্তেরা গাড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া। তিনি উঠিতেছেন—অনেক সন্তর্পণে তাঁকে উঠান হইল। এখনো 'গর্গর মাতোয়ারা।'

গাড়ী চলিয়া গেল। ভক্তেরা—যে যার আলয়াভিমুখে যাইতেছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

(সেবক-হৃদয়ে)

মস্তকের উপরে তারকামণ্ডিত নৈশ গগন—হৃদয়পটে অদ্ভুত রামকৃষ্ণ-ছবি—স্মৃতি মধ্যে ভক্তের মজ্‌লিস্—সুখ-স্বপ্নের ন্যায় নয়ন-পথে সেই প্রেমের হাট্! কলিকাতার রাজ-পথে গৃহাভিমুখে ভক্তেরা যাইতেছেন। কেহ সরস বসন্তানিল সেবন করিতে করিতে সেই গানটী আবার গাইতে গাইতে যাচ্ছেন,

সব দুখ দূর করিলে দরশন দিয়ে।

মোহিলে প্রাণ॥

কেউ ভাবৃতে ভাবৃতে যাচ্চেন, সত্য সত্যই কি ঈশ্বর মানুষদেহ ধারণ করে আসেন? তবে অবতার কি সত্য? অনন্ত ঈশ্বর "চৌদ্দ পোয়া" মানুষ কেমন করে হবেন? অনন্ত কি সান্ত হয়? বিচার তো অনেক হ'ল। কি বুঝ্লাম? বিচারের দ্বারা কিছুই বুঝ্লাম না। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তো বেশ বল্লেন "যতক্ষণ বিচার—' ততক্ষণ বস্তুলাভ নাই, ততক্ষণ ঈশ্বরকে পাওয়া যায় নাই।—তাও বটে, এই তো এক ছটাক বুদ্ধি; এর দ্বারা আর কি বুঝ্বো! ঈশ্বরের কথা? একসের বাটীতে কি চার সের দুধ ধরে? তবে অবতারে বিশ্বাস কিরূপে হয়? ঠাকুর বল্লেন, ঈশ্বর যদি দপ্ করে দেখিয়ে দেন, তাহলেই এক দণ্ডেই বুঝা যায়। Goethe মৃত্যুশয্যায় বলেছিলেন "Light! More Light!" তিনি যদি দপ্ করে আলো জ্বেলে দেখিয়ে দেন, তবে—

"ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ"

যেমন Palestineএ মূর্খ ধীবরেরা Jesusকে পূর্ণাবতার দেখেছিলেন, অথবা যেমন শ্রীবাসাদি ভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গকে পূর্ণাবতার দেখেছিলেন।

যদি দপ্ করে তিনি দেখান্, তা না হলে উপায় কি? কেন? যে কালে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বল্‌ছেন ও কথা, সে কালে অবতারে বিশ্বাস করবো। তিনিই শিখিয়েছেন,—বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস।—
"তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হবনাকো পথহারা॥"

আমার তাঁর বাক্যে ঈশ্বরকৃপায় বিশ্বাস হয়েছে—আমি বিশ্বাস করবো। অন্যে যা করে করুক্—আমি এই দেব-দুর্লভ বিশ্বাস কেন ছাড়্বো? বিচার থাক্। জ্ঞান চর্চ্চা ক'রে কি আর একটী Faust হব? আবার কি গভীর রজনী-মধ্যে বাতায়নপথে চন্দ্রকিরণ আসিবে, আর আমি একাকী ঘরের মধ্যে "হায়! কিছু জানিতে পারিলাম না, Science, Philosophy বৃথা অধ্যয়ন করিলাম; এ জীবনে ধিক্" এই বলিয়া বিষের শিশি লইয়া আত্মহত্যা করিতে বসিব? না Alstor-এর মত অজ্ঞানের বোঝা বইতে না পেরে শিলাখণ্ডের উপর মাথা রাখিয়া মৃত্যুর অপেক্ষা করিব? না, আমি কি এ সব ভয়ানক পণ্ডিতদের মত এক ছটাক্ জ্ঞানের দ্বারা এ রহস্য ভেদ কর্‌তে যাবো? প্রয়োজন নাই। আর একসের বাটীতে চার সের দুধ ধর্‌লো না বলে, মরিতে যাবারও দরকার নাই। বেশ কথা,—গুরু-বাক্যে বিশ্বাস! হে ভগবান্! আমায় ঐ বিশ্বাস দাও, আর মিছামিছি ঘুরাইও না। যা হবার নয়, তা খুঁজতে যাইও না। আর ঠাকুর যা শিখিয়েছেন, 'যেন তোমার পাদ-পদ্মে শুদ্ধ ভক্তি হয়—অমলা, অহৈতুকী—ভক্তি; আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই, কৃপা করে এই আশী-র্ব্বাদ কর।'

আবার, কোন ভক্ত ঠাকুর-রামকৃষ্ণের অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রেমের কথা ভাবিতে ভাবিতে সেই তমসাচ্ছন্ন রাত্রিমধ্যে রাজপথ দিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন,

"কি ভালবাসা! গিরীশ থিয়েটরে চলে যাবেন, তবু তাঁর বাড়ীতে যেতে হবে! শুধু তা নয়। এমনও বল্‌ছেন না যে, 'সব ত্যাগ কর, আমার জন্য গৃহ, পরিজন, বিষয়কর্ম্ম, সব ত্যাগ করে সন্ন্যাস অবলম্বন কর।' বুঝেছি, এর মানে এই যে, সময় না হলে ছাড়্‌লে কষ্ট হবে; ঠাকুর যেমন নিজে বলেন—ঘায়ের মামড়ী ঘা শুকুতে না শুকুতে ছিঁড়লে রক্ত প'ড়ে কষ্ট হয়, কিন্তু ঘা শুকিয়ে গেলে মামড়ী আপনি খসে পড়ে যায়। সামান্য লোকে—যাদের অন্তর্দৃষ্টি নাই—তারা বলে, এক্ষণে সংসার ত্যাগ কর। ইনি সদ্‌গুরু, অহেতুক কৃপাসিন্ধু, প্রেমের সমুদ্র, কিসে মঙ্গল হয়, এই চেষ্টা নিশিদিন করিতেছেন।

"আর গিরীশের কি বিশ্বাস! দুদিন দর্শনের পরই বলেছিলেন, "প্রভু তুমিই ঈশ্বর, মানুষ-দেহ ধারণ করে এসেছ—আমার পরিত্রাণের জন্য। গিরীশ ঠিক্‌তো বলেছেন, ঈশ্বর মানব-দেহ ধারণ না কর্‌লে ঘরের লোকের মত কে শিক্ষা দেবে? কে জানিয়ে দেবে যে, ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু? কে ধরায় পতিত দুর্ব্বল সন্তানকে হাত ধরে তুল্‌বে? কে কামিনী-কাঞ্চনাসক্ত পাশবস্বভাবপ্রাপ্ত মানুষকে আবার পূর্ব্ববৎ অমৃতের অধিকারী করিবে? আর তিনি মানুষরূপে সঙ্গে সঙ্গে না বেড়ালে, যাঁরা তদ্‌গতান্তরাত্মা, যাঁদের ঈশ্বর বই আর কিছু ভাল লাগে না—তাঁরা কি করে দিন কাটাবেন? তাই "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্, ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

"কি ভালবাসা!—নরেন্দ্রের জন্য পাগল, নারাণের জন্য ক্রন্দন। বলেন, 'এরা ও অন্যান্য ছেলেরা—রাখাল, ভবনাথ, পূর্ণ, বাবুরাম ইত্যাদি—সাক্ষাৎ নারায়ণ, আমার জন্য দেহ ধারণ করে এসেছেন। এ প্রেমতো মানুষ-জ্ঞানে নয়, এ প্রেম দেখ্‌ছি—ঈশ্বর-প্রেম। ছেলেরা—শুদ্ধ-আত্মা, স্ত্রী-লোক অন্যভাবে স্পর্শ করে নাই, বিষয়-কর্ম্ম ক'রে ক'রে এদের লোভ, অহঙ্কার, হিংসা ইত্যাদির স্ফূর্ত্তি হয় নাই—তাই ছেলেদের ভিতর ঈশ্বরের বেশী প্রকাশ; কিন্তু এ দৃষ্টি কার আছে? ঠাকুরের অন্তর্দৃষ্টি; সমস্ত দেখিতেছেন—কে বিষয়াসক্ত, কে সরল, উদার, ঈশ্বর-ভক্ত। তাই এরূপ ভক্ত দেখ্‌লেই সাক্ষাৎ নারায়ণ মনে করেন। তাদের নাওয়ান্, খাওয়ান্, শোয়ান্;—তাদের দেখিবার জন্য কাঁদেন, কলিকাতায় ছুটিয়া যান্; লোকের খোসামোদ করে বেড়ান্—কলিকাতা থেকে তাদের গাড়ী করে আন্‌তে; গৃহস্থ ভক্তদের সর্ব্বদা বলেন—ওদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াইও, তাহলে তোমাদের ভাল হবে। একি মায়িক স্নেহ? না—বিশুদ্ধ ঈশ্বর-প্রেম?—প্রতিমাতে এতো * ষোড়শোপচারে ঈশ্বরের পূজা ও সেবা হয়, আর শুদ্ধনরদেহে হয় না?

"নরেন্দ্রকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাহ্যজগৎ ভুলে গেলেন; ক্রমে নরেন্দ্রকে ভুলে গেলেন; apparent manকে (বাহ্যিক-মনুষ্যকে) ভুলে গেলেন—Real manকে (প্রকৃত মনুষ্যকে) দর্শন কর্‌তে লাগলেন; অখণ্ড সচ্চিদানন্দে মন লীন হইল—যাঁকে

ধ্যান ক'রে কখনও অবাক্ স্পন্দহীন হয়ে চুপ ক'রে থাক্‌তেন—কখনওবা ওঁ ওঁ বল্‌তেন; কখনও মা মা করে বালকের মত ডাক্‌তেন। নরেন্দ্রের ভিতর—তাঁর বেশী প্রকাশ দেখ্‌তেন, তাই নরেন্দ্র নরেন্দ্র করে পাগল।

নরেন্দ্র অবতার মানেন নাই,—তার আর কি হয়েছে? ঠাকুরের দিব্য চক্ষু. তিনি দেখ্‌লেন যে, এ অভিমান হতে পারে। তিনি যে বড় আপনার লোক; তিনি যে আপনার মা, "পাতানো" মা ত নন্; তিনি কেন বুঝিয়ে দেন না, তিনি কেন দপ্ করে আলো জ্বেলে দেখিয়ে দেন না? —তাই বুঝি ঠাকুর বল্লেন,

"মান করলি ত করলি, আমরাও তোর মানে আছি।"

আত্মীয় হতে যিনি পরমাত্মীয়, তাঁর উপর অভিমান করবেন না ত কার উপর অভিমান কর্‌বেন? ধন্য নরেন্দ্রনাথ, তোমার উপর এই পুরুষোত্তমের এত ভালবাসা! তোমাকে দেখে এত সহজে ঈশ্বরের উদ্দীপন!'

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সেই গভীর রাত্রে রামকৃষ্ণ স্মরণ করিতে করিতে ভক্তেরা গৃহ-প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

অন্নপূর্ণা-স্তোত্রম্।

(শঙ্করাচার্য্য-রচিতম্)

মন্দারকল্পহরিচন্দন পারিজাত
সন্তানচন্দ্রমণিমণ্ডিতবেদিসংস্থে।
অর্দ্ধেন্দুমৌলিসুললাটষড়র্দ্ধনেত্রে
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায়-
মহ্যম্॥

পারিজাত-কল্প-হরিচন্দন-সন্তান
মন্দার পাদপপঞ্চ কিবা শোভমান;
কিবা চন্দ্রকান্তমণি পরম সুন্দর,
সবাই করিছে তব বেদী মনোহর।
এ হেন বেদীর পরে নিত্য তব স্থিতি,
অর্দ্ধচন্দ্র ভালে তব পাইতেছে ভাতি।
পরম সুন্দর মাগো! ললাট তোমার,
ত্রিনেত্র ধরিয়া তুমি আছ অনিবার।
ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ জ্বলিছে সদাই,
ভিক্ষা দে মা অন্নপূর্ণে! এই ভিক্ষা চাই।

২

তালীকদম্বপরিশোভিতপার্শ্বভাগে
শক্রাদয়ো মুকুলিতাঞ্জলয়ঃ স্তুবন্তি।
দেবি ত্বদীয় চরণৌ শরণং প্রপদ্যে
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায়
মহ্যম্॥

কিবা তালতরু, কিবা কদম্বের দল—
মহাশোভা পায় তব পার্শ্বে অবিরল।
ইন্দ্রাদি-দেবতা-গণ থাকি সন্নিকটে,
করিছে তোমার স্তুতি বদ্ধ-কর পুটে।
জগতের যত কিছু ত্যজিয়া জননি!
আশ্রয় করিনু তব চরণ-দুখানি।
ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ জ্বলিছে সদাই,
অন্ন দে মা অন্নপূর্ণে! এই ভিক্ষা চাই।

৩

কেয়ূরহারমণিকঙ্কণকর্ণপূর
কাঞ্চিকলাপমণিকান্তিলসদ্দুকূলে।
দুগ্ধান্নপূর্ণবরকাঞ্চনদর্ব্বিহস্তে
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায়
মহ্যম্॥

কেয়ূর কঙ্কণ কাঞ্চী কর্ণপূর হার
তোমার বস্ত্রের শোভা করে অনিবার।
সোনার হাতায় নিত্য দুগ্ধ-অন্ন ধরি,
ক্ষুধিতের প্রাণ রাখ, তুমিই শঙ্করি!
ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ জ্বলিছে সদাই,
অন্ন দে মা অন্নপূর্ণে! এই ভিক্ষা চাই।

৪

সদ্ভক্তকল্পলতিকে ভুবনৈকবন্দ্যে
ভূতেশহৃৎকমলমগ্নকুচাগ্রভৃঙ্গে।
কারুণ্যপূর্ণনয়নে কিমুপেক্ষসে মাং
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায়
মহ্যম্॥

তোমাকেই কল্পতরু বলে ভক্তজন,
তোমারি চরণ-পদ্ম পূজে ত্রিভুবন।
শঙ্করের হৃৎপদ্মে করি অধিষ্ঠান,
তোমারি কুচাগ্র-ভৃঙ্গ করে মধুপান।
যখন কারুণ্য-পূর্ণ তোমার নয়ন,
কেন মোরে অনাদর কর মা তখন?
ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ জ্বলিছে সদাই,
অন্ন দে মা অন্নপূর্ণে! এই ভিক্ষা চাই।

৫

শব্দাত্মিকে শশিকলাভরণার্দ্ধদেহে
শম্ভোরুরঃস্থলনিকেতননিত্যবাসে।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা।
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায়-
মহ্যম্॥

তোমাকেই শব্দময়ী বলে ত্রিসংসার,
শশিকলা অর্দ্ধদেহে শোভিছে তোমার।
তুমি মাগো! শঙ্করের হৃদয়বাসিনী,
তুমিই দারিদ্র্য-দুঃখ-ভয়-নিবারিণী।
তুমি এই ত্রি-সংসারে একমাত্র সার,
তোমা বিনা সার বস্তু কিছু নাহি আর!
ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ জ্বলিছে সদাই,
ভিক্ষা দে মা অন্নপূর্ণে! এই ভিক্ষা চাই।

৬

লীলাবচাংসি তব দেবি ঋগাদিবেদাঃ
সৃষ্ট্যাদিকর্ম্মরচনা ভবদীয়চেষ্টা।
ত্বত্তেজসা জগদিদং প্রতিভাতি নিত্যং
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায়
মহ্যম্॥

সাম-যজুঃ-ঋক্-অথর্ব্ব-বেদ চতুষ্টয়—
তব লীলাবাক্য বিনা কিছু আর নয়;
কিবা সৃষ্টি, কিবা স্থিতি, কিবা লয় আর,
সকলি তোমার খেলা, এই বুঝি সার।
স্থাবর-জঙ্গম-পূর্ণ এই ত্রিসংসার
তোমারি প্রভায় প্রভা পায় অনিবার।
ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ জ্বলিছে সদাই,
ভিক্ষা দে মা অন্নপূর্ণে! এই ভিক্ষা চাই।

(৭)

বৃন্দারবৃন্দমুনিনারদকৌশিকাত্রি-
ব্যাসাম্বরীষকলসোদ্ভবকশ্যপাদ্যাঃ।
ভক্ত্যা স্তুবন্তি নিগমাগমসূক্তমন্ত্রৈ
র্ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায়-
মহ্যম্ ॥

নারদ অগস্ত্য অত্রি ব্যাস তপোধন,
বিশ্বামিত্র অম্বরীষ কশ্যপাদিগণ,
কিবা ত্রিভুবনে যত দেবতা সকল,
সকলেই পূজে তব চরণ-কমল।
নিগম-আগম-মন্ত্র করি উচ্চারণ,
করে মা তোমার স্তুতি, দেখি সর্ব্বক্ষণ।
ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ জ্বলিছে সদাই,
অন্ন দে মা অন্নপূর্ণে! এই ভিক্ষা চাই।

(৮)

অম্ব ত্বদীয় চরণাম্বুজসেবনেন
ব্রহ্মাদয়োঽপি বহুলাং
শ্রিয়মাশ্রয়ন্তে।
তস্মাদহং তব নতোঽস্মি
পদারবিন্দে
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায়
মহ্যম্ ॥

তোমারি চরণ-পদ্ম সেবি সর্ব্বক্ষণ,
ব্রহ্মাদির হইয়াছে ঐশ্বর্য্য এমন।
তাই মাগো! যত কিছু সকলি ত্যজিয়া,
তোমারি চরণ-পদ্মে রহিনু পড়িয়া।
ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ জ্বলিছে সদাই,
ভিক্ষা দে মা অন্নপূর্ণে! এই ভিক্ষা চাই।

(৯)

সন্ধ্যাত্রয়ে সকল ভূসুরসেব্যমানা
স্বাহাস্বধাসি পিতৃদেবগণার্ত্তিহন্ত্রী।
জায়া সুতাঃ পরিজনোঽতিথয়োঽ-
ন্নকামা
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায়
মহ্যম্ ॥

তিন সন্ধ্যা ধরি মাগো! যতেক ব্রাহ্মণ,
লইয়া তোমারি পূজা ব্যস্ত হ'য়ে রন্।
তুমি স্বাহা দেবগণ-তর্পণকারিণী,
তুমি স্বধা পিতৃ-লোক-তৃপ্তি-প্রদায়িনী।
স্ত্রী-পুত্র-অতিথি আর যত পরিবার,
অন্নের লাগিয়া সদা করে হাহাকার।
ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ জ্বলিছে সদাই,
অন্ন দে মা অন্নপূর্ণে! এই ভিক্ষা চাই।

(১০)

একাত্মমূলনিলয়স্য মহেশ্বরস্য
প্রাণেশ্বরি প্রণতভক্তজনায় শীঘ্রম্।
বামাক্ষি রক্ষিতজগত্ত্রিতয়েঽন্নপূর্ণে
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায়
মহ্যম্ ॥

সকলেরি আত্মা যাঁরে বলে ত্রিভুবন,
সেই শঙ্করের মাগো! তুমি প্রাণধন।
পরম সুন্দর দুটী নয়ন তোমার,
তুমিই করিছ রক্ষা এই ত্রিসংসার।
জগতের যত কিছু করিয়া বর্জ্জন,
তোমারি শ্রীপদে মাগো! স'পিয়াছি মন।
ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ জ্বলিছে সদাই,
ভিক্ষা দে মা অন্নপূর্ণে! এই ভিক্ষা চাই।

(১১)

ভক্ত্যা পঠন্তি গিরিজাদশকং প্রভাতে

ধর্ম্মার্থকামবহুপুণ্যজমোক্ষকামাঃ।

প্রীত্যা মহেশবনিতা হিমশৈলকন্যা

তেভ্যো দদাতি সততং মনসেপ্সিতানি॥

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, এই চারি ধন—
যে জন কামনা করে প্রাপ্তির কারণ,
সেই জন এই অন্নপূর্ণা-শ্লোকচয়,
পঠে যদি প্রাতঃকালে হইয়া তন্ময়,
তাহা হ'লে হিমালয়-সুতা মহেশ্বরী
অন্নপূর্ণা স্নেহভরে দৃষ্টিপাত করি,
তাহার মনের বাঞ্ছা করেন পূরণ,
ইহার অন্যথা নাহি হয় কদাচন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি, এ,

ভূ-গোল পরিচয়।

২য় পাঠ। ১ম প্রপাঠক।

আমরা যে পৃথিবীর পৃষ্ঠে বাস করিতেছি, ঐ ভূপৃষ্ঠে আমরা সর্ব্বত্র পদব্রজে, অশ্বারোহণে, বাষ্প-শকটে, নৌযানে বা বাষ্পপোতে সতত দেশ-বিদেশ পরিভ্রমণ করিতেছি। যেখানে সেখানে নির্ম্মল প্রান্তরে দণ্ডায়মান হইয়া সর্ব্বদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমরা দেখিতে পাইব, আমাদিগের দৃষ্টির ক্ষেত্র সমতল ও চক্রাকার। চক্রাকার সমতল ক্ষেত্রকে চক্রবাল বলে। কিন্তু উন্নত গিরি-শৃঙ্গে আরোহণ করিলে অথবা ব্যোমযান আরোহণে ঊর্দ্ধে উঠিলে আমরা দেখিতে পাই যে, চক্রাকার চক্রবাল সমতল নহে; কূর্ম্ম-পৃষ্ঠের ন্যায় গোল বা বর্ত্তুলাকৃতি। (১) মানবদেহ খর্ব্ব বলিয়া এবং ভূপৃষ্ঠের বন্ধুরতা বশতঃ ভূপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হইয়া আমরা ভূপৃষ্ঠের যে ক্ষুদ্র খণ্ড দেখিতে পাই, ঐ ভূখণ্ডের গোলত্ব দর্শকের পক্ষে উপলক্ষিত হয়না। কারণ কোন বৃত্তের পরিধির শতাংশ লইলে যেমন ঐ পরিধি-খণ্ড সরল রেখা বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ চক্রবালের ব্যাস ভূগোল-পরিধির ক্ষুদ্র অংশ বলিয়া সরল রেখার ন্যায় দেখায় এবং চক্রবাল সমতল ক্ষেত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। (২) পৃথিবীর গোলত্বের এই একটী বিশেষ প্রমাণ।

দর্শক সুবিস্তীর্ণ অবন্ধুর নির্ম্মল ভূতলে দণ্ডায়মান হইয়া সুদূরবর্ত্তী অশ্বারোহী বন্ধুর অনুসন্ধানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, দর্শক অগ্রে বন্ধুর উদ্দেশ পাইবেন না। ক্রমে বন্ধু নিকটে আসিলে, দর্শক বন্ধুর উষ্ণীষ মাত্র দেখিতে পাইবেন। ক্রমে বন্ধু নিকটতর হইলে, দর্শক অশ্বারোহী বন্ধুর দেহ দেখিতে পাইবেন। ক্রমে বন্ধু নিকটতম হইলে, দর্শক বন্ধুর বাহন দেখিতে পাইবেন। বিবেচনা করিয়া দেখ, এই অবন্ধুর নির্ম্মল প্রান্তরে কে দর্শকের দৃষ্টি রোধ করিয়াছিল? ভূপৃষ্ঠের বর্ত্তুলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। আবার চতুর্দ্দিক হইতে অশ্বারোহী

(১) অল্পকায়তয়া লোকাঃ স্বস্থানাৎ সর্ব্বতো মুখং। পশ্যন্তি বৃত্তামপ্যেতাং চক্রাকারাং বসুন্ধরাং সূর্য্য. ১২।৫৪

(২) সমঃ যতঃ স্যাৎ পরিধেঃ শতাংশঃ। সিদ্ধান্ত শিরোমণি ৩।১৩

বন্ধুগণ দর্শকের স্থিতি-স্থানে আসিতে লাগিলে, দর্শক অনুভব করিবেন যে, তিনি উচ্চতম স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন এবং চতুর্দ্দিক হইতে বন্ধুগণ উচ্চে আরোহণ করিতেছেন; কিন্তু ইহাও দর্শকের ভ্রম; (৩) কারণ ভূগোলের যে কোন স্থানে দণ্ডায়মান থাকিলে, দর্শকের ঐ ভ্রম জন্মিতে পারে যে, দর্শক যে স্থানে দণ্ডায়মান, ঐ স্থানই পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ স্থান। ভূগোল বর্ত্তুলাকার না হইলে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই ভ্রম জন্মিতে পারিত না। পৃথিবী বর্ত্তুলাকার বলিয়াই এই ভ্রম পৃথিবীর সর্ব্বত্রই জন্মে। এই ভ্রম বশতঃ সুমেরুস্থ ব্যক্তি মনে করেন যে, কুমেরুস্থ ব্যক্তি পাতালে রহিয়াছে, এবং কুমেরুস্থ ব্যক্তি মনে করেন যে, সুমেরুস্থ ব্যক্তি পাতালে রহিয়াছে। (৪)

এমনকি, দর্শকের সমসূত্রপাতে ভূপৃষ্ঠের অপরাংশস্থিত আর দর্শক বিবেচনা করেন যে, তিনি ভূপৃষ্ঠের উচ্চতম স্থানে দণ্ডায়মান এবং দর্শক ভূপৃষ্ঠের নিম্নতম স্থানে দণ্ডায়মান এবং দর্শকও ঐ ভ্রমপ্রমাদে পতিত। ভদ্রাশ্ববর্ষস্থ যমকোটি নগরবাসিগণ এবং কেতুমালবর্ষস্থ রোমকবাসী পরস্পর পরস্পরকে পাতালবাসী জ্ঞান করেন এবং ভারতবর্ষস্থ লঙ্কাবাসিগণ এবং কুরুবর্ষস্থ সিদ্ধপুরবাসিগণ পরস্পর পরস্পরকে পাতালবাসী জ্ঞান করেন। (৫)

উভয় পক্ষে বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন, শূন্যে স্থিত বর্ত্তুলাকার পৃথিবীর উচ্চতম স্থানই বা কোথায়, নিম্নতম স্থানই বা কোথায়! (৬)

তরঙ্গহীন সমুদ্র-বক্ষে শত সহস্র জাহাজ বিচরণ করিতেছে, কিন্তু সুদূরস্থ জাহাজ একখানিও দৃষ্টিগোচর হয়না; এমন কি, দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যেও দৃষ্টিগোচর হয় না। আগন্তুক জাহাজ চক্রবালের সীমাতলে উপনীত হইলে অগ্রে কেবল মাত্র জাহাজের মোটা মাস্তুলের পাইল দৃষ্টিগোচর হয়, জাহাজের কাণ্ড দৃষ্টিগোচর হয় না। ক্রমে জাহাজ নিকটস্থ হইলে, জাহাজের কনিষ্ঠ মাস্তুল, তৎপরে জাহাজের কাণ্ড দর্শকের দৃষ্টিগোচর হয়। নির্ম্মল তরঙ্গহীন সমুদ্রবক্ষে কে জাহাজ দর্শকের দৃষ্টি হইতে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছিল? সাগরপৃষ্ঠের বর্ত্তুলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। (৭) ভাস্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

যেমন কদম্ব পুষ্পের উন্নত কেশরমালা কদম্ব পুষ্পের গোলত্ব নষ্ট করিতে পারে না, সেইরূপ ভূপৃষ্ঠের সর্ব্বত্র পর্ব্বত, বন, গ্রাম, দেবস্থলী সমূহে পরিবৃত থাকিলেও, পৃথিবী গোলাকার রূপ পরিত্যাগ করেনা।

---

(৩) সর্ব্বত্রৈব মহীগোলে স্বস্থানমুপরিস্থিতং। সূর্য্য ১২।৫৩

(৪) উপর্য্যাত্মানমন্যোন্যং কল্পয়ন্তি সুরাসুরাঃ। সূর্য্য ১২।৫১

(৫) অন্যেঽপি সমসূত্রস্থামন্যোন্যেঽধঃ পরস্পরং ভদ্রাশ্ব কেতুমালস্থা লঙ্কাসিদ্ধপুরাশ্রিতাঃ সূর্য্য। ১২।৫২

(৬) খে যতো গোলঃ তস্মাৎ ক্বোর্দ্ধং ক্ব বাপ্যধঃ সূর্য্য। ১২।৫৩

(৭) সর্ব্বতঃ পর্ব্বতারাম গ্রাম চৈত্য চয়ৈশ্চিতঃ, কদম্বকুসুমাকারঃ-কেশর-প্রসরৈরিব। সিদ্ধান্ত-শিরোমণি ।৩।১

ভূপৃষ্ঠ সমতল হইলে, পৃথিবীর যে কোন স্থানে থাকিয়া এক কটাহের সমগ্র নক্ষত্রই দৃষ্টিগোচর হইতে পারিত, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, নিরক্ষ রেখায় দর্শক দণ্ডায়মান হইলে, উত্তর ধ্রুব তারা ও দক্ষিণ ধ্রুব তারা, এই উভয় তারা দর্শকের চক্রবাল ক্ষেত্রে অবস্থিত থাকে এবং দর্শকের দৃষ্টিগোচর হয়; কিন্তু দর্শক উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলে, দক্ষিণ ধ্রুবতারা দর্শকের চক্রবাল ক্ষেত্রের নিম্নে ডুবিয়া যায়, গতিকে দক্ষিণ ধ্রুব তারা অদৃশ্য হয়, এবং উত্তর-ধ্রুব তারা দর্শকের চক্রবাল ক্ষেত্রের ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে। দর্শক নিরক্ষরেখা ত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলে, উত্তর-ধ্রুব তারা দর্শকের চক্রবাল ক্ষেত্রের নিম্নে ডুবিয়া যায় এবং দর্শকের অদৃশ্য হয়। কিন্তু দক্ষিণ ধ্রুবতারা ক্রমে দর্শকের চক্রবালক্ষেত্রের ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে। নিরক্ষ রেখা ত্যাগ করিয়া দর্শক যত উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইবেন, ততই উত্তর ধ্রুব তারা দর্শকের চক্রবাল ক্ষেত্রের ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে, অবশেষে দর্শক সুমেরু-বিন্দুতে উপনীত হইলে, উত্তর-ধ্রুব তারা দর্শকের মস্তকোপরিস্থ খ-বিন্দুতে উপস্থিত হয়। দর্শক নিরক্ষ-রেখা ত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে যত অগ্রসর হইতে থাকেন, দক্ষিণ ধ্রুবতারা দর্শকের চক্রবাল ক্ষেত্র হইতে তত ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে। অবশেষে দর্শক কুমেরু বিন্দুতে উপনীত হইলে, দক্ষিণ ধ্রুব তারা দর্শকের মস্তকোপরিস্থ খ-বিন্দুতে উপস্থিত হয়। পৃথিবী বর্ত্তুলাকার না হইলে, ধ্রুব তারা দ্বয়ের দৃষ্টি সম্বন্ধে এরূপ বিপর্য্যয় ঘটনা কখনই হইত না। (৮) পৃথিবী সমতল ক্ষেত্র হইলে, সর্ব্বদেশবাসিগণ উভয় ধ্রুব তারা দেখিতে পাইতেন। কিন্তু কলিকাতাবাসিগণ নিরক্ষ রেখা হইতে প্রায় ২২॥ অংশ উত্তরে অবস্থিত বলিয়া দক্ষিণ-ধ্রুবতারা কলিকাতাবাসীর দৃষ্টিগোচর নহে; কিন্তু দক্ষিণ—ধ্রুবতারা হইতে ৩৮ অংশ উত্তরস্থ অগস্ত্য তারা কলিকাতাবাসিগণ অনেক সময়ে দেখিতে পান, কিন্তু লণ্ডনবাসিগণ নিরক্ষ রেখার ৫০ অংশাধিক উত্তরস্থিত বলিয়া অগস্ত্য তারা কখনও দেখিতে পান না। আবার দেখ—

ভূচ্ছায়ার আকৃতি মোচক বা কদলীফুলের ন্যায়। এই মোচকাকৃতি ভূচ্ছায়া মধ্যে চন্দ্র পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব গমনে প্রবেশ করিয়া গ্রহণগ্রস্ত হয়। পৃথিবী বর্ত্তুলাকার না হইলে, ভূচ্ছায়া সতত মোচকাকৃতি হইত না। (৯)

পৃথিবী বর্ত্তুলাকার বলিয়া পৃথিবীর দারুক (Globe) বর্ত্তুলাকারে নির্ম্মিত হয় এবং পৃথিবী-মানচিত্র বৃত্তাকারে অঙ্কিত হয় এবং মানচিত্রে উত্তর বিন্দুতে সুমেরু শব্দ এবং দক্ষিণ বিন্দুতে কুমেরু শব্দ লিখিত থাকে এবং উভয় বিন্দুর মধ্যস্থলে নিরক্ষ রেখা অঙ্কিত থাকে।

---

(৮) ধ্রুবোন্নতির্ভচক্রস্য নতিমেরুং প্রয়াস্যতঃ নিরক্ষাভিমুখং যাতুঃ বিপরীতে নতোন্নতে। সূর্য্য ।১২।৭২

উদক্ ধ্রুবং পশ্যতি চ উন্নতং ক্ষিতেঃ। ভাস্কর ।৩।৩৯

(৯) ভানোর্ভার্দ্ধে মহীচ্ছায়া তত্তুল্যেহর্ক সমেহপিবা।

শশাঙ্ক পাতে গ্রহণং * * * সূর্য্য ৪।৬

২য় পাঠ ২য় প্রপাঠক।

পার্থিব গোলে ও পৃথিবীর মানচিত্রে দেখিবে, নিরক্ষ রেখা হইতে সুমেরু-বিন্দু পর্য্যন্ত পরিধির ১ ভাগ সমান ৯০ বিভাগে বিভক্ত করিয়া, প্রতি বিভাগের বিবরে নিরক্ষ রেখার সমান্তরাল ৯০টি অক্ষ-বলয় অঙ্কিত আছে; ঐরূপ নিরক্ষ-রেখা হইতে কুমেরু বিন্দু পর্য্যন্ত ৯০টি বলয় অঙ্কিত আছে; ঐ বলয়কে অক্ষ-বলয় বা অক্ষরেখা বলে এবং বলয় গুলি ৬৯॥ মাইল অন্তরে অবস্থিত। নিরক্ষ-রেখার উত্তরস্থ অক্ষ-রেখাকে উত্তর-অক্ষ-রেখা এবং দক্ষিণস্থ অক্ষ-রেখাকে দক্ষিণ অক্ষরেখা বলে। অক্ষরেখা দ্বারা পৃথিবী-পৃষ্ঠস্থ নগর দ্বয়ের উত্তর দক্ষিণ ব্যবধান নির্ণয় করা যায়।

পার্থিব গোলে এবং পৃথিবীর মানচিত্রে আরও দেখিবে, জ্যোতির্ব্বিদের মানমন্দিরে ভেদ করিয়া সুমেরু-বিন্দু হইতে কুমেরু বিন্দু পর্য্যন্ত একটী রেখা অঙ্কিত আছে, এই রেখাকে মূল দ্রাঘিমা বলে। এই দ্রাঘিমায় সূর্য্য উপনীত হইলে, মানমন্দিরে মধ্য দিন হয় বলিয়া এই রেখাকে মধ্য রেখা বলে। জ্যোতির্ব্বিদগণের মানমন্দির অবন্তি নগরে। মূল দ্রাঘিমা নিরক্ষ-রেখাকে যে বিন্দুকে ভেদ করিয়াছে ঐবিন্দুতে লঙ্কা নগর অবস্থিত। ঐ বিন্দুকে কীলক ধরিয়া নিরক্ষ রেখা পূর্ব্বাভিমুখে ১৮০ ভাগে এবং পশ্চিমাভিমুখে ১৮০ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, এবং ঐ প্রত্যেক ভাগের বিবর দিয়া সুমেরু বিন্দু হইতে কুমেরু বিন্দু পর্য্যন্ত এক একটি দ্রাঘিমা অঙ্কিত আছে। ভূমধ্য বা মূল দ্রাঘিমার পূর্ব্বস্থ দ্রাঘিমাগণকে পূর্ব্ব দ্রাঘিমা এবং পশ্চিমস্থ দ্রাঘিমাগণকে পশ্চিম দ্রাঘিমা বলে। নিরক্ষ দেশে দ্রাঘিমা-গুলি পরস্পর ৬৯॥ মাইল ব্যবধানে স্থিত এবং সুমেরু ও কুমেরু বিন্দুতে উহাদিগের ব্যবধান শূন্য এবং অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থলে অক্ষ রেখা-দ্বয়ের ব্যবধান ক্রমে ন্যূন হইয়াছে। দ্রাঘিমা দ্বারা পৃথিবীপৃষ্ঠস্থ নগরদ্বয়ের পূর্ব্ব-পশ্চিম ব্যবধান নির্ণয় করা যায়। অক্ষরেখা দ্বয়ের ও দ্রাঘিমারেখা দ্বয়ের ব্যবধানকে অংশ বলে। বুঝিতে হইবেক, ৯০ অংশ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় যমকোটি নগর এবং পশ্চিম দ্রাঘিমায় রোমকপত্তন নগর এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম ১৮০ অংশ দ্রাঘিমায় লঙ্কা নগরের অধঃস্বস্তিকস্থিত সিদ্ধপুর নগর পড়িল।

পার্থিব গোলকে এবং পৃথিবীর মানচিত্রে আরও দেখিবে যে, নিরক্ষরেখার উত্তরে ও দক্ষিণে ২৩॥ অংশ ব্যবধানে দুইটি বিন্দু বলয় অঙ্কিত আছে। উত্তর বিন্দুবলয়কে কর্কট-ক্রান্তি-বলয় বলে এবং দক্ষিণ বিন্দুবলয়কে মকর-ক্রান্তি বলয় বলে এবং সুমেরু বিন্দুর ২৩॥ অংশ দক্ষিণে একটি বিন্দু বলয় অঙ্কিত আছে, ঐ বিন্দু বলয়ের নাম উত্তর শীত বলয় এবং কুমেরু-বিন্দুর উত্তরে ২৩॥ অংশ ব্যবধানে আর একটি বিন্দু বলয় অঙ্কিত আছে, ঐ বিন্দু বলয়ের নাম দক্ষিণ শীত বলয়।* মহাবিষুপ সংক্রান্তি

---

* এখন দেখিবে ভারত বর্ষস্থ যমকোটি নগরের দ্রাঘিমার উপরি সূর্য্য উপনীত হইলে ভারত বর্ষস্থ লঙ্কা নগরে

হইতে পরবর্ত্তী মহাবিষুপ সংক্রান্তি পর্য্যন্ত প্রতিদিন লঙ্কা নগরে সূর্য্যের উদয় অস্ত দর্শক পুরীক্ষা করিলে দেখিবেন, মহা বিষুপ সংক্রান্তি দিনে প্রাতঃ সন্ধ্যাকালে সূর্য্য পূর্ব্বদিকে যমকোটি নগরে দ্রাঘিমা হইতে উদয় হইয়া মধ্যাহ্নকালে সূর্য্য দর্শকের মস্তকোপরে খবিন্দুতে উপনীত হইবে এবং সায়ং সন্ধ্যাকালে সূর্য্য পশ্চিমদিকে রোমকপত্তনের দ্রাঘিমায় অস্তগত হইবে।* সূর্য্যের এই উদয় বিন্দুকে উদয়-লগ্ন এবং অস্ত বিন্দুকে অস্ত-লগ্ন বলে এবং ঐ উদয় ও অস্তলগ্ন নিরক্ষরেখার উপরে অবস্থিত, এবং এই দিন সূর্য্য বিষুপ-রেখায় পরিভ্রমণ করিবে। এই দিন দিবা রাত্রি সমান হয়, এবং এই মহাবিষুপ সংক্রান্তি দিনের। উদয় বিন্দুকে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত বা বাসন্তিক বিষুপ বা সমরাত্রি বিন্দু বলে। এই দিন সূর্য্য বিষুপরেখা সংক্রমণ করেন বলিয়া এই দিনে মহা বিষুপ সংক্রান্তি হয়। পঞ্জিকানুসারে এই দিন চৈত্র-সংক্রান্তি। তৎপর দিন ১লা বৈশাখ তারিখে নিরক্ষ রেখার প্রায় ১৫ কলা উত্তরে সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হয়; ২রা বৈশাখ তারিখে নিরক্ষ রেখার ৩০ কলা উত্তরে সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হয়। এইরূপে প্রতিদিন ১৫ কলা উত্তরে সরিয়া সরিয়া সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হইয়া আষাঢ় সংক্রান্তির দিনে সূর্য্য যে বিন্দুতে উদয় হয়, ঐ বিন্দুকে উত্তর ক্রান্তি বিন্দু বা কর্কট ক্রান্তি বিন্দু বলে এবং আষাঢ় সংক্রান্তিকে উত্তরায়ণ সংক্রান্তি বলে, এবং ঐ দিন সূর্য্য নিরক্ষ রেখার ২৩॥০ অংশ উত্তরে উদিত ও অস্তগত হয়। ১লা শ্রাবণ দক্ষিণায়ন আরম্ভ হয়। সূর্য্য প্রতিদিন ১৫ কলা দক্ষিণে সরিয়া উদয়াস্তগত হয় এবং তিন মাস গতে পুনরায় সূর্য্য-নিরক্ষ-রেখার উপরে আসিয়া উদয় হয়। আশ্বিন-সংক্রান্তি দিনে সূর্য্য-জল বিষুপ সংক্রান্তি-বিন্দুতে উদয়াস্তগত হয়। এবং ১লা কার্ত্তিক হইতে পৌষ সংক্রান্তি পর্য্যন্ত—সূর্য্য প্রতিদিন ১৫ কলা দক্ষিণে সরিয়া সরিয়া উদয়াস্তগত হয়। পৌষ-সংক্রান্তি—বা মকর-সংক্রান্তি দিনে সূর্য্যের দক্ষিণ-গমনের শেষ হয়। ঐ জন্য পৌষ সংক্রান্তি বা মকর-সংক্রান্তিকে দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি বলে। ১লা মাঘ হইতে সূর্য্য প্রতিদিন ১৫ কলা উত্তরে সরিয়া উদয় ও অস্তগত হয়, এবং চৈত্র সংক্রান্তি দিনে পুনরায় বিষুপ রেখায় উপনীত হয়।

সূর্য্যের উদয় হইবে এবং কেতুমাল বর্ষস্থ রোমকপত্তন নগরের উপর-দ্রাঘিমায় সূর্য্য উপনীত হইলে লঙ্কায় অর্দ্ধরাত্রি হইবে এবং কুরু বর্ষস্থ সিদ্ধপুরের দ্রাঘিমার উপরে সূর্য্য উপনীত হইলে লঙ্কায় মধ্যরাত্রি হইবে। সিদ্ধান্ত শিরোমণি পাঠে দেখিবে

তত্রাখোপরিগঃ কুর্য্যাস্তারতে তুদয়ং রবিঃ।
লঙ্কার্দ্ধে কেতু মালেতু কুরাবস্তময়ং তদা॥
সূর্য্য ১২।৭০

যখন লঙ্কাপুরে সূর্য্যের উদয় হইবে, তখন যমকোটি পুরীতে মধ্য দিন হইবে। অধঃস্থিতস্থ সিদ্ধপুরে তখন সূর্য্যাস্ত হইবে এবং রোমক নগরে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইবে।

লঙ্কা পুরেঽর্কস্য যদোদয়ঃ স্যাত্তদা
দিনার্দ্ধং যমকোটি পুর্য্যাং।
অধস্তদা সিদ্ধপুরেঽস্তকালঃ স্যাদ্রোমকে
রাত্রি দলং তদৈব। ৩।৪৪

দুর্ভিক্ষ।

ত্যজি মোহঘুম, জাগরে হৃদয়,
বিষাদের গাথা চির অভিনয়!
দুঃখের পাথারে আজীবন ভ'রে
ভাস কেন, আজ দেও পরিচয়।

যে করাল ছায়া সুখ-সুধাকরে
আবরি, ভারতগগনে বিহরে;
যাহে প্রীতি-গতি-শান্তি-মতি-রতি—
নাপাও দেখিতে বারেকের তরে;—

আঁধারে আলোক, পিপাসায় জল,
রোগে রসায়ন, ক্ষুধায় সুফল,
বিলাপে সান্ত্বনা, মোহে উদ্দীপনা,
যে রাহু-কবলে মিশেছে সকল;—

চিন কি উহারে? যাহার দাপটে
ক্রন্দনের রোল কোটীকণ্ঠে উঠে,
বহু নরনারী শুধু আঁখি-বারি
সম্বল লইয়া ধূলায় লুটে।

বিবর্ণ বিশাল জীর্ণ দেহ-ছবি,
মরিরে যেমন মেঘাবৃত রবি!
উদ্যম-মূরতি যুবক সুমতি
নিরাশ-সাগরে যাইছে ডুবি!

অনশনে, আহা! ক্ষীণ কলেবর,
কমল বদন বিষাদে ধূসর,
শোক-কালীমাখা ভালে চিন্তারেখা,
অবাহু, কপোলে মাত্র দুটী কর।

নাসাপথে বহে ক্ষীণ উষ্ণশ্বাস,
বিপদে—জীবনে একটি আশ্বাস।
গণ্ডস্থলপরে চুপে চুরি ক'রে
অশ্রুতপ্ত আঁখি ঢালে জলোচ্ছ্বাস!

প্রাণের আরাম—প্রেমের পুতলি
পুত্র প্রিয়তম—দীনভিক্ষা-ঝুলি,
"বড় ক্ষুধা" ব'লে ছুঁটে আসে কোলে,
স্নেহের নিগড় ভুজযুগ তুলি।

কি দিবে বদনে, হৃদয়ের ধনে
কি উত্তর দিবে হতভাগা, মনে
এই চিন্তাকুল রহিয়া আকুল,
অনুকূল যেন মরণেরে গণে!

সাহস-আশ্বাস-প্রয়াস-যতনে
ধরি প্রাণে পুনঃ দুঃখবেগ সনে,
দাঁড়াইছে হায়! ঘন কাঁপে কায়,
অমনি পড়িছে বাধি দুচরণে!

ওইযে, অদূরে নবনিতম্বিনী,
সরলতাভরা চারুতার খনি,
এবে যেন ধনী নিদাঘে তটিনী;—
অঙ্গ-অলঙ্কার অকলঙ্কমণি—

ক্ষুধায় আতুর, নহে ব্যক্তভাব,
মনের আভাস আননে প্রকাশ,
কত সমাদরে ধরি দুটী করে
শুষ্কচর্ম্মসম নিতান্ত নীরস—

মাতৃপয়োধর, কত আশা ক'রে
চুষিছে সে শিশু হায়! দুঃখভরে,
বিষণ্ণবদন—আকুল ক্রন্দনে
ফেলিছে ঠেলিয়া অতীব কাতরে!

অভাগিনী মাতা প্রাণের জ্বালায়,
কপাল হানিছে করে, হায় হায়!
বলে, "বিশ্বময়! হৃদে কত সয়,
রণ আমার চরম আশ্রয়"।

হেথা ভূমিতলে ধূলি-বিলুণ্ঠিত,
দশম দশায় এবে উপস্থিত—
বৃদ্ধ অস্থিসার—লোচনে আঁধার,
আরো তারপর ক্ষুধায় পীড়িত।

হেতা বৃক্ষতলে গাভীটী দাঁড়িয়ে;
কে দেয়বা তৃণ তার মুখচেয়ে!
কৃশ অনাহারে বৎস অদূরে,
হাম্বারব শুনি বিদরিছে হিয়ে।

আদরে পালিত মার্জ্জার সুদীন,
উপবাসী প্রায় পাঁচ ছয় দিন;
হেঠি আরশলা উদরের জ্বালা
নিবায় তাহার—দেহ যষ্টি ক্ষীণ।

নদী-হ্রদ-কূপ হ'ল বারিহীন,
আকাশের পানে চেয়ে দৃষ্টি দীন,
এবে ধরা হ'তে স্নেহ চ'লে যেতে
চায়, তাই বুঝি এ ঘোর দুর্দ্দিন!

প্রতিঘরে হেরি বিষাদ—রোদন—
হাহাকার রবে আকুল গগন।
এ দুঃখ দেখিলে, নয়ন-সলিলে
পাষাণেরো বুক ভাসে অনুক্ষণ।

হে দগ্ধ ভারত, কতকাল আর
পরিবে গলায় কলঙ্কের হার?
পবিত্র বিমলে জাহ্নবীর জলে
কর, নির্জ্জন রূপা দেহ ভার।

হে ভারতবাসি! জাগ একবার,
এ ঘোর নিদ্রার কর পরিহার।
কেন ধন-জন মাণিক রতন
নাই? শূন্য কেন সাধের ভাণ্ডার?

বহুবর্ষ গত আছহে নিদ্রিত,
এ কাল নিদ্রার নাহি কি লয়?
যুগ-যুগান্তর—বর্ষ-মাস বার
যায় পিছু ফিরে—কথা না কয়।

"নীচ" বলি তোমা করে অবহেলা,
(কুকুরে যেমন গৃহস্থের বালা)
সবে পদে দলে, সবে কটুবলে;
কেমনে সহিছ এ বিষম জ্বালা?

কেন তুমি ভবে ঘৃণার ভাজন?
কেন নাহি তব গ্রাস-আচ্ছাদন?
অকর্ম্মণ্য ব'লে কেন ধরাতলে
ঘোষে অপযশ জগতের জন?

সিংহের ঔরসে জনমে শৃগাল,
"ভীরু" চিহ্নে তাই অঙ্কিত কপাল।
উপহাস বাণী বিষতুল্য গণি,
ক্লান্ত কর্ণ বল সবে কতকাল?

সত্য কি সে কথা অথবা কল্পনা,
ঈর্ষাভরে শুধু অসার জল্পনা,
ভেবে দেখ এবে মনেতে তাই।

আকাশে তারকাদল পাতালে সাগরজল
এ বিশাল ভূমণ্ডল মত্ত যার গুণগানে,
প্রতিভার অবতার কীর্ত্তির চারু আগার,
হেন আর্য্যবংশে জন্ম শুনি একথা পুরাণে;
হায় হায়! লজ্জা হয় কহিতে সে কথা,

আর্য্যবংশধর-পরে এ দীনের রায়তা।
গেছে ধন-রত্ন আদি, আর্য্যের শোণিত যদি
বিন্দুমাত্র থাকে দেহে, তবু নিরুদ্যম—
মুমূর্ষু আশ্রিত আজো এ বড় বিষম।

প্রকৃতির গতি নববিধি নয়,
কভু অস্তমন কভু অভ্যুদয়;
কত পরাজয় কত বা বিজয়,
হের ইতিহাসে শত অভিনয়।

শত শত বর্ষ সহি নানা ক্লেশ,
দুঃখ-রজনীর দেখিয়াছে শেষ,
কত শত জাতি কত শত দেশ;
একভাবে কেন তুমিই রও?

শরীরের বল শুধু কি সম্বল?
সাহস উদ্যম সবকি বিফল?
জ্ঞানের গরিমা—শিক্ষার মহিমা
নহে কি জগতে দৃষ্টান্তের স্থল?

পদচিহ্নে যাঁর আঁকা এ অবনী,
জিজ্ঞাস তাঁহারে, শুনিবে অমনি—
সাহসের বলে দীনতা-বিলয়,
সাহসের বলে জগৎ-জয়।

এ দারুণ ক্লেশ তবে কেন সও?
বুকে করি ভর উঠিয়া দাঁড়াও।
দেখ দেখি শান্তি পাও কি না পাও;
ঘুমে দিন কেটে কি ফল বল?

দেখহ আকাশে বিমল তপন,
জগৎ-ভরিছে আনন্দ-কিরণ,
বহে মৃদু বায়—ব্যাকুলতা যায়,
সবাই রাখিছে আপন আপন।

অন্ধকারে ছিল যারা চিরদিন,
অসভ্য বর্ব্বর নীচ দীনহীন,
এবে আলোকিত সম্মানে প্রবীণ,
তবু তুমি কেন মলিন বেশে?

উদ্যমে হৃদয় সুদৃঢ় বাঁধিয়া,
জাতীয় পতাকা দেও উড়াইয়া,
লেখ তারপরে অলন্ত অক্ষরে;—
সুষুপ্ত ভারত প্রবুদ্ধ আ'জ।

ধনি-সুতগণ! ঘুমে কেন আর?
নিধন-সাধন ধন কোন্ ছার?
জগতের তরে হেমে নিজ করে,
দীন জনে দান কর অনিবার।

আফ্রিকা প্রদেশে সুবর্ণের খনি,
গোলকুণ্ডা-ব্রহ্মে রত্ন-মণি-চুনি,
মুকুতা সিংহলে—অতল সলিলে,
কতকি কোথায় জগতে না জানি।

সে সকলে তব কোন অধিকার
আছে কি হে বায় নাকরিলে তার?
গৃহে অর্থ যত আছে রাশীকৃত,
সদ্ব্যয় বিহনে সম সে সবার।

চিরকাল কভু থাকেনা আঁধার,
সব বিশ্ব নহে মরীচিকা সার;
জলদের দলে বিমান-মণ্ডলে
সতত ঢালেনা বরিষার ধার।

রোগান্তে সুকান্তি, ঊষা নিশাশেষে,
রাহু-গ্রাস-পরে পুনঃ শশী হাসে;
বরষা-শিশিরে শরতে আতপে
হেরি বিশ্বজন সুখ-স্রোতে ভাসে।

চিরদিন শেষ রবেনা এ দিন,
রজনী পোহালে আসিবে সুদিন;
কিন্তু সুনিশ্চয় আসিবেনা হায়!
দানের সুযোগ হেন কোন দিন।

পরের কল্যাণে আপন মঙ্গল,
পর-উপকার করিহ সম্বল।
শুধু উদাসীন তুমি এতদিন,
জগৎ তোমার সাধিছে কুশল।

সুদুর রুসিয়া, তুরস্ক, জর্ম্মণ,
এ দেশের দুঃখে মলিন-বদন;
তোমার লইতে কর্ত্তব্যের পথে,
করে অর্থব্যয়, কর নিরীক্ষণ।

সূর্য্য সমকালে কভু আলোদান—
তব সনে যারে করেনা সমান;
বিজ্ঞান—দর্শন প্রকাশে নূতন,
হের আমেরিকা তোমা করে দান।

সহোদর সম মাতৃভূমি-সুত
করে হাহাকার—দুঃখে অভিভূত;
লালসা-কিঙ্কর তুমি শয্যাপর,
ভ্রমেও ভাবনা মরে কত শত!

জরাজীর্ণ বৃদ্ধ দধীচি ব্রাহ্মণ
পরতরে করে আত্মবিসর্জ্জন;
কপোতে রাখিতে স্বীয় মাংস দিতে
অকুণ্ঠিত-চিত্ত শিবি মহাত্মন।

মেহের তনয়ে দিয়া বলিদান,
রাখে দানি-বীর যাচকের মান;
পরউপকার ভিন্ন স্বার্থ আর
না চিনিত কভু ভারত-সন্তান।

সে দেশে কি হায়! মোদের জনম?
তবে কেন মোরা এত নরাধম?
স্বার্থমদে মত্ত, ভুলি পুরাতত্ত্ব,
সত্য ত্যজি কেন মিথ্যা মনোরম?

বুঝেছি এবার ভুলে আর্য্যাচার,
ভারত ভরিয়া শ্লেচ্ছ-ব্যবহার!
হারায়ে স্বধর্ম্ম—জ্ঞান-যোগ-কর্ম্ম,
সোনার ভারত হ'ল ছারখার।

পর-দুঃখে দুঃখী কর ধনি! হিয়া,
প্রাণ দিতে শিখ পরের লাগিয়া।
ভ্রাতৃঅশ্রুজলে আপন অঞ্চলে—
সস্নেহ অন্তরে দেও মুছাইয়া।

বিষম বিপদে, ভারত-সন্তান!
ভুলে যাও, দ্বেষ-হিংসা-অভিমান,
ধনী কি নির্ধন, সামর্থ্য যেমন,
অন্ন-ক্লিষ্টে দিয়া কর প্রাণদান।

দীনদুঃখিজনে অন্ন-বস্ত্র-দান,
আর্য্যধর্ম্মে এই শাশ্বত বিধান;
উপেক্ষি এ নীতি ঘৃণ্য নীচমতি—
চরমে—নিরয়ে লভে নিজস্থান।

শ্রীকেদার নাথ ভারতী সাংখ্যতীর্থ।
ব্রহ্মচারিআশ্রম।
যশোহর।

কর্ম্ম-গীতা।

("ব্রহ্মচারিণ্‌" পত্রে প্রকাশিত
"Gospel of Work"
প্রবন্ধের পদ্যানুবাদ।)

১। শুন মম নিবেদন ভারত-সন্তান!
কর্ম্ম কর, কর্ম্মে তব মুক্তি বর্ত্তমান॥

২। তোমরা কি কৃতদাস—অথবা স্বাধীন?
কৃতদাস যদি হও, অলস—অবশ রও,
স্বাধীন যদ্যপি, কর্ম্ম কর অনুদিন।

৩। তব পূর্ব্বপিতৃগণ সাধি কর্ম্ম সাধুতম,
গড়েছিলা প্রাচীন ভারত।
তোমরাও তাঁহাদের যোগ্য বংশধর সম,
কর্ম্মযোগে হও সবে রত॥

৪। বেঁচে আছ যতক্ষণ, রহ কর্ম্মরত।
যেহেতু মরণ তব সম্মুখে সতত॥

৫। কর্ম্মকর, উর্দ্ধে-অধে-চৌদিকে তোমার,—
সর্ব্বময় কর্ম্মস্রোত বহে অনিবার।

৬। কর্ম্মকর, কর্ম্মই তোমার—
ঈশ্বরের উপাসনা-সার।

৭। অদ্যকার কর্ম্ম যাও তুমি করে'।
কল্যকার চিন্তা রাখ কল্য-পরে॥

৮। এ জন্মের কর্ম্মযোগ যাও তুমি করে'।
পরজন্ম-চিন্তা রাখ পরজন্ম-পরে॥

৯। "কর্ম্ম নীচ" নির্ব্বোধেরা কয়।
কর্ম্ম ধন্য—ঘৃণ্য কভু নয়।
কর্ম্ম-শক্তি স্বর্গীয় নিশ্চয়॥

১০। কর্ম্মকর, যে ভাবেই চলে,
লেখনীতে অথবা লাঙ্গলে।

১১। কর্ম্মকর যেভাবেই হয়,
[illegible]

১২। কর্ম্মকর, অকর্ম্মাই অলস—অধম।
রাজপথ-সম্মার্জ্জক কর্ম্মীও উত্তম॥

১৩। কর্ম্ম কর, ঘটে যেইরূপে,
দাসত্ব বা প্রভুত্ব-স্বরূপে।

১৪। কর্ম্মকর, গলগ্রহ হ'ওনা পরের।
হ'ওনা প্রত্যাশী জ্ঞাতি-বন্ধু-কুটুম্বের॥

১৫। কর্ম্ম কর, কভু যেন ভিক্ষা করিওনা।
অলস ভিখারীকেও প্রশ্রয় দিওনা॥

১৬। কর্ম্মকর, কর্ম্মই জীবন।
অলসতা জীবনে মরণ॥

১৭। কর্ম্মকর, মানব-জীবন—
নিরর্থক নহে কদাচন॥

১৮। কর্ম্মকর, নির্ব্বোধেই ভাবে—
এ জীবন নিরর্থক ভবে।

১৯। কল্য যদি সত্য হয় ভবে,
অদ্য ত নিশ্চয় সত্য হবে।
কর্ম্মকর কর্ম্মকর তবে॥

২০। পরলোক সত্য যদি ভবে,
এ লোক নিশ্চয় সত্য হবে।
কর্ম্মকর কর্ম্মকর তবে॥

২১। অসত্যেতে সত্যলাভ কভু না সম্ভবে।
তাইবলি কর্ম্মকর কর্ম্মকর সবে॥

২২। যেমন বুনিবে বীজ, ফলিবে তেমন;
তাইবলি সাধু-কর্ম্ম সাধ অনুক্ষণ।

২৩। যেমন সাধিবে, সিদ্ধি হইবে তেমন;
তাইবলি কর্ম্মযোগ সাধ অনুক্ষণ।

২৪। কর্ম্মকর বীরবৎ প্রভু-শক্তি লয়ে।
দিওনা আপনে দোষ কৃতদাস হয়ে॥

২৫। কর্ম্ম না করিও শুধু আত্ম-স্বার্থ চেয়ে।
সার্থক পরার্থ-কর্ম্ম নরজন্ম পেয়ে॥

২৬। দুঃখ নাশে সুখ লভে, অশান্তিতে
শান্তি আনে

অন্ধকারে আলো আনে, হীনতায় ধন,
যে কর্ম্ম, সে কর্ম্মযোগ সাধ অনুক্ষণ।

২৭। দীন-দুঃখী-আর্ত্তলোকে—
সেবা কর কর্ম্মযোগে।

২৮। ব্যবসা-বাণিজ্য ধর।
স্বদেশ সম্পন্ন কর॥
স্বজাতি-হীনতা হর।
কর্ম্ম কর কর্ম্ম কর॥

২৯। কর্ম্মকরি স্বদেশে যা পাবে,
তদর্থে বিদেশে কেন যাবে?
কর্ম্মকর কর্ম্মফল তবে।

৩০। সিন্ধুর তুফাণ তুচ্ছকর।
পর্ব্বতের কাঠিন্য বিস্মর।
বীরবৎ কর্ম্মযোগ ধর॥

৩১। ভোল পরদোষ, পর-দুরাচার সও।
শুভার্থে দুরাচারীর কর্ম্মযোগী হও॥

৩২। সাধু-সত্যপরায়ণ-পরিশ্রমী হয়ে,
সার্থক করহ জন্ম কর্ম্মযোগ লয়ে।

৩৩। কর্ম্মকর সাবধানে রহি অনিবার,
কুচিন্তা পশেনা যেন মস্তকে তোমার।

৩৪। কর্ম্মকর, (যেন আলস্যে ধরেনা।)
অঙ্গে যেন ভব মরিচা পড়েনা॥

৩৫। কর্ম্মকর, কর্ম্মযোগে মজ।
গল্পগাছা—পরচর্চ্চা ত্যজ॥

৩৬। কর্ম্মকর; অন্যের সৎকর্ম্ম-সমাধানে,—
সহযোগী হও সদা সাহায্য প্রদানে।

৩৭। কর্ম্ম কর, হ'ওনা হিংসুক।
পরদুঃখে পেওনাকো সুখ॥

৩৮। কর্ম্মকর, কিন্তু যেন হায়!
কটাদিকা গ'ড়না হাওয়ায়।

৩৯। [illegible], কিন্তু সাবধান [illegible]
[illegible] ক'রনা প্রকাশ।

৪০। কর্ম্মকর, হয়ে কর্ম্ম-বীর,
সম্মুখে আদর্শ রাখি স্থির।

৪১। কর্ম্মকর, সৎকর্ম্ম-সাধন-পথে সদা—
জাতি-কুল-বর্ণের যেনরা কোন বাধা।

৪২। যদি কর্ম্মযোগ-সাধক হও,
কায়-মন-বাক্যে পবিত্র রও।

৪৩। যদি কর্ম্মযোগ সাধন ধর,
দেহ-মন দু-ই সবল কর।

৪৪। সাধ কর্ম্মযোগ, কিন্তু সঙ্গে তার,
করিলে অভ্যাস ধ্যান-ধারণার,
কর্ম্মের সুসিদ্ধি হইবে তোমার।

৪৫। কর্ম্ম কর, শ্রেষ্ঠে দিও মান;
নিকৃষ্টে করিও দয়া দান।

৪৬। সুপিতা-সুভ্রাতা, আর সুপুত্র-সুপতি হও।
সু হ'য়ে সম্বন্ধ সর্ব্বে সুকর্ম্ম-সাধনে রও।

৪৭। প্রজা হ'য়ে রাজভক্ত,
হও কর্ম্মযোগ-যুক্ত।

৪৮। যোগ্য জানপদ হও।
যোগ্য কর্ম্মযোগ লও॥

৪৯। কর্ম্ম কর, রাজবিধি মান।
যে বিধি কুবিধি তুমি জান,
পার, তার পরিবর্ত্ত আন॥

৫০। দলি দুষ্ট রিপুদলে,
কর্ম্ম কর ধর্ম্ম-বলে।

৫১। নাহি হবে তীব্র ত্যাগী,
না হবে বিলাসভোগী;
এ দুয়ের মধ্যভাগে হ'তে হবে কর্ম্মযোগী।

৫২। দয়াল-প্রেমিক-নম্র হও।
নিরন্তর কর্ম্মে রত রও॥

৫৩। কর্ম্মকর, হও উপাসক;
হইওনা বাহ্যপ্রদর্শক।

৫৪। কর্ম্ম কর, [illegible] এই জন্য—
ভ্রাতৃভাব [illegible]

৫৫। সেবনা দৃষ্টির সৌন্দর্য্য-বিয়োগ,
হও'না নিষ্ঠুর, সাধ কর্ম্মযোগ।

৫৬। যে ধর্ম্মের যে প্রথা, সে ধর্ম্মেই তা রোক্।
সর্ব্বধর্ম্ম-সার এক কর্ম্মযোগ হোক্।

৫৭। কর্ম্মকর, প্রতিবাসি-ধনে,
কভু লোভ করিওনা মনে।

৫৮। কর্ম্ম কর, শুধু মুখের কথায়,
মোক্ষপদ কেহ কভু নাহি পায়।

৫৯। কর্ম্মকর, শুধু কথার লহর
খোসামোদে খুসী না হন ঈশ্বর।

৬০। রক্ষাকর ক্ষীণ জনে।
কর্ম্মকর কায়-মনে॥

৬১। দম অত্যাচারী জনে।
কর্ম্ম কর কায়-মনে॥

৬২। সম্মান, প্রশংসা কিম্বা পুরস্কার-তরে,
করিওনা কর্ম্ম, কর্ম্ম কর ধর্ম্মতরে।

৬৩। যেইমত কর্ম্ম তুমি চাহ পর হতে,
পর-প্রতি কর্ম্ম তুমি কর সেইমতে।

৬৪। যে কিছু কর্ত্তব্য আসে সম্মুখে তোমার,
যথাশক্তি কর্ম্ম কর সম্পাদনে তার।

৬৫। কর্ম্ম কর, কর্ম্মযোগ-বলে সুনিশ্চয়
নরের জীবন-ব্রত সুসম্পন্ন হয়।

৬৬। কর্ম্মপথ চিনে লওহে ত্বরায়,
অন্তর-নিহিত-বিবেক-বিভায়।

৬৭। কর্ম্ম কর, যেই লক্ষ্য রাখ কর্ম্ম-ফলে,
সেই লক্ষ্য রাখ কর্ম্ম-সাধন-সবলে।

৬৮। কর্ম্ম কর নিষ্কামে এ ভবে,
ফল তার যা হবার হবে।

৬৯। কর্ম্ম কর ধর্ম্ম-ভাবাবেশে,
শিরোপরে অগ্নি পরমেশে।

৭০। কর্ম্মকর দেব-ভাব-ভরে,
লভ তার দেবে অন্তরে।

[illegible]

প্রেম-গীতা।

("ব্রহ্মচারিণ্" পত্রে প্রকাশিত "Gospel of Love" প্রবন্ধের পদ্যানুবাদ।)

১। এ দীন দাসের শুন নিবেদন,
ভারত-সন্ততি সবে।
কর্ম্মেতেই ফল হবেনা কেবল,
ভালবাসিতেও হবে॥
ভালবাসা ধর্ম্মের জীবন।
ভালবাসা কর্ম্মের শোধন॥

২। শুন দীন-নিবেদন, ভালবাস নিরন্তর।
ভালবাসা কেন্দ্র করি ঘোরে বিশ্বচরাচর॥

৩। ভালবাসা হতে হয় জগৎ-সৃজন।
ভালবাসাতেই হয় জগৎ-পালন॥
ভালবাসা-তত্ত্বে পুনঃ জগতের লয়।
ভাল যদি চাহ, ভালবাসিতেই হয়॥

৪। ভালবাস, হাসে ভানু ভালবাসা-ভরে।
ভালবাস, বহে বায়ু ভালবাসা-তরে॥
ভালবাস, দহে বহ্নি ভালবাসা-বশে।
ভালবাস, বহে নদী ভালবাসা-রসে॥

৫। ভালবাস, এক মাত্র ভালবাসা-ভরে,
প্রতি বস্তু ক্রিয়াশীল বিশ্বচরাচরে।

৬। নর! কর ভালবাসা সার।
ভালবাসা স্বভাব তোমার॥

৭। ভালবাস, ভালবাসা-শূন্য হলে তুমি,
এ জীবন হবে তব মহা মরুভূমি।

৮। ভালবাস, না থাকিলে ভালবাসাবাসি।
মানব-জীবন যেন শশী-শূন্য নিশি॥

৯। ভালবাস, ভালবাসা ছাড়িওনা কভু।
ভালবাসা জীবের যে জীবনের প্রভু॥

১০। ভালবাস, বিনা এই ভালবাসা-ধনে,
থাকিবে অসার হায়! বৈধব্য-জীবন।

১১। ভালবাস, ভালবাসা কর্ম্ম-শুদ্ধি করে।
ভালবেসে ভালবাসা বিজ্ঞান বিতরে॥

১২। ভালবাস, ভালবাসাহীন হলে হবে,
কর্ণহীন অর্ণব-তরণী ভবার্ণবে।

১৩। বাস—ভালবাস, ভালবাসা-হারা
জীবন জগতে হায়!
নিষ্পত্র পাদপ, নির্গন্ধ কুসুম,
নিঃস্রোতা নদীর ন্যায়।

১৪। ভালবাস, ভালবাসাবিহীন যে জন,
ভার মাত্র সার তার মানব-জীবন।

১৫। ভালবাস মিথ্যাবাদী নরে।
ঘৃণা কর মিথ্যাবাদিতারে॥

১৬। ভালবাস হত্যাকারী জনে।
ঘৃণা কর হত্যাকার্য্য মনে॥

১৭। ভালবাস সর্ব্বপাপী জনে।
ঘৃণা কর সর্ব্বপাপ মনে॥

১৮। ভালবাস বাপ-মায়।
তাঁরা তব নিজাত্মায়॥

১৯। ভালবাস ছেলে-মেয়ে।
তারা আত্ম আত্মচেয়ে॥

২০। ভালবাস প্রতিবাসীকুল।
তাঁরা তব আত্মসমতুল॥

২১। ভালবাস শত্রুকেও তব।
শত্রুকেও আত্মতুল্য ভাব॥

২২। ভালবাস এ বিশ্বসংসার।
বিশ্বময় আত্মা যে তোমার॥

২৩। ভালবাস, ভালবাসা তব
জীবনের সারাংশ-সৌরভ।

২৪। ভালবাস, ভালবেসে মনে,
ক্ষমিও কেও অপরাধী জনে।

২৫। ভালবাস, ভালবাসা-তরে,
[illegible] পাপীর পাশেরে।

২৬। ভালবেসে ছাত্র-শিষ্যদলে—
শিখাউন আচার্য্য সকলে।

২৭। ভালবাসা-বশে ভৃত্যগণ—
প্রভুগণে করুন্ সেবন।

২৮। ভালবেসে চিকিৎসকজন—
চিকিৎসুন্ নিজ রোগীগণ।

২৯। সতী-পতি ভালবাসা নিঃস্বার্থ-অহেতু।

৩০। সত্য ভালবাসা শুধু ভালবাসা-হেতু॥

৩১। ভালবাসা শাসন করুক্ কারাগার,
কার্য্যালয়, দীনবাস দরিদ্রজনার।

৩২। ভালবাসা-বশে যোদ্ধাগণ—
যুদ্ধ-কার্য্য করুন্ সাধন।

৩৩। একমাত্র ভালবাসা করুক্ শাসন,
সিংহাসন, ব্যাসাসন, ধর্ম্মাধিকরণ।

৩৪। ভালবাসা-বশে প্রজাগণ—
রাজভক্ত হোক্ সর্ব্বজন।

৩৫। হত্যাও করিতে যদি হয় প্রয়োজন,
ভালবাসা তরে কর তা'ও সম্পাদন।

৩৬। ভালবাসা অহেতুক হলে,
অমৃত উপজে হলাহলে।

৩৭। ভালবাস, কিন্তু যেন ভুল নাহি হয়,
কামজ বিকার কভু ভালবাসা নয়।

৩৮। ভালবাস, কিন্তু যেন ভুল নাহি হয়,
রূপজ মোহও কভু ভালবাসা নয়।

৩৯। ভালবাস, ভালবাসা পদ্মগন্ধ-প্রায়—
নীর-মাঝে মিলিত হইয়ে শোভা পায়।

৪০। ভালবাস, শুধু ভালবাসা-বশে,
গোলাপ-কলিকা বিলাসে বিকসে।

৪১। ভালবাস, শুধু ভালবাসা তরে,
ললিত-পঞ্চমে কোকিল কুহরে!

৪২। ভালবাস, শুধু ভালবাসা-তরে,
জননীর স্তনে ক্ষীর-ধারা ঝরে।

৪৩। ভালবাস, ভালবাসা হইতে উদ্ভবে
কবি, ঋষি, ধর্ম্মবীর প্রভৃতি এ ভবে।

৪। ভালবাস, ভালবাসা-ধন
মানবের যথার্থ জীবন।

৫। ভালবাস, ভালবাসা হয়
সত্যজ্ঞান স্বরূপ নিশ্চয়।

৬। ভালবাসা-মহিমায় বোবায় সঙ্গীতগায়,
কালায় শ্রবণ সুখে করে।
খোঁড়ায় আনন্দে নাচে, এ ভব-ভবন-মাঝে,
ভালবাসা মহাশক্তি ধরে॥

৭। ভালবাস, ভালবাসা ব্রহ্ম-শক্তি ধরে,
জাতি-কুল-বর্ণের বিচার নাহি করে।

৮। ভালবাস, ভালবাসা-ধারে,
মোহ-পাশ কাটে এ সংসারে।

৯। ভালবাস, আহা! ভালবাসা হয়
জীবনের ধ্রুব-নক্ষত্র নিশ্চয়।

০। ভালবাস, আহা! ভালবাসা হয়
অনিত্য সংসারে নিত্যসামাময়।

১। ভালবাস, আহা! ভালবাসা হয়
অসত্য সংসারে সত্যধর্ম্মময়।

২। ভালবাস, আহা! ভালবাসা হয়
দুঃখ-কষ্ট-শোক-নাশক নিশ্চয়।

৩। ভালবাসা-অভয়-তরীতে করি স্থান,
বাঙ্গকর ভব-সিন্ধু-তরঙ্গ-তুফাণ।

৪। ভালবাস, ভালবাসা রক্ষিবে তোমারে,
জয়ায় যতনে ভ্রূণে রক্ষে যেপ্রকারে।

৫। দান কর, চর ফের ভালবাসা-বশে,
জীবন সরস কর ভালবাসা-রসে।

৬। ভালবাস, ভালবাসা নিজ মহিমায়,
মেষ-শিশু সম-শান্ত, সিংহ-সম পরাক্রান্ত,
সুনিশ্চয় [illegible]।

৭। ভালবাস, ভালবাসা আত্মার অভয়।
ভালবাসা নাহি জানে কারে বলে ভয়॥

৫৮। মনোদুঃখে হলে ম্রিয়মাণ,
ভালবাসা করে শান্তিদান।

৫৯। নিরাশায় হলে নিমগন,
ভালবাসা করে উত্তোলন।

৬০। ভালবাস, ভালবাসা পূরে সর্ব্ব আশা।
ভালবাসা হয় স্বর্গ, স্বর্গ ভালবাসা॥

শ্রীশঃ——

মীমাংসাদর্শনম্

(জৈমিনিসূত্রম্)

(পূর্ব্বানুবৃত্তম্)

সমন্তু তত্র দর্শনম্। ১২

পদপাঠঃ। সমং। তু। তত্র। দর্শনম্।

ব্যাখ্যা। সমং—সমান অর্থাৎ তুল্য। তু—(পক্ষান্তরের পরিজ্ঞাপক।) তত্র—সেখানে অর্থাৎ শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব-বিচার-প্রসঙ্গে। দর্শনম্—যুক্তি-তর্কাদি। (দৃশ্যতেঽনুমীয়তে যেন তৎ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা।)

বঙ্গার্থ। শব্দের নিত্যত্ব নির্ণয়ে উভয় পক্ষেই পূর্ব্বপ্রদর্শিত যুক্ত্যাদির সমতা দেখা যায়।

বিশদ ব্যাখ্যা। পূর্ব্বপক্ষের যুক্তি-জালের পরিসমাপ্তি হইয়াছে; সম্প্রতি সিদ্ধান্তী মীমাংসাচার্য্য স্বীয় মত সংস্থাপনের জন্য প্রবৃত্ত হইতেছেন। এই সূত্রে পূর্ব্ববাদীর সুদৃঢ় তর্কের নিরসন জন্য কোনও প্রয়াস পাওয়া হয়নাই, কিন্তু বলা হইতেছে যে,

যদি কোনও সুচারু সবল যুক্তির দ্বারা শব্দের নিত্যতা নির্দ্ধারণ করাযায়, তখন পূর্ব্বপ্রদর্শিত প্রমাণ-পটল অনিত্যতাপক্ষের ন্যায় নিত্যত্ববাদেও সমানই উপযোগী হইবে। "শব্দ নিত্য" এরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হইলে, "প্রযত্নে জন্মে" না বলিয়া, "প্রযত্ন দ্বারা অভিব্যক্ত হয়" বলাযাইতে পারে; অতএব প্রযত্নের পরবর্ত্তিসময়ে শব্দের উপলব্ধিরূপ প্রমাণ উভয়পক্ষে—অর্থাৎ উৎপত্তি ও অভিব্যক্তি, এই মতদ্বয়ে সমান কার্য্যকারী হইল; অতএব শব্দের নিত্যতার স্থির প্রতিবন্ধী নয়।

সতঃ পরমদর্শনং বিষয়ানা-গমাৎ ॥ ১৩ ॥

পদপাঠঃ। সতঃ। পরং। অদর্শনং। বিষয়-অনাগমাৎ।

ব্যাখ্যা। সতঃ—বিদ্যমান পদার্থের। পরং—তদনন্তর। অদর্শনং—অনুপলব্ধি (হইয়া থাকে)। বিষয়-অনাগমাৎ—বিষয়ের অনাগম অর্থাৎ অনুপস্থিতি অথবা অপ্রাপ্তি হইতে।

সরলার্থ। বর্ত্তমান বস্তুগুলিরও উপলব্ধি-জনক ব্যাপারের অবসানে, অপ্রাপ্তি নিবন্ধন অনুভূতি হয়না।

বিশদব্যাখ্যা। পূর্ব্বমতে বলা হইয়াছে, উপলব্ধির পরেই শব্দ নাশ হওয়ায় আমরা বিসর্জ্জন করিয়া কোনও অনুভবাতীত প্রদেশে গমন করে, তাহার বিনাশ অবধারিত; সুতরাং "শব্দকে অবিনাশী বলিতে পারা নাই" এতাদৃশ বাসনা মানসেই বিলীন হইতে বাধ্য হইল, এ সূত্রে সেই সিদ্ধান্তে সারবত্তা নাই, ইহাই দেখা যাইতেছে। শব্দ উচ্চারিত হইয়া পরক্ষণেই বিধ্বস্ত হইল, এবিষয়ে প্রমাণ আর কিছুই নয়, কেবল অনুভূতি হয় না, এই মাত্র। কিন্তু তাহা হইতে শব্দের ধ্বংস অনুমিত হওয়া অতীব অসম্ভব। জগতের যাবতীয় সামগ্রীজাত সর্ব্বদা আমাদিগের জ্ঞানে উদ্ভাসিত হয় না, সুতরাং শব্দের দোষ কি? চন্দ্রমণ্ডলস্থ প্রতিফলিত সৌরকিরণকণা যে সময়ে আমার অক্ষিপথ অলঙ্কৃত করিয়া, আভাত হইতে পারিয়াছিলনা, এখান হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল; অথচ উহা যথার্থই তথায় বিদ্যমান ছিল, তখন কি আমি অবগত ছিলাম না বলিয়া, উহার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিব? রাম আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, পরক্ষণেই দ্রুতচরণচালনে আমার লোচনমার্গ অতিক্রম করিল, আমি কি অনুমান করিব যে, জীব-রঙ্গাঙ্গণে তাহার অভিনয়-যোগ্য নাট্যের শেষাঙ্ক সমাপ্ত হইয়াছে? অন্য প্রমাণ-বলে তাহার বর্ত্তমানতা পরীক্ষা করিতে প্রয়াস পাইব।

(ক্রমশঃ)

শ্রী[illegible]নাথ কাব্য-সাংখ্যতীর্থ
[illegible]
[illegible]।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২৫ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা। | আষাঢ়। | ১৩০৭ সাল, ১৮২২ শকাব্দা।

মীমাংসা দর্শনম্।

জৈমিনি-সূত্রম্

(পূর্ব্বানুবৃত্তম্)

শব্দাভিব্যঞ্জক সংযোগ-বিভাগ সত্ত্বে শব্দের অনুভূতি, তদভাবে অনুভবেরও অভাব। অতএব কল্পনাকরা যাইবে, শব্দের উপলব্ধিতে সংযোগ-বিভাগ প্রকৃষ্ট কারণ। যদি বলা যায়, সংযোগ-বিভাগ বিনষ্ট হইলেও শব্দ শ্রবণপথে উপস্থিত হয়, তখন আমাদের প্রত্যুত্তর এই যে, শব্দের উপলব্ধি আছে বলিয়া সংযোগ-বিভাগও বিদ্যমান, এরূপ অনুমান করিব। সংযোগ-বিভাগ প্রত্যক্ষ পদার্থে নয়, কার্য্যদ্বারা অনুমান করা হয়। এখানে আশঙ্কা হইতে পারে, "সংযোগ-বিভাগ আকাশপ্রদেশে শব্দের অভিব্যক্তি ও উপলব্ধি সম্পাদন করে, কিন্তু কর্ণবিবরে যে শ্রোত্রাকাশ, অপর দেশস্থ আকাশও তাহাহইতে অস্বতন্ত্র, এই হেতু বর্শোহরের আকাশে সংযোগ-বিভাগদ্বারা অভিব্যক্ত শব্দ রাজসাহীস্থ পুরুষের অনুভবে আসিতে পারে; কেননা আধার গগন একই, উপলব্ধিকারণ সংযোগ-বিভাগও সশরীরে উপস্থিত, অববোধের রোধক কে?" "উৎপত্তিবাদ অঙ্গীকার করিলে এ আপত্তির প্রতিপত্তিতে বিপত্তি-প্রাপ্তি ঘটে না। কেননা বায়ুাশ্রিত সংযোগবিভাগ বায়ু-প্রবাহেই শব্দের অভি-ব্যক্তি জন্মায়। মৃত্তিকাসমূহ মৃত্তিকায়ই কুম্ভ উৎপাদন করিয়া থাকে। তন্তুসংযোগ সূত্রেই বসন প্রস্তুত করে, অন্যত্র নয়। তাহা—হইলে একদেশস্থ বায়ু-স্রোতঃ অপর প্রদেশ পর্য্যন্ত উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে তথাকার সংযোগবিভাগ জন্য শব্দ অন্যত্র শ্রুত হওয়া অযুক্ত। অতএব অভিব্যক্তিপক্ষ হইতে উৎপত্তিবাদ রম্যতর।" সমাধানে বলা যাইবে, অভিব্যক্তিমতে অনিষ্টশঙ্কা দেখিনা। যে প্রদেশেই না কেন শব্দের অভিব্যক্তি হউক, উহা কর্ণশষ্কুলী *প্রদেশ* প্রাপ্ত হইলেই শ্রোত্রের শব্দ গ্রহণ কার্য্যে সাহায্য করিবে। অপ্রাপ্ত অর্থাৎ দূরস্থ সংযোগ-বিভাগ কর্ণের সহায় হইলে, সমসময়েই দূরবর্ত্তী ও সন্নিকটস্থ শব্দের গ্রহণ আবশ্যক হইয়া উঠে। সেটা

আবার চিরপ্রসিদ্ধ অনুভবের অপলাপ। যদি অপ্রাপ্ত সংযোগবিভাগ শব্দ-গ্রহণে উপকারিক না হইল, তবে সংযোগবিভাগ মাত্রই শব্দোপলম্ভক, এ কথা বলা যায় না। অতএব বলিতে হইবে যে, অভিঘাত প্রেরিত সবল পবন স্তিমিতবায়ুরাশিকে বাধিত করিয়া সর্ব্বদিকে সংযোগবিভাগ উৎপাদন করে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত উহার বেগ মন্দীভূত না হয়, তাবৎকাল ঐরূপই হইতে থাকে। যে স্থানে সংযোগবিভাগ দ্বারা শব্দ অভিব্যক্ত হয়, তথায় ও বায়ু-প্রচারের সম্বন্ধযুক্ত প্রদেশেই শব্দের উপলব্ধি হয়। সংযোগ-বিভাগ বায়ুতে উৎপন্ন। বায়ু মহাশয় স্বয়ং অপ্রত্যক্ষ, সুতরাং তদাশ্রিত সংযোগ-বিভাগেরও সেইদশা। শব্দোপলব্ধি সংযোগবিভাগের বিদ্যমান অবস্থায়ই হয়, অতএব অনুপপত্তি নাই। গভীর তামসী নিশার নিবিড় অন্ধকার-স্তূপ অতিক্রম করিয়া কলকণ্ঠের সঙ্গীত-ধারা দূরদেশেও অনুকূল বায়ুবলে সংযোগবিভাগের দ্বারা অভিব্যক্তাবস্থায় আগমন পূর্ব্বক অনুভূতির সহিত পরিচিত হয়; সুতরাং সংযোগবিভাগ শব্দের উপলম্ভক, ইহা প্রতিপাদিত হইল। অভিব্যক্তি পক্ষে অনুপলব্ধি দূষনীয় নয়, সূত্রে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রয়োগস্যাপরং ॥১৪॥

পদপাঠঃ। প্রয়োগস্য। পরং।

ব্যাখ্যা প্রয়োগস্য—প্রয়োগ অর্থাৎ ব্যবহারের। (প্রয়োগকর—এই অর্থের) পরং বোধক। (প্রতিপাদন প্রত্যাশায় ব্যবহৃত)

বঙ্গার্থঃ। শব্দকর, শব্দ করিওনা ইত্যাদি স্থলে "কর" এই পদ "প্রয়োগ কর" এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বিশদব্যাখ্যা। পূর্ব্বপক্ষ সমর্থনে বলা হইয়াছে, কার্য্য অর্থাৎ "অনিত্য জন্য পদার্থকে লক্ষ্য করিয়া "কর" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ হয়, নিত্যকে লক্ষ্য করিয়া হইতে পারেনা। "শব্দকর" এই ব্যবহার আছে বলিয়া শব্দ কার্য্য। তাহার নিত্যতা সাধন প্রত্যাশা মরুভূমিতে তরুতলে উপবেশনের বাসনার ন্যায় অন্তঃসাররহিত এই সূত্রে দেখান হইতেছে যে, শব্দ যদি নিত্য হয়, তবেও "শব্দকর" এই বৃদ্ধব্যবহারপরম্পরার অনুপপত্তি নাই; কেননা, শব্দের নিত্যতা অবধারণ করা হইলে, "কর" এই পদের "প্রয়োগকর" অর্থ হইবে। অতএব এ যুক্তিও উভয়ত্র তুল্য।

আদিত্যবদ্ যৌগপদ্যং ।১৫।

পদপাঠঃ। আদিত্যবৎ। যৌগপদ্যং।

ব্যাখ্যা॥ আদিত্যবৎ—সূর্য্যের ন্যায় যৌগপদ্যং—যুগপৎভাব অর্থাৎ সমসাময়িকতা। শব্দেরও।

বঙ্গার্থঃ। শব্দের যুগপদ্ভাবের যে অনুভূতি হয়, তাহাও আদিত্য দেবের যৌগপদ্যের ন্যায়। (ভ্রমাত্মক।)

বিশদব্যাখ্যা॥ পূর্ব্বপক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছে, শব্দের নিত্যতাবাদ স্বীকার করিলে, একই নিত্য শব্দের বিশেষ কারণ ব্যতীত নানাদেশে যুগপৎ উপলব্ধি অসঙ্গত হয়। এখানে সেই কলঙ্কপঙ্ক প্রক্ষা-

লনের প্রামস পাওয়া হইয়াছে। একই সূর্য্য যেমন দূরত্ব হেতুক নানাস্থানে যুগপৎ উপলব্ধ হন বলিয়া ভ্রমাত্মক প্রতীতি হয়, বস্তুতঃ মোহবশতঃ একদেশস্থ সূর্য্যেও ঐরূপ জ্ঞান হইতেছে। তদ্রূপ শব্দেও ভ্রমাত্মিকা বহুদেশে যুগপদুপলব্ধি। যদি বলা যায় আদিত্যের একদেশে বিদ্যমানতার প্রমাণ কি? তখন বলা যাইবে প্রমাণপ্রধান প্রত্যক্ষের ইহাতে সাক্ষাৎসম্মতি রহিয়াছে। তরুণ অরুণের চারুকিরণে যখন প্রাচীবালার প্রশান্ত বদন-কমলে ললিত লাবণ্যের বিমলবিভা উদ্ভাসিত হয়, তখন যদি পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া গগনমণ্ডলে নয়ন নিঃক্ষেপ করি, দেখিতে পাইব, সম্মুখে দেদীপ্যমান দিনমণি অন্ধকারের সৈন্যসামন্তগণকে প্রবল সংগ্রামে পরাজিত করিয়া অপূর্ব্ব বিজয়শ্রী ধারণ করিয়াছেন। তখন তাঁহাকে একই দেখিলাম, প্রত্যাবৃত্ত নয়ন পশ্চাৎ ভাগে নিঃক্ষেপ করিলাম, দেখিলাম পশ্চিমাকাশে সূর্য্য নাই। তির্য্যগ্ ভাগে বক্র দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক দক্ষিণে বামে কোনও পার্শ্বে সূর্য্যের দর্শন পাইলামনা। বুঝিলাম এই বিশাল গগণে একই সূর্য্য। অতএব আদিত্য একদেশস্থ এক। যদি কর্ণেন্দ্রিয় সংযোগ বিভাগ দেশে গমন পূর্ব্বক শব্দ গ্রহণ করিত, তাহা হইলে শব্দের অনেকদেশতা সম্ভব ছিল। বেদান্তি-সম্প্রদায়ের কোনও কোনও প্রৌঢ়তাভিমানী প্রকরণকার, "শ্রবণ" শব্দস্থানে গমন পূর্ব্বক শব্দ গ্রহণ করে বলেন। তাঁহাদের অভিপ্রায়, যেখানে ভেরীশব্দ শুনিয়াছি, এই অনুভবকে প্রমাণ রূপে উপন্যস্ত করা। বেদান্ত-পরিভাষা গ্রন্থে ধর্ম্মরাজ দীক্ষিত "লিখিয়াছেন চক্ষুঃশ্রোত্রেস্থ স্বত এব বিষয়দেশংগত্বা স্বস্ববিষয়ং গৃহ্নীতঃ শ্রোত্রস্যাপি চক্ষুরাদিবৎ পরিচ্ছিন্নত্বেন ভের্য্যাদিদেশ গমন সম্ভবাৎ অতএবানুভবো ভেরীশব্দোময়া শ্রুতঃ।" ইত্যাদি। শ্রবণেন্দ্রিয় স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিয়া শব্দাদিগ্রহণকরে, এসিদ্ধান্তে মহামুনি জৈমিনি সম্মতি প্রকাশ করেন নাই। ভাষ্যকার শবরস্বামী তাঁহার অভিপ্রায় আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন, শ্রোত্র আর কিছুই নয়, উহা কর্ণশঙ্কুল্যবচ্ছিন্ন আকাশ মাত্র। কর্ণ শষ্কুলী স্বে স্থান পরিত্যাগকরে না, ইহা প্রত্যক্ষতঃই অনুভূত হইতেছে। তদবচ্ছিন্ন নভোভাগের গমনাগমন বিচার কতদূর স্বাভাবিক, তাহা ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়ঙ্গম করিবার সামর্থ্য আছে। যদি শব্দ নিত্য, একথা স্বীকার করিতে হয়, তবে শব্দের নানাদেশে উপলম্ভ আদিত্য দৃষ্টান্তে ভ্রমাত্মক বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। শব্দের পক্ষে বস্তুতঃ নানাদেশ সম্ভাবনাই নাই। আকাশই এক মাত্র শব্দের দেশ। আকাশ আবার অদৃষ্ট ক্রমে এক, অতএব নানাদেশে শব্দের উপলব্ধি হয়, ইহা অসম্ভব। যদি দেশে একরূপতা বলিয়াই একত্তাজ্ঞান, এরূপ বলা যায়, তাহা হইলে দেশ পরস্পর ভিন্ন হউক, কিন্তু শব্দ ভিন্ন হইতে পারিলনা; অতএব যুগপদুপলব্ধি ভ্রমবশতঃ, সুতরাং তাহা হইতে নিত্যতার পথে কণ্টকার্পণ করিতে পারাগেলনা।

—

বর্ণান্তরমবিকারঃ। ১৬।

পদপাঠঃ। বর্ণ-অন্তরং। নঅবিকারঃ।

ব্যাখ্যা। বর্ণান্তরং—অন্ত অর্থাৎ পৃথক্‌বর্ণ। অবিকারঃ বিকার অর্থাৎ কার্য্যনহে। (যকারাদি।)

বঙ্গার্থঃ। (যকার ও ইহার) ভিন্ন বর্ণ, (উহারা একে) অপরের বিকার হইতে পারে না।

বিশদব্যাখ্যা। আপত্তি প্রদর্শন সময়ে বলা হইয়াছে, ইকার যকারাদির প্রকৃতি-বিকার-ভাব হইতেও অনিত্যতা আবিষ্কৃত হয়। এ সূত্রে সেই শঙ্কার পরিহার করা হইতেছে, "ই"কারের বিকার "য"কার নয়, উহা ইকার হইতে একটী স্বতন্ত্র বর্ণ। কেন না "য"কার ব্যবহর্ত্তা "ই"কার প্রয়োগ করেন না। যেমন কটকর্ত্তা বীরণ অর্থাৎ তৃণ বিশেষ সংগ্রহ করে, তদ্রূপ যকার-প্রযোক্তা ইকার আদান করে এদৃষ্টান্ত অপ্রসিদ্ধ। সামান্যতঃ সাদৃশ্য সন্দর্শনেই পদার্থদ্বয়ের প্রকৃতি বিকৃতি ভাব অবধারণ করিতে হইলে, সুপরিষ্কৃত শর্করা ও বালুকার প্রকৃতি-বিকার ভাব সিদ্ধ হইতে পারিত। ব্যক্তি-বর্গের মধ্যে বিজ্ঞেরা এ বাক্যে অনুমোদন করেন না, সুতরাং সাদৃশ্য থাকিলে, প্রকৃতিও বিকার বলিয়া বোধ করা অনুপযুক্ত। শব্দ নিত্যতার সাদৃশ্য-বাধক নহে।

নাদবৃদ্ধিপরা॥ ১৭

পদপাঠঃ। নাদ-বৃদ্ধি পরা—

ব্যাখ্যা। নাদবৃদ্ধি পরা—নাদবৃদ্ধিতেই শব্দ বর্দ্ধিত হইয়া মহান্ আকার ধারণ করিল বোধ হয়।

বঙ্গার্থঃ। নাদ অর্থাৎ সংযোগ-বিভাগের বস্তুতঃ বৃদ্ধি হয়, তাহা হইতে বোধ হয়, শব্দের বৃদ্ধি হইয়াছে।

বিশদ ব্যাখা। পূর্ব্বমত সমর্থনে বলা হইয়াছে, একত্র বাদ্যমান পটহনিকরের ধ্বনি ও একমাত্র পটহ ধ্বনিত হইলে, শব্দ যথাক্রমে মহান্ ও অল্পরূপে অনুভূত হয়, ইত্যাদি কারণে শব্দ অনিত্য অর্থাৎ সকারণক। সেই সিদ্ধান্তমঞ্জরীর মস্তকে এখানে যুক্তিরূপ বিদ্যুদগ্নির ব্যবস্থা করা হইতেছে। যাহা অবয়ব-বিশিষ্ট পদার্থ, তাহারই মহত্ত্ব ও লঘুতা সম্ভব আছে, শব্দের অবয়ব নিরূপণ করা যায় না বলিয়া উহার মহত্ত্বাদি হইতে পারে না। শব্দকে যে মহান্ বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহার উপায় চিন্তা করা দরকার। ঐ মহত্ত্ব শব্দের নহে, নাদ অর্থাৎ শব্দাভিব্যঞ্জক সংযোগ-বিভাগেরই ধর্ম্ম। একের দ্বারা উচ্চার্য্যমান শব্দের অভিব্যঞ্জক সংযোগবিভাগ অপেক্ষা বহু ব্যক্তির উচ্চারিত শব্দের শষ্কুলী প্রদেশে অনুভূত সংযোগবিভাগ মহান্, তজ্জন্যই শব্দ মহান্ বলিয়া বোধ হয়, বস্তুতঃ উহা একইরূপ। সংযোগ-বিভাগের কর্ণশষ্কুলীদেশে নিরন্তর ভাবে গ্রহণই মহত্ত্বের কারণ। অতএব বারম্বার প্রতিপাদিত হইল, নাদবৃদ্ধিতে শব্দ-নিত্যত্বের অপলাপ হয় না।

নিত্যস্তুস্যাদ্দর্শনস্যপরার্থত্বাৎ ॥১৮॥

পদপাঠঃ। নিত্যঃ। তু। স্যাৎ দর্শনস্য। পরার্থত্বাৎ।

ব্যাখ্যা। নিত্য।—শব্দ নিত্য অর্থাৎ উৎপত্তিবিনাশরহিত। তু—(পূর্ব্ববাদীর মত হইতে অপর পক্ষ বোধক পদ। অথবা কিন্তু এই অর্থে।) স্যাৎ—হয়। দর্শনস্য উচ্চারণের। পরার্থত্বাৎ অর্থকে বুঝাইবার নিমিত্ততা বশতঃ।

বঙ্গার্থঃ। শব্দ নিত্য, কেন না উহা অর্থ-প্রত্যয় জন্মাইবার জন্যই উচ্চারিত হয়। (শব্দ নিত্য না হয়, তাহা হইলে উহার উচ্চারণ দ্বারা অর্থ-প্রত্যয় নিষ্পন্ন হইতে পারে না, এই তাৎপর্য্য বলা হইয়াছে)।

বিশদব্যাখ্যা॥ জনসমাজে বাক্য ব্যবহার প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবার অবশ্যই কোনও অসাধারণ উদ্দেশ্য আছে, তাহা কি? এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে, পারস্পরিক মনোভাব বিজ্ঞাপনই আপাততঃ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে। নিজের অন্তঃকরণের ভাব অপরকে বুঝান অর্থাৎ তাহার মনে তদ্রূপ প্রতীতি জন্মাইবার জন্যই স্ফুটবাক্য জীবগণের ভাষার আবিষ্কার। রাম শ্যামকে জল আনিতে অনুমতি করিবে, তখন যেরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে শ্যাম বুঝিতে পারে যে, তাহাকে জল আনিতে বলা রামের অভিপ্রায়, রাম নিশ্চয়ই সেরূপ বাক্য (শ্যাম জল আন) উচ্চারণ করিবে। যদি শব্দ উচ্চারণের পর-সময়েই বিনষ্ট হইল, তবে শ্যাম কাহার দ্বারা ঐরূপ বোধ প্রাপ্ত হইবে? যদি শব্দ বিনাশপ্রাপ্ত না হয়, তবে উহা বারম্বার উপলব্ধ হইয়া অর্থ-প্রত্যয় জন্মাইতে পারে অতএব অর্থ প্রতীতির জন্য শব্দকে নিত্য বলিয়া মানিতে হইবে। যদি আপত্তি করা যায় যে, ঐ শব্দটী বিনষ্ট বলিয়া উহার স্বরূপতঃ অর্থাবগতিতে কারণতা নাই, তবে উচ্চারণ সময়ে উহাতে অর্থবৎ শব্দের সাদৃশ্য অনুভূত হয়, তাহা হইতেই অর্থজ্ঞান জন্মে। উহাতে নিত্যতা স্বীকার করিবার স্বতন্ত্র কারণ আবিষ্কার হয় না। তখন আমরা বলিব, তাহাতে অশেষ অনিষ্ট প্রসঙ্গ আছে। কেননা, কোনও শব্দই অর্থাবগতিতে সমর্থ নয়, কারণ উচ্চারণ কালে সকল শব্দই নবভাবে জন্মিল। পূর্ব্বে সে যখন ছিলনা, তখন অর্থ-সম্বন্ধ কাহার সহিত হইবে? যখন ঐ শব্দ জন্মিল, তাহার পর সময়ে নাশ প্রাপ্ত হইল, অর্থ সম্বন্ধ কখন হইবে? একই উচ্চারণ প্রযত্ন দ্বারা শব্দ সংব্যবহার এবং অর্থ-সম্বন্ধ উভয় উৎপন্ন হইতে পারেনা। বস্তুতঃ অর্থবৎ সাদৃশ্যে অর্থবোধ হইলে, কদাচিৎ ব্যামোহ বশতঃ জ্ঞান অন্যরূপ হইতে পারে, কিন্তু যে শব্দ যাদৃশার্থ বোধনের জন্য উচ্চারিত, সে তাহাই বুঝায়, ইহাই শব্দ-স্বভাব। অতএব পর-প্রত্যায়নার্থ উচ্চারিত শব্দকে নিত্য বলিয়া না মানিলে অর্থাবগতিতে বিরোধ উপস্থিত হয়।

সর্ব্বত্র যৌগপদ্যাৎ ।১৯॥

পদপাঠঃ। সর্ব্বত্র। যৌগপদ্যাৎ।

ব্যাখ্যা। সর্ব্বত্র—সকল স্থানে। যৌগপদ্যাৎ—যুগপৎ অর্থাৎ এককালে অনুভব হয় বলিয়া (শব্দ নিত্য।)

বঙ্গার্থঃ। সকল ব্যক্তিতে অর্থপ্রত্যয়োৎপাদন একই শব্দের দ্বারা সমান সময়ে

জন্মিতেছে, এই হেতু শব্দের নিত্যতা স্বীকার করিতে হয়।

বিশদব্যাখ্যা। গো-শব্দ উচ্চারণ করিলে, বাটীর সেই খর্ব্বাকৃতি কৃষ্ণবর্ণা দুগ্ধবতী সবৎসা গাভিটীকে যেমন বুঝিয়া থাকি; তদ্রূপ অপরের আলয়ের অরুণাক্ষী মৃত-পুত্রা লোহিতবর্ণা দীর্ঘাকৃতি গরুটীকেও বুঝা হইয়া থাকে। গোশব্দ দ্বারা প্রতিপাদিত হইতে সকল দেশস্থ সকল কালস্থ সকল গরুর সমানই সামর্থ্য আছে। এখানে পক্ষপাতের প্রত্যাশা নাই। যদি শব্দ নিত্য হয়, তবে তাহা আকৃতি অর্থাৎ জাতি বোধক হইতে পারে। অনিত্যতা পক্ষে সকল গরুকে বুঝা অসঙ্গত হইবে। কেননা গো-শরীরে যে জাতি আছে, তাহার সহিত গোশব্দের সম্বন্ধ করা দরকার; নচেৎ অসম্বদ্ধ বস্তুকে বুঝাইতে অসম্বদ্ধ পদ স্বতই অপারগ, এবং তাহা অঙ্গীকার করিলে, ঘট শব্দের দ্বারা বস্ত্র বুঝাইতে বাধানাই; অসম্বদ্ধ সহজেই অনুমানযোগ্য। এই মাত্র যে গো শব্দ উচ্চারিত ও তখনি আবার বিনষ্ট হইল, তাহার সহিত জগতের যাবতীয় গরুর সম্বন্ধ করাটা বড় কষ্টকর কার্য্য। যদি নিত্য বলিয়া বলা যায়, তবে অনন্তকালস্থায়ীগোশব্দ সকলের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে এবং অন্বয় ব্যতিরেক বলে বহু গোব্যক্তিতে অর্থ-প্রত্যায়ক প্রকারে ব্যবহৃত হইতেও সক্ষম হয়। বারম্বার উপলব্ধ একই গো শব্দের যত বারই না কেন অভিব্যক্তি হউক, একই প্রকারে বোধ জন্মাইতে পারে। যুগপৎ যাবতীয় গোপিণ্ডে ও নিত্য গোশব্দের নিত্য আকৃতির সহিত শাশ্বতিক-সম্বন্ধ সহজেই স্বীকার করিতে হয়। শব্দ জাতিবোধক বলিয়া উহাকে অবিনাশী বলিতে হইবে, নচেৎ জাতি-প্রত্যয় উৎপন্ন-শব্দের দ্বারা সম্ভব নয়, ইহা প্রদর্শিত হইল।

সংখ্যাভাবাৎ ॥২০॥

পদপাঠ। সংখ্যা- ভাবাৎ।

ব্যাখ্যা। সংখ্যাভাবাৎ—সংখ্যাভাব অর্থাৎ আটবার গোশব্দ উচ্চারণ কর, ইত্যাদি ব্যবহার দ্বারা বুঝাযায়। (যে শব্দ নিত্য।) কেননা যদি জন্য হইত, তবে আটটী গো শব্দ উচ্চারণ কর এরূপ প্রয়োগ হইত, অত এব একই নিত্যশব্দের আটবার অভিব্যক্তি উচ্চারণ প্রযত্নের দ্বারা সম্পাদিত হইলে, "অষ্টবার উচ্চারণ কর" এই বাক্যব্যবহার অপ্রমাদ হয়।

বঙ্গার্থঃ॥ সংখ্যাভাব হইতে শব্দের নিত্যতা আবিষ্কৃত হইতে পারে। (সংখ্যা-ভাব অষ্টআদি সংখ্যার ব্যবহার।)

বিশদ ব্যাখ্যা। একই শব্দের বহুবার উচ্চারণ, নিত্যত্বপক্ষে অভিব্যক্তি স্বীকার করিলেই সমধিক যুক্তি-যুক্ত হইতে পারিবে। বিগতকল্য যে গো শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলাম, অদ্যকার উচ্চারিত গোশব্দ যদি তাহাহইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়, তবে অনন্ত গোশব্দের পরিকল্পনা উপস্থিত হয়। একই নিত্যশব্দ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অথবা এককালে বিভিন্ন প্রযত্ন দ্বারা অভিব্যক্ত হয় বলিলে, অনন্তকল্পনারূপ অনিষ্টপ্রসঙ্গ আর আমাদিগকে আতঙ্কিত করিতে পারে না। সুতরাং নিত্যশব্দের

অভিব্যক্তি ও প্রত্যভিজ্ঞা বলিলে সকল উৎপাতের শান্তি হইতে পারে। অতএব আটবার গো শব্দ উচ্চারণ কর, এবাক্য হইতে আমরা একই গোশব্দের পুনঃ প্রত্যভিজ্ঞা বুঝিতে প্রয়াস পাইব। আমাদের ইন্দ্রিয়গত দূষণ দেখিতে পাইনা, তাহাদের অপাটব নির্ণয় সুতরাং ঘটিলনা। যেরূপ আমরা প্রত্যভিজ্ঞা করি, তদ্রূপ অপর সকলেরই প্রত্যভিজ্ঞা সন্দেহ নাই। যদি কেহ বলেন, গত কল্য উচ্চারিত গো শব্দ অদ্যতন "গো" পদ অপেক্ষা পৃথক, কিন্তু সাদৃশ্য হেতুক আমাদের "এ সেই গো শব্দ" এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয়। বস্তুতঃ ভিন্ন হইলেও, সাদৃশ্যহেতুক সজাতীয়তাই ভ্রম হইবার অসাধারণ কারণ। মনে করা যাউক, চতুর্ম্মুখ নামক ঔষধ সেবন করিয়া কোনও লোকের প্রবলবায়ু প্রকোপ প্রশমিত হইয়াছে, সে সময়ে আমি একবার ঐ ঔষধ দর্শন করি, পুনর্ব্বার ঐ ঔষধ কদাচিৎ কোন ও প্রকারে দেখিতে পাইলে, আমি বলিয়া থাকি, "ইহা সেই ঔষধ," এখানে প্রত্যভিজ্ঞা তজ্জাতীয়তাবিষয়িনী। শব্দের বেলা তাদৃশ সিদ্ধান্ত স্বীকার করা অতিশয় আবশ্যক। ন্যায়াচার্য্য-চক্রবর্ত্তী বিশ্বনাথ বলিয়াছেন;—"সোঽয়ংক ইতি বুদ্ধিস্তু সাজাত্যমবলম্বতে।" এবং, "তদেবৌষধমিত্যাদৌ সজাতীয়েঽপিদর্শনাৎ।" এখানে সমাধানে বলিতে হইবে যে, সে ঔষধ ভক্ষিত হইয়া গিয়াছে, বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যমান নাই। এই হেতুক, সে এই ঔষধ এইবাক্য সেখানে প্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞাপক নহে, তজ্জাতীয়তার প্রত্যভিজ্ঞা, ঔষধের নহে। তাহার অভিনব প্রত্যক্ষ। "এ সেই শব্দ" এখানে তৎসজাতীয় বা তৎসদৃশ এরূপে প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছেনা। তাহারই প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে, তৎসদৃশের নহে। বিশেষতঃ সজাতীয়ের দর্শনে সজাতীয়ে স্মৃতি প্রকৃত পক্ষে প্রত্যভিজ্ঞা হইতেপারেনা। একের দর্শন অন্যের স্মৃতি প্রত্যভিজ্ঞানহে। একই পদার্থের এককালে দর্শন, ও অন্যকালে যে দর্শন হইয়াছিল, তৎ সংস্কৃত স্মৃতিই প্রত্যভিজ্ঞা নাম পাইবার যোগ্য। সজাতীয়তা প্রত্যভিজ্ঞার পদার্থ নহে। তাহা হইলে "সেই আমি" প্রত্যভিজ্ঞাকেও প্রকারান্তরে স্থাপনকরা আবশ্যক হইবে। জ্ঞান হইতেছে "সে এই," বুঝিব "ইহা তজ্জাতীয়," এরূপ হইতে পারেনা। যদি কেহ আপত্তি করেন, প্রত্যভিজ্ঞানুসারে নিত্যতাস্থাপন করিতে হইলে আবও বহুবিধবস্তু নিত্যনামের রাজটীকা মস্তকে ধারণ করিতে পারিবে। এখানে প্রত্যুত্তর এইযে, অপরের প্রত্যক্ষপ্রমাণে অনিত্যতা অবধারণ করা যায়। দশ বৎসর পূর্ব্বে পিতাকে দর্শন করিয়া ছিলাম, অদ্য আবারপ্রত্যভিজ্ঞা হইল, কিন্তু আর দশ বৎসরপরে প্রত্যক্ষতই বিনাশ অবধারিত হইবে, প্রত্যভিজ্ঞাপ্রবাহ ভঙ্গ হইলেই অনিত্যত্ব আসিল, শব্দের প্রত্যভিজ্ঞা অনন্তকাল সমান।

যদি বলাযায় পূর্ব্বে উচ্চারিত শব্দ বিনষ্ট হইয়াছে তাহার প্রত্যভিজ্ঞা কিরূপ? তখন উত্তর, এই যে, যখন পুনর্ব্বার তাহাকে অনুভব করিতেছি তখন বিনাশটা স্বীকার করায় আপত্তি করিতে স্বভাবতঃই ইচ্ছা হয়। যাহাকে পূর্ব্বে দর্শন করিয়া ছিলাম

দশ দিন তাহাকে নয়নের পথে না পাইলে তাহার বিনাশ নিশ্চয় করিতে মন অগ্রসর হয় না। যদি তাহাই করিতে হয়, তবে, বিদেশে থাকিয়া প্রিয়তমপরিজন বর্গের উপর মরণ নিশ্চয় উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা অত্যন্ত অস্বাভাবিক। যেখানে অপর কোনও প্রমাণ তাহার অনুকূলে উপস্থিত হইয়া আকুলতা নিবারণ করেনা, সেখানেই ঐ মতে অগত্যা সম্মতি দিতে সজ্জিত হই। এখানে তাহাকে পুনর্ব্বার উপলব্ধি করিতেছি। "ছিলনা" বলিতে কাজেই সার্থক হয় না। তবে এইমাত্র অবধারণ করা যাইতে পারে, যে সময় উহাকে দেখি নাই, তখন উহা আমার অনুভবযোগ্য স্থানে ছিলনা। থাকিলেও আমার অনুভবের কারণ কূট একত্র সংগৃহীত না থাকায়, অনুভূতির আলোকে অজ্ঞানান্ধকার নিবৃত্ত হইতে পারিয়া ছিলনা। অভিব্যক্ত শব্দকে আমি গ্রহণ করিতে পারি। কেবল শব্দকে পারিনা। আমার জ্ঞান-বিষয় না-হওয়া-সময় শব্দ অভিব্যক্ত ছিলনা এই কথা বলিলেই চরিতার্থতা। অনন্তশব্দ, তাহার ধ্বংস, অনন্ত প্রাগভাব এবং অনন্ত কারণ স্বীকারাপেক্ষা, একই শব্দের বহুবার অভিব্যক্তি বলিলে ক্ষতি নাই। বরঞ্চ পদার্থ সংখ্যার আধিক্য কল্পনা-পক্ষে মহান্ গৌরব, লঘুকল্পনায় স্বার্থসিদ্ধি হইলে গুরুতর নানাপদার্থকল্পনা জঘন্য জ্ঞানে উপেক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব প্রত্যভিজ্ঞা-প্রবাহ হইতে শব্দ-নিত্যত্ব সিদ্ধ হইল।

অনপেক্ষত্বাৎ ॥২১॥

পদপাঠঃ। ন—অপেক্ষত্বাৎ।

ব্যাখ্যা। অনপেক্ষত্বাৎ—কাহারও অপেক্ষা-করে না বলিয়া অর্থাৎ কোনও কারণ নাই বলিয়া। (শব্দ নিত্য।)

বঙ্গার্থঃ। কোনও কারণকে অপেক্ষা না করিয়াই শব্দ বিদ্যমান আছে এই হেতুক (উহা নিত্য পদার্থ।)

বিশদব্যাখ্যা। পদার্থের অনিত্যতা-নিশ্চয় দুইপ্রকারে হইয়া থাকে, উৎপত্তি-দর্শনে ও বিনাশদর্শনে। যে সুদৃঢ় সুরম্য চারু কারু-কার্য্য-পরিচিত হর্ম্ম্যটীর উৎপত্তি আমি জন্মগ্রহণ করিবার শতবর্ষ পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছে, অধুনা তাহার ভ্রষ্ট ইষ্টক-রাশি ও বিস্রংসিত কাষ্ঠকলাপদর্শনে অনিত্যতা নিশ্চয় করা গেল। আবার যে বসন খানি আমি বয়ন করিতে দেখিলাম, অথচ বিনাশ সময় আমার সাক্ষাৎ নাই, তাহাও উৎপন্ন বলিয়া বিনাশশীল ইহা অনুমান করিব। শব্দের বিনাশ নাই প্রদর্শিত হইয়াছে, উৎপত্তি ও নাই এই সূত্রে তাহাই বলা হইয়াছে। শব্দের এরূপ কোনও কারণ আমরা অনুভব করিনা, যাহার অপেক্ষায় শব্দ অপেক্ষী। কাহারও মুখাপেক্ষী নহে বলিয়া শব্দ অকারণক অর্থাৎ নিত্য।

প্রখ্যাভাবাচ্চ যোগস্য ॥২২॥

পদপাঠঃ। প্রখ্যাঅভাবাৎ। (প্রখ্যাভাবাৎবা।) চ। যোগস্য।

ব্যাখ্যা। প্রখ্যাভাবাৎ—প্রখ্যা অর্থাৎ জ্ঞানের (প্রকর্ষেণ খ্যায়তে ইনয়াইতিব্যুৎপত্ত্যা)

অভাববশতঃ। চ—ও। যোগস্য—যোগের অর্থাৎ সন্নিবেশবিশেষের। (এই হেতু ইহার কারণ বায়ু বা অপর কিছু হইতে পারেনা, সুতরাং শব্দ নিত্য অকারণক।)

বঙ্গার্থঃ। (শব্দে) অবয়ব বিশেষের জ্ঞান হইতেছেনা বলিয়াও। (অকারণ অর্থাৎ নিত্য।)

বিশদব্যাখ্যা॥ এই সূত্রটী অপর একটী মনোনিহিত আপত্তির নিরাসার্থে আচার্য্য কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে। শব্দের কারণ নাই বলা হইল, কিন্তু আপত্তি হইতে পারে, যে বায়ুই উহার কারণ, ঊর্দ্ধগমনশীল বায়ু, আঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা শব্দরূপে পরিণত হয়। প্রাচীন আর্য্যমহোদয়গণের মধ্যে অনেকে ইহা স্বীকারও করিয়াছেন। শিক্ষাকার বলেন, "বায়ুরাপদ্যতে শব্দতাং"॥ অতএব শব্দ বায়ুজ, তাহাতে সন্দেহ নাই, সুতরাং নিত্যত্ববাদ প্রমত্ত-প্রলাপ। সমাধানে বলা হইতেছে, শব্দ বায়ু-পরিণাম হইলে, বায়বীয় পরমাণু প্রচয় ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারিবেনা। যেমন বস্ত্র তন্তুকার্য্য, তন্তুসকলের সমষ্টি, অর্থাৎ সুকৌশল সম্পন্ন অসাধারণ সংস্থিতি ভিন্ন কিছুই নহে। অথবা যেমন মৃত্তিকার ঘট মৃত্তিকাপ্রচয় মাত্র, তদ্রূপ শব্দও বায়ুবিকার মাত্র হইতে পারিবে, কিন্তু শব্দে কোনও বায়বীয় অবয়ব অনুভূত হয়না। যদি বলা যায়, বায়বীয় অবয়বাবলী শব্দে রহিয়াছে। শব্দও তৎসমষ্টি মাত্র। তখন বিজয়-রবে মীমাংসকেরা সবলকণ্ঠে উত্তর করিবে, "তবে শব্দ [illegible] কেন? [illegible] কারণগুলি [illegible] ইন্দ্রিয়ের বিষয়, তাহাদের সমষ্টি কার্য্য তত্তদিন্দ্রিয়েরই বিষয়, এ, সিদ্ধান্ত সর্ব্বত্র অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজত্ব করে। মৃত্তিকাতে যে যে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যতা আছে, ঘটেরও তাহাই। শব্দের এমনকি দুর্ভাগ্য যে, সে পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী না হইয়া, অন্যের অনুগ্রহে পরিপুষ্ট হইবে? যদি না হইল, তবে শব্দ বায়ু-কারণক নহে, সিদ্ধ হইল। অন্য কারণও অনুসন্ধানে আসিল না, অতএব নিত্য।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ॥ ২৩॥

পদপাঠঃ। লিঙ্গদর্শনাৎ। চ।

ব্যাখ্যা॥ লিঙ্গদর্শনাৎ—(শাস্ত্রীয় প্রমাণ রূপ) হেতু দেখা যাইতেছে বলিয়া। চ—ও (শব্দের নিত্যত্ব নির্দ্ধারিত হয়।)

বঙ্গার্থঃ॥ প্রমাণ আছে বলিয়াও (শব্দকে নিত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে নির্ব্বিষ্টচিত্তে স্বীকার করিতে হইবে।)

বিশদব্যাখ্যা॥ আমাদের সকল যুক্তি-তর্ক বিচারের পর্য্যবসান সেই অগাধ অপৌরুষেয় বেদবাক্য। সহস্র যুক্তি-তর্কও যদি বেদবিরুদ্ধ হয়, তথাপি আর্য্যমহর্ষিগণ তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিয়াছেন এবং উপেক্ষা করিয়াছেন। শব্দের এই নিত্যতা-বিচারে যাঁহারা পূর্ব্ববাদী, তাঁহারাও বেদের অমোঘ-অটল- প্রামাণ্য স্বীকারে কটিবদ্ধ হইয়া অগ্রসর; অতএব এখানে শেষ কথা—একটী বেদবাক্য প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করা। তাহাহইলে বেদ স্বীকারকারী আস্তিকপক্ষের "সর্ব্বচূর্ণ গদা" হইয়া যায়। শ্রুতি বলেন, "বাচাবিরূপনিত্যয়া," যদিও এই শ্রুতিবাক্য অন্য উদ্দেশ্যে উচ্চা-

রিত এবং ব্যবহৃত, তথাপি ইহার অর্থ শব্দের (বাক্যের) নিত্যতা প্রকাশ করে। ভাষ্যকার শবরস্বামী মহোদয় বলিয়াছেন—"অন্ত পরং হীদং বাক্যং বাচোনিত্যতামনুবদতি"। আমরা তাঁহার কথার প্রতিধ্বনি করিয়াই কৃতার্থ। এ অধিকরণের এইখানেই অবসান। ইহার নাম শব্দ-নিত্যতাধিকরণ। পূর্ব্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ, বিষয় ও সংশয় দেখান হইয়াছে। যথাক্রমে সূত্র পাঠ করিলে বুঝা যায়, শব্দার্থের নিত্যসম্বন্ধ-ব্যবস্থাপক পূর্ব্বাধিকরণের সাধক বলিয়া, এই অধিকরণে পূর্ব্বসঙ্গতি আছে। অধ্যায়-সঙ্গতিও পাদসঙ্গতি সকল অধিকরণেই আছে, তাহা প্রদর্শিত হওয়া অনাবশ্যক। শব্দের নিত্যতাবাদ মীমাংসকাচার্য্যের হৃদয়ের ধন। অপরের ইহাতে বিশেষ বিবাদ। ফলতঃ ইহা দৃঢ়-যুক্তিক বলিয়া বিদ্বদ্বর্গ অনুমোদন করেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীকেদার নাথ ভারতী সাংখ্যরত্ন সাংখ্যতীর্থ।
(ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমস্থ বেদ-বিদ্যালয়।)
যশোহর।

ভূগোল-পরিচয়।

—•:০:•—

৩য় পাঠ, ১ম প্রপাঠক।
ধ্রুবক ও বিক্ষেপ।

ভূপৃষ্ঠস্থ নগর নিরক্ষ রেখাস্থিত লঙ্কা নগর হইতে কত দূর পূর্ব্বে বা পশ্চিমে অবস্থিত, এই দূরত্বের নির্ণয় জন্য পৃথিবীর গোল (globe) ও ভূচিত্রে দ্রাঘিমা অঙ্কিত করা হয়। রবিমার্গের উপরিস্থ যোগ-তারা রেবতীর ১০´ পূর্ব্বে স্থিত বিন্দু হইতে তারার পূর্ব্ব দূরত্বকে ধ্রুবক বলে, এবং এই ধ্রুবক নির্ণয় জন্য ঐ বিন্দুকে মূল কীলক ধরিয়া রবি-মার্গকে ৩৬০ ভাগে বিভক্ত করা হয়। এই এক এক ভাগকে অংশ বলে। প্রতি অংশের সীমাবিবর ভেদ করিয়া সৌম্যধ্রুব হইতে যাম্যধ্রুব পর্য্যন্ত যে রেখা অঙ্কিত করা যায়, এই রেখার নাম ক্ষেপ-সূত্র। এই ৩৬০টী ক্ষেপ-সূত্রের দ্বারা মূল কীলক বিন্দু হইতে তারাগণের দূরত্ব বা তারাগণের ধ্রুবক নির্ণীত হয়, যথা—মূলকীলকভেদী ক্ষেপসূত্রস্থ তারার ধ্রুবক শূন্য। মূল ক্ষেপ সূত্রের পূর্ব্বস্থিত ক্ষেপসূত্রে অবস্থিত তারার ধ্রুবক ১ এক এবং মূল কীলক হইতে দশম ক্ষেপসূত্রে অবস্থিত তারার ধ্রুবক ১০´ অংশ ইত্যাদি। রবিমার্গ হইতে উত্তরে বা দক্ষিণে তারার দূরত্বকে বিক্ষেপ বলে। সৌম্যধ্রুব হইতে রবিমার্গস্থিত মূল কীলক

পর্য্যন্ত মূলক্ষেপসূত্রের অর্দ্ধাংশকে সমান ৯০ ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রতি ভাগের সীমা-বিবর ভেদ করিয়া রবি-মার্গের সমান্তরালভাবে যে গোলাকার রেখা গোলক-পৃষ্ঠে অঙ্কিত করা যায়, ঐ রেখা, গুলিকে উত্তর-বিক্ষেপরেখা বলে, এবং মূল কীলক হইতে যাম্যধ্রুব পর্য্যন্ত মূল-ক্ষেপসূত্রের অর্দ্ধাংশকে সমান ৯০ ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগের সীমান্তর-বিবর ভেদ করিয়া, ঐ মার্গের সমান্তরাল ভাবে গোলক-পৃষ্ঠে যে মণ্ডলাকার রেখা অঙ্কিত করা যায়, ঐ ৯০ টী মণ্ডলাকার রেখাকে দক্ষিণ-বিক্ষেপরেখা বলে। বিক্ষেপরেখা দ্বারা রবিমার্গ হইতে তারা-গণের উত্তর-দক্ষিণ দূরত্ব গণনা করা যায়। যথা রবিমার্গের উত্তরে তৃতীয় বিক্ষেপ-রেখাস্থিত তারার বিক্ষেপ তিন অংশ।

ভূ-পৃষ্ঠস্থ উত্তরমেরু-বিন্দু, দক্ষিণ-মেরুবিন্দু এবং নিরক্ষরেখার ন্যায় ভগোলস্থ সৌম্যধ্রুববিন্দু, যাম্যধ্রুববিন্দু এবং বিষুবরেখা গতিবিহীন বা স্থায়ী নহে। এজন্য তারাগণের দূরত্ব-গণনায় বিষুবরেখা পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু-জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ কদম্ববিন্দু, পরকদম্ব-বিন্দু এবং রবি-মার্গ অবলম্বন করিয়া ক্ষেপসূত্র ও বিক্ষেপরেখা গোলকে অঙ্কিত করিয়া থাকেন; কিন্তু তথাপি ধ্রুবদ্বয়েরও ক্রান্তিপাতের বিলোমগতি বশতঃ তারা-গণের ধ্রুবক ও বিক্ষেপে অয়নাংশ যোগ করিয়া যথাসময়ে সংশোধন করিয়া লইতে হয়।

৪র্থপাঠ, ১মপ্রপাঠক।

সংজ্ঞা।

জ্যোতিষ্ক। স্বকীয় বা পরকীয় জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় যে সমস্ত পদার্থ আকাশে দৃষ্ট হয়, তাহাদিগের নাম জ্যোতিষ্ক। পৃথিবীও জ্যোতিষ্ক, কারণ অন্য জ্যোতিষ্ক হইতে পৃথিবীকেও জ্যোতির্ম্ময় দেখায়।

বিশ্ব। আকাশ (স্থির বায়ু)—চঞ্চল বায়ু, বাষ্প ও জ্যোতিষ্ক সমূহের সাধারণ নাম বিশ্ব। বিশ্ব অসীম। গোলাকৃতি ভিন্ন অসীম বস্তুর অন্য আকৃতি কল্পনা করা যায় না এবং দেখিতেও বিশ্ব গোলা-কৃতি, এজন্য বিশ্বের নাম ব্রহ্মাণ্ড বা গোলক, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, বিশ্ব-গোলক বা গোলক-ব্রহ্মাণ্ড।

জগৎ। বিশ্ব সতত ভ্রাম্যমান, এজন্য বিশ্বের নাম জগৎ, বিশ্ব-জগৎ জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড।

খগোল। বিশ্বময় গোলাকার নীলবর্ণ আকাশের সংজ্ঞা খগোল।

ভগোল। ভ অথবা জ্যোতিষ্ক-পরিবৃত শূন্যগর্ভ বর্ত্তুলাকার ক্ষেত্রকে ভপঞ্জর বা ভগোল বলে।

তারা। আমাদের সূর্য্যচন্দ্র ব্যতীত যে জ্যোতির্ম্ময় গোলাকার জ্যোতিষ্কগণ আকাশে সন্তরণ করে, তাহাদিগকে তারা বলে।

সবর্ণতারা। তারা শুক্লবর্ণ ভিন্ন অন্য বর্ণযুক্ত হইলে, সেই তারাকে সবর্ণ-তারা বলে।

বহুরূপতারা। যে তারার জ্যোতির বিশেষ হ্রাসবৃদ্ধি বা অবস্থান্তর হয়, সেই তারাকে বহুরূপ তারা বলে।

নবতারা। তারা কথনও দৃশ্য এবং প্রায়শঃ অদৃশ্য থাকিলে, সেই তারাকে সাময়িক তারা বা নব তারা বলে।

গুচ্ছক। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুবিচ্ছিন্ন তারা-সংহতিকে গুচ্ছক বলে।

তারাস্তবক। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিরবচ্ছিন্ন তারা-সংহতিকে, তারাস্তবক বলে।

ছায়াপথ। যে সুবিস্তৃত স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময় শুভ্র নদীরূপা তারাস্তবক ভ-পঞ্জর বেষ্টন করিয়া আছে, তাহাকে ছায়াপথ, দেবপথ, সোমধারা, নভঃসরিৎ, অংশুমতী নদী বা বিরজা বলে।

বাষ্পস্তবক। বাষ্পময় স্তবককে বাষ্প-স্তবক বলে।

উত্তরধ্রুবতারা। পৃথিবীর মেরুদণ্ড কল্পনা দ্বারা উত্তরে প্রসারিত করিলে, উহা ভ-গোলের যে বিন্দু স্পর্শ করে, ঐ বিন্দু স্থিত তারাকে উত্তর ধ্রুবতারা বা সৌম্য ধ্রুবতারা বলে। ঐ বিন্দুতে কোন তারা না থাকিলে, ঐ বিন্দুর সন্নিহিত স্থানস্থিত তারাকে উত্তর ধ্রুবতারা বা সৌম্যধ্রুবতারা বলে।

দক্ষিণ ধ্রুবতারা। পৃথিবীর মেরুদণ্ড কল্পনা দ্বারা দক্ষিণে প্রসারিত করিলে, ভ-গোলের যে বিন্দু স্পর্শ করে, ঐ বিন্দুস্থিত তারাকে দক্ষিণ ধ্রুবতারা বা যাম্য ধ্রুবতারা বলে। ঐ বিন্দুতে তারা না থাকিলে, ঐ বিন্দুর সন্নিহিত স্থানস্থিত তারাকে দক্ষিণ-ধ্রুবতারা বা যাম্য ধ্রুবতারা বলে।

নক্ষত্র। সূর্য্য ও চন্দ্রাদির গতি-পরিমাণ নিরূপণ করার জন্য ভগোলে যে তারা-কীলক সকল নির্ব্বাচিত আছে, ঐ তারা-কীলকের নাম নক্ষত্র। নক্ষত্রস্থ তারার বর্ণ বা গুণ অথবা তারাগণের সংহতির আকার অনুসারে নক্ষত্রের নামকরণ হইয়াছে। যথা অশ্ব-মুখাকৃতিক ত্রিতারকময় অশ্বিনী নক্ষত্র এবং বিচিত্র বর্ণময় চিত্রা নক্ষত্র, ইত্যাদি।

যোগতারা। নক্ষত্র একাধিক তারা-ময় হইলে, জ্যোতিষ গণনায় যে তারাটী ব্যবহৃত হয়; সেই তারাটীকে যোগতারা বলে। যথা অনুরাধা নক্ষত্রস্থ পারিজাত তারাকে যোগতারা, অনুরাধা নক্ষত্র এক তারাময় হইলেও সেই তারাকে শিষ্টাচার বশতঃ যোগতারা বলা হয়। যথা এক তারকাময় আর্দ্রা, চিত্রা, স্বাতীনক্ষত্রের আর্দ্রা, চিত্রা ও স্বাতী তারা।

মণ্ডল। নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ তারা ও স্তবকাদির সংহতিকে মণ্ডল বলে। মণ্ডলস্থ তারা-সংহতির বর্ণ বা আকৃতি অনুসারে মণ্ডলের নামকরণ হইয়াছে। যথা শিশুমার-মণ্ডল, চিত্রশিখণ্ডিমণ্ডল; ইত্যাদি।

ঘনআয়তন। আকৃতিবিশিষ্ট বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ পরস্পর গুণ করিলে যে সারা কালী হয়, তাহাকে ঘন-আয়তন বলে।

পৃষ্ঠক্ষেত্রফল। আকৃতিবিশিষ্ট বস্তুর পৃষ্ঠদেশের ক্ষেত্রের যে ক্ষেত্রকালী হয়, তাহাকে পৃষ্ঠক্ষেত্রফল বলে।

অণুরাশি। আকৃতিবিশিষ্ট বস্তুর পরমাণু-সংখ্যাকে অণুরাশি বলে।

ঘনত্ব। পরমাণুর সন্নিকর্ষকে ঘনত্ব বলে।

আকর্ষণ। যে শক্তি দ্বারা এক পরমাণু অন্য পরমাণুর সহিত যুক্ত হইতে চাহে, সেই শক্তিকে আকর্ষণ বলে।

মাধ্যাকর্ষণ। যে শক্তিদ্বারা অনুরাশিময় বস্তু স্বীয় কেন্দ্রে স্বীয় পরমাণু আকর্ষণ করে অথবা দূরস্থ অপর অণুরাশিময় বস্তু আকর্ষণ করে, ঐ শক্তিকে মাধ্যাকর্ষণ বলে।

সৌরজগৎ। স-সূর্য্য-গ্রহ-উপগ্রহ-ধূমকেতু-সংহতিকে সৌরজগৎ বলে।

উল্কা। বজ্র ভিন্ন যে ক্ষণস্থায়ী আলোক সময়ে সময়ে আকাশ হইতে স্খলিত হয়, ঐ আলোককে উল্কা বলে।

তারাস্খলন। উল্কা ক্ষুদ্র ও তীব্র বেগবিশিষ্ট হইলে তাহাকে তারাস্খলন বলে।

অগ্নিপিণ্ড। উল্কা বৃহৎ পিণ্ডবৎ হইলে তাহাকে অগ্নিপিণ্ড বলে।

শৈলউল্কা। উল্কা ধাতুময় রূপে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলে তাহাকে শৈলউল্কা বলে।

রাশি। যে দ্বাদশ মণ্ডল মধ্যে চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহগণের কক্ষা অধিষ্ঠিত আছে, সেই মণ্ডলগণকে রাশি বলে।

যুগলতারা। যে দুই তারা চাক্ষুষ দৃষ্টিতে একতারা বলিয়া বোধ হয়, ঐ তারা দ্বয়কে যুগল তারা বলে।

যৌথতারা জগৎ। যে তারাদ্বয় উভয়ে কোন শূন্যস্থ কেন্দ্র পরিভ্রমণ করে, ঐরূপ তারা-সংহতিকে যৌথতারা-জগৎ বলে; এবং এক বা বহুতারা এক তারাকে পরিভ্রমণ করিলে, সেই তারা-সংহতিকেও যৌথতারা-জগৎ বলে।

গ্রহ। ভূগোলস্থ যে জ্যোতিষ্ক ... বিন্দুর গতি পরিগণিত হয়, তাহাকে গ্রহ বলে। যথা বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, চন্দ্র, সূর্য্য, রাহু, কেতু।

গ্রহপঞ্চক। গ্রহগণের মধ্যে যে জ্যোতিষ্ক পরকীয় জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় ও যে জ্যোতিষ্ক সূর্য্য পরিভ্রমণ করে, ঐমৌলিক বুধাদি ৫।৬টী গ্রহকে গ্রহ-পঞ্চক বলে।

উপগ্রহ। পরকীয় জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় যে জ্যোতিষ্ক কোন গ্রহ পরিভ্রমণ করে, ঐ জ্যোতিষ্ককে উপগ্রহ বলে;—যথা চন্দ্র, কোবস্, যোমিমাস্ এরিয়োল ইত্যাদি।

ধূমকেতু। ধূমময় পুচ্ছযুক্ত বা ধূমবেষ্টিত জ্যোতিষ্ককে ধূমকেতু বলে। যথা হেলির ধূমকেতু, ডোনটীর ধূমকেতু ইত্যাদি।

সূর্য্য। যে দীপ্যমান বৃহৎ জ্যোতিষ্ককে গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু আদি প্রদক্ষিণ করে, সেই জ্যোতিষ্ককে সূর্য্য বলে। যে তারাকে অন্য তারা বা তারাগণ প্রদক্ষিণ করে; ঐ তারাকেও সূর্য্য বলা যাইতে পারে।

বিম্ব। সূর্য্য, গ্রহ ও উপগ্রহগণের পিণ্ড বা দেহকে বিম্ব বলে। যথা সূর্য্য-বিম্ব, চন্দ্র-বিম্ব, ইত্যাদি।

পরম প্রেম বা ভক্তি।

প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে ভক্তির আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। জ্ঞান ও কর্ম্মের যেমন বিভিন্ন দুইটী স্রোত বহুকাল ধরিয়া ভারতীয় সমাজের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে, ভক্তিরও সেইরূপ একটী স্বতন্ত্র প্রবাহ আছে। প্রত্যেকটীই সময়ে ২ প্রবল ভাবে, কখনওবা প্রচ্ছন্ন দুর্ব্বল ভাবে আমাদের অনুভবে আসে। নিপুণ দৃষ্টিতে অবলোকন করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, একে অপরের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং প্রত্যেকেই গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইতে অপরকে সাহায্য করে। একটীকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিলে, অপরের সত্তা আদৌ থাকে না; কার্য্যকারিতায়ও সঙ্গে সঙ্গে বিলোপ হয়। ব্যবহারিক জগতে অজ্ঞদিগের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে দেখাযায়, জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির মধ্যে বহু ব্যবধান। জ্ঞানের গরিমায় উপনিষদাদি অধ্যাত্মশাস্ত্র পরিপূর্ণ; বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগে লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়—জীবের উর্দ্ধে, অধোদেশে, দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, পশ্চাতে, অনন্তকর্ম্ম। কর্ম্মপ্রবাহের মধ্যে জীববুদ্বুদ কখনও দৃশ্য, কখনও অদৃশ্য, কখনও স্থির, কখনও ঘূর্ণায়মান। বেদের জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয় কাণ্ডের মধ্যে একটী অন্তঃস্রোতও দেখিতে পাওয়া যায়, উহা ভক্তির। অনেক বেদমন্ত্র পাঠ করিলে মনে হয়, যেন ভক্তির অদৃশ্যস্রোতে বিশ্ব-সংসার ভাসিয়া চলিতেছে। বেদের মন্ত্রে ভক্ত বা সাধকের আত্মসমর্পণ ও নয়নে অশ্রুমিলন, উভয়েরই পরিচয় পাওয়া যায়। কুসুমের হাসি, চাঁদের জ্যোৎস্না, নিশার শিশির, এ সকলের মজ্জায় মজ্জায় ভক্ত ভক্তির স্রোত দর্শন করিতেন, সুতরাং প্রকৃতি-সেবক ভক্তির সংবাদ পূর্ব্বেই জানিতেন। অতএব বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বোক্ত তিনটীর মধ্যে কোনওটী ভারতের অভিনব-অতিথি নহে। তবে সন্ন্যাসের নবনিয়মের পরিণাম—পথে ঘাটে জ্ঞানচর্চ্চার ছড়াছড়ি, এবং ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান-ভক্তি সব বৃথা, কেবল প্ররোচক নিরর্থক বাক্য, কর্ম্মই পবিত্র, এইরূপ অজ্ঞানী অভক্তের কর্ম্মাচরণ; ও কেবল ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান-কর্ম্মে যাঁহার বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস নাই, সাম্প্রদায়িকপীড়ার বীজস্বরূপ গোঁড়ামীতেই যিনি অভ্যস্ত, বস্তুতঃ যাঁহার হৃদয় অপবিত্র, এরূপ ভক্তের ভক্তি, কখনই সার্ব্বজনীন বা পুরাকালের হইতে পারে না। কাজেই প্রাচীন ভারতে উহার দৃষ্টান্ত বিরল। অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার গীতা, কর্ম্মীকে কর্ম্মফল ঈশ্বরোদ্দেশে অর্পণ করিতে উপদেশ দেন, কর্ম্মযোগীকেই জ্ঞানী হইতে বলেন, জ্ঞানীকে ভক্তিমান্ হইতে অনুরোধ করেন। কর্ম্মহীন জ্ঞানী, ভক্তিহীন কর্ম্মী ও জ্ঞানহীনকর্ম্মীকে তিনি ভালবাসেন না, আবার অজ্ঞানী ভক্তের উপরও তিনি কোনও অধিকার দেন নাই। বস্তুতঃ ভক্তিহীন কর্ম্ম অকর্ম্ম, ভক্তি-

শূন্য জ্ঞান নীরস বিশুষ্ক, সুতরাং জ্ঞানীই হউন, আর কর্ম্মীই হউন, সকলেরই ভক্তিতত্ত্ব অবগত হওয়া আবশ্যক। ভক্তিকে প্রেম বলা যায় কিনা, আমরা তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। সকল-শাস্ত্রেই ভক্তির কথা আছে, তবে কোনও স্থানে প্রচ্ছন্নভাবে বক্তব্যবিষয়ের অন্তরালে, কোথাও বা তীব্রবেগে জন-সমাজের সম্মুখে; আমরা এই বিস্তৃত বিষয়টীকে সহজে ও সংক্ষেপে বুঝিতে প্রয়াস পাইব।

পুরাকালে ভারতে ভক্তির নাম ছিল পরম প্রেম। পিতামহ ব্রহ্মার মানসপুত্রগণের মধ্যে চিরকৌমার্য্য ও ভক্তির পূর্ণাবতার ভক্তিবীর নারদ "ভক্তিসূত্র" অথবা "নারদ সূত্র" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"সা কস্মৈ পরম-প্রেমরূপা।" ভক্তি কাহারও (ভগবানের) * উদ্দেশে পরম প্রেম স্বরূপ। ব্যবহারিকপ্রেম হইতে ইহার স্থান সহস্রযোজন উর্দ্ধে। ভ্রাতার প্রতি সামাজিক নিয়মে ভগিনীর অভ্যস্ত প্রেম, পুত্রের প্রতি উপকার প্রত্যাশায় অথবা মোহবশে পিতার প্রেম, পতি-পত্নীর প্রেম ও অন্যান্য কলুষিত প্রেম, ভক্তির স্থান অধিকার করিতে পারে না; কেননা এই সকল প্রেমে "পরমত্ব" নাই। ব্যবহারিক প্রেমে একজনকে দেখিলে অপরের হাঁসি আসে, কখনওবা চ'খের জলে বুক ভাসে। প্রেমিক জানে, ঐ হাসি-কান্না দুর্ব্বলতার পরিচয়, কাজেই সে তাহা লুকাইতে চায়। ভক্ত ভগবানের পবিত্র মূর্ত্তি হৃদয়ে দেখিয়া আনন্দে ভাসেন ও হাসেন, কখনও আনন্দে কাঁদেন। তাঁহার প্রাণ সবল, সুতরাং জগতের হিতাকাঙ্ক্ষায় ব্যস্ত, তাই তিনি জগৎকে প্রেমভরে হাসিতে কাঁদিতে শিখান, গোপন করেন না। তিনি সমাজের নিন্দাভয় যেমন উপেক্ষা করেন, প্রশংসারও তেমনি অপেক্ষা করেন না।

লৌকিক কান্নায় এক জাতীয় অভাব ও ব্যবহারিক হাসিতে একপ্রকার দুর্ব্বলতামূলক সামান্য সন্তোষ বুঝাইয়া দেয়। ভক্তের হাসি-কান্না নিত্যানন্দ ভগবানের পবিত্র দর্শন লাভে তাঁহার মাহাত্ম্য চিন্তা করিতে করিতে প্রাণের আবেগভরে দ্রবীভূত হৃদয়ে সংঘটিত হয়। উভয়ত্র উদ্দেশ্য ও বিধেয় ভিন্ন প্রকার। লৌকিকপ্রেমের অভিনেতা দুইটি ব্যবহারিক জ্ঞানান্ধ জীব, আর পরম প্রেমের বেলা সত্যানন্দ চিন্ময় পরমেশ্বর ও বিশুদ্ধান্তঃকরণ পবিত্র জীব। প্রেমে প্রেমিকদ্বয়ের শরীরগত ধর্ম্ম সকল অবাধে বিদ্যমান, মানসব্যবহারে তাহারা তৃপ্ত হয় না, কেননা শরীর তাহাতে অনুমোদন করে না। কাজেই প্রেমতরঙ্গ সমল হইয়া দাঁড়ায়। ভক্ত ভক্তিতে পরমেশ্বরের চিন্মূর্ত্তি জগতের যাবতীয় সৌন্দর্য্য একত্র করিয়া মনোমত সাজাইয়াছে; যে চিন্ময় অথবা কল্পনাময় বিগ্রহে শারীর ধর্ম্ম নাই, কাজেই শরীর-সম্বন্ধজনিত কলুষিতভাব এ প্রেমে সম্ভব নয়, ইহাই পার্থক্য। লৌকিকপ্রেম কেবল প্রেম, আর ভক্তি পরম-প্রেম। প্রেমে

---

* ক শব্দে সুখ স্বরূপ ভগবানকেই বুঝায়। বেদভাষ্যে সায়ন বলেন। বস্তুতঃ পরমপ্রেম ঈশ্বর ভিন্ন অন্যে হয় না, এইজন্য "কাহারও" এ স্থানে অর্থ পরমেশ্বরের।

প্রেমিকদ্বয় পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হয়। কারণ উভয়েই অপূর্ণ কামনার তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত। ভগবান্ পূর্ণকাম, মোহের সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ, কাজেকাজেই মুগ্ধ হন না। বলা যাইতে পারে, লৌকিক প্রেম এক-জাতীয় মোহ অথবা মোহজ বিকার। আর পরমেশ্বরে নির্লিপ্ত নির্দ্দোষ অথবা অহেতুক ভালবাসা পরম প্রেম বা ভক্তি। ভক্তি ও লৌকিকপ্রেমের বাহ্য পরিচয় অনেকটা একপ্রকার।

ভক্তকুল-চূড়ামণি মহর্ষি শাণ্ডিল্য ভক্তির লক্ষণে বলেন ;—"সাপরানুরক্তিরীশ্বরে।" ঈশ্বরের প্রতি শ্রেষ্ঠাঅনুরক্তিই ভক্তি। নারদের "কস্মৈ" এই অস্পষ্ট অংশটুকু, শাণ্ডিল্যের "ঈশ্বরে"এই কথায় প্রকারান্তরে সম্পূর্ণ পরিস্ফুট। প্রেম আর অনুরক্তি একই কথা। সুতরাং ঋষিদ্বয়ের পরম-প্রেম ও পরানুরক্তি একই হইল। লৌকিক অনুরাগ প্রতিদান ও আশাদ্বারা পরিপুষ্ট। ভক্তের পরানুরাগ আপনাতেই সন্তুষ্ট, তাহাতেই পরিতৃপ্ত, কেবল ভজনীয় ভগবানকে চায়। সাধারণ অনুরাগ জড়-জগৎ লইয়া। জড়ের কার্য্য উভয় সাপেক্ষ। পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে, ইহাই তাহাদের স্বভাব। ভক্তি চিন্ময় ঈশ্বর লইয়া; এখানে আকর্ষণ ও প্রত্যাকর্ষণ নাই; পদ্মপত্রস্থ সলিলের ন্যায় নির্লেপ চিজ্জ-ড়ের রহস্যময় মৌলিক-ভালবাসা পরম-প্রেমে পরিস্পষ্ট। লৌকিকপ্রেমে প্রেমিক চাঁদ চায়, চাঁদের মিষ্ট হাসিটুকুও চায়, মোহের গুণে চাঁদের কলঙ্কটুকু ভুলে গিয়ে, চাঁদকে সকল সংসার আঁধার ক'রে শয়নঘরে আস্‌তে বলে; না এলে অসন্তুষ্ট ও হয়। মোট কথা, লৌকিক প্রেমিক কড়ায় গণ্ডায় হিসাব ক'রে ভালবাসাটুকু পরীক্ষা করে ও তাহার প্রতীক্ষা করে। ভক্ত ভালবাসাও উপেক্ষা করে, তাহার অপেক্ষা রাখেনা। আর কিছুই চায়না, কেবল ভজনীয় ভগবান্‌কে চায়। তাহাও শুধু নিজে ভালবাসিবার জন্য, ভালবাসা পাইবার জন্য নয়। ভক্ত বলে,

"চাইনা অভয়,
চাই হে তোমায়,
চাইনা তোমার ভালবাসা।
আপন বিক'ই,
কেনা হয়ে র'ই,
ভালবাসিলেই পূরে আশা।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে "ভগবদুদ্ধব-সম্বাদে" স্বয়ং জগন্নাথ কৃষ্ণ বলিতেছেন, "ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যং, ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবংবা, মযার্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনাহন্যৎ।"

নাচায় ব্রহ্মত্ব ইন্দ্র-সিংহাসন,
পাতলে ভূতলে রাজত্বস্থাপন,
যোগফল—মুক্তি ভক্তমহাজন,
আমাতে অর্পিয়া নিজপ্রাণ-মন,
আমাবিনা আর কিছু না চায়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধ্রুবোপাখ্যানের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল। ভগবান্ বলেন—ধ্রুব, বর নেও। ধ্রুব বলিতেছে, "স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোহহং, ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্র গুহ্যং, কাচংবিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং স্বামিন্! কৃতার্থোহস্মি বরংন যাচে"। দেবেন্দ্র মুনীন্দ্র গণের দুষ্প্রাপ্য তোমাকে পাইয়াছি,

স্নান প্রত্যাশয় তপস্যা করিয়া তোমাকে পাইলাম, কাচ খুঁজিতে রত্ন মিলিল, কৃতার্থ হইয়াছি, আর বর চাহিনা। এই সময়ে ধ্রুবের অন্তরে প্রকৃত ভক্তির স্রোত উদ্বেলিত হইয়াছে। কাজেই ভগবানকে চাহে। ভালবাসিয়া ভগবান বর দিতে চাহিলেন, সে তাহা চাহে না। ভক্তির অনেক লক্ষণ আছে।

শাস্ত্রকারেরা ভক্তির বিকাশ নয় প্রকার দর্শন করিয়াছিলেন; তাই তাঁহারা "নবধা ভক্তি" বলিয়া থাকেন। "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।" শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন, এই নয় প্রকার লক্ষণ ভক্তির প্রাণ, তজ্জন্যই ইহাদিগকে ভক্তি বলে।

প্রথম লক্ষণ শ্রবণ; এলক্ষণ লৌকিক প্রেমেও আছে। যাহাকে ভালবাসি, তাহার কার্য্যকলাপ অথবা নাম যদি কেহ বলিতে থাকে, তবে আগ্রহের সহিত শুনিতে ইচ্ছাহয়, যেন শুনিলে প্রাণের উপর দিয়া কত কি সুখস্রোত বহিয়া যায়, যেন কত হারান-জিনিষ মনে জাগিয়া উঠে! ভক্ত শতকথার মধ্যে ভগবানের নাম অথবা মাহাত্ম্য শুনিলে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করেন। দ্বিতীয় কীর্ত্তন; শুধু শুনিলে প্রাণ মানেনা, নিজের যেন কহিতে ইচ্ছাহয়। বোধহয় যেন নিজে বলিয়া শুনিলে কতই মধুর লাগিবে। লৌকিক প্রেমেও এ লক্ষণ আছে, তবে একটু ভিন্নভাবে, অপরকে লুকাইয়া নির্জ্জনগৃহে একা একা এদিক্ ওদিক্ তাকাইয়া মৃদুস্বরে আবেগভরে ভালবাসার লোকের নামটি উচ্চারণ করিতে পারিলে প্রেমিকের কত শান্তি! ভক্ত বলেন,—

"সুধাহ'তে সুমধুর নাম!
অতৃপ্ত রসনা, অপূর্ণ বাসনা,
করিতে চাহে যে পান!
সে কথাকহিতে, সে গান গাহিতে,
হৃদয়-তন্ত্রীতে উঠে যে তান!"

পাঠক মনে করিবেননা, আমি উভয়কে তুল্য বলিতে চাহি, এই জন্যই লৌকিক প্রেমের কথা তুলিয়াছি। জাগতিক সমস্ত প্রেমেই যে ভাগবত প্রেমের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মলিন ছায়া-বিকাশ মাত্র, তাহাই বলিতে চাহি। পূর্ণচন্দ্রের সমল সলিলগত অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব জলের দোষের অংশী হইয়া অন্যরূপ হয়। নির্ম্মল মুখের মলিন দর্পণস্থ ছায়ার ন্যায় কলুষিত লৌকিক প্রেম ভগবানের বিমল প্রেমের প্রতিবিম্ব রূপ অবস্থাবিশেষ। পাত্র, ক্ষেত্র ও মাত্রার ন্যূনাধিক্য বশতঃই লৌকিক প্রেমের ভিন্ন ভাব। ভক্ত কহেন,—

"পুত্র-প্রেম, প্রীতি পত্নী-প্রতি,
ভ্রাতৃস্নেহ, বন্ধুজনে রতি;
আর যত ভাবের উচ্ছ্বাস,
সে প্রেমের এ সব বিকাশ।"

তৃতীয় স্মরণ। মনে চিন্তা করা। ধ্যানাত্মক প্রকাশ। একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিলে অন্তঃকরণে তদ্ভাবের আবির্ভাব হয়। তন্ময়তাই ইহার মূল মন্ত্র। কালিদাস ও ভবভূতি প্রভৃতি কবিকুলের কাব্য-নাটকের প্রসিদ্ধ নায়ক-নায়িকায় স্মরণের অভিনয় করিয়াছেন; তাহা লৌকিক ক্ষেত্রের স্মরণ, তাহার উদ্দেশ্য অন্য। ভক্তের স্মরণ পূর্ণা-

নন্দের নির্লিপ্ত প্রকাশের অহেতুক রহস্য। কৃষ্ণ-চিন্তায় ব্রজ-গোপিকারা কৃষ্ণময় হইয়া গিয়াছিল। রাধা ও অপর সকল গোপিকা কৃষ্ণ সাজিয়া কৃষ্ণের অসুর-বধাদি লীলার অভিনয় করিয়াছিল। স্মরণের পরিণাম এতদূরও উপস্থিত হইতে পারে। চতুর্থ পাদসেবন। পরিচর্য্যা। প্রেমিক তাহার প্রেম-পাত্রের কতকি পরিচর্য্যা করে। ভক্ত ভগবানের চিন্ময় মূর্ত্তির পরিচর্য্যায় নিজের সমস্তই নিযোজিত করিয়াছে। তাহার পর অর্চ্চন। পূজা। লৌকিক প্রেমিকের পূজোপহার বাহ্যবস্তু ও কলুষিত আভ্যন্তরিক বস্তু। ভক্তের উপহার চিত্ত-কুসুম, ভক্তি-চন্দন, সন্তোষ-সলিল ইত্যাদি পবিত্র মানসোপচার ও পবিত্র বাহ্যবস্তু। মানস-পূজার শাস্ত্রোক্ত নিয়ম-এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। বন্দন প্রণাম। এটী ভাবাবেশের পরিচয়। প্রবল জ্যোতির সম্মুখে অবনত হইয়া প্রকৃতির ভক্ত সর্ব্বময় ভগবানকে দেখিয়া প্রাণের আবেগে গলিয়া পড়েন, তখনই প্রণাম করেন। তারপর দাস্য। দাস্য সমস্ত কর্ম্ম ভগবানকে অর্পণ করার নামান্তর। দাস্য অর্থাৎ দাসত্ব। যদি আমি মৎকৃত কার্য্যের ফল গ্রহণ করিলাম না, ভগবানের উপর ছাড়িয়া দিলাম, তাহাহইলে আমি তাঁহার দাস বই আর কি? ভৃত্য কার্য্য করে, ফল চিরদিনই প্রভুর হস্তে। "যৎ করোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ। যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণং।"

যাহা কর, যাহা খাও,
যাহা হোম কর. আর অপরে যা দেও:
হে কৌন্তেয়! যত তপ কর অনুদিন,
সব ফল দেও মোরে থেকে উদাসীন,"

এই মহাশিক্ষা—এই ভক্তির পরিস্ফুট লক্ষণ গীতায় দেখাযায়। আমাদের দেশে সমস্ত কর্ম্মফল ভগবানে মন্ত্রপাঠ সহকারে সমর্পণ করিবার নিয়ম অদ্যাপি আছে। এই ভাবের ভাবুক বলেন, "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" সখ্য দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন। যাঁহাকে বিশ্বাস করাযায়, সে-ই প্রকৃত সখা। সখার কাছে প্রাণের কথা গোপন করা যায়না। নিজের দুর্নীতি (ভগবানকে সখা বলিয়া মনেকরিলে) তাঁহার কাছে লুকান যায়না। কাজেই সখিত্বের পরিণাম আত্মোন্নতি; শেষ লক্ষণ আত্ম-নিবেদন। (আত্মশব্দের শরীর ও মন এই দুই অর্থ লইয়া লিখিত হইতেছে।) দেহ ও মন সমর্পণ করা। দেহ সমর্পণে প্রেমিক বলেন,—

"এ দেহ তোমার বঁধু।
ওটীযে আমার"

আর পরম প্রেমিক বলেন,—

বিনিময় শিখিনাই হরি!
জানি শুধু এদেহ তোমারি।

এইরূপ সকল স্থানেই প্রেমিক প্রতিদান চান, ভক্ত চাননা, কাজেই তিনি পরম প্রেমিক। যে দ্রব্য অপরকে দান করা হইয়াছে, তাহার ভরণ-পোষণ জন্য বড় উৎকট বাসনা থাকেনা, যেমন তেমন করিয়া শরীর-যাত্রা চলিলেই হয়। এ ভাবটী ভক্তের শরীরে পরিস্ফুট। কেননা তিনি ভগবানে দেহ অর্পণ করিয়াছেন। ভগবানের কার্য্যেই তাঁহার দেহ ব্যয়িত হয়। মন সমর্পণে

সাধারণ প্রেমিক নেওয়া দেওয়া ব্যবসায় করেন। ভক্ত বলেন,—

"দয়াময়, নেওহে মিশায়ে প্রাণে প্রাণ,
বারি-বিন্দু আমি, জলনিধি তুমিই,
এখানে কোথায় তোমার স্থান।
চাইনা হৃদয়, সম্ভব (ও) ত নয়,
মিশেযাই, ব(হু)ক্ প্রেমতুফান।"

নয়টী লক্ষণের উদয় হইলে ভক্তের প্রাণে আনন্দ-স্রোত বহিতে থাকে। মুহুর্মুহুঃ ভগবানের আনন্দময়ী মূর্ত্তি দর্শনে ভক্ত আনন্দময় হইয়া যান।

শরীরে রোমাঞ্চ, আলুথালু প্রাণ,
নয়ন সলিলে ভাসে বয়ান,

ইহাই তখনকার প্রয়াশঃ অবস্থা। ভাগবতে ভগবান বলিতেছেন, "কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা, বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুদ্ধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ।" আর বলিতেছেন, "বাগ্‌গদ্‌গদা দ্রবতে যস্ত চিত্তং রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি কচিচ্চ, বিলজ্জ উদ্‌গায়তি নৃত্যতেচ, মদ্‌ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি।"

বাণীগদগদ প্রাণ গ'লে যায়,
কভু হাসে কভু কাঁদে উভরায়।
ত্যজি লাজ ভয়, উচ্চ রবে গায়,
কভু নাচে, ধরা পবিত্রিত তায়।

ভক্তের স্পর্শে জগৎ পবিত্র, ভক্তিযোগে অন্তঃকরণ সরস, ভক্তিশূন্য প্রাণ শ্মশানের মত। ভক্তিতত্ত্ব দুরবগাহ। সাধনমার্গে সর্ব্বত্রই ভক্তি চাই। বুঝিবার দোষেই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ। ভগবান ভক্তির মহত্ত্ব বুঝাইয়া সম্প্রদায়পীড়া নিবারণ করুন, ইহাই তাঁহার নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি।

(কস্যচিৎ ভক্তিকামস্য।)

রাধাবিনোদিনী।

প্রকৃতি বিশ্বসংসারের প্রসূতি। আমরা জগতে যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ করি, সেই দিকেই দেখি, বিশ্বমাতা প্রকৃতি আমাদের সম্মুখে নানাবিধ লীলা-মূর্ত্তিতে বিরাজিত। কি তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ, কি উত্তুঙ্গ তরঙ্গ-সঙ্কুল বিশাল বারিধি, কি দুর্ব্বাদল-সমাকীর্ণ শ্যামল প্রান্তর, কি স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বতী, কি মরীচিকাময় মরুক্ষেত্র, কি শস্যশ্যামলা উর্ব্বরা ভূমি, কি ঘোরান্ধকারাচ্ছন্ন তামসী নিশা, কি রুচির চন্দ্রিকা-সহচরী, রজনী যাহাই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, সমস্তই প্রকৃতির লীলা।

তত্ত্বপিপাসিত প্রাণে প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ডে প্রকৃতির দুইটী ভাব পরিস্ফুট—একটী ভৈরব, অপরটী মধুর। বিশ্বমাতাকে আমরা কখনও বলি, "কালী করালী ভৈরবী শ্যামা" এবং কখনও বলি "রাধাবিনোদিনী।"

এ জগতে চিরদিন কোনও ভাবই থাকে না। পরিবর্ত্তন এ বিশ্বের প্রাণ।

কাজেই কখনও আমরা শ্যামা ভালবাসি, কখনও রাধা চাই। যখন হৃদয়ে উগ্রতার আবির্ভাব হয়, হৃদয় রৌদ্ররসে পরিপূর্ণ হয়, তখন আমরা উগ্রতা ভালবাসি। করাল কাল মেঘের ন্যায় কৃষ্ণ-ভীষণ মূর্ত্তিকেই তখন প্রাণ চায়। তখন তাঁহার গলদেশে বিশাল ভয়াল নরকপাল-মালা, বিকটবদনের ভয়াবহ অট্টহাস, করে নরমুণ্ড ও দর্পখর্ব্বকারী খর্পর ও কটিদেশে রক্তাক্ত ছিন্ননরহস্তরচিত কিঙ্কিণী আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করে। লোলজিহ্বা তখন প্রীতিকর হয়। 'দারুণ দন্তে রিপু-মস্তক চর্ব্বণ করায় দরদর' রুধির-ধারায় সর্ব্বশরীর রঞ্জিত। লম্বিতকেশ। প্রচণ্ড প্রতপ্ত নিশ্বাস। জীবকুল শঙ্কাকুল। ভর্জ্জন গর্জ্জনে প্রাণ-মন চমকিত। এদৃশ্যও তখন প্রাণের তৃপ্তি সম্পাদন করে। শবাসন। শব-শিবের পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম। মস্তকে বিশাল বিষম বিষধরবেষ্টিত জটাজাল। নয়ন ঈষন্নিমীলিত। হস্তে ভীষণরব বিষাণ ও অম্বরবিদারী ডমরু এবং বিশ্বসংহারক ত্রিশূল। এদৃশ্য দেখিলেও তখন প্রাণে আনন্দ হয়। আভরণ রুদ্রাক্ষমালা। অঙ্গরাগ চিতা-ভস্ম। পানপাত্র নরকপাল! ইহা দেখিলেও তখন শান্তির আবির্ভাব হয়। যেস্থান জনসমাগমশূন্য, প্রবল পবন হুহুরবে বহিতেছে, চিতানল ধূধূ করিতেছে, অস্থিরাশি পুঞ্জীকৃত রহিয়াছে, পূতিগন্ধে নাসারন্ধ্র বিদীর্ণ হয়, অঙ্গাররাশি অতীতের সাক্ষ্য দিতে চায়; এহেন শ্মশানে শ্যামাকে দেখিলে প্রীত হই। সঙ্গিনী ডাকিনী হাকিনী প্রেতিনীর মেলাও তখন ভাল লাগে, আমাবস্যার নিশীথসময়ে এ মূর্ত্তির পূজা করিলে প্রাণ সুখী হয়। দেবীর প্রধান প্রীতিকর কার্য্য ধ্বংসও তখন প্রিয় হয়।

আবার যখন মধুর রসের স্রোত হৃদয়ের উপর দিয়া বহিয়া যায়, তখন আমরা কনকচম্পকবরণী, সুচারুহাসিনী, সুমধুরভাষিণী রাধাবিনোদিনীকে ইষ্টদেবতা বলিয়া আনন্দিত হই। পরিহিত নীলাম্বরী তখন নয়ন-রঞ্জন করে, কণ্ঠদেশের কমলমালা তখন ভাল বোধ হয়। চরণযুগলের মণিমঞ্জীর তখন শ্রবণে সুধা ঢালিয়া দেয়। বাহুবল্লীতে প্রসূনবলয় তখন চক্ষুঃপ্রীতিকর বোধ হয়। সঙ্গিনী ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী হৃদয়ে সুখের উৎস ফুটাইয়া দেয়। মধুরা দেবীর দক্ষিণদেশে নবঘনশ্যাম তনু—মোহনমূর্ত্তি! তাঁহার ললাটে অলকাতিলকা, গলে গুঞ্জমালা, শরীরে অগুরু চন্দন, অধরে মধুর সুধারসময়ী শ্রীরাগ আলাপকারী প্রাণ-মনোহারী মুরলী, পরিধান পীতাম্বর, উচ্চ শিখি-পুচ্ছগুচ্ছের চারুচূড়া শিরোদেশ চুম্বন করিতে উদ্যত। দর্শনেই তখন প্রাণে হারান-সুখ জাগিয়া উঠে। প্রাণারাম যমুনাপুলিনে প্রাণ তখন পরিতৃপ্ত হয়। তমাল-ডালে কোকিলকুলের মন-মাতান কলকাকলি, প্রফুল্ল প্রসূনে মধুগন্ধে অন্ধ অলিকুলের আকুল বিচরণ ও একতানে গুণ গুণ রবে গান, মুকলিত চূতলতিকা, পুষ্পরাশি-বিরাজিত কেলীকদম্ব, কুসুম-পরিমলবাহী মন্দ মন্দ মলয়ানিলান্দোলিত লতিকাকুল-সমাকুল মঞ্জুতর কুঞ্জবন, এ সকলই তখন হৃদয়ের সহিত ভালবাসি। পূর্ণচন্দ্রের পবিত্র চন্দ্রিকায়

যেদিন ধরাতল ধৌত, চকোরের পিপাসা যে দিন পরিপূর্ণ, সেই জগন্মোহর রাস-পূর্ণিমাতেই এই মধুর মূর্ত্তি পূজা করিলে শান্তি-রসে প্রাণ আপ্লুত হয়।

একদিকে ভীষণতার ভয়ানক দৃশ্য, অপর-দিকে মাধুর্য্যের ললিত মৃদুল প্রবাহ। এক-দিকে তরুণ অরুণের চারুকিরণে জগৎ পুলকিত ও আলোকিত, অপরদিকে মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের খরতর করে কলেবরে স্বেদনীর গলিতে থাকে, পিপাসায় প্রাণ কণ্ঠাগত, শ্রান্ত, ক্লান্ত ও ভীত।

যখন হৃদয় মধুর রসে সিক্ত, তখন রৌদ্র মূর্ত্তির ভীষণতাদর্শনে কম্পিত-কলেবরে ভগ্নস্বরে বলিতে ইচ্ছা হয় "ভয় পাই শ্যামা উলঙ্গিনী।" আবার মধুর মূর্ত্তি দেখিলে প্রীতচিত্তে বলি, "চায় প্রাণ রাধাবিনোদিনী।"

রৌদ্ররসের পূর্ণাবির্ভাব; বিষম ঝঞ্ঝাবাত উপস্থিত। প্রবল পবনের পৈশাচ ক্রীড়া, কখনও সম্মুখস্থ উচ্চশির তরুকে মহা বলে আকর্ষণ পূর্ব্বক তাহার মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ করিতেছে। আঘাতে বৃক্ষকুল ধরাশায়ী। উৎপীড়নে জীবজন্তু নিরাশ্রয়—অনুপায়, "হায় হায়" করিতেছে। মেঘগণ গর্জ্জন পূর্ব্বক বিজয়-ডঙ্কার কার্য্য করিতেছে, মুষলধারে বারিবর্ষণ, করকা-নিকরের শব্দে শ্রবণ ব্যথিত, কুলী-শকলাপের তীব্রাগ্নিতে কত বৃক্ষ দগ্ধ হইতেছে, গুড়ুম্ গুড়ুম্ রবে প্রাণ আতঙ্কিত, মধ্যে মধ্যে বিজলীস্ফুরণ অট্টহাস্য, রৌদ্রী প্রকৃতির এই ভৈরবী মূর্ত্তি দর্শন করিলেই তখন মনে হয় "ভয় পাই শ্যামা উলঙ্গিনী।"

আবার যখন লতাকুলে কেলী-পরবশ ধীর স্থির মলয় সমীর শরীরে লাগে, যখন বজ্রাগ্নি, চপলাচমক, শিলাপাত, কিছুই নাই, বারিবর্ষণও নাই, তরুকুল শান্তভাবে দণ্ডায়মান; যখন এই মধুরা প্রকৃতির লীলা দেখি, তখন হৃদয়-তন্ত্রীতে একটী ঝঙ্কার উঠে—"চায় প্রাণ রাধাবিনোদিনী।"

বিশাল অতল বারিনিধি, ঝটিকারঙ্গে প্রমত্ত তরঙ্গভঙ্গে তীরদেশ গ্রাস করিবার জন্য বিকট বদন-ব্যাদান করিয়া অগ্রসর, সে গর্জ্জন শ্রবণ করিলে হৃৎকম্প হয়; ঝটিকা-তাড়িত পোত সকল কখনও কখনও বিলীন হইতেছে, কখনও আবার দেখা যাইতেছে; বিপন্ন কণ্ঠের হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ! দেখিতে দেখিতে চিরকালের জন্য পোত-খানির বিলয়। ভীষণ আবর্ত্ত। মধ্যে মধ্যে বাড়বাগ্নির ভয়ঙ্কর খেলা। এ করালী মূর্ত্তি দর্শন করিলে শঙ্কায় প্রাণ বলে, "ভয় পাই শ্যামা উলঙ্গিনী।"

এদিকে কুঞ্জবনমধ্যস্থা পূতসলিলা কালিন্দীর নিস্তরঙ্গ বক্ষ। মলয়পবন-তাড়িত নয়ন-সুভগ-লহরীমালা প্রেমভরে তীরস্থ তমাল-তরুর চরণ ধোয়াইয়া দিতেছে! কুল কুল রবে একে অপরের কানে প্রাণের কথা কহিতেছে, সারি সারি তরি চলিতেছে, বাহক সবে মধুর রবে সারি গাইতেছে, কুলে মরালদল জলকেলি করিতেছে, জলে কমল কতই না শোভা করিয়াছে! মৃদু বাতাসে একে অপরের গায় গড়াইয়া পড়িতেছে, এ মধুর শান্ত দৃশ্য দেখিলে প্রাণে তান উঠে, "চায় প্রাণ রাধাবিনোদিনী।"

ভয়াবহ মরুস্থান! তরুরাজির দেখা নাই, বারিলাভের আশাও দুরাশা! অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত বালুকারাশি প্রবল বায়ুবেগে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত! দৃষ্টি-শক্তি বিলোপ করিতে উদ্যত! ক্লান্ত পথিক পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ—ছট্ ফট্—শীতল ছায়ার অভাবে হাহাকার করিতেছে, কি কঠোর ব্যাপার! পবন অঙ্গে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিতেছে। রৌদ্রী প্রকৃতির ভীষণ তাণ্ডব! প্রাণ যায়! এ দৃশ্য সম্মুখীন হইলে সভয়ে বলি, "ভয় পাই শ্যামা উলঙ্গিনী।"

আবার যখন, সুরম্য কুসম-কানন, কোকিল-কূজিত কুঞ্জকুটীর, সুরস ফল ভরে অবনত বৃক্ষ সমূহ, শ্যামল-দুর্ব্বাদল, মধুর যমুনা-জল, মৃদু মন্দ গন্ধবহ, স্নিগ্ধ যমুনাতট, অদূরে সুচ্ছায় প্রাচীন বট, এই প্রকৃতির মধুর মূর্ত্তি নয়ন-পথে পতিত হয়, হৃদয়ের সকল জ্বালা জুড়াইয়া যায়। মন বলে, "চায় প্রাণ রাধা-বিনোদিনী।"

যোধবৃন্দ রণরঙ্গে প্রমত্ত। ভয়ঙ্কর শব্দে রণঢক্কা, দামামা, দুন্দুভি, ভেরী, তুরী বাজিতেছে। অসূয়া-হিংসা-দ্বেষ মূর্ত্তিমান হইয়া বিরাজিত। কামানের ভীষণ শব্দ। তরবারির ঝন্ ঝনা। "মার মার" বিকট চীৎকার। "উহুঃ উহুঃ" তীব্র হাহা-কার। শুণ্ডধরের শুণ্ড-সঞ্চালন। বাজি-রাজির গভীর গর্জ্জন। মুহুর্মুহুঃ বীরগণের হস্তকড়মড়ি। সক্রোধ ভীম উচ্চ হাস। রুধির-স্রোতে মৃত্তিকা কর্দ্দমাক্ত। ছিন্ন হস্ত, ছিন্ন পদ, ছিন্ন মস্তক রাশি রাশি পতিত। ফেরুদলের আনন্দ-ধ্বনি। শকুনি-গৃধিনীর বিকট রব। সৈন্যগণের সাহঙ্কার হুহুঙ্কার। দিগ্ বসনা রণচণ্ডী। কি ভীষণতা! এই ভীমা প্রকৃতির দিকে চাহিলেই প্রাণ কাঁপে। বলিতে হয় "ভয় পাই শ্যামা উলঙ্গিনী।"

এ দিকে গোপাল-দল গোচারণে গোষ্ঠে প্রবিষ্ট; মূর্ত্তিমান শান্ত-মধুর-দাস্য ও সখ্য ভাব! দাম, সুদাম, বসুদাম, শ্রীদাম আনন্দে ক্রীড়া করিতেছে। গো-বৎসের হাম্বারব, নবতৃণপূর্ণ শ্যামল প্রান্তর। বৃন্দাবনের ময়ূর-ময়ূরী—শুক-শারীর আনন্দ-নৃত্য। প্রেমের পূর্ণপ্রকাশ। স্নেহ, ভক্তি, সখিত্ব, সরল-তার পরাকাষ্ঠা। মুখের ফলটী মিষ্ট বলিয়া বোধ হইলে অপরকে দেওয়া। কত ভালবাসা। বংশী-রব, বালক্রীড়া, কত মধুর। এ দৃশ্য চখে পড়িলে প্রাণ আনন্দস্রোতে ভাসিয়া যায়। প্রেমের তুফান বহিতে থাকে। বলিতে হয় "চায় প্রাণ রাধাবিনোদিনী।"

প্রবলভূমিকম্প। প্রাচীন মন্দিরের অভ্র-ভেদী চূড়া ভূপতিত। সুরম্য প্রাসাদ ধরা-শায়ী। ভবন শ্মশানে পরিণত। সাগরের জল বেলাভূমি অতিক্রম করিয়াও উচ্ছলিত; ধরণী সঘনে কাঁপিতেছে। উন্নত স্তম্ভ, বিশাল বৃক্ষ ও গ্রাম-নগর ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইতেছে, আবার কত প্রোথিত পর্ব্বত গাত্রোত্থান করিতেছে। নদীর জল গড়াইয়া গ্রামের অভ্যন্তরে উপস্থিত হইয়াছে। দাঁড়াইলে পড়িয়া যাই। কোলাহল ও ক্রন্দনে আকাশ শব্দায়মান। কেহ পতিত, কেহ পীড়িত, কাহারও হস্ত-পদ ভগ্ন, কাহারও প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইয়াছে। এ উলঙ্গিনী করালী

প্রকৃতি দর্শন করিলে সভয়ে বলি, "ভয় পাই শ্যামা উলঙ্গিনী।"

আবার যখন দেখি, চরাচর স্থির। অট্টালিকা যেন আনন্দে দণ্ডায়মান। সমুদ্র নিস্তরঙ্গ। ভূমিতল যেমন তেমনি শান্তিময়। নদী আপন মনে বহিতেছে। কুসুমবন প্রাণ-রঞ্জন ভাবে সজ্জিত। চতুর্দ্দিকে শান্তির বিজয়-পতাকা উড়িতেছে। দর্শন মাত্রেই মনে উঠে, "চায় প্রাণ রাধাবিনোদিনী।"

একদিকে করাল দুর্ভিক্ষের সর্ব্বসংহারক মূর্ত্তি, অন্নাভাব, জলাভাব, ঘরে ঘরে হাহাকার! বেদনা—যাতনা—লাঞ্ছনা। নয়ন-জল, মর্ম্মপীড়া, দীর্ঘ নিশ্বাস! শরীর অস্থি-সার! চক্ষুঃ কোটরগত। বদন বিবর্ণ! কণ্ঠ শুষ্ক। হৃদয়বিদারক দৃশ্য! অভাবের পর অভাব! বিসূচিকা! প্রবল পিপাসা! হিমাঙ্গ! কণ্ঠরোধ! দৃষ্টিহীনতা ছটফটি, শিরোলুণ্ঠন। জ্বর-জ্বালা, প্রলাপ-বাক্য, তন্দ্রা, কাতরোক্তি! গৃহ জনশূন্য অরণ্য প্রায়! শৃগাল-কুকুরের রাজত্ব। পূতিগন্ধ! শবের উপর শব! এই প্রকৃতির নৃমুণ্ডমালিনীরূপ চিন্তা করিলে প্রাণ আকুল হয়। অমনি হৃদয়ে জাগে, "ভয় পাই শ্যামা উলঙ্গিনী।"

অন্যদিকে সুবৃষ্টি; দেশ শস্য-সম্পন্ন। প্রতিগৃহে আনন্দ-গীতি, শান্তি, প্রীতি, পবিত্রতা! হাসির লহরী! আমোদ—আশ্বাস—স্বাস্থ্য—উৎসাহ, কার্য্যসম্পাদন। সর্ব্বত্র উৎসব। আনন্দ-বাদ্য! দ্বারে দ্বারে মঙ্গলঘট, তোরণে তোরণে শুভ কদলীস্তম্ভ। বিষাদের দেখা নাই, বিবাদের পরিচয় নাই। কি মধুরতা! মনে ভাবিলেও প্রীত হই, আর অন্তরে উঠে, "চায় প্রাণ রাধাবিনোদিনী।"

নিদাঘের নির্দ্দয় তাড়ন, স্নেহ-শূন্য ধরা-বক্ষ শত খণ্ডে বিভক্ত, নদী-গর্ভে সলিল নাই, কেবল বালুকা-রাশি! পবন অতিশয় উত্তপ্ত! গ্রীষ্মের যন্ত্রণায় সর্ব্বাঙ্গে স্বেদবারি—তরঙ্গ বহিতেছে, ভানুদেব প্রচণ্ড কিরণ অকাতরে বর্ষণ করিতেছেন। বন. উপবন দগ্ধ প্রায়! পত্র-ছায়া নাই! আকাশে মেঘের দেখা নাই, নদীর জল উত্তপ্ত প্রায়। প্রাণ ব্যাকুল! রৌদ্রী প্রকৃতির এ মূর্ত্তি দর্শন করিলে ভয়ে বলি "ভয় পাই শ্যামা উলঙ্গিনী।"

বসন্তবায়ু। উদ্যানে কুসুম-সুষমা, প্রাণ-মন হরণ করিতেছে। দিবাবসানের রমণীয়তায় মুগ্ধ হইতে হয়। কোকিল-কূজন, ভ্রমর-গুঞ্জন। বাহ্যদৃশ্য লাবণ্য-পরিপূর্ণ। সকলই যেন মধুর। এ মধুরা প্রকৃতির মাধুর্য্য প্রাণে উদিত হইলে মন মুগ্ধ হয়, বলিতে থাকে, "চায় প্রাণ রাধাবিনোদিনী"।

যোগাচল, ভৈরবতার বাসস্থান! জীবজন্তুর দর্শন নাই। নীরবতার রাজ্য। পদ্মাসন, ভদ্রাসন, স্বস্তিকাসন প্রভৃতি কষ্ট-সাধ্য অভিনয়। যোগী উর্দ্ধবাহু। পত্রাহার, অনাহার, বায়ুভক্ষণ, জীর্ণশরীর, নিমীলিত নেত্র, উর্দ্ধপদে, অধোমুখে। গ্রীষ্মে ভয়ানক অগ্নিকুণ্ড চতুর্দ্দিকে, মধ্যে অবস্থান। শীতে জলমজ্জন। বর্ষায় অনাবৃত স্থানে অবস্থান। স্বহস্তে মস্তকের কেশোৎপাটন। প্রবল

বায়ুতে অনাবৃত শরীরে অবস্থিতি। অস্ত্রদ্বারা নিজমস্তক ছেদন পূর্ব্বক স্বহস্তে অগ্নিতে আহুতি প্রদান! কি লোমহর্ষণ ব্যাপার! করে ও গলে রুদ্রাক্ষমালা। ভালে ত্রিপুণ্ড্র! সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম—উলঙ্গ। এ কঠোর সাধকের রৌদ্রী প্রকৃতিকে দেখিলে মন বলে,—"ভয় পাই শ্যামা উলঙ্গিনী।"

অন্যদিকে সংকীর্ত্তনের অঙ্গন। আনন্দ-কোলাহল। মধুর মৃদঙ্গ, সঙ্গে মৃদুল করতাল, রামশিঙ্গা। প্রেমভরে ধূলায় গড়াগড়ি। নয়নে প্রেমবারি। আবেগ-আবেশ ভরে মুখে হরি হরি! প্রেমে নাচা, প্রেমে কাঁদা, প্রেমে প্রাণ-বাঁধা! কি মধুর! কি শান্তি! কি ললিত! দর্শনমাত্রেই প্রাণের গূঢ়তম প্রদেশের গভীর রহস্যদ্বার উদ্ঘাটিত হয়, উহার উপরে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে,—"চায় প্রাণ রাধাবিনোদিনী।"

(বিশ্ব-মাতা—চরণাশ্রিতস্য
কস্যচিৎ—।)

স্তোত্র।

—:০:—

অনন্ত অণ্ডের অনাদি কারণ,
সৃজন করিছ, করিছ পালন;
নাশিছ সময়ে, হে বিশ্বপাবন!
সকলি তোমার নিয়মবশে।

নিয়মে তোমার রবি-শশধর—
গ্রহ আদি করি ফিরে নিরন্তর;
নক্ষত্র নিকর রচনা তোমার,
তোমারি মহিমা গগনে ভাসে।

অণু হতে তুমি হও ক্ষুদ্রতর,
আকাশ জিনিয়া তব কলেবর;—
তুমি হে স্বয়ম্ভু জনক সবার,
তোমাতে আবার সকলি লয়।

পুত্ররূপে স্নেহ করিছ গ্রহণ,
পত্নীরূপে প্রেম কর বিতরণ,
সর্ব্বভূতে তুমি আছ সর্ব্বক্ষণ;
তথাপিও তোমা দেখা না যায়।

তুমিই পুরুষ—তুমিই প্রকৃতি,
সত্য শাস্ত্র তুমি—তুমিই নিয়তি,
সদানন্দময় চিন্ময় মূরতি,
নিদান তোমার কেহ না পায়।

তুমি নিরাকার, তুমিই সাকার,
তুমিই আলোক, তুমিই আঁধার,—
তুমি গুপ্ত, তুমি বিদিত সবার,
ডুবিয়া অবনী তব মায়ায়।

অনন্ত আকাশ মস্তক তোমার,
দুই চক্ষু তব শশী-দিবাকর,
তুমিই করেছ তব কলেবর;—
নিশ্বাস পবন নিয়ত রয়।

কটীতে সাগর পরিধান বাস;
তুমিই প্রকাশ তুমিই বিনাশ,
না জানি তোমার কিবা অভিলাষ,
কি উদ্দেশ্য তব কে জানে তায়!

জগত জনমে বাসনার বলে;
রাখিয়াছ সবে মরি কি কৌশলে!

কে চিনে তোমায় এ জগতীতলে?
লক্ষ্যহীন সবে কোথায় ধায়?

কোথা বা ছিলাম, কোথাবা এলাম!
ওহে দয়াময়! কেন আসিলাম?
ভাসিতে ভাসিতে কোথা চলিলাম!
না জানিহে প্রভু কিসের তরে?

দেও পদাশ্রয় সর্ব্বশক্তিময়,
স্বরূপ তোমার বুঝাও আমায়,
তত্ত্বমসি বাক্য বেদের নির্ণয়——
সেই তুমি আমি এক শরীরে!

তবে কেন মন! আছরে ঘুমায়ে?
আত্মজ্ঞান লভি উঠরে জাগিয়ে।
বিবেকের কথা শুন স্থির হয়ে,
অচিরে সুফল ফলিবে তোর।

অজ্ঞান-আঁধার রহিবে না আর,
যাবে ভ্রান্তি—শান্তি আসিবে আবার,
সর্ব্বভূতে আমি—সকলি আমার,
আমার জীবন তাঁহাতে ভোর।

মোহান্ধ মানব, জাগরে জাগরে——
কর্ম্মক্ষেত্র এই, এসেছ সংসারে,
থেকনা ঘুমায়ে জাগিয়ে উঠরে
জ্ঞানাগ্নি জ্বালাও হৃদয় মাঝে।

দেহ-রাজ্য তব ক'রে অধিকার,
রিপুগণ সদা করিছে বিহার,
কেমনে সহিছ হেন অত্যাচার,
পোড়াও সে সবে জ্ঞানাগ্নি তেজে।

হে বিভো! দুর্ব্বল সন্তানে তোমার
করুণ-নয়নে চাও একবার,
দেও-শক্তি—শিক্ষা আত্মদান আর,
নিবেদি হে ঈশ! তব চরণে।

ডুবিয়া রয়েছে, উঠিবে কি আর
অকৃতজ্ঞ মূঢ় তনয় তোমার?
পতিত আমরা তরিব কি আর
পতিতপাবন নামের গুণে?

ব্রহ্মচারি আশ্রম। } শ্রীদুর্গাদাস চক্রবর্ত্তী

আপস্তম্বীয়-গৃহ্যসূত্র।

(প্রথম খণ্ড)

বৈদিক কালের আর্য্যগণের আচার ব্যবহারাদির পরিচয় পাইতে হইলে গৃহ্যসূত্র অধ্যয়ন করা অতীব আবশ্যক। প্রাচীন ভারতীয় পূর্ব্বপুরুষগণের অনেক কার্য্য-কলাপের অনুষ্ঠান আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমাদিগের দুর্ভাগ্য বশে ঐ সমস্ত অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়েও অনুশীলন উঠিয়া গিয়াছে। দুষ্প্রাপ্য দুই এক খানি গৃহ্যসূত্র উহার সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু সে দিকে দৃষ্টিপাত করিতে কয়জনের অবকাশ আছে? পুরাকালের আচার ব্যবহার সময়ের স্রোতে পতিত হইয়া অন্য আকার ধারণ করিয়াছে, কোনওটী বা একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়াছে, গৃহ্যসূত্র পাঠে ইহা অবগত হওয়া যায়। গোভিল, আশ্বলায়ন ও আপস্তম্ব প্রভৃতির গৃহ্যসূত্র গুলির মধ্যে আপস্তম্বের গৃহ্যসূত্র সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে আমরা

আপস্তম্ব-প্রণীত গৃহ্যসূত্রখানির আলোচনা করিব। আপস্তম্বের প্রথম সূত্র।—

—অথ কর্ম্মাণ্যাচারাদ্যানি গৃহ্যন্তে। ১

ইহার বৃত্তিকার-সম্মত অর্থ এই যে, অতঃপর বিবাহাদি যে সকল কর্ম্ম আচার-পরম্পরায় হওয়া যায়, অর্থাৎ যে সকল কর্ম্ম বিষয়ক অগ্নির প্রত্যক্ষশ্রোত বিধান প্রায়ই দেখা যায় না, সেই সকল কর্ম্মের বিষয় বলিতেছি। এ সূত্রটী প্রতিজ্ঞাবোধক। এই সূত্রে "গৃহ্যন্তে" এই পদের দ্বারা গ্রন্থের নাম "গৃহ্যসূত্র" এ কথাও প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে। এখানে প্রসঙ্গতঃ বলা আবশ্যক, "গৃহ্যসূত্র" কাহাকে বলে। বেদের ছয়টী অঙ্গ আছে, যথা—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ। ইহার মধ্যে কল্প, নামক অঙ্গ গৃহ্যসূত্র ও শ্রৌতসূত্র নামে অভিহিত হয়। কল্প অর্থাৎ মহর্ষিগণের রচিত বেদাঙ্গ শ্রৌত ও গৃহ্যগ্রন্থ সূত্রকারের গঠিত, এজন্য উহাদের নাম শ্রৌতসূত্র ও গৃহ্যসূত্র। শ্রৌতসূত্রভাগে শ্রুতির দ্বারা সাক্ষাৎ প্রতিপাদিত শ্রৌতাগ্নি-সাধ্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। শ্রৌত অগ্নির বিষয় বেদের ব্রাহ্মণভাগে উক্ত হইয়াছে। গৃহ্যসূত্রভাগে আচারপ্রাপ্ত স্মার্ত্তাগ্নিসাধ্য বিবাহাদিকর্ম্ম বলা হইয়াছে। গৃহ্য অথবা স্মার্ত্ত অগ্নির বিষয় বেদে থাকিলেও, স্পষ্টরূপে শ্রৌত অগ্নির ন্যায় তাহার ব্যবহার প্রণালী প্রদর্শিত হইতে পারে নাই। এই "গৃহ্য" অথবা "স্মার্ত্ত অগ্নি" অভিহিত কর্ম্মাদির প্রকাশক বলিয়া সূত্রগ্রন্থ ও "গৃহ্যসূত্র" নাম প্রাপ্ত হয়। গৃহ্য শব্দের অর্থ দুই প্রকার (গৃহায় হিতং ইত্যর্থে) অগ্নি এবং ভার্য্যা। "গৃহ্য অগ্নি"-সাধ্য কর্ম্ম, গৃহ্য কর্ম্ম, তৎপ্রতিপাদক সূত্রগ্রন্থ গৃহ্যসূত্র। আবা[র] ভার্য্যার্থ অর্থাৎ তৎপ্রতিপাদনের জন[্য] বিবাহ কর্ম্মাদি গৃহ্যকর্ম্ম, তৎপরিজ্ঞাপক শাস্ত্রও গৃহ্যসূত্র। প্রতিজ্ঞায় গোভি[ল] বলেন,—গৃহ্যকর্ম্মাণ্যুপদেক্ষ্যামঃ। তাঁহা[র] মতে বিবাহাদি গৃহ্যকর্ম্ম। পত্নী-পুত্র-কন্যাদি[র] নাম গৃহ্য। তৎসংস্কারার্থকৃত সমস্ত জাত কর্ম্মাদি সংস্কারকর্ম্ম গৃহ্য। তদ্বোধিক সূত্র তাঁহার মতে "গৃহ্যসূত্র" অথবা "গৃহ্যসূত্র" নাম ধারণ করিবে, ইহা বিবেচ্য। "গৃহ্য সংগ্রহ" গ্রন্থে তাঁহার মত-পোষক বচ[ন] দেখিতে পাওয়া যায়, যথা,—"পত্ন্যঃ পুত্রাশ্চ কন্যাশ্চ জনিষ্যাশ্চাপরে সুতাঃ। গৃহ্য ইত সমাখ্যাতা যজমানস্য দয়কাঃ। তেষা[ং] সংস্কারযোগেন শান্তিকর্ম্মক্রিয়াসুচ। আচার্য্য বিহিতং কল্পস্তস্মাদ্গৃহ্য ইতি স্থিতিঃ।"

গৃহ্যসংগ্রহঃ ১। ৩৫। ৩৬।

আশ্বালায়নীয় গৃহ্যসূত্রের প্রথম সূত্র "উক্তানি বৈতানিকানি গৃহ্যানি বক্ষ্যামঃ।" এখানেও কর্ম্মের নাম গৃহ্য দেখা যায়। গর্গনারায়ণের বৃত্তিতে দেখা যায় "গৃহনিমিত্তোঽগ্নির্গৃহ্যঃ।" অর্থাৎ বিবাহ উৎপন্ন অগ্নি গৃহ্য। তাহাতে কর্ত্তব্য সমস্ত কার্য্যই গৃহ্যকর্ম্ম। তিনি বলেন, গৃহশব্দের অর্থ ভার্য্যা ও শালা। যাহা হউক, প্রত্যেক মতেই আচার পরিজ্ঞাত বিবাহ কর্ম্ম গৃহ্য কর্ম্ম, তৎশাস্ত্র "গৃহ্যসূত্র" ইহার আভাস পাওয়া যায়।

প্রতিজ্ঞাবসানে, আপস্তম্ব যে সকল কর্ম্ম বলিবেন, তাহাদিগের সম্বন্ধেঃকতক-গুলি সাধারণ নিয়ম অর্থাৎ সাধারণতঃ কিরূপ সময়ে কি নিয়ম করা উচিত, তাহাই বলিতেছেন। দ্বিতীয় সূত্রে তিনি বলিলেন,—

উদগয়ন পূর্ব্বপক্ষাহঃ পুণ্যাহেষু কার্য্যাণি। ২।

অর্থাৎ উদগয়ন (উত্তরায়ণ) পূর্ব্বপক্ষহ (শুক্লপক্ষদিন) পুণ্যাহ, এই সকল সময়ে কার্য্য সকল করিতে হইবে। এই নিয়ম যেখানে বিশেষরূপে কিছু বলা হইয়াছে, সেখানকার জন্য নহে, বুঝিতে হইবে। উত্তরায়ণে কার্য্য করিবার ব্যবস্থা প্রায়শঃ দৈব বিষয়েই অধিক দেখাযায়। শাস্ত্রের ঘোষণা—উত্তরায়ণে দেবগণ জাগ্রত ও দক্ষিণায়নে নিদ্রিত অবস্থায় থাকেন। তজ্জন্যই শ্রীরাম চন্দ্রের অকালে বোধন করিয়া লইতে হইয়াছিল। মহাত্মা ভীষ্মদেব দক্ষিণায়নে জীবন ত্যাগ করিতেও স্বীকার করেন নাই। উত্তরায়ণের শ্রেষ্ঠত্ব ইহার দ্বারা প্রতিপাদিত হয়। পূর্ব্বপক্ষ বলিলে শুক্লপক্ষ বুঝিবার কারণ এই যে, গণনায় শুক্লপক্ষই প্রথম ধৃত হয়। শুক্লপ্রতিপদ হইতে আমাবস্যা পর্য্যন্ত চান্দ্রমাস গণনার নিয়ম। শুক্লপক্ষীয় দিবসে কার্য্যানুষ্ঠান সুবিধা জনক। পুণ্যাহ শব্দের অর্থ বৃত্তিকার বলেন জ্যোতিষশাস্ত্রে যে সকল পুণ্যাহ বলিয়া বিখ্যাত, তাহাই। কেহ বলেন দিন—অর্থাৎ সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সময়কে সমান নয় ভাগে বিভক্ত করিয়া, তাহার প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, নবম, এই পাঁচ ভাগকে পুণ্যাহ বলা হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে কোনও ভাগ বার বেলা ইত্যাদি হইলে পরিত্যাজ্য। এই পাঁচ ভাগের পাঁচটী নাম আছে। প্রাতস্তন, সংগব, মধ্যন্দিন, অপরাহ্ন, সায়ং। কাহারমতে কৃত্তিকানক্ষত্র হইতে বিশাখানক্ষত্র পর্য্যন্ত যত গুলি নক্ষত্র, ঐ গুলির নাম পুণ্যাহ দেবনক্ষত্র। ঐ সকল নক্ষত্র যে যে দিনে থাকিবে, সেই সকল দিনের বিধান বুঝিতে হইবে। কোনও কোনও নব্যব্যাখ্যাকারের মতে যে দিনে মেঘ, বৃষ্টি, ঝাঞ্ঝাবাতাদি উপসর্গ নাই, সেই দিনই পুণ্যাহ। এই কয়টী দিনেই করিতে হইবে। উত্তরায়ণ প্রভৃতি সকল গুলি অর্থাৎ উত্তরায়ণ পূর্ব্বপক্ষ-দিন ও পুণ্যাহের একত্র সমুচ্চয় হইলেই কর্ম্মযোগ্য সময় হইল। কোনও একটী হইল, অপরটী হইল না, এরূপভাবে কর্ম্ম কর্ত্তব্য নয়। বৃত্তিকার বলেন—উদগয়নাদীনং সমুচ্চয়োন. বিকল্প।

তৃতীয় সূত্রে কর্ম্মকর্ত্তার, যজ্ঞোপবীত ধারণের নিয়ম বলা হইতেছে।

যজ্ঞোপবীতিনা। ৩।

যজ্ঞোপবীতী হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। যজ্ঞোপবীত সম্বন্ধে গোভিল বলেন,—"যজ্ঞোপবীতং কুরুতে বস্ত্রং বাঽপি বা কুশরজ্জুংএব। সূত্র-বস্ত্র অথব কুশরজ্জু যজ্ঞোপবীত হইবে। যখন যেরূপ সুলভ, তদনুসারেই ব্যবস্থা করা আবশ্যক। অন্যত্র "অজিন নির্ম্মিত" যজ্ঞোপবীত ব্যবহারের প্রমাণও পাওয়া যাইতে পারে।

যজ্ঞোপবীত ধারণের নিয়ম আছে। দক্ষিণং বাহুমুদ্ধৃত্য শিরোঽবধায় সব্যেঽংসে প্রতিষ্ঠাপয়তি দক্ষিণং কক্ষমন্ববলম্বং ভবত্যেবং যজ্ঞোপবীতী ভবতি।" অর্থাৎ দক্ষিণ হস্ত উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া, মস্তক অবনত করিয়া বামস্কন্ধের উপর যজ্ঞোপবীত স্থাপন করিবে। দক্ষিণ স্কন্ধের অধোভাগে লম্বমান রাখিবে; এইরূপ করিলে তাহাকে যজ্ঞোপবীতী বলে। আমরা সর্ব্বদা এই নিয়মে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া থাকি; এ নিয়মটী দৈবকার্য্য বুঝিতে হইবে। কেননা পৈত্র্য কর্ম্মে বিশেষ বিধান আছে। এখানে যজ্ঞোপবীতের নবগুণাদির বিষয় ও পরিমাণাদি বলা হইল না। সময়ান্তরে আমরা তাহার আলোচনা করিব।

চতুর্থ সূত্রে বলা হইতেছে;—

প্রদক্ষিণং ।৪।

অর্থাৎ প্রদক্ষিণভাবে সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিবে। বৃত্তিকার মহোদয় দক্ষিণ হস্তদ্বারা করাকেই "প্রদক্ষিণ" বলেন। (দক্ষিণং পাণিং প্রতি গতং ইতি ব্যুৎপত্ত্যা।) দক্ষিণ অঙ্গের প্রাধান্য বলাই এখানে তাৎপর্য্য। দক্ষিণ হস্ত কার্য্যসম্পাদক, বামহস্ত তাহার সহকারী মাত্র, এই নিয়ম প্রায় দৈব পৈত্র্য সাধারণ হইলেও দৈব কার্য্যে দক্ষিণ জানু পাতিবার ব্যবস্থা দেখাযায়। পৈত্র্যে তাহার বিপরীত। ব্যবহারই এখানে প্রবল প্রমাণ, কেননা ইহা আচারপ্রধান শাস্ত্র। দৈবকার্য্যের এই নিয়ম শ্রৌতসূত্রে বলা হইয়াছে। তথাপি জাতকর্ম্মাদি মনুষ্যকর্ম্মেও ইহার ব্যবহার আছে জানাইবার জন্য এখানে আবার বলা হইতেছে অতঃপর কোন্‌দিকে সম্মুখ রাখিয়া কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে, তাহা বলা হইতেছে; যথা;——

পুরস্তাদুদগ্বোপক্রমঃ। ৫ ।

পুর্ব্বমুখ অথবা উত্তরমুখ হইয়া কার্য্যের উপক্রম অর্থাৎ আরম্ভ করিতে হইবে। কোনও কোনও কার্য্যে অন্য প্রকার ব্যবস্থা আছে, সুতরাং এনিয়ম সাধারণতঃ। কদাচিৎ সন্দিগ্ধরূপেও ইহার ব্যভিচার করাহয়।

কার্য্য সমাপ্তি সময়ে ঐ নিয়ম অতিক্রম করা যাইবে কিনা, তাহা লিখিত হইতেছে।

তথাপবর্গঃ। ৬ ।

অপবর্গ অর্থাৎ সমাপ্তি সময়েও পূর্ব্বাভিমুখ অথবা উত্তরাভিমুখ হইয়া করিতে হইবে। পুরাকালের এই সমস্ত নিয়ম অদ্যাপি জনসমাজে আদৃত রহিয়াছে। ভাগ্যদোষে আমরা ইহার প্রচলনের সময় পর্য্যন্তও অবগত নহি।

সাধারণ নিয়মানুসারে পৈত্র্য কার্য্য হইবে কিনা, এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য বলা হইতেছে।

অপরপক্ষেপিত্র্যানি। ৭ ।

যে সকল কর্ম্ম পিতৃপুরুষগণকে উদ্দেশ করিয়া করা হয়, তাহাকে পৈত্র্য কর্ম্ম কহে। জীবিত পিতাদির প্রতি এরূপ ব্যবহার নহে। পরলোকগত পিতৃগণের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি যাহা করা হয়, তাহাই এখানে লক্ষ্য। ঐ সমস্ত কর্ম্ম কৃষ্ণপক্ষে করা উচিত। কৃষ্ণপক্ষের

একাদশী অথবা অমাবস্যাই শ্রাদ্ধাদির কাল। "অপরপক্ষ" নামক প্রসিদ্ধ কৃষ্ণপক্ষে আমাদের দেশে তিলতর্পণ করা হইয়া থাকে। এইসকল কার্য্য কৃষ্ণপক্ষেই বিহিত ও অনুষ্ঠিত। অতএব এ প্রচলিত নিয়মটীর বিষয়ে বেশী বলিবার প্রয়োজন দেখিনা।

পৈত্র্যকার্য্য যজ্ঞোপবীতী হইয়া অথবা অন্যথা করিবার বিধান আছে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে, যথা————

প্রাচীনাবীতিনা। ৮।

পিতৃকাকার্য্যের সময়ে প্রাচীনাবীতী হইতে হইবে। গোভিলও বলিয়াছেন, "পিতৃযজ্ঞেষ্বের প্রাচীনাবীতী ভবতি।" প্রাচীনাবীতী হওয়া কাহাকে বলে, এ কথায় আপস্তম্ব আপাততঃ কিছু বলেন নাই। গোভিল বলেন, "সব্যবাহুমুদ্ধৃত্য শিরোহবধায় দক্ষিণেহংসে প্রতিষ্ঠাপিয়তি" সব্যং কক্ষমন্ববলম্বং ভবত্যেবং প্রাচীনাবীতী ভবতি।" বাম হস্ত উর্দ্ধে উঠাইয়া মস্তক অবনত করিয়া দক্ষিণস্কন্ধে যজ্ঞোপবীত স্থাপন করিবে, দক্ষিণ কক্ষদেশে লম্বায়মান করিয়া দিবে, এই প্রকারে যজ্ঞোপবীতধারণ করিলে, তাহাকে "প্রাচীনাবীতী" বলে। শ্রাদ্ধাদিতে এই নিয়ম এখনও রক্ষিত হয়। মালাকারে উত্তরীয় ধারণের নাম নিবীত। যিনি ঐরূপ করেন, তিনি নিবীতী। অনেকে বলেন, দৈবকার্য্যে যজ্ঞোপবীতী ও পিতৃকার্য্যে প্রাচীনাবীতী হইবার ব্যবস্থা থাকিলে তাৎপর্য্যতঃ বুঝা যায়, সাধারণ সময়ে নিবীতী থাকাই উচিত। ব্যবহার ঐ কথার অনুমোদন করে না। আমরা সময়ান্তরে এ বিষয়ের বিশদ আন্দোলন করিব। কোন প্রসিদ্ধ বৈদিক পণ্ডিত বলেন, গোভিলোক্ত সূত্রে অর্থাৎ যজ্ঞোপবীতী ও প্রাচীনাবীতী বিজ্ঞাপক সূত্রদ্বয়ে "দক্ষিণংকক্ষমন্ববলম্বং ও "সব্যং কক্ষমন্ববলম্বং" এক দুইটী বাক্য দ্বারা বুঝা যায়, কক্ষ পর্য্যন্ত হইলেই সামবেদীয় কৌথুমশাখার ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞোপবীতের উপযুক্ত পরিমাণ হইল। সর্ব্বদা যেরূপ দীর্ঘ প্রমাণ সামবেদীয়েরা ব্যবহার করেন, তাহা প্রাচীন নিয়ম নহে। আমরা দেখিতে পাই, ঐ সূত্রে যজ্ঞোপবীত-পরিমাণের কথা বলা হয় নাই, কেবল যজ্ঞোপবীতী ও প্রাচীনাবীতী হইবার প্রকারই বলা হইয়াছে। সামবেদীয়গণের ঐরূপ হ্রস্ব প্রমাণ স্বীকার করিলে ব্যবহার ও অনেক ঋষিবাক্য ভুল হইয়া দাঁড়ায়। আমরা সময়ে ইহার আলোচনা করিব।

নবম সূত্রে বলা যাইতেছে—

প্রসবং। ৯।

সব্য অর্থাৎ বামাঙ্গের এখানে প্রাধান্য পিতৃকর্ম্মে প্রায়শঃই পাতিত বামজানুর ব্যবস্থা ও ব্যবহার। প্রদক্ষিণ ও প্রসব্য এই সূত্রদ্বয়ের ব্যাখ্যায় অনেকে বলেন, নিজের বক্ষঃস্থলের সমসূত্রপাতে সম্মুখে যে স্থান, তাহার দক্ষিণ পার্শ্বের স্থানের নাম প্রদক্ষিণ ও বামের স্থানের নাম প্রসব্য। দৈব্যকার্য্যে প্রদক্ষিণ স্থানের অধিক উপযোগিতা। পৈত্র্যে প্রসব্যের অধিক ব্যবহার। সূত্রে তাহাই বলা হইয়াছে। সুধীগণের উপর উৎকর্ষ বিচারের ভার অর্পণ করিয়া অদ্য আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম। অবসরে এবিষয় আলোচ্য।

পিতৃকার্য্যের অপর বিশেষ নিয়ম বলা হইয়েছে।

দক্ষিণতোঽপবর্গঃ । ১ । ১০ ।

পিতৃ কার্য্যের পরিসমাপ্তি দক্ষিণাভিমুখে হইবে। আরম্ভ সর্ব্বত্র সমান নয়, এজন্য বিশেষ বলা হইল না। যথাযথ তত্তৎ প্রকরণে কথিত নিয়মে করিতে হইবে।

এই পর্য্যন্ত যে সকল কাল বিধান উক্ত হইল, উহা নৈমিত্তিক কর্ম্ম নহে, ইহা বর্ত্তমান সূত্রে প্রতিপাদিত হইতেছে।

নিমিত্তাবেক্ষানি নৈমিত্তিকানি ।১১।

নৈমিত্তিক কর্ম্ম অর্থাৎ যাহা কোন একটী নিমিত্তকে উদ্দেশ করিয়াই প্রবর্ত্তিত হয়, তাহারা নিমিত্তকেই অপেক্ষা করে, উদগয়নাদি পূর্ব্বোক্ত কালের অপেক্ষা করে না। পুত্রের জাতকর্ম্ম পুত্র জন্মিলেই করিতে হইবে, নচেৎ নহে। পুত্র যদি অশুদ্ধ কালে কৃষ্ণপক্ষে দুর্দ্দিনে জন্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে জাত কর্ম্ম শুক্লপক্ষের অপেক্ষায় বন্ধ থাকিবে না। নিমিত্ত সংঘটিত হইলে, তদনন্তরই নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিতে হয়। দীর্ঘকাল পরে নয়। অগারস্থূণা-বিরোহণ নৈমিত্তিক কর্ম্ম বৃত্তিকার বলেন। গৃহ-প্রবেশকে কেহ নৈমিত্তিক বলেন, কেহ বলেন না। আতিথ্য কর্ম্ম পাকনিষ্পন্ন হইলে, করিতে হয়, সুতরাং উহা নৈমিত্তিক। সীমন্তোন্নয়নাদি নৈমিত্তিক, ইহা বৃত্তিকার মহোদয়ের মত। আমরা ক্রমশঃ অন্যান্য সমস্ত গৃহকর্ম্ম যথা নিয়মে আলোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)

কস্যচিৎ ব্রহ্মচারিণঃ—

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সাবিত্রি তত্ত্ব— শ্রীচন্দ্র নাথ বসু প্রণীত। মুল্য কাপেড় বাঁধাই ১৷০ এক টাকা চারি আনা মাত্র, কাগজে বাঁধাই এক টাকা মাত্র। কলিকাতা ২০১ নম্বর কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বঙ্গসাহিত্য জগতের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। মাতৃভাষা তাঁহার নিকট অনেক প্রকারে ঋণী, সাবিত্রিতত্ত্ব লিখিয়া তিনি মাতৃ-ভাষাকে একটি নুতন ঋণে আবদ্ধ করিলেন। গ্রন্থ খানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইলাম। এক কথায় গ্রন্থ খানির সমালোচনা করিলে এই বলা যাইতে পারে, যে গ্রন্থ খানি চন্দ্রনাথ বাবুর লেখনীর উপযুক্ত হইয়াছে। চন্দ্র নাথ বাবু যে কেবল সুলেখক তাহা নহে, তিনি ধার্ম্মিক বিনয়ী ও স্বদেশ-বৎসল। তাঁহার গ্রন্থে ও তাহার স্বদেশ প্রীতির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দু-সমাজে সাবিত্রীর পবিত্র-চরিত্র চিরদিনই নারী জাতির আদর্শ রূপে গৃহীত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু নানাবিধ সমাজ বিপ্লব হেতু এই আদর্শটীর স্থান-চ্যুতি হওয়ার আশঙ্কা নাই এমতও নহে, এই জন্যই সাবিত্রীর চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া তাহার মূল-তত্ত্বগুলি হিন্দু-সমাজকে বিশদরূপে বুঝাইবার জন্যে চন্দ্রনাথ বাবু এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। প্রাচীন আর্য্যেরা পতি-পত্নীর যে অপূর্ব্ব সম্বন্ধ স্ব স্ব গ্রন্থে আদর্শ-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, এবং যাহা অদ্যাপি অনেকটা কেবল কথায় নহে, কার্য্যেও আদর্শ বলিয়া স্বীকার করা হয়, সেই সম্বন্ধ অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিদিগের পতি-পত্নি সম্বন্ধ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও অন্য জাতীয়। পতি হিন্দু-রমণীর নিকট দেবতার ন্যায় পূজ্য, অথচ তাঁহার অন্তরের অন্তরাত্মা, তাঁহার মত অন্তরঙ্গ আর কেহ নাই। পতি উচ্চাসনে সমাসীন হইলেও তাহার নিকট পত্নীর গোপনীয় কিছুই নাই। ভক্তি ও প্রেম মিশ্রিত হইয়া যে অপূর্ব্ব একটী পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাই

হিন্দু-রমণীর পতি-ভক্তি অথবা পতি-প্রেম। এই ভাবটী হিন্দু জাতির নিজস্ব। অপর কোনও জাতির মধ্যে দৃষ্ট হয় না। চন্দ্রনাথ বাবু এই ভাব তাঁহার গ্রন্থে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় পরিস্ফুট করিয়াছেন। পতিই হিন্দু-রমণীর সর্ব্বস্ব। যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, উপবাস, সকলই পতি; পতি ভিন্ন নারীর অন্য গতি নাই। এই ভাবটী হিন্দু-জাতির মজ্জায় মজ্জায় বিশেষরূপে জড়িত, এবং ইহাই আমাদের মতে হিন্দু জাতিকে ধ্বংসের করাল-কবল হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। অনেকে মনেকরেন, হিন্দু-শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের পাতিব্রত্য লইয়াই ব্যস্ত, কিন্তু পুরুষের প্রতি আদৌ কোনও নিয়ম সংস্থাপন করেন না। পুরুষের যথেচ্ছাচারটা যেন সমাজের পক্ষে সহনীয়। কিন্তু তাঁহারা বিস্মৃত হয়েন যে, যে মনু লিখিয়াছেন "নাস্তি স্ত্রীনাং পৃথগ্‌ যজ্ঞঃ ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতং, পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে", সেই মনুই লিখিয়াছেন।

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ,
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।
সন্তুষ্টোভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভত্রা ভার্যা তথৈবচ,
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্রবৈধ্রুবং।

পত্নী সহধর্ম্মিণী, পত্নী পতির গুণই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মনু বলেন,

যাদৃগ্‌ গুনেন ভর্ত্রা স্ত্রীসংযুজ্যেত যথাবিধি।
তাদৃগ্‌ গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা।

পত্নী অপকৃষ্টা হইলেও পতির গুণে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়। মনু বলেন,

অক্ষমালা বশিষ্টেন সংযুক্তা হধমযোনিজা।
সারঙ্গী মন্দপালেন জগামাভ্যর্হণীয়তাম।

সুতরাং এতৎসমুদয় দ্বারাই স্পষ্ট পরিস্ফুট হইতেছে যে, পতি যদি স্বীয় জীবনকে উচ্চাদর্শ দ্বারা পরিচালিত না করেন, তাহাহইলে পত্নীও উচ্চাদর্শ ভ্রষ্টা হইবেন।

সাবিত্রী চরিত্র বড়ই মনোহর। এই আদর্শ-চরিত্র স্ত্রীজাতির কর্ত্তব্য গুলি অতি সংক্ষেপে অথচ যথেষ্ট কাব্য কারিতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। সাবিত্রী রাজার কন্যা, বিপুল ঐশ্বর্য্য মধ্যে লালিত পালিত, কিন্তু বিধি-নিবন্ধন রাজ্য-ভ্রষ্ট অন্ধ দ্যুমৎ সেনের পুত্র সত্যবানের সহিত তাঁহার অবিচ্ছেদ্য পবিত্র পরিণয় সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়। এই বিবাহ তাঁহার স্বাভিমত, আত্মীয় স্বজনের অনুরোধে যে তিনি দরিদ্রের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হয়েন তাহা নহে। ধন বানের কন্যা হইয়াও তিনি দরিদ্র পতির গৃহে গিয়া ধন বা বিলাস অভাবে কখনও ক্ষুব্ধ হয়েন নাই। আদর্শ হিন্দু স্ত্রীর ন্যায় তিনি প্রফুল্ল চিত্তে পতি শ্বশুর ও শ্বশ্রূর সেবা করিতেন দরিদ্র গৃহোচিত দ্রব্যাদিতেও সন্তুষ্ট থাকিতেন। পিতৃ-গৃহের সুখ-স্বচ্ছন্দতা ভ্রমেও স্মরণ করিতেন না। পতির অকাল মৃত্যু হইবে এই সংবাদ পূর্ব্ব হইতে জানিয়াও তিনি কখনও বিচলিত-চিত্ত হয়েন নাই। এক মাত্র ভগবানের করুণার উপর নির্ভর করিয়া ছিলেন। পতির যে গতি হইবে, তাঁহারও সেইগতি হইবে, এই ধারণা করিয়াই সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। ধর্ম্মই তাঁহার জীবনের ভিত্তি ছিল, এবং তাহারই সাহায্যে তিনি স্বীয় পতিকে অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন। নব্যেরা বলেন, মানুষ মরিলে কি বাঁচে? সাবিত্রী যে সত্যবান্‌কে বাঁচাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন ইহা একটি গল্প-কথা, তবে গল্পটী ভাল। ইঁহাদিগকে আমরা কবি সেক্সপীরের কথায় বলিব,

There are more things in Heaven
and Earth, Horatio,
Than are dreamt of in your Philosohy.

লৌকিক অলৌকিক ব্যাপারের সীমা অবধারণ করা দুঃসাধ্য। যাহা আমরা বুঝিনা, তাহাকেই অলৌকিক বলি; বুঝিতে পারিলেই তাহার অলৌকিকত্ব লুপ্ত হয় ও তাহা লৌকিক হইয়া দাঁড়ায়। সাবিত্রী স্বীয় ধর্ম্ম প্রভাবে মৃত পতিকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিয়াছিলেন, একথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখিনা। ভগবানের কৃপায় না হইতে পারে এমন কিছুই নাই। তাঁহার কৃপা হইলেই

পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করে, চক্ষুহীনও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন হয়, মূকও কথা বলিতে পারে, বধিরেও শ্রবণ করে। কিন্তু কৃপার উপযুক্ত পাত্রেই এই কৃপা হইয়া থাকে।

সাবিত্রীর যেরূপ পতির প্রতি তন্ময়তা ছিল, তিনি যেরূপ যমের সহস্রবর পরিত্যাগ করিয়া একপতির জীবনই পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাতে ভগবান যে তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার মৃত পতির জীবন পুনঃ প্রদান করিবেন, ইহাতে আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে?

যাঁহারা জীবনে কখনও পাপ করেন না, তাঁহাদের এক অমানুষিক শক্তি জন্মে, এবং সেই অমানুষিক শক্তি-বলে তাঁহাদের কিছুই অসাধ্য থাকেনা। আমরা এই বিশ্বের মূলতত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া এইরূপে অনেক ব্যাপার অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করি। ফলে যম-সাবিত্রী-সংবাদ ব্যাপারটির ঐতিহাসিক সংস্থান যিনি যে ভাবেই সম্ভব বিবেচনা করুন, সাবিত্রীর সাধনায় সত্যবানের জীবন লাভরূপ মূল ঘটনাকে অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য ভাবিবার হেতু নাই।

সাবিত্রী চিরদিনই হিন্দুর গৃহে আদর্শ থাকুন ভগবানের নিকট ইহাই আমাদের প্রার্থনা। সাবিত্রী-চরিত হিন্দু-গৃহের ভিত্তি স্বরূপ। যেদিন সাবিত্রীর পুণ্যচরিত হিন্দুগৃহস্থল হইতে অন্তর্হিত হইবে, সেই দিনেই হিন্দু-গৃহের পতন অবশ্যম্ভাবী। যাঁহারা এই সাবিত্রীচরিত হিন্দু-সমাজে বহুল-প্রচারের জন্যে প্রয়াস পাইতেছেন, তাঁহারা সমগ্র হিন্দু সমাজের ধন্যবাদার্হ।

বিজয়গীতিকা-বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীলশ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ্র মহতাপ বাহাদুর কর্ত্তৃক রচিত। বর্দ্ধমান রাজবাটী হইতে প্রকাশিত।

কবি বলিয়াছেন "যত্রাকৃতিস্তত্রগুণা-বসন্তি," এই কথাটী সকলস্থলে সত্য না হইলেও বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান ভূপতিতে সম্পূর্ণ সত্য। যুবা মহারাজের প্রণীত সঙ্গীতগুলি পাঠ করিয়া আমরা নিরতিশয় আনন্দ সম্ভোগ করিলাম। বিজয়গীতিকা গ্রন্থে মহারাজের কবিত্ব ও সঙ্গীত বিদ্যার পরিদর্শিতার যথেষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের সঙ্গীতে যেরূপ চপলতার প্রমাণ পাওয়া যায়, মহারাজের সঙ্গীতে সেরূপ নাই। সঙ্গীতগুলির রাগ রাগিণী গভীরভাব সম্পন্ন, এবং বিষয়গুলিও আধ্যাত্মিকতা স্বদেশবৎসলতা, ও ঈশ্বরভক্তি, এবং প্রকৃতি-প্রেমব্যঞ্জক। সঙ্গীত পাঠ করিলে বোধহয় যেন মহারাজ অল্প বয়সেই "বৃদ্ধত্বং জরসাবিনা" এই বাক্যের লক্ষ্যস্থল হইয়াছেন। গুণ সর্ব্বত্রই আদরনীয়, কিন্তু পদস্থব্যক্তিদিগেতে অধিকতর মনোহর হইয়া থাকে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তিনি শ্রীযুক্ত রাজা বনবিহারি কপুর ও শ্রীযুক্ত বাবু রামনারায়ণ দত্ত মহাশয়দিগের স্নেহ ও উপদেশে ধর্ম্মের ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হইয়া ভগবানের প্রতি ভক্তি সম্পন্ন থাকেন, ও স্বদেশের উপকারে রত থাকিয়া বঙ্গদেশের আদর্শ জমিদারের স্থানলাভ করুন।

কৃষিতত্ত্ব।

১২০৬ সাল, ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যা।

কৃষিতত্ত্ববিষয়ক সচিত্র মাসিক পত্র। শ্রীযুক্ত বাবু নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপদেশানুসারে "ইম্পিরিয়াল-নর্শরি" (১২০নং কর্ণওয়ালিশষ্ট্রীট্) হইতে প্রকাশিত।

ভারতবর্ষ কৃষি-প্রধান দেশ। দেশে বাণিজ্যের প্রসার হওয়া বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু কৃষির অবহেলা করাও কিছুতেই কর্ত্তব্য নয়। ধর্ম্মভাবে ধন উপার্জ্জন করিতে গেলে বাণিজ্য অপেক্ষা কৃষি প্রশস্ততর। বাণিজ্যের এক নাম "সত্যানৃত" অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যা। ইহাদ্বারা সূচিত হইতেছে যে, বাণিজ্য করিতে গেলে একেবারে সত্য-পথে থাকা চলেনা। কথায় বুঝান সহজ নহে। কিন্তু যাঁহারা বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত, তাঁহারা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন যে, যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও, অনেক সময় বাণিজ্যে সত্য-পথে থাকা চলেনা। কৃষি-জীবন দোষ-স্পর্শশূন্য। কৃষি-প্রধান ভারতবর্ষ কিন্তু চাকরী-প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পল্লীগ্রামের মধ্যবর্ত্তী ভদ্রলোক চাকরীর জন্য কতই লাঞ্ছনা, কতইনা যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকেন। এণ্ট্রান্স্ এল্ এ পাশ করিয়াও আপিসে আপিসে [illegible] ন্যায় ব্যবহৃত হইতে হয়। কিন্তু তথাচ চেষ্টা হয় না। কৃষি-ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া পৈতৃক জমির উন্নতি করিলে, তাহারাও নিকট অবমানিত হইতে হয় না, বরঞ্চ সম্মান ও স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া যথেষ্ট ধন উপার্জ্জন করিতে পারা যায়। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে না জন্মে, এমন জিনিষ নাই। আমাদের কৃষকেরা সেই সত্য যুগ হইতে যিনি যাহা করিয়া আসিয়াছেন, তদ্ভিন্ন নূতন উপায় কেহ কিছু অবলম্বন করেননা। মধ্যবর্ত্তী ভদ্র লোকেরা যদি কৃষি-ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া নূতন বীজ বপন, নূতন নূতন বৃক্ষাদি রোপণ করেন তাহা হইলে তাঁহাদের অনুকরণে সাধারণ কৃষকেরাও ক্রমশঃ নিজেদের উন্নতি করিতে পারে। "কৃষিতত্ত্ব" মাসিকপত্রখানিতে কৃষি বিষয়ক নানা উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ থাকে। দেশীয় বিদেশীয় বীজ, বৃক্ষ, ফুল, লতা ইত্যাদির বিশেষ বিবরণ থাকে। কিরূপ জমিতে কোন্ সময়ে কি বীজ রোপণ করিতে হয় ও উহাতে কিরূপ সার দিতে হয়, কোন্ চাষে কিরূপ লাভ হয়, এই মাসিক পত্রে তাহা বিশদরূপে ব্যক্ত থাকে। নৃত্য-গোপাল বাবুর অভিজ্ঞতার দ্বারা এই মাসিক পত্র যথেষ্ট লাভবান্ হইয়াছে। আশা করি, বঙ্গের গৃহে গৃহে কৃষিতত্ত্ব গৃহীত হইবে এবং হিন্দুসন্তানকে চাকরী-রোগ হইতে কতকটা মুক্ত করিবে। পল্লীগ্রামের মধ্যবর্ত্তী অনেক ভদ্রলোক আলস্যময় জীবন যাপন করেন, তাঁহাদের পক্ষে কৃষিতত্ত্ব গ্রহণ ও তাহার উপদেশানুসারে পৈত্রিক জমির উন্নতি করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, কৃষিব্যবসায় করিতে গেলে কেবল

বেতনভোগী কৃষাণের উপর নির্ভর করিলে চলিবেনা। নিজেরও সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট শ্রম করিতে হইবে। কোদাল লাঙ্গল ব্যবহারে বাঙ্গালীর কিন্তু ভারি অপমান; চর্ম্মকার ইংরেজের দাসত্ব হইতে কোদাল লাঙ্গল ধরা তাঁহারা অপমানজনক বোধ করেন। শারীরিক পরিশ্রমের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ অপসারিত না হইলে ভারতের মঙ্গল নাই।

স্বাধীন জীবিকা। মাসিক পত্রিকা। শ্রীপ্রতুল চন্দ্র সোম সম্পাদিত, ২০৮। ২ কর্ণওয়ালিষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। বৈশাখ, ১৩০৭ সাল।

এই পত্রিকাখানি সময়োপযোগিনী হইয়াছে। ছাপা ভাল; কাগজ ভাল, উদ্দেশ্য ও বিষয়ও ভাল, চাকুরি-প্রবল দেশে এরূপ পত্রিকার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। এই সংখ্যায় বোম্বে বিভাগান্তর্গত আহমদাবাদের সুপ্রসিদ্ধ রায় বাহাদুর স্বর্গীয় রণছোড়লাল ছোটলাট সি, আই, ই, মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও একটী সুন্দর প্রতিকৃতি আছে। ইনি কাপড়ের কল সংস্থাপন করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কলে প্রত্যহ ১৬০০ লোক আপন জীবিকা অর্জ্জন করে। বাঙ্গালা দেশে অনেক ধনী আছেন, কিন্তু তাঁহাদের ধনে কোম্পানীর কাগজই খরিদ হয়, শিল্পাদিতে নিয়োজিত হয় না; ইহা বড় দুঃখের বিষয়। প্রথম সংখ্যাখানি যেরূপ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, ভবিষ্যৎ সংখ্যাগুলি সেইরূপ ভাবে প্রকাশিত হইলে, ইহা দ্বারা দেশের অনেক উপকারের আশা করা যাইবে।

সাহিত্য-সংহিতা। সাহিত্য-সভার মাসিক পত্রিকা, ১৩০৭ সাল, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা। সাহিত্যপরিষৎ-সভার মুখপত্র সাহিত্যপরিষৎপত্রিকা; সাহিত্য-সংহিতাও সাহিত্য-সভার মুখপত্র। শুনিতে পাই, সাহিত্যপরিষৎসভার কতকগুলি সভ্যই সাহিত্যপরিষৎসভা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাহিত্য-সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। আমরা ভিতরের কথা জানি না, কিন্তু বাহির হইতে দেখিলে বোধ হয়, যেন ভিতরে ভিতরে কিছু গোল হইয়াছে। এই গোলের কারণ জানিতে সাধারণের কৌতূহল জন্মে। সাহিত্যপরিষৎসভা বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির জন্যই সংস্থাপিত হইয়াছিল, এবং মফঃস্বলবাসিদের সংস্রব না থাকিলেও, কলিকাতার অনেক মান্য গণ্য কৃতবিদ্য লোক ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন; সাহিত্যসেবার মধ্যেও কি সূত্র লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইল, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না; কাহার দোষ আমরা জানি না; কিন্তু দেশের বড়ই দুর্ভাগ্য যে, যে সব বিষয়ে বিবাদ বিসম্বাদের কোনই কারণ নাই, তাহাতেও আমাদের মধ্যে নানাবিধ গোলযোগ উপস্থিত হয়; যাহাহউক আমরা আশা করি, নূতন সংস্থাপিত সাহিত্যসভা বঙ্গভাষার উন্নতি বর্দ্ধনার্থ সচেষ্ট হইবেন।

প্রবন্ধগুলি সুপাঠ্য এবং চিন্তা-প্রসূত। অবতরণিকায় দেখিলাম, সাহিত্যই সাহিত্য সংহিতার আলোচ্য ও প্রতিপাদ্য। ইহার কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিলাম

না। অন্যান্য সাহিত্য বিষয়ক সাময়িক পত্রিকার ন্যায় ইহাও একখানি; কিন্তু তাইবলিয়া যে, ইহার কার্য্যের ক্ষেত্রের অভাব রহিয়াছে, তাহা নহে; বাঙ্গালায় সাহিত্য বিষয়ক পত্রিক যত অধিক প্রচারিত হয়, ততই তাহা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, সাহিত্য-সংহিতা দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া দেশের উপকার করিতে নিরত থাকুন।

পঞ্চদশী ব্যখ্যা।

ভূত-বিবেক।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

চিন্তয়েদ্বহ্নি মপ্যেবং মরুতো ন্যূনবর্ত্তিনম্।
ব্রহ্মাণ্ডাবরণেষ্বেষাং ন্যূনাধিক বিচারণা। ৮১।
বায়োর্দ্দশাংশ-শতোন্যূনো বহ্নি-র্ব্বায়ৌ প্রকল্পিতঃ।
পুরাণোক্তং তারতম্যং দশাংশৈ-র্ভূতপঞ্চকে। ৮২।

টীকা। বায়াবক্ত বিচারং তেজস্যতিদিশতি চিন্তয়েৎ বহ্নিমিতি। ননু সদস্তন্যোক দেশান্ত মায়াতত্ত্বেত্যাদিনা—বিয়দাদীনা ন্যূনাধিক্য ভাব উক্তঃ সলোকেন ক্বাপি দৃষ্ট ইত্যাশঙ্ক্যাহ ব্রহ্মাণ্ডাবরণেষু এষাং ন্যূনাধিক বিচারণা। ৮১।

বঙ্গানুবাদ। অগ্নি ও বায়ুর ন্যূনবর্ত্তি মনে করিও। এই ভূত সকল ন্যূনাধিক ক্রমে আবরণ রূপে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছে। ৮১

টীকা। নম্বু বায়োঃ কিয়দংশেন ন্যূনো বহ্নিরিত্যত আহ বায়ো দশাংশ শতো ন্যূনঃ বহ্নি ইতি তস্য বাস্তবত্ব শঙ্কা বারয়তি বায়ৌ প্রকল্পিতঃ ইতি নম্বয়ং ন্যূনাধিক ভাবঃ স্বকপোল কল্পিত ইত্যাশঙ্ক্যাহ পুরাণোক্ত ইতি। ৮২।

বঙ্গানুবাদ। বায়ুর দশাংশ ন্যূন অগ্নি বায়ুতে কল্পিত হইয়াছে; পুরাণানুযায়ী পঞ্চভূত যথাক্রমে একের দশাংশ অন্য এইরূপ তারতম্য আছে। ৮২।

উপরক্ত ৮১। ৮২ শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ।

যেরূপ যুক্তি প্রদর্শনদ্বারা বায়ুর অনিত্যত্ব প্রমাণীকৃত হইল, সেইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া অগ্নির অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। অগ্নি বায়ুর কার্য্যস্বরূপ বায়ুতে অগ্নি প্রকল্পিত হইয়াছে, এবং ইহা বায়ু হইতে অল্প স্থানব্যাপী। সুতরাং অগ্নির অনিত্যত্ব বিষয়ে তজ্জন্য কোন যুক্তি বা প্রমাণের আবশ্যকতা নাই; কেবল এই যুক্তি দ্বারাই অগ্নির অনিত্যত্ব সবিশেষ প্রমাণীকৃত হইবে। আকাশাদি পঞ্চভূত এই সচরাচর ব্রহ্মাণ্ডকে উপর্য্যুপরি আবরণ করিয়া আছে। এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সকল বস্তুতেই সেই সকল ভূত ক্রমশঃ ন্যূনাধিকারূপে বর্ত্তমান থাকে। বায়ুর দশাংশের একাংশ পরিমিত অগ্নি বায়ুতে পরিকল্পিত হইয়া থাকে। পুরাণ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যে উক্ত প্রকারে সকল ভূতেই তাহাদিগের প্রত্যেকের দশাংশ পরিমাণে তারতম্য আছে॥ ৮১। ৮২॥

ক্রমশঃ।

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্রহ্মচারিআশ্রম।

উদ্দেশ্য—ব্রহ্মচারিআশ্রমের উদ্দেশ্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যার হিন্দুপত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। বাহুল্যরূপে উহা পুনর্ব্বার বিবৃত করা নিষ্প্রয়োজন। সংক্ষেপে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, হিন্দুসন্তানগণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া স্বীয় স্বীয় উপযোগিতা অনুসারে অস্মদ্দেশীয় এবং বিদেশীয় নানাবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সদাচার ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া যাহাতে স্বদেশের হিতসাধনে আপনাদিগের শক্তি সামর্থ্য নিয়োজিত করেন, তৎপক্ষে চেষ্টা করা।

——:•:——

যশোহরে ব্রহ্মচারিআশ্রম-সংস্থাপন—এই উদ্দেশ্য সাধনের বাসনায় যশোহরে একটী ব্রহ্মচারিআশ্রম সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে বেদ, উপনিষৎ, বেদান্তাদি ষড়দর্শন, ও স্মৃতি-সাহিত্যাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইতেছে। মহারাষ্ট্র দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নরহরি শাস্ত্রী এবং বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র তর্কতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামদাস স্মৃতিতীর্থ ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেদার নাথ ভারতী সাংখ্যতীর্থ অধ্যাপনা কার্য্য করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত ছাত্রদিগকে ধর্ম্ম, নীতি, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতিষ ও অন্যান্য বিজ্ঞানাদির মৌখিক উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে।

———

ব্রহ্মচারি আশ্রমের ছাত্র—সচ্চরিত্র অথচ দরিদ্র ছাত্রদিগকে আশ্রম হইতে মাসিক বৃত্তি এবং ভৃত্যের ও কাষ্ঠাদির খরচ দেওয়া হইয়া থাকে। ছাত্রবর্গ প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক অধ্যয়নে নিযুক্ত হয়েন। অধ্যয়নে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বেই সকলে সমবেত হইয়া ভগবানের একটী স্তব পাঠ করেন, তৎপরে সকলেরই গীতা ও বেদসূক্ত বা উপনিষৎ পাঠ। তৎপরে ছাত্রগণ স্বীয় স্বীয় বিশেষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সন্ধ্যাকালেও ঐরূপ সকলে সমবেত হইয়া ভগবানের স্তব পাঠ করেন এবং তৎপরে মৃদঙ্গ-করতাল সংযোগে ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিয়া অভ্যাগত ভদ্রলোক অথবা অধ্যাপকদিগের সহিত বিবিধ শাস্ত্রচর্চ্চা করিয়া থাকেন। গগন মেঘাবৃত না থাকিলেই কীর্ত্তনান্তে ছাত্রদিগকে গ্রহ-নক্ষত্রাদি দেখান ও সঙ্গে সঙ্গে গণিত-জ্যোতিষ শিক্ষা দেওয়া হয়। আশ্রমের বর্ত্তমান ছাত্র সংখ্যা ১৪টী, তন্মধ্যে ৮টী বৃত্তিধারী। যাঁহারা ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করিয়াছেন এবং আশ্রমের নিয়মানুসারে অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছুক, এরূপ সচ্চরিত্র ছাত্র দরিদ্র হইলে আশ্রমের বৃত্তি পাইবার অধিকারী হইবেন। আশ্রমের ছাত্রদিগকে প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিবার নিয়ম করা হয় নাই, অথচ দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী সংযমের বিধান করা হইয়াছে, এবং তদনুসারেই তাঁহাদের আহার নিদ্রা, ব্যায়াম, অধ্যয়নাদি করিতে হয়।

ব্রহ্মচারি আশ্রমের গৃহ—ব্রহ্মচারি-আশ্রমের ছাত্র ও অধ্যাপকদিগের বাসস্থান এবং রন্ধনশালার জন্য প্রথমে কয়েকখানি খড়ের ঘর প্রস্তুত হয় এবং ঐ ঘরেই অধ্যাপনা কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে থাকে। গত বৈশাখ মাসে অধ্যাপনার জন্য একটী ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহ হইয়াছে। সেই স্থানে বর্ত্তমান সময়ে অধ্যাপনা কার্য্য হইতেছে। ব্রহ্মচারিআশ্রমের প্রাঙ্গণে এইক্ষণ ১৫। ১৬ বিঘা জমি হইয়াছে, এবং উহাতে একটী সুবৃহৎ পুষ্করিণী আছে।

———

ব্রহ্মচারি আশ্রমের পুস্তকালয়-ব্রহ্মচারি আশ্রমে একটী পুস্তকালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, এই পুস্তকালয়ে বেদাদি নানাবিধ শাস্ত্র ও সম্পাদক মহাশয়ের অন্যান্য ধর্ম্ম-বিজ্ঞান-দর্শন ও সাহিত্য বিষয়ক সংস্কৃত, ইংরেজী ও বাঙ্গালা গ্রন্থ দেওয়া হইয়াছে। এই পুস্তকালয়ে হিন্দুপত্রিকা ও ইংরেজী মাসিক পত্র ব্রহ্মচারিণের পরিবর্ত্তে যে সকল সংস্কৃত, ইংরেজী, বাঙ্গালা, মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্র পওয়া যায়, তাহাও রাখা হয়। উহা ও অন্যান্য পুস্তকাদি সাধারণে পাঠ করিতে পারেন, কিন্তু আশ্রম হইতে পুস্তকাদি অন্যত্র লইবার নিয়ম নাই। আশ্রমে কেহ কোন পুস্তকাদি দান করিলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। ছাত্রদিগের অধ্যাপনা-গৃহেই এই পুস্তকাদি রক্ষিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে, আশ্রমের পুস্তকালয়ে যতগুলি পুস্তক আছে, তাহার মূল্য ২৫০০৲ টাকার কম নহে, কিন্তু এখনও অনেক টাকার সংস্কৃত ও ইংরেজী পুস্তকের অভাব।

———

ব্রহ্মচারিআশ্রমের আয়—ব্রহ্মচারি-আশ্রমের এইক্ষণ পর্য্যন্তও কোন স্থায়ী আয় হয় নাই। হিন্দু-পত্রিকার আয়ের উপরই অধিক আশা স্থাপন করা যায়, কিন্তু হিন্দু-পত্রিকায় আশানুরূপ আয় হইতেছে না; হিন্দুপত্রিকার গ্রাহক ও আয় বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। আয় বৃদ্ধির সহিত আশ্রমের উন্নতির আশা করা যায়। হিন্দু-পত্রিকা প্রেসের আয়ও আশ্রমে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, কিন্তু এই প্রেসেও এ পর্য্যন্ত লাভ হয় নাই, কিছু ক্ষতিই হইয়াছে। হিন্দুপত্রিকা-প্রেসে ইংরেজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত টাইপ আনা হইয়াছে, এবং সাধারণে ক্রমে প্রেসের বিষয় অবগত হইলে আয় বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে। গত জানুয়ারি মাস হইতে "ব্রহ্মচারিন্" নামে ইংরেজী মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হইতেছে, ইহার আয়ও আশ্রমে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। ইহার দ্বারা কিরূপ আয় হইবে, বৎসরান্তে বুঝা যাইবে। ব্রহ্মচারিন্ ও হিন্দুপত্রিকার গ্রাহকগণ যদি নিয়মিতরূপে মূল্য প্রদান করেন, তাহা হইলে যে কেবল পত্রিকার উপকার করা হইবে, এমত নহে, আশ্রমেরও প্রকারান্তে মহোপকার করা হইবে। আশা করি, হিন্দুপত্রিকা ও ব্রহ্মচারিণের গ্রাহকগণ এই পত্রিকার গ্রাহক বৃদ্ধি করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইবেন।

হিন্দুপত্রিকার কোনও কোনও গ্রাহক

অনুগ্রহ করিয়া আশ্রমের জন্য কিছু কিছু সাহায্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট আশ্রম অনুগৃহীত; আশাকরি, হিন্দু-পত্রিকার সকল গ্রাহকই হিন্দুপত্রিকার মূল্য প্রদানের সময় আশ্রমের জন্য কিছু কিছু সাহায্য করিবেন।

স্থানীয় অনেক ভদ্রলোকে আশ্রমের সাহায্যার্থে মাসিক চাঁদা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং অনেকে দিতেছেন। তাঁহাদের নিকট আমরা যথেষ্ট কৃতজ্ঞ। যিনি যে সাহায্য করিতে স্বীকার করিয়াছেন, তাহা নিয়মিতরূপে করিলে, আশ্রমের বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। "আমিত্বের প্রসার" ও "শাণ্ডিল্যসূত্র" এই দুইখানি গ্রন্থের আয়ও আশ্রমে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে।

বিশেষ সুসংবাদ—অত্র জেলাস্থ নলডাঙ্গার রাজা শ্রীলশ্রীযুক্ত রাজা প্রমথ ভূষণ দেব রায় বাহাদুর ব্রহ্মচারিআশ্রমের অভিভাবকতা গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মচারি-আশ্রমের প্রতি রাজা বাহাদুরের অকৃত্রিম স্নেহ ও অনুরাগ দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মচারিআশ্রম তাঁহার অনুগ্রহের জন্য তাঁহার নিকট যথেষ্ট ঋণী। অস্মদ্দেশীয় অনেক ধনবান ব্যক্তি রাজকর্ম্মচারিগণের অসন্তুষ্ট কোনও সৎকার্য্যে সাহায্য বা সহানুভূতি প্রকাশ করেন না। রাজাবাহাদুর এই দুর্নীতি [illegible] উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশের ধন্যবাদের পাত্রই হইয়াছেন। আশা করা যায়, যে [illegible] কৃপায় আশ্রম তাঁহার সমশ্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে।

আশ্রমের ব্যয়—এই পর্য্যন্ত আশ্রমের আয়ের কথাই বলিলাম। আয় অনিশ্চিত, অপরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে, কিন্তু ব্যয় সুনিশ্চিত; মাসে মাসে ছাত্র এবং অধ্যাপকদিগের বৃত্তি দিতেই হইবে। ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্যে সঞ্চয় আশা পরিত্যাগ করিলেও, বর্ত্তমান ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেই হয়। ব্যয়ের আবশ্যক হইলেই প্রথমে আশ্রমের মাসিক চাঁদা বা এককালীন দানের তহবিলে হাত দেওয়া হয়; সেখানে না কুলাইলে হিন্দুপত্রিকার তহবিলে যাওয়া হয় এবং সেখানেও অভাব হইলে, "আমিত্বের প্রসার" ও "শাণ্ডিল্যসূত্রের" তহবিলে হাত দিতে হয়; ঐ সকল তহবিল যখন শূন্য থাকে, তখন মাননীয় সম্পাদক মহাশয়কে ঐ ব্যয়-ভার নিজ হইতেই বহন করিতে হয়।

বর্ত্তমান বৎসর—একটা মোটামুটি এষ্টীমেট্ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বর্ত্তমান বৎসরে আশ্রমের নিয়মিত ব্যয় নির্ব্বাহার্থে অন্ততঃ ২০০০৲ দুই হাজার টাকার প্রয়োজন, এই দুই হাজার টাকায় দ্বারা আশ্রমের নূতন কোনও উন্নতি সংসাধিত হইবে না; যাহা আছে, তাহাই সংরক্ষিত হইবে মাত্র।

সাহায্য প্রার্থনা।—হিন্দুপত্রিকার গ্রাহকগণের নিকট আমরা সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আসিতেছি। হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহকগণের সংখ্যা যেরূপ, তাহাতে প্রতিগ্রাহক স্বীয় স্বীয় অবস্থানুসারে বৎসর বৎসর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য করিলেও দুই হাজার টাকার অনেক বেশী হইতে পারে। ১০, ৫, ২, ১ যিনি যাহা পারেন, তাহা দিলে এই সদনুষ্ঠানটী জীবিত থাকে। এবৎসর হিন্দুপত্রিকার গ্রাহকগণের নিকট হইতে বর্ত্তমান বর্ষের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দুই হাজার টাকা পাইলেই যথেষ্ট অনুগৃহীত হইব, এবং ঐ দুই হাজার টাকা সম্পূর্ণ হইলে আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ এবৎসর আর কোনও গ্রাহকের নিকট কিছু প্রার্থনা করিব না। এই দুই হাজার টাকার মধ্যে বর্ত্তমান বৎসরের বৈশাখ ও জৈষ্ঠ মাসে ১৮৬৷৷/১০ একশত ছিয়াশী টাকা সাড়ে এগার আনা পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে সম্পাদক মহাশয়ের নিজের চাঁদা ১০০৲ একশত টাকা। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের আয়-ব্যয়ের হিসাব স্বতন্ত্র স্থলে প্রকাশিত হইল। এই দুই মাসের সমস্ত আয় দেওয়া হইল, কিন্তু ব্যয় আরও প্রায় ৮০৲ টাকা লাগিবে। অর্থাভাবে এ পর্য্যন্ত তাহা দেওয়া হয় নাই।

—:•:—

ব্রহ্মচারিআশ্রমের অভাব— আশ্রমে একটী সুবৃহৎ পুষ্করিণী আছে, তাহার পঙ্কোদ্ধার এবং পুরাতন ইষ্টক নির্ম্মিত ঘাটটীর সংস্কার ও একটী নূতন ইষ্টক নির্ম্মিত ঘাট প্রস্তুত করা আবশ্যক। ইহাতে প্রায় ২০০০৲ দুই সহস্র টাকার প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ আশ্রমের একটী মন্দিরের নক্সা প্রস্তুত করা হইয়াছে, উহার এষ্টিমেট্ প্রায় ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা, এতদ্ব্যতীত পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে পুষ্পোদ্যান করা আবশ্যক। ইহা ব্যতীত ছাত্র ও অধ্যাপকদিগের বাসস্থানের জন্য ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহেরও প্রয়োজন। উহাতেও ৪০০০।৫০০০ হাজার টাকার প্রয়োজন। এই সমুদয় কার্য্যই অর্থ-সাপেক্ষ। সম্পাদক মহাশয় হিন্দুপত্রিকা-প্রেস ও অফিসের জন্য নিজ হইতে প্রায় ৫০০০৲ পাঁচ সহস্র টাকা দিয়াছেন। তাঁহার পক্ষে আর টাকা দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। সাধারণের সহানুভূতি ব্যতীত এই সকল অভাব পূরণের আর অন্য সম্ভাবনা নাই। আশ্রম পরিচালনার্থ বর্ত্তমান বৎসর ২০০০৲ দুই হাজার টাকা এষ্টিমেট করা হইয়াছে; ইহার অধিক যদি কিছু পাওয়া যায়, তবে তাহা দ্বারা ইহার কোনও একটী অভাব পূরণ করা যাইতে পারে। আশ্রমের পুস্তকালয়েও অনেক টাকার পুস্তকের আবশ্যক।

———

বিশেষত্ব—সাধারণ সংস্কৃত চতুষ্পাঠী হইতে আশ্রমের বিশেষত্ব কি? সাধারণ চতুষ্পাঠীতে কেবল শাস্ত্রাদির অধ্যাপনা হইয়াথাকে, কিন্তু কেবল শাস্ত্রাদির অধ্যাপনাই এই আশ্রমের উদ্দেশ্য নহে। যাহাতে ছাত্রদিগের চরিত্র সংগঠিত হয়, ভগবানে নিষ্ঠা বৃদ্ধি হয়, স্বদেশবৎসলতা জন্মে এবং স্বদেশের অভাবাদি পরিগ্রহ করিয়া যাহাতে

তাঁহারা ভবিষ্যৎ জীবনে স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে স্বদেশের সেবায় আপনাদিগকে নিয়োজিত করিতে পারেন; তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ইহাতে পাশ্চাত্যদর্শন ও বিজ্ঞানাদিরও আলোচনা হইয়া থাকে। আশ্রমের আয় বৃদ্ধি অনুসারে প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত বিদ্যাই শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইবে। সংক্ষেপে ব্রহ্মচারিআশ্রমকে হিন্দুধর্ম ও সাহিত্য-বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থান করাই আমাদের অভিপ্রায়।

উপসংহার—উপসংহারে নিবেদন এই, ভগবানের দয়ার উপর নির্ভর করিয়াই এই সমুদয় কার্য্যে ব্রতী হওয়া গিয়াছে; আশাকরি, তাঁহাদ্বারা পরিচালিত হইয়াই দেশের মহানুভবগণ এই আরব্ধ সৎকার্য্যের স্থায়িত্ব সাধনে যত্নবান হইবেন। কার্য্য লঘু ভাবেই আরম্ভ করা হইয়াছিল, কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে ভগবানের কৃপায় ইহার যেরূপ উন্নতি দেখা যাইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। আশ্রমের নিয়মিত ব্যয় নির্ব্বাহ করাই এইক্ষণ আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্যেই হিন্দু-পত্রিকার সমুদয় গ্রাহকের নিকট সানুনয়ে এই নিবেদন করি যে, বর্ত্তমান বর্ষের নির্দ্ধারিত ব্যয় ২০০০৲ দুই হাজার টাকার মধ্যে যিনি যতদূর পারেন, তাহা দিয়া আশ্রমের আনুকূল্য করিলে আশ্রম তাঁহাদের নিকট বিশেষ অনুগৃহীত হইবে।

প্রতিমাসে হিন্দুপত্রিকা ও ব্রহ্মচারিণ্ নামক ইংরেজী মাসিক পত্রিকায় আশ্রমের আয় ব্যয় প্রকাশিত হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তি চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পারেন যে, তাঁহারা অনর্থক কত অর্থই ব্যয় করিয়া থাকেন, অথচ তাহার অতি সামান্য অংশ সৎকার্য্যে ব্যয় করিলে অনেক বহুব্যয়সাধ্য ব্যাপারও সংসাধিত হইতে পারে। কেহ যেন ইহা মনে করেন না যে, তাঁহার সামান্য দানে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে—

"তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্ বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ।"

অর্থাৎ সামান্য সামান্য তৃণ একত্রিত করিয়া যে রজ্জু প্রস্তুত করা যায়, তাহা দ্বারা মত্ত হস্তীকেও বদ্ধ করা যাইতে পারে। যে সমুদায় মহাত্মারা আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ আর্থিক সাহায্য করিয়া আসিতেছেন, আশ্রমের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করি। ভগবান তাঁহাদিগকে সর্ব্ববিধ কুশলে রাখুন, এই প্রার্থনা।

শ্রীনিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা। | শ্রাবণ। | ১৩০৭ সাল, ১৮২২ শকাব্দা।

পঞ্চদশী ব্যাখ্যা।

ভূতবিবেক।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

বহ্নিরুষ্ণঃ প্রকাশাত্মা পূর্ব্বানু
গতিরত্রচ।
অস্তি বহ্নিঃ সনিস্তত্ত্বঃ শব্দবান্
স্পর্শবানপি॥ ৮৩।

সন্মায়া ব্যোম বায়্বংশৈর্যুক্ত-
স্যাগ্নেনিজো গুণঃ।
রূপং তত্র সতঃ সর্ব্বমন্যদ্
বুদ্ধ্যা বিবিচ্যতাম্॥ ৮৪।

টীকা—বহ্নেঃ স্বরূপমাহ—বহ্নিরুষ্ণ ইতি অত্রাপি বায়োরিব কারণ ধর্ম্মে অনুগতা ইত্যাহ পূর্ব্বানুগতিরিতি। কে তে ধর্ম্মা ইত্যাশঙ্ক্যায়ামাহ অস্তি বহ্নিরিতি। ৮৩।

বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বানুরূপ অগ্নি উষ্ণ এবং প্রকাশক; তদ্ভিন্ন অগ্নি আছে (সত্তা) নিস্তত্ত্ব শব্দবান্ ও স্পর্শবান। ৮৩।

টীকা—এবমগ্নৌ কারণ ধর্ম্মানুগত্যনুবাদ পূর্ব্বকং স্বকীয় ধর্ম্মং দর্শয়তি সন্মায়েতি ইত্যং সবিশেষণং বহ্নিস্বরূপং ব্যুৎপাদ্য ইদানীং সত্বস্তনো বহ্নিং বিবিনক্তি তত্র সত ইতি। তত্রতেষু মধ্যে সতঃ সত্বস্তনো হন্যৎ সর্ব্ব ধর্ম্ম জাতং মিথ্যেতি বুদ্ধ্যা বিবিচ্যতাং পৃথক্ ক্রিয়তামিত্যর্থঃ। ৮৪।

বঙ্গানুবাদ—সৎ মায়া ব্যোম্ ও বায়ুর অংশ অগ্নিতে আছে এবং অগ্নির নিজ গুণ রূপও অগ্নিতে আছে। সৎ হইতে অন্য সমস্ত পৃথক্ (মিথ্যা) জানিও। ৮৪।

উপরোক্ত ৮৩। ৮৪ শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ যথা—

পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে আকাশ ও বায়ুর স্বভাব ও অনিত্যত্ব নিরূপিত হইয়াছে, এইরূপ অগ্নির স্বরূপ ও অনিত্যত্ব নিরূপণ করিতেছেন। অগ্নির স্বীয় গুণ প্রকাশকতা। পরন্তু তাহার অপর চারিটি গুণ আছে, যথা—সত্তা, অনিত্যতা, শব্দ এবং উষ্ণস্পর্শ। এই গুণ চতুষ্টয় তাহার স্বভাবসিদ্ধ নহে, উহা তাহার কারণ হইতে আগত গুণ। অগ্নির উক্ত চারিটি গুণ তাহার কারণীভূত, সত্ত্ব, মায়া, আকাশ

ও বায়ু হইতে সঞ্চারিত হইয়াছে, অর্থাৎ অগ্নির কারণীভূত সদ্বস্তু হইতে সত্তাগুণ, মায়া হইতে অনিত্যতা, আকাশ হইতে শব্দ এবং বায়ু হইতে স্পর্শ-গুণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইরূপ সদ্বস্তু, মায়া, আকাশ ও বায়ুর গুণ চতুষ্টয় বিশিষ্ট এবং স্বীয় প্রকাশকতা গুণযুক্ত সেই অগ্নিকে সৎ হইতে পৃথক্ করিলে, তাহার অনিত্যতা-সিদ্ধি হয় কি না, বিবেচনা কর, অর্থাৎ অগ্নিকে সৎ, মায়া, আকাশ এবং বায়ু হইতে পৃথক্ করিয়া লইলে, ইহার অনিত্যতা সিদ্ধি হইয়া থাকে। এই প্রকার সদ্-যুক্তির দ্বারা অনুধাবন পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে, নিশ্চই অগ্নি যে অনিত্য পদার্থ, তাহা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইবে॥ ৮৩। ৮৪।

সতোবিবেচিতে বহ্নৌ মিথ্যাত্বে
সতি বাসিতে।
আপো দশাংশতো ন্যূনাঃ
কল্পিতা ইতি চিন্তয়েত্। ৮৫।
সত্ত্যাপোঽমুঃ শূন্যতত্ত্বাঃস শব্দ
স্পর্শসংযুতাঃ।
রূপবত্যোঽন্যধর্ম্মানুবৃত্তা স্বীয়
রসো গুণঃ॥ ৮৬।

টীকা—এবং বহ্নের্মিথ্যাত্ব-নিশ্চয়ানন্তর-মপাং মিথ্যাত্বং চিন্তয়েদিত্যাহ সতো বিবেচিতে বহ্নিরিতি। ৮৫।

বঙ্গানুবাদ—সৎ হইতে পৃথক্ বিবেচনায় অগ্নির মিথ্যাত্ব প্রমাণিত হয়। ঐ অগ্নির দশাংশ ন্যূন আপ (জল) অগ্নিতে কল্পিত হইয়াছে জানিও। ৮৫।

টীকা—অপ্ স্বপি কারণ ধর্ম্মান্ স্বধর্ম্মাংশ্চ বিভজ্য দর্শয়তি সত্ত্যাপ ইতি শব্দেন সহ বর্ত্তমান সশব্দ সশব্দাশ্চাসৌ স্পর্শস্তেন যুক্তা ইত্যর্থঃ। ৮৬।

বঙ্গানুবাদ—জলে সত্তা, তত্ত্বশূন্যতা, শব্দ, স্পর্শ এবং রূপ আছে; এই সকল অন্য ধর্ম্মানুবৃত্ত্য এতদ্ভিন্ন জলের স্বীয় রস-গুণ আছে। ৮৬

উপরোক্ত ৮৫। ৮৬ শ্লোকের তাৎপর্য্য।

এই প্রকারে অগ্নির স্বরূপ ও তাহার অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া, জলের স্বরূপ ও তাহার অনিত্যত্ব নিরূপণ করিতেছেন। সদ্বস্তু হইতে পৃথগ্ভূত অনিত্য অগ্নি হইতে দশাংশ পরিমাণে ন্যূন জল সেই অগ্নিতে কল্পিত হয়। জলেতে সত্তা, অনিত্যতা, শব্দ, স্পর্শ এবং রূপ, এই পাঁচটি কারণ গুণ বর্ত্তমান আছে, এই পাঁচটি জলের স্বাভাবিক গুণ নহে। জলের স্বাভাবিক গুণ রস। সমুদায়ে জলেতে ছয়টী গুণ বিদ্যমান আছে। এইরূপে উক্ত সত্তাদি পঞ্চ কারণ গুণবিশিষ্ট এবং স্বীয় রস-গুণ যুক্ত জলকে সদ্বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া বিবেচনা করিলে তাহার অনিত্যত্ব বিলক্ষণ-রূপে প্রতীয়মান হইবে॥ ৮৫। ৮৬॥

সতো বিবেচিতা স্বপ্সু তন্মি-
থ্যাত্বে চ বাসিতে।
ভূমির্দ্দশাংশতোন্যূনা কল্পি-
তাপ্স্বিতি চিন্তয়েৎ। ৮৭।
অস্তি ভূস্তত্ত্বশূন্যাস্যাঃ শব্দ-
স্পর্শৌ স্বরূপকৌ।
রসশ্চ পররতো নৈজো গন্ধঃ
সত্তা বিবিচ্যতাম্। ৮৮

টীকা—বিবেক ধ্যানাভ্যাম্ অপাং মিথ্যাত্বং নিশ্চিতানন্তরং ভূমের্মিথ্যাত্বং চিন্ত-নীয়মিত্যাহ সতো বিবেচিতাপ্স্বিতি। ৮৭।

বঙ্গানুবাদ—সৎ হইতে পৃথক্ করিলে জলের মিথ্যাত্ব প্রমাণিত হয়; ঐ জলের দশাংশ ন্যূন ক্ষিতি জলের মধ্যে আছে জানিও। ৮৭।

টীকা—তস্যা মিথ্যাত্ব চিন্তনীয় তদ্ধর্ম্মা-নপি বিভজ্যতে অস্তিভূতত্বশূন্যেতি। তেভ্যঃ সত্বমাত্রং পৃথক্ কর্ত্তব্যমিথ্যাহ সত্তা বিবি-চ্যতামিতি। ৮৮।

বঙ্গানুবাদ—ভূমিতে সত্তা, তত্ব শূন্যতা, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, এবং রস গুণ আছে; এই সকল 'পরতো' অর্থাৎ অন্য হইতে প্রাপ্ত, তদ্ভিন্ন তাহার নিজের গন্ধ-গুণ আছে বিবেচনা করিও। ৮৮।

উপরোক্ত ৮৭। ৮৮ শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ।

পূর্ব্ব শ্লোকে সদ্যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা বিচার পূর্ব্বক জলের গুণ ও অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া, এইক্ষণ ভূমির গুণ নিরূ-পণপূর্ব্বক তাহার স্বভাব ও অনিত্যত্ব নিরূপণ করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত যুক্তি দ্বারা সদ্বস্তু হইতে পৃথগ্ভূত অনিত্য জল অপেক্ষা দশাংশ পরিমাণে ন্যূন ভূমি জলে কল্পিত হয়। সেই ভূমিতে সত্তা, অনিত্যতা, শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, এই ছয়টি কারণ গুণ বিদ্যমান আছে। এই ছয়টি ভূমির স্বাভা-বিক গুণ নহে। ভূমির স্বাভাবিক গুণ গন্ধ। ভূমিতে সমুদায়ে সাতটী গুণ আছে। ৮৭। ৮৮ ।

পৃথক্ কৃতায়াং সত্তায়াং ভূ-
মির্ম্মিথ্যা বশিষ্যতে।
ভূমের্দ্দশাংশতো ন্যূনংব্রহ্মাণ্ডং
ভূমিমধ্যগম্ ॥ ৮৯।
ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে তিষ্ঠন্তি ভুবনানি
চতুর্দ্দশ।
ভুবনেষু বসন্ত্যেষুপ্রাণিদেহা
যথাযথম্ ॥ ৯০।

টীকা—সত্তা পৃথক্ করণে ফলমাহ পৃথক্-কৃতায়ামিতি ইদানীং ভৌতিকেভ্যো—ব্রহ্মা-ণ্ডাদিভ্যঃ সত্তো বিবেচনায় অবস্থান প্রকারং দর্শয়তি ভূমের্দ্দশাংশতো ন্যূনমিত্যাদি যথা-যথমিত্যন্তেন সার্দ্ধেন। ৮৯। ৯০।

বঙ্গানুবাদ—সৎ হইতে পৃথক্ করিলে ভূমি মিথ্যাত্বে পরিণত হয়। ঐ ভূমির দশাংশ ন্যূন ব্রহ্মাণ্ড ঐ ভূমির মধ্যে আছে। ঐ ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে চতুর্দ্দশ ভুবন অবস্থিত আছে। ঐ চতুর্দ্দশ ভুবনেতে ঐ ভুবনানুরূপ প্রাণিদেহ বাস করে। ৮৯। ৯০।

৮৯। ৯০ শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ—এইক্ষণ সদ্যুক্তি দ্বারা ষট্ কারণ গুণ বিশিষ্ট ও স্বীয় গন্ধ গুণ সমন্বিত ভূমিকে সদ্বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ভূমির অনিত্যতা বিলক্ষণরূপে প্রতিপন্ন হইবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে প্রমাণ দ্বারা যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক আকাশাদি পঞ্চ-ভূতের কারণ, গুণ এবং অনিত্যতা প্রতি-পাদন করিয়া এইক্ষণ সেই ভৌতিক ব্রহ্মাণ্ড হইতে সদ্বস্তুর পার্থক্য নিরূপণাভিপ্রায়ে

বিন্দুকে কর্কট ক্রান্তি (Tropic of cancer) বলে। ক্রান্তি মণ্ডলের যে বিন্দুতে সূর্য্য উপনীত হইলে, হ্রস্বতম দিবা ও দীর্ঘতম রাত্রি হয়, ঐ বিন্দুকে মকর ক্রান্তি (Tropic of capricorn) বলে। কর্কট-ক্রান্তি ও মকর ক্রান্তি বিন্দুদ্বয়কে অয়ন (Solstitial points) বলে, এবং ঐ ক্রান্তিদ্বয়ের নাম অয়নান্ত (Solstices)। যে সরল রেখা ক্রান্তিবৃত্তের সমকোণে ও ক্রান্তিবৃত্তের কেন্দ্র ভেদ করিয়া অবস্থিত, ঐ রেখাকে কদম্বযষ্টি (Axis of the pole of the Ecliptic) বলে। কদম্বযষ্টির উত্তর বিন্দুকে কদম্ব—(Pole of the Ecliptic) বলে এবং দক্ষিণ বিন্দুকে পরকদম্ব-বিন্দু বলা যাইতে পারে।

যে বৃত্ত পৃথিবীর মেরুদণ্ডের সম কোণে ও পৃথিবীর উত্তর মেরুর (সুমেরু) ও দক্ষিণ মেরুর (কুমেরুর) সমদূরে থাকিয়া পৃথিবী-পৃষ্ঠ সম দুই খণ্ডে বিভক্ত করে, ঐ বৃত্তকে নিরক্ষ বৃত্ত বলে। নিরক্ষ বৃত্তের পরিধিকে নিরক্ষ রেখা (Terrestrial Equator) বলে। নিরক্ষ রেখার উত্তরস্থ পৃথিবীর গোলার্দ্ধকে দেব ভাগ বলে। নিরক্ষ রেখার দক্ষিণস্থ পৃথিবী-গোলার্দ্ধকে "অসুর-ভাগ" বলে।

কল্পনাদ্বারা পৃথিবীর মেরুদণ্ড উত্তরে ও দক্ষিণে প্রসারিত করিলে, ঐ মেরুদণ্ড উত্তরে গোলকের যে বিন্দু স্পর্শ করিবে, ঐ বিন্দুকে সৌম্য ধ্রুব বিন্দু বলে এবং দক্ষিণে গোলকের যে বিন্দু স্পর্শ করিবে, ঐ বিন্দুকে যাম্য ধ্রুব বিন্দু বলে, এবং প্রসারিত মেরুদণ্ডকে ধ্রুবযষ্টি বলে।

পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্ত কল্পনাদ্বারা প্রসারিত করিলে, গোলক স্পর্শ করিয়া গোলকে যে মণ্ডলাকার রেখা উৎপাদন করিবে, ঐ মণ্ডলাকার রেখার উপরে বিষুপদ্বয় অবস্থিত থাকে, এ জন্য ঐ মণ্ডলাকার রেখাকে বিষুব-মণ্ডল বলে এবং বিষুব মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী ক্ষেত্রকে বিষুব বৃত্ত বলে। বিষুববৃত্ত ধ্রুব-যষ্টির সম কোণে থাকিয়া—গোলক ও ধ্রুব-যষ্টি সমদ্বিখণ্ডে বিভক্ত করিতেছে। গোলকের উত্তরার্দ্ধকে দেব ভাগ এবং দক্ষিণার্দ্ধকে অসুর ভাগ বলে।

ক্রান্তি মণ্ডল ও বিষুব মণ্ডল, এই উভয়ের সংযোগ বিন্দুদ্বয়কেই বিষুব বলে। পশ্চিমস্থ বিষুবকে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত বলে এবং পূর্ব্বস্থ বিষুবকে শারদীয় ক্রান্তিপাত বলে।

ক্রান্তিবৃত্ত ও বিষুব বৃত্ত পরস্পর তির্য্যক্‌-ভাবে অবস্থিত ; উভয়ের ক্ষেত্র সমতল নহে।

ক্রান্তিবৃত্তের অর্দ্ধাংশ বিষুপ বৃত্তের উত্তরে অবস্থিত এবং অর্দ্ধাংশ বিষুপ বৃত্তের দক্ষিণে অবস্থিত। ক্রান্তি মণ্ডলের যে অর্দ্ধাংশ বিষুপ রেখার উত্তরে অবস্থিত, ঐ অংশকে উত্তর ধনু বলে এবং ক্রান্তিমণ্ডলের যে অর্দ্ধাংশ বিষুপ বৃত্তের দক্ষিণে অবস্থিত, ঐ অংশকে দক্ষিণ ধনু বলে।

উভয় ধ্রুব বিন্দু ও ক্রান্তিপাতদ্বয় ভেদ করিয়া যে বলয় অঙ্কিত করা যায়, ঐ বলয়কে ক্রান্তি-পাত বলয় (Equinoctial colure) বলে।

উভয় ধ্রুব বিন্দু ও অয়ন বিন্দুদ্বয় ভেদ করিয়া যে বলয় অঙ্কিত করা যায়, ঐ বলয়কে অয়নান্ত বলয় (Solstitial colure) বলে।

বৃত্ত পরিধিকে ৩৬০ ভাগে বিভক্ত করিলে এক এক ভাগকে অংশ বলে। এক

অংশকে ৬০ ভাগে বিভক্ত করিলে, এক এক ভাগকে কলা বলে। এক কলাকে ৬০ ভাগে বিভক্ত করিলে, এক এক ভাগকে বিকলা বলে। ° চিহ্ন অংশ বোধক। ′ চিহ্ন কলা বোধক। ″ চিহ্ন বিকলা বোধক। দর্শকের স্বস্তিক বা ভূকেন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া উভয় ধ্রুব বিন্দু ও খ বিন্দু ও অধঃস্বস্তিক ভেদ করিয়া যে মণ্ডল অঙ্কিত করা যায়, ঐ মণ্ডলকে যাম্যোত্তর মণ্ডল (Meridian) বলে। ক্ষিতিজ বৃত্তের উপরিস্থিত ঐ মণ্ডলের অর্দ্ধকে তুঙ্গরেখা এবং নিম্নস্থ ঐ মণ্ডলার্দ্ধকে অতুঙ্গ রেখা বলে।

উর্দ্ধ স্বস্তিক, স্বস্তিক ও অধঃস্বস্তিক, এই তিন বিন্দুর যোজক সরল রেখাকে স্বস্তিক রেখা বলে।

স্বস্তিক রেখাকে ব্যাস করিয়া যে বৃত্ত অঙ্কিত করা যায়, ঐ বৃত্তকে দৃগ্বলয় (Vertical circle) বলে। দৃগ্বলয়ের উপর যে তারা বা গ্রহ অবস্থিত থাকে, ঐ তারার বা গ্রহের নামে দৃগ্বলয় পরিচিত হয়। দৃগ্বলয় দক্ষিণোত্তর ধ্রুববিন্দুভেদী হইলে, দৃগ্বলয়কে যাম্যোত্তর মণ্ডল বলে; পূর্ব্ব পশ্চিম স্বস্তিক ভেদী হইলে, দৃগ্বলয়কে সম মণ্ডল (Prime Vertical) বলে। দৃগ্বলয় বিদিক্‌ভেদী হইলে দৃগ্বলয়কে বিদিক্‌-দৃগ্বলয় বলে।

দক্ষিণোত্তর ধ্রুব বিন্দুদ্বয় ও পূর্ব্ব-পশ্চিম স্বস্তিকভেদী মণ্ডলকে উন্মণ্ডল বলে। উন্মণ্ডল দিবা রাত্রির ক্ষয়-বৃদ্ধিকারী।

তারা ও ক্ষিতিজের মধ্যবর্ত্তী দৃগ্বলয় খণ্ড দ্বারা তারার উন্নতি (Altitude) পরিমিত হয়। এবং দৃগ্বলয় খণ্ডের অংশ পরিমাণে উন্নতি ব্যক্ত করা হয়।

ধ্রুব বিন্দুর উন্নতিকে অক্ষোন্নতি (elevation of the pole) বলে। কারণ উহা দর্শকের অক্ষাংশের সমান।

দর্শকের খ বিন্দু হইতে তারার দূরত্বকে দৃক্ (Zenith distance) বলে।

তারার উদয় বিন্দুকে উদয় লগ্ন, অস্তবিন্দুকে অস্তলগ্ন বলে (Ascending and descending points)

তারা যে বিন্দুতে যাম্যোত্তর মণ্ডল পার হয়, ঐ বিন্দুকে মধ্যলগ্ন (Culminating point) বলে। মধ্যলগ্নে তারা উন্নতির চরম সীমা ভোগ করে।

মধ্য লগ্নস্থ তারার দৃক্‌কে নতাংশ (Meridian zenith distance) বলে।

উভয় ধ্রুববিন্দু, তারা ও অপমণ্ডল ভেদ করিয়া যে মণ্ডল অঙ্কিত করা যায়, ঐ মণ্ডলকে অপক্রম মণ্ডল বলে। অপমণ্ডল ও অপক্রম মণ্ডলের শেষ বিন্দুকে তারার সংযোগ-বিন্দু বলে অপ মণ্ডল হইতে তারার উত্তর দূরত্ব বা দক্ষিণ দূরত্বকে বিক্ষেপ বলে।

তারা ও সংযোগ বিন্দুর মধ্যবর্ত্তী অপক্রম মণ্ডল খণ্ডদ্বারা বিক্ষেপ পরিমিত হয়। এবং অপক্রম মণ্ডল খণ্ডের অংশ পরিমাণে বিক্ষেপ—ব্যক্ত করা হয়।

বাসন্তিক ক্রান্তিপাত বিন্দু হইতে তারার পূর্ব্ব দূরত্বকে ধ্রুবক বা ধ্রুব বলে। বাসন্তিক ক্রান্তিপাত বিন্দু ও তারার সংযোগ বিন্দু, এই উভয় বিন্দুর মধ্যবর্ত্তী অপমণ্ডল খণ্ডদ্বারা ধ্রুবক পরিমিত হয়, এবং অপমণ্ডল খণ্ডের অংশ পরিমাণে ধ্রুবক ব্যক্ত করা হয়।

ধ্রুবক পরিমাণ জন্য সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে যোগতারা রেবতীর ১০° পূর্ব্বস্থ বিন্দুকে স্থায়ী বাসন্তিক ক্রান্তিপাত বিন্দু ধরিয়া লওয়া হয়।

তারা ও গ্রহের ধ্রুবক সমান হইলে, ঐ মিলনকে যুতি বা যুদ্ধ (conjuction) বলে।

যুতিতে চন্দ্র পক্ষ হইলে যুতিকে সমাগম (Occultation) বলে। যুতিতে সূর্য্য-পক্ষ হইলে যুতিকে অস্তমন (heliacal setting) বলে।

তারা বা গ্রহ অস্তমনগত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তারা বা গ্রহ ম্লান হয়, তৎকালে তারা গ্রহের বৃদ্ধত্ব হয়।

অস্তমনগত তারা বা গ্রহের উদয়কে হেলীক উদয় (heliacal rising.) বলে। অস্তমন মুক্ত ম্লান তারা বা গ্রহের অবস্থাকে বাল্যত্ব বলে। সূর্য্যগ্রহণ—চন্দ্রবিম্বদ্বারা সূর্য্য-বিম্ব আচ্ছাদিত হইলে সূর্য্যগ্রহণ হয়। ভূচ্ছায়াদ্বারা চন্দ্রমণ্ডল আচ্ছাদিত হইলে চন্দ্রগ্রহণ হয়।

তারা বা গ্রহদ্বয়ের বিক্ষেপে ১৮০° পার্থক্য হইলে, উভয়ের অবস্থিতিকে বৈপরীত্য (opposition) বলে।

সূর্য্যের বিপরীত গ্রহ ও উপগ্রহের বিম্বার্দ্ধ সম্পূর্ণ ভাবে কিরণময় লক্ষিত হয়। গ্রহ ও উপগ্রহের এই উজ্জ্বলতাকে পূর্ণমা বলা যাইতে পারে।

পৃথিবীর শীর্ষোচ্চ বিন্দুস্থিত, গ্রহ ও উপগ্রহের পূর্ণিমাকে পরম পূর্ণিমা বলে।

অপমণ্ডলের উত্তরে ১০° দূরে ও দক্ষিণে ১০° দূরে অপমণ্ডলের সমান্তরাল দুইটী মণ্ডল অঙ্কিত করিলে, উভয় মণ্ডলের মধ্য-বর্ত্তী চক্রাকার ভ-গোলখণ্ড গোলকের কটিবন্ধরূপে অবস্থিতি করিবে। এই কটিবন্ধকে ভ-চক্র বা রাশি-চক্র (Zodiac) বলে।

স্থায়ী বাসন্তিক ক্রান্তিপাত বিন্দু হইতে অর্থাৎ যোগ তারা রেবতীর ১০° পূর্ব্বস্থ বিন্দু হইতে পূর্ব্বাভিমুখে অপমণ্ডল ও ভ-চক্র ৩০° হিসাবে সমান দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত হইলে, ভ-চক্রের এক এক ভাগকে রাশি বলে। এই দ্বাদশ রাশি মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন, এই দ্বাদশ নামে পূর্ব্বাদি-ক্রমে খ্যাত।

তারা ও গ্রহগণের পূর্ব্বদিকে উদয়-লগ্নে উদয় ও পশ্চিম দিকে অস্ত-লগ্নে অস্তগমন নিত্য যে উপলক্ষিত হয়, এই দৃশ্য গতিকে দৈনিক গতি (Diver nalimotion) বলে। যে গতিবলে গ্রহগণ অল্প অল্প করিয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হয়, ঐ গতিকে বাস্তব গতি (Proper motion) বলে।

যে গতি বলে ক্রান্তিপাতদ্বয় পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে সরিয়া যায়, ঐ গতিকে বিলোম গতি (Precession) বলে।

গ্রহ পঞ্চক পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে অল্প অল্প অগ্রসর হইতে উপলক্ষিত হইলে ঐ গতিকে বক্র (Retrograde) গতি বলে।

এক সূর্য্যোদয় হইতে দ্বিতীয় সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সময়কে সাবন দিন বলে।

চন্দ্র যে সময়ে সূর্য্য হইতে ১২° দূরে গমন করিতে পারে, ঐ সময়কে তিথি (Lunar day) বলে।

যে তিথিতে চন্দ্র অস্তমন প্রাপ্ত হয়—ঐ তিথিকে অমা বলে। যে তিথিতে চন্দ্র বৈপরীত্য প্রাপ্ত হয়, তাহাকে পূর্ণিমা বলে।

যে পঞ্চদশ দিন সায়ং সন্ধ্যাকালে চন্দ্র উদিত হয়, ঐ পঞ্চদশ দিনকে শুক্ল পক্ষ বলে। অমার পর তিথি হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পঞ্চদশ তিথিকে শুক্লপক্ষ বলে।

যে পঞ্চদশ দিন সায়ং সন্ধ্যাকালে চন্দ্র অদৃশ্য থাকে, ঐ পঞ্চদশ দিনকে কৃষ্ণপক্ষ বলে। পূর্ণিমার পর তিথি হইতে অমা পর্য্যন্ত পঞ্চদশ তিথিকে কৃষ্ণপক্ষ বলে।

অমাতিথিতে ইন্দুকলা দৃষ্ট হইলে, অমাকে সিনীবালী বলে। অমা তিথিতে ইন্দুকলা দৃষ্ট না হইলে অমাকে কুহূ বলে।

পূর্ণিমা তিথিতে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে কলাহীন চন্দ্র উদিত হইলে, পূর্ণিমাকে অনুমতি বলে, এবং যুগপৎ পূর্ণচন্দ্র-উদয় ও সূর্য্য অস্তগত হইলে, পূর্ণিমাকে রাকা বলে।

এক তিথিতে চন্দ্রের যে খণ্ড বৃদ্ধি বা হ্রাস প্রাপ্ত হয়, ঐ খণ্ডকে কলা বলে।

অমাতিথিতে চন্দ্র ও সূর্য্যের পূর্ণ সাক্ষাৎ হয় বলিয়া অমাকে দর্শ বলে।

নাক্ষত্রিক দিন।—যে সময়ে ভ-চক্র পৃথিবীকে নিত্য পরিভ্রমণ করে—ঐ সময়কে নাক্ষত্রিক দিন বলে। অর্থাৎ যে সময়ে একটী স্থিরতারা দর্শকের খ বিন্দু হইতে পশ্চিম গমন করিয়া পুনরায় দর্শকের খ-বিন্দুতে উপনীত হয়, সেই সময়কে নাক্ষত্রিক দিন বলে।

সৌর—দিন।—যে সময়ে সূর্য্য দর্শকের খ বিন্দু হইতে পশ্চিমে গমন করিয়া পুনরায় দর্শকের খ বিন্দুতে উপনীত হয়, সেই সময়কে সৌরদিন বলে।

মধ্যদিন।—সমগতিবিশিষ্ট কল্পিত সূর্য্য বিষুব মণ্ডলের এক অংশ যে সময়ে ভ্রমণ করে, তাহাকে মধ্যদিন বলে।

চান্দ্রমাস।—চন্দ্রের ৩০ তিথিকে ১ এক চান্দ্রমাস বলে।

মুখ্যচান্দ্র মাস।—শুক্ল প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত ৩০ তিথিকে মুখ্য চান্দ্রমাস বলে।

গৌন চান্দ্রমাস।—কৃষ্ণপ্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ৩০ তিথিকে, গৌণ চান্দ্রমাস বলে।

সৌর-মাস।—যে সময়ে সূর্য্য মেষাদি দ্বাদশ রাশির একরাশি সংক্রমন করেন, সেই সংক্রমনকালকে সৌর-মাস বলে।

অক্ষুণ্ণ।—যে দিনে সূর্য্য কোন রাশিতে প্রবেশ করেন, সেই দিনকে অক্ষুণ্ণ বলে।

সংক্রান্তি।—রাশ্যন্তর-সংযোগানুকূল ব্যাপারকে সংক্রান্তি বলে; কিন্তু সাধারণ ভাষায় মেষ-সংক্রান্তিকে চৈত্র-সংক্রান্তি বলে, মকর-সংক্রান্তিকে পৌষ-সংক্রান্তি বলে।

চান্দ্র বৎসর।—দ্বাদশ অমাবস্যায়—এক চান্দ্র বৎসর হয়।

সৌর বৎসর।—যে সময়ে পৃথিবী স্বীয় কক্ষায় কোন এক বিন্দু হইতে পূর্ব্বগতিতে সূর্য্য পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় ঐ বিন্দুতে উপনীত হয়, সেই সময়কে সৌর বৎসর বলে। অর্থাৎ যে সময়ে সূর্য্য ক্রান্তিমণ্ডলের কোন বিন্দু হইতে পূর্ব্ব গমনে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় ঐ বিন্দুতে উপনীত হয়, সেই সময়কে বৎসর বলে।

ভগণ।—যে সময়ে কোন গ্রহ বাসন্তিক-ক্রান্তিপাত হইতে পূর্ব্বগতিদ্বারা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতঃ পুনরায় ঐ বাসন্তিক ক্রান্তি-পাতে উপনীত হয়,সেই সময়কে ভগণ বলে।

সম্বৎসর।—যে সময়ে বৃহস্পতি এক রাশি সংক্রমণ করেন, সেই সময়কে সম্বৎসর বলে।

দেবদিবা।—যে ছয় মাস সূর্য্য উত্তর গমনে ভ্রমণ করিয়া সুমেরু প্রদেশে অবি-চ্ছেদে আলোক প্রকাশ করেন,সেই ছয়মাস সময়কে দেবদিবা বলে।

দেবরাত্রি।—যে ছয় মাস সূর্য্য দক্ষিণ-গমনে ভ্রমণ করিয়া সুমেরু প্রদেশে অদৃশ্য থাকেন, সেই ছয়মাস সুমেরু প্রদেশ অবিচ্ছেদে অন্ধকারময় থাকে, সেই ছয়-মাসকে দেবরাত্রি বলে।

দেবদিন।—এক বৎসরে এক দেব-দিন হয়।

অসুররাত্রি।—দেবদিনে সুমেরুপ্রদেশে রাত্রি হয়; ইহাকে অসুররাত্রি বলে।

অসুরদিবা।—দেব-রাত্রিতে সুমেরু প্রদেশে দিবা হয়, ইহাকে অসুর-দিবা বলে।

সামুদ্রিকবেলা।—প্রতি তিথিতে দুই বার স্থানীয় যে জল বৃদ্ধি হয় ঐ জল বৃদ্ধিকে সামুদ্রিকবেলা বলে। সাধারণভাষায় ইহাকে জোয়ার বলে।

জলসংকোচ।—প্রতি তিথিতে স্থানীয় জলের যে হ্রাস হয়, ঐ হ্রাসকে জলসংকোচ বলে। সাধারণ ভাষাতে জল-সংকোচকে ভাটা বলে। (ক্রমশঃ)

বৈশেষিক দর্শন।

প্রথম অধ্যায়, প্রথম আহ্নিক।

পূর্ব্বানুবৃত্ত।

রূপ রস গন্ধ স্পর্শাঃ সংখ্যাঃ পরিমাণানি পৃথক্ত্বং সংযোগ-বিভাগৌ পরত্বাপরত্বে বুদ্ধয়ঃ সুখ-দুঃখে ইচ্ছাদ্বেষৌ প্রযত্নাশ্চ গুণাঃ।৬

পদব্যাখ্যা।—

রূপ—শ্বেত, পীত, রক্ত, শ্যাম, নীল, হরিৎ, ইত্যাদি নানাবিধ।

রস—মধুর, অম্ল, তিক্ত, ক্ষার, কষায়, কটু, এই ছয় প্রকার।

গন্ধ—সৌরভ ও অসৌরভ (অর্থাৎ সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ) এই দুই প্রকার:

স্পর্শ—শীতল, উষ্ণ, অনুষ্ণাশীত (অর্থাৎ শীতলও নয় উষ্ণও নয়) এই তিন প্রকার।

সংখ্যা—একত্ব, দ্বিত্ব, ত্রিত্ব, ইত্যাদি।

পরিমাণ—অণু, মহৎ, হ্রস্ব, দীর্ঘ ইত্যাদি।

পৃথক্ত্ব—পার্থক্য বোধের হেতু গুণ-বিশেষ, যেমন মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি হইতে পৃথক্।

সংযোগ—বিভিন্ন স্থান স্থিত বস্তু দ্বয়ের একত্রীভাব (অর্থাৎ সংলগ্নতা)।

বিভাগ—সংযুক্ত বস্তু দ্বয়ের পরস্পর ব্যবধান।

পরত্ব—জ্যেষ্ঠত্ব ও দূরত্ব।

অপরত্ব—কনিষ্ঠত্ব ও নিকটত্ব।

বুদ্ধি—জ্ঞান।

সুখ—সন্তোষ।

দুঃখ—ক্লেশ।

ইচ্ছা—অভিলাষ।

দ্বেষ—অনিষ্টকারী ব্যক্তির প্রতি বিরক্তি বিশেষ।

প্রযত্ন—প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি এবং জীবনযোনি (অর্থাৎ যে যত্ন হইতে শরীরে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া করা হয়)

চ—ও, (এই চকারের অর্থ সমুচ্চয়; ইহাতে এইটি সমুচ্চিত হইতেছে যে, রূপ অবধি প্রযত্ন পর্য্যন্ত যে সপ্তদশটি গুণের নাম উল্লেখ করা হইল, তদ্ভিন্নও গুণ পদার্থ আছে, যথা—গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও শব্দ, এই সাতটি; সুতরাং উক্ত ও সমুচ্চিত উভয়ের সমষ্টিতে চতুর্বিংশতিটী গুণ পদার্থ।)

অনুবাদ—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও শব্দ, এই চতুর্ব্বিংশতিটীকে গুণ বলে। ইহাদের মধ্যে গুরুত্ব অবধি শব্দ পর্য্যন্ত শেষোক্ত সাতটী গুণ পদার্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ থাকায়, সূত্রে নাম উল্লেখ না করিয়া, সমুচ্চয়ার্থ চকারের প্রয়োগে উহাদিগকে সমুচ্চিত করা হইয়াছে।

তাৎপর্য্য—রূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতি সূত্রোক্ত পদার্থ নিচয়, দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, অর্থাৎ দ্রব্য হইতে ইহাদের পৃথক্‌ভাবে অবস্থিতির সম্ভাবনা নাই, এবং ইহারা দ্রব্যের অভিব্যঞ্জকও (প্রকাশক) হয়, এ নিমিত্ত ইহাদিগকে গুণ পদার্থ বলে। যেমন রক্ত পুষ্প; এই স্থলে পুষ্পের রক্তিমা-গুণ কদাচ পুষ্পকে পরিত্যাগ করিয়া পৃথক্‌ভাবে থাকিতে পারে না এবং ঐ রক্তরূপ পুষ্পের প্রকাশকও বটে, অর্থাৎ পুষ্পে যদি রূপ না থাকিত, তবে উহাকে আমরা দেখিতে পাইতাম না। বায়ুতে শ্বেত-পীতাদি কোন রূপ নাই, এজন্য বায়ুকে চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না; বৃক্ষ প্রভৃতিতে শাখা-পল্লবাদির সঞ্চালন মাত্র পরিলক্ষিত হয়। রক্ত জবা কুসুমের রক্তিমাগুণই শ্বেত-পীতাদি-জবা পুষ্প হইতে তাহার ভিন্নশ্রেণীত্ব প্রতিপাদন করিতেছে; কারণ তাহাদের আকৃতিগত পার্থক্য নাই। এইরূপ রস গন্ধ প্রভৃতিও দ্রব্যকে দ্রব্যান্তর হইতে পৃথক্ শ্রেণীত্ব বুদ্ধি জন্মায়। ইক্ষুরস ও খর্জ্জুররসে আকৃতিগত কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না, কিন্তু মাধুর্য্য-বিশেষ কিম্বা গন্ধবিশেষের দ্বারা তাহাদের বিভিন্ন জাতীয়ত্ব প্রতিপত্তির কোন বাধা নাই। গুণ পদার্থ নিচয় যেমন দ্রব্যের অভিব্যঞ্জক হয়, তদ্রূপ দ্রব্যও গুণের প্রকাশক হইয়া থাকে। আম্রাদি সুমধুর ফলনিচয় রসনা সংযুক্ত না হইলে, তাহার মাধুর্য্যের উপলব্ধি হইতে পারেনা। দ্রব্যের সহিত গুণের এতাদৃশ নিকট সম্বন্ধ থাকায়, দ্রব্য নিরূপণের পর গুণ-পদার্থের নিরূপণ করা হইতেছে। পরসূত্রে গমনাদি কর্ম্ম পদার্থের বিভাগ করা হইবে। যদিচ গুণের ন্যায় কর্ম্ম পদার্থেরও দ্রব্যের সহিত নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে, তথাপি ঘট-পটাদি দ্রব্য নিষ্ক্রিয় (চলনাদিশূন্য) অবস্থায় সময় বিশেষে দীর্ঘকাল অবস্থিত থাকে এবং গমনাদি ক্রিয়া

কদাচিৎও কোন ক্রিয়া জন্মে না; কিন্তু ঐ গগনাদি নিত্য দ্রব্য সকল. কদাচিৎ গুণশূন্য অবস্থায় থাকে না এবং ঘট পটাদি জন্য দ্রব্যেও উৎপত্তির পরক্ষণ হইতে স্থিতিকাল পর্য্যন্ত একটী না একটী গুণ অবশ্যই অবস্থান করে, এনিমিত্ত কর্ম্ম পদার্থ নির্ব্বাচনের পূর্ব্বেই গুণের উল্লেখ করা হইতেছে। কেহ কেহ ক্রিয়াকে সংযোগাদি গুণ পদার্থের মধ্যেই অন্তর্নিবিষ্ট করেন, কিন্তু সেই মতটী সম্যক্ নহে; কারণ প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে, ফল বৃক্ষশাখা হইতে পতিত হইয়া ভূতলে সংলগ্ন হইল; ক্ষণবিলম্বেই ফলের চাঞ্চল্য আর থাকিলনা, কিন্তু মৃত্তিকার সহিত তাহার সংযোগ দীর্ঘকাল থাকিয়া গেল; সুতরাং সংযোগ ও পতন যে দুইটী পৃথক পদার্থ, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সূত্রে উল্লিখিত গুণ পদার্থ-সমূহের মধ্যে যে যেটী যে যে সময়ে জগতের মঙ্গলের জন্য সদনুষ্ঠানের প্রযোজক হয়, তখন তাহাদিগকে আমরা গুণ বলিয়া অভিহিত করি, এবং যে যেটী কুৎসিৎ ক্রিয়ার জনক হইয়া বিশ্বের অপকার সাধনের মূলীভূত হইয়া পড়ে, তাহারা তখন গুণ নামের সর্ব্বথা অযোগ্য, এনিমিত্ত দোষ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে গুণ ও দোষ উভয়ই উল্লিখিত গুণ পদার্থের অন্তর্গত অথবা তজ্জনিত সদাচরণ ও অসদাচরণের নামান্তর মাত্র। দৃষ্টান্ত স্থলে বুঝিতে হইবে, দয়ালু ব্যক্তিগণ পরদুঃখে কাতর হইয়া অন্যের দুঃখ বিমোচনে সাধ্যানুসারে যত্নবান হইয়া থাকেন। দয়া একটী [illegible] গুণের সমষ্টি স্বরূপ। দয়াশীলদিগের প্রথমতঃ অন্যের ক্লেশ দেখিয়া নিজের দুঃখ উপস্থিত হয়, এবং তন্নিবন্ধন তাঁহারা পরোপকার করাকে অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করেন। ঐ জ্ঞান হইতে পরদুঃখমোচনে ইচ্ছা জন্মে এবং পরক্ষণেই তাঁহারা তাহাতে সাধ্যানুসারে যত্ন প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই প্রকারে কৃপালু পুরুষের ক্রমশঃ উৎপন্ন দুঃখ, জ্ঞান, ইচ্ছা ও যত্ন, সূত্রে উল্লিখিত গুণ পদার্থের অন্তর্গত এবং ইহারা বাস্তবিক গুণ বলিয়া সর্ব্বসম্মতও বটে; কিন্তু পক্ষান্তরে পরশ্রীতে কাতরতাপন্ন ব্যক্তিগণের ঐ কাতরতা (দুঃখ), পরের অনিষ্ট করাকে কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ, পর-গুণাদিতে দোষারোপ করিবার ইচ্ছা এবং পরের অনিষ্টাচরণাদিতে যত্ন, এই সকল গুণ নামের অযোগ্য হইয়া পুরুষের দোষ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

সূত্রে উল্লিখিত গুণ-পদার্থগুলির বিশেষ পরিচয় অগ্রিম গ্রন্থে যথাস্থানে প্রকাশিত হইবে। শ্বেত-পীত-নীল প্রভৃতি রূপ সকল এক মাত্র চক্ষুরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অর্থাৎ নয়ন ব্যতীত অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপ দেখা যায় না। এই প্রকার মধুর; অম্ল, তিক্ত প্রভৃতি রসকে এক মাত্র রসনেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায়। সৌরভ ও অসৌরভ অর্থাৎ সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ একমাত্র ঘ্রাণেন্দ্রিয় (নাসিকা) দ্বারা অনুভূত হয় এবং শীত, উষ্ণ ও অনুষ্ণাশীত (শীতও নয় উষ্ণও নয়) এই তিন প্রকার স্পর্শের প্রত্যক্ষ করিতে হইলে, একমাত্র ত্বগিন্দ্রিয় ব্যতীত অন্য ইন্দ্রিয়ের কোন উপযোগিতা

নাই। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, ইহারা প্রত্যেকে এক একটি বহিরিন্দ্রিয় হইতে প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। ইহাদের আরও বিশেষ আছে যে, সূর্য্য-কিরণাদির দ্বারা দ্রব্যের পাক হইলে, রূপাদিরও পার্থক্য হয়। অনেক প্রকার আম যখন অপক্ব (কাঁচা) থাকে, তখন তাহার শ্যামরূপ, অম্লরস, একবিধ গন্ধ ও কঠিন স্পর্শ থাকে, পরে ঐ আমের সুপক্ব দশায় বর্ণ লাল হয়, রস সুমধুর হয়, তখন তাহার সুগন্ধে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি জন্মে এবং তাহার স্পর্শও সুকোমল হয়। রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ, ইহারা প্রত্যেকে উদ্ভূত ও অনুদ্ভূত ভেদে দুই প্রকার। স্থূল দ্রব্যে যে সমস্ত রূপাদির প্রত্যক্ষ হয় না, তাহারা অনুদ্ভূত এবং তদ্ভিন্নের নাম উদ্ভূত। কোন মৃত্তিকা-নির্ম্মিত পাত্রকে অত্যন্ত উত্তপ্ত করিলে, তন্মধ্যে যে বহ্নিরাশি প্রবেশ করে, সেই বহ্নির রূপ অনুদ্ভূত; চক্ষু দ্বারা তাহার প্রত্যক্ষ হয় না, অথচ সেই পাত্র মধ্যে শুষ্ক বস্ত্র খণ্ডাদি প্রক্ষিপ্ত হইলে, ঐ বস্ত্র খণ্ড তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হইতে দেখা যায়। কোন দিন রাত্রি কালেও অসম্ভব গ্রীষ্ম বোধ হইয়া থাকে। ঐ গ্রীষ্মে উষ্মার রূপ উদ্ভূত নহে, অথচ তাহার উষ্ণ স্পর্শ হইতে শরীরে অত্যন্ত গ্রীষ্ম বোধ হয়, এজন্য তাহাকে তেজের অংশ বলিতে হইবে, কিন্তু ইহাতে উদ্ভূত রূপ না থাকায় চক্ষু দ্বারা ইহাকে দেখা যায় না। পাষাণে উদ্ভূত রূপ আছে বটে, কিন্তু তাহার রস ও গন্ধ অনুদ্ভূত। ঐ রসের ও গন্ধের সম্বন্ধে উপলব্ধি হয় না; যদিও পাষাণে যে রস কিম্বা গন্ধ নাই, এমত নহে; কারণ প্রস্তরকে দগ্ধ করিলে, তাহা হইতে গন্ধ নির্গত হয় এবং উহার ভস্ম রসনাসংলগ্ন হইলে, এক প্রকার রসেরও অনুভব হইয়া থাকে। সুবর্ণ এক প্রকার তৈজস পদার্থ বলিয়া সিদ্ধান্তিত, উহার উষ্ণ স্পর্শটী অনুদ্ভূত, এ নিমিত্ত সুবর্ণখণ্ড হস্তে গ্রহণ করিলে উষ্ণ বলিয়া বোধ হয় না। এই সকল দৃষ্টান্তে অনুদ্ভূত রূপাদি বুঝিতে হইবে এবং অনুদ্ভূত ব্যতীত অন্যান্য রূপ প্রভৃতিকে উদ্ভূত বলিয়া বুঝিবারও কোন বাধা নাই। সূত্রে "রূপ রস-গন্ধ স্পর্শাঃ" এই চারিটী গুণবাচক শব্দে দ্বন্দ্ব সমাস করিয়া একটী মাত্র বিভক্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অথচ "সংখ্যাঃ পরিমাণানি" ইত্যাদি স্থলে সমাস করা হয় নাই; ইহার উদ্দেশ্য এই যে, উল্লিখিত প্রকারে রূপ-রস-গন্ধ ও স্পর্শ, এই গুণচতুষ্টয়ের অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন "সংযোগ বিভাগৌ" "পরত্বাপরত্বে" "সুখ দুঃখে" "ইচ্ছা দ্বেষৌ" এই সকল স্থলেও দুই দুইটী গুণবাচক পদে সমাস করা হইয়াছে, কারণ ইহারাও দুই দুইটী এক এক শ্রেণীর গুণ। পক্ষিগণ উড়িতে উড়িতে বৃক্ষশাখায় যখন পতিত হয়, তখন পাখীর সহিত বৃক্ষের সংযোগ হয়, আবার পাখী উড়িয়া গেলে অমনি তাহার সহিত বৃক্ষের বিভাগ জন্মে; অতএব বুঝা যাইতেছে যে, সংযোগ বিভাগ, এই উভয় গুণই চলন-জনিত, সুতরাং এক শ্রেণীস্থ।

জ্যেষ্ঠত্ব স্বরূপ পরত্ব ও কনিষ্ঠত্ব স্বরূপ অপরত্ব, এই উভয়ের প্রতীতির প্রতি কাল

(সময়) কারণ, এবং দূরত্ব রূপ পরত্ব ও নিকটত্ব রূপ অপরত্ব, এই উভয়েরই প্রতীতি দিক্ হইতে জন্মে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, পরত্ব ও অপরত্বের প্রতীতিতে কারণগত সাম্য আছে। সুখ ও দুঃখ, এই উভয়টী সদসৎ কর্ম্ম জনিত, অদৃষ্টবিশেষের ফল। তন্মধ্যে সৎ কার্য্য হইতে সুখ ও কুকার্য্য হইতে শেষে দুঃখ জন্মে। এই সুখ ও দুঃখ উভয়ই কর্ম্মজনিত, সুতরাং এক জাতীয়। ইচ্ছা ও দ্বেষ, এই দুইটী গুণও এক শ্রেণীর; ইচ্ছা জন্মিলে কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় এবং বিদ্বেষ জন্মিলে তাহাতে নিবৃত্তি হয়। এই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ই প্রযত্ন পদার্থ, সুতরাং প্রযত্নের কারণ বলিয়া "ইচ্ছাদ্বেষৌ" এই রূপ এক সমাসান্তর্গত করা হইয়াছে।

সূত্রে "প্রযত্নাশ্চ" এইস্থলে যে সমুচ্চয়ার্থ চকারের প্রয়োগ আছে, তাহাদ্বারা গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও শব্দ, এই প্রসিদ্ধ সাতটী গুণ পদার্থের সূচনা বুঝিতে হইবে। যে পদার্থে কিঞ্চিন্মাত্রও ভার থাকে, তাহাতেই গুরুত্ব আছে। এ নিমিত্ত গুরুত্বের ন্যায় লঘুত্ব একটী পৃথক্ গুণ নহে। গুরুত্ব নামক গুণ পদার্থ অতীন্দ্রিয়, তোলা-মাসা-মণ প্রভৃতি পরিমাণ হইতে পৃথক্। এই গুরুত্বই পতন রূপ ক্রিয়ার প্রতি কারণ। বায়ুতে কিম্বা বহ্ন্যাদি তেজে গুরুত্ব নাই, পৃথিবী ও জল ইহার আশ্রয়; দ্রবত্ব অর্থাৎ তরলতা গুণ জলে স্বভাবতঃ থাকে, ঘৃত প্রভৃতিতে সময়বিশেষে জন্মে। স্নেহ গুণ থাকাতে বস্তু সকল স্নিগ্ধ বলিয়া ব্যবহৃত হয়, তৈলাদিতে স্নিগ্ধ গুণের প্রকর্ষতা আছে। সংস্কার তিন প্রকার—ভাবনা, বেগ ও স্থিতি-স্থাপক। ভাল করিয়া কোন বিষয়টী পড়িলে অথবা উপেক্ষা না করিয়া কোন বস্তু দেখিলে বা স্পর্শ করিলে, আত্মায় যে সংস্কার জন্মে, অর্থাৎ যাহা হইতে সময়ান্তরে সেই অনুভূত বিষয়গুলির স্মরণ জন্মিতে পারে, ঐ সংস্কারের নাম ভাবনা। বেগাখ্য সংস্কার থাকা প্রযুক্ত ঘটাদি বস্তুর সঞ্চালন হয়। গাছের ডাল কিম্বা বাঁশের অগ্রভাগ নোয়াইয়া ছাড়িয়া দিলে ঐ শাখা কিম্বা বাঁশ পুনর্ব্বার যথাস্থানে যায়, শাখা প্রভৃতির ঐ সংস্কারকে স্থিতি স্থাপক সংস্কার বলে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই দুয়ের নাম অদৃষ্ট। সকল সময়ে সদাচরণের কিম্বা অসদাচরণের ফল তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায় না, দীর্ঘকাল পরে পাইতে হয়, এজন্য সৎক্রিয়া-জনিত শুভাদৃষ্ট অর্থাৎ ধর্ম্ম এবং কুকার্য্য জনিত দুরদৃষ্ট অর্থাৎ অধর্ম্ম নামক গুণদ্বয় স্বীকার করিতে হয়। এই গুণদ্বয় হইতে ভবিষ্যতে সুখ ও দুঃখ জন্মে। শব্দ, ধ্বনি ও বর্ণ ভেদে দ্বিবিধ। মৃদঙ্গাদি হইতে যে শব্দ শুনা যায়, উহার নাম ধ্বন্যাত্মক শব্দ এবং কণ্ঠ তালু প্রভৃতির আঘাত জনিত ক খ প্রভৃতিকে বর্ণাত্মক শব্দ বলে। জলের তরঙ্গমালার ন্যায় এক শব্দ হইতে অপর শব্দের উৎপত্তি হওয়াতে শব্দ সকল ক্রমশঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ে উৎপন্ন হইয়া শ্রুত হয়। কেহ কেহ বলেন, কদম ফুলের কলিকার ন্যায় একটী শব্দ হইতে দুইটী, এবং দুইটীর প্রত্যেক হইতে দুই তিনটী শব্দ জন্মে, তাহাতে ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকে বহু শব্দের

উৎপত্তি হওয়ায় উহা বহু পুরুষের ক্রত হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

শ্রীগিরিশচন্দ্র তর্কতীর্থ।

গীতার্থ।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের আবশ্যকতা এবং ঐতিহাসিক ঘটনা।

ভারতীয় আর্য্যগণ হিমালয়ের উচ্চতম শিখরস্থ বৈজয়ন্তবাসী সুর বা দেবগণের বংশোদ্ভূত; ঐ বৈজয়ন্তবাসী সুরগণ সুমেরু-বাসী ব্রহ্মের মানস-পুত্র মরীচি, দক্ষ প্রভৃতি দশ প্রজাপতিগণের সন্ততি। প্রকৃতিদেবী, ক্রমোন্নতির নিয়ম অনুসারে মানবকুল সৃষ্টি করিয়া, জ্ঞান-বুদ্ধি বিকাশের উপযোগী স্বভাব রূপে তাহাদের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। মানবকুলের অতি শৈশবকালে প্রকৃতি মাতা স্বয়ং শিক্ষয়িত্রী না হইলে মানবের চিরকাল অজ্ঞানান্ধকারে কাল যাপন করিতে হইত; মানব জীব-জগতে শ্রেষ্ঠ হইত না। কিন্তু সমস্ত মানবকুলই যে প্রথমে প্রকৃতিমাতার জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে স্বভাবতঃই জ্ঞানরত্ন লাভ করিয়াছিল, এমত নহে, তবে অনন্ত প্রকৃতির অভ্যন্তরে যে মহত্তত্ত্ব বা বিশ্বনিয়ামিকা বিরাট মানস-শক্তি অন্তর্নিহিত আছে, সেই বিরাট মানস-শক্তির অনন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে কোন সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে অন্ততঃ কতিপয় মানব (দেশ, কাল, অবস্থা এবং প্রকৃতির অনুকূলতা ও কঠোরতার সংঘর্ষণে) কিয়ৎ পরিমাণ জ্ঞান-রত্ন লাভ না করিলে, মানবকুলের প্রথম অন্ত শিক্ষক অভাবে ঐ মানব জাতির চিরকাল অসভ্যাবস্থায় কালযাপন করিতে হইত। যে কতিপয় আদর্শ মানবে ব্রহ্মের বিশ্ব নিয়ামিকা মহামানসশক্তির অনন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে জ্ঞানরত্ন স্ফুরিত হইয়াছিল, তাহারাই ব্রহ্মের মানসপুত্র। পুরাণে বর্ণিত আছে, সুমেরুস্থিত মানসপুত্র—প্রজাপতি দক্ষের ঔরসে এবং অপর মানসপুত্র মনুকন্যা প্রসূতির গর্ভে বুদ্ধি, মেধা, ধৃতি, স্মৃতি, লজ্জা, শান্তি, সিদ্ধি, কীর্ত্তি, প্রীতি, দয়া, ক্ষমা, নীতি ও সতী প্রভৃতি চতুর্বিংশতি কন্যার উৎপত্তি হইয়াছিল তন্মধ্যে ত্রয়োদশটীর সহিত ধর্ম্মের এবং দশটীর সহিত দেবাসুরের পিতামহ মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণের এবং সতীর সহিত সর্ব্বমঙ্গলময় শিবের বিবাহ হইয়াছিল; ঐ সতীই যে দেবাসুরের পিতৃপিতামহগণের সর্ব্বমঙ্গলালয়া, সর্ব্বার্থ-সাধিকা, সুনীতিপূর্ণা সমবেত সৎশক্তি, তাহার আর সন্দেহ নাই। দক্ষ হইতে সতীর জন্ম স্বাভাবিক, ঐ দক্ষের পতনেই সতীর পতন। যাহাহউক, দক্ষযজ্ঞে আর্য্য-পিতামহগণ সেই সমবেত সৎশক্তি হারাইয়া দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া নানা দিগ্‌দেশ অতিক্রম করতঃ হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গারোহণ পূর্ব্বক সুরসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলে, ঐ সতী পুনর্ব্বার হিমালয়পর্ব্বতজাতা সেই সুরগণের দিগন্তব্যাপী প্রভাশালী অপরিমেয় সমবেত তেজ ও শক্তিরূপে অবতীর্ণা হইয়া অসুর জয় পূর্ব্বক বিজয়সূচক বৈজয়ন্ত ধাম নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। এই বৈজয়ন্তবাসী সমবেত আর্য্যপিতামহ—সুরগণের মধ্যে বরুণদেব সেনাপতি কার্ত্তিক, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি

বৃহস্পতি, জ্ঞানে বাগ্‌দেবী সরস্বতী, ধনৈশ্বর্য্যে স্বয়ং লক্ষ্মী, সিদ্ধিতে গণেশ, তেজে সূর্য্য, ধর্ম্মে স্বয়ং ধর্ম্মরাজ, গতিতে পবন এবং সমবেত শক্তিতে স্বয়ং মূর্ত্তিমতী মহাশক্তি অসুরনাশিনী দুর্গতিনিবারিণী দুর্গা ছিলেন। যাঁদের অস্ত্র বৈদ্যুতিক, যান বিমান, গতি বায়ু; যাঁহাদের উদ্যান নন্দনকানন, সম্পত্তি কামধেনু, রত্ন পারিজাত, ভাণ্ডারী কুবের ছিলেন, যে জাতির প্রত্যেকের শক্তি ও তেজ একত্রিত ও মিলিত হইয়া উষ্ণস্পর্শ তেজরাশি দিগন্তব্যাপী জ্বলনশীল পর্ব্বতের ন্যায় দীপ্তিমান হইয়াছিল এবং যে জাতির দেহ ও মানসোৎপন্নাঃ দিগন্তব্যাপী প্রভাশালী অপরিমেয় তেজরাশি মিলিত হইয়া মহাশক্তিরূপে আবির্ভূতা হইয়া ছিলেন, সে জাতির বীরত্ব, ঐশ্বর্য্য, একতা, এবং মহাপ্রাণতা কি আশ্চর্য্যজনক! সেই জাতি যদি দেবতা না হইবে, তবে দেবতা আর কাহাকে বলা যাইতে পারে? সেই দেবকুলের বংশধরগণই সূর্য্য ও চন্দ্র বংশোদ্ভূত নৃপতিবৃন্দ। ঐ দেবকুলের আধ্যাত্মিক ও লৌকিক উভয় প্রকার ব্যাখ্যা গীতার শ্লোকার্থ ব্যাখ্যার সময় প্রদর্শিত হইবে। উপরোক্ত দেবকুলোদ্ভূত আর্য্যপিতামহগণ হিমালয় হইতে অবতরণ এবং ভারতাগমন পূর্ব্বক ভারতবাসী অনার্য্য রাক্ষস, দৈত্য ও নাগ প্রভৃতি ক্রূর অসভ্য বর্ব্বর জাতিকে জয় এবং তাহাদের মধ্যে কতকাংশ বশীভূত ও কতকাংশ বিতাড়িত করতঃ প্রাকৃতিক নিয়মে বর্ণ বিভাগ এবং আশ্রম ধর্ম্ম প্রবর্তিত করিয়া ভারতের উত্তর ভাগে আর্য্যাবর্ত্ত নামে শীঘ্রাধিপত্য স্থাপন করিয়া ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যেই জ্ঞানযোগে মহর্ষি বশিষ্ঠ, কপিল, গৌতম, ভরদ্বাজ ও যাজ্ঞবল্ক্য, ভক্তিযোগে নারদ, শাণ্ডিল্য প্রমুখ দেবর্ষি ও মহর্ষিবর্গ; কর্ম্মযোগে বিশ্বামিত্র জনক প্রমুখ রাজর্ষিবর্গ; বল, বীর্য্যে রঘু প্রমুখ নৃপতিবৃন্দ; কীর্ত্তিতে ভগীরথ প্রমুখ রাজেন্দ্রবৃন্দ ছিলেন এবং সর্ব্ব সামঞ্জস্যের আধার সুদর্শন-নীতিচক্রধারী উদার অথচ রক্ষণনীতির পূর্ণ অবতার রামচন্দ্র আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণাবতারের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা সমসাময়িক কালে যেরূপ কতকগুলি আসুরী প্রকৃতি নৃপতিবৃন্দের অভ্যুদয় হওয়ায়, গৃহবিবাদ, সমাজ-বিপ্লব, ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছিল, রামাবতারের পূর্ব্বেও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে অধিকার ঘটিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও আত্মকলহ উপস্থিত হইয়ার প্রায় ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস হইয়াছিল, তদ্ধেতু রাক্ষস প্রভৃতির পুনঃ অভ্যুত্থান হওয়ায় ঐ অনার্য্য রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক আর্য্যসমাজ ঘোর উৎপীড়িত এবং মুমূর্ষু অবস্থাপন্ন হইয়া ধ্বংসনীতির কবলাগত প্রায় হইয়াছিল। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের মধ্যে অধিকার ঘটিত বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রমাণ স্বরূপ বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে বিবাদ, বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তির চেষ্টা, বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক বশিষ্ঠের শত পুত্র নাশ, গায়ত্রীর শাপ ও উদ্ধার, নহুষ রাজা কর্ত্তৃক রথে অশ্বের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণ যোজনা ও ব্রাহ্মণের মস্তকে পদাঘাত, ব্রাহ্মণের অভিশাপ, রাজর্ষি জনক কর্ত্তৃক শাস্ত্রে ব্রাহ্মণগণের পরাজয়, বেদের ব্রাহ্মণোক্ত যাগ-যজ্ঞের পরিবর্ত্তে উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবিদ্যা-প্রচার, কপিল ঋষি কর্ত্তৃক সগর [illegible] অশ্বমেধ যজ্ঞে

তৎকালে মথুরাধিপ কংস পিতাকে রাজ্যচ্যুত, ভগ্নী ও ভগ্নিপতিকে কারারুদ্ধ,জ্ঞাতি-বর্গ,আত্মীয় স্বজন ও প্রজাবর্গের প্রতি ঘোর উৎপীড়ন করিয়া, আর্য্যলক্ষ্মীকে পদদলন করিতেছিল, মগধের অধীশ্বর জরাসন্ধ পর রাজ্য অন্যায় আক্রমণ এবং ভারতের ষড়-শিতি নৃপতি বৃন্দকে বলিদান দিবার নিমিত্ত কারারুদ্ধ করিয়া ভারতমাতা আর্য্যলক্ষ্মীর হস্ত-পদাদি-অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছেদন করিতে উদ্যত হইয়াছিল, চেদীশ্বর শিশুপাল ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া গোপনে শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী দ্বারকা নগরে অগ্নিপ্রদান এবং যাদবগণকে বিনা কারণে হত্যা করিয়া দুর্নীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন ; তদ্ভিন্ন ধন ও যৌবনোন্মাদে মত্ত হইয়া বামনের চন্দ্র ধরার ন্যায় উদার ধর্ম্মনীতি সংস্থাপক স্থিতি-শক্তির আধার সুদর্শননীতিচক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের ভাবী পত্নী ভীষ্মকরাজদুহিতা রুক্মিণীকে হরণ করিতে উদ্যত এবং ঐ উদার ধর্ম্ম-নীতির অবতার শ্রীকৃষ্ণের সহিত ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। দুর্য্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি ভ্রাতৃ বর্গকে বিনাশের চেষ্টা করিয়া তাহাতে অকৃতকার্য্য হওয়ায়, তাঁহাদের প্রাপ্য রাজ্যাপহরণের নিমিত্ত ঘোরতর পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া হিংসানল প্রজ্বলিত করতঃ ভারতমাতা আর্য্যলক্ষ্মীকে ঐ হিংসানলে আহুতি দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ উপনিষদুক্ত সাম্যনীতি ও সার্ব্বজনীন উদার ধর্ম্ম এবং বিষ্ণুপ্রীত্যর্থে বিশ্বহিতকর সাত্ত্বিক যজ্ঞের পরিবর্ত্তে ভেদনীতি, স্বার্থমূলক জীবনঘাতক রাজসিক ও তামসিক যাগ-যজ্ঞ ও কর্ম্ম-কাণ্ড প্রবর্ত্তিত করতঃ জ্ঞান ও কর্ম্মযোগ-ভ্রষ্ট হইয়া আর্য্য জাতিকে ঘোর পাপ-পঙ্কে নিমজ্জিত করিতেছিলেন ; প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হওয়ায়, সাধুদিগের পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতীদিগের ধ্বংস পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্য বিশ্বনিয়ামক পূর্ণ জ্ঞান ও মঙ্গলের অবতার শ্রীকৃষ্ণ রূপ মঙ্গল, চক্র রূপ সুদর্শন বা সুনীতি, গদারূপ দণ্ড বা শাসন এবং পদ্মরূপ শক্তির সহিত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বিশ্বে, সংসার-বন্ধনের চারিটী রজ্জু যথা— সন্তানের স্নেহ, পতি বা পত্নী প্রেম,বন্ধুপ্রীতি; পিতৃ বা মাতৃ ভক্তি; এই স্নেহ, প্রেম, প্রীতি ও ভক্তি নিঃস্বার্থ, উদার ও বিশ্বব্যাপী হইলে বিশ্বের বন্ধন অতিক্রম করিয়া বিশ্বেশ্বরের চরণ বন্দন করা যাইতে পারে। যাঁহার গৃহই বিশ্ব, যাঁহার বিশ্বের প্রত্যেক ভূতে যথাক্রমে নিঃস্বার্থ সন্তানস্নেহ, পতি বা পত্নী-প্রেম, বন্ধুপ্রীতি, পিতৃ বা মাতৃ ভক্তি বিস্তৃত হয়,সেই জীবন্মুক্ত পুরুষ বা স্ত্রী বিশ্বেশ্বরে লীন হয়েন। আবার যিনি, স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে, সাধারণ জনগণের অকৃত্রিম নিঃস্বার্থ পুত্র-স্নেহ,পতি বা পত্নী-প্রেম, বন্ধু-প্রীতি, পিতৃ বা মাতৃভক্তি সমভাবে প্রাপ্ত হন, তিনি স্বয়ং বিশ্বেশ্বর স্বরূপে বিশ্বে লীন হন। শ্রীকৃষ্ণ কৈশোর কালে গোপ ও গোপিনীদিগের নিকট অকৃত্রিম পুত্রস্নেহ,পিতৃভক্তি, নিঃস্বার্থ পতিপ্রেম, বন্ধুপ্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি ঐ কৈশোর কালে পুতনা ও বকাসুর প্রভৃতি বিনাশ; কালীয় নাগ দমন প্রভৃতি গোকুলের কয়েকটী অশুভ নাশ করিয়া

বৃন্দাবনে চিরপ্রচলিত সকাম ইন্দ্রযজ্ঞের পরিবর্ত্তে গোবর্দ্ধন ধারণরূপ সাধারণের হিতকর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া উদার নীতির পোষণ ও নিষ্কাম কর্ম্মের প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। যৌবনে কর্ম্মক্ষেত্রে পদার্পণ মাত্রেই নিঃস্বার্থে সাধারণের হিতার্থে দেশের কণ্টক স্বরূপ কংসরাজকে ধ্বংস পূর্ব্বক তাঁহার পিতা উগ্রসেনকে পুনঃ রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া ব্রজ ও মথুরাবাসী জনগণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তদনন্তর মৃত কংসরাজের শ্বশুর ভারতের প্রবল পরাক্রান্ত মগধরাজ জরাসন্ধ কর্ত্তৃক মথুরা বারম্বার আক্রমিত হওয়ায় এবং যাদব সৈন্যাপেক্ষা জরাসন্ধের সৈন্য শতগুণ বিধায়, বিশেষতঃ মথুরার দুর্গ উত্তমরূপ সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় না থাকা প্রযুক্ত জরাসন্ধের আক্রমণ হইতে অন্ধ, ভোজ, বিষ্ণি ও যদুকুল এবং সাধারণ প্রজাবর্গকে রক্ষা, জীবহত্যা ও সৈন্য ক্ষয় নিবারণ এবং আত্মবল সঞ্চয় ইত্যাদি জন্য পশ্চিম ভারতে সিন্ধুতীরে রৈবতক পর্ব্বতমালা-বেষ্টিত শত্রুগণের অনধিগম্য দুশ্ছেদ্য ও দুর্ভেদ্য দুর্গ এবং সৌধমালা-পরিশোভিত দ্বারকা নাম্নী মহানগরী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সপ্রজা অন্ধ-ভোজ-বিষ্ণি ও যদুকুল সহিত তথায় যাদব রাজ্য সংস্থাপন করণান্তর ভেদ ও রক্ষণনীতির পরিবর্ত্তে উদার সাম্য নীতির প্রবর্ত্তন, খণ্ড রাজ্যের পরিবর্ত্তে অদ্বিতীয় অখণ্ড মহান্ ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন এবং বেদোক্ত সকাম যাগ-যজ্ঞ ও কর্ম্ম কাণ্ডের পরিবর্ত্তে অনাসক্তভাবে নিষ্কাম কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও বিষ্ণু-প্রীত্যর্থে বিশ্বহিতকর যজ্ঞ প্রবর্ত্তন এবং সাম্য ও উদার নৈতিক বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার যাহাতে হয়, তৎপক্ষে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। উপরোক্ত মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইলে, জ্ঞান এবং বাহুবল, উভয়ই আবশ্যক, এই জন্য বাহুবলের সহায় নীতি-ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণকে অবলম্বন করিয়া উপরোক্ত গুরু কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। মহাভারতের আদিপর্ব্ব হইতে উদ্যোগ পর্ব্ব পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রমাণিত হইবে যে, বিনা যুদ্ধে বা বিনা রক্তপাতে কৌশলে উপরোক্ত গুরুকার্য্যগুলি সম্পন্নকরা তাঁহার একান্ত অভিপ্রেত ছিল। পঞ্চাল নগরে দ্রুপদ রাজকন্যা দ্রৌপদীর বিবাহের সভায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবগণের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। যখন সমবেত রাজগণ লক্ষ্যভেদী ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণের উদ্ধত বাক্যে ক্রোধান্ধ হইয়া ঐ ব্রাহ্মণকে শাস্তি দিতে এবং দ্রৌপদীকে বল পূর্ব্বক হরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তখন শ্রীকৃষ্ণ উক্ত রাজগণকে কতিপয় নীতিগর্ভ বাক্যদ্বারা ঐ অন্যায় যুদ্ধ হইতে নিরস্ত করেন এবং ঐ স্থানেই রাজগণ কর্ত্তৃক কৃষ্ণের বীরত্ব ও গৌরব সূচিত হইয়াছে এবং দরিদ্র বিপন্ন পাণ্ডবগণের প্রতি তাঁহার করুণা ও সদ্ব্যবহারদ্বারা যথোপযুক্ত সমদৃষ্টি ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা লক্ষিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ঐ বিবাহ-সভায় পাণ্ডবগণের নীতিধর্ম্মপরায়ণতা, বীরত্ব ও কৌশল ইত্যাদি দৃষ্টি করিয়া, উঁহারাই যে তাঁহার অভীপ্সিত গুরু কার্য্য সম্পাদন করিবার ভাবী আশার একমাত্র অবলম্বন, ইহা যে তিনি তৎকালেই স্থির করিয়াছিলেন, তাহা পরবর্ত্তী কার্য্যদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। ঐ সভায় সর্ব্বপ্রথমে শ্রীকৃষ্ণের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে

অশ্বাপহরণ, সগর-পুত্রগণ কর্তৃক ঐ কপিল ঋষির অবমাননা, তৎকর্তৃক সগরবংশ ধ্বংস, পরশুরামের মাতৃবধ, পরশুরাম কর্তৃক এক বিংশতি বার ক্ষত্রিয় নাশ ইত্যাদি রামায়ণ মহাভারত এবং পুরাণ সমূহের মধ্যে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং আত্মকলহ হইতে ক্ষত্রিয় কুলধ্বংস প্রায় হওয়ায় রাক্ষসগণ কর্তৃক আর্য্য-সমাজের শীর্ষস্থানীয় শাস্ত্রপ্রণেতা ও ব্যবস্থাপক মহর্ষি প্রমুখ সমাজনেতা ব্রাহ্মণগণ ও সমাজের শাসনকর্ত্তা রক্ষক শস্ত্রপাণি ক্ষত্রিয়গণ উৎপীড়িত এবং তাঁহাদের কর্ত্তব্য কার্য্যের বিঘ্ন হওয়ায়, আর্য্যসমাজ বিশৃঙ্খল এবং জাতীয় জীবন অকালে ধ্বংস নীতির কবলাশ্রিত হইয়াছিল। তাহাতে ঐ কৈশোর আর্য্যসমাজের মনঃপীড়া ও সরল আর্ত্তনাদ অম্বর রাজ্য ভেদ করিয়া মহাকারণক্ষেত্রে সর্ব্বজ্ঞান ও সর্ব্বমঙ্গলময়ের বিশ্বনিয়ামিকা শক্তির নিকট পৌঁছিয়া অকালবোধন দ্বারা সেই মহাশক্তি জাগরিত করিয়াছিল, তাহাতে ঐ আর্য্যসমাজের ঘোরতর পীড়ারূপ মহা শত্রু বিনাশের নিমিত্ত সেই সর্ব্বজ্ঞান ও মঙ্গলময়ের সুদর্শন-নীতি-চক্র স্বয়ং ভিষক্ স্বরূপ অবতীর্ণ হইয়া বহুকালব্যাপী অন্তর্জাতীয় বিদ্বেষসূচক ভেদনীতিরূপ প্রাচীন হরধনু ভগ্ন পূর্ব্বক সেই হিমালয়-জাতা সর্ব্বমঙ্গলাময়ী সর্ব্বার্থসাধিকা বিশ্বনিয়ামিকা মহাশক্তিসম্ভূতা আর্য্যসমাজের মহা প্রাণদাত্রী সমবেত শক্তিরূপিণী আর্য্যমহালক্ষ্মীর সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে রক্ষণ-নীতির পূর্ব্বকর্ম্মার অপহারক তামসের প্রধান ছত্রত অনার্য্য জাতিকে ধ্বংস পূর্ব্বক অবশিষ্ট অনার্য্য জাতিকে বশীভূত করিয়া আর্য্যানার্য্য-শক্তি-সম্মিলনে ভারতভূমিকে এক ছত্র এবং একটী সর্ব্ব প্রধান রাজশক্তি ও ক্ষমতার বশে আনয়ন করিয়া ধর্ম্ম-রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। *

ভারতে ঐ ধর্ম্মরাজ্য বহুকাল অক্ষুণ্ণভাবে ছিল। কিন্তু কাল কখনও নিস্তব্ধ থাকিতে পারে না; কালের অভ্যন্তরে যে দৈবী ও আসুরী শক্তির অলক্ষ্য সংগ্রাম চলিতেছে, তাহাতে একতর শক্তিকে পরাজয় করিয়া অন্যতর শক্তি প্রবলা হয়। যেমন বালকের বাল্য ক্রীড়ার সহিত বলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কৈশোরে বিদ্যার প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যৌবনে ধনসম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য এবং ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রৌঢ়ে ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও নীতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বৃদ্ধের কেবল বাক্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্বতঃই উপস্থিত হয়। সেইরূপ আর্য্যসমাজে শৈশব দেব যুগ হইতে বর্ত্তমান বার্দ্ধক্য কাল পর্য্যন্ত ঐ প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়া আসিতেছে। দেবযুগে শৈশব-আর্য্যসমাজে দেবাসুরের যুদ্ধে শক্তি বা বলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা।† কৈশোর আর্য্যসমাজে ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয়গণের বিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞান লাভের নিমিত্ত সরল প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হইয়াছিল; ‡ উদার

* প্রাচীন কালে অশ্বমেধ যজ্ঞ সর্ব্বোপের রাজশক্তির পরিচায়ক; উহাতে সগর দিলিপ প্রভৃতি অকৃতকার্য্য হন; পরে উহা রামকর্তৃক সম্পাদিত হয়।

† দেবযুগে শক্তিই নায়িকা। মার্কণ্ডেয়চণ্ডী দ্রষ্টব্য।

‡ আর্য্য জাতির বা আর্য্য সমাজের যৌবনাবস্থাতেই বিষয় ঘটিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাই কৌরব-যুদ্ধ; প্রৌঢ়ে বুদ্ধের ধর্ম্মনীতির এবং এখন বৃদ্ধাবস্থায় কেবল বাক্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়া আসিতেছে।

রক্ষণ নীতির পূর্ণ অবতার রামচন্দ্র কর্ত্তৃক ধর্ম্ম রাজ্য সংস্থাপনের পর ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে জ্ঞানাধিকার ঘটিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিম্বা আর্য্যানার্য্যের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিরোধ বা সংঘর্ষণ উপস্থিত হয় নাই। অনার্য্য জাতির শক্তির হ্রাস এবং তাহারা আর্য্য জাতির অধীন হওয়ায় এবং ব্রাহ্মণগণ ধনৈশ্বর্য্যের প্রত্যাশী না হওয়ায়, যৌবন-উদ্দীপ্ত আর্য্যসমাজের উদ্যমী ক্ষত্রিয় জাতি ধনৈশ্বর্য্যপূর্ণ এবং (ঐ ক্ষত্রীয় সমাজ) প্রভুত্ব ও যৌবন মদে মত্ত হইয়াছিল। যে কালে মনুষ্যের—বিশেষতঃ ধনৈশর্য্য-বল-বীর্য্যশালী সমাজের বহিঃশক্রর কি ভিন্ন সমাজের সহিত বিরোধ না থাকে, সেই কালে সমাজে প্রাকৃতিক নিয়মে ঐশ্বর্য্য, ক্ষমতা, ধন এবং সম্পত্তির গরিমায় আসুরী শক্তি প্রবল হইলে, বহিঃশক্র অভাবে অন্তর্ব্বিরোধ প্রবল হইয়া উঠে। রামচন্দ্রের পর সূর্য্যবংশীয় সম্রাটদিগের ছত্রতলে ও অন্যান্য নৃপতিগণের সুশাসনে আর্য্যসমাজ নির্ব্বিঘ্নে বহুকাল সুখ-সমৃদ্ধি ভোগের পর সূর্য্যবংশীয়গণ রাজশক্তিহীন এবং চন্দ্রবংশীয় রাজগণ প্রবল হওয়ায়, ভারতবর্ষ বহুতর স্বাধীন খণ্ড-রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। যে মহাজাতি সর্ব্ব প্রধান একই রাজশক্তি বা শাসন শক্তির অধীন একই আইন, একই ধর্ম্ম, একই ভাষা, একই শিক্ষা, একই সামাজিক নীতি ও নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া একত্ব, সুনীতি ও সুনিয়ম সংস্থাপন পূর্ব্বক পরস্পর সৌভ্রাত্ররূপে বিজ্ঞান, শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্য প্রভৃতিদ্বারা জ্ঞান ও ধন অর্জ্জন পূর্ব্বক বিপুল মহাদেশ ভোগ করিতে পারেন, সেই জাতি জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি। অতি প্রাচীন কালে আর্য্যপিতামহগণ উপরোক্ত মহা নীতির অধীনে প্রথমে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। যদিও সুবিধার নিমিত্ত সমাজে কর্ম্মবিভাগ, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত এবং ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল, তথাচ সমবেত আর্য্যসমাজের শীর্ষস্থানীয় মহর্ষিগণের কৃত একই ধর্ম্ম একই নীতি, একই শাস্ত্র এবং একই আইন ও নিয়মের অধীনে অবনত মস্তকে সমগ্র নৃপতিগণ স্বীয় স্বীয় রাজ্য শাসন ও পালন করিতেন। তৎকালে সমগ্র আর্য্য জাতির মধ্যে একই সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত এবং পরস্পরের মধ্যে অন্ন ভোজন ও অনুলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল। কালক্রমে পূর্ব্ববর্ণিতমত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে অধিকার ঘটিত বিরোধ উপস্থিত হইয়া সমাজ বিশৃঙ্খল হওয়ায়, মহারাজ রামচন্দ্র পূর্ব্বোক্ত বিরোধ শান্তি ও ভেদনীতি দূরীভূত করিয়া, মহর্ষিগণের কৃত ধর্ম্মনীতি ও ব্যবস্থার অধীনে ভিন্ন ভিন্ন রাজশক্তির উপরে এক উচ্চতম মহারাজশক্তি সংস্থাপন পূর্ব্বক দাক্ষিণাত্য আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্ভূত করিয়া, সমগ্র ভারতবর্ষ ঐ মহা শক্তির অধীন করতঃ জগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিলেন। কালক্রমে ভারতবর্ষ পূর্ব্বোক্ত মত বহুখণ্ড খণ্ড স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হইয়া ঐ খণ্ড খণ্ড রাজ্য সমূহের নরপতিবৃন্দ লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যের বশীভূত এবং নীতিমার্গ-ভ্রষ্ট হইয়া হিংসানল প্রজ্বলিত করতঃ আর্য্যলক্ষ্মীকে দগ্ধ এবং খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহার মাংস ভক্ষণের নিমিত্ত বিকট গৃধ্র শকুনির ন্যায় পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ পূর্ব্বক একের গ্রাস অন্যে কাড়িয়া লইতেছিল;

শিশুপালকে বধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দৈবশক্তি যুদ্ধে* শিশুপাল নিহত হইলে, শ্রীকৃষ্ণের সুকৌশলে উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্রবৎ উত্তেজিত ও ক্ষোভিত নৃপতিবৃন্দ শান্ত হওয়ায়, রাজসূয় যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইয়াছিল এবং তাঁহার অভিলষিত সর্ব্বোপরি সসাগরা উচ্চতম রাজশক্তি বা ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু অধর্ম্মের ভিত্তি-উৎপাটন না হইলে যে তদুপরি ধর্ম্মাট্টালিকা কথনই স্থির থাকিতে পারে না, তাহা ঐ সাম্রাজ্য সংস্থাপনের কিছু পরেই উৎকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছিল। ঐ রাজসূয়যজ্ঞ সম্পাদন এবং সাম্রাজ্য সংস্থাপনের পর শ্রীকৃষ্ণ স্বগৃহে প্রস্থান করিলে, দ্যূতক্রীড়ার অছিলায় শকুনি, কর্ণ ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি, কূটচক্র, প্রবঞ্চনা ও কৌশলে মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রমুখ পঞ্চ পাণ্ডবের নির্ব্বাসন, সাম্রাজ্ঞী দ্রৌপদীর অপমান এবং নবস্থাপিত ধর্ম্মরাজ্য ছারখার করিয়াছিল। যদিও সম্রাট যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্য দুর্য্যোধনের হস্ত-গত হইয়াছিল, কিন্তু ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি কর্ত্তৃক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের দিগ্বিজিত রাজ্যের সমগ্র নৃপতিবৃন্দ দুর্য্যোধনকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করে নাই। তদ্ভিন্ন যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মরাজ্য দুর্য্যোধনের হস্তে পাপরাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নির্ব্বাসন কালে দুর্য্যোধন স্থানে স্থানে পরাজিত ও অপমানিত হইয়াছিলেন; এমন কি, ঐ নির্ব্বাসিত পাণ্ডবগণের সাহায্য না পাইলে, সপরিবারে শত্রুহস্তে বন্দী এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেন। পূর্ব্বোক্ত প্রবঞ্চনা মূলে ঐ পঞ্চ পাণ্ডবকে নির্ব্বাসন এবং ধর্ম্মরাজ্য ধ্বংস করিয়াও দুর্য্যোধন ক্ষান্ত হন নাই; বনবাস কালেও তাঁহাদিগের ধ্বংসের নিমিত্ত নানাপ্রকার কূট জাল বিস্তার করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন পরস্বাপহরণে প্রবৃত্ত হইয়া মৎস্যাধিপ বিরাটের গোধন হরণের নিমিত্ত সসৈন্যে মৎস্য দেশ আক্রমণ করিয়া ঐ ছদ্মবেশী মহাবলী অর্জ্জুনের নিকট পরাজিত হইয়া তথা হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন; তদনন্তর নির্ব্বাসনান্তে অসহায় পাণ্ডবগণ মৎস্যাধিপ বিরাটের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক তথায় শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখ যাদব ও দ্রুপদ পঞ্চালগণকে আহ্বান করিয়া পুনঃ রাজ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত সমবেত যাদব, পাঞ্চাল ও বিরাট প্রভৃতি বন্ধুবর্গের মতানুযায়ী কর্ত্তব্যাবধারণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঐ সমবেত সভ্যমণ্ডলীর মধ্যে যাদবশ্রেষ্ঠ বলদেব, দুর্য্যোধনের সহিত সন্ধির অভিপ্রায় প্রকাশ করায়, সাত্যকি দ্রুপদ প্রভৃতি অধিকাংশ সভ্যমণ্ডলী বলদেবের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত সৈন্য সংগ্রহ এবং সাহার্য্যার্থে ভারতীয় নৃপতিবৃন্দের নিকট দূত প্রেরণ করার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন; তখন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ উপরোক্ত উভয় মতের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পাণ্ডবদিগকে অর্দ্ধ রাজ্য পরিত্যাগ করিতে এবং তদ্রূপ প্রস্তাবে সন্ধির নিমিত্ত দুর্য্যোধনে নিকট উপযুক্ত দূত প্রেরণ করিতে উপদেশ দেন। যদি তদ্রূপ সন্ধি দুর্য্যোধন স্বীকার না করেন, তজ্জন্য অন্যান্য নৃপতির নিকট যুদ্ধের সাহার্য্যার্থে দূত প্রেরণ করিতেও সম্মতি প্রদান করেন।

* যুদ্ধকালে সুদর্শনচক্র স্মরণ বা আহ্বানের ও চক্রদ্বারা শিশুপালের মস্তকচ্ছেদের গূঢ় রহস্য ক্রমে বিশদ হইবে।

কিন্তু নিজে কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, নিতান্ত নিরুপায় ব্যতীত লোকক্ষয়কর যুদ্ধ তাঁহার নিতান্ত অনভিপ্রেত ছিল। যাহা হউক, তিনি ধর্ম্মজ্ঞ, নীতিজ্ঞ এবং পরিণামদর্শী আদর্শ পুরুষ ছিলেন; তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ভবিষ্যতের যবনিকা-অন্তরালে অদৃষ্টের গভীর অন্ধকার ভেদ করিতে সক্ষম ছিল, এই জন্য তিনি ত্যাগ স্বীকার করিয়া সন্ধির নিমিত্ত একান্ত ইচ্ছুক এবং চেষ্টিত হইলেও, যুদ্ধের উদ্যোগ এবং সৈন্য সংগ্রহের উপদেশ দিতে ক্ষান্ত হন নাই। পক্ষান্তরে, যাহাতে যুদ্ধ না হইয়া সন্ধি হয়, তজ্জন্য কর্ত্তব্যানুষ্ঠানেও বিন্দুমাত্র ত্রুটী করেন নাই। দুর্য্যোধন পূর্ব্বোক্ত সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার পর উভয় পক্ষ তাঁহার নিকট যুদ্ধের সাহায্য প্রার্থনা করায়, তিনি উভয়ের প্রতি সমদৃষ্টিমান্ হইয়া, কোন পক্ষকে প্রত্যাখ্যান করেন নাই। তিনি দুর্য্যোধনের প্রার্থনা মত তাঁহাকে নিজের দশ সহস্র নারায়ণী সৈন্য প্রদান করিয়া ছিলেন এবং অর্জ্জুনের প্রার্থনামত পাণ্ডবপক্ষে স্বয়ং নিরস্ত্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। উভয় পক্ষের যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হওয়ার পর সন্ধির জন্য স্বয়ং শুভ দিনে ইষ্ট দেবার্চ্চনা ও সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনপূর্ব্বক সাত্যকি প্রমুখ কতিপয় সেনাপতি ও যাদব সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া অতি উৎকৃষ্ট বেগগামী অশ্বযুক্ত গরুড়ধ্বজরথে আরোহণ করিয়া কুরু-সভায় গমন করিয়াছিলেন; এবং সন্ধির প্রস্তাব করিয়া সমর্থনার্থে সর্ব্বহিতকর সুযুক্তিপূর্ণ নীতিগর্ভ ওজস্বী বক্তৃতাদ্বারা অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র-প্রমুখ সভাসদ্‌বর্গকে মোহিত করায়, তাঁহারা ন্যায়সঙ্গত নীতিপূর্ণ যুক্তিযুক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। তাহাতে ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, এমনকি স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্র পর্য্যন্ত 'এক বাক্যে দুর্য্যোধনকে সন্ধির জন্য অনুরোধ করায় দুর্য্যোধন ঐ সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বন্দী করিবার জন্য গোপনে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন! ঐ ষড়যন্ত্র কৃষ্ণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির নিকট গোপন না থাকায়, তিনি সর্ব্বজন সমক্ষে ঐ ঘৃণাকর ষড়যন্ত্র প্রকাশ করিয়া, ঐ ষড়যন্ত্রের একজন প্রধান নেতা কর্ণের হস্ত ধারণপূর্ব্বক সভাগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন! কর্ণও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার সহিত গমনকরিলেন। এই সভা হইতে গাত্রোত্থান করিবার সময় 'দুর্য্যোধনের সাধ্য থাকে, আমাকে বন্দী করুক' ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে এই কথা বলিয়া সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক কতিপয় গুপ্ত বিষয় কর্ণকে জানাইয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া প্রস্থান করিলেন। ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণ সন্ধির নিমিত্ত যতদূর সম্ভব, চেষ্টা করিয়াছিলেন। নররক্তে বসুন্ধরাকে বিধৌত করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। একান্ত অনন্যোপায় হইয়া সাধুগনের পরিত্রাণ ও অধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ্য পুনঃস্থাপন করিবার নিমিত্তই পাণ্ডবদিগকে যুদ্ধে অনুমোদন দান করিয়াছিলেন। বুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট ও গৌরাঙ্গ দেব যেরূপ জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম বিস্তারদ্বারা সমাজকে পাপপঙ্ক হইতে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের সময়ে সামরিক তেজস্বী মদমত্ত উদ্ধত ক্ষত্রিয়সমাজকে তদ্রূপ উদ্ধার করার

ঐ ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণরূপধারী পাণ্ডবগণ প্রথম প্রকাশিত হন, তদনন্তর ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি বুঝিতে পারায়, ঐ ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুরের পরামর্শানুযায়ী ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে হস্তিনায় আহ্বান করেন ; ঐ ধৃতরাষ্ট্রের আহ্বানে কেবল শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শেই পাণ্ডবগণ হস্তিনা গমনে স্বীকৃত হইলে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দ্রুপদ প্রভৃতির সহিত পাণ্ডবগণের সমভিব্যাহারে ধৃতরাষ্ট্রের সভায় গমন করেন এবং ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক পাণ্ডবগণকে যে অর্দ্ধ রাজ্য প্রদত্ত এবং ইন্দ্রপ্রস্থে তাহাদিগের রাজধানী নির্ণীত হইয়াছিল, তাহার প্রধান নেতা শ্রীকৃষ্ণ। ঐ ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবগণের রাজধানী সংস্থাপনের পর অর্জ্জুনের সহযোগে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটবর্ত্তী নিবিড় সুবৃহৎ খাণ্ডবারণ্য দহন এবং তথাকার অসভ্য-বন্য-অনার্য্য ক্রূর সর্পের ন্যায় তক্ষক অশ্বসেন প্রভৃতি নাগ ও দানবগণকে বিতাড়িত এবং শিল্পী ময় নামক দানব প্রমুখ কতকাংশকে বশীভূত করিয়া তদ্দ্বারা কারুকার্য্য খচিত ও অতি উৎকৃষ্ট সৌধ মালা পরিশোভিত মহানগরী নির্ম্মাণ ও শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতির বিস্তার পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সৌরাজ্য বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ঐ খাণ্ডব দাহনের পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠ বলরাম প্রমুখ যাদবগণের বিরুদ্ধমত সত্ত্বেও অতি সুকৌশলে সর্ব্বসম্মতিমতে স্বীয় ভগ্নী সুভদ্রাকে অর্জ্জুনের সহিত বিবাহ দিয়া পাণ্ডবগণের সহিত অধিকতর গাঢ় বন্ধুত্ব সংস্থাপন করনান্তর সমগ্র পৃথিবীতে একটি রাজনীতি, সমাজনীতি এবং উদার ধর্ম্ম বা সাম্যনীতি তের চতুর্দ্দিগস্থ অন্যান্য দেশ ও মহাদেশ সমূহের রাজন্যবর্গের উপর সর্ব্বোপরি একটী উদার নৈতিক সাম্রাজ্য বা ধর্ম্ম রাজ্য সংস্থাপন পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ঐ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর বা রাজরাজেশ্বর করিবার নিমিত্ত ঐ যুধিষ্ঠিরদ্বারা রাজসূয় যজ্ঞের সূচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে ভারতবর্ষে হস্তিনাপেক্ষা মগধের অধর্ম্মার্জ্জিত প্রধান উচ্চতর রাষ্ট্রশক্তি শনৈঃ শনৈঃ সংস্থাপিত এবং মগধেশ্বর অন্যায়রূপে ভারতের একাধিপতি সম্রাটের ন্যায় হওয়ায়, পূর্ব্বোক্ত যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্য সংস্থাপন সূচক রাজসূয় যজ্ঞের প্রধান অন্তরায় ঐ মগধেশ্বর জরাসন্ধ ছিলেন। তিনি ভারতের ষড়শীতি নৃপতিকে বলিদান করিবার নিমিত্ত কারারুদ্ধ ও অধিকাংশ নৃপতিবর্গকে রাজ্যচ্যুত করিয়া ভারতে একাধিপত্য সংস্থাপনে চেষ্টিত ছিলেন ; এতএব দেশের কণ্টক স্বরূপ জরাসন্ধকে ধ্বংস বা পরাজয় ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, কৃষ্ণ তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন এবং ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, সমবেত পাণ্ডব ও যাদব সৈন্য কর্তৃক মগধেশ্বর জরাসন্ধের রাজধানী গিরিব্রজপুর আক্রমণ করিয়াও তাঁহার রাজ্য জয় করা সুদূরপরাহত, এই জন্য সুকৌশলী ও সুদর্শন-নীতিচক্রধারী মহামহিমাময় শ্রীকৃষ্ণ বিনা সৈন্যক্ষয়ে একটী সহজ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তৎকালে ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে একটী দ্বৈরথ-যুদ্ধ প্রচলিত ছিল। তুল্য বলশালী কোন ক্ষত্রিয় কোন ক্ষত্রিয় বীর পুরুষকে দ্বৈরথ যুদ্ধে আহ্বান করিলে, কখনও প্রত্যা-

পর কেবল মাত্র ভীমার্জ্জুনের সহিত স্বয়ং ব্রাহ্মণ বেশে অতি দুরারোহ পর্ব্বতমালা-পরিবেষ্টিত মগধের রাজধানীতে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখীন হইয়া উদার নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তদনন্তর তাঁহার দৌরাত্ম্যে রাজগণের অন্যায় কারাবরোধ ও তাঁহাদিগকে ধ্বংসের কল্পনা ইত্যাদি কুটিল নীতি সম্বন্ধীয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়া সৎসাহসের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে তিন জনের মধ্যে যদিচ্ছামত এক জনের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাহাতে জরাসন্ধ ভীমের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, ঐ ভীম ও জরাসন্ধের মধ্যে ক্রমান্বয়ে চতুর্দ্দশ দিবস দ্বৈরথ যুদ্ধ হয়। ঐ চতুর্দ্দশ দিবসের যুদ্ধে জরাসন্ধ পীড্যমান হইলে, উদারনীতিজ্ঞ মহিমাময় শ্রীকৃষ্ণ ভীমকে পীড়ন করিতে নিষেধ করেন। ঐ যুদ্ধে জরাসন্ধ ভীম কর্ত্তৃক হত হওয়ায়, প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ কারারুদ্ধ নৃপতিগণকে মুক্ত করিয়া দিয়া, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তদনন্তর জরাসন্ধ-পুত্র সহদেবকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিপন্ন রাজগণকে উদ্ধার এবং বিনা সৈন্যক্ষয়ে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন সূচক রাজসূয় যজ্ঞের প্রধান অন্তরায় দূরীভূত করিলেন। তৎপরে, অর্জ্জুন, ভীম, নকুল ও সহদেব দ্বারা উত্তরে উত্তরকুরুবর্ষ (বর্ত্তমান রুশিয়ার উত্তর ভাগ) পূর্ব্বে চীন রাজ্য, দক্ষিণে লঙ্কা দ্বীপ, পশ্চিমে শাকদ্বীপ (তুরস্ক, আরব, পারস্য) পর্য্যন্ত অর্থাৎ তৎকালের পৃথিবীর সমগ্র মানব, গন্ধর্ব্ব, দানব, যক্ষ ও রক্ষ-রাজ্য দিগ্‌বিজয় * করিয়া রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ রাজসূয় যজ্ঞে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজধানীতে সমগ্র নৃপতিবৃন্দ আহূত এবং মহাসভা সমিতি হইলে, ঐ সভায় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পিতামহাগ্রজ সর্ব্বশাস্ত্র ও শস্ত্র-বিশারদ মহাজ্ঞানী সর্ব্বপ্রাচীন ভীষ্মদেবের প্রস্তাবানুসারে মহামহিমাময় শ্রীশ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদত্ত হওয়ায়, কৃষ্ণবিদ্বেষী চেদীশ্বর শিশুপাল তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ অর্ঘের অনুপযুক্ত বলিয়া বারম্বার তাঁহাকে বহু নিন্দা এবং প্রাচীন ন্যায়ধর্ম্মপরায়ণ মহাবীর ভীষ্মকে বহু তিরস্কার ও অপমান সূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তৎ সত্ত্বেও মহানীতিজ্ঞ ক্ষমাশীল শ্রীকৃষ্ণ নিস্তব্ধভাবে পরম শত্রু শিশুপালকে বারম্বার ক্ষমা করিয়াছিলেন। পরে যখন ঐ শিশুপাল কএকটী দুর্নীতিপরায়ণ নৃপতির সহিত এক যোগে সভাস্থ অন্যান্য নৃপতিগণকে উত্তেজিত করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ ভঙ্গের ষড়যন্ত্র এবং তাঁহার ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের প্রতিবন্ধক জন্মাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন শিশুপালকে ধ্বংস ব্যতীত উপস্থিত মহাযজ্ঞ সম্পাদনের উপায়ান্তর না থাকায় এবং শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্ব সমক্ষে দ্বৈরথ-যুদ্ধে আহ্বান করায়, কর্ত্তব্যপরায়ণ মহানীতিজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ অনন্যোপায় হইয়া অগত্যা সম্মুখ-যুদ্ধে

* মহাভারতের সভাপর্ব্বে অর্জ্জুনের উত্তর দিগ্‌বিজয়ে কিম্পুরুষ বর্ষে (তিব্বৎ ও তাতারে) কিম্পুরুষ, যক্ষ ও গন্ধর্ব্বের সহিত, হরিবর্ষ ও উত্তর কুরু বর্ষে (সাইবেরিয়া—রুসিয়া) দৈত্য গন্ধর্ব্বের সহিত অন্যান্য দিগ্‌বিজয়ে কিরাত, দানব, রক্ষ প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ জয়ের বর্ণনা আছে।

সম্ভব ছিল না। সর্ব্বপ্রকার রোগে এক ঔষধ প্রয়োজ্য হয়না। রোগের অবস্থানুসারেই ভিন্ন ভিন্ন ঔষধের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। রাজপুত্র বুদ্ধদেব রাজসিংহাসন ও পার্থিব সুখ-সম্পদ পরিত্যাগপূর্ব্বক ত্যাগস্বীকারের জলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন না করিলে, সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া শত শত উপদেশ বা শত বৃদ্ধ জয়দ্বারা "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" এই সুনীতি বলে কদাচ সমাজে ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারিতেন না। পক্ষান্তরে, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুন জ্ঞাতি-হিংসা-বিমুখ হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত রাজ্য সম্পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৌপীনধারী হইলে, কদাচ সাধুগণের পরিত্রাণ, অধর্ম্ম দূরীভূত এবং ধর্ম্ম-রাজ্য সংস্থাপিত হইত না, অথবা ঐ অধর্ম্মের নেতা বিপুল ক্ষমতাশালী, উদ্ধত, মদমত্ত, কামী ও স্বার্থান্ধ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের ধ্বংস বিনা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধের ন্যায় কৌপীনধারী সন্ন্যাসী হইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিলেও লোক-হিতকর নিষ্কাম বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিতে কখনই সক্ষম হইতেন না। শত বর্ষ পূর্ব্বে ইউরোপে সাম্যবাদ প্রচারার্থ নেপলিয়ন বোনাপার্ট বসুন্ধরা নররক্তে প্লাবিত করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তৎকালে তাঁহার কল্পিত সাম্যবাদ সময়োচিত না হওয়ায়, তিনি ইউরোপীয় সমাজে অশান্তি আনয়ন পূর্ব্বক পরিশেষে স্বয়ং বিধ্বস্ত হইয়াছিলেন। আজ সেই সাম্যবাদ ইউরোপে বিনা চেষ্টা ও যত্নে স্বভাবতঃ শনৈঃ শনৈঃ বিস্তৃত ও শান্তির কারণ হইয়া উঠিতেছে।

জগৎ বিবর্ত্তন-নীতির মধ্য দিয়া শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে প্রধাবিত হইতেছে সত্য, কিন্তু ইহার মধ্যে শত শত উত্থান ও পতন আছে। এই উত্থান পতনের অধীনতায় জগৎ মণ্ডলাকারে নির্দ্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে কেন্দ্রাভিমুখী হইতেছে। মধ্যে মধ্যে যখন কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি কর্ত্তৃক পথভ্রষ্ট হয়, তখন পুনর্ব্বার কেন্দ্রানুসারিণী শক্তির সাহায্য ব্যতীত নির্দ্দিষ্ট বৃত্তে পৌঁছিতে পারে না। ঐ উভয় শক্তির সংগ্রামকালে যে কত প্রকার ঘূর্ণাবর্ত্ত উৎপন্ন হয়, তাহা কে বলিতে পারে? এবং ঐ ঘূর্ণাবর্ত্ত হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত কেন্দ্রিকী শক্তির যে কত প্রকারের কার্য্য প্রসূত হয়, তাহাইবা কে নির্দ্দেশ করিতে পারে?

রোগী বিশেষে এবং রোগীর অবস্থানুসারে কোন স্থলে উগ্র বিষ প্রয়োগদ্বারা রোগী তৎক্ষণাৎ নিরাময় হয়, আবার কোন স্থলে ঐ বিষ প্রয়োগদ্বারা আশু রোগী নিরাময় হয় না বটে, বরং রোগের ভিন্ন উপসর্গ উপস্থিত হইয়া, রোগীকে ঘোর কষ্টে নিপতিত করে, ক্রমে স্নিগ্ধ ঔষধদ্বারা বা ঔষধ বিনা শনৈঃ শনৈঃ রোগী উপশম পায়; এরূপ স্থলে বিষ প্রয়োগ আশু অপকারক হইলেও, রোগীর জীবন রক্ষার যে অমোঘ উপায়, তাহার আর সন্দেহ নাই। ঐ স্থলে বিষ প্রয়োগের পরিবর্ত্তে স্নিগ্ধ ঔষধদ্বারা কখনই রোগের উপশম হয়না; রোগী নিশ্চয়ই মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হয়। পক্ষান্তরে, রোগের অবস্থাবিশেষে স্নিগ্ধ ঔষধদ্বারাই রোগী নিরাময় হইয়া থাকে। বিষ প্রয়োগের আবশ্যকতা হয় না; বরং ঐ অবস্থায় বিষপ্রয়োগই রোগীর মৃত্যুর কারণ হয়।

অতএব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের উদ্যোগের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ বহুতর স্নিগ্ধ সুখসেব্য ঔষধ প্রয়োগদ্বারা রোগ শান্তি করিতে অপারক হইয়াই অবশেষে বিষ প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন! কিন্তু আসন্ন সময়ে অর্জ্জুন ঐ বিষাক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিতে অনিচ্ছুক হওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্জগতের আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক নিদান এবং ঔষধের ব্যবস্থাস্বরূপ জগৎপূজ্য ভগবদ্গীতা প্রকাশ করিয়া জগতের ঐ ত্রিবিধ ভব-রোগ-মুক্তিরউপায় করিয়াছিলেন। উপরোক্ত ভারত-যুদ্ধে ভারতের সমগ্র নৃপতিবর্গ কেহ ধার্ত্ত-রাষ্ট্র ও কেহ পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে সসৈন্যে সমাবেত হওয়ার পর ধার্ত্তরাষ্ট্র পক্ষে ভীষ্ম এবং পাণ্ডব পক্ষে অর্জ্জুন সেনাপতি-পদে বরিত হয়েন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, লোক-ক্ষয়কর যুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের নিতান্ত অনভিপ্রেত ছিল; অনন্যোপায় হইয়া যুদ্ধে অনুমোদন করিলেও, স্বয়ং অস্ত্রধারণ করিয়া নিষ্ঠুর হত্যা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক হন নাই। পূর্ব্ববর্ণিত: মত উভয় পক্ষ তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান করায়, এক পক্ষে যুদ্ধার্থে তাঁহার দশ সহস্র সৈন্য প্রদান করিবেন, অন্য পক্ষে স্বয়ং নিরস্ত্র থাকিয়া যুদ্ধের সাহায্য করিবেন, প্রকাশ করেন; তাঁহাতে দুর্য্যোধন প্রথমোক্ত সৈন্য-সাহায্য ও অর্জ্জুন শেষোক্তমত স্বয়ং তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলে, অর্জ্জুনের প্রার্থনা মতে পাণ্ডব পক্ষ অবলম্বন করিয়া সেনাপতি অর্জ্জুনের সারথ্য-কার্য্যে নিযুক্ত হন। তৎকালে সারথ্য-কার্য্য অতীব গুরু-তর কার্য্য ছিল। রাজার সহিত রাজমন্ত্রীর যেরূপ সম্বন্ধ, যুদ্ধ কার্য্যে সেনাপতি রথীর সহিত সারথির তদ্রূপ সম্বন্ধ। রাজমন্ত্রীর সুমন্ত্রণায় রাজার রাজ্য যেরূপ রক্ষা হয়, তৎকালে যুদ্ধে সারথির সুমন্ত্রণায় ও কার্য্যে তদ্রূপ রথীর জীবন রক্ষা ও যুদ্ধ জয় হইত, এই জন্য সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের সারথির নাম সুমন্ত্র ছিল। প্রকৃত পক্ষে তৎকালে আর্য্য-সমাজে একাধারে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ধার্ম্মিক, জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, মন্ত্রণা-কুশল, শস্ত্র ও শাস্ত্র-বিশারদ, রাজনীতিজ্ঞ, সমাজনীতিজ্ঞ, নিষ্কামী. অপক্ষপাতী, পরহিতরত, স্বার্থ-ত্যাগী ও সর্ব্বকর্ম্মবিশারদ পুরুষ যে আর দ্বিতীয় ছিল না, তাহা তাঁহার শ্রীমুখ-নির্গত ভগবদ্গীতাতেই প্রকাশ; তদ্ভিন্ন সভাপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদানের সময় ভীষ্ম ও শিশু-পালের বাদানুবাদের মধ্যে এবং মহাভারতের অনেক স্থানে প্রকাশ আছে। যেমন মানস-রাজ্যের রাজা বা রথী মন, মন্ত্রী বা সারথি বুদ্ধি; যেরূপ অধ্যাত্মরাজ্যে রথী জীবাত্মা, সারথি পরমাত্মা, তদ্রূপ পাপ-পুণ্যরূপ কুরু-পাণ্ডব-যুদ্ধে রথী অর্জ্জুন, সারথি শ্রীকৃষ্ণ। পূর্ব্ববর্ণিত মত যুদ্ধারম্ভ সূচক রণবাদ্য নিনা-দিত হইলে, পাণ্ডব-সেনাপতি অর্জ্জুন বিপ-ক্ষের নেতা ও সেনাপতি ভীষ্মপ্রমুখ কৌরব-গণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার সময় তাঁহা-দিগকে অবলোকন করিয়া স্নেহ বশতঃ অন্তর দ্রবীভূত, শোক-মোহে হৃদয় বিচলিত এবং করুণায় হস্ত শ্লথ হওয়ায়, জ্ঞাতিবধ-জনিত পাপাশঙ্কায় ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ করায়, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে যে জ্ঞানগর্ভ উপদেশদ্বারা তাঁহার শোক ও মোহাদি দূরীভূত ও তাঁহাকে কর্ত্তব্য-পথে চালিত করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন, সেই

জ্ঞানগর্ভ উপদেশই জগতের সাররত্ন স্বরূপ এই ভগবদ্‌গীতা। হিন্দু-পত্রিকায় আগামী সংখ্যা হইতে আমরা মূল গ্রন্থের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। (ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বেদান্ত-সূত্র।

("ব্রহ্মচারিন্" পত্রে প্রকাশিত, শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এম্. এ মহাশয়ের লিখিত "Vedanta Sutras" প্রবন্ধের স্বল্প-পরিবর্ত্তিত বঙ্গানুবাদ।)

১। অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসেতি।

২। জন্মাদ্যস্য যতইতি।

৩। শাস্ত্র যোনিত্বাদিতি॥

৪। তত্তু সমন্বয়াৎ॥

১। অতএব তৎপর ব্রহ্মতত্ত্বের জিজ্ঞাসা।

২। যাঁহা হইতে এই বিশ্ব বিকাশিত, যাঁহাদ্বারা পালিত ও যাঁহাতে সংহৃত হয়, তিনিই ব্রহ্ম।

৩। জ্ঞানোপায়স্বরূপ শাস্ত্র হইতে ইহাই প্রতিপ্রাদিত হয় যে ব্রহ্মই জগতের কারণ।

৪। সর্ব্বশাস্ত্রই ব্রহ্মজ্ঞানের মূল উৎস, তাহাদের অর্থ-সমন্বয়ে ব্রহ্ম-তত্ত্বই প্রতিপাদিত হয়।

"কুতশ্চ কোঽহং" আমি কোথা হইতে আসিলাম এবং আমিইবা কে? এই চিন্তা যেদিন মানবের জ্ঞানক্ষেত্রে প্রথম উদিত হয়, সেই দিন হইতেই তাহার ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার আরম্ভ। মানবের অতি পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় যখন জন্ম-মৃত্যু-রহস্যের মীমাংসার্থ কোন চেষ্টারই উন্মেষ ছিলনা, তখন এই আত্মচিন্তার অবস্থা কেমন ছিল, তাহা ঠিক অনুমান করা কঠিন; কিন্তু মানবের বিবর্ত্ত-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার উন্নতির ক্রম-পরম্পরায় ক্রমশঃ যে ঐ আত্ম-চিন্তা পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। "মানুষ কি, মানুষের অদৃষ্ট কি" এই জ্ঞান-পিপাসার প্রবল প্রেরণায় মানুষ কবি হয়, মুনি-ঋষি হয়, ভবিষ্যৎবেত্তা হয়। এরূপ মনে করা ভুল, যে অসভ্য জাতির চিন্তা কেবলই বহিঃপ্রকৃতি-বিষয়িণী, এবং উহা মোটেই অন্তঃপ্রকৃতিঅভিমুখিনী নহে। মানব যে কোন দেশীয় বা জাতীয়ই হউক না কেন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যখন তাহার স্বপ্নাতীত বিষয়, তৎপূর্ব্বকাল হইতেও অহংতত্ত্বের বা আমিত্বের আধ্যাত্মিক রহস্য-মীমাংসায় সে কোন না কোনরূপে সচেষ্ট। এরূপ না হইলে, সেটি অস্বাভাবিকতাজনিত বিস্ময়ের বিষয় হইত, সন্দেহ নাই।

মানব-জীবন ক্ষণভঙ্গুর, দুঃখ-সঙ্কুল ও ইহার আদ্যন্ত দুর্জ্ঞেয় রহস্য-সমাকুল। মানবের যদি পুনর্জ্জন্ম না থাকে, যদি কেবল মরিবার জন্যই বাঁচিতে হয়, তবে মানব কি পরিণাম

লক্ষ্য করিয়া জীবন ধারণ করিবে? মানবের "মাটির দেহ" যদি কেবল মাটি হইবার জন্যই সৃষ্ট হইয়া থাকে, তবে ইহার ভোজন সাধনার্থে শস্যোৎপাদন, বাসার্থে গৃহ-পত্তন, আবরণার্থে বস্ত্র-বয়ন, আভরণার্থে অলঙ্কার-গঠন ইত্যাদি ব্যাপারে কেন মানব এত বিব্রত হইবে? ইহা যদি এতই অসার, তবে ইহার জন্য কে এত "ভূতের বেগার" খাটিতে চায়? অতএব "মানব-জীবনে এই দেহ অপেক্ষা কি স্থায়ী পদার্থ বা সারতত্ত্ব আর কিছুই নাই?" এইরূপে প্রথমে আত্ম-জিজ্ঞাসার উদয় হয়। "এই দেহই কি "আমি" না এই দেহ "আমার?" এইরূপ বিতর্কে মানব ক্রমে আত্মজিজ্ঞাসা-বর্ত্মে অগ্রসর হয়, ক্রমে তত্ত্ব-চিন্তার চালনায় মানব মনের মোহাবগুণ্ঠন ধীরে অপসারিত হয়, ধীরে অধ্যাত্মালোক উদ্ভাসিত হয়; সেই আলোকে ধীরে মানব আত্মদর্শনের আভাস পায় এবং তখন মনে মনে বলে "আমি দেহ নই, দেহই আমার; আমি দেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র কিছু, নচেৎ আমার এই "আমি"র জ্ঞান কোথা হইতে আসিল? "আমি নাই" বা "আমি কিছুই না" এরূপ চিন্তাত কখনও আমার আসেনা। আমিই হই এই "আমি"— আর আমার এই দেহ "আমি"র আধার মাত্র; অতএব আমার এই আধার স্বরূপ দেহটারই মৃত্যু ঘটে, আধেয় "আমি"র মরণ নাই।

মানুষ এইরূপে ক্রমে বুঝিতে পারে যে, দেহীই বিষয়ী (Subject) এবং দেহ ও অন্য যে কোন পদার্থ, সমস্তই বিষয় (Object); মানুষের আমিত্ব বা আত্মতত্ত্বই জ্ঞাতা এবং আর সমস্তই জ্ঞেয়। মানুষ ক্রমে স্পষ্টই বুঝিতে পারে যে, তাহার এই দেহ একখানি রথস্বরূপ, মন প্রগ্রহস্বরূপ, এবং আত্মস্বরূপ সে স্বয়ং তাহাতে রথীরূপে অধিষ্ঠিত রহিয়া অপর সমস্তের শাসন-পরিচালনাদি সাধন করিতেছে। শাস্ত্র স্পষ্ট তাহাই বলিয়াছেন।—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহু র্বিষয়াস্তেষু গোচরাণ্॥"

এতাবতা মানুষ বুঝিতে পারে যে, মৃত্যু কেবল তাহার দেহকেই অধিকার করিতে পারে, তাহার আত্মাকে নহে। মানুষ ক্রমে "নায়ংহন্তি ন হন্যতে"—গীতোক্ত এই পরম তত্ত্বের আভাস পায়।

"তবে কি আত্মা চিরসৎ বা চির নিত্য"—(আপেক্ষিক সৎ বা আপেক্ষিক নিত্যের অতীত) তখন এই প্রশ্নের উদয় হয় ও সমাধান-সাধনের চেষ্টা হয়। "আত্মা জন্মিলে আর মরে না" এ সিদ্ধান্ত ন্যায়-নিকষে টিঁকেনা। জন্ম-মৃত্যু পরস্পর আপেক্ষিক। জন্মিলেই মরিতে হইবে। "জাতস্যহি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্যচ।" (গীতা) আত্মা যদি জন্মেন, স্বীকার করা যায়, তবে তিনি মরেনও বটে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব যিনি মরেন না, তিনি জন্মেনও না। আত্মার যদি মৃত্যু নাই, তবে জন্মও হয় নাই।

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ।
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ॥
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো।
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥(গীতা)

কিন্তু আত্মার মৃত্যু অপ্রতিপন্ন হইলে, জন্মও যে অপ্রতিপন্ন, অপ্রাপ্ত-অধ্যাত্মালোক মানব তাহা না বুঝিয়া আত্মাকে 'জাত' মনে করে। সে মনে করে যে, তাহার আত্মা "ঈশ্বর" নামক এক উচ্চতর আত্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট, এবং অপরাপরের আত্মা সমূহ হইতে তাহার নিজাত্মা সংপূর্ণ স্বতন্ত্র।

জ্ঞান-বৃদ্ধি সহকারে মানব বুঝিতে পারে যে, আমাদের পরস্পরের আমিত্বের পার্থক্য-বোধ কেবল মায়া-মোহের ফল মাত্র। যদি উপাধির অপগম হয়, তবেই সেই পার্থক্য-বোধের অপগম হইবে। এককে অনেক, অখণ্ডকে খণ্ড, নিরবয়বকে সাবয়ব রূপে কেবল অবিদ্যা-কল্পিত উপাধিজন্যই উপলব্ধি হয়। এই আত্মায় ভেদ-বোধ পরমার্থতঃ প্রকৃত নহে, উহা কেবলঃ উপাধি-ভেদের আপাত-উপলভ্য ফল মাত্র।

জ্ঞানোন্নত মানব জন্ম-মৃত্যুর অচ্ছেদ্য আপেক্ষিকত্ব পরিষ্কার অনুভব করিতে পারেন। উহার একের অপ্রতিপন্নতায় অপরের অপ্রতিপন্নতা স্বতঃসিদ্ধ হইয়া উঠে। পূর্ব্বোদ্ধৃত "ন জায়তে ম্রিয়তে" শ্লোকের তত্ত্ব তাঁহার হৃদয়ে স্ফুরিত হয়। আত্মার একত্ব ও অবিনশ্বরত্ব তিনি বুঝিতে পারেন। এতাবতা তিনি বুঝিতে পারেন, আত্মা যদি নিশ্চয় অমর, তবে অবশ্য অজ; অতএব আত্মা অজ হইলে, তাঁহার (সৃষ্টিকর্ত্তারূপ) উচ্চতর আত্মার কল্পনাও অসিদ্ধ হইতেপারে।

জ্ঞানোন্নতির সহিত মানব বুঝিতে পারেন যে, যেমন একই সূত্র বিবিধ আকৃতি, বিবিধ বর্ণ, বিবিধ গন্ধবিশিষ্ট বিবধ জাতীয় পুষ্প-সমষ্টির অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকায়, এক বিচিত্র পুষ্প-মালা রচিত হয়, তদ্রূপ এক আত্মা বিবিধ ভেদ-বৈচিত্র্যপূর্ণ উপাধিসমূহে অবস্থিত থাকায়, এই বিচিত্র বিশ্ব বিরচিত হইয়াছে। কেবল মানব-দেহ বলিয়া নহে, এক সার্ব্বভৌম আত্মতত্ত্ব বা বিশ্ব-আমিত্ব বিশ্বের চেতনাচেতন সর্ব্ব পদার্থেই বিরাজিত; তবে উহার ঐশ ভাব কোথাও জাগ্রত, কোথাও সুপ্ত; কোথাও বিকসিত, কোথাও অন্তর্নিহিত; কোথাও অঙ্কুরিত, কোথাও বীজীভূত। ক্রমে যখন এই বিশ্ব-বৈচিত্র্য-বোধক অবিদ্যাজাত উপাধি সমূহের নিমিত্ত ও উপাদান—উভয় কারণ স্বরূপ এক আত্মাই অবধারিত হন, তখন সৃষ্ট ও স্রষ্টার কৃত্রিম স্বাতন্ত্র্য তিরোহিত হয়; তখন আত্মজ্ঞানী মানব মহাবাক্যের অধিকারী হইয়া বলেন—'তত্ত্বমসি।'

এই ভৌতিক জগৎ তখন তাঁহার নিকট আর স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট বোধ হয়না; উহা বিশ্ব-আমিত্বেরই এক বিবর্ত্তন-বিকাশ বোধ হয়। উহা স্বগত, স্বজাতীয়, বিজাতীয়, এই ভেদত্রয়-শূন্য বোধ হয়। দ্বৈতত্ত্ব অন্তর্হিত হয়। তখন আত্মজ্ঞানী দেখেন যে, "সর্ব্বভূতেই আত্মা এবং আত্মাতেই সর্ব্বভূত।"

"সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ (গীতা)

(অনুবাদ)

আত্মাকে সমস্তভূতে সমস্ত ভূত আত্মায়।
সমদর্শী আত্মযোগী সর্ব্বদা দেখিতে পায় ॥

যদি সর্ব্বভূতই আত্মময়, তবে এক মাত্র আত্মজিজ্ঞাসাই সর্ব্বজিজ্ঞাসার সার নিষ্কর্ষ, সন্দেহ নাই; সুতরাং অন্য সর্ব্ববিধ জিজ্ঞাসাই প্রকৃত পক্ষে অনর্থক ও অতিরিক্ত হইয়া পড়ে। কারণ পরিজ্ঞাত হইলে, কার্য্যও স্বতএব পরিজ্ঞাত হয়। ঘটতত্ত্ব-জ্ঞান মৃত্তত্ত্ব-জ্ঞানেরই অন্তর্ভূত।

বৈদান্তিকেরা এই আত্মতত্ত্ব বা বিশ্ব-আমিত্বকেই ব্রহ্ম বলেন। কারণ ইহাই বৃহৎ—বিশ্বময়—অসীম; ইহা হইতেই বিশ্ব-পদার্থের বিকাশ। "বৃহত্তাৎ বৃংহণত্বাচ্চ"—"ব্রহ্ম" শব্দের ব্যুৎপত্যর্থই বৃহত্ত্ববোধক।

অজ্ঞানাবস্থাতেই মানব বিবেচনা করে যে, জগতের কিছুই স্থায়ী নহে। তাহার নিজস্ব বোধের সামান্তর্গত সকল বস্তুরই অনিত্যত্ব সে অনুভব করে। ধন-মান-স্ত্রী-পুত্র-গৃহ-ক্ষেত্র, ঐহিক যা কিছু তাহার প্রিয়, তাহার সে অজ্ঞাত-দেশ-যাত্রায় কিছুই তাহার "সঙ্গের সাথী" নহে, ইহা বুঝিয়া তাহার নৈরাশ্য-নিপীড়িত অন্তরাত্মা আর্ত্তস্বরে বলিতে থাকে "তবে কি এ জীবন অলীক—অকিঞ্চিৎকর ও একটি তামাসার অভিনয় মাত্র? যদি কোন নিত্য পদার্থই ইহার লক্ষ্য না হয়, এবং যাহা কিছু ইহার লক্ষ্যীভূত, তাহাই অলক্ষ্যে অনিত্যে পরিণত, তবেকি মানব-জীবন কেবল 'ফাঁকিজুকির কারখানা?' আমার কি আগে পাছে কেবল মরণের মেলা? তবে আর এ নিমেষস্থায়ী নিরর্থক জীবন-বুদ্বুদের জন্য এত চেষ্টা বেষ্টনের—স্বার্থ সংগ্রামের কি প্রয়োজন? ফলিতার্থে তবে "আমি" কেন? এ বিড়ম্বনাময় "আমি" থাকা অপেক্ষা "আমি" আদৌ না হওয়াই কি ভাল ছিল না?"

এইরূপে নৈরাশ্যে মুহ্যমান ও বিষাদে রোরুদ্যমান হইয়া অজ্ঞান মানব যখন বুঝিতে পারে না যে, তাহার কোথায় যাইতে হইবে, কি করিতে হইবে, তখন "কিংকরোমি কগচ্ছামি" অবস্থায়—সেই কর্ত্তব্য-জিজ্ঞাসু জীবের 'কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়'তার ঘোর ঘনান্ধকারে ভারতীয় আর্য্যর্ষিই বেদান্ত-বিজ্ঞানের আলোক-বর্ত্তিকা প্রজ্জ্বালিত করেন এবং বলেন "জীব! আশ্বস্ত হও।"

বৈদান্তিক ঋষি বলেন—বৎস! শোক করিও না। অমৃতের সন্তান তুমি,—শুধু তাই কেন? তুমি স্বয়ংই অমৃত। তুমি আপনাকে চিনিতে শেখ, তবেই তোমার সর্ব্বসন্দেহ দূরীভূত হইবে, সর্ব্ব বন্ধন ছেদিত হইবে ও অবিদ্যার ইন্দ্রজাল অপসারিত হইবে। যখন তুমি তোমাকে চিনিবে, তখন তোমার জীবন সত্য ও সার্থক হইবে, উহা আর অলীক বা অনর্থক বোধ হইবে না। শাস্ত্র স্পষ্টই বলিয়াছেন;—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥"

যাহাহউক, আত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যায় উপনীত হইতে সর্ব্বসাধারণেরই গমনাধিকার-বিষয়ীভূত কোন একটি পন্থা নাই। উক্ত পন্থালাভ উপযুক্ত অধিকার সাপেক্ষ—কঠোর সাধন-সাপেক্ষ। আত্ম-বিজ্ঞান দীপকে যাঁহার আত্মদীপনের অভিলাষ, তিনি অবশ্য ইন্দ্রিয়-দমন ও চিত্ত সংযম করিবেন, তিনি অবশ্য শান্ত, সমাহিত, ইহ-পারলৌকিক কর্ম্মফলা-কাঙ্ক্ষাশূন্য হইবেন। মানুষের এমন অনেক আচারানুষ্ঠানের অভ্যাস আছে যে, তাহা ধর্ম্মকার্য্যবিশেষ বলিয়া বোধ হইলেও, তদ্দ্বারা বাস্তবিক আত্মবিকাশের বাধকতা জন্মে; সে সমস্ত অভ্যাসও শাস্ত্রীয় যুক্তি-বিচারদ্বারা অপসারিত করিবেন। অবশেষে আত্মদীপন-সাধন-সিদ্ধ গুরুর আশ্রয় গ্রহণে কৃতার্থ বা কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। শম (অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ,) দম (বহিরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ,) তিতিক্ষা (দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা,) উপরতি (ভোগ-বৈরাগ্য,) শ্রদ্ধা (গুরু-বেদান্ত-বাক্যে বিশ্বাস,) সমাধান (ঈশ্বরে চিত্তাভিনিবেশ,) গুরুর কৃপায় সাধ্য এই ষট্‌সম্পত্তি" অর্জ্জন ভিন্ন আত্মজ্ঞান লাভো-পযোগী পূর্ণচিত্তশুদ্ধির সম্ভাবনা নাই। এই জন্য "অথ" শব্দের প্রয়োগে পূর্ব্বোক্তরূপ চিত্তশুদ্ধ্যাদির পর সাধকের যথার্থ ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা বা আত্মবিজ্ঞান-শিক্ষার অধিকার সূচিত হইতেছে।

এক্ষণে কথা এই যে, কি কারণে মানব ব্রহ্মবিদ্যা বা আত্মবিদ্যার সাধনে ও অনুশী-লনে ব্রত হইবে? কারণ এই যে, তদ্ভিন্ন মান-বের শান্তিলাভ সুদূরপরাহত। মানবের হৃদয়ে স্বতঃই ও সততই প্রবল ঔৎসুক্যময় অদম্য জিজ্ঞাসা-প্রবাহ বহিতেছে যে "সে কি? সে কোথা হইতে আগত এবং কোথার-ইবা যাত্রী?" অতএব এই কারণেই, (অতঃ) মানবের ব্রহ্ম-বিদ্যানুশীলনের আবশ্যকতা নিহিত রহিয়াছে।

আত্মানুশীলনের দ্বারাই মানব বুঝিতে পারে যে, আত্মাই জীবের সর্ব্বস্ব, আত্মাই কর্ত্তা বা প্রভু। তাহার মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই যন্ত্রস্বরূপ। আত্মজ্ঞান-সাধক দেখেন যে, আত্মস্বরূপ তিনিই প্রকৃত জ্ঞাতা বা বিষয়ী, অপর সমস্তই জ্ঞেয় বা বিষয়।

এই যে জ্ঞাতা, ইনিই আত্মা বা ব্রহ্ম। ইঁহার বহুত্ব-বোধ অজ্ঞান বা ভ্রান্তজ্ঞান-বিজৃম্ভিত। তরঙ্গ-হিল্লোলিত বারি-বক্ষে যেমন এক সূর্য্য বহু সূর্য্যরূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ অবিদ্যা বা অজ্ঞান-বিক্ষেপ-বিকৃত মনে এক ব্রহ্মে বহুত্ব কল্পিত হয়। মনকে শান্ত সমাহিত কর। জল থিতাইলে সূর্য্য এক, মন থিতাইলে ব্রহ্মও "একমেবা-দ্বিতীয়ম্।" তুমি আত্মজ্ঞানালোকে আলো-কিত হও, সমস্ত ভেদ-বোধ চলিয়া যাইবে, জাতি-কুল-বর্ণ-বাধকতা বিলুপ্ত হইবে; সমস্ত জগৎ তোমার আপনার হইবে। "বসুধৈব কুটুম্বকং" বাক্য তোমাতেই সার্থক হইবে। হর্ষ তোমাকে চঞ্চল করিবে না, বিষাদ তোমাকে অবসন্ন করিবে না। জয় তোমাকে উত্তেজিত করিবে না, পরাজয় তোমাকে অভিভূত করিবেনা। জীবন তোমাকে উৎ-সাহিত করিবে না, মরণ তোমাকে ভীত করিবে না। তখন তোমার হইবে——

"নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপ-পত্তিষু।" (গীতা)

তখন তুমি সর্ব্বশান্তিপ্রদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

মাত্র বুদ্ধিগত আত্মপ্রতীতিতেই যথেষ্ট হইবে না, আত্মার অদ্বৈতত্ব জ্ঞানগতভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে।

"কো মোহঃ কঃ শোক একত্ব-
মনুপশ্যত।"

হইলে অদ্বৈত-জ্ঞানোদয়,
কোথা মোহ—কোথা শোক রয় ?

যে বুদ্ধিতে যে ভাবে আমরা বাহ্য বিষয় সমূহ অবগত হই, "আমি"—আত্ম ও ব্রহ্ম-তত্ত্ব সে বুদ্ধিতে—সে ভাবে অবগত হইবার বিষয় নহে। যে মুহূর্ত্তে তুমি 'আমি'কে জানিবে, সেই মুহূর্ত্তেই 'আমি' তুমি হইয়া যাইবে। বিষয়ীই বিষয়ীভূত হইবে। "আমি" সকলেরই জ্ঞাতা, কিন্তু "আমি" জ্ঞেয় নহি। যাহাহউক, সাধন বলে এই আত্মার অলৌকিক অনুভূতি হয়।

"যস্যামতং তস্যমতং মতং যস্য
নবেদসঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতম-
বিজানতাং॥" (কেনশ্রুতি)

বৃহদারণ্যক শ্রুতি আরও বুঝাইয়া দেন যে, দৃষ্টির দ্রষ্টাকে দেখা যায় না, শ্রুতির শ্রোতাকে শুনা যায় না, ভাবনার ভাবককে ভাবা যায় না, জ্ঞানের জ্ঞাতাকে জানা যায়না।

"নেতি—নেতি" ভাবের অনুসন্ধানে,—ব্রহ্ম ইহা নহেন, উহা নহেন, যাহা কিছু আমরা জানিতে পারি, তাহা নহেন; এই ভাবের অনুসন্ধানে অবান্তরক্রমে আমরা ব্রহ্মতত্ত্ব লক্ষ্য করিতে পারি মাত্র।

যাহাহউক, মোটামুটি আমরা এইটুকু বুঝিতে পারি যে, নির্গুণ ব্রহ্ম মানব-জ্ঞানের অবিষয়ীভূত হইলেও, সগুণ ব্রহ্মকে আমরা বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্তা বলিয়া বুঝিতে বা অন্ততঃ মানিতে পারি। আধুনিক বিজ্ঞানের এই আপাততঃ গৌরব যে, জগৎ-কারণের বহুত্ব-স্থলে ক্রমে এক্ষণে তদ্দ্বারা একত্ব সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকৃত হইতেছে। এই বিশ্বের অনন্ত কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খল-প্রবাহ কল্পনায় অতিক্রম করিলে, মূলে মূলকারণ ব্রহ্মকেই পাই।

এই বিশ্ব ব্রহ্মকেন্দ্র হইতে বিকাশিত। ইহার ভৌতিক সত্তা ব্রহ্মেই বিলীন ছিল; ব্রহ্মের সগুণত্ব-জনিত ইচ্ছাশক্তির স্ফুরণে উহা প্রকাশিত হইয়াছে। অব্যক্ত ব্যক্ত হইয়াছে। মহামহীরুহ বটবৃক্ষের গুণ্ড শাখা-প্রশাখাকাণ্ডাদি-সমন্বিত প্রকাণ্ড দেহায়তন একদিন ক্ষুদ্রতম বট-বীজেই সূক্ষ্মতমভাবে নিহিত ছিল; ক্রমে অঙ্কুরিত হইয়া, বহিঃপ্রকৃতির অনুকূলতায় ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইতে হইতে কালে বিশাল বটবিটপীরূপে পরিণত হইল! বৃক্ষ বীজে নিহিত, কার্য্য কারণে নিহিত; সুতরাং কার্য্য হইতে কারণ স্বতঃই সূক্ষ্ম। সমগ্র সংসারের মূল কারণ ব্রহ্ম। বিরাট বিশ্ব-বিটপীর বীজ ব্রহ্ম; সুতরাং ব্রহ্ম পদার্থ সর্ব্বময়রূপে বৃহৎ হইলেও কারণরূপে সুসূক্ষ্ম-অব্যক্ত—অননুভবনীয়। কারণ-ব্রহ্ম কার্য্য-বিশ্বরূপে বিকাশিত। ফলিতার্থে কারণ ও কার্য্য এক। এতাবতা অব্যক্ত কারণ-ব্রহ্ম আমাদের অজ্ঞেয় হইলেও, সুব্যক্ত কার্য্য হইতে আমরা ইহার সত্তা অনুভব করিতে পারি। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা। | ভাদ্র। | ১৩০৭ সাল, ১৮২২ শকাব্দা।

বেদান্ত-সূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জন্ম-বৃদ্ধি-মৃত্যুর ব্যাপার আমরা প্রতি-নিয়ত আমাদের চতুর্দ্দিকে প্রত্যক্ষ করিতেছি। একদিকে সৃষ্টি-স্থিতি, অপরদিকে লয়; এইরূপে সৃষ্টির সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতেছে। মৃত্যু ভিন্ন জন্ম নাই, জন্মভিন্ন মৃত্যু নাই। জন্ম-মৃত্যু পরস্পর আপেক্ষিক। একের অনুভূতি ভিন্ন অপরের অনুভূতি অসম্ভব। সুখ-দুঃখ, আলো-অন্ধকার, ভাল-মন্দ, শৈত্য-উষ্মা, পাপ-পুণ্য, এইরূপে জগৎ দ্বন্দ্বাত্মক।

জগতের সর্ব্ব পদার্থেরই জীবন-মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অতএব জগৎ-কারণেও জীবন-মরণ উভয়েরই কারণতা রহিয়াছে, বুঝিতে হইবে। কতকগুলি বীজ বপন কর; কতক অঙ্কুরিত হইবে, কতক অঙ্কুরিত হইবেনা। অনঙ্কুরিত গুলিতে যথোচিত জীবন-শক্তির অপ্রতিষ্ঠাই অনঙ্কুরণের কারণ, সন্দেহ নাই। জল, বায়ু, আলোক, উত্তাপ ইত্যাদির সমব্যবস্থা সত্বেও এই বৈষম্য কেবল বীজগত উক্ত বিষম শক্তিদ্বয়ের ক্রিয়াফল মাত্র। এইরূপে কারণের বহুত্ব হইতে আমরা একত্বে উপনীত হই। মূল কারণে ঐ দুই বিপরীত শক্তির সত্তা উপলব্ধি করিতে পারি। উহার একটি জনন-শক্তি, অপরটী মরণ-শক্তি। এই শক্তিদ্বয় পরস্পর সাপেক্ষ বিধায়, একের সত্তায় অন্যের সত্তা অবিচ্ছেদ্য। এই শক্তিদ্বয় জগতে অনবরত কার্য্যশীল। বৈদান্তিকেরা এই শক্তি-দ্বয়ের আধারকে সগুণ ব্রহ্মের মায়াতত্ত্ব-রূপিণী বলেন। এই শক্তিদ্বয়ের অন্তর্ভূতই ত্রিগুণ। সত্ত্ব ও রজোগুণ জীবন-শক্তির অন্তর্ভূত এবং তমোগুণ মরণ-শক্তির অন্তর্ভূত; অথবা জীবনশক্তি সত্ত্ব-রজোময়ী ও মরণশক্তি তমোময়ী। বিকাশ ও বৃদ্ধিই সত্ত্ব ও রজোগুণের ফল, সংহার বা অন্ধকারই তমোগুণের ফল। মনেকর, তুমি একটি ভাবতত্ত্ব ভাবিতেছ, কিন্তু সিদ্ধান্ত-নিষ্পত্তি হইতেছেনা। তুমি তোমার মস্তিষ্ক খাটাইতেছ, ক্রমে সিদ্ধান্ত জন্মিয়া আসিতেছে, ইহাই রজোগুণের কার্য্য বা জন্ম ও বৃদ্ধি। পরে, ভাবটী সুসম্পন্নভাবে সিদ্ধান্ত-পূত হইয়া

দাঁড়াইল, সেই অবস্থাই সত্ত্বগুণের কার্য্যফল বা বিকাশ ও স্থিতি; আর যদি ভাবটি শতচিন্তার ব্যায়ামেও বিকসিত বা সিদ্ধান্তসংস্থিত না হইল, তবে তাহাই তমোগুণ বা লয়শক্তির কার্য্যফল।

দীপালোক-বিভা বিমল স্বচ্ছ চিম্‌নী দিয়াই বিকাশিত হয়, কিন্তু একটি মেটে হাঁড়ীর ভিতর আলো জ্বালিলে, তাহার বিভা কদাচ বাহিরে বিকাশিত হইবে না। যদি চিম্‌নী অমল ধবল হয়, অমল ধবল আলো বাহির হইবে; যদি রঞ্জিত চিম্‌নী হয়, রঞ্জিত আলো বাহির হইবে। এইরূপ আমাদের অধ্যাত্মালোক যখন আমাদের জীবনে বিকাশিত হয়না, তখন উহা তমোগুণরূপ মেটে হাঁড়ী-ঢাকা বুঝিতে হইবে। আর যখন রঞ্জিত অর্থাৎ একটু বিকৃত—বাহ্যবস্তু-মিশ্রিত-ভাবে বিকাশিত হয়, তখন উহা রজোগুণরূপ রঞ্জিত চিম্‌নী-আবৃত; আর যখন উহা বিশোধিত বিমল বিভায় বিকাশ পায়, তখনই তদুপরে সত্ত্বের সেই অমল ধবল চিম্‌নী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

স্বচ্ছ—সত্ত্ব-স্ফাটিকাধারে কাহার অধ্যাত্মালোক জ্বলে? যাহার পূর্ব্বোক্ত "শম-দমাদি ষট্ সম্পত্তি" অর্জ্জিত, মন কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জিত। সে স্থলে আত্মার স্বকীয় স্বাধীন সমুজ্জ্বল অবিকৃত আলোকই অতুল্য প্রভায় প্রকাশিত।

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই ত্রিশক্তিই বিশ্ব-ব্যাপার-বিধাত্রী হইয়া আছেন। এই শক্তি-ত্রয় বা গুণত্রয় যখন ব্রহ্মে সাম্যাবস্থায় বিলীন থাকেন, তখন সেই ত্রিগুণ-সাম্য-মূলশক্তি বা আদ্যাশক্তিই "প্রকৃতি" পদবাচ্য হন। এই প্রকৃতি হইতেই গুণত্রয় যোগে সর্ব্ব জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হয়। ব্রহ্ম স্ব-ইচ্ছায় সগুণ হইয়া, প্রকৃতির এই গুণত্রয় যোগেই রজোগুণে ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণে বিষ্ণু ও তমোগুণে শিব হইয়াছেন এবং সংসারের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারে রত আছেন। ব্রহ্মকে আমরা নির্গুণ অব্যক্ত তত্ত্বে জানিতে পারি না সত্য, কিন্তু এই ত্রিগুণাবতার ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বররূপে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার কার্য্যে তাঁহাকে সগুণ ব্যক্ত তত্ত্বে উপলব্ধি করিতে পারি। ব্রহ্মের বিশ্ব-মূল-কারণত্ব এই ত্রিগুণাশ্রিত সগুণভাবেই জ্ঞাতব্য।

ব্রহ্মের বিশ্বকারণত্ব যে কেবল দার্শনিক যুক্তি-তর্ক-বিচারেই বোধ্য, তাহা নহে; স্মরণাতীত কাল হইতে—মানব-সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই মানব-মনে স্বতএব উহা স্পষ্টভাবে মুদ্রিত। বিশ্বকারণস্বরূপে ঈশ্বর-তত্ত্ব-বিশ্বাস মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক সম্পত্তি।

ভৃগুবারুণী পিতৃসকাশে ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে চাহিলে, পিতা বরুণ বলিলেন "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্ব্রহ্মত্বংবিদ্ধি।"

এই ভূতগ্রাম যাঁ হ'তে জনিত,
জন্মিয়া রহিছে যাঁহাতে জীবিত,
লয়ে হয় পুনঃ যাঁহাতে নিহিত,
তিনি ব্রহ্ম, তুমি হওহে বিদিত।

(তৈত্তিরীয় উপনিষৎ-৩-১) আনন্দস্বরূপ হইতে ভূতগ্রাম সম্ভূত, আনন্দস্বরূপেই জীবিত এবং প্রলয়ে আনন্দস্বরূপেই নিহিত হয়।

প্রাচীন ভারতের ঋষি মুখ-নির্গত ভগবৎ-প্রত্যাদিষ্ট সিদ্ধবাণী সমূহের সমষ্টিই সনাতন সত্যপূত বেদশাস্ত্র। উহা ব্রহ্মের প্রতি-

পাদক। কেবল আমাদিগের শাস্ত্রই যে ব্রহ্ম প্রতিপাদন করে, এমন নহে; সর্ব্ব জাতির সর্ব্ববিধ শাস্ত্রও ব্রহ্ম-প্রতিপাদন করিয়া থাকে।

ব্রহ্মই বিশ্বকারী, ব্রহ্মই বিশ্বধারী, ব্রহ্মই বিশ্বহারী, ইহা সর্ব্ববেদ-সম্মত সার সিদ্ধান্ত, সন্দেহ নাই। যেখানেই ব্রহ্মতত্ত্ব-বর্ণনা, জগৎ-কারণ-আলোচনা, সেইখানেই ঐ অর্থ মূর্ত্তিমান। সকল শাস্ত্রে আপাততঃ নানাবিধ বিভিন্ন বিষয় উক্ত এবং ব্যক্ত থাকিলেও, সকলের সমন্বয় ব্রহ্মেই, সন্দেহ নাই। শাস্ত্র মাত্রেরই সমন্বয় সেই পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

সাংখ্য দর্শন।

(ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত কারিকা।)

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)।

বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি তেষাং পঞ্চবিশেষাবিশেষ বিষয়াণি।
বাগ্‌ভবতি শব্দবিষয়া শেষাণিতু পঞ্চ বিষয়াণি ॥ ৩৪ ॥

বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াণি। তেষাং। পঞ্চ-বিশেষ অবিশেষ-বিষয়াণি। বাক্। ভবতি। শব্দ-বিষয়া। শেষাণি। তু। পঞ্চ-বিষয়াণি।

ব্যাখ্যা ॥ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি—জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ। তেষাং—তাহাদের (দশেন্দ্রিয়ের) মধ্যে। পঞ্চবিশেষা বিশেষ বিষয়াণি—পঞ্চ-বিশেষ অর্থাৎ স্থূল ও পঞ্চ অবিশেষ অর্থাৎ সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রকাশক। বাক্—বাগিন্দ্রিয়। ভবতি—হইতেছে। শব্দবিষয়া (স্থূল) শব্দ গ্রহণ সমর্থা। শেষাণি—অবশিষ্ট (চারিটী) ইন্দ্রিয়। তু। কিন্তু। পঞ্চবিষয়াণি—পাঁচটী বিষয়-গ্রাহক।

বঙ্গার্থঃ। দশটী ইন্দ্রিয়ের মধ্যে পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটী স্থূল এবং সূক্ষ্মপদার্থ-বিষয়ক। বাগিন্দ্রিয়ের স্থূলশব্দ বিষয়। অপর চারিটী অর্থাৎ পায়ু, উপস্থ, হস্ত, পাদ, ইহারা পঞ্চবিষয়ক।

বিশদব্যাখ্যা ॥ বাহ্যেন্দ্রিয় বর্ত্তমান-সময়ে উপস্থিত পদার্থকে গ্রহণকরে, অতীত অথবা অনাগত বস্তু গ্রহণে তাহার সামর্থ্য নাই, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই কারিকায় বাহ্যেন্দ্রিয়ের মধ্যে কে কোন পদার্থ গ্রহণে সক্ষম, তাহা বলা হইতেছে। দৃশ্যমান ভৌতিকজগতের প্রতিবস্তুই দ্বিবিধ অবস্থাশালী, ইহার একটী সূক্ষ্ম, অপরটী তদপেক্ষায় স্থূল। আমাদের চক্ষু যে পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে পারে, তাহাই আমাদের বিবেচনায় স্থূল। আবার যেখানে (অর্থাৎ পরমাণু প্রভৃতিতে) আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় পরাজিত, সেখানে যোগীর দর্শন-শক্তি অপ্রতিহত। বস্তুতঃ দার্শনিক ভাষায় বলিতে গেলে একটী জগতের ভৌতিক স্থূল ভাব, অপরটী আণবিক তন্মাত্রভাব। এই তন্মাত্রের নাম অবিশেষ। কেননা উহাতে কোনও বিশেষত্ব নাই। উহা ভৌতিক অণুমাত্র। বিজাতীয় অণুর পরস্পর রাসায়নিক সংযোগ জনিত নূতন গুণ, নূতন আকার প্রকার বিশিষ্ট স্থূল ভূত গুলির তুলনায় উহা যথেষ্ট সূক্ষ্ম পদার্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরস্পর সংযোগ বশতঃ

নানাবিধ গুণ-ক্রিয়ার বিকাশ হইতে দেখা যায়, স্থূল ভূতে সেইটুকুই বিশেষত্ব। আমাদের দৃশ্যমান স্থূল জলে জলের রস, বায়ুর স্পর্শ, আকাশের শব্দ, অগ্নির রূপ, ভূমির গন্ধ, সকলই বিদ্যমান। এই জলটী পঞ্চ তন্মাত্রের সম্মিলনজনিত। এই জলকে বাষ্পোৎপন্নতা হেতুক যৌগিক পদার্থ বলিতে পারিয়াই আজ কাল অনেকে আর্য্যমহোদয়গণের পদার্থ-নির্ণয়ে দোষ খলিলাম, মনে করেন। ইহাকে দুর্দ্দশা ব্যতীত আর কি বলে? শ্রবণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, ইহারা পঞ্চস্থূল এবং পঞ্চসূক্ষ্ম বিষয়কে গ্রহণ করে। আমাদের চক্ষু স্থূল-পদার্থ দর্শন করে, ঐরূপ শ্রবণাদি স্থূলই গ্রহণ করে। যোগিগণের চক্ষু তন্মাত্র বা অণু দর্শন করিতে সমর্থ হয়। আপাততঃ এগুলি আমাদের সাধারণ-বুদ্ধির বিষয় নহে। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষমতার অতীত বস্তু মাত্রকেই প্রায়শঃ অস্বীকার করিতে পারিলেই ত্রুটি করিনা। এই ভ্রম অপনোদনের জন্য আমাদিগকে বিশ্বাস অবলম্বন করিতে হইবে। বাক্ স্থূল-শব্দ-বিষয়িণী। বাচস্পতি মিশ্র মহাশয় সূক্ষ্মশব্দ বাগিন্দ্রিয়ের বিষয় নয় বলিয়াছেন। সূক্ষ্ম শব্দ, শুনিবার যোগ্য হইলেও বলিবার যোগ্য নয়, তাহা নিঃসন্দেহ। পায়ু, উপস্থ, হস্ত, পদ, এই চারিটী ইন্দ্রিয়ের-বিষয় যে সকল পদার্থ, তাহারা শব্দ-স্পর্শাদি পাঁচটীর সম্মিলনজাত, কাজেই তাহারা পঞ্চবিষয়ক। পাণির ক্ষমতা গ্রহণ করা। মনে করা যাউক, গ্রহণ করিবার বিষয় ঘটটী; ঐটী শব্দ-স্পর্শাদি পঞ্চ শক্তির সমবায়, সুতরাং পাণি অর্থাৎ হস্ত নামক কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চবিষয়ক। অপর তিনটীও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

সান্তঃ করণাবুদ্ধিঃ সর্ব্বং বিষয়-
মবগাহতেযস্মাৎ।
তস্মাৎ ত্রিবিধং করণং দ্বারি
দ্বারাণি শেষাণি ॥ ৩৫ ॥

পদপাঠঃ। স-অন্তঃকরণা। বুদ্ধিঃ। সর্ব্বং। বিষয়ং। অবগাহতে। যস্মাৎ। তস্মাৎ। ত্রিবিধং। করণং। দ্বারি। দ্বারাণি। শেষাণি।

ব্যাখ্যা॥ সান্তঃকরণা—অন্তঃকরণ সহিতা। বুদ্ধিঃ—অহঙ্কারের কারণ—মহত্তত্ত্ব। সর্ব্বং—সকল। বিষয়ং—বিষয়কে। অবগাহতে—অবগাহন করে। তস্মাৎ—সেই জন্য। ত্রিবিধং—তিন প্রকার। করণং—জ্ঞানের সাধন। দ্বারি—প্রধান। দ্বারাণি—দ্বার অর্থাৎ অপ্রধান। শেষাণি—অবশিষ্ট কয়টী। (করণ)

বঙ্গার্থঃ। অন্তরিন্দ্রিয়ের সহিত বুদ্ধি সকল প্রকার বিষয় গ্রহণ করে, সেই জন্য ত্রিবিধ করণ প্রধান, অবশিষ্ট সকল অপ্রধান।

বিশদব্যাখ্যা॥ বাহেন্দ্রিয়গণ ও অন্তরিন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি, এই ত্রিবিধ জ্ঞান সাধনের মধ্যে বস্তুতঃ কোন্ গুলির বা কোন্টীর প্রাধান্য বা অপ্রাধান্য, তাহাই নির্দ্ধারণ করিবার জন্য এই কারিকা রচিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গণ বস্তু আলোচনা করেন, তার পর মন সঙ্কল্প করেন, অহঙ্কার অভিমান করেন, তৎপরে বুদ্ধি নিশ্চয় করেন। এখানে অন্তরিন্দ্রিয়ের সহিত বুদ্ধিকেই প্রধান বলা

হইতেছে; কেননা দশেন্দ্রিয়গণ দ্বারা জ্ঞান অপরিস্ফুটরূপে উপস্থিত হয়। অন্তঃকরণে গিয়া পুষ্ট হয়, বুদ্ধিতে গেলে সংশয়-শঙ্কা দূর হয়, সুতরাং বাহ্যেন্দ্রিয় অপেক্ষা অন্তরিন্দ্রিয় ও বুদ্ধি শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হওয়া সঙ্গত। দ্বারি শব্দের অর্থ প্রধান। (দ্বারং অস্তীতি ব্যুৎপত্ত্যা।) অর্থাৎ যাহার দ্বার অর্থাৎ কার্য্য নিষ্পাদনের একটী অবান্তর স্তর আছে। বাহ্যেন্দ্রিয়গণ অধ্যবসায়রূপ বুদ্ধি-কার্য্যে সহায়তা করে, কিন্তু আলোচনায় (ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে।) বুদ্ধির সাহায্য-সম্ভাবনা নাই। ইন্দ্রিয়গণ বুদ্ধির আজ্ঞাবহ, বুদ্ধি-স্বতন্ত্রা, সুতরাং প্রধানা।

এতে প্রদীপকল্পাঃ পরস্পর
বিলক্ষণা গুণবিশেষাঃ।
কৃৎস্নং পুরুষস্যার্থং প্রকাশ্য
বুদ্ধৌ প্রযচ্ছন্তি ॥ ৩৬ ॥

পদপাঠঃ। এতে। প্রদীপকল্পাঃ। পরস্পর বিলক্ষণাঃ। গুণ বিশেষাঃ। কৃৎস্নং। পুরুষস্য। অর্থং। প্রকাশ্য। বুদ্ধৌ। প্রযচ্ছন্তি।

ব্যাখ্যা ॥ এতে—এই সকল। প্রদীপ-কল্পাঃ প্রদীপসদৃশ। পরস্পর বিলক্ষণাঃ—পরস্পর পৃথক্। গুণ বিশেষাঃ—গুণ সকল প্রত্যেকে। কৃৎস্নং—সকল। পুরুষস্য—পুরুষের। অর্থং—বিষয়। প্রকাশ্য—প্রকাশ করিয়া। বুদ্ধৌ—বুদ্ধিতে। প্রযচ্ছন্তি—পৌঁছিয়া দেয়। (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা আলোচিত বিষয় তাহারা অন্তঃকরণে দেয়, এরূপ অন্তঃকরণ অহঙ্কারে, অহঙ্কার বুদ্ধিতে উপস্থিত করে, সেইখানে বুদ্ধির অধ্যবসায় হইলে, বস্তুটী প্রকৃতপক্ষে জ্ঞাত হইল, অর্থাৎ বস্তুজ্ঞান পূর্ণতা লাভ করিল।)

বঙ্গার্থঃ। প্রদীপের মত পরস্পর বিরোধী এই সকল গুণ (ইন্দ্রিয় হইতে অহঙ্কার পর্য্যন্ত) সমস্ত পুরুষার্থ প্রকাশ করিয়া বুদ্ধিতে লইয়া উপস্থিত করে।

বিশদ ব্যাখ্যা ॥ বাহ্যেন্দ্রিয় অপেক্ষা অন্তঃকরণ, অহঙ্কার ও বুদ্ধি, এই তিনটীর প্রাধান্য পূর্ব্বে বলা হইল। এখানে বলা আবশ্যক যে, বুদ্ধি, অন্তঃকরণ ও অহঙ্কার হইতেও শ্রেষ্ঠা। (ঐ দুইটীও বুদ্ধির ব্যাপারে দ্বার মাত্র হইবে।) মনে করা যাউক, যেমন কৃষক প্রজাগণের নিকট হইতে গোমস্তাগণ কর আদায় করেন; তিনি নায়েব মহাশয়কে দেন; নায়েব মহাশয় সদর নায়েবের কাছে দেন; তিনি দেওয়ানকে দেন; দেওয়ান রাজামহাশয়কে অর্পণ করেন, ঐরূপ বাহ্যেন্দ্রিয়, বিষয়ের আলোচনজ্ঞান লইয়া মনকে দেন, মন অহঙ্কারকে, অহঙ্কার বুদ্ধিকে, বুদ্ধি আবার আত্মায় প্রদান করিয়া তাঁহার ভোগ সম্পাদন করেন। এখানে সাক্ষাৎসম্বন্ধে রাজার নিকট উপস্থিত করেন বলিয়া যেমন দেওয়ান, নায়েব ও সদরনায়েব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ বুদ্ধি সাক্ষাৎ আত্মার ভোগ নিষ্পাদন করেন বলিয়া, মন ও অহঙ্কার হইতে প্রধানা।

এখানে একটী বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গণের সামর্থ্য এবং কার্য্যপ্রণালী পরস্পর বিভিন্ন, মনের কার্য্যের সহিতও ইহাদের মিল নাই। একরূপ বুদ্ধির কার্য্যও কাহারও সহিত মিলে-

না। এই ত্রয়োদশটী করণের মধ্যে প্রত্যেকেই পৃথক্‌প্রকৃতির। কিন্তু এই বিরুদ্ধধর্ম্মশীল পদার্থসকল পরস্পর বিরোধ করিয়া পরস্পরের কার্য্যে সহায়তা করিতে আপত্তি প্রকাশ করে না কেন? চক্ষু যখন কোনও পদার্থের দর্শনজ্ঞান সম্পাদন করিবার জন্য ব্যগ্র হইল, তখন শ্রবণ চুপ করিয়া না থাকিয়া, দর্শনজ্ঞানে বাধা জন্মাইবার জন্য শ্রবণজ্ঞান উৎপাদনের চেষ্টা করে না কেন? মনই বা আলোচিত বস্তুর সংকল্প করে কেন? প্রত্যেকে অপরের সহায়তা করা ভিন্ন বিরুদ্ধাচরণ করিতে চায় না, কিন্তু ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মা। আর একটু উপরে উঠিলে বুঝা যাইবে, ত্রিগুণের বিভিন্ন প্রকার বিকাশ ব্যতীত এই ইন্দ্রিয়াদি আর কিছুই নয়; কিন্তু গুণত্রয়েরও পরস্পর বিভিন্ন ভাব। কেহ লঘু, কেহ গুরু, কেহ প্রকাশ, কেহ অপ্রকাশ, কেহ সচল, কেহ অচল, ইহারাই বা কেমন করিয়া একে অপরের সহায়তা করে? এই তর্কের প্রত্যুত্তরে বলা হইতেছে—"প্রদীপকল্পাঃ।" যেমন প্রদীপে তিনটি বিরুদ্ধ-পদার্থ একত্র মিলিত হইয়া পরস্পরের সহায়তা সম্পাদন করে, কেহ কাহারও বাধা জন্মায় না, এখানেও সেইরূপ। প্রদীপের তৈল, প্রদীপের সলিতা ও আগুন, এই তিনটি যে তিনধর্ম্মা, তাহা বলিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু অন্ধকার বিনাশ ও প্রকাশ-কার্য্য সম্পাদনের জন্য, ইহারা বিরোধী হইয়াও একে অপরের অনিষ্ট অর্থাৎ কার্য্যে প্রতিবাদ করে না। এখানেও ইন্দ্রিয়গণ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, ইহারা পুরুষার্থ নিষ্পাদনের জন্য বিরোধিতা ভুলিয়া যাইয়া পরস্পরকে সাহায্য করিতেছে।

বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা, এই তিনটি পদার্থ পরস্পর বিরুদ্ধ। ইহারা একে অপরকে আক্রমণ না করিয়া কেমন সমভাবে শরীর রক্ষা করে! কাহারও কার্য্যে কেহ আপত্তি করিয়া বিষম বিভ্রাট ঘটাইয়া বসে না।

সর্ব্বং প্রত্যুপভোগং যস্মাৎ পুরুষস্য সাধয়তি বুদ্ধিঃ।
সৈব চ বিশিনষ্টিপুনঃ প্রধান-পুরুষান্তরং সূক্ষ্মং। ৩৭।

পদপাঠঃ। সর্ব্বং। প্রত্যুপভোগং। যস্মাৎ। পুরুষস্য। সাধয়তি। বুদ্ধিঃ। সা। এব। চ। বিশিনষ্টি। পুনঃ। প্রধান—পুরুষ—অন্তরং। সূক্ষ্মং।

ব্যাখ্যা। সর্ব্বং—সকল। প্রত্যুপভোগং-তচ্ছায়াপত্তিরূপভোগ। যস্মাৎ—যে হেতুক। পুরুষস্য—পুরুষের। সাধয়তি—সম্পাদন করে। বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি। সা—সেই। এব—ই। চ—আরও। বিশিনষ্টি—সম্পাদন করে। প্রধান—পুরুষ—অন্তরং—প্রকৃতি—পুরুষের পার্থক্য। সূক্ষ্মং—দুর্জ্ঞেয় অর্থাৎ যাহা সাধারণ অপরিষ্কৃতচিত্তের বোধবিষয় নহে।

বঙ্গার্থঃ। বুদ্ধি, পুরুষের সকলভোগ নিষ্পাদন করে। আরও সেই বুদ্ধিই প্রকৃতি-পুরুষের সূক্ষ্ম পার্থক্যজ্ঞান উৎপাদন করে।

বিশদব্যাখ্যা॥ অহঙ্কার বা মন প্রধান নহে, কেননা তাহারা বুদ্ধিতে বিষয় সমর্পণ

করে। এটি ভোগসম্পাদনে বুদ্ধির প্রাধান্য বলা হইল, মোক্ষেও যে বুদ্ধিরই শ্রেষ্ঠতা, ইহা এই কারিকাতে প্রদর্শিত হইতেছে।

কার্য্য মাত্রেরই কতকগুলি কারণ থাকা চাই। একটী কারণ হইতে একটী কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না। যদি উহা স্বীকার করা হয়, তবে তর্কশাস্ত্রে তাহাকে এক-কারণ-শেষাপত্তি দোষ বলা হয়। পুরুষের ভোগ সম্পাদনে অনন্ত পদার্থ কারণ, কিন্তু সাক্ষাৎ সাধন বলিয়া বুদ্ধিই প্রধান কারণ। মোক্ষের বেলাও ঐরূপ। প্রকৃতি অচেতনা প্রসবধর্ম্মিনী ত্রিগুণা, পুরুষ চেতন, অপ্রসবধর্ম্মা, নির্গুণ। প্রকৃতি কর্ত্রী, পুরুষ অকর্ত্তা। এই যে ভেদজ্ঞান, ইহাতেও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বুদ্ধির কারণতা, সুতরাং প্রাধান্য। যে প্রকৃতির ও পুরুষের পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়াই জীবকুল অবিরত ত্রিতাপানলে দগ্ধ হইতেছে, সে পৃথগ্‌ভাব বুঝাইলেন বুদ্ধি। অতএব বুঝাযাইতেছে, মোক্ষ এবং ভোগে প্রধান সাধন বুদ্ধি; মন ও অহঙ্কার হইতে তাঁহার স্থান অনেক উচ্চে। গুণাগুণ বিচারেও দেখা যায়, মনের সংশয় অপেক্ষা বুদ্ধির গুণ নিশ্চয় কত উৎকৃষ্ট। অহঙ্কার এবং অধ্যবসায়, এতদুভয়ের তুলনা করিলে, কোন্‌টীকে শ্রেষ্ঠ বলিতে ইচ্ছা হয়? ইহার দ্বারা প্রতিপাদিত হইল যে, দশেন্দ্রিয় ও মন এবং অহঙ্কার ও বুদ্ধি, এই ত্রয়োদশবিধ করণের মধ্যে বুদ্ধির প্রাধান্য স্বীকার্য্য। করণের গুণ-ক্রিয়া-বৈভাগাদি প্রদর্শিত হইল।

তন্মাত্রাণ্যবিশেষাস্তেভ্যোভূতানি
পঞ্চ পঞ্চভ্যঃ।

এতে স্মৃতা বিশেষাঃ শান্তা
ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ। ৩৮॥

ব্যাখ্যা। তন্মাত্রাণি—ভূতগণের সূক্ষ্মাবস্থা। অবিশেষাঃ—শান্তত্ব-ঘোরত্ব-মূঢ়ত্বাদিশূন্য। তেভ্যঃ—তাহাদিগের হইতে। ভূতানি—স্থূল ভূত। পঞ্চ—পাঁচটী। পঞ্চভ্যঃ—পাঁচহইতে। এতে—ইহারা। স্মৃতাঃ—কথিত হয়। বিশেষাঃ—বিশেষ। শান্তাঃ—শান্ত। ঘোরাঃ—ঘোর। চ—এই হেতু। মূঢ়াঃ—মূঢ়। চ—এবং।

বঙ্গার্থঃ। তন্মাত্র গুলি অবিশেষ, তাহা-হইতে অর্থাৎ সেই পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি। এই স্থূল ভূতেরা বিশেষ নামে কথিত হয়, যে হেতু ইহারা শান্ত, ঘোর এবং মূঢ়।

বিশদব্যাখ্যা। তন্মাত্রে বিশেষত্ব নাই। মহাভূতের সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক শান্তত্ব, ঘোরত্ব, মূঢ়ত্ব আছে, তাহারা ইহাদ্বারাই পরস্পর পৃথগ্‌ভাবে অনুভূত হয়, কাজেই ইহাদের বিশেষ নাম হয়। সূক্ষ্মভূত আমরা পরস্পর পৃথগ্‌ভাবে অনুভব করিতে পারিনা, কাজেই তাহার বিশেষত্ব আমাদের নিকট অপরিচিত, সুতরাং উহাকে আমরা "অবিশেষ" বলি। এ কারিকার তাৎপর্য্য ও রহস্য পূর্ব্বে অন্যান্য কারিকা-ব্যাখ্যায় প্রকটিত হইয়াছে।

সূক্ষ্মা মাতাপিতৃজাঃ সহপ্রভূতৈস্ত্রি-
ধাবিশেষাঃ স্যুঃ।
সূক্ষ্মাস্তেষাং নিয়তা মাতাপিতৃজা
নিবর্ত্তন্তে। ৩৯।

ব্যাখ্যা॥ সূক্ষ্মাঃ—সূক্ষ্ম অর্থাৎ বর্ত্তমান চক্ষুর অদৃশ্য। মাতাপিতৃজাঃ—মাতাপিতার

লোহিতরেতঃ সম্ভূত। সহ—সহিত। প্রভূতৈঃ-মহাভূতের। ত্রিধা—তিন প্রকার। বিশেষাঃ-পূর্ব্ব কারিকায় কথিত বিশেষ। স্যুঃ—হইবে। সূক্ষ্মাঃ—সূক্ষ্মগণ। তেষাং—তাহাদের মধ্যে। নিয়তাঃ—নিত্য অর্থাৎ প্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী। মাতাপিতৃজাঃ—যাহারা পিতা হইতে উৎপন্ন, তাহারা। নিবর্ত্তন্তে—নিবৃত্তি অর্থাৎ অচিরে পরিণতি প্রাপ্ত হয়। (সত্বরই অন্য প্রকার হইয়া যায়, জলই হউক আর মাটীই হউক।)

বঙ্গার্থঃ। বিশেষ তিন প্রকার, সূক্ষ্ম অর্থাৎ লিঙ্গশরীর। মাতাপিতৃজ অর্থাৎ ষাট্‌কৌশিকশরীর এবং মহাভূত। (ঘটাদি), তাহাদের মধ্যে সূক্ষ্মশরীর প্রলয়কাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে। ষাট্‌কৌশিক নিবৃত্ত হইবে।

বিশদব্যাখ্যা॥ বিশেষের অবান্তর বিভাগ বলা হইতেছে। সূক্ষ্ম শরীর অনুমানগম্য মানব-চক্ষুর অবিষয়। অনুমান পরে প্রদর্শিত হইবে। মাতাপিতৃজ এই আমাদের প্রত্যক্ষ শরীর। মাতৃভাগ হইতে রোম, রক্ত, মাংস, পিতৃভাগ হইতে স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, এই তিনটী সঙ্কলনে এই ছয়টি মাতাপিতা হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া, এই শরীরের নাম ষাট্‌কৌশিক। লিঙ্গশরীর সৃষ্টির প্রথমে উৎপাদিত, প্রলয় পর্য্যন্ত থাকিবে। ইহলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকে যাইতে হইলে, আত্মা যে শরীর মাত্র অবলম্বন করেন, তাহারই নাম লিঙ্গশরীর। ষাট্‌কৌশিক শরীর যদি পচিয়া যায়, তবে তাহার পরিণতি রসান্তা; আর যদি দাহ করা হয়, তবে তাহার পরিণতি ভস্মান্তা। আর যদি কুক্কুর প্রভৃতিতে ভোজন করে, তবে তাহার পরিণাম মলরূপ প্রাপ্ত হওয়া। এই প্রকারেই ইহার নিবৃত্তি।

পূর্ব্বোৎপন্নমসক্তং নিয়তং
মহদাদিসূক্ষ্মপর্য্যন্তং।
সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈ-
রধিবাসিতংলিঙ্গং। ৪০

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বোৎপন্নং—সৃষ্টি সময়ে প্রত্যেক পুরুষের জন্য একএকটী উৎপাদিত। অসক্তং—অব্যাহত অর্থাৎ শিলার অভ্যন্তরেও প্রবেশ করিতে পারে। নিয়তং—প্রলয় পর্য্যন্ত থাকে। মহদাদি সূক্ষ্ম পর্য্যন্তং—মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, একাদশেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র, এই গুলির সমষ্টি (ইহাতে শান্তত্ব-ঘোরত্ব-মূঢ়ত্ব যুক্ত ইন্দ্রিয় আছে বলিয়া ইহা বিশেষ) যদি বলা যায়, এ শরীর থাকিতে ষাট্‌কৌশিক শরীর সৃষ্ট হইবার উদ্দেশ্য কি? তাহাতেই বলা হইতেছে) সংসরতি—ষাট্‌কৌশিক শরীর পরিত্যাগ করে এবং অন্য ষাট্‌কৌশিক গ্রহণ করে। (যদি বলা যায়, যে কেন? তদুত্তরে কথিত হইতেছে) নিরুপভোগং—যখন ষাট্‌কৌশিক শরীর পরিত্যাগ করিলে সূক্ষ্ম শরীরের ভোগ নাই, কাজেই। ষাট্‌কৌশিকের একটী নাম ভোগায়তন শরীর। আমাদের ভোগ্যবস্তু স্থূল, গ্রহণ উপায় ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানস্থান স্থূল, কাজেই স্থূল অধিষ্ঠান ছাড়িলে ইন্দ্রিয়ের ভোগ অনুপপন্ন হইয়া উঠে। সংসারের কারণ বলিতে গেলে

বলা যাইতে পারে) ভাবৈরধিবাসিতং—"ভাবৈঃ" অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রভৃতি দ্বারা অধিবাসিত অর্থাৎ সম্পর্কিত। (এই হেতু সংসার হয়।) যেমন সুগন্ধচম্পককুসুম বস্ত্রের সহিত সংস্পৃষ্ট হইলে, বস্ত্রে উহার গন্ধ থাকিয়া যায়, তদ্রূপ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি রূপ যে সকল ভাব বুদ্ধিতে আছে, তাহা, লিঙ্গ শরীরে বুদ্ধি আছে বলিয়া লিঙ্গ শরীরেই আছে। লিঙ্গং—লিঙ্গশরীর।

বঙ্গার্থঃ। লিঙ্গ-শরীর সৃষ্টিসময়ে উৎপন্ন, অব্যাহত, মহত্তত্ত্ব হইতে সূক্ষ্মভূত পর্য্যন্ত তাহার উপকরণ, ধর্ম্মাধর্ম্মাদির দ্বারা সংস্পৃষ্ট হইয়াই উহা একটী স্থূলশরীর পরিত্যাগ ও অপরটী গ্রহণ করে, কারণ স্থূলশরীর বিনা ভোগ অসম্ভব।

বিশদ ব্যাখ্যা। লিঙ্গ শরীরের কথা পূর্ব্বে বিশেষরূপে বলা হইয়াছে। অপর কথা ব্যাখ্যায়ই শেষ হইয়াছে। এখানে মতভেদাদি কিছুই বিস্তার ভয়ে বিবৃত হইলনা। লিঙ্গ শরীরের উপাদান সূক্ষ্মভূত অর্থাৎ তন্মাত্র, বুদ্ধি প্রভৃতিও তাহাতে আছে, এই সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্মাদি ভাবের যে পরিণাম, তাহা লিঙ্গ-শরীরকে বাধ্য হইয়াই প্রাপ্ত হইতে হইবে। এই শরীরের নাম "লিঙ্গ" হইবার প্রধান কারণ (লয়ংগচ্ছতি ইতি ব্যুৎপত্ত্যা।) ইহা লয় প্রাপ্ত হয়। যদি বলা যায়, স্থূল শরীরও লয় প্রাপ্ত হয়, অতএব তাহারও ঐরূপ নাম হউক, তখন উত্তরে বলা হইবে, স্থূল শরীরের বিনাশ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অনুমানগম্যলিঙ্গ-শরীরের বিনাশ আছে কিনা, ইহাই নিরূপণ করা আবশ্যক। 'লিঙ্গ' শব্দের অনেক প্রকার অর্থ অনেকে করেন, বিস্তার ভয়ে সে সমস্ত পরিত্যাগ করা গেল। এই কারিকার ৩ প্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারে, তাহাও বলা হইল না, কেবল তত্ত্বকৌমুদীকারের মত বলা হইল।

চিত্রং যথাশ্রয়মৃতে স্থাণ্বাদি-
ভ্যোবিনা যথা চ্ছায়া।
তদ্বদ্বিনা বিশেষৈর্নতিষ্ঠতি
নিরাশ্রয়ং লিঙ্গং ॥ ৪১ ॥

ব্যাখ্যা। চিত্রং—ছবি অর্থাৎ আলেখ্য। যথা—যেরূপ। আশ্রয়ং—আধার। ঋতে—বিনা। স্থাণ্বাদিঃ—স্থাণু প্রভৃতি। (শুষ্ক-কাষ্ঠ অর্থাৎ পোঁতা খুঁটাকে স্থাণু বলে।) বিনা—ব্যতীত। যথা—যেমন। ছায়া—প্রসিদ্ধ ছায়া। তদ্বৎ—সেইরূপ। বিনা—ব্যতীত (বই)। বিশেষৈঃ—সূক্ষ্ম শরীর। নতিষ্ঠতি—থাকিতে পারে না। নিরাশ্রয়ং—আশ্রয়-হীন। লিঙ্গং—বুদ্ধ্যাদিতত্ত্ব। (লিঙ্গন অর্থাৎ আত্মাকে জ্ঞাপন করে বলিয়া বুদ্ধ্যাদিকে লিঙ্গ বলে।)

বঙ্গার্থঃ। চিত্র যেমন আধার বিনা থাকিতে পারে না এবং ছায়া যেরূপ স্থাণু (যাহার ছায়া) ভিন্ন থাকিতে পারে না, সেইরূপ সূক্ষ্ম শরীর ছাড়িয়া নিরাশ্রয় লিঙ্গ অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদি অবস্থান করিতে সক্ষম নহে।

বিশদ ব্যাখ্যা। বুদ্ধি অহঙ্কারের ও ইন্দ্রিয়ের সহিত সংসরণ অর্থাৎ লোকান্তর গমন করে, এরূপ স্বীকার করিলেই সূক্ষ্ম-শরীর অঙ্গীকার করিবার আবশ্যকতা থাকে না, এইপ্রকার আপত্তি এখানে উপস্থিত হইতে পারে, তাহার প্রত্যুত্তর দিবার জন্যই

কারিকার অবতারণা। ছবি আঁকাইতে হইলে তাহার আধার চাই। বুদ্ধি প্রভৃতি এক একটী সূক্ষ্মপদার্থ ইহাদের একটা আণবিক আধার (যাহা ইহাদের অপেক্ষা স্থূল) আবশ্যক, কাজেই পঞ্চসূক্ষ্মভূতময় আধারের উপর ঐ সকলকে স্থাপন করা দরকার। যখন বুদ্ধ্যাদি লোকান্তরে গমন করে, তখন তাহারা একটী সূক্ষ্ম শরীরকে আশ্রয় করিয়া থাকে, নতুবা নিরাশ্রয় গমন করিতে পারে না। ইহা-দ্বারা অনুমান করা যায়, লিঙ্গ শরীর আছে। শাস্ত্রেতে লিঙ্গ শরীরের কথা আছে। সাবিত্র্যুপাখ্যানে লিঙ্গশরীরের লোকান্তর-গমনের প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা, "ততঃ সত্যবতঃ কায়াৎ পাশবদ্ধং বশং গতং। অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ বলাৎ যমঃ॥" সত্যবানের দেহ হইতে যম অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ অর্থাৎ স্থূল শরীররূপ পুরে যে বাস করে, এমন সূক্ষ্মশরীর বাহির করিয়াছিলেন। এখানে আত্মা সর্ব্বব্যাপী বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ মাত্র হইতে পারে না। উহা লিঙ্গ শরীরের পরিমাণ, এই কথা আচার্য্য বাচস্পতি বলেন। এই কারিকায় লিঙ্গশরীর অনুমিত হইল।

পুরুষার্থহেতুকমিদং নিমিত্ত-
নৈমিত্তিক প্রসঙ্গেন।
প্রকৃতের্বিভুত্বযোগান্নটবদ্ব্যব-
তিষ্ঠতে লিঙ্গং ॥৪২॥

ব্যাখ্যা। পুরুষার্থহেতুকং—পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গ-হেতু প্রবৃত্ত। ইদং—ইহা। নিমিত্তনৈমিত্তিকপ্রসঙ্গেন—নিমিত্ত এবং নৈমিত্তিক অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি ও ষাট্কৌশিক শরীর গ্রহণ এই উভয় বিষয়ে যে প্রসঙ্গ অর্থাৎ প্রসক্তি, তাহার দ্বারা। প্রকৃতেঃ—প্রকৃতির অর্থাৎ প্রধানের। বিভুত্ব যোগাৎ—বিপুল সামর্থ্য আছে বলিয়া। নটবৎ—অভিনেতার ন্যায়। ব্যবতিষ্ঠতে—বিভিন্ন প্রকারে অবস্থিত হইয়া থাকে। লিঙ্গং—সূক্ষ্মশরীর।

অন্বয়ার্থঃ। ধর্ম্ম ধর্ম্মাদি নিমিত্ত শরীর পরিগ্রহ করিয়া পুরুষার্থ সম্পাদন করিবার উদ্দেশেই লিঙ্গ শরীর নানাভাবে অবস্থিত হয়, এই ব্যাপারের একমাত্র কারণ প্রকৃতিদেবীর অসাধারণ সামর্থ্য মাত্র।

বিশদব্যাখ্যা। সূক্ষ্মশরীর প্রমাণ করিয়া, তদনন্তর কেন সূক্ষ্মশরীর লোকান্তর-গমনাদি করে এবং তাহাতে তাহার ক্ষমতাইবা কি, এই বিষয়ে একটু আলোচনা করা হইতেছে। লিঙ্গ শরীর পুরুষার্থ অর্থাৎ ভোগাদি সম্পাদনের জন্যই নানা-লোকে গমন করে। পুরুষার্থই তাহার একমাত্র লক্ষ্য। যেরূপ কোনও অভিনেতা কখনও রাম, কখনও কর্ণ, কখনও বসুদেবের বেশ ধারণ করিয়া সভ্যগণের পরিতৃপ্তি সাধন করে, তদ্রূপ লিঙ্গ-শরীর কখনও মানুষ, কখনও পশু, কখনও কীটাদি আকার অর্থাৎ স্থূলশরীর ধারণ করিয়া পুরুষের তৃপ্তি সম্পাদন করে। লিঙ্গ-শরীরের ক্ষমতা আসিল কোথা হইতে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে, প্রকৃতির অসীম ক্ষমতা। শাস্ত্র বলেন, "বৈশ্বরূপ্যাৎ প্রধানস্য পরিণামোহয়মদ্ভুতঃ।" প্রকৃতির নানারূপতা-নিবন্ধন এইপ্রকার আশ্চর্য্য পরিণাম সংঘটিত হয়। বাচস্পতি-মতানুসারে বলা হইল।

সাংসিদ্ধিকাশ্চ ভাবাঃ প্রাকৃতিকা
বৈকৃতিকাশ্চ ধর্ম্মাদ্যাঃ।

দৃষ্টাঃ করণাশ্রয়িনঃ কার্য্যাশ্রয়িনশ্চ
কললাদ্যাঃ। ৪৩।

ব্যাখ্যা। সাংসিদ্ধিকাঃ—স্বাভাবিক। চ—ও। ভাবাঃ—ধর্ম্মাদি। প্রাকৃতিকাঃ—প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত। বৈকৃতিকাঃ—উপায় অনুষ্ঠানদ্বারা উৎপন্ন। চ—এবং। ধর্ম্মাদ্যাঃ—ধর্ম্মাধর্ম্ম, জ্ঞান-অজ্ঞান, বৈরাগ্য-অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য-অনৈশ্বর্য্য এই আটটী। দৃষ্টাঃ—দেখাযায়। করণাশ্রয়িনঃ—বুদ্ধিতে আশ্রিত। কার্য্যাশ্রয়িনঃ—শরীরাশ্রিত। চ—ই। কললাদ্যাঃ—কলল বুদ্বুদ ইত্যাদি অবস্থা গর্ব্ভস্থের এবং প্রসূতের বাল্য-কৌমার-যৌবন-বার্দ্ধক্য ইত্যাদি।

বঙ্গার্থঃ। সাংসিদ্ধিক এবং বৈকৃতিক, এই দুইপ্রকারে প্রাকৃতিক ভাবের বিভাগ করা হয়, তাহারা বুদ্ধিতে আশ্রিত। কললাদি অবস্থাই শরীরাশ্রিত।

বিশদব্যাখ্যা। ধর্ম্মাদি কাহারও স্বাভাবিক, কাহারও বা অনুষ্ঠান প্রাপ্ত। মহর্ষি কপিলের ধর্ম্মজ্ঞানাদি স্বাভাবিক। প্রাচেতস প্রভৃতি ঋষিগণের জ্ঞানাদি যোগানুষ্ঠান হইতে উৎপন্ন। অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, ইহারা বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া হয়. কেবল শুক্রশোণিতের সম্মিলন হইতে কললবুদ্বুদাকৃতি ও করণ্ড প্রভৃতি অবস্থা এবং বাল্য, বার্দ্ধক্য ও যৌবনাদি অবস্থা শরীরের আশ্রিত, বুদ্ধির নহে। ধর্ম্মাদির মত ইহারাও বুদ্ধিগত কি না, এ বিষয় বিবেচনা করিবার আবশ্যক বলিয়াই ইহারা শরীরাশ্রিত, একথা বলা হইল। নিমিত্ত-নৈমিত্তিকের বিভাগ করা এই কারিকার উদ্দেশ্য। নিমিত্ত ধর্ম্মাদির বিষয় বলিয়া, পরে নৈমিত্তিক-শরীরের ধর্ম্মও বলা আবশ্যক, তাহা বলা হইল।

ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধং গমনমধস্তাদ্
ভবত্যধর্ম্মেণ।
জ্ঞানেন চাপবর্গো বিপর্য্যয়াদিষ্যতে
বন্ধঃ। ৪৪।

ব্যাখ্যা। ধর্ম্মেণ—ধর্ম্মের দ্বারা। গমনং—যাওয়া। ঊর্দ্ধং—(স্বর্গলোকে অথবা) শ্রেষ্ঠ। গমনং—যাওয়া। অধস্তাৎ—(পাতালাদি স্থানে অথবা) নিম্ন। ভবতি—হইতে পারে। অধর্ম্মেণ—অধর্ম্মের দ্বারা। জ্ঞানেন—জ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি এবং পুরুষের অন্যথা খ্যাতিদ্বারা। চ—(নিশ্চয়ার্থে।). অপবর্গঃ—পরিসমাপ্তি (মোক্ষ।) বিপর্য্যয়াৎ—অজ্ঞানের দ্বারা। ইষ্যতে—প্রাপ্ত হওয়া যায়। বন্ধঃ—অর্থাৎ সংসার-যন্ত্রণা ভুগিতে থাকা। (জ্ঞান-চক্ষু নিমীলিত থাকার নাম বন্ধ, অথবা সংসার-দুঃখে বন্দী হওয়ার নাম বন্ধ অথবা ঘৃণা-লজ্জা প্রভৃতিতে আবদ্ধ থাকার নাম বন্ধ।)

বঙ্গার্থঃ। ধর্ম্মের দ্বারা ঊর্দ্ধগতি লাভ ও অধর্ম্মের দ্বারা অধোগতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। জ্ঞান হইতে মুক্তি এবং অজ্ঞান হইতে বন্ধ হয়।

বিশদব্যাখ্যা। কিরূপ নিমিত্তে কিরূপ নৈমিত্তিক হয়, তাহা এই কারিকায় প্রদর্শিত হইতেছে। বন্ধ তিনপ্রকার। প্রাকৃতিক, বৈকৃতিক, দাক্ষিণিক। প্রকৃতিকে যাহারা আত্মা বলিয়া মনে করে, তাহাদের প্রাকৃতিক বন্ধ। "পূর্ণং শতসহস্রন্তু তিষ্ঠন্ত্যব্যক্তচিন্তকাঃ" এই প্রমাণে অবগত হওয়া যায়, যাহারা প্রকৃতির উপাসক, তাহারা শতসহস্র

মন্বন্তর প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকে, তৎপরে আবার আবির্ভূত হয়। যেমন বর্ষাবসানে ভেক সকল মৃত্তিকার মধ্যে লীনভাবে অবস্থান করে, আবার পুনর্ব্বার বর্ষার উপস্থিতিকালে তাহারা যেমন তেমনি হইয়া দাঁড়ায়, তদ্রূপ প্রকৃতি-লীন ব্যক্তি উপযুক্ত সময়াবসানে আবার জাগিয়া সংসারে আসে। যাহারা বিকৃতি অর্থাৎ ভূত, ইন্দ্রিয়, অহঙ্কার ও বুদ্ধিকে উপাসনা করে,তাহারাও তাহাতে লীন হইয়া বহুদিন অতিবাহিত করে। "দশমন্বন্তরানীহতিষ্ঠন্তীন্দ্রিয়চিন্তকাঃ ভৌতিকাস্তু শতং পূর্ণং সহস্রন্ত্বাভিমানিকাঃ।' বৌদ্ধা দশ সহস্রাণি তিষ্ঠন্তি বিগতজ্বরাঃ॥" এই বচনগুলির দ্বারা অবগত হওয়া যায়,ইন্দ্রিয়োপাসক দশমন্বন্তর পর্য্যন্ত নিরাপদ্‌ভাবে থাকে, ভূতোপাসক শত মন্বন্তর, অহঙ্কারোপাসক সমগ্র মন্বন্তর, বুদ্ধির উপাসক দশসহস্র মন্বন্তর স্ব স্ব উপাস্যতত্ত্বে লীন থাকে, কালান্তরে আবার তাহাকে সংসারচক্রে ঘুরিতে হয়। আত্মার তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া কেবলমাত্র অগ্ন্যাদি সাধ্য 'ইষ্ট' ও পুষ্করিণ্যাদি খনন প্রভৃতি 'পূর্ত্ত' নামক কার্য্য করিলে সে সাধকের দাক্ষণিক বন্ধ হয়। তাহাদের দক্ষিণায়ন পথে ধূমময় গতি হয়, একথা শাস্ত্রে আছে। অপর কোনও বিষয়ের বিশদীকরণ এখানে আবশ্যক হইতেছে না। কারণ সুবোধ্য।

বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়ঃ সংসারো
ভবতি রাজসাদ্ রাগাৎ।
ঐশ্বর্য্যাদবিঘাতো বিপর্য্যয়াত্তদ্বিপর্য্যাসঃ। ৪৫

ব্যাখ্যা। বৈরাগ্য—বৈরাগ্য অর্থৎ ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ে বিরক্তভাব, তাহা হইতে। প্রকৃতিলয়ঃ—প্রকৃতি অর্থাৎ অব্যক্তে লীন হওয়াযায়। সংসারঃ—জন্মাদি। ভবতি—হয়। রাজসাৎ—রজোগুণাত্মক। রাগাৎ—আসক্তি হইতে। ঐশ্বর্য্যাৎ—অণিমাদি হইতে। অবিঘাতঃ—সর্ব্বত্র অপ্রতিহত প্রভাব। বিপর্য্যয়াৎ—ঐশ্বর্য্যের অভাবে। তদ্বিপর্য্যাসঃ—তাহার বিপরীত অর্থাৎ সর্ব্বত্র ইচ্ছাবিঘাত হয়।

বঙ্গার্থঃ। পুরুষের তত্ত্ব না জানিয়া ঐহিক-পারত্রিক বিরাগ উপস্থিত হইলে, প্রকৃতিতে লীন হওয়া যায়। রাজস অনুরাগ হইতে সংসার উপস্থিত হয়। ঐশ্বর্য্য হইতে সর্ব্বত্র অপ্রতিঘাত হয় এবং ঐশ্বর্য্য না থাকিলে সকলপ্রকারে ইচ্ছার ব্যাঘাত সংঘটিত হয়।

বিশদ ব্যাখ্যা। যদি পুরুষের তত্ত্ব অবগত না হইয়া, শুধুমাত্র প্রকৃতিরই তত্ত্ব জানিয়া প্রাকৃত পদার্থেই বিরক্তি ঘটে, তবে প্রকৃতি লয় হয়, মোক্ষ হয় না; কারণ শুধু প্রকৃতিকে জানিলে যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান হইল না। প্রকৃতি শব্দের অর্থ এখানে প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয় ও ভূত সকল। ইহারা বাহ্য জগতের কারণ, তবে কেহ সন্নিকৃষ্ট, কেহ বা বিপ্রকৃষ্ট। "রাজসরাগ" বলায় রজোগুণের শক্তি দুঃখ সংসারে বিদ্যমান, একথা বলা হইয়াছে। রাজস রাগ—কারণ, কার্য্যসংসারও কারণের গুণ দুঃখ পাইতে অধিকারী। প্রকৃতি প্রভৃতি জড়ের স্বভাব দুঃখ, তাহাদের চিন্তা করিলে দুঃখের একান্ত বিনাশ হওয়া অসম্ভব। ঐশ্বর্য্য যোগসিদ্ধ

শক্তিবিশেষ, উহা ঈশ্বরের স্বতঃসিদ্ধ নিজস্ব নহে, একথা এখানে বলা হইল, অপরত্র ঈশ্বর সম্বন্ধেও কিছু বলা হইবে।

এষঃ প্রত্যয়সর্গো বিপর্য্যয়া-শক্তি-
তুষ্টিসিদ্ধ্যাখ্যঃ।
গুণবৈষম্যবিমর্দ্দাত্তস্য চ ভেদাস্তু
পঞ্চাশৎ। ৪৬।

ব্যাখ্যা। এষঃ—এই প্রত্যয় সর্গঃ—প্রত্যয় অর্থাৎ (প্রতীয়তেঽনেনেতি ব্যুৎপত্ত্যা।) বুদ্ধিতত্ত্বের সৃষ্টি। বিপর্য্যয়াশক্তি-তুষ্টি সিদ্ধ্যাখ্যঃ—বিপর্য্যয়, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি এই গুলির নাম। গুণবৈষম্য বিমর্দ্দাৎ-গুণ—অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তম, ইহাদের বৈষম্য অর্থাৎ এক একটীর অধিক বলতা অথবা দুইটীর অধিক বল লাভ করা এবং বিমর্দ্দ অর্থাৎ একের দ্বারা অপরের অভিভূত হওয়া, এই উভয় কারণে। তস্য—তাহার (বুদ্ধি সৃষ্টির।) চ—ই। ভেদাঃ—অবান্তর প্রকার অর্থাৎ অবয়ব। তু—('কিন্তু' অর্থে।) পঞ্চাশৎ—৫০টী।

বঙ্গার্থঃ। এই প্রত্যয়সর্গ সংক্ষেপতঃ বিপর্য্যয়, অশক্তি, তুষ্টি, সিদ্ধি এই নামে কথিত হয়, গুণের বলাবল ও অভিভূত ভাব হইতে তাহার বিস্তরতঃ ৫০ প্রকার বিভাগ করা যাইতে পারে।

বিশদব্যাখ্যা। বুদ্ধি ধর্ম্মগুলির সংক্ষেপ ও বিস্তাররূপে কথন এই কারিকার উদ্দেশ্য। পূর্ব্বে যে ধর্ম্মাধর্ম্মাদি অষ্টবিধ ভাব বলা হইয়াছে, ইহার মধ্যে তাহাদের অন্তর্ভাব বুঝিতে হইবে। বিপর্য্যয় অজ্ঞান—তাহা বুদ্ধি-ধর্ম্ম। অশক্তি—করণবিকলতাহেতুক হইলেও বুদ্ধি-ধর্ম্ম। তুষ্টি এবং সিদ্ধিও বুদ্ধির ধর্ম্ম। ইহাদের মধ্যেই 'ধর্ম্ম' ব্যতীত অবশিষ্ট সাতটী বুদ্ধি ধর্ম্মের অন্তর্ভাব। সিদ্ধিতে জ্ঞানের অন্তর্ভাব। অল্প কথায় বিপর্য্যয়, অশক্তি, তুষ্টি, সিদ্ধি, ইহাই প্রত্যয়সর্গের বিভাগ। ইহাদের প্রত্যেকের আবার সংখ্যাধিক্য আছে, যথা বিপর্য্যয় পঞ্চবিধ। এইরূপভাবে গণনা করিতে গেলে, প্রত্যয়সর্গ ৫০ ভাগে বিভক্ত হয়। ক্রমশঃ তাহাদের স্বরূপ ও অবান্তর বিভাগ প্রদর্শিত হইবে।

পঞ্চবিপর্য্যয়ভেদা ভবন্ত্যশক্তিশ্চ
করণবৈকল্যাৎ।
অষ্টাবিংশতি ভেদাস্তুষ্টির্নবধাঽষ্টধা
সিদ্ধিঃ। ৪৭।

ব্যাখ্যা। পঞ্চ—পাঁচটী। বিপর্য্যয় ভেদাঃ—বিপর্য্যয়ের বিভাগ। ভবন্তি—হইতেছে। অশক্তিঃ—অশক্তি। চ—ও। করণবৈকল্যাৎ—করণের বুদ্ধির (ইন্দ্রিয় সহকৃত) বিকলতা অর্থাৎ কার্য্যনিষ্পাদনে অসামর্থ্য হইতে। অষ্টাবিংশতি ভেদাঃ—২৮—প্রকারের। তুষ্টি—তুষ্টিনামক বুদ্ধি ধর্ম্ম। নবধা—নয়প্রকার। অষ্টধা—আটপ্রকার। সিদ্ধিঃ—সিদ্ধি সংজ্ঞক বুদ্ধিধর্ম্ম।

বঙ্গার্থঃ। বিপর্য্যয় ৫ ভাগে বিভক্ত। করণের অপটুতাবশতঃ অশক্তি ২৮ প্রকার। তুষ্টি ৯ প্রকার। সিদ্ধি ৮ প্রকার।

বিশদব্যাখ্যা। বিপর্য্যয় পাঁচপ্রকার, তাহাদের নাম যথা, অবিদ্যা ১, অস্মিতা ২, রাগ ৩, দ্বেষ ৪, অভিনিবেশ ৫, ইহাদের স্বতন্ত্র নাম যথাক্রমে তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র, অন্ধতামিস্র। অশক্তির সংখ্যা

২৮টী ক্রমশঃ বলা হইতেছে, যথা...বাবির্য্য ১, কুষ্ঠিতা ২; অন্ধত্ব ৩, জড়তা ৪, অজিঘ্রতা ৫, মূকতা ৬, কৌণ্য ৭, পঙ্গুত্ব ৮, ক্লৈব্য ৯, উদাবর্ত্ত ১০, মুগ্ধতা ১১, প্রকৃত্যাখ্যা বৈকল্য ১২, উপাদান বৈকল্য ১৩, কাল বৈকল্য ১৪, ভাগ্য বৈকল্য ১৫, পার বৈকল্য ১৬, সুপার-বৈকল্য ১৭, পারাপার বৈকল্য ১৮, অনুত্ত-মাম্ভ বৈকল্য ১৯, উত্তমাম্ভ বৈকল্য ২০, তার বৈকল্য ২১, সুতার বৈকল্য ২২, তার তার বৈকল্য ২৩(কাহারও মতে ভাববৈ-কল্য ২১, স্বভাববৈকল্য ২২, ভাবাভাব বৈকল্য ২৩) বিবেক বৈকল্য ২৪, শুদ্ধি বৈকল্য ২৫, প্রমোদ বৈকল্য ২৬, মুদিত বৈকল্য ২৭, মোদমান বৈকল্য ২৮। তুষ্টি নবধা যথা—প্রকৃতি ১, উপাদান ২, কাল ৩, ভাগ্য ৪, পার ৫, সুপার ৬, পারপার ৭, অনুত্তমাম্ভ ৮, উত্তমাম্ভ ৯। প্রকৃতিতুষ্টির নামান্তর অম্ভ, উপাদানের নামান্তর সলিল, কালের অন্যনাম ওঘ, ভাগ্যের অপর নাম বৃষ্টি। সিদ্ধি আট-প্রকার যথা;—উহ ১, শব্দ ২, অধ্যয়ন ৩, সুহৃৎ প্রাপ্তি ৪, দান ৫, প্রমোদ ৬, মুদিত ৭, মোদমান ৮। ইহাদিগের লক্ষণাদি পরে বলা হইবে। এখানে শুধু নাম বলাগেল মাত্র

ভেদস্তমসোঽষ্টবিধো মোহস্যচ
দশবিধোমহামোহঃ।
তামিস্রোঽষ্টাদশধা তথা ভবত্যন্ধ-
তামিস্রঃ। ৪৮।

[illegible] ব্যাখ্যা। ভেদঃ—বিভাগ। তমসঃ—[illegible] বিপর্য্যয়ের। অষ্টবিধঃ—আট-প্রকার [illegible] মোহস্য—মোহের। চ—ও।
(আট প্রকার।) দশবিধ—দশপ্রকার। মহামোহঃ—মহামোহ নামক বিপর্য্যয়। তামিস্রঃ—অর্থাৎ দ্বেষ। অষ্টাদশধা—আঠারপ্রকার। তথা—সেইরূপ। ভবতি—হইতেছে। অন্ধতামিস্রঃ—অভিনিবেশ।

বঙ্গার্থঃ। তম ৮ প্রকার। মোহও ৮ প্রকার। মহামোহ ১০ প্রকার। তামিস্র ১৮ প্রকার। অন্ধতামিস্রও ১৮ প্রকার।

বিশদব্যাখ্যা। এই প্রকারগুলির নামোল্লেখ নাই। বিষয়ের ভিন্নতাবশতঃই উহাদের সংখ্যাধিক্য। ইহা প্রদর্শিত হই-তেছে। অব্যক্ত, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রে আত্মবুদ্ধি অবিদ্যা অথবা তমঃ। অবি-দ্যার নানাপ্রকার লক্ষণ আছে, তাহা এখানে বলা বিশেষ দরকার নহে। ফলতঃ অষ্টবিধ জড় পদার্থে আত্ম বুদ্ধি আট প্রকার অবিদ্যা। বিষয়ের সংখ্যানুসারেই বিভাগ করা হইল। দেবতারা অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া মনেকরেন, আমাদের এই ঐশ্বর্য্য চিরকাল স্থায়ী, এই অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যবিষয়ক আটপ্রকার মোহই বিষয়ভেদে অষ্টবিধা অস্মিতা। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পাঁচটী পদার্থ দিব্য এবং অদিব্য ভেদে সম ষ্টিতে দশ প্রকার। এই দশবিধ বিষয়ের প্রতি যে রাগ অর্থাৎ আসক্তি, তাহা বিষয় ভিন্নতায় দশবিধ মহামোহ বলিয়া কথিত হইতেছে। দিব্যাদিব্য দশবিধ শব্দাদি বিষয় এবং অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য, এই সমষ্টিতে অষ্টা-দশ বিষয়ে ভোগের পারস্পরিক ক্রমবশতঃ যে ব্যাঘাত, তাহাতে দ্বেষের উদ্ভব হয়। বিষ-য়ের সংখ্যা অনুসারে দ্বেষেরও সংখ্যা অষ্টা-দশ। ইহাই ১৮ প্রকার তামিস্র। দেবতারা

দশবিধ বিষয় এবং অষ্টপ্রকার ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া তাঁহাদের এইগুলি অসুরদিগেরদ্বারা পাছে অপহৃত হয়, এই জন্য ভীত হন। এই স্তরের বিষয় ১৮টী, সুতরাং ১৮ প্রকার (বিষয়ভেদে) অন্ধতামিস্র বা অভিনিবেশ ইহা প্রতিপাদিত হইল। অতঃপর কারিকার অশক্তি প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ প্রদর্শিত হইবে। পাঁচপ্রকার বিপর্য্যয় অবান্তর ভেদে ৬২ প্রকার হইল—যথা,তমঃ৮, মোহ ৮, মহামোহ ১০, তামিস্র ১৮ ও অন্ধতামিস্র ১৮। যতগুলি একারিকায় বলা হইল,সকলগুলি বিভিন্নভাবে বস্তুতঃ একতাৎপর্য্যে পাতঞ্জলে বিবেচিত হইয়াছে।

একাদশেন্দ্রিয় বধাঃ সহ বুদ্ধিবধৈর-
শক্তিরুদ্দিষ্টাঃ।
সপ্তদশবধা বুদ্ধের্বিপর্য্যয়াত্তুষ্টিসিদ্ধী
নাম্। ৪৯।

ব্যাখ্যা। একাদশেন্দ্রিয়বধাঃ—একাদশ ইন্দ্রিয়ের অপাটব। সহ—সহিত। বুদ্ধিবধৈঃ—বুদ্ধির বৈকল্যের। অশক্তিঃ—অশক্তি। উদ্দিষ্টা—কথিতা। সপ্তদশ—১৭ প্রকার। বধঃ—বিকলতা। বুদ্ধেঃ—বুদ্ধির (স্বরূপতঃ।) বিপর্য্যয়াৎ—বৈপরীত্য অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিকলতা হইতে। তুষ্টি সিদ্ধীনাং—তুষ্টি এবং সিদ্ধি, ইহাদের।

বঙ্গার্থঃ। একাদশ ইন্দ্রিয়ে যে অপটুতা, তাহা বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধ বলিয়া, বুদ্ধিরই একাদশেন্দ্রিয়ের বৈকল্য। হেতুক একাদশ অশক্তি। আর তুষ্টি ও সিদ্ধির বিপর্য্যয় সপ্তদশবিধ বুদ্ধির নিজের অশক্তি, এই ২৮ প্রকার-অশক্তি।

বিশদব্যাখ্যা। বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণের দ্বারাই বাহ্য বস্তুর সম্বন্ধ প্রাপ্ত হন। যদি ইন্দ্রিয়ের বিকলতা উপস্থিত হইল, তবে বস্তুতঃ বুদ্ধির সেই বিষয়ে অশক্তি আসিয়া দেখা দিল। অশক্তি শব্দের অর্থ অসামর্থ্য অর্থাৎ ক্ষমতা না থাকা। ইন্দ্রিয়গণ অসমর্থ হইলে, বুদ্ধির ক্ষমতা স্ফুরিত হইতে পারে না; কাজেই তাহাকে বুদ্ধির ইন্দ্রিয়াপাটব নিমিত্ত অশক্তি বলাযায়। কর্ণ, ত্বক, চক্ষুঃ, জিহ্বা,নাসিকা, বাক্, পাণি, চরণ, উপস্থ, পায়ু ও মন, এই একাদশেন্দ্রিয়ের একাদশপ্রকার অপটুতা যথাক্রমে বাধির্য্য [বধিরতা] কুষ্ঠিতা, অন্ধত্ব, জড়তা, অজিঘ্রতা, মূকতা, কৌণ্য, পঙ্গুত্ব, ক্লৈব্য, উদাবর্ত্ত ও মুগ্ধতা বলিয়া কথিত হয়। তুষ্টি নয়প্রকার, তাহার বিপর্য্যাসও নয় প্রকার। তুষ্টির নাম প্রকৃতি; আবার অশক্তির নাম প্রকৃতি-বৈকল্য, এইরূপ অপরগুলির বেলায়ও হইবে। সিদ্ধির সংখ্যা ৮; বিপর্য্যয় ৮ হইবে। সিদ্ধির নাম প্রমোদ; অশক্তি অর্থাৎ প্রমোদের বিপর্য্যয়ের নাম প্রমোদ, বৈকল্য। ঐরূপ মুদিত ও মোদমানেরও বুঝিতে হইবে। (উহ সিদ্ধির আর এক নাম তারতার, শব্দ সিদ্ধির নামান্তর সুতার; অধ্যয়নের অন্য নাম তার, সুহৃৎ প্রাপ্তির অন্য নাম রম্যক। দানের অপর নাম সদামুদিত।) তার, সুতার, তারতার ইহাদের উপর বৈকল্য বসাইলেই এই তিনটী সিদ্ধির বিপর্য্যয় যে অশক্তি, তাহার নাম হইল। সুহৃৎ প্রাপ্তির বিপর্য্যয়ের নাম বিবেকবৈকল্য এবং দানের বিপর্য্যয়ের নাম শুদ্ধিবৈকল্য; এই দুইপ্রকার ও অশক্তির মধ্যে। কারণ, অষ্টসিদ্ধির মধ্যে এই দুইটী,

যে দুইটীর বিপর্যায়, তাহারা গণিত হইয়াছে।

আধ্যাত্মিকাশ্চতস্রঃ প্রকৃত্যুপাদান-
কাল ভাগ্যাখ্যাঃ।
বাহ্যাবিষয়োপরমাৎপঞ্চ নবতুষ্টয়ো-
ঽভিমতাঃ। ৫০।

ব্যাখ্যা। আধ্যাত্মিকাঃ—আধ্যাত্মিক। চতস্রঃ—চারিপ্রকার। প্রকৃত্যুপাদান কাল ভাগ্যাখ্যাঃ—প্রকৃতি, উপাদান, কাল, ভাগ্য, এই চারিনাম কথিত হয়। বাহ্যাঃ—বাহ্য তুষ্টি। বিষয়োপরমাৎ—বিষয় ত্যাগ হইতে। পঞ্চ—পাঁচ প্রকার। নব—নয় রকম। তুষ্টয়ঃ—তুষ্টি। অভিমতাঃ—অভিপ্রেত।

বঙ্গার্থঃ। তুষ্টিসাধারণতঃ দ্বিবিধ—আধ্যাত্মিক ও বাহ্য। আধ্যাত্মিক ৪ প্রকার, যথা, প্রকৃতি, উপাদান, কাল, ভাগ্য। বাহ্য পাঁচ প্রকার। তাহা বিষয় পরিত্যাগ হইতে জন্মে। সকলনে তুষ্টি নয় প্রকার।

বিশদব্যাখ্যা। প্রকৃতি ব্যতীত অপর আত্মা আছে, এইরূপ জানিয়া যে আত্মার শ্রবণ-মননাদিতে মনোযোগ করে না, তাহার আধ্যাত্মিক চতুর্ব্বিধ তুষ্টি হয়, অসদুপদেশে যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে, তাহার এই তুষ্টি হয়। প্রকৃতি ব্যতিরিক্ত আত্মাকে অধিকার করিয়া যখন এই তুষ্টি হয়, তখন ইহারা আধ্যাত্মিক নাম পাইতে পারে। বিবেক-সাক্ষাৎকার প্রকৃতির পরিণাম, প্রকৃতি হইতেই হইবে, ধ্যানাভ্যাসাদি বৃথা, এইরূপ উপদেশে যে প্রকৃতির প্রতি তুষ্টি, তাহারই নাম প্রকৃত্যাখ্যাতুষ্টি। বিবেক খ্যাতি প্রকৃতি-কার্য্য হইলেও প্রকৃতি হইতে হইবে না, সন্ন্যাস হইতে হইবে, ধ্যানাভ্যাস বৃথা, এই উপদেশজনিত সন্ন্যাসোপাদানে তুষ্টিই উপাদান তুষ্টি। সন্ন্যাস বৃথা, সময়েই সকল হয়, এইরূপ উপদেশে কালে যে তুষ্টি, তাহাই কালাখ্যাতুষ্টি। কালে সামর্থ্য কি? ভাগ্যই প্রধান। এই উপদেশমূলক ভাগ্যের প্রতি তুষ্টিই ভাগ্যাখ্যা প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব ইত্যাদিকে আত্মা বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা এই বাহ্যবিষয়ে তুষ্টিপান বলিয়া সে তুষ্টির নাম বাহ্য। বিষয় অর্থাৎ শব্দাদির অর্জ্জন, রক্ষণ, ক্ষয়, ভোগ, হিংসা; এই পাঁচপ্রকার দোষ দর্শন জনিত যে বিষয় হইতে উপরতি অর্থাৎ বিরক্তি, সেই বিরক্তি হইতে যে তুষ্টি জন্মে, তাহাই বাহ্যতুষ্টি পাঁচটী। বিষয়ের অর্জ্জন দুঃখকর, এই নিমিত্ত বিষয়ে বিরক্ত ব্যক্তির যে সন্তোষ, তাহার নাম পার। অর্জ্জিত ধনাদি রক্ষাকরা কষ্টকর, এই জ্ঞানে বিষয়ে বিরক্ত ব্যক্তির তুষ্টির নাম সুপার। বড় কষ্টের বিষয় ভোগে ক্ষয় হয়। এই বিবেচনায় বিষয় বিরক্তের সন্তোষ পার-পার। বিষয় ভোগে কাম বৃদ্ধি হয়, অপ্রাপ্তিতে আবার দুঃখ হয়, এই বিষয়-দোষ চিন্তা করিয়া বৈরাগ্য হইলে, বিরক্ত ব্যক্তির যে তুষ্টি হয়, তাহার নাম অনুত্তমাম্ভ। প্রাণি-হিংসা ব্যতিরেকে বিষয়ভোগ সম্ভবে না, এই বিবেচনায় বিষয়-বৈরাগ্য হইলে যে সন্তোষ জন্মে, তাহার নাম উত্তমাম্ভ তুষ্টি। তুষ্টির সংখ্যা ও লক্ষণ-কথন এই কারিকায় প্রদর্শিত হইল।

(ক্রমশঃ—)

মীমাংসাদর্শনম্।

(জৈমিনি-সূত্রম্।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তম্।)

উৎপত্তৌ বাহবচনাঃ স্যুরর্থস্যা-
তন্নিমিত্তত্বাৎ। ২৪॥

পদপাঠঃ।—উৎপত্তৌ। বা। অবচনাঃ। স্যুঃ—। অর্থস্য। অতন্নিমিত্তত্বাৎ॥

ব্যাখ্যা।—উৎপত্তৌ—ঔৎপত্তিক অর্থাৎ নিত্য বলিয়া স্বীকার করিলে। বা—(চকারার্থে) ও। অবচনাঃ—অর্থপ্রত্যয়-অজনক। স্যুঃ—হইতেছে। অর্থস্য—(পদের) অর্থের। অতন্নিমিত্তত্বাৎ—তাহার (বাক্যার্থের) নিমিত্ততা নাই বলিয়া।

বঙ্গার্থঃ।—শব্দকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও,বেদ-বাক্যের অর্থবোধনে সামর্থ্য নাই; কেন না, পদার্থ বাক্যার্থের নিমিত্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। (বেদ-বাক্য অর্থাৎ কর্ম্মবোধক বিধিই প্রমাণ, কিন্তু বাক্যের অর্থ বোধ জন্মাইবার ক্ষমতা নাই; যদি বলা যায়, পদার্থই বোধ জন্মাইবে, তাহাও অকিঞ্চিৎকর, কারণ, পদার্থ বাক্যার্থের নিমিত্ত হইতে পারে, ইহার কোনও উপযুক্ত যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না।)

বিশদব্যাখ্যা।—এই সূত্রে পূর্ব্বপক্ষের মত বলা হইতেছে। ধর্ম্মের প্রমাণ বলা হইয়াছে, 'বেদবাক্য'। যদি বেদবাক্য কোনও রূপ অর্থবোধ জন্মাইতে অপারগ হয়, তবে বেদবাক্য যে ধর্ম্মের প্রমাণ, এ কথা বৃথা হইয়া যাইবে। এই তর্ক এ সূত্রে মীমাংসকের প্রতিকূলে বলা হইতেছে। "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ" অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বর্গ কামনা করে, সে অগ্নিহোত্র হোমানুষ্ঠান করিবে। এখানে "অগ্নিহোত্রং" এই পদের দ্বারা অগ্নিহোত্র হোম করিলে স্বর্গ হয়, এরূপ বুঝায় না। "জুহুয়াৎ" এই পদেরদ্বারাও ঐরূপ অর্থের প্রতীতিজন্মে না, "স্বর্গকামঃ" এপদও ঐরূপ অর্থ বুঝাইতে অক্ষম। অপর কোনও পদ এখানে নাই, যদ্দ্বারা আমরা পূর্ব্বোক্ত অর্থ বুঝিতে পারি, এই তিনটী পদের অতিরিক্ত "বাক্য" নামক নূতন কিছু নাই, যাহাদ্বারা ঐরূপ জ্ঞান আমাদের জন্মিতে পারে। তিনটীপদ অর্থ প্রকাশ করিতে পারে,কেন না তাহাদের সহিত অর্থের সম্বন্ধ নিত্য, কিন্তু এই তিনটী পদের কোনওটী বাক্যার্থ বুঝাইতে সামর্থ্য রাখে না। 'অগ্নিহোত্রং' শব্দ অগ্নিহোত্র বুঝায়। "জুহুয়াৎ" শব্দ হোম বুঝায়। 'স্বর্গকামঃ' শব্দ স্বর্গাভিলাষীকে বুঝায়। অগ্নিহোত্র হোমে স্বর্গ হয়, এই অর্থ বুঝাইতে ইহারা কেহই সমর্থ নয়। অতএব পদ সমুদয়ের একটা অর্থ কল্পনা করা এবং তাহাকে বাক্যার্থ নাম দেওয়া অমূলক। পদ সকলের অর্থই বাক্যার্থ, একথা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেননা পদ সামান্যবাচী। বাক্য বিশেষবাচী, সামান্য ও বিশেষে আকাশ পাতাল প্রভেদ, সুতরাং সামান্যবাচী পদের অর্থ বিশেষবাচী বাক্যের অর্থ হইতে পারে না। পদার্থ হইতে বাক্যার্থের জ্ঞান জন্মে, ইহাও বলা যায় না। যাহার সহিত সম্বন্ধ, সে তাহার অববোধক হইতে পারে। যেমন পদ পদার্থের বোধক। পদার্থে ও বাক্যার্থে—কোনও সম্বন্ধ নাই। যদি পদার্থে, সম্বন্ধশূন্যবাক্যার্থও বুঝাইতে পারে, তবে

অন্য প্রকার অর্থ বুঝাইতেও পারে; কেন না, উভয়ত্রই অসম্বন্ধ সমান। "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ" এখানে পদার্থ, যদি অগ্নিহোত্রে স্বর্গ হয়, এই অসম্বন্ধ-বাক্যার্থ বুঝাইল, তবে অন্ন আহার করিলে স্বর্গে যাওয়া যায়, এরূপ অসম্বন্ধ অর্থ বুঝাইতে বা তাহার আপত্তি কি? ইহা দ্বারা বুঝা গেল, পদার্থ ও বাক্যার্থে কোনও সম্বন্ধ নাই, সুতরাং একে অপরের নিমিত্ত নহে। যদি বলা যায়, যাহারা পদের অর্থ অবগত আছে, তাহারাই বাক্যার্থ জ্ঞান লাভ করিতে পারে। অগ্নিহোত্রং, জুহুয়াৎ এবং স্বর্গকামঃ, এই তিনটী পদের অর্থ যে জ্ঞাত আছে, সে এই তিনটী পদ উচ্চারণ করিবামাত্রই বুঝিবে যে, অগ্নিহোত্রহোম স্বর্গ-সাধন। তখন এ আপত্তির উত্তরে বলা যাইবে, যদি বাক্যের শেষ বর্ণটী পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণের সংস্কার সহিত পদার্থ হইতে অর্থান্তর বুঝাইয়া দেয়, তবেই পদার্থ বাক্যার্থের জ্ঞানের কারণ বলিয়া স্বীকার করিব। যখন তাহা হইতেছে না, তখন বাক্যার্থ-কল্পনা ভ্রমমূলক অথবা কল্পনার লীলাতরঙ্গ মাত্র। যদি বলা হয়, "বিশিষ্ট পদার্থই বাক্যার্থ।" 'কৃষ্ণা গৌর্গচ্ছতি' এই বাক্যটী প্রয়োগ করিলে বুঝা যায়, কৃষ্ণবর্ণ গোরু যাইতেছে। এখানে 'গোঃ' শব্দের অর্থ গোত্বজাতি, যাইতেছে, এই ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইয়া, গোব্যক্তির অববোধক হইল, কিন্তু কৃষ্ণা এই পদের অর্থ যে কৃষ্ণরূপ, তাহা দ্বারা যখন এই গো শব্দের অর্থ গো-ব্যক্তির সম্বন্ধ হইল, তখন কৃষ্ণবর্ণ গোরু যাইতেছে, এইরূপ বিশিষ্ট বোধ জন্মিবে। এই বিশিষ্ট বোধই বাক্যার্থ-জ্ঞান, অতএব পদার্থ বাক্যার্থ-জ্ঞানের নিমিত্ত।' তাহা হইলেও ইষ্টসিদ্ধি হয় না, 'গো' পদের অর্থ গোত্বজাতি, গচ্ছতি এই ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইলেই গোত্বজাতির আশ্রয় গোব্যক্তিকে বুঝাইবে, ইহার তাৎপর্য্য কি? ক্রিয়াপদ নিকটে থাকিলে প্রকৃত অর্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপর অর্থ বুঝাইবে, ইহারইবা রহস্য কি? গো শব্দে যখন শুক্ল-কৃষ্ণ-লোহিত ইত্যাদি সর্ব্ববিধবর্ণের গোরু বুঝিলাম, তখন আবার নিকটে "কৃষ্ণ" পদ আছে বলিয়া অপর সকল গো বুদ্ধির নিবৃত্তি হইয়া কেবল কৃষ্ণবর্ণ গো মাত্র বুঝিবার হেতু কি? যদি কৃষ্ণ পদের অর্থ শুক্ল-নীলাদির নিবৃত্তি হয়, তবে এরূপ বিশিষ্ট-বোধ জন্মিতে পারে। প্রকৃত পক্ষে 'কৃষ্ণ' পদের, অর্থ কৃষ্ণবর্ণ, শুক্ল প্রভৃতি বর্ণের নিবৃত্তি তাহার অর্থ নহে। এরূপ অবস্থায় পদের অর্থ বাক্যার্থ অর্থাৎ বিশিষ্টার্থের নিমিত্ত নহে। বাক্য পদসংঘাত মাত্র, তদ্ভিন্ন আর কিছু নয়। লৌকিক শ্লোকাদি যেরূপ পুরুষ-রচিত, এগুলিও তদ্রূপ। অতএব এই সকল বাক্যের অর্থ-প্রত্যয় নির্দ্দোষ নহে, কল্পনা মাত্র।

তদ্‌ভূতানাং ক্রিয়ার্থেন সমাম্নায়োঽর্থস্য তন্নিমিত্তত্বাৎ ॥২৫

পদপাঠঃ। তদ্‌ভূতানাং। ক্রিয়ার্থেন। সমাম্নায়ঃ। অর্থস্য। তৎ-নিমিত্তত্বাৎ।

ব্যাখ্যা। তদ্‌ভূতানাং (তেষু পদার্থেষু বিদ্যমানানাং) সেই সকল পদার্থে বাচকরূপে বিদ্যমানপদসমূহের। ক্রিয়ার্থেন—কার্য্যার্থে। সমাম্নায়ঃ—সমুচ্চারণ। অর্থস্য—অর্থের (বাক্যার্থের।) তন্নিমিত্তত্বাৎ—পদার্থ নিমিত্ততা নিবন্ধন।

বঙ্গার্থঃ॥—পদার্থ বোধক পদের ক্রিয়োদ্দেশেই উচ্চারণ, কেন না, পদার্থ বাক্যার্থের নিমিত্ত। (অতএব বেদবাক্য অর্থপ্রত্যায়ক, ইহা অবধারিত, স্থতরাং "চোদনালক্ষণোঽর্থোধর্ম্মঃ" এই ধর্ম্মের প্রমাণ-লক্ষণ অভ্রান্ত।)

বিশদ ব্যাখ্যা। এই সূত্র উত্তরপক্ষের মতপ্রতিপাদক। "অগ্নিহোত্রং" ইত্যাদি পদত্রয়ের উচ্চারণে প্রবৃত্তি হইবার উদ্দেশ্য কি? এ বিষয় অনুসন্ধান করিলে বুঝাযায়, ক্রিয়া প্রতিপাদনই মুখ্য তাৎপর্য্য। বাক্যার্থবোধ পদার্থজ্ঞান ব্যতিরেকে হইতে পারে না, এবং বাক্যার্থজ্ঞান, পদার্থজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিরই হইয়া থাকে, এই অন্বয়-ব্যতিরেক বলে বুঝাযায়, পদার্থ-জ্ঞান বাক্যার্থ অবগতিতে কারণ। বাক্যের শেষবর্ণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণজ সংস্কার সহিত হইয়া, পদার্থকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বতন্ত্র একটী বাক্যার্থ বুঝাইয়া দিতে সক্ষম হয়, ইহাতে প্রমাণ নাই। বিশিষ্ট পদার্থই বাক্যার্থ। পদার্থ ব্যতিরিক্ত নূতন বাক্যার্থ বলিয়া একটা কিছু নাই। যদি কেহ বলেন যে, পদার্থ হইতে পৃথক্ বাক্যার্থ অবগত হইতেছি, এইরূপ অনুভব হয়, অতএব বাক্যার্থ পদার্থভিন্ন। শক্তি ব্যতীত এরূপ সম্ভব হয় না, অতএব বাক্যেরও একটী স্বতন্ত্র শক্তি কল্পনা করা যাইতে পারে। এ যুক্তি নিতান্ত আকিঞ্চিৎকর, কেন না, শক্তি থাকুক, আর নাই থাকুক, পদার্থজ্ঞানই বাক্যার্থজ্ঞানে নিমিত্ত। অপর একটী কারণ সত্ত্বে শক্তি কল্পনাই বৃথা। পদ সকল স্বস্ব অর্থ বুঝাইয়া নিবৃত্ত হয়। অবগত পদার্থ, তদনন্তর পরস্পর সম্বন্ধ হইয়া বাক্যার্থরূপ বিশিষ্ট বোধ জন্মাইয়া দেয়। 'কৃষ্ণ আছে' এই শব্দ উচ্চরিত হইবা মাত্র গুণবাচক কৃষ্ণ শব্দ গুণবৎ প্রত্যয়োৎপাদন করিয়া থাকে। ইহাতেই বিশিষ্টবোধ জন্মিল। বিশিষ্টার্থবোধই বাক্যার্থজ্ঞান। ইহাদ্বারা বুঝাগেল, পদার্থজ্ঞান হইতেই বাক্যার্থজ্ঞান জন্মে। পদ সমুদয়ের কল্পিত শক্তি, অন্যপ্রকারে উপপত্তি হইলেও, কে স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবে? আরও দেখা যাইতেছে, কোনও একটী বাক্য উচ্চারণ করিলে, যে ব্যক্তি ঐ বাক্যের অন্তর্গত পদগুলির অর্থ অবগত নহেন, তিনি বাক্যার্থ বোধে সমর্থ হন না। পূর্ব্বপক্ষে যে বলা হইয়াছে 'বাক্যানুরোধে পদ স্বার্থ সামান্যরূপে বুঝাইয়া বিশেষে পরিবর্ত্তিত হয়, ইহা অসম্ভব।' বস্তুতঃ তাহা হইতেছে না; সমস্ত গো হইতে নিবৃত্ত হইয়া কোনও বিশেষ গো-ব্যক্তিকে বাক্যানুরোধে গোশব্দ বুঝাইতেছে, এই সিদ্ধান্ত স্থির করিতে হইলে, প্রথমে মনে করা আবশ্যক যে, যেখানে কেবল পদার্থ প্রযুক্ত হইয়া প্রয়োজনাভাব বশতঃ অনর্থক হইয়া দাঁড়ায়, সেইখানে বিশিষ্টার্থ কল্পনা আবশ্যক হয়। ইহাতে বুঝাগেল "কৃষ্ণাগৌঃ" বলিলে কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট গোরু বুঝিব। শুক্লাদির নিবৃত্তি ফলবলতঃ হইয়া দাঁড়াইল। তাহা শব্দার্থ না হইলেও, তাৎপর্য্যতঃ উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইল। কৃষ্ণবর্ণ এবং গোরু, এই সন্নিহিত পদার্থদ্বয় স্বার্থ বুঝাইয়াও অনর্থক হয়, সেই জন্য আকাঙ্ক্ষাবশে পরস্পর সম্বন্ধ হয়। পরস্পর সম্বন্ধ হইলেই এক বিশিষ্ট অপর হইয়া বিশিষ্টার্থবোধসম্পন্ন হয়, তাহাই বাক্যার্থ। এইরূপে পদার্থ বাক্যার্থবোধে কারণ হয়। বিশেষতঃ "গো" শব্দের অর্থ গোত্ব সামান্য

হইলেও দ্বিতীয়াদি বিভক্তি তাহার বিশেষিকা। বিভক্তি প্রাতিপদিক অর্থাৎ শব্দের সামান্যাংশে—বিশেষ উৎপাদন করে, ইহাই আচার্য্যগণের অভিমত।

পূর্ব্বপক্ষের "বেদবাক্য পুরুষকৃত" এই সিদ্ধান্তটীও একান্ত ভ্রান্তিমূলক। বেদের কর্ত্তা যে কোনও পুরুষ হইতে পারে না, তাহা আমরা পঞ্চম সূত্রে বলিয়াছি, পুনরুল্লেখ বৃথা।

লোকে সন্নিয়মাৎ প্রয়োগ-সন্নিকর্ষঃস্যাৎ। ২৬।

পদপাঠঃ। লোকে। সন্নিয়মাৎ। প্রয়োগসন্নিকর্ষঃ। স্যাৎ।

ব্যাখ্যা। লোকে—ব্যবহারে। সন্নিয়মাৎ—প্রত্যক্ষদ্বারা পদের অর্থ অবগত হইয়া তন্নিমিত্তই। প্রয়োগসন্নিকর্ষঃ—বাক্যপ্রয়োগরূপ সন্নিকর্ষ অর্থাৎ পদ সকলের পরস্পর নিকটভাবে অবস্থান বা স্থাপন করা। স্যাৎ—হইয়া থাকে।

বঙ্গার্থঃ। লৌকিক ব্যবহারে প্রত্যক্ষদ্বারা পদার্থ অবগত হইয়া বাক্য প্রয়োগ অর্থাৎ পদ-সমূহ স্থাপন করা হইয়া থাকে। (বৈদিক বাক্যেও তদ্রূপ অর্থাৎ পদার্থ অবগত হইয়া বাক্যজনিত-অর্থের জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে।)

বিশদব্যাখ্যা। এ সূত্রে মীমাংসক লৌকিক ও বৈদিক উভয় ক্ষেত্রে বাক্যার্থবোধের প্রকার একরূপ বলিতেছেন। লোকেও পদের দ্বারা তৎপ্রতিপাদ্যার্থের জ্ঞান, তদনন্তর বিশিষ্টার্থবোধ, তাহাই বাক্যার্থজ্ঞান। অতএব পদার্থজ্ঞান হেতুক বাক্যার্থজ্ঞান, এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সত্য। তাহা হইলে বৈদিক পদের অর্থ-প্রত্যায়কতা-বলেই বেদবাক্যেরও অর্থজ্ঞানে সামর্থ্য আছে, একথা প্রমাণ করা হইল; অতএব বেদবাক্য ধর্ম্মের প্রমাণ, এই পূর্ব্বোক্ত ঘোষণা অনর্থক হইলনা। বেদের অর্থপ্রত্যায়কতাধিকরণই এই অধিকরণের নাম। বেদবাক্যের অর্থ-বোধনে ক্ষমতা নাই, ইহাই পূর্ব্বপক্ষের অভিপ্রায়। বেদবাক্যে পদার্থজ্ঞানমূলক বাক্যার্থজ্ঞানসম্ভাবনা সুনিশ্চিত, অতএব পূর্ব্বোক্ত শঙ্কা বৃথা, ইহাই সিদ্ধান্তপক্ষের তাৎপর্য্য।

বেদাংশ্চৈকে সন্নিকর্ষং পুরুষাখ্যাঃ। ২৭

পদ পাঠঃ। বেদান্। চ। একে। সন্নিকর্ষং। পুরুষাখ্যাঃ।

ব্যাখ্যা। বেদান্—(অধিকৃত্য ইত্যধ্যাহার্য্যঃ) চারি বেদকে। চ—ও। একে—কেহ কেহ (বলিয়া থাকেন।) সন্নিকর্ষং—(দৃষ্ট্বা ইত্যধ্যাহার্য্যং) সম্বন্ধমূলক সন্নিকর্ষ অর্থাৎ সমাখ্যা দেখিয়া। পুরুষাখ্যাঃ—("ইতি" ইত্যধ্যাহার্য্যং) পুরুষ কর্ত্তৃক আখ্যাত অর্থাৎ রচিত (এই কথা।)

বঙ্গার্থঃ। কেহ কেহ বেদের সমাখ্যা দেখিয়া মনে করেন যে, বেদ সকল পুরুষরচিত অর্থাৎ অপৌরুষেয় নহে। (ইঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বর বেদরচয়িতা নহেন, এই মতের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদান করেন, কিন্তু আপাততঃ ঐ উদ্দেশ্য গোপন রাখিয়া সমাখ্যামূলক বেদ-মন্ত্র রচনার কথা বলিতেছেন।)

বিশদব্যাখ্যা। এই সূত্রে পূর্ব্বপক্ষের অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইতেছে। মীমাং-

সক মহাশয়েরা বেদকে নিত্য বলেন, বেদের রচয়িতা কোনও পুরুষ নহেন, কেননা বেদ নিত্য। শব্দ যখন নিত্যপদার্থ হইল, তখন শব্দ-সমষ্টিস্বরূপ বেদবাক্যও নিত্য হইবে। এমতে সাধারণতঃ ঈশ্বর স্বীকার করা হয় না বলিয়াই বিশ্বাস। যদিও ঈশ্বরের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক শত শত যুক্তি-জালের অবতারণা করিয়া সাঙ্খ্যদর্শনের মত এ দর্শনে ঈশ্বর-নিরসনে প্রযত্ন পাওয়া হয় নাই, তথাপি বেদরচয়িতা পুরুষের অস্তিত্ব অস্বীকার করায় ও শব্দার্থ-সম্বন্ধ পুরুষকৃত নহে, এই কথা বলায়, ঈশ্বরেই কটাক্ষ করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। জ্ঞান-ভক্তির কথা দূরে নিঃক্ষেপ করিয়া কেবল কর্ম্মজ অপূর্ব্বই ফলদায়ক, একথা বলিলে ভগবানের সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব অতলজলে বিসর্জ্জন দেওয়া হয় বলিয়া বুঝ যায়। সূত্রের বচনভঙ্গী দেখিলে বোধ হয়, নৈয়ায়িক মহাশয়ের পরমেশ্বর-বিরচিত বেদকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইতেছে। "বেদানাং নিত্য সর্ব্বজ্ঞপরমেশ্বর রচিতত্বেন প্রামাণ্যং ইতি নৈয়ায়িকাঃ।" এইসকল পরবাক্য এবং কুসুমাঞ্জলির অনুমানবাক্য পাঠ করিলে বুঝাযায়, ঈশ্বর বেদকর্ত্তা, এই কথা ন্যায়ের। এখানে সেই মতই লক্ষ্য বলিয়া বোধ হয়। "সন্নিকর্ষং" শব্দের অর্থ বোধহয় 'অনুমান-বেদ্যত্ব' হইবে। ভাষ্যকার শবর স্বামীর মতানুসারে ব্যাখ্যা করিতে গেলে বলিতে হয়, কঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরাই বেদ রচনা করেন। সমাখ্যা অর্থাৎ যোগার্থই উহাতে প্রমাণ। "কাঠক" সংজ্ঞা হইবার কারণ কি? বোধহয় 'কঠ' এই অংশ রচনা করেন। অন্যান্য শাখা সম্বন্ধেও ঐরূপ। যদিও বলা যায় যে, কঠ, পিপ্পলাদ, প্রভৃতি সকলেই রচনা করেন, এমত নহে, উঁহারা ঐ ঐ অংশের প্রচারক মাত্র; তাহা হইলেও অন্ততঃ একটী কর্ত্তা এবং কতকগুলি প্রচারক স্বীকার দরকার হইয়া উঠে। রচয়িতা পুরুষের নাম স্মরণ গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় না বলিয়াই যে বিরত হইতে হইবে, এমন নহে। কার্য্য দেখিয়াই কর্ত্তার অনুমান করা সঙ্গত। ভাষ্যকার মতে যে কোনও পুরুষ বেদের রচয়িতা, এই প্রকারে এবং অন্য মতে ঈশ্বর বেদকর্ত্তা, এই উভয়প্রকারেই এই সূত্রের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে; কিন্তু কোনও প্রসিদ্ধ দার্শনিক সম্প্রদায় পূর্ব্বোক্ত মতের সমর্থন করেন বলিয়া সাধারণতঃ প্রকাশ নাই। এখন কথা এই যে, যদি বেদ কঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণবর্গের বাক্যই হইল, তবে ধর্ম্মে বেদ-প্রামাণ্য অপসিদ্ধান্ত হইয়া পড়িল।

অনিত্য দর্শনাচ্চ। ২৮।

পদপাঠঃ। অনিত্য-দর্শনাৎ। চ।

ব্যাখ্যা। অনিত্য-দর্শনাৎ—অনিত্য বলিয়া প্রমাণ দেখা যাইতেছে। চ—এই বলিয়াও। (বেদ অনিত্য।)

বঙ্গার্থঃ। (বেদের অনিত্যতা বিষয়ে) বেদেই বহু প্রমাণ দেখা যাইতেছে বলিয়াও (বেদ নিত্য নহে।)

বিশদব্যাখ্যা। বেদে যে সমস্ত ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনাবলী উক্ত হইয়াছে, তাহারা যদি অনিত্য হয়, তবে তৎপ্রতিপাদক বেদ, বাক্যগুলিও অনিত্য হইবে, সুতরাং বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের দ্বারাই বেদের অনিত্যতা আবিষ্কৃত হইতে পারিতেছে। বেদে

লিখিত আছে "ঔদ্দালকিরকাময়ত" অর্থাৎ উদ্দালক ঋষির পুত্র কামনা করিয়াছিলেন। যদি কেহ বলেন যে, রাম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন আমরা বুঝি, 'জন্মিয়াছিলেন' এই বাক্যদ্বারাই রামের অতীতকালে বিদ্যমান থাকাই পরে অপর কাহারও দ্বারা কথিত হইল। এরূপ "ঔদ্দালকি" কামনা করিয়াছিলেন বলিলে বুঝাযায়, উদ্দালক পুত্রের কামনার পরে ঐ কথা অপর কোন ব্যক্তির বাক্যদ্বারা আবিষ্কৃত হইতেছে। এই অতীতকালের প্রয়োগ দেখিলে মনে হয়, ঔদ্দালকি জন্মগ্রহণ করিবার পরে ঐ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। মনে করা যাউক, বেদে যুধিষ্ঠিরের নামোল্লেখ আছে। যদি যুধিষ্ঠির জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে বেদ বিদ্যমান থাকিত, তবে যুধিষ্ঠিরের সংবাদ বেদ কোথায় পাইলেন? অতএব বেদের মন্ত্রগুলি পাঠ করিলে বুঝাযায়, বেদ অনিত্য, সুতরাং বেদ নিত্য বলিলে মনের আশা মনেই নিবিল, তাহাতে বিশেষ স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। এ সূত্রটীও পূর্ব্বপক্ষের মত সুদৃঢ় করিতেছে। অতঃপর মীমাংসকের নিজস্ব বেদের নিত্যতা প্রমাণকরা হইতেছে।

উক্তন্তু শব্দ-পূর্ব্বত্বং। ২৯।

পদপাঠঃ। উক্তং। তু। শব্দপূর্ব্বত্বং।

ব্যাখ্যা।—উক্তং—বলা হইয়াছে। শব্দপূর্ব্বত্বং—শব্দপূর্ব্বকত্বা। (অধ্যেতৃবর্গের সম্বন্ধে।)

বঙ্গার্থঃ। পাঠকগণের বেদ—পূর্ব্বরূপ—অর্থাৎ তাঁহারা যেরূপে নিত্য শব্দ অধ্যয়ন ও শিষ্যপরম্পরা ক্রমে প্রচার করিতেন, তাহা বলা হইয়াছে। বেদ তাঁহারা রচনা করেন নাই, কেবল জন-সমাজের মঙ্গলার্থে প্রচার করেন মাত্র।

বিশদব্যাখ্যা। এই সূত্রটীতে মীমাংসাচার্য্য পূর্ব্বোক্ত বেদ-বিষয়ক উত্তর স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। ইহা সিদ্ধান্তসূত্র। এখানে স্বমতের সংস্থাপনজন্য যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই স্মরণ করান হইল। পূর্ব্বপক্ষের যুক্তির প্রত্যুত্তর দেওয়া আবশ্যক, তাহা পরবর্ত্তিসূত্রে ক্রমশঃ হইতেছে।

আখ্যা প্রবচনাৎ। ৩০।

পদপাঠঃ। আখ্যা। প্রবচনাৎ।

ব্যাখ্যা। আখ্যা—নাম। প্রবচনাৎ—প্রকৃষ্টরূপে বলা হেতুক।

বঙ্গার্থঃ। কাঠক প্রভৃতি নাম প্রবচন নিমিত্ত হইতে পারে।

বিশদব্যাখ্যা। পূর্ব্ববাদী বলিয়াছেন, কাঠক নাম হইবার কারণ 'কঠ' ইহার রচয়িতা। কঠ কর্ত্তৃক যাহা প্রচারিত হয়, তাহাও কাঠক নাম প্রাপ্ত হইতে পারে, ইহাই এখানে উত্তর। কঠ নিজে যে শাখা অধ্যয়ন করেন, তিনি তাহারই চর্চ্চা ও প্রচারাদি করেন, তাহারই নাম কাঠক। অপরে ঐ শাখা অধ্যয়ন করিলেও কঠ প্রচারক বিধায় প্রধান, তজ্জন্যই তাঁহার নামানুসারে শাখার নাম হইল। বেদে লিখিত আছে, "বৈশম্পায়নঃ সর্ব্বশাখাধ্যায়ী কঠঃ পুনরেকাং শাখামধ্যাপয়াং বভূব।" বৈশম্পায়ন সকল শাখা অধ্যয়ন করেন, কঠ কেবল একমাত্র শাখা অধ্যয়ন করেন। "বহুশাখাধ্যায়ী বৈশম্পায়নকে পরিত্যাগ করিয়া, এক শাখাধ্যায়ী কঠ মহাশয়ের নামেই তাঁহার পঠিত শাখার নাম হওয়া সঙ্গত। কঠ স্বয়ংই

শাখার নাম, রচনা করা বা প্রচার করা ইত্যাদির এখানে (অর্থাৎ এইরূপ নাম ব্যবহারের কারণরূপে গৃহীত হইবার) কোনও উপযোগিতা নাই। একরূপ হইলেই হইতে পারে। কেন না, উভয় প্রকারেই সম্ভাবনা আছে। যে জিনিষ যিনি রচনা করেন, তাঁহার নামে ঐ জিনিষের নাম হইতে দেখা যায়। আবার যাহা যিনি জনসমাজে আনাইয়া দেন, তাঁহার নামেও ঐ জিনিষের নাম হয়। গ্রহের নাম "হর্শেল" শেষোক্ত প্রথার দৃষ্টান্ত। এরূপ আরও বহুবিধ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এ সূত্র উত্তরবাদীর।

পরন্তু শ্রুতিসামান্য মাত্রং : ৩১।

পদপাঠঃ। পরং। তু। শ্রুতি সামান্যমাত্রং।

ব্যাখ্যা। পরং—আর যাহা (বলা হইয়াছে।) তু—তাহাও। শ্রুতিসামান্যমাত্রং—শ্রবণসামান্যমাত্র।

বঙ্গার্থঃ। আর ঔদ্দালকি প্রভৃতি ব্যক্তির ঘটনা থাকায় তাহার পরবর্ত্তিবেদ অনিত্য বলিয়া যাহা পূর্ব্বপক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, তাহাও শ্রবণসামান্য মাত্র।

বিশদব্যাখ্যা। ঔদ্দালকি, প্রাবাহয়নি ইত্যাদি নাম যে বেদে কতকগুলি পূর্ব্ববর্ত্তি-ব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে, এরূপ নহে। কোনও সত্য প্রকাশ করিতে হইলে শ্রোতা ও বক্তা থাকা আবশ্যক। বেদ কখনও পুত্ররূপে পিতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতেছেন, কখনও গুরু, কখনও শিষ্য, নানাভাবে উক্তি প্রত্যুক্তি। ঐ সকল আধ্যাত্মিকাংশের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যক্তি-প্রতিপাদন নহে, ওগুলি কেবল বাক্যমাত্র। শ্রোতার অভিনিবেশের জন্য আধ্যায়িকা সমাবেশ আবশ্যক। নিত্যবেদে এই জগতের হিতকর সুলভ উপায় অনাদিকাল হইতেই আছে। উহা পূর্ব্ব সময়ের সংবাদ নহে। ওগুলি কেবল কথার কথা মাত্র। ঐ শব্দ সকল কোথাওবা অনুকরণে কোনও স্থানেবা যোগার্থ-বলে কর্ম্ম-প্রতিপাদক অথবা তত্ত্বপ্রকাশক হইতে পারিবে। উহার মধ্যে গূঢ় রূপক রহস্যও আছে বোধ হয়।

কৃতেবা বিনিয়োগঃ স্যাৎ কর্ম্মণঃ সম্বন্ধাৎ। ৩২।

পদপাঠঃ। কৃতে। বা। বিনিয়োগঃ। স্যাৎ। কর্ম্মণঃ। সম্বন্ধাৎ।

ব্যাখ্যা। কৃতে—কার্য্যে। বা—(অবধারণে অথবা পূর্ব্ব পক্ষ হইতে পক্ষান্তর-বোধনে।) বিনিয়োগঃ—সন্নিবেশ। (প্রয়োগ) স্যাৎ—হয়। কর্ম্মণঃ—কর্ম্মের। সম্বন্ধাৎ—সম্বন্ধ আছে বলিয়া।

বঙ্গার্থঃ। কর্ম্মসম্বন্ধ হেতুক বেদের কর্ম্মেই বিনিয়োগ হইবে। (উত্তরোত্তর কর্ম্মবোধক অঙ্গাদির উপদেশ এবং ক্রম প্রভৃতি পরিলক্ষিত হইতেছে বলিয়া, বেদ বিধির কার্য্যার্থেই বিনিয়োগ, ঘটনার্থে নহে)

বিশদব্যাখ্যা। বেদবাক্যের অতীত ঘটনা লিপিবদ্ধ করাই প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। বেদ-কর্ম্ম প্রতিপাদক। কর্ম্ম প্রতিপাদন করিতে হইলে, অঙ্গ এবং ফলাদির যথাযথ উপদেশ এবং ইতিকর্ত্তব্যতার বিশদীকরণ আবশ্যক হয়। বেদ তাহাই করিয়াছেন। বেদ বলিলেন, জ্যোতিষ্টোম যাগ করিবে। কিজন্য করিবে, কিরূপ অধিকারী ব্যক্তি করিবে, কোন্ সময়ে করিবে, কিপ্রকারে করিবে, একে একে সমস্তই বেদ প্রকাশ করিয়াছেন। বেদ-

বিধিবাক্য কর্ম্মপ্রতিপাদক, অপর সকল অংশ যেরূপে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহাও পরে বলা হইতেছে। বেদে বলা হইয়াছে, 'বনস্পতয়ঃ সত্রমাসত।' অর্থাৎ বৃক্ষগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিল বৃক্ষেরা যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে সমর্থ নহে, সুতরাং বেদের ঐ অংশ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা অসঙ্গত। এখানে আমরা বলিব, ইহা কেবল প্ররোচক বাক্যমাত্র। যেমন কোনও ব্যক্তিকে দর্শন বিষয়ে উৎসাহিত করিতে হইলে বলিতে হয় যে, 'এ জিনিষ এতই স্পষ্ট যে অন্ধেরাও দেখিতে পায়, আপাততঃ দেখা যায়, অনেকে পুত্রকে পড়াইতে গিয়া বলেন "এযে চক্ষু বুজিয়াও পড়া যায়।" এখানে বুঝা উচিত, যাহাকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে, তাহার প্রতি উপযুক্ততা এবং একান্ত-কর্ত্তব্যতাই বলা হইতেছে। যখন বৃক্ষেরা পর্য্যন্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিল, তখন বিদ্বান্ বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণেরা এই যজ্ঞানুষ্ঠানে অবশ্যই যত্ন করিবেন, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। আবার লিখিত আছে, "সর্পাঃ সত্রমাসত" সর্পেরা যজ্ঞ করিয়াছিল, এখানেও ঐরূপ বুঝা আবশ্যক। বেদে লেখা আছে, "জরদ্গবো-গায়তি মত্তকানি" জরদ্গব গান করা অসম্ভব হইলেও, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে এই সকল বেদ-বাক্যের উপপত্তি করা যাইতে পারিবে। বেদবাক্য বৃথা নহে, চিরদিনই কর্ম্ম-প্রতিপাদক। কোনও কোনও স্থানে কর্ম্ম-প্রশংসাদিও করিয়াছেন। বেদবাক্য উন্মত্ত-বাক্য নহে, কর্ম্মবোধক, অতএব প্রমাণ। এ অধিকরণের বিষয় বেদ অপৌরুষেয়, এই কথা বলা মাত্রই। পূর্ব্বপক্ষ—নানাযুক্তি আছে বলিয়া বেদ অনিত্য, পুরুষ-সৃষ্ট। উত্তর পক্ষ—ঐ সকল যুক্তির অন্যথা উপপত্তি করিতে পারাযায়, এবং শব্দার্থের নিত্য-সম্বন্ধ নিবন্ধন ও অন্যান্য বহুবিধ যুক্তি আছে বলিয়া বেদ নিত্য—অপৌরুষেয়। এমত মীমাংসকেরই, অপর কোনও দার্শনিক বেদকে এরূপ নিত্য বলেন না, যাঁহারা অপৌরুষেয় বলেন. তাঁহারাও নিত্য বলেন না, যথা বেদান্ত-দর্শনকার ও কপিল। ; বেদ অপৌরুষেয় বলিয়া প্রমাণ, কিন্তু উৎপত্তি শ্রুতি আছে বিধায় উহা জন্য। তাঁহারা এই কথা বলেন। এ পাদের এইখানে শেষ হইল। ইহার নাম তর্কপাদ। মীমাংসাদর্শনে প্রথমাধ্যায়ে প্রথমপাদ সমাপ্ত।

প্রথমাধ্যায়স্য

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

(অর্থবাদ প্রামাণ্য নিরূপণং)

আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্য মতদর্থানাং তস্মাদনিত্যমুচ্যতে। ১।

পদপাঠ। আম্নায়স্য। ক্রিয়ার্থত্বাৎ। আনর্থক্যং। অতদর্থানাম্ তস্মাৎ। অনিত্যং। উচ্যতে।

ব্যাখ্যা। আম্নায়স্য—বেদের। ক্রিয়ার্থত্বাৎ—কর্ম্মপ্রতিপাদকতাবশতঃ। আনার্থক্যং—ব্যর্থতা। অতদর্থানাং—যাহা কর্ম্ম-প্রতিপাদক নহে, তাহাদের। তস্মাৎ—সেই হেতুক। (কর্ম্মবোধক নহে বলিয়া) অনিত্যং—অপ্রমাণ। উচ্যতে—বলাহয়।

বঙ্গার্থঃ। বেদবাক্য যাগাদি কর্ম্মের প্রতিপাদক বলিয়াই প্রমাণ। যেগুলি

কর্ম্মবোধক নহে, সেই ভাগ অপ্রমাণ বলিয়া কথিত হইতে পারে।

বিশদব্যাখ্যা।—পূর্ব্বোক্তসূত্রগুলিতে বিধি-বাক্যের প্রামাণ্যই নিরূপিত হইয়াছে। এখন যেগুলি বিধিশেষ অর্থাৎ বিধিবোধিত বিষয়ের স্তাবক (অর্থবাদ যাহাদের নাম) সেইগুলির প্রামাণ্য আছে কিনা, তাহা বিচারিত হইতেছে। এই সূত্রটী পূর্ব্বপক্ষ মতের জ্ঞাপক। বেদবাক্য ধর্ম্ম প্রতিপাদন করে, কিন্তু অর্থবাদবাক্য ধর্ম্মপ্রতিপাদনে সমর্থ বলিয়া বোধ হয় না, অতএব উহার প্রামাণ্য-পরীক্ষার অভিলাষ আপাততই হয়। বেদে উক্ত হইয়াছে—"সোঽরোদীৎ, যদরোদীৎ তদ্ রুদ্রস্য রুদ্রত্বং" সে রোদন করিয়াছিল, যে রোদন করিয়াছিল, তাহাই রুদ্রের রুদ্রত্ব। এখানে কোনওপ্রকার যাগকর্ম্ম কথিত হইল না। কেবল রুদ্র রোদন করিয়াছিলেন, ইহাই বুঝা গেল। যদি বলা যায়, অধ্যাহারাদি দ্বারা অথবা বিপরিণাম কিম্বা ব্যবহিত কল্পনানুসারে কোনওপ্রকার অর্থ কল্পনা করা যাইতে পারে, তাহাও বৃথা, কেননা "রুদ্র রোদন করিয়াছিলেন, অন্যেরও রোদন করা উচিত" এইরূপ একটী অসার অর্থই ঐরূপে কল্পিত হয়। সকলের রোদনকরা বেদের আদেশানুসারে সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব এবং অনুচিত। অতএব এ সকল বাক্য অপ্রমাণ। আবার দেখা যাইতেছে, বেদে আছে, "স প্রজাপতিরাত্মনো বপামুদখিদৎ" "সেই প্রজাপতি নিজের বপাউৎখেদ করিয়াছিলেন।" এখানেও অর্থ কল্পনা করিতে হইলে, "প্রজাপতি আত্মবপাউৎখেদ করিয়াছিলেন, অতএব অপরকেও ঐরূপ করিতে হইবে" এতাদৃশ একটী অর্থ কল্পিত হইতে পারে। এই ব্যাপারের সহিত যজ্ঞের সম্বন্ধ আছে, একথা বলিতে পারা যায় না। প্রজাপতির দৃষ্টান্তে যজমান যদি নিজের বপা উৎখেদ করেন, তবে তখনই সকল যজ্ঞের অবসান হইল। রুদ্রের মত যজমান কাঁদিতে লাগিলেও প্রায় তথৈবচ, অতএব এগুলির সহিত কর্ম্মের সম্বন্ধ নাই। বেদবাক্য আরও বলিতেছেন,—'দেবাবৈ দেব-যজনমধ্যবসায় দিশোন প্রজানন্' দেবতারা দেবযজন অধ্যবসায় করিয়া দিক্ জানিতে পারিয়াছিলেন না, অর্থাৎ তাঁহারা দিগ্‌ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। এখানে অর্থকল্পনাদ্বারা, "দেবতাদের দিগ্‌ভ্রম হইয়াছিল, অতএব অন্যেরও হওয়া উচিত" এরূপ বুঝিয়া লাভ নাই। কাহার দিগ্‌ভ্রমে পতিত হইতে ইচ্ছা হয়? আত্মীয়-মরণাদি উপলক্ষ্য না থাকিলেও কে রোদন করিতে চাহে? নিজের বপা উৎখেদ করিতেইবা কাহার অভিসন্ধি আছে? অতএব পূর্ব্বোক্ত অর্থ কল্পনাও বৃথা, ঐ সকল অর্থবাদবাক্য প্রমাণও হইতে পারে না। এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ৬ষ্ঠ সূত্র পর্য্যন্ত পূর্ব্বপক্ষেরই মত।

শাস্ত্রদৃষ্ট বিরোধাচ্চ। ২।

পদঃপাঠঃ। শাস্ত্রদৃষ্ট বিরোধাৎ। চ।

ব্যাখ্যা। শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধাৎ—শাস্ত্রবিরোধ এবং দৃষ্টবিরোধহেতুক। চ—ও। (অপ্রমাণ।)

বঙ্গার্থঃ। (অর্থবাদ বাক্য) শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও দৃষ্টবিরুদ্ধ-অর্থবোধক বলিয়াও প্রমাণ হইতে পারে না।

বিশদব্যাখ্যা। অর্থবাদের প্রামাণ্য নাই, এই বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষের যুক্তি ক্রমে ক্রমে

সঙ্কলিত হইতেছে। শ্রুতি বলেন "স্তেনং মনঃ" মন স্তেয়কারী। "অনৃত বাদিনীবাক্" বাণী মিথ্যাবাদিনী। এরূপ অর্থ ভূতানুবাদ মাত্র। কর্ম্মবোধক নহে, সুতরাং অপ্রমাণ। যদি বিপরিণামাদিদ্বারা অর্থ কল্পনা করিয়া কর্ম্ম সম্বন্ধ বজায় রাখিতে ইচ্ছাহয়,তাহাতেও কৃতকার্য্য হওয়া সুকঠিন। মন যখন স্তেয়কারী,তখন যজমানের স্তেয়ানুষ্ঠান আবশ্যক। ঐরূপ মিথ্যাবাক্য যজমানের ব্যবহার্য্য,এতাদৃশ এক একটি অর্থ কল্পিতহয়। তাহাতে ইষ্টসিদ্ধির সম্পূর্ণ অসম্ভাব। কেননা,যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মকালে মিথ্যাকথা বলা ও চৌর্য্য শত শতবার নিষিদ্ধ হইয়াছে। যদি বলা যায়, কখনও মিথ্যা বলা কখনও না বলা,এইরূপ বিকল্প হউক, তাহাও অন্যায়। কেননা, প্রত্যক্ষ ও কল্পিত বিধির বিকল্প হয়না,কারণতুল্য বল পদার্থেরই বিকল্প। সুতরাং কোনও প্রকারে ঐ বাক্য গুলির ক্রিয়াবোধকত্ব কল্পনা করা যায় না, অতএব উহার প্রামাণ্য নাই। শাস্ত্রবিরোধ দেখান হইল, সম্প্রতি দৃষ্ট-বিরোধও প্রদর্শিত হইতেছে। "তস্মাদ্ধূম এবাগ্নের্দিবাদদৃশে নার্চ্চিঃ, তস্মাদর্চ্চিরেবাগ্নের্নক্তংদদৃশে ন ধূমঃ।' সেই জন্য অগ্নির ধূম দিনে দেখা যায়,অর্চ্চি দেখা যায়না, সেইজন্য অর্চ্চি রাত্রিতে দেখা যায়, ধূম দেখা যায় না। এখানে "সেইজন্য" এই অংশদ্বয়ের তাৎপর্য্য এই যে, এই লোক হইতে অগ্নি আদিত্যে যায় (দিবসে) এবং রাত্রিতে আদিত্য অগ্নিতে যায়। এই নিমিত্তই দিনে ধূম দেখা যায়, অর্চ্চি দেখা যায় না, রাত্রিতে অর্চ্চি দেখা যায়,ধূম দেখা যায় না। এই অর্থ একান্ত অসম্ভব, দৃষ্টবিরুদ্ধ। অগ্নি আদিত্যে যায়, ইহার প্রতিকূলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। অগ্নিকে কেহ কখনও আদিত্যে যাইতে দেখে নাই, দিনে অর্চ্চি দেখাযায় না, ইহাও প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ, কেননা সকলেই দিবসে অগ্নির অর্চ্চি অর্থাৎ দীপ্তি দর্শন করিয়া থাকে। বেদ বলেন "দেখে না।" সুতরাং বেদের এ অংশ অপ্রমাণ। আরও দৃষ্টবিরোধ বেদে লিখিত আছে। "ন চৈত দ্বিদ্মোবয়ং ব্রাহ্মণাবাস্মঃ অব্রাহ্মণাবাইতি।" আমরা ব্রাহ্মণ কি অব্রাহ্মণ, ইহা আমরা জানিতে পারি না। এইবাক্য ক্রিয়াবোধক নহে, তাহা স্পষ্টতই প্রতীত হইতেছে। যেরূপ অর্থ বুঝাগেল, তাহাও প্রকৃতপক্ষে দৃষ্ট-বিরুদ্ধ। আমরা ব্রাহ্মণ কি অব্রাহ্মণ, ইহা আমরা জানি না, একথা আদৌ হইতে পারে না। লোকতঃ দেখাযায়, সকলেই ইহা অবগত থাকে, বিশেষতঃ ক্রিয়াদিরদ্বারা প্রকৃষ্ট-নির্ণয়ই হইতে পারে। এরূপ সন্দেহ সম্পূর্ণ অসম্ভব। অপর একটী বেদবাক্য উদ্ধৃত করা যাইতেছে;—"কোহিতদ্বেদ যদমুষ্মিন্ লোকেঽস্তি বা নবাইতি" "কে তাহা জানে, যাহা এই লোকে আছে অথবা নাই" যদি প্রশ্নবোধক হয়, তবে ক্রিয়াবোধক নহে বলিয়া আপাততই অপ্রমাণ। কে তাহা জানে, এই অংশ যদি "কেজানে তাহা বুঝিতে পারি না" এই অর্থে প্রযুক্ত হয়, তবে শাস্ত্র-দৃষ্ট-বিরোধ, এবং যাহা "এখানে আছে অথবা নাই" এরূপ বস্তু প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ, আবার "কে তাহা জানে জানি না" ইহাও শ্রুত্যাদির বিরুদ্ধ, সুতরাং এ বাক্যের কোনও সঙ্গত অর্থ পাওয়া যাইতেছে না, অতএব উহা অপ্রমাণ।

তথা ফলাভাবাৎ। ৩।

পদপাঠঃ। তথা। ফল-অভাবাৎ।

ব্যাখ্যা। তথা—সেইপ্রকার। ফলাভাবাৎ—ফল নাই বলিয়া (অর্থবাদ বাক্য প্রমাণ নহে।)

বঙ্গার্থঃ। সেইপ্রকার ফল নাই বলিয়াও অর্থবাদ অংশের প্রামাণ্য নাই। (বিধিবাক্যের ফলশ্রুতি আছে, অর্থবাদের ফল নাই, কোনও কোনও স্থলে যে সকল ফল বলা হইয়াছে, তাহা একান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ, অতএব ফল নাই বলিয়া অর্থবাদ অনর্থক।)

বিশদব্যাখ্যা। যেরূপ শাস্ত্র-দৃষ্ট-বিরুদ্ধ বলিয়া অর্থবাদ অনর্থক ও অপ্রমাণ, তদ্রূপ ফলাভাব বশতঃ অপ্রমাণ। গর্গত্রিরাত্র ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইতেছে, "শোভতেঽস্যমুখং য এবং বেদ" যে ইহা জানে (পাঠ করে,) তাহার মুখ শোভাপায়। এ কথা অযুক্তিক। কোনও পুস্তকের অংশ পাঠ করিলে মুখ শোভা পাইবার কারণ নাই। কালান্তরে মুখ শোভা পাইবে, ইহাতেও কোন প্রমাণ নাই। ইহাকে বিধিবাক্যও বলিতে পার না, কেন না বিধিশ্রুতি নাই। অতএব অযুক্তিক ফল বলিয়া, অফলঅর্থবাদের প্রামাণ্য পরিগ্রহ করা একান্ত অনুচিত ব্যবহার।

অন্যানর্থক্যাৎ। ৪।

পদপাঠঃ। অন্য-আনর্থক্যাৎ।

ব্যখ্যা। অন্যার্থক্যাৎ—অপরের আনর্থক্য অর্থৎ অনাবশ্যকতা অথবা ব্যর্থতা হয় বলিয়া। (অর্থবাদ অপ্রমাণ।)

বঙ্গার্থঃ। অপর সকলের অনাবশ্যক হয় বলিয়াঅর্থবাদ বাক্য প্রমাণ হইতে পারে না। বিশদব্যাখ্যা। অপর কারণ প্রদর্শিত হইতেছে। অর্থবাদের প্রামাণ্য স্বীকার করিলে, অপর অনেকগুলি কর্ম্ম অনর্থক হয়। সুতরাং উহা স্বীকার করা যায় না। "পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বান্ কামান্‌অবাপ্নোতি" পূর্ণাহুতিদ্বারা সকল অভিলষিত প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ কথা একান্ত অন্যায়, কেননা এক পূর্ণাহুতি দিলেই যদি সকল ফল পাওয়াগেল, তবে এই যাবজ্জীবন অনন্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে কোন্ বোকুচন্দ্রের প্রবৃত্তি হয়? "পশুবন্ধযাজী সর্ব্বান্ লোকানভিজয়তি" পশুবন্ধযাজী সকল লোক জয় করেন। যদি সকল লোকই পশুবন্ধ-যাজীর হইল, তবে অন্য যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার আবশ্যকতা দেখি না। "তরতি মৃত্যুং তরতি ব্রহ্মহত্যাং যোঽশ্বমেধেন যজেতে, য উ চৈনমেবং বেদইতি।" যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, সে মৃত্যু এবং ব্রহ্মহত্যা হইতে উত্তীর্ণ হয়, যে ইহা অবগত আছে, সেও উত্তীর্ণ হয়। এটী একেবারে প্রমাদবাক্য। না জানিয়া কেহ কখনও অশ্বমেধ করে না। বেদ অধ্যয়ন করিবার সময়ই অশ্বমেধ জানা হইয়াছে। তাহার পরে যজ্ঞাধিকার হয়। যদি জানা থাকিলেই সব ফুরাইয়া গেল, তবে যজ্ঞ করা পণ্ডশ্রম মাত্র। যখন জানা আছে, তখন ফল পাওয়া যাইবে, অশ্বমেধ করা না করা উভয়ই সমান। এরূপ অবস্থায় কে করে? শাস্ত্রকারগণ বলেন;—"অর্কে (অক্কেইতিবা) চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতংব্রজেৎ। ইষ্টস্যার্থস্য সংসিদ্ধৌ কো বিদ্বান্ যত্নমাচরেৎ।" অর্থাৎ যদি পথের মাঝে অর্ক বৃক্ষে (অক্কে অর্থ গৃহকোণে) মধু পাওয়া যায়, তবে সেই মধুর জন্য আবার

পর্ব্বতে যাইবে কেন? কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অভিলষিত অর্থ সিদ্ধ হইলেও বৃথা পরিশ্রম স্বীকার করেন?

অভাগিপ্রতিষেধাচ্চ। ৫।

পদপাঠঃ। ন-ভাগি-প্রতিষেধাৎ। চ।

ব্যাখ্যা। অভাগি প্রতিষেধাৎ—অসম্ভবের নিষেধ করা হইয়াছে বলিয়া। চ—ও। (অর্থবাদ অপ্রমাণ।)

বঙ্গার্থঃ। যাহা সম্ভব নহে, তাহাই আবার নিষেধ করা হইয়াছে, সুতরাং অর্থবাদ অপ্রমাণ।

বিশদ ব্যাখ্যা। ন্যায় বলেন "প্রাপ্তেহি প্রতিষিধ্যতে" যাহার প্রাপ্তি আছে তাহারই প্রতিষেধ করা যায়। যাহা সম্ভব নাই, তাহার স্বভাবতঃ নিষেধ আছে। আবার নিষেধ করা কিজন্য? অগ্নিচয়নে শ্রুত হইতেছে, "ন পৃথিব্যামগ্নিশ্চেতব্যোনান্তরীক্ষে নদিবি।" পৃথিবীতে অগ্নিচয়ন করিবে না, অন্তরীক্ষে নয়, স্বর্গেও নয়। অন্তরীক্ষে অগ্নিচয়ন করা যায় না, ইহা সকলেই অবগত আছে, পুনর্ব্বার বলা বৃথা। স্বর্গে-অগ্নিচয়ন করা পৃথিবীতে থাকিয়া হয় না, সেখানে যাইতে হয়, কিন্তু স্বর্গে যাইতে পারিলে আর অগ্নি চয়নেরও আবশ্যকতা থাকেনা। অতএব এ উক্তিরও মূল্য নাই। পৃথিবীতে অগ্নিচয়ন করিবে না বলিলে, অগ্নিচয়নের নিষেধই করা হইল, কারণ পৃথিবী ছাড়িয়া অগ্নিচয়ন করিবে কোথায়? এবাক্য অপ্রমাণ হইলে সব নিষ্পত্তি হয়। যাহা নিজেও আকুল হয়, পরকেও আকুলিত করে, তাহা কিরূপ প্রমাণ? এই শ্রুতির তাৎপর্য্য "চয়ন করিবে না।" শ্রুত্যন্তরে দেখাযায় "হিরণ্যং নিধায় চেতব্যং" "স্বর্ণ রাখিয়া চয়ন করিবে" বিধি আকুলিত না হউক, এই জন্যই অর্থবাদ অপ্রমাণ। যথাক্রমে এই অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তর বলা হইতেছে। পূর্ব্বপক্ষের আর দুই একটী কথা আছে, পরে সিদ্ধান্ত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকেদারনাথ ভারতী সাংখ্যতীর্থ।
যশোহর ব্রহ্মচারি আশ্রম, বেদবিদ্যালয়।

আপস্তম্বীয় গৃহ্য সূত্র।

প্রথম খণ্ড।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বর্ত্তমানে পরিস্তরণাদি অগ্নি সাধারণ বিধানগুলির বিশদীকরণার্থে আপস্তম্ব বলিতেছেন,—

অগ্নিমিদ্ধাপ্রাগগ্রৈর্দর্ভৈরগ্নিং পরিস্তৃণাতি। ১২।

অগ্নিকে কাষ্ঠাদিদ্বারা উত্তমরূপে প্রজ্বলিত করিয়া পূর্ব্বাগ্র অর্থাৎ তাহার অগ্রভাগ পূর্ব্বদিকে থাকিবে এইরূপ কুশের দ্বারা পরিস্তরণ করিবে। কুশ ছড়াইয়া দেওয়ার নাম পরিস্তরণ। "অগ্নি মিদ্ধা" এই সূত্র ভাগের রহস্য এই যে, যদি প্রজ্বলিত অগ্নিও উপস্থিত থাকে, তথাপি তাহাকে (সেই প্রজ্বলিত অগ্নিকে) আবার প্রজ্বলিত অর্থাৎ সমিধাদি প্রদান পূর্ব্বক অধিকতর প্রভান্বিত করিয়া লইতে হইবে। সুদর্শনাচার্য্য বলেন, "বচনাদিদ্ধমপীধীত" অর্থাৎ বচন আছে বলিয়া, প্রজ্বলিতকেও আবার প্রজ্বলিত

করিতে হইবে। "অগ্নিমিদ্ধা" এখানে গোভিল বলেন, "অগ্নিমুপসমাধায়," আবার আপস্তম্বীয় সূত্রের বৃত্তিকার হরদত্ত বলেন, "অগ্নিমিদ্ধেতি তদগ্নেরুপসমাধানং ইত্যুচ্যতে তচ্চকর্ম্মাঙ্গং।' অগ্নিমিদ্ধা ইহাদ্বারা যাহা বলা হইল, তাহার নাম অগ্নির উপসমাধান—তাহা কর্ম্মাঙ্গ। এদিকে গোভিলীয় গৃহ্যসূত্রে "অগ্নিমুপসমাধায়" অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিয়া, এই কথা লিখিত আছে। ইহাদ্বারা বুঝা যাইতে পারে, অগ্নিপ্রজ্বলনই অগ্নির উপসমাধান অথবা অগ্নির ইন্ধন।

পূর্ব্বমুখ ব্যতীত অন্যপ্রকার অর্থাৎ যাহার অগ্র উত্তর দিকে থাকে, এরূপ কুশার দ্বারা অথবা অন্যবিধ কুশ দিয়া পরিস্তরণ করাযায় কিনা, অথবা কখনও পূর্ব্বাগ্রকুশা গ্রহণ, কখনও উত্তরাগ্রকুশাগ্রহণ পরিস্তরণে উপযোগী কিনা, তাহা বলা হইতেছে।

প্রাগুদগগ্রৈর্ব্বা। ১৩।

সকল স্থানে পূর্ব্বাগ্র কুশার দ্বারা পরিস্তরণ করিতে হইবেই এমন নহে। উত্তরাগ্র কুশারদ্বারা ও পরিস্তরণ করা যাইতে পারে। হরদত্ত বলেন, এই পরিস্তরণে উত্তরাগ্র কুশার ব্যবহার অগ্নির সম্মুখভাগে ও পশ্চাদ্ভাগে হইবে। অন্যভাগে পূর্ব্বাগ্র কুশার ব্যাবহার করিতে হইবে, তাঁহার এরূপ নির্দ্দেশের কারণ কোনও স্থানের ব্যবহারানুরোধ হইতে পারে, কিন্তু আপস্তম্বের বচনে তাহা নাই।

দৈবকার্য্যে এবং পিতৃ কার্য্যে উভয়ত্রই এই নিয়ম সমান কিনা, তাহা আলোচনা করা আবশ্যক, তজ্জন্য বলা হইতেছে,—

দক্ষিণাগ্রৈঃ পিত্র্যেষু। ১৪।

পিতৃকার্য্যে (শ্রাদ্ধাদিতে) দক্ষিণাগ্রকুশের দ্বারা সকল দিকে পরিস্তরণ করিতে হইবে।' পিত্র্য শব্দে বৃত্তিকার বলেন মাসিক শ্রাদ্ধ।

এখানে পক্ষান্তর আশ্রয় করা যাইতে পারে কিনা, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে;—

দক্ষিণাপ্রাগগ্রৈর্ব্বা। ১৫।

দক্ষিণাগ্র অথবা পূর্ব্বাগ্রদ্বারাও পরিস্তরণ করা যাইতে পারে। সুদর্শনাচার্য্য বলেন, দক্ষিণাগ্রকুশদ্বারা অগ্নির পশ্চাদ্ভাগে, পূর্ব্বাগ্রকুশদ্বারা অগ্নির সম্মুখভাগে, এবং দক্ষিণাগ্রকুশদ্বারা উত্তর দিকে, পূর্ব্বাগ্রকুশের দ্বারা দক্ষিণদিকে পরিস্তরণ করিতে হইবে। এই বিকল্পটীকে কেহ কেহ পিত্র্যকার্য্য বিষয়ক বলেন, কেহ কেহ আবার সাধারণবিধির পক্ষান্তর বলিয়াছেন, মধ্যে পিতৃকার্য্যের বিধানটীই যত সন্দেহের একমাত্র কারণ। এই পরিস্তরণ-কার্য্য আহুতিবিশিষ্ট অনুষ্ঠান মাত্রেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অন্যান্য আচার্য্যগণের অভিপ্রায়ানুসারে অবগত হওয়া যায় যে, পরিস্তরণ বৃত্তাকারে, ত্রিকোণাকারে ও চতুষ্কোণাকারে হইতে পারে, এখানে তাহার বিশেষ কোনও পরিচায়ক বাক্য নাই, কেবল পরিস্তরণ মাত্র বিহিত। বস্তুতঃ কুশগুলির অভিমুখ নির্দ্দেশ করায় চতুষ্কোণাকারে পরিস্তরণই এখানকার লক্ষ্য বলিয়া বোধ হয়, কারণ অন্যবিধপরিস্তরণে কুশার তির্য্যগ্ভাবে অবস্থিতি ও কোণে অর্থাৎ উত্তর ও পূর্ব্বের মধ্যকোণে ইত্যাদি স্থানে কুশার অগ্রভাব পতিত হওয়া সম্ভব। সমস্ত কুশা পূর্ব্বাভিমুখ অথবা সমস্ত উত্তরাভিমুখ করিয়াও বৃত্তাকারে স্থাপন করা যায়, কিন্তু ত-

ভাবে ছড়াইলে ত্রিকোণাকারেও স্থাপন করা যাইতে পারে ; তবে বৃত্তিকারের অভিপ্রায় সেরূপ বলিয়া বোধ হয় না, কেন না, তিনি বারম্বার অগ্নির সম্মুখে, অগ্নির পশ্চাতে, ইত্যাদিরূপে নির্দ্দিষ্টদিকে অগ্রভাগবিশিষ্ট কুশের ব্যবস্থা করিতেছেন, যাহাহউক ব্যবহার বশতঃ চতুষ্কোণাকারে স্থাপনই অধিকতর প্রধান কল্প।

পরিস্তরণানন্তর পাত্রপ্রয়োগার্থ কুশ সংস্তরণাদি কার্য্য কথিত হইতেছে। পাত্রের বিষয়ও একটু বিবৃত হইতেছে।

উত্তরেণাগ্নিং দর্ভান্ সংস্তীর্য্য দ্বন্দ্বং ন্যঞ্চি পাত্রাণি প্রযুনক্তি দেবসংযুক্তানি। ১৬।

অগ্নির উত্তরদিকে কুশ পাতিয়া, তাহার উপর যুগ্ ভূত পাত্র প্রয়োগ করিবে অর্থাৎ পাত্র রাখিয়া দিবে। দেব সংযুক্ত পাত্র দুটী দুটী স্থাপন করিবে ; এখানে কেহ কেহ বলেন, এক পাত্রই দুইবার স্থাপন করিবে। ক্রিয়াদ্বিত্ব, বস্তু একই। এক দ্রব্যের দুইবার স্থাপন অনেক স্থানে দেখাযায়। পরসূত্রে "সকৃৎ" থাকাতে দুইবারই প্রকৃত অর্থ বলিয়া বোধ হয়। বৃত্তিকার বলেন, এখানে পূর্ব্বাগ্রকুশ পাতিবার ব্যবস্থা। পাত্রশব্দে এখানে প্রয়োজনবিশিষ্টসামগ্রীসকলই বুঝিতে হইবে। সেই জন্যই উপনয়নে মেখলার সাদন অর্থাৎ স্থাপন হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মেখলা পাত্র নহে। যজ্ঞায়ুধ বলিলেই আপাততঃ পাত্র বুঝাযায়। স্রুব, স্রুক্ ইত্যাদির নামই পাত্র। দেব—সংযুক্ত দর্ব্বী প্রভৃতি অধোবিল অর্থাৎ নিম্নগর্ত্ত পাত্র সকল দুইবার স্থাপন করিবার বিধান করায়, তাৎপর্য্যাধীন অনুষ্ঠানে বিশেষ নিয়ম আছে বুঝাযায়। পরে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

সকৃদেব মনুষ্যসংযুক্তানি। ১৭।

মনুষ্যসংযুক্ত দ্রব্য দুইবার স্থাপন করিতে হইবে না। একবার মাত্র স্থাপন করিতে হইবে। ইহাতে ভঙ্গীক্রমে একটী মাত্র স্থাপন করিবার অনুমতিই দেওয়া হইল। বিবাহোপনয়নাদি কর্ম্ম মনুষ্য কর্ম্ম, তৎসংযুক্ত দ্রব্যই মনুষ্যসংযুক্ত, তাহা দুটী করিতে হইবে না। তাৎপর্য্যতঃ একবার স্থাপন করিবার আদেশেই একটী স্থাপন করিবার কথা আসিল। দুইটী দ্রব্য স্থাপনের চেষ্টা একবারে অসম্ভব না হইলেও অনেকাংশে কষ্টসাধ্য এবং প্রচলিত নিয়মের বহির্ভূত, সুতরাং একবার বলায় একটীর কথাই আসিয়াছে, মনুষ্য-কর্ম্ম-সংযুক্ত মেখলা দ্রব্য একটী এবং স্থাপনও একবার। যদি একটী দ্রব্য দুইবার স্থাপন অর্থাৎ ক্রিয়ার আবৃত্তি পক্ষ শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণকরা আবশ্যক হয়, তবে আমরা তাহার অনুকূলে একটী প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি। বৃত্তিকার সুদর্শনাচার্য্য বলিতেছেন "মনুষ্য সংস্কারযুক্তানি অশ্ম বাসোমেখলাজিনানি সকৃদেব ক্রিয়াভ্যাবৃত্তি-পরিহারেণ প্রযুনক্তি।" মনুষ্য সংস্কারযুক্ত অশ্ম অর্থাৎ প্রস্তর, বাস অর্থাৎ বস্ত্র, মেখলা এবং অজিন অর্থাৎ মৃগচর্ম্ম, এই সমস্ত দ্রব্য, ক্রিয়ার আবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক একবারই স্থাপন করিবে। ইহাতে বোধহয় দেবসংযুক্ত পাত্রে ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি বলাই উদ্দেশ্য, কেননা এখানে সূত্রে যখন "সকৃৎ" অর্থাৎ একবার লেখা আছে, তখন ক্রিয়ার আবৃত্

তাহাতেই নিষিদ্ধ হইয়াছে, বৃত্তিকারের বলিবার একটু উদ্দেশ্য চিন্তাকরা আবশ্যক। ক্রিয়াবৃত্তির কথা যদি পূর্ব্বসূত্রে না উঠিয়া থাকে, তবে তিনি কোথায় পাইবেন? যদি বলাযায় "সকৃৎ" শব্দের অর্থ লিখিতে একথা লেখা আবশ্যক হইয়াছে, তাহাকেও সঙ্গত উক্তি বলিতে পারি না। কেন না তিনি বলিতেছেন "সকৃদেবক্রিয়াভ্যাবৃত্তি-পরিহারেণ" ক্রিয়ার অভ্যাবৃত্তি পরিত্যাগ করিলে সকৃৎ স্থাপন ছাড়া আর হইতে পারে না। ক্রিয়া একবার, স্থাপনও একবার। অতএব এরূপ স্পষ্টার্থে ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া প্রাচীনগণের নীতির একটু বাহিরে। ঐ কথার উদ্দেশ্য পূর্ব্বে ক্রিয়াভ্যাবৃত্তি দ্বারাই দুইবারের উপপত্তি করা হইয়াছে, এই রহস্য প্রকাশ করা। সূত্র যখন পরে 'সকৃৎ' বলিয়াছেন, তখন পূর্ব্বে দুইবারের কথাই বলিয়াছেন, দুইটীর নহে। দুইটী বলিলে যদি দুইবার আসে, তবে একটী বলিলেও একবার আসিতে পারিত।

পিতৃপক্ষে বিশেষ আছে কিনা, ইহা সকল স্থানেই অনুসন্ধেয়।

একৈকশঃ পিতৃসংযুক্তানি। ১৮।

পিতৃকর্ম্ম অর্থাৎ পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে যে সকল কর্ম্ম করাযায়, তাহাতে প্রত্যেকের নিমিত্তই এক একটী পাত্রের ব্যবস্থা বলা হইল। পিতৃপুরুষের মধ্যে যে কয়জন যেখানে উদ্দিষ্ট হইবেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের জন্য এক একটী, পৃথক্ পাত্রের বন্দোবস্ত। তাঁহাদের পাত্রের স্থাপনও একবার, পাত্রও এক। ক্রিয়াভ্যাবৃত্তি এখানে নাই। ব্যবহারই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

পরসূত্রে কতকগুলি কার্য্যের প্রতি একস্থানে কথিত ধর্ম্ম অতিদিষ্ট হইতেছে।

পবিত্রয়োঃ সংস্কার আয়ামতঃ পরিমাণং প্রোক্ষণীসংস্কারঃ পাত্রপ্রোক্ষ ইতি দর্শপূর্ণমাসবত্তূষ্ণীম্। ১৯।

পবিত্রদ্বয়ের সংস্কার, আয়াম পরিমাণ, প্রোক্ষণী সংস্কার এবং পাত্রপ্রোক্ষ দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞের মত তূষ্ণীং অর্থাৎ চুপ করিয়া, মন্ত্রাদি পাঠ না করিয়া করিতে হইবে। দর্শপূর্ণমাসে এই সমস্ত কার্য্য চুপ করিয়া করার নিয়ম আছে। দর্শপূর্ণমাস শ্রৌতকর্ম্ম। এখানে অর্থাৎ গৃহ্যকর্ম্মেও সেই ধর্ম্মের অতিদেশ কথিত হইতেছে। পবিত্রের লক্ষণ কর্ম্মপ্রদীপে উক্ত আছে "অনন্তর্গর্ভিণং সাগ্রং কৌশং দ্বিদলমেবচ, প্রাদেশমাত্রং বিজ্ঞেয়ং পবিত্রং যত্র কুত্রচিৎ।" যাহার অন্তর্গর্ভ নাই, এরূপ অগ্রসহিত কুশের দলদ্বয় প্রাদেশ প্রমাণ হইলে তাহাকে পবিত্র বলিয়া জানিবে। সাধারণতঃ পুরোহিত মহাশয়েরা যেরূপ আকারের পবিত্র ব্যবহার করেন, তাহা অনেকেই জানিতে পারেন, ইহাতে নূতনত্ব নাই। শ্লোক তাঁহাদের পরিচিত-পবিত্রের কথাই বলিল, নূতন এক রকমের কিছু বুঝাইতেছে না। পবিত্রদ্বয়ের আয়াম অর্থাৎ দৈর্ঘ্য পরিমাণ, (পবিত্র দুইটীকে প্রাদেশমাত্র করিয়া মাপিয়া রাখা) প্রোক্ষণী সংস্কার (প্রোক্ষণী হস্ত প্রক্ষালনার্থ জলপূর্ণ পাত্র বিশেষ) এবং পাত্র প্রোক্ষণ। (উত্তানেনৈব হস্তেন প্রোক্ষণং সমুদাহৃতং।) উত্তান হস্তদ্বারা জলের ছিটা দেওয়ার নাম প্রোক্ষণ।) "পাত্র" এখানে অগ্নিহোত্রহবণী

ব্যতিরিক্ত অন্য পাত্র, একথা কেহ কেহ বলেন। এই সকল কার্য্যই কুশান্তরে করিতে হইবে।

অতঃপর অন্যবিধ কর্ত্তব্য উপদিষ্ট হইতেছে।

অপরেণাগ্নিং পবিত্রান্তর্হিতে পাত্রে ইপ আনীয়, উদগগ্রাভ্যাং পবিত্রাভ্যাং ত্রিরুৎপূয়,সমং প্রাণৈর্হৃত্বা, উত্তরেণাগ্নিং দর্ভেষু সাদয়িত্বা দর্ভৈঃ প্রচ্ছাদ্য। ২০।

পাত্র-প্রোক্ষণের পরে অগ্নির অপরদিকে 'প্রণীতা' পাত্রের মধ্যে উত্তরাগ্র পবিত্রদ্বয় স্থাপন করিয়া, পরে জল আনিয়া ঐ উত্তরাগ্র পবিত্রদ্বয়দ্বারা জল তিনবার উৎপবন করিবে। (জলে তৃণাদি অপবিত্র থাকিলে তাহা পবিত্রদ্বারা উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে ফেলিয়া দেওয়ার নাম উৎপবন।) তাহার পর ঐ জল প্রাণের সহিত হরণ করিবে। (প্রাণৈঃ সমং এ কথার ব্যাখ্যায় বৃত্তিকার বলেন, মুখেন তুল্যং অর্থাৎ মুখেরদ্বারা যেরূপ ভাবে জল হরণ করাযায়, তদ্রূপ ঐ জল পবিত্রেরদ্বারা হরণ অর্থাৎ ছিটাইয়া দিবে।) ("প্রাণৈঃসমং" শব্দের অর্থ "প্রাণ স্থানাভ্যাং মুখ নাসিকাভ্যাং সমুদ্ধৃত্য" প্রাণের স্থান যে মুখ এবং নাসিকা, তাহারদ্বারা "সমুদ্ধৃত্য" অর্থাৎ তুলিয়া) তাহারপর অগ্নির উত্তরদিকে সংস্তীর্ণ অর্থাৎ পাতিত কুশগুলির উপর স্থাপন করিয়া (প্রণীতা পাত্রকে) কুশের দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। অগ্নির উত্তরে জলপূর্ণ রক্ষিত স্রুবকে প্রণীতা বলাযায়; জলপূর্ণ করিবার পূর্ব্বক্ষণেও উহাকে প্রণীতাই বলে।)

অনন্তর কর্ত্তব্য পরসূত্রে উপদিষ্ট হইতেছে।

ব্রাহ্মণং দক্ষিণতো দর্ভেষু নিষাদ্য। ২১।

ব্রাহ্মণকে অগ্নির দক্ষিণদিকে কুশের উপর বসাইয়া। এখানে পাঠান্তর আছে, "ব্রহ্মাণং" তাহার অর্থ ব্রহ্মাকে। ব্রহ্মা যজ্ঞীয় ঋত্বিক্ বিশেষ। ব্রহ্মার বরণবস্ত্র মান্য গণ্য অথবা দৌহিত্র সন্তানেই সর্ব্বত্র আমাদের দেশে পাইয়া থাকেন। কাজের ভার ভগবানেই অর্পিত আছে। ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে শ্রাদ্ধাদিতে ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য করিতেন। আজকাল "দর্ভময় ব্রাহ্মণ"ই প্রায়শঃ ব্যবহৃত। ব্রাহ্মণের অনুপযুক্ততাজ্ঞানই বোধহয় পরিবর্ত্তনের কারণ।

(ক্রমশঃ)

কস্যচিৎ ব্রহ্মচারিণঃ

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। | আশ্বিন। | ১৩০৭ সাল, ১৮২২ শকাব্দা।

আপস্তম্বীয় গৃহ্য সূত্র।

প্রথম খণ্ড।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আজ্যং বিলাপ্য উত্তরেণাগ্নিং পবিত্রান্তর্হিতায়ামাজ্যস্থাল্যাং আজ্যং নিরূপ্য উদীচোঽঙ্গারা-ন্নিরুহ্য তেষ্বধিশ্রিত্য জ্বলতা-বদ্যুত্য দ্বে দর্ভাগ্রেপ্রত্যস্য ত্রিঃ পর্য্যগ্নিকৃত্বা উদগুদ্বাস্য অঙ্গারান্ প্রত্যূহ্য উদগগ্রাভ্যাং পবিত্রাভ্যাং পুনবাহারং ত্রিরুৎ-পূয় পবিত্রেঽনুপ্রহৃত্য। ২২

আজ্য অর্থাৎ ঘৃতকে বিলাপ্য অর্থাৎ গলাইয়া অগ্নির উত্তর দিকে 'পবিত্র' যাহার মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছে, এরূপ আজ্যস্থালীতে অর্থাৎ ঘৃত-রক্ষণের পাত্রে ঘৃত রাখিয়া দিয়া, অঙ্গারগুলিকে উত্তরদিকে পৃথক্ করিয়া, তাহাদের উপর ঘৃত-পাত্র স্থাপন করিয়া, জ্বলৎকাষ্ঠের অধোগামিনী দীপ্তিদ্বারা আলো-কিত করিয়া, দুই কুশাগ্র পবিত্রের মত সংস্কৃত করিয়া ঘৃতে নিঃক্ষেপ করিবে। তাহার পর ঐ আজ্য-পাত্রের চতুর্দ্দিকে তিন-বার অগ্নিদ্বারা প্রদক্ষিণ করিবে। পরে উহা অর্থাৎ ঘৃত-পাত্র উত্তরদিকে নামাইয়া রাখিয়া অঙ্গারগুলিকে পুনর্ব্বার অগ্নিসংসৃষ্ট করিয়া উত্তরাগ্রপবিত্রদ্বয়দ্বারা বারম্বার আহরণ পূর্ব্বক তিনবার উৎপবন অর্থাৎ পবিত্রদ্বারা ঘৃত আলোড়ন করিয়া তাহার মধ্যগত তৃণাদি ফেলিয়া দেওয়ারূপ কার্য্য করিবে, তাহার পর পবিত্রদ্বয়কে আচারানু-মতে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে।

এই সূত্রে আজ্য-সংস্কার-ক্রম (যজুর্ব্বে-দীয় নিয়মে) বলা হইতেছে। আজ্য শব্দে ঘৃত, তৈল, দধি, দুগ্ধ, যবাগু, এই সকল পদার্থই বুঝাযাইতে পারে। গৃহ্যসংগ্রহে লেখা-আছে, "অগ্নিনাচৈব মন্ত্রেণ পবিত্রেণ চ চক্ষুষা। চতুর্ভিরেব যৎপূতং তদাজ্যং ইতরং ঘৃতং" অগ্নি, মন্ত্র, পবিত্র, এবং চক্ষু, এই চারি-টীরদ্বারা যাহা পূত হইয়াছে, তাহাকে (সেই ঘৃতকেই) আজ্য বলাযায়, অপর সাধারণ অসংস্কৃত ঘৃতের নাম ঘৃত। আমরা অনুবাদে আজ্য শব্দের বোধনার্থে ঘৃত শব্দ ব্যবহার

করিতেছি। পাঠক মহাশয়! ভুলিবেন না। আরও লেখা আছে যে, 'ঘৃতঞ্চ যদিবা' তৈলং পয়োবা যদি বাবকং, আজ্যস্থানে প্রযুক্তানাং আজ্য শব্দো বিধীয়তে, ঘৃতই হউক, তৈলই হউক, আর দুগ্ধই হউক, আর যবাগুই হউক, যাহারা আজ্যের কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহারা সকলেই আজ্য শব্দ প্রয়োগের লক্ষ্য হইতে পারে। এখন আজ্য-স্থালীর একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। আজ্য সহিত যে আজ্যপাত্র, তাহাকেই আজ্যস্থালী বলিতে হয়। কর্ম্মপ্রদীপে দৃষ্ট হয়;—আজ্যস্থালীচ কর্ত্তব্যা তৈজস-দ্রব্য সম্ভবা, মহীময়ী বা কর্ত্তব্যা সর্ব্বাস্বাজ্যাহুতীষুচ॥ আজ্য স্থাল্যাঃ প্রমাণন্তু যথাকামং প্রকল্পয়েৎ। সুদৃঢ়ামব্রণাং ভদ্রামাজ্যস্থালীং প্রচক্ষতে। ধাতু দ্রব্যের দ্বারা আজ্যস্থালী প্রস্তুত করিতে হয় অথবা অভাবে মৃত্তিকার দ্বারা নির্ম্মিত পাত্রও আজ্যস্থালী নাম পাইতে পারে। সর্ব্বপ্রকার আজ্যাহুতিতে আজ্যস্থালীর দরকার। ইচ্ছানুরূপ আজ্যস্থালীর প্রমাণ হইবে। উত্তমরূপে দৃঢ় এবং ছিদ্রশূন্যভাবে আজ্যস্থালী নির্ম্মাণ করিতে হয়। অগ্নির উত্তরদিকে অঙ্গার পৃথক্ করিবার কথা, উত্তরদিকে পাত্র নাবাইবার কথা, পিত্র্য কর্ম্মেও অনুরূপ হইবে না। পিত্র্যকর্ম্মে প্রাদক্ষিণভাবে পর্য্যগ্নিকরণ হইতে পারে, আচার্য্যেরা এরূপ বলেন। পর্য্যগ্নিকরণ জ্বলৎকাষ্ঠ অথবা অলাতুক-দ্বারা করিতে হইবে। যদি ঘৃতপূর্ব্বেই গলান থাকে, তথাপি কল্পোক্ত বিধানানুসারে তাহাকে হোমার্থক অগ্নিতে পুনর্ব্বার গলাইয়া লইবে।

অবেক্ষ্য আজ্যকাষ্ঠে। অন্যা তৃণের [illegible] ... তৎপর একবার পাত্রস্থ ঘৃতকে ভাল করিয়া দেখিয়া লওয়া। অঙ্গারগুলিকে পুনর্ব্বার অগ্নিসংসৃষ্ট করার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, ঐ অঙ্গারগুলি অগ্নিতে পূর্ব্বে যে স্থানে অবস্থান করিতেছিল, তাহাদের সেই স্থানে পুনর্ব্বার রাখিয়া দেওয়া। বৃত্তিকার বলেন, "পুনরায়তনস্থানাগ্নিনা সংযোজ্য" 'পুনর্ব্বার সেই আয়তন স্থানের অগ্নির সহিত সংযুক্ত করিয়া, এইরূপ ব্যাখ্যা হইতেই পূর্ব্বোক্ত বাক্য প্রমাণিত হয়।

এইখানে প্রথমখণ্ড পরিসমাপ্ত হইল।

দ্বিতীয় খণ্ড।

যেনজুহোতি তদগ্নৌ প্রতিতপ্য দর্ব্ভ্যৈঃ সংমৃজ্য পুনঃ প্রতিতপ্য প্রোক্ষ্য নিধায় দর্ভাগ্রৈঃ সংস্পৃশ্য অগ্নৌ প্রহরতি। ১।

(পবিত্রদ্বয় অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিবার পর) যদ্দ্বারা হোম করিবে অর্থাৎ দর্ব্বীই হউক, স্রুবই হউক, অথবা হস্তই হউক, তাহা অগ্নিতে তপ্ত করিয়া, অর্থাৎ স্পর্শ করাইয়া, কুশেরদ্বারা মার্জ্জনা করিয়া পুনর্ব্বার অগ্নিস্পৃষ্ট করিয়া তাহার পর জলের ছিটা (হস্ত উত্তানভাবে রাখিয়া) দিয়া স্থাপনপূর্ব্বক কুশগণকে জলস্পর্শ করাইয়া পরে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। স্রুব ঘৃতহোমে সাধন। প্রত্যেক দ্রব্য সাধ্য হোমে স্বতন্ত্র হোমপাত্র কল্পনা করা হইয়াছে। (দধিদ্রব্যক হোমে পূর্ব্বোক্ত অগ্নিশ্রয়াদি নাই।)

শম্যাঃ পরিধ্যর্থে বিবাহোপনয়ন-সমাবর্ত্তন-সীমন্ত-চৌলগোদান-প্রায়শ্চিত্তেষু ।২।

পরিধিকার্য্যে অর্থাৎ যেখানে পরিধি ব্যবহৃত হয়, সেই খানেই শম্যা ব্যবহার করা যাইতে পারে। বিবাহ, উপনয়ন,সমাবর্ত্তন, সীমন্তোন্নয়ন, চৌল, (চৌড়) গোদান, প্রায়শ্চিত্ত,এই সকল কার্য্যেই এ নিয়ম,সর্ব্বত্র নহে। পরিধি বলিলে সাধারণতঃ বহিঃসীমা বুঝায়। কর্ম্মপ্রদীপে পরিধির লক্ষণ আছে,যথা—'বাহুমাত্রাঃ পরিধয়ঃ ঋজবঃ সত্বচোহব্রণাঃ। ত্রয়োভবন্তু শীর্ণাগ্রা একৈকাস্ত চতুর্দ্দিশং। প্রাগগ্রাবভিতঃ পশ্চাদুদগগ্রমথাপরং। ন্যসেৎ পরিধিমন্যন্তুদগগ্রঃ সপূর্ব্বতঃ।" ইহার অর্থ এই যে——

পরিধিগণ বাহু পরিমাণ হইবে, উহাদের ত্বক্ (ছাল্) থাকা চই। গাত্রে ব্রণ না থাকা চাই। উহারা ঋজু অর্থাৎ সরল হইবে। তিনটী এমন হওয়া চাই, যাহাদের অগ্রভাগ শীর্ণ হয় নাই। চারিদিকে এক একটী পরিধি থাকিবে। পূর্ব্বাগ্র পরিধি দুইটী উত্তরে ও দক্ষিণদিকে রাখিতে হইবে, পশ্চিমদিকে উত্তরাগ্র একটী এবং পূর্ব্বদিকে উত্তরাগ্র একটী ব্যবহার করিতে হইবে, এরূপ কেহ কেহ বলেন। বস্তুতঃ পরিধি অগ্নির চতুর্দ্দিকস্থ কাষ্ঠ বেষ্টনের নামান্তর মাত্র। তাহার স্থানে উপনয়নাদিতে শম্যার বিধান করা হইতেছে। (পরিধি পলাশ অথবা শমীকাষ্ঠ রচিত হওয়াই নিয়ম। আচার্য্য গোভিলও বলেন, "পরিনীনপেকে কুর্ব্বন্তি শামীলান্ পার্ণান্ বা।" শমীকাষ্ঠ অথবা পলাশ কাষ্ঠ-রচিত সীমা স্থাপনও কোনও কোনও আচার্য্য করিয়া থাকেন, ইহাই গোভিল-বাক্যের তাৎপর্য্য। শম্যা লোক প্রসিদ্ধ বলিয়া বৃত্তিকার বলেন। "যুগপ্রান্তয়োশ্ছিদ্রেষু কীলরূপা কাষ্ঠবিশেষাঃ।" দুই পার্শ্বের ছিদ্রগুলিতে কীলকরূপ কাষ্ঠবিশেষ থাকিলে, তাহাকে শম্যা বলে। বিবাহাদির অন্যত্র অর্থাৎ পার্ব্বণাদিতে পরিধিই ব্যবহৃত হয়। তথায় শম্যা নহে। প্রায়শ্চিত্ত (স্থূলত্ব) শব্দের অর্থ আকস্মিক কোনও অদ্ভুত উৎপাত আপতিত হইলে তজ্জন্য যে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তাহাই। এসকল কার্য্যেও দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞের নিয়মের অতিদেশানুসারে কুশাস্তাব বিজ্ঞাতব্য।

অপর অনন্তর কর্ত্তব্য উপদিষ্ট হইতেছে।

অগ্নিং পরিষিঞ্চত্যদিতেঽনুমন্যস্বেতি দক্ষিণতঃ প্রাচীনং,অনুমতেঽনুমন্যস্বেতি পশ্চাদুদীচীনং সরস্বত্যনুমন্যস্বেতি উত্তরতঃ প্রাচীনং দেব সবিতঃ প্রসুবেতি সমন্তম্ ।৩

এই সূত্রে উদক অর্থাৎ জলেরদ্বারা অগ্নিপর্য্যুক্ষণ কথিত হইতেছে। অগ্নিকে পরিষেচন অর্থাৎ উদকদ্বারা পর্য্যুক্ষণ করিবে। "অদিতেঽনুমন্যস্ব" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণ হইতে পূর্ব্ব জলের দ্বারা অগ্নি পর্য্যুক্ষণ করিবে। "অনুমতেঽনুমন্যস্ব" এই মন্ত্র পাঠ সহকারে পশ্চিমে উত্তরে জলদ্বারা অগ্নি পর্য্যুক্ষণ করিবে। "সরস্বতি অনুমন্যস্ব" এই মন্ত্রদ্বারা উত্তর হইতে পূর্ব্ব দিকে জলদ্বারা অগ্নি পর্য্যুক্ষণ করিবে। "দেব সবিতঃ

প্রসুব" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা চারিদিকে জলদিয়া অগ্নি পর্যুক্ষণ করিবে। পর্যুক্ষণ এবং পরিষেচন একই। সাধারণতঃ আমাদের দেশে এইরূপ বিধিই প্রচলিত আছে।

পিতৃকার্য্যে বিশেষানুসন্ধান অনেক স্থানেই আবশ্যক হইবে।

পিতৃকেষু সমন্তমেব তুষ্ণীং। ৪।

পৈতৃক কর্ম্মে চারি দিকেই জলের দ্বারা অগ্নির পরিষেচন করিতে হইবে। তথায় দক্ষিন পূর্ব্বাদি নিয়ম কিছুই নাই। মন্ত্র পাঠের ব্যবস্থাও নাই, কেবল তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক পিতৃকর্ম্মে ঐ অগ্নি পর্যুক্ষণ করিতে হইবে। বৃত্তিকার হরদত্তের মতানুসারেই বলা হইতেছে, পরিষচন অগ্নিপর্য্যুক্ষণ। "পরিষেচনমুদকেন পর্য্যুক্ষণং" ইহাই তাঁহার বাক্য।

ইধ্মমাধায়াঘারাবাঘারয়তীতি দর্শপূর্ণমাসবত্তূষ্ণীম্। ৫।

ইধ্ম রাখিয়া আঘার সংজ্ঞক হোমদ্বয় দীর্ঘধারায় করিবে। এখানেও দর্শপূর্ণমাসোক্ত নিয়মে নির্ব্বাক্ হইয়া করিতে হইবে, মন্ত্রাদি নাই। আঘার শব্দে হোম (আঘার সংজ্ঞক হোম) বুঝায়। আঘার শব্দের কর্ম্মকাণ্ড প্রসিদ্ধ এই অর্থই গ্রাহ্য। ইধ্ম শব্দে পাত্রবিশেষ বুঝায়। কর্ম্মপ্রদীপে উক্ত হইয়াছে "প্রাদেশদ্বয়মিধ্মস্য প্রমাণং পরিকীর্ত্তিতং।" দুই প্রাদেশইধ্মের প্রমাণ কথিত হয়। এই পাত্র 'মেক্ষণের'মত। (মেক্ষণ শব্দে হাতার মত যে পাত্রে চরু গ্রহণ করিয়া হোম করা হয়, তাহাকেই বুঝায়।) ইধ্ম ও মেক্ষণ এক জাতীয় হইলেও মেক্ষণ ইধ্মের অর্দ্ধ পরিমাণ। ইধ্মজাতীয়মিধ্মার্দ্ধপ্রমাণং মেক্ষণং ভবেৎ" এ কথা কর্ম্মপ্রদীপে উক্ত হইয়াছে। দর্ব্বী, মেক্ষণ, ইধ্ম, ইহারা সকলেই এক জাতীয়, প্রায়শঃ একাকার, সামান্য মাত্র পরিমাণ অথবা কার্য্যপার্থক্যই ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞার কারণ হইয়াছে। এতাদৃশ ইধ্ম পাত্র স্থাপন করিয়াই আঘার হোম করিতে হইবে। আঘারয়তি শব্দের অর্থে সুদর্শনাচার্য্য বলেন "আঘারয়তি দীর্ঘং ধারয়া জুহোতি" দীর্ঘধারায় হোম করার নাম আঘার।

অথাজ্য ভাগৌ জুহোত্যগ্নয়ে স্বাহেত্যুত্তরার্দ্ধপূর্ব্বার্দ্ধে সোমায় স্বাহেতি দক্ষিণার্দ্ধ পূর্ব্বার্দ্ধে সমং পূর্ব্বেণ।৬

তাহার পর আজ্যভাগ হোমদ্বয় করিবে। একটী উত্তর পূর্ব্ব কোণে 'অগ্নয়ে স্বাহা' এই মন্ত্রে অপরটি দক্ষিণপূর্ব্বকোণে 'সোমায় স্বাহা, এই মন্ত্রে করিবে। এবং তাহা পূর্ব্বের সহিত সম করিয়া করিবে। অগ্নির উত্তর ভাগের নাম উত্তরার্দ্ধ, এবং পূর্ব্বভাগের নাম পূর্ব্বার্দ্ধ, তাহাদের অন্তরালবর্ত্তিদিক্ অর্থাৎ কোণের নাম উত্তরার্দ্ধ-পূর্ব্বার্দ্ধ। এই হোমদুইটি "সম" ভাবে করিতে হইবে, বিষম ভাবে নহে। যেখানে আঘার সংভেদ হইয়াছিল, সেখান হইতে যতদূরে পূর্ব্ব-হোমটি করিতে হইবে, ততটুকু অন্তরেই পরবর্ত্তি হোম করিতে হইবে, তাহা অপেক্ষা নিকটে অথবা দূরে নহে। আঘার নামক হোম সম্পাদন পূর্ব্বক প্রয়োজন অথবা তাৎপর্য্যাধীন যে সকল কার্য্য আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা না করিয়াই আজ্য ভাগ হোম করিতে হইবে, একথা

বৃত্তিকার মহাশয় বলেন। হরদত্ত বলেন, উত্তরভাগঃ উত্তরাৰ্দ্ধঃ পূৰ্ব্বভাগঃ পূর্ব্বার্দ্ধঃ তয়োরন্তরালং উত্তরার্দ্ধ পূর্ব্বার্দ্ধঃ। তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারেই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

যথোপদেশং প্রধানাহুতীর্হুত্বা জয়াভ্যাতানান্ রাষ্ট্রভৃতঃ প্রজাপত্যাং ব্যাহৃতীর্ব্বিহৃতাঃ সৌবিষ্টিকৃতীমিত্যুপজুহোতি, যদস্য কর্ম্মণো-হত্যরোযিচং যদ্বান্যূনমিহাকরম্, অগ্নিষ্টৎস্বিষ্টকৃদ্বিদ্বান্ সর্ব্বং স্বিষ্টং সুহুতং করোতু স্বাহা। ৭

উপদেশানুসারে প্রধানাহুতি প্রদান করিয়া, তাহার পর জয় অভ্যাতান রাষ্টভৃত প্রজাপত্য ব্যাহৃতি হোম করিয়া পরে স্বিষ্টিকৃৎ হোম করিবে। তাহার মন্ত্র'যদস্য' ইত্যাদি 'স্বাহা' পর্য্যন্ত। উপদেশানুসারে এ কথার অর্থ এই যে, যে কর্ম্মে যেটিকে অথবা যে কয়টি প্রধান আহুতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন (আচার্য্যেরা,) তাহাই সেথানকার প্রধানাহুতি। যে মন্ত্রে বিবাহাদি কর্ম্মে হবির্ব্বিধানানুসারে প্রধানাহুতি উপদিষ্ট হই-হইয়াছে, তাহা সম্পাদন করিবে, তাহার পর 'জয়'সংজ্ঞক ত্রয়োদশটী হোম করিতে হইবে। তদনন্তর 'অভ্যাতান' নামক অষ্টাদশ হোম নিষ্পন্ন করিয়া, তাহার পর 'রাষ্টভৃত' নামক দ্বাবিংশতিটী হোম করিবে। পরে ভূঃস্বাহা, ভুবঃ স্বাহা, এবং স্বঃ স্বাহা এই তিনটী মন্ত্রে ব্যাহৃতি হোম করিয়া, পরে স্বিষ্টিকৃৎ হোম করিবে। (সু ইষ্টি) ইষ্টির শোভনতা সম্পাদনার্থে এই হোম করিতে হইয়া থাকে। যদস্য ইত্যাদি ঋকটী স্বিষ্টিকৃৎ হোমের মন্ত্র। উহার অর্থ এই যে, এই কর্ম্মের যাহা অতিরিক্ত (অর্থাৎ বিহিতের বহির্ভূত) করিয়াছি, অথবা যাহা ন্যূন (প্রকৃতাপেক্ষায় অসামর্থ্য। অথবা অজ্ঞতাবশতঃ অল্প করিয়াছি) করিয়াছি, তৎ সমস্তই ইষ্টি দোষোপশমনকারী বিদ্বান্ অগ্নি সু-ইষ্ট এবং সুহুত করুন। এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, সর্ব্বত্রই যদি সাধারণে প্রধানহোমানন্তর জয়াদির বিধান হইল, তবে স্থানে স্থানে জয়াদির জন্য বিশেষ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার তাৎপর্য্য কি? তাহাতে উত্তর এই যে, এই বিধি যেখানে যাইবে না, অথচ বিশেষ বচনও নাই, সেখানে জয়াদিও নাই, যথা পার্ব্বণাদিতে। এই বচন যেখানে গেল, সেখানে বলিবার আবশ্যকতা নাই। অন্যত্র বিশেষ বিধান আবশ্যক, কাজেই বিশেষোক্তির সার্থকতা সংরক্ষিত হইতে পারে। বস্তুতঃ জয়াদি প্রধানের পরে কর্ত্তব্য। যেখানে প্রাপ্ত, সেইখানেই ক্রমবিচার; যেখানে তাহা নাই, সেখানে ক্রমবিচার অন্তঃসারশূন্য।

পূর্ব্ববৎ পরিষেচনং অন্বমংস্থাঃ প্রাসাবীরিতি মন্ত্রসংনামঃ। ৮।

পরিষেচন অর্থাৎ উদকের দ্বারা পর্য্যুক্ষণ পূর্ব্ববৎ, অর্থাৎ পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, (পিতৃকার্য্যে চতুর্দ্দিকে মন্ত্র শূন্যভাবে একবার এবং অপরকার্য্যে চারিটী সমন্ত্রক পরিষেচন যাহা উক্ত হইয়াছে) তাহাই করিতে হইবে। কেবল 'অনুমন্যস্ব' ইহার স্থানে 'অন্বমংস্থা' এইরূপ বলিতে হইবে। 'প্রসুব'এই শব্দের স্থানে 'প্রাসাবীঃ' এই শব্দ উচ্চারণ করিতে

হইবে। তাহাহইলে 'অদিতে অনুমন্যস্ব ইহার স্থানে' ‘অদিতে অন্বমংস্থাঃ' এইরূপ সংনাম অর্থাৎ উহ করা হইল। সমস্ত গৃহ্যকর্ম্মের হোম বিষয়ক সাধারণ নিয়ম বলা হইল। (যাহা স্মৃতি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।) ইদানীং বিবাহাদি কর্ম্মে যে সমস্ত শ্রৌত-বৈকল্পিক-বিধি আছে, তাহাও বলা হইতেছে।

লৌকিকানাং পাকযজ্ঞশব্দঃ। ৯

লৌকিকগণের পাক যজ্ঞ শব্দ। 'পাক যজ্ঞ' এই শব্দটী লৌকিকগণের অর্থাৎ লৌকিকের মধ্যে বিবাহাদিতে প্রসিদ্ধ। হরদত্ত বলেন, লোক বলিলে যাঁহারা শিষ্ট ব্যক্তি, তাঁহাদের বুঝায়। তাঁহাদের কথিত শাস্ত্রসকলের পাকযজ্ঞশব্দ বিবাহাদিকর্ম্ম-বাচী। "পাকযজ্ঞইতি বিবাহাদীনাং সংজ্ঞা বিধীয়তে।" ইহা হরদত্তের কথা। "পাক-যজ্ঞ শব্দঃ বিবাহাদিষু বর্ত্ততে।" এইরূপ অন্বয় তাঁহার অভিমত। পাকশব্দে অল্প। যাহাতে অল্প যজ্ঞ আছে, সেই বিবাহাদি কর্ম্মই পাক-যজ্ঞ। পাকগুণবিশিষ্ট যজ্ঞ বলিলে, কেবল আজ্যহোমেই এই সংজ্ঞা উপস্থিত হয়। সুদর্শনাচার্য্য মহাশয় বলেন, "লোকয়ন্তি বেদে বেদার্থান্ ইতি লোকা স্ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধাঃ শিষ্টাঃ দ্বিজন্মানঃ। তৈরাচর্য্যন্তে যানি কর্ম্মাণি তানি লৌকিকানি তেষাং মধ্যে সপ্তানামৌপাসন-হোমাদীনাং পাকযজ্ঞ-শব্দঃসংজ্ঞাত্বেন প্রসিদ্ধঃ।' যাঁহারাবেদে বেদার্থ দর্শন করেন অথবা আচরণ করেন, এরূপ শিষ্ট বেদজ্ঞ দ্বিজাতির নাম লোক; তাঁহাদের দ্বারা আচরিত কর্ম্মের নাম লৌকিক, তাহা-দের মধ্যে ঔপাসন-হোমাদি সাতটীর নাম পাকযজ্ঞ। বিবাহাদির ঐনাম নহে, ইহারা শ্রৌত-কর্ম্ম। পঞ্চচরুর দ্বারা সাধ্য যজ্ঞ পাক-যজ্ঞ। এই সংজ্ঞা-বলেই অগ্নিহোত্র বিধিতে চরুই হবি, আজ্যাদি নয়, এই নিয়ম জানা হইতেছে।

তত্রব্রাহ্মণাবেক্ষোবিধিঃ। ১০।

পাকযজ্ঞে পরবিধি ব্রাহ্মণাবেক্ষ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে প্রমাণ বলিয়া অবেক্ষা অর্থাৎ দর্শন করে। ব্রাহ্মণাবেক্ষ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-দৃষ্ট। পূর্ব্বে যে কতকগুলি বিধি বলা হই-য়াছে, তত্তৎ কর্ম্মের প্রকৃতি দর্শপূর্ণমাস যাগ। এটীর প্রকৃতি অগ্নিহোত্র, অতএব বিধি ব্রাহ্মণাবেক্ষ। অতএব উভয়ের বিকল্প। যেখানে পাক-যজ্ঞেতে আধারবান্ তন্ত্রের প্রবৃত্তি, সেইখানেই ইহার বিকল্পে প্রাপ্তি। সেই জন্য পণ্য-হোমাদিতে এ বিধির প্রবৃত্তি নাই। এখানে হরদত্তের মতানুসারেই লিখিত হইল।

দ্বির্জুহোতি দ্বির্নির্ম্মার্ষ্টি দ্বিঃ প্রাশ্নাত্যুৎ-সৃপ্যাচামতি নির্লেঢ়ীতি। ১১।

দুইবার হোম করিবে, দুইবার লেপ-নির্ম্মার্জ্জনা করিবে। দুইবার অঙ্গুলি প্রাশন করিবে। তৃতীয় প্রাশন পরিত্যাগ পূর্ব্বক আচমন করিবে। স্রুক্ দ্বারা অথবা স্রুক্ই দুইবার নির্লেহণ করিবে। দুইবার হোম এখানে অগ্নিহোত্রের আহুতি দ্বয়ের ধর্ম্ম পাক-যজ্ঞে প্রধানাহুতি এবং স্বিষ্টিকৃৎ আহুতি, এই উভয়কে অধিকার করিয়া বিহিত হইতেছে। এই সমস্তই সেখানে উক্ত হইয়াছে, এখানেও হইতেছে।

সর্ব্বঋতবো বিবাহস্য শৈশিরৌ মাসৌ পরিহাপ্যোত্তমং চ নৈদাঘং। ১২।

সকল ঋতুই বিবাহের কাল। শিশির ঋতুর মাসদ্বয় ও নিদাঘের উত্তমমাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিবাহ করিবে। সুদর্শনাচার্য্য বলেন, "শিশিরৌ মাসৌ মাঘফাল্গুনৌ" নিদাঘের অর্থাৎ গ্রীষ্মের উত্তম অর্থাৎ অন্ত্যমাস অর্থাৎ আষাঢ়। সুদর্শন বলেন "গ্রীষ্মস্য উত্তমোহন্ত্যা আষাঢ় ইতি।" ইঁহাদের মতে মাঘ,ফাল্গুন ও আষাঢ় মাস বিবাহে নিষিদ্ধ। উদগয়ন, পূর্ব্বপক্ষ হঃ, পুণ্যাহ ইত্যাদির অপবাদার্থ এই সূত্র। ইহাতে প্রতিপাদিত হইল যে, রাত্রিতে, অপরপক্ষে বিবাহ হইতে পারিবে। কেহ কেহ বলেন, বিহিত পূর্ব্বপক্ষাদি এখানে গ্রাহ্য, তবে অপর পক্ষাদি নিষিদ্ধ নহে, ইহাই প্রদর্শনকরা এখানকার উদ্দেশ্য। পুণ্যাহ এখানে সম্ভব নহে,কেননা দিনের মধ্যে প্রাতস্তনাদি কালের নামই পুণ্যাহ। বিবাহ আবার দিনে নিষিদ্ধ। শাস্ত্র বলেন, "বিবাহেতু দিবভাগে কন্যা স্যাৎ পুত্রবর্জ্জিতা।" দিবাভাগে বিবাহ করিলে সেই বিবাহিতা কন্যা পুত্রবর্জ্জিতা হয়; কথাটা বড় বিষম। যদি পুত্র-রত্নেই বঞ্চিত হইতে হয়, তবে কোন্ পুরুষ বা কোন্ স্ত্রী বিবাহে সম্মত হয়, জানি না। প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই নিয়মই চলিয়া আসিতেছে। অদ্যাপি দিবাবিবাহ ভদ্রলোকের বাটীতে হয় না। মাসের বিধান একটু পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। মাঘ-ফাল্গুনের নিষেধক কোনও ঋষিবচন পাওয়া যাইতেছে না। "দশমাসাঃ প্রশস্তে চৈত্র-পৌষ বিবর্জ্জিতাঃ" চৈত্রমাস এবং পৌষমাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপর দশমাস বিবাহে প্রশস্ত অর্থাৎ উক্ত। এখানে মাঘ, ফাল্গুনের প্রতিষেধ পাওয়া গেলনা। আবার "আষাঢ়ে, ধনধান্যভোগরহিতা নষ্টপ্রজা শ্রাবণে,বেশ্যা ভাদ্রপদে ইষেচ মরণং রোগান্বিতা কার্ত্তিকে, পৌষে প্রেতবতী বিয়োগবহুলা চৈত্রে মদোন্মাদিনী, অন্যেষেব বিবাহিতা সুতবতী নারী সমৃদ্ধা ভবেৎ।" আষাঢ় মাসে, ধন ধান্য ভোগ দুর্ল্লভ। শ্রাবণ মাসে বিবাহ করিলে, সন্তান মরিয়া যায়। ভাদ্র মাসে বেশ্যা হয়। আশ্বিনমাসে বিবাহ হইলে মরিয়া যায়। কার্ত্তিকমাসে রোগান্বিতা হয়। পৌষমাসে বিবাহ করিলে বিধবা হয়। চৈত্র মাসে অহঙ্কারিণী হয়। অন্যমাসে বিবাহিতা নারী পুত্রবতী এবং সমৃদ্ধি-শালিনী হয়। এখানে মাঘ-ফাল্গুন নিষিদ্ধ নহে, বরং সুফলপ্রদ বলিয়া বিহিত। এ সূত্রে যে সকল মাস পরিত্যজ্য, অর্থাৎ হয় কন্যা মরিবে, না হয় জামাতা মরিবে, এই গুরুতর দোষ যে সকল মাসে থাকিল,তাহাও বিহিত। পরন্তু নির্দ্দোষ মাস মাঘ-ফাল্গুনের উপর যত দোষ। বর্ত্তমান সময়েও মাঘ ফাল্গুন নির্দ্দোষ বলিয়া গ্রাহ্য হইতেছে। গৃহ্যসূত্রের আদেশ আজকাল এবিষয়ে আদৌ প্রতিপালিত হইতেছে না, শেষোক্ত বচনানুসারে সময় নির্দ্ধারণই অদ্যকার দিনে প্রচলিত। কম পরিবর্ত্তন নহে। অন্যান্য বহুল ঋষি-বচনানুরোধে শেষোক্ত বিধানই আদৃত। পরন্তু,জ্যোতিষশাস্ত্র শেষোক্তবিধির পরিপোষক।

সর্ব্বানি পুণ্যোক্তানি নক্ষত্রাণি ।১৩

পূর্ব্বোক্ত সকল পুণ্য-নক্ষত্রও বিবাহের কাল। হরদত্ত বলিতেছেন,"যানি পুণ্যানি নক্ষত্রাণি যানি পুণ্যোক্তানি মুহূর্ত্তানি, তানি সর্ব্বানি বিবাহস্য কালাঃস্যুঃ।" যে সকল পুণ্য-

নক্ষত্র, (কৃত্তিকাদি বিশাখা পর্য্যন্ত) এবং যে সকল পুণ্য-মুহূর্ত্ত প্রাতস্তনাদি, তাহা সমস্তই বিবাহের কাল। সুনক্ষত্র জ্যোতিষশাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায়। "প্রাতস্তন সংগব মধ্যন্দিনাপরাহ্ণঃ সায়ং ইত্যেতে সুমুহূর্ত্তাঃ।" এই বাক্যের দ্বারা দিবসে বিবাহের একটু পরিচয় পাওয়া যায়; প্রাতস্তন প্রভৃতি সুমুহূর্ত্ত, ঐগুলি দিনের বেলায় হইতে পারে, রাত্রিতে সংগব বা প্রাতস্তন নামক সময় নাই। কাজেই দিবা-বিবাহ অর্থাৎ সিদ্ধ হইতেছে। হরদত্ত স্পষ্টাক্ষরে সুমুহূর্ত্ত-প্রাতস্তনপ্রভৃতির বিধান করিয়াছেন। অবশ্য ভাবিবার বিষয়। আমরা পুণ্যাহ বলিতে অকালাদি দোষশূন্য, মেঘবর্ষণাদিউৎপাতশূন্য দিনকেই বলিব; দিন বলিলেই রাত্রিতে কার্য্য করিতে নিষেধ করা হয় না। বিবাহে বার বিচারও করা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাতস্তন বলিলে আর রাত্রিতে যাওয়া যায় না। কারণ রাত্রিতে প্রাতস্তন নাই। তবে অমুক দিনে করিতে হইবে বলিলে, সেদিন রাত্রিতে করিলেও দোষ হয় না। নক্ষত্রের কথায় তিথ্যাদির কথাও আসিয়াছে। সুদর্শনাচার্য্য বলিতেছেন "তিথ্যাদীন্যপি" অর্থাৎ শুভ তিথিও থাকা চাই। এবিষয় আমরা সময়ান্তরে আলোচনা করিব এবং মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব। এখানে বিস্তারভয়ে আপাততঃ বিদায় গ্রহণ করিলাম, পরে স্বতন্ত্র সময়ে আলোচনা করিব।

তথামঙ্গলানি। ১৪।

উক্তরূপ স্বশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ মঙ্গলকার্য্যানুষ্ঠানও করিবে। হরদত্ত বলেন, ব্রাহ্মণগণকে ভোজ্য প্রদান করা এবং আশীর্ব্বাচন, এ সকল মঙ্গল কার্য্য। স্নান করা, হরিদ্রা-মাখা, নূতন বস্ত্র পরিধান করা, স্নানের পূর্ব্বে নাপিত-কর্ম্ম অর্থাৎ ক্ষৌর হওয়া, গন্ধানুলেপন, মাল্যধারণ, ইত্যাদি লোক ব্যবহার প্রসিদ্ধ মঙ্গলকার্য্য। স্ত্রীগণের হুলুধ্বনি প্রদানও একটা ব্যবহারিক মঙ্গল কার্য্য। সুদর্শনাচার্য্যের মতে শঙ্খবাজান, দুন্দুভি বাজান, বীণা বাদন, অপরাপর তত্তৎকাল-দেশ-প্রসিদ্ধ বাদ্যযন্ত্রের বাদন ও কুলমহিলাগণের মঙ্গলগান, ধ্বজ-পতাকাদির সমাবেশ ইত্যাদি শিষ্টাচার পরিপ্রাপ্ত মঙ্গল কার্য্য। এই সকল মঙ্গল অদ্যাপি অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব্ববঙ্গে কুলমহিলাগণের গীত এখনও সমাদৃত; তবে সর্ব্বত্র এ নিয়ম যত্নের সহিত পালিত হয় না। বিবাহ-অন্নাশনাদি কার্য্যে, রামের বিবাহ রামের অন্নাশনাদি বিষয়ক গানই স্ত্রীগণের অভিপ্রায়ানুসারে উত্তম।

আবৃতশ্চাস্ত্রীভ্যঃ প্রতীয়েরন্। ১৫

আবৃত ক্রিয়া সকল স্ত্রীদিগের নিকট হইতেও জানিয়া লইবে। হরদত্ত বলেন, আবৃত বলিলে অমন্ত্রক ক্রিয়া বুঝায়, যথা নাগবলি, যক্ষবলি ইত্যাদি। যে দেশে যে বংশে যে সময়ে যে সকল আবৃত ক্রিয়া প্রচলিত আছে, তাহাই করিতে হইবে। এখানে কেবল মাত্র আচারেরই প্রামাণ্য। সুদর্শনাচার্য্যের মতে বৈবাহিকী ক্রিয়াগুলির নাম আবৃত। সেই সকল কর্ম্মের মধ্যে কতকগুলি অমন্ত্রক, কতকগুলি সমন্ত্রকও বটে। ইহা স্ত্রীলোকের—এমনকি সকল জাতীয় লোকের নিকট হইতে বরগণ জ্ঞাত হইতে পারেন। গৃহপূজা, অঙ্কুরারোপণ ইত্যাদি

আচার সিদ্ধ কর্ম্মও সমন্ত্রক করিতে হয়। আবার নাগবলি, যক্ষবলি ইত্যাদি ব্যবহার-সিদ্ধ হইলেও অমন্ত্রক। এই সকল কার্য্য, যে যে জাতির মধ্যে যেরূপ ব্যবহার, যে যে কুলে যেরূপ আচার ও যে স্ত্রী এবং যে পুরুষ যেরূপভাবে প্রতিপালন করিতেছেন, সময়ানুমতে তাহাই কর্ত্তব্য। স্বেচ্ছানুসারে নহে, কেননা এখানে আচারই প্রমাণ।

ইন্বকাভিঃ প্রসৃজ্যন্তে তেবরাঃ প্রতিনন্দিতাঃ। ১৬।

কন্যার আলয়ে বিবাহার্থ গমন করিতে হইলে যে সকল বর ইন্বকা নক্ষত্রে বাটী হইতে রওনা হন, তাঁহারাই কৃতকার্য্য হন, এবং কন্যার পিতার দ্বারা প্রতিনন্দিত হন। ইন্বকা কাহাকে বলে, তাহা সূত্রকারই পরে বলিতেছেন। হরদত্ত বলেন, এই সূত্রটী মহর্ষি আপস্তম্ব বলেন নাই, উহা দেশ-প্রচলিত গাথা মাত্র। অপরের দ্বারা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যাহাহউক, সূত্রই হউক, প্রাচীন গাথাই হউক, বর্ত্তমানে এ নিয়ম উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, সন্দেহ নাই।

এখানে দ্বিতীয় খণ্ড পরিসমাপ্ত হইল।

তৃতীয় খণ্ড।

মঘাভির্গাবোগৃহ্যন্তে। ১।

মঘানক্ষত্রে গো গ্রহণ করিবে। আর্ষ বিবাহে বর কন্যার পিতাকে উপঢৌকন স্বরূপ দুইটী গরু দিবেন, এই ব্যবস্থা আছে। "আদায়ার্ষস্তু গোযুগ্মং" বরের নিকট হইতে কন্যার পিতা দুইটী গরু লইয়া বিবাহ দিলে, তাহাকে আর্ষবিবাহ বলে। মঘানক্ষত্রে আর্ষ-বিবাহ হওয়া উচিত, একথা সুদর্শনের মতানুযায়ী। তিনি লিখিতেছেন "আর্ষং বিবাহং মঘাস্বেব কুর্য্যাৎ, ন ব্রাহ্মাদিবন্নক্ষত্রান্তরেষপীতি।" মঘা নক্ষত্রে আর্ষ বিবাহ করিবে, ব্রাহ্মাদি বিবাহ যেমন জ্যোতিষশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ সুনক্ষত্রে করা উচিত, আর্ষ তাহা নহে। আর্ষ-বিবাহে এরূপ বিশেষ অপর কোনও ঋষি-বচনে অবগত হওয়া যায় না। আপস্তম্ব-বাক্যের তাৎপর্য্য ওরূপ নহে, বলিয়া বোধহয়।

আপস্তম্ব বলিয়াছেন "বরপক্ষ হইতে গো ক্রয় করিয়া দিতে হইলে, সেই গো মঘায় মূল্য দিয়া গ্রহণ করা উচিত, তাহাহইলে কন্যার পিতা আনন্দ সহকারে ঐ গো গ্রহণ করেন।" হরদত্তও বলেন যে, "মঘাভির্গাবঃ ক্রয়াদিনা গৃহ্যন্তে" ক্রয় করিয়া মঘায় গো গ্রহণ করিবে। এ গ্রহণ বর-পক্ষের। পরে সেই গো, কন্যার পিতাকে দিতে হইবে। জ্যোতিষ শাস্ত্র আর্ষবিবাহ মঘায় হইবে, একথা বলেন কই? কাজেই পূর্ব্বোক্ত মতে সম্মতি প্রদান করিতে আপত্তি আছে।

ফল্গুনীভ্যাং ব্যূহ্যতে। ২।

ফল্গুনী নক্ষত্রদ্বয়ে বধূ বাটী লইয়া যাইবে। (ব্যূহ্যতে—নীয়তে ইতি সুদর্শনাচার্য্যঃ) কেহ কেহ বলেন, বিবাহের পরেই বাটী লইয়া যাইবে; এখানে ব্রাহ্মে ও আর্ষে কিছুই পার্থক্য নাই। সুদর্শন বলেন, পূর্ব্বফল্গুনী এবং উত্তরফল্গুনী, এই দুই নক্ষত্রই বধূকে বাটী লইয়া যাইবার সময়। বিবাহের পরেই ব্রাহ্মাদি মতে লইবার বিধান থাকিলেও, আর্ষ বিবাহে এই নিয়মই প্রশস্ত। হরদত্ত বলিতেছেন, 'ফল্গুনীভ্যাং ব্যূহ্যতে সেনা।'

ফল্গুনী নক্ষত্রদ্বয়ে সেনা ব্যূহিত করিবে। যুদ্ধার্থ সেনা-ব্যূহ রচনায় ফল্গুনী নক্ষত্রই উপযুক্ত কাল। "তস্মাৎ সেনা ব্যূহে প্রশস্তে ফল্গুন্যৌ" সেনা-ব্যূহ রচনায় ফল্গুনীই প্রশস্ত। আর্যবিবাহপ্রসঙ্গে গোগ্রহণ-কাল সূত্রিত করিয়া, তাহার পর ব্যূহরচনার কথা আপস্তম্ব বলিতেছেন, এরূপ বিশ্বাস আমাদের আদৌ নাই। ঋষি এতই বিহ্বল ছিলেন না যে, তিনি অগ্রে পশ্চাতে উভয় দিকে বিবাহ-নিয়ম লিখিতেছেন, অথচ মধ্যে একটী সূত্রে ব্যূহ রচনার বিধি লিপিবদ্ধ করিতেছেন! হরদত্তের কথা চিন্তার বিষয়। বারান্তরে আমরা অপর গৃহকর্ম্ম আলোচনা করিব। (ক্রমশঃ—)

কস্যচিৎ ব্রহ্মচারিণঃ—।

—

মায়ের কোলে ছেলে।

সুন্দর সংসারে সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সার—
মায়ের কোমল কোলে শিশু সুকুমার।

নীল নভের কোলে চাঁদের খেলা সুন্দর, শ্যাম শাখীর কোলে পাখীর মেলা সুন্দর, তরুলতার কোলে ফলের দোল—ফুলের হাসি সুন্দর; আর ততোধিক সুন্দর মায়ের কোলে ছেলে!

মায়ের কোলে ছেলে সকল দৃশ্যের সার দৃশ্য। উহা আমাদের আদর্শ-দৃশ্য। কারণ ঐ দৃশ্যই জীবনে সাধিত ও জীবন্ত করিতে হইবে। যে দৃশ্য কেবল স্থূল বা বাহ্য দৃষ্টির বিষয়ীভূত, তাহা স্থূল বা বাহ্য জগতের ক্ষণভঙ্গুরত্বের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণভঙ্গুর। ক্ষণভঙ্গুর আদর্শ অমৃততীর্থের যাত্রী মানবের সাধনাদর্শ হই পারে না। তবে কিনা, নিত্য ও অনি সাপেক্ষ-সম্বন্ধ-বদ্ধতা থাকাতেই অনিত্যে মধ্য দিয়া আমরা নিত্যের নিদর্শন পাই নিত্য আধ্যাত্মিক, অনিত্য ভৌতিক, এ ত যদি সত্য হয়, তবে সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতা হ তেই স্থূল ভৌতিকতা প্রসূত বা কল্পিত হ য়াছে। আর ইহা যদি মায়ার কার্য্য হয়, ত অনিত্যের বীজরূপিণী মায়া নিত্য-বী ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, নিত্যানিত্যের ন্যা ব্রহ্ম-মায়াও মানব-বোধাধিকারে পরস্প আপেক্ষিক সম্বন্ধবদ্ধ।

বেদান্তাদির ব্রহ্ম-মায়া, সাংখ্যাদির পুরুষ প্রকৃতি, ন্যায়াদির চৈতন্য-শক্তি, পাশ্চাত দর্শনাদিরও প্রায় সেই চৈতন্য-শক্তি, এসব ফলিতার্থে একই কথা। ব্রহ্ম, পুরুষ, চৈতন্য, একই তত্ত্ব; মায়া-প্রকৃতি-শক্তিও একই তত্ত্ব। এতাবতা নিত্য ও অনিত্যের অচ্ছেদ্য আপেক্ষিকতা উপলব্ধ হইতেছে। অতএব জগতে 'মায়ের কোলে ছেলে'—এই অনিত্য ভৌতিক দৃশ্যের অন্তরালে জগন্মায়ের কোলে সাধক ছেলে, এই নিত্য আধ্যাত্মিক দৃশ্য নিত্য বর্ত্তমান। তাই বলিতেছিলাম, 'মায়ের কোলে ছেলে' দৃশ্যটি আমাদের সার দৃশ্য ও আদর্শ-দৃশ্য। যে মানব স্বীয় দুর্ল্লভ জীবনে এ দৃশ্য সাধিত, জাগ্রত ও জীবন্ত করিতে পারিয়াছে, যে মানব-মণি মায়ের ছেলে হইয়া মায়ের কোলে বসিতে পাইয়াছে, সে-ই ধন্য, সে-ই কৃতার্থ।

সমস্ত বাহ্যিক দৃশ্যেরই একটা আধ্যাত্মিক পিঠ আছে। সে পিঠটা যেন ঈশ্বরের দিকে ফিরাণো, আর ভৌতিক পিঠটা যেন

আমাদের দিকে ফিরাণো। "মায়ের কোলে ছেলে' যদি বাহ্যিক দৃশ্যের সুন্দরতম অবস্থা বা ব্যবস্থা ধরা যায়, তবে উহার আধ্যাত্মিক পিঠেও "মায়ের কোলে ছেলে" সুন্দরতম দৃশ্য হইবে,তাহাতে সন্দেহ কি ?

আহা ! মায়ের কোলে ছেলের কি নির্ভর—কি নির্ভয়তা—নিশ্চিন্ততা, আর কিবা নিত্যানন্দশীলতা ! মায়ের কোলে ছেলে দেখিলে, আবার মায়ের কোলে ছেলে হইতে ইচ্ছা করে। একবার অনিত্য মায়ের কোলে অজ্ঞান ছেলে ছিলাম, এখন আবার নিত্য মায়ের কোলে সজ্ঞান-ছেলে হইতে ইচ্ছা করে। অবশ্য ছেলের এ সজ্ঞানতাও সেই মহাজ্ঞানরূপিণী মায়ের কাছে অজ্ঞানতা। অথবা সেই পরম জ্ঞানেই পরম বাল্যতা।

'বালভাবস্তথাভাব,ব্রহ্মজ্ঞানং তদুচ্যতে।' (তন্ত্র)

জগতে যদি মানবের কোন অভয়-দুর্গ থাকে, তবে সে মায়ের কোল। দুষ্পার পরিখা-পরিবেষ্টিত দুর্গম দৃঢ়তম দুর্গেও শত্রু প্রবেশ করিয়া বিপদ ঘটায়, কিন্তু মায়ের কোলের কাছে স্বয়ং শমনও বুঝি শঙ্কিত পাদক্ষেপে অগ্রসর হন ! ফলে পার্থিব মাতৃঅঙ্কে অন্য শঙ্কা তত না থাকিলেও অন্ততঃ শমন-শঙ্কা আছে ; কিন্তু জগন্মাতার অপার্থিব আধ্যাত্মিক অঙ্কে যে স্থান পাইয়াছে, সে-ই শমনজয়ী; সে যে সর্ব্বময়ীর সোহাগের শিশু ! সেই সোহাগে মায়ের কোলে বসিয়া রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন—

মায়ের অভয় কোলে স্থান পেয়েছি,
না রাখি শমনের ডর।
ও যাঁর চরণতলে শরণ পেয়েই
মরণজয়ী মহেশ্বর ॥

মায়ের কোলে স্থান পেলে, সে ছেলের কাছে শিবত্ব-পদ—ব্রহ্মত্ব-পদও অকিঞ্চিৎকর।

'না পারমেষ্ঠ্যং ন মাহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্ব্ব-
ভৌমং ন রসাধিপত্যং।
ন যোগসিদ্ধি র্নপুনর্ভবং বা মষ্যর্পিতা-
ত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ ॥'

কিবা সে ব্রহ্মত্ব-পদ—কিবা সে ইন্দ্রত্ব,
কিবা সার্ব্বভৌমিকত্ব—কি রসাধিপত্য,
যোগ-সিদ্ধি—মুক্তিতেও নাহি অভিলাষ,
মদর্পিত চিত্তে নাই আমাছাড়া আশ ॥

এই অমূল্য ভগবদ্ভক্তির মহিমা ভগবদ্ভক্ত ভিন্ন অন্য কে বুঝিবে ? মায়ের কোলের মহিমাও "মায়ের কোলের" ছেলে ভিন্ন অন্যের বোধগম্য নয়। মায়ের কোল যে কি বস্তু ছিল, তাহা আমরা এখন "বুড়ো ছেলে" হইয়া যেন ভুলিয়া গিয়াছি। শিশু সংসারে যত বাড়ে, ততই ক্রমে মায়ের কোল ছাড়ে। অহঙ্কার-বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও পূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে মায়ের কোলের সঙ্গ কমিয়া আসে। ক্রমে সংসার-সলিলের পূর্ণাভিষেকে অহংতত্ত্ব পূর্ণ পরিণত হইলে, মায়ের অমৃত-কোল ছাড়িয়া মানুষ মৃত্যুময় বিষয়-বিষ-ক্ষেত্রে বিচরণ করে।

"যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,
যেন জাতানি জীবন্তি,
যৎ প্রযন্ত্যভিশং বিশন্তি,
তদ্ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি।"

ইত্যাদি শ্রুতিতে ঐ স্থূল তত্ত্বেরই রহস্যোদ্ঘাটন হইতেছে। প্রকৃতির ত্রিগুণ-বৈষম্যে মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি। সেই অহঙ্কারকে সর্ব্বস্ব করিয়াই জীবের সংসৃতি।

পার্থিব মায়ের কোল হইতেও বয়ঃপুষ্ট বালক অহঙ্কারে আত্মনির্ভর করিয়া নামিয়া

আসে; জগন্মায়ের কোল হইতেও আমরা অহঙ্কারকে লইয়া স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছি। অহঙ্কারেরই ঐন্দ্রজালিক কুহকে ব্রহ্মে জগৎ-বুদ্ধি, নিরাকারে সাকার-বুদ্ধি, অনন্তে সান্ত-বুদ্ধি, অদ্বৈতে দ্বৈত-বুদ্ধি এবং সর্ব্বভূত হইতে আমার আমিত্বে স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধি অনুভব করিতেছি।

"প্রাপ্তি হবে কবে? 'আমি' যাবে যবে।" রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্ত এই মহা-সত্য সাধকের সার সম্পত্তি। অহঙ্কারের আক্রমণে মায়ের কোল ছাড়িয়াছি, আবার অহঙ্কারের নির্গমনে মায়ের কোলের পুনঃ-প্রাপ্তি ঘটিবে। এই অহঙ্কারকে মাতৃভক্তি-মহাদ্রাবকে গলাইয়া, সর্ব্বভূতে সঞ্চারিত করিয়া সংহার করিতে পারিলেই আবার সেই মাতৃনির্ভরশীলত্ব বা শিশুত্ব সম্পাদিত হয়। মায়ের কোল পাইবার আর ভাবনা থাকে না। অনন্য-মাতৃ-নির্ভর অপত্য "মা" বলিয়া কাঁদিলে কি মা আর থাকিতে পারেন? অমনি কোমল কোলে তুলিয়া, তৃষিত কণ্ঠে অমৃত-স্তন্য ঢালিয়া অমৃতীভূত করেন। একটি গান আছে—

মা! আবার আমি শিশু হব।
মা তোর কোলে উঠে মেনু খাব।
ওমা! আমি আর মা জগৎ-যোড়া,
তা ছাড়া আর না জানিব। ১
জানব কেবল ক্ষুধার রোদন,
চিনব কেবল মায়ের বদন,
(মায়ের) ভাবে ঢলে, স্নেহে গলে,
কোমল কোলে নিদ্রা যাব। ২
বিশ্বের লাল-চুষী চুষে,
শুকনো গলা গেলে শুষে,
(পিয়ে) স্তন্যামৃত এ তাপিত
জীবন মন জুড়াব। ৩

গানটি মাতৃভক্ত সাধকের হৃদয়ের ধন গানটির তত্ত্ব জীবনে জীবন্ত ও ফলবত্ব করিতে পারিলেই "মায়ের ছেলে" কৃতার্থ হয়।

ঈশ্বরে নির্ভরশীলতাই নবধা ভক্তির চরম ও পরম পরিণতি আত্মনিবেদন-সিদ্ধির সাধন। 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—শ্রীভগবানের শ্রীমুখের এই সর্ব্বসার-তম অতুল্য উপদেশ নির্ভরশীল সাধকের আত্মনিবেদনই শিক্ষা দিতেছে।

শিশুর মাতৃনির্ভরশীলতা স্বতঃসিদ্ধ। জগতে যদি শান্তি ও নিশ্চিন্ততা থাকে, তবে সে সুবিশ্বস্ত নির্ভরশীলতায়। মায়ের কোলের ছেলে কেবল মাতৃনির্ভরতার মহীয়সী শক্তি-তেই নিশ্চিন্ত ও নিত্যানন্দময়। জগতের সুখ-দুঃখ, সম্পদ-বিপদ, নির্ভরশীলের কাছে সমস্তই জগন্মাতার প্রসাদ। তাঁহার ইচ্ছা নিত্যমঙ্গলময়ী, সুতরাং তৎপ্রসূত সর্ব্ব ঘট-নাই ছেলের মঙ্গলানুকূল। "ঈশ্বরের দণ্ডই অনুগ্রহ" এ মহাসত্যের তত্ত্বরসাস্বাদে নির্ভর-শীলই অধিকারী।

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—"মা যশোদা আমার করে ক্ষীর-ননী দিলেও আমার যে আনন্দ, রজ্জু-বন্ধন দিলেও সেই আনন্দ; কারণ সবই যে মায়ের আমাতে "নিহেতু-বাৎসল্য-রসের ফল।" এই ভগবদুক্তির তত্ত্ব-মূর্ত্তি নির্ভরশীল সাধকের নিত্যধেয়। ভগবান স্বয়ং মায়ের কোলের ছেলে সাজিয়া এ তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন। একটি গোষ্ঠ-কীর্ত্তনের একাংশ মনে পড়িল—"ও ভাই

শ্রীদাম! আমি মায়ের আজ্ঞাকারী। মা যা ভাবেন আমার ভাল, তাই ভাল আমারি।" ইত্যাদি। মাতৃনির্ভর-সাধনার উপদেশ ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে?

মাতৃসর্ব্বস্ব শিশুর সকল 'আখুটি—আব্দার' মায়ের কাছে। নির্ভর-সাধক ছেলের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা, আয়োজন-প্রয়োজন মায়ের কাছে। মায়ে যাহার পূর্ণ-আত্মসমর্পণ, সেই ছেলেই মায়ের কোলের সার্থক শোভা।

উপসংহারে, মাতৃভক্ত পাঠকমহাশয়-গণকে একটি মাতৃসাধক সন্তানের আত্মসমর্পণ-সংগীত শুনাইয়া বিদায় গ্রহণ করিব।

ওমা! আমিত পার্‌বনা।

মা তুই আপ্‌নি কবে' কর্ম্মে' নে মা॥

ও যেমন হ'তে হবে—র'তে হবে এই ভবে,

ওমা! তুইমা আমার সে ভার নেনা॥ ১

(যা যা) কর্ত্তে হবে—ধর্ত্তে হবে,

ছাড়তে হবে—বেড়তে হবে,

নিতে হবে—দিতে হবে মা!

চেতে হবে—পেতে হবে,—

(ওতা) আমিত জানিনে তারা! দিশেহারা—

মা তুই জানিয়ে শুনিয়ে বানিয়ে নেমা॥ ২

(আমার) যেখানে যে সাজ্‌টি সাজে,

(আমায়) সাজিয়ে দে মা সেই সাজে,

(আমি) আপ্‌নি সাজ্‌তে জানি না যে,

(শেষে) তার পরে পার মরি লাজে,

(দেখে) আড়াল থেকে হাস্‌ছ মাগো!

আস্‌ছ নাকো,

যদি না সাজাস্‌, সাজ খুলে নে মা॥ ৩

(বয়ে) ভূতের বোঝা পাঁচটা ঝুড়ী,

(আমি) কোথায় উঠ্‌তে কোথায় পড়ি;

(ওমা) ভর মানে না ভাঙ্গা নড়ী,

(এবার) খাই বুঝি মা গড়াগড়ি,

(এখন) দয়া যদি মা হয়ে থাকে—

অন্ধ দেখে,

(আমার) হাত ধরে পথ দেখিয়ে দেমা!

(অসার) সংসারেরি ধূলো খেলায়,

(এমন) সাধের দিন কাটালেম হেলায়,

(এখন) মনে প'ল সন্ধ্যে বেলায়,

(আমার) মায়ের কথা গায়ের জ্বালায়,

(এখন) দয়া যদি মা হয়ে থাকে—

মলিন দেখে,—

(আমার) ধূলো ঝেড়ে কোলে নে মা॥ ৫

শ্রীশঃ——

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ।)

চতুর্থোঽধ্যায়।

৮

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্,
যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তং ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি
য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥

অন্বয়ঃ—ঋচঃ অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ (ব্যোম্নি) নিষেদুঃ। যস্মিন্ (অক্ষরে) বিশ্বে দেবা অধিনিষেদুঃ, যঃ তম্ ন বেদ, ("স") ঋচা কিম্ করিষ্যতি? য ইৎ (ইত্থম্) তদ্ বিদুঃ তে ইমে সমাসতে॥

বিষমপদব্যাখ্যা—"ঋচঃ"—ঋচান্তে অর্চ্চ্যন্তে আভিঃ দেবা ইতি—"ঋচ স্তুতৌ" ক্বিপ্।

দেবতাগণকে যাহার দ্বারা স্তব করা যায়, তাহা, অতএব এস্থলে ঋক্ শব্দ সমস্ত বেদের উপলক্ষণ, অর্থাৎ ঋগাদি সমস্ত বেদ। "ঋগাদি সর্ব্বে বেদা" ইতি বিজ্ঞানভগবৎ। "অক্ষরে"—অবিনশ্বর অথবা ব্যাপক কারণ। "ব্যাপিনি কারণে" ইতি শঙ্করানন্দঃ। ন ক্ষরতি ইত্যক্ষরম্ সর্ব্বম্ অশ্নুতে ইতি বা, ক্ষরম্।

"পরমে"—নিরতিশয় উৎকৃষ্ট, বস্তুতঃ অনবচ্ছিন্ন নিত্য শুদ্ধ। "ব্যোমন্"—ব্যোম্নি ইত্যর্থঃ; অত্র লুপ্তসপ্তম্যেকবচনম্ ছান্দসাৎ সোঢ়ব্যম্, আকাশ-শব্দ-বাচ্য পরমাত্মাতে; এস্থলে ব্যোম অর্থাৎ আকাশ শব্দ পরমাত্মা, এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; আকাশ শব্দের অর্থ যে "পরমাত্মা" "পরব্রহ্ম"—তাহা "আকাশো বৈ নাম নামরূপ "যোনির্বহিতা" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যেই অঙ্গীকৃত হইয়াছে। "বিশ্বে"—সমস্ত "নিষেদুঃ" আশ্রয় করিয়া রহিয়াছিল। "যঃ"—যে অধিকারী। "তম্" শব্দার্থাধিষ্ঠান ভূতম্ পরমাত্মানম্, শব্দ এবং অর্থের একমাত্র অধিষ্ঠানভূমি সেই পরমাত্মাকে। "ন বেদ" জানে না। সেই ব্যক্তি, "ঋচা"—ঋগাদি দ্বারা অর্থাৎ অপ্রবিষ্টভাবে মাত্র ঋগাদির উচ্চারণ দ্বারা "কিম্ করিষ্যতি"—কি প্রয়োজন সিদ্ধ করিবে? এস্থলে "কিম্" শব্দ আক্ষেপার্থে প্রযুক্ত। "যে" যে সকল অধিকারিবর্গ। "ইৎ"—ইত্থং—এই প্রকারে অর্থাৎ বেদোদিত উপদেশানুসারে। "তম্ বিদুঃ" তাঁহাকে জানেন। "তে ইমে" এবম্বিধ বিদ-বিহিত ক্রিয়ানুশীলন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন সেই মহাত্মবৃন্দ। "সমাসতে" সম্যগুপবেশনং কুর্ব্বোতি; সম্যক্ প্রকারে সেইব্রহ্মে উপবেশন করেন, অর্থাৎ আনন্দাত্মস্বরূপে সর্ব্বব্যাপী হয়েন।

বঙ্গার্থঃ—ঋগাদি সমস্ত বেদ, সেই অবিনশ্বর, ব্যাপক, নিরতিশয় উৎকর্ষভাক্, অনবচ্ছিন্ন এবং নিত্য শুদ্ধ পরমাত্মাকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, বেদ-ত্রয়ের এক মাত্র প্রতিপাদ্য সেই চিৎ-স্বরূপ পরব্রহ্ম। যে পরমাত্মায় সমস্ত দেবগণ সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবে আশ্রিত রহিয়াছেন। দেবতারা যাঁহার দিব্য জ্যোতির বিকাশস্থল, সেই সর্ব্ব-বেদবেদ্য পরাৎপর-পরমাত্মাকে না জানিয়া, তাঁহার স্বরূপজ্ঞানের প্রতি উদাসীন থাকিয়া—যে ব্যক্তি অপ্রবিষ্টভাবে এবং অবুদ্ধি সহকারে মাত্র কর্ম্ম-লিপ্সার বশবর্ত্তী হইয়া বেদাদি উচ্চারণ করে, সেই আহিতুণ্ডিকবৎ অর্থবিহীন-ভাষণশীল ব্যক্তির ঋগাদি বেদোচ্চারণে কোনই ফল হয় না। তাঁহার বেদপাঠ ব্যর্থ হয়। আর যাঁহারা বেদ-বিধি অনুসারে তাঁহাকে মনোরাজ্যের সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার চিন্তা করেন, তাঁহারাই বাস্তবিক আনন্দ লাভ করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহাদের বেদপাঠই যথার্থ বেদপাঠ। এই অনুশাসনের আরও দুই প্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারে। বাহুল্য ভয়ে তাহা পরিত্যক্ত হইল।

বিশেষব্যাখ্যা—বেদে পরমাত্মারই বিভূতি, তাঁহাকে প্রাপ্তির উপায় ও তাঁহার স্বরূপ জ্ঞানের নিদান প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনুশাসন সমূহে কথিত হইয়াছে যে, পরমাত্মার কীর্ত্তনে—শ্রবণে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়; অধুনা সেই কীর্ত্তনাদির প্রকার প্রকটন করা যাইতেছে।

যাঁহার কথা চিন্তা করিলে জীবন নিষ্কলঙ্ক হয়, জীবনের ভ্রান্তি ঘুচিয়া যায়, সেই সর্ব্বভ্রান্তিহর পরমপুরুষের যখন চিন্তা বা কীর্ত্তন করা যায়, তখন যদি তাঁহার বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা থাকে, তবে তাদৃশী অর্থ-হীনা ভাবনা বা কীর্ত্তনায় কোনই ফল হয় না; অর্থ না বুঝিয়া সাপের মন্ত্রের ন্যায় বেদমন্ত্রের উচ্চারণে পাপক্ষয় হয় না, বা বেদগানজনিত অপূর্ব্ব আনন্দ লাভের অধিকারী হওয়া যায় না। তাঁহার চরণে মন-প্রাণ উৎসর্গ করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে যে তাঁহার উপাসনা করে, সে-ই বাস্তবিক অনুপম আনন্দলাভের অধিকারী, তাঁহার একমাত্র প্রিয়;—তাই ভগবান নিজেই বলিয়াছেন—

"ময্যাবেশ্য মনোযে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে"।
"শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ"।

আসল কথা—জ্ঞান। যখন যাহা কর, জ্ঞানপূর্ব্বক করিও; অজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে ভাব-বিহীন হইয়া যে কার্য্যই করনা কেন, তাহাতে সফলকাম হইতে পারিবে না। কর্ম্ম কর, কিন্তু বুদ্ধি পূর্ব্বক করিও, অবুদ্ধভাবে কোন কার্য্য করিও না। বুদ্ধির অাদিকারণ সমাধি, অতএব সমাধি অবলম্বন কর; সমাধিহীন ক্রিয়া ফল-পুষ্পবিহীন লতিকার ন্যায়। সে ক্রিয়ার ফল মাত্র শারীরিক এবং মানসিক গ্লানি, অন্য কিছুই নয়।

৯

ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি,
ভূতং ভব্যং যচ্চবেদা বদন্তি।
অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ,
তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সংনিরুদ্ধঃ॥

অন্বয়ঃ—ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবঃ ব্রতানি, ভূতম্ ভব্যম্ যৎ চ (যদিতিবর্ত্তমানং) বেদাঃ বদন্তি (বেষাং বেদা এব প্রমাণত্বেন গৃহ্যন্তে) তৎ সর্ব্বম্ অস্মাৎ প্রকৃতাৎ অক্ষরাৎ ব্রহ্মণঃ সমুৎপদ্যন্তে ইতি সম্বন্ধঃ" (শঙ্করঃ)। (কথম্ অবিকারিব্রহ্মণঃ জগদুৎপাদনত্বম্ ইতি আশঙ্ক্য আহ) মায়ী এতৎ বিশ্বম্ সৃজতে, তস্মিন্ অন্যঃ ইব—মায়য়া সংনিরুদ্ধঃ সন্ সংসার-সমুদ্রে ভ্রমতি"—শঙ্করসম্মতঃ অন্বয়ঃ। শঙ্করানন্দ-নারায়ণ-বিজ্ঞান-ভগবদাদয়ঃ ব্যাখ্যাতারঃ পক্ষান্তরাণি ব্যাখ্যাতবন্তঃ, বিস্তৃতিভিয়া পরিহৃতম্ তৎসর্ব্বম্॥

বিষমপদব্যাখ্যা—"ছন্দাংসি" ঋগ্-যজুঃ সামাথর্ব্বাঙ্গিরসনামধেয় বেদাদি। "যজ্ঞাঃ" দেবপূজা প্রভৃতি এবং দানাদি, "যজ দেবার্চ্চাদান সঙ্গকৃতৌ ইতিধাতো ন"। "ক্রতবঃ"—জ্যোতিষ্টোমাদি, "ব্রতানি"—চান্দ্রায়ণ অনশন প্রভৃতি যম নিয়ম সমূহ। "ভূতম্" অতীত। "ভব্যম্" ভবিষ্যৎ। "যৎ চ" এবম্ বর্ত্তমান। "বেদাঃ বদন্তি"—বেদ বলিয়া থাকেন, বেদে উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ যজ্ঞাদি সাধ্য অতীত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানরূপে অবস্থিত, এই যে জগৎ-প্রপঞ্চ, যাহার প্রমাণ বেদ, অর্থাৎ বেদ যাহার প্রমাণ করিতেছে। "তৎ সর্ব্বম্" সেই সমস্তই। "অস্মাৎ" এই বর্ণিত অবিনাশী এবং অবিকারী ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইতেছে। বিকারবিহীন ব্রহ্ম হইতে কিরূপে বিকৃত জগৎ উৎপন্ন হইল, এই আশঙ্কায় কথিত হইতেছে—"মায়ী"—মায়া-উপাধিবিশিষ্ট হইয়া। "সর্ব্বং সৃজতে"

সমস্ত উৎপাদন করিতেছেন। তিনি কূটস্থ হইয়াও মায়ারূপ উপাধি পরিগ্রহ নিবন্ধন স্বকীয় মায়াময়ী শক্তির বলে সমস্ত সৃষ্টি করিয়া থাকেন, মায়া-পরিগ্রহই তাঁহার সৃষ্টিকারিতার নিদান। "তস্মিন্" সেই সমষ্টি এবং ব্যষ্টিভাবাপন্ন কার্য্য-কারণাত্মক বিশ্বপ্রপঞ্চে। "অন্য" অন্য ইব ইত্যর্থঃ, অন্যের ন্যায় অর্থাৎ সিসৃক্ষা-বশবর্ত্তী, অতএব ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অন্যের সদৃশ। "মায়য়া- সংনিরুদ্ধঃ" মায়াপাশবদ্ধ হইয়া। "সংসার সমুদ্রে ভ্রমতি"—এই সংসার-সমুদ্রে ভ্রমণ করিতেছেন।

বঙ্গার্থঃ—পরমদেব পরমেশ্বর স্বকীয় মায়া-শক্তি দ্বারা পুরুষার্থ সাধনপ্রতি-পাদক বেদাদি, এবং বেদ-প্রতিপাদ্য যাগাদি ও যাগাদি সাধ্য ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান প্রপঞ্চজাত সৃষ্টি করিয়া নিজের মায়াশক্তির বিবর্ত্তীভূত সমষ্টি এবং ব্যষ্টি-ময় কার্য্য-কারণাত্মক উপাধিতে জলে চন্দ্রের ন্যায় প্রবেশ করিয়া, বস্তুতঃ নির্লিপ্ত ভাবে অবিদ্যা-সম্ভূত কামকর্ম্মাদি দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া "জীব" এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন, ইহাই প্রকটিত করিবার জন্য পঠ্যমান অনুশাসনের অবতারণা করা হইয়াছে। এই জগৎপ্রপঞ্চ, যাহার প্রমাণস্থল বেদ, তৎসমস্তই এই অবিনাশী বিকারবিরহিত অক্ষর ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইতেছে। অক্ষর অবিকার ব্রহ্ম হইতে কি প্রকারে ক্ষর এবং বিকৃত প্রপঞ্চ উদ্ভূত হইল, এই আশঙ্কার পরিহার বাসনায় বলা যাইতেছে যে, তিনি মায়া পরিগ্রহ পূর্ব্বক এই বিশ্ব-বিরচন ব্যাপার নির্ব্বাহিত করিতেছেন। এই জগৎ-প্রপঞ্চে স্বকীয় মায়াপাশ কর্তৃক সংবদ্ধ হইয়া সেই পরম পুরুষ "জীব" এই আখ্যা গ্রহণ পুরঃসর অন্যের ন্যায় অর্থাৎ ব্রহ্মব্যতিরিক্ত ভাবে জীবরূপে অবিদ্যাবশবর্ত্তী হইয়া, স্বীয় মায়া-পরি-কল্পিত সংসার-সমুদ্রে ভ্রমণ করিতেছেন। তরঙ্গিনীর তরঙ্গ নিকরে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের ন্যায় বস্তুতঃ এই জগৎ-প্রপঞ্চে প্রতিনিয়ত অনুমেয়মান সেই বিশ্বনাথ প্রকৃতপক্ষে জগৎ হইতে নির্লিপ্ত, অবিদ্যা-রূপ পারদাবৃত বিশ্বমুকুরে তাঁহার প্রতি-বিম্বন হইতেছে সত্য, কিন্তু বাস্তবিক তিনি দর্পণ-কল্পিত পদার্থের ন্যায় বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথগ্‌ভূত। এস্থলে ভগবদ্বাক্য স্মরণ করুন—"প্রকৃতিম্ স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ। ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ। ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়। উদাসীনবদাসী-নমসক্তং তেষু কর্ম্মসু॥"

মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনন্তু
মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং
জগৎ॥

অন্বয়ঃ—মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ, মায়িনম্ তু মহেশ্বরং বিদ্যাৎ। তস্য (মহেশ্বরস্য) অবয়বভূতৈঃ ইদং সর্ব্বং জগৎ ব্যাপ্তম্।

বিষমপদব্যাখ্যা—অবয়বভূতৈঃ—কল্পিত সর্পাদিস্থানীয়ৈঃ মায়িকৈঃ স্বকীয়ৈঃ অংশৈঃ—

সেই মহেশ্বর অর্থাৎ পরমেশ্বরের কল্পিত রজ্জ্বাদিতে সর্পভ্রান্তির ন্যায় সে মায়াময় অঙ্গ বা একদেশ, তদ্দ্বারা। "তু" "তু" "তু" এই অনুশাসনে তিনটি "তু" কারই অবধারণার্থ।

বঙ্গার্থ—যে মহামায়ায় আত্মহারা হইয়া সেই মহিমময় পুরুষ এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই মায়াকেই প্রকৃত বলিয়া জানিবে। আর সেই পরমা মায়া বা পরমা প্রকৃতির বশতাপন্নকে মহেশ্বর অর্থাৎ পরমেশ্বর বলিয়া জানিও। তাঁহার মায়াকঞ্চুকাবৃত অবয়ব দ্বারা অর্থাৎ সেই মহাপুরুষের মায়াজড়িত অবয়ব স্বরূপ জীব দ্বারা এই বিশ্বভুবন পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। মায়াময় জীবের আত্মানুবৃত্তির সহিত এই জগৎ পরিবৃত্ত হইতেছে। ভগবদ্বাক্য স্মরণ করুন—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ॥
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥"

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

মুকুন্দ-মালা।

বন্দে মুকুন্দমরবিন্দদলায়তাক্ষং,
কুন্দেন্দুশঙ্খদশনং শিশুগোপ-
বেশম্ ॥
ইন্দ্রাদিদেবগণ-বন্দিত পাদপীঠং,
বৃন্দাবনালয়মহং বসুদেবসূনুম্ ॥১॥

নেত্র অরবিন্দ, শঙ্খ-ইন্দু-কুন্দ-
তুল্য শ্বেত বর্ণে যাঁর-
শোভিত দশন, সেবিত চরণ
ইন্দ্র আদি দেবতার;
শিশু গোপ বেশী, বৃন্দাবন বাসী,
বসুদেব-সুত হরি,
বন্দি সে মুকুন্দে সতত আনন্দে
ভব-ভীত-ভয়হারী ॥১॥

শ্রীবল্লভেতি বরদেতি দয়াপরেতি,
ভক্তিপ্রিয়েতি ভবলুণ্ঠন কোবি-
দেতি!
নাথেতি নাগশয়নেতি জগন্নিবাসে-
ত্যালাপিনং প্রতিদিনং কুরু মাং
মুকুন্দ ॥২॥

লক্ষ্মীকান্ত দয়াময় হে বরদ!
ভক্তিপ্রিয় ভবলুণ্ঠন কোবিদ,
নাথ নাগশায়ী হে জগন্নিবাস!
মুকুন্দ নাম নিত্য করাও প্রকাশ ॥২॥

জয়তু জয়তু দেবো দেবকী-
নন্দনোঽয়ং,
জয়তু জয়তু কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশ-
প্রদীপঃ।
জয়তু জয়তু মেঘশ্যামলঃ কো-
মলাঙ্গো,
জয়তু জয়তু পৃথ্বী-ভারনাশো
মুকুন্দঃ ॥৩॥

দেবকী-নন্দন দেব জয় হ'ক তাঁর।
বৃষ্ণিবংশ-দীপ কৃষ্ণ জয় জয় তাঁর ॥
শ্যামল কোমল কায় নবীন নীরদ প্রায়!
পৃথিবীর ভার যিনি করেন হরণ,
মুকুন্দ—তাঁহার জয় হ'ক সর্ব্বক্ষণ ॥৩॥

মুকুন্দ মূৰ্দ্ধ্না প্রণিপত্য যাচে-
ভবন্তমেকান্ত মিয়ন্তমর্থম্।
অবিস্মৃতিস্তচ্চরণারবিন্দে ভবে-
ভবে মেঽস্তু তবপ্রসাদাৎ॥৪॥

প্রণতশিরে বলি তোমারে,
শুনহে মুকুন্দ এ চির কিঙ্করে,
একান্ত মনে প্রার্থনা হরি!
জন্ম হয় হ'ক্ কি দুখ আমারি?
প্রতি জন্মে যেন থাকে হে স্মরণে
তোমারি প্রসাদে তোমারি চরণে॥৪॥

শ্রীগোবিন্দ-পদাম্ভোজমধুনো-
মহদদ্ভুতম্,
তৎপায়িনো নমুঞ্চন্তি মুঞ্চন্তি-
যদপায়িনঃ॥৫॥

গোবিন্দের চরণ-সরোজে
মহৎ অপূৰ্ব্ব মধু রাজে,
পিয়ে যেই একবার,
পিয়ে সেই বারম্বার;
কভু যেই করে নাই পান,
ত্যাগে নহে কাতর পরাণ॥৫॥

নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্ব
হেতুং,
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং
নাপনেতুম্।
রম্যারামামৃদুতনুলতা নন্দনে নাপি
রন্তুম্,
ভাবে ভাবে হৃদয়-ভবনে ভাব-
য়েয়ং ভবন্তম্॥৬॥

মুক্তির কারণ চরণ বন্দন
করিনাই হরি গুণ নিবেদন,
কিম্বা কুম্ভীপাক নিবারণ তরে,
অথবা নন্দন কানন মাঝারে
রম্যারামা সনে খেলিতে পুলকে
ডাকি নাই হরি! কখন তোমাকে;
হৃদয়ে রাখিয়া কখন তোমায়
চিন্তিনাই ওহে হরি দয়াময়॥৬॥

নাস্থা ধর্ম্মে ন বসু-নিচয়ে নৈব
কামোপভোগে,
যদ্ভাব্যং তদ্ভবতু ভগবন্ পূৰ্ব্ব-
কর্ম্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্ম-
জন্মান্তরেঽপি,
ত্বৎ পদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা
ভক্তিরস্তু॥৭॥

ধর্ম্মে আস্থানাই—ধনে নাহিক যতন,
কাম-উপভোগ বাঞ্ছা নাহি করে মন;
যাহবার হ'ক্ পূৰ্ব্ব কর্ম্ম অনুসারে,
করি এ কামনা বিভো! কাতরঅন্তরে,
চরণ-সরোজে তব অচলা ভকতি
জন্মজন্মান্তরে যেন থাকে হে শ্রীপতি॥৭॥

দিবিবা ভুবি বা মমাস্তু বাসো
নরকে বা নরকান্ত! প্রকামম্।
অবধীরিত শারদারবিন্দৌ চরণৌ
তে মরণে বিচিন্তয়ামি॥৮॥

ত্রিদিবে অথবা মর্ত্তে কিম্বা নরকেতে
বাস হয় হ'ক্ হরি নাহি দুঃখ তাতে;
শারদ সরোজ সম তোমার চরণে—
নরকান্তকারি! চিন্তি জীবনে মরণে॥৮॥

সরসিজ নয়নে সশঙ্খচক্রে মুরভিদি
মা বিরমেহ চিত্ত রন্তুম্।

সুখতরমপরং ন জাতু জানে হরি-
চরণ-স্মরণামৃতেন তুল্যম্ ॥৯॥

মুরঅরি হরি সরোজনয়ন
শঙ্খচক্রীরূপে করিতে রমণ
বিরত হ'য়োনা মনরে আমার,
হরি-পদস্মৃতি-সুধা ভিন্ন আর
সুখ-সম্ভাবনা কি আছে এমন
কোথায়—আমি তা জানিনা কেমন ॥ ৯ ॥

মাভৈর্মন্দমনো বিচিন্ত্য বহুধা
যামীশ্চিরং যাতনা,
নৈবামী প্রভবন্তি পাপ-রিপবঃ
স্বামী ননু শ্রীধরঃ।
আলস্যং ব্যপনীয় ভক্তিসুলভং
ধ্যায়স্ব নারায়ণং,
লোকস্যব্যসনাপনোদনকরো
দাসস্য কিং ন ক্ষমঃ ॥ ১০ ॥

কেন ভ্রান্ত মন, কাতর এমন,
কেন চিন্তানলে সন্তাপিত?
যমের যাতনা, রবেনা রবেনা,
রিপুগণ রবে পরাভূত।
অলসতা ছাড়ি, ভজ ভক্তি করি
ভকতি-সুলভ নারায়ণ;
জগৎ-ব্যসন তিনিই নাশন
দাসের কি তিনি ন'ন ॥ ১০ ॥

ভবজলধিগতানাং দ্বন্দ্ববাতাহতা-
নাম্।
সুতদুহিতৃকলত্রত্রাণভারাবৃতা-
নাম্।
বিষম-বিষয়-তোয়ে মজ্জতা-

ভবতু শরণমেকো বিষ্ণুপোতো
নরাণাম্ ॥ ১১ ॥

দুহিতৃ কলত্র সুত ত্রাণ ভারাবৃত,
বিষম বিষয়-তোয়ে ভব-সিন্ধুগত,
মগ্ন যারা-দ্বন্দ্ব-বাতাহত বৃত আর,
বিষ্ণুই আশ্রয়-তরী হউন সবার। ১১।

রজসি নিপতিতানাং মোহজালা-
বৃতানাং
জনন মরণ দোলা দুর্গ সংসর্গ-
গানাম্।
শরণমশরণানামেক এবাতুরাণাং,
কুশলপথ-নিযুক্তশ্চক্রপাণির্নরা-
ণাম্ ॥১২॥

ধূলি-বিলুণ্ঠিত কিম্বা মোহজালাবৃত,
জন্ম-মৃত্যুজ্বালাগ্রস্ত অথবা পীড়িত,
সে সবের হিতপথ প্রযোজকরূপে
চক্রপাণি নিরাশ্রয়-আশ্রয় স্বরূপে
একমাত্র বিষ্ণু সদা বিদ্যমান ॥১২॥

অপরাধ সহস্র সঙ্কুলং পতিতং
ভীম ভবার্ণবোদরে।
অগতিং শরণাগতং হরে কৃপয়া
কেবলমাত্মসাৎকুরু ॥১৩॥

পতিত আমি যে ভীম ভব-সিন্ধুনীরে,
অপরাধ সহস্র যে আমার শরীরে;
হে হরি! শরণাগত গতিহীন জনে
প্রদান সাযুজ্য-মুক্তি নিজ কৃপাগুণে ॥১৩॥

মা মে স্ত্রীত্বং মাচমেস্যাৎ কুভাবো,
মা মূর্খত্বং মা কুদেশেষু জন্ম।
মিথ্যা দৃষ্টির্মা চ মে স্যাৎ কদাচিৎ,
জাতৌ জাতৌ বিষ্ণুভক্তো

মূর্খের স্বভাব অথবা কুভাব,
নাস্তিকতা কিম্বা রমণীর ভাব
কুদেশে জনম মিথ্যা-দৃষ্টি আর
যেন ওহে হরি! না হয় আমার!
জন্মে জন্মে যেন বিষ্ণুভক্ত হই ॥ ১৪ ॥

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈশ্চ;
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুস্মৃতি স্বভাবাৎ।
করোমি যদ্যৎ সকলং পরস্মৈ,
নারায়ণায়ৈব সমর্পয়ামি ॥১৫॥

শরীর ইন্দ্রিয় পূর্ব্বস্মৃতি বা মানসে,
বাক্য বুদ্ধি আত্মা যোগে অথবা অভ্যাসে
যাহা করি, নারায়ণে সমর্পিনু সব ॥১৫॥

যৎকৃতং যৎকরিষ্যামি তৎ সর্ব্বং
ন ময়া কৃতম্।
ত্বয়া কৃতন্তু ফলভুক্ ত্বমেব
মধুসূদন ॥১৬॥

যাহা করিয়াছি হরি! নয় হে আমার,
করিব যাহাও হরি! তাহাও তোমার;
যাহা করাইছ তার্ তুমিই কারণ
তুমি তার্ ফলভোগী হে মধুসূদন ॥১৬॥

ভবজলধিমগাধং দুস্তরং নিস্তরেয়ং
কথমিমমিতি চেতো মাস্ম গাঃ
কাতরত্বম্।
সরসিজদৃশি দেবে তারকী ভক্তি-
রেকা
নরকভিদি নিষণ্ণা তারয়িষ্যত্য-
বশ্যম্ ॥১৭॥

দুস্তীর্ণ গভীর সংসার-সাগর
কিসে হবে পার ভাবিয়া কাতর
হয়োনারে মন; সরোজ-নয়ন
হরিতে নিমগ্না—নরক ভীষণ
উদ্ধারকারিণী পরমাভকতি
অবশ্যই তোমা দিবেন-মুকতি ॥১৭॥

তৃষ্ণাতোয়েমদন-পবনোদ্ধূত-
মোহোর্ম্মিমালে
দারাবর্ত্তে-তনয়সহজগ্রাহ সঙ্ঘা-
কুলে চ।
সংসারাখ্যে মহতি জলধৌ মজ্জতাং
ন স্ত্রিধামন্
পাদাম্ভোজে বরদ ভবতো ভক্তি-
ভাবং প্রসীদ ॥১৮॥

তৃষ্ণারূপ জলেপূর্ণ সংসার-পাথার,
মদন-বায়ুতে যাহে উঠে অনিবার—
মোহের তরঙ্গ মালা, ওহে ত্রিধামন্!
নারীরূপ জলাবর্ত্ত যাহে সর্ব্বক্ষণ,
পুত্র-ভ্রাতৃ কুম্ভীরাদি যাহে সদা রয়,
ডুবিয়া রয়েছি তাহে বলিহে তোমায়,
তব পাদপদ্মে ভক্তি-ভাব্ কর দান,
প্রসন্ন বরদ হও হ'গে কৃপাবান্ ॥১৮॥

পৃথ্বী রেণু রেণুঃ পয়াংসি কণিকাঃ
ফল্গুস্ফুলিঙ্গোঽলঘুঃ, তেজো
নিঃশ্বসনংমরুত্তনুতরং রন্ধ্রং
সুসূক্ষ্মং নভঃ।
ক্ষুদ্রা রুদ্রপিতামহপ্রভৃতয়ঃ
কীটাঃ সমস্তাঃ সুরাঃ, দৃষ্টা যত্র
স তারকো বিজয়তে শ্রীপাদ-ধূলি-
কণঃ ॥১৯॥

পরমাণু প্রায় হয় এ অবনী,
সিন্ধু জলকণা সম মনে গণি,
ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ প্রখর কিরণ,
নিশ্বাস স্বরূপ ভীম প্রভঞ্জন,

গগণমণ্ডল ছিদ্র সূক্ষতম,
রুদ্র পিতামহ ক্ষুদ্র জীবসম,
দেব সমুদয় কীটের প্রমাণ
তার কাছে; যেই পেয়েছে সন্ধান
চরণ তাঁহার—জয় হ'ক তাঁর
শ্রীপাদ-সঞ্জাত সে ধূলি কণার ॥ ১৯ ॥

আম্নায়াভ্যসনান্যরণ্যরুদিতং কৃচ্ছ্র-
ব্রতান্যন্বহং, মেদচ্ছেদপদানিপূর্ত্ত-
বিধয়ঃ সর্ব্বংহুতং ভস্মনি।
তীর্থানামবগাহনানি চ গজস্নানং-
বিনা যৎপদ, দ্বন্দাম্ভোরুহসংস্তুতিং
বিজয়তে দেবঃ স নারায়ণঃ। ২০।

বিনা যাঁর চরণ চিন্তন
বেদাভ্যাস অরণ্যে রোদন,
কষ্ট সাধ্য ব্রত আদি তার
শরীর-শোষক মাত্র সার,
পূর্ত্তকার্য্য আদি যে সকল,
ভস্মে হোম সম সে বিফল,
তীর্থ-স্নান গজস্নান সম
নিরর্থক বৃথা পণ্ডশ্রম;
যাঁর চিন্তা ভিন্ন বৃথা সব,
কর তাঁর জয় জয় রব ॥ ২০ ॥

আনন্দ-গোবিন্দ-মুকুন্দ-রাম-নারা-
য়ণান্ত নিরাময়েতি। বক্তুংসমর্থো-
ঽপি ন বক্তি কশ্চিদহো জনানাং
ব্যসনানি মোক্ষে ॥ ২১ ॥

আনন্দ গোবিন্দনাম মুকুন্দ অনন্ত রাম,
নারায়ণ আর নিরাময়,
বলিবার শক্তিধ'রে তবু কেহ বলেনারে!
বুদ্ধিভ্রংশ মোক্ষের বিষয় ॥ ২১ ॥

ক্ষীরসাগরতরঙ্গ-শীকরাসারতারকিত
চারু মূর্ত্তয়ে। ভোগি ভোগ
শয়নীয় শায়িনে মাধবায় মধুবিদ্বি-
ষেনমঃ ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীকুলশেখরেণ রাজ্ঞা বিরচিতা
মুকুন্দমালা সম্পূর্ণা।

ক্ষীরোদ সাগর লহরী লীলার
অম্বুকণা দিয়া যাঁর
তারকা মণ্ডল মণ্ডিত মোহন
সম শোভে কলেবর;
অনন্ত শয়নে শয়ন যাঁহার,
যিনি মধুনিসূদন,
বন্দি ভক্তিভাবে আমি বারম্বার
মাধবের সে চরণ ॥ ২২ ॥

শ্রীদুর্গাদাস চক্রবর্ত্তী। ব্রহ্মচারি-আশ্রম।

শিব-লীলা রহস্যম্।

মহাদেব অর্দ্ধনারীশ্বর হইয়াছেন কেন, তাহা কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন:—

ভিক্ষয়াঽসম্ভবং নিত্যমুদরদ্বয় পূরণম্।
অতো বিচক্ষণো ভিক্ষুরর্দ্ধনারীশ্বরো হরঃ॥

প্রতিদিন ভিক্ষা করে দিন হীন জন
ভরাতে না পারে দুটী উদর কখন;
পরম ভিক্ষুক তাই বুদ্ধিমান্ হর
ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে অর্দ্ধনারীশ্বর!

মহাদেব বিষপান করিয়াও কিরূপে মৃত্যুঞ্জয় হইয়া আছেন, তাহা কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন:—

পার্ব্বতীমোষধীমেকামপর্ণাং রোগনাশিনীম্।
লব্ধ্বা বিষমপি পীত্বা শূলী মৃত্যুঞ্জয়ঃ স্থিতঃ॥

একে শূলী, তায় জ্বলে গলায় গরল,
যন্ত্রণায় তাই শিব হইয়া বিহ্বল,
অপর্ণা পার্ব্বতী মহারোগ-বিনাশিনী
একমাত্র ওষধিরে সার মনে গণি,
মহানন্দে লইলেন তাঁহারি আশ্রয়,
সে অবধি হয়েছেন ভবে মৃত্যুঞ্জয়!

মহাদেব কালীর চরণ চিরকাল বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন কেন, তাহা কবি নিম্নলিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

দৈবৈ র্ম্মথিত দুগ্ধ-সাগরতলাদুত্থাপিতং ভীষণং
পীত্বা ভূরি বিষং পুনঃ পশুপতিস্তৎজ্বালয়া বিহ্বলঃ।
ন্যস্তোরসি কালিকাপদযুগং কৈবল্যদং শীতলং।
প্রাপ্যাতুলনির্বৃতিঞ্চ বহুলামদ্যাপি তন্নো-জ্ঝতি॥

দেবগণ করে যবে সমুদ্র মন্থন,
পরম প্রচণ্ড বিষ উঠিল তখন।
চক্ চক্ করি সেই বিষপান করি,
ছট্‌ফট্ করে হর বহুকাল ধরি।
অবশেষে বুঝে কালী-চরণ-কমল
একে মুক্তিপ্রদ, তায় পরম শীতল;
আনন্দে মাতিয়া তাই দেব দিগম্বর
কালী পদ-যুগ নিজ বক্ষের উপর
রাখিয়া পরম সুখে বিভোর হইয়া
দুর্জ্জয় বিষের জ্বালা গিয়াছে ভুলিয়া।
ছাড়িলে বিষের জ্বালা পুনঃ বেড়ে যায়,
অদ্যাপি শঙ্কর তাই ছাড়িতে না চায়!

মহাদেব বিষপান-কালে কিছুমাত্র প্রাণের আশঙ্কা করেন নাই কেন, তাহা কবি নিম্নলিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

হরস্তা মম সুরতটিনী—
ব্যতিকর মরণেঽপি তুল্যৈব।
গঙ্গাধর ইতি গরলং
করতলতরলং নিজগ্রাস॥

এখন স্বয়ং শিব আছি এই ভবে,
বিষপানে মৃত্যু হ'লে শিবত্বই রবে।
পবিত্র জাহ্নবী-জল স্পর্শ যদি করে,
শবের শিবত্ব হয়, জানি এসংসারে!
যে শিবত্ব সে শিবত্ব থাকিবে আমার,
বিষপানে তবে মোর ভয় কিবা আর?
গঙ্গাধর মনে মনে ইহাই বিচারি
বিষপান করিলেন আশঙ্কা না করি!

অন্নদান করিয়া এই ত্রিসংসার রক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং অন্নপূর্ণা যাঁহার গৃহে নিত্য বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে কি কারণে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হয়, তাহা কবি নিম্নলিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

সীমন্তিনী যস্য গৃহেঽন্নপূর্ণা
ত্রিলোকরক্ষাকরণেঽন্নদানৈঃ।
সংভিক্ষতে সোঽপি কপালপাণি
র্ল'লাটলেখা ন পুনঃ প্রয়াতি॥

অন্নদানে ত্রিসংসার রাখিবার তরে
ভগবতী অন্নপূর্ণা নিত্য যাঁর ঘরে,
লইয়া মড়ার মাথা তবু সেই হর
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে হইয়া কাতর!
এই ত্রিভুবনে হেন কেবা কোথা রয়,
ললাটের-বিধিলিপি যেবা করে লয়?

মহাদেব কি কারণে গঙ্গাদেবীকে মস্তক হইতে নামাইতে চাহেন না, তাহা কবি নিম্নলিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

কণ্ঠে গরলমত্যুগ্রমঙ্গেঽহিরলিকে শিখী।
ইতি গঙ্গাধরো গঙ্গামুত্তমাঙ্গান্ন মুঞ্চতি॥

ঢল্ ঢল্ করে কণ্ঠে দুর্জ্জয় গরল,
শন্ শন্ ভ্রমে সর্প দেহে অবিরল,
ধক্ ধক্ জ্বলে অগ্নি ললাট উপর,
এসব উত্তাপে দগ্ধ সদা গঙ্গাধর।
পাছে আরো জ্বালা বাড়ে ছাড়িলে গঙ্গায়,
তাই শিব মাথা হ'তে নামাতে না চায়!

মহাদেবই দরিদ্রের একমাত্র উপাস্য দেবতা কেন, তাহা কবি নিম্নলিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

মূর্ত্তি মৃদা বিল্বদলেন পূজা,
অযত্নসাধ্যং বদনেন বাদ্যম্।
ফলঞ্চ সাযুজ্য-পদ-প্রদানং
নিঃস্বস্য বিশ্বেশ্বর এব দেবঃ॥

মূর্ত্তিটী গড়িতে চাই মৃত্তিকা কেবল,
পূজা করিবারে চাই শুধু বিল্বদল,
ঢাক ঢোল বাদ্যযন্ত্রে কিবা প্রয়োজন?
গালবাদ্যে সেই কার্য্য হইবে সাধন।
তথাপি সাযুজ্য-ফল দেন নিরন্তর,
দরিদ্রের একমাত্র দেব দিগম্বর।

মহাদেবের যথেষ্ট সহায় থাকিলেও তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ান কেন, তাহা কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

স্বয়ং সুরেশঃ শ্বশুরো নগেশঃ
সখা ধনেশস্তনয়ো গণেশঃ।
তথাপি ভিক্ষাটনতে মহেশঃ
কপালবল্লেরিয়মেব রীতিঃ॥

স্বয়ং সুরেশ, যাঁর শ্বশুর নগেশ,
সুহৃদ্ ধনেশ, যাঁর তনয় গণেশ,
ভিক্ষার ঝুলিটী তবু লইয়া মহেশ
ঘুরে ঘুরে পান কত যন্ত্রণা অশেষ।
হায়রে! সংসারে পোড়া কপাল যাহার,
যতই সহায় থাক্, সুখ নাহি তার!

মহাদেব নিজ দেহে ভস্ম লেপন করিয়া থাকেন কেন, তাহা কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

একা ভার্য্যা সমররসিকা নিম্নগা চ দ্বিতীয়া,
পুত্রো জ্যেষ্ঠো দ্বিরদবদনঃ ষন্মুখোঽন্যতঃ কনিষ্ঠঃ।
নন্দী ভৃঙ্গী চ কপিবদনং বাহনং পুঙ্গবেশঃ,
স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং ভস্মদেহো মহেশঃ॥

এক ভার্য্যা ভালবাসে করিবারে রণ,
দ্বিতীয়টী নিম্নগামী তায় সর্ব্বক্ষণ,
জ্যেষ্ঠপুত্র গণেশের হস্তিমুখ আর,
কনিষ্ঠ কার্ত্তিক যেটী, ছটী মুখ তার,
নন্দীর ভৃঙ্গীর মুখ বানরের প্রায়,
বাহন গরুটী বটে, দুধ নাহি তায়;—
এসব দুঃখের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া
ছাই ভস্ম মাখে শিব পাগল হইয়া।

মহাদেব কি কারণে বিষ পান করিয়াছিলেন, তাহা কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

বৃদ্ধোক্ষঃ প্রপলায়তে প্রতিদিনং সিংহাবলোকাদ্‌ভিয়া,
পশ্যন্ মত্তময়ূরমস্তিকচরং ভূষাভুজঙ্গব্রজঃ।
কৃত্তিং কৃন্ততি মূষিকোঽপি রজনৌ ভিক্ষান্নমাভক্ষয়ন্,
দুঃখেনেতি দিগম্বরঃ স্মরহরো হলাহলং পীতবান্॥

সিংহ দেখি বৃদ্ধ বৃষ নিত্যই পলায়,
ময়ূর দেখিয়া সর্প পলাইয়া যায়,
ইন্দুর ভিক্ষান্ন খায় হ'লে রাত্রিকাল,
চর্ম্মবস্ত্র কাটি পুনঃ বাড়ায় জঞ্জাল;
লোকে বলে দিগম্বর না দেখি বসন,
স্মরহর হলো নাম বধিয়া মদন;—
এসব দুঃখের কথা ভাবিয়া অন্তরে,
বিষ খেয়েছেন শিব মরিবার তরে!

মহাদেব মস্তকে চন্দ্রকলা ধারণ করিয়া আছেন কেন, তাহা কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

গঙ্গাজল নয়নানল —
মিলনাদেকত্র নৈব কল্যাণম্।
তৎ কিং ধূর্জটি মূর্দ্ধনি
মধ্যস্থা বৈধবী লেখা॥

টল্ টল্ করিতেছে শিরে গঙ্গাজল,
ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে নয়নে অনল।
জল অনলের শত্রু, পাছে তথা গিয়া
নির্ব্বাণ করিয়া দেয়, ইহাই ভাবিয়া;
চন্দ্রকলা গিয়া সেই শঙ্করের শিরে,
মধ্যস্থ হইয়া আছে চিরদিন ধ'রে!

মহাদেব উলঙ্গ হইয়া থাকেন কেন, তাহা কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

সহস্রাস্যো নাগঃ প্রভুরপি মতঃ পঞ্চবদনঃ
ষড়াস্যো হস্তৈক স্তনয় ইতরো বারণমুখঃ।
চিরংভৈক্ষ্যাং নিত্যং প্রভবতু কথং বর্ত্তনমিতি
বদন্ত্যাং পার্ব্বত্যাং স্মরহর উলঙ্গঃ সমভবৎ॥

বাসুকি হাজার মুখে করিছে আহার,
তোমারো পাঁচটী মুখ, ভেবো একবার;
কার্ত্তিক ছয়টী মুখে করিছে ভক্ষণ,
গণেশের মুখ খানি হাতীর মতন;
ভিক্ষা ক'রে চিরকাল কাটিল তোমার,
দিন দিন ভিক্ষা ক'রে চলে কি সংসার?
পার্ব্বতীর এই সব দুর্ব্বাক্য শুনিয়া,
অদ্যাপি আছেন শিব উলঙ্গ হইয়া!

মহাদেব কি কারণে মৃন্ময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, তাহা কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

অত্তুং বাঞ্ছতি বাহনং গণপতেরাখুং ক্ষুধার্ত্তঃ ফণী,
তঞ্চ ক্রৌঞ্চপতেঃ শিখী চ গিরিজাসিংহোঽপি নাগাননম্।
গৌরী জহ্নুসুতামসূয়তি কলানাথং কপালানলো
নির্ব্বিণ্ণঃ স শিবঃ কুটুম্বকলহাদ্ মূর্ত্তিংচরেদ্ মৃন্ময়ীম্॥

গণেশের ইন্দুরটী করিয়া দর্শন
ছুটে ছুটে যায় সর্প করিতে ভক্ষণ।
কার্ত্তিকের ময়ুরটা সর্পকে দেখিয়া
অমনি ছুটিয়া যায় খাইবে বলিয়া।
গজানন গণেশকে চক্ষে যদি হেরে,
পার্ব্বতীর সিংহটা ও যায় ধরিবারে।
সপত্নী গঙ্গারে যদি করেন দর্শন,
পার্ব্বতীর মহাক্রোধ অমনি তখন।
শিবের কপালে অগ্নি ধক্ ধক্ জ্বলে,
চন্দ্রকে পাইয়া কাছে খেতে যায় গিলে।
এইসব দেখি শুনি হ'য়ে জ্বালাতন,
মাটি হ'য়ে গিয়াছেন দেব ত্রিলোচন!

মহাদেব গৃহ পরিত্যাগ করিয়া শ্মশানবাসী হইয়াছেন কেন, তাহা কবি নিম্নলিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

কিং গোত্রং কিমু জীবনং কিমু ধনং কা জন্মভূঃ কিং বয়ঃ,
কা বিদ্যা কিমু সদ্ম কে সহচরাঃ কে বংশজাঃ প্রাক্তনাঃ।
কা মাতা চ পিতা ভবেতি গুরুণা পৃষ্টো বিবাহে শিবঃ
মালিন্যেন হৃদঃ স্বকীয় ভবনং ত্যক্ত্বা শ্মশানস্থিতঃ॥

কিবা তব গোত্র, কিসে জীবিকা-অর্জ্জন?
কোথা তব জন্মস্থান, কিবা তব ধন?
কিবা তব বয়ঃক্রম, কি বিদ্যা তোমার

কেমন গৃহস্থী, কে কে সহচর আর?
তোমার বংশীয় পূর্ব্বলোক কে কে রয়?
পিতা মাতা কেবা তব, দাও পরিচয়।
শিবের বিবাহকালে বসিয়া সভায়,
কুলগুরু জিজ্ঞাসেন এসব তাঁহায়।
প্রশ্নের উত্তর দানে অক্ষম হইয়া,
লাজে অধোমুখ হ'য়ে রহেন বসিয়া।
মনের দুঃখেতে তাই দেব ত্রিলোচন
অদ্যাপি শ্মশানে নিত্য করেন ভ্রমণ!

মহাদেব চিরকাল শ্মশানবাসী হইয়াও কি কারণে গৃহস্থাশ্রম আশ্রয় করিলেন, তাহা কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন:—

উজ্ঝিত্বাদিশমম্বরং বরতরং বাসো বসানশ্চিরং
হিত্বা বাসরসং পুনঃ পিতৃবনে কৈলাস-
হর্ম্ম্যাশ্রয়ঃ।
ত্যক্ত্বা ভস্ম কৃতাঙ্গরাগনিচয়ঃ শ্রীখণ্ডসারদ্রবৈ-
র্দেবেশো হিমাদ্রিজা পরিণয়ং কৃত্বা
গৃহস্থঃ শিবঃ॥

শিবারে করেন শিব বিবাহ যখন,
অমনি হ'লেন শিব গৃহস্থ তখন;—
দিগম্বর পরিহরি দেব ত্রিলোচন
পরিধান করিলেন সুন্দর বসন;
ত্যজিয়া শ্মশান-ভূমি দেব পশুপতি
সুরম্য কৈলাসে গিয়া করেন বসতি;
চিতাভস্ম পরিহরি অমনি সত্বর
চন্দনেতে অঙ্গরাগ করিলেন হর।
ধন্য ধন্য শিবানীর শুভ পরিণয়,
গৃহস্থ-আশ্রম শিব করেন আশ্রয়!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি, এ।

—

ওঁতৎসৎওঁ

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়

কঠোপনিষৎ

(বঙ্গানুবাদিতা।)

প্রথমাবল্লী।

যজ্ঞফল-কামনায় রাজশ্রবা ঋষি
করিলা সর্ব্বস্ব দান; নচিকেতা নামে
ছিল তাঁর পুত্র এক; বিভাগের কালে
দক্ষিণা প্রদান জন্য গাভীসমূহেরে,
শ্রদ্ধার আবেশ হ'ল সাধু সে বালকে। ১:২
ভাবিতে লাগিলা সেই, যেই যজমান
পীতোদক, ভুক্ততৃণ, ইন্দ্রিয়বিহীন
দুগ্ধ-দোহ গাভীগণে করয়ে প্রদান,
অনন্দা লোকেতে তার হয় অধিষ্ঠান। ৩।
"আমায় কাহাকে দিবে?" সুধিলা জনকে
একে একে তিনবার; হয়ে ক্রোধান্বিত,
"তোমায় মৃত্যুকে দিব" বলিলেন পিতা। ৪

১। রাজশ্রবা বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞ করিয়াছিলেন; ঐ যজ্ঞের ফল লাভ করিতে হইলে দক্ষিণারূপে আপনার সর্ব্বস্ব দান করিতে হয়। তাই তিনি সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন। ১।

২। শ্রদ্ধা—আস্তিকী বুদ্ধি, ধর্ম্মভাব।

৩। পীতোদক—যাহাদের জল পান শেষ হইয়াছে, অর্থাৎ যাহারা পুনর্ব্বার জল পান করিবার পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করিবে।

ভুক্ততৃণ—যাহাদের তৃণভক্ষণ শেষ হইয়াছে, অর্থাৎ যাহারা পুনর্ব্বার তৃণ ভক্ষণের পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করিবে।

ইন্দ্রিয়বিহীন—সন্তান-জনন-শক্তিহীন (অত্যন্ত বার্দ্ধক্যাদি বশতঃ)

দুগ্ধদোহ—যাহার দুগ্ধ-দোহন কার্য্য শেষ হইয়াছে।

৪। নচিকেতা ভাবিতে লাগিলেন, পিতা এরূপ জীর্ণ গোসমূহ দক্ষিণাজন্য প্রদান করিতেছেন, ইহাতে তাঁহার যজ্ঞফল সকলই বৃথা হইল; তাঁহাকে আনন্দশূন্য স্থানে বাস করিতে হইবে। অতএব পুত্র হইয়া

অনেক তনয় মধ্যে হইব প্রথম ;
না হই প্রথম যদি, অন্ততঃ মধ্যম ;
(অধম না হ'ব কভু এ কথা নিশ্চয়)
কি কাজ যমের আছে, জানি না, যা পিতা
সম্পাদিত মোরে দিয়ে করিবেন আজ। ৫
(ভাবিতে ভাবিতে ইহা কহিলেক পুনঃ)
পূর্ব্ব মহাজনগণ করেছেন যাহা,
আলোচনা কর ; তথা দেখহ ভাবিয়া,
করেছেন যাহা পরবর্ত্তিসাধুগণ ;
মানব মরিয়া যায় শস্যের মতন
জীর্ণ হয়ে ; পুনঃ করে জনমগ্রহণ। ৬।
(তাইবলি কর পিতঃ সত্যাবলম্বন,
পাঠাও আমারে এবে শমন-সদন।)
(শুনি মুনি রাজশ্রবা সত্য পালিবারে
প্রেরিলা শমনালয়ে তনয়ে আপন।)
না ছিলা আলয়ে যম, তাই একে একে
যাপিলা যামিনী তিন সেথা নচিকেতা।
আসিলে আলয়ে যম, যমাত্মীয়গণ
কহিলা সম্বোধি তাঁরে—ওহে বৈবস্বত!
অতিথি ব্রাহ্মণ গৃহে বৈশ্বানর সম
প্রবেশেন, তেঁই তাঁর পাদ্যাসন দিয়া
শান্তির বিধান করে ; আনহ উদক। ৭।

অভুক্ত ব্রাহ্মণ যার গৃহে করে বাস,
হারায় সে অল্পবুদ্ধি—অজ্ঞাত বিজ্ঞাত
আশার সকল ফল ; সাধু-সহবাস,
সুনৃত বচন, যজ্ঞ, কূপাদি খনন-
সম্ভূত বিমল পুণ্য, পুত্র, পশুগণ। ৮।
(তখন কহিলা যম ঋষি-তনয়েরে)
হে ব্রাহ্মণ, নমস্কার ; (তোমার কৃপায়)
হউক মঙ্গল মোর ; তিন রাত্রি তুমি—
নমস্য অতিথি, তবু করিয়াছ বাস
অনশনে গৃহে মোর ; করহ প্রার্থনা,
নিশা প্রতি একবর, সমুদায়ে তিন ॥ ৯।
(কহিলেন নচিকেতা)"ওহে যমরাজ,
তব অঙ্গীকৃত বর তিনটীর মাঝে
প্রথম প্রার্থনা এই—জনক আমার
গৌতম হয়েন যেন উৎকণ্ঠারহিত ;
বীতমন্যু, সুপ্রসন্ন আমার উপর ;
পরিত্যক্ত হয়ে যবে তব গ্রাস হ'তে
ফিরিয়া যাইব গেহে, চিনেন আমায়,
সাদরে সস্নেহে পুনঃ সম্ভাষেণ মোরে। ১০
(কহিলেন যম) "শুন, তোমার জনক
ঔদ্দালকি আরুণি র'বেন পূর্ব্ববৎ

আত্মপ্রদান করিয়াও পিতার যাহাতে যজ্ঞফল লাভ হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য ; এই ভাবিয়া তিনি পিতার নিকটে গিয়া কহিলেন "কোন্ ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা-রূপে আমায় দিবেন" ইহাতে উত্তর না দেওয়ায় তিনবার জিজ্ঞাসা করিলেন।

৫। যে পুত্র পিতার অভিপ্রায় বুঝিয়া কার্য্য করে, সে প্রথম পুত্র, যে পুত্র পিতার আদেশ পাইবা-মাত্র তদনুযায়ী কার্য্য করে, সে মধ্যম পুত্র। যে পুত্র পিতার শাসনের ভয়ে কার্য্য করে, সে অধম পুত্র।

৬। এই শ্লোকে নচিকেতা অতীত ও বর্ত্তমান কালের সাধুগণের দৃষ্টান্ত দ্বারা পিতাকে বলিতে-ছেন যে, তাঁহারা সকলেই সত্যবাদী ; আপনিও সত্যানুষ্ঠান করুন। মিথ্যা ব্যবহারদ্বারা কেহ কখনও অজর ও অমর হইতে পারে না, শস্যের মত মানুষও উৎপত্তি এবং বিনাশের অধীন, অতএব মিথ্যাচরণে প্রয়োজন কি? আপনার সত্য পালন করুন ও আমাকে যমালয়ে প্রেরণ করুন।

৮। এই শ্লোকে মূলে আছে "ইষ্টাপূর্ত্তে" শাঙ্কর ভাষ্যে ইহার অর্থ ইষ্টং যাগজম্। পূর্ত্তং—আরামাদি ক্রিয়াজং ফলম্।

আমি পূর্ত্তের প্রচলিত অর্থ "জলাশয়াদি খননই গ্রহণ করিয়াছি।

"বাপীকূপ-তড়াগাদি দেবতায়তনানি চ। অন্ন-প্রদানমারামঃ পূর্ত্তমিত্যভিধীয়তে॥

৯। সমুদায়ে তিন অর্থাৎ তিন রাত্রির জন্য তিনটী বর।

১০। বীতমন্যু বিগতক্রোধ।

স্নেহপূর্ণ তব প্রতি, চিনিবেন তোমা
আমার আদেশে ; হেরি প্রমুক্ত তোমায়
মৃত্যুমুখ হ'তে, বীতমন্যু—সুখে তাঁর
নিশিতে হইবে নিদ্রা, হে ঋষিকুমার ! ১১
(কহিলেন নচিকেতা——)
হে মৃত্যো, নাহিক স্বর্গে কিছুমাত্র ভয় ;
না বিরাজ তুমি তথা, জরা না বিরাজে ;
ক্ষুধা-তৃষ্ণা অতিক্রমি, শোকশূন্য হ'য়ে
স্বর্গলোকে চিরানন্দ ভুঞ্জে নরগণ। ১২।
হে মৃত্যো, যে অগ্নি-কথা জান সবিশেষ
যে অগ্নি সাধনভূত স্বর্গ গমনের ;
যে অগ্নির বলে লোক স্বর্গবাসী হ'য়ে
অমৃতত্ব করে লাভ ; শ্রদ্ধাবান্ আমি—
দ্বিতীয় বরেতে চাহি সে অগ্নি-বিজ্ঞান। ১৩
(উত্তরিলা যম——)
স্বর্গের সাধনভূত সে অগ্নির কথা
জানি আমি নচিকেতঃ, জানি সবিশেষ ;
কহিবও সবিশেষ—শুন মন দিয়া।
অনন্ত লোকাপ্তি হেতু, জগৎ-আশ্রয়,
গুহায় নিহিত বলি জানিবে ইঁহারে। ১৪।
লোকাদি অগ্নির কথা কহিলেন যম,
যে ইষ্টকা আবশ্যক অগ্নি চয়িবারে,
যেরূপে করিতে হয় অগ্নির চয়ন,
বলিলেন সবিশেষ ; নচিকেতা তার
করিলেন পুনরুক্তি, শুনি তুষ্ট হ'য়ে
বলিলেন যম পুনঃ "ওহে নচিকেতঃ !
এ বিষয়ে পুনঃ তোমা দিব একবর।
—এ অগ্নি তোমারি নামে হবে পরিচিত ,
লও এই বহুরূপা সৃঙ্কা মনোহরা। ১৫।১৬।

মাতা পিতা-আচার্য্যের আদেশ লইয়া,
তিনবার করে যেই অগ্নির চয়ন,
যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, করে কর্ম্ম তিন,
জন্ম-মৃত্যু অতিক্রম করে সেই জন ;
লভয়ে পরম শান্তি—বিদিত হইয়া—
নেহারিয়া তথা পূজ্য ব্রহ্মজজ্ঞ দেবে॥ ১৭
যে প্রকার—যতগুলি ইষ্টকা লাগিবে
অগ্নির চয়ন তরে, চয়নের রীতি,
জানি এই তিনে, যেই বিদ্যাবান জন
ত্রিবার করেন নিজে অগ্নির চয়ন,
শরীরপাতের পূর্ব্বে মৃত্যুর বন্ধন
দূর করি, এড়াইয়া শোকের যাতনা,
ভুঞ্জেন অপূর্ব্বানন্দ স্বর্গলোকে থাকি ॥ ১৮
এইত দ্বিতীয় বর—প্রার্থিত তোমার—
স্বর্গের সাধনভূত অগ্নি বিষয়ক ;
তব নামে অভিহিত করিবেক লোকে
এ অগ্নিরে, নচিকেতঃ ! মাগহ তৃতীয়। ১৯
(কহিলেন নচিকেতা)—"বিরাজে সংশয়
মৃত-নর-বিষয়ক ; কেহ কহে থাকে,
থাকে না—কেহবা কহে, মরিলে মানব ;
চাহি তাই জানিবারে শেষ বরে তব ;
এই বিদ্যা লাভ করি তব উপদেশে। ২০

১৩। অমৃতত্ব—অমরত্ব, দেবত্ব।

১৪। অনন্তলোকাপ্তি-হেতু—যাহা স্বর্গপ্রাপ্তির উপায় স্বরূপ। গুহায়—বিদ্বান্‌গণের বুদ্ধিতে।

১৫।১৬। লোকাদি অগ্নি—সৃষ্ট বস্তুর আদি অর্থাৎ প্রথম সৃষ্ট অগ্নি। ইষ্টকা—যজ্ঞাদি কার্য্য। সৃঙ্কা—শব্দবতী রত্নময়ী মালা ; (অথবা) অকুৎসিতা কর্ম্মময়ী গতি।

যম বলিলেন, অগ্নির একটী নাম "নচিকেতা" হইবে।

১৭। ব্রহ্মজজ্ঞ দেব—ব্রহ্মজ, ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন—জ্ঞ—যিনি সমুদয় বস্তু জানেন,—সর্ব্বজ্ঞ। ব্রহ্মজ ও জ্ঞ—ব্রহ্মজজ্ঞ, যে দেব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন ও সর্ব্বজ্ঞ।

১৮। মৃত্যুর বন্ধন—মৃত্যুর বন্ধন স্বরূপ অধর্ম্ম, অজ্ঞান, রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি।

২০। এই শ্লোকে নচিকেতা যমকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, মৃত মানব স্বস্থ রহেন হইতে

(কহিলেন যম——)
পুরাকালে দেবগণ ছিলেন সংশয়ী
এ বিষয়ে; এই ধর্ম্ম নহে সুবিজ্ঞেয়।
সূক্ষ্ম ইহা, নচিকেতঃ! চাহ অন্য বর;
করিওনা উপরোধ, ত্যজহ ইহারে। ২১।
(কহিলেন নচিকেতা)
নিশ্চয় সন্দেহযুক্ত ছিলা দেবগণ—
এ বিষয়ে; কহিতেছ—নহে সুবিজ্ঞেয়
ধর্ম্ম এই; কিন্তু তব সম বক্তা আর
নহে লভ্য; অতএব ইহার সমান
নাহি অন্য কোন বর প্রার্থনীয় মোর। ২২।
(কহিলেন যম)
করহ প্রার্থনা—পুত্র-পৌত্র দীর্ঘজীবী,
বহুপশু, হস্তী, অশ্ব, স্বর্ণ, ভূমিচয়,
স্বয়ং বাঁচিয়া থাক যথেচ্ছ বৎসর। ২৩।
যদি অন্যকোন বর ইহার সমান
বিত্ত বা চিরজীবিকা, রাজত্ব অগাধ
প্রশস্ত ভূমির পরে, কর অভিলাষ,
কামনার কামভাগী করিব তোমায়। ২৪।
মর্ত্তলোকে সুদুর্লভ কামনা যে সব,
প্রার্থনা করহ তাহা ইচ্ছা অনুরূপ।
সরথা সতূর্য্যা রামা—ইহার মতন
প্রাপণীয়া মনুষ্যের নহে কদাচন;
আমার প্রদত্ত এই রমণী-নিকরে
সেবিত হইয়া থাক; করোনা জিজ্ঞাসা
মরণ-সম্বন্ধী সেই প্রশ্ন গুরুতর। ২৫।

(কহিলেন নচিকেতা)
হে অন্তক, ভোগাচয় তব উক্ত যাহা,
থাকে বা না থাকে কল্য, সন্দেহ-বিষয়;
মর্ত্ত্য-সর্ব্বেন্দ্রিয়-তেজঃ এরা করে নাশ,
থাকুক্ তোমারি অশ্ব, নৃত্য-গীত তব। ২৬
বিত্তে নহে তর্পণীয় মানব কখন;
যখন দেখেছি তোমা, লভিব নিশ্চয়
বিত্ত, তুমি প্রভুভাবে রবে যতদিন,
বাঁচিয়া থাকিব; কিন্তু চাই সেই বর। ২৭
জরাধীন কোন্ মর্ত্ত্য করিয়া গমন
অজর অমর কাছে; জেনে শুনে, আছে
প্রয়োজনান্তর আর প্রাপ্তব্য মহান্
এ আত্মার, চিন্তাকরি রূপ-রতি-সুখ
ক্ষণস্থায়ী, অতিদীর্ঘ চাহেবে জীবন
স্বর্গচেয়ে নিম্নতর ভবধামবাসী? । ২৮।
হে মৃত্যো, যে পরলোক-বিষয়ে মানব
সর্ব্বদা-সংশয়াকুল, আছে যাহা—তাহে
প্রকাশিয়া বল, গূঢ় পরলোক-ভাবে
অনুপ্রবেশিতে পারে কেবল যে বর,
তাহাভিন্ন নচিকেতা না চাহে অপর। ২৯

(ইতি প্রথমা বল্লী।)

শ্রীমনোরঞ্জন মিশ্র।

একটী সংশয় আমার মনে রহিয়াছে; কেহ কেহ বলেন যে, মনুষ্যের মৃত্যুর পর শরীর, ইন্দ্রিয়, মনঃ ও বুদ্ধি হইতে পৃথক্, দেহান্তর-সমন্বিত "আত্মা" নামে একটী পদার্থ থাকে; কেহ কেহ বলেন, এরূপ পদার্থ থাকেনা। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক-ইহার কোন্‌টী সত্য, তাহা বলুন। নচিকেতার এই প্রশ্ন হইতে প্রকৃত আত্মজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রশ্ন হইল ও উপনিষৎ আরম্ভ হইল। দ্বিতীয় বল্লীতে ইহার উত্তর সংক্ষেপ বলা হইয়াছে।

২১। যম ২১, ২৩, ২৪ ও ২৫শ্লোকে—নচিকেতা প্রকৃত আত্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত কিনা, ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন।

২৫। সরথা সতূর্য্যা রামা——রথযুক্তা ও বাদ্য-যন্ত্রধারিণী রমণীগণ।

২৬। শঙ্করাচার্য্য বলেন, সকলেরই আয়ু অল্প, এমন কি, ব্রহ্মারও আয়ু কম—সুতরাং আমাদিগের ত কথাই নাই।

২৯। মূলে "সাম্পরায়ে" আছে—সাম্পরায়ে অর্থাৎ পরলোক বিষয়ে।

নচিকেতা এই শ্লোকে যমকে বলিতেছেন—পরলোকে যাহা আছে, তাহা আমাদিগকে বলুন, অর্থাৎ মনুষ্যের মৃত্যুর পর "আত্মা" থাকে অথবা দেহের সহিত বিলয় প্রাপ্ত হয়, তাহা সবিশেষ রূপে বলুন। অনুপ্রবেশিতে পারে—অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে, অর্থাৎ যে বর লাভ করিলে পরলোক-ভাব স্পষ্ট প্রকাশিত হইতে পারে।

নীতিসারঃ।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

দাতৄণাং ধার্ম্মিকানাঞ্চ শূরাণাং কীর্ত্তিং সদা।
শৃণুয়াৎ তু প্রযত্নেন তচ্ছিদ্রং নৈব লক্ষয়েৎ ॥ ১০১।
কালে হিতমিতাহার-বিহারী বিঘসাশনঃ।
অদীনাত্মা চ সুস্বপ্নঃ শুচিঃ স্যাৎ সর্ব্বদা নরঃ ॥ ১০২।
কুর্য্যাৎ বিহারমাহারং নির্হারং বিজনে সদা।
ব্যবসায়ী সদা চ স্যাৎ সুখং ব্যায়ামমভ্যসেৎ ॥১০৩
অন্নং ন নিন্দ্যাৎ সুস্বস্থঃ স্বীকুর্য্যাৎ প্রীতিভোজনম্।
আহারং প্রবরং বিদ্যাৎ ষড়্রসং মধুরোত্তরম্ ॥১০৪
বিহারং চৈব স্বস্ত্রীভি র্বেশ্যাভির্ন কদাচন।
নিযুদ্ধং কুশলৈঃ সার্দ্ধং ব্যায়ামং নতিভির্বয়ম্ ॥ ১০৫।
হিত্বা প্রাক্ পশ্চিমৌ যামৌ নিশি স্বাপো বরোগতঃ।
দীনান্ধপঙ্গুবধিরা নোপহাস্যাঃ কদাচন ॥ ১০৬।
নাকার্য্যেতু মতিং কুর্য্যাৎ দ্রাক্ স্বকার্য্যং প্রসাধয়েৎ
উদ্যোগেন বলেনৈব বুদ্ধ্যা ধৈর্য্যেণ সাহসাৎ।
পরাক্রমেণার্জবেন মানমুৎসৃজ্য সাধকঃ ॥১০৭॥
যদি সিধ্যতি যেনার্থঃ কলহেন বরস্তু সঃ।

দাতা, ধার্ম্মিক, শূরব্যক্তিদিগের গুণানুবাদ যত্ন পূর্ব্বক শ্রবণ করিবে, কিন্তু তাঁহাদের ছিদ্র অন্বেষণ করিবেনা। ১০১।

মনুষ্য যথাসময়ে পথ্য ও পরিমিত আহার-বিহারী, দেবাদি নিবেদিত অন্নভোজী, অদীনাত্মা, সুনিদ্র ও সর্ব্বদা শুচি থাকিবেন। ১০২।

নির্জ্জনে আহার-বিহার ও মল-মূত্রাদি ত্যাগ করিবেন, সর্ব্বদা উদ্যোগী ও স্বচ্ছন্দে ব্যায়াম করিবেন। ১০৩।

সুস্থ শরীরে অন্ন নিন্দা করিবেনা, প্রীতি ভোজন স্বীকার করিবেন; মধুররস শেষযুক্ত ষড়রস-ভূয়িষ্ঠ আহার শ্রেষ্ঠ জানিবেন। ১০৪।

নিজের স্ত্রীর সহিত বিহার করিবে, বেশ্যাদি সঙ্গ কখনও করিবেনা; নিপুণ ব্যক্তির সহিত নতিদ্বারা বরং ব্যায়াম রূপ যুদ্ধ করিবে। ১০৫।

রাত্রির পূর্ব্ব ও শেষ প্রহর পরিত্যাগ করিয়া নিদ্রা যাইবে, দীন, অন্ধ, পঙ্গু, বধির দেখিয়া কখনও হাস্য করিবে না। ১০৬।

অকার্য্যে মতি দিবেনা, উদ্যোগে, বল, বুদ্ধি, ধৈর্য্য, পরাক্রম ও সরলতা দ্বারা সাহস পূর্ব্বক কার্য্যার্থী মান ত্যাগ করিয়া শীঘ্র স্বকার্য্য সাধন করিবেন। ১০৭।

অন্যথায়ুর্ধন সুহৃদ্ যশঃ সুখহরঃ স্মৃতঃ ॥১০৮।
নানিষ্টং প্রবদেৎ কস্মিন্ ন ছিদ্রং কস্য লক্ষয়েৎ।
আজ্ঞা ভঙ্গস্তু মহতাং রাজ্ঞঃ কার্য্যো ন বৈ ক্বচিৎ ॥১০৯
অসৎ কার্য্য নিযোক্তারং গুরুং বাপি প্রবোধয়েৎ।
নাতি ক্রমেদতিলঘুং ক্বচিৎ সৎ-কার্য্য বোধকম্ ॥ ১১০।
কৃত্বা স্বতন্ত্রাং তরুণীং স্ত্রিয়ং গচ্ছেন্ন বৈ ক্বচিৎ।
স্ত্রিয়ো মূলমনর্থস্য তরুণ্যঃ কিং পরৈঃ সহ ॥ ১১১ ॥
নপ্রমাদ্যেন্মদদ্রব্যৈর্ন বিমুহ্যেৎ কুসন্ততৌ।

যদি কলহে কোন অর্থসিদ্ধি হয়, তাহা হইলে বরং কলহ ভাল; নতুবা কলহে আয়ু, ধন, সুহৃদ, যশ ও সুখ নষ্ট করে, ইহা কথিত হইয়াছে। ১০৮।

কোন লোককে দুর্ব্বচন বলিবে না; কাহারও দোষ লক্ষ্য করিবেনা। মহৎ ব্যক্তির অথবা রাজার আজ্ঞা-ভঙ্গ কদাচ করিবেনা। ১০৯।

অসৎ কার্য্যে নিযোক্তা গুরুকেও উপদেশ দিবে এবং অত্যন্ত ক্ষুদ্র ব্যক্তিকেও কখনও সৎকার্য্য-বোধক কর্ম্মে অতিক্রম করিবেনা, অর্থাৎ ইতর ব্যক্তিকেও উপদেশ দিবে। ১১০।

স্ত্রীকে অরক্ষিত রাখিয়া কখন কোথাও যাইবেনা, স্ত্রী অনর্থের মূল; তাহাতে যদি যুবতী স্ত্রী পরের সহিত থাকে, তাহাহইলে

সাধ্বী ভার্য্যা পিতৃপত্নী মাতা বালা পিতা স্নুষা ॥১১২
অভর্তৃকানপত্যা যা সাধ্বী কন্যা স্বসাপি চ।
মাতুলানী ভ্রাতৃভার্য্যা পিতৃ-মাতৃ স্বসা তথা ॥ ১১৩ ॥
মাতামহোঽনপত্যশ্চ গুরু-শ্বশুর-মাতুলাঃ
বালোঽপিতা চ দৌহিত্রো ভ্রাতা চ ভগিনীসুতঃ
এতেঽবশ্যং পালনীয়াঃ প্রযত্নেন স্বশক্তিতঃ ॥১১৬॥
অভিভবেঽপি বিভবে পিতৃ-মাতৃ কুলং সুহৃৎ।
পত্ন্যাঃকুলং দাসদাসী ভৃত্য-বর্গাংশ্চ পোষয়েৎ ॥১১৭ ॥
বিকলাঙ্গান্ প্রব্রজিতান্ দীনা-নাথাংশ্চ পালয়েৎ।

যে অনর্থের মূল হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের কথা কি? ১১১।

ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি মাদক দ্রব্যে কখনও মত্ত হইবে না এবং কুপুত্রে কখনও মমতা করিবে না। সাধ্বী স্ত্রী, বিমাতা, মাতা, অবিবাহিতা কন্যা, পিতা, পুত্রবধূ, বিধবা অপুত্রা সাধ্বীকন্যা, ভগিনী, মাতুলানী, ভ্রাতৃজায়া, পিতৃস্বসা, মাতৃস্বসা, অনপত্য মাতামহ, গুরু, শ্বশুর, মাতুল, পিতৃহীন বালক, দৌহিত্র, ভ্রাতা, ভগিনীপুত্র, এই সকল স্বশক্তি অনুসারে যত্ন পূর্ব্বক পালন করা কর্ত্তব্য। ১১২-১৬।

সম্পত্তি না থাকিলেও এই সকলকে পালন করা কর্ত্তব্য; ধন থাকিলে, শ্বশুরকুল, দাস-দাসী, ভৃত্যবর্গকেও পোষণ করা কর্ত্তব্য। ১১৭।

কুটুম্বভরণার্থেষু যত্নবান্ন ভবেচ্চ যঃ, তস্য সর্বগুণৈঃ কিন্তু জীবন্নেব মৃতশ্চ সঃ ॥ ১১৮॥

ন কুটুম্বং ভৃতং যেন নাশিতাঃ শত্রবোঽপি ন।
প্রাপ্তং সংরক্ষিতং নৈব তস্য কিং জীবিতেন বৈ? ১১৯॥

স্ত্রীভির্জিতো ঋণী নিত্যং সুদরিদ্রশ্চ যাচকঃ।
গুণহীনোঽর্থহীনঃ সন্ মৃতা এতে সজীবকাঃ ॥১২০॥

আয়ুর্বিত্তং গৃহচ্ছিদ্রং মন্ত্রমৈথুনভেষজম্।
দানমানাপমানং চ নবৈতানি সুগোপয়েৎ ॥১২১॥

দেশাটনং রাজসভাবেশনং শাস্ত্রচিন্তনম্।
বেশ্যাদি দর্শনং বিদ্বন্মৈত্রীং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ ॥১২২॥

অনেকাশ্চ তথা ধর্ম্মাঃ পদার্থাঃ পশবো নরাঃ।
দেশাটনাৎ স্বানুভূতাঃ প্রভবন্তি চ পর্বতাঃ। ॥১২৩॥

কীদৃশা রাজপুরুষা ন্যায়ান্যায়ং চ কীদৃশং।
মিথ্যাবিবাদিনঃ কে চ কে বৈ সত্যবিবাদিনঃ ॥১২৪॥

কীদৃশী ব্যবহারস্য প্রবৃত্তিঃ শাস্ত্রলোকতঃ।
সভাগমনশীলস্য তদ্বিজ্ঞানং প্রজায়তে ॥১২৫॥

নাহঙ্কারী চ ধর্ম্মান্ধঃ শাস্ত্রাণাং তত্ত্বচিন্তনৈঃ।
একং শাস্ত্রমধীয়ানো ন বিদ্যাৎ কার্য্যনির্ণয়ম্ ॥১২৬॥

স্যাদ্ বহ্বাগমসন্দর্শী ব্যবহারো মহানতঃ।
বুদ্ধিমানভ্যসেন্নিত্যং বহুশাস্ত্রাণ্যতন্দ্রিতঃ ॥১২৭॥

বিকালঙ্গ, সন্ন্যাসী, দীন, অনাথকেও পালন করিবে; কুটুম্ব-পোষ্য ভরণ জন্য যিনি যত্ন না করেন, তিনি সর্ব্ব গুণী হইলেও জীবিত থাকিলেও মৃত। ১১৮।

যিনি পোষ্যবর্গ ভরণ না করেন, শত্রু নাশ না করেন, যিনি প্রাপ্ত বস্তু রক্ষা না করেন, তাঁহার জীবনে প্রয়োজন কি? ১১৯

যিনি স্ত্রীজিত, নিত্যঋণী, দরিদ্র, যাচক, গুণহীন, অর্থহীন, তিনি জীবিত থাকিলেও মৃত। ১২০।

আয়ু, ধন, গৃহ-ছিদ্র, মন্ত্র, মৈথুন, ঔষধ, দান, মান ও অপমান, এই নয়টি দ্রব্য গোপনে রাখিবে। ১২১।

দেশপর্য্যটন, রাজসভায় গমন, শাস্ত্রচিন্তন, বেশ্যাদি দর্শন ও মৈত্রী, জ্ঞানীপুরুষ এই সমুদায় আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক করিবে। ১২২।

এক্ষণে দেশভ্রমণের ফল কহিতেছেন। নানা বিধ ধর্ম্ম, পদার্থ, পশু, মনুষ্য, পর্ব্বত, দেশভ্রমণে জানিতে পারাযায়। ১২৩।

কীদৃশ রাজপুরুষ, কিরূপ ন্যায় ও অন্যায়, কে মিথ্যাবিবাদী, কে সত্যবিবাদী, শাস্ত্রতঃ ও লোকতঃ কীদৃশ ব্যবহারের (ঋণদানাদি বিবাদী বিষয়ের) প্রবৃত্তি, সভাগমনকারী ব্যক্তি জানিতে পারেন। ১২৪ ১২৫।

শাস্ত্র সকলের তত্ত্বচিন্তনে অহঙ্কারী ও ধর্ম্মান্ধ হইবেনা। এক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে কার্য্য নির্ণয় করিতে পারাযায় না। ১২৬।

বহুশাস্ত্রদর্শী অত্যন্ত লোকতত্ত্বদর্শী হইয়া

তদর্থংতু গৃহীত্বাপি তদধীনা ন জায়তে।
বেশ্যা তথাবিধা বাপি বশীকর্ত্তুং নরংক্ষমা।
নেয়াৎ কস্য বশং তদ্বৎ স্বাধীনং কারয়েজ্জগৎ ॥১২৮॥
শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণানামর্থ-বিজ্ঞান-মেব চ।
সহবাসাৎ পণ্ডিতানাং বুদ্ধিঃ পণ্ডা প্রজায়তে ॥১২৯॥
দেবপিত্রতিথিভ্যোঽন্নমদত্বা নাশ্নীয়াৎ কচিৎ।
আত্মার্থং যঃ পচেন্মোহান্নরকার্থং সজীবতি ॥১৩০॥
মার্গং গুরুভ্যো বলিনে ব্যাধিতায় শবায়চ।
রাজ্ঞে শ্রেষ্ঠায় ব্রতিনে যানগায় সমুৎসৃজেৎ ॥১৩১॥

শকটাৎ পঞ্চহস্তং তু দশহস্তং তু বাজিনঃ।
দূরতঃ শতহস্তং চ তিষ্ঠেন্নাগাদ্ বৃষাদ্ দশ ॥১৩২॥
শৃঙ্গীনাং চ নখিনাংচ দংষ্ট্রীণাং দুর্জ্জনস্য চ।
নদীনাং বসতৌ স্ত্রীণাং বিশ্বাসং নৈব কারয়েৎ ॥১৩৩॥
খাদন্নগচ্ছেদধ্বানংনচ হাস্যেন ভাষণম্।
শোকং নকুর্য্যান্নষ্টস্য স্বকৃতেরপি জল্পনম্ ॥১৩৪॥
স্ব-শঙ্কিতানাং সামীপ্যং ত্যজেদ্ বৈ নীচ সেবনম্।
সংলাপং নৈব শৃণুয়াদ্ গুপ্তঃ কস্যাপি সর্ব্বদা ॥১৩৫॥

শ্রীবিধু ভূষণ দেব।

(ক্রমশঃ)

থাকেন, তজ্জন্য আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বহু শাস্ত্র অভ্যাস করিবেন।১২৭

বেশ্যা কোন লোকের ধন লইয়াও তাহার অধীন হয় না; বেশ্যা ঐরূপ করিয়াও মনুষ্য সকলকে বশ করিয়া থাকে, কিন্তু সে কাহারও বশ হয় না; মনুষ্য জগৎকে ঐরূপ নিজের অধীন করিবে। ১২৮

পণ্ডিতের সহবাসে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ সকলের অর্থজ্ঞান ও উজ্জ্বল বুদ্ধি হইয়া থাকে।১২৯।

দেবতাকে, পিতৃলোককে ও অতিথিকে অন্ন নাদিয়া কখনও ভোজন করিবে না। যিনি নিজের জন্য মোহ বশতঃ পাক করেন, তিনি নরকের জন্য জীবন ধারণ করেন। ১৩০

গুরুকে, বলশালীকে, পীড়িতকে এবং শব, মান্যব্যক্তি, ব্রতী ও যানগামীকে পথ ছাড়িয়া দিবে। ১৩১।

শকট হইতে পঞ্চহস্ত, ঘোটক হইতে দশ হস্ত, হস্তী হইতে শত হস্ত ও বৃষ হইতে দশ হস্ত দূরে থাকিবে। ১৩২।

শৃঙ্গী, নখী, দণ্ডধারী, দুর্জ্জন, নদী ও স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করিবে না। ১৩৩

খাইতে খাইতে পথে চলিবেনা, হাস্য করিয়া কথা কহিবে না, নষ্ট দ্রব্যের শোক করিবে না ও নিজকার্য্য কীর্ত্তন করিবে না। ১৩৪।

নিজ হইতে শঙ্কিত লোকের নিকট গমন করিবে না ও নীচ লোকের সেবা করিবে না; কোন লোকের গুপ্ত আলাপ শ্রবণ করিবে না।১৩৫।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টরীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা। } কার্ত্তিক। { ১৩০৭ সাল, ১৮২২ শকাব্দা।

সামবেদ-সংহিতা।

(পূর্ব্বতেনুবৃত্তা)

অথ তৃতীয় খণ্ডে সেয়ং প্রথমা।

(প্রয়োগ ঋষিঃ)

৩ ১ ২ ৩১ ২ ৩১ ২ ৩ ২
অগ্নিং বোবৃধন্তমধ্বরাণাং পুরুতমম্।
২৩ ২ ৩ ১২
অচ্ছা নপ্ত্রে সহস্বতে ॥১॥

নপ্ত্রে—বন্ধুং—বন্ধুকে।

সহস্বতে—বলবন্তং—বলবান।

বৃধন্তং—জ্বালাভির্বর্দ্ধমানং—জ্বালার দ্বারা বর্দ্ধিত।

পুরুতমম্—অতিশয়েন বহুমগ্নিং—অধিক অগ্নিকে।

বঃ—যূয়ং—তোমরা (ঋত্বিক্‌ সকলকে-সম্বোধন)

অচ্ছা—অভিগচ্ছত—প্রাপ্ত হও।

(হে ঋত্বিক্‌গণ!) যিনি যজ্ঞসকলের বন্ধু, বলবান, জ্বালা বর্দ্ধিত ও অধিক পরিমিত (১) সেই অগ্নিকে তোমরা প্রাপ্ত হও।১।

(১) অধিক পরিমিত; কারণ অধিক পরমাণু দ্বারা বর্দ্ধিত।

অথ দ্বিতীয়া।

(ভরদ্বাজ ঋষিঃ)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২৩ ২ ৩ ২ ৩ ২
অগ্নিস্তিগ্মেন শোচিষায়(ং) সদ্বিশ্বংন্য-
১ ২ ৩ ১ ২ ৩৩
ত্রিণম্। অগ্নি র্নো বংসতেরয়িং ২॥

তিগ্মেন—তীক্ষ্ণেণ। শোচিষা—তেজসা—তেজদ্বারা।

অত্রিণং—অত্তারং রাক্ষসাদিকং—রাক্ষসাদি ভক্ষককে।

নিয়ংসৎ—নিহন্তু—বধ করুন।

নঃ—অস্মভ্যং—আমাদিগকে। রয়িং—ধনং। বংসতে—দদাতু—দেন।

অগ্নি নিজ তীক্ষ্ণ তেজদ্বারা রাক্ষসাদি প্রাণীভক্ষক সকলকে বধ করুন ও আমাদিগকে ধন দান করুন।

অথ তৃতীয়া।

(বামদেব ঋষিঃ)

১ ২ ৩ ২ ৩২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩
অগ্নে মৃড় মহা (ং) অস্য য আ দেব
১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
যুঞ্জনম্। ইয়েথ বর্হিরাসদম্।৩॥

হে অগ্নে! মৃড়—অস্মান্ সুখময়—আমাদিগকে সুখী কর। মহান্ অসি—প্রভূতে ভবসি—প্রভূত হও—উন্নত হও। যঃ—যে তুমি। অয়ঃ—গন্তা—গমনকারী। দেবয়ুং দেবানাং কাময়িতারং—দেবতা সকলের নিকট কামনাকারীকে। জনং—যজমানং-যজমানকে। বর্হিঃ—দর্ভং—দর্ভাসনকে। আসদম্—(যজ্ঞে) আসত্তু—গ্রহণ করিবার জন্য। আইয়েথ (১)—আগচ্ছসি—আগমন করিতেছ।

হে অগ্নি! তুমি মহান্ হইতেছ; তুমি এই যজ্ঞে আগমনশীল হইয়া দেবতাদিগের কাময়িতা যজমান প্রদত্ত দর্ভাসন গ্রহণ করিতে আসিতেছ। তুমি আমাদিগকে সুখী কর। ৩॥

অথ চতুর্থী।

(বশিষ্ঠ ঋষি।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
অগ্নে রক্ষাণোঅং(২) হসঃ প্রতি

৩ ২ ১ ২ ৩ ১
স্ম দেব রীষতঃ। তপিষ্ঠৈ রজ-

হ
রোদহ॥ ৪॥

হে অগ্নে! ত্বং নঃ—আধান্। অংহসঃ পাপাৎ। রক্ষা (২) পাহি—রক্ষ কর। (অপিচ হে মহাদেব! দ্যোতমানাগ্নে! অজরঃ—জরারহিতস্ত্বং—তুমি জর রহিত। রীষতঃ—হিংসতঃ শত্রূন্—হিংসাকারী শত্রুগণকে। তপিষ্ঠৈ—অতিশয়েন তাপকৈস্তেজোভিঃ—অতিশয় সন্তপ্তকারী তেজদ্বারা। প্রতিদহস্ম—ভস্মীকুরু—ভস্মকর।

হে অগ্নি! তুমি আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা কর। হে দ্যোতমান অগ্নি! তুমি জরা রহিত, হিংসাকারী শত্রুগণকে অতিশয় সন্তপ্তকারী তেজ সকল দ্বারা ভস্ম কর। ৪॥

অথ পঞ্চমী।

(ভরদ্বাজ ঋষিঃ)

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১
অগ্নে যুঙক্ষ্বা হিযে তবাশ্বাসো-

২
দেব সাধবঃ।

২ ১ ২ ৩ ১ ২
অরংবহং ত্ব্যাশবঃ। ৫॥

হে দেব!—দ্যোতমান! অগ্নে! (তান-শ্বান্) যুঙ্ক্ষ্ব—আত্মীয়ে রথে যোজয়—নিজরথে যোজনা কর।

যে ত্বা—ত্বদীয়া। সাধবঃ—সাধকাঃ। অশ্বাসঃ—অশ্বাঃ। আশবঃ—ক্ষিপ্রগামিনঃ শীঘ্রগামী। অরং—অলং-পর্যাপ্তং (ত্বদীয়ং রথং) বহন্তি।

হে দ্যোতমান! হে অগ্নে! যাঁহারা তোমার সাধন করেন ও যাঁহারা তোমার রথ উত্তমরূপে বহন করেন, সেই সকল দ্রুতগামী সাধকরূপ অশ্বগণকে নিজ রথে যোজনা কর। ৫॥

এই ঋকের এই রূপ অর্থ হইতে পারে—হে দেব! যে সকল সাধক স্ব স্ব ভোগায়তন স্থূল শরীর রূপ তোমার রথ

---

(১) যদ ও লেটের প্রয়োগ কিন্তু লঙের অর্থ হইবে। যথা "ছন্দসি লঙ্ লুঙ্ লিটঃ।"

(২) সংহিতায়াং দীর্ঘশ্ছান্দসঃ।

যথাবিহিত সৎকর্ম্ম দ্বারা বহন করিতেছেন, অর্থাৎ নিয়ত তোমার নিকট অগ্রগামী হইতেছেন, তাঁহাদিগকে তুমি স্ব স্ব ভোগায়তন স্থূল শরীরেই সোঽহং রূপ জ্ঞান-রজ্জু দ্বারা, অর্থাৎ "সেই অগ্নি আমি" এই জ্ঞান-রজ্জু দ্বারা যোজনা করিয়া দাও, অর্থাৎ জ্ঞানযুক্ত করিয়া দাও।

অথ ষষ্ঠী।

(বশিষ্ঠ ঋষিঃ)

১২ ৩ ১ ২র
নিত্বা নক্ষ্য বিশ্পতে দ্যুমন্তং
৩ ২
ধীমহে বয়ম্।
৩ ১২
সুবীরমগ্ন আহুত। ৬॥

নক্ষ্য!—উপগন্তব্য! ব্যাপক! বিশপতে—বিশাংপতে। মনুষ্য সকলের পতি! আহুত—সর্ব্বৈর্যজমানৈরভিহুত! হে অগ্নে! দ্যুমন্তং—দীপ্তিমন্তং। সুবীরং—কল্যাণস্তোতৃকং তোমার শুভদস্তবকারী আছে। ত্বা—ত্বাং। বয়ং নিধীমহে—নিহিতবন্তঃ—নিহিত করিলাম।

হে ব্যাপক! হে মনুষ্য সকলের পতি! সকল যজমান কর্তৃক অভিহুত! হে অগ্নে! তোমার উত্তম স্তবকারী আছে। দীপ্তিমন্ত তোমাকে আমার এই যজ্ঞে নিহিত করিলাম। ৬॥

অথ সপ্তমী।

(বিরূপ ঋষিঃ).

৩১ ৩২ ৩২ ৩ ১র ২র ৩২
অগ্নি মূর্দ্ধাদিব ককুৎ পতিঃ পৃথিব্যা
৩ ২
অয়ম্।
৩১ ২র
অপাং রেতাংসি জিন্বতি। ৭॥

মূর্দ্ধা—দেবানাং শ্রেষ্ঠঃ। দিবঃ—দ্যুলোকস্য ককুৎ—উচ্ছ্রিতঃ—উন্নত স্থান। পৃথিব্যাশ্চ পতিঃ। অয়ং অগ্নিঃ। অপাং রেতাংসি স্থাবরজঙ্গমাত্মকানি ভূতানি। জিন্বতি—প্রীণয়তি—পরিতৃপ্ত করেন।

অগ্নি দেবগণের শ্রেষ্ঠ দ্যুলোকের ককুৎ স্বরূপ ও পৃথিবীর (মনুষ্য-লোকের) পালনকর্ত্তা। ইনি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদায় জীবকে পরিতৃপ্ত করিতেছেন।

[দ্যুলোকের ককুৎ স্বরূপ অর্থাৎ বৈশ্বানরাগ্নি সূর্য্যরূপে দ্যুলোকের উপরিভাগ হইতে একপ প্রকাশিত হইতেছেন, যেন তিনি একটি ককুৎ স্বরূপ, অর্থাৎ যেরূপ ককুৎ বৃষের পরিচায়ক, তদ্রূপ বৈশ্বানরাগ্নি সূর্য্যও দ্যুলোকের পরিচায়ক।]

[সূর্য্য মনুষ্যের পালনকর্ত্তা, কারণ "আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ।" সূর্য্য দ্বারা জলাকর্ষণ, তাহা হইতে মেঘ, মেঘ হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে শস্য শস্য হইতে প্রজা-পালন।]

অথাষ্টমী।

(শুনঃ শেপ ঋষিঃ।)

৩২ ৩২উ ৩১২ ৩১ ২৩ ১র
ইমমূষুত্বমস্মাক(ং) সনিং গায়ত্রং
২র
নব্যা(ং) সম্।
১২ ৩ ২৩ ১২
অগ্নে দেবেষু প্রবোচঃ। ৮॥

হে অগ্নে! ত্বং অস্মাকং—অস্মাৎ সম্বন্ধিনং—আমাদের সম্বন্ধীয়। ইমমূষু(১)—পুরোদেশেহনুষ্ঠীয়মানমপি অগ্রে অনুষ্ঠীয়মান ও অনিং—হবির্দানং—ঘৃত প্রদানকে। নব্যাসং—নবতরং। গায়ত্রং—স্তুতিরূপং বচোপি—স্তুতিরূপবাক্যকে। দেবেষু—দেবনং অগ্রে—দেবতাদিগের অগ্রে। প্রবোচঃ প্রব্রূহি—বল।

অগ্নি! তুমি আমাদের অগ্রে অনুষ্ঠীয়মান নূতনতর হবিঃ প্রদান ও স্তুতিবাক্য দেবতাদিগের অগ্রে বলিয়া দাও।

অথ নবমী।

(গোপবনঃ ঋষিঃ)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
তং ত্বা গোপবনোগিরা জনিষ্ঠদগ্নে
অঙ্গিরঃ।
১ ২ ৩ ১ ২
সপাবক শ্রুধীহবম্।

হে অগ্নে! তং ত্বা—ত্বাং। গোপবনঃ—গোপবন ঋষি। গিরা-স্তত্যা—স্তুতিদ্বারা জনিষ্টৎ—জনয়তি—বর্দ্ধয়তি। অঙ্গিরঃ—সর্ব্বত্র গন্তঃ, অঙ্গিরসাং পুত্রোবা—সর্ব্বত্রগন্তঃ অথবা অঙ্গিরসের পুত্র। হে পাবক—হে শোধক! হবং—গোপবনস্ত আহ্বানং—গোপবনের আহ্বানকে—শ্রুধি—শৃণু। অগ্নি! তোমাকে গোপবন ঋষি স্তুতিবাক্যদ্বারা বাড়াইতেছে। হে অঙ্গির! হে শোধক! তুমি এক্ষণে গোপবনের আহ্বান শ্রবণ কর। ৯॥

অথ দশমী।

(বামদেব ঋষিঃ)

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
পরি বাজপতিঃ কবিরগ্নির্হব্যাঃ ন্যক্রমীৎ
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
দধদ্রত্নানি দাশুষে ॥১০॥

বাজপতিঃ—বাজানামন্নানাং পতিঃ পালকঃ ভক্ষ্যদ্রব্যের রক্ষাকর্ত্তা। কবিঃ—ক্রান্তদর্শী মেধাবীবা—মেধাবী। দাশুষে—হবির্দত্তবতে যজমানায়—হবিঃ দানকারী যজমানকে। রত্নানি—রমণীয়ানি ধনানি দধৎ প্রযচ্ছন্—দান করিয়া। অগ্নিঃ। হব্যানি—হবীংষি—হবিকে। পর্য্যক্রমীৎ—পরিক্রামতি—ব্যাপ্নোতি।

অগ্নি সমুদায় ভক্ষ্যদ্রব্যের রক্ষাকর্ত্তা, মেধাবী অথবা দূরদর্শী। তিনি হবিদানকারী যজমানকে রমণীয় ধন দান করিয়া তাঁহাদের হবি সকলে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন।

---

(১) উষু পাদপূরণে।

অথৈকাদশী।

(কণ্বাঋষিঃ)

২ ৩ ২ ৩ ১.২ ৩২ ২
উদুত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি
৩ ১ ২
কেতবঃ।

৩ ১র ২র৩ ১ ১
দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্। ১১ ॥

কেতবঃ—প্রজ্ঞাপকাঃ,সূর্য্যং—সর্ব্বস্যপ্রেরক-মাদিত্যং—সকলের প্রেরক আদিত্যকে। উদ্বহন্তি—ঊর্দ্ধংবহন্তি—উর্দ্ধে বহন করে। উ—পাদপূরণে। বিশ্বায়—বিশ্বস্মৈ সর্ব্বস্মৈ ভুবনায়—সকল বিশ্বকে। দৃশে—দ্রষ্টুং।

ত্যং—তং প্রসিদ্ধং—সেই প্রসিদ্ধকে। জাতবেদসং—জাতানাং প্রাণিনাং বেদিতারং জাতপ্রজ্ঞং, জাতধনং বা—প্রাণিসকলের জ্ঞাতাকে। দেবং—দ্যোতমানং।

সেই প্রসিদ্ধ জাতবেদা অর্থাৎ প্রাণীমাত্রের জ্ঞাতা অগ্নিরূপী সূর্য্য সমুদায় বিশ্বকে দর্শনজন্য অর্থাৎ আলোকিত করিবার জন্য তাঁহার রশ্মিরূপী ঘোটক সকলকে উর্দ্ধে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছেন।

অথ দ্বাদশী।

(মেধাতিথি ঋষিঃ)

৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১২ ৩ ২
কবিমগ্নিমুপস্তুহি সত্যধর্ম্মাণমধ্বরে।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
দেবমমীবচাতনম্। ১২ ॥

হে স্তোতৃসজ্ঘ! অধ্বরে—ক্রতৌ—যজ্ঞে। অগ্নিং। উপস্তুহি—উপেত্য স্তুতিং কুরু—আসিয়া স্তব কর।

কবিং—মেধাবিনং।

সত্যধর্ম্মাণং—সত্য বচন রূপেণ ধর্ম্মেণো-পেতং—সত্যবচনরূপে ধর্ম্মাক্রান্ত। দেবং-দ্যোতমানং।

অমীবচাতনং—অমীবানাং হিংসকানাং শত্রূণাং বা ঘাতকং—হিংস্রক জন্তুর অথবা শত্রুঘাতক।

হে স্তোতৃগণ! তোমরা যজ্ঞে সত্যধর্ম্ম-হিংস্রক জন্তুগণ-ঘাতক অগ্নিদেবের নিকট আসিয়া স্তব কর।

[অগ্নি "সত্যধর্ম্মা" বলিলে, এ অগ্নি পঞ্চ-মহাভূতের তৃতীয় মহাভূতাগ্নি হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়, কারণ সে অগ্নি জড়। বেদের মন্ত্রভাগে অগ্নি. বায়ু প্রভৃতি যে সকল জড়পদার্থের মধ্যে যে সর্ব্বময় পরমাত্মা বর্ত্তমান আছেন, যাঁহাকে দেখিবার অন্য উপায় নাই, তাঁহাকে যে কোন জড়পদার্থ অবলম্বন করিয়া হউকনা কেন, যে কোন রূপ ও নাম দিয়া হউকনা কেন, একবার সমাধিপূর্ব্বক দর্শন করিতে পারিলেই বাসনা পূর্ণ হইবে। এই দৃঢ় নিশ্চয় আর্য্যজাতির বৈদিক সম্প্রদায় হইতে পুরাণ-সম্প্রদায় পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে।]

অথ ত্রয়োদশী।

(সিন্ধু দ্বীপোঽম্বরীষো বা তৃত-আপ্তো বা ঋষিঃ)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
শন্নো দেবী রভিষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু-
৩ ১ ২ ২উ ৩ ১ ২
পীতয়ে শংযোরভি স্রবন্তু নঃ।১৩।

নঃ—অস্মাকং (পাপাপনোদদ্বারেণ) শং—সুখং। ভবন্তু। দেবীঃ—দেব্যঃ আপঃ-

জলদেবীগণ। অভিষ্টয়ে—অস্মদ্‌যজ্ঞায় ভবন্তু—আমাদের যজ্ঞের জন্য হউন। নঃ—অস্মৎ সম্বন্ধিনে, পীতয়ে—পানায়। শং—সুখং ভবন্তু। তথা, শং—উৎপন্নানাং রোগানাং শমনং। যোঃ—যাপনং অনুৎপন্নানাং পৃথক্করণং চকুর্ব্বন্তু। নঃ—অস্মাকং। অভি—উপরি স্রবন্তু, অত্যর্থং সিঞ্চন্তু।

জলদেবী আমাদের পাপ দূর করিয়া আমাদের যজ্ঞের জন্য সুখদায়িনী হউন। আমাদের পানের জন্য সুখ-প্রদায়িনী হউন। উৎপন্ন রোগের শমন ও অনুৎপন্ন রোগ (১) নিবারণ করুনও আমাদের উপর সর্ব্বদা শান্তিজল সেচন করুন।

অথ চতুর্দ্দশী।

(উশনা ঋষিঃ)

১ ২ ৩১র ২র ৩ ১ ২
কস্য নূনং পরীণসিধীয়োজিন্বসি-
১ ২ ৩ ১ ২ ৩
সৎপতে। গোষাতা যস্য তে
১ ২
গিরঃ ।১৪।

হে সৎপতে—সতাংপতে! অগ্নে! নূনং—ইদানীং। কস্য—কীদৃশস্য জনস্য। পরীণসি—ব্রহ্মণি। ধিয়ঃ—কর্ম্মাণি। জিন্বসি—প্রীণয়সি। যস্য তে—তব সম্বন্ধিন্যঃ গিরঃ—স্তুতয়ঃ। গোষাতা—গোসাতৌ—গবাং লাভে ভবন্তু খলু। তস্মাৎ-ত্বং কুত্র তিষ্ঠসি? অস্মাকং ইদানীং গবিচ্ছা প্রবর্ত্ততে।

হে সৎপতে অগ্নে! এক্ষণ কিরূপ যজমান ব্রাহ্মণে কর্ম্ম সকল সফল করিতেছে? তোমার সম্বন্ধীয় স্তবগুলি গোধন লাভে সমর্থ হউক। তজ্জন্য তুমি কোথায় আছ? আমাদের এক্ষণ গোধন-লাভেচ্ছা হইতেছে।

ইতি তৃতীয়া দশতি। †

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

---

(১) রোগ তিন প্রকার, যথা—
অতীত, আগত ও অনাগত।

† 'দশতি' বলিতে দশটি মন্ত্র বুঝায়, কিন্তু এ স্থানে ১৪টি মন্ত্র হইয়াছে; এরূপ মধ্যে মধ্যে ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইবে।

স্মরণ-মাহাত্ম্যম্।

শ্রীমহাদেব উবাচ।—

দৃষ্ট্বা তত্ত্বেন দেবেশি স্মরাম্যেনং তু নিত্যশঃ।
তৃষ্ণাতুরো যথৈবাম্ভস্তদ্বদ্ বিষ্ণুং স্মরাম্যহম্ ॥ ১ ॥

হিমেনাকুলিতং বিশ্বং স্মরত্যগ্নিং যথা তথা।
স্মরন্তি সততং বিষ্ণুং পিতৃ-দেবর্ষি-মানবাঃ ॥ ২ ॥

পতিব্রতা যথা নারী পতিং স্মরতি নিত্যশঃ।
তথা স্মরামি দেবেশি বিষ্ণুং বিশ্বেশ্বরেশ্বরম্ ॥ ৩ ॥

দূরস্থোঽপি যথা গেহং চাতকো জলদং যথা।
ব্রহ্মবিদ্যাং ব্রহ্মবিদস্তথা বিষ্ণুং স্মরাম্যহম্ ॥৪ ॥

হংসা মানসমিচ্ছন্তি ঋষয়ঃ স্মরণং হরেঃ।
ভক্তাশ্চ ভক্তিমিচ্ছন্তি তথা বিষ্ণুং স্মরাম্যহম্ ॥ ৫ ॥

বৈষ্ণবাশ্চ যথা ভক্তিং পশবশ্চ যথা তৃণম্।
ধর্ম্মমিচ্ছন্তি বৈ সন্তস্তথা বিষ্ণুং স্মরাম্যহম্ ॥ ৬ ॥

যথা ব্যসনিনো মারং তথা বিষ্ণুং স্মরাম্যহম্।
প্রাণিনাং বল্লভো দেহো যত্র আত্মাঽবতিষ্ঠতে ॥
আয়ুর্বাঞ্ছন্তি বৈ জীবাস্তথা বিষ্ণুং স্মরাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

ভ্রমরাশ্চ যথা পুষ্পং চক্রবাকা দিবাকরম্।
যথাত্মবল্লভাঃ ভক্তিং তথা বিষ্ণুং স্মরাম্যহম্ ৮ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন—হে দেবশি! তৃষাতুর ব্যক্তি যেরূপ জল বাসনা করে, আমিও তদ্রূপ যাথার্থ্যদর্শন করিয়া প্রতি দিন বিষ্ণু স্মরণ করিয়া থাকি। ১।

বিশ্ব শীতে আকুলিত হইলে, লোক যেরূপ অগ্নি স্মরণ করে, তদ্রূপ পিতৃ-দেবর্ষি-মানবগণ বিষ্ণুকে স্মরণ করেন। ২।

যেরূপ পতিব্রতা নারী সর্ব্বদা স্বামীচিন্তা করেন, তদ্রূপ আমি বিশ্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুকে চিন্তা করি। ৩।

যেরূপ দূরস্থ ব্যক্তি গৃহকে, চাতক যেরূপ মেঘকে, ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্ম-বিদ্যাকে স্মরণ করেন, তদ্রূপ আমি বিষ্ণুকে স্মরণ করি। ৪।

যেরূপ হংস সকল মানস-সরোবর, ঋষিকুল হরির স্মরণ, ভক্তসকল ভক্তি ইচ্ছা করেন; যদ্রূপ বৈষ্ণব সকল ভক্তি, পশু সকল তৃণ, সাধু সকল ধর্ম্ম, ব্যসন-প্রাপ্ত যেরূপ কন্দর্পকে বাসনা করেন, তদ্রূপ আমি বিষ্ণুকে স্মরণ করি। জীবের প্রিয় দেহ—যাহাতে আত্মা থাকেন, সেই দেহকে ও আয়ুকে জীব যেরূপ বাসনা করে, তদ্রূপ আমি বিষ্ণুকে স্মরণ করি। ভ্রমর সকল যেরূপ পুষ্পকে, চক্রবাক্ দিবাকরকে, যেরূপ আত্মারাম ভক্তিকে, তদ্রূপ আমি বিষ্ণুকে স্মরণ করি। ৫—৮।

অন্ধেনাকুলিতা লোকা দীপং
বাঞ্ছন্তি বৈ যথা।
তথৈব পুরুষা লোকে স্মরণং
কেশবস্য চ ॥ ৯ ॥
যথা শ্রমার্ত্তা বিশ্রামং নিদ্রাং
ব্যসনিনো যথা।
যথালস্যোজ্ঝিতা বিদ্যাং তথা
বিষ্ণুং স্মরাম্যহম্ ॥ ১০॥
মাতঙ্গাঃ পার্ব্বতীং ভূমিং সিংহা
বনগজাদিকম্।
তথৈব স্মরণং বিষ্ণোঃ কর্ত্তব্যং
পাপভীরুভিঃ ॥ ১১ ॥
সূর্য্যকান্তরবের্যোগাদ্বহ্নিস্তত্র প্র-
জায়তে।
এবং বৈ সাধুসংযোগাদ্ধরৌ ভক্তিঃ
প্রজায়তে ॥ ১২ ॥

তামসাবৃত জগৎ যেরূপ দীপ ইচ্ছা করে, তদ্রূপ মনুষ্যগণ কেশবের স্মরণ করেন। ৯।

শ্রমার্ত্ত যদ্রূপ বিশ্রামকে, ব্যসনগ্রস্ত যেরূপ নিদ্রাকে, যেরূপ অলস ব্যক্তি ত্যক্ত বিদ্যাকে বাঞ্ছা করে, তদ্রূপ আমিও বিষ্ণুকে স্মরণ করি। ১০।

মাতঙ্গ যেরূপ পার্ব্বত্য ভূমিকে, সিংহ যেরূপ বন ও গজাদিকে বাসনা করে, তদ্রূপ পাপ-ভীত ব্যক্তিগণ বিষ্ণুকে স্মরণ করিবেন। ১১।

সূর্য্যকান্তমণি যেরূপ সূর্য্য-সংযোগে বহ্নি উৎপাদন করে, তদ্রূপ সাধু-সংসর্গে শ্রীহরিতে ভক্তি উৎপন্ন হয় ১২ ॥

শীতরশ্মি-শিলা যদ্বচ্চন্দ্র-
যোগাদপঃ স্রবেৎ।
এবং বৈষ্ণবসংযোগাদ্ভক্তির্ভবতি
শাশ্বতী ॥ ১৩ ॥
কুমুদ্বতী যথা সোমং দৃষ্ট্বা পুষ্পং
বিকাশতে।
তদ্বদ্দেবে কৃতা ভক্তির্মুক্তিদা
সর্ব্বদা নৃণাম্ ॥ ১৪ ॥
যথা নলস্য সংত্রস্তা ভ্রমরী
স্মরণং চরেৎ।
তেন স্মরণ-যোগেন নল-সারূপ্য-
তামিয়ৎ ১৫ ॥
গোপীভির্জ্জারবুদ্ধ্যা চ বিষ্ণোশ্চ
স্মরণং কৃতম্।
তাশ্চ সাযুজ্যতাং নীতাস্তথা বিষ্ণুং
স্মরাম্যহম্। ১৬ ॥

চন্দ্রকান্তমণি যদ্রূপ চন্দ্র-সংযোগে জল স্রাব করে, তদ্রূপ বৈষ্ণব সংযোগে শাশ্বতী ভক্তি উৎপন্ন হয়।১৩॥

কুমুদফুল যদ্রূপ চন্দ্র দর্শন করিয়া বিকশিত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করিলে মনুষ্য মুক্তি লাভ করিয়া থাকে।১৪।

যদ্রূপ নলের ত্রাসে ভ্রমরী তাহার স্মরণ করে ও সেই স্মরণ বশে তদাকারতা প্রাপ্ত হয়। ১৫।

গোপীগণ জার-বুদ্ধিতে বিষ্ণুর স্মরণ করিয়াছিলেন ও সেই স্মরণ-বলে বিষ্ণু-সাযুজ্যতা প্রাপ্ত হইলেন, তদ্রূপ আমিও বিষ্ণু স্মরণ করি॥১৬॥

কেহপিবৈ দুষ্টভাবেন ছদ্মভাবেন কেচন।
কে চাপি লোভভাবেন নিঃস্পৃহা-শ্চৈব কেচন।
ভক্ত্যা বা স্নেহভাবেন দ্বেষভাবেন বা পুনঃ ॥ ১৭ ॥
কেহপি স্বামিত্ব ভাবেন বুদ্ধ্যা বা বুদ্ধি-পূর্ব্বকৈঃ।
যেন কেনাপি ভাবেন চিন্তয়ন্তি জনার্দ্দনম্। ইহলোকে সুখং ভুক্ত্বা যান্তি বিষ্ণোঃ সনাতনম্। ১৮।
অহো বিষ্ণোশ্চ মাহাত্ম্যমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্।
যদৃচ্ছয়াহপি স্মরণং ত্রিধামুক্তি-প্রদায়কম্ ॥ ১৯ ॥

কেহবা দুষ্টভাবে, কেহবা ছদ্মভাবে, কেহবা লোভে, কেহবা স্পৃহভাবে, কেহ ভক্তিতে, কেহ স্নেহভাবে, কেহবা দ্বেষভাবে, কেহ স্বামিভাবে, কেহবা বুদ্ধিপূর্ব্বক, যিনি যে কোন ভাবে জনার্দ্দনকে চিন্তা করুন না কেন, তিনি ইহলোকে সুখ ভোগ করিয়া সনাতন বিষ্ণু লোকে গমন করিয়া থাকেন। অহো! বিষ্ণুর মাহাত্ম্য অদ্ভুত ও লোমহর্ষণ! যদৃচ্ছা ক্রমে স্মরণ করিলেও তিন প্রকারে মুক্তি লাভ হয়। ধন, ঐশ্বর্য্য কিম্বা বিপুল বুদ্ধিতে তাঁহাকে প্রাপ্ত

ন ধনেন সম্বন্ধেন নবৈ বিপুলয়া ধিয়া
একেন ভক্তি-যোগেন সমীপে দৃশ্যতে ক্ষণাৎ।
সান্নিধ্যেহপি স্থিতোদূরে নেত্রয়োঃ রঞ্জনং যথা ॥ ২০ ॥

হওয়া যায় না, একমাত্র ভক্তিযোগে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ দর্শন করিতে পারা যায়! তিনি নিকটে থাকিলেও দূরে থাকেন,—যেরূপ চক্ষের অঞ্জন।১৭—২০।

[শ্রীকৃষ্ণকে যিনি যে ভাবে চিন্তা করুন না কেন, তিনি তাঁহাকে সেই ভাবেই মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন, যথা—

গোপ্যঃ কামাৎ ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥
(শ্রীভাগবতে ৭ স্কন্ধে ১ অঃ ২৯)

শ্রীকৃষ্ণে বিদ্বেষ করিয়াও যদি মনুষ্য তাঁহার পদ লাভ করেন, তাহা হইলে তাঁহার পরায়ণজন যে তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

বিদ্বেষাদপি গোবিন্দং দমঘোষাত্মজঃ স্মরণ্।
শিশুপালো গতস্তত্ত্বং কিং পুনস্তৎ-পরায়ণঃ॥
(গরুড় পুরাণে ২৩৫ অধ্যায় ১৯)

এই নাম পরিহাসে, সঙ্কেতে, অনাদরে, হেলায় গ্রহণ করিলেও অশেষ পাপ নষ্ট হয়।

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভ-
হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠ নাম গ্রহণমশেষাঘ-
হরং বিদুঃ ॥১৪।
(শ্রীভাগবতে ৬ষ্ঠ স্কন্ধে—২ অধ্যায়ে।)

অন্যত্র পদ্মপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে ২৫ অধ্যায়ে—

নামৈকং যস্যবাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলংগতং বা। শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিত-রহিতং তারয়ত্যেব সত্যং ॥

একনাম প্রসঙ্গ ক্রমে যাঁহার বাক্যে, স্মরণপথে আইসে, অথবা শ্রবণমূলে আইসে, উহা শুদ্ধ, অশুদ্ধবর্ণ, ব্যবহিত রহিত হইলেও মনুষ্যকে তারণ করে, ইহা সত্য। ("ব্যবহিত রহিত" অর্থাৎ নারায়ণ শব্দ কিঞ্চিৎ উচ্চারণান্তর প্রসঙ্গক্রমে অন্য শব্দ ব্যবধান রহিত) এইজন্য অজামিল মৃত্যু-সময়ে পুত্রের নাম 'নারায়ণ' উচ্চারণ করিয়া বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, গোপীগণ জার-বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিয়াছিলেন। এ কথা সাধারণ বুদ্ধিতে দূষিত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। পাছে অন্যের সংশয় হয়, এইজন্য মহাত্মা পরীক্ষিৎও শুকদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু এ পাপ-সংশয় তাঁহার পবিত্র মনে কখনও উদয় হয় নাই, কারণ তিনি বিষ্ণুরাত নামে খ্যাত। নবধা ভক্তির মধ্যে শ্রবণে পরীক্ষিৎ শ্রেষ্ঠ।

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদ-
ভবদ বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে।
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রি-ভজনে
লক্ষ্মীঃ পৃথুপূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতি
র্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ।
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ
কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরং ॥
(পদ্যাবল্যাং।)

যিনি শ্রীকৃষ্ণ নাম শ্রবণ ও তাঁহার লীলা শ্রবণ জন্য সপ্তাহকাল নিরম্বু ছিলেন—

নৈষাতিদুঃসহাক্ষুন্মাং ত্যক্তো-
দমপিবাধতে।
পিবন্তংত্বন্মুখাম্ভোজ চ্যুতংহরি-
-কথামৃতম্ ॥
(১০।১স্ক ১অ ১১।)

সে পরীক্ষিতের মনে কখনও ঈদৃশ পাপ-সংশয়ের উদয় হইতে পারে না এবং যে শুকদেব—যাঁহার শ্রীকৃষ্ণনামে পদে পদে অশ্রু-পুলক প্রভৃতি সাত্বিক লক্ষণ হইতেছে, সে মহাত্মা শুকদেব যে শ্রীকৃষ্ণচরিতে অশ্রাব্য কথার যোজনা করিবেন, ইহা কখনও সম্ভবপর নহে। আমাদের পাপ-বুদ্ধি, সুতরাং পাপকথা—পাপসংশয় প্রথমেই মনে হয়; ভক্ত-হৃদয়ে কখনও এরূপ সংশয় হয় না। পাছে সভাস্থ অন্যের মনে পাপ-সংশয়-উদয় হয়, তজ্জন্যই পরীক্ষিৎ মহাশয়ও শুকদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন।—

সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়ে-
তরস্যচ।
অবতীর্ণোহি ভগবানংশেন
জগদীশ্বরঃ
সকথং ধর্ম্মসেতূনাং বক্তা কর্ত্তাভি
রক্ষিতা।

প্রতীপমাচরদ্ব্রহ্মণ্ পরদারাভিমর্ষণং ॥ ২৭ ॥
আপ্তকামো যদুপতিঃকৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতম্।
কিমভিপ্রায় এতন্নঃসংশয়ং ছিন্ধি সুব্রত ॥ ২৮ ॥

ইহাতে বৈষ্ণবতোষণী বলেন—

"তস্মাৎ 'তত্রক্যানাং কেষাঞ্চিৎ সন্দেহ বিতর্ক্য তেষামেব হিতার্থং তমুখাপ্য স্বসন্দেহব্যাজেন পৃচ্ছতি।"

তিনি নিজের সন্দেহ ছলে সেইস্থানে কোন কোন লোকের মনে সন্দেহ-তর্ক ধরিয়া, তাঁহাদের হিতার্থ প্রশ্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু এ সন্দেহ ভক্তের হৃদয়ে স্থান পায় না; ভক্তের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ বাস করিয়া থাকেন; সে পবিত্র স্থানে কখনও পাপ-সন্দেহ-উদয় হইতে পারে না। এইজন্য ভক্তের প্রাধান্য অধিক।

পৃথ্বী তাবদিয়ং মহৎসু মহতী-তদ্বেষ্টনং বারিধিঃ
পীতোঽসৌ কলসোদ্ভবেন মুনিনা স ব্যোম্নি খদ্যোতবৎ।
তদ্বিষ্ণো র্দনুজারিনাথমথনে-পূর্ণং পদংনাভবৎ।
তদ্দেবো বসতি ত্বদীয় হৃদয়ে তত্তো মহাত্মাপরঃ ॥ (১)

অর্থাৎ পৃথিবী অত্যন্ত বড়, কিন্তু তাহাকেও সপ্ত সমুদ্র বেষ্টন করিয়া আছে; ঐ সপ্ত সমুদ্রকেও অগস্ত্য মুনি পান করিয়াছিলেন, সেই মুনিও আকাশে খদ্যোতবৎ; সেই আকাশও বলি-মথনে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণপদ প্রাপ্ত হন নাই; (কারণ বলি রাজা ত্রিপদ-ভূমি শ্রীকৃষ্ণকে দান করিয়াছিলেন; একপদে মর্ত্ত ও অন্যপদে স্বর্গ, তৃতীয় পদের স্থান-অভাব হইয়াছিল); সেই দেব তোমার (কোন সাধুর) হৃদয়ে বাস করেন, সুতরাং সাধু অপেক্ষা মহৎ আর নাই।

তজ্জন্য পূজ্যপাদ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিয়াছেন "কর্ম্মিজ্ঞানিপ্রভৃতীনাং হৃদয়ে সন্দেহ সমুদ্ভূতমালক্ষ্য তদুচ্ছেদার্থং পৃচ্ছতি"—

কর্ম্মী ও জ্ঞানী প্রভৃতি লোকের হৃদয়ে সন্দেহ সমুদ্ভূত দেখিয়া, শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ সেই সন্দেহ দূর করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

সুতরাং কর্ম্মী ও জ্ঞানী পুরুষদিগের মাত্র এ সন্দেহ হইয়া থাকে; ভক্তের এ সন্দেহ হয়না; কারণ তিনি ভক্তের ধন। এক্ষণে দেখা যাউক যে, শ্রীকৃষ্ণ যে লীলা করিয়াছিলেন, তাহা কোন্ দেহের লীলা। তাহা কি প্রাকৃত দেহ অথবা অপ্রাকৃত দেহ; তাহা কি আমাদের ন্যায় মাংসাসৃক্‌পূযবিমূত্রস্নায়ুমজ্জাস্থিময় দেহ অথবা তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য চিন্ময় দেহ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

---

(১) এই শ্লোকটি আমার স্বর্গীয়া মাতাঠাকুরাণীর পিতৃস্বসার "গুরুমার" মুখে প্রথম শুনিয়াছিলাম। তাঁহার বার্দ্ধক্য বশতঃ সমুদয় কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারিনাই। যাহা বুঝিয়াছিলাম, লিখিলাম, কোন পাঠক মহোদয়ের এই শ্লোকটি জানা থাকিলে ও তাহা অশুদ্ধ বোধহইলে, কৃপাকরিয়া আমায় সংবাদ দিলে পরমোপকৃত হইব। এই শ্লোকটি এই ভাবেই হিন্দুপত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলাম।

ভ-গোল পরিচয়।

৫ম পাঠ—১ম প্রপাঠক।

তারা।

নাম।—পরিচয়ের সুবিধার জন্য পৃথিবীস্থ প্রত্যেক অট্টালিকা, পল্লী, গ্রাম, নগর, মহানগর, পৃথক্ পৃথক্ নাম পাইয়াছে। যথা বিশ্ববিদ্যালয় চেৎলা, কালীঘাট, ভবানীপুর, কলিকাতা এবং সন্নিহিত পল্লী, গ্রাম, নগর, মহানগর সংহতির দেশ-বাচক এক এক নাম হইয়াছে, যথা—বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা।

পরিচয়ের সুবিধার জন্য ভ-গোলের প্রধান প্রধান তারাগণের ও গুচ্ছক ও তারকাস্তবকের এবং বাষ্পস্তবকের নামকরণ হইয়াছে, যথা—ধ্রুবতারা, গুচ্ছক, কৃত্তিকা এবং তারকা-স্তবক; মধুচক্র, বাষ্পস্তবক, স্তবকরাজ্ঞী ইত্যাদি। প্রত্যেক সন্নিহিত তারাগণ, গুচ্ছক, তারকাস্তবক ও বাষ্পস্তবক-সংহতির এক এক মণ্ডলবাচকনাম আছে। যথা শিশুমার মণ্ডল, সপ্তর্ষি মণ্ডল ইত্যাদি। ভ-চক্রস্থিত ১২টী মণ্ডলের বিশেষ নাম রাশি এবং ঐ ১২টী মণ্ডল রাশি নামে পরিচিত। মেষরাশি, বৃষরাশি ইত্যাদি। ১২টী রাশির সাধারণ নাম ভ-গণ।

সংখ্যা।—ভ-গোলে চন্দ্র-সূর্য্য ব্যতীত যে সকল অগণ্য জ্যোতিষ্ক আছে, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে তাহাদের মধ্যে ৭১৯৯ তারা এবং কয়েকটী তারকাস্তবক এবং ২১১টী বাষ্পস্তবক মাত্র আমরা দেখিতে পাই। চাক্ষুষ দৃষ্টিতে তারাগুলির আকার টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানির মত, গুচ্ছকগুলির আকার বরট চক্রবৎ এবং তারাস্তবক ও বাষ্পস্তবকগুলির আকার মেঘখণ্ডবৎ, ধূমকেতুগুলির আকার সম্মার্জ্জনী বৎ। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে ভ-গোলের তারা-সংখ্যা ৩ সহস্র কোটি গণনা করা যায়।

জ্যোতিষ গণনা দ্বারা আমরা জানিতে পারি যে, ঘন আয়তনে পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্য চতুর্দ্দশ লক্ষগুণ বড়, এবং সূর্য্য অপেক্ষা বহুতর তারা অতি বৃহত্তর। কোন তারা সূর্য্যাপেক্ষা শতগুণ বড়, কোন তারা সূর্য্যাপেক্ষা সহস্রগুণ বড়।

ঘন আয়তন অনুসারে তারাগণ বিভাগ করিলে, দেখা যায় যে, মৃগব্যাধ লুব্ধক তারা, যোগতারা অভিজিৎ, পদতারা, প্রভাসতারা এবং যোগতারা শ্রবণা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এবং এই ১ম শ্রেণীর তারাগণ নীলাভ শ্বেত বর্ণ। এই ১ম শ্রেণীর তারাগণ উজ্জ্বলতম এবং অধিকতম চাকচিক্যময়। লুব্ধক ভ-গোলের শিরোমণি। আয়তনে লুব্ধক সূর্য্য অপেক্ষা অন্যূন ৫০০গুণ বড়।

ঘন আয়তন অনুসারে দ্বিতীয় শ্রেণীর তারাগণ পীত বর্ণ; এই দ্বিতীয় শ্রেণীর তারাগণ তাদৃশ চাকচিক্যময় নহে। সুতরাং ব্রহ্মহৃৎ তারা, যোগ তারা, রোহিণী ও স্বাতী প্রভৃতি এই শ্রেণীর তারা এবং আমাদিগের সূর্য্যও এই নিম্ন শ্রেণীর তারা।

৩য় শ্রেণীর তারাগণের পৃষ্ঠদেশ সাময়িক কলঙ্কে আবৃত হয় এবং ইহাদিগের কলঙ্কের সংখ্যা ও বিস্তৃতি অধিকতর। এ জন্য এই ৩য় শ্রেণীর তারাগণের উজ্জ্বলতার অধিকতর পরিবর্ত্তন ঘটে। কলঙ্কের প্রাদুর্ভাব হইলে তারা মলিন ও ম্লান হয়। আবার কলঙ্কের

অভাব হইলে,তারা উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করে। এই শ্রেণীর অধিকাংশ তারা বহুরূপ তারা। এই শ্রেণীর তারাগণ লোহিত বর্ণ, এবং সম্ভবতঃ আমাদের সূর্য্যাদি পীতবর্ণ তারা অপেক্ষা ইহাদের উত্তাপ ন্যূনতর।

তারা-জগতে এই তিন শ্রেণীর তারাই প্রধান ; চতুর্থ শ্রেণীর তারাগণ তাদৃশ উজ্জ্বল নহে। সুতরাং আমাদের সূর্য্যাপেক্ষা চতুর্থ শ্রেণীর তারাগণ অবশ্যই ঘন আয়তনে ক্ষুদ্রতর হইবে। জ্যোতির্ব্বিদ্যার উন্নতি সহকারে অপর এই শ্রেণীর তারা আবিষ্কৃত হইবেক। যতদূর আবিষ্কার হইয়াছে,তাহাতেই বিদিত হয় যে,তারাগণের নির্ম্মাণ-প্রকার এক নহে। গ্রহগণ মধ্যে যেমন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী আছে, সূর্য্যগণ (তারাগণ) মধ্যে তদ্রূপ নানাবিধ প্রকার-ভেদ আছে। আয়তন-ভেদ,অবস্থা-ভেদ,আলোক-ভেদ, উত্তাপ-ভেদ, বর্ণ-ভেদ, গতি ভেদ ইত্যাদি নানাবিধ ভেদ-লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

ঘন আয়তন অনুসারে তারাগণের তালিকা।

১ম শ্রেণী নীলাভ শুক্লবর্ণ।	১ম শ্রেণী নীলাভ শুক্লবর্ণ।	২য় শ্রেণী পীত বর্ণ।	৩য় শ্রেণী লোহিত বর্ণ।
লুব্ধক।	পুলস্ত্যতারা।	ব্রহ্মহৃৎ।	যোগতারা অনুরাধা।
যোগতারা অভিজিৎ।	পুলহ তারা।	যোগতারা স্বাতী।	যোগতারা আর্দ্রা।
পদ তারা।	অত্রি তারা।	যোগতারা রোহিণী।	মার তারা।
যোগতারা শ্রবণা।	বশিষ্ট তারা।	ধ্রুবতারা।	কালিয় তারা।
যোগতারা চিত্রা।	মরীচি তারা।		লোপামুদ্রা।
মৎস্যমুখ তারা।	অঙ্গিরা তারা।		
যোগতারা মঘা।			
বিষ্ণুতারা।			
স্পর্শমণি।			

চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষে চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারা প্রভৃতি সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সমস্তরে অবস্থিত বোধ হয়।

দূরত্ব।—জ্যোতিষ গণনা দ্বারা আমরা ইহাও জানিতে পারি যে, পৃথিবী হইতে চন্দ্র গড়ে ২৪০০০০ মাইল দূরে অবস্থিত, সূর্য্য প্রায় ১০ কোটী মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু তারাগণ কোনটী সূর্য্য অপেক্ষা শত গুণ দূরে,কোনটী সূর্য্য অপেক্ষা সহস্র গুণ দূরে, কোনটী সূর্য্য অপেক্ষা লক্ষ গুণ দূরে, কোনটীবা ৫০ লক্ষ গুণ দূরে অবস্থিত।

আলোক প্রতি ২॥ পলে (এক সেকেণ্ডে) ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল গমন করে। সূর্য্যের কিরণ পৃথিবীতে আসিতে ১৯ পল (৭॥ মিনিট) সময় লাগে। কিন্তু কোন তারা হইতে পৃথিবীতে আলোক আসিতে তিন বৎসর, কোন তারা হইতে ৪ বৎসর, কোন তারা

হইতে দশ বৎসর, কোন তারা হইতে বিশ বৎসর, কোন তারা হইতে ত্রিশ বৎসর, কোন তারা হইতে ৪০ বৎসর, কোন তারা হইতে প্রায় ৫০ বৎসর সময় লাগে। আবার কোন তারা হইতে পৃথিবীতে আলোক আসিতে শত-সহস্র বৎসর লাগিতে পারে! ইহাতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, মানবের চাক্ষুষ দৃষ্টি অতি ক্ষীণ। তিন সহস্র কোটী তারা মধ্যে আমরা ৭১৯১টী তারা মাত্র দেখিতে পাই। পৃথিবী অপেক্ষা শত সহস্রগুণ বড় জ্যোতিষ্ককে আমরা সিকি দুয়ানির আকারে দেখি; এবং শত সহস্র কোটী মাইল দূরস্থিত তারাকে আমরা ২ লক্ষ ৪০ হাজার মাইল দূরস্থিত চন্দ্রের সমদূরে দেখি।

পৃথিবীর সন্নিহিত তারাগণের দূরত্বের তালিকা।

তারার নাম।	দূরত্বের পরিমাণ, সূর্য্য দূরত্বের কতগুণ।	তারা হইতে পৃথিবীতে আলোক আসিবার সময়।	দূরত্বের মাইল।
জয় তারা।	২ লক্ষ ৭৫ হাজার।	৪· ৩ বৎসর।	২৫½ শত কোটি।
৬১ বকমণ্ডল।	৪ ,, ৬৯ ,,	৭· ৪ ,,	৪৩½ ,,
লুব্ধক।	৬ ,, ২৫ ,,	৯. ৯ ,,	৫৮ ,,
প্রভাস তারা।	৭ ,, ৬১ ,,	১২. ,,	৭০½ ,,
যোগতারা রোহিণী।	৮ ,, ৭৪ ,,	১৩· ৮ ,,	৮১ ,,
যোগতারা শ্রবণা।	১০ ,, ৮৬ ,,	১৭· ১ ,,	১০৩ ,,
যোগতারা অভিজিৎ।	১৩ ,, ৭৩ ,,	২১· ৭ ,,	১২৭ ,,
ব্রহ্মহৃৎ তারা।	১৮ ,, ৭৫ ,,	২৯· ৬ ,,	১৭৪ ,,
যোগতারা স্বাতী।	২১ ,, ৯৪ ,,	৩৬· ,,	২০৩ ,,
ধ্রুব তারা।	২৩ ,, ১৮ ,,	৩৬· ,,	২১৫ ,,

পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তন হেতু আমরা চন্দ্র, সূর্য্য ও তারাগণের যে দৈনিক গতি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে অনুভব করি এবং স্বীয় কক্ষায় পৃথিবীর বার্ষিক গতিদ্বারা তারাগণের অবস্থিতি স্থানের যে বৈলক্ষণ্য আমরা অনুভব করি, তদ্ভিন্ন সূর্য্য ও তারাগণের কোন গতি আমরা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে দেখিতে পাই না। কিন্তু প্রাচীন জ্যোতিষ গ্রন্থে ভ-গোলে তারাগণের যে গতি, অবস্থিতি-স্থান বর্ণিত আছে, সেই অবস্থিতি-স্থানের সহিত ভ-গোলের তারাগণের বর্ত্তমান অবস্থিতি-স্থান তুলনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, তারাগণ স্থানান্তরিত হইয়াছে। সুতরাং অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তারাগণের গতি আছে এবং দূরবীক্ষণাদি যন্ত্রের সাহায্যে ক্রমাগত পর্য্যবেক্ষণ করিলেও সূর্য্য ও তারাগণের গতির প্রত্যক্ষ হয়। কয়েকটী প্রধান তারার গতির তালিকা সংযোজিত হইল।

তারাগণের গতির তালিকা

তারার নাম।	প্রতি সেকেণ্ডে গতির পরিমাণ কত মাইল।
ধ্রুব তারা।	২৭
ব্রহ্মহৃৎ।	৩০
লুব্ধক।	৩২
৬১ বক মণ্ডল।	৪০
যোগতারা অভিজিৎ।	৫০
যোগতারা স্বাতী।	৭০

স্থূলত্ব।—তারাগণের জ্যোতির উজ্জ্বলতাকে স্থূলত্ব বলে, তারাগণের স্থূলত্বের তারতম্য অনুসারে তারাগণকে বিংশতি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা জ্যোতির্ম্ময় তারাগুলি প্রথম শ্রেণীভুক্ত। এই শ্রেণীর তারাগণ সর্ব্বপ্রধান। প্রথম শ্রেণীর তারা অপেক্ষা নিকৃষ্ট জ্যোতির্ম্ময় তারাগণকে ২য় শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। এইরূপে জ্যোতির তীব্রতা ও ক্ষীণতা মূলে ৩য় শ্রেণী, ৪র্থ শ্রেণী ৫ম, শ্রেণী ৬ষ্ঠ শ্রেণী, ৭ম শ্রেণী, ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১শ, ১২শ, ১৩শ, ১৪শ, ১৫শ, ১৬শ, ১৭শ, ১৮শ, ১৯শ ও ২০তি শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১ম শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর তারাগণ মানবের চক্ষুর গোচর। ১ম শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর তারা সংখ্যা ৭২৯১ মাত্র। সুতীব্র চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি ৬.৫ স্থূলত্ব পর্য্যন্ত দর্শনক্ষম।

স্থূলত্ব অনুসারে তারাগণের তালিকা।

প্রথম শ্রেণী।		দ্বিতীয় শ্রেণী।		তৃতীয় শ্রেণী।	
তারার নাম।	স্থূলত্ব।	তারার নাম।	স্থূলত্ব।	তারার নাম।	স্থূলত্ব।
লুব্ধক।	—১.৪	যোগতারা পুনর্ব্বসু।	১.১	যোগতারা উঃ ভাঃ।	২.১
যোগতারা স্বাতী।	০.১	যোগতারা চিত্রা।	১.২	যোগতারা অশ্বিনী।	২.১
যোগতারা অভিজিৎ।	০.২	যোগতারা মঘা।	১.৪	সৌম্য ধ্রুবতারা।	২.২
ব্রহ্মহৃৎ।	০.২	যোগতারা মূলা।	১.৭	যোগতারা উঃ ফাঃ।	২.২
অগস্ত্য।	০.৪	আশ্বিনী তারা।	১.৯	যোগতারা উঃ আঃ।	২.৩
যোগতারা আর্দ্রা।	০.৯	অঙ্গিরা তারা।	১.৯	বশিষ্ঠ তারা।	২.৪
যোগতারা রোহিণী।	১.০	ক্রতু তারা।	২.০	পুলহ তারা।	২.৬
যোগতারা অনুরাধা।	১.০	মরীচি তারা।	২.০	পুলস্ত্য তারা।	২.৬
যোগতারা শ্রবণা।	১.০			যোগতারা উঃ পূঃ ভাঃ	২.৬
				যোগতারা পূঃ ফাঃ।	২.৮
				যোগতারা হস্তা।	২.৮
				যোগতারা পূঃ আঃ।	২.৮

৪র্থ—৬ষ্ঠ শ্রেণী।	স্ফুলত্ব।	৪র্থ—৬ষ্ঠ শ্রেণী।	স্ফুলত্ব।
যোগতারা অশ্লেষা।	৬.৩	যোগতারা ভরণী।	৩.৮
অত্রি তারা।	৩.৪	যোগতারা পুষ্যা।	৩.৫
যোগতারা মৃগশিরা।	৩.৫	যোগতারা রেবতী	৫.১
যোগতারা ধনিষ্ঠা।	৩.৭	অরুন্ধতী।	৬.
যোগতারা শতভিষা।	৩.৮		

৭ম শ্রেণী হইতে ২০তম শ্রেণীর তারা মানব-চক্ষুর অগোচর, তবে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মানব-দৃষ্টির গোচর হয়। প্রত্যেক শ্রেণীর তারা-সংখ্যার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

প্রথম হইতে বিংশতিতম শ্রেণীর তারা সংখ্যার তালিকা।

তারার শ্রেণী।	তারার সংখ্যা।	তারার শ্রেণী।	তারার সংখ্যা।
১	২০	১১	১০০০০০০
২	৫৯	১২	৩০০০০০০
৩	১৮২	১৩	১০০০০০০০
৪	৫৩০	১৪	৩০০০০০০০
৫	১৬০০	১৫	৯০০০০০০০
৬	৪৮০০	১৬	২৭০০০০০০০
৭	১৩৮০০	১৭	৮২০০০০০০০
৮	৪০০০০	১৮	২৫০০০০০০০০
৯	১০০০০০	১৯	৭০০০০০০০০০
১০	৪০০০০০০	২০	২২০০০০০০০০০

সবর্ণ তারা।—শুভ্র বর্ণ ভিন্ন অন্য বর্ণে রঞ্জিত তারাকে সবর্ণ তারা বলে।

সবর্ণতারা-তালিকা।

নীলবর্ণ।	পীত বর্ণ।	লোহিত বর্ণ।
যোগতারা অভিজিৎ।	সূর্য্য।	যোগতারা অনুরাধা।
বিষ্ণুতারা।	ব্রহ্মহৃৎ।	যোগতারা আর্দ্রা।
	যোগতারা রোহিণী।	কালিয়তারা।
	যোগতারা স্বাতী।	লোপামুদ্রা তারা।

নৈসর্গিক কারণে তারাগণের জ্যোতি ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে, ইহাই বাস্তব হ্রাসতা। আবার পৃথিবীর স্বীয় কক্ষায় পরিভ্রমণ জন্য তারাগণের দূরত্বের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, আমরা তারাগণের জ্যোতির তারতম্য অনুভব করি এবং দৈনিক আবর্ত্তনকালে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে লগ্ন-বিন্দু হইতে পূর্ব্ব চক্র পাদবিন্দু পর্য্যন্ত ভ্রমণকালে জ্যোতিষ্ক মাত্রের জ্যোতি

ক্রমে গাঢ়তর হয়, এবং পূর্ব্বচক্র পাদবিন্দু হইতে তুঙ্গ-রেখা পর্য্যন্ত অধিরোহণকালে তারাগণের জ্যোতি ক্রমে ক্ষীণ হইতে থাকে। তুঙ্গ-রেখা হইতে পশ্চিম চক্রপদ-বিন্দু পর্য্যন্ত অবরোহণ কালে তারাগণের জ্যোতি পুনর্ব্বার ক্রমে গাঢ়তর হইতে থাকে এবং পশ্চিম চক্রপাদ বিন্দু হইতে অস্তবিন্দু পর্য্যন্ত তারাগণ নিমজ্জন কালে ক্রমে ম্লান হইতে থাকে। যে বায়ুরাশি পৃথিবী বেষ্টন করিয়া আছে, ঐ বায়ুরাশি তারাগণের জ্যোতির ক্ষীণতার কারণ, এবং তারাগণের এই জ্যোতি-পরিবর্ত্তন অবাস্তব।

কিন্তু সময় ভেদে কোন কোন তারার স্থূলত্বের বিশেষ ন্যূনাধিক্য দৃষ্ট হয়। এমনকি প্রথম শ্রেণীর তারা প্রথম শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে নামিয়া যায়; এবং সময়ে সেই তারা পুনরায় ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণীতে আরোহণ করে। এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল তারা-গণকে বহুরূপ তারা বলে। বহুরূপ তারা ৪ ভাগে বিভক্ত।

১। প্রথমতঃ যে বহুরূপ তারার জ্যোতির তীব্রতা ও ক্ষীণতা চন্দ্রের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে রীতিমত দৃষ্ট হয়; যথা পরশুমণ্ডলে মায়াবতী তারা। এই প্রথম ভাগের তারা প্রায় উজ্জল অবস্থায় থাকে। অল্প সময়ের জন্য ক্ষীণপ্রভ হয়।

২। দ্বিতীয়তঃ বহুরূপ তারা নির্দ্দিষ্ট সময়ে রীতিমত উজ্জল ও ম্লান হয়; কিন্তু কিছু দিন মাত্র উজ্জল থাকে। সময়ে অদৃশ্যভাব ধারণ করে, বলিতে হয়। যথা—তিমি-মণ্ডলের মার তারা।

৩। তৃতীয়তঃ বহুরূপ তারা প্রায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে রীতিমত উজ্জল ও ম্লান হয় বটে, কিন্তু প্রতিবারে স্বীয় নিম্নতম শ্রেণীতে অবরোহণ করে না, অথবা প্রতিবারে স্বীয় উচ্চতম শ্রেণীতে আরোহণ করেনা। অর্থাৎ একবারে যে ঔজ্জল্য ধারণ করে, পরবারে তাহার ন্যূনতর ঔজ্জল্য প্রাপ্ত হয়; এবং একবারে যেরূপ ম্লান হয়, পরবারে তত ম্লান হয় না, যথা—শূলফল।

৪। চতুর্থতঃ বহুরূপ তারা অনির্দ্দিষ্ট সময়ে অনিয়মিত ভাবে উজ্জল ও ম্লান হয়। জ্যোতির পরিবর্ত্তনের সীমা অধিক, যথা—মরীচি তারা।

বহুরূপ তারার তালিকা।

১ম শ্রেণী।	মায়াবতী।	পরশুমণ্ডল।	স্থূলত্ব পরিবর্ত্তন ২·২ হইতে ৩·৭ পর্য্যন্ত।	৩দিন।
	রেণুকা।		৩·৪ ······ ৪·১ ······	
২য় শ্রেণী।	মার	তিমি মণ্ডল।	স্থূলত্ব পরিবর্ত্তন ১·৭ হইতে ৯·৫ পর্য্যন্ত।	৩৩১দিন
	লোপামুদ্রা।	সুবর্ণ মণ্ডল।	৫·০ ······ ৬·৫ ······	
৩য় শ্রেণী।	শূলফল।	বীণা মণ্ডল।	১·০ ······ ৭·০ ······	৭০বৎসর
৪র্থ শ্রেণী।	মরীচি।	অর্ণবযান মণ্ডল।	স্থূলত্ব পরিবর্ত্তন ৩·৪ হইতে ৪·৫ পর্য্যন্ত।	২৩দিন

ভূগোলের কোন কোন তারা সময়ে তীব্র জ্যোতির্ম্ময় রূপ ধারণ করিয়া সুদৃশ্য হয়; আবার কখনও সেই তারা অদৃশ্য হয়। এই তারাগণকে সাময়িক বা নবতারা বলে। সাময়িক তারাগণের দর্শনাদর্শনের কারণ অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। সাময়িক তারার সহিত, দ্বিতীয় শ্রেণীর বহুরূপ তারার অনেক সৌসাদৃশ্য আছে।

সাময়িক তারার তালিকা।

তারার নাম।	যে মণ্ডলে স্থিত।
টাইকো।	কাশ্যপীয় মণ্ডল।
কেপলার।	সর্পধারী মণ্ডল।
চিন্তামণি।	উঃ কিরীট মণ্ডল।

টাইকো তারা ১৫৭২ খৃঃ অব্দে কাশ্যপীয় মণ্ডলে আবির্ভূত হয় এবং লুব্ধক তুল্য তেজস্বী হয়। ১৫৭৩ সালে মার্চ্চ মাসে এই তারা পীত বর্ণ ধারণ করিয়া ক্ষীণ হইতে আরম্ভ করে এবং এক বৎসর পরে রক্তবর্ণ অবস্থায় বিলীন হয়। এই তারাকে মধ্যদিনে তীব্র চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি দেখিতে পাইতেন।

কেপলার ১৬০৪ খৃঃ অব্দে আবির্ভূত হয়। ১৬০৬ সালের মার্চ্চ মাসে ইহার তিরোভাব হয়।

খৃঃ অঃ ১৮৬৬ সালে মে মাসে চিন্তামণির উদয় হয়। এবং ৫ সপ্তাহ মধ্যে ২য় শ্রেণী হইতে ৯ম শ্রেণীতে অবনত হইয়াছে।

৫ম পাঠ। ২য় প্রপাঠক।

যৌগ তারা।

আমরা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে যত তারা দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে কতকগুলি তারা যদিও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে একটী দেখায়, কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা দেখিলে প্রকাশ হয় যে, দুই, তিন, চারি, পাঁচটী তারা একত্রীভূত হইয়া একটী মাত্র দেখায়। জ্যোতির্বিদ্ হক্ সাহেব ১৬৬৪ খৃঃ অশ্বিনী নক্ষত্রের রশ্মি তারা-দূরবীক্ষণে দর্শন করিয়া দ্বিতারকময় দেখেন। এইরূপ তারা সংহতিকে যৌগতারা বলে। জগতে বহুতর যৌগতারা আছে। তাহাদের সংখ্যা সহস্রাধিক। যৌগতারা তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ১। দ্রষ্টব্য যৌগতারা। ২। তারা-জগৎ। ৩। সৌরতারা-জগৎ।

দ্রষ্টব্য যৌগতারা দ্বয়ের মধ্যে কোন নৈসর্গিক সম্বন্ধ নাই। কেবল প্রায় এক ধ্রুবক ও বিক্ষেপে পরস্পর বহু দূরে স্থিত তারাদ্বয় মানবের ক্ষীণ দৃষ্টিতে এক তারা বলিয়া বোধ হয়। তারা-জগতে দুই তুল্য প্রকাণ্ড তারা উভয়ের সাধারণ ভারকেন্দ্র পরিভ্রমণ করে, এই তারা সংহতি প্রকৃত যৌগ তারা। যথা নাভিতারা, সৌরতারা-জগৎ। যখন কোন তারা বা তারাগণ কোন প্রকাণ্ড তারা পরিভ্রমণ করে, ঐ তারা-সংহতিকে সৌর-যৌগতারা-জগৎ বলে, এবং পরিভ্রমণকারী তারা বা তারাগণকে তারাগ্রহ বলে। যথা লুব্ধকের তারাগ্রহ।

তারা-জগতের ও সৌরতারা-জগতের তারাগণ প্রায়শঃ মনোহর বর্ণে রঞ্জিত; কিন্তু পরস্পর সুরঞ্জক বর্ণে রঞ্জিত। তারাজগৎ ও সৌর তারাজগতের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

যৌথতারার তালিকা।

যৌথ তারার নাম।	মণ্ডল বা রাশি।	স্থূলত্ব।	তারার সংখ্যা।	পরিভ্রমণ-কাল।	
জয় তারা।	মহিষাসুর।	১.০ + ২.০	২	৭৭.৪	বৎসর।
বিষ্ণু তারা।	কর্কট রাশি।	২.৫ + ২.৮	২	৯৯৭	"
নাভিতারা।	কন্যারাশি।	৩.০ + ৩.২	২	১৮৫	"
স্কন্ধতারা।	সিংহরাশি।	২.০ + ৩.৫	২	৪০৭	"

গুচ্ছক।

ভ-গোল পর্য্যবেক্ষণ করিলে ভ-গোলের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকামালা সমবেত-ভাবে স্থিত দৃষ্ট হয়। এই সমবেত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকা-মালাকে গুচ্ছক বলে। গুচ্ছক মধ্যে কৃত্তিকা উজ্জ্বলতম। এই মনোহর গুচ্ছক বৃষ রাশিতে অবস্থিত। চাক্ষুষ দৃষ্টিতে কৃত্তিকা-গুচ্ছকে সাতটী মাত্র তারা দেখাযায়, কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ৪০০ তারা গণনা করা যায়।

গুচ্ছক-তালিকা।

গুচ্ছক নাম।	যে মণ্ডলে বা রাশিতে স্থিত।	গুচ্ছকের পাশ্চাত্য নাম।
কৃত্তিকা।	বৃষ রাশি।	Pleiades.
করিমুণ্ড।	করিমুণ্ড মণ্ডল।	Coma.
চিত্ররথ।	পরশু মণ্ডল।	M 34.
ভরবারি।	কালপুরুষ মণ্ডল।	1376.

স্তবক।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা ভ গোল পর্য্যবেক্ষণ করিলে অসংখ্য স্তবক দৃষ্টিগোচর হয়। কতক-গুলি স্তবক অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকাময়। এই স্তবকগুলিকে তারকাস্তবক বলে। তারকা-স্তবকগুলি দূরবীক্ষণে অতি মনোহর দেখায়। অপর স্তবকগুলি দূরবীক্ষণের অভেদ্য। এই স্তবকগুলি বাষ্পময় বলিয়া প্রতীতি জন্মে। এজন্য ইহাদিগকে বাষ্প-স্তবক বলিতে হয়। কিন্তু সময়ে বিজ্ঞানের উন্নততর অবস্থায় এই স্তবকগুলি কি দাঁড়ায়, কেহই বলিতে পারে না। বাষ্পস্তবক সংখ্যা সপ্ত সহস্রাধিক। প্রধান প্রধান তারকাস্তবকের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

তারাস্তবক-তালিকা।

নাম।	কোন্ মণ্ডলে বা রাশিতে স্থিত।	সন্নিহিত তারা-সংখ্যা ও নাম।	পাশ্চাত্য নাম।	পাশ্চাত্য চিহ্ন।	মন্তব্য।
	কাশ্যপীয় মণ্ডল।	,৪		M 103.	
	পরশুমণ্ডল।			212. 221.	
	মিথুন রাশি।	৭, ইলবলা ২।		M 35.	

নাম।	কোন্ মণ্ডলে বা রাশিতে স্থিত।	সন্নিহিত তারা-সংখ্যা ও নামে।	পাশ্চাত্য নাম।	পাশ্চাত্য চিহ্ন।	মন্তব্য।
মধুচক্র।	কর্কট রাশি।	৩, সুমিত্রা।	Bee-hive.		
	হরকুলেশ মণ্ডল।	৭		M. 31.	
		২		H52.	চক্ষুষদৃশ্য।
	মহিষাসুর মণ্ডল।	৭		H.3531.	চাক্ষুষদৃশ্য।

আকার ভেদে বাষ্পস্তবকগুলি ৬ শ্রেণীতে বিভক্ত। ১। বৃত্ত-আকার। ২। ডিম্ব-আকার। ৩। অঙ্গুরীয়ক-আকার। ৪। চূড়া-আকার। ৫। বক্র-আকার। ৬। বিবিধ-আকার। প্রধান প্রধান বাষ্পস্তবকের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

বাষ্পস্তবক-তালিকা।

নাম।	কোন্ মণ্ডলে বা রাশিতে স্থিত।	সন্নিহিত তারার নাম।	পাশ্চাত্য নাম।	পাশ্চাত্য চিহ্ন।	মন্তব্য।
রাজ্ঞীস্তবক।	ধ্রুবমাতা মণ্ডল।	মীনমুখ তারা।	Queen.	M31.	চাক্ষুষদৃশ্য।
জটাভার-স্তবক।	সারমেয় যুগল-মণ্ডল।	মরীচি তারা।	Spiral.	M51.	
অঙ্গুরীয়ক-স্তবক।	বীণা মণ্ডল।	শূলকনং তারা।	Annular.	M57.	
ডম্বরু।	শৃগাল মণ্ডল।	বকমুখতারা।	Dumb Bell.	M.27	
কুলীরক।	বৃষ রাশি।	ইলবলা ১তারা।	Crab.	M1.	
পুলি।	সিংহরাশি।	অর্জ্জুন তারা।		M65. 66.	
জটাভার।	কন্যারাশি।		Spiral.	M88.	
বৃহৎ।	কালপুরুষ মণ্ডল।	৮	Great.	M42.	

ছায়াপথ।

সুনির্ম্মল কৃষ্ণ-রাত্রিতে ভ-গোল দর্শন করিলে ভ গোলের এই শুভ্র মেখলা অনায়াসে দৃষ্টিগোচর হয়। এই শুভ্র মেখলার বিস্তৃতি স্থূল দৃষ্টিতে গড়ে আট হাত। এই সুবিমল দুগ্ধফেণনিভ স্নিগ্ধ-জ্যোতিষ্মতী মেখলা দেবপথ, ছায়াপথ নভঃসরিৎ, সোমধারা এবং বিরজা নামে প্রসিদ্ধ। ইহা উপনীতরূপে বিশ্ব বেষ্টন করিয়াছে। উত্তর ভ-গোলে ছায়াপথ মিথুন রাশি হইতে আরম্ভ করিয়া বৃষ রাশি, ব্রহ্ম মণ্ডল, কাশ্যপীয় মণ্ডল, শেফমণ্ডল, বকমণ্ডল, বা মণ্ডল ভেদ করিয়া শ্রবণা নক্ষত্রে উপনীত হইয়াছে এবং দক্ষিণ-গোলার্দ্ধে সর্পমণ্ডল হইতে ধনু রাশি, বৃশ্চিক রাশি, বেদী মণ্ডল, মহিষাসুর মণ্ডল, ত্রিশঙ্কু মণ্ডল, অর্ণবযান মণ্ডল, লুব্ধক মণ্ডল ভেদ করিয়া মিথুন রাশিতে আসিয়া মিশিয়াছে।

অতি প্রাচীন কাল হইতে ছায়াপথ মানবজাতির মন আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে, এবং সকল জাতিই ছায়াপথের তত্ত্ব

নিরূপণের যত্ন করিয়াছে। শতাব্দী হইতে শতাব্দী বৈজ্ঞানিকগণ এই বিচিত্র বিস্ময়কর ছায়াপথের তথ্য অনুসন্ধানে বিস্তর গবেষণা করিয়াছেন এবং প্রতি রাত্রে ছায়াপথ বৈজ্ঞানিকের খ-বিন্দু আচ্ছাদন করিয়াছে; কিন্তু ইহার তত্ত্ব-নির্ণয় হয় নাই। ইদানীন্তন কালে জ্যোর্ব্বিদের পর জ্যোতির্ব্বিদ দুর-বীক্ষণের পর দূরবীক্ষণ দ্বারা ছায়াপথ লক্ষ্য করিয়াছেন; কিন্তু বিশ্ব-জগতের এই প্রকাণ্ড বন্ধনের তাৎপর্য্য গ্রহন করিতে পারেন নাই। প্রাচীনগণ কেহ কেহ কল্পনা করিয়াছেন যে; ছায়াপথই স্বর্গ। প্রাচীন গ্রীকগণ ছায়াপথ অগণ্য ক্ষুদ্র তারকা-নির্ম্মিত অবধারণ করিয়া বিলক্ষণ বিচক্ষণতা প্রদর্শন করিয়াছেন। রোমক কবি ওবিদ ছায়াপথের যে বর্ণনা করিয়াছেন,ঐ বর্ণনা ইদানীন্তন বৈজ্ঞানিকের শ্লাঘাজনক; যথা—

পত্তন তারকা কুলে সুবিস্তীর্ণ পথ
অবাধে লইবে তোমা বজ্রীর সদন।

প্রাচীন হিন্দুগণ ছায়াপথকে দেব-পথ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই কবি-কল্পনা লক্ষ্যভেদী হইলেও ইহা কল্পনা মাত্র। ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে মানব স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে অদ্ভুত দূরবীক্ষণ যন্ত্রের বলে ছায়াপথের রহস্য-ভেদ হইবেক। জগৎ-পূজ্য রোমক গালিলীয় চিরস্মরণীয় নবনির্ম্মাণে দূরবীক্ষণ প্রস্তুত করিয়াছেন; তাই আজ ছায়াপথের রহস্য-ভেদ হইয়াছে। এক্ষণে সকলেই দূরবীক্ষণের সাহায্যে দেখিতে পারেন যে, দুগ্ধফেণনিভ ছায়াপথ অগণ্য অস্ফুটপ্রভ তারকাবলী মাত্র। জগৎবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ স্যার উইলিয়ম হর্শেল গণনা দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন যে, ছায়াপথে দুই কোটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকা আছে। কিন্তু তথাপি ছায়াপথের কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ সুতীক্ষ্ণদূরবীক্ষণও সমুৎকীর্ণ করিতে পারে নাই।

ছায়াপথ স্তরবৎ দেখাইলেও ইহার তারকা-কণাগুলি ভূগোলের দৃশ্য তারকা-মালা হইতে পরস্পর বহু বিচ্ছিন্ন; এবং দূরত্ব প্রতি লক্ষ্য করিয়া সহজেই অনুমান করা যায় যে, ছায়াপথের সহিত তুলনা করিলে, আমাদিগের এই প্রকাণ্ড সৌর জগৎ সমুদ্র তুলনায় শিশির-বিন্দু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র-তর! এবং এই ধূলিকণা সদৃশ পৃথিবীতে যখন দুইশত কোটী বুদ্ধিমানজীব বাস করিতেছে, তখন এই অসীম প্রকাণ্ড ছায়াপথ কেবল আবর্ত্তনে শোভা বিতরণ জন্য সৃষ্ট হইয়াছে,কোন জীবের আবাসভূমি নহে, ইহা কে বলিতে পারে?

ছায়াপথ মধ্যস্থিত শনৈশ্চর গ্রহ ছায়াপথ হইতে নির্গমন করিয়া গ্রহ বলিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছিল,তদবধি এই গ্রহের নাম ছায়াপুত্র।

(ক্রমশঃ)

পঞ্চদশী।

ভূতবিবেক।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

সদদ্বৈতাৎ পৃথগ্ভূতে দ্বৈতে
ভূম্যাদিরূপিণি। তত্তদর্থ ক্রিয়া
লোকে যথাদৃষ্টা তথৈবসা ।।৯৩।।

টীকা। ননু ভূম্যাদিনাং অসত্ত্বে বিদুষাং ব্যবহার লোপঃ প্রসজ্যেত ইত্যাশঙ্ক্য

বিবেকেন মিথ্যাত্বে নিশ্চয়েঽপি ভূম্যাদেঃ স্বরূপ মর্দনা ভাবায় ব্যবহারো• লুপ্যতে-, ত্যাহ সদদ্বৈতাদিতি। । ৯৩॥

বঙ্গানুবাদ। সৎ অদ্বৈত হইতে পৃথক্ করিলে ভূম্যাদি দ্বৈত অর্থাৎ মিথ্যা প্রমাণিত হয়; তাহা হইলেও উহাদিগের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেরূপ লৌকিক ব্যবহার আছে, তাহাই থাকুক, অর্থাৎ লৌকিক ব্যবহারে দোষ হয় না ॥ ৯৩॥

উপরোক্ত ৯৩ শোকেব ত ৎপর্যার্থ।

সবিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক তত্ত্ব-নির্ণয় দ্বারা সৎস্বরূপ অদ্বৈত পদার্থ হইতে আকাশাদি ভূত ও ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থকে পৃথক্ করিলে, ভূত ও ভৌতিক পদার্থের অনিত্যত্ব বা মিথ্যাত্ব বর্ণিত হয়। কিন্তু এইরূপ মিথ্যাত্ব বর্ণিত হইলেও, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ যে ভূত ও ভৌতিক পদার্থের সত্তাব্যবহার কবিয়া থাকেন, এইরূপ ব্যবহারিক বিষয়ের ব্যবহারেও কোন ব্যাঘাত ঘটে না। কারণ, আকাশাদি পঞ্চভূত ও ব্রহ্মাণ্ডাদি ভৌতিক পদার্থের মিথ্যাত্বরূপে পরিজ্ঞান হইলেও, তাহারা বিদ্যমান থাকে; অতএব পণ্ডিতবর্গের ব্যবহার হইতে কোন বাধা নাই, সুতরাং তাঁহারাও যে অসদ্বস্তুর সত্তা ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং এইপ্রকার ব্যবহারও যে হইতে পারে, তাহাও নির্দ্দিষ্ট হইল ॥৯৩॥

সাংখ্য কাণাদবৌদ্ধাদ্যৈর্জগ-ন্তেদো যথা যথা। উৎপ্রেক্ষতে-ঽনেকযুক্ত্যা ভবত্বেষ তথা তথা। ॥৯৪॥

টীকা। নম্বুতত্ত্বস্যাদ্বৈতরূপত্বে সাংখ্যাদিভিরভিধীয়মানস ভেদস্য কুতো নিরাসঃক্রয়ঃ ইত্যাশঙ্ক্য ব্যবহারিক ভেদস্য অস্মাভিরভ্যুপগতত্বায় নিরাসায় প্রযত্যত ইত্যাহ সাংখ্যকাণাদবৌদ্ধাদ্যৈরিতি ॥৯৪॥

বঙ্গানুবাদ। সাংখ্য, কাণাদ ও বৌদ্ধগণ বিবিধ যুক্তি দ্বারা যেরূপ জগদ্ভেদ করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভেদ হউক।

উপরোক্ত ৯৪ শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ।

সাংখ্যমতবাদী, কণাদমতাবলম্বী ও বৌদ্ধবাদীরা বিবিধ যুক্তিপ্রদর্শন দ্বারা যে যে প্রকারে জগতের সত্তাভেদ নিরূপণ করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহারা করুন, কিন্তু সেই সকল সাংখ্যবাদী প্রভৃতিকে পরাস্ত করিবার নিমিত্ত আমাদিগের কোন বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়া বৃথা প্রয়াসের প্রয়োজন নাই। ব্যবহারিক বিষয়ে কোন বাদীর সহিত আমাদিগের বিবাদ নাই, এই নিমিত্ত ব্যবহারিক বিষয়ে আমরা বিবাদের ইচ্ছা করি না; কেবল পারমার্থিক সত্তার বিচার করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য এবং তদ্বিষয়ে আমরা সবিশেষ যত্নবান্ হইয়া থাকি। লৌকিক ব্যবহারে প্রত্যেক ব্যক্তির মতের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহাতে পরমার্থের কোন হানি হয় না। সেই জন্য আমরা পরমার্থ স্থির রাখিতে যত্নবান আছি; লৌকিক ব্যবহারে দৃষ্টিপাত করিনা ॥৯৪॥

অবজ্ঞাতং সদদ্বৈতং নিঃশঙ্কৈরন্য-বাদিভিঃ। এবংকা ক্ষতিরস্মাকং তদ্বৈতমবজানতাং। ৯৫ ॥

টীকা। নম্বু প্রমাণ সিদ্ধস্য সতত্ত্বভেদস্যাব জ্ঞানুপপন্না ইত্যাশঙ্ক্যাহ অবজ্ঞাতমিতি

যথা অদ্বয়বাদিভিঃ সাংখ্যাদিভির্নিঃশঙ্কৈঃ শ্রুত্যাদিসিদ্ধস্যাপি সদদ্বৈতস্যাবজ্ঞা ক্রিয়তে তথা শ্রুতি-যুক্ত্যনুভবাবষ্টম্ভেনাস্মাকং তদীয় দ্বৈতানাদরেণ কিং হীয়তে ইত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ। অন্যবাদীগণ যেমন সৎ-অদ্বৈতকে নিঃশঙ্কে অবজ্ঞা করেন, সেইরূপ আমাদিগের দ্বৈতকে অবজ্ঞা করায় ক্ষতি কি?

সাংখ্য, কাণাদ ও বৌদ্ধ প্রভৃতি বিবিধ মতাবলম্বীরা যদি নিঃশঙ্কচিত্ত হইয়া শ্রুতি-প্রসিদ্ধ সদ্বস্তুর অদ্বৈতত্ব প্রতিপাদন বিষয়ে অনাদর করে, তাহাতে আমাদিগের কোন হানি নাই। সাংখ্যবাদী প্রভৃতিরা যদি কেবল লৌকিক ব্যবহারাদির প্রতি নির্ভর করিয়া সদ্বস্তুর দ্বৈতত্ব স্বীকার পূর্ব্বক অপথে পদার্পণ করে, তাহা করুক, আমরা তাহাতে বিরক্ত নহি। কিন্তু আমরা শ্রুতি ও শাস্ত্রীয় যুক্তি এবং অনুভব দ্বারা বিচার পূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডকে অনিত্য জানিয়া তাঁহাদিগের সদ্বস্তুর দ্বৈতত্ব প্রতিপাদনে অবজ্ঞা করিয়া থাকি। তাঁহারা যেমন অদ্বৈতত্ব প্রতিপাদনে অনাস্থা প্রদর্শন করেন, আমরাও সেই প্রকার তাঁহাদিগের দ্বৈতত্ব প্রতিপাদনে ঘৃণা করিয়া থাকি ॥ ৯৫ ॥

দ্বৈতাবজ্ঞা সুস্থিতা চেদদ্বৈতা ধীঃ-স্থিরা ভবেৎ। স্থৈর্য্যেতস্যা পুমানেষ জীবন্মুক্ত ইতীর্য্যতে ॥৯৬

টীকা। নন্বনিষ্প্রয়োজনেয়ং দ্বৈতাবজ্ঞেত্যাশঙ্ক্য জীবন্মুক্তি লক্ষণ প্রয়োজন সদ্ভাবান্নৈবমিত্যাহ দ্বৈতাবজ্ঞেতি ৯৬।—

বঙ্গানুবাদ। যখন দ্বৈতকে অবজ্ঞা করিলে অদ্বৈত-বুদ্ধি স্থির হয়; অদ্বৈত-জ্ঞান স্থির হইলে সেই পুরুষকে জীবন্মুক্ত বলিয়া থাকে, তখন দ্বৈতাবজ্ঞা অনুচিত নহে। ৯৬।

তাৎপর্য্যার্থ। দ্বৈতত্ব প্রতিপাদনে এই প্রকার অবজ্ঞা প্রদর্শন নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন নহে। তাহাতে বিশেষ ফল আছে। কারণ পুনঃ পুনঃ পর্য্যালোচনা দ্বারা দ্বৈত বিষয়ের অবজ্ঞাতে দৃঢ় বিশ্বাস হইলে, অদ্বৈত-জ্ঞান ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া থাকে। যেহেতু দ্বৈত-জ্ঞান তিরোহিত হইলেই অদ্বৈতজ্ঞান বর্দ্ধিত হয়। যাঁহারা দ্বৈত-মতকে অনাদর করিবার জন্য বিবিধ যুক্তি ও অনুভব দ্বারা স্বীয় অন্তঃকরণ হইতে দ্বৈতজ্ঞানকে বিদূরিত করিয়া অদ্বৈত-মতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও জীবন্মুক্ত বলা যায় ॥৯৬॥

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং-প্রাপ্য বিমুহ্যতি। স্থিত্বাস্যামন্তকালে-ঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥৯৭॥

টীকা। ন কেবলং জীবন্মুক্তিরেব প্রয়োজনম্, অপিতু বিদেহ-মুক্তিরপি ইত্যভিপ্রায়েণ শ্রীকৃষ্ণবাক্যমুদহরতি "এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থেতি।" অস্যার্থ যথা ব্রাহ্মীস্থিতিঃ (ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা) এষা এনাং স্থিতিং প্রাপ্য নবিমুহ্যতি সংসার-মোহং ন প্রাপ্নোতি অন্তকালে (মৃত্যু সময়ে) অস্যাং স্থিত্বা ব্রহ্মনির্ব্বাণং প্রাপ্নোতি।

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা ঈদৃশী, ইহা পাইলে সংসার-মোহ থাকেনা। মৃত্যুকালেও ইহাতে অবস্থান করিতে পারিলে ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। ৯৭।

উপরোক্ত ৯৭ শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ।

দ্বৈতমতে অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক অদ্বৈতমতে দৃঢ় বিশ্বাস হইলে যে কেবল জীবন্মুক্তি মাত্র ফললাভ হয়, এমত নহে; উক্ত প্রকারে অদ্বৈত-মতে নিশ্চয় জ্ঞান জন্মিলে, নির্ব্বাণ-মুক্তিও হইয়া থাকে। ভগবদ্গীতায় দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিসপ্ততিতম শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন যে, হে পার্থ! যাঁহারা উক্ত প্রকার জ্ঞানবান ও জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কখনও সংসার-মোহে পুনঃ পুনঃ মোহিত হননা; তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানের অনুষ্ঠান করিয়া অন্তকালে সংসার-মায়া বিসর্জ্জন পূর্ব্বক নির্ব্বাণ পদ লাভ করিয়া অনন্তকাল ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতে থাকেন। ॥ ৯৭ ॥

সদদ্বৈতেঽনৃতদ্বৈতে যদন্যোন্যৈক্যবীক্ষণম্। তস্যান্তকালস্তদ্ভেদবুদ্ধিরেব নচেতরঃ ॥৯৮।

যদ্বান্তকালঃ প্রাণস্য বিয়োগস্ত্ব প্রসিদ্ধিতঃ। তস্মিন্ কালেঽপি ন ভ্রান্তের্গতায়াঃ পুনরাগমঃ। ৯৯ ॥

৯৮শ্লোকের টীকা—অন্তকাল শব্দেন বর্ত্তমান-দেহপাতোঽভিধীয়তে ইত্যাশঙ্কা বারয়িতুং বিবক্ষিতমর্থমাহ সদদ্বৈত ইতি। সদ্রূপে অদ্বৈতে অনৃতরূপে দ্বৈতেচ যদন্যোন্যাধ্যাস-লক্ষণমৈক্য-জ্ঞানমস্তি তস্যৈক্যভ্রমস্যান্তকালোনাম তয়োরদ্বৈতয়োঃ সত্যানৃতরূপেণ ভেদ-বুদ্ধিরেব না পরো বর্ত্তমান দেহপাত ইত্যর্থঃ ॥ ৯৮।

বঙ্গানুবাদ। সৎঅদ্বৈত-মিথ্যাদ্বৈতে ঐক্য-জ্ঞান থাকে; যে কালে সেই ঐক্য-জ্ঞান-ভেদ হয়, সেই কালকে অন্তকাল বলে; তদ্ভিন্ন অন্যকালকে অন্তকাল বলে না। ৯৮।

৯৯ শ্লোকের টীকা—ইদানীং লোকপ্রসিদ্ধার্থ স্বীকারেঽপি নদোষ ইত্যভিপ্রায়েনাহ যদ্বান্তকালে ইতি ॥ ৯৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। প্রাণবিয়োগকালও অন্তকাল বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, সেই অন্তকালেও জীবন্মুক্ত পুরুষের আর ভ্রম-জ্ঞান থাকে না ও পুনর্জ্জন্ম হয় না ॥ ৯৯ ॥

উপরোক্ত ৯৮। ৯৯ শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ। পূর্ব্বশ্লোকে যে "অন্তকাল" শব্দের উল্লেখ হইল, এই শ্লোকে সেই অন্তকালের প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ প্রকাশ করিতেছেন। ব্যবহার-কালে বিষয়-বাসনাদ্বারা সৎস্বরূপ অদ্বৈত-বস্তু ও অসৎস্বরূপ দ্বৈতবস্তু, এই উভয় পদার্থের ঐক্যজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। পরে যে সময়ে তত্ত্ববিচারদ্বারা সৎ ও অসৎ, এই উভয়ের ভেদ-জ্ঞান জন্মে, সেই সময়কে অন্তিমকাল বলা যায়। অথবা লৌকিক ব্যবহারে ইহাই প্রসিদ্ধ আছে যে, যে সময়ে প্রাণ দেহ পরিত্যাগ করে, সেই সময়কে অন্তকাল বলিয়া থাকে। অন্তিমকালে সেই তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত পুরুষের আর ভ্রম-জ্ঞান উপস্থিত হয় না। ৯৮। ৯৯ ॥

নীরোগ উপবিষ্টো বা রুগ্নোবা বিলুঠন্ ভুবি। মূর্চ্ছিতো বা ত্যজেদেষ প্রাণান্ ভ্রান্তির্ন সর্ব্বথা ॥১০০।

টীকা—উক্তমেবার্থ বিশদয়তি নীরোগ ইতি ॥ ১০০ ॥

বঙ্গানুবাদ। নীরোগ, উপবিষ্ট, রুগ্ন, ভূমি বিলুণ্ঠিত বা মূর্চ্ছিত অবস্থায় প্রাণত্যাগ হইলেও ভ্রান্তি থাকে না। ১০০।

উপরোক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ। জীবন্মুক্ত ব্যক্তি অন্তকালে নীরোগ শরীরে প্রাণ পরিত্যাগ করুন, কিম্বা উৎকট রোগগ্রস্ত হইয়া ভূমিতে বিলুণ্ঠনপূর্ব্বক দেহ বিসর্জ্জন করুন, অথবা মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করুন, কোন প্রকারেই তাঁহার ভ্রান্তি উপস্থিত হয় না। জীবন্মুক্ত পুরুষ কোন কালেও মোহের বশীভূত হন না, সর্ব্বকালেই তাঁহার অভ্রান্ত জ্ঞান থাকে ॥ ১০০ ॥

দিনে দিনে স্বপ্নসুপ্তেরধীতে বিস্মৃতেঽপ্যয়ম্। পরেদ্যুর্নানধীতঃ স্যাৎ তত্ত্ববিদ্যা ন নশ্যতি ॥১০১॥

টীকা। ননু প্রাণ বিয়োগ কালে মূর্চ্ছাদিনা জ্ঞান নাশে ভ্রান্তিঃ স্যাদেবেত্যাশঙ্ক্য জ্ঞাননাশাভাবে দৃষ্টান্তমাহ দিনে দিনে ইতি যথা প্রত্যহমধীতে বেদে স্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থায়াং বিস্মৃতেঽপি পরেদ্যুরনধীতবেদত্বং নাস্তি মৃতিকালে তত্ত্বানুসন্ধানাভাবেঽপি জ্ঞাননাশাভাব ইত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ। যেমন প্রত্যহ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি কালে পূর্ব্বাধীত বিদ্যার বিস্মরণ হইলেও, পরে জাগরিত কালে স্মরণ হয়, সেইরূপ মৃত্যু-মূর্চ্ছাদি কালান্তে তত্ত্ববিদ্যা নষ্ট হয় না।১০১॥

১০১ শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ।

অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞানী জীবন্মুক্ত পুরুষ প্রাণবিয়োগকালে মূর্চ্ছাপন্ন হইলেও, দেহত্যাগ কালে সেই ব্যক্তির অদ্বৈত-জ্ঞান কখনই বিস্মৃত হয় না। যেমন সামান্য ব্যক্তির প্রাত্যহিক স্বপ্ন বা সুষুপ্তি কালে তাহার পূর্ব্বাধিত বিদ্যার বিস্মরণ হইলেও, কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় যখন পুনর্ব্বার তাহার সেই চৈতন্যের উদয় হয়, তখন আর সেই বিদ্যা বিস্মৃত থাকেনা, অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় পুনরায় যে প্রকার তাহার পূর্ব্ব পঠিত বিদ্যা স্মৃতিপথে উদিত হইতে থাকে, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি দেহত্যাগ কালে মূর্চ্ছিত হইলেও, তাঁহার অদ্বৈত-জ্ঞানের বিস্মৃতি হয় না।১০১॥

প্রমাণোৎপাদিতা বিদ্যা প্রমাণং প্রবলং বিনা। ন নশ্যতি ন বেদান্তাৎ প্রবলং মানমীক্ষতে ॥১০২॥ তস্মাৎ বেদান্ত সংসিদ্ধং সদদ্বৈতং ন বাধ্যতে। অন্তকালেঽপ্যতো ভূতবিবেকান্নিবৃতিঃস্থিতা ॥ ১০৩॥

টীকা। জ্ঞাননাশাভাবমেব উপপাদয়তি প্রমাণোৎপাদিতেতি ॥১০২

১০২র বঙ্গানুবাদ। প্রমাণোৎপাদিতা বিদ্যা তদপেক্ষা প্রবল প্রমাণ ব্যতীত নষ্ট হয়না। বেদান্ত হইতে প্রবলতর প্রমাণ দৃষ্ট হয় না ॥১০২॥

টীকা। উৎপাদিত মর্থ্ম উপসংহরতি, তস্মাৎ বেদান্তসংসিদ্ধমিতি।১০৩।

বঙ্গানুবাদ। তদ্ধেতু বেদান্ত-সংসিদ্ধ সৎঅদ্বৈতের কিছুতেই বাধা হয় না, অন্তকালেও এই ভূতবিবেক হইতে নিবৃত্তি লাভ হয়।১০৩।

উপরোক্ত ১০২।১০৩।শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ॥

কোন প্রমাণ দ্বারা একটি বিষয়ের নিশ্চয়-জ্ঞান জন্মিলে, তদপেক্ষা অন্য একটি প্রবল প্রমাণ ব্যতিরেকে কখনই সেই

নিশ্চয় জ্ঞানের অন্যথা হয় না। যে পর্য্যন্ত প্রবল প্রমাণ হৃদয়ঙ্গম না হয়, সেই পর্য্যন্ত কোন বিষয়ের পূর্ব্ববৎ নিশ্চয় জ্ঞান অবিস্মৃত থাকে, ইহাই প্রসিদ্ধ আছে। অতএব বেদান্ত প্রমাণ দ্বারা অন্তঃকরণে যে অদ্বৈত জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, অন্তকালেও সেইজ্ঞানের বিপর্য্যয় হয় না, যেহেতু বেদান্ত-প্রমাণ হইতে তর্কবিচার-বিষয়ক প্রবল প্রমাণ আর নাই। অতএব স্বতঃসিদ্ধ বেদান্ত-প্রমাণ দ্বারা প্রতিপাদিত ভূত-বিবেক দ্বারা অলীক বিষয়-বাসনা দূরীভূত হইয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ হইলে, নিশ্চয়ই তখন আর কোন প্রকার দুঃখ ভোগের সম্ভাবনা থাকে না॥১০২।১০আ (ক্রমশঃ)

ইতি ভূতবিবেক সমাপ্ত।

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গানুবাদিতা

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়া

কঠোপনিষৎ।

দ্বিতীয়া বল্লী।

শ্রেয় অন্য প্রেয় হ'তে; প্রেয় শ্রেয় হ'তে
পৃথক্; উভয়ে বদ্ধ করে পুরুষেরে
ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনে; যে করে গ্রহণ
শ্রেয়, তার সুমঙ্গল; সে চাহে প্রেয়েরে,
ধ্রুব সে বিচ্যুত হয় পরমার্থ হ'তে॥ ১

শ্রেয়, প্রেয় উভয়েই করয়ে আশ্রয়
মনুষ্যে, মনেতে তাই বিচারি সম্যক্,
জ্ঞানী জন এ উভয়ে জানেন পৃথক।
প্রেয় হ'তে শ্রেষ্ঠ বলি শ্রেয় লন তিনি,
মন্দমতি মাগে প্রেয় যোগক্ষেম হেতু॥ ২

প্রিয়—আর প্রিয়রূপ অভিলাষচয়
অসার—চিন্তিয়া তুমি করিয়াছ ত্যাগ;
গ্রহণ করনি এই সৃঙ্কা বিত্তময়ী;
যাহাতে নিমগ্ন হয় মানব নিচয়। ৩

বিদ্যা ও অবিদ্যা বলি জ্ঞাত আছ যাহা—
বিপরীত, ভিন্ন গতি এরা পরস্পর,
তোমারে বিদ্যার্থী বলি মানি নচিকেতঃ।
পারে নাই কাম্য বস্তু প্রলোভিতে তোমা।৪

অবিদ্যার মাঝে যারা থাকি বর্ত্তমান,
আপনারে মনে করে ধীর সুপণ্ডিত,

১। শ্রেয়—যাহা প্রকৃত মঙ্গলকর, যাহাদ্বারা পারলৌকিক কল্যাণ সাধিত হয় ও অনন্ত শান্তিলাভ হয়,তাহাই শ্রেয়।

প্রেয়—আপাতসুখকর দ্রব্য। যাহা উপভোগ সময়ে সুখকর বোধ হয়, কিন্তু পরিণাম-বিরস।

২। যোগ ক্ষেম হেতু—অলভ্য বস্তুর লাভ বিষয়িণী চিন্তার সহিত লব্ধ বস্তুর পরিরক্ষণের নাম যোগক্ষেম, তজ্জন্য অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ জন্য।

যোগ—অলভ্যার্থ লাভ চিন্তা।

ক্ষেম—লব্ধবস্তু রক্ষণ।

৩।—প্রিয়—পুত্র-কলত্রাদি রমণীয় কাম্যবস্তু।

প্রিয়রূপ – অপসরা প্রভৃতি প্রিয়রূপ কাম্য বস্তু, যাহা যম নচিকেতাকে প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন। প্রথমবল্লীর ২৩, ২৪ ও ২৫ শ্লোক দেখ।

সৃঙ্কা—সৃতি, পথ।

সৃঙ্কা বিত্তময়ী— এই বিত্তময় অর্থাৎ ধন-প্রাপণ-পথ, এই মূঢ়জন-প্রবৃত্ত কুৎসিত পথ।

যম নচিকেতাকে বলিতেছেন—হে নচিকেতঃ। তুমি পুত্রাদি প্রিয় বস্তু ও অপ্সরাদি প্রিয়রূপ বস্তু সমূহের অনিত্যতা চিন্তা করিয়া তৎসমুদায় ত্যাগ করিয়াছ, এই ধনলাভকর পথ অবলম্বন কর নাই, যাহা বহুলোকেই অবলম্বন করে।

৪। বিদ্যা ও অবিদ্যা—শ্রেয় ও প্রেয়।

বিদ্যার্থী—শ্রেয়পথাবলম্বী; শ্রেয়লাভেচ্ছুক।

কাম্য বস্তু—অপ্সরা প্রভৃতি।

কুটিল বিভিন্ন পথে সেই মূঢ়গণ
ভ্রময়ে, অন্ধ-চালিত যথা অন্ধজন। ৫

তার কভু নাহি হয় পরলোক-বোধ,
যে জন প্রমাদগ্রস্ত—বিত্ত-মোহে মূঢ়;
ইহলোক মাত্র আছে, নাহি পরলোক,
এরূপ বিশ্বাস যার, সেই অবিবেকী
আমার বশতাপন্ন হয় বার বার। ৬

না পায় অনেকে যাঁরে করিতে শ্রবণ,
না পায় জানিতে যাঁরে করিয়া শ্রবণ,
দুর্লভ কুশলবক্তা জেনো সে আত্মার—
ততোধিক সুদুর্লভ বিজ্ঞাতা তাহার। ৭

হীনজন যদি এঁর দেয় উপদেশ,
সুবিজ্ঞেয় তাহা হ'লে না হন কখন;
অনেকে অনেকরূপে এঁরে চিন্তা করে,
কিন্তু শ্রেষ্ঠাচার্য্য ছাড়া কে পারে বুঝাতে—
অণু হ'তে অণীয়ান্ অতর্ক্য আত্মারে? ৮

যে মতি পেয়েছ তুমি ওহে নচিকেতঃ!
নহে তাহা প্রাপণীয়া তর্কেতে কখন।
অভিজ্ঞ আচার্য্য-প্রোক্ত হ'লে প্রিয়তম,
হয় ইহা সুবিজ্ঞেয়; পাই যেন মোরা
সত্যধৃতি প্রশ্নকার তোমার মতন। ৯

শেবধি অনিত্য, ইহা জানিয়াছি আমি;
অধ্রুবের বিনিময়ে নাহি পাওয়া যায়
ধ্রুব সেই পরমাত্মধনে; অতএব
নাচিকেত অগ্নি আমি করিয়া চয়ন
অনিত্য দ্রব্যেতে, লভি নিত্যপ্রায় পদ। ১০

কামনাসমাপ্তি আর জগৎ-আশ্রয়—
ক্রতুর অনন্ত ফল, অভয়ের পার—
অতীব প্রশংসনীয়া সুবিস্তীর্ণা গতি,
আত্মার প্রতিষ্ঠা তুমি দেখিয়াই ধীর!
ধৈর্য্য সহ (শ্রেয় পথে) করিয়াছ ত্যাগ। ১১

জ্ঞানীজন বুদ্ধিস্থিত-নিহিত দুর্গমে—
অতএব গূঢ় আর প্রচ্ছন্ন দুর্দ্দর্শ
পুরাতন সে আত্মারে অধ্যাত্মযোগেতে
জানিয়া, ধীমান্ জন ত্যজে হর্ষ-শোক। ১১

এই পরমাত্মতত্ত্ব শুনিয়া মানব—
সম্যক্ বুঝিয়া, তথা করিয়া পৃথক্,
ধর্ম্ম্য এ আত্মারে বিনশ্বর কায় হ'তে—
লভিয়া সুসূক্ষ্ম হর্ষণীয় এঁরে পুনঃ

৮। এই শ্লোকে যম বলিতেছেন যে, আত্মতত্ত্ব অতি কঠিন বিষয়; আত্মা অণু হইতেও অধিক সূক্ষ্ম এবং ইহা তর্কদ্বারা পাইবার বিষয় নহে। কোন হীনবুদ্ধি আচার্য্যের উপদেশে ইঁহাকে জানা যায় না, কারণ শিষ্যের মনে নানাপ্রকার তর্ক উপস্থিত হয়, ইহা আছে অথবা নাই? ইহা কর্ত্তা বা অকর্ত্তা? ইহা শুদ্ধ বা অশুদ্ধ, ইত্যাদি। যিনি এই সমস্ত তর্ক খণ্ডন করিয়া দিতে না পারেন, তিনি কিরূপে ইহার উপদেষ্টা হইবেন? অতএব যিনি যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী, সেই অভেদদর্শী শ্রেষ্ঠাচার্য্য যদি আত্মজ্ঞানের উপদেশ দেন, তাহা হইলেই কেবল শিষ্য আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন।

৯। সত্যধৃতি—স্থির সঙ্কল্প, সত্য সঙ্কল্প।
মতি—ব্রহ্মবিষয়িণী মতি।

১০। শেবধি—নিধি, ধন; কর্ম্মফল-লভ্য ধন।
এই কবিতার শেষ লাইনটী কিছু অস্পষ্ট বলিয়া বোধ হইতে পারে। উহার স্ফুটার্থ এই—যম নচিকেতাকে বলিতেছেন, দেখ আমি অনিত্য দ্রব্য দ্বারা নাচিকেত অগ্নি চয়ন করিয়াছি বলিয়া নিত্য পদ প্রাপ্ত হই নাই অর্থাৎ মুক্তি লাভ করিতে পারি নাই, তবে নিত্যপ্রায় পদ যমত্ব লাভ করিয়াছি। মূলে যে "প্রাপ্তবানস্মি নিত্যং" আছে, ঐ "নিত্যং" অর্থ "আপেক্ষিক নিত্য" বা 'নিত্যপ্রায়', যাহা অনিত্য হইলেও, পার্থিব ধনের তুলনায় নিত্য বলিয়া বোধ হয়।

১১। কামনা-সমাপ্তি—দেখিয়াই ধীর——ব্রহ্মপদে এই সমস্ত আছে দেখিয়াই তুমি তাহা জানিবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছ এবং অনিত্য সুখাদি ত্যাগ করিয়াছ।

১২। "অধ্যাত্মযোগেতে" চিত্তকে বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া আত্মায় সমাধান করাকে অধ্যাত্মযোগ কহে, তদ্দ্বারা।

হয় আনন্দিত ; আমি করি অনুমান,
ব্রহ্মদ্বার অবারিত নচিকেত কাছে। ১৩
কহিলেন নচিকেতা—কহ ওহে যম !
ধর্ম্মাধর্ম্ম, কৃতাকৃত, ভূত-ভবিষ্যৎ,
পৃথক্ এ সব হ'তে দেখিয়াছ যাহা। ১৪।
কহিলেন যম :—
চারিবেদ যে পদের করিছে কীর্ত্তন,
তপস্যার অনুষ্ঠান হয় যাঁর তরে,
লভিতে যাঁহারে ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান
করে লোকে, সংক্ষেপেতে কহিব তোমায়—
ওঁ এই নাম মাত্র সে পদের হয়। ১৫
এ অক্ষরই ব্রহ্মরূপী, পরব্রহ্ম এই;
ইঁহারে জানিয়া যেবা যাহা ইচ্ছা করে,
প্রাপ্তব্য তাহার তাহা হইবে নিশ্চয়। ১৬
এ অবলম্বন শ্রেষ্ঠ, ইহা উচ্চতম,
ইঁহারে জানেন যিনি, তিনি ব্রহ্মলোকে
মহত্ত্ব করিয়া লাভ বিরাজেন সদা। ১৭
না জন্মে, না মরে এই আত্মা বিপশ্চিৎ,
উৎপন্ন হয়নি ইহা কোন বস্তু হ'তে;
উৎপন্ন হয়না কিছু ইহা হ'তে পুনঃ।
অজ নিত্য পুরাতন আত্মা এ শাশ্বত—
শরীর বিনষ্ট হ'লে বিনষ্ট না হয়। ১৮
হন্তা যদি ইচ্ছাকরে করিতে হনন,
হত যদি মনে করে—হত "আত্মা" তার,
ভ্রান্ত উভয়েই তবে—না করে হনন,
নাহি হয় হত এই আত্মা সুমহান্। ১৯
অণু হ'তে অণীয়ান্, মহৎ হইতে
মহীয়ান্ আত্মা এই জন্তুর হৃদয়ে
আছয়ে নিহিত, নিষ্কামী বীতশোক
জনগণ দরশন করেন আত্মার
মহিমারে, হলে পরে ধাতুর প্রসাদ। ২০
আসীন হলেও আত্মা যান দূরে চলি,
ভ্রমেন সর্ব্বত্র তিনি হলেও শয়ান ;
আমাছাড়া কেবা আর পারে জানিবারে
(আপাত-বিরুদ্ধধর্ম্মী) হর্ষাহর্ষ-দেবে ? ২১
অনিত্য শরীরে স্থিত অশরীরী এই,
মহৎ ও সর্ব্বব্যাপী আত্মারে জানিয়া,
ধীর জন শোক কভু না করে প্রকাশ। ২২
এই আত্মা নহে লভ্য বেদ-অধ্যাপনে,
মেধা কিম্বা বহুশাস্ত্র-জ্ঞানে লভ্য নয়।
করেন বরণ যাঁরে পরআত্মা নিজে,
লভেন তিনিই তাঁরে, আত্মাও তাঁহার
স্বরূপ তাঁহার কাছে করেন প্রকাশ। ২৩
যেজন বিরত নহে পাপকাজ হ'তে,
ইন্দ্রিয়ের চঞ্চলতা ঘোচেনি যাহার,
নহে যে একাগ্রমনা ; অশান্ত-মানস,
সেজন জ্ঞানেতে কভু আত্মা নাহি পায়। ২৪
ব্রহ্ম-ক্ষত্র উভয়েই যাঁহার ওদন—
মৃত্যুপকরণ যাঁর, সেই আত্মা কোথা—
সাধনবিহীন কেবা পারে লভিবারে,
যথোক্ত সাধনবান্ জ্ঞানীজন যথা। ২৫

ইতি দ্বিতীয়া বল্লী।

শ্রীমনোরঞ্জন মিশ্র।

১৪। কৃতাকৃত কার্য্য-কারণ।
১৮। বিপশ্চিৎ মেধাবী, সর্ব্বজ্ঞ, জ্ঞানবান।
অজ যাহা জন্মে না।
শাশ্বত অপক্ষয়বর্জ্জিত।

২০। অণীয়ান্—সূক্ষ্মতর।
মহীয়ান্ মহত্তর।
ধাতুর প্রসাদ মন আদি ইন্দ্রিয়গণের প্রসন্নতা।
২৫। ওদন অন্ন।

লম্বোদর-জননী-স্তোত্রম্।

ও

(তাৎপর্য্যদীপন নামক ভাবানুবাদ।)

শিশৌনাসীদ্বাক্যং জননি! তব মন্ত্রং প্রজপিতুং,
কিশোরে বিদ্যায়াং,বিষমবিষয়ে তিষ্ঠতি মনঃ,
ইদানীঞ্চেদ্ ভীতো মহিষ-গলঘণ্টা-ধ্বনরবাৎ,
নিরালম্বো লম্বোদরজননি! কং যামি শরণম্।১

জপিতে তোমার মন্ত্র ছিল না বচন,
জননি গো! শৈশব সময়।
যখন কিশোর কাল, (ক'হিতাম কথা)
বিদ্যাচর্চ্চা কেবল আশ্রয়।
যৌবনে ভ্রময়ে মন বিষম বিষয়ে;
এখনযে প্রাণে হয় ভয়!
(বিকট-বরণ ওই মহিষ উপরে,
আসিতেছে আদিত্য-তনয়।)
মহিষের গলঘণ্টা কাঁপাইয়া দিক্,
ঘনরবে ওই গরজয়।
লম্বোদরমাতঃ! বল কাহার শরণ লব?
আমি যে হয়েছি নিরাশ্রয়!

হরিঃ শেতে শেষে নয় কমলজো নাভিকমলে,
সমাধৌ সংলীনঃ পুরমথন দেবঃ প্রতিদিনম্,
যমাদ্ভীতো মাতঃ! পদকমল যুগ্মং তব বিনা,
নিরালম্বো লম্বোদরজননি! কং যামি শরণম্। ২

অনন্ত শয্যার পরে যোগনিদ্রা-অভিভূত,
শায়িত আছেন নারায়ণ।
নাভিপদ্মে পদ্মযোনি. তপমগ্ন. প্রতিদিন—
সমাধিতে ভুজঙ্গ-ভূষণ।
যমভয়ে ভীত মাতঃ চরণকমলযুগ
বিনা তব, কি করি আশ্রয়?
লম্বোদরমাতঃ! বল, কাহার শরণ লব?
আমি যে হয়েছি নিরাশ্রয়!

পরিত্যক্তা দেবাঃ কঠিনতর সেবাকুলতয়া,
ময়া পঞ্চাশীতেরধিকমপনীতে তু বয়সি।
ইদানীং মে মাতস্তব যদি কৃপা নাপি ভবিতা,
নিরালম্বো লম্বোদরজননি! কং যামি শরণম্।৩

দেবতা তেত্রিশ কোটী সেবা করা সুকঠিন,
ত্যজিয়াছি আকুল হইয়া।
পঞ্চাশীতি বর্ষ হায়! বিফলে অধিক তারো
চলিগেল, না পাই খুঁজিয়া!
এবে মা করুণাময়ি! যদি এ দীনের প্রতি,
তোমার করুণা নাহি হয়,
লম্বোদরমাতঃ! বল কাহার শরণ লব?
আমিযে হ'য়েছি নিরাশ্রয়!

নমে বাক্যং যুক্তং নহি যদনুরক্তং জপবিধৌ,
ন পূজায়াং ধ্যানে ধরণিধরকন্যে! মম মনঃ,
প্রসীদ ত্বং মাতর্গুণরহিত পুত্রেঽধিকদয়া,
নিরালম্বো লম্বোদরজননি! কং যামি শরণম্।৪

বচন আমার শিবে! উপযুক্ত নয়,
জপে নাই বিন্দুমাত্র রতি।
নগেন্দ্রনন্দিনি! তব পাদপদ্ম-পূজা,
কিম্বা ধ্যানে রত নয় মতি।
জননি! প্রসন্না হও, নির্গুণতনয়ে—
জানি মা'র বড় দয়া হয়।
লম্বোদর মাতঃ! বল, কাহার শরণ লব?
আমি যে হ'য়েছি নিরাশ্রয়!

ন মন্ত্রং নো যন্ত্রং তদপিচ ন জানে স্তুতিকথাং,
ন জানে মুদ্রাস্তে তদপিচ ন জানে বিলপনম্,
ন জানে তদ্ভক্তিং নচ ভজনশক্তি র্গিরিসুতে!
পরং জানে মাতস্ত্বদনুসরণং ক্লেশহরণম্! ৫

না জানিগো মন্ত্র তব, তন্ত্রমতে যন্ত্র আর
নাহিজানি স্তবন-বচন।
জানিনা তোমার মুদ্রা,জানিনা জননি! আমি—
কভু করিবারে বিলপন।

জানিনা মা তব ভক্তি, নাহিমা ভজন-শক্তি,
শুন ওগো গিরিবর-বালা!
এইমাত্র জানি সার, আনুগত্যে মা তোমার—
দূরে যায় যত ক্লেশ-জ্বালা।

পৃথিব্যাং পুত্রাস্তে জননি! বহবঃ সন্তি সরলাঃ,
বরং তেষাং মধ্যে দুরিতসহিতোঽহং তব সুতঃ।
মদীয়োঽয়ং ত্যাগঃ সমুচিতমিদং নো তব শিবে।
কুপুত্রো জায়েত কচিদপি কুমাতা ন ভবতি।৬

বিশাল ব্রহ্মাণ্ড মাঝে, জননি! তোমার
আছে সুত কত শত সরল সুজন।
তাহাদের মাঝে মাগো! দীন মূঢ়-মন—
দুরিতচরিত আমি—জঘন্য সবার।
আমাকে ত্যজিবে শিবে! এত ব উচিত নয়।
কুপুত্র জনমে বহু, কুমাতা কি কভু হয়?

জগন্মাতর্মাতস্তব চরণসেবা ন রচিতা,
ন বা দত্তং দেবি! দ্রবিণমপি ভূয়স্তব ময়া।
তথাপি ত্বং স্নেহং ময়ি নিরুপমং যৎপ্রকুরুষে—
কুপুত্রো জায়েত কচিদপি কুমাতা ন ভবতি। ৭

মাগো! ওগো বিশ্বমাতঃ! বিমল চরণ তব,
সেবি নাই কভু ভক্তিভরে।
দেবি! দেই নাই হায়! রতন-কাঞ্চন-মণি
কখনো তোমার যত্ন ক'রে।
তবু কর অনুপম স্নেহ মোরে জননিগো!
ইহা হ'তে বুঝিনু নিশ্চয়।
কুপুত্র জনমে কত—কুলের কণ্টক,
কুমাতা কখনো নাহি হয়!

স্বয়ম্ভূত্বং পাদাম্বুজ ভজন কর্ত্তৈব জগতাং
অভূৎ কর্ত্তা ধর্ত্তা হরিরপি তথৈবাস্য জগতঃ,
সদা ভক্তো শম্ভুঃ পদকমলমেতাদৃশমৃতে,
নিরালম্বো লম্বোদরজননি! কং যামি শরণং। ৮

বিরিঞ্চি ও পদযুগ সেবিয়া যতনে
প্রাণপণে,
সৃজিলা সংসার সেই বলে চরাচর
জীবজনে।
পালনে পারগ হরি বিশাল বিশ্বের,
শুধু তব পদ-সেবা ফল।
উড়াইয়া সংহার-নিশান,
বাজাইয়া প্রলয়-বিষাণ,
করেন যে ধ্বংস বৃষযান,
তারো মাগো ও চরণ বল।
বিনা ও পবিত্রপদে, বল না আমায়,
লম্বোদর-মাতঃ! লব কাহার শরণ?
আমি যে হ'য়েছি নিরাশ্রয়!

চিতাভস্মালেপো গরলমশনং দিক্পটধরো
জটাধারী কণ্ঠে ভুজগপতিহারী পশুপতিঃ।
কপালী ভূতেশো ভজতি জগদীশৈকপদবীং
ভবানি! ত্বৎপাণিগ্রহণপরিপাটী ফলমিদং। ৯

চিতাভস্ম অঙ্গরাগ, কালকূট ক্ষুধাবিনাশন,
দিক্ পরিধেয় বাস, জটাজাল শিরে সুশোভন।
গলে খেলে ফণিকুল, (অনাকুল তায় পঞ্চানন।)
করেতে নরকপাল পশুপতি প্রমথ-পালন।
(এইত ঐশ্বর্য্য সার!) জগদীশপদে
তবু শিব অধিষ্ঠিত!
তব পাণিগ্রহ ফল এই ভবানি গো!
মনে হয় সুনিশ্চিত।

নমোক্ষস্যাকাঙ্ক্ষা নচ বিভববাঞ্ছাপি চ নমে।
ন বিজ্ঞানাপেক্ষা শশিমুখি! সুখেচ্ছাপি ন পুনঃ।
অতস্ত্বাং সংযাচে জননি! জননং যাতু মমবৈ
মৃড়াণী রুদ্রাণী শিবশিবভবানীতি জপতঃ ১০

মোক্ষলাভে আকাঙ্ক্ষা ত নাই,
বিভবের বাঞ্ছা নাহি মোর।
বিজ্ঞানে অপেক্ষা নাই শশিমুখি!
সুখ-বাসনায় নহি ভোর।

এই জন্য করিহে প্রার্থনা,
জননিগো! যাউক জীবন,
রুদ্রাণী-মৃড়াণী-শিবশিবা,
ভববাণী—এই নাম
জপিতে জপিতে অনুক্ষণ।

নারাধিতাসি বিধিনা বিবিধোপচারৈঃ,
কিং রুক্ষচিন্তনপরৈর্ন কৃতং বচোভিঃ,
শ্যামেত্বমেব যদি কিঞ্চন ময্যনাথে,
ধৎসে কৃপামুচিতমম্ব পরং তবৈব। ১১

নানা উপচারে বিধি অনুসারে,
করিনাই তব আরাধনা।
রুক্ষচিন্তাপর বাক্য ব্যবহারে,
ওগো মা করেছি কি'না?
ওগো শ্যামা তুমি এ অনাথে যদি,
বিতর করুণা-কণা।
তবে দয়াময়ি! হইবে উচিত,
মহিমা যাইবে জানা।

আপৎসু মগ্নঃ শরণং ত্বদীয়ং
করোমি দুর্গে! করুণার্ণবেশি!
নৈতচ্ছঠত্বং মম ভাবয়েথাঃ,
ক্ষুধাতৃষার্ত্তা জননীং স্মরন্তি। ১২

ও দুর্গে দুর্গতিহরা! বিপদে মগন,
করি তব চরণ চিন্তন।
করুণাসিন্ধুরূপিণি! (শুনগো দীনের
এই আন্তরিক আবেদন।)
শঠতা বা চাটুবাণী গণি, (সন্তানের দুঃখে)
ক'রো না মা অযতন।
ক্ষুধা-পিপাসায় ক্লিষ্ট হ'লে (ওগো স্নেহময়ি!)
পুত্র মা'য় করয়ে স্মরণ।

জগদম্ব বিচিত্রমত্রকিং
পরিপূর্ণা করুণাস্তি চেন্ময়ি।
অপরাধ পরংপরাবৃতং,
নহি মাতা সমুপেক্ষতে সুতং। ১৩

জগৎজননি! যদি দীনে
করুণা করগো বিতরণ
পূর্ণরূপে, নাহি হায়!
কিছু তায় বিস্ময়-কারণ।
(জানে জগজ্জনে,) পুত্র যদি
অপরাধপরিপূর্ণ হয়,
স্নেহময়ী মাতা সে সন্তানে
উপেক্ষা করিয়া নাহি রয়।

মৎসমঃ পাতকী নাস্তি,
পাপঘ্নী ত্বৎসমা নহি,
এবং জ্ঞাত্বা মহাদেবি!
যথেচ্ছসি তথা কুরু। ১৪

আমা সম পাপী নাই, জননি গো!
জগৎ-মাঝারে,
কলুষনাশিনী নাই তব সম
এ তিন সংসারে।
মহাদেবি!
জানি মনে করিয়া বিচার,
যথাযোগ্য,
কর তাহা, যা ইচ্ছা তোমার।

(শঙ্করাচার্য্য-বিরচিত লম্বোদরজননীস্তোত্র
সমাপ্ত।)

ষট্‌পদী স্তোত্রম্।

ও

(রহস্যাভাস নামক বঙ্গানুবাদশ্চ)

অবিনয়মপনয় বিষ্ণো!
দময় মনঃ শময় বিষয়মৃগতৃষ্ণাং।
ভূতদয়াং বিস্তারয়
তারয় সংসার-সাগরতঃ॥ ১

অবিনয় কর অপনয়,
ওহে বিশ্বময় হরি!
দম মম মূঢ় মন; কর প্রশমিত,
এ বিষয়-মরীচিকা চিরমোহকরী।১
দিব্য ধুনী মকরন্দে,
পরিমল পরিভোগ সচ্চিদানন্দে
শ্রীপতি-পদারবিন্দে
ভবভয়-খেদচ্ছিদে বন্দে। ২
ভবভয়ে হ'য়ে খিন্নমন,
সে খেদ করিতে নিবারণ
বন্দি সে সুন্দর পদপঙ্কজ যুগল
কমলাপতির।
সুরধুনী মকরন্দ যাহে,
সচ্চিৎআনন্দ যেথা রহে—
পরিমল-পরিভোগস্থির। ২
সত্যাপি ভেদাপগমে
নাথ! তবাহং ন মামকীনস্ত্বং।
সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ
ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ।৩
অপগত হ'লে ভেদ, আসিবে অভেদ,)
কিন্তু নাথ! রহিব তোমারি আমি,
কভু মম হবে নাহে তুমি।
সাগরের—তরঙ্গনিচয়,
(জানি চিরদিন প্রভো!)
বিশাল জলধি কভু তরঙ্গের নয়! ৩
উদ্ধৃতনগ! নগভিদনুজ!
দনুজকুলামিত্র মিত্র শশিদৃষ্টে!
দৃষ্টে ভবতি প্রভবতি
ন ভবতি কিং ভবতিরস্কারঃ! ৪
নগারি-অনুজ! ওহে গোবর্দ্ধনগিরিধর!
দনুজকুলনাশকারি-দেবকুল মিত্রবর।
[illegible] মম বিমল মতি তোমার।

অতুল প্রভাব তব, হেরিলে তোমারে
হয়নাকি ভব তিরস্কার? ৪
মৎস্যাদিভিরবতারৈ-
রবতারবতাহবতা সদা বসুধাং।
পরমেশ্বর! পরিপাল্যো।
ভবতা ভবতাপভীতোহহং। ৫
অবতরি ধরাধামে, অবনী পালিতে
মৎস্য আদি অবতার ক'রেছ গ্রহণ।
তুমি প্রভু পরম ঈশ্বর,
ভবতাপে ভীত আমি নর,
প্রতিপাল্য সর্ব্বথা তোমার। ৫
দামোদর! গুণ-মন্দির!
সুন্দরবদনারবিন্দ! গোবিন্দ!
ভবজলধি-মথন-মন্দর!
পরমন্দরমপনয় ত্বং মে।৬
অশেষ গুণ-মন্দির! ওহে দামোদর!
বদনসরোজ তব, (এ মহীমণ্ডলে)
সর্ব্বসৌন্দর্য্য-আকর!
এ সংসার-পারাবার মথনের তরে—
তুমিহে মন্দর, নাথ!
সংহর পরম দুঃখ কৃপায় সত্বরে। ৬
নারায়ণ! করুণাময়!
শরণং করবাণি তাবকৌ চরণৌ—
ইতি ষট্পদী মদীয়ে
বদন-সরোজে সদা বসতু। ৭
নারায়ণ! করুণানিলয়!
তব পদযুগে আজ লইনু আশ্রয়।
এই "ষট্পদী" স্তব করুক নিবাস
বদনে সতত, মম শেষ অভিলাষ। ৭
শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিত "ষট্পদী" স্তোত্রং
সমাপ্তং। কস্যচিৎ—
ভক্তিকামস্য।

শ্রী শ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ। | ১৩০৭ সাল, ১৮২২ শকাব্দা।

আপস্তম্বীয় গৃহসূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

বিবাহ-নক্ষত্র নিরূপণ একান্ত আবশ্যক, তজ্জন্য পরবর্ত্তিসূত্রে পরমর্ষি আপস্তম্ব গম্ভীর রহস্যময় ভাবব্যঞ্জক বাক্য দ্বারা ঐ বিষয় নিরূপণ করিতেছেন।

যাং কাময়েত দুহিতরং প্রিয়া স্যাদিতি তাং নিষ্ঠ্যায়াং দদ্যাৎ. প্রিয়ৈব ভবতি নৈবতু পুনরাগচ্ছতীতি ব্রাহ্মণাবেক্ষোবিধিঃ। ৩

যে কন্যাকে পতির ভালবাসার পাত্রী করা আবশ্যক হইবে, সেই কন্যাকে নিষ্ঠ্যা নক্ষত্রে দান করিবে, তাহাহইলে সেই কন্যা নিশ্চয়ই তাহার স্বামীর প্রিয়পাত্রী হইবে। পুনর্ব্বার পিতার গৃহে (অভাবগ্রস্তা হইয়া) আসিবে না। এখানে ব্রাহ্মণাবেক্ষ বিধি বুঝিতে হইবে। আপস্তম্বের এই সূত্রটী পাঠ করিলে হৃদয়ে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্তার উচ্ছ্বাস উঠে। পিতা মাতার চিরদিনই এ কামনা থাকে যে, তাঁহাদের কন্যাটী স্বামি-সুখে সুখিনী হইবে, কখনও একমুষ্টি অন্নের জন্যে অপরের দ্বারে যাওয়া দূরে থাকুক, অভাবে পড়িয়া কোনও সময়ে আবার নিজেদের নিকটও ফিরিয়া না আসে। কন্যার এই সমস্ত ভবিষ্যদ্দুঃখ দূর করিবার বাসনায়ই পিতা মাতা উপযুক্ত পাত্রে কন্যাদান করিতেন। কন্যার মতামতের উপর একটা নির্ভর করিতেন না। বলিতে গেলে তাহার একপ্রকার অপেক্ষাই রাখিতেন না। এই সূত্রে ঋষি বলিতেছেন, নিষ্ঠ্যানক্ষত্রে কন্যাদান করিলে কন্যার সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়। তাহাকে অপরের দ্বারে যাওয়া দূরে থাকুক, কষ্ট পাইয়া অথবা অযথারূপে পীড়িত হইয়া আবার পিতার কাছেও আসিতে হইবে না। ইহাতে সকলেরই ইচ্ছা হয়, এই নক্ষত্রে কন্যাদান করি। কিন্তু ভাবিবার বিষয় এই যে, জ্যোতিষ শাস্ত্র স্বতন্ত্ররূপে বিবাহের নক্ষত্র লিখিতেছেন। বিবাহের নক্ষত্র নিরূপণে জ্যোতিষ বলিতেছেন ;—

রেবত্যুত্তর রোহিণী মৃগশিরোমূলানু-
রাধা মঘা,

হস্তাস্বাতিষু তৌলি ষষ্ঠ মিথুনেষূ-
ত্থৎসু পাণিগ্রহঃ। ·

অর্থাৎ রেবতী, উত্তরফল্গুণী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তর ভাদ্রপদ, রোহিণী, মৃগশিরা, মূলা, অনুরাধা, মঘা, হস্তা, স্বাতি, এই সকল নক্ষত্রে এবং তুলা, মিথুন, কন্যালগ্নে পাণিগ্রহণ করিবে। নিষ্ঠ্যা স্বাতিনক্ষত্রের নাম, ইহা আপস্তম্ব নিজেই বলিবেন। এই নক্ষত্রের এত শ্রেষ্ঠতা, অর্থাৎ বিবাহে এত কল্যাণকারিতা জ্যোতিষ বলেন কই? আরও দেখা যাইতেছে, আপস্তম্ব যজুর্ব্বেদোক্ত গৃহ্যকর্ম্ম সূত্রিত করিয়াছেন, ঐ যজুর্ব্বেদীয় বিবাহে, চিত্রা, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, এই কয়টী নক্ষত্র প্রশস্ত, কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, এই গুলির প্রশস্ততা আপদ্বিষয়ে অর্থাৎ বিপত্তিকালে বিবাহ দিতে হইলে। "চিত্রাশ্রবণাধনিষ্ঠাশ্বিনী নক্ষত্রং যজুর্ব্বেদি বিষয়ং" ইহাই আচার্য্য-বাক্য। পারস্কর সূত্রেও "স্বাতৌ চ মৃগশিরসি রোহিণ্যাম্বা" এইরূপ দেখা যায়। স্বাতিনক্ষত্র বিবাহে প্রশস্ত, কিন্তু স্বাতির পূর্ব্বোক্ত গুণানুকীর্ত্তন অন্যত্র পাওয়া যায় না। ইহাতে অনুমান করা যায়, আপস্তম্বের সময়ে যজুর্ব্বিবাহ স্বাতিনক্ষত্রেই প্রশস্ত বলিয়া ব্যবহৃত হইতেছিল। মনুষ্য-শরীরের সহিত গ্রহ-নক্ষত্রাদির এরূপ দৃঢ় সম্বন্ধ আছে, যাহাতে মনুষ্যের বহুবিধ শুভাশুভ গ্রহ-নক্ষত্রগণের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে। নক্ষত্রাদির সহিত মানবের কর্ম্মকাণ্ডের দৃঢ় সম্বন্ধ রাখিতে আর্য্যমহর্ষিগণ এই যুক্তিকে ভিত্তিরূপে অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। এই বিষয়টী জ্যোতিষশাস্ত্র-প্রতিপাদিত। পরিবর্ত্তনের বেগে অনেক সময় শাস্ত্র ছাড়িয়াও ব্যবহার শ্রেষ্ঠতা লাভ করে। বহুদিন পরে ঐ দৃঢ় প্রচলিত ব্যবহার-পরম্পরাও শাস্ত্ররূপে পরিণত হইয়া যায়। স্বাতির প্রাধান্য জ্যোতিষের অনুমোদিত না হইলেও, ব্যবহার-বশে গৃহ্যসূত্রে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। মহর্ষি গোভিলের সময়ে ব্যবহার-প্রাধান্য শাস্ত্রকে পরাজিত করে নাই। গোভিল বলেন,—

"পুণ্যে নক্ষত্রে দারান্ কুর্ব্বীত"

অর্থাৎ জ্যোতিষ শাস্ত্রোক্ত পুণ্য নক্ষত্রে দারাগ্রহণ করিবে। অনেকে বলেন, আপস্তম্ববাক্যের তাৎপর্য্য স্বাতিনক্ষত্রের প্রশংসাকথন নহে। স্বাতির প্রাধান্য সেই সময়ে প্রচলিত ছিল, ইহা জ্ঞাপন করাই উদ্দেশ্য। তিনি অপর সকল জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত পুণ্যনক্ষত্র গ্রহণ করিবার অভিপ্রায় সঙ্কেতে প্রকাশ করিয়াছেন। "ব্রাহ্মণাবেক্ষাবিধিঃ" বলায়, ব্রাহ্মণে অর্থাৎ বিধায়ক বেদবাক্যে যে সমস্ত নক্ষত্র কর্ম্মোপযোগী বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার অপেক্ষা এ বিধানে করিতে হইবে। পুণ্য-নক্ষত্রে পাণিগ্রহণ উচিত। ফল উক্ত নক্ষত্রে একরূপই সর্ব্বত্র, তবে স্বাতির ব্যবহারিক প্রাধান্য অব্যাহত, এই টুকু আপস্তম্বের সূত্রের রহস্য। হরদত্ত বলেন, এখানে একথা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে না বলিলে বোধহয় যে, পুংসবনের মত বিবাহও একমাত্র স্বাতি নক্ষত্রে বিহিত হইয়া উঠে, কিন্তু ব্যবহার তাহার বিরোধী, অতএব পূর্ব্বোক্তরূপে সিদ্ধান্ত করাই সঙ্গত।

ইষ্বকাশব্দো মৃগশিরসি নিষ্ঠ্যাশব্দঃ
স্বাতৌ। ৪

"ইষ্বকাভিঃ প্রসৃজ্যন্তে" বলা হইয়াছে। ইষ্বকা শব্দ প্রসিদ্ধ নহে। আর নিষ্ঠ্যা শব্দে

অর্থও সাধারণে অবগত নহে, কাজেই আপস্তম্ব স্বয়ংই ইষকা শব্দের অর্থ মৃগশিরা নক্ষত্র এবং নিষ্ঠ্যাশব্দের অর্থ স্বাতিনক্ষত্র, একথা বলিতেছেন। সাধারণতঃ অপ্রচলিত কোনও অর্থে শব্দ প্রয়োগ করিলে, অর্থটী বলিয়া দেওয়া গ্রন্থরচয়িতার প্রধান কর্ত্তব্য। এই গুরুতর দায়িত্বের কর হইতে অনেক প্রাচীন লেখক মুক্তিপান নাই। আপস্তম্ব প্রশংসার্হ। ভারতবর্ষের প্রাচীন পদ্ধতির অনেকটা প্রকট পরিচয় পরসূত্রে পাওয়া যাইবে। যাহা পরসময়ের শাস্ত্রকারগণ অধর্ম্ম—অকর্ত্তব্য—মহাপাপের কার্য্য মনে করিয়াছেন,তাহাই পূর্ব্বাচার্য্যগণের বিহিত নিয়ম। ভগবন্ কাল! তোমার কুক্ষিতে যে জগতের কত পরিবর্ত্তন-পরিপাক হইয়াগিয়াছে,তাহা ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবের অগম্য। তোমার মাহাত্ম্য-নির্ণয় দুরূহ। আজ যাহা ধর্ম্ম, সভ্য সমাজে গৃহীত, আদৃত, পূজিত,কা'ল তাহা ঘৃণা, জঘন্য, অকর্ম্মণ্য!

বিবাহে গৌঃ। ৫

বৃত্তিকার হরদত্ত বলিতেছেন "বিবাহে গোরালব্ধব্যা দুহিতৃমতা" অর্থাৎ কন্যার পিতা বিবাহে গোবধ করিবেন। আজকাল ভারতীয় হিন্দু-সমাজে "গোবধ" শব্দ উচ্চারণ করাও দোষের হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কার্য্য ত বহুদূরে। বহু বর্ষ-পূর্ব্বে আচার-ব্যবহারের নির্দেষ্টা আপস্তম্ব মহর্ষি বলিতেছেন,বিবাহে গোবধ করিতে হইবে। জগতে কোনও নিয়ম চিরদিন প্রচলিত থাকিতে পারে না,এবং থাকিলেও সমাজের মঙ্গলকর হয় না। অদ্য আমরা যে আইন বলে শাসিত হইতেছি, আমাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন অর্থাৎ সামাজিক জীবন এবং জাতীয় জীবনের এক একটী একটী দৃশ্য অভিব্যক্তি হইলে,স্বতন্ত্রপ্রকার আইন-বন্ধনের বন্দোবস্ত করা আবশ্যক হইয়া উঠিবে। এইরূপ পরিবর্ত্তন চিরদিনই হইতেছে। জাতীয় স্রোত অথবা সামাজিক স্রোত ফিরান সাধারণ লোকের কার্য্য নয়। প্রবল বেগের সমক্ষে সুদৃঢ় বাঁধ দেওয়া আবশ্যক হইয়া উঠে। যে সময় সমাজের যে সকল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অর্থাৎ নেতা, তাঁহারাই সামাজিক স্রোতকে অন্য দিক্ দিয়া প্রবাহিত করিবেন। এই পরিবর্ত্তন বিধাতার অভিপ্রেত এবং জগতের মঙ্গলকারক। সকল সময় কোনও একটী জিনিষ ভাল লাগে না। শীতল জল গ্রীষ্মের সময় ভাল লাগে, শীতকালে বহ্নিসেবন সুখকর। এইরূপ দেশ-কাল-পাত্রানুসারে ব্যবহার-পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া উঠে। আর্য্যগণের দেশপরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বতন্ত্র স্থানে উপনিবেশ স্থাপন, স্বাস্থ্য, মনোবৃত্তি ও অন্যান্য আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তনের একটী কারণ হইতে পারে। বর্ত্তমান ভারতীয় সমাজের অবস্থা বহু পূর্ব্বে হইতেই তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণ অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা গোবধাদি নিয়মের পরিবর্ত্তন করিতে আদেশ করিয়াছেন। সেই বাক্য দৈববাণীর ন্যায় কার্য্যকর হইয়াছে। আদিপুরাণে দেখাযাইতেছে ;—

দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ।
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্দত্তা কন্যা প্রদীয়তে।
কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।
আততায়িদ্বিজাগ্র্যাণাং ধর্ম্মযুদ্ধেন হিংসনং,

* * * * *

প্রায়শ্চিত্ত বিধানঞ্চ বিপ্রাণাং মরণান্তিকং,

সংসর্গদোষঃ পাপেষু মধুপর্কে পশোর্বধঃ।
দত্তৌরসেতরেষান্তু পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ॥

অর্থাৎ দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, সজল কমণ্ডলু ধারণ, দেবরের দ্বারা পুত্রোৎপাদন, বিবাহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া, অসবর্ণ কন্যা বিবাহ, ধর্ম্মযুদ্ধে শত্রু-ব্রাহ্মণ-হিংসা * * * ব্রাহ্মণের মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, পাপে সংসর্গ-দোষ, মধুপর্কে পশু(গবাদি) বধ, দত্ত ও ঔরস ব্যতীত ক্ষেত্রজাদি পুত্রের গ্রহণ, এই সকল কার্য্য বলিয়া পরে বলিতেছেন,—

এতানিলোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ,
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থা পূর্ব্বকং বুধৈঃ।

অর্থাৎ এই সকল কার্য্য কলির প্রথমে পণ্ডিতেরা সমাজের মঙ্গলের জন্য নিষেধ করিবেন। অতএব বুঝাগেল, গোবধ নিষিদ্ধ হওয়া উচিত এবং শাস্ত্রানুমত।

গৃহেষুগোঃ। ৬

অপর একটা গরুকে গৃহে সন্নিহিত করিবে। তাৎপর্য্যাধীন তাহাকে বধ করিবার ব্যবস্থাই করা হইল। এই দুইটী (বিবাহস্থানে একটী এবং গৃহে অপরটী) গোবধের উদ্দেশ্য ক্রমে ক্রমে পরবর্ত্তিসূত্রে আপস্তম্ব মহোদয়ই বলিতেছেন। সুদর্শনাচার্য্যের মতে এই গোবধটী শাস্ত্রসঙ্গত না হইলেও, ব্যবহার-প্রসিদ্ধ, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিবাহ স্থানে গবালম্ভন প্রথা অস্মদ্দেশে একটু বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। একটী গরুকে বিবাহস্থানে উপস্থিত করা গোবধ-প্রথা রহিত হইলে পরেও প্রচলিত ছিল। তখন নাপিত "গোর্গো" অর্থাৎ "গরু গরু" এই কথাটী বলিয়া উঠিত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বরের অভিপ্রেত হইলে, এই গরু আছে, হত্যাকরা যাইতে পারে। এই সময়ে প্রথার সম্পূর্ণ নিষেধ হয় নাই, বরের অভিপ্রায়াধীন; কাজেই আদেশ গ্রহণ করা হইত। যখন প্রথা নিষিদ্ধ হইল, তখন গরুর মোচনার্থে দুই একটী মন্ত্রের ব্যবস্থাও হইল। অতঃপর বহুকাল গত হইলে গরু আনয়ন বন্ধ হইয়া গেল, কিন্তু "গৌর্গৌঃ" উচ্চারণ বজায় থাকিল। উহা একটী বিবাহাঙ্গ মন্ত্র বলিয়াই সাধারণ লোকে মনে করে। আজ কাল বঙ্গের অনেক পল্লীতে নাপিত "গৌর গৌর" বলিয়া থাকে। সাধারণ লোকের ধারণা, উহা গৌরচন্দ্রের পবিত্র নাম। একদা কোনও পল্লীবাসী লোক আমার নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন, বিবাহে গৌরচন্দ্রের নাম বলা হয় কেন? আমি প্রকৃত কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া হার মানিলাম, এবং তাঁহার নিকট উপহাসাস্পদও হইলাম, পরে তিনি আমাকে বলিলেন,—ইহা একটী উপদেশ। গৌরচন্দ্র বিবাহ করিয়াও সংসারে আসক্ত হন নাই। অতএব তোমরাও তদ্রূপ সংসারে অনাসক্তভাবে থাকিতে চেষ্টা করিবে। ব্যাখ্যাটী শুনিয়া কথঞ্চিৎ তৃপ্ত হইলাম, কিন্তু এইরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাপার আধিক্য হওয়াতেই আমাদের অনেক কাজ আসলের সঙ্গে অমিল থাকে, এই চিন্তায় একটু দুঃখিতও হইলাম। এই দুইটী গোবধের পরিণাম পরসূত্রে দেখা যাইবে।

তয়াবরমতিথিবদর্হয়েৎ। ৭

সেই গো দ্বারা বরকে অতিথির ন্যায় অর্হণা অর্থাৎ সম্মাননা সৎকারে সৎকৃত

করিবে। যথাক্রমে দুইটী গোবধ বলা হইয়াছে, দুইটীর পরিণামও যথাক্রমে বলা হইতেছে। প্রথম বিবাহ স্থানে যে গোবধ করা হইয়াছে, তাহা বরের মধুপর্ক দিবার জন্যই। অতিথিকে যেরূপ মধুপর্কাদি দান প্রাচীন পদ্ধতি ছিল, তদ্রূপ এই নব জামাতাকেও দেওয়া হইত। শাস্ত্র বলেন;—"গোমধুপর্কার্হো বেদাধ্যায়ঃ" বেদাধ্যয়নসম্পন্ন ব্যক্তি আতিথ্য স্বীকার করিলে, তাঁহাকে গোসংযুক্ত মধুপর্ক দেওয়া উচিত। মধুপর্ক-উদ্দেশ্যেই গবাদি পশুর বধ হইত। "মধুপর্কেপশোর্ব্বধঃ" এই পূর্ব্বোক্ত বাক্য এখানে আবার স্মরণ করা উচিত। মহাকবি ভবভূতি-বিরচিত সুপ্রসিদ্ধ উত্তর চরিত নাটকে মহামুনি বসিষ্টের "বৎসরী ভক্ষণ" ব্যাপারটা একটু রহস্যরূপেই পরিণত হইয়াছে। সেখানে তাঁহাকে ব্যাঘ্র বলিয়াও কেহ কেহ উপহাস করিয়াছে। যাহাহউক, বেদজ্ঞ (বর) গোসংযুক্ত মধুপর্ক পাইতে অধিকারী বলিয়াই পূর্ব্বে বিবাহে গোবধ হইত। এখন উভয়ই নাই, বেদাধ্যয়ন দূরে, গোবধও বহুদূরে, সুতরাং কাহারও অপেক্ষায় কাহারও কষ্ট পাইতে হয় নাই। মঙ্গলের বটে।

যোঽস্যাপচিতস্তমিত-রয়া। ৮

বরের পূজ্য আচার্য্যাদি যে কেহ তাহার সঙ্গে আসিয়াছেন, তাঁহাকে অপরটী অর্থাৎ গৃহে যে গরুটী বধ করা হইয়াছে, তাহার দ্বারা মধুপর্কাদি দানে সংকৃত করিবে। সুদর্শনাচার্য্য বলেন, বিদ্যাসম্পন্ন বলিয়াই হউক, চরিত্রবান্ বলিয়াই হউক, সম্পত্তিশালী বলিয়াই হউক, সৎকুলজাত বলিয়াই হউক, আর পিতা বা আচার্য্য বলিয়াই হউক, ইহার কোনও প্রকারে যে ব্যক্তি বরের পূজ্য, তাঁহাকেই ঐরূপে গৃহে হত গরুটীর দ্বারা মধুপর্কাদি দিতে হইবে। এ নিয়মের কোনও অনুকল্প ব্যবস্থা আছে বলিয়া বুঝিতে পারি না। বরের পক্ষে সাদা মধুপর্ক ও "গৌর গৌর" বলাই অনুকল্প।

এতাবদ্ গোরালম্ভস্থানং অতিথিঃ পিতরো বিবাহশ্চ। ৯

এই তিন সময়েই 'গবালম্ভ করিতে হইবে। অতিথি' এবং পিতৃকর্ম্ম অর্থাৎ মাংসাষ্টকাদি ও বিবাহ, এই তিনটী ব্যতীত ব্যবহারসিদ্ধ গৃহ্যকর্ম্মে প্রায়শঃ গোবধ নাই। বৈদিক যাগযজ্ঞাদিতে আছে। মাংসাষ্টকা গোভিল গৃহ্যসূত্রেও গোমাংসদ্বারা করিবার বিধান দেখিতে পাই। এই তিন কর্ম্মের মধ্যে বিবাহে বিকৃত অনুকরণ ব্যবস্থা চলিতেছে। আতিথ্য এবং পিতৃকর্ম্মে মাংস ব্যবহার ত দূরের কথা, গরুর নামটী উচ্চারণ করিতেও শুনাযায় না।

সুপ্তাং রুদতী নিষ্ক্রান্তাং বরণে পরিবর্জ্জয়েৎ। ১০

বিবাহের কন্যাবরণে যে কন্যা নিদ্রিতা এবং যে কন্যা রোরুদ্যমানা ও যে কন্যা গৃহ হইতে নির্গত হইয়া দৌড়াইয়া যাইবে, সেই সেই কন্যাকে পরিত্যাগ করিবে। পিতামাতা কন্যার মতামত লইয়া অথবা তাহাদের অভিপ্রায়ের অধীন থাকিয়া বিবাহাদি দিবেন, এরূপ সিদ্ধান্ত আর্য্যশাস্ত্রের সম্পূর্ণ অনুমোদিত না হইলেও যে বিবাহে কন্যার অথবা পুত্রের উপস্থিত অথবা ভাবী অনু-

খের কারণ থাকে, সেইরূপ বিবাহ দিতে পুত্র-কল্যাণকামী পিতার এবং মাতার কোন দিনই কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ ছিল না। যে কন্যা বরণ জন্য গ্রহণ করিতেগেলে শুইয়া পড়ে, অথবা রোদন করে, কিম্বা ছুটিয়া পলাইতে চায়, সে কন্যার ঐ বিবাহ দেওয়া অসঙ্গত, কারণ ঐ বিবাহে সে নিজের কোনও অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়াছে। রোদনাদি অলক্ষণ সংঘটিত হইলে, শুভ কার্য্যে বাধা উপস্থিত হয়, আর্য্যশাস্ত্রে এরূপ কথা অনেক স্থানে আছে। অতএব সর্ব্বথা ঐ কন্যাকে, বিবাহে বরণার্থে গ্রহণ করিবে না। বৃত্তিকার বলেন "পরিগ্রহণ মত্যর্থপ্রতিষেধার্থং" বর্জ্জয়েৎ বলার উদ্দেশ্য তিনি বুঝাইতে চাহেন। ত্যাগ করিবে বলিলেই যথেষ্ট হইত, পরিত্যাগ পর্য্যন্ত বলিবার হেতু এই যে, কখনও ঐরূপ কন্যা গ্রহণ করিবে না। একান্ত দৃঢ়রূপে নিষেধ করাই এখানকার তাৎপর্য্য। একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, স্বেচ্ছাবিরুদ্ধ সম্বে বিবাহ দিলে, তাহার দুঃখের কারণ হইবে। আমার অনভিমতে যদি কেহ আমার মঙ্গলজনক কার্য্য করিতেও চেষ্টা করেন, তাহা হইলে সংস্কার বলে ঐ কার্য্যে আমি প্রকৃতরূপে মানসিক শান্তি লাভ করিতে পারিব না। উহার গুণও আমার চ'খে দোষ দেখাইবে।

বিবাহে অপর নিষিদ্ধ কন্যার উল্লেখ করা যাইতেছে। এই নিয়মগুলির পূর্ব্বে বিচার করা হইত বলিয়া বোধ হয়, ব্যভিচারের সংবাদ জানা যায় না, তবে অধুনা, ইহার মধ্যে অনেকগুলি সম্ভব হইলে প্রতিপালিত হয়, আবার স্থান বিশেষে, অনেকগুলিই উপেক্ষিত হয়, দেখিতে পাই। ফলতঃ যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলে পরিত্যাগ করাই ভাল।

দত্তাং গুপ্তাং দ্যোতাং ঋষভাং শরভাং
বিনতাং বিকটাং মুণ্ডাং মণ্ডূষিকাং
সাংকারিকাং রাতাং পালীং মিত্রাং
স্বনুজাং বর্ষকরীং চ বর্জ্জয়েৎ।১১

যে কন্যা দত্তা অর্থাৎ অপরকে দান করা হইয়াছে, সেই কন্যা বিবাহে পরিত্যাগ করা উচিত। ঐরূপ যে কন্যা গুপ্তা অর্থাৎ প্রযত্নরক্ষিতা (যাহাকে দৃঢ়রূপে রক্ষা করা হয়, তাৎপর্য্যতঃ যাহার প্রতি দুর্নীতির আশঙ্কায় শাসনে রাখিবার কঠোর বন্দোবস্ত হইয়াছে) তাহাকেও পরিত্যাগ করিবে। আর যে কন্যা দ্যোতা অর্থাৎ বিষমদৃষ্টি (যাহাকে সাধারণতঃ টেরা বলা হয়) আর যে কন্যা ঋষভা অর্থাৎ ঋষভশীলা (ঋষভের মত অর্থাৎ যাহার পুরুষের মত চরিত্র; অনেক স্ত্রীলোকের আচার-ব্যবহার পুরুষের মত, তাহাতে স্বাভাবিক সুলভ ধর্ম্মগুলি নাই) এবং যে কন্যা শরভা, (যাহাকে লাভ করিবার জন্য দুশ্চরিত্র পুরুষেরা সর্ব্বদা প্রার্থনা করে, এবং যে নিজেও মনে মনে দুশ্চরিত্র পুরুষের সঙ্গ প্রার্থনা করে, তাহার নাম শরভা) তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। বিনতা অর্থাৎ নতগাত্রা (বেঁড়ে) কিম্বা কুব্জা কন্যাও পরিত্যাজ্যা। যে কন্যা বিকটা অর্থাৎ যাহার জঙ্ঘাদেশ অতি স্থূল এবং বিস্তীর্ণ কিম্বা যে কন্যা দেখিতে ভয়ঙ্করা, বিবাহে তাহার পরিত্যাগ আবশ্যক। যে কন্যা মুণ্ডা (মুণ্ডিতকেশা)

অর্থাৎ যাহার মাথার চুল মুড়াইয়া ফেলা হইয়াছে।) এবং যে কন্যা মণ্ডুকিকা (যাহার শরীরের চর্ম্ম মণ্ডুক অর্থাৎ ভেকের মত অমসৃণ) ও যে কন্যা সাংকারিকা (কুলান্তরে জাতা অথবা যে কুলান্তরের অপত্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ অপরের পালিতা পুত্রী) কিম্বা যাহাকে রাতা অর্থাৎ রতিশীলা (কামুকী) বলিয়া নিশ্চয় করাযায়, সে সকল কন্যার বিবাহে পরিবর্জ্জন আবশ্যক। পালী অর্থাৎ পশুপালয়িত্রী (প্রাচীন কালে কন্যাগণের উপর পশু প্রভৃতির পালন-দোহনাদি ভার অনেক সময়ে অর্পিত থাকিত) কন্যাকে ত্যাগকরা আবশ্যক। যে কন্যার অনেকগুলি মিত্র, তাঁহাকেও পরিত্যাগ করা একান্ত দরকার। আর যে কন্যা অনুজা, অর্থাৎ যাহার অনুজা (ছোট ভগিনী) বড় সুন্দরী, তাহাকেও বিবাহ করিতে নাই। এখানে সূত্রকার মহাশয়ের অভিপ্রায় অল্পেই আবিষ্কৃত হয়। বৃত্তিকার সুদর্শনাচার্য্যও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, "শোভনায়ামনুজায়াং কদাচিৎ প্রমাদঃস্যাৎ" যদি শ্যালিকাটী সুন্দরী হয়, তবে ভগিনীপতি অনায়াসে একটী প্রমাদ ঘটাইয়া বসিতে পারেন। সমাজে শ্যামাঙ্গীর ছোট-গৌরাঙ্গী-ভগিনী ভগিনীপতির সহিত প্রমাদ সংঘটন করিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত অসম্ভব নহে। মোটের উপর বিপৎপাতের সম্ভাবনা দেখিয়া, জানিয়া শুনিয়া করাটা ঠিক নহে। বর্ষকরী কন্যার পরিবর্জ্জন আবশ্যক। বর্ষকরী কথাটার অর্থ লইয়া একটা গোলযোগ আছে। তাহাতে ব্যবস্থাও উলটিয়া যায়। যে কন্যা বরের জন্মগ্রহণের এক বৎসর পূর্ব্বে জন্মিয়াছে, তাহাকে অনেকে বর্ষকরী বলেন। তাঁহাদের মতে জন্মের ২।৪ মাস পূর্ব্বে জন্মিলেও বিবাহ হয়, কিন্তু তাহা অশাস্ত্রীয়, অতএব এইরূপ অর্থ সঙ্গত হইতে পারে না; ইঁহা অনেকে বলেন। তাঁহাদের মতে বর্ষ অর্থাৎ বরের জন্মের পূর্ব্বে যে কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, অর্থাৎ যে বরের বয়োজ্যেষ্ঠা (১মাস, ৫দিন, এক বৎসরের বিশেষ নাই) তাহার বিবাহ সে বরে দিতে নাই। কেহ কেহ বলেন, বরের জন্ম বৎসরে যে কন্যা জন্মে, সে বর্ষকরী। ইঁহাদের অভিপ্রায়মত ব্যবহার সমাজে অধিক স্থানে সংঘটিত হয় না। বয়োজ্যেষ্ঠার সহিত বিবাহও সুচারুকৌলিন্য প্রথার কল্যাণে আমাদিগকে দর্শন করিতে হইতেছে। সম্বৎসরত দূরের কথা, দশবৎসর পর্য্যন্ত বয়সের জ্যেষ্ঠা কন্যার পাণিগ্রহণ কন্যাপেক্ষা দশবর্ষ ন্যূন বয়স্ক পাত্রের দ্বারা হইতেছে! শাস্ত্র আর জীবিত থাকিয়া কষ্ট পান কেন? বর্ষকরীর আর একটী অর্থ আছে। স্বেদশীলা অর্থাৎ যাহার অতিশয় ঘর্ম্ম হয়, সে কন্যাও বিবাহে পরিত্যজ্যা। অতিশয় ঘর্ম্ম হইলে শরীরে দুর্গন্ধ এবং তাহা দ্বারা রোগ অনুমান করাযায় ইহাই ত্যাগের কারণ। সুদর্শনাচার্য্য দত্তা শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, অন্যের প্রতি বাগ্দত্তা অথবা হাতে জল লইয়া দান করিলাম, এইরূপে প্রতিপাদিতা। ফলতঃ ঐ কন্যার পূর্ব্বে বিবাহার্থ সম্প্রদান সিদ্ধ হউক, অথবা বাগ্দান পর্য্যন্ত হইয়াই থাকুক, সে কন্যা বিবাহে বর্জ্জনীয়া। আ'জ কা'ল বাগ্দান উঠিয়া গিয়াছে। আসন হইতে বিবাহ-সভায় বর উঠিয়া চলিলেন, অপরের সহিত বিবাহ হইল, ইহাও দেখা যাইতেছে।

সুদর্শনাচার্য্য দোতা শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, পিঙ্গাক্ষী (যাহার চক্ষু পিঙ্গল বর্ণ) কন্যাকেই দোতা বলা শাস্ত্রকারের অভিপ্রেত। তিনি আরও বলেন, যাহার গমন ঋষভ অর্থাৎ বৃষের মত সে ঋষভা, অথবা যাহার ঘাড়ে বৃষের মত ককুদ আছে, সে ঋষভা। শরভা শব্দে তিনি নিষ্প্রভা অথবা নীলবর্ণ লোমবিশিষ্টা নারীকে বুঝিয়াছেন। মুণ্ডা বলিলে, যাহার চুল উঠে নাই, তাহাকেও বুঝা উচিত, ইহা সুদর্শনের সূক্ষ্মদর্শন। ইনি "বামনা" শব্দটী সূত্রে নিবিষ্ট করেন এবং দগ্ধাঙ্গা- (যাহার শরীর পুড়িয়া গিয়াছে) কে বামনা বলেন। সাংকারিকা অর্থে তিনি বলেন, যে কন্যা গর্ভস্থ থাকাসত্ত্বে মাতা স্বামি-বিয়োগ প্রাপ্ত হন, তাহার নাম সাংকারিকা। "কন্দুকা" শব্দটীও তিনি সূত্রে পাঠ করেন। তাঁহার ব্যাখ্যায় বলেন—কন্দুক-ক্রীড়াশালিনী অথবা ঋতুস্নাতা কন্যাকে কন্দুকা বলা যায়। মহর্ষি মনুর সময়েও নিষিদ্ধ কন্যাগণের মধ্যে ইহার দুইচারিটীকে দেখিতে পাই।

"নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিনীং, নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাং।

মনুসংহিতা ৩য় অধ্যায় ৮ম শ্লোক।

কপিলা অর্থাৎ যাহার কেশ কপিলবর্ণ, সেই কন্যা এবং যাহার অঙ্গ-বৃদ্ধি আছে, (যেমন একহাতে ছয় আঙ্গুল) সেই কন্যা ও চিররোগিণী, ইহাদিগকে বিবাহ করিবে না। যাহার শরীরে অধিক লোম, তাহাকে, এবং লোম নাই, এরূপ কন্যাকে বিবাহ করিবে না। যে পুরুষের সহিত বেশী কথা বলে, তাহাকে এবং পিঙ্গলাক্ষী নারীকে বিবাহ করা অন্যায়। ধর্ম্মশাস্ত্র-রচয়িতা মহর্ষিগণের আদেশ শিরোধার্য্য ও সর্ব্বথা প্রতিপালনীয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে একটু চিন্তায় আকুল হইতে হইতেছে। যে সমস্ত লক্ষণ নিষিদ্ধ, মহর্ষিগণের মতে সেই সকল কন্যাকে বিবাহে পরিত্যাগ করা হইল; এখন বিবেচনাকরা আবশ্যক, এই সকল লক্ষণের অন্ততঃ একটীও যাহাতে আছে, সে কন্যার বিবাহ হওয়া উচিত কি না। দেখিতে গেলে, এই সকল দোষ-লক্ষণ একেবারে একটীও নাই, এমন কন্যা পাওয়া দুর্ঘট; পাইলেও বিবাহ-যোগ্যস্থানে পাওয়া যায় না। এ অবস্থায় পুরুষ কি ঈশ্বরের পবিত্র আজ্ঞা প্রতিপালনে উদাসীন থাকিবে? না—এই সকল কন্যা আজীবন অবিবাহিতভাবে কাল অতিবাহিত করিবে? সমাজ এ আদেশ শুনিতে প্রস্তুত নহেন; শুনিতেগেলে, বহুসংখ্যক নারী এবং বহু নর জাগতিক ব্যাপারে সংসৃষ্ট থাকিয়াও বিবাহসংস্কারে বঞ্চিত থাকে। এই বিবাহবিভ্রাট শাস্ত্রকারেরা চিন্তা করিয়াছিলেন কি? আমরা বলি, ভাবিয়াই লিখিয়াছেন। তাঁহারা সমাজকে বিবাহে বঞ্চিত হইতে বলেন না। তবে বলেন, এইরূপ কন্যা-বিবাহ সমাজের মঙ্গলের জন্য নহে। ঐ সকল নিষিদ্ধা কন্যার বিবাহ সমাজে প্রচলিত থাকায়, সামাজিকেরাও অনবরত তাহার বিষময় ফল ভোগ করিতেছেন। ঋষিরা বলেন, যদি এরূপ কন্যা বিবাহ না করা হয়, তবে এ সকল বিপত্তির যন্ত্রণায় ব্যস্ত হইতে হয় না। ঋষিগণের আরও অভিপ্রায়, তাঁহাদের অভিপ্রেত আচারবান,

বিধান, সদ্বংশজ সুপুরুষ বর এরূপ কন্যাগণকে বিবাহ করিলে দোষের হয়। যদি যোগ্যের সহিত যোগ্যের মিলন হয়, তাহা অনিবার্য্য, শাস্ত্র সেখানে নিরুত্তর। বিকলাঙ্গ ব্যক্তি বিকলাঙ্গী নারীকে বিবাহ করে, তাহাতে শাস্ত্রের মতামত নাই। শাস্ত্র বলেন, পূর্ণাঙ্গবর সুন্দরাবয়বিনী নারীকে বিবাহ করিবে, বিকলাঙ্গীকে নহে। ইহাতে বিকলাঙ্গ পুরুষের বিকলাঙ্গী কন্যা বিবাহ করার নিষেধও নাই, বিধানও নাই। ঋতুস্নাতার বিবাহ নিষেধ করায় আমাদের আবার সেই "গৌরী" "রোহিণী'র কথা মনেপড়ে। প্রকৃতপক্ষে ঋতুস্নাতার প্রতি সন্দেহ হইবার কথা। রান্তা রমণীকে পরিত্যাগ করাসঙ্গত। কামুকীর বিবাহের পরিণাম অনেক স্থানে বিসদৃশ হইয়া দাঁড়ায়। অধিক বয়স্কাকে বিবাহ করিলে নানা রোগ ও অশান্তির কারণ থাকে, ইহা চিকিৎসাবিজ্ঞানেরও অনুমোদিত। পুরুষ সমবয়স্কার সহিত বিবাহিত হইলেও অপেক্ষাকৃত আশঙ্কার কারণ। বরের অপেক্ষা কন্যার বয়স কম হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। আপত্তি হইতে পারে যে, বয়োজ্যেষ্ঠা রমণীকে বিবাহ করিয়াও অনেকে অনেক সুপুত্র উৎপাদন করিতে পারিয়াছেন। বিবাহ পুত্রার্থে; যদি সেই মুখ্য উদ্দেশ্যই রক্ষিত হইল, তবে এ কন্যার বিবাহে বর্জ্জন যুক্তিসঙ্গত নয়। আমরা ইহার প্রত্যুত্তরে বলিব, বয়োজ্যেষ্ঠা, ভিন্ন জাতীয়া, বিবধা অথবা কুলটাকে বিবাহ করিয়াও অনেকে সুপুত্র প্রাপ্ত হইতে পারেন, কিন্তু মনে রাখা উচিত, কোনও স্থানে নিয়ম ভঙ্গ হইলে, তাহা নিয়মের ব্যভিচার মাত্র, তাহা স্বতন্ত্র নিয়ম নহে। ঐরূপ একটী দুইটীর অনুকরণ করিতে সমাজ চাহে না। অনেককে লইয়া অনেক স্থানে যে নিয়ম খাটিতেছে, সমাজ তাহাকেই আদর্শ করিবে। নিয়মের দুই একটী ব্যভিচারকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিলে, সমাজের আচার ব্যভিচারে পরিণত হইবে মাত্র। বারান্তরে অপর কথা বলাযাইবে। (ক্রমশঃ)

কস্যচিদ্ ব্রহ্মচারিণঃ।

সাংখ্য দর্শন।

(ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত কারিকা)

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

ঊহঃ শব্দোঽধ্যয়নং দুঃখবিঘাতাস্ত্রয়ঃ সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ।
দানঞ্চ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ সিদ্ধেঃ পূর্ব্বোঽঙ্কুশস্ত্রিবিধঃ। ৫১

পদপাঠঃ। ঊহঃ। শব্দঃ। অধ্যয়নং। দুঃখবিঘাতাঃ। ত্রয়ঃ। সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ। দানং। চ। সিদ্ধয়ঃ। অষ্টৌ। সিদ্ধেঃ। পূর্ব্বঃ। অঙ্কুশঃ। ত্রিবিধঃ।

ব্যাখ্যা। ঊহঃ—সিদ্ধির নামবিশেষ। শব্দঃ—একপ্রকার সিদ্ধি। অধ্যয়নং—ইহাও সিদ্ধির নাম। দুঃখবিঘাতাঃ—দুঃখের বিনাশ। ত্রয়ঃ—তিন প্রকার। সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ—সিদ্ধির এটীও একটী নাম। দানং—সিদ্ধির নাম। চ—এবং। সিদ্ধয়ঃ—সিদ্ধি সকল। অষ্টৌ—আটপ্রকার। সিদ্ধেঃ—সিদ্ধির। পূর্ব্বঃ—পূর্ব্বোক্ত অর্থাৎ প্রথমে কথিত। (তিনটী) অঙ্কুশঃ—আকর্ষক অথবা বিক্ষেপক। ত্রিবিধঃ—তিনপ্রকার।

বঙ্গার্থঃ। উহ, শব্দ, অধ্যয়ন, সুহৃৎ-প্রাপ্তি, দান, এবং ত্রিবিধ দুঃখ বিনাশ—তিন প্রকার (সিদ্ধি)—এই অষ্টবিধ সিদ্ধি। ইহার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ পদার্থ (অশক্তি, তুষ্টি, বিপর্য্যয়) সিদ্ধির প্রতিবন্ধক।

বিশদব্যাখ্যা।—তুষ্টির কথা বলা হইয়াছে, এখন সিদ্ধির বিষয় কথিত হইতেছে। উহ, শব্দ, অধ্যয়ন, দান, সুহৃৎপ্রাপ্তি, প্রমোদ, মুদিত, মোদমান, এই অষ্টপ্রকার শাস্ত্রোক্ত সিদ্ধি। ইহার মধ্যে গৌণ-মুখ্য ভেদ আছে। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই দুঃখ-ত্রয়ের বিনাশরূপ সিদ্ধি তিনটীই মুখ্যসিদ্ধি। কেন না জগতের জীব প্রধানতঃ দুঃখ নিবারণই প্রার্থনা করে। ঐ দুঃখবিনাশই জীব-জীবনের চরম লক্ষ্য ও পরম শান্তিকর। শাস্ত্রে উহাই মুক্তি নামে পরিচিত হইতেছে। অপর যে সকল সিদ্ধি জীবের অদৃষ্টগুণে সংঘটিত হয়, তাহারা কেহই ঐ প্রধান সিদ্ধির তুল্য নহে। অনেকেই দুঃখ বিনাশের উপায় মাত্র। অপর পাঁচটী গৌণ সিদ্ধির মধ্যে কেহ কাহারও কারণ এবং কেহ কাহারও কার্য্য বলিয়া প্রতীত হয়। অধ্যয়ন-সিদ্ধিই প্রথমা-সিদ্ধি। যথাবিধি গুরু-মুখ হইতে অধ্যাত্ম-বিদ্যার অক্ষরস্বরূপ গ্রহণই অধ্যয়ন। সমস্ত সিদ্ধির প্রথমেই অধ্যয়ন আবশ্যক। অধ্যয়ন-সিদ্ধির অন্য নাম তার। তাহার পর শব্দসিদ্ধি। অধ্যয়নে অক্ষরগ্রহণ, শব্দসিদ্ধিতে ঐ শব্দের অর্থজ্ঞান। শব্দ সিদ্ধির নাম 'সুতার।' অক্ষর-পাঠ ও তাহার অর্থজ্ঞান, এই উভয় প্রকারে অধ্যয়নকে বিভক্ত করা হইয়াছে ইহার প্রথমাংশের নাম অধ্যয়নসিদ্ধি ও শেষাংশের নাম শব্দসিদ্ধি। তৃতীয় সিদ্ধির নাম উহ। উহ শব্দের অর্থ তর্ক। শাস্ত্রের অনুমোদিত তর্কের সাহায্যে শাস্ত্রীয় পদার্থের প্রামাণ্য বিচারের সিদ্ধান্ত করার নাম এখানে উহসিদ্ধি। বিচার পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত স্থির করিতে হইলে, পূর্ব্বপক্ষে যুক্তির আলোচনা ও তাহার সংশয়াদি নিরসন করা আবশ্যক। ইহাকে মনন বলা যায় মনে মনে তর্ক-বিতর্কদ্বারা কোনও বিশ্বাসকে হৃদয়ে সুদৃঢ় করিতে পারিলেই মনন করা হইল। সুপ্রসিদ্ধ ন্যায়াচার্য্য উদয়ন বলিয়াছেন, স্বতঃসিদ্ধ স্বানুভবসিদ্ধ পদার্থে সংশয় না থাকিলেও, তদর্থে যুক্ত্যাদির অবতারণা কেবল মনন মাত্র। এই উহ সিদ্ধির নাম 'তারতার।' চতুর্থ সিদ্ধি—সুহৃৎপ্রাপ্তি। নিজের বুদ্ধি অনুসারে তর্কেদ্বারা যে মীমাংসা করা যায়, অনেক সময়ে স্বীয় সামর্থ্যে বিশ্বাস না থাকাবশতঃ, সেই মীমাংসায়ও অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত হয় না। তখন কোনও সুবিদ্বান্ ব্যক্তির নিকট হইতে ঐ বিষয়টীর সত্যতা বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক হয়। ব্রহ্মচারী প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎই সুহৃৎপ্রাপ্তি। জ্ঞানী সকলেরই আত্মীয়, তাঁহার অন্তঃকরণ সুন্দর, কাজেই তিনি জগতের সুহৃৎ। এরূপ সুহৃদের (মহাপ্রাণ সাধকের) নিকট গমন করিয়া, তাঁহার অনুগ্রহ লাভ সুহৃৎপ্রাপ্তি-সিদ্ধি। ইহার অপর একটী নাম 'রম্যক।' সাধকের নিকট এই সিদ্ধি বড় রমণীয়। পঞ্চম সিদ্ধি—দান। বিবেকের প্রবাহ যখন স্বচ্ছভাব ধারণ করে, তখন বিবেকের বিমলতা স্বরূপ সেই সিদ্ধিকে দান-সিদ্ধি বলা যায়। নিরন্তর অভ্যাসবশে জ্ঞানের পরিপক্কতাই এই অবস্থা। যখন বারম্বার আলোচনা করায়, জ্ঞানের অন্তরে

অন্তঃকরণের অন্ধকার রাশি বিলীন হয়, তখন সেই নিরাবাধ নির্ম্মল বিবেকস্রোত বহিতে থাকে, উহাই সাধকের প্রাণের বল—প্রধান অবলম্বন। এই সিদ্ধির নামান্তর 'সদামুদিত।' পাঁচটী গৌণ সিদ্ধির নাম রাখিতেও শাস্ত্রকারগণ অসাধারণ ধিষণার পরিচয় দিয়াছেন। প্রথম সিদ্ধির নাম—তার। (তারয়তি ইতি ব্যুৎপত্ত্যা) সাধককে বিপজ্জাল হইতে ত্রাণ করে বলিয়াই 'তার' নাম। তাহার পর সুতার। তারণ বিষয়ে 'তার' অপেক্ষা এ সিদ্ধির সৌন্দর্য্য এবং সামর্থ্য আর একটু অধিক, কাজেই নাম—সুতার। তদপেক্ষা তারতারের স্থান আর একটু উচ্চে। তারসিদ্ধি হইতেও তার অর্থাৎ উন্নত অথবা উৎকৃষ্ট, ইহাই নামের রহস্য। তাহার পর চতুর্থ সিদ্ধির নাম 'রম্যক' রাখিবার উদ্দেশ্য এই যে, সাধকের মন এই সিদ্ধিতে আগ্রহের সহিত রমণ করে। পঞ্চম সিদ্ধির নাম সদামুদিত; সাধকও তখন সদা মুদিত অর্থাৎ সদানন্দ। মুখ্য সিদ্ধি কয়টীর নাম,—প্রমোদ, মুদিত, মোদমান রাখাই সুবিবেচকের কার্য্য হইয়াছে, কারণ যদি ত্রিবিধ দুঃখেরই বিনাশ হইল, তখন সাধকের আনন্দ বই আর রহিল কি? আনন্দময় সাধক তখন আনন্দসলিলে হৃদয়ের ত্রিতাপানল নির্ব্বাপিত করিয়া সুশীতল হইয়াছেন। বিপর্য্যয়, অশক্তি, তুষ্টি, এই তিনটী সিদ্ধির অঙ্কুশ। তাহার কারণ, বিপর্য্যয় বিবেক-জ্ঞানের চির শত্রু, কাজেই বিপর্য্যয় সিদ্ধির বাধা জন্মায়। অশক্তি সকল সিদ্ধিরই প্রতিবন্ধক। সামর্থ্য না থাকিলে কিছুতেই কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। তুষ্টিও সিদ্ধির প্রতিকূলাচরণ করে। কোনও বিষয়ে তুষ্ট হইলে তাহার প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া উঠা যায় না। যাহা আমার কাছে ভাল লাগে, স্বভাবের শক্তিতে আমি তাহার গুণে মোহিত, তাহার দোষের ভাগ আমার চক্ষে পড়ে না। কিছুর উপর তুষ্ট হওয়াই অন্যায়। আসক্তিতে মোহ উৎপাদন করে। কোনও কোনও আচার্য্যের মতানুসরণ করিলে সিদ্ধির অন্য প্রকার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যাইবে। ঊহ অর্থ স্ফুরণ; অভ্যাসাদি ব্যতীত আত্মজ্ঞানের পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে যে পরিস্ফুরণ, তাহার নাম ঊহ। শাস্ত্রে এরূপ অনেক আখ্যায়িকা আছে, যাহাতে অবগত হওয়া যায়, ইহজন্মে অভ্যাসাদিরহিত ব্যক্তিরও স্বয়ং জ্ঞানোদয় হইয়াছে। অপর কেহ গুরুর নিকট অধ্যাত্মশাস্ত্র পাঠ করিতেছে, ঐ পাঠ শ্রবণ করিলে যদি সেই উপদেশ গ্রহণ করিয়া, কাহারও কখনও তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, তবে সেখানে সেই জ্ঞানস্ফুরণসিদ্ধি শব্দ শ্রবণ করিয়াই হইয়াছে বলিয়া, তাহারও নাম হয় শব্দসিদ্ধি। তাহার পর অধ্যয়ন; রীতিমতভাবে শাস্ত্রোক্ত ব্যবহার প্রতিপালন করিতে করিতে গুরুর নিকট স্বাধ্যায়াভ্যাস করাই অধ্যয়ন। অধ্যাত্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানোদয় হইলে, সেই সিদ্ধিকে অধ্যয়নসিদ্ধি বলে। আত্মতত্ত্ববিৎ সুহৃৎকে প্রাপ্ত হইয়া দৈবাৎ ভাগ্যক্রমে কাহারও জ্ঞানস্ফূর্ত্তি হইলে, সেই সিদ্ধির নাম সুহৃৎপ্রাপ্তি। দানসিদ্ধির লক্ষণে এ আচার্য্যের মতে একটু নূতনত্ব আছে। ইনি বলেন, দান সিদ্ধির কারণ, দাননিমিত্ত যে জ্ঞান হয়, তাহাকে দানসিদ্ধি বলে। কোনও জ্ঞানীকে আমি এই অর্থ দান

করিলাম,তিনি আমার সদ্ব্যবহারে প্রীত হইয়া আত্মতত্ত্বের যথাযথ রহস্য আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। এ জ্ঞানপ্রাপ্তির কারণ—দান। অনেকে এ সিদ্ধান্তে সংশয় প্রকাশ করিতে পারেন। জ্ঞানীর আবার দানের আকাঙ্ক্ষা কি? পাইলেইবা পরিতুষ্টি কি? শাস্ত্র স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন, যিনি লাভে এবং অলাভে সমান চিত্ত, পাইলেও হৃষ্ট হননা, না পাইলেও ক্লিষ্ট অথবা রুষ্ট হন না—তিনিই যথার্থ জ্ঞানী। এখানে একটু প্রণিধান আবশ্যক। মনেকবা দরকার, আপনার কোনও আকাঙ্ক্ষা না থাকুক.জগতের দুঃখ দূর করিবার জন্য জ্ঞানীর আকাঙ্ক্ষা আছে। আপ্তকাম পরমেশ্বরও জীবের ক্রন্দনে কর্ণপাত করিয়া দুঃখ বিনাশের ব্যবস্থা করেন, এ কথা আস্তিক শাস্ত্রে অনেক স্থানে আছে; জ্ঞানী ত পরে। যে সকল সাধু সন্ন্যাসী নিজের জন্য অর্থ গ্রহণ করা বিষ্ঠা-গ্রহণের মত অকর্ত্তব্য মনে করেন,শুনাযায়,দেশীয় রাজন্যবর্গের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া তাঁহারাই দুর্গম পর্ব্বত-প্রদেশের পথ ও সেতু প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়াছেন। পরহিতৈষণা উদ্দীপিত না হইলে জ্ঞানীর জ্ঞান বৃথা। যাহা জগতের কোনও কাজে আসে না, এরূপ জ্ঞান আর্য্য-শাস্ত্রে আদৃত নহে। আর্য্য-শাস্ত্রে মহামহিম কৃষ্ণ বলিতেছেন,—

উৎসীদেয়ুরিমেলোকা নকুর্য্যাং কর্ম্মচেদহং।
শঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ।

যদি আমি কর্ম্ম না করি, তবে আমার দৃষ্টান্তে এই জগতের সকলেই বৃথা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া লোক উচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। শঙ্করের (কুরীতির পরিণাম অবৈধ সন্তান উৎপাদন,তাহাই শঙ্কর প্রথার মূল) কর্ত্তা আমিই হইব। এই সকল প্রাণিগণ আমা হইতে কলুষিত—অর্থাৎ না বুঝিয়া আমার পথে চলিতে যাইয়া জগৎকে মলিন করিয়া তুলিবে। বস্তুতঃ জগতের ইহাই একটী নিয়ম,শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কর্ম্ম দেখিয়া অপর সকলে স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্যের অবধারণ করে। দেখিতে পাওয়া যায়, 'যে স্থানে কোনও একজন অশিক্ষিত ব্যক্তি স্থানীয় আচারের হর্ত্তাকর্ত্তা, সেখানকার লোকে অকুণ্ঠিত ভাবে তাহাদের নেতার অনুসরণ করে। হয়ত অপরের পক্ষে তাহাদের সেই ব্যবহার যারপরনাই জঘন্য বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। ফলতঃ ভগবান্ও লোকসংগ্রহার্থে কর্ম্ম করেন। সাধু-কর্ম্ম করিলে দোষ কি? পরোপকার ব্রত অবলম্বন না করিলে জ্ঞানীর জ্ঞানের গরিমা কি? অতএব পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যায় দোষাশঙ্কা নাই। "পূর্ব্বোঽঙ্কুশস্ত্রিবিধঃ" এই অংশের ব্যাখ্যায় এই আচার্য্য বলেন, পূর্ব্ব তিনটী, অর্থাৎ ঊহ, শব্দ ও অধ্যয়নরূপ ত্রিবিধ সিদ্ধি মুখ্য সিদ্ধির আকর্ষক। অঙ্কুশদ্বারা আকর্ষণ করিয়া কোনও বস্তু নিকটে আনা যায়। এই তিনপ্রকার সিদ্ধিও পরবর্ত্তিশ্রেষ্ঠসিদ্ধিকে আকর্ষণ করিয়া আনে। ইঁহার এরূপ ব্যাখ্যার মূল রহস্য আর কিছু নয়, কেবল পূর্ব্বোক্ত মতের অনুপযুক্ততা বিবেচনাই কারণ। তুষ্টি সিদ্ধির বিরোধী, তুষ্টির অভাব অশক্তিও সিদ্ধির প্রতিবন্ধক। কোনও পদার্থ এবং তাহার অভাব, এই দুইটীই একটী কার্য্যে প্রতিবন্ধক হইতে পারে, এরূপ কল্পনা অন্যায়, ইহা মনে করিয়াই

আচার্য্য মহোদয় পূর্ব্বোক্তমতের অনুসরণ করিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই। প্রত্যয়সর্গ বর্ণিত হইল।

ন বিনা ভাবৈর্লিঙ্গং ন বিনা লিঙ্গেন ভাবনির্বৃত্তিঃ।
লিঙ্গাখ্যোভাবাখ্যশ্চ তস্মাদ্দ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ। ৫২

পদপাঠঃ। ন। বিনা। ভাবৈঃ। লিঙ্গং। ন। বিনা। লিঙ্গেন। ভাবনির্বৃত্তিঃ। লিঙ্গাখ্যঃ। ভাবাখ্যঃ। চ। তস্মাৎ। দ্বিবিধঃ। প্রবর্ত্ততে। সর্গঃ।

ব্যাখ্যা। ন—হয়না। বিনা—ব্যতীত। ভাবৈঃ—প্রত্যয়সর্গ। লিঙ্গং—তন্মাত্রসর্গ। ন—হয়না। বিনা—ভিন্ন। ভাবাখ্যঃ—ভাব এই নামক প্রত্যয়সর্গ। চ—ও। তস্মাৎ—সেই নিমিত্ত। দ্বিবিধঃ—দুই-প্রকার। প্রবর্ত্ততে—প্রবৃত্ত হয়। সর্গঃ—সৃষ্টি। (পরস্পরের অপেক্ষা আছে বলিয়া দ্বিবিধ সৃষ্টিরই আবশ্যকতা আছে।)

বঙ্গার্থঃ। বুদ্ধিসৃষ্টি ব্যতীত তন্মাত্র অর্থাৎ ভৌতিক সৃষ্টির পূর্ণতা হয় না, আবার তন্মাত্রসৃষ্টি ভিন্নও বুদ্ধিসৃষ্টির স্বরূপ-নিষ্পত্তি হয় না, তজ্জন্যই উভয়বিধ সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হয়।

বিশদব্যাখ্যা। এখানে আশঙ্কা উপস্থিত হইতেছে যে, উভয়প্রকার সৃষ্টির আবশ্যকতা কি? পুরুষার্থ সম্পাদনের জন্য সৃষ্টি। সৃষ্টি না হইলে ভোগ ও মোক্ষ, এই উভয়-বিধ পুরুষার্থের কোনওটী সুসিদ্ধ হইতে পারে না, সত্যবটে; কিন্তু তন্মাত্রসৃষ্টি অথবা বুদ্ধিসৃষ্টি, ইহার যে কোনটীর দ্বারা পুরুষার্থ-সম্পাদন চলিতে পারে, দ্বিবিধ সৃষ্টি কেন? কারিকায় এই প্রশ্নের উত্তরই দেওয়া হই-তেছে। এই দুইটী সৃষ্টি পরস্পরকে অপেক্ষা করে। তন্মাত্র-রচিত শরীরাদি না থাকিলে বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সকল থাকিবে কোথায়? লিঙ্গ শরীর অনুমান করিবার সময় প্রদর্শিত হইয়াছে, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণের একটী ভৌতিক আধার চাই, নচেৎ তাহাদের কার্য্যকারিতার বিলোপ হয়; অতএব বুঝা যাইতেছে, বুদ্ধি-সৃষ্টি তন্মাত্রসৃষ্টিকে অপেক্ষা করে। আবার বুদ্ধিশূন্য শরীরের কিছুই কার্য্য থাকিতে পারে না বলিয়া তন্মাত্রসৃষ্টিও বুদ্ধিসৃষ্টির সহানুভূতি প্রার্থনা করে। শব্দাদি বিষয় ও বিবেক-বৈরাগ্যাদি—উভয়েরই আবশ্যকতা; ভোগ ও মুক্তি, উভয়েই সৃষ্টিদ্বয়ের দরকার। একটী ছাড়িলে অপরটী থাকে না; সুতরাং দুইটী চাই।

অষ্টবিকল্পোদৈব স্তৈর্য্যগ্‌যোনশ্চ পঞ্চধা ভবতি।
মানুষ্যশ্চৈকবিধঃ সমাসতো ভৌতিকঃ সর্গঃ। ৫৩।

পদপাঠঃ। অষ্টবিকল্পঃ। দৈবঃ। তৈর্য্যগ্‌-যোনঃ। চ। পঞ্চধা। ভবতি। মানুষ্যঃ। চ। একবিধঃ। সমাসতঃ। ভৌতিকঃ। সর্গঃ।

ব্যখ্যা। অষ্টবিকল্পঃ—অষ্টপ্রকারের বিকল্প অর্থাৎ স্বতন্ত্র বিভাগ যাহাতে আছে। দৈবঃ—দেব জাতীয় সৃষ্টি। তৈর্য্যগ্‌যোনঃ—তির্য্যগ্‌যোনির সম্বন্ধে। পঞ্চধা—পাঁচ প্রকার। ভবতি (সৃষ্টিঃ)—সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষ্যঃ—মনুষ্য সম্বন্ধীয় সৃষ্টি। চ—এবং। একবিধঃ—একপ্রকার। সমাসতঃ—সংক্ষেপে। ভৌতিকঃ—স্থূলভূত বিষয়ক (প্রাণি সম্বন্ধীয়।) সর্গঃ—সৃষ্টি।

বঙ্গার্থঃ। দেবতাসৃষ্টি আট প্রকারের। পাঁচ প্রকার তির্য্যগ্‌যোনির সৃষ্টি। মনুষ্যসৃষ্টি এক প্রকার। সংক্ষেপে ইহাই ভৌতিক সৃষ্টি।

বিশদ ব্যাখ্যা। স্থূলভূত হইতে যাহাদের দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের সৃষ্টিই ভৌতিক সর্গ। দেবতাদিগের মধ্যে আট প্রকার বিভিন্ন আকৃতি সম্পন্ন সম্প্রদায় আছে। টীকাকারগণ বলেন, ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, ঐন্দ্র, পৈত্র, গান্ধর্ব্ব যাক্ষ, রাক্ষস ও পৈশাচ, এই অষ্টবিধ দেবতা-সর্গ। এই আট প্রকারের আকৃতিগত মিলন নাই। কোনও সম্প্রদায়ের তিন পা, কাহাদের বা চারিহাত, কোনও দলের তিন চক্ষু ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন আকার ইহাদের দলবিভাগের একমাত্র কারণ হইয়াছে। পশু, পক্ষী, মৃগ, সরীসৃপ, স্থাবর, এই পাঁচপ্রকার তির্য্যগ্‌যোনির বিভাগ। পশু এবং মৃগ জাতীয়তায় একটু বিভিন্ন। মৃগ এখানে হরিণ নহে। পশু শ্রেণীকে বিশেষ লক্ষণদ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া একটীকে পশু, অপরটীকে মৃগ নাম দেওয়া হইয়াছে। পক্ষীর অবয়ব পশুর অপেক্ষা স্বতন্ত্র, সুতরাং উহা ভিন্ন জাতীয়। সরীসৃপ সর্পাদি সম্প্রদায় সাধারণের পরিচিত। মানুষ সর্ব্বত্রই এক প্রকার। তিনখানি চরণ অথবা তিনখানি হাত কিম্বা চারিটী চক্ষু কোনও দেশীয় কোনও মানবজাতির দেখিতে পাওয়া যায় না। স্থাবরকে তির্য্যগ্‌যোনির মধ্যে ফেলিবার উদ্দেশ্য, উহার স্ফুট চৈতন্য নাই, তির্য্যগ্‌জন্তু পক্ষী-পশ্বাদির ও অপেক্ষা। ভৌতিক সৃষ্টির বিস্তার করিতে গেলে সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যায়। প্রত্যেক পক্ষী, পশু প্রভৃতির শ্রেণীর অন্তর্গত অবান্তর বিভাগ অথবা উপবিভাগগুলি অনেক অধিক হওয়া সম্ভব।

ঊর্দ্ধং সত্ত্ববিশালস্তমোবিশালশ্চ
মূলতঃ সর্গঃ।
মধ্যে রজোবিশালো ব্রহ্মাদিস্তম্ব
পর্য্যন্তঃ। ৫৪

পদপাঠঃ। ঊর্দ্ধং। সত্ত্ববিশালঃ। তমোবিশালঃ। চ। মূলতঃ। সর্গঃ। মধ্যে। রজোবিশালঃ। ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তঃ।

ব্যাখ্যা। ঊর্দ্ধং—উপরিতন দ্যু প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ লোকে। সত্ত্ববিশালঃ—সত্ত্বগুণের আধিক্য বশতঃ সুখবহুল। তমোবিশাল—তামস গুণের আধিক্য হেতুক মোহসঙ্কুল। চ—এবং। মূলতঃ—মূলদেশে অর্থাৎ অধোদিকে পশু প্রভৃতি। সর্গঃ—সৃজন ব্যাপার। মধ্যে—সাত্ত্বিক গুণের নিম্নে এবং তামসিক গুণের উপরে, এই মধ্যভাগে অর্থাৎ রাজস মনুষ্যাদিতে। রজোবিশালঃ—রজোগুণ প্রবলতাবশতঃ দুঃখবহুল (সৃষ্টি।) ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তঃ—সংক্ষেপে ত্রিবিধ জীব-সৃষ্টির পরিচয় অথবা সীমানির্দ্ধারণ—ব্রহ্মা হইতে অপকৃষ্ট চৈতন্যস্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট তৃণগুল্মাদি পর্য্যন্ত।

বঙ্গার্থঃ। ঊর্দ্ধলোক সত্ত্ববহুল, অধঃসৃষ্টি তমোবহুল, মধ্যে মনুষ্য সৃষ্টি রজোবহুল সংক্ষেপে ত্রিবিধ সৃষ্টির পরিচয় ব্রহ্মা হইতে তৃণগুল্ম পর্য্যন্ত।

বিশদ ব্যাখ্যা। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী, প্রাকৃত জগতে জীবসৃষ্টিবিভাগও ত্রিবিধ কাহারও সত্ত্বাংশের আধিক্যবশতঃ সুখাধিক্য, কাহারও তামসতা প্রযুক্ত অজ্ঞানভাব, কাহারও বা রাজস প্রকৃতি বশতঃ দুঃখ-

স্বভাব। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অমৃতাক্ষরে বলিতেছেন,—রজসস্তু ফলং দুঃখং অজ্ঞানং তমসঃ ফলং। অর্থাৎ দুঃখ রজোগুণের ফল এবং অজ্ঞানাবৃত অবস্থায় থাকা তমোগুণের কার্য্য। মনুষ্য-সমাজ মুহুর্মুহুঃ নানাবিধ প্রতিবিধান করিয়াও দুঃখের কর হইতে তিলার্দ্ধ নিষ্কৃতি পায় না। দুঃখ এই শ্রেণীর সাধারণ গুণ—তাহাকে পরিত্যাগ করিতে এসে যাইতে চাহে না। মানব কর্ম্মজীব, সংসারে কর্ম্ম করাই যত কষ্টকর। পশ্বাদির মোহ প্রযুক্ত সুখ-দুঃখের সম্যক্ আলোচনা হয় না; দেখা যায়, তাহারা অনেক সময়ে সুখ-দুঃখের পার্থক্যও সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। তাহাদের সাধারণ বিষয়ে সুখ-দুঃখের অজ্ঞতা অনায়াসে অনুমান করিতে পারা যায়। আংশিক সাত্ত্বিক ভাব মনুষ্যেও দেখা যায়, তবে তাহার পরিমাণ রজোগুণের অনুপাতে অকিঞ্চিৎকর; কখনও একটু অধিক হইলে, সে মনুষ্যকে দেবপ্রকৃতি বলা হইয়া থাকে। সত্ত্ববহুল উর্দ্ধসৃষ্টি আমাদের চক্ষুর বিষয় নয়।

তত্র জরামরণকৃতং দুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ।
লিঙ্গস্যাবিনিবৃত্তেঃ তস্মাৎ দুঃখং স্বভাবেন। ৫৫

পদপাঠঃ। তত্র। জরামরণকৃতং॥ দুঃখং। প্রাপ্নোতি। চেতনঃ। পুরুষঃ। লিঙ্গস্য। অবিনিবৃত্তেঃ। তস্মাৎ। দুঃখং। স্বভাবেন।

ব্যাখ্যা। তত্র—সেখানে অর্থাৎ উর্দ্ধে, অধোদেশে ও মধ্যে। (দেবসৃষ্টি পশ্বাদিসৃষ্টি ও মনুষ্য-সৃষ্টিতে)। জরামরণকৃতং—জরা অর্থাৎ শরীরের অকর্ম্মণ্যাবস্থা—জীর্ণভাব এবং মরণ—অর্থাৎ দেহ-পতন বা মৃত্যু, এই উভয় ব্যাপার জনিত। দুঃখং—দুঃখ। প্রাপ্নোতি—প্রাপ্ত হয়। চেতনঃ—চেতনাবিশিষ্ট। পুরুষঃ—জীব (পুরি—লিঙ্গশরীরে শেতে—তিষ্ঠতি তদাশ্রয়ণেন লোকান্তরগমনং সাধয়তি চ, ইতি ব্যুৎপত্ত্যা।) লিঙ্গস্য—লিঙ্গ অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীরের। অবিনিবৃত্তেঃ—নিবৃত্তি—অর্থাৎ বিনাশ পর্য্যন্ত। তস্মাৎ—সেইজন্য। দুঃখং—দুঃখ। স্বভাবেন—স্বভাব বশতঃ। (প্রকৃতির গুণ প্রাকৃত পদার্থের স্বভাব।)

বঙ্গার্থঃ। সৃষ্টিতে সর্ব্বত্রই জীবগণ জরা-মরণজনিত দুঃখ প্রাপ্ত হয়, যাবৎ লিঙ্গ-শরীরের নিবৃত্তি না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত এই দুঃখ হয়, সেইজন্য দুঃখই সৃষ্টির স্বভাব।

বিশদব্যাখ্যা। সত্ত্বহুল সৃষ্টিই হউক, আর রজোবহুল সৃষ্টিই হউক, দুঃখ সর্ব্বত্রই অল্প বিস্তর আছে। কেন না, গুণত্রয় পরস্পর কেহ কাহাকেও পরিত্যাগ করিয়া থাকে না, তবে কাহারও আধিক্য ও কাহারও অল্পতা সংঘটিত হয় মাত্র। সাত্ত্বিক শরীরেও রজোগুণ-কার্য্য দুঃখ আছে; দেব-শরীরের দুঃখ-সংবাদে পুরাণ সাক্ষ্য দিতেছে। চিরদিন কেহই থাকিবে না। জীর্ণতা ব্রহ্মারও হইবে। ব্রহ্মা হইতে কৃমি পর্য্যন্তেরও "আমি মরিয়া যাইব" এইরূপ একটী ত্রাস রহিয়াছে। নির্দ্দিষ্ট দিনাবসানে শরীর অকর্ম্মণ্য হইলে, শরীরী মাত্রেরই দেহপাত হইবে, এ দুঃখ হয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে "লিঙ্গস্যাবিনিবৃত্তেঃ" এ অংশটুকুর অর্থ ক্ষুর্ণ করা যাইতে পারে। অজ্ঞানবশতঃ পুরুষ লিঙ্গ-শরীরের সুখদুঃখাদি ধর্ম্ম নিজের বলিয়া মনে করে,

এই জন্যই দুঃখ। লিঙ্গ শরীর হইতে নিজে পৃথক্, এ জ্ঞান স্ফুরিত না হওয়াই দুঃখের কারণ। অথবা এই অংশের দ্বারা দুঃখ কতকাল? এই প্রশ্নের উত্তর করা হইতেছে। যতদিন লিঙ্গদেহ আছে, ততদিন। লিঙ্গদেহ-গেলে মুক্তি। তখন ভোগ থাকে না; কাজেই দুঃখের সম্ভাবনা তখন নাই।

ইত্যেষ প্রকৃতিকৃতো মহদাদি-
বিশেষভূত পর্য্যন্তঃ।
প্রতিপুরুষবিমোক্ষার্থং স্বার্থইব
পরার্থ আরম্ভঃ। ৫৬

পদপাঠঃ। ইতি। এষঃ। প্রকৃতিকৃতঃ। মহদাদিবিশেষভূত পর্য্যন্তঃ। প্রতিপুরুষ বিমোক্ষার্থং। স্বার্থে। ইব। পরার্থে। আরম্ভঃ।

ব্যাখ্যা। ইতি—(পূর্ব্বোক্তস্মারক ইতি শব্দ এখানে ব্যবহৃত।) এষঃ—এই। প্রকৃতি-কৃতঃ—প্রকৃতি অর্থাৎ উপনিষদুক্ত প্রধানের কার্য্য মহদাদি বিশেষ ভূত পর্য্যন্তঃ—মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধি হইতে স্থূলভূত পর্য্যন্ত। (স্থূলভূত পর্য্যন্ত বলিবার হেতু এই যে, ঐ স্থানেই সৃষ্টির শেষ। ভৌতিক চরাচর ভূতের গুণ ব্যতীত নূতন কিছু গুণ পায় নাই, কাজেই উহাকে স্থূলভূত হইতে পৃথক্ বলিতে পারি না। এইজন্য স্থূলভূতসৃষ্টিই পদার্থসৃষ্টির শেষস্তর।) প্রতিপুরুষ বিমোক্ষার্থং—প্রত্যেক পুরুষ অর্থাৎ জীবের মোক্ষ-সম্পাদনের জন্য। (পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ভোগ এবং মোক্ষ, উভয়বিধ পুরুষার্থ সৃষ্টির দ্বারা সাধিত হয়; এখন দেখান যাইতেছে, বিষয়ভোগে বিরক্ত হইয়া পুরুষ মুক্তির পথে পদার্পণ করিবে, এইজন্যই প্রকৃতি সৃষ্টি করেন-স্বার্থে—নিজের প্রয়োজনে। ইব—ন্যায়, মত, সদৃশ। (যেমন নিজ প্রয়োজনে, সেই-রূপ) পরার্থে—পর প্রয়োজনে। আরম্ভঃ—প্রকৃতির জগৎ সৃষ্টির প্রথম উদ্যম। (সৃষ্টি তাঁহার নিজের জন্য নহে, পরের জন্য।)

বঙ্গার্থঃ। মহতত্ত্ব হইতে মহাভূত পর্য্যন্ত এই সৃষ্টি প্রকৃতির কার্য্য। প্রত্যেক পুরু-ষের মুক্তির জন্য প্রকৃতি সৃষ্টি করেন। লোকে নিজের প্রয়োজনের জন্য যেরূপ কার্য্য করিতে দেখা যায়, প্রকৃতি পরের দরকারেও তদ্রূপ সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করেন। (আরম্ভ নিজের কার্য্যের মত ভাবে, কিন্তু কার্য্য পরের জন্য।)

বিশদব্যাখ্যা। সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা করিয়া পরে অনেকানেক বিপক্ষ মতের প্রতিবাদ ও স্বমতের যুক্তি প্রদান করা আবশ্যক হইয়াছে। এই জগৎ সর্ব্বশক্তিমান্ অগাধজ্ঞানার্ণব পরমেশ্বর কর্ত্তৃক রচিত। তিনি জীবকুলের কর্ম্মানুসারে অনুগ্রহ-নিগ্রহের ব্যবস্থা করেন। সেশ্বর-সম্প্রদায়ের এই একটী প্রসিদ্ধ মত। আবার কোনও কোনও ঈশ্বরবাদীর অভি-প্রায় এই যে, জগৎ প্রকৃতিকার্য্য হইলেও ঈশ্বরের ইচ্ছায় উৎপন্ন। প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে জগৎ জন্মে, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা বিহনে অথবা তাঁহার অধিষ্ঠান বিনা প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ অথবা সৃষ্টি, কিছুই হইতে পারে না। বিবর্ত্তবাদীর মত, জগৎ কল্পনা মাত্র, ইহাতে কিছু বাস্তব বস্তু নাই। এই ভ্রমাত্মক বিশ্বের উপাদান ও নিমিত্ত, উভয় কারণই ব্রহ্ম। এই সকল মত নিরাস করিতে না পারিলে, "প্রকৃতি-জগৎকারণ"

এ সিদ্ধান্ত স্থির থাকে না। প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, সৃষ্টি প্রকৃতিরই কার্য্য। কেন না, ঈশ্বরের সৃষ্টি করিবার দরকার কি? তিনি যদি একজন সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বসম্পন্ন হন, তবে কি অভাবে সৃষ্টি করিবেন, বুঝি না। নিজের কোনও কামনা নাই, সৃষ্টির পূর্ব্বে অন্য কেহই নাই, কাহার জন্য অথবা কাহাকে কর্ম্মফল দিবার জন্য সৃষ্টি করিবেন? সৃষ্টির পূর্ব্বে কাহার কর্ম্ম ছিল? যে সময় জগৎ জন্মে নাই, তখনকার কর্ম্ম একটা কি? আবশ্যক ব্যতীত কে কার্য্য করে? ঈশ্বরের কিছু দরকার প্রমাণ করা যায় না, অতএব ঈশ্বর সৃজন করিয়াছেন, এটা বৃথা কথা; আর ঈশ্বর প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগের জন্য ইচ্ছুক হইবেন কেন? কামনা না থাকিলে তিনি নির্ব্যাপার; নির্ব্যাপার সূত্রধর কি বাস্য নামক ছেদন সাধনের অধিষ্ঠান সম্পাদন করে? যে কাষ্ঠচ্ছেদ করার কামনা করে, সেই সূত্রধারণ করে, বস্তুতঃ আপ্তকাম ঈশ্বরের প্রকৃতির অধিষ্ঠান অসম্ভব। জগৎ মিথ্যা নহে, প্রত্যক্ষ বস্তু, তবে বিকারী। ব্রহ্ম যদি উপাদান-কারণ হন, তবে তিনিও বিকারী হন, তখন ব্রহ্মত্ব বাঙ্মাত্র। অতএব ব্রহ্ম জগৎকারণ নহে; অচেতন প্রকৃতি পরের কাজ নিজের কাজের মত করে। সৃষ্ট বস্তুর ভোগ জীবের, বিরক্ত হইলে মুক্তিও জীবের; প্রকৃতির কেবল ভাঙ্গা গড়া। অচেতনের কামনা থাকে না, কিন্তু কার্য্য থাকে। জ্ঞানবানের কামনা না থাকিলে কার্য্য থাকিতেই পারে না। চেতনের ইচ্ছা হইতে চেষ্টা জন্মে। ইষ্ট-সাধনতা জ্ঞানটা আগেই থাকা চাই। প্রকৃতির (অচেতনের) ইষ্ট-সাধনতাজ্ঞান নাই, কিন্তু কার্য্য আছে; অতএব ঈশ্বরকে জগৎকারণ বলিলে যে দোষ হয়, প্রকৃতিকে বলিলে, তাহা হয় না। নিরীশ্বর-বাদের অনেক ভাল যুক্তি-তর্ক আছে, তাহা এখানে আলোচ্য নয়। কপিল নিরীশ্বর ছিলেন, মনে হয় না। সাংখ্য-দর্শনে ঈশ্বর স্বীকার করা হয় নাই কেন? এবিষয়ের রহস্য সময়ান্তরে প্রকাশ করিব।

(ক্রমশঃ—)

মীমাংসাদর্শনম্।

(পূর্ব্বানুবৃত্তম্।)

অনিত্যসংযোগাৎ। ৬

পদপাঠঃ। অনিত্য-সংযোগাৎ।

ব্যাখ্যা। অনিত্যসংযোগাৎ—অনিত্য পদার্থের সহিত সংযোগ আছে বলিয়াও। (অর্থবাদ বাক্য অপ্রমাণ)।

বঙ্গার্থঃ। অর্থবাদ বাক্যে কতকগুলি অনিত্য অর্থাৎ অচিরস্থায়ী পদার্থ প্রতিপাদিত হয়, এইজন্যও অর্থবাদের প্রামাণ্য স্বীকার করা যায় না।

বিশদব্যাখ্যা। পূর্ব্বেও একবার অনিত্য-সংযোগ বলিয়া আপত্তি করা হইয়াছিল, কিন্তু বিধিবাক্যের প্রামাণ্য স্থাপন করায় সেই প্রশ্ন আবার অর্থবাদে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। এটীও পূর্ব্বপক্ষের সূত্র। এখানেই পূর্ব্বপক্ষের অবসান। আগামিসূত্রে সিদ্ধান্তীর মত অর্থাৎ অর্থবাদ বাক্যগুলিরও প্রামাণ্য আছে, উহারা অনর্থক নহে, এই পক্ষ প্রতিপাদিত হইবে।

বিধানা ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ। ৭।

পদপাঠঃ। বিধিনা। তু। একবাক্যত্বাৎ। স্তুত্যর্থেন। বিধীনাং। স্যুঃ।

ব্যাখ্যা। বিধিনা—বিধির সহিত। তু—কিন্তু। একবাক্যত্বাৎ—একবাক্যতা আছে, এই জন্যই। স্তুত্যর্থেন—স্তুতি অর্থাৎ প্রশংসার্থ দ্বারাই। বিধীনাং—বিধিবাক্য সকলের। স্যুঃ—হইতেছে। (অর্থবাদ বাক্য সকলের প্রমাণ)

বঙ্গার্থঃ। বিধির সহিত একবাক্যতা আছে বলিয়া বিধিস্তাবক অর্থবাদ-বাক্যের প্রামাণ্য আছে।

বিশদব্যাখ্যা। অর্থবাদ নিরর্থক নহে, উহার আবশ্যকতা আছে। যে বেদে বহু-কালাবসানে ফলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, সেই বেদে অর্থবাদ বাক্য বৃথা প্রযুক্ত হওয়া অসম্ভব। চিন্তা করিলে, অনুসন্ধান করিলে, অনায়াসেই ঐ সকল বাক্যের রহস্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। বিধিবাক্যের সহিত একবাক্যতা করিলে দেখা যাইবে, অর্থবাদবাক্য বিধির স্তাবক। কোনও কার্য্যে কাহাকেও প্ররোচিত করিতে হইলে, বলিতে হয়, এ কার্য্য অতি উত্তম, ইহার পরিণাম বিশেষ সুখপ্রদ ইত্যাদি। আপাততঃ বহুব্যয়সাধ্য এবং নানা ক্লেশে নিষ্পাদনযোগ্য যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম করিতে বলিলে লোকের তাহাতে সহজতঃ প্রবৃত্তি হয় না। তাহাকে প্ররোচিত করিবার জন্য যাগ-কর্ম্মের দেবতার প্রশংসা অথবা দ্রব্যের প্রশংসা, কোনও স্থানে বা কর্ম্মকর্তার প্রশংসাও আবশ্যক হইয়া উঠে। অর্থবাদ বাক্যগুলি বিহিত কর্ম্মে লোকের অতিশয় আগ্রহ জন্মাইবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। মনে করা যাউক, আমার কতকগুলি গাভী বিক্রয় করিবার দরকার আছে। বাজারে যাইয়া ক্রেতাকে প্ররোচিত করিবার জন্য আমাকে বলিতে হইবে, এ গাভী এখনও অনেককাল জীবিত থাকিবে। বিশেষতঃ কালোবর্ণে ইহার পরিষ্কার চেহারা দেখায়। আর এ গাভীটী গত বৎসর যে প্রসব করিয়াছিল, তাহাতে অনেক পরিমাণে দুগ্ধ দান করিত। ইহাদের বংশে প্রায়শই স্ত্রীবৎস (বকনাবাছুর) প্রসবকরা নিয়ম। গুণানুসারে বিচার করিতে গেলে ইহার মূল্য অনেক অধিক হওয়া উচিত, কিন্তু আপনি লইলে অতি অল্পমূল্যে দিতে পারিব। আপনি সামান্য খড় (বিচালী) খাইতে দিলেই ইহার পরিতুষ্টি হইবে; খৈল অথবা অন্যান্য মোসলাদি ইহাকে খাইতে দিতে হইবে না। এসকল উক্তি শ্রবণ করিলে ক্রেতার মন নিশ্চয়ই আকৃষ্ট হইবে। যজ্ঞাদি কর্ম্ম চরমে পরম সুখদ হইলেও আপাততঃ নানা কষ্টকর বলিয়া ব্যক্তিগণের প্রবৃত্তি হইবে না, কিন্তু তাই বলিয়া নিরস্ত হইলে চলিবে না। রোগী তিক্ত ঔষধ খাইতে চাহিবে না, তাহাকে বলিতে হইবে, "ইহা মধুর, খাইলে সকল অসুখ সারিয়া যায়, ঔষধ খাইলেই তোমাকে ভাত দিব, সন্দেশ দিব"—যিনি মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহারই এরূপ করা কর্ত্তব্য। বেদ জগন্মঙ্গলের চিন্তায় পরিপূর্ণ, কাজেই শত শত প্রলোভন দেখাইয়া ঔষধ খাওয়াইতেছেন। অর্থবাদ বিধিবাক্যের শেষভাগ। যে বাক্যাংশ

বিভক্ত হইলে পরস্পরের আকাঙ্ক্ষা করে এবং সকলে মিশিয়া একটী মাত্র কার্য্য অথবা প্রয়োজন বুঝাইয়া দেয়, তাহাকে 'একবাক্য' বলা যায়। এরূপ একবাক্য ভাব অর্থবাদের সহিত বিধিবাক্যের আছে। কোনও স্থানে বলা হইল, বৃক্ষগণ যজ্ঞ করিয়াছিল, অপর স্থানে বলা হইল "যজ্ঞ করিবে।" এই দুইটী বাক্যের সম্বন্ধ আছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা একবাক্য। অচেতন বৃক্ষাদিও যখন যজ্ঞ করিয়াছে, তখন মনুষ্যের করা একান্ত উচিত, এইরূপ অর্থের একাংশ অর্থবাদ বাক্য দ্বারা প্রশংসারূপে প্রদর্শিত হইল, সুতরাং একার্থ-প্রতিপাদক বলিয়া উহা একই বাক্য। কোন্ বাক্যে কোন্ বাক্যের শেষ ভাব প্রাপ্ত হইয়া একবাক্যতাপন্ন হইয়াছে, তাহা উত্তরোত্তর যথাস্থানে প্রদর্শিত হইবে। এরূপ অর্থবাদবাক্য মহাভারত গ্রন্থ হইতেও উদ্ধৃত হইতেছে। মস্তকশূন্য কবন্ধের কথা আছে। সেই কবন্ধ যুদ্ধ করিয়াছে, এ কথাও লেখা আছে।

"উদ্যতায়ুধদোর্দ্দণ্ডাঃ পতিতস্বশিরোহক্ষিভিঃ।
পশ্যন্তঃ পাতয়ন্তিস্ম কবন্ধা অপ্যরীনিহ॥"

অর্থাৎ উদ্যত অস্ত্রধারী কবন্ধগণ (ছিন্নমস্তক) ভূমিতলে পতিত যে নিজের মস্তক, তাহাতে যে চক্ষু আছে, সেই চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিয়াই শত্রুগণকে পাতিত করিতে লাগিল। ভূমিতলে পতিত মস্তকের চক্ষুদ্বারা দেখিয়া মস্তকশূন্য দেহের হস্ত অস্ত্রাঘাতে শত্রুবিনাশ করিতে পারে, এ ধারণা অনেকের অন্তঃকরিতে আসিলেও, সূক্ষ্মদর্শিশাস্ত্রকারগণ ইহাতে অঙ্গুলি সঞ্চালনে অনুমোদন করিতে অস্বীকৃত ছিলেন। মহাভারতের ঐ বাক্যকে অর্থবাদ অর্থাৎ যোদ্ধৃগণের উৎসাহ বর্দ্ধন জন্য প্ররোচনা বাক্য (অর্থবাদ) ভিন্ন আর কি বলিব? প্রকৃত বিষয় অসঙ্গত হইলে, গুণার্থ দ্বারা উপপত্তি করা উচিত। কপোলকল্পিত কথা নহে। সুপ্রসিদ্ধ বেদান্তবিৎ "সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ" নামক সুবৃহৎ যুক্তিপূর্ণ বেদান্ত গ্রন্থের রচয়িতা মহানুভব অপ্যয়দীক্ষিত মহাশয় ঐ সিদ্ধান্তলেশ গ্রন্থে লিখিতেছেন,- শিরশ্ছেদানন্তরং মূর্চ্ছামরণয়োরণ্যতরাবশ্যম্ভাবেন দৃষ্টবিরুদ্ধার্থস্য তাদৃশবাক্যস্য কৈমুত্যন্যায়েন যোধোৎসাহাতিশয়প্রশংসাপরত্বাৎ। অর্থাৎ মস্তকচ্ছেদ করিয়া ফেলিলে মূর্চ্ছা এবং মরণ, ইহার যে কিছু একটা অবশ্যই উপস্থিত হইবে, এই জন্য ঐ সকল দৃষ্টবিরুদ্ধ বাক্য প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, অতএব ঐসকল বাক্য যোদ্ধাগণের উৎসাহাতিশয় প্রশংসার্থ বলিয়া বুঝিতে হইবে। মস্তকবিহীন হইয়াও শত্রুনিপাত করিয়াছিল, অতএব প্রত্যেক সশিরস্ক ব্যক্তিকেই শত্রুনিপাতের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। এইরূপ তাৎপর্য্যে ঐ বাক্যের প্রয়োগ। অতএব এ সকল বাক্য অনর্থক বলিতে ইচ্ছা হয় না। এখানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যেখানে অর্থবাদ বাক্য পাওয়া যায় না, অর্থাৎ বিধিবাক্যই আছে, তাহার অর্থবাদ নাই, সেখানে প্ররোচনা জন্মাইবে কে? সেখানে বিধিবাক্যে যে ফলের উদ্দেশে যে কার্য্য করিতে আদেশ করা হইয়াছে, সেই ফলের আকাঙ্ক্ষাই প্ররোচন উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে। যদি বলা যায়, বিধি স্বয়ংই যদি প্ররোচনা জন্মাইল, তবে অর্থবাদ কেন? ভাবিয়া দেখিলে, এ আশঙ্কা অত্যন্ত অসঙ্গত। কেননা যেখানে অর্থবাদ আছে

সেখানে তাহা প্রশংসার্থ; যেখানে নাই, সেখানে ক্ষতি নাই। যেগুলি আছে, তাহারা অনর্থক নহে, তাহাদের কার্য্য আছে, ইহাই অর্থবাদের প্রামাণ্য। যদি অর্থবাদ না থাকিত, তবে বিধি দ্বারাই সর্ব্বত্র প্ররোচনা ঘটিত। যেখানে অর্থবাদ আছে, সেখানে ঐ অর্থবাদের আনর্থক্য পরিহারার্থে উহাকে ব্যবহারদৃষ্ট প্রশংসার্থে বলাই যুক্তিপূর্ণ। যেখানে কোনও ব্যক্তির অর্থবাদ বাক্য নাই, সেখানেও গাভী দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া ক্রেতার ইচ্ছা হইতে পারে, আর যেখানে সর্ব্বগুণবতী গাভী থাকিলেও প্রশংসাবাক্যদ্বারা ক্রেতার মন আকৃষ্ট হয়, সেখানেও ঐ অর্থবাদ বাক্যের সফলতা কল্পনা করা যাইতে পারে। যে যাগের দেবতা অথবা দ্রব্যাদিকে লক্ষ্য করিয়া অর্থবাদ বাক্য স্তুতি করে নাই, সেখানে স্বর্গফল অথবা পুত্রফল এবং সম্পত্তিফলাদির কথা শ্রবণ করিয়া সেই সেই কামনাশীল ব্যক্তির সহজতই প্রবৃত্তি হইতে পারে। অতএব অর্থবাদ বাক্য বিধিসেবক; সুতরাং তাহাদের প্রামাণ্য আছে। এই সূত্রে মীমাংসক-মত বলা হইল। অতঃপর ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ববাদীর এক একটী যুক্তির প্রত্যুত্তর দেওয়া হইবে। কোন্ কোন্ স্থানে কিরূপ ভাবে স্তুতি বর্ণিত হইয়াছে পর পর প্রদর্শিত হইতেছে।

তুল্যং চ সাম্প্রদায়িকম্। ৮

পদপাঠঃ। তুল্যং। চ। সাম্প্রদায়িকং।

ব্যাখ্যা। তুল্যং—সমান, একরূপ। চ—ও। সাম্প্রদায়িকং—সম্প্রদায়সিদ্ধ পঠন-পাঠনাদি।

বঙ্গার্থঃ। সাম্প্রদায়িক পঠন-পাঠনাদি অর্থবাদে ও বিধিবাক্যে উভয়ত্রই সমান।

বিশদব্যাখ্যা। অর্থবাদের প্রামাণ্য স্থাপনজন্য আরও অনেকগুলি যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে। বিধিবাক্য যেরূপ নিয়মে গুরু-শিষ্যাদিক্রমে সেবিত ও আলোচিত হইয়া আসিতেছে, অর্থবাদ বাক্যও তদ্রূপ। যদি অর্থবাদ বাক্যগুলি অনর্থক প্রলাপ মাত্র হইত, তবে বিধিবাক্যের সহিত এইগুলি সুদীর্ঘকাল ধরিয়া আচার্য্যগণ শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন কেন? ছাত্রগণইবা নিরর্থক এই অর্থবাদ বাক্যরাশি মনে রাখিয়া কষ্ট পাইয়াছেন কেন? অনর্থক প্রমাদ-বাক্য যুগ যুগান্তর মনে করিয়া রাখিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? অতএব বলা যাইতে পারে, বিধিবাক্যের যেরূপ আবশ্যকতা আছে, অর্থবাদ বাক্যগুলিও তদ্রূপ। নচেৎ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের নিকট ইহা সসম্মানে অভ্যস্ত হইত না। যদি অর্থবাদ প্রমাণ হয়, তবে বিধিবাক্যের সম্মান বর্দ্ধিত হয়, এবং বিধিপ্রতিপাদিত যজ্ঞাদি কর্ম্মেও লোকের আগ্রহ হইবার একটা উপযুক্ত কারণ আবিষ্কৃত হয়। ঐ সকল অর্থবাদ সাম্প্রদায়িকতায়ও বিধিবাক্যের ন্যায়, অতএব প্রমাণ, এ কথা বলা হইল।

অপ্রাপ্তাচানুপপত্তিঃ প্রয়োগেহি বিরোধঃ স্যাচ্ছব্দার্থস্ত্বপ্রয়োগভূতস্তস্মাদুপপদ্যেত। ৯

পদপাঠঃ। অপ্রাপ্তা। চ। অনুপপত্তিঃ প্রয়োগে। হি। বিরোধঃ। স্যাৎ। শব্দার্থঃ তু। অপ্রয়োগভূতঃ। তস্মাৎ। উপপদ্যেত

ব্যাখ্যা। অপ্রাপ্তা—(পাইতেছে না অনুপযুক্ত অথবা অনুপস্থিত। চ—আরও

অনুপপত্তিঃ—উপপত্তির অসম্ভাব। প্রয়োগে—অনুষ্ঠানে। হি—যেহেতু। বিরোধঃ—বিরুদ্ধভাব। স্যাৎ—সেইনিমিত্ত। উপপদ্যেত—উপপন্ন হইতেছে।

বঙ্গার্থঃ। পূর্ব্বে যে অনুপপত্তি অর্থাৎ শাস্ত্র দৃষ্ট বিরোধ দেখান হইয়াছে, তাহাও আমাদিগের সিদ্ধান্তবাদের উপর উপস্থিত হইতে পারিতেছে না। যেহেতু কার্য্যের অনুষ্ঠানে ঐ সকল ব্যবহৃত হইলে, শাস্ত্রও দৃষ্ট বিরোধ হইতে পারিত। শব্দের অর্থ প্রয়োগ নহে; সেইজন্য উপপন্ন হইতে পারে।

বিশদব্যাখ্যা। শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং দৃষ্টবিরুদ্ধপদার্থ প্রতিপাদক বেদের অর্থবাদবাক্য প্রমাণ নহে, এই যে একটী অনুপপত্তি সিদ্ধান্তের উপর পূর্ব্বপক্ষ হইতে দেওয়া হইয়াছে, বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সেই অনুপপত্তি দোষ সিদ্ধান্তের সহিত কোনই সংস্রব রাখে না। মন স্তেয়কারী অর্থাৎ চোর, একথা বলায় কাহারও (কোনও যজ্ঞাধিকারী পুরুষের।) প্রতি চৌর্য্যের বিধান করা হয় নাই। যদি বলা হইত যে, যজ্ঞে স্তেয়ানুষ্ঠান করিতে হয়, তখন চৌর্য্য-নিষেধজ্ঞাপক শ্রুতির সহিত বিরোধ হইত। বেদ ঐসকল বাক্য দ্বারা কাহারও কর্ত্তব্য বিধান করেন নাই। শব্দের অর্থ প্রয়োগ নহে, প্রয়োগ না হইলে বিরুদ্ধও হইল না। অতএব সিদ্ধার্থবোধক শব্দগুলিও বিধিবাক্যের সহিত একবাক্যতা প্রাপ্ত হইয়া কখনও নিন্দাদ্বারা স্তুতি, কখনও আধিক্য কথনের দ্বারা স্তুতি করে মাত্র। উহা অনুষ্ঠান নহে, বিরোধও নাই।

গুণবাদস্তু। ১০

পদপাঠঃ। গুণবাদঃ। তু।

ব্যাখ্যা। গুণবাদঃ—গৌণার্থ-প্রয়োগ। তু—কিন্তু (সেখানে।)

বঙ্গার্থঃ। যেখানে একটী বিধেয়, অপর কোনওটী স্তুত হইতেছে, সেখানে গৌণার্থ দ্বারা স্তুতি বুঝিতে হইবে।

বিশদ ব্যাখ্যা। এই সূত্রটীর চারি প্রকার ব্যাখ্যা ভাষ্যকার পূজ্যপাদ ভট্টশবর স্বামী মহাশয় করিয়াছেন। ক্রমে সেই চারিটী অর্থ প্রদর্শিত হইতেছে। বঙ্গার্থে যাহা বলা হইয়াছে, উহা ১ম প্রকারের অর্থ। সূত্র রচনার উদ্দেশ্য চিন্তা করিলে দেখাযায় যে, পূর্ব্বপক্ষের যুক্তি খণ্ডনই এখনকার প্রধান লক্ষ্য। প্রমাণ করাগেল, অর্থবাদবাক্য সকল বিধির স্তাবক। তাৎপর্য্যতঃ বিধিবোধিত (বিধেয়) পদার্থের স্তুতিই উহাদের লক্ষ্য। কিন্তু আপত্তি করা যাইতে পারে, অর্থবাদ সকল স্থানে বিধেয় পদার্থের স্তুতি করে না। এক পদার্থ বিধেয়, অপরের স্তুতি করে; এরূপ হইলে, বিধেয় স্তাবক বলিয়া অর্থবাদের প্রামাণ্য, এ কথা বৃথা হয়। "বেতসশাখয়াঽবকাভিশ্চাগ্নিং বিকর্ষতি" বেতসশাখা ও অবকাদ্বারা অগ্নিকে বিকর্ষণ করিবে। এখানে অগ্নি-বিকর্ষণ কার্য্যে বেতসশাখা ও অবকার বিধান আছে। ইহার শেষে অর্থবাদ দেখিতে পাই। "আপো-বৈ শান্তাঃ" জল শান্তিকারক। বিধান হইল বেতসশাখা ও অবকার, স্তুতি হইল জলের। অতএব বিধিস্তাবক অর্থবাদ, এ কথা মিথ্যা। এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্যই "গুণবাদস্তু" সূত্রের রচনা। এক বিহিত, অপর স্তুত, এ দোষ

এখানে হয় নাই। জলের স্তুতি করাতেই গৌণভাবে বেতসশাখার স্তুতি করা হইতেছে। বেতস জলে জন্মে, জলের প্রশংসায় তাহারও প্রশংসা হয়। পিতার প্রশংসা করিলে গুণভাবে তাঁহার অপত্যগণেরও প্রশংসা সম্পাদিত হয়। ককুৎস্থ এবং রঘু রাজার প্রশংসা করায়, নানাস্থানে রামাদির প্রশংসা হইয়া গিয়াছে। সমাজে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। শাস্ত্রে ও অন্যান্য গ্রন্থে (কাব্যাদিতে) ইহার বহুল পরিমাণে পরিচয় পাওয়া যায়। এখনও আমাদের দেশে ৺ বিষ্ণু ঠাকুরের প্রশংসা করিলে, তদ্বংশজাত ব্যক্তিরা আপনাদিকে প্রশংসিত ও আদৃত বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এ নিয়ম সর্ব্বত্র খাটে; সুতরাং বুঝা গেল, জলের প্রশংসায় বেতসশাখা ও অবকার গুণানুকীর্ত্তন করা হইয়াছে। (১ম প্রকার ব্যাখ্যা)

দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যার আভাষ দেওয়া যাইতেছে। পূর্ব্বপক্ষী প্রশ্ন করিতেছেন, "অর্থবাদ বিধিশেষ হইলে, সোঽরোদীৎ ইত্যাদি অর্থবাদটী কোন্ বিধির শেষ? সিদ্ধান্তে বলা হইল "তস্মাদ্ বর্হিষি রজতং ন দেয়ং"(সেই জন্য যাগে রজত-দক্ষিণা দিবেনা) এই বিধিবাক্য। "সোঽরোদীৎ" ইত্যাদির পরে দেখা যাইতেছে, "তস্য যদশ্রু অশীর্যান্ত' (তাহার যে অশ্রুপাত হইয়াছিল।) ইহা দেখিলে নিশ্চয়ই বুঝাযায়, রোদন করার কথায় "সে" এই শব্দদ্বারা যাহাকে বলা হইয়াছে, "তস্য" এইখানে ষষ্ঠ্যন্ত তৎ শব্দদ্বারাও তাহাকেই বুঝিতে হইবে। এই পর্য্যন্ত দ্বারা (তৎশব্দ পূর্ব্বকথিত ব্যক্তি বস্তু প্রভৃতিকে আবার স্মরণ করাইয়া বুঝাইয়াদেয়, এই কারণে) অশংসয় প্রতিপাদিত হইল যে, "তস্য যদশ্রু অশীর্য্যত" ইহার অর্থ রুদ্রের যে চ'খের জল পড়িয়াছিল। তাহার পর দেখা যাইতেছে "তদ্ রজতমভবৎ" তাহাই রজত হইয়াছিল। রুদ্র রোদন করিলে, তাঁহার নেত্র হইতে যে জল বাহির হইয়াছিল, তাহাই রজত হইয়াছিল, এইরূপ অর্থ এখন স্থির হইল। আবার অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে—যোবর্হিষি রজতং দদ্যাৎ, পুরাস্য সম্বৎসরাৎ গৃহে রোদনং ভবতি (যে যজ্ঞে রজত-দক্ষিণা দান করে, সম্বৎসর মধ্যে তাহার ঘরে কান্নার রোল উঠে,) এই রজত-নিন্দা-শ্রুতি বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব রজত দান করিবে না, এই বিধির সহিত অর্থবাদের একবাক্যতা হইল। এখন আপত্তি হইতেছে, ঐ অর্থবাদ বিধির উপকার করিল কিরূপে? (নিষেধের বেলায় নিন্দা দ্বারাই নিষেধশ্রুতির উপকার করা অর্থবাদের স্বভাব, এই উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া) সূত্রে উত্তর দিতেছেন "গুণবাদস্তু" গুণবাদ দ্বারা উপকার করিবে, ইহাই উত্তর। রজত যদি রোদনজাত হইল, তবে রোদনগুণ। রজত দান করিলেও রোদন উপস্থিত হয়। রোদনজাত রজত দান করিলেও রোদন হইবার কথা। এখানে গুণবাদ স্পষ্টই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই নিষেধের গুণ রোদন না করা। রোদন না করিলেও রোদন করিয়াছিল, একথা বলা হইল কেন? রজত অশ্রুজাত না হইলেও তাহাকে অশ্রুজাত বলা হইয়াছে কেন? সম্বৎসর মধ্যে রোদন হইবে, বলা হইল, কিন্তু হইবে কেন? এই কয়টী প্রশ্ন হইতে পারে। বাস্তবিক কাঁদিলে রজত

জন্মে না, রুদ্রকেও কেহ কাঁদিতে দেখে নাই, কাজেই এ কথা কয়টীর সাধারণ উত্তর হইলে চলিবে না। তজ্জন্য গুণবাদে উত্তর দেওয়া হইতেছে। রুদ্র শব্দ প্রয়োগ গৌণভাবে রোদন নিমিত্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। (রোদনাৎ রুদ্রইতিভাবঃ) যখন নাম বলা হইল রুদ্র, তখন রোদন না করিলেও রোদন করিয়াছিল বলাযায়। চক্ষু-জলের সহিত বর্ণসাদৃশ্য আছে বলিয়া রজত অশ্রুজাত বলা-যায়। সাদৃশ্য হেতুক গৌণ প্রয়োগ। (সাদৃশ্যাত্তু মতাগৌণাঃ।) রজত দান করিলে ধনক্ষয় জনিত দুঃখ অনিবার্য্য, রোদন হইতেও পারে। ঐ সকল বাক্যের আপাততঃ অর্থ যাহাই হউক, উহাদের উদ্দেশ্য রজত দিতে নিষেধ করা। (২য় প্রকার ব্যাখ্যা।)

তৃতীয়প্রকার ব্যাখ্যায় "স আত্মনো-বপামুদখিদৎ" এই অর্থবাদ "যঃপ্রজাকামঃ পশুকামোবা স্যাৎ স এবং প্রাজাপত্যং তূপরমালভেত" (যে প্রজা অথবা পশু কামনা করে, সে এই প্রজাপতি দেবতাকপবিত্র পশু আলভন করিবে) এই বিধির শেষ ইহা বলা হইতেছে। সে সময় পশু একেবারেই ছিল না, কাজেই বাধ্য হইয়া প্রজাপতিকে নিজের বপা উৎখেদ করিতে হইয়াছিল। পশুর বপার অভাবে নিজের ব্যবহার। যজ্ঞের এতাদৃশ মাহাত্ম্য যে, বপা অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিলে অগ্নি হইতে পবিত্র পশু উত্থিত হইল। এইরূপে অনেক পশু হইল। এখানে একথাদ্বারা কর্ম্মসামর্থ্য ও পশুপ্রাপ্তি প্রকারান্তরে বলা হইল। বপা উৎখেদ না হইলেও হইয়াছিল, একথা বলা কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিব, যাহা হয় নাই, একরূপ বৃত্তান্ত বলায় প্রকারান্তরে কর্ম্ম-প্রশংসা হয়। কর্ম্মের পশু মিলাইতে না পারিয়া প্রজাপতি নিজেই নিজ বপাদ্বারা কার্য্য করেন। ইহা প্রশংসা বটে। ব্যক্তি-বিশেষের নাম ও কর্ম্মাদি লেখায় লোকের প্রবৃত্তি অথবা দ্বেষ, একটা কিছু হয়। বস্তুতঃ আখ্যায়িকা বেদের জিনিষ নহে। যে সকল গল্প দেখা যায়, তাহার তাৎপর্য্য অন্যদিকে। এ কথা বলিলে কোনও ঘটনার পর সময়ে রচিত বলিয়া বেদ অনিত্য হইয়া যায়। তবে আখ্যায়িকা কি নিরবলম্ব? তাহা নহে। জাগতিক জিনিষ লইয়া গৌণভাবে ঐ সকল শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রজাপতি বলিলে, বায়ু, আকাশ অথবা সূর্য্য বুঝা যাইতে পারে। বপা, বৃষ্টি, বায়ু, রশ্মি, একই হইতে পারে। তাহাকে অগ্নিতে প্রক্ষেপ করা বিদ্যুদগ্নিতে দেওয়া, আর্চ্চীসাগ্নিতে দেওয়া, লৌকিকাগ্নিতে দেওয়া এক পদার্থ হওয়া উচিত। তাহাহইলে জন্মিল যে অজ, অন্ন ও বীজ এবং বিরূৎ, ইহাকে আলভন অর্থাৎ গ্রহণ করিলে, প্রজা অর্থাৎ জীবগণ পুত্র ও পশ্বাদি প্রাপ্ত হন। এখানে শব্দ গৌণীবৃত্তি দ্বারা ঐ ঐ পদার্থে প্রযুক্ত হইয়া সত্য অর্থের আবিষ্কার করিতেছে। (৩য় প্রকার ব্যাখ্যা।)

চতুর্থ ব্যাখ্যায়—দেবাবৈদেবযজনমধ্য-বসায় দিশোন প্রজানন—এই অর্থবাদ "আদিত্যঃ প্রাপণীয়শ্চরুঃ" (আদিত্য দেবতাক প্রাপণীয় চরু) এই বিধির শেষ ইহা প্রদর্শিত হইতেছে। আদিত্যচরু সকল মোহ নাশক, দিঙ্মোহ পর্য্যন্তও নাশ

করিতে সক্ষম, এইরূপে প্রশংসা প্রতিপাদন এ বাক্যের তাৎপর্য্য। প্রকৃত ঘটনা যে, এখানে কিছু নাই, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যদি বলা যায়, দিঙ্‌মোহ শব্দ কেন প্রযুক্ত হইল? দিঙ্‌মোহ ছিল না বটে, কিন্তু বহুকার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় অনবকাশ ও অবধান করিতে না পারাই এখানে মোহ। মোহ শব্দ অনবধানে গৌণরূপে ব্যবহৃত। আদিত্য দেবতাকে চক্ষু বহু কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও অনবধানাদি বিনাশ করে, ইহাই এখানকার রহস্যময় প্ররোচনা। অর্থবাদের প্রামাণ্য সম্বন্ধে অনেক যুক্তি আছে; পর পর প্রকাশিত হইবে। (ক্রমশঃ।)

শ্রীকেদারনাথ ভারতী সাংখ্যতীর্থ।
যশোহর, বেদবিদ্যালয়।

বেদান্ত-সূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

(২য়)

৫। ঈক্ষতে না শব্দম্।

৬। গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ।

৭। তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ।

৮। হেয়ত্বা বচনাচ্চ।

৯। স্বাপ্যয়াৎ।

১০। গতিসামান্যাৎ।

১১। শ্রুতত্বাচ্চ।

৫। "ঈক্ষতে" শব্দ থাকায় শ্রুতি-বিরুদ্ধ বলিয়া, প্রকৃতি বা প্রধান জগতের কারণ হইতে পারে না।

৬। "আত্ম" শব্দ থাকাতে "ঈক্ষণ" শব্দের গৌণার্থ অগ্রাহ্য, মুখ্যার্থই গ্রাহ্য।

৭। শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, আত্মনিষ্ঠই মোক্ষাধিকারী, সুতরাং "আত্মা" শব্দ প্রধান বা প্রকৃতিতে প্রযোজ্য হইতে পারে না।

৮। "সৎ" বা "আত্মা" পদে প্রধানকে বুঝায় না; যেহেতু প্রধান বা প্রকৃতির পরিত্যাক্ত হইবার কোন বচন নাই।

৯। "আত্মা" প্রধান বা প্রকৃতি হইতে পারে না, যেহেতু জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত মিলিত হয়।

১০। ব্রহ্মই যে জগতের কারণ, এ বিষয়ে উপনিষৎ সমূহের এক মত।

১১। শ্রুতিতেও স্পষ্ট-উক্তি থাকাহেতু ব্রহ্মই জগৎ-কারণ বুঝিতে হইবে।

(৫ম সূত্র।)—সাংখ্যমতানুসারিগণের মতে জড়া প্রকৃতিই জগতের কারণ। বৈদান্তিকগণের মতানুমত যে সমস্ত ঔপনিষদী বাক্যাবলী সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্মকে উদ্দেশ করে, তাহাও তাঁহাদের মতে সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ—এই ত্রিগুণাত্মিকা জড়া প্রকৃতিতেই অবিরোধে প্রযুক্ত হইতে পারে।

সাংখ্যমতানুসারে পুরুষ বা জীবাত্মা ব্যতীত অন্য সর্ব্ব পদার্থই জড়ের আদিম সত্তা প্রকৃতি হইতে প্রসূত। এই প্রকৃতিই পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রবর প্লেটোর মতানুসারিগণের মতে এক অপ্রত্যক্ষ সুসূক্ষ্ম বিশ্বোপাদান বা বিশ্বপ্রাণ, এবং ইহা হইতেই সর্ব্বভূতের সম্ভূতি।

প্রকৃতি হইতে মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্বের উৎপত্তি ; তদ্দ্বারাই পুরুষ বা জীবাত্মার বহির্জগৎ-জ্ঞান জন্মে। ফলে ভৌতিকতার সূক্ষ্মতম মূল অবস্থাই মহত্তত্ত্ব। বুদ্ধিতত্ত্ব হইতেই অন্তর্বোধ, অহঙ্কার বা আমিত্বের উদ্ভব। অহঙ্কারই অন্তর্বোধের সত্তা স্বরূপ। ইহাকে মনস্তত্ত্বের মূল তত্ত্ব বা সর্ব্বজীবত্ব-তত্ত্বের ভিত্তিভূমি বলা যাইতে পারে। অহঙ্কার হইতেই ভৌতিক জগতের হেতুভূত পঞ্চ-তন্মাত্রার উৎপত্তি। এই সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্রা হইতে স্থূল সৃষ্টির মূল সত্তা স্বরূপ পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন। অহঙ্কার হইতেই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও আভ্যন্তরিক গ্রহণ-বিচারণক্ষম অন্তরিন্দ্রিয় বা মন সমুৎপন্ন।

সাংখ্য-মতে আমিত্ব পদার্থটি ব্যক্তিগত জীবাত্মতত্ত্ব। উহা অনুৎপন্ন ও অনুৎপাদনশীল অন্তর্জ্যোতি স্বরূপ। উহা কেবল প্রকৃতির দ্রষ্টা মাত্র। প্রকৃতি-তত্ত্বজ্ঞান হইতেই জীবাত্মার আত্মজ্ঞান জন্মে; এবং তাহা হইতেই জীবাত্মা দুঃখমুক্ত হন। প্রকৃতি জ্ঞানশূন্য-অন্ধশক্তি-স্বরূপিণী, কিন্তু ক্রিয়াময়ী এবং আত্মা অক্রিয়, অশক্ত অথচ জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন। এই আত্মা ও প্রকৃতির পরস্পর সান্নিধ্যেই এই সর্ব্বভূতাত্মক জগৎপ্রপঞ্চ সমুদ্ভূত।

এই তত্ত্ব-ব্যাখ্যা উপলক্ষে শাস্ত্রে "অন্ধ-পঙ্গু-ন্যায়"ের একটী সুন্দর উদাহরণ উক্ত হইয়াছে। পঙ্গু অন্ধের স্কন্ধে চড়িয়া স্বস্থ নেত্রে দিগ্দর্শন-পূর্ব্বক অন্ধকে চালাইতে লাগিল; অন্ধ পঙ্গু-কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া স্বস্থ পদে অভীষ্ট পথে চলিল। এইরূপ অজ্ঞানান্ধ ক্রিয়াশীল প্রধানের সহযোগিতায় নিষ্ক্রিয় জ্ঞানময় পুরুষের অভীষ্ট এই জগৎ-কার্য্য চলিতেছে।

সাংখ্যকার কপিলোক্ত পুরুষ বা আত্মাই বৈদান্তিক জীবাত্মা। তবে কিনা, বৈদান্তিকগণ সর্ব্ব আত্মার একত্ববাদী, কিন্তু সাংখ্যানুসারিগণ তাহাদের চিরপৃথগত্ববাদী অর্থাৎ বহুজীবাত্মবাদী। বৈদান্তিক মতে উপাধির সসীমত্ব বা সাবয়বত্ব জন্যই আত্মায় আত্মায় আপাত-পার্থক্য-বোধ ; কিন্তু উপাধির অপগমেই সর্ব্বাত্মার একত্ব-পরিণতি। সাংখ্যবাদী এক অদ্বৈত বিশ্বাত্মসত্তা স্বীকার করেন না ; কিন্তু বৈদান্তিক বুঝেন যে, সেই বিশ্বাত্মা হইতেই প্রতি পদার্থ প্রকাশিত, এবং ব্যক্তিগত জীবাত্মাসমূহ এই মায়া-প্রপঞ্চ-পরিকল্পিত জগতে আপাত-সত্যরূপে আভাসমান, কিন্তু তত্ত্বতঃ তাহাদের তথাবিধ বহুত্ব-সত্তা অসিদ্ধ।

সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" অসীম বিশ্বাত্মা বা পরমাত্মা সাম্বিক উপাধিগত সসীমত্ব-ফলে বহুবৎ প্রতীয়মান। যদি সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি মূলতত্ত্ব সহ বেদান্তোক্ত অদ্বৈত-ব্রহ্মতত্ত্ব যোগ করা যায়, আর তৎসঙ্গে যদি ইহা স্বীকার করা যায় যে, প্রত্যেক পদার্থই ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত এবং ব্রহ্মই প্রত্যেক পদার্থ, অর্থাৎ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এবং এই প্রত্যেক পৃথক্‌প্রতীয়মান জীবাত্মাও সোপাধিক সীমাবচ্ছিন্ন সেই এক ব্রহ্ম, তাহা হইলেই বেদান্তদর্শনের তত্ত্ব ও সাংখ্যদর্শনের সহিত তদ্বিভিন্নত্ব আমরা উপলব্ধি করিতে পারি।

জগদেককারণস্বরূপে স্বীকৃত প্রধান বা প্রকৃতিকে অতিক্রম করিবার সাধ্য সাংখ্যের নাই। বৈদান্তিক বলেন যে, অন্ধশক্তিময়ী

প্রকৃতির জগৎ-কারণত্ব সম্ভাবিত নহে, পরন্তু কোন চৈতন্যসত্তাতেই নিখিল সৃষ্টির মূল কারণত্ব নিহিত। বৈদান্তিক ও সাংখ্য উভয় মতেই অব্যক্ত প্রাকৃতিক তত্ত্বে জগতের উপাদান-কারণত্ব বর্ত্তমান; কিন্তু নিখিল বিশ্বের নিয়ামিকা বা নায়িকারূপে প্রকৃতির যে প্রকৃষ্ট স্বাধীন সত্তা সাংখ্যশাস্ত্রে স্বীকৃত, বেদান্তে তাহা অস্বীকৃত। প্রকৃতি ব্রহ্মেরই শক্তিমাত্র, ইহাই বেদান্ত-সিদ্ধান্ত।

সাংখ্যাচার্য্যগণ উপনিষৎ হইতে প্রকৃতির জগৎ-কারণত্ব প্রমাণ করিতে প্রয়াস পান; কিন্তু বৈদান্তিক মতে ঐ সমস্ত ঔপনিষদী বাক্যাবলীর লক্ষীভূত সাংখ্যোক্ত প্রধান বা প্রকৃতি নহে, পরন্তু পরব্রহ্মই বটে।

পঞ্চম সূত্রে ইহাই উক্ত হইয়াছে যে, 'ঈক্ষণ' শব্দ জগৎ-কারণে প্রযুক্ত হওয়ায়, জড়া প্রকৃতি বা প্রধানের জগৎ-কারণত্ব সূচিত হয় না। 'ঈক্ষণ' শব্দ চিন্তন-অর্থেই উপনিষদে প্রযুক্ত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬-২) দৃষ্ট হয়।——

'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্। তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়ং তত্তেজোঽসৃজত।"

হে সৌম্য! আদিতে একমাত্র অদ্বিতীয় সৎ ছিলেন, তিনি দেখিলেন (চিন্তা করিলেন) আমি প্রজা উৎপাদনার্থে বহু হই। তৎপরে তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন। আমরা ঐতরেয় আরণ্যকে (২১। ৪-১-২) দেখিতে পাই "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ স ঐক্ষত লোকান্নুসৃজা, স ইমাল্লোঁকানসৃজত।" এক মাত্র আত্মাই এই নিখিল বিশ্বসৃষ্টির প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন। আর নিমেষকারী কিছুই ছিল না। পরে "আমি জগৎ সৃষ্টি করিব" ব্রহ্ম এই চিন্তা করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিলেন। এই সমস্ত এবং আরো অনেক ঔপনিষদী শ্রুতি-দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃতি বা প্রধান জগৎ-কারণ নহে, সর্ব্বজ্ঞ প্রভু পরমাত্মা পরমেশ্বরই জগৎ-কারণ।

সাংখ্য এইরূপ তর্ক করেন যে "সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্" অর্থাৎ সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান জন্মে, অতএব জ্ঞান-পদার্থ সত্ত্বগুণাত্মক; এবং প্রকৃতি সত্ত্বাদিগুণময়ী, সুতরাং প্রকৃতি কেননা "সর্ব্বজ্ঞা" আখ্যায় অভিহিতা হইতে পারিবেন? এরূপ স্থলে তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, যেমন সত্ত্ব প্রকৃতির গুণ, তেমনি রজস্তমও প্রকৃতির গুণ। রজোগুণ প্রবর্দ্ধক ও উদ্দীপকরূপে ইন্দ্রিয়-উত্তেজক তমোগুণনাশকরূপে ও অন্ধকারস্বরূপে জ্ঞানাবরক; সুতরাং এতদুভয়ের ক্রিয়া-প্রভাবে প্রকাশক সত্ত্ব অভিভূত হওয়ায়, উহার জ্ঞান-শক্তিও অভিভূতা হয়। অতএব প্রকৃতিকে সর্ব্বজ্ঞা বলিলে, অল্পজ্ঞাও বলিতে হয়। ফলিতার্থে চৈতন্যসত্তা দ্বারাই জ্ঞানবত্তা প্রমাণিতব্য। সুতরাং চৈতন্যাভাব বশতঃ প্রকৃতি বা প্রধানে কোন তত্ত্ববোধের সাক্ষিত্ব সম্ভবেনা। "না চেতনস্য প্রধানস্য সাক্ষিত্বমস্তি।" আস্তিক সাংখ্যবাদিগণের অর্থাৎ পাতঞ্জলবাদিগণের মতানুমত এক জগৎকর্ত্তার বিদ্যমানতা যাহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বলেন, প্রকৃতি বা যে প্রধানের জ্ঞান ঈশ্বরেরই জ্ঞান-সাপেক্ষ। যেমন অগ্নিবর্ণ তপ্ত লৌহগোলকে প্রকাশিত দাহিকা শক্তি লৌহ গোলকের প্রতি পরমাণুময় অগ্নিরই দাহিকা-শক্তি, তদ্রূপ চৈতন্যময় ঈশ্বরের জ্ঞানশক্তি অচেতন।

প্রকৃতিতে প্রকাশিত হইতে পারে। তদুত্তরে ইহাই বলা যাইতে পারে যে,লৌহ-গোলকের দাহিকা যেমন অগ্নিরই দাহিকা, তদ্রূপ প্রকৃতির জ্ঞানময়তা বা সর্ব্বজ্ঞতা আত্মা বা ব্রহ্মেরই জ্ঞানময়তা ও সর্ব্বজ্ঞতা মাত্র।

সাংখ্যবাদিগণ আর একটি নূতন তর্ক ধরেন। তাঁহারা বলেন যে, যদি এক নিত্যজ্ঞান-শক্তি বা সর্ব্বজ্ঞতা-শক্তি ব্রহ্মে বিদ্যমান,স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ব্রহ্মের অস্তিত্ব জ্ঞাতব্য বস্তুর অধীন হইয়া পড়ে, স্বীকার করিতে হইবে। এতদুত্তরে বলা যায় যে, সূর্য্যের রশ্মিপ্রভা যেরূপ সৌরকর-দীপ্ত বা রৌদ্রতপ্ত পদার্থ-সমূহের সাপেক্ষ নয়, উহা সর্ব্ব পদার্থেই নিত্যনিরপেক্ষভাবে স্বয়ম্প্রকাশিত ও স্বতঃ-অনুভূত হয়, সর্ব্ববিষয়-নিরপেক্ষভাবে ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞানময়ত্বও তদ্বৎ।

যাহাহউক, যদি তর্কস্থলে ব্রহ্মের জ্ঞান-শক্তির ক্রিয়াভূমিরূপে কোন স্থায়ী বিষয় অঙ্গীকারে নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, নাম-রূপাত্মক উপাধিই সেই বিষয়। উহা অব্যক্ত অথচ বিকাশোন্মুখ। ('নামরূপে অব্যাকৃতে ব্যাচিকীর্ষিতে') অথবা অন্তকথায় বলিতে হইলে বলা যায় যে, মায়াই সেই বিষয়, যাহা জগদ্বীজরূপ জগৎকর্ত্তার জ্ঞান-শক্তির ক্রিয়াভূমি। ব্রহ্ম স্বয়ং মায়া হইতে ভিন্নও নহেন, অভিন্নও নহেন; অথচ মায়া ব্রহ্মেই বিলীনা বা ব্রহ্মময়ী। এতাবতা সমগ্র বৈদান্তিক শব্দই ব্রহ্মবাচক, কিন্তু প্রকৃতি বা প্রধান-বাচক নহে।

শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে উক্ত হইয়াছে;—

"নতস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে।
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে॥
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।
স্বাভাবিকী জ্ঞান বলক্রিয়া॥
অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা।
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ॥
স বেত্তি বেদ্যং নচ তস্য বেত্তা।
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥

(অনুবাদ)

কার্য্য বা করণ নাহিক তাঁহার।
তুল্য বা অধিক কিছু নহে তাঁর।
বহুরূপে তাঁর শক্তির বিকাশ।
স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান-ক্রিয়ার প্রকাশ॥
অকর-চরণে গ্রহণ-গমন।
অনেত্র অশ্রোত্রে দর্শন-শ্রবণ॥
তিনি সমস্তের বেত্তা, তাঁর বেত্তা নাই।
প্রধান আদিপুরুষ বলে তাঁরে তাই॥

(৬ষ্ঠ সূত্র)—সাংখ্যবাদী আবার এক অভিনব তর্ক উদ্ভাবন করিয়া বলেন যে, জগৎ-কারণত্বে প্রকৃতি বা প্রধানই লক্ষ্যীভূত, যেহেতু 'ঈক্ষণ' শব্দ রূপকভাবেই উহাতে প্রযুক্ত হইয়াছে, কারণ "অগ্নি চিন্তা করিলেন"—"আপ চিন্তা করিলেন" এইরূপ উক্তি-সমূহ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় এবং তত্তৎস্থলে অগ্নি-জল প্রভৃতি ভূত সচেতনভাবেই কল্পিত হয়, ইত্যাদি। কিন্তু এই সূত্রেই উক্ত পূর্ব্ব-পক্ষের নিরাস করা হইয়াছে। অর্থাৎ জগৎ-কারণত্ব নির্দ্দেশস্থলে "সৎ" শব্দ উক্ত হওয়াতে, 'ঈক্ষণ' শব্দ রূপকার্থে ব্যবহৃত নয়, বুঝিতে হইবে। উক্ত শাস্ত্রোক্তি পূর্ব্বে এক বার উক্ত হইয়াছে "স দেব সোম্য ইদমগ্র

আসীৎ" ইত্যাদি। অগ্নি, জল ও মৃত্তিকার সৃষ্টি বর্ণনান্তে অগ্নি, জল ও মৃত্তিকাদিকে 'দেবতা' এবং ঐ অধ্যায়ের ব্যাখ্যাত মূলতত্ত্বকেও "দেবতা" শব্দে নির্দ্দেশ করা হইতেছে; যথা—"সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনাহনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি।" ঐ দেবতা চিন্তা করিলেন যে, আমি এই জীবাত্মা দ্বারা উক্ত তিন দেবতা মধ্যে প্রবেশ করিব। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই প্রথমোক্ত 'দেবতা' পদ কদাপি অচেতন প্রকৃতি বা প্রধানে প্রযুক্ত হইতে পারে না; কারণ "জীবাত্মা" শব্দের স্বতঃ পরিচিত ও পরিগৃহীত অর্থে দেহের পরিচালক এক সজীব ও সচেতন আত্মতত্ত্বই প্রতীত হয়। এবম্ভূত চৈতন্যতত্ত্বে অচেতন প্রধানের সত্তা কদাচ সম্ভাবিত নহে। ফলে কেবল চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের নির্দ্দেশ প্রতীয়মান হইলেই সমগ্র অধ্যায়টির পূর্ণ তাৎপর্য্য পরিষ্কার পরিগৃহীত হয়। তৎপরে আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬।৮-৭) দেখিতে পাই—

'স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।"—ইহাই বিশ্বের মূল সূক্ষ্ম সারতত্ত্ব, সমস্তই সেই আত্মা। সেই আত্মাই সত্য। হে শ্বেতকেতো! তুমিও তাই। এখানেও চৈতন্যস্বরূপ আত্মারই নির্দ্দেশ হইতেছে——অচেতন প্রধানের নহে।

সাংখ্য পুনরপি একটি নূতন আপত্তি উপস্থিত করেন। সাংখ্যোক্ত দার্শনিক প্রণালী অনুসারে প্রকৃতিতত্ত্ব পুরুষ কর্ত্তৃক পরিজ্ঞাত হইলেই পুরুষ বা জীবাত্মা মুক্তিলাভ করেন; প্রকৃতি বা প্রধান ভৃত্যবৎ পুরুষের সেবা করেন; এবং প্রভু যেমন প্রিয় ভৃত্যকে "আমার অপর আত্মাস্বরূপ" বলিতে পারেন, তদ্রূপভাবে পুরুষের প্রিয়পরিচারিকা প্রকৃতিকে পুরুষের আত্মাস্বরূপ বলা যাইতে পারে। পরন্তু সাংখ্যে এরূপও উক্ত হয় যে, "ভূতাত্মা" শব্দে পঞ্চভূত; সুতরাং যেস্থলে জগতের ভৌতিক মূল পদার্থ সমূহকে নির্দ্দেশপূর্ব্বক "আত্মা" শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, সেস্থলে সেরূপ ভাবেও প্রধানকে আত্মা বলা অসঙ্গত নহে; সুতরাং ঔপনিষদী বাক্যাবলী ব্রহ্মবাচিকা না হইয়া প্রকৃতিবাচিকাই হইবে।

(৭ম সূত্র)—সপ্তম সূত্রে উপরোক্ত সাংখ্যোক্তি নিরস্ত হইতেছে। আমাদের পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্বেতকেতু-প্রাসঙ্গিক বাক্যে শ্বেতকেতুর ন্যায় একটা চৈতন্যময় জীবকে "তত্ত্বমসি" "তুমি তাহাই" এইরূপ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে; সুতরাং উক্ত 'আত্মা' শব্দে অচেতন প্রধানকে না বুঝাইয়া চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে; কারণ চেতন জীবকে অচেতন হইবার উপদেশ নিতান্ত অস্বাভাবিক। এরূপ অর্থ স্বীকার করিলে একটী অনুপেক্ষণীয় অনুপপত্তি উপস্থিত হয়। অনেক স্থলে অনেক পদ রূপকভাবে ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু যে ক্ষেত্রে তত্তৎ পদের প্রশস্ত মৌলিক অর্থ উজ্জ্বলভাবে সঙ্গতি পায়, সে ক্ষেত্রে রূপকত্বের আরোপ কষ্টকল্পিত ও অসঙ্গত। পঞ্চভূত সম্বন্ধে 'আত্মা' শব্দ রূপকভাবে বা গৌণভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে: এবং ঐরূপ, রূপকার্থ বা গৌণার্থভিন্ন উহ নিতান্ত অযৌক্তিক হইয়া পড়ে। সমস্ত অধ্যায়টির তাৎপর্য্যে ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

এস্থলে উক্ত শব্দটি উহার মৌলিক অর্থে বা মুখ্যার্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে ; কারণ যাঁহারা আত্মনিষ্ঠ, তাঁহারাই মুক্তি-সাধনার বা মুমুক্ষুত্বের অধিকারী, কিন্তু অচেতন প্রধানকে অবলম্বন করিয়া কাহারও কদাপি সে অধিকার লাভ সম্ভবে না। যাহারা স্বীয় আত্মাকে স্ব-সর্ব্বস্ব করিয়া পরের আত্মাকে স্বতন্ত্রিত ও সুদূরস্থিত জ্ঞান করে, বিশ্বের সহিত তাহাদের সন্ধি-সংস্থাপন সুদূর-পরাহত। যিনি স্বীয় আত্মাকে অপরের আত্মাসহ স্থূলতঃ স্পষ্টপার্থক্যবিশিষ্ট দেখিয়াও মূলতঃ এক বা অপৃথক্ দেখিতে পারেন, বিশ্বের সর্ব্বপদার্থেই তাঁহার সেবার্থ শান্তি-সুধা সঞ্চিত। বিশ্বাত্মতত্ত্বের আশ্রিত হইয়া তিনি ঐশানুগ্রহে আনন্দ-রাজ্যে বিহার করিতে সমর্থ হন। তাঁহার সন্দেহজাল ছেদিত, মোহাবরণ অপসারিত, কর্ম্মবন্ধ বিমোচিত হয় ; তিনি ব্রহ্মতত্ত্ব লাভে কৃতার্থ হন। শাস্ত্র স্পষ্টই তাহা বলিয়াছেন,—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।" ফলে তিনি বিশ্বাত্মায় স্বীয় জীবাত্মা একীভূত বা সমীকৃত উপলব্ধি করিতেছেন, তিনিই "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের অধিকারী। এই অধিকারেই যথার্থ মুক্তি বা শান্তি। স্বর্গভোগ-কল্পনা ইহার নিকট অকিঞ্চিৎকর।

(৮ম সূত্র)—প্রধান যে "আত্মা" সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইতে পারে না, তাহার আর একটি কারণ এই সূত্রে সূচিত হইয়াছে। "অরুন্ধতী-দর্শন-ন্যায়" একটি ন্যায়শাস্ত্রের প্রবচন। সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ 'বশিষ্ঠ' নামক একটি বড় তারার নিকটে 'অরুন্ধতী' একটি ক্ষুদ্র তারা। আমাদের পুরাণশাস্ত্র অরুন্ধতীকে বশিষ্ঠের পত্নী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সূক্ষ্মের পরিচয় স্থূল-পরিচয়-সাপেক্ষ। সুতরাং ক্ষুদ্র তারা অরুন্ধতীকে দেখাইতে হইলে, অগ্রে বৃহত্তারা বশিষ্ঠের প্রদর্শন আবশ্যক। অর্থাৎ প্রথমতঃ বশিষ্ঠই যেন অরুন্ধতী, এই-ভাবে বশিষ্ঠের প্রদর্শন ব্যতীত তৎপার্শ্ববর্ত্তী বিন্দুবৎ প্রকৃত অরুন্ধতীর প্রদর্শন সুসাধ্য নহে ; সুতরাং অরুন্ধতী দর্শনের উহাই প্রণালী। অতএব এই "অরুন্ধতী দর্শন" রূপ ন্যায়-প্রবচন অনুসারে বলা যাইতে পারে যে, সূক্ষ্ম ব্রহ্মতত্ত্বের নির্দ্দেশার্থ অগ্রে স্থূল প্রকৃতিতত্ত্ব নির্দ্দেশ আবশ্যক। এই জন্য প্রকৃতি বা প্রধানকে অগ্রে "আত্মা" বলিয়া পরে যথার্থ আত্মা ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করা যায়। ফলিতার্থে কিন্তু এ ক্ষেত্রে বশিষ্ঠ নক্ষত্রবৎ প্রধানের অগ্র-নির্দ্দেশ এবং অরুন্ধতীবৎ ব্রহ্মের পশ্চাৎ-নির্দ্দেশ হয় নাই ; অর্থাৎ প্রধানকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম-নির্দ্দেশ হয় নাই।

এই সূত্রে 'চ' (ও) শব্দ একটি অতিরিক্ত কারণ সূচনার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। যদি প্রধানকে পূর্ব্বোক্ত নৈয়ায়িক প্রবচন মতে বশিষ্ঠস্থানীয় ধরা যায়, তাহা হইলেও তৎপ্রতি 'আত্মা' পদ প্রয়োগ বিসদৃশ হইয়া উঠে। অধ্যায়-প্রারম্ভে উক্ত হইয়াছে যে, কারণের পরিজ্ঞানে প্রতি বস্তুই পরিজ্ঞাত হয়। শ্বেতকেতুকে তৎপিতা বলিলেন—"উত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যঃ যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতং অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্।" অর্থাৎ—তুমি কি কদাপি সেই উপদেশ

প্রার্থনা করিয়াছ, যদ্দ্বারা আমরা অশ্রুত বিষয় শুনিতে,অবুদ্ধ বিষয় বুঝিতে ও অজ্ঞাত বিষয় জানিতে পারি ? তখন পুত্র সেই উপদেশ প্রার্থনা করিলেন এবং পিতা উত্তর করিলেন—"যথা সৌম্যেকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ। বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।" অর্থাৎ—"হে সৌম্য ! একটি মাত্র মৃৎপিণ্ডজ্ঞানেই সর্ব্ব মৃণ্ময় বস্তুর পরিজ্ঞান হয়। ব্যবহারিক জগতে মৃত্তিকার বিবিধ বৈকারিক গঠন ভেদে সংজ্ঞাবাক্যের ভেদ হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বে যে মাটিসেই মাটি !" যিনি মাটিকে জানেন, তিনি মাটি-গঠিত সর্ব্ব দ্রব্যই জানেন, অথবা যেখানে যেভাবে যে আকারেই পরিণত হউক না কেন, তিনি মাটিকে চিনিবেনই। মৃৎপাত্র ভাঙ্গিলে আবার মৃত্তিকাতেই পরিণত; অতএব মৃণ্ময়ের তুলনায় মূল মৃত্তিকাই নিত্য ও যথার্থ; আর মৃণ্ময়ের আকারগত বিভিন্ন মৃত্তিকার ব্যবহারিক জগতে সত্য হইলেও তত্ত্বতঃ অনিত্য ও অযথার্থ।

অতএব জগতের যদি এক মাত্র মূলকারণ হয় এবং তাহা পরিজ্ঞাত হয়,তবে জাগতিক প্রতি বস্তুই পরিজ্ঞাত। এ ক্ষেত্রে উৎপাদক কারণই কেবল যথার্থ, কিন্তু উৎপন্ন কার্য্য অযথার্থ। যে স্থলে সমগ্র অধ্যায়টিতে ইহাই অবিতর্কিত ভাবে সূচিত হইতেছে যে, মূল কারণ পরিজ্ঞাত হইলে প্রতিপদার্থই পরিজ্ঞাত হয়, সে স্থলে 'আত্মা' পদে যদি প্রধানকে বুঝায়, তবে প্রধানকে জানিলে সমস্তই জানা যাইতে পারে; কিন্তু সাংখ্যমতেই প্রধানজ্ঞানে সূক্ষ্ম পুরুষ-জ্ঞান জাত হয় না; কারণ পুরুষ প্রধানের বিকার নহে। অতএব জগদেককারণ 'আত্মা' বা 'সৎ' শব্দে প্রকৃতি বা প্রধানকে নির্দ্দেশ করা যায় না।

(৯ম সূত্র)—অবশেষে ৯ম সূত্রে আর একটি নবযুক্তি অনুসারে দেখান হইয়াছে যে, প্রকৃতি বা প্রধান উপনিষদসমূহের "আত্মা" পদ-বাচ্য হইতে পারে না। এই সূত্র সিদ্ধান্ত করিতেছে যে, যে-স্থলে জীবের চরম ও পরম গতি আত্মা, সে স্থলে প্রধান কখনও সেই আত্মা হইতে পারে না। এই সূত্রে আমাদের অন্তর্ব্বোধ বা জ্ঞানের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, এই ত্রিবিধ অবস্থা সূচিত হইয়াছে। ঐ ত্রিবিধ অবস্থার আত্মতত্ত্বকে জাগরিত অন্তর্ব্বোধ, স্বপ্নশীল অন্তর্ব্বোধ ও সুষুপ্ত অন্তর্ব্বোধ বলা যায়।

জাগ্রদবস্থায় জীবাত্মা মনন দ্বারা বাহ্য জগতের বিষয়-বৈচিত্র্যে সম্বন্ধবদ্ধ থাকে। উহাতে আত্মার উপাধি কল্পিত হয়। এই প্রকারে অনিত্য বাহ্য-পদার্থ-বিশেষ এই স্থূল জড় দেহেতেই আত্মবুদ্ধি জন্মে। আত্মার স্বপ্নাবস্থায় বাহ্যবিষয়-সম্বন্ধ দেহাধীনত্ব ছাড়াইয়া মাত্র অন্তরিন্দ্রিয়ে বা মনে সংস্কাররূপে নিবদ্ধ থাকে, এবং এইরূপে মনেই আত্মবুদ্ধি জন্মে। অবশেষে যখন স্বপ্নের নিবৃত্তি হয়, তখন আত্মার গাঢ় নিদ্রা বা সুষুপ্তি আসে এবং আত্মা পূর্ণাত্মস্বরূপে নিমজ্জিত বা নিলীন হয়। যখন কেহ গাঢ় নিদ্রা হইতে উত্থিত হয়,তখন,সে যে সুগভীর সুখ-নিদ্রায় সুনিদ্রিত ছিল, এ অন্তর্ব্বোধ স্পষ্ট অনুভব করে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, বাহ্য বিষয়ের সম্বন্ধলেশশূন্য অবস্থায়ও অন্তর্ব্বোধ বা জ্ঞান অবস্থিত রা

না। যদি সুষুপ্তি সময়ে অন্তর্ব্বোধের অভাব থাকিত, তবে জাগ্রদবস্থায় বিগত-সুষুপ্তি-সম্ভোগের জ্ঞান আমরা কোথায় পাইতাম? এতাবতা আত্মার সহিতই 'আত্মা'র সঙ্গতি সিদ্ধান্তিত হইতেছে। এই আত্মা কদাচ প্রকৃতি বা প্রধান হইতে পারে না; কারণ প্রকতি বা প্রধান কেবল বাহ্যজ্ঞানের বিষয় মাত্র। সচেতন আত্মা কখনও অচেতন প্রকৃতিতত্ত্বে লীন হইতে পারেন না।

(১০ম সূত্র)—দশম সূত্রে উক্ত হইতেছে যে, সমগ্র ঔপনিষদী শ্রুতিই এক বাক্যে অবিসংবাদী সিদ্ধান্তে ব্রহ্মকেই জগৎকারণ নির্দ্দেশ করিতেছে। এ বিষয়ে যদি প্রকৃতি বা প্রধান-বাচিকা কোন শ্রুতি উপনিষদে থাকিত, তবে অবশ্য অপরাপর শ্রুতির সহিত তাহার অর্থ-সামঞ্জস্য সম্পাদনের সুসঙ্গত কারণও থাকিত। সে যাহাহউক, ফলে সমগ্র উপনিষদেরই সর্ব্বশ্রুতি-সমন্বিত সার সিদ্ধান্ত এইযে, ব্রহ্মই বিশ্বের মূল কারণ। আমরা এইরূপ শ্রুতি দেখিতেপাই,—'আত্মনআকাশঃ সম্ভূতঃ। (তৈঃ উঃ ৩.৩) "আত্মন এবেদং সর্ব্বং" [ছাঃ উঃ ৭।২৬] "আত্মন এষঃ প্রাণো জায়তে।" [প্রঃ উঃ ৩।৩] অর্থাৎ আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন, আত্মা হইতে এই সমস্ত উৎপন্ন, আত্মা হইতে প্রাণ উৎপন্ন, ইত্যাদি। ফলে এই মর্ম্মের বহু বচন-পরম্পরা সমস্ত উপনিষদেই দৃষ্ট হইবে।

(১১শ সূত্র)—একাদশ সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রুতিতে সুস্পষ্ট ও সরলভাবেই "ব্রহ্মই বিশ্ব-কারণ" এই মহাতত্ত্ব ও মহাসত্য সংযোজিত হইয়াছে।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ (৬৯) বলেন,—"স কারণং করণাধিপাধিপো নচাস্য কশ্চিৎ জনিতা নচাধিপঃ।" অর্থাৎ তিনিই কারণ, তিনিই ইন্দ্রিয়েশ্বরেশ্বর; তাঁহার কেহই জনয়িতা বা প্রভু নাই। অতএব যাঁহারা প্রধানকেই শ্রুতিবাক্য-প্রমাণে জগৎ-কারণ-রূপে প্রমাণিত করিতে প্রয়াসী, তাঁহাদের যুক্তি-তর্ক বিচারাদি সর্ব্বৈব ভিত্তিহীন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশঃ——

সুচিন্তা-গীতা।

("Brahmacharin" পত্র হইতে পদ্যানুবাদিত।)

কর কর সুচিন্তা চিন্তন।
বাক্যরূপে সাবয়ব চিন্তাই স্বয়ম্। ১

কর কর সুচিন্তা চিন্তন।
কর্ম্মরূপে পরিণত চিন্তাই স্বয়ম্। ২

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
যেমন চিন্তিবে, তুমি হইবে তেমন। ৩

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
চর্ম্মে বর্ণে কিছু নয়, চিন্তা অনুসারে হয়
সুরূপ বা কুরূপ-ধারণ। ৪

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
গঠনেতে কিছু নয়, চিন্তা অনুসারে হয়
সুরূপ বা কুরূপ ধারণ। ৫

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
সুচিন্তা সুরভি-ফুল, সৌরভেতে সমাকুল
করিবেক তোমার জীবন। ৬

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
তোমার সুচিন্তা গুণে অলক্ষ্যে অন্যের মনে,
হইবে সুচিন্তা-উদ্দীপন। ৭

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
দেবেরা সুচিন্তাকারী—'সুমনসঃ' আখ্যাধারী,
দানবেরা 'দুর্ম্মনসঃ' দুশ্চিন্তা-কারণ। ৮

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
সুচিন্তা-সদ্ভাব কিবা বিকাশে বিমল বিভা;
হারাইয়া হীরক-রতন। ৯

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
সংসার-সংগ্রামে হবে সন্ধি-সংস্থাপন। ১০

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
স্বাস্থ্যরক্ষা তরেও সুচিন্তা-প্রয়োজন। ১১

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
ইহোন্নতি তরেও সুচিন্তা-প্রয়োজন। ১২

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
হবে শান্ত সমাহিত প্রফুল্লিত মন। ১৩

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
হবে তুমি পুতাত্মার প্রিয় নিকেতন। ১৪

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
কুচিন্তায় হ'তে হয় পশুর অধম। ১৫

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
কালা-খোঁড়া-বোবা-অন্ধ,
দৈহিক বিকারে মন্দ;
ততোধিক মানসিক কুচিন্তক জন। ১৬

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
যেহেতু সুচিন্তাবর্গ মর্ত্ত্যে আনে সত্য স্বর্গ;
কুচিন্তা নরক সত্য করে সংস্থাপন। ১৭

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
ক্লেদ-মলে তত নয়, কুচিন্তায় যত হয়
কলুষিত মানব-জীবন। ১৮

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
পরমেশ-কৃপাপ্রাপ্ত সুচিন্তক জন। ১৯

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
চিন্তার তোমার উত্তরাধিকার
করিবে সন্ততিগণ। ২০

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
চিন্তা অনুসারে ইহলোকান্তরে—
পুনঃ দেহ-সংগঠন। ২১

শ্রীশঃ——

"ব্রহ্মচারি-আশ্রমে"র নিয়মিত আয়-ব্যয়ের হিসাব।

১৩০৭ আষাঢ়।

জমা।

বাবু কেশবলাল রায় চৌধুরী উকীল যশোহর *মাঃ চাঃ চৈত্র ১৩০৬ ও বৈশাখ ১৩০৭ ১৲

" নিবারণচন্দ্র দত্ত উকীল যশোহর মাঃ চাঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ ১৲

" প্রিয়নাথ দত্ত উকীল যশোহর মাঃ চাঃ ফাল্গুন ১৩০৬ ৷৷০

" যোগেন্দ্রনাথ মিত্র উকীল যশোহর মাঃ চাঃ চৈত্র ১৩০৬ ১৲

" অম্বিকাচরণ বসু উকীল যশোহর মাঃ চাঃ ফাল্গুন ১৩০৬ ১৲

রাজা জনার্দ্দন সিংহ মর্দ্দরাজ জগদ্দেব, হিন্দোল, কটক ‡এঃ দাঃ ৩০৲

রাজা কিশোরচন্দ্র বীরবর হরিচন্দন, তালচের, কটক এঃ দাঃ ১৫৲

রাজা বৈকুণ্ঠনাথ বালেশ্বর এঃ দাঃ ১৫৲

বাবু ব্রজনাথ চৌধুরী জিয়ালগড়, ঝারিয়া এঃ দাঃ ৷৷০

" মহাতাপচন্দ্র বড়াল ৯৮ চাঁপাতলা ২য় লেন কলিকাতা এঃ দাঃ ৷৷০

" শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় পাহারপুর, মতিগঞ্জ, শ্রীহট্ট এঃ দাঃ ১৲

[illegible] ৬৮৷৷০

জের ৬৮৷৷০

বাবু অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বেঙ্গাল সেক্রেটরীয়েট টেল্ ডিপার্টমেণ্ট এঃ দাঃ ৷৷০

রাজা উর্দ্ধ্বচন্দ্র সিংহ মানভূম এঃ দাঃ ২৲

বাবু ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী গৌরীপুর, ময়মনসিংহ এঃ দাঃ ৩৷০

" হরমোহন গুপ্ত উকীল মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা এঃ দাঃ ৶০

" শশধর সরকার হাটকোরা, জামিত্রা, পাবনা এঃ দাঃ ১৶০

" ব্রজেন্দ্রনন্দন দত্ত হেট্‌মাষ্টার, ময়ূরভঞ্জ, বারিবাদগড় এঃ দাঃ ৷০

" কিশোরীমোহন চৌধুরী উকীল রাজসাহী এঃ দাঃ ১৲

" যদুপতি চট্টোপাধ্যায় কাটোয়া এঃ দাঃ ৷৷০

" কুঞ্জবিহারী গোস্বামী ডোলপুর এঃ দাঃ ৩৷০

" সি, কে, মজুমদার শিলিগুড়ী, দার্জ্জিলিং এঃ দাঃ ৷৷০

" কালীনাথ মুখোপাধ্যায় উকীল যশোহর মাঃ চাঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ ৪৲

" দক্ষিণাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ৪২ টালিগঞ্জ রোড, কালীঘাট, কলিকাতা এঃ দাঃ ১৲

" কালিদাস ভট্টাচার্য্য নায়েব নাজীর যশোহর মাঃ চাঃ বৈশাখ ১৩০৭ ৷৷০

৮৫৲

* মাঃ চাঃ = মাসিক চাঁদা। ‡ এঃ দাঃ = এককালীন দান।

জমা ৮৫৲

বাবু তারাপ্রসন্ন সেন জজকোর্ট যশোহর মা: চা: মাঘ ১৩০৬ ।০

" শ্রীশচন্দ্র গুহ জজকোর্ট যশোহর মা: চা: জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ ।০

" শ্যামলাল ঘোষ জজকোর্ট যশোহর মা: চা: চৈত্র ১৩০৬ ও বৈশাখ ১৩০৭ ॥০

" দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী নায়েব নাজীর যশোহর মা: চা: জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ ।০

" অশ্বিনীকুমার মজুমদার নাজীর যশোহর মা: চা: আষাঢ় ১৩০৭ ॥০

" লক্ষ্মণচন্দ্র ঘোষ জজকোর্ট যশোহর মা: চা: বৈশাখ ১৩০৭ ।০

" আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় ডি: ইঞ্জিনীয়ার যশোহর মা: চা: বৈশাখ ১৩০৭ ॥০

" রামচন্দ্র ঘটক মোক্তার যশোহর মা: চা: মাঘ ১৩০৬ ।০

" যোগেন্দ্রনাথ মিত্র উকীল যশোহর মা: চা: বৈশাখ ১৩০৭ ১৲

" হাজারীলাল সিংহ মোক্তার যশোহর মা: চা: ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩০৬ ১৲

" অতুলচন্দ্র রায় জজকোর্ট যশোহর মা: চা: চৈত্র ১৩০৬ ।০

" অমৃতলাল রায় একাউণ্টেণ্ট মুন্সেফ-কোর্ট তমলুক মেদিনীপুর এ: দা: ॥০

" ভুবনমোহন ঘোষ বরহোগাকুঠি জামাবাজার এ: দা: ॥০

" অমৃতলাল রায় ৩৪ বারওয়ারীতলা রোড্ বালিয়াঘাটা কলিকাতা এ: দা: ২৲

৯৯৲

জের ৯৯৲

বাবু রামগোপাল গঙ্গোপাধ্যায় একাউণ্টেণ্ট জজকোর্ট যশোহর মা: চা: চৈত্র ১৩০৬ ও বৈশাখ ১৩০৭ ১৲

" যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় গভর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ আফিস এলাহাবাদ এ: দা: ।৵০

" গিরীশচন্দ্র কুণ্ডু সোনারপুরা বেণারেস এ: দা: ১।৵০

" হরিচরণ দত্ত মিলিটারী ডিপার্টমেণ্ট সিমলা এ: দা: ॥০

" উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল যশোহর মা: চা: পৌষ ১৩০৬ ১৲

" জগচ্চন্দ্র ভাদুড়ী সম্পাদক হরিসভা সবজীবাগ, বাঁকীপুর এ: দা: ॥০

" প্রসন্নকুমার মিত্র সবজীবাগ, বাঁকীপুর এ: দা: ॥০

" লালবিহারী চট্টোপাধ্যায় গভর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ আফিস শিলচর এ: দা: ॥০

" শশিভূষণ শীল ৭ নিতাইবাবুরলেন চাঁপাতলা কলিকাতা এ: দা: ১॥০

" অম্বিকাচরণ বসু উকীল যশোহর মা: চা: চৈত্র ১৩০৬ ১৲

" পরমানন্দ সাহা নিমতলা, কোটবাজার, মেদিনীপুর এ: দা: ॥০

১০১৸০

"হিন্দু-পত্রিকা"র তহবিল হইতে ১০৲

১১১৸০

জ্যৈষ্ঠমাসের খরচবাদে অবশিষ্ট জমা ১০৶৫

মোট ১২১৸৵৫

খরচ।

অধ্যাপকদিগের বৃত্তি	২৪৮৮০
ছাত্রদিগের বৃত্তি	২২॥০
ভৃত্য ব্যয়	৬৷৯
আশ্রমসম্বন্ধীয় অন্যান্য নানাবিধ ব্যয়	৫৫॥৶১৫
মোট	১০৯৷১০

১৩০৭ শ্রাবণ।

জমা।

বাবু যামিনীকান্ত রায় চৌধুরী উকীল যশোহর মাঃ চাঃ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩০৭	২৲
জি, রায় স্কয়ার মুন্‌সেফ যশোহর এঃ দাঃ	৫৲
বাবু রজনীকান্ত ঘোষ উকীল যশোহর মাঃ চাঃ মাঘ ১৩০৬	১৲
" দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল যশোহর মাঃ চাঃ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩০৭	১৲
" কেশবলাল রায় চৌধুরী উকীল যশোহর মাঃ চাঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭	॥০
" অক্ষয়কুমার মিত্র জমিদার যশোহর মাঃ চাঃ আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৩০৭	২৲
" বাবু অতুলচন্দ্র রায় জজকোর্ট যশোহর মাঃ চাঃ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭	॥০
" করুণাকান্ত চক্রবর্ত্তী ডিঃ ইঞ্জিনীয়ারস্ আফিস,যশোহর মাঃ চাঃ শ্রাবণ ১৩০৭	॥০
" কুশপ্রসাদ জানা কাঁথি, মেদিনীপুর এঃ দাঃ	১৲
" ধরণীধর শর্ম্মা ব্রজবল্লভপুর, ময়না, মেদিনীপুর এঃ দাঃ	॥০
" শশিভূষণ সেন নাজীর নীলফামারী এঃ দাঃ	৶০
	১৩৶০

জের	১৩৶০
বাবু ধরণীমোহন রায় জমিদার মোয়াইল, ছোটহিস্যা,ঢাকা এঃ দাঃ	৫৲
" দুর্গাচরণ সেন রেকর্ডকীপার যশোহর মাঃ চাঃ আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৩০৭	২৲
" রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল যশোহর মাঃ চাঃ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭	।০
" দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী নায়েব নাজীর যশোহর মাঃ চাঃ আষাঢ় ১৩০৭	।০
" অশ্বিনীকুমার মজুমদার নাজীর যশোহর মাঃ চাঃ শ্রাবণ ১৩০৭	॥০
" লক্ষ্মণচন্দ্র ঘোষ নায়েব নাজীর যশোহর মাঃ চাঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭	।০
" শ্যামলাল ঘোষ জজকোর্ট যশোহর মাঃ চাঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭	।০
" দুর্গাদাস রায় জিলাস্কুল ময়মনসিংহ এঃ দাঃ	২৲
" বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী পেশকার যশোহর মাঃ চাঃ আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৩০৭	॥০
" মাখনলাল ঘোষ গুমানীগঞ্জ,গোবিন্দগঞ্জ, রংপুর এঃ দাঃ	॥০
" কালীনাথ মুখোপাধ্যায় উকীল যশোহর মাঃ চাঃ আষাঢ় ১৩০৭	৪৲
" নিবারণচন্দ্র দত্ত উকীল যশোহর মাঃ চাঃ আষাঢ় ১৩০৭	১৲
" কেশবলাল রায় চৌধুরী উকীল যশোহর মাঃ চাঃ আষাঢ় ১৩০৭	॥০
" সীতানাথ মিত্র পেশকার যশোহর মাঃ চাঃ বৈশাখ ১৩০৭	১৲
রায় সাহেব শশিভূষণ বসু খুলনা এঃ দাঃ	২৲
	৩২৶০

জের ৩২৵০

বাবু অক্ষয়কুমার বসু যশোহর মাঃ চাঃ, আষাঢ় ১৩০৭ ৵০

" কালিদাস মুখোপাধ্যায় রাধানগর, সাদারী-হাট, জলপাইগুড়ী এঃ দাঃ ।০

" যোগেন্দ্রনাথ মিত্র উকীল যশোহর মাঃ চাঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ ১৲

" প্রিয়নাথ দত্ত উকীল যশোহর মাঃ চাঃ চৈত্র ১৩০৬ ॥০

" কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় উকীল যশোহর মাঃ চাঃ শ্রাবণ ১৩০৭ ৪৲

৩৮৲

"হিন্দু-পত্রিকা"র তহবিল হইতে ৩৫৲

"শাণ্ডিল্য-সূত্রে"র তহবিল হইতে ১৬৲

"আমিত্বের প্রসারে"র তহবিল হইতে ৩৲

৯২৲

আষাঢ় মাসের খরচ বাদে অবশিষ্ট জমা ১৫॥৵১৫

মোট ১০৭৸৵১৫

খরচ।

অধ্যাপকদিগের বৃত্তি ৩৪৸০

ছাত্রদিগের বৃত্তি ৪১৲

ভৃত্য-ব্যয় ৬॥০

আশ্রম সম্বন্ধীয় অন্যান্য নানাবিধ ব্যয় ১৭৶৫

৯৯।৶৫

১৩০৭ ভাদ্র।

জমা।

বাবু কেদার নাথ ঘোষ হিলিকা টি ষ্টেট্, ডিব্রুগড় এঃ দাঃ ১৲

" প্রসন্নগোপাল রায় উকীল যশোহর মাঃ চাঃ মাঘ ১৩০৬ ১৲

" অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট, বারাসত এঃ দাঃ ২৲

শ্রীযুক্ত কমলানন্দ বড়ুয়া থুমটিয়া টি ষ্টেট্, শিবসাগর এঃ দাঃ ১৲

পণ্ডিত রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য জামালপুর, বর্দ্ধমান এঃ দাঃ ॥০

বাবু রজনীকান্ত নন্দী মঙ্গলকোট, বিদ্যানন্দকাঠী এঃ দাঃ ।০

" প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী মঙ্গলকোট, বিদ্যানন্দকাঠী এঃ দাঃ ।০

" শরচ্চন্দ্র ঘোষ সাংস্রাইল পোঃ, পাঁচাভায়া এঃ দাঃ ১৲

" আকিঞ্চন রায় ঠগী ডাকাইতি আফিস হাইদারাবাদ ডেকান এঃ দাঃ ॥০

" বাবু হরিনাথ রায় উকীল মজফ্ফরপুর এঃ দাঃ ॥০

" কালিদাস ভট্টাচার্য্য নাজীর সাতক্ষীরা মাঃ চাঃ জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৩০৭ ১॥০

কে, পি, চাটার্জ্জি স্কয়ার ম্যানেজার সাপুর টি ষ্টেট, শিলিগুড়ী এঃ দাঃ ॥০

বাবু রামচরণ লাল সুলতানগঞ্জ, গদাগাড়ী, রাজসাহী এঃ দাঃ ৫৲

" বিধুমাধব সেন নায়েব যশোহর মাঃ চাঃ মাঘ ১৩০৬ ১৲

১৬৲

জের ১৮৲

" দেবেন্দ্রনাথ দত্ত দেওয়ান এবং য়্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার, হাতুয়া রাজ এঃ দাঃ ৩।।০

" কুঞ্জবিহারী কর ম্যানেজার, নিউচামটা টি ষ্টেট, শিলিগুড়ী এঃ দাঃ ।।০

" বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী পেশকার যশোহর মাঃ চাঃ ভাদ্র ১৩০৭ ।০

" সতীশচন্দ্র দত্ত শিক্ষক, জিলাস্কুল, যশোহর মাঃ চাঃ ভাদ্র ১৩০৭ ।০

" রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল যশোহর মাঃ চাঃ শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩০৭ ।০

" শরচ্চন্দ্র রায় মুন্সেফ যশোহর এঃ দাঃ ৫৲

" যোগেন্দ্রনাথ মিত্র উকীল যশোহর মাঃ চাঃ আষাঢ় ১৩০৭ ১৲

" দুর্গাচরণ সেন রেকর্ড কীপার যশোহর মাঃ চাঃ ভাদ্র ১৩০৭ ।।০

" গোপালচন্দ্র বিশ্বাস উকীল বরিশাল এঃ দাঃ ২৲

" জ্ঞানচন্দ্র রায় য়্যাসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনীয়ার পরিকা, নৈহাটী এঃ দাঃ ১৲

" রাসবিহারী সেন এসেসর পূর্ণিয়া এঃ দাঃ ।।০

শ্রীমতী অনুশীলা দেবী এঃ দাঃ ।।০

বাবু মাধবচন্দ্র মজুমদার উকীল যশোহর মাঃ চাঃ ফাল্গুন ১৩০৬ ১৲

" যামিনীকান্ত রায় চৌধুরী উকীল যশোহর মাঃ চাঃ শ্রাবণ ১৩০৭ ।।০

" মন্মথনাথ বসু ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট, যশোহর মাঃ চাঃ আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩০৭ ৩৲

৩৫৸০

জের ৩৫৸০

" দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারস্ আফিস শিবসাগর এঃ দাঃ ।।০

" প্রাণকৃষ্ণ দত্ত গ্রেহামস্ অয়েল ডিপট বাগবাজ এঃ দাঃ ১৲

" হরিহর চট্টোপাধ্যায় কীটগঞ্জ, এলাহাবাদ এঃ দাঃ ।।০

" অম্বিকাচরণ বসু উকীল যশোহর মাঃ চাঃ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ ২৲

" কেশব লাল রায় চৌধুরী উকীল যশোহর মাঃ চাঃ শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩০৭ ১৲

" যদুনাথ মজুমদার উকীল যশোহর মাঃ চাঃ বৈশাখ হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত ১৩০৭ ৫০৲

" যতীশ্বর ভট্টাচার্য্য দুদসরা কোটচাঁদপুর এঃ দাঃ ৩০৲

" যোগেন্দ্রনাথ মিত্র উকীল যশোহর মাঃ চাঃ শ্রাবণ ১৩০৭ ১৲

" দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী নায়েব নাজীর যশোহর মাঃ চাঃ শ্রাবণ ১৩০৭ ।০

" লক্ষ্মণচন্দ্র ঘোষ নায়েব নাজীর যশোহর মাঃ চাঃ আষাঢ় ১৩০৭ ।০

" তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল তমলুক এঃ দাঃ ।।০

" অমরেশচন্দ্র রায় চৌধুরী মোক্তার যশোহর মাঃ চাঃ ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩০৬ ১৲

" বনহরি ঘোষ চৌধুরী জমিদার রামনগর যশোহর এঃ দাঃ ।।০

" কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদগাঁও, ঢাকা এঃ দাঃ ।।০

১২৪৸০

জের ১২৪৮০

"হিন্দু-পত্রিকা"র তহবিল হইতে ৩৫৲

ভাদ্রমাসের খরচ বাদে অবশিষ্ট জমা ৭৮৶১০

মোট ১৬৭৷৶১০

খরচ।

অধ্যাপকদিগের বৃত্তি ৯১৲

ছাত্রদিগেরবৃত্তি ১৯৷৶০

ভৃত্য-ব্যয় ৬৷৹

আশ্রম সম্বন্ধীয় অন্যান্য নানাবিধ ব্যয় ৩৮৷৶১০

১৫৫৷৶১০

১৩০৭ আশ্বিন।

বাবু রামচরণ ঘটক মোক্তার যশোহর মাঃ চাঃ চৈত্র ১৩০৬ ও বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ় ১৩০৭ ১৲

" চন্দ্রনাথ চৌধুরী হস্‌পিটেল ম্যাসিষ্টাণ্ট, ওয়াটী পোঃ, আসাম এঃ দাঃ ।৶০

" রজনীকান্ত ঘোষ উকীল যশোহর মাঃ চাঃ ফাল্‌গুন ১৩০৬ ১৲

" অমৃতলাল ঘটক পোষ্টমাষ্টার বাগডোগরা এঃ দাঃ ॥০

" আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় ডিঃ ইঞ্জিনীয়ার যশোহর মাঃ চাঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ ॥০

" যজ্ঞেশ্বর রায় ম্যাসিষ্টাণ্ট সারজন গোরক্ষপুর এঃ দাঃ ১৷৷০

" আনন্দলাল মুখোপাধ্যায় উকীল বাগেরহাট এঃ দাঃ ॥০

৫।৶০

জের ৫।৶০

" কার্ত্তিকচন্দ্র রায় চৌধুরী কটক এঃ দাঃ ১৲

" কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় উকীল যশোহর মাঃ চাঃ ভাদ্র ১৩০৭ ৪৲

" কালীগোপাল মজুমদার জমিদার যশোহর মাঃ চাঃ পৌষ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ১৩০৬ ২৲

" জয়গোপাল মজুমদার জমিদার যশোহর এঃ দাঃ ৩৲

" ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় বহরমপুর এঃ দাঃ ॥০

জনৈক ভদ্রলোক
মাং বাবু অন্নদাচরণ রায় এঃ দাঃ ২৲

বাবু নিবারণচন্দ্র দত্ত উকীল যশোহর মাঃ চাঃ শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩০৭ ২৲

" কেদারনাথ সেন উকীল যশোহর মাঃ চাঃ আষাঢ় ও শ্রাবণ ॥০

" হরশঙ্কর ভট্টাচার্য্য কাদাই, বহরমপুর এঃ দাঃ ॥০

" বিজয়লাল দত্ত ২৩।৩ চক্রবাড়ী রোড্‌, দক্ষিণ ভবানীপুর কলিকাতা এঃ দাঃ ॥০

" শ্রীনাথ প্রধান ম্যানেজার দেভোগ, মেদিনীপুর এঃ দাঃ ।০

" রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ট্রাক্টর পি, ডবলিউ, ডি, শিলচর এঃ দাঃ ১৲

" শ্রীকান্ত রায় জমিদার হরিপুর, টিপরা এঃ দাঃ ॥০

" বিপিন বিহারী ঘোষ উকীল মেদিনীপুর এঃ দাঃ ।৶০

" শরচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, কালনা, বর্দ্ধমান এঃ দাঃ ॥০

২৭৲

জের ২৪৲
"হিন্দু-পত্রিকা"র তহবিল হইতে
৩৫৲
৫৯৲
ভাদ্র মাসের খরচবাদে অবশিষ্ট জমা ১২/০
মোট ৭১/০

খরচ।

অধ্যাপকদিগের বৃত্তি	৫২॥০
ভৃত্য-ব্যয়	৬। ০
আশ্রম সম্বন্ধীয় অন্যান্য নানাবিধ ব্যয়	১০॥১০
মোট	৬৯॥১০

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

"ব্রহ্মচারি-আশ্রমে"র বর্ত্তমান বর্ষের (১৩০৭ সালের) ব্যয়ের জন্য ২০০০৲ দুই-সহস্র টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বিগত বৈশাখ হইতে গত আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত; স্বদেশ বান্ধব উন্নতমনা মহোদয়গণের মধ্যে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সাহায্য সমষ্টি ৪৭০৵১০টাকা এখনও ১৫২৯৸১০টাকার আবশ্যক। ভগবৎ কৃপায় ধর্ম্ম-প্রাণ, বিদ্যোৎসাহী, বদান্য মহাত্মাদিগের অনুগ্রহে অবশিষ্ট টাকা সংগৃহীত হইতে হইলে এবৎসরের আশ্রম সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় স্থিরীকৃত বিষয়গুলি অবাধে সম্পন্ন হইতে পারে।

ব্রহ্মচারি-আশ্রম

(সংবাদ)

বিগত ১৬শে ভাদ্র রবিবার পূর্ণিমা তিথিতে যশোহর "ব্রহ্মচারি-আশ্রমে" দুর্ভিক্ষ-প্লেগ-প্রপীড়িত ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের শান্তিকামনার্থ, আশ্রমস্থ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নরহরি শাস্ত্রী প্রমুখ অধ্যাপকগণ ও ছাত্রবৃন্দ সমবেত হইয়া উক্ত রবিবার দিবস পূর্ব্বাহ্নে যথাক্রমে স্তোত্র-পাঠ, হোম, শান্তি-যজ্ঞ, বেদ-পাঠ এবং সংকীর্ত্তন প্রভৃতি নানাবিধ মঙ্গলময় মহোৎসব পবিত্র ভাবে সুসম্পন্ন করিয়াছেন; ঐ দিবস অপরাহ্নও ক্রমান্বয়ে হোম, শান্তি-যজ্ঞ, বেদ-পাঠ কবিতা ও প্রবন্ধ-পাঠ, শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা-ব্যাখ্যা, বক্তৃতা, সঙ্গীত, সংকীর্ত্তন ইত্যাদি শুভকার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে। আশ্রমের জনৈক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভারতী সাংখ্যতীর্থ, এবং এই সহরের সুপরিচিত বক্তা শ্রীযুক্ত শরদিন্দু মিত্র মহাশয়দ্বয় শান্তি এবং অশান্তির প্রভেদ, ও কি উপায়ে শান্তিলাভ হয় এতৎ সম্বন্ধে সুমধুর গভীর ভাবপূর্ণ সাধারণের সুবোধ্য বক্তৃতা করিয়াছেন। আশ্রমের উল্লিখিত দেশ-হিতকর উৎসবাদি দর্শনার্থে স্থানীয় হাকীম, উকীল, ডাক্তার, জমিদার, শিক্ষক, মোক্তার আমলা প্রভৃতি প্রায় সমস্ত ভদ্রলোকই আশ্রমে যথাকালে আগমন করিয়াছিলেন। অপরাহ্নে লোক-সংখ্যা এতই অধিক হইয়াছিল যে, আশ্রমস্থ ইষ্টক নির্ম্মিত নূতন সুবৃহৎ হল এবং তাহার চতুষ্পার্শস্থ স্থান সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল; এমনকি যাঁহারা অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ বিলম্বে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই স্থানাভাবে প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছিল। আশ্রমের কার্য্যে স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণের আন্তরিক-সহানুভূতি ও অদম্য উদ্যোগ পরিলক্ষিত হওয়ায়, পরম প্রীতির কারণ

হইয়াছে। ভরসা করি, তাঁহাদের এই অকৃত্রিম উৎসাহ হইতে "ব্রহ্মচারি আশ্রম" কখনই, বঞ্চিত হইবে না।

ব্রহ্মচারি-আশ্রম হিন্দু-পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের অটল অধ্যবসায় এবং বহুল চেষ্টার ফলস্বরূপ; কিন্তু ইহার স্থায়িত্ব এবং ভবিষ্যদুন্নতি স্বদেশ হিতাকাঙ্ক্ষী, বিদ্যোৎসাহী, বদান্য, উন্নতমনা মহাত্মাদিগের দয়ার উপর নির্ভর করিতেছে; কেন না, ব্রহ্মচারি-আশ্রমের ন্যায় একটী ব্যয়-সাধ্য-কার্য্য যদুবাবুর পক্ষে একাকী বহন করা, অতীব অসম্ভব। যদু বাবু এ পর্য্যন্ত আশ্রমের জন্য প্রায় ১০০০০ দশ সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছেন। প্রথমতঃ আশ্রম স্থাপনের জন্য ১৬ বিঘা ভূমি ক্রয় ও ৫খানা খড়ের ঘর প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। তদনন্তর ইষ্টক নির্ম্মিত বৃহৎ পাঠাগার নির্ম্মাণ, করিয়া দিয়াছেন, এবং প্রায় চারি সহস্র টাকা মূল্যের পুস্তকালয় ও একটী সুদীর্ঘ পুষ্করিণী দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আশ্রম স্থাপন হইতে এযাবৎ আশ্রম পরিচালনার্থ অধিকাংশ ব্যয়ই ইঁহার নিজ হইতে বহন করিতে হইতেছে। যদিও স্বদেশ শুভানুধ্যায়ী মহাত্মাদিগের মধ্যে কেহ কেহ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আর্থিক সাহায্য করিতেছেন, তথাপি ঐ সাহায্যসমষ্টি এরূপ নহে, যাহা দ্বারা আংশিক ব্যতীত অন্ততঃ অর্দ্ধেক ব্যয়ও নির্ব্বাহিত হইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে, আশ্রমে মহারাষ্ট্র প্রদেশীয় সুবিখ্যাত বেদাধ্যাপক শ্রীযুক্ত নরহরি শাস্ত্রী প্রমুখ ৪জন পণ্ডিত এবং ১৬টী ছাত্র বেদ, বেদান্ত, মীমাংসা, ন্যায়, সাংখ্য, স্মৃতি, কাব্য, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন করিতেছেন। আশ্রমের মাসিক ব্যয় প্রায় ২০০৲ দুইশত টাকা। এ বৎসরের (১৩০৭ সালের) ব্যয়ের জন্য ২০০০৲ দুই সহস্র টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ব্যক্তি মাত্রেরই কত সময়ে কত রকমে অর্থের অপব্যয় হইয়া থাকে, অথচ যদি সকলেই দয়া করিয়া, এই গরিব ব্রহ্মচারি-আশ্রমকে কিছু কিছু সাহায্য করেন, তাহা হইলে এই মহদনুষ্ঠান অনায়াসে নির্ব্বাহিত হইতে পারে। পক্ষান্তরে, আশ্রমের অধ্যাপক এবং ছাত্র সংখ্যা ক্রমশ: বৃদ্ধি করারও চেষ্টা করা যাইতে পারে।

আমরা ভগচ্চরণ ভরসা করতঃ আশ্রমের ব্যয়ভার দেশীয় ধর্ম্ম-প্রাণ, বিদ্যোৎসাহী, সৎকার্য্যের সহায়, সদনুষ্ঠানের সাহায্যদাতাদিগের কৃপার উপর ন্যস্ত করিলাম। নির্দ্দিষ্ট ২০০০ দুই সহস্র টাকা পূর্ণ হইলে, কৃতজ্ঞতা স্বরূপ যথাকালে এ শুভ সংবাদ সাহায্যদাতাদিগের নামের তালিকা ও সাহায্যের পরিমাণসহ সাধারণের অবগতির জন্য হিন্দু-পত্রিকায় প্রকাশ করা যাইবে। ঐ দুইসহস্র টাকা পূর্ণ হইলে বর্ত্তমান বর্ষের ব্যয়ের জন্য আর কাহারও নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হইবে না। আশা করি, সহৃদয় মহোদয়গণের উৎসাহ এবং সাহায্যে এ দরিদ্র আশ্রম ক্রমোন্নতি লাভ করতঃ, দেশের ও ধর্ম্মের মহান্ কল্যাণ সাধন করিবে।

বিনীত,

শ্রীনিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কার্য্যাধ্যক্ষ।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টরীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা।	পৌষ।	১৩০৭ সাল, ১৮২২ শকাব্দা।

দুর্গাস্তোত্রম্।

স্তোতুঃ কঃ পরিবর্ণিতুং তব গুণং রূপঞ্চ বিশ্বাত্মিকং
কো দেবি জগত্ত্রয়ে বহুযুগৈ র্দেবোঽথবা মানুষঃ।
কিঞ্চিৎ স্বল্পমতি র্ব্রবীমি করুণাং কৃত্বা স্বকীয়ৈ র্গুণৈ-
র্মাং মোহয় মায়য়া পরময়া বিশ্বেশি তুভ্যং নমঃ॥

দেবা দেব, কিম্বা নর, এই ত্রিসংসারে
যদি করে যুগ-যুগান্তর ধ'রে,
তথাপি তোমার গুণ, বিশ্বরূপ আর,
বর্ণন করিতে পারে, হেন সাধ্য কার?
সেই ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমি কিরূপ করিয়া
বর্ণন করিব তাহা, না পাই ভাবিয়া!
নিজ গুণে কৃপাবিন্দু করিয়া বিস্তার,
মায়াপাশে বদ্ধ মোরে করিও না আর।
তোমার সম্মুখে আছি নত অবিরাম।

প্রপন্ন ভীতিনাশিকে প্রসূন মালাকন্ধরে
ধিয়স্তমোনিবারিকে বিশুদ্ধবুদ্ধিকারিকে।
সুরার্চ্চিতাঙ্ঘ্রি পঙ্কজে প্রচণ্ড বিক্রমেঽক্ষরে
বিশাল পদ্মলোচনে নমোঽস্তুতে মহেশ্বরি!

ভয় নাশ তার মাগো! ভীত যেই জন,
কণ্ঠদেশে পুষ্পমালা করহ ধারণ;
অজ্ঞানতা-অন্ধকার ঘেরিয়াছে যারে,
জ্ঞানালোক দিয়া তুমি তরাও তাহারে।
করিতে হইলে মাগো! বুদ্ধি সুনির্ম্মল,
তোমা বিনা কেহ নাই এ কার্য্যে কুশল!
পাদপদ্ম সেবে তব যত সুরবর,
প্রচণ্ড বিক্রম তব, তুমি অনশ্বর।
বিশালাক্ষী তুমি মাগো! দীর্ঘ নেত্র ধরি;
চরণে প্রণাম তব করি মহেশ্বরি!

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধু র্ন দাতা
ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্ত্তা।
ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তির্ম্মমৈব
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥

ভৃত্য নাই, কর্ত্তা নাই, ভার্য্যা নাই তায়,
বিদ্যা নাই, নাই কোন জীবন-উপায়!
তোমা বিনা নাহি মোর কেহই জননি!
একমাত্র গতি তাই তুমিই ভবানি!

বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে
জলে চানলে পর্ব্বতে শত্রুমধ্যে।
অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥

বিবাদে বিষাদে কিংবা প্রবাসে, অনলে,
প্রমাদে, পর্ব্বতে, শত্রুমধ্যে কিংবা জলে,
কিংবা অরণ্যেও যদি পড়ি গো জননি!
উদ্ধার করিও মোরে উদ্ধারকারিণি!
তোমা বিনা নাহি মোর কেহই জননি!
একমাত্র গতি তাই তুমিই ভবানি!

অপারে মহাদুস্তরেঽত্যন্ত ঘোরে
বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাম্।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারনৌকা,
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

অপার অগাধ ঘোর বিপৎ সাগরে
যেন জন ডুবিয়া মাগো! হাহাকার করে,
তখনি হইয়া তার নিস্তার-তরণী,
বিপৎ-সাগর হ'তে তরাও জননি!
ত্রাণ করিতেছ মাগো! এই ত্রিসংসার,
আমারেও কর ত্রাণ, করি নমস্কার!

চিতাভস্মালেপো গরলমশনং দিক্‌পটধরো
জটাধারী কণ্ঠে ভুজগপতিহারী পশুপতিঃ।
কপালী ভূতেশো ভজতি জগদীশৈকপদবীং
ভবানি ত্বৎপাণিগ্রহণপরিপাটীফলমিদম্॥

চিতাভস্ম দেহোপরি মাখে সর্ব্বক্ষণ,
নিরন্তর ক'রে থাকে গরল ভক্ষণ,
কণ্ঠে সর্প জড়াইয়া করে কণ্ঠহার,
মাথায় ধরিয়া রয় নিত্য জটাভার,
সর্ব্বদাই থাকে নর-কপালে লইয়া,
ঘুরিয়া বেড়ায় সদা ভূত নাচাইয়া,
উলঙ্গ হইয়া রহে সদা পশুপতি,
তুমিই শিবের দুর্গে! একমাত্র গতি।
ধন্য শিবে পাণিদান করিলে শঙ্করি!
তাই শিব জগদীশ-পদ-অধিকারী!

অশেষব্রহ্মাণ্ড প্রলয় বিধিনৈসর্গিক মতিঃ
শ্মশানেষ্বাসীনঃ কৃতভসিতলেপঃ পশুপতিঃ।
দধৌ কণ্ঠে হালাহলমখিলভূগোলকৃপয়া
ভবত্যাঃ সঙ্গত্যাঃ ফলমিতি চ কল্যাণি কলয়ে॥

অগণিত ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ কারণ
পড়িয়া রয়েছে যাঁর মন সর্ব্বক্ষণ,
সর্ব্বদাই রন্ যিনি শ্মশানে পড়িয়া,
নিজ দেহে দেন যিনি ভস্ম মাখাইয়া,
সেই পশুপতি পৃথ্বী-রক্ষার কারণ
করিলেন কণ্ঠে দেখ গরল ধারণ
কেবল তোমারি সঙ্গে রহি অনিবার,
শিবের সুবুদ্ধি হেন, বুঝিলাম সার!

মাতস্তাতস্য দেহাজ্জননী জঠরগস্তাবদানন্দদে
ত্বং কর্ত্রী কারয়িত্রী করুণ গুণময়ী কর্ম্মদেহস্বরূপ
ত্বং বুদ্ধিশ্চিত্তসংস্থাহ্যপ্যহমপি. ভবিতা সর্ব
মেতৎ ত্বদর্থ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কাম
রূপে করালে

পিতার শরীর হ'তে জনম লভিয়া,
মাতৃগর্ভে রহিলাম শয়ন করিয়া।
তার পর তথা হতে দেখিনু সংসার,
যত কিছু খেলা মাগো! সকলি তোমার!
তুমি দয়াময়ী, কর্ম্ম-দেহ-স্বরূপিণী,
তুমি বুদ্ধি, তুমি চিত্ত-আশ্রয়-কারিণী;

তথাপিও অহং-বুদ্ধি গেল না আমার,
যাহা কিছু করি মাগো! সকলি তোমার!
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
অপরাধ যত মোর ক্ষম গো জননি!

বার্দ্ধক্যে বুদ্ধিহীনঃ কৃতবিবশতনুঃ শ্বাস-কাশাতিসারৈঃ
কর্ম্মানর্হোঽক্ষিহীনঃ প্রগলিতদশনঃ ক্ষুৎ-পিপাসাভিভূতঃ।
পশ্চাত্তাপেন দগ্ধো মরণমনুদিনং ধ্যেয়মাত্রং ন চান্যৎ।
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে॥

বৃদ্ধকালে বুদ্ধিটুকু না রহিল আর,
আসিয়া জুটিল শ্বাস কাশ অতিসার,
অবশ হইল অঙ্গ,—হ'ল অতি ক্ষীণ,
হইলাম অকর্ম্মণ্য তায় দৃষ্টিহীন,
দন্তগুলি একে একে খসিয়া পড়িল,
ক্ষুধা-তৃষ্ণা আসি মোরে চাপিয়া ধরিল,
অনুতাপানল শেষে দহিল আমায়,
চিন্তিনু মরণ-চিন্তা না চিন্তি তোমায়!
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
অপরাধ যত মোর ক্ষম গো জননি!

আপৎসু মগ্নঃ স্মরণং ত্বদীয়ং
করোমি দুর্গে করুণার্ণবেশি।
নৈতচ্ছঠত্বং মম ভাবয়েথাঃ
ক্ষুধাতৃষার্ত্তা জননীং স্মরন্তি॥

করুণা-সাগর দুর্গে! তুমিই ধরায়,
তব নাম স্মরে যেই, তরাও তাহায়।
বিপৎ-সাগরে মাগো, নিমগ্ন হইয়া,
স্মরিতেছি তব নাম বিপদে পড়িয়া।
যাহা কিছু বলিতেছি, সত্য সমুদয়,
সন্তান ব্যাকুল হ'লে ক্ষুধায় তৃষ্ণায়,
অমনি স্মরণ করে তাহার মাতায়!

জগন্মাতর্ম্মাতস্তব চরণসেবা ন রচিতা,
ন বা দত্তং দেবি দ্রবিণমপি ভূয়স্তব ময়া।
তথাপি ত্বং স্নেহং ময়ি নিরুপমং যৎ প্রকুরুষে,
কুপুত্রো জায়েত কচিদপি কুমাতা ন ভবতি॥

জগৎ-জননি দুর্গে! জননি আমার,
নাহি সেবিলাম কভু চরণ তোমার।
তোমার উদ্দেশে মাগো! ভুলেও কখন
দান নাহি করিলাম কভু কিছু ধন।
তথাপি অতুল স্নেহ আমার উপর
প্রদর্শন করিতেছ তুমি নিরন্তর।
পুত্র করিতেও পারে মন্দ আচরণ,
মাতা কিন্তু না করেন কখন তেমন!

ন মোক্ষস্যাকাঙ্ক্ষা ন চ বিভববাঞ্ছাপি চ ন মে,
ন বিজ্ঞানাপেক্ষা শশিমুখি সুখেচ্ছাপি ন পুনঃ।
অতস্ত্বাং সংযাচে জননি জননং যাতু মম বৈ,
মৃড়ানী রুদ্রাণী শিবশিবভবানীতি জপতঃ॥

নাহি মোর কিছু মাত্র মোক্ষের বাসনা,
নাহি মোর কিছু মাত্র ধনের কামনা,
তত্ত্বজ্ঞান হেতু মোর নাহি অভিলাষ,
সুন্দরী-সম্ভোগ-সুখে নাহিক প্রয়াস।
শিব-শিব-শিব-শম্ভু-শিবাণী-ভবানী,
মৃড়ানী রুদ্রাণী দুর্গা উমা কাত্যায়নী,
এই সব নাম মাগো! করি উচ্চারণ
জীবন কাটিয়া যায়, প্রার্থনা এখন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি, এ।

জ্ঞান-গীতা।

("Brahmacharin" পত্র হইতে
পদ্যানুবাদিত।)

কর কর জ্ঞানানুসন্ধান;
আলো জ্ঞান,আঁধার অজ্ঞান। ১

কর কর জ্ঞানানুসন্ধান;
জ্ঞান সব ধর্ম্মে, অধর্ম্মে অজ্ঞান। ২

কর কর জ্ঞানানুসন্ধান;
জ্ঞান দেয় শান্তি, অশান্তি অজ্ঞান। ৩

কর কর জ্ঞানানুসন্ধান;
পশু হতে নরকে পৃথক্ করে জ্ঞান। ৪

জ্ঞানানুসন্ধান কর,
যত জ্ঞান, তত আরো
বিনয়-বিনম্র হবে,
সবার সম্মান্য রবে। ৫

কর কর জ্ঞানানুসন্ধান,
অসত্য হইতে সত্য, অনিত্য হইতে নিত্য,
বাছিয়া তোমায় দিবে জ্ঞান। ৬

কর কর জ্ঞান উপার্জ্জন,
কর্ত্তব্য-নির্ণয়ে ভুল হবে না কখন। ৭

কর জ্ঞান উপার্জ্জন সবে;
মর্ত্ত্য-বিষয়ের ব্যর্থ গুরুত্ব না রবে। ৮

কর জ্ঞান উপার্জ্জন সবে,
অনিবার্য্য বিষয়েতে বিষাদ না হবে। ৯

কর কর জ্ঞানানুসন্ধান;
নিরখিবে নর সবে সোদর-সমান। ১০

কর কর জ্ঞানানুসন্ধান;
নির্ভর নিশ্চিন্ত তোমা করিবেক জ্ঞান। ১১

কর কর জ্ঞান অধিকার;
মরণে ত্রাসিত, জীবনে হর্ষিত
কভু না হইবে আর। ১২

কর কর জ্ঞান অধিকার;
হবে সদা নির্ব্বাসিত অজ্ঞান-সংস্কার। ১৩

কর কর জ্ঞান উপার্জ্জন;
হবে সর্ব্ব পদার্থের স্বরূপ দর্শন। ১৪

কর কর জ্ঞান উপার্জ্জন;
জ্ঞানে হবে কর্ম্ম-প্রেম—দুয়েরি সাধন। ১৫

কর কর জ্ঞান উপার্জ্জন;
বৈষম্যে করিবে তুমি সাম্য দরশন। ১৬

কর কর জ্ঞান উপার্জ্জন;
প্রতি দ্রব্যে দেখিবে একেরি প্রকটন। ১৭

কর কর জ্ঞান উপার্জ্জন;
আত্মায় নিজাত্মা, নিজাত্মায় আত্মা
করিবেক দরশন। ১৮

কর কর জ্ঞানানুসন্ধান;
দূর হবে সর্ব্ব-দুঃখ-মূল দ্বৈতজ্ঞান। ১৯

কর কর জ্ঞানানুসন্ধান;
পাইলে একের জ্ঞান,পাবে সর্ব্বজ্ঞান। ২০

জ্ঞান-উৎস হতে কর জ্ঞান অধিকার;
জ্ঞানে পরানন্দ লাভ হইবে তোমার। ২১

পঠন-পাঠন-গীতা।

("Brahmacharin" পত্র হইতে
পদ্যানুবাদিত।)

(তৈত্তিরীয় উপনিষৎ)

(ঋতঞ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। সত্যঞ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। তপশ্চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ। দমশ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ।

নয়শ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। অগ্নয়শ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। অগ্নিহোত্রঞ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। অতিথয়শ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। মানুষঞ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। প্রজা চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। প্রজাতিশ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। সত্যমিতি সত্যবচা রাথীতরঃ। তপইতি তপোনিত্যঃ পৌরুশিষ্টিঃ। স্বাধ্যায় প্রবচনে এবেতি নাকো মৌদ্গল্যঃ। তদ্ধি তপস্তদ্ধি তপঃ।)

ন্যায়-নিষ্ঠা শিক্ষা কর।
পঠন-পাঠন ধর। ১

সত্যের সাধন লও।
পঠন-পাঠনে রও॥ ২

তপস্যা সাধনে রহ,
পঠন-পাঠন সহ। ৩

দমিবে ইন্দ্রিয়সবে,
পঠন-পাঠনে রবে। ৪

শমগুণে চিত্ত বাঁধ,
পঠন-পাঠন সাধ। ৫

তেজোগ্নি জ্বালিবে রঙ্গে,
পঠন-পাঠন সঙ্গে। ৬
যজ্ঞ কর, বাধা নাই;
পঠন-পাঠন চাই। ৭
অতিথি-সেবায় থাক;
পঠন-পাঠন রাখ। ৮
নরের কর্ত্তব্য লহ;
পঠন-পাঠনে রহ। ৯
সাধিবে গৃহস্থ-ধর্ম্ম;
সন্তানে শিখাবে কর্ম্ম।
মনে রেখ অনিবার,
পঠন-পাঠন সার। ১০

সত্যপর "রথীতর"-সুত
সাধনে হইলা সত্যপূত। ১১
অনুতপ্ত "পুরুশিষ্ট"-সুত
সাধিলা কঠোর তপ-ব্রত।
"নাক" নামে "মুদ্গল"-নন্দন
সেধেছিলা পঠন-পাঠন। ১৩
পঠন-পাঠন জেনো ভবে—
তীব্র তপ—তীব্র তপ তবে। ১৪

শ্রীঃ—

সনৎসুজাতপর্ব্ব।

পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় শাঙ্করভাষ্য সমেত সনৎসুজাতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র প্রকাশ করিয়া আমাদিগের পরম উপকার করিয়াছেন; কারণ উহাতে যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ভাষ্য করিয়াছেন,তাহা জানিতাম না। তিনি প্রস্তাবনায় লিখিয়াছেন যে "সনৎসুজাতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র চারি অধ্যায়ে সমাপ্ত"; কিন্তু মহাভারত উদ্যোগপর্ব্বে দেখিতে পাই যে, উহা পাঁচ অধ্যায়ে (৪১ হইতে ৪৫ অধ্যায়ে) সম্পূর্ণ। ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায় ক্রমান্বয়ে ৪১, ৪২ ও ৪৩ অধ্যায়ে শেষ হইয়াছে। মধ্যে ৪৪ অধ্যায়টি উহাতে নাই। ঐ অধ্যায়টির শঙ্করাচার্য্য ভাষ্য করিয়াছিলেন কিনা, জানি না, সুতরাং কেবল মূল ও অনুবাদ প্রকাশ করিয়া হিন্দুপত্রিকার পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম। যদি কোন মহাত্মার নিকট শাঙ্কর ভাষ্য থাকে, কৃপাকরিয়া প্রকাশ করিবেন অথবা আমায় জানাইলে ভাষ্য সানুবাদ প্রকাশ করিব।

সনৎসুজাত উবাচ।

শোকঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ কাম-
মানঃ পরাসুতা।
ঈর্ষামোহৌ বিধিৎসা চ কৃপা-
সূয়া জুগুপ্সতা ॥১॥
দ্বাদশৈতেমহাদোষা মনুষ্যপ্রাণ-
নাশনাঃ।
একৈকমেতে রাজেন্দ্র মনু-
ষ্যান্ পর্য্যুপাসতে।
যৈরাবিষ্টো নরঃ পাপং মূঢ়-
সঙ্গো ব্যবস্যতি ॥২॥
স্পৃহয়ালুরুগ্রঃ পরুষো বদান্যঃ
ক্রোধং বিভ্রন্মনসা বৈ বিকত্থী।
নৃশংসধর্ম্মাঃ ষড়িমে জনা বৈ
প্রাপ্যাপ্যর্থং নোত সভাজয়ন্তে-
॥৩॥

সনৎসুজাত কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! শোক, ক্রোধ, লোভ, কাম, মান, নিদ্রা-পরতা, ঈর্ষা, মোহ, বিধিৎসা, স্নেহ, অসূয়া ও জুগুপ্সা মনুষ্যের প্রাণনাশকারী; এই দ্বাদশটি মহাদোষ। ইহাদের মধ্যে এক একটি, মনুষ্যসকলকে (আশ্রয় করিবার-জন্য) উপাসনা করে, মনুষ্য ঐ সমস্ত দোষে আবিষ্ট ও মূঢ়সঙ্গ হইয়া পাপাচরণ করে।২॥ স্পৃহয়ালু, উগ্র পরুষ (কটুবাক্য), বদান্য (বহুভাষী), মনে মনে ক্রোধকারী ও বিকত্থী, এই ছয়টি নৃশংসধর্ম্মা মনুষ্য অর্থ প্রাপ্ত হইয়াও তাহার মান্য করেনা, অপিতু মহৎ লোকের অপমান করে।৩ সম্ভোগ-সম্বিদ্-

সম্ভোগ সম্বিদ্ বিষমোঽতিমানী
দত্ত্বা বিকত্থী কৃপণো দুর্ব্বলশ্চ।
বহুপ্রশংসী বনিতাদ্বিট্ সদৈব
সপ্তৈবোক্তাঃ পাপশীলা নৃশংসাঃ
॥৪॥
ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ তপোদমশ্চ অমাৎ-
সর্য্যংহ্রীস্তিতিক্ষানসূয়া।
দানং শ্রুতঞ্চৈব ধৃতিঃ ক্ষমাচ
মহাব্রতাদ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য ॥৫॥
যোনৈতেভ্যঃ প্রচ্যবেদ্দ্বাদশেভ্যঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং চ শিষ্যাৎ।
ত্রিভির্দ্বাভ্যামেকতো বার্থিতো যো
নাস্য স্বমস্তীতি চ বেদিতব্যম্॥৬॥

বিষম (স্ত্রীসঙ্গে পুরুষার্থ-বুদ্ধিবশতঃ অব্যবস্থিত) অতিমানী, দানকরিয়া আত্মশ্লাঘাকারী, দুর্ব্বল বলদ্বারা অন্যের অমঙ্গলকারী, বহুপ্রশংসী (নিজের সুখ্যাতিকারী) ও সর্ব্বদা বনিতাবিদ্বেষী, এই সাত প্রকার মনুষ্য পাপশীল ও নৃশংস বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।৪।

ধর্ম্ম, সত্য, তপস্যা, দম, অমাৎসর্য্য, লজ্জা, তিতিক্ষা, অনসূয়া, দান, শ্রুত, ধৃতি ও ক্ষমা, এই দ্বাদশ ব্রাহ্মণের মহাব্রত। ৫॥

যিনি এই দ্বাদশ "গুণ" হইতে স্খলিত না হন, তিনি এই সমস্ত পৃথিবী শাসন করিতে পারেন। এই সকল গুণের মধ্যে যিনি দুই বা তিনটী গুণ অধিকার করিতে পারেন, তাঁহার আপনার কোন দ্রব্যই নাই ইহা তাঁহার জানা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ তিনি সমুদায় ত্যাগ করিতে পারেন। ৬॥

দমস্ত্যাগোঽথাপ্রমাদ ইত্যেতে-
ষ্বমৃতং স্থিতম্।
এতানি ব্রহ্মমুখ্যানাং ব্রাহ্মণানাং
মনীষিণাম্॥ ৭ ॥
সত্বাসত্বা পরীবাদো ব্রাহ্মণস্য ন
শস্যতে।
নরক প্রতিষ্ঠাস্তেস্য্যর্থ এবং
কুর্ব্বতে জনাঃ॥ ৮ ॥
মদোঽষ্টাদশদোষঃ স স্যাৎ পুরা
সোঽপ্রকীর্ত্তিতঃ।
লোকদ্বেষ্যং প্রাতিকূল্যমভ্যসূয়া
মৃষাবচঃ॥ ৯ ॥
কামক্রোধৌপারতন্ত্র্যং পরিবা-
দোথ পৈশুনম্। অর্থহানির্বিবাদশ্চ
মাৎসর্য্যং প্রাণিপীড়নম্॥ ১০ ॥
ঈর্ষা মোহোঽতিবাদশ্চ সংজ্ঞানা-
শোভ্যসূয়িতা।
তস্মাৎ প্রাজ্ঞো নগাদ্যেতে সদা-
হ্যেতদ্বিগর্হিতম্॥ ১১ ॥

দান, ত্যাগ ও অপ্রমাদ, একয়টি দ্রব্যে অমৃত থাকে; এই কয়টি দ্রব্য মনীষী ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণেরই হইয়া থাকে। [বৃহদারণ্যকোপনিষদে ৫ অ-২ ব্রাহ্মণ ৩মন্ত্র—এতৎ ত্রয়ংশিক্ষেত্ দমংদানং দয়ামিতি] ৭॥

সত্যই হউক অথবা মিথ্যাই হউক, পরনিন্দা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি এরূপ করে, তাহার নরকে স্থান হয়। ৮॥

পূর্ব্বে যে মদ প্রভৃতি অষ্টাদশ দোষ কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাই এক্ষণে বিশেষ করিয়া বলা যাইতেছে—লোকদ্বেষ্য (পরদার হরণাদি (প্রাতিকূল্য, (ধর্ম্মবিষয়ে বাধা দেওয়া), অভ্যসূয়া, মিথ্যাকথা, কাম, ক্রোধ, পারিতন্ত্র্য (মদ্যাদির বশ হওয়া) পরিবাদ, পরদোষ কথন, অর্থহানি, (নৃত্যবেশ্যাদিতে ধনক্ষয়) বিবাদ মাৎসর্য্য, প্রাণিপীড়ন, ঈর্ষা, মোহ অতিবাদ (মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া বাক্য বলা), সংজ্ঞানাশ (কার্য্যাকার্য্য বিবেকশূন্যতা) ও অভ্যসূয়িতা (পরের অত্যন্ত দ্রোহকরা) এই সকল দোষে প্রাজ্ঞব্যক্তি কখনও মত্ত হইবেন না; কারণ এই সকল সর্ব্বদা বিগর্হিত। ১১॥

কর্ম্মগীতা।

১—২

কর্ম্মানুষ্ঠীয়তাম্ নিত্যংতত্রৈব মুক্তিরুত্তমা।
স্বাধীনেষ্বিন্দ্রিয়ার্থেষু কথমালস্যমাস্থিতম্?

৩

যৎপূর্ব্বপিতরো যস্মাৎ কৃত্বা কৃত্যমনুত্তমম্।
পুরাতনমিদং দিব্যম্ ভারতম্ প্রাণয়ন্ মুদা॥
তেষাং বংশাবতংসাঃ কিম্ যূয়ম্ কর্ম্ম পরিচ্যুতাঃ?
সদা কর্ম্মানুশীলেন সংরক্ষ কুলসদ্ব্রতম॥

৪

যাবজ্জরা-জীর্ণ-শরীর-পঞ্জরাৎ
নৈবোৎপতন্তি হ্যসু-পক্ষিণস্তব।
তাবৎ সুকৃত্যম্ সততম্ সমাচ
কাস্থা শরীরে ক্ষণভঙ্গুরে বদ॥

৫

কুরু কৃত্যমহোরাত্রম্ নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
সমন্তাৎ পশ্যতে বেগাৎ কর্ম্ম স্রোতোঽভিবর্ত্ততে॥

৬

কুরু কর্ম্ম, বিনা কর্ম্ম নাস্তীশোপাসনং কচিৎ।
কর্ম্মোপাসনয়া শশ্বৎ ঈশ্বরঃ পরিতুষ্যতি ॥

৭

সন্তজ্য শস্তনীম্‌চিন্তাম্ কার্য্যমশ্বতনং কুরু।
স্মরনিত্যমিদং মূঢ়! শরীরম্ ক্ষণ-ভঙ্গুরম্ ॥

৮

কর্ম্মণো ন বিরন্তব্যম্ পরজন্ম-বিচিন্তয়া।
বিধারয় মনস্যেতৎ চিন্তা সর্ব্ব-বিনাশিনী ॥

৯

নীচাত্তিহেয়ম্ কর্ম্মেতি মন্যে মূঢ়-বিকল্পনম্।
দিব্য-শক্তিপ্রদম্ কর্ম্ম সর্ব্বতঃ সম্পদাবহম্ ॥

১০—১১

সীরেণ ক্রিয়তাম্ কর্ম্ম লেখনী-চালনেন বা।
কায়েন মনসা বাপি নগরে বা বনে সদঃ ॥

১২

কুরু কর্ম্ম সদা, কর্ম্মহীনঃ সর্ব্বত্র নিন্দিতঃ।
অকর্ম্মণো রাজ-মার্গ-মার্জ্জকোহি বিশিষ্যতে ॥

১৩

কর্ম্ম-প্রভুতয়া শশ্বৎ চর দাসতয়াহপি বা।
যেন কেনাপি ভাবেন যথা ভবতি যাদৃশম্ ॥

১৪

কুরু কর্ম্ম, কদা মাভূর্হেয়ঃ পরগলগ্রহঃ।
জ্ঞাতিবন্ধুকুটুম্বানাম্ অথবা ভাগ্যজীবনঃ ॥

১৫

চর্য্যতাম্ সর্ব্বদা কর্ম্ম ভিক্ষা সন্ত্যজ্যতাম্ সদা।
ন কর্ম্মগৌরবে দেয়ঃ প্রশ্রয়ো ভিক্ষুকায়চ ॥

১৬

কুরু কর্ম্ম, মত্যে দেহে কর্ম্মৈব জীবনং ধ্রুবম্।
নৈষ্কর্ম্ম্যমথবালস্যম্ জীবনে মরণাদিকম্ ॥

১৭

ইদম্ মানুষ্যকম্ বিদ্ধিজীবনং হি সুদুর্লভং।
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রকারেণ যত্নাৎ কর্ম্ম সমাচর ॥

১৮

নিরর্থকমিদম্ জন্ম মূর্খৈরিতিবিকল্পিতম্ ॥

১৯

যদি সত্যম্ ভবেৎ কল্য সত্যমদ্য তদা ধ্রুবম্।
অতঃ কুরু সদা কর্ম্ম—কালাকালমচিন্তয়ন্ ॥

২০

যদি জন্মান্তরম্ সত্যম্ ইদম্ জন্ম তদা ধ্রুবম্।
অতোহনুষ্ঠীয়তাম্ কর্ম্ম নির্ব্বিকল্পেন চেতসা ॥

২১

নাহসত্যাৎ জায়তে সত্যম্ সত্যাৎ সত্যো-
ত্তরন্নবা।
অতো জন্মান্তরে সত্যে বিদ্ধি সত্যমিদম্
জনুঃ।
জন্মনি শাশ্বতে তস্মাৎ কর্ম্ম শাশ্বতমাচর।

২২

যাদৃশম্ বপতে বীজম্ ফলম্ ভবতি তাদৃশম্।
অতঃ সর্ব্বপ্রযত্নেন সাধু কর্ম্মানুশীলয় ॥

২৩

যাদৃশী সাধনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।
তস্মাৎ সমাধিমাস্থায় নিয়তম্ কর্ম্ম সাধয় ॥

২৪

সমরে বীরবৎ শশ্বৎ উৎসাহম্ হৃদয়ে বহন্।
অনুতিষ্ঠ সদা কর্ম্ম মা দৈব-দোষদো ভব ॥

২৫

আত্মার্থে কেবলম্ কর্ম্ম বিধেয়ম্ ন মনস্বিভিঃ
পরার্থে সকলম্ কর্ম্ম তুলভে নর-জন্মনি ॥

২৬

দুঃখং বিনাশয়তি যৎ জনয়চ্চ শর্ম্ম,
ক্লেশানপাস্য সততম্ বিতনোতি শান্তিম্,
দারিদ্র্য-ঘোর-তিমিরম্ দ্রবিণার্কদীপ্ত্যা,
দূরীকরোতি চ সদা কুরু তদ্ধি কর্ম্ম

২৭

কুরু যত্নাদহর্নিশম্ কাতরাতুর-সেবনম্।
যেন কেনাপি ভাবেন কর্ম্মব্রতিরতো ভব॥

২৮

জন্মভূমিমুন্নতাম্ কুরু বাণিজ্য-কর্ম্মণা।
সজাতীয়ানুন্নতান্ যত্নাৎ কুরু সৎকর্ম্মণা সদা॥

২৯

স্বদেশে কর্ম্মণা লব্ধম্ যদত্র শক্যতে কথম্।
দেশান্তর গতিস্তস্য লাভায়, ভব কর্ম্মঠঃ॥

৩০

তরঙ্গনিকরানব্ধেরুত্তুঙ্গাচলশেখরম্।
সমতিক্রম্য পৌরুষ্যাৎ কর্ম্মব্রতিরতো ভব॥

৩১

পরদোষননালোচ্য পরাচারমনিন্দয়ন্।
সকৃতাং দুষ্কৃতাম্বাপি হিতং নিয়তমাচর॥

৩২

কর্ম্মণা মনসা বাচা হ্যসাধুত্বম্ বিগর্হয়ন্।
সত্যাশ্রমরতো ভূত্বা জন্মেদম্ কুরু সার্থকম্॥

৩৩

চিন্তা-বিষধরীম্ তীব্রাম্ কর্ম্ম-মন্ত্রৈঃ পরাভবন্।
সাবধানমহোরাত্রম্ কর্ম্মব্রতিরতো ভব॥

৩৪

দুস্তরেঽলসতাপঙ্কে নিপতেন্ন যথা বপুঃ।
তথা সর্ব্বপ্রযত্নেন কর্ম্ম-যোগ-রতো ভব॥

৩৫

পরনিন্দাম্ বৃথালাপম্ বৃথা গোষ্ঠীবিবর্দ্ধনম্।
পরিত্যজ্য কর্ম্মতীর্থেষ্বাত্মবিবেকং সদা কুরু॥

৩৬

অত্র সৎকর্ম্মসম্পত্তৌ সাহায্যম্ কুরু সর্ব্বদা।
কায়েন মনসা বাচা সুধর্ম্মোপকো ভব॥

৩৭

হিংসাং হি পাশবীম্ বৃত্তিম্ পর-দুঃখে তথা সুখং।
নারকীয়মিদং ত্যক্ত্বা সৎ-কর্ম্ম-নিরতো ভব॥

৩৮

কুরু কর্ম্ম, পুরঃ পৃষ্ঠং বিলোক্য নয়-চক্ষুষা।
আকাশে হর্ম্ম্য-রচনম্ মা মূঢ়ধীভয়া রচ॥

৩৯

কুরু কর্ম্ম, পরচ্ছিদ্রং মা সন্ধেহি কদাচন।

৪০

মহাজনানামাদর্শম্ বিলোক্যানুপদম্ পুরঃ।
সমাচর সদা কর্ম্ম ধৈর্য্যোৎসাহ-সমন্বিতঃ॥

৪১

লিঙ্গং বয়স্তথা বংশং অবিচার্য্য নিরন্তরম্।
যস্মিন্ কস্মিন্নপি সদা কর্ম্মাভ্যাস-রতো ভব॥

৪২

যদ্যস্মিন্ জননে কর্ম্ম-যোগী ভবিতুমিচ্ছসি।
কায়েন মনসা বাচা সুপবিত্রস্ততো ভব॥

৪৩

যদ্যত্র কর্ম্ম-যোগেন শান্তিম্ সমধিগচ্ছসি।
সবলং কুরু তদ্ যত্নাৎ হৃদয়ং চ কলেবরম্॥

৪৪

ধ্যানং তথা ধারণাদি যশ্চরেৎ কর্ম্মণা সমম্॥
করস্থামিব জানীহি তস্য সিদ্ধিমসংশয়ম্॥

৪৫

শ্রেষ্ঠে মানং নিকৃষ্টেচ দয়াদানং প্রযত্নতঃ।
বিতরন্ সর্ব্বদা ধীমন্ কর্ম্মযোগরতো ভব॥

৪৬

পুত্রাণাং "সু-পিতা" ভূয়াঃ ভ্রাতৄণাং "সু-সোদরঃ।"
পিতৄণাং "সু-সুতঃ" স্ত্রীণাং "সু-পতি" র্ভব সর্ব্বদা॥

সম্বন্ধিষু চ সর্ব্বেষু "সু-"পূর্ব্ব-পদ-ভাগ্ ভব।
সর্ব্বেষামুপকারায় সুকর্ম্মাণি সদাচর॥

৪৭

[illegible] বন্ধনে-যুক্তো ভব প্রকৃতি-ধর্ম্মতঃ।

৪৮

শ্রেষ্ঠো জানপদো ভূত্বা বসতিংস্বামলঙ্কুরু।
সৎ-কর্ম্মণি মহাযজ্ঞে সর্ব্বদা দীক্ষিতো ভব॥

৪৯

কৃত্বা রাজবিধিম্ মূর্দ্ধ্নি কুরু কর্ম্ম নিরন্তরম্।
আবিষ্কুরু বিধিং নব্যং কুবিধিং পরিবর্জ্জয়ন্॥

৫০

কুরু কর্ম্ম ধর্ম্মবুদ্ধ্যা নির্ম্মম্য পরিপন্থিনঃ॥

৫১

ন শ্রেয়ান্ কেবলং ত্যাগঃ শ্রেয়সী ন বিলাসিতা।
এতয়োরুভয়োরন্তঃ কর্ম্মযোগং সমাচর।

৫২

বিনয়েন তথা প্রেম্ণা দয়ার্দ্রেণ চ চেতসা।
সুকর্ম্মণি মহাযজ্ঞে নিরতোঽহর্দিনং ভব।

৫৩

ভব কর্ম্মকরো নিত্যম্ উপাসকবরো ভব।
ত্যজ সর্ব্বপ্রকারেণ ধর্ম্ম কাপট্য-কঞ্চুকম্॥

৫৪

কুরু কর্ম্ম, সমগ্রেঽস্মিন্ ভুবনে সর্ব্বমানবে।
শিবাং শান্তিময়ং চিন্ত ভ্রাতৃভাবমহর্নিশম্॥

৫৫

ইদং বিধাতৃসৃষ্টৌ নিসর্গস্য মনোরমং।
সৌন্দর্য্যং নিষ্ঠুরতয়া মা হংসি—ভব কর্ম্মঠঃ॥

৫৬

বহুলেষু চ ধর্ম্মেষু প্রকারা বহবঃ স্মৃতাঃ।
তেষামেক এব সারঃ কর্ম্ম-যোগো বিশিষ্যতে॥

৫৭

[illegible] নিস্পৃহো বিত্তৌ প্রতিবেশিধনে-
তথা।
[illegible] ত্যক্ত্বা কর্ম্মরতো
ভব॥

৫৮

[illegible] বিত্তাৰ্জ্জনে ন কেনচিৎ।
[illegible] স্যাৎ মোক্ষপদং তস্মাৎ কর্ম্মরতো ভব॥

৫৯

কেবলং চাটুবাক্যেন নতু যাতি পরাৎপরঃ।
তস্মাৎ বিশ্বজনীনেন কর্ম্মণা প্রীণয়েশ্বরম্॥

৬০

দুর্ব্বলং বা বিপন্নং বা দীনং বা শরণাগতম্।
রক্ষ প্রণিহিতাত্মা সন্ সদা কর্ম্মব্রতী ভব॥

৬১

অত্যাচারপরং দুষ্টং হিংস্রকং চাততায়িনং।
দময়ন্ নিত্যশো বীর্য্যাৎ কর্ম্ম-ব্রত-রতো ভব॥

৬২

সম্মাননাস্তুতের্বাপি পুরস্কারস্য লিপ্সয়া।
কর্ম্মা কৃতনাশঃ স্যাৎ অতো ধর্ম্মায় উৎকুরু॥

৬৩

যাদৃশং যাচসে কর্ম্ম ত্বং পরেষাং সমীপতঃ।
তান্ প্রত্যনারতং কর্ম্ম যত্নেনাচর তাদৃশম্॥

৬৪

যৎকিঞ্চিদপি কর্ত্তব্যং যদিস্যাৎ পুরতঃস্থিতম্॥
সম্পাদয় প্রযত্নেন তদ্ যথা-শক্তি সত্ত্বরম্

৬৫

কুরু কর্ম্ম, কর্ম্মযোগ বলেন নিশ্চিতং নৃণাং।
ভবেৎ সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণং দুশ্চরং জীবনব্রতম্॥

৬৬

বিবেকনিভয়া শশ্বৎ কর্ম্মক্ষেত্রং বিনির্ণয়ম্।
বিদ্যাদুৎসাহধৈর্য্য বীর্য্যেণ কর্ত্তব্যং প্রতিপালয়॥

৬৭

কুরু কর্ম্ম ফলং তস্য পরিণামং চ চিন্তয়ন্।
সাধনানি চ সর্ব্বাণি যত্নেন চ বিবেচয়ন্॥

৬৮

বিহায় ফলসন্ধানং কুরু কার্য্যমহর্নিশং।
যদ্ভবেদ্ ভবতু ন্যায্যে ফলং তত্র বিধায়য়

৬৯

পরমেশং পরং শ্রেষ্ঠং হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিতম্
চিন্তয়ন্ নিরন্তরং ধর্ম্মবুদ্ধ্যা কর্ম্মপরো ভব

৮০

সদৈবাহর ভাবেন ত্বং কর্ম্মসু তৎপরঃ।
[illegible] কর্ম্মণা শিবাং দেবত্বং মনুজন্মনি।

(ইতি কর্ম্ম-গীতা *)

* কর্ম্মগীতার [illegible] পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয়

কঠোপনিষৎ।

(তৃতীয়াবল্লী)

এজগতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরব্রহ্ম স্থানে
গুহায় প্রবিষ্ট থাকি ভুঞ্জে দুই জন
স্বকৃত কর্ম্মের ফল, ধ্রুব যাহা হয়;
ব্রহ্মবিৎ ত্রিনাচিকেত পঞ্চাগ্নিকগণ
যে জাব ব্রহ্মেরে ছায়াতপ তুল্য ক'ন। ১
যেই নাচিকেত অগ্নি, যাজ্ঞিকগণের
সেতুর সমান; যেই পরম অক্ষর
ব্রহ্ম, ভয়শূন্য-পার, ত্রাণার্থীবর্গের;
আমরা সক্ষম হই সে দু'য়ে জানিতে। ২
আত্মারথী, দেহরথ, বুদ্ধিরে সারথি,
মনকে লাগাম বলি জানিবে নিশ্চয়। ৩
ইন্দ্রিয়গণেরে অশ্ব, তাহাতে গৃহীত
বিষয় সমূহে পথ, ইন্দ্রিয় ও মন,
এ উভয়, যুক্তাত্মারে মনীষী সকল
ভোক্তা বলি (রূপকেতে) করেন বর্ণন। ৪
যে নহে বিজ্ঞানবান্; মানস যাহার
কভু নহে সমাহিত; সারথি সমীপে
দুষ্টাশ্বের মত তার ইন্দ্রিয় অবশ। ৫
সমাহিত মন যার, বিবেকী যে জন,
ইন্দ্রিয় বশেতে তার—সদশ্ব যেমন। ৬
যেইজন অবিবেকী, নহে সমাহিত
মন যার; নিরন্তর অশুচি যেজন,
পায় না সে ব্রহ্মপদ, সংসারেই আসে। ৭
যেজন বিজ্ঞানবান্, সমনস্ক সদাশুচি,
সে পায় সে ব্রহ্মপদ, যাতে না জন্মিতে হয় ৮
বিজ্ঞান সারথি যার, প্রগ্রহ মানস,
বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করে সেই।
সংসার-পথের যাহা পারের স্বরূপ। ৯
ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ অর্থ সমুদয়;
অর্থ হ'তে শ্রেষ্ঠ মনঃ, বুদ্ধি মনঃ হ'তে,
বুদ্ধি হ'তে হয় শ্রেষ্ঠ আত্মা সুমহান্। ১০

১। সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরব্রহ্ম স্থানে—মূলে আছে "পরমেপরার্দ্ধে।" শঙ্করাচার্য্য বলেন—পরস্য চ ব্রহ্মণোঽর্দ্ধং স্থানং পরার্দ্ধং হার্দ্দাকাশং তস্মিন্। অতএব "হৃদয়াকাশে।"
গুহায়—বুদ্ধিতে।
পঞ্চাগ্নিকগণ—গৃহস্থগণ—
ছায়াতপ তুল্য কন—জীবাত্মা ছায়াতুল্য, পরমাত্মা আতপ তুল্য। প্রতিবিম্ব স্বরূপ জীবাত্মা সাক্ষাৎ কর্ম্মফল ভোগ করে। পরমাত্মা কেবল দ্রষ্টা বা সাক্ষী মাত্র। শঙ্কর বলেন—
"একস্তত্র কর্ম্মফলং পিবতি ভুঙ্‌ক্তে নেতরস্তথাপি পাতৃসম্বন্ধাৎ পিবন্তৌ বিত্যুচ্যেতে পুত্রিন্যায়েন।"
শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ৪র্থ অধ্যায়, ৬ষ্ঠ শ্রুতি "দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া"-ইত্যাদি দেখুন।
২। সেতুর সমান—দুঃখরূপ জলের পারে যাইবার সেতু। এই সেতু অবলম্বন করিলে যাজ্ঞিকগণকে আর দুঃখজলে সাঁতার দিতে হয় না।
সে দু'য়ে—"অগ্নি" ও "ব্রহ্ম" এই উভয়কে।
৩। আত্মার সংসার-গমনের প্রধান সাধন শরীর রূপ রথ। এই শরীর রূপ রথের মনরূপ লাগাম দেওয়া ইন্দ্রিয়রূপ অশ্ব বুদ্ধিরূপী সারথিদ্বারা পরিচালিত হয়।

৪। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ এই পঞ্চ বিষয়—ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের পথ বলিয়া জানিবে।
৭। সংসারেই আসে—সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে।
৮। বিজ্ঞানবান্—বিবেকী।
সমনস্ক—সমাহিতমনা।
৯। প্রগ্রহ—লাগাম।
বিষ্ণুর—সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের।
৫, ৬, ৭, ৮, ৯, শ্রুতিতে-চিত্তশুদ্ধির আবশ্যকতা বর্ণিত হইয়াছে।
১০, ১১। চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় স্থূল, এই সকল ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়ের বিষয় রূপাদি সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয়ের বিষয় রূপাদি হইতে মনঃ, মনঃ হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ। মহৎ হইতে জগতের বীজ স্বরূপ অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ এবং অব্যক্ত হইতে

মহৎ হইতে শ্রেষ্ঠ অব্যক্ত; তা হ'তে
পুরুষ, তাহ'তে শ্রেষ্ঠ নাহি আর কিছু;
তাহাই পর্য্যবসান, তাহা শ্রেষ্ঠ গতি। ১১
সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে র'ন আত্মা এই;
প্রকাশ না হন; কিন্তু সূক্ষ্মবোদ্ধাগণ
তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম বুদ্ধিবলে দেখেন ইঁহারে। ১২
সংযত করিবে প্রাজ্ঞ, বাক্য মনোমাঝে,
মনেরে করিবে জ্ঞানরূপী আত্মামাঝে,
জ্ঞানকে আত্মায়, পুনঃ আত্মারে সংযত
করিবে বিকারশূন্য পরমাত্মমাঝে। ১৩
উঠ, জাগ, জীবগণ! মোহ-নিদ্রা হ'তে,
শ্রেষ্ঠাচার্য্য কাছ হ'তে হও অবগত
পরমাত্ম তত্ত্ব; শুন কহে কবিগণ—
ক্ষুরের শাণিত ধার যথা দুরত্যয়,
তদ্রূপ দুর্গম তত্ত্ব-জ্ঞান-পথ হয়। ১৪
অশব্দ, অস্পর্শ আর অরূপ, অব্যয়,
অরস ও নিত্য, গন্ধহীন; আদি হীন,
অন্তহীন, যাহা শ্রেষ্ঠ মহৎ হইতে,
ধ্রুব সে ব্রহ্মেরে জ্ঞাত হইয়া সাধক,
মৃত্যু-মুখ হ'তে মুক্ত হ'ন সুনিশ্চিত। ১৫
মৃত্যুপ্রোক্ত নচিকেত-প্রাপ্ত উপাখ্যান
বলিয়া, শুনিয়া তথা, মেধাবী মানব
ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মবৎ হ'ন মহীয়ান্। ১৬
যেজন প্রযত হ'য়ে ব্রাহ্মণ-সভায়
কিম্বা শ্রাদ্ধ কালে এই গুহ্য উপাখ্যান
শুনায় করিয়া পাঠ, তাহার নিকট
অনন্ত ফলদায়ক সেই শ্রাদ্ধ হয়। ১৭

ইতি তৃতীয়াবল্লী,
প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

১১। পুরুষ শ্রেষ্ঠ।—পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই; তাহাই শেষ, তাহাই পরমগতি।
১৪। দুরত্যয়—দুরতিক্রমণীয়।

(চতুর্থী বল্লী)

দ্বিতীয় অধ্যায়—প্রথমাবল্লী।

স্বয়ম্ভু ইন্দ্রিয়-দ্বার বহির্ম্মুখ করি
সৃজন করিলা, তেঁই মানবসকল
বাহ্য বিষয়ের প্রতি করে দৃষ্টিপাত;
না দেখে অন্তরাত্মারে; কোন কোন ধীর
নিবৃত্ত করিয়া চক্ষুঃ বিষয় হইতে,
অমৃতত্ব লাভেচ্ছায় দেখে সে আত্মায়। ১
অল্পবুদ্ধি জন করি কামানুসরণ,
মৃত্যুর বিস্তীর্ণ পাশে হয় নিপতিত,
জানি ধ্রুব অমৃতত্ব কিন্তু ধীর জন
অধ্রুব বস্তুর মাঝে কিছুই না চায়। ২
রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ মৈথুনজ—
যাঁর বলে জানা যায়, হেথায় তাঁহার
কিবা আছে জানিবার? ইনি আত্মা সেই।৩
যঁাহার বলেতে লোক দেখে বস্তুচয়
স্বপনে ও জাগরণে; জ্ঞানীজন জানি
মহান্ ও সর্ব্বব্যাপী যে আত্মস্বরূপ—
মুক্ত হ'ন সংসারের শোক-তাপ হ'তে। ৪
যিনি এই কর্ম্মফল ভোগী জীবাত্মারে
জানেন নিয়ন্তা বলি ভূত ও ভব্যের,

২। মৃত্যুর বিস্তীর্ণ পাশে—জন্ম, মৃত্যু, জরা, রোগ ইত্যাদিতে
ধ্রুব অমৃতত্ব—পরমাত্ম স্বরূপাবস্থানরূপ অমৃতত্ব।

৩। সাধারণতঃ লোকে মনে করে, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় রূপ-রসাদি অনুভব করিতেছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; আত্মাবিহীন পাঞ্চভৌতিক দেহ জড় মাত্র; যেমন অগ্নিতে উত্তপ্ত হইলে লৌহও দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু সেই অগ্নিতাপ অপগত হইলে আর লোহের সেই দাহিকা শক্তি থাকে না তদ্রূপ এই জড় দেহে আত্মার অধিষ্ঠান হইলেই ইন্দ্রিয় সকল রূপ-রসাদি অনুভব করিতে পারে আত্মার অপগমে শরীর জড় মাত্র থাকে। সেই আত্মা সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহার অজ্ঞাত কিছুই নাই। হে নচিকেত! তুমি যে আত্মার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ, সে আত্মা এইরূপ।

তথা বিদ্যমান সদা আপন নিকটে;
না লুকান তিনি এঁরে—ইনি আত্মা সেই।৫
প্রথম উৎপন্ন ব্রহ্ম তপঃ হ'তে যিনি
প্রবেশি হৃদয়াকাশে প্রাণীসমূহের
অবস্থিত পঞ্চভূত সহ;—যিনি জাত
জলের—সৃষ্টির পূর্ব্বে—তাঁহারে যেজন
জানেন—জানেন তিনি—ইনি আত্মা সেই।৬
সম্ভূতা অদিতি যেই সর্ব্বদেবময়ী
প্রাণরূপে; সমুৎপন্না পঞ্চভূত সহ;
জীবের হৃদয়াকাশে প্রবেশিয়া যিনি
রহেন, তাঁহারে যিনি করেন দর্শন,
দেখেন ব্রহ্মেরে তিনি—ইনি আত্মা সেই।৭
অরণি-নিহিত যেই অগ্নি জাতবেদা
সুরক্ষিত গর্ভতুল্য গর্ভিণী কর্ত্তৃক;
পূজ্য যেই প্রতিদিন, জাগরণশীল
আত্মবান্ জনে; জেনো—ইনি আত্মা সেই।৮
যাঁ'হ'তে উদিত সূর্য্য, অস্ত যাঁ'তে যান,
তাঁহাতেই অবস্থিত দেবতা সকল,
অতিক্রম তাঁরে কেহ না পারে করিতে;
(জানিবে নিশ্চয় তুমি)—ইনি আত্মা সেই।৯
যিনি হেথা অবস্থিত, তিনিই সেথায়;
যিনি সেথা অবস্থিত, তিনিই হেথায়;
যেই জন নানারূপে ভাবয়ে ইঁহারে,
পুনঃ পুনঃ মৃত্যুবশ হয় সে নিশ্চিত।১০
প্রাপ্তব্য মনের দ্বারা এই আত্মা; ইথে
নাহি কিছু নানাভাব, যেই জন এঁরে
দেখে নানারূপে, সেই হয় পুনঃ পুনঃ
মৃত্যুর অধীন (সত্য কহিনু তোমায়)।১১
আছেন পুরুষ এক অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ,
শরীরের মাঝে, যিনি ভূত ও ভব্যের
নিয়ামক; এঁরে যদি জানেন সাধক,
গোপন থাকেনা কিছু; ইনি আত্মা সেই।১২
ধূমহীন জ্যোতি তুল্য, অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ,
ভূত-ভব্য-নিয়ামক, অদ্য বর্ত্তমান,
কল্য ও র'বেন যিনি—ইনি আত্মা সেই।১৩
দুর্গম পর্ব্বতে বৃষ্ট সলিল যেমতি
ধায় নানা দিকে, নিম্ন পার্ব্বত্য ভূমিতে,
সেরূপে পৃথক্ যিনি জানেন ধর্ম্মেরে
আত্মা হ'তে, পুনঃ পুনঃ জন্ম হয় তাঁর।১৪
হে গৌতম, শুদ্ধোদকে শুদ্ধোদক যথা
বৃষ্ট হ'লে এক(ই) রূপ করয়ে ধারণ,
সেরূপ জানেন যিনি একত্ব আত্মার,
পরমাত্মা সহ তাঁর আত্মা এক হয়।১৫

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমাবল্লী।

চতুর্থীবল্লী সমাপ্তা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমনোরঞ্জন মিশ্র।
সংস্কৃত বিদ্যালয়, বারৈখালী।
(যশোহর)

৫। কর্ম্মফল ভোগি—মূলে আছে "মধ্বদং"—মধু—অদং, মধুপোত্তারং, কর্ম্মফলভুজং ইতি ভাষ্যকারঃ।

৬। জলের ও সৃষ্টির পূর্ব্বে—কেবল জলের পূর্ব্বে নহে, জল সহিত পঞ্চভূতের ও সৃষ্টির পূর্ব্বে ইহাই ভাষ্যকারের অভিপ্রায়।

৮। অরণি—দুইখানি কাষ্ঠ পরস্পর সংঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপন্ন করিতে হইত, এই উৎপাদিত অগ্নিই যজ্ঞে ব্যবহৃত হইত। অগ্ন্যুৎপাদক সেই কাষ্ঠ খণ্ড-দ্বয়ের নাম "অরণি।"
[illegible]
আত্মবান জনে—মূলে আছে "হবিষ্মদ্ভিঃ" ধ্যান-ভাবনাবিশিষ্ট ব্যক্তি কর্ত্তৃক।

৯। যাঁহা হ'তে—যে প্রাণ হইতে।

১০। হেথা—এই শরীরে। সেথায়—সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে।

১১। মনের দ্বারা—যে মন [illegible] আচার্য্যের উপদেশে বিশুদ্ধ হইয়াছে, সেই মনের।

আপস্তম্বীয় গৃহ্যসূত্রম্।

(পূর্ব্বানুবৃত্তম্)

প্রাকৃতিক জগতে অনিষ্টের প্রশমনে সকলেরই স্বভাবতঃ বাসনা হওয়া নিয়ম; সুতরাং গুণাগুণ বিচার পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট স্থির করিতে এবং নিকৃষ্ট পরিবর্জ্জন ও উৎকৃষ্ট গ্রহণ করিতে হয়। আচার্য্যগণ এই অভিপ্রায়েই নিষিদ্ধ কন্যালক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন। পূর্ব্ব সংখ্যায় অনেকগুলি নিষিদ্ধা কন্যা ও তাহাদের নিষেধের অনুকূলে মূল যুক্তি প্রকাশ করা হইয়াছে, বর্ত্তমান সংখ্যায় অবশিষ্ট নিষিদ্ধ কন্যার বিবরণ সর্ব্বাগ্রে লিপীবদ্ধ করা হইতেছে। আপস্তম্ব বলিতেছেন,—

নক্ষত্রনামা নদীনামা বৃক্ষনামাশ্চ গর্হিতাঃ। ১২

নক্ষত্রের নামে যাহার নাম সেই কন্যা ও নদীর নামে যাহার নাম, সেই কন্যা এবং বৃক্ষের নামে যাহার নাম, সেই কন্যাকে বিবাহের বরণে গ্রহণ করা গর্হিত কর্ম্ম, অতএব পরিত্যাগ একান্ত কর্ত্তব্য। চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, রোহিণী ইত্যাদি নক্ষত্র-নাম স্ত্রীলোকের থাকিতে পারে। গঙ্গা, যমুনা, নর্ম্মদা, কৃষ্ণা প্রভৃতি নদী-নামেও রমণীর নাম শুনা যায়। বৃক্ষ-নামের মধ্যে শিংশপা প্রভৃতিও স্ত্রীগণের নামরূপে পুরাকালে ব্যবহৃত হইত। সূত্রকার মহাশয় এবং পরবর্ত্তি ধর্ম্মশাস্ত্রসংগ্রাহক মহোদয়েরা, পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। শিংশপা নাম ইদানীং শুনা যায় না। লক্ষ্মী, যমুনা, গঙ্গা, বিশাখা এখনও রমণীসমাজে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যায়; তবে মানুষের রুচি পরিবর্ত্তনের সহিত সমস্ত উপকরণই নূতন আকার ধারণ করে, এই জন্য আজ কাল ঐ সকল নাম বিরল-প্রচার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। "নক্ষবৃক্ষনদীনাম্নীং" ইত্যাদি স্মৃতি-বাক্য হইতেও আপস্তম্বীয় সূত্রের রহস্য আবিষ্কৃত হইতেছে। অনেকে মনে করিতে পারেন, নাম দিয়াছেন অনুপযুক্ততা বুঝায় কেমন করিয়া? পিতা-মাতা স্বজনে কন্যার নাম রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা বিশাখা রাখিলেও কন্যা আপত্তি করিতে পারে না; আর রাধা রাখিলেও কন্যার সামর্থ্যে তাহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। বিশেষতঃ পিতা-মাতার নাম রাখিবার দোষে সন্তান বিবাহ হইতে বঞ্চিত হইবে, ইহাও অত্যন্ত অযুক্তিক। কন্যার নাম গঙ্গা থাকিলে, তাহাকে বিবাহ করাটা দোষের বলিয়া সহসা ধারণা হয় না। প্রত্যুত্তরে আমরা বলিতে চাহি, পিতা মাতার দোষেই হউক, অথবা নিজ দোষেই হউক, বর যাহাতে অনিষ্টজনকতা আশঙ্কা করিবেন; অর্থাৎ যে কন্যাকে বিবাহ করিতে ক্ষতি বোধ করিবেন, সেই কন্যাই তাঁহার পক্ষে পরিবর্জ্জনের যোগ্য। সর্ব্বদা বরগণ নিজেদের ইষ্টানিষ্ট বিবেচনা করিয়া উঠিতে পারেন না, কাজেই নিরপেক্ষ মহর্ষিগণ কৃপাপরায়ণ হইয়া সাধারণের মঙ্গলের জন্য সেই সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন। যে সময়ে সর্ব্বপ্রথমে এই বিধান প্রবর্ত্তিত হয়, তখন যে সমস্ত কারণেই হউক না কেন, ঐগুলি সমাজের অনিষ্টকর বলিয়া লোকের ধারণা ছিল। [illegible] বিশেষ কতকগুলি জিনিষ লোকের নিকট ক্রমাগত হইয়া দাঁড়ায়। ঐ সমস্ত নাম বহুদিন সাধা-

বর্ণের নিকট অপকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে-ছিল। বিবাহ একটী গুরু-গম্ভীর রহস্যময় পদার্থ। মানব-জীবনের অধিকাংশ শুভাশুভ ইহার সহিত সম্বদ্ধ, এটী নিশ্চিত। দাম্পত্য প্রেম এই বহুদুঃখসঙ্কুল সংসারের একটী অতি পবিত্র শান্তির সামগ্রী, ইহাকে দুঃখ মরীচিকায় শান্তির শীতল ছায়া বলিতেও অনেক ভাবুক কুণ্ঠিত হন নাই। নাম আবার ভালবাসার একটী উপকরণ। অনেকের নাম শুনিবা মাত্র তাহার উপর একরূপ অনির্ব্বাচ্য স্নেহ, ভক্তি ও প্রেম হইতে দেখাযায়। আবার, কোনও শত্রুতা নাই, কত উপকার-- আদর করে—কত আপন ভাবে, এরূপ লোকেরও নামটী শুনিলে প্রাণটী জ্বলিয়া উঠে! ফলতঃ নামের ভিতর যে কি, বুঝা যায়—অথচ বলা যায় না, এমন মাধুর্য্য আছে, তাহা নিরূপণ করা কঠিন হইলেও অনুভব করা সকলের হৃদয়েই হইতে পারে। সমাজে বর্ত্তমান সময়ে কালী, শ্যামা, তারা, সারদা, মোক্ষদা, গঙ্গা, কমলা, বগলা, সর্ব্বমঙ্গলা প্রভৃতি নামের আদর নাই। গোলাপ-কামিনী, সরোজবাসিনী, সুরবালা, ইন্দুবালা, সরলা, মালতী, চাঁপা, যূথী, বেলী, চামেলী, চিনি, মিছরী ইত্যাদির অসদ্ভাব নাই,—ঘরে ঘরে, পথে পথে সাজান। "রাসমণি" শুনিলে হাসির রোলে গোলযোগ বাধিয়া যায়! তথনও এইরূপ ঐ সকল নাম লোকে ভাল বাসিত না; কাজেই কন্যার পিতা-মাতা সমাজের গতি না বুঝিতে পারিয়া ঐরূপ নাম রাখিতে পারেন; রাখিলেও জামাতার মন: [illegible] ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিয়া আমাদের মহর্ষিগণ ইঙ্গিতে ঐ সকল নাম রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন। এ বিধানের স্থায়িত্ব নাই। কিছুদিন পরে এই সকল বিধানের এক একটী প্রতিপ্রসব বচনও সমাজ রীতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রচিত হইয়াছিল, তাহা এখানে আলোচ্য নহে। আপস্তম্বের সময়ে প্রায়শঃ এই সকল নাম আদৃত ছিল না, ইহাই অনুমান করা সঙ্গত। গোভিলের সময়ে এ সকল বিষয় লইয়া একটা বিশেষ কিছু আন্দোলন হইত না বোধহয়। ঋষি এইবার বিবাহকে আরও সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আনিয়া ফেলিলেন। এবার অনেকগুলি নাম পাত্রীর বিবাহ যোগ্যতার বাধক হইতে গেল। বর্ত্তমান কালের রীতির দিকে নজর করিয়া পাঠক মহাশয়েরা বিনা ওজরে সিদ্ধান্ত করিলেই আমরা অনেক পরিমাণে আশ্বস্ত হইব। মহর্ষি সূত্রে বলিতেছেন,—

সর্ব্বাশ্চ রেফলকারোপান্ত্যা বরণে পরিবর্জ্জয়েৎ। ১৩

যাহাদের নামের উপান্ত্য অর্থাৎ শেষ বর্ণের পূর্ব্ববর্ণ "র" অথবা "ল" হইবে, সেই সমস্ত কন্যাকে বরণে পরিত্যাগ করিতে হইবে। হরদত্ত বলেন "বরণে পরিবর্জ্জয়েৎ" এ বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে,'বরণমপাসাং ন কর্ত্তব্যং" অর্থাৎ ইহাদের বরণও করিবে না। অন্যান্য বিবাহে নিষিদ্ধকন্যা বরণ পর্য্যন্ত করিয়া পরে ত্যাগ করাযায়; এইগুলির বরণও করিতে নাই! কলা, সুশীলা, তারা, এই সকল নাম হরদত্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধার করিয়াছেন। সুদর্শনাচার্য্য গৌরী, কালী ইত্যাদি লিখিয়াছেন। সরলা, বিমলা, চারু প্রভৃতিও এই উৎপাতগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

এ সকল নিয়ম পূর্ব্ববৎ অধুনা প্রতিপালিত হয় না, হওয়ারও আবশ্যকতা দেখা যায় না।

ইহাপের "লক্ষণ সম্পন্নামুপয়চ্ছেৎ" এই-রূপ যে বিধান করিবেন, তদ্বিষয়ে একটু চিন্তা করা দরকার হইয়াছে। লক্ষণ কি, তাহা জানিতে না পারিলে অন্যরূপে পরীক্ষা করা উচিত। সেই পরীক্ষা-প্রণালীই আপাতত: বিধিবদ্ধ করা হইতেছে।

শক্তি বিষয়ে দ্রব্যাণি প্রতিচ্ছন্নান্যু-পনিধায় ব্রূয়াদুপস্পৃশেতি ॥ ১৪

শক্তি অর্থাৎ কন্যার বিবাহযোগ্যতারূপ সামর্থ্য আছে কিনা, ইহা পরীক্ষা করিতে হইলে, পরোক্ত দ্রব্যগুলি মৃত্তিকাপিণ্ডের অভ্যন্তরে লুকায়িত রাখিয়া, ইহার একটীকে স্পর্শ কর, এরূপ আদেশ করিতে হইবে। স্পৃষ্ট পদার্থের গুণ এক একটী বিশেষ ফল প্রসব করে; তাহা দ্বারা বিবাহের কর্ত্তব্যতা নির্ণয় করা যাইতে পারে।

পর পর সূত্রে এই সমস্ত বিষয় ক্রমে পরিস্ফুট হইতেছে। গোভিলের সময়েও পিণ্ড-পরীক্ষা প্রচলিত ছিল। গোভিল গৃহ্যসূত্রের দ্বিতীয় প্রপাঠকে বিবাহপ্রকরণে— "তদলাভে পিণ্ডান্" এই তৃতীয় সূত্রে গোভিল বলিতেছেন, যদি কন্যার লক্ষণ-পরীক্ষণ না জানা থাকে, তবে এই পিণ্ডগ্রহণ-রূপ পরীক্ষা করিতে হইবে। কিরূপে কন্যাকে মৃৎপিণ্ড প্রদান করিয়া পরীক্ষা করিতে হয়, তাহা গোভিল বলিতেছেন, "বেদ্যাঃ সীতায়া হ্রদাদ্ গোষ্ঠাচ্চতুষ্পথাৎ আদেব-নাৎ আদহনাৎ ইরিণাৎ সর্ব্বেভ্যঃ সম্ভারেভ্যঃ [illegible] কুমার্য্যা উপনাময়েদৃতমেব প্রথমং মৃতনাভ্যেতি কশ্চনর্ত্তে ইয়ং পৃথিবী শ্রিতা সর্ব্বমিদমসৌ ভূয়াদিতি তস্যানাম গৃহীত্বৈষামেক গৃহাণেতি ব্রূয়াৎ পূর্ব্বেষাং চতুর্ণাং গৃহ্নতী মুপযচ্ছেৎ সম্ভার্য্যমপীত্যেকে।" অর্থাৎ যজ্ঞবেদি হইতে, হলদ্বারা কৃষ্ট ভূমি হইতে, অগাধ-জল হ্রদ হইতে, চতুষ্পথ (চৌরাস্তা) হইতে দ্যূতস্থান হইতে, শ্মশানভূমি হইতে ও উষর ভূমি হইতে মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া, দেখিতে একপ্রকারের আটটী পৃথক্ পিণ্ড প্রস্তুত করিবেক, এবং আট প্রকারের মৃত্তিকা কিছু কিছু মিশাইয়া একটি পিণ্ড রচনা করিতে হইবে। পরে যে কন্যা বিবাহার্থ পরীক্ষণীয়া হইবে, তাহার নিকটে উপস্থিত করিবে এবং ঋত ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিবে, "এই পিণ্ড কয়টীর মধ্যে ইচ্ছামত একটী গ্রহণ কর।" তখন সে যদি পূর্ব্বোক্ত অর্থাৎ বেদী-কর্ষিত ভূমি, হ্রদ ও গোষ্ঠ হইতে আনীত মৃত্তিকাদ্বারা রচিত পিণ্ড গ্রহণ করে, তবে তাহাকে বিবাহ করা যাইতে পারে। কেহ কেহ বলেন, মিশান মাটির পিণ্ডকে গ্রহণ করিলেও বিবাহ করা যাইতে পারে। আপস্তম্বের মত ঠিক এরূপ নয়। শুদ্ধ মাটির পিণ্ডে পরীক্ষা আপস্তম্ব বলেন নাই, মৃৎপিণ্ডের মধ্যে বীজাদি গোপনে রাখিয়া পিণ্ড স্পর্শ করিতে বলিয়াছেন। গোভিলের মতে ৯টী পিণ্ডের কথা। আপস্তম্ব ৫টীর অধিক দেখেন নাই। উপকরণগুলিও উভয় মতে একরূপ নহে; পরসূত্রে প্রকাশ পাইবে। এরূপ পরীক্ষা [illegible] নাই, ইহার উদ্দেশ্য সহজে অনুমান করা যায় না।

আপস্তম্ব মতানুসারে মৃত্তিকাপিণ্ডের অভ্যন্তরে যে সকল পদার্থ লুক্কায়িত রাখা নিয়ম, তাহার একটী তালিকা প্রদর্শিত হইতেছে। ইহা গোভিল-মতের সহিত সম্পূর্ণ একরূপ নয়, সুতরাং বলা যাইতে পারে, পরীক্ষার রীতি একটু বিভিন্নাকার ধারণ করিয়াছিল।

নানাবীজানি সংসৃষ্টানি বেদ্যাঃ পাংসূন্ ক্ষেত্রাল্লোষ্টং শকৃচ্ছ্মশান-লোষ্টমিতি। ১৫॥

সংসৃষ্টব্রীহি যবাদি, বেদী-পাংসু (ধূলি), ক্ষেত্রলোষ্ট্র (ঢেলা) শকৃৎ (গোময়) শ্মশান-লোষ্ট্র, এই কয়টী পদার্থই মৃৎপিণ্ড মধ্যে অদৃশ্যভাবে রাখিতে হইবে। অতঃপর কোন্‌টী স্পর্শ করিলে কিরূপ ফল হয়, তাহাও বলা হইতেছে।

পূর্ব্বেষামুপস্পর্শনে যথা লিঙ্গ-মৃদ্ধিঃ। ১৬

পূর্ব্বোক্ত চারিটী বস্তুর স্পর্শনে লিঙ্গানুরূপসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, অতএব যে কন্যা এইগুলি স্পর্শ করে, তাহাকে বিবাহ করা শাস্ত্রের অনুজ্ঞাধীন। ব্রীহি-যবাদি বীজ, বেদীপাংসু, ক্ষেত্র লোষ্ট্র, গোময়, এই কয়টী পদার্থযুক্ত-পিণ্ড স্পর্শে যাহার যেরূপ সামর্থ্য, তদনুরূপ সমৃদ্ধি হয়। বীজ জনন কার্য্যেরই উপযোগী অতএব সন্তান কৃত অভ্যুদয় উহার দ্বারা সূচিত হয়। বেদীপাংসু (ও) যজ্ঞদ্বারা উত্ত স্থাপন করে। বেদীতে যজ্ঞই হয়, যজ্ঞ শুভ ফল প্রসব করিতে সক্ষম; কাজেই বেদী-পাংশু যজ্ঞজাত অভ্যুদয়ের সূচক হইতে পারে। ক্ষেত্রলোষ্ট্র হইতে ক্ষেত্রজাত ধান্যাদি সম্পত্তির দ্বারা সমৃদ্ধি বর্দ্ধন অনুমান করা হয়। গোময় দ্বারা পশুলাভজনিত উন্নতির বিষয় ধারণা করা অসঙ্গত নহে। ইহাকে সামর্থ্যানুরূপ ফলই বলা যায়। অবশিষ্ট পিণ্ডটী স্পর্শ করিলে দোষ হয় কি গুণ হয়, তাহা এখন চিন্তা করিবার অবসর হইয়াছে। আপস্তম্ব তদ্বিষয়ে বলিতেছেন,—

উত্তমং পরিচক্ষতে। ১৭॥

শেষ দ্রব্যটী অর্থাৎ শ্মশান লোষ্ট্র সকলেই নিন্দা করেন। "পরিচক্ষতে" কথার অর্থে বৃত্তিকার বলেন "গর্হন্তে" অর্থাৎ নিন্দিত মনে করেন। এখানেও যথালিঙ্গ নিন্দা বুঝিতে হইবে। কেবলমাত্র নিন্দা করেন বলিলে, তাহার ফল মন্দ, একথা বুঝা যায়, কিন্তু নির্দ্দেশ আবশ্যক। সেইজন্য সামর্থ্যানুমতে ফল বুঝা উচিত। শ্মশান-লিঙ্গে মরণই ফল জানা যায়। মরিলেই শ্মশানে যাইতে হয়। আপস্তম্ব মতের পঞ্চপিণ্ডের ফল বর্ণনা সমাপ্ত হইল। বিবেচনা পূর্ব্বক অবধারণ করিতে হইলে, এ সকল নিয়ম এখন পরীক্ষারূপে গ্রহণ করা হয় না।

পূর্ব্বে নিষিদ্ধ কন্যা সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে, বিহিত কন্যার লক্ষণ নির্ব্বাচনও আবশ্যক। তজ্জন্য সূত্রে দেখা যায়—

বন্ধুশীললক্ষণসম্পন্নামরোগ্যামুপ-যচ্ছেৎ। ১৮॥

কুলশীলসম্পন্না দুশ্চিকিৎস্যরোগশূন্যাকে বিবাহ করিবে। বন্ধু শব্দে হরদত্ত বলেন কুল। যে কন্যা সৎকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সে বিবাহ্যা। যাহারা সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করে তাহারা সদ্‌গুণের আশ্রয় হয় বটে, কিন্তু আমরা অদ্যাপি নীতিবিদ্যাবিশারদের "স্ত্রী-

স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি" এই অব্যর্থ বচন ভুলিতে পারি নাই। যাহাহউক, সদ্বংশে বিবাহ ভাল কথা, বন্ধু শব্দে বন্ধুজন বুঝাও আবশ্যক। বিবাহ একটী অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের আবিষ্কারক। কন্যার পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধুজন না থাকিলে, আত্মীয়তা এবং পারস্পরিক উপকার প্রত্যাশা প্রবৃত্তিত থাকে না, সুতরাং ব্যক্তি মাত্রেরই উহা প্রার্থনীয়। শীলবতী কন্যাকে বিবাহ করা একান্ত কর্ত্তব্য। নারী জগতে দুশ্চরিত্রতার ন্যায় দুরপনেয় ব্যাধি আর নাই। দৌঃশীল্য বশতঃ বিবাহের পর বিষময় ফল ঘটিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত অধুনাতন সমাজে বিরল নহে। ইহাতে জগতের মহদনিষ্ট সংঘটিত হয়। শীল শব্দে কেহ কেহ "আর্য্যাচার" বুঝিয়াছেন। আর্য্যগণের পক্ষে আর্য্যাচারানুরক্তা রমণীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করাই সঙ্গত। পত্নীর একটী নাম "সহধর্ম্মিণী"—সে স্বধর্ম্মানুরূপ আচারবতী না হইলে চলিবে কেন? লক্ষণ নিরূপণে সমাজ-প্রচলিত নারী-লক্ষণই গ্রাহ্য। সুদর্শন বলেন, "গূঢ়গুল্ফত্বাদিনারীলক্ষণযুক্তাং" গুল্ফদেশ গূঢ় থাকা, কপালদেশ অনুন্নত থাকা, দন্তাবলীর অতিশয় সুক্ষ্মতা না থাকা, কেশের অনল্পতা, মধ্যদেশের ক্ষীণতা ইত্যাদি প্রচলিত লক্ষণই সুলক্ষণ। ইহার বিপরীত হইলে "ধড়মপেয়ে" 'উঁচকপালী' প্রভৃতি বর্জ্জনীয়তা-বোধক বিশেষণ আসিয়া উপস্থিত হয়। অরোগা অর্থাৎ ক্ষয়কাস, অপস্মার, কুষ্ঠ ইত্যাদি অচিকিৎস্য রোগাক্রান্তা নহে, এরূপ কন্যা বিবাহ্যা। আর উপরোক্ত-রোগ-রুগ্না গুলির বিবাহ অনাবশ্যক, কেননা উহাদের দ্বারা বিবাহের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। ধর্ম্মাচরণের সাহায্য করা পূর্ব্বকালে পত্নীর প্রধান কার্য্য ছিল। উহারা ঐ কার্য্যে অসমর্থা। অপত্যোৎপাদনও উহাদের ক্ষেত্রে অনেকাংশে অসঙ্গত ও অসম্ভব। বংশানুক্রমে অচিকিৎস্যরোগ জন্মিবার উপায় আপনা হইতে সংগ্রহ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। "নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীং" স্মৃতিবাক্য মনে করুন। এরূপ কন্যা বিবাহ করিলে বিবাহবৃক্ষে কুফলই ফলে, ইহা সাধারণের সমস্বরে স্বীকর্ত্তব্য মনে করি।

কন্যা-লক্ষণের পর বর লক্ষণও কথিত হইতেছে, যথা,—

বন্ধুশীল লক্ষণসম্পন্নঃ শ্রুতবান-
রোগইতি বরসংপৎ। ১৯।

বন্ধুশীল, লক্ষণসম্পন্ন, বেদাধ্যায়ী, নীরোগ ব্যক্তিই উপযুক্ত বর। যে সমস্ত গুণ থাকা একান্ত অভিপ্রেত, ইহাতে তাহাদের সকল গুলিরই সংগ্রহ হইল। এরূপ বরে কন্যা দান বিহিত। আর্য্যশাস্ত্র ও আর্য্যধর্ম্মের মূল বেদ, বেদাধ্যয়নকারী বরই আর্য্যরীতি বিবাহে প্রশস্ত পাত্র। বন্ধু, চরিত্র, লক্ষণ ও অরোগিতা, কন্যা এবং বরে সমানই উপযোগী। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এরূপ সুলক্ষণ বরের বিবাহেই পূর্ব্বোক্ত নিষিদ্ধ কন্যার উল্লেখ। এরূপ গুণসম্পন্ন, তাৎপর্য্যতঃ রূপগুণবান্ বরের সহিত নিষিদ্ধকন্যার বিবাহ দেওয়া অতীব অন্যায় কার্য্য।

বন্ধুশীল লক্ষণাদি নির্ব্বাচন করিবার একটী গূঢ় রহস্য আছে, তাহা কেবল বর-বধূর মানসিক প্রীতির দ্বার পরিষ্কৃত করার উপায় চিন্তা মাত্র। সুলক্ষণ বর সুলক্ষণা কন্যাতেই অনুরক্ত হইতে পারেন। আমার সহিত যাহার কাজ গুলি এক প্রকারের, আমার

মনোবৃত্তি যাহার মনোবৃত্তির সহিত অনেকাংশে মিলে, আমি তাহাকেই ভালবাসিতে পারি। কাজেই দম্পতীর ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার, ব্যবহার একরূপ হওয়া আবশ্যক। পরিণয় প্রণয়শূন্য হইলে উহা মরুভূমির ন্যায় ভয়ঙ্কর। সংসারের পথে জীবনের ব্রত প্রতিপালনে যে দুইটি জীবন সমদুঃখসুখ হইয়া এক সঙ্গে চলিতে পারে, তাহাই জায়াপতি। এই গভীর রহস্য পূর্ব্বাচার্য্যগণ বিশেষরূপে ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন, কাজেই বিবাহ অনুরাগমূলক হওয়াই উপযুক্ত, এ কথা বলিতে তিনি একটি সূত্র রচনা করিয়াছেন, যথা,——

যস্যাংমনশ্চক্ষুসোর্নিবন্ধস্তস্যামৃদ্ধি-
র্নেতরদাদ্রিয়েতেত্যেকে। ২০॥

যে কন্যায় বরের মন এবং চক্ষু পরিতৃপ্ত হয়, তাহাকে বিবাহ করিলেই মঙ্গল হয়, লক্ষণাদির আদর করিবার দরকার নাই, কোনও কোনও আচার্য্য একথা বলেন। হরদত্ত লিখিতেছেন "নেতরৎ দত্তাদিগুণদোষাদিকং আদরণীয়ং"—লক্ষণের শেষ কথা পরস্পরের সন্তুষ্টি, যদি তাহাই ঘটিল, তবে উঁচুকপালে দোষ কি? উঁচু কপাল দেখিয়া জামাতা যদি কন্যার প্রতি অনাকৃষ্ট হন এবং কন্যাও যদি জামাতাকে কৃষ্ণ দেখিয়া পছন্দ না করেন, তবেই দোষ। মনোমিলন হইলে বর্ণের বেমিল কতক্ষণ থাকে? এই বিধান পূর্ব্বকালে বিশেষরূপে আদৃত হইত। বর যদি কন্যা দেখিতে চাহেন, তবে তাহা আজ কাল একটু নির্লজ্জতার পরিচায়ক। অনেককে রূপান্তর গ্রহণ করিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে কন্যা দেখিতে যাইতে শুনি। নব্যশিক্ষার প্রসরের সহিত এই রীতি অনেকটা অপসৃত হইতেছে। আপস্তম্ব-বচন হইতে বুঝাযায়, পূর্ব্বে কন্যা দেখিয়াই বরেরা বিবাহ করিতেন। গুণ শ্রবণে মন পরিতৃপ্ত হয় বটে, কিন্তু ঋষি নয়নের পিপাসাটুকুও মিটাইতে অনুমতি দিয়াছেন; এরূপ অমূল্য শাস্ত্রাদেশ লঙ্ঘন করিয়া দেশাচারের প্রাদুর্ভাবে কতজনে যে কত অশ্রুবন্যাবাত সমাজের উপর বহাইয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। হিন্দুর এই দুর্ল্লভরত্ন শাস্ত্রগুলি যদি দেশের দশজনের কার্য্যোপদেশক থাকিত, তবে আর দেশে অত্যাচার, অনাচার ও ব্যভিচারের এত প্রবল স্রোত চলিত না। নামে শাস্ত্র রক্ষা, ব্যবহারে শাস্ত্রের মস্তকে পদাঘাত করাই এদেশের সর্ব্বনাশের মূল। যদি রোরুদ্যমানা কন্যার পরিত্যাগ দেশে প্রচলিত থাকিত, তবে বোধহয় কবির হৃৎপিণ্ড-বিদারী—"কেহবা করিছে বর-মালা দান, মুমূর্ষুর গলে হ'য়ে ম্রিয়মাণ, নয়নে মুছিয়া গলিত বারি" ইত্যাদি বাক্য শুনিতে হইত না। এ নিয়ম এখনও ঘৃণিত, লাঞ্ছিত, পদদলিত, ধূলিধূসরিত। এক কথায়, বিবাহ-প্রস্তাবে এপর্য্যন্ত যে সকল মহামান্য আদেশ বলা হইল, তাহার একটিও এদেশে স্থান পাইতেছে না। বিবাহ সম্বন্ধে গুণাগুণ বিচার শেষ হইল। এখানে এই খণ্ড এবং এই পটলের অবসান, অতঃপর খণ্ডে বিবাহ-প্রক্রিয়া, কন্যার বরণাদি ও অন্যান্য বিষয় বিবৃত হইতেছে।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত।
প্রথম পটল সমাপ্ত।

চতুর্থ খণ্ড।

দ্বিতীয় পটল।

সর্ব্বাগ্রে কন্যার বরণ বিধি বলা হইতেছে। পূর্ব্বে বরণে পরিণীয়া কন্যার কথা বলা হইয়াছে, অধুনা বরণের প্রণালী লেখা আবশ্যক।

সুহৃদঃ সমবেতান্ মন্ত্রবতো বরান্ প্রহিণুয়াৎ। ১ ॥

সুহৃৎসঙ্গত মন্ত্রবান্ বরগণকে কন্যাবরণ করিতে পাঠাইবে। এখানে বর শব্দে যিনি সেই কন্যা বিবাহ করিবেন, তিনি নহেন, যাহারা কন্যা বরণ করিতে যাইবে, তাহাদেরই নাম এখানে বর। হরদত্ত লিখিতেছেন—"বরান্ কন্যা বরয়িতৄন্ প্রহিণুয়াৎ প্রস্থাপয়েৎ যূয়মমুষ্মাৎ কুলাৎ মহ্যং কন্যাং বৃণীধ্বং" অর্থাৎ এই কুল হইতে তোমরা আমার জন্য কন্যাবরণ করিয়া আইস, এই কথা বলিয়া (ব্রাহ্মণ) মন্ত্রবান্ কন্যা-বরয়িতাগণকে পাঠাইবে। সুদর্শনাচার্য্য লিখিয়াছেন, "মন্ত্রবত ইতি ব্রাহ্মণানাং এব গ্রহণং তেন ক্ষত্রিয় বৈশ্যয়োরপি ব্রাহ্মণা বরাঃ।" অর্থাৎ মন্ত্রবান্ এই কথা বলায় ব্রাহ্মণ বরয়িতা পাঠানই নিয়ম। ইহাদ্বারা বুঝাযায়, ক্ষত্রিয় বৈশ্যদিগের বিবাহেও কন্যাবরণ-কার্য্য ব্রাহ্মণের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। এই কন্যা বরণার্থ বর প্রেরণ আমাদিগের বঙ্গীয় সমাজে কথঞ্চিৎ-বিকৃত হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের কন্যাশীর্ব্বাদই এই কন্যাবরণ। ইহা কন্যা-দেখা নহে, পাকা দেখার সঙ্গে কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করা। এই নিয়মে অদ্যাপি পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য জাতিরা ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণেরা কিছু পাইয়াও থাকেন। পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত "পান পত্র" অনেকাংশে এই রীতির (কন্যাবরণের) স্মৃতি-চিহ্ন হইলেও তাহার প্রতিনিধি স্বরূপে ব্যবহৃত। পূর্ব্ব বঙ্গে "পানপত্রে" ব্রাহ্মণ পাঠান নিয়ম নাই, নিজেরাই করা হয়। কন্যাবরণ কন্যার পিত্রালয়ে হওয়া উচিত, আশীর্ব্বাদও কন্যার পিত্রালয়ে (কন্যা যেখানে বাস করে; মাতুলালয়েও হইতে পারে) হইয়া থাকে। কিন্তু "পান পত্র" এ নিয়ম সর্ব্বদাই উল্লঙ্ঘন করে। এই জন্য বলিতেছিলাম "স্মৃতিচিহ্ন" মাত্র হইলেও অন্ততঃ পক্ষে বিকৃত প্রতিনিধি বলিব।

তানাদিতো দ্বাভ্যামভিমন্ত্রয়েত।২॥

সেই কন্যাবরণকারী ব্রাহ্মণকে দুইটী ঋক্‌মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে। মন্ত্র সমাম্নায়ে প্রদর্শিত প্রথম দুইটি ঋক্‌ই অভিমন্ত্রণের মন্ত্র। "অভিবীক্ষ্য মন্ত্রোচ্চারণং অভিমন্ত্রণং" হরদত্ত এইরূপ অভিমন্ত্রণের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হরদত্ত আরও বলিয়াছেন, এই অভিমন্ত্রণান্তর কন্যাকুলে গমন করিয়া ব্রাহ্মণগণ কন্যার পিতাকে বলিবে, অমুক গোত্রের অমুককে তোমার কন্যা সম্প্রদান করিবে কি? তিনি বলিবেন, আচ্ছা ভাল কথা দিব। তাহার পর বিবাহের দিন স্থির হইবে। ইহা হইতে বুঝা গেল, পান-পত্র ও কন্যাশীর্ব্বাদ, দুইটিই কন্যাবরণের প্রতিনিধি, তবে নিকট এবং অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী, এই টুকুই পার্থক্য।

স্বয়ং দৃষ্ট্বা তৃতীয়াং জপেৎ। ৩ ॥

বর স্বয়ং কন্যাকে দর্শন করিয়া মন্ত্রসমাম্নায়ে পঠিত তৃতীয় ঋক্ পাঠ করিবে। এই দর্শন কখন কর্ত্তব্য, তাহার বিবরণ সূত্রে

কিছুই নাই। বৃত্তিকার মহাশয়দিগের অনুগ্রহে উহা আমরা অবগত হইতে পারি। করদত্ত বলেন, এই কন্যার সহিত এই পাত্রের বিবাহ অমুক দিনে দেওয়া হইবে, বর-কন্যা উভয় পক্ষ হইতেই এরূপ নিশ্চয় করা হইলে পর, যখন সেই বিবাহের অবধারিত দিন আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন (পূর্ব্বের দিনে বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করিতে হইবে) ব্রাহ্মণ-ভোজন, আশীর্ব্বচনাদি কার্য্য সম্পাদনান্তে বর বিবাহার্থ বধূকুলে অর্থাৎ কন্যার পিতৃভবনে গমন করিবেন। মধুপর্কাদি দ্বারা বরের অর্চ্চনা সম্পাদন পূর্ব্বক "এই কন্যাকে পুত্র-জননাদি কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য তোমাকে অর্পণ করিলাম" বলিয়া কন্যা সম্প্রদান করিবেন। তাহার পর বর কন্যাকে গ্রহণ করিয়া স্বয়ং কন্যাকে দর্শন করিয়াই তৃতীয়া (অবঘ্নীমিত্যাদি) ঋক্‌টী পাঠ করিবেন।

চতুর্থ্যা সমীক্ষেত। ৪॥

চতুর্থী ঋক্ পাঠ করিয়া সমীক্ষণ অর্থাৎ সন্দর্শন করিবে। বর কন্যাকেই স্বয়ং ইতি পূর্ব্বে দর্শন করিয়া তৃতীয়া ঋক্ পাঠ করিয়াছেন, তখনও বধূ বরকে দর্শন করে নাই। চারিচক্ষু-সম্মিলন তখনও ঘটে নাই। এই সমীক্ষণই শুভ দৃষ্টি। পরস্পরের অবলোকন, সুদর্শনাচার্য্য বলিতেছেন "বধ্বা দৃষ্টৌ স্বদৃষ্টিং নিপাতয়েৎ।" অর্থাৎ "সমীক্ষেত" শব্দে বধূর দৃষ্টিতে নিজের দৃষ্টিপাত। "স্বয়ং" শব্দ তৃতীয় সূত্রে ব্যবহৃত হইবার উদ্দেশ্য এই যে, সেখানে বরের দেখা, এখানে বধূ-বরের দেখাদেখি। সুদর্শনের নিকট আমরা আরও শুনিতে পাই, কুশাসনে বর ও বধূ এই সময়ে উপদেশন করিয়া কুশ ধারণ পূর্ব্বক প্রাণায়াম-পরায়ণ হইয়া মনে মনে চিন্তা করিবে যে, আমাদিগের দুই জনে মিলিত হইয়া সংসারের যাবতীয় কর্ত্তব্য কার্য্য নিষ্পাদন এবং প্রজা অর্থাৎ সন্তানোৎপাদনাদি করিতে হইবে। কোনও কোনও আচার্য্য নাকি এইরূপ অভিমতও প্রকাশ করেন। ব্যবহার এখানে বিশেষ কিছুরই প্রামাণ্য বুঝাইতেছে না। সুদর্শন মহাশয় মতের আবিষ্কর্ত্তার নামটীও প্রকাশ করেন নাই।

অঙ্গুষ্ঠেনোপমধ্যময়া চাঙ্গুল্যাদর্ভং সংগৃহ্য উত্তরেণ যজুষা তস্যা ভ্রুবোরন্তরং সংমৃজ্য প্রতীচীনং নিরস্যেৎ। ৫॥

অঙ্গুষ্ঠ এবং উপমধ্যমা অঙ্গুলিদ্বারা কুশ গ্রহণ করিয়া বর উত্তর অর্থাৎ পূর্ব্বব্যবহৃত মন্ত্রের পরবর্ত্তী "ইদমিদং" ইত্যাদি যজুর্মন্ত্র দ্বারা বধূর ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে মার্জ্জিত করিয়া ঐ কুশাকে প্রত্যগ্‌ভাবে শিরোদেশের উপরে পরিত্যাগ করিবে। উপমধ্যমা অনামিকা অঙ্গুলীর নাম। "মধ্যমাসমীপে বর্ত্তিতে ইত্যুপমধ্যমা।" মধ্যমার নিকটে থাকে বলিয়াই ইহার নাম উপমধ্যমা। তর্জ্জনীও মধ্যমার সন্নিকটেই আছে, তাহাকে কিজন্য উপমধ্যমা বলি না? এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, বৃত্তিকার মহোদয় বলিতেছেন, "অনামিকেত্যুপদেশঃ"—তাঁহার উপদেশ অগ্রাহ্য করিলে গৃহ্যসূত্রের তাৎপর্য্য অনেকস্থলেই অগ্রাহ্য হইয়া উঠে, অতএব ব্যবহার দর্শনেই তিনি ঐরূপ উপদেশ প্রচার করিয়াছেন, মনে করিতে পারি।

প্রাপ্তে নিমিত্তে উত্তরাং জপেৎ। ৬

রোদনাদি নিমিত্ত প্রাপ্ত হইলে, উত্তরা

ঋক্ পাঠ করিতে হইবে। সেই ঋক্ "জীবাং রুদন্তি" ইত্যাদি। যদি বধূ অথবা বধূর কোনও আত্মীয় স্বজন কোনও কারণে রোদন করেন, তাহা হইলে এই ব্যাপারে রোদন নিমিত্ত ঋক্ পাঠের ব্যবস্থা। সাধারণতঃ রোদনে নহে, তাৎকালিক রোদনে। সূত্রে আছে "প্রাপ্তেনিমিত্তে" অর্থাৎ নিমিত্ত প্রাপ্ত হইলে। ব্যাখ্যায় বলিতে হইতেছে "রোদনাদি নিমিত্ত।" এখানে নিমিত্ত শব্দে রোদন বুঝিবার কারণ কি? এরূপ প্রশ্ন অনুসন্ধিৎসু প্রাণে উদিত হইতে পারে। তজ্জন্য আমাদিগকে কয়েকটি কথা বলিতে হইতেছে। মহর্ষি জৈমিনিপ্রমুখ বেদার্থ-নির্ণায়ক মহাজনগণ "অঙ্গাঙ্গীভাব" অর্থাৎ কে কাহার অঙ্গ, ইহা বুঝিবার জন্য শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান, সমাখ্যা, এই ছয়টি প্রমাণ বলিয়াছেন। ঋক্ একটী মন্ত্র, মন্ত্র কার্য্যের অঙ্গ। কার্য্যোদ্দেশেই মন্ত্র পঠন। এখন বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক "জীবাং রুদন্তি" ইত্যাদি মন্ত্রটী কোন্ কার্য্যের অঙ্গ—অর্থাৎ কোন্ কার্য্যে পঠিত হইবে। লিঙ্গ নামক প্রমাণ বলে, তাহা রোদন নিমিত্তেই ব্যবহৃত হইবে। "লিঙ্গং শব্দসামর্থ্যং" শব্দের সামর্থ্যকে লিঙ্গ বলে। যে শব্দের যে পদার্থ বুঝাইবার ক্ষমতা আছে, সেই কার্য্যে সেই শব্দযুক্ত মন্ত্রের ব্যবহার হইলে, তাহাকে লিঙ্গ-প্রমাণে অঙ্গাঙ্গীভাবে প্রয়োগ হওয়া বলা-যায়। আমরা এই মন্ত্রে "রুদন্তি" শব্দের দ্বারা রোদন বুঝিয়াছি। অতএব এখানে নিমিত্ত রোদনই হওয়া উচিত। মীমাংসা-শাস্ত্রে প্রবেশ না থাকিলে একথাগুলি তাদৃশ হৃদয়ঙ্গম হইবে না। পাঠকমহোদয়বর্গের অবগতির জন্য আভাস মাত্র প্রদর্শিত হইল। শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য ইত্যাদির প্রামাণ্য এবং এইগুলির দ্বারা কিরূপে অঙ্গাঙ্গীভাব-সিদ্ধি হয়, তাহা মীমাংসাদর্শনে যথাসময়ে হিন্দু-পত্রিকায় পাঠক দেখিতে ও জানিতে পারিবেন। অধুনা আমরা তাঁহাদের জন্য আভাস ও আশ্বাস ভিন্ন অন্য কিছুই দিতে পারিলাম না। আশাকরি, পাঠকগণ সহিষ্ণুতার পরিচয় দিবেন।

যুগ্মান্ সমবেতান্ মন্ত্রবত উত্তরয়া-হদ্ভ্যঃ প্রহিণুয়াৎ। ৭

সমবেত মন্ত্রবান্ যুগ্ম তৎপরবর্ত্তিঋক্ মন্ত্রদ্বারা জলাহরণের জন্য প্রেরণ করিবে। উত্তরা ঋক্ "ব্যাকংকুরঃ" ইত্যাদি ঋক্। এখানে মন্ত্রবান্ পাঠাইবার উদ্দেশ্য বধূর স্নানার্থ জলাহরণ। ইহাদের দ্বারা আনীত জলের দ্বারা যে বধূর স্নান সম্পাদিত হইবে, তাহাতে সূত্রের সম্মতি আছে; ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতেছে।

উত্তরেণ যজুষা তস্যাঃ শিরসি দর্ভেণ্ডুং নিধায় তস্মিন্নুত্তরয়া দক্ষিণং যুগচ্ছিদ্রং প্রতিষ্ঠাপ্য ছিদ্রে সুবর্ণং উত্তরয়াহন্তর্দ্ধায় উত্তরাভিঃ পঞ্চভিঃ স্নাপয়িত্বা উত্তরয়া হতেন বাসসাচ্ছাদ্য উত্তরয়া যোক্ত্রেণ সংনহ্যতি৮

তদনন্তর তাঁহাদের দ্বারা জল আনীত হইলে, বধূর শিরোদেশে দর্ভ অর্থাৎ কুশদ্বারা পরিকল্পিত মণ্ডল "অর্ঘ্যম্নো অগ্নিং" ইত্যাদি যজুর্ম্মন্ত্রদ্বারা স্থাপন করিয়া তাহার দক্ষিণ যুগচ্ছিদ্রের বাহ্যছিদ্রটী স্থাপন

করিয়া (যেনস ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা) সেই ছিদ্রে "শংতে হিরণ্যং" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা সুবর্ণ দিয়া ঐ ছিদ্র ঢাকিয়া দিয়া (জল নির্গত হইতে পারে, এরূপ ভাবে ঢাকা আবশ্যক, নচেৎ ছিদ্র একেবারে ঢাকিয়া গেলে, জল না পড়িলে স্নান করানই হইতে পারিবে না) সেই পূর্ব্বোক্ত আনীত জলদ্বারা 'হিরণ্য বর্ণা' ইত্যাদি পাঁচটী মন্ত্রদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পাঁচবার স্নান করাইবে। (কেহ কেহ বলেন, পাঁচ মন্ত্রের পাঠান্তে স্নান একবারই করিতে হইবে।) অতঃপর সেই স্নাতা বধূকে "পবিত্রা বিরোগোহির" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা আহত অর্থাৎ অখণ্ড বস্ত্র স্বয়ং বর পরাইয়া দিবেন। (স্বয়মেব মন্ত্রমুক্তা পরিধাপয়তি ইতি বৃত্তিকারঃ) তাহার পর (আচমন করাইয়া) "আশাসানা সৌমনসং" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা যোক্ত্র (সাধনবিশেষ) স্পর্শ করাইবে। দর্ভেস্ব শব্দে কুশরচিত ইস্ব অর্থাৎ মণ্ডলাকার বস্তুবিশেষ। (দর্ভৈঃ পরিকল্পিতমিস্বং পরিমণ্ডলাকারমিত্যর্থঃ) প্রয়োগে অবগত হওয়া যায় "ইস্বং নাম কুম্ভ ধারণার্থং তৃণপুঞ্জং" তৃণরচিতমণ্ডল অথবা তৃণপুঞ্জ, যাহাই হউক, ফলতঃ এই স্নানকার্য্যে ইস্বের আবশ্যকতা। তৃণমণ্ডল মস্তকের উপর স্থাপিত হইবে এবং তৃণপুঞ্জ হইলে কুম্ভ ধারণে ব্যবহৃত হইবে। ঋষির কথায় মস্তকে স্থাপিত সচ্ছিদ্র কুশ-রচিত মণ্ডলকেই ইস্ব বলিবার ইঙ্গিত আছে। অনন্তর কি করিতে হইবে, তাহা কথিত হইতেছে,——

অথৈনাং উত্তরয়া দক্ষিণে হস্তে গৃহীত্বাগ্নিমভ্যানীয়াপরেণ অগ্নিমুদগগ্রং কটমাস্তীর্য্য তস্মিন্নুপবিশতঃ উত্তরোবরঃ।৯

তাহার পর এই বধূকে "পূষাত্বেত" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা দক্ষিণহস্তে ধারণপূর্ব্বক অগ্নির অভিমুখে আনয়ন করিবে, অগ্নির অপর দিকে উত্তরাগ্র একটী কট (মাদুর) আস্তৃত করিয়া (বিছাইয়া) বর এবং বধূ তাহাতে যুগপৎ উপবেশন করিবে। বর উত্তরদিকে, বধূ দক্ষিণ দিকে বসিবে। "উত্তরা" এই শব্দদ্বারা অবগত "পূষাত্বেত" এই মন্ত্রটী আনয়নেই প্রযুক্ত, হস্ত ধারণে নহে। হস্তধারণ মন্ত্রবিহীন। হরদত্ত লিখিয়াছেন "হস্তগ্রহণং তূষ্ণীমেব" অর্থাৎ হাত ধরাটা নীরবে (চুপ করিয়া) করিতে হইবে। বর-বধূর উপবেশন সম সময়ে সম্পাদিত হওয়া উচিত, একথা সূত্রে নাই। সুদর্শনাচার্য্য বলেন, "যুগপদুপবিশতঃ যথোত্তরো বরঃ দক্ষিণাচ বধূঃ।" বর উত্তর দিকে অর্থাৎ বধূর উত্তরদিকে বসিবে, তাৎপর্য্যাধীন বধূ বরের দক্ষিণেই বসিল। অর্থাৎ সিদ্ধ হয় বলিয়া বধূর দক্ষিণে উপবেশন আচার্য্য মহর্ষি মহোদয় সূত্র সন্নিবিষ্ট করেন নাই। বর-বধূপবেশনেই আমাদের এসংখ্যার গৃহ্যসূত্রের বিশ্রাম। (ক্রমশঃ—)

কস্যচিৎ ব্রহ্মচারিণঃ—

সদাচার—শৌচবিধি।

সদাচার সম্বন্ধে কিছু বলা বোধ হয় অসাময়িক হইবে না, কারণ কদাচার আজ কাল সর্ব্বদাই দেখিতে হইতেছে উচ্ছৃঙ্খলার

কারণ থাকিলে বস্তুর প্রকাশ সহজেই হইয়া পড়ে। সদাচারই ধর্ম্মের মূল। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন।—

শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং সম্যঙ্ নিবদ্ধং-
স্বেষু কর্ম্মসু।
ধর্ম্মমূলং নিষেবেত সদাচার-
মতন্দ্রিতঃ॥

অর্থাৎ বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রসম্মত, ধর্ম্মের কারণ, অধ্যয়নাদি স্বস্ব কর্ম্মের অঙ্গ যে সদাচার, তাহা আলস্যশূন্য হইয়া একান্ত যত্নে সেবা করিবে। ঋষিরা যখন মহর্ষি ভৃগুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাহ্মণেরা স্বধর্ম্ম পালন করিয়াও কেন অকালে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়েন?

ভৃগু উত্তর দিলেন,—

অনভ্যাসেন বেদনামাচারস্য চ
বর্জ্জনাৎ।
আলস্যাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্বিপ্রান্
জিঘাংসতি॥

অর্থাৎ বেদ অভ্যাস না করায়, সদাচার পরিত্যাগ করায়, সামর্থ্য থাকিলেও অবশ্য কর্ত্তব্য না করায় অভোজ্য অন্নাদি ভোজন করায় মৃত্যু ব্রাহ্মণদিগকে হিংসা করিয়া থাকেন। সদাচার কাহাকে বলা যায়?

সাধবঃ ক্ষীণ দোষাশ্চ সচ্ছব্দঃ
সাধু বাচকঃ।
তেষামাচরণং যত্তু সদাচারঃ স
উচ্যতে॥

(শঙ্করকৃত বামনপুরাণ।)

অর্থাৎ নির্দ্দোষ সাধুরা যে আচার পালন করেন, তাহা সদাচার বলিয়া কথিত হয়। কিংবা যে আচার পালন করিলে সৎ হওয়া যায়, তাহাকে সদাচার বলা যাইতে পারে।

এখন এক আপত্তি হইতে পারে যে, এক এক দেশের সাধুরা এক এক প্রকারে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন দেখিতে পাওয়া যায়, তবে কাহার নিয়ম পালন করিয়া চলিব? আর্য্যশাস্ত্র যখন সকল বিধির উৎপত্তি-স্থান, তখন যে সাধু, যে স্থানে যে আচার অনুষ্ঠান করুন না কেন, সকলই শাস্ত্রসম্মত, সকলেরই উদ্দেশ্য এক—অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি। সকল শাস্ত্রেরই সামঞ্জস্য আছে, বিজ্ঞেরা তাহা অনুভব করিয়া থাকেন। তথাপি দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে আচারের কিছু পার্থক্য সম্ভব এবং অজ্ঞদিগের সুবিধার জন্যই সর্ব্বজ্ঞ মনু ব্যবস্থা করিয়াছেন—

যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ
পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গস্তেন
গচ্ছন্নরিষ্যতে॥

অর্থাৎ শাস্ত্রের নানা প্রকার শাসন থাকিলেও, যে শাস্ত্রার্থ পিতৃপিতামহাদি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; সেই সৎপথ; সে পথে গমন করিলে কোন মতে তাহাকে অধর্ম্মে আক্রমণ করিতে পারিবে না।

সদাচারের কি অসাধারণ প্রভাব! শাস্ত্র বলেন,—

আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।
আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারো হন্ত্য-লক্ষণম্ ॥ (মনু।)

অর্থাৎ সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তি বেদোক্ত আয়ু (শত বর্ষ), অভিমত পুত্র-পৌত্রাদি প্রজা ও অক্ষয় ধন প্রাপ্ত হন; এমন কি, শরীরে অশুভ ফল সূচক অলক্ষণ থাকিলেও তাহা নিষ্ফল হইয়া যায়। আচার সকল অলক্ষণই নষ্ট করে।

পুনশ্চ——

সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি যঃ সদাচার-বান্নরঃ।
শ্রদ্দধানোঽনসূয়শ্চ শতং বর্ষাণি জীবতি ॥

অর্থাৎ যে পুরুষ সদাচারসম্পন্ন, বেদে শ্রদ্ধান্বিত ও পরের দোষ কীর্ত্তন করেন না, তিনি সর্ব্বপ্রকার শারীরিক ও মানসিক শুভলক্ষণহীন হইলেও শত বর্ষ জীবিত থাকেন।

ইহাতে দেখা যাইতেছে, এক সদাচার পালনেই বাঞ্ছিত সমস্ত ঐহিক বস্তু লাভ হয়। অতএব ধর্ম্ম-পিপাসুর ত কথাই নাই, ইহসর্ব্বস্ব নাস্তিকও সর্ব্বদা সদাচারী হইলে অশেষ কল্যাণ লাভ করিতে পারে। "সদাচার" বলিতে অনেক কার্য্যের অনুষ্ঠান বুঝায়। আমাদের জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিকাদি সমস্ত কার্য্যের বিধি পূর্ব্বক অনুষ্ঠানের নাম সদাচার। অশাস্ত্রীয় ও স্বেচ্ছামত কার্য্যে কোন ফল হয় না। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃয্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥

যুদ্ধ-বিদ্যালয়ে আহার-বিহার—এমন কি, প্রতি পদক্ষেপটি পর্য্যন্ত গুরু-বাক্য ও শাস্ত্রসম্মত হওয়ার কঠিন বিধি আছে। তদপেক্ষা অত্যধিক গুরুতর—এমন কি—গুরুতম জীবন-সংগ্রামে শিক্ষালাভ করিতে হইলে কি কোন নিয়ম পালনের আবশ্যকতা নাই?

শয্যা হইতে উঠিয়া প্রথম কার্য্য শৌচ। অতএব প্রথমে আমরা শৌচ-বিধির আলোচনা করিব। এক কথায় বলিতে, অশুচি ব্যক্তি সদাচারী নহে। তজ্জন্য উপনয়নের পরই আচার্য্য শিষ্যকে প্রথমে শৌচ শিক্ষা দিবেন।

উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং শিক্ষয়েচ্ছৌ-চমাদিতঃ।
আচারমগ্নিকার্য্যঞ্চ সন্ধ্যোপাসন-মেবচ ॥ (মনু)

অর্থাৎ গুরু শিষ্যের উপনয়ন দিয়া, প্রথমতঃ তাহাকে আদ্যোপান্ত শৌচ শিক্ষা দিবেন, পরে স্নান, আচমন ও সন্ধ্যাবন্দনাদি এবং সায়ং প্রাতঃ হোমের অনুষ্ঠান কিরূপে করিতে হয়, তাহার উপদেশ দিবেন; কারণ—

শৌচাচারবিহীনস্য সমস্তাঃ নিষ্ফলাঃ ক্রিয়াঃ।

অর্থাৎ যাহার শৌচাচার নাই, তাহার

সন্ধ্যাবন্দনাদি—পূজাদি সমস্ত কার্য্যই বিফল হয়। শ্রীলক্ষ্মীদেবীও বলিয়াছেন—

ত্যাগং সত্যঞ্চ শৌচঞ্চ ত্রয় এতে মহাগুণাঃ।
যঃ প্রাপ্নোতি গুণানেতান্ শ্রদ্ধাবান্ স চ মে প্রিয়ঃ॥

(স্কন্দপুরাণীয় লক্ষ্মীচরিত)

অর্থাৎ দান, সত্যপালন ও শৌচ, এই তিনটি মহাগুণ। যে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির এই তিনটি গুণ আছে, সেই আমার প্রিয়।

শৌচ দ্বিবিধ, অন্তঃশৌচ এবং বহিঃশৌচ। অন্তঃশৌচ অর্থে ভাবশুদ্ধি, অর্থাৎ মনকে কাম-ক্রোধাদি হইতে দোষশূন্য করিয়া নির্ম্মল করণ। বাহ্যশৌচ বলিলে মস্তকের কেশাগ্র হইতে পদের নখাগ্র পর্য্যন্ত শরীরের শুদ্ধি বুঝিতে হইবে। আর্য শাস্ত্রের বিহিত সকল কার্য্যেই প্রথমে স্থূলের অনুষ্ঠান, পরে তদ্দ্বারা ক্রমে সূক্ষ্মে উপস্থিত হওয়া যায়।

প্রথমে বাহ্যশৌচ আবশ্যক। প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া প্রথম কার্য্য মল-মূত্র ত্যাগ। পূর্ব্বকালে বোধ হয় সকলেই মাঠে মল ত্যাগ করিতেন এবং এখনও নগর ভিন্ন প্রায় সকল গ্রামের লোকেই ঐরূপ করিয়া থাকেন। সকল নগরেই এখন পায়খানা'র ব্যবস্থা হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই সে গুলি এক প্রকারের নরক বলিলে হয়। অতএব পায়খানায় যাইয়া ভাল করিয়া শুচি হওয়া একান্ত আবশ্যক। শৌচের নিয়ম যথা——

উত্থায় পশ্চিমে রাত্রে তত আচম্য চোদকং।
অন্তর্দ্ধায় তৃণৈর্ভূমিং শিরঃ প্রাবৃত্য বাসসা॥
বাচং নিয়ম্য যত্নেন ষ্ঠীবনোচ্ছ্বাসবর্জ্জিতঃ।
কুর্য্যান্মূত্রে পুরীষন্তু শুচৌ দেশে সমাহিতঃ॥

(আহ্নিকতত্ত্ব)

অর্থাৎ শেষ রাত্রিতে শয্যা হইতে উঠিয়া, মুখ ধুইয়া, ঘাসের দ্বারা স্থান পরিষ্কার করিয়া, মস্তক কাপড়ের দ্বারা আবৃত করিয়া, কথা বন্ধ করিয়া, থুথু ফেলা, হাঁইতোলা প্রভৃতি দীর্ঘশ্বাসের কার্য্য না করিয়া, শুচিস্থানে মল মূত্র ত্যাগ করিবে।

তৎপরে ধৌতি কার্য্য করিবে। তাহার নিয়ম যথা——

একা লিঙ্গে গুদে তিস্র স্তথা বামকরে দশ।
উভয়োঃ সপ্ত দাতব্যা মৃদঃ শুদ্ধিমভীপ্সতা॥ (মনু।)

অর্থাৎ বিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া, লিঙ্গে একবার, গুহ্যে তিনবার, বাম করে দশ বার, উভয় হস্তে সাতবার মৃত্তিকা এবং জল প্রদান করিবে। এই শ্লোকের টীকাতে কুল্লুক ভট্ট বলিয়াছেন, যদি উপরি সংখ্যক মৃত্তিকা লেপনে দুর্গন্ধ দূর না হয়, তবে অধিক সংখ্যায় লেপন করিবে। আবার যদি অল্প সংখ্যক ধৌতিতে

গন্ধ দূর হয়, তাহা হইলেও শ্লোকোক্ত সংখ্যা মত ধৌতি করিতে হইবে। তাহার কারণ আছে। কোন কোন সময় দেখা যায়, দুই তিনবার হস্ত ধৌত করিলেই হয়ত গন্ধ তখনই দূর হয় বটে, কিন্তু হস্ত শুষ্ক হইলে আবার দুর্গন্ধ অনুভূত হয়।

পদতলেও তিনবার মৃদ্বারি দিতে হইবে, যথা——

তিস্রস্তু পাদয়োর্দেয়া শুদ্ধিকামেন নিত্যশঃ॥ (আহ্নিকতত্ত্ব।)

কারণ——

মেধ্যং পবিত্রমায়ুষ্যমলক্ষ্মী-
কলিনাশনং।
পাদয়ো র্মলমার্গানাং শৌচাধান-
মভীক্ষ্ণশঃ॥

(শব্দকল্পদ্রুমধৃত রাজবল্লভ বচন।)

অর্থাৎ পদদ্বয় ও মলনির্গমনের পথ সকল বারম্বার ধৌত করিলে মেধা ও আয়ু বৃদ্ধি হয়, শরীর শুদ্ধ হয় এবং অলক্ষ্মী ও কলির প্রভাব নষ্ট হয়।

দেখা যাইতেছে, ঋষিরা মল-মূত্র ত্যাগের বড় দৃঢ় নিয়ম করিয়া গিয়াছেন। তাহার কারণ কি, একবার বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

ভাবিয়া দেখুন, পায়খানার ভিতরটা কি? মল-মূত্রের সূক্ষ্ম রেণুতে পরিপূর্ণ বাতাস। কেহ তাহার মধ্যে যাইলে, সেই বাতাসে ডুবিয়া গেল। সর্ব্বাঙ্গে সেই সকল রেণু মাখা ত হইল, উপরন্তু চক্ষু, কর্ণ, নাসা, মুখ প্রভৃতি দ্বার দিয়া সেই সকল ত্যক্ত বিষবৎ পদার্থ পুনরায় শরীরে প্রবেশ করিতে লাগিল; ইহাতে নিশ্চয়ই শরীর অসুস্থ হইবার সম্ভাবনা; অতএব যতদূর সম্ভব, সেই সকল রেণু যাহাতে চর্ম্মে না লাগে এবং দ্বার সকল দিয়া শরীর মধ্যে না যায়, তাহা করা উচিত। ঋষিরা সেই ব্যবস্থাই করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল অপবিত্র রেণু সকল ধূলি-কণার ন্যায় কেশে ও খরস্পর্শ বস্তুতে অধিক লাগিয়া যায় এবং বায়ু-মিশ্রিত বলিয়া শূন্যস্থান পাইলেই তাহাতে প্রবেশ করে। এখন দেখুন, মাথায় ও সর্ব্বাঙ্গে, বিশেষতঃ প্রত্যেক দ্বারের চতুর্দ্দিকে ও সম্মুখে কত কেশ আছে। প্রতি কেশের চারিদিকে শূন্য স্থান আছে। তাহা হইলে, পায়খানায় যাইলে, কত অপবিত্র রেণু আমাদের সর্ব্বাঙ্গে লাগিয়া গেল! বাস্তবিক ভাবিলে আতঙ্ক হয় এবং কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকি, তাহাই আশ্চর্য্য বোধ হয়। কারণ যে পায়খানায় অধিক লোক যায়, সেখানে মল-মূত্রের সহিত কত প্রকার রোগের বীজ প্রত্যহ নিক্ষিপ্ত হইতেছে, তাহার সীমা নাই। সেই সকল বীজ রেণু আকারে পায়খানার বাতাসে সর্ব্বদা মিশ্রিত হইতেছে। অতএব সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে, সেই সকল রেণু যাহাতে কেশে ও চর্ম্মে না লাগে এবং দ্বার সকল দিয়া শরীরে প্রবেশ না করে, স্বাস্থ্যার্থে তাহাই নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং সর্ব্ব প্রযত্নে তদ্বিধান আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। অতীন্দ্রিয় জ্ঞানী, সর্ব্বলোকহিতকারী ঋষিরা

স্থূলদর্শীদিগের জন্য তদনুরূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ব্যবস্থা করিয়াছেন, কাপড় দিয়া মস্তক বেষ্টন করিবে,' এমন কি, অবগুণ্ঠন করিবে। ইহাতে দূষিত রেণু সমূহ লগ্ন হইবার প্রধান স্থান মস্তকের কেশ ও উপরিস্থ ইন্দ্রিয়-দ্বার-গুলি বন্ধ হইল। আবার বলিয়াছেন, কথা কহিবেনা এবং থুথু কিংবা দীর্ঘশ্বাস ফেলিবে না। বুকের মধ্যে বাতাস শূন্য হইলেই তাহা পূরণের জন্য তৎক্ষণাৎ তথায় বেগে বায়ু প্রবেশ করে। কথা বলা, থুথু ফেলা, হাই তোলা, হাঁচি প্রভৃতি সকল কার্য্যেই বেগে শ্বাস বহির্গত হইয়া যায়; সুতরাং পূরণের জন্য মুখ ও নাসিকা দিয়া বেগে বায়ু বক্ষ মধ্যে প্রবেশ করে। এখন পায়খানায় কথা কহিলে বা থুথু ফেলিলে, কত মল-কণা মুখ ও নাসা দিয়া শরীরে প্রবেশ করে, একবার চিন্তা করুন। বাস্তবিক তাহাতে বিষ্ঠা ভোজনই হইল! তবে ধার সকলের মুখে কেশ থাকাতে, অনেক কণা তাহাতে বাধিয়া যায় এবং শীঘ্র ভিতরে যাইতে পারেনা। এই জন্য মল-ত্যাগ কালে কাপড় দিয়া মাথা, কাণ ঢাকিয়া, মুখ ও নাসিকার সম্মুখে তিন চারি পুরু কাপড় হাত দিয়া ধারণ করা উচিত এবং বাহিরে আসিয়া হস্তপদে মৃদ্বারি লেপনের পর মুখমণ্ডল উত্তম করিয়া শীতল জল দ্বারা ধৌত ও বারম্বার কুলি করিতে হইবে।

আমার বোধ হইতেছে, যেন কলেজের কোন নব্য যুবা উৎসাহ পূর্ব্বক বলিতেছেন, "জুতা, মোজা, জামা পরিয়া পায়খানায় যাওয়া ভাল"। আমি বলি, বিচার করিয়া দেখ, তাহা ভাল নহে। প্রতিবার পায়খানা হইতে আসিয়া সমস্ত পোষাক ধৌত করিতে হইবে, অর্থাৎ পায়খানায় যাওয়ার জন্য এক প্রস্থ পোষাক আবশ্যক। বাড়ীর সমস্ত লোকের ঐ রূপ এক এক প্রস্থ করিয়া পোষাক রাখা বড় সামান্য কথা নহে। পোষাক আবার শীঘ্র শুষ্ক হয় না, বর্ষাকালে হয়ত সমস্ত দিনেও শুষ্ক না হইতে পারে। অতএব পায়খানার জন্য ২।৩ প্রস্থ স্বতন্ত্র পোষাক প্রত্যেকের রাখা আবশ্যক হইয়া পড়ে। আর তাহা রাখিলেই বা লাভ কি? যে গুহ্য স্থান সকলে মৃত্তিকা ও বারি লেপন আবশ্যক, পোষাকে তাহার নিবারণ হইতেছে না, কেবল পদতলের ৩ বার ধৌতিটা বাঁচিতেছে। এখন বিচার করিয়া দেখা যায়, বিনা পয়সায় তিনবার জল মাটি দিয়া ধৌত করা ভাল, কি ২।৩ প্রস্থ পোষাক রাখা ভাল? আর সাধারণ লোকে (দরিদ্রের ত কথাই নাই) কি সেই পোষাক প্রত্যেকে রাখিতে সমর্থ? আর্য্যশাস্ত্রোক্ত সকল কার্য্যেই দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে যতদূর সম্ভব, অভাব দূর হয় ও পরের অধীন না হইতে হয়, তাহা করা। তাহা হইলে, আত্মচিন্তনের অবসর পাওয়া যায় ও সুখ লাভ হয়। পোষাক করিয়া কত অভাব বৃদ্ধি করিতে হয় ও পরের অধীন হইতে হয়, একবার ভাব দেখি। বরং তাহাতে সেই পরিমাণ তোমার দুঃখ ও অশান্তিরই বৃদ্ধি হইল। যদি পোষাক ধৌত না কর, তবে পায়খানার যত মল-রেণু ঘরে আনিলে এবং

সকল পোষাক একত্র হইলে, ক্রমে বাসের ঘর পায়খানা হইল! আজ কাল দেশ-ব্যাপী অস্বাস্থ্যতার ইহা একটী প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়।

দুর্গন্ধ নিবারণ ও মল-মূত্রের কথা সর্ব্বদা ধৌত করা কত উপকারী, সুতরাং আবশ্যক, তাহা বোম্বাই ও কলিকাতার প্লেগ রোগেতে গভর্ণমেণ্ট যে ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে উত্তম বুঝিতে পারা-গিয়াছে। বাড়ীর সমস্ত নর্দ্দামা ও পায়খানা সর্ব্বদা চূণ, আলকাতরা, রসকর্পূর প্রভৃতি গন্ধ ও রোগবীজ নাশক দ্রব্য দ্বারা ধৌত করার আজ্ঞা হইয়াছিল। আমাদের এই বিকারযুক্ত শরীর ইইতে ৯।১০ টি দ্বার দিয়া অনবরত মলক্ষরণ হইতেছে। অতএব স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তি শুচি থাকিয়া এই শরীর সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিতে চেষ্টা করিবেন।

আমাদের অদৃষ্টগুণে ইদানীং ভারতবর্ষে নানা প্রকার রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। ডেঙ্গু, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হুপিংকাশি, প্লেগ, এই সকল বিদেশীয় রোগ জাহাজ করিয়া এই দেশে আসিয়াছে। জাহাজে যাতায়াত অনেকদিন হইতে হইয়াছে, কিন্তু রোগের আগমন এতদিন তত ছিল না। প্লেগ ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপ পর্য্যন্ত নানা স্থানে দেখাগিয়াছে; সকল স্থানেই অল্প মাত্রায় হইয়াই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহা বোম্বাইকে যেমন ছারখার ও কলিকাতাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল, এমন আর কুত্রাপি হয় নাই। আমার বোধ হয়, আমাদের শরীর রোগের বীজ অঙ্কুরিত হইবার উপযুক্ত জমি হইয়াছে, নতুবা ভারতবর্ষে রোগ আসিলেই থাকিয়া যাইতেছে কেন? উপযুক্ত সরস ভূমি পাইলেই বীজের তলায় অঙ্কুর হয়। অনেকে জানেন যে, বাতাসে নানা প্রকার পীড়ার বীজ সর্ব্বদা বেড়াইতেছে, অনুকূল শরীর পাইলেই তাহাকে আশ্রয় করে। শৌচাচার-বিহীন হইয়া আমাদের শরীর দিন দিন পীড়ার উত্তম আবাস স্থান হইতেছে। কারণ তাহাতে সত্ত্বগুণের হ্রাস করিয়া তমোগুণের বৃদ্ধি করিতেছে। তমোরূপী শ্লেষ্মা শরীরকে সরস করিয়া রোগ-বীজের পোষণ ও অঙ্কুর জন্মাইতেছে। শাস্ত্রীয় শৌচ দেশ হইতে এক প্রকার উঠিয়াগিয়াছে। অসংযমী উদরসর্ব্বস্ব হওয়ায়, এখন পায়খানার সহিত অনেকবার সাক্ষাৎ করিতে হয়। কতবার বিধিরক্ষা করিবে? এখন সকলেই এক প্রকার রোগী বলিলেই হয়। "আতুরে নিয়মো নাস্তি"। বিধি সকল সুস্থ ব্যক্তির জন্য এবং তাহা রক্ষা করিতে হইলে সকল বিষয়ে সংযম আবশ্যক।

কেবল শীতল জল একটী উত্তম দুর্গন্ধ-নিবারক বস্তু। শীতল জলে গন্ধ আকর্ষণ করে। সম্প্রতি আমেরিকার একখানি চিকিৎসা-পত্রে এই বিষয় স্পষ্ট করিয়া লিখিত হইয়াছে। তাহাতে যাহা লেখা আছে, তাহার অনুবাদ এই—"বিজ্ঞান-শাস্ত্রের প্রভাবে আজ কাল নানা প্রকার দুর্গন্ধ-নিবারক ও রোগের বীজনাশক পদার্থের কথা শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু নূতন বিষয় আবিষ্কার করিতে যাইয়া আমরা অনেক পুরাতন অথচ বাস্তবিক উপকারী এবং সুলভ দ্রব্য সকলের কথা ভুলিয়া

যাই—যেমন শীতল জল। সকলেরই জানা উচিত যে, শীতল জলে গ্যাস (gas) অত্যন্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে, তাই যে সকল গৃহে বায়ু সহজে যাতায়াত করিতে পারে না, সেই সকল স্থান উত্তম করিয়া ধৌত করা উচিত। (Medical Envoy) অতএব শৌচকার্য্যে প্রভূত জল ব্যবহার কত উপকারী! সর্ব্বদাই দেখা যায়, কোন দুর্গন্ধময় স্থানের ভিতর দিয়া আসিলে বোধ হয় যেন মুখ ও নাসিকাতে সেই গন্ধ লাগিয়া রহিয়াছে। সেই সময় শীতল জলের দ্বারা মুখ ও নাসিকা ধুইয়া দুই একবার কুলি করিলে আর গন্ধ অনুভব হয় না, অর্থাৎ শীতল জল সেই গন্ধ আকর্ষণ করিয়া লইল।

শুষ্ক মৃত্তিকা যে অতি উত্তম ও সুলভ দুর্গন্ধনিবারক বস্তু, তাহা সকলেরই জানা উচিত। কোন পচা বস্তুকে মাটি চাপা দিলে আর তাহার দুর্গন্ধ জানিতে পারা যায় না। কোন কোন জেলখানায় গভর্ণমেণ্ট-বিধি আছে যে, চোরেরা মলত্যাগ করিয়া তাহা শুষ্ক ও চূর্ণ মৃত্তিকা দ্বারা ঢাকিয়া ফেলিবে। প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যতত্ত্ববেত্তা ডাঃ পার্কস্ (Dr. Parkes) তাঁহার পুস্তকে (Practical Hygiene) দুর্গন্ধনিবারক পদার্থের মধ্যে শুষ্ক মৃত্তিকার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। বলিতে পার, কার্ব্বলিক এসিড্ (Carbolic acid) রসকর্পূর, ফিনাইল (Phenile) প্রভৃতি উৎকৃষ্ট দুর্গন্ধনিবারক বস্তুর একবার প্রয়োগেই যখন সমস্ত গন্ধ দূর হইতে পারে, তখন কেন ১০ দশ বার মাটি লেপন করিয়া সময় নষ্ট করি? এই আপত্তি বড় দুর্ব্বল। প্রথমতঃ উহারা প্রত্যেকেই বিষ, নিত্য ব্যবহারে পরিণামে নানা প্রকার রোগ জন্মাইতে পারে, এবং ঘরে রাখাও নিরাপদ নহে, ভ্রমক্রমে কেহ খাইলে আশু প্রাণবিয়োগ হইতে পারে। ২য়তঃ ব্যয়সাধ্য ও কষ্টলভ্য—ডিস্‌পেন্সারি ভিন্ন কোন স্থানে পাওয়া যায় না।

আজ কাল শৌচকার্য্যে অনেকে সাবান (Soap) ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহাও ভাল নয়। প্রথমতঃ উহা ব্যয়সাধ্য। সাধারণতঃ সস্তা যে সকল সোপ্ বাজারে বিক্রয় হয়, তাহাদের সর্ব্বদা দীর্ঘ ব্যবহারে বর্ণের হানি হয়। ভাল সোপের অনেক মূল্য—এ দরিদ্র দেশে কখনই তাহার প্রচলন হওয়া উচিত নহে। ২য়তঃ—এক সাবান অনেকবার ব্যবহার করিলে, কিম্বা এক জলে তাহা দ্বিতীয়বার ব্যবহার করিলে শুচি হওয়া হইল না, কারণ অশুচি দ্রব্য বারম্বার ব্যবহার করিতে হইল। পায়খানার মধ্যে প্রত্যেকে এক একখানি সোপ রাখা অসুবিধাজনক ও ব্যয়সাধ্য।

অতএব শৌচকার্য্যে শীতল জল ও শুষ্ক মৃত্তিকা যেমন উপযোগী, তেমনই অনায়াসলভ্য ও ব্যয়শূন্য। ঋষিদিগের ব্যবস্থা কি সুন্দর, স্বাস্থ্যপ্রদ, অনায়াসসাধ্য ও সর্ব্বজন-উপযোগী, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। স্থূল দৃষ্টিতে আমরা এই বিচার করিলাম, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে শীতল জল ও মৃত্তিকার হয়ত আরও নানা গুণ থাকিতে পারে।

উপসংহারে বক্তব্য, প্রত্যহ নিত্যকার্য্যের অধিকারী হইতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়ম

পালন করা উচিত। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা হইতে উঠিয়া, বেগ হইলে, মল-মূত্র ত্যাগ করিতে হইবে। বিধি পূর্ব্বক মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা যথা স্থান ধৌত করিয়া দন্তধাবন করা কর্ত্তব্য; তৎপরে প্রাতঃস্নান করিতে হইবে। যাঁহারা প্রাতঃস্নান করিতে অসমর্থ, তাঁহারা অশিরস্ক স্নান করিবেন, অর্থাৎ ২।৩ ঘটি শীতল বা উষ্ণ জল বক্ষে ও পৃষ্ঠে ঢালিয়া দিবেন, তাহাতে মস্তক ভিন্ন সমস্ত শরীর এক প্রকার ধৌত হইবে। তাহাও যাঁহার সহ্য হয় না, তিনি ভিজা গামছা দিয়া মস্তক ও সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জনা করিবেন এবং ধৌত বা পট্টবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক আসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যায় প্রবৃত্ত হইবেন।

শ্রীসত্যজীবন লাহিড়ী।

বেদান্ত-সূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

(৩য়)

১২। আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ।

১৩। বিকারশব্দান্নেতি চেন্নপ্রাচুর্য্যাৎ।

১৪। তদ্ধেতু ব্যপদেশাচ্চ।

১৫। মন্ত্রবর্ণিকমেবচ গীয়তে।

১৬। নেতরোঽনুপপত্তেঃ।

১৭। ভেদব্যপদেশাচ্চ।

১৮। কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা।

১৯। তস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি।

১২। ব্রহ্ম বোধার্থে "আনন্দ" পদের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হেতু "আনন্দময়" আত্মাই পরমাত্মা।

১৩। "আনন্দময়" শব্দের "ময়" প্রত্যয়টি বিকারার্থে প্রযুক্ত নহে, পরন্তু প্রাচুর্য্য বা পূর্ণত্ব অর্থেই প্রযুক্ত।

১৪। "আনন্দময়" পদের "ময়" পূর্ণার্থেই প্রযুক্ত, যেহেতু ব্রহ্মই আনন্দের মূল কারণ বলিয়া উক্ত।

১৫। আনন্দময়ই ব্রহ্ম; কারণ বেদের মন্ত্রভাগে যে ব্রহ্ম বর্ণিত, ব্রাহ্মণভাগেও সেই ব্রহ্মই গীত।

১৬। ব্যক্তিগত জীবাত্মাও ইহার লক্ষ্য নহে; কারণ তাহাতে সিদ্ধান্তপক্ষে অনুপপত্তি উপস্থিত হয়।

১৭। পরমাত্মা ও জীবাত্মার পার্থক্য উক্ত থাকায়, "আনন্দময়" কদাপি জীবাত্মা নহেন।

১৮। আনন্দময়ে কামবত্তার অস্তিত্ব উক্ত হওয়ায়, সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ-সিদ্ধান্তও অপ্রতিপন্ন।

১৯। আনন্দময় পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন শ্রুতি-সিদ্ধান্ত সম্মত।

তৈত্তিরীয় উপনিষৎ বলেন, পঞ্চকোষগত ভাবে আত্মা পঞ্চভাবে লক্ষিত হন; যথা অন্নময়, প্রাণময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়; অর্থাৎ অন্নগত আত্মা, প্রাণবায়ুগত আত্মা, মনোগত আত্মা, বুদ্ধিগত আত্মা ও আনন্দগত আত্মা। যদিও এই অন্নময় দেহ, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি,

এই চারিটীই আত্মার বাহ্য পরিচ্ছদ বা বাহ্যস্তর, কিন্তু আমাদের মোহমুগ্ধ চিত্তের স্বভাবই এই যে, আমরা ঐ সমস্তকেই 'আত্মা বলিয়া গ্রহণ করি। আমরা সর্ব্বদা আত্মার যন্ত্রস্বরূপ অন্তর্ব্বোধকেই ভ্রমবশতঃ আত্মা বলিয়া গ্রহণ করি। ফলে আনন্দময়ই প্রকৃত আত্মা।

আনন্দময় কোষাত্মক আত্মাই পরব্রহ্ম, অথবা অন্নময়াদি কোষাত্মক আত্মার ন্যায় তাহা হইতে কিঞ্চিদ্বিভিন্ন, এই বিষয়ের বিচারই ১২শ সূত্রের বিষয়। ফলে পরমাত্মার নির্দ্দেশ সূচনায় "আনন্দ" পদ পুনঃ পুনঃ প্রযুক্ত হওয়ায়, ইহা পরব্রহ্ম হইতে স্বরূপতঃ স্বতন্ত্র নহে।

"আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। বিজ্ঞানানন্দং ব্রহ্ম (তৈঃ উঃ ৩৬) ইত্যাদি ঔপনিষদী শ্রুতি এবং এইরূপ সমতাৎপর্য্যসূচিকা অন্যান্য শ্রুতিও "আনন্দ" পদে ব্রহ্মই বুঝাইতেছেন। মানুষ সাধারণতঃ অন্নময় স্থূল শরীর বা মনোময় সূক্ষ্ম শরীরকেই অসাধক অবস্থায় আত্মা বলিয়া বুঝিয়া বসে, সুতরাং ঔপনিষদী শিক্ষাও মানব-প্রকৃতির স্বতঃ অনুগতি অনুসারে ক্রমশঃ সাধককে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে উপনীত করে। ঔপনিষদী বাক্যাবলী ব্রহ্মরহস্য-ভেদিনী, ব্রহ্ম বিদ্যা-বোধিনী বা ব্রহ্মবার্ত্তা-বাহিনী; সাধককে তাহার স্ববোধানুরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব উপহার দেওয়াই তাঁহার কার্য্য; সুতরাং মানবীয় অধিকার-ক্রমের অনুবর্ত্তনে তিনিও ব্রহ্ম-বোধন-বিষয়ে আদৌ স্থূল জড়াত্মা হইতে আরম্ভ করেন। যদিও উহা বাস্তব আত্মা নহে, তথাপি স্থূল ভেদ করিয়া সূক্ষ্মে সঞ্চরণই আত্মানুসন্ধানের ক্রম। সুতরাং স্থূল হইতে ক্রমে স্থূলাল্পতরে বা ক্রমসূক্ষ্মে অগ্রসর হইতে হইতে চরম পরিণামে সহজ জ্ঞান বা আত্মপ্রত্যয়ের বিষয়ীভূত ভাবেই আত্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।

বিন্দুবৎ ক্ষুদ্র অরুন্ধতী-নক্ষত্রকে দেখাইতে হইলে, তোমাকে তৎপার্শ্ববর্ত্তী বশিষ্ঠ নামক একটী উজ্জ্বল বড় নক্ষত্রকে (তাহাই যেন অরুন্ধতী, এই ভাবে) অগ্রে দেখাইয়া, পরে তন্নিকটস্থ যথার্থ অরুন্ধতী-বিন্দু দেখাইতে হইবে।

যদি প্রতিপক্ষবাদী এইরূপ তর্ক উপস্থিত করেন যে, "তস্যপ্রিয়মেব শিরঃ" আনন্দই তাঁহার মস্তক, ইত্যাদি বাক্যে আনন্দময় পরমাত্মায় নির্দ্দেশিত হইতে পারেন না, কারণ তিনি হর্ষ-বিষাদের অস্পৃশ্য বা অতীত। এ স্থলে তদুত্তর স্বরূপ এই বলা যায় যে, উহা কেবল সৌষ্ঠবরক্ষার্থ রূপক কল্পনা মাত্র। এই আনন্দময় আত্মতত্ত্বেও একটী শরীর বা কোষ আরোপিত হইয়াছে। যেহেতু বেদান্তোক্ত ঐ সমস্ত কোষ বা শরীর-পরম্পরার অন্যতম রূপেই এই আনন্দময় কোষও কল্পিত হইয়াছে। উক্ত কোষ-পরম্পরার আরম্ভ অন্নময়কোষে অর্থাৎ অন্ন-পরিণাম-গঠিত ভৌতিক শরীরে এবং চরম বা পরম পরিণতি এই আনন্দময় বা প্রকৃত আত্মময় কোষে।

(ক্রমশঃ)

—:০:—

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা। | মাঘ। | ১৩০৭ সাল, ১৮২২ শকাব্দা।

বেদান্ত-সূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

১৩শ সূত্রে ব্যক্ত হইয়াছে যে, যদিও অন্নময়, প্রাণময় ইত্যাদি পদে 'ময়' প্রত্যয় বিকারার্থেই [illegible] বুঝায়, কিন্তু আনন্দময়ের "ময়" পূর্ণার্থেই প্রযুক্ত। ব্রহ্ম আনন্দময়, কারণ অনন্ত আনন্দেই তাঁহার সর্ব্বময় সত্তার সংপূর্ণতা। শ্রুতি বলেন "পূর্ণানন্দময়ং ব্রহ্ম"।

১৪শ সূত্রে ইহাই সুব্যক্ত যে—"আনন্দময়" শব্দের "ময়" পূর্ণার্থকই বটে, যেহেতু শ্রুতি "এবহ্যেবানন্দয়তি" প্রভৃতি বাক্যে ব্রহ্মকেই আনন্দের মূল উৎস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব যিনি আনন্দমূলাধার, আনন্দের অভাব বা অপূর্ণতা তাঁহাতে কিরূপে সম্ভবে? তিনি স্বরূপলক্ষণে পূর্ণানন্দসত্তাতেই সুপ্রতিষ্ঠিত।

১৫শ সূত্রে অপর একটী যুক্তিবাদ দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, "আনন্দময়" পদে ব্রহ্মই বাচ্য। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ব্রহ্মজ্ঞ জন পরমকে প্রাপ্ত হন। তৎপরের মন্ত্রেই বলিতেছেন—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"। ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ। অতঃপর শ্রুতি বুঝাইয়াছেন যে, সমগ্র বিশ্ব এই ব্রহ্ম হইতে বিকাশিত। তৎপর অধিকতর সমীচীন ভাবে ব্রহ্মতত্ত্ব-বোধনার্থে "অন্নময়কোষ" হইতে আরম্ভ করিয়া "বিজ্ঞানময় কোষ" পর্য্যন্ত আত্মতত্ত্বের বাহ্য চতুঃস্তর প্রদর্শন করিয়াছেন। অবশেষে মন্ত্রে যে ব্রহ্ম "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" বলিয়া কীর্ত্তিত, সেই পরব্রহ্মই "ব্রাহ্মণে "তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ" অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কোষ পর্য্যন্ত বাহ্য চতুষ্কোষাত্মক আত্মা হইতে অতিক্রান্ত বা অতীত অন্তরাত্মা আনন্দময় কোষাত্মক, এই বলিয়া গীত হইতেছেন। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ, উভয় ভাগের বাক্যাবলীই পরব্রহ্ম-প্রমাণিকা।

যদি এরূপ অনুমান করা যায় যে, পরবর্ত্তী বাক্যে পরমাত্মাতিরিক্ত অন্যবিধ আত্মা আভাষিত হইয়াছেন, তবে তাহা

শ্রুতিবাক্যের মুল আলোচ্য বিষয়টিই বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়; তাহা হইলে 'শ্রুতিকে এক নূতন অভিধেয় বিষয় অবলম্বন করিতে হয়। ফলে আনন্দময় আত্মাতিরিক্ত অন্তরাত্মার অস্তিত্বই অসিদ্ধ; অতএব আনন্দময় আত্মাই পরব্রহ্ম।

আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।

সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা।

আনন্দই ব্রহ্ম, ইতি তত্ত্বজ্ঞানোদয়।
আনন্দ-সম্ভূত সর্ব্বভূত সুনিশ্চয়॥
আনন্দে সঞ্জাত ভূত আনন্দে জীবিত।
চরমে পরমগতি আনন্দে মিলিত॥
ব্রহ্মবিদ্যা এই ভার্গবী বারুণী।
পরম ব্যোমেতে প্রতিষ্ঠিতা ইনি॥

অর্থাৎ যিনি ভৃগুবরুণের উপরোক্ত এই আনন্দ-ব্রহ্ম-বিজ্ঞান বিজ্ঞাত হন, তিনি পরব্যোমে (অন্তরাকাশে, ফলিতার্থে অন্তরাত্মায়) প্রতিষ্ঠিত হন। এতাবতা "আনন্দময়" আত্মাই পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম।

১৬শ সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, "আনন্দময়" আত্মা ব্যক্তিগত জীবাত্মা নহে। শ্রুতি বলেন—"সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয় ইতি। স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।" (তৈঃ উঃ ২।৬)

'বহু হয়ে জনমিব' এই ইচ্ছা করি,
আত্মতপে তপ্ত হয়ে সগুণত্ব ধরি,
এ সমস্ত যাহা কিছু— (অখিল ভুবন)
স্বইচ্ছায় ইচ্ছাময় করিলা সৃজন।

এই বিশ্ব-সৃষ্টি-বিধায়িনী শক্তির অসাধারণ স্বাভাবিক বিশেষত্ব পরমাত্মা ব্যতীত কোন সোপাধিক জীবাত্মার সম্ভবে না।

১৭শ সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, নিরুপাধিক পরমাত্মা ও সোপাধিক জীবাত্মার লক্ষণ-স্বাতন্ত্র্য শ্রুতিবাক্যে সুস্পষ্ট নির্দ্দেশিত থাকায়, পরমাত্মা ব্যতীত জীবাত্মা কদাপি "আনন্দময়" আখ্যায় অভিহিত হইতে পারেন না। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ (২।৭) বুঝাইতেছেন যে, "আনন্দময়" আত্মা রসস্বরূপ; সেই রসাস্বাদ-সাধনাতেই জীবের আনন্দলাভ হয়। অতএব সেই আস্বাদিত বা বিদিত রসস্বরূপই পরমাত্মা এবং আস্বাদক বা বেত্তাই জীবাত্মা। যদিও তত্ত্বতঃ পরমাত্মা ও জীবাত্মা এক ও অভিন্ন, তথাপি যতদিন অবিদ্যা ও অজ্ঞানতা অবিদূরিত, ততদিন পরমাত্মা ও জীবাত্মা পৃথক্‌রূপেই প্রতীত। সুতরাং জীবাত্মা অবাধ অখণ্ড সত্য-গৌরবে পরাত্মা হইতে পরমার্থতঃ প্রভিন্ন না হইলেও, জীবের মায়া-মোহ-ভ্রান্তির ক্ষান্তি পর্য্যন্ত প্রভিন্ন প্রতীয়মান হইবেই। ১৬শ ও ১৭শ—উভয় সূত্রেই জীবাত্মা ও পরমাত্মার কৃত্রিম স্বাতন্ত্র্য সুপ্রচারিত হইয়াছে।

১৮শ সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, যেস্থলে "ইচ্ছাবত্ত্ব দ্বারাই ব্রহ্মের সগুণত্ব এবং তাহাই বিশ্বসৃষ্টির মূল-কারণ-তত্ত্ব, সেস্থলে ব্রহ্মই "আনন্দময়" হইতে পারেন, কিন্তু সাংখ্যোক্ত ইচ্ছাদি-অন্তর্বৃত্তিশূন্য অচেতনা জড়া প্রকৃতি বা প্রধান কদাচ হইতে পারে না।

শ্রুতি বলেন,—"সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়" (তৈঃ উঃ ২।৬) জড়া প্রকৃতিতে কামনা সম্ভবে না, উহা চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মেই সম্ভবে। যদিও শ্রুতিবাক্য-বিচারে সাংখ্যোক্ত প্রধানের জগৎকারণত্ববাদ ইতঃপূর্ব্বেই নিরস্ত হইয়াছে, তথাপি ইহাও তদুদ্দেশ্য-পোষক একটি অতিরিক্ত যুক্তিবাদ বলা যাইতে পারে।

১৯শ সূত্রের তাৎপর্য্যে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, "আনন্দময়" আত্মা প্রধানও হইতে পারেন না, ব্যক্তিগত জীবাত্মাও হইতে পারেন না। কারণ তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে জীবাত্মা "আনন্দময়" পরমাত্মার সম্মিলন লাভ করেন।

শ্রুতি বলেন,—

"যদাহ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি, যদাহ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতি।" (তৈঃ উঃ ২।৭)

অশরীরী, অনির্দ্দেশ্য, অদৃশ্য ও অবিশেষ্য
আত্মায় অভয়-স্থিতি যার,
সেইত অভয় পায়; বিন্দু-ভেদ-বোধে হায়!
ভয়ের কারণ ঘটে তার।

দ্বৈতজ্ঞানের রাজ্যেই এই ভয়ের অধিকার। দ্বৈতজ্ঞানের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে ভয়েরও তিরোধান হয়; কারণ তখন কে আর কাহাকে ভয় করিবে? এক্ষণে কথা এই, ইতঃপূর্ব্বেই যেস্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, সাংখ্যমতানুসারেও প্রধানের সহিত জীবাত্মার চির-পার্থক্য নির্দ্দিষ্ট, সেস্থলে এতদুভয়ের অভিন্নত্ব বা একত্ব একান্তই অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক। অতএব যখন শ্রুতিবাক্য-প্রমাণে জীবাত্মা ও আনন্দময় আত্মার অভিন্নত্ব বা সম্মিলন সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, তখন উক্ত "আনন্দময়" আত্মা অবশ্যই পরমাত্মা বা ব্রহ্মই বটেন।

উপরি-উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য দ্বারা তাৎপর্য্যতঃ ইহাই অববোধিত হয় যে, যিনি অখণ্ড সাম্য-জ্ঞান দ্বারা "আনন্দময়" আত্মায় আত্মসমর্পণ করেন, তিনিই তৎসহ অভেদ-মিলন-লাভে মোক্ষপদের অধিকারী হন।

জীবাত্মা আর কিছুই নহে, উপাধ্যবচ্ছিন্ন পরমাত্মা। যেমন "ঘটাকাশ" ঘট ভাঙ্গিলেই মহাকাশ, তেমনই জীবোপাধি বা জীবত্ব-ঘট ভাঙ্গিলেও জীবাত্মা পরমাত্মায় পরিণত বা প্রলীন।

অজ্ঞ জনেরা স্বভাবতঃ এই ভয়ে ভীত হয় যে, পাছে তাহাদের জীবাভিমান-সর্ব্বস্ব ক্ষুদ্র আমিত্বটুকু হারাইয়া যায়! তাহার সান্ত ক্ষুদ্র আমিত্বটুকুরই যেন অস্তিত্ব আছে, আর অনন্তস্বরূপতাই যেন অস্তিত্বশূন্যতা বা শূন্যে বিলীনতা! জীবনের দৈনন্দিন সামান্য ব্যাপারেও মানব উদার সমবেদনা ও উন্নতলক্ষ্যের মর্ম্মাবধারণ করিয়া থাকে এবং তাহার বিপরীত ভাব বা ব্যবহারকে হেয় জ্ঞান করে। অতএব এরূপ ধারণা বস্তুতঃই বিস্ময়ের বিষয় যে, মানবের আত্মোন্নতি কোন এক নির্দ্দিষ্ট সীমায়ই আবদ্ধ থাকিবে, উহা চরম ও পরম লক্ষ্যে পঁহুছিবে না! তোমার সংকীর্ণ আমিত্বের

গণ্ডী ভেদ কর, সত্যস্বরূপ পরমাত্মার উদার আশ্রয় অবলম্বন কর। তোমার ব্যক্তিগত আমিত্ব বা আত্মস্বরূপ ভঙ্গপ্রবণ; উহা অচিরেই ভগ্ন হয়; কিন্তু সত্য কখনও ভগ্ন হয় না; অতএব সত্যের শরণ লও—সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হও। তোমার সর্ব্বভয়ের হেতু তোমার ক্ষুদ্র আমিত্বে নিহিত। বিশ্বসাম্য-সাগরে তোমার ক্ষুদ্র আমিত্ব বিসর্জ্জন কর, অর্থাৎ বিশ্বাত্মায় আত্মসমর্পণ কর; আর শোক-মোহ-ভয়ের ভয় থাকিবে না। ইহাই নিত্যানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ। ইহা অনন্ত—অক্ষয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশঃ——

সাধন-পঞ্চকম্।

বেদোনিত্যমধীয়তাং তদুদিতং কর্ম্মস্বনুষ্ঠীয়তাং, তেনেশস্য বিধীয়তামুপচিতিঃ কাম্যে মতিস্ত্যজ্যতাম্।
পাপৌঘঃ পরিধূয়তাং ভব-সুখে দোষোঽনুসন্ধীয়তাম্, আত্মেচ্ছা ব্যবসীয়তাং নিজ গৃহাত্তূর্ণং বিনির্গম্যতাং। ১

সংগঃ সৎসু বিধীয়তাং ভগবতো ভক্তির্দৃঢ়া ধীয়তাম্। শান্ত্যাদিঃ পরিচীয়তাং দৃঢ়তরং কর্ম্মাশু সংত্যজ্যতাম্। সদ্বিদ্বানুপসর্প্যতাং প্রতিদিনং তৎপাদুকে সেব্যতাম্। ব্রহ্মৈকাক্ষরমর্থ্যতাং শ্রুতিশিরোবাক্যং সমাকর্ণ্যতাম্। ২

বাক্যার্থশ্চ বিচার্য্যতাং শ্রুতিশিরঃ পক্ষঃ সমাশ্রীয়তাম্। দুস্তর্কাৎ সবিরম্যতাং শ্রুতিমতস্তর্কোঽনুসন্ধীয়তাম্। ব্রহ্মৈবাস্মি বিভাব্যতামহরহর্গর্ব্বঃ পরিত্যজ্যতাম্। দেহেঽহম্মতিরুজ্ঝ্যতাং বুধজনৈর্ব্বাদঃ পরিত্যজ্যতাম্। ৩

ক্ষুদ্ব্যাধিশ্চ চিকিৎস্যতাং প্রতিদিনং ভিক্ষৌষধং ভুজ্যতাং স্বাদ্বন্নং নতু যাচ্যতাং বিধিবশাৎপ্রাপ্তেন সংতুষ্যতাম্। শীতোষ্ণাদি বিসহ্যতাং নতু বৃথাবাক্যং সমুচ্চার্য্যতাম্। ঔদাসীন্যমভীপ্স্যতাং জনকৃপা-নৈষ্ঠুর্য্যমুৎসৃজ্যতাম্। ৪

একান্তে সুখমাস্যতাং পরতরে চেতঃ সমাধীয়তাম্—পূর্ণাত্মা সুসমীক্ষ্যতাং জগদিদং তদ্বাধিতং দৃশ্যতাম্। প্রাকর্ম্ম প্রবিলাপ্যতাং চিতিবলান্নাপ্যুত্তরৈঃ শিষ্যতাম্। প্রারব্ধন্ত্বিহ ভুজ্যতাং অথ পরব্রহ্মাত্মনা স্থীয়তাম্। ৫

যঃ শ্লোকপঞ্চকমিদং পঠতে মনুষ্যঃ, সঞ্চিন্তয়ত্যনুদিনং স্থিরতামুপেত্য, তদাশু সংসৃতি-দাবানল-তীব্র-ঘোর-তাপঃ প্রশান্তিমুপযাতি চিতিপ্রসাদাৎ।

ছায়ানুবাদ।

বেদ অধ্যয়ন কর অনুক্ষণ—
সদা রাখ মন করিতে পালন—
বেদ মত কর্ম্ম, (সেই সার ধর্ম্ম)
কর্ম্ম দিয়া কর ঈশ-সন্তোষণ।
কাম্যকর্ম্ম-মতি কর পরিত্যাগ।
অপসৃত কর যত পাপভাগ
সংসারের সুখে করিয়া বিচার,
দোষানুসন্ধান কর বারম্বার।
আত্মইচ্ছা ব্যবসায়,
কর, (ত্যজি মমতায়)
বাহির স্বগৃহ হ'তে হওহে সত্বর। ১
সাধুসঙ্গ কর সদা,
দৃঢ় ভক্তি কর ভগবানে।

শান্তি আদি পরিচিত
হ'ক্, ত্যাগ কর্ম্ম অনুষ্ঠানে।—
কর হে সুশীঘ্রতর,
জানি দৃঢ় বন্ধক তাহায়।
জ্ঞানবান–কাছে যাও,
রাখি যত্নে পাদুকা মাথায়,
প্রতিদিন সেবহ সে গুরু-পাদুকায়।
ব্রহ্মতত্ত্ব করহ সন্ধান,
একমনে করি প্রণিধান,
শুন সদা বেদান্ত-বিজ্ঞান॥ ২
মহাবাক্য "তত্ত্বমসি"—নাশিতে অজ্ঞানরাশি,
কর তার তাৎপর্য্য বিচার।
অটল বেদান্তপক্ষ, তাহাতে করিয়া লক্ষ্য,
আশ্রয় লওহে তুমি তার।
কর্কশ কুতর্ক যত, কর ত্যাগ, শ্রুতিমত-
তর্ক মনে খুঁজ অনিবার।
(অনাদি অনন্ত শুদ্ধ নিরীহ অপাপবিদ্ধ)
"ব্রহ্মআমি" ভাব এই সার।
গর্ব্ব কর পরিহার, দেহে"আমি"ও"আমার"
এই মতি ত্যজহ সত্বরে।
কভু বুধগণ সনে, বাদ-বিতণ্ডা-জল্পনে,
করিওনা মন, ত্যজ তারে॥ ৩।
ক্ষুধা নামে আছে ব্যাধি ভয়ানক,
করে যদি আক্রমণ,
ভিক্ষা নামে তার অব্যর্থ ঔষধ,
তখনি কর সেবন।
সুস্বাদু ভোজন কভু অন্বেষণ,
ক'রোনা ভ্রমের বশে।
শুধু দৈববলে যা পাবে যেকালে,
তাতেই রবে সন্তোষে।
শীত উষ্ণ আদি সহি নিরবধি
রহিবে, অধীর হবেনা তায়।
(তত্ত্বকথা ভিন্ন বৃথাবাক্য অন্য)
কভু উচ্চারণ করোনা হায়।
ঔদাসীন্যে কর অভিপ্রায়; জনে কৃপা,
নিষ্ঠুরতা, ছাড়হ উভয়॥ ৪।
নিরজনে সঙ্গোপনে, করহে পরম সুখে
অবস্থান।
পরতর নারায়ণে, যোগে কর স্বীয় চিত্ত
সমাধান॥
পূর্ণতম পরমাত্মা, বিশ্ব তাহে কল্পিত—
বাধিত—
দেখ, কর বিলাপিত, পূর্ব্বকর্ম্ম যত
রাশীকৃত॥
জ্ঞানবলে হয়ে বলী, পরকর্ম্মে লিপ্ত
না হইও।
প্রারব্ধের ভোগ কর, ব্রহ্মরূপে সুস্থির
রহিও॥ ৫।
যে মানব প্রতিদিন এই পঞ্চশ্লোক
"সাধনপঞ্চক" নাম—করয়ে পঠন,
অথবা যে চিন্তাকরে স্থিরভাবে সদা,
সত্বর সে সংসারের তীব্র দাবানল-
সম-ঘোর-তাপ-শান্তি সুখে প্রাপ্ত হয়
(জ্ঞানের গরিমা গুণে) চৈতন্য প্রসাদে।৬
(কস্যচিদ্ দীনস্য।)

বৈশেষিক দর্শন।

প্রথম অধ্যায়, প্রথম আহ্নিক।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

উৎক্ষেপণমবক্ষেপণমাকুঞ্চনং
প্রসারণং গমনমিতিকর্ম্মাণি।৭॥

অনুবাদ।—কর্ম্মপদার্থ পাঁচ প্রকার,যথা—উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন।

বিশদব্যাখ্যা।—উর্দ্ধ্বদিকে নিক্ষেপের নাম উত্ক্ষেপণ। হস্তস্থিত লোষ্ট্রকে যখন উর্দ্ধ-দিকে সঞ্চালিত করা হয়, তখন মনুষ্যের প্রযত্ন হইতে হস্তে যে ক্রিয়া জন্মে, ঐ জাতীয় ক্রিয়াকে উত্‌ক্ষেপণ বলে। ঐরূপ অধোভাগে নিক্ষেপের নাম অবক্ষেপণ। উদূখলে (তণ্ডুল প্রস্তুত করিবার পাত্র বিশেষে) ধান্যাদি সংস্থাপন করিয়া তুষবিমুক্তির নিমিত্ত তাহাতে উত্তোলিত মুষলকে পাতিত করিতে যত্নশীল পুরুষের হস্তে যে ক্রিয়ার আবশ্যক হয়, ঐ জাতীয় কর্ম্মই অবক্ষেপণ পদের প্রতিপাদ্য। বালকেরা বল খেলিবার সময় সমতল ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়া ঐ বলকে যখন সমভাবে ক্ষেপণ করে, তখন ঐ ক্ষেপণকে সমক্ষেপণ বলাযাইতে পারে। কিন্তু এই সমক্ষেপণ অতিরিক্ত ক্রিয়া নহে, উল্লিখিত অবক্ষেপণের অন্তর্গত; ফলে উৎক্ষেপণ ব্যতীত ক্ষেপণ মাত্রই অবক্ষেপণ বলিতে হইবে। প্রসারিত বস্তুর সঙ্কোচ-ক্রিয়া আকুঞ্চন এবং সঙ্কোচিত পদার্থের বিস্তারণকে প্রসারণ বলে। ফুল সকল যখন বিকশিত, তখন তাহাদের দলের প্রসারণ হয় এবং পুনরায় পর্য্যুষিত হইলে দল সকল সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। ঐরূপ পরিধেয় বস্ত্রাদিকে আমরা কখন প্রসারিত—কখনবা আকুঞ্চিত করিয়া থাকি। এই আকুঞ্চন ও প্রসারণ ক্রিয়াদ্বারা পদার্থের আরম্ভক সংযোগের নাশ হয় না। তন্তু হইতে বস্ত্র প্রস্তুত করিবার সময়ে তন্তু সমূহের পরস্পর যে সংযোগ হইতে বস্ত্র জন্মে, ঐ সকল সংযোগকে বস্ত্রের আরম্ভক সংযোগ বলে। এই আরম্ভক সংযোগ সকল বিদ্যমান থাকিতেই বস্ত্রকে কদাচিৎ আকুঞ্চিত কখনবা প্রসারিত করা হয়। যে ক্রিয়াদ্বারা বস্তুতঃ দ্রব্যের আরম্ভক সংযোগের নাশ হইয়া যায়, তাহা আকুঞ্চন বা প্রসারণ পদের প্রতিপাদ্য নহে। একারণ দুগ্ধ রাশিকে উত্তাপদ্বারা ঘনীভূত করিয়া ক্ষীর প্রস্তুত করিলে, তাহাতে "আকুঞ্চিত" শব্দের ব্যবহার হয়না এবং ঐ ঘনীভূত অংশকে পুনর্ব্বার জল-সংমিশ্রণে দ্রবীভূত করিলেও উহা প্রসারিত বলিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে না। উত্‌ক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন ও প্রসারণ ব্যতীত অন্য চলন মাত্রকেই গমন বলে। সাধারণতঃ গমন বলিলে আমরা পাদ বিক্ষেপ করাই বুঝি, কিন্তু রথ, শকট, নৌকা প্রভৃতির চলন স্থলেও 'যাইতেছে' প্রভৃতি পদের ব্যবহার হইতেছে; সুতরাং একমাত্র পাদবিক্ষেপই গমন পদের প্রতিপাদ্য নহে।

কেহ কেহ কর্ম্ম পদার্থকে দশভাগে বিভক্ত করেন। তাঁহাদের মতে সূত্রে উল্লিখিত উত্‌ক্ষেপণ প্রভৃতি পাঁচটী ক্রিয়া ব্যতীত ভ্রমণ, রেচন, স্যন্দন, উর্দ্ধ্বজ্বলন ও তির্য্যগ্‌গমন নামক আরও পাঁচটী কর্ম্মপদার্থ রহিয়াছে।

ভ্রমণ—কুলাল-চক্রাদির ঘূর্ণন। রেচন—অভ্যন্তর হইতে তরল পদার্থের বহির্গমন। স্যন্দন—ক্ষরণ। উজ্জ্বলন—প্রজ্বলিত বহ্নিশিখার উর্দ্ধ্বদিকে উত্থিতি। তির্য্যগ্‌গমন—সর্পাদির বক্রভাবে গমন। উত্‌ক্ষেপণত্ব, অবক্ষেপণত্ব, আকুঞ্চনত্ব, প্রসারণত্ব ও গমনত্বের ন্যায় ভ্রমণত্ব, রেচনত্ব, উর্দ্ধ্বজ্বলনত্ব ও তির্য্যগ্‌গমনত্ব, এই পাঁচটী ধর্ম্মও কর্ম্ম পদার্থের বিভাজক হইতেছে; সুতরাং সমষ্টিতে কর্ম্মবিভাজক ধর্ম্ম দশটী, কিন্তু

এই প্রকার বিভাগে বৈশেষিক দর্শনকার কণাদের সম্মতি নাই, কারণ ভ্রমণ, রেচন প্রভৃতি কর্ম্মনিচয় গমনের অন্তর্গত। নতুবা নিক্রমণ,প্রবেশনপ্রভৃতি ভেদে কর্ম্ম পদার্থকে বহু ভাগে বিভক্ত করিতে হয়। কোন পুরুষ গৃহের এক দ্বার দিয়া নিক্রান্ত হইয়া অন্য দ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ করিল, এস্থলে পুরুষের এক মাত্র গমন ক্রিয়াই প্রথম দ্বারে নিক্রমণ ও দ্বিতীয় দ্বারে প্রবেশন আখ্যা ধারণ করিতেছে,সুতরাং বুঝিতে হইবে, নিক্রমণ-প্রবেশনাদি গমনেরই অন্তর্গত—অতিরিক্ত কর্ম্ম পদার্থ নহে।

এইরূপ বিবেচ্য হইবে—জপ, যজ্ঞ, উপাসনা প্রভৃতি সাধকের কর্ম্ম, প্রজাবর্গের সংরক্ষণ, সুবিচার, সুনীতি শিক্ষা প্রদান প্রভৃতি রাজকীয় ও কৃষি, বাণিজ্য, শিল্পাদি শ্রমোপজীবিগণের কর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত ও সমাজে ব্যবহৃত হইতেছে, কিন্তু কর্ম্ম-বিভাজক সূত্রে উত্ক্ষেপণ প্রভৃতি পাঁচটী মাত্র কর্ম্ম পদার্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল; তবে কি যজ্ঞাদি কর্ম্মের সহিত উল্লিখিত সূত্রোক্ত কর্ম্ম পদার্থের কোন সম্বন্ধ নাই? না থাকিলে ঐ জপ-যজ্ঞাদি ক্রিয়া কোন্ পদার্থের অন্তর্গত, এই প্রশ্নের উত্তর বিষয়ে একটু নিবিষ্ট চিত্তে বিবেচনা করিলে, সহজতই প্রতীত হইবে যে, যাগ-যজ্ঞাদি জাগতিক কর্ম্ম নিচয়ের অনুষ্ঠান করিতে হইলে, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অথবা পদার্থান্তর কিম্বা অন্ততঃ মনকে এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে অবশ্য সঞ্চালিত করিতে হয়; অতএব চলনরূপ কর্ম্ম পদার্থ যে প্রত্যেক পুরুষের প্রতি কার্য্যে বিরাজ করে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যজ্ঞানুষ্ঠানস্থলে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক অগ্নিমধ্যে ঘৃতাদি নিক্ষিপ্ত করিতে হয়। ঈশ্বরচিন্তায় নিরত হইতে হইলে মনকে বিষয়ান্তর হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক ব্রহ্মে অর্পণ করিতে হয়। রাজ্য রক্ষার জন্য রাজার অথবা রাজকর্ম্মচারীদের যুদ্ধক্ষেত্রে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও অসি প্রভৃতির সঞ্চালন করিতে হয়। কাহাকেও উপদেশ দিতে হইলে,শব্দ প্রয়োগের জন্য কণ্ঠতাল্বাদির পরিচালন করিতে হয়; কৃষিকার্য্যে শরীর ও হলাদি সঞ্চালন অতীব প্রয়োজনীয়। বাণিজ্যে পণ্য দ্রব্যের একস্থান হইতে স্থানান্তরে আনয়ন, ক্রয়-বিক্রয়াদি করিতে হয় এবং শিল্প কার্য্যও শরীর ও অঙ্গের পরিচালন ভিন্ন হয় না; সুতরাং বুঝা যাইতেছে, স্থলবিশেষে গুণবিশেষ প্রযুক্ত সঞ্চালনসমষ্টি যজ্ঞাদি নানা আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়া থাকে।

সদনিত্যং দ্রব্যবত্ কার্য্যং কারণং সামান্য বিশেষ বদিতি দ্রব্যগুণ কর্ম্মণামবিশেষঃ। ৮ ॥

পদব্যাখ্যা।—সৎ—সত্তানামক জাতির আশ্রয়। অনিত্যং—নাশেরপ্রতিযোগি অর্থাৎ যাহার ধ্বংস আছে। দ্রব্যবৎ—দ্রব্যস্বরূপ-সমবায়িকারণে আশ্রিত। কার্য্যং—প্রাগভাবের প্রতিযোগি অর্থাৎ উৎপন্ন। কারণং—কার্য্যান্তর জননে হেতু। সামান্য বিশেষবৎ—যে ধর্ম্মটী সামান্য (কোন জাতিস্বরূপ সাধারণের ধর্ম্ম) হইয়া, বিশেষ (অন্য কোন ব্যাপক ধর্ম্ম হইতে অল্পস্থানবৃত্তি) হয়, সেই প্রকার জাতিবিশিষ্ট। ইতি—এইরূপ প্রত্যয়। দ্রব্য-গুণ-কর্ম্মণাং—দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম,

এই তিন প্রকার পদার্থের। অবিশেষ—বৈলক্ষণ্যশূন্য অর্থাৎ সমান।

অনুবাদ।—সত্তার আশ্রয়, বিনাশী, দ্রব্যাত্মক সমবায়িকারণে অবস্থিত, উৎপন্ন, কার্য্যান্তরের জনক এবং অন্য কোন জাতি হইতে অল্পস্থানবৃত্তি কোন জাতির আধার বলিয়া দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম, এই ত্রিবিধ পদার্থে সমান ভাবেই প্রত্যয়টী জন্মে। দ্রব্য যে সৎ অর্থাৎ সত্তার আশ্রয় বলিয়া প্রতীত হয়, ঐরূপ গুণ, মন, কর্ম্ম সৎ, এইভাবে গুণ কর্ম্মও প্রমাজ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অনিত্যাদি ব্যবহারও দ্রব্যের ন্যায় গুণ ও কর্ম্মে তুল্য ভাবেই হয়, এমত বুঝিতে হইবে।

তাৎপর্য্য—পদার্থের উদ্দেশ সূত্রে ব্যক্ত আছে যে, সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যদ্বারা পদার্থ নিচয়ের তত্ত্বনিশ্চয় করা মুমুক্ষু পুরুষের প্রয়োজনীয়। এই প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম নামক পদার্থত্রয়ের বিভাগানন্তর তাহাদের সাধর্ম্ম্য (সজাতীয়ের ধর্ম্ম) বলা হইতেছে। সত্তানামে একটী জাতি, দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম, এই তিন পদার্থেই থাকে, অন্যত্র থাকে না, এ জন্য দ্রব্য সৎ; গুণ, মন ও কর্ম্ম সৎ, এতাদৃশ ব্যবহার হইতেছে। ঐ সত্তা দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম, তিনেরই সাধর্ম্ম্য। সত্তার ন্যায় অনিত্যত্ব, দ্রব্যবত্ত্ব অর্থাৎ দ্রব্যাত্মক সমবায়িকারণাশ্রিতত্ব, কার্য্যত্ব (উৎপন্নত্ব) কারণত্ব (কার্য্যান্তর জনকত্ব) এবং সামান্য বিশেষবত্ত্ব, অর্থাৎ সত্তা হইতে অল্পস্থানস্থায়ী জাতিবিশেষবত্ত্ব, এই কয়েকটী ধর্ম্মও দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম্ম, এই পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্ম্য। অনিত্যত্ব বলিলে, যে পদার্থ চির স্থির না থাকে, তাহার ধর্ম্ম বিনাশকে বুঝায়। ঐ বিনাশ সকল প্রকার কর্ম্মে আছে বটে, কিন্তু গগন প্রভৃতি নিত্য দ্রব্যে এবং গগনৈকত্ব প্রভৃতি নিত্য গুণে থাকে না, অথচ ঐ অনিত্যত্বকে দ্রব্য কিম্বা গুণের ও সাধর্ম্ম্য বলা হইল। যে ধর্ম্মটী সকল দ্রব্যে কিম্বা সকল গুণে না থাকে, তাহাকে দ্রব্যের কিম্বা গুণের সাধর্ম্ম্য বলা অসঙ্গত। এই প্রকার কার্য্যত্ব ও দ্রব্যবত্ত্ব অনুৎপন্ন গগনাদিতে নাই এবং কারণত্ব ও পরমাণুর পরিমাণে থাকে না, সুতরাং ইহাদিগকেও দ্রব্যগুণের সাধর্ম্ম্য বলা যাইতে পারে না, এমত আশঙ্কাস্থলে বক্তব্য এই যে, সূত্রে যে অনিত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, উহাদের অর্থগুলি পরিভাষিত—অর্থাৎ শাস্ত্রকারের সাঙ্কেতিক। যথা—অনিত্যত্ব—অনিত্যবৃত্তিজাতিমত্ত্ব। দ্রব্যবত্ত্ব—দ্রব্যরূপ সমবায়িকারণাশ্রিতবৃত্তি জাতিমত্ত্ব। কার্য্যত্ব—উৎপন্ন বৃত্তি জাতিমত্ত্ব। কারণত্ব—কারণবৃত্তি জাতিমত্ত্ব। দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কর্ম্মত্ব নামক জাতিত্রয়ের প্রত্যেকেই অনিত্যবৃত্তি, কার্য্যবৃত্তি ও দ্রব্যরূপ সমবায়িকারণাশ্রিত বৃত্তি, হইয়াছে। ঐ দ্রব্যত্ব সকলদ্রব্যেইআছে ঐ গুণত্ব সকল গুণেই আছে এবং ঐকর্ম্মত্ব সকল কর্ম্মেই রহিয়াছে; সুতরাং পরিভাষিত অনিত্যত্ব প্রভৃতি দ্রব্যাদির সাধর্ম্ম্য হইতে অযোগ্য নহে।

দ্রব্যগুণয়োঃ সজাতীয়ারম্ভকত্বং সাধর্ম্ম্যং। ৯ ॥

ব্যাখ্যা।—দ্রব্যগুণয়োঃ—দ্রব্য এবং গুণের। সজাতীয়ারম্ভকত্বং—সজাতীয়ের প্রতি, আশ্রয় ভাবে কিম্বা আশ্রয়ে আশ্রিতভাবে উৎপাদকত্ব। সাধর্ম্ম্যং—স্ববৃত্তিধর্ম্ম।

অনুবাদ। সজাতীয় কার্য্যান্তরেরপ্রতি সমবায়িকারণত্বটী দ্রব্যের এবং সজাতীয়ের প্রতি অসমবায়িকারণত্বটী গুণের সাধর্ম্ম্য।

দ্রব্যাণি দ্রব্যান্তরমারভন্তে গুণাশ্চ গুণান্তরং। ১০ ॥

অনুবাদ।—একটী দ্রব্য দ্রব্যান্তরকে জন্মায় এবং একটী গুণ অপর একটী গুণের উৎপাদক হইয়া থাকে।

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সাধর্ম্ম্য বলিলে সজাতীয়ের ধর্ম্মকে বুঝায়। মনুষ্যত্ব রূপে সকল মনুষ্য সজাতীয় হইলেও, ব্রাহ্মণত্ব ক্ষত্রিয়ত্বাদিরূপে সকলে সজাতীয় নহে। বহু স্থানবৃত্তি ব্যাপক ধর্ম্ম পুরস্কারে অনেককে সধর্ম্মা বলা যায়, কিন্তু অল্পস্থানস্থায়িব্যাপ্য ধর্ম্ম অল্পসংখ্যকেরই সাধর্ম্ম্য প্রতিপাদন করে। সদনিত্যাদি অষ্টম সংখ্যক সূত্রে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম, এ তিনের সাধর্ম্ম্য দেখাইয়া উপরোক্ত সূত্র দ্বয়ে দ্রব্য এবং গুণ, এই দুয়ের মাত্র সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ সমান ধর্ম্ম বলিয়া ব্যবহারোপযোগী ধর্ম্মটী দেখান হইতেছে; ঐ ধর্ম্মের নাম সজাতীয়ারম্ভকত্ব। কুলালেরা দুই খণ্ড কপাল প্রস্তুত করিয়া তাহাদের পরস্পর সংযোগে ঘট প্রস্তুত করিয়া থাকে। ঐ কপালদ্বয় কিম্বা তদারব্ধ ঘট, উভয়ই দ্রব্য পদার্থ, তন্মধ্যে একটী অবয়ব, অপরটী অবয়বী; একটী আশ্রয়, অপরটী আশ্রিত, একটী কারণ অপরটী কার্য্য অর্থাৎ কপাল স্বরূপ দ্রব্য পদার্থ সজাতীয় (দ্রব্যান্তর) ঘটের উৎপাদনে সমবায়িকারণ (সমবায় সম্বন্ধে আশ্রয়রূপে উৎপাদক) হইয়া থাকে। গুণান্তরের উৎপাদনে গুণের আশ্রয়রূপে হেতুতা নাই, কিন্তু অসমবায়ি হেতুত্ব আছে। কপালদ্বয়ের রূপ হইতে ঘটের রূপ জন্মে। কপালের রূপের আশ্রয় কপাল, ঘট ঐ কপাল খণ্ডে আশ্রিত, এ নিমিত্ত স্বাশ্রয়াশ্রিতত্ব সম্বন্ধে কপালের রূপ ঘটে থাকে, এমত বলা যায়। এইক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, ঘটীয় রূপের আশ্রয়ে ঘটে কপালীয় রূপ স্বাশ্রয়াশ্রিতত্ব সম্বন্ধে অবস্থিত থাকিয়া ঘটীয় রূপের জনক হইতেছে। গুণের সজাতীয় (গুণান্তর) জননে এতাদৃশ অসমবায়ি কারণত্বকে সজাতীয়ারম্ভকত্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে। নিমিত্ত কারণস্থলে আরম্ভ শব্দ ব্যবহার্য্য নহে। ঘটের উৎপত্তিতে দণ্ডচক্রাদি নিমিত্ত কারণ হওয়ায়, ঘটে দণ্ডারব্ধ, চক্রারব্ধ, এইরূপ ব্যবহার হয়না। এই প্রসঙ্গে সমবায়িকারণ, অসমবায়িকারণ ও নিমিত্ত কারণ ভেদে কারণত্বকে ত্রিবিধ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

কর্ম্ম কর্ম্মসাধ্যং নবিদ্যতে। ১১ ॥

পদব্যাখ্যা। কর্ম্ম—উৎক্ষেপণ গমনাদি। কর্ম্মসাধ্যং—কর্ম্মজনিত। ন—না। বিদ্যতে—প্রমাণিত হয়।

অনুবাদ। উৎক্ষেপণাদি কর্ম্ম পদার্থের একটীও কর্ম্মান্তরারব্ধ বলিয়া প্রমাণিত হয় না, সুতরাং কর্ম্ম পদার্থ সজাতীয়ারব্ধ নহে।

তাৎপর্য্য। ঘটাদি সাবয়ব দ্রব্য যেমত তদীয়াবয়বীভূত কপালাদি দ্রব্যান্তরারব্ধ হইতেছে এবং ঘটীয় রূপাদি গুণনিচয় যেমত কপালীয় রূপ প্রভৃতি গুণ হইতে জন্মিতেছে, তদ্রূপ একক্রমে দীর্ঘকাল চলনশীল বস্তুর প্রথমোৎপন্ন চলনক্রিয়া হইতে দ্বিতীয়, দ্বিতীয় হইতে তৃতীয়, এইরূপে একটী গমন ক্রিয়া হইতে অপর গমনটী উৎপন্ন হইতেছে বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত সূত্রদ্বয়ে কেবল মাত্র দ্রব্যের ও গুণের সজাতীয়ারম্ভ-

কত্ব সাধর্ম্ম্য বলা অসঙ্গত হয়, এই আশঙ্কা নিরাসের নিমিত্ত এই একাদশ সূত্রের উত্থাপনা হইয়াছে। বস্তুতঃ কর্ম্মে কর্ম্মান্তরারম্ভকত্বের প্রমাণ নাই, এইটিই সূত্রের তাৎপর্য্যার্থ। এই সূত্রে বিদ্ ধাতু সত্তার্থক নহে—জ্ঞানার্থবাচী। এস্থলে বক্তার অভিসন্ধি এইরূপ—কর্ম্ম পদার্থ সকল ক্ষণচতুষ্টয়স্থায়ী। প্রথম ক্ষণে দ্রব্যে ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়, দ্বিতীয় ক্ষণে ঐ দ্রব্যের সহিত পূর্ব্ব সংযুক্ত স্থানের বিভাগ জন্মে, তৃতীয় ক্ষণে ঐ বিভাগ হইতে পূর্ব্ব সংযোগের বিনাশ হয়, চতুর্থ ক্ষণে ক্রিয়াশ্রয়ীভূত ঐ দ্রব্যের সহিত উত্তর দেশের সংযোগ জন্মে; পঞ্চম ক্ষণে ক্রিয়ার নাশ হয়। দীর্ঘকাল চলনশীল দ্রব্যে প্রথম ক্রিয়ার বিনাশ ক্ষণে যে দ্বিতীয় চলন-ক্রিয়া জন্মে, তাহার প্রতি প্রথম-চলন-ক্রিয়া কারণ নহে, কিন্তু ঐ প্রথম ক্রিয়া প্রযুক্ত দ্রব্যে যে এক প্রকার বেগের উৎপত্তি হয়, ঐ বেগাখ্য সংস্কার প্রভৃতিই দ্বিতীয় ক্রিয়ার কারণ, নতুবা যদি প্রথম ক্রিয়াই দ্বিতীয় ক্রিয়ার উৎপাদনে সমর্থ হইত, তবে ঐ প্রথমক্রিয়া নিজের উৎপত্তির দ্বিতীয়ক্ষণেই দ্বিতীয় চলন ক্রিয়াকে জন্মাইতে পারিত; কেননা সমর্থ ব্যক্তির পক্ষে ক্ষণ বিলম্বে সামর্থ্য কল্পনা করা কদাচ ন্যায়সঙ্গত নহে। কারণান্তরের সহায়তাবশতঃ চতুর্থ ক্ষণে ক্রিয়ান্তর জননে প্রথমক্রিয়ার সামর্থ্য কল্পনাও অন্যায্য, কারণ তাহা হইলে সেই কারণান্তর হইতেই দ্বিতীয় চলন ক্রিয়ার সম্ভাবনা হইতে পারে; সুতরাং প্রথম ক্রিয়ার কারণতা স্বীকারে কোন প্রয়োজনই থাকে না। যদি বলা যায় যে—দীর্ঘকাল চলনশীল পদার্থে ক্রিয়া উৎপত্তির দ্বিতীয় ক্ষণে দ্বিতীয় চলন ক্রিয়া হয়, তৃতীয় ক্ষণে তৃতীয় চলন ক্রিয়া জন্মে, এই প্রকার কর্ম্মধারা স্বীকারে দোষ কি? তবে উত্তরবাদীও এস্থলে অবশ্য বলিবেন যে, তাহা হইলে দ্বিতীয় ক্ষণে উৎপন্ন কর্ম্ম হইতে কোনওরূপ বিভাগ জন্মে না, যেহেতু পূর্ব্ব দেশের সহিত বিভাগ ত প্রথমোৎপন্ন ক্রিয়া হইতেই জন্মে; চতুর্থ ক্ষণ ব্যতীত উত্তরদেশ-সংযোগ জন্মে না; সুতরাং মধ্যে বিভাগান্তরের সম্ভাবনা নাই। এইরূপে দ্বিতীয়ক্ষণে উৎপন্ন দ্বিতীয় ক্রিয়া যদি কোন বিভাগই না জন্মাইল, তবে তাহার কর্ম্মত্বেরই অনুপপত্তি হয়, কেন না সংযোগ-বিভাগের অনপেক্ষ কারণই কর্ম্ম পদার্থ। ইহা ১৭সূত্রে কর্ম্মলক্ষণাবসরে ব্যক্ত হইবে। যাহাতে বিভাগজনকত্ব নাই, তাহাতে কর্ম্মত্বও নাই, সুতরাং দ্বিতীয় ক্ষণে কর্ম্মের উৎপত্তিই অলীক হইতেছে। এতাবতা কর্ম্মে সজাতীয়ারম্ভকত্ব নাই বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।

(ক্রমশঃ)

সাংখ্যদর্শন।

(ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত কারিকা।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তা।)

বৎসবিবৃদ্ধি নিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা-
প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য।
পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃ-
ত্তিঃ প্রধানস্য ॥ ৫৭

পদপাঠঃ। বৎস বিবৃদ্ধি নিমিত্তং। ক্ষীরস্য। যথা। প্রবৃত্তিঃ। অজ্ঞস্য। পুরুষবিমোক্ষ-নিমিত্তং। তথা। প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য।

ব্যাখ্যা। বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং—বৎসের (বাছুরের) বৃদ্ধির জন্য। ক্ষীরস্য—ক্ষীর অর্থাৎ দুগ্ধের। যথা—যেমন। প্রবৃত্তিঃ—প্রবর্ত্তনাব্যাপার। অজ্ঞস্য—অজ্ঞের অর্থাৎ অচেতনের। পুরুষবিমোক্ষনিমিত্ত—পুরুষের মুক্তির জন্য। তথা—সেইরূপ। প্রবৃত্তিঃ-প্রবর্ত্তন। প্রধানস্য—প্রধানের। (সাংখ্যশাস্ত্রে প্রকৃতির প্রধান সংজ্ঞাটী পারিভাষিকী, যোগার্থ নহে)

বঙ্গার্থঃ। বৎসের বৃদ্ধির জন্য যেমন অচেতন দুগ্ধও প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ অচেতনা প্রকৃতি পুরুষের মুক্তির জন্য প্রবর্ত্তিত হয়।

বিশদব্যাখ্যা। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, প্রকৃতি হইতেই এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন, পরমেশ্বর এই সকল জাগতিক কার্য্যের কোনওটীর কারণ হইতে পারেন না, কেননা পরমেশ্বর কোনও প্রমাণের বিষয় নহেন। সেশ্বরবাদীরা ঈশ্বর-সমর্থনের অনুকূলে যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়া থাকেন, তাহার কোনওটী কপিলের তীব্র প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারে না। সম্প্রতি আশঙ্কা হইতেছে, প্রকৃতি বিশ্বসংসার প্রসব করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতি অচেতনা, চৈতন্যব্যতিরেকে জড়পদার্থের কোনও কার্য্যকারিতা সম্ভবে না। দুর্ভাগ্যক্রমে প্রকৃতি স্বয়ংই জড়া। জগৎকার্য্য নিষ্পাদন করিতে হইলে প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা চেতন চাই। জীবিত মনুষ্য, জীবিত গবাদি প্রাণিগণ কার্য্য সম্পাদন করে, মরিয়া গেলে কেহই কিছু করিতে পারে না। সেই জড় শরীর বিদ্যমান রহিল বটে, কিন্তু জড়ের চালক চৈতন্য আর জড়শরীরে অধিষ্ঠিত নাই, কাজেই চৈতন্যরূপ অধিষ্ঠাতাকে হারাইয়া জড়দেহ অসাড় হইল, সমস্ত কার্য্য বিলুপ্ত হইল। এ দৃষ্টান্তে এক মহাসত্য আবিষ্কৃত হয়"জড়কার্য্যে অধিষ্ঠাতা চেতন চাই।" পুরুষগণ অর্থাৎ জীবসমূহ প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হইতে পারেনা। কেননা তাহারা কেহই প্রকৃতির স্বরূপ অবগত নহে। যে যাহার স্বরূপ জানেনা, সে তাহার অধিষ্ঠাতা হওয়া অসম্ভব। রথের অধিষ্ঠাতা সারথি রথের যথাযথ সমস্তই অবগত আছে, এইজন্য তাহার অধিষ্ঠানে রথ চলে। যে রথের স্বরূপ জানে না সেইরূপ একজন চেতনমনুষ্য দ্বারাও রথচালনা কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারেনা; ইহাতে মনে হয়, অধিষ্ঠাতা সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর। জীবগণ প্রকৃতিদেবীর অঞ্চল ধরিয়াই আছেন, তাঁহার একাংশ মাত্রই তাহারা অবগত; সুতরাং তাহাদের দ্বারা প্রকৃতির অধিষ্ঠান অর্থাৎ পরিচালন যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। ইহাদ্বারা প্রতিপাদিত হইল, প্রকৃতি বিশ্বপ্রসূতি হইলেও পরমেশ্বর উপেক্ষার বিষয় নহেন। এই আশঙ্কা যোগবাদীর (পতঞ্জলিমতের।) এই কারিকার রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য যোগবাদীর প্রদর্শিত আশঙ্কার প্রত্যুত্তর দেওয়া মাত্র। উত্তরে বলা হইতেছে, কোনও একটী উদ্দেশ্যলক্ষ্য করিয়া অচেতন প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে স্বরূপাভিজ্ঞ অধিষ্ঠাতার আবশ্যক হয় না। চেতন মাত্র হইলেই হইল। পুরুষের ভোগমোক্ষ সম্পাদনার্থেই প্রকৃতি প্রবৃত্তা, তাহার প্রযোজক একমাত্র পরার্থতা। পারার্থ্যই প্রকৃতির সমস্ত কার্য্যের মূল রহস্য। দুগ্ধ অচেতন পদার্থ, বৎসের বৃদ্ধিরূপ পরার্থতাবশেই

দুগ্ধ আপনি প্রবৃত্ত হয়; প্রকৃতিও পুরুষের ভোগমোক্ষ সম্পাদনের জন্য প্রবৃত্ত হয়। যদি বলা যায়, দুগ্ধও ঈশ্বরাধিষ্ঠিত বলিয়া প্রবৃত্ত হয়, অতএব দৃষ্টান্তাসিদ্ধি নিবন্ধন অনুমান ব্যর্থ হইল। তখন প্রত্যুত্তরে বলা যাইতে পারিবে, ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব একেবারে অসম্ভব এবং যুক্তিবিরুদ্ধ। ঈশ্বর স্বীকার করিলে, ঈশ্বরবাদিগণ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই স্বীকার করেন; কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী পরমেশ্বরের প্রকৃতি পরিচালনা নিরর্থক। জ্ঞানীলোকের কার্য্যে প্রবৃত্তির কারণ দুই প্রকার। স্বার্থ এবং করুণা। যদি পরমেশ্বর করুণাযুক্ত প্রকৃতির অধিষ্ঠানে জগৎ সৃষ্টি করেন, তবে সে করুণা কাহার প্রতি? প্রকৃতি-অধিষ্ঠানের পরে সৃষ্টি। সৃষ্টির পূর্ব্বে কাহার দুঃখে পরমেশ্বরের হৃদয় গলিয়াছিল? করুণার পাত্র চাই। যখন জীব-জগতের মনুষ্যাদি তৃণ পর্য্যন্ত কোনও প্রকার পদার্থ সৃষ্ট হয় নাই, তখন কাহার উপর করুণা? সৃষ্টি করিলে পর দুঃখিত জীবগণের প্রতি করুণাবান্ হইয়া পরমেশ্বর দুঃখ নিবারণের উপায় করিতে পারেন বটে, কিন্তু পরম কারুণিক পরমেশ্বরের দুঃখময় জীবজগৎ সৃষ্টি করিয়া পরে দুঃখ বিনাশের উপায় চিন্তা করা অপেক্ষা সুখী করিয়াই বিশ্বসংসার সৃষ্টি করা উচিত ছিল। সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের এই সামান্য বিবেচনাটুকুও ছিল না, একথা বড়ই বিস্ময় উৎপাদন করে। আর যদি বলা যায়, বিশ্বসৃষ্টিতে ঈশ্বরের স্বার্থ আছে। তিনি করুণা বশতঃ করেন নাই; স্বার্থবশেই প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন; তাহা হইলেও আশা পুরিল না। পরমেশ্বর যদি জগৎ সৃষ্টি করিয়া স্বার্থ সিদ্ধি করিতে চাহেন, তবে তাঁহার ঐশ্বর্য্য অপূর্ণ। যিনি সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যের আকর, তিনি আবার কোন্ স্বার্থ সাধনের জন্য জগৎ রচনা করিবেন? যাহার কোনও বস্তুতে আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহার কোনওপ্রকার অভাব আছে, ইহা নিশ্চয়। যাহা নাই, তাহাই চাই, ইহা হইল জগতের সাধারণ রীতি। আশা পুরিয়াগেলে আর কেহ কিছু চায় না। যদি জগৎ সৃষ্টিতে পরমেশ্বরের কোনও আশা না থাকিত, তবে তিনি সৃষ্টি করিবেন কেন? অতএব অনুমান করা যাইতে পারে, স্বার্থ এবং করুণা, কোনটীই ঈশ্বরের প্রবৃত্তির কারণ হইলনা। ইহা ব্যতীত প্রেক্ষাবান্‌দিগের প্রবৃত্তির অন্যবিধ কারণও নাই। অতএব ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব সম্ভব নহে। সুতরাং ঈশ্বরানুমানও অনর্থক। অচেতনের প্রবৃত্তিতে স্বার্থও চাই না, করুণারও আবশ্যক নাই। কেবল পরার্থতা মাত্র প্রযোজক স্বীকার করিলেই সকল উৎপাত নিবৃত্ত হয়। এখানে আচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণমহোদয় সংক্ষেপে ঈশ্বরাঙ্গীকার করিতে অনুমতি জানাইয়াছেন। সাংখ্যদর্শনেও নানাস্থানে ঈশ্বরাস্তিত্বের বিরুদ্ধে অনেকানেক যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানে তাহা আলোচনা করা প্রসঙ্গানুগত হইলেও অনাবশ্যকীয়। কেন না নিরীশ্বরবাদের এত আড়ম্বরযুক্ত বিচার সম্পূর্ণ বৃথা। কপিলাচার্য্য নিরীশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু লিখিবার রীতি দেখিলে বোধহয় উহা "অভ্যুপগম বাদ" মাত্র। কেহ কেহ ইহাকে "প্রবাদুতর্জ্জন ন্যায়" বলিয়া থাকেন। দার্শনিক ক্ষেত্রে অনেক

সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা স্বমতের পরিপোষক নহে, আপাততঃ স্বমতের উপকারক বলিয়া বোধ হয়, সেই গুলিই স্বীকার করা হয়, তদ্বিরুদ্ধ মতের প্রতিকূলে যুক্তির উল্লেখও করা হয়। নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে বুঝা যায়, ঐ সকল মত গ্রন্থকারের নিজস্ব নহে। কেননা ঐ সকল পক্ষ আশ্রয় ব্যতিরেকেও তাঁহারা স্বমত স্থাপন করিতে পারেন। পাতঞ্জলমত অবলম্বন করিলেও প্রকৃতির জগৎকর্তৃত্বে বাধা পড়ে না; অথচ সর্ব্বশাস্ত্র-প্রতিপাদ্য পরমেশ্বরের বিরুদ্ধেও অস্ত্র ধারণ করিতে হয় না। নিরীশ্বরবাদ সর্ব্বত্র নিন্দিত। ভগবানের অবতার কপিল মহোদয় যে ঈশ্বর মানিতেন না, ইহা বিশ্বাস হয়না। গীতাশাস্ত্রের ভগবদ্বাক্য স্মরণ করুন। "সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ" আবার সাংখ্য প্রবচনে কপিল বলিতেছেন "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেন, এখানে ঈশ্বর-নিরাস কপিলের উদ্দেশ্য নহে; কেননা তাহা হইলে "ঈশ্বরাভাবাৎ" এইরূপ সূত্র করাই সঙ্গত ছিল। কপিল প্রৌঢ়বাদ আশ্রয়ে ঈশ্বরাঙ্গীকার করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় ব্যতীত অপর সকল অংশ গ্রন্থকারের মতবহির্ভূত হইতে পারে। মুখ্য বিষয় লইয়াই প্রামাণ্য। সেই বিষয়টীই গ্রন্থকারের নিজস্ব, তদ্ব্যতীত অংশ সকল গ্রন্থকারের মতবিরুদ্ধ হইলেও গ্রন্থের প্রামাণ্য হানি হয় না। যাহহউক, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে সকল যুক্তি আছে, তদপেক্ষা এ যুক্তি অনেকাংশে দুর্ব্বল, তাহাতে সন্দেহ নাই। নিরীশ্বরবাদের যে সকল দৃঢ় যুক্তি আছে, তাহাও কপিল বলেন নাই। প্রকৃতি-পুরুষ প্রতিপাদনই তাঁহার উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গে তিনি এরূপ অনেক মত উপেক্ষা করিয়াছেন, যাহা আপাততঃ সাংখ্য মতের বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ তাহার পরিপন্থী নহে। প্রত্যক্ষের লক্ষণটী টিকেনা দেখিয়া অগত্যা ঈশ্বর অস্বীকার করাই কপিলের গ্রন্থে দেখা যায়; তাহাতে যথার্থতঃ ঈশ্বর অস্বীকার করা হয় নাই।

ঔৎসুক্য নিবৃত্ত্যর্থং যথা ক্রিয়াসু
প্রবর্ত্ততে লোকঃ।
পুরুষস্য বিমোক্ষার্থং প্রবর্ত্ততে
তদ্বদব্যক্তম্ ॥ ৫৮

পদপাঠঃ। ঔৎসুক্য—নিবৃত্যর্থং। যথা। ক্রিয়াসু। প্রবর্ত্ততে। লোকঃ। পুরুষস্য। বিমোক্ষার্থং। প্রবর্ত্ততে। তদ্বৎ। অব্যক্তম্।

ব্যাখ্যা। ঔৎসুক্য নিবৃত্ত্যর্থং—আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির জন্য। যথা—যেরূপ। ক্রিয়াসু—কার্য্যে। প্রবর্ত্ততে—প্রবৃত্ত হয়। লোকঃ—মনুষ্যসমাজ। (তাৎপর্য্যতঃ প্রাণিমাত্র) পুরুষস্য—পুরুষের (জীবের আত্মার।) বিমোক্ষার্থং—মোক্ষ অর্থাৎ ত্রিবিধ দুঃখ বিগমের জন্য। প্রবর্ত্ততে—ব্যাপারিত হয়। তদ্বৎ—সেইরূপ। অব্যক্তং—প্রকৃতি বা প্রধান।

বঙ্গার্থঃ। আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তির জন্য যেমন লোক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তদ্রূপ প্রকৃতি পুরুষের মোক্ষের নিমিত্ত (আপনা হইতেই) প্রবৃত্ত হয়। (পুরুষার্থ সম্পাদিত হইলে সেই পুরুষের নিকট হইতে নিবৃত্ত হয়।)

বিশদব্যাখ্যা। লোকে দেখিতে পাওয়া যায়, যে যে উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাই

তাহার প্রয়োজক। মনুষ্য আদি জীবগণ নিজের ঔৎসুক্য নিবৃত্তি করিবার জন্যই কার্য্যে মনোযোগ করে। প্রকৃতিরও পুরুষার্থ সম্পাদনে ঔৎসুক্য আছে, তজ্জন্যই সেই উদ্দেশ্যে প্রকৃতির অনিবার্য্য প্রবৃত্তি। দরকার থাকিলেই তদ্বশে প্রবৃত্তি হয়, এই লৌকিক দৃষ্টান্ত প্রকৃতির প্রবৃত্তিতে খাটে, এই কথা বলাই গ্রন্থকারের অভিপ্রায়।

রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাৎ।
পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য বিনিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ। ৫৯

পদপাঠঃ। রঙ্গস্য। দর্শয়িত্বা। নিবর্ত্ততে। নর্ত্তকী। যথা। নৃত্যাৎ। পুরুষস্য। তথা। আত্মানং। প্রকাশ্য। বিনিবর্ত্ততে। প্রকৃতিঃ

ব্যাখ্যা। রঙ্গস্য—রঙ্গমঞ্চের। (সমীপে ইত্যধ্যাহার্য্যঃ) দর্শয়িত্বা—দেখাইয়া। নিবর্ত্ততে—বিরতা হয়। নর্ত্তকী—নৃত্যকারিণী নটী। যথা—যেরূপ। নৃত্যাৎ—নৃত্য (নাচ) হইতে। পুরুষস্য—পুরুষের (অত্রাপি সমীপে ইত্যস্য অধ্যাহারঃ কর্ত্তব্যঃ।) তথা—সেই প্রকার। আত্মানং—নিজেকে। (তাৎপর্য্যাধীন নিজের সমস্ত কার্য্যাদি।) প্রকাশ্য—প্রকাশিত করিয়া। বিনিবর্ত্ততে—নিবৃত্ত হয়। প্রকৃতিঃ—সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত প্রধান জড়তত্ত্ব।

বঙ্গার্থঃ। যেমন রঙ্গস্থানস্থ সভ্য অথবা দর্শক মণ্ডলীকে নিজের নৃত্যাদি দেখাইয়া পরে নর্ত্তকী নৃত্য হইতে বিরতা হয়, তদ্রূপ প্রকৃতিও পুরুষের সমীপে নিজের সমস্ত কার্য্যাদি ভালরূপে দেখাইয়া পরে নিবৃত্ত হয়। (প্রয়োজন পরিসমাপ্ত হইলেই প্রকৃতির সৃষ্টি (তৎপুরুষের প্রতি) নিবৃত্ত হয়।

বিশদব্যাখ্যা। প্রবৃত্তির কথা বলিলে একটা আশঙ্কা সহজতই আসিয়া উপস্থিত হইল। যে কারণ বলা গেল, তাহা অনুসারে প্রকৃতির প্রবৃত্তি হউক, কিন্তু নিবৃত্তি হইবার একটা উপায় থাকা চাই। যাহারা চেতন, তাহারা বিবেচনাপূর্ব্বক প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত হইতে জানে, অচেতনা প্রকৃতি চিরদিনই প্রবৃত্তা হইতে পারে, কেননা তাহার বিবেচনা করিবার সামর্থ্য নাই। প্রকৃতির নিবৃত্তি না হইলে সর্ব্বদাই সৃষ্টি হইতে লাগিল। অনন্ত সৃষ্টিবন্ধনে পুরুষ ক্রমশঃ আবদ্ধ হইতে লাগিলেন। মুক্তি ক্রমশঃই সম্ভাবনা অতিক্রম করিল। এ সকল অনুপপত্তি নিরাস করিতেই এই কারিকার রচনা। যেরূপ উদ্দেশ্যে যে কেহ প্রবৃত্ত হয়, সেই উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইলে আপনা হইতেই নিবৃত্তি উপস্থিত হয়। নর্ত্তকীর কার্য্য সভাস্থ দর্শক মণ্ডলীর পরিতৃপ্তি সাধন, যখন তাহা নিষ্পন্ন হইল, তখন নৃত্য হইতে আপনা আপনিই নিবৃত্তি হইল। প্রকৃতির উদ্দেশ্য পুরুষের মোক্ষ, যখন যে পুরুষের প্রতি প্রকৃতির আত্মপ্রদর্শন সমাপ্ত হয়, প্রকৃতির স্বরূপ বুঝিয়া পারিয়া বিরক্ত পুরুষ তাহা হইতে দূরে থাকিতে ইচ্ছা করেন। তখন প্রকৃতি পুরুষের মোক্ষ অর্থাৎ প্রকৃতি সঙ্গ পরিত্যাগজনিত ত্রিবিধদুঃখবিনাশ উপস্থিত দেখিয়া স্বতঃই ঐ পুরুষের প্রতি আর সৃষ্টি করেন না। আবশ্যক বশেই প্রবৃত্তি। দরকার ফুরাইলে প্রবৃত্তিরও নিবৃত্তি উপস্থিত হয়।

নানাবিধৈরুপায়ৈরুপকারিণ্যনুপ-
কারিণঃ পুংসঃ।
গুণবত্যগুণস্য সতস্তস্যার্থমপার্থকং
চরতি ॥ ৬০

পদপাঠঃ। নানাবিধৈঃ। উপায়ৈঃ। উপকারিণী। অনুপকারিণঃ। পুংসঃ। গুণবতী। অগুণস্য। সতঃ। তস্য। অর্থং। অপার্থকং। চরতি।

ব্যাখ্যা। নানাবিধৈঃ—নানাপ্রকারের। উপায়ৈঃ—উপায়ের দ্বারা। উপকারিণী—উপকার করিতে প্রবৃত্তা। অনুপকারিণঃ—উপকার করিতেছে না, তাহার। পুংসঃ—পুরুষের। গুণবতী—সদ্গুণসম্পন্না (ত্রিগুণময়ী)। অগুণস্য—যাহার গুণ নাই, তাহার। সতঃ—নিত্যের। তস্য—তাহার। অর্থং—জন্য। অপার্থকং—বৃথা, অর্থাৎ নিজের লাভ না থাকিলেও। চরতি—আচরণ করে। (পুরুষের পরিতৃপ্তি সাধনের জন্য স্বার্থশূন্যভাবে কার্য্য সম্পাদন করাই প্রকৃতির অনর্থক আচরণ।)

বঙ্গার্থঃ। গুণবতী প্রকৃতি উপকার-প্রবৃত্তা কিঙ্করীর ন্যায় নানাবিধ উপায়ে অনুপকারী নির্গুণ পুরুষের জন্য স্বার্থশূন্যভাবে কার্য্য করে।

বিশদব্যাখ্যা। পুরুষার্থ সম্পাদনেই প্রকৃতির প্রবৃত্তি, একথা স্বীকার করিলেও প্রশ্ন হইতে পারে যে, নর্ত্তকী সভ্যগণের সন্তুষ্টি সম্পাদন করিয়া যেরূপ স্বার্থ লাভ করে, কিঙ্করী যেমন নানারূপে পরিচর্য্যা করিয়া প্রভু হইতে উপকার প্রাপ্ত হয়, প্রকৃতিও তদ্রূপ পুরুষ হইতে কোনরূপ উপকার পায় কি না? যদি উপকার না থাকে, তবে নর্ত্তকী-দৃষ্টান্তে নিবৃত্তিও হওয়া অনুচিত। স্বার্থ-সিদ্ধি বশেই নর্ত্তকীর প্রবৃত্তি, কেবল সভার পুরুষগণকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য নহে। অতএব প্রকৃতিরও পুরুষার্থ সম্পাদনে কোননা কোনপ্রকার স্বার্থ আছে, সন্দেহ নাই। প্রশ্নানুসারে এই নবশঙ্কা উদিত হইলে, প্রত্যুত্তর দিবার জন্য এই কারিকার অবতারণা। সর্ব্বত্রই যে স্বার্থসিদ্ধি একটা স্বতন্ত্র চাই, এরূপ নিয়ম হইতে পারে না। সভ্য পুরুষদিগকে সন্তুষ্ট করাই স্বার্থ হইতে পারে, তজ্জন্যই প্রবৃত্ত হইতেও পারে। আবার নিজের কোনও জাতীয় উপকার না থাকিলেও অপরের উপকার প্রত্যাশায় নিঃস্বার্থ কর্ম্ম করা জগতে অসম্ভব নয়। পুরুষ প্রকৃতি-সঙ্গ জনিত দুইটী ফল প্রাপ্ত হন। অনুরক্ত হইলে ভোগ, বিরক্ত হইলে মোক্ষ। গুণবান্ ব্যক্তি গুণহীনের জন্য নানা উপায়ে উপকার-চেষ্টা করিতে পারে, তাহাতে স্বার্থের সংস্রব না থাকাই দরকার। প্রকৃতিরও পুরুষার্থ সম্পাদনই আবশ্যক। পুরুষ হইতে ফলপ্রাপ্তির আশা নাই। উৎকৃষ্ট কিঙ্করীর লক্ষণ প্রকৃতিতে বিদ্যমান। প্রভুর কার্য্য করিতে হইবে, তজ্জন্য কিছুই প্রার্থনা নাই, এরূপ প্রবৃত্তির ইহাই মূলমন্ত্র। পরের উপকার স্বার্থ হইলেও স্বার্থ নয়, কেননা তাহার ফল পরগত। এজন্যই প্রকৃতির আচরণকে অপার্থক, অর্থাৎ স্বার্থবিহীন বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ পরার্থে কার্য্যকরা নিঃস্বার্থ বটে।

প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিদ-
স্তীতি মে মতির্ভবতি।

যা দৃষ্টাস্মীতি পুনর্ন দর্শনমুপৈতি
পুরুষস্য। ৬১

পদপাঠঃ। প্রকৃতেঃ। সুকুমারতরং। ন। কিঞ্চিৎ। অস্তি। ইতি। মে। মতিঃ। ভবতি। যা। দৃষ্টা। অস্মি। ইতি। পুনঃ। ন। দর্শনং। উপৈতি। পুরুষস্য।

ব্যাখ্যা। প্রকৃতেঃ—প্রকৃতির চেয়ে। সুকুমারতরং—অতিশয় কোমল স্বভাব। ন—না। কিঞ্চিৎ—কিছু। অস্তি—আছে। ইতি—এইপ্রকার। মে—আমার। মতিঃ—মনে। ভবতি—হয়। যা...সে (প্রকৃতি।) দৃষ্টা—অপর কর্তৃক দৃষ্টা। অস্মি—হইয়াছি। ইতি—এই প্রকার মনে করিয়া। পুনঃ—আবার। ন...না। দর্শনং...দৃষ্টিপথে পতিত হওয়া। উপৈতি...প্রাপ্ত হয়। পুরুষস্য—পুরুষের। (একবার পুরুষ কর্তৃক ভালরূপে দৃষ্টা হইলে পুনর্ব্বার দৃষ্টিতে উপস্থিত হয় না, এইটুকু প্রকৃতির বিশেষত্ব।)

বঙ্গার্থঃ। প্রকৃতি অপেক্ষা অপর কোনও সুকুমার কিছুই নাই, এইরূপ মনে হয়। কেন না, প্রকৃতি একবার পুরুষ কর্তৃক দৃষ্টা হইয়া "আমাকে দেখিয়াছে" এইরূপ মনে করিয়া আবার পুরুষের সম্মুখে উপস্থিত হয় না।

বিশদব্যাখ্যা। নর্ত্তকী-দৃষ্টান্তে প্রকৃতির নিবৃত্তি বলা হইয়াছে; এখানে চিন্তার বিষয় এই যে, একবার নৃত্য হইতে বিরতা হইয়াও নর্ত্তকী পুনর্ব্বার নৃত্যে প্রবৃত্তা হইয়া থাকে; প্রকৃতিও যদি তাহাই হয়, তবে ত মোক্ষের আশা রহিল না। এই কারিকায় এই চিন্তারই উত্তর দেওয়া হইতেছে। যদিও প্রকৃতি নর্ত্তকী, তথাপি প্রকৃতির স্বভাব কুলবধূর ন্যায় সুকুমার। যদি কখনও কোনও কুলকামিনী অনবধান বশতঃ অসংযত বস্ত্রাদি সত্ত্বে পর-পুরুষের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তবে সে যেমন দ্বিতীয়বার পুরুষ-সমক্ষে উপস্থিত হইতে চায় না, প্রত্যুত দূরে থাকিতেই ভালবাসে, তদ্রূপ প্রকৃতিও নিজের স্বরূপ পুরুষের নিকট বিবৃত করিয়া পুনর্ব্বার সে পুরুষের নিকটস্থ হইতে ইচ্ছা করে না। কাজেই পুনঃ পুনঃ সংসার-নৃত্য উপস্থিত হয় না। মুক্তির পথও অকণ্টক থাকিয়া যায়। প্রকৃতির এই পেশল স্বভাবেই প্রকৃতির সহিত কুলাঙ্গনার তুলনা।

তস্মান্ন বধ্যতেঽদ্ধা ন মুচ্যতে নাপি
সংসরতি কশ্চিৎ।
সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানা-
শ্রয়া প্রকৃতিঃ।

পদপাঠঃ। তস্মাৎ। ন। বধ্যতে। অদ্ধা। ন। মুচ্যতে। ন। অপি। সংসরতি। কশ্চিৎ। সংসরতি। বধ্যতে। মুচ্যতে। চ। নানাশ্রয়া। প্রকৃতিঃ।

ব্যাখ্যা। তস্মাৎ—সেইজন্য। ন—না বধ্যতে—বদ্ধ হয়। অদ্ধা—সাক্ষাৎ। ন—না মুচ্যতে—মুক্ত হয়। ন—না। অপি—ও সংসরতি—সংসরণ লাভ করে। বধ্যতে—বদ্ধ হয়। মুচ্যতে—মুক্ত হয়। চ—ই নানাশ্রয়া—নানাবিধ আশ্রয়া হইয়া প্রকৃতিঃ—প্রধান বা অব্যক্ত।

বঙ্গার্থঃ। যেহেতু প্রকৃতি নানাশ্রয়া হইয়া বদ্ধ হয়, মুক্তি পায় ও সংসরণ লাভ করে সেজন্য পুরুষ সাক্ষাৎসম্বন্ধে বদ্ধ হন না মুক্তি পান না, সংসার লাভও করেন না।

বিশদব্যাখ্যা। পুরুষ অগুণ অপরিণামী হইলে তাঁহার বন্ধইবা কি? মোক্ষইবা কি? পুরুষের মোক্ষ বলিলে কি বুঝিব? মুচ্ ধাতু হইতে মোক্ষ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। মুচ্ ধাতুর অর্থ বন্ধ-বিশ্লেষণ। পুরুষের যদি প্রকৃত পক্ষে বন্ধ না থাকে, তবে মোক্ষইবা কি? আবার বন্ধ থাকিলে, অপরিণামী কেমন করিয়া? বন্ধ গুণ-সঙ্গের পরিণাম বিশেষ। এ তর্কের প্রত্যুত্তর এই শ্লোকে প্রদত্ত হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে পুরুষের বন্ধ-মোক্ষাদি নাই। উহা উপচারিক—অর্থাৎ কল্পিত মাত্র। যুদ্ধে যদি সৈন্যেরা পরাজিত হয় অথবা জয় লাভ করে, তাহাদের সেই জয় পরাজয় রাজার উপর গিয়া পড়ে। তদ্রূপ প্রকৃতির বন্ধ-মোক্ষাদি প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা পুরুষের বলিয়াই বলা হয়। বাস্তবিক তাঁহার বন্ধাদি হইতেই পারে না।

রূপৈঃসপ্তভিরেবতু বধ্নাত্যাত্মানমাত্মনা প্রকৃতিঃ।
সৈব চ পুরুষার্থং প্রতি বিমোচয়ত্যেকরূপেণ। ৬৩

ব্যাখ্যা। রূপৈঃ—ধর্ম্মাদি ভাবের (দ্বারা) সপ্তভিঃ—সাতটীরদ্বারা। (এব—নিশ্চয়ার্থে।) তু—কিন্তু। বধ্নাতি—বদ্ধকরে। আত্মানং—আপনাকে। আত্মনা—(নিজেথেকে) প্রকৃতিঃ—প্রধান। সা—সেই প্রকৃতি। এব—ই। চ—আবার। পুরুষার্থং প্রতি—ভোগ এবং মুক্তির প্রতি। বিমোচয়তি—বিমুক্ত করে। একরূপেণ—একটী ভাব (জ্ঞান) দ্বারা।

বঙ্গার্থঃ। প্রকৃতি আপনা হইতে আপনাকে জ্ঞান ব্যতীত অপর সাতটী রূপ দ্বারা বদ্ধ করে, আবার একমাত্র জ্ঞানদ্বারা পুরুষার্থ সম্পাদিত হইলে আপনাকে মুক্ত করে। (প্রকৃতির বন্ধ-মোক্ষ পারমার্থিক।)

বিশদব্যাখ্যা। প্রকৃতিগত বন্ধ-সংসার-মোক্ষ ইত্যাদি পুরুষে উপচরিত অথবা আরোপিত হয়, কিন্তু প্রকৃতি কি উপায়ে বন্ধমোক্ষ অথবা সংসার প্রাপ্ত হয়েন, তাহা বলা আবশ্যক। এশ্লোকে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অনৈশ্বর্য্য, এইগুলিই শ্লোকোক্ত সাতটী রূপ। এইগুলির দ্বারাই বন্ধ হয়। আবার একমাত্র জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ নামক পরমপুরুষার্থ সম্পন্ন হয়। জ্ঞানোদয় হইলে পুরুষার্থের শেষ প্রকৃতির কর্ত্তব্য সমাপনান্তে অবসর।

এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাস্মি নমে নাহমিত্যপরিশেষং।
অবিপর্য্যয়াদ্বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানং। ৬৪

ব্যাখ্যা। এবং—এইপ্রকারের। তত্ত্বাভ্যাসাৎ—তত্ত্ব অভ্যাস হইতে। ন—না। অস্মি—ক্রিয়াযুক্ত আছি। ন—নাই। মে—আমার অর্থাৎ মন্নিষ্ঠ স্বামিত্ব। ন—নহি। অহং—(কর্ত্তৃত্ববান্) আমি। ইতি—এইরূপ। অপরিশেষং—যেজ্ঞানে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। অবিপর্য্যয়াৎ—বিপর্য্যয়ের অভাব বশতঃ। বিশুদ্ধং—দোষস্পর্শশূন্য। কেবলং—বিপর্য্যয়াদি পরিহীন। উৎপদ্যতে—আবির্ভূত হয়। জ্ঞানং—তত্ত্বজ্ঞান।

বঙ্গার্থঃ। এইরূপে তত্ত্ব বিষয়ক অভ্যাস বশতঃ তত্ত্বসাক্ষাৎকার উপস্থিত হইলে, বিপ-

র্য্যয় না থাকায় আমার ক্রিয়া নাই। "আমার কর্ত্তৃত্ব নাই" "আমার স্বামিত্ব নাই" এই প্রকার বিশুদ্ধ কেবল তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ পায়। (এই জ্ঞানই ত্রিবিধ দুঃখের বিনাশহেতু।)

বিশদব্যাখ্যা। প্রকৃতিগত বন্ধ-মোক্ষাদি পুরুষে উপচরিত, পুরুষ নির্লিপ্ত, এইরূপ তত্ত্ব অবগত হইলে হয় কি? এই প্রশ্নের উত্তরে তত্ত্ববিষয়ক অভ্যাস হইতে তত্ত্বজ্ঞান, তাহা বিশুদ্ধ, কারণ তাহাতে কর্ত্তৃত্ব স্বামিত্ব এবং সক্রিয়ত্ব আত্মায় স্থান পায় না। কর্ত্তৃত্বাদির অপগম হইলে, আত্মার নিত্যবিশুদ্ধতা উপস্থিত হইলে, ত্রিতাপ আরোপ বন্ধ হয়, তাহাকেই মুক্তি বলা যায়। এই জ্ঞান অপরিশেষ, অর্থাৎ নিখিল জ্ঞেয় বস্তু এই সার্ব্বভৌম জ্ঞানে উদ্ভাসিত হয়। এই তত্ত্ব জ্ঞানোদয় তত্ত্বাবগমের ফল।

তেন নিবৃত্ত প্রসবামর্থবশাৎ সপ্তরূপ বিনিবৃত্তাং।
প্রকৃতিং পশ্যতি পুরুষঃ প্রেক্ষকবদবস্থিতঃ স্বচ্ছঃ। ৬৫

ব্যাখ্যা। তেন—সেইহেতুক। নিবৃত্ত প্রসবাং—যাহার প্রসব অর্থাৎ সৃষ্টিকার্য্য নিবৃত্ত হইয়াছে সেই প্রকৃতিকে। অর্থবশাৎ—বিবেক জ্ঞানের সামর্থ্যবশতঃ সপ্তরূপ বিনিবৃত্তাং—ধর্ম্মাদি (জ্ঞান ব্যতীত) অবশিষ্ট সপ্তভাব নিবৃত্তিহইয়াছে যাহার, তাহাকে। প্রকৃতিং—প্রকৃতিকে। পশ্যতি—দেখে। পুরুষঃ—জীব। প্রেক্ষকবৎ—সাক্ষীস্বরূপ। অবস্থিতঃ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। স্বচ্ছঃ—নির্ম্মল।

বঙ্গার্থঃ। তত্ত্বজ্ঞান হইলে, প্রকৃতি আর কার্য্য প্রসব (সেই জ্ঞানী পুরুষের প্রতি) করেন না, তাঁহার ধর্ম্মাদি সপ্তভাব নিবৃত্ত হয়, কারণ বিবেক জ্ঞানের সামর্থ্যই ঐরূপ। তখন সাক্ষীপুরুষ নির্ম্মল ভাবে স্বস্বরূপে অবস্থিত হইয়া প্রকৃতিকে দর্শন করেন।

বিশদব্যাখ্যা। ভোগ এবং মোক্ষ প্রকৃতির কার্য্য, উহা হইলেই অধিকার সমাপ্ত হইল। অতএব প্রসব করাও নিবৃত্ত হইল। তত্ত্বজ্ঞানের অভাব (ভ্রমজ্ঞান) বশতঃই ধর্ম্মাদি সপ্তভাব বিদ্যমান থাকে। তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইয়া ভ্রমজ্ঞান দূর হইলে সপ্তভাবও নিবৃত্ত হইবে। কারণ বিনাশ হইলে কার্য্যও সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হয়। স্বচ্ছ বা নির্ম্মল বলিলে রজস্তমোবৃত্তি-কলুষিত বুদ্ধির সংস্রবশূন্য বুঝিতেহইবে। সাত্ত্বিকী বুদ্ধির সম্পর্ক চাই, নচেৎ প্রকৃতি দর্শন ঘটে না।

দৃষ্টা ময়েত্যুপেক্ষক একোদৃষ্টাহমিত্যুপরমত্যন্যা।
সতিসংযোগেঽপি তয়োঃ প্রয়োজনং নাস্তি সর্গস্য। ৬৬

ব্যাখ্যা। দৃষ্টা—অবলোকিতা। ময়া—আমাকর্ত্তৃক। ইতি—এই জন্য। উপেক্ষকঃ—অবহেলাকারী। এক—একজন। (পুরুষ) দৃষ্টা—(পূর্ব্ববৎ) অহং—আমি। ইতি—এই রূপে। উপরমতি—বিরত হয়। অন্যা—অপর। (প্রকৃতি।) সতিসংযোগেঽপি—সংযোগ থাকিলেও। তয়োঃ—তাহাদের উভয়ের। (প্রকৃতিপুরুষের।) প্রয়োজনং—দরকার। নাস্তি—নাই। সর্গস্য—সৃষ্টির।

বঙ্গার্থঃ। "আমি দেখিয়াছি" মনে করিয়া পুরুষ উপেক্ষা করেন, প্রকৃতিও "আমাকে দেখিয়াছে" ভাবিয়া বিরতা হয়। তাহাদের পরস্পর সংযোগ থাকিলেও সৃষ্টির কোনও প্রয়োজন নাই। (ভোগ এবং অপ-

বর্ণ জন্যই সৃষ্টি, সংযোগ সঙ্গে হয় বলিয়া অনাবশ্যক স্থলে সংযোগ থাকিলে হইবে না)

বিশদব্যাখ্যা। প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ জন্য সৃষ্টি হয়, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এখন আবার বলা হইতেছে,পুরুষের জ্ঞানোদয় হইলে প্রকৃতির সৃষ্টি কার্য্য নিবৃত্ত হয়। ইহা আপাততঃ বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে। সংযোগ হইল প্রকৃতির ভোগ্যত্ব—যোগ্যতা, ও পুরুষের ভোক্তৃত্ব-যোগ্যতা। এতদুভয়ের যোগ্যতার নিবৃত্তি নাই, সৃষ্টির নিবৃত্তি হইবার কারণ কি? এ শঙ্কার প্রত্যুত্তর এই কারিকায় দেওয়া হইল। সংযোগ থাকিলেই সৃষ্টি হইবে এমন নহে, পুরুষার্থ হেতুক সংযোগই সৃষ্টির কারণ। পুরুষার্থ সম্পূর্ণ হইলে শুধু সংযোগে সৃষ্টি হইতে পারে না। পুরুষ প্রকৃতিকে দর্শন করিলে আর প্রাকৃতিক কার্য্যে সংসৃষ্ট হইতে ইচ্ছা করেন না। প্রকৃতিও সুকুমারতা বশতঃ একবার দেখাদিলে আর নিকটস্থ হইতে চাহেন না, কাজেই সৃষ্টি হইতে পারে না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আবশ্যক থাকিলেই প্রবৃত্তি। পুরুষার্থ ব্যতীত অন্য কিছু আবশ্যকও নাই।

সম্যগ্ জ্ঞানাধিগমাৎ ধর্ম্মাদীনামকারণপ্রাপ্তৌ।
তিষ্ঠতি সংস্কারবশাচ্চক্র ভ্রমিবদ্ধৃত শরীরঃ। ৬৭

ব্যাখ্যা। সম্যক্ জ্ঞানাধিগমাৎ—সম্যক্ প্রকারে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে। ধর্ম্মাদীনাং—ধর্ম্মাদি সকলের। অকারণপ্রাপ্তৌ—অকারণত্ব প্রাপ্তৌ ইত্যর্থে স্থাদি প্রধান নির্দ্দেশঃ।) অকারণত্ব অর্থাৎ কারণ নহে, এই প্রকার অর্থই হয়। তিষ্ঠতি—থাকিবে। সংস্কার বশাৎ—সংস্কার থাকে বলিয়া। (বাচস্পতি মতে সংস্কার শব্দে 'অবিদ্যা জনিত সংস্কার।)চক্রভ্রমিবৎ—চাকার ভ্রমণের মত। ধৃতশরীর—শরীর ধারণ করিয়া।

বঙ্গার্থঃ। সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে ধর্ম্মাদির বন্ধজন্মাইবার কারণত্ব বিনষ্ট হইলেও প্রারব্ধ পরিসমাপ্য সংস্কারবশে জ্ঞানী শরীর ধারণকরেন। যেমন কুলালের ব্যাপার নিবৃত্ত হইলেও বেগাখ্য সংস্কারবশতঃ কুমারের চাকা আপনাআপনি ঘুরিতে থাকে, তদ্রূপ ধর্ম্মাদির বন্ধ্যত্ব হইলেও অবিদ্যাসংস্কার বলে শরীর ধারণ হয়।

বিশদব্যাখ্যা। তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হইলে শরীর কারণ ধর্ম্মাদির ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়, তখন দেহ পতনই সম্ভব। তাহা হইলে শাস্ত্রে যে জীবন্মুক্ত ব্যক্তির উল্লেখ আছে,তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়। কেন না জ্ঞান হইলে জীবন থাকা সম্ভব নয়। যদি বল,কর্ম্মভোগের জন্য শরীর ধারণ, তবে অনন্ত কর্ম্ম ভোগে অনন্তকাল কাটিল, তত্ত্বজ্ঞানে মোক্ষ, এ প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হইল। এতাদৃশ শঙ্কার সমাধানার্থে এই শ্লোক। ধর্ম্মাদির সামর্থ্য লোপ হইলেও শরীরধারণ প্রারব্ধ-কর্ম্ম-সংস্কারবশতঃ হয়। জ্ঞানে প্রারব্ধ ব্যতীত অপর কর্ম্ম বিনষ্ট হয়,প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগে অতিবাহিত করিতেহয়।

প্রাপ্তে শরীর ভেদে চারিতার্থত্বাৎ প্রধান বিনিবৃত্তৌ।
ঐকান্তিকমাত্যান্তিকমুভয়ং কৈবল্যমাপ্নোতি। ৬৮

ব্যাখ্যা। প্রাপ্তে—প্রাপ্ত হইলে (উপস্থিত হইলে।) শরীরভেদে—দেহবিনাশ।

চরিতার্থত্বাৎ—প্রয়োজন সমাপ্ত হয় বলিয়া। প্রধান বিনিবৃত্তৌ—সেই পুরুষের প্রতি প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্তি হইলে। ঐকান্তিকং—অবশ্যম্ভাবী। আত্যন্তিকং—অবিনাশী। উভয়ং—দুইপ্রকার। কৈবল্যং—মুক্তি অর্থাৎ ত্রিবিধ দুঃখ-বিগম। আপ্নোতি—প্রাপ্ত হয়।

বঙ্গার্থঃ। শরীর বিনাশের পর প্রকৃতির নিবৃত্তি হইলে অবশ্যম্ভাবী অবিনাশী মোক্ষ প্রাপ্ত হন (পুরুষ।)

বিশদব্যাখ্যা। প্রারব্ধ ভোগের পর শরীর পতন, তৎপরে বিদেহ মুক্তি। এই ক্রম বলা হইতেছে। জ্ঞানের পরেও শরীর থাকিলে কোন্ সময়ে মোক্ষ হইবে? এই প্রারব্ধ ভোগান্তে দেহপাত, পরে চির শান্তি।

পুরুষার্থ জ্ঞানমিদং গুহ্যং পরমর্ষিণা
সমাখ্যাতং।
স্থিত্যুৎপত্তিপ্রলয়াশ্চিন্ত্যন্তে যত্র
ভূতানাম্। ৬৯

ব্যাখ্যা। পুরুষার্থ জ্ঞানং—পুরুষার্থ সাধক জ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান) প্রতিপাদক সাংখ্য-শাস্ত্র। (লক্ষণয়া।) ইদং—এই। গুহ্যং—গোপনীয় অথবা দুরধিগম্য। পরমর্ষিণা—ঋষিপ্রবর কপিল কর্তৃক। সমাখ্যাতং—বিস্তৃতরূপে কথিত। স্থিত্যুৎপত্তিপ্রলয়াঃ—স্থিতি, উৎপত্তি, এবং প্রলয়। চিন্ত্যন্তে—অর্থাৎ বিবেচিত হয়। যত্র—যেশাস্ত্রে। ভূতানাং—প্রাণিগণের। (তাৎপর্য্যতঃ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের।)

বঙ্গার্থঃ। এই মোক্ষ কারণ তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিপাদক সাংখ্যশাস্ত্র মহামুনি কপিল বলিয়াছিলেন। এই শাস্ত্রে বিশ্বের উৎপত্তি স্থিতি, ভঙ্গ ইত্যাদি বিষয় বিশেষরূপে বিচারিত হইয়াছে।

বিশদব্যাখ্যা। সাংখ্য-জ্ঞানের আদি আচার্য্য ভগবানের পঞ্চমাবতার কপিল। অতএব ভগবদ্বাক্য বলিয়া এই শাস্ত্র পরম শ্রদ্ধেয়। স্বকপোল-কল্পিত বলিয়া লোকে উপেক্ষা করিতে পারে, এই জন্য গ্রন্থকার নিজের দায়িত্ব প্রতিপালন করিয়াছেন।

এতৎ পবিত্রমগ্র্যং মুনিরাসুরয়ে-
হনুকম্পয়া প্রদদৌ।
আসুরিরপি পঞ্চশিখায় তেন চ
বহুধাকৃতং তন্ত্রং।
শিষ্য পরম্পরয়াগতমীশ্বরকৃষ্ণেণ
চৈতদার্য্যাভিঃ।
সংক্ষিপ্তমার্য্যমতিনা সম্যগ্বিজ্ঞায়
সিদ্ধান্তিতং। ৭০—৭১

বঙ্গার্থঃ। এই পবিত্র শ্রেষ্ঠ সাংখ্যশাস্ত্র কপিল মুনি আসুরি নামক ঋষিকে প্রদান করিয়াছিলেন। আসুরি পঞ্চ শিখাচার্য্যকে দান করেন। পঞ্চশিখ কর্তৃক অনেকগুলি গ্রন্থও রচিত হয়। শিষ্যপরম্পরায় ঈশ্বর কৃষ্ণ পর্য্যন্ত আসিলে মতিমান্ ঈশ্বর কৃষ্ণ সম্যক্ প্রকারে জানিয়া আর্য্যাছন্দে সংক্ষেপে নিবদ্ধ করেন।

বিশদব্যাখ্যা। মুনি-বাক্যে বিশ্বাস করাযায়, কিন্তু ঈশ্বর কৃষ্ণের কথার প্রামাণ্য কি? এই আশঙ্কায় বলা হইতেছে, শিষ্য-পরম্পরা ক্রমে ঋষি হইতে ঈশ্বর কৃষ্ণ এ গ্রন্থের অধিকারী হইয়াছেন। এ দুইটী শ্লোক ঈশ্বর কৃষ্ণের রচিত নয় বলিয়া অনেকে বলেন। সম্ভবতঃ শিষ্যের রচনা।

সপ্তত্যাং কিল যেঽর্থাস্তেঽর্থা কৃৎ-
স্নস্য ষষ্ঠিতন্ত্রস্য।
আখ্যায়িকা বিরচিতাঃ পরবাদ
বিবর্জ্জিতাশ্চাপি। ৭২

বঙ্গার্থঃ। সপ্ততিতে (৭০ শ্লোক বিশিষ্ট এই কারিকা গ্রন্থে) যে সকল পদার্থ নির্ণীত হইয়াছে, ষষ্ঠিতন্ত্র নামক সাংখ্য-প্রবচনের প্রতিপাদিত পদার্থও সেইগুলি, তবে সাংখ্য-প্রবচনের চতুর্থ অধ্যায়ে যে সকল আখ্যায়িকা বলা হইয়াছে এবং পঞ্চ অধ্যায়ে (পরপক্ষ নির্জ্জয়াধ্যায়ে) যে সকল পরমত বলা হইয়াছে, তাহা এ গ্রন্থে বলা হইল না।

বিশদব্যাখ্যা। এই শ্লোক হইতে মূল সাংখ্যদর্শনের আভাস পাওয়া যায়। সাংখ্য-প্রবচনের চতুর্থ অধ্যায় ও পঞ্চমাধ্যায়ের পূর্ব্বপক্ষমত এ গ্রন্থে নাই। অপর সাংখ্য-রহস্য সংক্ষেপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। মূল সাংখ্য দর্শনের প্রাচীনতা অনেকে অস্বীকার করেন। তাঁহারা হিন্দু-পত্রিকায় ষষ্ঠ বর্ষের "সাংখ্যদর্শন ও বিজ্ঞানভিক্ষু" প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। এখানে বিস্তৃত বলিয়া সে সকল কথার অবতারণা করা গেল না। কারিকা গ্রন্থ প্রামাণ্যযুক্ত, সমাজের আদরেরও বটে। ঈশ্বর কৃষ্ণ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতিরও বহু পূর্ব্ববর্ত্তী সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ-কারিকা ব্যাখ্যায় আমরা অনেক স্থলেই তত্ত্বকৌমুদী রচয়িতা বাচস্পতি মিশ্রের মত গ্রহণ করিয়াছি; গৌড়পাদ অথবা বিজ্ঞানভিক্ষুর মত গ্রহণ করি নাই; তবে স্থানে স্থানে সংক্ষেপে ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছি মাত্র। কারিকাগ্রন্থের ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল।

সাংখ্যদর্শন সমাপ্ত।

ধন্যাষ্টকম্।

১

তজ্জ্ঞানং প্রশমকরং যদিন্দ্রিয়াণাং
তজ্জ্ঞেয়ং যদুপনিষৎসু নিশ্চিতার্থং
তে ধন্যা ভুবি পরমার্থ নিশ্চিতেহাঃ—
শেষাস্তু ভ্রমনিলয়ে পরিভ্রমন্তি।

২

আদৌ বিজিত্য বিষয়ান্ মদমোহ রাগ
দ্বেষাদি শত্রুগণ মাহৃতযোগরাজ্যাঃ—
জ্ঞাত্বাঽমৃতং সমনুভূয় পরাত্মবিদ্যা—
কান্তাসুখা বত গৃহে বিচরন্তি ধন্যাঃ।

৩

ত্যক্ত্বা গৃহে রতিমতো গতিহেতুভূতং
আত্মেচ্ছয়োপনিষদর্থরসং পিবন্তঃ
বীতস্পৃহা বিষয়ভোগপদে বিরক্তাঃ
ধন্যাশ্চরন্তি বিজনেষু বিরক্তসঙ্গাঃ॥

৪

ত্যক্ত্বা মমাহমিতি বন্ধ করে পদে দ্বে
মানাবমানসদৃশাঃ সমদর্শিনশ্চ—
কর্ত্তারমন্যমবগম্য তদর্পিতানি—
কুর্ব্বন্তি কর্ম্মপরিপাক ফলানি ধন্যাঃ॥

৫

ত্যক্ত্বৈষণাত্রয়মবেক্ষিত মোক্ষমার্গাঃ
ভৈক্ষ্যামৃতেন পরিকল্পিত দেহযাত্রাঃ
জ্যোতিঃ পরাৎ পরতরং পরমাত্মসংজ্ঞং
ধন্যা দ্বিজা রহসি হৃদ্যবলোকয়ন্তি॥

৬

না সন্ন সন্ন সদসন্ন মহন্ন চাণু—
ন স্ত্রী পুমান্ নচ নপুংসকমেকবীজং
যৈর্ব্রহ্ম তৎ সমনুপাসিত মেকচিত্তা—
ধন্যা বিরেজু রিতরে ভবপাশবদ্ধাঃ॥

৭

অজ্ঞানপঙ্ক পরিমগ্নমপেত সারং
দুঃখালয়ং মরণ জন্ম জরাবসক্তং
সংসার বন্ধন মনিত্যমবেক্ষ্য ধন্যাঃ
জ্ঞানাসিনা তদবশীর্য্য বিনিশ্চয়ন্তি।

৮

শান্তৈ রনন্যমতিভির্মধুর স্বভাবৈঃ
একত্বনিশ্চিতমনোভিরপেত মোহৈঃ—
সাকং বনেষু বিজিতাত্মপদ স্বরূপং
শাস্ত্রেষু সম্যগনিশং বিমৃশন্তি ধন্যাঃ।

৯

অহিমিব জনযোগং সর্ব্বদা বর্জ্জয়েদ্ যঃ
কুণপমিব সুনারীংত্যক্ত্‌কামোবিরাগী—
বিষমিব বিষয়ান্ যঃ মন্যমানো দুরন্তান্
জয়তি পরমহংসো মুক্তিভাবং সমেতি॥

১০

সংপূর্ণং জগদেব নন্দনবনং সর্ব্বেঽপি কল্পদ্রুমাঃ
গাঙ্গংবারি সমস্তবারিনিবহঃ পুণ্যাঃ সমস্তাঃ ক্রিয়াঃ
বাচঃ প্রাকৃতসংস্কৃতাঃ শ্রুতি শিরো বারাণসী মেদিনী—
সর্ব্বাবস্থিতিরস্য বস্তু বিষয়া দৃষ্টে পর-ব্রহ্মণি॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিতং
ধন্যাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

ছায়ানুবাদ।

১

প্রশমিতে পারে, ইন্দ্রিয়গণেরে—
যেই জ্ঞান, সেই প্রকৃত জ্ঞান।
উপনিষদেতে, যথাবিধিমতে—
[illegible] জ্ঞেয়, সেই জ্ঞান [illegible]

ধন্য তারা—পরমার্থে বিনিশ্চল চেষ্টা যাহাদের।
শেষ যারা,--ভ্রমময় সংসারেতে ভ্রমে ভুগে ফের।

২

করিয়া বিষয় জয়, কামআদি রিপুচয়
বীর্য্যবশে পরাজিয়া, যোগরাজ্য সংগ্রহিয়া
জানিয়া মোক্ষের তত্ত্ব, অনুভব করি সত্য,
আত্মবিদ্যাকান্তা ল'য়ে, সুখে পরিতুষ্ট হ'য়ে
ভবনে বিচরে যারা, তারাইত ধন্য।

৩

ত্যজি গৃহ ক্ষেত্র-রতি, যা'হতে চরমগতি
সেই বেদান্তার্থ রস পানকরি স্বেচ্ছা বশ,
বাসনা বিসর্জ্জি মুক্ত, বিষয়ভোগে বিরক্ত,
সঙ্গদিয়া বিসর্জ্জন, বিজনে বিনষ্ট মন,
বিচরে সানন্দ যারা তারাইত ধন্য।

৪

'আমি'ও'আমার'জ্ঞান জীবের বন্ধনিদান
ত্যজিয়া এ দুটি রঙ্গে ভাসিয়া জ্ঞানতরঙ্গে,
মানে আর অপমানে মনে মনে সম জানে,
উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট দুয়ে সমচ'খে নিরখিয়ে,
নিজ হ'তে কর্ত্তা অন্য জানিয়া, আপনি ধন্য,
কর্ম্মপরিপাক মত লভিয়া ফল সতত,—
জগৎকর্ত্তার দত্ত (দাসভাব বা প্রভুত্ব)
সুখমনে করেন পালন।

৫

পুত্রাদি ইষণাত্রয় পরিহরি স্বইচ্ছায়,
মোক্ষমার্গ নিরীক্ষণ করিয়া, (প্রফুল্ল মন)
ভিক্ষালব্ধ সুধা দিয়া দেহযাত্রা সমাপিয়া,
পরমাত্ম নাম যাঁর পরমজ্যোতিঃ প্রকার
অন্তরেতে নির[illegible] সেইহারে [illegible],
নিরজনে নির[illegible] [illegible]নিকর।

সৎ যাহা নয়, অসত্ও যা নয়।
নহে সদসৎ, না হ মহৎ,
অণু পরিমাণ— নহে তার মান,
পুরুষ রমণী কিছুই নয়।
নহে নপুংসক, কিন্তু তাহা হায়
বিশাল বিশ্বের বীজ বলে যায় ;
অনির্ব্বাচ্য হেন ব্রহ্ম উপাসনা করিয়াছে যারা,
একচিত্ত ধন্যগণ্য বিরাজিছে।
ভবপাশে দৃঢতর বদ্ধ আছে
ধন্য হ'তে স্বতন্ত্র তাহারা।

৭

অজ্ঞান-কর্দ্দমে সুনিমগ্ন হায়! সারহীন,
জন্মজরামৃত্যু-সম্মিলিত দুঃখালয় দীন,
অনিত্য সংসার-বন্ধ করি দরশন,
জ্ঞান-অসি আঘাতনে করিয়া ছেদন,
পাশমুক্ত করে বিচরণ,ধন্যই তাহারা।

৮

অনন্তমানস যাঁরা—শান্তিরসে প্লাবিত অন্তর,
অদ্বৈত নিশ্চয়ে মন,অপগত মোহ-তমোবর ;
মধুর স্বভাব,যাঁরা ত্যজিয়া বিভব বনবাসী—
তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রে আত্মতত্ত্ব-
অভিলাষী
রাত্রি দিন বিচারনিরত,
আত্মজ্ঞান-আশে পিপাসিত
ভবধামে ধন্য তাঁরাইত।

৯

জনসমাগম আশীবিষ সম—
যে জন সতত করে পরিহার,
হরিণনয়না ললনা নিরখি
শব সম মনে জ্ঞান হয় যার,
দুরন্ত বিষয়দল বিষের সমান
বিরাগে বিরক্তচিত্ত করে অনুমান
মোক্ষভাবে অধিষ্ঠিত সেই জ্ঞানালয়
"পরহংস" নামধারী, তার হ'ক্ জয়!!

১০

সকল জগৎ হয় নন্দন কানন,
কল্পপাদপের সম সর্ব্ব শাখিগণ,
গাঙ্গেয় সলিল জলাশয়ে বারিচয়
সকল ক্রিয়াই পুণ্য কার্য্য পুণ্যময়।
প্রাকৃত সংস্কৃত কিম্বা সমস্ত বচন
বেদান্ত-বাদের সম, নিরখে নয়ন
এই যে মেদিনী, পুণ্যতীর্থ বারাণসী,
জগতের বস্তুজাত ব্রহ্ম অবিনাশী,
পূর্ণ হ'লে সাধকের ব্রহ্ম দরশন,
এইমত চিন্তা চিত্তে উপজে তখন।
পরমহংস শঙ্করাচার্য্যবিরচিত
ধন্যাষ্টক সমাপ্ত।

কস্যচিদ্ দীনস্য।

ভূ-গোল পরিচয়।

৬ পাঠ। ১ম প্রপাঠক।

মণ্ডল বর্ণন।

দ্বাদশ রাশি ব্যতীত অপর মণ্ডলগণের কোন উল্লেখ প্রচলিত হিন্দু জ্যোতিষ গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। এজন্য পাশ্চাত্য সুশিক্ষিত সম্প্রদায় বিবেচনা করেন যে,হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদগণ

ভ-চক্র ব্যতীত ভ-গোলের অপর অংশ পর্য্যবেক্ষণ করেন নাই। এই নিন্দাবাদ কলঙ্কের কথা বটে। হিন্দু-জ্যোতির্ব্বিদগণের এই কলঙ্ক আচ্ছাদনার্থে মহামতি ব্রেনাণ্ড বলেন, যে, বেদ-বিহিত ক্রিয়া কলাপের ক্ষণ নির্ণয়ে গ্রহগণের গতি পরীক্ষায় রাশিচক্রে হিন্দু-চিত্ত সতত নিবিষ্ট থাকিত। প্রাচীন চীন জাতির ন্যায় ভ-গোলের অপর ভাগের সুশোভন তারকামালার তালিকা প্রকটনে হিন্দু চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই। তাঁহাদিগের দৃষ্টি রাশি নক্ষত্র হইতে বিক্ষিপ্ত হইলে বিনা যান্ত্রিক সাহায্যে হিন্দু গণিত শাস্ত্র পর্য্যবেক্ষণ মূলে সুবিশুদ্ধ ফলপ্রদ হইত না। মহামতি ব্রেনাণ্ড পূর্ব্বপক্ষের নিন্দাবাদ স্বীকারে উত্তর পক্ষ সমর্থনে অতি বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা প্রদর্শন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু শিশুমার মণ্ডল, সপ্তর্ষিমণ্ডল, ব্রহ্মমণ্ডল ত্রিশঙ্কু মণ্ডল, কাল পুরুষ মণ্ডল আদি কয়েকটী অপর মণ্ডল নাম পুরাণাদিতে পরিলক্ষিত হয়। কোন হিন্দু জ্যোতিষ গ্রন্থ হইতে এই সকল মণ্ডলের নাম গৃহীত হইয়া থাকিবে। তবে হিন্দু-জ্যোতিষ গ্রন্থ প্রায়শঃ বিনষ্ট বা বিলুপ্ত হইয়াছে, সুতরাং প্রচলিত হিন্দু জ্যোতিষগ্রন্থাদিতে মণ্ডলগণের নামের অভাব দৃষ্ট হয় বলিয়া পাশ্চাত্য সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করা সুসঙ্গত নহে।

দ্বাদশ রাশি ব্যতীত উত্তর ভ-গোলার্দ্ধে ২১টী ও দক্ষিণ ভ-গোলার্দ্ধে ১২টী মণ্ডল এই ৩৩টী প্রাচীন মণ্ডল নাম পাশ্চাত্য গ্রন্থে লক্ষিত হয়। ইদানীং দিনেমার-কুল-তিলক টাইকো নব নব মণ্ডল নাম সৃষ্টির পথ প্রদর্শন করেন এবং ব্রো বেয়ার বোড প্রভৃতি জ্যোতিষীগণ তৎপথাবলম্বী হইয়া ক্রমে ৫৯টী নব মণ্ডল নাম যোগ করিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ নব মণ্ডল নাম ব্যবহৃত হয় না। মণ্ডল তালিকায় নব মণ্ডলগুলি তিল চিহ্নিত রহিল।

পাশ্চাত্য মণ্ডল তালিকা। (১)

I.	II.	III.	IV.
১। পরশুমণ্ডল।	১। চিত্রক্রমেন*	১। মিথুন।	১। বনমার্জ্জার*
২। ত্রিকোণমণ্ডল।	২। ব্রহ্মমণ্ডল।	২। কালপুরুষ।	২। কর্কট রাশি।
৩। মেষরাশি।	৩। বৃষরাশি।	৩। শশ মণ্ডল।	৩। শুনকা মণ্ডল।
৪। তিমিমণ্ডল।	৪। ঘটিকা মণ্ডল*	৪। কপোত*	৪। একশৃঙ্গী মণ্ডল*

(১২) ১২ রাশি ২৮ নক্ষত্র এবং ইলবলা নক্ষত্র এবং শিশুমার মণ্ডল চিত্র-শিখণ্ডি মণ্ডল ব্রহ্মর্ষি মণ্ডল কাল পুরুষ মণ্ডল মৃগব্যাধ মণ্ডল ত্রিশঙ্কু মণ্ডল এবং তারাগণ মধ্যে ধ্রুব তারা প্রজাপতি তারা ব্রহ্মহৃৎ তারা অগ্নি তারা লুব্ধক তারা অগস্ত্য তারা আপতারা অপাংবৎস তারা এই কয়েকটী হিন্দু নামে প্রচলিত গ্রন্থাদিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অবশিষ্ট লেখকের কল্পিত বা অনুবাদিত।

I.

৫। যজ্ঞকুণ্ড মণ্ডল।*
৬। যামীমণ্ডল।

II.

৫। স্বর্গাশ্রমমণ্ডল*
৬। আঢ়ক মণ্ডল।*

III.

৫। মৃগব্যাধ।
৬। অর্ণবযান।
৭। চিত্রপটু *
৮। অভ্র।*
৯। টেবিল।*

IV.

৫। কৃকলাশমণ্ডল।*
৬। পতত্রীমীনমণ্ডল*

V.

১। সিংহশাবকমণ্ডল*।
২। সিংহরাশি।
৩। ক্ষুদ্রসর্প মণ্ডল।
৪। ষষ্ঠাংশমণ্ডল *
৫। বায়ুযন্ত্র।*

VI.

১। সপ্তর্ষি মণ্ডল।
২। সারমেয়মণ্ডল*
৩। কবিমুণ্ডমণ্ডল*
৪। কন্যারাশি।
৫। করতল মণ্ডল
৬। কাংস্য মণ্ডল।
৭। ত্রিশঙ্কু মণ্ডল*
৮। মক্ষিকা মণ্ডল।*

VII.

১। শিশুমার মণ্ডল।
২। ভূতেশ মণ্ডল।
৩। তুলারাশি।
৪। শার্দ্দূল মণ্ডল।
৫। মহিষাসুর মণ্ডল।
৬। বৃত্তমণ্ডল।*
৭। ধূম্রাট মণ্ডল।*

VIII.

১। হরকুলেশমণ্ডল।
২। কিরীট মণ্ডল।
৩। সর্প মণ্ডল।
৪। বৃশ্চিকরাশি।
৫। মানদণ্ড মণ্ডল*
৬। দক্ষিণ ত্রিকোণ* মণ্ডল

IX.

১। তক্ষক মণ্ডল।
২। বীণামণ্ডল।
৩। সর্পধারী মণ্ডল।
৪। ধনুরাশি।
৫। দক্ষিণকিরীট*
৬। দূরবীক্ষণ মণ্ডল*
৭। বেদি মণ্ডল।

X.

১। বক মণ্ডল।
২। শৃগাল মণ্ডল*
৩। বাণ মণ্ডল*
৪। গরুড় মণ্ডল।
৫। শ্রবিষ্ঠা মণ্ডল।
৬। মকররাশি।
৭। অনুবীক্ষণমণ্ডল*
৮। সিন্ধু মণ্ডল।*
৯। ময়ূর মণ্ডল।*
১০। অষ্টাংশ মণ্ডল।*

XI.

১। শেফালি মণ্ডল।
২। গোধা মণ্ডল*
৩। পক্ষীরাজ মণ্ডল।
৪। অশ্বতর মণ্ডল।
৫। কুম্ভরাশি।
৬। দক্ষিণমীন মণ্ডল।
৭। সারস মণ্ডল।*
৮। চঞ্চুভৃৎ মণ্ডল।*

XII.

১। কাশ্যপীয় মণ্ডল
২। ধ্রুবমাতা মণ্ডল।
৩। মীনরাশি।
৪। ভাস্কর মণ্ডল।*
৫। সম্পাতি মণ্ডল।
৬। হ্রদমণ্ডল।
৭। গ্রাব মণ্ডল।*

I. ১ম বিথী।

পর্শু মণ্ডল Perseus.

তারা চিহ্ন।	তারা নাম।	পাশ্চাত্য তারা চিহ্ন।	পাশ্চাত্য তারা নাম।	স্থূলত্ব।	সংখ্যা।	তারা বর্ণন।
১	কুঠারপৃষ্ঠ	Alpha.	Merfek.	২·০	১০৪৩	
২	মায়াবতী	Beta.	Algol.	২·২--৩·৭	৯৬১	বহুরূপ

তারা চিহ্ন।	তারা নাম।	পাশ্চাত্য তারা চিহ্ন।	পাশ্চাত্য তারা নাম।	স্থূলত্ব।	সংখ্যা।	তারা বর্ণন।
৩		Gamma.		৩'১	৯৫৭	
৪		Epsilon.		৩'১	১২১৯	বহুরূপ
৫		Zeta.		৫'১	১২০৭	
৬		Delta.	Capout.	৩'২	১২২৯	বহুরূপ
৭	বেণুকা	Rho.	Meduci.	৩'৭	৯৫৩	বহুরূপ
৮		Eta.		৪'০	৮৬১	"
৯		Nu.		৪'০	১১৩৯	
১০		Omicron.		৪'০	১১৩৮	
১১		Tau.		৪'০	৮৮৫	
১২		Iota		৪'১	৯৬২	
১৩		Theta.		৪'৩	৮২৭	
১৪		Upsilon				
১৫		Phi.				
১৬		Psi.				
M.৩৪		M. 34				তারাস্তবক
		ত্রিকোণ মণ্ডল	Triangulium.			
১		Beta.		৩'১	৬৫৬	
২		Epsilon.		৩'৬	৫৫৯	
৩		Gamma.				
		পাশ্চাত্য মেষরাশি	Arus.			
১	অমল যোগ তারা অশ্বিনী	Alpha.	Hamal.	২'১	৬৪৮	
২	শিরস্ত্রাণ	Beta.	Sheratap.	২'৮	৫৭৭	
৩	যোগ তারা ভরণী			৪'৩	৮৭২	
৪	মুখরশ্মি	Gamma.	Mesar thim.	৫'৩	৫৭২--৭৩	প্রথম আবিষ্কৃত যোগ তারা
৫		Delta.		৪'৫	৯৮৬	
৬		Mu.				
৭		Epsilon.				

তারা চিহ্ন।	তারা নাম।	পাশ্চাত্য তারা চিহ্ন।	পাশ্চাত্য তারা নাম।	স্থূলত্ব।	সংখ্যা।	তারা বর্ণন।
৮		Zeta.				
৯		36.				
১০		Tau.				

মন্তব্য (১) ১।২।৪ তারা = অশ্বিনী নক্ষত্র

(২) ৩।৬।৯ তারা = ভরণী নক্ষত্র (Musca.)

তিমিমণ্ডল Cetus.

তারা চিহ্ন।	তারা নাম।	পাশ্চাত্য তারা চিহ্ন।	পাশ্চাত্য তারা নাম।	স্থূলত্ব।	সংখ্যা।	তারা বর্ণন।
১	মার	Omicron.	Mira.	২·০--৭·০	৭২০	
২		Beta.	Dephda.	২·১	১৯৬	
৩	মীনকেতন	Alpha.	Mencar.	২·৭	৯৪৯	
৪		Gamma.	Kaffaldhina.	৩·৬	৩৩২	
৫		Eta.	Dheneb.	৩·৬	৩৩২	
৬	তিমিপুচ্ছ	Iota.	Dheneb Koitos.	৩·৬	৬২	
৭		Tau.		৩·৬	৫৩৬	
৮		Theta.		৩·৮	৪২০	
৯		Upsilon		৩·৮	৬১৮	
১০		Zeta.	Bebukoitos.	৩·৯	৫৬৫	
১১		Delta.		৪·১	৮১১	
১২		Pi.		৪·৩	৮৪৭	
১৩		Xiz.		৪·৫	৭৬০	

যজ্ঞকুণ্ড মণ্ডল Fornax.

তারা চিহ্ন।	তারা নাম।	পাশ্চাত্য তারা চিহ্ন।	পাশ্চাত্য তারা নাম।	স্থূলত্ব।	সংখ্যা।	তারা বর্ণন।
১		Alpha.		৩·৮	৯৯৭	
২		Beta.				বহুরূপ
৩		Nu.				

(ক্রমশঃ)

যোগী কে ?

(Brahmacharin পত্র হইতে
পদ্যানুবাদিত)

মস্তকে নিবিড় জটা, ভস্ম-মাখা অঙ্গ-ছটা,
সুদীর্ঘ শ্মশ্রুর ঘটা, সেও যোগী নয় ;

পরার্থ-জীবনে যার
আমিত্বের সুপ্রসার—
সর্ব্বভূতে একাকার,
সেই যোগী হয়। ১

অথবা মুণ্ডিত-মুণ্ড,
গুম্ফ-শ্মশ্রুশূন্য তুণ্ড,
গেরুয়া-করোয়া-দণ্ড,
তবু যোগী নয়;
পরার্থ-জীবনে যার
আমিত্বের সুপ্রসার—
সর্ব্বভূতে একাকার,
সেই যোগী হয়। ২

প্রাণায়ামে প্রাণ-অন্ত,
আসন-মুদ্রায় শ্রান্ত,
নয়নে নিমেষ ক্ষান্ত,
তবু যোগী নয়;
পরার্থ-জীবনে যার
আমিত্বের সুপ্রসার—
সর্ব্বভূতে একাকার,
সেই যোগী হয়। ৩

বিভূতি দেখায় কত,
ভোজ-ভেল্কী জানে শত,
করে চিত্ত চমৎকৃত,
তবু যোগী নয়;
পরার্থ-জীবনে যার
আমিত্বের সুপ্রসার—
সর্ব্বভূতে একাকার,
সেই যোগী হয়। ৪

মঠে রাজপূজা যার,
দানে রাজ-ব্যবহার,
শিষ্য রাজা-জমিদার,
তবু যোগী নয়;
পরার্থ-জীবনে যার
আমিত্বের সুপ্রসার—
সর্ব্বভূতে একাকার,
সেই যোগী হয়। ৫

সাধি সদা তীব্র তপ,
দেহ দহি যে মানব
লভে খ্যাতি-স্তুতি-স্তব,
সেও যোগী নয়;
পরার্থ-জীবনে যার
আমিত্বের সুপ্রসার—
সর্ব্বভূতে একাকার,
সেই যোগী হয়। ৬

কি দারিদ্র্য কি সম্পদ,
নগ্নতা কি পরিচ্ছদ,
যথার্থ যোগিত্ব-পদ
কিছুতে না হয়।
মন-বাক্য-ব্যবহার
শমিত দমিত যার,
যোগ-মার্গে অধিকার,
তাহারি নিশ্চয়। ৭

আমিত্বের প্রসারার্থ
পরার্থে মিলায়ে স্বার্থ,
লভি যেবা পরমার্থ,
প্রেমানন্দভোগী;
সুখেতে যে অচঞ্চল,
দুঃখেতে যে অবিহ্বল,
শুভাশুভে অবিকল,
সেই বটে যোগী। ৮

তিরস্কার পুরস্কার,
নিগ্রহানুগ্রহ আর,
কিছুতে না চিত্ত যার
সুপথ-বিয়োগী,

পরার্থ-জীবনে যার
আমিত্বের সুপ্রসার—
সর্ব্বভূতে একাকার,
সেই বটে যোগী। ৯

মিত যার পানাহার,
মিত কার্য্য—নিদ্রা আর;
কায়-মন-বাক্য যার
সুমিত সংযত,
সত্যস্বরূপেতে আর
আত্মসমর্পণ যার,
"যোগী" অভিধান তার
সত্য সুসঙ্গত। ১০

আত্মা সর্ব্বভূতময়,
সর্ব্বভূত আত্মময়,
আমিত্ব-প্রসারে হয়
যাহার প্রেক্ষণ;
ব্যষ্টিগত সর্ব্ব আত্মা
সমষ্টিতে পরমাত্মা,
যে পায় এ ব্রহ্ম-বার্ত্তা,
যোগী সেই জন। ১১

সংসার-সংগ্রামে যার
আগত উপসংহার,
শান্তি-ধাম-সমাচার
প্রাপ্ত যেই জন;
স্বেচ্ছা-সত্তা নাহি যার,
"প্রভোহে! ইচ্ছা তোমার
পূর্ণ হক্" উক্তি যার,
যোগী সেই জন। ১২

শ্রীশঃ———

সাধকের হরি।

সাধকের হরি বিশ্বময়। সাধক তাঁহাকে ইচ্ছাময়, জ্ঞানময়, আনন্দময়, প্রেমময়, পরিশেষে সর্ব্বময় বলিয়াই প্রাণে তৃপ্তি পান, অপার আনন্দ রসে নিমজ্জিত হন। সাধকের হরি অনলে, অনিলে, সলিলে, মরুতলে, তরুমূলে, ফুলে, ফলে সর্ব্বত্র। ভক্তিরসের পূর্ণাবতার প্রহ্লাদ বলিলেন, "হরি যে কেবল বৈকুণ্ঠে বাস করেন তাহা নহে, এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি পদার্থেই তাঁহার অধিষ্ঠান।" ক্রোধপ্রজ্বলিত হিরণ্যকশিপু কহিলেন, "আরে মূর্খ! তোর হরি যদি সর্ব্ব স্থলেই থাকেন, তবে এই স্ফটিকস্তম্ভেও আছেন।" প্রহ্লাদ বিনয়াবনত বদনে উত্তর করিলেন, "জগতের প্রতি পরমাণুতে যাঁহার চিন্মূর্ত্তি বিরাজিত, সেই হরি এখানে আছেন, ইহা আর আশ্চর্য্য কি?" প্রহ্লাদের দৃঢ় বিশ্বাস হরি জগন্ময়। বস্তুতঃ ও তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া হিরণ্যকশিপু পরিশেষে প্রহ্লাদকে "কুলভূষণ" বলিয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপু যে একজন ভক্তি ভাবের সাধক নহেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু তিনি শত্রুভাবে ভগবৎ প্রাপ্তির উচ্চতম আদর্শ, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের হরি প্রাপ্তি শাস্ত্রের অবিসম্বাদীমত। কি কি ভাবে হরি প্রাপ্তি হইতে পারে, তাহা আমরা শাস্ত্র পাঠে অবগত হইতে পারি। "গোপ্যঃ কামাৎ ভয়াৎকংসঃ দ্বেষাৎ চৈদ্যাদয়োনৃপাঃ। সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো!" নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, গোপীগণ কামভাবে ভগবানকে ভজনা করিয়া তৎপদ

প্রাপ্ত হইয়াছে। কংস ভয়ে ভজনা এবং অচ্যুতদ্বেষিনৃপতিবৃন্দ শিশুপাল প্রভৃতি দ্বেষ-ভাবে চিন্তা করিয়া ভগবচ্চরণে স্থানলাভ করিয়াছে। বৃষ্ণিবংশোদ্ভূত ব্যক্তিগণ ভগবৎ কৃষ্ণকে আত্মীয় (ভ্রাতৃ পুত্রাদিরূপে) রূপে গ্রহণ করিয়া চরমে তদ্‌গতি লাভ করিয়াছে। তোমরা ভগবানকে ভালবাসিয়াই তাঁহার হইতে পারিয়াছ, আমরা ভক্তি সাধনা সমাধান করিয়া ভগবানের কৃপা-কণিকা লাভে সমর্থ হইয়াছি। গোপীগণ কৃষ্ণকে চাহিত, "কান্ত" বলিতেই চাহিত। ভ্রাতা, পুত্র বা ভগবদ্‌ভাবে তাহারা কৃষ্ণের অর্চ্চনা করে নাই। তাহারা "জগন্নাথ" কৃষ্ণকে "প্রাণনাথ" বলিয়াই অতুল সুখ-সাগরে ভাসিত। কৃষ্ণের উদ্দেশে তাহাদের অনিবেদিত কিছুই ছিল না। লৌকিক সঙ্কীর্ণতার আবরণ বিদূরিত হইলে যে বিশ্বময় নির্ম্মল প্রেম উদিত হয়, তাহাতে ভগবান্‌কে লজ্জা, ভয়, করিবার অবকাশ থাকে না। গোপীগণ জানিয়াছিল তাহাদের প্রাণেশ্বর ব্রজেশ্বর হরি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বস্থানে। তাহারা যেদিকে চাহিত, সেই দিকেই কৃষ্ণ; কাজেই লজ্জা করিয়া কোথায় লুকাইবে, ভয় করিয়াইবা কোথায় পালাইবে! নবধা ভক্তিলক্ষণের শেষ লক্ষণ "আত্মনিবেদন" তাহাদের আবির্ভূত হইয়াছিল। তাহারা, সুখ, দুঃখ, সম্পৎ, বিপৎ, প্রাণ, মন, কুল, মান, সবই কৃষ্ণের উদ্দেশে অর্পণ করিয়াছিল। কৃষ্ণের সুখ দুঃখ ব্যতীত তাহাদের স্বতন্ত্র একটা সুখ-দুঃখ-জ্ঞান ছিল না। তাহাদের জগৎ প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণময় হইয়াছিল। এই তন্ময় ভাবে মিত্রতা, শত্রুতা, স্নেহ ও নিরবচ্ছিন্ন ভক্তি ইত্যাদি সকল মার্গেরই চরম পরিণতি। কংস ভয়ে ও শিশুপাল হিরণ্যকশিপু প্রভৃতিরা দ্বেষভাবে সর্ব্বস্থানে হরিদর্শন করিতেন। কংসের বিষয়ে শ্রীমদ্‌ভাগবতে দেখিতে পাই, "আসীনঃ সংবিশন্ তিষ্ঠন্ পর্য্যটন্ প্রবদন্ পিবন্। চিন্তয়া নো হৃষীকেশং অপশ্যৎ তন্ময়ং জগৎ।" কংস বসিয়া আছেন, দেখিলেন চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণ, গৃহে প্রবেশ করিতেছেন, গৃহের সর্ব্বস্থানে কৃষ্ণ। দাঁড়াইয়া থাকিয়াও দেখিলেন সমস্ত স্থানে কৃষ্ণ বিরাজিত। বিচরণ করিতে, বাক্যালাপ করিতে—পান ভোজন করিতে—সর্ব্বদা কৃষ্ণচিন্তা অন্তরে উদিত থাকায় যেন জগৎই কৃষ্ণময় দর্শন করিতে লাগিলেন। এখানে তন্ময়তা পরিস্ফুট ভাব ধারণ করিয়াছে। শিশুপালাদির অন্তঃকরণে সর্ব্বদা হরিনির্য্যাতন বাসনা বলবতী ছিল, তাহারা দ্বেষ্য ভগবান্‌কে অনবরত চিন্তা করিয়া তন্ময় হইয়াছিল। বৃষ্ণিগণের আত্মীয় জ্ঞান এবং পাণ্ডবের স্নেহ ভগবান্‌কে বাস্তবিকই বাধ্য করিয়াছিল। পাণ্ডবের আনুগত্য ভগবান্ আপনার অলঙ্কার স্বরূপ বিবেচনা করিতেন। পুরাণের পাঠককে এ কথা বলিতে হইবে না। ভক্তিতে নারদ, শুক, শাণ্ডিল্য, প্রহ্লাদ, ধ্রুব ইত্যাদি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁহারা ভগবান্‌কে ভগবান্ বলিয়াই ভাবিতেন। সকল সাধকই ভক্ত, কেননা পুত্র ভাবেই হউক, আর শত্রু ভাবেই হউক এবং মহামহিম পরমেশ্বর মনে করিয়া হউক, সকলেই ভগবানের চিন্তায় একান্ত অনুরক্ত হইয়া তন্ময়তা এবং পরিণামে তৎপরতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সাধনার রীতি ভিন্ন হইলেও গতি একপ্রকার।

জগতের যাবতীয় বস্তুজাত ভগবানের বিভূতি। পুত্র, মিত্র, শত্রু, সকল ভাবেই ভগবান্‌কে ভাবা যাইতে পারে। যে সাধক যে ভাবে ভগবানের উপর আত্মসমর্পণ করেন, ভগবান্ তাহার সম্মুখে সেই ভাবেই আবির্ভূত হন। ভগবানের মূর্ত্তি সাধকের ভাবময়। সাধকের মনে কৃষ্ণ, সম্মুখেও কৃষ্ণ। আবার ভিতরে কালী বাহিরেও তাহাই। সাধক ভগবান্‌কে যেমন পুত্র, মিত্র, শত্রু ইত্যাদি রূপে ভাবিতে পারেন, তদ্রূপ শ্বেত, কৃষ্ণ, নীল, রক্ত ইত্যাদি বিবিধ বর্ণে এবং দ্বিহস্ত,চতুর্হস্ত, দশহস্ত, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, স্ত্রী, পুরুষ, ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবে ভাবিতে পারেন। স্বতন্ত্র ভূষণে স্বেচ্ছামত সাজাইতে পারেন। শ্বেত, নীল, সকলই ভগবানের স্ফূর্ত্তি। সে সমসাগরে অন্যান্য তরঙ্গ নাই, শ্বেত, কৃষ্ণ সেখানে একই বস্তু। সাধক ভগবানের জলদনীল বর্ণ কল্পনা করিলেন, জগতের "নীল" দেখিলেই তিনি ভগবদ্ ভাবে বিভোর হন। নীল জল দেখিতে শান্তি পান, নীল আকাশে চাতকের মত তাকাইয়া থাকেন। রাধা কৃষ্ণবিরহিণী হইয়া কতবার যে কত কৃষ্ণবর্ণ মস্তকে হৃদয়ে রাখিয়াছিলেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন, পরিশেষে কিছুতেই প্রবল পিপাসার তৃপ্তি না হওয়ায় স্বয়ংই কৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সখীগণকে রাখাল সাজাইয়াছিলেন। ভাগবতচূড়ামণি উদ্ধব স্বয়ং কৃষ্ণবেশে কালাতিপাত করিতেন। ভক্তের চক্ষে বিশ্ব ভগবানের মূর্ত্তি অথবা প্রতিমা। ভক্তিসাধকের পদ্ম পলাশলোচন খুঁজিতে অনেক দিন লাগিয়াছে; কিন্তু যখন ভগবানের অসীম করুণাজলধর ধ্রুবের মস্তকে গলিয়া পড়িল, তখন ধ্রুব বিশ্বময় ভগবানকে দেখিয়াছিল। আর পদ্মপলাশলোচনের অনুসন্ধানে গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্য বাস করিতে হয় নাই। সাধকের হরি, মান, অভিমান, ঘৃণা, লজ্জায় বশীভূত ও ক্ষুদ্র নহেন, বিশাল ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ইচ্ছাময়। ভক্তের পন্থা বড় পরিষ্কৃত। ভক্ত স্বয়ং ভগবানের মহিমামাধুর্য্যে পরিতৃপ্ত হইয়া বিষয়ী হইলেও সন্ন্যাসী। জ্ঞানমার্গের সাধনা, যম নিয়ম, প্রাণায়াম, বেদবিচার কত কঠোরতা পরিপূর্ণ, তাহাতে বিদ্যা চাই, বুদ্ধি চাই,আরও কতকি দরকার হয়। ভক্তির স্রোত জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল তত্ত্বই ভাসাইয়া দেয়, চণ্ডাল ব্যাধ বিচার করে না, প্রাণ গলিলেই মিলিল। বেদার্থবিচার বিষমঝঞ্ঝাটে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না। কেবল সাধকের হরিকে প্রাণ খুলিয়া চিন্তা করা চাই। তাহাতে প্রেমানন্দ আবির্ভূত হইবে। জগদ্দুর্লভ অমৃত-রস আস্বাদনে সাধকের ভবপিপাসা শান্ত হইবে। ভক্তবীর চিনি খাইয়া সেই রাজ্যে রাজত্ব করিতে চাহেন। নির্ব্বাণ পাইতে ভক্তের বাসনা নাই, তিনি সচ্চিদানন্দসমুদ্রে সুখে বাড়বাগ্নির ন্যায় জ্বলিতে চাহেন। সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন,—"চিনি হওয়া ভাল নয় মন চিনি খেতে ভালবাসি।" ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান বৃথা, আবার জ্ঞানহীনের ভক্তি হইতে পারে না। যাহাকে না চিনি,তাহাকে কি ভাল বাসিতে পারি? যাহার কোনও খবর জানি না, তাহাকে কি আত্মসমর্পণ করা যাইতে পারে? যে দিকেই কেন যাই না, জ্ঞান এবং ভক্তি দুই চাই। যে পথের জ্ঞানে পরিনিষ্ঠা ভক্তির স্রোত সেখানে ফল্গু নদীর ন্যায়। যে পথের ভক্তিতে পরিসমাপ্তি, সে পথে জ্ঞান মেঘান্তরস্থ বিদ্যুতের মত। প্রকাশ এবং অপ্রকাশ দেখিয়া দুর্ব্বল সাধক

দলাদলি করিয়া ফেলেন। সাম্প্রদায়িকতা সাধকের হরি আদর করেন না। তাঁহার নিকট অটল সাম্য রাজ্য প্রতিষ্ঠিত। বড় ভক্তি সাধকের জ্ঞান, অগাধ অতলস্পর্শী; যখন ভক্তির জলে দেশ ডুবিয়া গেল, তখন জ্ঞান ভিতরে জ্বলিতে লাগিল। কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া অধ্যাত্ম রাজ্যে প্রবেশ করিতে পায় না। জ্ঞানপ্রচারক ভগবান্ শঙ্কর যে কতদূর ভক্তিসম্পন্ন ভক্তিসাধক ছিলেন, তাহা তাঁহার রচিত স্তবগুলির দুই একটী যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন। জ্ঞানবাদের প্রসিদ্ধ মহামহিম আচার্য্য মহর্ষি পতঞ্জলি যোগ দর্শনে ঈশ্বর প্রণিধান অর্থাৎ ভগবদ্ ভক্তির কথা বলিয়াছেন, জ্ঞানমার্গের অন্যতম গুরু মহামুনি ব্যাসদেব যোগভাষ্যে ভগবদ্ ভক্তির অনুমোদন করিয়াছেন। ভক্তি সম্প্রদায়ের আচার্য্য শাণ্ডিল্যও জ্ঞানকে উপেক্ষা করেন নাই, তবে ভক্তির স্রোতে জ্ঞান মার্গ—লুকায়িত থাকে, কিন্তু উভয়েরই আবশ্যক আছে, এ কথা তিনি মুহুর্মুহুঃ বলিতে ভুলেন নাই। ভক্তাচার্য্য শিরোমণি দেবর্ষি নারদ কেবল ভক্তি বিবর্হিত জ্ঞানের দ্বারা মুক্তির সোপানে একপদও অগ্রসর হওয়া দুষ্কর বলিয়াছেন। ভক্তিরসিক শুকদেব জ্ঞানীর উচ্চতম শিখরে সমাসীন হইতে যোগ্য। ভাগবতে আছে; "দৃষ্ট্বানুযান্ত মৃষিমাত্মজমপ্যনগ্নং, দেব্যোহ্রিয়া পরিদধুর্ন সুতস্য চিত্রং, তদ্বীক্ষ্য পৃচ্ছতি মুনৌ জগদুস্তবাস্তি, স্ত্রীপুংভিদা নতু সুতস্য বিবিক্তদৃষ্টেঃ।" একদা ভগবান্ শুকদেব নগ্নাবস্থায় গমন করিতে ছিলেন, তৎপশ্চাৎ বস্ত্র পরিধান করিয়া তৎপিতা আচার্য্য ব্যাসদেব তাহার অনুসরণে রত ছিলেন। অপ্সরাগণ কোনও সরোবরে উলঙ্গাবস্থায় জলক্রীড়া করিতেছিল, তাহারা উলঙ্গ শুকদেবকে দেখিয়া বস্ত্র পরিধান করিল না, কিন্তু বস্ত্রধারী ব্যাসকে দেখিয়া লজ্জায় সত্বরে বস্ত্র ধারণ করিল। তখন বিস্মিত ব্যাসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা [illegible] করিলে কেন? তাহারা অম্লান বদনে উত্তর করিল, শুকদেব যুবা এবং নগ্ন হইলেও স্ত্রীপুরুষ পার্থক্য তাহার মনে আসে না। সে লজ্জা হইতে দূরে অবস্থিত এবং আপনি স্ত্রীপুরুষের ভেদজ্ঞান হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন, লজ্জাকেও বিদায় দেন নাই।" যাহার স্ত্রী পুরুষ ভেদজ্ঞান অন্তর্হিত হইয়াছে, তাঁহাকে অদ্বৈত ভাবাপন্ন বলা যাইতে পারে, এই উচ্চতম জ্ঞানধনে প্রধান ভক্তেরা ধনী ছিলেন। অনবরত যেখানে ভগবৎচিন্তা, সেখানে অপর জ্ঞানের অবকাশ কই? ভক্তেরা প্রকৃত পক্ষেই অদ্বৈত জ্ঞান সম্পন্ন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে জ্ঞানের বিকাশ হয়, তজ্জন্য অতত্ত্বজ্ঞ আমরা গোল বাধাইয়া বসি। প্রকৃত জ্ঞানী প্রকৃত ভক্তকে প্রেমালিঙ্গন দিয়া থাকেন। সাধকের প্রধান কর্ত্তব্য সম্প্রদায় সিদ্ধ ঘৃণা জিঘাংসাবৃত্তি বিসর্জ্জন দিয়া সার্ব্বজনীন "সাধকের হরি"কে ভজনা করে। যেদিন ভক্তিবাদী এবং জ্ঞানবাদী আনন্দে মাতিয়া কোলাকুলি করিবে, গলাগলি হইবে, সেইদিনই প্রকৃত ভক্ত এবং প্রকৃত জ্ঞানীর পরিচয় পাওয়া যাইবে। বিবাদ বিসম্বাদ সাধকের হরি ভাল মনে করেন না। সাধক মাত্রেই জ্ঞানী হউন, ভক্ত হউন, কর্ম্মী হউন, সকলেরই চরম উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে, এক অপূর্ব্ব সমরসানন্দে মাতিতে হইবে, সমরস স্রোতে ভাসিতে হইবে। সাধকের হরি! দগ্ধ ভারতে আর সম্প্রদায় বিদ্বেষবহ্নি জ্বালাইও না। দীন লেখক শ্রীচরণে প্রার্থনা করে, সুমতি দেও। হরি! মনের ময়লা মুছাইয়া দেও, প্রাণের জ্বালা ঘুচাইয়া দেও, সুমতি দেও, ভারতের প্রতি সদয় হও। দয়াময় নাম যে ডুবিতে চলিল!! অশান্তি উৎপাতে শান্তি দাও। ভ্রান্তি ঘুচাইয়া শান্তি দাও!! বিপদে সম্পদে শান্তি দেও!!

শ্রী ভারতী—

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টারীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড, ১১দশ সংখ্যা।	ফাল্গুন।	১৩০৭ সাল, ১৮২২ শকাব্দা।

মীমাংসা দর্শনম্।

(পূর্ব্বানুবৃত্তম্)

রূপাৎপ্রায়াৎ ॥ ১১ ॥

পদপাঠঃ। রূপাৎ। প্রায়াৎ।

ব্যাখ্যা। রূপাৎ—রূপ অর্থাৎ গুণবাদ-রূপ পূর্ব্বসূত্রোক্তহেতুনিবন্ধন। প্রায়াৎ—(প্রায়িকাৎ ইত্যর্থে) প্রায়িকত্ব হেতুকও। ("স্তেনংমন" ইত্যাদি স্থলে দৃষ্টবিরোধ নাই)।

বঙ্গার্থঃ। "স্তেনংমনঃ" "অনৃতবাদিনী বাক্" এই স্থলে দৃষ্ট বিরোধের শঙ্কা করা হইয়াছিল, তাহা অমূলক। বস্তুতঃ গুণবাদ এখানে বক্তব্য। প্রায়িকত্ব গুণযোগে অনৃতবাদিনী বাক্ এই স্থান সমর্থিত হইয়াছে। কাজেই দৃষ্টবিরোধ দোষ এখানকার যোগ্য নহে।

বিশদব্যাখ্যা। অর্থবাদ বাক্য বিধিশেষ হওয়াই চাই। "স্তেনংমনঃ" এই অর্থবাদ "হস্তে হিরণ্যং ভবতি অথ গৃহ্লাতি" এই বিধির শেষ ভাগ। হিরণ্য ধারণ হস্তেই কর্ত্তব্য, এই তাৎপর্য্যে হিরণ্য প্রশংসা-আবশ্যক হওয়ায়, মন স্তেন না হইলেও তাহাকে স্তেন এবং বাক্ অনৃতবাদিনী না হইলেও তাহাকে মিথ্যাবাদিনী বলা হইতেছে। এইরূপ প্রশংসা লোকে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন "গুরুদেবে কাজ নাই, রামকে ভোজন করাইলেই ভাল হইবে" এখানে রামের প্রশংসা করিবার জন্য এই রাম-প্রশংসা ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে অসংসৃষ্ট গুরুদেবের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হইল। ইহাতে গুরুদেবের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত নয়, কেন না, ঐ বাক্যের দ্বারা রামের প্রশংসা ব্যতীত অপর কিছুই হইতেছে না। আচার্য্যেরা কেহ বলিয়াছেন, হিরণ্য প্রশংসা, কেহ বলেন হস্ত প্রশংসা। মন স্তেন বাণী মিথ্যাবাদিনী, অতএব হিরণ্য ধারণ হস্তেই করা উচিত, এই ভাবে কেহ ব্যাখ্যা করেন। অপরে বলেন হিরণ্য গ্রহণই কর্ত্তব্য, মনস্তেন, হিরণ্যই পবিত্র। এই উভয়বিধ ব্যাখ্যার মধ্যে পণ্ডিতগণ বিচার পূর্ব্বক মুখ্যপক্ষ

আশ্রয় করিবেন, আমরা ব্যাখ্যাতামাত্র সমালোচক নহি। একের নিন্দা করিলে তাৎপর্য্যতঃ অপরের প্রশংসা হয়, ইহা স্বাভাবিক। পূর্ব্বাচার্য্য মীমাংসকগণ বলেন "নহিনিন্দানিন্দিতুং প্রবর্ত্ততে ইতরচ্চ প্রশংসিতুং।" নিন্দা করায় সেই নিন্দিত বস্তুর প্রকৃত নিন্দনীয়ত্ব বুঝায় না, অপর কোনও বিহিত বস্তুর প্রশংসা বুঝাইয়া দেয়। সেই নিন্দার প্রয়োগ গুণবাদ আশ্রয় করিয়াই করিতে হয়। মন স্তেন অর্থাৎ প্রচ্ছন্নরূপ, এই প্রচ্ছন্নরূপতা হস্তে নাই, অতএব হস্ত প্রশস্ত। এখানে মনকে প্রকৃত পক্ষে চৌর্য্যদোষে দোষী বলা উদ্দেশ্য না হইলেও, পরন্তু হস্তকে প্রশংসা করা এই বাক্যের তাৎপর্য্য হইলেও, প্রচ্ছন্নরূপগুণযোগ লক্ষ্য করিয়া হস্তপ্রশংসার পরিচায়ক স্বরূপ মনকে স্তেনকারী বলা হইয়াছে। ঐরূপ বাক্ অনৃতবাদিনী, এখানেও প্রাসিকত্ব গুণ অবলম্বন করিয়া মিথ্যাবাদ দোষ অর্পিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বাক্ মিথ্যাবাদিনী ইহা নিশ্চিত। অতএব তাৎপর্য্য বিষয়ে লক্ষ্য করিলে দৃষ্ট বিরোধাদি কিছুই নাই। অর্থবাদের গভীর তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়াই লোকে সহসা বীতশ্রদ্ধ হয়, কিন্তু নিপুণ নয়নে আলোকন করিলে দেখা যাইবে, বিধির সমর্থন ব্যতীত অর্থবাদ আর কিছুই করে না। অর্থবাদ বিধির ভৃত্যবৎ কার্য্য করে। বৈধ পদার্থের উপকার করিতে সে সর্ব্বদাই প্রস্তুত, তাহাতে অপর অবিহিত বস্তুর নিন্দা করিতে হয়, কিম্বা সেই বৈধ বস্তুর প্রশংসার্থ তাহার গুণ বাড়াইয়াই বলিতে হয়, যাহা হউক না কেন, অর্থবাদ তাহা করিতে ব্যগ্র। এই মূল রহস্যটুকু ধারণা করিলে অর্থবাদের অর্থ বুঝিতে বিশেষ গোল হইবে না। তবে অর্থবাদগুলি চিনিতে পারা চাই, বিধিশেষ অর্থবাদ, এইটুকু মনে রাখিলেই সে কার্য্য সহজ সাধ্য হইয়া দাঁড়াইবে। অপর যে স্থানে দৃষ্টবিরোধ বলিয়া আপত্তি করা হইয়াছে, তাহাও অকিঞ্চিৎকর ইহা জানাইবার জন্য পরসূত্রে তদ্বিষয়ে আলোচনা করা হইতেছে।

দূরভূয়স্ত্বাৎ ॥ ১২ ॥

পদপাঠঃ। দূরভূয়স্ত্বাৎ।

ব্যাখ্যা। দূরভূয়স্ত্বাৎ—দূরবাহুল্য বশতঃ। ('নদদৃশে এই বাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত অদর্শন গৌণ। অতএব দৃষ্ট বিরোধ হইল না।)

বঙ্গার্থঃ। বহু দূরতানিবন্ধন অদর্শন বলা হইয়াছে। (বস্তুতঃ বহু দূরত্ব গুণ যোগে ঐ অদর্শনের অর্থ দর্শনাভাস মাত্র, কাজেই দৃষ্টবিরোধ এ স্থানে প্রযোজ্য নহে।)

বিশদব্যাখ্যা। তস্মাৎ ধূম এবাগ্নে র্দিবা দদৃশে নার্চ্চিঃ, তস্মাৎ অর্চ্চিরেব অগ্নের্নক্তং দদৃশে নধূমঃ এই বাক্যে পূর্ব্বে প্রত্যক্ষবিরোধ মনে করা হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই, বেদে আছে দেখা যায় না, কাজেই এ বেদবাক্য অপ্রমাণ, কেননা প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ বিষয় ইহার প্রতিপাদ্য। পূর্ব্ববাদীর এই কথারই বর্ত্তমান সূত্রে উত্তর দেওয়া হইতেছে। প্রথমতঃ অর্থবাদ বাক্য কোন্ বিধির শেষ তাহা সাব্যস্ত

করা দরকার তাহার পর উহার প্রতিপাদ্য বস্তুর আলোচনা করা যায়, নচেৎ বৃথা পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়। "অগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিঃস্বাহা ইতি সায়ং জুহোতি সূর্য্যো জ্যোতি জ্যোতিঃ সূর্য্যঃস্বাহা ইতি প্রাতঃ, এই দুইটী বিধান আছে। প্রাতঃকালে সূর্য্য মন্ত্রে হোম এবং সায়ংকালে অগ্নিমন্ত্রে হোম করা এই বিধিযুগলের বোদ্ধব্য বিষয়,। এই বিধির শেষ পূর্ব্বোক্ত অর্থবাদ। এই বিধিদ্বয়ের স্তুতি করা অর্থবাদের রহস্য। দিবসে অগ্নির অর্চ্চি দেখা যায় না বলিয়া অগ্নিমন্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক সূর্য্যমন্ত্র দ্বারাই প্রাতঃকালীন হোমসম্পাদন করিতে হইবে এই রূপে স্তুতিকরাই অর্থবাদের অন্তস্তত্ত্ব। আবার রাত্রিতে অর্চ্চিঃই দেখিতে পাওয়া যায় অতএব রাত্রিতে অগ্নি মন্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে এইরূপে প্রয়োগের উপযুক্ততা অবধারণ করাই অর্থবাদের স্তুতি বা প্রশংসা। এখন চিন্তার বিষয় এইটুকু যে অর্চ্চি দেখা যায় না কই? দেখা যায় ইত! এ তর্ক সুদৃঢ় নহে, কেননা দেখা যায় না বলিবার উদ্দেশ্য দুর্দ্দৃশ্যত্ব। বহুদূরে পর্ব্বতাগ্রে আমরা যেসকল বৃক্ষাদি দেখিতে পাই তাহাদের দর্শন যে প্রকৃত তাহা বলিতে পারি না। শতহস্ত দীর্ঘ বিশাল বৃক্ষ তখন আমার নয়নে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তৃণরূপে দৃশ্যমান। আকার পরিমাণ রূপাদির অবধারণা শূন্য অসম্পূর্ণ দর্শনকে দেখা না বলিয়া দর্শনাভাস বলাই যুক্তিসঙ্গত। এখানে ও তাহাই। বহুদূরত্ব নিবন্ধন অগ্নিশিখাদর্শন প্রকৃত দর্শন নহে। অগ্নির প্রকৃতরূপ তখন অনেক দূরে অবস্থিত। যদি অদর্শন অর্থ দূর বাহুল্য বশতঃ দর্শনাভাস বলা গেল তবে আর আপত্তির গতি কি? অর্থবাদ নির্দোষ। অন্য দৃষ্ট বিরোধ পরিহারের জন্য সূত্র রচনা করা হইয়াছে যথা।

অপরাধাৎকর্ত্তুশ্চ পুত্র দর্শনম্।১৩॥

পদপাঠঃ। অপরাধাৎ। কর্ত্তুঃ। চ। পুত্র দর্শনম্।

ব্যাখ্যা। অপরাধাৎ—ব্যভিচারাদি অপরাধ জনিত। কর্ত্তুঃ—জননকর্ত্তা অর্থাৎ উপপতির। চ—ও। পুত্র দর্শনম্—পুত্রদেখা যাইতেছে। (অতএব অজ্ঞেয় অর্থ দুর্জ্ঞেয়।)

বঙ্গার্থঃ। রমণীগণের চরিত্র গত ব্যভিচারাদি অপরাধ বশতঃ উপপতিরও পুত্র দেখা যাইতেছে, অতএব পিতৃতত্ত্ব অবিজ্ঞাত না হইলেও দুর্বিজ্ঞেয় বটে সুতরাং দৃষ্টবিরোধ হইতে পারে না।

বিশদব্যাখ্যা॥ "নচৈতদ্বিদ্মোবয়ংব্রাহ্মণা বা অব্রাহ্মণাবাস্মঃ" এই অর্থবাদ বাক্যে সুবুদ্ধি বাদী দৃষ্টবিরোধ বুঝিয়া ব্যাকুল হইয়া ছিলেন। আমরা ব্রাহ্মণকি অব্রাহ্মণ এ সন্দেহ তাঁহার অন্তঃকরণে অবকাশ পায় নাই। ব্রাহ্মণ সন্তান ব্রাহ্মণোচিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পরিপালন জন্য ব্রাহ্মণ গত বিশেষত্ব লাভ করিবে তাহাতেই ব্রাহ্মণ বলিয়া দৃঢ় ধারণা থাকিবে। ব্রাহ্মণের অসাধারণ নিয়ম তাহাকে পালন করিতে হয় শূদ্রাদি করেনা। ইহাতে সে আপনাকে নিঃসন্দেহ ব্রাহ্মণ বলিয়া স্থির করিবে। প্রশ্নকারী মহাশয়ের প্রধান যুক্তিই এই। শাস্ত্র প্রবর্ত্তক মহর্ষি দেখিলেন ঐ অর্থবাদ

প্রবরে প্রব্রিয়মাণে ব্রূয়াৎ দেবাঃ পিতর ইতি।" অর্থাৎ প্রবরানুমন্ত্রণ সময়ে যজমান "দেবাঃ পিতর" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারাপ্রবরানুমন্ত্রণ করিবেন এই বিধির শেষভাগ। এই মন্ত্র দ্বারা প্রবরাণুমন্ত্রণ করা উচিত, এবিষয়ে এই অর্থবাদ বাক্য বিধির দৃঢ়তার্থ বিধানের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন করিতেছেন, তাহাতেই বলা হইতেছে "আমরা ব্রাহ্মণ কি অব্রাহ্মণ তাহা জানিনা"। একথার তাৎপর্য্য এই যে যদিও আমরা অব্রাহ্মণ হই তথাপি এই মন্ত্রে প্রবরানুমন্ত্রণ করিলে ব্রাহ্মণত্ব সম্পাদিত হইবে। বিধানের এত দূর সামর্থ্য এ মন্ত্রদ্বারা প্রবরানুমন্ত্রণে অব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হয় অর্থবাদ এই কথা জানাইতেছেন। যদি কেহ বলেন যে এরূপ করিবার দরকার কি? তখন অর্থবাদের চির মিত্র যুক্তি জাল আসিয়া বলিবে, প্রত্যেকেরই জন্মতত্ত্ব দুর্জ্ঞেয়। সন্তান নিজের জন্ম দোষশূন্য অথবা ব্যভিচারপঙ্ককলঙ্কিত এ. বিষয়ে কোনও অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত স্থির করিতে পারেনা। কেন না তাহার পরীক্ষাকরিবার সময়ের বহুপূর্ব্বে তাহার জন্ম সময়। নিজে নিজজন্মের নির্দ্দুষ্টতা প্রমাণ করিতে গেলে প্রত্যেকেরই অন্ধকারে পড়িতে হয়। স্ত্রীগণের ব্যভিচার একান্ত সম্ভব, যজমানের জন্ম তাহার মাতৃজার হইতে অথবা পিতা হইতে এ সন্দেহ চিরদিনই আছে,. এতত্ত্ব চিরদুর্জ্ঞেয়, কাজেই পরমপূজনীয় বেদের আদেশ প্রতিপালন করা সঙ্গত। ব্রাহ্মণ ঔরসে জন্ম কিনা এই সন্দেহে জানিনা বলা হইয়াছে। নিজের প্রত্যক্ষানুভূত ব্রাহ্মণোচিত সংস্কারাদি দ্বারা পরিজ্ঞাত ব্রাহ্মণত্ব নিষেধউদ্দেশ্য নহে। পূর্ব্বপক্ষে যে শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধ দেখান হইয়াছে, তৎপরিহারার্থে পুনর্ব্বার সূত্ররচনা করা হইয়াছে, সেইসূত্র——

আকালিকেপ্সা।১৪॥

পদপাঠঃ। আকালিকেপ্সা।

ব্যাখ্যা। আকালিকেপ্সা—অকালের ইচ্ছা, অর্থাৎ যে ইচ্ছা বহুকালপরে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, অধুনা হইবার নহে। তাদৃশী ইচ্ছাকেই লক্ষ্যকরিয়া "কে তাহা জানে যাহা এলোকে আছে অথবা না আছে" এই বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে।

বঙ্গার্থঃ॥ বহুকাল ব্যবহিতা সন্দিগ্ধা-ইচ্ছা (ঐ বাক্যের প্রতিপাদ্য।)

বিশদব্যাখ্যা। "কোহিতদ্বেদ" ইত্যাদি যে অর্থবাদবাক্যটী শাস্ত্রদৃষ্ট বিরোধের উদাহরণরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা "দিক্ষ্বতীকাশান্ করোতি" এই প্রাচীনবংশমণ্ডপের দ্বারবিধির শেষভাগ। ঐ ভাগদ্বারা দ্বারবিধির স্তুতিকরা দরকার। অর্থবাদের উহাই পরমপ্রয়োজন। দ্বারবিধির প্রত্যক্ষ ফল ধূম ইত্যাদিনির্গমন। এই দ্বারবিধি প্রকারান্তরে স্বর্গসাধক হইতে পারিলেও অর্থবাদবাক্য বলিতেছে যে বহুদিবসাবসানে অনিশ্চিত স্বর্গাদিকে দ্বারবিধির ফল বলা অনাবশ্যক, কারণ তাহা গৌণ অর্থাৎ বিলম্বে প্রাপ্য। আপাততঃ সুলভফল ধূমনির্গমনই ইহার উদ্দেশ্য। দ্বারবিধির এতাদৃশ মাহাত্ম্য যে বিপ্রকৃষ্ট অনির্দ্দিষ্ট স্বর্গাদি ফলের প্রত্যাশায় আবদ্ধ রাখেনা, সহজলভ্য ধূমনির্গমনাদি দৃষ্টফলদ্বারাই তত্রত্যগণের উপকার করে। বহুবর্ষাবসানে আমায় এই প্রকার পুত্র

অথবা পৌত্র জন্ম গ্রহণ করিবে, এবং তাহার দ্বারা এবম্বিধ প্রকারে উপকৃত হইব ইত্যাদি বার্ত্তা যেমন বর্ত্তমান পুত্রের উপকারের অপেক্ষায় প্রত্যক্ষফল নয় বলিয়া অনাশ্বাসের কারণ হয়, তদ্রূপ ভাবিকালীন স্বর্গ ও প্রত্যক্ষ ধূমাপগম ফলের বর্ত্তমানতাসত্ত্বে আশ্বাসের বিষয় নহে। (যেখানে প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে সেখানেই অপ্রত্যক্ষ ফলের অনাদর, প্রত্যক্ষফল না থাকিলে অগত্যা অপূর্ব্ব স্বর্গের আশায় তাকাইয়া থাকিতে হয়।)

অতঃপর ১অ ২পা ৩সূত্রে (তথা ফলাভাবাৎ ইত্যত্র) যে বলা হইয়াছে "শোভতেহস্যমুখং" ইত্যাদি স্থলেও প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ মিথ্যাফল প্রদর্শিত হইয়াছে, অতএব মিথ্যা সমর্থক ঐ অর্থবাদ বাক্য প্রমাণ পদবীতে পদস্থাপন করিতে যোগ্য নয়। এ সূত্রে সেই আপত্তির সমাধান প্রদত্ত হইতেছে।

বিদ্যাপ্রশংসা। ১৫ ॥

পদপাঠঃ। বিদ্যাপ্রশংসা।

ব্যাখ্যা। বিদ্যা প্রশংসা—বিদ্যারপ্রশংসা করাই এখানকার উদ্দেশ্য।

বঙ্গার্থঃ। বিদ্যাপ্রশংসার্থই পাঠফল ঐ রূপে উপন্যস্ত করা হইয়াছে।

বিশদব্যাখ্যা॥ যে অধ্যয়ন করিবে তাহার মুখ শোভিত হইবে, একথা কেবল বিদ্যা গ্রহণে প্রশংসা মাত্র। বস্তুতঃ গর্গত্রিরাত্র বিধানের শেষ ভাগ "শোভতেহস্যমুখং য এবং বেদ" এই অর্থবাদ বিধির উপকার করিতে পাঠ মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া কৈমুতিক ন্যায় অবলম্বনে বিধানের অনুষ্ঠানাংশের প্রশংসাসম্পাদন করিতেছে। যাহা পাঠ করিলে পাঠকের মুখ পরিশোভিত হয় তাহার অনুষ্ঠান না জানি, কতই সুফল প্রদ এইরূপে স্তুতিনিষ্পাদন অর্থবাদের রহস্য। মুখ শোভাসম্পাদন বিষয়ে যদি বাদী একান্তই অধীরতা প্রকাশ করেন, তবে তাঁহার তুষ্টির নিমিত্ত আমাদিগের বলিতে হইবে পাঠক আচর্য্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া যখন শিষ্য মণ্ডলীর নিকট শ্রুতির গভীর রহস্য জালের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে লাগিবেন। তখন চতুর্দ্দিকে উপবিষ্টশিষ্যবৃন্দ গুরুবদনে, নয়নযুগল সংস্থাপন পূর্ব্বক আহ্লাদ সহকারে শ্রুতিতত্ত্ব শ্রবণ করিবে। সেই সময়ের শিষ্যগণ কর্ত্তৃক আগ্রহ সহকারে দৃষ্ট আচার্য্যমুখ যে অনির্ব্বচনীয় শোভা সমূহের বিকাশ করিতে থাকিবে, তাহা সহৃদয় মাত্রেরই হৃদয়ে অনুভূত হইতে পারে। অথবা অধ্যাপনা সময়ে কিম্বা অধ্যয়নকালে রসজ্ঞ পাঠক অথবা ব্যাখ্যাতার অন্তঃকরণে যে পরমানন্দস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে তজ্জনিত অপূর্ব্ব জ্যোতিতে তৎকালীন তাহার মুখমণ্ডল এক অভিনবশোভার আবিষ্কার করে। যাহাহউক মুখশোভাটা একবারে অসম্ভব নহে। আর একটী বাক্যে ও পূর্ব্বপক্ষবাদী বিফলতা প্রদর্শন করিতে বিফল প্রয়াস পাইয়াছেন, যথা "আহস্য প্রজায়াং বাজীজায়তে" বেদ পাঠকের বংশানুক্রমে সন্তানসন্ততিরা ও সাম হইবে।" এইটুকু ও আপত্তিকারীর লক্ষ্য হয় নাই। পুরুষানুক্রমে যাহারা বিদ্বান্ হয়, শাস্ত্র চর্চ্চা এবং ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত

হয়, তাহারা সমাজের আদরের সামগ্রী সন্দেহ নাই। বংশক্রমে বেদাধ্যয়ন ও, বৈদিকাচার পরিপালন নিয়ম থাকিলে বেদানুবর্ত্তী আর্য্য সমাজে তাহাদের অন্ন-সংস্থান বিশেষ কষ্টকর হয় না। এখানে মনে করা উচিত বেদজ্ঞ-পিতার 'বেদজ্ঞ পুত্রকে লক্ষ্য করিয়াই সম্ভাবনায় বলা হইয়াছে, এতটুকু সাধারণ চিন্তাও যে মহোদয়ের মনে উদিত হইতে পারে না, তিনি বেদার্থতত্ত্বের বিচার বিস্তায় উপযুক্ত আপত্তি-কারীই বটেন। মহর্ষির প্রতিদ্বন্দী সংগ্রহ করিতে এতদূর ও 'অবতরণ করিতে হইয়া থাকে এইটুকুই আমাদের বুদ্ধির বহির্ভূত।

অন্যানর্থক্য সম্বন্ধে বাদিবর দুই চারিটী উত্তমতর্কেরই অবতারণা করিয়াছেন। যদি পূর্ণাহুতিতেই সব সকল হইল তবে ক্রিয়া কাণ্ড, করিয়া কাজ কি? তাঁহার আপত্তি উত্তম, শুনিতে ভাল, বুঝিলে কিন্তু কিছুই থাকেনা। মীমাংসাচার্য্য প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে বলিতেছেন সব শব্দটার অর্থটা না বুঝিয়াই যত গোলযোগ হইয়াছে।

সর্ব্বত্বং আধিকারিকম্। ১৬।

পদপাঠঃ। সর্ব্বত্বং। আধিকারিকং।

ব্যাখ্যা। সর্ব্বত্বং—সকলত্ব। আধিকারিকং—অধিকার বিষয়ে অর্থাৎ প্রস্তা মাত্র লইয়া, জগতের অগণিত পদার্থ নিচয় তাহার বিষয় হইতে পারে না।

বঙ্গার্থঃ। "পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বান্ কামান্ অবাপ্নোতি" এই স্থলে "সর্ব্বত্ব" 'পদার্থ প্রস্তাবিত বিষয় লইয়াই বুঝিতে হইবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লইয়া নহে।

বিশদব্যাখ্যা॥ পূর্ণাহুতি দ্বারা সকল ফল পাওয়া সম্ভব হইলে, অবশিষ্টাংশ করিবার আবশ্যক নাই, কিন্তু অপরাপর কার্য্যকলাপের উপদেশ আপনা হইতেই অপ্রমাণ হইয়া দাঁড়াইল। এই চিন্তায় বাদিমহাশয় ব্যাকুল হইয়া, অর্থবাদ বাক্যের প্রামাণ্য মানিলে আর আর উপদেশ ব্যর্থ হয় এজন্য উহা অপ্রমাণ বলিয়া বসিয়াছেন। সিদ্ধান্ত পক্ষের কথা এই যে, "পূর্ণাহুতিংজুহুয়াৎ" এই বিধি-বাক্যের শেষাংশ প্রোক্ত অর্থবাদ। পূর্ণাহুতি হইতে সমস্ত ফল হয়, ইহার অর্থ যে কর্ম্মের যে ফল বেদ শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে তৎ তৎ কর্ম্মের পরি সমাপ্তিরূপ পূর্ণাহুতি দ্বারা সেই উক্ত ফলসমস্তই পাওয়া যায়। কেবল কর্ম্মটী করিলে ফল হয় না, ঐ কার্য্য বিধানানুমতে শেষ করা চাই, পূর্ণাঙ্গ কর্ম্মই ফলদায়ক, পূর্ণাহুতিই কর্ম্মের পরাকাষ্ঠা, তাহা বাকী থাকিলে কার্য্য অসম্পূর্ণ,। পূর্ণাহুতি যখন কার্য্য সম্পাদন করিল, তখন সমস্ত ফল পূর্ণাহুতিরই বলা যাইতে পারে। অনেকে মনে করিতে পারেন, তবে আগেকার কিছু না করিয়া পূর্ণাহুতিমন্ত্রে পূর্ণাহুতি দিলেই হইল, তাঁহারা চিন্তা করিতে অবকাশ পান না যে, কোনও কর্ম্মের পরিসমাপ্তিজ্ঞাপক আহুতি বিশেষ পূর্ণাহুতি নামে অভিহিত হয়, পূর্ব্বের কর্ম্মটী যদি না থাকিল তবে কিসের কিরূপ পূর্ণাহুতি? যেখানে যাহা অধিকৃত বিষয়, সেখানে তাহার কিছু অবশেষ না থাকিয়া নিঃশেষ হইলে

তাহাকেই "সর্ব্ব" শব্দের দ্বারা বলা যাইতে পারে। অস্য আমার আবশ্যকীয় ৪০ খানি পুস্তক কিনিতে হইবে। ঐ চল্লিশ খানি সম্পূর্ণ হইলে আমি বলিতে পারি "সমস্ত পুস্তক কিনিয়াছি।" জগতের যাবতীয় গ্রন্থরাশির তুলনায় আমার ৪০ খানি পুস্তক অনুমাত্র হইলেও আমার আবশ্যক হইয়াই আমার "সমস্ত" শব্দের প্রয়োগ। এখানেও তত্তৎকর্ম্মের সমগ্র ফল "সর্ব্ব শব্দের" প্রতিপাদনার্হ বস্তু। দর্শপূর্ণমাসযাগীয় পূর্ণাহুতিদ্বারা জ্যোতিষ্টোমের ফল পাওয়া যাইবেনা। দর্শপূর্ণমাসেরই শাস্ত্রোক্ত সম্পূর্ণ ফল লাভ করা যাইতে পারে। দর্শ পূর্ণমাসীয় ফলের সম্পূর্ণতাই 'সমস্ত' শব্দের লক্ষ্য, পূর্ণাহুতি আধানাদি কর্ম্মাঙ্গ। যেখানেই (যে কাজেই) পূর্ণাহুতি দেওয়া হউক না কেন উহা কর্ম্মের অন্তিম অঙ্গ বলিতে হইবে, যদি অঙ্গই হইল তবে "ফলবৎসন্নিধাবফলং তদঙ্গং" অর্থাৎ ফলবান্ প্রধান কর্ম্মের সমীপে পঠিত অফল কর্ম্মাদি ঐ পূর্ব্বোক্ত প্রধান কর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয় এই নিয়মানুসারে পূর্ণাহুতির ফলবাক্য বৃথা, এইরূপ বিনিশ্চিত হইলে "দ্রব্যসংস্কার কর্ম্মসু পরার্থত্বাৎ ফলশ্রুতিঃ অর্থবাদ ইতি" এই সূত্রানুসারে পরার্থ অর্থাৎ অঙ্গ কর্ম্মের ফলশ্রুতি অর্থবাদ ইহা অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে পূর্ণাহুতি অঙ্গ কর্ম্ম ইহা সর্ব্ব সিদ্ধান্ত। অতএব এখানে পূর্ণাহুতির ফলকে অর্থবাদ বলিতে পারিলেও, পশুবন্ধযাজী সর্ব্বলোক জয় করেন এই বাক্যে পঠিত সর্ব্বলোকাভিজয় ফল অর্থবাদ বলা যাইবেনা। কারণ উহা অঙ্গ কর্ম্ম নহে, উহার ফলশ্রুতিকে মুখ্য ফলশ্রুতি বলিতেই হইবে, অর্থবাদের ন্যায় গৌণফল কল্পনা করা এখানে উচিত হয় না, তাহা হইলে সর্ব্বত্র বিধি বাক্যের ফলসম্বন্ধ অর্থবাদই হইয়া দাঁড়ায়, ফলবিধি উচ্ছিন্নই হইয়া যায়। অতএব এখানে অন্যানর্থক্য দুর্ব্বার হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্ব পক্ষ বাদীর এই সুন্দর তর্কের প্রত্যুত্তর প্রদান করিবার জন্যই মহর্ষি জৈমিনির বিজয় ডিণ্ডিমে ঘোষিত হইতেছে।

ফলস্য কর্ম্মনিষ্পত্তেস্তেষাং লোকবৎ পরিমাণতঃ সারতো বা ফলবিশেষঃ স্যাৎ। ১৭।

পদপাঠঃ। ফলস্য। কর্ম্মনিষ্পত্তেঃ। তেষাং লোকবৎ। পরিমাণতঃ। সারতঃ। বা। ফলবিশেষঃ। স্যাৎ।

ব্যাখ্যা। ফলস্য-ফলের। কর্ম্মনিষ্পত্তেঃ—কর্ম্ম হইতে নিষ্পত্তি হয় এই জন্য। তেষাং-তাহাদের। লোকবৎ—লোকে যেরূপ দেখা যায় তাদৃশ। পরিমাণতঃ—পরিমাণানুসারে সারতঃ—ভোগসারত্বানুযায়ী। বা—(বিকল্প) অথবা। ফলবিশেষঃ—বিশিষ্টফল। স্যাৎ—হয়।

বঙ্গার্থঃ। ফলের নিষ্পত্তি কর্ম্ম হইতে হয়, কিন্তু সেই সকল ফলের পরিমাণবাহুল্য অথবা প্রকৃষ্টরূপে ভোগের বিষয় হওয়া ইত্যাদিরূপ প্রকৃষ্টফল অন্য কর্ম্ম দ্বারা সম্পাদিত হয়। পশুবন্ধযাগ দ্বারা সমস্ত ফল প্রাপ্ত হইলেও তাহা সামান্য রূপে, ঐ ফল গুলি বিশেষ প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া

অথবা সেই ফলই অধিক পরিমাণে পাই বার জন্য অন্য কর্ম্ম করিতে হয়, অতএব অন্য কর্ম্ম বৃথা হইলনা। লোকে' ইহার দৃষ্টান্তানুসন্ধান করিলে এইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়।

বিশদব্যাখ্যা। পশুবন্ধযাজী পৃথিবী অন্তরীক্ষাদি যে কোনও লোক সাকল্যে জয় করিলেন ইহাতেই তাঁহার সর্ব্বলোক জয় হইল, কেননা, সমগ্রভাবে কোনও লোক জয় করিলে তাহাতেই আমাদের "সর্ব্ব শব্দ" অনুগৃহীত হইল। অন্যকর্ম্ম দ্বারা তিনি অবশিষ্ট লোক জয় করিতে পারেন, কাজেই ইতর কর্ম্মগুলি বিফল হইলনা। অথবা পশুবন্ধ দ্বারা স্বর্গাদি যে কোনও লোক জয় করিয়াও তাহাতে দেববৎ স্বতন্ত্রস্বচ্ছন্দভাবে অব্যাহত উপভোগ হইল না, তজ্জন্য অন্যকর্ম্ম দ্বারা আবশ্যক এক কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গে সুখভোগ হইল, কিন্তু তাহা স্বর্গ সুখের পরাকাষ্ঠা নহে। ঐ শেষ সীমায় উপনীত হইবার জন্য কর্ম্মান্তরের সেবা করিতে হয়। কোনও স্থানে রাজা হওয়া অপেক্ষা সেখানকার সর্ব্বেসর্ব্বা সম্রাট হইতে স্বতন্ত্র কর্ম্ম আবশ্যক। এই রূপে পরিমাণের প্রসার ও ভোগের বিস্তার লইয়াই সকল কার্য্য উপযোগী হইতে পারে। ফলের দৃঢ়তা সম্পাদনই এখানকার প্রকৃত উত্তর। লোকে যেরূপ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, কোনও ভূমি খণ্ড জমা করিয়া লইলে নিজের তাহাতে একজাতীয় স্বামিত্ব জন্মে, কিন্তু ঐ ভূমি খণ্ডকে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে নিজের করিতে হইলে উহা ক্রয় করা দরকার হয়, সেইরূপ পৃথিবীতে কোনও কর্ম্ম দ্বারা আধিপত্য প্রচারিত হইলেও তাহাকে তদপেক্ষা নিরাপদ করিবার জন্য অনেক অন্যান্য কর্ম্ম করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিম্বা কোনও রাজা কোনও দেশ জয় করিয়াছেন, কিন্তু তাহার অন্তর্গত অনেক গুলি রাজা স্বাধীন রহিয়াছে তাহাদিগের বিশেষ কোনও জাতীয় কর্ত্তৃত্ব অধিকারীর নাই; এখানে এই সমগ্র দেশের সর্ব্বপ্রধান প্রভুশক্তি লাভ করিবার জন্য যেমন তাঁহাকে আরও অনেক কর্ম্ম করিতে হয়। তদ্রূপ পশুবন্ধযাজীর কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যর্থ নহে, উহা প্রকৃত ফলের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং দৃঢ়তা নিষ্পাদন করে; তবে উহা অত্যাবশ্যক বই উপেক্ষণীয় হইতে পারিল না। যে এই অশ্বমেধ অবগত আছে তাহারও ব্রহ্মহত্যাপাপ বিদূরিত হয়। এই স্থলে যে পূর্ব্বপক্ষী মহাশয় বলিয়াছেন, তাহা হইলে অশ্বমেধ অনুষ্ঠান করাটা বেজায় বোকামী। আমরা তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে বলিতে বাধ্য হইব যে, অশ্বমেধ যজ্ঞপ্রকরণ পাঠ করিয়া তাহার যথার্থতত্ত্ব জ্ঞাত হইলে পাঠকের মানসপাপবৃত্তি প্রশমিত হইতে পারে। যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে তাহার শরীরপরমাণুর প্রত্যেকটী পাপের দাগ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। কথাটা আর একটু পরিষ্কার রূপে বলিতে হইলে বলা উচিত যে মনে মনে ব্রহ্মহত্যা করিবার প্রগাঢ় বাসনা ও ব্রহ্মহত্যা পাপ, তবে উহাকে মনোগত পাপ বলিতে হয়, আর শরীর (হস্তাদি) দ্বারা সত্যসত্যই ব্রহ্মহত্যা সম্পাদন করা শরীর

হইতে তরঙ্গমালার ন্যায় কিম্বা কদম্ব কুসুমের কলিকার ন্যায় ঐ সকল শব্দ হইতে চর্দ্দিতুকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ বহু শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই সমস্ত শব্দরাশির মধ্যে প্রথমোৎপন্নটী দ্বিতীয়োৎপন্ন শব্দ হইতে এবং দ্বিতীয়টী তৃতীয় হইতে নষ্ট হইয়া যায় এই রূপে উপান্ত্য শব্দটী অন্তিম্ শব্দকে জন্মাইয়া তাহার নাশকও হয় যেহেতু অন্তিম শব্দের আর নাশকান্তর নাই। তবেই দেখা-যাইতেছে যে প্রথম শব্দটী স্বজনিত দ্বিতীয় শব্দ হইতে নষ্ট হয় এবং চরম শব্দটী স্বকীয় জনক উপান্ত্য (অন্তিন শব্দের অব্যবহিত পূর্ব্ব) শব্দ হইতে হত হইতেছে এ নিবন্ধন গুণে কার্য্য নাশ্যত্ব এবং কারণ নাশ্যত্ব উভয়টীই থাকে।

কার্য্য বিরোধি কর্ম্ম। ১৪

পদব্যাখ্যা। কার্য্যবিরোধি—কার্য্য হইয়াছে বিরোধি যাহার এতাদৃশ অর্থাৎ স্বকীয় কার্য্যনাশ্য। কর্ম্ম—গমনাদি ক্রিয়া।

অনুবাদ। কর্ম্ম পদার্থ নিচয় স্বকীয় কার্য্যনাশ্য অর্থাৎ স্বজনিত উত্তর দেশ সংযোগ হইতে ক্রিয়ার নাশ হয়।

তাৎপর্য্য। পূর্ব্ব সূত্রে গুণে কার্য্যকারণোভয় বিরোধিত্ব আছে দেখান হইয়াছে। সেইরূপ কর্ম্মেও উভয়টী আছে কিনা এই সন্দেহ নিরাসের নিমিত্ত এই সূত্রের উল্লেখ হইতেছে। উৎপন্ন ও বিনাশী পদার্থের উৎপত্তির প্রতি ও বিনাশের প্রতি অবশ্য কোন না কোন কারণ আছে অবশ্য স্বীকার করিতে হয় নতুবা সকল সময়ে একটী পদার্থের উৎপত্তি কিম্বা সকল সময়ে তাহার বিনাশ হয় না কেন? ঘটাদিতে প্রথম ক্ষণে ক্রিয়া জন্মে দ্বিতীয় ক্ষণে পূর্ব্ব সংযুক্ত দেশের সহিত ঘটের বিভাগ হয়। তৃতীয় ক্ষণে ঐ পূর্ব্ব সংযোগের নাশ হয়। চতুর্থ ক্ষণে উত্তর দেশের সহিত ঘটের সংযোগ জন্মে পরক্ষণে ঘটের ঐ ক্রিয়ার নাশ হয়। এই নাশের প্রতি ফল বলতঃ ঐ উত্তর দেশ সংযোগকে কারণ বলিতে হইবে যেহেতু ঐ উত্তর দেশ সংযোগ না হওয়া পর্য্যন্ত ক্রিয়া নষ্ট হয় না অথচ উত্তর দেশ সংযোগ জন্মিলেই পরক্ষণে ক্রিয়া আর থাকে না সুতরাং অন্বয় ব্যতিরেক বলতঃই ক্রিয়াতে স্বজনিত উত্তর দেশ সংযোগ নাশ্যত্ব রহিয়াছে বলিয়া প্রতীত হইবার বাধা নাই।

ক্রিয়া গুণবৎ সমবায়িকারণ মিতি দ্রব্য লক্ষণম্। ১৫

পদব্যাখ্যা। ক্রিয়াগুণবৎ—কর্ম্মের ও গুণের আশ্রয়। সমবায়ি কারণং—কার্য্যের সমবায় সম্বন্ধে আশ্রয় হইয়া যেটী কারণ। ইতি—এইটী। দ্রব্যলক্ষণম্—দ্রব্য পদার্থের বোধক লক্ষণ।

অনুবাদ। কর্ম্ম বিশিষ্ট এবং গুণ বিশিষ্ট যে পদার্থ নিচয় কার্য্যের সমবায় সম্বন্ধে আশ্রয় হইয়া কারণহয় তাহাদিগকে দ্রব্য বলে। এইটী দ্রব্য পদার্থের লক্ষণ।

তাৎপর্য্য। শিষ্যদিগের আকাঙ্ক্ষানুরোধে দ্রব্য গুণ ও কর্ম্ম এই তিন পদার্থের সাধর্ম্ম্য বলিয়া ইহাদের লক্ষণ বলিতে আরম্ভ করতঃ প্রথমতঃ দ্রব্য পদার্থের লক্ষণ করিতেছেন। লক্ষণ বলিলে যে চিহ্ন দ্বারা পদার্থকে চিনিয়া লওয়া যায় কিম্বা যে ধর্ম্মটী ইতরের ব্যাবর্ত্তক হয় তাহা বুঝায়। দ্রব্য লক্ষণে ক্রিয়াবৎ এই অংশ দ্বারা দ্রব্যের চিহ্ন দেখান

হইতেছে। ঘটাদিতে ক্রিয়া জন্মিলে প্রত্যক্ষ দেখা যায় সুতরাং ক্রিয়ার আধার বলিয়া দ্রব্যকে চিনিয়া লওয়ার বাধা নাই। যদ্যপি গগনাদি দ্রব্যে কোন ক্রিয়া জন্মে না তথাপি ক্রিয়াবৎ এই শব্দ দ্বারা ক্রিয়াশ্রয় বৃত্তি যে পদার্থ বিভাজক ধর্ম্ম, (দ্রব্যত্ব) তদ্বৎ এই নিষ্কৃষ্টার্থের বোধ হওয়াতে গগনাদি নিষ্ক্রিয় দ্রব্যে লক্ষণের অব্যাপ্তি হওয়ার সম্ভাবনা নাই যেহেতু ক্রিয়ার আশ্রয়ী ভূত ঘটাদিতে যে পদার্থ বিভাজকী ভূত দ্রব্যত্ব আছে ঐ দ্রব্যত্ববৎ হইতে সকল দ্রব্যই হইয়াছে। অথবা ক্রিয়াজনিত সংযোগবৎ কিম্বা ক্রিয়াজনিত বিভাগবৎ এইরূপই ক্রিয়াবৎ শব্দের নিষ্কৃষ্টার্থঃ। গগনাদি নিষ্ক্রিয় দ্রব্যে ক্রিয়া না থাকিলেও তজ্জনিত ঘটাদি-সংযোগের কিম্বা ঘটাদি বিভাগের গগনাদিতে অসম্ভাব নাই। গুণবৎ এই বিশেষণে ব্যতিরেক দৃষ্টান্তক্রমে দ্রব্যের ইতরের ব্যাবৃত্তি দেখান হইয়াছে অর্থাৎ যে দ্রব্য নয় সে গুণের আশ্রয়ও নয় যেমত গুণ কর্ম্ম সামান্য প্রভৃতি। যদিচ উৎপন্ন দ্রব্যে আদ্য ক্ষণে গুণের সম্বন্ধ নাই কারণ, জন্যগুণের জনকী ভূত দ্রব্য একক্ষণ পূর্ব্বে না থাকিলে তাহাতে গুণের উৎপত্তি হয় না। কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে কারণ না থাকিলে কার্য্য জন্মে না এইটীই কার্য্য কারণ ভাবের নিয়ম। এমত অবস্থায় গুণবৎ এই লক্ষণ ঘটাদিতে আদ্য ক্ষণে অব্যাপ্ত হইতেছে তথাপি গুণবৎ শব্দ দ্বারা গুণাত্যন্তাভাবের বিরোধি যে যে পদার্থ (অর্থাৎ গুণ গুণের প্রাগভাব ও গুণের ধ্বংস) তাহার অন্যতম বৎ এইরূপ নিষ্কৃষ্টার্থটী প্রতিপাদিত হওয়ায় ঘটাদিতে আদ্যক্ষণে গুণাত্যন্তা ভাবের বিরোধীভূত গুণপ্রাগভাব থাকা নিবন্ধন অব্যাপ্তি সম্ভাবনা নাই। অত্যন্তাভাবের বিরোধী পদার্থ তিনটী প্রতিযোগী তাহার প্রাগভাব এবং প্রতিযোগীর ধ্বংস। যেমত গুণ যেখানে আছে সে স্থলে গুণের অত্যন্তাভাব থাকে না সেইরূপ গুণের প্রাগভাব কিম্বা গুণের ধ্বংস যে স্থানে আছে সে স্থলেও গুণের অত্যন্তাভাব থাকে না এই মতটীই এখানে অবলম্বনীয় হইয়াছে। সূত্রে ইতি শব্দের অর্থ ইহারা যেমত কর্ম্মবৎ কিম্বা গুণবৎ এই দুয়ের মধ্যে প্রত্যেকই দ্রব্যের লক্ষণ হইতে পারে সেইরূপ সমবায়ি কারণং দ্রব্যং এই অংশ মাত্রও দ্রব্য লক্ষণ হইলে কোন অব্যাপ্তি কিম্বা অতিব্যাপ্তি হয় না কারণ সমবায়ি কারণত্বটী একমাত্র দ্রব্যে থাকে অন্য কেহ সমবায়ি কারণ হয় না এবং গুণবৎ এই স্থলে সংযোগবৎ কিম্বা বিভাগবৎ অথবা পৃথক্ত্ববৎ এই সমস্তও প্রত্যেকে দ্রব্যের লক্ষণ হইতে পারে বুঝিতে হইবে।

দ্রব্যাশ্রয্য গুণবান্ সংযোগ বিভাগেষ্ কারণ মনপেক্ষ ইতি গুণ লক্ষণম্। ১৬

পদব্যাখ্যা। দ্রব্যাশ্রয়ী—দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান অর্থাৎ দ্রব্যরূপ আশ্রয়ে অবস্থিত। অগুণবান্—যাহাতে গুণ থাকে না অর্থাৎ দ্রব্যভিন্ন। সংযোগবিভাগেষু—সংযোগ ও বিভাগ এই গুণদ্বয়ের প্রতি অকারণ অনপেক্ষঃ—নিজের উত্তর কালোৎপন্ন ভাবান্তরকে অপেক্ষা না করিয়া যে কারণ নাহয় অর্থাৎ কর্ম্ম পদার্থ ভিন্ন। ইতি-

ব্রহ্মহত্যা পাপ। এই উভয়বিধ পাপের জন্য উভয়বিধ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা হইয়াছে। উভয়ের গুরুত্ব সমান নহে, কাজেই সমান প্রতীকার উচিত হইতে পারে না। তজ্জন্য মানস ব্রহ্মহত্যা পাপ মনে মনে অশ্বমেধ অবগত হইলে সারিতে পারে কেন না ঐ পবিত্র যজ্ঞের মাহাত্ম্য পাঠে অন্তঃকরণ অপেক্ষাকৃত বিমল হইলে আর অনুষ্ঠান পর্য্যন্ত গড়ায় না। মনে হয় আমার সঙ্কল্পিত কার্য্য একান্ত গুরুতর অপরাধ, কেন না তাহার প্রতিকারের জন্য এই একটী প্রকাণ্ড যাগ বিহিত হইয়াছে। অতএব এত বড় গুরুতর দোষ অনুষ্ঠান করা ভাল নয়। এরূপে নিবৃত্ত হইলে তাহা অধ্যয়নের ফল বই আর কি বলা যাইতে পারে। আর যজ্ঞানুষ্ঠান যে কঠোর নিয়মে করিতে হয়, সেই সকল দুঃসাধ্য প্রয়োগ অনুষ্ঠান করিলে শারীরিক পাপ উত্তেজনা ও মানসিক পাপ প্রবৃত্তি উভয়েরই প্রশমন সংঘটিত হয় সুতরাং অনুষ্ঠান করিলে প্রকৃত ব্রহ্মহত্যা নিবন্ধন শারীরিক ও মানস কলুষ কলঙ্ক দুইই যাইবার কথা। মানসিক আন্দোলনে মনঃ প্রবৃত্তিরূপ পাপ নিস্তেজ হইতে পারে, কিন্তু শরীর ধর্ম্ম তাহাতে কুণ্ঠিত হয় না। সময়বশে মানস প্রবৃত্তির দৌর্ব্বল্য শরীর উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া উঠে, যদি শরীরের সংস্কার করা হয় তবে আর শরীর ধর্ম্ম উদ্দীপ্ত হয় না, কাজেই নিস্তেজ মনঃ প্রবৃত্তিরূপ পাপ আর সহায় অভাবে বৃদ্ধি পাইতে পারে না। কেহ কেহ বলেন পাপের দ্বিবিধ শক্তি একশক্তি শরীরের প্রত্যেক পরমাণুতে স্থূলরূপে লাঞ্ছন উৎপাদন করে, অপর শক্তি মনের উপর আধিপত্য প্রচার করে, ঐ শক্তি সূক্ষ্মরূপে বিলীন ভাবে থাকে। ব্রহ্মহত্যা অনুষ্ঠান করিলে মনে ঐরূপ পাপ শক্তির ক্রিয়া হইল। অশ্বমেধ অবগত হইলে মনের কালী ঘুচিয়া যায়, শরীরের পাপ বিদূরিত করিতে হইলে অনুষ্ঠান চাই। উভয় মতের পার্থক্যটুকু এই যে প্রথম মতের মানস পাপ কেবল ইচ্ছা মাত্র, অনুষ্ঠান জনিত মনের মলা নহে। দ্বিতীয় মতে উহা ইচ্ছা মাত্র নহে অনুষ্ঠান জনিত মনে যে পাপ কালিমা পতিত হয় তাহাই। এতাবৎ পর্য্যন্ত দ্বারা প্রতিপাদিত হইল অধ্যয়নার্থক্য হইতে পারে না।

পূর্ব্বে যে "পৃথিবীতে অগ্নিচয়ন করিবে না, স্বর্গে করিবে না, আকাশে করিবে না, ইত্যাদি স্থানে অনুপযুক্তের ব্যর্থ নিষেধ করা হইয়াছে, অর্থাৎ আকাশেঅথবা স্বর্গে অগ্নিচয়ন হইতে পারে না সেই অপ্রসক্তের প্রতিষেধ কেন? এই আশঙ্কা করা হইয়াছে তাহার উত্তরে এখানে বলা যাইতেছে, আর ববরঃ প্রাবাহয়ণিঃ ইত্যাদি স্থলে যে অনিত্য সংযোগ বলা হইয়াছিল তাহার প্রত্যুত্তর এখানে সূত্রে আছে। ঐ উত্তর পূর্ব্বেই বেদ প্রামাণ্য পরিচিন্তনে বলাহইয়াছে, আবার তাহাই স্মরণ করা হইতেছে।

অন্ত্যয়োর্যথোক্তম্। ১৮।

পদপাঠঃ। অন্ত্যয়োঃ। যথা। উক্তম্।

ব্যাখ্যা। অন্ত্যয়োঃ—শেষ দুইটী প্রশ্নের। যথা—যেরূপ। উক্ত—বলা হইয়াছে।

বঙ্গার্থঃ। শেষ দুইটী আপত্তির উত্তর আগে যেরূপ দেওয়া হইয়াছে তাহাই এখানে পুনর্ব্বার বলা হইল।

বিশদব্যাখ্যা। পৃথিবীতে অগ্নিচয়ন করা যায় এ হেতু স্বর্গ রাখিয়া চয়ন করিবার বিধান দ্বারা তাহার নিবৃত্তি করা হইতেছে। আকাশে করিবে না ইত্যাদি স্বভাবতঃ সিদ্ধ নিষেধের অনুবাদ অর্থাৎ পুনরুল্লেখ মাত্র। যাহা সিদ্ধ, তাহা বলিলে অনুবাদ করা হয়। ঐ অংশ নিত্যানুবাদ। এখানে একটী বিষয় অগ্নিচয়নের বাক্য। অপরটী ববর শব্দ সম্পন্ন প্রবহণশীল বায়ুকে বুঝাইবার বাক্য। একটীতে উত্তর স্তুতি ও অপ্রসক্তের নিত্যানুবাদ। অপরটীতে ব্যবহার দশায় নিত্য বায়ুই প্রতিপাদ্য, অতএব দোষ নাই অর্থবাদের এক শ্রেণীর প্রামাণ্য চিন্তা শেষ হইল। ক্রমশঃ——

শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ।

বৈশেষিক দর্শন।

প্রথম অধ্যায়। প্রথম আহ্নিক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ন দ্রব্যং কার্য্যং কারণঞ্চ বধতি ।১২

পদব্যাখ্যা। ন—না। দ্রব্যং—ঘট পটাদি দ্রব্য পদার্থ। কার্য্যং—স্বজনিত দ্রব্যান্তরকে। কারণঞ্চ—স্বকীয় কারণকেবা। বধতি—নষ্টকরে।

অনুবাদ। দ্রব্য পদার্থ নিচয় স্বজনিত দ্রব্যান্তরকে কিম্বা স্বকীয় কারণকে নাশ করে না অর্থাৎ কার্য্য কারণ ভাবাপন্ন দ্রব্যদ্বয়ের মধ্যে বধ্যঘাতক ভাব নাই।

তাৎপর্য্য। উল্লিখিত সূত্রে দ্রব্যের, গুণ ও কর্ম্ম হইতে বৈধর্ম্ম্য দেখান হইতেছে। কোন গুণ স্বজনিত গুণান্তরের কিম্বা স্বকীয় কারণ গুণান্তরের নাশক হয় পর সূত্রে তাহা দেখান হইবে এবং কর্ম্মও স্বকীয় কার্য্য উত্তর দেশ সংযোগ হইতে নষ্ট হইয়া থাকে কিন্তু দ্রব্যে কার্য্যনাশ্যত্ব কিম্বা কারণনাশ্যত্ব নাই। কপাল দ্বয়ে যে ঘটের আরম্ভক সংযোগ থাকে ঐ সংযোগের নাশ হইলে কিম্বা কপালের নাশ হইলে ঘট নষ্ট হইয়া যায় তদ্ভিন্ন কপাল কখনও ঘটকে নষ্ট করে না কিম্বা ঘটও কপালকে নষ্ট করিতে সমর্থ হয়না। সুতরাং কার্য্য নাশ্যত্ব কিম্বা কারণনাশ্যত্বটী দ্রব্যের বৈধর্ম্ম হইতেছে॥

উভয়থা গুণাঃ। ১৩॥

পদব্যাখ্যা। উভয়থা—উভয় প্রকারে অর্থাৎ কার্য্যকে নাশ করিতে কিম্বা কারণকেও নাশ করিতে। গুণাঃ—শব্দাদি গুণ পদার্থ সমর্থ হয়॥

অনুবাদ। গুণ পদার্থের মধ্যে কোনটী কার্য্যনাশ্য কোনটীবা কারণ হইতে নষ্ট হইয়া থাকে।

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বসূত্রে কার্য্যবধ্যত্ব কিম্বা কারণ বধ্যত্ব এই উভয়টীকে দ্রব্যের বৈধর্ম্ম্য বলা হইয়াছে। ঐ উভয়টীই যে গুণে আছে, ইহাই এই সূত্রের প্রতিপাদ্য। ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত আছে যে এতন্মতে শব্দ সকল উৎপন্ন ও বিনাশী। কণ্ঠতাল্বাদির আঘাত জনিত বর্ণাত্মক শব্দের কিম্বা মৃদঙ্গাদি সমুত্থিত ধ্বন্যাত্মক শব্দের শ্রবণেন্দ্রিয়ে উপস্থিত

প্রত্যেকে একে থাকে না দুইটী দ্রব্যে থাকে আর দ্বিত্ব, ত্রিত্ব প্রভৃতি সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে দুইটী দ্রব্য তিনটী দ্রব্য প্রভৃতিতে থাকে এবং ঘটাদি সাবয়ব দ্রব্য ও অবয়বদ্বয়ে কিম্বা অবয়ব ত্রয়াদিতে অবস্থিত এজন্য দ্রব্যকে কিম্বা গুণকে এক দ্রব্য বলা যায় না কিন্তু কর্ম্ম পদার্থ সকল প্রত্যেকে এক একটী মাত্র দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। ঘটের চলন ক্রিয়া কদাচ পটে—থাকে না কিম্বা পটের পরিচালনও মঠাশ্রিত নহে সুতরাং কর্ম্মকে এক দ্রব্য বলিতে হইবে। একাধিক দ্রব্যাশ্রিতপদার্থে নাথাকে অথচ সত্তার সাক্ষাৎ ব্যাপ্য যেজাতি তদ্বত্বই এক দ্রব্যত্ব এইটী ফলিতার্থঃ। পূর্ব্বে প্রকাশ আছে যে সত্তা নামক জাতি দ্রব্য গুণ ও কর্ম্ম এই পদার্থ ত্রয়ে থাকে। দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কর্ম্মত্ব নামক জাতি ত্রয়ের প্রত্যেকই ঐ সত্তার সাক্ষাৎ ব্যাপ্য (সত্তার একাধিকরণে বৃত্তি অথচ তাহা অপেক্ষা অল্প স্থানে স্থায়ি হইয়া তাদৃশ অল্পস্থান স্থায়ি জাত্যন্তর হইতে অল্পস্থান স্থায়ি না হয় এমত) জাতি হইয়াছে। ঐ দ্রব্যত্বাদি জাতি ত্রয়ের মধ্যে একমাত্র কর্ম্মত্বই একাধিক দ্রব্যাশ্রিত পদার্থে অবৃত্তি হয় অর্থাৎ উভয় দ্রব্যাশ্রিত পদার্থে থাকে না এ নিমিত্ত ঐ কর্ম্মত্বকে আদান করিয়া কর্ম্মে লক্ষণের সমন্বয় করিতে হইবে। দর্শিত রীত্যনুসারে অগুণ শব্দেরও গুণবত্তিন্ন বৃত্তি গুণাবৃত্তি জাতিমত্ত্ব এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে গুণবত্তিন্ন অর্থাৎ গুণশূন্য-কর্ম্ম পদার্থে, কর্ম্মত্ব জাতি বৃত্তি হইয়া গুণেও অবৃত্তি (অনবস্থিত) হইয়াছে সুতরাং ঐ কর্ম্মত্ব জাতি দ্বারা কর্ম্মে লক্ষণ সমন্বয়ের বাধা নাই। সংযোগ বিভাগের অনপেক্ষ কারণ এইটী কর্ম্মের তৃতীয় লক্ষণ। ক্রিয়া স্বাশ্রয়ে পূর্ব্বদেশ বিভাগ এবং উত্তর দেশ সংযোগ জন্মাইতে সমবায়ি কারণ—দ্রব্য কাল, অদৃষ্ট ঈশ্বরেচ্ছা প্রভৃতি কারণান্তরকে অপেক্ষা করিলেও স্বোত্তর কালোৎপন্ন কোন ভাবান্তরকে অপেক্ষা করে না অর্থাৎ সংযোগ বিভাগের সমবায়ি কারণীভূত দ্রব্য, কাল অদৃষ্ট ঈশ্বরেচ্ছা প্রভৃতি কারণান্তরের মধ্যে কেহই ক্রিয়ার উত্তর কালোৎপন্ন নয় এজন্য কর্ম্মে লক্ষণের সঙ্গতি হইতেছে।

দ্রব্যগুণ কর্ম্মাণাং দ্রব্যং কারণং সামান্যং। ১৮

পদব্যাখ্যা। দ্রব্য গুণ কর্ম্মণাং দ্রব্য গুণ ও কর্ম্মের প্রতি। দ্রব্যং—দ্রব্যপদার্থই। কারণং —সমবায়িকারণ। সামান্যং—সমান অর্থাৎ এক।

অনুবাদ। দ্রব্য যে সমবায়ি কারণ হয় তাহা দ্রব্য গুণ কিম্বা কর্ম্ম এই তিনের প্রতিই সমান। অর্থাৎ একমাত্র দ্রব্য দ্রব্যান্তর গুণ ও কর্ম্ম এই পদার্থ ত্রয়ের প্রতি সমবায়িকারণ হয়।

তাৎপর্য্য। সমান শব্দের উত্ত স্বার্থে তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়া সূত্রস্থ সামান্য শব্দ নিষ্পন্ন হওয়ায় উহা তুল্যার্থবাচী হইয়াছে। দ্রব্য গুণ ও কর্ম এই তিনেরই দ্রব্যরূপ সমবায়িকারণগত সাম্য আছে। সাবয়ব দ্রব্যের প্রতি যেমত তদীয় অবয়বাত্মক দ্রব্য সমবায়ি কারণ হয়। সেই প্রকার জন্যগুণের এবং কর্ম্ম পদার্থ মাত্রের প্রতিও তাহাদের আশ্রয় স্বরূপ দ্রব্যই সমবায়ি কারণ হইয়া থাকে। ঘটীয়

অবয়ব কপালদ্বয়, যেমত ঘটের প্রতি সমবায়ি কারণ,সেইরূপ কপালে উৎপন্ন রূপাদি, গুণ ও চলনাদি ক্রিয়ারও সমবায়িকারণ। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে দ্রব্যরূপ সমবায়ি কারণ জন্যত্বটী দ্রব্যাদি পদার্থ ত্রয়ের সাধর্ম্ম্য বলা হইল। যদিচ নিত্য দ্রব্যে কিম্বা নিত্য-গুণে দ্রব্য-জন্যত্ব নাই তথাপি দ্রব্য জনিত পদার্থে থাকে এমত যে পদার্থ বিভাজক ধর্ম্ম (অর্থাৎ দ্রব্যত্ব কিম্বা কর্ম্মত্ব) তদাশ্রয়ত্ব স্বরূপ তাৎপর্য্য বিষয়ীভূত ধর্ম্মকে দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্ম্য বলাতে কোন দোষের সম্ভাবনা নাই,কেন না তাদৃশ ধর্ম্ম হইতে দ্রব্যত্ব গুণত্ব ও কর্ম্মত্ব প্রত্যেকই হইয়াছে, এবং সকল দ্রব্যে সমস্ত গুণে ও যাবতীয় কর্ম্ম পদার্থে উক্ত ধর্ম্ম ত্রয়ের কোননাকোনটী অবশ্যই রহিয়াছে।

তথাগুণঃ। ১৯

পদব্যাখ্যা। তথা—সেইরূপ। গুণঃ—গুণ পদার্থ।

অনুবাদ। দ্রব্যের ন্যায় গুণ ও দ্রব্য গুণ ও কর্ম্ম এই তিনের প্রতি কারণ হয়।

তাৎপর্য্য। দ্রব্য গুণ ও কর্ম্ম এই পদার্থ ত্রয়ে যেমত দ্রব্য জন্যত্ব আছে তদ্রূপ গুণজন্যত্বও আছে তবেকিনা উক্ত দ্রব্যাদি ত্রয়ের প্রতি দ্রব্য সমবায়ি কারণ হয় আর গুণ অসমবায়ি কারণ এই পার্থক্য। যাহাতে সমবায় সম্বন্ধে কার্য্যটী থাকে তাহার নাম সমবায়িকারণ এবং ঐ সমবায়ি কারণে থাকিয়া কার্য্যের জনক অথচ যাহার নাশে কার্য্যটীও নষ্ট হয় সেই অসমবায়ি কারণ; অবয়ব দিগের সংযোগ হইতেই অবয়বী জন্মে। কপালদ্বয়ের সংযোগ ব্যতীত ঘট জন্মে না—এজন্য ঘটাত্মক দ্রব্যের প্রতি কপালদ্বয়ের সংযোগ স্বরূপ গুণকে অবশ্য কারণ বলিতে হইবে। এইপ্রকার অবয়বীর রূপরসাদি গুণ যে অবয়বের রূপরসাদি জনিত তাহা অনমুভূত নহে। এবং ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে বায়ু প্রভৃতির অভিঘাতাদি বশতঃই বৃক্ষে শাখা পল্লবাদির সঞ্চালন ক্রিয়া জন্মিয়া থাকে ঐ অভিঘাতাদি, সংযোগরূপ গুণবিশেষ ব্যতীত অন্য কিছু নয়। পূর্ব্ব সূত্রোক্তবৎ এস্থলেও গুণাত্মকা সমবায়ি কারণ জন্যত্ব অর্থাৎ গুণজন্য বৃত্তি পদার্থ বিভাজক ধর্ম্মবত্ত্বকে দ্রব্যাদি পদার্থ ত্রয়ের সাধর্ম্ম্যান্তর বলা হইতেছে বুঝিতে হইবে।

সংযোগ বিভাগ বেগানাং কর্ম্ম সমানম্। ২০

পদব্যাখ্যা। সংযোগ বিভাগ বেগানাং—সংযোগবিভাগ এবং বেগাখ্য সংস্কার এই গুণ ত্রয়ের প্রতি। কর্ম্ম—গমনাদি ক্রিয়াপদার্থ। সমানম্—এক। এ স্থলে কারণ পদের পূরণ করিয়া অথবা পূর্ব্ব হইতে অনুষঙ্গ লইয়া অন্বয় করিতে হইবে।

অনুবাদ। এক কর্ম্ম সংযোগ বিভাগ ও বেগ এই গুণত্রয়ের প্রতিকারণ।

তাৎপর্য্য। দ্রব্য কিম্বা গুণের ন্যায় কর্ম্মেরও অনেক কার্য্যকারিত্ব আছে ইহাই এ স্থলে প্রতিপাদ্য। ধনুর্ব্বাণধারী পুরুষ শর নিক্ষেপ করিলে শরের যে চলন ক্রিয়া জন্মে ঐ চলনক্রিয়া হইতে ধনুর সহিত শরের বিভাগ হয় এবং শরের সহিত উত্তর দেশের সংযোগ জন্মে আর ঐ শরে বেগও জন্মিয়া থাকে সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে বাণের এক

এইটী। গুণলক্ষণম্—গুণ পদার্থের লক্ষণ অর্থাৎ পরিচায়ক।

অনুবাদ। দ্রব্যরূপ আশ্রয়ে অবস্থিত অথচ গুণের অনাশ্রয় (অর্থাৎ দ্রব্যভিন্ন) যে পদার্থ নিচয় নিজের উত্তর কালজাত অন্য কোন ভাবান্তরকে অপেক্ষা না করিয়া সংযোগ কিম্বা বিভাগের প্রতিকারণ হয় না তাহারা গুণ পদার্থ। এইটী গুণের লক্ষণ।

তাৎপর্য্য। উদ্দেশ সূত্রে দ্রব্যের উদ্দেশানন্তর গুণের এবং তদনন্তর কর্ম্মের উদ্দেশ করা হইয়াছে এইক্ষণ দ্রব্যাদির লক্ষণ নির্ব্বাচনাবসরেও প্রথমতঃ দ্রব্যের লক্ষণ বলিয়া এই সূত্রে গুণের লক্ষণ বলিতেছেন এবং পরসূত্রে কর্ম্ম পদার্থের লক্ষণ বলা হইবে। দ্রব্যাশ্রয়ী এই বিশেষণ দ্বারা গুণ সকল যে দ্রব্যেই থাকে অন্যত্র থাকে না এইটী দেখান হইয়াছে। যদিচ সামান্যতঃ প্রতীত হয় যে দ্রব্যাশ্রয়ী হইতে দ্রব্যত্ব ক্ষিতিত্ব প্রভৃতি জাতি পদার্থ হইয়াছে অথচ তাহারা গুণবান্ও নয় এবং সংযোগ কিম্বা বিভাগের প্রতিও কারণ নহে সুতরাং দ্রব্যত্বাদি জাতিতে (অলক্ষ্যে) গুণ লক্ষণের গমন হেতুক অতি ব্যাপ্তিরূপ দোষ হইতেছে। তথাপি বিশেষতঃ ইহাই বুঝিতে হইবে যে, যে শ্রেণীস্থ আশ্রিত পদার্থ একমাত্র দ্রব্যেই সমবায় সম্বন্ধে থাকে অন্যত্র থাকে না তাহারাই বস্তুতঃ দ্রব্যাশ্রয়ী পদ প্রতিপাদ্য। জাতি পদার্থের মধ্যে দ্রব্যত্ব ক্ষিতিত্ব প্রভৃতি এক মাত্র দ্রব্য বৃত্তি হইলেও গুণত্ব কর্ম্মত্বাদি জাতি গুণ কিম্বা কর্ম্মে থাকে বলিয়া জাতি পদার্থান্তর্ব্বর্ত্তি সকলে দ্রব্যাশ্রয়ী নহে; কিন্তু সকল গুণই দ্রব্যে থাকে এজন্য দ্রব্যাশ্রয়ী হইয়াছে। এ স্থলে ইহা বিবেচ্য যে উক্ত প্রকারে দ্রব্যাশ্রয়ী পদে গুণকে গ্রহণ করা যাইবে কিন্তু জাতি পদার্থ গ্রাহ্য নহে ইহার অনুভব মাত্র দেখান হইল বস্তুতঃ লক্ষণে নিবেশাবসরে দ্রব্যাশ্রয়ী পদে জাত্যাশ্রয় এই-নিষ্কৃষ্টার্থ লক্ষণামূলক বুঝিতে হইবে জাত্যাদি পদার্থে আর জাতি থাকে না সুতরাং লক্ষণে পূর্ব্বোক্ত অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা নাই। অগুণবান্ এই বিশেষণটী দ্বারা দ্রব্যের ব্যাবৃত্তি করা হইয়াছে। সাবয়ব দ্রব্য সকল স্ব স্ব অবয়ব রূপ দ্রব্যে আশ্রিত এজন্য দ্রব্যাশ্রয়ী হওয়ায় তাহার ব্যাবৃত্তি করা আবশ্যক। দ্রব্যভিন্ন অন্য কেহ গুণবান্ হয় না সুতরাং গুণবান্ এই শব্দ হইতে গুণবদ্ভিন্ন এই যোগার্থমূলক দ্রব্য ভিন্ন এই নিষ্কৃষ্টার্থটী লাভ হইতেছে নতুবা যে অগুণবান্ অর্থাৎ গুণবান্ নয় সেই গুণ এইরূপ ভাবে লক্ষণে প্রবেশ করা হইলে প্রথমতঃ গুণ পদার্থের জ্ঞান না থাকিলে আর লক্ষণ বাক্য দ্বারা গুণের জ্ঞান হওয়া সম্ভব হয় না এজন্য লক্ষণে আত্মাশ্রয় নামক দোষ হয়। যে পদার্থের লক্ষণ করা হয় পূর্ব্বে ঐ পদার্থের জ্ঞানটী না থাকিলে যদি লক্ষণ প্রতিপাদ্য পদার্থের জ্ঞান হওয়া অসম্ভব হয় তবেই লক্ষণটী আত্মাশ্রয় দোষে দুষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হইবে। স্বকীয় জ্ঞান সাপেক্ষ জ্ঞানকত্বের নাম আত্মাশ্রয়ত্ব। সংযোগ বিভাগেষ্ব কারণ মনপেক্ষঃ এই অংশদ্বারা কর্ম্মের ব্যাবৃত্তি করা হইয়াছে। অন্যথা কর্ম্ম পদার্থ সকল দ্রব্যাশ্রয়ীও বটে এবং অগুণবান্ অর্থাৎ দ্রব্য ভিন্নও হইয়াছে সুতরাং তাহাতে গুণ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। উক্ত সংযোগ বিভাগেষ্ব কারণ

মনপেক্ষ: এই অংশ লক্ষণে থাকিলে আর কর্ম্মে অতিব্যাপ্তি হয় না কারণ ঘটাদি দ্রব্যে, ক্রিয়া জন্মিলে তাহা হইতে পূর্ব্ব সংযুক্ত স্থলের সহিত ঘটাদির প্রথমতঃ বিভাগ হয় পরে উত্তর দেশের সহিত ঐ ঘটের পুনঃ সংযোগও হইয়া থাকে ঘটের ঐ চলনাদি ক্রিয়া উক্ত ঐ বিভাগও সংযোগ জন্মাইতে স্বোত্তর জাত কোন ভাবান্তরকে অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই সমর্থ হয় এ নিবন্ধন কর্ম্ম পদার্থ সংযোগ কিম্বা বিভাগ জন্মাইতে নিরপেক্ষ হইয়া কারণই হইয়াছে অকারণ নহে। এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে সংযোগ কিম্বা বিভাগের প্রতি যেটী কারণ নয় এমত বলিলেই কর্ম্ম পদার্থের ব্যাবৃত্তি হয় তবে লক্ষণে অনপেক্ষ এই অংশ বলিবার তাৎপর্য্য কি? তাহার উত্তর এই—পূর্ব্ব সংযুক্ত পদার্থ দ্বয়েরই বিভাগ হয় এবং বিভক্ত পদার্থ দ্বয়েরই পুনর্ব্বার সংযোগ হইয়া থাকে এজন্য বিভাগের প্রতি পূর্ব্ব সংযোগের এবং উত্তর সংযোগের প্রতি পূর্ব্ব বিভাগের কারণতা আছে স্বীকার করিতে হয় কিন্তু ঐ সংযোগ ও বিভাগ স্বোত্তর জাত ক্রিয়ার সাহায্য ব্যতীত বিভাগ ও সংযোগ জননে সক্ষম নহে সুতরাং অনপেক্ষ শব্দদ্বারা একমাত্র কর্ম্মেরই ব্যাবৃত্তি হইয়াছে সংযোগও বিভাগরূপ গুণে লক্ষণ গমনের বাধা হয় নাই। নতুবা সংযোগ ও বিভাগের অকারণ নয় বিধায় বিভাগে ও সংযোগে লক্ষণের অব্যাপ্তি হইত। বস্তুতঃ সংযোগ বিভাগেষ কারণ মনপেক্ষঃ এই অংশের, কর্ম্ম পদার্থ ভিন্ন এই নিষ্কৃষ্টার্থে তাৎপর্য্য বলিতে হইবে। তাহা হইলে সূত্রের নিষ্কৃষ্টার্থ এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, যেসমস্ত পদার্থ দ্রব্য ও কর্ম্ম ভিন্ন হইয়া জাতির আশ্রয় হয়, তাহাদিগকে গুণ বলে। অতএব সংযোগ বিভাগ ধর্ম্ম অধর্ম্ম প্রভৃতি কোন গুণেরই অসংগ্রহ নাই এবং দ্রব্যে কিম্বা কর্ম্মাদিতে ও লক্ষণের অতিব্যাপ্তি (অলক্ষ্য সংগ্রহরূপ দোষ) নাই।

একদ্রব্য মগুণং সংযোগ বিভাগেষ্বনপেক্ষ কারণমিতি কর্ম্মলক্ষণম্॥ ১৭।

পদব্যাখ্যা। একদ্রব্যং—একটী মাত্র দ্রব্য হইয়াছে আশ্রয় যাহার অর্থাৎ যাহারা প্রত্যেকে এক একটী মাত্র দ্রব্যে আশ্রিত। অগুণং—যাহাতে গুণ নাই অর্থাৎ গুণপদার্থের অনাশ্রয়। সংযোগ বিভাগেষ্বনপেক্ষ কারণং—নিজের উত্তর কালোৎপন্ন কোন ভাবান্তরকে অপেক্ষা না করিয়া যাহারা সংযোগ ও বিভাগ জন্মাইতে সমর্থ হয়। ইতি—এইটী। কর্ম্মলক্ষণং—পূর্ব্বোদ্দিষ্ট কর্ম্মপদার্থের লক্ষণ।

অনুবাদ। যে পদার্থ নিচয়ের প্রত্যেকে একাধিক দ্রব্যে থাকে না অর্থাৎ এক একটী মাত্র দ্রব্যে অবস্থান করে ও যাহাতে গুণ থাকে না অর্থাৎ যাহারা দ্রব্য ভিন্ন এবং যাহারা প্রত্যেকে নিজের উত্তর কালোৎপন্ন কোন ভাবান্তরের সহায়তা ব্যতিরেকেই সংযোগ ও বিভাগকে জন্মাইতে সমর্থ হয় তাহারা কর্ম্ম পদার্থ। এইটী কর্ম্মের লক্ষণ।

তাৎপর্য্য। উদ্দেশ সূত্রের ক্রম অবলম্ব করিয়া গুণ লক্ষণের পর কর্ম্মের লক্ষণ বলা হইতেছে। গুণের মধ্যে সংযোগ ও বিভা

চলনক্রিয়া বিভাগ সংযোগ ও বেগ এই গুণ ত্রয় স্বরূপ অনেক কার্য্য জন্মায়।

নদ্রব্যাণাং কর্ম্ম। ২১

পদব্যাখ্যা। ন—নয়। দ্রব্যাণাং—দ্রব্যের প্রতি। কর্ম্ম—উৎক্ষেপনাদি ক্রিয়া (কারণ পদের পূরণ অথবা অনুষঙ্গ বুঝিতে হইবে।)

অনুবাদ। দ্রব্যের প্রতি কর্ম্মের কারণতা নাই। অর্থাৎ উৎক্ষেপনাদি কর্ম্ম পদার্থ কোন দ্রব্যেরই কারণ হয় না।

তাৎপর্য্য। পূর্ব্ব সূত্রে কর্ম্ম পদার্থকে সংযোগ বিভাগ ও বেগ এই গুণত্রয়ের প্রতি কারণ বলা হইয়াছে কিন্তু দেখাযায় দ্রব্যের উৎপত্তিতেও কর্ম্মের উপযোগিতা আছে। ঘট প্রস্তুত করিবার সময়ে কপালদ্বয়কে সংযুক্ত করিতে তাহাদের পরস্পর নৈকট্যের সম্পাদক যে সঞ্চালন ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় ঐ ক্রিয়া ব্যতীত ঘটারম্ভক সংযোগ (অর্থাৎ কপালদ্বয়ের সংযোগ) না জন্মাতে ঘট জন্মিতে পারে না এ নিবন্ধন ঘটাত্মক দ্রব্যের প্রতি কপালদ্বয়ের সংযোগ-সম্পাদক ঐ চলন ক্রিয়াকে কারণ বলা উচিত তবে সংযোগ প্রভৃতি গুণ ত্রয়ের ন্যায় দ্রব্যের প্রতিও কর্ম্মকে কারণ বলিলেন না কেন? এতাদৃশ প্রশ্নমূলক "নদ্রব্যাণাং কর্ম্ম" এই সূত্রের উল্লেখ হইয়াছে। বস্তুতঃ দ্রব্যের প্রতি কর্ম্মের কারণতা নাই ইহাই এ স্থলে প্রতিপাদ্য। এতৎ পক্ষে যুক্ত্যাদি পর সূত্রে প্রকাশিত হইবে।

ব্যতিরেকাৎ। ২২

পদব্যাখ্যা। ব্যতিরেকাৎ—ব্যতিরেক অর্থাৎ নিবৃত্তি নিবন্ধন।

অনুবাদ। দ্রব্যোৎপত্তি সময়ে কর্ম্মের নিবৃত্তি (বিনাশ) এ নিবন্ধন কর্ম্মকে দ্রব্যের প্রতি কারণ বলাযায় না।

তাৎপর্য্য। সাবয়ব দ্রব্যের উৎপত্তিতে অবয়বের সংযোগ জনকীভূত ক্রিয়ার উপযোগিতা থাকা সত্বেও কর্ম্ম যে দ্রব্যের কারণ নয় তৎপক্ষে হেতু কি? এই আপত্তির নিরাসার্থ "ব্যতিরেকাৎ" এই সূত্র দ্বারা কর্ম্মের নিবৃত্তিকে অর্থাৎ দ্রব্যোৎপত্তি পর্য্যন্ত কর্ম্মের অস্থায়িত্ব অকারণত্বের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইতেছে। কপালদ্বয়ের ক্রিয়া তাহাদের পরস্পর সংযোগ জন্মাইয়া ঘটোৎপত্তি ক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায় (যেহেতু সর্ব্বত্র উত্তর দেশ সংযোগই কর্ম্মের নাশক) তাই কার্য্য ক্ষণে থাকেনা বলিয়া অবয়বের ক্রিয়া অবয়বির প্রতি কারণ হইতে পারে না। এস্থলে ইহা বিবেচ্য যে কার্য্যাধিকরণে কারণের অবস্থিতি সম্পর্কে মতভেদ দেখাযায়। একমতে পূর্ব্বক্ষণে থাকিয়া কার্য্যক্ষণ পর্য্যন্ত কারণের থাকা চাই। অন্যমতে কার্য্যোৎপত্তিক্ষণে না থাকিলেও চলে অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে থাকিয়াই কার্য্য জন্মাইতে কারণের সামর্থ্য আছে এই উভয় মতের মধ্যে পূর্ব্বমত অবলম্বন করিলে দ্রব্যোৎপত্তি সময়ে কর্ম্মের ব্যতিরেক তাহার অকারণত্বের হেতু হইতে পারে কিন্তু পরমতে ঘটোত্পত্তির পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত স্থায়ি-অবয়বকর্ম্মের কারণত্বের বাধা হয়কৈ? মতবিশেষ অবলম্বন করিয়া উক্ত কারণত্বের খণ্ডন করিলে তাহাতে বাদীর নিরাস হয় না এজন্য পরমতেও উক্ত ব্যতিরেক কর্ম্মের দ্রব্যাকারণত্বে হেতু হইতেছে দেখাইতে হইবে মহাপট ধ্বংস জনিত খণ্ড

পটই তাহার দৃষ্টান্তস্থল। অবয়বির প্রতি অবয়বের ক্রিয়াকে কারণ বলিতে হইলে (পূর্ব্বোক্ত মতদ্বয়ের পর মতেও) সর্ব্বত্র সাবয়ব পদার্থোৎপত্তির পূর্ব্বক্ষণে তাহার অবয়বে আরম্ভক সংযোগানুকূল ক্রিয়া থাকা চাই। কিন্তু একখানা লম্বায়মান বস্ত্রকে খণ্ড করিয়া তাহা হইতে ক্ষুদ্র বস্ত্র প্রস্তুত করিলে ঐ ক্ষুদ্র পটের আরম্ভকীভূত তন্তু সন্ততি সংযোগের অনুকূল কোন ক্রিয়া ঐ খণ্ড বস্ত্রোৎপত্তির পূর্ব্বক্ষণে বাস্তবিক পক্ষে থাকে না সুতরাং কর্ম্মের ব্যতিরেক অর্থাৎ অভাবই দ্রব্যাকারণত্বে হেতু হইতেছে। পরন্তঃ যেটী কারণের কারণ তাহাতে জনকতা স্বীকার নাই। কালিদাস রচিত পুস্তকে কালিদাসের পিতা যে কারণ নহে তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেননা। কার্য্যোৎপত্তিতে জনকের জনককে (নিষ্প্রয়োজনবিধায়) অন্যথাসিদ্ধ বলা হয়। জন্য দ্রব্যস্থলেও জনকী-ভূত অবয়ব সংযোগের জনক বিধায় কর্ম্ম দ্রব্যের প্রতি অন্যথা সিদ্ধ অর্থাৎ কর্ম্ম জনিত অবয়ব সংযোগ হইতেই দ্রব্যোৎপত্তি সম্ভাবনা হওয়ায় কর্ম্মকে কারণ বলিবার কোনই প্রয়োজন থাকে না।

ক্রমশঃ

অথর্ব্ববেদীয়া

মুণ্ডকোপনিষৎ।

প্রথমমুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ।

(মূলম্)

ওঁ ব্রহ্মাদেবানাম্ প্রথমঃ সম্বভূব
বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্ম বিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা
মথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠ পুত্রায় প্রাহ॥ ১

অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মা—
থর্ব্বাতাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্।
স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ
ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাম্॥ ২

শৌনকো হবৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং
বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ।
কস্মিন্ ভগবো বিজ্ঞাতে
সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি॥ ৩

তস্মৈ স হোবাচ। দ্বে বিদ্যে
বেদিতব্য ইতি হস্মযদ্
ব্রহ্ম বিদো বদন্তি পরা
চৈবাপরা চ॥ ৪

তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ
সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো
ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষ মিতি
অথ পরা যয়া তদক্ষর মধিগম্যতে॥ ৫

যত্তদদৃশ্য মগ্রাহ্য মগোত্র মবর্ণম্
অচক্ষুঃ শ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিত্যং
বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং
তদ্ভূত যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ। ৬

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথাসতঃ পুরুষাৎ কেশ লোমানি
তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্। ৭

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম
ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণোমনঃ সত্যং
লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতম্॥ ৮

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্
যস্য জ্ঞান ময়ং তপঃ

তস্মাদেতদ্ ব্রহ্মনাম
রূপ মন্নঞ্চ জায়তে। ৯
(বঙ্গানুবাদ)
এ বিশ্বের রচয়িতা ভুবন পালক
ব্রহ্মা, দেবগণ মাঝে জন্মেন প্রথম ;
জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বকে, কহিলেন তিনি,
সকল বিদ্যার সার, ব্রহ্ম বিদ্যা জ্ঞেয়।
বলিয়া ছিলেন ব্রহ্মা অথর্ব্বকে যাহা
অথর্ব্বা তাহাই কহিলেন অঙ্গিরসে ;
তিনি পুনঃ ভারদ্বাজ সত্যবাহে কন ;
তা'হতে সে পরাবরে আঙ্গিরস লন। ২
যথাবিধি উপস্থিত হ'য়ে মহাশাল—
শৌণক, করেন প্রশ্ন ঋষি অঙ্গিরসে
—"কৃপাকরি ভগবন্, কহ মোরে তবে
কি জানিলে এ সকল জানা মোর হবে ? ৩
বলিলেন তিনি, কহেন ব্রহ্মবিদ্‌গণ
বেদিতব্য দুই বিদ্যা পরা ও অপরা। ৪।
ঋক্ যজু সামাথর্ব্ব বেদ চতুষ্টয়
শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ,
ছন্দঃ পুনঃ, হয় জেনো সে বিদ্যা অপরা
অক্ষর পুরুষ বেদ্য যাহে সেই পরা। ৫
অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, মূলহীন, বর্ণহীন,
চক্ষুঃ, কর্ণ, হস্ত, পদ, নাহি যাঁর কিছু—
নিত্য, বিভু, সর্ব্বগত, সুসূক্ষ্ম অব্যয়—
সর্ব্বভূত-যোনি বলি জানে জ্ঞানিগণ। ৬
আপন শরীর হ'তে ঊর্ণনাভ যথা
বাহির করয়ে তন্তু, লয় পুনরায় ;
ওষধি জনমে যথা এই পৃথিবীতে,
জীবিত পুরুষ হ'তে কেশ লোম যথা—
সে অক্ষর হ'তে জন্মে এই বিশ্ব তথা। ৭
হইলেন ব্রহ্ম যবে তপঃ উপচিত
তাঁহাতে জন্মিল অন্ন ; অন্ন হতে প্রাণ,
মনঃ, সত্য লোকচয়, কর্ম্ম অমৃত
(একে একে, ক্রমে ক্রমে) হইল উদ্ভূত। ৮
সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ হন যেই জন
তপঃ যাঁর জ্ঞানময়, জনমে তাঁ হ'তে
ব্রহ্ম, নাম, রূপ, অন্ন তাঁহারি ইচ্ছাতে। ৯
ইতি প্রথম মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ।

প্রথম মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

তদেৎ সত্যং
মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি কবয়োযান্যপশ্যং
স্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি।
তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা
এষ বঃপন্থা সুকৃতস্য লোকে। ১
যদালেলায়তে হ্যর্চ্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে
তদাজ্য ভাগাবন্তরেণাহুতীঃ প্রতিপাদ—
য়েচ্ছ্রদ্ধয়াহুতম্। ২
যস্যাগ্নিহোত্র মদর্শ মপৌর্ণমাস
মচাতুর্মাস্য মনাগ্রয়ণ মতিথি বর্জ্জিতঞ্চ
অহুত মবৈশ্বদেব মবিধিনা হুত
মাসপ্তমাং স্তস্য লোকান্ হিনস্তি। ৩
কালী করালীচ মনোজবাচ
সুলোহিতা যাচ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচীব দেবী
লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ। ৪
এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু
যথাকালং চাহুতয়োহ্যাদদায়ন্।
তন্নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্য্যস্য রশ্ময়ো
যত্র দেবানাং পতিরেকোঽধিবাসঃ। ৫
এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চ্চসঃ
সূর্য্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি।
প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোর্চ্চয়ন্ত্য
এষবঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ। ৬

প্লবাহেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়াঃ
জরা মৃত্যুং তে পুনরেবাপি যান্তি। ৭

অবিদ্যায়া মন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ। ৮

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা
বয়ং কৃতার্থাইত্যভি মন্যন্তি বালাঃ।
যৎকর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি
রাগাত্তেনাতুরাঃ ক্ষীণ লোকাশ্চ্যবন্তে। ৯

ইষ্টা পূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং
নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
না কস্য পৃষ্ঠেতে সুকৃতেঽনুভূত্বে—
মং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি। ১০

তপঃ শ্রদ্ধে যেহ্যপবসন্ত্যরণ্যে
শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষ্যচর্য্যাংচরন্তঃ।
সূর্য্য দ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি
যত্রামৃতঃ স পুরুষোহ্যব্যয়াত্মা। ১১

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্ব্বেদ মায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরু মেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্ম নিষ্ঠং। ১২

তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্
প্রশান্ত চিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্। ১৩

(বঙ্গানুবাদ)

সত্য ইহা—
বেদমন্ত্রে জ্ঞানিগণ কর্ম্ম যে সকল
দেখিয়াছিলেন, তাহা বিবিধ রূপেতে
ত্রেতাতে বিস্তৃত ; সবে হয়ে সত্যকাম
নিয়ত করহ তাহা ; ইহা তোমাদের
হয় ফলপ্রাপ্তিপথ স্বকৃত কর্ম্মের। ১

সমিদ্ধ হইলে হব্যবাহন, তাঁহার
শিখা যবে লক্ লক্ করে, সে সময়
আজ্যভাগ মধ্যস্থলে শ্রদ্ধার সহিত
আহুতি করিবে দান ; ইহা তোমাদের
হয় ফল প্রাপ্তি পথ স্বকৃত কর্ম্মের। ২

যার অগ্নিহোত্র যজ্ঞ, দর্শ পৌর্ণমাস
আগ্রয়ণ যাগ হীন, অতিথি বর্জ্জিত ;
অকালানুষ্ঠিত, বৈশ্বদেব কর্ম্মহীন,
অনুষ্ঠিত অবিধিতে, তাহার নিশ্চয়
হেন যজ্ঞফলে সপ্তলোক নষ্ট হয়। ৩।

কালী ও করালী, মনোজবা, সুলোহিতা,
সুধূম্র বরণা স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী,—
দীপ্তিময়ী, লক্ লক্ এই জিহ্বা সাত
আছয়ে অগ্নির ; ৪।

এরা হলে দীপ্যমান্
করে যেই যথাকালে অগ্নিহোত্রাদির
অনুষ্ঠান, তারে এই আহুতি সকল
সূর্য্যরশ্মি দিয়া সেই স্থানে লয়ে যায়
একমাত্র দেবপতি রহেন যেথায়। ৫

দীপ্তিময়ী আহুতিরা সেই যজমানে
"এস, এস, তোমাদের সুকৃতির ফলে
লব্ধ পুণ্য ব্রহ্মলোক এই, হেন রূপ
প্রীতিকর বাক্য কহি, অর্চ্চনা করিয়া,
বহন করিয়া লয় সূর্য্যরশ্মি দিয়া। ৬

এই অষ্টাদশাশ্রয় যজ্ঞরূপ ভেলা
অদৃঢ়, কথিত যাহে অশ্রেষ্ঠ করম ;
এরে শ্রেষ্ঠ মনে করে যেই মূঢ় গণ
লভে তারা পুনরায় জরা ও মরণ। ৭

অবিদ্যার মাঝে যারা থাকি বর্ত্তমান
আপনারে মনে করে ধীর সুপণ্ডিত
জরা রোগাদিতে তারা হ'য়ে পীড়মান
ভ্রমে অন্ধনীয়মান অন্ধের সমান। ৮
নানারূপ অবিদ্যায় থাকি বর্ত্তমান,
"কৃতার্থ আমরা" হেন করে অভিমান
অজ্ঞানীরা ; কর্ম্মিগণ রাগবশে
কর্ম্মকালে, ব্রহ্ম বিদ্যা জানে না বিশেষে ;
অতএব কর্ম্মফল হইলেক ক্ষয়
দুঃখার্ত্ত হইয়া তারা স্বর্গচ্যুত হয়। ৯
মূঢ় যারা ইষ্টাপূর্ত্ত শ্রেষ্ঠ ভাবে মনে,
নাহি জানে অন্য শ্রেয়ঃ, সুকৃতির ফলে
স্বর্গে যেয়ে কর্ম্মফল অনুভব করি,
এইলোকে কিম্বা হীনতরে আসে ফিরি। ১০
যে সকল শান্ত জ্ঞানী ভিক্ষাবৃত্তি ধরি,
অরণ্যে করিয়া বাস করেন সাধন
তপঃ আর শ্রদ্ধা, তাঁরা হয়ে রজোহীন,
সূর্য্যদ্বার দিয়া সেথা করেন প্রয়াণ
পুরুষ—অমৃতাব্যয় যথা বর্ত্তমান। ১১
পরীক্ষা করিয়া কর্ম্ম লব্ধ লোকচয়,
ব্রাহ্মণ নির্ব্বেদ ভাবধরিবেন নিজে ;
কর্ম্মে লভ্য নহে নিত্য পদার্থ যখন
অতএব নিত্যবস্তু জ্ঞান লাভ তরে
শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্ম নিষ্ঠ গুরু সন্নিধান
সমিধ্ লইয়া করে করিবে প্রয়াণ। ১২
সে বিদ্বান্ গুরু শান্ত চিত্ত শমান্বিত
তদীয় সমীপ গত জনেরে তত্ত্বতঃ
বলিলেন ব্রহ্ম বিদ্যা, যাহা প্রকাশয়
সে অক্ষর, সেই সত্য পুরুষ বিষয়। ১৩

ইতি প্রথম মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ডঃ।

ইতি প্রথম মুণ্ডকং সমাপ্তম্।

শ্রীমনোরঞ্জন মিশ্র।

আমিত্বের প্রসার।

(মায়া)

মায়া! মায়া! মায়া! সর্ব্বত্রই মায়া। স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল, সর্ব্বত্রই মায়ার সাম্রাজ্য। প্রিয় পাঠক! ভাবিয়া ছিলাম, তোমার মায়া-পাশ ছিন্ন করি, হিন্দু-পত্রিকাকে বিস্মৃতির গর্ভে পাতিত করি, কিন্তু পারিলাম কই? মায়া, সেই বিশ্ববিমোহিনী মায়া, সেই ব্রহ্ম-বিমোহিনী মায়ার হস্তে বন্দী হইয়া পুনর্ব্বার তোমার দ্বারে উপস্থিত হইলাম। এদীনকে কিন্তু তাই বলিয়া তুমি অবহেলা করিও না। আমিত আমি, আমার অপেক্ষা কত শত মহাজন, মুনি, ঋষি, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, দেবতা কেহই মায়ার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। স্বয়ং ব্রহ্মই মায়ার হস্তে নিস্তার পান নাই। প্রলয়ে মায়া তাহাতে লীন হয়েন বটে, কিন্তু একেবারে বিনষ্ট হন না। স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া তিনি আবার ব্রহ্মের চিদাকাশে উদিত হইয়া তাহাকে সৃষ্টির কার্য্যে নিয়োজিত করেন। ব্রহ্ম একজন বড় গৃহস্থ, তোমার আমার গৃহ ক্ষুদ্র, কিন্তু এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মের গৃহ, আর এই ব্রাহ্মী মায়াই তাহার গৃহিণী স্বরূপা। ব্রহ্ম যেন সারাদিন গৃহস্থালীর কার্য্য করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া পড়েন, এবং দিনান্তে গৃহস্থলী বিস্মৃত হইয়া নিদ্রাভি-ভূত হন। এত যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না, সৃষ্টি করিয়া কি কুকার্য্যই করিয়াছি! বিশুদ্ধ পুরুষের, এইরূপ মনোভাব দেখিয়া মায়া গৃহিণী তখন সঙ্কুচিত হয়েন। মায়া

অতি চতুরা গৃহিণী, স্বামীর মনের বিরক্ত ভাব দেখিয়া তিনিও বলেন, তাইত এত ঝঞ্ঝাট কি আর সহ্য হয়, চল আমরা বিশ্রাম করিগিয়া। সুচতুরা তখন ব্রহ্মের কর্ণ-কুহরে পুনর্ব্বার ধীরে ধীরে সংসারের নানাবিধ সুমিষ্ট কথা প্রবেশ করান রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই, নির্গুণ ক্লীব ব্রহ্মের সংসার বাসনা পুনর্ব্বার জাগরূক, তিনি পুনর্ব্বার ঘোর সংসারী সম্পূর্ণ। ব্রহ্মাণ্ড তোমার আমার দিন রাত্রি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, কিন্তু ব্রহ্মের দিন রাত্রি এক এক বৃহৎ যুগ, তোমার আমার গৃহিণী সকল ক্ষুদ্র মায়া ললনা, কিন্তু ব্রহ্মের গৃহাঙ্গনা সেই আদ্যাশক্তি জগৎজননী, ব্রাহ্মী মহামায়া। স্বয়ং ব্রহ্ম যখন এই সংসারের মায়া এড়াইতে পারেন না, তখন আমরা ত কোন্ কীটাণু-কীট। আর ব্রহ্মের এই সংসার কি যথার্থই অশান্ত? সংসার যদি যথার্থই অশান্তি ময় হয় তাহা হইলে ইনি ব্রহ্মেরই হউন আর যারই হউন, উহা সর্ব্বথা পরিহার করা কর্ত্তব্য। সংসারের যে অশান্তি, সে কি সংসারের নিজের না আমাদের কৃতকার্য্যের। সংসারে তৃষ্ণা আছে সত্য, কিন্তু তৃষ্ণা নিবারণার্থে জলাশয়ও আছে। তুমি বলিতে পার, তৃষ্ণা না থাকিলেই হইত, কেবল জল থাকিলেই চলিত। কিন্তু তৃষ্ণা না থাকিলে জলের প্রয়োজন কোথায়? জল পানে যে সুখটুকু তাহা তৃষ্ণা আছে বলিয়া। ভাবিয়া দেখ তুমি যাহা কিছুকেই দুঃখ অভিধানে অভিহিত করিবে, তাহাই বস্তুতঃ তোমার সুখের উপাদান বলিয়া। রৌদ্র ও বৃষ্টি উভয় হইতেই সুখ দুঃখ আসিতে পারে। রৌদ্র ও বৃষ্টি প্রকৃতির নিয়মানুসারে হইবে, তোমার তাহা পরিবর্ত্তন করিবার সামর্থ্য নাই, কিন্তু তুমি তোমার কার্য্যাবলী এমনি ভাবে নিয়মিত করিতে পার, যে রৌদ্র ও বৃষ্টি তোমার পক্ষে সুখকর হয়। সৃষ্টির প্রত্যেক ব্যাপারেই অনন্ত মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে, মানব অজ্ঞান বশতঃ তাহাদিগকে অমঙ্গলে পরিণত করে। জ্ঞানের বিকাশের সহিত সর্প বিষও মানবের মঙ্গলদায়ক হইয়াছে। মঙ্গল, অমঙ্গল বস্তু-সত্বাতে নহে, প্রয়োগের বিভিন্নতায়। এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিলে, আপাত প্রতীয়মান অবশ্যম্ভাবী অতীব দুঃখ জনক ব্যাপারকেও আত্মার শান্তির উপকরণ স্বরূপ গ্রহণ করা যায়। জগতে পিতার পুত্রাদি-মৃত্যু জনিত শোক অপেক্ষা অন্য কোন ক্লেশই বলবত্তর নহে, কিন্তু পিতা জ্ঞানী হইলে সে ক্লেশ অনুভব করেন না। মৃত্যু কি? এই দেহের বিনাশ। পুত্র পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র, যাহা আর পরিধান করা যায় না, তাহা পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করিলে, পিতার সুখ না দুঃখ হয়? সুখই হয়। তবে মৃত্যু কেবল দেহান্তর প্রাপ্তি, এই জ্ঞান দৃঢ় হইলে, আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে দুঃখ হইবে কেন? ভগবানের বিধানে যে দেহ কার্য্যক্ষম সে দেহের ধ্বংস হয়না। মৃত্যু অতিশয় দয়ালু। জীবের কষ্টে তিনি অতি ক্লিষ্ট। জীবের কষ্ট তিনি সহ্য করেন না। তাই জীব যখন নানাবিধ অপকার্য্যে নিজের দেহকে সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য করিয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করেন, মৃত্যু তখন অনুকম্পা করিয়া তাহার দুঃখের অবসান করিয়া দেন। ভাবিয়া দেখ, মৃত্যু না থাকিলে, জগৎ কি অশান্তিময় হইত। স্বীয় কৃত কার্য্যে রোগ দেহে উপ-

স্থিত, কিছুতেই আরোগ্যের সম্ভাবনা নাই। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে এদেহের উপকরণ আর কর্ম্মণ্য করা অসম্ভব। এই বিপদের সময় মৃত্যু উপস্থিত হয়েন এবং অভয় প্রদান করেন,"ভয় নাই,আমি তোমার দেহ পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেছি, নূতন দেহ ধারণ করিয়া, নূতন উপকরণ লইয়া নূতন বলে বলীয়ান হইয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ কর।" কত সময় আমরা, "হা মৃত্যু তুমি কোথায়" বলিয়া আর্ত্তনাদ করি, কত অনুনয়ে বিনয়ে মৃত্যুকে আহ্বান করি, কিন্তু মৃত্যু দেখা দেন না। সময় হয় নাই, এখনও দেহের উপকরণ এত অকর্ম্মণ্য হয় নাই, যখন নূতন দেহের প্রয়োজন। এ বস্ত্র এখনও ব্যাবহার করা যায়, পিতা নূতন বস্ত্র দিলেননা। বালক কাঁদিল, পিতা তাহা শুনিলেন না। কে না দেখিয়াছেন, পুত্রশোকে কত জনক জননী দিবানিশি মৃত্যুর সাধ্য সাধনা করিতেছেন, কেনা দেখিয়াছেন কত পত্নী পতির শোকে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যুর উপাসনা করিয়াছেন, কিন্তু কৈ, মৃত্যু কোথায়? মৃত্যু দয়ালু বটে, কিন্তু অজ্ঞানীর প্রার্থনায় কর্ণ দেন না। আবার বিনা আহ্বানেও তিনি আসিয়া উপস্থিত হয়েন; যে পুত্রকে চক্ষুর অন্তরাল করিলেই প্রাণান্ত হয়, তাহাকেও তিনি বলপূর্ব্বক লইয়া যান। আর্ত্তনাদে কর্ণও দেন না। মৃত্যু অপেক্ষা জগতে আর কোন পদার্থই অধিকতর দুঃখজনক বলিয়া বিবেচিত হয় না, কিন্তু সেই মৃত্যুও আমাদের মঙ্গলের জন্য। আর এই মৃত্যু জনিত যে দুঃখ, তাহার মূল কোথায়? মৃত ব্যক্তির স্বার্থ, না নিজের? ভাবিয়া দেখ, স্বীয় স্বার্থই উহার মূল। তুমি চলিয়া গেলে আমার কি হইবে, কিম্বা আমি আকাশে যে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম, তাহা কোথায় গেল! আমি দুঃখ ভোগ করিব,কিম্বা আমার কত কল্পগুলি আশা পূর্ণ হইল না, ইহাই আমাদের দুঃখের মূল কারণ। শাস্ত্র বলেন যে আত্মীয় স্বজন অশ্রুবর্ষণ করিলে,দেহ—বিমুক্ত আত্মার ক্লেশ হয়। হইবারই কথা। আমি পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করিতেছি, আমি দুঃখ বিমুক্ত হইয়া সুখে প্রবেশ করিয়াছি, তুমি স্বীয় স্বার্থে অন্ধ হইয়া আমার জন্য চীৎকার আরম্ভ করিলে। আমাকে যদি যথার্থই ভালবাস, তবে তোমার দুঃখিত না হইয়া আনন্দিত হওয়াই উচিত। বৌদ্ধেরা আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে অনেক প্রকার আমোদ আহ্লাদ করে। সমাজ বিশেষের চক্ষে শোক চিহ্ন ধারণ না করিয়া এইরূপ সময় হর্ষ চিহ্ন ধারণ উপহাসাস্পদ হইতে পারে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে মৃত্যু যথার্থই কি আনন্দের জিনিষ নহে? এখন ভেবে দেখ মায়া কি? মায়ার দার্শনিক ব্যাখ্যা আপাততঃ ভুলিয়া যাও। ব্রহ্মের অঘটন ঘটনপটীয়সী শক্তি, ক্ষণ [illegible] জন্য বিস্মৃত হও। নির্গুণ ব্রহ্ম পরিত্যাগ করিয়া এই সগুণ ব্যবহারিক জগতের দিকে নেত্রপাত কর। সন্তানের প্রতি মাতার মায়া, এ মায়া কি মধুময়! মাতা নিজের সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, মায়ার প্রভাবে পুত্রেতে আত্মহারা হন। তুমি কি বল যে এই মায়া পরিত্যাজ্য? কখনই না। তুমি বলিবে যে এ মায়া স্বর্গীয় মায়া, এজগতে যদি কেহ স্বর্গ সুখ অনুভব করেন, তবে

সন্তান বৎসলা মাতা। তাহাই যদি হইল তবে এ মায়া পাশ ছেদন কেন করিব, উহার বিনাশ না করিয়া প্রসার করিয়া অনন্ত স্বর্গ সুখ কেন উপভোগ না করি? বস্তুতঃ প্রত্যেক ব্যক্তির স্বীয় সন্তানের প্রতি যে মমতা, উহা যদি সে প্রসার করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তাহার ক্ষুদ্র মায়া ব্রাহ্মী মায়া বা মহামায়াতে পরিণত হইল। ক্ষুদ্র আত্মার ক্ষুদ্র মায়া, কিন্তু মহাত্মা বা পরমাত্মার মহা বা পরম মায়া। ক্ষুদ্র মায়া যতই প্রসার করিতে পারিবে, ততই তোমার ক্ষুদ্র আত্মা ক্ষুদ্র উপাধি পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মার নিকটবর্ত্তী হইবে। তোমার আত্মা যে ক্ষুদ্র, তাহার কারণ তোমার মায়া ক্ষুদ্র, তাহার কারণ তুমি নিজ পুত্র কন্যাদি ভিন্ন আর কাহারও প্রতি মায়া করিতে জান না, তোমার মায়াকে মহামায়ার পরিণত কর, তোমার আত্মার ক্ষুদ্রত্ব থাকিবে না, উহা মহা বা পরমাত্মায় পরিণত হইবে। অতএব পুত্র কন্যার প্রতি যে মায়া তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে না, উহার প্রসার করিতে হইবে। উহার প্রসার করিলেই আমিত্বের প্রসার হইবে, ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করিবে আর মায়া পরিত্যাগ করিতে চাহিলেই কি করা যায়? করাও যায় না, করিতে চেষ্টা করাও অমঙ্গল জনক। স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করিলাম, ধনৈষণাদি পরিত্যাগ করিলাম, অরণ্যে গমন করিলাম। সেখানেও সেই বিশ্ববিজয়িনী মায়া। হয়ত শকুন্তলা আসিয়া জুটিল, না হয় হরিণ শিশু আসিয়া জুটিল। তাহাদিগেতেই ভগবান [illegible] না হরিণ শিশু আমার আমাকে সংসারে প্রবেশ করাইল। রাজ্যাদি পরিত্যাগের পর এক হরিণ শিশুতেই ভরতের তাবৎ সংসার হইয়াছিল। শকুন্তলা পতি গৃহে যাইবার সময় বৃদ্ধ কণ্ব মহর্ষি কতই না কাঁদিলেন।

যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া
অন্তর্ব্বাষ্প ভরোপরোধি গদিতং চিন্তাজড়ং দর্শনম্।
বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমপি স্নেহাদরণ্যৌকসঃ
পীড্যন্তে গৃহিনঃ কথং ন তনয়া বিশ্লেষ দুঃখৈর্নবৈঃ।

শকুন্তলা অদ্য পতি গৃহে গমন করিবে, হৃদয় উৎকণ্ঠিত হইতেছে, অভ্যন্তরীণ দুঃখ হেতুক মুখে যে কথা সরিতেছে না! জড়তা আসিতেছে, চিন্তা হেতু চক্ষুতে অন্ধকার দেখিতেছি, আমি বনবাসী, তথাপি কন্যা স্নেহে আমার এতদূর বিহ্বলতা উপস্থিত হইয়াছে না জানি কন্যা পতিগৃহে প্রথম গমন করিবার সময় গৃহিদের কতই না দুঃখ উপস্থিত হয়। হরিণ শিশু বা শকুন্তলা না থাকিলেও আশ্রমের তরুলতা তাহাদের স্থান অধিকার করে, তাহারাই পুত্র কন্যা হইয়া দাঁড়ায়। এড়াইবার উপায় নাই, আবশ্যক ও নাই, লাভও নাই, এড়াইতে গেলেও সমূহ অনিষ্ট। নির্গুণ ব্রহ্ম মায়া আশ্রয় সগুণ ব্রহ্মা বা ঈশ্বর হয়েন। তিনিই ব্রহ্মাণ্ড গৃহের গৃহস্বামী, মহামায়া তাহার গৃহিনী। গৃহিনীকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে কে কখন গৃহস্বামীকে সন্তুষ্ট করিতে পারে? অসম্ভব। মাতৃদ্বেষী পুত্রকে পিতা কি কখন ভাল বাসেন? কখনই না। গীতায় ভগ-

বান্ বলিয়াছেন যে মায়া আশ্রয় করিয়া তিনি জগৎ প্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়াছেন। মহামায়া আমাদের মাতৃ স্বরূপা, তিনিই জননীরূপে আমাদিগকে লালন পালন করেন। পিতার নিকট কি সব সময় যাওয়াযায়, যত কিছু আবদার সব না মায়ের কাছে। মা জগদম্বে! মহামায়ে একবার আমাকে ক্রোড়ে লও, তাহা হইলেই আমার জীবন স্বার্থক হইবে। তোমার কৃপায় পিতৃ পদ লাভ হইবে, আর তোমার অকৃপা হইলে আমার দুর্গতির সীমা থাকিবে না।

মায়ার প্রসার বহুবিধ ভাবে করা যায়। ভগবানকে পিতৃরূপ এবং মহামাকে মাতৃরূপে গ্রহণ করিয়া আমিত্বের প্রসার সাধন করা যায়। সাধারণ সাধকের পক্ষে ইহাই সহজ প্রকৃষ্ট উপায়। ভগবান্ পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াঃ। তাহাকে পিতৃ ভাবে দেখিতে চাও দেখ, সখাভাবে দেখিতে চাও দেখ, পুত্র ভাবে দেখিতে চাও দেখ, পতিভাবে দেখিতে চাও তাহাও পার। সর্ব্ববিধ ভাবেই মায়ার প্রসার। মায়ার প্রসার না করিলে তাহাকে পাওয়া যায় না। ক্ষুদ্রমায়ার তিনি ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত বা জীবাত্মা,মহামায়ায় তিনি মহা বা পরমাত্মা। নন্দরাজা ও যশোদা ঠাকুরাণী ভগবানকে পুত্ররূপে আরাধনা করিয়াছিলেন। মনে করিওনা যে নিজের পুত্রের প্রতি ঐকান্তিক মায়া বা স্নেহ থাকিলেই ভগবানকে পুত্ররূপে আরাধনা করা যায়। স্বীয় পুত্রের প্রতি যেরূপ স্নেহ মমতা,তাবৎ বিশ্বে সেইরূপ স্নেহ মমতা দেখান চাই। যাহার স্নেহ মমতা যতদূর প্রসারিত, তিনি ভগবানের নিকট ততদূর অগ্রসর। যাহার পুত্র প্রেম বিশ্ব প্রেমে পরিণত হয়, তিনি ক্ষুদ্র মায়োপাধি পরিত্যাগ করিয়া মহামায়োপাধি আশ্রয় করিয়া আনন্দধামে চিরানন্দ ভোগ করেন। সখার প্রতি সখার যে প্রেম, তাহাও প্রসারিত করিতে হয়, তাবৎ বিশ্বে সখিত্ব স্থাপন করিতে পারিলেই, শ্রীদাম, সুদাম, অর্জ্জুন প্রভৃতির ন্যায় ক্ষুদ্র মায়োপাধি পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বজনীন মায়োপাধি আশ্রয় করিয়া মহামায়াধীশ্বর পরব্রহ্ম সন্নিধানে যাওয়া যায়। পিতা হইয়া যেরূপ বিশ্বে পুত্র প্রেম প্রসার করিতে পার, তদ্রূপ পুত্র হইয়া বিশ্বে পিতৃ প্রেম প্রসার করিতে পার। মাতা হইয়া যেরূপ বিশ্বে পুত্রপ্রেম বিস্তার করিতে পার, তদ্রূপ পুত্র হইয়া বিশ্বে মাতৃ প্রেম বিস্তার করিতে পার। বহুবিধ ভাবের মধ্যে পতি পত্নী ভাবে সাধনা বড়ই কঠিন ও বিপজ্জনক। এই ভাবকে সাধারণতঃ মধুর ভাব বলা যায়। নিজেকে মহামায়া করিয়া ভগবানের আরাধনাই মধুর বা গোপী ভাব বা বামাচার। আমি নিজেই সেই মহামায়া, সেই প্রকৃতি। বস্তুতঃ এই জগতই মহামায়াময়। আমরা সকলেই মায়ার উপাধি মাত্র। মহামায়া যেভাবে ভগবানকে আশ্রয় করিয়াছেন, আমিও আমার ক্ষুদ্রত্ব পরিহার করিয়া সেইভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিব। তাবৎ বিশ্বে পতি-প্রেম প্রসার করিব। ঐরূপ তাবৎ বিশ্বেই পত্নী প্রেম প্রসার ও একবিধ উপাসনা। পতি-প্রেম বা পত্নী প্রেম প্রসারের সহিত ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির কোন সংস্রব নাই,অজ্ঞান বশতঃ ভ্রান্ত-জীব ইহাতে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি সংসৃষ্ট করিয়া পাপ পঙ্কে নিমগ্ন হয়। ঋষি

যাজ্ঞবল্ক্য তদীয় পত্নী মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছিলেন যে পতি যে পত্নীকে ভালবাসে, সে পত্নীত্বের জন্য নহে, পত্নীর মধ্যে আত্মা বিরাজিত বলিয়া, এবং পত্নী যে পতিকে ভালবাসে সে পতিত্বের জন্য নহে, পতির মধ্যে আত্মা আছে বলিয়া। আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি হওয়া চাই। আত্মাই যে একমাত্র নিত্য বস্তু তাহাও উপলব্ধি করা চাই। মানব উপাধি জড়িত। পার্থিব নিম্ন উপাধি হইতে ক্রমে তাহার উচ্চ উপাধিতে আরোহণ করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই, এজন্য তাহার পতি, পত্নী, পুত্র, পিতা মাতা, ভ্রাতা ইত্যাদি কতকগুলি জাত মায়োপাধি আশ্রয় করিয়া উর্দ্ধে মহামায়ার নিকট গমন করিতে হয়। ইন্দ্রিয় পরিচর্য্যায় উর্দ্ধে গমন করা যায় না, নিম্নে পতিত হইতে হয়। বামাচার ও গোপী ভাবের অন্তরালে আমাদের দেশে যে কত ব্যভিচার, কত ভ্রূণ হত্যা আদি পাপ-স্রোত প্রবেশ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এ সমুদায় ভাব নির্দ্দোষ ভাবে প্রসারিত করা বড়ই কঠিন। মাতৃভাব পিতৃভাব বা পুত্র ভাবাদি প্রসারিত করা সহজ ও সুকর এবং তাহাতে আপদের আশঙ্কা নাই। গোপীভাব বা বামাচারে পদে পদে পদস্খলনের সম্ভাবনা। এইজন্য সর্ব্বথা পরিহার্য্য। ফল কথা এই যে যিনি যে ভাবেই বিশ্বে বিরাজ করুন, তাহার মায়া প্রসারিত করিতেই হইবে, এবং এই মায়া প্রসারিত করিতে পারিলেই, তিনি তাহার ক্ষুদ্র অহংকে বা আমিত্বকে প্রসারিত করিয়া সমগ্র বিশ্বে সেই পরমাত্মার সত্তা উপলব্ধি করিয়া ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতে পারেন। নিজের প্রতি এবং যাহাদিগকে নিজ বা আত্মীয় জ্ঞান করি, তিনিই পতি পত্নীই হউন, পিতা মাতা পুত্র বা বন্ধুই হউন, তাহাদের প্রতি যে মমতা, তাহা প্রসারিত করিয়া স্বীয় ক্ষুদ্র মায়াকে মহামায়ায় পরিণত করা চাই, তাহা হইলেই আমিত্বের প্রসার সাধন করা হয়। হে জীব! তুমি যদি ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতে চাও, তাহা হইলে আমিত্বের প্রসার কর, এবং যদি আমিত্বের প্রসার করিতে চাও, তাহা হইলে তোমার ক্ষুদ্র মায়াকে মহামায়ায় পরিণত কর। মাতঃ জগদম্বে! দীনের প্রতি দয়া কর, বিশ্বের প্রতি তোমার যে মায়া তাহার অণু প্রমাণ অধম সন্তানকে দান করিয়া কৃতার্থ কর। ওং শান্তি, শান্তি, শান্তি।

কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য।

প্রাচীন ও নব্য ন্যায়ের
সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।

সাংসারিক সুখে আসক্ত-চিত্ত ব্যক্তিবর্গের মানস দর্পণ নানাবিধ মিথ্যা জ্ঞান জনিত কুসংস্কার কালিমায় আবৃত থাকায় তাহাতে সহজতঃ সৎপদার্থের প্রতিভা পড়ে না সুতরাং ধারণা হয় যে শরীর ব্যতীত অন্য কোন আত্মা নাই; আমি গৌরবর্ণ আমি হৃষ্ট পুষ্ট অথবা আমি রুগ্ন কৃশ কৃষ্ণবর্ণ ইত্যাদি প্রতীতি নিচয় শরীরেরই আত্মত্ব পরিচয় প্রদান করিতেছে। পুত্র কলত্রাদি হইতে যাদৃশ সুখের অনুভূতি হয় তদতিরিক্ত জগতে বিশেষ সুখের আর কি হইতে পারে। আজ আমি রাজকীয় নিয়ম বিরুদ্ধ অথবা পর পীড়ন করিয়াও রাজদ্বারে প্রমা-

ণাভাব বশতঃ পরিত্রাণ পাইলাম। পরকীয় অর্থরাশি বলে ছলে অথবা কৌশলে গ্রহণ করিতে পারিলে তাহা হইতে সংসারযাত্রা সুখে নির্ব্বাহ হইতে পারে, সুতরাং শাস্ত্র প্রণেতাগণ ভ্রম বশতঃ ঐগুলি নিষিদ্ধ শ্রেণী ভুক্ত করিয়াছেন। কার্য্যের ফলাফল এই শরীরেই ভোগ করিতে হয়। পরলোক বলিয়া অন্য কিছু নাই এবং অদৃষ্ট নামক কোন ক্রিয়া-ফলেরও অস্তিত্ব অসম্ভব। স্ত্রী পুরুষ হইতে শরীরান্তরের উৎপত্তি ও জরা অবস্থায় কিম্বা তৎপূর্ব্বেও ধাতুবৈষম্য সমুত্থিত কঠিন রোগাদি জনিত ঐ শরীরের পতন স্বভাবসিদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। শাস্ত্রকারেরা যে অপবর্গ (মুক্তি) পদার্থ নির্ব্বাচন করেন তাহা কি ভয়ানক! যে সময়ে কল্যাণ কর কার্য্যাদি কিছুই থাকে না। ঐসর্ব্ব কর্ম্ম শূন্যাবস্থায় কিসে ভদ্র হইতে পারে? সুতরাং ঐরূপ মুক্তিতে কাহারও রুচি জন্মিতে পারে না। এইরূপ ভ্রমরাশি পরিপূর্ণ সংসার সমুদ্রে নিমগ্ন মানবগণ বস্তুতঃ অকল্যাণীয় বিষয়-গুলিকে কল্যাণার্হ মনে করিয়া তাহার অনুকূলে অনুরাগ ও প্রতিকূলে দ্বেষ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ঐ রাগ দ্বেষ হইতে মায়া লোভ ঈর্ষা অসূয়া প্রভৃতি দোষ নিচয়ের প্রাদুর্ভাব হয়। দোষাশ্রিত হইলে মনুষ্য শরীরদ্বারা হিংসাচৌর্য্য অবৈধ মৈথুনাদি আচরণ করিয়া থাকেন, বাগিন্দ্রিয়দ্বারা মিথ্যা কিম্বা অন্যের মর্ম্ম-পীড়াদায়ক পরুষ বাক্যের প্রয়োগ করেন, এবং মনদ্বারা পরদ্রোহ পর দ্রব্যলিপ্সা প্রভৃতি নিন্দনীয় বৃত্তির প্রশ্রয় দানে কুণ্ঠিত হয়েন না এই সমস্ত পাপাত্মিকা প্রবৃত্তি অবশ্য অধর্ম্মের জন্য হইয়া থাকে; ঐ অধর্ম্ম হইতে দুঃখ দায়ক পুনঃ শরীরান্তর-পরিগ্রহ হয় এবং ক্রমশঃ দুঃখ রাশিও উপ-ভুক্ত হইতে থাকে। যদিচ ধার্ম্মিক পুরুষেরা ইহ জন্মে আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার দশায় উপ-নীত হইতে না পারিলে, শরীরদ্বারা দান পরিত্রাণ পরিচর্য্যা প্রভৃতি, বাগিন্দ্রিয়দ্বারা সত্যহিত প্রিয় বাক্য প্রয়োগ ও স্বাধ্যায়াদি, এবং মনদ্বারা দয়া অস্পৃহা ও শ্রদ্ধা প্রভৃতি সদনুষ্ঠান সম্পাদন করিলেও তজ্জনিত ধর্ম্ম বশতঃ শরীরান্তর গ্রহণ করাতে জন্ম মৃত্যু জনিত ক্লেশ উপভোগ করিয়া থাকেন অধর্ম্মার্জ্জিত শরীরের ন্যায় প্রতি নিয়ত তাঁহাদিগকে দুঃখরাশি ভোগ করিতে হয় না এবং তাহাদের মুক্তিপথও সন্নিকটে উপস্থিত হয়। ফলতঃ যতদিন শরীর পরি-গ্রহ থাকিবে ততদিনই ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে এনিমিত্ত দুঃখ জনকীভূত পুনঃ জন্মের নিরাকরণে চেষ্টিত থাকা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। পুনর্জ্জন্ম নিবৃত্তি করিতে হইলে তৎ সাধনীভূত ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্পাদিকা প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করা প্রয়োজন হয়। রাগ দ্বেষ সমুত্থিত দোষের অপসারণ ব্যতীত উক্ত প্রবৃত্তির নিরাকরণ সম্ভবে না সুতরাং অবশ্য নিরাকরণীয় দোষ নিচয়ের নিরাস মানসে পূর্ব্বোল্লিখিত মিথ্যাজ্ঞান গুলিকে দূরীভূত করিতে হইলে পদার্থ নিচয়ের তত্ত্বজ্ঞানই একমাত্র প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। মিথ্যা জ্ঞান, দোষ, প্রবৃত্তি, জন্ম ও দুঃখ ক্রমশঃ উৎপন্ন এই পাঁচটী পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইয়া সংসারচক্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তত্ত্ব জ্ঞান দ্বারা ঐ পাঁচের মূলীভূত মিথ্যাজ্ঞান গুলিকে অপসারিত করিতে পারিলে মনুষ্য

দিগকে আর সংসার চক্রে পরিভ্রমণ করিতে হয় না। মিথ্যাজ্ঞানের অপায়ে রাগ দ্বেষা-ত্মক দোষের বিনাশ হয়, দোষ না থাকিলে ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মক প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইয়া যায়, প্রবৃত্তি না থাকিলে জন্ম সম্ভাবনা হয় না এবং পুনর্জ্জন্ম না হইলে দুঃখও আর জন্মে না সুতরাং দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তিতে মানব মোক্ষ দশায় উপনীত হইতে পারেন। আমাদের এই নশ্বর দেহ আত্মা নহে; আত্মা অবিনাশী জ্ঞাতা সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্মের আশ্রয়; ঐ ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মক অদৃষ্ট, সদসৎ ক্রিয়ার ব্যাপার মাত্র; তাহা হইতে শরী-রান্তর পরিগ্রহ করিয়া লোকে সুখ দুঃখের উপভোগ করিয়া থাকেন; সুখের ন্যায় দুঃখ নিবৃত্তিও আমাদের একান্ত অভীপ্সিত স্বতঃ প্রয়োজন, তাই দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ অপবর্গ (মুক্তি) ভীষণ পদার্থ নহে; ইত্যাদি বিষয়গুলি কেবল বাক্যের দ্বারা প্রতিপা-দিত হয় না কারণ লোকের মনে যে সমস্ত কুসংস্কার বদ্ধমূল রহিয়াছে তাহারাও স্বকীয় বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদক বাক্যের উপর বিশ্বাস স্থাপনের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, একারণ যুক্তি প্রমাণাদি দ্বারা ঐ সমস্ত সৎপদার্থের যথার্থতা প্রতিপাদন করা একান্ত প্রয়োজ-নীয় হইয়া পড়ে। প্রায়শঃ পরোক্ষ বিষয়ে প্রত্যক্ষ মূলক অনুমানই বলবৎ প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। মহর্ষি গৌতম প্রণীত ন্যায় দর্শন, প্রমাণ প্রমেয় প্রভৃতি ষোড়শ পদার্থের প্রথমতঃ উদ্দেশ অনন্তর প্রত্যেকের লক্ষণ, অবান্তর বিভাগ ও বিচার পূর্ব্বক ব্যবস্থা করতঃ অপ্রত্যক্ষীভূত পদার্থ নিশ্চায়ক অনুমানাত্মক প্রমাণ ও তদনুকূল তর্কাদির পথ প্রদর্শক হইয়া মোক্ষোপযোগি তত্ত্ব জ্ঞানের প্রযোজক হইয়াছে। শ্রুতিতে উক্ত আছে আত্মার ক্রমশঃ শ্রবণ মনন নিদি ধ্যাসন ও সাক্ষাৎকার সম্পাদিত হইলে মোক্ষ লাভ হয়। শ্রবণের পশ্চাৎ ঈক্ষা (উন্নয়ন) অন্বীক্ষা পদের প্রতিপাদ্য; তৎ সম্পাদক তর্ক বিদ্যা [ন্যায় বিদ্যা] আন্বী-ক্ষিকী পদে অভিহিত হইয়া থাকে শাস্ত্র-কারেরা বলেন শ্রুতি স্মৃতি প্রতিপাদিত বিষয় যিনি শাস্ত্র বিরোধি তর্কদ্বারা অনুসন্ধান করিতে সমর্থ তিনিই বস্তুতঃ ধর্ম্মজ্ঞ। মোক্ষ ধর্ম্মে উক্ত আছে শাস্ত্র প্রধান আন্বীক্ষিকী রূপ মন্থন দণ্ডদ্বারা উপনিষৎ সমুদ্র মথিত হইলে তাহা হইতে অমৃত (মোক্ষ) লাভ হয়; অর্থাৎ উপনিষদের ন্যায়ানুসারী অর্থ-টীই গ্রহণ করিতে হইবে।

আমাদের জ্ঞান ভ্রম ও যথার্থভেদে দ্বিবিধ। এক পদার্থকে অন্য বলিয়া জানার নাম ভ্রম যেমন অন্ধকারে রজ্জু দেখিলে কোন সময় সর্প বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে; এই ভ্রম জ্ঞান উত্তর কালে বাধিত হয় অর্থাৎ রজ্জু সমীপে আলোক লইয়া ভালরূপ দেখিলে যখন জানাযায় যে উহা সর্প নহে রজ্জু তখন পূর্ব্বকার সর্প বলিয়া জ্ঞানটী যে মিথ্যা তাহা নিশ্চিত হইয়া যায়। ভ্রম ভিন্ন জ্ঞানকে যথার্থ জ্ঞান বলে। যেমন মনুষ্য দেখিলে এইটী মনুষ্য, বৃক্ষ দেখিলে এইটী বৃক্ষ, অথবা রজ্জু দেখিলে ইহা রজ্জু ইত্যাদি। যথার্থ মিথ্যাভেদে যেমন জ্ঞানকে বিভাগ করা যায় সেইমত অনুভব এবং স্মরণ ভেদেও জ্ঞান দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে; তন্মধ্যে অনুভব চারি প্রকার প্রত্যক্ষ অনুমিতি উপ-

মিতি ও শব্দ (শব্দজনিত) প্রত্যেকের বিবরণ ক্রমশঃ প্রকটিত হইবে। এই চতুর্ব্বিধ অনুভবের মধ্যে যথার্থ জ্ঞান গুলিই বস্তুতঃ প্রমাপদবাচ্য এবং করণ অর্থাৎ যাহাদিগের দ্বারা প্রমাজ্ঞান জন্মে তাহারা প্রমাণ বলিয়া কথিত সকলেই জানেন যে, পূর্ব্বে যে বিষয়টী জানা ছিল না তাহার কখনও স্মরণ হয় না তাদৃশ অজ্ঞাত বিষয়টী কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তাহা তখন স্মৃতিপথে উপস্থিত হয় কিম্বা উপেক্ষা না করিয়া পূর্ব্ব প্রত্যক্ষীকৃত পদার্থটীই স্মরণের বিষয় হইয়া থাকে সুতরাং স্মরণাত্মক জ্ঞানে অগৃহীত গ্রাহিত্ব না থাকাতে অর্থাৎ অজ্ঞাত কোন পদার্থকে বিষয় না করাতে পারিভাষিক প্রমাত্ব নাই; অতএব স্মরণের কারণীভূত পূর্ব্বানুভব কিম্বা তজ্জনিত সংস্কারকে প্রমাণ বলিয়া অভিহিত করা হয় না। এতাবতা স্থির হইতেছে যে প্রত্যক্ষ অনুমিতি উপমিতি ও শব্দে এই চতুর্ব্বিধ প্রমাজ্ঞানের করণীভূত প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান ও শব্দ এই চারিপ্রকার প্রমাণ পদার্থ। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত ঘটাদি পদার্থের সন্নিকর্ষ হইলে যে যথার্থ জ্ঞান জন্মে তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমিতি বলে এবং ঐ প্রত্যক্ষ প্রমার করণীভূত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া কথিত হয়। চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মনঃ এই ছয়টী ইন্দ্রিয় ভেদে প্রত্যক্ষ ও ছয় ভাগে বিভক্ত। চক্ষুঃদ্বারা ঘটাদি দ্রব্য তাহার রূপ ও পরিমানাদির প্রত্যক্ষ হয় এই প্রত্যক্ষকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বলে। কর্ণ দ্বারা ধ্বনি ও বর্ণভেদে দ্বিবিধ শব্দ ও তদগত ধ্বনিত্ব বর্ণত্বাদির প্রত্যক্ষ হয়, ইহাকে শ্রাবণ প্রত্যক্ষ কহে। নাসিকাদ্বারা গন্ধ ও তদগত সৌরভাদির প্রত্যক্ষ হয়, ইহা ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ বলিয়া কথিত হয়। জিহ্বা দ্বারা রস ও তদ্গত মধুরত্ব অম্লত্বাদির প্রত্যক্ষ হয় ইহাকে রাসন প্রত্যক্ষ বলে। ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা দ্রব্য তাহার স্পর্শ ও তদগত শীতত্ব উষ্ণত্বাদির প্রত্যক্ষ হয় ইহা ত্বাচ প্রত্যক্ষ নামে অভিহিত হয়। এবং মনঃ দ্বারা জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি গুণও সেই জ্ঞানাদির আশ্রয় বলিয়া জীবাত্মারও প্রত্যক্ষ হয়, এই প্রত্যক্ষ মানস প্রত্যক্ষ নামে কথিত হইয়া থাকে। চক্ষুরাদি পাঁচটী ইন্দ্রিয় কেবল বাহ্য পদার্থের গ্রাহক, এনিমিত্ত উহাদিগকে বহিরিন্দ্রিয় এবং মনঃদ্বারা জ্ঞানাদি অভ্যন্তরস্থ পদার্থের জ্ঞান হয় বিধায় মনকে অন্তরিন্দ্রিয় বলে। বাহ্য কিম্বা অভ্যন্তরস্থ যেকোন পদার্থের প্রত্যক্ষ করা হউক সর্ব্বত্রই জ্ঞাতব্য পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হওয়া প্রয়োজন। চক্ষু মুদ্রিত করিলে পুরোবর্ত্তি কোন পদার্থের দর্শন হয় না কিম্বা চক্ষু এবং দ্রষ্টব্য এই উভয়ের মধ্যে কোন আবরণ থাকিলেও সেই দ্রষ্টব্য পদার্থটীকে প্রত্যক্ষ করা যায় না সুতরাং সন্নিকর্ষের উপযোগিতা রহিয়াছে।

ইন্দ্রিয়ের সহিত জ্ঞাতব্য পদার্থের যে সম্বন্ধ হওয়া প্রয়োজন তাহাই এ স্থলে সন্নিকর্ষ পদবাচ্য। এই সন্নিকর্ষ প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত লৌকিক এবং অলৌকিক। লৌকিক সন্নিকর্ষ হইতে লৌকিক প্রত্যক্ষ এবং অলৌকিক সন্নিকর্ষ হইতে অলৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে। সচরাচর লোকে চক্ষু দ্বারা রূপাদি দর্শন করে ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে রসনা দ্বারা রসের আস্বাদন লয় ত্বক দ্বারা স্পর্শা-

নুভব করে শ্রবণদ্বারা শব্দ শ্রবণ করে এবং মনদ্বারা আমি বুঝিতেছি আমি, সুখ পাই-তেছি ইত্যাদিরূপে যে জ্ঞানাদির উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় ঐ সমস্ত প্রত্যক্ষ লৌকিক সন্নিকর্ষজাত। এই লৌকিক সন্নিকর্ষ ষড়্-বিধ। সংযোগ, সংযুক্ত সমবায়, সংযোক্ত সমবেত সমবায়, সমবায়, সমবেত সমবায় এবং বিশেষণতা (স্বরূপ সম্বন্ধ)। দ্রব্যের প্রত্যক্ষে দ্রব্যের সহিত চক্ষুরাদির সংযোগই সন্নিকর্ষ। সম্মুখস্থ বৃক্ষাদি দর্শন কালে বৃক্ষাদির সহিত নয়নের একপ্রকার সংযোগ জন্মে। এবং দৃষ্টিক্ষেপ না করিয়াও ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত সংলগ্ন হওয়াতে হস্তাদি দ্বারা গৃহীত পুস্তকাদির অনুভব হইয়া থাকে। দ্রব্যে অবস্থিত রূপ রস গন্ধ স্পর্শাদির প্রত্যক্ষে সংযুক্ত সমবায় নামক সন্নিকর্ষ উপযোগী। দ্রব্য-গুলি ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্তরূপ রসাদি ঐ দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে সুতরাং রূপ রসাদিতে চক্ষু রসনা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সংযুক্ত সমবায়ই সন্নিকর্ষ। রূপে শুক্লত্ব পীতত্বাদি রসে মধুরত্ব অম্লত্বাদি, গন্ধে সৌরভত্ব অসৌরভত্বাদি এবং স্পর্শে শীতত্ব উষ্ণত্বাদি যে যে ধর্ম্ম আছে ঐ সমস্ত জাতি পদার্থ রূপাদিতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে, ইহাদের প্রত্যক্ষকালে দ্রব্যটী ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত হয় ঐ দ্রব্যে, রূপাদির সমবায় সম্বন্ধ শুক্লত্বাদি ধর্ম্মে আছে বলিয়া প্রত্যক্ষ কালে শুক্লত্বাদি ধর্ম্মে ইন্দ্রিয়ের সংযুক্ত সমবেত সমবায় নামক সন্নিকর্ষ থাকে বুঝিতে হইবে। আমরা এখন শব্দ শ্রবণ করি ঐ শব্দ দূরবর্ত্তী থাকিলেও ক্রমশঃ কর্ণে আসিয়া উপনীত হয়। শ্রবণেন্দ্রিয় গগনাত্মক এবং উহাতে শব্দ সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিত এজন্য শব্দের প্রত্যক্ষে সমবায়ই সন্নিকর্ষ। শব্দের কোনটী ধ্বনি কোনটী বা বর্ণাত্মক, শব্দগত ঐ ধ্বনিত্ব, বর্ণত্ব, কত্ব, খত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের প্রত্যক্ষে সমবেত সমবায়াত্মক সম্বন্ধই ব্যাপার; কেননা শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়ে সমবেত, এবং ঐ সমবেত শব্দের আবার সমবায়, কত্ব, খত্ব প্রভৃতি জাতি স্বরূপ ধর্ম্মে রহিয়াছে। এস্থলে যে ধর্ম্ম শব্দের প্রয়োগ করা হইল ঐ ধর্ম্ম শব্দে আধেয় পদার্থকে বুঝায় অর্থাৎ যে পদার্থটী কোন স্থানে থাকে তাহাকেই ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে গগণ প্রভৃতি পদার্থ আধেয় হয় না এজন্য গগন কালদিক আত্মা ইহাদিগকে কাহারও ধর্ম্ম বলা যায় না। আধার ও আধেয় এই দুয়ের পরস্পর কোন সম্বন্ধ না থাকিলে তাহাদের আধারাধেয়ভাবের উপপত্তি হয় না। আমি আসনে উপবিষ্ট আছি এস্থলে আমার সহিত আসনের সংযোগ নামক সম্বন্ধ আছে বিধায় আমি আধেয় ও আসন আধার হইতেছে। মনুষ্যে গৌর, শ্যাম, কৃষ্ণ ইত্যাদি কোন একটী রূপ গমনাদি ক্রিয়া ও মনুষ্যত্বাদি জাতি আছে এস্থলে মনুষ্য ও তাহার রূপাদিতে সমবায় সম্বন্ধ থাকাতে মনুষ্য আধার ও রূপ ক্রিয়া জাতি প্রভৃতি আধেয় বলিয়া প্রতীত হয়। দ্রব্য ব্যতীত অন্যত্র সংযোগ সম্বন্ধ থাকে না এবং দ্রব্য গুণ কর্ম্ম ও জাতি পদার্থ ব্যতীত অন্য কেহ সমবায় সম্বন্ধে সম্বন্ধীয় হয় না সুতরাং অভাবাদিতে আধেয় প্রতীতি স্থলে বিশেষণতা নামক সম্বন্ধান্তর স্বীকার করিতে হয়। বিশেষণতার অপর নাম স্বরূপ। অর্থাৎ ঐ সম্বন্ধটী আধার ও আধেয়েরই স্বরূপ। সংসর্গ ব্যতীত আধ

রাধের ভাবের উপপত্তি হয় না বিধায় বিশেষণতার সম্বন্ধত্ব স্বীকার করা হইয়া থাকে। এইক্ষণ এই গৃহে কোন শব্দ নাই অর্থাৎ গৃহ মধ্যবর্ত্তি আকাশে শব্দের অভাব আছে; শ্রবণেন্দ্রিয়দ্বারা এইরূপ প্রত্যক্ষ স্থলে গগনাত্মক শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত শব্দাভাবের সন্নিকর্ষের নাম বিশেষণতা এবং এইক্ষণ এই বৃক্ষে ফল কিম্বা দল নাই অর্থাত্ ফল ও পুষ্পের অভাব আছে, চক্ষুরদ্বারা এইপ্রকার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে এস্থলে বৃক্ষের আধারতাও ফল পুষ্পাভাবের আধেয়তা নিয়ামক বিশেষণতারই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষ বলিয়া বুঝিতে হইবে। যদিচ শব্দাভাবের শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিশেষণতা মাত্র সন্নিকর্ষ। একিন্তু চক্ষু সংযুক্ত বৃক্ষে যে ফল পুষ্পের অভাব আছে ঐ অভাবের সহিত চক্ষুর কেবল মাত্র বিশেষণতা সম্বন্ধ নহে পরন্তু সংযুক্ত বিশেষণতাই তত্রত্য সন্নিকর্ষ এমত অবস্থায় বিশেষণতাকে নানাপ্রকার বলাযায় তথাপি প্রত্যক্ষোপযোগী সন্নিকর্ষের বিভাগ স্থলে সমস্ত প্রকার বিশেষণতাকে বিশেষণতাস্বরূপ অনুগত ধর্ম্মদ্বারা একপ্রকার ধরিয়া পূর্ব্বোক্ত ষড়্বিধত্বের অবতারণা করা হইয়াছে।

অলৌকিক সন্নিকর্ষ তিন প্রকার। সামান্য লক্ষণ জ্ঞান লক্ষণ ও যোগজ। সম্মুখীন বৃক্ষে বৃক্ষত্ব দর্শন করিয়া সেই বৃক্ষত্বের আশ্রয় বলিয়া যাবতীয় বৃক্ষের একপ্রকার অলৌকিক অনুভব হইয়া থাকে এইস্থলে ঐ জ্ঞাত বৃক্ষত্বই সন্নিকর্ষ এই সন্নিকর্ষের নাম সামান্য লক্ষণ কেন না এই সন্নিকর্ষটী বৃক্ষত্বাদি সাধারণ ধর্ম্মের স্বরূপ হইতেছে। জ্ঞান লক্ষণাত্মক সন্নিকর্ষ জ্ঞানের স্বরূপ; রক্ত রূপাত্মক বিশেষণ জ্ঞানটী যে কোন প্রকারে থাকিলে তৎপরে রক্তরূপ বিশিষ্ট বলিয়া অনেকগুলি পদার্থের অলৌকিক অনুভব হইতে পারে এইস্থলে বিশেষণীভূত রক্ত রূপের জ্ঞানই লক্ষণাত্মক সন্নিকর্ষ। যদিচ সামান্য লক্ষণ সন্নিকর্ষ জনিত ও জ্ঞান লক্ষণ সন্নিকর্ষ জনিত অলৌকিক প্রত্যক্ষ দ্বয়কে সাধারণতঃ একবিধ বলিয়াই প্রতীতি হয় তথাপি বিশেষ দৃষ্টিতে উহাদিগের পার্থক্য জানা যায়। চক্ষুঃদ্বারা সম্মুখীন বৃক্ষে বৃক্ষত্বের প্রথমতঃ লৌকিক প্রত্যক্ষ না জন্মিলে সেই বৃক্ষত্বের আশ্রয়ীভূত যাবতীয় বৃক্ষের সামান্য লক্ষণ সন্নিকর্ষবশতঃ অলৌকিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না এস্থলে আরও বিশেষ এই আছে যে বৃক্ষত্বাদি সাধারণ ধর্ম্মের আশ্রয় ব্যতীত অন্যের (বৃক্ষ ব্যতীত পদার্থের) অনুভব হয় না কিন্তু জ্ঞান লক্ষণাস্থলে প্রথমতঃ বিশেষণের প্রত্যক্ষ অপেক্ষা করে না যে কোন প্রকারে জ্ঞান থাকিলেই চলে এবং বিশিষ্ট বুদ্ধি জন্মিতে বস্তুতঃ যে বিশেষণের আশ্রয় নয় তাহারও অনুভব হইতে পারে আর বিশেষ্য কোন স্থলে একটী কোন স্থলে দুইটী কোন স্থলে বা বহু পদার্থ অনুভব হইয়া থাকে। যোগজ সন্নিকর্ষটী যোগি পুরুষ সাধ্য; তাঁহারা যোগবলে একস্থানে থাকিয়া নানা স্থানের বিষয়গুলি জানিতে পারেন এই জ্ঞানটী অলৌকিক প্রত্যক্ষ ব্যতীত অনুমানাদি নহে। যোগি পুরুষদিগের যোগ যে অলৌকিক ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ জন্মে তাহারই নাম যোগজ সন্নিকর্ষ।

(ক্রমশঃ)

স্বরজ্ঞান।

(সূচনা।)

অনন্ত রত্নপূর্ণ রত্নাকরে কোন্ রত্নের অভাব? প্রকৃতি দেবীর লীলাভূমি, প্রকৃতি-গত সৌন্দর্য্যের প্রতিচ্ছবি, প্রকৃতি রাজ্ঞীর ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার ভারতবর্ষে অমূল্য ঐশ্বর্য্যের অপ্রতুল নাই। নিখিল-রস-বিলাসিনী জীব-হৃদয়-বিনোদিনী ভারতভূমির কৃতী সন্তান—আর্য্যজাতি জ্ঞান ধনে অতুলনীয় ধনী ছিলেন। তাঁহাদের অলোক সামান্য জ্ঞানালোকের স্তিমিত জ্যোতিঃ এখনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত মণ্ডলীর নয়ন ঝলসিত—মন বিমোহিত করিতেছে। সেই আর্য্য জাতির অনন্ত-জ্ঞান-প্রসূত অনন্ত-শাস্ত্রের মধ্যে স্বরোদয় শাস্ত্রখানি অতি উপাদেয় প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ এবং গুহ্যাদপি গুহ্য। কিন্তু সর্ব্বনাশক কালের গুরুতর সংঘর্ষণে, বিভিন্ন জাতির বারম্বার নিষ্পেষণে, সর্ব্বগ্রাসী যুগের অপ্রতিহত প্রচলনে—অপূর্ব্ব মাধুর্য্য পূর্ণ, অতীব প্রয়োজনীয় প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ স্বর-শাস্ত্র আজ লুপ্ত প্রায়। দুর্ভাগ্য ভারতের—বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশের শাস্ত্র ব্যবসায়ী "ব্রাহ্মণ পণ্ডিত" আখ্যাধারী মহাশয়দিগের স্বরজ্ঞানে জ্ঞান থাকা দূরে থাকুক, স্বরোদয় শাস্ত্রের নাম পর্য্যন্ত অনেকের কর্ণে প্রবেশ করে নাই। স্বরোদয় শাস্ত্রে যোগিগণের অত্যাবশ্যক যোগবিষয়ক গূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে বলিয়া,ইহার গৌরব যোগী মহাত্মারাই এখনও রক্ষা করিতেছেন। স্বরোদয় শাস্ত্রে যোগ সাধনের অপূর্ব্ব কৌশল ও সহজ পন্থা ব্যক্ত আছে। কিন্তু বিষয়-বাসনা-বিরহিত যোগিগণের ন্যায়, নিয়ত বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত গৃহস্থলোকেরও স্বরোদয় শাস্ত্র অতীব প্রয়োজনীয়।

একমাত্র শ্বাস প্রশ্বাসের গতি অনুসারে সকল কার্য্য করিবার ব্যবস্থা যাহাতে বর্ণিত আছে, তাহাকে স্বরশাস্ত্র বা স্বরোদয় কহে। স্বরশাস্ত্র কাহারও স্বকপোল-কল্পিত নহে। ইহা পঞ্চানন-আনন নির্গত প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ।

স্বদেহস্থিত শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বুঝিয়া-স্বরশাস্ত্রানুশারে কার্য্য করিলে সংসারে প্রত্যেক কার্য্যে সুফল লাভ করা যায় দৈনন্দিন সুখ দুঃখ এবং ভাবী আপদ বিপদ ও মঙ্গলামঙ্গল প্রত্যহ জানিতে পারাযায়। একপক্ষ (১৫ দিন) মধ্যে নিজ দেহে শ্লেষ্মা ঘটিত কি গরম-জনিত কোন পীড়া হইবে কিনা, তাহা প্রতি প্রতিপদ তিথিতে জানিতে পারাযায় এবং বিনা ঔষধে সহজে পীড়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়; ডাক্তার কবিরাজের খোসামোদ কি অর্থব্যয় করিতে হয় না। এক কথায় বলি, প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ অবধি সাংসারিক, বৈষয়িক সমস্ত কার্য্যে সুফল হয়। স্বরশাস্ত্রের নিয়মে যে কার্য্যে গমন করিবে, তাহা সুসিদ্ধ হয়। কিন্তু যোগী ও গৃহস্থের নিত্য সহচর অতীব প্রয়োজনীয় প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ স্বরশাস্ত্র যে দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ল্লভ, তেমনি স্বরজ্ঞ উপযু গুরুরও অভাব। আজ্ কাল্ ব্যবসায় অনুরোধে কেহ কেহ "পবন বিজয় স্বরোদ নামক একখানি পুস্তক কলিকাতা হইতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অসম্পূর্ণ ও অ শুদ্ধ এবং ভ্রম প্রমাদ পূর্ণ। তদ্ভিন্ন 'স্ব স্বরোদয়' 'যোগ স্বরোদয়' প্রভৃতি অন্য গ্রন্থ বাঙ্গলাদেশে আছে কিনা সন্দেহ। আ সংস্কৃত ভাষায় মহাপণ্ডিত এবং বিবিধ শাস্ত্রে মহাজ্ঞানী হইলেও স্বরশাস্ত্র পড়িয়া বুঝিতে বা স্বরশাস্ত্রের অনুবাদ করিতে পারেন না।

(ক্রমশঃ)

শ্রী শ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজষ্টী কৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড, ১২দশ সংখ্যা। | চৈত্র। | ১৩০৭ সাল, ১৮২২ শকাব্দা।

স্বরজ্ঞান।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

স্বরজ্ঞ গুরুর নিকট শিক্ষা ব্যতীত, কেবল শাস্ত্রদৃষ্টে বুঝিবার কি প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিবার উপায় নাই। এ দেশে শাস্ত্র গ্রন্থ দুর্ল্লভ এবং স্বরজ্ঞ গুরুরও অভাব। এজন্য প্রত্যক্ষ ফলদায়ক অমূল্য স্বরশাস্ত্র লুপ্ত প্রায়।

আমি তীর্থ পর্য্যটন সময় পবিত্র পঞ্চবটী তীর্থে তৈলঙ্গ দেশীয়া এক ভৈরবী মাতার নিকট স্বরজ্ঞানের শিক্ষা কিঞ্চিৎ পাই। সেই আমার প্রথম। তৎপূর্ব্বে স্বরজ্ঞানের কথা কখন জ্ঞানে আসে নাই এবং স্বর শাস্ত্রের কথাও কর্ণে পৌছে নাই। তৎপরে পুণ্য-সলিলা নর্ম্মদা তীর-বাসী জনৈক যোগী মহাত্মার নিকট হস্ত লিখিত স্বরোদয় শাস্ত্র দেখিয়াছিলাম। সেই মহাজ্ঞানী মহাতপা যোগী মহাত্মার অনুসেবা করিয়া সেই জীর্ণ পুথি পড়িয়া তাঁহার নিকট উপদেশ পাইয়াছিলাম। শেষে আমি হরিদ্বারে গমন করিয়া জনৈক মুসলমান ফকিরের নিকট স্বরজ্ঞানের বহু-বিষয় এবং গূঢ়তত্ত্ব সকল শিখিয়াছিলাম*। কিন্তু ক্রমাগত ৮ বৎসর নানা তীর্থ ও নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া স্বরজ্ঞ উপযুক্ত গুরুদর্শন আমার ভাগ্যে আর ঘটে নাই। এবং অদ্যাপি সমগ্র স্বর শাস্ত্র ও গুরুযোগ্য স্বরজ্ঞ ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হইল না। ইহাতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, স্বরশাস্ত্র কিরূপ দুষ্প্রাপ্য ও স্বরজ্ঞ গুরুর কেমন অভাব।

* আমি তীর্থ পর্য্যটন কালীন হরিদ্বারে অবস্থিতি সময় জনৈক মুসলমান ফকির দেখিয়াছিলাম। তাঁহার জন্মস্থান বোম্বে প্রদেশান্তর্গত সুরাট (সৌরাষ্ট্র) নামক প্রসিদ্ধ দেশে। তিনি মুসলমানের তীর্থ মক্কা বহুবার দর্শন করিয়া, শেষে হিন্দুর তীর্থ ভ্রমণ করিতেছেন। মৌলবী উপাধি বিশিষ্ট বলিয়া, মৌলবি সাহেব নামে তিনি পরিচিত। জ্ঞানে ও যোগ সাধনে তাঁহার ন্যায় উপযুক্ত সাধু খুব কম দেখিয়াছি। মুসলমানের ন্যায় নমাজ, কি হিন্দুর ন্যায় পূজার্চ্চনাদি বাহ্যিক ক্রিয়া কিছুই করিতেন না। কেবল নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহযোগ সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার যোগের প্রভাব এবং তজ্জনিত অলৌকিক ক্ষমতা হরিদ্বার, রুড়কি, এলাহাবাদ, লাহোর প্রভৃতি স্থানে তদানীন্তন প্রবাসী উচ্চপদস্থ কতিপয় বাঙ্গালী বাবু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি যোগবলে ভূত ভবিষ্যৎ বেত্তা, এবং যোগ-বলে অন্তর্য্যামী ও মুহূর্ত্তমাত্রে শূন্যে বহুদূরে গমনাগমন ক্ষমতাবিশিষ্ট। ভক্তিগুণে বিশেষ কৃপাপাত্র ব্যক্তিগণ ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। মহাত্মা মুসলমান যোগীর সহিত

যোগী, সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে ক্বচিৎ কোন স্বরজ্ঞ যোগীর নিকট স্বরশাস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সহস্র সহস্র যোগিগণের মধ্যে একজন স্বরোপদেশ ও শিক্ষা দিবার উপযুক্ত গুরু পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। আমার পূর্ব্ব শিক্ষা ব্যতীত যাহা অভাব আছে এবং যে বিষয়—সহস্র সহস্র শাস্ত্র পাঠে বুঝিয়া কার্য্য করা যায় না,—গুরু-মুখে শিখিতে হয়, তাহা শিক্ষা করিবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করিয়াও অদ্যাপি উপযুক্ত স্বরজ্ঞ গুরুলাভ আমার ভাগ্যে হইল না। যাহউক স্বরানুসারে কার্য্য করিলে স্বরবলে সমস্ত কার্য্যই সুসিদ্ধ হয়। জগদ্গুরু মহাদেব বলিয়াছেন—

"শত্রুং হন্যাৎ স্বরবলৈ স্তথা মিত্রসমাগমঃ।
লক্ষ্মী প্রাপ্তিঃ স্বরবলৈঃ কীর্ত্তিঃ স্বরবলৈস্তথা।

* * * *

স্বরবলৈর্দ্দেবতা সিদ্ধিঃ স্বরবলৈঃ ক্ষিতিপোবশঃ।

* * * *

* * * *

সর্ব্ব শাস্ত্র পুরাণাদি স্মৃতিবেদাঙ্গপূর্ব্বকম্।
স্বরজ্ঞানাৎ পরং মিত্রং নাস্তি কিঞ্চিদ্বরাননে।'

শত্রুবিনাশ, বন্ধু সমাগম, লক্ষ্মী প্রাপ্তি, কীর্ত্তি সঞ্চয়, দেবতা সিদ্ধি, বশীকরণ প্রভৃতি সকল কার্য্যই স্বরবলে সুসিদ্ধ হয়। পুরাণাদি শাস্ত্র ও স্মৃতি, বেদাঙ্গাদি শাস্ত্র স্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। স্বরজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মিত্র আর কিছুই নাই। বাস্তবিক স্বরোদয় অনুসারে সংসারে সকল কার্য্যই সুসিদ্ধ হয়। ভগবান বলিয়াছেন——স্বরজ্ঞানের অপেক্ষা মিত্র, ধন ও গোপনীয় বিষয় কিছুই দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায় না। যথা—

"স্বরজ্ঞানাৎ পরং মিত্রং স্বরজ্ঞানাৎ পরং ধনম্।
স্বরজ্ঞানাৎ পরং গুহ্যং ন বা দৃষ্টং ন বা শ্রুতম্॥

স্বর শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

'ইদং স্বরোদয়ং শাস্ত্রং সর্ব্বশাস্ত্রোত্তমোত্তমম্।'

অর্থ—এই স্বরোদয় শাস্ত্র সর্ব্বশাস্ত্রাপেক্ষা উত্তম।

স্বরানুসারে যাত্রাদি কোন কার্য্য করিলে, জ্যোতিষ মতে মন্দ তিথি, বার, কু-যোগ, বিষ্টি প্রভৃতি অন্যান্য বিরুদ্ধ যোগাদিতে ঐ কার্য্য হইলেও একমাত্র স্বরবলে শুভ হয়। যথা—

"ন তিথি নর্চ নক্ষত্রং ন বার গ্রহ দেবতাঃ।
ন বিষ্টি র্ন ব্যতীপাতো বিরুদ্ধাদ্যাস্তু বৈধৃতি।

আমিও উপরোক্ত স্থানে একত্রে অনেকদিন বেড়াইয়াছি। আমরা উভয়েই সংসার বিরাগী সন্ন্যাসী হইলেও আমাদের উভয়ের মধ্যে কেমন একটা স্নেহ, ভক্তির বন্ধন পড়িয়াছিল অতি স্নেহ চক্ষে অপত্য বাৎসল্য চক্ষে অপত্য বাৎসল্য ভাবে আমাকে দেখিতেন এবং দয়া পূর্ব্বক আমাকে স্বর শাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব ও শ্বাস প্রশ্বাসের কয়েক প্রকার ক্রিয়া, যোগ সাধনের কৌশল, যোগাসনে বসিয়া অগ্রে মনঃস্থির করিবার চমৎকার সহজ উপায়, দেহতত্ত্ব প্রভৃতি অতি গুহ্য ও দুর্লভ বিষয়ের শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার স্নেহ ও শিক্ষাগুণে আমি এতাধিক মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, শেষ ছাড়াছাড়ির দিনে বালকের ন্যায় কান্দিয়াছি। তাহাতে সেই দিন হইতে ১৫ বৎসরান্তে—আমি যেখানেই থাকি না কেন, আমাকে দর্শন দিবেন বলিয়াছিলেন।—একথা বিশ্বাস করি। তিনি যেরূপ সত্যবাদী, ধার্ম্মিক যোগী এবং আমার ভবিষ্য জীবনের ভাগ্যলিপী যাহা যাহা বলিয়াছেন, সমস্তই বর্ণে বর্ণে মিলিতেছে, আর যেরূপ অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়াছি। তাহাতে আমার অবস্থিতি স্থান অন্তর্ব্বলে জানিয়া দর্শন দিবেন অসম্ভব কি? তাঁহাকে দেখিয়া বুঝিয়াছি যে, স্বর বলে সমস্ত কার্য্য যোগ সাধনে হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকল জাতির সমান অধিকার আছে।

দিয়া প্রতিনিয়ত নিশ্বাস প্রশ্বাস গতায়াত করিয়া থাকে। শ্বাস বাহির হইয়া যদি দেহের মধ্যে পুনঃ প্রবেশ না করে, কিম্বা দেহ হইতে পুনঃ বাহির না হয় তাহা হইলেই জীবের মৃত্যু অনিবার্য্য। ইহাতে নিঃসন্দেহ বুঝা যাইতেছে যে শ্বাসই জীবের প্রাণ। এজন্য শাস্ত্রেও একবার নিশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগকে 'প্রাণ' সংজ্ঞা দিয়াছেন। একবার নিশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ (প্রাণ) হিসাব ধরিয়া হিন্দু-শাস্ত্রে পল, দণ্ড নির্ণীত হইয়াছে। তদ্‌যথা—

একবার নিশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগকে 'প্রাণ' বলে। ইহার ৬ প্রাণে অর্থাৎ ৬ বার নিশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগে এক পল হয়; ৬০ পলে এক দণ্ড, ৬০ দণ্ডে এক দিবা রাত্র হয়। এই সময়নিরূপণের সহিত স্বর ও যোগশাস্ত্রের মিলন রহিয়াছে। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, একদিবা রাত্রে মনুষের ২১৬০০ বার নিশ্বাস প্রশ্বাস হইয়া থাকে। যথা—

৬ × ৬০ × ৬০ = ২১৬০০

এক দিবা রাত্রে মনুষ্যের ২১৬০০ বার নিশ্বাস প্রশ্বাস হয়। উহাকে অজপাজপ কহে। একবার শ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগে 'হংস' শব্দ হয়। উপনিষদ বাক্যদ্বারা উহা পরব্রহ্ম 'হংস' উৎপত্তি, স্থিতি, লয়, এই তিনের কারণ। এই হংস বিপরীত সোহং জীবের স্বাভাবিক সহজাত সাধনা। ইহার বিবরণ এখানে বলিব না।

হিন্দুর গণনানুসারে ৬ প্রাণে একপল হয়। ইংরাজী হিসাবে ঐ এক প্রাণ বা একবার নিশ্বাস প্রশ্বাস ৪ সেকেণ্ড সময়ে হয়, আর ১৫ শ্বাসে ১ মিনিট।

এখন স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে যে, মনুষ্যের শ্বাস প্রশ্বাসই প্রাণ। প্রাণ বা স্বরের দ্বারায় যেরূপ কালের প্রভেদ, এবং মনুষ্যের প্রাণের সহিত দেবলোক, পিতৃলোক প্রভৃতির সহিত কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও এক সূত্রে গ্রথিত, তাহা নিম্নের লিখিত তালিকায় প্রকাশ করিতেছি।

একবার নিশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগে নাম।	প্রাণ
৬ প্রাণে	১ পল হয়।
৬০ পলে	১ দণ্ড।
৬০ দণ্ডে কিম্বা ২১৬০০ প্রাণে	১ দিবা রাত্র।
১৫ দিনে	১ পক্ষ।
২ পক্ষে	১ মাস।
৩ ঋতুতে	১ অয়ন।
২ অয়নে বা ৩৬৫ দিনে†	১ বৎসর।
মনুষ্যের ১ মাস পিতৃলোকের	১ দিন
মনুষ্যের ১বৎসরে দেবতার	১ দিন।
মনুষ্যের ৩৭২০০০০বৎসরে	১ মহাযুগ।
৭১ মহাযুগে	১ মন্বন্তর।
১৪ মন্বন্তরে	ব্রহ্মার ১ দিন।
১০০ মহাযুগে	১ কল্প।
২ কল্পে	ব্রহ্মার ১দিবারাত্র।
ব্রহ্মার ১০০ বৎসরে	বিষ্ণুর ১ দিন।
বিষ্ণুর ১০০ বৎসরে	মহাদেবের ১ দিন।

† সচরাচর ৩৬৫ দিনে বৎসর ধরা হয়। কিন্তু জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণ সূক্ষ্ম গণনা করিয়া ৩৬৫ দিন ৬ঘণ্টা, ১২ মিনিট, ৩৫ সেকেণ্ডে পূর্ণ এক বৎসর হয় বলিয়া থাকেন। আমাদের দেশীয় জ্যোতির্ব্বিদগণের মতে ইহা মিলিবে কিনা জানি না।

এই কাল পরিমাণ দৃষ্টে ও অন্যান্য অনেক কারণে বুঝাযায় যে, প্রাণ ভগবানের অংশ। শাস্ত্রেও উক্ত আছে যে,—

'প্রাণোহি ভগবানীশঃ প্রাণোবিষ্ণুঃ পিতামহঃ।
প্রাণেন ধার্য্যতে লোকঃ সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ।"

এই প্রাণ যে মনুষ্যের শ্বাস বায়ু, তাহা অবিসম্বাদিত সত্য। গন্ধর্ব্ব তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—'প্রাণোবায়ুরিতি খ্যাতঃ।' এই প্রাণ বায়ু নখাগ্র হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ব্যাপৃত থাকিয়া শরীরে বল প্রদান ও চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় গণকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতেছে এবং উদর মধ্যগত অন্ন জলাদি ভুক্ত দ্রব্য পাক করিয়া রসাদি রক্ত ও বীর্য্যরূপে পরিণত করে। ঐ প্রাণবায়ু দশ নামে কথিত হয়; কিন্তু তাহা একমাত্র শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া বিশিষ্ট প্রাণ-বায়ুর অবস্থা বিশেষ মাত্র। সুতরাং প্রাণ-বায়ুই প্রধান। এই প্রাণ বায়ু নাসাপুট দিয়া যাহা নিয়ত গতায়াত করিতেছে। তাহারই নাম নিশ্বাস প্রশ্বাস।

শ্বাসের গতি।

সকলেই বলিয়া থাকেন যে, দুই নাসিকায় সমান ভাবে শ্বাস প্রবাহিত হয়; কিন্তু তাহা খুব ভ্রম। মনুষ্যের দুই নাসিকায় এককালে বায়ু বহন হয় না। কখন দক্ষিণ নাসিকায়,কখন বাম নাসিকায় বহিয়া থাকে। প্রাতঃকালে সূর্য্যউদয়ের সময় হইতে এক ঘণ্টা (আড়াই দণ্ড) কাল বাম নাসিকায়, আবার এক ঘণ্টা দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন হয়। এইরূপে দিবা রাত্র মধ্যে ১২ বার বাম নাসিকায়,১২ বার দক্ষিণ নাসিকায় বহন হয়। প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের সময় কোন্ দিন কোন নাসিকায় প্রথমে নিশ্বাস বহিবে তাহার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে। যথা—

কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা—এই কয় তিথিতে সূর্য্যোদয় কালে প্রথমে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন আরম্ভ হইয়া এক ঘণ্টা থাকিবে। পরে বাম নাসিকায় শ্বাস আসিয়া এক ঘণ্টা বহন হইবে। আবার দক্ষিণ নাসিকায় আসিয়া এক ঘণ্টা থাকিবে। এইরূপে দিবারাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১২ ঘণ্টা দক্ষিণ ও ১২ ঘণ্টা বাম নাসিকায় উপরোক্ত নিয়মে পর্য্যায়ক্রমে নিশ্বাস প্রবাহিত হয়। আর কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী, পঞ্চমী,ষষ্ঠী দশমী, একাদশী দ্বাদশী—এই ছয় তিথিতে প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের সময় প্রথমে বাম নাসিকায় শ্বাস বহন হয় এবং উপরোক্ত নিয়মে এক ঘণ্টা হিসাবে ক্রমান্বয়ে একবার বাম নাসিকায়,একবার দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস বহে। শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া; সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী; ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা—এই নয় দিন প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের সময় প্রথমে বাম নাসিকায় শ্বাস বহন আরম্ভ হয়। চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী; দশমী,একাদশী, দ্বাদশী—এই ছয় দিন সূর্য্যোদয়ের সময় প্রথমে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন আরম্ভ হইয়া এক ঘণ্টা স্থিতি থাকে। পরে উপরোক্ত নিয়মে আবার বাম নাসিকায় আসিয়া এক ঘণ্টা ও পুনঃ এক ঘণ্টা দক্ষিণ নাসিকায় পর্য্যায়ক্রমে দিবারাত্র শ্বাস বহিবে। এইরূপ নিয়মে শ্বাস বহন

মনুষ্য জীবনে স্বাভাবিক। কিন্তু শ্লেষ্মা ও কফের পীড়ার জন্য ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে।

উপরোক্ত নিয়মে—যে তিথিতে সূর্য্যোদয়ের সময় যে নাসিকায় শ্বাস বহন হইলে সকল কার্য্য সিদ্ধি হয়। যথা—

সূর্য্যোদয়ে যদা সূর্য্যশ্চন্দ্রে চন্দ্রোদয়ো ভবেৎ।
সিদ্ধ্যন্তি সর্ব্ব কার্য্যানি দিবা রাত্র গতাস্বপি।"

(সূক্ষ্ম স্বরোদয়)

অর্থাৎ—যেদিন প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের সময় দক্ষিণ নাসিকায় প্রথম বহন হইবার নিয়ম এবং যে দিন বাম নাসিকায় প্রথম শ্বাস বহন হইবার নিয়ম নিরূপিত হইয়াছে। সেই দিন সেই সেই নির্দ্দিষ্ট নাসিকায় বহন হইলে কি দিবা কি রাত্রিকালে সকল কার্য্য সিদ্ধি হয়!

যদি কোন দিন সূর্য্যোদয়ের সময় কাহারও উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম হয়, অর্থাৎ যে তিথিতে যে নাসিকায় প্রথম শ্বাস বহন হইবার নিয়ম, সে দিন যদি তাহার বিপরীত নাসিকায় শ্বাস বহন হয়, তাহা হইলে সেদিন অমঙ্গল জনক হইবে। যথা—

"যদা প্রত্যুষকালে তু বিপরীতোদয়ো ভবেৎ।
চন্দ্রস্থানে বহত্যর্কো রবি স্থানে চ চন্দ্রমাঃ।
প্রথমে মানসোদ্বেগং ধনহানিং দ্বিতীয়কে।
তৃতীয়ে গমনং প্রোক্ত মিষ্টনাশং চতুর্থকে।
পঞ্চমে রাজ্য বিধ্বংসং ষষ্ঠে সর্ব্বার্থ নাশনং।
সপ্তমে ব্যাধি দুঃখানি, অষ্টমে মৃত্যুমাদিশেৎ॥"

প্রত্যুষকালে যদি নিশ্বাসের বিপরীত বহন হয়, তাহা হইলে প্রথম সময়ে মানসিক উদ্বিগ্নতা, দ্বিতীয় সময়ে ধনহানি, তৃতীয় সময়ে গমন, চতুর্থ সময়ে ইষ্টনাশ, পঞ্চম সময়ে বিত্তবিধ্বংশ, ষষ্ঠ সময়ে সর্ব্বার্থ নাশ, সপ্তমে ব্যাধি ও দুঃখ, অষ্টম সময়ে মৃত্যু হয়।*

উভয় পক্ষের প্রতিপদ তিথি ব্যতীত আর সমস্ত তিথিতে বিপরীত উদয় হইলে ঐরূপ ফল ফলিবে। প্রতিপদ তিথিতে বিপরীত বহন হইলে যে দোষ হয়, তাহা পরে বলিব।

যদিচ তিথির নিয়মে বিপরীত নাসিকায় প্রথম শ্বাস বহন হইলে উপরোক্ত ফল হয়; কিন্তু বারবিশেষে তিথির নিয়মের বিপরীত হইলেও অশুভ হয় না। তদ্ যথা—

সূক্ষ্ম স্বরোদয়ে——

"শুক্র শুক্র বুধেন্দূনাং বাসরে বামনাড়িকাঃ।
অর্ক অঙ্গার শৌরাণাং বাসরে দক্ষ নাড়িকা
সিদ্ধ্যন্তি সর্ব্ব কার্য্যেষু।" ইত্যাদি।

অর্থ—শুক্ল পক্ষের সোমবার ও বুধ বৃহস্পতি, শুক্র এই চারিদিন প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের সময় প্রথমে যদি বাম নাসিকায় শ্বাস বহন হয়, তাহা হইলে সেই দিন সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হইবে এবং সর্ব্বত্র জয়লাভ হইবে।

(ভারতের নারীরত্ন বিদুষী খনার বচনে একথার প্রমাণ আছে যথা—"সোম, শুক্র গুরু, বুধে বাম, হেলায় লঙ্কা জিতেন রাম।")

আর কৃষ্ণ পক্ষে শনি, রবি ও মঙ্গলবারে সূর্য্যোদয়ের সময় দক্ষিণ নাসিকায় প্রথম শ্বাস বহন হইলে, সেইদিন সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হয়। ইহা দ্বারায় স্থির হইতেছে যে, শুক্ল পক্ষে যে তিথিতে প্রথম দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন হইবার নিয়ম, সেদিন যদি বাম

---

* মৃত্যু বলিলে একেবারে ভবলীলা সাঙ্গ বুঝিতে হইবে না। গুরুতর অপমান, কষ্ট প্রভৃতি মৃত্যুবৎ ঘটনা।

নাসিকায় প্রথম শ্বাসবহন হয়,আর সেই দিন প্রথমোক্ত চারি বারের কোন বার হয়,তাহা হইলে তিথির নিয়মের বিপরীত বশতঃ কোন হানি হইবে না। ঐ চারিবার মাত্র শুক্ল পক্ষে ফলদায়ক হইবে।

ঐ নিয়মে শনি, রবি, মঙ্গলবার কেবল মাত্র কৃষ্ণ পক্ষে ফলদায়ক হইবে। কৃষ্ণপক্ষে ঐ তিন বারে তিথির নিয়মের বিপরীত বহন হইলেও কোন হানি হইবেনা। প্রত্যুত শুভ হইবে।

এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহাতে পাঠকগণ নিশ্বাস প্রশ্বাসের পরিচয় ও গতি অবশ্যই বুঝিয়াছেন। এক্ষণ শ্বাসের গতি অনুসারে সাংসারিক সকল কার্য্য কিরূপে করিলে সুফল পাওয়াযায়, তাহা বলিব। কিন্তু বিষয় বড় গুরুতর; স্বরশাস্ত্র ও কঠিন। বিনা গুরূপদেশে কেবল মাত্র স্বরশাস্ত্র পাঠ করিয়া কিছুই বুঝিবার যো নাই। এজন্য দেবাদিদেব মহাদেব বলিয়াছেন—"জায়তে গুরু বাক্যেন, ন বিদ্যা শাস্ত্র কোটিভিঃ।" এ হেন বিষয়ের গুরুগিরি করিবার ক্ষমতা ও সাহস আমার নাই। শ্রীশ্রী গুরুদেবের কৃপায় আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান ও শিক্ষানুসারে স্বরমতে যে সকল কার্য্য করিয়া প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়াছি, তাহাই প্রকাশ করিব। পাঠকগণ তদনুসারে কার্য্য করিলে প্রত্যক্ষ ফল লাভ করিবেন এবং স্বর শাস্ত্রের সফলতা ও শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়া মোহিত হইবেন।

[ক্রমশঃ]

শ্রীউমানাথ চট্টোপাধ্যায়।

যশোহর।

আপস্তম্বীয় গৃহ্যসূত্রম্।

(পূর্ব্বানুবৃত্তম্)

বর বধূ কটে উপবেশন করিলে পর যাহা যাহা অনুষ্ঠান করিবে যথাক্রমে মহর্ষি বলিতেছেন—

অগ্নেরুপসমাধানাৎ আজ্যভাগান্তেঽথৈনামাদিতোদ্বাভ্যাং অভিমন্ত্রয়েত। ১০

অগ্নির উপসমাধান (ইহা পূর্ব্বে পরিস্কৃত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।) হইতে আজ্যভাগ হোম পর্য্যন্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া বর বধূকে প্রথম হইতে দুইটী মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে। বর উত্থিত প্রায় হইয়া বধূকে এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবে, বধূ উপবিষ্টাই থাকিবে। তৃতীয় অনুবাকের প্রথম দুইটী মন্ত্র "সোমঃ প্রথমঃ" ইত্যাদিই এখানকার অভিমন্ত্রণের মন্ত্রদ্বয়। অতঃপর পাণিগ্রহণ নামক কর্ম্মটী বিবৃত হইবে। মহর্ষি পাণিগ্রহণের রীতি বলিতেছেন—

অথাস্যৈ দক্ষিণেন নীচা হস্তেন দক্ষিণমুত্তানং হস্তং গৃহ্ণীয়াৎ। ১১

তদনন্তর বর দক্ষিণ হস্ত ন্যগ্‌ভূত করিয়া বধূর উত্তান দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিবে। ইহাকে আচার্য্যেরা পাণিগ্রহণ কর্ম্ম নামে অভিহিত করেন অস্যৈ শব্দ এখানে অস্যাঃ (ইহার অর্থাৎ বধূর) এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। পাণি গ্রহণ ব্যাপার যে অদ্যাপি অব্যভিচারিতরূপে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহা সকলেই অবগত আছেন এবিষয়ে অধিক

বলিবার আবশ্যক দেখি না। বিশেষ কামনায় কর গ্রহণের ও কিঞ্চিৎ বিশেষ উপস্থিত হইবে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

যদি কাময়েত স্ত্রীরেব জনয়েয়ং ইতি অঙ্গুলীরেব গৃহ্ণীয়াত্। ১২

বর যদি কামনা করেন যে স্ত্রী প্রজা (কন্যা) ই জন্মাইব, তবে অঙ্গুলী গ্রহণ করিবেন। অঙ্গুষ্ঠ অথবা করতল গ্রহণ করিবেন না। অঙ্গুলী গ্রহণ করিলে সেই সংকল্প সিদ্ধ হইতে পারে এরূপ কোনও যুক্তি আছে কিনা বলাযায় না। অগাধ জ্ঞানার্ণবমহর্ষিগণের বাক্য অবশ্যই মূল শূন্য নহে, তবে সাধারণ বুদ্ধি লেখকের অথবা পাঠকের তাহা বুঝিবার সামর্থ্য নাই। অনুরূপ কামনা থাকিলে গ্রহণ প্রথা অন্য আকার ধারণ করিবে যথা—

যদি কাময়েত পুংসএব জনয়েয়ং ইত্যঙ্গুষ্ঠমেব। ১৩

যদি কামনা থাকে যে পুরুষ (পুত্র) উৎপাদন করিব তাহা হইলে অঙ্গুষ্ঠ গ্রহণ করিবে। এখানে পূর্ব্ব সূত্র হইতে "গ্রহণ করিবে" এই অংশ লইয়া অর্থ করিতে হইবে। বিশেষ কিছু কামনা থাকিলে যেরূপ করিবে তাহা কথিত হইতেছে—

সোঽভীবাঙ্গুষ্ঠ মেভীব লোমানি গৃহ্ণাতি। ১৪

যে পাণি গ্রহণে পুত্রোৎপাদন অথবা কন্যাজননরূপ কোনও নির্দ্দিষ্ট কামনা করে না, সে হস্তজাত লোম সকল ঈষদভিস্পৃষ্ট হয় এবং অঙ্গুষ্ঠ ও ঈষদভিস্পৃষ্ট হয়, তদ্রূপে গ্রহণ করিবে।

গৃভ্ণামি ইত্যেতাভিশ্চতসৃভিঃ। ১৫

গৃভ্ণামিত্বা (তোমার হস্ত গ্রহণ করিলাম) ইত্যাদি চারিটী মন্ত্রদ্বারা গ্রহণ করিবে। এখানেও "গৃহ্ণীয়াৎ" এই অর্থ বোধক "গৃহ্ণাতি" পদের অনুবৃত্তি আবশ্যক। পাণিগ্রহণে মন্ত্র চারিটী। প্রত্যেক মন্ত্রদ্বারা একবার পৃথগ্‌ভাবে পাণিগ্রহণ করিতে হইবে না। মন্ত্র চারিটী পাঠ করিতে হইবে ও চা[রি] মন্ত্রে শেষে একবার মাত্র পাণি গ্রহণ করি[তে] হইবে। "প্রত্যেকমাবৃত্তির্ম্মাভূৎ" প্রত্যে[ক] মন্ত্র পাঠে পাণি গ্রহণ পুনঃ পুনঃ করা না হউ[ক] এই বৃত্তিকার বাক্য পূর্ব্বোক্ত রহস্যের আবি[ষ্]কারক। ব্যবহারও একটী প্রমাণ।

অথৈনা মুত্তরেনাগ্নিং দক্ষিণেন পদা প্রাচীমুদীচীং বা দশমভিপ্রক্রময়ত্যেকমিষ ইতি। ১৬

তাহার পর অগ্নির অদূরে উত্তর হইতে আরম্ভ করিয়া নব বধূকে দক্ষিণ পদের দ্বারা প্রাচী (পূর্ব্ব) অথবা উদীচী (উত্তর) দিকে সপ্তপদ গমন করাইবে। ইষেত্বা ইত্যাদি সাতটী মন্ত্র ঐ সপ্তপদ গমনে ক্রমে (একপদ গমনে একটী) ব্যবহৃত হইবে। ইহাকে সপ্তপদী গমন কহে। সপ্তপদীগমনের রহস্য অতি গভীর। তাহা মন্ত্রগুলির অর্থ পাঠ করিলে বুঝা যায়। সপ্তপদী গমনের মন্ত্রগুলি দম্পতীর পরস্পরের প্রতি দৃঢ়রূপে নির্ভর ও অন্যান্য অনুরাগ বৃদ্ধি করিতে এবং চিরস্থ[ায়ী] অধিকার দানাদি বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিতে শিক্ষাদেয়। হিন্দু-পত্রিকায় বহুদিন হই[ল] সপ্তপদীগমনের তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে [।] প্রসঙ্গে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সখেতি সপ্তমে পদে জপতি। ১৭

সপ্তমপদে "সখাসপ্তপদাভব" ইত্যাদি মন্ত্রটী জপ করিবে। সপ্তম পদ ভূমিতে নিঃক্ষিপ্ত হইলে এই মন্ত্র পাঠ করা হয়, ব্যবহার ও শাস্ত্র উভয়েরই সমমত।

চতুর্থখণ্ড সমাপ্ত হইল।

পঞ্চম খণ্ড।

প্রাগ্‌ঘোমাৎ প্রদক্ষিণমগ্নিং কৃত্বা। ১

হোম মন্ত্রের পূর্ব্বে যে সকল মন্ত্র নিবদ্ধ আছে, সেই সকল মন্ত্র হোমকালের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত জপ করিবে। জপ সমাপনান্তে অগ্নি প্রদক্ষিণ করিবে। হোমের পূর্ব্বে বর ও বধূ উভয়েই করিবে। বধূর দক্ষিণ হস্ত বর গ্রহণ করিয়া পরিক্রমা করিবে কোনও টীকাকারের অভিপ্রায় এইরূপ।

যথাস্থানমুপবিশ্যান্বারব্ধায়ামুত্তরা আহুতীর্জুহোতি সোমায় জনিবিদে স্বাহা ইত্যেতৈঃ প্রতিমন্ত্রং। ২

প্রদক্ষিণ করিবার পর বর ও বধূ পূর্ব্বে যে স্থানে যিনি উপবিষ্ট ছিলেন সেই স্থানেই পুনর্ব্বার উপবেশন করিয়া বধূ অন্বারব্ধা হইলে পরবর্ত্তি ষোড়শ প্রধান আহুতি প্রদান করিবে। "সোমায়জনিবিদে স্বাহা" ইত্যাদি প্রত্যেক মন্ত্রে এক একটী দিতে হইবে।

অথৈনামুত্তরেণাগ্নিং দক্ষিণেন পদা অশ্মানং আস্থাপয়ত্যাতিষ্ঠেতি। ৩

অনন্তর অগ্নির উত্তরাংশে দক্ষিণ পদের দ্বারা পাষাণখণ্ড (লোড়া) টানিয়া লইয়া রুর এই বলিয়া স্থাপন করিতে হইবে। এই অশ্মাক্রমণ ব্যাপার বিলুপ্ত হয় নাই তবে কোনও স্থানে একটু আধটু অন্যরূপ হইয়াছে।

অথাস্যা অঞ্জলাবুপস্তীর্য্য দ্বির্লাজা নোপ্যাভি ঘারয়তি। ৪

তাহার পর বধূর অঞ্জলি বিস্তার করিয়া দুইবার লাজ দ্বারা (খই দিয়া) হোম করিবে। হোম বর স্বয়ংই করিবেন। বধূর হস্ত হোমীয় বস্তু রক্ষার পাত্র স্বরূপ "ইয়ং-নারী" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ বরকেই করিতে হইবে। বর হোমকর্ত্তা হইলেও বধূ হস্তই এখানে বিধান বলে হোম সম্বন্ধি লাজ দ্রব্যের আধার।

ভ্রাতা সোদর্য্যো লাজান্ আব পতীত্যেকে। ৫

বধূর সোদর্য্য খইগুলিকে লইয়া বধূ হস্তে ঢালিয়া দিবে, তাহার পর বর হোম করিবেন, কোনও কোনও আচার্য্য এই কথা বলিয়া থাকেন—সর্ব্বত্র ব্যবহার এ নিয়ম সমর্থন করে না, তবে কোথাওবা দেখিতে পাওয়া যায়।

জুহোতীয়ং নারীতি। ৬

"ইয়ংনারী" ইত্যাদি মন্ত্রে লাজ হোম করিতে হয়।

উত্তরাভিস্তিসৃভিঃ প্রদক্ষিণমগ্নিং কৃত্বাশ্মান-মাস্থাপয়তি যথা পুরস্তাৎ। ৭

পরবর্ত্তি "তুভ্যমগ্রে পর্য্যবহন্" ইত্যাদি মন্ত্রত্রয় দ্বারা অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিয়া লোড়া-টীকে পূর্ব্ব স্থানে স্থাপন করিতে হইবে। বর বধূর হস্ত ধারণ করিয়া মন্ত্র তিনটী পাঠ

করিবেন। হরদত্ত মহাশয় বলেন, 'ত্রিস্থণামন্ত্রে পরিক্রমণারম্ভঃ" তিনটী মন্ত্রের শেষে পরিক্রমণ আরব্ধ হইবে। যে কোনওটীর পরে অথবা পড়িতে পড়িতে ভ্রমণ নহে।

হোমশ্চোত্তরয়া। ৮

অর্য্যমণং নু দেবং ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা হোম করিতে হইবে।

পুনঃ পরিক্রমণমাস্থাপনং হোমশ্চোত্তরয়া। ৯

পুনর্ব্বার পরিক্রমণ অশ্মাস্থাপন ও ঐ পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রদ্বারা হোম করা আবশ্যক। পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইল তদ্রূপই আবার করিতে হইবে। এখানে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান বারম্বার, নিয়ম মন্ত্রাদি সকলই একরূপ।

পুনঃ পরিক্রমণম্। ১০

আবার পূর্ব্ববৎ অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতে হইবে।

জয়াদি প্রতিপদ্যতে। ১১

জয়াদি হোম সকল এখানে করা আবশ্যক।

পরিষেচনান্তং কৃত্বা উত্তরাভ্যাং যোক্ত্রং বিমুচ্য তাং ততঃপ্রবা বাহয়েৎ প্রবাহায়েৎ। ১২

জয়াদি হোম করিয়া তৎপরে পরিষেচনান্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া "প্রত্বা মুঞ্চামি" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া যোক্ত্র বিমোক করিয়ার পরে বধূকে রথারোহণ পূর্ব্বক লইয়া যাইবে অথবা শিবিকাদি মনুষ্য বাহ্য যানে আরোহণ করাইয়া লইবে। পরিষেচনের পরেই যোক্ত্র বিমোক করিতে হইবে প্রস্থান কালে নহে। রথাদি দ্বারা লইয়া যাওয়া পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল, বর্ত্তমানকালে তাহার দৃষ্টান্ত মিলে না। শিবিকাবাহনে বধূকে লইয়া যাওয়া আ'জ কা'ল প্রায়ই পরিদৃষ্ট হয়। এ নিয়ম সহসা উচ্ছিন্ন হইবার সম্ভবও নাই।

সমাপ্যোত্তমগ্নিমনুহরন্তি। ১৩

এই বৈবাহিক অগ্নি উখাতে (ধূপদানীর ন্যায় পাত্র বিশেষ ইহাতে অগ্নি স্থাপন করা হইত) তুলিয়া গমনশীল বরবধূর পশ্চাতে তদীয় লোকেরা লইয়া যাইবে। "পশ্চাতে" বলিবার তাৎপর্য্য এই যে অগ্রে লইবেনা। সঙ্গে সঙ্গে লইয়া গেলে কোনও দোষ হয় না। এই বৈবাহিক অগ্নি হইতেই সাগ্নিকদিগের সমস্ত আগ্নেয় কর্ম্মের প্রথম সূত্রপাত হইতে থাকে।

নিত্যোধার্য্যঃ। ১৪

এই বৈবাহিক অগ্নি পত্নী সম্বন্ধি কর্ম্মের জন্য অর্থাৎ গৃহস্থদিগের পক্ষে আশ্রমোচিত হোমাদির নিমিত্ত সর্ব্বদা ধার্য্য। পাণিগ্রহণ হইতে আচার লক্ষণ সমস্ত কর্ম্ম এই অগ্নিতে করিতে হইবে। ইহাকে গৃহ্য অগ্নি কহে। প্রাচীনকালে এই অগ্নি উখায় তুলিয়া গলদেশে বাঁধিয়া রাখা হইত, অথবা মস্তকে রাখা হইত। কোনও স্থানে গমন করিতে হইলেই এই উপায়ে লইতে হইত। সর্ব্বদা গলে ধারণ নিয়ম ছিল না, কুণ্ডেই রাখা হইত। এই অগ্নি ধারণ সম্বন্ধে কোনও গৃহকার বিকল্প বিধান করিয়াছেন। মহর্ষি আপস্তম্বের মতে তাহা অন্যায়।

অনুগতো মন্থ্যঃ। ১৫

শ্রোত্রিয়াগারাদ্বাহার্য্যঃ। ১৬

অরণি নির্ম্মথনদ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিতে হইবে। যদি বৈবাহিক অগ্নি কোনরূপে

নষ্ট হয় তখন এইরূপ বিধান অনেক আচার্য্যের মত। মথন দ্বারা উৎপাদন কিম্বা বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন ব্রাহ্মণের গৃহে যে অগ্নিদ্বারা পাকাদিক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাহাও আনা যাইতে পারে। উভয় পক্ষেই বৈবাহিক অগ্নি তত্তদুপায়ে উৎপন্ন বুঝিতে হইবে। যাঁহারা বলেন, মন্থন দ্বারা উৎপাদন করিতে হইবে তাঁহাদের মতে বিবাহের অগ্নি ও মন্থনোৎপন্ন হওয়া চাই। শ্রোত্রিয় গৃহ হইতে আয়নপক্ষেও বৈবাহিক অগ্নি সেই রূপে সংগৃহীত বুঝিতে হইবে। শ্রোত্রিয় শব্দটী আ'জ কা'ল বড় গৌরব বিহীন হইয়া পড়িয়াছে। শাস্ত্র বলেন—একাংশাখাং সকল্পাং বা ষড়্ভিরঙ্গৈরধীত্যচ, ষট্ কর্ম্ম নিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিৎ। সমগ্র বেদশাখাধ্যায়ী অন্ততঃপক্ষে এক শাখাও যিনি শিক্ষা. কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, ও জ্যোতিষ এই ষড়ঙ্গ সহিত অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং যজন, যাজন, অধ্যয়ন অধ্যাপন, দান, প্রতিগ্রহণ এই বিপ্রোচিত ষট্ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তাঁহাকে শ্রোত্রিয় বলে। কেবল বিদ্বান্ হইলে চলিবে না। অনুষ্ঠানও করিতে হইবে। পবিত্র কর্ত্তব্য পরায়ণ ব্রাহ্মণই শ্রোত্রিয়। বাল্যকালে ৬ পিতৃদেবের নিকট শুনিতাম "ষট্ কর্ম্মকালিতং ব্রাহ্মণত্বং।" সম্প্রতি ষট্ কর্ম্মহীন ব্রাহ্মণ সন্তান জাতীয় গৌরবে উন্মত্ত। বেদের নাম যাহারা শুনে নাই তাহারা শ্রোত্রিয়। অধ্যয়নসম্পন্ন হইলেও কৌলিন্যের চ'খে "শ্রোত্রিয়" নিম্ন স্তরে। আর সমাজ মস্ত কেরা অক্ষর না শিখিয়াও গৌরবান্বিত! হায়! শাস্ত্র কেবল যে আচারের পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা নহে, বাহ্য ব্যবহার (শব্দব্যবহারও) নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। প্রাসঙ্গিক বিষয়টী এইখানেই পরিত্যক্ত হইল।

উপবাসশ্চান্যতরস্যাভার্য্যায়াঃ পত্যুর্ব্বানুগতে। ১৭।

অগ্নি অনুগত হইলে ভার্য্যা এবং পতি উভয়েরই উপবাস করিতে হইবে। যে কেহ করিতেও পারে। কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন যে অন্যতর কালের জন্য অর্থাৎ দিনে অথবা রা'ত্রে কোনও কালের জন্য উভয়েরই উপবাস করিতে হইবে। এই উপবাস অগ্ন্যুৎপত্তির প্রায়শ্চিত্তার্থ। কাহারও মতে একের উপবাস কাহারও মতে উভয়েরই উপবাস। কেহ বলেন বিকল্প, কাহারও মতে সমুচ্চয়।

অপিবোত্তরয়া জুহুয়াল্লোপবসেৎ। ১৮

কিম্বা "অযাশ্চাগ্ন" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা একটী আহুতি প্রদান করিবে, উপবাস করিতে হইবে না। হরদত্ত বলেন "প্রায়শ্চিত্তমিদং অপহরণাদিনাগ্নিনাশেঽপি দ্রষ্টব্যম্" অর্থাৎ অগ্নি সমেত উখা যদি কেহ চুরি করিয়া লইয়া যায় তাহাহইলেও এই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। অগ্নির অপহরণ অথবা অন্য কোনও উপায়ের অগ্নি বিনাশ করিল তখন শত্রুতা সাধন সম্পন্ন হইত। বৌদ্ধবিপ্লবের সময়েও অনেক উপায়ে গৃহে সুরক্ষিত অগ্নি নষ্ট করা হইয়াছিল এরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে।

উত্তরা রথস্যোত্তম্ভনী। ১৯

"সত্যেনোত্তভিতা" ইত্যাদি ঋক্ মন্ত্র দ্বারা রথের উত্তম্ভন করিতে হইবে। এই

বিধান বর বধূর প্রস্থান কালীন রথারোহণের মন্ত্র ক্রমাদি জ্ঞাপন করিতেছে। মধ্যে কতকগুলি অনির্দিষ্টক বিধি নিপীবদ্ধ করায় আপাততঃ তৎসম্বন্ধীয় কার্য্যবিশেষের কর্ত্তব্যোপদেশ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। এই জন্যই টীকাকার বলিতেছেন 'দম্পত্যোঃ প্রস্থান বিশেষ ধর্ম্ম উচ্যতে" দম্পতীর বিবিধ গমনের মধ্যে রথারোহণ দ্বারা সম্পাদনীয় গমন বিশেষের ধর্ম্মই এখানে বলা হইতেছে। পরবর্ত্তী কার্য্য পূর্ব্বে বলা এবং পূর্ব্ববর্ত্তি কার্য্য পরে লেখা, গৃহ্যসূত্রের অপরাধ নহে, কারণ গৃহ্যসূত্র মন্ত্রকাণ্ডানুসারে প্রবৃত্ত, অনুষ্ঠান ক্রমানুসারে নহে।

বাহাবুত্তরাভ্যাং যুনক্তি। ২০

রথবহনকারী অশ্ব অথবা বৃষকে বাহ বলাযায়। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের পরস্থ মন্ত্র দুইটী দ্বারা রথে বাহ যোজনা করিতে হইবে। কোনও ব্যাখ্যাকারের মতে মন্ত্র দুটী এককালীন দুইটী বাহ ধুরায় বাঁধিতে হইবে। কেহবা বলেন 'যুঞ্জন্তি" ইত্যাদি প্রথম মন্ত্র দ্বারা দক্ষিণের বাহ সংযুক্ত করিবে। 'যোগে যোগ" ইত্যাদি দ্বিতীয় মন্ত্রদ্বারা অন্যটী প্রত্যেক বাহই মন্ত্রদ্বয় পাঠের পরে পৃথক রূপে বাঁধিতে হইবে, এ কথাও কোনও আচার্য্য বলিয়াছেন। যাহাহউক আজ কাল রথারোহণপূর্ব্বক বরবধূকে গৃহে গমন করিতে হয় না, সুতরাং ব্যবহার কোন পক্ষই সমর্থন করিতে পারিল না। রথে গরু যোজনা করা তৎকালে শাস্ত্রীয় নিয়মই ছিল। বৃত্তিকার হরদত্ত বলিয়াছেন "যাভ্যামুহ্যতে রথস্তৌবাহৌ অশ্বাবনড্বাহৌবা" যে দুইটী রথ বহিয়া লইবে তাহারা বাহ, অশ্ব অথবা বৃষভ। ইহার বহু পূর্ব্ব কালে গোবাহ্য যান ব্রাহ্মণগণ ব্যবহার করিতেন এরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু আজ কাল উহা জঘন্য পদ্ধতি বলিয়া গণ্য। যদিও বঙ্গের অনেক স্থানেই ভদ্র লোকের গোযানে চলিতে হয়, তথাপি আরোহীরা ঐ কার্য্য শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়া মনে করেন না। প্রত্যুত অগত্যা ঐ কার্য্য করিতে হয় ইহাও ব্যক্ত করেন। গরুতে যে রথ টানে তাহা গরুর গাড়ী বই আর কি? গঠন প্রণালী হয়ত একটু বিভিন্ন হইতে পারে। কিন্তু গোবাহ্যযান বলিয়া পূর্ব্ববর্ত্তি ব্যবহার শাস্ত্র তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই, অনন্ত ব্রতের কথায় দেখা যায় গোযানে আরোহণ করিয়া বিবাহান্তে বর বধূ গৃহে গমন করিতেছেন, এ কথাটী সাধারণের গোচরীভূত হইলেও অনেকেই ইহা ভালরূপে অবগত নহেন। গৃহ্যসূত্রের বৃত্তিকার মাননীয় হরদত্ত বলেন, পৌরাণিক বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়, আরও অনুকূলে প্রমাণ সুলভতা। গোবধ নিবৃত্তির সময় হইতেই গোযানে গমন দূষণীয় বলিয়া বিবেচিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে ভারতে গোজাতির উপর আরও অনেক জাতির সহানুভূতি উপস্থিত হয়। যেখানে যত আদর, সেখানে ততই অকর্ম্মণ্যতা, সুতরাং ভারতীয় গোসমাজ দেব পূজা পাইয়াও বলহীন দুগ্ধহীন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল। বস্তুতঃ গোযান ব্যবহার পুরাতন সমাজে আদৃত ছিল সন্দেহ নাই।

দক্ষিণমগ্রে। ২১

প্রথমে দক্ষিণ দিকের বাহটী যোজনা করিতে হইবে।

আরোহতী মুত্তরাভিরভিমন্ত্রয়তে। ২২

বাহ যোজনার পরে রথে আরোহণ কারিণী বধূকে "সুকিংশুকং" ইত্যাদি মন্ত্র চতুষ্টয় দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে। মন্ত্রে "সুচক্রং" ইত্যাদি পদ থাকায়, তাহার দ্বারা বুঝাযায় মন্ত্র পাঠ রথেই করিতে হইবে। মন্ত্রস্থ পদের দ্বারা অর্থ বুঝিয়া তৎ সামার্থ্যানুসারে সেই কার্য্যে মন্ত্র নিয়োগ করিলে তাহাকে "লিঙ্গ" প্রমাণানুমতে নিয়োগ বলা যায়। মীমাংসাদর্শনে এ বিষয় ব্যাখ্যাত হইবে। গৃহ্য সূত্রেও পূর্ব্বে একবার বলা হইয়াছে। কাহারও মতে এ মন্ত্র বধূর অভিমন্ত্রণে নিযুক্ত এই হেতুক উহা রথ বুঝাইবার সামর্থ্য অর্থবাদ, কর্ত্তব্যের উপদেশ নহে। সুদর্শনাচার্য্য বলেন, বধূ রথে আরোহণ করিতে থাকিলে এই মন্ত্র অভিমন্ত্রণে ব্যবহৃত হইবে, কারণ "সুচক্রং" ইত্যাদি রথ লিঙ্গ মন্ত্রে আছে। যদি অশ্বাদি আরোহণ কালে বধূকে অভিমন্ত্রিত করা হয়, তবে প্রথম তিনটী মন্ত্রদ্বারা। চতুর্থ মন্ত্রেই রথলিঙ্গ "সুচক্র" শব্দ আছে। এ সকল মতামতের সমালোচনায় বিশেষ ফল হইবার সম্ভাবনা দেখি না।

সূত্রে বর্ত্মনোর্ব্বা বস্তৃণাতু ত্তবয়া নীলং দক্ষিণস্যাং লোহিত মুত্তরস্যাং। ২৩

রথের উভয় বর্ত্মে নীল এবং লোহিত দুইটী সূত্র "নীললোহিতে" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা তির্য্যগ্‌ভাবে অবস্তৃত করিবে। সেই সূত্র দুইটীর মধ্যে যেটী নীল সেটী দক্ষিণ বর্ত্মে যোজনা করিবে, লোহিতটী উত্তর অর্থাৎ অপর বর্ত্মে।

উত্তরাভিরভিয়াতি। ২৪

সেই সূত্র দুইটী "যেনধ্বশ্চক্রং" ইত্যাদি তিনটী মন্ত্রপাঠ উপরি যাইবে।

তীর্থস্থাণুচতুষ্পথব্যতিক্রমেচোত্তরাং জপেৎ। ২৫

তীর্থ, স্থাণু, ও চতুষ্পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে হইলে বর উত্তরা ঋকটী জপ করিবেন। পুণ্য নদী, গঙ্গা যমুনা, প্রভৃতি অন্যান্য তীর্থ স্থান এখানে তীর্থ শব্দবাচ্য, পশুদিগের গাত্র কণ্ডূয়নের জন্য প্রোথিত কাষ্ঠ দণ্ডকে স্থাণু বলা হয়। সাধারণতঃ খুঁটার নামই স্থাণু। কাহারও মতে পশু শয়ন জন্য যে পর্ব্বত নিম্নভূমি তাহাই স্থাণু। চতুষ্পথ (চৌরাস্তা) সাধারণের পরিজ্ঞাত। এই সকল স্থানের উপর দিয়া যাইতে হইলে "তামন্দসান্য" ইত্যাদি মন্ত্র বর জপ করিবেন। যদি এতাদৃশ স্থান বারম্বার অতিক্রম করিতে হয় তবে বারম্বারই জপ করিতে হইবে। যেখানে নিমিত্ত উপস্থিত হয় সেখানে নৈমিত্তিক কার্য্য করাই দরকার। নিমিত্ত না হইলে সেটেই করিতে হইবে না।

পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত।

ষষ্ঠ খণ্ড।

নাবমুত্তরয়ানুমন্ত্রয়তে। ১

"অয়ংনো মহ্যাং পারং" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা নৌকা অনুমন্ত্রণ করিতে হইবে। এ বিধানটীর উদ্দেশ্য এই যে, পথে গমন করিতে যদি বৃহৎ নদী পার হইতে হয় তখন নৌকা ব্যতীত আর গতি নাই, সুতরাং নৌকায় পার হইতে হইবে, তৎকালে নৌকার অনুমন্ত্রণ করিতে হইবে। পৃষ্ঠের দিকে থাকিয়া পশ্চাদ্‌ দর্শন করিতে করিতে মন্ত্র পাঠ করার নাম অনুমন্ত্রণ।

অনুজ্ঞারণ করিয়া পরে বর ও বধূ সেই নৌকায় আরোহণ করিয়া পার হইবেন।১

ন চ নাব্যাং স্তরতী বধূঃ পশ্যেৎ। ২

নৌকায় পার হইবার কালে বধূ নৌকাবাহকদিগকে দর্শন করিবে না। নৌকাতে (নাবিভবানাব্যাঃ) যাহারা থাকে তাহারা না ১, তাহাদিগকে (নাব্যান্) দেখাই বধূর নিষিদ্ধ কর্ম্ম। নীচজাতীয় কৈবর্ত্তাদি নাব্য একথা বৃত্তিকার বলিয়াছেন। তাহাদিগকে দর্শন করা নব বধূর পক্ষে সুলক্ষণ নহে। ইহাতে অনেকটা লজ্জা রক্ষার কথা আসিয়াছে। কেহ বলেন নাব্য শব্দে নৌকার জল, কিন্তু তাহা পুংলিঙ্গ হইতে পারে না, তজ্জন্য তাদৃশ ব্যাখ্যার সারবত্তা দেখি না। বিশেষতঃ নৌকায় জল দর্শন করা বধূর পক্ষে কোনও অন্যায় কাজ নহে। নৌকাস্থিত নীচ শ্রেণীর লোক দর্শন করা স্ত্রীলোকের পক্ষে বিশেষতঃ নববিবাহিতার অন্যায়। "তরতী" প্রভৃতি অনেক ছান্দস প্রয়োগ গৃহ্যসূত্রে আছে। অর্থবোধে বিশেষ কষ্ট হয় না, এই জন্য সেগুলির বিশদ পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক।

তীর্ত্বোত্তরাং জপেৎ। ৩

পার হইয়া পরে বর "অস্য পার" ইত্যাদি ঋক্ মন্ত্র জপ করিবেন। উত্তীর্ণ হইয়া মন্ত্র পঠন, নৌকায় থাকিয়া নহে।

শ্মশানাধি ব্যতিক্রমে ভাণ্ডে রথেব রিষ্টেঽগ্নেরুপসমাধানাদাজ্যভাগান্তেঽম্বারব্ধায়ামুত্তরা আহুতীর্হুত্বা জয়াদি প্রতিপদ্যতে পরিষেচনান্তং করোতি। ৪

শ্মশানভূমির উপরিভাগে ভোজনার্থ ভাণ্ড কিম্বা বধূর অলঙ্কারাদি পূর্ণ ভাণ্ড অথবা রথ নষ্ট হইলে পরোক্ত হোম কর্ম্ম করিতে হইবে। অগ্নির উপসমাধান হইতে আজ্যহোম পর্য্যন্ত ও বধূ অম্বারব্ধা হইলে 'যদৃতেচিৎ" ইত্যাদি সপ্ত আহুতি প্রদান করিবে, জয়াদি হোম করিবে, পরিষেচনান্ত সমস্ত করিবে। এখানে অধি শব্দের যোগ থাকায় (শ্মশানাধি) শ্মশানেরই উপর দিয়া গমন করা এবং তথায় ভাণ্ডাদি নষ্ট হওয়ার কথা আসিল। শ্মশানের উপর দিয়া গেলে পূর্ব্বোক্ত প্রায়শ্চিত্ত, তথায় দ্রব্য নষ্ট হইলে এই হোম প্রায়শ্চিত্ত। তীর্থ স্থানাদির উপর দিয়া না গিয়া নিকট দিয়া গেলেও পূর্ব্বোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। অনেক স্থলে নিকট গমনই সম্ভব।

ক্ষীরিণামন্যেষাং বা লক্ষণানাং বৃক্ষাণাং নদীনাং ধন্বনাংচ ব্যতিক্রম উত্তরে যথা লিঙ্গং জপেৎ। ৫

ক্ষীরিবৃক্ষ ("উডুম্বরো বটোঽশ্বত্থো বেতসঃ প্লক্ষ এবচ পঞ্চৈতে ক্ষীরিণোবৃক্ষাঃ সংস্কারাং সমুদাহৃতাঃ ইত্যায়ুর্ব্বেদে" যজ্ঞডুমর, বট, অশ্বত্থ, বেতস, পাকুড় এই পাঁচটী ক্ষীরিবৃক্ষ।) গণের অথবা অন্যান্য লক্ষণযুক্ত প্রসিদ্ধ শমীবৃক্ষাদির নদীর (জলপূর্ণাইহউক জলহীনাই হউক) ও নির্জ্জল অরণ্য প্রদেশের অতিক্রম হইলে পরোক্ত মন্ত্র লিঙ্গানুসারে পাঠ করিতে হইবে। অর্থাৎ যে মন্ত্রে যে স্থানের অবোধক কোনও শব্দ আছে সে স্থানের অতিক্রম হইলে সেই মন্ত্রটীই পাঠ করিবে, অন্যটী নহে।

বৃক্ষাতিক্রমে যে গন্ধর্ব্বা ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে হরদত্ত বলেন, নদী অতিক্রম করিলে "যা ওষধয়ঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ তাঁহার অভিপ্রেত। ধন্ব ব্যতিক্রম ক[illegible]

হইলে "ষানি ধম্বানি" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ আবশ্যক। সুদর্শনাচার্য্যের মতে দুর্গাদি তিন্তিনীকা সীমাকদম্ব ইত্যাদি লক্ষণ বৃক্ষ। গ্রাম্য পশু যে অরণ্যে বাস করে না এতাদৃশ দীর্ঘারণ্যের নাম ধম্ব ইহা সুদর্শন বলেন।

গৃহানুত্তরয়া সংকাশয়তি। ৬

উত্তরা ঋক্ মন্ত্র "সংকাশয়ামি" ইত্যাদি পাঠ করিয়া গৃহ সংকাশিত করিবে। বাটী আসিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া গৃহে প্রাপ্ত যৌতুকাদি লভ্যধন স্থাপন করিয়া তাহার দ্বারা গৃহ বিকাশ বিশিষ্ট করিবে। সুদর্শনাচার্য্যের মতে গৃহ শব্দের অর্থ জ্ঞাতি বন্ধু প্রভৃতি। তাহাদিগকে দেখাইবে। নব বিবাহিতা বধূকে সঙ্গে লইয়া জামাতা স্বগৃহে গমন করিয়া শ্বশুরালয় হইতে লভ্যধনাদি আত্মীয় বর্গকে দেখাইবেন, অথবা তাহার দ্বারা গৃহ সুশোভিত করিবেন এ আদেশ সর্ব্বথা প্রতিপাল্য। কিন্তু মন্ত্রাদি পাঠ পূর্ব্বক শাস্ত্রানুমতে এই কার্য্য সম্পাদন করিতে দেখা যায় না। পূর্ব্বকার দিনে লোকে নিজের বয়স ও অর্থাদি গোপন করিত, তদ্দিনে অর্থাদি আত্মীয়দিগকে দেখান একটা বিধি সাপেক্ষ কার্য্য ছিল, অধুনা সামাজিক স্রোতের পরিবর্ত্তনে উহা স্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, সুতরাং বিধির অপেক্ষা নাই। এমতাবস্থায় মন্ত্র কার্য্য উঠিয়া যাওয়ায় প্রকৃত কার্য্যের কোনও হানি হইতেছে কিনা তাহা ভগবান্ জানেন। মন্ত্রাদিদ্বারা সম্পাদিত সংস্কারকার্য্য ফলপ্রসূ আর্য্য ভূমিতে অনেক দিন হইতে এই ধারণা চলিয়া আসিতেছে। গূঢ় রহস্য অনুসন্ধেয়।

বাহাবুত্তরাভ্যাং বিমুঞ্চতি দক্ষিণমগ্রে। ৭

"আ বামগন্নয়ং নোদেবঃ সবিতা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বয় দ্বারা রথের বাহ দুইটী মোচন করিবে তাহার মধ্যে দক্ষিণ বাহটী অগ্রে মোচন করিতে হইবে। বাহযুগল রথ বহনে পরিশ্রান্ত ক্লান্ত হইয়াছে, তাহাদের যথেচ্ছ বিচরণ ও ভোজনাদি দান উচিত, সুতরাং সর্ব্বাগ্রে তাহাদের মোচনই কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইতেছে।

প্রপাদয়ন্ উত্তরাং বাচয়তি দক্ষিণেন পদা। ৮

বর বাহ মোচন করিয়া পরে সায়ংকালে গৃহে প্রবেশ করিয়া দম্পতীর যেখানে বাসস্থান সেই গৃহের মধ্যে লোহিত বর্ণ বৃষচর্ম্ম বিস্তৃত করিয়া পাতিবে। যাহার গ্রীবা পশ্চিমে থাকে ও লোম উত্তরাভিমুখ সেই রূপে চর্ম্ম পাতিতে হইবে। শর্ম্ম বর্ম্ম ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্র পাঠ করিয়া বিস্তৃত করিতে হয়। তাহার পর দক্ষিণ পদের দ্বারা বধূকে গৃহে প্রবেশ করাইবে। দক্ষিণ পদ প্রথমে গৃহে নিঃক্ষেপ করিবে ইহাই তাৎপর্য্য। তাহার পর বধূকে গৃহান্ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করাইবে। প্রাচীনকালে বধূকে মন্ত্র পড়ান হইত বলিয়া বোধ হয়, কেন না অনেক স্থানে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। নিজে পড়িয়া তাহাকে শুনাইলে তাহাতে বোধহয় "বাচয়তি" শব্দের গৌরব রক্ষিত হয় না যাহাহউক "বাচয়তি" শুনিলে মনে হয় ঐ মন্ত্র নিজে প্রযোজক হইয়া তাহার দ্বারা বলাইবে। এ বিষয় প্রিয় পাঠক! স্বমতানুরূপ সমর্থন করিয়া লইও। দীন লেখকের ততদূর আলোচনা করার ক্ষমতা নাই।

ন চ দেহলীমভি তিষ্ঠতি। ৯

দেহলী আক্রমণ করিবে না। দরজার চতুষ্পার্শ্বের বন্ধনী কাষ্ঠের নাম দেহলী। কাহারও মতে দরজার চতুষ্পার্শ্বের বন্ধনী কাষ্ঠের (যে চতুষ্কোণাকৃতি কাষ্ঠের অভ্যন্তরের অবকাশ দরজা সেই কাষ্ঠের) মধ্যে যে কাষ্ঠটী মৃত্তিকার উপর স্থাপিত তাহাকেও দেহলী বলেন। মোটের উপর অনেকে "চৌকাঠ" কে দেহলী বলিয়া থাকেন, কেহবা তাহার নিম্নের কাষ্ঠ খানি বলেন এইরূপ বুঝিতে হইবে। বধূ গৃহে যাইবার সময় দেহলী কাষ্ঠে তাহার পদ সংস্পর্শ না হয় এরূপে যাইবে। সুদর্শনাচার্য্য বলিয়াছেন দেহলীতে পদ সংস্পর্শ হওয়া বরেরও নিষিদ্ধ। "চকারদ্বারাহপি" ইহাই তাঁহার কথা। সূত্রে "নচ" এই এক চ আছে তাহার দ্বারা বরও সমুচ্চিত হইতেছেন এই রূপই তাঁহার অভিপ্রায়।

উত্তর পূর্ব্বে দেশেহগারস্যাগ্নেরুপসমাধানাবাজ্যভাগান্তেহস্যাবৰ্দ্ধয় মুক্তবাআহুতীর্হুত্বা জয়াদি প্রতিপদ্যতে পরিষেচনান্তং কৃত্বা উত্তরয়া চর্ম্মণ্যুপবিশত উত্তরোবরঃ। ১০

যে স্থানে চর্ম্ম আস্তৃত আছে সেই স্থানের উত্তর পূর্ব্ব দিকে বৈবাহিক অগ্নি প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া অগ্নির উপসমাধান হইতে আজ্য ভাগান্ত সম্পাদন করিয়া পরবর্ত্তি ত্রয়োদশ প্রধানাহুতি "আগন্ গোষ্ঠং" ইত্যাদি মন্ত্র যোগে বর দিবেন। জয়াদি হোমান্তে পরিষেচনান্ত কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া "ইহগাবঃ প্রজায়ধ্বং" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া পূর্ব্বোক্ত চর্ম্মে উপবেশন করিবে। তাহাতে বর উত্তর দিকে। তাৎপর্য্যাধীন বধূর দক্ষিণভাগে বসিতে হইবে ইহাও সূচিত হইল। এই কার্য্যটীকে অনডুচ্চর্ম্মোপবেশন বলে। স্মার্ত্ত কুল চূড়ামণি রঘুনন্দন লিখিয়াছেন বৃষচর্ম্মোপবেশন পর্য্যন্ত যজুর্ব্বেদীয়গণের বিবাহ। যজুর্ব্বেদের কর্ম্মকাণ্ড আপস্তম্ব মহোদয় সূত্রিত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে এই সূত্রিত চর্ম্মোপবেশন যজুর্ব্বেদীয় বিবাহের পরিসমাপ্তিরূপ অনুষ্ঠান।

অথাস্যাঃ পুংস্বোজীব পুত্রায়াঃ পুত্রমঙ্ক উত্তরয়া উপবেশ্য তস্মৈ ফলান্যুত্তরেণ যজুষা প্রদায় উত্তরে জপিত্বা বাচং যচ্ছতানক্ষত্রেভ্যঃ। ১১

তাহার পর যে নারী কেবল পুত্রই প্রসব করিয়াছে কন্যা প্রসব করে নাই এবং যাহার পুত্র সকল জীবিত আছে সেই স্ত্রীর পুত্রকে নব বধূর ক্রোড়ে "সোমেনাদিত্যা" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা উপবেশন করাইয়া উপবিষ্ট পুত্রকে প্রস্বস্থ ইত্যাদি যজুর্ম্মন্ত্রদ্বারা ফলাদি দান করিতে হইবে। তাহার পর "ইহপ্রিয়ং সুমঙ্গলী" ইত্যাদি ঋক্‌দ্বয় জপ করিয়া সেই বৃষচর্ম্মাসনে বর ও বধূ কথা বলা বন্ধ করিয়া নীরবে নক্ষত্র উঠিবার সময় অর্থাৎ সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিবে। ফল গ্রহণান্তে পুত্রটী যথেচ্ছা গমন করিতে পারে হরদত্তের কথায় অবগত হওয়া যায়। অপরিচিতা নব বধূর কোলে বসাইয়া কুমারকে ফলাদি না দিলে সে কাঁদিতেও পারে, সুতরাং ভুলাইবার ব্যবস্থা। যে স্ত্রী কখনও পুত্র শোক প্রাপ্ত হয় নাই, তাহার পুত্রকে স্পর্শ করিলে নব বধূও সন্তান শোকে কাতর হইবে না এইরূপ অভিপ্রায়েই বোধহয় এ নিয়ম ব্যবস্থিত হয়। নব বধূ পুত্রই গর্ভে ধারণ করিবে এই জন্যই যে পুত্রপ্রসূতির পুত্রকে তাহার ক্রোড়ে দেওয়া হয়। প্রাচীন সংস্কার কর্ম্ম আর্য্য

মহর্ষিগণের গভীর গবেষণার ফল, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহার যুক্তি অনুসন্ধান করা ঘটে না। কোনও প্রাচীন টীকাকারের মতে বধূ একাই নীরবে থাকিবে, মতান্তরে উভয়েরই নীরবতা অবলম্বন বিধেয়।

উদিতেষু নক্ষত্রেষু প্রাচীং উদীচীং বা দিশং উপনিষ্ক্রম্য উত্তরাভ্যাং যথা লিঙ্গং ধ্রুবং অরুন্ধতীং চ দর্শয়তি। ১২

নক্ষত্র উদিত হইলে পূর্ব্বদিকে বা উত্তর দিকে নিষ্ক্রান্ত হইয়া "ধ্রুবক্ষিতিঃ সপ্তবর্ষয়ঃ" এই মন্ত্র দুইটীর দ্বারায় সামর্থ্যানুসারে (যে মন্ত্রের যে দর্শন প্রতিপাদনে ক্ষমতা আছে, সেই মন্ত্রদ্বারা সেইটী দেখা) ধ্রুব ও অরুন্ধতী বধূকে দেখাইবে। অরুন্ধতী দর্শন ও ধ্রুব দর্শন যুক্তিমূলক বলিয়া মনে হয়।

পৃথিবীর জীব ধ্রুবকে একস্থানেই দর্শন করিবে। ভ-চক্রের পরিবর্ত্তনে পৃথিবীবাসী গ্রহ-নক্ষত্রাদির স্থান ত্যাগ দেখিলেও ধ্রুবের একস্থানে স্থিতি দেখিবে। ধ্রুব পৃথিবীর সমসূত্রে। মেরুদণ্ডকে বৃদ্ধি করিয়া উত্তর দিকে চালাইলে তাহা ধ্রুবের সমীপে উপনীত হইবে, সুতরাং ধ্রুবের গতি পৃথিবীর লোকের পক্ষে দৃশ্য নয়। এই জন্য ধ্রুব অনড় বলা হয়। শ্বশুর-কুলে সকল নড়চড় হইলেও তুমি ধ্রুবের মত অনড় থাকিও, এই উপদেশ ধ্রুব দর্শনে লাভ হয়। "পতি কুলে ধ্রুবাসি" ইত্যাদি বাক্য ইহার প্রমাণ। অরুন্ধতীও যেমন বশিষ্টের সহিত মিলিয়া আছেন, তাঁহাকে লোকে সহসা দেখিতে পায় না, তদ্রূপ তোমাকেও তোমার স্বামীর [illegible]য়া এবং সাধারণের সহিত অসংসৃষ্ট হইয়া থাকিতে উপদেশ দেওয়া হইতেছে। অরুন্ধতী দর্শন এই উপদেশ আবিষ্কার করে। দুইটী মন্ত্রদ্বারাই ধ্রুব দর্শন ও অরুন্ধতী দর্শন করিতে হয়, অথবা যাহাতে ধ্রুব শব্দ আছে, সেই মন্ত্র দ্বারা ধ্রুব দর্শন এবং অপরটী দ্বারা অরুন্ধতী দর্শন করিতে হয়, এইরূপ মন্ত্র-বিকল্প হরদত্তের অভিপ্রেত। লিঙ্গানুরূপ মন্ত্র বিনিয়োগ আপনা হইতেই হইতে পারে, সূত্রে বলা অনাবশ্যক, এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি উক্তবিধ বিকল্পার্থ সূত্রে বলা হইয়াছে, এরূপ বলেন। অপরের মতে "যথালিঙ্গং" এই অংশটুকু ভ্রম বশতঃ সূত্ররূপে গৃহীত হইয়াছে, বস্তুতঃ উহার মৌলিকতা নাই। কেহ বলেন, উহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে।

পরবর্ত্তী মন্ত্রদ্বারা অরুন্ধতী, সপ্তর্ষি ও কৃত্তিকার সহদর্শন প্রতিপাদিত হওয়ায়, ঐ গুলিকেই ঐ মন্ত্রদ্বারা দেখাইতে হইবে; কেবল অরুন্ধতীকে নহে, কোনও আচার্য্য এ কথা বলেন। মতান্তরের সমালোচনা পাঠক স্বয়ং করিবেন। সন্ধ্যাকালে ধ্রুব দর্শন সর্ব্বদা ঘটিতে পারে, কিন্তু অরুন্ধতী বা সপ্তর্ষি অথবা কৃত্তিকা দেখা সকল সময়ে সন্ধ্যাকালে হইতে পারে না। কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহ হয়, তখন সন্ধ্যাগগণে অরুন্ধতী থাকে না। অনেক সময় শেষ রজনীতে সপ্তর্ষি উদিত হয়। অরুন্ধতীও সপ্তর্ষির মধ্যে বশিষ্ঠের গায় গায় আছে। সে সকল সময়ে তাঁহাদিগকে দেখার ব্যবস্থা কিরূপে সমর্থিত হইবে, বুঝি না। যাহা হউক, যখন দেখা যাওয়া সম্ভব, তখনই দেখিবে, এইরূপ অর্থে বিধান রচিত বলিয়া বুঝিতে বোধহয়

অনেকের আপত্তি নাই। বারান্তরে অন্য বিষয় আলোচিত হইবে।

ষষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত।

(ক্রমশঃ)

কস্যচিদ্ ব্রহ্মচারিণঃ।

বেদান্ত-সূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৪র্থ)

২০। অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ।

২১। ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ।

২২। আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ।

২৩। অতএব প্রাণঃ।

২৪। জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ।

২৫। ছন্দোঽভিধানান্নেতি চেন্ন তথা চেতোঽর্পণ নিগদাত্তথাহি দর্শনং।

২৬। ভূতাদি পাদব্যপদেশোপপত্তেশ্চৈবং।

২৭। উপদেশ ভেদান্নেতি চেন্নোভয়স্মিন্নপ্যবিরোধাৎ।

২৮। প্রাণস্তথানুগমাৎ।

২৯। নবক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেদধ্যাত্ম সম্বন্ধ ভূমাহ্যস্মিন্।

৩০। শাস্ত্রদৃষ্ট্যাতূপদেশো বামদেব বৎ।

৩১। জীব মুখ্য প্রাণলিঙ্গান্নেতি চেন্নোপাসাত্রৈবিধ্যাদাশ্রিতত্বাদিহতদ্যোগাৎ।

২০। ব্রহ্মের লক্ষণ-নির্দ্দেশ থাকায় আদিত্য ও অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ পরব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে।

২১। ভেদের ব্যপদেশ থাকায় আদিত্যাদি ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন।

২২। ব্রহ্মের লক্ষণ থাকায় "আকাশ" পদে ব্রহ্মই বুঝাইতেছে।

২৩। ঐরূপে (পূর্ব্বসূত্রোক্ত কারণে) 'প্রাণ' পদে ব্রহ্মই বুঝাইতেছে।

২৪। "চরণ" শব্দের উল্লেখ থাকায় "জ্যোতিঃ" পদে ব্রহ্মই বুঝাইতেছে।

২৫। "ছন্দ" অভিধান ব্রহ্ম-বাচক নহে বলিয়া যে আপত্তি উত্থাপিত হয়, তাহা যুক্তি-বিরুদ্ধ; কারণ ছন্দ দ্বারা ব্রহ্মাভিমুখে চিত্ত পরিচালিত হয় এবং এরূপ প্রয়োগ শ্রুত্যন্তরেও পরিদৃষ্ট হয়।

২৬। ভূতাদি কারণ স্বরূপ উল্লিখিত হওয়ায় "গায়ত্রী" পদ ব্রহ্ম বাচক হইলেই উপপত্তি সিদ্ধ হয়।

২৭। ভেদ হেতু ব্রহ্ম লক্ষ্য হইতে পারে না বলিয়া যে আপত্তি, তাহা অসঙ্গত; কারণ তাহাতে কোন বিরোধ দৃষ্ট হয় না।

২৮। যাহা পশ্চাৎ উক্ত হইবে, তদ্দ্বারাই প্রমাণিতব্য যে 'প্রাণ' পদ ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করে।

২৯। বক্তার স্বীয় আত্মাকে উদ্দেশ করা হেতু ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হয় নাই, এইরূপ আপত্তি হইলে, তদুত্তর এই যে, বহু স্থানে "প্রাণ" শব্দ প্রয়োগে ব্রহ্মকেই ব্যক্ত করা হইয়াছে।

৩০। শাস্ত্রদৃষ্টি হেতুই ইন্দ্রের "অহং ব্রহ্ম" উক্তি বামদেবের উক্তির ন্যায় বুঝিতে হইবে।

৩১। জীব এবং প্রাণের লক্ষণ থাকায় ব্রহ্মবোধকতা অনুপপন্ন এই আপত্তি

কারণ অন্যরূপ অর্থ করিলে,প্রথমতঃ ত্রিবিধ-উপাসনার প্রয়োজন হয়, দ্বিতীয়তঃ যে অর্থ করা হইয়াছে, অন্য শ্রুতিপরাম্পরাতেও সেই অর্থ দৃষ্ট হয়, তৃতীয়তঃ ইহাতে ব্রহ্ম-লক্ষণও ব্যক্ত।

২০শ ও ২১শ সূত্র ৭ম অধিকরণের অন্তর্ভূত। ২২শ সূত্র ৮ম, ২৩শ সূত্র ৯ম, ২৪শ হইতে ২৭শ সূত্র পর্য্যন্ত ১০ম এবং ২৮শ হইতে ৩১শ সূত্র পর্য্যন্ত ১১শ অধিকরণের অন্তর্ভূত।

এই সমস্ত অধিকরণে উপনিষদে ব্যবহৃত কতিপয় শব্দ বা পদ-বিশেষের বিচার-বিতর্ক মীমাংসিত হইয়াছে। "আকাশ" ও "প্রাণ" শব্দ পরমাত্মা-বোধক হইয়াই তৎপর্য্যায় শব্দরূপে উপনিষদে ব্যবহৃত হইয়াছে; অথচ উক্ত শব্দদ্বয়ে ভৌতিক আকাশ ও ভৌতিক প্রাণবায়ুও বুঝায়; অতএব উহা বিচার-বিতর্কের বিষয়ীভূত হইয়াছে।

(২০শ ও ২১শ সূত্র)—ছান্দোগ্য-উপনিষদে (১।৬।৬) নিম্নস্থ বাক্যাবলী দৃষ্ট হয়;—

"অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রু হিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ। তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীক মেবমক্ষিণী, তস্যোদিতি নাম, সএব সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ উদিত, উদেতি হবৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো য এবং বেদ ইত্যাদি দৈবতং অথাধ্যাত্মমথ য এবোঽন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে।

হিরণ্ময় পুরুষ আদিত্যে অধিষ্ঠিত।
[illegible] তাঁর হিরণ্যমণ্ডিত॥
পদনখ পর্য্যন্ত সমস্ত স্বর্ণময়।
অরুণারবিন্দ সম শোভে নেত্রদ্বয়॥
"উৎ" অভিধানে তিনি অভিহিত হন।
যেহেতু সর্ব্বপাপের উর্দ্ধে তিনি রন॥
এই তত্ত্ব অবগত আছেন যে জন,
তিনিও পাপের উর্দ্ধে অবস্থিত হন।
ইতি তত্ত্ব দেবপক্ষে; অধ্যাত্ম পক্ষেতে,
সে পুরুষ দৃষ্ট অন্তরক্ষি-দর্পণেতে।

এক্ষণে বিচার্য্য বিষয় এই যে, যিনি আদিত্যাসনে ও অন্তর্নয়নে অধিষ্ঠিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তিনিই পরমাত্মা ব্রহ্ম, না তিনি অপর কোন পরমপূজাস্পদ পুরুষ-বিশেষ।

পরমাত্মা "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" (কঃ উঃ ১।৩।১৫) শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও ক্ষয়-রহিত। তিনি নিরাধার—আত্ম মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত এবং আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী, অনাদি-অনন্ত-নিত্য। যথা—"স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত কতিস্বেমহিম্নি আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ।" (কঃ উঃ ৭-২৪) এই সমস্ত এবং অপরাপর ঔপনিষদী উক্তি সমূহ দ্বারাও ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে যে, পরমাত্মা সর্ব্বোপাধিপরিশূন্য। অতএব বিচার্য্য প্রশ্ন এই যে, ছান্দোগ্য উপনিষদুক্ত পুরুষ এই নিরুপাধিক ব্রহ্ম-লক্ষণান্বিত না হইয়াও কিরূপে পরমাত্মা বা পরব্রহ্মরূপে প্রতিপন্ন হইতে পারেন? এতদুত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, "য আত্মা অপহত পাপ্মা" (ছাঃ উঃ ৮-৭।১) ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারাই পাপাতীত পরমাত্ম-সত্তারই অববোধ হইতেছে; সুতরাং বিচার্য্য স্থলেও উক্ত আদিত্যাধিষ্ঠিত হিরণ্ময় পুরুষের পাপাতীতত্ব স্পষ্ট পরিব্যক্ত থাকায়,উহা দ্বারা

সেই "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্" ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইতেছেন।

এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে, পরমেশ্বরের স্বরূপ-লক্ষণান্বিত নির্গুণতত্ত্ব বর্ণন স্থলে তাঁহাকে "নিরুপাধিক" বলা হইয়া থাকে, কিন্তু উপাস্য স্বরূপে তাঁহার তটস্থ লক্ষণান্বিত সগুণতত্ত্ব শ্রুতি-সিদ্ধান্ত-সম্মত। যদিও প্রকৃতপক্ষে অরূপ ব্রহ্ম তাঁহার স্বমহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত, তথাপি এ স্থলে সাধকের ধ্যান-ধারণার উপযোগিতা বিধানার্থ আদিত্যাসনে ও অক্ষি-দর্পণে তাঁহার সরূপসত্তা কল্পিত হইয়াছে। নেত্রের বিষয় রূপ, রূপের মূল-তত্ত্ব তেজঃ, তেজের মূলতত্ত্ব আদিত্য; অতএব উপাসকের ধ্যান ধারণাধিগম্য ভাবেই সগুণ ব্রহ্ম হিরণ্ময় পুরুষরূপে তৈজসাধিষ্ঠানে কল্পিত। শাস্ত্র স্পষ্টই বলিয়াছেন, "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।"

সর্ব্বময় নিরাকার ব্রহ্মের আকার ও আধার কল্পনা ভিন্ন উপাসনাই অসম্ভব হয়। পরবর্ত্তী ২১শ সূত্রে এই তত্ত্বই সিদ্ধান্তিত হইতেছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের (৩-৭.৯) অন্তর্যামী ব্রাহ্মণে এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়, যথা—

"য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরোযমাদিত্যো নবেদ যস্যাদিত্যঃ শরীরং য আদিত্যমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ।

আদিত্য-আধারে, আদিত্য অন্তরে,
অধিষ্ঠান হয় যার,
যার পরতত্ত্ব না জানে আদিত্য;
আদিত্যই তনু তার।
আদিত্য-অন্তরে রহি যেবা করে
আদিত্যেরে নিয়মিত,
আদিত্যস্থ সেই আত্মারূপী এই—
অন্তর্যামী নিত্যামৃত।

উপর্য্যুদ্ধৃত বাক্যে আদিত্যোদ্দীপক আত্মা-পুরুষ যে পরমাত্মা নহে, এইরূপ সিদ্ধান্তই আপাততঃ অববোধিত হয়; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বৃহদারণ্যকোক্ত এই অন্তর্যামী পুরুষই ছান্দোগ্য-উপনিষদুক্ত আদিত্যাধিষ্ঠিত হিরণ্ময় পুরুষ। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, যদিও পরমাত্মা প্রতি জীবাত্মারই মূলতত্ত্ব, তথাপি উপাধির অধিকার-কালাবচ্ছিন্ন-ভাবে সর্ব্ব জীবাত্মা হইতে স্বতন্ত্রবৎ সুপ্রতিপন্ন।

(২২শ সূত্র)—ছান্দোগ্য উপনিষৎ (১৭৯) নিম্নোদ্ধৃত উক্তি করিতেছেন, যথা—

"অস্য লোকস্য কা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচ সর্ব্বাণি হবা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত ইত্যাকাশং প্রত্যস্তং যন্ত্যাকাশো হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণং ইতি।

কিবা হয় মূলতত্ত্ব এই জগতের?
উত্তর—আকাশ হয় মূলতত্ত্ব এর।
যেহেতু আকাশ হতে সর্ব্ব-ভূতোদয়;
আকাশেই হয় পুনঃ সর্ব্বের বিলয়।
সর্ব্বভূত হতে হয় আকাশ মহান্;
আকাশেই সবের পরম পরিণাম।

এখানে "আকাশ" পদে পরমাত্মাই বোধব্য; যেহেতু ব্রহ্মের লক্ষণ-বিশেষত্ব এখানে বিস্পষ্ট ব্যক্ত। সমুদয় উপনিষদেরই ইহা অবিসংবাদী সিদ্ধান্ত যে, ব্রহ্ম হইতেই সর্ব্বভূতের সম্ভূতি; অতএব উপর্য্যুদ্ধৃত ছান্দোগ্য-বাক্যে আকাশকেই যে স্থলে সর্ব্বভূতের সমুদ্ভাবক মূল কারণ বলা—হ

সে স্থলে উক্ত "আকাশ" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য। উহা ভৌতিক আকাশ নহে; কারণ ভৌতিক আকাশস্বয়ংই ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন।

"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ।
আকাশাৎ বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ ইত্যাদি॥
(তৈঃ উঃ ২)

এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন; আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে জল উৎপন্ন, ইত্যাদি। এতদ্রূপ অন্যান্য ঔপনিষদী শ্রুতিতেও "আকাশ" পদ ব্যবহৃত হইয়াছে।

"আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্বহিতা" (ছাঃ উঃ ৮।১৪) আকাশই নাম-রূপের প্রকাশক। এ উক্তিতে ব্রহ্ম-লক্ষণই লক্ষিত। "ঋচোঽক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ। (ঋগ্বেদ ১-১৬৪।৩৯) ক্ষয়-লয়-রহিত পরম ব্যোমে বেদসমূহ প্রতিষ্ঠিত ও দেব সমূহ অধিষ্ঠিত।

"সৈষা ভার্গবী-বারুণী বিদ্যা পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা।" (তৈঃ উঃ ১৬) ভৃগু-বরুণের এই ব্রহ্মবিদ্যা, ইহা পরম ব্যোমে প্রতিষ্ঠিতা।" ওঁং ক ব্রহ্ম, ওঁং খং ব্রহ্ম।" ব্রহ্মই ক, ব্রহ্মই খ (আকাশ) (ছাঃ উঃ ৪ ১০।৫)

(২৩শ সূত্র) ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—"ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে।" এই সমস্ত ভূতই প্রাণে নিমজ্জিত, প্রাণে সমুদ্ভূত এবং প্রাণেই শ্বাস-সঞ্জীবিত। এ উক্তিও ব্রহ্ম-লক্ষণেরই বিশেষত্ব-বিজ্ঞাপনী। এতাবতা পূর্ব্ব সূত্রানুসারিণী মীমাংসা অনুসারে এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন হইতেছে যে, "আকাশ" [illegible] -বোধক, এই "প্রাণ" শব্দও সেইরূপ ব্রহ্ম-বোধক, ইহা ভৌতিক বায়ু নহে।

২৪শ হইতে ২৭শ সূত্র পর্য্যন্ত যে "জ্যোতি" পদ আলোচিত হইয়াছে, উহাও সাধারণ ভৌতিক জ্যোতি নহে; উহাও পরব্রহ্ম-প্রজ্ঞাপক। এতদ্বিচারবিষয়ীভূত। উক্তি ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩-১৩.৭) এইরূপ দৃষ্ট হয়,—

'অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষ্বনুত্তমেষূত্তমেষু লোকেম্বিদং বাব তদ্যদিদম স্মিন্নন্তঃ পুরুষে জ্যোতিঃ।"

যে আলো বিকাশে এই আকাশ উপর।
মহল্লোক-সর্ব্ব হতে যাহা মহত্তর॥
যাহার অতীত আর নাহি অন্য লোক।
পুরুষের অন্তর্জ্যোতি এই সে আলোক॥

এ স্থলে "জ্যোতিঃ" শব্দ সামান্য ভৌতিক আলোক বুঝাইতেছে না, পরন্তু সর্ব্বান্তর্জ্যোতি স্বরূপ পরমাত্মাকেই বুঝাইতেছে। পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্র সমূহের সিদ্ধান্তে আদিত্যাসনে ও অক্ষিদর্পণে অধিষ্ঠিত হিরণ্ময়-পুরুষসত্তা যদ্রূপ ব্রহ্ম-বোধক, বক্ষ্যমাণ সূত্র নিচয়ে "জ্যোতি" পদও তদ্রূপ ব্রহ্ম-বোধক।

অপর, "গায়ত্রী" পদের প্রয়োগেও ব্রহ্ম তত্ত্বই বিজ্ঞাপিত। "গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতং।" (৩-১২ ১) এই সমস্ত ভূতই গায়ত্রী, অথবা গায়ত্রীই সর্ব্বভূতাত্মিকা।

এই অধিকরণে ইহাও প্রকাশিত যে; এই সমস্তই তাঁহার মহত্ত্ব; ইহার অতীত মহত্তর তত্ত্বই পরম পুরুষ। তাঁহার এক পদে সর্ব্বভূত-সত্তা; অমৃত স্বরূপ অপর ত্রিপাদ দিবিতে প্রতিষ্ঠিত। কথা—এতাবান

নস্য মহিমা জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ পাদোস্য সর্ব্ব-ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।" অতএব "ত্রিপাদ" পদের উল্লেখেই বুঝিতে হইবে, সূত্রোক্ত "জ্যোতিশ্চরণ" পদ পরব্রহ্ম-প্রজ্ঞাপক; সুতরাং এ জ্যোতি সামান্য ভৌতিক জ্যোতি নয়; ইহা সমগ্র ভৌতিক বিশ্বের বিধাতা জ্যোতিস্বরূপ ব্রহ্ম।

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে ব্রহ্মের চতুষ্পাদ বা চতুরংশ উক্ত হইয়াছে। ইহার ত্রিপাদ অমৃতত্ব-প্রতিষ্ঠ এবং অবশিষ্ট চতুর্থ পাদে এই মায়িক জগৎ সৃষ্ট। এক্ষণে বিবেচ্য, বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়ই যে স্থলে ব্রহ্ম সে স্থলে "জ্যোতি" পদে ব্রহ্ম না বুঝিয়া সাধারণ আলোক মাত্র বুঝিলে, আলোচ্য বিষয় ছাড়িয়া আমরা অবান্তর অপ্রাসঙ্গিক নূতন বিষয়ে অবতরণরূপ মহাভ্রমে পতিত হইব; যে হেতু অধ্যায়টী একান্তই ভৌতিক জ্যোতিঃ-প্রসঙ্গপরিশূন্য। ব্রহ্মই এস্থলে "জ্যোতি" রূপে উক্ত হইয়াছেন; কারণ তিনিই সর্ব্বজ্যোতির জ্যোতিঃস্বরূপ।

"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং।
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"
তিনি জ্যোতি,সর্ব্ব জ্যোতি তাঁরি অনুসৃত।
তাঁহারি বিভায় এই বিশ্ব বিভাসিত।

ধর্ম্মভাবের ক্রমবিকাশক্ষেত্রে কার্য্য-ফলকেই মূল কারণরূপে কল্পনা অনেক স্থলে বিরল নহে। আকাশেই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি-স্থিতি, সুতরাং অজ্ঞানাবস্থায় নিম্নাধিকারী মানব আদৌ আকাশকেই ভৌতিক জগতের মূল কারণ রূপে গ্রহণ করিয়াছিল। তৎপর ক্রমে সাধনোন্নতিসহকারে সে ভ্রমের অপনোদন হইল, মানব জগতের যথার্থ মূল-কারণের যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হইল, তখনও সেই কার্য্যফলের অভিধানেই প্রকৃত কারণকে অভিহিত করিতে লাগিল। এই রূপেই মানব সমাজে একদা প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান ভৌতিক সূর্য্যই জগৎ-প্রসবিতা "সবিতা" নামে জগৎ কারণরূপে গৃহীত ও পূজিত হওয়ার পরে, সেই সবিতার সবিতা পরম কারণের যথার্থ জ্ঞান লাভ হইলেও 'সূর্য্য' শব্দেই তাঁহার অভিধান অপরিবর্ত্তিত রহিয়া গেল। ব্রহ্মের "আকাশ" "জ্যোতি" "প্রাণ" প্রভৃতি অবান্তর অভিধানেরও এই ভাবে উৎপত্তি। সূর্য্যের ন্যায় কোন কোন সময়ে আকাশ, জ্যোতি, প্রাণ-বায়ু প্রভৃতিই জগৎ-কারণ রূপে পরিগৃহীত হইয়াছিল; পরে কালে মানব-জ্ঞানের উচ্চাধিকার ফলে যখন সূর্য্যের সূর্য্য, আকাশের আকাশ, জ্যোতির জ্যোতি, প্রাণের প্রাণ পরব্রহ্মের পরম জ্ঞান লাভ হইল,তখন ঐ সমস্তকে এক মাত্র মূল কারণের কার্য্য জানিলেও, কার্য্য-পরিচয়ের সহিত কারণ-পরিচয় সম অভিধানে অভিন্নরূপে প্রচলিত রহিল। আলোচ্য সূত্র সমূহে ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, উপনিষদে যদিও ভৌতিক সংজ্ঞায় পরমাত্মা অভিহিত হইয়াছেন, তথাপি তত্ত্বার্থতঃ ইহা অভ্রান্তরূপেই অববোধিত হয় যে, উক্ত ভৌতিক সংজ্ঞা সকল ব্রহ্ম-বোধক, পরব্রহ্ম নামান্তররূপ বাস্তব ভৌতিক-সত্তা-বোধক নহে।

২৫শ সূত্র পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রের সমর্থক ও তাৎপর্য্য-পোষকমাত্র। পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রের টীকায় উল্লিখিত "গায়ত্রী" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত, কিন্তু বৈদিক ছন্দ বিশেষ নহে।

বা ইদং সর্ব্বং” এই শ্রৌত বাক্যই বিচার-বিষয়ীভূত। অনন্তর গায়ত্রী, পৃথিবী, শরীর, অন্তঃকরণ, বাক্য, নিশ্বাস ইত্যাদি বিবিধ ভৌতিক তত্ত্বে বর্ণিত হইতেছে। তৎপর এইরূপ বাক্য উক্ত হইয়াছে যে, গায়ত্রীর চতুষ্পাদ ও ষড় ব্যাহৃতি বা বিভাগ আছে। সর্ব্বশেষে আমরা এই বাক্য প্রাপ্ত হই যে, এ সমস্ত তাঁহারই মহিমা স্বরূপ। এখানে ‘গায়ত্রী’ শব্দ বৈদিক ছন্দ মাত্রকেই বুঝাইতে পারে না, কারণ উহা কেবল কতিপয় শব্দ-বিশেষ বা বর্ণ-বিশেষের সমষ্টি মাত্র; সুতরাং উহা কদাপি সর্ব্বভূতের আত্মাস্বরূপ হইতে পারে না। অতএব “গায়ত্রী” শব্দ বিস্পষ্ট ব্রহ্ম-বাচক। আমরা ইতঃপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বিবিধ নাম-রূপ-উপাধ্যবচ্ছিন্ন ভাবে সগুণ স্বরূপে, ব্রহ্ম বিবিধ সাধকের উপাস্য হইয়া থাকেন; অতএব “গায়ত্রী” শব্দের উল্লেখ কেবল ছন্দ-গীত গায়ত্রীর তত্ত্বার্থ-বলে ব্রহ্মের প্রতি চিত্তের রতি-গতি সম্পাদনার্থই হইয়াছে। অপর, অন্যরূপ সরল ভাবেও গায়ত্রীকে ব্রহ্মবোধিকা বলা যাইতে পারে; কারণ ষড়ব্যাহৃতি সহ গায়ত্রী চতুষ্পাদী এবং ব্রহ্মও চতুষ্পাদ।

২৬ সূত্রের নির্দ্ধারণ এই যে, গায়ত্রী ব্রহ্ম-বাচিকা না হইয়া মাত্র ছন্দবাচিকা হইতে পারে না; কেন না, তাহা হইলে শাস্ত্র যে পৃথিবী, শরীর, অন্তঃকরণ, বাক্য ইত্যাদি সর্ব্ববিধ ভৌতিক সত্তাই তাঁহার ‘চরণ” রূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত ও অনুপপন্ন হইয়া পড়ে। সমস্ত অধ্যায়ের মূল বিষয় ব্রহ্ম, সুতরাং ‘সর্ব্ব-[illegible] গায়ত্রী” এরূপ উক্তিতে ব্রহ্ম-লক্ষণ সূচিত হওয়ায়, উহা তত্ত্বার্থতঃ ব্রহ্মই বটে, কিন্তু সামান্য ছন্দবিশেষ নহে।

২৭শ সূত্রের বিচার্য্য এই যে, যে স্থলে পূর্ব্বোক্ত শ্রৌত বাক্যে (তাঁহার অমৃত-তত্ত্বাত্মক পাদত্রয় আকাশে প্রতিষ্ঠিত) আকাশ ব্রহ্মের অধিষ্ঠান রূপে বর্ণিত এবং পরবর্ত্তী শ্রৌতবাক্যে (সেই জ্যোতি আকাশের ঊর্দ্ধে উদ্ভাসিত) আকাশ ব্রহ্মের অব্যবহিত সীমাস্বরূপে কথিত হইয়াছে, সে স্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্য কিরূপে তাৎপর্য্যতঃ পরবর্ত্তীর সহিত সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হইতে পারে? যেহেতু একতঃ ‘আকাশ’ ব্রহ্মের অধিষ্ঠান, অন্যতঃ আকাশ ব্রহ্মের সমীপবর্ত্তী মাত্র! এতদুত্তরে বলা যায়, যথা একটি বাজ-পক্ষী “তরু শিরের উপরে” দৃষ্ট হইতেছে বলাও যাহা, “তরু-শিরে” দৃষ্ট হইতেছে বলাও তাহাই। অতএব প্রকৃত পক্ষে যে ব্রহ্ম “আকাশের অতীত বা ঊর্দ্ধস্থ”—তাঁহাকে “আকাশস্থ” বলিলেও বিরোধ-বোধ কষ্ট-কল্পনা মাত্র; ফলিতার্থে উহাতে বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নাই।

২৮শ সূত্রের বিচার্য্য এই যে, “কৌশিতকী ব্রাহ্মণ” উপনিষদে ব্যবহৃত “প্রাণ” শব্দ ব্রহ্ম-বাচক বা ভৌতিক প্রাণ-বায়ু-বাচক। পূর্ব্বোক্ত ২১শ সূত্রের বিচারিত বিষয়ের সহিত ইহা সমবিষয়ীভূত। নিম্নোক্ত রূপ বাক্যাবলী কৌষিতকী ব্রাহ্মণ উপনিষদে দৃষ্ট হয়, যথা—

দিবোদাস-পুত্র প্রতর্দ্দনকে ইন্দ্র কহিলেন, “আমিই প্রাণ—আমিই চিদাত্মা; জীবন স্বরূপ—অমৃত স্বরূপ আমাতে ধ্যান-পরায়ণ হও।” প্রাণই গৌণতঃ চিদাত্মা, আনন্দ, অবিনশ্বর; অমৃত রূপে উক্ত। এ

স্থলে অমৃতত্ব, চিদাত্মকত্ব, আনন্দ ইত্যাদি ব্রহ্মেরই বিশেষ লক্ষণ সমূহ প্রাণে আরোপিত হওয়ায়, "প্রাণ" পদ পরমাত্মা বা ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছুরই বাচক হইতে পারে না।

২৯শ সূত্রের বিচার্য্য বিষয় এই যে, যখন ইন্দ্র বলিয়াছেন, আমিই প্রাণ, আমিই চিদাত্মা ইত্যাদি, তখন তদ্বাক্য ব্রহ্ম বা পরমাত্মা-প্রতিপাদক কিরূপে হইতে পারে? এতদুত্তরে বলা যায়, এই একই অধ্যায়ে যে স্থলে ঐরূপ ব্রহ্ম-বিনির্দ্দেশের বহুত্ব দৃষ্ট হয়, সেস্থলে "প্রাণ" পদও তদ্রূপেই ব্রহ্ম-বিনির্দ্দেশক হইয়াছে। যদি এ উত্তর সন্তোষজনক না হয়, তবে ৩০শ সূত্রানুসারে এই উত্তর-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ইন্দ্র যেখানে স্বীয় উক্তিতে স্বীয় ব্রহ্ম-স্বরূপতাই ব্যক্ত করিতেছেন, সেখানে শ্রুত্যুক্ত বামদেব ঋষির ব্রহ্ম-পরিণতির ন্যায় তাঁহারও সমাধি-সিদ্ধি-সঞ্জাত ব্রহ্ম-পরিণতি স্বীকার করিতে হইবে। যখন কাহারও সমাধি-সিদ্ধি-ফলে অবিদ্যার অপগম হয়, তখন তাঁহার জীবাত্মা পরমাত্মা ব্রহ্মের সহিত একীভূত উপলব্ধ হয়, তখন সেই সিদ্ধ পুরুষ "সোঽহং" মহাবাক্যের অধিকারী হন, যে হেতু "ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রহ্মৈব ভবতি" "ব্রহ্ম জানে যে, ব্রহ্ম হয় সে।" যখন ইন্দ্র বলিলেন, "আমিই প্রাজ্ঞ আত্মা" ইত্যাদি, তখন তিনি আত্ম ব্রহ্মত্বই বিজ্ঞাপন করিলেন; অতএব ইহাতে অণুমাত্র অসঙ্গতি নাই।

৩১শ সূত্রের মীমাংসিতব্য বিষয় এই যে, উপর্য্যুদ্ধৃত ঔপনিষদী শ্রুতি-পরম্পরায় ব্যক্তিগত জীবাত্মা ও প্রাণ-বায়ু প্রভৃতিরও প্রাকৃতিক লক্ষণাবলি লক্ষিত হইতেছে, সুতরাং তদ্দ্বারা তত্তৎ সত্তার সপ্রমাণতা সঙ্গত না হইয়া পরব্রহ্ম-প্রমাণ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? উত্তর এই যে, সমগ্র অধ্যায়টি ব্রহ্মতত্ত্বেই সমাহিত, অতএব যদি উপরোক্ত শ্রৌত বাক্যাবলীর অর্থ ভৌতিক প্রাণবায়ু প্রভৃতি রূপেই গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে একব্রহ্ম-সাধকের উপাসনাগত ধ্যান-ধারণাদির ত্রিধা বিভক্ত বিষয় কল্পিত হইয়া পড়ে, যথা—জীবাত্মা, প্রাণ বায়ু এবং ব্রহ্ম; সুতরাং এ সিদ্ধান্ত অতীব অসঙ্গত বা অনুপপন্ন, সন্দেহ নাই। একাভিধেয়-লক্ষিত একটি মাত্র বাক্যে তিনটি বিভিন্ন ধ্যান-ধারণার কল্পনা অসম্ভব। যাহা হউক, পূর্ব্বপ্রদর্শিত মতে এই সমস্ত শ্রৌত বাক্যের অর্থই ভগবানে পরিগৃহীত হইয়াছে। অতএব ইহা সিদ্ধান্তিত হইতেছে যে, ব্রহ্ম-লক্ষণের বিশেষত্বই বিস্পষ্ট ব্যক্ত হওয়ায়, ভৌতিক "প্রাণ" ইত্যাদিই কদাচ ব্রহ্ম-পরিবর্ত্তে পরিগৃহীত ও প্রতিপাদিত হইতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশঃ—

—

অনার্য্য কে?

মসী বর্ণ দেহ চর্ম্ম, হীন ব্যবসায় কর্ম্ম,
নীচ জন্ম, অনার্য্য সে নয়।
মসীময় মন যার, হীনাচার-ব্যবহার,
হীনাশয়, অনার্য্য সে হয়॥ ১

উপজীব্য আপনার— অর্জ্জনে অশক্তি যার,
অকর্ম্মণ্য অলস যে জন;
পর-গলগ্রহ হয়ে, আগ্রহে নিগ্রহ সয়ে,
জীবিত যে, অনার্য্য সে

পত্নী পুত্র আপনার, বৃদ্ধ পিতা-মাতা আর,
পালনে উপেক্ষা যার হয়;
স্বোপার্জ্জিত-অর্থ যত নেশায় বেশ্যায় গত,
সেই হায়! অনার্য্য নিশ্চয়॥ ৩

পরস্ত্রী পাইলে পথে, কলুষ কটাক্ষপাতে
পরিহরে পাপেচ্ছা সংযম;
হেন ক ম-কিঙ্কর যে, নরকের অতিথি সে,
নিশ্চয় সে অনার্য্য অধম। ৪

ইন্দ্রিয়-সেবন-গত বিষয়-বিলাস যত,
তাই যার জীবনের সার;
অতীন্দ্রিয়-তত্ত্বে যার একান্ত অনধিকার,
যথার্থ "অনার্য্য" আখ্যা তার। ৫

গুরু-সবশ্যতাযুত সুদৃষ্টি সম্ভ্রম-পূত—
নারী-প্রতি নাহি যার হয়;
যে ভাবে নারী কেবল "ইন্দ্রিয় সেবার কল"
সেই হায়! অনার্য্য নিশ্চয়। ৬

শুধু স্বার্থ-সিদ্ধি তরে যে জন জীবন ধরে,
পরার্থে অনর্থ ভাবে যেই;
সৃষ্টি রসাতলে যাক্, নিজার্থ বজায় থাক্,
যে চায়, অনার্য্য হায় সেই॥ ৭

প্রত্যক্ষে মিত্রতাকারী, পরোক্ষে পরম অরি,
"বিষকুম্ভ পয়োমুখ" যেই;
পর-দুঃখে চক্ষু ভাসে, কিন্তু যে অন্তরে হাসে,
অনার্য্যের অগ্রগণ্য সেই। ৮

দরিদ্র-দুর্ব্বলে যার সুপ্রবল অত্যাচার,
নরমের প্রতি যে গরম;
অথচ "শক্তের ভক্ত," শ্রীপদ-লেহনাসক্ত!
সেই সত্য অনার্য্য অধম। ৯

অথবা পরার্থ-তরে,
বাহিরে যা বিচার-আগারে;

কয় যে অসত্য বাক্য, দেয় যে অসত্য সাক্ষ্য,
যথার্থ অনার্য্য বলি তারে। ১০

ডাকাতী-চুরী চাতুরী, জালিয়াতী জুয়াচুরী,
নানা শাঠ্য সাধিয়া যে জন—
নিজস্ব পূরণ তরে পরস্ব হরণ করে,
এ সংসারে অনার্য্য সে জন। ১১

অনার্য্য সে ব্যভিচারী, অত্যাচারী-হত্যাকারী,
অনার্য্য বিশ্বাসহারী যত;
হিংসুক-দুর্ম্মুখ শঠে অনার্য্যত্ব সত্য বটে,
অনার্য্যত্ব নহে জাতিগত। ১২

অনার্য্য নিষ্ঠুর-ক্রূর, অনার্য্য যে লোভাতুর,
ক্রোধাবিষ্ট-কাম-ক্লিষ্ট-অশিষ্ট নিচয়,—
সমাজের শত্রু যারা, কার্য্যতঃ অনার্য্য তারা,
নীচজাতি-জন্মগত অনার্য্যত্ব নয়। ১৩

কার্য্যদোষে অনার্য্যত্ব—চণ্ডালত্ব ঘটে।
কার্য্যগুণে ব্রাহ্মণত্ব—আর্য্যত্ব প্রকটে॥
ব্রাহ্মণত্ব—চণ্ডালত্ব, আর্য্যত্ব বা অনার্য্যত্ব,
কার্য্যাকার্য্য বিচারে বিদিত।
উচ্চ-কুল-অভিমান আর্য্যত্ব না করে দান;
উচ্চ কার্য্যে আর্য্যত্ব নিশ্চিত॥ ১৪

অনার্য্যত্ব কার্য্যতঃ জীবনে যার ঘটে,
তার সঙ্গ অবশ্যই পরিহার্য্য বটে।
সনাতন ধর্ম্ম তরে, স্বদেশের শুভ তরে,
থাকুক্ এ সত্য নিত্য চিত্তে সর্ব্বময়,—
অযথার্থ অনার্য্যেরা পরিহার্য্য নয়॥ ১৫

কঠোপনিষৎ।

(বঙ্গানুবাদিতা)

পঞ্চমী বল্লী।

আছয়ে নগর এক একাদশদ্বার;
তাহাতে করেন বাস আত্মা জন্মহীন,

নিত্য ও চৈতন্যরূপী, তাঁরে করি ধ্যান,
সাধক না পান শোক; বিমুক্ত হইয়া
কর্ম্মের বন্ধন হ'তে, মুক্তি পান তিনি।
(নিশ্চয় জানিও তুমি) ইনি আত্মা সেই।১
যে আত্মাই হ'ন সূর্য্য আকাশ নিবাসী।
সে আত্মাই হ'ন বায়ু অন্তরীক্ষবাসী ॥
সে আত্মাই হ'ন অগ্নি পৃথিবীনিবাসী।
সে আত্মাই হ'ন সোম কলসাধিবাসী ॥
সে আত্মা মানবে,দেবে, যজ্ঞে ও আকাশে।
সে আত্মা জলজ রূপে জলেতে প্রকাশে ॥
সে আত্মা স্থলজরূপে ব্রীহি-যবাদিতে।
সে আত্মা যজ্ঞাঙ্গরূপে জনমে যজ্ঞেতে ॥
সে আত্মা নদ্যাদি রূপে শৈলে বহমান।
তিনিই কেবল মাত্র সত্য ও মহান্ ॥ ২
সে আত্মা প্রাণেরে ঊর্দ্ধে, নিম্নে অপানেরে
করেন প্রেরণ, মধ্যে আসীন বামনে
সকল দেবতাগণ করে উপাসনা। ৩
শরীরস্থ ভ্রাম্যমান, আত্মা দেহ হ'তে
বিমুক্ত হইলে হেথা কিবা থাকে আর?
——ইনি আত্মা সেই। ৪
প্রাণ কিম্বা অপানেতে না থাকে জীবিত
কোন মর্ত্ত্য; থাকে মাত্র জীবিত কেবল
অন্যের আশ্রয়ে, যাহে এ দুই আশ্রিত। ৫
এই গুহ্য সনাতন ব্রহ্মের বিষয়,
তথা মরণের পর আত্মা যাহা হয়,
এখন বলিব তোমা, শুনহে গৌতম। ৬
কর্ম্ম, জ্ঞান অনুসারে আত্মা কোন কোন
শরীর গ্রহণ জন্য প্রবেশে যোনিতে,
স্থাবরত্ব প্রাপ্ত অন্য কেহ কেহ। ৭

স্বপ্ত হ'লে প্রাণিগণ, থাকিয়া জাগ্রত
নিষ্পন্ন করেন যিনি কাম্য বস্তু চয়,
শুদ্ধ তিনি, ব্রহ্ম তিনি, তিনিই অমর;
পৃথিব্যাদি সর্ব্ব লোক তাঁতেই আশ্রিত;
না পারে করিতে কেহ অতিক্রম তাঁরে;
(নিশ্চয় জানিবে তুমি) ইনি আত্মা সেই।৮
ভুবনে প্রবিষ্ট যথা একই অনল
দাহ্যবস্তু-রূপ-ভেদে হয় ভিন্ন রূপ;
তথা এক অন্তরাত্মা সর্ব্বভূতগত—
নানা বস্তু ভেদে ধরে ভিন্ন ভিন্ন রূপ;
রহে না অন্তরে শুধু, বাহিরেও থাকে। ৯
ভুবনে প্রবিষ্ট যথা একই পবন
নানা বস্তু ভেদে ধরে ভিন্ন ভিন্ন রূপ,
তথা অন্তরাত্মা এক সর্ব্বভূতগত—
নানা বস্তু ভেদে ধরে ভিন্ন ভিন্ন রূপ;
রহেনা অন্তরে শুধু, বাহিরেও থাকে। ১০
যথা নাহি লিপ্ত হ'ন সর্ব্বলোকচক্ষুঃ—
সূর্য্য বাহ্য দোষ সহ, চক্ষু গ্রাহ্য যাহা,
তথা এক অন্তরাত্মা সর্ব্বভূতগত—
লোক-দুঃখ সহ কভু নাহি লিপ্ত হন;
যেহেতু নির্লিপ্ত তিনি স্বতন্ত্রস্বভাব। ১১
এক মাত্র নিয়ামক সকলের যিনি,
সর্ব্বভূত-অন্তরাত্মা; যিনি এক রূপে
করেন বহু প্রকার, যে সকল জ্ঞানী
দেখেন আত্মস্থ তাঁরে, লভেন তাঁহারা
ধরায় শাশ্বত সুখ, না পায় অপরে। ১২
অনিত্য বস্তুর মাঝে শুধু নিত্য যিনি,
চৈতন্য-কারণ যিনি চেতন বস্তুর,
একমাত্র যিনি পূর্ণ করেন কামনা,
দেখেন আত্মস্থ তাঁরে যে সকল জ্ঞানী,
নিত্য শান্তি তাঁহাদের, নহে অপরের। ১৩
"তিনি এই"—এইরূপেতে [illegible]

১। নগর এক একাদশ দ্বার—এই কবিতায় শরীরকে নগর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। চক্ষুর্দ্বয়, নাসাদ্বয়, কর্ণদ্বয়, মুখ, নাভি, উপস্থ, গুহ্য এবং ব্রহ্মরন্ধ্র, এই একাদশ দ্বারই শরীরের একাদশ দ্বার।

অনির্দ্দেশ্য শ্রেষ্ঠ সুখ লভে ব্রহ্মবিৎ,
কিরূপে জানিব তাঁরে ? তিনি দীপ্তিমান্—
আপনারজ্যোতিঃকিম্বা অন্যজ্যোতিঃবলে?১৪
সূর্য্য কিম্বা চন্দ্র-তারা না দেয় কিরণ,
অথবা বিদ্যুৎ সেথা না পায় প্রকাশ;
এ অগ্নি কোথায় লাগে ?—এরা সকলেই
তাঁহারি দীপ্তিতে শুধু হয় দীপ্তিমান্॥ ১৫

ইতি পঞ্চমী বল্লী।

ষষ্ঠী বল্লী।

ঊর্দ্ধমূল, নিম্নশাখ, এই সনাতন
সংসার পাদপ, এর মূল হ'ন যিনি,
——শুদ্ধ তিনি, ব্রহ্ম তিনি, তিনিই অমর;
পৃথিব্যাদি সর্ব্বলোক তাঁতেই আশ্রিত;
না পারে করিতে কেহ অতিক্রম তাঁরে;
(নিশ্চয় জানিবে তুমি) ইনি আত্মা সেই।১
প্রাণরূপ ব্রহ্ম হ'তে নিঃসৃত হইয়া
সমস্ত পদার্থচয়—সকল জগৎ
চলিতেছে নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদিয়া;
উদ্যত বজ্রের তুল্য মহা ভয়ানক
তাঁহারে যে জন জানে, সে হয় অমর। ২
এঁরি ভয়ে অগ্নি, সূর্য্য তাপ করে দান,
এঁরি ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু, মৃত্যু ধাবমান। ৩
শরীর-পাতের পূর্ব্বে যদি নাহি পারে
ব্রহ্মেরে জানিতে জীব, তা'হলে নিশ্চয়
জীবের আবাসভূমি পৃথিব্যাদি লোকে
শরীর ধারণ করি আসে পুনরায়। ৪
আপনার প্রতিবিম্ব দর্পণে যেমতি
দেখে লোক, করে তথা ব্রহ্ম দরশন
নির্ম্মল আত্মায়; দেখে স্বপনে যেমতি
জাগ্রৎ-বাসনাজাত কার্য্যাবলী তার,
[illegible]লোকে করে ব্রহ্ম দরশন।
জলে যথা আত্মরূপ করে দরশন,
গন্ধর্ব্বলোকেতে তথা নিরখে ব্রহ্মেরে;
ছায়াতপে হেরে যথা, তথা ব্রহ্মলোকে।
আত্মা হ'তে ভিন্নরূপে উৎপন্ন যাহারা,
সে ইন্দ্রিয় সমূহের জেনে ভিন্ন ভাব,
জেনে আর উদয়াস্ত, জ্ঞানীজন কভু
শোক নাহি প্রকাশেন, শুন নচিকেতঃ।
ইন্দ্রিয় সমূহ হ'তে শ্রেষ্ঠ জেনো মনে;
মন হ'তে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; বুদ্ধি হ'তে পুনঃ
মহান্ সে আত্মা শ্রেষ্ঠ; মহৎ হইতে
অব্যক্তে জানিবে শ্রেষ্ঠ; তা হ'তেও পুনঃ
ব্যাপক সংসারধর্ম্ম-বর্জ্জিত পুরুষ—
হ'ন শ্রেষ্ঠ; যাঁরে জেনে জীব সমুদায়
করে মুক্তিলাভ, তথা অমরতা পায়। ৭৮
না হয় ইঁহার রূপ দর্শন-বিষয়,
চক্ষেতে কেহ না পারে দেখিতে তাঁহারে;
হ'ন তিনি প্রকাশিত, সংশয়রহিত
হৃদয়স্থ বুদ্ধিবলে; মননেতে পুনঃ
তাঁহারে জানিলে লাভ হয় অমরতা।৯
যে সময় রহে স্থির মনের সহিত
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; বুদ্ধি চেষ্টা নাহি করে,
তাহারে পরমাগতি কহে জ্ঞানীগণ। ১০
স্থিরভাবে ইন্দ্রিয়ের ধারণাই যোগ;
যে হেতু যোগের আছে উৎপত্তি অপায়,
অতএব অপায়ের পরিহারতরে
যোগিগণ অপ্রমত্ত র'ন যোগ কালে। ১১
বাক্য, মনঃ, কিম্বা চক্ষে নাহি পাওয়া যায়
সেই পরমাত্মধনে, আস্তিক ব্যতীত
অন্যে তাঁর উপলব্ধি পারে কি করিতে ? ১২
(উপাধিসংযুত আর উপাধিবিহীন,
এ উভয় ভাবে তিনি জ্ঞাতব্য জীবের।)
"আছেন" এরূপে তাঁর উপলব্ধি করি,

তত্ত্বভাবে করিবেও উপলব্ধি তাঁর ;
"আছেন" এরূপ ভাবে যে জানে তাঁহারে,
তার কাছে "তত্ত্বভাব" হয় প্রকাশিত। ১৩

মর্ত্ত্য-জীব-হৃদয়েরে আশ্রয় করিয়া
থাকে যে কামনা সব, তাহারা যখন
বিনষ্ট হইয়া যায়, মর্ত্ত্যও তখন
অমর হইয়া যায়, ব্রহ্মে পায় তথা। ১৪

ইহলোকে হৃদয়ের গ্রন্থিগুলি যবে
ছিন্ন হয়, মর্ত্ত্য করে অমরতা লাভ।
এই মাত্র এ শাস্ত্রের জেনো উপদেশ। ১৫

হৃদয়ের এক শত এক নাড়ী মাঝে
সুষুম্না নির্গত, ভেদ করিয়া মস্তক ;
অন্তকালে উর্দ্ধে এসে এই নাড়ী যোগে
লভে জীব অমরত্ব ; অন্য নাড়ী যত—
বহুবিধ গতিশালী, ঘটায় তাহারা
সংসারেতে যাতায়াত জীবের কেবল। ১৬

সে পুরুষ অন্তরাত্মা, অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ
সন্নিবিষ্ট হৃদয়েতে সকল জনের,
মুঞ্জা হ'তে ইষীকার গ্রহণ সমান
আপন শরীর হ'তে ধৈর্য্য সহ তাঁরে
করিবে পৃথক্ ; তাঁরে শুদ্ধ ও অমৃত
জানিবে—জানিবে তাঁরে শুদ্ধ ও অমৃত। ১৭

শুনি নচিকেতা যমের কথিত—
ব্রহ্মবিদ্যা, জেনে যোগবিধি যত
হ'ল ব্রহ্মপ্রাপ্ত নির্ম্মল অমর!
অন্যে জানিলেও লভিবে এ বর। ১৮

ইতি ষষ্ঠীবল্লী।

কঠোপনিষৎ সমাপ্তা।

শ্রীমনোমোহন মিশ্র।

প্রকৃতি-বিজয়।

যেবা কেহ চিন্তা করে কর্ম্ম মানবের,
জ্ঞান-শক্তি করি দৃষ্ট, হয় সে বিস্ময়াবিষ্ট,
যে শক্তিতে পরাভূত শক্তি স্বভাবের।
মহতী শকতি অতি প্রকৃতির বটে ;
কিন্তু মহত্তরা শক্তি নরের নিকটে।

সত্য বটে হেন শক্তি আছে স্বভাবের,
বহু সাধে বাদ সদা সাধে মানবের ;
তবু নর আপনারে সামালি রাখিতে পারে,
স্ববশে স্বভাবে আনে প্রভাবে জ্ঞানের।

আপাততঃ এ সিদ্ধান্ত বুঝে উঠা ভার,
কিন্তু এ অভ্রান্ত সত্য, নর-প্রতিকূলে নিত্য
স্বাধীন স্বভাব সাধে শত্রু-ব্যবহার।
অথচ বিজ্ঞান-বলে বাধ্য বশীভূত হলে,
তার তুল্য মানবের মিত্র নাহি আর।

প্রকৃতির প্রতিকূল শক্তি-নিচয়ের
প্রয়োজন প্রতিষ্ঠিতে উন্নতি নরের।
কিন্তু বজ্র-বৃষ্টি-বাত, ভূমিকম্প অগ্ন্যুৎপাত,
জলপ্লাবনাদি যত অনর্থ-অপায়,
আজিও মানবী শক্তি পরাভূত তায়।
অক্লান্ত-সাধন-ফলে, বিবৃদ্ধ বিজ্ঞান বলে
তাওবা জিনিবে নর! তাই বা কে কবে,
বিজ্ঞানের শক্তি কোথা সীমাবদ্ধ হবে?
তবে কিনা এই সব অনর্থ যা ঘটে,
ভাবান্তরে তাও দেখি আবশ্যক বটে।
বৃদ্ধি করে সবলতা, সিদ্ধি করে সতর্কতা,
পূর্ণস্বাবলম্বনতা তূর্ণ করে দান।
করে নরে নিসর্গের নিরপেক্ষাবান॥

শক্তের ভক্ত সবাই, নরের

ভাবান্তরে হয় পরে বান্ধব পরম।
ব্যক্তিগত ভাবে নর ধ্বংস পায় সুবিস্তর,
স্বভাব-সংগ্রামে হায়! হয়ে পরাজিত;
কিন্তু জাতিগত ভাবে ; প্রকৃতি বিজয় লাভে
স্বভাবের প্রভু হয়ে বসে সে নিশ্চিত।

প্রকৃতির সহ রণে হ'লে পরাজিত,
মনুষ্যের মনুষ্যত্ব না হয় অর্জ্জিত।
হয় সে মরিবে রণে বিশেষত্ব বিসর্জ্জনে,
নয় সে করিবে রণে প্রকৃতি-বিজয়।
এ দুয়ের অন্যতর নিয়তি নিশ্চয়॥

সুপ্তশক্তি প্রকৃতি করিয়া সম্বোধন,
মানব-সমাজে সাধে দৌরাত্ম্য ভীষণ;
দুর্ব্বল মানব তবু প্রবলা-প্রকৃতি-প্রভু
হইয়া বসেছে আজ সাধি কি সাধন!
বেদে ব্যক্ত এ রহস্য-ভেদ বিবরণ।

প্রকৃতির নিয়ন্তা যে পুরুষ পরম,
মানব-হৃদয় তাঁর প্রিয় নিকেতন।
মানবের এ মহত্ত্ব, বিশ্বেতে এ বিশেষত্ব,
জীব-রাজ্যে এ রাজত্ব, তাঁরি বলে হয়।
তাঁরি বলে মানবের প্রকৃতি-বিজয়॥

ভূ-গোল পরিচয়।

৬ পাঠ। ১ম প্রপাঠক।

মণ্ডল বর্ণন।

যামী মণ্ডল Eridanus. 18.

তারা চিহ্ন।	তারা নাম।	পাশ্চাত্য তারা চিহ্ন।	পাশ্চাত্য তারা নাম।	স্থূলত্ব।	সংখ্যা। (a)	তারা বর্ণন।
১	নদীমুখ	Alpha.	Achornar.	০·৫	৫০৭	অতুজ্জ্বল।
২		Theta.		২·৭	৯৩৭	
৩		Beta.	Cursa.	২·৯	১৫৮৮	
৪		Gamma.	Zaurok.	৩·০	১২৩৪	
৫		Upsilon 4.		৩·৩	১৩৩৩	
৬		Phi.		৩·৬	৭১৭	
৭		Delta.	Rana.	৩·৭	১১৪৮	
৮		Epsilon.		৩·৭	১১০০	
৯		Tau 4.		৩·৮	১০৩৭	
১০		Upsilon 2.		৩·৮	১৪৩৩	
১১		Upsilon,		৩·৯	১৪২৯	
১২				৩·৯	১৪৪১	
১৩		Eta.	Azha.	৪·০	৯১৯	
[illegible]		Upsilon 3.		৪·০	১৩৭২	

(a) ব্রিটিশ এসোসিয়েশান ক্যাটেলগের লিখিত সংখ্যা।

তারা চিহ্ন।	তারা নাম।	পাশ্চাত্য তারা চিহ্ন।	পাশ্চাত্য তারা নাম।	স্থূলত্ব।	সংখ্যা।	তারা বর্ণন।
১৫		Kapha.		৪·০	৫৯৬	
১৬		Omicron.	Beid.	৪·১	১২৯০	
১৭		Tau 3.		৪·১	৯৫৪	
১৮		Mu.		৪·৩	১৪৫৯	
১৯		Pi.				
২০		Zeta.	Zebal.			
২১		41.	Themim.			
২২		Psi.				নীলবর্ণ।
H৮২৬		H826				বাষ্পস্তবক

মন্তব্য (১) ৪। ২০। ৭। ৮। ২১। ১৪। ১৮। ৯ ইত্যাদি তারা = বিপ্রমুণ্ড।

হ্রদমণ্ডল Hydrus.

২য় বিথী 25

চিত্রক্রমেল মণ্ডল Cameleopardalis.

তারা চিহ্ন।	তারা নাম।	পাশ্চাত্য তারা চিহ্ন।	পাশ্চাত্য তারা নাম।	স্থূলত্ব।	সংখ্যা।	তারা বর্ণন।
১		Beta.				
২		Alpha.				
৩		Gamma.				
৯৪০		940				তারাস্তবক
		ব্রহ্ম মণ্ডল Auriga. (*b*)				
১	ব্রহ্মহৃৎ	Alpha	Capella.	০·২	১৬১৬	যৌথ তারা অত্যুজ্জ্বল পীতবর্ণ
২	উরঃ	Beta.	Menkali naw.	২·১	১৮৯৫	
৩		Theta.		২·৭	১৯০০	
৪		Iota.		২·৭	১৫২০	
৫		Epsilon.		৩·২	১৫৪০	
৬		Eta.		৩·৩	১৫৫৮	
৭	প্রজাপতি	Delta.		৩·৮	১৮৮৫	
৮		Zeta.	Sudutomi.	৪·০	১৫৪১	
১০৬৭		1067				তারাস্তবক
M. ৩৭		M37:				তারাস্তবক

মন্তব্য (১) ৫ ৬·৮ তারা = মৃগশিশু (Kids)

(*b*) ব্রহ্মরাশিঃ বিশুদ্ধ। রামায়ণ ৬।৪।৪৮

পাশ্চাত্য বৃষরাশি Taurus 14.

তারা চিহ্ন।	তারা নাম।	পাশ্চাত্য তারা চিহ্ন।	পাশ্চাত্য তারা নাম।	স্থূলত্ব।	সংখ্যা।	তারা বর্ণন।
১	চলদীবর্ণ	Alpha.	Aldebaran	১·০	১৪৭০	
২	অগ্নি	Beta·	Nath.	২·৯	১৬৮১	
৩	ইল্বলা (c)	Zeta.		৩·০	১৭৬৭	
৪	দেবসেনা	Eta.	Alcyone.	৩·০	১১৬৬	
৫		Theta.	Alya.	১·৬	১৫৮১	
৬		Lambda		১·৬	১২৪১	
৭		Epsilon		৩·৭	১৩৭৬	
৮		Xi.		৩·৮	১০২৮	
৯		Omicron.		৩·৮	১০৫৮	
১০				৩·৮	১১৪৭	
১১				৫·৮	১১১৬	
১২	শকটমুখ	Gamma.	Hyadum primus.	৩·৯	১৩২৮	

(ক্রমশঃ)

৺ভারতেশ্বরী।

"মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি।"

বিংশ শতাব্দীর প্রথম বরষে,
প্রথম মাসের দ্বাবিংশ দিবসে,
অপরাহ্ণ ষষ্ঠ ঘটিকার শেষে—
পড়িল কি কাল নিশার ছায়া!

অস্তাচলগত দেব দিনমণি,
সন্ধ্যার আঁধার গ্রাসিল অবনী,
সে আঁধারে করি আঁধার ধরণী—
মহারাণী মাতা ত্যজিলা কায়া। ১

পলকে পলকে তাড়িত ঝলকে—
এ শোক-সংবাদ ভরিল ভূলোকে,
"মহারাণী আর নাই ইহলোকে"—
বিলাত—ভারত মা-হারা হায়!

শুধু তাই নয়, এসিয়া-আফ্রিকা,
সমগ্র য়ুরোপ্, যুগ-আমেরিকা,
অষ্ট্রেলিয়া—শতদ্বীপা সাগরিকা,
শোক-পর্ব্ব সর্ব্ব ভুবনময়! ২

শত শত তোপ ছাড়ি আর্ত্তনাদ—
(শোক দুর্য্যোগের অশনি-সম্পাত!)
ঘোষিল এ ঘোর অশুভ সম্বাদ;
নব বরষের হরষ-ক্ষয়!

(c) ইল্বলাঃ তৎ শিরোদেশে তারকা নিবসন্তি যে॥ অমরকোষঃ
(d) [illegible]ঃ পঞ্চ তারকাঃ। ইতিস্বামী।
[illegible] সোম দৈবত্যা। গরুড়পুরাণ ১১৫অঃ

অশ্রু মুখে এল এ বিংশ শতাব্দ,
নৃত্য-গীতোৎসব সব হল স্তব্ধ;
হাট ঘাট-বাট বিষাদে বিশব্দ,
শোক-কৃষ্ণ-চিহ্ন চৌদিকময়! ৩

কি বিচারালয়, কিবা কার্য্যালয়,
কিবা পণ্যালয়, কি বিদ্যা-আলয়,
সব রুদ্ধ—শুদ্ধ শোকের নিলয়!
নীরব্—নিচেষ্ট—নিরাশ প্রাণ!

প্রাণায়ামে যেন করি শ্বাস বন্ধ,
বিশাল বিরাট বৃটিশ্-রাজত্ব,
যোগে সংযমিয়া শোকাকুল চিত্ত,
মহারাণী মায় করিল ধ্যান! ৪

"মহারাণী নাই"—একি অকস্মাৎ
নিদারুণ শোক-সম্বাদ নির্ঘাত্!
বিনা মেঘে হায় যেন বজ্রাঘাত!
বিনা বাতে সিন্ধু উথলে যেন!

কোটি কোটি প্রজা নেত্র-নীরে ভাসে,
হা-হুতাশে হায়! দুখ-দীর্ঘশ্বাসে;
হারায়ে নিঠুর নিয়তির বশে—
স্নেহ-দয়াময়ী জননী হেন। ৫

মহারাণী রাজ্য রাম-রাজ্য প্রায়,
নির্ব্বিঘ্ন নিশ্চিন্ত প্রজা সমুদায়,
জাতি-ধর্ম্মে থেকে সুখে নিদ্রা যায়,
শান্তি-সমীরণ শীতলে সবে।
এহেন সৌরাজ্য সুচরিতে যাঁর,
সে চরিতে আজ্ চিরোপসংহার!
হেন রাণী-মায়ে হারায়ে প্রজার
মাতৃশোকভার কেন না হবে? ৬

যাঁর রাজ্যে রবি অস্ত নাহি যান,
ছয় মহাদেশে যাঁর রাজ-স্থান,
যে রাণী মর্ত্ত্যের ইন্দ্রাণী সমান,
সে রাণীমা আর নাহি ধরায়।
শূন্য সিংহাসন থসিল ভূলোকে,
পুণ্য-সিংহাসনে বসিল দ্যুলোকে;
পতি-পুত্র-পৌত্র লইয়া পুলকে—
বসিলা মোদের রাণীমা তায়! ৭

তবে কেন আর শোকের বিকার?
ঈশ্বরেচ্ছা বুঝি মুছি অশ্রুধার;
পিতৃ মাতৃশোকে নয়ন-আসার
বর্ষিতেও হিন্দু-শাস্ত্রে বারণ।
শাস্ত্রাদেশে তাই মাতৃশোক স'য়ে,
পরমেশ-পদে প্রণত হৃদয়ে
এ প্রার্থনা, যেন শ্রীপদ আশ্রয়ে
মা মোদের চির শান্তিতে র'ন। ৮

মায়ের প্রসাদী রাজাসনে আজ
রাজুন্ মোদের প্রিয় যুবরাজ,
ভারত-সম্রাট্ ইংরাজের রাজ—
বিশ্বরাজ-কৃপা করুন লাভ।
হ'ন দীর্ঘজীবী—পালুন পৃথিবী,
স্মরি সদা হৃদে সেই মাতৃদেবী;
শীতল-শাসন-সমীরণ সেবি
জুড়াক্ প্রজায় প্রাণের তাপ। ৯

এ প্রার্থনা পূর্ণ কর ভগবান;
রাজা-দেবতায় অভিন্নতা-জ্ঞান
প্রাচীন ভারতে ছিল দীপ্যমান;
সে শিক্ষা-উপেক্ষা যেন না হয়।
স্বর্গে হ'ক্ জয় শ্রীমহারাণীর,
মর্ত্ত্যে হ'ক্ জয় নব ভূপতির,
এ বাসনা দীন ভারতবাসীর
পূরাও দয়াময়!

হিন্দু-পত্রিকা।

১৩০৮ সালের সূচীপত্র।

শ্রী শ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২০ আইন মতে রেজষ্টরী কৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৮ম বর্ষ, ৮ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা। | বৈশাখ। | ১৩০৮ সাল, ১৮২৩ শকাব্দা।

মঙ্গলাচরণম্।

হে দেবদেব করুণামৃতবারিবাহ!
নিঃসীমমঙ্গলময় প্রণতৈকবন্ধো!
কামং ভবন্তিহ নরঃ সুবিচক্ষণস্তু
যস্ত্রেয় এব নিতরামসি তৎসমীপে। ১

যাবন্তি সন্তি নিগমাগমদর্শনানি
পুংসঃ সুধৈক সদনান্যপি ধীপ্রদানি
সর্ব্বাণি তানি ভগবান্! তব সন্নিধানে
বাচং নিয়ম্য মনসা স্থিতিমাচরন্তি। ২

জানাতি কেবলমসীতি নরস্ত্বমীশ!
এবং ভবান্ বিবিধ শক্তিভিরারচয্য
সৃষ্টের্জনি স্থিতিলয়ান্নরমঙ্গলায়
তাঃ স্বীয়মঙ্গলময়স্পৃহয়া নিযুংক্তে। ৩

নমামি পাদপঙ্কজং সুরার্চ্চিতং শিবং সদা
সমাশিষং সদামুদা বিধেহি বিশ্বকামদাং
সুমঙ্গলপ্রদায়িকা ভবৎকৃপা-সুধারিকা
জগদ্ধিতেহি পূর্ব্ববৎ রতাহস্তু হিন্দুপত্রিকা। ৪

পুনঃ সম[illegible]বঃ প্রমুক্তলোভহিংসনাঃ
[illegible]প্রসাধনৈকতৎপরাঃ
ধরামরা নরা যথা ভবেয়ুরত্র সর্ব্বদা
তথাদয়াং বিধায় নো সমার্চ্চনং গৃহাণবৈ। ৫

বিচিত্রজাতিমাশ্রিতা বিভিন্নবর্ণসংশ্রিতা
বৃথাভিমানতাপিতাঃ পরস্পরং নিরন্তরং
নরাঃ সুশান্তিশালিনঃ সহোদরব্রতঙ্করা
যথা ভবেয়ুরত্রৈব তথাশিষং দদস্ব নঃ। ৬

ভরদ্বর্ষমস্মিন্নবীনেতু বর্ষে, সদানন্দসান্দ্রং
সুভিক্ষানুরক্তং
তথা ব্যাধিমুক্তং পরেশ! ক্ষমায়িন্! কুরুস্ব
প্রকামং ধিয়া সঙ্গতং বৈ॥ ৭

অয়ং হিন্দুসার্থঃ সমস্তান্নিতান্তং কৃতিং পূর্ব্ব-
জানাং তথাসং তনোতু
যথাদর্শকার্য্যং বিধাতা জগত্যামশেষেষু
কার্য্যেষ্বপি স্থানুরেষু। ৮

ভবৎ পাদপঙ্কেরুহায়ং চিরংবৈ মধুপ্রাপ্তমত্তো
মনঃষট্পদো মে
সলীলং সমস্তানপি প্রেমমত্তান্ বিদধ্যাৎ
যথাবৈ তথা মাং প্রসীদ। ৯

বয়মিহ মনুজাস্ত্বাং সাদরং প্রার্থয়ামঃ।
কুশলদ পরমাত্মন্! মঙ্গলং নো বিধেহি,
সততমভিরতাস্তে পাদসেবাসুকার্য্যে
চরণকমললীনান্ পাহি দীনান্ পরেশ! ১০

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবদেব! হে কৃপামৃতবর্ষণকারী মেঘ! হে অনন্ত কল্যাণময়! হে প্রণতগণের একমাত্র বন্ধু! মনুষ্য যতই না কেন বিচক্ষণ হউক, তথাপি তুমি তাহার নিকট অজ্ঞেয়। ১

হে ভগবন্! সুখসদন ও জ্ঞানপ্রদ যে সকল নিগম ও আগম ও দর্শনশাস্ত্রাদি আছে, তাহারা সকলেই তোমার সমীপে নীরবে অবস্থিতি করে। ২

মানব জানে যে, তুমি আছ এবং তুমি নিজের বিবিধ শক্তিদ্বারা জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ সাধন করিয়া, স্বকীয় মঙ্গলময় ইচ্ছাদ্বারা সেই সকল শক্তিকে মনুষ্যেরমঙ্গলের জন্য নিযুক্ত করিয়াছে। ৩

সুরগণ কর্ত্তৃক পূজিত মঙ্গলকর তোমার পাদপদ্মে প্রণাম করি। আনন্দেরসহিত সর্ব্বদা জগতের কামনাপূর্ণকারী আশীর্ব্বাদ প্রদান কর। তোমার করুণা ধারণ করিয়া কুশলদায়িনী "হিন্দু-পত্রিকা" পূর্ব্বের ন্যায় জগতের মঙ্গলে নিযুক্ত হউক। ৪

পুনর্ব্বার এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনাকরি যে, মনুষ্যগণ যেরূপে পরস্পর লোভ-হিংসাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পরের মঙ্গল সাধনে তৎপর হইয়া পৃথিবীর দেবতার ন্যায় হয়, আমাদিগকে সেই ভাবে দয়া করিয়া পূজা গ্রহণ কর। ৫

সর্ব্বদা পরস্পর অনর্থক অভিমানে তাপযুক্ত নানা বর্ণের বিভিন্ন জাতীয় নরগণ যাহাতে সহোদরব্রত গ্রহণ করিয়া শান্তিশালী হইতে পারে, আমাদিগকে সেইরূপ আশীর্ব্বাদ প্রদানকর। ৬

হে পরমেশ্বর! হে মায়ারহিত! এই নব বর্ষে ভারতবর্ষকে আনন্দপূর্ণ, দুর্ভিক্ষশূন্য এবং পীড়াশূন্য ও বৃদ্ধিযুক্ত কর। ৭

মনুষ্যসমাজে বহুবিধ কার্য্যের মধ্যে যাহাতে হিন্দুগণ সকলের আদর্শকার্য্য সম্পাদন করিতে পারে এবং পূর্ব্বপুরুষগণের কার্য্যকলাপ সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করিতে পারে, সেইরূপ আশীর্ব্বাদ কর। ৮

এই আশীর্ব্বাদ কর, আমার মন-মধুকর তোমার চরণ-কমলের মধু-পানোন্মত্ত হইয়া যেন সকলকে ঐ মধুপানে মত্ত করাইতে পারে। আমারপ্রতি প্রসন্ন হও। ৯

হে কুশলপ্রদাতা! হে পরমাত্মন্ আমরা সাদরে তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, আমাদিগের কল্যাণ বিধান কর। হে পরমেশ! তোমার চরণ-সেবারূপ সুখে যাহারা সতত নিরত, সেই পাদপদ্মলীন দীন জনগণকে রক্ষাকর। ১০

বেদান্ত-সূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

২য় পাদ। (৫ম)

১। সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ।

২। বিবক্ষিত গুণোপপত্তেশ্চ।

৩। অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ।

৪। কর্ম্মকর্ত্তৃ ব্যপদে[illegible]

৫। শব্দ বিশেষাৎ।

৬। স্মৃতেশ্চ।

৭। অর্ভকৌকস্ত্বাত্তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতিচেন্ন নিচায্যত্বা দেবং ব্যোমবচ্চ।

৮। সম্ভোগ প্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষাৎ।

১। "মনোময"ই যে ব্রহ্ম, ইহা সর্ব্বোপনিষদ্‌-প্রসিদ্ধ।

২। "মনোময়"এর যে সমস্ত গুণ বিবৃত হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মে প্রযুক্ত হইলেই উপপন্ন হয়।

৩। "মনোময়"এর গুণাদি জীবাত্মায় প্রযু হইলে অনুপপত্তি দোষ ঘটে।

৪। কর্ম্ম ও কর্ত্তার ব্যপদেশ থাকাতেও "মনোময়" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

৫। শব্দের প্রভেদ থাকাতেও, "মনোময়" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

৬। স্মৃতিশাস্ত্রদ্বারাও উহাই প্রতিপাদ্য।

৭। অধিষ্ঠান ও আকারের ক্ষুদ্রত্ব বিষয়িণী আপত্তির উত্তর এই যে, আকাশবৎ ব্রহ্ম চিন্তনীয়।

৮। তত্ত্বতঃ জীব-ব্রহ্ম অভিন্ন হইলেও, ব্রহ্মের বিশেষত্ব হেতু জীবের ন্যায় ব্রহ্মের সম্ভোগপ্রাপ্তি হয় না।

প্রথমসূত্র ও তৎপরবর্ত্তী সপ্ত সূত্র ছান্দোগ্য উপনিষদের ৩য় অধ্যায়ের ১৪শ প্রপাঠক অবলম্বনে রচিত। উক্ত প্রপাঠকের [illegible] বিদ্যা" নামে সাধারণতঃ অভিহিত। উহাতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে, যথা—

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত। অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথাক্রতুরস্মিল্লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি সক্রতুং কুর্ব্বীত। ১

এই সমস্তই ব্রহ্ম—ব্রহ্মেতে জনিত।
ব্রহ্মে বিমজ্জিত বিশ্ব—ব্রহ্মেই পালিত।
শান্ত সমাহিত চিত্তে সাধন যাহার।
ব্রহ্মের উপাসনায় অধিকার তার॥
মানব কর্ম্মের জীব—কর্ম্মবশে সৃষ্ট।
ইহজন্ম-কর্ম্ম পরজন্মের অদৃষ্ট॥
অতএব কর্ম্মফলবিধানজ্ঞ যাঁরা।
শাস্ত্রমর্ম্ম জেনে কর্ম্ম করিবেন তাঁরা॥ ২

অর্থাৎ বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থের কারণ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম কাহাকে বলা যায়?—যিনি নিরতিশয় মহৎ। (বৃহত্তমাৎ ব্রহ্ম) সেই ব্রহ্মেই এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হইতেছে। (তজ্জলানি—তজ্জশ্চ—তল্লশ্চ—তদনশ্চ—তজ্জলান—অবয়বলোপশ্ছান্দসঃ। সেই ব্রহ্ম হইতে জাত "তজ্জং"—তাঁহাতে লীন "তল্লং"—তাঁহাদ্বারা রক্ষিত—তদনং। তস্মাদ্ জাতং, তস্মিন্ লীযতে, তস্মিন্নেব স্থিতিকালে অনিতি প্রাণিতি ইতি।) জিতেন্দ্রিয়—জিতচিত্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা কর্ত্তব্য। তাঁহাকে চিত্তে ধারণ করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করাই তাঁহার উপাসনা, এইজন্যই মানবকে "ক্রতুময়" বলে। ইহলৌকিক কর্ম্মানুসারে পারলৌকিক অদৃষ্টফল নির্দ্দিষ্ট হয়। অতএব কর্ম্মফলজ্ঞ ব্যক্তি শাস্ত্রাদিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন। (যথা ক্রতু যথা অস্য পুরুষস্য ক্রতু, প্রেত্য—মরিয়া

—স ক্রতুং কুর্ব্বীত, স এবং জানন্ ক্রতুং কুর্ব্বীত।)

মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্য-সঙ্কল্পঃ আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্ব-গন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্য-নাদরঃ। ২

মনোময় জ্যোতিরূপ, সত্যসঙ্কল্পস্বরূপ,
প্রাণদেহ, আকাশাত্মা, সর্ব্বকর্ম্মা যিনি।
সর্ব্বকাম, সর্ব্বাবাস, সর্ব্বরস, সর্ব্ববাস,
অবাক্য ও অনাদর ব্রহ্ম হন তিনি॥ ২

সেই ব্রহ্ম মনোময়—অর্থাৎ মনঃপ্রায়। (যদ্দ্বারা মনন করা যায়, তাহাই মন; কিন্তু মন যখন কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত, তখন আত্মাও প্রবৃত্তবৎ উপলব্ধ হন; তদ্রূপ মন কোন বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইলে, আত্মাও নিবৃত্তবৎ উপলব্ধ হন; এইরূপে আত্মা মনের ন্যায় প্রতীয়মান হন বলিয়াই মনঃপ্রায়—সুতরাং "মনোময়"। তিনি প্রাণশরীর—অর্থাৎ প্রজ্ঞাশরীর (যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা, যা বা প্রজ্ঞা, স প্রাণ, ইতিশ্রুতেঃ)
তিনি চৈতন্যস্বরূপ (ভা দীপ্তিশ্চৈতন্য লক্ষণং) তিনি সত্যসঙ্কল্প, তিনি আকাশাত্মা অর্থাৎ আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম—রূপাদিবিহীন এবং সর্ব্বব্যাপী। তিনি সর্ব্বকর্ম্মা, অর্থাৎ বিশ্ব-জগৎ তাঁহারই কার্য্য। (স হি সর্ব্বস্য কর্ত্তেতি শ্রুতেঃ) তিনি সর্ব্বকাম—(ধর্ম্মা-বিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মীতি—গীতা।) তিনি সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, (রসোঽহমপ্সু—পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাশ্চ, ইত্যাদি—গীতা), তাঁহাদ্বারা এই বিশ্ব ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তিনি অবাকী (বাক্য এস্থলে সর্ব্বেন্দ্রিয়-বোধক শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি-বিরহিত—অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্য-চক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ) তিনি অনাদর, অর্থাৎ কোন বস্তুতে তাঁহার আদর বা অনুরাগ নাই।

এষ ম আত্মাঽন্ত হৃদয়েঽণীয়ান্ ব্রীহের্ব্বা যবাদ্বা সর্ষপাদ্বা শ্যামাকতণ্ডুলাদ্বা এষ ম আত্মান্ত-র্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাজ্জ্যায়া-ন্দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ॥ ৩

ব্রীহি-যব-সর্ষপ বা শ্যামাশস্য-কণ,
সব হতে অণু মম অন্তরাত্মা হন।
পৃথিবী-আকাশ-স্বর্গ—বিশ্বচরাচর,—
সব হতে মম অন্তরাত্মা বৃহত্তর। ৩

এ স্থলে অধিক কিছু বলিবার নাই। "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" শ্রুতির এই ব্রহ্মতত্ত্বোক্তিই এই শাণ্ডিল্য-উপদেশে ব্যক্ত হইয়াছে। অতি সূক্ষ্ম ও অতি বৃহৎ, উভয়ই উপলব্ধির অযোগ্য। ব্রহ্মতত্ত্ব এত সূক্ষ্ম—যে অনুভবে আসে না, এবং এত বৃহৎ—যে ধারণাই হয় না।

সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্ব-মিদমভ্যাত্তোঽবাক্যানাদর এষ ম আত্মান্তর্হৃদয় এতদ্ব্রহ্মৈতমিতঃ প্রেত্যাভি সম্ভবিতাস্মীতি যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাস্তীতি চ স্মাহ শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ। ৪

"সর্ব্বকর্ম্মা-সর্ব্বকাম, সর্ব্বরস-সর্ব্বঘ্রাণ,
এবিরাট বিশ্বব্যাপী যিনি।
অবাকী ও অনাদর, আমার হৃদয়েশ্বর
পরাৎপর পরব্রহ্ম তিনি।
এ দেহের পরিহারে, অবশ্য পাইব তাঁরে,
এ দৃঢ় বিশ্বাস যার হয়।
শাণ্ডিল্যের উক্তি সার—[illegible] ফলে তার
ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবে নিশ্চয়।

২য় উক্তির ব্যাখ্যাস্থলে "অবাক্য" ও "অনাদর" পদের তাৎপর্য্য আলোচিত হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে তৎপুনরুক্তির প্রয়োজনাভাব। অন্যান্য অংশ পদ্যানুবাদেই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে, আশা করি। "শাণ্ডিল্য" পদের দ্বিরুক্তি-প্রয়োগ কেবল গৌরব প্রকাশ বা আদরার্থক মাত্র। যদিও ব্রহ্ম এস্থলে "মনোময়" ইত্যাদি পদে প্রখ্যাত হইয়াছেন, তথাপি সমগ্র প্রপাঠকটীই ব্রহ্ম বা পরমাত্মা-প্রাসঙ্গিক, পরন্তু জীবাত্মা-প্রাসঙ্গিক নহে। এরূপ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত হইতে পারে যে, ব্রহ্মে যেখানে মনের বা প্রাণের অস্তিত্ব অসিদ্ধ, (যথা—মঃ উঃ ২—১।২) সেখানে উপরোক্ত শ্রৌত বাক্য ব্রহ্মবাচক হওয়া সম্ভাবিত নহে, এবং উহা জীবাত্মবাচকই বটে। এস্থলে উত্তরপক্ষে ইহাই বক্তব্য যে, ব্রহ্মতত্ত্বই যেস্থলে মূল বিচর্য্য বিষয়, সেস্থলে নব-বিষয়ান্তরের আলোচনা একান্তই অপ্রাসঙ্গিক। যদিও চিত্তশুদ্ধির আদেশ-উপদেশই উক্ত প্রপাঠকে পরিব্যক্ত, কিন্তু সেই চিত্তশুদ্ধি সাধনের একমাত্র উপায় স্বরূপ উপাসনা ও ধ্যান-ধারণার বিষয় ব্রহ্মতত্ত্বই এস্থলে ব্যক্ত বা বিবৃত, পরন্তু উপাসনাদির অবিষয় জীবাত্মতত্ত্ব কদাচ নহে। সমগ্র বৈদান্তিক সন্দর্ভের সারভূত সিদ্ধান্তই এই যে, ব্রহ্মই বিশ্বের সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণ এবং ব্রহ্মতত্ত্বের এই অসাধারণ বিশেষ লক্ষণ এখানেও বিস্পষ্ট ব্যক্ত।

২য় সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, পূর্ব্বোদ্ধৃত বৈদান্তিক উক্তিতে যে সমস্ত লক্ষণাদি বিবৃত হইয়াছে, তাহা পরমাত্মা ব্রহ্মে প্রযুক্ত হইলেই [illegible] সমুপপন্ন হয়, কিন্তু জীবাত্মায় [illegible] প্রয়োগ কল্পনা করিলে, উহা অতীব অসঙ্গত ও অনুপপন্ন হয়, সন্দেহ নাই।

এস্থলে এইরূপ লক্ষণাদি বিবৃত হইতেছে, যথা—ইনি পৃথিবী হইতে বৃহত্তর, ইনি শস্যকণা হইতে সূক্ষ্মতর, ইনি সর্ব্বকর্ম্মা, ইনি সর্ব্বকাম, ইত্যাদি। এ সমস্ত ব্রহ্মেরই লক্ষণ। ব্রহ্মই "অণোরণীয়ান্—মহতো মহীয়ান্।" ব্রহ্মেই অবাধিত বিশ্বকর্তৃত্ব ও বিশ্বকারণত্ব। ব্রহ্মেই বিশ্বের সত্তা, ব্রহ্মেই বিশ্বের সমাধান। ব্রহ্মই বিশ্ব। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, যথা—

> ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং
> কুমার উত বা কুমারী।
> ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চয়সি
> ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥

> তুমিই পুরুষ, তুমিই রমণী।
> তুমিই কুমার, তুমিই কুমারী।
> তুমিই প্রাচীনরূপে দণ্ডপাণি,
> তুমিই সর্ব্বত্র সর্ব্বরূপধারী।

এতাবতা দেখা যাইতেছে যে, জীবাত্মার বিশেষ লক্ষণাবলী পরমাত্মায়ও প্রযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু পরমাত্মার বিশেষ লক্ষণাবলী কদাচ জীবাত্মায় প্রযুক্ত হইতে পারে না।

মুণ্ডকোপনিষদের উক্তিমতে পরমাত্মা অমনঃপ্রাণসত্ত, শুদ্ধ, শান্ত ইত্যাদি বটে, কিন্তু উহা তাঁহার নির্গুণ সত্তার স্বরূপ লক্ষণ, আর তাঁহার সগুণ সত্তার তটস্থ লক্ষণে তিনি সগুণ জীবাত্মার সর্ব্বলক্ষণসমন্বিতই বটেন। অতএব জীবাত্মার লক্ষণে পরমাত্মা লক্ষিত হইতে পারেন, কিন্তু পর-

মাত্মার লক্ষণে জীবাত্মা কদাচ লক্ষিত হইতে পারেন না।

৩য় সূত্র।—পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, বর্ণিত লক্ষণাবলী ব্রহ্মেই প্রযোজ্য এবং এই বক্ষ্যমাণ ৩য় সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত লক্ষণাবলী জীবাত্মায় অপ্রযোজ্য—অনুপপাদ্য। যেহেতু—"আকাশাত্মা" "সর্ব্ব-কর্ম্মা" "সর্ব্বব্যাপী" প্রভৃতি বিশেষণ উপাধ্যবচ্ছিন্ন সসীম গুণ জীবাত্মায় কদাচ সম্ভাবিত নহে। যদি বলা যায় যে, পরমাত্মা ত জীব-দেহেও অবস্থিত; তদুত্তর এই যে, তাহা হইলেও তিনি কেবল মাত্র জীব-দেহেই অব-স্থিত নহেন, তিনি সর্ব্বস্থিত। "পৃথিবী হইতে বৃহত্তর" "আকাশ হইতে বৃহত্তর" "সর্ব্বাধার" ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মই ব্যক্ত, কিন্তু জীবাত্মার অস্তিত্ব দেহ বা উপাধি-অবচ্ছিন্নই বটে; সুতরাং জীবাত্মা কদাচই উক্ত উক্তিসমূহের বিষয়ীভূত হইতে পারেন না।

৪র্থ সূত্র।—"মনোময়" ইত্যাদি বিশেষণে এ স্থলে জীবাত্মা লক্ষিত হইতে পারেন না; কারণ তাহা হইলে বিষয়-বিষয়ীভাবের বিপর্য্যয় ঘটিয়া যায়। প্রথম সূত্রের আলোচনায় এইরূপ ঔপনিষদী উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে যে,—"ইনিই সেই ব্রহ্ম" "ইহলোকান্তরে আমি ইঁহাকে প্রাপ্ত হইব" ইত্যাদি। এই "ইনি" কে? "ইনি" যদি জীবাত্মা হন, তবে ইঁহাকে পাইবে যে, সে আবার কে? যে প্রাপক, সে-ই প্রাপ্য হইবে কিরূপে? পূর্ব্বোক্ত "মনোময়" ইত্যাদি বিশেষণের বিষয়ীভূত বস্তুকে "আমি পাইব" এরূপ উক্তি জীবাত্মার ভিন্ন আর কাহার সম্ভবে? অদ্বৈততত্ত্বে পরমার্থতঃ জীবাত্মা পরমাত্মার (প্রাপ্য-প্রাপকের) একত্বসিদ্ধ হইলেও "শাণ্ডিল্য বিদ্যার" লক্ষ্যীভূত সগুণ ব্রহ্মোপাসনাস্থলে দ্বৈততত্ত্বেই উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ-রূপে পরমাত্মা-জীবাত্মায় (প্রাপ্য-প্রাপকরূপে) পার্থক্য সূচিত হইয়াছে। অতএব উপাসক জীবাত্মাই ইহ-লোকান্তরে সেই "মনোময়" "প্রাণ-শরীর" "আকাশাত্মা" প্রভৃতি বিশেষণ-বেদ্য উপাস্য পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবেন, ইহাই সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তিত হইতেছে।

৫ম সূত্র।—পরমাত্মা ব্রহ্মই যে উপাসনার বিষয়, এস্থলে অপর একটি হেতুবাদে তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। শতপথ ব্রাহ্মণে (১০—১৮.২) এইভাবের উক্তি দৃষ্ট হয় যে,—"ব্রীহি বা যবশস্য-কণার তুল্য কিম্বা শ্যামাক-শস্য বা শ্যামাক-তুষ তুল্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপে এই হিরণ্ময় পুরুষ আত্মায় অবস্থিত," ইত্যাদি। এ স্থলে "আত্মা" পদ অধিকরণ কারক-রূপে ব্যবহৃত হওয়াতে, উহা জীবাত্মাবাচক এবং কর্ত্তৃপদ "হিরণ্ময়" প্রভৃতি বিশেষণ-বেদ্য পরমাত্মা ব্রহ্ম হইতেছেন। অতএব জীবাত্মাতে পরমাত্মা প্রতিষ্ঠিত, এই তাৎপর্য্য বোধনার্থ কারকার্থ-ভেদে স্পষ্টতঃই শব্দ-বিভিন্নতায় জীবাত্মা-পরমাত্মায় বিভিন্নতা প্রতিপাদিত হইতেছে।

৬ষ্ঠ সূত্র।—কেবলমাত্র শ্রুতি বা বেদই জীবাত্মা-পরমাত্মার পূর্ব্বোক্তরূপ ভেদ প্রতিপাদন করেন নাই; পরন্তু স্মৃত্যাদি শাস্ত্রেও উহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। গীতাশাস্ত্রেও (১৮—৬১) উক্ত হইয়াছে, যথা—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥"

অর্জ্জুন! ঈশ্বর হয়ে সর্ব্বভূত-হৃদিস্থিত।
মায়ায় ঘুরান সবে কলের পুতুল

বস্তুতঃপক্ষে কোন আত্মাই পরমাত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ (৩—৭.২৩) এইরূপ বলেন——

দ্রষ্টা কেহ নাহি আর সেই এক ভিন্ন।
সেই এক ভিন্ন আর শ্রোতা নাহি অন্য॥

ফলে যদি আমরা অদ্বৈতবাদের কৈবল্যতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারি, আমরা "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের অধিকারী হইতে পারি, তবেই আমরা উক্ত তত্ত্বোপলাভে শক্ত হই। কিন্তু যাবৎ আমরা উক্ত চরম-পরমার্থ-সত্য সম্বোধে সমর্থ না হই, তাবৎ আমাদিগের নিকট সর্ব্বসারতম সত্য এই যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা পরস্পর অভিন্ন; স্রষ্টা ও সৃষ্ট স্ব স্ব সত্তায় স্বতন্ত্র! আকাশ অনন্ত, ঘটাদিরূপ উপাধির অবচ্ছিন্নতাফলে উহা "ঘটাকাশ" প্রভৃতি অভিধানে সান্তরূপে প্রতিপন্ন। যতদিন ঘট, ততদিন ঘটাকাশ; যেই ঘটের অস্তিত্ব হত, সেই ঘটাকাশ মহাকাশগত! মনের সঙ্কোচ, দেহের সাবয়বত্ব এবং ইন্দ্রিয়াদির কার্য্যাদি সান্তত্ব ইত্যাদির সমষ্টিই উপাধি। এই উপাধিই অনবচ্ছিন্ন অনন্ত আত্মার সান্তত্ব-সাধক অবচ্ছেদ। বস্তুতঃ তোমাতেও যে আত্মা, আমাতেও সেই আত্মা। আমাদের দেহেন্দ্রিয়াদিই এস্থলে ঘটতুল্য। এই ঘট সংপূর্ণ ভাঙ্গিতে পারিলে—অর্থাৎ সাধন-বলে মানসেন্দ্রিয়াদিসমন্বিত সূক্ষ্ম দেহ পর্য্যন্ত নিরস্ত করিয়া সিদ্ধিসমাধি লাভ করিতে পারিলে, আমাদের জীবাত্মারূপ ঘটাকাশ পরমাত্মারূপ মহাকাশে পরিণত হয়, সন্দেহ নাই।

[illegible] বিদূরিত হউক, জীবাত্মার [illegible] হউক, সর্ব্বভূতাত্মার জীবাত্মার আত্মসমর্পণ হউক, তখন কেবল "একমেবাদ্বিতীয়ম্!"

ভেদ-বুদ্ধির নিরাকরণার্থে কর্ম্মত্যাগের প্রয়োজন নাই সাংসারিক কর্ত্তব্য-অবহেলারও আবশ্যকতা নাই, অথবা (তথাকথিত) বৈরাগ্যাবলম্বনেরও কোন বিশিষ্ট কারণ নাই। সব দিক বজায় রাখিয়াই আমিত্বের প্রসার-সাধন চলে এবং তদ্দ্বারাই উক্তরূপ ভেদবোধ নিরাকৃত হয়। তোমার ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে ঈশ্বরেচ্ছার অধীনতায় সমর্পণ কর, তোমার সংকীর্ণ স্বার্থসমূহের উপসংহার কর, তোমার সমগ্র কর্ত্তব্য ভেদ-বোধ-নিরাকরণে বা আমিত্বের সম্প্রসারণে কেন্দ্রীভূত কর। ইহাই যথার্থ যোগ-সাধন।

অনেক লোক মোক্ষসাধনার্থী হইয়া কেবল অহঙ্কারের লম্ফ প্রদান করেন। তাঁহারা অনেকেই নানারূপ দৈহিক তপস্যা দ্বারা দেহকে কষ্ট দিয়াই মোক্ষাধিকার লাভের আশা করেন; কিন্তু ওরূপ ধারণা ও সাধনা সমীচীন নহে। মোক্ষার্থী মানব যথাবিহিত "শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনে" নিরত রহিবেন ও পূর্ণপরার্থপরায়ণ হইবেন।

উপনিষদের জ্বলন্ত সত্য সমূহ স্বীয় জীবনে জীবন্ত ও জাগ্রত কর। বেদান্তবিচারে নিযুক্ত রও, বেদান্তবিজ্ঞানে আসক্ত হও। ফলে যতদিন তুমি পরার্থে স্বার্থ বিসর্জ্জন অথবা পর-আমিত্বে আত্ম আমিত্বের সম্প্রসারণ না করিতে পারিবে, ততদিন কিছুতেই কিছু হইবে না। আমিত্বের প্রসার সাধনেই তোমার সংকীর্ণ জীবাত্মসত্তা বিশ্বব্যাপী পরমাত্মসত্তায় উৎসর্গীকৃত হইবে এবং তাহা হইলেই তোমার উপাধি-ঘট ভাঙ্গিবে।

তোমার সোপাধিক আত্মারূপী ঘটাকাশ নিরুপাধিক পরমাত্মারূপ মহাকাশে পরিণত হইয়া কৃতার্থ হইবে।

৭ম সূত্র।—"আত্মা আমার অন্তরস্থ, আত্মা শস্য-কণা হইতে সূক্ষ্ম" ইত্যাদি বাক্যে যে আত্মার ক্ষুদ্রত্ব প্রকাশিত হইতেছে, সে আত্মা ব্রহ্ম কিরূপে হইতে পারেন?" এইরূপ তর্কোক্তি উপস্থিত হইলে, তদুত্তরে এই বলা যায় যে, প্রকৃত পক্ষে সান্ত বা ক্ষুদ্র পদার্থকে আবার "সর্ব্বব্যাপী" বলা হইয়াছে কিরূপে? ফলে নিরবচ্ছিন্ন সর্ব্বব্যাপীকে সান্ত অবচ্ছেদাত্মক ভাবেও স্থলবিশেষে উপলক্ষিত করা যাইতে পারে। উহা কেবল সাধকের ধারণার করিবার অনুকূলতা মাত্র।

পূর্ব্বোদ্ধৃত শাণ্ডিল্য-বিদ্যার ১ম উক্তিতেই ব্রহ্মের ধারণা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। স্বরূপ-লক্ষণে নির্গুণ ব্রহ্ম ধারণাতীত; কিন্তু তটস্থ লক্ষণে সগুণ ব্রহ্মই ধ্যান-ধারণাধিগম্য—অতএব উপাস্য। ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই বিরাজিত—সুতরাং হৃদয়েও উদিত। অতএব হৃদয়স্থ অন্তরাত্মারূপে তাঁহার উপাসনায় কোন অসঙ্গতি বা আপত্তির অবকাশ নাই। এই জন্যই ব্রহ্ম আকাশাত্মা; অনন্তবিস্তারিত আকাশ ধারণাতীত হইয়াও ঘটাকাশরূপে সান্ত, আয়ত্তীভূত ও ধারণাধিগত।

৮ম সূত্র।—৮ম সূত্রের আলোচ্য বিষয় এই যে, যদি ব্যক্তিগত আত্মা জীব ও পরমাত্মা ব্রহ্ম পরমার্থতঃ একই হন, তবেত ব্রহ্মেরও কর্ম্মফল-ভোগ স্বীকার ঘটিয়া উঠে! কিন্তু জীবই সুখ-দুঃখ রূপ কর্ম্মফলের ভোক্তা, পরম নহেন। পরম সাক্ষীস্বরূপ দ্রষ্টা মাত্র, ইহাই বেদোক্তি। অথচ "জীব-পরম এক" বলিলে, পরমের সুখ-দুঃখ-ভোগ কিসে নিরাকৃত হয়? ফলকথা, জীব ও পরমে একত্ব কখন? না যখন সর্ব্বোপাধির অপগম। কর্ম্ম-ফল-ভোগ কতদিন? না জীবের অবিদ্যোপাধি যতদিন। এই বাসনা-বিকারে ভব-রোগী কর্ম্মফলভোগী জীবের কর্ম্মভোগ সেই নির্গুণ নির্লেপ নিরুপাধিক ব্রহ্মে কিরূপে স্পৃষ্ট হইবে? ব্রহ্ম "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্"। নিষ্কল নির্ম্মল ব্রহ্মে পাপ-মলিন জীবের কর্ম্ম-কলঙ্ক কিরূপে লাগিবে? অনন্ত আকাশ-ঘটাধারে সান্ত, তাই ঘটের অস্তিত্বকাল ব্যাপিয়া, নিত্যমুক্ত অনন্ত বহিরাকাশ হইতে সাময়িকভাবে বদ্ধ সান্ত ঘটাকাশ অবশ্যই স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্য যতদিন, অবশ্য একত্বও অসিদ্ধ ততদিন। ঘটত্বের বিনাশেই একত্ব, সুতরাং সেই অনন্ত একে সান্ত ঘটের গুণ বা ঘট-ধর্ম্ম কিরূপে বর্ত্তিবে? জীবের কর্ম্মফলভোগ তাহার অবিদ্যাজনিত অজ্ঞানতার ফল মাত্র; কিন্তু পরমে অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা সম্ভবে না, যেহেতু নিরুপাধিকতায় তিনি উহার অতীত; সুতরাং তাঁহার কর্ম্মফলভোগ ফলিতার্থে সম্ভাবিত নহে।

অজ্ঞান-চক্ষু আকাশকে গাঢ় নীলবর্ণ দেখে, কিন্তু বিজ্ঞান-চক্ষু অবর্ণই দেখে। বর্ণের হেতু অন্য—বিষয় অন্য। বিজ্ঞানমতে উহা বৈদ্যুতিক ব্যাপারের বিকার বিশেষ, ইত্যাদি। ফলে সূত্রের সার সিদ্ধান্ত এই যে, পারমার্থিক একত্ব সত্ত্বেও ঐহিক ভিন্নত্ব অনুসারে জীবের ঐহিক কর্ম্মাদির ফলভোগ কখনও ব্রহ্ম-সংস্পৃষ্ট হইতে পারে না; যেহেতু উপাধিগত বিভিন্নতা বিস্পষ্ট [illegible] এই বিভিন্নতাটি কি? জ্ঞান ও [illegible]

বিদ্যা ও অবিদ্যা, এ দুয়ের পার্থক্য-সিদ্ধান্ত কিসে সিদ্ধ? এতদুত্তরে বক্তব্য, পার্থক্যের অবস্থায় ফলভোগই অজ্ঞান বা অবিদ্যার কার্য্য, আর একত্ব-জ্ঞান বা বিদ্যার কার্য্যই ভোগাতীতত্ব বা মোক্ষ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশঃ—

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

১১

যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো
যস্মিন্নিদং সং চ বিচৈতি সর্ব্বম্।
তমীশানং বরদং দেবমীড্যম্
নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি॥

অন্বয়ঃ।—যঃ একঃ (দেবঃ) যোনিং যোনিং অধিতিষ্ঠতি। যস্মিন্ (দেবে) ইদং সর্ব্বং সম্-এতি চ, বি-এতি চ। (সাধকঃ) তম্ ঈশানং বরদং ঈড্যং দেবং নিচায্য ইমাং শান্তিং অত্যন্তং এতি।

বিষম পদব্যাখ্যা।—"যঃ" মায়াবিনির্মুক্তঃ আনন্দৈকঘনঃ। "দেবঃ" দ্যুতিমান্ পরমেশ্বরঃ। "যোনিং যোনিং" মায়াময়ং কারণং কারণং প্রতিকারণে; (বীপ্সয়া দ্বিরুক্তিঃ)। "অধিতিষ্ঠতি" অন্তর্যামিরূপেণ অধিষ্ঠায় বর্ত্ততে, অন্তর্যামিরূপে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক বর্ত্তমান রহিয়াছেন। "যস্মিন্"— [illegible] ভিন্ন পরমেশ্বরে,মায়া প্রভৃতির অধিষ্ঠাতা যে পরমেশ্বরে। "ইদং সর্ব্বম্" এই সমগ্র জগৎ। "সম্-এতি"—উপসংহার কালে প্রলীয়তে,অন্তকালে প্রলয় প্রাপ্ত হয়। "চ" অত্র প্রথম চকারঃ ধাতু-সমুচ্চয়ার্থঃ, দ্বিতীয়শ্চকারঃ স্থিতিপ্রলয়য়োঃ কারণসমুচ্চয়ার্থঃ—ইতি শঙ্করানন্দঃ। "বি-এতি চ" বিবিধ রূপেণ প্রকাশতে—পুনরায় সৃষ্টিকালে বিবিধরূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশিত হয়। "ঈশানম্" নিয়ন্তারং নিয়মকর্ত্তা। "বরদং" মোক্ষপ্রদ। "নিচায্য"—নিশ্চয়েন 'ব্রহ্মাহমস্মীতি' সাক্ষাৎ কৃত্য,নিশ্চয়রূপে "আমিই—ব্রহ্ম" এই প্রকারে দর্শন করিয়া। "ইমাং" সর্ব্বদুঃখবিনির্ম্মুক্তাং সুখঘনাং—সর্ব্বদুঃখরহিত নিরবচ্ছিন্ন সুখময়ী। 'শান্তিং' হৃদয়ের নির্ব্বিকল্প.আনন্দভোগ। "অত্যন্তং" পুনরাবৃত্তিরহিতং 'চিরদিনের মত, এতি' —প্রাপ্ত হয়।

বঙ্গার্থঃ।—যে অদ্বিতীয়, দ্যুতিমান্, পরম পুরুষ জগতের মায়াময় প্রত্যেক কারণে অন্তর্যামিরূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। মায়ার অধিষ্ঠাতা যে পরম পুরুষে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড উপসংহার সময়ে অর্থাৎ প্রলয় কালে বিলীন হয়, এবং সৃষ্টিকালে পুনরায় বিবিধ আকার পরিগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশিত হয়। সেই সর্ব্বান্তর্যামী বিশ্ব নিয়ন্তা, মোক্ষপ্রদ, বেদাদি পূজিত সচ্চিদানন্দময় পরমেশ্বরকে নিশ্চয়রূপে 'তিনিই আমি" এইভাবে প্রত্যক্ষীভূত করিতে পারিলে, সাধক সর্ব্ববিধ দুঃখবিনির্ম্মুক্ত নিরন্তর সুখস্বরূপিণী চিরন্তনী শান্তি প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহাকে আর সংসার যাতনা —ভোগ করিতে হয় না। পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি

মাত্মঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়।" প্রলয়-কালে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সেই আদি কারণে পুনঃ বিলিত হয় ইহা শাস্ত্রান্তরেও এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—যথা,—

"সংহৃত্য সর্ব্বভূতানি কৃত্বা চৈকার্ণবং জগৎ।
বালঃ স্বপিতি যশ্চৈকস্তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ॥

সমগ্র ভূতগ্রাম আত্মায় সংহৃত করিয়া, জগৎকে এক মহা সমুদ্রে পরিণত করিয়া যে বালকমূর্ত্তি পরম দেবতা নিদ্রিত হয়েন, সেই কৃষ্ণাত্মার উদ্দেশে নমস্কার। ভগবান্ নিজেও বলিয়াছেন—

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজ মব্যয়ম্॥"
গীতা ৯—১৮

আমিই সকলের গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, রক্ষক, সুহৃৎ, স্রষ্টা সংহর্ত্তা, আধার, লয়স্থান এবং অব্যয় বীজ অর্থাৎ অক্ষয় মূলকারণ।

১২

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং পশ্যত জায়মানম্
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥

অন্বয়।—যঃ (পরমেশ্বরঃ) দেবানাং প্রভবঃ উদ্ভবশ্চ। "যঃ" বিশ্বাধিপঃ, রুদ্রঃ, মহর্ষিশ্চ, (হে মুমুক্ষবঃ!) হিরণ্যগর্ভং জায়মানং, তম্, পশ্যত (অবলোকয়ত) স নঃ শুভয়া বুদ্ধ্যা সংযুনক্তু॥ এই শ্রুতি তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থী শ্রুতির সমরূপা তাহাই দ্রষ্টব্য।

বঙ্গার্থঃ।—যে অনন্ত শক্তি মহিমময় পুরুষ শক্তিশালী দেববৃন্দেরও শক্তির কারণ, যিনি জগতের অদ্বিতীয় অধিপতি, সর্ব্বজ্ঞ ও জগতের সংহর্ত্তা বা রুদ্র, হে মুক্তি লিপ্সুগণ, তোমরা সেই সনাতন পুরুষকে অবলোকন কর; আত্মায় তাঁহার সত্তা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হও। তিনি আমাদিগকে মোক্ষ-প্রিকা শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন।

১৩

যো দেবানা মধিপো
যস্মিল্লোঁকা অধিশ্রিতাঃ।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পাদঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

অন্বয়ঃ—যঃ (দেবঃ) দেবানাং অধিপঃ। যস্মিন্ লোকাঃ অধিশ্রিতাঃ। যঃ অস্য দ্বিপদঃ চতুষ্পদঃ চ (জীবস্য) ঈশে, ঈষ্টে ইত্যর্থঃ, অত্র "তলোপশ্ছান্দসঃ" ইতি ভগবচ্ছঙ্করাচার্য্যাঃ) (তস্মৈ) কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

বিষম পদব্যাখ্যা।—"দেবানাম্" ব্রহ্মাদি দেবতাবৃন্দের। যস্মিন্ লোকাঃ অধিশ্রিতাঃ" সর্ব্ব কারণস্বরূপ যে পরমেশ্বরে "ভূঃ" প্রভৃতি সমস্ত জগৎ আশ্রিত রহিয়াছে। "যঃ অস্য দ্বিপদঃ চতুষ্পদশ্চ ঈশে" যে পরমেশ্বর মনুষ্য প্রভৃতি দ্বিপদ প্রাণি সমূহের এবং চতুষ্পদ পশ্বাদির প্রতি স্বায় ঐশী শক্তির পরিচালনা করিতেছেন অর্থাৎ ইহাদিগকে প্রাতিনিয়ত নিয়মিত করিতেছেন। "কস্মৈ"—আনন্দ রূপায়—আনন্দ স্বরূপকে এখানে ক শব্দের অর্থ আনন্দ, বৈদিক নিয়মানুসারে চতুর্থীর এক বচনে "কস্মৈ" হইয়াছে, ... "কায়"

হইও। "হবিষা" চরুপুরোডাশাদি পবিত্র যজ্ঞীয় দ্রব্যদ্বারা। "বিধেম"—পরিচরেম—পরিচর্য্যা অর্থাৎ সেবা এবং অনুসন্ধান করিব॥

বঙ্গার্থঃ।—যে পরম ঐশ্বর্য্যশালী পরমেশ্বর ব্রহ্মাদি দেবতাবৃন্দেরও অধিপতি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার অনন্ত সত্তায় আশ্রিত রহিয়াছে, কি দ্বিপদ মনুষ্যাদি কি চতুষ্পদ পশ্বাদি যাবতীয় প্রাণীই যে সর্ব্বনিয়ন্তার অপূর্ব্ব নিয়মে প্রতিনিয়ত নিয়মিত হইতেছে, সেই চিরানন্দময় পরম দেবতাকে পরম পবিত্র যজ্ঞীয় চরু এবং পুরোডাশাদিরদ্বারা পরিচর্য্যা অর্থাৎ সেবা করিব।

বিশেষ ব্যাখ্যা।—যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক "আমার" বলিতে যাহা বুঝায়, তৎ সমস্তই সেই যজ্ঞে তাঁহার উদ্দেশে সমর্পণ করিয়া, অর্থাৎ সর্ব্বস্ব তাঁহাতে উৎসর্গীকৃত করিয়া, আমি দিবানিশি তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিব। ইহাই এই শ্রুতির তাৎপর্য্য। একটু অনুধাবন করিলে এই শ্রুতির আরও মধুরতার উপলব্ধি করা যায়।—অনন্ত শক্তিশালী অচিন্ত্য-প্রভাব দেবগণ পর্য্যন্ত যাঁহার অধীন, সমগ্র জগৎ যাঁহার বিরাট্ সত্তায়—আশ্রিত, জগতের যাবতীয় জীবই যাহার অনুজ্ঞায় বশবর্ত্তী, আনন্দ যাহার প্রতিকৃতি, সৎ যাহার স্বভাব এবং জ্যোতিঃ অর্থাৎ অপূর্ব্ব বিশ্বপ্রকাশিকাদ্যুতি যাহার সত্তা, তাঁহাকে যদি আমি আমার যথা সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে পারি, কায়মনোবাক্যে যদি তাঁহার দাসত্ব স্বীকার পূর্ব্বক নিরন্তর তদীয় চিন্তায় আত্মহারা হইয়া থাকিতে পারি, তবে জগতে আমার ন্যায় [illegible]? যাহার অক্ষয় অনন্ত ভাণ্ডারে কোন বিষয়েরই অপ্রতুল নাই, তাঁহাকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ পূর্ব্বক, যদি "আমার" বলিয়া ধরিতে পারি, তবে আর আমার—দুঃখ কি? অপ্রমেয় আনন্দ নির্ঝর, যে মহোচ্চ পুরুষ হইতে প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হইতেছে, যদি সেই চিরানন্দ নিকেতনের চরণে মন প্রাণ বলি দিতে পারি, তবে আর আমার অভাব কিসের? আনন্দের জন্যইত জগৎ উদ্ভ্রান্ত! সদ্যোজাত শিশু মায়ের স্তন্য প্রার্থী, শুধু আনন্দের জন্য। মাতা পুত্রগত-জীবনা, শুধু আনন্দের জন্য। বালা দয়িত প্রার্থিনী, শুধু আনন্দের জন্য। প্রাপ্তাধিকার পুরুষ বনিতাভিলাষী, শুধু আনন্দের জন্য। শুধু মনুষ্য কেন, অপরাপর তির্য্যগ্ জাতির মধ্যেও আনন্দস্রোতঃ নিরন্তর প্রবাহিত। অতএব আনন্দই যখন জীবনের প্রধান লক্ষ্য পদার্থ, তখন, যাহার—আশ্রিত হইতে পারিলে আমার অভিপ্রেত পরিমিত ক্ষুদ্র আনন্দ অপেক্ষা কোটি গুণে অধিক অমরা অধিক অপরিমিত অনন্তকাল স্থায়ী অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিতে পারিব, যে করুণাময়ের কারুণ্য কল্প-লতিকার ছায়ায় সংসারতাপদগ্ধ দেহখানি বিশ্রান্ত করিতে পারিলে হৃদ-দয়ের দুর্ব্বিষহ যাতনা চিরদিনের মত তিরোহিত হইবে, আমি আনন্দের কমনীয় অঙ্কে ঘুমাইয়া পড়িব হায় এতাদৃশ মহনীয় পুরুষের চরণে যদি আশ্রয় প্রার্থী না হই তবে আমার ন্যায় ধূর্ত্ত, আত্মদ্রোহী আর কে আছে? এমন সনাতন আনন্দে কখন শক্তিমান্ স্বামীর চরণে "অহং" জ্ঞান পরিহার পূর্ব্বক যদি সর্ব্বস্ব অঞ্জলি প্রদান না করি তবে আমার ন্যায় অভাগ্য আর কে? সম্মুখে প্রসন্নসলিলা

পতিতপাবনী মন্দাকিনী প্রবাহিতা, তুমি যদি তাহাতে অবগাহন না কর,বল দেখি তোমার, তুমা পায়ও তোমার তুমা হৃদয় বিহীন দুরদৃষ্ট পুরুষ আর কে? তাই ক্রান্তদর্শী সাধক বলিতেছেন, "আমার সর্ব্বস্ব যজ্ঞায় চরু এবং পুরুডাশাদির ন্যায় সেই পরম দেবতার চরণে অর্পণ পূর্ব্বক, তাঁহাকে নিয়ত অনুধ্যান করিব।" ইহাই বোধহয় এই শ্রুতির গূঢ় অর্থ।

১৪

সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মং কলিলস্য মধ্যে
বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারম্
জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি॥

অন্বয়ঃ।—সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মং কলিলস্য মধ্যে (বর্ত্তমানম্) বিশ্বস্য স্রষ্টারং অনেকরূপম্, বিশ্বস্য একম্ পরিবেষ্টিতারং, শিবম্ জ্ঞাত্বা (সাধকঃ) অত্যন্তম্ শান্তিম্ এতি॥

বিষমপদব্যাখ্যা।—"কলিলস্য মধ্যে" আবিদ্যতৎ কার্য্যাত্মকদুর্গস্য গহনস্য মধ্যে" ইতি ভগবচ্ছঙ্করঃ অবিদ্যা এবং অবিদ্যাজনিত অতীব দুর্গম গহনের মধ্যে।

"নারী বীর্য্যেণ সঙ্গতং পৌরুষং বীর্য্যং অল্পকালস্থং কলিল মিত্যুচ্যতে, অথবা জগদাম্ভকানাং অপাং বুদ্বুদস্য পূর্ব্বাবস্থা কলিল মিত্যুচ্যতে,কোমলানি উদকানি ইত্যর্থঃ ইতি শঙ্করানন্দঃ। শঙ্করানন্দ নামক ব্যাখ্যাতা বলেন যে নারী বীর্য্যের সহিত পুংবীর্য্য মিশ্রিত হইয়া কিয়ৎকাল অবস্থানের পর কলিল সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। অথবা জগতের আরম্ভক কারণ বারির বুদ্বুদ সংঘটনের পূর্ব্বাবস্থার নাম কলিল, অর্থাৎ কোন যুক্ত যে কারণ বারি, তন্মধ্যে।

"কলিলস্য মধ্যে"—"তমসো মধ্যে গূঢ়ং" ইতি—নারায়ণঃ। নারায়ণ বলেন যে সৃষ্টির পূর্ব্বে যে অনন্ত তিমির থাকে, সেই তিমির মধ্যে নিগূঢ়।

"প্রকৃতি-প্রাকৃতাখ্যস্য সংসারদুর্গস্য গহনস্য মধ্যে অন্তঃসাক্ষিত্বেন অবস্থিতং" ইতি বিজ্ঞানভগবৎ। বিজ্ঞান ভগবৎ বলেন যে "প্রকৃতি এবং তৎসমুৎপন্ন সংসার গহনের মধ্যে সাক্ষিরূপে যিনি অবস্থিত রহিয়াছেন, এই ব্যাখ্যাই ভগবান্ শঙ্করের সম্মত সমীচীনও বটে।

"শিবম"—মঙ্গলস্বরূপ।

বঙ্গার্থঃ।—যিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, সাক্ষিরূপে যিনি নিরন্তর প্রকৃতির অতীব গহন কার্য্যাবলীর মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছেন, যাহার অধ্যক্ষতা ব্যতীত প্রকৃতির কার্য্য সমাহিত হইতে পারে না, সমস্ত পদার্থের উৎপাদক, উপাদান উপাদেয় এবং নিমিত্ত নৈমিত্তিক প্রভৃতি ভেদ বিশিষ্ট অতএব অনেকরূপ জগতের অদ্বিতীয় পরিবেষ্টিতা অর্থাৎ পরিব্যাপক সেই পরম মঙ্গল নিধানকে জানিতে পারিলে, সাধক চিরদিনের মত শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। তিনি যে অধ্যক্ষরূপে প্রকৃতির কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন তাহা গীতায় এইভাবে উক্ত হইয়াছে:—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয়। জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
মেট্রপলিটান কলেজ।

পঞ্চদশী।

ভূতবিবেক ৭২ শ্লোক হইতে ১০০ শ্লোক পর্য্যন্তের সমালোচনা।

এই ভূতবিবেকের প্রথমেই কথিত হইয়াছে যে অদ্বৈত সৎ পদার্থ পঞ্চভূত বিচার দ্বারা হৃদয়াঙ্গম হয়, এই জন্য পঞ্চভূত বিচার আবশ্যক। এক্ষণে কি প্রকারে পঞ্চভূত বিচারদ্বারা অদ্বৈত সৎপদার্থ হৃদয়াঙ্গম হইতে পারে তাহাই কথিত হইতেছে।—

ইতিপূর্ব্বে উপরোক্ত ভূতবিবেকের ৫৪ শ্লোক হইতে ৭১ পর্য্যন্ত শ্লোকের সমালোচনায় প্রদর্শিত হইয়াছে যে নিরাকার একমাত্র সত্য জ্ঞানই সৎ পদার্থ বা ব্রহ্ম, চৈতন্য, ঐ চৈতন্যোপরি ভাসমানা কল্পনারূপিণী মায়া (শক্তি) কর্ত্তৃক কল্পিত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভাসমান হয় ‡। প্রকৃতপক্ষে সত্যজ্ঞানের ছায়াবলম্বনে অব্যক্তা শক্তি এক একটী ব্যক্তভাবে পরিণত হইয়া আকাশ, বায়ু, তেজাদিরূপে ক্রমে বিকাশিত হয় ভাষান্তরে বলিতে হইলে প্রকৃত জ্ঞানের ছায়াবলম্বনে অব্যক্তা প্রকৃতি বিকৃতভাবে (অর্থাৎ আকাশাদি ভূত ও ব্রহ্মাণ্ডাদি ভৌতিক পদার্থ) প্রকাশিত বা ব্যক্ত হয়েন। যে জ্ঞান বা চৈতন্যে ভূত বা ভৌতিক জগৎ ভাসমান হয় সেই চৈতন্য বা জ্ঞানই সত্য। উপলব্ধভাবসমূহ (অর্থাৎ ভূত ও ভৌতিক জগৎ) বিকৃত বা মিথ্যা। ইতি পূর্ব্বে বিশদরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে যে মিথ্যা ভাব মিশ্রিত সত্যের ছায়াই জীব চৈতন্য। উহা ঐ বিকৃত ভাব সংসৃষ্ট অর্থাৎ ভৌতিক দেহ সংসৃষ্ট * হইয়া ঐ ভাবের মধ্যে (ভৌতিক দেহে) স্ফুরিত হওয়ায় তাহার নিকট ঐ বিকৃত ভাব সমূহ স্থূল জগদাকারে প্রকটিত এবং সত্যের ন্যায় উপলব্ধ হয়। উপরোক্ত বিকৃতভাবের প্রথম বিকাশই আকাশ অর্থাৎ শূন্য কিছুই নাই এইরূপ ভাবের উপলব্ধি। অতএব ঐ শূন্য বা আকাশ একটি ভাবের উপলব্ধি মাত্র হওয়ায় আকাশ যে সত্য পদার্থ নহে তাহা ইতিপূর্ব্বে (অর্থাৎ উপরোক্ত ৫৪ শ্লোক হইতে ৭১ শ্লোক পর্য্যন্তের সমালোচনা কালে) বিশদরূপে প্রদর্শিত ও প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে যুক্তি প্রমাণদ্বারা আকাশ মিথ্যা সৎ সত্য প্রমাণিত হইয়াছে সেই যুক্তি ও প্রমাণদ্বারা সৎ পদার্থ ভিন্ন পৃথক বায়ু, তেজ, জল, ক্ষিতি প্রভৃতি কোন ভূত বা ভৌতিক জগতের অস্তিত্ব নাই প্রমাণিত হইবেক। সত্য জ্ঞান অনন্ত তাহার সীমা নাই ঐ জ্ঞান গর্ভে বা জ্ঞানের মধ্যে যে ভাব কল্পিত বা স্ফুরিত হয় তাহা জ্ঞানের অন্তর্ভূত বা সীমাবদ্ধ কিন্তু, জ্ঞান তাহার অন্তর্ভূত বা সীমাবদ্ধ নহে। জীবের জ্ঞান যে সীমাবদ্ধ বলিয়া কথিত হয় তাহা প্রকৃত জ্ঞান নহে, জ্ঞানের ছায়াধারী, বিকৃত বুদ্ধি কর্ত্তৃক মায়াচ্ছন্ন জীবের নিকট নানাপ্রকার ভাবের বিকাশ হয় মাত্র, সত্য জ্ঞানের বিকাশ হয় না। যখন জীবের স্বভাবরূপ আবরণ ভেদ করিয়া সত্য জ্ঞানের বিকাশ হয় তখন ঐ ভাব সমূহ (অর্থাৎ ভূত ও ভৌতিক জগৎ) এবং তাহা-

‡ হিন্দুপত্রিকা ষষ্ঠ বর্ষ ষষ্ঠ খণ্ড ৮ম সংখ্যা ২২০ [illegible] দ্রষ্টব্য।

* কারণ সূক্ষ্ম স্থূল ত্রিবিধ শরীরই ভৌতিক দেহ।

দিগের জননী মায়া জ্ঞান গর্ভে বিলীন হইয়া যাওয়ায় জীবের জীবত্ব ঘুচিয়া শিবত্ব লাভ হয়। উপরোক্ত বর্ণনানুসারে মায়া শক্তি অনন্ত জ্ঞান ব্যাপিনী নহে এক দেশ বর্ত্তিনী। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে সত্তা জ্ঞানাবলম্বনে জগৎ কল্পনা কারিণী যে শক্তির বিকাশ হয় অর্থাৎ জ্ঞানের ছায়াবাহিনী যে অব্যক্তা শক্তি ব্যক্ত বা ভাসমানা হইয়া ভূত বা ভৌতিক জগদাকারে বিবর্ত্তিত হয় সেই শক্তির নামই মায়া।

অতএব মায়াশক্তি অনন্ত সত্তা জ্ঞানের ছায়াবলম্বিনী, সুতরাং অনন্ত জ্ঞান ব্যাপিনী নহে যে অব্যক্তা শক্তি ব্যক্ত ভাব (অর্থাৎ আকাশাদি ভাব রূপে প্রকটিত হয়েন সেই শক্তি কখন অনন্ত জ্ঞান ব্যাপিনী হইতে পারেন না বা অনন্ত সত্তা জ্ঞান কখন জগৎ কল্পনা কারিণী মায়া শক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে যে হেতু মায়ার অতীত সত্তা জ্ঞানই শুদ্ধ বুদ্ধ চৈতন্য কেবল সেই সত্তা জ্ঞানের উপরি ভাগে মায়া শক্তি ঐ জ্ঞানের ছায়াবলম্বনে একের পর অন্য ভাবরূপে স্তরে স্তরে প্রকটিত হয় মাত্র যেমন কল্পনারূপিণী মায়া শক্তি অনন্ত সত্তা জ্ঞানের এক দেশ ব্যাপিনী সেইরূপ ঐ কল্পনা শক্ত্যদ্ভূত ভাবরূপ শূন্য বা আকাশ সমগ্র শক্তি ব্যাপী নহে ঐ শক্তির অন্তর্গত এক দেশ ব্যাপী মাত্র। যদিও কল্পনা শক্তিই কল্পিত ভাবে বিবর্ত্তিত হয় তথাচ সমগ্র কল্পনা শক্তি কখন একটী কল্পিত ভাবে বিবর্ত্তিত ও প্রকটিত হইয়া নিঃশেষিত হয় না অতএব মায়ার এক দেশ ব্যাপী আকাশ—অর্থাৎ কল্পিত ভাব কল্পনা শক্তির এক দেশ ব্যাপী—প্রমাণিত হইল। আবার ঐ আকাশ ব্যতীত গতি বা বেগের প্রসার হইতে পারে না যেমন অন্তর্জগৎ অবকাশ (Vacant.) না থাকিলে কল্পনার বিস্তার বা তাহার গতির প্রসার হয় না বাহ্য জগতেও তদ্রূপ অবকাশ বিনা গতির উপলব্ধি অসম্ভব সুতরাং আকাশরূপ ভাবের মধ্যেই বায়ু প্রকল্পিত হয় ঐ বায়ু সমস্ত আকাশ ব্যাপী নহে ঐ আকাশের মধ্যে যথায় গতি (Motion.) উৎপন্ন হয় তথায় বায়ুর বিকাশ হয় অতএব বায়ু আকাশের একদেশ ব্যাপী গতি বিশিষ্ট কোন বস্তুর মধ্যে সংঘর্ষণ (Friction.) উপস্থিত হইলে উষ্ণতার বা তেজের বিকাশ হয় সুতরাং বায়ুর আণবিক সংঘর্ষণে উষ্ণতা বা তেজ বায়ুর মধ্যে ব্যাপী নহে বায়ুর মধ্যে যথায় আণবিক সংঘর্ষণ উপস্থিত হয় তথায় অগ্নি বা তেজের বিকাশ হয় ঐ তেজ বা অগ্নির মধ্যে অণু সকল শ্লথ ও দ্রবীভূত হওয়ায় ঐ তেজের মধ্য হইতে জল উৎপন্ন হয় অর্থাৎ উষ্ণতা হইতে বিয়োজিনী শক্তির বিকাশ হয় তৎপ্রভাবে যে সকল অণুশ্লথ ও দ্রবীভূত হয় তাহাই জলে পরিণত হয়। পূর্ব্ব সংঘর্ষণহেতু ঐ জলের মধ্য হইতে উষ্ণতা বা তৈজসগুণ বাষ্পীভূত এবং ঊর্দ্ধে বিকীরিত (Evapo-ruted.) হওয়ায় ঐ জলের—নিম্নাংশ শীতল ও আকর্ষণী শক্তি প্রভাবে মিলিত ও ঘনীভূত হইয়া ক্ষিতি বা মৃত্তিকায় পরিণত হয় এতাবতা প্রমাণিত হইতেছে যে আকাশের একাংশে বায়ু বায়ুর একাংশে [illegible]

হিন্দু-পত্রিকা ষষ্ঠ খণ্ড ষষ্ঠ পত্রের অষ্টম সংখ্যায় ২২৫ পৃষ্ঠা হইতে ২৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ১৩০৬ বঙ্গাব্দে অগ্রহায়ণ।

একাংশে জল, জলের একাংশে মৃত্তিকা পরিকল্পিত হইয়াছে। সত্য জ্ঞানই সৎ পদার্থ, সৎ অর্থে অস্তিত্ব যাহা চিরকাল আছে, এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন জ্ঞান বা চৈতন্য না থাকিলে কোন ভাবেরই বিকাশ হয় না অতএব চৈতন্য বা জ্ঞানই চির অস্তিত্ববান্. এ সত্য জ্ঞানাবলম্বনে যে যে ভাবের বিকাশ হয় সেই সেই ভাব এক একটী গুণের বিকাশক এ প্রথম ভাবের বিকাশই আকাশ বা অবকাশ এ আকাশে শব্দগুণ আছে কিন্তু সৎপদার্থে তাহা নাই ইহার তাৎপর্য্য এই যে চির অস্তিত্ববান্ চৈতন্য সমুদ্রে এক একটী ভাব বা গুণ ভাসমান হয় চৈতন্যই তাহা অনুভব করেন সুতরাং অনুভাবক বা জ্ঞাতা কখন অনুভূত বা জ্ঞাত পদার্থ নহেন এ ভাবময় পদার্থ চৈতন্য বা জ্ঞান সমুদ্রে ভাসমান হইয়া জ্ঞাতার নিকট অনুভূত হয়। যে চৈতন্যের শক্তি কর্ত্তৃক ভাবের বিকাশ হয় তাহাই চিচ্ছক্তি বা জ্ঞান শক্তি যে চৈতন্য বা জ্ঞানের নিকট ঐ ভাব অনুভাব হয় সেই জ্ঞানই জ্ঞাতা অতএব স্বয়ং চৈতন্যই—জ্ঞান ও জ্ঞাতা উহাই সৎ পদার্থ শব্দাদি গুণ চৈতন্যে ভাসমান হইয়া ঐ চৈতন্যের নিকট অনুভূত হয়।

যে সৎ পদার্থ অবলম্বনে শক্তির বিকাশ হয় ঐ শক্তি বিকাশের পূর্ব্বে নিষ্ক্রিয় সৎ বা সত্তামাত্রই থাকেন সেই সৎ বা সত্তাই নির্গুণ ব্রহ্ম। ঐ সৎ পদার্থে শক্তির বিকাশ হইলে চিৎ সমুদ্রেরও গুণময় হইয়া উঠে এ গুণময় চিৎ সমুদ্রই সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

যখন এ গুণময় চৈতন্য সমুদ্রে জ্ঞান বিকাশিকা ... যিকা বুদ্ধি ও ভাব বিকাশক সঙ্কল্পাত্মক মন, ভাসিয়া উঠে তখন ঐ মন কর্ত্তৃক সৃষ্টি কল্পনা সূচক এক একটী ভাবের বিকাশ হয় এবং বুদ্ধি কর্ত্তৃক তাহা উপলব্ধ ও সুব্যবস্থিত হয়। যে চৈতন্য, এভাব উপভোগ করেন সেই সমষ্টি চৈতন্যই জীবঘন হিরণ্যগর্ভ, ব্যষ্টি, চৈতন্যই তৈজস জীবাত্মা। এ হিরণ্যগর্ভরূপ পূর্ব্বোক্ত চিৎসমুদ্রে গুণ সকল ভাসমান ও স্থূল ভাবাপন্ন হইয়া কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড রূপে পরিণত হয়। নির্গুণ ব্রহ্ম নিরাকার কিন্তু সগুণ ব্রহ্ম ও জীব সাকার। ইহার তাৎপর্য্য এই যে সূক্ষ্ম চৈতন্যে যখন কোন ভাবের বিকাশ না হয় তখন চৈতন্য নিষ্ক্রিয় নির্গুণ কেবল অস্তিত্ব মাত্রে পর্য্যবসিত থাকেন যখন চৈতন্যে গুপ্ত বা নিদ্রিত ক্রিয়া শক্তি জাগরিত হয় তখন এ শক্তি প্রবর্ত্তকরূপে কার্য্য করেন বলিয়া প্রকৃতি নামে অভিহিত হয়েন এ প্রকৃতির মধ্যে স্বতঃই মহত্তত্ত্বের অর্থাৎ-সমষ্টি বুদ্ধি তত্ত্বের বিকাশ হয় এ মহত্তত্ত্ব ভাবময়মানসাকারে (Jdeal form এ) পরিণত হয় এবং প্রকৃতির গর্ভে নানাভাব প্রকটিত হয়। মনে করুন যখন আপনি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত থাকেন তখন কোন ভাবেরই বিকাশ থাকে না কিন্তু অব্যক্ত শক্তি কর্ত্তৃক নিদ্রোত্থিত হইলে স্মৃতিও জাগরিত এবং তৎসহ যে কোন প্রকার একটি মনোভাব (Idea.) অন্তরে গঠিত হইতে থাকে এবং তাহা মানসাকারে——পর্য্যবসিত হয় এ মানসাকার কখন নিরাকার নহে এ সূক্ষ্ম মানসাকারই স্থূল আকার বা রূপের আদর্শ অতএব উহা সাকার ঐ মানসিক ভাব বা মানসাকারের মধ্যে গুণের স্ফূর্ত্তি হয় গুণ ব্যতীত ভাবের

এবং ভাব ব্যতীত গুণের স্ফুরণ অসম্ভব, অবশ্যই নিম্নোল্লিখিত কালে আপনার মস্তিষ্ক মধ্যে মনোভাবের স্ফুরণ বা মানসিক ক্রিয়া হইতে থাকে এবং বুদ্ধি কর্ত্তৃক ঐ সকল ভাবের নিশ্চিত জ্ঞান বা উপলব্ধিও হয় কিন্তু স্বয়ং মস্তিষ্ক ঐ সকল ভাবের বা বোধের জনক নহে নিরাবলম্বন প্রকৃতির এবং প্রাকৃতিক পঞ্চভূতের ভৌতিক পদার্থের মধ্যেও মন বুদ্ধি আছে। অতএব চৈতন্য নাই ভাবের বা জনক, শক্তিই জননী, মস্তিষ্ক মন বুদ্ধি প্রকাশের যন্ত্র মাত্র ঐ মস্তিষ্ক স্নায়বীয় পদার্থ উহা দেহের উত্তমাংশ হইলেও দৈহিক পদার্থ। দেহ পিতা মাতার শুক্র শোণিত সংযোগে উৎপন্ন হয় ঐ শুক্র শোণিত অন্ন (খাদ্যদ্রব্য) উদ্ভিদ ও খনিজ প্রভৃতি পদার্থ হইতে, ঐ সকল পদার্থ ক্ষিতি জল তেজ বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন হয় আকাশ বা অবকাশ ব্যতীত কোন বস্তুর সংশ্লেষণ বিশ্লেষণ হইতে পারে না। যদি কোন বস্তুর মধ্যে ছিদ্র বা অবকাশ না থাকে তবে সেই বস্তুর যে রাসায়নিক বিশ্লেষণ অসম্ভব ইহা বোধহয় প্রমাণ করিতে হইবেক না যেমন একটী রেখাকে দুই বা বহু বিন্দে পরিণত করিতে হইলে ঐ উভয় বিন্দুর বা বিন্দু সমূহের মধ্যে ছেদ বা অবকাশ আবশ্যক সেইরূপ কোন বস্তু বিশ্লেষণ দ্বারা দুই বা বহু উপাদানে পরিণত করিতে হইলে ঐ ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের পার্থক্যসূচক ব্যবচ্ছেদ অবশ্যই আবশ্যক উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক বস্তুর মৌলিক উপাদান ক্ষিত্যপতেজ মরুৎ হইতেছে ঐ চতুর্বিধ উপাদানের মধ্যে ছিদ্র বা আকাশ আছে অতএব সমস্ত বস্তুই পঞ্চভূতোৎপন্ন পদার্থ যখন এই পঞ্চভূত বা পঞ্চ ভৌতিক পরমাণু সমষ্টি হইতে সমস্ত জগৎ ও জাগতিক পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে তখন জীবের প্রাণ মন প্রভৃতির সূক্ষ্ম উপাদান যথাক্রমে শুক্র শোণিতের মধ্যে এবং ঐ শুক্র শোণিতের মূল উপাদান পঞ্চভূতের মধ্যে লুক্কায়িত আছে বীজের মধ্যে বৃক্ষ না থাকিলে বীজ হইতে বৃক্ষের বিকাশ অসম্ভব এবং অবৈজ্ঞানিক। ঐ জীবের দৈহিক জৈবিক এবং মানসিক উপাদান এরূপ অবিচ্ছিন্ন ওতপ্রত ভাবে সংসৃষ্ট যে তাহা কোন ক্রমে পৃথক বা বিশ্লেষ করা যায় না দেহের সপ্ত ধাতুর মধ্যে জীবাণুসকল ওতপ্রতভাবে আছে অনুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা এক বিন্দু রক্তের মধ্যে সহস্র জীবাণু দৃষ্ট হয় অথবা ঐ সহস্র জীবাণুসমষ্টিই একবিন্দু রক্ত, জীবাণুর ক্রিয়া রুদ্ধ হইলে বায়ুর গতি রোধ, উষ্মতার অভাব ও ধাতু বিকৃত হয় এবং রক্ত জলীয় ভাগ মাত্র পর্য্যবসিত হইয়া শরীরের পোষণ ক্রিয়াও রহিত হয়। অন্ন হইতে জৈবোপাদান প্রস্তুত হয় এবং তদ্দ্বারা ধাতু সকল পুষ্ট, শরীর পোষিত ও বলশালী হয়। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন যেমন বীজের মধ্যে একজাতীয় সূক্ষ্ম আটান পদার্থ (যাহাকে প্রটোপ্লজম্ কহে) থাকায় সরসমৃত্তিকার মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত এবং পোষিত হইয়া ক্রমে বৃক্ষাকারে পরিণত হয় সেইরূপ শুক্র শোণিতের মধ্যে জীবাণু থাকায় মাতৃগর্ভে জীবদেহ অঙ্কুরিত ও পুষ্ট হইয়া মনুষ্য গো প্রভৃতি আকারে বিবর্ত্তিত হয়) এখন বুঝিলাম যে পঞ্চভূতের মধ্যে জীবাণু বা জৈবোপাদান অথবা প্রকৃতির মধ্যে পোষণ [illegible]

জৈবোপাদান বা পোষণশক্তি দ্বারা দেহ পুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়; কিন্তু জীবের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়, হস্ত-পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়, প্লীহা, যকৃৎ, অণ্ড, ধমনী, স্নায়ু ও মস্তিষ্ক প্রভৃতি দৈহিক ও মানসিক যন্ত্র (Organs) প্রভৃতি যেখানে যাহা আবশ্যক, তাহার গঠন এবং তন্মধ্যে শারীরিক শক্তি এবং মানসিক জ্ঞানের বিকাশ, মস্তিষ্ক মধ্যে কল্পনা, চিন্তা, বিবেক, যুক্তি প্রভৃতির কার্য্য-প্রণালী ইত্যাদি কেবল জৈবোপাদান বা প্রকৃতির পোষণশক্তি কর্তৃক সম্পন্ন হইতে পারে না। সংকল্পাত্মক মন এবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ব্যতীত উপরোক্ত মত সৃষ্টিক্রিয়া অসম্ভব; এতাবতা সাব্যস্ত হইতেছে, প্রকৃতির মধ্যে মানসাকারে (Ideal fom এ) সৃষ্টি সূক্ষ্মভাবে কল্পিত হইয়া প্রকৃতির পোষণশক্তি কর্তৃক স্থূলে পরিণত হয়। প্রকৃতির মধ্যে যাহা আছে, প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যেও তাহা আছে। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে চৈতন্য সূক্ষ্ম মানসাকারে সূক্ষ্মরূপে কল্পিত হইয়া স্থূলে পরিণত হয়। সমুদ্র যেমন আবর্ত্ত, ফেন ও বুদ্‌বুদে পরিণত হয়, তদ্রূপ সৎ পদার্থই সূক্ষ্ম মানসাকারে পরিণত হইয়া ভূত ও ভৌতিক জগদাকারে বিবর্ত্তিত হয়েন। যেমন সমুদ্রের স্রোত আবর্ত্ত মধ্যে নিপতিত, ঘূর্ণিত ও সন্দীভূত হইয়া ফেন-বুদ্‌বুদে পরিণত হয় এবং ঐ বুদ্‌বুদ ও ফেনরাশি ক্রমে ঘনীভূত হওয়ায় সমুদ্র-গর্ভে মৃত্তিকার সঞ্চার হইতে থাকে, পরে উহা দ্বীপরূপে বিবর্ত্তিত হয়।

সেইরূপ চিৎশক্তি মায়াবর্ত্তে নিপতিত ও ঘূর্ণিত হইয়া মানসাকারে—পরে সূক্ষ্মাকারে [illegible] ভৌতিক পরমাণুময় সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হয়েন এবং তাহাই ঘনীভূত হইয়া স্থূল জগদাকারে বিবর্ত্তিত হয়েন। অনেকেই অবগত আছেন যে, হাইড্রজন্ ও অক্সিজন, এই দুই জাতীয় অদৃশ্য বাষ্প যন্ত্র-বিশেষে একত্রিত করিয়া তন্মধ্যে তড়িৎ পাস্ করিলে, ঐ অদৃশ্য বাষ্প দ্রব পদার্থে অর্থাৎ জলাকারে পরিণত হয় এবং ক্রিয়া-বিশেষদ্বারা ঐ জল এক এক খানি বরফে পরিণত করা যাইতে পারে; অতএব অদৃশ্য সূক্ষ্ম পদার্থ হইতে স্থূল পদার্থের বিকাশ অবৈজ্ঞানিক নহে। যেমন 'আবর্ত্ত, ফেন, বুদ্ বুদ্, জল ভিন্ন স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নহে এবং ঐ আবর্ত্ত মধ্যে উহাদিগের মৃণ্ময় দ্বীপে বিবর্ত্তনও জলের বিকার মাত্র, সেইরূপ মানসাকারে কল্পিত (পঞ্চতন্মাত্র বা পাঞ্চভৌতিক পরমাণুময়) সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ড চৈতন্য ব্যতীত স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নহে এবং উহাদিগের এই দৃশ্য স্থূল জগদাকারে বিবর্ত্তনও চৈতন্যের বিকার মাত্র; অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানের নিকট ভ্রান্ত বা স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ মাত্র।

এতাবতা প্রমাণিত হইতেছে যে, আবর্ত্ত, ফেন, বুদ্ বুদ্ প্রভৃতির ন্যায় পঞ্চভূত বা ভৌতিক জগৎ মিথ্যা। পরমার্থ-জ্ঞানে ভূত ও ভৌতিক জগৎ মিথ্যা হইলেও, লৌকিক ব্যবহারে মিথ্যা নহে; যেহেতু পরমার্থজ্ঞান লাভ করিতে হইলে সাধনাদ্বারা উহা লাভ করিতে হয়। ঐ সাধনা কর্ম্মও বিচারমূলক এবং তাহাতে ভূত ও ভৌতিক পদার্থ অবলম্বন ব্যতীত সিদ্ধিলাভ করা যাইতে পারে না; অতএব সাধনাদ্বারা বিষয় জ্ঞান, পরমাত্ম-জ্ঞানে এবং জীবচৈতন্য অনন্তব্রহ্মচৈতন্যে লীন না হইলে, ভূত বা ভৌতিক জগৎ যে

মিথ্যা, ইহা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি হয় না। ঐরূপ পরমাত্ম জ্ঞানের উদয় হইলে, জীব জীবন্মুক্ত হয় এবং ভাবী কর্ম্মের বীজ নষ্ট ও বিদেহ-মুক্তি লাভ হয়। ঐ মুক্ত পুরুষের দেহ-ত্যাগ যেরূপেই হউক, তাঁহার পরমাত্ম-জ্ঞানের ধ্বংস হয় না। সাধনা দ্বারা পরমাত্ম-অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, এই জগৎ মিথ্যা—মায়াময় বিবেচনা করিয়া তৎপ্রতি সর্ব্বদা অনাস্থা প্রদর্শন আবশ্যক। যাহা সর্ব্বদা চিন্তা করা যায় এবং যুক্তি ও বিবেক দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, কার্য্যও তদনুবর্ত্তী হয়। একাগ্র-চিত্তে চিন্তা করিতে করিতে মনও তদাকার ধারণ করে এবং অন্তরে তাহা বদ্ধমূল হয়। দেহ-ত্যাগ দ্বারা ঐ বদ্ধমূল অদ্বৈত জ্ঞান নষ্ট হয় না। এজন্য সর্ব্বদা দ্বৈত জ্ঞানের প্রতি অবজ্ঞা ও শোকতাপপূর্ণ মায়াময় মিথ্যা জগতের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন আবশ্যক; তদ্দ্বারা হৃদয়ে শান্তিলাভ ও অদ্বৈত জ্ঞান বদ্ধমূল হয়। অতএব পঞ্চভূত বিচার দ্বারা যে ভূত এবং ভৌতিক জগৎ মিথ্যা, একমাত্র পরমাত্মজ্ঞানই সত্য, তাহা প্রমাণিত হইল।

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পঞ্চদশী

পঞ্চকোষ বিবেক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গুহাহিতং ব্রহ্ম যত্তৎ পঞ্চকোষ বিবেকতঃ।
বোদ্ধুং শক্যং ততঃ কোষপঞ্চকং প্রবিবিচ্যতে ॥

তৈত্তিরীয়োপনিষত্তাৎপর্য্যব্যাখ্যানরূপং পঞ্চকোষ বিবেকস্য প্রকরণমারাভমাণ গুহাহিতমিতি। যো বেদনিহিতং গুহায়াং পরমব্রহ্মন্নিত্যাদি শ্রুত্যা গুহাহিতমে—নাভিহিতং যদ্ ব্রহ্মাস্তি তদ্ গুহা শব্দ—বাচ্যানুময়াদি কোষপঞ্চকবিবেকেন জ্ঞাতুং শক্যতে যতঃ ততস্তেষাং কোষাণাং পঞ্চকং প্রত্যাগাত্মনঃ সকাশাত্ বিভজ্য প্রদর্শত ইত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ। গুহাগত যে ব্রহ্ম, তাহা পঞ্চকোষ-বিবেকদ্বারা বুঝা যায়; তদ্ধেতু পঞ্চ-কোষ বিচার করা আবশ্যক।

তাৎপর্য্যার্থ। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ পুরুষ পঞ্চ-কোষ রূপ গুহাগত অদ্বৈত পরম ব্রহ্মকে জানিয়া, সেই অনাদি সর্ব্বময় পরম পিতা পরম পুরুষের সহিত একভাবে অনির্ব্ব-চনীয় অতুল আনন্দ ভোগ করিতে থাকে। কিন্তু "গুহা" শব্দবাচ্য পঞ্চকোষ বিবেকদ্বারা তাহারই স্বরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়। অতএব এইক্ষণ সেই পঞ্চকোষবিবেক কথিত হই-তেছে; যেহেতু পঞ্চকোষরূপ গুহাগত ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান আবশ্যক হইলে, সেই পঞ্চকোষ বিচার আবশ্যক।

দেহাদভ্যন্তরঃ প্রাণঃ প্রাণাদভ্যন্তরং মনঃ।
ততঃ কর্ত্তা ততো ভোক্তা গুহা সেয়ং প[illegible] ॥ ২ ॥

নন্বেবং গুহা যস্যা নিহিতং ব্রহ্ম কোষপঞ্চকবিবেকেনাবধুধ্যাত ইত্যাশঙ্ক্য শ্রুত্যা গুহা শব্দেন বিবক্ষিতমর্থমাহ দেহাদভ্যন্তর প্রাণ ইতি। দেহাদন্নময়াৎ প্রাণঃ প্রাণময়ঃ অভ্যন্তরঃ আন্তরঃ। প্রাণাৎ প্রাণময়াৎ মনঃ মনোময়ঃ অভ্যন্তরঃ আন্তরঃ। ততো মনোময়াৎ কর্ত্তা—বিজ্ঞানময়ঃ আন্তরঃ ইত্যনুষজ্যতে। ততো বিজ্ঞানময়াৎ ভোক্তা আনন্দময়ঃ সোঽপি পূর্ব্ববদান্তর ইত্যর্থঃ। সেযং অন্নময়াদ্যানন্দময়ান্তানাং পরম্পরা গুহা শব্দে নোচ্যত ইত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ। দেহের অভ্যন্তরে প্রাণ, প্রাণের অভ্যন্তরে মন, তদভ্যন্তরে কর্ত্তা এবং তদভ্যন্তরে ভোক্তা, এই সকলই গুহা-পরম্পরা।

তাৎপর্য্যার্থ। এই অন্নময় কোষের অভ্যন্তরে প্রাণময় কোষ আছে। সেই প্রাণময় কোষের অভ্যন্তরে মনোময় কোষ, মনোময় কোষের অভ্যন্তরে বিজ্ঞানময় কোষ এবং সেই বিজ্ঞানময় কোষের অভ্যন্তরে আনন্দময় কোষ আছে। এইরূপে পরম্পরা ক্রমে বর্ত্তমান অন্নময়াদি পঞ্চকোষ গুহা শব্দের বাচ্য, অর্থাৎ এইস্থলে "গুহা" শব্দদ্বারা অন্নময়াদি পঞ্চকোষকে বুঝাইতেছে।

পিতৃ ভুক্তান্নজাদ্ বীর্য্যাজ্জাতোঽন্নেনৈব বর্দ্ধতে। দেহঃ সোঽন্নময়ো নাত্মা প্রাক্‌চোর্দ্ধ্বং তদভাবতঃ॥৩

ইদানীমন্নময়স্য স্বরূপং তদনাত্মত্বশ্চ দর্শয়তি পিতৃভুক্তান্নজাৎইতি। পিতৃভুক্তান্নজাৎ পিতৃ[illegible]ভুক্তাদ্‌ব্রীহ্যাদি লক্ষণাদন্নাজ্জায়মানিং যদ্ বীর্য্যং তস্মাদ্ বীর্য্যাদ্ যোদেহঃ জাতঃ সশ্চ, জননানন্তরং ক্ষীরাদ্যন্নেনৈব বর্দ্ধতে সদেহোঽন্নময়োঽনস্য বিকারং স আত্মা ন ভবতি। কুতঃ ইত্যত আহ প্রাক্‌চোর্দ্ধ্বমিতি। জন্মনঃ প্রাক্‌ মরণাদূর্দ্ধ্বঞ্চ তদভাবিতত্বস্য দেহস্য-অভাবাদিত্যর্থঃ। দেহ আত্মা ন ভবতি কার্য্যত্বাৎ ঘটাদিবৎ—ইতি ভাবঃ।

বঙ্গানুবাদ। পিতৃ মাতৃ ভুক্ত অন্ন হইতে বীর্য্য উৎপন্ন হয়; সেই বীর্য্যোৎপন্ন দেহ অন্নদ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয়; সেই অন্নময় দেহ পূর্ব্বে ছিল না; পরেও থাকিবে না, তদ্ধেতু উহা আত্মা নহে।

তাৎপর্য্যার্থ। পূর্ব্ব শ্লোকে পঞ্চকোষের নাম মাত্র উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণে সেই কোষপঞ্চকের প্রত্যেকের স্বরূপ ও তাহাদিগের অনাত্মত্ব প্রকাশ মানসে প্রথমতঃ অন্নময় কোষের স্বরূপ ও তাহার অনাত্মত্ব নিরূপণ করিতেছেন। পিতা মাতা যে সকল অন্ন আহার করেন, সেই সকল অন্ন পরিপাক পাইয়া, পরিণামে শুক্র-শোণিত হইতে শরীর উৎপন্ন-হইয়া, অন্নময় রসদ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সেই শরীর—অর্থাৎ স্থূল দেহ, এইরূপে অন্ন হইতে উৎপন্ন হইয়া অন্নদ্বারাই বর্দ্ধিত হয় বলিয়া সেই স্থূল দেহকে অন্নময় কোষ বলে, কিন্তু এই স্থূল দেহরূপ অন্নময় কোষ জীবের উৎপত্তির পূর্ব্বেও ছিল না এবং মরণের পরেও থাকিবে না, অতএব এই কোষকে নিত্যশুদ্ধ অবিনাশী বা আত্মার স্বরূপ বলা যায় না, অর্থাৎ উহা অনিত্য।

পূর্ব্বজন্মন্যসত্ত্বে তজ্জন্ম সম্পাদয়েৎ কথম্।

ভাবিজন্মন্যসৎকর্ম্ম স ভুঞ্জীতেহ সঞ্চিতম্ ॥ ৪

এতদ্দেহরূপস্যাত্মনঃ পূর্ব্বস্মিন্ জন্মনি অসত্ত্বাৎ এতজ্জন্ম-হেত্বদৃষ্টাসম্ভবেঽপি অস্য জন্মনোঽপ্যঙ্গীক্রিয়মানত্বাদকৃতাভ্যাগমঃ প্রসজ্যেত তথা ভাবিজন্মন্যপি অস্য দেহরূপস্যাত্মনোঽসত্ত্বাদভাবাদিহানুষ্ঠিতয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ ফলভোক্তৃত্বভাবেন ভোগমন্তরে-ণাপি কর্ম্মক্ষয় প্রসজ্যেতায়ং কৃতনাশ এবং অকৃতভ্যাগমকৃতনাশরূপ বাধক সম্ভাবাদাত্মনঃ কার্য্যত্বং নাঙ্গীকর্ত্তব্যমিতিভাবঃ।

বঙ্গানুবাদ। পূর্ব্বজন্ম অভাবহেতু তাহার কি প্রকারে জন্ম হইতে পারে? ভাবী জন্মের অভাবহেতু ইহজন্মের কর্ম্মফল ভোগ অসম্ভব।

তাৎপর্য্যার্থ। যদি বল, উৎপত্তি-বিনাশশালী স্থূল দেহ অনিত্য হইলেও তাহাকে আত্মা স্বীকার করিলে হানি কি আছে? তদ্বিষয়ের প্রকৃত মীমাংসা করিতেছেন,—পূর্ব্ব জন্মে যে স্থূল দেহ অসৎ ও অনিত্য ছিল, ইহজন্মে সেই অনিত্য স্থূল দেহের কিপ্রকারে জন্ম হইতে পারে? যে বস্তু একবার নষ্ট হইয়া গিয়াছে, পুনর্ব্বার তাহার জন্ম কখনই হইতে পারে না। তবে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলভোগার্থ ইহকালে জন্ম হইয়া থাকে, অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মসঞ্চিত কর্ম্মভোগের অনুরোধ ব্যতিরেকে কাহারও ইহকালে জন্মগ্রহণ সম্ভব হয় না। আর পর জন্মে যে পদার্থ অসৎ হইবে, সে ইহকালে যে সঞ্চিত কর্ম্মফল ভোগ করিবে, তাহাও অসম্ভব। কারণ জন্মান্তরের কারণীভূত কর্ম্ম সম্পাদন করিবার নিমিত্তই পুনরায় দেহ পরিগ্রহ করিয়া ইহজন্মে পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়।

পূর্ণো দেহে বলং যচ্ছন্নক্ষাণাং যঃ প্রবর্ত্তকঃ।
বায়ুঃ প্রাণময়ো নাসাবাত্মা চৈতন্য বর্জ্জনাৎ ॥৫

এবমন্নময় কোষস্যানাত্মত্বং প্রদর্শ্য প্রাণময় কোষ স্বরূপং তদনাত্মত্বঞ্চ দর্শয়তি পূর্ণো দেহে বলমিতি। যো বায়ুঃ দেহে পূর্ণঃ পাদাদি মস্তক পর্য্যন্তং ব্যাপ্তঃসন্ বলং যচ্ছন্ ব্যানরূপেণ সামর্থ্যং প্রযচ্ছন্নক্ষাণাং চক্ষুরাদীনামিন্দ্রিয়াণাং প্রবর্ত্তকঃ প্রেরকো বর্ত্ততে স বায়ুঃ প্রাণময় ইত্যুচ্যতে। অসাবপ্যাত্মা ন ভবতি। জড়ত্বাৎ ঘটবদিতিভাবঃ।

বঙ্গানুবাদ। দেহে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত যে বায়ু দেহের বল প্রদান করে এবং ইন্দ্রিয়গণের প্রবর্ত্তক হয়, সেই বায়ু প্রাণময় কোষ; এ বায়ু চৈতন্যাভাব হেতু আত্মা নহে।

তাৎপর্য্যার্থ। এইরূপে স্থূল দেহরূপ অন্নময় কোষের অনাত্মত্ব প্রতিপাদন করিয়া প্রাণময় কোষের অনাত্মত্ব ও স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন। যে প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু অন্নময় কোষরূপ শরীরের বলাধান করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয় গ্রহণে নিয়োজিত করে, সেই পরিপূর্ণ স্বভাব বিশিষ্ট প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুকে প্রাণময় কোষ বলে। সেই প্রাণময় কোষকেও আত্মা বলা যায় না। যেহেতু সেই প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু জড় পদার্থ, তাহাদিগের চৈতন্য নাই।

অহন্তাং মমতাং দেহে গৃহাদৌ চ

কামাদ্যাবস্থয়া ভ্রান্তো নাসাবাত্মা মনোময়ঃ ॥ ৬

ইদানীং মনোময়স্বরূপ প্রদর্শনপূর্ব্বকং তস্যাপ্যনাত্মত্বমাহ অহন্তাং মমতামিতি। দেহে অহন্তাম্ অহন্তাবং গৃহাদৌ মমতাং মদীয়ত্বাভিমানংচ যঃ করোতি অসৌ মনোময় আত্মা ন ভবতি। কুত ইত্যত আহ কামাদ্যাবস্থয়া ভ্রান্ত ইতি হেতু দর্শিতং বিশেষণং কাম-ক্রোধাদি বৃত্তিমত্ত্বে—নানিয়ত স্বভাবত্বাদিত্যর্থঃ। তথাচ মনোময় আত্মা ন ভবতি বিকারিত্বাদ্দেহবদিতি ভাবঃ।

বঙ্গানুবাদ। দেহ আমি,গৃহাদি আমার, যে বোধ করে এবং যে কামাদি অবস্থাদ্বারা ভ্রান্ত, সেই মনোময় আত্মা নহে।

তাৎপর্য্যার্থ। এইক্ষণ মনোময় কোষের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া তাহার অনাত্মত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। অহঙ্কারের বশীভূত যে মন, তাহাকে মনোময় কোষ বলে। সেই মন ভ্রান্তিজ্ঞানের বাধ্য হইয়া অন্নময় কোষ স্বরূপ শরীরকে অহংজ্ঞান করে এবং পুত্র মিত্র-গৃহ-ধনাদিরূপ অসার সংসারে আত্মবোধ করে, কিন্তু সেই মনোময় কোষকেও আত্মা বলা যায় না। যেহেতু কাম-ক্রোধাদি বৃত্তিদ্বারা সেই মনোময় কোষের বিকার জন্মিয়া থাকে। আত্মা নির্ব্বিকার ও অভ্রান্ত, তাহার কোন কারণে বিকার হয় না বা ভ্রান্তি-জ্ঞানও জন্মে না। সুতরাং ভ্রান্ত ও বিকৃত পদার্থ মনোময় কোষ কখনই আত্মা হইতে পারে না।

লীনা সুপ্তৌ বপুর্ব্বোধে ব্যাপ্নুয়াদানখাগ্রগা।

চিচ্ছায়োপেতধীর্নাত্মা বিজ্ঞানময় শব্দভাক্। ৭

অনন্তরং কর্তৃ শব্দাবাচ্যস্য বিজ্ঞানময়স্য স্বরূপং প্রদর্শয়ন্ তদনাত্মত্বং দর্শয়তি লীনাসুপ্তাবিতি। যা চিচ্ছায়োপেতা ধীঃ চিদাভাসসহিতা বুদ্ধিঃ সুপ্তৌ সুষুপ্তিকালে লীনা বিলীনা সতী বোধে জাগরণকালে আনখাগ্রগা নখাগ্র পর্য্যন্তং বর্ত্তমানা সতী বপুঃ শরীরং ব্যাপ্নুয়াৎ সংব্যাপ্য বর্ত্ততে সা বিজ্ঞানময় শব্দভাক্ বিজ্ঞানময় শব্দেনোচ্যমানা অসাবপ্যাত্মা অসৌ-অপি আত্মা ন ভবতি। বিলয়োৎপত্তিমত্ত্বাৎ ঘটাদিবদিত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ। যে সুপ্তিকালে লীনা জাগরণ কালে নখাগ্র পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত থাকে, সেই চিচ্ছায়াবিশিষ্ট বুদ্ধিকে বিজ্ঞানময় কোষ কহে। এ বিজ্ঞানময় কোষ আত্মা নহে।

তাৎপর্য্যার্থ। এইক্ষণ বিজ্ঞানময় কোষের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া তাহার অনাত্মত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। যে বুদ্ধি সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানদ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকে এবং পুনরায় জাগ্রদবস্থায় নখাগ্র পর্য্যন্ত সর্ব্ব শরীর ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে, সেই বুদ্ধিকে বিজ্ঞানময় কোষ বলে, এই বুদ্ধি চৈতন্যের ছায়াবিশিষ্ট। উক্ত প্রকারে এই বুদ্ধির উৎপত্তি-বিনাশ হয়, এই নিমিত্ত ইহাকে আত্মা বলা যাইতে পারে না। যদি উৎপত্তি বিনাশ বা প্রলয়শীল পদার্থকে আত্মা বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে ঘটাদি অন্য পদার্থকেও আত্মা বলিতে পার।

কর্ত্তৃত্বকরণত্বাভ্যাং বিক্রিয়েতান্তরিন্দ্রিয়ম্।

বিজ্ঞান মনসী অন্তর্ব্বহিশ্চৈতে,
পরস্পরম্। ৮

মন্তু মনোবুদ্ধ্যারন্তঃকর ত্বা বিশেষাৎ মনোময় বিজ্ঞানময় স্বরূপেণ কোষদ্বয় কল্প-নানুপপন্না ইত্যাশঙ্ক্য কর্ত্তৃত্বকরণত্বাভ্যাং ভেদসদ্ভাবাৎ ঘটত এব মনোময়ত্বাদি ভেদ ইত্যাহ কর্ত্তৃত্বকরণত্বাভ্যামিতি। অন্তরি-ন্দ্রিয়মন্তঃকরণং কর্ত্তৃত্ব করণত্বাভ্যাং কর্ত্তৃ-রূপেণ করণরূপেণচ বিক্রিয়েত পরিণমত ইত্যর্থঃ। এতৈ কর্ত্তৃকরণে বিজ্ঞানমনসী বিজ্ঞানমনঃ শব্দ বাচ্যে ভবতঃ। এতেচ পরস্পরমন্তর্ব্বাহ্য ভাবেন বর্ত্তেতে অতঃ কোষদ্বয়মুপপন্নত ইত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ। কর্ত্তৃত্ব ও করণত্ব দ্বারা অন্তর-ইন্দ্রিয় বিকৃত হয়—বিজ্ঞান অন্তর মন বাহ্যে পরস্পর বিকৃত হয়।

তাৎপর্য্যার্থ। মন এবং বুদ্ধি, উভয়ই অন্তঃকরণ হইতে বিভিন্ন হইলেও, সামান্যতঃ উক্ত পদার্থদ্বয়ের ঐক্য প্রতিপন্ন হয়। অতএব এইক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক যে, মনোময় কোষ ও বিজ্ঞানময় কোষের পৃথক্ নির্ণয়ের তাৎপর্য্যার্থ কি? যদি উভয়ই এক পদার্থ হইল, তবে পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ করিলেন কেন? উভয় কোষের পৃথক্ নির্ণয়ের তাৎপর্য্য এইযে, একই অন্তঃকরণ কর্ত্তৃত্বরূপে ও করণত্বরূপে প্রকাশ পায়। বুদ্ধি কর্ত্তৃত্বরূপে বিকৃত হইয়া বিজ্ঞান-ময় শব্দে অভিহিত হয় এবং মন বাহ্যেতে করণরূপে বিকৃত হইয়া মনোময় কোষ শব্দের বাচ্য হয়। আপাততঃ উভয়ের একত্বরূপে প্রতীতি হইলেও, কর্ত্তৃত্ব ও কর-ণত্ব রূপে বিভিন্নতা আছে।

কাচিদন্তর্ম্মুখী বৃত্তিরানন্দ প্রতিবিম্ব-
ভাক্।
পুণ্যভোগে ভোগশান্তৌ নিদ্রা-
রূপেণ লীয়তে। ৯

কাদাচিত্কত্বতো নাত্মা স্যাদানন্দ-
ময়োঽপ্যয়ম্।
বিম্বভূতো য আনন্দ আত্মাসৌ
সর্ব্বদা স্থিতে ॥ ১০

ইদানীং ভোক্তৃ শব্দ বাচ্যস্যানন্দময়স্যা-নান্দত্বং দর্শয়িতুং তস্য স্বরূপমাহ কাচিদন্ত-র্ম্মুখাবৃত্তিরিতি। পুণ্যভোগে পুণ্যকর্ম্ম-ফলানুভব কালে কাচিদ্ধীবৃত্তিরন্তর্ম্মুখী সতী আনন্দ প্রতিবিম্ব ভাক্ অন্তঃস্বরূপস্য আনন্দস্য প্রতিবিম্বং ভজতে সৈব ভোগ-শান্তৌ পুণ্যকর্ম্মফলভোগোপরমে সতি নিদ্রা রূপেণ লীয়তে বিলীনা ভবতি সা বৃত্তি-রানন্দময় ইত্যভিপ্রায়ঃ।

অস্যানাত্মত্বমাহ কাদাচিৎ কত্বতইতি। অথমানন্দময়োঽপি কাদাচিৎকত্বাৎ আত্মা ন স্যাদভ্রাদি পদার্থবৎ ইত্যর্থঃ। নন্বেবমানা-নামানন্দ ময়াদীনাং সর্ব্বেষাম্ আত্মত্ব নিবাশে নৈরাত্ম্যং প্রসজ্যেত ইত্যাশঙ্ক্যাহ বিম্বভূতো য ইতি। বুদ্ধ্যাদৌ প্রতিবিম্বতয়া অবস্থি-তস্য প্রিয়াদি শব্দ বাচ্যস্যানন্দময়স্য বিম্বভূতঃ কারণভূতো য আনন্দ অসাবেবাত্মা অসৌ এব আত্মা ভবতি কুত ইত্যাত আহ সর্ব্বদা স্থিতে-রিতি। নিত্যত্বাদিত্যর্থঃ বিবাদাধ্যাসিত আনন্দ আত্মা ভবিতুমর্হতি নিত্যত্বাৎ য আত্মা ন ভবতি নাসৌ নিত্যো যথা দেহাদিঃ। গগনাদেরুৎপত্তিমত্তেনানিত্য[illegible] ত্বেতিভাবঃ।

বঙ্গানুবাদ। যে অন্তর্মুখী বৃত্তি পুণ্য-ভোগকালে আনন্দের প্রতিবিম্ববিশিষ্ট হয় এবং ভোগান্তে নিদ্রারূপে বিলীনা হয়, তাহা-কেই আনন্দময় কোষ কহে।

আনন্দময় কোষও আত্মা নহে; উহা অন্নাদিবৎ—উহার বিম্বভূত যে আনন্দ, সেই আনন্দই নিত্য আত্মা রূপে স্থিত।

তাৎপর্য্যার্থ। আনন্দময় কোষকে ভোক্তা বলা যায়, এ ভোক্তৃ শব্দবাচ্য আনন্দ-ময় কোষের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া তাহার অনা-ত্মত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক পরমাত্মার স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন। যে বুদ্ধিবৃত্তি পুণ্যকর্ম্মের ফল-ভোগ কালে আত্মার অন্তর্গত সুখ স্বরূপ হইয়া সেই চিদানন্দময় আত্মাস্বরূপের প্রতি-বিম্ববিশিষ্ট হয় এবং ভোগাবসান কালে নিদ্রারূপা প্রকৃতিতে লীন থাকে, সেই আন্ত-রিক বুদ্ধিবৃত্তিকে আনন্দময় কোষ বলিয়া থাকে। এই আনন্দময় কোষ ক্ষণভঙ্গুর, চিরকালস্থায়ী নহে। এই নিমিত্ত উক্ত আনন্দময় কোষকে আত্মা বলাযাইতে পারে না। যদি প্রত্যক্ষীভূত অন্নময় কোষাদির মধ্যে কোন একটীকেও আত্মা বলিয়া স্বীকার না করিলে, তবে আত্মাও স্বীকার করিও না; এই আশঙ্কায় আত্মার যথার্থ স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন। যিনি অন্নময়াদি পঞ্চ কোষের অতিরিক্ত আনন্দময়ের প্রতিবিম্ব-ভূত সৎস্বরূপ অখণ্ড চিদানন্দময় বুদ্ধ্যাদির আশ্রয়, তিনিই আত্মা। সেই আত্মা নিত্য দেহাদির ন্যায় তাঁহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই।

বৈশেষিক দর্শন।

প্রথম অধ্যায়, প্রথম আহ্নিক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

দ্রব্যাণাং দ্রব্যং কার্য্যং সামান্যং।২৩

পদব্যাখ্যা। দ্রব্যাণাং—দুই কিম্বা বহু অবয়বরূপ দ্রব্যের। দ্রব্যং—অবয়বিস্বরূপ দ্রব্য। কার্য্যং—জন্য। সামান্যং—এক।

অনুবাদ। দুইটী অবয়ব হইতে অথবা ততোধিক অবয়বসমষ্টি হইতে একটী অব-য়বী স্বরূপ দ্রব্য জন্মে।

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, একটী পদার্থে নানাকার্য্যের আরম্ভকত্ব আছে। এক্ষণে এক জাতীয় একাধিক পদার্থে যে একটি মাত্র কার্য্যের আরম্ভকত্ব থাকে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। দুইখানি কপালের সংযোগে যেমত একটি মাত্র ঘট জন্মে, তদ্রূপ কতকগুলি তন্তু-সমষ্টি হইতে একখানা মাত্র বস্ত্র উৎপন্ন হয়। এইরূপে জন্য দ্রব্য মাত্রেই দুই বা ততোধিক অবয়বা-শ্রিত হইয়াথাকে।

গুণবৈধর্ম্ম্যান্ন কর্ম্মণাং কর্ম্ম ॥ ২৪

পদব্যাখ্যা। গুণবৈধর্ম্ম্যাৎ—গুণেতে যা থাকে, এতাদৃশ ধর্ম্ম থাকা প্রযুক্ত। ন—নয়। কর্ম্মণাং—দুই বা বহু কর্ম্মের। কর্ম্ম—গম-নাদি ক্রিয়াপদার্থ (এস্থলে পূর্ব্বানুষঙ্গিক কার্য্য পদের অন্বয় হইবে।)

অনুবাদ। কর্ম্মেতে গুণের বৈধর্ম্ম্য আছে অর্থাৎ সর্ব্বাংশে সাধর্ম্ম্য নাই, এনিমিত্ত সজাতী-

মারম্ভ-গুণের ন্যায়:কর্ম্ম যে অন্যান্য কর্ম্ম-জনিত নয়, তাহা অসঙ্গত নহে।

তাৎপর্য্য। নানা অবয়বের নানারূপ হইতে অবয়বীর একটী মাত্র রূপ জন্মে; যেমত কপালদ্বয়ের রূপ হইতে ঘটীয় রূপ; এ ঘটীয় রূপ গুণ পদার্থের অন্তর্গত; সুতরাং গুণে যে সজাতীয় অনেক জন্যত্ব আছে, ইহা স্বীকৃত। ঐ গুণ এবং কর্ম্ম উভয়ে একমাত্র দ্রব্যাশ্রিত বলিয়া পরস্পর সমানধর্ম্মীও হইয়াছে। সধর্ম্মীদের মধ্যে একে যে ধর্ম্মটী থাকে, অন্যেতেও অবশ্য সেই ধর্ম্মটী থাকিবার সম্ভাবনা; তাই গুণের ন্যায় সজাতীয় জন্যত্বটী কর্ম্মেতে না থাকিবে কেন? এতাদৃশ আশঙ্কার উত্তর স্থলে সূত্রে বলা হইতেছে যে, কর্ম্মেতে গুণের কেবল সাধর্ম্ম্যই আছে, এমত নহে, গুণ-ধর্ম্ম-কর্ম্মত্ব নামক ধর্ম্মটী যে কর্ম্মে থাকে, তাহা কেহই অস্বীকার করেনা। এমত অবস্থায় কর্ম্মে সজাতীয় জন্যত্ব নামক অর্থাৎ সজাতীয় জন্যত্বাভাব রূপ গুণবিরুদ্ধ ধর্ম্মটি থাকা দোষবহ নহে, কারণ একটী ধর্ম্মের আশ্রয়ে বৈধর্ম্ম্যান্তর থাকায় কোন আপত্তি কিম্বা অনুপপত্তির সম্ভাবনা দেখা যায় না। কর্ম্মকে সর্ব্বাংশে গুণের সমান বলিতে কাহারও সামর্থ্য নাই। কর্ম্মের প্রতি ক্রিয়ান্তরের যে জনকতা নাই, তাহা পূর্ব্বেই "কর্ম্ম কর্ম্ম সাধ্যং নবিদ্যতে" এই সূত্রে বলা হইয়াছে; এই স্থলে তাহারই সুস্প-ষ্টতার নিমিত্ত কর্ম্মেতে গুণের ধর্ম্ম থাকাকেও হেতুরূপে বর্ণন করিয়া উল্লিখিত আশঙ্কার নিবৃত্তি করা হইল।

দ্বিত্ব প্রভৃতয়ঃ সংখ্যা পৃথকত্ব সংযোগবিভাগাশ্চ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ। দ্বিত্ব ত্রিত্ব প্রভৃতি পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত সংখ্যা, দ্রব্যদ্বয়েস্থিত পৃথকত্ব, সংযোগ এবং বিভাগ, ইহারাও অনেক দ্রব্যারব্ধ অর্থাৎ প্রত্যেকে একাধিক দ্রব্যে আশ্রিত।

তাৎপর্য্য। সাবয়ব দ্রব্যের ন্যায় গুণের মধ্যেও অনেকাশ্রিত গুণ আছে। একটী মাত্র দ্রব্যে দুই কিম্বা তিন বলিয়া ব্যবহার হয়না। দ্রব্যদ্বয়ে কিম্বা দ্রব্যত্রয়ে যথাক্রমে দুই কিম্বা তিন বলিয়া ব্যবহার হইয়া থাকে। দ্বিত্ব ত্রিত্বাদি সংখ্যার অবস্থিতিই উক্ত ব্যবহারের কারণ; সুতরাং দ্বিত্বাদি সংখ্যাকে অনেকাশ্রিত বলিতে হইবে। সূত্রে উল্লিখিত পৃথকত্ব পদটী দ্বিপৃথকত্বপর, যেমন পশু ও পক্ষী, মনুষ্য হইতে পৃথক্, এস্থলে মনুষ্যকে অপেক্ষা করিয়া পৃথকত্ব গুণটী পশু ও পক্ষী, এই দুইনিষ্ঠ হওয়াতে, ঐ দ্বিগত পৃথকত্বকে অনেকাশ্রিত বলিতে হইবে। সংযোগ এবং বিভাগ, এই গুণদ্বয় অনেকাশ্রিত বলিয়া প্রত্যক্ষসিদ্ধ। দুই কিম্বা ততোধিক দ্রব্য একত্রিত হইলে সংযোগ জন্মে এবং সংযুক্ত পদার্থদিগেরই পরস্পর বিভাগ হইয়া থাকে। এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, লম্বায়মান রজ্জু প্রভৃতির এক প্রান্তের সহিত অপর প্রান্তকে সংযুক্ত করিয়া, পরে বিভক্তও করা যায়; ঐ সংযোগ ও বিভাগ একমাত্র রজ্জুতেই থাকে; সুতরাং সকল সংযোগ কিম্বা সকল বিভাগ অনেকাশ্রিত গুণ নহে। এতৎপক্ষে সমাধান এই, রজ্জু প্রভৃতির এক প্রান্তকে অপর প্রান্তে সংলগ্ন করিতে যে ক্রিয়ার আবশ্যক হয় [illegible]

বশতঃ রজ্জুর অবয়বদিগের পরস্পর বিশ্লেষজন্যে; এক প্রান্তের সহিত অপর প্রান্তের যে সংযোগ কিম্বা বিভাগ অনুমান যায়, তাহা ক্রিয়ান্বিতরজ্জুর বিশ্লিষ্ট এক অবয়বের সহিত অবয়বান্তরেরই হইয়া থাকে; তদ্ভিন্ন একমাত্র রজ্জুতেই তাদৃশ ভাবে সংযোগ কিম্বা বিভাগ হইতেছে বলিয়া প্রত্যয়টী সর্ব্বথা ভ্রমাত্মক বলিয়া বুঝিতে হইবে।

অসমবায়াৎ সামান্যকার্য্যং কর্ম্ম নবিদ্যতে ॥ ২৬ ॥

পদব্যাখ্যা। অসমবায়াৎ—সমবায়সম্বন্ধে অভাব থাকা প্রযুক্ত। সামান্যকর্য্যং—সাধারণের জন্য অর্থাৎ দুই কিম্বা বহুদ্রব্যের কার্য্য। কর্ম্ম—উৎক্ষেপণাদি ক্রিয়া। নবিদ্যতে হয় না।

অনুবাদ। উৎক্ষেপণাদি ক্রিয়াপদার্থের কোন একটীও সাধারণের (দুই কিম্বা বহু দ্রব্যের) কার্য্য নয়, যেহেতু প্রত্যেকে একাধিক দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে না।

তাৎপর্য্য। সাবয়ব দ্রব্য ও সংযোগ প্রভৃতি গুণের ন্যায় কর্ম্মপদার্থও অনেক দ্রব্যারভ্য কিনা? এতাদৃশ প্রশ্ন মূলক স্থলে বলা হইতেছে যে, কর্ম্ম সাধারণের কার্য্য নহে, কারণ একাধিক দ্রব্যে একটী ক্রিয়ার সত্তা নাই। মনুষ্যদিগের গমনসময়ে প্রত্যেক পুরুষে পৃথক্ পৃথক্ প্রযত্ন হইতে ভিন্ন ভিন্ন চলন ক্রিয়া জন্মিয়া থাকে, এবং তন্নিবন্ধনই একের [illegible] সকলের স্থিতি কিম্বা একের [illegible] তৎকালে দুই হয়না।

সংযোগানাং দ্রব্যং ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। বহু সংযোগ স্বরূপ কারণ হইতে একটী দ্রব্য স্বরূপ কার্য্য জন্মে।

তাৎপর্য্য। পুনরায় গুণান্তর্গত বহু ব্যক্তির একটী দ্রব্য স্বরূপ কার্য্য দেখান হইতেছে। তন্তুদিগের পরস্পর বহু বহু সংযোগ ব্যক্তি হইতে এক একখানি বস্ত্র উৎপন্ন হয়।

রূপাণাং রূপং ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। একটী রূপ নানারূপের কার্য্য অর্থাৎ নানা অবয়বের নানাবিধরূপ হইতে অবয়বীর একটী মাত্র রূপ জন্মিয়া থাকে।

তাৎপর্য্য। কিয়দংশ চূণের সহিত কিয়ৎ পরিমিত হরিদ্রার গুঁড়া মিশাইলে ঐ মিশ্রিত পদার্থে যে অভিনব লোহিত রূপের প্রত্যক্ষ হয়, তাহার প্রতি চূণের এবং হরিদ্রার রূপই কারণ; এই প্রকার সর্ব্বত্রই অবয়বের নানারূপ রস গন্ধ প্রভৃতি হইতে অবয়বীর এক একটী রূপ রস গন্ধাদি জন্মে ইহা অনুভব সিদ্ধ। সূত্রোক্তরূপ পদার্থ উপলক্ষক হইয়া রস, গন্ধ, স্পর্শ, স্নেহ, স্বভঃসিদ্ধ দ্রবত্ব, একত্ব, পৃথকত্ব, পরিমাণ, বেগ, স্থিতিস্থাপক সংস্কার এবং গুরুত্বকেও বুঝাইতেছে, তাহাতে নানারূপ হইতে যেমত একটী রূপ জন্মে, সেইপ্রকার নানা গন্ধ হইতে একটী গন্ধ, নানা গুরুত্ব হইতে একটী গুরুত্ব জন্মিয়া থাকে। এতাদৃশভাবে উল্লিখিত গুণের প্রত্যেক লইয়া সূত্রার্থ বুঝিতে হইবে।

গুরুত্বপ্রযত্নসংযোগানামুৎক্ষেপণম্ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ। উৎক্ষেপণাত্মক একটী কর্ম্ম-পদার্থ, গুরুত্ব, প্রযত্ন ও সংযোগ, এই ত্রিবিধ গুণের কার্য্য।

তাৎপর্য্য। যখন কোন পুরুষ লোষ্ট্রা-দিকে উৎক্ষিপ্ত করে তখন লোষ্ট্রের গুরুত্ব, পুরুষের যত্ন এবং হস্তের সহিত লোষ্ট্রের নোদন [শব্দের অজনক সংযোগ] এই গুণত্রয় লোষ্ট্রের ঐ উৎক্ষেপণের হেতুভূত হয়। এস্থলে উৎক্ষেপণ পদটী অবক্ষেপণাদির উপ-লক্ষক। পূর্ব্ব সূত্রে প্রতিপাদিত একটী গুণে বহু গুণ-জন্যত্বের ন্যায় একটী কর্ম্মেও বহু গুণ জন্যত্বদেখানি, এই সূত্রের উদ্দেশ্য।

সংযোগ বিভাগাশ্চ কর্ম্মণাং। ৩০

অনুবাদ। সংযোগ বিভাগ প্রভৃতি কর্ম্মের কার্য্য; অর্থাৎ চলনাদি ক্রিয়া পদার্থ হইতে সংযোগ বিভাগ ও বেগ জন্মে।

তাৎপর্য্য। কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান করা হয়; যেমন ধূম দেখিলে বহ্নির অনুমান করাযায়, সেইরূপ গৃহস্থিত পুরুষ ঘন-গর্জ্জন শুনিয়া মেঘের, এবং বাহিরে খাত প্রভৃতিতে জলবৃদ্ধি দেখিয়া বৃষ্টিরও অনুমান করিয়া থাকেন, যে পদার্থের কোন কার্য্য দেখাযায় না, তাহার অনুমান করাও সুকঠিন এ নিমিত্ত চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতির যে অতীন্দ্রিয় গতি আছে, তাহাতে প্রমাণ কি? ঐ গতির কোন কার্য্যবিশেষ প্রত্যক্ষীভূত না হওয়ায় অনুমানের সম্ভাবনা নাই। এই আশঙ্কার নিরাসের জন্য সংযোগ বিভাগ প্রভৃতিকে কর্ম্মের কার্য্য বলিয়া, "পূর্ব্বোক্ত "সংযোগবিভাগবেগানাং কর্ম্ম" এই সূত্রের বিবরণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, সংযোগ বিভাগরূপ কার্য দেখিয়া চন্দ্র-সূর্য্যের গতি অবধারণ করাযায় গগনমণ্ডলে চন্দ্রকে আজ ভরনী নক্ষত্র সমীপে দেখিতেছি, গত কল্য তাহাকে অশ্বিনী নক্ষত্রে দেখিয়াছিলাম; আগামীকল্য তাহাকে কৃত্তিকা নক্ষত্র সমীপে দেখিব, এই ভাবে তত্তৎ স্থলীয় সংযোগ-বিভাগদ্বারা চন্দ্রের গতি অবধারিত হয়। দিনে সূর্য্য-কিরণে নক্ষত্রমালা অদৃশ্য হইলেও, অস্তের পরক্ষণেই পশ্চিম গগনে একদিন যেন নক্ষত্রটীকে দেখা-গেল কিম্বা পূর্ব্বগগনে উদয়ের পূর্ব্বক্ষণেই যে নক্ষত্রটী দৃষ্ট হইল, কিছুদিন পরে ঐ সময় পূর্ব্ব পশ্চিম গগনে আর সেই সেই নক্ষত্রকে দেখা গেল না; তৎ পরিবর্ত্তে নক্ষত্রান্তরের পরিদর্শন হইল এইরূপে তত্তৎ নক্ষত্রের সমীপবর্ত্তিস্থানে সূর্য্যের সংযোগ কিম্বা বিভাগ অনুভূত হওয়ায়, তাহাহইতে সূর্য্যের গতি-ক্রিয়া অবধারণকরা অসম্ভব নহে।

কারণ সামান্যে দ্রব্য কর্ম্মণাং কর্ম্মা-কারণমুক্তম্। ৩১॥

পদব্যাখ্যা। কারণ সামান্যে—কার-ণের সাধারণ্যপক্ষে অর্থাৎসমবায়ি, অসমবায়ি ও নিমিত্ত, এইতিনপ্রকার কারণপক্ষেই। দ্রব্য কর্ম্মণাং—দ্রব্যের কিম্বা কর্ম্মের প্রতি। কর্ম্ম—ক্রিয়াপদার্থ। অকারণম্—কারণ নয় অর্থাৎ কারণ ভিন্ন বলিয়া। উক্তম্—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

অনুবাদ। দ্রব্য কিম্বা কর্ম্মের প্রতি কর্ম্মকারণ নয় বলিয়া পূর্ব্বে যে কথিত হই-য়াছে; তাহা সর্ব্ববিধ কারণ [illegible] বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ ক্রিয়া পদার্থ[illegible]

কর্ম্মান্তরের প্রতি [সমবায়িকারণ, অসমবায়িকারণ এবং নিমিত্তকারণ এই ত্রিবিধ কারণের মধ্যে] কোনরূপ কারণই হয় না॥

তাৎপর্য্য। সংযোগ নিচয় কর্ম্মজনিত বলিয়া স্থিরীকৃত। এইক্ষণ আশঙ্কা হইতে পারে যে,চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ের প্রত্যক্ষ করিতে যেমত স্বজনিত সন্নিকর্ষকে [ঘটাদি বস্তুর সহিত চক্ষুরাদির সংযোগকে] দ্বার করিয়া কারণ হয়, সেইপ্রকার ঘটাদি দ্রব্যের উৎপত্তিতেও কপালাদি অবয়বের ক্রিয়া, অবয়বদিগকে সুযুক্ত করিয়া দিয়া, তদ্দ্বারা কারণ হইতে পারে এবং হস্তের ক্রিয়া হস্তের সহিত লোষ্ট্রের সংযোগ জন্মাইয়া লোষ্ট্রোৎক্ষেপণে হেতুভূত হইতেছে বলাযায় ; তবে কর্ম্মকে যে দ্রব্যের কিম্বা কর্ম্মের অকারণ বলা হইয়াছে,তাহাকি অসমবায়ি কারণপর ? অর্থাৎ কর্ম্মেতে দ্রব্যের কিম্বা কর্ম্মের অসমবায়ি কারণতা নাই বটে, কিন্তু নিমিত্ত কারণতা থাকিবার বাধা নাই ; এই কি তাহার তাৎপর্য্য ? যেহেতু সমবায়ি কিম্বা অসমবায়ি-করণনাশে কার্য্য নষ্ট হওয়া নিয়ম থাকিলেও নিমিত্ত কারণ নাশে কার্য্যের নাশ হয় না ; সুতরাং অবয়বের ক্রিয়ার নাশ হইলেও অবয়বী থাকাতে, অবয়ব ক্রিয়াকে অবয়বীর নিমিত্ত কারণ বলাতে কোন বাধা দেখাযায় না,এইরূপ জিজ্ঞাসামূলক ভাবে বলা হইতেছে যে,দ্রব্য কিম্বা কর্ম্মের প্রতি কর্ম্মের নিমিত্ত-কারণত্ব নাই। প্রত্যক্ষে চক্ষুঃসন্নিকর্ষ চক্ষুর ব্যাপার, যেহেতু চক্ষুকে নিমীলিত করিলে ঐ সন্নিকর্ষও থাকে না এবং প্রত্যক্ষও জন্মে না [illegible] দ্রব্যোৎপত্তি বিষয়ে অবয়বসংযোগটী অবয়বের ক্রিয়ার ব্যাপার হইতে পারে না; কারণ অবয়বদ্বয়ের সংযোগ জন্মিবার পরক্ষণে অবয়বে আর ক্রিয়া থাকে না। অথচ অবয়ব সংযোগ এবং তদারব্ধ অবয়বী দ্রব্যটী বাচিকাই থাকে, তাই প্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষরূপ ব্যাপারদ্বারা চক্ষুরাদির অন্যথা সিদ্ধত্ব হয় না সত্য, কিন্তু দ্রব্য কিম্বা কর্ম্মের উৎপত্তিতে স্বজনিত সংযোগই ক্রিয়াকে অন্যথাসিদ্ধ করিয়া দেয় কারণ কারণের কারণ নহে,পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে এবং ব্যবহার সিদ্ধও বটে।

ইতি বৈশেষিক দর্শনে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত।

বালাকি অজাতশত্রু সংবাদ।

পুরাকালে অজাতশত্রু নামে কাশীর এক নরপতি ছিলেন। তিনি ব্রহ্মবিদ্যায় বিভূষিত ছিলেন, ভারতবর্ষের বিবিধ স্থান হইতে মহর্ষিগণ ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনার জন্য তাঁহার সভায় উপস্থিত হইলেন। একদা বালাকি নামক এক ঋষি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমি তোমার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা ব্যাখ্যা করিব। বালাকি নিজে ব্রহ্মবিৎ হইয়াছেন বলিয়া মনে করিতেন, এবং তজ্জন্য বড়ই গর্ব্বিত ছিলেন। অজাতশত্রু বলিলেন,আপনি ব্রহ্মবিদ্যা ব্যাখ্যা করুন আপনি সহস্র গাভী দক্ষিণা পাইবেন।

বালাকি বলিলেন আমি আদিত্যান্তর্গত পুরুষকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি। অজাতশত্রু বলিলেন, ব্রহ্মকে জানিয়াছ বলিয়া গর্ব্ব করিওনা। আমি তাঁহাকে সর্ব্বভূতের মূ

তাহাদিগের রাজা বলিয়া তাহাকে উপাসনা করি, কিন্তু ব্রহ্ম বলিয়া নয়,বালাকি বলিলেন আমি চন্দ্রান্তর্গত পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি, অজাত শত্রু বলিলেন আমিও তাঁহাকে উপাসনা করি, কিন্তু ব্রহ্ম বলিয়া, তাঁহাকে বৃহৎ, শুক্লবাস, সোম রাজা অন্নদাতা বলিয়া উপাসনা করি। বালাকি বলিলেন আমি বিদ্যুতান্তর্গত পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি, অজাত শত্রু বলিলেন আমিও তেজস্বী রূপে উপাসনা করি, কিন্তু ব্রহ্মবলিয়া নয়। বালাকি বলিলেন আমি আকাশান্তর্গত পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি, অজাতশত্রু বলিলেন আমিও তাহাকে পূর্ণ বলিয়া উপাসনা করি,কিন্তুব্রহ্ম বলিয়া নহে। বালাকি বলিলেন আমি অনিলান্তর্গত পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি, অজাতশত্রু বলিলেন আমিও তাহাকে জয়শীল ইন্দ্র বলিয়া উপাসনা করি কিন্তু ব্রহ্ম বলিয়া নহে। বালাকি বলিলেন আমি অনলান্তর্গত পুরুষকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি, অজাত শত্রু বলিলেন আমিও তাহাকে ধ্বংস শক্তিরূপে উপাসনা করি, কিন্তু ব্রহ্ম বলিয়া নহে, বালাকি বলিলেন আমি সলিলান্তর্গত পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি, অজাতশত্রু বলিলেন যে আমিও তাহাকে উপাসনা করি, কিন্তু ব্রহ্ম বলিয়া নহে বালাকি বলিলেন আমি হৃদয়ান্তর্গত পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি। অজাত শত্রু বলিলেন আমিও তাঁহাকে উপাসনা করি কিন্তু ব্রহ্ম বলিয়া নহে। বালাকি বলিলেন আমি গুণান্তর্গত পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি। অজাত-শত্রু বলিলেন আমিও তাঁহাকে উপাসনা করি কিন্তু ব্রহ্ম বলিয়া নহে। বালাকি বলিলেন আমি দিগন্তর্গত পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি অজাত শত্রু বলিলেন আমিও তাহাকে উপাসনা করি কিন্তু ব্রহ্ম বলিয়া নহে। বালাকি বলিলেন আমি ছায়ান্তর্গত পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি, কিন্তু অজাতশত্রু বলিলেন আমিও তাহাকে উপাসনা করি কিন্তু ব্রহ্ম বলিয়া নহে। বালাকি বলিলেন আমি জীবাত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি। অজাত শত্রু বলিলেন আমিও তাঁহাকে উপাসনা করি কিন্তু ব্রহ্ম বলিয়া নহে। অজাতশত্রু বলিলেন তোমার ব্রহ্মজ্ঞান কি এই পর্য্যন্ত? বালাকি বলিলেন হা এই পর্য্যন্ত। অজাতশত্রু বলিলেন এই জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্ম বিদিত হন না; বালাকি বলিলেন আমি তোমার শিষ্য হইব।

অজাতশত্রু বলিলেন ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রাহ্মণ ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়ন করিবে, এ রীতি প্রতিলোম, যাহাহউক আমি তোমাকে ব্রহ্ম বিদ্যার উপদেশ দিব। অজাত শত্রু বালাকির হস্ত ধরিয়া একটি নিদ্রিত ব্যক্তির নিকট লইয়া গেলেন, এবং তাহাকে ডাকিলেন, সে জাগৃত না হওয়ায়, তাহার হস্ত ধরিয়া তাহাকে জাগাইলেন। সুপ্ত অবস্থায় এই বিজ্ঞানময় পুরুষ কোথায় ছিল, এবং কোথা হইতে আসিল বালাকি এ তত্ত্ব জানিবেন না। অজাত শত্রু বলিলেন বিজ্ঞানময় পুরুষ ব্রহ্মে সুপ্ত ছিলেন, যখন এই বিজ্ঞানময় পুরুষ, ইন্দ্রিয়াদি বহিঃপ্রদেশ হইতে অন্তরের দিকে আকর্ষণ করেন, তখন তিনি নিদ্রিত হয়েন। নিদ্রিতাবস্থায় তিনি মহারাজার ন্যায় হয়েন। তিনি ইচ্ছানুসারে [illegible]

চয় বর্গকে সেই রাজ্য মধ্যে প্রেরণ করেন। যখন তিনি সুষুপ্ত হয়েন, তখন তিনি ব্রহ্মে লীন হয়েন, এবং ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করেন। এই ব্রহ্ম হইতে সকল প্রাণ, সকল লোক, সকল দেবতা সকল ভূত উদ্ভূত হয়েন তিনি সত্যের সত্য।

ভূ-গোল পরিচয়।

৭ম পাঠ।

প্রদর্শন। (১)

মণ্ডল (২) নক্ষত্র (৩) তারা (৪)

ভূগোলের উজ্জ্বলতর তারাগণ ও গণিত শাস্ত্রের কীলকভূত তারাগণ এবং অসাধারণ রূপ গুণ সম্পন্ন তারাগণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে বিশেষ বিশেষ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, যথা— লুব্ধক, শতভিষক, ধ্রুব ইত্যাদি। এই নামগুলি জাতীয় প্রবাদজনিত, ইতিহাসমূলক, অথবা তারার অবস্থিতিস্থানসূচক। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক মণ্ডলে বা রাশিতে অবস্থিত তারাগুলির স্থূলত্বের তারতম্য অনুসারে মণ্ডলস্থ প্রত্যেক তারা ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি সংখ্যাদ্বারা চিহ্নিত হইয়া থাকে। যথা— মেষ রাশির ১ তারা বলিলে, মেষ রাশিস্থ তারাগণ মধ্যে সর্ব্ব উজ্জ্বল তারা অমলতারা বুঝাইবে। বৃষ রাশিস্থ ২ তারা বলিলে, বৃষ রাশিস্থ তারাগণ মধ্যে উজ্জ্বলতায় ২য় তারা অগ্নি তারক বুঝাইবে।

১। শিশুমার মণ্ডল।

রাত্রিকালে ভূগোলের তারকামালার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দর্শক দেখিবেন যে, সমস্ত তারাগণ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ধাবমান রহিয়াছে; কিন্তু উত্তরাস্যে দণ্ডায়মান হইয়া সরলভাবে নেত্রপাত করিলে দর্শক দেখিবেন যে, একটী পীতবর্ণ মধ্যমাকৃতি অনুজ্জ্বল তারা স্থিরভাবে অচল ও অটল রহিয়াছে। ভূগোলের অবশিষ্ট জ্যোতিষ্কগণ মণ্ডলাকার পথে ঐ তারা প্রদক্ষিণ করিতেছে। এই পীতবর্ণ তারাটীর নাম ধ্রুব, কারণ এই তারা অটল ও অচল।

---

(১) কলিকাতাস্থ দর্শক ও মধ্য রেখাস্থ তারা সম্বন্ধে এই প্রস্তাবের লিখিত দূরত্ব-পরিমাণ প্রযোজ্য।

(২) মণ্ডল শব্দ তারা-সংহতি অর্থে ব্যবহার করিতে কেহ কেহ আপত্তি করেন। কিন্তু তদর্থে বহু প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যথা—

রবে রূর্দ্ধং স্থিতঃ সোমঃ সোমান্নক্ষত্র মণ্ডলং।
তস্মাৎ শনৈশ্চর শ্চোর্দ্ধং তস্যোর্দ্ধং ঋষিমণ্ডলং॥

ইতি দেবীপুরাণে গ্রহগতিঃ

নক্ষত্র মণ্ডলং কৃৎস্নংউপরিষ্ঠাৎ প্রকাশতে।

বিষ্ণুপুরাণ ২।৭৬

(৩) কেহ কেহ তারা ও নক্ষত্র শব্দদ্বয় একই অর্থে অভিন্ন ভাবে ব্যবহার করিতে চাহেন। কিন্তু জ্যোতিষ শাস্ত্রে নক্ষত্র শব্দ ২৭টী বা ২৮টী নির্দ্দিষ্ট তারানিচয় বোধক, এবং এই পারিভাষিক অর্থের প্রতি কাহারও কোন আপত্তি হইতে পারে না। যথা—

পূর্ব্বাদশধাস্থানং বিস্তৃতং রাশিসংজ্ঞকং
নক্ষত্ররূপিণং ভূয়ঃ সপ্তবিংশাত্মকংবশী।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১২।২৫

গ্রহনক্ষত্র তারাণাং ভূমে র্বিশ্বস্তবাবিভুঃ।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১২।২৮

পুরাণে ও কাব্যে নক্ষত্র শব্দ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার প্রশস্ত বলিয়া অনুমোদিত হইয়াছে। যথা—

সূর্য্যচন্দ্রমসৌ তারা নক্ষত্রানি গ্রহৈঃ সহঃ।

বিষ্ণুপুরাণ ২।৯।৩

নক্ষত্র তারা — পাভুলাপি জ্যোতিষ্মতী চান্দ্রমসীব রাত্রিঃ।

রঘুবংশে ৬।২২

নক্ষত্রগণ চন্দ্র গৃহ। চন্দ্র ১ দিন এক নক্ষত্রে বাস করেন। কবিকল্পনায় নক্ষত্র চন্দ্র-গৃহিণী ও দক্ষসুতা বলিয়া বর্ণিত। যথা—

অশ্বিন্যাদ্যাস্তু দক্ষস্য উপযেমে সুতাবিধুঃ

পাদ্মে স্বর্গ খণ্ডে।

(৪) তারাগণ দেবনিবাস ও সিদ্ধ পুরুষগণের স্থূল দেহ বলিয়া বর্ণিত হয়

আধুনিক লোকপ্রবাদে তারাগণ দ্যুলোকগত পুরুষের চক্ষু এবং খদ্যোতগণ পৃথিবীচর সত্তাসুগণের চক্ষু বলিয়া কথিত।

যেকোন ঋতুতে রাত্রিকালের যে কোন সময়ে দর্শক যথাস্থানে দৃষ্টিপাত করিলে, দর্শকের সম্মুখে ধ্রুব তারা থাকিবে। ধ্রুব তারা যে মণ্ডলে অবস্থিত, ঐ মণ্ডলে ১০টী তারা প্রধান। তন্মধ্যে ৮টী তারা হলদী (হ'লদী) পাছের পাতার আকৃতি গঠন করিয়াছে। অবশিষ্ট ২টী তারা হলদী পত্রের অগ্র ভাগের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত। এই দুইটী তারার মধ্যে দক্ষিণস্থ তারাটী উজ্জ্বলতর। সমস্ত মণ্ডল অবলোকন করিলে দেখাযায় যে, ১০টী তারাদ্বারা একটী শিশুমারের আকৃতি গঠিত হইয়াছে। এই শিশুমার দৈর্ঘ্যে ৮ হাত প্রস্থে প্রায় ৪ হাত। প্রাচীন হিন্দুগণ এইজন্য এই মণ্ডলকে শিশুমার নাম দিয়াছেন। (৫) ধ্রুব তারা তারাময় শিশুমারের পুচ্ছদেশে অবস্থিত। (৬)

শিশুমার মণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিলে দর্শক দেখিবেন যে, ভূপৃষ্ঠস্থ শিশুমারের পুচ্ছদেশ বিদ্ধ করিয়া একখানি শড়কী মাটিতে পুতিলে শিশুমার যেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া সড়কী প্রদক্ষিণ করে, ভগোলস্থ শিশুমার ধ্রুব তারায় বদ্ধ হইয়া তৈলী চক্রবৎ ধ্রুব তারাকে সেইরূপ প্রদক্ষিণ করিতেছে। (৭)

শিশুমার মণ্ডলস্থ ১—১০ তারা = শিশুমার আকৃতি।

এই মণ্ডলের পাশ্চাত্য নাম ক্ষুদ্র ভল্লুক [Eng] The little bear. [Lat] Ursaminor. [Gr] Arctos.

চিত্র শিখণ্ডিমণ্ডল।

শিশুমার মণ্ডলের দক্ষিণে চিত্র শিখণ্ডি মণ্ডল অবস্থিত। এই মণ্ডলস্থ ৪উজ্জ্বল তারাদ্বারা একটী চতুর্ভুজ ক্ষেত্র অঙ্কিত হইয়াছে। এই তারাময় চতুর্ভুজ ক্ষেত্রটী পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বমান। উত্তর বাহু ৬হাত এবং দক্ষিণ বাহু ৫ হাত দীর্ঘ। পূর্ব্ব বাহু ২॥০ হাত ও পশ্চিম বাহু ৩ হাত দীর্ঘ। এই চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের ঈশান কোণে বক্রভাবে ৩টী তারা অবস্থিত। বক্র রেখার পরিমাণে ৯ হাত। এই সমস্ত তারা একটী ময়ুর আকৃতি গঠন করিয়াছে।

তারাময় এবং বক্র রেখা ময়ুরপুচ্ছ সদৃশ চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের বায়ু কোণস্থ তারার নাম ক্রতু, নৈঋত কোণস্থ তারার নাম পুলহ। অগ্নি কোণস্থ তারার নাম পুলস্ত্য এবং ঈশান কোণস্থ তারার নাম অত্রি। ময়ুরের শিখাগ্রে ক্রতু, কণ্ঠে পুলহ, নাভিদেশে পুলস্ত্য এবং পৃষ্ঠে অত্রি তারা। ময়ূরের পুচ্ছাগ্রস্থিত তারার নাম মরীচি, পুচ্ছ মধ্যস্থিত তারার নাম বশিষ্ঠ এবং পুচ্ছমূলস্থ তারার নাম অঙ্গিরা। বশিষ্ঠ তারার ঈশানকোণে দুই অঙ্গুলি দূরে একটী ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ক্ষুদ্র তারা আছে, ঐ ক্ষুদ্র তারার নাম অরুন্ধতী। (৮)

---

(৫) তারাময়ং ভগবতঃ শিশুমারাকৃতি প্রভোঃ।
দিবিরূপং হরের্যস্ত্ তস্য পুচ্ছে স্থিতো ধ্রুবঃ।
বিষ্ণুপুরাণ ২।৯।১

(৬) সতারাশিশুমারস্য ধ্রুবঃ পুচ্ছে ব্যবস্থিতঃ।
বিষ্ণুপুরাণ ২।৯।৫

(৭) মেধীভূত সমস্তস্য জ্যোতিশ্চক্রস্য বৈধ্রুবঃ।
বিষ্ণুপুরাণ ২।৭।১০

ব্যবস্থানৈব তারা আত্মাবস্থো রাত্রয়ঃ
সূর্য্যে ধ্রুবে নিবদ্ধায়ে ভ্রমস্তো ভ্রামরস্তিতম।
বিষ্ণু ২।১২।২৬

(৮) আসন্নমৃত্যু ব্যক্তি ধ্রুব তারা ও অরুন্ধতী তারা এবং কৃত্তিকা নক্ষত্র দেখিতে পান না, ইহাই প্রাচীন প্রবাদ। যথা—

অরুন্ধতীং ধ্রুবংচৈব বিষ্ণো স্ত্রীণি পদানিচ।
আসন্নমৃত্যু র্ন পশ্যেৎ চতুর্থং মাতৃমণ্ডলং॥
স্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে ১২।১৩

বিবাহকালে বর কন্যাকে এ[illegible] দর্শন করায়। যথা—

প্রাচীনকালে ; ক্রতু, পুলহ, পুলস্ত্য তারা অত্রির ন্যায় সমুজ্জ্বল ছিল।

ক্রতু ও পুলহ তারা যোগ করিয়া ঐ যোগ রেখা উত্তরে প্রসারিত করিলে, বর্ত্তমান ধ্রুবতারা স্পর্শ করে, এই জন্য এই দুই তারাকে "প্রদর্শক" বলে (৯)

চিত্রশিখণ্ডি মণ্ডলস্থ ১—৬। ১১ তারা- চিত্রশিখণ্ডি আকৃতি (১০)
চিত্রশিখণ্ডি মণ্ডলের অপর নাম ঋক্ষ (১১)
সপ্তর্ষি মণ্ডল এবং পরমর্ষি মণ্ডল (১২)
এই মণ্ডলের পাশ্চাত্য নাম বৃহৎ ভল্লুক।
[Eng] The great bear. [Lat] Ursa maior [Gr] Arctos magus.

ব্রহ্মমণ্ডল।

অত্রি ও ক্রতু তারা যোগ করিয়া ঐ যোগ রেখা পশ্চিমাভিমুখে প্রসারিত করিলে, একটী প্রথম শ্রেণীর গাঢ় পীতবর্ণ অত্যুজ্জ্বল তারা স্পর্শ করিবে। ঐ তারাটীর নাম ব্রহ্ম হৃৎ। ব্রহ্মহৃৎ যে মণ্ডলে অবস্থিত, ঐ মণ্ডলের নাম ব্রহ্মমণ্ডল [১৩]। তারাব্রহ্মের হৃৎপদ্মে অবস্থিত বলিয়া উহাকে ব্রহ্মহৃৎতারা বলে। ব্রহ্মহৃৎ তারার ২ ফুট অন্তরে নৈর্ঋত কোণে একটী ক্ষুদ্র সমদ্বিবাহু ত্রিভুজক্ষেত্র অঙ্কিত করিয়া ৩টী ক্ষুদ্র তারা অবস্থিত আছে। ঐ তারা ত্রিভুজ "রামবাণ" নামে খ্যাত। ব্রহ্মহৃত্ তারার ৪ ফুট পূর্ব্বে উরঃ তারা তারা ব্রহ্মের ফুস্ফুস্ স্থানে অবস্থিত। তারা ত্রিভুজের ভূমি রেখার পূর্ব্ব ভাগের কোণস্থ তারা ও ব্রহ্মহৃৎ তারা যোগ করিয়া ঐ যোগরেখা ঈশানকোণে প্রসারিত করিলে প্রজাপতি তারা স্পর্শ করিবে। প্রজাপতি তারাব্রহ্মের শিরোদেশে অধিষ্ঠিত।

ব্রহ্মমণ্ডলস্থ ১-৭ তারা = তারাব্রহ্ম দেহ। ব্রহ্মমণ্ডলের অপর নাম ব্রহ্মরাশি (১৪) ব্রহ্ম মণ্ডলের পাশ্চাত্য নাম শকটবাহক। [Eng] wagonner [Lat] Auriga. (Gr) Heniocleus. তারা ত্রিভুজের পাশ্চাত্য নাম The kids.

বৃষরাশিস্থ কৃত্তিকা নক্ষত্র।

ইদানীন্তন কালে রাশিচক্রের আদি রাশি মেষ এবং আদি নক্ষত্র অশ্বিনী। কিন্তু প্রাচীন কালের রাশি চক্রের আদি রাশি। এবং আদি নক্ষত্র কৃত্তিকা ছিল এবং কার্ত্তিকাদিমাস গণনা হইত (১৫) এই জন্য আমরা বৃষ রাশিস্থ কৃত্তিকা নক্ষত্র হইতে পরিচয় আরম্ভ করিলাম।

ব্রহ্মহৃৎ তারা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী রামবাণ নামক তারা ত্রিভুজের শীর্ষ কোণস্থ বাণমুখ তারা সংযোজিত করিয়া ঐ সংযোগ রেখা নৈর্ঋত কোণে প্রসারিত করিলে একটী মনোহর তারাগুচ্ছে দর্শকের নেত্র-নীত হইবে! ঐ তারাগুচ্ছের আকার ক্ষুর সদৃশ। এইজন্য তারাগুচ্ছের নাম কৃত্তিকা। তারাক্ষুর লম্বে ১ফুট এবং ভূগোলে উত্তরাস্য নাপিত দক্ষিণাস্য যজমানকে ক্ষৌরী করিতে বসিলে, যে ভাবে ক্ষুর অবস্থিত থাকে কৃত্তিকা ঠিক সেই

ততো জামাতা অমুং মন্ত্রং পাঠয়ন্ বধূমরুন্ধতীং দর্শয়তি প্রজাপতি ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দ বধূর্দেবতা অরুন্ধতী দর্শনে বিনিয়োগঃ ওঁ অরুন্ধত্যবরুদ্ধাঽহমস্মি।

(৯) Pointers. ভবদেবঃ।

(১০) সপ্তর্ষয়ো মরীচ্যাত্রিমুখাঃ চিত্র শিখণ্ডিনঃ। ইতি অমরঃ।

(১১) অমীয ঋণঃ। ঋক্ ১।২৪।১০ ভল্লুক শতপথ ব্রাহ্মণ ২।১।২।৪।

(১২) সপ্তর্ষি মণ্ডলং তস্মাৎ নক্ষমেকং দ্বিজোত্তম। বিষ্ণুপুরাণ।

... পরমর্ষয়ঃ। বাল্মীকি ৬।৪।৩৮.

মহাত্মা রামানুজ স্বামীর মতে ব্রহ্মরাশি অর্থে ধ্রুব তারা বাল্মীকি ৬।৪।৪৮ টীকা দ্রষ্টব্য।

কিন্তু যে মণ্ডলের শিরোভাগে "প্রজাপতি" তারা, মধ্যভাগে ব্রহ্মহৃৎ তারা সেই মণ্ডলই ব্রহ্মমণ্ডল।

(১৪) রাশি শব্দ মণ্ডল অর্থে ব্যবহৃত।

(১৫) অথর্ব্ব ১৯।৭।২।

ভাবে অবস্থিত দৃষ্ট হয়। এই তারাগুচ্ছ অতি সুন্দর ও তড়িন্ময়। ইহার তারা-সংখ্যা প্রায় ৪০০। তন্মধ্যে প্রধান ৭টী দৃষ্টিগোচর হয়। বৃহত্তম তারাটীর নাম দেবসেনা (১৬) অপর ৮টী তারা কৃত্তিকা নক্ষত্র বলিয়া গণ্য।

সাধারণতঃ এই তারাগুচ্ছের তারাগুলি ঝাপ্‌সা দেখায়; কিন্তু শরদাগমে এই গুচ্ছ অতি মনোহররূপ ধারণ করে এবং কৃষ্ণ-রাত্রিতে কৃত্তিকা ঝলকে ঝলকে তড়িৎ বিকীর্ণ করিতে থাকে। এই নক্ষত্র তারাবৃষের ককুদ্ [ঝুঁট]।

বৃষরাশিস্থ ১৬।১৭ ১৮।১৯।২০।২১ তারা = কৃত্তিকা নক্ষত্র এবং ২০ তারা—যোগ-তারা কৃত্তিকা।

কৃত্তিকা নক্ষত্রের অপর নাম বহুলা (১৭) মাতরঃ [১৮] এবং মাতৃমণ্ডল [১৯] এই নক্ষত্রের গ্রাম্য নাম সাতভেয়ে। গ্রীসে কৃত্তিকাগণ Pleiades নামে অভিহিত [২০]

রোহিনী নক্ষত্র (Hyades)

কৃত্তিকা নক্ষত্রের অগ্নিকোণে—৭ ফুট অন্তরে রোহিনী নক্ষত্র অবস্থিত। এই নক্ষত্রস্থ ৫টী তারা শকটাকৃতি। আরোহিণী [শকট] শব্দ হইতে এই নক্ষত্রের নামকরণ হইয়াছে [২১] শকটের বাহুযুগল লম্বে ১ফুট, শকট-পৃষ্ঠ প্রস্থে ১ বিতস্তি [বিঘৎ] শকট শীর্ষে "শকটমুখ তারা"। শকট ধুর-স্কন্ধের [ধুরা] প্রান্তদ্বয়ে ২তারা এবং শকটের পশ্চাৎভাগের পার্শ্বদেশে ২ তারা। শকট নৈঋত কোণাভিমুখ।

শকটের পশ্চাৎভাগের পূর্ব্বকোণস্থ তারার নাম হলদ্দীবর্ণ। এই তারাটী গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ বা রক্তবর্ণ এবং প্রথম শ্রেণীর তারা, অপর ৪টী ক্ষুদ্র তারা।

পাশ্চাত্য বৃষরাশিস্থ ১।৫।৭ ১২।১৪ তারা = রোহিনী নক্ষত্র

১ তারা = যোগতারা।

পাশ্চাত্যে রোহিণী নক্ষত্র Hyades নামে খ্যাত। (২২)

এই নক্ষত্র তারা বৃষের মুণ্ড।

---

(১৬) প্রধানাংশ স্বরূপা সা দেবসেনাচ নারদ মাতৃকাসু পূজ্যতমা সাচ ষষ্ঠী প্রকীর্ত্তিত শিশূনাং প্রতিবিশ্বেষু প্রতিপালনকারিনী তপস্বিনী বিষ্ণুভক্তা কার্ত্তিকেয়স্য কামিনী।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতি খণ্ডে ১।৭৩-৪

কার্ত্তিক শুক্ল ষষ্ঠী তিথি হইতে বার্হস্পত্য বর্ষ গণনা হইত।

(১৭) প্রাচীনকালে নক্ষত্র মধ্যে ষট্‌তারকময় কৃত্তিকা নক্ষত্রের তারা-সংখ্যা অধিকতম ছিল, এজন্য কৃত্তিকার বহুলা নাম।

তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১।৬

শতপথ ব্রাহ্মণ ২।১।২।২।

(১৮) প্রাচীনকালে কৃত্তিকা ভ-চক্রের আদি নক্ষত্র ছিল। কৃত্তিকা বিশ্বজগতের কেন্দ্রস্থানীয়। বিশ্বজগৎ কৃত্তিকা প্রদক্ষিণ করে। ইহাও অনুমিত হয়।

ষট্ কৃত্তিকা ও অরুন্ধতি সপ্তর্ষি-ভার্য্যা। এই কারণে কৃত্তিকা লোকমাতরঃ ও মাতৃমণ্ডল বলিয়া বর্ণিত। যথা—

সংস্কৃতি বসুন্ধরাচ ক্ষমা প্রীতিশ্চ সন্নতিঃ

অরুন্ধতিঃ তথা লজ্জা তৎপত্ন্যোঃ লোকমাতরঃ

ইতি পাদ্মে স্বর্গখণ্ডে। ৭১

(১৯) অপবাদ বশতঃ ষট্ কৃত্তিকা পতি পরিত্যক্ত হইয়া স্বামী সহবাসে বঞ্চিত এবং সপ্তর্ষি মণ্ডলে স্থান পান নাই। যথা—

অথ সপ্তর্ষয়ঃ শ্রুত্বা জাতং পুত্রং মহৌজসম্।

কার্ত্তিকেয়ং।

তত্যজুঃ ষট্ তদা পত্নী বিনা দেবীং অরুন্ধতিং।

মহাভারত। ২২৫।৮

(২০) Gr plein to sail হইতে Ploeiades নাম। গ্রীক জাতি কৃত্তিকার উদয়ে নৌ যাত্রার শুভক্ষণ জ্ঞান করিতেন।

গ্রীক প্রবাদে কৃত্তিকার সপ্ততারা অট্‌লস্ দেবের (অতলস) সপ্তকন্যা। মিকরী প্রবাদে কৃত্তিকা "সপ্ত-মনীষি" "Seven sages." বলিয়া খ্যাত। হিন্দু জাতির সপ্তর্ষিমণ্ডল স্বতন্ত্র।

(২১) হিন্দু প্রবাদ বিদ্যায় [Hindu mytholoy] রোহিণীর নামার্থ অন্যরূপ। মৃগশিরা নক্ষত্রের টীকা দ্রষ্টব্য।

(২২) Gr. uein to rain. রোহিনী তারার হেলীক উদয়ের অর্থাৎ অস্তমণ [illegible] হইত এ জন্য Hyades নাম।

শ্রী শ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২৫ আইন মতে রেজিষ্টরী কৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৮ম বর্ষ, ৮ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ। | ১৩০৮ সাল, ১৮২৩ শকাব্দা।

শ্রীগৌরাঙ্গ।

রাধা-ভাব-কান্তি-বিলাসরূপায়
হেমাভদিব্যচ্ছবি সুন্দরায়।
তস্মৈ মহা-প্রেমরস-প্রদায়
শ্রীগৌরচন্দ্রায় নমোনমস্তে ॥

"শ্রীগৌরাঙ্গ" ধ্বনি আবার ধীরে ধীরে বঙ্গদেশে উত্থিত হইতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গের নামের সঙ্গে তাঁহার প্রেম, লীলা, প্রচার প্রভৃতি প্রসঙ্গও ক্রমশঃ পুস্তকে, প্রবন্ধে, কবিতায়, বক্তৃতায়, সংগীতে, সংকীর্ত্তনে, আলাপে, আলোচনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে।

যে "গৌর-ভক্তি" বস্তুটি এতদিন প্রায়শঃ ভেকধারী বাউল-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে সংগোপিতপ্রায় ছিল, তাহা এখন দেশের মুখ-পাত্র কৃতবিদ্য সমাজে সাদরে অভ্যর্থিত ও প্রার্থিত হইতেছে। সংপ্রতি গৌরতত্ত্ব-সেবক সুধীবর শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের "Lord Gouranga" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রচার ফলে গৌরাঙ্গ-প্রসঙ্গ, খ্রীষ্টধর্ম্ম প্লাবিত বিলাস-বিমোহিত বিলাত-প্রদেশেও আলোচিত—আস্বাদিত হইতে চলিল। ফলে আধুনিক গৌরাঙ্গ-প্রসঙ্গীগণ সকলেই যে ঠিক গৌরাঙ্গকে ভগবানের অবতার বা "স্বয়ং কৃষ্ণ" বিশ্বাস করিয়া গৌরভক্তিতে আকৃষ্ট হইতেছেন, তাহা নহে। কেহ তাঁহাকে পূর্ণ ভগবান গৌরাঙ্গাবতার, কেহ অংশাবতার বা গুণাবতার, কেহবা ভগবদ্ভক্ত মাত্র জ্ঞানেও গৌরভক্তির ভাবক, সেবক ও যথাসম্ভব সাধক হইতেছেন।

অস্মদ্দেশে অনেকেই জানেন যে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের "হাত-চালা" পরীক্ষায় এই বাক্যটি প্রকাশিত হইয়াছিল——

"গৌরাঙ্গো ভগবদ্ভক্তো নচ পূর্ণো নচাংশকঃ।"

ইহার তিনপ্রকার অর্থ হয়, তাহাও অনেকে জানেন।

গৌরাঙ্গঃ ভগবদ্ভক্তঃ,নচ পূর্ণঃ,নচ অংশকঃ।(১)

গৌরাঙ্গঃ ভগবদ্ভক্তঃ নচ,পূর্ণঃ নচ,অংশকঃ।(২)

গৌরাঙ্গঃ ভগবদ্ভক্তঃ নচ,পূর্ণঃ,নচ অংশকঃ।(৩)

এই বাক্যটির প্রথম ত্রিধাভেদান্বয়ে গৌরাঙ্গকে ভগবদ্ভক্তঃমাত্র বুঝায়; দ্বিতীয় ত্রিধাভেদান্বয়ে তাঁহাকে অংশাবতার বুঝায়; তৃতীয় ত্রিধাভেদান্বয়ে পূর্ণ অবতার স্বয়ং ভগবান বুঝায়। তবে কিনা, সংস্কৃত ভাষার সহজ রীতি-প্রকৃতি অনুসারে প্রথমান্বয়ই স্বতঃসঙ্গত বোধহয়; কিন্তু জনরব-জীবিত ঐ "হাত-চালা" সংবাদটির উপরেই গৌরতত্ত্ব-নিরূপণ-নির্ভর সম্ভবেনা। উহার বিশ্বস্ততা ও বিশুদ্ধতা সম্বন্ধেও প্রকৃষ্ট প্রমাণ কিছু নাই; বিশেষতঃ উহাতে প্রত্যক্ষ,অনুমিতি ও আপ্ত, এই ত্রিবিধ শাস্ত্র-সম্মত-প্রমাণের অবিতর্কিত অস্তিত্ব অসিদ্ধ। যাহাহউক,শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে উক্ত ত্রিবিধ মতভেদই চলিয়া আসিতেছে, সত্য। বর্ত্তমান সময়েও ঐরূপ; তবে ইদানীং দিন দিন গৌরাঙ্গের প্রতি ঐশী-ভক্তি ও বিশ্বাসের ভাব ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ও বিস্তারিত হইতেছে, তাহা আমরা দেখিতেছি। মোটের উপর,শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি অতি মহীয়ান মান ও পরম প্রীতি-গৌরবের ভাব অধুনা দিন দিন স্পষ্ট-পুষ্ট ও বলিষ্ঠ-গরিষ্ঠ হইতেছে, সন্দেহ নাই। আশা করি, ইহা অতি শুভফলপ্রসূ সুলক্ষণই হইবে।

গৌরাঙ্গের লীলা বা জীবনচরিত অপূর্ব্ব। গৌরাঙ্গের রূপ অতুল্য, গুণ অনন্ত। গৌরাঙ্গের শিক্ষা, শক্তি, প্রেম, ভক্তি, ভাব, প্রভাব, ঐশ্বর্য্য,মাধুর্য্য, সমস্তই অসাধারণ—অলৌকিক—অনুপম! এই জন্যই গৌরাঙ্গ-চরিত বা গৌরাঙ্গ-লীলার বিবরণ বিশিষ্টরূপে অবগত হইলে, তাঁহার প্রতি "ভগবান"—"অবতার" বা অন্ততঃ "মহাপুরুষ"-বুদ্ধি স্বতএব বিকসিত হইয়া উঠে। সুতরাং গৌরাঙ্গ-মহিমার মহামাননা সম্বন্ধে সাধারণতঃ মতদ্বৈধ নাই বলিলেই হয়। প্রকাশ্য-পরধর্ম্ম-প্রনিন্দুক "পাদ্রী" প্রচারকেরাও কষ্ট-কল্পনা করিয়া আমাদের "নিখুঁত গৌরাঙ্গ-সুন্দরে" কোন খুঁত আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। সর্ব্বধর্ম্ম সার শিক্ষক শ্রীগৌরাঙ্গের চারু চরিতে সর্ব্বধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ধার্ম্মিকগণই মুগ্ধ।

ধার্ম্মিক হিন্দুদের ত কথাই নাই। বিশেষতঃ বৈষ্ণবের ত সর্ব্বস্বধন শ্রীগৌরাঙ্গ। আর শাক্ত, শৈব, সৌর,গাণপত্য, এই অপর চতুঃ-সম্প্রদায়ের উপাসকগণও গৌরাঙ্গ-শিক্ষায় স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক উপাসনার অনুকূল সাধন-শক্তি ও প্রেম-ভক্তি লাভ করিতে পারেন। হিন্দুধর্ম্ম-সংস্পৃষ্ট বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্ম প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বীরাও গৌরভক্তির শক্তিতে স্ব স্ব ধর্ম্মসাধন-ক্ষেত্রে বিশিষ্ট উপকার প্রাপ্ত হইতে পারেন। এমন কি, খৃষ্টিয়ান্ মুসলমান, ইহুদী,পার্শিক প্রভৃতি অভারতীয় মুসলবৈদেশিক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ীরা ও গৌরাঙ্গকে অন্ততঃ মহাত্মা বা মহাপুরুষরূপে মানিয়াও, তাঁহার অসাম্প্রদায়িক সার্ব্বজনীন স্বর্গীয় শিক্ষা প্রণাদের স্বাধিকারানুযায়ী অংশভোগে সমর্থ হইয়া আত্মোন্নয়নের অনুত্তম অনুকূলতা লাভ করিতে পারেন। অতএব মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক সম্পত্তি কবিত্ব সম্বন্ধে

"ভারতের কালিদাস! জগতের তুমি" এইরূপ কবি-উক্তি প্রচারিত আছে,তদ্রূপ জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে মানবাত্মার সাধারণ ও স্বাভাবিক সম্পত্তি ভগবদ্ভজন লক্ষ্য করিয়াও ভাব-ভরে-তারস্বরে—অকুণ্ঠিত কণ্ঠে বলাযায়——"ভারতের শ্রীগৌরাঙ্গ! জগতের তুমি!"

ভক্তিই ভগবদুপাসনা সিদ্ধির একমাত্র শক্তি, এ সত্য সর্ব্বদেশ, সর্ব্বজাতি ও সর্ব্বধর্ম্মের উপাসকগণেরই অবিসংবাদ-স্বীকৃত। এ তত্ত্ব বেদ-পুরাণ, বাইবেল্-কোরাণ, ইঞ্জিল-জব্বুর, আবেস্তা মানসুর ইত্যাদি সর্ব্ব ধর্ম্ম-শাস্ত্রেই একতানে গীত—এক সিদ্ধান্তে সমন্বিত। সেই ভক্তির চরম আদর্শ,পরম পরাকাষ্ঠা,অনুপম ও অসাধারণ উদাহরণ শ্রীগৌরাঙ্গের মহামহিমাময় জীবনে স্তরে স্তরে সংন্যস্ত বা থরে থরে সজ্জিত! শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন সাধক-সাধারণের হৃদয়ের ধন। শ্রীগৌরাঙ্গের চরিত কথা সাধন-নন্দনের কল্পলতা।

সত্য হইতেই কল্পনার উদ্ভব। সত্যের ছায়াতেই কল্পনা পালিত। অতএব কল্পনা ফলিতার্থে সত্যকে অতিক্রম করিতে অসমর্থ। "Truth is often stranger than fiction" ইত্যাদি কবি-বাক্যে পাশ্চাত্য জগতেও এ তত্ত্ব স্বীকৃত। ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে এ তত্ত্ব গৌরাঙ্গ-জীবনে পরম প্রোজ্জ্বল প্রভায় প্রকাশিত। দ্বিপাদ-ধর্ম্মময় দ্বাপরে মহাভারতের মহাকবি ব্যাসদেব মহাপুরাণ ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত-প্রসঙ্গে ভক্তিতত্ত্বের যে লোকোত্তর লীলা-বিলাস প্রদর্শন করিয়াছেন, এই পাদধর্ম্মাবশিষ্ট কলিযুগে গৌরাঙ্গ চরিতে তাহাও অতিক্রান্ত হইয়াছে! ভগবদ্ভক্তির [illegible]কোন যুগে কেহ কখনও কল্পনাতেও ভাবিতে পারে নাই, শ্রীগৌরাঙ্গ সেই মূর্ত্তি দেখাইয়া জগৎ মোহিত করিয়াছেন। এইজন্যই আজিও অনেক বঙ্গীয় "কথক" মহাশয় কর্ত্তৃক

"অনর্পিত চরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ।
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং॥
হরিঃ পুরটসুন্দর-দ্যুতি-কদম্ব-সন্দীপিতঃ।
সদা হৃদয়-কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥"

গৌর-লীলার প্রত্যক্ষসাক্ষী ভাগবতপ্রবর ও ভক্তি-দর্শন-কবিবর শ্রীরূপগোস্বামীর বিখ্যাত "বিদগ্ধমাধব" গ্রন্থের গৌরবন্দনা সূচক এই সুমধুর শ্লোকটিদ্বারা গৌর-লীলার অসাধারণ বিশেষত্ব কীর্ত্তিত বা গীত হইয়া থাকে।

"লালসোদ্বেগ জাগর্য্যা তানবং জড়িমা তথা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহ মৃত্যু দশাদশঃ॥"

অথবা—

অঙ্গেষু তাপঃ কৃশতা জাগর্য্যালম্বশূন্যতা।
জড়তা ব্যাধিরুন্মাদো প্রলাপো মূর্চ্ছিতং মৃতিঃ॥

বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিরহীর এই যে দশ দশা বর্ণিত আছে, তাহা সেই কৃষ্ণ-বিরহ-বিধুরা কৃষ্ণপ্রাণা কৃষ্ণ-প্রাণাধিকা রাধিকার কৃষ্ণ-সর্ব্বস্ব জীবনেও পূর্ণপ্রকটিত হয় নাই। শ্রীরাধার নবমী দশা পর্য্যন্ত প্রকাশ পাইয়াছিল, ইহাই পৌরাণিক ইতিহাসের সাক্ষ্য। অনেকের মতে সে ইতিহাসও অর্থবাদ, অতি-কল্পনা ও রূপক-রঞ্জনাপূর্ণ। কিন্তু শতাব্দী-চতুষ্টয় মাত্র পূর্ব্বের ঘটনা গৌরাঙ্গ-লীলায় ইতিহাসের সমুজ্জ্বল সত্যালোকে সুস্পষ্টরূপে উক্ত দশ দশাই পূর্ণ পরিণামে প্রকটিত বা পরিস্ফুটিত! গৌরাঙ্গের গভীর গোবিন্দ-বিরহ তাঁহার শ্রীমুখের শ্লোক-বাক্যেই সুব্যক্ত, যথা——

"যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎসর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥"
পলকে, প্রলয় মম—বর্ষাসম ঝরে আঁখি।
সমস্ত সংসার শূন্য গোবিন্দ-বিরহে দেখি॥

বাস্তবিক গৌরাঙ্গের ভগবদ্ভক্তির অলৌকিক অসামান্য ব্যাপার-পরম্পরা—"নভূত ন ভবিষ্যতি" বাক্যের বিশিষ্ট বিষয়ীভূত বলিলেইযেন যথার্থ বলা হয়। আবার বলি, কোন দেশের, কোন জাতির, কোন ধর্ম্মের, কোন ভগবদুপাসকই ভক্তির এমন অনন্ত-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যময় অসামান্য আদর্শ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। মনুষ্যের তেমন ভাষা নাই, ভাষায় তেমন শব্দ নাই, শব্দে তেমন অর্থ-প্রকাশ-শক্তি নাই, যদ্দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবদ্ভক্তির সম্যক্ বর্ণনা সম্ভবে। সাধে কি বৈষ্ণবাদি সাধকেরা গৌরাঙ্গকে "ভগবান" বলিয়া জানেন?—"অবতার" বলিয়া মানেন? এবং অপর—সাধারণেরা অন্ততঃ "মহাপুরুষ" জ্ঞানে ভক্তি করেন? অতি প্রচণ্ড পাষণ্ড নাস্তিকও গৌরাঙ্গ-জীবনী অধ্যয়ন করিয়া, তাহার ঐতিহাসিক সত্যতায় অন্ততঃ আংশিক বিশ্বাস করিলেও বোধহয় গৌরভক্ত না হইয়া পারেন না। অতএব গৌরাঙ্গ জীবনী সকলেরই অবশ্য অধ্যেয় ও একান্ত আলোচ্য।

আমাদের এ ক্ষুদ্র নগণ্য প্রবন্ধে গৌরাঙ্গ-মহিমার অণু-কণাও প্রকাশিত হইতে পারে না। ভাষায় উহার বর্ণন-চেষ্টা উহার অবর্ণনীয়তা ও অনির্ব্বচনীয়তায় অবিশ্বাস-সূচিকা হয় মাত্র। পাঠক মহাশয়গণকে আমাদের সানুনয় অনুরোধ, তাঁহারা (যাঁহাদের প্রয়োজন) গৌরাঙ্গ-চরিতের ইতিহাস "শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত" "চৈতন্যভাগবত" ও "চৈতন্য-মঙ্গল" প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে স্বয়ং অবগত হইবেন। "মুরারী গুপ্তের কড়চা" প্রভৃতি আরও বিস্তর প্রামাণিক গৌর-লীলাসন্দর্ভ বর্ত্তমান। যাঁহারা গৌরাঙ্গের প্রকৃত ও প্রায় সমসাময়িক, যাঁহারা স্বচক্ষে বা স্বগুরু চক্ষে গৌর-লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের স্বরচিত সন্দর্ভ সাক্ষ্যে (আশা করি) অন্ততঃ অনেকেরই গৌর-মহিমা বিষয়ে সন্দেহ-অন্ধকার অন্তর্হিত হইবে। প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাদি যাঁহারা সংগ্রহ পূর্ব্বক অধ্যয়ন-আলোচনাদি করিতে অসুবিধা বোধ করেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের লিখিত "অমিয় নিমাই চরিত" পুস্তক পাঠ করুন, ইহা আমাদের একান্ত অনুরোধ। এ পুস্তক একাধারে গৌর-লীলার, ইতিহাস, কাব্য ও দর্শন স্বরূপ।

এক্ষণে কথা এই যে, গৌরাঙ্গ যদি অবতার হন, তবে তাঁহার অবতারত্বের মাত্র প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ হিন্দুর বিচারে সিদ্ধান্ত-সমাধান পক্ষে যথেষ্ট নয়। আপ্ত বা শাব্দ প্রমাণ—অর্থাৎ শাস্ত্রীয় প্রমাণই তৎসম্পূরণে সমর্থ। প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণে গৌরাঙ্গকে অবতার স্বীকার করিলে, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, তৎসম্বন্ধে আপ্ত প্রমাণেরও অসদ্ভাব নাই। ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণের যোগ সিদ্ধ-জ্ঞান-দর্পণে অবশ্যই উহা অপ্রতিফলিত রহে নাই। অবশ্যই আর্ষ শাস্ত্রে উহার অন্ততঃ কিছু না কিছু উল্লেখ বা প্রমাণ পরিচয় আছেই। সুতরাং গৌরাঙ্গ যে ভগবান, গৌরাঙ্গ যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের "রাধা-ভাব-কান্তি-বিলাসরূপী" অবতার, আমদেশীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ী পণ্ডিতগণ তৎসমর্থক কতিপয় শাস্ত্রীয় বচন-প্রমাণাদি সং[illegible]

য়াছেন। তাঁহারা বলেন,—"গৌরাঙ্গ ছন্ন অবতার, সুতরাং তাঁহারই ইচ্ছায় শাস্ত্রে তদ্বিবরণ একটু প্রচ্ছন্ন আছে; অর্থাৎ বিশদ-বিস্তৃতভাবে নাই; অথচ খুঁজিয়া বুঝিয়া দেখিলে, বিভিন্ন শাস্ত্রেই তাহার আভাষ, ইঙ্গিত, সংক্ষিপ্ত সংবাদ এবং কোথাও কোথাওবা বিস্পষ্ট বিবৃতিও দৃষ্ট হয়।" প্রাচীন গৌরাঙ্গ চরিতাখ্যায়ক বৈষ্ণবাচার্য্য গ্রন্থকারগণ কতকগুলি শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তৎপর এযাবৎকাল আরও কতকগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা তাহার কতিপয় সংখ্যক বচন নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। এ দীন লেখক অশাস্ত্রজ্ঞ—অপণ্ডিত, সুতরাং উদ্ধৃত করিয়াই গৃহীতাবসর; ফলে লেখক-পক্ষ হইতে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত সমাধানের চেষ্টা বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। অতএব নিম্নোদ্ধৃত বচন-প্রমাণগুলির উপক্রম-উপসংহার-সমন্বয়, ব্যাখ্যা-বিবৃতি, বিচার-বিতর্ক, খণ্ডন-সমর্থন, পূর্ব্বপক্ষ-সিদ্ধান্তপক্ষ, এ সমস্তই গৌরাঙ্গাবতার-বাদের স্বপক্ষ-প্রতিপক্ষ পণ্ডিত-পাঠক-মণ্ডলীর জন্যই প্রতীক্ষিত রহিল।

গীতায়—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥"

(গৌরাঙ্গাবির্ভাব-কালে এতদ্দেশে শুষ্ক জ্ঞানমার্গীয় ন্যায়-তর্কের প্রবল প্রভাব, তান্ত্রিক "পঞ্চমকারাদির" অতি অপব্যবহার প্রভৃতি কারণে ভক্তিমার্গীয় "ভাগবতধর্ম্মের" অত্যবনতি ঘটিয়াছিল।)

ভাগবতে—

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥"
"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

বায়ুপুরাণে—

"শুদ্ধো গৌরঃ সুদীর্ঘাঙ্গস্ত্রিস্রোতস্তীরসম্ভবঃ।
দয়ালুঃ কীর্ত্তনগ্রাহ্যো ভবিষ্যামি কলৌযুগে॥"

স্কন্দপুরাণে—

"অন্তঃকৃষ্ণো বহির্গৌরঃ সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদঃ।
শচীগর্ভে সমাপ্নুয়াং মায়া-মানুষ-কর্ম্মকৃৎ।"
"শ্বেতঃ সত্যযুগে বর্ণঃ রক্তস্ত্রেতা যুগে পুনঃ।
দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণোঽহং পীতঃ কলিযুগে স্মৃতঃ॥"

বামনপুরাণে—

"কলৌ ঘোরতমশ্ছন্নান্ সর্ব্বাচারবিবর্জ্জিতান্।
শচীগর্ভে চ সংভূয় তারয়িষ্যামি নারদ॥"

ভবিষ্য পুরাণে—

"আনন্দাশ্রুকলারোমহর্ষপূর্ণং তপোধন।
সর্ব্বে মামেব দ্রক্ষ্যন্তি কলৌ সন্ন্যাসরূপিণং॥"
"কলৌ সন্ন্যাসরূপেণ বিচরামি চরাচরম্॥"

গরুড়পুরাণে—

"কলৌ প্রথম সন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যতি।
দারুব্রহ্ম সমীপস্থঃ সন্ন্যাসী গৌরবিগ্রহঃ॥"
"অহমেব পরংব্রহ্ম সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
হরের্ণাম কীর্ত্তনেন তারয়ামি কলৌ নরান্॥"

কূর্ম্মপুরাণে—

"কলিনা দহ্যমানানামুদ্ধারায় সমুদ্ভবঃ।
কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং ভবিষ্যামি দ্বিজাতিষু॥"

লিঙ্গপুরাণে—

"ভক্তিযোগপ্রকাশায় লোকস্যানুগ্রহায় চ।
সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিত্য কৃষ্ণচৈতন্য নামধৃক্॥"

নারদীয়পুরাণে—

"কলৌ সংকীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥"

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে --

"অহমেব পরংব্রহ্ম সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
গ্রাহয়ামি হরৌ ভক্তিং কলৌ পাপহতান্নরান্॥"

ব্রহ্মপুরাণে —

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ইতি পুণ্যতমং প্রভোঃ।
হেলয়াশ্রদ্ধয়ারাধ্য সর্ব্বমার্থফলং লভেৎ।"

অগ্নিপুরাণে—

"শান্তাত্মা লম্বকণ্ঠশ্চ গৌরাঙ্গশ্চ সুরাবৃতঃ।"

বিশ্বসার তন্ত্রে—

"গঙ্গায়া দক্ষিণেভাগে নবদ্বীপে মনোহরে।
কলিপাপবিনাশায় শচীগর্ভে সনাতনঃ॥
জনিষ্যতে প্রিয়ে মিশ্রপুরন্দর গৃহে স্বয়ং।
ফাল্গুনে পৌর্ণমাস্যাঞ্চ নিশায়াং গৌরবিগ্রহঃ॥

কপিল তন্ত্রে—

"জম্বুদ্বীপে কলৌ ঘোরে মায়াপুরে দ্বিজালয়ে।
জনিত্বা পার্ষদৈঃ সার্দ্ধং কীর্ত্তনং কারয়িষ্যতি॥"

মুক্তসঙ্কলিনী তন্ত্রে —

"কুরুক্ষেত্রং কৃতে তীর্থং ত্রেতায়াং পুষ্করং স্মৃতং।
দ্বাপরে নৈমিষারণ্যং নবখণ্ডং কলৌ কিল।
যথা দ্বিজমণি গৌরঃ সাক্ষাদবতরিষ্যতি॥"

কৃষ্ণযামলে—

"পুণ্যক্ষেত্রে নবদ্বীপে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ।"

অনন্ত সংহিতায়—

"রাধিকাবল্লভঃ কৃষ্ণো ভক্তানাং প্রিয়কাম্যয়া।
শ্রীমদ্গৌরাঙ্গরূপেণ নবদ্বীপে বিরাজতে॥
গোপীভাব প্রদানার্থং ভগবান্ নন্দনন্দনঃ।
ভক্তবেশধরঃ শান্তো দ্বিভুজো গৌরবিগ্রহঃ॥

মনুসংহিতায়—

"প্রশাসিতারং সর্ব্বেষামনীয়াংসমণুষ্বপি।
রুক্মাভং স্বপ্নধীগম্যং বিদ্যাত্তং পুরুষং পরং॥"

[টীকা—"রুক্মাভং—(উপাসনাবিস্ফুর্ত্তৌ) শুদ্ধ স্বর্ণাভং। স্বপ্নধীঃ—আত্মধীঃ।"]

ভাগবতে—প্রহ্লাদ স্তবে—

"ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং।
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোহথ সত্বং॥"

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে—

"মহান্ প্রভুর্বৈঃপুরুষঃ সত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।"

মুণ্ডকোপনিষদে—

"যদাপশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং।
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্॥
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়।
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥"

গোপালোপনিষদে—

"নমো বেদান্তবেদ্যায় কৃষ্ণায় পরমাত্মনে।
সর্ব্বচৈতন্যরূপায় চৈতন্যায় নমোনমঃ॥"

ভারতীয় শ্রীকৃষ্ণ সহস্রনামে—

"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।"

ইত্যাদি।

গৌরাঙ্গাবতারের বচন-প্রমাণ উপরে যেগুলি উদ্ধৃত হইল, তদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি আছে। আমরা আপাততঃ সকলগুলি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ফলে যাহা কিছু সংগৃহীত হইল, তাহাতেই দেখা যাইতেছে যে, বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, তন্ত্র, সর্ব্ব শাস্ত্র হইতেই গৌরাঙ্গাবতারের প্রমাণ-প্রয়োগহইতেছে। এ সমস্ত হাসিয়া উড়-ইবার বস্তু নহে।—উদাস্য উপেক্ষার বিষয় নহে। তিনটি মাত্র মৌখিক বর্ণ-ব্যয়ে "প্রক্ষিপ্ত" বলিয়া একটানে বিচারের বাহিরে নিক্ষিপ্ত করার জিনিস নহে। তবে কিনা, "গৌরাঙ্গ" "কৃষ্ণচৈতন্য" "শচী" "নবদ্বীপ" প্রভৃতি প্রোজ্জ্বল-প্রমাণক পদগুলিযুক্ত বচনগুলিতে প্রক্ষিপ্ততার সন্দেহ আ[illegible]

হয়ত আসিতে পারে কিন্তু কথা এই যে, "এই সেদিনকার আমাদেরই বাঙ্গালী নিমাই চাঁদ মিশ্র কখনও অবতার হইতে পারেন না" এইরূপ বলাৎকৃত 'এক গুঁয়ে' বিশ্বাস ভিন্ন নিশ্চয় "প্রক্ষিপ্ত" বলিয়া বুঝিবার কারণ নাই। গৌরাঙ্গের অবতার হওয়া যদি অসম্ভব না হয়, তবে উক্ত বচনগুলি প্রক্ষিপ্ত না হওয়ারইবা অসম্ভাবনা কোথায়? যে ত্রিকালজ্ঞ সিদ্ধর্ষিগণ কলির অন্ত্যসন্ধ্যাস্থ সুদূর ভবিষ্যতের যুগাবতার কল্কীশদেবের লীলা-বিবরণ বিবৃত করিয়াছেন, গৌরাঙ্গের অবতারত্ব সত্য হইলে, তাঁহারা কি কলির প্রথমসন্ধ্যার ছন্নরূপী সেই ভক্তি শিক্ষয়িতা ভক্তাবতারের বিষয়ে কিছুই বলিবেন না? বিশ্ব-দর্শন আর্য্যশাস্ত্রে কি তাহার অন্ততঃ আভাষ-ইঙ্গিত বা সংক্ষিপ্ত সংবাদও থাকিবে না? গৌরাঙ্গের কথা ঠিক খাটিয়া গিয়াছে, এই অপরাধেই কি উক্ত বচনগুলিকে 'প্রক্ষিপ্ত' জ্ঞান করিতে হইবে? বুঝিয়া দেখিলে, ইহা একরূপ হাস্যকর সিদ্ধান্ত। রাম-কৃষ্ণাদির অবতারব্যাপার বহুকাল হইয়া গিয়াছে, অতএব তাহার পৌরাণিক সাক্ষ্য ঐতিহাসিক সত্য; আর কল্কী অবতার অনেক দূরে। অতএব ঋষিদের তদ্বিষয়িণী ভবিষ্যদ্বাণি নিশ্চয় সত্য হওয়া সম্ভব; কিন্তু গৌরাঙ্গাবতার এই সেদিন বাঙ্গালায় হইয়া গিয়াছে, অতএব তৎপূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে কোন আর্ষ ভবিষ্যদ্বাক্যই অসম্ভব; এরূপ অর্থশূন্য "অতএব" গুলির আনীত সিদ্ধান্ত কখনও অবতারবিশ্বাসী জ্ঞানী হিন্দুর অনায়াস-গ্রাহ্য হইতে পারে না।

মোটকথা, যদি স্বতঃসিদ্ধভাবে বা অনুমানাদি প্রমাণান্তর-প্রভাবে গৌরাঙ্গাবতার প্রকৃত বোধ হয়, তবে উক্ত বচনগুলিও প্রকৃত বলিয়া বুঝিতে, অর্থাৎ গৌরাঙ্গাবতার-প্রতিপাদক আপ্ত প্রমাণ বলিয়া মানিতে বাধা নাই। আর যদি গৌরাঙ্গাবতার অপ্রকৃত মনে হয়, তবে ওগুলিও কাজেই প্রক্ষিপ্ত বা ভিন্নার্থক মনে হইবেই। কিন্তু তাই বলিয়া, গৌরাঙ্গাবতারে ঠিক বিশ্বাস হইলেই বচনগুলি ঠিক বলিয়া বিশ্বাস করিব, এরূপ প্রতিজ্ঞা যেন কতকটা "সাঁতার শিখিয়া জলে পা দিব" বা "রোগমুক্ত হইয়া ঔষধ খাইব" এইরূপ প্রতিজ্ঞার ন্যায়! কেননা বচনগুলিতে বিশ্বাসই গৌরাঙ্গাবতারে পূর্ণ বিশ্বাসের প্রয়োজক; কারণ আপ্ত বা শাস্ত্রীয় প্রমাণ ভিন্ন অন্যান্য প্রমাণে হিন্দুর মনস্তৃপ্তি হয় না। শাস্ত্র শাস্ত্রীয় প্রমাণকেই শ্রেষ্ঠতম আসন দিয়াছেন। ফলকথা, যদি গৌরাঙ্গাবতার বিশ্বাসের সাপেক্ষতায় তৎপ্রতিপাদক প্রমাণগুলি বিশ্বাস করিতে হয়, তবে ন্যায়শাস্ত্রের মস্তক ভক্ষণ করা হয়; অর্থাৎ তাহাহইলে প্রমাণকেই প্রমেয়দ্বারা প্রমাণিত করিতে হয়! তাহাহইলে অবস্থাটি এইরূপ দাঁড়ায়, যেন উক্ত বচনগুলির খাতিরেই গৌরাঙ্গকে অবতার হইতে হইয়াছে! যেন ঋষি বেচারিরা সোমরসের নেশার ঝোঁকে বচনগুলা শাস্ত্রে বসাইয়া প্রচার করিয়া ফেলিয়াছেন, কাজেই দয়াল ভগবানকে অগত্যা গৌরাঙ্গ সাজিতে হইয়াছে!

যাহাহউক, বিষয় অতি গুরুতর। বিষয়টি ধর্ম্মার্থী—ভগবদ্ভজনার্থী—জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশিষ্ট মানব মাত্রেরই আলোচ্য। বিশেষতঃ

হিন্দুমাত্রেরই, এবং সুবিশেষতঃ বাঙ্গালী হিন্দু-মাত্রেরই আলোচ্য যেহেতু শ্রীগৌরাঙ্গ বাঙ্গালী ছিলেন। এই দীন কৃষ্ণাঙ্গ বাঙ্গালীকুলেই দীনবন্ধু গৌরাঙ্গ জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

উদ্ধৃত বচন-প্রমাণগুলির মধ্যে যে গুলিতে আপাততঃ প্রক্ষিপ্ততার সন্দেহ আসিতে পারে, আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সেগুলিকে মাত্র মনের বিশ্বাসেই "প্রক্ষিপ্ত" না বলিয়া, শাস্ত্রীয়তা সহযোগে তাহা প্রমাণ করিতে পারেন, এবং যাহাতে একটু আব-রিত ভাবে—অর্থাৎ আভাষে—ইঙ্গিতে বা অন্ততঃ সুসংক্ষিপ্ত সংবাদে "গৌরাঙ্গাবতার" সূচিত হইয়াছে, এরূপ অবশিষ্ট বচনগুলি ভিন্নার্থবাচক বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারেন, এরূপ পণ্ডিত কেহ আছেন কিনা, জানিনা; কিন্তু অদ্যাপি সেরূপ কোন প্রতিবাদ-ব্যাখ্যাদি শুনি নাই বা সাহিত্যের বাজারেও প্রকাশিত দেখি নাই। যদি সেরূপ কিছু থাকে, তবে বোধহয় তাহার স্পষ্ট ও প্রকৃষ্ট আলোচনা আবশ্যক। খাঁটি সোনার আগুনে ভয় কি? পরন্তু দ্বিধা-মনে সুধা খাইলেও ক্ষুধা যায় না। বিশেষতঃ এ বিংশ শতাব্দী, জড়-বিজ্ঞানের যুগ, যুক্তি-তর্কের যুগ। এ যুগে লোক অন্ধকারে সন্দেশ খাইতেও চায় না, হাতে সোনা দিলেও লয়না! আলো চাই, প্রমাণ-পরীক্ষা চাই। তা প্রমাণ-পরীক্ষারইবা বাধা কি?—আপত্তি কি? একটি গ্রাম্য প্রবাদ এই যে, "সাচা গুড় আঁধারেও মিঠা।" প্রমাণ-পরীক্ষার বিচার বিতর্ক আপাততঃ ভক্তি-বাধক বোধহইলেও, এই বিচার-বিতর্কের যুগে উহা অপরিহার্য্য বলিয়া, তদধিকৃত করিয়াও, ভক্তির আলম্বকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া থাকিতে হইবে। উহাকে বিতর্ক বিজয়ী করিয়া নিতে হইবে।

"নৈষাতর্কেণ মতিরাপনীয়া" ইত্যাদি বেদ-বাক্য এবং "বিশ্বাসে পাইবে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর" ইত্যাদি চিরপ্রচলিত বঙ্গীয় মহা-জন-বাক্যের প্রতিবর্ণে—প্রতিমাত্রায় সত্য জ্যোতি সমুৎকীর্ণ, সন্দেহ নাই; কিন্তু ভগবদ্বিষয়ে তর্ক-সংস্পর্শশূন্য স্বতঃসবল বিশ্বাস বর্ত্তমান যুগে অতি অল্প লোকেই ভাগ্যবান করে। যিনি সহজ বিশ্বাস ও তর্কানুশীলন, দুয়ের বাহির, তাঁহার আশা কোথায়? বরং বিশ্বাসের মূলভিত্তি ভাগ্যে নাথাকিলেও, অন্ততঃ "তর্কে বহুদূর" বলিয়া এক দিন না একদিন কিছু না কিছু হইলেও হইতে পারে। অনেক স্থলে, সরল সত্যজিজ্ঞাসুর তর্ক-ফলে অনুকূল সিদ্ধান্ত-সমাধান লাভ হইয়া, ভক্তি-বিশ্বাস অর্জ্জনের আনুকূল্য হয়; কিন্তু দুয়ের বাহির হইলে কোন আশা নাই। এইজন্য প্রমাণ-পরীক্ষার কথা কহি-লাম। অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ে সহজ জ্ঞানের অভাবস্থলে বরং প্রমাণ-পরীক্ষা-লভ্য জ্ঞানই গ্রাহ্য, কিন্তু উপেক্ষা ও ঔদাসীন্য একান্তই অন্যায্য ও ত্যাজ্য।

গৌরাঙ্গাবতার বিষয়ক পূর্ব্বোক্ত বচন প্রমাণগুলি যদি তত্ত্বান্তরনিষ্ঠ বা অসত্য-প্রতিষ্ঠ হয়, তবে আমাদের (বুঝিয়া দেখিলে) বিশেষ ক্ষতি নাই; কিন্তু যদি সত্যপ্রতিষ্ঠ গৌরতত্ত্বনিষ্ঠই হয়, এবং আমরা উপেক্ষা-নিদ্রায় নিদ্রিত থাকি, "হেলায়ে রতন হারাই" বা "হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলি," তবে বিশেষ ক্ষতির কথা বটে। অপিচ, সামান্য মানুষকে অব-তারবোধে গ্রহণের ক্ষতি অপেক্ষা [illegible]

সামান্য মানুষবোধে ত্যাগের ক্ষতি মহত্তর, সন্দেহ নাই। অবতারতত্ত্বে অবিশ্বাসী অহিন্দুর নিকট এ যুক্তি নগণ্য বা ন-কিঞ্চিৎ-কর হইলেও হিন্দুর পক্ষে কদাচ তাহা নহে। হিন্দু বুঝিবেন যে, অবতার জ্ঞানে মানুষের সাধনা করিলে, সাধকের তাহাতে সাধন-শক্তি বা প্রেম-ভক্তির অপচয় হইবে না, বরং স্থলবিশেষে সাত্ত্বিক অনুশীলনে তাহার বর্দ্ধন-পোষণই হইবে এবং তাহাতে তাঁহার পূর্ব্ব-প্রণিহিত ইষ্ট বিষয়ে কিছুই অনিষ্ট হইবেনা; কিন্তু অবতারকে সামান্য মানুষবোধে উপেক্ষা করিলে, তাহাতে অনেক করামলকবৎ সঞ্চিত ইষ্টে বঞ্চিত হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব তর্কস্থলে বলা যায় যে, যদি গৌরাঙ্গাবতার অলীক হন, তবে বহু-অবতার-সেবী হিন্দুর তাহাতে নিতান্ত নিরাশার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু কলিযুগ পাবনরূপে——সুলভ শান্তিবিধাতা স্বরূপে গৌরাঙ্গাবতার যদি সত্য হন, আর আমরা দুর্ভাগ্যদোষে দুর্ব্বুদ্ধি-বশে তাঁহার শুদ্ধ শীতল আশ্রয় হারাইয়া ক্রমাগত কলিকল্মষ-কলঙ্কিত ও ত্রিতাপ-তাপিত হইতে থাকি, তবে তাহার ন্যায় নিদারুণ নিরাশা, ক্ষতি ও খেদের কারণ আর কি হইতে পারে? এইজন্যই বলি, গৌর-লীলার বিশেষ বিবরণাদি অধ্যয়ন, অনুসন্ধান, অনুধ্যান আমাদের একান্ত আবশ্যক। এই দুর্লভ—অথচ চঞ্চল জীবনে ইহাতে আলস্য বা ইতস্ততঃ করা সুবুদ্ধিসঙ্গত বোধ হয় না।

অবশ্য "ঘষে মেজে রূপ আর ধরে বেঁধে পীরিত" হয় না সত্য; কিন্তু স্বতঃসুরূপমূর্ত্তি [illegible] ধুলো-মাথা হইলেও, যেমন ঘষে মেজে নিলে আবার রূপ ভাসে, তেমনি স্বতঃসর্ব্ব-মনোহর পাত্রের শুভসঙ্গ ধরে বেঁধে করাই-লেও তাহাতে আপনি মনের অনুরাগ আসে; নচেৎ "মনোহর" শব্দের অর্থই যে অসিদ্ধ হয়। অতএব ভগবৎকৃপায় স্বতঃ-সদ্ভাব-সুন্দর হিন্দু-হৃদয়ে কুশিক্ষা-কলঙ্ক না থাকিলে এবং স্বতঃসর্ব্বমনোহর গৌরাঙ্গচরিত অনুশীলিত হইলে, তাহাতে গৌরাঙ্গানুরাগ স্বতঃই সঞ্চারিত হইবার সম্ভাবনা।

অপর, যদি হিন্দুর বিশ্বাসে যোগ্য মানুষে ঈশ্বরাবতারত্ব অশাস্ত্রসঙ্গত ও অস্বাভাবিক না হয়, তবে গৌরাঙ্গের ন্যায় অমন যোগ্যাতিযোগ্য পাত্রে ঈশ্বরাবতারত্বেরইবা অশাস্ত্রসঙ্গতি ও অসম্ভাবনা কি? বাঙ্গালী জাতি কি এতই অভিশপ্ত যে, এ জাতিতে ঈশ্বরের অবতার হওয়া একান্তই অসম্ভব ও অস্বাভাবিক? বাঙ্গালীর ছেলে হইয়া, বাঙ্গালীর আকৃতি-প্রকৃতি লইয়া, বাঙ্গালা কথা কহিয়া কি ঈশ্বরের অবতার হওয়া একান্তই হিন্দুর দর্শন-বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ? বোধকরি অবতারবাদী কেহই তাহা প্রমাণ করিতে পারিবেন না। ঘরের লোককে ভগবানরূপে পাওয়া বড়ই ভাগ্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। ঘরের লোক উপাস্য ঈশ্বরাবতার, ঘরের লোক ভোগ-মোক্ষ-দাতা, শান্তি বিধাতা, এ অপেক্ষা সুখ, সুবিধা ও সুকৃতির বিষয় সাধকের আর কি হইতে পারে? এ কথায় অবতার-অবিশ্বাসী অহিন্দু-মণ্ডলে হয়ত হাস্য-রসের তরল তরঙ্গ বহিতে পারে, কিন্তু হিন্দুর-পক্ষে তদ্বিপরীত। ভাবিয়া দেখিলে, ব্যাপার বড় গুরুতর। যে ধর্ম্মার্থী হিন্দু প্রয়োজন-লাঘব-বোধে এবিষয়ে উদাসীন রহিলেন, তিনি সংসারে

অপর সহস্র গুণ-বিশেষণে বিভূষিত হইলেও তাঁহাকে "প্রকৃত বুদ্ধিমান" বলা যায় কিনা, সন্দেহ। ফলকথা, আমরা ঠকিয়া না যাই। পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতার অসার অভিমান-মোহে মজিয়া আমরা আত্মপ্রতারিত না হই। স্বর্ণ ফেলিয়া শূন্য অঞ্চলে গ্রন্থিবন্ধন না করি। অধর-ধৃত সরল সুধাপাত্র স্বকরে সরাইয়া, কুটিল কালকূট গরল গলাধঃকৃত না করি, ইহাই প্রার্থনীয়।

শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ণব, প্রধানতঃ এই পঞ্চ উপাসক-সম্প্রদায়ে হিন্দুজাতি বিভক্ত। ইহার মধ্যে বৈষ্ণবের (বিশেষতঃ বঙ্গীয় বৈষ্ণবের) গৌরাঙ্গাবতারে বিশ্বাস একরূপ স্বাভাবিক, বলা যায়। ইহার ব্যতিক্রমে কলিতে কৃষ্ণভজনের অধিকারই অসম্ভব, ইহাও গৌরভক্ত বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস। কৃষ্ণমন্ত্রে ইষ্ট সাধন এবং গৌরভক্তিতে তাহারই শক্তি-সঞ্চারণ ও সিদ্ধি সম্পাদন, ইহাই বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সমাজের তত্ত্ব-সাধন-নীতি। বিশেষতঃ শ্রীগৌরাঙ্গে একাধারে রাধা-কৃষ্ণ-যুগল মিলনের সমাবেশ! শ্রীরাধার ভাব-কান্তি-বিলাস-লীলারূপী শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌরাঙ্গ, অস্মদ্দেশে আনুষ্ঠানিক বৈষ্ণব সাধক-সমাজে এই গুহ্য তত্ত্বের নিষ্ঠা ও প্রতিষ্ঠাই গৌর-ভজনের ভিত্তিভূমি। অতএব গৌর-ভজন সম্বন্ধে বৈষ্ণবের পথ পরিষ্কার। তবে শৈব-শাক্ত প্রভৃতি সমাজস্থ স্থূলাধিকারিগণের আপাততঃ তদ্বিষয়ে একটু জটিলতা বোধ হইতে পারে।

বৈষ্ণবেতর অপর সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের অনেকে হয়ত গৌরাঙ্গকে বড় জোর "ভগবদ্ভক্ত" মাত্র বলিতে প্রস্তুত। গৌরাঙ্গাবতার-বাদের পক্ষ হইতে ইহাকে "মন্দের ভাল বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণের 'Second Edition' বলিয়া কৌতুকোক্তি করা অপেক্ষা ভগবদ্ভক্ত বলা মন্দ নহে। "ভগবদ্ভক্ত" বিশেষণটি মানুষের পক্ষে সর্ব্বোচ্চ বা সর্ব্বোত্তম সন্দেহ নাই। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্য কে? উত্তর—ভগবদ্ভক্ত যে। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন-চরিত অবগত হইয়া, তাঁহাকে অতুল্য অসাধারণ ভগবদ্ভক্ত—সুতরাং মানবশ্রেষ্ঠ—নরোত্তম বলিয়া বুঝিতে পারিলেও উপকার আছে। ভক্ত ও ভগবানে বিশেষ নৈকট্য। রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি মানব মূর্ত্তিতে যেখানে অবতারত্ব, সেখানেই আদর্শ বা শ্রেষ্ঠ মানবত্বই অবতারত্বের আধাররূপে প্রতিপন্ন। গৌরাঙ্গও ভক্তরূপী অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ; সুতরাং ভগবদ্ভক্তের চূড়ান্ত আদর্শ স্বরূপ শ্রেষ্ঠতম মানবত্বে অবতারত্বের অসম্ভাবনা কোথায়? অতএব আদৌ "ভক্তশ্রেষ্ঠ" বোধে গৌরাঙ্গে ভক্তিমান হইয়া, ক্রমে তাঁহার অপূর্ব্ব লীলা-বিলাসের সমগ্র ইতিহাস আলোচনা, তাঁহার সমসাময়িক দেশপ্রসিদ্ধ পরম পণ্ডিত ও জ্ঞানী মহাত্মাগণের স্বহস্ত-লিখিত গৌরতত্ত্ব সিদ্ধান্তের অবধারণা এবং পূর্ব্বোদ্ধৃত শাস্ত্রীয় বচন-প্রমাণাদির বিচারণা ইত্যাদিতে "গৌরাঙ্গবতার" বিশ্বাস-বিষয়ীভূত হন কিনা, তাহার অন্ততঃ একবার পরীক্ষা করিয়া দেখাও ধর্ম্মসাধনার্থী মানব (বিশেষতঃ হিন্দু) মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়। ফলে গৌরাঙ্গাভিমুখিনী চিদ্বৃত্তির কথঞ্চিৎ প্রাকৃতিক প্রেরণা ভিন্ন গৌরতত্ত্বানুসন্ধানে কাহারও প্রবৃত্তিই অসম্ভব। সকলের মূলেই প্রকৃতি-প্রতিভা

তদ্ভিন্ন সহস্র চেষ্টাতেও কিছুই হয় না। মূলে যাহা নাই, ডালে তাহা কখনও ফলে না।

যে হেতু মূলেই হউক, গৌরাঙ্গের অবতারত্বে বিশ্বাস হইলে, বৈষ্ণব ব্যতীত অপর চতুরুপাসক সম্প্রদায় কিরূপে তাঁহার ভজনা করিবেন? এ প্রশ্নের উত্তর সহজ। শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহারা যেরূপে ভজেন, সেইরূপেই গৌরাঙ্গ ভজিবেন। সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষ হিন্দুমাত্রেরই শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বাস স্বাভাবিক। বৈষ্ণব বিশেষভাবে বিষ্ণু-উপাসক হইলেও সাধারণভাবে হিন্দুমাত্রেই বিষ্ণু-উপাসক। শালগ্রামশিলারূপী বিষ্ণুবিগ্রহ সর্ব্ব সম্প্রদায়স্থ হিন্দুরই গৃহ-দেবতা। এই বিষ্ণু ও কৃষ্ণ যেমন তত্ত্বতঃ একই বলিয়া হিন্দুর বিশ্বাস, গৌরাঙ্গাবতারে বিশ্বাস হইলে, কৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গও তদ্রূপ একই বলিয়া হিন্দুর মানিতে হয়। যাঁহারা গৌরাঙ্গাবতার বিশ্বাসী, তাঁহারা সেইরূপই মানিতেছেন। গৌরাঙ্গ যদি স্বয়ং ভগবানই হন, তবে তাঁহাতে ভক্তি-বিশ্বাসবান হইলে, তিনি বৈষ্ণবের বিষ্ণু-উপসনা যেমন সিদ্ধ করিবেন, শাক্ত-শৈবাদির শিবশক্তি উপাসনাদিও তিনি তদ্বৎ সিদ্ধ করিবেন, সন্দেহ নাই। গৌরাঙ্গ "ভক্তাবতার" (ভক্তরূপী অবতার) বলিয়াই প্রতিষ্ঠিত, অতএব তাঁহার কৃপায় তাঁহার অবতারত্বে আন্তরিক বিশ্বাসকারী উপাসকমাত্রেরই ইষ্টভক্তি সুপুষ্ট ও ইষ্টসাধন সুসিদ্ধ হইবে, আশা করা যাইতে পারে। যদি তাহা না হয়, তবে পঞ্চোপাসনাত্মক হিন্দু-শাস্ত্রের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকে না, এবং তাহা হইলে গৌরাঙ্গকে হিন্দু-শাস্ত্র-বিপ্লাবী একাকারকারী বলিয়া বুঝিতে হয়; [illegible] বোধহয় অনেকেরই সেরূপ বিশ্বাস নয়। অবতারের উপাসনাজনিত কার্য্যফল বিশেষভাবে সম্প্রদায়-বিশেষে বিকাশিত হইলেও, সাধারণভাবে উহা জাতি-সাধারণেরই সম্পত্তি। এই সাধারণতা অধিকার ও আবশ্যকতার অনুপাত অনুসারে অল্পাধিক পরিমাণে সমগ্র মানব জাতিতেই বিস্তারিত হয়। মনে করুন, রামাবতারের বিশেষ উপাসনা রামায় ("রামাৎ") বৈষ্ণব সমাজে বিশেষত্ব প্রাপ্ত হইলেও, উহা হিন্দুমাত্রেরই সাধারণ অধ্যাত্ম সম্পত্তি। "রাম" হিন্দু-সাধারণেরই "তারকব্রহ্ম নাম।" কৃষ্ণাবতার সম্বন্ধেও সেই কথা। অধিক বাগ্‌বিস্তার নিষ্প্রয়োজন; সেই রাম—সেই কৃষ্ণই যদি কলিতে সেই গৌরাঙ্গ হইলেন, তবে গৌর-ভক্তিও অবশ্য হিন্দু-সাধারণের জাতীয় অধ্যাত্ম-সম্পত্তি হইবে, সন্দেহ কি? গৌরাঙ্গের সমসাময়িক ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত পুরীর রাজ-অধ্যাপক শ্রীমৎ বাসুদেব সার্ব্বভৌম স্বচক্ষে স্বগৃহ-কক্ষে গৌরাঙ্গ অঙ্গে রাম-কৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ, এই তিন অবতারের একত্ব নিদর্শনস্বরূপ ধনুঃশর, মুরলী ও দণ্ড-কমণ্ডলুধারী "ষড়ভুজ" মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভক্তি-বিস্ময়-বিমুগ্ধ-চিত্তে যে স্তব রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বৈষ্ণব-সন্দর্ভে প্রকাশিত আছে। প্রধানতঃ সেই ঘটনা—বিশ্বাস হইতেই যিনি রাম, তিনি কৃষ্ণ, তিনিই গৌরাঙ্গ, এই বিশ্বাস বৈষ্ণব-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গৌরলীলায় এ বিশ্বাসের প্রবর্ত্তক ও প্রবর্দ্ধক কারণান্তরেরও অভাব নাই। বিশেষতঃ গৌরাঙ্গই কৃষ্ণ, ইহা প্রতিপন্ন হইলে, গৌরাঙ্গই রাম, এতৎপ্রতীতি অনায়াসসিদ্ধ; যেহেতু রাম-কৃষ্ণের একত্ব-প্রতীতি হিন্দু-হৃদয়ে স্বাভাবিক। এ তত্ত্ব জ্যামিতি-

শাস্ত্রের প্রথম স্বতঃসিদ্ধেই সুসিদ্ধ। অতএব গৌরাঙ্গাবতার সত্য হইলে, তিনি রামকৃষ্ণের ন্যায় হিন্দুজাতির সাধারণ উপাস্য কেন না হইবেন? অধিকন্তু, গৌরাঙ্গ ভক্তরূপী অবতার হওয়ায়, তিনি শুধু হিন্দুর নহেন, ভগবদ্ভজনার্থী মানব মাত্রেরই আদর্শ গুরুরূপে আরাধ্য হইবার যোগ্য।

আমরা গলাগলি ছাড়িয়া দলাদলিতেই তৎপর। ঈশ্বরের কাছে দলাদলি নাই। সকলই তিনি; তবে তিনি কি আপনার সঙ্গে আপনি দলাদলি করিবেন? শাক্ত-বৈষ্ণবে দলাদলি হইতে পারে, কিন্তু শক্তি ও বিষ্ণুতে দলাদলি সম্ভবে না; কারণ উভয়েই তত্ত্বতঃ একত্ব; কেবল রূপ নামের বা ধ্যান-মন্ত্রের ভিন্নত্ব, ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। অতএব গৌরাঙ্গকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া মানিলে, ইহাও মানিতে হইবে যে, তিনি স্বয়ং ভক্ত-বৈষ্ণব-ভাবে লীলা বিস্তার করিলেও, তাঁহাতে ভক্তি-বিশ্বাসবান যে কোন সাম্প্রদায়িক উপাসকেরই তিনি পারমার্থিক মঙ্গল বিধান করিবেন। কেবল নাম-সাধন ও ভক্তি-ভজনই দীন হীন অল্পপ্রাণ অল্পজ্ঞান কলির জীবের উদ্ধারের উপায়, গৌরাঙ্গের শিক্ষায় ইহাই বিবৃত; সুতরাং গৌরাঙ্গভক্ত যে কোন সাম্প্রদায়িক উপাসকই গৌরাঙ্গ-প্রসাদে স্বীয় ইষ্ট-পদে ভক্তিলাভ ও ইষ্টনাম-মন্ত্র-সাধনে শক্তিলাভ করিবার আশা কেন না করিবেন? অতএব গৌরাঙ্গাবতারের সত্যতায়, সর্ব্বসম্প্রদায়-নির্ব্বিশিষ্ট গৌরাঙ্গনিষ্ঠ মাত্রই স্বীয় ইষ্টভক্তির প্রকৃষ্ট পরিপুষ্টতায় চরিতার্থ হইতে পারেন।

অধিক কি, আত্মার অমরত্বে, পরলোকের অস্তিত্বে ও ভগবানের ভক্তিপ্রিয়ত্বে যাঁহার বিশ্বাস, তিনি যে কোন ধর্ম্মাবলম্বীই হউন, যথার্থ ধর্ম্মার্থী হইলেই তিনি গৌর-ভজন-প্রয়োজনে ধর্ম্মতঃ বাধ্য। গৌরলীলা অনতি-দূরবর্ত্তী কালের ঐতিহাসিক সত্যে সমুদ্ভাসিত, অতএব ওরূপ ধারণাতীত—চিন্তাতীত—কল্পনাতীত অসাধারণ ভক্তি লীলা দেখাইয়া যিনি জগৎকে চমকিত—স্তম্ভিত—মোহিত করিয়াছেন, তিনি যিনিই হউন, তিনি আজ তাঁহার অতুল অমৃত সত্তায় পরলোকে বা যে কোন লোকে যে কোন লীলায়ই বিবা-জিত থাকুন, তাঁহার ভক্তের আধ্যাত্মিক উপকার তাঁহার মহিমায়——তাঁহার কৃপায় অবশ্যই সম্পাদিত হইবে। ধর্ম্মজগতে তিনি পূর্ণ আদর্শপুরুষ; অতএব ধর্ম্মার্থী বা ভগ-বদ্ভজনার্থী মানব তাঁহার ন্যায় ওরূপ ভক্তি-পথ-প্রদর্শক গুরু আর কোথায় পাইবেন? সামান্য শাক্ত-বৈষ্ণবে, হিন্দু-ব্রাহ্মে বা খ্রীষ্টিয়ান মুসলমানে ধর্ম্ম-বিতর্ক-বিবাদ বাধিতে পারে, কিন্তু রামপ্রসাদ-তুলসীদাসে, রাম-কৃষ্ণে-বিজয়কৃষ্ণে, ভমরে-লুথরে কখনও বিবাদ বাধিবে না। ধর্ম্মার্থী মানব (হিন্দুর ন্যায় অবতারতত্ত্ব না মানিলেও) যীশু, মহম্মদ, শঙ্কর, গৌরাঙ্গ, ইঁহাদের সকলকেই অন্ততঃ "মহাপুরুষ" বোধে অবশ্যই মানিবেন। তবে অবশ্য নিজের মতে—নিজের পথে—আত্ম ইষ্টে একান্তনিষ্ঠ হইবেন। রাম-সর্ব্বস্ব হনু-মান বলিয়াছিলেন,——

"শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচন..."

ভক্তচূড়ামণি তুলসীদাস বলিয়াছেন—
"সব্‌সে পশিয়ে সব্‌সে রসিয়ে,
সব্‌কা লিজিয়ে নাম।
হাঁজী হাঁজী কর্‌তে রহিয়ে
বৈঠে আপ্‌না ঠাম॥"

ফলে উপাসক মাত্রেই স্বেষ্ট-সাধনে দৃঢ় নিবিষ্ট থাকিলেও গৌরভক্তির ফলে তাহাতে আশাতীত উন্নতিলাভ করিবেন, এ আশা অসঙ্গত বোধ হয় না। কারণ, গৌরাঙ্গের লীলা-সাক্ষ্যেই সুপ্রমাণিত হয় যে, তাঁহার ন্যায় ভক্তিসাধক—পরমার্থ-শিক্ষা-প্রচারক আদর্শ ধর্ম্মসংস্কারক কোন যুগে কোন দেশে কোন জাতিতে আর হয় নাই। হইবে কিনা, ভগবান জানেন।

গৌরাঙ্গের ভগবৎসত্ত্ব-প্রতিপাদক শাস্ত্রোক্তি সমূহ, গৌরাঙ্গের ভাগবতী চরিত-লীলা, তাৎকালিক ভারতের সর্ব্বপ্রধান তীর্থদ্বয় পুরুষোত্তম ও কাশীধামের সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিতদ্বয় বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সুস্পষ্ট সাক্ষ্য ইত্যাদির অনুকূলতায়, সর্ব্বোপরি ভক্তিভাব-প্রবণ হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রেরণায় যিনি গৌরাঙ্গকে "ভগবান" ভাবিতে পারেন, তাঁহার ত কথাই নাই, কিন্তু যিনি অন্ততঃ "পূর্ণ ভগবদ্ভক্ত" "মহামহিম পুরুষ" "আদর্শধর্ম্মসংস্কারক বা ধর্ম্ম-প্রচারক" প্রভৃতি বিশেষণ-বেদ্যভাবেও তাঁহাতে ভক্তিমান হইবেন, তাঁহারও বোধ হয় নিরাশ হইবার কারণ নাই। আশাকরি, তিনিও কৃপা-সিন্ধু গৌরাঙ্গের কৃপায় বঞ্চিত হইবেন না। গৌর-কৃপায় যথার্থ গৌরতত্ত্ব-[illegible] তিনিও ক্রমশঃ অধিকারী হইবেন।

গৌরাঙ্গ তখনও ছিলেন, এখনও আছেন। তিনি স্বীয় অনন্ত অমৃতসত্ত্বে ও ভক্তের হৃদ্‌-পদ্মে চিরবিরাজিত থাকিবেন। বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সমাজে একটি পরমাদৃত মহাজন-প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে,—
"অদ্যাবধি সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"
ভক্তিমানের তুল্য ভাগ্যবান আর কে? যে ভাগ্যবান ভক্ত গৌরলীলা-রসে নিত্য নিমগ্ন, গৌরতত্ত্ব-বোধার্থী তাঁহার সঙ্গ করিলেই সিদ্ধকাম হইবেন। আমাদের ন্যায় অধম অভক্তের শতপ্রবন্ধ ও সহস্র বক্তৃতাতেও সে আশা নাই। "স্বয়মশুদ্ধঃ কথং পরান্ শোধয়তি?" আপনি অশুদ্ধ যে, অন্যে কি শোধিবে সে? তবে যদি ভগবৎ কৃপায় এই সব আলোচনায় আমাদেরই পাষাণ-প্রাণে একটু উদ্দীপনার আনুকূল্য হয়, এইমাত্র আশা। আমাদের ব্যক্তিগত মত এ ক্ষেত্রে অকিঞ্চিৎকর।

যাহাহউক শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়িণী আলোচনায় এ প্রবন্ধে যাহা কিছু বলা হইল, তাহার সুসংক্ষিপ্ত সারসংগ্রহ এইরূপ—

গৌরাঙ্গ ভগবানই হউন বা ভক্তই হউন, তিনি ভজনীয়। গৌরাঙ্গ শুধু বৈষ্ণবের নহেন, তিনি শাক্ত-শৈব প্রভৃতিরও বটেন। গৌরাঙ্গ সমগ্র হিন্দু-জাতির। গৌরাঙ্গ শুধু হিন্দুর নহেন, কিন্তু মানবজাতির। গৌরাঙ্গ প্রেমিকের প্রাণ, কিন্তু পাষণ্ডের ত্রাণ। গৌরাঙ্গ ভক্তের জীবন—তথা অভক্তের পাবন। গৌরাঙ্গ সাধুর আনন্দ—পাপীর আশা। ফলে গৌরাঙ্গ যে কি, তাহা গৌরাঙ্গই জানেন! কবি ঠিক গাহিয়াছেন,—

গোরার তুলন গোরা—অতুল ভূতলে।
জাহ্নবী-পূজন যথা জাহ্নবীর জলে॥

উপসংহারে, যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান-বোধে ভজনা করেন, তাঁহাদের সেই গৌরাঙ্গ-পদ কমলসেবী কর কমলে নিম্নের গৌরাঙ্গবিষয়িণী কবিতাটি নিবেদন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

শ্রীগৌরাঙ্গ।

[বাঙ্গালীর সৌভাগ্য।]

(১)

জাননা বাঙ্গালি! তুমি কত ভাগ্যবান,
উদিত তোমারি ঘরে স্বয়ং ভগবান!
তোমারি বাঙ্গালীরূপে, তোমারি ধরণে,
তোমারি মতন ধূতি চাদর পরণে।
শ্রীঅঙ্গে তোমারি মত কোঁচার বাহার,
শ্রীপদে তোমারি মত চটী ব্যবহার!
শ্রীমুখে বাঙ্গালী-বুলি তোমারি মতন;
ভাব-ভঙ্গি তোমারি—তোমারি আচরণ।
তোমারি মতন ঠিক হেলে জলে নেয়ে,
তোমারি মতন ঠিক শাক-ভাত খেয়ে,
বিকাশি বাঙ্গালী-রূপ—বাঙ্গালী-শ্রীছাঁদ,
ধরিলা বাঙ্গালী-নাম শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদ!

(২)

এ হতে বাঙ্গালি! তব সৌভাগ্য কি আর?
তব নবদ্বীপে সপ্তদ্বীপার উদ্ধার!
তোমারি "স্বজাতি" নরজাতি-ত্রাণকারী,
জন্মিলা তোমারি কুলে অকুল-কাণ্ডারী!
ধন্য ধন্য বাঙ্গালার পুণ্য-পুরস্কার,
বিরিঞ্চি—বাঞ্ছিত নিধি বঙ্গের কুমার!
দেখুক্ ভুবনবাসী ভক্তি-আঁখি মেলে,
দেবের দুর্লভধন বাঙ্গালীর ছেলে!
বাঙ্গালায় জগতের শুভ আশীর্ব্বাদ,
বাঙ্গালী "জগন্নাথের" ঘরে জগন্নাথ!
দেখ আসি ভববাসি! যদি ভাগ্য খোলে,
যশোদা-দুলাল দোলে শচীমা'র কোলে!

(৩)

সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরের যোগীন্দ্র-জীবন,
কলিতে বাঙ্গালিনীর যাদু-বাছা-ধন!
যুগ-তপস্যায় যোগী যে পায় না পায়,
শচীমা সে রাঙ্গাপায় হলুদ মাথায়!
নাহেন নদীয়া গঙ্গা-নীরে গোরারায়,
নিজ পদোদক দেন নিজেই মাথায়!
কমলা-কোলে যে পদ-কমল-সুন্দর,
সে পদ এ নদীয়ার ধূলায় ধূসর!
কালো বাঙ্গালীর কোলে গৌরাঙ্গ সুন্দর,
কলিতে শ্রীরাধাকান্ত রাধা-কান্তিধর!
গহন মোহন গৌরলীলা-তত্ত্ব-বোধ,—
প্যারীর পরম-প্রেম-ঋণ-পরিশোধ।

(৪)

কলিতে অল্পায়ু নর, অল্পবুদ্ধি-বল,
তাইসে অল্পেতে হয় সাধন সফল।
অল্পায়াসে অল্পকালে সিদ্ধির বিধান—
করুণায় করিলেন করুণানিধান।
বিশেষ অশেষ-কৃপা-কৌমুদী বিতরি,
গৌরচন্দ্র রূপে বঙ্গে অবতীর্ণ হরি!
হরিনাম—হরিনাম—হরিনাম সার,
নাই নাই নাই গতি কলিকালে আর।
গোলকবিহারী হরি গৌরহরি সেজে,
দিলা হেন হরিনাম আচণ্ডালে যেচে।

নিতাই-অদ্বৈত সঙ্গে নিত্য নবরঙ্গে,
ভাসাইলা বঙ্গ হরি-প্রেমের তরঙ্গে!

(৫)

বহু তপস্যায় যায় জনম-মরণ,
দু অক্ষরে কলিতে এ দুয়েরি হরণ!
সেই দু-অক্ষর শুধু "হরি" নাম-ধ্বনি,—
বিলাইলা বাঙ্গালার গৌর গুণমণি।
দুর্লভ হরিনামের সুলভ সাধন
শিখিলা বাঙ্গালা হতে জগতের জন!
বাঙ্গালীর শিষ্য হল সর্ব্বদেশী লোক;
বঙ্গ-প্রাণে বদ্ধ হল সমগ্র ভূলোক!
এক গৌর-রূপে—আর এক হরিবোলে,
আদরে বসিল বঙ্গ বসুধার কোলে!
যে বঙ্গের কোলে বসি বঙ্গ-সুতগণ!
লাগাও শ্রীহরি-ধ্বনি—জাগাও ভুবন!

(৬)

তুচ্ছ ক্ষুদ্র বঙ্গদেশ প্রান্তে পৃথিবীর,
প্রেমলীলা-ক্ষেত্র হ'ল পৃথিবী-পতির!
কলিকালে বঙ্গ-ভালে কি সৌভাগ্য-যোগ!
হারা'ওনা বঙ্গবাসি! এ স্বর্ণ-সুযোগ।
আশিলক্ষ যোনি ভ্রমি মানব হয়েছ,
কর্ম্মভূমি এ ভারতে জনম পেয়েছ;
তাহে গৌর-লীলা-ক্ষেত্র বঙ্গদেশে ঘর;
বাঙ্গালীর কি সৌভাগ্য আছে এর পর?
তাই বলি হে বাঙ্গালি! সব দুঃখ ভুলে,
গৌর-প্রেমানন্দে মজ মনোপ্রাণ খুলে।
শ্রীকৃষ্ণভজনে কভু এ কলি-দুর্দ্দিনে,
কারো না হইবে শক্তি গৌরভক্তি বিনে।

(৭)

তাইবলি হে বাঙ্গাল! গৌরাঙ্গ-স্বজাতি!
গৌর প্রেমে মজ—গৌর ভজ দিবারাতি।
[illegible]ভরে ধর করে করতাল-খোল,
গৌর-প্রেমানন্দে গাও হরি-হরি-বোল!
'গৌর ভেকে গৌরভাবে হইয়ে বিভোল,
গৌর-প্রেমানন্দে গাও হরি-হরি-বোল!
গৌরহরি-ভাবে ভবে দেও সবে কোল,
ভ'ব হরি, জপ হরি, বল হরিবোল!
গৌরহরি ধরি ধন্য বাঙ্গালার কোল;
বাঙ্গালি! হওহে ধন্য বলে হরিবোল!
গৌরহরি হয়ে হরি বলে হরিবোল,
হরি সহ অহরহ বল হরিবোল!

— —

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

শুনঃশেপ।

হরিশ্চন্দ্র নামে ইক্ষ্বাকু বংশীয় এক রাজা ছিলেন। তাঁহার শত জায়া ছিল, কিন্তু কাহারও গর্ভে পুত্র জন্মে নাই। তাঁহার গৃহে নারদ ও পর্ব্বত নামক দুই ঋষি বাস করিতেন। রাজা একদিন নারদকে বলিলেন যে, হে নারদ! মনুষ্য, এমনকি পশুরাও পুত্র কামনা করিয়া থাকে; পুত্রের দ্বারা কি লাভ হয়, আমাকে তাহা বলুন। নারদ বলিলেন যে, পিতা পুত্রের দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ করেন এবং অমৃতত্ব লাভ করেন। অন্ন জীবন রক্ষা করে, বস্ত্র শীত নিবারণ করে, সুবর্ণ দ্বারা সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়, জায়া বন্ধুর সমান, কন্যা দয়ার পাত্রী কিন্তু পুত্র জ্যোতিঃস্বরূপ। পতিই পত্নীর গর্ভে প্রবেশ করেন, এবং দশম মাসে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করেন। পতি পত্নীতে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া, পত্নীকে "জায়া" বলা হয়। (তজ্জায়া জায়া ভবতি যদস্যাং জায়তে পুনঃ) পুত্রাভাবে রাজা বড়ই দুঃখিত ছিলেন। নারদ রাজাকে

বরুণ সন্নিধানে পুত্র প্রার্থনা করিতে এবং পুত্র জন্মিলে, তাহাকে বরুণের নিকট বলিপ্রদান করিতে উপদেশ দিলেন। হরিশ্চন্দ্র বরুণের নিকট পুত্র প্রার্থনা করিলেন, এবং পুত্র জন্মিলে, উহাকে বলি প্রদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। রাজার এক পুত্র জন্মিল, তাহার নাম রাখা হইল রোহিত। তখন বরুণ রাজাকে বলিলেন, তোমার পুত্র জন্মিয়াছে, এখন উহাকে আমার নিকট বলি প্রদান কর। রাজা বলিলেন, পশ্বাদি দশম দিবসের পূর্ব্বে বলির উপযুক্ত হয় না। দশ দিন গত হইলে তবে বলি প্রদান করিব। দশ দিন গত হইল, তখন বরুণ পুনর্ব্বার চাহিলেন, রাজা বলিলেন যে, দন্ত না উঠিলে বলি দেওয়া যায়না। দন্ত উঠিলে বরুণ পুনর্ব্বার আসিলেন, কিন্তু রাজা বলিলেন, দন্ত না পড়িলে বলি দেওয়া যায় না। দন্ত পড়িল, তখন রাজা বলিলেন, দন্ত পুনর্ব্বার না উঠিলে বলি দেওয়া যায় না। দন্ত পুনর্ব্বার উঠিল, তখন রাজা বলিলেন যে, ক্ষত্রিয় সন্তান অস্ত্র-সজ্জিত না হইলে বলির উপযুক্ত হয় না। রোহিত অস্ত্র-সজ্জিত হইলেন, বরুণ পুনর্ব্বার বলি প্রার্থনা করিলেন। তখন রাজা পুত্র রোহিতকে ডাকিয়া বলিলেন যে, হে পুত্র! যিনি তোমাকে দিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট আমি তোমাকে বলি প্রদান করিব। রোহিত তাহাতে সম্মত হইলেন না, তিনি ধনুর্গ্রহণ করিয়া অরণ্যে গমন করিলেন।

বরুণ হরিশ্চন্দ্রকে আশ্রয় করিলেন, এবং তাঁহার উদর স্ফীত হইল, অর্থাৎ রাজা জলোদরী রোগের দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। এদিকে রোহিত ছয় বৎসর ধরিয়া অরণ্য-পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। অরণ্যে তিনি অজী-গর্ত্ত নামক এক ঋষির দেখা পাইলেন। অজী-গর্ত্ত অন্নাভাবে সপরিবারে উপবাস করিতে-ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র ছিল, তাহাদি-দিগের নাম শুনঃপুচ্ছ, শুনঃশেপ, শুনোলা-ঙ্গুল। রোহিত ঋষিকে বলিলেন যে, আমি তোমাকে শত গাভী প্রদান করিব, আমার পরিবর্ত্তে তোমার এক পুত্রকে বলি দিতে হইবে। অজীগর্ত্ত বলিলেন যে, আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দিতে পারিব না; তাঁহার পত্নী বলিলেন, কনিষ্ঠ পুত্রকে দিতে পারিব না। উভয়েই মধ্যম পুত্রকে দিতে সম্মত হইলেন। রোহিত তাহাদিগকে শত গাভী প্রদান করিয়া শুনঃশেপকে লইয়া পিতৃসমীপে গেলেন এবং বলিলেন, আমার পরিবর্ত্তে ইহাকে বলি প্রদান করুন। হরিশ্চন্দ্র বরুণকে ঐ কথা বলিলেন এবং বরুণ তাহাতে সম্মত হইলেন। রাজা রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন এবং ঐ যজ্ঞের অভিষেচনীয় দিনে পশুস্থানে নর-বলি দিবার ব্যবস্থা হইল।

এই যজ্ঞে বিশ্বামিত্র হোতা, জমদগ্নি অধ্বর্য্যু, বশিষ্ঠ ব্রহ্মা এবং অয়স্য উদ্গাতা ছিলেন। বলি দিবার সময় শুনঃশেপকে যূপকাষ্ঠে বন্ধন করিতে লোক পাওয়া গেল না। তখন শুনঃশেপের পিতা অজীগর্ত্ত বলি-লেন, আমাকে আর এক শত গাভী দেও, আমি উহাকে বন্ধন করিব। তৎপরে তাহাকে হত্যা করে, এমন লোকও পাওয়া গেলনা। তখন অজীগর্ত্ত বলিলেন, আমাকে আর এক শত গাভী দেও, আমি উহাকে বধ করিব। তিনশত গাভী প্রাপ্ত হইয়া অজীগর্ত্ত

পুত্রকে স্বহস্তে বধ করিতে চলিলেন। তিনি যখন অসি শাণিত করিতে লাগিলেন, তখন শুনঃশেপ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাকে পশুর মত বধ করা হইবে। তখন তিনি দেবতাদিগকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবতাদিগের স্তব করিতে করিতে তিনি বন্ধন বিমুক্ত হইলেন. এবং রাজা হরিশ্চন্দ্র রোগবিমুক্ত হইলেন।

এই সময় ঋত্বিকেরা শুনঃশেপকে বলিলেন যে, তুমিও এ যজ্ঞের কার্য্য সম্পন্ন কর, এবং তিনি তাহা করিলেন। যজ্ঞান্তে শুনঃশেপ বিশ্বামিত্রের কোলে গিয়া বসিলেন। তখন তাঁহার পিতা অজীগর্ত্ত বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,হে ঋষি! আমার পুত্র আমাকে পুনর্ব্বার দান কর। বিশ্বামিত্র বলিলেন,দেবতারা ইহাকে আমাকেই দিয়াছেন। তদবধি শুনঃশেপের নাম দেবরাত হইল। তখন অজীগর্ত্ত শুনঃশেপকে বলিলেন যে, তোমার মাতা এবং আমি তোমাকে ডাকিতেছি, তুমি বাটীতে ফিরিয়া আইস। শুনঃশেপ উত্তর করিলেন, আমা অপেক্ষা তিনশত গাভী তোমার নিকট বড় হইল,এবং শূদ্রও যে কার্য্য করিতে না পারে, তুমি তাহা করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলে! অজীগর্ত্ত বলিলেন যে, আমি যে পাপ-কার্য্য করিয়াছি, তাহার জন্য আমি অনুতপ্ত হইতেছি, তোমাকে শত গাভী প্রদান করিব, তুমি ফিরিয়া আইস। শুনঃশেপ বলিলেন, যে ব্যক্তি এইরূপ কার্য্য একবার করিতে পারে, সে তাহা পুনর্ব্বারও করিতে পারে। তুমি এখনও শূদ্রজনোচিত নৃশংসতা পরিত্যাগ [illegible]তে পার নাই; তোমার সহিত পুনর্ব্বার মিলন হইতে পারে না। বিশ্বামিত্রও বলিলেন যে, এ কার্য্যের পর মিলন অসম্ভব। বিশ্বামিত্র আরও বলিলেন,অজীগর্ত্ত যখন অসি হস্তে করিয়া পুত্রবধ করিতে দণ্ডায়মান হইয়াছিল,তখন তাহার কি ভীষণমূর্ত্তিই হইয়াছিল। হে শুনঃশেপ! তুমি ইহার পুত্র হইওনা, আমি তোমাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিব। শুনঃশেপ বলিলেন, আমি অঙ্গিরসবংশ-সমুৎপন্ন, তোমার পুত্র হইব কিরূপে? বিশ্বামিত্র বলিলেন, তুমি আমার পুত্রদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ পুত্র হইবে, এবং আমার দৈব ধন সমুদায়ই তোমার হইবে। বিশ্বামিত্র তখন মধুচ্ছন্দা, ঋষভ, রেণু, অষ্টক প্রভৃতি পুত্রগণকে ডাকিয়া বলিলেন,হে পুত্রগণ! দেবরাত তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইলেন।

শুনঃশেপের আখ্যান ঋগ্বেদান্তর্গত ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে সংক্ষিপ্তভাবে গৃহীত হইল। অতি প্রাচীন কালেই যে ভারতবর্ষ হইতে নরবলি প্রথা উঠিয়া গিয়াছে, শুনঃশেপের বৃত্তান্ত হইতে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। শুনঃশেপ একজন বৈদিক মন্ত্রদ্রষ্টা এবং ঋগ্বেদ তাঁহার মন্ত্রদৃষ্ট হয়। এই বৃত্তান্তটি পাঠ করিলে, বিশ্বামিত্রই যে শুনঃশেপের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন,তাহা বোধহয়। যখন অজীগর্ত্ত শুনঃশেপকে লইতে চাহিলেন, তখন বিশ্বামিত্র বলিলেন যে, তাঁহাকেই দেবতারা শুনঃশেপকে দিয়াছেন, এবং পরে শুনঃশেপ বিশ্বামিত্রের অন্তিকে উপবেশন করিলেন এবং তাঁহার পুত্ররূপে গৃহীত হইলেন। ব্রাহ্মণেরাও ক্ষত্রিয়দিগের দত্তক-পুত্ররূপে গৃহীত হইতেন, এতদ্দারা তাহারও প্রমাণ পাওয়া

যাইতেছে। গোধন যে প্রাচীন ভারতে পরম ধন ছিল, এ প্রসঙ্গে তাহাও প্রতিপন্ন হইতেছে। এইপ্রকার বৈদিক আখ্যানগুলিই প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য সমাজের অবস্থা পরিজ্ঞানের ঐতিহাসিক উপায় স্বরূপ।

—

মীমাংসা দর্শনম্।

[জৈমিনি সূত্রং]

(পূর্ব্বানুবৃত্তম্)

অর্থবাদ বাক্যের প্রামাণ্য স্থাপন করিয়া, অতঃপর মীমাংসাচার্য্য মহর্ষিপ্রবর জৈমিনি "বিধিবন্নিগদ" নামক বেদবাক্যাবলীর বিচার করিতেছেন। এই সমস্ত বাক্য আপাততঃ বিধিবাক্যের ন্যায় প্রতীত হয়। কিন্তু বস্তুতঃ উহারা বিধিবাক্য নহে, স্তাবক মাত্র। বিহিতবস্তুর স্তুতিকরাই উহাদিগের উদ্দেশ্য। "বিধিবৎ নিগদ্যতে" (বিধির ন্যায় কথিত হইতেছে) এই জন্যই ইহাদের নাম "বিধিবন্নিগদ।" ঐ সকল বাক্যে বিধিভ্রম উপস্থিত হওয়ায় উহারা বিধি, কি অর্থবাদ, তাহা নিশ্চয়করা আবশ্যক, সুতরাং উহাদিগকে বিধিবাক্য বলিয়াই "পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত হইতেছে। যুক্তিবলে উহাদিগের অর্থবাদত্ব প্রমাণীকৃত হইলে আর বিধি বলিয়া ভ্রান্তি হইবে না!

পূর্ব্বপক্ষাবলম্বীর প্রথম সূত্র যথা,—

বিধির্ব্বাস্যাদপূর্ব্বত্বাদ্বাদমাত্রংহ্যনর্থকং। ১৯

পদপাঠঃ। বিধিঃ। বা। স্যাৎ। অপূর্ব্বত্বাৎ। বাদমাত্রং। হি। অনর্থকং।

ব্যাখ্যা। বিধিঃ—বিধি অর্থাৎ বিধায়ক বাক্য। বা—(পক্ষান্তরে) স্যাৎ—হইবে। অপূর্ব্বত্বাৎ—অপূর্ব্ব পদার্থ প্রতিপাদন করিতেছে এইজন্য। বাদমাত্রং—অর্থবাদ হইলে উহা বাঙ্মাত্র। (যেহেতু অর্থবাদ বাক্যের স্বার্থবোধনে তাৎপর্য্য নাই।) হি—যেহেতু। অনর্থকং—ব্যর্থ হইয়া যায়। (নিষ্ফল হইয়া যাওয়া অপেক্ষা অপূর্ব্ব বিধি বলিলে বেদবাক্যের তাৎপর্য্য রক্ষিত হয় এবং মর্য্যাদাও অক্ষুণ্ণ থাকে। সুতরাং বিফল অর্থবাদ বলা যায় না "বিধি"—বলাই সমধিক সঙ্গত। পূর্ব্বপক্ষের এই একটী সাধারণ যুক্তি।)

বঙ্গার্থঃ। বিধির ন্যায় প্রতীত বিধিবন্নিগদ নামক বেদবাক্যগুলি বিধিই হইবে কিম্বা অর্থবাদ বলা যাইবে এইরূপ সংশয় সমুপস্থিত হইলে বাদী বলিতেছেন, উহারা বিধি। যেহেতু অপূর্ব্ব অজ্ঞাত অর্থ বিধান করাই বিধির কার্য্য,ইহাতেও তাহাই দেখিতে পাইতেছি। যদি ঐগুলিকে অর্থবাদ বলাহয়, তাহারা উহা বাক্যমাত্রেই পর্য্যবসিত হইলে, কেন না অর্থবাদ বাক্যের স্বার্থে তাৎপর্য্য নাই। আর অর্থবাদ হইলে উহারা অনর্থক।

বিশদব্যাখ্যা।—"বা" শব্দেরদ্বারা পক্ষান্তর সূচিত হইয়াছে। "বিধির্ব্বা উত অর্থবাদঃ" এইরূপ সংশয় (অধ্যাহারদ্বারা) প্রদর্শিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই সন্দেহ দেখাইয়া পূর্ব্বপক্ষের নির্ণয় বলিতেছেন "স্যাৎ" বিধিরেব।" উহাকে বিধিবাক্যই বলিব। অপূর্ব্বত্বাৎ—পূর্ব্বে যাহা [illegible]

প্রকারে জ্ঞাত হওয়া যায় নাই তাহাই যাহা-দ্বারা জানা যায় তাহাকে বিধি বলে। এই বিধিই এখানকার পূর্ব্বপক্ষের অভিপ্রেত। বেদে যে সকল যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ড বিহিত-হইয়াছে তৎসমস্তই অপূর্ব্ব পদার্থ। যাগ করিলে স্বর্গ হয় ইহা লোকতঃ জানা যায় না, বেদবাক্যের দ্বারাই অবগত হইতে হয়। যেসকল পদার্থ অপূর্ব্ব,তৎপ্রতিপাদনই বিধির কার্য্য, সুতরাং নিগদবাক্য পূর্ব্বে সর্ব্বথা অজ্ঞাত পদার্থ জ্ঞাপক বলিয়া উহাকে বিধিই বলিব।

বাক্যটী আলোচনা করিলে ইহার রহস্য অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট হইবে। "ঔডুম্বরো যূপোভবতি ঊর্গ্বা উডুম্বর ঊক্ পশবঃ ঊর্জ্জৈবাস্মা ঊর্জ্জং পশূনাপ্নোতি ঊর্জ্জোবরুদ্ধ্যৈ।" ইহা একটী বিধিবন্নিগদ। উডুম্বর যূপ করিলে পশ্বাদি প্রাপ্তিফল হইবে। এইরূপ ফলবিধান এবং প্রয়োজনাদিও এই বাক্যে শ্রুত হইয়াছে। যূপ-কাষ্ঠ সাধারণের অপরিচিত নহে। পশুযাগে পশুবন্ধনের জন্য যূপ কাষ্ঠ আবশ্যক হইত। ঐ যূপকাষ্ঠ খদিরাদি বৃক্ষ হইতেই গ্রহণ করা হইত। এখানে বলা হইতেছে, উডুম্বর বৃক্ষজাত যূপ-কাষ্ঠ যজ্ঞে ব্যবহার করিলে পশুরূপ ফল পাওয়া যাইবে। এই পদার্থটী সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। উডুম্বর বৃক্ষের যূপকাষ্ঠের এরূপ ফলপ্রদানে সামর্থ্য আছে ইহা লোকতঃ অবগত হওয়া যায় না। ইহাকে বিধিবাক্য বলিলে কোনও দোষ হয় না। যদি ঐ বাক্য অর্থবাদ মাত্র হয়, তবে উহা বৃথা হইয়া গেল। অর্থবাদ স্তুতি করুক আর নাই করুক তাহাতে বিধের বস্তুর কিছু আসে যায় না, কারণ অনেক বিধিস্তাবক অর্থবাদ নাই। বিধিবাক্যে যদি উহার ফলবত্তা অবগত হওয়া যায়, তবে ফলার্থী পুরুষ অবশ্যই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। যে কর্ম্মের যে বিহিত ফল, তাহা দেখিয়াই লোকের প্রবৃত্তি জন্মে। স্তুতি করিবার বিশেষ দরকার দেখাযায় না। সুতরাং অর্থবাদ পক্ষে ঐ বাক্য একেবারে নিষ্ফল। যদি বলাযায় যে, অর্থবাদ প্রবৃত্তির দৃঢ়তা জন্মায়। প্রশংসা শ্রবণ করিলে কার্য্যে সম্যক উৎসাহ হয়। এইজন্য অর্থবাদের আবশ্য-কতা থাকায় উহাকে অনর্থক বলা অনুচিত। তাহার উত্তরে বলিতে হইবে। বিধিপক্ষে শ্রুতিবলেই বিধানের জ্ঞান জন্মে। অর্থবাদ পক্ষে লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়। কেননা, প্রশংসাবোধক কোনও শব্দ নাই। ইহা এইরূপ ফলপ্রদান করে, অতএব প্রশস্ত, সুতরাং ইহা করা উচিত। এইপ্রকারে প্রশংসা কল্পনা করিতে হয়। লক্ষণা অপেক্ষা শ্রুত পদার্থ সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠ, অতএব লক্ষণা স্বীকার করিয়া উহাকে অর্থবাদ বলাবচেয়ে শ্রুতিবলে সকল বিধিবাক্য বলাই বিশেষ সঙ্গত।

ইহার পরে পূর্ব্বপক্ষে আশঙ্কা উত্থিত হইতেছে যথা—

লোকবৎ ইতিচেৎ। ২০

পদপাঠঃ। লোকবৎ। ইতি। চেৎ।

ব্যখ্যা। লোকবৎ—লোকে যেরূপ দেখা-যায় সেইরূপ। ইতি—ইহা। চেৎ—যদি-বলাযায়। (অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ তাহা হইতে পারে না। ইরূপ প্রতিবাদাংশটুকু পরসূত্রে রহিয়াছে।)

বঙ্গার্থঃ। স্তুতি বার্থ নহে, ইহার উপ-যোগিতা সাধারণতঃ লোক দৃষ্টান্তেই অবগত

হওয়া যায় এইরূপ যদি বলা হয়। ("তাহাও হইতে পারে না" এই টুকু পরসূত্রে আছে; পরসূত্রের সহিত ইহার অন্বয় করিতে হইবে।)

বিশদব্যাখ্যা।—প্রশংসা অনর্থক নহে, কারণ লৌকিক বাক্যগুলির রহস্য অন্বেষণ করিলেও তাহাকে প্ররোচনার কারণ প্রশংসা ইহা দেখিতে পাওয়া যাইবে। দেবদত্তের এই গরুটী দুগ্ধবতী, স্ত্রীবৎস (বকনাবাছুর) প্রসব করে, ইহার বৎস কখনও মৃত্যুমুখে পতিত হয় না, অল্পমাত্র আহারেই ইহার তৃপ্তি সংসাধিত হয়, অতএব ইহাকে ক্রয় করা উচিত।" এই লৌকিক বাক্যে প্রশংসার কার্য্য কারিতা দেখা যাইতেছে। শুদ্ধ মাত্র "এই গরু ক্রয় করা উচিত" বলিলে তাহাতে ক্রেতায় আকর্ষণের কোনও জিনিষ নাই বলিয়া আগ্রহ হয় না। কিন্তু উহার গুণগ্রাম শুনিলে তাহাতে আপনা হইতে ক্রেতা আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। বৈদিক বাক্যেও সেইরূপ হইতে পারে। কতকগুলি ঔদুম্বর যূপের প্রশংসা-শুনিলে অবশ্যই অনুষ্ঠাতা উহাতে প্ররোচিত ও প্রবৃত্ত হইবেন সন্দেহ নাই, সুতরাং প্রশংসার অভ্যন্তরে আবশ্যকতা রহিয়াছে। অর্থবাদ পক্ষের এই কথা বিধিপক্ষ (পূর্ব্বপক্ষবাদী) অনুপযুক্ত বলিতেছেন।

বর্ত্তমান সূত্রে আশঙ্কার মূল্য নাই ইহা বলা হইতেছে।

ন, পূর্ব্বত্বাৎ। ২১

পদপাঠঃ।—ন। পূর্ব্বত্বাৎ।

ব্যাখ্যা।—ন—প্রশংসা অনর্থক নহে ইহা বলিতে পারাযায় না (কেননা) পূর্ব্বত্বাৎ—লৌকিক দৃষ্টান্তে যে সকল প্রশংসা বাক্য শুনিয়া লোকে দৃঢ় প্রযত্ন ও প্ররোচনা প্রাপ্ত হয় তথায় সেই সকল প্রশংসা তাহারা পূর্ব্বে জানিত বলিয়া আকৃষ্ট হয়। (এখানে তাহা নহে, কেননা এখানে যে সকল গুণের কথা বলা হইতেছে সে সকল গুণের বিষয় কেহই অবগত নহে, সুতরাং অজ্ঞাত গুণোল্লেখের দ্বারা প্রশংসাই হইতে পারে না, হইলেও তাহাতে প্ররোচিত হইবার কারণ নাই।)

বঙ্গার্থ।—স্তুতি ব্যর্থ নহে, একথা সত্য নয়, কারণ লৌকিক দৃষ্টান্ত এখানে খাটিতে পারে না। লোকে পূর্ব্বে পরিজ্ঞাত গুণগুলির উল্লেখ করিয়াই গরুর প্রশংসা করা হইয়াছে, এখানে তাহা নহে।

বিশদব্যাখ্যা।—যে ব্যক্তি অবগত আছে "বকনাবাছুর প্রসব করিলে সে গরু ভাল, অল্প খাইলে বেশী দুগ্ধ দিলে তাহা সুলক্ষণ, বাছুর না মরিলে শীঘ্র গরুর দল বৃদ্ধি হয়" তাহারই ঐ গুণ গুলি বোধহওয়ায় প্রবৃত্তি হয়। ঐ সকলগুলি লোকে পরিচিত, পূর্ব্বে অনুভূত। বৈদিক প্রশংসায় যে সকল গুণের উল্লেখ করা হয়, তাহা লৌকিক পদার্থের ন্যায় সাধারণের জ্ঞাত বিষয় নহে, যে সকল গুণ শুনিয়া আকৃষ্ট হওয়া সম্ভব নয়। বিধিবাক্যদ্বারা "কর্ম্মকরা উচিত" ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, যদি "ইহা উচিত" শুনিয়া কেহ প্রবৃত্ত না হয়, তবে অজ্ঞাত কতকগুলি গুণের কথা তাহাকে বলিলে সে তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিবে এরূপ হইতে পারে না। বিধিবাক্যে যদি সন্দেহ থাকে, অর্থবাদের সে সন্দেহ ভঞ্জনে সামর্থ্য নাই। বিধিবাক্য নিঃসন্দেহ বলিয়া [illegible]

হইলে তদ্দ্বারাই প্ররোচনা হইতে পারে, অর্থবাদের আবশ্যক কি ? আরও দেখা যাই-তেছে, যেহেতুস্ব উল্লিখিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অসত্য, "উর্গা উদুম্বরঃ" উদুম্বর অন্ন এইজন্য উদুম্বর কাষ্ঠজাত যূপ করা উচিত, এই হেতুস্ব একান্ত অনুচিত ও অসম্ভব। উদুম্বরবৃক্ষ অন্ন হইতে পারে না, এ বচন নিশ্চয় মিথ্যা, অতএব ইহাতে যে প্রয়োজন উক্ত হইয়াছে তাহাও মিথ্যাবলিয়া বলাযাইতে পারে, সুতরাং অর্থবাদ বলিলে ঐ বাক্য অনর্থক উহাদ্বারা প্রশংসা বোধন অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর, সুতরাং অগত্যা মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে ফলবিধি বলা উচিত। পূর্ব্ব-পক্ষবাদী এখানে বিশ্রামগ্রহণ করিলেন।

অতঃপর মীমাংসাচার্য্যের মধুর গম্ভীর রব কি ঘোষণা করে আলোচনা করা-যাউক।

উক্তন্তু বাক্য শেষত্বং। ২২

পদপাঠঃ।—উক্তং। তু। বাক্য-শেষত্বং।

ব্যাখ্যা।—উক্তং—বলাহইয়াছে। তু—(পক্ষান্তর অববোধক শব্দ।) বাক্যশেষত্বং—বিধিবাক্যের শেষভাগ অর্থবাদ ইহা।

বঙ্গার্থঃ।—বিধিবাক্যের শেষভাগ অর্থ-বাদ একথা পূর্ব্বেই "বিধিনাত্বেকবাক্যত্বাৎ" এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে। বিধির জন্য অর্থবাদ চাই এরূপ নহে, আছে বলি-য়াই বিধির সহিত একবাক্যতা করিয়া উহার সার্থক্য সম্পাদন করাহয়।)

বিশদব্যাখ্যা।—বিধির শেষ হইলে তাহা অর্থবাদ, ঐ অর্থবাদ যেরূপে বিধির উপকার [illegible] এবং তাহার প্রামাণ্য যেরূপ তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, চর্ব্বিত চর্ব্বণ নিষ্প্রয়োজন। এখানে ফলবাক্য আছে বলিয়া উহাকে বিধি বলিতে এত আগ্রহ কেন? ঔদুম্বরযূপের ফলবাক্য এখানে বিধি হইতে পারে না কেন না, অবিহিত ঔদুম্বরের ফল কল্পনা অনুচিত, অবশ্যই বিহিত ঔদুম্বর যূপের ফল বলিতে হইবে। ফলবত্তা বুঝা-ইলে জানাযায় ইহার ফল আছে, ফল থাকিলে অবশ্য তাহা প্রশস্ত, কেননা নিষ্ফল অপেক্ষা চিরদিনই ফলবান্ আদৃত। সুতরাং ফল বচনের দ্বারা প্রশংসাই কথিত হইতেছে। প্রশংসা বুঝাইবার জন্য লক্ষণাস্বীকার দোষা-বহ নহে, কারণ লক্ষণা লোক প্রসিদ্ধ পদার্থ। একটী অপ্রসিদ্ধ অযুক্তিক ফল কল্পনা করা অপেক্ষা লোকপ্রসিদ্ধ লক্ষণাস্বীকার অসঙ্গত নহে, উদুম্বর বৃক্ষ অন্ন নহে সত্য বটে, কিন্তু সাদৃশ্যনিবন্ধন ঐরূপ গৌণ ব্যবহার হয় ইহা গুণবাদের প্রতিপাদনে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অন্ন যেরূপ প্রীতি সাধন ও তৃপ্তিকর সেইরূপ উদুম্বর বৃক্ষ পক্ক-ফল দ্বারা অন্নের ন্যায় তৃপ্তি সাধন হইতে পারে। এতাদৃশ সাদৃশ্য মনে করিয়াই উদু-ম্বরকে অন্নবলা হইয়াছে। ফলবচনই স্তুতি-বোধক, প্রকৃত ফল সম্বন্ধবোধক নহে কেন না তাহাতে বাক্যভেদ প্রভৃতি গুরুতর দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়।

সিদ্ধান্তে স্তুতি সম্ভব ইহাই দেখান হই-য়াছে। ফলবিষয় অসম্ভব। সম্প্রতি ইহা দেখাইবার জন্য অন্য একটী বিধিবহির্গত বাক্যের বিচার করা হইতেছে।

বিধিশ্চানর্থকঃ কচিৎ তস্মাৎ স্তুতিঃ

প্রতীয়েত, তৎ সামান্যাৎ ইতরেষু তথাত্বং। ২৩।

পদপাঠঃ।—বিধিঃ। চ। অনর্থকঃ। ক্বচিৎ। তস্মাৎ। স্তুতিঃ প্রতীয়েত। তৎসামান্যাৎ। ইতরেষু। তথাত্বং।

ব্যাখ্যা।—বিধিঃ—বিধান। চ—(হেত্বর্থে) যেহেতু। অনর্থকঃ—বৃথা। ক্বচিৎ—কোনও কোনও স্থানে। তস্মাৎ—সেইজন্য। স্তুতি—প্রশংসা। প্রতীয়েত—বুঝাযাইতেছে। তৎসামান্যাৎ—সেই সাদৃশ্য [বিধির সম্ভাবনা না থাকা এবং স্তুতির সম্ভাবনা থাকা] বশতঃ। ইতরেষু—অপরগুলিতে অর্থাৎ তৎ সজাতীয় সমস্ত স্থানে। তথাত্বং—তদ্রূপতা অর্থাৎ স্তাবকত্ব।

বঙ্গার্থঃ। কোনও কোনও স্থানে বিধি-সম্ভব নহে, কিন্তু প্রশংসার সম্ভাবনা আছে সেইজন্য তৎসদৃশ সকল স্থানেই স্তাবকত্ব বলিতে হইবে। [কেননা সর্বত্র বিধি অসম্ভব, কিন্তু কোন স্থানে প্রশংসা অসম্ভব নহে। অসম্ভব বস্তু প্রতিপাদন করিলে বাক্যের গৌরব রক্ষিত হয় না, বরঞ্চ ঐ বাক্য প্রলাপবাক্য বলিয়া উপেক্ষিত হয় অর্থ-বাদ পক্ষে সে দোষ সম্ভবই নহে, অতএব ঐ শ্রেণীর বাক্যগুলি অর্থবাদ একটীও বিধি নহে।]

বিশদব্যাখ্যা।—একটী বিধিবন্নিগদ আছে—"অপ্সুযোনির্বা অশ্বো অপ্সুজো বেতসঃ" এখানে আর বিধি বলাযায় না, কেন না অপ্সুযোনি (জলজ) অশ্ব করা যায় না, তাহা অসম্ভব। মুখে বলিলে অসম্ভব সম্ভব হইবে না, বিধি বলে অশ্বকে অপ্সু-যোনি করা সাধ্যায়ত্ত নয়, সুতরাং বাধ্য হইয়া এখানে বিধিপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া স্তুতি পক্ষের স্তুতি করিতে হইবে, শনয়িতৃজলের সহিত অশ্বের সম্বন্ধ যজমানের কষ্ট প্রশমিত করে ইত্যাদি রূপএকটী স্তুতি বোধন পথ অব-শ্যই আশ্রয় করিতে হইবে। যখন এখানে বিধিসম্ভব নয়, স্তুতি সম্ভব আছে, তখন এই জাতীয় সমস্ত বাক্যেই অন্বেষণ করিলে দেখা-যাইবে বিধি হয়না স্তুতিই প্রতিপাদিত হয়। অতএব ইহারা সকলেই স্তাবক অর্থবাদ, বিধিভ্রম উৎপাদন করিয়া নিজেদের বিধিবন্নি-গদ নামের সার্থকতা সংরক্ষণ করে এইটুকু-মাত্র সাধারণ অর্থবাদ অপেক্ষা ইহাদের বিশে-ষত্ব। এইজন্যই ইহাদের স্বতন্ত্র অধিকরণে ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আরও একটী বিধিবন্নিগদ বাক্য আলো-চনা করিয়া দেখান যাইতেছে বিধান অত্যন্ত অসম্ভব সর্বথা স্তুতিই ইহাদের অর্থ।

প্রকরণে সম্ভবন্ অপকর্ষো নকল্পেত, বিধ্যানর্থক্যং হি তং প্রতি। ২৪

পদপাঠঃ। প্রকরণে। সম্ভবন্। অপ-কর্ষো নকল্পেত, বিধ্যানর্থক্যং। হি। তং। প্রতি।

ব্যাখ্যা।—প্রকরণে—প্রস্তাবে। সম্ভবন্—সম্ভব হইলে। (তাহার) অপকর্ষঃ—অন্যত্র উঠাইয়া লওয়া। ন—না। কল্পেত—কল্পিত হয়। [কল্পিত হয় না এইরূপ অর্থ।] বিধ্যানর্থক্যং—বিধানের ব্যর্থতা উপস্থিত হয়। তংপ্রতি—সেই প্রকরণ প্রতি-পাদিত কার্য্যের প্রতি। [অতএব স্তুতি-বাদেই আনর্থক্য নিবারণ করিতে হইবে।]

বঙ্গার্থঃ।—অনেক স্থানে বিহিত পদার্থ-প্রকরণে স্থান পায় না, কিন্তু উহাকে অর্থবা-

বলিলে প্রকরণেই সম্ভব হয়, যেখানে প্রকরণের প্রামাণ্য রক্ষার জন্য অর্থবাদই বলিতে হয়, কারণ প্রকরণপ্রতিপাদ্য পদার্থের প্রতি বিধানের সার্থকতা নাই। অতএব উহাকে অর্থবাদ বলিতে আপত্তি না থাকা উচিত।

বিশদব্যাখ্যা।—দর্শ পূর্ণমাস যজ্ঞের প্রকরণে "যোবিদগ্ধঃ সনৈঋর্তঃ যোঽশৃতঃ সরৌদ্রঃ যঃ শৃতঃ সদৈবতঃ তস্মাদবিদহতা শ্রপয়িতব্যং সদৈবতত্বায়" এই বাক্য আছে। ইহার অর্থ যে পুরোডাশ—দগ্ধ হইয়াছে তাহা নিঋর্তির যাহা অশৃত অর্থাৎ সম্পুর্ণ পক্ক হয় নাই তাহারুদ্রের যাহা শৃত অর্থাৎ সম্যক পক্ক (অদগ্ধ) তাহাই দেবতার অতএব যাহাতে দগ্ধ না হয় এরূপ ভাবে শ্রপণ (উষ্ণকরণ) করা উচিত, তাহাহইলে তাহা দেবতার উপযোগী হয়। এখানে বিধান বলা যায় না, কেন না তাহা হইলে নৈঋত পুরোডাশ বিদগ্ধ করিতে হইবে, এইরূপ অর্থ হয়, কিন্তু দর্শপূর্ণমাসযজ্ঞে নিঋর্তি দেবতা নাই, এ প্রকরণে সে কথা বলিবার কোনও কারণ দেখা যায় না, বস্তুতঃ এখানে উহা সম্পূর্ণ অনর্থক, উহাকে অন্য কোনও স্থানে লইয়া যাওয়াও অনুচিত, কারণ তাহাতে প্রকরণ প্রমাণ বাধিত হয়। শ্রুতি, অথবা লিঙ্গ কিম্বা বাক্যবলে প্রকরণ প্রমাণের বাধ সংঘটিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু এখানে ইহাকে অপরত্র লইবার কোনও শ্রুতিলিঙ্গ অথবা বাক্য প্রমাণ নাই। অতএব ইহার গতি নাই। অন্যত্র যাইবার সামর্থ্য নাই, থাকিবারও যোগ্যতা নাই, বেদবাক্যটী ব্যর্থ হইয়া পড়ে। যদি ইহাকে অর্থবাদ বলাযায় তবে দর্শপূর্ণমাসযাগীয় শৃত পুরোডাশকে ব্যাখ্যা করিবার জন্য দগ্ধ ও অপক্কের কথা বলা হইয়াছে। শৃত পুরোডাশ দৈবত তাহাই প্রশস্ত অশৃত ও বিদগ্ধ—দৈবত নহে, সুতরাং পরিত্যাজ্য। এইরূপে শৃত প্রশংসা বলিলে আর গোল নাই। বিধিপক্ষে ব্যর্থতা, সুতরাং ইহারা বিধি নহে, স্তাবক অর্থবাদ মাত্র।

অন্য প্রবল যুক্তির উল্লেখ করা হইতেছে—

বিধৌ চ বাক্যভেদঃ স্যাৎ। ২৫

পদপাঠঃ। বিধৌ। চ। বাক্যভেদঃ। স্যাৎ।

ব্যাখ্যা। বিধৌ—বিধিস্বীকার করিলে। চ—আরও দোষ। বাক্যভেদঃ—বাক্যভেদ নামক দোষ। স্যাৎ—হয়।

বঙ্গার্থঃ। বিধি স্বীকার করিলে বাক্যভেদ দোষে তাহা অসম্ভব হয়।

বিশদব্যাখ্যা।—ঔডুম্বর যূপের যে বাক্য প্রথমে কথিত হইয়াছে, তাহাতে বিধান বলিলে বাক্যভেদ হয়। "ঔডুম্বরোযূপঃ প্রশস্তঃ সচ উর্জ্জোকৈঃ" ঔডুম্বর বৃক্ষজাত যূপ প্রশস্ত ভাবিতীর উর্জ্জ (বল অথবা অন্ন) অনুরোধ করে এই ভিন্ন বাক্যতা দোষ উপস্থিত হয়। বাক্যভেদ অনুচিত ও অশেষ দোষের মূলীভূত। শবর স্বামিমতে বাক্যভেদ প্রকার প্রদর্শিত হইল। ভট্টপাদ বলেন "সম্ভবতোক-বাক্যত্বে বাক্য ভেদোনবেষ্যতে" একবাক্যতা করিতে পারিলে বাক্যভেদ করা উচিত নয়। পুর্ব্বাপর আলোচনাকরিলে একবাক্যতা প্রতীত হয় সুতরাং বিধি নহে। অর্থবাদ বলিলে বাক্যভেদাদি দোষ হয় না। সুতরাং সেই পক্ষই শ্রেয়ঃ। অতএব বিধিবহির্গত

অর্থবাদ মাত্র। তথায় বিধির সম্ভাবনা সুদূর পরাহত ইহা প্রতিপাদিত হইল। পরে অপর অর্থবাদের বিষয় বলা যাইবে।

ক্রমশঃ—

শ্রীকেদারনাথ ভারতী।

আমিত্বের প্রসার।

বৈরাগ্য।

মানুষ সুখের আশায় কতই কিনা করিতেছে, কিন্তু সুখ লাভ করিতে পারিতেছে না। সুখের আশায় ঘর বাঁধিতেছে, কিন্তু তাহা আগুনে পুড়িয়া যাইতেছে। সুখের আশায় পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতেছে, সাগর পার হইতেছে, কিন্তু কিছুতেই সুখ হস্তগত হইতেছে না। প্রাসাদ কি কুটীর, লোকালয়, কি বিজনবন সর্ব্বত্রই বালক, বৃদ্ধ, যুবা সুখের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান, সুখের জন্য কত যত্ন কত চেষ্টা, এমনকি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ, কিন্তু সুখ স্বর্ণমৃগের ন্যায় কিছুতেই ধরা দিতে চাহে না। মানবজীবন বিড়ম্বনা পরিপূর্ণ। কোথাহইতে কে আসিয়া মানবের সমস্ত গণনীয় ভুল করিয়া দেয়। যখন চাই রৌদ্র, তখন হয় বৃষ্টি, যখন চাই বৃষ্টি তখন হয় রৌদ্র। নীল নভোমণ্ডল—মেঘ মাত্র নাই, কিন্তু হঠাৎ মানবের শিরে বজ্রপাত হইতেছে। কন্যার বিবাহ উৎসবে গৃহ আনন্দ পরিপূর্ণ, কিন্তু বাসরঘরেই কন্যা বিধবা; আনন্দধ্বনি হৃদয়বিদারি আর্ত্তনাদে পরিণত হইল। বলিবার কিছুই নাই। মানবের পদে পদে বিপদ, ভয়ে জড় প্রায়। পুত্রহীন ব্যক্তি পুত্রের জন্য কত লালায়িত, কত তপ, জপ, শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিল, পুত্রও জন্মিল তখন কত আনন্দ, কিন্তু সেই পুত্র পিতা মাতাকে দুঃখের পাথারে ভাসাইয়া অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিল। কত যত্ন করিয়া গোলাপ গাছটি রোপণ করিলাম, মুকুলও দেখাদিল কিন্তু ফুল ফুটিতে না ফুটিতে কোথাকার এক কীট আসিয়া তাহাকে দংশন করিয়া গেল। সব আশা ফুরাইয়া গেল। সর্ব্বত্রই মানব জীবন অবিচ্ছিন্ন বিষাদে পরিপূর্ণ দৃষ্ট হয়। যাহাকে বড়ই সুখী বলিয়া বিবেচনাকর না কেন, তাহার হৃদয়ের অভ্যন্তর প্রদেশ খুলিয়া দেখিলে, দেখিতে পাইবে সেখানে একটি দুঃখের উৎস নিয়ত বিষাদ উদ্গীরণ করিতেছে। মানুষ যে আত্মহত্যা করে না, সে কেবল আশার প্ররোচনায়। আশাই মানবের দুঃখের কারণ কিন্তু ঐ আশাই আবার মানবকে দুঃখসহ্য করিবার শক্তি প্রদান করে। এইজন্যই আশাকে কুহকিনী বলে। কুহকিনীর কুহকে পড়িয়াই মানব দুঃখের সাগরে হাবুডুবু খাইতেছে। কুহকিনীকে পরিত্যাগ কর, দেখিবে দুঃখ কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এই জন্যই বলি আশাতে পরম দুঃখ, নিরাশায় পরম সুখ। আশায় পরিত্যাগ করিতে পারিলে বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং বৈরাগ্যে আত্মজ্ঞান জন্মিয়া থাকে।

আশার কুহকে জীব কতই না কি করিতেছে! সুখ, দুখ, সম্পৎ, বিপৎ, সকলই আশারূপ সুদৃঢ়-ভিত্তির উপর সংস্থাপিত। আশার মোহনবীণাধ্বনি যখন কর্ণবিবরে প্রচুর সুধা বর্ষণ করে জীবের হৃদয়ে

তখন আনন্দরসের ভরপুর তুফান বহিয়া যায়। জীব আত্মহারা হয়। কর্ত্তব্যের পথ আপনা হইতে কণ্টকিত রহিয়াছে। মুগ্ধ-জীবের অন্ধ নয়ন তাহা দেখিতে পায় না। কাজেই পদে-পদে বিপদ জালে জড়ীভূত হয়। যখন আশাকে বিদায় দিয়া জীব আপনাতেই আপনি তুষ্ট হন, তখন কর্ত্তব্যের সঙ্কীর্ণ বিশাল সঙ্কুল কণ্টকিত পন্থাও বিবেক-খড়্গের দ্বারা তিনি অকণ্টক করিতে পারেন। আশার অপগমে আশার সমস্ত চাতুরীও বিদূরিত হয়। জীবের নয়ন হইতে ঘুমের ঘোর ঘুচিয়া যায়। জীবের হৃদয়ের কলঙ্ক-কালিমা মুছিয়া যায়। দর্পণ পরিষ্কৃত হইলে তাহাতে কোনও বস্তু প্রতিবিম্বিত হইতে বাধা হয় না। আশার কালী মাখিয়া হৃদয় কাল হইয়া গিয়াছিল। আশার অন্তর্দ্ধানে কালিমা ও কালের কবলে বিলীন হইল। বিমল হৃদয় দর্পণে—পরম জ্যোতি আপনা হইতে প্রকাশ পাইতে লাগিল। মেঘের আবরণ আর নাই, নির্ম্মল আকাশে ভাস্কর কেন দেখা দিবে না? তত্ত্বজ্ঞানালোকে অবিদ্যা তিমির দূরে গেল। রহিল সেই শাশ্বত নির্ম্মল জ্যোতি, আমি যাহা ছিলাম তাহাই হইলাম, আর কি আশায় আশ্বস্ত হইব? না নৈরাশ্যে ব্যথিত হইব? আর কি সুখে প্রাণ পাগল হইবে? না, দুঃখে দগ্ধ হইবে? দৈব দুর্ব্বিপাকে আমাকে আমি চিনিয়াও চিনিতাম না। এখন যে শান্তির কমনীয়-কান্তি দেখিতেছি, কাহার প্রসাদে? বৈরাগ্যের। আশার মূল উৎপাটিত হইলে অশান্তির নিবৃত্তি হইল। এই আশা ত্যাগ বৈরাগ্যের পরিচয়। বৈরাগ্য জীবকে দেখাইতে চায়—বুঝাইতে চায়—জানাইতে চায়, কুহকিনীর প্রলোভনে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছ উহাকে পরিত্যাগ করিলেই তোমার নিকট শান্তিকুটীরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবে। স্ত্রী পুত্র গৃহ ক্ষেত্র ধন ধান্য পরিত্যাগ করাই বৈরাগ্য নহে। বৈরাগ্য ইহার কিছুইত ত্যাগ করিতে বলে না। ইহাদের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিতে বলে। পুত্রাদির প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিলে আর পুত্রজনিত সুখ দুঃখ হৃদয়কে ব্যথিত করিবে না। অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মফল পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম করাই জীবের নির্দ্দোষ সন্ন্যাস, কর্ম্ম পরিত্যাগ করা সন্ন্যাস নহে; ভগবদ্ভক্তিতে দেখা যায়। "অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ। স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ। ধন জনের বৃথামোহমূলক মমতা ত্যাগই বৈরাগ্য। রাগ অর্থাৎ আসক্তি না থাকাই বৈরাগ্য শব্দের প্রকৃত অর্থ। আসক্তি গেলে কর্ত্তব্য কার্য্য যায় না। অথচ সকল গোল মিটিয়া যায়, শান্তির বাতাস একটু একটু ক্রমশঃ বহিতে থাকে বৈরাগ্য আমিত্বের প্রসারের সন্নিকৃষ্ট। আমার শরীর স্ত্রী পুত্র ধন সম্পত্তির প্রতি অযথা আসক্তিতেই আমার আমিত্ব সঙ্কুচিত হইয়াছে। আসক্তির বন্ধন কাটিয়া গেলে জগৎজোড়া-আমিত্ব দেখা-দিবে। সর্ব্বভূতে আত্ম দর্শন সকল সাধনারই ত মূলমন্ত্র। বৈরাগ্য তাহার পরম আত্মীয়। বৈরাগ্য সম্বন্ধে ভ্রান্তসংস্কারই আমাদের অনিষ্ট-জনক। স্বর্ণ পর্য্যঙ্ক পরিত্যাগ করিলাম, কুশাসনে শয়ন, কিন্তু কুশাসন খানি ছিঁড়িয়া-গেলে যেন হৃদয়ের তন্ত্রী ছিঁড়িয়া যায়, ইহা কি বৈরাগ্য? বৈরাগ্য বলেন, কুশাসনেও আসক্ত

হইও না, স্বর্ণাসনেও আসক্ত হইও না। আমরা এই উপদেশের অপব্যবহার করি। নিজের বিশাল রাজ্য পরিত্যাগ করি, প্রজা-পুঞ্জের প্রতি অনাসক্ত হই অরণ্যের ক্ষুদ্র আশ্রম-রাজ্যে রাজা হইয়া মৃগশাবক প্রজার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হই। ইহা প্রকৃষ্ট বৈরাগ্য নহে। প্রজাপুঞ্জ আর মৃগশাবক যেই হউক না কেন কেহই আমার বৈরাগ্যে সহায়তা করে না। একটীর প্রতি বিরক্ত হওয়ায় আর অপরের প্রতি অনুরক্ত হওয়ায় বৈরাগ্য হইতে পারে না। কোটী কোটী প্রজার প্রতি যে বিপুল স্নেহ বা আসক্তি তাহাকে চাঁপিয়া এক মৃগশিশুর উপর দেওয়াহইয়াছে মাত্র, বস্তুতঃ কিছুই কমে নাই। তুলারাশিকে একটী থলিয়ায় আবদ্ধ করিয়াছি, কিন্তু তাহাই অনবরত হৃদয়ে ধারণ করিয়া তৃপ্তি পাইতেছি, মাটীতে রাখিলেও যেন ভাল লাগে না। এরূপ বৈরাগ্য যথার্থ বৈরাগ্য নহে, কেবল বৈরাগ্যের প্রথম সোপান। আসক্তিকে কলসী হইতে তুলিয়া ক্ষুদ্র ঘটের মধ্যে রাখা ভিন্ন ইহা কিছুই নয়। সকল বস্তুর আসক্তি পরিত্যাগই প্রকৃত বৈরাগ্য তাহাতেই আমিত্বের প্রসার।

প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে আশাই আমাদের তাবৎ দুঃখের কারণ। স্বার্থই আশার জনয়িতা। যেখানে স্বার্থ নাই সেখানে আশা নাই, আছে কেবল কর্ত্তব্য, এবং যেখানে কর্ত্তব্য সেখানে ফল প্রাপ্তি হেতু সুখ নাই কিম্বা ফলাপ্রাপ্তি হেতু দুঃখ নাই আছে কেবল কর্ত্তব্যসম্পাদনজনিত বিশুদ্ধ আনন্দ। পুত্রের মৃত্যুজনিত যে দুঃখ তাহার মূল কোথায়? তাহার মূল আমার হৃদয়ের পোষিত-বাসনায়। বাসনা পূর্ণ না হওয়াতেই আমার দুঃখ। পুত্র যদি জীবিত থাকিত এবং ঐ পুত্র হইতে যদি আমার পোষিত বাসনাগুলি পূর্ণ না হইত, তাহা হইলেও আমার দুঃখ হইত। কিছুমাত্র ইতরবিশেষ হইত না। কর্ত্তব্য জ্ঞানে কোন কার্য্য করিলে ওরূপ হয় না। আমার যাহা কর্ত্তব্য আমি করিলাম, ফল যাহা হইবার তাহা হউক। রাজা যুধিষ্ঠির নিরতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন, কিন্তু আজীবন ধর্ম্মে নিরত থাকিয়াও, তাঁহার সহস্র সহস্র বিপদের মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল; অন্য লোক রাজার দুঃখে কতই দুঃখিত হইত কিন্তু রাজার বিন্দুমাত্রও দুঃখ ছিল না। কেন না তিনি ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কোন কর্ম্ম করিতেন না। যখন যুধিষ্ঠির তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ ও দ্রৌপদীর সহিত রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া অরণ্যে বাস করিতেছিলেন তখন দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মে কি লাভ হইল, দুর্য্যোধন নানাবিধ অন্যায় কার্য্য করিয়াও সুখে অবস্থান করিতেছেন এবং যুধিষ্ঠির নানাবিধ সুকার্য্য করিয়াও দুঃখে কালযাপন করিতেছেন ইত্যাদি নানাবিধ বাক্যের দ্বারা যুধিষ্ঠিরের প্রতি হিংসা প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করাতে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে কহিয়াছিলেন—

"নাহং কর্ম্ম ফলান্বেষী রাজপুত্রি চরামুত
দদামি দেয়মিতি যজে যষ্টব্যমিত্যুত।
অস্তু বাত্র ফলং মাবা কর্ত্তব্যং পুরুষেণ যৎ।
গৃহে বা বসতা কৃষ্ণে যথাশক্তি করোমি তৎ॥
ধর্ম্মঞ্চরামি সুশ্রোণি ন ধর্ম্ম ফলকারণাৎ।
আগমাননতিক্রম্য সতাং বৃত্তমবেক্ষ্য চ॥

ধর্ম্ম এব মনঃ কৃষ্ণে স্বভাবশ্চৈব মে ধ্রুবম।
ধর্ম্মবাণিজ্যকো হীনো জঘন্যো ধর্ম্মবাদিনাম॥

হে দ্রৌপদি! আমি কর্ম্মফল অন্বেষণ-করিয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠান করি না! দান করা কর্ত্তব্য তাই আমি দান করি, যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য তাই আমি যজ্ঞ করি। ফল হউক বা না হউক, গৃহে থাকিয়া যে সকল কার্য্য করা কর্ত্তব্য আমি তাহা যথাশক্তি করিয়া থাকি। হে সুশ্রোণি! আমি সাধুজনের ব্যবহার ও শাস্ত্র অনুসরণ করিয়া থাকি, কিন্তু ধর্ম্মের ফল কামনা করিয়া ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করি না। হে কৃষ্ণে! আমার মন স্বভাবতই ধর্ম্মে আবদ্ধ আমি ধর্ম্মের বণিক নহি, যাহারা ধর্ম্মের বণিক তাহারা ধর্ম্মবাদীদিগের নিকট জঘন্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

কর্ত্তব্য জ্ঞানে কার্য্য সম্পাদন করিতে করিতে হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় শক্তির আবির্ভাব হয়। বাহিরের লোক দেখিতেছে যুধিষ্ঠিরের কতই দুঃখ, কিন্তু যুধিষ্ঠির কর্ত্তব্য সম্পাদন জনিত আনন্দে বিহ্বল; সুখ দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। এই জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন
মা কর্ম্মফল হেতুর্ভূর্মাতে সঙ্গোস্ত্বকর্ম্মণি॥

কর্ম্মেই তোমার অধিকার আছে ফলে তোমার অধিকার নাই। ফল আকাঙ্ক্ষা করিয়া কোন কর্ম্ম করিও না, কিন্তু কর্ম্ম না করিয়াও থাকিও না। কর্ত্তব্য জ্ঞানে কর্ম্ম করিতে করিতে আত্মার বিকাশ হয়। যপর্য্যন্ত বাসনা থাকে, সে পর্য্যন্ত আমাদের কর্ম্ম কার্য্যই রঞ্জিত ভাব ধারণ করে এবং তাহাহইলে আত্মার নির্ম্মল বিকাশ হয় না। নিস্বার্থভাবে কর্ত্তব্য জ্ঞানে কর্ম্ম করিতে করিতে সাত্ত্বিকতা লাভ হয় এবং সাত্ত্বিকতা লাভ হইলে আত্মার নির্ম্মল বিকাশ হয়।

ট্রান্সভালে ইংরেজদিগের সহিত বুয়রদিগের তুমুল সংগ্রাম হইতেছে। প্রেসিডেন্ট ক্রুগার যদি কর্ত্তব্য জ্ঞানে কার্য্য না করিয়া স্বীয় স্বার্থের অভিসন্ধিতে এ ঘোর যুদ্ধে লিপ্ত হইতেন, তাহাহইলে আজ তাঁহার কি শোচনীয় দশা উপস্থিত হইত। তাহাহইতে স্বীয় আত্ম-গ্লানি এবং সমগ্র জগতের নিন্দা তাঁহার জীবনকে দুঃখময় করিয়া তুলিত কিন্তু রাজ্যভ্রষ্ট, দেশ ভ্রষ্ট, পরিবার ভ্রষ্ট হইয়াও, ক্রুগার অচল অটল, ও বলীয়ান এবং তাঁহার শত্রুগণও শতমুখে তাঁহার অচল ভগবৎভক্তি বিশ্বাসে প্রশংসা না করিয়া পারিতেছেন না। কর্ত্তব্য জ্ঞানে কার্য্য করিলে ফললাভ না হইলেও, হৃদয় বিষণ্ণ বা উৎকণ্ঠিত হয় না কিন্তু স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিলে তাহার ফল সর্ব্বত্রই বিষময় পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

কিন্তু নিস্বার্থভাবে কার্য্য করিতে গেলেই আত্ম-জ্ঞানের আবশ্যক তোমার আত্মা ও আমার আত্মা এক ইহা উপলব্ধি না করিতে পারিলে নিস্বার্থ-ভাবে কার্য্য করা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। এই দেহ আত্মার উপাধি মাত্র কিন্তু দেহ মধ্যবর্ত্তী অন্তর্য্যামী পুরুষ এক মাত্র এই জ্ঞান দৃঢ় করিতে না পারিলে নিস্বার্থভাবে কার্য্য করিতে পারা যায় না এবং নিস্বার্থভাবে কার্য্য করিতে না পারিলে কর্ত্তব্য জ্ঞানে কার্য্য সম্পাদন হয় না। বৈরাগ্য ভিন্ন আত্মজ্ঞান হয় না। ধন-জন জায়া সুত পার্থিব তাবৎ পদার্থই

অনিত্য। তাহাদিগের দ্বারা কেহ কখন অমৃততত্ত্বের অধিকারী হইতে পারে না; তাহারা কখনও বিশুদ্ধ নিত্যানন্দ প্রদান করিতে পারে না এই জ্ঞান দৃঢ় না হইলে কেহ কখন আত্ম বিষয়ে জিজ্ঞাসু হয় না। তোমার পিতা পিতামহ কোথায়, তুমি বা কিছুদিন পরে কোথায় যাইবে, কে তোমার পুত্র কে তোমার কন্যা তুমি কে কোথা হইতে আসিয়াছ এই সমুদয় প্রশ্ন হৃদয়ে উপস্থিত হইলে ভৌতিক জগতের উর্দ্ধে গমন করা যায়। এই সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করিতে করিতে আত্মজ্ঞান উপস্থিত হয়। জাগতিক তাবৎ পদার্থে বিরাগ উপস্থিত হয় এবং আত্মাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্যস্থল হয়। হৃদয়ে বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে জগতের তাবৎ পদার্থের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে, কিন্তু ঐ বৈরাগ্যই আত্মার দিকে লইয়া যায় এবং আত্মজ্ঞান জন্মিলে আবার তাবৎ বস্তুতেই স্বীয় আত্মা অনুভূত হওয়ায় তাহারা আত্মীয় হইয়া দাঁড়ায়। এই সময়ে কর্ত্তব্য থাকে কিন্তু আকাঙ্ক্ষা থাকে না। এই সময়ে সুখে স্পৃহা থাকে না, দুঃখে উদ্বেগ জন্মে না, চিত্ত শান্ত ও সমাহিত হয়। যাঁহার যত বৈরাগ্য তাঁহার তত লাভ, কেন না এই বিশ্ব তাঁহার বাহিরে নয়। অতএব হে জীব, যদি শান্তিদেবীর প্রসাদ লাভ করিতে চাহ, তাহাহইলে বৈরাগ্য অবলম্বন কর, বৈরাগ্য অবলম্বন করিলে তোমার আত্ম জ্ঞান হইবে এবং আত্ম জ্ঞান হইলেই তোমার সর্ব্বত্রই আত্মোপলব্ধি হইবে। ওং শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শোকোচ্ছ্বাস।

"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।"

বিধাতার বিচিত্রকৌশলপূর্ণ বিশ্বচক্র প্রতিনিয়ত আপনা আপনি আবর্ত্তিত হইতেছে। অযাচিত ভাবেই সুখের পর দুঃখ শান্তির উপর অশান্তি আমাদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। আমরা চাহি না বলিলেও যাইবে না, প্রীতিকুসুমে সাদর সম্ভাষণে অভিনন্দিত করিলেও চির দিন রহিবে না। জগতের এই গতি, এই প্রকৃতি এই পদ্ধতি। পূর্ব্ববঙ্গের গগনে যে অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রটী আপন আভায় আপনি আলোকিত হইয়া আকাশতল বিমল করিতেছিল—যাহার অদর্শনে অচিরকাল মধ্যেই চিরদিনের মত তিমিরে বঙ্গ আবৃত হইয়াছে সেই প্রভাময় নক্ষত্রটী আর আমাদিগের নয়নের আনন্দ সংবর্দ্ধন করিবে না। পাঠক-মহোদয়! সেই ভীষণ শোককথা কহিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, প্রাণ যেন খিন্ন [illegible] হইতেছে, জিহ্বা জড়তা প্রাপ্ত হইতেছে কি নিদারুণ শোক সংবাদ! ভাওয়াল [illegible] [illegible]-নিকেতন অসাধারণ দানশক্তি-সম্পন্ন বঙ্গ সাহিত্যের অকৃত্রিম সুহৃৎ মান্যবর রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরকে আমরা হারাইয়াছি। বঙ্গ শোকে ম্রিয়মান আত্মীয় স্বজনের ও প্রজাপুঞ্জের

আকুল আর্ত্তনাদে আকাশ পূর্ণ ও উষ্ণ অশ্রুতে ভূমী কর্দ্দমাক্ত হইতেছে ক্রমে ক্রমে বঙ্গের [illegible] স্তম্ভ না জানি বিশ্বপতির কোন্ অজ্ঞাত [illegible] সংসারের গর্ভ-গহ্বরে লুকাইয়া যাইতেছে। বলিতে পারি না, বিধাতার মনে আর কি আছে? রাজাবাহা-দুরের [illegible] সাহিত্য সমাজ ও [illegible]র ক্ষতি হইল [illegible] তাহা [illegible] ভুলিতে পারিব না। প্রতিবৎসর ৫০ খণ্ড হিন্দু-পত্রিকা রাজাবাহাদুর গ্রহণ করিতেন। হিন্দু-পত্রিকা একজন অকৃত্রিম আশ্রয়দাতা হারা-ইয়া শোকার্ণবে নিমগ্ন। হিন্দু-পত্রিকা রাজাবাহাদুরকে হারাইয়াছে, কিন্তু তাঁহার অসাধারণ স্নেহ জীবনে ভুলিবে না। স্বর্গীয় রাজাবাহাদুরের শোকাকুল স্বজন[illegible] নয়নজলের সহিত হিন্দু-পত্রিকা [illegible] অশ্রু মিশাইয়া চরিতার্থা। সংসারের অনাচার অত্যাচার ঘাত প্রতিঘাত দুঃসহ দুর্দ্দিন বেদনা তাড়না যাতনাময় মর্ত্ত্যরাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজাবাহাদুর মহাযাত্রা করিয়াছেন। স্বর্গের চির-শান্তিময় রাজ্য তাঁহার জন্য রহিয়াছে। যেখানে ঈর্ষা প্রতিহিংসার প্রবল পৈশাচক্রীড়া-নাই, অশান্তি অত্যাচারের নামগন্ধও নাই, সর্ব্বদা যেখানে শান্তির সুবাতাস ঝির ঝির রবে ধীরে ধীরে বহিতেছে সেই রাজ্যই তাঁহার যোগ্য। পাপের সংসারে পর দুঃখে যাঁহার প্রাণ কাঁদে এরূপ মহাত্মার স্থান স্বল্প সম-য়ের জন্যই। অতি দুঃখিত অন্তরে তাঁহার পারলৌকিক কল্যাণ কামনা করি, যেখানে ভগবানের অনন্ত করুণার উৎস তাঁহার জন্য প্রবাহিত আছে, সেই স্থানে তিনি শান্তি লাভ করুন। অ[illegible] আর্ত্তধ্বনি আর যেখানে তাঁহার কর্ণবিবরে পৌঁছিতে পারিবে না, কিন্তু শত শত নিরাশ্রয়ের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার [illegible] করিবে। রাজাবাহাদুরের অশেষ গুণগ্রাম বঙ্গের হৃদয়ে অঙ্কিত আছে, বঙ্গ তাহা ভুলিবে না। আমরা বঙ্গসাহি-ত্যের মহারথী বঙ্কিমের ধীশক্তির অবতার [illegible]প্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের দীর্ঘ জীবন [illegible] করিয়া [illegible], বিশাল ভাওয়াল [illegible] সুসন্তান [illegible] রাজকুমার ত্রয়ের [illegible] তিনি থাকিলে ভাওয়াল সিংহা-সনে রাজেন্দ্রের অন্তর্দ্ধানের পর আমরা সেই-স্থানে [illegible] তিন রাজেন্দ্র দেখিয়া আমা-দের মনের আশা পরিপূর্ণ হইবে। অতীতের অনুশোচনা কেবল ক্লেশকর। রাজাবাহাদুরের শোকাকুল পরিজনবর্গকে সংসারের নশ্বরতা দেখাইয়া আমরা সান্ত্বনা করিতে চাহি। ক্ষণভঙ্গুর শরীর সংস্থান কোনও না কোন দিন ভাঙ্গিবেই ভাঙ্গিবে। প্রকৃতির সে প্রবল বেগ অনিবার্য্য। কিন্তু সৎকার্য্য জগতে আপনার প্রতিভূ রাখিয়া যাইবে। রাজা বাহাদুর নরদেহ বিসর্জ্জন করিয়াছেন বটে, কিন্তু বঙ্গ সমস্বরে বলিবে কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।

শরীর রক্ষার্থ সদ্বৃত্তের অনুষ্ঠান।

সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্য
শরীরমনুপালয়েৎ
তদভাবে হি ভাবানাং
সর্ব্বাভাবঃ শরীরিণাং

এ জগতে মানবমাত্রেই চতুর্ব্বর্গের ফল কামনা করিয়া থাকে, চতুর্ব্বর্গের ফল লাভ করিতে হইলেই সর্ব্বতোভাবে শরীর সুস্থ রাখা আবশ্যক। ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ লাভের প্রধান কারণই শরীর, এইজন্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উক্ত আছে যে

সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ
তদভাবে হি ভাবানাং সর্ব্বভাবঃ শরীরিণাং।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যমূলমুত্তমং
রোগাস্তস্যাপহর্ত্তারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্যচ।

অর্থাৎ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শরীর রক্ষা করা আবশ্যক, কেন না শরীর অভাব হইলে সকল কার্য্যই বিনষ্ট হয়। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের মূল কারণই সুস্থতা। কিন্তু রোগ স্বাস্থ্য এবং শরীর বিনাশ করে, শরীর রক্ষা বিষয়ে হঠযোগবলেন "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং।" কেবল যে পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিলেই শরীর রক্ষা হইবে তাহাও নহে ঐ সঙ্গে ধর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করিতে হইবে, বেদাদি শাস্ত্রে যেমন সদাচার অনুষ্ঠানের বিধান আছে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও সেরূপ সৎকার্য্যানুষ্ঠানের নিয়ম আছে। সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে মনকে বশীভূত করা আবশ্যক, যেহেতু "মনঃপুরঃসরাণী ইন্দ্রিয়াণ্যর্থগ্রহণসমর্থানি ভবন্তি" মনই চক্ষু আদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং জিহ্বাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়কে স্বীয় স্বীয় কর্ম্মে প্রেরণ করে, মনব্যতীত কখনই ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান হইতে পারে না, মন যে সময় যে ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করে তখন সেই ইন্দ্রিয় জনিত জ্ঞান হয়, অন্য ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান হয় না। অর্থাৎ মন যদি চক্ষুকে আশ্রয় করে চক্ষু জনিত জ্ঞান হয় এইরূপ কর্ণাশ্রিত হইলে শ্রবণ জন্য জ্ঞান হয়, এইজন্য একদা উভয় ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান হয় না, ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, মনই সমস্ত সুকার্য্য দুষ্কার্য্যের একটী প্রধান কারণ, সত্ত্ব, রজঃ তম গুণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া মন সুকার্য্য দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, রজওতম গুণাক্রান্ত হইয়া কুপথে রত হয় মন যদি সত্ত্বগুণাধিক্য হয় তাহাহইলে কখনই গর্হিত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয় না কেন না "রজস্তমোভ্যামাবিষ্টং চক্রবৎ পরিবর্ত্ততে" রজ এবং তমগুণেরদ্বারা আক্রান্ত হইয়া চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হয়, এই রজ এবং তম গুণই শরীরের অস্বাস্থ্যের প্রতি একমাত্র কারণ, রজওতমগুণাক্রান্ত হইয়া মানবগণ নানাপ্রকার অসদনুষ্ঠানে আসক্ত হয়। ক্রমে সেই কুকার্য্যরূপপাপ হইতে রোগাক্রান্ত হইয়া শরীরকে অসার জড়পিণ্ডের ন্যায় মনে করে দেহিনং নহি নির্দ্দোষং রোগঃ সমুপসেবতে" পাপবিনাকখনই রোগ হয় না, পাপ কার্য্যের আদি কারণ ভূত রজওতমগুণকে বশীভূত করাই মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, তাহাহইলেই মানব জীবনের কার্য্য সাধিত হয় এবং শরীরও অসুস্থ হয় না। এই উদ্দেশ্যে আত্রের মুনি

স্বীয় শিষ্য অগ্নিবেশকে বলিয়াছেন যে হে অগ্নিবেশ! যাহাতে মন সৎপথগামী হয় এবং ইন্দ্রিয় জয় হয় আমি তোমাকে সেই সকল সদ্বৃত্ত উপদেশ দিতেছি, এই সদাচার পালন করিলে ঐহিক এবং পারত্রিক সুখ ভোগ হইবে।

তত্ সদ্বৃত্তমখিলেনোপদেক্ষ্যামি। তদ্ যথা—দেব গো ব্রাহ্মণগুরুবৃদ্ধসিদ্ধাচার্য্যা-নর্চ্চয়েত্। অগ্নিমনুচরেত্। ওষধীঃ প্রশস্তা ধারয়েত্। দ্বৌকালাবুপস্পৃশেত্। মলায়নেষ ভীক্ষং পাদয়োশ্চ বৈমল্যমাদধ্যাত্। ত্রিঃ পক্ষস্যকেশশ্মশ্রুলোমনখান্ সংহারয়েত্ নিত্য-মপহুত বাসাঃ সুমনঃ সুগন্ধিঃ স্যাত্। সাধুবেশঃ প্রসাধিতকেশো মূর্দ্ধশ্রোত্রঘ্রাণ-পাদতৈলনিত্যো ধূমপঃ পূর্ব্বাবভাষী সুমুখঃ দুর্গেষ্বভ্যুপপত্তা হোতা যষ্টা দাতা চতুষ্প-থানাং নমস্কর্ত্তা বলীনামুপহর্ত্তা অতিথীনাং পূজকঃ পিতৃণাং পিণ্ডদঃ কালে হিতমিত-মধুরার্থবাদী বশ্যাত্মা ধর্ম্মাত্মা হেতাবীর্ষ্যুঃ নিশ্চিন্তো নির্ভীকো ধীমান্ হ্রীমান্ মহোত-সাহো দক্ষঃ ক্ষমাবান্ ধার্ম্মিক আস্তিকো বিনয় বুদ্ধি বিদ্যাভিজন বয়োবৃদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যণা মুপাসিতা। ছত্রী দণ্ডী মৌনী সেপানত্কো যুগমাত্রদৃগ্ বিচরেৎ। মঙ্গলাচারশীলঃ কুচে লাস্থি কণ্ঠকামেধ্যকেশতুষোত্কর ভস্মক-পাল স্নানবলিভূমীনাং পরিহর্ত্তা, প্রাক্ শ্রমাদ্ব্যায়ামবর্জ্জী স্যাৎ। সর্ব্বপ্রণিষু বন্ধুভূতঃ স্যাৎ, ক্রুদ্ধানামনুনেতা ভীতানামাশ্বাসয়িতা দীনানামভ্যুপপত্তা সত্য সন্ধঃ সাম প্রধান-পরপরুষবচনসহিষ্ণুঃ অমর্ষঘ্নঃ প্রশমগুণ দর্শী রাগদ্বেষহেতুনাং হন্তা। নানৃতং ব্রুয়াৎ। নান্যস্বমাদদীত। নান্যস্ত্রিয়মভিহরয়েৎ। নান্য শ্রিয়ং নবৈরং রোচয়েৎ। ন কুর্য্যাৎ পাপং নপাপেঽপিপাপী স্যাৎ। নান্যদোষান্ ব্রূয়াৎ। নান্যরহস্যমাগময়েত্। নাধার্ম্মি-কৈর্ন নরেন্দ্রদ্বিষ্টৈঃ সহাসীত, নোন্মত্তৈর্ন পতিঃ তৈর্ন ভ্রূণ হন্তৃভির্নক্ষুদ্রৈর্ন দুষ্টৈঃ। নদুষ্টয়া নান্যারোহেৎ। নজানুসমং কঠিনমাসনম-ধ্যাসীৎ। নানাস্তীর্ণমনুপহিতমবিশালমসমং বা শয়নং প্রপদ্যেত। নগিরিবিষমমস্তকেষু অনুচরেৎ, নদ্রুমমারোহেৎ, কুলচ্ছায়াংনোপা-সীৎ। নোচ্চৈর্হসেৎ। শব্দবতং মারুতং মুঞ্চেৎ।

সদাচার সমস্ত উপদেশ দিব। যথা—

দেবতা গো ব্রাহ্মণ গুরু, বৃদ্ধ, সিদ্ধ আচার্য্যদিগেকে অর্চ্চনা করিবে, যজ্ঞাদি হোম কার্য্য অনুষ্ঠান করা উচিত মণি মুক্তা প্রবলাদি ধারণ করিবে, প্রাতঃ এবং সায়ং কালে স্নান করতঃ উপাস্য দেবতার আরাধনা করিবে। মলায়েনের স্থান সমস্ত অর্থাৎ মেঢ্র গুহ্যদ্বার চক্ষুদ্বয় কর্ণদ্বয় নাসিকা দ্বয় মুখ এবং রোমকূপ সমস্ত পাদদ্বয় সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবে। পক্ষের মধ্যে তিনবার কেশ শ্মশ্রু লোম নখ কর্ত্তন করিবে জীর্ণ বস্ত্র এবং দুর্জ্জন সংসর্গ পরিত্যাগ করতঃ সুমন সুগন্ধি হইয়া চিরুণী দ্বারা কেশ পরিষ্কার করিবে মস্তক চক্ষু নেত্র এবং পায়ে নিয়মমত তৈল ব্যবহার করিবে ধূমপায়ী এবং মিষ্টভাষী হইবে দরিদ্র দিগকে যথাসাধ্য দান করিবে ধনীদিগকে দান করিবার আবশ্যক হয়না মহাভারতে মহাত্মা বিদুর যুধিষ্ঠিরকে বলিয়া,

ছেন। দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনং।

ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ।

হে যুধিষ্ঠির দরিদ্রদিগকে দান কর ধনবান ব্যক্তিদিগকে দান করিবার কোন আবশ্যক নাই রোগীরই ঔষধ পথ্য নিরোগের ঔষধের প্রয়োজন হয় না। অতিথি সৎকার করিবে পিতৃলোককে পিণ্ডদান করিবে, কালে অর্থাৎ যে সময় যেরূপ যোগ্য সেই সময়ে জিতেন্দ্রিয় এবং ধর্ম্মাত্মা হয়ে হিতকর প্রমিত এবং মধুর বাক্য বলিবে, সর্ব্বদা কার্য্যকারণের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে, সহসা কোন ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক নির্ভীক হইবে, সাধুবিগর্হিত কোন কার্য্য করিয়া অনুষ্ঠিত হইলে লজ্জিত হইবে। জ্ঞানবান্ কালজ্ঞ ক্ষমাবান্ বুদ্ধিমান্ এবং ঈশ্বরভক্ত আস্তিক হইয়া নীতি বুদ্ধিমান্ [illegible] এবং পুণ্য ব্যক্তিদিগকে উপাসনা করিবে। কোন স্থানে গমন করিতে হইলে সঙ্কীর্ণ পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক ছত্র, যষ্টি এবং পাদুকা গ্রহণ করিয়া গমন করিবে, কদাচ অমঙ্গলজনক কার্য্য করিবে না, উপযুক্ত পরিশ্রম হওয়ার পূর্ব্বেই ব্যায়াম হইতে নিবৃত্তি হইবে। সকল প্রাণিকে বন্ধুর ন্যায় দেখিবে ক্রুদ্ধব্যক্তিদিগকে বিনয়েরদ্বারা বাধ্য করিবে, কোন ব্যক্তি দুর্ব্বাক্য বলিলেও তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইবে না রাগদ্বেষাদির কারণ সমস্ত বিনাশ করতঃ কদাচ মিথ্যাকথা বলিবে না। অন্যের ধন এবং অন্যের সম্পত্তি অভিলাষ করিবে না। কাহারও সহিত বিবাদ করিবে না, অন্যের গম্ভীর বিষয় চিন্তা করিবে না, পাপ সংসর্গে থাকিয়াও পাপ কার্য্যে রত হইবে না, পরনিন্দা হইতে বিরত থাকিবে। অপরের গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করিবে না, অধার্ম্মিক, রাজদ্বেষী উন্মত্ত ভ্রূণহত্যাকারী ক্ষুদ্র এবং দুষ্ট লোকের সংসর্গ পরিত্যাগ বিধেয়। অতিশয় উচ্চাসনে উপবেশন করিবে না, আবরণ রহিত অপরিষ্কৃত এবং অসম শয্যায় শয়ন করিবে না। পর্ব্বতশৃঙ্গ এবং বৃক্ষে আরোহণ করিবে না। জলের প্রবল স্রোতে অবগাহন এবং নদ্যাদির [illegible] উপাসন করিবেনা, কারণ [illegible] উপরের মৃত্তিকা শরীরের উপর পতিত হইতে পারে, উচ্চৈঃস্বরে হাসিবে না। কদাচ প্রবল বাতের সম্মুখে যাইবে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতিরঞ্জন কাব্যতীর্থ।

আশ্রমবার্ত্তা।

পূর্ব্বদীপাবলিপরমেশ্বরের পবিত্র করুণা বলে, ধর্ম্ম পরায়ণ মহোদয় গণের সহানুগ্রহ সম্বলে ব্রহ্মচারি-আশ্রম সুচারুরূপে পরিচালিত হইতেছে। বিপৎপাত অতিক্রম করিয়া অনটনের আঘাত সহ্য করিয়াও স্বীয় কার্য্যক্ষেত্রকে প্রসারিত ভিন্ন সঙ্কুচিত করিতে চেষ্টা করে নাই। আশ্রমে পূর্ব্বমত বেদ, ষড়্‌দর্শন, সাহিত্য, মহারাষ্ট্রদেশীয় প্রতিভাশালী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নারায়ণ শাস্ত্রী প্রভৃতি অধ্যাপক বর্গ অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। আশ্রমে আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র শিক্ষার জন্য শ্রীযুক্ত মতিরঞ্জন কাব্যতীর্থ কবিরাজ মহাশয়কে অধ্যাপক নিযুক্ত

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২০ আইন মতে রেজষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৮ম বর্ষ, ৮ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা।	আষাঢ়।	১৩০৮ সাল, ১৮২৩ শকাব্দা।

বেদান্ত-সূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

(৬ষ্ঠ ও ৭ম)

দ্বিতীয় পাদ।

৯। অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ।

১০। প্রকরণাচ্চ।

১১। গুহাংপ্রবিষ্টাবাত্মা নৌহিত-দর্শনাৎ।

১২। বিশেষণাচ্চ।

১৩। অন্তর উপপত্তেঃ।

১৪। স্থানাদি ব্যপদেশাচ্চ।

১৫। সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ।

১৬। শ্রুতোপনিষৎক গতাভি-ধানাচ্চ।

১৭। অনবস্থিতেরসম্ভাবাচ্চ নেতরঃ।

১৮। অন্তর্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্ম-ব্যপদেশাৎ।

১৯। ন চ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ।

২০। শারীরশ্চোভয়েহপি ভেদে নৈনমধীয়তে।

২১। অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ।

২২। বিশেষণ ভেদব্যপবদেশাভ্যা-ঞ্চনেতরৌ।

২৩। রূপোপন্যাসাচ্চ।

২৪। বৈশ্বানরঃ সাধারণঃ শব্দ-বিশেষাৎ।

২৫। স্মর্য্যমানমনুমানং স্যাদিতি।
২৬। শব্দাদিভ্যোন্তঃ প্রতিষ্ঠানা-ন্নেতি-চেন্ন, তথা দ্রষ্ট্যুপদেশাদ-সম্ভবাৎ পুরুষমপি চৈনমধীয়তে।
২৭। অতএব ন দেবতা ভূতঞ্চ।
২৮। সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ।
২৯। অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ।
৩০। অনুস্মৃতের্ব্বাদরি।
৩১। সম্পাত্তেরিতি জৈমিনিস্তথাহি দর্শয়তি।
৩২। আমনন্তি চৈনমস্মিন্।

৯। "চরাচর" পদের প্রয়োগ হেতু অত্তা (খাদক) শব্দে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

১০। প্রকরণ অর্থাৎ আলোচ্য বিষয় অনুসারেও ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

১১। "গুহা-প্রবিষ্ট দ্বয়" বাক্যে জীবাত্মা ও পরমাত্মাকেই বুঝাইতেছে; কারণ এক বস্তুর দ্বিতীয়কে লক্ষ্য করিলে, লৌকিক ব্যবহারে তাহার সমজাতীয় বস্তুই বুঝায়।

১২। বিশেষণ হেতুও ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

১৩। উপপত্তি হেতু "অক্ষি-মধ্যবর্ত্তী পুরুষ" বাক্যেও ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

১৪। অধিষ্ঠানাদির বর্ণনা থাকাতেও ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

১৫। "সুখবিশিষ্ট" অভিধানহেতুও ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

১৬। বেদান্ত-বিদের পরমগতি-নির্দ্দেশ থাকাতেও ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

১৭। "অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ" বাক্যে পরমাত্মা ভিন্ন অন্য আত্মা বুঝায় না; যেহেতু অন্য আত্মা [অন্যতাত্মক ভাবে] অনিত্য এবং বর্ণিত অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষের গুণ তাহাতে অপ্রযোজ্য।

১৮। গুণ-সমন্বয় হেতু "অন্তর্যামী পুরুষ" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

১৯। গুণ-বিরোধ-হেতু "অন্তর্যামী পুরুষ" পদে সাংখ্যাদি-স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত "প্রধান" প্রতিপাদ্য নহে।

২০। "অন্তর্যামী পুরুষ" পদে "শরীরী" অর্থাৎ জীবাত্মা প্রতিপাদ্য নহে; কারণ আরণ্যকের উভয় শাখাতেই লক্ষণ-ভেদ বর্ণিত হইয়াছে।

২১। অদৃশ্যতাদি লক্ষণ বর্ণিত থাকায় ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

২২। বিশেষণ-ভেদ বর্ণিত হওয়ায়, পরমাত্মা ব্যতীত প্রধান বা জীবাত্মা অপ্রতিপাদ্য।

২৩। রূপের উপন্যাস থাকাহেতুও ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

২৪। বৈশ্বানর ও আত্মা, এই দুই পদানুগতরূপে দুয়ের লক্ষণ-স্বাতন্ত্র্য সুনির্দ্দিষ্ট থাকায়, "বৈশ্বানর" পদে পরমাত্মাই প্রতিপাদ্য।

২৫। অপিচ, স্মৃতির বর্ণনা আমাদিগকে শ্রুতির অর্থ সম্বোধে সমর্থ করে।

২৬। যদি এই পূর্ব্বপক্ষ লওয়া যায় যে, বৈশ্বানর পদের অর্থ-পার্থক্য নির্দ্দিষ্ট থাকায় এবং জঠরাগ্নির লক্ষণ পুরুষান্তর্ব্বর্ত্তিতার উল্লেখ থাকায়, উক্ত পদে পরব্রহ্ম প্রতিপাদ্য নহেন; সিদ্ধান্ত এই যে, স্বর্গলোক জঠরাগ্নির মস্তক হওয়া অসম্ভবহেতু অ-

বাজসনেয়িগণ কর্ত্তৃক জঠরাগ্নি-পক্ষে অপ্রযোজ্য "পুরুষ" পদের প্রয়োগহেতু উক্ত পদে পর-ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

২৭। উপরোক্ত হেতুবাদে 'বৈশ্বানর' অগ্নির অধিষ্ঠাতৃদেবও নহে, ভৌতিক অগ্নিও নহে।

২৮। জৈমিনির মতে বৈশ্বানররূপে পরব্রহ্মের স্বরূপোপাসনার কল্পনাতেও কোন-রূপ আপত্তি বা অনুপপত্তির হেতু নাই।

২৯। ঐশ্বরিক প্রকাশহেতু আশ্মর-থ্যের মতেও তাহাই বটে।

৩০। অনুস্মরণহেতু বাদরির মতেও তাহাই বটে।

৩১। কাল্পনিকনির্দ্দেশন হেতু জৈমি-নির মতে পরব্রহ্মই "প্রাদেশ মাত্র" বাক্যে বিজ্ঞেয়; বিশেষতঃ উহা শ্রুত্যুক্তি-সম্মত।

৩২। অপিচ, [জাবালমতে] মস্তক হইতে চিবুক পর্য্যন্ত স্থান-ব্যাপিত্ব-কল্পনাহেতু "প্রাদেশমাত্র" বাক্যে পরব্রহ্মই বিজ্ঞেয়।

৯ম ও ১০ম সূত্র।—নবম ও দশম সূত্র অনুসারে কঠোপনিষদুক্ত 'অত্তা" (খাদক) পদে পরমাত্মা ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে। কঠোপনিষদে এইরূপ উক্ত হইয়াছে, যথা—
"যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চোভে ভবত ওদনঃ, মৃত্যু-র্যস্যোপসেচনম্ কইত্থা বেদ যত্র সঃ।"

কেমনে কেজানে, কোন্ অধিষ্ঠানে
অধিষ্ঠিত তিনি হন।
ব্রহ্ম-ক্ষত্র যাঁর উভয়ে আহার,
মরণ উপকরণ॥

এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষ এই যে, এতদুক্তি পর-মাত্মা-প্রতিপাদক কিনা? উত্তর, বিশ্বের তাবৎ [illegible]ই যে স্থলে ব্রহ্মে প্রলয়-প্রাপ্ত হয়, সেস্থলে ব্রহ্মকেই বিশ্বগ্রাসক বলা যায়। অত-এব কঠবল্লী বলিতেছেন যে, তিনি সেই খাদক, এই বিশ্বচরাচর যাঁর খাদ্য। "ব্রহ্ম-ক্ষত্র" সমবেত সর্ব্বভূতেরই উদাহরণ-উপলক্ষ্য স্বরূপ। সুতরাং ব্রহ্মই অত্তা বা খাদক। অগ্নি এ খাদক হইতে পারেন না; কারণ অগ্নি "অন্ন-খাদক" পদে স্পষ্টই শ্রুতি-প্রতিষ্ঠিত। যথা—"অগ্নিরন্নাদঃ।" (বৃঃ উঃ ১।৪।৬) কিন্তু "সর্ব্বাদঃ" বা সর্ব্বখাদক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। এস্থলে "মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং" বাক্যেই ব্রহ্মের বিশ্ব-খাদকত্ব ব্যক্ত হইতেছে।

যদি এরূপ তর্ক ধরাযায় যে, নিরাকার পর-মাত্মা নির্লেপ—নির্ভোগ, তাঁহার খাওয়া সম্ভবে না, এই তাৎপর্য্যই সচরাচর শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, পরন্তু জীবাত্মাই ভোগী বা খাদক বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। যথা—
"তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্নন্যোঽভি-চাকশীতি (মঃ উঃ।৩।)

উত্তর এই যে, জীবাত্মার এই যে ভোজন, ইহা জগৎ-গ্রাসন নহে, ইহা কর্ম্ম-ফল-ভোজন মাত্র; কিন্তু পরমাত্মা নির্লেপ—সুতরাং নির্ভোগ, কারণ তিনি কর্ম্ম-ফলের ভোক্তা নহেন; তিনি সাক্ষীস্বরূপ দ্রষ্টা মাত্র। জীবা-ত্মাই কাম-কর্ম্মী ও ভোগী, অর্থাৎ যাচক ও খাদক। আর সমগ্র জগৎ-সমষ্টির খাদক বলিলে, ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে; কারণ মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মেই বিশ্ব বিলীন হয়। অত-এব সূত্রোক্ত "অত্তা" পদের ব্রহ্মবাচকত্ব অসঙ্গত বা অনুপপন্ন নহে।

কঠোপনিষদের আলোচ্য বিষয়ের ব্রহ্মই অবলম্বন। "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ",

[কঃ উঃ ১।২।১৮] অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মা যিনি, অজ ও অমর তিনি। এস্থলে যদি পরমাত্মা ব্যতীত অন্য আত্মা বুঝিতে হয়, তবে আলোচ্য-বিষয়ের মূল-বিবৃতি-বিপর্য্যয়-জনিত স্থূল অনুপপত্তি দোষ ঘটে; কিন্তু তাহা অসঙ্গত ও অসম্ভব; সুতরাং পরমাত্মা ব্রহ্মই অজ ও অক্ষর।

১১শ ও ১২শ সূত্র।—এই দুই সূত্রে কঠোপনিষদের নিম্নোক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য-সিদ্ধান্ত সমাহিত।

"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহা-প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিনাচিকেতাঃ।"

[কঃ উঃ ১।৩।১]

দুয়ে ভবে সুকৃতের সুধারস পিয়ে।
সে পরম ধামরূপ গুহাগত হুয়ে॥
সে দুয়েরে 'ছায়াতপ' বলে ব্রহ্মবিদ্‌জন।
ত্রিনাচিকেতাগ্নিযাজী তথা পঞ্চাগ্নিকগণ॥

কোন্ দুয়ের বিষয় এস্থলে বলা হইয়াছে? এ দুই কে কে? অবশ্য জীবাত্মা ও পরমাত্মাই বটে; কিন্তু ইহা কিরূপে সঙ্গত হয়? যেস্থলে মুণ্ডকোপনিষদ্ স্পষ্টতঃ পরমাত্মা ব্রহ্মকে জীবাত্মার কর্ম্মের সাক্ষীস্বরূপ অভোক্তা দ্রষ্টারূপে ব্যক্ত করিয়াছেন, সেস্থলে সেই পরমাত্মা ব্রহ্ম এস্থলে আবার সুকৃত-কর্ম্মের সুফল-সম্ভোগী বলিয়া ব্যক্ত হইবেন কিরূপে? উত্তর এই যে, যদিও পরমাত্মা তত্ত্বতঃ কর্ম্মফলের অতীত, কিন্তু এস্থলে পরমাত্ম-বাচকত্ব ঔপমিকভাবেই ব্যবহৃত। এস্থলে বিশদরূপেই সিদ্ধান্ত করা হইতেছে যে, জীবাত্মাই নিশ্চয় কর্ম্মফল-ভোক্তা বটে, কিন্তু দ্বিবচনের প্রয়োগহেতু আমাদিগকে অবশ্য আর একটি আত্মার অনুসন্ধান করিতে হইবে। সুতরাং জীবাত্মা ও পরমাত্মা, এই দুইটি মাত্র "আত্মা" সংজ্ঞক আপাত-সমধর্ম্মী চৈতন্যস্বরূপ পদার্থ সত্তা স্বতঃসংবুদ্ধ থাকায়, ঐ অপরাত্মা পরমাত্মাকেই বুঝিতে হইবে।

অপর, "গৌর্দ্বিতীয়োঽন্বেষ্টব্যঃ।" এই গরুর দ্বিতীয়টি চাই, এ কথায় কিছু আমরা ঐ দ্বিতীয়টির পূরণার্থ গরু ব্যতীত কোন মনুষ্য বা ঘোটকের অনুসন্ধান করিব না; কারণ সাধারণতঃ এইরূপ দৃষ্ট হয় যে, একাধিক বচনের পদ-প্রয়োগে সেই পদ-প্রবোধিত পদার্থের একজাতীয়ত্বই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, পরমাত্মাকে কিরূপে গুহা-প্রবিষ্ট অর্থাৎ হৃদয় প্রবিষ্ট বলা যাইতে পারে? ফলে উক্ত বাক্য রূপক-ভাবেই বিন্যস্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। যদিও ব্রহ্ম বিশ্বময় বটেন, তথাপি সগুণাধিকারীর সসীম জ্ঞান জনিত বিশদ-বোধার্থে তাঁহার সসীম স্থিতি-স্থানবিশেষ কল্পিত হইতেছে। যথা বিষ্ণু বিশ্ব-বিনিবিষ্ট হইয়াও, সগুণ-সাধন ক্ষেত্রে বিশেষভাবে শালগ্রাম শিলাধারে পূজিত হইয়া থাকেন। যাহা-হউক, জীব ও পরম, এই দুই আত্মাই ছায়া ও আতপরূপে কথিত হইয়াছেন। জীবাত্মা অজ্ঞানান্ধতমোরূপিণী অবিদ্যার অধীন, কিন্তু পরমাত্মা অবিদ্যার অধীশ্বর হইয়া সর্ব্বজ্ঞান-জ্যোতিঃস্বরূপ, অতএব অবিদ্যাযুক্ত অজ্ঞ জীবাত্মা ছায়া এবং অবিদ্যামুক্ত সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মা আতপ।

১২শ সূত্রের সমাধেয় এই যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার লক্ষণ-স্বাতন্ত্র্য সুনির্দ্দিষ্ট থাকায়, এই দ্বিবিধ আত্মাই এ স্থলে অভিপ্রেত, বুঝিতে হইবে।

কঠোপনিষদে (১।৩।৩) উক্ত হইয়াছে,—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ॥"
আত্মাকে জানিবে রথী, রথ জান দেহ।
বুদ্ধিকে সারথি জান, মনকে প্রগ্রহ॥

এই স্থলে আত্মা পদে জীবাত্মাই বুঝাইতেছে। আবার আমরা উক্ত কঠবল্লীর ষষ্ঠ শ্লোক এইরূপ দেখিতে পাই,—

"বিজ্ঞান সারথির্যস্য মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ।
সোহধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥"
বিজ্ঞান-সারথি, আর মানস-প্রগ্রহ যার পরিবদ্ধ রয়।
পার হয়ে ভ্রাম্য পথ, বিষ্ণুর পরম পদ সেই প্রাপ্ত হয়॥

এ স্থলে বিষ্ণুর পরমপদ অর্থাৎ পরমধাম সেই পরমাত্মতত্ত্ব। অতএব তৃতীয় বল্লীর তৃতীয় ও নবম শ্লোক দ্বারাই প্রথম শ্লোকের অর্থ বিশদীভূত হইতেছে।

অতঃপর মুণ্ডকোপনিষদে (৩।১।২) দৃষ্ট হয়,—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানংবৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোহনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥"
প্রেমবদ্ধ পাখী দুটি সখা পরস্পর।
প্রেমভরে বাস করে এক বৃক্ষ-পর॥
সে দুটির একটি মধুর ফল খায়।
অপরটি সাক্ষীরূপে চেয়ে দেখে তায়॥
এক বৃক্ষে করি বাস বদ্ধিতাত্মা পাখী।
শোকে ক্ষুণ্ণ আপনাকে শক্তিশূন্য দেখি॥
যবে সে পরাত্মা দেখে হয়ে যোগযুক্ত।
মহিমা বুঝিয়া হয় শোক মোহ-মুক্ত॥

এখানে পরমাত্মা ও জীবাত্মার কথাই বলা হইয়াছে, কিন্তু বুদ্ধি ও জীবাত্মার কথা বলা হয় নাই। ফলে অনেকে এ স্থলে বুদ্ধি ও জীবাত্মা ভাবিয়া ভুল করেন।

১৩শ হইতে ১৭শ সূত্র।—ছান্দোগ্য উপনিষদে (৪।১৫) দৃষ্ট হয়,—"য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে, এষ আত্মেতি হোবাচৈ তদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্ম। তদ্যদ্যপ্যস্মিন্ সর্পির্বোদকং বা সিঞ্চতি বর্ত্মনী এব গচ্ছতি।"
সেই পরমাত্মা ব্রহ্ম অভয় অমর॥
যে পুরুষ অধিষ্ঠিত অক্ষি-অভ্যন্তর।
সর্পি বা সলিল ইথে হলে সুসিঞ্চিত।
পক্ষদ্বয় বাহি হয় বহির্বিনিঃসৃত॥

এস্থলে এই "অক্ষি-মধ্যবর্ত্তী পুরুষ" বাক্যে অপরের অক্ষি-দর্পণে প্রতিবিম্বিত কোন পুরুষবিশেষের প্রতিকৃতি প্রতিপাদিত হইবে না, পরন্তু তদ্দ্বারা পরমাত্মাই প্রতিপাদ্য। পরমাত্মা ব্রহ্মই অভয় ও অমৃত। অতএব অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ অভয় ও অমৃত, এ কথায়, উক্ত পুরুষ ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছুই নহে, ইহাই বুঝিতে হইবে। ইহাদ্বারাই বিরোধের সমন্বয় ও সিদ্ধান্তের সদুপপত্তি

সম্পাদিত হইবে। অক্ষিমণ্ডলে ব্রহ্মের অবস্থান রূপককল্পনা মাত্র। উহাদ্বারা ব্রহ্মের পরমাত্মধর্ম্মের পরম নৈর্ম্মল্য ভাবই আভাষিত হইতেছে। অক্ষি-মণ্ডলে কিছুরই স্পর্শাঙ্ক প্রলিপ্ত থাকে না, উহা সতত সমুজ্জল ও সুনির্ম্মল; এইজন্যই রূপক ভাবে অক্ষিমণ্ডলই পরমাত্মার অধিষ্ঠান রূপে কল্পিত ও কথিত হইয়াছে।

কেবলমাত্র অক্ষি-মণ্ডলই পরমাত্মার অধিষ্ঠান-স্থান রূপে উক্ত হয় নাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৩।৭) আমরা দেখিতে পাই যে, ব্রহ্মের অধিষ্ঠান-স্থানরূপে পৃথিবী, জল, অগ্নি, আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ইত্যাদি সমস্ত ভৌতিক মহৎ পদার্থই কল্পিত ও কথিত হইয়াছে। বহু নাম-রূপ-উপাধিই তাঁহাতে আরোপিত হইয়াছে। এবম্বিধ উপাধির অবলম্বই ধ্যান-ধারণার অনুকূল উপায়।

১৪শ সূত্র।—অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ যে ব্রহ্মকেই বুঝায়, তাহা "ক" অর্থাৎ সুখ, এই শ্রৌতবাক্যবিশেষ দ্বারাও প্রতিপন্ন। সত্যকাম-জাবাল নামক ঋষির নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া উপকোশল নামক জনৈক ব্রহ্মবিদ্যার্থী দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষকাল ব্রহ্মচারীরূপে উপস্থিত ছিলেন; তথাপি তাঁহার উক্ত গুরু তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিলেন না। অবশেষে গুরুদেবের আরাধিত আহিত অগ্নিস্বয়ং দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে শিক্ষা দিলেন "প্রাণো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম।" "প্রাণ" অর্থাৎ প্রাণবায়ু [শ্বাস] ব্রহ্মস্বরূপ, "ক" অর্থাৎ সুখ ব্রহ্ম স্বরূপ, "খ" অর্থাৎ আকাশ ব্রহ্মস্বরূপ।

গার্হপত্য প্রভৃতি অগ্নিগণ তাঁহাকে এইরূপ ব্রহ্মবিদ্যা শিখাইয়া বলিলেন যে, তাঁহার গুরু তাঁহাকে এ বিষয়ে আরো শিক্ষা দিবেন। পরে গুরুও তাঁহাকে পূর্ব্বোক্তরূপ অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষের ব্রহ্মত্ব এবং তাঁহার অমরত্ব প্রভৃতি তত্ত্ব শিক্ষা দিলেন। এস্থলে গুরু সেই ব্রহ্মতত্ত্বই শিখাইলেন, যে ব্রহ্মতত্ত্ব উক্ত অগ্নিগণ "ক" শব্দাত্মক শ্রুতি উল্লেখে শিখাইয়াছিলেন। অতএব "অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ" বাক্যে ব্রহ্মতত্ত্বই বিজ্ঞাপিত।

"ক" (সুখ) শব্দ ভৌতিক সুখকে বুঝায় না, পরন্তু ব্রহ্মানন্দই বুঝায়; "খ" শব্দে ভৌতিক আকাশ বুঝায় না, কিন্তু উক্ত ব্রহ্মানন্দের আধারতত্ত্ব বুঝায়। এইরূপ আধার-আধেয়ত্ব ভাবেও স্বরূপতঃ ব্রহ্মতত্ত্বই সূচিত। "যদ্বা কং তদেব খং, যদেব খং তদেব কং।" যাহা ক, তাহাই খ; যাহা খ, তাহাই ক। এইরূপে 'খ'এর সমবায়িতায় 'ক'তত্ত্ব ভৌতিক বা ঐন্দ্রিয়িক সুখবোধের অতীত আধ্যাত্মিক সুখ বা ব্রহ্মানন্দস্বরূপ হইয়াছে এবং 'ক'এর সমবায়িতায় 'খ'তত্ত্ব ভৌতিক ব্যোম বা আকাশের অতীত ব্রহ্মানন্দাধার স্বরূপ হইয়াছে। এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয়িত্ব বা পরস্পর-সাপেক্ষত্ব ভাবজনিত মৌলিক একত্ব "নীল-লোহিত ন্যায়" অনুসারে নিষ্পন্ন হয়। যথা কোন বস্তুকে "নীল-লোহিত" বলিলে, তাহাকে নীলও বলা হয় না, লোহিতও বলা হয় না; ফলিতার্থে নীল-সাপেক্ষ লোহিত বা লোহিত-সাপেক্ষ নীলই বলা হয়। তৎপর, "য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে" ইত্যাদি বাক্যের পর উক্ত হইতেছে, যথা—"এতং সংযদ্বাম ইত্যাচক্ষতে

এতং হি সর্ব্বাণি বামত্ভিসংযন্তি। এষ উ এব বামনীরেষ হি সর্ব্বাণি বামানি নয়ন্তি। এষ উ ভামনীরেষ হি সর্ব্বেষু লোকেষু ভাতি।"

সর্ব্ব পবিত্রতা তাঁতে থাকে।
সংযদ্বাম বলে তাই তাঁকে॥
সর্ব্বাশীষ তাঁহা হতে ফলে।
তাই তাঁকে বামনীও বলে॥
সর্ব্ব লোক তাঁতে দীপ্তি পায়।
তাই বলে ভামনীও তাঁয়॥

এই বর্ণনা শুদ্ধ মাত্র পরমাত্মাতেই প্রযোজ্য।

১৬শ সূত্র।—অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ যে ব্রহ্ম, তাহা এইরূপেও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে ব্রহ্মকে জানে, সে মোক্ষ লাভ করে, এইরূপ শ্রুতি আছে এবং যে অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষকে জানে, সে মোক্ষলাভ করে, এরূপও শ্রুতি আছে। অতএব ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত যেখানে মোক্ষলাভ-সম্ভাবনা নাই, সেখানে উক্ত উভয় মোক্ষলাভ-সম্ভাবনা স্থলে সেই একই ব্রহ্ম সূচিত হইতেছেন, বুঝিতে হইবে।

১৭শ সূত্র।—অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ ছায়াত্মা, বিজ্ঞানাত্মা, দেবাত্মা প্রভৃতি অন্য কোনবিধ আত্মা হইতে পারেন না। তাঁহারা 'আত্মা' পদবাচ্য হইলেও অনিত্য। 'অভয়' 'অমর' প্রভৃতি যে সকল বিশেষণ অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষকে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা নিরুপাধিক নিত্য পরমাত্মা ব্যতীত উপরোক্ত অপরবিধ কোন সোপাধিক অনিত্য আত্মার প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারেনা। অপরের অক্ষি-দর্পণে কোন পুরুষবিশেষের প্রতিবিম্বরূপ ছায়াত্মা, বা ভয় ও মৃত্যুর আস্পদীভূত বিজ্ঞানাত্মা বা সূর্য্য প্রভৃতি জনন মরণশীল দেবত্মা, [যাঁহাদের তথাকথিত অমরত্ব সুদীর্ঘজীবীত্ব ব্যতীত আর কিছুই নহে] ইঁহারা কেহই অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ হইতে পারেন না, কারণ উক্ত পুরুষের অমৃতত্ব ও অভয়ত্ব বিস্পষ্ট বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। সুতরাং অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ পরমাত্মা।

শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় যে, দেবতারাও ভয়াতিক্রান্ত নহেন।

ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে ভীষোদেতি
সূর্য্যঃ ভীষ স্মাদগ্নিশ্চন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম।'

এঁর ভয়ে ভয়ে, বায়ু সদা বহে,
এঁর ভয়ে সূর্য্য উঠে।
এঁর ভয়ে ভয়ে বহ্নি বিশ্ব দহে,
চন্দ্রফুটে—মৃত্যু ছুটে॥

অতএব পূর্ব্বোক্ত কারণেই অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ পরমাত্মা ব্রহ্মই হইতেছেন।

১৮শ সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, বৃহদারণ্যক শ্রুতি (৩।৭) কথিত "অন্তর্যামী পুরুষ" সেই পরমাত্মাই বটে। সেই অন্তর্যামী পুরুষ পৃথিবীতে, জলে, অনলে, পবনে, তপনে, চন্দ্রে, নক্ষত্রে, দেহে, মনে, ইত্যাদি সমস্ত পদার্থে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তৎসমস্তকে নিয়মিত করেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহই জানিতে পারে না, ইহাই উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, উক্ত অন্তর্যামী পুরুষ পরমাত্মা কি না? এতদুত্তরে বলা যায় যে, উপরে যেরূপ বর্ণিত হইল, তাহাতে ব্রহ্মলক্ষণই সূচিত হইতেছে। অন্তর্যামীত্বের পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাদি ব্রহ্ম-লক্ষণেই সমন্বিত। অতএব ব্রহ্মই উক্ত অন্তর্যামী পুরুষ।

বৃহদারণ্যক [৩৭] উপসংহারভাগে এইরূপ বলিতেছেন, যথা—তিনি "অদৃষ্ট হইয়াও দৃষ্টি করেন, অশ্রুত হইয়াও শ্রবণ করেন, অমনোগত হইয়াও মনন করেন এবং অজ্ঞানিত হইয়াও জানেন। কেহ দেখে না, তিনি দেখেন। কেহ শুনে না, তিনি শুনেন। কেহ মনন করে না, তিনি মনন করেন। কেহ জানিতে পারে না, তিনি জানেন। তিনিই তোমার আত্মা, তিনি অন্তর্যামী ও অমর—অর্থাৎ নিত্য। তদিতর যাহা কিছু, সমস্তই মর্ত্ত্য অর্থাৎ অনিত্য।" এতাবতা ইহা বিশদীভূত যে, অন্তর্যামী পুরুষ পরমাত্মা ব্রহ্মই বটেন।

১৯শ সূত্র।—এরূপ তর্ক উপস্থিত হইতে পারে যে, সাংখ্যদর্শনোক্ত "প্রধান" উক্ত অন্তর্যামী পুরুষ কেন হইতে পারে না? প্রধানও অপ্রকাশ্য এবং অজ্ঞেয়। প্রধানও বিশ্বের কারণরূপে পরিগণিত, অতএব অন্তর্যামী পুরুষের লক্ষণে প্রধান কেন লক্ষিত হইতে পারে না? এ তর্কের সমাধান এই যে অন্তর্যামী পুরুষের এরূপ লক্ষণবিশেষও বর্ণিত হইয়াছে যে, সাংখ্যশাস্ত্রানুসারেও তাহা কদাপি প্রধানে প্রযুক্ত হওয়া সম্ভাবিত নহে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যথা—প্রধান জ্ঞানশূন্য, সুতরাং দর্শন-শ্রবণ-মনন ইত্যাদি জ্ঞান-ক্রিয়া প্রধানে কদাচ সম্ভবে না, কিন্তু জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মায় সম্ভবে। অতএব অন্তর্যামী পুরুষের দর্শন-শ্রবণাদি উল্লিখিত হওয়ায়, উহাতে পরমাত্মাই সূচিত হইতেছেন।

২০শ সূত্র।—অতঃপর আর একটি এইরূপ তর্ক উত্থিত হইতে পারে যে, জীবাত্মা দেহান্তর্বর্ত্তী রহিয়া দৈহিক ক্রিয়াদি নিয়মন ও পরিচালন করিতেছেন। তিনি চেতন স্বরূপ ও অদৃষ্ট; কারণ ক্রিয়া-নিষ্পাদনের সহিত যুগপৎ কর্ত্তার কর্ম্মত্ব-প্রাপ্তি অসম্ভব। "ন দৃষ্টে দ্রষ্টারং পশ্যেঃ।" দৃষ্টের দ্রষ্টা স্বয়ং দ্রষ্টব্য নহেন; অতএব জীবাত্মাই অন্তর্যামী পুরুষ হইতে পারেন। উত্তর এই যে, যদিও জীবাত্মা উপাধিদ্বারা সীমাবদ্ধ, এবং যদিও দেহান্তর্বর্ত্তী থাকিয়া দেহকে নিয়মিত করেন, কিন্তু ইনি বৃহদারণ্যক-বর্ণিত অন্তর্যামী পুরুষের ন্যায় সর্ব্বভূতে অবস্থিত থাকিয়া সর্ব্বভূতকে নিয়মিত করেন না। অতএব ইনি কিরূপে সেই অন্তর্যামী পুরুষ হইবেন? দ্বিতীয়তঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদের কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন, উভয় শাখাই স্ব স্ব সিদ্ধান্তে জীবাত্মা ও অন্তর্যামী পুরুষের স্পষ্ট পার্থক্য নির্দ্দেশ করিতেছেন। কাণ্ব (বৃঃ আঃ উঃ ৩।৭।২২) বলেন যে, "যিনি স্বয়ং জ্ঞানাধিষ্ঠিত, জ্ঞান যাঁহাকে জানে না, জ্ঞানই যাঁহার দেহস্বরূপ; যিনি অন্তর্দ্দেশ হইতে জ্ঞানকে নিয়মিত বা পরিচালিত করেন, তিনিই অন্তর্যামী আত্মা।" ইহাই কাণ্বোক্ত সিদ্ধান্ত। আর যদি আমরা এস্থলে জীবাত্মাকেই পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানাত্মার স্থানীয় ধরি, তবেই আমরা মাধ্যন্দিনোক্ত সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হই। কাণ্বোক্ত বিজ্ঞানতত্ত্ব মাধ্যন্দিনোক্ত জীবাত্মতত্ত্ব দ্বারাই অববোধিত। এস্থলে জীবাত্মা ও পরমাত্মায় এইরূপে পার্থক্য পরিসূচিত হইতেছে।

তৎপর এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, অন্তর্যামী পুরুষ দুইটি কিনা। অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদির পরিচালক বা নিয়ামক জীবাত্মা এবং পরমাত্মা, এই দুইটি কি

কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মার তত্ত্বতঃ একত্ব শ্রুতিসম্মত। এস্থলে উত্তর এই যে, আত্মা মোটে একটি মাত্র। উপাধির অবচ্ছেদবশে বহুরূপে প্রতীয়মান। যথা- ঘটাকাশাদি উপাধি-অবচ্ছিন্ন মহাকাশ। মায়িক জগতে এক জীবাত্মা অপর জীবাত্মা হইতে এবং পরমাত্মা হইতে প্রভিন্ন; কিন্তু সাধনবলে যাঁহার অন্তঃকরণ আত্মিক হইতে অবিদ্যাবন্ধন অপসারিত হইয়াছে, তাঁহার নিকট "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" পরমাত্মা মাত্র প্রকাশিত। তখন দ্রষ্টা-দৃশ্য — জ্ঞাতা জ্ঞেয় একত্বে পরিণত। শ্রুতি বলেন, "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি।" "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎকেন কং পশ্যেৎ।" অর্থাৎ—দ্বৈতজ্ঞান যেখানে, দেখাদেখি সেখানে। অদ্বৈতাত্মজ্ঞান যথা, কেবা কারে দেখে তথা?

১ শ সূত্র।— মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। যত্তদদৃশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্। নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ।'

পরা ও অপরা এই দুই বিদ্যা হন।
এ দুয়ে জানিতে হবে ব্রহ্মজ্ঞেরা কন॥
ঋক্ যজুঃ সামাথর্ব্ব চারি বেদগ্রন্থ।
শিক্ষা কল্প-ব্যাকরণ-নিরুক্ত ও ছন্দ॥
[illegible]তিষ সহিত এই বেদ-অঙ্গ ছয়।
এ শিক্ষা অপরা-বিদ্যা-বলে সিদ্ধ হয়॥
পরাবিদ্যা-বলেতে অক্ষর হন জ্ঞাত।
অদৃশ্য অগ্রাহ্য যিনি অবর্ণ অজ্ঞাত॥
অচক্ষু অশ্রোত্র যিনি অপাণি অপদ।
নিত্য বিভু সূক্ষ্ম অব্যয় সর্ব্বগত॥
যাঁহা হতে সর্ব্বভূত সম্ভূত হবে।
পরাবিদ্যাবলে জ্ঞানী তাঁর জ্ঞান লভে॥

বক্ষ্যমাণ সূত্রের সমাধান এই যে, পূর্ব্ব-বর্ণিত সর্ব্বভূত-সমুৎপাদয়িতা অদৃশ্য অগ্রাহ্য ইত্যাদি বিশেষণ-বেদ্য যিনি, তিনি পরমাত্মা বা জীবাত্মা। সিদ্ধান্ত এই যে, "সর্ব্বভূত-সমুৎপাদক" বলিলেই পরমাত্মা বুঝায়; অন্যান্য বর্ণিত বিশেষণের বিচার বাহুল্য মাত্র। যে সমস্ত গুণ বা লক্ষণ এস্থলে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পরমাত্মা ব্যতীত দেহোপাধি-অবচ্ছিন্ন অবিদ্যাধীন জীবাত্মা বা মাত্র জড়-তত্ত্বস্বরূপ অচেতন প্রধানে কদাচ প্রযুক্ত হইতে পারে না।

এস্থলে আরও একটি তর্ক উঠিতে পারে যে, প্রধানও অদৃশ্য তত্ত্ব এবং উহা হইতেই সর্ব্বভূত উদ্ভূত, বলা যাইতে পারে। কিন্তু কথা এই যে, মুণ্ডকোপনিষদে যে পুরুষের তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে, শুধু অদৃশ্যত্বই মাত্র তাঁহার গুণ বা লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। সর্ব্বজ্ঞত্ব—সর্ব্বান্তর্যামিত্ব প্রভৃতি তাঁহার স্বরূপ-গত বিশিষ্ট লক্ষণাবলীও বর্ণিত হইয়াছে। যথা—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্" ইত্যাদি। [মুঃ উঃ ১।১ ৯] পরমাত্মা ব্যতীত উক্ত বিশেষণগুলি স্বভাবানুসারে কদাচ প্রধান বা জীবাত্মার যোগ্য নয়। তারপর, "কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।" [মুঃ উঃ ১।১।৩]

হে আর্য্য! জানিলে কারে।
সমস্ত জানিতে পারে?

এই শ্রুতুক্তিদ্বারা পরিষ্কার প্রমাণিত হইতেছে যে, সর্ব্বভূতাত্মা ব্রহ্মই সর্ব্বথা সুপ্রতিপন্ন।

২২শ সূত্র।—সর্ব্বভূতযোনি যে পরমাত্মা ব্রহ্মই বটেন, তাহা এই দ্বাবিংশ সূত্রে একটি অতিরিক্ত সুযুক্তি সহযোগে সমর্থিত হইয়াছে। এক পক্ষে পরমাত্মার তত্ত্ব লক্ষণাবলী ও অপরপক্ষে প্রধানের তত্ত্ব-লক্ষণাবলী পরস্পর স্বতন্ত্র ও সুবিশদ। মুণ্ডকোপনিষৎ (২।১।২) বিস্পষ্ট বলিতেছেন,—"দিব্যো-হ্যমূর্ত্তপুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হি অজোহ-প্রাণো অমনা শুভ্রঃ।"

সে দিব্য অমূর্ত্ত পুরুষ যিনি,
বাহ্য-অভ্যন্তর অজ ও অমর,
অপ্রাণ অমন-অমল তিনি।

এ বর্ণনার বিষয়ীভূত বা অধিকারাস্পদ হওয়া প্রধান বা জীবাত্মপুরুষের যোগ্যতা-বহির্ভূত।

অতঃপর সেই সর্ব্বভূত-জনয়িতার এরূপও লক্ষণ লক্ষ্য করা হইয়াছে, যথা—"অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠতর। সৃষ্টি অনিত্য হইলেও প্রবাহরূপে নিত্য বিধায়, এই সৃষ্ট বিশ্বের ভৌতিক সুসূক্ষ্ম কারণতত্ত্ব প্রধানকে এস্থলে "অক্ষর" বলা হইয়াছে। এই প্রধান স্বয়ং পরমাত্মা পরমেশ্বরেরই আশ্রিত থাকিয়া বিবিধ জাগতিক নাম-রূপ বা পরমাত্মার বিবিধ উপাধি কল্পনা করে। তর্কস্থলে যদি প্রধানকে স্বায়ত্ত বা স্বাধীনসত্ত্বও কল্পনা করা যায়, তথাপি "শ্রেষ্ঠ অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ" এ কথায় স্পষ্টই প্রধান হইতে স্বতন্ত্র পদার্থান্তর সূচিত হইতেছে, সন্দেহ নাই; অতএব সেই পদার্থান্তর প্রধান হইতেও প্রধান—পরাৎপর পরমাত্মা।

২৩শ সূত্র।—এই সূত্রের সিদ্ধান্ত এইরূপ যে, যেরূপ রূপোপন্যাস উক্ত হইয়াছে, তাহাতে প্রধান কখনই সর্ব্বভূত-জনয়িতা রূপে প্রতিপন্ন হইতে পারেন না। "অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ। বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।"

অগ্নি মূৰ্দ্ধা, রবীন্দু নয়ন।
দিক্ শ্রোত্র, বেদোক্তি বচন॥
বায়ু যাঁর নিশ্বাস-নিস্বন।
হৃদি যাঁর এ বিশ্বভুবন॥
চরণে ধরণীবর যাঁর।
সর্ব্বভূত-অন্তরাত্মা তিনি॥

এইরূপ বর্ণনা ব্রহ্মেরই সম্ভবে, কিন্তু প্রধানের বা জীবাত্মার নহে; কারণ অজ্ঞান প্রধান কখনও সর্ব্বভূতান্তরাত্মা হইতে পারেন না, আর উপাধিবদ্ধ অবিদ্যাবাধ্য জীবাত্মাও জগজ্জনয়িতা হইতে পারেন না।

পরমাত্মা ব্রহ্মের রূপ প্রদর্শন জন্যই যে এরূপ রূপ বর্ণনা হইয়াছে, তাহা নহে; উহা রূপকোক্তি মাত্র। উহাদ্বারা পরমাত্মার সর্ব্বভূতান্তরাত্মস্বরূপতাই সুপ্রকাশিত হইয়াছে।

ঋগ্বেদোক্ত হিরণ্যগর্ভ-স্বরূপেও পরমাত্ম সূচিত হন না।"

"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে,
ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং

কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥"
সমুদিত সর্ব্বাগ্রে—হিরণ্যগর্ভ যিনি।
একমাত্র জাত ভূত পতি হন তিনি॥
স্থাপিলেন তিনি এই আকাশ পৃথিবী।
কোন্ দেবোদ্দেশে মোরা নিবেদিব হবিঃ॥

এই হিরণ্যগর্ভ পরমাত্মা নহেন; কিন্তু পরমাত্মা হইতে সম্ভূত দেবপুরুষ বা ঈশ্বরবিশেষ। ইনি ব্রহ্মের সগুণ স্বরূপাত্মক প্রথমাবতার স্বরূপ। শাস্ত্রান্তরে ইঁহাকে 'ব্রহ্মা' বলা হইয়াছে। ঔপনিষদী উক্তি অনুসারে ইঁহাকে "সর্ব্বভূতাত্মা" বলিলেও অনুপপত্তি হয় না; কিন্তু তিনি সর্ব্বভূত সৃষ্টির আদিকারণ নহেন।

২৪শ সূত্র।—ছান্দোগ্য উপনিষদের (৫।২) একটি উক্তিতে আত্মা "বৈশ্বানর" পদে উক্ত হইয়াছেন। আলোচ্য প্রশ্ন এই যে, এই বৈশ্বানর পদে জঠরাগ্নি, বাহ্য-জড়াগ্নি বা অগ্ন্যধিষ্ঠাতা দেবপুরুষবিশেষ ইত্যাদিই বুঝাইবে না পরমাত্মা বুঝাইবে অপিচ, উক্ত পদ আত্মার সাধারণ লক্ষণ-বিশেষত্বে ব্যবহৃত হওয়ায়, উহাদ্বারা "জীবাত্মা" বুঝাইবে কিনা, তাহাও আলোচ্য।

উত্তর এই যে, উহাদ্বারা পরমাত্মাই প্রতিপাদ্য হইতেছেন। অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়ই ব্রহ্ম, সুতরাং এতদ্দ্বারা তদিতর পদার্থান্তর সূচিত হওয়া সম্ভবে না। অতএব যদিও "বৈশ্বানর" পদে জঠরাগ্নি প্রভৃতি অগ্নিতত্ত্ব সূচিত হইলেও, অন্যান্য লক্ষণানুসারে আত্মতত্ত্বও সূচিত হয়; কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মার লক্ষণ-স্বাতন্ত্র্য সুনি[illegible]কায়, উক্ত আত্মতত্ত্ব পরমাত্মতত্ত্বই বটে, পরন্তু জীবাত্মতত্ত্ব নহে। শ্রুতি বলিতেছেন,—

"যস্ত্বেতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে স সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষাত্মস্বন্নমত্তি, তস্য হবা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাশ্চক্ষু বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মাত্মা সন্দেহবহুলো বস্তিরেব রয়িঃ পৃথিব্যেব পাদাবুর এব বেদির্লোমানি বর্হির্হৃদয়ং গার্হপত্যোমনোঽন্বাহার্য্যপচন আস্যমাহবনীয় ইত্যাদি।"

প্রাদেশ মাত্রাভিমানী, বৈশ্বানর-ধাতা যেই।
সর্ব্বলোক-সর্ব্বভূত-সর্ব্বাত্মসম্ভোগী সেই॥
এই বৈশ্বানরাত্মার মস্তক সুতেজোময়।
বিশ্বরূপ নেত্র তাঁর—শ্বাস পৃথগ্বর্ত্ম হয়॥
সন্দেহবহুল তাঁর—বস্তি রয়ীরূপ।
চরণধরণী—বক্ষ বেদিকা স্বরূপ॥
লোমাবলী বেদিকার তৃণরূপী হয়।
গার্হপত্য অগ্নিরূপী তাঁহার হৃদয়॥
অন্বাহার্য্য অগ্নিরূপী হয় তাঁর মন।
যে অগ্নি আহবনীয়, সে তাঁর আনন॥

উপরোক্ত বর্ণনায় ব্রহ্মতত্ত্বই বিস্পষ্ট বিজ্ঞাপিত। প্রাচীন আর্য্যজাতি ব্রহ্ম-মূর্ত্তি স্বরূপেই অগ্নির উপাসনা করিয়াছেন। তাঁহারা পরমাত্মা বোধক ভাবেই 'অগ্নি' পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহারা কদাপি একের স্থলে অন্যের সূচনাদ্বারা প্রমাদ-পাতিত হন নাই।

২৫শ সূত্র।—স্মৃতিও পরমাত্মার বর্ণন করিতেছেন। উহা উপরোক্ত বৈশ্বানরাত্মা-বর্ণন-প্রণালীতেই বর্ণিত। স্মৃতিদ্বারাই শ্রুতির অর্থ আমাদের অধিগত হয়।

স্মৃতির পরমাত্মবর্ণন এইরূপ,—

"যাং মূর্দ্ধানং যস্য বিপ্রা বদন্তি খং বৈ নাভিং চন্দ্রসূর্য্যৌ চ নেত্রে। দিশঃ শ্রোত্রে বিদ্ধি পাদৌ ক্ষিতিঞ্চ সোঽচিন্ত্যাত্মা সর্ব্বভূতপ্রণেতা।"

বলেন ব্রাহ্মণবর্গ মস্তক যাঁহার স্বর্গ,
অন্তরীক্ষ নাভি যাঁর, রবীন্দু নয়ন;
দিক্ যাঁর শ্রোত্রগণ, পৃথিবী পদস্বরূপ,
তিনি হন সর্ব্বভূত-অনাদিকারণ।

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, বৈশ্বানর শব্দেও সর্ব্বভূত কারণই সূচিত হন।

২৬শ সূত্র।—এইরূপ তর্ক উত্থাপিত হইতে পারে যে, বৈশ্বানর শব্দের নির্দ্দিষ্ট অর্থ থাকা সত্ত্বেও কি কারণে উহা অন্যার্থে প্রযুক্ত হইবে? অন্তরস্থ বৈশ্বানর বলিলে, উহা বৈশ্বানরের স্বভাববিশেষের হেতু উহাদ্বারা জঠরাগ্নিই প্রতিপন্ন হয়, এবং এই হেতুই উহা পরমাত্ম-প্রতিপাদক হইতে পারে না। উত্তর এই যে পরমাত্মতত্ত্ব এইরূপেই বোধবিষয়ীভূত হয়। সসীম-উপাধ্যবচ্ছিন্নত্ব ব্যতীত অসীম পরমাত্মার বোধবিষয়িত্ব সম্ভবে না; এই হেতুই এ স্থলে বৈশ্বানরত্ব তাঁহার উপাধিস্বরূপ।

চতুর্দ্দিশ শস্ত্রপ্রকরণে যে বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা বাহ্য জড়াগ্নি বা জঠরাগ্নি প্রভৃতি বুঝিতে হইলে, উহা কল্পিতার্থে অর্থশূন্যই হইয়া পড়ে। যদি তদ্দ্বারা মাত্র জঠরাগ্নিই বুঝাইত, তবে "পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতোঽগ্নি" বাক্যেই তাহা সিদ্ধ হইত; কিন্তু বাজসনেয়িগণ কর্তৃক তাহা "পুরুষ" পদেও অভিহিত হইয়াছে, অতএব উক্ত বর্ণনায় অগ্নি বা জঠরাগ্নি বুঝাইবে কিরূপে? বাজসনেয়িগণ তৎসম্বন্ধে এইরূপ বলেন,—

"স যো হৈতমেবমগ্নিং বৈশ্বানরং পুরুষং পুরুষবিধং পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ।"

যেই জন জানে এই অগ্নি বৈশ্বানরে,
পুরুষস্বরূপে আর পুরুষ অন্তরে॥

২৭শ সূত্র।—পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্র সমূহের আলোচিত হেতুবাদ বলে "বৈশ্বানর" শব্দ ভৌতিকাগ্নি বা অগ্ন্যধিষ্ঠাত্রী কোন দেবপুরুষবিশেষ হইতে পারেন না।

২৮শ সূত্র।—ষড়্বিংশ সূত্রের আলোচনায় "পুরুষেঽন্তঃ প্রতিষ্ঠিতং" এই বাক্যে জঠরাগ্নির অনুমান করা হইয়াছে, কিন্তু উহাদ্বারা অভ্যন্তরাত্মা স্বরূপে পরমাত্মাও বুঝাইতে পারে। যেহেতু পরমাত্মা সকলপুরুষ হৃদয়ে অন্তর্যামী থাকিয়া সর্ব্বদা সাক্ষীস্বরূপে পরিগৃহীত, এইরূপ শ্রুতি আছে। অতএব মহর্ষি জৈমিনি বলেন যে জঠরাগ্নিকে উপাধিস্বরূপ মনোনীত না করিয়া, উক্ত উপনিষদে উল্লিখিত সর্ব্বাত্মা স্বরূপ পরমাত্মাই সম্পূর্ণ, এইরূপ সহজ উপপত্তিই গৃহীত হইতে পারে। এই হেতু কি যেস্থলে বৈশ্বানরকে পরমাত্ম কর্ত্তা অথচ স্বয়ং পুরুষস্বরূপ বলিয়াছেন, সেস্থলে তদ্দ্বারা পরমাত্মাই প্রতিপাদিত হইতেছেন, সন্দেহ নাই। "বৈশ্বানর" এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছেন, যথা—

"বিশ্বশ্চায়ং নরশ্চেতি, বিশ্বেষাং বা অয়ং নরঃ, বিশ্বে বা নরা অস্যেতি বিশ্বানরঃ পরমাত্মা সর্ব্বাত্মত্বাৎ বিশ্বানর এব বৈশ্বানরঃ তদ্ধিতোঽনন্যার্থঃ।"

যিনি বিশ্বরূপ, যিনি নররূপ,
বিগ্রহরূপ যিনি,
বিশ্ব-জীব-আত্মা, নরাত্মা পরাত্মা
"বৈশ্বানর" বটে তিনি।
বিশ্বানর পদ, বৈশ্বানর পদ,
সমার্থসূচক হয়।
তদ্ধিত প্রত্যয় প্রয়োগে নিশ্চয়
ভিন্নার্থবাচক নয়।

২৯শ হইতে ৩২শ সূত্র।—আচার্য্য আশ্মরথ্য বলেন, যদিও পরমাত্মা সর্ব্বমিতি-মাত্রাতীত, তথাপি তাঁহার ধ্যানাধিগম্যতা-মূলক প্রকাশ কল্পনায় তাঁহাকে "প্রাদেশ মাত্র" বলা হইয়াছে। সাধকগণের হিতার্থে পরব্রহ্ম হৃদয়, ভ্রূমধ্য প্রভৃতি স্থানে ধ্যানাধিগম্য ভাবে প্রকাশিত। বাদরি বলেন,— পরব্রহ্মকে "প্রাদেশ মাত্র" বলার হেতু এই যে, তিনি অনন্তমাত্রায় বা মাত্রাতীত সত্তায় "অবাঙ্মনসোগোচরম্"— কিন্তু মনের উপাস্য হইতে হইলে, তাঁহাকে সাত্ত্বমাত্র ও মনের ধ্যানাধিগম্য বা স্মর্ত্তব্য স্বরূপে প্রকাশিত হইতে হইবে। এজন্যই তিনি শাস্ত্র-কথিত হৃদয়স্থ প্রাদেশমাত্রাত্মক— অর্থাৎ মনের আবৃত্তিযোগ্যভাবে স্বয়ংই "প্রাদেশমাত্র" রূপে কল্পিত হইয়াছেন। অথবা সরলভাবে এরূপও বুঝা যাইতে পারে যে, ব্রহ্ম প্রকৃতপক্ষে "প্রাদেশ মাত্র" না হইলেও, "প্রাদেশ মাত্র' রূপেই তিনি যোগী-হৃদয়ের যোগ ধ্যানাধিগম্য হইয়া থাকেন।

আচার্য্য জৈমিনিও বলেন, "প্রাদেশ মাত্র" বিশেষণ ব্রহ্মের কাল্পনিক নির্দ্দেশ মাত্র। বাজসনেয়ী ব্রাহ্মণ আকাশ, পৃথিবী প্রভৃতিকে বৈশ্বানরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলিয়াছেন। শিরোর্দ্ধ দেশ হইতে চিবুক পর্য্যন্ত স্থান, প্রাদেশ-পরিমিত; উহার মধ্যস্থলে ভ্রূমধ্যে "আজ্ঞাচক্রে—দ্বিদলে" যোগীর ধ্যানাবস্থ ঐশতত্ত্ব অবস্থিত। অতএব ত্রিভুবনাত্মা ভগবান প্রাদেশমাত্রাত্মকরূপে ঐ স্থানে বিদ্যমান। "বৈশ্বানর" পুরুষের তথাবিধ প্রাদেশমাত্রাত্মক বিদ্যমানতা বর্ণিত হওয়াতে, তদ্দ্বারা পরমাত্মা পরমেশ্বরেরই প্রতিপাদন হইতেছে। জাবাল তাঁহাকে মূর্দ্ধা ও চিবুক দেশের ব্যবধান-মধ্যবর্ত্তী বলেন। ফলে নাসিকাগ্র অর্থাৎ ভ্রূমধ্যই পরমাত্মার যোগধ্যানাধিগম্য স্বরূপের অধিষ্ঠান স্থান।

[ক্রমশঃ]

শ্রীশঃ—

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

১৫

স এব কালে ভুবনস্যাস্য গোপ্তা
বিশ্বাধিপঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ।
যস্মিন্ যুক্তা ব্রহ্মর্ষয়ো দেবতাশ্চ
তমেবং জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাংশ্ছিনত্তি॥

অন্বয়ঃ— সঃ এব কালে অস্য ভুবনস্য গোপ্তা, বিশ্বাধিপঃ, সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ। যস্মিন্ ব্রহ্মর্ষিঃ দেবতাঃ চ যুক্তাঃ। তম্ এবম্ জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশান্ ছিনত্তি।

বিবরণব্যাখ্যা— 'স এব' পূর্ব্বপূর্ব্ব-

শ্রুতি সমূহে যাঁহাকে সর্ব্বকার্য্যের সাক্ষী-রূপে বর্ণনা করাহইয়াছে, তিনিই, অর্থাৎ, সেই পরমেশ্বরই। "কালে" — অতীত কালেষু, জীবসঞ্চিতকর্ম্মপরিপাকসময়ে ইতি ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্যঃ; স্থিতিকালে ইতি-শঙ্করানন্দঃ জীবের সঞ্চিত কর্ম্মের পরিপাক-সময়ে, অথবা স্থিতিকালে। "ভুবনস্যগোপ্তা" জগতঃ তত্তৎ কর্ম্মানুগুণতয়া রক্ষিত— জগতের যাবতীয় কর্ম্মের অনুগুণতা-নিবন্ধন জগতের অদ্বিতীয় পরিপালক। "সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ" ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তেষু সাক্ষিমাত্রতয়াহ-বস্থিতঃ, ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত যাবতীয়-পদার্থে সাক্ষিস্বরূপে অবস্থিত। "যস্মিন্‌"--চিদ্‌ঘনা-নন্দরূপিণি যে চিদ্‌-ঘন-আনন্দময় পরমপুরুষ। "ব্রহ্মর্ষয় সনকাদি-ব্রহ্মর্ষিগণ। "দেবতাশ্চ" ব্রহ্মাদি-দেবতাগণও। "যুক্তা" — ঐক্যং প্রাপ্তাঃ ইতি শঙ্করাচার্য্যঃ, যোগং আশ্রিত্য প্রবৃত্তাঃ ইতি নারায়ণঃ "জ্ঞাত্ব"ব্রহ্মাহমস্মীতি অপরোক্ষীকৃত "তিনিই আমি" এবম্প্রকারে প্রত্যক্ষকরিয়া। "মৃত্যুপাশান্‌" মৃত্যুঃ অবিদ্যা, তমঃ, রূপাদয়শ্চ" মৃত্যুশব্দের অর্থ অবিদ্যা, মহামোহ এবং রূপাদি, পাশঃ—পাশ্যতে বধ্যতে অনেন ইতি পাশঃ, যাহাতে বন্ধন করে, মৃত্যোরেবপাশঃ মৃত্যুপাশঃ তান্‌. অবিদ্যা রূপ মহাপাশ অর্থাৎ প্রধান বন্ধন। 'ছিনত্তি' নাশয়তি—ঐক্যরূপ স্বপ্রকাশাগ্নিনা দহতী-ত্যর্থঃ—ঐক্য অর্থাৎ তৎসাযুজ্যরূপ স্ব-প্রকাশানলের দ্বারা দহন করেন।

বঙ্গার্থঃ— সেই পরমদেবতা পরমেশ্বর (যিনি পূর্ব্বপূর্ব্ব শ্রুতি সমূহে সর্ব্বকার্য্যের সাক্ষী রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন) জীবের সঞ্চিত কর্ম্মফল-ভোগ সময়ে এই বিশ্ব রক্ষাকরিয়া থাকেন, তিনিই বিশ্বের অদ্বিতীয় অধিপতি, ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থেই তিনি সাক্ষিস্বরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন। যে পরমপুরুষে সনকাদিব্রহ্মর্ষিগণ এবং ব্রহ্মাদি-দেবতাগণ একতা প্রাপ্ত হইয়া মিলিয়া রহিয়াছেন, সেই আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত পদার্থের আশ্রয়ভূমিকে সেই অপায়বিহীন করুণা-নিধানকে "তিনিই আমি" এইভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, সাধক অবিদ্যা, মহামোহ প্রভৃতি সংসারের দুশ্ছেদ্য-বন্ধন ছেদনে সমর্থ হয়েন, তাঁহাকে আর প্রতি-নিয়ত অবিদ্যার কঠিনতম-শৃঙ্খলে সম্পিষ্ট হইতে হয়না।

বিশেষব্যাখ্যা—আমাদের যে অবস্থাকে আমরা মৃত্যু বলি, তাহা প্রকৃত-মৃত্যু নহে; প্রকৃত-মৃত্যু অবিদ্যাচ্ছন্নতা, তাঁহার হৃদয়শ্বাস প্রশ্বাস-যুক্ত থাকিয়াও অবিদ্যামুক্ত নহে, তিনি জীবিত থাকিয়াও মৃত। এই মহা-মোহ বা প্রগাঢ় "তমঃ"ই শ্রুতিতে মৃত্যু নামে আখ্যাত হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন, "মৃত্যুর্বৈ তমঃ" "তমঃ"ই মৃত্যু। এই তমো-বিনাশেরই নামান্তর মৃত্যুবিনাশন। মায়া-বিনী-অবিদ্যার মায়ার কুহকে আত্মহারা হইয়া জীব ইতস্ততঃ উদ্ভ্রান্ত হৃদয়ে বাসনা-পরিতৃপ্তির লুব্ধ-আশ্বাসে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অবিদ্যার কুহক-সম্ভূত এই বাসনার বিনাশ-সাধনের একমাত্র উপায় ঈশ্বর-চরণ-ভগবদ্‌-বিষয়িণী রতি। ভগবানের চরণ-নখময়ূখের মনোরম দীপ্তিতে যে হৃদয় পরিদীপ্ত, অবিদ্যা-রূপিণী নিশাচরীর তিমির-পূর্ণা-বাসনাচ্ছায়া সে হৃদয়ে কদাচও প্রবেশ করিতে পারেনা। স্বর্গীয় কৌমুদীর সম্মুখে কি নারকী

অন্ধকার স্থান পায়? তাই শ্রুতি বলিতেছেন যে, যদি হৃদয়ের অশান্তিদায়িনী অবিদ্যার করাল-কবল হইতে পরিত্রাণলাভ করিতেচাও, তবে সেই সর্ব্বশক্তিময়ের চিন্তাকর; তদায় দিব্য-বিভূতি স্বীয় উর্ব্বরহৃদয়ে ধারণা করিতে অভ্যাস কর। নতুবা অবিদ্যার কঠোর-বন্ধকবালগ্রস্ত হইতে নিস্তার লাভের আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

১৬

ঘৃতাৎপরং মণ্ডমিবাতি সূক্ষ্মং
জ্ঞাত্বা শিবং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারম্—
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥

অন্বয়ঃ— ঘৃতাৎপরংমণ্ডমিব অতিসূক্ষ্মং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্, শিবং বিশ্বস্য একং পরিবেষ্টিতারম্ দেবং জ্ঞাত্বা (সাধকঃ) সর্ব্বপাশৈঃ মুচ্যতে।

বিষমপদব্যাখ্যা— "মণ্ডম্"— সারঃ মণ্ড শব্দের অর্থ সার। "সর্ব্বভূতেষুগূঢ়ম্" ইহা পূর্ব্ব শ্রুতিতেই অনুবাদিত হইয়াছে।

বঙ্গার্থঃ—ঘৃতের উপরিভাগে বিদ্যমান অতিসূক্ষ্মতম-মণ্ডের ন্যায় যিনি সূক্ষ্মহইতেও সূক্ষ্মতম, ব্রহ্ম হইতে ক্ষুদ্রতমতৃণ পর্য্যন্ত প্রত্যেক পদার্থে যাঁহার দিব্যবিভূতি অনুস্যূত রহিয়াছে, নিয়ত মঙ্গলময়, সেই জগতের অদ্বিতীয় পরিব্যাপক পরমদেবকে আত্মার সহিত অভিন্নভাব জানিতে পারিলে সাধক দুশ্ছেদ্যসংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। তাঁহার জীবনের শান্তিপথের যাবতীয় বাধা-বিঘ্ন জন্মের- তিরোহিত হয়।

১৭

এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মনীষা মনসাঽভিক্লৃপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥

অন্বয়ঃ—এষ দেবঃ বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা চ, (অয়ং) সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। (এষঃ) হৃদা মনীষা (মনীষয়া ইত্যর্থঃ অত্র ছান্দসাৎ বিভক্তি-বিপর্য্যয়ঃ) মনসা (চ) অভিক্লৃপ্তঃ (ভবেৎ)। যে এতদ্ বিদুঃ, তে অমৃতাঃ ভবন্তি।

বিষমপদব্যাখ্যা— "বিশ্বকর্ম্মা" — "মহৎ" আদি বিশ্বং "কর্ম্ম" কার্য্যং অস্য ইতি বিশ্বকর্ম্মা। বিশ্বস্থ যাবৎপদার্থের আদি কর্ত্তা। "মহাত্মা"—সর্ব্বব্যাপী। "দেবঃ"—দ্যোতনাত্মক। "মনীষা"—বিবেকবুদ্ধিরদ্বারা। "হৃদা"—নেতি নেতি নেতি নিষেধোপদেশেন—ইহানয়, ইহানয়, ইহানয়, এই প্রকারে প্রাতবিষয়ে তিতিক্ষা পুরঃসরী যে বুদ্ধি, তাহা দ্বারা। "মনসা"—বিচার পরিপূত-জ্ঞানদ্বারা (অর্থাৎ অন্ধবুদ্ধি বশতঃ নয়) "অভিক্লৃপ্তঃ" প্রকাশিতঃ—প্রকাশিত হয়েন।

বঙ্গার্থঃ—বিশ্বের আদিকর্ত্তা সেই সনাতন-পুরুষ সর্ব্বদা সর্ব্বস্থলে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। জীব-হৃদয় ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার অধিষ্ঠান-বিচ্যুত হয়না। তিনি নিরন্তর সর্ব্বজীবেরঅন্তঃকরণে সন্নিবেশ করিয়া আছেন। বিবেক-মার্জ্জিত--প্রতিভা তিতিক্ষাপূর্ব্বিকা বুদ্ধি এবং আত্ম-বিচার-পরিপূত জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে স্বস্ব হৃদয়াভ্যন্তরে উপলব্ধি করা-যায়। যাঁহারা ঐ সমুদয় দুশ্চর-সাধনা-

সাহায্যে তাঁহাকে জানিতে পারেন, তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়েন। তাঁহাদের সংসার যাতনা চিরদিনেরমত তিরোহিত হয়। অনন্তশান্তিসংস্পর্শে তাঁহাদের মনপ্রাণ জুড়াইয়া যায়।

১৮

যদাঽতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রিঃ
ন সন্নচাসচ্ছিব এব কেবলঃ।
তদক্ষরং তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্
প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী ॥

অন্বয়ঃ—যদা অতমঃ (ভবতি) তৎ (তদা) দিবা ন (ভবতি), রাত্রিঃ ন (ভবতি), সন্ ন (ভবতি), অসৎ চ ন (ভবতি)। কেবলঃ শিবঃ এব প্রকাশতে, তৎ অক্ষরং, তৎ সবিতুর্বরেণ্যং, তস্মাৎ (হি) পুরাণী প্রজ্ঞা প্রসৃতা।

বিষমপদব্যাখ্যা—"যদা"—যস্যাং অবস্থায়াং, যে অবস্থায়। "অতমঃ" তমোনিবৃত্তিঃ অজ্ঞানের ধ্বংস হয়। "তৎ" তদা, সেই সময়ে। "দিবা ন ভবতি"- দিন-কল্পনা থাকেনা। 'রাত্রিঃন ভবতি' রাত্রি-কল্পনা থাকেনা। "সৎ ন ভবতি" সৎ অর্থাৎ কারণ বা ভাব কল্পনা থাকেনা। "অসৎ ন ভবতি" অসৎ অর্থাৎ কার্য্য বা অভাব-কল্পনাও থাকেনা, "কেবলঃ"—জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদিভেদশূন্য নির্ব্বিকার। "শিবঃ" চিদ্রূপ অবিদ্যাস্পর্শরহিত জ্ঞানময় আনন্দাত্মা। "তৎ"—সেই প্রসিদ্ধ-বিজ্ঞানময় পরম-জ্যোতিঃ। "অক্ষরং ব্যাপক বা সর্ব্বপরিচ্ছেদশূন্য। "সবিতুঃ" প্রাণিনাং উৎপাদকস্য সর্ব্বজনকস্য ইতি শঙ্করানন্দঃ, সমস্ত প্রাণীর জনক সবিতৃদেবের "বরেণ্যং" সম্যক্ প্রকারে ভজনীয়। "পুরাণী প্রজ্ঞা"—পুরাঽপি নবীনা সর্ব্বদা একরূপা অহং ব্রহ্মাস্মীতি বাক্যজন্যা ইত্যর্থঃ—ইতি শঙ্করানন্দঃ, প্রাচীনতমা হইলেও সর্ব্বদা একরূপা অর্থাৎ "আমিই ব্রহ্ম" এইপ্রকার জ্ঞান জন্যানিত্যা আত্মবিদ্যা।

বঙ্গার্থঃ—যখন "তমঃ" অর্থাৎ অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া সুবিমল স্বপ্রকাশজ্ঞানালোকের সমুদ্ভাস হয়, তখন কি দিন, কি রাত, কি ভাব, কি অভাব, কিছুরই কল্পনা থাকেনা। সমস্ত কল্পনাই অবিদ্যার কুহকবিজৃম্ভিত, সেই অবিদ্যার ধ্বংসে তাহার ক্রিয়াবলীরও ধ্বংস হয়। সেই সময়ে জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদিভেদপরিশূন্য, নির্ব্বিকার, চিৎস্বরূপ, অবিদ্যাস্পর্শরহিত জ্ঞানময় আনন্দ জ্যোতিঃই ইতস্ততঃ প্রকাশিত হইয়া থাকেন। সেই প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানময় পরমজ্যোতিঃ ব্যাপক—অর্থাৎ সর্ব্বপরিচ্ছেদশূন্য; সর্ব্বপ্রাণীর জনক পরমধ্যেয় সবিতৃদেবও তাঁহাকে ভজনা করিয়া থাকেন। তাঁহা হইতেই, প্রাচীনতমা হইলেও সর্বদা অবিকৃতা "আমিই ব্রহ্ম" এবংবিধা নবীনা অধ্যাত্মবিদ্যা বিনির্গতা হয়। তিনিই সর্ব্ববিধ বিকল্পের একমাত্র পরিচ্ছেদ। তাঁহাকে জানিলে সমস্ত বিকল্পই দূরীভূত হয়। যে অবস্থার কথা বর্ণিত হইল, তখন যে কোনপ্রকার কল্পনাই থাকেনা; তাহা অপরাপর শ্রুতিতে এই প্রকার উক্ত হইয়াছে — "নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদ আসীদিতি"।

১৯

নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চং ন মধ্যে
পরিজগ্রভৎ।

ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম
মহদ-যশঃ ॥

অন্বয়:— (কশ্চিদপি) এনং ঊর্দ্ধং ন পরিজগ্রভৎ, তির্য্যঞ্চং ন পরিজগ্রভৎ, (বা) মধ্যে ন পরিজগ্রভৎ, তস্য প্রতিমা ন অস্তি, যস্য নাম মহৎ যশঃ।

বিষমপদব্যাখ্যা—কূটস্থস্য ব্রহ্মণঃ কুত্রচিৎ কেনাঽপি অগ্রাহ্যত্বং, অদ্বিতীয়ত্বাৎ নিরুপমত্বম্ সর্ব্বেভ্যঃ সমধিকযশঃস্বরূপঞ্চ প্রকটয়তি ইয়ং শ্রুতিঃ।

পরিজগ্রভৎ—পর্য্যগ্রহীৎ বা পরিগ্রহীতুম্ শক্নুয়াৎ, পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হয় না। "তস্য প্রতিমা ন অস্তি"—অদ্বিতীয়ত্বাৎ তস্য উপমা নাস্তি। অদ্বিতীয়তানিবন্ধন তাঁহার উপমা নাই, অর্থাৎ তিনি কোন পদার্থেরই সহিত উপমিত হইবার যোগ্য নহেন। যস্য নাম মহদ্‌যশঃ।— যাঁহার সর্ব্বাতিরিক্ত যশোরাশি জগতের প্রতিস্তরে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। "নাম"—প্রসিদ্ধ।

বঙ্গার্থ—সেই কূটস্থব্রহ্ম কি ঊর্দ্ধ কি অধঃ, কি মধ্য, কোথায়ও কাহার পরিগ্রাহ্য নহেন, কেহ তাঁহাকে পরিগ্রহণ করিতে সমর্থ হয়েন না। (তবে তাঁহাকে কি করিয়া পরিজ্ঞাত হওয়া যায়? তাঁহার স্বরূপ কিপ্রকার? এতদুত্তরে কথিত হইতেছে যে) তাঁহার উপমা নাই, (অতএব তিনি অমুক পদার্থের ন্যায়, ইহাও বলা যাইতে পারে না; তবে তিনি কিরূপ? কি করিয়া তাঁহাকে বুঝিব? এতদুত্তরে উক্ত হইতেছে) যাঁহার সর্ব্বাতিরিক্ত প্রসিদ্ধযশঃ বিশ্বের তাবৎ পদার্থেই বিরাজিত রহিয়াছে, জগতের যাবতীয় বস্তুই যাঁহার কীর্ত্তিমেখলায় বিমণ্ডিত। তাঁহাকে বুঝিতে হইলে, সর্ব্বপদার্থে তাঁহার কীর্ত্তি-সত্তা-পরিগ্রহ করিতে প্রথমতঃ যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক। ভূতভৌতিক প্রপঞ্চজাত তদীয় সনাতনী কীর্ত্তি। সমাহিত হৃদয়ে দেখিতে চেষ্টা করিলে, প্রতি পদার্থেই সেই কীর্ত্তিমানের কীর্ত্তি-কৌমুদী অবলোকন করিয়া চরিতার্থ হওয়া যায়; কিন্তু সকলের মূল সমাধি, সেই সমাধি বর্জ্জিতহৃদয়ে তদুপলব্ধির আশা কদাচ সম্ভবপর নহে।

২০

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এনম্
এবং বিদুরমৃতাস্তে ভবতি ॥

অন্বয়:—অস্য রূপম্ সন্দৃশে ন তিষ্ঠতি, কশ্চন এনং চক্ষুষা ন পশ্যতি। যে এনং হৃদিস্থং হৃদা মনসা চ এবং বিদুঃ, তে অমৃতাঃ ভবন্তি।

বিষমপদব্যাখ্যা—"সন্দৃশে"—(সম্যক্ প্রকারেণ দৃশ্যতে অত্র ইতি সম্+দৃশ্+ক, চক্ষুরাদিগ্রহণযোগ্য প্রদেশঃ—তত্র,) চক্ষুরাদিইন্দ্রিয়গ্রাহ্যস্থানে। "হৃদা"—শুদ্ধবুদ্ধি দ্বারা। "মনসা"—মননধর্ম্মক মনো দ্বারা। "হৃদিস্থং"—হৃদাকাশগুহাস্থ। "তে অমৃতাঃ ভবন্তি"—ইহা পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

বঙ্গার্থঃ—এই পরম ব্রহ্মের নির্বিশেষ স্বপ্রকাশ অখণ্ডানন্দ স্বরূপ চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থানে অবস্থান করে না, অর্থাৎ ইহার স্বরূপ ইন্দ্রিয়-গোচর নহে, ইহাকে কেহ

চক্ষুদ্বারা উপলব্ধ করিতে পারেনা। যে সাধনচতুষ্টয়াদিযুক্ত যোগাধিকারি-সন্ন্যাসিগণ সুপরিশুদ্ধ-সমাধিমার্জ্জিত বিমলবুদ্ধি ও নিশ্চলমনের দ্বারা হৃদাকাশগুহাস্থ এই পরমপুরুষকে "ব্রহ্মাহমস্মি" "ব্রহ্মই আমি" এই ভাবে জানিতে পারেন, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তাঁহারা অপরোক্ষীকরণ-মহিমা বলে অমৃতত্বলাভ করেন। মরণের হেতু অবিদ্যাদি তত্ত্বজ্ঞানরূপ অনলের দ্বারা দগ্ধীভূত হওয়ায়, সেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারী-দিগকে আর পুনরায় দেহান্তরভজনা করিতে হয়না। পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে—"তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ইতি।"

২১

অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ ভীরুঃ প্রতিপদ্যতে।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

অন্বয়ঃ— (ত্বম্) অজাতঃ ইতি এবং (কশ্চিদ্) ভীরুঃ (সন্) (ত্বাম্ এব শরণম্) প্রতিপদ্যতে। হে রুদ্র! যৎ তে দক্ষিণং মুখং, তেন মাং নিত্যং পাহি।

বিষমপদব্যাখ্যা—"অজাতঃ" জন্ম-জরা-অশন- পিপাসাধর্ম্মবর্জ্জিত। "ভীরুঃ"—সংসার হইতে ভীত হইয়া। "ত্বামেব শরণং প্রতিপদ্যতে" তোমাকে শরণপ্রাপ্ত হইতেছে। "দক্ষিণংমুখং"—উৎসাহজননং রূপং তোমার উৎসাহজনন আহ্লাদপূর্ণ চিন্ময়রূপ। "পাহি"—রক্ষা কর।

বঙ্গার্থঃ—সাধক জন্ম, জরা, মরণ, অশন, পিপাসা, শোক, মোহ প্রভৃতি অনন্ত-ক্লেশ-পরিপূর্ণ সংসার হইতে ভীত হইয়া, তত্তৎ ক্লেশাত্মক-ধর্ম্মবর্জ্জিত তোমাকে একমাত্র নিরপায় সংশ্রয়রূপে প্রাপ্ত হয়েন। হে রুদ্র অর্থাৎ হে অবিদ্যাবিনাশক! তোমার নিয়তানন্দময় উৎসাহজনক রূপদ্বারা তুমি সর্ব্বদা আমাকে অবিদ্যার করাল-কবল হইতে রক্ষা কর। হৃদয়াভ্যন্তরে তোমার অনুপমদ্যুতি প্রকাশিত করিয়া, আমার মনের চিরান্ধতমসের বিনাশসাধন কর। তুমি জন্ম-জরা মরণ প্রভৃতি অকস্তুদ সংসার-ধর্ম্মবর্জ্জিত; তাই হে রুদ্র! অর্থাৎ হে অবিদ্যাধ্বংসক! তোমাকেই একমাত্র আশ্রয় অবলম্বন করিয়াছি, তুমি তোমার চিরোৎসাহময়ী মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া আমার জড়তাপন্ন জীবন পুনরুৎসাহিত করিয়া দাও।

২২

মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি
মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ।
বীরান্ মা নো রুদ্র ভামিতো—
বধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমিত্ত্বা হবামহে॥

অন্বয়ঃ— হে রুদ্র! (ত্বম্) নঃ তোকে, তনয়ে, আয়ুষি গোষু অশ্বেষু (চ) মা রীরিষঃ। ভামিতঃ (সন্) বীরান্ নঃ মা বধীঃ। হবিষ্মন্তঃ (বয়ং) সদম্ইত্ ত্বাহবামহে।

বিষমপদব্যাখ্যা— "তোকে"— পুত্রে—অর্থাৎ পুত্রকে। "তনয়ে"— পৌত্রকে। "আয়ুষি"— আয়ুঃ। "অশ্বেষু"—অপরাপর শরীরিসমূহকে। "মা ন রীরিষঃ" বধং মা কার্ষীঃ— বধ করিও না। "ভামিতঃ"

বীরান্ নঃ মা বধীঃ"—অত্র শঙ্করঃ—"যে চাস্মাকং বীরা বিক্রামন্তো ভৃত্যা, হে রুদ্র! তান্ "ভামিতঃ ক্রোধিতঃ সন্ মা বধীঃ',—হে রুদ্র! আমরা তোমার বিক্রমশালী অর্থাৎ ঔদ্ধত্যযুক্ত ভৃত্য; তুমি ক্রোধিত হইয়া, তোমার এই সকল ভৃত্যকে বিনষ্ট করিওনা। "হবিষ্মন্তঃ" হবিযুক্ত হইয়া, অর্থাৎ নিয়ত হোমপরায়ণ হইয়া। "সদমিৎ"—সদা সর্ব্বদা, "ত্বা" ত্বাম্—তোমাকে। "হবামহে"—রক্ষণার্থং আহ্বয়ামঃ—রক্ষারনিমিত্ত আহ্বান করিতেছি।

বঙ্গার্থঃ—হে রুদ্র! হে অনন্তশক্তে! তুমি আমাদের পুত্র, পৌত্র, জীবন, হবিঃ-সাধন গো এবং অন্যান্য শরীরধারীদিগকে বিনাশকরিও না। আমরা শত উদ্ধত হইলেও, তোমার ভৃত্য; হে নাথ! তুমি তোমার ভৃত্যের প্রাণ-সংহার করিও না। আমরা প্রতিনিয়ত হবিরাদি সাধন দ্বারা তোমাকে আমাদের রক্ষার নিমিত্ত আহ্বান করিতেছি; তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর।

ইতি চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ।
মেট্রপলিটান কালেজ।

এক ও অনেক।

এক চন্দ্র অন্ধকার হরে;
অনেক তারায় কিবা করে? । ১
রাজ্যরক্ষা একটি রাজায়;
নাহি হয় অনেক প্রজায়। ২
এক সেনাপতির শাসনে,
অনেক সৈনিক রত রণে। ৩
এক শিক্ষকের শিক্ষামত—
সম্প্রদায় হয় সমুন্নত।
মিলিয়া অনেক মূর্খজন,
কোন শিক্ষা না করে সাধন ৪
ভাল এক বাক্যও সার্থক,
অনেক প্রলাপ অনর্থক। ৫
একটি সুখাদ্য স্বাস্থ্যরয়,
অনেক কুখাদ্য কিছুনয়। ৬
সুপুত্রেকে সুখ-সম্ভাবনা,
কুপুত্র-অনেকে বিড়ম্বনা। ৭
সুপঠিত এক গ্রন্থ সার,
কুপঠিত অনেক অসার। ৮
সুকৃত এক কাজেও হিত,
কুকৃত অনেক বিপরীত। ৯
একটি সরিৎ সুনিশ্চয়—
অনেক কূপের শ্রেষ্ঠ হয়। ১০
অনেক কুসুম উপেক্ষিত,
একটি গোলাপ সমাদৃত। ১১
অনেক দিনের দাসত্বের তুলনায়,
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ-সুখ প্রায়। ১২
দিনেকের তরে ধর্ম্ম-জীবন সার্থক;
অধর্ম্মে অনেক দিন বাঁচা অনর্থক। ১৩
ঘৃণিত অধর্ম্মার্জ্জিত কনক অনেক,
সমাদৃত ধর্ম্মার্জ্জিত কপর্দ্দক এক। ১৪
সুপাত্রে একটি পাই দানও সার্থক;
অপাত্রে অনেক অর্থদান অনর্থক। ১৫
সুকৃত ব্যবসা এক ধনপ্রদ বটে;
কুকৃত অনেকে মাত্র অপহ্নব ঘটে। ১৬
তরুর একটী মূলে জল দিলে ফল,

অনেক শাখায়-পত্রে সেচন নিষ্ফল। ১৭
সুসিদ্ধ একটি লক্ষ্যে শুভ ফলোদয়,
অসিদ্ধ অনেক লক্ষ্যে বৃথা কালক্ষয়। ১৮
অনেক নাস্তিক শুধু ধরণীর ভার;
এক ভগবৎভক্ত ভুবনালঙ্কার। ১৯
এককে যে সার করে অনেক সে পায়,
অনেক যে চায়, তার এক পাওয়া দায়।২০

হিন্দু ও অহিন্দু।

সত্য হিন্দু হতে যদি চাও,
সত্যপর-ন্যায়বান হও। ১
যদ্যপি প্রকৃত হিন্দু হও,
কায়মনোবাক্যে শুচি রও। ২
স্বার্থত্যাগী পরার্থানুরাগী,
সেই সত্য হিন্দু নামভাগী। ২
সুখে শান্ত দুখে অবিহ্বল,
হিন্দু নাম তাহারি সফল। ৪
ভ্রাতৃভাবে ভাবে যে মানবে,
হিন্দু আখ্যা তাকেই সম্ভবে। ৫
সদা যে কর্ত্তব্য কাজে রত,
হিন্দু সংজ্ঞা তাহারি সঙ্গত। ৬
মূকজীবে যেবা দয়াবান,
সত্য তার হিন্দু অভিধান। ৭
সর্ব্বধর্ম্মে ধীর-দৃষ্টি যার,
হিন্দু নাম শ্লাঘ্য বটে তার। ৮
ঈশে যার রতি-গতি-নতি,
হিন্দু সংজ্ঞা সাজে তারি প্রতি। ৯
খুটিনাটি ত্রুটি আচারের—
হেতু নয় "অহিন্দু" নামের।
স্বার্থপর অধার্ম্মিক যেই,
যথার্থ অহিন্দু বটে সেই। ১০
খাদ্য-বিচারের অঙ্গহানি,
তাতেই না যায় হিন্দুয়ানী।
সুচিন্তা সুবাক্য-সুকর্ম্মের—
হানিতেই হানি হিন্দুত্বের। ১১
সর্ব্বভূতে আত্ম প্রসারণ,
সনাতন ধর্ম্মের সাধন।
যে জাতি সে ধর্ম্মে আস্থাবান,
সিন্ধুতীরে যার আদিস্থান।
সে জাতীয় যে জন্মে যথায়,
সাধে ধর্ম্ম যেবা সুবিধায়,
তাহারেই "হিন্দু" নামে মানি;
তদিতর "অহিন্দু" বাখানি। ১২
আহার-বিচার-ভিন্নত,
জল-যানে সমুদ্র-যাত্রায়,
সত্যজ্ঞানে নহে অহিন্দুত্ব;
অহিন্দুত্ব অসত্যেই সত্য! ১৩
চোর দস্যু লোলুপ লম্পট,
নিপট কপট ক্রূর শঠ;
হত্যাকারী অত্যাচারী তথা,
গৃহদাহী মিথ্যাসাক্ষ্যদাতা;
জালিয়াৎ দাঙ্গাবাজ ঠক,
প্রবঞ্চক বিশ্বাসঘাতক;
কামুক ও হিংসুক দুর্ম্মুখ,
মিথ্যুক ও বিশ্ব-বিনিন্দুক;
ঈশ্বরে যে বিশ্বাসবিহীন,
চিত্ত যার দীন হীন ক্ষীণ;
নাস্তিকতা-নীরস-পরাণ,
মন যার মহামরুস্থান;

নাহি যার স্নেহ-দয়া-বিন্দু,
ইহারাই প্রকৃত অহিন্দু। ১৪
(শুধু) ——
অন্নাদি-আচার-ভেদে,
বর্ণাদি-বিচার-ভেদে,
হিন্দু বা অহিন্দু হয়,
এ সিদ্ধান্ত শুদ্ধ নয়;
বিশ্বাস ও কার্য্যে বদ্ধ
হিন্দুত্ব ও অহিন্দুত্ব। ১৫

সেকাল ও একাল।

আয়কর।

ইনকম্ টেক্স বা আয় অনুসারে প্রজার নিকট হইতে করগ্রহণ, আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কালেও প্রচলিত ছিল। ইহা একালে ইংরাজ রাজ্যের একটী উৎপীড়ন বলিয়া যে সাধারণের ধারণা আছে তাহা ভ্রমমূলক। বিজিত জাতি বলিয়া রাজা আমাদের নিকট অতি উচ্চহারে এই কর গ্রহণ করেন বলিয়া যে অনেক লোকের সংস্কার আছে, তাহাও ভ্রমমূলক। বাস্তবিক সেকালের "রামরাজ্যেও" ইনকম্ টেক্স ছিল এবং তাহার হার একালের অপেক্ষা বেশী ছিল। একথা কেবল বলিলে পাছে লোকের বিশ্বাস না হয়, এজন্য দুএকটী শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিতেছি।

মনু, ৭ম অধ্যায়।

ক্রয়বিক্রয়মধ্বানং ভক্তঞ্চ সপরিব্যয়ম্।
যোগক্ষেমঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য বণিজো-দাপয়েৎ করান্॥ ১২৭
যথা ফলেন যুজ্যেত রাজা কর্ত্তাচ কর্ম্মণাম্;
তথাবেক্ষ্য নৃপোরাষ্ট্রে কল্পয়েৎ সততং করান্॥ ১২৮
যথাল্পাল্পমদন্ত্যাদ্যং বার্য্যোকো বৎস ষট্পদাঃ।
তথাল্পাল্পো গ্রহীতব্যো রাষ্ট্রাদ্রাজ্ঞাব্দিকঃ করঃ॥ ১২৯
পঞ্চাশদ্ভাগ আদেয়ো রাজ্ঞা পশু-হিরণ্যয়োঃ।
ধান্যানামষ্টমো ভাগঃ ষষ্ঠোদ্বাদশ-এব বা। ॥ ১৩০
আদদীতাথ ষড়্ভাগং দ্রুমাংসমধুসর্পিষাম্।
গন্ধৌষধি রসানাঞ্চ পুষ্পমূল ফলস্য। চ॥ ১৩১
পত্রশাকতৃণানাঞ্চ বৈদলস্য চ চর্ম্মণাম্।
মৃণ্ময়ানাঞ্চ ভাণ্ডানাং সর্ব্বস্যাশ্মময়স্য চ॥ ১৩২
যৎকিঞ্চিদপি বর্ষস্য দাপয়েৎ করসংজ্ঞিতম্।
ব্যবহারেণ জীবন্তং রাজা রাষ্ট্রে পৃথগ্ জনম্॥ ১৩৭

কারুকান্ শিল্পিনশ্চৈব শূদ্রাংশ্চাত্মোপজীবিনঃ।
একৈকং কারয়েৎ কর্ম্ম মাসি মাসি মহীপতিঃ॥ ১৩৮

বাণিজ্য দ্রব্য কবে কোন্ স্থানে কত মূল্যে ক্রীত হইয়াছে, এবং ঐ দ্রব্য কবে কোন্ স্থানে কত মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে, আনিতে পথে বিপদাদির কিরূপ সম্ভাবনা, পথে ব্যয়, মাসুল প্রভৃতি কত দিতে হইয়াছে, চোরদস্যু প্রভৃতি হইতে রক্ষণাবেক্ষণ জন্ম কত ব্যয় হইয়াছে, বর্ত্তমানে লাভালাভের কিরূপ সম্ভাবনা ইত্যাদি দেখিয়া কর ধার্য্য হইবে। যাহাতে রাজা উচিত মত কর পান ও বণিক্ সম্যক্ রূপে আপন কার্য্যের ফল লাভ করিতে পারেন, উভয় বিষয়ই সর্ব্বতোভাবে বিবেচনা করিয়া কর সংস্থাপিত হইবে। যেরূপে জলৌকা (জোঁক) রক্ত পান করে বা গোবৎস দুগ্ধ পান করে অথবা ভ্রমর মধু পান করে সেই প্রকার রাজা ও মূলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অল্প অল্প কর গ্রহণ করিবেন। যাহাতে মূলধনের প্রতি কোন ব্যাঘাত, বা উৎপাদিত ফলভোগে বঞ্চিত হইয়া বণিকের বাণিজ্যে অনুৎসাহ জন্মে, এরূপ একেবারে অধিক কর রাজা গ্রহণ করিবেন না। পশু ও সুবর্ণ সম্বন্ধীয় লভ্যের পঞ্চাশ ভাগের একভাগ; ধান্য শস্যাদি সম্বন্ধীয় লভ্যের ৬, ৮ বা ১২ ভাগের এক ভাগ; বৃক্ষ, মাংস, মধু, গন্ধদ্রব্য, ঔষধি, বৃক্ষাদির রস, ফল, মূল, পত্র, পুষ্প, শাক, তৃণ, বংশনির্ম্মিত পাত্র, চর্ম্মপাত্র, মৃৎপাত্র, বা প্রস্তর নির্ম্মিত দ্রব্য সম্বন্ধীয় লভ্যের ৬ ভাগের ১ ভাগ, রাজার গ্রহণীয়।

বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ভিন্ন দুঃখী প্রজা, যাহারা শাকাদি সামান্য বস্তু বিক্রয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, রাজা তাহাদিগের নিকট ও কিঞ্চিৎ মাত্র কর বর্ষে বর্ষে গ্রহণ করিবেন। কারু ও শিল্পজীবিগণ—যথা, পাচক, মালাকার, কাংসাকার, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, সূত্রধর, চিত্রকর, ভাস্কর এবং যে সকল শূদ্র নিজের শারীরিক পরিশ্রমে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, এই সকল ব্যক্তিকে রাজা মাসে মাসে এক এক দিন করিয়া কর্ম্ম করাইয়া লইবেন।

মনুর দশম অধ্যায়ের ১১৮। ১১৯ এবং ১২০ শ্লোকেও এই বিষয়ের কথা আছে। আপৎকালে রাজা শস্যাদির ৪ভাগের এক ভাগ, সুবর্ণাদির ২০ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করিবেন, শূদ্র এবং কারু ও শিল্প কার্য্যোপজীবিগণের নিকট কর গ্রাহ্য নহে, তাহাদিগের দ্বারা (সাধারণকাল অপেক্ষা অধিক পরিমাণে) কাজ করাইয়া লওয়া যাইতে পারে।

মনুর ন্যায় হারীতও " * * * ষড় ভাগার্হঃ সদানৃপঃ" (২য় অধ্যায় ৩য় শ্লোক) বলিয়াছেন। বশিষ্ঠও একোনবিংশ অধ্যায়ে প্রায় এইরূপ বলিয়াছেন। বশিষ্ঠ যে মনুর পরবর্ত্তী, ঐ অধ্যায়েই তাহার নিদর্শন অন্তর্নিহিত (internal evidence) আছে। এই বশিষ্ঠ যে রামচন্দ্রের সমকালবর্ত্তী বশিষ্ঠ নহেন তদ্বিষয়ে প্রমাণ দেখি নাই।

উপরোক্ত শ্লোকগুলি হইতে দেখা যায় যে, ভূমি ও ব্যবসায়ের উপর কর সেকালে সাধারণতঃ $\frac{1}{6}$ হইতে $\frac{1}{12}$ পর্য্যন্ত ছিল এ

আপৎকালে ¼ পর্য্যন্ত উঠিত। অর্থাৎ এখন যেমন আফগান যুদ্ধাদিতে লবণাদির শুল্ক বর্দ্ধিত হয় তখনও সেইরূপ হইত। তখনও এই "ঘৃণিত" বনকর ছিল। এখন নিম্নবঙ্গের সুন্দরবনে কাষ্ঠ, মধু, "গোল" পাতা এবং ছোটনাগপুর অঞ্চলে তৃণ (১) লাক্ষা (২) "মহুয়া" মধুপুষ্প প্রভৃতি হইতে বন বিভাগের যে শুল্ক আদায় হইয়া থাকে, তাহার বিরুদ্ধে লোকে নানা আপত্তি ও দোষারোপ করে, কিন্তু এ কর নূতন নহে। বঙ্গের সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও সুশাসিত (Regulation District) দেশে "বেগার" নাই; কিন্তু ছোটনাগপুর অঞ্চলের (non regulation) বন্য প্রদেশে "বেগারের" কুলিদিগকে কষ্ট করিয়া সংগ্রহ করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করিবার (অবশ্য কাজ করিলে পয়সা দিবার) প্রথা আছে। "বেগার" প্রথা সেকালে সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল; একালে উহা প্রায় তিরোহিত হইয়াছে বলিলেই চলে। অতি দরিদ্র-লোকেও ৩০ ভাগের এক ভাগ কর দিত, ইহাদিগকে এখন কিছুই দিতে হয় না। বিদ্যার উপর কর ছিল না (মনু ৭ম অঃ ১৩৫—১৩৬) বরং বিদ্যাদানের ও লাভের পথ যাহাতে প্রশস্ত হয় তজ্জন্য বৃত্তি প্রভৃতি দান করা হইত। রাজা এখনও বিদ্যাদানে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়া থাকেন।

[১] "সাবাই" ঘাস (দড়ি ও কাগজের জন্য ব্যবহৃত হয়) এবং পশুচারণার্থ ঘাস গবর্ণমেণ্ট জঙ্গলে "বিলি" হয়।

[২] পলাসবৃক্ষে কীট বিশেষের উৎপাদিত নির্য্যাস।

করবহনক্ষম সকল ব্যক্তির উপর সমানভাবে কর হওয়া উচিত। যে ব্যক্তি যত দরিদ্র তাহার আয়ের তত বেশী ভাগ ভরণ পোষণে ব্যয় হয়, অথবা ভরণ পোষণে যে ব্যক্তির বা জাতির ব্যয় আয়ের অনুপাতে যত বেশী সে ব্যক্তি বা জাতি তত দরিদ্র। ছোটনাগপুরের পালামৌ অঞ্চলের মফঃস্বলে ৪ হইতে ৮টী গোরক্ষপুরী পয়সা (প্রচলিত ২½ হইতে ৪½ পয়সা) দিলে স্ত্রীলোকে ও পুরুষে ৭।৮ঘণ্টা কাজ করে, অনেকস্থলে পাকি দেড়সের মকাই বা নিকৃষ্ট চাউল পাইলে এক ব্যক্তি সমস্ত দিন কাজ করে। এই আয়ে উহাদের উদর পূর্ত্তি হইয়া কষ্টে বস্ত্রাদির জন্য কিছু থাকে, বোধ হয় শতকরা ৯০ ভাগ আহারে ব্যয় হয়। কলিকাতার নিকট যে সকল ভদ্র লোকের কেবল মাত্র চাকুরীই সম্বল, তাঁহাদের ৪২।৪৩, আয় হইতে ১৲ টাকা টেকস্ দেওয়া বড় কষ্টকর। নিজেদের কথা দূরে থাকুক, বালক বালিকাগণও শরীর পোষণার্থ অত্যাবশ্যকীয় দুগ্ধ ঘৃতাদি উপযুক্ত পরিমাণে পায় না। এস্থলে ঐ ৪২৲।৪৩৲ টাকা হইতে যদি ১৲ টাকা না দিতে হইত, তাহা হইলে কোন অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের জন্য ঐ টাকাটী ব্যয় হইত এবং সেই পরিমাণে ঐ পরিবারের সুখ স্বাস্থ্য বৃদ্ধি পাইত।

এক্ষণে চাকরিতে বার্ষিক ৫০০৲ বা ততোধিক ২০০০৲ পর্য্যন্ত আয়ের উপর টাকায় ৪ পাই বা $\frac{1}{48}$ ভাগ এবং ব্যবসায়ে ৫০০৲ আয়ের উপর প্রায় $\frac{1}{50}$ ভাগ এবং বার্ষিক ২০০০৲ আয়ের উপর সর্ব্বত্র ১ টাকায় ৫

পাই বা প্রায় ১/৪০ ভাগ কর ধার্য্য আছে। আমাদের রাজার নিজের দেশে গত বৎসর, পাউণ্ডে ১ শিলিং বা ২০ ভাগের একভাগ আয় কর ছিল। এবার দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধে অনেক কোটী টাকা ব্যয় হওয়ায় আয়কর বর্দ্ধিত হইয়। পাউণ্ডে ১ শিলিং ২ পেন্স বা প্রায় ১৯ ভাগের এক ভাগ হইয়াছে। ইংলণ্ড ধনী, ভারত দরিদ্র' ইংলণ্ডে এই বর্দ্ধিত করে আপত্তিও হয় নাই। ইংলণ্ডে যথেষ্ট টাকা, মূলধনের অভাব নাই, বার্ষিক ৩৲ হারে ধার দিতেও লোকে উৎসুক। ভারতে ব্যবহার যোগ্য মূলধন বড় অল্প, সুদের হার শতকরা বার্ষিক ২৪৲ টাকা প্রায় দেখা যায়। ব্যবসায়ের উপর কর এদেশে অনেকস্থলে মূলধনে আঘাত করে; মূলধনে আঘাত লাগিলে ধনী প্রথমতঃ ঐ কর দ্রব্যের দাম বাড়াইয়া দ্রব্য ব্যবহারকারীর উপর এবং তৎপরে শ্রমজীবিগণের উপর চাপাইতে চেষ্টা করেন; উহাতে ও ঠিক না হইলে ব্যবসায় বন্ধ হয়। দরিদ্র দেশে আরও দরিদ্রতা বর্দ্ধিত হয়। ইংলণ্ডের ন্যায় ধনশালী দেশে অনেক লোকের ২০০০০৲ আয়। তাহারা টেক্স দিয়াও যথেষ্ট খায়দায় ও বাবুয়ানী করে। টেক্স কমিলে তাহাদের সেই টাকা যে টাকা জমিতেছিল, তাহাই কিঞ্চিৎ বাড়াইয়া দিবে মাত্র। অর্থাৎ ধার দিবার বা কোম্পানির কাগজ কিনিবার অর্থ কিছু বাড়িবে। টেক্স বাড়িলে স্বল্প সংখ্যক টাকা জমিল না মাত্র— ঐরূপ টাকা না জমায় সুখস্বাস্থ্যের কিছু প্রতিবন্ধক হয় না, সুতরাং লোকে বিশেষ আপত্তিও করেনা।

প্রত্যেকের আয়, সাংসারিক সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য কিরূপ অভাব পূরণের আবশ্যক, তৎপরে রাজাকে দিবার মত কত থাকে, ক্রয় বিক্রয়ের মূল্য, পথের ব্যয় ক্লেশ ও বিপদ, কিরূপে জাতীয় বাণিজ্যাদির বিস্তার অক্ষুণ্ণ থাকে, এই সকল সর্ব্বতোভাবে বিবেচনা করিয়া একালের মত সেকালেও করবহন ক্ষমতা নির্দ্ধারণের রীতি ছিল। যে ব্যক্তি অধিক সম্পত্তির অধিকারী, তাহার সুখ শান্তির জন্য রাজার সামান্য চৌকি পাহারার বন্দোবস্তও অধিক প্রয়োজন, তাহার করদানের ক্ষমতাও অধিক। কিন্তু যাহার কিছুই নাই, যে শাক বেচিয়া, কাঠ কুড়াইয়া বা সামান্য মজুরী করিয়া কষ্টে খাদ্যের সংস্থান করে, তাহার কর দানের ক্ষমতা নাই, তাহার উপর আয় কর হওয়া অকর্ত্তব্য। ইংরাজ রাজ সেকালের মত এইরূপ দীন দরিদ্র ব্যক্তি বর্গের নিকট আয় করগ্রহণ করেন না, ইহা আমাদের রাজার দয়া, মহানুভবতা ও গভীর অর্থনীতিজ্ঞতার পরিচায়ক, বর্ত্তমানে আমাদের দেশে যে হারে আয়কর আছে, তাহা ইংলণ্ডের অপেক্ষা অনেক কম হইলেও ভারতের ব্যক্তিগত ও জাতিগত অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া রাজা উহার হার বর্দ্ধিত করিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক। বরং বার্ষিক ৫০০৲ আয়ের উপর কর এক বারে তুলিয়া দিয়া যদি ১০০০৲ আয়ের উপর হইতে কর সংস্থাপন সম্ভব হয় তাহা হইলে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে আমাদিগের রাজা সচেষ্ট আছেন ইহা একাধিকবার প্রজাবর্গকে বিজ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীশরচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত

মন্তব্য।

রাজা প্রজাদিগের স্বদেশবাসী হইলে, তিনি যে করগ্রহণ করেন, তাহা অধিক হইলেও প্রজাদিগের মধ্যে ব্যয়িত হওয়ায়, তাহারা যথেষ্ট উপকৃত হয়। বিদেশীয় রাজার সংগৃহীত কর অল্প হইলেও উহার অধিকাংশই বিদেশে ব্যয়িত হওয়ায় প্রজাদিগের উহা হইতে কোন প্রত্যুপকার পাইবার সম্ভাবনা থাকেনা, এবং দেশ ক্রমশঃ দরিদ্র হইতে থাকে, রাজা বিদেশীয় হইলে বিদেশীয় শিল্প বাণিজ্যের প্রভাবে দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের অবনতি না হইয়াও পারেনা এবং তাহাতে দেশ ক্রমশঃ দরিদ্র হইয়া পড়ে।

হিঃ পঃ সম্পাদক।

ভ-গোল-পরিচয়।

৭ম পাঠ।

বৃষ-রাশি।

কৃত্তিকানক্ষত্রের ¾ অংশ ও রোহিণী-নক্ষত্র এবং মৃগশিরা বা মৃগশীর্ষ নক্ষত্রের ½ অংশ দ্বারা বৃষরাশি গঠিত। কিন্তু বৃষরাশির আয়তন মধ্যে কৃত্তিকা নক্ষত্রের ও রোহিণী নক্ষত্রের তারা গুলি অবস্থিত। (১)

কৃত্তিকা নক্ষত্র দ্বারা তারাময় বৃষের ককুৎ গঠিত এবং রোহিণী নক্ষত্র দ্বারা তারা-বৃষের মুণ্ড গঠিত।

বর্ত্তমান সময়ে বৈশাখাদি বর্ষগণনা হয়; রাশি চক্রের প্রথম রাশি মেষ এবং প্রথম নক্ষত্র অশ্বিনী। প্রাচীনকালে কার্ত্তিকাদি বর্ষগণনা হইত,এবং রাশিচক্রের প্রথম নক্ষত্র কৃত্তিকা এবং প্রথম রাশি বৃষরাশি ছিল। (২)

বৃষরাশিস্থ তারাগণ মধ্যে...

(১) হলদ্দীবর্ণ তারা বৃহত্তম, এবং লোহিতবর্ণ এই তারাটী দেখিতে অতি মনোহর। এই তারা রোহিণী নক্ষত্রের যোগতারা; রোহিণী নক্ষত্রের অধিপতি ব্রহ্মা, এজন্য রোহিণীর অপর নাম ব্রাহ্ম বা কমলজ দৈবতা। (৩)

(২) হলদ্দীবর্ণ তারার প্রায় ৮ হাত উঃ পূঃ কোণে অগ্নিতারক অবস্থিত।

কৃত্তিকা নক্ষত্রের তারাগণ মধ্যস্থিত দেবসেনা তারা। দেবসেনা বৃষরাশির ৪র্থ তারা। ইহার পাশ্চাত্য নাম Alcyone

কালপুরুষমণ্ডলস্থ মৃগশিরা নক্ষত্র।

দেবসেনা ও হলদ্দীবর্ণ তারা সংযোজিত করিয়া ঐ সংযোগ রেখা অগ্নিকোণে পরিবর্দ্ধিত করিলে, হলদ্দীবর্ণ তারা হইতে ১০ ফুট অন্তরে একটী ২য় শ্রেণীর তারা দর্শকের দৃষ্টিপথে পতিত হইবেক। এই তারাটীর নাম কার্ত্তিকেয় তারা। কার্ত্তিকেয় তারা হইতে ২ফুট অন্তরে ঈশানকোণে একটী ক্ষুদ্র তারাগুচ্ছ আছে; ঐ তারাগুচ্ছের তিনটী মাত্র ক্ষুদ্র তারা দৃষ্টিগোচর হয়। তারাগুচ্ছের উত্তরস্থ তারাটী ৪র্থ শ্রেণীর এবং ঐ তারার নাম এনকতারা। অপর ২টী তারা ৬ষ্ঠ শ্রেণীর। তারাত্রয় বিড়াল পদাকৃতি; ঐ তারাগুচ্ছের নাম মৃগশিরা বা মৃগশীর্ষ (৪)

কালপুরুষমণ্ডলস্থ ১১।১৩।১৭তারা = মৃগশিরা নক্ষত্র। এণকতারা-যোগতারা (মৃগশিরা)

কালপুরুষ মণ্ডলস্থ আর্দ্রা নক্ষত্র।

কার্ত্তিকেয় তারার ৪ হাত পূর্ব্বে এবং এণকতারার ৩ হাত অগ্নিকোণে যে একটী

১। সাধারণতঃ নক্ষত্র শব্দে রবিমার্গের ৩৬০° অংশের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট ১৩⅓° অংশ বুঝিতে হইবে। তারা বর্ণনকালে নক্ষত্র শব্দে তারাসংহতি বুঝিতে হইবে।

২। সূর্য্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাতা দেবতার বাহন বৃষ।

"শিবাধিদৈবতং দেব অগ্নি প্রত্যাভি দৈবতং"
ইতি গ্রহযাগতত্ত্ব।

৩। রোহিণীর অধিপতি ব্রহ্মমণ্ডলস্থ অথবা মৃগরূপী কালপুরুষ।

৪। কালপুরুষমণ্ডলস্থ মৃগরূপী প্রজাপতির মস্তক।

৫। আর্দ্রানক্ষত্রে সূর্য্য প্রবেশ করিবা মাত্র অম্বুবাচির সূচনা হয়। অম্বুবাচির স্থিতি ৩ দিন ২০ দণ্ড। অম্বুবাচির সূচনার ৪র্থ দিনে দীর্ঘতম দিবা এবং হ্রস্বতম রাত্রি হয় এবং বর্ষাঋতুর আবির্ভাব হয়।

১ম শ্রেণীর রক্তবর্ণ তারা দর্শক দেখিবেন, ঐ তারাটীর প্রাচীন নাম বিশাখা আধুনিক নাম আর্দ্রা। আর্দ্রা কালপুরুষমণ্ডলস্থ ২ তারা। সৌন্দর্য্য-বলে আর্দ্রা স্বপ্রকাশে সমর্থ। এজন্য আর্দ্রা তারা এককই নক্ষত্র বলিয়া গণ্য।

বিশাখ তারা = আর্দ্রা নক্ষত্র

বিশাখ তারা = আর্দ্রা নক্ষত্রের যোগ তারা। আর্দ্রাতারা নামের সার্থকতা আছে।

মৃগব্যাধ মণ্ডলস্থ লুব্ধক তারা পূর্ব্বে আর্দ্রানক্ষত্র ছিল। পৌরাণিক সময়ে অয়নাংশগতি বলে লুব্ধক তারার আর্দ্রানক্ষত্রত্ব লোপ হয়। কালপুরুষ মণ্ডলস্থ বিশাখ তারাকে আর্দ্রানক্ষত্র পদে (৬) অভিষিক্ত করা হইয়াছে। স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ লুব্ধক আর্দ্রালুব্ধক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে। (৭)

৬। যে তারা অয়নান্ত বিন্দুর সহিত এক ধ্রুবকে অবস্থিতি করে, ঐ তারায় সূর্য্য উপনীত হইলে,বর্ষাগম হয় এবং ঐ তারাকে আর্দ্রা বলা হয়। অয়নান্তবিন্দু বিলোমগতি-বলে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে সরিতেছে এবং ক্রমে আর্দ্রা নক্ষত্রের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। অতি প্রাচীনকালে সরমা তারা (আধুনিক প্রভাষতারা) আর্দ্রানক্ষত্র ছিল, পরে তৎ-পুত্র শ্বা (লুব্ধক) আর্দ্রা হইয়াছিল ; এক্ষণে বিশাখাতারা আর্দ্রানক্ষত্র।

৭। একই তারার আর্দ্রানাম, এবং লুব্ধক নাম, অথবা অগ্রে আর্দ্রানাম পশ্চাৎ লুব্ধক নাম, এই অর্থে আর্দ্রা-লুব্ধক। কিন্তু পণ্ডিতবর হলায়ুধ স্বীয় কোষে বলেন— "আর্দ্রা লুব্ধকঃ কেতুগ্রহঃ।"

মিথুন রাশি।

মৃগশিরা নক্ষত্রের ১/২ অংশ, ও আর্দ্রা নক্ষত্র এবং পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের ৩/৪ অংশ দ্বারা মিথুনরাশি গঠিত। কিন্তু মিথুন রাশির আয়তন মধ্যে তারামিথুন (অশ্বিদ্বয় = বিষ্ণু-তারা + সোমতারা) অবস্থিত নহে। মিথুন রাশির আয়তন মধ্যে মৃগশিরা নক্ষত্রের তারাগণ এবং আর্দ্রা নক্ষত্রের তারা অবস্থিত। আদিমতারামিথুন কর্কটরাশিতে অবস্থিত। রাশিচক্রের আদিগঠনকালে তারা মিথুন অবশ্যই মিথুন রাশির আয়তন মধ্যে অবস্থিত ছিল। পুনর্গঠনকালে বাহিরে পড়িয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণোক্ত ঋশ্য-মৃগরূপী প্রজাপতি কালপুরুষ ও রোহিৎ মৃগ-রূপিণী রোহিণী, এই মিথুন হইতে বর্ত্তমান মিথুন রাশির নামের (৮) সার্থকতা কতকাংশে রক্ষা পাইয়াছে। কারণ মৃগশিরা

৮। ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ৬১ সূক্তের ৫—৯ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে—একদা প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বদুহিতার প্রতি ধাবমান হইলেন।

(কেহ বলেন দুহিতা অর্থে দিব কেহ বলেন ঊষা।) প্রজাপতি ঋশ্য মৃগরূপ ধারণ করিয়া রোহিৎমৃগরূপধারিণী স্বদুহিতার অনুসরণ করেন। দেবগণ তাঁহাকে দেখিয়া বলেন, প্রজাপতি অকার্য্য করিতেছেন, ইঁহাকে কে বধ করিবে। দেবগণের যে ঘোরতম আকৃতি ছিল তাহা সমবেত হইয়া এক দেবরূপ সম্ভূত হইল। ঐ সম্ভূতরূপ ভূতবৎদেব নামে অভিহিত। দেবগণ

নক্ষত্র মিথুন রাশির আয়তনের মধ্যগত বলিলেও বলাযায়; কিন্তু রোহিণী নক্ষত্র মিথুন রাশির আয়তন বহির্গত।

বৎকে বলিলেন প্রজাপতি অকৃতপূর্ব্ব কর্ম্ম করিলেন। ইঁহাকে বধকর। তিনি বলিলেন—তথাস্তু। তিনি পশুপতি হইবার প্রার্থনা করিলেন। দেবগণ-বরে তিনি পশুমান্ (বা পশুপতি) হইলেন। বাণবিদ্ধ প্রজাপতি ঊর্দ্ধে উঠিলেন। ইঁহাকে মৃগ বলে। ভূতবৎ মৃগব্যাধ। রোহিৎরূপ ধারিণী রোহিণী। সেই ইষু ত্রিসন্ধিময় বলিয়া তাহার নাম ত্রিকাণ্ড।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩।৩৩

শত পথ ব্রাহ্মণে দৃষ্ট হয়:—

প্রজাপতি স্বদুহিতার প্রতি আসক্ত হইলেন; স্বদুহিতা দিব বা ঊষা তাঁহার সহিত আমি মিলিত হই, এই [চিন্তা করিয়া] তিনি আসক্ত হইলেন। দেবগণের চক্ষে ইহা পাপ বলিয়া নিশ্চয় বোধ হইল। দেবগণ. চিন্তা করিলেন, যিনি স্বদুহিতার, আমাদিগের ভগ্নীর প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতেছেন, তিনি পাপে লিপ্ত। দেবগণ তখন পশুপতি [রুদ্র] দেবকে বলিলেন, যিনি স্বদুহিতার, আমাদিগের ভগ্নীর প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতেছেন তিনি পাপে লিপ্ত। নিশ্চয়ই "বাণে বিদ্ধ কর।" রুদ্র শর সন্ধানপূর্ব্বক তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন।

শতপথ ব্রাহ্মণ ১।৭ ৪।১—৩

মৃগশীর্ষ নক্ষত্রে গৃহী অগ্নি স্থাপন করিতে পারেন, কারণ মার্গশীর্ষ নিশ্চয়ই প্রজাপতির শিরঃ। শিরঃই শ্রী। শিরঃ অর্থেই শ্রেষ্ঠ। এই জন্য সমাজপতিকে শ্রেষ্ঠী বলে। অর্থাৎ তিনি সমাজের প্রধান। এতৎ সমস্ত জ্ঞাত থাকিয়া যিনি মৃগশিরা নক্ষত্রে অগ্নি স্থাপন করেন, তিনি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন।

অপরপক্ষে বলিতে পারেন, মৃগশীর্ষনক্ষত্রে অগ্নি স্থাপন ব্যবস্থা নহে। সত্য বটে মৃগশীর্ষ প্রজাপতির দেহ, কিন্তু যখন দেবগণ তদবস্থায় তাঁহাকে ত্রিকাণ্ড বাণে বিদ্ধ করিয়াছেন, তখন তিনি ঐ দেহ ত্যাগ করেন। শরীর আবরণ মাত্র, অপবিত্র ও নির্বীর্য্য; সুতরাং গৃহস্থের মৃগশীর্ষ নক্ষত্রে অগ্ন্যাধান বিধেয় নহে।

যাহাহউক, তিনি মৃগশীর্ষ নক্ষত্রে অগ্নি স্থাপন করিতে পারেন। কারণ প্রজাপতির দেহ শব বা অপবিত্র নহে।

শতপথ ব্রাহ্মণ ২।১।২।৮-১০

আমরা কেবল একটী কথা বলিতে চাই, এই ত্রিকাণ্ড বাণ পুরাণোক্ত পাশুপত বাণ।

৯। ঐতরেয় ব্রাহ্মণোক্ত মৃগরূপী কালপুরুষের মস্তক নক্ষত্র মধ্যে গণ্য হইবার পূর্ব্বে ইল্‌বলনক্ষত্র মৃগশীর্ষ স্থানীয় ছিল।

"ইল্‌বলাঃ তৎশিরোদেশে তারকাঃ নিবসন্তি যে।"

ইতি অমরকোষঃ।

"ইল্‌বলাঃ সোমদৈবত্যাঃ।"

ইতিগরুড়পুরাণ ১।৫৯

মিথুন রাশির তারাগণ মধ্যে —

১। স্বাহা তারা, অগ্নিতারার প্রায় ৫ হাত দূরে, অগ্নি কোণে অবস্থিত। এই স্বাহা তারা আদিম ইল্বল নক্ষত্রের যোগতারা। পঞ্চতারাত্মিকা প্রাচীন ইল্বল নক্ষত্রের অপর তারাচতুষ্টয় স্বাহা তারার পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। (৯)

২। স্বাহা তারার উত্তরেই পুতনা নামক কর্কটাকৃতি তারাস্তবক অবস্থিত।

কালপুরুষমণ্ডল।

মৃগশিরা নক্ষত্রের দক্ষিণে একটী তারাময় চতুর্ভুজক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ তারাচতুর্ভুজের উত্তর বাহু ৪ হাত, দক্ষিণ বাহু ৫ হাত, পূর্ব্ব বাহু ৮ হাত এবং পশ্চিম বাহু ১০ হাত দীর্ঘ। তারাচতুর্ভুজক্ষেত্রের অগ্নিকোণে কার্ত্তিকেয় তারা, ঈশান কোণে আর্দ্রাতারা, বায়ুকোণে কার্ত্তবীর্য্য এবং নৈর্ঋত কোণে একটী প্রথমশ্রেণীর অত্যুজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ তারা। ঐ তারার নাম বাণতারা। এ তারা চতুর্ভুজক্ষেত্রের মধ্যদেশে শরাকৃতি উজ্জ্বলতারাত্রয়। মৃগশিরা নক্ষত্র সহ এই তারা চতুর্ভুজক্ষেত্র কালপুরুষমণ্ডল নামে অভিহিত। কালপুরুষ মণ্ডল দেখিলে বোধহয়,নাভিদেশে শরবিদ্ধ মৃগ লক্ষপ্রদানে আকাশমণ্ডলে অবস্থিত রহিয়াছে। লোকে কালপুরুষমণ্ডলকে ত্রিশঙ্কুরাজ বলে। (১০)

মৃগব্যাধ মণ্ডল।

কালপুরুষ মণ্ডলস্থ তারাময়শর অগ্নিকোণে প্রসারিত করিলে ১২ হাত দূরে একটী নীলাভ শুভ্রবর্ণ অতি বৃহৎ তারা দর্শক দেখিবেন। এ তারার আদি নাম তিষ্য, প্রাচীন নাম স্বন্ ও লুব্ধক এবং এক সময়ে লুব্ধক আর্দ্রা নাম পাইয়াছিল। লুব্ধক ও তৎসন্নিহিত তারাচতুষ্টয় একটী তারাময় মহিষশৃঙ্গ গঠন করিতেছে। যে মণ্ডলে এই তারাশৃঙ্গ অবস্থিত, এ মণ্ডলের নাম মৃগব্যাধ মণ্ডল। লুব্ধক তারা মৃগব্যাধমণ্ডলের ১ তারা। লুব্ধক তারা তারাকুলের শিরোমণি। আয়তনে লুব্ধক সূর্য্য অপেক্ষা ৫০০ গুণ বৃহত্তর। প্রাচীনকালে লুব্ধক রক্তবর্ণ ছিল। কালবশে লুব্ধকতারা হীনাভ শুক্লবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাচীনকালে লুব্ধকতারা আর্দ্রানক্ষত্র বলিয়া গণ্য ছিল, এজন্য ইহার অপর নাম আর্দ্রালুব্ধক। কিন্তু লুব্ধক নামেই পরিচিত। মৃগব্যাধমণ্ডলের পাশ্চাত্য নাম বৃহৎকুকুর Canis majoris.

লুব্ধক-গ্রীস দেশে Cyon. (১১)
রোমকে Canis বা Canicula. (১২)
মিসরদেশে Sirus. "জ্বলন্ত"
ইংলণ্ডদেশে Dog star.
ইরাণে তিস্ত্র্য নামে খ্যাত। (১৩)

শুনী মণ্ডলস্থ ও কর্কটরাশিস্থ পুনর্ব্বসুনক্ষত্র।

আর্দ্রাতারা এবং লুব্ধক তারা পরস্পর ১২ হাত দূরে অবস্থিত। আর্দ্রা তারারপূর্ব্বে ১২ হাত দূরে আর একটী ১ম শ্রেণীর উজ্জ্বল তারা দর্শক দেখিতে পাইবেন; এ তারাটীর

"ইনবলাস্তু মৃগশিরঃ শিরস্থা. পঞ্চতারকা।"
ইতি হেমচন্দ্র।

১০। মহর্ষি বাল্মীকির মতে কালপুরুষ মণ্ডলই ত্রিশঙ্কুমণ্ডল। এই জন্য এই মণ্ডল জন-সাধারণে ত্রিশঙ্কুরাজ বলিয়া খ্যাত। রামায়ণ ১.৬০

১১। সংস্কৃত শ্বন্ শব্দে কুকুর, Gr. cyon.

১২। কুকুর তারা হইতে কুকুর দিন (Dog days) শব্দ হইয়াছে। গ্রীকগণ Dies caniculares, হিন্দুগণ অম্বুবাচি বলেন।

১৩। তিষ্য তারা ইরাণে তিস্ত্র্য নামে খ্যাত।

নাম প্রভাষ তারা। প্রভাষ তারা শুনীমণ্ডলে অবস্থিত। আর্দ্রাতারা, লুব্ধকতারা ও প্রভাষতারা এই তারাত্রয়ে একটী সুদৃশ্য সমবাহু ত্রিভুজ গঠন করিতেছে। ঐ প্রভাষ তারা ও তাহার বায়ুকোণস্থ ৪ হাত দূরস্থিত এবং উহা দেখিতে ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড সদৃশ। প্রত্যুষ তারা এবং প্রভাষ তারার উত্তরে ১২ হাত দূরস্থিত পাশ্চাত্য সোমতারা নামক একটী ১ম শ্রেণীর তারা ( ) ঐ সোমতারার ৪ হাত অন্তরে বায়ুকোণে হরিদ্বর্ণ বিষ্ণুতারা নামক যে তারা আছে, ঐ বিষ্ণুতারার দক্ষিণস্থ ৫ হাত দূরস্থিত অনিল তারা এবং অনিল তারার ৪ হাত দূরে নৈঋত কোণস্থ অনল তারা দর্শক দেখিতে পাইবেন। সোমতারা, অনিলতারা, অনলতারা, প্রত্যুষতারা, ও প্রভাষ তারা, এই পঞ্চতারায় একটী ধনুকাকৃতি গঠন করিতেছে। ঐ তারাময় ধনুকের নাম পুনর্ব্বসুনক্ষত্র। এই নক্ষত্রের দেবতা অদিতি। (ক)

কর্কট রাশিস্থ তিষ্য বা পুষ্যা নক্ষত্র।

পুনর্ব্বসুনক্ষত্রের পূর্ব্বদিকে যে মণ্ডলাকৃতি তারাস্তবক আছে, ঐ তারাস্তবকের আকার মধুচক্র সদৃশ, এজন্য উহার নাম মধুচক্র তারাস্তবক। এই তারাস্তবক ঈষৎ রক্তাভ এবং ইহার তারাগুলি ধূলি সদৃশ সূক্ষ্ম। তারাস্তবকের ব্যাস প্রায় ১ ফুট প্রভাষতারা ও সোমতারা হইতে মধুচক্র ৮ হাত দূরে অবস্থিত। তারাস্তবকের তারাপুঞ্জ এত ঘন ও ক্ষুদ্র যে, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিও নির্ব্বাচন করিতে অশক্ত। এই তারাস্তবকের ১ফুট দূরে অগ্নিকোণে ও ঈশান কোণে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর দুইটী ক্ষুদ্র তারা আছে; তারাদ্বয়ের নাম সুমিত্রা ( ) ও খর ( )। এই তারাদ্বয়ের যোগরেখা অগ্নিকোণে প্রসারিত করিলে, একটী ৪র্থ শ্রেণীর তারার পশ্চিম দিয়া ঐ সংযোগরেখা চলিয়া যাইবে। এই তারার নাম তোমর। তোমরতারা সুমিত্রা তারা হইতে ৪ হাত দূরে স্থিত। পাশ্চাত্য কর্কট রাশিস্থ ২তারার নাম তোমর, ৩ তারার নাম সুমিত্রা এবং ৪ তারার নাম খর, এই তারাত্রয় শরাকৃতি।

পাশ্চাত্য কর্কট রাশিস্থ ২।৩৪ তারা = পুষ্যানক্ষত্র।

সুমিত্রাতারা।—যোগতারা, পুষ্যা = এই নক্ষত্রের নাম তিষ্য। তিষ্য পুষণদেবতা বলিয়া তিষ্য পুষ্যা নামে খ্যাত।

পাশ্চাত্য কর্কটরাশিস্থ ৩।৪ তারা + মধুচক্র = কর্কটাকৃতি এবং এই কর্কট হইতে কর্কট রাশির নামকরণ হইয়াছে। কর্কটটী পূর্ব্বাভিমুখ।

কর্কটরাশিস্থ অশ্লেষানক্ষত্র।

খরতারা ও সুমিত্রা তারার সংযোগরেখা তোমরতারা অতিক্রম করিয়া পরিবর্দ্ধিত করিলে দর্শকের নেত্র একটী তারাগুচ্ছে নীত হইবে। এই তারাগুচ্ছে ৬ টী ক্ষুদ্র তারা দৃষ্টিগোচর হয়, তারাগুচ্ছের আকার।—

কর্কটরাশি।

পুনর্ব্বসুনক্ষত্রের ১ পাদ এবং পুষ্যা ও

(ক) অদিতির্দেবকী হ্যভূৎ। হরিবংশ।
দেবমাতা দেবকী। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে জন্মখণ্ডে।

অশ্লেষা নক্ষত্রদ্বারা কর্কটরাশি গঠিত। কিন্তু এই রাশিস্থ মধুচক্র নামক তারাস্তবক এবং পুষ্যানক্ষত্রের খর ও সুমিত্রাতারাদ্বারা কর্কট দেহ গঠিত। (১৪)

ক্রমশঃ।

আর্য্য কবিতা।*

ওঁ অগ্নি মীলে পুরোহিতং
যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং।
হোতারং রত্নধাতমং। ১
অগ্নিঃ পূর্ব্বেভি ঋষিভি
রীড্যোনূতনৈরূত।
স দেবাঁ এহ বক্ষতি। ২
অগ্নিনা রয়ি মশ্নবৎ
পোষমেব দিবে দিবে।
যশসং বীরবত্তমং ॥ ৩
অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং
বিশ্বতঃ পরিভূরসি।
স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি। ৪
অগ্নি র্হোতা কবিক্রতুঃ
সত্যশ্চিত্র শ্রব স্তমঃ।
দেবো দেবেভি রাগমৎ। ৫
যদঙ্গ দাশুষে ত্বমগ্নে
ভদ্রং করিষ্যসি।
তবেত্তৎ সত্যমঙ্গিরঃ। ৬
উপত্বাগ্নে দিবে দিবে
দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ং।
নমো ভরংন্ত এমসি। ৭
রাজং তমধ্বরাণাং
গোপামৃতস্য দীদিবিং।
বর্দ্ধমানং স্বে দমে। ৮
স নঃ পিতেব সূনবে
অগ্নে সূপায়নো ভব।
সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে ॥ ৯

অগ্নিদেবে করি আমি স্তব ;—
যিনি যজ্ঞ পুরোহিত, যিনিদীপ্তিমান্।
যিনি সে ঋত্বিক্ হোতা বহুরত্নবান ॥ ১
যিনি পূর্ব্ব ঋষিগণ-স্তুতির ভাজন,

১৪। কর্কট দশপদযুক্ত, এজন্য কর্কট উৎকলে দশরথ বলিয়া খ্যাত; আবার উঃপঃ অঞ্চলে সারস পক্ষী দশরথ নামে খ্যাত।

* আর্য্যগণই জগতের আদি কবি এবং তাঁহাদের কাব্যই জগতের প্রথম মহাকাব্য এ কথা এখন সর্ব্বত্র স্বীকৃত। সেই আদি কাব্য ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তটী এইবার অনুবাদ করিয়া দিলাম; শিক্ষিত মণ্ডলী যদি ইহা পাঠোপযোগী মনে করেন। তবে ক্রমশ অগ্রসর হইব নচেৎ এই পর্য্যন্ত। পাঠকবর্গের এস্থানে মনেরাখা কর্ত্তব্য যে, আর্য্যগণ যদিও অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে স্তব করিতেন, তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে একেশ্বরবাদী ছিলেন। এ কথা ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮২ সূক্তের তৃতীয় ঋকে ব্যক্ত হইয়াছে :—

"যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি
বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
যো দেবানাং নামধা এক এব তং সং প্রশ্নং
ভুবনা যন্ত্যন্যা॥

পরবর্ত্তী মনুসংহিতাতেও ইহা স্পষ্টতররূপে প্রকাশিত হইয়াছে :—

"এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনু মন্যে প্রজাপতিম্
ইন্দ্র মেকে পরে প্রাণ মপরে ব্রহ্ম শাশ্বতম্।"
মনুসংহিতা ১২। ১২৩

যাঁহারে করয়ে স্তুতি নব ঋষিগণ,
তিনি দেবগণে হেথা করুন বহন ॥ ২
অগ্নি যজমানে ধন করেন প্রদান
—প্রতিদিন পুষ্যমাণ হেতু বর্দ্ধমান্,
যশঃ আর বীর শ্রেষ্ঠে করে যেই দান। ৩
হে অগ্নি, সর্ব্বতঃ থাক যে যজ্ঞ অধ্বরে,
নিশ্চয় সে যজ্ঞ যায় দেবতৃপ্তি তরে ॥ ৪
হোতা, যজ্ঞকারী, আর সত্য পরায়ণ
বিচিত্রকীর্ত্তিসংযুত, সহ দেবগণ
করুন এ যজ্ঞে অগ্নিদেব আগমন ॥ ৫
যে কল্যাণ কর তুমি হব্য প্রদাতার,
অগ্নে, অঙ্গিরস, তাহা সত্যই তোমার ॥ ৬
আসিতেছি দিনে দিনে নিকটে তোমার,
দিবা রাত্র মনঃ সহ করি নমস্কার ॥ ৭
যজ্ঞের রক্ষক তুমি, তুমি দীপ্যমান্
যজ্ঞ দীপ্তিদাতা যজ্ঞাগারে বর্দ্ধমান ॥ ৮
পুত্র কাছে পিতৃবৎ, অনায়াস গম্য হও।
মোদের কুশলতরে মোদের সমীপেরও ॥ ৯

কস্যচিৎ বৈদিকস্য।

স্বরজ্ঞান

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

স্বরশাস্ত্রানুসারে কার্য্য করিতে হইলে এবং স্বরশাস্ত্রে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিবার ইচ্ছা থাকিলে, অগ্রে দুইটি বিষয় উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। ১ম—ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাম্নী নাড়ীর বিষয়। ২য়,—পঞ্চতত্ত্বের বিষয়। যেমন ব্যকরণ না পড়িলে সংস্কৃত শাস্ত্র অভ্যাস করিয়া ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার কি বুঝিবার উপায় নাই; তেমনি ঐ নাড়ী তিনটি ও পঞ্চতত্ত্বের বিবরণ অগ্রে প্রকৃষ্টরূপে পরিজ্ঞাত না হইলে, "অব্যাকরণ জনস্তক্তঃ" সদৃশ স্বরশাস্ত্রালোচনা বিফল। কেবল হাতড়ান সার। অধিক কি, ক, খ, ইত্যাদি অক্ষর পরিচয় না হইলে এবং স্বরবর্ণ ত্যাগ করিয়া ব্যঞ্জনবর্ণ অবলম্বনে ভাষা পড়িতে চেষ্টা করা যেমন হাস্যাস্পদ, তদ্রূপ নাড়ীজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান অগ্রে উত্তমরূপে না হইলে স্বরশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিবার চেষ্টা ও বিফল প্রয়াস এবং পক্ব বিল্বফলে বায়স-চঞ্চু-পুটাঘাতের ন্যায় উপহাসাস্পদ ও পণ্ডশ্রম মাত্র। একারণ এই দুই বিষয়ের পরিচয় প্রদান করিতেছি। পরে অন্যান্য ক্রিয়ানুষ্ঠান বলিব। এবার এই অংশটি পাঠকগণের কিছু নীরস বোধ হইবে; কিন্তু ইহাদ্বারা পরে সরসরস উপভোগ করিবার সুবিধা হইবে।

এখানে আর একটি কথা বলি। বেদান্ত শাস্ত্র ও স্বরশাস্ত্রে অধিক প্রভেদ নাই; ইহাতে অল্পই প্রভেদ দৃষ্ট হয়। স্বরশাস্ত্রে উক্ত আছে যে, স্বর হইতে ঋক্, যজু, সামাদি বেদ চতুষ্টয়, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ এবং স্বর হইতে গান্ধর্ব্বাদি সঙ্গীত বিদ্যা ও স্বর হইতেই তল, অতল, বিতল, রসাতল, পাতালাদি চতুর্দ্দশ ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে এবং স্বরই আত্মার স্বরূপ। প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসে 'হংস' উচ্চারিত হয়*। এই 'হং' শব্দ-

* হংকারো নির্গমে প্রোক্তঃ সকারস্তু প্রবেশনে।
হংকারঃ শিবরূপেণ, সকারঃ শক্তিরুচ্যতে ॥

মনুষ্যের শ্বাসপতন কালে হং ও শ্বাস

রূপী, আর 'স' শক্তিরূপিণী। এই প্রকৃতি পুরুষ সম্মিলনে হংস পরব্রহ্ম-প্রতিপাদক এবং সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কারণ। বৈদান্তিকদিগের মতেও ইহাকে পরমব্রহ্ম এবং হংস বীজরূপে উল্লেখ হইয়া থাকে। "যতোবা ইমানি ভূতানি" ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্য দ্বারা পরমব্রহ্ম হংসই উৎপত্তি স্থিতি ও লয় এই তিনের কারণ।

[ক্রমশঃ।]

গ্রহণ সময়ে স উচ্চারিত হয়। হং শিবরূপী ও স শক্তিরূপিণী।

এই হংসো বিপরীত উচ্চারিত হইলে সোহহং বুঝায়, জীব সর্ব্বদা তাহাই জপ করিতেছে।

সোহহং হংসপদেনৈব জীবো জপতি সর্ব্বদা।

সোহহং অর্থে সেই আমি, অর্থাৎ শিবশক্তিরূপ পরমব্রহ্ম আমি। হংস প্রতিপাদক পরমব্রহ্ম অভেদ শিবশক্তিরূপ। হংসের দুইপক্ষ আগম ও নিগম, পদদ্বয় শিবশক্তি, কণ্ঠ ও নেত্র কামকলারূপ। কামকলাতত্ত্ব অতি গুহ্য ও সাধারণের নিকট অপ্রকাশ্য। যোগী ও অধিকারী সাধক ব্যতীত অন্যের নিকট প্রকাশ করিলে, প্রকাশকের সর্ব্বনাশ হয়; ইহা শিববাক্য ও প্রত্যক্ষফল দৃষ্ট। কামকলাতত্ত্ব যথা সম্ভব প্রকাশযোগ্য, তাহা ও হংসের গূঢ় রহস্য মৎপ্রণীত "যোগের সোপান" নামক পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

হংস এই পরমমন্ত্র জীব সর্ব্বদা জপ করিতেছে। গতবারে বলিয়াছি যে, এক দিবারাত্রে মনুষ্যের ২১৬০০বার নিশ্বাস প্রশ্বাস হয়। উহাকে অজপাজপ কহে।

"একবিংশতি সহস্রং ষট্ শতাধিকমীশ্বরি।
জপতে প্রত্যহং প্রাণী সান্দ্রানন্দময়ীং পরাং।
বিনা জপেন দেবেশি জপো ভবতি মন্ত্রিণঃ।
অজপেয়ং ততঃ প্রোক্তা ভবপাশ নিকৃন্তনী।"

যতবার নিশ্বাস প্রশ্বাস হয়, ততবার 'হংস' পরমমন্ত্র অজপাজপ হয় এবং প্রত্যেক মনুষ্যের ২১৬০০ বার অজপাজপ হইয়া থাকে। ইহাই মানবের স্বাভাবিক জপ ও সাধনা। ইহা জানিতে পারিলে মালাঝোলা লইয়া আর জপ করিতে হয় না এবং উপবাসাদি কঠোর কায়ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না। দুঃখের বিষয় ইহার প্রকৃত তত্ত্ব ও সঙ্কেত না জানায় ও উপদেশাভাবে এমন সহজ জপ সাধনা কেহ বুঝেনা। মুখে 'সোহহং' বলিয়া বাহিরে কাছা খুলিয়া পরমহংস সাজো, কি রাজহংস সাজিয়া বেড়াও, ভিতরের হংসের প্রকৃত তত্ত্ব না জানিলে বাহিরে আড়ম্বর বৃথা। বড় বড় পেটমোটা নামজাদা পরমহংস দেখিতেছি যে, প্রকৃত হংসের কোন অংশ জ্ঞাত নহে, তাহাপেক্ষা হংস পরিজ্ঞাত ক্ষুদ্র পাতিহংস সাদা কাপড়ে আবদ্ধ থাকিলেও শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই।

মোক্ষদায়িনী অজপা দ্বিবিধ। যথা—ব্যক্তা ও গুপ্তা। ব্যক্তা অজপাজপের অঙ্গন্যাসাদি আছে; কিন্তু গুপ্তা অতি গুপ্ত, তাহাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। ইহার বিস্তারিত বিবরণ যোগার্ণব ও দক্ষিণমূর্ত্তি সংহিতা এবং কুল মূলাবতার কল্পসূত্র টীকায় বিবৃত আছে; কিন্তু অনেক বিষয় গুরুমুখগত। সুতরাং যোগিগুরুর নিকট শিক্ষা না করিলে কোন কায হয় না, এবং প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২৫ আইন মতে রেজষ্টীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৮ম বর্ষ, ৮ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা। | শ্রাবণ। | ১৩০৮ সাল, ১৮২৩ শকাব্দা।

স্বরজ্ঞান।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

"হংসঃ পরংব্রহ্মরূপঃ সাকারঃ শিবরূপকঃ।
হকারঃ শম্ভুরূপঃস্যাৎ সকারঃ শক্তিরুচ্যতে॥"

ইহাতে দেখাযাইতেছে যে, হং—চিৎকলা, চৈতন্য। সঃ সত্ত্ব, রজ, তম—এই ত্রিগুণময়ী শক্তি, মায়া ও জড়-স্বরূপা। এই শক্তিরূপিণী মায়ার শক্তি দুইটি। একটি বিক্ষেপ শক্তি; আর একটি আবরণ শক্তি। মায়াময়ী প্রকৃতি আবরণ শক্তি দ্বারা নির্ব্বিকার নিরঞ্জন ব্রহ্মকে আবৃত রাখিয়া বিক্ষেপশক্তি প্রভাবে তাহাকেই জগদাকারে দেখাইয়া থাকেন। চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে এই চরাচর বিশ্ব উদ্ভূত হইবার একমাত্র কারণ, ঐ মায়া-রূপিণী শক্তি প্রকৃতির বিক্ষেপ শক্তি সত্য স্বরূপ ব্রহ্মে জগৎ আভাষিত করিতেছে। প্রকৃতির শক্তি চৈতন্যে অনুপ্রবিষ্ট না হইলে ব্রহ্ম চৈতন্য থাকিতেও নিষ্ক্রিয়, আর প্রকৃতির সঙ্গে চৈতন্য সংমিলিত না হইলে, প্রকৃতি চৈতন্য-হীনা জড়স্বরূপা। এই জন্য প্রকৃতি-পুরুষ অভেদ চণকাকার। শক্তি রূপিণী মায়া সত্ত্ব, রজ, তম গুণে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও দুর্গা নামে অভিহিত হয়েন এবং তদুপহিত চৈতন্য বিষ্ণু ব্রহ্মা ও রুদ্র বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়েন।

বেদান্ত ও স্বর, যোগাদি-শাস্ত্র এবং তন্ত্রশাস্ত্রে প্রকার প্রণালী পৃথক হইলেও মূল উদ্দেশ্য ও বিষয় এক পরমব্রহ্ম। পরম-ব্রহ্ম প্রকৃতি পুরুষরূপে নানা নামে কথিত হইয়া থাকেন এবং উপাসনার প্রণালী বিভিন্ন মাত্র। এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা তান্ত্রিক-সাধক শুনিলেই—মদ্য মাংসাদি পঞ্চমকারের সেবক মনে করিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করতঃ সাধক ও তন্ত্র এবং পঞ্চমকারের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া কত কথাই বলিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর লোক

পণ্ডিত নামে সমাজে পরিচিত হইলেও বাস্তবিক অতিমূর্খ মহাপাপী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাহারা রীতিমত তন্ত্র অধ্যয়ন করে নাই, উপযুক্ত শিক্ষা পায় নাই, তাহারাই নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া ঘৃণা প্রকাশ করে। কোন শাস্ত্রে রীতিমত অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়া মতামত প্রকাশ করা মূর্খতার পরিচয়। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে আদ্যাশক্তি-কালীর সাধনাই ব্রহ্ম সাধনা এবং ব্রহ্মজ্ঞানই উপাসনার শ্রেষ্ঠতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অন্যান্য তন্ত্রে "হংস" পরমব্রহ্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্ম সাধনা যোগাদি ক্রিয়ার অতিচমৎকার উপদেশ আছে। যে তন্ত্রে মূর্ত্তি পূজার বিধি ও পঞ্চমকার সহযোগে সাধনের উপদেশ আছে, সেই তন্ত্র বলিতেছেন—

"কাষ্ঠ মধ্যে যথা বহ্নিঃ পুষ্পে গন্ধঃ পয়োঘৃতং।
দেহমধ্যে তথাদেবঃ পুণ্যাপাপবিবর্জ্জিতঃ।"
(গায়ত্রীতন্ত্র।)

কাষ্ঠ মধ্যে অগ্নি, ফুলে গন্ধ ও দুগ্ধে ঘৃত যেরূপ আছে, মানব দেহের মধ্যে সেইরূপ পাপপুণ্য বর্জ্জিত দেবতা রহিয়াছেন।

গায়ত্রী তন্ত্রোক্ত ঐ একটী মাত্র কথায় তন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করা যায়। উহাতেই বেদান্ত ও যোগের আভাষ পাওয়া যাইতেছে। আর "হংস" স্পষ্টতঃ বেদ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, তাহা অগ্রে বলিয়াছি। দুঃখের বিষয় আজ কাল সমগ্র তন্ত্র ও তন্ত্র-গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের অংশ প্রচলিত আছে; তাহার সমস্ত বিধি সর্ব্বদেশে ব্যবহার্য্য নহে। উহাদিগের ক্রান্তাদি দেশভেদে এবং অধিকারী ভেদে প্রযোজ্য। আমরা তাহা বলিয়া এবং কালের গতি অধিকারী ও লোকের মতি গতি, শরীর ও রুচি অনুসারে সাধন বিধি, পঞ্চমকারের উদ্দেশ্য কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। অথচ মদ্য মাংসাদির উল্লেখ দেখিয়া শুঁড়ির দোকানের মদ, জলের মাছ, কশাইয়ের দোকানের মাংস ইত্যাদি স্থির করিয়া বসি। সুতরাং কেহ-বা তন্ত্রোক্ত সাধনার নামে মদ্য, মাংস উদরগত ও শক্তিরূপিণী-বেশ্যা ক্রোড়গত করিয়া বসেন। কেহবা তন্ত্রের নিন্দা ও মহাযোগী মহেশ্বরকে পাপাচারের পথ প্রদর্শক অপদার্থ মনে করিয়া থাকেন। হায়! কালমাহাত্ম্যে তন্ত্র ও যোগ শাস্ত্র দুর্দ্দশার চরমসীমায় উপনীত হইয়াছে। তন্ত্র, যোগ ও স্বরশাস্ত্র* এবং চিকিৎসা ও জ্যোতিষ প্রত্যক্ষ ফলদায়ক সকল শাস্ত্র। শেষোক্ত দুই শাস্ত্রের সফলতা সকলেই নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছেন। প্রথমোক্ত তিন শাস্ত্রের সফলতা ও প্রত্যক্ষতা বর্ত্তমান কালে কলির গৃহস্থ সাধক বৃন্দের ভাগ্যে অতীব দুর্লভ। সুলভ হইবেই বা কিসে?

---

* স্বরোদয়শাস্ত্র তন্ত্রশাস্ত্রের অন্তর্নিবিষ্ট হইলেও নানা কারণে এখন পৃথক শাস্ত্র রূপে পরিণত হইয়াছে। তন্ত্র ও যোগশাস্ত্র লুপ্ত প্রায়।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা ভিন্ন, তন্ত্র শাস্ত্রে চিকিৎসার ব্যবস্থা ও অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ আছে। পারাদি ভস্ম ও দ্রব্যগুণে অতি সহজে স্বল্প সময়ে ধাতু আদি ভস্ম করিবার ও রসায়নাদি করিবার উপায় যাহা তন্ত্রোক্তমতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা অতি আশ্চর্য্য।

"মথিত্বা চতুরো বেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রাণি চৈব হি।
সারন্তু যোগিভিঃ পীতন্তক্রং পিবন্তি পণ্ডিতাঃ।"

সর্ব্বশাস্ত্রের সারভাগ যোগীরা গ্রহণ করেন; আর পণ্ডিতগণ ঘোল আহার করেন। —অসার ভাগ লইয়া বৃথা কচ্‌কচি করিয়া বেড়ান্। সুতরাং কূপমণ্ডুকের ন্যায় সহস্র বৎসর গৃহে বদ্ধ থাকিলে কিম্বা বারাম কোটী টোলে পড়িলেও উহা শিখিবার উপায় নাই। কেহ যদি পর্য্যটন করিয়া অনাহারে, অনিদ্রায়, বহু ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া যোগী ও সাধকের নিকট কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়া গৃহে আইসে, তবে সে ব্যক্তি সংসারী সদাশয়মহাশয়গণের নিকট দুর্ভাগ্য বলিয়া পরিচিত হয়। অধিকন্তু তাহার অন্নচিন্তা-চমৎকারিত্ব-গুণে সব হজম হইয়া যায়। তৎপ্রতি কাহারও সহানুভূতি নাই, কাহারও শিখিবার আগ্রহও নাই। বিশেষতঃ—

'স্বদেশ জাতস্য জনস্য লোকে গুণাধিকস্যাপি ভবেদবজ্ঞা।
গৃহাঙ্গনা যদ্যপি চারুরূপা তথাপি পুংসাং পরদারবাঞ্ছা।"

স্বদেশস্থ কোন ব্যক্তির গৃহস্থ জন দুর্ল ভ কোন বিদ্যা বা গুণ আয়ত্ত থাকিলে, তাহা দেশীয় লোকের উপেক্ষণীয় ও অনাদরণীয় হয়। এ বিষয়ের অধিক আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। অনুতাপে মর্ম্ম-দাহে ব্যথিতান্তঃকরণে অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। কেহ হয় তো বলিবেন, ধান ভানিতে শিবের গীত কেন? স্বমতে কার্য্য করিবার কথা বলিব, তাহাতে পেনেল সাহেবের রায়ের মত অবান্তর কথা কেন? ইহাতে পেনেলের মতন আমারও কৈফিয়ৎ।

ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার পরিচয়।

মানব দেহের মধ্যে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার নাড়ী সর্ব্ব-শরীর ব্যাপিয়া আছে। যথা—

'সার্দ্ধ লক্ষত্রয়ং নাড্যঃ সন্তি দেহান্তরে নৃণাম্।'

সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ী এইরূপ ভাবে রহিয়াছে যে,—

"যথাশ্বত্থদলে তদ্বৎ পদ্মপত্রেষু যা শিরাঃ।
নাড়ীভেতাসু সর্ব্বাসু বিজ্ঞাতব্যাস্তপোধন॥"

অর্থ।—অশ্বত্থ কি পদ্মপত্রে যে প্রকার শিরা সকল বিন্যস্ত থাকে, দেহমধ্যে সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ী তদ্রূপ সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

মনুষ্য-শরীরে যে ঘর্ম্ম নির্গত হইতে দেখাযায়, তাহা ঐ নাড়ী সকলের মুখ হইতে ক্ষরণ হয়। যথা—

"নাড়ী মুখানি সর্ব্বাণি ঘর্ম্ম-বিন্দুং ক্ষরন্তি চ।"

শরীরাভ্যন্তরস্থিত নাড়ীর ঘর্ম্ম সকল বাহিরে ত্বকের উপর প্রত্যেক লোমকূপের সহিত সংমিলিত এবং নাড়ী-মুখ হইতে ঘর্ম্ম নিঃসরণ হইয়া থাকে।

সার্দ্ধ তিন লক্ষ নাড়ীর মধ্যে নাভির অধোদেশে কুণ্ডলীস্থানকে * আশ্রয় করিয়া সর্পাকার বিংশতি নাড়ী অবস্থিত আছে। উহাদের মধ্যে ১০টি ঊর্দ্ধমুখী ও দশটি নিম্নমুখী রহিয়াছে। যথা—

* নাভির অধোদেশে যে কুণ্ডলী স্থানের কথা বলিলাম। ইহাতে কেহ যেন মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনী শক্তি না বুঝেন। কুণ্ডলী ও কুণ্ডলিনী শক্তি সম্পূর্ণ পৃথক এবং অব-

"নাভ্যধঃকুণ্ডলী--স্থানেভুজঙ্গাকার নাড়িকাঃ।
উর্দ্ধগা দশ নাড্যস্তু দশৈবাধগতাঃ স্থিতাঃ॥"

এই বিংশতি নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া ৭২০০০ নাড়ী সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া জীবনের আধারভূতা হইয়া আছে। এই সকল নাড়ীদ্বারা সর্ব্বদেহে বায়ু ও ভুক্ত-দ্রব্যের রস সঞ্চার হয়। তদ্ধেতু ইহাদিগকে ভোগবহা নাড়ী কহে। মনুষ্য অস্মাদি যাহা

স্থিতির স্থান বিভিন্ন। আজ্ কাল্ দেশ-কাল পাত্র সব নূতন রকম কিম্ভূত কিমাকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চিরকাল পক্ষী পাখালী খাইয়া স্বেচ্ছাহার বিহার করিয়া কেহ চক্রমিগুলিরূপ শীকা মস্তকে রাখিয়া, কি গৈরিক বসন পরিধান করিয়া হঠাৎ একেবারে গোঁড়া হিন্দু সাজিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বাহিরে শীকা, ভিতরে 'ফক্কা! উদ্দেশ্য—বক্তৃতার কেতায় লোক ভুলাইয়া ডঙ্কা মারিয়া কিঞ্চিৎ 'টাকা সংগ্রহ'—দৃষ্টান্ত ও প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব নাই। কেহ বা যোগের যো পর্য্যন্ত না জানিয়া কলিকাতা সহরে যোগে যাগে যোগের দোকান খুলিয়া আপামর সাধারণকে যোগ শিক্ষা দিতেছেন। কিন্তু প্রথমেই পঞ্চমুদ্রা প্রণামি না দিলে, যোগের দোকানে প্রবেশ করিবার যো নাই। অনেকেই আবার বাপের রাখা, মায়ের দেওয়া নাম ত্যাগ করিয়া প্রেমানন্দ, কেবলানন্দ, ভুঁরিয়া-নন্দ প্রভৃতি বিশ্রী, বিতিকিচ্ছি নাম গ্রহণ করিয়া গৈরিক বসন পরিধানে কাচা খুলিয়া যথেচ্ছাচার বিহার করিয়া বেড়াইতেছে এবং ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছে। আবার একদল রাতারাতি 'স্বামী' উপাধি গ্রহণ করিয়া সর্ব্বত্যাগী সাধু হইয়াছে; কিন্তু নিত্য প্রাতঃকালে সর্ব্বাগ্রে দুগ্ধ চিনি সংযুক্ত বা হালুয়া প্রচুর ভোজন; প্রাতঃ ভোজন রূপে পরিণত হয়। এই দল অতি চতুর চালাক! এই দলের অর্থোপার্জ্জন ও উদর-পোষণ ও শরীরের তৈয়ারি করাই প্রধান কারণ। ইহাদের গৈরিক বসন ও মুখের বচন শুনে অনেকগুলি গবারাম [illegible] ঢাকায় এই স্বামী দলের সম্পদ ও বিলাসিতা বৃদ্ধি হইতেছে। এখন নগরে, গ্রামে, হাটে, বাজারে, রেলগাড়ীতে, পথে সর্ব্বত্রই বাঙ্গালী যুবক যোগী, সাধু দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকেই বিনা গুরূপদেশে আপনাপনি একেবারে মহাযোগী ও তত্ত্ব-জ্ঞানী সাধু হইয়া পড়েন। কিন্তু ইহার মূল, ব্যবসায়ীর প্রকাশিত 'ঘেরণ্ডসংহিতা' প্রভৃতি মুদ্রিত পুস্তক একটু আধটু কি গীতা একটু ঘরে বসিয়া পড়িয়া হঠাৎ স্বয়ম্ভূসিদ্ধ মহাযোগী! পাঠকগণ! এই সকল কথা আমার কল্পিত বা অতিরঞ্জিত মনে করিবেন না। ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট অতি সত্য। বিনা গুরূপদেশে আপনাপনি মহা-যোগী ২।১ জনের জ্বালায় আমি মধ্যে মধ্যে জ্বালাতন হইয়া থাকি এবং অনেকের যোগশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা ও গুরূপদেশ বিনা স্বয়ং যোগীর পাগলামী অনেক দেখিয়াছি। যাহউক ঐ শ্রেণীর যোগী ও সবজান্তা পণ্ডিতগণ কুণ্ডলিনী একটি জিনিষ বুঝিয়া না বসেন। এই জন্য কুণ্ডলীর পরিচয় ও অবস্থিতির স্থান সংক্ষেপে বলিতেছি। বলা বাহুল্য কালে এই প্রবন্ধের শেষে পাঠকগণেরও লাগিবে।

"* * * * * নাভৌ চক্র সমুদ্ভবঃ।
দ্বাদশারযুতং তচ্চাস্তেন দেহং প্রতিষ্ঠিতম্।
তস্যোর্দ্ধং কুণ্ডলীস্থানং নাভেস্তির্য্যগ-
গধ্যূর্দ্ধতঃ।

অষ্ট প্রকৃতিরূপা সা অষ্টধা কুণ্ডলাকৃতিঃ।'

নাভি হইতে এক চক্র সমুদ্ভব হইয়াছে। উহার দ্বাদশ অর (পত্র), এবং উহাতেই সমস্ত শরীর প্রতিষ্ঠিত। এই চক্রের উর্দ্ধ-দিকে এবং নাভির তির্য্যক্, উর্দ্ধ ও নিম্ন

আহার করে, তাহা অপানবায়ু-কর্তৃক শরীর-মধ্যগত অগ্নির দ্বারায় পরিপাক ক্রিয়ার সম্পন্ন হইলে, প্রাণ বায়ু সমান নামক বায়ুর সহিত একত্র হইয়া ভুক্ত-অন্নাদির রস-সমূহকে অগ্নির সহিত ঐ ৭২০০০ নাড়ী-পথে শরীরের সর্ব্বস্থানে পরিচালিত করিয়া থাকে।

এই নাড়ীপুঞ্জ মধ্যে চতুর্দ্দশ নাড়ী শ্রেষ্ঠ। তাহাদের নাম যথা—

"সুষুম্নেড়া পিঙ্গলা চ গান্ধারী হস্তিজিহ্বিকা।
কুহূঃ সরস্বতী পূষা শঙ্খিনী চ পয়স্বিনী।
বারুণালম্বুষা চৈব বিশ্বোদরী যশস্বিনী
এতাসু তিস্রো মুখ্যাঃ স্যুঃ পিঙ্গলেড়া সুষুম্নিকাঃ।"

সুষুম্না, ইড়া, পিঙ্গলা, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা কুহূ, সরস্বতী, পূষা, শঙ্খিনী, পয়স্বিনী, বারুণী, অলম্বুষা, বিশ্বোদরী, যশস্বিনী। এই চতুর্দ্দশ নাড়ীর মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাম্নী তিন নাড়ী প্রধান ও শ্রেষ্ঠ। আবার এই তিন নাড়ীর মধ্যে সুষুম্না নাড়ীই সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ এবং মুক্তিমার্গে সাধনার প্রধান অবলম্বন।

দিকে কুণ্ডলীর স্থান। এই কুণ্ডলী অষ্ট প্রকৃতিরূপ অষ্ট কুণ্ডলাকৃতি।
নরপতি জয়চর্য্য। স্বরোদয়ে উক্ত আছে যে,—
"শরীর পুষ্ট্যর্থমেব নাভৌ কুণ্ডলী মাহ।
মহাশক্তিঃ কুণ্ডলী নাড়ীপাহি স্বরূপিণী।
ততো দশোর্দ্ধগা নাড্যো দশ চাধোগতা স্তথা।"

অর্থাৎ শরীরের পুষ্টির জন্যই নাভিতে কুণ্ডলী রহিয়াছে। এই কুণ্ডলীস্থান হইতে দশটি নাড়ী ঊর্দ্ধমুখী ও দশটি নাড়ী অধোমুখী হইয়া রহিয়াছে।

ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না ব্যতীত অপর একাদশ নাড়ী চক্ষ, কর্ণ, মুখ, উপস্থ প্রভৃতি এক এক স্থান অবস্থান পূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে। তদ্বিষয় চিকিৎসা প্রকরণে বলিব। এক্ষণ বিশেষ প্রয়োজনায় প্রধান তিন নাড়ীর কথা বলিতেছি।

মনুষ্যের প্রাণবায়ু (শ্বাস-প্রশ্বাস) যাহা নাসাপুট দিয়া বাহির হয় ও ভিতরে পুনঃ প্রবেশ করে, তাহা ঐ ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী-পথে গতায়াত করিয়া থাকে। ঐ নাড়ী ও তত্ত্বের দোষ-গুণেই যাত্রাদি সাংসারিক বৈষয়িক সকল কার্য্যের ভাল ও মন্দ ফল হইয়া থাকে। এই তিন নাড়ীর পরিচয় জানিয়া স্বরশাস্ত্রের উপদেশ পালন করিলে, শরীর সুস্থ থাকে ও মানুষ দীর্ঘজীবী হয়।

মানবদেহের পূর্ব্বদেশে যে মেরুদণ্ড দেখাযায়, তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুষুম্না নাড়ী অবস্থিত। আর মেরুদণ্ডের বামপার্শ্বে ইড়া নাড়ী ও দক্ষিণ পার্শ্বে পিঙ্গলা নাড়ী রহিয়াছে। মেরুদণ্ডের বাম পার্শ্বস্থিত ইড়া নাড়ী বাম নাসিকা পর্য্যন্ত গিয়াছে। দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত পিঙ্গলা নাড়ী দক্ষিণ নাসিকা পর্য্যন্ত গিয়াছে।

ইড়া নাড়ী—শক্তিরূপিণী এবং ইহাতে চন্দ্র অবস্থিতি করে। এজন্য ইহা সুধা-স্বরূপা। ইড়া নাড়ীর গুণ শীতল, স্থির-প্রকৃতি, স্ত্রীরূপা, এবং উত্তরায়না। বর্ণ, শঙ্খচন্দ্রাভা। শুক্লপক্ষ, সোম, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র এই চারিবারের এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের অধিপতি ইড়া নাড়ী। মেরুদণ্ডের বামপার্শ্বে স্থিত ইড়া নাড়ী

বামনাসিকা পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং বামনাসিকায় যে শ্বাসবহন হয়, তাহা ঐ ইড়া নাড়ী-পথে প্রবাহিত হয়। এজন্য বাম-নাসিকায় শ্বাসবহন সময় "ইড়ারবহন" "চন্দ্রচার" প্রভৃতি নামে কথিত হয়। পিঙ্গলানাড়ী সূর্য্যস্বরূপ, পুরুষ, দক্ষিণায়না। ইহার গুণ উষ্ণ, চর প্রকৃতি, বর্ণ-সিত-রক্তাভা, কৃষ্ণপক্ষ ও শনি, রবি, মঙ্গল এই তিন বারের এবং পূর্ব্ব ও উত্তর দিকের অধিপতি। পিঙ্গলানাড়ী মেরুদণ্ডের দক্ষিণ-পার্শ্বে থাকিয়া দক্ষিণ নাসিকা পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং দক্ষিণ নাসিকায় যে শ্বাসবহন হয়, তাহা ঐ পিঙ্গলা নাড়ী-পথে যাতায়াত করে। তজ্জন্য দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন কালের নাম "পিঙ্গলার বহন" 'সূর্য্যবাহ' ইত্যাদি নামে কথিত হয়।

সুষুম্নানাড়ী—অগ্নি স্বরূপা এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণুশিবাত্মিকা। মেরুদণ্ডের মধ্যে সুষুম্নানাড়ী রহিয়াছে। ক্ষণে বাম ও দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন হইলে, তাহাকে 'সুষুম্নার বহন' বলা যায়। এই সুষুম্নার বহন বড় অমঙ্গল জনক।

ইড়া ও পিঙ্গলার বহন সময় অর্থাৎ বাম ও দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন কালে যে ২ কার্য্য করা কর্ত্তব্য, তাহা পরে বলিব। এক্ষণ সুষুম্নার বহন কাহাকে বলে এবং সুষুম্নার বহনসময়ের কর্ত্তব্য নিয়ে বলিতেছি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, একবার বাম নাসিকায় এক ঘণ্টা ও একবার দক্ষিণ নাসিকায় এক ঘণ্টা পর্য্যায় ক্রমে শ্বাস বহন হইয়া থাকে। এক সময়ে যখন এক নাসিকায় শ্বাস বহিতে থাকে, তখন অন্য নাসিকায় নিশ্বাস খুব কমতেজে মৃদু বহিতে থাকে। আর এক নাসিকায় নিশ্বাস বহন এক ঘণ্টা পূর্ণ হইয়া যখন অন্য নাসিকায় বহন আরম্ভ হয়, তখন অতি অল্প সময়ের জন্য কখন বাম, কখন দক্ষিণ নাসিকায় ক্ষণিক নিশ্বাস বহন হয়, কিম্বা ঐ সময়ে ক্ষণকালের জন্য একেবারে দুই নাসিকায়ও সমানরূপে নিশ্বাস বহিতে থাকে। ইহাকে 'সুষুম্নার উদয়' বা সুষুম্নার বহন বলে। এরূপ সময় মনুষ্যের বিবিধ বিপদ, কলহ ও ক্ষতি নিশ্চয়ই হয় এবং যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে তাহার ফল বিপরীত হইবে। মনুষ্য-জীবনে যত কিছু অমঙ্গল হইয়া থাকে, তাহা সুষুম্নার প্রবাহেই সংঘটিত হয়।

"ক্ষণং বামে ক্ষণং দক্ষে যদা বহতি মারুতঃ।
সুষুম্না সা চ বিজ্ঞেয়া সর্ব্বকার্য্যহরাঽশুভা॥"

ক্ষণে বাম নাসিকায়, ক্ষণে দক্ষিণ নাসিকায়, নিশ্বাস বহিলে সুষুম্নার বহন বলা যায়। এরূপ সময় সর্ব্বকার্য্য নষ্ট হয় ও অশুভ জনক।

"ক্ষণং বামে ক্ষণং দক্ষে বিষমং ভাবমাদিশেৎ।
বিপরীত ফলং জ্ঞেয়ং জ্ঞাতব্যঞ্চ বরাননে॥"

যদি কখন নিশ্বাস একবার বাম ও একবার দক্ষিণ নাসায় ক্ষণে ক্ষণে বহন হয়, তবে তাহার বিপরীত ফল ফলিবে।

যদানুক্রমমুল্লঙ্ঘ্য যস্য নাড়ী দ্বয়ং বহেৎ।
তদা তস্য বিজানীয়াদশুভং সমুপস্থিতং॥

যাহার শ্বাসের নিয়ম ব্যতিক্রম হইয়া ইড়া ও পিঙ্গলায় বহন হয়, অর্থাৎ বাম ও দক্ষিণ উভয় নাসিকায় একেবারে নিশ্বাস বহন হইলে, তাহার অশুভ উপস্থিত জানিতে হইবে।

"উভয়োরেব সঞ্চারে বিষুবন্তং সমাদিশেৎ।
ন কুর্য্যাৎ ক্রূরসৌম্যানি তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ॥"

যখন দুই নাসিকায় এককালীন নিশ্বাস বহন হয়, তখন বিষুব যোগ বলে। এইরূপ সময় ক্রূর কিম্বা সৌম্য কোন কার্য্যই করিবেনা, করিলে সকল কার্য্যই নিষ্ফল হইবে সন্দেহ নাই।

যাঁহারা জ্ঞাত আছেন যে, দুই নাসিকায় সমানভাবে নিরত নিশ্বাস বহন হয়, তাঁহারা সে ভুল সংস্কারটী একেবারেই ভুলিয়া যাইবেন। দুই নাসিকায় সমানভাবে সর্ব্বদা নিশ্বাস বহিলে, বিঘ্নসঙ্কুল-সংসারে বিবিধ বিঘ্নজালে সতত জড়িত থাকিয়া দুঃখভোগ করিতে হয়, কচিৎ কখন দুই নাসায় নিশ্বাস বহন হইয়া থাকে, সে সময় কষ্ট, ক্ষতি, কার্য্যধ্বংশ, আশানাশ, বিবাদ প্রভৃতি যাহা কিছু অমঙ্গল নিশ্চয়ই ঘটিবে। এজন্ত সেরূপ সময়ের কর্ত্তব্য এই—

ঈশ্বর স্মরণং কার্য্যং যোগাভ্যাসাদিকর্ম্মসু।
অন্তৎ তত্র ন কর্ত্তব্যং জয়লাভসুখার্থিভিঃ॥

কচিৎ এক আধ মুহূর্ত্তের জন্ত যদি ঐরূপ সুষুম্নায় প্রবাহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে সময় কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া নির্জ্জন স্থানে বসিয়া ইষ্ট দেবতার স্মরণ ও যোগাভ্যাসাদি কর্ম্ম করিবে। ঐরূপ সময় অন্ত কোন কার্য্য করিবে না, কাহারও নিকট যাইবে না, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিবেনা।

উত্তান ভাবে শয়ন করিলে সুষুম্নার বহন হয়, এজন্ত চিৎ হইয়া শয়ন করিতে নাই, [illegible] ক্ষতি, অরিষ্ট, বিপদ প্রভৃতি যত কিছু অনিষ্টকর ঘটনা সুষুম্নার প্রবাহেই সংঘটিত হইয়া থাকে *। রাগের মত বালাই আর নাই, ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া লোকে কত অকার্য্য করিয়া থাকে। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চারিটির শত্রু ক্রোধ।

"অপরাধিনি চেৎ ক্রোধং ক্রোধে ক্রোধং কথং নহি।
ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাণাং চতুর্ণাং পরিপন্থিনি॥"

বাস্তবিক, ক্রোধোদ্দীপ্ত ব্যক্তি নিজের ও অপরের সর্ব্বনাশ করে, কিন্তু সুষুম্নার বহনের সময়ই চতুর্ব্বর্গের শত্রু ক্রোধ উপস্থিত হয়, একারণ কোন বিষয়ে বা কোন কারণে রাগ উপস্থিত হইলে, দক্ষিণ নাসিকা-

---

* বিষ্ণুপুর রাজবংশের আদি পুরুষ যিনি বাগদী রাজা নামে বিখ্যাত, তিনি বিষ্ণুপুরবাসী জনৈক ব্রাহ্মণের বাটীতে থাকিয়া গোচারণ করিতেন। এক দিন রাজোচিত কোন শুভ ঘটনা দৃষ্টে ব্রাহ্মণ বুঝিয়াছিলেন যে, এই বালক সামান্ত নয়, ভবিষ্যতে রাজা হইবেন। সেই দিনই নিজ স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন যে, রাখাল বালককে কোন প্রকার উচ্ছিষ্ট খাইতে দিও না এবং এই বালকের উপর কোন রূপ অসদ্ব্যবহারাদি করিও না, আর ঐ বালককে চিৎ হইয়া শয়ন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ স্বরজ্ঞানী ছিলেন বলিয়া চিৎ হইয়া শয়ন করিতে বারণ করিয়াছিলেন। কারণ, সুষুম্নার বহন সময় শুভক্ষণ, লগ্ন নষ্ট হইয়া ভবিষ্যতে রাজসিংহাসন প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক হইবে। সত্যই, ঐ বাগদী নামে পরিচিত ক্ষত্রিয় বালক বিষ্ণুপুরে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া টীকাধারী রাজা হইয়াছিলেন এবং তিনিই বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

বন্ধ করিয়া, বাম-নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত করিবে। তাহা হইলে খুন করিবার মত মহাক্রোধ উপস্থিত হইলেও অতি শীঘ্রই নিবৃত্ত হইয়া যাইবে, আর কোন অনর্থ ঘটিবে না।

(নিশ্বাস পরিবর্তনের উপায়াদি পরে বলিব।)

যে পর্য্যন্ত বলা হইল, ইহাতে পাঠকগণ ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার অবস্থিতির স্থান, বহন ইত্যাদি বুঝিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। শারীরিক ও বৈষয়িক সমস্ত কার্য্য কোন নাড়ীর বহন সময় কি ভাবে করিলে, সকল কার্য্য সিদ্ধি হইবে, তাহা পরে বলিব। এক্ষণ ঐ নাড়ী সম্বন্ধে আর একটি বিষয় বলিতেছি।

ইড়া নাড়ীকে পিতৃযান ও পিঙ্গলা নাড়ীকে দেবযান বলে যথা—

ইড়া চ বাম নিশ্বাসঃ সোমমণ্ডলগোচরা।
পিতৃযান মিতিজ্ঞেয়া বামমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি।'

যে নাড়া দ্বারায় বাম নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হয়, তাহার নাম ইড়া। ইহাকে পিতৃযান কহে।

যে যোগী ইড়া নাড়ীতে সাধনা করেন, তিনি জীবনান্তে পিতৃলোক পথে গমনকরিয়া চন্দ্র লোক প্রাপ্ত হন এবং কর্ম্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত চন্দ্রলোকে অবস্থিতি করেন। কর্ম্মক্ষয় হইলে পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।

পিঙ্গলা নাড়ীকে পিতৃযান কহে। যথা—

দক্ষিণ পিঙ্গলা নাড়ী সূর্য্যমণ্ডলগোচরা।
দেবযান মিতি জ্ঞেয়া পুণ্যকর্ম্মানুসারিণী।

যে নাড়ী দ্বারায় দক্ষিণ নাসিকাতে শ্বাস প্রবাহিত হয়, তাহার নাম পিঙ্গলা। ইহা সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় তেজোময় এবং পুণ্য কর্ম্মানুসারিণী। ইহাকে দেবযান কহে।

যে সাধক পিঙ্গলা নাড়ীতে সাধনা করেন, তিনি দেবলোক পথে ক্রমে ক্রমে যাইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু পিঙ্গলা সাধকের বা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তজীবের আবার মর্ত্তে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। কেন না, ব্রহ্মলোকও অনিত্য। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকা পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।"

"হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক হইতে সমস্ত লোকই অনিত্য, সুতরাং তত্তৎ লোকগত জীবের পুনরাবর্ত্তন হইয়া থাকে। কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হইলে, জীবের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।"

গীতা বাক্যেও ব্রহ্মলোক অনিত্য প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু কোন হঠাৎযোগী গীতার অনুবাদে ওস্তাদি করিয়া বলিয়াছেন যে—'পিঙ্গলা সাধনকারী ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত সাধকের আর পুনরার্ত্তন হয় না: ইত্যাদি।" ঘরে বসিয়া মুদ্রিত পুস্তক একটু আধটু পড়িয়া আপনাপনি জ্ঞানী যোগী সাজিলে উঁহার অধিক তত্ত্ব জানিবার ও জ্ঞান লাভ করিবার উপায় নাই।

যাহাহউক, যোগিগণ কঠোরজঠর যন্ত্রণাভয়ে পিঙ্গলা সাধন ও ব্রহ্মলোক কমন করেন না। তাঁহারা সুষুম্নার সাধন করিয়া থাকেন। কারণ—

মুক্তিমার্গেতু সা প্রোক্তা সুষুম্না বিশ্বধারিণী।
(যোগ স্বরোদয়)

সুষুম্নাই মুক্তির মার্গ স্বরূপ। যে ব্যক্তি

পূর্ব্ব-সুকৃতি বলে উপযুক্ত গুরু লাভ করিয়া সুষুম্নার সাধন শিখিয়াছেন, তিনিই কৃতার্থ হইয়াছেন, অর্থাৎ সুষুম্না সাধনকারী ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

"সুষুম্নায়াং ভবেন্মোক্ষঃ" সুষুম্না যে মোক্ষ-দায়িনী ইত্যাদি যোগ-স্বরোদয়ে অনেক বার উক্ত হইয়াছে। সুতরাং মুক্তি মার্গে সুষুম্না দাত্রী। নিষ্কাম কর্ম্ম প্রভৃতি মুক্তির সোপান বলিয়া যে সকল শাস্ত্র বাক্য আছে, তাহা প্রবৃত্তি ও ভক্তি-উদ্দীপক মাত্র। নিষ্কামী হইলে মুক্তি হয় বটে; কিন্তু মনুষ্যের মধ্যে নিষ্কামী ও নির্ম্মম কেহ আছে কি? জটাধারী সন্ন্যাসী সুদূর নির্জ্জনবনে বসিয়া আছেন, তিনি কি মুক্তির উপযোগী-কামনা ও মায়া শূন্য হইয়াছেন? কখনই না। যতক্ষণ পাঞ্চভৌতিকদেহে জীবাত্মা বাস করিবেন, ততক্ষণ জীব-কামনা ও মায়া শূন্য হইতেই পারে না এবং কাম, ক্রোধাদি প্রবৃত্তিনিচয় কখনই ধ্বংশ হইতে পারে না। সুতরাং সুষুম্না সাধন ব্যতীত মুক্তির উপায় নাই। এই সুষুম্না ও শম্ভুরূপা চ, শম্ভুর্হংসঃ স্বরূপক। হংসের পরিচয় অগ্রে বলিয়াছি।

সুষুম্না সম্বন্ধে যাহা ইঙ্গিত করিলাম, এ রসের রসজ্ঞ (যোগী ও স্বরসাধক) পাঠক বুঝিয়া লইবেন। যাঁহারা ঐ রসে বঞ্চিত, তাঁহারা স্বরজ্ঞ—যোগী গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণ করিবেন। ফলকথা, পূর্ব্ব সুকৃতি ফলে প্রাণের ঐকান্তিকী ব্যাকুলতা হইলে, গুরুর কৃপায় উপযুক্ত গুরু আপনিই ধরা দেন। তদ্ভিন্ন প্রকৃত গুরু লাভ হয় না। অতএব প্রাণের আগ্রহ ও ব্যাকুলতা চাই।

সুষুম্নাকে জ্ঞানজননী দাত্রী কহে।

সুষুম্না বাক্যের ঈশ্বরী, এজন্য সুষুম্নার নাম বাগীশ্বরী এবং জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী। শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া কথা কহিতে পারে না, তাহার কারণ, সুষুম্নার বিকাশাভাব। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সহিত ক্রমে সুষুম্না হইতে শ্লেষ্মা অপসারিত হয়, আর সেই সঙ্গে সুষুম্নার ক্রমবিকাশ হইয়া বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতে থাকে।

দাত্রী সম্বন্ধে যে পর্য্যন্ত প্রকাশ যোগ্য, তাহা প্রকাশ করিলাম। এক্ষণ দশ বায়ুর রূপ বলিব।

দশ বায়ুর রূপ।

১। প্রাণ,—"ইন্দ্রনীল প্রতী কাশং
প্রাণ রূপং প্রকীর্ত্তিতং।"

প্রাণ বায়ুর রূপ পদ্মরাগমণি নামক বিখ্যাত মণির বর্ণ ও জ্যোতির ন্যায়। পদ্মরাগমণির বর্ণ ইন্দ্রনীল সদৃশ। বিশ্বসারে উক্ত আছে, "প্রাণ আদৌ হৃদিস্থানে পদ্মরাগ-সমদ্যুতিঃ।"

২। অপান—ইন্দ্রগোপ প্রতীকাশং (১)
সন্ধ্যা-জলদ—সন্নিভং।

অপান বায়ু কাপাসিয়া পোকার ন্যায় রক্ত বর্ণ, কিম্বা সূর্য্যাস্ত হইবার সময় সন্ধ্যা

---

(১) ইন্দ্রগোপো—রক্ত বর্ণ কীট বিশেষঃ।
কাপাসিয়া পোকা ইতি ভাষা।

বর্ষাকালে কাপাসিয়া পোকা অধিক দৃষ্ট হয় এবং রক্তবর্ণ কাপাসিয়া পোকা একস্থানে অনেক গুলি একত্রিত থাকে, পল্লীবাসী ব্যক্তিগণ তাহা দেখিয়াছেন, সন্দেহ নাই। ধান্যের গাছের তুলনা করিতে অভি-লাষী ধান-গাছের বায়ুর অনুক্রমে অদৃষ্ট ও জ্ঞানাতীত।

কালে পশ্চিম আকাশে যে রক্তবর্ণ মেঘ দৃষ্ট হয়, তাহার ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট।

৩। সমান—গোক্ষীর সদৃশাকারঃ সর্ব্বদেহে ব্যবস্থিতঃ।

সমান নামক বায়ু গোদুগ্ধের ন্যায় ধবলাকার।

৪। উদান—উদানো নাম মারুতঃ বিদ্যুৎ পাবক-বর্ণঃ স্যাৎ।

উদান বায়ুর রূপ বিদ্যুদগ্নি সদৃশ।

৫। ব্যান—মহারজত সঙ্কাশঃ (২) সর্ব্বব্যাধি প্রকোপনঃ।

ব্যান বায়ুর রূপ স্বর্ণের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট এবং ব্যানবায়ু সর্ব্বব্যাধি প্রকোপক।

৬। নাগ—উদগারে নাগ ইত্যুক্তো নীলজীমূত সন্নিভঃ।

নাগ বায়ুর রূপ নীলমেঘের ন্যায়।

৭। কূর্ম—উন্মীলনে স্থিতঃ কূর্ম্মো ভিন্নাঞ্জনসমপ্রভঃ।

কূর্ম নামক বায়ুর রূপ গাঢ় কজ্জলের সদৃশ।

৮। কৃকর—ক্ষুৎকর শ্চৈব জবাকুসুম-সন্নিভঃ।

কৃকর নামক বায়ুর রূপ জবাফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ। এবং ইহার কার্য্য ক্ষবথু (হাঁচি)

৯। দেবদত্ত—বিজৃম্ভণে দেবদত্তঃ শুদ্ধ-স্ফটিকসন্নিভঃ।

দেবদত্ত বায়ুর রূপ বিশুদ্ধস্ফটিকের বর্ণ বিশিষ্ট এবং মনুষ্যের মুখে যে হাই উঠে, তাহাই এই বায়ুর কার্য্য।

১০। ধনঞ্জয়—ধনঞ্জয় স্তথা ঘোষে মহারজত-বর্ণকঃ।

ধনঞ্জয় নামক বায়ুর রূপ বিশুদ্ধ স্বর্ণ বর্ণ সদৃশ। (৩)

(২) মহারজতং—কাঞ্চনং।

(৩) ধনঞ্জয় ও ব্যান বায়ুর রূপ একই প্রকার স্বর্ণ-বর্ণ হইয়াছে। ইহাতে অনেকের মনে তর্ক সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে, আবশ্যক সময়ে ব্যান কি ধনঞ্জয় বায়ু নির্দ্দিষ্ট করিবার উপায় কি? কিন্তু এখনকার প্রচলিত ধরণে পুথিগত বিদ্যা কিম্বা বিনা গুরূপদেশে স্বয়ং যোগী হইলে উপায় নাই। এই স্বরোদয় শাস্ত্র ও যোগাদি যোগীগুরুর নিকট শিক্ষা করিতে হয়। গুরু মুখে শিক্ষা হইলে, শরীরের স্থান ও কার্য্য বিশেষে এক বর্ণ বিশিষ্ট ঐ দুই বায়ুর পার্থক্য বুঝা যায়। তদ্ভিন্ন মুদ্রিত শাস্ত্র পড়িয়া কি স্বয়ং হঠযোগী সাজিলে বুঝিবার উপায় নাই।

এই দশ বায়ু মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সমস্ত জীবশরীরে রহিয়াছে। আর প্রথমোক্ত পঞ্চ বায়ু ও পঞ্চতত্ত্ব জীব-দেহের ন্যায় পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থে বিদ্যমান আছে। অধিক কি, স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের প্রত্যেক বর্ণের পঞ্চ বায়ু ও পঞ্চতত্ত্ব রহিয়াছে। যথা—

"ককারস্যোর্দ্ধকোণেষু প্রাণবায়ুঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
অপানো বামভাগেচ সংস্থিতশ্চ সদা প্রিয়ে।
সমানো দক্ষিণে কোণে শুদ্ধস্ফটিক-সন্নিভঃ।
উদানস্ত্বঙ্কুশাকারে মাত্রায়াং ব্যান এব চ॥"

ককারের উর্দ্ধ কোণে প্রাণ বায়ুঃ প্রতিষ্ঠিত। বামভাগে অপান বায়ু ও দক্ষিণ কোণে শুদ্ধ স্ফটিক সদৃশ সমান বায়ু এবং অঙ্কুশে উদান বায়ু, আর ব্যান বায়ু মাত্রাতে অবস্থিত।

দশ বায়ুর কার্য্য ও অবস্থিতির স্থান চিকিৎসা প্রকরণে বলিব।

পাঠকগণের অবগতির জন্য কেবল 'ক' অক্ষরের পঞ্চ বায়ু বলিলাম। প্রত্যেক অক্ষরে এইরূপ পঞ্চবায়ু ও পঞ্চতত্ত্ব আছে। তদ্বিস্তারিত বিষয় বর্ণোদ্ধার তন্ত্র প্রভৃতি তন্ত্রে আছে; কিন্তু ইহার গুঢ়রহস্য তত্ত্বজ্ঞ যোগীর নিকট জানিতে হয়।

উপরে দশ বায়ুর রূপ বলিয়াছি; কিন্তু সকলেই জানেন বায়ুর কোন রূপ নাই। এখন বিজ্ঞান বলে কত কি আবিষ্কার হইতেছে, কিন্তু বায়ুর রূপজ্ঞান কিম্বা রূপদর্শন বর্ত্তমানবিজ্ঞানবিদগণের জ্ঞানাতীত। ভারতবর্ষের প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে দশ বায়ুর রূপ নির্ণয় করিয়াছিলেন। যদি কোন বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি বলেন যে, উহা ঋষিগণের কল্পনা প্রসূত; উহার কোন অস্তিত্ব নাই। কিন্তু একথা কেমন করিয়া বলিব?

মনুষ্য শরীরে কোন চর্ম্মরোগ হইলে, চিকিৎসকগণ রক্ত বিকৃতি কারণ বলিয়া তৈল ও ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া থাকেন এবং বহুদিন তৈলমর্দ্দন ও ঔষধ ব্যবহার করাইয়া থাকেন। তাহার ফল নিঃসন্দেহ ভাবে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ, হয় তো কিছু দিন রোগ অদৃশ্য হইয়া যাপ্য থাকে। কিন্তু স্বরজ্ঞ যোগিগণ বায়ুর রূপানুসারে রোগের কারণ নির্ণয় করিয়া থাকেন এবং যে বায়ুর রং বিকৃত হইয়া কিম্বা যে বায়ুর স্বরাধিক্য বশতঃ পীড়ার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া অপূর্ব্ব কৌশলে রোগারোগ্য করিয়া থাকেন এবং রোগ সমূলে নির্ম্মূল হয়। ডাক্তার ও কবিরাজগণ যে সমস্ত পীড়ার কারণ বায়ু [illegible] রক্তের বিকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, ঐ সকল এবং অন্যান্য বাতজ, রক্তজ পীড়ায় যোগিগণ দশ বায়ুর রূপ ও পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্বের রূপ ও গুণানুসারে আশ্চর্য্য উপায় দ্বারা অতি সহজে রোগারোগ্য করিয়া থাকেন। তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। সুতরাং কিরূপে বলিব যে, বায়ুর রূপ কল্পনা প্রসূত। প্রকৃত উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া অভ্যাস করিলে, দশ বায়ুর ও পঞ্চতত্ত্বের রূপ যখন প্রত্যক্ষ করাযায়; তখন কোন্ সাহসে বলিব যে উহা কল্পনা মাত্র। যে সকল প্রাতঃস্মরণীয় অলৌকিক ক্ষমতাশালী মহাত্মগণ সংসারের সুখ ও ভোগৈশ্বর্য্য তৃণবৎ ত্যাগ করিয়া শ্বাপদ-সঙ্কুল গহনবনে ও সুদূর হিমালয়ের হিম-গহ্বরে অবস্থিতি করিতেন, সেই ধর্ম্মপরায়ণ ভগবদ্‌ভক্ত ঋষিগণ আমাদের জন্য শাস্ত্রে কল্পনাবলে মিথ্যা-কথা বলিয়া গিয়াছেন কি? এখন পাশ্চত্য দেশে এ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, ক্রমোপ্যাথি প্রভৃতি কত রকম বিরকম চিকিৎসা তত্ত্ব আবিষ্কার হইয়াছে; কিন্তু ভারতবর্ষের বনবাসী ঋষিগণ যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অন্য কোন দেশবাসী সভ্যগণ অদ্যাপি জানিতে পারেন নাই। বাস্তবিক, বায়ুর রূপ জানিতে পারিলে চর্ম্ম পীড়া (Skin deases) ও চক্ষু পীড়া অতি সহজে আরোগ্য করা যায় *। আজ কাল ইউরোপ

---

* দুঃখের বিষয়, বায়ুর রূপ ও পীড়ার কারণ নির্ণয় ইত্যাদি শিক্ষা ও সাধ্যায়ত্ত হইলেও চিকিৎসা বিষয়টা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে, পারি নাই। পারি [illegible] সাধ্যাতীত বলিয়া নহে। পরমারাধ্য [illegible] জননীর অপার্থিব স্নেহ মমতা [illegible]

প্রদেশে কোন একটি তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইলে আমরা বাহবা বলি, আর সেই দিকে দৌড়িয়া মরি! আমাদের ঘরে কি আছে, তাহা দেখি না; দেখিতে বুঝিতে চেষ্টাও করি না। ইংলণ্ডের অস্তিত্ব প্রকাশ হইবার বহু পূর্ব্বে ভারতবাসী কর্ত্তৃক পাতালোক বিদিত ছিল এবং পাতালের নাম 'পুষ্করদ্বীপ' বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ভাস্করাচার্য্যের 'চলাপৃথ্বী স্থিরাভাতি' ইত্যাদি ভারতবাসীর অবিদিত ছিল না। অধুনা ইহা কয়জনে জ্ঞাত আছেন? ভারতে না ছিল কি? জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ, শিল্পাদি যাহা ছিল, তাহার তুলনায় পৃথিবীর কোন দেশ অদ্যাপি সমকক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু হায়! বিজাতীয় শিক্ষায় আমাদের মস্তিষ্ক বিকৃত, চাল চলন অশন, বসন সবই বিকৃত, আর্য্য-তেজ, কার্য্য বল, বুদ্ধি ও ধর্ম্ম, ভক্তি, শাস্ত্র, অনুষ্ঠান সকলি বিদূরিত। আমাদের ঘরে কি আছে দেখিনা, নিজস্ব মহার্ঘ জিনিষের মূল্য জানি না—গৌরব বুঝি না, দেবোপম পূর্ব্ব পুরুষগণের অলৌকিক ক্ষমতা জানি না, তাঁহাদের বিধি নিষেধ মানি না। কি পরিতাপ! জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতির অনন্তভাণ্ডার সর্ব্বদেশের শীর্ষস্থানীয় ভারতবর্ষে এখন বিদেশী বিজাতি বিধর্ম্মী কেহ কচিৎ হিন্দু ধর্ম্মের শাস্ত্রের এক আধটুক টুকী ব্যাখ্যা করিতেছে, তাহা শুনিয়া আমরা মোহিত স্তম্ভিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি। আমরা কশ্যপ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি ঋষিগণের গোত্রোৎপন্ন। শাস্ত্র অশ্রদ্ধা করিয়া শাস্ত্র বাক্যে অবিশ্বাস করিয়া শারীরিক মানসিক বল, ধর্ম্ম হারাইয়া ক্রমে বিকৃত কিমাকার ঘৃণিত জীব হইতেছি এবং সর্ব্বজাতি অপেক্ষা সর্ব্বপ্রকার নিকৃষ্ট ও নিন্দনীয় হইতেছি। একি কম বিড়ম্বনা! আহা! কালের গতি অতি কুটিল, ঘাট অঘাট ও অঘাট ঘাট হইয়া উঠিতেছে। আমাদের কি ছিল কি হলো, আরো বা না কি হয়! ভারতবাসিগণ! আগে ঘর রক্ষা কর, পরে বাহিরে চেষ্টা কর। আর্য্য শাস্ত্র বিশ্বাস কর, লুপ্ত প্রায় গুপ্তশাস্ত্রের উদ্ধার কর, ধর্ম্ম-বন্ধন দৃঢ় কর, ধর্ম্মে মতি রাখিয়া ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া শিথিল সমাজ, ছিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম, অবনমিত জাতীয় আচার ব্যবহার একত্রিত কর, দেখিবে সর্ব্ব বিষয় সমুন্নত হইবে, হিন্দু ধর্ম্মের গৌরব [illegible]

দুঃখ-সন্তাপ-হারিণী জড়-জীবনের মহাশক্তি-স্বরূপিণী সদাসরলা সহধর্ম্মিণীর অকৃত্রিম ভক্তি, ভালবাসা, আত্মিক অংশ যাহার পূর্ণ বিকাশ প্রাণাধিকা কন্যার মায়া ভুলিয়া, সংসারের প্রচুর প্রলোভন হইতে দূরে থাকিব এবং মানব জীবনের চরম লক্ষ্য-পথে চিরদিন বিচরণ করিব আশা ছিল। সুতরাং ঐ বিষয় আলোচনা করিবার প্রয়োজন অত্যধিক মনে করি নাই, সংসারে পুনঃ প্রবেশের ইচ্ছাও করি নাই। কিন্তু হায়! মনুষ্যের সব ইচ্ছা কবে পূর্ণ হয়? আর যাহা কখন চিন্তা করি নাই, কল্পনায় আইসে নাই, স্বপ্নেও ভাবি নাই, তাহাই হইয়াছে। সন্ন্যাস লইয়া জীবনের সর্ব্বস্ব আশাকে বিসর্জ্জন দিব বলিয়াছি, বিধাতা বুঝি আবার সংসারের প্রত্যাবর্ত্তন করাইলেন। এখন ভাবিতেছি, তখন যদি যত্ন পূর্ব্বক উহা শিখিতাম, তবে অনেক কার্য্যে লাগিত। কিন্তু সকল যোচনা নাহি। বস্তুতঃ যেখা [illegible] আছে, তাহা চিকিৎসা প্রকরণে বলিবার [illegible]।

হইবে; হিন্দু নামের মহিমা পুনরুদ্দীপ্ত হইবে।

পঞ্চতত্ত্বের বিবরণ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি এক ঘণ্টা করিয়া এক নাসিকায় নিশ্বাস বহন হয়; কিন্তু সেই ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চতত্ত্বের উদয় যথাক্রমে হয়। যথা—

এক নাসিকায় এক ঘণ্টা শ্বাস বহন সময় প্রথমে পৃথিবীতত্ত্ব ৫০ পল ইংরাজী ২০ মিনিট কাল পর্য্যন্ত থাকে; পরে জলতত্ত্বের উদয় হইয়া ৪০ পল, ইং ১৬ মিনিট পর্য্যন্ত থাকে। তৎপরে অগ্নিতত্ত্বের উদয় হইয়া ৩০ পল, ইং ১২ মিনিট থাকে। পরে বায়ুতত্ত্ব ২০ পল, ইং ৮ মিনিট পর্য্যন্ত থাকে। সর্ব্ব শেষে আকাশতত্ত্বের উদয় হইয়া ১০ পল, ইং ৪ মিনিট পর্য্যন্ত থাকে। সর্ব্বশুদ্ধ ১৫০ পলে ২॥০ দণ্ড ইং এক ঘণ্টা পঞ্চতত্ত্বের যথাক্রমে উদয়ে ঐ নির্দ্ধারিত সময় পর্য্যন্ত স্থিতি থাকিয়া এক নাসিকায় শ্বাস বহন একঘণ্টা পূর্ণ হয়।

যখন যে নাসিকায় শ্বাস বহন হইবে, তখন সেই নাসিকায় এরূপ পঞ্চতত্ত্বের উদয় হইয়া নিরূপিত সময় পর্য্যন্ত এক এক তত্ত্বের স্থিতি হয়।

এই তত্ত্ব বিচার করিয়া নিশ্বাসের অনুকূলে কার্য্য করিলে সকল কার্য্যই সুফল হয়। পরন্তু সাংসারিক বৈষয়িক কোন কার্য্য বিফল হইল, বলিয়া হতাশাস চিত্তে দুঃখ প্রকাশ করিতে হয় না। [illegible]বিচার করিয়া কার্য্য করায় অনেক রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র ও পাণ্ডবকুল-ধুরন্ধর অর্জ্জুন যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং বিপরীত তত্ত্বে যাত্রা করিয়া কৌরবগণ নিহত হইয়াছিলেন।

তত্ত্বে রামো জয়ং প্রাপ্তঃ সুতত্ত্বে চ ধনঞ্জয়ঃ।
কৌরবা নিহতাঃ সর্ব্বে যুদ্ধে তত্ত্ব বিপর্য্যয়ে॥

দেখিলেন! স্বয়ং বিষ্ণু রামচন্দ্র ও বিষ্ণু-সখা অর্জ্জুন তত্ত্ব বিচার করিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। কৌরবগণ অমিত তেজা কর্ণের বীরত্বের উৎসাহে উজ্জীবিত হইয়া মহা অহঙ্কারে অন্ধ বশতঃ তত্ত্ব বিচার করেন নাই, সেজন্য ভীষ্ম-প্রমুখ বীরপুরুষ সহায়েও ক্ষয় প্রাপ্ত হইলেন। অতএব আমরা ক্ষুদ্র মনুষ্য বিঘ্ন সঙ্কুল সংসারে তত্ত্ব বিচার করিয়া স্বরানুকূলে কার্য্য না করিলে হতাশাস হইবে বৈচিত্র্য কি?

কোন্ নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময়, কোন্ তত্ত্বের উদয় কালে কিরূপে কার্য্য করিলে, সমস্ত কার্য্যে সুফল লাভ করা যায় এবং তত্ত্ব চিনিবার যে সহজ উপায়াদি, তাহা বারান্তরে বলিব। পাঠকগণ তদনুসারে কার্য্য করিলে নিশ্চয় ফল পাইবেন, কোন কার্য্যে আশা-ভঙ্গ, মনস্তাপ জনিত হা হুতাশ করিতে হইবে না। আরও দেখিবেন যে, দয়াময় মহেশ্বর মোকদ্দমায় জয়লাভ, ক্রুদ্ধ প্রভুকে সন্তোষ ও দুষ্ট শত্রু ব্যক্তিকে মুগ্ধ করিবার জন্য—মন্ত্র ও ঔষধ ব্যতীত কেমন সহজে বশীকরণ এবং সাংসারিক বৈষয়িক সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধিলাভ করিবার উপায় নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। যদি চিরপূজ্য হিন্দু ধর্ম্ম সত্য হয়, যদি দেবাদিদেব মহাদেবের বাক্য মিথ্যা না হয় এবং পাঠকেরা যদ্যপি বিশ্বাস

স্থান পায়, তাহা হইলে পূজ্যপাদ আর্য্য ঋষিগণের নাম স্মরণ করিয়া উন্নত কণ্ঠে বলিতেছি প্রত্যক্ষ ফল লাভ করিবেন নিশ্চয়! নিশ্চয়!!

প্রসঙ্গাধীন বলিতে হইতেছে যে, স্বর-জ্ঞানের প্রথমাংশ পাঠ করিয়া হিন্দু পত্রিকার গ্রাহকগণের মধ্যে কতিপয় শিক্ষিত মহাত্মা উৎসুক চিত্তে আমার পূর্ব্ব পরিচয় ও বর্ত্তমান অবস্থা জানিবার জন্য আমাকে পত্র লিখি-য়াছেন। তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্যে আমি কৃতজ্ঞচিত্তে বাধ্য হইয়া বলিতেছি যে, প্রত্যেক পত্রের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। আর আমার পূর্ব্বা-পর পরিচয় এবং সাংসারিক অবস্থা—যে অবস্থা হইতে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছি—শুনিলে হৃদয়বান্ ব্যক্তির হৃদয় ব্যথিত হইবে সন্দেহ নাই। সংক্ষেপে এই বলি, যে হতভাগ্য কিঞ্চিৎ ন্যূন পাঁচ বৎসরের মধ্যে পিতা মাতা, ভগ্নী ও কন্যা, পুত্র এবং সর্ব্বশেষে সহধর্ম্মিণী প্রভৃতি—জীবনের সর্ব্বস্ব শ্মশানে বিসর্জ্জন দিয়া উদাসমনে, আকুল হৃদয়ে, আশা আকাঙ্ক্ষা শূন্য প্রাণে লক্ষ্য হারা ধূমকেতুর ন্যায় বেড়াইতেছে; তাহার আবার পরিচয় কি? বর্ত্তমান বয়ক্রম অতিপ্রৌঢ় অতিক্রম করিবার উপক্রম— এখন কন্যা ক্ষীরোদবাসিনী, জামাতা অমর-নাথ তৃষ্ণার জল ও ক্ষুধায় অন্ন দিবার স্থল এবং অন্ধের নড়ি সম্বল। ইহার পর যাহা হইবে, তাহা ভবিষ্যতের তমসাচ্ছন্ন গম্ভীর-গহ্বরে গাঢ়-প্রোথিত।

[illegible] সম্বন্ধে কাহারও কোন বিষয় জানি-বার ইচ্ছা হইলে, কিম্বা কোন স্থানে ভ্রম প্রমাদ দৃষ্ট হইলে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জানাইবেন। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান শিক্ষা যাহা আছে, তাহা বলিতে কুণ্ঠিত হইব না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীউমানাথ চট্টোপাধ্যায়।
বাবু অমরনাথ মুখোপাধ্যায়
যশোহর।

বস্ত্র ও সভ্যতা।

প্রত্যেক সমাজেই বেশ ভূষা, আচার ব্যবহার, আহার বিহার ইত্যাদিতে কতক-গুলি আদর্শ থাকে এবং যে কার্য্যগুলি সেই আদর্শ দ্বারা পরিচালিত না হয়, সেই কার্য্য-গুলিকে আমরা সাধারণতঃ অসভ্য আখ্যা প্রদান করিয়া থাকি। সমাজ বিশেষে এই আদর্শ বিভিন্ন হইয়া থাকে। কোন সমাজে যে কার্য্য সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হয়, অন্য সমাজে তাহা হয় ত অত্যন্ত নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত হয়। যে সমুদয় সমাজে বস্ত্র পরিধানের রীতি প্রচলিত রহিয়াছে, সেই সমুদয় সমাজে যদি কোন ব্যক্তি উলঙ্গ হইয়া থাকে, অথচ সে উন্মাদ নয় কিংবা নিতান্ত শিশুও নয়, তাহা হইলে তাহাকে অসভ্য বলা হইয়া থাকে। আবার যে সমুদয় দেশে বস্ত্র পরিধান প্রচলিত রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যেও সমাজ বিশেষে কোথায়ও বা সমুদয় অঙ্গ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়, কোথায়ও বা কেবল মাত্র অধমাঙ্গ আবৃত করা হইয়া থাকে। আমাদের দেশে কেহ নাভির উর্দ্ধদেশ অনাবৃত রাখিলে

আমরা তাঁহাকে অসভ্য বলি না। কিন্তু ইউরোপ বাসীদিগের নিকট উহা ভয়ানক অসভ্যতা। এই জন্য আমাদের দেশের ভদ্র লোকেরা সাহেব দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, সমস্ত দেহ বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া যান। একজন অতি অনক্ষর ইংরাজও কখনও তাহার দেহ অনাবৃত রাখিবে না। কিন্তু আমাদের দেশের বেদ-বেদান্তাদি-শাস্ত্র-বিশারদ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণও তাঁহাদের দেহের ঊর্দ্ধদেশ অনাবৃত রাখিতে কিছু মাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করে না। আবার যাঁহারা গার্হস্থধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা উত্তম ও অধম উভয় অঙ্গই অনাবৃত রাখেন এবং আমাদের সমাজের চক্ষে তাঁহাদিগের ঈদৃশ ব্যবহার অসভ্য বলিয়া পরিদৃষ্ট হয় না। উলঙ্গ তৈলঙ্গ স্বামীকে যুবতী স্ত্রী লোকেরাও অসঙ্কুচিতচিত্তে যাইয়া প্রণাম করিত। এবং উহা তাহাদিগের আত্মীয় স্বজনেরা কিংবা সমাজ কিছু মাত্র দূষ্য বিবেচনা করিত না। এক দিকে মিশমি, নাগা, কুকি, খন্দ উলঙ্গ, আর এক দিকে তৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী উলঙ্গ। ইংলণ্ডে কার্ডিন্যাল নিউম্যান ভাস্করানন্দের ন্যায় যদি দিগম্বর-বেশ ধারণ করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, তাঁহাকে উন্মাদ বলিয়া উন্মাদ—আগারে রাখা হইত। ভাস্করানন্দ কিন্তু মিশমি. নাগাও ছিলেন না কিংবা উন্মাদও ছিলেন না। যে কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত এদেশে আসিতেন, তিনি কাশী না দেখিয়া থাকিতেন না, এবং কাশীতে গিয়া ভাস্করানন্দকে দর্শন করাই তাঁহার সর্ব্ব প্রধান কার্য্য হইত। ভূতপূর্ব্ব ভারত সেনাপতি লকহার্ট প্রভৃতি উচ্চরাজকর্ম্মচারিগণ ভাস্করানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করা অতীব শ্লাঘাজনক বিবেচনা করিতেন। বস্ত্রাবৃত ইংরাজ অনাবৃত হিন্দু সন্ন্যাসীকে মিশমি নাগার ন্যায় অসভ্য বিবেচনা করিতেন না। সুতরাং সভ্যতাসভ্যতার বিষয় আলোচনা করিতে গেলে, কেবল বস্ত্র ব্যবহার রীতি পর্য্যালোচনা করিলে, ভাস্করানন্দ মিশমি বা নাগার ন্যায় অসভ্য হইয়া পড়েন। অথচ তাঁহাকে কিছুতেই অসভ্য বলা যায় না।

যখন মানব বস্ত্রধারণ প্রণালী জানিত না, তখন বৃক্ষবল্কল বা পশুচর্ম্ম দ্বারা দেহকে শীতাদি হইতে রক্ষা করিত, এবং ক্রমে বস্ত্রধারণ প্রণালী প্রথা অবগত হইয়া নানাবিধ বস্ত্রের দ্বারা দেহ আচ্ছাদিত করিতে লাগিল। শরীর রক্ষার্থই বোধ হয় বস্ত্রাদি প্রথম ব্যবহৃত হয়। লজ্জা নিবারণ ও শরীরের সৌন্দর্য্য বিধান হেতু ও ক্রমে বস্ত্র ব্যবহৃত হইতে থাকে। শীত প্রধান দেশ সমূহে গ্রীষ্মপ্রধান দেশ সমূহ অপেক্ষা বস্ত্র ব্যবহারের আধিক্য দৃষ্ট হয় এবং বহুকালের সংস্কার ও অভ্যাস হেতু গ্রীষ্ম প্রধান দেশে থাকিলেও শীত প্রধান দেশের লোকেরা তাহাদের দেশোচিত বস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন। বস্ত্র ব্যবহার দ্বারা কোন সমাজের সভ্যতা বা অসভ্যতা নির্দ্ধারিত করা যায় না। আজ যদি সমস্ত মিশমি জাতিকে ইংরাজদিগের ন্যায় কোট প্যাণ্ট্‌লান্ পরিধান করাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা কি ইংরাজ জাতি অপেক্ষা

অধিক অসভ্য হইয়া পড়িবে? আমরা যদি ইংরাজ দিগের অপেক্ষা ধর্ম্ম, নীতি, আচারাদিতে নিকৃষ্ট হই, তাহা হইলে কি কোট প্যাণ্টালুন পরিধান করিলেই সভ্যতায় তাহাদের সমকক্ষ হইতে পারিব, কিম্বা ঐ সব বিষয়ে আমরা যদি তাহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হই, তাহা হইলে আমাদের দেহ অনাবৃত থাকে বলিয়াই কি আমরা তাহাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়া পড়িব? প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে বস্ত্র দ্বারা কাহারও সভ্যতা বা অসভ্যতা নির্দ্ধারিত হইত না। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা মানুষের গুণ দেখিয়া সভ্য বা অসভ্য আখ্যা দিতেন, বস্ত্র দেখিয়া না। অধুনা বস্ত্রই হিন্দু সমাজের মানদণ্ড হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও অতিকষ্টে চটি জুতা ও মোটা চাদর দিয়া কাটাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু আর চলে না। কোট প্যাণ্টালুন না হইলে সামাজিক ভাবে বিভূষিত না হইয়া কাহারও পক্ষে একপদও অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। আদালতের চাপরাশি, কনেষ্টবল, রেলওয়ের গার্ড বা দারবানের নিকট কত ভদ্রলোকের যে কত অপমানিত হইতে হয়, তাহা বলা যায় না। হিন্দু সমাজে বেশ বিন্যাসের এক মহাতরঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এবং সকল শ্রেণীর হিন্দু নর নারী তাহাতে হাবুডুবু খাইতেছেন। কত রকম কোট, কামিজ, বডি বুক্ কি যে হইতেছে, তাহার নামও মনে থাকে না। দেশের ধনবানেরা ইংরাজদিগের অনুকরণ করিতেছেন, এবং দরিদ্রেরা তাহাদের অনুকরণ করিতে গিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন। নিত্য নূতন ফ্যাসিয়ান আসিয়া সমগ্র দেশকে সভ্যতার দিকে লইয়া যাইতেছে। আমাদের দেশ নিতান্ত দরিদ্র। আমরা বস্ত্রাদি সম্বন্ধে কখন ইংরাজদিগের সমকক্ষ করিতে পারি না, কিন্তু আমরা ইংরাজদিগের সংসর্গে পড়িয়া তাহাদের মত চাল চলন করিতেছি, অথচ রীতি নীতি একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। ধুতি চাদরও রাখিতে হয়, হ্যাট কোট ও রাখিতে হয় ফরাশও রাখিতে হয়। আমরা যেরূপ দরিদ্র তাহাতে আমাদের ইংরাজদিগের বিলাসিতা সাজে না।

বঙ্গভাষার উচ্চারণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

বাঙ্গালা, হিন্দি, প্রভৃতি ভাষা সংস্কৃত-ভাষার অপভ্রংশ। সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালাই ইহাদিগের বর্ণমালা। প্রত্যেক বর্ণই শব্দ-বিশেষের পরিচায়ক। ক, খ ইত্যাদির ন্যায় একটি একটি শব্দ প্রকাশ করিবার জন্য একাধিক বর্ণের প্রয়োজন হয় না। বাঙ্গালা ভাষায় মূর্দ্ধণ্য ণ ও দন্ত্য ন একইভাবে অর্থাৎ উভয় বর্ণই দন্ত্য ন এর ন্যায় উচ্চারিত হয়। একই ভাবে উচ্চারিত হয় বলিয়াই; মূর্দ্ধণ্য ও দন্ত্য এই দুই বিশেষণের দ্বারা উহাদের পার্থক্য সূচিত হয়। পূর্ব্ব-বঙ্গবাসীরা যেরূপ র, ড় ও ঢ় এর পার্থক্য শব্দদ্বারা সূচিত করিতে অশক্ত হইয়া ব এ শূন্য র, ড এ শূন্য ড় ও ঢ এ শূন্য ঢ়, বলিয়া সূচিত করেন, সমগ্র বঙ্গদেশে, সেইরূপ মূর্দ্ধণ্য

দন্ত্যান ন, বর্গীয় ব ও জ, অন্তস্থ ব ও য, তালব্য শ মূর্দ্ধণ্য ষ, ও দন্ত্য স এর পার্থক্য শব্দদ্বারা সূচিত না করিয়া উৎপত্তিস্থান উল্লেখ করিয়া সূচিত করেন। এক বঙ্গদেশ ব্যতীত সমগ্র ভারতবর্ষেই এই সমুদায় বর্ণ পৃথক শব্দ দ্বারা উচ্চারিত হয়। বঙ্গদেশবাসী সংস্কৃতভাষা উচ্চারণ করিতে ও ঐ সমুদায় বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ করেন না। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই বঙ্গদেশে শ, স ও ষ এই তিন বর্ণই শ এর ন্যায় উচ্চারিত হয়। দন্ত্য স এর উচ্চারণ S এর ন্যায়, তালব্য শ এর Sh এর ন্যায় এবং ষ এর hh এর ন্যায়। স এর প্রকৃত-উচ্চারণ সৃষ্টি, স্রাব, স্থান ইত্যাদি স্থলে পরিলক্ষিত হয়। তিনটি বর্ণই যদি এক তালব্য শ এর ন্যায় উচ্চারিত হইল, তাহা হইলে তিনটি বর্ণের প্রয়োজন কোথায়। ঐরূপ বর্গীয় ব ও অন্তস্থ ব এই দুই বর্ণই বর্গীয় ব এর ন্যায় উচ্চারিত হয়। বর্গীয় ব এর উচ্চারণ ইংরাজি b এর ন্যায় এবং অন্তস্থ ব এর ইংরাজি v এর ন্যায়, ভ এর উচ্চারণ ইংরাজি v এর ন্যায় নহে bh এর ন্যায়। অন্তস্থ ব যখন অন্য বর্ণের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন উহার উচ্চারণ ইংরাজি W এর ন্যায়। বাঙ্গালা ভাষায় ব ফলা ও ব ফলা একই প্রকারে উচ্চারিত হয়। য ও ব যে বর্ণের সহিত যুক্ত হয়, তাহার দ্বিত্ব করা হয় মাত্র। অর্থাৎ ক্ক ও ক্ক ক্যএর উচ্চারণের মধ্যে কোন প্রভেদ করা হয় না, তিন স্থানেই ক্ক এর ন্যায় উচ্চারণ করা হয়। সেকালের গুরু মহাশয়েরা পড়াইতেন ক, ক, [illegible] ইত্যাদি, আজ'কালের নর্ম্মাল স্কুলের শিক্ষিত-পণ্ডিত মহাশয়েরা পড়ান ক্ক, ক্য, ক্ব ক্ব। য ও য় এর মধ্যে কোন প্রভেদ নাই, উভয়ের উচ্চারণই হয়। বাঙ্গালা ভাষায় "য" কে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা-য ও য়। য় স্থলে উহার প্রকৃত উচ্চারণ রাখা হইয়াছে, কিন্তু য এর স্থলে উচ্চারণ উহাকে জ এর সহিত এক করিয়া লওয়া হইয়াছে। যাদব, যোগেন্দ্র প্রভৃতি উচ্চারণ করিবার সময় আমরা 'জ' এর উচ্চারণই করি। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে, উহারা ইয়াদব, ইয়োগেন্দ্র এইরূপ উল্লেখিত হয়। জ,'য প্রভৃতির উচ্চারণগত প্রভেদ না থাকিলেও বাঙ্গালা ভাষায় এখনও তাহাদের আকারগত প্রভেদ আছে; কিন্তু বর্গীয় ব অন্তস্থ ব এর আকারগত প্রভেদ পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বেই বাঙ্গলা ভাষায় এই দুই বর্ণের আকারগত ও উচ্চারণগত দুই প্রভেদই ছিল। সেকালের গুরুমহাশয়েরা বর্ণমালা পড়াইবার সময় পেটকাটা ব বলিয়া বর্গীয় বয়ের পরিচয় দিতেন ও অক্ষরের মধ্যস্থলে একটী সরল রেখা অঙ্কিত করাইতেন। প্রাচীন পুঁথিতেও বর্গীয় "ব" এর এরূপ আকার দৃষ্ট হয়। অন্তস্থ ব এর উচ্চারণ চাই একাকীই উচ্চারিত হউক, চাই অন্য বর্ণের সহিত যুক্ত হইয়াই উচ্চারিত হউক, উহার উচ্চারণ পূর্ব্বে বঙ্গ-ভাষায় উক্ত হইত। স্বামী (সোয়ামি) দ্বারিকা (দোয়ারিকা) দ্বার (দোয়ার) ইত্যাদি উচ্চরণ এখনও শুনা যায়। ন, ণ এর উচ্চারণ লেখনীর দ্বারা প্রকাশ করা কঠিন। আমরা এই উভয় বর্ণের যেরূপ উচ্চারণ করি, তাহাতে ন এর উচ্চারণ হইয়া থাকে, ণ এর উচ্চারণ

কথকটা ড় য়ে ৺ সংযুক্ত করিলে যেরূপ হয়, সেই প্রকার। বাঙ্গালাদেশ ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে এই বর্ণের যেরূপ উচ্চারণ প্রচলিত আছে, তাহা না শুনিলে উহার প্রকৃত উচ্চারণ বুঝা কঠিন। বিসর্গের উচ্চারণ বাঙ্গালাভাষায় আদৌ করা হয় না। তবে ইহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। যেহেতু বাঙ্গালাভাষায় পদান্ত বিসর্গের ব্যবহার বিরল। ক্ষ এর উচ্চারণও বঙ্গ ভাষায় আদৌ হয় না। উহার উচ্চারণ ক এর সহিত ষ সংযুক্ত করিলে যেরূপ উচ্চারণ হয়, সেইরূপ করা হইয়া থাকে। ম পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বর্ণের সহিত যুক্ত হইলে, স্থলবিশেষে উচ্চারিত হয়, এবং স্থলবিশেষে উচ্চারিত হয় না; যথা—জন্ম; বাল্মীকি প্রভৃতি স্থলে ম উচ্চারিত হয় এবং আত্মা, পদ্ম, রুক্মিণী প্রভৃতি স্থলে উচ্চারিত হয় না; কেবল যে বর্ণের সহিত যুক্ত হয়, সেই বর্ণকে দ্বিত্ব করিয়া উচ্চারণ করা হয়। সংস্কৃত ভাষায় ম বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্যত্র সর্ব্বত্রই উচ্চারিত হয়। বাঙ্গালাভাষায় ঋকারের আদৌ স্বতন্ত্র উচ্চারণ নাই, উহা রকারে ই বা ঈ যুক্ত করিয়া উচ্চারণ করিলে যেরূপ উচ্চারণ করা হয়, তাহাই করা হয়। ঋষি ও রিষ্ট, কৃত ও ক্রীত ইত্যাদির ঋ ও র এর উচ্চারণে কোন প্রভেদ করা হয় না। বস্তুতঃ ঐ দুই বর্ণের উচ্চারণ সম্পূর্ণ পৃথক। ণ এর উচ্চারণে ন্যায় ঋ এর উচ্চারণ লিখিয়া বুঝান কঠিন। বাঙ্গালা ভাষায় জ্ঞ এর প্রকৃত উচ্চারণ করা হয় না, সাধারণতঃ গ কে দ্বিত্ব করিয়া উচ্চারণ করা হয়। সংস্কৃত ভাষায় যুক্ত বর্ণের প্রত্যেক বর্ণেরই স্বতন্ত্র উচ্চারণ হইয়া থাকে। বাঙ্গালাভাষায় স্বরবর্ণের মধ্যে ই ঈ উ, ঊ ইত্যাদির উচ্চারণে হ্রস্ব দীর্ঘের প্রভেদ করা হয় না। যে বর্ণ যেরূপ ভাবে উচ্চারিত হওয়া উচিত, তাহা না হওয়ায় বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে সাধারণতঃ অনেক বর্ণাশুদ্ধি হয়। কোন্ স্থানে কোন্ স লাগিবে কোন্ ন লাগিবে, কোন্ স্থানে কোন্ ব লাগিবে, কোন্ স্থানে কোন্ য লাগিবে, তাহা বালকদিগের কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে হয়। যে বালকের বর্ণজ্ঞান হইয়াছে, তাহাকে অচল শব্দ লিখিতে বলিলে, তাহার কোন ভ্রম হইবে না, কেন না, অ, চ, ল এই তিন বর্ণই বিভিন্ন শব্দের দ্বারা সূচিত হয়। কিন্তু মনে করুণ, এক বালককে বিস্মরণ লিখিতে বলা হইল। যে ভাবে আমরা বিস্মরণ উচ্চারণ করি, তাহাতে বালক যে কোন 'স' ও যে কোন "ন" লিখিতে পারে এবং ম ফলার পরিবর্ত্তে ব ফলা, য ফলা দিতে পারে, কিম্বা ঐরূপ কোন ফলা না দিয়া, যে কোন স দ্বিত্ব করিয়া লিখিতে পারে। কিন্তু ঐ কথাটি বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্যান্য স্থলে যেরূপ ভাবে উচ্চারিত হয়, তাহাতে কোনরূপ বর্ণাশুদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। বাঙ্গালী বালকের ঐ বর্ণাশুদ্ধি পরিহারের জন্য কোন্ ন, কোন স, ও সব কোন ফলা, ইহা তোতা পাখীর ন্যায় মুখস্থ করিয়া রাখিতে হয় "কামিনী" কথাটি যেভাবে আমরা উচ্চারণ করি, তাহাতে লিখিবার সময় ম এ এবং ন এ যে কোন ইকার দেওয়া যাইতে পারে। এ বিষয়ে অধিক উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। ফলকথা এই প্রত্যেক বর্ণের যথাযথ উচ্চারণ প্রচলিত

থাকিলে, ভাষা বিশুদ্ধভাবে লিখিতে কষ্ট পাইতে হয় না, এবং স্মৃতিশক্তিকেও অযথা কষ্ট দিতে হয় না।

সংস্কৃতভাষা অধ্যয়ন কালে উহার যথাযথ উচ্চারণ প্রবর্ত্তিত করা তত কঠিন বলিয়া বোধ হয় না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রদেশের সংস্কৃত উচ্চারণের প্রথার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বর্ত্তমান দূষণীয় উচ্চারণ সংশোধিত হইতে পারে। স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর মহোদয় স্কুল পরিদর্শনের সময় বালকদিগের সংস্কৃত উচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে অত্যল্প সময়েই এ দেশের সংস্কৃত উচ্চারণ বিশুদ্ধ হইতে পারে। স্কুল কলেজ ও টোলাদির সংস্কৃত উচ্চারণ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয় সার্কুলার জারি করিলে এ দেশের উচ্চারণ শীঘ্রই তিরোহিত হইতে পারে।

বাঙ্গালাভাষার উচ্চারণ পরিবর্ত্তিত করা নিতান্ত সহজ নহে, কিন্তু বিদ্যালয়াদিতে পড়িবার কালে বালকদিগকে প্রথম হইতেই প্রত্যেক বর্ণের যথাযথ উচ্চারণ শিক্ষা দিলে কালে বাঙ্গালা ভাষার উচ্চারণ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। বর্ত্তমান উচ্চারণ যে বিশুদ্ধ নহে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, এবং ইহা পরিবর্ত্তিত হওয়া যে উচিত, তাহা অস্মদ্দেশীয়-পণ্ডিতগণ নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন। অধুনা বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ উন্নতি ও প্রসার হইতেছে, তাহাতে ইহার উচ্চারণের এরূপ দোষ থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। বঙ্গভাষার উন্নতিসাধনার্থ সাহিত্য-সভা, সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতি যে সমস্ত সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, তাঁহাদের এবং অস্মদ্দেশের সাহিত্য-সেবক ব্যক্তিমাত্রেরই এবিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা উচিত। কোন জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করিতে হইলে তাহার ভাষার উন্নতি সাধন করাও নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

বাঙ্গালা ভাষায় শ, ষ, স তিন বর্ণেরই উচ্চারণ শ এর ন্যায় হইলেও কোন কোন স্থলে শ এর উচ্চারণ স্থলে স এর উচ্চারণ প্রচলিত আছে, যথা—শৃঙ্গ শ্রী শ্রবণ ইত্যাদি। অর্থাৎ ত, থ, ন, র, ঋকারের সহিত যুক্ত হইলে স এর প্রকৃত উচ্চারণ হয়, অন্য স্থলে শ এর মত উচ্চারণ হয়; এবং ঋকারও র সংযুক্ত হইলে শ এর উচ্চারণ স এর ন্যায় হয়।

শরীর-রক্ষার্থ সদ্বৃত্তের-অনুষ্ঠান।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

নাসংবৃতমুখো জৃম্ভাং ক্ষবথুং হাস্যং বা প্রবর্ত্তয়েৎ। ন নাসিকাং কুষ্ণীয়াৎ। ন দশান্ বাদয়েৎ। ন ভূমিং বিলিখেৎ। ন ছিন্দ্যাত্তৃণং। জ্যোতীংষ্যনিষ্টামেধ্যাপ্রশস্তঞ্চ নাভিবীক্ষেত। নচৈত্যধ্বজগুরুপূজ্যাশস্তচ্ছায়ামাক্রামেৎ। ন ক্ষপাস্বমরসদন চৈত্যচত্বর-চতুষ্পথোপবন শ্মশানায়তনাদ্যা-সেবেত। নৈকঃ শূন্যগৃহং নচাটবীমভ্যুপ্রবিশেৎ। ন পাপবৃত্তান্ স্ত্রী মিত্র ভৃত্যান্ ভজেৎ। নোত্তমৈর্বিরুধ্যাৎ নাবরাদুপাসীত। ন জিহ্মং রোচয়েৎ। নানার্য্যমাশ্রয়েৎ। ন সাহসাতিস্বপ্নপ্রজাগর-স্নান পানাশনান্যা-

সেবেত। নোর্দ্ধজানুশ্চিরং তিষ্ঠেৎ। ন ব্যালানুপসর্পেৎ ন দংষ্ট্রিণো ন বিষাণিনঃ। পুরোবাতাতপাবশ্যায়াতিপ্রবতান্ জহ্যাৎ। কলিংনারভেত। ন স্নানশাট্যা স্পৃশেদুত্তমাঙ্গং। নাস্পৃষ্ট্বা রত্নাজ্যপূজ্য মঙ্গল সুমনসোঽভিনিষ্ক্রামেৎ। ন পূজ্য মঙ্গলান্যপসব্যং গচ্ছেৎনারত্নপাণির্নাস্নাতো নোপহতবাসা না জপিত্বা না-হুত্বা, দেবতাভ্যো গুরুভ্যঃ পিতৃভ্যোনা তিথিভ্যো নোপাশ্রিতেভ্যো নাপুণ্যগন্ধো নামালী না প্রক্ষালিত পাণিপাদ বদনো নাশুদ্ধমুখো নোদঙ্মুখো ন বিমনা নপাত্রীষ্মেধ্যাসু নাদেশে নাকালে, নাকীর্ণে না দত্বাগ্রে হুগ্নয়ে নাপ্রোক্ষিতং প্রোক্ষণোদকৈর্ন মন্ত্রৈরনভিমন্ত্রিতং ন কুৎসিতং ন প্রতিকূলোপহিতমন্নমাদদীত। নাশেষভুক্ স্যাদন্যত্র দধিমধুলবণসক্তুসর্পিভ্যঃ। ন নক্তং দধি ভুঞ্জীত। ন সক্তূনেকানশ্নীয়াৎ নানৃজুঃ ক্ষুয়াৎ নাস্নাৎ নশয়ীত। নবেগিতোঽন্যকার্য্যং কুর্য্যাৎ। ন বায়্বগ্নি সলিলসোমার্কদ্বিজ গুরু প্রতিমুখং নিষ্ঠীবিকা বর্চোমূত্রাণ্যুৎসৃজেৎ। নপন্থানং অবমূত্রয়েৎ ন জনবতি নান্নকালে। ন জপ্য হোমাধ্যান বলি মঙ্গলক্রিয়াসু শ্লেষ্মসিঙ্ঘাণকং মুঞ্চেৎ। ন স্ত্রিয়মবজানীত নাতি বিশ্রম্ভয়েৎ নাতি গুহ্যমনুপ্রবেশয়েৎ নাধিকুর্য্যাৎ। ন রজস্বলাং নাতুরাং নামেধ্যাং নাপ্রশস্তাং নাকামাং নান্যকামাং নান্যস্ত্রিয়ং, নশ্মশানায়তন সলিলৌষধ দ্বিজগুরু সুরালয়েষুন সন্ধ্যয়োর্ন নির্বিদ্ধতিথিষু নাশুচির্না জগ্ধভেষজো নানুপস্থিত প্রহর্ষো নানুক্রবান্ ন মূত্রোচ্চারপীড়িতোনশ্রমব্যায়ামোপবাস ক্লমাভিহতো ব্যবায়ং গচ্ছেৎ। ন সতো ন গুরূন্ পরিবদেৎ। না শুচিরভিচার কর্ম্ম পূজাধ্যয়নমভিনি বর্ত্তয়েৎ। ন বিদ্যুৎসু ন ভূমিকম্পে নোল্কাপাতে ন নষ্টচন্দ্রায়াং তিথৌ ন সন্ধ্যয়োর্ন মহোৎসবে না মুখাদ্গুরোর্নাতি মাত্রং নাতিদ্রুতং নাতিবিলম্বিতং নাত্যুচ্চৈর্নাতিনীচৈঃ স্বরৈরধ্যয়নং কুর্য্যাৎ। নাতি সময়ংজহ্যাৎ ন নিয়মং ভিন্দ্যাৎ। ন নক্তং নাদেশে চরেৎ। ন সন্ধ্যাস্বভ্যবহারাধ্যয়ন স্ত্রী স্বপ্নসেবী স্যাৎ। ন বাল বৃদ্ধ লুব্ধ মূর্খ ক্লিষ্ট ক্লীবৈঃ সহ সখ্যং কুর্য্যাৎ। ন মদ্য দ্যূত বেশ্যা প্রসঙ্গরুচিঃ স্যাৎ। নগুহ্যং বিবৃণুয়াৎ। নকঞ্চিদবজানীত। নাহং মানীস্যাৎ ন বৃদ্ধান্ নগুরূন্ ন নৃপান্ বাধিক্ষিপেৎ, ন চাতিব্রূয়াৎ। নাভৃতভৃত্যো নাবিশ্রব্ধস্বজনো নৈকঃ সুখী ন সর্ব্ববিশ্রম্ভী নসর্ব্বাভিশঙ্কী ন কার্য্যকালমতিপাতয়েৎ। নচাতিদীর্ঘ সূত্রীস্যাৎ নক্রোধহর্ষাবনুবিদধ্যাৎ ন শোকমনুবিশেৎ। ন সিদ্ধাবৌৎসুক্যং গচ্ছেৎ নাসিদ্ধৌদৈন্যং।

মুখ বন্দ করিয়া জৃম্ভা (হাই) ক্ষবতু (হাঁচি) ত্যাগ কিংবা হাস্য করিবে না, চরকে উক্ত আছে, "বায়ুর আধিক্য হইলে জৃম্ভা ও ক্ষবথু হয়।" সেই বায়ুকে নির্গমন করাই তাহার চিকিৎসা, সেই বায়ুকে নির্গমন হইতে না দিয়া যদি তাহার বেগরোধ করা যায়, তাহাহইলে, ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্য, শিরঃশূল, অর্দ্ধাবভেদক, (অর্দ্ধেক মাথা ধরা) কম্প, শরীরের শিথিলতা উৎপন্ন হয়। চরকে উক্ত আছে যথা—

মন্যাক্রস্তশিরঃ শূলমর্দ্দিতার্দ্ধাভেদকৌ।
ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ দৌর্বল্যং ক্ষবথোঃস্যাৎ
বিধারণাৎ।

যদি মুখ বন্দ করিয়া ক্ষবথু এবং জৃম্ভা পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে কুপিত বায়ু নিঃশেষ রূপে বহির্গত না হওয়ার দরুণ, কুপিত বায়ু জন্য শিরোরোগ প্রভৃতি ব্যাধি উপস্থিত হইতে পারে, এই জন্যই মুখ বন্দ করিয়া জৃম্ভাদি পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। অপবিত্র অপ্রশস্ত অগ্নি এবং গ্রহাদি দর্শন করিবে না। (শ্মশানাদি স্থানের যে অগ্নি, ধূমকেতু প্রভৃতিযে গ্রহ, তাহাকেই অপবিত্র অগ্নি ও অপবিত্র গ্রহ বলে।) জ্যোতিষ শাস্ত্রেও অমঙ্গলজনক গ্রহাদির দর্শন নিষেধ আছে: ধূমকেতু উদয় হইলে জগতের অমঙ্গল উপস্থিত হয়। যে অমঙ্গলময় তাহার দর্শনে যে লোকের অমঙ্গল হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই জন্যই মহাত্মা শূদ্রক কবি মৃচ্ছকটিক প্রকরণে ধূমকেতুকে অমঙ্গলের কারণ বলিয়া উপমা দিয়াছেন যথা।

অঙ্গারকবিরুদ্ধস্য প্রক্ষীণস্য বৃহস্পতেঃ
গ্রহোঽয়মপরঃ পার্শ্বে ধূমকেতুরিবোত্থিতঃ॥

মঙ্গল বিরোধী হইলে, বৃহস্পতি ক্ষীণবল হয়, তাহাতে পার্শ্বে আবার অপর ধূমকেতু উপস্থিত। ধূমকেতু প্রভৃতি গ্রহগণ অমঙ্গলজনক বলিয়াই ইহাদিগকে দর্শন করা নিষেধ। নাসিকা সংকোচ করিবে না।

চতুষ্পথস্থিত বৃক্ষ, গুরু এবং পূজ্যাদিগের ছায়া অতিক্রম করিবে না। রাত্রিতে দেবমন্দির, চৈত্য, চতুষ্পথ, (চৌরাস্তা) উদ্যান ও শ্মশানে থাকিবে না, একাকী গৃহ মধ্যে থাকিবে না, এবং অরণ্যে গমন করিবে না। কারণ; একাকী গৃহেথাকিলে এবং একাকী অরণ্যে প্রবেশ করিলে, যদি সহসা কোন বিপদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে জীবন রক্ষা করা বড়ই কষ্ট হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, লোকে নির্জ্জনগৃহে শয়ন করিয়া মুখচাপা কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া যার-পর নাই ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, সে সময় যদি কেহ নিকটবর্ত্তী না থাকে, তাহাহইলে মুখচাপাগ্রস্ত-ব্যক্তি মৃত প্রায় হয়: এই জন্যই একাকী নির্জ্জনগৃহে থাকা অনুচিত। পাপাসক্ত স্ত্রী, বন্ধু ভৃত্য পরিত্যাগ করিবে। সজ্জনের সহিত বিরোধ এবং নীচ ব্যক্তির সহিত মিত্রতা করিবে না। নীচ ব্যক্তির সহিত মিত্রতা করিলে স্বীয় চরিত্রের উৎকর্ষ হয় না, বরং তৎসহবাসে সংসর্গজ দোষই হইয়া থাকে। মহাবীর অর্জ্জুন যখন, দেবাদিদেব মহাদেবের সন্তোষার্থ ধ্যাননিষ্ঠ ছিলেন, তখন দেববিরোধী মুকদানব অর্জ্জুনকে দেবতা মনে করিয়া শূকর বেশে নাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। মহাদেব এই বিবরণ অবগত হইয়া ব্যাধ রূপ ধারণ করতঃ ঐ বরাহের উপর বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন ও ঠিক সেই সময় বরাহকে লক্ষ্য করিয়া বাণ নিক্ষেপ করেন, উভয় বাণে বরাহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে, ব্যাধ-বেশধারী মহাদেবের চর ছদ্মবেশে বাণগ্রহণেচ্ছু অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, হে অর্জ্জুন! আমার প্রভু কর্তৃক তোমার জীবন রক্ষা হইয়াছে, নতুবা বরাহ কর্তৃক আজ তোমার জীবন বিনাশ হইত; তোমার প্রত্যুপকার স্বীকার করা উচিত, প্রত্যুপকার স্বীকার করা

দূরে থাকুক; তুমি আমার প্রভুর বাণ অপহরণ করিতে উদ্যত হইয়াছ।

আমার প্রভুকে সামান্য লোক বিবেচনা করিও না। ইনি এই অরণ্যের একমাত্র অধীশ্বর। যদি তোমার বাণের নিতান্তই আবশ্যক হয়, তাহা হইলে প্রভুর সহিত মিত্রতা করিয়া যাচ্ঞাকর, যদি তুমি পৃথিবী প্রার্থনাকর, তাহাও তোমাকে অম্লানচিত্তে সমর্পণ করিবেন। তখন অর্জ্জুন ছদ্মবেশধারী দূতের "মিত্রতা কর" এই বাক্য শ্রবণ করিয়া জলদগম্ভীরস্বরে দূতকে বলিলেন যে, হে ব্যাধদূত! তোমার প্রভুর ন্যায় লোকের সহিত আমার ন্যায় ব্যক্তির মিত্রতা সম্ভব হয় না, কেন না—

যদা বিগৃহ্ণাতি হতং তদাযশঃ
করোতি মৈত্রীমথ দূষিতা গুণাঃ॥
স্থিতিং সমীক্ষ্যোভয়থা পরীক্ষকঃ
করোত্যবজ্ঞোপহতংপৃথগ্ জনং॥

নীচ ব্যক্তির সহিত বিরোধ করিলে যশ নষ্ট হয়, মিত্রতা করিলেও স্বকীয় সমস্ত সদ্‌গুণ দূষিত হয়, অতএব বিবেচক ব্যক্তি উভয় কার্য্যেই দোষ বিবেচনা করিয়া হীন ব্যক্তির সহিত মিত্রতা কিম্বা বিরোধ করেন না; এই হেতুই নীচলোকের সহিত মিত্রতা বিধেয় নয়। খলের সহিত মিত্রতা করিবে না এবং দুর্জ্জনকে আশ্রয় করিবেনা। অতি সাহস, অতি নিদ্রা, অতি জাগরণ, অতি স্নান, অতি জলপান, অতি ভক্ষণ পরিত্যাগ বিধেয়। মোটের উপর সর্ব্বত্রাতিরিক্ত। বিপৎ-সঙ্কুলস্থানে অতি-সাহস পূর্ব্বক কোন কার্য্যে ব্রতী হইলে, জীবন পর্য্যন্ত নাশ হইতে পারে। অধিক নিদ্রাতুর হইলে অর্দ্ধাবভেদক ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হওয়ার বিশেষ সম্ভব। চরক এবং সুশ্রুতে উক্ত আছে যে, অলস এবং নিদ্রা সুখরতব্যক্তিদের প্রমেহ হইয়া থাকে। অতিশয় জাগরণ করিলে, বায়ু বৃদ্ধি হইয়া তজ্জন্য উন্মাদাদি রোগ হইতে পারে। অধিক জলপান এবং অধিক ভোজন করিলে অজীর্ণ রোগ হইতে পারে।

অত্যম্বুপানাৎ বিষমাশনাচ্চ
সংধারণাৎ স্বপ্নবিপর্য্যয়াচ্চ
কালেপিসাত্ম্যং লঘুচাপি ভুক্তং
অন্নং ন পাকং ভজতে জনস্য॥
অনাত্মবন্তঃ পশুবৎ ভুঞ্জতে যেহপ্রমাণতঃ
রোগানীকস্য তে মূলমজীর্ণং প্রাপ্নুবন্তিহি॥

অধিক জলপান, বিষমাশন, (দধি মৎস্য একত্র ভোজন এবং অনিয়ত সময়ে ভোজন) মল মূত্রাদির বেগধারণ, দিবানিদ্রা ও রাত্রি জাগরণ এই সকল কারণে অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয়। এই অজীর্ণ উপস্থিত হইলে যথা সময়ে যদি লঘু আহারও করা যায়, তাহাও পরিপাক হয় না। যাহারা পশুর ন্যায় অপরিমাণ আহার করে, তাহাদের সমস্ত রোগের কারণ ভূত অজীর্ণ উপস্থিত হয়। অনেক সময় উর্দ্ধজানু হইয়া বসিবে না। মহিষ, হস্তি, সর্প প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীর নিকট গমন করিবে না। অতি রৌদ্র, অতি হিম, অতি রৌদ্র, অতি বায়ু সেবা পরিত্যাগ করিবে। স্নান করিয়া পরিধান বস্ত্র দ্বারা মস্তক পরিষ্কার করিবেনা।

শরীর পরিষ্কার এবং পবিত্র রাখাই স্নানের মুখ্য উদ্দেশ্য। পরিধানবস্ত্রের দ্বারা মস্তক পরিষ্কার করিলে; বস্ত্রে ময়লা মাথায় যাওয়ার সম্ভব, সেই জন্যই পরিধান বস্ত্র দ্বারা মস্তক পরিষ্কার করা বিধেয় নয়। স্থানান্তরে গমন করিতে হইলে রত্ন, ঘৃত, পূজ্য, মঙ্গলজনকপুষ্প স্পর্শ করিয়া গমন করিবে, পূজ্যাদিগকে এবং মঙ্গলকর দ্রব্যাদি বাম দিকে রাখিয়া গমন করিবেনা, অকালে অস্থানে, অপবিত্র পাত্রে আহার করিবেনা। দেবতা, গুরু, অতিথি এবং আশ্রিতদিগকে সৎকার করিয়া হস্ত, পদ, মুখ ধৌত পূর্ব্বক মালাধারণ করতঃ স্বীয় অভীষ্ট দেবতার জপ করিয়া প্রসন্নান্তঃকরণে আহার করিবে, আহার কালে অন্যমনস্ক হইবে না। দধি, মধু, লবণ, ঘৃত উদরপূর্ণ করিয়া আহার করিবে না, রাত্রিতে দধি ভোজন করিবে না। সরলভাবে ক্ষেথু পরিত্যাগ করিবে। বক্রভাবে শয়ন করিবে না। মল মূত্রের বেগ রোধ করিয়া অন্য কোন কার্য্য করিবে না, মল মূত্রের বেগ রোধ করিলে, বায়ু কুপিত হইয়া রাজযক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ হইতে পারে, চরক বলিয়াছেন মল মূত্রের বেগরোধ, ধাতুক্ষয়, বিষমাশন, অতি সাহস এই সমস্ত কারণে যক্ষ্মা হইয়া থাকে। বায়ু, অগ্নি, জল, চন্দ্র, সূর্য্য, দ্বিজ, গুরু, ইহাদে সম্মুখে নিষ্ঠীবন (মুখেরশ্লেষ্ম-ফেলা) মল, মূত্র পরিত্যাগ করিবে না, পথে, লোকসঙ্কুলস্থানে এবং ভোজন-সময়ে মূত্র পরিত্যাগ করিবে না। স্ত্রীকে অবজ্ঞা করিবে না এবং অতিশয় বিশ্বাসও করিবে না। স্ত্রীকে অতি গোপনীয় কথা কখনও বলিবে না এবং কোন কার্য্যের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করিবে না।

রজস্বলা, পীড়িতা, অপবিত্রা অন্য পুরুষাসক্ত স্ত্রী গমন করিবে না। নিষিদ্ধ তিথিতে (অমবস্যা পূর্ণিমা প্রভৃতিতে) সন্ধ্যাকালে স্ত্রী সংসর্গ পরিত্যাগ করিবে, গুরু জনের নিন্দা করিবে না। অপবিত্রাবস্থায় পূজাদি কোন কার্য্য করিবে না। ভূমিকম্পে, বিদ্যুৎপাত সময়ে, নষ্টচন্দ্রায়, মহোৎসবে, সন্ধ্যাকালে অধ্যয়ন করিবে না। অতি-দ্রুত অতিধীরে অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিবে। অনর্থক বৃথা সময় নষ্ট করিবে না। সন্ধ্যাকালে ভোজন, অধ্যয়ন, স্ত্রীসংসর্গ, নিদ্রা পরিত্যাগ করিবে। বালক, বৃদ্ধ, মূর্খ, ক্লীব ইহাদের সহিত মিত্রতা করিবে না। মদ্য, অক্ষক্রীড়া এবং বেশ্যাসক্ত হইবে না। অনর্থক অধিক কথা বলিবে না। একাকী সুখী হইবার ইচ্ছুক হইবে না, যাহাতে অন্যে সুখী হয় তাহাও চেষ্টা করিবে, দীর্ঘ সূত্রতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথাসময় কার্য্যাদি সমাধা করিবে। কোন কার্য্য সিদ্ধ হইলে অহ্লাদিত হইবে না এবং অসিদ্ধ হইলেও দুঃখিত হইবে না, ক্রোধ, হর্ষ শোকের বশীভূত হইবে না। ভগবানও গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন।

"যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি
নকাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্যঃ
সমেপ্রিয়ঃ॥
১২ অঃ ১৭ শ্লোক।

যিনি হৃষ্ট হয়েন না, কাহারও প্রতিদ্বেষ করেন না, যিনি শোকাকুল হন না, কোন

বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করেন না, এবং শুভাশুভ পরিত্যাগী, এতাদৃশ ব্যক্তি আমার প্রিয়।

(ক্রমশঃ)

কবিরাজ শ্রী মতিরঞ্জন কাব্যতীর্থ
যশোহর ব্রহ্মচারি আশ্রম।

পূনর্জ্জন্মতত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে দেহের উপাদানের সূক্ষ্মত্ব, স্থূলত্ব এবং নির্ম্মলত্ব ও মলিনত্ব হেতু জ্ঞান বা চৈতন্যের ন্যূনাতিরেক বিকাশ বা অবিকাশ হয়। সূর্য্য * হইতে সপ্তর্ষিমণ্ডল পর্য্যন্ত সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতির্ম্ময় বিশুদ্ধ তেজ প্রধান উপাদানে নির্ম্মিত; সুতরাং সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ নক্ষত্রাদির অধিষ্টাত্রী পুরুষ ও তদংশভূত জীব সমূহ নির্ম্মল জ্যোতির্ম্ময় ও তেজোময় সূক্ষ্মদেহ ধারী, উহারা উচ্চ হইতে উচ্চতর দেবতা হইতেছেন। পৃথিবী হইতে সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত অন্তরীক্ষে তৈজস, দ্রবীয়, বাষ্পীয় ও বায়বীয় সূক্ষ্ম উপাদানে নির্ম্মিত অতি সূক্ষ্মদেহধারী জীব সমূহ আছে। উহারা গুণ ভেদে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট ও অতি নিকৃষ্টতম জীব হইতেছে, প্রকৃত পক্ষে আমাদিগের সহিত তুলনায় উহাদিগের অধিকাংশই জীব পদ বাচ্য নহে, জীবাণুপদ বাচ্য। উহাদিগের মধ্যে কতকগুলি আমাদের শরীরের ও কতকগুলি আমাদের মনের বড়ই অনিষ্ট কারক। যেমন বসন্ত বিসূচিকা বীজের মধ্যে অনিষ্ট কারক জীব বা জীবাণু আছে সেইরূপ, নিদানোক্ত দেবগ্রহ গন্ধর্ব্বগ্রহ পিশাচগ্রহ ইত্যাদি গ্রহজুষ্ট অনেক উন্মাদ রোগ আছে উহারা শরীর ও মনের অনিষ্ট কারক। ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব বা ভাবাংশ একত্রিত সম্মিলিত হইয়া এক একটী ভাবের বিকাশ হয় এবং ইহাও কথিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক পদার্থ একত্রকটী ভাবের আধার, পরমাণু যে অতি সূক্ষ্মতম পদার্থ তাহাও ভাব শূন্য নহে, তবে পার্থিব অণু বা জড় পদার্থে চৈতন্যের বিকাশ না হওয়ায় তাহারা স্বয়ং কোন ভাব প্রকাশ করিতে পারেনা। * পৃথিবীস্থ জল,

---

* সবিতা সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভাবান্ প্রসূয়তে সবনাৎ প্রেরণাচ্চৈব সবিতা তেন উচ্চতে। ঈশ্বরের স্থূল ত্রিমূর্ত্তির প্রধান মূর্ত্তি যে সূর্য্য তাহা সৃষ্টিতত্ত্ব ত্রিমূর্ত্তি শীর্ষক প্রবন্ধে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ৩য় খণ্ড ১৫। ৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

টীকা * ইয়ুরোপীয় তার্কিকগণ একটি বৃহৎ কাচপাত্রের মধ্যে স্বচ্ছ কাচ পরকলা দিয়া দুইটি কুটরীর ন্যায় দুইভাগে বিভক্ত করিয়া একটি কুটরির মধ্যে একটি জলাধারে কতকগুলি মৎস্য অন্য কুটরিতে মৎস্যভোজী একটা জীব (ধাড়ে) বদ্ধ করিয়া রাখায়, ঐ মৎস্য ভোজীজীব ঐ মৎস্য ধরিতে যাওয়ায়, বারম্বার ঐ পরকলায় বাধা প্রাপ্ত ও মস্তকে আঘাত লাগিয়া প্রতি নিবির্ত্ত হওয়া সত্বেও তৎক্ষণাৎ তাহা বিস্মৃত হইয়া আবার ধরিতে আসত লাগিয়া প্রতি বিবির্ত্ত হয়। এইরূপে বহুবার আঘাতিত হইয়া অবশেষে সংস্কারের ন্যায় বাধা জনিত ভাবটি সামান্য উপলব্ধি হয়, ইহা দ্বারাও প্রামাণিত হয় যে, তির্য্যগ্ জাতির স্মৃতি ও ধৃতির বিকাশ অতি অল্প।

তেজ, বায়ুর মধ্যে বহুতর জৈবোপাদান আছে, এমন কি, একটী বৃক্ষপত্র বা ক্ষুদ্রঘটস্থ জল উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করিলে, জীবাভাসময় শত শত কীটের ন্যায় জীবাণু পরিলক্ষিত হয়। বিষ্ঠা, গোময় হইতে বহুতর কীট উৎপন্ন হয়। এতাবতায় সাব্যস্ত হইতেছে যে, জগতে জীব শূন্য স্থান নাই।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, বুদ্ধিতত্ত্বে যে জ্ঞানাভাস প্রতিবিম্বিত হয়, ঐ বুদ্ধিস্থ জ্ঞানাভাসই আমি পদ বাচ্য জীবাত্মা। ঐ বুদ্ধিতে গুণ ক্ষোভ হেতু যে সকল বিকল্পাত্মক ভাবের স্ফুরণ হয়, ঐ সকল বিকল্পাত্মক ভাব রূপ তত্ত্বই (Thinking Entity) মন হইতেছে। যেমন হোমিওপ্যাথিক ঔষধ জল দ্বারা ডাইলিউট করিলে ঔষধের গুণ ও শক্তি পরিবর্দ্ধিত হয়, ক্রমে ক্রমে বহু শতবার বা বহু সহস্র বার ডাইলিউট করার পর ঔষধের গুণ লুপ্ত হইয়া শুদ্ধ জলে পরিণত হয়, সেইরূপ বিরাটমনের এক একটী চেতন ভাব তমগুণ কর্ত্তৃক ক্রমে সূক্ষ্ম, স্থূল, স্থূলতর ও স্থূলতম মৃৎপাষাণাদি জড় পদার্থে পরিণত হইয়া চেতন ভাব একেবারে বিলুপ্ত হয়। কিন্তু যেমন জল দ্বারা অনেক বার ডাইলিউট হেতু ঔষধের গুণ অপ্রকাশ হইলেও ঔষধের অতি সামান্য অণুপরমাণু অবশ্যই জলের মধ্যে মিশ্রিত থাকে, কিন্তু প্রায় সমস্তই জলীয় অংশ হওয়ায় জলের গুণ দ্বারা ঔষধের গুণ আবরিত হইয়া যায়, সেইরূপ জড়ের স্বাভাবিক (কেবল মাত্র তম) গুণদ্বারা তদন্তর্গত রজ ও সত্ত্ব গুণ সম্পূর্ণ রূপে আবরিত হইয়া প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। কেবল মাত্র রজ গুণের অতি-সামান্য ক্রিয়া (অর্থাৎ ক্ষয় বৃদ্ধির ক্রিয়া মাত্র) প্রকাশ পায়, যেমন কাচপোকা কর্ত্তৃক ধৃত আরসুল্যা কীটের (ভয় বৃত্তি দ্বারা) ক্ষুদ্র অন্তর কাচপোকা ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া দেহ তদাকারে পরিণত হয়, সেইরূপ বিরাট মনের চেতন ভাব মৃত্তিকা বা পর্ব্বত রূপে কল্পিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম কঠিন ক্ষিতি জাতীয় অণু হইতে স্থূলতম মৃত্তিকা বা পর্ব্বতাকারে পরিণত হয়। যেমন অক্সিজন, হাইড্রোজন দুই জাতীয় অদৃশ্য বাষ্প একটী কাচ যন্ত্র বিশেষে পুরিয়া তন্মধ্যে যদি তড়িৎ পাস্ করা যায়, তাহা হইলে ঐ অদৃশ্য বাষ্প দ্বয় সংমিশ্রিত হইয়া সামান্য বাষ্পীয় জ্যোতি অর্থাৎ এক একটী রেখার ন্যায় প্রকাশ হয়, পুনর্ব্বার উহাতে অন্য প্রকারে তড়িৎ পাস দ্বারা ঐ বাষ্প ঘনীভূত হইয়া বিন্দু বিন্দু জলাকারে পরিণত হয়। তদনন্তর ঐ জল অন্য যন্ত্র বিশেষে প্রক্রিয়া দ্বারা কঠিন বরফাকারে পরিণত করা যাইতে পারে অর্থাৎ যেমন সূক্ষ্ম হাইড্রজন্ ও অক্সিজন্ প্রক্রিয়া দ্বারা কঠিন বরফে পরিণত হইতে পারে, সেইরূপ মহৎ ক্ষেত্রে কল্পিত সূক্ষ্ম মনোভাব (তড়িৎ পাসের ন্যায়) তম গুণের প্রক্রিয়া দ্বারা স্থূলদৃশ্যজগতে পরিণত হয়।

পূর্ব্ব বর্ণিত মত মৃৎপাষাণাদিতে যেমন আদৌ জীবত্বের বিকাশ নাই, সেইরূপ কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী প্রভৃতিতে জীবত্বের ও ইন্দ্রিয়াদির বিকাশ হইলেও স্বাধীনভাবে মন ও বুদ্ধির বিকাশ হয় না। জড় পদার্থে যে সকল জড়ীয় প্রবৃত্তি ও ক্রিয়া (যথা, আকর্ষণ, বিক্ষেপণ, তাপের স্ফুরণ) ইত্যাদি

আছে, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি তীর্য্যগ্ জাতিতে (জীবত্বের স্ফুরণহেতু) ঐ সকল আকর্ষণ বিক্ষেপণ আদি রাগ, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতিতে পরিণত হয়। পশ্বাদির বুদ্ধি ও মানবের সামান্য অঙ্কুর যাহা মস্তিষ্কে প্রকটিত হয়, তাহা ঐ রাগ, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ লোভ হিংসা প্রভৃতির অন্তর্ভূত হইয়া তদাকার ধারণ করে, ঐ সকল প্রবৃত্তি পশ্বাদিকে যে ভাবে চালিত করে; উহারা সেই ভাবে চালিত হয়। পশুদিগের স্বাধীন বিবেক বা যুক্তির বিকাশ না হওয়ায়, উহারা স্বাধীনভাবে চিন্তা ও সদসদ্ বিবেচনা করিতে পারেনা।

বস্তুত উহাদের অন্ধ প্রবৃত্তি দমন করিবার শক্তি নাই। এবং উহাদের ধৃতি ও স্মৃতি শক্তি অতিঅল্পমাত্র বিকাশ হয়। মানবের সহিত তুলনায় ধৃতি ও স্মৃতিশক্তি উহাদের এত অল্প যে, নাই বলিলেই হয় *। প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন আমিত্বের অর্থাৎ স্বাধীন কল্পনাকারী মন ও নিশ্চয়কারী বুদ্ধির বিকাশ উহাদের হয় নাই। যেমন গর্ভস্থ-শুক্র ও শোণিত সংযোগে গর্ভেজীবসঞ্চার হয় এবং যত দিন ভ্রূণ গর্ভে থাকে, তত দিন মাতার অস্তিত্বেই ভ্রূণের অস্তিত্ব, মাতার আহারের দ্বারায় ভ্রূণের শরীর পোষিত হয়, কিন্তু জীব প্রসূত হওয়ার পর স্তন্যপায়ী শিশুর মাতার আহার দ্বারা শরীর পুষ্ট হইলেও উহার স্বতন্ত্র আহারের প্রয়োজন ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় সেইরূপ উদ্ভিদ, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি, প্রকৃতি মাতার গর্ভস্থ ভ্রূণ সদৃশ। অর্থাৎ স্বাভাবিক লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধাদির অস্তিত্বেই উহাদের অস্তিত্ব, স্বভাবের বিরুদ্ধে স্বাধীনচিন্তা ও ন্যায়ান্যায় বিচার দ্বারা উহারা কোন কার্য্য করিতে পারে না। কিন্তু মানব প্রকৃতি মাতার স্তন্যপায়ী শিশু পুত্র সদৃশ হইলেও (অর্থাৎ স্বভাবের অধীন হইলেও) স্বাধীনভাবে চিন্তা যুক্তি ও ন্যায়ান্যায় বিচার করিতে সক্ষম। বর্ণিত আছে, মনু প্রজাপতি ব্রহ্মার মানস পুত্র এবং মনুই মানবের আদি পুরুষ, যে হেতু মানবের মন বুদ্ধি সেই বিরাট মনের ভাব-বিশেষ, উহা এই পঞ্চভূতোৎপন্ন দেহে স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে বিকাশিত হইয়াছে। শিশু মাতৃ গর্ভ—প্রসূত হইয়া যেমন প্রতিদিন দিবা ভাগে জাগরিত অবস্থায় পার্থিব অভিজ্ঞতা ও নানা ভাব শিক্ষা ও তাহা অন্তরে সঞ্চয় করিয়া নিশিতে নিদ্রা যায় এবং পর দিন নিদ্রোত্থিত হইলে ঐ পূর্ব্ব দিনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও ভাব সমূহ অস্পষ্ট সংস্কার রূপে পরিণত হইয়া নূতন অভিজ্ঞতা ও নূতন ভাব সঞ্চয়ের ভিত্তি স্বরূপে পরিণত হয় এবং ঐ প্রতিদিনের নূতন নূতন সংগৃহীত ভাব সমূহ তাহাতে যোগ করিয়া লওয়ায় ক্রমে ক্রমে নানাভাব ও অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়া মালার ন্যায় গ্রথিত হয় অর্থাৎ রাসায়নিক সংযোগের ন্যায় নূতন নূতন ভাবে পরিণত হয়। সেইরূপ সূত্রাত্মা তাঁহার ত্রিগুণ সূত্রে জন্ম জন্মান্তরের অভিজ্ঞতারূপ এক একটী পুষ্প মালাকারে গ্রন্থন করিতে থাকে অর্থাৎ মানবাত্মা এক জন্মে যে অভিজ্ঞতা ও ভাব সমূহ সঞ্চয়

* এই স্থানের টীকা ভ্রমক্রমে ১৭০ পৃষ্ঠায় দিয়ে দিয়াছে, উক্ত পৃষ্ঠায় ৩৫ পংক্তিস্থিত * চিহ্ন উঠিয়া যাইবে। (হিং সঃ)

করে, পর জন্মে তাহার সারাংশ সংস্কাররূপে পরিণত হইয়া অভিজ্ঞতা ও নূতন নূতন ভাবের বিকাশ হয়। বালক যেমন শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করিয়া স্বাধীনভাবে কর্ম্ম করিতে সক্ষম হয় ও বয়প্রাপ্ত হইয়া মাতার স্তন্য ত্যাগ পূর্ব্বক মাতার প্রতিপালনাধীন হইতে মুক্ত হইয়া স্বয়ং আবার অন্য বালকের পিতৃ স্থানীয় হয়, মানবও সেইরূপ জন্ম জন্মান্তরের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া সাধনা দ্বারা প্রকৃতি হইতে মুক্ত হইয়া স্বয়ং মহাত্মা বা মহাপুরুষে পরিণত হয় ও তাহার ক্ষুদ্র মনও বিরাট মনে পরিণত হয়।

উপরোক্ত সৃষ্টিতত্ব বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইলে কালের অবনয়ন ও উন্নয়ন প্রণালী (যাহাকে ইংরেজীতে descending এবং Ascending cycle কহে) ও সংস্কৃতে কালের অবসর্পিণী ও উপসর্পিণী প্রণালী কহে) বুঝা আবশ্যক, ইতিপূর্ব্বে হোমিওপ্যাথি ঔষধের ডাইলিউসন্ এবং অদৃশ্য বাষ্প বরফে পরিণতি ইত্যাদি বহুতর দৃষ্টান্ত দ্বারা বিরাটমনের এক একটী সূক্ষ্ম ভাব তমগুণাক্রান্ত হইয়া বা তামসিক অহঙ্কারাচ্ছন্ন হইয়া ক্রমে মৃৎ-পাষাণাদি স্থূল জড় পদার্থে কি রূপে পরিণত হয়, তৎসম্বন্ধীয় কার্য্য প্রণালী যাহা কথঞ্চিৎ পরিব্যক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা পাঠকগণ কালের বা প্রকৃতির অবনয়ন প্রণালীর সামান্য আভাস কিঞ্চিৎ পাইতে পারেন, তদ্‌ভিন্ন যথার্থ তত্ত্ব উপলব্ধি করা ভয়ঙ্কর কঠিন। এক্ষণে উন্নয়ন প্রণালী যাহা কথিত হইবে, তাহাও সহজ নহে। বেদান্তানভিজ্ঞ পাঠকগণের পক্ষে কালের অবনয়ন ও উন্নয়ন উভয় প্রণালীই ভয়ঙ্কর কঠিন। তবে ইংরাজী শিক্ষিত পাঠকগণ যাঁহারা ডারউইনের সৃষ্টিবিবর্ত্তবাদ (Evolution therory) মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের সৃষ্টির উন্নয়ন প্রণালী অর্থাৎ ক্রমোন্নতির নিয়ম বুঝার কিছু সুবিধা হইতে পারে। মৃত্তিকা ও প্রস্তরাদিতে যে ক্রিয়া শক্তি আছে, তদ্দ্বারা বহুকালে উহাদিগের অন্তরোপাদানের সংঘর্ষণ উপস্থিত হইয়া আভ্যন্তরীণ কথঞ্চিৎ তেজের স্ফুরণ হয়, তদ্দ্বারা আভ্যন্তরীণ উপাদান অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ ক্রিয়া শীল দ্রবীভূত হয়। ঐ দ্রবীভূত উপাদান সকল কিঞ্চিৎ বিশ্লিষ্ট বা শ্লথ হইয়া উহাদের আভ্যন্তর কিঞ্চিৎ শীতল হইলে আকর্ষণ শক্তি কর্ত্তৃক যখন ঐ সকল অণু পুনঃসংশ্লিষ্ট হয়, তখন উহাদের গুণের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়া রাসায়নিক সংযোগের ন্যায় ঐ মৃত্তিকা প্রস্তরের উপাদান পরিবর্ত্তিত হইয়া ধাতবোপাদানে পরিণত হয়। কিন্তু উপাদান লৌহ, তাম্র, সীস প্রভৃতি আকরজ ধাতুতে পরিণত ও ঐ সকল ধাতুর সংমিশ্রণে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে স্বর্ণ, রৌপ্য, কাংস, পিত্তল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। পুনর্ব্বার উক্ত আকরজ ধাতব ঔপাদানিক অংশ সহস্র সহস্র বর্ষে আভ্যন্তরীণ তেজের স্ফুরণ হইতে দ্রবীভূত হইয়া তাহাতে উষ্মার বিকাশ হইলে পূর্ব্বোক্ত নিয়মাধীনে বিকৃত হইয়া উদ্ভিদ ও জৈবোপাদানে পরিণত হয় * চিকিৎসা ও রাসায়নিক শাস্ত্রে জীবে ও উদ্ভিদে যে লৌহ প্রভৃতি

টীকা * আভ্যন্তরীণ তেজ বিশেষ হইতে যে, জীবত্ত্বের বিকাশ হয়, ইহা আধনিক পাশ্চাত্য ও প্রাচীন আর্য্যবিজ্ঞান সম্মত।

ধাতব উপাদান আছে। ইহা স্বীকৃত ও প্রমাণিত হইয়াছে, আবার ঐ উদ্ভিদের ঔপাদানিক অংশ বিকৃত হইয়া তদ্দ্বারা যে কীটাদি জীবের উৎপত্তি হয়, ইহা কেবল শাস্ত্রের প্রমাণ নহে, অনেক রাসায়নিক পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে গলিত ও বিকৃত বৃক্ষ—পত্র—বিশেষ হইতে ভিন্ন ভিন্ন কীট ও ক্ষুদ্র চিঙ্গড়া মৎস্য প্রভৃতি কীট উৎপন্ন হয়, কাঁচোরায় যে তাম্র ভাগ অধিক ইহা পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। আমাদের তন্ত্র শাস্ত্রোক্ত ও অথর্ব্ব বেদোক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা এক ধাতুর সহিত পত্র বিশেষের রস সংযোগে অন্য ধাতু উদ্ভিদ ও কীট পতঙ্গ প্রভৃতির উৎপত্তি হইতে পারে। ভিন্ন জাতীয় ঔদ্ভিদ্য উপাদান দ্বারা আর এক জাতীয় উদ্ভিদ যে প্রস্তুত হইতে পারে ইহা পরীক্ষিত। যদিও অদ্যাপি কোন বৈজ্ঞানিক বা রাসায়নিকপণ্ডিতেরা ধাতব্য ঔদ্ভিদ্য উপাদানে কিম্বা কীট পতঙ্গাদির জৈবোপাদান দ্বারা স্বেদজজীব ব্যতীত পশু পক্ষ্যাদি জরায়ুজ বা অণ্ডজ বৃহৎ জীব নির্ম্মাণ করিতে পারেন নাই * কিন্তু উদ্ভিদও ধাতু বিশেষ দ্বারা সর্প দংশিত মৃত জীব যে পুনর্জ্জীবিত হইতে পারে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এবং জীবের মস্তিষ্ক রক্ত মেদ ও মাংস প্রভৃতিতে বহুতর ধাতু উদ্ভিদতত্ত্ব এবং অন্য জৈবোপাদান অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জৈবনিক বা জীবাণু আছে। ইহা বিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্রানুমোদিত ও পরীক্ষিত। প্রাচীন পাশ্চাত্য ক্যা-বেলিষ্টগণের মতে আকরজ ধাতব-উপাদান বিকৃত হইয়া উদ্ভিদে, ঔদ্ভিদ্য উপাদান বিকৃত হইয়া পতঙ্গ ও কীটাদির জৈবোপাদানে, ঐ কীট পতঙ্গাদির জৈবোপাদান বিকৃত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পশু পক্ষীর জৈবোপাদানে বিবর্ত্তিত এবং উচ্চতর জীবের অর্থাৎ বানর উল্লুক ও বন মানুষের জৈবোপাদান বিকৃত হইয়া মানবের দৈহিক জৈবোপাদানে পরিণত হয়। তদনন্তর মানবের জৈব ও মানসোপাদান * সংস্কৃত ও বিশুদ্ধ হইয়া নির্ম্মল বিশুদ্ধ দেবোপাদানে বিবর্ত্তিত হয় এবং ঐ বিশুদ্ধ দেবোপাদান ঈশ্বরতত্ত্বে পরিণত হয়। যথা Kabalistic aphorism runs "A stone becomes Plant, a plant a beast, the beast a man, a man Deva and Deva himself becomes God." পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, পশু জগৎ পর্য্যন্ত প্রকৃতি

The caloric heat is as Heracletus widely taught the Primordial Principel of life, আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমং হৃদয়ে সর্ব্বভূতানাং জীবভূতঃ স তিষ্ঠতি।

টীকা * কিন্তু প্রাচীন কালের আর্য্য ঋষিগণ যোগ বলে অণ্ডজ ও জরায়ুজ জীব মানস শক্তি দ্বারা নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন, ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পুরাণাদিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

* মানবের মানস সোপান উচ্চতর লোকস্থ দেবাংশ। কিন্তু দৈহিক জৈবোপাদান প্রস্তুত হইলে ঐ তৈজস দেবোপাদান আকর্ষিত হইয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় তত্ত্ব ও তাহাদের সার সংগ্রহ স্বরূপ মন ও বুদ্ধিতত্ত্বের বিকাশ হয়। ঐ দেবোপাদান পঞ্চ ভূতের সত্ত্বাংশ। তবে পার্থিব তম রজগুণের সহিত মিশিয়া তদনুরূপ হয়।

মাতার গর্ভস্থ ভ্রূণের স্থায় বা ভ্রূণ সদৃশ। তবে ৫ দিনের গর্ভস্থ বীর্য্যাপেক্ষা এক মাসের গর্ভস্থ ভ্রূণ এবং তদপেক্ষা ৬।৭।৮ ৯।১০ মাসের গর্ভস্থ ভ্রূণের যেরূপ দেহ ও চেতনার ন্যূনাতিরেক প্রভেদ হয়, সেইরূপ উদ্ভিদাপেক্ষা কীটাদি ও কীটাপেক্ষা পশ্বাদির দেহ ও চেতনার অধিকতর উন্নতি হওয়ায় উহাদের মধ্যে সেইরূপ প্রভেদ। শক্তি-উপাধিধারি ব্রহ্মই স্বয়ং ঈশ্বর এবং কোষোপাধিধারীই জীব – যথা

চিচ্ছায়াবেশতঃ শক্তিশ্চেতনেববিভাতি সা।
তচ্ছক্ত্যুপাধি সংযোগাৎ ব্রহ্মৈবেশ্বরতাং
ব্রজেৎ॥
কোষোপাধি বিবক্ষায়াং যাতি ব্রহ্মৈব
জীবতাম্।
পিতা পিতামহ শ্চৈকঃ পুত্র পৌত্রৌ
যথা প্রতি॥

যথার্থ। চৈতন্যেরছায়ায় শক্তি চেতনবৎপ্রকাশ হয়েন। শক্তি উপাধিধারি ব্রহ্মই ঈশ্বর নামে ও কোষাপধারি ব্রহ্মই জীব নামে অভিহিত হন। পরব্রহ্মই পিতামহ তাঁহার পুত্র স্বরূপ ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের পুত্র (পরব্রহ্মের-পৌত্র) স্বরূপে জীব হইতেছেন। ইহার পর শ্লোকেই বর্ণিত আছে যে—

পুত্রাদেরবিবক্ষায়াং ন পিতা ন পিতামহঃ।
তদ্বন্নেশো নাপি জীবঃ শক্তি কোষা-বিবক্ষণে॥

যেমন পুত্র ও পৌত্রাভাবে পিতা ও পিতামহ নাম থাকেনা, সেইরূপ শক্তি ও কোষাভাবে ঈশ্বর বা জীবের অভাব হওয়ায় পর ব্রহ্ম মাত্র অবশিষ্ট থাকেন। অর্থাৎ কেবল তাঁহারাই তিনি থাকেন।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে স্বত্ত্বগুণ মলিন হওয়ায় ঐ মলিন সত্ত্বগুণই এক একটি জীবের কারণ রূপে পরিণত হয়, উহাই জীবের কারণ শরীর। ঐ কারণ শরীরে আনন্দ প্রতিভাত হওয়ায় উহাকে আনন্দময় কোষ বলে, তদুপরি বুদ্ধিতত্ত্বকে বিজ্ঞানময় মনস্তত্ত্বকে মনোময় জৈবতত্ত্বকে প্রাণময় ও স্থূল দেহকে অন্নময় কোষ বলে। যেমন গুটি পোকা স্বীয় লালা দ্বারা সূত্রের ন্যায় পদার্থ বাহির করিয়া তদ্বারা কোষ রূপ গুটি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বদ্ধ হয়, সেইরূপ সূত্রাত্মা স্বভাব হইতে ত্রিগুণ সূত্র বাহির করিয়া তদ্বারা পঞ্চ কোষ নির্ম্মাণ করতঃ তাহাতে বদ্ধ হন। প্রকৃত পক্ষে সদাত্মা বদ্ধ হন না। তাঁহার আভাস চৈতন্য স্বীয় ভাবে মগ্ন হইয়া কোষোপাধি জীব অভিমানী হন। ঐ আনন্দময় কোষকে কারণ দেহ বলে, যে হেতু শুদ্ধচিৎই আনন্দ এই জন্য কারণ দেহে আনন্দ মাত্র প্রতিভাত হয়। বিজ্ঞানময়, মনোময় এবং প্রাণময় কোষকে সূক্ষ্ম দেহ বলে, যে হেতু, বিজ্ঞানময়কোষে বুদ্ধি ও অহঙ্কার রূপে অর্থাৎ আমিত্বকারে, মনোময় কোষ কল্পনাও কামরূপ দেহাকারে এবং প্রাণময় কোষে বায়ুরূপ দেহাকারে আভাস চৈতন্য প্রতিভাত হয় এবং অন্নময় কোষকে স্থূল দেহ বলে। পূর্ব্ব বর্ণিত মত কার্য্যের অবনয়ন প্রণালী অনুসারে পূর্ব্বোক্ত ভাব সমূহ তমগুণাক্রান্ত হইয়া যখন পঞ্চভূতে বিবর্ত্তিত হয় এবং তমগুণের প্রাধান্য হেতু মৃত্তিকা ও পাষাণাদিতে পরিণত হয়, তখন ঐ মৃৎ পাষাণাদি স্থূল জড়রূপ ভেদ করিয়া

বুদ্ধি মন প্রাণ ইত্যাদির বিকাশ হয় না, কেবল রজ গুণের কিঞ্চিৎ মলিনাভাস তমগুণের সহিত মিশ্রিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত মত আকর্ষণ বিয়োজনাদি জড় ধর্ম্মাক্রান্ত—কর্ম্ম সমূহ ঐ মৃৎ পাষাণাদির অন্তরোপাদানকে ধাতবোপাদানে এবং ধাতবোপাদানকে উদ্ভিদোপাদানে উদ্ভিদোপাদনকে জৈবোপাদানে পরিণত করে, তদনন্তর ঐ জৈবোপাদান মধ্যে রজগুণ জনিত জান্তব-উষ্মা (Animal magnetism উদ্দীপিত হইয়া ঐ জৈবোপাদান বা জীবাণু সকলকে পরস্পর সংযোগ করিয়া অন্নময় কোষ অর্থাৎ সপ্ত ধাতু ও জৈব যন্ত্র (organs সকল নির্ম্মাণ করিতে থাকে, ঐ যন্ত্র সকল নির্ম্মিত হইলে শুদ্ধ সত্ত্ব গুণের সামান্য কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র রজগুণাক্রান্ত হইয়া ঐ রজগুণের কিঞ্চিৎ সাহায্যকারি হওয়ায় রজগুণই কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় নির্ম্মাণ করিয়া লইয়া জীবের প্রাণময় কোষ প্রস্ফুটিত করিয়া দেয়, এই সম্মিলিত কোষদ্বয় অর্থাৎ অন্নময় ও প্রাণময় কোষ মনুর স্মৃতিতে ভূতাত্মা বলিয়া বর্ণিত আছে ; ঐ ভূতাত্মাই তীর্য্যগ্ অর্থাৎ পশু পক্ষ্যাদির আত্মা। পশু পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যগ্ জাতির মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষের সম্পূর্ণ বিকাশ না হওয়ায় উহাদের জীবাত্মার সম্যক বিকাশ হয় না। উহাদের জীবনান্তে প্রাণময় কোষ বিশ্লিষ্ট হইয়া যায় এবং ঐ কোষস্থ জীবাণু সকল ভূলোকে বিশ্লিষ্ট অবস্থায় থাকে অবশ্যই উক্ত জীবাণু সকলের মধ্যেও প্রাণময় কোষের অঙ্কুর আছে। যাহাহউক, উহাদের অভ্যন্তরস্থ রজস্তমগুণ জনিত রাগ বা আকর্ষণী শক্তি প্রভাবে উহারা পুনঃ সংশ্লিষ্ট ও কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া স্বজাতীয় বীর্য্যে জন্ম গ্রহণ করে। অবশ্যই পশু পক্ষ্যাদির মধ্যেও আনন্দ বিজ্ঞানও মনোময় কোষ আছে, তবে ঐ কোষত্রয় মুদ্রিত থাকায়, পশ্বাদিতে আত্ম জ্যোতি বিকাশ হয় না। উহাদের লক্ষ লক্ষ জন্ম পরিগ্রহের পর ক্রমে ক্রমে উহাদের জৈবোপাদান সংস্কৃত ও তাহাতে সত্ত্ব গুণের বিকাশ হয়, সত্ত্ব গুণের বিকাশ হইলে ঐ জৈবোপাদানের মধ্যে উচ্চতর লোকস্থ সত্ত্ব গুণময় দেবতত্ত্বের স্ফুরণ হয় এবং তদ্দ্বারা মনোময় কোষ প্রস্ফুটিত হয় ঐ মনোময় কোষ প্রস্ফুটিত হইলে বিজ্ঞানময় কোষের কিঞ্চিৎ বিকাশ হয় এবং বিজ্ঞানময় কোষে আত্মাভাস প্রতিবিম্বিত হয় ঐ প্রতিবিম্ব মনোময় কোষে পতিত হইয়া তদাকার ধারণ করে এবং তদ্ গুণাক্রান্ত ও তদনুরূপ দেহেন্দ্রিয় নির্ম্মাণ করিয়া লইয়া তাহাতে প্রতিভাত হয়।

উপরোক্ত বর্ণনা আমার স্বকপোল কল্পিত নহে। আত্রেয় উপনিষদে প্রকাশ আছে "প্রজাপতি ব্রহ্ম প্রথমে কীট পতঙ্গ; পরে ক্ষুদ্র পশু সৃষ্টি করিয়া তাহাদের ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগকে প্রবেশ করিতে আদেশ করেন কিন্তু দেবতাগণ ঐ দেহ তাঁহাদের উপযোগী নহে বলিয়া প্রবেশ করিতে অস্বীকার করায় গবাশ্বাদি বৃহৎ পশু সৃষ্টি করিয়া দেবতাদিগের প্রতি পুনর্ব্বার ঐরূপ আদেশ করিলেন, দেবতাগণ ঐ পাশব দেহও অনুপযুক্ত বলিয়া অগ্রাহ্য করায় প্রজাপতি মানব দেহ সৃষ্টি করিবা মাত্র অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ আহ্লাদের সহি

মানবেন্দ্রিয়ে প্রবিষ্ট হইলেন দেবগণ প্রবিষ্ট হইবা মাত্র মহৎ সমভিব্যাহারী পুরুষ দ্রবীভূত হইয়া দেহেন্দ্রিয়াদির মধ্যে সর্ব্বস্থান ব্যাপ্ত হইলেন”।

বেদান্তোক্ত মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষই মনুর মহৎ সংজ্ঞক জীব। উহাই আত্মার সমভিব্যাহারী। প্রকৃত পক্ষে বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের আভাস মনোময় হইয়া ইহপরলোক গতায়াত পূর্ব্বক সুখ দুঃখ ভোগ এবং জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া ক্রমোন্নতি লাভ করে।

এ মহৎ সমভিব্যাহারী জীবাত্মা ইহলোক পরিত্যাগ কালে ইন্দ্রিয় ও মনের প্রবৃত্তি ও অভিজ্ঞতার সার সংগ্রহ সমভিব্যাহারে লইয়া পরলোক গমন করেন।

তথায় উহা পরিপাক ও বুদ্ধি কোষে দ্রবীভূত হইয়া পূর্ব্ব জন্মের প্রবৃত্তি ও অভিজ্ঞতার সংস্কার পরজন্মের বীজরূপে পরিণত হয়। পরজন্মে এ বীজ হইতে এ সকল প্রবৃত্তি ও বিষয় জ্ঞান প্রস্ফুটিত ও বিকাশিত হওয়ায়, তাহার সহিত নূতন নূতন ভাব ও অভিজ্ঞতা যতই সঞ্চিত হইতে থাকে বুদ্ধি কোষস্থ জ্ঞান মণ্ডল ততই বিস্তৃত হইতে থাকে, এ জ্ঞানালোকে বুদ্ধি নির্ম্মল হইলে প্রকৃত সুখের বা জ্ঞানানন্দের বিকাশ হয় এবং ভ্রান্ত জ্ঞানের কারণীভূত অবিদ্যা ধ্বংস হয়। অবিদ্যা ধ্বংস হইলে চিন্ময়ি বিদ্যা দেবীর বিকাশ হয় এবং বিজ্ঞানময় কোষ আনন্দময় কোষে বিলীন এবং আনন্দময় কোষ অবিদ্যায় অঙ্গীভূত হইয়া স্বরূপ জ্ঞানানন্দে পরিণত হয়। [illegible] কথিত [illegible] চিদ্দর্পণ সদৃশ ঐশ্বরিক শক্তিই যে বিদ্যা তাহা বলা বাহুল্য অতএব অবিদ্যারাজ্য হইতে জীব মুক্ত হইলে বিদ্যা রাজ্যান্তর্গত হইয়া সর্ব্ব-শক্তিময় সর্ব্বজ্ঞ মহেশ্বরের অঙ্গীভূত হয়। তখন মুক্তাত্মা আর জীব বা জীবাত্মা পদ বাচ্য থাকে না। যে হেতু অবিদ্যাই জীবের কারণ শরীর বা চিত্ত এ কারণ শরীরস্থ চিদাভাসই প্রাজ্ঞ বা ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ। এ ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ বুদ্ধি তত্ত্বে প্রতিবিম্বিত হইলে তৈজস জীবাত্মা নামে অভিহিত হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত চিত্ত-দর্পণ মহৎ চিদ্দর্পণে পরিণত হইলে প্রাজ্ঞ বা ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর বা সর্ব্ব ক্ষেত্রজ্ঞ মহাপুরুষ পদে উন্নীত হইয়া সর্ব্বেশ্বরের সমাঙ্গীভূত হন। ইহাই বেদান্ত মতের সার সংগ্রহ।*

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

* আমাদের বুদ্ধি বা বিজ্ঞানময় কোষ, যাহা চিত্ত-দর্পণ বলিয়া কথিত হইয়াছে অথবা মনু যাহাকে আত্মার সমভিব্যাহারী মহৎ সংজ্ঞক জীব বলিয়াছেন এ মহৎ এবং পূর্ব্বোক্ত মহদ্ব্রহ্ম সমষ্টি বুদ্ধিরূপ ঈশ্বরের চিদ্দর্পণ এক নহে। উক্ত মহদ্বুদ্ধি সমষ্টি ভাবাপন্ন অর্থাৎ অনন্ত চৈতন্য বা জ্ঞানের মহৎ চিদ্দর্পণ স্বরূপ। আমাদের বুদ্ধি ব্যষ্টি ভাবাপন্ন পৃথক ২ চিত্তের পৃথক ২ মলিন চিত্ত দর্পণ স্বরূপ। শেষোক্ত বুদ্ধি বা বিজ্ঞানময় কোষকে মনের উচ্চ অঙ্গ বলিলে ভাল হয়। সঙ্করাচার্য্য “মুখাভাসকো দর্পণে দৃশ্যমান” শ্লোকে যে দর্পণের কথা বলিয়াছেন, উহা শেষোক্ত চিত্ত-দর্পণ।

সামবেদীয়া

কেনোপনিষৎ।

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

[মূল]

ওঁ কেনেষিতং পততিপ্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি। ১
শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসোমনোযদ্
বাচো হবাচং সউ প্রাণস্য প্রাণঃ
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥ ২
ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি
নবাগ্ গচ্ছতি নো মনো
ন বিদ্মো ন বিজানীমো
যথৈতদনুশিষ্যাৎ।
অন্যদেব তদ্বিদিতা
দথো অবিদিতা দধি
ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং
যেনস্তদ্ ব্যাচচক্ষিরে ॥ ৩
যদ্ বাচা নভ্যুদিতং
যেন বাগভ্যুদ্যতে
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি
নেদং যদিদমুপাসতে। ৪
যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতম্
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে। ৫
যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি
যেন চক্ষূংষি পশ্যতি
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি
নেদং যদিদমুপাসতে। ৬
যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি
যেন শ্রোত্রমিদংশ্রুতম্
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি
নেদং যদিদমুপাসতে। ৭
যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি
যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি
নেদং যদিদমুপাসতে। ৮ ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ

[অনুবাদ]

শিষ্য। প্রেরিত হইয়া কাঁহা কর্ত্তৃক মানস
ধায় নিজ বিষয়েতে ? কার নিয়োজনে
প্রথম স্বরূপ প্রাণ হয় অগ্রসর ?
কাহার ইচ্ছায় লোকে বাক্য উচ্চারয় ?
কোন্ দেবতাবা চক্ষু কর্ণে নিয়োজয় ? ১

আচার্য্য।
শ্রোত্রেরও শ্রোত্র তিনি, মনের ও মন:
বাক্যেরওবাক্য তিনি প্রাণের ও প্রাণ।
চক্ষুরও চক্ষু তিনি; এই জ্ঞানে ত্যজি
শ্রোত্রাদিতে আত্ম বোধ, সব ধীরগণ
এলোক হইতে যেয়ে লভে অমরণ। ২
চক্ষু কিম্বা বাক্যমন-গম্য তিনি নন;
জানি না তাঁহারে; পুনঃ তাঁর উপদেশ
কিরূপে অন্যেরে দেয় তাহাও না জানি।
"জ্ঞাত ও অজ্ঞাত হ'তে ভিন্ন তিনি হন"
এরূপ কহেন সেই পূর্ব্বাচার্য্যগণ
যাঁহাদের উপদেশ করেছি শ্রবণ। ৩
নাহি হন প্রকাশিত বাক্যে যেই জন
কিন্তু বাক্য প্রকাশিত যাঁহার সত্তায়
তাঁহারেই জেনো ব্রহ্ম; যাহার অর্চ্চন
করে লোকে ইহা ব্রহ্ম না হয় কখন। ৪
না পারে করিতে যাঁরে মনেতে মনন
কিন্তু মন চিন্তা করে যাঁহার সত্তায়
তাঁহারেই জেনো ব্রহ্ম; যাহার অর্চ্চন
করে লোকে ইহা ব্রহ্ম না হয় কখন। ৫
না পারে করিতে যারে চক্ষুতে দর্শন
চক্ষের দর্শন শক্তি যাঁহার সত্তায়
তাঁহারেই জেনো ব্রহ্ম; যাহার অর্চ্চন
করে লোকে ইহা ব্রহ্ম না হয় কখন। ৬
নাহি পারে কর্ণে যাঁরে করিতে শ্রবণ
কর্ণের শ্রবণশক্তি যাঁহার সত্তায়
তাঁহারেই জেনো ব্রহ্ম; যাহার অর্চ্চন
করে লোকে ইহা ব্রহ্ম না হয় কখন। ৭
না পারে করিতে যাঁরে প্রাণেতে প্রাণন
প্রাণের প্রাণন শক্তি যাঁহার সত্তায়
তাঁহারেই জেনো ব্রহ্ম; যাঁহার অর্চ্চন
করে লোকে ইহা ব্রহ্ম না হয় কখন। ৮

শ্রীমনোরঞ্জন মিত্র।

শ্রী শ্রী হরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজেষ্টারীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৮ম বর্ষ, ৮ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা।	ভাদ্র।	১৩০৮ সাল, ১৮২৩ শকাব্দা।

শ্রীসূর্য্য-স্তোত্রম্।

কার্ত্তিকান্ত দীপনৈক দীপভূতমংশুভি।
শ্লানিমঃশুপুণ্ডরীকদীপ্তিহর্ষকারিণম্।
রক্তগন্ধভূষিতাঙ্গ রক্তপুষ্পধারিণম্।
বন্দয়ামি শর্ম্মদং মতিপ্রদং দিবাকরম্। ১

খোদয়েন জাত মোদকোকযুগ্ম-সংস্তুতং।
পদ্মগর্ত্ততাম্রকান্তিদারিতান্ধকারজম্।
সানুরাগপূর্ব্বদিগ্বধূবিচুম্বিতাননম্।
বন্দয়ামি শর্ম্মদং মতিপ্রদং দিবাকরম্। ২

চণ্ডরশ্মিদীপ্রদেহ বিপ্রমুখ্যদৈবতম্।
শস্যপুষ্টিবৃষ্টিহেতু হৃষ্টি-তুষ্টি-দায়িনম্।
ছায়য়োসজ্ঞার্থমস্বরূপ ধারকম্।
বন্দয়ামি শর্ম্মদং মতিপ্রদং দিবাকরং। ৩

বেদমন্ত্রজপ্যমান সৌরভর্গভূসুর।
প্রত্ত অর্ঘ্যবারি দিব্য শস্ত্রনাশিতাসুরম্।
প্রাজ্ঞমুক্তিমার্গদং পুরাতনং জগৎপতিং।
বন্দয়ামি শর্ম্মদং মতিপ্রদং দিবাকরং। ৪

[illegible]বর্ণ লব্ধ সূর্য্য দেবতা নিবর্ত্তিত।
শ্রৌতকর্ম্মনক্তবিপ্রহূয়মান জোহবম্।
কুঙ্কুমাভহস্তজাল সন্নিহীর্ষ মুদ্গতং
বন্দয়ামি শর্ম্মদং মতিপ্রদং দিবাকরং। ৫

বেদতত্ত্ব বোধনেষ্ট সিদ্ধ্যুপায় কোবিদে।
নার্য্যাবর্গ্যশঙ্করেণ তত্ত্বভাব্য-ভূষিতং।
অন্তরাদিত্যায়গম্যাহেমদেহদীপিতং।
বন্দয়ামি শর্ম্মদং মতিপ্রদং দিবাকরং। ৬

যোগিবর্গ্য যাজ্ঞবল্ক্য মুষ্ট্যানুষ্ঠিতস্তুতি
প্রসাদিতঃ সমাদদৌহি দিব্যবেদবৈভবম্।
যাজুষস্তমম্বুজাসন স্থিতং দয়াঘনং।
বন্দয়ামি শর্ম্মদং মতিপ্রদং দিবাকরং। ৭

শান্ত-দান্ত কান্ত দেহ-যোগীবৃন্দ-সেবিতম্
স্বপ্রকাশমদ্বিতীয়মংশুজাল ভাস্বরং।
স্থাবরাদিসৃষ্টিকার্য্য-মূলকারণংপরম্।
বন্দয়ামি শর্ম্মদং মতিপ্রদং দিবাকরং। ৮

উদয়গিরিশিখায়াং দিব্যরত্ন প্রভাভঃ।
সুর-নর-মুনিসঙ্ঘৈর্ব্বন্দিতোহভীষ্টসিদ্ধ্যৈ।

অরুণকিরণজালৈর্বোধয়ন্ সর্ব্ব জন্তুন্।
দিনমণিরতি ভক্ত্যাস্তু য়ত্তাং ভোঃ সমস্তাঃ ৯,
ইতি শ্রীনরহরি শাস্ত্রি-বিরচিতম্ দিবা-
করাষ্টকস্তোত্রং সমাপ্তম্।

১। যিনি নিমীলিত পদ্মসমূহকে প্রস্ফুটিত করতঃ হর্ষ প্রদান করেন, রক্তগন্ধদ্বারা শোভিত শরীর, রক্তপুষ্পধারী, সুখ এবং জ্ঞানপ্রদ, কার্য্য সমূহের প্রকাশে দীপের স্বরূপ, সেই সূর্য্যদেবকে নমস্কার করি।

২। যে সূর্য্যদেব পদ্মগর্ভের ন্যায় তাম্র-কান্তিদ্বারা অন্ধকার জন্য দোষ সমূহ নিরাকরণ করিয়া উদিত হইলে, চক্রবাক চক্রবাকীগণ আনন্দে যাঁহার স্তব করিয়া থাকে, এবং যিনি অনুরক্তা পূর্ব্বদিক্‌রূপা বধুর মুখ সাদরে চুম্বন করেন, বুদ্ধি এবং সুখদাতা সেই সূর্য্যদেবকে আমি প্রণাম করি।

৩। হে প্রচণ্ডকিরণশালিসূর্য্যদেব! তুমিই দ্বিজগণের মুখ্য আরাধ্য দেবতা, তুমিই বৃষ্টি হেতু ধান্যাদির বৃদ্ধির জন্য কিরণের দ্বারা ধান্যাদির সন্তোষ দানকর, তুমিই স্বীয় পত্নীর জন্য অশ্বরূপ ধারণ করিয়াছিলে, হে সুখদ জ্ঞানদ দিবাকর! আমি তোমাকে বন্দনা করি।

৪। বিপ্রগণ বেদমন্ত্রেরদ্বারা জপ করিয়া সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য প্রদান করিলে, যে সূর্য্যদেব সেই অর্ঘ্য দানের জলরূপ দিব্যাস্ত্রদ্বারা অসুর সমূহকে নাশ করিয়াছিলেন, প্রাজ্ঞদিগের মুক্তিমার্গদাতা জ্ঞানদায়ী জগৎপতি সেই সূর্য্যদেবকে প্রণাম করি।

৫। বেদজ্ঞব্রাহ্মণগণ সূর্য্যদেবকে আরাধনা করিয়া অগ্নিতে আহুতি অর্পণ করিলে, যে সূর্য্যদেব কুঙ্কুম সদৃশ হস্তদ্বারা সেই হোমীয় দ্রব্যাদি গ্রহণ করিবার জন্যই যেন উদয় হন, আমি সেই সূর্য্যদেবকে প্রণাম করি।

৬। বেদের তত্ত্ব-জ্ঞানান্বেষণে তৎপর আর্য্যশ্রেষ্ঠ শঙ্করাচার্য্য ভাষ্য দান করিয়া যাঁহাকে শোভিত করিয়াছিলেন, যাঁহার শরীর অস্ত্রাদি ন্যায় দ্বারা দেদীপ্যমান, আমি সেই সূর্য্যদেবকে বন্দনা করি।

৭। যিনি মুনিশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য মুনির স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দিব্য যজুর্ব্বেদ দান করিয়াছিলেন, জ্ঞানদাতা পদ্মাসনস্থ দয়ালু সেই সূর্য্যদেবকে প্রণাম করি।

৮। যোগিগণ যাঁহাকে আরাধনা করিয়া দান্ত কান্ত শান্ত দেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি অদ্বিতীয় হইয়া স্বয়ং প্রকাশিত হইতেছেন এবং যিনি কিরণ সমূহের দ্বারা প্রকাশমান, স্থাবরাদি জগতের মূল কারণ স্বরূপ সুখদাতা সেই সূর্য্যদেবকে প্রণাম করি।

৯। হে জীবগণ! সুর, মানব, মুনিগণ অভীষ্টসিদ্ধির জন্য উদয়াচলের শিখরে দিব্য রত্ন প্রভা সদৃশ যাঁহাকে আরাধনা করেন, এবং যিনি অরুণ-কিরণ সমূহদ্বারা সমস্ত জীবকে জাগরিত করেন, সেই সূর্য্যদেবকে আরাধনা কর।

বৈদান্তিক-মতের সমালোচনা।

বিগত বর্ষের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখের ইংরাজী ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় উপাধ্যায় ব্রহ্ম বন্ধু ৮ই ডিসেম্বর বুধবার তারিখে আগত

বার্টহলে (Albert Hall) বেদান্ত সম্বন্ধে যে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। এ বক্তৃতায় তিনি আধুনিক বৈদান্তিকদিগের ও থিয়সফিষ্ট-গণের প্রতি যে সকল দোষারোপ করিয়াছেন, তাহা যে নিতান্ত অমূলক, ইহাই প্রদর্শন করা আমাদিগের এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ঐ বক্তৃতা ইংরাজী ভাষায় কথিত এবং ইংরাজী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা হিন্দু, আমাদিগের পত্রিকার নাম হিন্দু-পত্রিকা, বিশেষতঃ বিষয়টীও হিন্দু-দিগের মৌলিক বেদান্তদর্শন-মূলক ; অতএব হিন্দুদিগের ভাষা ব্যতীত বিজাতীয় ভাষা উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা আমাদের অভিপ্রেত নহে, এজন্য তাঁহার অতিরঞ্জিত ইংরাজি বক্তৃতার কায়দাটী পাঠকগণকে দেখাইতে পারিলাম না ; সুতরাং তাঁহার বক্তৃতার সার বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

উপরোক্ত বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ।

"বৈদিক কালে ক্রমে ক্রমে হিন্দু-দিগের অধ্যাত্মজ্ঞান উচ্চতর হইতে উচ্চতম সীমায় অধিরোহিত হইয়াছিল, অর্থাৎ তাঁহাদের সীমাবদ্ধ সান্ত সসীম ব্যষ্টিজ্ঞান এক অদ্বিতীয় অসীম অনন্ত ব্রহ্মজ্ঞানে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তদনন্তর ব্রহ্মজ্ঞান পুনর্ব্বার অধঃপতিত হইয়াছে। হিন্দু জাতির বর্ত্তমান শোচনীয় অধঃপতন দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে উহা তাহাদের ভ্রান্তি-[illegible] অপরাধের দণ্ড ভোগ মাত্র; যেহেতু ন্যায়বান ঈশ্বর বিনা কারণে কাহাকেও দণ্ড প্রদান করেন না। প্রকৃত পক্ষে হিন্দুরা বেদান্তদর্শনোক্ত অভ্রান্ত মত পরিত্যাগ করিয়া ভ্রান্তমত অবলম্বন করায় এতদূর অধঃপতিত হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

বেদান্তদর্শনে আমরা দেখিতে পাই যে, জগতের এক মাত্র কারণ আছে; সেই আদি কারণই পরব্রহ্ম; তিনিই সৎ (পবিত্র), তিনিই চিৎ (জ্ঞান), তিনিই আনন্দ (সুখ)। আর্য্যঋষিগণ সেই সচ্চিদানন্দ রূপ মূল্যবান রত্ন-ভাণ্ডার তাঁহাদের উত্তর বংশীয়গণকে প্রদান করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে সেই মূল্যবান রত্ন যাহাতে অপহৃত না হয়, তৎপক্ষে আধুনিক হিন্দুগণের সাবধান হওয়া অতীব কর্ত্তব্য। আধুনিক থিয়সফিষ্টগণ পরব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ স্বীকার না করায়, তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে হিন্দুজাতির শত্রুরূপে পরিগণিত। ঐ থিয়সফিষ্টগণ হিন্দুদিগের সহিত এক মতাবলম্বী বলিয়া মৌখিক স্বীকার করেন বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা প্রাচীন বেদান্ত মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। উপরোক্ত একমেবাদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মবাদ প্রচারিত হওয়ার পর হিন্দুগণ তাহাদের (পূর্ব্ববিশ্বাসরূপ) বহু দেব দেবীর সহিত এ অদ্বৈতবাদের সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ সামঞ্জস্যের সন্ধি-স্থানে শনৈঃ শনৈঃ ভয়ঙ্কর ভ্রান্তি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। পরবর্ত্তিবৈদান্তিকগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, যদিও ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয়, নিরংশ ও অবিচ্ছিন্ন, তথাচ এক ব্রহ্ম আবশ্যক মত সৃষ্টির নিমিত্ত বহু হইয়া থাকেন।

অতএব সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বহুরূপে বিবর্ত্তিত হওয়ায়, "এই বহু-জন-সংশ্লিষ্ট জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহাদের এ উক্তি সম্পূর্ণ অসংলগ্ন। যদি ব্রহ্ম সীমাবদ্ধ ব্যষ্টি-জীবে পরিগণিত হইয়া থাকেন, তাহাহইলে তাঁহাকে আর অসীম অনন্ত বলা যাইতে পারে না। অথবা একই সময় তিনি অসীম অনন্ত এবং সসীম সান্ত জীব, উভয়ই পরিগণিত হইয়াছেন, বলিতে হয়। এ পরবর্ত্তি-বৈদান্তিকগণ, এই অসংলগ্ন ভ্রান্তমত সংস্থাপনের কোন উপায় করিতে না পারিয়া অর্থাৎ এক ব্রহ্মের সহিত বহুত্বের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে অপারক হইয়া, এ অসংলগ্নতা দূরীভূত ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য ব্রহ্মের "মায়া" কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত মায়া-কল্পনা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত অসংলগ্নতা দোষ সংশোধিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং তদপেক্ষা আরও জঘন্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; অর্থাৎ উহা দ্বারা অসীম অনন্ত ব্রহ্মে যে কেবল সীমাবদ্ধ ব্যষ্টিত্বের আরোপণ হইয়াছে, তাহা নহে ; তদপেক্ষা গুরুতর দোষ ব্রহ্মের মায়া—অর্থাৎ কপটভাব আরোপিত হইয়াছে। উক্ত মতবাদ হইতে পৌত্তলিকতা—অর্থাৎ বহুদেব-দেবীর পূজা প্রচলিত হওয়ায়, হিন্দুদিগের নৈতিক অবনতি ও ন্যায়অন্যায়-বিচারশক্তি এককালে তিরোহিত হইয়াছে।" ইত্যাদি।

বক্তা অবশেষে তাঁহার স্বদেশীয়দিগকে বহু দেব দেবীর পূজা পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় একমেবাদ্বিতীয়ং সচ্চিদানন্দের উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলেন, সেই অনাদি একমেবাদ্বিতীয়ং সচ্চিদানন্দ হইতে এই বহু জীব-জন্তু-সমন্বিত জগৎ কি প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে, তর্ক বা যুক্তি দ্বারা তাহা সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। উহা কেবল সেই অন্তরাত্মার—অর্থাৎ হৃদয়ের অন্তরতম স্তরের ভাব দৈববাণীর ন্যায় স্ফুট হইলে, মানবের এ আশা পূর্ণ হইতে পারে ; তদ্‌ভিন্ন সৃষ্টিতত্ত্ব জ্ঞাত হইবার অন্য উপায় নাই। তিনি স্বীয় অন্তরাত্মা হইতে উহার আভাস প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঙ্গিতে এইরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়া বলেন যে, এই ব্যষ্টি জগতের সহিত ব্রহ্মের যে সংস্রব আছে, তদ্দ্বারা অনন্ত ব্রহ্ম সান্ত রূপান্তরিত বা ব্যষ্টিত্বে পরিণত হন নাই। এই জগৎ তাঁহারই প্রতিমূর্ত্তি। তিনি অনাদি কাল হইতে তাঁহার আত্মার স্বরূপাংশের সহিত এই জগতে সম্পূর্ণ সংসৃষ্ট আছেন, এবং তাঁহার আত্মা উক্ত প্রতিমূর্ত্তির মধ্যে স্থিত হইয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতেছেন। তিনি তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ কার্য্য-জগৎকে সম্পূর্ণ জানেন ও ভালবাসেন এবং প্রতিদানে জ্ঞান ও প্রেম পাইয়া থাকেন। এইরূপে বহুত্বের অর্থাৎ ব্যষ্টি জগতের সহিত অনাদি অদ্বিতীয় অনন্ত ব্রহ্মের সামঞ্জস্য হইতে পারে।

উপরোক্ত বক্তৃতার সমালোচনা।

বক্তার উপরোক্ত বক্তৃতার অভিপ্রায় এই যে, পরবর্ত্তিবৈদান্তিকগণ (Later Vetantists) অনন্ত ব্রহ্ম বহুরূপে ব্যক্ত হইয়াছেন বলায়, ব্রহ্মের প্রতি সসীম ব্যষ্টিত্ব দোষ আরোপিত হইয়াছে এবং জগৎ তাঁহার মায়া বলাতে, তাঁহার প্রতি অ[illegible]

উৎপাদক কপটতার আরোপ হইয়াছে। কিন্তু তৎপরেই বক্তা স্বীকার করিয়াছেন যে, এই জগৎ ব্রহ্মের প্রতিমূর্ত্তি; এই প্রতিমূর্ত্তির মধ্যে তাঁহার আত্মা স্থিত হইয়া জগতের সহিত সংসৃষ্ট আছেন। বক্তা বোধ হয় শঙ্করাচার্য্য-প্রমুখ বৈদান্তিকদিগকে (Later Vetan tists) পরবর্ত্তি বৈদান্তিক বলিয়া তাঁহাদিগের বেদান্ত-ব্যাখ্যার উপর দোষারোপ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ পরবর্ত্তিবৈদান্তিকগণ—অসীম অনন্ত ব্রহ্ম যে সসীম সান্তজীব রূপে পরিণত হইয়াছে, ইহা কোথাও বলেন নাই। এই জগৎ যে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি, এই ভাবটী বক্তা তাঁহার অন্তরাত্মার নিকট হইতে দৈববাণীর ন্যায় প্রাপ্ত হইয়াছেন, প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ঐ দৈববাণী. তাঁহার কথিত পরবর্ত্তিবৈদান্তিকগণ বহুকাল পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়া যে সকল অমূল্য দৃষ্টান্ত দিয়া গিয়াছেন, বক্তার অন্তরাত্মা বক্তার প্রতি বোধ হয় ততদূর অনুগ্রহ করেন নাই, যথা—

মুখাভাসকো দর্পণে দৃশ্যমানো
মুখত্বাৎ পৃথক্ত্বেন নৈবাস্তি বস্তু॥
চিদাভাসকো ধীষু জীবোঽপি তদ্বৎ
সনিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা॥

অনুবাদ। দর্পণ প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থে মুখের প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেই প্রতিবিম্ব (বিম্বভূত) মুখ হইতে পৃথক্ বস্তু নয়। সেইরূপ জীবাত্মা অন্তঃকরণে প্রতিফলিত পরমাত্মার প্রতিবিম্ব মাত্র; পৃথক্ বস্তু নয়। আমি নিত্য জ্ঞানময় সেই [illegible]॥

যথা দর্পণাভাব আভাসহানৌ
মুখং বিদ্যতে কল্পনাহীনমেকম্।
তথা ধীবিয়োগে নিরাভাসকো যঃ
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা॥

অনুবাদ। যেমন দর্পণের অভাবে প্রতিবিম্বের অভাব হয়; তখন কেবল প্রতিবিম্বশূন্য মুখ মাত্র থাকে; সেইরূপ যিনি অন্তঃকরণের বিয়োগে প্রতিবিম্বশূন্য (অর্থাৎ "জীব" এই উপাধিশূন্য) হন, আমিই সেই নিত্যজ্ঞানময় আত্মা।

য একো বিভাতি স্বতঃ শুদ্ধচেতাঃ
প্রকাশস্বরূপোঽপি নানেব ধীষু।
শরাবোদকস্থো যথা ভানুরেকঃ
সনিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা॥

অনুবাদ। যিনি এক (অর্থাৎ যাঁহার সদৃশ বস্তু নাই।) প্রকাশ স্বরূপ হইলেও শুদ্ধচিত্তে স্বতঃ যাঁহার প্রকাশ; যেমন শরাব প্রভৃতি বিবিধ জলপূর্ণ পাত্রে প্রতিফলিত সূর্য্য এক হইলেও (পাত্র ভেদে) ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ আত্মা এক হইলেও, নানা অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হওয়ায়, নানা বলিয়া বোধ হয়, সেই নিত্য জ্ঞানময় আত্মাই আমি।

যথানেক চক্ষুঃ প্রকাশোরবির্ণ
ক্রমেন প্রকাশীকরোতি প্রকাশ্যং।
অনেকাধিয়ো যস্তথৈক প্রবোধঃ
সনিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা॥

অনুবাদ। যেমন সূর্য্য এক হইয়া অনেক চক্ষুর প্রকাশ্য বিষয় যুগপৎ প্রকাশ করেন, সেইরূপ এক প্রবোধ (আত্মা) অনেক অন্তঃকরণ (অর্থাৎ যিনি এক হইয়া অনেক অন্তঃকরণের বিষয়কে) এককালে প্রকাশ

করেন, ক্রমে নয়; সেই নিত্য জ্ঞানময় আত্মাই আমি।

যথা সূর্য্য একোঽপ্যনেকশ্চলাসু।
স্থিরাস্বপ্যনন্যদ্বিভাব্য স্বরূপঃ॥
চলাসু প্রভিন্নাসু ধীষেব এবং
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা॥

অনুবাদ। যেমন সূর্য্য এক হইয়া সচল জলে অনেক এবং অচল জলে একরূপ দৃষ্ট হন, সেইরূপ যিনি স্বরূপতঃ এক হইয়া চঞ্চল নানা বুদ্ধিতে নানা প্রকার প্রতিভাত হন, নিত্য জ্ঞানময় সেই আত্মাই আমি।

ঘনচ্ছন্ন দৃষ্টির্ঘনচ্ছন্নমর্কং
যথা নিষ্প্রভং মন্যতে চাতিমূঢ়ঃ।
তথা বদ্ধবদ্ভাতি যো মূঢ় দৃষ্টেঃ
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা॥

অনুবাদ। যেমন অতি মূঢ়ব্যক্তি, নয়ন-পথ আবৃত হইলে, সূর্য্যকে মেঘাবরণে অপ্রকাশস্বরূপ বিবেচনা করে, সেইরূপ অজ্ঞানে জ্ঞান আবৃত হইলে, অতিমূঢ় স্বপ্রকাশস্বরূপ যে চৈতন্যকে অপ্রকাশস্বরূপের ন্যায় বিবেচনা করে, সেই নিত্য জ্ঞানময় আত্মাই আমি।

সমস্তেষু বস্তুষ্বনুস্যূতমেকং
সমস্তানি বস্তূনি যন্ন স্পৃশন্তি।
বিয়দ্বৎ সদা শুদ্ধ স্বচ্ছস্বরূপং
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা॥

অনুবাদ। যিনি সমস্ত (নানা) বস্তুতে অন্তর্যামীরূপে অনুগত, অথচ এক, সমস্ত বস্তু যাঁহাকে স্পৃষ্ট (লিপ্ত) করিতে পারেনা এবং আকাশের ন্যায় সর্ব্বদা সমস্ত বস্তুতে অনুস্যূত হইলেও যিনি—শুদ্ধ (রোগাদি-দোষমুক্ত) এবং অমূর্ত্তস্বভাব নিত্য জ্ঞানময় সেই আত্মাই আমি।

পাঠক! একবার দেখুন যে, বক্তার অন্তরাত্মার দৈববাণীর বহুশত বর্ষ পূর্ব্বে বক্তার কথিত পরবর্ত্তিবৈদান্তিক—অর্থাৎ মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য সৃষ্টির সহিত অনন্ত ব্রহ্মের যে কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা স্পষ্টাক্ষরে দর্শাইয়া প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়া গিয়াছেন। উপরোক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা অনন্ত অসীম ব্রহ্মে কি সান্ত সসীম দোষ স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়?

ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ের ৪। ৫। ৬ শ্লোকে বর্ণিত আছে যে—

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্ত মূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ॥

অনুবাদ। অব্যক্তরূপী আমি এই সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া আছি; চরাচর ভূত সমুদয় কারণীভূত আমাতে অবস্থিত, আমি নির্লিপ্ত বলিয়া সে সকলে অবস্থিত নহি।

নচ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥

অনুবাদ। আমি নির্লিপ্ত, এজন্য ভূত সকলও আমাতে অবস্থিত নহে। আমার ঐশ্বরিক যোগ দেখ, আমি ভূত-ধারক ও ভূতপালক, তথাপি ভূতগণে অবস্থিত নহি।

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥

অনুবাদ। সর্ব্বব্যাপী এবং মহান বায়ু যেরূপ অসংশ্লিষ্ট ভাবে আকাশে অবস্থিত, সমুদয় ভূতও সেইরূপভাবে আমাতে অবস্থিত, ইহা জানিও।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥

অনুবাদ। হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, সূত্রে মণিগণের ন্যায় আমাতে এই সমস্ত জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে।

পাঠক! দেখিবেন, উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা অসীম অনন্ত ব্রহ্ম সসীম বা সান্ত হন নাই এবং সংসৃষ্ট-দোষেও দোষিত হন নাই। কিম্বা বক্তার কথিতমত একই সময় অসীম অনন্ত ও সসীম সান্ত হন্ নাই; তিনি অনাদি কাল হইতে অসীম অনন্তস্বরূপে বিরাজিত ছিলেন ও আছেন ও থাকিবেন; জগৎ-প্রকাশ দ্বারা তাঁহার কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই।

বক্তার অন্তরাত্মার দৈববাণীর—বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে আর্য্যঋষিগণ এবং তৎপর-বর্ত্তিবৈদান্তিকগণ ঐ দৈববাণী নানারূপ রূপক ও দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ঐ বৈদান্তিকগণ অনন্তের সহিত ব্যষ্টি জগতের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গিয়া কোথাও ভ্রমে পতিত হন নাই, এবং ঐ সামঞ্জস্যের সন্ধি-স্থানে বক্তার উক্তমত শনৈঃ শনৈঃ ভ্রান্তি আসিয়া অধিকার করে নাই। উহা বক্তার কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

বক্তা পরবর্ত্তিবৈদান্তিকদিগের প্রতি যে দোষারোপ করিয়াছেন, তাঁহারা সেই দোষে কোন অংশে দোষী নহেন। মহাত্মা-শঙ্করাচার্য্য বেদান্তের শারীরক ভাষ্যে বক্তার বর্ণিত মত দোষ সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়া, অতি সুন্দররূপে তাহার মীমাংসা এবং দোষক্ষালন করিয়া গিয়াছেন। যথা,—

আপত্তি—

বিশুদ্ধ কারণ রূপ ব্রহ্মে অশুদ্ধ কার্য্যরূপ জগতের বীজ থাকায় কারণও অশুদ্ধ হয়।

মীমাংসা—

কারণ-ব্রহ্ম স্থিতি কালে বা লয়কালে অর্থাৎ কোন কালেই কার্য্য ধর্ম্মাক্রান্ত হন না। উভয় কালেই অবিকৃত থাকেন। কারণে কার্য্য-জগৎ থাকে না। যেমন স্বর্ণে কুণ্ডল, মৃত্তিকায় ঘট প্রস্তুত হইলেও স্বর্ণ, কুণ্ডলধর্ম্মাক্রান্ত কি মৃত্তিকা ঘটধর্ম্মা-ক্রান্ত হয় না। তবে স্বর্ণে কুণ্ডল প্রভৃতির শক্তি বা মৃত্তিকায় ঘট প্রভৃতির শক্তি গুহ্য থাকে; সেইরূপ ব্রহ্মে শক্তির বীজ গুহ্য থাকে। তাহাতে কারণ-ব্রহ্ম অশুদ্ধ হইবে কেন? (বেদান্তদর্শন।)

আপত্তি—

ব্রহ্মে যদি তপ্য-তাপক বিকার থাকে, তবে তিনি অশুদ্ধ হন। অর্থাৎ তিনি মুক্ত পুরুষ হওয়া অসম্ভব। যদি তাঁহাতে তপ্য-তাপক বিকার না থাকে, তবে নিত্য ব্রহ্মের পক্ষে তপ্য-তাপকভাব কোথা হইতে আসিবে?

মীমাংসা—

ব্রহ্ম নিত্য মুক্ত, তাঁহাতে তপ-তাপক ভাব নাই। সত্ত্ব রজোগুণে ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব পতিত হইলে, প্রকৃত পক্ষে সেই সত্ত্বগুণই তপ্য, রজোগুণই তাপক হয়। বেদান্ত দর্শন ২য় পাদ ৬ হইতে ৯ সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম ঐ ২য় পাদের ১৭১ হইতে ১৭৩ সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্য বিশেষ দ্রষ্টব্য। উহাতে ব্রহ্মের অনন্তত্ব ও জগতের সান্তত্ব বা ব্যষ্টিত্ব সম্বন্ধে অতি সুন্দর সামঞ্জস্য আছে।

প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় বিবৃত করিতে ক্ষান্ত হইলাম।

উপরে বর্ণিত হইয়াছে, সত্ত্ব-রজ-গুণে ব্রহ্ম প্রতিবিম্ব পতিত হইলে, সত্ত্বগুণ তপ্য ও রজোগুণ তাপক হয়; প্রশ্ন-এ সত্ত্ব-রজোগুণ কোথা হইতে আসিল?

এই প্রশ্নের মীমাংসা যদিও মৎকৃত 'পুনর্জ্জন্মতত্ত্ব' প্রবন্ধে বিষদরূপে ব্যাখ্যাত ও সিদ্ধান্তীত হইয়াছে, তথাপি বক্তার কৃত অন্যায় আরোপিত দোষ খণ্ডনের নিমিত্ত সংক্ষেপে উহার উত্তর প্রদান আবশ্যক।

চিদানন্দময়-ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব সমন্বিতা,
তমো রজঃ সত্ত্বগুণা প্রকৃতি র্দ্বিবিধা চ সা।
সত্ত্ব শুদ্ধাবিশুদ্ধিভ্যাং মায়া বিদ্যে চ তেমতে,
মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ-ঈশ্বরঃ।
অবিদ্যাবশগস্ত্বন্যস্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা,
সা কারণশরীরং স্যাৎ প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানবান্।
তমঃ প্রধান প্রকৃতেস্তদ্ভোগায়েশ্বরাজ্ঞয়া
বিয়ৎ পবন তেজোঽম্বু ভুবো ভূতানি জজ্ঞিরে॥

অনুবাদ। আত্মার পরমানন্দ প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধকের হেতু অবিদ্যা এবং ইহার কারণ স্বরূপ প্রকৃতি। সেই প্রকৃতি সচ্চিদানন্দময় এবং ব্রহ্মের প্রতিবিম্ববিশিষ্ট বিশুদ্ধ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সূক্ষ্মতম অবস্থা স্বরূপ। সেই প্রকৃতি দ্বিবিধা; মায়া ও অবিদ্যা। যখন প্রকৃতি সত্ত্বগুণের নির্ম্মল অবস্থা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যখন সাত্ত্বিক ভাবাপন্না হয়, তখন তাহাকে মায়া বলে। এ প্রকৃতি যে সময়ে এ সত্ত্বগুণের মালিন ভাব আশ্রয় করে, তখন তাহাতে প্রকৃতি অবস্থাভেদে মায়া ও অবিদ্যা স্বরূপে প্রকাশিত হইয়া দ্বিধা বিভক্ত হয়। এক প্রকৃতি যে কারণে মায়া ও অবিদ্যা রূপে বিভিন্ন হইয়াছে, তাহা এই যে, মায়াতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব স্বরূপ যে চৈতন্য, যিনি মায়াকে বশীভূতা করিয়া রাখিয়াছেন, সেই চৈতন্য সর্ব্বজ্ঞ ও পরাৎপর ঈশ্বর নামে খ্যাত আছেন।

উক্ত অবিদ্যাতে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব সমন্বিত যে চৈতন্য, যিনি অবিদ্যার বশতাপন্ন হইয়া 'জীব' নামে কীর্ত্তিত হয়েন, সেই অবিদ্যার নির্ম্মলতা ও মালিন্যের তারতম্য প্রযুক্ত ঐ জীব দেব, মনুষ্য, গো, অশ্ব প্রভৃতি নানাপ্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রাজ্ঞগণ সেই স্থূল শরীরকে 'বৈশ্বানর' জ্ঞান করিয়া অবিনাশী কারণ-শরীরকে ব্রহ্ম-প্রাপ্তির কারণ বলিয়া স্বীকার করেন।

পূর্ব্বোক্ত কারণ-শরীরকে ঈশ্বর-প্রাপ্তির নিদান এবং স্থূল শরীর—কেবল জীবের সুখাদি ভোগার্থ; সেই স্থূল শরীর উৎপত্তির কারণীভূত যে আকাশ, বায়ু, তেজঃ, অপ্ ও ক্ষিতি, এই পঞ্চভূত, তাহা প্রাজ্ঞ জীবের ভোগার্থ। ইহা তমোগুণপ্রধান প্রকৃতি হইতে ঈশ্বরের আজ্ঞায় প্রাজ্ঞদিগের ভোগের জন্য সমুৎপন্ন হইয়াছে। ঐ সকল আকাশাদি পঞ্চ ভূত এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের নিমিত্ত। ইহা হইতে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে।

এখন এই তর্ক উঠিতে পারে, যে

প্রতিবিম্বিতা প্রকৃতি ত্রিগুণবিশিষ্টা ; ঐ ত্রিগুণের বিশুদ্ধতা ও অবিশুদ্ধতা উভয়ই আছে। কিন্তু ব্রহ্ম সৎ—চিৎ—আনন্দ, তাঁহার স্বভাব বা প্রকৃতি অবিশুদ্ধ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব।

ইহার উত্তর অতি সহজ। তিনি সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ। তিনি প্রকৃতির অধীন নহেন। প্রকৃতি তাঁহার শক্তি, ঐ শক্তি ; কর্তৃক প্রকৃষ্টরূপে কার্য্য কৃত হয় বলিয়া উহাকে প্রকৃতি কহে। চৈতন্য শক্তির অধীন নহেন, শক্তিই চৈতন্যের অধীন। তুমি জ্ঞানবান পুরুষ, শক্তি এবং কার্য্য তোমার সম্পূর্ণ অধীন। তুমি বিবেচনা ও ইচ্ছা পূর্ব্বক তোমার শক্তি ও কার্য্য যে ভাবে পরিচালন করিবে, সেই ভাবে পরিচালিত হইবে। যাহা-হউক, যখন তিনি অনন্ত, তখন তাঁহার শক্তিও অসীম। তাঁহার ইচ্ছাশক্তি হইতে কোটী ২ ব্রহ্মাণ্ড, জীব, বস্তু, মানব, সকলই উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ জীব জন্তু সমন্বিত জগৎ তাঁহার বিভূতি বা তাঁহার প্রকৃতির ভাব-প্রবাহ। ঐ ভাবের মধ্যে তাঁহার স্বরূপের যে কিঞ্চিৎ আভাস পতিত হয়, তাহাই জীব-চৈতন্য।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, অনন্ত ব্রহ্ম তাঁহার শক্তির অধীন নহেন ; শক্তি তাঁহার অধীন, তিনি অনন্ত ; সুতরাং তাঁহার শক্তি হইতে আবশ্যক মত সমস্ত ভাবের বা গুণের স্ফুরণ বা বিকাশ হইতে পারে। কোন ভাব বা গুণ তাঁহার শক্তির বহির্ভূত নহে। বহির্ভূত হইলে তাঁহার অনন্তত্ব থাকেনা। মনে করুন, আপনি ধার্ম্মিক, সচ্চরিত্র, বিদ্বান, জ্ঞানবান, কার্য্যদক্ষ ও সর্ব্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ। আপনি জন-সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত "মডেল্ ভগিনী" উপন্যাসের ন্যায় এক-খানি উপন্যাসে পাপরূপ নরকের চিত্র অতি রঞ্জিত করিয়া মানবের কর্ম্মানুরূপ ফলের অনন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা সমাজকে শিক্ষা দিলেন। ঐ পাপচিত্রগুলি আপনার কল্পনা-প্রসূত ভাবের প্রবাহ মাত্র ; কিন্তু ঐ পাপ-চিত্র রঞ্জন দ্বারা আপনাকে কি কোন পাপ স্পর্শ করিল? অথবা আপনি স্বয়ং কি সেই পাপে লিপ্ত বা অবিশুদ্ধ হইলেন? কখন না, কখন না ; অথচ ঐ "মডেল্ ভগিনী" উপন্যাসোক্ত পণ্ডিত রাধাশ্যাম ও বেহারের রাজা আপনার কল্পিত ভাবের বিশুদ্ধ চিত্র বা স্বর্গ এবং কমলিনী, তাহার গৃহ-শিক্ষক, নগেন্দ্র, গৃহ-চিকিৎসক মহেন্দ্র এবং খানসামা কপিল অবিশুদ্ধ চিত্র বা নরক। ঐ উপন্যাসটী আপনার ভাবের প্রবাহ, ঐ ভাবের মধ্যে সত্ত্ব, রজ ও তম, ত্রিগুণ বিদ্যমান আছে। সত্ত্বগুণের চিত্র পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত রাধাশ্যাম, বেহারের রাজা এবং পরে কৈলাসচন্দ্রও বটে ; রজ-তমমিশ্রিত গুণের চিত্র পূর্ব্বোক্ত কমলিনী, নগেন্দ্র, মহেন্দ্র, কপিল প্রভৃতি ; আবার সামান্য রজমিশ্রিত তমঃপ্রধান গুণের চিত্র কমলিনীর পিতার ঘোড়ার ঘাসিদার। * ঐ গ্রন্থে মুক্ত পুরুষের দৃষ্টান্ত কাশীর উলঙ্গ সন্ন্যাসী। নির্ম্মল জ্ঞান, নির্ম্মল সুখ, শম, দম, দয়া, ক্ষমা, ঔদার্য্য

* কেবল তম-গুণের চিত্র না বলিয়া সামান্য রজমিশ্রিত তম বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তম-গুণ হইতে জড় বস্তুর উৎপত্তি হয় ; অতএব জীব যতই অজ্ঞান ও জড়-ভাবাপন্ন হউক না কেন, তাহাতে কিঞ্চিৎ

প্রভৃতি সত্ত্বগুণের কার্য্য; কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি এবং কর্ম্মের অদমস্পৃহা ইত্যাদি রজগুণের কার্য্য; ভ্রান্তি, মোহ, জড়তা, তম গুণের কার্য্য।

এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, আপনার ভাবের প্রবাহ আপনার মন, হস্ত, কাগজ, কালী ও কলম সংযোগে যেরূপ পুস্তকাকারে পরিণত হইতে পারে, সেইরূপ নিরাকার ব্রহ্মের ভাব-প্রবাহ কি প্রকারে স্থূল জগদাকারে বিবর্ত্তিত হইবে? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, (১) ব্রহ্ম অনন্ত, তাঁহার মহামানস বা মহতী ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিও অনন্ত। তাঁহার ইচ্ছাশক্তি হইতে ভাবের বিকাশ এবং ক্রিয়াশক্তি হইতে এই ভাবময় জগৎ উৎপন্ন বা ভাবসমূহ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জড়জীবজন্তুসমন্বিত অসংখ্য জগদাকারে বিবর্ত্তিত হইয়াছে। কালী, কলম, কাগজের ন্যায় পরমাণুর সংযোগ, বিয়োগ, আকর্ষণ, বিক্ষেপণ, প্রভৃতি ক্রিয়া হইতে সূক্ষ্ম স্থূলত্বে ও স্থূল সূক্ষ্মত্বে পরিণত হইয়া, এই বৈচিত্র্যময়ী সৃষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছে ও হইতেছে। এ বিক্ষেপণ ও আকর্ষণাদির মূলে ঈশ্বরের হস্ত স্বরূপ একটী শক্তি অন্তর্নিহিত আছে; এ শক্তিই ক্রিয়াশক্তি। ব্রহ্মের মহামানস স্বরূপই চিন্ময়ী ইচ্ছাশক্তি (Intelectual force) হইতে এ ক্রিয়াশক্তি উৎপন্ন হয়; এ শক্তিকে যে চিন্ময়ী শক্তি ভিন্ন জড়শক্তি বলা যাইতে পারে না, জগতের যেখানে যেরূপ আবশ্যক সেইরূপ সর্ব্বনামরূপাই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

(২) যেমন অদৃশ্য হাইড্রজান—অক্সিজান বাষ্প কাচ-যন্ত্র বিশেষে পূর্ণ করিয়া তাহাতে তড়িৎ পাস্ করিলে, উহা দৃশ্য তৈজস বাষ্প রূপে বিবর্ত্তিত ও তাহা দ্রবীভূত হইয়া বিন্দু২ নীহারের ন্যায় ক্ষরিত হয়; পরে ঐ বারি বিন্দু সকল একত্রিত হইয়া যে বারি-রাশি উৎপন্ন হয়, তাহা যন্ত্রবিশেষে প্রক্রিয়া দ্বারা স্থূল কঠিন বরফাকারে পরিণত হইতে পারে, সেইরূপ ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তির ভাব-প্রবাহ তমোগুণ দ্বারা পঞ্চতন্মাত্রে (পঞ্চ ভূতে) বা পঞ্চগুণবিশিষ্ট পরমাণু রূপে বিবর্ত্তিত হয় এবং তাহা পূর্ব্বোক্ত আকর্ষণাদি ও রাসায়নিক ক্রিয়াদি দ্বারা সংশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট হইয়া রূপান্তরিত হয় এবং ঐ রূপান্তরিত ভিন্ন ভিন্ন উপাদান পুনঃ সংশ্লিষ্ট হইয়া বিচিত্র ভাবময় স্থূল জগতে পরিণত হইয়াছে।

৩। যেমন হোমিওপ্যাথি ঔষধ, যত অধিক ডাইলিউসন্ করা হয়, ততই ঔষধের তেজ ও গুণ অপেক্ষাকৃত স্ফূর্ত্ত ও পরিবর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ চিদাভাসময় সূক্ষ্ম ভাবসমূহ পূর্ব্বোক্ত মত স্থূল জড়জগতে পরিণত হইয়া, তদভ্যন্তরস্থ শুদ্ধ সত্ত্বগুণের স্ফুরণ হেতু জীবদেহের উৎপত্তি হয় এবং বহু জন্মের পর ঐ জীবের মস্তিষ্কে মানস ও বিজ্ঞান (বুদ্ধি) যন্ত্র প্রস্তুত এবং কল্পনা-চিন্তা, যুক্তি, বিচার, অহং-জ্ঞান ও সদসদ্বিবেচনার বিকাশ হয়। অর্থাৎ জড় ভাবের মধ্যে হইতে চিদাভাস স্ফুরিত হয়।

রজ-গুণের বিকাশ আছে; এমন কি, সত্ত্বগুণের কিঞ্চিৎ আভাসও আছে; কিন্তু কার্য্যতঃ সত্ত্বগুণের ক্রিয়া তমোভাবাপন্ন হওয়ায় উহা গণ্য নহে।

যেমন অন্ধকার গৃহে একটী দীপ মৃন্ময়-হাঁড়ি চাপা দিয়া রাখিলে, ঐ দীপালোক প্রকাশিত হয় না; কিন্তু যদি ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা মৃন্ময়পাত্র কাচপাত্রে পরিণত হয় কিম্বা স্বচ্ছ কাচের চিম্‌নির মধ্যে আলোক রক্ষিত হয়, তবে ঐ কাচের চিম্‌নি মধ্যস্থ আলোক-জ্যোতি বিকাশিত হইয়া গৃহ আলোকিত করে, সেইরূপ মৃত্তিকা পর্ব্বত প্রভৃতিতে জ্ঞান বা চৈতন্যের বিকাশ হয় না, কিন্তু জীব জন্তুতে কিঞ্চিৎ চিদাভাস—বিশেষতঃ মানবে জ্ঞানাভাস বিকাশিত হয়।

৫। যেমন সূর্য্য ও সূর্য্য-কিরণ এক হইলেও, যে পদার্থের উপর পতিত হয়, সেই পদার্থাকারে চক্ষে প্রতিবিম্বিত হওয়ায়, আমরা অসংখ্য আকার বা রূপ দর্শন করি, সেইরূপ ব্রহ্মের চিদাভাসময় জ্ঞান-সূর্য্যের কিরণ ভিন্ন ভিন্ন মস্তিষ্কে (ঐ মস্তিষ্কের গুণানুসারে) ভিন্ন ২ রূপে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় আমরা অসংখ্য জীব জন্তু রূপে ব্যক্ত হই। যেমন সূর্য্যকিরণ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে অসংখ্যাকারে প্রতিবিম্বিত হইলেও সূর্য্য বিকৃত বা বহু হন না, সেইরূপ চিদাভাস অসংখ্য জীব-দেহে প্রতি-বিম্বিত হইলেও সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বিকৃত বা বহু হন না। সূর্য্য-কিরণ অপবিত্র বিষ্ঠার উপর পতিত হওয়ায় ঐ বিষ্ঠা-প্রতিবিম্বিত-জ্যোতি চক্ষে প্রতিবিম্বিত হইলে বিষ্ঠা দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা যেমন সূর্য্য বা সূর্য্য কিরণ অপবিত্র হয় না, সেইরূপ চৈতন্যের জ্যোতি কুৎসিৎ পদার্থে বা হিংস্র জীব-দেহে প্রতি-বি[illegible] হওয়ায় [illegible] কখনও অপবিত্র হন না। * এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, পূর্ব্ববর্ত্তিবৈদান্তিকগণ কোন ভ্রমে পতিত হন নাই, বরং প্রকৃত তত্ত্ব অতি বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

বক্তা তাঁহার স্বদেশীয়গণকে বহুদেব-দেবীর উপাসনা করিতে নিষেধ করিয়া সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের উপাসনার কার্য্য-পদ্ধতি কিছুই ব্যক্ত করেন নাই। ব্রহ্ম অসীম—অনন্ত ও নিরাকার। আমরা সসীম সান্ত আকারবিশিষ্ট জীব এবং আমাদের জ্ঞানও সান্ত ও সসীম; ঐ জ্ঞান এক একটী ভাবের আকারে বিকাশিত হয়; অতএব সসীম সান্ত জ্ঞান কিরূপে অসীম অনন্ত নিরাকার ধারণা করিবে? অবশ্যই তিনি সচ্চিদানন্দ, সুতরাং পবিত্র সত্য জ্ঞানানন্দের উপাসনাই তাঁহার উপাসনা; অর্থাৎ আত্মায় সত্য পবিত্র ভাব উচ্ছলিত হইলে, সতের উপাসনা; প্রকৃত চৈতন্য উদিত, অন্ত বিজ্ঞান স্ফুরিত ও দর্শন ও তত্ত্বজ্ঞান বিকাশিত হইলে চিতের উপাসনা এবং আত্মা লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, মদ, মাৎসর্য্য, শোক, দুঃখ, প্রভৃতি হইতে মুক্ত হইয়া শান্তিময় হইলে আনন্দের উপাসনা হয়। প্রকৃত পক্ষে উপরোক্ত উপাসনাই যথার্থ উপাসনা, কিন্তু ঐ প্রকার উপাসনার কার্য্যপদ্ধতি আবশ্যক। ঐ উপাসনা বেদান্তদর্শনে ও যোগদর্শনে স্পষ্ট ব্যাখ্যাত আছে, অর্থাৎ বেদান্তোক্ত

---

* বালস্য বা বিষয় ভোগ রতস্য বাপি, মূর্খস্য সেবকজনস্য গৃহস্থিতস্য, এতদ্ দ্বয়োঃ কিমপিনৈব ন চিন্তনীয়ং, রত্নং কথং ত্যজতি কোঽপ্যশুচৌ প্রবিষ্টম্।

শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধি এবং পাতঞ্জলোক্ত যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধিই উহার কার্য্যপদ্ধতি। শ্রবণ অর্থে বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন ও তত্ত্বশাস্ত্রাদি শ্রবণ বা পাঠ দ্বারা তাহার অর্থোপলব্ধি, মনন অর্থে শ্রবণ দ্বারা যে অর্থোপলব্ধি হয়, চিন্তা দ্বারা তাহার প্রকৃত তত্ত্বাবিষ্কার, নিদিধ্যাসনার্থে ঐ তত্ত্ব অন্তরে প্রত্যক্ষ দর্শনের নিমিত্ত একাগ্রতার সহিত অবিচ্ছেদচিন্তা, সমাধি অর্থে ঐ অবিচ্ছেদ-চিন্তা দ্বারা অন্তরে যে তত্ত্বের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়, সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানে তন্ময়ত্ব বুঝায়। ঐ সমাধি দ্বারা প্রথম স্থূল তত্ত্বে, তদনন্তর সূক্ষ্ম তত্ত্বে, অবশেষে সর্ব্ব কারণের কারণ স্বরূপ সচ্চিদানন্দ প্রত্যক্ষ ও তাহাতে তন্ময়ত্ব লাভ হয়। কিন্তু শম (অন্তর্বৃত্তির শমতা), দম (ইন্দ্রিয়ের দমন), তিতিক্ষা শীতোষ্ণ প্রভৃতি সহিষ্ণুতা উপরতি (এক বস্তুর প্রতি মন ও ইন্দ্রিয়ের নিয়োগ পূর্ব্বক অন্য বিষয়ের প্রত্যাক্ষাভাব) শ্রদ্ধা (ভক্তি), সমাধান (একাগ্রতা), বিবেক (সদসৎ বিবেচনা), বৈরাগ্য (ত্যাগ স্বীকার) ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত শ্রবণ-মননাদির অধিকার হয় না। পাতঞ্জলোক্ত যম-নিয়মাদির একই উদ্দেশ্য এবং কার্য্যপদ্ধতিও প্রায় এক রূপ। ঐ সকল কার্য্যপদ্ধতি অতীব কঠিন; ঐ শম-দমাদির সাধন করিতে হইলে, বিষয়ের ত্যাগ ও লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধাদির দমন আবশ্যক; কিন্তু ভক্তি ও মনের উচ্ছ্বাস ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত ত্যাগ ও দমন অসম্ভব। উপরোক্ত কার্য্যপদ্ধতি ভিন্ন আর এক প্রকার কার্য্যপদ্ধতি আছে। ব্রহ্ম জগন্ময়, অতএব ভেদ-নীতিরহিত ও হিংসা দ্বেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জগতের হিত সাধন, প্রাণী মাত্রের উপকার, পরিতুষ্টি এবং সাম্য-নীতির অনুসরণ দ্বারা তাঁহার উপাসনা হয়। উপরোক্ত কয়েক প্রকার উপাসনাই উচ্চ অধি-কারীর পক্ষে ব্যবস্থেয়। এই ভারতবর্ষে উচ্চ মহর্ষি ও রাজর্ষি হইতে নীচ জাতীয় বন্য গারো কুকির পর্য্যন্ত বাস আছে। সুতরাং সাধারণ লোকের পক্ষে বেদান্তোক্ত বা পাতঞ্জলোক্ত যোগ দ্বারা আত্মোন্নতি অতীব দুষ্কর, এই জন্য সিদ্ধ মহর্ষিগণ সাধারণ জনগণের ভক্তি-প্রণোদনের নিমিত্ত ঈশ্বর-প্রেরণায় এক একটী শক্তির বা তত্ত্বের গুণানুরূপ এবং কোন২ স্থানে উচ্চতর জীবের পবিত্র চরিত্রানুরূপ (রূপক বা আদর্শ স্বরূপ) এক একটী ঐশী মূর্ত্তি আবিষ্কার ও ধ্যান প্রচার এবং পূজা-পদ্ধতির নিয়ম স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

যদি পবিত্রতা, জ্ঞান ও শক্তি লাভই উদ্দেশ্য হয়, তবে অজ্ঞানীর পক্ষে এক একটী ঐশী শক্তি বা সদ্‌গুণের প্রতিমা বা উচ্চতর সদ্‌ব্যক্তির আদর্শ চরিত্র বা গুণের উপাসনা বা পূজা অযৌক্তিক উপা-সনাই নহে। মানবের স্বীয় স্বভাবানুসারে প্রকৃতিসঙ্গত। স্বভাবকে হঠাৎ কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। দেবোপাসনা বা মূর্ত্তিপূজা দ্বারা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় উন্নতি সংসাধ্য। একটী একটী পূজা উপলক্ষে শত্রু-মিত্র অভেদ জ্ঞান, সকলকে আহ্বান, তাহাদিগের উৎকৃষ্ট ভোজনাদি দ্বারা সৎকার করা হয় এবং বিনয় ও সদ্-ব্যবহার দ্বারা মনস্তুষ্টি করা হয় এবং তদ্দ্বারা অন্তরে কতকটা শান্তি লাভ হয়। এতদ্ব্য-

মূর্ত্তিতে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও পূজাদি দ্বারা মন পবিত্র হয়। ঐ মূর্ত্তিময়ী ঐশী বিচ্ছক্তির কৃপা লাভ হয়।

মূর্ত্তিপূজা বা সাকারউপাসনার প্রকৃত ফল আমার কৃত "উপাসনতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধে (যাহা "অনুসন্ধান" নামক মাসিক পত্রে ১৩০১ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল) বিষদভাবে ব্যাখ্যাত আছে। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় পুনঃ বর্ণনায় নিরস্ত হইলাম। যাহাহউক, সাকার উপাসনার যথেষ্ট ফল আছে; উহা বক্তার কথিত মত ন্যায়-অন্যায়-বিচার রহিত অন্ধ-বিশ্বাসের কার্য্য নহে।

উপসংহারে বক্তব্য এই, বক্তা থিয়সফিষ্ট-দিগের প্রতি যে দোষারোপ করিয়াছেন, উহা ভিত্তিশূন্য, যেহেতু থিয়সফিষ্টগণ তাঁহাদিগের কোনও গ্রন্থে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম অস্বীকার করেন নাই। তবে জগতের সর্ব্ব প্রকার কারণ পরব্রহ্ম, অনাদি, অব্যক্তের অব্যক্ত এবং মন-বুদ্ধির অতীত। ঐ প্রথম কারণ সৎও নহে, অসৎও নহে, অথচ ঐ প্রথম কারণ হইতে সদসৎ সমস্তই বিকাশিত হইয়াছে। সৎই চিৎশক্তি, উহাকেই থিয়সফিষ্টগণ সমগ্র উদ্ভবের কেন্দ্র বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, উহাই সৎ, চিৎ ও আনন্দ। যাহাহউক, থিয়সফিষ্টদিগকে সমর্থন করা এবং তাহাদের গ্রন্থাদির সমালোচনা করা আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, থিয়সফিষ্টগণ প্রাচীন বেদান্তমতের বিরোধী নহেন এবং বক্তার উক্তিমত হিন্দুদিগের শত্রুও নহেন। [illegible] বেদান্তপ্রমুখ দর্শন ও তত্ত্বশাস্ত্রের প্রকৃত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের সহিত মিল করিয়া অতি সরল ভাবে প্রকাশ করায়, তাঁহারা হিন্দুদিগের পরম মিত্র এবং ধন্যবাদের পাত্র, তাহার সন্দেহ নাই। বক্তা যদি ম্যাডাম ব্লাভাটস্কি-প্রণীত "সিক্রেট্ ডক্‌ট্রিন্" নামক গুপ্ত ব্রহ্মবিদ্যা গ্রন্থখানি পাঠ করিতেন, তাহা হইলে উঁহা-দিগকে প্রাচীন বেদান্ত মতের বিরোধী বলিতে সাহসী হইতেন না। উক্ত গ্রন্থ উপনিষদ্ ও বেদান্ত প্রমুখ দর্শন ও তত্ত্ব-শাস্ত্রের বিজ্ঞানসম্মত অতি উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাহাহউক, উক্ত গুপ্ত ব্রহ্মবিদ্যা শঙ্করাচার্য্যের মতের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্যযুক্ত। উক্ত শঙ্করাচার্য্যের মত যে প্রাচীন বেদান্তসম্মত, তাহা পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে; অবশেষে বক্তব্য এই যে, শঙ্করা-চার্য্যের ভাষ্যোল্লিখিত মায়াবাদ তাঁহার স্বকপোলকল্পিত নহে। ঐ মায়াবাদ বেদের অতি প্রাচীন নারদীয় সূত্রে সুস্পষ্ট ব্যক্ত আছে এবং ঐ সূত্রে মায়াবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য বিষদভাবে বর্ণিত আছে। ঐ মায়াবাদ যে স্বাভাবিক ও বিজ্ঞানসম্মত, তাহা উক্ত "সিক্রেট্ ডক্‌ট্রিন্" গ্রন্থ (গুপ্ত ব্রহ্মবিদ্যা) পাঠে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। তদ্ভিন্ন এই হিন্দুপত্রিকার 'পুনর্জ্জন্মতত্ত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধের শেষভাগে মায়াবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য কথঞ্চিৎ পরিব্যক্ত হইয়াছে। বক্তা বোধ হয় মায়ার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারেন নাই, এই জন্যই উক্ত মায়াবাদ দ্বারা ব্রহ্মের প্রতি দোষ আরোপিত হইয়াছে বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। যাহাহউক, উহা দ্বারা ব্রহ্মের প্রতি যে কোনরূপ দোষ আরোপিত হইতে

পারে না, তাহা এই প্রবন্ধে প্রমাণিত হইয়াছে; অলমতিবিস্তরেণ।

দার্শনিক মীমাংসা-প্রণেতা
শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষাষ্টক।

শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষাষ্টক কি? শ্রীগৌরাঙ্গদেব-কৃত ও 'পদ্যাবলী'-ধৃত বৈষ্ণব-সারশিক্ষা-স্বরূপ শ্লোকাষ্টক। এই শ্লোকাষ্টক তাঁহার স্বরচিত, স্বয়মাস্বাদিত এবং জীব-শিক্ষা-ছলে শ্রীমুখনির্গত। কলির জীব দীন মানবকে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ অনেক শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি কলি-ক্লিষ্ট আর্ত্ত মানব-সমাজের ভগবদ্ভজনের কৃপা-কল্পতরু গুরু হইয়া আসিয়াছিলেন। অপূর্ব্ব, অসাধারণ, অলৌকিক ও অনুপম কৃষ্ণভজন জীবকে দেখাইয়া, শিখাইয়া, লিখাইয়া ও গিয়াছেন। স্বনাম-বরণীয় প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীরূপাদি ছয় গোস্বামীর বৈষ্ণব-হৃদয়-রত্নস্বরূপ সন্দর্ভ-সমূহ শ্রীগৌরাঙ্গেরই আদিষ্ট, উপদিষ্ট ও স্বশিক্ষাবিনিবিষ্ট। তৎ সমস্তেরই সার-নিকর্ষ (Extract) গৌরাঙ্গেরই স্বমুখ-বিবৃত এবং স্বয়ংসাধিত ও আস্বাদিত ঐ 'শিক্ষাষ্টক'। গৌরাঙ্গ-শিক্ষা-ক্ষীরাব্ধির মহনোৎপন্ন সুধাস্বরূপ এ শিক্ষাষ্টক। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রসাদ স্বরূপ—কলির জীবের হরি-তত্ত্ব-চিন্তামণি-হারের মধ্য-মণিই এ শিক্ষাষ্টক। "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত" বলিয়াছেন,—

"পূর্ব্বে অষ্ট শ্লোক করি লোক-শিক্ষা দিলা।
সেই অষ্ট শ্লোকার্থ আপনে আস্বাদিলা॥
প্রভু-শিক্ষা অষ্ট শ্লোক যেই পড়ে শুনে।
কৃষ্ণে প্রেম-ভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে॥"

কৃষ্ণ-প্রেম-ভক্তিই জীবের চরম ও পরম সম্পদ। যে শিক্ষাষ্টকের শ্রবণ-কীর্ত্তন মননাদি রূপ সাধনে সে সম্পদের আস্পদ হওয়ার আশা করা যায়, তাহা যে কিরূপ প্রাণ-প্রিয় বস্তু, বলাই বাহুল্য।

ভাবুক ভক্ত বুঝিলে বুঝিতে পারিবেন যে, এই শিক্ষাষ্টকই মানবের সমস্ত অধ্যাত্ম-প্রয়োজনের সম্যক্ আয়োজনে সুসম্পন্ন। এই শ্লোকাষ্টকেই গীতা, ভাগবত, ভক্তি-সূত্র, উপনিষৎ, সমস্তই বর্ত্তমান। বলিতে কি, বেদ-বেদান্ত, স্মৃতি, দর্শন, তন্ত্র, পুরাণ, সর্ব্ব-শাস্ত্রের সার-সৌরভ (Essence) স্বরূপ "শিক্ষাষ্টক" আখ্যাত ঐ সুবিখ্যাত শ্লোকাষ্টক। আপাততঃ অতি স্থূল দৃষ্টিতে এ শ্লোকাষ্টক বিভিন্ন ভাবের কতিপয় বৈষ্ণবী কবিতা মাত্র বোধ হইতে পারে; কিন্তু ভাবুক উপাসক উহার তত্ত্বার্থ-রস-কূপে যত পশিবেন, ততই রসিবেন; উহার তলাও পাইবেন না, উঠিতেও চাহিবেন না। অন্ততঃ গোস্বামী প্রভুগণের এই সাক্ষ্য। "অন্ততঃ" বলিলাম এই জন্য যে, আমাদের সুসংকীর্ণ হৃদয় হয়ত সে ভাব-সিন্ধুর বিন্দু-বিসর্গেই প্লাবিত হইয়া যায়, সুতরাং পূর্ণ প্রতীতির আশা পরিহার দুরাশা। তবে কিনা, সুপক্ক সৌরভ-গৌরবিত সুরস অমৃত-ফলের ঈষদাঘ্রাণও আনন্দপ্রদ, মনোহর ও স্বাস্থ্যকর। কথাই আছে,—"ঘ্রাণেন চার্দ্ধভোজনং"। যার আপাততঃ ভোজনের আশা নাই, তার এবম্বিধ অর্দ্ধ-ভোজনও একটু উপকারী; অন্ততঃ ইহাতে ভোজনলালসা বর্দ্ধিত হয়। লালসা হইতে

চেষ্টা, চেষ্টা হইতে কার্য্য, কার্য্য হইতে ফল। যাহাহউক, আমরা এইরূপ আশায় বিচার অবলম্বন করিয়াই "শিক্ষাষ্টক" বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা ও নিবেদন করিতে অগ্রসর হইলাম। বৈষ্ণব-সমাজে এই শিক্ষাষ্টক সুপরিচিত। তন্মধ্যে স্বতঃসাধু-মণ্ডলে ইহা স্বতএব আস্বাদিত ও সাধিত। তবে কি না, ব্যবহার না জানিলেও যেমন সুন্দর জিনিসটি নাড়াচাড়া করিতে শিশুর সাধ হয়, শ্রীগৌরাঙ্গের সেই শিক্ষাষ্টক লইয়া আমাদের নাড়াচাড়া করাও তদ্বৎ। যাহাহউক, নিম্নে শ্লোক কয়টি উদ্ধৃত ও আলোচিত হইল।

(১)

চেতো দর্পণ-মার্জ্জনং ভবমহা-
দাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং।
শ্রেয়ঃকৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণং
বিদ্যাবধূ-জীবনম্॥
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণা-
মৃতাস্বাদনং।
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে
শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনম্॥

অন্বয়।—(এ শ্লোকের অন্বয় প্রায় ইহার পুনরাবৃত্তি মাত্র; কেবল শেষ চরণে "শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনং পরং বিজয়তে" এইরূপ করিলেই হয়।)

পদ্যানুবাদ।—

চিত্ত-দরপণ হয় মার্জ্জিত যাহায়।
ভব-মহাদাবদাহ নির্ব্বাপিত যায়॥
কুশল-কুমুদে যাহা কৌমুদী-বর্ষণ।
যাহা হয় বিদ্যারূপা বধূর জীবন॥
আনন্দ-অমৃতসিন্ধু যাহাতে বর্দ্ধিত।
প্রতিপদে পূর্ণামৃত যাহে আস্বাদিত॥
সর্ব্বাত্মা সুস্নিগ্ধ অভিসিঞ্চনে যাহার।
সেই কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের জয়জয়কার॥

(২)

নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন
কালঃ।
এতাদৃশী তবকৃপা ভগবন্ মমাপি।
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

অন্বয়।—নাম্নাম্ বহুধা অকারি। তত্র নিজ সর্ব্বশক্তিঃ অর্পিতা; স্মরণে কালঃ ন নিয়মিতঃ। ভগবন্! তব এতাদৃশী কৃপা, মম অপি ঈদৃশং দুর্দ্দৈবং, ইহ অনুরাগঃ ন অজনি।

পদ্যানুবাদ।—

আপনার বহুনাম করি বিস্তারিত।
নিজ সর্ব্বশক্তি তায় করিলা অর্পিত॥
সেই নাম সকলের স্মরণ কারণ।
না করিলা কোনরূপ কাল-নির্দ্ধারণ॥
ভগবন্! হেন দয়া তব, কিন্তু হায়।
আমারো দুর্দ্দৈব হেন, রতি নাহি তায়॥

(৩)

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি
সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ
সদা হরিঃ॥

অন্বয়।—(আর সমস্তই যথাবৎ; কেবল শেষে—হরিঃ সদা কীর্ত্তনীয়ঃ (ভবতি), এই মাত্র।)

পদ্যানুবাদ।—

তৃণ হতে নীচ হয়ে, সহিষ্ণু তরুর চেয়ে,
আপনি অমানী হয়ে, অন্যে যে মানদ।
তারি দ্বারা কীর্ত্তনীয় শ্রীহরি সতত॥

(৪)

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তি-রহৈতুকী ত্বয়ি॥

অন্বয়।—জগদীশ! ধনং ন, জনং ন, সুন্দরীং ন, কবিতাং বা (ন) কাময়ে। মম জন্মনি জন্মনি ঈশ্বরে ত্বয়ি অহৈতুকী ভক্তিঃ ভবতাৎ।

পদ্যানুবাদ।—

জগদীশ! ধন, জন, সুন্দরী, কবিত্ব,
এ সকল কামনা না করে মম চিত্ত।
তুমি হে ঈশ্বর, যেন তোমাতে নিশ্চয়—
জন্মে জন্মে অহৈতুকী ভক্তি মোর হয়।

(৫)

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলী-সদৃশং বিচিন্তয়॥

অন্বয়।—অয়ি নন্দতনুজ! বিষমে ভবাম্বুধৌ পতিতং কিঙ্করং মাং কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত ধূলীসদৃশং বিচিন্তয়।

পদ্যানুবাদ।—

হে নন্দতনুজ! ভীম ভব-পারাবার-
নীরে নিপতিত এই কিঙ্কর তোমার।
তব পদপঙ্কজের ধূলি-কণা প্রায়—
ভাবি মোরে কৃপা করি রাখ (হরি) পায়।

(৬)

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদ-রুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম-গ্রহণে ভবিষ্যতি।

অন্বয়।—তব নাম গ্রহণে, গলদশ্রুধারয়া নয়নং, গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা বদনং, পুলকৈঃ নিচিতং বপুঃ (চ) কদা ভবিষ্যতি।

পদ্যানুবাদ।—

গলদশ্রুধারে কবে ভাসিবে নয়ন।
বদনে গদ্গদ রুদ্ধ হইবে বচন॥
কবে হবে পুলকেতে লোমাঞ্চিত গাত্র।
(হরি হে!) নামটি তব উচ্চারণ মাত্র॥

(৭)

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে॥

অন্বয়।—গোবিন্দ-বিরহেণ মে (মম) নিমেষেণ যুগায়িতং, চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং, সর্ব্বং জগৎ শূন্যায়িতং (ভবতি)।

পদ্যানুবাদ।—

নিমেষে যুগান্ত মম, বর্ষা সম ঝরে আঁখি।
সমস্ত জগৎ শূন্য গোবিন্দ-বিরহে দেখি॥

(৮)

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো, মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

অন্বয় ।—পাদরতাং মাং আশ্লিষ্য পিনষ্টু বা, অদর্শনাৎ (মাং) মর্ম্মহতাং করোতু বা; লম্পটঃ যথা তথা বা বিদধাতু; তু (কিন্তু) সঃ মৎ-প্রাণনাথঃ এব, ন অপরঃ।

পদ্যানুবাদ।—

প্রেমাবেশে বাহুপাশে বাঁধিয়া সে জোরে।
পেষণ করুক্ এই পদরতা মোরে॥
অথবা দর্শনদান না করিয়া হায়।
পরম মরমহতা করুক্ আমায়॥
সে লম্পট যা খুসি তা করুক্ বিধান।
আমারি সে প্রাণনাথ—নহে কভু আন॥

প্রথম শ্লোকে সাধকের প্রথম ও প্রধান অবলম্বন নাম-সংকীর্ত্তনের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। একটী প্রাচীন নাম-সংকীর্ত্তন-পদে আছে—"হরি হৈতে হরির নাম বড় ধন"। কথাটি লইয়া শুষ্ক তর্ক উঠাইলে রস পাওয়া যাইবে না—লাভ কিছু হইবে না। মোটামুটি এইটুকু বুঝিতে পারা যায় যে, তত্ত্বরূপী হরিকে কে পায়? কিন্তু নামরূপী হরিকে অর্থাৎ হরি-নামকে সকলেই পাইতে পারে; এই নামস্বরূপ হরি সকলের সুলভ; অথচ নাম ও নামী অভিন্ন।

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম-
নামিনোঃ।"

"হরিনাম-চিন্তামণি" গ্রন্থে ইহার ভাবানুবাদ, যথা—

"কৃষ্ণনাম চিন্তামণি অনাদিচিন্ময়।
যেই কৃষ্ণ সেই নাম—এক তত্ত্ব হয়॥
চৈতন্যবিগ্রহ নাম—নিত্য মুক্ততত্ত্ব।
নাম-নামী ভিন্ন নয়, পূর্ণ শুদ্ধসত্ত্ব॥

ফলে পুরাণাদি বহু শাস্ত্রবাক্যেই হরি ও হরিনামের অভিন্নত্ব প্রতিপাদিত।

"যেই নাম সেই কৃষ্ণ, ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত র'ন আপনি শ্রীহরি॥"

এই তত্ত্বামৃত বৈষ্ণবসমাজে সাদরে আস্বাদিত।

"বিশ্বব্যাপী সে হরি, নরে করুণা করি,
হরিনামের মাঝে নাগর-সাজে নাচে আমরি!"

শ্রীহরির বিশ্বব্যাপী একান্ত-ঐশ্বর্য্য-সত্তার সারতত্ত্ব পরিমিতগ্রাহী ক্ষুদ্র জীবের জন্য মাধুর্য্য-সত্তায় ক্ষুদ্ররসনারত্ত নামে বিরাজিত! ইহা অপেক্ষা কৃপা আর কি হইতে পারে? নামে ঐশ্বর্য্য-শক্তিও অপরিসীম। নাম-বলে কি না হইতে পারে? অধিক কথায় কাজ কি, নামেই যখন নামীকে পাই, তখন আর কি চাই? নামে নামীর ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য, উভয় তত্ত্বই উপেত।

"নাম ধর, নাম স্মর, নাম কর ভাই।
নামে কৃষ্ণ বিনিবিষ্ট, নামে কৃষ্ণ পাই॥"

আবার শাস্ত্র বলেন, "জপাৎ সিদ্ধিঃ।" মন্ত্রজপ—নামজপ একই। নামই মন্ত্র, মন্ত্রই নাম। 'বীজ' সকল উপাস্য ঐশতত্ত্বেরই রাশি-নাম স্বরূপ, অথবা সংক্ষিপ্ত সাঙ্কেতিক নাম বা 'বর্ণ-ব্রহ্ম'ও বলা যায়।

জপ-সাধনে—নাম-মন্ত্রের প্রত্যেক বিশুদ্ধ মননে ভগবদাকর্ষণ হয়।

"নাম সেব, নাম ভাব, নাম জপ ভাই।
নাম-সূত্র ধরি ধরি হরিধনে পাই॥
নাম লও, নাম কও, নাম গাও ভাই।
কীর্ত্তনে মিলান কৃষ্ণ চৈতন্য নিতাই॥"

এতাবতা সিদ্ধান্ত এই যে, স্বয়ং ভগবান্ ও ভগবন্নাম অভিন্ন হইলেও, নামে সুলভতা-

রূপ ভাবটি অধিক বলিয়াই "হরি হইতে হরির নাম বড় ধন।"

পৌরাণিক উদাহরণেও এ তত্ত্ব প্রমাণিত। সত্যভামার ব্রতে হরিনামের সহিত হরির তুলাযন্ত্রে আরোহণ ও নামের গৌরব-প্রতিষ্ঠাপন-লীলার বৃত্তান্ত অনেকেই অবগত আছেন। ইহাতে ফলিতার্থে হরির লাঘব হয় নাই; কারণ নামের যে গৌরব, তাহা তাঁহার নাম বলিয়াই, এবং তাঁহারই সর্ব্বশক্তি নামে সঞ্চিত বলিয়াই।

"তোমাতে মজিনি শ্যাম! মজেছি বাঁশীতে।
কুটিল কটাক্ষে আর মধুর হাঁসিতে॥"

এ কথায়, শ্যামের কুটিল কটাক্ষ, মধুর হাসি, আর সেই "কুল মজানো" মোহন বাঁশী, এ সবের গৌরব-ঘোষণায় কি বস্তুতঃ শ্যামের লাঘব হইয়াছে? ফলে ও সব শ্যামের বলিয়াই এত গৌরবের! নামের বিষয়টি তাহারও অধিক; কারণ এস্থলে শ্যামের হাসি, বাঁশী, কটাক্ষ ইত্যাদি সমস্ত উপকরণ সহ সমগ্র শ্যামতত্ত্বই নাম-নিবিষ্ট! অতএব কেবল হরির নাম বলিয়াই "হরিনাম" এত গৌরবের নয়; পরন্তু নাম স্বয়ং হরি বলিয়াই এ গৌরব। হরির ইচ্ছাতেই হরির সহিত হরিনামের চির-একীভবন এবং হরির কৃপাতেই "হরি হইতে হরির নাম বড় ধন!" তবে কিনা, শুধু কথার আলোচনায় এ তত্ত্ব হৃদগত হইবার নহে। শুধু বাগ্বিস্তার-বিচারণায় এ সিদ্ধান্ত সমাহিত হইবার নহে; কার্য্যতঃ সাধনা চাই। যেমন কোন রসময় বস্তুর রসবোধ আস্বাদন ব্যতীত কেবল দর্শন-স্পর্শনাদিতেই হইতে পারে না, তদ্রূপ সাধ্য বস্তুর তত্ত্ববোধ সাধনা ভিন্ন কেবল বচন-রচনা বা তর্কালোচনা দ্বা[রা] সম্ভাবিত নহে। এই জন্যই কলির অন[ন্য] আরাধ্য ভগবন্নাম তত্ত্ব লাভার্থে সংকীর্ত্ত[ন] দ্বারা তৎসাধনার ব্যবস্থা।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
গতিরন্যথা॥"

হরি-নাম হরি-নাম হরি-নাম সার।
নাই নাই নাই গতি কলিকালে আর॥

কলিতে হরি-নাম অর্থাৎ হরির নাম ভি[ন্ন] গতি নাই। মূলেও "হরের্নাম" (হরির নাম) এই ষষ্ঠ্যন্ত পদ আছে। অর্থাৎ হরির যে কোন নাম-মন্ত্র এস্থলে লক্ষিত। কেবল "হরি" এই শব্দাত্মক নামটি মাত্র নয়; কিন্তু হরি, রাম, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, নারায়ণ, গোবিন্দ, গোপাল, বাসুদেব, ইত্যাদি নামগুলি সমস্তই পরিত্রাতা, মোক্ষদাতা, শাশ্বতশান্তিবিধাতা;—আবার (নাম-বিশেষে) নাম মোক্ষাধিকধন মধুর আত্মসমর্পণ ও তদ্গত সাক্ষাৎ-সেবা-প্রেমানন্দপ্রদাতা। ফলে ভগন্নামনিচয় সমস্তই মন্ত্রময়। সমস্তই 'ইষ্ট' ও ভক্তের কাছে সমস্তই সুমিষ্ট। তারপর, যার যে নামাত্মক মন্ত্রে উপাসনা, তার সেই নামই একান্ত আত্মাধনিষ্ঠ। তাহার মনোপ্রাণ তাহাতেই নিতান্ত নিষ্ঠ ও নিত্য-নিবিষ্ট। আবার এক ভাবে তত্ত্বতঃ অভিন্নত্ব থাকিলেও, ভাবান্তরে অভ্যন্তরে নাম-ভেদে মন্ত্র-ভেদ, মন্ত্রভেদে ভজন-ভেদ, ভজন-ভেদে ভাবাশ্রয়-ভেদ, ভাবাশ্রয়-ভেদে সিদ্ধি বা প্রাপ্তি-ভেদ ব্যবস্থিত।

"যে ভাবে যে ডাকে, সে ভাবে সে পাবে।
তবে ভাবময় ব্যক্ত ভক্ত-ভাবে॥"

শ্রীভগবান স্ব-শ্রীমুখে গীতায় গাহিয়াছেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" শ্রীচরিতামৃতকার এবিষয়ে বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে।
যেহ যৈছে ভজে কৃষ্ণে, কৃষ্ণ ভজে তৈছে॥"

ফলে আমাদের এতৎপ্রসঙ্গে অধিক অগ্রসর হইবার সাধ্য নাই। গূঢ় ভজনতত্ত্বের আলোচনা অস্মদীয় অধমাধিকারের অতি দূরবর্ত্তী।

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥"

সত্যযুগে ধ্যানযোগে বিষ্ণুর ভজন।
ত্রেতায় যজ্ঞেতে যজ্ঞেশ্বরের যজন॥
দ্বাপরে হরি-সাধন সিদ্ধ অর্চ্চনায়।
কলিকালে হরিসঙ্কীর্ত্তনে হরি পায়॥

অপিচ—

"ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্।"

সত্যযুগে ধ্যান ধরি, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ করি,
দ্বাপর যুগেতে অর্চ্চনায়।
পায় নর যেই ফলে, কেশব-কীর্ত্তন-ফলে
সেই ফল কলিযুগে পায়।

কলিযুগের ভগবদ্ভজন বিষয়ে নাম সংকীর্ত্তনের ঐকান্তিক আবশ্যকতা আরও অনেক শাস্ত্রোক্তি দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে; বাহুল্য-ভয়ে অধিক উদ্ধৃত হইল না।

কলির জীবের সামর্থ্য স্বল্প, আয়ু অল্প, [illegible] অল্প, দেহ অল্প, বুদ্ধি দুর্ব্বলা, প্রবৃত্তি প্রবলা। স্বভাবতঃই "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি—" বিশেষতঃ এই কলিযুগে। এ যুগে কুসঙ্গ যত্র তত্র, পাপ-প্রলোভন সর্ব্বত্র। এ যুগে ধরিয়া তুলিতে অনেকেই অক্ষম, কিন্তু ঠেলিয়া ফেলিতে প্রায় প্রত্যেকেই পটু। এমন অবস্থায়, এত প্রতিকূলতার সহিত সংগ্রাম করিয়া, কলির এই সুদীনসত্ত্ব মানব কিরূপে আত্মরক্ষা করিবে? কিরূপে পরমার্থসাধনে সমর্থ হইবে? তাই দয়াল ভগবান জীবের অবস্থা বুঝিয়াই এমন সুলভ উপায়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

রোগ সাংঘাতিক, রোগী 'এখন তখন'—এই সময়ে কবিরাজ মহাশয় ঔষধ-বকালের প্রকাণ্ড ফর্দ্দ দাখিল করিলেই প্রতুল! তাহাতে যে "নুন আনিতেই পান্তা ফুরায়"! তখন সুসংক্ষিপ্তপদ—অথচ মহাশক্তিসম্পন্ন মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা যিনি করিতে পারেন, তিনিই সুচিকিৎসক। ভব-ব্যাধি বৈদ্য ভগবান কলির মুমূর্ষু জীবের জন্য তাহাই করিয়াছেন।

"ভব-ব্যাধি বিকারের প্রকৃষ্ট প্রয়োগ।
হরিনামামৃত-বিন্দু মহামুষ্টিযোগ॥"

সর্ব্বৌষধি-সার এই হরিনাম-রস। আমরাও ভব-রোগে 'এখন তখন'! অতএব "শুভস্য শীঘ্রং"। স্বয়ং কৃপাসিন্ধু শ্রীগৌরাঙ্গ বৈদ্যরাজ হইয়া, স্বহৃদয়-শুক্তিতে মাড়িয়া, স্বভক্তি-রসে গুলিয়া, স্বপ্রেম মধুর প্রক্ষেপ দিয়া, স্ব-শ্রীহস্তে কলি-জীব-কণ্ঠে এ মহৌষধ ঢালিয়া দিতেছেন। আমরা শুধু ঢোক্ গিলিতেই 'ওক্' তুলিতেছি! বিড়ম্বনা আর কাহাকে বলে? যিনি গিলিলেন, তিনি উঠিয়া বসিলেন। যিনি

ফেলিলেন, তিনি চলিলেন! একটী মেয়েলী প্রবাদ আছে, "বড় সুহৃদ্‌ হয়, গালে তুলে দ্যায়, না গিল্‌লে কে গিলায়?" কাতর রোগীর কণ্ঠে ঔষধ ঢালিয়া দিতে হয়; দয়াল গৌরাঙ্গ তাহাই দিয়াছেন। কিন্তু আমরা না গিলিয়া মারা গেলে আর চারা কি?

ঔষধে ভক্তি ও গিলিবার শক্তি বর্দ্ধনের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার শ্রীমুখে সুবিখ্যাত শিক্ষা-শ্লোকাষ্টকের প্রথম শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছেন। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনই কলির ভব-রোগ-রসায়ন; অতএব উক্ত শ্লোক দ্বারা সেই কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-মাহাত্ম্যই বিবৃত ও বিস্তৃত হইয়াছে।

"চেতো দর্পণ মার্জ্জনং"। কৃষ্ণ-কীর্ত্তন চিত্তরূপ দর্পণের মার্জ্জন স্বরূপ। অমার্জ্জিত মলিন দর্পণে প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় না। মনের আরসিখানি ময়লা থাকিলে, মনোমোহনের হাসি-মুখটি তায় ফোটে না। মন ঠিক আরসিই বটে। "আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত" সমগ্র বিশ্বই ইহাতে বিম্বিত হয়। কিন্তু দর্পণের মার্জ্জন চাই; নচেৎ ইহার প্রতিবিম্ব-গ্রাহিণী প্রতিভা বিনষ্ট হয়। অতএব এই মহাদর্পণ মনের মোহ-মল-মার্জ্জনই মানবের প্রধান সাধন। ইহাকেই শাস্ত্র "চিত্তশুদ্ধি" বলিয়াছেন। "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"—পুরাণের ভাষায় 'ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা' ভগবদুপাসনা। এই ভগবদুপাসনায় প্রবেশ-দ্বার এই চিত্তশুদ্ধি সাধন। এই সাধনের সাধনার্থেও আবার ভজন চাই। সেই ভজনই এই কৃষ্ণ-কীর্ত্তন। ইহাই "চেতো দর্পণ-মার্জ্জনং।"

চিত্ত শুদ্ধি ও উপাসনায় পরস্পর জন্য-জনকতা সম্বন্ধ; অর্থাৎ পরস্পর আপেক্ষিক (Co-relative)। চিত্ত-শুদ্ধি ভিন্ন উপাসনা হয় না, এবং উপাসনা ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি হয় না। প্রথমতঃ এই চিত্তশুদ্ধির জন্যই কৃষ্ণ-কীর্ত্তনরূপ পরমোপাসনা। আবার চিত্তশুদ্ধি সাধিত হইলে, এই কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-উপাসনায়, প্রতি কৃষ্ণনামে কৃষ্ণকে পাইয়া প্রাণ জুড়াইবে; জীবন ধন্য ও জন্ম সার্থক হইবে; জীব কৃষ্ণদাসত্ব রূপ 'হারানিধি' পাইয়া কৃতার্থ হইবে। কৃষ্ণপদ-সেবক-পদই জীবের চরম ও পরম সম্পদ। এই পদ হারাইয়াই জীবের বিপদ। দুশ্ছেদ্যমায়া-শৃঙ্খল-ভার, ভীম ভব-কারাগার, কামাদির অসহ্য অত্যাচার; সুতরাং হাহাকার—অশ্রুধার! অন্তরে নিরন্তর ত্রাহি ত্রাহি চীৎকার! এ বিপদে এক মাত্র উপায়ই কৃষ্ণ-কীর্ত্তন।

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্‌॥"

চিত্তশুদ্ধির জন্য অগ্রেই শ্রবণ-কীর্ত্তন। কীর্ত্তনে শ্রবণও হয়; সুতরাং যুগপৎ-উভয়-সিদ্ধি-হেতুক কীর্ত্তনই চিত্তশুদ্ধির পরম সাধন। এতৎফলে চিত্তশুদ্ধি হইলে, সেই শুদ্ধচিত্তে "স্মরণ" অর্থাৎ ধ্যানের যন্ত্রস্থাপন হয়। পরে ক্রমে পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও নবলক্ষণা ভক্তির নবম বা চরম-লক্ষণ আত্মনিবেদনে ভক্ত কৃতার্থ হন।

প্রাথমিক কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনরূপ সাধনা-দ্বারা চিত্তশুদ্ধি সিদ্ধ হওয়ার পরে, সেই শুদ্ধ চিত্তের কৃষ্ণনাম-সাধন ও কৃষ্ণ-তত্ত্ব-রসাস্বাদন একই কথা। এই জন্যই কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন জন্যই

কৃষ্ণ সাধন-ব্যবস্থা। কলিতার্থে য হা সাধন, তাহাই সাধ্য; যাহা ঔষধ, তাহাই খাদ্য! এমন সুখাদ্য ঔষধও আর নাই, এমন ঔষধ-ময় খাদ্যও আর নাই! অতএব "চেতো-দর্পণমার্জ্জনং" ইত্যাদি গুণ ব্যাখ্যা করিতে করিতে জীবদুঃখ-দয়ার্দ্র গৌরাঙ্গদেব ইহা জীবের মুখে তুলিয়া দিয়াছেন!

"ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং।" শাস্ত্র-কার মহর্ষিগণ সংসারকে অনেকস্থলে অরণ্য-সাদৃশ্যে "ভবাটবী" "ভবারণ্যং ঘোরং" ইত্যাদি বলিয়াছেন। বনের প্রধান বিপদ দাবাগ্নি বা বনাগ্নি। তাহাতেই বন ও বনবাসী, উভয়েরই সর্ব্বনাশ। আমরাও "ভবাটবিনিবাসিনঃ"—সুতরাং বিষয়-বাসনা-দাবানলে আমরা অহরহ দহ্যমান। শাস্ত্রেও বাসনাকে বহ্নিশিখা সহই উপমিতা করা হইয়াছে; আর উপভোগকে বলা হইয়াছে বিষয়রূপ ঘৃতাহুতি। মনু বলেন,—

"ন জাতু কামঃকামানামুপভোগেন
শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।"
উপভোগে বাসনা হয় না প্রশমিত।
ঘৃতাহুতিযোগে বহ্নি শিখাই বর্দ্ধিত॥

বাসনার লক লক বহ্নিশিখা বিশ্বলেহন করিয়াও নির্ব্বাপিত হয় না; অবশেষে নিজের আগুণে নিজে পুড়িয়া মরে। দাবাগ্নি বনের বৃক্ষ-কাষ্ঠে আশ্রয় নিয়া, বন পোড়াইতে পোড়াইতে—নিজের আধার বিস্তৃত ও অধি-কার বর্দ্ধিত করিতে করিতে—বনবাসী প্রাণী-গণকে পোড়াইয়া, অবশেষে নিজের আশ্রয় সমেত নিজে পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়। [illegible] এই প্রকৃতি দাবাগ্নিরই অনুরূপ। বাসনাগ্নি জীবকে কোটিকল্প পোড়াইয়া, অবশেষে ভোগাবসানে নিজে পুড়িয়া ভস্ম হয়। সেই ভস্ম মাখিয়াই জীব শিব সাজে! যাহাহউক, ভীষণ ভবারণ্যে বিষম-বিষয়-বাসনা দাবদাহ। এ দারুণ দাবানলে জীবের ইহকাল-পরকাল সব পুড়িল—জীবের কপাল পুড়িল! এ দিগ্‌দাহ—সর্ব্বদাহ নির্ব্বাপণের কি কোন উপায় নাই? দয়াল গৌরাঙ্গ বলেন,—আছে—কৃষ্ণকীর্ত্তন! উহাই "ভব-মহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং।"

"দহে ভব-দাব-জীব বাসনা-দাবদাহন।
হরিনাম-বরিষায় পায় সর্ব্ব-নির্ব্বাপণ॥"

হরিনাম সুধা রস সিঞ্চনে ভবের সকল জ্বালা জুড়ায়। হরিনাম-বর্ষাধারা বর্ষণে ভব-দাবানল নির্ব্বাপিত হয়। এই ভবদাবানল-নির্ব্বাণকেই ভক্তি-মার্গীয় ভাগবত-ধর্ম্মের 'নির্ব্বাণ' বলা যাইতে পারে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের নির্ব্বাণ বা সাযুজ্য-নির্ব্বাণঃভক্তের পিপাসার জল নহে। শাক্তভক্তচূড়ামণি শ্রীরামপ্রসাদ কি মনোহর ও মোহহর কথাই বলিয়াছেন—"চিনি হতে চাইনে মা! চিনি খেতে ভাল-বাসি।"

ভবতাপ-প্রতাপ প্রশমিত নাহইলে, যথার্থ ভগবৎসেবার অধিকারই হয় না। নিজের একটা জ্বালা-যন্ত্রণা লইয়া, তজ্জনিত একটা প্রকাণ্ড নিজত্ব-(আমিত্ব) বোধের বোঝা লইয়া কি প্রাণেশ্বরের সেবা করা যায়? জ্বালায় প্রাণ দিলে আর 'কালায়' প্রাণ দিতে প্রাণ কোথায় পাওয়া যাইবে? তবে কি না, কালায় প্রাণ দিলে যে জ্বালা, সে ত ভক্তের গলার মালা! বিষয়-বাসনা থাকিতে ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি হয়না। অহৈতুকী

ভক্তি ভিন্ন আত্মনিবেদন হয় না। আত্মনিবেদন ভিন্ন প্রকৃত ভজন বা কৃষ্ণ-সেবনও হয় না। একটি পদে আছে,—

"না বোলে প্রেম ষোলআনা,—
(আমার) ষোলকলা কালোশশীর মন ত ওঠেনা"

অতএব কৃষ্ণ-কীর্ত্তনামৃতসিঞ্চনে ভবমহা-দাবাগ্নি নির্ব্বাপিত না হইলে, ষোলআনা মনটি কৃষ্ণে সমর্পণ—অর্থাৎ কৃষ্ণে সর্ব্বাত্ম-নিবেদন কদাচ সম্ভাবিত নহে।

"শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং।"

অর্থাৎ জীবের কুশলরূপ কুমুদ বিকশিত করিতে কৃষ্ণকীর্ত্তনই চন্দ্র-কর-বর্ষণ স্বরূপ। তাপ ও প্রভা, বহ্নির এই দুটি ধর্ম্ম। প্রভার আলোক-আহ্লাদন ক্রিয়া, তাপের দহন-নির্য্যাতন-ক্রিয়া। চন্দ্রিকার প্রভা আছে, কিন্তু তাপ নাই। চদি ধাতুর অর্থই আহ্লাদন। আহ্লাদময়ী চন্দ্রিকার স্নিগ্ধ সম্ভাষণে আহ্লাদে কুমুদ হাসিয়া উঠে। সেই কৃষ্ণচন্দ্রের চিরসুধাময়ী চন্দ্রিকাচুম্বনে জীবের জীবন-সরোবরে প্রেমানন্দভরে কুশল-কুমুদ-রাশিও হাসিয়া উঠে।

আবার চন্দ্রকে শাস্ত্রে 'মন' বলিয়াছেন। বেদ পুরাণাদিতে বিরাট পুরুষের দেহ বর্ণন-স্থলে চন্দ্রকে তাঁহার 'মন' বলা হইয়াছে। আরো বহুশাস্ত্রের বহুস্থানে মনকে চন্দ্র এবং চন্দ্রকে মন বলা হইয়াছে। এই তত্ত্ববাদিনী একাধিক 'উপনিষদী' শ্রুতিও রহিয়াছে। বস্তুত চন্দ্রতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বে আশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক [illegible]-সম্বন্ধ বর্ত্তমান। অতএব মনশ্চন্দ্র-কিরণেই কুশল-কুমুদরাশি বিকাশিত [illegible] হয়। মনশ্চন্দ্র অবিদ্যা-মেঘমুক্ত, তখন তাঁহার কিরণ-সুধাবর্ষণ ও কুশল-কুমুদ-হর্ষণ, উভয় কর্ম্মই স্থগিত।

কিন্তু—"সেই চাঁদ-মুখ হেঁসে ওঠে।
অম্নি জলে কুমুদ ফোটে॥"

ফলে আমাদের মনটি মোহ-মেঘ-মুক্ত দিব্য প্রভাযুক্ত না হলে আর কুশলের আশা নাই। সোজা কথা—মন ভাল না হলে মঙ্গল নাই। মঙ্গল কেবল সাত্ত্বিক মনঃপ্রসন্নতার ফল। এই মায়া-মোহ, পাপ-তাপ, রোগ-শোক, জরা-মৃত্যুময় সংসারে মঙ্গল কোথায়? যে ভগাবান ভগবদ্ভক্ত জগতের প্রতিকার্য্যে মঙ্গলময়ের মঙ্গল-হস্ত দর্শন করেন; যিনি ঈশ্বরের "করালবদনাং ঘোরাং" কাল-শক্তিকে "স্মেরাননসরোরুহাং" দর্শন করেন, যিনি "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" ঈশ্বরের প্রচণ্ড দণ্ডকেও অনুগ্রহ স্বরূপ অনুভব করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত মনস্বী ও যথার্থ শ্রেয়োলাভের অধিকারী। একটি বঙ্গীয় প্রবাদ-পদ্য এই—

"মন যার ভাল, সেই আছে ভাল।
নিত্য হয় আয়ুক্ষয়, কুশল কোথা বল?"

আর কিছু অকুশল হঠাৎ না বুঝিলেও, "কুতঃ কুশলমস্মাকমায়ুর্যাতি দিনে দিনে" বাক্যটির সত্যতা আমরা কতকটা স্বতঃই বুঝিতে পারি। কিন্তু আয়ুক্ষয়ও ভগবানের প্রাকৃতিক বিধান, অতএব ভক্তের দৃষ্টিতে তাহাও অকুশল নহে। "সাধুর জীবন-মৃত্যু একই সমান।" এই অনিত্য পাঞ্চ-ভৌতিক দেহকে চির রক্ষা করাই "শমন দমন" নহে। জীবন-মৃত্যু যাঁহার কাছে সমান হইয়া গিয়াছে, যিনি "নৈবোদ্বিজেত মরণে জীবনে নাভিনন্দতি" শমন দমন

তাঁহারই হয়; তিনিই মর্ত্ত্যে "মৃত্যুঞ্জয়!" অথবা ভগবদ্ভক্তের অল্পায়ুষ্কতারই বা আক্ষেপ কি?

"জীবনং কৃষ্ণভক্তস্য বরং পঞ্চদিনানিচ।
নতু কল্পসহস্রাণি ভক্তিহীনস্য কেশবে॥"

(ভাবানুবাদ)

পাঁচদিনো বাঁচা ভাল কৃষ্ণভক্ত হয়ে।
নিষ্ফল অভক্ত হয়ে কোটিকল্প রয়ে॥

অপর, যথার্থ দীর্ঘজীবীত্ব কালগত নয়, উহা কার্য্যগত।

সে যাহাহউক, জীবন থাকুক্ বা যাউক, ভক্তের মোহমুক্ত মন সদাই প্রসন্ন, সুতরাং তাঁহার কুশলাকুশল অভিন্ন। মনের অপ্রসন্নতাই অকুশল-বুদ্ধির ফল; উহা তমোগুণের কার্য্য; আর নিত্য-চিত্ত-প্রসন্নতাই সর্ব্বমঙ্গল-প্রতীতির পরিণাম; উহা শুদ্ধ সত্ত্বগুণের ফল। সত্ত্বগুণ চন্দ্র-কিরণবৎ, প্রকাশক—অথচ সুস্নিগ্ধ। অতএব মনই চন্দ্র, সত্ত্বগুণ তাহার কৌমুদী, চিত্ত-প্রসন্নতা সেই কৌমুদীর বিমল বিভা। সেই বিভায় কুশল-কুমুদের বিকাশ। অবিদ্যা-মেঘ-মোচন দ্বারা মনশ্চন্দ্রকে সত্ত্বজ্যোতির্ম্ময় করিয়া ভক্ত সাধকের কুশল-কুমুদ বিকাশিত করাই কৃষ্ণকীর্ত্তনের কার্য্য। এই জন্যই কৃষ্ণ-কীর্ত্তনকে বলা হইয়াছে—"শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং।"

অপিচ, "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে" মহাপ্রভুরই অভিপ্রেত এইরূপ উপদেশোক্তি দৃষ্ট হয়, যথা—

"শ্রেয়ো মধ্যে কোন্ শ্রেয়ো জীবের হয় সার?
কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়ো নাহি আর।"

অতএব এই যে সর্ব্বশ্রেয়ঃসার সুদুর্লভ কৃষ্ণভক্তসঙ্গ, তাহাও কৃষ্ণ-কৃপায় কৃষ্ণ-কীর্ত্তনকারীর পক্ষে সুলভ হয়। যেখানে ফুল ফোটে, সেইখানেই মধুকর যোটে। যেখানে কৃষ্ণকীর্ত্তন, সেইখানেই কৃষ্ণভক্ত-সমাগম। অতএব—"শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্।"

"বিদ্যা-বধূ-জীবনং।" কৃষ্ণ কীর্ত্তন বিদ্যারূপা বধূর জীবনরক্ষার অনন্যসাধন, অথবা জীবনস্বরূপ সর্ব্বস্বধন। "বিদন্তি অনয়া" এই ব্যুৎপত্তিতেই অভিধানে "বিদ্যা" শব্দের নানার্থ। অধ্যয়নাদি-জনিত জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান, মন্ত্রতন্ত্র, ইষ্টদেবতত্ত্ব, গুণ-কলা-তত্ত্ব, সরস্বতী, শক্তি-দেবী ভগবতী, ইত্যাদি। আশ্চর্য্য ও আনন্দের বিষয় এই যে, ইহার যে কোন অর্থ গ্রহণ করা যায়, তদ্দারাই কৃষ্ণকীর্ত্তনকে "বিদ্যাবধূজীবনং" বলা যায়। সাধিলে, অধ্যয়নাদিজনিত জ্ঞানের চরম পরিণতি বা পরম সারস্বতী সিদ্ধি কৃষ্ণভক্তের করতলগত; এই সত্যটি স্বয়ং সরস্বতীকান্ত স্বরূপে সম্পূজিত আমাদের "নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিত" শ্রীশ্রী চৈতন্যাবতারের কৃষ্ণকীর্ত্তন-সর্ব্বস্ব চারুচরিতে বিচিত্রবর্ণে চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞান—ব্রহ্মজ্ঞান ত কৃষ্ণ-নামের গৌণ-ফল, কারণ তাহার পরিণাম মোক্ষ; কিন্তু—

"যদি ভবতি মুকুন্দে ভক্তিরানন্দসান্দ্রা।
বিলুঠতি চরণাব্জে মোক্ষ-সাম্রাজ্য লক্ষ্মীঃ।"

(ভাবানুবাদ)

মুকুন্দের পাদপদ্মে সান্দ্রানন্দা ভক্তি যাঁর।
মোক্ষ-সাম্রাজ্যের লক্ষ্মী লুটে পাদপদ্মে তাঁর॥

অতএব মোক্ষ-সাধন ব্রহ্মজ্ঞান বা তত্ত্ব-জ্ঞানরূপা বিদ্যা-বধূর জীবন যে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন,

তাহা বলাই বাহুল্য। অশুদ্ধ চিত্তে মোক্ষকারণ তত্ত্বজ্ঞানোদয় হয়না; সংসারে চিত্তশুদ্ধির প্রধান সাধনই কৃষ্ণ-কীর্ত্তন। মন্ত্রতত্ত্বরূপিণী বিদ্যারও জীবন এই কৃষ্ণকীর্ত্তন। অন্যান্য মন্ত্রের কথা বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে বলিব না। কলির সর্ব্বজন-সাধারণের সংসার-ত্রাণমন্ত্র সেই তারকব্রহ্ম মন্ত্র স্মরণ করুন।—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

মহাপ্রভু শিখাইয়াছেন যে, এই মহামন্ত্র স্বতএব জীবন্ত—জাগ্রত, নিত্য-শুদ্ধ-সাধিত; এমন কি, গুরুদীক্ষা-নিরপেক্ষিত। এই তারকমন্ত্র বৈষ্ণব-শৈব-শাক্তাদি-নির্ব্বিশেষে সকলেরই আরাধ্য; কারণ অন্তে তারকব্রহ্মনাম সকলেরই সম্বল। "অদ্য মে কালিকাদেবী রামরূপা ভবিষ্যতি" ইত্যাদি শাক্ত-ভক্ত-মুমূর্ষুক্তিস্বরূপ সুপ্রচলিত শ্লোকার্দ্ধের ভাবও ঐ তাৎপর্য্যানুগত। সাধকসমাজে স্ব স্ব কুলধর্ম্ম-ভেদে কুলমন্ত্রোপাসনাভেদ বর্ত্তমান থাকিলেও, তারকমন্ত্র সকলেরই সাধ্য, আরাধ্য, জপ্য, ভাব্য, সেব্য। এ মন্ত্র নিত্যসিদ্ধ স্বতঃসাধারণ-ইষ্টতত্ত্ব। ইহাতে গুরুকরণ—পুরশ্চরণাদিরও অপেক্ষা নাই। এ মন্ত্র সম্বন্ধে "শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে" শ্রীচৈতন্যোক্ত সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত, যথা—

"দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা-বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডাল সবারে উদ্ধারে॥"

অপিচ, কৃষ্ণকীর্ত্তন-জনিত সত্ত্বগুণোদয়ে সর্ব্বমন্ত্রই সজীব হয়। অতএব ইষ্ট বা মন্ত্রতত্ত্বরূপিণী বিদ্যা-বধূর জীবন কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, সন্দেহ নাই।" গুণতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব, দেবীতত্ত্বরূপিণী এই বিদ্যাবধূ। অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব নির্গুণ বা গুণাতীত হইলেও, উপাস্য সগুণ ঐশতত্ত্বের সারতমতত্ত্ব কৃষ্ণতত্ত্ব সর্ব্বগুণের গুণমণি! ইঁহার গুণ-ক্রিয়াশক্তি মহাদেবী যোগমায়া সর্ব্বগুণতত্ত্ব-সঞ্জীবনী। সুতরাং কৃষ্ণ-কীর্ত্তন গুণতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব বা দেবীতত্ত্বরূপিণী বিদ্যাবধূর জীবন।

কৃষ্ণকীর্ত্তন জগৎ-জীবন। ভৌতিক মারীভয়ে জীবনরক্ষা হইতে আধ্যাত্মিক মারীভয়ে আত্মরক্ষা পর্য্যন্ত এই কৃষ্ণকীর্ত্তনসাধ্য। কৃষ্ণনামে মরা জগৎ বাঁচে। মাথুরলীলায় কৃষ্ণহারা মরা-বৃন্দাবন কেবল কৃষ্ণনামে বাঁচিয়া ছিল। এ মরা-ভারত যদি কোন দিন বাঁচে, তবে কৃষ্ণনামেই বাঁচিবে। "নামে শুষ্কতরু মুঞ্জরিল, বোল হরিবোল!" ইত্যাদি কৃষ্ণকীর্ত্তন পদ আমরা মুখে গাইয়া থাকি বটে, কিন্তু নামের সর্ব্বসঞ্জীবনী শক্তি না বুঝিলে, উহার যথার্থ অর্থ বুঝা যাইবে না। কামাসক্তির সঙ্কোচক শৈত্যে হৃদয় অতীব সঙ্কুচিত থাকে, কিন্তু নামাসক্তির নব-বসন্ত-সমাগমে উহা নবজীবিত ও সংবর্দ্ধিত হয়। এ নাম জগৎ-জীবন—বিশ্বরসায়ন। এ নামে রত্নাকরের হৃদয়শ্মশানে ফুল ফুটিয়াছে, জগাই-মাধাইর মনোমরুভূমে বান ডাকিয়াছে! ফলে যে ভাবে ভাবুন, যে অর্থে বিচার করুন, কৃষ্ণকীর্ত্তন "বিদ্যাবধূ-জীবনম্।"

"আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনং।" আহা! এ বাক্যের স্মরণে—উচ্চারণেও আনন্দ! একেত অপার অম্বুধি—তাতে আবার তাহার বর্দ্ধন, সে মাহাত্ম্য কেমন! চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হয়, ইহাই জানা আছে

কবি কালিদাস "কুমারসম্ভবে" উমা-শশী সন্দর্শনে সমুদ্র গম্ভীর শিবের চকিত-চিত্ত-চাঞ্চল্য বর্ণন-ছলে এইরূপ বলিয়াছেন,—

ঈষৎ চঞ্চল হল মহেশের মন।
যেমন চন্দ্রোদয়ে সাগর যেমন ॥

চন্দ্রোদয়ে সিন্ধু-হৃদয়োচ্ছ্বাস যেরূপ স্বাভাবিক, কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে, হৃদয়-গগনে, কৃষ্ণ-চন্দ্রের শুভসন্দর্শনে, আনন্দসিন্ধুর সমুচ্ছ্বাসও ততোধিক—স্বাভাবিক।

"(নামে) দুখ-বিন্দু না রহিবে, বোল্ হরিবোল।
(নামে) সুখ সিন্ধু উথলিবে, বোল্ হরিবোল্ ॥"

আনন্দময়ের নাম আনন্দময়। তাহার স্মরণে-মননে, শ্রবণে কীর্ত্তনে, জপনে-স্তবনে, পঠনে-রটনে, সর্ব্ববিধ আস্বাদনেই আনন্দ! তবে "কীর্ত্তন" শব্দের বিশেষত্বে এই তাৎপর্য্য পাওয়া যায় যে, কীর্ত্তনে স্মরণ-মনন-শ্রবণাদি সমস্তই যুগপৎ সিদ্ধ হয়। অন্য সর্ব্ববিধ আস্বাদনই এক কীর্ত্তনের অন্তর্ভূত। কৄৎ—বর্ণনে; অতএব গানে, কথনে, স্তবনে, আলোচনে, ভগবন্নাম রূপ-গুণ-লীলা-বর্ণনই আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধন কৃষ্ণ-কীর্ত্তন।

শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ংই কৃষ্ণ-কীর্ত্তনানন্দ-অম্বুধি। তাঁহার উচ্ছ্বাসে এক দিন সমস্ত ভারত প্লাবিত হইয়াছে। আজিও সে প্লাবন-তরঙ্গের প্রসার প্রশমিত হয় নাই; ধীরগতিতে ক্রমে জগৎ ব্যাপ্ত হইতেছে। সভ্য মানব-সমাজ যদি যথার্থ সত্য-পিপাসু ও অনুসন্ধিৎসু হয়, তবে এক দিন না এক দিন জগৎ গৌরপরায়ণ হইয়া কৃষ্ণ ভজিবে। গৌরাঙ্গের কৃষ্ণভজন কেবল হিন্দুরই এক চেটিয়া নহে; তাহা গৌরাঙ্গ নিজলীলাতেই দেখাইয়াছেন ও শিখাইয়াছেন; তবে কি না, অধিকার-ভেদে পরিণাম-(বৈষ্ণবী ভাষায় 'প্রাপ্তি') ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য। আধ্যাত্মিকতায় হিন্দুর অধিকার অবশ্য অগ্রগণ্য এবং ভারতীয় প্রকৃতির সাহায্যে সুসম্পন্ন। প্রাকৃতিক অনুকূলতা-বলেই কৃষ্ণ-ভজনের গূঢ়তম রসতত্ত্বের আস্বাদনে হিন্দুরই উপযোগিতা বা অধিকার অধিক। তবে হিন্দু যদি কিছু না করে, আপন দোষে আপনি মরে, তাহার ফল সে পাইতেছে—পাইবে। হিন্দুর যেন হইয়াছে "ময়রার সন্দেশ-বৈরাগ্য।" দেশ শুদ্ধ লোককে সন্দেশ খাওয়াইয়া এখন নিজের বেলায় শুধু চাউল জল; কারণ সন্দেশে অরুচি! আমাদেরও এখন হইয়াছে সেই দশা।

সে যাহাহউক, কৃষ্ণ-কীর্ত্তনানন্দ-সিন্ধু দীনবন্ধু গৌরাঙ্গের প্রেম-প্লাবন-তরঙ্গ-রঙ্গ আমরা কি বুঝিব? আমরা বিষয়-বিষাচ্ছন্ন বিষণ্ণ জীব, আমরা আনন্দাম্বুধির ভাব কিরূপে ধরিব? আমাদের হৃদয় গোষ্পদ সিন্ধুর বিন্দুপাতেই বিপ্লাবিত হইতে পারে। সামান্য, স্বল্পসত্ত্ব, অনিত্য বিষয়ানন্দই আমাদের সুপরিচিত; কৃষ্ণ-কীর্ত্তনানন্দের অসাধারণত্ব কিরূপে ধারণ করিব?

শুনিয়াছি, সে আনন্দে কুষ্ঠরোগের চর্ম্মভেদ বা পুত্রশোকের মর্ম্মচ্ছেদ—কোন যাতনা থাকে না। সে আনন্দ বিত্তনাশ বা সর্ব্বনাশেরও অপেক্ষা রাখে না! সে আনন্দের কথার জন্য রাজা কৌপীন পরে, বিলাসী ভস্ম মাখে, কৃপণ ধন-রত্ন ফেলে, যুবক যুবতী সুখ ভোলে। অধিক কি,—সে আনন্দে ব্রহ্মা তপস্বী, শিব

শ্মশানবাসী; কলিতে স্বয়ং কৃষ্ণ নাকি গৌর-সন্ন্যাসী! পার্থিব ভোগের সহিত তাহার তুলনা বাতুলতা মাত্র। উহা অপার্থিব চরম পরমার্থ। উহা জগজ্জীবের প্রতি শ্রীগোলকের মহাপ্রসাদ! যে উহার অণু-কণা বা অন্ততঃ অমৃতঘ্রাণও পাইয়াছে, তাহারও আনন্দ-সিন্ধুতে তরঙ্গ উঠিয়াছে!

"সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার দূরে যায় যথা।
শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনানন্দে নিরানন্দ তথা॥"

ফলে নিরানন্দের কৃষ্ণকীর্ত্তনে অধিকার আছে, (নচেৎ তাহার উপায়ইবা কি?) কিন্তু কৃষ্ণানন্দরসাস্বাদের অধিকার বহু দূরে। কৃষ্ণতত্ত্বের দিকে একটু অগ্রসর হইতে হইলেও অন্তঃকরণে একটু সাত্ত্বিক উল্লাস-ঔজ্জ্বল্য চাই। সে আনন্দময়ের দরবারে বিষাদ-বিমলিনচিত্তের প্রবেশ-নিষেধ।—এক পাগ্‌লা বৈষ্ণব গাইয়াছিলেন,—

"কৃষ্ণ আমার বড় বাবু, তাঁর দরবারে।
যাবি যদি, মন জল্‌দি ধোপাবাড়ী দে॥"

হায়! ভাবিতে অশ্রু অসম্বরণীয় হয়, আমাদের মসী-মলিন-মন, আমরা আপন দুর্গন্ধে আপনি কুণ্ঠিত, আমাদের আশা কোথায়? তবে সাধু-গুরুর কৃপায় আমরা অন্তরে দীন ভিখারী হইতে পারিলে, বুঝি কৃষ্ণ-দরবারের দ্বারে আঁচল পাতিতে পারি। ভগবদ্গীতায় "অপিচেৎ সুদুরাচারো" পড়িলে বড় আশা হয়, আবার "ভজতে মামনন্যভাক্" পড়িলেই যেন হতাশ হইয়া পড়ি! অতএব উপায় কি? উপায় কেবল কৃষ্ণকীর্ত্তন। কৃষ্ণকীর্ত্তনানন্দই কৃষ্ণভজনে অনন্যচিত্ততা জন্মায়। সে আনন্দে চিত্তের পূর্ব্বানুভব-জনিত ইতরানন্দ সমূহ চন্দ্র-কিরণে খদ্যোৎ-দ্যুতিবৎ অভিভূত ও অলক্ষিত হইয়া যায়। আনন্দ-লীলাময়বিগ্রহ দয়াল-গৌরাঙ্গ এই আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধন কৃষ্ণকীর্ত্তন কলির জীবের দ্বারে দ্বারে বিলাইয়াছেন। আমরা তৎফলে আনন্দ-সিন্ধুর বিন্দু পাইলেও বাঁচিয়া যাইব।

"প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্।"

কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের প্রতিপদেই পূর্ণামৃতের আস্বাদ লাভ হয়; অথবা প্রতিপদে অমৃতের পূর্ণা-স্বাদ লাভ হয়। আবার "পূর্ণামৃত" শব্দে প্রকৃত অমৃত বুঝায়। অমৃতের লক্ষণ যাহাতে পূর্ণ, এমন অমৃতই পূর্ণ বা প্রকৃত অমৃত। সাধারণতঃ "অমৃত" সংজ্ঞক অনেক বস্তুই হইয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীতে দুগ্ধকে এবং জলকেও আমরা অমৃত বলি। বৈদ্যক ভাষায় বিষও "অমৃত"। "আম্র" নামক একটা ফলেরও নাম "অমৃত-ফল'। যাহা একটু বেশি ভাল লাগে, তাহাকেই আমরা 'অমৃত' বলিয়া অমৃত-সেবার সাধ মিটাই। "শিশিরে বহ্নিঃ"হইতে "বালভাষিতম্"পর্য্যন্ত আমাদের অমৃত। একটি কৌতুক-কবিতা আছে—

"কেচিৎ বদন্ত্যমৃতং সুরেশলোকে।
কেচিৎ বদন্তি বনিতাধরপল্লবেষু॥
ব্রুমো বয়ং সকলশাস্ত্র-বিচারদক্ষাঃ।
জম্বীর-নীর-পরিপূরিতমৎস্যখণ্ডে॥

ইহার ভাবানুবাদ-পদ্য এইরূপ হয়—

কেহ বলে স্বর্গে সুধা, কেহ নারী-মুখে।
মোরা বলি "টকের মাছে" সর্ব্বশাস্ত্র দেখে॥

ফলে আসল সুধা দুর্লভ হইলেও আমাদের ঘরে নকল সুধার ছড়াছড়ি। তবে আসল সুধা কি সেই সুরেন্দ্র-লোক-বিদ্যমান সুরাসুর-দ্বন্দ্ব-নিদান সুধাকেই বলিব? তাহাই কি পূর্ণ বা প্রকৃত অমৃত?

সাধুগুরু-মুখে শুনা যায়, কৃষ্ণ-প্রেমামৃতই প্রকৃত অমৃত। তাহাই কৃষ্ণ-পারিষদ দেবগণ পান করিয়া অমর বা অমৃতীভূত হইয়াছেন। কৃষ্ণ-বিমুখ বিষম বিষয়ভোগ-কামুক অবিদ্যা-মদমত্ত অসুরগণ তাহাতে বঞ্চিত। তাহাদের ভাগ্যে বিষ। তাহারা বিষয়-বিষ-বিলাসী। আর আমরা—দেবও নহি, দানবও নহি, আমরা মানব; কিন্তু যদি গুরু-কৃপায় কৃষ্ণ-প্রেমামৃত-কণা পাই, তবে দেবত্বও চাই না; আর যদি কেবল বিষয়-বিষ খাই, তবে দানবত্বও পাই না! অর্থাৎ দানবেরও অধম হই। পুরাণকর্তারা অনেক বড় বড় দানবের ইতিহাস বলিয়াছেন। তাহারা বিষ্ণু-বিরোধী হইয়া, শত্রু-ভাবে সাধিয়াও তাঁহার কৃপা পাইয়াছে। আর আমরা একুল ওকুল দুকুল হারাইয়া বিষয়-বাসনা-বিষার্ণবে আকুল হইয়া ভাসিতেছি।

বিষয়-বিষে বিরক্ত ও ভীত হইয়া ভাগবতামৃতের ভিখারী হইতে হইবে। কেহ বলেন, স্বর্গের অমৃত মর্ত্ত্য মানবে পায় না। সে কোন্ অমৃত, আমরা তাহা বুঝি না; কিন্তু সাধু-গুরু বলেন, স্বর্গামৃতের কথা কি, মোক্ষামৃতও মর্ত্ত্যমানব তুচ্ছ করিতে পারে, যদি কৃষ্ণ-প্রেমামৃত পায়! অতএব কৃষ্ণ-প্রেমামৃতই সর্ব্বামৃত-সার প্রকৃত অমৃত বা পূর্ণামৃত। দয়াল গৌরাঙ্গ সেই দেব-দুর্লভ অমৃত কলির জীবের সুলভ করিয়া দিয়াছেন! কলিতে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের প্রতি পদে পদে সেই পূর্ণামৃত আস্বাদনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

"কৃষ্ণ বস্তু হন চারি ধর্ম্মে পরিচিত।
নাম-রূপ-গুণ-কর্ম্ম অনাদিবিহিত ॥"

"নাম-রূপ-গুণ-লীলা কৃষ্ণ-তত্ত্ব চারি;
একাধারে নামে এই চারি পেতে পারি ॥"

কৃষ্ণনামের এই অসাধারণ বিশেষত্বই নামের স্বয়ংকৃষ্ণত্ব। এহেন কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনের প্রতিপদেই যে কৃষ্ণচন্দ্র বিরাজমান! সুতরাং প্রতিপদই সুধার আধার।

সংগীত-কীর্ত্তনের পদাবলী সমূহের কোন পদ নাম-প্রধান, কোন পদ রূপ-প্রধান, কোন পদ গুণপ্রধান ও কোন পদবা লীলা-প্রধান থাকে; বিমিশ্রভাব-প্রধানও থাকে। পূর্ণভাবের পদগুলিতে প্রায় ইহার সকল তত্ত্বই অল্লাধিক থাকে। অতএব কীর্ত্তনের প্রতি পদেই নামাদি (এক নাম থাকিলেই অপর ত্রিতত্ত্বও থাকিবে) আছেই এবং তৎসর্ব্বগত সুনির্ম্মল তত্ত্বাকাশে আমাদের শ্যাম-সুধাকর সমুদিত আছেনই! সুধার আর ভাবনা কি? অতএব "প্রতি-পদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্" কৃষ্ণকীর্ত্তনের এই বিশিষ্ট বিশেষণ স্বরূপ সত্যসুধাময় বাক্যটি শ্রীগৌরাঙ্গের বদন-সুধাকর বিগলিত।

"সর্ব্বাত্মস্নপনং"—কৃষ্ণকীর্ত্তন সর্ব্বাত্মা রসাভিষিক্ত করেন; অর্থাৎ কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-রসে সর্ব্বেন্দ্রিয় সহ অন্তরাত্মার অভিষেচন বা আর্দ্রীকরণ হয়। সোজা কথায় বলা যায়—হরিসংকীর্ত্তনে দেহ-মন-প্রাণ যেন গলে যায়! গলে যাওয়া এবং স্নপন—অর্থাৎ ভিজে যাওয়া অবশ্য এক কথা নহে; কিন্তু বক্ষ্যমাণ স্থলে এক বলিলেও বোধ হয় ভাবানুবন্ধে আঘাত বা রসাস্বাদে ব্যাঘাত না হইতে পারে।

সর্ব্বেন্দ্রিয় সহ ভগবানের সেবা কর্ত্তব্য। সর্ব্বেন্দ্রিয় যে বিষয়-সেবা হইবে, তাহা

বিরক্তভাবে; কিন্তু যে ভগবৎসেবা হইবে, তাহা অনুরক্তভাবে। আসক্তি-অনুরক্তি বিষয়মুখী হইলেই জীবের বন্ধন, আর ভগবৎ-মুখী হইলেই মোচন। ভক্তি—"পরানুরক্তি-রীশ্বরে"। সেই অধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা। স্বেচ্ছাচারিতা স্বাধীনতার সঙ্ মাত্র; ফলিতার্থে উহা প্রকৃতির অতি-অধীনতা—প্রবৃত্তির কৃতকিঙ্করতা। শ্রীচরিতামৃত বলেন—

"নিত্য কৃষ্ণদাস জীব, তাহা ভুলি গেল।
সেই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল॥"

যাহাহউক, আমাদের সেই হারানিধি কৃষ্ণদাসত্ব প্রার্থনীয় হইলে, কৃষ্ণ-সেবানন্দ-রসে "সর্ব্বাত্মস্নপন" প্রয়োজন। ভক্তের ভক্তি-গদগদ কীর্ত্তনে ভক্তবৎসল হরি সেবিত ও সুপ্রীত হন। বুঝি সেই লোভেই ভক্ত-গীত-কীর্ত্তনে ভগবান না আসিয়া থাকিতে পারেন না।

"মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।"
মম ভক্ত যথা আমারে গায়।
হে নারদ! আমি রহি তথায়॥

হরি-সংকীর্ত্তনে যে ভাগ্যবান ভক্ত ভগবদাবির্ভাব অনুভব করেন, তিনিই সার্থক সর্ব্বাত্মস্নপন লাভে যথার্থ কৃতার্থ হন। সংকীর্ত্তনে তাঁহারই 'দশা' (ভাব-সমাধি) হয়। সেই সময়ে তিনি কীর্ত্ত্যমান পদের ভাব-ভাবিত চিত্তে জগৎ ভুলিয়া, কেবল সেই জগচ্চিন্তামণি কৃষ্ণধনের দর্শন-স্পর্শন-সেবনাদি দ্বারা সর্ব্বাত্মস্নপিত ও অমৃতীভূত হন।

সংকীর্ত্তনে 'দশা' হওয়া প্রায় সকলেই দেখিয়া থাকিবেন। যদি তাঁহাতে কালধর্ম্ম কৃত্রিমতা বা আতিশয্যিকতা না থাকে তবে তাহা যে শত-সহস্র জন্মের সুকৃতি-সৌভাগ্যার্জ্জিত ফল, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সেরূপ দশা একদিন একবার যাহার হয়, তাহার বোধ জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। যথার্থ ভাব-সমাধি-ফলে ক্ষণকালের জন্যও সাক্ষাৎ-কৃষ্ণ-সেবানন্দরসে তাহার সর্ব্বথা সর্ব্বাত্মস্নপন হওয়ায়, সে নূতন মানুষ হইয়া যায়!

অপর, 'দশা' ব্যতীতও কৃষ্ণকীর্ত্তনে একটু ভাবাবেশ হইলেও যেন সর্ব্বাত্মস্নপন অনুভূত হয়। তখন মদনমোহনের মাধুর্য্য-রসে মনোপ্রাণ একটু মগ্ন হইলেই বাহ্যেন্দ্রিয়ের বিক্ষেপ বিরাম পায়। সকলেই যেন যুগপৎ স্ব স্ব ভোগ্য বিষয় পাইল, এইরূপ ভাবানুবন্ধ হয়। তখন ক্ষুধা থাকে না—তৃষ্ণা থাকে না। প্রেয়সীর রূপরাশি, শিশুর মধুর হাসি, মুদ্রার মুখ-শশী তখন মনে থাকে না। তখন সকল মোহাকর্ষণ, সকল চিত্তোত্তেজনা, সকল ভোগ-প্রলোভন, সকল বিলাস-বাসনা,—এক কথায়—সর্ব্বাত্মার সর্ব্ব-পার্থিব-সন্তর্পণ-ভাব-কামনা যেন কিঞ্চিৎ কালের জন্যও কেন্দ্রীভূত হইয়া সেই যোগীন্দ্র-হৃদয়ানন্দ ব্রজেন্দ্রনন্দনে আকৃষ্ট ও বিনিবিষ্ট হয়।

ভক্তগণ কৃষ্ণকীর্ত্তনের বহিরঙ্গ সাধনে বাহিরে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিই করেন বটে, কিন্তু অন্তরে অন্তরঙ্গ কৃষ্ণসেবানন্দ রসে পূর্ণশান্তি, সর্ব্বাত্মস্নপন লাভ করেন। এই বিষয় শ্রীচরিতামৃতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

"বাহ্যান্তর দুই হয় ইহার সাধন।
বাহ্যেতে সাধক-দেহে শ্রবণ-কীর্ত্তন॥

মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥"

সর্ব্বেন্দ্রিয়ের বিষয় গোবিন্দে সমর্পণ করিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ে গোবিন্দ-সেবনই ভক্তির লক্ষণ।

"হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে।"
(নারদ-পঞ্চরাত্র)

সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়েশ্বরের সেবা ভিন্ন সর্ব্বাত্মস্নপন কিরূপে সম্ভবে? শ্রীচরিতামৃত বলেন—

"আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন।"

বড় শক্ত কথা। এই কলিকালে জ্ঞান, যোগ বা কর্ম্মমার্গে ইহা দুঃসাধ্য সাধন। ভক্তিমার্গেই ইহা সুসাধ্য। ভক্তিভাবন কৃষ্ণকীর্ত্তনই ইহার সাধন এবং তাহাই সাধকের অনন্য অবলম্বন। অতএব কৃষ্ণকীর্ত্তন "সর্ব্বাত্মস্নপনম্"।

"পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনম্।" এ হেন যে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন, তাহার পরম বিজয়—অর্থাৎ জয়জয়কার! শ্রীকৃষ্ণের নামের জয়, প্রেমের জয়, রূপের জয়, গুণের জয়, লীলা-বিলাসের জয়! আর এই সমস্ত তত্ত্ব-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের পরম বিজয়! এই স্থানে একটি শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন নিবেদন করিলাম।

মন!
কর হরেকৃষ্ণ-হরিনাম।
স্মর হরে কৃষ্ণ হরে রাম।

১। ধর হরেকৃষ্ণনাম, কর কৃষ্ণরূপ ধ্যান,
কর কৃষ্ণ-গুণ-গান, (কর) কৃষ্ণলীলা-রস পান ॥
২। কলিতে কৃষ্ণনাম বিনে, শ্রীকৃষ্ণ-চরণ
পাবিনে;
এই বেলা মন! বুঝে শুনে, নামে স'প প্রাণ ॥
৩। কৃষ্ণনাম যে প্রাণাধিক, তাহতে কি
প্রাণ অধিক?
তেমন প্রাণে ধিক্!
(ছার) প্রাণের ভাগো, যা হয় হ'কৃগে,
তুমি ছেড়নারে নাম ॥
৪। (কৃষ্ণ) নামের মাঝে নাগর-সাজে,
ব্রজেন্দ্রনন্দন্ বিরাজে,
রাধারাণী বামে রাজে, বিচিত্র বিধান!
কর হরে কৃষ্ণ হরিনাম ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

ভূ-গোল পরিচয়।

৯ম পাঠ।

সিংহ রাশিস্থ মঘানক্ষত্র (Sickle)(১)

প্রভাষতারা ও তোমর তারা সংযোজিত করিয়া যোগরেখা পূর্ব্বাভিমুখে বর্দ্ধিত করিলে, তোমর তারা হইতে ৪ হাত দূরে অবস্থিত একটী শুভ্রবর্ণ ২য় শ্রেণীর তারা দর্শকের দৃষ্টিগোচর হইবে। এই তারাটীর নাম "খ্যাতি"। [২]। এই খ্যাতি তার পাশ্চাত্যে সিংহহৃৎ—(Regulus) নামে অভিহিত। খ্যাতিতারা মধুচক্র নামক

---

[১] বরাহমতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে ঋষিরেখা মঘানক্ষত্রে অবস্থিত ছিল।
দ্রষ্টব্য—

[২] এই খ্যাতির গর্ভে মহর্ষি ভৃগুর ঔরসে শ্রী বা লক্ষ্মীর জন্ম হয়। দ্রষ্টব্য—
"দেবৌধাতা বিধাতারৌ-ভৃগোঃখ্যাতি-
রসূয়ত।
শ্রিয়ঞ্চ দেব দেবস্য পত্নী নারায়ণস্য যা"
ইতি বিষ্ণুপুরাণ ১।৮।১৩

তারাস্তবকের পূর্ব্বভাগে ৮ হাত অন্তরে অবস্থিত। প্রভাবতারা ও সোমতারা এই তারাদ্বয়ের সংযোগরেখাকে ভূমিকল্পনা করিলে এবং খ্যাতিতারাকে শীর্ষকোণস্থ তারা কল্পনা করিলে, একটী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ বিমানে অঙ্কিত করা যায়। খ্যাতি-তারা এবং সিংহরাশিস্থ অপর তারা চতুষ্টয়ের সংহতিকে মঘা নক্ষত্র বলে।

খ্যাতি তারার এবং তাহার ২ হাত উত্তরস্থ ৪র্থ শ্রেণীর একটী তারা এবং এই ২য় তারার ২॥০ হাত দূরে ঈশান কোণস্থিত "সিংহককুৎ" নামক ৩য় শ্রেণীর একটী তারা এবং সিংহককুৎ তারার ৪ হাত দূরে বায়ুকোণস্থ "মণি" নামক ৫ম শ্রেণীস্থ তারা, এবং মণিতারার নৈর্ঋৎ কোণস্থ ১ ফুট দূরস্থিত ৪র্থ শ্রেণীস্থ একটী তারা, এই তারা-পঞ্চকে লাঙ্গলাকৃতি মঘা নক্ষত্র গঠিত হয়। খ্যাতিতারা মঘানক্ষত্রের যোগতারা। মঘা নক্ষত্র পাশ্চাত্যে কর্ত্তনাস্ত্র (Sickle) নামে অভিহিত। মঘা নক্ষত্র দ্বারা তারাময় সিংহের সম্মুখভাগ গঠিত। মঘা নক্ষত্র হইতে শুক্র গ্রহ "মঘাভূ" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। [৩]

সিংহ রাশিস্থ পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র।

তারাদ্বয়ে পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র গঠিত। তারাদ্বয় উত্তর-দক্ষিণভাবে অবস্থিত, এবং পরস্পর ৩ হাত অন্তরে স্থিত। উত্তরস্থ তারাটীর নাম "শিবা" এবং দক্ষিণস্থ তারা-টীর নাম অর্জ্জুন। [৪]

শিবাতারা এই নক্ষত্রের যোগতারা। শিবা সিংহককুৎ তারার পূর্ব্বভাগে ৪ হাত অন্তরে স্থিত। এই নক্ষত্রে তারাময় সিংহের পশ্চাৎভাগ গঠিত।

সিংহরাশিস্থ ৪। ৬ তারা = পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র। অর্জ্জুন ও শিবাতারার যোগরেখা উত্তরে প্রসারিত করিলে ধ্রুবতারা উপলক্ষিত হইবে। পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র হইতে বৃহস্পতি গ্রহ পূর্ব্বফল্গুনীভব নামে খ্যাত। [৫]

সিংহ রাশি (Leo)।

কর্কট রাশির পূর্ব্বভাগস্থ ৩০ অংশে সিংহ রাশি অবস্থিত এবং মঘানক্ষত্রের ১৩.৩০ এবং পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রের ১৩.৩০ এবং উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রের ৩.৩০ এই

---

[৩] শ্রীক্ষেত্রে, গ্রহগণের প্রস্তরময়ী যে সকল মূর্ত্তি আছে, তন্মধ্যে শুক্রগ্রহের স্ত্রীমূর্ত্তি লক্ষিত হয়। শুক্রগ্রহ মঘাভূ, সুতরাং কবিকল্পনায় একই গ্রহ শ্রী বা লক্ষ্মী এবং শুক্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে। পৌ-রাণিকগণ উভয়বিধ রূপের সামঞ্জস্য করণার্থে শুক্রের 'লক্ষ্মীসহজ' নাম দিয়াছেন।

দ্রষ্টব্যঃ—

[৪] পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রের অপর নাম অর্জ্জুনী নক্ষত্র।

দ্রষ্টব্যঃ—

ঋক্‌বেদ ১০।৮৫।১৩

পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রের ১০° অংশ উত্তরে সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ লক্ষ্ম নামক যৌথতারাজগৎ অবস্থিত। এই যৌথতারাজগৎ সপ্তর্ষি-মণ্ডলস্থ ১৭ তারা।

[৫] অঙ্গিরা-পত্নী শিবার গর্ভ হইতে বৃহস্পতির জন্ম হয়।

দ্রষ্টব্যঃ—

মহাভারত বনপর্ব্ব।

রাশির অন্তর্ভুক্ত। সিংহের সম্মুখভাগ মঘানক্ষত্রে এবং পশ্চাৎভাগ পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে গঠিত এবং পাশ্চাত্যমতে উত্তর ফল্গুনীর যোগতারা তারাময় সিংহের পুচ্ছাগ্রে অবস্থিত।

সিংহরাশিস্থ সিংহককুৎ নক্ষত্রের পশ্চিম ভাগ হইতে সৈংহিক নামক উল্কা-বৃষ্টি পতিত হয়। এই উল্কা-বৃষ্টি অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমার্দ্ধের শেষভাগে হইয়া থাকে। ১৭৮৮ শকাব্দে সৈংহিক উল্কাবৃষ্টি প্রচুর পরিমাণে হইয়াছিল।

কন্যারাশিস্থ উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র।

খ্যাতিতারা এবং অর্জ্জুন তারা সংযোজিত করিয়া ঐ সংযোগ-রেখা পূর্ব্বাভিমুখে প্রসারিত করিলে, অর্জ্জুন তারার ৪ হাত পূর্ব্বভাগে যে একটা ২য় শ্রেণীর অত্যুজ্জ্বল তারকা দৃষ্ট হয়, ঐ তারার নাম "সিংহলাঙ্গুল"। সিংহলাঙ্গুল তারা এবং তৎদক্ষিণস্থ পাশ্চাত্য কন্যা রাশিস্থ দ্রুপদ তারা, এই তারা-সংহতিকে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র বলে। সিংহলাঙ্গুল তারা উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রের যোগতারা।

সিংহলাঙ্গুল তারা পাশ্চাত্যে সিংহলাঙ্গুল (Denebola) নামে খ্যাত। পর্জ্জন্য দেব এই নক্ষত্রের অধিপতি।

কন্যা রাশিস্থ হস্তা নক্ষত্র।

ধ্রুব ও অত্রিতারা সংযোজিত করিয়া, ঐ সংযোগ-রেখা অসুরভাগে প্রসারিত করিলে, ঐ রেখা একটী ক্ষুদ্রতারা-মণ্ডলে নীত হইবে। এই তারামণ্ডলের নাম করতল মণ্ডল। করতল মণ্ডলের পঞ্চতারা [illegible]মণ্ডলাকৃতি। এই পঞ্চতারাসংহতির নাম হস্তা নক্ষত্র। তারাময় করতল বায়ুকোণে প্রসারিত লক্ষিত হয়। অঙ্গুষ্ঠ তারা এই নক্ষত্রের যোগতারা, তর্জ্জনী, অনামিকা কনিষ্ঠা এবং মণিবন্ধ হস্তার অপর নক্ষত্রচতুষ্টয়ের নাম। পাশ্চাত্যে করতল মণ্ডল কাক (corvus) নামে অভিহিত।

কন্যারাশিস্থ চিত্রানক্ষত্র।

তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ তারার যোগরেখা পূঃ পূঃ উঃ দিকে প্রসারিত হইলে, অঙ্গুষ্ঠ তারার ৮ হাত দূরে একটী ১ম শ্রেণীর তারকা, দর্শকের দৃষ্টিপথে পতিত হইবে। এই তারার নাম চিত্রা [৬]। কেবল মাত্র

---

[৬] শতপথব্রাহ্মণমতে চিত্রা নামের ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিত আছে যে,—

শতপথ ব্রাহ্মণ ২।১।২

১৩। সুর এবং অসুরগণ উভয়ে প্রজাপতির সন্তান, এবং প্রত্যেকেই স্বর্গরাজ্যের আধিপত্যের জন্য ব্যাকুল। স্বর্গরাজ্যে অধিরোহণ জন্য অসুরগণ 'রৌহিণ' নামক যজ্ঞকুণ্ড নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন।

১৪। ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ তদ্দৃষ্টে চিন্তামগ্ন হইলেন, কারণ অসুরগণ স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিলেই সুরগণের স্বর্গচ্যুতি হইবে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে ইন্দ্র ১ খণ্ড আষাঢ় বা ইষ্টক হস্তে লইয়া তথায় উপনীত হইলেন।

১৫। এবং অসুরগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, শুন, আমার নিজের জন্য আমি এই ইষ্টক যজ্ঞকুণ্ডে দিতেছি; তৎশ্রবণে অসুরগণ বলিলেন—ভাল, দিতে পার। এই রূপে যজ্ঞকুণ্ড নির্ম্মাণ সমাপ্তপ্রায় হইল।

১৬। তদ্দৃষ্টে ব্রাহ্মণবেশধারী ইন্দ্র কহিলেন, আমার ইষ্টক আমি বাহির করিয়া লইব। এই বলিয়া ইন্দ্র স্বীয় ইষ্টক ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। যজ্ঞকুণ্ডের

চিত্রাতারা দ্বারা চিত্রা নক্ষত্র গঠিত [৭] এবং চিত্রাতারা চিত্রানক্ষত্রের যোগতারা।

বিশ্বকর্ম্মা বা ইন্দ্র এই নক্ষত্রের অধিপতি।

আকারে এই তারা শস্যশীর্ষবৎ। এজন্য পাশ্চাত্যগণ এই তারাকে শস্যশীর্ষ (Spica) নাম দিয়াছেন।

কন্যারাশি।

সিংহ রাশির পূর্ব্বস্থ রবিমার্গরেখার ৩০°তে কন্যারাশি অবস্থিত।

উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রের ১০°, হস্তানক্ষত্রের ১৩.২০ এবং চিত্রানক্ষত্রের ৬.৬০ কন্যা রাশির অন্তর্ভুক্ত। তারাময় কন্যাগঠনে উত্তরফল্গুনী বা হস্তানক্ষত্র উপাদানরূপে গৃহীত নহে। চিত্রাতারা তারাময় কন্যার মস্তকে অবস্থিত এবং এই রাশিস্থ অপর তারাগণ দ্বারা কন্যাদেহ নির্ম্মিত। কন্যা রাশির পাশ্চাত্য নাম কুমারী (Vergenes বা Virgo) [৮]

করিমুণ্ড মণ্ডল।

কন্যারাশির উত্তরভাগে যে বিস্তীর্ণ অতি ক্ষুদ্র তারকারাশি দৃষ্টিগোচর হয়, ঐ তারকা-রাশি আকারে করিমুণ্ড সদৃশ, এজন্য এই তারকামণ্ডল করিমুণ্ডমণ্ডল নামে অভিহিত হইতে পারে। করিমুণ্ড উত্তর শিরে পূর্ব্বাস্যে স্থাপিত।

পাশ্চাত্যে এই তারামণ্ডল "মিসর রাজ্ঞী বেরিণীর কেশ পাশ (Coma Berenices) নামে খ্যাত।

সারমেয় যুগল মণ্ডল।

চিত্রশিখণ্ডির পুচ্ছতলে এবং করিমুণ্ড-মণ্ডলের উত্তরে একটী ক্ষুদ্র তারামণ্ডল আছে, এই তারামণ্ডলের নাম—সারমেয় যুগল-মণ্ডল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

মধ্যভাগস্থ ইষ্টক আকৃষ্ট হইলে, যজ্ঞকুণ্ড পতিত হইল এবং সেই সঙ্গে ২ নির্ম্মাণকারী অসুরস্থপতিগণ ভূপতিত হইতে লাগিলেন। ইন্দ্র প্রচ্যুত ইষ্টক সকল লইয়া তদ্দ্বারা বজ্র নির্ম্মাণ করিলেন, এবং তদ্দ্বারা অসুরবধ করিতে লাগিলেন।

১৭। তদ্দৃষ্টে সুরগণ ইন্দ্রসন্নিধানে সমবেত হইয়া বলিলেন, "চিত্রং" অর্থ আশ্চর্য্যং।

এই ঘটনা হইতে এই তারার নাম চিত্রা হইল।

[৭] পঞ্জিকায় চিত্রানক্ষত্রের দশভুজা মূর্ত্তি অঙ্কিত হয়।

[৮] গ্রীস্ দেশস্থ আথেন্স্ নগরে 'আইকেরিয়াস্' নামে এক ব্যক্তি বাস করিত এবং তাহার 'এরিগনি' নামে একটী কন্যা ছিল। মদিরাদেব ব্যাকাস তাঁহার আলয়ে আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মদিরাদেব দ্রাক্ষা-রোপণ শিক্ষা দেন।

এই দ্রাক্ষাজাত মদ্য পানে উন্মত্ত কৃষক গণ আইকেরিয়াস্‌কে হত্যা করে। কন্যা "এরিগনি" সারমেয় "মৈর" সাহায্যে পিতার কবর অন্বেষণ করিয়া মৃত পিতৃদেহ দর্শনে শোকার্ত্ত হইয়া কবর সন্নিহিত বৃক্ষশাখায় উদ্বন্ধনে দেহ ত্যাগ করেন। স্বর্গপতি দ্যুঃ (বৃহস্পতি) কুমারী এরিগনিকে কন্যা রাশি রূপে বিমানে স্থাপন করেন এবং তৎপিতা আইকেরিয়াস্‌কে ভূতেশ (Bootes) এবং সারমেয় 'মৈরকে' "প্রোসা-য়ন" (সরমা) নামে স্বর্গে স্থাপন করেন।

শ্রী শ্রী হরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২৫ আইন মতে রেজেষ্টারীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৮ম বর্ষ, ৮ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।	আশ্বিন।	১৩০৮ সাল, ১৮২৩ শকাব্দা।

ভূ-গোল পরিচয়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সারমেয় যুগল মণ্ডল।

এই তারামণ্ডলের ২টী তারা প্রধান। সর্ব্ব-প্রধান তারাটী ৩য় শ্রেণীর এবং ইহার নাম জ্যেষ্ঠকালকাঞ্জ। [৯] অপরটী ৫ম শ্রেণীর এবং উহার নাম কনিষ্ঠ কাল-কাঞ্জ: ক্রতু ও পুলস্ত তারা সংযোজিত করিয়া সংযোগরেখা পূর্ব্বাভিমুখে প্রসারিত করিলে, কনিষ্ঠ কালকাঞ্জ তারা, পুলস্ত তারার ৮ হাত পূর্ব্ব দিকে লক্ষিত হইবে।

কনিষ্ঠ কালকাঞ্জ তারার পূর্ব্বদিকে ৪ ফুট দূরে, জ্যেষ্ঠ কালকাঞ্জ তারা অবস্থিত। এই তারামণ্ডলে "রৌহিণ" নামক বক্রাকৃতি একটী বাষ্পস্তবক আছে। ঐ বাষ্পস্তবক পাশ্চাত্যে M. 51. সংখ্যায় চিহ্নিত।

অথর্ব্ববেদে কালকাঞ্জগণের আদি উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। [১০]

---

[৯] কালকাঞ্জ নামে অসুরগণ স্বর্গা-রোহণ মানসে যজ্ঞকুণ্ড নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইল। প্রত্যেকে এক এক খানি ইষ্টক প্রদান করিল। ব্রাহ্মণ-বেশধারী ইন্দ্র তাহাতে ১ খণ্ড ইষ্টক স্থাপন করিয়া বলিলেন, এই ইষ্টক চিত্রা এবং এই ইষ্টক আমার। অসুরগণ আকাশে উঠিতে লাগিল। কিন্তু ইন্দ্র স্বীয় ইষ্টক বাহির করিয়া লওয়ায় অসুরগণের সোপান স্খলিত হইল। যাহারা [illegible] হইল তাহারা ঊর্ণনাভিরূপে রহিল কিন্তু ২টী কালকাঞ্জ আকাশে উড্ডীয়মান হইল এবং তাহারা সারমেয় যুগলরূপে বিমানে বিরাজমান রহিল। দ্রষ্টব্য—

কালকাঞ্জাঃ বৈনাম অসুরাঃ আসন্। তে সুবর্গায় লোকায় অগ্নিং অচিন্বত। ইষ্টি প্রক্রম্য স ইন্দ্র ইষ্টকাং আবৃহৎ। তে ঊর্ণনাভয় অভবন্। দ্বৌ উদপততাম্। তৌ দিব্যৌ শ্বানৌ অভবতাম্।

ইতি তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে—
১।১।২।৬

[১০] কালকাঞ্জের আকাশ আগে

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ এবং শতপথ ব্রাহ্মণ-লিখিত উপাখ্যান দ্বারা সারমেয় যুগলের স্বরূপত্ব প্রতিপন্ন হয়। পাশ্চাত্যে সারমেয় যুগল (Canis venatici) নামে খ্যাত এবং জ্যেষ্ঠ কালকঞ্জ (cor caroli) নাম খ্যাত।

পাশ্চাত্যে সারমেয় যুগল (Canis Venatici) নামে খ্যাত এবং জ্যেষ্ঠ কাল-কাঞ্জ (cor caroli) নামে খ্যাত।

সারমেয় যুগলের উপাখ্যান তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এইরূপ বর্ণিত আছে যথা [১১]

উড্ডীন হইল এবং বিমানে তাহারা দেবতারূপে স্থিত রহিল।

দ্রষ্টব্যঃ—

যে ত্রয়ঃ কালকাঞ্জাঃ দিবি দেবাঃ ইব শ্রিতাঃ।

ইতি অথর্ব্ববেদ ৬।৮০।২

[১১] কালকাঞ্জ নামে এক অসুর জাতি ছিল। তাহারা স্বর্গারোহণার্থ এক সোপান নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। প্রত্যেক অসুর এক এক খানি ইষ্টক সোপানে অর্পণ করিল। ব্রাহ্মণ-বেশ-তিরোহিত দেবরাজ এই বলিয়া নিজের এক খণ্ড ইষ্টক সোপানে স্থাপন করিলেন, "এই চিত্র ইষ্টক (চিত্রা-তারা) আমার রহিল।" ক্রমে সোপান নির্ম্মাণ শেষ হইলে অসুরগণ স্বর্গারোহণে প্রবৃত্ত হইল। ব্রাহ্মণছদ্মবেশী ইন্দ্র নিজের ইষ্টক সোপান হইতে নিষ্কাশিত করিয়া লইলেন। ...ন্দ্র সোপান ভূপতিত হইতে লাগিল। অসুরগণ আকাশে বিক্ষিপ্ত হইল। ভূপতিত অসুরগণ ঊর্ণনাভি হইল। দুইটী মাত্র অসুর লম্ফ প্রদানে স্বর্গে উঠিল। ইহারাই সারমেয় যুগলরূপে অবস্থিত। [illegible]

তুলারাশির স্বাতি নক্ষত্র।

করিমুণ্ড মণ্ডল ও সারমেয় যুগল মণ্ডলের পূর্ব্বভাগে ভূতেশ মণ্ডল। ভূতেশ মণ্ডলের সর্ব্ব প্রধান তারার নাম নিষ্ঠ্যা। চিত্রশিখণ্ডি.

দ্রষ্টব্য

যে ত্রয়ঃ কালকাঞ্জাঃদিবি দেবাঃ ইবশ্রিতাঃ
ইতি অথর্ব্ববেদ ৬।৮০।২

দ্বৌ উদপততাং। তৌ দিব্যৌ শ্বানৌ অভবতাম।
ইতি তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ
১।১।২।৬

কালকাঞ্জা বৈ নাম অসুরাঃ আসন্। তে সুবর্গায় লোকায় অগ্নিং অচিন্বত। পুরুষ ইষ্টকাং উপাদধাৎ পুরুষ ইষ্টকাং। স ইন্দ্রঃ ব্রাহ্মণঃ ব্রুবাণঃ ইষ্টকাং উপাধত্ত এষামে চিত্রা নাম ইতি। তে সুবর্গলোকং আপ্রারোহন্। স ইন্দ্রঃ ইষ্টকাং আবৃহৎ তেবা কীর্য্যন্ত। যে বা কীর্য্যন্ত। তে ঊর্ণনাভয়ঃ অভবন্। দ্বৌ উদপতন্তাম্। তৌ দিব্যৌ শ্বানৌ অভবতাং।

ইতি তৈঃ ব্রাঃ। ১। ১। ২। ৭৬।৪।৬

গ্রীক দেশে এই উপাখ্যান রূপান্তরে চলিত ছিল। যথা—অসুরদ্বয় ওতস্ এবং এফিয়ল্টেস্, স্বর্গারোহণ জন্য অলিম্পস্ পর্ব্বতোপরি অশুণ পর্ব্বত এবং অশুণ (অশ্ম ?) পর্ব্বতোপরি পিলিয়ন পর্ব্বত স্থাপন করিল। তদ্দৃষ্টে আপল্লন (Apollon) দেব অসুর দ্বয়ের বিনাশ সাধন করিলেন। হিব্রু বাইবেলে ও এই উপাখ্যান রূপান্তরে লক্ষিত হয়। যথা :—

সৃষ্টি অধ্যায় ১৩।

১। মানব জাতির এক মাত্র ভাষা ছিল।

২। পশ্চিমাভিমুখ মানব জাতি সিনার দেশে সমতল ক্ষেত্র দেখিতে পাইলেন।

৩। তাহারা পরামর্শ করিয়া ইষ্টক নির্ম্মাণ ও দগ্ধ করিল।

৪। তাহারা নগর ও তিদিবস্পর্শী সোপান

মণ্ডলের শিখণ্ডের বক্র রেখা প্রসারিত করিলে বর্দ্ধিত বক্র রেখা প্রথম শ্রেণীর কুঙ্কুমবর্ণ তারা ভেদ করিয়া চিত্রাতারায় মিলিবে এবং ধ্রুব তারা ও কংস তারা সংযোজিত করিয়া ঐ যোগ রেখা বর্দ্ধিত করিলে ঐ প্রথম শ্রেণীর কুঙ্কুম বর্ণ তারায় দর্শকের নেত্র নীত হইবে। ঐ তারার নাম নিষ্ঠ্যা [১] এবং এই তারাকেই স্বাতি নক্ষত্র বলে। এই তারা স্বাতি নক্ষত্রের যোগ তারা, রোমে এই তারা (Arcturus) নামে বিদিত। এই তারা কুঙ্কুম বর্ণ ও অতি উজ্জ্বল। এবং দেখিতে অতি সুন্দর, নিষ্ঠস্থির তারা হইলেও অতিদ্রুতগামী। প্রতি বিপলে ২৮ মাইল গমন করে।

নির্ম্মাণে কৃত-সংকল্প হইল:

৫। মানব নির্ম্মিত নগর দর্শনাভিলাষে ঈশ্বর স্বর্গ হইতে পৃথিবী তলে অবতরণ করিলেন।

৬। ঈশ্বর বলিলেন, দেখ মানব জাতি এক এবং তাহাদের ভাষা এক। তাহারা যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে তাহা ; হইতে নিবৃত্ত হইবে না।

৭। চল, মর্ত্তে যাই, এবং মানবের ভাষা বিপর্য্যয় সাধন করি।

৮। ঈশ্বর মানবজাতি ভূতলে বিক্ষিপ্ত করিলেন। মানব নগরনির্ম্মাণে বিরত হইল।

৯। নগর বাবেল Babel নামে খ্যাত হইল, কারণ তথায় ভাষা বিপর্য্যয় ঘটিল।

পুষ্পিকা ১। অসুরগণের ভাষা বিপর্য্যয়ের উল্লেখ বেদে দৃষ্ট হয়। যথা :—শত পথ ব্রাহ্মণ ৩। ২। ১। ২৩।

পুষ্পিকা ২। কৃত্তিবাসের রামায়ণে লিখিত রাবণের স্বর্গ-সোপান-নির্ম্মাণ-কল্পনা মৌলিক [illegible]

তুলারাশিস্থ রাধা বা বিশাখা নক্ষত্র।

কন্যা রাশির দঃ পূঃ কোণে তুলারাশির মরিচী ও নিষ্ট্যা তারা সংযুক্ত করিয়া ঐ সংযোগ রেখা বর্দ্ধিত করিলে, চিত্রাতারার অগ্নিকোণস্থ একটী শুভ্রবর্ণ—দ্বিতীয় শ্রেণীর তারায় দর্শকের দৃষ্টি নীত হইবে। এই তারার নাম যাম্যকীলকা। যাম্যকীলক তারার ৪।৫ হাত দূরে অগ্নিকোণে ও ঈশান কোণে দুইটী তারা দৃষ্ট হইবে। এই তারাত্রয়ে একটী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ অঙ্কিত রহিয়াছে ; যাম্য কীলক তারা এই ত্রিভুজের শীর্ষ দেশে অবস্থিত। এবং এই ত্রিভুজের ভূমি রেখায় আর একটী তারা অবস্থিত আছে। এই তারা চতুষ্টয়ে রাধা নক্ষত্র গঠিত [২] ; মতান্তরে পঞ্চ তারায় রাধা নক্ষত্র গঠিত। ক্রান্তি মণ্ডল এই রাধা

---

[২] সূর্য্য সিদ্ধান্ত লিখিত যোগ তারাগণের ধ্রুবক ও বিক্ষেপ দৃষ্টে বোধ হয়, এই তারা চতুষ্টয়ের পূর্ব্বস্থ তারা চতুষ্টয়ই বিশাখা নক্ষত্র। কিন্তু পৌরাণিক জ্যোতির্বিদগণ এই নব নক্ষত্রের স্থাপন করিয়া সূর্য্য সিদ্ধান্ত সম্মত বৃশ্চিকরাশিস্থ চতুস্তারকময় রাধা নক্ষত্রকে অনুরাধা নক্ষত্র নাম দিয়াছেন এবং সূর্য্য সিদ্ধান্ত সম্মত অনুরাধা নক্ষত্রের জ্যেষ্ঠা নাম দিয়াছেন। এবং সূর্য্য সিদ্ধান্ত সম্মত জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের তারা ত্রয় দ্বারা ধনুঃরাশিস্থ মূলা নক্ষত্রের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন। গণক কালিদাস সূর্য্যসিদ্ধান্ত সম্মত জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের তারাত্রয় আধুনিক অনুরাধা নক্ষত্র ভুক্ত করিয়া আধুনিক অনুরাধা নক্ষত্রের কলেবর সুবর্দ্ধিত করিয়াছেন। এবং সূর্য্য সিদ্ধান্ত সম্মত জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র যথা স্থানে রাখিয়াছেন, ঐজন্য কালিদাস মতে অনুরাধা সপ্ত তারাত্মিকা সর্পাকৃতি।

নক্ষত্রকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া অবস্থিত। রাধা নক্ষত্রের এক অংশ বা শাখা ক্রান্তি মণ্ডলের উত্তরে অবস্থিত এবং অপর অংশ বা শাখা ক্রান্তি মণ্ডলের দক্ষিণে অবস্থিত, এই জন্ত রাধা নক্ষত্রের অপর নাম বিশাখা নক্ষত্র। পৌরাণিক জ্যোতির্ব্বিদের গূঢ় অভিসন্ধি ক্রমে এই নক্ষত্রের রাধা নাম বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে এবং অধুনা এই নক্ষত্র বিশাখা নামেই সর্ব্বত্র পরিচিত, এই নক্ষত্রের উত্তরস্থ তারার নাম সৌম্যকীলক এবং দক্ষিণস্থ তারার নাম তড়িত্ব।

তুলারাশি।
(Libra)

তুলারাশি কন্যা রাশির দঃ পূঃ কোণে অবস্থিত এবং চিত্রা তারা হইতে আধুনিক বিশাখা নক্ষত্রস্থ সৌম কীলক তারা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তুলা পঞ্চ তারায় গঠিত। ধট মস্তকে কীলক তারা। ধটযুগের উভয় পার্শ্বস্থ ধটকর্কটদ্বয়ে কীলক তারা ও তড়িৎ তারা দ্বয়। শিকারয় তলে সর্প মণ্ডলস্থ "৩" তারা ও শার্দ্দূল মণ্ডলস্থ তারা। এই রাশিতে সূর্য্যের অবস্থিতি কালে দিবা মান ও রাত্রিমান সমান হয় বলিয়া এই রাশির নাম তুলা বা মানদণ্ড।

বৃশ্চিক রাশিস্থ অনুরাধা নক্ষত্র।

তুলার দঃ পূঃ কোণে একটী সুদৃশ্য বৃশ্চিক দর্শক দেখিতে পাইবেন, এই বৃশ্চিকের বক্ষদেশে পারিজাত নামক একটী অত্যুজ্জল রক্ত বর্ণ তারা। তারাটী দেখিতে মঙ্গল গ্রহ সদৃশ, এজন্ত এই তারা গ্রীকে অনটরস্ (Antares) নামে খ্যাত। পারিজাত তারার ৮ হাত উঃ পঃ কোণে বাণি তারা। তারাটী তৃতীয় শ্রেণীস্থ এবং শুভ্রবর্ণ। এই বাণি তারার ২ হাত দঃ পঃ কোণে দিবাচঞ্চলা তারা, এই তারাটী ২য় শ্রেণীর ও শুভ্রবর্ণ। এই দিবা চঞ্চলা অনুরাধা নক্ষত্রের যোগতারা। দিবা চঞ্চলা তারার ২ হাত দক্ষিণে বহ্নী তারা, তারাটী শুভ্রবর্ণ। বহ্নী তারার ২ হাত দক্ষিণে বিদ্যুৎ তারা, তারাটী পঞ্চম শ্রেণীস্থ ও শুভ্র বর্ণ। বাণি দিবাচঞ্চলা, বহ্নী ও বিদ্যুৎ এই তারা চতুষ্টয়ে অনুরাধা নক্ষত্র গঠিত। রাধা (=বিশাখা) নক্ষত্রের পরবর্ত্তী বলিয়া এই নক্ষত্রের অনুরাধা নাম। এই অনুরাধা নক্ষত্রে বৃশ্চিকের বাহু দ্বয়, 'হাত' গঠিত।

বৃশ্চিক রাশিস্থ
জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র।

রক্তবর্ণ পারিজাত তারা ও তাহার ১ হাত দূরে দ্রোণ তারা ও অগ্নি কোণস্থ সুগ্রীব তারা, এই তারা ত্রয় জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র গঠিত, নক্ষত্রটী দেখিতে কর্ণভূষণ (পাশক) সদৃশ। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র বৃশ্চিকের বক্ষ দেশে অবস্থিত। পারিজাত তারা দেখিতে অতি মনোহর। এ জন্ত বেদে জ্যেষ্ঠা সুনক্ষত্র বলিয়া বর্ণিত [৩] কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদে জ্যেষ্ঠা রোহিণী নামে কথিত। [৪]

জ্যেষ্ঠা শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক মত ভেদ হইতে পারে। অথর্ব্ববেদ মতে জ্যেষ্ঠার পূর্ণ নাম জ্যেষ্ঠঘ্নি [৫]। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এই মত সমর্থিত হইয়াছে।

[৩] জ্যেষ্ঠা সুনক্ষত্রং অরিষ্ট মূলং ইতি অথর্ব্ববেদ ১৯।৭।৩

[৪] কৃষ্ণ যজুঃ বেদ ৪। ৪।

[৫] জ্যেষ্ঠঘ্ন্যাং জাত বিচৃতো র্যমস্য। ইতি অথঃ বেঃ ৬। ১১০।

[৬] এবং সায়ণাচার্য্য এই মত বিকশিত করিয়াছেন [৭] কিন্তু এই নক্ষত্রের প্রাচীনতম নাম ইন্দ্র ছিল [৮] এবং জ্যেষ্ঠা ইন্দ্রের নামান্তর মাত্র। আবার ইন্দ্রই জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের দেবতা। কেহ বা বলেন, নক্ষত্র মালার আদি নক্ষত্র এক সময়ে এই নক্ষত্র ছিল এবং সেই জন্য ইহার জ্যেষ্ঠা নাম [৯] রক্তবর্ণ পারিজাত তারার গ্রীক নাম মঙ্গলসম (Antares) (রক্তবর্ণ,) এবং ইহার লাটীন নাম বৃশ্চিকহৃৎ (cor scorpionis)। বোধিনানে এই নক্ষত্রের নাম রাজ নক্ষত্র (Kekkab Dar lugal) ছিল এবং ইহার অধিপতি দেব কামরাজ।

বৃশ্চিক রাশি।

অনুরাধা নক্ষত্রের তারা চতুষ্টয়ে বৃশ্চিকের বাহুদ্বয় গঠিত। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের তারাত্রয়ে বৃশ্চিকের বক্ষ গঠিত। এবং জ্যেষ্ঠা তারার পরবর্ত্তী তারাত্রয়ে বৃশ্চিকের উদর গঠিত। এবং ধনুঃরাশিস্থ মূলা নক্ষত্র বৃশ্চিকের পুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু মূলা নক্ষত্র ধনুঃরাশির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া জ্যোতিঃ শাস্ত্রে মূলাকে বৃশ্চিকপুচ্ছ বলিয়া গণ্য করা যায় না।

(ধনুঃ রাশিস্থ)

মূলা নক্ষত্র

জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের পূর্ব্ব সীমার পূর্ব্বে দৃশ্য-বৃশ্চিকের পুচ্ছ দেশে যে পঞ্চ তারা আছে, ঐ তারাপঞ্চকের আকার অরিষ্ট-(=লশুন) মূল বা মাত্রাহীন "ব" কার সদৃশ। তারা পঞ্চককে শঙ্খাকৃতি বলিলেও বলা যায়। এই অরিষ্ট মূলাকৃতি বা শঙ্খাকৃতি তারাপঞ্চকে মূলা নক্ষত্র গঠিত। মূলার পূর্ব্বনাম অরিষ্ট মূল [১০] বা মূলবর্হণী [১১]। মূলা নক্ষত্রের অগ্রদেশস্থ অর্থাৎ উত্তরস্থ তারাদ্বয় অতীব চাকচিক্যময় এবং দেখিতে নৃচক্ষু সদৃশ [১২]। পূর্ব্বস্থ তারার নাম শুক, পশ্চিমস্থ তারার নাম সারণ (১৩)। এবং মূলার পঞ্চ তারার পূর্ব্বস্থ তারার নাম পঞ্চজন। এই পঞ্চজন মূলার আধুনিক যোগতারা এবং শুক তারা মূলার প্রাচীন যোগতারা [১৪]। মতান্তরে মূলা ক্রদ্ধ-সিংহ-লাঙ্গুল সদৃশ এবং নব বা একাদশ তারায় গঠিত। মূলার দেবতা নির্ঋতি (=রাক্ষসেশ্বর)। বেবিলনে এই নক্ষত্র সারউন ও সারগাজ নামে খ্যাত ছিল। (সার=কুকুর)।

---

[৬] জ্যেষ্ঠং এষাম অবধিষ্মেতি তৎ জ্যেষ্ঠঘ্নী ইতি তৈঃ ব্রাঃ ১। ৪। ২। ৮

[৭] তস্যাং জ্যেষ্ঠায়াং জাতিঃ পুত্রঃ জ্যেষ্ঠস্য পিতৃ ভ্রাতৃ আদেঃ হন্তা ভবতি। ইতি সায়ণ।

[৮] ইন্দ্রো জ্যেষ্ঠা। ইতি শত পথব্রাহ্মণ ৫।৩।১।৮

[৯] Bentley ...

[১০] জ্যেষ্ঠা সুনক্ষত্রং অরিষ্ট মূলং। ইতি অথঃ বেঃ ১৯। ৭। ৬

[১১] মূলং এষাং অবৃক্ষাম্ এতি তৎমূলবর্হিণী ইতি তৈঃ ব্রাঃ ১। ৪। ২। ৮

[১২] বেদমতে মূলার তারাদ্বয় যমের সারমেয় দ্বয় এবং দেখিতে নৃচক্ষু সদৃশ যথা, যৌতে শ্বানৌ যম রক্ষিতারৌ চতুরক্ষৌ নৃচক্ষসৌ। ইতি

ঋক ১০। ১৪। ১১

[১৩] বিচৃতৌ নক্ষত্রৌ পিতরৌ দেবতা আষাঢ়া নক্ষত্রং আপো দেবতা, ইতি। তৈঃ সং ৪। ৪। ১০। ২।

[১৪] বৈদিক কালে নক্ষত্রগণের তারা সংখ্যা অধিক ছিল না, মূলা নক্ষত্রের তারা সংখ্যা দুইটী মাত্র ছিল।

প্রাচীন ইরানে এই নক্ষত্রের নাম বনস্ত ছিল। এবং ইহার দেবতা নারগল। (নরক রাজ)।

বনস্ত' নক্ষত্র হইতে ইরানে ছায়া-পথ বনস্ত নামে অভিহিত ছিল। [১৫]

পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র।

শ্রাবণ ও পঞ্চজন তারা সংযোজিত করিয়া ঈশান কোণাভিমুখে রেখা টানিলে পঞ্চজন তারা হইতে ১০ হাত ঈশান কোণে একটী ৩য় শ্রেণীর শুভ্র বর্ণ তারা দৃষ্টিগোচর হইবে, এই তারার নাম তুলসী এবং এই তারা পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্রের যোগতারা। তুলসী তারার ২।০ হাত পশ্চিমে ৩য় শ্রেণীর [illegible] একটী তারা দেখিবে। ঐ তারার নাম বিভীষণ। তুলসীর ৩ হাত দক্ষিণে ২য় শ্রেণীর একটী তারা ও বিভীষণের ৬ হাত অগ্নিকোণে ৩য় শ্রেণীর আর একটী তার এই তারা চতুষ্টয় ইষ্টকাকৃতি এই জন্য ইহার নাম আষাঢ় নক্ষত্র [১৬] কিন্তু পৌরাণিক জ্যোতিষিকগণ এই নক্ষত্রকে সূর্পাকৃতি বলেন।

ধনুঃ রাশিস্থ।

উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র।

পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রের পূঃ উঃ দিকে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র। এই নক্ষত্র ৪ তারায় গঠিত। বিভীষণ ও তুলসী তারাদ্বয় সংযোজিত করিয়া ঐ যোগ রেখা পূর্ব্বাভিমুখে প্রসারিত করিলে, তুলসী তারা হইতে ৬ হাত পূর্ব্বে পূর্ণিমা তারা। তারাটী ২য় শ্রেণীর ও শুভ্রবর্ণ। তারা চতুষ্টয়ের অপর তারাত্রয় মধ্যে একটী তারা পূর্ণিমার ১।। হাত পশ্চিমে, অপর ২টী ১হাত পূঃ দঃ। তারা চতুষ্টয় ইষ্টকাকৃতি বলিয়া আষাঢ় নাম পাইয়াছে। কিন্তু পৌরাণিক জ্যোতিষিকগণ আষাঢ় নক্ষত্রের রূপ সূর্পাকৃতি বলেন।

ধনুঃ রাশি।

মূলা পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া এই নক্ষত্র ত্রয়ে ধনুঃরাশি গঠিত। মূলা ও পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রদ্বয়ে অশ্বারোহী পুরুষ, এবং উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে ধনু গঠিত। কেহ ২ বলেন পুরুষের জঙ্ঘা দেশ অশ্বাকৃতি। [১৭]

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

আমাদিগের ধর্ম্মের মূল কি?

বিংশ শতাব্দীর এই উন্নত সভ্যতার দিনে, বঙ্গীয়-সমাজের এই সুপরিমার্জ্জিত-পাঠক-মণ্ডলী মধ্যে, এই বিজ্ঞান-প্রসাদ লব্ধ অণুবাদ, জড়বাদ, জীববাদ, হিতবাদ প্রভৃতি বহুবাদের দিনে, যদৃচ্ছাবাদ বলে যাহা বহু দিন হইল, অজ্ঞানাচ্ছন্ন-কুসংস্কার বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই পুরাতন কথার নূতন অবতারণা দেখিয়া শিক্ষিত সমাজে হয়ত কেহ উপহাস করিতে পারেন। এ স্থলে আত্মপক্ষ সমর্থনে বো[illegible] হয় এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হয়, আমর[illegible] আর্য্য-সন্তান, দেবকল্প মনিষী পূর্ব্ব পুরুষগণ কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া যে ধর্ম্মমত মানব[illegible] স্মৃতির অতীত-কাল হইতে চলি[illegible] আসিতেছে, বিধর্ম্মীদিগের বিষমবিদ্বেষব[illegible]

[১৫] শুক ও সারণ তারার মধ্যে শুক-তারা ও যোগ তারা বলিয়া গণ্য ছিল।

[১৬] আষাঢ় — ইষ্টক। ইতি। [illegible] শব্দ পথ [illegible]

[১৭) ধনুঃ তুরঙ্গ [illegible]

প্রয়োগেও, একই মাতৃস্তন্যে পোষিত সনাতন ধর্ম্মদ্রোহী ভ্রাতৃদিগের অস্বাভাবিক আক্রমণে মুখে কেবল মাত্র "আর্য্য" নাম স্বীকার পূর্ব্বক কার্য্যতঃ আমাদিগের অন্তঃসার শূন্য সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবহারে জাতীয় ও ব্যক্তিগত, নৈতিক ও সাংসারিক-অবস্থা, দেশ, কালাদিও বিশেষ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাহার লোপ সাধনে খড়্গহস্তে দণ্ডায়মান হইলেও আজও যাহা অপ্রতিহত প্রভাবে অনুবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে; এমন কি, বিপক্ষ পক্ষ যতই কেন প্রবল হউক না, দূরবর্ত্তী ঐতিহাসিক কালেও যাহার উচ্ছেদ সাধন সংঘটিত হইবে না বলিয়া এখনও আমাদিগের বিশ্বাস, তাহা কেবল ভ্রম-প্রমাদ পরিপূর্ণ, এধারণা আমাদিগের নাই। সুতরাং নিতান্ত তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়াই বহুবার খণ্ডন সমর্থনের পরও এই পুরাতন প্রশ্নের অবতারণা 'আমাদিগের' ধর্ম্মের মূল্য কি?

আমরা অল্প শক্তিবিশিষ্টমানব। জীবনের প্রায় সমস্ত কার্য্যেই আমরা পরের মুখাপেক্ষী। পরের সাহায্য ব্যতিরেকে আমাদিগের জীবনের একদণ্ড কালও অতিবাহিত হওয়া অসম্ভব। এ সাহায্য আমরা দুই কারণে গ্রহণ করি। প্রথমতঃ, আমরা নিজের সুবিধার জন্য অপরের সাহায্য প্রার্থী হই। হয়ত, কোন একটা কাজ আমি নিজে করিতে পারিতাম, কিন্তু আপনাকে তজ্জনিত ক্লেশ বা পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য অপর কাহাকেও দিয়া সেই কাজটা করাইয়া লইলাম। দ্বিতীয়তঃ আমরা অনন্যোপায় হইয়াই [illegible] অপরের শরণাপন্ন হই। একটা সাধারণ দৃষ্টান্তেই বিশেষ বুঝিতে পারা যাইবে, মনে করুন, কোন একটা কূট গাণিতিক প্রশ্নের বিশেষ চেষ্টাতেও সমাধান হইতেছে না, তখন অগত্যা বিনীতমস্তকে একজন বিজ্ঞতর-গণিতবিদের আশ্রয় লওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই; নচেৎ তাহা অপরিজ্ঞাতই থাকিয়া যায়। সাংসারিক কার্য্য প্রতিক্ষণেই আমাদিগকে পরের সাহায্যের প্রতীক্ষায় মুখ তুলিয়া থাকিতে হয়, অন্তর্জগতের জটিল-প্রশ্ন সমূহের সমাধানের আশায়ও আমাদিগকে সেইরূপ সর্ব্বদা মহাজনদিগের উপদেশ বাক্যের জন্য উন্মুখ থাকিতে হয়। কিন্তু ধর্ম্মতত্ত্বের মুহুর্মুহু উদীয়মান-সংশয়সমূহ নিরাসের উপযোগী সিদ্ধান্ত সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সুলভ নহে। বিশেষতঃ মানব মাত্রেই অল্প বিস্তর ভ্রমাকুল; তাই মঙ্গল নিদান করুণাময় পরমেশ্বর স্থান, কাল, বা অবস্থাভেদে তাঁহারই আজ্ঞানুবর্ত্তী বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের জন্য, সেই ২ সম্প্রদায়-প্রচলিত ধর্ম্ম-তত্ত্বের-কূট সংশয়সমূহের মীমাংসা করিয়া ধর্ম্ম জগতের নিয়ামক রূপে,—নিরপেক্ষ ভাবে স্বয়ং বা কোন মনস্বী মহাত্মার হৃদয়মন্দিরে অধিষ্ঠিত হইয়া, পৃথক্ ২ সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক্ ২ ধর্ম্ম গ্রন্থ-প্রচার করিয়াছেন। তাই ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া খৃষ্টীয়ের পবিত্র বাইবেলের প্রতি এত আদর, ত্রিপেটক বৌদ্ধের জীবন সর্ব্বস্ব, জেন্দ আবেস্তা পার্শীর প্রাণ-প্রিয় বস্তু, মুসলমানদিগের কোরাণ-শরিফ প্রাণাধিক প্রিয়তর। ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীরও সুতরাং এই জাতীয় একটা কিছু আছে। কাহারও 'আপত্তি' থাকিলেও,

সত্যের অনুরোধে অগত্যা আমাদিগের বলিতে হইবে—শ্রুতি ও স্মৃতি। অন্ততঃ এক বেদ বলিলেই আর অধিক কিছু বলিতে হয় না। কোন ২ উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মণ যুবকেরও 'শ্রুতি কোরাণের ন্যায় একখানি গ্রন্থ বিশেষ, ও স্মৃতি কেবল অশৌচ-প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা মাত্র। আর পুরাণাদি জনব্যাপিশান-লিখিত পিলগ্রিমস্ সংপ্রগ্রেস্ জাতীয় কতিপয় ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আখ্যায়িকা মূলক পুস্তক মাত্র, এই অপূর্ব্ব ধারণা পরিলক্ষিত হয়। অনেক সময়ে কেহ ২ উদ্ধতভাবে এই মতেরই পোষকতা করিতে অণুমাত্রও লজ্জিত হ'ন না। সুতরাং আজ কালকার সুশিক্ষিত ও সুসভ্য বঙ্গীয় সমাজেরও এই চিরপ্রচলিত শ্রুতি-স্মৃত্যাদির বোধ হয় একটা স্থূল ব্যাখ্যার প্রয়োজন। শ্রুতিশব্দে ঈশ্বর হইতে সাক্ষাৎ শ্রুত যে প্রাপ্ত জ্ঞানরাশি, তাহাই অভিহিত। কেহ ২ বলেন, ত্রিকালদর্শী দেবকল্প ঋষিশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্যাদিতে ঈশ্বর অধিষ্ঠিত হইয়া যে সমস্ত উপদেশ প্রচার করিয়াছেন, তাহাও শ্রুতি পদবাচ্য। শ্রুতি ও বেদ একার্থবোধক শব্দ। দর্শন শাস্ত্রাদির প্রকরণ প্রয়োগগত পরস্পর কিঞ্চিৎ বিসংবাদ থাকিলেও 'শ্রুতি বা বেদ অনন্তকাল ব্যাপক ও অপৌরুষেয়' ইহাই চির প্রসিদ্ধমত। সাম, শুক্ল ও কৃষ্ণযজুঃ, ঋক ও অথর্ব্বরূপ মন্ত্র সংহিতা চতুষ্টয় ও তাহদিগের আনুষঙ্গিক-ব্রাহ্মণ আরণ্যক-উপনিষদ্ সমস্তই সাধারণতঃ শ্রুতি নামে নির্দ্দিষ্ট। স্ত্রী শূদ্রাদির শ্রুতি উপদেশ গ্রহণের অধিকার না থাকায় ও কোন ২ গৌণ অর্থের সাধারণ লোক বুদ্ধিতে ধারণা না হওয়ায়, সর্ব্ব-সাধারণের বোধ-সৌকর্য্যার্থে শ্রুতি রহস্যাভিজ্ঞ সর্ব্বপ্রত্যক্ষদর্শী সিদ্ধ-মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক, সার সংগ্রহ পূর্ব্বক বেদার্থের অনুবাদরূপে লোক বা দেশাচার সাপেক্ষ বা সাধারণ লোক বুদ্ধির গ্রাহ্য আখ্যায়িকা মূলক যে সমস্ত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারই সাধারণ নাম স্মৃতি ও পুরাণ। মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ-বিরচিত বিংশ 'ধর্ম্ম সংহিতা ও তাহাদিগের সমন্বয় ও ব্যাখ্যা রূপে রঘুনন্দনাদি-বিরচিত ধর্ম্ম শাস্ত্র; পুরাণ, ইতিহাস, ও কণাদ প্রবর্ত্তিত বৈশেষিক, গৌতম প্রবর্ত্তিত ন্যায়, কপিল প্রবর্ত্তিত সাংখ্য, পতঞ্জলি প্রবর্ত্তিত যোগ, জৈমিনী প্রবর্ত্তিত 'পূর্ব্ব মীমাংসা ও বাদরায়ণ ব্যাস প্রবর্ত্তিত উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত আচার্য্যগণ স্থাপিত এই ছয়টি আস্তিক দর্শন, সাধারণতঃ দর্শন নামেই পরিচিত। দর্শনগুলি যুক্তি বহুল হইলেও তাহাতে বেদের প্রাধান্য স্বীকৃত ও তাহাদের উপকরণও শ্রুতি হইতে সংগৃহীত; সুতরাং বেদমূলক ও ক্রান্তদর্শী ঋষি—প্রণীত বলিয়াই ইহারা শ্রুতি প্রকোষ্ঠে সন্নিবেশিত। বস্তুতঃ মীমাংসা দর্শনদ্বয় শ্রুতিবৎ পূজিত ও আদৃত। শিবোক্ত তন্ত্র সাধন শাস্ত্র। উহা কলিকালে শ্রুতিবৎ প্রামাণ্য ও অগ্রগণ্য।

সাধারণ ভারতবাসীর ধর্ম্ম শাস্ত্র শ্রুতি স্মৃতি হইলে কি হয়, আজ কাল বঙ্গীয় সমাজের যাহারা অগ্রণী, সেই উচ্চশিক্ষিতমণ্ডলী হইতে, হয়ত আপত্তি উঠিবে, 'বাঙ্গলা ভারতীয় অপরাপর প্রদেশ অপেক্ষা অনেক উন্নত ও সভ্যতা লোকের উন্নত

শিখরে সমুত্থিত; সুতরাং সাধারণ ভারত-বাসীর অপেক্ষা বাঙ্গালীর,—অন্ততঃ উচ্চ-শিক্ষিত বাঙ্গালীর কিছু বিশেষত্ব থাকা চাই। এ অবস্থায় অন্য সাধারণ ভারত-বাসীর সহিত একতানে 'আমাদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্র শ্রুতি স্মৃতি' বলিলে, সেই বিশেষত্বের অপলাপ করা হয় বলিয়াই, বোধ হয়, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই সনাতন সংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করণানন্তর মিল, হকস্‌লে কোমৎ প্রভৃতিকে নবীন ধর্ম্ম গুরুরূপে বরণ করিয়া তাঁহাদিগের নব প্রচারিত মত মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তাহারই ঘোষণায় বদ্ধ পরিকর হন। এরূপ নব প্রচারকের সংখ্যা অধিক না হইলেও, তাঁহারাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট ও প্রবেশেচ্ছু-নব্যযুবক দলের নেতা ও মুখপাত্র। শেষোক্তগণ তাহাদিগের নবীন বৈজ্ঞানিক-মতে বিশেষ সারবত্তা উপলব্ধি না করিয়াই, পিতৃপৈতামহিক ধর্ম্মবিশ্বাস অন্তঃসারশূন্য ও কুসংস্কারমূলক জ্ঞানে, তাহারই অযথোচিত সমাজ-শরীরে তুমুল আলোড়ন বিলোড়ন উত্থাপিত করিয়া, সনাতন ধর্ম্মে সাধারণের আস্থা অপনয়নে উদ্যত হন। অথচ স্বপ্রচারিত ভিত্তিহীন মতেও কোনমতে বিশ্বাস উৎপাদনে সমর্থ না হইয়া সমাজ-কলেবরে ভীষণ ধর্ম্মহীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত করেন। তাই আজ মৃত্তিকা খণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন-তৃণগাছির ন্যায় বঙ্গীয়-সমাজ ধর্ম্ম-বিশ্বাসের গুরুত্ব শূন্য অবস্থায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্যমান হইয়া কি দুরবস্থাই না সহ্য করিতেছে। তাই বাঙ্গলায় সমাজ-বন্ধন [illegible] যেরূপ শিথিল, ভারতীয় অপর কোন প্রদেশে সেরূপ কিনা, সন্দেহ। যথেচ্ছাচার বাঙ্গলায় দিন ২ কি পরিমাণে প্রশ্রয় পাইতেছে, তাহা সমাজ-চিন্তাশীল-মাত্রেরই অনুভবসিদ্ধ।

হোটেলে আহারের ন্যায় তৃপ্তি বোধ হয় জগতে আর কোন জাতীয় আহারে নাই বলিয়া এক জাতীয় যুবকের বিশ্বাস। * অপর এক শ্রেণীর, প্রকাশ্য স্থানে বারবনিতার নৃত্যগীত লাস্য বিলাসাদিতে কৌতুক অনুভব ও মাদকাদি সেবন অণুমাত্রও দোষাবহ বলিয়া যেন ধারণা হয় না। এইরূপ নানাপ্রকার উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার ও অত্যাচার পর্য্যবেক্ষণ করিলে বাঙ্গালার সমাজ-বন্ধন কোন কালে সুদৃঢ় ছিল কি না, এইরূপ বিষম-সন্দেহ উপস্থিত হয়। এক ধর্ম্মানুশাসনের শৈথিল্যেই যে এই বিষাদ কালিমাময়সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা চিন্তাশীল মাত্রেরই অনুভব সিদ্ধ। সেই ধর্ম্মানুশাসন ঈশ্বর-প্রণীত ও ঈশ্বর প্রণোদিত ধর্ম্ম-শাস্ত্র হইতে সংকলিত না হইলে, উহা মূলচ্ছিন্ন বৃক্ষের ন্যায় হইয়া কোন মতেই একেবারে অনেকের আশ্রয়রূপে উন্নত-মস্তকে দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না। †।

---

* হিন্দু-হোটেল, হিন্দু-আশ্রম, হিন্দু-নিবাস জাতীয় আহার নিকেতনের সংখ্যা দিন ২ কিরূপ মাত্রায় লাভ বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া সমাজ-চিন্তক মাত্রেই কাতর হইতেছেন। কেহ ২ ইহাদিগের 'হিন্দু' নাম দেখিয়া মুগ্ধ হন, কিন্তু আমাদিগের বিশ্বাস, অনেক স্থলে হিন্দু আবরণের অন্তরালে করাল-মূর্ত্তি স্বেচ্ছাচার লুক্কায়িত।

† বিস্তৃত যুক্তি জিজ্ঞাসুকে অধ্যাপক ফ্লিণ্টের Theism নামক ইংরাজী গ্রন্থ পাঠে অনুরোধ করি।

সুতরাং আমাদিগের ধর্ম্ম রাজ্যের নিয়ন্তা হিক্সলি, কোমৎ, ডারুইন বা অপর কেহ হইতে পারেন না। এ অবস্থায় অনন্তকাল প্রচলিত শ্রুতি স্মৃতি আমাদিগের হৃদয়ের যে স্থান টুকু অধিকার করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহা হইতে কোন্ যুক্তি বলে তাঁহাদিগকে অপসারিত করিব?

শ্রুতি স্মৃতিই আমাদিগের ধর্ম্মের মূল; এ বিষয়ের সর্ব্ব সাধারণের বিশেষ বিসংবাদ না থাকিলেও, কেহ ২ পাশ্চাত্য পণ্ডিত-পুঙ্গবের সহিত সমস্বরে দুই একটি যুবকধুরন্ধর মুখ বিনিসৃত 'বেদ জড়োপাসক কৃষকের গান, স্মৃতি ক্রুরমতি-ব্রাহ্মণগণের স্বার্থপর বিধি নিষেধ মাত্র, এইরূপ শ্রুতি-স্মৃতির লক্ষণ নির্ব্বাচন শ্রুতিগোচর হয়। আর্য্য-দিগের ভাগ্যহীন দেশের ন্যায় তাঁহা-দিগের ধর্ম্মশাস্ত্রও পৌনঃপুনিক আক্রমণের বিষয়ীভূত, মহৎকে নিম্নপদবীতে আনয়ন জন্য এবম্বিধ পিশুন-প্রয়াস, বোধ হয়, চির-প্রচলিত ও সর্ব্বজনীন। এরূপ হেয় নিন্দার প্রতিবাদও নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় হইলেও, ইহা আমাদিগেরই অনুমোদিত সুশিক্ষার অবশ্যম্ভাবী ফল জানিয়া, পরমত চর্ব্বিত চর্ব্বনকারী করুণার্হ যুবকবৃন্দকে দোষ না দিয়া, আমাদিগেরই অদূরদর্শিতায় জন্য ঈদৃশ আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়। আজ যদি বঙ্গদেশে সমাজ-বন্ধন এত শিথিল না হইত, সামাজিক শিক্ষার গুরুত্বে আজ যদি লোকের অণুমাত্রও আস্থা থাকিত, যদি ব্রাহ্মণগণের শাস্ত্রীয় গ্রন্থের আলোচনা ও ধর্ম্ম শিক্ষায় কিছু মাত্র প্রচলন থাকিত, তাহা হইলে, বোধ হয়, আজ বাঙ্গালী জাতিকে ভারতীয় অপরাপর জাতি অপেক্ষা অন্যান্য-বিষয়ে অভ্যুদয়শীল হইলেও, ধর্ম্মরাজ্যে এরূপ মতিশূন্য, নির্জ্জীব অথচ স্বেচ্ছাচারে উচ্ছৃঙ্খল থাকিতে হইত না।

আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের ভিত্তি যদি নিতান্ত শিথিলই হইত, তাহা হইলে জগৎ-সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া এই বিজ্ঞান সাম্রাজ্যের নবযুগেও, সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ভারতবাসী স্বীয় ধর্ম্ম-মতকে এরূপ অক্ষুণ্ণ ও অপ্রতিহত রাখিতে সমর্থ হইতেন না। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়া স্বীয় জনকের বিনাশ সাধনে দৃঢ় ব্রত হওয়ায়, সেই পাপে মাতৃ-ভূমি হইতে চির নির্ব্বাসিত হইয়া, দেশান্তরের আশ্রয় লইয়া এক ভারত-বর্ষ ব্যতীত সমস্ত পূর্ব্ব এসিয়া খণ্ডেই সুবিশাল রাজ্য-বিস্তার করিয়াছে। পুরা-তত্ত্ব সমালোচনা করুন, প্রাচীন জাতির ইতি হাস পাঠ করুন, জগৎ তন্ন ২ করিয়া অনু-সন্ধান করুন, দেখিবেন প্রতিদ্বন্দ্বী নবীন-ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে প্রাচীন ধর্ম্মগুলি ক্ষোভে লজ্জায় কিরূপে বিস্মৃতির সর্ব্বাচ্ছাদক অঞ্চলের অন্তরালে অপসৃত হইয়া অনন্তকালের জন্য তাহরই ক্রোড় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ঐ ভারত-প্রতিবাসী অনাদিসভ্য চীন স্বীয়-প্রাচীন ধর্ম্মমত ত্যাগ করিয়া অভিনব-বৌদ্ধমত গ্রহণ করিয়া তাহারই কেন্দ্র স্থানীয় হইয়াছে। সেই অতি প্রাচীন কালের সুসভ্য মিশর (ইজিপ্ট) পুরাতন প্রকৃতি-পূজা ত্যাগ করিয়া, এক্ষণে মহম্মদীয় ধর্ম্মেই বিশেষ গর্ব্বিত। পারস্য তৈজসোপাসনা পদ-দলিত করিয়া ইস্লাম ধর্ম্মের জন্যই জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। গ্রীস রোমের অভ্যু

স্বর্গ। অন্তর্হিত হইতে না হইতেই, যিশু খৃষ্ট ধর্ম্মের ক্রীড়া ক্ষেত্ররূপে পরিণত হওয়ায় পিথাগোরস্, প্লেটো সিসরো-সম্পূজিত দেব-মণ্ডলী হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া অনন্তকালের জন্য জগতীতল পরিত্যাগ করিয়াছেন; তাঁহাদের মাহাত্ম্য খ্যাপনকারী ধর্ম্ম গ্রন্থ, তদ্দেশবাসী কর্ত্তৃকই ভূতপ্রেতোপাসনামূলক বলিয়া ঘৃণিত ও পদদলিত হইয়াছে, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর এই ভারতবাসী, সেই অনাদিকাল হইতে প্রচলিত ধর্ম্মনীতির অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন, কোনও বিজাতীয় ধাতুও প্রবেশ লাভ করিয়া তাহার বিকৃতি বা উচ্ছেদ সাধন করিতে সমর্থ হয় নাই, যাহা হইয়াছে, তাহাতে অদ্যাপি মূল ভিত্তি টলিত হয় নাই, ঈশ্বরের নিতান্ত প্রকোপ উপস্থিত না হইলে হইবেও না—ইহাই আমাদিগের ঐকান্তিক বিশ্বাস। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় আমরা অনেক সময়ে, খৃষ্ট-ধর্ম্ম-পরায়ণ অধ্যাপক মোক্ষমূলরের আমাদিগের বেদ শাস্ত্রের জীবনব্যাপী তন্ময়ত্ব দর্শনে, জর্ম্মণ-পণ্ডিত শোপেনহরের উপনিষৎ প্রভৃতির প্রতি আলোচিত শ্রদ্ধা অনুভব করিয়া * বিদুষী আনিবেশান্তের, আমাদিগের শাস্ত্রাদির প্রতি ঐকান্তিক আস্থা দর্শনে পুলকিত হইও; আমাদিগের ধর্ম্মের মাহাত্ম্য স্মরণে তাৎকালিক বিমল-চিত্ত-প্রসাদ লাভ করি। পরক্ষণেই শুভ্র গায়ত্রী মন্ত্রোচ্চারণে অনুরক্ত ব্রাহ্মণকুমারের মুখ অনেক সময়ে শুষ্ক হইতে দেখিয়া, আমাদিগের ধর্ম্ম ও শাস্ত্র বিষয়ক অজ্ঞতা উপলব্ধি করিয়া, বিষাদ-সাগরে নিমজ্জমান হইয়াও, তাহার প্রতীকারের চেষ্টায় জীবনীশক্তির অণুমাত্রও চালনা করিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি হয় না—আমরা এতই নিস্তেজ ও গতি হীন! অথচ আমরা দর্প করিতে ত্রুটি করি না। 'আমরা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সুসভ্য জাতি।' যাহাহউক, আমাদের ধর্ম্মের মূল ভিত্তি শ্রুতি-স্মৃতির আদর ইদানীং দিন ২ একটু বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিতেছি; ইহা যদি নির্ব্বাণ কালের প্রদীপ সন্দীপ্তি না হয়, তবে অবশ্য পুনর্জীবনের আশা আছে।

শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
(বারাণসী)

* Schopenhauer writes, 'In the whole world, there is no study so benificial and so elevating as that of the Upanishads. It has been the solace of my life, it will be the solace of my death.

Vide Max mullers India, what can it teach us, Lec VII.

আহার।*

—•:o:•—

(সূচনা।)

ভারতবর্ষের পুণ্যপুঞ্জময় পবিত্র-ধর্ম্মানুশীলন-যুগে, কুসুমিত-তরুরাজি শোভিত, হোম-ধূমগন্ধ-মোহিত, সামগানমুখরিত, শ্যামল-ধর্ম্ম-কুঞ্জে তপস্তপোজ্জ্বলকান্তি স্বধর্ম্ম-নিরত ঋষিগণ যখন তদগত-চিত্তে

* পঞ্জিকাদি ভিন্ন ভিন্ন তিথিতে যে সকল সামগ্রী ভোজন করা নিষেধ, শাস্ত্রীয় যুক্তি তর্ক প্রয়োগে তাহারই হেতু নির্দ্ধারণ করিয়া একটী প্রবন্ধ লিখিবার কথা গত পৌষ

তাঁহাদিগের অন্তরের দেবতার চরণ-মূলে হৃদয়-কুসুম-গ্রথিত ভক্তিপুষ্পহার সমর্পণ করিতেন, তখন তাঁহাদিগের দিব্যজ্ঞানো-জ্জ্বল বিমল-বদনমণ্ডল হইতে এক অপূর্ব্ব পুণ্যপ্রভা বিকীর্ণ হইয়া যেন ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত করিয়া তুলিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, শাস্ত্রতত্ত্ব প্রভৃতি সকল বিষয়ের তত্ত্বালোচনা করিয়া সেই সকল তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণ তাঁহাদিগের সংসার চিন্তাশূন্য অনাবিল ধর্ম্ম-জীবন আরও পবিত্র করিয়াছেন এবং সেকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত ভারতের হৃদয়ে এমন কতক-গুলি বদ্ধমূল সংস্কার রোপিত করিয়া গিয়া-ছেন যে, কোন দিনই তাহার আর উচ্ছেদ হইবার সম্ভাবনা নাই। যুগ যুগান্তর ধরিয়া বিপ্লবের পর বিপ্লব আসিয়া ভারত-বর্ষকে কতবার আঘাত করিয়াগিয়াছে, সেই আঘাতে কত ধর্ম্মের উন্নত সুদৃঢ় স্তম্ভ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই সনাতন আর্য্য-ধর্ম্মের বিলুপ্তির কথা এখনও স্বপ্নের অগোচর—তাহার বিনাশ হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না।

সেই মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারিত—সেই যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা—সেই যম, আপ-

---

মাসের হিতবাদী পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। এই বিষয়ের শ্রেষ্ঠ-প্রবন্ধ-লেখককে কলিকাতার কালীঘাটস্থিত সভা-সমাজ হইতে মহিমানাথ পদক পুরস্কার দিবার কথা হয়। মহিমানাথ পদক প্রাপ্ত সেই প্রবন্ধ হিন্দু-পত্রিকায় প্রকাশের জন্য আমি আজ মহাশয়ের নিকট পাঠাইতেছি। প্রবন্ধটী অতিশয় দীর্ঘ। তাই তাহার "সূচনা" ও "প্রথমাধ্যায়" আপনার নিকট পাঠাইলাম। প্রবন্ধটী যেরূপভাবে বিভক্ত হইয়াছে তাহা হইতেই বোধ হয় বুঝিতে পারিবেন যে, ইহা খুবই দীর্ঘ। যাহাহউক, আর অধিক কি লিখিব। অনুগ্রহ করিয়া পত্রোত্তরে বাধিত করিবেন। নিবেদন ইতি।

আমি যে উপায়ে বর্ত্তমান প্রবন্ধটী ভাগ করিয়াছি তাহা নিম্নে লিখিতেছি।

১। সূচনা।

প্রথমাধ্যায়।

১। তিথি প্রকরণ।
২। তিথিগত ধাতু বিকার।
৩। প্রতিপদাদি তিথিতে নিষিদ্ধ-দ্রব্য সমূহের তালিকা।

দ্বিতীয়াধ্যায়।

১। হিন্দু জাতির খাদ্যাখাদ্য।
২। [illegible] ও [illegible]।
৩। রসোৎপত্তি।
৪। কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি নিষিদ্ধ দ্রব্যাদির গুণ।

তৃতীয়াধ্যায়।

১। খাদ্যাখাদ্যের সাধারণ বিভাগ।
২। নরবিভাগ ও তৎসংক্রান্ত খাদ্য বিভাগ।

চতুর্থাধ্যায়।

তালিকা ও তুলনা।

(অর্থাৎ সাধারণ সমুদয় খাদ্য সামগ্রীর গুণাগুণ এবং প্রতিপদাদি তিথিতে কয়েকটী নিষিদ্ধ খাদ্য সামগ্রীর গুণাগুণের সহিত তাহাদিগের তুলনা)

পঞ্চমাধ্যায়।

১। কুষ্মাণ্ডাদি সম্বন্ধে বিশেষ নিয়মে বিশদ যুক্তি।

ষষ্ঠাধ্যায়।

১। শাস্ত্রকারদিগের নিষেধ অন্ধ বাতুলতা নহে।
২। নিষেধ প্রতিপালনার্থ শপথ বাক্যের আবশ্যকতা কি?

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ।

ভৃগু, সম্বর্ত, কাত্যায়ন—সেই বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ—সেই লিখিত, দক্ষ গৌতম, সেই শাতাতপ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ যাহা ভারত-বক্ষে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—যত দিন ভারত থাকিবে, ততদিন তাহার অস্তিত্ব ও জীবন থাকিবে—যতদিন ভারতবাসী আছে, তত দিন তাহার পূজা হইবে। শত সহস্র বৌদ্ধ—বিপ্লব, লক্ষ লক্ষ মুসলমান-বিপ্লব, কোটী কোটী হিন্দু-বিদ্বেষী ধর্ম্মত্যাগী কালাপাহাড়—কিছুতেই কিছু হইবে না। ভারতবাসীর অধীত অধ্যয়নীয় সেই সকল পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ—সেই মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতির স্মৃতি—ন্যায়, বেদান্ত, সাংখ্য প্রভৃতি দর্শন—সেই কল্পসূত্র, আরণ্যক-উপনিষৎ প্রভৃতি ভারত-হৃদয়ের শোণিততুল্য অমূল্য গ্রন্থরাশির কোন দিনই বিনাশ নাই। গ্রন্থ বিশেষের শিথিল গ্রন্থি হয়ত ছিঁড়িয়া যাইবে—কিন্তু ভারতের রক্তের সহিত, মজ্জার সহিত, মাংসের সহিত, সেই সকল গ্রন্থের সম্বন্ধ, তাই তাহাদিগের বিনাশ নাই। গ্রন্থের মর্ম্ম, ভারতের মর্ম্মে মর্ম্মে গ্রথিত হইয়াছে—গ্রথিতই থাকিবে। ধর্ম্মের বন্ধন—ভক্তির বন্ধন—স্নেহের বন্ধন কি কখনও ছিঁড়িয়া যায়?

পূর্ব্বে যে সকল মহাপুরুষদিগের নামোল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারাই সেই পূর্ব্বতন ভারতের পুরাতন সমাজের নেতা, শিক্ষক, গুরু—আদর্শ। তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত-বিধি নিয়মেই তখনকার সমাজ চলিত—[illegible] চলিত—পৃথিবী শাসিতা হইত। অধ্যয়ন করিবার অধিকার তখন সকলের ছিল না। তাঁহারাই শাস্ত্র ভাঙ্গিতেন, তাঁহারাই আবার তাহা গড়িতেন—তাঁহারাই বিধিব্যবস্থার স্রষ্টা, তাঁহারাই তাহার পরিবর্ত্তক, আবার তাঁহারাই তাহার পরিমার্জ্জক ও সংশোধক। তখনকার জনসাধারণ তাঁহাদিগকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত—ধর্ম্মের মত শ্রদ্ধা ও ভয় করিত—বেদবাক্যের মত তাঁহাদিগের কথায় প্রাণপাত করিয়াও বিশ্বাস করিত—রাজাজ্ঞার ন্যায়, নির্ম্মল-হৃদয়ের তপ্ত-শোণিত ঢালিয়াও তাঁহাদিগের অনুশাসন প্রতিপালন করিত। হেতুবাদ জিজ্ঞাসা করিবার সাহস, ইচ্ছা, বা প্রয়োজন, তখন কাহারও ছিল না—যে যাহার আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সম্পাদন করিত। তাহাই তাঁহাদিগের পবিত্র ধর্ম্ম ছিল। তাই—শাস্ত্রকারগণও কোন বিধির কোন হেতু প্রদর্শন করিয়া যান নাই। তখনকার যুগ বিশ্বাসের যুগ ছিল—এখন যুক্তির যুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

আমাদিগের শাস্ত্রে যে সকল বিধি নিয়ম লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, সে সমুদয়ের ভিতর যে কোনটীর মূলেই যুক্তি নাই, তাহা নহে। তবে আবার ইহাও সত্য যে, অনেক নিয়মের মূলে যুক্তির অভাব আছে বলিয়া সচরাচর বোধ হয়। এই সকল বিধি ব্যবস্থা প্রধানতঃ দ্বিজবর্গের জন্যই প্রচলিত হইয়াছিল। দ্বিজেতর জাতি আপন আপন অবস্থা ভেদে তাহা গ্রহণ এবং প্রতিপালন করিত।

আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা আধ্যাত্মিকতায় পৃথিবীতে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া

গিয়াছেন। তাঁহারা সকল কার্য্যই সেই চক্ষে দেখিতেন! প্রাতরুত্থান হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় প্রাতরুত্থান পর্য্যন্ত কোন কার্য্যই তাঁহাদিগের সর্ব্বদর্শী চক্ষুর তীক্ষ্ণ পরীক্ষার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে নাই। মানবজীবনের সকল কার্য্যকেই তাঁহারা ধর্ম্মানুষ্ঠানের একটি অংশের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বাবু একবার বলিয়াছিলেন :—

"আহার শরীর ও আত্মা উভয়ের মঙ্গলের জন্য। অতএব আহার একটি ধর্ম্মানুষ্ঠান মনে করিয়া আহার করিবে। আহারকে একটি ধ্যানস্বরূপ করিয়া তুলিবে, তবেই আহার করিয়া দেহ ও আত্মার মঙ্গল হইবে। আহার অতি গুরুতর, অতি পবিত্র কার্য্য। এই জন্য শাস্ত্রে নির্জ্জনে মৌনী হইয়া নিবিষ্টচিত্তে প্রফুল্লান্তঃকরণে আহার করিবার ব্যবস্থা আছে।" * আমরা সেই সকল পবিত্রমনা ঋষিদিগের গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝি না বলিয়া তাঁহাদিগের কৃত-কার্য্যের অপলাপ করিবার অধিকার আমাদিগের নাই, আমরা মূর্খ বলিয়া তাঁহাদিগের সেই নিষ্কলঙ্ক গৌরবরবির শাস্ত্রোজ্জ্বল-কিরণ-রাশি কলঙ্কের কালিমা-চিহ্নিত অন্ধকার-আবরণে আচ্ছাদিত করিবার অন্যায় অধিকার আমাদিগের নাই—আমরা কিছু বুঝি না বলিয়া তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করিবার গুরুতর ধৃষ্টতা অমার্জ্জনীয়!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শাস্ত্রকারগণ তাঁহাদিগের কৃত কোন শাস্ত্রেই কোন একটি বিধিনিয়মেরও হেতুবাদ দেন নাই। ইহারও যে কোন উদ্দেশ্য নাই তাহা নহে। যে সকল লোক তাঁহাদিগের এই সকল বিধি নিয়ম মানিয়া চলিত, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই তাহার হেতুবাদ জানিলেও তাহা সম্যক্‌রূপে ধারণা করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। আরও একটি কথা আছে—অনেক সময় হেতু প্রদান করিলে বিজ্ঞাপিত তথ্যের মূল্য কমিয়া যায়। "লোকে মনে করে, "এ-ই—!" , ইহারই জন্য আবার "এই" করিতে হইবে, ইহা আমি বিশ্বাস করি না।' এতদ্ভিন্ন, হেতুবাদ না দিলেও তখন চলিত। যে উদ্দেশ্যে যে বিধি ব্যবস্থাপিত হইত, সেই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য হেতুবাদের আবশ্যক হইত না। বিনা কারণ প্রদর্শনেই লোকে তাহা মানিয়া লইত।

একজনকে লইয়া সমাজ নহে, দশজনের সমষ্টিই সমাজ। "সমাজ মানব জীবনের দুশ্ছেদ্য, অখণ্ডনীয়, অপরিহার্য্য, অ-শ্রুত-কর্ত্তব্য নিয়ম-পত্র। কোন কোন দার্শনিক বলেন 'মানুষ-জন্মাবধিই স্বাধীন'—অর্থাৎ জন্মাবধিই সমাজের রীতি নীতি, বিধিব্যবস্থা, ব্যবহার এবং শাসনের অন্তর্ভূত নহে। একটু বিবেচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, ইহা প্রকৃত সত্য নহে—কেবল তাহাদিগের উচ্চমস্তিষ্কের স্বেচ্ছাকৃত কল্পিত মত মাত্র।............জন্মের পর হইতেই যদি আমরা একটি শিশুর চরিত্র আলোচনা করিতে আরম্ভ করি, তাহাহইলে দেখিতে পাইব যে, সেই চরিত্রের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যেক চিত্র—এমন কি, প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষু

* সাহিত্য—অগ্রহায়ণ ১২৯৮।

(বন্দু) পর্য্যন্ত কোন জাতীয়, স্থানীয় এবং পারিবারিক ঘটনাবলীর অমানুষিকী ক্ষমতার ছায়া মাত্র। মানুষ, সমাজের অনুলিপি—প্রতিবিম্ব—নিখুঁৎ অবিকৃত চিত্র।.........
.........পাঁচ জনে মিলিয়া একটি ব্যবসা আরম্ভ করিলে, সেই ব্যবসায়ে তাহাদের প্রত্যেকেরই যেমন এক একটি অংশ থাকে—তাঁহাদিগের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত চেষ্টা যত্ন ও উদ্যমে যেমন সেই আরব্ধ কার্য্য দিন দিন উন্নতি লাভ করে—মনুষ্য বিশেষ বা জাতি বিশেষের স্বেচ্ছাকৃত সমাজবন্ধনেও তাহাদিগের তেমনি এক একটি অংশ আছে। সেই সমাজের শিক্ষা, দীক্ষা, উন্নতি, অবনতি, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়েই তাহাদিগের অংশ লক্ষিত হয়। এই অংশিত্ব যে শুধু জীবিত-মনুষ্য-সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিভক্ত, তাহা নহে। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই তিন কালকে সমাজ এক সূত্রায় গ্রথিত করিয়া রাখে। প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজের এক একটি নিয়ম—জনসাধারণের সেই অখণ্ডনীয় বন্ধনের অনুবর্ত্তী—বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ ভোগ, বর্ত্তমান মানবমণ্ডলী এবং এখনও যাহারা ভবিষ্যতের অন্ধকার-যবনিকার অন্তরালে লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহাদিগের প্রত্যেকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইতিহাসের যোগ-সূত্র। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন সমষ্টি তাহাদিগের নৈতিক ও প্রাকৃতিক জীবনের শৃঙ্খলা-শৃঙ্খল। সমাজ অতীতের জীবন্ত স্মরণ-চিহ্ন—বর্ত্তমানের সুদৃঢ় শৃঙ্খল—ভবিষ্যতের সত্যপথ-প্রদর্শক, ধ্রুবতারা। যত [illegible] দিন, যতদিন সমাজ—যতদিন ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, ততদিন সমাজের আয়ু এবং বিস্তৃতি।" * এই সমাজ—এই সমাজ-বন্ধন। সেই সমাজের যাঁহারা নেতা ছিলেন, সমাজের মঙ্গলের জন্য তাঁহারা যে সকল বিধি নিয়ম ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা তাৎকালিক সমাজ ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল না—দিতে পারেও নাই, কারণ সকলেই জানিত যে, যাঁহাদিগের নেতৃত্বের অধীনে তাহারা সৈনিক—তাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী—তত্ত্বান্বেষী—সাধুপুরুষ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এক জনকে লইয়া সমাজ নহে, দশজনের সমষ্টিই সমাজ। সেই সমাজান্তর্গত প্রত্যেকেই যে বিদ্বান্ হইবে, এরূপ সিদ্ধান্ত করা কোন ক্রমেই উচিত নহে—এবং সে সিদ্ধান্ত ও ভ্রমাত্মক। শাস্ত্রকারগণ যে সকল বিধি প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাও আবার একজনের জন্য নহে—তাঁহাদিগের নেতৃত্বাধীন সমাজের মঙ্গলের জন্য—সমাজের প্রত্যেকের জন্য। কারণ তাঁহাদিগের প্রত্যেকের দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিতেই সমাজের উন্নতি। কিন্তু এরূপ স্থলে, যখন সমাজের সকলেই সমান শিক্ষিত নহে—যখন কতক শিক্ষিত, কতক অর্দ্ধশিক্ষিত, আর কতক বা একেবারেই নিরক্ষর, তখন, কোন একটি বিধি নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিবার সময় সেই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে যদি যুক্তি তর্ক দিয়া প্রস্তাবিত বিধির উপকারিতা সম্বন্ধে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতে হয়, তাহা হইলে বিধি ব্যবস্থা অসম্ভব হইয়া উঠে। দৃষ্টান্ত দিবার

* নব্যভারত। মাসিক "মানুষ ও সমাজ" [illegible]

জন্ত অধিক দূর যাইতে হইবে না। যখন কোন একটি রাজানুশাসন লিপিবদ্ধ করা হয়, তখন কি ভারতবাসী সকলকেই আহ্বান করিয়া যুক্তির সাহায্যে, তর্কের সাহায্যে সেই প্রস্তাবিত রাজ—বিধির উপকারিতা বুঝাইয়া দিয়া তাহা পালন করিবার আদেশ দেওয়া হয়? তাহা করিতে হইলে রাজ-বিধি প্রণয়নে অসম্ভব হইত। দেশের যাঁহারা নেতা, কেবল তাঁহারাই ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গল এবং ফলাফল বিবেচনা করিয়া থাকেন। তাহার পর তাহা বিধিবদ্ধ হয়—আর সেই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধি-অনুসারে সমগ্র-ভারতবাসী শাসিত হইয়া থাকে। তাই বলিয়া কি সে রাজবিধির মূলে কোন যুক্তি বা হেতু নাই? যুক্তি আছে। তবে সকলের জন্ত সে সকল হেতুবাদ আবশ্যক করে না। শুধু এই টুকু জানা থাকিলেই হইল যে, দেশের যাঁহারা মুখপাত্র—সকলের যাঁহারা নেতা, তাঁহারাই যুক্তি তর্ক দিয়া সেই বিধি-বিশেষের উপকারিতা বা অনুপকারিতা সম্বন্ধে তাঁহাদিগের বুদ্ধি, ক্ষমতা ও শক্তির অনুরূপ বিচার করিয়াই উক্ত বিধির প্রচলন করিয়াছেন। সাধারণ সমাজের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। সমাজ ইহা অপেক্ষা আর অধিক আশা করে না—আশা করিতেও পারে না।

"এখন অনেকে বলেন, আমাদের সমাজ কুসংস্কার ও যুক্তিবিহীন অন্ধবিশ্বাস পরি-পূর্ণ—আমাদের সমাজ ভ্রমান্ধ। তাঁহাদিগের কথা কতদূর সত্য, তাহা বলিতে পারি না। কুসংস্কার কিছু থাকিতে পারে—সকল দেশের সকল সমাজেই তাহা আছে। কিন্তু সেই জন্ত সমাজকে পদদলিত করা—অতলজলে নিক্ষেপ করা—আপনাকে সেই সমাজের সুপ্রতিষ্ঠিত সুদৃঢ় শৃঙ্খল—বন্ধনের বহির্ভূত মনে করা জ্ঞানীর কার্য্য নহে—মূর্খের কার্য্য। অন্ধ বিশ্বাস দুর্ব্বল-হৃদয়ের ধর্ম্ম। কুসংস্কার যদি কিছু থাকে, তবে, তাহা থাকিতে দাও। যদি সম্ভব হয়, ধীরে ধীরে তাহা দূর কর। তাই বলিয়া একেবারে গোড়া কাটিয়া ফেলিও না—অংশ বিশেষ যদি দূষিত হইয়া থাকে, তবে তাহারই নিরাকরণের চেষ্টা দেখ—সম্পূর্ণ ধ্বংশ করিও না। তাহা করিতে গেলে মহাবিপ্লব উপস্থিত হইবে। ভগ্ন প্রসাদ সংস্করণের মত, ভালটুকু যেমন আছে, তেমনি রাখিয়া তাহারই সহিত বেশ মিলাইয়া মিশাইয়া মন্দের স্থানে ভাল আনিয়া বসাও। আমাদের সমাজ কত পুরাতন কত ঝড় তুফান ইহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। যাহা পুরাতন—যাহা কালের তীক্ষ্ণ-অঙ্কুশাঘাত সহিয়াও টিকিয়া আছে—অসময়ের অগ্নি-পরীক্ষায় আজ পর্য্যন্ত কা[illegible] কার্য্যই হইয়াছে—তাহার ভিতর কিছু কিছু সত্য অবশ্যই আছে।............ক[illegible] অতীত বংশ—কত অতীত সম্প্রদায়ে[র] বিচক্ষণতার ফল বর্ত্তমান সমাজ। য[দি] তাহাদিগের উপর ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকে, ত[বে] তোমার সমাজকে ভক্তি কর—নষ্ট ক[রিও] না। উন্নত কর—সে তোমাদেরই উন্নতি। যদি তোমরা এখন পূর্ব্বপুরুষ-প্রতি[ষ্ঠিত] বিধি নিয়মগুলি অবজ্ঞা করিয়া, তাঁহাদিগ[কে] অপমান করিতে কুণ্ঠিত না হও—[ত] তোমাদিগের পরে যাহারা আসিবে, তাহারা যে আবার তোমাদিগকে "অন্ধ [illegible]

বলিয়া তোমাদেরই মস্তকে পদাঘাত করিবে। তাই সমাজকে সম্মান করিয়া তোমার অতীত পুরুষকে সম্মান কর।"*

ধর্ম্মের বন্ধন ছুশ্ছেদ্য বলিয়া, ধর্ম্মের দোহাই ছুর্লঙ্ঘ্য বলিয়া, আর্য্য তপোধনগণ আমাদিগের প্রাত্যাহিক জীবনেরও সকল কার্য্য ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে আমাদিগের দেশের রমণীগণই অধিক ধর্ম্মপরায়ণ—পুরুষ জাতি আপনার অভাব-অভিযোগ-ব্যথিত কার্য্য-ক্লান্ত জীবনের কুটিল কুহেলিকা লইয়াই ব্যস্ত। অবসর সময়েও তাহার চিন্তা সহস্র পথে ধাবিতা। কিন্তু এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, যখন দেবচরণবিনিঃসৃতা সন্ধ্যার শান্ত-অন্ধকার নিঃশব্দ মানবচরণ-সঞ্চারে স্বর্গের সুবর্ণ-দ্বার অতিক্রম করিয়া পল্লীগ্রামে সহস্রকোলাহল চঞ্চল সজীব গৃহ-প্রাঙ্গনে ধীরে ধীরে নামিয়া আসে, তখন শুদ্ধবেশপরিহিতা গৃহস্থ-কুলবধূগণ প্রজ্বলিত মৃন্ময়-প্রদীপ হস্তে নুপুরশিঞ্জিত কোমল-চরণে সমান ভক্তির সহিত তুলসী বেদীকার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, নারায়ণজ্ঞানে তুলসী-চরণ প্রান্তে প্রদীপটী রাখিয়া ভক্তিপূর্ণ অগাধ বিশ্বাসে গললগ্নবাসে প্রণাম করিয়া ধন্যা হয়। এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, বয়োজ্যেষ্ঠা বঙ্গ হিন্দু-ললনাগণ অবগাহন-স্নানান্তে, আবক্ষনিমজ্জিতা হইয়া আর্দ্র বসনা-ঞ্চলে ভাসমান কলসী আবৃত করিয়া নিমিলিত নেত্রে, মুক্ত-বেশে, সিক্ত-কেশে যুক্তকরে স্তব পাঠ করিয়া থাকেন। এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, অসহনীয় শারীরিক কষ্ট সহ্য করিয়াও হিন্দুরমণীগণ সুবিধা ও সুযোগ পাইলেই সুদূরতীর্থক্ষেত্রে দেবদর্শনে যাত্রা করেন—এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রত-নিয়মাদির জন্য দীর্ঘ-উপবাসান্তে ব্রাহ্মণ ভোজন না করাইয়া তাঁহারা জল গ্রহণ করেন না—ধর্ম্মের জন্য অনশন বা অর্দ্ধাশনে হিন্দুরমণী কাতরা নহেন। প্রাত্যাহিক জীবনে, ধর্ম্মের অগণিত কঠোর অনুশাসন সমক্ষেও তাঁহারা ভক্তিবিমিশ্রিত ভয়ের সহিত হেটমুণ্ডে, যুক্ত-করে অবস্থান করিয়া থাকেন। হয়ত আধুনিক পরিমার্জ্জিত-রুচি নব্য সভ্য আমরা এই সকল দেখিয়া নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সুরে বলিব, ইহা অন্ধকুসংস্কার পূর্ণা লজ্জাহীনা বর্ব্বরতা মাত্র!

তাই প্রতিপদাদি ভিন্ন ভিন্ন তিথিতে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য ভোজন করা নিষিদ্ধ—আমরা এখন তাহা মানিতে চাহি না। আমরা শিক্ষিত—আমরা পরিমার্জ্জিত-রুচি—আমরা হেতুবাদের পরিপোষক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তখনকার যুগ বিশ্বাসের যুগ ছিল, আর এখনকার যুগ যুক্তির। সরল-বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া এখনও বঙ্গকুললক্ষ্মীগণ সেই সকল পুরাতন বিধি নিয়ম ধার্য্য বলিয়া মানিয়া চলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের সেই অন্ধ (!!) বিশ্বাস যেন ধীরে ধীরে স্তিমিত প্রদীপের মত প্রভাহীন হইয়া যাইতেছে। অন্ধতমোরাশিসমা-চ্ছন্না নিস্তব্ধা সুপ্তারজনীতে স্বল্প-খদ্যোত্ত শোভিত, তরুরাজিপরিবেষ্টিত শান্ত-বাপী জলে যেমন খদ্যোতের ক্ষীণ আলোক এক একবার জ্বলিয়া উঠে, আবার পার্শ্বস্থ

* নব্যভারত। "মল্লিখিত মানুষ ও [illegible]"

নিশিথিনীর তামসময়ী অন্ধকারের সহিত লিপ্ত হইয়া লুপ্ত হইয়া যায়, সেই প্রকার রমণী-দিগের যাহারা গুরু—রমণীদিগের যাহারা শিক্ষক, তাহারা উক্ত বিধি নিয়ম যথার্থত চাহে না, বরং উহাদিগকে উন্মাদগ্রস্ত বিকৃত-মস্তিষ্কের অর্থহীন-প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহে। মানব অনুকরণ-প্রিয় এবং শিষ্য বা শিষ্যা গুরুদেবেরই অনুকরণ করিয়া থাকে।

কিন্তু * "মনের সহিত দেহের যে অতি-ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধ আছে, তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। সে সম্বন্ধে আমরা সকলেই নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি। আহারের তারতম্য বা ভিন্নতা অনুসারে আমরা কেবল যে শারীরিক অবস্থা ভিন্নতা অনুভব করি, তাহা নহে, মানসিক অবস্থার ভিন্নতাও উপলব্ধি করিয়া থাকি। ফলতঃ আমাদের মানসিক-অবস্থা যে বহুল পরিমাণে আমাদের শারীরিক অবস্থা অনুসরণ করিয়া থাকে, তাহা আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। আহারের ফলে উদরাময়, শিরঃ-পীড়া প্রভৃতি শারীরিক অবস্থার নানাবিধ বিকৃতি ঘটিয়া থাকে। কিন্তু সকলেই জানেন যে, সে বিকৃতি শুধু শরীরে সম্বন্ধ না থাকিয়া মন পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। উদরা-ময় বল, শিরঃপীড়া বল শারীরিক যে কোন ব্যাধি উপস্থিত হইলেই মনের অবস্থারও ব্যত্যয় বা বিপর্য্যয় ঘটে, মনের শান্তি, স্থৈর্য্য প্রভৃতি স্বল্পাধিক পরিমাণে বিনষ্ট হইয়া যায়। আমরা যেসকল দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া থাকি, সে সমস্তের সমান গুণ নয়। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে ভক্ষ্য দ্রব্যের গুণাগুণের যে আলোচনা আছে, তাহা পাঠ করিলে জানা যায় যে, কোনও দ্রব্য ভক্ষণ করিলে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয়, কোনও দ্রব্য ভক্ষণ করিলে পিত্ত বৃদ্ধি হয়, কোনও দ্রব্য ভক্ষণ করিলে বায়ু বৃদ্ধি হয়, ইত্যাদি। আমরাও নানাবিধ দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া একবার সত্যতা উপলব্ধি করিয়া থাকি। কিন্তু বায়ু, পিত্ত প্রভৃতি বৃদ্ধি হইলে মানসিক অবস্থারও বিপর্য্যয় বা পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। বায়ু বৃদ্ধি হইলে মানসিক উগ্রতা ও চঞ্চলতা জন্মে, পিত্ত বৃদ্ধি হইলে রাগদ্বেষাদি বৃদ্ধি হয়, শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হইলে মানসিক অবসাদ ও অলসতা হইয়া থাকে। এসকল নিত্য প্রত্যক্ষ বিষয়, অস্বীকার করিবার যো নাই। কিন্তু এ সকল অতি-স্থূল-কথা—ইহার সূক্ষ্ম তত্ত্বও আছে।.........কিন্তু যে স্থূলতত্ত্ব আমাদের প্রত্যক্ষীভূত, কেবল মাত্র তদ্দৃষ্টেই বুঝিতে পারা যায় যে, আহার-ভেদে মানসিক অবস্থার ভিন্নতা ঘটিয়া থাকে। আহার-বিশেষে রাগদ্বেষাদি বৃদ্ধি হয়, মনের শান্তি, স্থৈর্য্য প্রভৃতি নষ্ট হয়। কিন্তু যেখানে রাগদ্বেষাদি প্রবল, বা মনে শান্তি স্থৈর্য্য প্রভৃতির অভাব, সেখানে ধ্যান ধারণ যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি ধর্ম্মচর্য্যার বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। চিত্ত-স্থৈর্য্য ও চিত্ত শুদ্ধি ব্যতীত ধর্ম্মচর্য্যা হয় না। অতএব যে আহার চিত্ত-স্থৈর্য্য ও চিত্ত-শুদ্ধির বিরোধী, সে আহার ধর্ম্মচর্য্যারও বিরোধী। এবং যাহা ধর্ম্মচর্য্যার বিরোধী, তাহা আত্মারও বিরোধী ইহার অপেক্ষা স্পষ্ট ও পরিষ্কার কথা বোধ হয় আর কিছুই হইতে পারে না

* সাহিত্য—ফাল্গুন, ১২৯৮।

এবং এই জন্যই আমাদের মহাজ্ঞানী ও সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকারেরা আহার ধর্ম্মের অন্তর্গত করিয়া গিয়াছেন।" এইত গেল আহার সম্বন্ধে স্থূল কথা। কিন্তু তিথি ভেদে আহার্য্য-সামগ্রীর মধ্যে কতকগুলি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ আছে। ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলেই প্রথমে বুঝিতে হয় "তিথি" কি।

প্রথমাধ্যায়।

তিথি প্রকরণ।

তিথি কি, কেমন করিয়াই বা তাহার উৎপত্তি এবং ক্রমাভিব্যক্তি, সে সকল কথা সম্যক্‌রূপে বুঝাইবার স্থান বর্ত্তমান প্রবন্ধ নহে। তবে সেই সম্বন্ধে সাধারণ দুই চারিটি কথা বলা নিতান্তই আবশ্যক।

তিথি—১। তন-ইথিন্ বাহুলকাৎ। নাদিলোপশ্চ

২। অত (সাতত্য গমনে) + ইথিন্। উণাদি।

তিথি—১। তনোতি বিস্তারয়তি চন্দ্রকলাং ইতি।

২। তন্যতে চন্দ্র কলা ইতি বা।

সূর্য্যমণ্ডল হইতে বহির্গত হইয়া, পুনর্ব্বার সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ পর্য্যন্ত দিন দিন চন্দ্রের যে জ্যোতি, তাহারই নাম তিথি ও চান্দ্রমাস।

"যে কাল বিশেষ ক্ষীয়মান বা বর্দ্ধমান চন্দ্রকলারে বিস্তার করে, সেই কাল বিশেষের নামই তিথি।" "অমাবস্যা হইতে পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত ও পৌর্ণমাসী হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত শশিকলার নাম তিথি।"*

তিথি দুই ভাগে বিভক্ত—শুক্লা ও কৃষ্ণা। অমাবস্যার পর প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পঞ্চদশ দিবসে এক এক পক্ষ হয়। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের মতে যে পঞ্চদশ দিবসে চন্দ্রের হ্রাস হয় তাহাকে কৃষ্ণ এবং যে পঞ্চদশ দিবসে চন্দ্রের বৃদ্ধি হয়, তাহাকে শুক্ল পক্ষ বলে। সূর্য্যমণ্ডল-বিনিঃসৃত চন্দ্র যে ত্রিংশদ্ভাগাত্মক রাশির দ্বাদশ ভাগ গমন করিয়া থাকেন, তাহাই এক এক তিথি। রাশির পরিমাণ ১৫০ দণ্ড। তাহারই ১২ এর ৩০ ভাগে (অর্থাৎ ত্রিশ ভাগের বার ভাগে) ৬০ দণ্ড হয়। সুতরাং এই ৬০ দণ্ডই এক এক তিথির পরিমাণ।

* "চন্দ্রের প্রথম-কলা অগ্নি, দ্বিতীয়-কলা রবি, তৃতীয় বিশ্বদেব, চতুর্থ সলিলাধিপ, পঞ্চম বষট্‌কার, ষষ্ঠ বাসব, সপ্তম ঋষি সকল, অষ্টম অজএকপাদ, নবম যম, দশম বায়ু, একাদশ উমা, দ্বাদশ পিতৃসকল, ত্রয়োদশ কুবের, চতুর্দ্দশ পশুপতি ও পঞ্চদশ প্রজাপতি পান করিয়া থাকেন। সমস্ত কলা পীত হইলে চন্দ্রমণ্ডল আর দেখা যায় না। যে

---

* "অমাষোড়শ ভাগেন দেবি প্রোক্তা মহাকলা।
সংস্থিতা পরমা মায়া দেহিনাং দেহধারিণী॥
অমাদি পৌর্ণমাস্যন্তা যা এব শশিনঃ কলা।
তিথয়স্তাঃ সমাখ্যাতাঃ ষোড়শৈব বরাননে॥"
সিদ্ধান্ত শিরোমণি।

* বিশ্বকোষ।

ষোড়শ কলা সর্ব্বদা জলমধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং অমাতে সোম ওষধিকে প্রাপ্ত হয়, ওষধিগত ও অম্বুগত হইলে গো সকল তাহা পান করে, সেই গো সম্ভূত ক্ষীর সমূহ অমৃত স্বরূপ, দ্বিজাতি কর্ত্তৃক মন্ত্রঃপূত হইয়া যজ্ঞীয় অগ্নিতে পূত হয়, তাহাতে শশী পুনর্ব্বার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এইরূপে দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণিমাতে পূর্ণতা লাভ করে।"

এখন দেখা যাউক কেমন করিয়া প্রতিপদাদি ভিন্ন ভিন্ন তিথির উৎপত্তি হইয়া থাকে। শীঘ্রগামী-চন্দ্র * সূর্য্যমণ্ডলের নিম্নে এবং মন্দগামী সূর্য্য চন্দ্রমণ্ডলের ঊর্দ্ধ প্রদেশে অমাবস্যার দিন অবস্থান করে। সেই জন্যই সমুদয় সূর্য্যরশ্মি চন্দ্রের উপরিভাগে পতিত হয়। চন্দ্রের নিম্ন বা পার্শ্বদেশ—কোনও দিক্ দিয়াই আর রবিরশ্মি প্রকাশিত হইতে পারে না। চন্দ্র ও সূর্য্যের এইরূপ গতিবিশেষের জন্য এবং সূর্য্যের কিরণ সম্পূর্ণরূপে অভিভূত হয় বলিয়াই আর চন্দ্রমণ্ডল একেবারেই দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু পরে শীঘ্রগতি দ্বারা সূর্য্য হইতে বহির্গত হইয়া চন্দ্র পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া থাকে এবং সূর্য্যকে উল্লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া যায়। সুতরাং এই সময়েই চন্দ্রের সেই পঞ্চদশ অংশের একাংশ দর্শনযোগ্য হয়। সেই প্রথম ভাগ দিয়া সূর্য্যরশ্মি বহির্গত হইবার নিমিত্ত সকলেই সেই ক্ষীণ নবোদিত চন্দ্রের প্রথম কলা দেখিতে পায়। ঐ কলানিষ্পত্তি পরিমিত কালই প্রতিপদ তিথি। দ্বিতীয়া প্রভৃতিতেও এইরূপ হইয়া থাকে।

জ্যোতির্ব্বেদ পণ্ডিতগণ স্ফুট গণনা দ্বারা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন যে, চন্দ্র সূর্য্য হইতে দ্বাদশ অংশ গমন করিলে পর এক একটী তিথি হয়। এই প্রকারে ৩৬০ অংশ গমন করিলে পর প্রতিপদাদি একটী তিথি হইয়া থাকে।

চন্দ্রমণ্ডলের যে অর্দ্ধাংশ আমারা দেখিতে পাই, সেই অর্দ্ধাংশ যখন তপনকিরণ-সম্পাতে সর্ব্বতোভাবে প্রকাশিত এবং উজ্জ্বল থাকে, সেই সময় তাহাকে পূর্ণচন্দ্র বলে এবং সেই দিনই পূর্ণিমা তিথি হয়। সেই উজ্জ্বল রবিকরোদ্ভাসিত অংশের ন্যূনাধিক্য অনুসারে চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে, সেই জন্যই তিথিও প্রতিপদাদি সংজ্ঞাবিশিষ্ট হইয়াছে।

প্রতিপদাদি তিথির উৎপত্তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র হইতে আমরা জানিতে পাই যে, এই সকল ভিন্ন ভিন্ন তিথির সহিত মনুষ্যশরীর সম্বন্ধবদ্ধ; অর্থাৎ বায়ু,

তিথিগত ধাতু বিকার

* সূর্য্যমণ্ডলস্য অধঃপ্রদেশবর্ত্তী শীঘ্রগামী চন্দ্রঃ ঊর্দ্ধপ্রদেশবর্ত্তী মন্দগামী সূর্য্যঃ তথা সতি তয়োর্গতিবিশেষবশাৎ দর্শে চন্দ্রমণ্ডলং অন্যূনমনতিরিক্তং সূর্য্যমণ্ডলস্যাধোভাগে ব্যবস্থিতংভবতি তদা সূর্য্যরশ্মিভিঃ সাকল্যেনাভিভূতত্বাৎ চন্দ্রমণ্ডলমীষদপি ন দৃশ্যতে। উপরিতনে শীঘ্রগত্যা সূর্য্যাদ্বিনিঃসৃতঃ শশী প্রাচীং যাতি। ত্রিংশদংশোপেতরাশৌ দ্বাদশভিরংশৈঃ সূর্য্যমুল্লঙ্ঘ্য গচ্ছতি। তথা চন্দ্রস্য পঞ্চদশসু ভাগেষু দর্শনযোগ্যঃ ভবতি। সোঽয়ং ভাগঃ প্রথমঃ কলা ইত্যভিধীয়তে। তৎকলানিষ্পত্তি পরিমিতকালঃ প্রতিপত্তিথির্ভবতি এবং দ্বিতীয়াদিষ্বপ্যূহ্যং।"

সিদ্ধান্তশিরোমণি।

কফ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধাতু, ভিন্ন ভিন্ন তিথিতে বিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোন তিথিতে কোন ধাতু হয়ত অতিশয় উষ্ণ হয়, কোন ধাতু অতিশয় স্নিগ্ধ হয়—কেহ বা অতিশয় উগ্র, কেহ ঈষদুষ্ণ—আর কেহ বা অতিশয় চঞ্চল এবং কেহ ঈষচ্চঞ্চল ভাব ধারণ করে। ভিন্ন ঋতুতেও মানবশরীরে এইরূপ ক্রিয়া হইয়া থাকে। কেন যে মানবধাতু এই প্রকার বিকার ভাবাপন্ন হয় তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে এইরূপই যে হইয়া থাকে ইহা জানা থাকিলেই হইল। * তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে,

প্রতিপদে—শ্লৈষ্মিক ধাতু অপেক্ষাকৃত লবণ রসাশ্রিত হয়।

দ্বিতীয়ায়—পৈত্তিক-ধাতু অতীব উষ্ণ হয় এবং বায়ু ও রুক্ষ হয়।

তৃতীয়াতে—শোণিত অত্যন্ত উষ্ণ হয় এবং বায়ু ক্রুর ভাব ধারণ করে। বায়ুর ক্রুরতায় ধমনীতে অতিশয় শারীরিক রক্ত-স্রোত প্রবাহিত হয়।

চতুর্থীতে—শ্লৈষ্মিক ও পৈত্তিক উভয় ধাতুই রুক্ষ হয়, সেই সঙ্গে বায়ুও ক্রুর ভাব ধারণ করে। এতদুভয় ধাতুর রুক্ষতায় এবং বায়ুর ক্রুরতায় মলাধারস্থ মল যথাযথরূপে নিঃসৃত হইতে পারে না। তাই বদ্ধ হইয়া দূষিত হয়। ধাতুত্রয়ের উক্ত বিকার-নিবন্ধন কোষ্ঠ সমুচিত পরিষ্কার না হওয়ায়, মলাধারে অত্যন্ত বেদনা বোধ হয় এবং "উদ্বেগ" অর্থাৎ অসুখোৎপত্তির লক্ষণ প্রকাশিত হইতে পারে।

পঞ্চমীতে—পিত্ত অত্যন্ত প্রবল হয়।

ষষ্ঠীতে—শৈত্যের ভাগ অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সপ্তমীতে—রক্ত এবং পিত্ত উভয়ই তরল হয়।

অষ্টমীতে—পাকস্থলী দুর্ব্বল হয়, সুতরাং অগ্নিমান্দ্য হইয়া থাকে।

নবমীতে—শ্লেষ্মা উষ্ণ হয় ও সেই সঙ্গে বায়ুও কুপিত হয়।

দশমীতে—অম্লের সহিত ক্রুরপিত্ত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

একাদশীতে—শ্লৈষ্মিক ও বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরোৎপাদক-রসের সঞ্চার হইয়া নাড়ী ভারাক্রান্ত হয়।

দ্বাদশীতে—রক্ত এবং ক্রুরশ্লেষ্মা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং বায়ু ক্রুর ভাব ধারণ করে।

ত্রয়োদশীতে—বায়ু মন্দগামী এবং রক্ত অত্যন্ত গাঢ় হয়। বায়ু মন্দগামী হইবার জন্য সেই গাঢ় শোণিত যথোপযুক্তরূপে মানব-শরীরে চালিত হইতে পারে না, স্থানে

---

* "পক্ষদ্বয়ে প্রতিপদি কফ ধাতুর্ভবেৎ পুনঃ।
লবণেন সমাযুক্তো দ্বিতীয়ায়াং তথৈবচ।
পিত্ত ধাতুশ্চ বায়ুশ্চ ক্রমাচ্চ ভৃশ মুষ্ণতাং।
তীক্ষ্ণত্বঞ্চ সমাপ্নোতি তৃতীয়ায়াঞ্চ শোণিতং॥
অত্যন্তমুষ্ণতাং প্রাপ্তঃ বায়ুশ্চ ক্রুরতাং গতঃ।
ক্রুরেণ বায়ুনারক্তং সাচীভাবেন চালিতং॥
চতুর্থ্যাং পিত্ত ধাতুশ্চ শ্লৈষ্মিকো ধাতুরেবচ।
দ্বৌধাতুরুক্ষতাং প্রাপ্তৌ বায়ুশ্চক্রুরভাবগঃ॥
রুক্ষাভ্যাঞ্চ তদা তাভ্যাং ক্রুরভাবেন বায়ুনা।
মলাধারান্মলং সর্ব্বং নিঃসৃতং ন যথোচিতং॥
তে নৈব হেতুনাধীরবেদনোদ্বেগ এবচ।
ভবেৎ তেনহি লোকানাং আমরোগস্য লক্ষণং।
ইত্যাদি, ইত্যাদি।
তান্ত্রিক চিকিৎসা শাস্ত্র।"

স্থানে আবদ্ধ হইয়া থাকে। সেই জন্যই দূষিত ভাব ধারণ করে।

চতুর্দ্দশীতে—"অপান বায়ু" (গুহ্য-দেশস্থ বায়ু) উর্দ্ধগামী হওয়ায় "আনাহ" (কোষ্ঠবদ্ধ ও মূত্ররোধক রোগ) রোগ এবং উদর ও স্তম্ভিত হইবার সম্ভাবনা।

অমাবস্যা ও পূর্ণিমায়—চন্দ্রের ষোড়শ-কলার ক্রিয়া কাল পূর্ণতালাভ করায়, শৈত্যের পর উষ্ণতা এবং উষ্ণতার পর শৈত্যের সঞ্চার হয়।

[কৃষ্ণ পক্ষে উষ্ণতা ও শুক্লপক্ষে শৈত্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত চন্দ্রকলার হ্রাস ও উষ্ণতার বৃদ্ধি হয় এবং শুক্ল প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চন্দ্রকলার বৃদ্ধির সহিত শৈত্যের বৃদ্ধি অধিক হয়। শীতোষ্ণতায় এই হ্রাস বৃদ্ধির জন্য অমাবস্যা এবং পূর্ণিমায় বিনা অত্যাচারেও স্বভাবতঃই কিছু অধিক পরিমাণ কফ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। নাড়ীতে এই প্রকার কফ সঞ্চার নিবন্ধন পাচিকা শক্তি দুর্ব্বলা হইয়া পড়ে এবং শরীরে কফোৎপত্তি লক্ষণও আংশিক প্রকাশিত হয়।

প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া অমাবস্যা ও পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তিথিতে ধাতুবিকার সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, শুক্ল এবং কৃষ্ণ উভয় পক্ষের তিথি সম্বন্ধে ঐ একই কথা।

তিথিগত ধাতু-বিকার হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, উক্ত ভিন্ন ভিন্ন বিকার (অর্থাৎ স্বাভাবিক ধাতুর অস্বাভাবিক-ভাবপ্রাপ্তি) উপশমের চেষ্টা করিয়া উপশম করিতে পারিলে অনাময় এবং না পারিলে ব্যাধি হইবার সম্ভাবনা। অগ্নিতে ঘৃত ঢালিয়া দিলে, অগ্নি আরও প্রজ্জ্বলিত ভিন্ন নির্ব্বাপিত হয় না। আহার বিহার প্রভৃতি দ্বারাই আমরা আমাদিগের ভিন্ন ভিন্ন ধাতুগুলির পোষকতা করিয়া থাকি। বিহারের কথা এখন ছাড়িয়া দিতেছি। কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন যে, কিরূপে আহারের দ্বারা ধাতুবিকারের পোষকতা করা হয়? কথাটী অবশ্য নিতান্তই সহজ ও সরল। তত্রাচ তাঁহাদিগের জন্য বলিতে হয় যে, যে দ্রব্যের সহিত যে বিকারের পরিপোষকতা সম্বন্ধ আছে, সেই দ্রব্য সেই বিকারের পোষকতা করে! স্থূলভাবে উত্তর দিতে গেলে ইহার অধিক আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে, জলের শৈত্য আছে, তেমন পৃথিবীর সকল দ্রব্যেরই আপন আপন নিজ স্বগুণ আছে

প্রতিপদাদি তিথিতে নিষিদ্ধ, দ্রব্য সমূহের তালিকা।

সুতরাং আমরা যে সকল দ্রব্য ব্যবহার (পান ভোজন ইত্যাদি) করিয়াথাকি, তাহার সমস্তই এই প্রকৃতির নিয়মের অধীন। অন্যান্য দ্রব্যের কথা পরিত্যাগ করিয়া আহার্য্য সামগ্রীর বিচারে অগ্রসর হওয়া যাউক।

ঈশ্বরেচ্ছায় আমাদিগের আহার্য্য সামগ্রীর সংখ্যা বড় কম নহে। পূর্ব্বে যাহা ছিল, এখন খাদ্য সামগ্রীর সংখ্যা তদপেক্ষা আরও অনেক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ "গোলালুর" নাম করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ইহার অস্তিত্ব ছিল না। ইংলণ্ড হইতে ১৭৯২ সালে গোলালু প্রথমে ভারতে আনীত হইয়াছে। যাহাহউক, আমাদিগের আহার্য্য সকল দ্রব্যগুলির গুণাবধারণ করিবার স্থান বর্ত্তমান প্রবন্ধ নয়। তাই, প্রতিপদাদি তিথিতে যে সকল দ্রব্য ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ, কেবল তাহাদিগেরই গুণাগুণ নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিব।

গুণনির্দ্ধারণ করিবার অগ্রে, কোন্ তিথিতে কোন্ সামগ্রী ভক্ষণ করা অবৈধ, তাহাই স্থির করা আবশ্যক। নিম্নলিখিত তালিকাটী "তিথি-তত্ত্ব" হইতে প্রদত্ত হইল। এই তালিকা হইতেই, কোন্ তিথিতে কোন্ কোন্ দ্রব্য ভোজন করা অনুচিত, তাহা জানা যাইবে।

(তালিকা)

পক্ষ	তিথির নাম	নিষিদ্ধ দ্রব্যের নাম	ঐ সকল দ্রব্যের সাধারণ নাম
শুক্ল এবং কৃষ্ণ	প্রতিপদ	কুষ্মাণ্ড	কুম্ড়া
ঐ	দ্বিতীয়া	বৃহতী	বিলাতি
ঐ	তৃতীয়া	পটোল।	পটোল
ঐ	চতুর্থী	মূলক।	মূলা
ঐ	পঞ্চমী	বিল্ব।	বেল
ঐ	ষষ্ঠী	নিম্বুক।	নিম
ঐ	সপ্তমী	তাল।	তাল
ঐ	অষ্টমী	নারিকেল।	নারিকেল
ঐ	নবমী	তুম্বী বা অলাবু।	লাউ
ঐ	দশমী	কলম্বী।	কল্মি শাক
ঐ	একাদশী	শিম্ব।	সিম
ঐ	দ্বাদশী	পুতিকা।	পুঁইশাক
ঐ	ত্রয়োদশী	বার্ত্তাকু।	বেগুণ
ঐ	চতুর্দ্দশী	মাষকলায়।	মাষকলায়
ঐ	অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা	মাংস।	মাংস

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ।

পুনর্জ্জন্মতত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এই স্থানে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, জীবের মুক্তি অর্থে কাহার মুক্তি হইল, অর্থাৎ চিত্তের ও বুদ্ধিতত্ত্বের মুক্তি, অথবা চিত্তস্থ ও বুদ্ধিস্থ-চিদাভাসের মুক্তি হইল? আপত্তিকারিগণ এইরূপ তর্ক করিতে পারেন যে, যদি চিত্ত বা বুদ্ধিতত্ত্বের মুক্তি হয়, তাহা হইলে যাহা অসৎ তাহা কখন সৎ হইতে পারে না "নাসতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ" অর্থাৎ অস্তিত্ব (যাহা চিরকাল আছে) কখন নাস্তিত্ব (তাহা নাই) বা নাস্তিত্ব কখন অস্তিত্ব হইতে পারে না. এক চৈতন্য ব্যতীত আর কোন পদার্থ নাই, সমস্তই কল্পনা বা কল্পনার ছায়া মাত্র, সুতরাং ঐ কল্পনা বা কল্পিত-বুদ্ধির মুক্তি অসম্ভব। যদি চিদাভাস বা চৈতন্যের প্রতিবিম্বের মুক্তি বলা হয়, তাহা হইলেও নিতান্ত হাস্যজনক হয়, যেহেতু চৈতন্য বা জ্ঞানের আভাস বা প্রতিবিম্ব কোন বস্তু নহে। উহাও চৈতন্য বা জ্ঞানের ছায়া মাত্র, সুতরাং প্রতিবিম্ব বা ছায়ার উন্নতি, অবনতি, বন্ধ, মুক্তি, ইহার তুল্য হাস্য-জনক বিষয় আর কি হইতে পারে?

অতএব জীবের অবনতি, উন্নতি, বন্ধ, মুক্তি প্রভৃতি আকাশ-কুসুম ও মরিচিকার জলভ্রান্তি তুল্য। বেদান্তও তাহাই বলেন যে ঘটাকাশ ও যাহা মহাকাশ ও তাহাই এবং দর্পণাভাব হইলে প্রতিবিম্ব আর থাকে না. তৎকালে যাহার প্রতিবিম্ব সেই প্রকৃত বস্তু থাকে (এই প্রবন্ধের পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) মহর্ষি দত্তাত্রেয় তাঁহার অবধূতগীতায় স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, প্রকৃত পক্ষে এক ব্রহ্ম ব্যতীত জীব বা জড় কোন পদার্থ নাই যথা—

আত্মানং সততং বিদ্ধি সর্ব্বত্রৈকং নিরন্তরম্।
অহং ধ্যাতা পরং ধ্যেয়ং অখণ্ডং খণ্ড্যতে কথং॥
ন জাতো ন মৃতোঽসি ত্বং ন তে দেহঃ কদাচন।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিখ্যাতং ব্রবীতি বহুধা শ্রুতিঃ॥
জন্ম মৃত্যু র্নতে চিত্তং বন্ধ মোক্ষৌ শুভা শুভৌ।
কথং রোদিষি রে বৎস নাম রূপং ন তে ন মে॥

বঙ্গার্থ। সমস্তই আত্মা ব্যতীত আর কিছুই নাই। যখন আত্মা অখণ্ড, তখন আমি ধ্যান-কারী, তিনি (ব্রহ্ম) ধ্যেয়, এক আত্মা দুই ভাগে কিরূপে বিভক্ত হইতে পারে অর্থাৎ অখণ্ড বস্তু কি প্রকারে খণ্ডিত হইবে? তুমি জন্ম গ্রহণও কর নাই, মরিবা না এবং দেহও কিছুই নহে, সমস্তই যে ব্রহ্ম, ইহা বহু শ্রুতিতে বর্ণিত আছে। তোমার জন্ম মৃত্যু বা চিত্তের বন্ধ মোক্ষ শুভ ও অশুভ কিছুই নাই এবং নাম রূপ তোমার বা আমার নহে, অতএব বৎস! কেন রোদন কর।

হরি বোল হরি! সমস্ত মীমাংসা করিয়া আসিয়া আবার ফিরে গণ্ডুষ! সুতরাং মীমাংসার সার মর্ম্ম সরল ভাবে, এক্ষণে

উদ্ধৃত না করিলে ঐ কূটতর্কের মীমাংসা কঠিন হইবে, মীমাংসার সার এই—

১। এক জ্ঞান বা চৈতন্য ব্যতীত আর কিছুই নাই, ইহাই সচ্চিদানন্দব্রহ্ম।

২। জ্ঞান বলিলে জ্ঞানের এক দিকে জ্ঞাতা, আর এক দিকে জ্ঞেয় বস্তু চাই এবং উভয়ের সংযোজক জ্ঞানের ক্রিয়াশক্তি ও চাই। যেমন আমাদের হৃদয় ও পৃষ্ঠ-পঞ্জরের মধ্যে মেরুদণ্ড আছে, উহার এক পার্শ্বে হৃদ-পদ্ম সহিত বক্ষ ও অন্য পার্শ্বে অস্থিময়-পৃষ্ঠ হইতেছে, সেইরূপ জ্ঞানক্রিয়া শক্তির এক দিকে জ্ঞাতা, অন্য দিকে জ্ঞেয় রহিয়াছে। জ্ঞাতা ব্যতীত জ্ঞানের ক্রিয়া শক্তি থাকিতে পারে না, আবার জ্ঞাতা যাহা জ্ঞাত হইবে, সেই জ্ঞেয়-বিষয় না থাকিলে জ্ঞানের ক্রিয়া শক্তিরও কোন অর্থ থাকে না অতএব এক জ্ঞান বলিলে তাহার তিনটী অঙ্গ জ্ঞাতা, জ্ঞানের ক্রিয়া, শক্তি এবং জ্ঞানের বিষয়, এই তিনটী আবশ্যক।

৩। জগতে যাহা কিছু দেখা যায়, সমস্তই পরিবর্ত্তন শীল, অর্থাৎ বিষয় মাত্রেই পরিবর্ত্তন-শীল, কল্য যাহা জল ছিল, অদ্য তাহা বাষ্প হয়, আবার অদ্য যাহা বাষ্প দেখ, কল্য তাহা বায়ুর সহিত মিশিয়া যাইবে। কিন্তু ঐ জল-জ্ঞান, বাষ্প-জ্ঞান, বায়ু-জ্ঞান পৃথক পৃথক হইলেও উহার জল, বাষ্প, বায়ু বাদ দিলে জ্ঞাতাই জ্ঞান, উহা অদ্বিতীয় উহার পরিবর্ত্তন নাই।

৪। যখন এক নিত্য-জ্ঞাতা ব্যতীত আর কিছুই নাই, তখন জ্ঞেয়-বিষয় কোথা হইতে আসিবে? সুতরাং জ্ঞেয়-বিষয় জ্ঞাতার জ্ঞান ক্রিয়া শক্তির ভাব প্রবাহ মাত্র।

৫। জ্ঞান-ক্রিয়া-শক্তি অর্থে; এক দিকে জ্ঞানানুভূতি-প্রকাশ-শক্তি, অন্য দিকে জ্ঞানের বিষয় প্রকাশ বা সৃষ্টি শক্তি বুঝায়। প্রকৃত পক্ষে দুইটিই এক শক্তি। জ্ঞানানুভূতির বাহ্য বিকাশ, যাহা জ্ঞানের বিষয় প্রকাশ্য তাহাই।

৬। জ্ঞানানুভূতির প্রকাশ বলিতে হইলে কোন একটী ভাবকে বোধ বা অনুভব করা বুঝায়, মনে কর একটী সিংহ কল্পনা করিতে হইবে, কিন্তু আমার যদি কখন সিংহ জ্ঞান বা বোধ না থাকে, তবে আমি কি কখন চিন্তা দ্বারা সিংহ কল্পনা করিয়া একটী সিংহ-মূর্ত্তি জ্ঞানের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারি? কিন্তু চিন্তা বা কল্পনা ব্যতীত ভাবের বিকাশ হয় না। অতএব ঐ জ্ঞান ক্রিয়া শক্তি প্রথমতঃ বোধ বা অনুভূতি রূপে প্রকাশ হইয়া মানসক্ষেত্রে চিন্তা বা কল্পনা রূপে ভাবের আকার নির্ম্মাণ করে, আবার ঐ আকার প্রথমোক্ত অনুভূতি বা বোধ রূপে জ্ঞাতার নিকট প্রকাশ করেন। ঐ আদি ভাবসমূহই বিষয়-বীজ, উহাই দৃশ্যজগতের বীজস্বরূপ পঞ্চতন্মাত্র। যখন মূল বিষয় পাঁচটী, তখন অনুভূত মূলে পাঁচ প্রকার হওয়া আবশ্যক, ঐ পাঁচ প্রকার অনুভূতির দ্বার-স্বরূপ পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়-তত্ত্ব। যখন জ্ঞানের ক্রিয়াশক্তি জ্ঞানের মধ্যেই লুকায়িত থাকে, তখন ঐ বিষয় রূপ ভাব সমূহ এবং তাহার অনুভূতি, মূল-শক্তির মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু জ্ঞান কখন বিলুপ্ত হয় না, ঐ জ্ঞান বুদ্ধি ও মনের অগোচর ও অপর পারস্থিত। যেহেতু, জ্ঞানের ক্রিয়া শক্তি

হইতে ভাবগ্রাহি-বুদ্ধি মন, এবং বুদ্ধি মনের দ্বার স্বরূপ ইন্দ্রিয়-তত্ত্বের বিকাশ হয়। যখন ঐ ভাব-সমূহ শক্তির মধ্যে লুক্কায়িত হয়, তখন ঐ ভাব গ্রাহি বুদ্ধি মনও ঐ ক্রিয়া শক্তির মধ্যেই বিলীন হয়। কেবল মাত্র নিত্য জ্ঞানের অস্তিত্ব মাত্র ; যাহা অবশিষ্ট থাকে, ঐ নিত্য জ্ঞানই জ্ঞাতা (সৎ-চিৎ-আনন্দ) নিত্যই সৎ (অস্তিত্ব) জ্ঞানই চিৎ ঐ জ্ঞাতাই স্বয়ং চিরানন্দময়, অতএব বিষয় রূপ ভাব-সমূহ জ্ঞানের ক্রিয়া শক্তির কল্পনা মাত্র। নিত্য জ্ঞানানন্দের (জ্ঞাতার) বন্ধ মুক্তি কিছুই নাই।

৭। পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে, কল্পিত ভাবের মধ্যে জ্ঞানাভাস আছে এবং ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, ক্রিয়া শক্তি ত্রিগুণান্বিতা, তন্মধ্যে তমোগুণ কর্ত্তৃক ঐ ভাব সমূহ মৃৎপাষাণাদি জড় পদার্থে পরিণত হইলে তদভ্যন্তরস্থ জ্ঞানাভাস অপ্রকাশ হয়! তদনন্তর ঐ জড়স্থ গূহ্য সত্ব ও রজোগুণের বিকাশ হইলে পূর্ব্ব বর্ণিত মত প্রাণ মন ও বুদ্ধি-তত্ত্বের বিকাশ হয়, অর্থাৎ যেন প্রস্তর বা মৃত্তিকা নানা জাতীয় উজ্জ্বল তৈজস-তত্ব আকর্ষণ করিয়া লইয়া উহাদের রাসায়নিক শক্তি প্রভাবে উজ্জ্বল মণি বা উজ্জ্বল কাচে পরিণত হইয়া তদ্দ্বারা যেন বুদ্ধিরূপ দর্পণ নির্ম্মাণ করিয়া লয়। অর্থাৎ সূক্ষ্ম ও স্থূল জগতে (ব্রহ্মাণ্ডে) যত প্রকার ভাব (অর্থাৎ ভাবময় সূক্ষ্ম ও স্থূল তত্ব) আছে, সেই সেই সমগ্র-ভাবের (অর্থাৎ ভাবময় সূক্ষ্ম ও স্থূল তত্ত্বের) এক-এক কণা অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ একত্রিত হইয়া একটী সংশ্লিষ্ট ভাবময়-কেন্দ্রে পরিণত হয়। উহাতে দৈব, আসুরিক, পৈশাচিক, পাশব, জাড্য প্রভৃতি সমস্ত ভাবের কণা অর্থাৎ কিয়ৎ-পরিমাণ অংশ থাকায়, উহাকে পূর্ণের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি বলা যায় (উহাই মানব তত্ব) এই জন্য মানবকে সমগ্র-ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি বলে।* ঐ সংশ্লিষ্ট-ভাবময় কৈন্দ্রিক-দর্পণে যে চৈতন্য বা জ্ঞানাভাস প্রতিবিম্বিত হয়, তাহাও তদাকারে প্রতি-বিম্বিত হওয়ায়, মানবাত্মা ঈশ্বরের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি বা তাঁহার পুত্র-স্বরূপ বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। ছায়া বা প্রতিবিম্ব এই দুইটী বাক্যের মধ্যে পার্থক্য আছে, ছায়া দ্বারা বস্তু আবৃত হয়, কোন স্থূল-বস্তুর ছায়া সূক্ষ্ম-বস্তুর উপর পড়িলে ঐ সূক্ষ্ম-বস্তু স্থূল-বস্তুর ছায়ায় ঢাকিয়া যায়, কিন্তু প্রতিবিম্ব সেরূপ নহে, ইংরাজিতে ছায়াকে Shed ও প্রতিবিম্বকে Reflection কহে, অস্পষ্টবস্তুর আলোকে বস্তুর যে যৎসামান্য স্থূল আভাস পড়ে, তাহাই ছায়া এবং উজ্জ্বল-দর্পণে বস্তুর যে পূর্ণাভাস প্রতি-বিম্বিত হয়, উহাকে প্রতিবিম্ব কহে! পার্থিব অন্যান্য-জীব দুই চারিটার ভাবের ছায়া মাত্র এবং মনুষ্য পূর্ণ ভাবময় জ্ঞানা-ভাসের ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব। ব্রহ্মাণ্ডে যত প্রকার ভাব আছে, সেই সমস্ত ভাব অংশতঃ মনুষ্যে আছে, তবে ভাবের স্থূলতা ও সূক্ষ্মতার পরিমাণের ন্যূনাতিরেক অনুসারে বুদ্ধিরূপ কৈন্দ্রিক-দর্পণের উজ্জ্বলতা

* হিন্দু-পত্রিকায় ১৩০৩ বঙ্গাব্দে ৩।৪।৫।৬ সংখ্যায় ৫৩ পৃষ্ঠায় আমার কৃত মুক্তি ও অমরত্ব প্রবন্ধের প্রারম্ভে ১হইতে ৪ ছত্র এবং তাহার টীকা দ্রষ্টব্য।

মলিনতা নির্ভর করে, তদ্ধেতু প্রতিবিম্ব ও (Refliction) স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট হয়। এই জন্য মনুষ্যের মধ্যে কেহ পণ্ডিত, কেহ মূর্খ, কেহ তত্বজ্ঞানী, কেহ বিষয়ী ইত্যাদি।

৯। উপরোক্ত এক একটী ভাবময়-তত্ব মানুষের মানসিক ও শারীরিক এক একটী বৃত্তির এক একটী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যথা-তেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দ্বাদশ আদিত্য, জ্যোতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অংশুমান্ রবি, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যথা ক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কোন কোন মতে মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র, বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সূর্য্য—* স্পর্শেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বায়ু, শ্রবণেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দিকপাল, রসনার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণ ইত্যাদি। দয়া, ক্ষমা, কাম, ক্রোধ, প্রভৃতি অন্তর্বৃত্তির অধিষ্ঠাতা দেব, অসুর, পিশাচ প্রভৃতি আছে, উহারাই মানবের শারীরিক ও মানসিক এক একটী বৃত্তি প্রকাশের সাহায্য-কারক। অতএব ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে, মানবে তাহার ক্ষুদ্র ২ অংশ থাকায় ঐ সকল অংশ একত্রিত হইয়া মানবের বুদ্ধি-মন-বৃত্তি ও ইন্দ্রিয়াদির বিকাশ হইয়াছে। ঈশ্বর যেমন সমগ্র-জগতের কেন্দ্র, মানব সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র ২ অংশ বা ভাব সমষ্টির কেন্দ্র। ঈশ্বর জ্ঞান বা চৈতন্যময়, এই জন্য চিৎ-দর্পণই তাঁহার জ্ঞান-প্রকাশের শক্তি, মানব ঐ জ্ঞান বা চৈতন্যের ভাবরূপ চিত্ত বা অন্তঃকরণময়, এই জন্যই চিত্ত-দর্পণে ঐ চৈতন্যের ভাবময় প্রতিবিম্ব বিকাশ হয়।

১০। উজ্জ্বল দর্পণে বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ার সংক্ষেপ হেতু এই যে, যেমন শব্দ কম্পনগতি (Vibration of sound) দ্বারা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়। রূপ (অর্থাৎ বস্তুর বর্ণ বা রং) কম্পনগতি (Vibration of colour) দ্বারা চক্ষে প্রতিবিম্বিত হয়, তদ্রূপ বস্তুর তৈজসরূপ বা বর্ণ ঐ কম্পন গতি দ্বারা দর্পণেও প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। ঐ দর্পণস্থ-বিম্ব পূর্ব্বোক্ত নিয়মে চক্ষে প্রতিবিম্বিত হওয়ায়, প্রকৃত-বস্তুর মুখ যে দিকে থাকে, দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের মুখ তাহার বিপরীত দিকে থাকা চক্ষে অনুভূত হয়, প্রথমতঃ বস্তুর রূপ বা অকৃতি জিনিষটা কি স্থির হইলে উহার প্রতিবিম্ব যে কি তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। পদার্থে যে সূর্য্যের আলোক পতিত হয়, ঐ আলোক সেই পদার্থের অণুসকলের সহিত মিশ্রিত হওয়ায় তদাকার ধারণ করে, উহাকেই রূপ বা আকৃতি বলে। ঐ আকৃতি পূর্ব্বোক্ত অণু প্রতিবিম্বিত জ্যোতি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ঐ আণব-জ্যোতি পূর্ব্বোক্ত কম্পন দ্বারা জ্যোতির ফোকস্ (Focus) স্বরূপ যে চক্ষু, ঐ চক্ষুতে প্রতিভাত হয়। জ্যোতিও তৈজস, চক্ষুও তৈজস, দর্পণ ও তৈজস, তদ্ধেতু দর্পণেও ঐ অণু-বিম্বিত জ্যোতি প্রতিভাত হয়। এতাবতায় সাব্যস্ত হইতেছে যে, প্রতিবিম্ব পদার্থ শূন্য নহে, ঐ প্রতিবিম্ব পদার্থের অণুমিশ্রিত

* সূক্ষ্ম এবং স্থূল ভেদে বিষ্ণু এবং সূর্য্য, ব্রহ্মা এবং চন্দ্র একই তত্ব মৎকৃত সৃষ্টিতত্ব ত্রিমূর্ত্তি-শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, হিন্দু-পত্রিকায় ৩য় খণ্ডের ১ম ২য় সংখ্যা ২৫ পৃঃ হইতে ৩৬ পৃষ্ঠা।

জ্যোতি হইতেছে অতএব উহা তৈজস অণু।

১১। এখন ভয়ানক কঠিন-সমস্যা, যাহাকে আমরা রূপ বা জ্যোতি বলি, জ্ঞানের বা চৈতন্যের সেই প্রকার রূপ বা দৃশ্য-পদার্থ প্রতিবিম্বত জ্যোতি নাই, উহা নিরাকার, তবে উহার (অর্থাৎ নিরাকার চৈতন্যের) প্রতিবিম্ব কিরূপ হইবে? এই জন্য এই প্রবন্ধের প্রথমেই কথিত হইয়াছে যে, অন্তর্জগতের ভাষা নাই, বাহ্য-জগতের ভাবের যে সকল ভাষা আছে, তাহার সহিত সম্পূর্ণরূপে তুলনা হয় না, তবে বাহ্য দৃষ্টান্তের সহিত অংশতঃ কিঞ্চিৎ মিল থাকায় সেই সেই বাহ্য জগতের একদেশ ব্যাপী দৃষ্টান্ত খাটাইয়া লইতে হয়, তদ্ভিন্ন ভাষা দ্বারা প্রকাশের উপায় নাই।

১২। যেমন সূর্য্যের আলোক কোন বাহ্য-বস্তুর উপর পতিত হইয়া তদাকার ধারণ করিয়া দর্পণে সেই আকার প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ জ্ঞানাভাস অন্তঃকরণে যে ভাবের আকার ধারণ করে, তাহা বুদ্ধিতে তদাকারে প্রতিবিম্বিত হয়। দর্পণ যেমন জ্যোতির ফোকস্, বুদ্ধি সেইরূপ জ্ঞানের ফোকস্। সূর্য্যের জ্যোতি বাহ্য বস্তুর ভাব প্রকাশ করে, জ্ঞানের জ্যোতি অন্তরের আধ্যাত্মিক-ভাব প্রকাশ করে, উভয়ই প্রকাশ স্বরূপ * অতএব বুদ্ধিস্থ জ্ঞান-বিম্ব একেবারে অবস্তু নহে,* উহা বুদ্ধিস্থ সমূহের সহিত অবিমিশ্রত থাকায়, বুদ্ধি যতই নির্ম্মল হইবে, ভাবময় জ্ঞান-বিম্বের ততই অধিক বিকাশ হইবে। এতাবতায় সাব্যস্ত হইতেছে বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত ভাব-জ্ঞানই জীবাত্মা, সুতরাং বুদ্ধি যতই নির্ম্মল হইবে ও অণুবীক্ষণ দর্পণের ন্যায় হইবে ভাব জ্ঞানময় জীবাত্মার ততই অধিক বিকাশ হইবে (অর্থাৎ জ্ঞানমণ্ডল বৃহৎ ও স্পষ্টীকৃত হইবে) ও জীব মুক্তির দিকে অগ্রসর হইবে।

১৩। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, সংশ্লিষ্ট ভাব সমষ্টির কেন্দ্রই মানবতত্ত্ব, যখন এ কেন্দ্র সম্পূর্ণরূপে পূর্ণতা লাভ করিবে, তখন চিত্ত দর্পণরূপ বুদ্ধি সম্পূর্ণ নির্ম্মল ও জ্ঞান জ্যোতি ধারণোপযোগী হইয়া নিত্য জ্ঞান প্রকাশরূপিণী (চিদ্দর্পণ সদৃশা) বিদ্যার অঙ্গীভূত হইবে এবং জীবাত্মাও পূর্ণ ভাবে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়া মুক্ত ও সর্ব্বেশ্বরের অঙ্গীভূত হইবেন।

১৪। এক্ষণে জীবাত্মার দিক দিয়া দেখিলে জীবের অবনতি, উন্নতি, বদ্ধ মুক্তি, সমস্তই আছে, পরমাত্মার দিক দিয়া দেখিলে

টীকা * সূর্য্যের জ্যোতি দ্বারা ভূর্ভুবস্ব অর্থাৎ পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ বিকাশিত হয় এবং সেই দেবের অর্থাৎ দীপ্তিমান সূর্য্যের অভ্যন্তরস্থ ভর্গ হইতে বুদ্ধি প্রেরিত অর্থাৎ বুদ্ধি প্রকাশিত হয়, অতএব ভৌতিক-জ্যোতি ও আধ্যাত্মিক-জ্যোতি উভয়ই প্রকাশ স্বভাব।

* চৈতন্য নিরাকার হইলেও জীবের বুদ্ধি মন একেবারে নিরাকার নহে। তবে ঐ বুদ্ধি মনের রূপ আমাদের স্থূল-ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে, মন বুদ্ধির সূক্ষ্ম জ্যোতি বা বর্ণ আছে; যোগ বলে তাহা প্রত্যক্ষ হইতে পারে, আধুনিক কোন যোগী মানস জ্যোতি বা বর্ণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বেদান্ত দর্শনেও অষ্ট-সিদ্ধি লাভ করিলে সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময় দেবতা-দিগের রূপ দর্শন হইতে পারে বর্ণিত আছে। (বেদান্ত দর্শন পাদ সূত্র পৃষ্ঠা)

এক নিত্য জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নাই কেন না, এই জগৎ তাঁহার শক্তির ভাব প্রবাহ মাত্র। ঐ এক একটী ক্ষুদ্র ২ ভাবের মধ্যে জ্ঞানাভাস যাহা অণুর ন্যায় * প্রবিষ্ট হইয়া সেই ভাবের অধীন হয়, সেই অণুপ্রবিষ্ট ভাবরূপ অন্তঃকরণে জন্ম জন্মান্তরের অভিজ্ঞতা ও নানাভাব সংশ্লিষ্ট হওয়ায় বৃদ্ধি ও উজ্জ্বল হয়। ও ঐ বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত জ্ঞান-মণ্ডল পরিবর্দ্ধিত হয়। ঐ জ্ঞান জ্যোতি দ্বারা কল্পিত ভাবের আবরণাংশ দূরীভূত এবং নির্ম্মল বুদ্ধিরূপ প্রকাশাংস সত্য-জ্ঞানের অধীন হয়। যত দিন ভাবের কল্পিত আবরণ অর্থাৎ ভ্রান্ত-জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত না হয়, তত কাল বুদ্ধিতে ভাবময় জ্ঞানাভাস সেই সেই ভাবে বা ভাবাকারে প্রতিবিম্বিত হয়, কিন্তু কল্পিত আবরণ দূরীভূত হইলে ভ্রান্ত জ্ঞান দর্পণরূপা বুদ্ধির ভ্রান্তি দূরীভূত হয় এবং তাহা নিত্য জ্ঞান দর্পণের সহিত মিলিত হয় ঐ নিত্য—জ্ঞান—দর্পণই বিদ্যা বা মহাশক্তি, উহাই ভগবদ্গীতোক্ত মহদ ব্রহ্ম, উহাই পুরাণোক্ত মহৎ বুদ্ধিরূপা ভবানী।

যত কাল জীবাত্মা মুক্ত না হয়, ততকাল দিবা রাত্রের ন্যায় ইহ পরলোক গতায়াত করে, পরলোকই পূর্ব্বোক্ত পিতৃলোক। কিন্তু সাধনা দ্বারা জীবে সুখময়—স্বর্লোকস্ত বিশেষ—কোন (উচ্চতর) দেবত্বের অধিক বিকাশ হইলে তাহার আকর্ষণে জীব (মরণান্তে) পিতৃলোকের পরিবর্ত্তে স্বর্লোকে গমন করিয়া যে পরিমাণ সুখের বিকাশ হয়, সেই পরিমাণ কাল স্বর্গসুখানুভব করিয়া ঐ সুখ ভোগান্তে পুনর্ব্বার পৃথিবীতে পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার লইয়া পুন জন্ম গ্রহণ করে * এবং ক্রমে ২ সাধনা দ্বারা যতই জ্ঞান জ্যোতি বিকাশ হয়, জীবাত্মা ততই মুক্তির পথে অগ্রসর হয়।

এতাবতায় সাব্যস্ত হইল, বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত ধী মনোময় জ্ঞানই জীবাত্মা, উহারই ইহ পরলোক গমন, উন্নতি, অবনতি, বন্ধ, মুক্তি হইয়া থাকে। প্রথমতঃ ঐ বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত জ্ঞানাভাস মনোময় হইয়া স্নায়ুযোগে ইন্দ্রিয় ও দেহের প্রত্যেকাংশে ব্যাপ্ত হওয়ায় দেহাত্ম-জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ দেহেই আমি এই জ্ঞান হয় ও দেহের সুখ দুঃখ আমার সুখ দুঃখ জ্ঞান হয়। ক্রমে সাধনা দ্বারা যতই অজ্ঞান নাশ ও জ্ঞানের বিকাশ হয় ; ততই দেহাত্ম জ্ঞান মানসাত্মজ্ঞানে মানসাত্মজ্ঞানে বুদ্ধ্যাত্ম এবং বুদ্ধ্যাত্ম জ্ঞানে সত্যপরমাত্ম জ্ঞানে পরিণত হয়। এক্ষণে একটী তর্ক উঠিতে পারে যে, সাংখ্য মত খণ্ডনের সময় কথিত হইয়াছে যে, সাংখ্যের পৃথক ২ পুরুষ (আত্মা) প্রকৃতি সংযুক্ত হইয়া কীটাণু হইতে মানব যোনি ভ্রমানান্তর মুক্তি লাভ করিয়া যাহা ছিল

* উহা ভৌতিক পদার্থের অণুর ন্যায় নহে, যেমন আমাদের মনে যে সামান্য এক একটী ভাব বা চিন্তা উদিত হয়, উহা আমাদের মূল জ্ঞান প্রতিবিম্বিত সমষ্টি ভাবের একটী ক্ষুদ্র অংশ বা অনুরূপ প্রোক্ত অণু তদ্রূপ।

টীকা * তেজ, জ্যোতি, আকর্ষণ বিক্ষেপণ প্রভৃতির প্রকৃত মৌলিকতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইলে স্বর্গের রহস্য ভেদ হইতে পারে, কিন্তু যোগবল ব্যতীত জড় বিজ্ঞান দ্বারা উহার প্রকৃততত্ত্ব আবিষ্কার হইতে পারে না।

তাহাই হয়, ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক এবং উদ্দেশ্য শূন্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এখন বিপক্ষবাদীরা বলিতে পারেন যে, তোমার বেদান্তোক্ত নিত্য-জ্ঞানের আভাস ও ভাব সংযুক্ত হইয়া জন্ম জন্মান্তর ভ্রমণ পূর্ব্বক পুনঃ নিত্য জ্ঞানে পরিণত হয়, অতএব চিদাভাসময় জীবের মুক্তি দ্বারা নিত্য জ্ঞান কি এক মাত্রা বৃদ্ধি হয়? যদি তাহাই হয়, তবে জ্ঞান নিত্য সত্য শাশ্বত অনন্ত ইত্যাদি বাক্যের অর্থ থাকে না, যদি জীবাত্মার মুক্তি দ্বারা নিত্য জ্ঞান পরবর্দ্ধিত না হয়, তবে সাংখ্যের মতের প্রতি যে দোষারোপ করা হইয়াছে; বেদান্ত মতেরও সেই দোষ দাঁড়ায়; তাহা হইলে এত লেখা লিখি বকা বকির আবশ্যক কি?

উপরোক্ত প্রশ্নের প্রকৃত মীমাংসা এই পুর্নজন্ম তত্ত্বের অন্তর্গত নহে, এই পুনর্জন্ম তত্ত্বে উহার এইরূপ উত্তরই যথেষ্ট, যে, সমুদ্রের জলবিন্দু কখন সমুদ্র পদ বাচ্য হইতে পারে না এবং আপনার দেহস্থ এক বিন্দু শুক্র কখনই আপনার পূর্ণ-দেহ নহে। এখন যদি অনন্ত সমুদ্রের একটি জলবিন্দু কোন অনির্ব্বচনীয় শক্তি প্রভাবে পরিবর্দ্ধিত হইয়া সমুদ্র বিশেষে পরিণত হয় কিম্বা এক বিন্দু বীর্য্য পূর্ণ একটী মানুষ হয়, তবে ঐ অণুর বৃদ্ধিত্ব ও উন্নতি স্বীকার করিব না কেন? সাংখ্যের পুরুষ, প্রকৃতি সংযুক্ত হইয়া বদ্ধ হইবার পূর্ব্বে ঠিক যে অবস্থায় ছিল, মুক্ত হইয়াও ঠিক সেই অবস্থা প্রাপ্ত হয় কিন্তু বেদান্তোক্ত জীবাত্মা তদ্রূপ নহে— বেদান্তোক্ত জীব পরমাত্মার প্রতিবিম্ব। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, প্রতিবিম্ব একেবারে অবস্তু নহে, যেমন কোন বস্তুর প্রতিবিম্বে পূর্ব্ব বর্ণিত মত ঐ বস্তুর তৈজস অণু আছে, সেইরূপ চৈতন্যের প্রতিবিম্বে চিদ্বীজ আছে, শাস্ত্রেও উহাকে চিদ্‌বীজ বলে, ঐ চিদ্‌বীজ প্রকৃতির গর্ভস্থ হইয়া শিশু জীবাত্মা রূপে প্রসূত হয়, সুতরাং পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার আত্মজ সম্বন্ধ। প্রকৃত পক্ষে পুত্র পিতা হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, তবে পুত্র যেরূপ পিতার অংশ, জীবাত্মা পরমাত্মার তদ্রূপ অংশ নহে, উহা স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ, এই জন্য আভাস বা প্রতিবিম্ব শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে কল্পিত ভাবের মধ্যে কল্পনাকারীর জ্ঞানের আভাস থাকে উহা দৃশ্য বস্তুর অণু বা অংশের ন্যায় নহে অথচ জ্ঞানের আভাস ও জ্ঞানের ন্যায় প্রকাশ স্বভাব, ঐ আভাস পূর্ণ প্রকাশ হইলে উহাই পূর্ণ জ্ঞান। অতএব জীব মুক্ত হইলে নিত্য সত্য—জ্ঞানময় হয়। অনন্ত নিত্য জ্ঞানের অংশাংশি বা হ্রাস বৃদ্ধি নাই, এই জন্যই পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, জীবাত্মার পক্ষ হইতে দেখিলে জীবের উন্নতি, বদ্ধ, মুক্তি সমস্তই সম্ভব, নিত্য জ্ঞানময় পরমাত্মার পক্ষ হইতে দেখিলে আত্মার উন্নতি, বদ্ধ, মুক্তি অসম্ভব, যেহেতু সত্য জ্ঞানের বিকাশ হইলে সমস্তই মায়াময় বদ্ধ মুক্তি মায়ার কল্পনা মাত্র দৃষ্ট হইবে।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, এই সৃষ্টি কল্পনা বা সৃষ্টি ক্রিয়া ও জীবের বদ্ধ মুক্তি কি উদ্দেশ্য শূন্য ইহা কি ঈশ্বরের ক্রীড়া মাত্র অনন্ত কালই কি তিনি উদ্দেশ্য শূন্য ক্রীড়া করিতেছেন? এক এক সৃষ্টির প্রারম্ভও যাহা সমাপ্তও কি তাহাই? আ

বার পুনরারম্ভ কি ঠিক সেই প্রকার? সৃষ্টির মূলতঃ উন্নতি, অবনতি কি কিছুই নাই?

ইহার উত্তরে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই প্রশ্নের উত্তর পুনর্জ্জন্ম তত্ত্বের অন্তর্গত নহে, সৃষ্টিতত্ত্বের অন্তর্গত। ঐ সৃষ্টিতত্ত্ববিশদরূপে লিখিতে হইলে একখানি গ্রন্থের ন্যায় প্রবন্ধ লিখিতে হয়। ফলতঃ ঈশ্বরের উদ্দেশ্য মানব বুদ্ধির অগম্য হইলেও যখন মানবাত্মা ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব বা তাঁহার নিত্য জ্ঞানের আভাস স্বরূপ (কেবল পার্থিব-ভাবের সহিত মিশিয়া ভ্রান্ত হইয়াছে) তখন সাধনা দ্বারা ঈশ্বরের সৃষ্টির উদ্দেশ্য-জ্ঞান কিয়দংশ মানব মস্তিষ্কে প্রতিভাত হইতে পারে, যাহাহউক এই ক্ষুদ্রতর জীব চিন্তারূপ সাধনা দ্বারা ঐ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে সত্য উপলব্ধি করিয়াছি, তাহা পৃথক সৃষ্টিতত্ত্ব প্রবন্ধে যথাসাধ্য বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করিব। *

তবে এখন সংক্ষেপতঃ এই পর্য্যন্ত বলিলে যথেষ্ট, যে অনন্ত সত্য জ্ঞানে এক অদ্বিতীয় নিত্য শাশ্বত, উহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই বটে, কিন্তু সৃষ্টি পরিবর্ত্তন শীল এবং তাহার উন্নতি অবনতি থাকায়, কার্য্যে যাহা আছে, কারণেও তাহা আছে, অতএব বস্তুর যেরূপ উন্নতি আছে, সৃষ্টি ক্রিয়া শক্তিরও তদ্রূপ উন্নতি আছে। ঐ ক্রিয়া শক্তিই পূর্ব্ব বর্ণিত মত জ্ঞানের সৃষ্টি প্রকাশ্য (সত্ত্বময়) মহদ্দর্পণ স্বরূপ। মানবাত্মার মুক্তি বলিলে পূর্ণ জ্ঞানের বিকাশ হওয়া এবং বিশুদ্ধ-ভাবের সহিত উজ্জ্বল বুদ্ধি (সূর্য্য উদয়ে যেমন প্রদীপের আলোক সৌরালোকে মিশিয়া যায়, সেইরূপ) পূর্ণ-জ্ঞান জ্যোতিতে বিলীন হইয়া যাওয়া বুঝায়। বিশুদ্ধ ভাবময়-নির্ম্মল-বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত জ্ঞান জ্যোতি সেই মহজ্জ্যোতিতে মিলিত হওয়ায় ঐ মহদ্দর্পণের উজ্জ্বলতা পরিবর্দ্ধিত হয়। ধূমকেতু সৌরাকর্ষণে আকর্ষিত হইয়া সূর্য্যে মিলিত হইলে যেমন সূর্য্য তেজের বৃদ্ধি অর্থাৎ উষ্ণতার বৃদ্ধি হয় সেইরূপ একটী জীব মুক্ত হইয়া জ্ঞানময় হইলে জ্ঞানের ক্রিয়া শক্তিরূপ জ্ঞান দর্পণের উজ্জ্বলতা ও শক্তি বৃদ্ধি হয়। যেমন ইহ-লোকে একজন জ্ঞানী মহাত্মা জন্মিলে তাঁহার জ্ঞান জ্যোতি দ্বারা মানব-সমাজ উজ্জ্বল হয় অর্থাৎ তাঁহার জ্ঞান জ্যোতির অণু সমাজস্থ অধিকাংশ ব্যক্তিতে প্রবিষ্ট হইয়া সমাজে জ্ঞান চর্চ্চা ও সমাজ সংশোধিত ও বিশুদ্ধ হয়। সেইরূপ একজন জ্ঞানী মুক্তি লাভ করিলে জ্ঞানের দর্পণরূপ কারণ শক্তি যে উজ্জ্বল ও বিশুদ্ধ হইবে ইহা যুক্তি বিরুদ্ধ নহে। যেমন বুদ্ধ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির জ্ঞান-জ্যোতিতে সমাজ বিশুদ্ধ হইয়াছিল এখনও তাঁহাদের সেই জ্ঞান-জ্যোতিতে স্বদেশ ও বিদেশস্থ সমাজ উজ্জ্বল হইতেছে কিন্তু তাঁহাদের জ্ঞানের হ্রাস বৃদ্ধি হয় নাই সেইরূপ মহাত্মার মুক্তি দ্বারা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া শক্তিময় জ্ঞান দর্পণ উজ্জ্বল হইলেও নিত্য জ্ঞানের হ্রাস বৃদ্ধি নাই।

ইহা দ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে যুগে যুগে, কল্পে কল্পে, জগতের জ্ঞানের বিকাশ অধিক হইতেছে ও হইবে, তবে ইহার মধ্যে কালের অবনয়ন ও উন্নয়ন প্রণালী-অনুসারে হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে, কিন্তু মোটের উপর সৃষ্টির এক এক আবর্ত্তনে জগতে সত্ত্বগুণের পরিবর্দ্ধন হেতু জ্ঞানমণ্ডল যে বৃদ্ধি হই-তেছে ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য সৃষ্টিতত্ত্ব প্রবন্ধে

টীকা * বিগত বর্ষের ১ম ২য় সংখ্যার হিন্দু-পত্রিকায় সৃষ্টিতত্ত্বের কারণ সূক্ষ্ম ও স্থূল ত্রিমূর্ত্তির ব্যাখ্যা পর্য্যন্ত হইয়া সৃষ্টিতত্ত্ব তৎপরে এপর্য্যন্ত আর লিখিত হয় নাই, ভবিষ্যতে লিখিবার ইচ্ছা আছে।

বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিবার ইচ্ছা আছে। যদি এই ক্ষুদ্র জীবের দ্বারা এ গুরুতত্ত্ব ব্যাখ্যা হওয়া সেই ইচ্ছাময় সর্ব্ব-নিয়ন্তার অভিপ্রেত হয়, তবে অবশ্যই ইচ্ছা সফল হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীশঙ্কর-স্তোত্রং।

১। যৎপাদপঙ্কজরজঃ স্মরণেন পুংসা
মিষ্টার্থ-সিদ্ধিরচিরাৎকরবিল্বতুল্যা।
সঞ্জায়তে তমমলং সুখচিৎস্বরূপং
শ্রীশঙ্করং গুরুবরং প্রণমামি ভক্ত্যা॥ ১॥

লোকানামভয়ঙ্কর শ্রুতিশিরোবাক্যোদ্ধৃত-জ্ঞানতঃ।
কর্ম্মাকর্ম্ম বিকারজাত কুমলং নির্ম্মূলমুন্মূলয়ন্।
নাম্নোঽস্বর্থকতামপি প্রকটয়ন্ যোজ্ঞানি-নামগ্রণীঃ।
সোঽয়ং বিশ্বনুতো মদীয়-হৃদয়ে শম্ভুঃ সমুজ্জৃম্ভতাং ২।

চার্ব্বাকাদিভিরার্য্যগর্হ্যচরিতৈঃ সম্মোহিতে ক্ষমাতলে।
কার্পণ্যেন পরিপ্লুতে নরচয়ে মিথ্যাফলান্বেষণাৎ।
স্বাংশেনাবিরভূৎ জনান্ সুখয়িতুং— যোযোগী সর্ব্বজ্ঞঃ
সোঽয়ং বিশ্বনুতো মদীয়-হৃদয়ে শম্ভুঃ সমুজ্জৃম্ভতাং ৩।

শ্রীমদ্ব্যাসমহর্ষি-নির্ম্মিত পরব্রহ্মাববোধাবহং
সূত্রাণাং নিচয়ং সুভাষ্যকলনে নালঙ্কৃতং যোবিধাৎ।
দেবৈরপ্রতিমপ্রভাবিলসিতৈঃ সানন্দমারাধিতঃ।
সোঽয়ং বিশ্বনুতো মদীয়-হৃদয়ে শম্ভুঃ সমুজ্জৃম্ভতাং ৪।

দুস্তর্কপ্রকর প্রকামবিগলৎ দানাম্বু গন্ধোৎকটান্।
বেদান্তোপবনোপমর্দ্দন দুরাধর্ষ কৃতাবুদ্যতান্।
দ্বৈতীভ-প্রবরান্ মমর্দ্দ নিতরাং যঃ সিংহবৎ নির্গতঃ।
সোঽয়ং বিশ্বনুতো মদীয়-হৃদয়ে শম্ভুঃ সমুজ্জৃম্ভতাং ৫।

যাঁহার পাদ-পদ্মের রজঃ স্মরণে হস্তস্থিত বিল্ব ফলের ন্যায় মানবদিগের অভীষ্ট-সিদ্ধি হয়, সেই নির্ম্মল, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, গুরুবর শ্রীশঙ্করকে ভক্তি সহকারে প্রণাম করি ১।

জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ যে শঙ্কর লোকদিগের অভয়দাতৃ শ্রেষ্ঠ বেদবাক্যের দ্বারা দুষ্কৃত জনিত-অজ্ঞান-সমূহকে সমূলে নাশ করত: স্বীয় নামের (অর্থাৎ শং মঙ্গল করেন যিনি এই নামের) স্বার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন, বিশ্বজনস্তুত সেই শঙ্কর আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হউন ২।

পৃথিবীস্থ মানবগণ সমস্ত সজ্জন-বিগর্হিত-চার্ব্বাকদিগের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া মিথ্যাফলান্বেষণে রত হইলে, যিনি মানবদিগকে সুখী করিবার জন্য স্বীয় অংশে আবির্ভূত হইয়া ছিলেন, বিশ্বজনস্তুত সেই শঙ্কর আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হউন, ৩।

যিনি মহর্ষিবেদব্যাস-নির্ম্মিত সূত্র সমূহকে স্বীয় রচিত-ভাষ্য দ্বারা শোভিত করিয়াছিলেন, অসীমপ্রভাবশালী দেবগণের আরাধ্য, বিশ্বজনস্তুত সেই শঙ্কর আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হউন। ৪।

যিনি কুতর্ক সমূহের দ্বারা বিগলিত মদজল, বেদান্তরূপ উপবন মর্দ্দনে নিরত, দ্বৈতবাদীরূপ গজ সমূহকে সিংহের ন্যায় আক্রমণ করিয়াছিলেন, বিশ্বজনস্তুত সেই শঙ্কর আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হউন ৫।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনরহরি শাস্ত্রী।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২০ আইন মতে রেজেষ্টারীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৮ম বর্ষ, ৮ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা। | কার্ত্তিক। | ১৩০৮ সাল, ১৮২৩ শকাব্দা।

"স্বরজ্ঞান" প্রবন্ধের প্রতিবাদ।

আমি হিন্দু-পত্রিকার একজন গ্রাহক। শ্রাবণ মাসের হিন্দু-পত্রিকায় প্রকাশিত 'স্বরজ্ঞান' নামক প্রবন্ধ-লেখকের বিরুদ্ধে আপনার নিকট আমার এক অভিযোগ আছে। প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না; কিন্তু উহাতে যে "ধান ভান্‌তে শিবের গীত" গীত হইয়াছে, তাহাই আমার প্রতিবাদের বিষয়।

আমার প্রথম প্রতিবাদ এই যে, আমার গুরুদেব শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বিনা কারণে আক্রমণ করা হইয়াছে।

প্রবন্ধকার লিখিয়াছেন—"কেহ বা যোগের 'যো' পর্য্যন্ত না জানিয়া কলিকাতা সহরে যোগে যাগে যোগের দোকান খুলিয়া আপামর সাধারণকে যোগ শিক্ষা দিতেছেন। কিন্তু প্রথমেই পঞ্চ মুদ্রা প্রণামী না দিলে যোগের দোকানে প্রবেশ করিবার যো নাই।" ইহার আমি বর্ণে বর্ণে প্রতিবাদ করিতেছি।

আমার গুরুদেব যোগ জানেন কি না এসম্বন্ধে মত প্রকাশ করা প্রবন্ধকারের নিতান্ত অনধিকারচর্চ্চা করা হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার অর্ব্বাচীনতাই প্রকাশ পাইয়াছে। আমার গুরুদেব যোগ-সিদ্ধ কৈবল্য পদস্থিত সাধু। পরলোকগত কাশীর শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার গুরু ছিলেন। আমার গুরুদেব ব্যতীত উক্ত মহাত্মার আরও কয়েক জন যোগসিদ্ধ শিষ্য উপদেশ দিয়া থাকেন। ইঁহারা সকলেই আধ্যাত্মিক সাধনে পারদ্রষ্টা। (স্বয়ং সিদ্ধ না হইলে অন্যকে উপদেশ দিবার আদেশ

লাহিড়ী মহাশয় কাহাকেও দিতেন না)। ভগবান্ স্বয়ং ইঁহাদের হৃদয়ে অবতীর্ণ থাকিয়া ইঁহাদিগকে নিমিত্ত মাত্র করিয়া আমার ন্যায় অধমগণকে উদ্ধার করিতেছেন।

এম্ ডি, এল্ এম্ এস্, এম্ এ, বি এল্, বি এ, প্রভৃতি উপাধিধারী অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি, অনেক গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ, অনেক মুন্সেফ, উকীল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি, অনেক সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিত, অনেক সাধু সন্ন্যাসী ইঁহাদের নিকট বিশেষতঃ আমার গুরুদেবের নিকট উপদেশ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। তিনি যোগে পারদ্রষ্টা কি না তাঁহার শিষ্যবর্গই তাহার প্রমাণ।

তিনি যে ভূতভবিষ্যৎ বেত্তা, সর্ব্বজ্ঞ— তিনি যে যোগ দ্বারা দুঃসাধ্য রোগ আরাম করেন, তিনি যে যোগ প্রভাবে দূর দেশ গমনক্ষম—ইহা আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়। বিশেষতঃ তিনি যে "অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং তৎপদং দর্শিতং যেন" এই লক্ষণাক্রান্ত সদ্‌গুরু তাহা আমাদের সাক্ষাৎ অনুভূতির বিষয়।

আমার গুরুদেব যে যোগের দোকান খুলিয়াছেন বলা হইয়াছে, তাহাও সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। তিনি সভায় বক্তৃতাদি করিয়া কখনও ধর্ম্ম প্রচার করেন নাই; তিনি কাহাকেও অযাচিতভাবে গায় পড়িয়া উপদেশ দেন না। তিনি স্বস্থানে আত্মানন্দে বিরাজ করিতেছেন; যে কেহ সংসার-তাপে তপ্ত হইয়া তাঁহার চরণ তলে আইসে তিনি তাহাকেই উপদেশ দিয়া শীতল করেন। পরেশ মণির ন্যায় লৌহবৎ মলিন জীবকে স্পর্শ দ্বারা স্বর্ণবৎ উজ্জ্বল শিবস্বপদ দেখাইয়া দেন।

তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আর্য্য-মিশন্-ইনষ্টিটিউশন্ নামক বিদ্যালয়কে যোগের দোকান বলা হইয়াছে। এখানে ইংরাজী (এণ্ট্রান্স্) শিক্ষার সহিত শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা পড়ান হয়। ইহাতে দোষের বিষয় কি?

তিনি যে আপামর সাধারণকে উপদেশ দিতেছেন বলা হইয়াছে, তাহা প্রকৃত বটে। ইহাই তাঁহার গৌরবের বিষয়। তিনি যদি আমার ন্যায় অধমকে না উদ্ধার করিতেন, তাহা হইলে আমাদের দশা কি হইত?

শিষ্যের নিকট যে পঞ্চ মুদ্রা গ্রহণের কথা বলা হইয়াছে, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম বলিতেছি। আমরা যে সাধনে দীক্ষিত, সেই পথের পথিক অনেক সিদ্ধ, সাধু, সন্ন্যাসী আছেন। তাঁহাদের সাহায্যার্থে এই পথে প্রথম প্রবেশ করিতে হইলে ৫৲ টাকা দিবার প্রথা আছে। আমার গুরুদেব কিম্বা অন্য কোনও উপদেষ্টা ঐ টাকা হইতে এককপর্দ্দকও গ্রহণ করেন না। ঐ টাকা সমস্তই সাধু সেবার জন্য প্রেরিত হয়। ইঁহারা শিষ্যগণের নিকট কখনও কোনও কারণে কোনওরূপে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন না।

যাহা বলা হইল তাহাতেই বোধ হয় লেখকের ভ্রান্ত-ধারণা নষ্ট হইবে। তবে যদি জানিয়া শুনিয়া সাধুনিন্দা দ্বারা স্বমাহাত্ম্য-খ্যাপনের চেষ্টা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা। 'কাঠকুড়ানী' 'রাজার মাকে ডাইন' বলিলে রাজার মা

কিছু প্রকৃত প্রস্তাবে ডাইন হয় না, কিম্বা সেই সুযোগে কাঠকুড়ানী কখনও রাজমাতার স্থানে উন্নীত হয় না।

আমার দ্বিতীয় প্রতিবাদ এই যে "রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের প্রিয় শিষ্য বিবেকানন্দস্বামী প্রমুখ সন্ন্যাসিগণের অযথা নিন্দা করা হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত সাধু মহাত্মা আছেন। ইঁহারা অনেক সৎকার্য্য করিতেছেন। ইঁহাদের অযথা নিন্দা করা হইয়াছে। ইঁহাদের নিন্দা করিয়া লেখক অন্ততঃ নিজের একদেশ দর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন।

আপনার হিন্দু-পত্রিকা ধর্ম্ম-প্রচারে উৎসর্গীকৃত। ইহা যে সাধুনিন্দার যন্ত্রস্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহাই আক্ষেপের বিষয়। প্রবন্ধটীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ সাধুনিন্দা, পাশ্চাত্য শিক্ষার নিন্দা ও স্বমাহাত্ম্যখ্যাপনে ব্যয়িত হইয়াছে। সাধুনিন্দারূপ ব্যাখ্যা দ্বারা প্রবন্ধকারের মূল আলোচ্য-বিষয় যে কতদূর সহজ বোধগম্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি না। গুরুদেবের নিকট শুনিয়াছিলাম যে "সব শেয়ালের এক ডাক" অর্থাৎ সাধুগণের মধ্যে মতভেদ হয় না। সুতরাং যিনি সাধুনিন্দা দ্বারা নিজের সাধুত্ব প্রমাণে প্রয়াসী তিনি নিশ্চয়ই নিজে অসাধু। ভবিষ্যতে যেন আর সাধুনিন্দা হিন্দু-পত্রিকায় স্থান না পায় সে বিষয়ে সাবধান হইবেন।

আমার তৃতীয় প্রতিবাদ এই যে, প্রবন্ধের আর এক স্থানে আমার গুরুদেবকে আক্রমণ করা হইয়াছে। গুরুদেব তাঁহার [illegible]ত-গীতার টীকায় লিখিয়াছেন যে, "পিঙ্গলাসাধনকারী দেবলোক পথে উত্তরোত্তর গমন করিতে করিতে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন অর্থাৎ গুণাতীতঅবস্থা প্রাপ্ত হন। সে অবস্থা হইতে তাঁহার আর পতন (অর্থাৎ সংসারে পুনরাগমন) হয় না। ইহার উপর প্রবন্ধকারের বড়ই রাগ। তিনি বলিয়াছেন যে, "ব্রহ্মলোক অনিত্য, 'কিন্তু কোন হঠাৎযোগী গীতার অনুবাদে ওস্তাদী করিয়া বলিয়াছেন যে, পিঙ্গলাসাধনকারী ইত্যাদি"। ঘরে বসিয়া মুদ্রিত পুস্তক একটু আধটু পড়িয়া যোগী সাজিলে ইহার অধিক তত্ত্ব জানিবার ও জ্ঞান লাভ করিবার উপায় নাই।" ইহারও আমি বর্ণে বর্ণে প্রতিবাদ করিতেছি। আজ বনে দৌড়াদৌড়ি করিয়া হস্ত লিখিত পুঁথি রাশি রাশি উদরস্থ করিয়া প্রবন্ধকার যে কিরূপ জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ দিতেছি। গীতার অষ্টম অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন।—

যত্রকালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতাযান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ। ২৩॥

এখানে ভগবদ্ বাক্যে স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে, এককালে অনাবৃত্তি এবং অন্য কালে আবৃত্তি (পুনরাগমন) হয়, ইহাই ভগবান্ বলিয়াছেন। তৎপরে শুনুন;—

অগ্নির্জ্যোতি রহঃশুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥২৪॥

এখানে দেখুন ভগবান্ বলিতেছেন যে, দেবযান পথগামী ব্রহ্মবিদেরা ব্রহ্ম লাভ করেন। তৎপরে আবার শুনুন;—

ধুমো রাত্রি স্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য-
নিবর্ত্ততে ॥২৫॥

এখানে ভগবান্ বলিতেছেন যে, পিতৃযান-গামী পুনরাবর্ত্তন করেন। সুতরাং দেবযান-সাধক যে পুনরাবর্ত্তন করেন না তাহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। পরিশেষে ভগবানের স্পষ্ট উক্তি শুনুন।—

শুক্লকৃষ্ণগতীহ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়াযাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥২৬॥

দেবযানগামী অনাবৃত্তি ও পিতৃযানগামী যে পুনরাবৃত্তি লাভ করে, তাহা ভগবান্ নিঃসংশয়রূপে বলিয়াছেন। এক্ষণে সম্পাদক মহাশয় দেখুন যে আমার গুরুদেবের কথা ঠিক, না প্রবন্ধকারের কথা ঠিক। গীতার উপর কে ওস্তাদী করিয়াছেন বিচার করিবেন।

গুরুদেব তাঁহার ব্যাখ্যার পোষক-ছান্দোগ্য শ্রুতি উদ্ধার করিয়াছেন; যথা— "এতেন (দেবযানেন) প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে"। অর্থাৎ দেবযানগত আর মানব আবর্ত্তে (জন্ম-মৃত্যুরূপ) প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। ইহাতেও প্রবন্ধকারের চৈতন্যোদয় হয় নাই। গুরুদেবের মতের পোষক-অনেক-শাস্ত্র-বচন উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। উদাহরণ রূপে কয়েকটী দিতেছি—

১। প্রশ্নোপনিষদ্ ১। ১০—"অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যাদিত্যমভিজয়ন্তে। এতদ্বৈ প্রাণানামায়তন মেতদমৃতমভয়মেতৎ পরায়ণমেতস্মান্ন পুনরাবর্ত্তন্ত ইতি।"

২। মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩। ১। ৬— "সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ। যেনাক্রমন্ত্যৃষয়োহ্যাপ্তকামা যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্॥"

কিছু দিন "অরণ্যে রোদন" করিয়া প্রবন্ধকার যে "স্বল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী" লাভ করিয়াছেন, তাহারই ভরসায় বুক বাঁধিয়া গীতার শ্রীভগবদ্বাক্যের বিরুদ্ধে ও শ্রুতি সমূহ বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে অতি সাহসী হইয়াছেন। গুরুদেব শ্রুতিসম্মত বাক্যই বলিয়াছেন। সাধুর বাক্য কখনও শাস্ত্র বিরুদ্ধ হয় না,—

"ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি" অসাধুর বাক্যই শাস্ত্র বিরুদ্ধ হয়।

আমার বোধ হয় সম্পাদক মহাশয়ের অসাবধানতা বশতঃই শাস্ত্রের নামে অশাস্ত্র হিন্দু-পত্রিকায় প্রকাশ হইতেছে। মহাশয় ভবিষ্যতে এ বিষয়ে সাবধান হইবেন।

আরও কিঞ্চিৎ বলিতে চাই; তাহা অনাবশ্যক হইলেও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। "আব্রহ্মভুবনাল্লোকা পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।" গীতার এই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ-বোধে অসমর্থ হইয়াই প্রবন্ধকার ভ্রমে পড়িয়াছেন। ইহার অর্থ নির্ণয় করা উচিত।

পূর্ব্বে যে সকল শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতে প্রমাণ হইয়াছে যে, ব্রহ্মলোক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন হয় না। আরও দেখুন;—"তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ।" (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৮। ২। ১৫)। আবার দেখুন;—অথৈতবোঽনস্তমপারমক্ষয্যং লোকং জয়তি যঃ পরেণাদিত্যম্।"(তৈত্তিরীয়...

ক্ষণ ৩।১১।৮)। তবে ভগবান্ কি এখানে শ্রুতি বিরুদ্ধে ও পরবর্ত্তী নিজ উক্তির(২৬ শ্লোক) বিরুদ্ধে উপদেশ দিতেছেন? তাহা কখনই নয়। তাঁহার উপদেশের তাৎপর্য্য এই যে; সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থা ও অপেক্ষাকৃত আরও নিকৃষ্টাবস্থা ব্রহ্মলোক নামে শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। যে স্থলে সাযুজ্য লাভার্থে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি বলা হইয়াছে, সেখানে বলা হইয়াছে যে, পুনরাবর্ত্তন নাই আর যেখানে অন্য অর্থে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি বলা হইয়াছে সেখানে অবশ্যই পুনরাবর্ত্তন আছে। সুতরাং ভগবানের এই উক্তির সহিত তাঁহার পশ্চাৎ উক্তির (২৬শ্লোক) কোনও অসামঞ্জস্য নাই।

এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, ব্রহ্মলোক গত ব্যক্তি সাযুজ্য লাভ না করিলেও মানব আবর্ত্তে আর প্রত্যাবৃত্ত হয় না। ব্রহ্মলোকাখ্য বিবিধ লোকে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন অর্থাৎ ভ্রমণ করে। "তেষু ব্রহ্মলোকেষু" বৃহদারণ্যকের পূর্ব্বোদ্ধৃত এই বচনে ব্রহ্মলোকাখ্য বিবিধ লোক থাকা প্রমাণিত হইতেছে। দেবযান ও পিতৃযান উভয়ের চরম গতিস্থান ভিন্ন ভিন্ন হইলেও উভয়ই প্রশ্নোপনিষদে ব্রহ্মলোক বলিয়া কথিত হইয়াছে যথা—"তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাং তপো ব্রহ্মচর্য্যং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্"। এখানে পিতৃযান রূপ চন্দ্রলোক ব্রহ্মলোক বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাহার পরেই আবার দেবযান রূপ সূর্য্যলোক ব্রহ্মলোক বলিয়া কথিত হইয়াছে। যথা;—"তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকো ন যেষু জিহ্মমনৃতং মায়া চেতি"। (প্রশ্নোপনিষদ্ ১।১৬।১৭) সুতরাং কোনও স্থলে ব্রহ্মলোক ক্ষয়িষ্ণু আবার কোথাও অক্ষয় বলিয়া কথিত হইলে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

মুণ্ডকোপনিষদ্ ১।২।৬।৭ শ্লোকে ক্ষয়িষ্ণু ব্রহ্মলোকের কথা দেখুন;—

"এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চ্চসঃ
সূর্য্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি।
প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোঽর্চ্চয়ন্ত্য
এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ॥৬॥
প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া-যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরা মৃত্যুং তে পুনরেবাপি যান্তি॥৭॥

অবার ঐ উপনিষদেই ১১ শ্লোকে অক্ষয় ব্রহ্মলোকের কথা দেখুন;—

"তপঃ শ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে
শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ।
সূর্য্য-দ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি
যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা॥১১॥

(পুরুষঃ—হিরণ্যগর্ভ ইতি)

(উদ্ধৃত শ্রুতি-বচনগুলির ভাষ্যকার-সম্মত অর্থই গ্রাহ্য)।

সুতরাং ভগবান্ ব্রহ্মলোককে প্রথমে ক্ষয়িষ্ণু বলিয়া পশ্চাৎ যে আবার অক্ষয় বলিলেন, তাহাতে অসামঞ্জস্য নাই।

কিন্তু ব্রহ্মলোক শব্দে যাহাই লক্ষিত হউক না কেন, দেবযানগত সাধক যে পুনরাবর্ত্তন করেন না, তাহা শ্রুতি সম্মত কথা। ইহার বিরুদ্ধে শাস্ত্রে কোথাও কোনও প্রমাণ নাই।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ, বি, এ।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

স্বরজ্ঞান সম্বন্ধে প্রথম-প্রবন্ধ আমি দেখিয়াই হিন্দু-পত্রিকায় প্রকাশিত করি, আমি নানাবিধ কার্য্যে বিব্রত থাকায় দ্বিতীয় প্রবন্ধ দেখিতে পারি নাই। কোনও ব্যক্তি বিশেষের নিন্দা করা হিন্দু-পত্রিকার উদ্দেশ্য নহে, প্রবন্ধ লেখকগণ ভবিষ্যতে এ বিষয়ে সাবধান হইলে আমরা সুখী হইব। কোন মত ভ্রমাত্মক বিবেচিত হইলে তাহা দেখাইবার অধিকার আমার আছে, কিন্তু তাই বলিয়া অপরকে নিন্দা করার অধিকার আমার নাই, একথা সকলেরই মনে রাখা উচিত। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় শিষ্যদিগের নিকট হইতে মুদ্রা গ্রহণ করেন এটি শুনিয়া ছিলাম, কয় মুদ্রা জানিতাম না। স্বরজ্ঞান-প্রবন্ধ, লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন যে, ৫৲ মুদ্রা না দিলে কাহাকেও যোগ শিক্ষা দেওয়া হয় না। শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় লিখিতেছেন যে, টাকা লওয়া হয় বটে, কিন্তু তাহা সাধু সেবার জন্য প্রেরিত হয়। ৮ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় না কি ঐরূপ কয় মুদ্রা লইয়া যোগ শিক্ষা দিতেন এবং তজ্জন্য অনেক লোকে অনেক কথা বলিত। যে সমুদায় সাধুর সেবা হয়, তাঁহারা কোথায়, মুদ্রা কাহার নিকট প্রেরিত হয়, কে তাহা ব্যয় করেন, কে তাহার হিসাব রাখেন, ঐ হিসাব সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত করায় বাধা কি? ইত্যাদি অনেক কথা লাহিড়ী মহাশয়ের জীবিত অবস্থায়ই উঠিয়া ছিল। এইক্ষণও শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সম্বন্ধে এইরূপ কথা উঠিয়াছে। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বাবু এই টাকা সম্বন্ধে একটি বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত করিলে, সাধারণের একটি বিশেষ উপকার হয়। যদি এ কথা বলা হয় যে, যাঁহারা টাকা দেন তাঁহাদেরই ঐ টাকা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আছে, অপরের নাই; তাহা হইলে আমাদের আর কোন বক্তব্য নাই। আমি টাকা লই বা না লই, অপরে দিউক বা না দিউক, তাহাতে আপনার কি? কিন্তু যদি বলি যে টাকায় আমার কোন অধিকার নাই, আমি দেশের উপকারার্থ উহা লই, তাহা হইলে বোধ হয়, আমার পক্ষে উহার হিসাবাদি সাধারণকে দেখানই কর্ত্তব্য।

বিষয়টি যখন প্রসঙ্গ ক্রমে উত্থাপিত হইয়াছে, তখন উহার মীমাংসা হইলে মন্দ হয় না।

"স্বরজ্ঞান" প্রবন্ধ অনেক কথার সহিত আমাদের মতের পার্থক্য আছে, কিন্তু প্রবন্ধ শেষ না হইলে আমরা কিছু বলিব না। প্রবন্ধ লেখক মহাশয়কে ইহাও অনুরোধ করি যে, তিনি যেন ব্যক্তি বিশেষকে শ্লেষ বা বিদ্রূপ না করিয়া, যদি তাহার কোন ভ্রম থাকে, তাহা শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা দেখাইয়া দেন।

প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে আমি উহা দেখিতে পাইলে নিশ্চয়ই বিদ্রূপাংশ উঠাইয়া দিতাম, এবং উহা করিতে পারি নাই বলিয়া দুঃখিত আছি। আশা করি পাঠকগণ এই অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

হিঃ পঃ সঃ।

ভাব

(বাৎসল্য)

—•:০:•—

ভাব বিশ্বের প্রাণ। এই প্রকাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডকাণ্ডে ভাবেরই বিভিন্ন জাতীয় বহির্বিকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। জগতের ভাব অব্যক্ত অপ্রকট অদৃশ্য অস্পৃশ্য, আর জাগতিক পদার্থ অথবা জগদ্ভাবের বহিঃসত্তা ব্যক্ত প্রকট দৃশ্য সম্যক্ প্রকারে গ্রহণ যোগ্য। রামকে আহ্বান করিবার যে ভাবটী অনভিব্যক্ত-অবস্থায় মনে ছিল, তাহাই উত্তেজক কারণের সাহায্যে ইন্দ্রিয়-শক্তি সমযোগে "রাম! এস" এই শ্রবণ-যোগ্য শব্দাকারে পরিস্ফুট হয়। কোনও কবির মনোভাবের অন্তবিধ অবস্থাই তাঁহার কাব্য। একটী শাখাকাণ্ড পত্রাদি প্রচুর বিশাল-বৃক্ষকে দর্শন করিলে ও যেমন তদ্দ্বারা আমরা ঐ বৃক্ষের বীজভাব পর্য্যন্ত কল্পনা করিতে পারি, সেইরূপ কবির কাব্য দেখিয়া পড়িয়া তাঁহার অন্তরস্থভাব অর্থাৎ যাহা ঐ কাব্যের অপ্রকট অবস্থা, যাহাকে সাধারণতঃ কবিহৃদয়ের কবিত্ব বলা যাইতে পারে, তাহা অনুমান করা যায়। যেহেতু ঐ ভাবই কাব্যের অসাধারণ কারণ। নিবিষ্ট-চিত্তে একখানি চারুচিত্র সন্দর্শন করিলে, তাহাতে বিশদরূপে পরিস্ফুট, চিত্রকরের মনের ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। চিত্র রচয়িতার মনের ভাব পূর্ণরূপে প্রকটিত না হইলে চিত্র সম্পূর্ণ হইতে পারে না। যতক্ষণ চিত্রে নিজের মনের ভাব স্পষ্টরূপ প্রতিভাত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্রকর আরাম পান না, যখন তুলিকায় মনের ভাবটী ফুটাইতে পারিলেন, তখনই বিরাম লাভ করিলেন, শ্রম সার্থক হইল। বালক আকুল-ক্রন্দনে কর্ণপীড়া জন্মাইতেছে। ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে। চক্ষু দুটী জলভারে কাতর! দুই একটী ধারা গণ্ডদেশ দিয়া গড়াইয়া যাইতেছে! এরূপ দেখিলে আমরা কি মনে করি? তাহার অন্তরস্থ অতৃপ্তি দুঃখ যেন সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে পরিণত হইয়া বিদ্যমান, ইহাইত মনে করি! যে দুঃখ যে অতৃপ্তি তাহার অন্তঃকরণে ভাবরূপে বাষ্পাকারে অল্পে অল্পে কম্পিত হইতেছিল, তাহারইত জল ঝড় সদৃশ পরিণতি স্বরূপ এই বাহ্যদৃশ্যটী! অধরে হাসির প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে, এ হাসি কি? আন্তরিক সন্তোষের মূর্ত্তি বিশেষইত। যে সন্তোষ ভাবাকারে অন্তরে ছিল, তাহাই বদনমণ্ডলে হাসির আকারে দেখা দিয়াছে। আবার মুখ পাংশুবর্ণ, ললাটদেশ অ কুঞ্চিত, কপোলদেশে করতল বিন্যস্ত, এ ক্লান্তদৃষ্ট নয়ন পথের পথিক হইলে চিন্তাভাব মূর্ত্তি ধারণ করিয়াই উপস্থিত এমন মনে হয় নাকি? দুরভিসন্ধিব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গী চপলচাহনী দেখিলেই বুঝা যায়, মনের কলুষভাব ব্যবহারে লোচনে বদনে আপনিই ফুটিয়া পড়িতেছে। বস্তুতঃ বলিতে গেলে জাগতিক দৃশ্য ভাবেরই প্রতিমামাত্র। যেমন প্রতিমার প্রতিপরমাণুতে সাধক প্রকৃত দেবতার উপলব্ধি করেন, তদ্রূপ ভাব গ্রহণে সমর্থ ভাবুকব্যক্তি জগতে যাবতীয় বস্তুতে ভাবেরই

অন্তঃস্রোত অনুভব করিয়া ভাবভরে গলিয়া পড়েন।

সংসার ভাবেরই প্রতিনিধি। দৃশ্য ও ভাবের পার্থক্য এই যে, ভাব সূক্ষ্ম দুর্লক্ষ্য অথচ সর্ব্বব্যাপী, আর ভাবের বাহ্যবিকাশ স্থূলগ্রাহ্য সীমাবদ্ধ সামগ্রী। ভাবের সামর্থ্যে শত শত চিত্র প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু চিত্রের সাহায্যে সেই চিত্র সম্বন্ধীয় ভাবের পরিজ্ঞান হয় মাত্র। ভাব অদৃশ্য হইলেও লক্ষ লক্ষ চিত্র ব্যাপিয়া আছে, আর চিত্র ভাবস্ফূর্ত্তি স্বরূপ হইলেও নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বিশ্ব অর্থাৎ আত্মভাবের স্থূলবিকাশ সসীম গ্রাহ্য, আত্ম-ভাব অনন্ত অসীম দুরবগাহ। যথা সামান্য স্থানে অবস্থান করেন, যথাভাবে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইতে পারে। পুত্র দৃশ্যমান ক্ষুদ্র, কিন্তু বাৎসল্য-ভাব বৃহৎ হইতেও বৃহত্তর। পুত্র যেমনই হউক না কেন, আয়-তনে সংসার অবৃত করিতে কখনও পারিবে না, পুত্রভাব কিন্তু অসংখ্য জীব জন্তুর উপর বিদ্যমান থাকিতে পারে।

এই ভাবের উদ্দীপনই ভবের উপায়। ভাবুক সাধকগণ বলেন, ভাবেই ভগবানকে লাভ করা যায়। সর্ব্বভূতে আত্মভাব অথবা সর্ব্বভূতে আত্মদর্শনই অনন্তজ্ঞানের ও অক্ষয়-ভক্তির অসীমভাণ্ডার গীতাশাস্ত্রে অধ্যাত্ম-রাজ্যের প্রধান শিক্ষা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সর্ব্বভূতে আত্মভাব আর কিছুই নহে, কেবল এই বিরাট বিশ্বের সমস্তই আত্ম-ভাবের বিকাশ মাত্র এই টুকু অবধারণ করা। মুখের হাসিতে অথবা চখের চাহ-নীতে যেমন মনের ভাব প্রকটিত; এই বিশাল সংসারের তাবদ্ বস্তুতে আত্মভাব অথবা ভগবদ্ ভাব তদ্রূপ পূর্ণরূপে প্রকাশিত। জগতের বস্তু নিচয় সেই মহাভাবের সেই ভগবদ্ভাবের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। এই টুকু ধারণা করিতে পারিলেই আত্মভাব প্রাপ্তি অথবা ভগবত্তাবাবাপ্তি সংঘটিত হয়। ভক্ত-চূড়ামণি প্রহ্লাদ সেই বিরাট আত্মভাব বা ভগবদ্ভাব বিশ্বের প্রতিপদার্থে এমন কি সেই স্ফটিক স্তম্ভেও দেখিয়াছিলেন, কাজেই সহর্ষে উৎসাহের সহিত বলিতে পারিয়া-ছিলেন "জগতের সর্ব্বত্র সেই ভগবান্ আছেন, জগৎ তাঁহার অধিষ্ঠানভূত প্রতিমা, স্ফটিকস্তম্ভে তিনি কেন থাকিবেন না! অবশ্যই আছেন।" হিরণ্যকশিপুর জ্ঞান নেত্র তখন ও উন্মীলিত হইয়া ছিল না। তিনি এই বিশ্বব্যাপী ভাবও দর্শন করিতে না পারিয়া বৃথা আড়ম্বর করিয়াছিলেন। অতএব সাধনার পথে ভাবের অভাব হইলে চলিবে না।

ভাবের সৌলভ্যসংঘটনমানসে ঐ অসীম-ভাবও সাধক কর্ত্তৃক শান্ত দাস্য বাৎসল্যাদি রূপে পরিগৃহীত হয়। অনবধা-রিত বা অনির্দ্দিষ্ট পদার্থ গ্রহণ করা কষ্ট-কর, কাজেই শ্রেণীবিভাগ করিতে হই-য়াছে। বর্ত্তমান-প্রবন্ধের আলোচ্য বাৎ-সল্যভাব। এই ভাবের রহস্য পুত্রে ভগব-দ্ভাব অথবা ভগবানে পুত্রভাব। সান্তকে অনন্ত চিন্তা করিতে সসীমকে অসীমচিন্তা করিতে পারাই আত্মভাবের প্রকৃত লক্ষ্য। ক্ষুদ্র-বটবীজ বৃহৎ বৃক্ষরূপে পরিণত ও বিস্তৃত হইতে চায়। সামান্যাকার ডিম্ব প্রকাণ্ড-প্রাণিশরীর রূপে পরিণত হ[illegible]

চেষ্টা করে। প্রকৃতপক্ষে নিপুণনেত্রে অবলোকন করিলে সংসারের সকল পদার্থের অভ্যন্তরেই ব্যাপিত্ব লাভের চেষ্টা দেখা যাইবে। ক্ষুদ্র বৃহৎ সসীম অসীম হইতে চায়, ইহাই বিশ্বের মূলতত্ত্ব। সঙ্কীর্ণতার অপনোদন এই সংসারের মজ্জাগত চেষ্টা। মহাসিন্ধু-বারিবিন্দু মন্ত্রবলে কমণ্ডলু মধ্যে আবদ্ধ, আবার সে যাহা ছিল, তাই হইতে চায়। প্রকৃতি তাহাকে সেই ভাবে অনুপ্রাণিত করে, যেহেতু চিরন্তন ভাবের সহকারিণী বই প্রকৃতির গতি আর কিছুই নহে।

সর্ব্বভূতাত্মা হওয়াই জ্ঞান, ভক্তি, ধর্ম্ম, কর্ম্ম সকলেরই মূললক্ষ্য। আমার পুত্রটীতেই যদি আমার পুত্রভাব আবদ্ধ রহিল, তবে পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বজনীন উদ্দেশ্যের দ্বার অনর্গল হইল কৈ? অপরের পুত্রেও পুত্রভাব প্রসারিত করা আবশ্যক। এই রূপে সমস্ত জগতে পুত্রভাব উপস্থিত হইলে পুত্রবাৎসল্য লাভে জগতের কিছুই বঞ্চিত হইল না। তখন মনে হইবে, জগৎ পুত্রময় বা পুত্র জগন্ময়, পুত্র ব্যতীত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই নাই, বিশ্বই যেন পুত্র রূপে উপস্থিত। এইরূপ ভাবই জগতে পুত্রগত বাৎসল্য ভাবের প্রণেতা। আমি আমার পুত্রটীকে প্রাণের সহিত ভালবাসি, যাহা কিছু সংসারের সার সুন্দর মনোহর সমস্তই যদি আমার পুত্রকে দিতে পারি, হৃদয়ের আবেগ যেন তাহা হইলে নিবৃত্ত হয়। সরস সুখাদ্য সম্মুখে উপস্থিত হইলে নিজে না খাইয়াও পুত্রকে দিতে ভালবাসি, পুত্র খাইলেই যেন নিজের পরিতৃপ্তি হয়। যদি অপরের পুত্রের উপরও এইভাব অর্পিত হয়, তবে পুত্রজ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা অনেক অপগত হয়। এই প্রসারই জগতের প্রার্থিত বস্তু। আমি পরপুত্রের কল্যাণ কামনা করি না, পরের পুত্র যদি বাৎসরিক পরীক্ষায় পুরস্কার প্রাপ্ত হয়, আমার পুত্র না পায়, তবে আমি হৃদয়বিদারি দারুণ-দুঃখশেলের আঘাতে কাতর হই। অপরের পুত্রের সৌন্দর্য্য দর্শনে আমি ব্যথিত মর্ম্মপীড়িত। সে পরের ছেলে সোনার চাঁদ হইলেও কোলে করিয়া আনন্দ পাই না, প্রাণ যেন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হয়। নিজের আবলুশ কাষ্ঠের মত মনোরম (!) বর্ণবিশিষ্ট নাসিকারন্ধ্রে কফলাঞ্ছিত পুত্রটীকেও কোলে করিয়া প্রাণের জ্বালা জুড়ায়, চব্বিশ ঘণ্টার অস্থি পীড়াপ্রদ পরিশ্রমও যেন কোন্ অজ্ঞাতলোকে পলায়ন করে। অপর বাটীর নির্ম্মলচন্দ্রকে দেখিলেও মুখের উপর অমাবস্যার অন্ধকারের আবির্ভাব হয়, আপন বাটীর অম্বর্থনামধেয় কৃষ্ণ আসিলেও আঁধার হৃদয়ে নবজ্যোৎস্নার উদয় হয়। জগতের এই মহামোহ এই অসাধারণ সঙ্কীর্ণতা বিনাশ করিবার জন্যই বাৎসল্যভাবের আবির্ভাব। পুত্রে সর্ব্বাত্মভাব অথবা সকলে পুত্রভাবই উক্ত যন্ত্রণার শান্তিবারি। শ্রীনন্দ ও শ্রীমতী যশোমতী ভগবান্‌কে পুত্রভাবে ভাবিতেন, তাঁহারা পুত্রে জগতের যাবতীয় ব্যাপার স্থাপন করিয়াছিলেন। জগতে তাঁহাদের যাহা কিছু সমস্তই পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র এই জ্ঞান হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। কৃষ্ণের অদর্শন সময়ে তাঁহারা জগৎ ভুলিয়া যাইতেন কেবল

ভাবিতেন কৃষ্ণ, কৃষ্ণই তাঁহাদের জগৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শয়নে ভোজনে জাগরণে বিচরণে স্বপনে মনে মনে কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই ভাবিতেন না। নন্দ যশোদার মনে জগতের জন্য যত টুকু স্থান ছিল; তাহা পূর্ণ করিয়াই কৃষ্ণ বিরাজমান থাকিতেন এবং নন্দের পাদুকামস্তকে বহন করিয়া বাৎসল্য-ভাবের উদার রহস্য মধুর পরিণাম জগৎকে শিক্ষা দিয়াগিয়াছেন। এ জগৎ আর কিছুতেই নমেনা দমেনা টলেনা চলেনা গলেনা, বারম্বার ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া করিতে অটল অচলভাবে দণ্ডায়মান। সংসার কেবল স্নেহে গলিয়া যায়। প্রভু ভাবে শঙ্কা, সঙ্কোচ সবই আছে। প্রভুকে যতই কেন আপন ভাবি না, তাঁহার কাছে প্রাণ খুলিতে পারি না, সখার কাছে প্রাণের কথা মনের ব্যথা বলি বটে, কিন্তু প্রতিদানের জন্য প্রাণ লালায়িত। বন্ধু যদি হৃদয়ের দ্বার আমার কাছে খুলিয়াছেন, আমি ও তাঁহার জন্য অর্গলবদ্ধ করি না, সখার জন্য ইহার অতিরিক্ত হয় না, কিন্তু বাৎসল্য ভাব বড় সুন্দর! বড় সরস! শঙ্কা নাই সঙ্কোচ নাই। গালি দিলেও কোলে করিয়া বাৎসল্য চরিতার্থ হয়, আমিত্ব কিন্তু তাহাতেই ভাঙ্গিয়া যায়। প্রাণ অকপট-স্নেহ-রসে গলিতে থাকে। একটুও আপত্তি করে না আর ভবিষ্যৎ ভাবে না! নন্দ পাদুকা-বহনের আদেশ দিতেন, যশোদা রজ্জু দিয়া বন্ধন করিতেন, বিন্দু মাত্র সঙ্কোচও ছিলনা। প্রভুকে তুমি বলিলে বিপদ্ অদূরবর্ত্তী, সখাকে বলিলেও যেন কত কি মনে উৎকণ্ঠা থাকে। এত সরল ব্যবহার করিতে বাৎসল্য ভাবেই শিক্ষা।

বাৎসল্যের বিজয়পতাকা নন্দ যশোদ প্রভৃতির কীর্ত্তিকাহিনী প্রচার করিতেছে। পুত্রে সর্ব্বাত্মভাব বা ভগবদ্ভাব তাঁহাদের যথাযথ উদিত হইয়াছিল। পুত্র সসীম সর্ব্বাত্মভাব (যাহা প্রচ্ছন্নভাবে পুত্র ভাবরূপে প্রকাশিত) উদিত হইলেই মূল উদ্দেশ্য সমর্থিত হইল। বাৎসল্য ভাব এই সর্ব্বজনীনতার পরিপোষক। যে ভাবেই হউক ভগবান্‌কে ভাবিতে পারিলে ভাবুকের ভব-যন্ত্রণা দূর হয়, কবে এ মরুভূমিতে ভাবের কুসুম ফুটিবে, ভগবান্ জানেন, তাঁহার ভাব তিনিই বুঝেন, ভবের ভাবনায় আর যেন কাতর হইতে হয় না। ভাবময়! এই টুকুই সর্ব্বান্তঃকরণে পবিত্রচরণ-প্রান্তে মনে কামনা করি।

ভক্তিকাম
শ্রী———ভারতী—
ব্রহ্মচারি-আশ্রম
যশোহর।

হিন্দু রাজা সীতারাম রায়।

২০০ দুইশত বৎসরের অধিক হইল, যশোহর জেলার অন্তর্গত মাগুরা মহকুমার অধীন মহম্মদপুর নামক স্থানে রাজা সীতারাম রায়ের রাজধানী ছিল। সীতারাম স্বাধীন রাজা ছিলেন। তাঁহার জীবনচরিত ইত্যাদি কিছুই পাওয়া যায় না, তৎকালীন মহম্মদপুরের কোন ইতিহাসও নাই। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, বাঙ্গালী কুলতিলক, পু

শ্লোক, কীর্ত্তিমান্ স্বাধীন রাজার কোন জীবন-চরিত পাওয়া যায় না। শ্রুতি পরম্পরায় অনেকটা অবগত হইবার কথা, কিন্তু দৈব-দুর্ব্বিপাক বশতঃ মহম্মদপুরে মহামারীতে জনপদটী একরূপ লোক শূন্য হইয়া যায়। সত্য-ঘটনা জানিবার কোন বিশেষ সুবিধা নাই। স্থানীয় বিশেষ অনুসন্ধানে যতদূর অবগত হওয়া যায়, তাহাই লিখিত হইল। সকলে একরূপ বলেন না। সীতারামের জীবন বৃত্তান্ত এক্ষণে উপন্যাসের ন্যায় হইয়াছে। প্রাচীন-লোকের নিকট বিশেষ অনুসন্ধানে যতদূর অবগত হওয়া যায়, তাহাই বর্ণিত হইল। যে যে স্থানে মতদ্বৈধ আছে, তাহাও লিখিয়া দেওয়া হইল।

সীতারাম উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ, তাঁহার পূর্ব্ব নিবাস রাঢ় দেশে গিধোন নামক স্থানে ছিল। তাঁহার পিতা মুরসিদাবাদের নবাব-সরকারে কার্য্য করিতেন, তিনিই এই প্রদেশের কার্য্যকারক নিযুক্ত হইয়া আসেন এবং মহম্মদপুরের উত্তর দিকে ৬। ৭ ক্রোশ দূরে জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত ভূষণা নামক স্থানেবাস করেন। মহম্মদপুরের নিকটবর্ত্তী সূর্য্যকুণ্ড গ্রামে উমা চরণ দাস নামক এক ব্যক্তি বলেন যে, তাঁহার পিতা ৺গিরীশ চন্দ্র দাস, সীতারামের প্রপৌত্র ৺রাধাকান্ত রায়ের দৌহিত্র। তিনি বলেন যে, সীতারামের পিতার নাম উদয় নারায়ণ রায়। উদয় নারায়ণের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ লক্ষ্মী নারায়ণ, কনিষ্ঠ সীতারাম। লক্ষ্মী নারায়ণ হরিহর নগরে বাস করিতেন, অদ্যাপি সেই স্থানকে রাজবাড়ী বলে। সেই বংশে [illegible]নারায়ণ রায় নামক একটী দত্তক পুত্র এক্ষণেও আছেন। সীতারামের শ্যামসুন্দর ও শূর নারায়ণ নামক দুই পুত্র থাকেন, শ্যাম সুন্দরের কোন সন্তান ছিল না। শূর-নারায়ণের প্রেমনারায়ণ নামে একটী পুত্র ছিলেন। প্রেমনারায়ণের পুত্র রাধাকান্ত রায়, তাঁহার পুত্র থাকে না, একটী মাত্র কন্যা ছিলেন, সেই কন্যার একমাত্র সন্তানই পূর্ব্বোক্ত ৺গিরিশ চন্দ্র দাস। সীতারাম উত্তর রাঢ়ীয় খাসবিশ্বাস কুলোদ্ভব ছিলেন। নিজে রাজা হইয়া রায় উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার বংশ পরিচয় ইহা অপেক্ষা আর কিছু পাওয়া যায় না। বাল্যজীবন বৃত্তান্ত ও কিছু অবগত হওয়া যায় না।

সীতারামের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করা ছিল, তাঁহার পিতার চাকুরীর সময় হইতেই তাঁহার স্বাধীন হইবার বাসনা বলবতী হয়। তিনি তখন হইতেই সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করেন। ক্রমশঃ কতকগুলি শিখ, হিন্দু-স্থানী ও পাঠান সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মহম্মদপুরে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক স্বাধীন-ভাবে রাজত্ব করেন। মহম্মদপুর একটী গ্রামের নাম নহে। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম সমূহের নামই মহম্মদপুর। যেস্থানে সীতারামের রাজধানী ছিল, তাহার নাম নারায়ণপুর। রাজবাড়ীকে সাধারণ লোকে মামুদপুরের রাজার বাড়ী বলিয়া থাকে।

কথিত আছে যে, সীতারামের প্রতিষ্ঠিত ৺দশভূজার বাটির নিকটে মহম্মদ আলি নামে একটি ফকিরের একটি আশ্রম ছিল, উক্ত ফকির একজন উত্তম সাধক ছিলেন। সীতারাম বাড়ী প্রস্তুত করিবার সময়ে উক্ত

ফকিরকে স্থানান্তরে যাইতে বলেন। ফকির সীতারামের ভবিষ্যৎ অবস্থা জানিতে পারিয়া সন্তুষ্ট-চিত্তে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ, করিয়া অন্য স্থানে গমন করেন এবং সীতারামকে তাঁহার নামানুসারে নগরের নাম করণ করিতে অনুরোধ করেন। সীতারাম ফকিরকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন এবং ফকিরের নামানুসারে রাজধানীর নাম মহম্মদপুর রাখেন। সীতারাম তাঁহার রাজধানীর নিকটস্থ অনেকগুলি গ্রামের নাম দেবতা-দিগের নাম-অনুকরণে রাখেন, উক্ত ফকিরের কবর-স্থান অদ্যাপি মহম্মদপুরে দৃষ্ট হয়। মহম্মদপুরের বর্ত্তমান-অবস্থা অতীব শোচনীয়। এই অবস্থা দেখিলে সহজে অনুমিত হয় যে, সীতারাম পুণ্যাত্মা, উদারচেতা ও স্বধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। ভূষণায়ও তাঁহার একটী রাজধানী ছিল। তথায় তাঁহার একটী সেনানিবেশ ছিল। এক্ষণে ঐ বাড়ী ইত্যাদি জঙ্গলময় হইয়া রহিয়াছে। মেনাহাতী ও হামলাবাঘ নামক তাঁহার দুইটী প্রধান সেনাপতি ছিল। ইহাদিগের অন্য কি নাম ছিল তাহা অপ্রকাশিত। সীতারাম তাহাদিগকে এই নামে আহ্বান করিতেন। মেনাহাতী সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বীর ছিলেন, তাঁহারই ভুজবলে সীতরাম এতদূর উন্নতি সাধন করেন। ইনি জাতিতে শিখ ছিলেন। রাজধানীর মধ্যে অনেক হিন্দু-স্থানীর বাস ছিল, অদ্যাপি সে স্থানকে কায়েপটী বলে। এক্ষণেও ৮।১০ ঘর রাজপুত ও তাহাদের পুরোহিত-কাম্বকুব্জ দেশীয় ব্রাহ্মণের বাস আছে। উক্ত রাজপুতদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা সীতারামের সৈনিক শ্রেণী ভুক্ত ছিল। রাজধানীর অন্তর্গত ঘুষইচ গ্রামে কতকগুলি পাঠানের বাস আছে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণও সীতারামের সৈনিক শ্রেণীভুক্ত ছিল এরূপ প্রকাশ। তিনি যুদ্ধার্থ অস্ত্র শস্ত্র স্বীয় রাজধানীতে প্রস্তুত করিতেন, রাজধানীতে কর্ম্মকার পটী বলিয়া একটী স্থান আছে, তথায় অনেক কর্ম্মকারের বাস ছিল। ১৮৩৬ সালে মহামারীতে এ স্থানের অধিকাংশ লোকই কালের করালকবলে পতিত হয়, শেষে অবশিষ্ট সকলে স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের পাকাবাড়ী ইত্যাদি জঙ্গলময় হইয়া রহিয়াছে।

সীতারামের রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপিও আছে। অট্টালিকাদি অধিকাংশ ভগ্ন হইয়া স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে, স্থানে স্থানে দেওয়ালগুলি কতকটা ভাল আছে। বাড়ীটী ভয়ানক জঙ্গলে আবৃত হইয়াছে। তথায় যাওয়াও কঠিন, যাইতেও সহসা কাহারও সাহস হয় না। রাজবাড়ীর পার্শ্বে তাঁহার নির্ম্মিত গড় অদ্যাপি আছে।

সীতারামের রাজত্ব সময়ে এই রাজধানীতে সমস্ত জাতিরই বাস ছিল। অনেক ধনী ও জ্ঞানী লোক ছিলেন। বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ যথেষ্ট ছিলেন এবং এই স্থান একটি বিদ্বৎ-সমাজ বলিয়া পরিগণিত ছিল। তিনি মহম্মদপুরের অনেক উন্নতি সাধন করিয়া যান। তিনি তাঁহার রাজ্যের মধ্যে বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণদিগকে ব্রহ্মোত্তর ও দেবসেবার জন্য অনেক লোককে দেবোত্তর সম্পত্তি দান করিয়া অক্ষয়পুণ্যসঞ্চার ও চিরকীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, অদ্যাপি

সে সমস্ত তাহাদের উত্তরাধিকারিগণ ভোগ দখল করিতেছেন। সীতারাম-প্রদত্ত সনন্দও তাঁহাদের নিকট আছে। ন্যায়বান্ বৃটীশ গভর্ণমেন্ট সেই সমস্ত সম্পত্তি খাস করেন নাই, সীতারামের সেই সনন্দ দেখিয়া জমি নিষ্কর বন্দোবস্ত ঠিক রাখিয়াছেন সীতারাম উদারচিত্তে যাচকের যাচ্ঞা পূর্ণ করিতেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে যাহাতে প্রজার কোন কষ্ট না হয়, সর্ব্বদা সেইরূপ চেষ্টা করিতেন। তিনি জল-কষ্ট নিবারণের জন্য মহম্মদপুরে রামসাগর, সুখসাগর, কৃষ্ণসাগর প্রভৃতি বহু সংখ্যক জলাশয় খনন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রাজ্যের মধ্যে অন্যান্য অনেক স্থানে ও তিনি অনেক জলাশয় খনন করিয়া গিয়াছেন। জলাশয়ই তাঁহার একটী প্রধান কীর্ত্তি। প্রবাদ আছে যে, জলাশয় খননের জন্য তাঁহার সহিত সর্ব্বদা ২২০০ দ্বাবিংশ শত লোক থাকিত। যেখানে জল কষ্ট শুনিতে বা বুঝিতে পারি-তেন, তথায় জলাশয় খনন করাইতেন। মহম্মদপুরে অনেক পুষ্করিণী রহিয়াছে। শুনা যায় যে, কোন গৃহস্থের জলের জন্য অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় নাই। এই সমস্ত জলাশয়ের মধ্যে মহম্মদপুরের রামসাগর অত্যন্ত প্রধান দীর্ঘিকা, সম্ভবতঃ এরূপ সুবৃহৎ দীর্ঘিকা যশোহর জেলায় আর নাই, অন্যান্য জেলায়ও খুব কম থাকিতে পারে। বর্ত্তমান সময় মহম্মদপুরে জলকষ্ট নিবারণের এই এক মাত্র জলাশয় রহিয়াছে। অন্যান্য পুষ্করিণীর মধ্যে কতকগুলিতে জল থাকে না, কতকগুলির জল খারাপ হইয়া যায়। রামসাগরের জলে অনেক লোকের উপকার হইতেছে। এই জলাশয়ের জন্য প্রত্যহ লোকে মহাত্মা সীতারামের নাম স্মরণ করিতেছে ও তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দিতেছে। রামসাগরে প্রতিবৎসর ৺ দশহরা স্নানের দিন ৺ গঙ্গা পূজা হইয়া থাকে এবং অনেক দূরের লোকে গঙ্গাস্নান ফল-কামনায় এখানে স্নান করিয়া থাকে। ইহার উত্তর-তীরে মহম্মদপুর-পোষ্ট আফিস স্থাপিত। কৃষ্ণ সাগরের জলে ধূসাইল বা ধোয়াইল ও তন্নিকটবর্ত্তী ৩। ৪ ক্রোশের লোকের উপকার হইতেছে। কৃষ্ণসাগরও খুব বড় পুষ্করিণী। তাহার জল ও ভাল থাকে। সুখসাগরের জলে কোন উপকার হয় না। তিনি এই সুখসাগরে পুষ্করিণীর মধ্যে অট্টালিকা প্রস্তুত করাইয়া তহাতে গ্রীষ্মকালে সপরিবারে বাস করি-তেন। এক্ষণে সেই অট্টালিকা ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, তদুপরি বৃক্ষাদি জন্মিয়াছে, চতু-র্দ্দিকে জল রহিয়াছে।

তিনি মহম্মদপুরে রাজবাড়ীর উপরে ৺দশভূজা ও ৺লক্ষ্মীনারায়ণ, রাজধানীর অন্তর্গত কানাইনগরে ৺হরেকৃষ্ণ রায় (শ্রী শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি) ও তাহার অনতিদূরে ৺ গোপাল পুরে ৺ বুড়াশিব স্থাপনা পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। প্রত্যেক বিগ্রহের স্বতন্ত্র মন্দির ও প্রাঙ্গণ আছে। মন্দিরগুলি দেখিতেও অতি মনোহর। তিনি এই সমস্ত বিগ্রহের সেবার জন্য অনেক ভূমি নিষ্কর বৃত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। অদ্যাপি সেই সম্পত্তি হইতে মন্দিরে রীতিমত দেবসেবা, দুর্গোৎসব, শ্যামাপূজা, রাস, রথ, দোলযাত্রা ইত্যাদি সমস্ত পর্ব্বই সম্পাদিত হইতেছে।

পূর্ব্বে খুব সমারোহের সহিত সমস্ত-পর্ব্ব হইত, এক্ষণে অনেকটা কমিয়া গিয়াছে, তিনি আরও অনেক দেবমন্দির ও দেব-মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া যান, তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট কোন বৃত্তি না থাকায় সেবা বন্ধ হইয়া যায়, এক্ষণে তাঁহাদের কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। দুই একটী ভগ্ন মন্দির দৃষ্ট হয় মাত্র। এক্ষণে উপরি উক্ত বিগ্রহগুলির সেবাইত নাটোরের বড় তরফের মহারাজা।

৺লক্ষ্মীনারায়ণের বাড়ীর উত্তর দিকে একটী পুষ্করিণী আছে, উক্ত পুষ্করিণীর নিম্নদেশ হইতে চারিধার সমস্তই ইষ্টক দিয়া পাকা করিয়া বান্ধান। প্রবাদ আছে যে, উক্ত পুষ্করিণী সীতারামের গুপ্ত-কোষাগার ছিল, তিনি অনেক সময় ইহার মধ্যে ধনরত্নাদি রাখিতেন। এই পুষ্করিণীতে এক্ষণও সকল সময় জল থাকে; অনেক-লোকে স্নানাদি করেন। দেবসেবা অদ্যাপিও রীতিমত চলিতেছে, দ্বিপ্রহরে অন্ন ও রাত্রিতে রুটি পায়স ইত্যাদি ভোগ প্রত্যহ দেওয়া হয়। এই ভোগের প্রসাদ অতিথিদের পাইবার ব্যবস্থা আছে। পুণ্যশ্লোক সীতারামের উদ্দেশ্য ছিল যে, মহম্মদপুরে অতিথিগণের কোন কষ্ট না হয়। তিনি সেইরূপ ভোগেরও বন্দোবস্ত করিয়া যান, ভোগের বন্দোবস্ত পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছে, তথাপি যথেষ্ট অতিথির উদর পূর্ণ হইতেছে, ৺দশভুজার বাড়ীতে রীতিমত দুর্গোৎসব, শ্যামা পূজা ইত্যাদি ও ৺লক্ষ্মীনারায়ণ ও ৺হরেকৃষ্ণ রায়ের বাড়ীতে রীতিমত রথ, ঝুলন, রাস, গোষ্ঠ দোলযাত্রা ইত্যাদি সমস্ত পর্ব্বই রীতিমত হইয়াথাকে সমস্ত ব্যয়ই মহাত্মা সীতারাম-দত্ত সম্পত্তি-আয় হইতে চলিতেছে। পরে নাটোরের সুপ্রসিদ্ধ দয়াময়ী দ্বিতীয়া অন্নপূর্ণা ৺রাণী ভবানী মহম্মদপুরে শ্রীরাম চন্দ্র ও কানাই নগরে বলরামজী স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের ঐরূপ পূজা ও ভোগ চলিতেছে। উক্ত মহারাণী কৃত একটী গড় এখানে রহিয়াছে। সীতারামের স্থাপিত-দেবমন্দিরগুলি ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। স্থানগুলিও অত্যন্ত জঙ্গলময় হইয়া উঠিয়াছে। ৺দশভুজা, লক্ষ্মীনারায়ণ ও হরেকৃষ্ণ রায়ের ৩ তিনটী মন্দিরে তিনটী সংস্কৃত কবিতা পাথরে খোদা আছে, উক্ত তিনটী কবিতা নিম্নে লিখিত হইল।

৺দশভুজার মন্দিরে

১ ২ ৬ ১

১। মহী ভুজ রস ক্ষৌণী শকে দশভুজালয়ং
অকারি শ্রীমতা সীতারাম রায়েন মন্দিরং॥

৺লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরে

৬ ২ ৬ ১

২। লক্ষ্মীনারায়ণ স্থিতৈ্য তর্কাক্ষিরসভূশকে
নির্ম্মিতং পিতৃ পুণ্যার্থং সীতারামেন মন্দিরং॥

৺হরেকৃষ্ণরায়ের মন্দিরে

৫ ২ ৬ ১

৩। বাণ দ্বন্দ্বাঙ্গ চন্দ্রৈঃ-পরিগণিত শকে কৃষ্ণ-
তোষাভিলাষী
শ্রীমদ বিশ্বাসখাসোদ্ভব কুল কমলোল্লাসকো-
ভানুতুল্যঃ
ভ্রাজৎশিম্নৌষযুক্তে রুচিররুচিহরে কৃষ্ণগেহং
বিচিত্রং
শ্রীসীতারাম রায়ো যদুপতি নগরে ভক্তি-
মানুৎ সসর্জ্জ॥

কবিতা তিনটীতে প্রমাণ পাওয়া

যাইতেছে যে, সীতারাম কর্ত্তৃক ৺দশভুজার মন্দির ১৬২১, লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির ১৬২৬ ও হরেকৃষ্ণ রায়ের মন্দির ১৬২৫ শকে স্থাপিত হয়। শ্লোকাঙ্কিত-প্রস্তর তিন খণ্ডের মধ্যে ২ দুই খণ্ড ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। ৺হরেকৃষ্ণ রায়ের বাড়ীর প্রস্তরখণ্ড অট্টালিকা হইতে স্খলিত হওয়ায় মহম্মদপুরের ৺বৃত্তির কাছারীতে রহিয়াছে। উক্ত প্রস্তরখণ্ড অপরিষ্কার থাকাতে সমস্ত পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় না, সুতরাং কবিতাগুলি শুনিয়া লিখিত হইল। এখানে কয়েক জন ভদ্রলোকের উক্ত শ্লোকত্রয় কণ্ঠস্থ আছে।

সীতারাম ১৪ বৎসর রাজত্ব করেন। নিজে সামান্য-অবস্থা হইতে রাজত্ব লাভ করেন। সুতরাং অনেক সময়ে রাজ্যের সুবন্দোবস্ত ও শাসন-প্রণালী ইত্যাদি চিন্তায় কাটাইতে হইত। এরূপ অল্পসময়ের মধ্যে তিনি যে অনেক-কীর্ত্তি স্থাপনা করিয়াগিয়াছেন, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে। তাঁহার কীর্ত্তিআদি দর্শন করিলে এবং তাঁহার সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিলে স্বভাবতঃ মন ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা-রসে আপ্লুত হয়।

সীতারাম বিলাসী ছিলেন। সুখসাগর তাঁহার বিলাসিতার প্রধান পরিচয়। রাজধানীর অনতিদূরে চিত্তবিশ্রাম বলিয়া একটী গ্রাম আছে, উক্ত গ্রামের নিম্নে পশ্চিম দিকে তখন ছত্রাবতী নদী প্রবাহিত ছিল, এক্ষণ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, বর্ত্তমানে উহার প্রায় ১ মাইল পূর্ব্বে মধুমতী নদী প্রবাহিত আছে। উক্ত গ্রামের স্বাভাবিকশোভা অতি মনোহর ও শান্তিপ্রদ ছিল বলিয়া, তিনি উক্তগ্রামের নাম চিত্তবিশ্রাম রাখেন, অনেক সময়ে তিনি তথায় থাকিতেন। বর্ত্তমান সময়ে উক্ত গ্রামে কতকগুলি মুসলমানের বাস, তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হওয়া যায় যে, তথায় সীতারামের একটী বাড়ী ছিল, এক্ষণ তাহার কিছুই নাই। এতদ্ব্যতীত মহম্মদপুরের নিকট শ্যামগঞ্জ, সূর্য্যকুণ্ড ও হরিহরনগরে তাঁহার বাড়ী অদ্যাপি আছে। সীতারাম বিলাসী ছিলেন কিন্তু ধর্ম্মাতিক্রম করিতেন না। তিনি কোন ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্য করিয়াছেন এরূপ শুনা যায় না, বস্তুতঃ এরূপ পবিত্রচেতা পুণ্যাত্মার চরিত্রে কোন দোষ থাকা সম্ভব নহে, প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি নির্ম্মল চরিত্র নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। অজ্ঞলোকেরা তাঁহার চরিত্রে দোষারোপ করিতে পারে, কিন্তু তাহা মিথ্যা। জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান্‌ লোকে কেহ এরূপ বলেন না।

সীতারামের রাজ্য সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। কেহ বলেন যে, তিনি প্রথমে নবাবের কার্য্যকারক "রায় রহিয়া" হইয়া আসেন, ক্রমশঃ নিজে সমস্ত অধিকার করিয়া স্বাধীনতা গ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলেন যে, নবাব সীতারামের উপর বিশেষ কোন কারণে সন্তুষ্ট হইয়াই হউক, অথবা এ প্রদেশ অনাবাদী জঙ্গলময় থাকাতে কয়েক বৎসরের জন্য জায়গীর স্বরূপ সীতারামকে এ প্রদেশ ভোগ দখল করিতে দেন, শেষে নবাবের সহিত বন্দোবস্ত করিবার কথা ছিল, কিন্তু সীতারাম ইত্যবসরে সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক স্বীয় অধিকার বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন, এইরূপে ক্রমশঃ অধিকার স্থাপনা করিয়া

নবাবের অধীনতা স্বীকার না করিয়া স্বাধীন-ভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। শেষে, নবাব সমস্ত জানিতে পারিয়া সীতারামের বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকেন। কয়েক বার যুদ্ধ ঘটে, কিন্তু সীতারাম নবাব-সেনাদিগকে পরাস্ত করিয়া জয় লাভ করেন। নবাবের জামাতা আবুতারা একবার সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া আসেন। ভূষণায় নবাবের সেনা নিবেশ ছিল, তথায় তিনি থাকিয়া সাধারণ লোকের উপর অনেক অত্যাচার করেন। সীতারাম তাহার অত্যাচারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার মস্তক কাটিয়া আনিতে আদেশ প্রদান করেন। তাঁহার আদেশ পাইয়া তদীয় সেনাপতি মেনাহাতী যুদ্ধে আবুতারাকে পরাস্ত করিয়া তাহার মস্তক কাটিয়া সীতারামের সমীপে আনয়ন করেন। নবাব ইহাতে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া সীতারামের বিরুদ্ধে বহুসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করেন। সীতারাম ও মেনাহাতীর যুদ্ধ কৌশল অত্যন্ত বেশী থাকায়, নবাব-সৈন্য যুদ্ধে পরাস্ত হন। মেনাহাতী থাকিতে সীতারামকে পরাস্ত করা সহজ-সাধ্য নয়, মনে করিয়া নবাব পক্ষ হইতে তাঁহার বিনাশ সাধনের চেষ্টা করা হয়। মেনাহাতীকে সম্মুখ-সমরে পরাস্ত করা দুঃসাধ্য, এজন্য নবাব পক্ষ হইতে একটী সৈনিক গোপনে ছদ্মবেশে রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া গুপ্তভাবে মেনাহাতীকে হত্যা করে। মেনাহাতীর সমাধি অদ্যাপি মহম্মদপুরে আছে। অপর সেনাপতি রামানাবাঘার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। মেনাহাতীকে যখন গোপনে হত্যা করা হয়, তখন নবাব-সেনা ভূষণায় শিবির সন্নিবেশ করিয়া থাকে এবং সীতারামের সৈন্য ঠিক সেই সময়ে যুদ্ধার্থ ভূষণাভিমুখে যাত্রা করে, এদিকে মহম্মদপুরে মেনাহাতীকে নবাব-সেনা গুপ্তভাবে হত্যা করে, সৈন্যদের শ্রেণী ভঙ্গ হইবে বলিয়া সীতারাম তখন এই হত্যা-সংবাদ প্রকাশ করেন না, অন্য সৈন্যাধ্যক্ষ পাঠাইয়া অতিশয় বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া নবাব-সৈন্যকে সে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। মেনাহাতীর মৃত্যুতে সীতারাম একেবারে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়েন। অপরদিকে নবাবসৈন্য মেনাহাতীর হত্যাসংবাদে উল্লাসিত হইয়া হঠাৎ সীতারামের মহম্মদপুরের রাজধানী অবরোধ করেন। তখন সীতারামের অধিকাংশ সৈন্য ভূষণায় ছিল। সৈন্যসংখ্যাও তত বেশী ছিল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া সীতারাম অল্পসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে নবাবসেনার সম্মুখীন হন। অবশেষে নবাবসেনা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সীতারামকে বন্দী করিয়া মুরসিদাবাদে নবাব গোচরে লইয়া যায়।

সীতারাম মুরসিদাবাদে নীত হইলে নবাব স্বয়ং তাঁহার বিচারের ভার গ্রহণ করেন। তথায় মণিরাম রায় নামক একটী উকীল সীতারামের অনুকূলে তর্ক বিতর্ক করেন। বিচারকালে সীতারাম নবাবের সম্মুখে উপস্থিত থাকেন। নবাব কিছু কর্কশ-ভাবে সীতারামের সহিত ব্যবহার করেন। বীরের হৃদয়ে তাহা অসহ্য, তিনি তাহাতে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হন। প্রবাদ আছে যে, যবনের অধীনতা স্বীকার অপেক্ষা মৃত্যুই শতগুণে

শ্রেয়ঃ এই বিবেচনায় স্বাধীনচেতা মহাত্মা সীতারাম নিজ অঙ্গুরী সহিত বিষাক্ত-অঙ্গুরী চুষিয়া নিজের জীবন নিজেই নাশ করেন। কেহ কেহ বলেন যে, উক্তযুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তিনি মহম্মদপুরে আত্মহত্যা করেন; কিন্তু তিনি মুরসিদাবাদেই আত্মহত্যা করেন, অধিকাংশ লোকেই এইরূপ বলে। সম্ভবতঃ তিনি ঢাকাতেই নীত হয়েন, কারণ এই সময়েও ঢাকায় বাঙ্গালার রাজধানী ছিল, ইহার দশ বৎসর পরে মুর্শিদাবাদ বঙ্গের রাজধানী হয়।

এরূপ প্রবাদ আছে, সীতারামের আত্মহত্যার সংবাদ শ্রবণে নবাব অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহার উত্তরাধিকারীকে তদীয় রাজ্য বন্দোবস্ত করিয়া দিবার আদেশ প্রদান করেন। এ দিকে নাটোর রাজ-বংশের আদি পুরুষ রঘুনন্দন তখন নবাব-সরকারের প্রধান কার্য্যকারক ছিলেন। তিনি নাকি এই জমিদারী স্বয়ং বন্দোবস্ত করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে সীতারামের মৃত্যুর পরেই মহম্মদপুরে লোক পাঠাইয়া ঘোষণা করিয়া দেন যে, নবাব সীতারামকে হত্যা করিয়াছেন এবং আদেশ করিয়াছেন যে, সীতারামের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সমস্তই মুরসিদাবাদে লইয়া হত্যা করিবেন। তচ্ছ্রবণে সীতারামের স্ত্রী পুত্রাদি সকলে নৌকারোহণে জলমগ্ন হইয়া আত্মঘাতী হন। তাঁহার বংশে কেহই জীবিত থাকেন না, এইরূপ প্রকাশ। কিন্তু ইহাও পাওয়া যাইতেছে যে, তাঁহার পুত্র শূরনারায়ণ জীবিত ছিলেন। শূরনারায়ণের পুত্র প্রেমনারায়ণ, ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব যশোহরের ইতিবৃত্তে প্রেমনারায়ণকেই সীতারামের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামসুন্দর ও অন্যান্য পরিবার-বর্গ আত্মহত্যা করেন; শূরনারায়ণ লুক্কায়িত অবস্থায় থাকেন। তিনি জীবিত না থাকিলে এরূপ বংশপরিচয় পাওয়া যাইত না। সূর্য্যকুণ্ড নিবাসী উক্ত উমাচরণ দাস মহাশয়কে মহম্মদপুর অঞ্চলের সকলেই সীতারামের দৌহিত্র-বংশীয় বলিয়া থাকেন। সীতারামের পুত্র শূবনারায়ণ জীবিত ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। রঘুনন্দন সীতারামের বংশে কেহই নাই বলিয়া স্বীয় ভ্রাতা রামজীবনের নামে সীতারামের সমস্ত সম্পত্তি বন্দোবস্ত করিয়া লন। সেই হতে এ দেশ অর্থাৎ ভূষণা প্রদেশ নাটোর রাজার অধীন হয়; শেষে ঐ বংশের রাজা ৺রামকৃষ্ণ রায় বাহাদুরের সময় এখানকার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রীত হওয়ায়, অন্যান্য জমিদারগণ খরিদ করেন। এক্ষণ মহম্মদপুরে নাটোরের বড় তরফের মহারাজের কেবল সেবাইতী স্বত্ব মাত্র আছে। সীতারাম তৎপ্রতিষ্ঠিত দেবতাদিগের যে বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছিলেন, সেই সম্পত্তি তাঁহার অধীনে আছে। তদ্দ্বারা সেবা আদি চলিতেছে।

জনশ্রুতিপরম্পরায় এরূপ অবগত হওয়া যায় যে, যখন ব্রিটীশগভর্ণমেণ্ট ভূষণা বন্দোবস্ত করেন, তখন সীতারাম-প্রদত্ত নিষ্কর ভূমির সনন্দ দেখিয়া ও তদ্বিবরণ অবগত হইয়া প্রকাশ করেন যে, সীতারামের উত্তরাধিকারী কেহ থাকিলে, তাঁহার সহিত জমিদারী বন্দোবস্ত করা হইবে এবং একটী সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া আদেশ করেন যে, এই

নিরূপিত সময়ের মধ্যে তাঁহার উত্তরাধিকারী কেহ থাকিলে, উপস্থিত হইবেন। তখন সীতারামের সম্পত্তি নাটোরের রাজার হাতে ছিল; তখন ৺রাণী ভবানী রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। এরূপ শুনা যায় যে, সীতারামের পৌত্র প্রেমনারায়ণ তখন জীবিত ছিলেন; ৺রাণী ভবানী প্রেমনারায়ণকে তখন নাটোর লইয়া যাইয়া যত্নপূর্ব্বক রাখেন। প্রেমনারায়ণ গভর্ণমেণ্টের আদেশ অবগত ছিলেন না। নির্দ্ধারিত সময় অতিবাহিত হইলে ৺রাণী ভবানীই সমস্ত সম্পত্তি গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বন্দোবস্ত করিয়া লন; প্রেমনারায়ণকে দৈনিক ১৲ এক টাকা ভাতা দিবার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার কোন কষ্ট না হয়, এরূপ কিছু সম্পত্তি তাঁহাকে বন্দোবস্ত করিয়া দেন এবং তাঁহার চাকর ইত্যাদির আবশ্যক বলিয়া তদুপযুক্ত কতকগুলি লোককে কিছু চাকরা জমি দিয়া তাঁহার কার্য্য করিতে আদেশ দেন। শেষে নাটোরের জমিদারী বিক্রীত হইলে সে বন্দোবস্ত আর থাকে না। প্রেমনারায়ণ সূর্য্যকুণ্ডে বাস করিতেন, অদ্যাপি তাহাকে রাজবাড়ী বলে। প্রেমনারায়ণ সম্বন্ধে এই ঘটনা কতদূর সত্য, তাহা জানা যায় না। সীতারামের দৌহিত্র-বংশীয় উল্লিখিত উমাচরণ দাস মহাশয়ের নিকট শুনিয়া লেখা হইল। অদ্যাপি সেই বাড়ী ও কিছু সম্পত্তি উক্ত দাস মহাশয়ের দখলে আছে। সীতারামের পুত্র শূরনারায়ণ জীবিত ছিলেন, তাহা নিশ্চিত বোধ হয়। তিনি শেষে সামান্য সম্পত্তি লইয়া সূর্য্যকুণ্ডে বাস করিতেন। বর্ত্তমানে সীতারামের বংশে কেহই নাই, কেবল উক্ত উমাচরণ দাস মহাশয় আছেন; তাঁহারও সন্তানাদি কিছুই নাই।

শ্রীবরদাকান্ত দেব।

(ক্রমশঃ)

বেদান্ত-সূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

[৮ম ও ৯ম]

১ম অধ্যায়। ৩য় পাদ।

১। দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ।
২। মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ।
৩। নানুমানমতচ্ছব্দাৎ।
৪। প্রাণভৃচ্চ।
৫। ভেদব্যপদেশাৎ।
৬। প্রকরণাৎ।
৭। স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ।
৮। ভূমাসম্প্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ।
৯। ধর্ম্মোপপত্তেশ্চ।
১০। অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ।
১১। সা চ প্রশাসনাৎ।
১২। অন্যভাব ব্যাবৃত্তেশ্চ।
১৩। ঈক্ষতি কর্ম্মব্যপদেশাৎ।
১৪। দহর উত্তরেভ্যঃ।
১৫। গতি শব্দাভ্যাং তথাহি দৃষ্টং লিঙ্গঞ্চ
১৬। ধৃতেশ্চ মহিম্নোঽস্যাস্মিন্ন পলব্ধেঃ

১৭। প্রসিদ্ধেশ্চ।

১৮। ইতর পরামর্শাৎ স ইতি চেন্নাসম্ভবাৎ।

১৯। উত্তরাশ্চেদাবির্ভূত স্বরূপস্তু।

২০। অন্যার্থশ্চ পরামর্শ।

২১। অল্পশ্রুতেরিতি চেত্তদুক্তম্।

২২। অনুকৃতেস্তস্য চ।

২৩। অপি চ স্মর্য্যতে।

১। 'স্ব' শব্দের প্রয়োগ হেতু স্বর্গ-পৃথিবী প্রভৃতির অধিষ্ঠান উক্ত হওয়ায়, তদ্দ্বারা ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

২। মুক্ত পুরুষেরাই সে স্থান প্রাপ্ত হন, ইহার উল্লেখ থাকাতে, তদ্দ্বারা ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

৩। স্বর্গ-পৃথিবী প্রভৃতি অধিষ্ঠান দ্বারা সাংখ্য-প্রতিপাদিত প্রধান সূচিত হন না; কারণ ঐ সমুদায় শব্দ দ্বারা প্রধানকে বুঝায় না।

৪। স্বর্গ-পৃথিবী প্রভৃতি অধিষ্ঠান দ্বারা জীবাত্মাকেও বুঝায় না।

৫। জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার পার্থক্য পরিব্যক্ত থাকাতেও জীবাত্মাকে বুঝায় না।

৬। প্রকরণের আলোচ্য বিষয় ব্রহ্ম হওয়াতেও জীবাত্মা বুঝায় না।

৭। ভোক্তৃত্ব ও সাক্ষীত্ব, এই দুই বিভিন্ন অবস্থার উল্লেখ থাকাতেও জীবাত্মা বুঝায় না।

৮। সম্প্রসাদ বা সুষুপ্তির অতিরিক্ত তত্ত্ব-নির্দেশ হওয়ায় "ভূমা" শব্দে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

৯। ব্রহ্মের ধর্ম্ম ও ভূমার ধর্ম্ম অভিন্নরূপে উপপন্ন হওয়ায়, 'ভূমা' পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

১০। 'অক্ষর' পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত; যেহেতু উহা আকাশ পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতেরই আধার।

১১। অক্ষরের প্রশাসনই এই আধারের হেতু।

১২। শাস্ত্রে অক্ষরকে অন্যান্য (অনিত্য) পদার্থ হইতে প্রভিন্ন করাতেও "অক্ষর" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

১৩। ঈক্ষণের বিষয় হওয়াতেও "অক্ষর" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

১৪। পরে যাহা উক্ত হইয়াছে, তদনুসারে "দহর" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

১৫। "ব্রহ্মে গতি" এবং "ব্রহ্মলোক" পদের শ্রৌত উল্লেখ থাকাতেও ব্রহ্মই প্রতিপাদিত; ইহাই একটী "লিঙ্গ" অর্থাৎ চিহ্ন।

১৬। "ধৃতি" হেতুও "দহর" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত; কারণ বিশ্ব-ধৃতি-মহিমা ব্রহ্মেই উপলব্ধ হয়।

১৭। দহরের এইরূপ অর্থ প্রসিদ্ধ থাকাতেও তদ্দ্বারা ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

১৮। জীবাত্মার উল্লেখ থাকাতেও অসম্ভবত্ব হেতু দহর পদে জীবাত্মা বুঝায় না।

১৯। পরে যাহা উক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভিন্নত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

২০। "জীবাত্মা" পদের অভিপ্রেত অর্থ স্বতন্ত্র।

২১। অল্প বা সূক্ষ্মাকাশ পদে বিশ্ব-

ব্যাপী ব্রহ্মতত্ত্ব বোধ-জনিত অনুপপত্তি-আশঙ্কার উত্তর পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে।

২২। ব্রহ্মের জ্যোতিঃস্বরূপতার অনুস্মৃতি হইতেও ব্রহ্মতত্ত্বই প্রতিপাদিত।

২৩। ঔপনিষদী স্মৃতিতেও বিশ্বজ্যোতি-ভাবে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

১ম সূত্র।—মুণ্ডকোপনিষৎ (১১—২ । ৫) বলেন,—"যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষ মোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈস্তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যাং বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ।"

স্বর্গ, পৃথ্বী, অন্তরীক্ষ আর।
অনুস্যূত সত্তায় যাঁহার॥
মনঃপ্রাণ সমস্তই যিনি।
জান তাঁরে, পরমাত্মা তিনি॥
অপর প্রসঙ্গ পরিহারে।
অমৃতের সেতু জান তাঁরে॥

ব্রহ্মই এস্থলে অভিপ্রেত, এ সিদ্ধান্ত পরিষ্কৃত। "তমেবৈকং জানথ আত্মানম্" এই বাক্যের প্রয়োগেই উহা স্পষ্টীকৃত।

"সেতু" শব্দের প্রয়োগে পদার্থান্তরের অপেক্ষা সুস্পষ্ট সূচিত হইতেছে। যাহা এক কূল হইতে অপর কূল সহ সংযোজিত হয়, তাহাই সেতু; অতএব "সেতু" এক কূল হইতে অপর কূলরূপ পদার্থান্তর-প্রাপ্তির অপেক্ষা সূচনা করে; কিন্তু ব্রহ্ম "অনন্তমপারম্"; তিনি আবার কোন্ সান্ত সপারের দুইপার-সংযোজক হইবেন? ফলে "সি" ধাতু-নিষ্পন্ন "সেতু" পদের প্রকৃত অর্থ সংযোজন বা একত্রীকরণ বটে, কিন্তু পারদ্বয়-সংযোজন-সেতুত্ব অবশ্য এখানে অভিপ্রেত নয়: কেবল সংযোজনত্ব বা মিলনত্বই এখানে অভিপ্রেত। অতএব যাঁহাতে জীবের অমৃতত্বসম্মিলন সংসিদ্ধ হয়, তিনিই অমৃতের সেতু। "বিধরণত্বমাত্রমত্র সেতুশ্রুত্যা বিবক্ষ্যতে ন পারবত্ত্বাদি।"

সমস্তই ব্রহ্ম। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, যেমন লবণ-সমষ্টির অন্তর্বাহ্যভেদ-বিশেষত্ব নাই; উহা মোটের উপর আস্বাদবিশেষের সমষ্টি মাত্র; তদ্রূপ ব্রহ্মতত্ত্বেরও জ্ঞেয়ত্বের অন্তর্বাহ্য-ভেদ-ভাব নাই; উহা মোটের উপর জ্ঞান-সমষ্টি স্বরূপ। যথা বৃহদারণ্যক উপনিষৎ (৭—৫। ১৩) বলিতেছেন—"স যথা সৈন্ধব-ঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ রসঘন এবৈবং বা অরেঽয়মাত্মাঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব।"

সৈন্ধব-সমষ্টিসার, নাহি তাহে যে প্রকার,
অন্তর্বাহ্য-ভেদ-বিশেষত্ব;
আস্বাদ-সমষ্টিসার; ব্রহ্মতত্ত্ব সে প্রকার,
প্রজ্ঞান-সমষ্টি মাত্র সত্য।

সমস্তই ব্রহ্ম,—অর্থাৎ "ব্রহ্মই সর্ব্বপদার্থ" বলিলে, ব্রহ্মের বহুরূপত্ব বুঝায় না; পরন্তু প্রকৃতি-রূপত্ব বুঝায়। এই প্রত্যক্ষ পরি-দৃশ্যমান বিশ্ব-প্রকৃতি ব্রহ্মেরই রূপ।

২য় সূত্র।—স্বর্গ-পৃথিবী ইত্যাদির আধার বলিতে ব্রহ্মকেই বুঝায়। স্বর্গ ও পৃথিব্যাদির সর্ব্ববন্ধ-স্খলিত মুক্ত পুরুষও ব্রহ্মতত্ত্বেই যুক্ত; অতএব মুক্তের মিলনাধিকরণ ব্রহ্মতত্ত্বগত। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।"

হৃদয়ের হয় গ্রন্থিভেদ।
হয় সর্ব্ব সংশয়ের ছেদ॥
সমস্ত কর্ম্মের হয় ক্ষয়।
পরাবর দর্শনে নিশ্চয়॥

এস্থলে "পরাবর" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য। অপিচ,—"যথাবিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ, পরাৎপরং পুরুষমুপৈতিদিব্যম্।"

নামরূপ-বিমুক্ত বিজ্ঞানবান জন।
প্রাপ্ত হন পরাৎপর পুরুষ পরম ॥

এই সমস্ত উক্তিগুলিতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্মই মুক্ত পুরুষের আশ্রয়, কিন্তু প্রধান বা অন্য কোন তত্ত্ব নহে।

৩য় সূত্র।—স্বর্গ-পৃথিবী প্রভৃতির আধারতত্ত্ব ব্রহ্ম ভিন্ন সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত প্রকৃতি কখনও হইতে পারে না; কারণ উক্ত সূত্রোক্ত শব্দেই তাহা সূচিত হইবার নহে। পরম পূত শাস্ত্র সমূহের সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, চিৎসত্তই বিশ্ব-কারণ; সুতরাং অচিৎসত্ত্ব প্রধান তাহা কিরূপে হইবে? এই চিৎসত্তই ব্রহ্ম।

৪র্থ।—জীবাত্মাও সেই কারণবশেই স্বর্গ-পৃথিব্যাদির আধারতত্ত্বরূপে প্রতিপন্ন হইতে পারেন না। পবিত্র শাস্ত্র সকল ব্রহ্মকেই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বস্ব বলেন, কিন্তু জীবাত্মা চিৎসত্তা প্রভৃতি ব্রহ্ম-সমধর্ম্মিতা পাইলেও তাঁহাকে তাহা বলা হয় নাই।

৫ম ও ৬ষ্ঠ সূত্র।—অপিচ, শাস্ত্রে বলেন, একমাত্র তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া জ্ঞাত হও। এই স্থলে জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার পার্থক্য সূচিত হইতেছে। আত্মাকেই এ স্থলে 'জ্ঞেয়' এবং জীবকে 'জ্ঞাতা' বলা হইয়াছে। আত্মাই স্বর্গ-পৃথিবী প্রভৃতির আধার, কিন্তু জীব কদাচ নহে। বিশেষতঃ আলোচ্য অধ্যায়টির বিষয়ই ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। মুণ্ডকোপনিষদে (৩।১।৩) দৃষ্ট হয়,—"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।" [?] ...কে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।"—অর্থাৎ—

"হেআর্য্য! জানিলে কারে,
সমস্ত জানিতে পারে?"

যদি ঐ উক্তিটি দ্বারা জীবাত্মাকেই বুঝায়, তাহা হইলে আলোচ্য অধ্যায়ের বিষয়বিপর্য্যয় ঘটিয়া যায়। তাহা হইলে যাহা হয়, তাহা অদ্ভুত ও অসঙ্গত।

৭ম সূত্র।—বেদান্তসূত্রের ২য় পাদের প্রথম অধ্যায়ের ১১শ সূত্রের আলোচনায় যাহা ইতঃপূর্ব্বেই বিচারিত হইয়াছে, সেই মুণ্ডকোপনিষদের (৩।১।১) উক্তিই এইরূপ,—

"প্রেমেবদ্ধ পাখীদুটি সখা পরস্পর
প্রেমভরে বাস করে একবৃক্ষ-পর ॥
সে দুয়ের একটি মধুর ফল খায়।
অপরটি সাক্ষীরূপে চেয়ে দেখে তায় ॥

এই পাখীদুইটির মধ্যে ভোক্তাটি জীব ও দ্রষ্টাটি ব্রহ্ম। ব্রহ্মই আলোচ্য বিষয়ের মূলতত্ত্ব; তবে জীবাত্মার উল্লেখ কেবল অবান্তরভাবে কৃত। অতএব স্বর্গ-পৃথিব্যাদির আধারতত্ত্ব ব্রহ্ম। যদি তর্কচ্ছলে বলা যায় যে, ব্রহ্মের উল্লেখই অবান্তরভাবে কৃত হইয়াছে, তবে তাহা অসঙ্গত হয়; যেহেতু অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয় ব্রহ্মতত্ত্ব বিধায় উহার সমাধান আনুষঙ্গিক বা অবান্তর আলোচনায় কুলায়না; পরন্তু অধিকতর বিস্তৃত ও বিশদ আলোচনারই প্রয়োজন। জীবাত্মার অনুভূতি সকলেরই স্বতঃসাধারণ-পরিচিত; সুতরাং তৎসম্বন্ধে এস্থলে বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক বিধায়, উহার অবান্তর উল্লেখ আপত্তিজনক হয় নাই।

৮ম সূত্র।—ছান্দোগ্যোপনিষদের (৭।২৩।২৪)

"ভূমা"শব্দে ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য কি না, তদালোচনাই এই সূত্রের বিষয়।

নারদ সনৎকুমারের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভের প্রার্থী হইয়াছিলেন। আমরা তৎপ্রসঙ্গে নারদের প্রশ্নাবলী ও সনৎকুমারের উত্তরাবলী শাস্ত্রে দেখিতে পাই। নারদ জিজ্ঞাসিলেন,—

"ভগবন্! নামের অধিক কিছু আছে কি?"

উত্তর—"নামের অধিক বাক্য।"

প্রশ্ন—বাক্যের অধিক কিছু আছে কি?

উত্তর—"বাক্যের অধিক মন।"

এইরূপে উত্তরোত্তর প্রশ্নোত্তর-প্রবাহ চলিয়া, উহা "প্রাণ"-প্রসঙ্গে উপনীত হইল। এই "প্রাণ" হইতে অধিক আর কিছুরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই সূত্রের মূল আলোচ্য বিষয় ছান্দোগ্যউপনিষদের উক্তি এই —

"ভূমানং ভগবো বিজিজ্ঞাসে যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি, স ভূমা অথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পম্।"

হে আর্য্য! ভূমার জ্ঞান বাঞ্ছে মম মন।
যাঁহাতে দেখেনা অন্য, শুনেনা জানেনা অন্য,
যিনি পূর্ণ, ভূমা তিনি হন॥
যাহা চক্ষে দেখে অন্য, শুনে অন্য—জানে অন্য,
যে অপূর্ণ, 'অল্প' শব্দে তাহারি গণন॥

এই ভূমাবিষয়িণী উক্তির পরেই এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, আশা হইতেও প্রাণ গরীয়ান্; সুতরাং এইরূপ সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে, প্রাণই বুঝি ভূমা, যেহেতু প্রাণাপেক্ষা অধিকতর গরীয়ান্ আর কিছুরই উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, বিচার্য্য বিষয়ই ব্রহ্ম, কিন্তু প্রাণ নহে। নারদ সেই জ্ঞানই পাওয়ার প্রার্থী হইয়াছিলেন, যে জ্ঞানে "অত্যন্তদুঃখ-নিবৃত্তি" রূপ পরম পুরুষার্থ প্রাপ্তি হয়; কিন্তু (ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন) প্রাণতত্ত্ব-জ্ঞানের পরমপুরুষার্থদায়িনী শক্তির উল্লেখ কোথাও দৃষ্ট হয় না; অতএব প্রাণ কদাচ 'ভূমা' হইতে পারে না। নারদকে সনৎকুমার যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার শেষে "আশা হইতে প্রাণ অধিক" এইরূপ সিদ্ধান্ত নিষ্পন্ন হইলেই নারদ নীরব হইলেন; আর প্রশ্ন করিলেন না। তখন সনৎকুমার ব্যাখ্যা করিলেন যে, "অতিবাদী" হওয়ার উপযোগিতা কেবল প্রাণতত্ত্ব-জ্ঞানে নির্ভর করিলে, উহা অন্তঃসারশূন্য হয়; যেহেতু তত্ত্বতঃ প্রাণ স্বয়ংই মিথ্যা; এবং তৎপরে বলিলেন যে, তিনিই যথার্থ অতিবাদী, যিনি সত্যজ্ঞানসম্পন্ন। এই স্থলে নারদ একটি নবতত্ত্ব-জিজ্ঞাসার প্রচ্ছক হইলেন এবং সনৎকুমারও তাঁহাকে বুদ্ধি হইতে ভূমাতত্ত্ব পর্য্যন্ত শিক্ষা দিলেন। এই ভূমাতত্ত্ব প্রাণতত্ত্বের অতিরিক্ত শিক্ষার ভাবেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ফলিতার্থে এই উভয় তত্ত্বে পরস্পর প্রকৃত সংস্রব নাই।

সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, সম্প্রসাদতত্ত্বের পরে ভূমাতত্ত্ব উক্ত হওয়ায়, প্রাণ কদাচ ভূমা নহে। "সম্যক্ প্রসীদত্যাস্মিন্নিতি" এই অর্থে "সম্প্রসাদ" শব্দে সুষুপ্তি বুঝায়; কারণ সুষুপ্তিই সম্যক্ প্রসন্নতাপ্রদ। সুষুপ্তিকালেও প্রাণ জাগ্রত থাকে; সুতরাং এই সূত্রে "সম্প্রসাদ" শব্দে প্রাণ বুঝাইলেও ভূমা শব্দে ব্রহ্মই বুঝায়, কিন্তু প্রাণ নয়।

না; কেননা ভূমাতত্ত্ব প্রাণতত্ত্বের পরে অতিরিক্ত তত্ত্বরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

"আত্মতঃ প্রাণ" (ছাঃ উঃ ৭-২৬।১।১) প্রাণ স্বয়ংই আত্মা হইতে উৎপন্ন। আত্মাই মূল পদার্থ; আত্মা পদার্থান্তরসাপেক্ষ নহে। অতএব "ভূমার প্রতিষ্ঠা কোথায়?" নারদের এইরূপ প্রশ্নে উত্তর হইল যে,—"স্বে মহিম্নি" অর্থাৎ স্বমহিমায়। ইহাতেই সর্ব্বসংশয়ের নিরাকরণ হইতেছে। স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ভূমা সেই বিশ্বকারণ পরমাত্মা ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছুই নহে।

৯ম সূত্র।—এই সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, পবিত্র শাস্ত্রবাক্যে ভূমার যেরূপ লক্ষণাবলী বর্ণিত হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মেই সম্পূর্ণ প্রযোজ্য, অতএব ভূমাই ব্রহ্ম। "যাহাতে অন্য আর কিছুই দৃষ্ট হয় না, (ইত্যাদি ইত্যাদি,) তাহাই ভূমা" এই বাক্যের সহিত "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্ কেন কং পশ্যেৎ" (বৃঃ উঃ ৪-৫।১) এই বাক্যের তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে যে, যখন আত্মাই সমস্ত, তখন তাহাতে আর অন্য কি দৃষ্ট হইতে পারে?

ছান্দোগ্যোপনিষদের এই আলোচ্য অধ্যায়টীতে ভূমাকে আনন্দস্বরূপ বলা হইয়াছে, এবং অমৃতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্বকেও আনন্দস্বরূপ বলা হইয়াছে। অতএব লক্ষণ-বাধ্য হেতু ভূমাই ব্রহ্ম, তাহাতে সংশয় নাই।

১০ম সূত্র—এ সূত্রের বিচার্য্য এই যে, বৃহদারণ্যক উপনিষদের (৩—৮।৭।৮) উক্ত "অক্ষর" শব্দে অবিনাশী ব্রহ্মকে বুঝায় বা অক্ষর শব্দেই বাচ্য অ-উ-ম-প্রকটিত প্রণব বুঝায়।

"কস্মিন্নু খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি সহোবাচৈতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি।"

কিসে ওতঃপ্রোত এই অনন্ত অম্বর?
কন (যাজ্ঞবল্ক্যযোগী), অবধান কর গার্গি!
বর্ণন করেন হেন ব্রাহ্মণনিকর,—
যে অম্বর এ ভুবন যা হতে করে পোষণ,
আধার সে অম্বরের সেই সে অক্ষর।

একণে বুঝিতে হইবে যে, যে অম্বর সর্ব্বাধার, তাহার আধার ব্রহ্ম ব্যতীত আর কে হইতে পারে? এই অম্বর যে অক্ষর তাহার হইতে বিশ্বের সমস্ত অভাব পূর্ণ করিতেছে, তাহাই 'অক্ষর' অর্থাৎ অবিনাশী ব্রহ্ম। "ওঁকারং এবেদং সর্ব্বং" অর্থাৎ প্রণবই এই সমস্ত বিশ্ব, এইরূপ উক্তি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহাতে কোন অনুপপত্তি নাই; কারণ উক্ত বাক্য ওঙ্কারের স্তুত্যর্থক; যেহেতু প্রণব সাধনই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়।

১১শ সূত্র।—এ সূত্রের বিচার এই যে, 'অক্ষর' কদাচ অচিৎসত্ত্ব প্রধানের প্রতিপাদক নহে। "এতস্য বাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত" ইত্যাদি। (বৃঃ উঃ ৩-৮।৯)।

হে গার্গি এ অক্ষরের প্রশাসন-বলে।
চন্দ্র-সূর্য্য স্ব স্ব কার্য্য সাধে নিশ্চলে॥

এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, চিৎস্বরূপ হইতেই প্রশাসন সম্ভবে; সাংখ্যোক্ত অচিৎস্বরূপ প্রধান হইতে তাহা অসম্ভব। অচিৎসত্ত্ব কর্দ্দমের প্রশাসনে কদাচ ঘটাদির সংগঠন সাধিত হয় না।

১২শ সূত্র।—এ সূত্রের অভিপ্রায় এই যে, যেরূপ ব্রহ্ম এই ভূত-প্রপঞ্চ হইতে

স্বরূপতঃ স্বতন্ত্র পদার্থ, তদ্রূপ অক্ষরকেও শাস্ত্রে ভূতপ্রপঞ্চ হইতে পৃথক্ পদার্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অতএব ব্রহ্ম ও অক্ষরে যে কেবল লাক্ষণিক তত্ত্ব-সাম্য-জনিত একত্ব, তাহা নহে, পরন্তু অন্যান্য অনিত্য-ভূত-প্রপঞ্চের সহিত পার্থক্য-সাম্য-জনিত একত্ব-ফলেও অক্ষরই ব্রহ্ম।

প্রধান ও জীবাত্মা হইতে ব্রহ্মতত্ত্ব বিভিন্ন, অপিচ সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত, এবং অক্ষরও তাহাই বলিয়া বর্ণিত; অতএব অক্ষরই ব্রহ্ম।

"অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ অশ্রুতং শ্রোতৃ, অমতং মন্তৃ, অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ।" (বৃঃ উঃ, ৩-৮। ৮৮ অর্থাৎ (হে গার্গি!) অক্ষর অদৃষ্ট হইয়াও দেখেন, অশ্রুত হইয়াও শুনেন, অমত হইয়াও মনন করেন, অজ্ঞাত হইয়াও জানেন, ইত্যাদি।

স্থলান্তরে, উক্ত অক্ষরে চক্ষু-কর্ণ-বাক্য-মনের অস্তিত্ব অসিদ্ধ, অথচ ইঁহাতে তত্তৎ শক্তির কারণ-তত্ত্ব নিহিত, এইরূপ সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয়। ইহার দ্বারা অক্ষরেরও সর্ব্বো-পাধিশূন্যতা সিদ্ধান্তিত হওয়ায়, "অক্ষর" পদে পরমাত্মা ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

১৩শ সূত্র।—প্রশ্নোপনিষদের (৫।২) একটি উক্তির বিচার এই সূত্রের বিষয়। উক্তিটি এই,—

"এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারস্তস্মাদ্ বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈ-কতরমন্বেতীতি প্রকৃত্য ...... যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ ... পুরুষমভিধ্যায়ীত ...

সত্যকাম! এ ওঙ্কার প্রণব-ব্রহ্ম অপর।
ইঁহারে জানিলে লভে এ দুয়ের অন্ততর॥
ত্রিমাত্র প্রণব এই, এতে ধ্যান ধরে যেই,
সেই পায় পরম পুরুষ পরাৎপর।

এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, এই ত্রিমাত্র-প্রণবের ধ্যান-ধারণায় যে পরমপুরুষের প্রাপ্তি হয়, তাহা পরমাত্মা ব্রহ্ম বা অপর কোনরূপ আত্মতত্ত্ব বা দেবতত্ত্ব।

সূত্রের অভিপ্রায় এই যে, ধ্যান-ধারণার বিষয় পরমাত্মা ব্রহ্ম। প্রকৃত বস্তুই প্রত্যক্ষ, সুতরাং ধ্যেয়; কিন্তু অপ্রকৃত বস্তু বা অবস্তু অপ্রত্যক্ষ, সুতরাং অধ্যেয়। "স এতস্মা-জ্জীবঘনাৎ পরাৎপরপুরুষং পুরিশয়মীক্ষতে"।

দেহ-দুর্গবাসী সেই পরম পুরুষে।
জীবঘন-আত্মাহতে প্রধান হেরে সে॥
(জ্ঞানেন্দ্রিয়—আর তার বিষয়নিকর।
তদতীত তিনিই পুরুষ পরাৎপর॥)

উপরোক্ত ঔপনিষদী উক্তিদুটি ফলি-তার্থে এক তত্ত্বকেই লক্ষ্য করিতেছে। প্রকৃত বস্তুই প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয়, এই হেতুই এক মাত্র প্রকৃত বস্তু ব্রহ্মই উক্ত উক্তিদ্বয়ে ব্যক্ত হইয়াছেন; কিন্তু প্রাণ নহে। প্রাণ যদিও দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের রাজা, কিন্তু ফলি-তার্থে মায়াকল্পিত অবস্তু। গৌণ-ব্রহ্ম, "হিরণ্যগর্ভ" বা "সূত্রাত্মা"ও প্রকৃতই অপ্রকৃত বস্তু বা অবস্তু। বেদান্তের সার সিদ্ধান্তই এই যে, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, ব্রহ্মই বিশ্ব; ব্রহ্মৈকমেবা-দ্বিতীয়ম্।"

১৪শ সূত্র।—এই সূত্রেরও বিচার্য্য ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি প্রতিবাক্য। নিম্নে সেটি উদ্ধৃত হইল।

"যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরিকং বেশ্ম দহরস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদ সত্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্।"

ব্রহ্মপুরী এই দেহ, সূক্ষ্ম হৃদ্‌পদ্ম গেহ,
তাহে সূক্ষ্ম অন্তর-আকাশ।
আশ্রয়ি সে সূক্ষ্মধাম, যে তত্ত্ব বিরাজমান,
আবশ্যক সে তত্ত্বজিজ্ঞাস।

বিচার্য্য এই, শাস্ত্র যে সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মপুরী এই দেহে সূক্ষ্ম হৃদ্‌পদ্মধামে সূক্ষ্ম-অন্তরাকাশতত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন, ইহার সারভূত তত্ত্ব বা লক্ষ্য কি, তাহাই অনুসন্ধেয়। উহা কি কেবল স্থূলভৌতিক সূক্ষ্মব্যোম মাত্র? অথবা উহা জীবাত্মা কিম্বা সেই পরাৎপর পরমাত্মা? পরবর্ত্তী বিচারমতে শাস্ত্রোক্তি অনুসারেই "সূক্ষ্ম অন্তরাকাশ" পদে ব্রহ্মতত্ত্বই বিজ্ঞেয়। নিম্নোক্ত বর্ণানুসারে অন্তরাকাশ গৌণপদ্য।

"এষ আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ।

শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ, অজর অমর নিত্য,
অশোক—অক্ষুৎ-তৃষ্ণ যেই।
যিনি সদা সত্যকাম, সত্যের সঙ্কল্পবান,
হন সত্য এই আত্মা সেই॥

এই বর্ণনা ভৌতিক আকাশ বা জীবাত্মা, এ দুয়ের কোনটীতেই প্রযুক্ত হইতে পারে না। শালগ্রাম শিলায় যদ্বৎ বিষ্ণুর অধিষ্ঠান, ধ্যানধারণাধিগম্যভাবে "ব্রহ্মপুর" দেহমধ্যে হৃদ্‌পদ্মে তদ্বৎ ব্রহ্মের অধিষ্ঠান।

১৫শ সূত্রে।—এই সূত্রের সমাধেয় এই যে, সূক্ষ্মব্যোম বা পরব্যোম ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। পরব্যোমে বা ব্রহ্মলোকে জীবের প্রাত্যহিক গতিবিশেষ শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। সুগভীর সুষুপ্ত সময়ে জীবাত্মার ব্রহ্মগতি বা ব্রহ্মলোকে গতি এবং জাগরণে পুনরাবৃত্তি হয়। ব্রহ্মলোক ব্রহ্মের আধিকরণিক তত্ত্ব, সুতরাং পরমার্থতঃ ব্রহ্মসহ অভিন্ন, ইহাই এস্থলে বিবৃত।

১৬শ সূত্র।—এই সূত্রে কথিত হইয়াছে যে, সূক্ষ্মব্যোমের জগদ্ধৃতি-লক্ষণ উক্ত হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ব্রহ্মই বোধ্য, যেহেতু ব্রহ্মেরই জগদ্ধৃতি-লক্ষণ শ্রুতি-বিশ্রুত। শাস্ত্রে এই সূক্ষ্ম ব্যোমতত্ত্বকে কেবল মাত্র পাপাতীতই বলা হয় নাই; অপিচ বলা হইয়াছে, ইহাদ্বারা এরূপ নিয়মিত ভাবে জগৎ-পোষণ হইতেছে যে, যাহাতে জগৎ বিপ্লুত না হইয়া যায়। যথা "য আত্মা সঃ সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়েতি"। "বৃহদারণ্যক" বলেন, একমাত্র সেই অমৃতস্বরূপের আদেশেই আকাশে চন্দ্র-সূর্য্য যথাব্যবহিতভাবে স্বকার্য্য সাধনার্থ সমুদিত রহিয়াছেন। মূলব্রহ্মের বশেই বিশ্বের সর্ব্ব পদার্থই স্ব-সত্তায় সংস্থিত। অতএব "সূক্ষ্মাকাশ" বা "পরব্যোম্" পদে ব্রহ্মতত্ত্বই বোধিত।

১৭শ সূত্র।—এই সূত্রের সমাধেয় এই যে, সূক্ষ্মব্যোম ব্রহ্মতত্ত্ব-বোধক; যেহেতু ইহার অন্যান্য অবান্তর অর্থ থাকিলেও এস্থলে মুখ্যার্থ বা লক্ষ্যার্থই ব্রহ্ম। "আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্বহিতা" (ছাঃ উঃ ৮। ১৪)

আকাশপদেতে হন পরিব্যক্ত যিনি।
নাম-রূপ-উপাধির প্রকাশক তিনি॥

"সর্ব্বাণি বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে।" (ছাঃ উঃ ১।৯)

আকাশপদেতে যাঁর পরিচয় জ্ঞাত।
এই সর্ব্বভূত হয় তাঁহাতেই জাত॥

আকাশ পদে অবশ্য জীবাত্মা বুঝায় না, ইহা ভৌতিক ব্যোমকেই বুঝায়; কিন্তু সূক্ষ্মব্যোমের যে লক্ষণাদি শাস্ত্রোক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্বই বিজ্ঞেয়; নচেৎ উহা অতীব অসঙ্গত ও অনুপপন্ন হয়।

১৮শ সূত্র।—ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, সূক্ষ্মব্যোম কদাচ জীবাত্মাবোধক হইতে পারে না; যেহেতু শাস্ত্রোক্তিমতে উহা অসম্ভব। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮-৩।৪) উক্ত হইয়াছে, "অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপ সম্পদ্য স্বেন রূপেণাভি নিষ্পদ্যতে এষ আত্মেতি হোবাচ।"

এই যেই 'সম্প্রসাদ'—দিব্য-বিভাসিত।
এ মর্ত্ত্য শরীর হতে হয়ে সমুত্থিত॥
পরজ্যোতিরূপে পরে পরিণতি পায়।
স্ব-স্বরূপে অবস্থিত আত্মা বলে তায়॥

এই প্রসঙ্গে সাধারণতঃ বা আপাততঃ জীবাত্মাই সমর্থিত বোধ হয়; কিন্তু (এই পাদেরই) পরবর্ত্তী ২০শ সূত্রে নিষ্পন্ন হইবে যে, মুখ্যার্থকভাবে বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গই পরমাত্মাবোধক। ফলিতার্থে উপরোক্ত উপনিষদ্-বাক্যেও পরমাত্মাই পরম লক্ষ্য। কারণ স্বরূপস্থ আত্মাই পরমাত্মা, যেহেতু উপাধি-নির্ম্মুক্ত; কিন্তু জীবাত্মা সোপাধিক ও সসীম; এবং "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্" বা "অপহতপাপ্মা" প্রভৃতি বিশেষণ জীবাত্মায় অপ্রযোজ্য। জীবাত্মা অবিদ্যোপাধিগত; অবিদ্যাতেই অজ্ঞান, অজ্ঞানেই পাপ; অতএব সূক্ষ্মব্যোমসহ জীবাত্মা তুলনীয় নহেন; পরন্তু পরমাত্মাই বটেন।

১৯শ সূত্র।—এই সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে জীবাত্মার বিষয় কথিত হওয়ায়, "সূক্ষ্মব্যোম্" জীবাত্মাবোধক কেন না হইবে? এরূপ তর্ক উত্থাপিত হইলে, তদুত্তর এই যে, উহাতে মুক্ত জীবাত্মার বিষয়ই বিবৃত হইয়াছে; মুক্ত জীবাত্মা ও পরমাত্মা ব্রহ্ম পরমার্থতঃ এক তত্ত্ব। "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।" জীবাত্মা যখন অবিদ্যামুক্ত হইয়া ব্রহ্মবিদ্ হন, তখন তিনি ব্রহ্মই হন।

পরবর্ত্তী অধ্যায়ে প্রজাপতি কর্ত্তৃক জীবাত্মার প্রকৃত-তত্ত্ব-বিকাশ বিবৃত হইয়াছে। মুক্ত জীবাত্মা ও পরমাত্মায় তত্ত্বপক্ষে প্রভেদ নাই। যদি "সূক্ষ্মব্যোম" মায়াপাশ-মুক্ত জীবাত্মাকে লক্ষ্য করে, তবে তাহা পরমার্থতঃ পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করে, বলা যায়।

২০শ সূত্র।—এ সূত্রের বিচার এই যে, যদি সূক্ষ্মব্যোম জীবাত্মাকে বুঝায়, তবে তাহার অর্থ-স্বাতন্ত্র্য স্বীকার্য্য; অর্থাৎ তদ্দ্বারা প্রকৃত-পক্ষে জীবাত্মার স্বরূপ-নির্ণয় অভিপ্রেত নয়; পরন্তু পরমাত্মার স্বরূপনির্ণয়ই অভিপ্রেত।

২১শ সূত্র।—যদি এরূপ তর্ক ধরা যায় যে, সূক্ষ্মব্যোমের সূক্ষ্মত্বরূপ লক্ষণটি বিশ্বব্যাপী পরমাত্মায় কিরূপে প্রযোজ্য হইতে পারে? তদুত্তরে বলা যায় যে, তিনি এই রূপেই ধ্যানাধিগত হইয়া থাকেন।

ঔপনিষদী শ্রুতি কেবল আমাদিগকে

আমাদের ধারণাধিগম্যভাবে সূক্ষ্ম হৃৎপদ্মে ব্রহ্মচিন্তার উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহার ক্ষুদ্রস্বরূপ সূক্ষ্মত্ব জ্ঞাপন করেন নাই।

২২শ সূত্র।—মুণ্ডকোপনিষদ্ ও কঠোপনিষদুক্ত একটি শ্রুতিবাক্যের বিচার এই সূত্রের বিষয়। শ্রুতি যথা—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র-তারকং, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং, তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥" (মুঃ উঃ ১১-২।১০)

সূর্য্য তথা নাহি জ্বলে, নাহি চন্দ্র-তারা তথা।
নাহি ঝলে এ বিদ্যুৎ, অগ্নি আর লাগে কোথা॥
তিনি ভান্ত, সর্ব্বভাতি তাঁরে অনুসরি রয়।
তাঁহারি বিভায় এই বিশ্ব বিভাসিত হয়॥

এই স্থলে এই ভাতি বা জ্যোতি কোন ভৌতিক জ্যোতিষ্ককে লক্ষ্য করিতেছে না; এস্থলে জ্যোতিস্বরূপ ব্রহ্মই লক্ষিত। শাস্ত্রে ব্রহ্মই "জ্যোতিষাং জ্যোতি" বাক্যে ব্যক্ত হইয়াছেন। ব্রহ্মই মৌলিক আলোচ্য বিষয়; অতএব সিদ্ধান্তিত তত্ত্বই ব্রহ্মতত্ত্ব,—অপর কোন ভৌতিক তত্ত্ব নহে।

২৩শ সূত্র।—ঔপনিষদী স্মৃতিও ব্রহ্মকে সর্ব্বজ্যোতির অপ্রকাশ্য স্বয়ংপ্রকাশ—অর্থাৎ "জ্যোতির জ্যোতি" ভাবে অভিনন্দিত করিয়াছেন; যথা গীতা—

"ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদগত্বা ন নিবর্ত্তন্তে—তদ্ধাম পরমং মম॥"

রবি না বিভাসে তাহা, না চন্দ্র না অগ্নি তথা।
সে মম পরমধাম, নাহি ফেরে গেলে যথা॥

অপিচ।—"যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলং।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্।"

আদিত্যগত যে তেজ বিকাশে বিশ্ব-সংসার।
যে তেজ চন্দ্রে—অনলে, সে তেজ জান আমার॥

এতবতা জ্যোতির জ্যোতি ভাবে অন্য কোন ভৌতিক জ্যোতিই প্রতিপাদিত নহে; পরন্তু পরমাত্মা পরব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

(ক্রমশঃ)

দুর্গামূর্ত্তি—দুর্গোৎসব।

(ধ্যান)

"জটাজুটসমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাং।
লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাং॥
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাং॥
সুচারুদশনাং দেবীং পীনোন্নতপয়োধরাং।
ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীং।
আপাদলম্বিতা-মালাং সর্ব্বরত্নবিভূষিতাং।
মৃণালায়তসংস্পর্শদশবাহুসমন্বিতাং॥
ত্রিশূলং দক্ষিণে হস্তে খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ।
তীক্ষ্ণবাণং তথাশক্তিং দক্ষিণে বিচিন্তয়েৎ॥
খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশমঙ্কুশমেব চ।
ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ॥
অধস্তাৎ মহিষং তদ্বৎ বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ।
শিরশ্ছেদোদ্ভবং তদ্বৎ দানবং খড়্গপাণিনং।
হৃদিশূলেন নির্ভিন্নং নির্য্যদন্ত্রবিভূষিতং।
রক্তারক্তীকৃতাঙ্গঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণং॥

বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রুকুটিভীষণাননং।
বমদ্রুধিরবক্ত্রঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ॥
দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরি স্থিতং।
কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি॥
প্রসন্নবদনাং দেবীং সর্ব্বকামফলপ্রদাং।
শত্রুক্ষয়করীং দেবীং দৈত্যদানবদর্পহাং॥
স্তূয়মানঞ্চ তদ্রূপমমরৈঃ সন্নিবেশয়েৎ॥"

জটাজুট কেশপাশে, অর্দ্ধেন্দু ললাটে হাসে,
ত্রিনয়না পূর্ণেন্দুবদনা।
তপ্তস্বর্ণ-সুবরণা, সুপ্রতিষ্ঠা সুলোচনা,
সুনবীনা সর্ব্বভূষণা॥
সুচারু-দশন-ধরা, পীনোন্নত পয়োধরা,
শ্রীঅঙ্গ ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গি ধরে।
মহিষ-মর্দ্দিনী মা'র আপাদলম্বিত হার,
সর্ব্বাস্ত্র তাহে শোভা করে॥
মৃণাল নাল-নিন্দিত দশবাহু সুশোভিত,
দশ অস্ত্র তাহে ঝলমলে।
ত্রিশূল দক্ষিণ করে, খড়্গ চক্র তদঃপরে,
তীক্ষ্ণ বাণ, শক্তি সমুজ্জ্বলে॥
খেটকাস্ত্র বামকরে, পূর্ণ চাপ তারপরে,
পাশ ও অঙ্কুশ পরে তার।
সর্ব্বশেষ-বাম-করে ঘণ্টা বা পরশু ধরে,
(রণরঙ্গময়ী মূর্ত্তি মা'র!)
নিম্নদেশে ছিন্নমুণ্ড মহিষাসুর প্রকাণ্ড,
তদ্ভূত খড়্গী সুররিপু।
শূলে হৃদি বিদারিত, নির্গতান্ত্র-বিভূষিত,
রক্তে রক্তময় বীরবপু॥
বিস্ফারি আরক্ত আঁখি, নাগপাশে বদ্ধ থাকি,
ভ্রুকুটিভীষণ মুখভঙ্গি।
দংশিয়া অসুর অঙ্গ, দেবীর বাহন সিংহ,—
বদন রদন-রক্তরঙ্গী॥
দেবীর দক্ষিণ পায়, সিংহ-পৃষ্ঠে শোভা পায়,
তাহার কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধদেশে।
শ্রীপদের বামাঙ্গুষ্ঠ মহিষের অঙ্গে স্পৃষ্ট,
(অসুর কৃতার্থ কৃপালেশে!)
প্রসন্নবদনা সদা, দেবী সর্ব্বকামপ্রদা,
সাধকের শত্রুবিনাশিনী।
দৈত্য-দানবের দর্প সগর্ব্বে করিয়া খর্ব্ব,
সর্ব্বদেব-স্তুতি-বিলাসিনী॥

যে রূপটি বর্ণিত হইল, সে কেবল রণ-রঙ্গিণী মহিষমর্দ্দিনীর রূপ। এ রূপের ধ্যানে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ নাই; কেবল দনুজ-দলনী সিংহবাহিনী দশভুজা মা! ধনদা লক্ষ্মী, জ্ঞানদা বাণী, সিদ্ধিদাতা গণেশ, বল-বীর্য্য ও বংশবিধাতা কার্ত্তিকের, এই সমস্ত দেব-দেবিতর সর্ব্ব-শক্তিময়ী মা দুর্গারই বিভিন্ন শক্তির মূর্ত্ত-বিকাশ মাত্র। ফলে দুর্গোৎসব-পদ্ধতিতে উহাঁদের পৃথক্ ২ ধ্যান-মন্ত্র সমন্বিত পৃথক্ ২ পূজা আছে; আবার মহাদেবীর মহাপূজার সমষ্টী-ভূত ভাবেও উহাঁদের পূজা সর্ব্বদেবতত্ত্বময়ী দুর্গাপূজার অন্তর্ভূত। কোন্ পূজাই বা দুর্গোৎসবের অন্তর্ভূত নয়? দুর্গোৎসবে অনন্ত পূজা। পূজা না কার? "অজ্ঞানায় নমঃ, অধর্ম্মায় নমঃ, চৌরেভ্যো নমঃ, বেশ্যাভ্যো নমঃ" পর্য্যন্ত নমস্কার-মন্ত্রগুলি সমন্বিত যে সব পূজা, তাহা কেবল দুর্গোৎসবেরই বিশোদার ক্রোড়ে স্থান পায়! সংসারের ধবল পৃষ্ঠটি ঈশ-সৃষ্ট, আর কৃষ্ণ পৃষ্ঠটি কি বাস্তবিক "সয়-তান্"-সৃষ্ট? এ সমস্যার সমাধানে হিন্দুশাস্ত্রে 'সয়তান' কল্পনা আবশ্যক হয় নাই। "সর্ব্বংখল্বিদংব্রহ্ম"। শুক্লপক্ষ-কৃষ্ণপক্ষ একই

তাঁদের লীলা শুভাশুভ, সুখ-দুঃখ, শ্বেত-কৃষ্ণ, আলো-অন্ধকার বা স্বর্গ-নরক, সব একজনেরই যেন পরস্পর-সাপেক্ষ দুটা পিঠ— মূল বস্তু এক। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ব্রহ্মে সমস্তই প্রতিষ্ঠিত। তবে যে দ্বৈত-দ্বন্দ্ব-বোধ, তাহা অবিদ্যার ঐন্দ্রজালিক কুহকমাত্র! তাহা সেই মায়াতীত মায়াময়ের মায়া-মোহেরই মহিমা! তাই বলি, দুর্গোৎসবে—দুর্গাপূজায় মহাপূজা—বিশ্ব-পূজা। "চোরের পূজা—বেশ্যার পূজা" না থাকিলে, এই ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মপূজার সর্ব্বময়ত্ব এবং মহামহত্ত্ব সামান্য মানবীয় দর্শন-শাস্ত্র কিরূপে আস্বাদন করিতে সমর্থ হইবে? মানুষের বেদ-বেদান্ত এ মহাপূজার মূর্ত্তিমন্ত।

আর একটি নিবেদন, এই মহাশক্তি-পূজা শত্রু-বিজয়ার্থ—তথা আত্মবল-বিধানার্থ শ্রীভগবান রামচন্দ্র কর্ত্তৃক উদ্বোধিত। তৎপূর্ব্বে বসন্তে বাসন্তী-দুর্গোৎসবেও এই সিংহবাহিনী মহিষ-মর্দ্দিনীর পূজা হইত; এখনও হইয়া থাকে; কিন্তু "রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ" হেতু-মূলে শারদীয় দুর্গোৎসবই শক্তিসাধনায় সুপ্রতিষ্ঠিত। বঙ্গে এই শারদীয়া মহাপূজারই বহুল প্রচার। এই পূজার বলেই বাঙ্গালী একদিন শক্তি-সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিল। বাঙ্গালার স্থানীয় প্রকৃতি উদ্ভিদের পক্ষে যেরূপ অনুকূল, মানুষের পক্ষে সেরূপ নহে। জল-বায়ু মৃত্তিকা প্রভৃতির গুণগত প্রাকৃতিক পোষণ-শক্তি উদ্ভিদ্ ও মনুষ্যের পক্ষে পরস্পর প্রভিন্ন এবং বিরোধী, ইহা বিজ্ঞান-সম্মত। উদ্ভিদ্‌বিরল বালু-কঙ্করাদিপূর্ণ উচ্চ ও শুষ্ক ভূমির প্রকৃতিই মানবের স্বাস্থ্য-পক্ষে পরম অনুকূল। যাহা হউক, বোধহয় এই জন্যই বাঙ্গালার মানুষ স্বভাবতঃ মৃদু, দুর্ব্বল, রোগপরবশ, অলস, অকর্ম্মঠ ও অকষ্ট-সহিষ্ণু হইবার কথা। প্রায় হয়ও তাহাই। তবে বাঙ্গালীর যে উন্নতি হইয়াছে, আমাদের বোধহয় সে কেবল দুর্গোৎসবের ফল। অনেকে হয়ত একথায় হাসিতে পারেন; কিন্তু নিরুপায়! "মনের কথা খুলিলে লোকে পাগল বলে" এরূপ প্রবাদ-বাক্যও প্রচলিত আছে। আমরা না হয় কোথাও "পাগল" গণিত হইব; কিন্তু এই মনের কথাটি নিবেদন না করিয়া পারিব না। বাঙ্গালীর যা কিছু উন্নতি, তাহার অন্ততঃ প্রধান কারণ দুর্গোৎসব। ইদানীং সেই দুর্গোৎসবের অবনতি;—হায়! বাঙ্গালীরও অবনতি। শরীরের বিষয়ে যাহাই হউক, মস্তিষ্ক বিষয়ে বাঙ্গালী সুপ্রশংসিত। সমগ্র ভারতের মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চা বঙ্গেই চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তারপর হৃদয়-বৃত্তির চর্চ্চাতেও বঙ্গ অগ্রগণ্য। ভগবদ্ভক্তিই হৃদয়-বৃত্তির সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিণতি। দেখুন বঙ্গের শ্রীগৌরাঙ্গ! স্থলবিশেষে অধিক বলিতে গেলেই ফলিতার্থে কম বলা হয়; অতএব গৌরাঙ্গসম্বন্ধে এস্থলে বিশেষ কিছু বলিব না। আজ সমগ্র সভ্যজগৎ বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে গৌরাঙ্গ-চরিতের দিকে চাহিয়াছে! এই জগদারাধ্য গৌরাঙ্গ বঙ্গেরই সন্তান। আমাদের বোধ হয় ইহা দুর্গোৎসবের ফল! মহাশক্তি যোগমায়া কাত্যায়নী দ্বাপরে বৃন্দাবনে রাধা-কৃষ্ণ লীলা আনিয়াছিলেন, সেই মহাশক্তি যোগমায়া দুর্গা কলিতে বঙ্গে গৌরাঙ্গ-লীলা আনিয়াছেন। বঙ্গীয় বৈষ্ণব-

মণ্ডলে শুনা যায়, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শিবাবতার, তাঁহারই সাধনাকর্ষণে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব। উত্তম কথা; কিন্তু শিবই তন্ত্রে বলিয়াছেন যে, তিনি মহাশক্তি-সহযোগেই 'শিব'—নতুবা 'শব' মাত্র! অতএব শিবের সাধনে কৃষ্ণচৈতন্যের আগমন ফলিতার্থে শক্তি-সাধনেরই ফল বলিতে হয়। বলিতে কি, বঙ্গের যতকিছু উন্নতি—যতকিছু গৌরব, তাহার অন্ততঃ প্রধান কারণ মহাশক্তিসাধনময় দুর্গোৎসব।

কেবল যে, বুদ্ধিবল বা হৃদয়-বলেই বাঙ্গালী বিখ্যাত, তাহা নহে; একদিন বাহুবলেও বাঙ্গালী বিখ্যাত ছিল। বাঙ্গালী প্রতাপাদিত্য—বাঙ্গালী সীতারাম ইতিহাসের পবিত্র মন্দিরে বীরপূজায় পূজিত। বাঙ্গালী সেনাপতি মৃণ্ময় (মেনাহাতী) মালীকরাজ, মাণিকচাঁদ; আর আমাদের পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরও আদরাভিনন্দিত বীর মোহনলালের বীরত্বাভিনয় সেদিনও বাঙ্গালীর বাহুবলের সাক্ষ্য দিয়াছে। তারপর হইতেই বাঙ্গালী জাতির বর্ত্তমান নির্জ্জীবতার আরম্ভ। প্রায় সেই হইতে বাঙ্গালীর জাতীয় মহোৎসব দুর্গোৎসবও নির্জ্জীব হইয়া আসিয়াছে। বাঙ্গালায় পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে ২ বাঙ্গালী হিন্দুর সগুণব্রহ্মোপাসনা প্রকৃত পক্ষেই পৌত্তলিকতায় দাঁড়াইয়াছে। মৃণ্ময়ীতে চিন্ময়ীর আবির্ভাব দেখে কে? সে চক্ষু আর কৈ? আমরা পাশ্চাত্য জড়সর্ব্বস্ব শিক্ষার মোহে মজিয়া, জড়াভিভূত চিত্তের প্রত্যক্ষে—জড়-চক্ষের সাক্ষ্যে জড়ময়ী প্রতিমার কোলে পুত্তলিকাই দেখিতেছি। আমরা পৌত্তলিক না ত কি? এইরূপ সজ্ঞান-পুতুল-পূজা একরূপ প্রহসন বিশেষ। জড় পুতুলে ভক্তি আসে না; সুতরাং ভক্তিশূন্য প্রহসন-গণ্য পূজায় শক্তিসাধনা কিরূপে সম্ভবে? কাজেই বাঙ্গালী বিকল, দুর্ব্বল, অলস, বিরস, মূঢ় ও ম্লান। মা দুর্গার দয়ায় বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব আধ্যাত্মিকতায় ও ভক্তি-বিশ্বাস-প্রবণতায় পুনঃসঞ্জীবিত না হইলে, বাঙ্গালীর শক্তি-সাধন বা সঞ্জীবতা-সম্পাদনের আর আশা নাই।

যে বাঙ্গালী একদিন বনের বাঁশের লাঠি কাটিয়া অপূর্ব্ব সমর-বীরত্ব দেখাইয়াছে, সে বাঙ্গালীর বাহুবলও নিতান্ত অবজ্ঞার বিষয় নহে। লাঠিই বাঙ্গালীর জাতীয় অস্ত্র বা দণ্ড। "যার লাঠি, তার মাটি"—ইহা বঙ্গেরই প্রবাদবাক্য। শুনা যায়, বাঙ্গালী "লাঠিয়াল" একদিন অপূর্ব্ব শিক্ষার গুণে লাঠির ঘূর্ণনে তীর-তরোয়াল—এমন কি—বন্দুকের গুলি পর্য্যন্ত নাকি ফিরাইয়াছে। লৌহ নাই, বারুদ নাই, শুধু কাষ্ঠদণ্ডে যে জাতির এ বীরত্ব, রাজা সে জাতিকে রীতিমত রণবিদ্যায় দীক্ষিত ও অস্ত্রশিক্ষায় শিক্ষিত করিলে, তাহারও বাহুবল বোধহয় জগতের অন্যান্য সামরিক জাতির বাহুবলের নিকট নিতান্ত হীনপ্রভ হইত না। কিন্তু বাঙ্গালীর বর্ত্তমান দশা দেখিলে, সে কথা আর বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। বাঙ্গালী ভাত চিরকাল খায়, কিন্তু "ভেতো বাঙ্গালী" তাহার প্রাচীন পরিচয় নয়। কেন এমন হইল? এতদুত্তরে যিনি যাহাই বলুন, আমাদের বিশ্বাসানুরূপ উত্তর পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে।

* মনোহর চক্রবর্ত্তী, মহাদেব ঘোষ, শ্রীমন্ত

মিত্র, কার্ত্তিক সর্দ্দার, রঘুরাম দাস প্রভৃতি ভীমতুল্য বলশালী বাঙ্গালীর কাহিনীও বেশি পুরাতন নহে। ব্যক্তিগতভাবে বঙ্গে কৃচিৎ কেহ হয়ত এখনও বীর আছেন। সুরেশ বিশ্বাস এখনও পাশ্চাত্য রণরঙ্গভূমে সেনাপতিত্ব করিতেছেন; এখনও কেহ হয়ত বিনা অস্ত্রে বাঘ মারিতেছেন; কিন্তু সে স্বতন্ত্র কথা। ফলে জাতিগতভাবে বাঙ্গালীর বাহুবলের পতন বাঙ্গালীর জাতীয় শক্তিসাধনোৎসব দুর্গোৎসবের পতন হইতেই প্রধানতঃ সূচিত; পরে আনুষঙ্গিক অপর বিবিধ অপুরুষকারিতায় উহা পোষিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া, অধুনা শোচনীয় কাপুরুষতায় পরিণত। সমাজের রুচিরও আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! এখন যেন বঙ্গাঙ্গনাও আর বীরপুরুষ-পক্ষপাতিনী নহেন। বোধ হয়, এখন তাঁহারাও অনেকে "যাত্রার দলের ছোকরা" জাতীয় মেয়েলী পুরুষের ভাব-মোহে মুগ্ধ হইয়া পড়েন! হা লজ্জা! হা বিড়ম্বনা! এখন যার হাত একটু শক্ত, সে চাষা; যে একটু বীর ভাবের ভক্ত, সে গোঁয়ার; যে একটু বেশি আত্মসম্মানতপস্বী, সে বদ্‌রাগী! এখন যে তেড়ীকাটে—গান গায়, মৃদুহাসে—বাঁকা চায়; যে মেয়েলী—নরম গা, থিয়েটারের অভিনেতা, সে-ই নায়ক্—সে-ই নাগর; 'বাসরঘরে' তারই আদর! বুঝি বঙ্গীয় যুবক-সমাজ এখন এই আদর্শেই আত্মগঠন করিতেছে! যদি এ সন্দেহ সত্য হয়, তবে অধঃপাতের আর বাকী কি? এখনও যাঁহারা বাঙ্গালীর মুখপাত্র আছেন, তাঁহারা এখনও চিন্তা [illegible] কেহ কি, এ রোগের নিদান কি, এ বিষ-বিটপীর মূল কোথায়? ফলে একমাত্র পৌরুষ-সাধনার উপেক্ষাতেই এ অবস্থা ঘটিয়াছে। এই পৌরুষ-সাধনা কি? ব্যায়ামচর্চ্চা, পুষ্টিকর আহারাদির ব্যবস্থা, সামরিক শিক্ষা ইত্যাদি বাঙ্গালী হিন্দুর পক্ষে এ সাধনার বহিরঙ্গ; কিন্তু সভক্তি-শক্তিপূজাই ইহার অন্তরঙ্গ-সাধন।

এখন বাঙ্গালীজাতিতে বীর-সাধনার উপযোগী পৌরুষ-উপকরণের যেন অত্যন্তাভাব ঘটিয়াছে। এখন বাঙ্গালী সমরক্ষেত্রে বাহুবলে রাজার সাহায্য করা দূরে থাক্, নিজ গৃহে কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষায়ও অপটু! এখন বাঙ্গালী, জোরে মেঘ ডাকিলেও 'জৈমিনি' স্মরিয়া 'পৈত্রিক প্রাণ'টি বুকে করিয়া শশব্যস্ত হন! এখন কেবল বাঙ্গালীর—

"ঢিলকাছা—ফুলকোঁচা মাটিতে লোটায়!
বাঙ্গালীর ব্রহ্মঅস্ত্র দে-দৌড়-সটান!!"

হাসিবেন না, ইহা কাঁদিবার কথা। এটি বাঙ্গালী কবির অশ্রুজলে-লেখা ব্যঙ্গ-কবিতা। বস্তুতঃ সমগ্র বাঙ্গালীজাতিটার উপরে যেন উচ্ছেদের কালো ছায়া পড়িয়াছে। অধুনা এ জাতিতে স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ শুধু যেন এই ধ্বংসপুরযাত্রী জাতির আপাততঃ কথঞ্চিৎ বংশরক্ষার জন্য। কেহ বা কপালে ঘা দিয়া বলেন, কেবল ব্যাকরণের লিঙ্গভেদ রক্ষার জন্য! ধ্বংসোন্মুখ বংশ বিড়ম্বনা মাত্র।

বঙ্গের দুর্গোৎসব বিশিষ্টভাবে হিন্দুর হইলেও, সাধারণভাবে সর্ব্বজাতিনির্ব্বিশিষ্ট বাঙ্গালী মাত্রেরই জাতীয় উৎসব। ভারতের কোন২ মুসলমান-প্রধান প্রদেশেও এইরূপ "মহরম" উৎসব হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশিষ্ট সাধারণ জাতীয় উৎসবে পরিণত। মুসলমানের এই মহরম উৎসবটিও আমাদের দুর্গোৎসবের ন্যায় শক্তি ও সজীবতা—পৌরুষ ও পটুতা লাভের অলৌকিক উপায়স্বরূপ। তবে কি, না, আমাদের দুর্গোৎসব আজ মৃতপ্রায়, মুসলমানের মহরম আজিও জীবন্ত ও জাগ্রত। [illegible] দুর্গোৎসবের

বিরলতা ঘটিয়াছে বলিয়া বলিতেছি না। মফস্বলে এখনও কোন২ একটি মাত্র পল্লী-গ্রামেও শতাধিক দুর্গোৎসব হইয়া থাকে। কলিকাতা প্রভৃতি মহানগরাদিতে অনেক দুর্গোৎসব হয়। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক অঞ্চলে লক্ষ্মীপূজার ন্যায় প্রায় ঘরে ঘরে দুর্গোৎসব হয়। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? একটী জীবন্ত উৎসবের যে শক্তি-সাফল্য, শত শবোৎসবেও তাহা সম্ভাবিত নহে। যদি বাঙ্গালী হিন্দুর জাতীয় জীবনের সজীবতা রক্ষার একান্ত আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে আমাদের দুর্গোৎসব-সঞ্জীবনই তাহার প্রধান সাধন। শাস্ত্রবাক্যে আশ্বাস, প্রতিমাপূজায় বিশ্বাস, দুর্গা-পদে ভক্তি ও শক্তি-সেবায় অনুরক্তি; দুর্গোৎসবের অপর স্বতন্ত্র বহিরঙ্গ-উপকরণের মধ্যে এই চারিটী অন্তরঙ্গ-উপকরণ থাকিলে, আমাদের এই জাতীয় জীবনের জীবনস্বরূপ উৎসব আবার জীবন্ত হইবে। ফলে আমাদের চেষ্টা বড়জোর কাঁদাকাটি ও মাথা-কোটাকুটি মাত্র; কিন্তু দেবীর দয়া দেবীর দয়ারই সাপেক্ষ। তবে কি না, খাঁটি কান্না বিফল হয় না। আবার "না কাঁদিলে মা-ও মাই দেয় না" ইহা অস্মদ্দেশেরই প্রবাদ-বাক্য। "বালানাং রোদনং বলং"—মায়ের দয়া পাইতে হইলে, বালকের রোদনই এক মাত্র বল। তবে কথা এই, রোদনের অভিনয়েও এ মাকে ভুলান যায়, কিন্তু খাঁটি রোদন ভিন্ন সে মা ভুলেন না। আমরা "রাবণ-বধ" পালায় রাম সাজিয়া, আভিনয়িক দুর্গোৎসব করিয়া, দেবী-প্রতিমার সমক্ষে খুব কাঁদিতে পারি; নীলপদ্মের অভাবে স্বীয় পিঙ্গলাক্ষ উৎপাটনে খুব প্রস্তুত হইতে পারি; কিন্তু আমাদের জাতীয় যথার্থ দুর্গোৎসবে যখন আমরা দেবী-পদে অঞ্জলি দিতে দিতে—

"ধন্যোহহং কৃতকৃত্যোহহং সফলং জীবনং মম।
আগতাসি যতো দুর্গে মহেশ্বরি মদাশ্রয়ম্ ॥"

ইত্যাদি পাঠ করি, তখন এ কাঠ-মেঝে এক বিন্দু জল আসিলেও আমরা কৃতার্থ হইতে পারি—আমাদের সাধের দুর্গোৎসব সার্থক হইতে পারে।

দুর্গোৎসবে মাতৃর্গা সর্ব্বতত্ত্ব কল্পলতা।—

"দয়া নিদ্রা চ ক্ষুত্‌তৃষ্ণা পিপাসা শ্রদ্ধা ক্ষমা ধৃতিঃ।
তুষ্টিপুষ্টিস্তথা কান্তির্লজ্জা হি দেবতা হি সা ॥
বৈকুণ্ঠে সা মহালক্ষ্মী গোলোকে রাধিকা সতী।
মর্ত্ত্যে লক্ষ্মীশ্চ ক্ষীরোদে দক্ষকন্যা সতী চ সা ॥
সা বাণী সা চ সাবিত্রী বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা।
বহ্নৌ সা দাহিকাশক্তিঃ প্রভাশক্তিশ্চ ভাস্করে ॥
শোভা শক্তিঃ পূর্ণচন্দ্রে জলে শক্তিশ্চ শীতলা।
শস্যপ্রসূতিশক্তিশ্চ ধারণা চ ধরাসু সা ॥
ব্রাহ্মণ্য শক্তি বিপ্রেষু দেবশক্তিঃ সুরেষু চ।
তপস্বীনাং তপস্যা সা গৃহীণাং গৃহদেবতা ॥
নৃপাণাং রাজলক্ষ্মীশ্চ বণিজাং লভ্যরূপিণী।
পারে সংসারসিন্ধূনাং ত্বয়া দুস্তরতারিণী ॥"

আর কি চাই? ভবসিন্ধু পার হইয়া আর কিছু চাই কি? ভবসিন্ধু-পার যদি মুক্তি হয়, তবে আরো চাই। অমুক্ত প্রকৃত ভক্ত হইতে পারে না। অতএব মুক্তিতেও সেই ভক্তি চাই, যাহাতে মুক্ত্যতীত কৃষ্ণধন পাই। ভবসিন্ধুর এ পারেই থাকি বা ও পারেই যাই, মায়ের কাছে জীবের জীবনসর্ব্বস্ব—সারসর্ব্বস্ব যথাসর্ব্বস্ব ধন কৃষ্ণধনকে চাই। আর যদি মাঝে ডুবি, যেন কৃষ্ণধন বুকে করিয়া ডুবি! দুর্গোৎসবে সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী জগন্মাতা যোগমায়া দুর্গার কাছে তাঁহারি মাধুর্য্যতত্ত্বরূপ—তাঁহারি প্রাণপুত্তলীস্বরূপ কৃষ্ণধনের চারু চরণ চাই। কুলকুণ্ডলিনী না কুলাইলে, সেই অকূলকাণ্ডারী গোকুল-বিহারীকে কিরূপে পাইব? কৃষ্ণময়ী ব্রজগোপীও তাঁহার কাছেই কৃষ্ণধন পাইয়াছিলেন; পাইবার জন্য তাঁহার কাছেই চাহিয়াছিলেন,—

(ওমা) ত্রিপুরে-ত্রিপুরেশ্বরি হেশিবে হেশুভঙ্করি!
'বিপদনাশিনী' বেদে বলে।
দেহি দুর্গে কৃষ্ণধন, হর বিচ্ছেদ-বেদন,
নিবেদন চরণকমলে ॥ (দাশুরায়)

জনৈক—দুর্গোৎসবের প্রসাদভিখারী।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২০ আইন মতে রেজষ্টীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৮ম বর্ষ, ৮ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা।	অগ্রাহয়ণ।	১৩০৮ সাল, ১৮২৩ শকাব্দা।

বর্ণ-শ্রেষ্ঠত্ব-নির্ব্বাচন।

১। বর্ত্তমান আদম স্নুমারীতে ঐ বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুত গাইট সাহেব প্রত্যেক জেলার প্রধানকার্য্যকারককে নিম্নলিখিত মর্ম্মে চিঠি লিখিয়াছেন ;—

হিন্দুদিগের মতে বর্ত্তমান-সমাজে যে জাতি যেরূপ গৌরবান্বিত ও সম্মানিত; তাহাদিগকে সেই ভাবে আদম স্নুমারীর বিবরণীতে শ্রেণীবদ্ধ করা আবশ্যক। এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক জেলার সুশিক্ষিত অধিবাসীদিগের দ্বারা এক একটী সমিতি গঠিত করিতে হইবে। এই সমিতির সভাপতি কোন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ কিংবা স্কুলের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর অথবা অন্য কোন সরকারী কার্য্যকারক হইলে ভাল হয়। যাঁহারা ঐ সমিতির সভ্যরূপে মনোনীত হইবেন, তাহাদিগের নাম আমার নিকট লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। এবং তাঁহাদের মতামত ১৫ই জুলাইর মধ্যে আমার নিকট পাঠাইতে হইবে।

২। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রিজলী সাহেব বঙ্গদেশের জাতি বিভাগের একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহার একটী নকল এই সাত পাঠান যাইতেছে। এই তালিকায় যে জাতিকে যে স্থানে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, হয়ত কোন জেলাতে সেই জাতি তদপেক্ষা উচ্চতর বা নিম্নতর গৌরব ও সম্মানের স্থান অধিকার করিয়া থাকিতে পারেন। যদি সেরূপ কোন বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, তবে তাহার উল্লেখ করিতে হইবে। ঐ তালিকায় যে যে কারণে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন-স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, তাহার কোন পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইলে তাহারও কারণ উল্লেখ করিতে হইবে।

৩। রিজলী সাহেবের বিবরণীতে নিম্নলিখিত জাতিদিগের কোন উল্লেখ নাই। উপযুক্ত স্থানে উহাদিগকে সন্নিবেশিত করিতে হইবে। পশ্চিম বাঙ্গালার নহেলিয়া, ভড়, ভাটিয়া জাতি। চট্টগ্রামের পার্ব্বতীয়-দেশের চকমা জাতি। ভাট বা চারণ জাতি। চাষা ধোপা ও চষাতি জাতি। উত্তর বঙ্গের দেশী, কোহ ও বাক্সবংশী জাতি। উত্তর পূর্ব্ববঙ্গের দোয়াই ও হাইজঙ্গ জাতি। পূর্ব্ববঙ্গের গাঁড়াব. কাচারু জাতি। রঙ্গপুর ও কুচবিহারের কলিতা জাতি। কাণ জাতি। পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের করঙ্গ জাতি। উত্তরবঙ্গের খান জাতি। পূর্ব্ববঙ্গের কোচমণ্ডি জাতি। পশ্চিম বঙ্গের কেনিয়া জাতি। মধ্য বঙ্গের কোটাল জাতি। কোচবিহারের অধিবাসী কুরিসাজান জাতি। পশ্চিমবঙ্গের লেট জাতি। পূর্ব্ববঙ্গের লোহাইট কুরী জাতি। দক্ষিণ পূর্ব্ববঙ্গের মঘ জাতি। উত্তরবঙ্গের মেচ জাতি। কুচবিহারের মোবাঙ্গিয়া জাতি। পূর্ব্ববঙ্গের নর বা নট জাতি। উত্তর বঙ্গের পালিয় জাতি। মধ্য বঙ্গের পুরো জাতি। মেদিনীপুরের রাজু জাতি। রংরেজ জাতি। বাঁকুড়ার সামন্ত জাতি। রাজসাহী ও দিনাজপুরের সাঁওতাল জাতি। মেদিনীপুরের শিয়ালগির ও শুকলি জাতি। ঢাকার সূর্য্যবংশী জাতি। বাঁকুড়ার তেলিঙ্গা জাতি। পার্ব্বতীয় ত্রিপুরার ত্রিপুরা জাতি।

৪। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দ্বারা শূদ্র ও তাহাদিগের নিম্নস্থ জাতিদের সামাজিক-পদ গৌরব বিচার করিতে হইবে :—

(১) শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগের পৌরহিত্য করে কি না?

(২) ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগের জল ব্যবহার করে কি না?

(৩) তাহাদের নিকট হইতে ব্রাহ্মণেরা গঙ্গাজল গ্রহণ করে কি না?

(৪) তাহাদের পৌরহিত্য করায় ব্রাহ্মণেরা সমাজে পতিত হয় কি না?

(৫) তাহাদের নিকট হইতে উচ্চ শ্রেণীস্থ জাতিরা অপক্ব খাদ্য দ্রব্য লয় কি না?

(৬) উচ্চ শ্রেণীস্থ জাতিরা তাহাদের নিকট হইতে পক্ব খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করে কি না?

(৭) গ্রামস্থ-পরামাণিক তাহাদের ক্ষৌরকার্য্য করে কি না?

(৮) গ্রামস্থ রজকে তাহাদের কার্য্য করে কি না?

(৯) গ্রাম্য-কূপ হইতে তাহারা জল উঠাইয়া লইতে পারে কি না?

(১০) তাহাদের স্পর্শে অপবিত্র হইতে হয় কি না?

(১১) তাহারা গোমাংসাদি খায় কি না?

বঙ্গদেশের বিভিন্ন জাতির শ্রেণী-বিভাগ।

১। বঙ্গদেশে রাঢ়া, বারেন্দ্র ও বৈদিক এই তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছে।

যে সকল ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও নবশাখাদিগের পৌরহিত্য করেন, তাঁহারা অশূদ্র-যাজী ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কতকটা সমাজে ন্যূন হইয়াছে

যাঁহারা পাচক, মিষ্টান্ন-প্রস্তুতকারী, অথবা পূজক, তাঁহারা যদিও জাতিচ্যুত হন নাই, তথাপি সমাজে হেয় হইয়া পড়িয়াছেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে, মুসলমানদিগের রন্ধন করা খাদ্য-দ্রব্যের আঘ্রাণ লইয়াছিলেন বলিয়া পিরালী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সমাজে পতিত আছেন। নবশাখাদিগের নিম্নশ্রেণীস্থ জাতিদিগের পৌরহিত্য যাঁহারা করেন, তাঁহাদিগকে বর্ণবিপ্র বলা হইয়া থাকে। তাঁহারা পতিত ব্রাহ্মণ, এবং অন্যান্য জাতিরা তাঁহাদের জল ব্যবহার করে না। শব দাহনের সময় যে ব্রাহ্মণেরা কার্য্য করে, তাহারা ও অগ্রদানী এবং আচার্য্য ব্রাহ্মণগণও পতিত। ভাট ব্রাহ্মণগণও ঐ শ্রেণী-ভুক্ত।

২। নিম্নলিখিত জাতিরা নবশাখা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

রাজপুত—

ক্ষত্রী—

বৈশ্য—বৈশ্য বঙ্গদেশে নাই। কিন্তু উত্তর ভারত হইতে আগত আগরওয়াল জাতি বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দেয়।

বৈদ্য—চিকিৎসা-ব্যবসায়ী জাতি। পূর্ব্ব বঙ্গের বৈদ্যেরা কায়স্থদিগের সহিত বিবাহাদি কার্য্য করায় হেয় অবস্থায় পতিত হইয়াছেন।

কায়স্থ—লিপিকর জাতি।

আগরি বা উগ্র ক্ষত্রিয়—চাষ ও বাণিজ্য-ব্যবসায়ী জাতি। ইহাদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় উপবীত ধারণ করে।

৩। নবশাখা বা সৎশূদ্র। ইহাদিগের জল সকলে ব্যবহার করে। ভাল ব্রাহ্মণে ইহাদের পুরোহিতের কাজ করে এবং গ্রাম্য-নরসুন্দরে ইহাদের ক্ষৌর-কার্য্য করে। বারুই, গন্ধবণিক, কর্ম্মকার, কাঁশারি, মেদিনীপুরের কৃষি ব্যবসায়ী কাঠ জাতি, কুম্ভকার, কুরি, মধুনাপিত, মালাকর, মোদক, পরামাণিক, সদ্গোপ, পাতিয়াল, শাঁখারি, পূর্ব্ববঙ্গের শূদ্র জাতি, তাম্বুলী, তাঁতি, তেলি ও তিলি।

৪। নিম্নলিখিত জাতিদিগের পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ পতিত, কিন্তু ইহাদিগের জল সকলে ব্যবহার করে।

গোপ বা গোয়ালা—পাবনা জেলার গোয়ালের ব্রাহ্মণ পতিত নহে। কিন্তু যে গোয়ালারা গোরু রাগে, তাহাদের জল ব্যবহৃত হয় না। চাষী, কৈবর্ত্ত (মাহিষ্য)

৫। উক্ত জাতি অপেক্ষা নিম্নলিখিত জাতি হীন বটে, কিন্তু ইহাদের জল ব্যবহৃত হয়, ভুইয়া, বৈষ্ণব।

৬। জুগী—শব কবর দেয় এবং ধর্ম্ম-কার্য্যাদিও ব্রাহ্মণের সাহায্য না লইয়া নিজেরাই করে।

৭। সুবর্ণবণিক—বৈশ্য বলিয়া দাবী করে।

৮। স্বর্ণকার—স্বর্ণ চুরি করার দরুণ পতিত হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে

৯। সূত্রধর।

১০। কলু, শুড়ি বা সাহা, কাপালি, পূর্ব্ববঙ্গের কর্ণি জাতি, শুকলী, চাষা ধোপা, ধোপা কোন কোন স্থানে ইহাদের জল ব্যবহৃত হয়, ধোপা, ভাস্কর করালি।

বঙ্গদেশের আদমসুমারীর কমিশনার

সাহেবের প্রশ্নোত্তরে কলিকাতা-সমিতি নিম্নলিখিত-অভিমত দিয়াছেন:—বিভিন্ন জাতির শ্রেণী বিভাগ করিতে এই সমিতির কোনরূপ ক্ষমতা না থাকায় ও হিন্দুদিগের সাধারণ-মতে বিভিন্ন-জাতির শ্রেণী বিভাগ কিরূপ প্রচলিত আছে; কেবল মাত্র তাহাই নিরূপণ করার ভার এই সমিতির প্রতি অর্পিত থাকায় এবং এতদ্বিষয়ে নানারূপ মতের ও ব্যবহারের পার্থক্য দৃষ্ট হওয়ায়, আবহমান কাল প্রচলিত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এইরূপ শ্রেণী বিভাগের উল্লেখ করা ব্যতীত এ সম্বন্ধে এই সমিতি আর কিছুই নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না।

গাইট সাহেবের এই চিঠিতে বঙ্গদেশের অনেক জাতির মধ্যে বিষম-বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, যে সকল জাতি এতকাল পরস্পর সৌহার্দভাবে বাস করিতেছিল, এখন তাহারা এই জাতি বিভাগ লইয়া পরস্পর বিবাদ করিতেছে। যেখানে পূর্ব্বে বন্ধুতা ছিল, এখন সেখানে ঘোর শত্রুতা চলিতেছে। এমন কি, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও এ সম্বন্ধে নানারূপ বাকবিতণ্ডা চলিতেছে। বঙ্গদেশের দুইটী প্রধান জাতি, কায়স্থ ও বৈদ্যকে, এ বিষয়ে বিশেষভাবে উত্তেজিত দেখা যাইতেছে। বৈদ্যেরা এইটী প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন যে, তাঁহারা স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত অম্বষ্ঠ জাতি। সুতরাং তাঁহারা বৈশ্য শ্রেণী ভুক্ত এবং তাহাদের মতে কায়স্থেরা শূদ্রশ্রেণী ভুক্ত বিধায়, তাঁহারা কায়স্থদিগের অপেক্ষা জাতিতে বড়। অন্যপক্ষে, কায়স্থেরা এইটী প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন যে, তাঁহারা ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভূত বিধায় বৈদ্য অপেক্ষা জাতিতে শ্রেষ্ঠ। বঙ্গদেশের বহির্ভাগে ক্ষত্রী ও রাজপুতদিগের মধ্যেও ঐরূপ বিবাদ চলিতেছে। ক্ষত্রীরা বলিতেছেন যে, তাঁহারা প্রাচীন ক্ষত্রিয় বংশ সম্ভূত এবং রাজপুতেরা অনার্য্য জাতি। অন্যপক্ষে, রাজপুতেরা নিজদিগকে প্রকৃত ক্ষত্রিয় জাতি এবং ক্ষত্রীদিগকে শঙ্কর জাতি বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। কায়স্থ, বৈদ্য ও ক্ষত্রীরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এ সম্বন্ধে সভা সমিতিও করিতেছেন। বর্ত্তমানে হিন্দু-সমাজে যেরূপ ভাবে বর্ণভেদ প্রচলিত আছে, তাহা শাস্ত্রসঙ্গত বলা যায় না। এবং উহাই হিন্দু জাতির পতনের কারণ, বেদ-বিদ্যা-বিশারদ-পণ্ডিতগণ এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, বৈদিককালে কোনরূপ বর্ণ-ভেদ প্রথা ছিল না। অধ্যাপক ওয়েবার সাহেব বলেন যে, সে সময়ে কোন বর্ণ-বিভাগ ছিল না। সমস্ত লোক একই জাতি এবং একই বিশ নামে অভিহিত হইত। অধ্যাপক মোক্ষমুলার বলেন যে "মনুসংহিতায় যেরূপ বিভিন্ন জাতির উল্লেখ দেখা যায় এবং বর্ত্তমান সমাজে যেরূপ প্রচলিত দেখা যায়, বাস্তবিক বৈদিকসময়ে সেরূপ কোন জাতি বিভাগছিলনা। বর্ণ শব্দের অর্থ রঙ্। ঋগ্‌বেদে উহা কোন স্থলে জাতি অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। অনার্য্যদিগের গাত্রবর্ণের সহিত আর্য্যদিগের গাত্রবর্ণের পার্থক্য সূচনা করিবার জন্য ঋগ্‌বেদে "আর্য্যবর্ণ" এইরূপ প্রয়োগ পাওয়া যায়। [ঋগ্‌বেদ ৩। ৩৪।৯] ঋগ্‌বেদে ব্রাহ্মণ এই শব্দে কোন জাতি বিশেষকে বুঝাইত না, কেবল ঋক্‌রচনাকারীকেই বুঝাইত। [ঋগ্বেদ ৭.৬৪.২৩

৭।৮৯] বর্ত্তমানে ক্ষত্রিয় শব্দে সৈনিক জাতিকে বুঝায়, কিন্তু ঋগ্বেদে ঐ শব্দে বলবান বুঝাইত এবং উহা দেবতাদিগের প্রতিই ব্যবহৃত হইত। [৭। ১১, ৬] বিশ এই শব্দে জন সাধারণকে বুঝাইত [৮। ৩৫, ১৮।] ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯০ সূক্তে কেবল শূদ্র এই কথাটীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সূক্তটী অন্য তিন বেদেও অবিকল উদ্ধৃত হওয়ায়, কেবল সেই সেই স্থলেই শূদ্র কথাটীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যজুর্ব্বেদের পুরুষ মেধ-অধ্যায়ে বধ্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের নামের ন্যায় শূদ্রের নামের ও উল্লেখ আছে।

পঞ্চনদ-দেশই আর্য্যদিগের আদিম বাসস্থান ছিল। তথায় শতদ্রু (সাটলেজ,) পরুষ্ণী (রাভি), অশিক্নী (চিনাব), বিতস্তা (ঝিলাম) এবং অর্জ্জিকীয়া (বিয়াস) এই পাঁচটী নদী ছিল। [১০। ৭৫] সিন্ধু ও সরস্বতী নদী লইয়া কখন কখন সাতটী নদীর উল্লেখ দেখা যায়। [ঋগ্বেদ ৭। ৩৬] আর্য্যগণ পাঁচটী নদীর ধারে অধিনিবাস স্থাপন পূর্ব্বক পাঁচটী পৃথক জাতিরূপে পরিণত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে পঞ্চ জন বলা হইত। যদু, তুর্ব্বশ, অনু, দ্রুহ্যু, এবং পুরু এই পাঁচটী জাতি।

যাস্কমুনি বৈয়াকরণ পাণিনীর একশতাব্দী পূর্ব্বে এবং খৃষ্টের নয়শতবৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তৎকৃত বৈদিক অভিধান নিরুক্ত শাস্ত্রে মনুষ্য শব্দের নিম্নলিখিত প্রতি শব্দগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্য, নর, ধব, জন্তু, বিশ, ক্ষিতি, কৃষ্টি, চর্ষণী, নহুষ, হরি, মর্য্য, মর্ত্ত্য, মর্ত্ত, ব্রাত, তুর্ব্বশ, দ্রুহ্য, আয়ু, যদু, অনু, পুরু, জগৎ তস্থু পঞ্চজন, বিবস্বৎ, পৃতন।

পরবর্ত্তী পৌরাণিকেরা ঐ পঞ্চজাতিকে যযাতির পুত্র বলিয়া বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে একজন অসভ্য ম্লেচ্ছজাতির রাজা বলিয়া খ্যাত আছেন। হিন্দু মাত্রেই জানেন যে, যযাতির পুত্রদিগের মধ্যে কেবল পুরুই রাজত্ব পাইয়াছিলেন। অন্যান্য পুত্রগণ পিতার জরা ভার নিজেরা লইতে অস্বীকার করায় অভিশপ্ত হইয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত আর্য্যজাতির মধ্যে পুরুজাতিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ছিলেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৫৯, ১০৮ ও ১৩০ সূক্তে এবং ষষ্ঠ মণ্ডলের বিংশতি সূক্তে সমস্ত জাতির নাম পাওয়া যায়। প্রথম-মণ্ডলের ৭ ও ১১৬ সূক্তে এবং ষষ্ঠ মণ্ডলের ৪র্থ সূক্তে আর্য্যদিগের প্রথম ও প্রধান উপনিবেশ সেই পাঁচটী স্থানের, "পঞ্চ-ক্ষিতির," উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ষষ্ঠ-মণ্ডলের ১১ ও ৫৪ সূক্তে এবং অষ্টম মণ্ডলে ৩২ সূক্তে ও নবম-মণ্ডলের ৫৫ ও অন্যান্য সূক্তে "পঞ্চজনের" উল্লেখ আছে। তাহাদিগকে "পঞ্চকৃষ্টি" বা পাঁচটী কৃষি-ব্যবসায়ী জাতিও বলা হইয়া থাকে। [২।২-১০; ৪। ৩৮-১০] পরবর্ত্তী গ্রন্থকারেরা এই বৈদিক কিম্বদন্তী পরিহার-পূর্ব্বক "পঞ্চ-জনের" দ্বারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নিষাদ এই পাঁচটী জাতির উল্লেখ বুঝিয়া থাকেন। এবং তাঁহাদের মতে যেন এই পাঁচটী জাতিতেই সমস্ত মানব জাতি বিভক্ত ছিল।

ঋগ্বেদে দশ সহস্র শ্লোক আছে। ঋক

বড় পণ্ডিতদিগের মতে উহা সাত আট শত বৎসর ধরিয়া রচিত হইয়াছে। ইহাতে লোকের আচার, ব্যবহার, সামাজিক ও ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়মপদ্ধতি, পারিবারিক রীতিনীতি, ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষিকার্য্য, বিভিন্ন জাতির মধ্যে ও পরস্পর যুদ্ধ এবং দার্শনিক ও জ্যোতির্ব্বিদ্যা বিষয়ক-প্রস্তাবনা প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা আছে, কিন্তু ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, উহাতে কোন বর্ণভেদের উল্লেখ নাই।

অন্য পক্ষে, সে সময়ে যে কোন বর্ণভেদ ছিল না, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। নবম-মণ্ডলের ১১২ সূক্তে শিশুঋষি সোম পবমানকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন "দেখ আমি স্তোত্র রচনা করি, আমার পিতা চিকিৎসক, মাতা প্রস্তরের উপর শস্য চূর্ণ করেন; আমরা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন কাজ করিয়া থাকি।" ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ঋগ্বেদের সময়ে জাতি ভেদ ছিল না। কারণ, তাহা হইলে পিতা চিকিৎসক, মাতা শস্যচূর্ণকারিণী এবং নিজে স্তোত্র রচয়িতা এরূপ কখন হইতে পারিত না।

পৌরাণিক গ্রন্থকারগণ বলেন যে, বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ছিলেন, পরে সাধনা বলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু বেদে আমরা এরূপ কোন কথাই দেখিতে পাই না। বাস্তবিক বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণও ছিলেন না, ক্ষত্রিয়ও ছিলেন না। তিনি একজন বৈদিক ঋষি মাত্র ছিলেন। এবং বৈদিক ঋষিদিগের ন্যায় কখন পুরোহিত, কখন সৈনিক, কখন গৃহস্থের কাজও আবশ্যক মত করিতেন।

বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ এই দুই পরিবারের মধ্যে বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। ইহা হইতে পৌরাণিক-লেখকগণ নানারূপ গল্পের অবতারণা করিয়াছেন। যাগ, যজ্ঞ, স্তোত্র রচনা করিয়াই ঋষিগণ সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতেন। তাঁহারা কোন স্বতন্ত্র-সমাজ ভুক্ত ছিলেন না। সমগ্র ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয় যে, ঋষিগণ, ধন, জন, গো, অশ্ব, প্রভৃতির জন্য দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেন।

এখন দেখা যাউক পুরুষ সূক্তে—এ সম্বন্ধে কি আছে। ১০ম মণ্ডল ৯০ সূক্ত।

১। সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥

অনন্ত শির (অবয়ব) যুক্ত, অনন্ত চক্ষু (জ্ঞানেন্দ্রিয়) যুক্ত, অনন্ত পাদ (কর্ম্মেন্দ্রিয়) যুক্ত বিরাট পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন, এবং তিনি মানবের নাভি প্রদেশ হইতে দশাঙ্গুল পরিমিতস্থান অতিক্রম করিয়া হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন।

২। পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥

এই বিশ্ব জগতে যাহা কিছু হইয়াছে ও হইবে, তৎসমস্তই এই পুরুষ, ইনি মোক্ষের অধিপতি এবং ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত যাবৎ জীব, যাহা অন্ন অর্থাৎ ভোগ্য বস্তুর দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয়, ইনি তৎসমুদয়ের অধিপতি। অথবা যে পুরুষ ভোগ্যান্নের দ্বারা কারণ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া জগদবস্থা প্রাপ্ত হন।

৩। এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥

এই সমুদায় তাঁহার মহিমা, ইহা তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ নহে। প্রকৃত পুরুষ ইহা অপেক্ষা অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ। বিশ্বস্থ-যাবৎ পদার্থ পরম-পুরুষের অংশ মাত্র কিন্তু ইহার ত্রিপাদ-স্বরূপ অমৃত অর্থাৎ পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোকব্যাপী বিনাশ রহিত স্বরূপ স্বীয়-রূপেই অবস্থিতি করিতেছেন।

৪। ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রমাৎ সাশনানশনে অভি॥

ত্রিপাদ-পুরুষ অজ্ঞানময়-সংসারের বহির্ভাগে বাস করেন, কিন্তু তাঁহার অংশ সৃষ্টিস্থিতি সংহার হেতুক মায়াজগতে পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হয়। মায়াজগতে আগমনান্তর তিনি বহুবিধরূপ ধারণ করিয়া চেতনাচেতন তাবৎ পদার্থে ব্যাপ্ত হইয়া থাকেন।

৫। তস্মাদ্বিরাড়জায়ত বিরাজো অধি-পুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ ভূমি-মথো পুরঃ॥

সেই নিরাকার পরম-পুরুষ হইতে বিরাট অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহ উৎপন্ন হইল এবং সেই বিরাট দেহের উপরে অর্থাৎ বিরাট-দেহ আশ্রয় করিয়া দেহাভিমানী পুরুষ জন্মিলেন। সর্ব্ববেদান্তবেদ্য পরমাত্মা মায়া দ্বারা বিরাট-দেহ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে জীবরূপে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী জীব হইলেন। তিনি যখন জীবরূপ ধারণ করিলেন, তখন তিনি দেবতা মনুষ্যাদি বিবিধ-রূপ ধারণ করিলেন এবং পঞ্চভূত ও জীব-শরীরাদি সৃষ্টি হইল।

৬। যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উৎপন্ন দেবতারা যখন এই দেহাভিমানী পুরুষকে হবিস্বরূপ করিয়া সেই পরম পুরুষের মানস যজ্ঞ করিয়াছিলেন অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডাত্মক দেহাভিমানী পুরুষকে অবলম্বন করিয়া নিরাকার আদি পুরুষের আরাধনা করিয়াছিলেন, তখন বসন্ত ঋতু তাঁহাদের পূজোপকরণের আজ্য স্বরূপ, গ্রীষ্ম কাষ্ঠস্বরূপ এবং শরৎ হবি স্বরূপ হইয়াছিল।

৭। তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে॥

সৃষ্টি সাধনসমর্থ এবং তত্ত্বজ্ঞানী দেবতারা সেই অগ্রজাত দেহাভিমানী যজ্ঞীয় পুরুষকে মানস-যজ্ঞে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এবং তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া পরমাত্মার উপাসনা করিয়াছিলেন।

৮। তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সংভৃতং পৃষদাজ্যম্।
পশূন্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যান্ গ্রাম্যাংশ্চ যে॥

সেই সর্ব্বহুত যজ্ঞ হইতে দধিযুক্ত-আজ্য সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই পরম পুরুষ ঐ যজ্ঞ হইতে গ্রাম্য, বন্য ও বায়ব্য পশু সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

৯। তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত॥

সেই সর্ব্বহুত যজ্ঞ হইতে ঋক্ মন্ত্র এবং সামমন্ত্র গায়ত্র্যাদি ছন্দ এবং যজুর্মন্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে।

১০। তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবোহ জজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ॥

সেই যজ্ঞ হইতে ঘোটক, অন্যান্য দন্ত-পংক্তিধারী পশুগণ, গাভী, ছাগ ও মেষগণ উৎপন্ন হইয়াছিল।

১১। যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা উরূ পাদা উচ্যেতে॥

দেহাভিমানী পুরুষকে যখন যজ্ঞে পশু-রূপে সংকল্প করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তখন তাহার দেহের বিভিন্নাংশকে কিরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল? কোন্ অংশকে মুখ? কোন্ অংশকে বাহু, কোন্ অংশকে উরু, কোন্ অংশকে পদ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল?

১২। ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥

ব্রাহ্মণকে এই পুরুষের মুখরূপে, ক্ষত্রিয়কে বাহু, বৈশ্যকে উরু এবং শূদ্রকে পদরূপে কল্পনা করা হইয়াছিল।

১৩। চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্র শ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত॥

চন্দ্র মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল অর্থাৎ চন্দ্রকে বিরাট পুরুষের মনস্বরূপ, সূর্য্যকে চক্ষুস্বরূপ, ইন্দ্র ও অগ্নিকে মুখস্বরূপ এবং বায়ুকে প্রাণস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল।

১৪। নাভ্যা আসীদন্তরীক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকান্ অকল্পয়ন্॥

নাভি হইতে অন্তরীক্ষ উৎপন্ন হইয়াছিল অর্থাৎ অন্তরীক্ষকে বিরাট-পুরুষের নাভি-স্বরূপ, দ্যৌঃ অর্থাৎ স্বর্গকে মস্তকস্বরূপ, ভূমিকে পদস্বরূপ, ভুবন সকল এবং দিক সকলকে কর্ণস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল।

১৫। সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত-সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্‌যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্॥

দেবতারা যখন যজ্ঞ সম্পাদন কালে পুরুষ পশুকে বন্ধন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ মানসিক যজ্ঞ সম্পাদনকালে দেহাভিমানী পুরুষ দেবকে পশুরূপে চিন্তা করিয়াছিলেন, তখন গায়ত্র্যাদি সপ্ত ছন্দকে ঐ যজ্ঞের সাতটী পরিধি বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছিল এবং দ্বাদশ মাস, পঞ্চ ঋতু, তিন লোক এবং আদিত্যকে ঐ যজ্ঞের কাষ্ঠস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল।

১৬। যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্।
তেহ নাকং মহিমানঃ সচন্ত পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ॥

দেবতারা যে মানস যজ্ঞ করিয়া পর-ব্রহ্মের উপাসনা করিয়াছিলেন, উহাই প্রথম ধর্ম্মানুষ্ঠান, পূর্ব্বে বিরাট পুরুষকে উপাধি-স্বরূপ করিয়া দেবতারা যে স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ বিরাট পুরুষ প্রাপ্তিরূপ স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মহাত্মা উপাসকেরা সর্ব্বদাই তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

কোলব্রুক সাহেব বলেন যে, এই সূক্তটী ঋগ্‌বেদের সময়ের অনেক পরে রচিত হইয়াছে। ওয়েবার ও মোক্ষ মূলর সাহেব

এবং অন্যান্য কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, এই সূক্তটী অপেক্ষা কৃত আধুনিক। আধুনিক হউক বা না হউক, এমন কি মহীধর ও সায়ণাদি প্রাচীন ভাষ্যকারগণও এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, এই সূক্তটী একটী রূপক মাত্র। দ্বাদশসূক্তে চারি জাতির উল্লেখ আছে। ঐ সূক্ত-রচয়িতা তখনকার লোকদিগকে বিভিন্ন ব্যবসায়ানুযায়ী চারিটী শ্রেণীতে বিভক্ত দেখিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি তাহাদিগকে বিরাট পুরুষের শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। নবম-সূক্ত হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ঋক্, সাম, এবং যজুর্ব্বেদের পরে জাতি বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। যজ্ঞাদির সময়ে দেবতাদিগের স্তোত্র পাঠ করার অধিকার কেবল পুরোহিতদিগের ছিল বলিয়া ব্রাহ্মণকে মহাপুরুষের মুখস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করার জন্য তরবারী এবং শূল ধারণ করার অধিকার কেবল ক্ষত্রিয়দিগের ছিল বলিয়া রাজন্য অর্থাৎ ক্ষত্রিয়দিগকে পুরুষের বাহুস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। বৈশ্যকে উরুস্বরূপ বলা হইয়াছে,—কারণ, উরুদেশই শরীরের সর্ব্বাপেক্ষা বল-সম্পন্ন অঙ্গ এবং বৈশ্যই কৃষি ও বাণিজ্য-ব্যবসায়ী বিধায় সমাজের প্রধান অবলম্বন স্বরূপ ছিল। শূদ্রকে পদ স্বরূপ বলা হইয়াছে, কারণ, তাহারা বিশেষ পরিশ্রমী ছিল; সমস্ত শরীর যেরূপ পদদ্বয়ের উপর থাকে, সেইরূপ সমস্ত সমাজও কৃষক ও শ্রমজীবীর উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। এই সূক্তে যে জাতি-প্রথা-সৃষ্টির কথা কিছু বলা হইতেছে না, তাহার প্রমাণ ইহাতেই আছে। দ্বাদশঋককে বলা হইতেছে—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥

প্রশ্ন করা হইতেছে যে, দেহাভিমানী পুরুষকে যখন যজ্ঞে পশুরূপে সংকল্প করা হইয়াছিল, তখন তাহার দেহের বিভিন্নাংশকে কিরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল? কোন্ অংশকে মুখ, কোন্ অংশকে বাহু, কোন্ অংশকে উরু, কোন্ অংশকে পদ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল? এ প্রশ্নের উত্তর উপরোক্ত শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে যে,—ব্রাহ্মণকে এই পুরুষের মুখরূপে, ক্ষত্রিয়কে বাহুস্বরূপ, বৈশ্যকে উরুস্বরূপ, এবং শূদ্রকে পদস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল। যদি বলা যায় যে স্বর্ণ অলঙ্কার হইয়াছিল, তাহা হইলে যেমন স্বর্ণের অস্তিত্ব পূর্ব্বে এবং অলঙ্কারের অস্তিত্ব পরে সূচিত হয়, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ মুখ হইয়াছে বলিলে, ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব পূর্ব্বে এবং মুখের অস্তিত্ব পরে সূচিত হয়। সুতরাং ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, "ব্রাহ্মণো মুখমাসীৎ" শব্দের অর্থ ইহা নয় যে, ব্রাহ্মণ মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, কিন্তু উহার প্রকৃত অর্থ এই যে, ব্রাহ্মণকে মুখ স্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল। মুখ এবং ব্রাহ্মণ উভয়ই এক বচনান্তপদ। এরূপ তর্ক হইতে পারে যে, উভয় শব্দই কর্ত্তৃকারক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐ শ্লোকের পরার্দ্ধে রাজন্য এক বচন এবং বাহু দ্বিবচন সুতরাং এক বচনান্ত কৃতের সহিত বাহুর যোজনা হইতে পারে না; রাজন্যের সহিত উহার অন্বয় হইবে। অতএব "রাজন্যঃ বাহূ কৃতঃ" অর্থাৎ রাজন্যকে বাহুদ্বয় করা হইয়াছিল। সুতরাং বাহুর অস্তিত্বের পূর্ব্বে

রাজন্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। এই রূপে "উরু তদস্য ..." ইহাতে উরুর অস্তিত্বের পূর্ব্বে ... অস্তিত্ব সূচিত হইতেছে। কিন্তু ... স্পষ্ট রহিয়াছে যে 'পদ্ভ্যাং ...জায়ত' অর্থাৎ পদদ্বয় হইতে শূদ্র ...। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তাঁহার মুখ, বাহু ও উরু স্বরূপ কল্পিত হইয়াছিলেন এই কথা বলার পর, 'অজায়ত' শব্দ থাকা সত্ত্বেও, "পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত" ইহার অর্থ শূদ্র তাহার পদদ্বয় স্বরূপ কল্পিত হইয়াছিলেন, এইরূপ করাই যুক্তি ও ন্যায় সঙ্গত, এবং ইহাই প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত ভাষ্যকারগণেরই অভিমত।

আমরা যতদূর দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে পুরুষ সূক্ত হইতে জাতি প্রথার সৃষ্টি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। তবে এই মাত্র পাওয়া যায় যে, আর্য্যদিগকে যখন চারিটী শ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়াছিল, তখন ব্রাহ্মণকে সর্ব্বোচ্চ স্থান, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে তৎপরবর্ত্তী স্থান এবং শূদ্রকে সমাজে সর্ব্বনিম্ন স্থান প্রদত্ত হইয়াছিল।

এই সূক্ত হইতে আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই চারি জাতিরই পূর্ব্বপুরুষ একই ছিল। মহাভারতে পাওয়া যায় যে, এই চারি জাতিরই ভাষা এক ছিল।

ইত্যেতে চত্বারোবর্ণা যেষাং ব্রাহ্মী সরস্বতী।
মহাভারত—শান্তি পর্ব্ব-অধ্যায়-১৮৮,১৮৯।

এই স্থলে আর একটী কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, পুরুষ সূক্তে বর্ণ বা জাতি কথার কোন উল্লেখ নাই। আমরা অবগত আছি যে, আর্য্য ও অনার্য্য জাতির সমাজ ও ভাষা পৃথক ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের ভাষা একই ছিল। শূদ্র যদি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হইতে স্বতন্ত্র বংশোদ্ভূত হইত, তাহা হইলে তাহাদের ভাষা কখনও এক হইতে পারিত না। বেদে শূদ্রকে কখন অনার্য্য বলা হয় নাই। অধ্যাপক মোক্ষমূলর বলেন যে, শূদ্র যে আর্য্যদিগের হইতে পৃথক জাতি ছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই।

বরঞ্চ হিন্দু শাস্ত্র হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, অতি প্রাচীন কালে চারি জাতিই একই জাতি ছিল।

মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব অধ্যায় ১৮৮, ১৮৯

মহাভারতে দৃষ্ট হয় যে, যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন ত্যাগ করিয়াছে, সর্ব্ব প্রকার খাদ্য খায় এবং সর্ব্ব প্রকার কার্য্যই করে এবং অশুচি, সে শূদ্র।

সর্ব্বভক্ষ্যরতি র্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ।
ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃস বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ।

এস্থলে 'ত্যক্তবেদঃ,' অর্থাৎ যে বেদাধ্যয়ন ত্যাগ করিয়াছে, এই কথাটীর উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বেদাধ্যয়ন ত্যাগ করিয়াছে বলিলে বেদাধ্যয়নে অনধিকার এরূপ কোন কথা বলা হয় না। ধর্ম্মকার্য্য ও যজ্ঞক্রিয়া করার পক্ষে যে শূদ্রদিগের কোন বাধা ছিল না, তাহাও মহাভারতে দৃষ্ট হয়।

সমস্ত লোককে যখন চারিটী শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছিল, তখনও তাহারা একই জাতির ন্যায় বাস করিত। যে শ্রেণীর লোকে যেরূপ ব্যবসায় অবলম্বন করিত তদনুসারে তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রি

বৈশ্য ও শূদ্র বলা হইত, ঐ সমুদয় শব্দে এখনকার মত কোন জাতি বিশেষকে বুঝাইত না, কেবল পুরোহিত, সৈনিক, বাণিজ্য ও কৃষিব্যবসায়ী এবং অন্যান্য নীচ কার্য্যকারী লোকদিগকে বুঝাইত।

অনেকের মনে এরূপ ভ্রমাত্মক ধারণা আছে যে, শাস্ত্রে যখন শূদ্রদিগকে কালবর্ণ বিশিষ্ট বলা হইয়াছে, তখন আর্য্যজাতিরও শূদ্রদিগের মধ্যে বংশ গত পার্থক্য ছিল। কিন্তু তাহাদের এটী মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, যে বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়কে আর্য্যজাতি বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহারাও বিভিন্ন বর্ণ বিশিষ্ট ছিল বলিয়া উক্ত আছে। ব্রাহ্মণেরা শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয়গণ রক্তবর্ণ, বৈশ্যেরা গৌরবর্ণ ও শূদ্রেরা কালবর্ণ বিশিষ্ট ছিল বলিয়া মহাভারতে উক্ত আছে। মহাভারতে আরও বলা হইয়াছে যে, এই চারিটী জাতি আদিতে একই ছিল।

যেরূপ শ্বেতকায় জাতিদিগের মধ্যে বর্ণের অনেক তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। সেইরূপ লাল, কাল ও গৌরবর্ণের জাতিদিগের মধ্যেও সেই সেই বর্ণের অনেক ইতর বিশেষ দৃষ্ট হয়। ইউরোপ বাসীরা সাধারণতঃ শ্বেতকায় বিশিষ্ট কিন্তু তাহাদের মধ্যেও শ্বেতবর্ণের অনেক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। অধ্যাপক ও পুরোহিত প্রভৃতির ন্যায় যে সকল লোক মানসিক পরিশ্রম করেন, তাঁহাদের মুখ সাধারণতঃ শুভ্র বর্ণ বিশিষ্ট হয়। আবার সৈনিক পুরুষ গণ সর্ব্বদা যুদ্ধ ও মৃগয়া কার্য্যে উত্তেজিত থাকায় তাহাদের মুখশ্রী রক্তিম দৃষ্ট হয়, যেন তাহাতে প্রকাশ করিয়া দিতেছে যে, তাহারা সকল প্রকার সাহসিক কার্য্য করিতেই প্রস্তুত। ব্যবসায়-জীবী সর্ব্বদা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে বলিয়া তাহার গৌরবর্ণ মুখ এবং ওষ্ঠ দেখিয়া বুঝা যায় যে, পার্থিব সমস্ত সুখকর দ্রব্য তাহার আয়ত্বাধীন আছে। আবার হলধারীর রৌদ্রতপ্ত-কৃষ্ণবর্ণ মুখ দেখিয়া বুঝা যায় যে, তাহার জীবন দুঃখ পরিপূর্ণ। কি শ্বেতকায় ইউরোপবাসী, কি লোহিতকায় আদিম আমেরিকাবাসী, কি গৌর বর্ণ চীনবাসী, কি কৃষ্ণ বর্ণ নিগ্রোজাতি, সর্ব্ব দেশের সর্ব্ব জাতি সম্বন্ধেই এই একই নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণগণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয়গণ রক্তবর্ণ, বৈশ্যগণ পীতবর্ণ এবং শূদ্রগণ কৃষ্ণবর্ণ।

ব্রাহ্মণানাং সিতো বর্ণঃ ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ লোহিতঃ।
বৈশ্যানাং পীতকো বর্ণঃ শূদ্রাণামসিত স্তথা॥

মহাভারত-ভৃগু ভরদ্বাজ সংবাদ শান্তিপর্ব্ব-১৮৮-১৮৯ অধ্যায়।

এখানে ইহাও দ্রষ্টব্য যে, শ্বেত-বর্ণ সত্বগুণের, রক্তবর্ণ রজোগুণের এবং কৃষ্ণবর্ণ তমোগুণের পরিচায়ক।

আর্য্যগণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যবসানুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়ার পরও, অন্য শ্রেণীর ব্যবসা অবলম্বন ও সেই দলভুক্ত বলিয়া পরিচিত হওয়ার পক্ষে, বিশেষ কোন বাধা ছিল না।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, আমি লোকদিগকে গুণ ও কর্ম্মানুসারে চারি বর্ণে বিভাগ করিয়াছি।

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।

ইহাতে আরও বলা হইয়াছে যে, যাঁহাদিগের সত্বগুণ প্রধান, তাঁহারা ব্রাহ্মণ,

যাঁহাদিগের রজোগুণ প্রধান, তাঁহারা ক্ষত্রিয় এবং যাঁহাদিগের তমোগুণ প্রধান, তাহারা শূদ্র। যাহাতে এক সময়ে তমোগুণ প্রবল আছে, তাহাতে অন্য সময়ে সত্বগুণাধিক্য হইতে পারে।

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্বংভবতি ভারত।
রজঃ সত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্বং রজস্তথা
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৪অ-১০।

অর্থাৎ প্রত্যেক গুণই অন্য গুণদ্বয়কে পরাভূত করিয়া স্বয়ং প্রবল হইতে পারে। আবার মহাভারতে দেখিতে পাই যে, পৃথিবীর সৃষ্টিকালে কোন জাতি প্রথা ছিল না, পরে মনুষ্যগণের বিভিন্ন কার্য্যানুসারে তাহারা বিভিন্ন জাতিতেবিভক্ত হইয়াছিল।

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বং হি সৃষ্টং কর্ম্মভি র্ব্বর্ণতাং গতম্।
মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ১৮৮ ১৮৯ অধ্যায়।

পরে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে যে, লোকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কি প্রকার হয়? উত্তর—যিনি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় এবং বেদাধ্যয়নশীল তিনিই ব্রাহ্মণ। যিনি সাহসী এবং সর্ব্বগুণান্বিত তিনি ক্ষত্রিয়। যিনি ব্যবসা, বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্য অথবা পশুপালন এবং বেদাধ্যয়ন করেন, তিনি বৈশ্য। এবং যিনি বেদাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং অন্তর ও বাহিরেঅশুচি তিনিই শূদ্র। অতঃপরে আরও পরিষ্কাররূপে বলা হইয়াছে :—

শূদ্রে চেত্তবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ॥

যদি শূদ্রবংশোদ্ভূত ব্যক্তিতে ব্রাহ্মণের লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তবে সে ব্যক্তি শূদ্র নহে এবং যদি ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত ব্যক্তিতে ব্রাহ্মণের লক্ষণ দৃষ্ট না হয়, তবে সে ব্যক্তিও ব্রাহ্মণ নহে।

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসোবর্ণাভিব্যঞ্জকং
যদান্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ
শ্রীমৎভাগবৎ পুরাণম্।

কোন এক জাতির নির্দ্দিষ্ট গুণাবলি অন্য কোন ব্যক্তিতে দৃষ্ট হইলেও তাহার বর্ণ তাহার গুণের দ্বারা নির্ব্বাচন করিতে হইবে।

প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ
মনুসংহিতা।

যাহাদের জাতি কুল অপবিজ্ঞাত, তাহাদের কার্য্য দেখিয়াই তাহাদের জাতি নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে।

তপোবীর্য্য প্রভাবৈস্তুতে গচ্ছন্তি যুগেযুগে,
উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ।
মনুসংহিতা।

মানবগণ ইহজীবনে স্বীয়তপ ও বীর্য্য প্রভাবে বর্ণের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ পাইয়া থাকে।

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্
মনুসংহিতা।

কার্য্য গুণে শূদ্র ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ শূদ্র হইয়া পড়ে।

জাতো নার্য্যামনার্য্যায়ামার্য্যাদার্য্যোভবেদ্‌গুণৈঃ।
মনুসংহিতা।

আর্য্যপুরুষ এবং অনার্য্যানারী হইতে উৎপন্ন সন্তান ও সদ্‌গুণ বশতঃ আর্য্য হইতে পারেন।

বর্ণান্তর গমন মুৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাম্। গৌতম।

জাতির পরিবর্ত্তন গুণের উৎকর্ষাপকর্ষ অনুসারে হইয়া থাকে।

অত্রিমুনি বলেন—যিনি ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া বেদাধ্যয়ন করেন এবং যিনি আসক্তি-বিহীন, তিনিই ব্রাহ্মণ। যিনি ক্ষত্রিয়ের ব্যবসা অবলম্বনে যুদ্ধাদি কার্য্য করেন, তিনিই ক্ষত্রিয়। যিনি বাণিজ্য, কৃষি বা গোপের কার্য্য করেন, তিনিই বৈশ্য। যিনি লবণ, মাংস, মধু ইত্যাদি বিক্রয় করেন, তিনিই শূদ্র। যে সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্ম কার্য্য বিহীন, মূর্খ ও সর্ব্ব-জীবের প্রতি নির্দ্দয়, সে চণ্ডাল।

ঘৃৎসমদ পুত্র শুনকের পুত্র শৌনক ঋষি বিভিন্ন কার্য্যানুসারে নিজের সন্তান দিগকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি শ্রেণীতে যে বিভাগ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ বায়ুপুরাণ ও বিষ্ণু পুরাণ এবং হরিবংশে দেখিতে পাওয়া যায়।

পুত্রো ঘৃৎসমদস্যচ শুনকো যস্য শৌনকঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ
এতস্য বংশ সম্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভির্দ্বিজাঃ
বায়ুপুরাণম্।

ঘৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্বর্ণ্যং প্রবর্ত্তয়িতা
বিষ্ণুপুরাণম্।

পুত্রো ঘৃৎসমদস্য চ শূনকো যস্য শৌনকঃ
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈবচ।
হরিবংশম্।

এমন কি যখন শ্রেণী বিভাগ মাত্র হইতে বর্ত্তমানে প্রচলিত জাতি ভেদের সৃষ্টি হইল, তখন কোন উচ্চ জাতি হইতে নীচ জাতিতে অবনতি এবং কোন নীচ জাতি হইতে উচ্চ জাতিতে উন্নতি হইবার নিয়ম ও প্রচলিত ছিল। মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত হইতে উদ্ধৃত উপরোক্ত অংশ সকলে ইহারই প্রমাণ রহিয়াছে।

এখানে আরও একটী বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ভারতবর্ষে আর্য্য জাতি ভিন্ন অন্যান্য জাতি ও ছিল। তাহাদিগকে অনার্য্য জাতি বলা হইত। কিন্তু অনার্য্য শব্দে তখন কেবল যাহারা আর্য্য নয়, তাহাদিগকেই বুঝাইত; তদ্ব্যতীত উহাতে বর্ত্তমান কালের ন্যায় কোনরূপ বংশের নীচত্বাদি বুঝাইত না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতির গাত্র বর্ণের সহিত আর্য্যদিগের গাত্র বর্ণের তুলনা করিবার সময়েই কেবল বর্ণ অর্থাৎ রঙ্ এই কথাটীর প্রয়োগ বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্‌বেদে আমরা দেখিতে পাই যে, আর্য্যগণ অনেক সময়ে কৃষ্ণকায় জাতি বিশেষের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। বিভিন্ন অনার্য্য জাতির বিবরণে দেখা যায় যে, তাহারা প্রবল পরাক্রান্তশালী লোক ছিল। তাহাদের সুন্দর নগর, সুপ্রশস্ত প্রমোদ কানন, মনোহর অট্টালিকা, লৌহ ও প্রস্তর নির্ম্মিত দুর্গ ছিল। সিন্ধু ও গঙ্গা নদীর পার্শ্ববর্ত্তী ভূমি লইয়া তাহাদিগের সহিত যে, আর্য্য জাতির বিবাদ হইয়াছিল, সভ্যতায় তাহারা সেই আর্য্য জাতির সমকক্ষ ছিল। আর্য্য ও অনার্য্য জাতির মধ্যে অনেক সময়ে বিবাহাদিও প্রচলিত ছিল—জরৎকারু ঋষি অনার্য্য বাসুকি রাজার ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। আস্তিকঋষি ইহাদের সন্তান। তিনিই আর্য্য ও অনার্য্যদিগের মধ্যে

বন্ধুতা স্থাপন করিয়া ছিলেন। আমরা সকলেই জানি যে, পরাশর ঋষি, শান্তনু রাজা, ভীম ও অর্জ্জুন ইঁহারা সকলেই অনার্য্য-কন্যাদিগের পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমস্ত অনার্য্য জাতিই কৃষ্ণবর্ণ ছিলনা। য়িহুদী, আরবদেশবাসী, তিব্বত দেশবাসী, চীন দেশবাসীরা, জাপান দেশ বাসী এবং ব্রহ্মদেশ বাসীরা সকলেই অনার্য্য জাতি, কিন্তু তাহাদের গাত্রবর্ণ কাল নহে। অনার্য্য-জাতির মধ্যে, কতকগুলি অশিক্ষিত জাতি ছিল। আর্য্যেরা তাহাদিগকে স্বীয় সমাজে লইবার সময় তাহাদিগকে স্বজাতি বলিয়া স্বীকার করিলেন না। ইহা হইতেই জাতি বিভাগের প্রথম সৃষ্টি হইল।

(ক্রমশঃ)

আহার।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

দ্বিতীয়-অধ্যায়।

দ্রব্যগুণ নির্দ্ধারণ করিবার জন্য আয়ু-র্ব্বেদ শাস্ত্রই প্রশস্ত। আয়ু-র্ব্বেদে এই বিষয়ের বিষদ-আলোচনা আছে। দ্রব্যাদির গুণাবধারণ করিবার পূর্ব্বে দেখাকর্ত্তব্য যে, কোন কালে হিন্দুদিগের রসায়ন ছিল কি না। কিন্তু এই বিষয়ের প্রমাণাদি দিতে গেলে বর্ত্তমান-প্রবন্ধের কলেবর অযথা ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িবে। তাই সংক্ষেপে দুই একটী কথা বলিব।

"হিন্দু জাতির রসায়ন।"

রসায়ন না জানিলে চিকিৎসা হইতে পারে না। কোন কোন দ্রব্যের কি কি গুণ আছে, কোন দ্রব্যের সহিত কাহার কিরূপ সংযোগ হয়, অন্য দ্রব্য সংযোগে দ্রব্য বিশেষের নিজ গুণের কি কি পরিবর্ত্তন ঘটে, এই সকল জানা নিতান্ত আবশ্যক। তদ্ভিন্ন ঔষধ প্রস্তুত করা অসম্ভব। সুতরাং ভৈষজ্য-তত্ত্বের এবং রসায়নের আলোচনা যে বহু-দিন হইতেই ভারতবর্ষে আছে, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। রসায়নের অস্তিত্ব দেখাইবার জন্য চরক ও সুশ্রুত হইতেও অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারা যায়। তবে বর্ত্তমান যুগে "রসায়ন" (chemistry) বলিলে আমরা যাহা বুঝি "হিন্দু জাতির রসায়ন" তদ্রূপ ছিল কি না বলিতে পারিনা। রসায়নের শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তেমন কোন আগার (Loboratory) প্রাচীন ভারতে ছিলনা। কিন্তু হিন্দুদিগের অনেক পুরাতন-গ্রন্থে নানাবিধ যন্ত্রের ও পাকের বর্ণনা পাওয়া যায়। সেই সকল যন্ত্র কেবল রসায়নেই ব্যবহৃত হইবার উপযুক্ত। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে কতকগুলি পুস্তকের ও যন্ত্রের নাম দিতেছি--

(১) বরাহমিহির কৃত "বৃহৎসংহিতার" ষষ্ঠবিংশতি অধ্যায়ের ষষ্ঠ হইতে নবম শ্লোক পাঠ করিলেই তুলা যন্ত্রের বিবরণ জানা যাইবে।

(২) সুশ্রুতের ৩১ অধ্যায়ে মান (weights) সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে।

(৩) সংস্কৃত "রাজসুন্দর" গ্রন্থে "পুট" বা চুল্লির (Furnace) বর্ণনা পাওয়া যায়।

যন্ত্রের নাম।

(১) কবচী যন্ত্র।
(২) দোলাযন্ত্র।
(৩) নর্ভ যন্ত্র।
(৪) হংসপাক যন্ত্র।
(৫) বিদ্যাধর যন্ত্র।
(৬) ঊর্দ্ধপাতন যন্ত্র।
(৭) বালুকা যন্ত্র।
(৮) ভূধর যন্ত্র।
(৯) পাতাল যন্ত্র।
(১০) তেজোযন্ত্র।
(১১) কচ্ছপ যন্ত্র।
(১২) জল যন্ত্র।
(১৩) গৌরী যন্ত্র।
(১৪) কপি যন্ত্র।
(১৫) মূলা যন্ত্র (crucibles)
(১৬) বারুণী যন্ত্র।
(১৭) তীর্য্যক্ পাতন যন্ত্র। (Retort stand with cramps and rings)
(১৮) স্বেদন যন্ত্র (Steambath)
(১৯) ডমরু যন্ত্র।

চোঁয়াইবার যন্ত্র বা (Distilling apparatus.

(১) ঊর্দ্ধনালিকা যন্ত্র।
(২) তেজো যন্ত্র।
(৩) বক্র যন্ত্র।
(৪) নাড়িকা যন্ত্র।
(৫) বারুণী যন্ত্র।

উল্লিখিত যন্ত্র গুলির বিস্তৃত বর্ণনা দিবার কোন প্রয়োজন নাই বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ঐ সকল যন্ত্রের নাম শুনিলেই বেশ অনুমান করিতে পারা যায় যে, হিন্দু জাতির রসায়ন ছিল।

এতদ্ভিন্ন চরকে নানাবিধ রোগের ঔষধ প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিস্তারিতরূপে বিবৃত আছে। চক্রদত্ত, রসেন্দ্রচিন্তামণি, শার্ঙ্গধর প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের তৈল, ঘৃত, ধাতু ঘটিত ঔষধ অরিষ্ট ও আসবাদি প্রস্তুত করিবার কথা লিখিত আছে। হারিত সংহিতা এবং বাগ্‌ভটে (অষ্টাঙ্গ হৃদয় সংহিতা) দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে অতি বিস্তৃত এবং সুন্দর আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই বাগভট বা অষ্টাঙ্গ-হৃদয় সংহিতা উত্তর পশ্চিমপ্রদেশের (পাঞ্জাব, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রভৃতি) চিকিৎসকগণের একমাত্র পাঠ্য পুস্তক, ইহাই তাঁহাদিগের অমূল্য কণ্ঠহার।

"রসেন্দ্রসার সংগ্রহে" নানাবিধ শোধন মারণ প্রভৃতি প্রক্রিয়ার বর্ণনা আছে। সেই সকল বর্ণনা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, হিন্দু জাতির রসায়ন ছিল, তবে সে রসায়নের অবস্থা বর্ত্তমান সময়ের রসায়নের মত এত উন্নত নহে। অল্-বেরুণীর ইণ্ডিকা নামক গ্রন্থে পুরাতন ভারতের তাৎকালিক রসায়নের প্রকৃত অবস্থা লিখিত রহিয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ তাহা পাঠ করিতে পারেন।

আমাদিগের শাস্ত্রকারগণ প্রতিপদাদি তিথিতে সে সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, সেই নিষেধ বাক্যের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিবার পূর্ব্বে সেই

রসগুণ ও দ্রব্য গুণ।

কল দ্রব্যের গুণাবধারণ করা কর্ত্তব্য জন্য আর্য্য-ঋষিগণ দ্রব্যের গুণাগুণ নির্দ্ধারণ করিবার পূর্ব্বে রসবিজ্ঞান করিয়া গিয়াছেন, কি ঔষধ, কি খাদ্য দ্রব্য, সকলই সগুণ সম্পন্ন। রসগুণে এবং দ্রব্য-গুণে অনেক পার্থক্য আছে। মিশ্ররসাত্মক দ্রব্যের সংখ্যাই অধিক। অথচ যে স্বভাবতঃ অমিশ্র, যে দ্রব্যে একটি রস, তাহা অমিশ্র রসাত্মক, আর যাহাতে দুই বা ততোধিক রস আছে, তাহা মিশ্ররসাত্মক। অমিশ্র-রসাত্মক দ্রব্যের সংখ্যা অতিশয় অল্প। অমিশ্র রসাত্মক-দ্রব্য ও আবার ব্যবহারে এবং অন্য সংযোগ মিশ্ররসাত্মক হইয়া উঠে। কিন্তু ইহা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য যে, দ্রব্যসকল রসের উপাদান হইলে ও দ্রব্যগুণ ও রস গুণের কার্য্যকারিতা শক্তি এক নহে, তাহা ও ভিন্ন। উদাহরণ স্বরূপ দেখান যাইতে পারে যে, জল হইতেই অম্লজান বা যব-ক্ষার জানের উৎপত্তি। তাই বলিয়া জলের যে কার্য্যকারিতা শক্তি আছে, অম্লজান বা যবক্ষার জানের তাহা নাই।

রস ছয় প্রকার—(১) মধুর। (২) লবণ, (৩) তিক্ত, (৪) কষায়, (৫ অম্ল এবং (৬) কটু। পৃথিবীতে যে সমস্ত দ্রব্য আছে, তাহার প্রত্যেকটীতে এই ষড়রসের এক কি দুই, কি ততোধিক রসের লক্ষণ দেখা যায়। রস যখন ভিন্ন ভিন্ন তখন তাহাদি-গের গুণাগুণও অবশ্য স্বতন্ত্র। দ্রব্যগুণ নির্দ্ধারণ করিবার অগ্রে ভিন্ন ভিন্ন রসের কি কি গুণ আছে, তাহা স্থির করা আবশ্যক।

মধুররস ,—তৃপ্তিজনক, পুষ্টিকারক, বলকারক, কণ্ঠরোগ, উদাবর্ত্তরোগ, বায়ু, পিত্ত, এবং ব্রণ-নাশক। ইহা রসচালক, গুরু, স্নিগ্ধ, নেত্রহিতকর, শীতল, আয়ুর্বর্দ্ধক এবং রুচি কারক। *

অম্লরস ;—তৃপ্তিজনক, অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ু-নাশক, রসনোত্তেজক, রক্তকারক, রুচিকর, প্রীতিকর, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, মাংসদ, পাকেলঘু, স্বাদে কটু এবং ব্রণাদির ক্লেদ বৃদ্ধি কারক। *

লবণরস ;—পাচক, উগ্র, বহ্নি উদ্দীপক, স্নিগ্ধ, রুচিকর, স্রাবক, শুক্রকারক, এবং দৃষ্টিশক্তি ও ব্রণাদির ক্লেদরোগ বর্দ্ধক *

কটুরস :—অঙ্গের রুচিবর্দ্ধক, জিহ্বা, আস্য, নেত্র এবং নাসিকার মলভেদক ইহা নাতি উষ্ণ, নাতি উগ্র এবং কণ্ডু, ক্রিমি, শুক্রও কফ-নাশক। কটুরস লঘুশোষক পাচক ও শ্লেষ্মনিবারক। *

---

* "মধুরঃ প্রীণনো বল্যো বৃংহণো২-নিলপিত্তহা।
রসায়নো গুরুঃ স্নিগ্ধ শ্চক্ষুষ্য ঃ শীতলশ্চসঃ।
আয়ুষ্কৃৎ ব্রণহা রুচ্যঃ কণ্ঠোদাবর্ত্ত নাশকঃ॥

স্মৃতি-আহ্নিকতত্ত্ব।

* "অম্লো রুচিকরো হৃদ্যঃ প্রীণনো বহ্নিবর্দ্ধনঃ।
বাতহা রসনোদ্বেগী স্নিগ্ধোষ্ণো রক্তমাংসদঃ।
ক্লেদন স্তর্পণঃ পক্কো লঘুব্যাপী কটু স্বাদঃ॥"

স্মৃতি-আহ্নিকতত্ত্ব।

* "লবণঃ ক্লেদনস্তীক্ষ্ণঃ পাচনো দীপনো রসঃ।
স্নিগ্ধো রুচিকরঃ স্যন্দী দৃষ্টি শুক্রকরো গুরুঃ॥"

স্মৃতি আহ্নিকতত্ত্ব।

তিক্তরস ;—পিত্ত কফ, বমি, উদ্গার, বিষ, কুষ্ঠ, জ্বর, ক্রিমি এবং কণ্ডুরোগ-নাশক। ইহা বহ্নি-উদ্দীপক-পাচক, রুক্ষ এবং লঘু। *

কষায়রস ;—বায়ুস্তম্ভনকারক, শোষক, ব্রণ-সম্বন্ধীয়-বেদনা, কফ, এবং রক্ত পিত্ত নাশক। ইহা লঘু শীতল ও রুক্ষ। আবার শীতোষ্ণভেদে এই রস দ্বিবিধ। উষ্ণ-কষায়রস বীর্য্যবর্দ্ধক ও পিত্তকারক। ইহা অল্প পরিমাণে বায়ু এবং শ্লেষ্মা নাশ-করে। শীতল কষায়-রস পিত্তনাশক বাতকফাদি বর্দ্ধক এবং বল কারক।*

সুশ্রুত সংহিতার "সূত্রস্থানের" "রসবিশেষ বিজ্ঞানীয়" শীর্ষক দ্বিচত্বারিংশৎ অধ্যায় পাঠ করিলেই রস সম্বন্ধে সর্ব্ব প্রকার জ্ঞাতব্য-বিষয় জানিতে পারা যাইবে। "আকাশ বায়ু অগ্নি, জল ও পৃথিবীতে যথাক্রমে শব্দ স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ আশ্রিত। অতএব রস জলীয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ পরস্পর সম্বন্ধ ও পরস্পরের উপকারক অথচ উহাদের একাত্মভাব ও সান্নিধ্য আছে। তবে যে দ্রব্যে যে গুণের আধিক্য থাকে, তদনুসারে তাহার অভিধান হয়। রস আপ্য, সুতরাং অব্যক্ত রস হইলেও আকাশাদি অন্যান্য ভূতের সংসর্গ হেতু পরিপাকান্তর বহুবিধ হইয়া থাকে।

ভূমি ও অম্বু গুণের বাহুল্যে মধুররস, জল ও অগ্নিগুণের বাহুল্যে অম্লরস, ভূমি ও অগ্নিগুণের বাহুল্যে লবণ রস, বায়ু ও অগ্নিগুণের বাহুল্যে কটুরস, বায়ু ও আকাশ গুণের বাহুল্যে কষায় রস হইয়া থাকে মধুরাদি সমস্তরসই সমান যোনির (কারণের) বর্দ্ধক ও অসমান যোনির ধ্বংসক। [যথা :—বায়ু গুণ বাহুল্যে তিক্ত, কটু ও কষায় রসের উৎপত্তি হয়। অতএব তিক্ত, কটু ও কষায় রস সেবিত হইলে বায়ু বৃদ্ধি হয়।]" * স্নেহ, গৌরব, শৈত্য ও পিচ্ছিলতা এই সমস্তই শ্লেষ্মার লক্ষণ। মধুর রস শ্লেষ্মার সমান-যোনি। শ্লেষ্মা ও মধুর, মধুর রসও মধুর; সুতরাং মধুর-রসে শ্লেষ্মার মাধুর্য্য বৃদ্ধি হয়; শ্লেষ্মাও গুরু, মধুর-রসও গুরু; সুতরাং মধুর-রসে শ্লেষ্মার গুরুত্ব বৃদ্ধি হয়। কিন্তু কটুরস শ্লেষ্মার বিরুদ্ধযোনি, সুতরাং কটু-রসের কটুত্ব হেতু শ্লেষ্মার মাধুর্য্য নষ্ট হয়, রুক্ষতা হেতু শ্লেষ্মার স্নিগ্ধতা নষ্ট হয়। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে "রসাঃ স্বযোনি-বর্দ্ধনা অন্যযোনিপ্রশমনাশ্চ"।

ভিন্ন ভিন্ন রসের উৎপত্তি এবং তাহা কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি নিষিদ্ধ দিগের বিশেষত্ব দ্রব্যাদির গুণ। লক্ষিত হইল, এখন দেখা যাউক, তিথ্যনুক্রমে যে সকল দ্রব্য ভোজন করা নিষিদ্ধ, তাহাদিগের নিজ

* "তিক্তঃ পিত্ত কফচ্ছর্দ্দি বিষকুষ্ঠ জ্বরাপহঃ দীপনঃ পাচনো রুক্ষঃ কণ্ডুক্রিমিহরোলঘুঃ।"
স্মৃতি—আহ্নিকতত্ত্ব।

* "কষায়ঃ শোষকস্তম্ভী ব্রণপাকার্ত্তি নাশনঃ।
কফশোণিত পিত্তঘ্নোরুক্ষঃ শীতোলঘুস্তথা।
শীতলঃ পিত্তহা বল্যঃ কফবাতকরোগুরুঃ।
উষ্ণঃ পিত্তকরো বৃষ্যো বাতশ্লেষ্ম হরো লঘুঃ।।"
স্মৃতি-আহ্নিকতত্ত্ব।

* সুশ্রুত সংহিতা।

গুণ কি এবং তাহারাই বা কোন্ কোন্ রসের অন্তর্গত।

১। কুষ্মাণ্ড।

(ক) "কুষ্মাণ্ডং বৃংহণং বৃষ্যং সক্ষারং রক্ত-পিত্তনুৎ।
বালং পিত্তাপহং শীতং মধ্যমং কফকারকম্॥
বৃদ্ধং নাতি হিমং স্বাদু দীপনং বাতমুন্নম্।
বস্তিশুদ্ধিকরং চেতোরোগঘ্নং সর্ব্বদোষজিৎ॥*

কুষ্মাণ্ড—বীর্য্যবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, অতিশয় ক্ষারগুণ সম্পন্ন এবং রক্তপিত্তনাশক। তরুণ-কুষ্মাণ্ড শীতল এবং পিত্তনাশক—মধ্যমবস্থায় কুষ্মাণ্ড কফকারক। পক্ব কুষ্মাণ্ড স্বাদু, নাতি শীতল, বায়ুনাশক, বহ্নিউদ্দীপক ইত্যাদি।

কুষ্মাণ্ডের তিন অবস্থা। অবস্থা ভেদে ইহার গুণেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। কিন্তু সকল অবস্থাতেই কুষ্মাণ্ড লবণ রসাত্মক, এতদ্ভিন্ন মধুর এবং অম্লরসও কুষ্মাণ্ডে আছে।

(খ) "কুষ্মাণ্ডং বৃংহণং বৃষ্যং গুরু পিত্তাস্রবাতনুৎ।
বল্যং লঘুষ্ণং সক্ষারং দীপনং বস্তিশোধনম্॥*

[গ] "পিত্তঘ্নং তেষু কুষ্মাণ্ডং......
পক্বং লঘূষ্ণং সক্ষারং......॥" †

সুতরাং কুষ্মাণ্ড যে লবণরসাত্মক তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

২। বৃহতী।

[ক] "বৃহতী গ্রাহিণী হৃদ্যা তীক্ষ্ণা পিত্তোষ্ণকারিণী।
পাচনী দীপনী বৃষ্যা ক্রূরবাত প্রকোপিণী॥
কটু-তিক্তাস্য বৈরস্য মলারোচক নাশিনী।
উষ্ণা কুষ্ঠ জ্বরশ্বাস শূল কাসাগ্নিমান্দ্যজিৎ॥"

মলকাঠিন্যকারিণী, হৃদয়েরস্বাস্থ্যবিধায়িনী, তীক্ষ্ণা, পিত্তোষ্ণকারিণী, অগ্ন্যুদ্দীপনী, পরিপাককারিণী, বৃহতী—বীর্য্য এবং ক্রূর বায়ু বর্দ্ধিনী। ইহা কটু এবং তিক্তরসাত্মিকা। মুখের বিরসতা, মুখমল এবং অরুচি বৃহতীতে দূর হয়, বৃহতী উষ্ণ গুণ সম্পন্না, কুষ্ঠ, জ্বর শ্বাস প্রভৃতি ও মন্দাগ্নি উপশম কারিণী।

[খ] "রক্তপিত্তহরাণ্যাহুর্হৃদ্যানি সুলঘূনি চ।" †

[গ] "ফলানি বৃহতীনাস্ত কটুতিক্ত লঘূনি চ" †

৩। পটোল।

[ক] "পটোলং পাচনং হৃদ্যং বৃষ্যং লঘ্বগ্নিদীপনম্।
বৃংহণং রুচিকৃত্রক্তস্যোষ্ণতাকাতিবর্দ্ধনং
স্নিগ্ধোষ্ণং হন্তিকাসাস্র জ্বর দোষত্রয় ক্রিমীন্॥"

পটোল পরিপাক কারক, হৃদয়ের স্বাস্থ্য কারক, বীর্য্যবর্দ্ধক এবং লঘু। ইহা অগ্নি দীপক, পুষ্টিকর এবং রুচিকর। পটোল অতিশয় শোণিতোষ্ণতাকারক এবং স্নিগ্ধোষ্ণ এতদ্ভিন্ন পটোলের আরও গুণ আছে

* আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্র।
* আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্র।
‡ সুশ্রুত সংহিতা।

* আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্র।
‡ সুশ্রুত সংহিতা।

পটোল রক্ত, কাস, জ্বর ও ত্রিদোষ নাশক এবং মধুরাম্লরসাত্মক।

[খ] পটোলং ;.........

পাচনং তর্পণং বৃষ্যং শোণিতন্তোষ্ণ-
কৃদ্‌ গুরু।

স্নিগ্ধোষ্ণং বৃংহণং.........

.........ত্রিদোষাণাং বিনাশনং ॥"*

বর্ত্তমান্‌ শ্লোক হইতেও দেখা যাইতেছে যে, পটোল ত্রিদোষ নাশনক্ষম হইলেও শোণিতোষ্ণকারী এবং স্নিগ্ধোষ্ণ।

৪। মূলক বা মূলা।

[ক] "মহৎ তদ্‌ গুরু বিষ্টম্ভি তীক্ষ্ণমামং
ত্রিদোষকৃৎ।

তদেব স্নিগ্ধসিদ্ধন্ত পিত্তঘ্নং কফ-
বাতজিৎ॥"‡

মূলক—গুরু, বিষ্টম্ভি, তীক্ষ্ণ ও ত্রিদোষ-কারক। স্নিগ্ধ ও সিদ্ধ মূলক পিত্তনাশক কফনাশক হয়।

(খ) মূলকং গুরু বিষ্টম্ভি তীক্ষ্ণমামং
ত্রিদোষকৃৎ।

তদেব স্নিগ্ধসিদ্ধন্ত পিত্তকৃৎ কফবাতনুৎ॥*

[মূলক গুরু, মলরোধক, তীক্ষ্ণ, আমোৎপাদক।]

বায়ু, পিত্ত, কফের ক্রূরতা রুক্ষতাপ্রাবল্যাদি বিকার মূলা হইতেই উৎপাদিত হয়। তৈলাদি দ্বারা রন্ধন করিলে মূলা কেবল মাত্র পৈত্তিক বিকার বৃদ্ধি করিয়া থাকে এবং বায়ুশ্লেষ্মার উগ্রতা ও প্রাবল্য নাশ করিতেপারে, তাহা ভিন্ন অন্য কোন ধাতুরই ক্রূরতা ও রুক্ষতা নাশে সমর্থ হয় না। মূলক আমকারক। কিন্তু যাহা আম-কারক তাহাই ত্রিবিধ-ধাতুরই ক্রূরতা ও রুক্ষতা বর্দ্ধক। স্নেহসিদ্ধ মূলকের আম-নাশিনী শক্তি নাই। যদি তাহা থাকিত, তবে মূলকের গুণনির্দ্ধারক শ্লোকে তাহার অস্তিত্ব দৃষ্ট হইত, সুতরাং স্নেহ-সিদ্ধমূলক যখন আম নিবারক নহে, তখন তাহাতে বাতাদি কোন ধাতুরই রুক্ষতা ও ক্রূরতা বিনষ্ট না হইয়া যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য এবং সত্য। মূলক কটু ও শীতোষ্ণ-কষায় রসাত্মক।

৫। বিল্ব। [বেল]

(ক) "শ্রীফলস্তবরস্তিক্তো গ্রাহীরূক্ষো-
হগ্নিপিত্তকৃৎ।

বাল: শ্লেষ্মহরো বল্যো লঘুরুষ্ণশ্চ
পাচনঃ॥"*

বিল্ব ধারক গুণ বিশিষ্ট, কষায় এবং তিক্তরসাত্মক। ইহা পিত্তকারক রুক্ষ ও অগ্নি-বর্দ্ধক। তরুণবেল শ্লেষ্মনাশক, লঘু, বলোদ্দীপক, উষ্ণ এবং পাচক।

(খ) "বিল্বং ;............ ।

.........বল্যং দীপনং পিত্তকৃদ্‌ গুরু॥"†

বর্ত্তমান শ্লোক হইতেও দেখা যাইতেছে যে, বিল্ব পিত্তবৃদ্ধি করিয়া থাকে।

৬। নিম্বুক।

"নিম্বুকং ক্রিমি সংমূহ নাশনম্‌।
তীক্ষ্ণ মম্লমুদরগ্রহাপহম্‌॥

* স্মৃতি।
† সুশ্রুত সংহিতা।
‡ স্মৃতি-আহ্নিকতত্ত্ব।

* আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্র।
† স্মৃতি-আহ্নিকতত্ত্ব।

বস্তি-বিশোধনস্তবেন্ধমম্লাং।
কিলং শীতরসং বর্দ্ধনস্ত্‌শম্‌॥
বাতপিত্ত কফ শূলিনে হিতং।
কষ্ট নষ্টরুচি রোচনং পরম্‌।
ত্রিদোষ বহ্নি ক্ষয় বাত রোগ।
নিপীড়িতানাং বিষবিহ্বলানাং।
মন্দানলে বদ্ধগুদে প্রদেয়ং॥
বিসূচিকায়াং মুনয়ো বদন্তি॥"*

নিম্ব—ক্রিমিনাশক, অম্লরসাত্মক, উগ্র, বস্তি-শোধক, উদরাময়নাশক। কিন্তু ইহাতে শিরায় শৈত্যরস অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বাতপিত্ত কফাদির বিকার জনিত রোগে, শূলরোগে ।।-।-। প্রভৃতিতে নিম্ব ভক্ষণ উপকারী। অম্ল ভিন্ন নিম্বুকে মধুর রসও আছে—অম্লের ভাগই অধিক, মধুর রস অল্প।

৭। তাল।

"পক্কং তালং তু মধুরং কফপিত্তাস্রবর্দ্ধনম্‌।
দুর্জ্জরং বহুমূত্রঞ্চ তন্দ্রাভিষ্যন্দ শুক্রদম্‌॥
তাল মজ্জা তু তরুণঃ কিঞ্চিন্মদকরোলঘুঃ।
শ্লেষ্মলো বাতপিত্তঘ্নঃ সস্নেহী মধুরঃ সরঃ।*

পাকাতাল কফ ও রক্তপিত্ত রোগ বর্দ্ধক, দুষ্পাচ্য, বহুমূত্র, তন্দ্রা ও শুক্র উৎপাদক ইত্যাদি। তরুণ তালও শ্লেষ্মবর্দ্ধক, মধুর রসাত্মক ও সরগুণ বিশিষ্ট। লবণ, মধুর, অম্ল এই ত্রিবিধ রসই তালে সমপরিমাণে আছে।

৮। নারিকেল।

(ক) বিশেষতঃ কোমল নারিকেলং।
নিহন্তি পিত্তজ্বর পুত্র দোষান্‌।
তদেব বৃদ্ধং গুরু পিত্তকারী।
বিদাহী বিষ্টম্ভীমতং ভিষগ্‌ভিঃ॥"*

(খ) "নারিকেলং ফলং শীতং দুর্জ্জরং বস্তিশোধনং।
বিষ্টম্ভি বৃংহণং বল্যং বাত পিত্তাস্রদাহনুৎ॥

(গ) "নারিকেলং গুরু স্নিগ্ধং"‡

[ক] শ্লোকে নারিকেল পিত্তকারক ও দাহপ্রদ এবং (খ) শ্লোকে দাহ ও পিত্তনাশক বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

ইহা দেখিয়াই নারিকেল দ্বিবিধ—তরুণ ও পক্ক, কিন্তু [ক] শ্লোকে পক্ক নারিকেল দাহপ্রদ ও পিত্তকারক বলিয়া বিবৃত হইয়াছে! সুতরাং [খ] শ্লোকের দাহ ও পিত্তনাশক নারিকেল যে তরুণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাহাহউক [ক] এবং [খ] এই উভয় শ্লোক হইতেই জানা যাইতেছে যে, তরুণ নারিকেল মলরোধক, শীতল, গুরু ও দুষ্পাচ্য, পুষ্টিকর, বলকারক, বস্তি-সংশোধক ইত্যাদি। উক্ত শ্লোকদ্বয় হইতে ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, পক্ক নারিকেল পিত্তকারক, দুষ্পাচ্য, মলরোধক, গুরু, বলকারক ইত্যাদি।

নারিকেল মাত্রেই মধুর ও শীতোষ্ণ কষায় রসাত্মক।

৯। অলাবু।

(ক) "অলাবুঃ শীতলা গুর্ব্বী মধুরা পিত্তনাশিনী।

* আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্র।

* আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্র।
† সুশ্রুত সংহিতা।

বাত শ্লেষ্মকরী রুক্ষা দুর্জ্জরা মল-
ভেদিনী।"*

অলাবু গুরুপাক, শৈত্য গুণ সম্পন্না পিত্তনাশিনী, বাত-শ্লেষ্মরোগকারিণী ইত্যাদি।

(খ) "অলাবু র্ভিন্নবিট্‌কা তু রুক্ষা
গুর্ব্বতিশীতলা"†

অলাবু বিষ্টাভেদক, রুক্ষ, গুরু ও অতি শীতল। ইহাতে মধুর ও কষায় রস সমভাগে আছে।

১০। কলম্বী। কলমি।

"কলম্বীস্তন্যদা প্রোক্তা মধুরা শুক্র-
কারিণী।
অম্লপিত্তকরী স্নিগ্ধা শ্লেষ্মলা মলবর্দ্ধিনী॥"*

কলম্বী অম্লপিত্ত রোগকারিণী, শ্লেষ্মা এবং মল বৃদ্ধিকারিণী, স্নেহযুক্তা ইত্যাদি।

লবণ, উষ্ণকষায়, অম্ল এবং মধুর এই চারি প্রকার রস ইহাতে সমভাগে আছে।

১১। শিম্বী (শিম বা ছিম)।

"শিম্বী তু শীতলা গুর্ব্বী মধুরা পিত্ত-
নাশিনী।
কটুকারসরুক্ষ্যা জ্বর শ্বাসকরী মতা॥"

শিম্বী বা শিম পিত্তনাশিনী, শৈত্যগুণ-সম্পন্না, রস, জ্বর ও শ্বাস রোগকারিণী ইত্যাদি।

১২। পুতিকা বা পুইশাক।

(ক) "তণ্ডুলীয়কোপোদিকা......
মন্দবাতকফান্যাহু রক্তপিত্তহরাণিচ।"†

তণ্ডুলীয়ক এবং উপোদিকা (পুই) বায়ুকফকারী রক্তপিত্তহারী ইত্যাদি।

(খ) "উপোদিকা......শ্লেষ্মকর হিম।"*

পুইশাক শ্লেষ্মকর এবং হিম।

(গ)। "পুতিকা শ্লেষ্মলা গুর্ব্বী স্নিগ্ধা
পিত্তপ্রকোপিণী।
দুর্জ্জরা মধুরা রুচ্যা কাসাস্র বাত
বর্দ্ধিনী।"*

পুতিকা পিত্ত, বায়ু, রক্ত ও কাস বর্দ্ধিনী স্নিগ্ধা, অতি বিলম্বে এবং কষ্টে জীর্ণ হয় ইত্যাদি।

১৩। বার্ত্তাকী।

(ক) "বার্ত্তাকী কফ বাতঘ্নী রুচ্যাগ্নিব-
লবর্দ্ধিনী।
বৃংহণী পাচনী বৃষ্যা কণ্ডুকৃদ্রক্ত পিত্তনুৎ॥"†

ইহাতে কফ এবং বায়ুর প্রকোপ বিনষ্ট হয়। বার্ত্তাকী কণ্ডুরোগোৎপাদিনী, অগ্নি ও বলবর্দ্ধিনী ইত্যাদি।

(খ) "কফ বাত হরং তিক্তং রোচনং
কটুকং লঘু।
বার্ত্তাকং দীপনং প্রোক্তং জীর্ণং সক্ষার-
পিত্তলম্॥"*

বার্ত্তাকু কফ এবং বাত নাশক, তিক্ত, রোচন, কটু, লঘু, দীপন, পক্ব বার্ত্তাকু ক্ষারযুক্ত এবং পিত্তকারক।

ইহাতে মধুর ও লবণ রস সমভাগে আছে।

১৪। মাষকলায়।

"মাষো বহুমলোবৃষ্যঃ স্নিগ্ধোষ্ণো মধুরো
গুরুঃ।
বাতনুৎ পিত্তলো বল্যো মেদোমাংস কফ
প্রদঃ॥"†

* স্মৃতি—আহ্নিক তত্ত্ব।
† সুশ্রুত সংহিতা।
* আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্র।
† সুশ্রুত সংহিতা।

* সুশ্রুত সংহিতা॥
† আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্র।
† স্মৃতি—আহ্নিক তত্ত্ব।

মাষকলায় অতিরিক্ত মলবৃদ্ধিকারক, (কফ, পিত্ত, মেদ, মাংসবর্দ্ধক), উষ্ণ-গুণ-সম্পন্ন, শুক্রবর্দ্ধক ইত্যাদি। মাষকলায় গুরু, বিষ্টামূত্রের তরলতাকারক, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, বৃষ্য, মধুর, বাতঘ্ন, সন্তর্পণ, স্তম্ভকর, বলপ্রদ এবং শুক্রকফকারক।

(খ) "মাষো গুরুর্ভিন্ন পুরীষ মূত্রঃ স্নিগ্ধো-ষ্ণবৃষ্যো মধুরোঽনিলঘ্নঃ।
সন্তর্পণঃ স্তন্যকরো বিশেষাদ্বলপ্রদঃ শুক্র কফাবহশ্চ।"†

১৫। মাংস।

"মাংসং বাতহরং সর্ব্বং বৃংহণং কফপিত্তকৃৎ।
প্রীণনং গুরু হৃদ্যঞ্চ মধুরং রস পাকয়োঃ।"*

বায়ুনাশক, কফকারক, পিত্তবর্দ্ধক, প্রীতিপ্রদ, পুষ্টিকর, গুরু ইত্যাদি।

ইহাতে মধুর এবং শীতল কষায় রস তুল্য পরিমাণে আছে।

কুষ্মাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া মাষকলায় পর্য্যন্ত দ্রব্যগুলির গুণাগুণ ইংরাজি পুস্তক হইতেও কতকাংশে দেখান যাইতে পারে। বাহুল্য ভয়ে তাহা হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য হইলাম। যাঁহারা ইংরাজি পুস্তক দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া "Dr Watt's Dictionary of the Economic Products of India" পাঠ করিবেন।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি এ

(ক্রমশঃ)

† আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্র।
* সুশ্রুত সংহিতা।

ভ-গোল পরিচয়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মকর-রাশি।

অভিজিৎ নক্ষত্র।

ধনুঃ রাশির উত্তরে গরুড় মণ্ডল। গরুড় মণ্ডলের বায়ু কোণে বীণা মণ্ডল। বীণা মণ্ডল ছায়া পথের পশ্চিমে স্থিত। এই বীণা-মণ্ডলে প্রথম শ্রেণীর অতি উজ্জ্বল নীল বর্ণ একটী তারা আছে। এই তারার নাম নীলমণি। পুলস্ত্য ও অত্রি তারা সংযোজিত করিয়া ঐ সংযোগ রেখা উঃ পূঃ অভিমুখে বর্দ্ধিত করিলে, বর্দ্ধিত রেখা নীলমণি তারার নিকটস্থ হইবে। নীল মণি তারা উত্তর ভগোলার্দ্ধে অবস্থিত। এবং ধ্রুব তারা হইতে ব্রহ্মহৃদয় তারার সমদূরে ও বিপরীত ভাগে নীলমণি তারা অবস্থিত। নীল মণি তারার ১ হাত উঃ পূঃ কোণে অশনি তারা। এবং ১ হাত দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে জয়ন্তি তারা অবস্থিত। অশনি ও জয়ন্তি তারা ৬ষ্ঠ শ্রেণীস্থ, তারায় ত্রয়ে একটী সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কিত হইয়াছে, এই তারা ময় ত্রিভুজের নাম অভিজিৎ নক্ষত্র। জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে অভিজিৎ নক্ষত্র শৃঙ্গাটক-আকৃতি। এই নক্ষত্রের যোগ তারা নীল মণি। অভিজিৎ বজ্রের নামান্তর [১] এই অভিজিৎ বা বজ্র নক্ষত্র অধুনা নক্ষত্র

(১) অভিজিন্নবীচিঃ। বজ্র বৈরোচনী॥ ইতি গোপথ ব্রাহ্মণ ২।২।১৩

মালা হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। [২]

নীল মণি তারার অগ্নিকোণে একটি সুন্দর তারাময় সমদ্বিবাহু ক্ষেত্র আছে। এই সমদ্বিবাহু ক্ষেত্রের বায়ু কোণস্থ কোণে অবস্থিত তারা।

নীলমণি তারা আরব দেশে অল্-নেসর অল ওয়াকী নামে খ্যাত। এবং এই বাকী [ওয়াকী] নাম হইতে ইয়ুরোপে এই তারার নাম বেগা হইয়াছে।

মকর-রাশির।

শ্রবণা নক্ষত্র।

ধনুঃ রাশির উত্তরে গরুড় মণ্ডল। গরুড় মণ্ডল ছায়া পথে স্থিত, এই মণ্ডলের প্রধান তারার নাম বাসুদেব। বাসুদেব তারা অতি উজ্জ্বল প্রথম শ্রেণীর তারা। ইহার অগ্নি ও বায়ু কোণে ১।। ০ হাত ও ১ হাত দূরে সারিক ও কর্ণ নামে দুইটী তারা আছে। সারিক চতুর্থ শ্রেণীর ও কর্ণ তৃতীয় শ্রেণীর তারা। এই তারা ত্রয় শরাকৃতি। এবং এই শরাকৃতি তারাত্রয়ে শ্রবণা নক্ষত্র গঠিত। শ্রবণা নক্ষত্রের দেবতা বিষ্ণু বা হরি। যে মাসে পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্র এই নক্ষত্র সন্নিহিত থাকে। সেই মাসের নাম শ্রাবণ। যে দিনে শ্রবণা নক্ষত্রে চন্দ্র থাকে সেই দিনের নক্ষত্র শ্রবণা। [৩]

রাশি চক্রস্থ মকর রাশি হইতে শ্রবণা নক্ষত্র বহু দূরে ও গরুড় মণ্ডলে অবস্থিত। শ্রবণা নক্ষত্র মকরের অঙ্গ ভুক্ত নহে।

বীণা মণ্ডল ও গরুড় মণ্ডল।

পাশ্চাত্যে বীণা মণ্ডল গরুড় মণ্ডলের একাংশ বলিয়া গণ্য। গরুড় ও অভিজিৎ হিন্দু প্রবাদ বিদ্যায় নিত্য সম্বন্ধে আকৃষ্ট। মাতার দাসীত্ব মোচনার্থ গরুড় বিমান মার্গে উড্ডীন হইল। এবং দেব-সমরে জয়ী হইয়া অমৃত আহরণ পূর্ব্বক প্রত্যাগমন কালে বিমান মার্গে গরুড়ের সহিত ভগবান্ বিষ্ণুর সাক্ষাৎ হইল। বিষ্ণু বরে গরুড় অমর হইলেন। এবং গরুড় বিষ্ণুর বাহন হইতে স্বীকৃত হইলেন। তৎপরে গরুড় বিমান হইতে অবতরণ কালে ইন্দ্র দেব গরুড়ের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু গরুড় অমর, গরুড় বজ্রের সম্মান রক্ষার্থে পক্ষ হইতে একটী পত্র উৎপাটন করিয়া অর্পণ করিলেন। পত্রের সৌন্দর্য্য অবলোকনে দেবগণ প্রীত হইয়া গরুড়ের নাম সুপর্ণ রাখিলেন।

এবং দেবরাজদত্ত বরে ভুজগগণ গরুড়ের ভক্ষ্য হইল। গরুড় অমৃত আনিয়া সর্পগণকে দিয়া মাতার ও আপনার দাসত্ব মোচন করিলেন। কুশ তৃণোপরি অমৃত স্থাপিত রহিল। সর্পগণ স্নান ও মঙ্গলাচরণ জন্ম গমন করিলে দেবরাজ অমৃত গ্রহণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন। সুধার্ত্ত সর্পগণ কুশোপরে অমৃত না দেখিয়া কুশ লেহন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের

---

(২) অভিজিদ্ স্পর্দ্ধমানাতু রোহিণ্যা কন্যসী স্বসা।
ইচ্ছন্তী জ্যেষ্ঠতাং দেবী তপস্তপ্তুং বনং গতা।

ইতি মহা ৩। ২২৯। ৮

(৩) শ্রবণা নক্ষত্রে গৃহ নির্ম্মাণ করিলে গৃহ দগ্ধ হয়। ইহাই ফলিত জ্যোতিষের সিদ্ধান্ত। গৃহ দাহ হউক বা না হউক, বিপদজনক বস্তু বা সহজক্রোধিব্যক্তি শ্রবণার খড়ের চিতা উপমেয়।

জিহ্বা দর্ভে দ্বিধা হইল। এবং অমৃত স্পর্শে দর্ভ পবিত্র হইল। [৪]

মকর-রাশির।

ধনিষ্ঠা নক্ষত্র।

গরুড় মণ্ডলের পূর্ব্বে শ্রবিষ্ঠা মণ্ডল। এবং শ্রবণা নক্ষত্র হইতে পূঃ পূঃ উঃ কোণে ৬ হাত দূরে যে একটী তারাগুচ্ছ দৃষ্ট হয়, ঐ তারা গুচ্ছের নাম শ্রবিষ্ঠ মণ্ডল। তারা গুচ্ছের পঞ্চ তারা আকারে মর্দ্দল বা মৃদঙ্গ সদৃশ। এই তারা মৃদঙ্গের নাম ধনিষ্ঠা নক্ষত্র। ধনিষ্ঠা অর্থে শব্দায়মান মৃদঙ্গাদি। এই নক্ষত্রের বৃহত্তম তারাটীর নাম রত্ন পুরী। তারাটী চতুর্থ শ্রেণীর, এবং ছায়া পথের পূর্ব্ব তীরে স্থিত ধনিষ্ঠার দ্বিতীয় তারার নাম বসুদেব। শ্রবিষ্ঠা মণ্ডলের পাশ্চাত্য নাম Delphinos।

মকর রাশি।

ধনুরাশির ঈশান কোণে মকর রাশি অবস্থিত।

উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের ৩ এর ৪ ভাগ শ্রবণা নক্ষত্র এবং ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের ১ এর ২ ভাগ ৩০ অংশ মকর রাশি।

মকর রাশির নক্ষত্র দ্বয় দ্বারা মকর রাশি গঠিত হয় নাই। কারণ মকরের নক্ষত্রদ্বয় রাশি চক্রের বহু দূরে অবস্থিত। মকরের পূর্ব্বার্দ্ধ মৃগাকৃতি। উত্তরার্দ্ধ মৎস্যাকৃতি। মকর-দেহ পূর্ব্ব পশ্চিম দশ হস্ত বিস্তৃত। শ্রবণা নক্ষত্রের দশ হাত অগ্নি কোণে মকর অবস্থিত। মকর পশ্চি-

---

(৪) ততঃ সা বিনতা তস্মিন্ পণিতেন পরাজিতা অভবৎ দুঃখ সন্তপ্তা দাসীভাবং সমাস্থিতা
মহাভারত ৩। ২৩। ৪

ততঃ সুপর্ণ মাতা তাং অবহৎ সর্প মাতরং পন্নগান্ গরুড়ঃ বাপি মাতুঃ বচন চোদিতঃ
মহাভারত ৩। ২৫। ৫

বহু-অস্মান্ অপরং দ্বীপং সুরম্যং বিমলোদকং দাসী ভূতাস্মি ছর্যোগাৎ সপত্ন্যাঃ পন্নগোত্তম কিম্ আহৃত্য বিদিত্বা বা কিংবা কৃত্বাহই পৌরুষং দাস্যাৎ বঃ বিপ্রমুচে হয়ং তথ্যং বদত লেলিহা।
মহাভারত ৩। ২৭। ৩—৫

ততঃ পর্ব্বতকূটাগাৎ উৎপপাত মহাজবঃ প্রাবর্ত্তন্ত অথ দেবানাং উৎপাতাঃ ভয় শংসিনঃ
৩। ৩০। ৬—৭

গরুড়ঃ পক্ষিরাট্ তূর্ণং সংপ্রাপ্তঃ বিবুধান্ প্রতি তং দৃষ্ট্বা অতিবলং চৈব প্রাকম্পন্ত সুরা ততঃ
৩। ৩২। ১

বিষ্ণুনা চ তদাকাশে বৈনতেয়ঃ সমেয়িবান্ তম্ উবাচ-অব্যয়ঃ দেবঃ বরদঃ অস্মিইতি খেচরং স বব্রে তব তিষ্ঠেয়ং উপরি ইতি অন্তরীক্ষগঃ অজরঃ চ অমরঃ চ স্যাম্ অমৃতেন বিনাপি অহং [illegible] গৃহ্য ধর্ম্মো [illegible] গরুড়ঃ [illegible] অব্রবীৎ [illegible] বরং দদামি বৃণীষ্ব ভগবান্ অপি [illegible] বাহনং [illegible] মহাবলঃ

তং ব্রজন্তং খগশ্রেষ্ঠং বজ্রেণ ইন্দ্রঃ অতাড়য়ৎ ঋষেঃ মানং করিষ্যামি বজ্রং যস্য অস্থি পন্তবং এবং উক্ত্বা ততঃ পত্রং উৎসসর্জ্জ সপক্ষিরাট্ সুরূপং পত্র মালোক্য সুপর্ণঃ অয়ং ভবতু ইতি
মহা ৩। ৩৩। ১২—২৪

ভবেতু ভুজগাঃ শক্র মম ভক্ষ্যাঃ মহাবলাঃ অথ সর্পান্ উবাচ ইদং সর্ব্বান্ পরম হৃষ্ট বান ইদং আনীতং অমৃতং নিক্ষেপস্যামি কুশেষু বঃ অদাসী চৈব মাতা ইয়ং অদ্য প্রভৃতি অস্তু মে যথা উক্তং ভবতাং এতৎ বচঃ মে প্রতি পাদিতং সোম স্থানং ইদং চেতি দর্ভাং তে লিলিহুঃ তদা ততো দ্বিধা কৃতা জিহ্বা সর্পানাং তেন কর্ম্মণা। অভবন্ চ অমৃতস্পর্শাৎ দর্ভাঃ তে অথ পবিত্রিণঃ।
মহাভারত ৩। ৩৪। ১২—২৪।

মাভিমুখ, মকরের পুচ্ছস্থ পুচ্ছ তারা সর্ব্ব প্রধান, তারাটী তৃতীয় শ্রেণীর, মকরের শৃঙ্গাগ্রস্থ তারা দুইটী চতুর্থ শ্রেণীর, মকর মুখ তিনটী ক্ষুদ্র তারার গঠিত।

তারা তিনটী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজাকৃতি। মকর পুচ্ছ অগণ্য ক্ষুদ্র তারায়ে নির্ম্মিত, ছায়া পথের [আকাশ গঙ্গার] নিম্ন ভাগে মকর রাশি অবস্থিত। [৫]

কুম্ভ রাশিস্থ।

শতভিষা নক্ষত্র।

শত ভিষা নক্ষত্র মণ্ডলাকৃতি শত তারক ময় বলিয়া জ্যোতিষ গ্রন্থে বর্ণিত। কিন্তু বেদ মতে শত ভিষা নক্ষত্র এক তারক ময় [১] তবে এই রাশিতে সে বহুতর তারা-গুচ্ছ আছে। তাহার একরূপ মণ্ডলাকার ভাবে স্থিত বলিলেও বলা যায়।

ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের পূর্ব্বদিকে যে চতুস্তারক ময় একটী সমচতু র্ভুজক্ষেত্র দেখা যায়। ঐ তারা ময় ক্ষেত্রের পশ্চিম বাহু দক্ষিণাভি মুখে প্রসারিত করিলে, একটা তারা ময় সমদ্বিবাহু ত্রভুর্জ ক্ষেত্র ভেদ করিয়া যাইবে, এই তারাময় সমদ্বিবাহু ত্রিভুর্জের পশ্চিমস্থ শীর্ষ কোণে চতুর্থ শ্রেণীর যে একটী তারা লক্ষিত হয় ঐ তারার নাম দুর্য্যোধন [১] এই দুর্য্যোধন তারা শত ভিষা নক্ষত্রের যোগ তারা, শত ভিষা নক্ষত্রে জ্বর হইলে শত ভিষক [বেদ] চিকিৎসা করিলে ও জ্বর আরগ্য হয় না, এই বিশ্বাসে এই নক্ষত্রের নাম শত ভিষা বা শত ভিষক, এই নক্ষত্র শত তারক ময় বোধে ইহার অপর নাম শত তারকা এবং এই নক্ষত্র বরুণ দৈবত বলিয়া এই নক্ষত্র বরুণ দৈবত বলিয়া এই নক্ষত্র বৃষ্টিকারী।

অবেস্তা পাঠে দেখা যায় এই নক্ষত্রের নাম শত ভিষা। তিস্ত্রা [তিস্য] তারা অশ্বরূপে বৌরকাষের [বরুণ কোষ] জলে প্রবেশ করিলে বৌরকাষের জল টগ্ বগ্ করিয়া ফুটিতে থাকে। এবং জল স্ফীত হইয়া উথলিয়া পড়ে। শতভিষা নক্ষত্র ঐ জল বণ্টন করিয়া সপ্ত বর্ষে প্রক্ষিপ্ত করেন।

ইতি অবেস্তা তীয় ষষ্ট অধ্যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

(৫) এই জন্য গঙ্গার বাহন মকর।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পঞ্চমোঽধ্যায়।

১

দ্বে অক্ষরে ব্রহ্মপরে ত্বনন্তে
বিদ্যাবিদ্যে নিহিতে যত্র গূঢ়ে।
ক্ষরন্ত্ববিদ্যা হ্যমৃতং তু বিদ্যা
বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোঽন্যঃ।

অন্বয়—দ্বে (বিদ্যাবিদ্যে) তু অক্ষরে অনন্তে ব্রহ্মরূপে বর্ত্তেতে, যত্র অক্ষরে ব্রহ্মপরে বিদ্যাবিদ্যে নিহিতে গূঢ়ে (চ ভবতঃ) অবিদ্যা তু ক্ষরং, বিদ্যা তু অমৃতং হি (ভবতি)। যস্ত—বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে, সঃ অন্যঃ (ভবতি)।

বিষমপদ ব্যাখ্যা—"অক্ষরে"—অবিনাশিনি—অবিনশ্বরে। "ব্রহ্মপরে পরব্রহ্মণি

পরব্রহ্মে "অনন্তে"—দেশতঃ কালতঃ বস্তুতঃ বা অপরিচ্ছিন্নে, দেশ-কাল বা বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। "বিদ্যাবিদ্যে" বিদ্যা এবং অবিদ্যা "নিহিতে"—স্থাপিত। "গূঢ়ে"—অনভিব্যক্ত। "অবিদ্যা তু ক্ষরং" অবিদ্যাই ক্ষরণের একমাত্র হেতু। "বিদ্যা তু অমৃতং"—বিদ্যাই মোক্ষের একমাত্র হেতু। "ঈশতে"—নিয়মযন্তি—।

মর্ম্মার্থ—বিনাশি-কার্য্য-মূলা সংসার বৃত্তির কারণ অবিদ্যা এবং অমৃতময়ী আত্মজ্ঞান রূপিণী বিদ্যা, এতদুভয়ই অনাদি অনন্ত পরব্রহ্মে, লৌকিক জগতের অজ্ঞাত ভাবে নিহিত রহিয়াছে, যে মহাত্মা সেই অজ্ঞানমূলা অবিদ্যা এবং সংসারবৃত্তি নিবারিকা বিদ্যাকে নিয়মিত করিতে পারিয়াছেন, একমাত্র তিনিই সেই দুঃখবহুলা অবিদ্যা ও সুখৈকমূলা বিদ্যা হইতে পৃথগ্‌ভূত, তাঁহাকে সংসার হইতেও সম্পূর্ণরূপে পৃথক বলিয়া জানিবে। সুখ বা দুঃখ কিছুতেই তাঁহাকে প্রসন্ন বা বিষন্ন করিতে পারে না, তিনি নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় স্থির চিত্ত হইয়া দ্বন্দ্বাতীতাবস্থা প্রাপ্ত হয়েন। "দ্বন্দ্বাতীতঃ বিমৎসরঃ" এই আখ্যা তাঁহাতেই প্রযুক্ত হইতে পারে।

২

যো যোনিং যোনি মধিতিষ্ঠত্যেকো
বিশ্বানি রূপাণি যোনীশ্চ সর্ব্বাঃ।
ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে
জ্ঞানৈ বির্ভর্ত্তি জায়মানঞ্চ
পশ্যেৎ।

অন্বয়ঃ—যোঽয়ং ইতি ক্ষটিকরোতি যঃ একঃ যোনিং যোনিং অধিতিষ্ঠতি, বিশ্বানি রূপাণি সর্ব্বাঃ যোনীঃ চ অধিতিষ্ঠতি, যঃ অগ্রে প্রসূতং ঋষিং কপিলং জ্ঞানৈঃ বিভর্ত্তি (তম্ জায়মানং চ পশ্যেৎ। (এবম্ভূতঃ সঃ)।

বিষমপদ-ব্যাখ্যা। তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায় এই শ্লোকের পদ-সমূহ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাই পুনরায় ব্যাখ্যাত হইল না।

মর্ম্মার্থ—পূর্ব্ব-শ্রুতি-বর্ণিত পুরুষকে, তাহা ব্যক্ত করিতেছেন—যে সত্য এবং নিরবচ্ছিন্ন সুখানুভূতিময় পরমেশ্বর অনাদি-সিদ্ধা মায়াখ্যা মূল প্রকৃতি, জগতের দৃশ্যাদৃশ্য নিখিল কারণ, যাবতীয় রূপ এবং সমুদয় বীজাদিতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, অর্থাৎ কি দৃশ্য, কি অদৃশ্য, বিশ্বস্থ-তাবৎ পদার্থই যে অনাদি পরমাত্মার অধিষ্ঠান ভূমি, যিনি ঋষি অর্থাৎ অপ্রতিহত জ্ঞান, স্বশক্তি সম্ভূত কনকাভ হিরণ্যগর্ভকে সৃষ্টির প্রথম কালে ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্যাদি দিব্য-জ্ঞানের দ্বারা যুক্ত করিয়াছেন, এবং সেই সহস্রাংশু সমপ্রভ জায়মান হিরণ্যগর্ভকে প্রকাশ কালে সাক্ষিরূপে অবলোকন করিয়াছিলেন, সে পরম পুরুষই পূর্ব্বশ্রুতি বর্ণিত অবিদ্যা এবং বিদ্যা উভয় বিমুক্ত মহাপুরুষ,—পরমাত্মা। একবার মনু স্মরণ করুন—

"তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্।
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥

৩

একৈকং জালং বহুধা বিকুর্ব্বন্
অস্মিন্ ক্ষেত্রে সংহরত্যেষ দেবঃ।
ভূয়ঃ সৃষ্ট্বা পতয়স্তথেশঃ
সর্ব্বাধিপত্যং কুরুতে মহাত্মা॥

অন্বয়ঃ—এষ দেবঃ অস্মিন্ ক্ষেত্রে ঐকৈকং জালং বহুধা বিকুর্ব্বন্ সংহরতি। যে লোকানাং পতয়ঃ ভূয়স্তান্ সৃষ্ট্বা মহাত্মা ঈশঃ তথা (পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে যথা কৃতবান্) সর্ব্বাধিপত্যং কুরুতে।

বিষমপদ-ব্যাখ্যা—"অস্মিন্ ক্ষেত্রে"—এই মায়াময় সংসারে। "একৈকং জালং"—একটি একটি মায়াজাল। "বহুধা বিকুর্ব্বন্ নানাপ্রকারে বিস্তৃত করিয়া "লোকানাং পতয়ঃ"—পুনঃ যে লোকানাং পতয়ঃ মরীচ্যাদয়ঃ মরীচি প্রভৃতি লোকপতিগণ "তান্ তথা সৃষ্ট্বা" তাঁহাদিগকে পূর্ব্ব-কল্পের ন্যায় সৃষ্টি করিয়া।

বঙ্গার্থ—এই অনাদিতন পরম-পুরুষ সৃষ্টিকালে সুরনর তির্য্যগাদি এক একটি জাল এই মায়াময় সংসার-ক্ষেত্রে নানাভাবে বিস্তার করিয়া আবার তাহা যথাকালে সংহৃত করেন। মহাত্মা ঈশ্বর প্রলয়াবসানে পুনঃ সৃষ্টির প্রাক্কালে মরীচি প্রভৃতি লোক-পালদিগকে পূর্ব্ববারের ন্যায় আবার সৃষ্টি করিয়া স্বীয় ঐশিক আধিপত্য বিস্তার করেন।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি অভিনয়ের তিনিই একমাত্র নেতা, তাঁহার নেতৃত্বই স্বর্গের দিব্য আধিপত্য হইতে আরম্ভ করিয়া তুচ্ছ কীটাদি পর্য্যন্ত মায়াময়-জাল বিস্তার করিয়া সকলকে মায়াবশে মন্ত্রমুগ্ধবৎ করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহার বিশ্ববিরচিকা কল্পনা অনন্তকাল একই প্রকার অপ্রতিহত প্রভাবে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইতেছে, শ্রৌত-মন্ত্রে কথিত হইয়াছে "যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ"। তিনি পূর্ব্বাপর সমভাবে সমগ্রবিশ্ব কল্পনা করিয়া আসিতেছেন। গীতা স্মরণ করুণ।

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরং।
হেতুনানেন কৌন্তেয়, জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥"

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ—
মেট্রপলিটান কলেজ।

হিন্দু-সমাজের উন্নতি-সাধনের উপায়। (১)

জাতি-ভেদ-প্রথা হিন্দু-সমাজের সামাজিক ব্যবস্থাপনের যন্ত্র স্বরূপ। উহা ভাল কি মন্দ, উহা জাতীয় উন্নতির সহায় বা অন্তরায়, সে আলোচনা এস্থলে করিব না। তবে এই মাত্র বলিতে চাই যে, জাতি-ভেদ-প্রথা হিন্দু-সমাজের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে; অতএব ইহাকে ভালই বিবেচনা করুন, বা মন্দই বিবেচনা করুন, ইহার মূলোৎপাটন সহজ নহে। এ প্রথার অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় পক্ষেই যথেষ্ট যুক্তি-প্রমাণ প্রদত্ত হইতে পারে; কিন্তু আমাদের কথা এই যে, প্রথাটী যখন আছে, এবং সহসা বিপর্য্যস্ত হইবারও সম্ভাবনা নাই, তখন ইহার দ্বারা সমাজের যত টুকু উপকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে, তাহা আমাদের করা কর্ত্তব্য।

হিন্দু সমাজের এই জাতি ভেদ-প্রথার দ্বারা আপাততঃ আমরা কি উপকার প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহা দেখা আবশ্যক। এই শত সহস্র সম্প্রদায় সমন্বিত সুপ্রকাণ্ড হিন্দু-জাতিকে একটি মাত্র সূত্রে সুসম্বদ্ধ করা

(১) শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার মহাশয়ের প্রদত্ত কোন বক্তৃতার সারাংশ।

আপাততঃ সম্ভবপর নহে। এতদন্তর্ভূত বিভিন্ন সম্প্রদায় যদি আপন ২ সাম্প্রদায়িক সমুন্নতি সাধনে যত্নপর হন, তবেই ক্রমে সমস্ত সম্প্রদায়ের সমবেত-উন্নতির ফলে সমগ্র হিন্দুজাতির উন্নতি সংসাধিত হইতে পারে। বৃহৎকার্য্য মাত্রেরই প্রায় এই নিয়ম।

বিভিন্ন জাতির বিভিন্নাকার বিশৃঙ্খল-বস্তু সমূহের একত্রীকরণ ও একসূত্রে বন্ধন সুসাধ্য নহে; পরন্তু বিভিন্ন জাতীয় বস্তু স্বতন্ত্র ২ ভাবে বন্ধন করিয়া, পরে এক রজ্জুতে বা এক আধারে অবস্থাপিত করা অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য, সন্দেহ নাই। জাতি-ভেদ-জনিত বিভিন্ন রীতি-নীতি, ক্রিয়া-কার্য্য সমন্বিত বহুবিভিন্ন সম্প্রদায়পূর্ণ হিন্দু-সমাজের উন্নতিবিধানের ইহাই ক্রম।

এই বিরাট হিন্দু জাতির সমস্ত অন্তর্ভূত জাতিই যদি স্ব স্ব জাতীয়-উন্নতি বিধানে অগ্রসর হন, তবে তাহাই হিন্দুর জাতীয় উন্নতি নহে কি? মনে করুন, একটি গ্রামে অনেকগুলি বাড়ী; কিন্তু কোনটী পাকা, কোনটি কাঁচা, কোনটি প্রায় ভগ্ন, কোনটি অর্দ্ধ ভগ্ন, কোনটি প্রায় প্রস্তুত, কোনটি অর্দ্ধ প্রস্তুত, ইত্যাকার। এখন সকল বাড়ীর অধিবাসীরাই যদি বিশেষ প্রযত্ন পরায়ণ হইয়া আপন আপন বাড়ীগুলি ভাল করেন, পাকা করেন, সুন্দর করেন, তবে অচিরাৎ সমগ্র গ্রাম খানিই একটি সৌধমালা-শালিনী নগরীর ন্যায় শোভমান হয়। বিভিন্ন খণ্ড সমাজ সমন্বিত সুবিস্তৃত সমাজের সমগ্র সমুন্নয়ের ইহাই প্রণালী। অতএব জাতিভেদ প্রথাতেই এই প্রণালীর ফলোপধায়কতা প্রতিষ্ঠিত জানিয়া, বিভিন্ন-সমাজের প্রত্যেক হিন্দুরই স্ব স্ব সমাজোন্নতি সাধনে যথা সম্ভব যত্নবান হওয়া প্রার্থনীয়।

এক্ষণে কি প্রকারে আমাদের এই জাতীয় উন্নতি সুসাধিত হইতে পারে, বর্ত্তমানে তাহাই আলোচ্য ও বিবেচ্য। আমি বিবেচনা করি, উন্নতির প্রধানতঃ চারিটি উপায়—ধর্ম্ম, বিদ্যা, বল ও ধন। সূক্ষ্ম ভাবে সকল তত্ত্বই ধর্ম্মতত্ত্বের অন্তর্ভূত, সকল সাধনই ধর্ম্মবলে সিদ্ধ; কিন্তু সে উচ্চাধিকারের কথা এস্থলে আমাদের আলোচ্য নহে, সাধারণতঃ স্থূলভাবে—মানব জাতির উন্নতির উক্ত চারিটি প্রধান অঙ্গ আমাদের প্রয়োজনীয়, সুতরাং আলোচনীয় ও সাধনীয়।

ধর্ম্ম-বিষয়ে বক্ষ্যমাণ-প্রসঙ্গে আমি অধিক কিছু বলিব না। প্রতি শুভ কার্য্য-সাধনাই ধর্ম্মাভাবে অসিদ্ধ, ইহা হিন্দু-হৃদয়ে স্বতঃএব সুপ্রতীত। হিতোদ্দিষ্ট সর্ব্বকার্য্য কর্ম্মই হিন্দুর পরিচালক, পোষক ও রক্ষক। মূলত এই ধর্ম্মের দুইটি বিভাগ। ভগবদ্ভক্তি ও নৈতিকশক্তি। এই দুইটি আবার পরস্পর সাপেক্ষ। অতএব যদি ভগবৎ কৃপায় আমরা ভগবচ্চরণে ভক্তি রাখিয়া ও নৈতিক শক্তিতে সঞ্জীবিত থাকিয়া ধর্ম্ম বলে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারি, তবে অচিরাৎ সিদ্ধির মুখ দেখিব; নচেৎ শত বৎসর ব্যাপী শত চেষ্টা—সহস্র সাধনাও তপ্ত বিক্ষিপ্ত বারিবিন্দুবৎ ব্যর্থতায় বিলীন হইবে।

বিদ্যা-বুদ্ধি বিষয়ে আমাদের দেশে কোনদিন সর্ব্বাগ্রগণ্য থাকিলেও এক্ষণে

বহুপশ্চাতে পড়িয়াছে। বিদ্যাকে স্থূল ভাবে লেখা পড়া মাত্র ধরিলেও দেখা যায়, অস্মদ্দেশ এক্ষণে কত পশ্চাদ্বর্ত্তী। এ দেশে অঙ্গুলি-পর্ব্বমের কয়েকখানি মাত্র সংবাদ ও সাময়িক পত্র অতি কষ্টে চলিতেছে; আর ইউরোপ-আমেরিকা তদ্বিষয়ে কি আশ্চর্য্য ও অদ্ভুদ বৈপরীত্য! অথচ এ দেশের লোকসংখ্যা কত অধিক! বিলাতে বোট্‌ম্যান, কোচ্‌ম্যান, মুটে-মজুর সংবাদ-পত্র পড়িয়া থাকে। অস্মদ্দেশে হয় ত কোন কোন সুসভ্য রাজাধিরাজও সংবাদ-পত্র পাঠে পৃথিবীর সংবাদ রাখা প্রয়োজনীয় মনে করেন না! যাক্ সংবাদ পত্র; সাময়িক পত্রের দশা ত ততোধিক শোচনীয়। সে যাহা হউক, অস্মদ্দেশে সর্ব্বজনীন বিদ্যা-শিক্ষা (Mass Education) না থাকাতে জাতীয় বিদ্যোন্নতি দুরপরাহত হইয়াছে। এক্ষণে যদি এদেশের খণ্ড খণ্ড জাতি বা সমাজ সমূহে স্বসীমাধিগত স্বতন্ত্র ও সারস্তভাবে বিদ্যা-শিক্ষা-বিস্তারের বিশেষ চেষ্টা হয়, তবে কালে উহারই সমষ্টিগতভাবে জাতীয় বিদ্যোন্নতি সহজেই সংসাধিত হইতে পারে।

বিদ্যাবলের অপচয়ে অত্যুন্নত ভারত অবনত হইয়াছে। বিদ্যাবলের উপচয়ে ইউরোপ উন্নত, আমেরিকা উন্নত, এসিয়ার ক্ষুদ্র দ্বীপ গতকল্যের জাপানও আজ উন্নত হইয়া পৃথিবীর ঈর্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। বিদ্যাবলে—বিজ্ঞান-বলে স্বভাবের অদম্য অনতিক্রম্য বল আয়ত্ত করিয়া, আজ পাশ্চাত্য জাতি প্রকৃতিকে পরিচারিকা করিবার স্পর্দ্ধা করিতেছে। বিদ্যাবলে—বিজ্ঞানবলে অসাধ্য সাধন, অঘটন সংঘটন করিয়া এইবিংশশতাব্দীর মানব যেন ঐশীশক্তিকে স্পর্শ করিতে উদ্যত হইয়াছে!

ঐহিক উন্নতির কথা ছাড়িয়া পারমার্থিক উন্নতিতে লক্ষ্যকরিলেও দেখাযায় যে, বিদ্যা তাহার এক প্রধান সাধন। ভারতীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্রে পরমার্থতত্ত্বজ্ঞানের অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানের এক নামই বিদ্যা। অজ্ঞানের নাম অবিদ্যা। ভারতে বিদ্যার উৎকৃষ্ট ফল ধর্ম্মসাধন—ভগবদ্ভজন আবহমানকাল সমাদৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যপ্রদেশও এখন এই তত্ত্বের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। অতএব এমন যে পরমধন বিদ্যাধন, সেধনে যে জাতি বা সমাজ নির্দ্ধন না হইলেও অন্ততঃ হীনধন, তাহার অপর বিশিষ্ট বৈষয়িক ধনবত্তাও বিড়ম্বনা মাত্র। এই পরমধনার্জ্জন সাধনে যে ধন বা অর্থ ব্যয়িত হয়, সেই অর্থই সার্থক, নতুবা নিতান্তই অনর্থক।

আমাদের তৃতীয় আবশ্যকতা বল বীর্য্যের। মানসিক-বল-বীর্য্যের কথা এস্থলে আলোচ্য নহে; কারণ তাহা মুখ্যতঃ ধর্ম্ম ও বিদ্যা বুদ্ধির ফল, গৌণতঃ কতকটা শারীর-বলেরও ফল বটে। ধর্ম্ম ও বিদ্যা-বলের বিষয় ইতঃপূর্ব্বে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিয়াছি; এক্ষণে শারীর-বলের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব।

অনেকদিন হইতে ভারতে শারীর-বলের অবনতি আরম্ভ হইয়াছে; এখন অভাব বলিলেও বোধহয় বড় অত্যুক্তি হয়না। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে এ "অভাব"

শব্দ প্রযোজ্য না হইতে পারে, কিন্তু জাতিগত-ভাবে বোধহয় স্বচ্ছন্দে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যদিও পাশ্চাত্য জাতিগণের দৃষ্টান্তে দৃষ্ট হয় যে, ধন বলই প্রধান জাতীয়-বল; তথাপি ইহাও নিশ্চিত যে শারীর-বল ভিন্ন সেই ধন-বল উপার্জ্জিত বা রক্ষিত হইতে পারেনা। প্রাচীন ভারত অপেক্ষা বিদ্যাবল ও ধন বল আধুনিক ভারতে অনেক কমিলেও শারীর-বলের মত কখনই কমে নাই।

প্রাচীন-শারীর-বলের যে সাক্ষ্য পুরা-ণেতিহাস ও কাব্য সাহিত্যাদিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে কবি-কল্পনা বা অতি-রঞ্জনার "ছুট্‌বাদ" দিলেও যে টুকু সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারা যায়, তাহাও বর্ত্তমানে আমাদের পক্ষে অসাধারণ ও অলৌকিক। তাহার তুলনায় এখনও যে আমাদের অস্তিত্ব বজায় আছে, ইহাই আশ্চর্য্য। দুই—চারি শতাব্দীর কথাও নহে, প্রায় সহস্রাধিক বৎসর হইতে আমাদের শারীর-বলের অবনতি। এই অবনতি আমাদের সর্ব্ববিধ অবনতির অন্যতম প্রধান হেতু, সন্দেহ নাই। অতএব শারীর-বল কদাচ উপেক্ষার বিষয় নহে। দুঃখের বিষয় এই শারীর-বলের উৎকর্ষ সাধনে আমাদের সামান্য চেষ্টাও দৃষ্ট হয় না। যোগেযাগে "পৈতৃক প্রাণটি" থাকিলে যেন যথেষ্ট; কিন্তু প্রাণেরই যে নামান্তর বল। বলশূন্য প্রাণ আর জলশূন্য নদী একই কথা। কেবল নাম মাত্র—বিড়ম্বনা। আত্ম ও পর লইয়াই সংসার। দুর্ব্বল-ব্যক্তি পরের কার্য্যে খাটিতে অসমর্থ, আত্মরক্ষায়ও অপটু। সুতরাং দুর্ব্বলের বিড়ম্বনাময় জীবন সমাজে ভার মাত্র।

এ দেশে পিতা-মাতা পুত্রের শারীর-বল বিধানের প্রতি দৃষ্টি রাখেন না। অনেক স্থলে পুত্রের বিদ্যা শিক্ষার চেষ্টা যথেষ্ট আছে, কিন্তু পুত্র বাঁচে কি মরে, সে দিক লক্ষ্য নাই! যেন বল ও জীবনীশক্তির অভাবে পুত্র পরলোকে গেলে, সেখানেও বিদ্যা শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন, এবং তাহার ফলও তাঁহারা পাইবেন; সুতরাং নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চিন্ত আছেন। ইহা হাসিবার কথা নহে; কাঁদিবার কথা। বড় দুঃখেই ইহা বলিলাম। দুর্ব্বলের দ্বারা কোন কার্য্য হয় না। সংসারে কেহই তাহাকে গ্রাহ্য করে না। একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দেখুন, কোন্ দূরদেশ হইতে পাহাড় পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া একটি কাবুলী এদেশে ভিন্ন রাজার অধিকারে আসিয়া কেবল নিজ শারীর বল মাত্র ভরসায় কেবল ব্যবসা করিয়া ধনী হইয়া স্বদেশে গমন করিতেছে। একক গ্রামে ২ গিয়া ধারে জিনিস বিক্রয় করিয়া, বিনা খৎপত্রে কত লোকের সহিত কারবার চালাইতেছে। তাহার টাকা পড়িয়া থাকে না। প্রায় নালীশের প্রয়োজন ও হয় না। সকলেই তাহাকে ভয় করে, শারীরিক-বলই তাহার এক মাত্র সহায়, শারীরিক-বলেই তাহার আইন-আদালতের কার্য্য সাধিত হয়। অধিক কি, আমাদের দেশের সাধারণ মুসলমানগণকে যে লোকে ভয় করে, তাহার কারণও তাহাদের শারীরিক-বলের আধিক্য। "বলং বলং বাহুবলং" ইহা আমাদের দেশেরই প্রবচন, বেদেও আছে, একো বলবান্ শতং বিজ্ঞানবতামাকম্পয়তে। বলেন বৈ পৃথিবী তিষ্ঠতি বলেনান্তরীক্ষং

বলেন দ্যৌর্ব্বলেন পর্ব্বতো, বলেন দেবা মনুষ্যা বলেন পশবশ্চ বয়াংসি চ তৃণ বনস্পতয়ঃ শ্বাপদান্য কীট পতঙ্গ পিপীলকং বলেন লোকস্তিষ্ঠতি। কিন্তু এক্ষণে ইহা আমাদের বাঙ্‌মাত্রে পর্য্যবসিত। যাহা-হউক, শারীর-বল সম্বন্ধে আমি আর অধিক কিছু বলিব না, যাহা প্রায় সকলেরই সুখ-বোধ্য বিষয়, তৎসম্বন্ধে অধিক বাগ্‌ বিস্তর বাহুল্য মাত্র। ফলে আমাদের সমাজে শারীর-বল বৃদ্ধির ব্যবস্থা যেরূপে হইতে পারে, বিশেষতঃ যুবক ও বালকদিগের তদনুশীলনার্থ গ্রামে ২ তাহার যে কোনরূপ উপায় অবলম্বিত হইতে পারে, তাহা আমাদের সর্ব্বতোভাবে আলোচ্য, অবধার্য্য ও কার্য্য।

আমাদের চতুর্থ বা শেষ প্রয়োজনীয় ও আলোচনীয় বিষয় ধন। সমাজে, অর্থাৎ আর একটু পরিষ্কাররূপে বলিতে হইলে-গার্হস্থ্য জীবনে পদে পদেই ধনের আবশ্যকতা। খাইতে, শুইতে, উঠিতে, বসিতে, চলিতে, বলিতে কেবল ধনেরই বিবিধ বিচিত্র লীলা-বিলাস! রাজা হইতে রাজপথ-ভিখারী পর্য্যন্ত সবাই ধনার্থী। রাজার রাজ্যলাভার্থে ধন চাই। ভিখারীর ভেজালাভার্থে ধন চাই। ফলে ধনের প্রয়োজন হইতে কাহারও অব্যাহতি নাই। এই সাংসারিক সর্ব্বার্থ-সাধন ধন, যে জাতি বা সমাজে যত অধিক, সে জাতি বা সমাজের সাংসারিক উন্নতি তত অধিক, সন্দেহ নাই। এই বিংশ শতাব্দীর সমুন্নত পাশ্চাত্য সমাজ বা জাতি-সমূহের অসাধারণ ঐহিক অভ্যুদয় প্রধানতঃ তাহাদের জাতির কুবেরত্বই পরিচায়ক। ধনই ঐহিক অভ্যুদয়ের জীবন।

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী।
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি॥
তদর্দ্ধং রাজ সেবায়াং।
ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ॥"

এটি অস্মদ্দেশের চির প্রচলিত প্রসিদ্ধ প্রবচন; কিন্তু এক্ষণে আমরা শুধু বচনেই মজবুদ্‌; কাজে কিছুই না। বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তাহা আমাদের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার বিজ্ঞাত; অথচ আমাদের দেশে বাণিজ্য মোটেই নাই বলিলেই হয়। এদেশে যে বাণিজ্য চলিতেছে, তাহা প্রায়শঃ বিদেশীয় বণিকের. দেশীয় যাহা কিঞ্চিৎ আছে, তাহা প্রায়শঃ অন্তর্বাণিজ্য মাত্র। বহির্বাণিজ্য ব্যতীত প্রভূত ধনাগমের দ্বিতীয় উপায় নাই। আজ পাশ্চাত্য প্রদেশ সমূহের যে অপ্রমিত অভ্যুদয়, বহির্বাণিজ্য-বিস্তারই তাহার বিশিষ্ট হেতু; আমাদের ইংরাজরাজ প্রাবণে বহির্বাণিজ্য করিতে আসিয়াই এই ক্ষুদ্র পৃথিবী ভারত-ভুবনের একাধীশ্বর হইয়াছেন। বাণিজ্য হইতে এরূপ আশাতীত অসামান্য মহৎ ফল লাভ আর কি হইতে পারে? আমাদের স্বদেশই এই দেদীপ্যমান দৃষ্টান্ত, অথচ সভ্য জাতি সমূহের মধ্যে আমাদের ন্যায় বাণিজ্য উদাসীন ও অসমর্থ জাতি বোধ হয় জগতে আর দ্বিতীয় নাই। বহির্বাণিজ্যে আমাদের জাতি যায়! কিন্তু বাণিজ্যের অভাবেই যথার্থ জাতি যায়, অর্থাৎ জাতি টেঁকেনা, জাতির জীবন দারিদ্র্যের দোষে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, তাহা আমরা ভাবি না। আমা-দেরই কবি-বাক্য "দারিদ্র-দোষো গুণরাশি-নাশী," ধনহীনত্ব সর্ব্বগুণনাশক। জাতির

দারিদ্র দোষে জাতীয় বিদ্যা-বুদ্ধি-গুণ-জ্ঞান কিছুই সম্যক্ কার্য্য কর হয় না। বাণিজ্য ব্যতীত এই জাতীয় দারিদ্র্য মোচনের উপায়ান্তর নাই।

শিল্প ও কৃষি-বাণিজ্যের প্রধান সহায়। এই শিল্প ও কৃষি বিষয়ে ভারতবর্ষ কোন দিন জগতে আদর্শ ছিল এবং কোন দিন ভারতে বহির্বাণিজ্যেরও প্রদীপ্ত প্রভাব ছিল, তাহা পুরাণাদির সাক্ষ্যে জানা যায়, কিন্তু এখন বাণিজ্যের অবনতিতে জাতীয় ধনবত্তার অবনতি ঘটিয়া এবং বিদেশীয় কলকারখানা প্রভৃতির প্রতিযোগিতা রূপ অপর বিবিধ আনুষঙ্গিক কারণে শিল্পের অবস্থা দিন ২ অতি অবনতই হইতেছে; কৃষির অবস্থা সেই সুপ্রাচীন উপায়াদির অবলম্বনে যতটুকু অব্যাহত আছে, তাহাও আশাজনক নহে। তবে ভারতভূমি স্বতঃই সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা, এই জন্য প্রকৃতি মাতার স্বতঃপ্রদত্ত প্রসাদে ভারতের কৃষি-প্রধানত্ব অদ্যাপি কতকটা অব্যাহত আছে; তথাপি এই ভারতবর্ষের যে অধুনা দুর্ভিক্ষের নিত্য প্রচণ্ডতাণ্ডব, তাহার প্রধান কারণই আমাদের দারিদ্র্য। রাজকীয় অনুসন্ধানেও আজ এ সত্য স্বীকৃত হইয়াছে; অতএব আমাদের জাতীয় জীবন বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে ধনেরই অত্যা-বশ্যকতা।

দারিদ্র্যের বিশ্বগ্রাসী করাল কবল ভারত গ্রাস করিতে উদ্যত, অথচ আমরা উদ্ধারের একমাত্র উপায় ধনাগমের প্রকৃষ্ট-পন্থা ব্যবসায়-বাণিজ্যে উদাসীন হইয়া, কৃষিকার্য্যও প্রায়শঃ নিরক্ষর চাষার উপর ভার দিয়া, কেবল "হা চাকরী! হা চাকরী!!" করিয়া মরিতেছি! হা লজ্জা! হা বিড়ম্বনা! অধঃ-পাতের বাকী কি? এখন কেবল জাতির ভিক্ষাবৃত্তির কথঞ্চিৎ বাকী আছে। আমা-দের যে গতিক, পশ্চাতে 'নৈব নৈবচ" পর্য্যন্ত না নামিয়া ছাড়িবে বোধ হয় না। ফলে দারিদ্র্যেই আমাদের সর্ব্বনাশ-ঘটিল। আমাদের মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে যাঁহারা লক্ষ্মীর বরপুত্র আছেন, তাঁহারা জাতীয় ধনাভাবের গুরুত্ব ও সর্ব্বনাশকত্ব লক্ষ্য করিতেছেন না; গরিবেরা আর কি করিবে? তবে কি না, আমাদের মত গরিবদেরই উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। আমাদের আন্দোলন—আলোচন ও উদ্যোগ আয়ো-জনের গোলযোগে হয়ত তাঁহাদেরও ঘুম ভাঙ্গিতে পারে।

আমি অন্ন বিদ্যা, বল ও ধন সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম, এক্ষণে আমার নিবেদন এই যে, বিরাট-হিন্দু-জাতির যুগপৎ সমবেত-চেষ্টায় যুগপৎ উক্ত চতুর্ব্বর্গ সিদ্ধি আপাততঃ অসম্ভব, অতএব তদন্তর্ভূত খণ্ড খণ্ড চেষ্টা দ্বারা কালে সমগ্র জাতির সমষ্টিগত অভ্যু-দয় অসম্ভব নহে।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২০ আইন মতে রেজষ্টীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৮ম বর্ষ, ৮ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা। | পৌষ।। | ১৩০৮ সাল, ১৮২৩ শকাব্দা।

স্বরজ্ঞান।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

——•:o:•——

নিশ্বাস প্রশ্বাসের (প্রাণের) দ্বারায় কার্য্য করিতে পারিলে সর্ব্ব কার্য্য সাধন হয়। প্রাণের ন্যায় মিত্র ও পরম বন্ধু মানবের আর কিছুই নাই। ভগবতীর প্রশ্নের উত্তরে মহাদেব যাহা বলিয়াছিলেন, পাঠকগণের গোচরার্থে নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম।

দেব্যুবাচ।

দেব দেব মহাদেব সর্ব্ব সংসার তারক।
কিং নরাণাং পরং মিত্রং সর্ব্ব কার্য্যার্থ-
সাধনং।

দেবী কহিলেন,—সর্ব্ব সংসার তারক দেব দেব মহাদেব! মনুষ্যগণের পরম মিত্র একপ কি আছে, যাহা দ্বারা সকল কার্য্য সাধন করা যায়।

এতদুত্তরে সর্ব্বজ্ঞ মহাযোগী মহেশ্বর বলিলেন—

প্রাণ এব পরং মিত্রং প্রাণ এব পরঃ সখা।
প্রাণতুল্যঃ পরোবন্ধুর্নাস্তি নাস্তি বরাননে॥

প্রাণই শ্রেষ্ঠ সখা, প্রাণই পরম মিত্র। প্রাণের তুল্য পরম বন্ধু মনুষ্যগণের আর কিছু নাই। (১)

বাস্তবিক একমাত্র প্রাণের (নিশ্বাসের) দ্বারা কার্য্য করিতে পারিলে, ঐহিক ও পারলৌকিক সকল কার্য্য সুসিদ্ধ হয়।

---

(১) পূর্ব্বে বলিয়াছি একবার শ্বাস প্রশ্বাসের নাম প্রাণ। প্রাণ শব্দে শ্বাস প্রশ্বাস বুঝিতে হইবে। হিন্দু-পত্রিকা ১৩০৭ সাল আষাঢ় চৈত্র সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রাণ বায়ুর ক্রিয়াযোগে যোগপরায়ণ যোগিগণ লোকদুর্লভ বিবিধ ক্ষমতা এবং অসীম অনন্ত ভগবানের সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকেন। সেই নিশ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া দ্বারা সাংসারিক, বৈষয়িক সকল, কার্য্য সুফল ও দীর্ঘ জীবন লাভ করা অসম্ভব হইতে পারে কি? কিন্তু প্রাণতত্ত্ব বিদ্যা গুরু-মুখে শিক্ষা করিতে হয়। মহাদেব বলিয়াছেন—

এবং প্রাণবিধিঃ প্রোক্তঃ সর্ব্ব কার্য্যে ফল-
প্রদঃ।

জায়তে গুরু-বাক্যেন ন বিদ্যা শাস্ত্র
কোটিভিঃ॥

প্রাণ বায়ুর বিধি যাহা কথিত হইয়াছে, এই প্রাণ বায়ু (শ্বাস প্রশ্বাস) সর্ব্ব কার্য্যেই ফল প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু এই স্বরতত্ত্ব বিদ্যা গুরুর মুখে অবগত হইবে; তদ্ভিন্ন কোটি কোটি শাস্ত্র পড়িলেও প্রাণ-তত্ত্ব বিদ্যা লাভ করা যায় না।

কথাটা অতি প্রকৃত। যিনি যত বড় চতুর, বুদ্ধিমান ও অন্যান্য নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হউন না কেন, স্বরজ্ঞ গুরুর শ্রীমুখাৎ শিক্ষা উপদেশ বিনা কেহই স্বরশাস্ত্র পাঠ করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন না। তজ্জন্য গুরু মুখের উপদেশ ব্যতীত, সকলে সহজে স্বরজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করিয়া সাংসারিক সকল কার্য্য করিতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিবার নিয়মএবং শ্বাসের দ্বারায় কিরূপে সাংসারিক সকল কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করা যায়, কিরূপে ভাবী আপদ বিপদ, মঙ্গলামঙ্গল জানিতে পারা যায় ইত্যাদি এবং বন্ধ্যা নারীর পুত্র লাভ করিবার উপায়, বাতের পীড়াদি আরোগ্য হইবার অপূর্ব্ব কৌশল, দীর্ঘ জীবন লাভ করিবার উপায় ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যকীয় বিষয় এখন বলিব। বলিব, কিন্তু ভয় হয়,—সাহস আসিয়া হৃদয়ে স্থান পাইতেছে না। কবিকুল—কেশরী কালিদাস আপনাকে "প্রাংশু লভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ" জ্ঞান করিয়া ভয়ে ভয়ে লেখনী ধরিয়াছিলেন। আমি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ মহাযোগিগণের হৃদয়ের ধন অতি গুহ্যাদপি গুহ্য লুপ্ত প্রায় স্বরশাস্ত্রে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়া সুশিক্ষিত পাঠকগণকে সন্তুষ্ট করিতে পারিব, কি "লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ" সদৃশ অর্ব্বাচীন সুলভ প্রগল্‌ভতার ভাজন হইয়া অপরিমেয় উপহাসের আস্পদ হইব, তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারি না। কালিদাসের পক্ষে "মণৌ বজ্র সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ" ছিল; আমার গতি, ভরসা শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ। আমার একটী অদ্বিতীয় সাহস ও আশ্বাসের হেতু গুরুকৃপা। গুরুদেবের অসীম কৃপায় তাঁহারই শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া অনন্যদুর্লভ এবং দুর্ব্বোধ্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আর যাঁহাদিগের জন্য প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ গুরুতর বিষয় নাড়া চাড়া করিব, তাঁহারা সকলেই সুশিক্ষিত হিন্দু এবং হিন্দু শাস্ত্রের অনুরাগী; তাঁহারা ক্ষুদ্র লেখকের ত্রুটী, ন্যূনতা, ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, অথবা করণাপাটব দেখিলে ক্ষমা করিবেন, এই সাহসে আশার আশ্বাসপ্রদ মধুর-কণ্ঠে বিশ্বাস করিয়া স্বয়মতে গুরুর

কার্য্য করিবার নিয়ম প্রকরণ বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পাঠকগণ নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে প্রত্যক্ষ ফল লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই।

প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিবার নিয়ম।

যত্রাঙ্গে চরতে বায়ু স্তদঙ্গস্য করস্তথা।
সুপ্তোত্থিতো মুখং স্পৃষ্ট্বা লভতে বাঞ্ছিতং ফলং।
ন হানিঃ কলহৈশ্চৈব কণ্টকৈর্নাপি ভিদ্যতে ॥

প্রত্যহ প্রাতঃকালে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে শয্যা হইতে উঠিবার সময় যে নাসিকায় শ্বাস বহে, সেই দিকের হস্ত দ্বারা সেই দিকের মুখস্পর্শ করিয়া উঠিলে, বাঞ্ছিত ফল লাভ হয়। কোন হানি, বিপদ, এমন কি, সে দিন একটি কণ্টক পর্য্যন্ত বিদ্ধ হইবার আশঙ্কা থাকে না।

এইরূপ করিয়া পরে শয্যা হইতে মৃত্তিকায় প্রথম পা দিবার সময়, যে নাসিকায় শ্বাস বহে, সেই দিকের পদ অগ্রে বাড়াইয়া শয্যা হইতে নামিবে। প্রত্যহ এই নিয়ম পালন করিতে কেহ ভুলিবেন না।

গুরু, বন্ধু, প্রভু ও আত্মীয় প্রভৃতির নিকট যাইয়া কার্য্য সিদ্ধি ও বশীভূত করিবার উপায়।

বামে বা দক্ষিণে বাপি যত্রাপ্যাক্রমতে স্বরঃ।
কৃত্বা তৎপদমাদ্যঞ্চ যাত্রা ভবতি সিদ্ধিদা।
গুরু বন্ধু নৃপামাত্যা অন্যেঽপি শুভদায়িনঃ।
পূর্ণাঙ্গে * খলু কর্ত্তব্যা কার্য্য সিদ্ধিমনীষিভিঃ ॥

গুরু, বন্ধু, রাজা, অমাত্য, প্রভু প্রভৃতির নিকট ও অন্যান্য কোন ব্যক্তির নিকট যে কোন কার্য্য সিদ্ধি করিবার মনন করিয়া যাত্রা করিবার সময়, যে নাসিকায় শ্বাস বহন হয়, সেই দিকের পদ অগ্রে ক্ষেপণ করিয়া নিজ গৃহ হইতে বহির্গত হইলে কার্য্য সিদ্ধি হইবে এবং অভীষ্ট ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া যে নাসিকায় শ্বাস বহিতে থাকে, সেই দিকে অভীষ্ট ব্যক্তিকে রাখিয়া কথা বার্ত্তা কহিবে।

তাৎপর্য্য এই যে,—যখন কোন কার্য্য সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কিম্বা কাহারও অনুগ্রহ লাভ প্রত্যাশায় বাটী হইতে বহির্গত হইবে, তখন যদি দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন হয়, তবে দক্ষিণ পদ অগ্রে ক্ষেপণ করিয়া এবং বাম নাসিকায় নিশ্বাস থাকিলে, বাম পদ অগ্রে বাড়াইয়া যাত্রা করিবে। ঐরূপ যাত্রা করিবার সময় যে নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত থাকে, সেই দিকের হস্ত দ্বারা সেই দিকের মুখ স্পর্শ করিয়া পরে পদ ক্ষেপণ করিবে।

অভিলষিত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইলে, তখন যদি বাম নাসিকায় শ্বাস বহন থাকে, তাহা হইলে এরূপ ভাবে দাঁড়াইবে কিম্বা বসিবে যে, ঐ অভীষ্ট ব্যক্তি বাম দিকে থাকেন। আর সে সময় দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন থাকিলে, দক্ষিণ দিকে তাঁহাকে রাখিয়া দণ্ডায়মান হইবে। বা উপবেশন করিয়া কথা বার্ত্তা কহিবে। এইরূপ করিলে সুফল ফলিবে। যদি স্বরের দিকশূল না হয়, তাহা হইলে এই সকল কার্য্য বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহনের সময়, বাম পদ অগ্রে বাড়াইয়া যাত্রা করা উচিৎ। এই

---

* যে নাসিকায় যখন নিশ্বাস বহে, তাহাকে পূর্ণাঙ্গ এবং তদ্বিপরীতাঙ্গকে রিক্তাঙ্গ কহে।

নিয়মে যাত্রা করিলে কার্য্য সিদ্ধি ও অভিলষিত ব্যক্তি বশীভূত হইবে।

দক্ষিণে যদি বা বামে যত্র সংক্রমতে শিবঃ।
তৎপাদমগ্রতঃ কৃত্বা নিঃসরেৎ নিজমন্দিরাৎ॥

কোন লাভজনক বা যে কোন মঙ্গলকর কার্য্যে যখন যাইবে, তখন দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন হইলে, দক্ষিণ চরণ অগ্রে বাড়াইয়া এবং বাম নাসিকায় শ্বাস বহন হইলে বামচরণ অগ্রে বাড়াইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইবে। এরূপ করিয়া যে কোন শুভ কার্য্যে যাইলে সুফল হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্বরোদয়ে উক্ত আছে—

'বহেন্নাড়ী পদে চৈব যাত্রা ভবতি সিদ্ধিদা।'
যস্যাং নাসিকায়াং প্রাণবায়োর্গতির্লক্ষ্যতে

তদংশীয় পাদ প্রসারণ পূর্ব্বিকা যাত্রা সিদ্ধিদা ভবতীত্যর্থঃ।

অর্থাৎ—যে নাসিকায় নিশ্বাস বহন হইবে, সেই দিকের পদ অগ্রে বাড়াইয়া যাত্রা করিলে কার্য্য সিদ্ধি হইবে। (১)

কোন শুভ কার্য্যোদ্দেশে কোন স্থানে গমন করিতে হইলে বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময় যাত্রা করা উচিৎ যথা—

চন্দ্রঃ সম্পদ কার্য্যাণি রবিস্তু বিষমঃ সদা।
পূর্ণপাদং (২) পুরস্কৃত্য যাত্রা ভবতি সিদ্ধিদা॥

বাম নাসিকায় শ্বাস বহন কালে যে কোন সম্পৎ কার্য্যাদির নিমিত্ত যাত্রা করিবে। লাভ বা যে কোন শুভ কার্য্যোদ্দেশে যাত্রা করিবার জন্য যখন বাম নাসিকায় শ্বাস বহে, তখন যাত্রা করা বিধি। বিষম ও ক্রূর কর্ম্মাদির নিমিত্ত দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন সময় যাত্রা করিবে। এইরূপ যাত্রায় নিঃসন্দেহ সকল কর্ম্ম সিদ্ধি হইবে।

কিন্তু দিক অনুসারে ইড়ার দিকশূল হইলে, বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময় যাত্রা না করিয়া দক্ষিণ নাসিকার শ্বাস বহন কালে যাত্রা করিবে। দিকশূলের বিষয় পরে বলিব।

কোন শুভ কার্য্যোদ্দেশে কোন স্থানে যাত্রা করা ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত শুভ কার্য্য বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময় করিবে।

সর্ব্বত্র শুভ কার্য্যেষু বামা ভবতি তুষ্টিদা।

(১) ভারতের নারীরত্ন বিদুষী খনার বচনে আছে যে—

"স্বরের আগায় দিয়ে পা,
যথা ইচ্ছা তথা যা।"

ইহার অর্থ উপরোক্ত নিয়মে যাত্রা করিতে হইবে। এই সকল খনার বচন আমরা বাল্যকালে পঞ্জিকাতে পড়িয়াছি। এখন পাশ্চাত্য বিদ্যার বিষম বোঝায় আমাদের মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ, বুদ্ধিও মার্জ্জিত—অতিসূক্ষ্ম বলিয়া খনার অমূল্য বচনের মর্ম্ম আমাদের বুঝিবার সাধ্য নাই। বর্ত্তমান কালে নূতন পুরাতন ধরণে সংগঠিত হালফেশনের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণও খনায় উক্ত জ্যোতিষ, স্বর, কৃষি প্রভৃতি নানাবিষয়িণী অমূল্য বচনগুলির মর্ম্মাবধারণে অক্ষম। তজ্জন্য বর্ত্তমান সময় পঞ্জিকাকারগণ অমূল্য রত্নরাজী স্বরূপ খনার বচনগুলি পঞ্জিকা হইতে বাদ দিয়া আপনাপন পাণ্ডিত্য বজায় করিয়া পশার রাখিয়াছেন।

(২) পূর্ণপদ কাহাকে বলে, তাহা পশ্চাল্লিখিত বার বিশেষে পদক্ষেপণের নিয়ম বা হঠাৎ যাত্রা করিবার সময় কোন পদ কতবার ক্ষেপণ করিতে হয় পড়িলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন।

সর্ব্বক্ষ সকল প্রকার শুভ কার্য্য বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময় করিলে শুভ ফল প্রদান করে।

অপিচ—

ইড়ায়াশ্চ প্রবাহেণ সৌম্য কর্ম্মাণি কারয়েৎ।

ইড়া অর্থাৎ বাম নাসিকায় শ্বাস বহন কালে সমস্ত শুভ কর্ম্ম করিবে। *

শত্রু, দুষ্ট ও অধম ব্যক্তির নিকট জয় লাভ করিবার উপায়।

অরি চৌরাধমাদ্যাশ্চ অন্যে উৎপাত বিগ্রহাঃ।
কর্ত্তব্যাঃ খলু রিক্তাঙ্গে জয় লাভ সুখার্থিভিঃ॥

শত্রু, দুষ্ট, চোর ও অধম ব্যক্তিদিগের নিকট যখন যাইবে এবং অন্যান্য উপদ্রব সময়ে বিবাদে ও যুদ্ধ আদিতে জয় লাভ করিবার জন্য এবং শত্রু, দুষ্ট ও খল, বিদ্বেষী ব্যক্তির নিকট কার্য্য সিদ্ধির উদ্দেশে যখন যাত্রা করিবে, তখন যে নাসিকায় নিশ্বাস বহিবে, তাহার বিপরীত দিকের পদ অগ্রে বাড়াইয়া যাত্রা করিবে, অর্থাৎ গৃহ হইতে যাত্রা করিবার সময় যদি দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন হয়, তাহা হইলে বামপদ অগ্রে ক্ষেপণ করিয়া যাত্রা করিতে হইবে। যদি বাম নাসিকায় শ্বাস বহন থাকে, তবে দক্ষিণ চরণ অগ্রে ক্ষেপণ করিয়া যাত্রা করিলে নিশ্চয়ই জয় লাভ হইবে।

কুপিত প্রভু, বিদ্বেষী ও খল ব্যক্তিকে বশীভূত করিবার উপায়।

ব্যবহারে খলোচ্চাটে দ্বেষি বিদ্যাদি বঞ্চকাঃ।
কুপিত স্বামী চৌরাদ্যাঃ পূর্ণস্থাঃ স্যুর্ভয়ঙ্করাঃ।

প্রভু যদি রাগ করিয়া থাকেন কিম্বা উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী যদি কুপিত হন এবং বিদ্বেষী ও খল চোর, বিদ্যাদি বঞ্চক প্রভৃতি লোকের নিকট যাইবার সময় উপরোক্ত নিয়মে অর্থাৎ যাত্রা কালীন যে নাসিকায় শ্বাস বহিতে থাকে, তাহার বিপরীত দিকের পদ অগ্রে ক্ষেপণ করিয়া যাত্রা করিবে এবং সেখানে উপস্থিত হইয়া যে নাসিকায় শ্বাস বহিতে থাকে, সেই দিকের হস্ত দ্বারা কার্য্য ও ব্যবহার করিবে। এরূপ করিলে কুপিত স্বামী ও খল, বিদ্বেষী ব্যক্তি নিশ্চয়ই বশীভূত ও মুগ্ধ হইবে।

চাকুরে লোকের পক্ষে প্রভুর ও উপরিতন বড় বাবুর কোপানলে পড়া বিরল নহে। সুতরাং চাকুরী ব্যবসায়ী মহাশয়েরা নিত্য পূর্ণাঙ্গে ও প্রভুর রাগ জানিলে রিক্তাঙ্গে যাত্রা করিয়া প্রভুর নিকট যাইয়া নিম্নোক্ত প্রকার ব্যবহার করিয়া দেখিবেন যে, প্রভু সন্তুষ্ট ও বশীভূত হইয়াছেন, আর খল ও তোমার বিদ্বেষকারী বশীভূত হইবে। শত্রুদিগের নিকট ঐরূপ রিক্তাঙ্গে যাত্রা করিলে প্রত্যক্ষ ফল পাইবেন।

ক্রোধিত প্রভু কিম্বা কুপিত যে কোন ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কর্ত্তব্য।

উপরে যেরূপ বলিয়াছি ঐ নিয়মে যাত্রা করিয়া কুপিত ব্যক্তির নিকট গমন করিবে এবং কুপিত ব্যক্তির সম্মুখে যখন উপস্থিত হইবে, তখন যদি দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস বহিতে থাকে, তবে বামদিকে ক্রোধিত ব্যক্তিকে রাখিয়া কথাবার্ত্তা কহিবে। আর যদি সে সময় বাম নাসিকায় শ্বাস বহিতে থাকে, যাহাতে দিকের দক্ষিণ পার্শ্বে

* ইহা ব্যতীত বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময় যে যে কার্য্য করা কর্ত্তব্য, তাহা পৃথক রূপে পশ্চাৎ বলিব।

ক্রোধিত ব্যক্তি থাকেন এরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া বা বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিলে ক্রোধিত ব্যক্তির ক্রোধ তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হইবে।

ঐ দুই নিয়মে কার্য্য করিলে ক্রোধিত ব্যক্তি সন্তুষ্ট ও বশীভূত হইবেন। বহু তোষামোদে ও বহু চেষ্টায় যে ফল লাভ না হয়, ঐ ক্রিয়ায় সে ফল লাভ অনায়াসে হইবে সন্দেহ নাই। মঙ্গলময় মহাদেবের আজ্ঞা মিথ্যা নয়, প্রত্যক্ষ ফল দেখিবেন।

যে সকল কার্য্যে যেরূপ ভাবে যাত্রা করিতে হইবে তাহা উপরে বলিলাম। ঐ রূপ নিয়মে যাত্রাদি করিলে সকল কার্য্যই সুসিদ্ধ হইবে, কিন্তু নিম্নলিখিত স্বরের দিকশূল বিচার করিয়া যাত্রা করিতে হইবে।

স্বরের দিকশূল।

তিষ্ঠেৎ পূর্ব্বোত্তরে চন্দ্রো ভানুঃ পশ্চিম দক্ষিণে।
দক্ষনাড়্যাঃ প্রবাহেতু ন গচ্ছেদ্দক্ষ পশ্চিমে॥
বামাচার প্রবাহেতু ন গচ্ছেৎ পূর্ব্ব উত্তরে।
পরিপন্থি ভবেত্তস্য গতোঽসৌ ন নিবর্ত্ততে॥
তস্মাদত্র ন গন্তব্যং বুধৈঃ সর্ব্বহিতৈঃ শুভৈঃ।
তদা তত্র তু সঙ্ঘাতো মৃত্যুরেব ন সংশয়॥

স্থূল তাৎপর্য্য এই যে,—ইড়ানাড়ী দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের অধিপতি। এজন্য ইড়ানাড়ীর অর্থাৎ বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন কালে দক্ষিণ অথবা পশ্চিম দিকে যাইলে শুভ হয়। উহার বিপরীত দিক দিকশূল হয়। বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময় উত্তর ও পূর্ব্ব দিক ইড়ার দিকশূল হওয়ায়, বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন কালে পূর্ব্ব কিম্বা উত্তর দিকে দিবা ও রাত্রিকালে কখনই যাইবে না। পিঙ্গলানাড়ী পূর্ব্ব ও উত্তর দিকের অধিপতি হওয়ায়, তাহার বিপরীত—পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক পিঙ্গলার দিকশূল হয়। এই কারণে পিঙ্গলা নাড়ীর অর্থাৎ দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন কালে পূর্ব্ব কিম্বা উত্তর দিকে যাওয়া কর্ত্তব্য। দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন কালে পশ্চিম কিম্বা দক্ষিণ দিকে কখনই যাইবে না। যে ব্যক্তি ইহা বিচার না করিয়া শূল লঙ্ঘন পূর্ব্বক ঐ নিষিদ্ধ দিকে গমন করে, সে বিপরীত ফল ভোগ করিয়া থাকে। এমন কি, তাহার ফিরিয়া আসাও অসম্ভব। অথবা মৃত্যুতুল্য কষ্ট পাইবে।

অতএব পাঠকগণ বাম নাসিকার শ্বাস বহন সময় দিবা রাত্রের কোন সময়ই পূর্ব্ব কিম্বা উত্তর দিকে যাইবেন না। দিবসে ও রাত্রিকালে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন সময় দক্ষিণ কি পশ্চিম দিকে যাইবেন না।

যাত্রা কালে কর্ত্তব্য।

সপ্তপাদাঃ শনি শুক্রে জ্ঞাতব্যাশ্চ বিচক্ষণৈঃ।
চন্দ্রে রবৌ পদং রুদ্রং কুজে বুধে তথৈবচ।
সার্দ্ধং সদা গুরৌ পাদং জ্ঞাতব্যঞ্চ বিচক্ষণৈঃ॥

উপরোক্ত নিয়মে বিধি নিষেধ মানিয়া যাত্রা করিবার সময় বিচক্ষণ ব্যক্তি যে কোন স্থানে যাত্রা কালে রবি, সোম, মঙ্গল, ও বুধবারে এগারো বার, বৃহস্পতি বারে অর্দ্ধবার ও শুক্র ও শনিবার সাতবার মাটিতে পদক্ষেপণ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইবেন।

হঠাৎ বা শীঘ্র
যাত্রা করিবার নিয়ম।

লোকানাং শীঘ্র গন্তব্যে কুশলায়াপনিযাতে।
পরদলে তথা গ্রামে হানিশ্চ কলহাগমে।
বহতে বহতে নাড়ী গ্রাহ্যং গতিকরং নৃণাম্।
চন্দ্রচারে চতুষ্পাদং পঞ্চ পাদশ্চ ভাস্করে॥ ●

এবন্ত গমনং শ্রেষ্ঠং সাধয়েদ্ ভুবন ত্রয়ং।
ন হানিঃ কলহোনৈব কণ্টকৈর্নাপি ভিদ্যতে।
নিবর্ত্ততে সুখেনৈব সর্ব্বাপত্তির্বিবর্জ্জিতঃ॥

যদি কোন শত্রুর সহিত বিবাদ জন্য যাইতে হয় কিম্বা হঠাৎ কোন ক্ষতির কারণ উপস্থিত হয়, অথবা যে কোন কার্য্যে কোন স্থানে যদি শীঘ্র গমন করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তখন যে নাসিকায় নিশ্বাস থাকিবে, সেই অঙ্গে সেই দিকের হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া যাত্রা করিবে এবং যাত্রা করিবার সময় যদি বাম নাসিকায় শ্বাস বহন হয়, তবে মৃত্তিকাতে চারিপদ ও দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন কালে মৃত্তিকাতে পঞ্চপদ ক্ষেপণ করিয়া যাত্রা করিলে ত্রিভুবনে কোন কার্য্যই অসিদ্ধ হইবে না। পরন্ত সর্ব্বপ্রকারে আপদ বিপদ বিহীন হইয়া ফিরিয়া আসিবে।

যখন যে নাসিকায় নিশ্বাস বহন কালে যাত্রা করিতে হইবে, তখন সমীরণ অন্তঃকরণে প্রবেশ করিলে প্রথম পদক্ষেপণ করিবে। অর্থাৎ নিশ্বাস গ্রহণ করিবার সময় প্রথম পদক্ষেপণ করিয়া যাত্রা করিবে। এ ব্যবস্থা জ্যোতিষ শাস্ত্রে আছে।

"অন্তঃ সমীরণে দেহে প্রবেশে সমুপস্থিতে।
স্বস্তীতি দক্ষিণং পাদমাসনাদব রোহয়েৎ।।"
(জ্যোতিষ বচন।)

অর্থাৎ বায়ু অন্তঃকরণে প্রবেশ করিলে স্বস্তি বলিয়া দক্ষিণ পদ ভূমিতে নামাইবে।

জ্যোতিষ মতে স্বস্তি বলিয়া দক্ষিণ পদ অগ্রে ক্ষেপণ করতঃ যাত্রা করিবার বিধি আছে। স্বরমতে সেরূপ করিতে হইবে না।

অতএব পাঠকগণ পূর্ব্বের লিখিতানুরূপ স্বরানুকূলে দক্ষিণ বা বাম পদ বাড়াইয়া যাত্রা করিবার সময় নিশ্বাস গ্রহণ কালে (শ্বাস বায়ু যখন ভিতরে প্রবেশ করে) সেই সময় প্রথম পদক্ষেপণ করিবেন।

উপরোক্ত নিয়মে যাত্রা করিবার সময় পৃথিবী কিম্বা জলতত্ত্বের উদয় কালে যাত্রা করিতে হইবে। (পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্বের উদয়, কোন্ তত্ত্বের পরিমাণ কত, তাহা গত বারে বলিয়াছি *।) লাভ ও মঙ্গলজনক এবং সম্পৎ প্রভৃতি কার্য্যের জন্ম পৃথিবী কিম্বা জলতত্ত্বের উদয় কালে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিশ্বাসের অনুকূলে পদক্ষেপণ করিয়া যাত্রা করিবে।

ভূমৌ জলে চ কর্ত্তব্যং গমনং।

পৃথ্বী ও জলতত্ত্বের উদয় কালে পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মে যাত্রা করিলে সকল কার্য্যই শুভ হইবে; কিন্তু অগ্নি, বায়ু, আকাশ তত্ত্বের সময় যাত্রা করিলে কখনই সুফল হইবে না।

উপরোক্ত নিয়মে যাত্রা করিলে নিশ্চয়ই কার্য্য সিদ্ধি হইবে। মন্দ তিথি বারাদি কিছুই বিচার করিতে হইবে না। তাহা স্বরশাস্ত্রে উক্ত আছে—

ন তিথির্নচ নক্ষত্রং বার গ্রহ দেবতা।
ন বিষ্টির্ন ব্যতিপাতো বিরুদ্ধ্যাদ্যা স্তথৈবচ।
কুযোগা নৈব দেবেশি প্রভবন্তি কদাচন।
প্রাপ্তে স্বর বলে সিদ্ধিং সর্ব্বমেব ফলং শুভম্।

স্বর অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিলে মন্দ-তিথি, বার, গ্রহদেবতা এবং বিষ্টিদোষ ও ব্যতীপাত প্রভৃতি কুযোগের প্রভাব কখন

* পঞ্চতত্ত্বের চিনিবার উপায়, তত্ত্বের আবশ্যকীয় অন্যান্য বিষয় বিস্তারিত রূপে পরে বলিব।

হয় না। পরন্তু স্বরবলে সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ ও শুভ হয়।

রাজদর্শন, প্রভুদর্শন এ চাকুরী করিবার জন্য কিম্বা লাভজনক প্রভৃতি যে কোন শুভ কার্য্যে যাত্রাদি করিতে হইলে পঞ্জিকা দেখিয়া শুভ দিন নির্ণয় করিবার রীতি আছে। তাহাতে মন্দতিথি, মন্দ-নক্ষত্র, বিষ্টিদোষ, বৈধৃতি, ব্যতীপাত, গণ্ড, ব্যাঘাতযোগ প্রভৃতি কুযোগে কোন কার্য্য করিতে নাই,—করিলেও বিঘ্ন হয়। কিন্তু একমাত্র শ্বাস প্রশ্বাস অবলম্বনে তত্ত্বানুকূলে যাত্রাদি যে কোন কার্য্য করিলে শুভ হইয়া থাকে। মন্দতিথি, বার ও কুযোগাদি কোন মন্দ করিতে পারে না।

যদিচ উপরোক্ত কিছুই বিচার করিতে হয় না এবং বিচার করিবার আবশ্যকও নাই; কিন্তু বারবেলা, কালরাত্রি বিচার করিতে হইবে। বারবেলা বিচার করিবার বিধি স্বরশাস্ত্রে নাই; কিন্তু গুরূপদেশ আছে। একারণ গুরূপদেশ মতে বলিতেছি যে, পঞ্জিকায় লিখিত প্রত্যেক বারে নির্দ্দিষ্ট বার বেলা, এবং রাত্রিকালে কালরাত্রি বিচার করিয়া যাত্রাদি শুভ কার্য্য করিতে হইবে। কারণ বারবেলা, কালবেলা ও কালরাত্রি শিবশক্তির তমোগুণ-সম্ভূত সর্ব্ব সংহারক কাল অংশ *। ইহাতে যে কোন কার্য্য করিলে মরণ প্রাপ্ত হয়।

কালবেলা ও কালরাত্রি শিবশক্তির তমোগুণ-সম্ভূত বলিলাম; তাহার গূঢ় রহস্য এখানে প্রকাশ করা অসম্ভব। পাঠকগণের অবগতির জন্য একটু আভাস দিতেছি। ভগবতী আদ্যাশক্তি জগজ্জননীর এক নাম কাল রাত্রি। মুণ্ডমালা তন্ত্রোক্ত কালী শত নামে—

"কালিকা কালরাত্রিশ্চ কুলজা কুলপণ্ডিতা।"

শ্রীশ্রীচণ্ডী—

"কাল রাত্রির্মহারাত্রির্মোহ রাত্রিশ্চ দারুণা।"

টীকা—ত্বং কালরাত্রিঃ কালো মরণং স এব রাত্রিঃ ব্রহ্মণো মরণ লক্ষণ রাত্রিঃ।

বাহুল্য ও গূহ্য বলিয়া ইহার বেশী প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

দিবাভাগে কোন্ সময়ে বারবেলা ও কালবেলা হয় এবং রাত্রিকালে কোন্ সময়ে কালরাত্রি হয়, তাহা নিত্য ব্যবহার্য্য পঞ্জিকাতে প্রত্যেক বার পৃথক পৃথক নির্দ্দিষ্ট সময় নির্দ্ধারিত লেখা আছে। সে জন্য এখানে তাহা আর বলিলাম না।

কাল বেলা, কাল রাত্রিতে যাত্রাদি কার্য্য করিলে তাহার ফল—

"যাত্রায়াং মরণং কালে বৈধব্যং পাণিপীড়নে।
ব্রতে ব্রহ্মবধঃ প্রোক্তঃ সর্ব্ব কর্ম্মসু তং ত্যজেৎ॥"

(জ্যোতিষ বচন।)

অর্থ—কালবেলাদিতে যাত্রা করিলে মৃত্যু হয়, বিবাহে কন্যা বিধবা হয়, উপনয়নে ব্রহ্ম বধের পাপ হয়। অতএব ইহা পরিত্যাগ করিয়া সকল কর্ম্ম করিবে।

স্বরশাস্ত্রানুসারে যাত্রাদি শুভ কার্য্য করিবার সময় শুভ নক্ষত্র, শুভ যোগাদিতে না করিলে কিছু মাত্র ক্ষতি হইবে না। স্বরশাস্ত্রানুসারে

---

* কাল বেলা ও কাল রাত্রির প্রকৃত অর্থ যাহা শ্রীশ্রীগুরুদেবের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি, তাহা আমাদের জ্ঞান বুদ্ধির অতীত এবং আমাদের দেশীয় জ্যোতির্বীদ্ পণ্ডিতগণের অজ্ঞাত। বাহুল্যভয়ে প্রকৃত অর্থ এখানে প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

কার্য্য স্বরের দিকশূল এবং উপরোক্ত বার-বেলাদি বিচার করিয়া তত্ত্বানুকুল শুভতত্ত্বে করিতে হইবে।

ইতাগ্রে বলিয়াছি নিশ্বাস গ্রহণ সময় কোন স্থানে যাত্রা করিবার জন্য প্রথম পদক্ষেপণ করিতে হইবে। উহা ভিন্ন নিশ্বাস গ্রহণ সময় গৃহস্থ লোকের আর একটি কার্য্য আছে। তাহা নিম্নে বলিতেছি।

শ্বাস গ্রহণ সময়ে কর্ত্তব্য।

মনুষ্যগণ নাসিকার দ্বারা অহরহ শ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিতেছেন, ইহাতো সকলেই জানেন। প্রত্যেকবার শ্বাস গ্রহণ সময়ে 'সঃ' এই বর্ণ ও শ্বাস পতন কালে 'হং' এই বর্ণ উচ্চারিত হয়, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।* 'সঃ' শক্তিরূপিণী। শক্তিরূপিণী স-কার স্থিত শ্বাস গ্রহণ সময়ে কাহাকে কিছু দান করিলে, প্রদত্ত বস্তুর পরিমাণ অপেক্ষা দানের ফল অত্যধিক গুণ হইয়া থাকে। যথা—

শ্বাসে সকারসংস্থে তু যদ্দানং দীয়তে বুধৈঃ।
তদ্দানং জীবলোকেঽস্মিন্ কোটিগুণং ভবে-
দ্ধিতৎ॥

অর্থাৎ শ্বাস গ্রহণ সময় 'স' উচ্চারিত হয়। সকার স্থিত শক্তিরূপিণী শ্বাস—নিশ্বাস গ্রহণ সময় যাহা কিছু দান করা যায়, সেই দানের ফল এই জীবলোকে কোটি কোটি গুণ অধিক হইয়া থাকে।

গৃহস্থগণের কর্ত্তব্য এই যে, মুষ্টি ভিক্ষা অথবা অর্থ, বস্ত্রাদি যাহা দান করিবেন, তাহা স্বাভাবিক শ্বাস গ্রহণ সময় দিবেন। এরূপ দান করিলে দান দ্রব্যের পরিমাণাধিক ফল লাভ হইবে।

আহার ও পরিশ্রমান্তে কর্ত্তব্য।

ভুক্ত মাত্রেচ মন্দাগ্নৌ স্ত্রীণাং বশ্যার্থ কর্ম্মণি
শয়নং সূর্য্যবাহেন কর্ত্তব্যং সর্ব্বদা বুধৈঃ॥

* * *
* * *

ভুক্ত মাত্রাদৌ বাম পার্শ্বেন, শ্রান্ত্যাদিষু দক্ষিণ পার্শ্বেন শয়নং কার্য্যমিতি তাৎপর্য্যং। আহারান্তে অগ্রে বাম পার্শ্বে শয়ন করিবে। পরিশ্রম অন্তে ও শ্রান্ত ক্লান্ত হইলে দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিবে।

পাঠকগণ নিত্য আহারান্তে বাম পার্শ্বে ও কোন পরিশ্রম অন্তে দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিবেন। রাস্তা হাঁটিয়া কিম্বা কোন কার্য্যে পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে (ডান্ কাত্ হইয়া) শয়ন করিলে ক্লান্তি দুর হইয়া শরীর কেমন সুস্থ বোধ হয়, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া সন্তুষ্ট হইবেন। পরিশ্রম নিবন্ধন শরীর ক্লিষ্ট ও ধাতু গরম (রুক্ষ) হয়, তাহারও প্রভূত উপকার হইবে।

অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয় বারান্তরে বলিব।

ক্রমশঃ।

---

* হিন্দু-পত্রিকা ১৩০৮ সাল আষাঢ় ৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

* নিত্য আহারান্তে বামপার্শ্বে শয়ন করাই উচিৎ। যাঁহাদের দিবাতে শয়ন করা অভ্যাস নাই, কিম্বা কার্য্যানুরোধে আহারান্তে বাহিরে যাইতে হয়, তাঁহাদের আহারান্তে কিছুক্ষণ উপবেশন পর কিছুক্ষণ বামপার্শ্বে শয়ন করা কর্ত্তব্য। ইহার বিশেষ উপকারিতা আছে, তাহা নাড়ী চালনায় বর্ণনায় বলিব।

প্রার্থনা।

"ন জানামি তব তত্ত্বং কীদৃশোঽসি মহেশ্বর।
যাদৃশস্ত্বং মহাদেব তাদৃশায় নমোনমঃ॥"

শ্রীউমানাথ চট্টোপাধ্যায়
যশোহর।

হিন্দু রাজা সীতারাম রায়।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

মহম্মদপুরের বর্ত্তমান অবস্থা।—

সীতারামের রাজত্ব কালে মহম্মদপুর একটী সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল। রাজধানী যেরূপ হওয়া আবশ্যক তদ্রূপই ছিল। কোন গৃহস্থের কিছুরই অভাব ছিল না। রাজবাটীর চতুঃপার্শ্বে রীতিমত প্রকাণ্ড গড়, কারাগার, বিচারালয় ইত্যাদি সমস্তই ছিল। অনেক ধনী, জ্ঞানী, বুদ্ধিমান্, বিদ্বান ও পণ্ডিতের বাস ছিল। সামাজিক শৃঙ্খলাও অত্যুৎকৃষ্ট ছিল। অদ্যাপি মহম্মদপুর-সমাজ "রাজ সমাজ" বলিয়া অভিহিত হয়। বর্ত্তমানে মহম্মদপুর এতদূর শোচনীয়-দশায় পরিণত হইয়াছে যে, সহসা কোন আগন্তুক জনপদাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, ইহার পূর্ব্বোন্নতি কিছুই অনুভব করিতে পারেন না। লোক সংখ্যা ও বসতি অতি অল্প, অধিকাংশ স্থান জঙ্গলে আবৃত; ব্যাঘ্র, শূকর ইত্যাদি বন্য জন্তুর আবাস স্থান। উদারচেতা, পরোপকারী, স্বদেশ বৎসল, স্বধর্ম্মানুরাগী ও ধনবান্ লোকের অভাব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক্ষণেও মধ বিত্ত অবস্থার অনেক ভদ্রলোক আছেন। কিন্তু সাধারণের উপকার, স্বদেশের উন্নতি কিংবা কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানে কাহারও সহানুভূতি নাই। সে সমস্ত বিষয়ে সকলেই নিশ্চেষ্ট। সকলেই নিজের স্বার্থ সাধনে তৎপর। অন্য কোন বিষয়ে কাহারও দৃষ্টি নাই। নিম্নে একটী বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করা হইতেছে, তাহাতে স্থানীয়-লোকের অবস্থা সহজে বুঝিতে পারা যাইবে।

মহম্মদপুরের সুবৃহৎ দীর্ঘিকা রামসাগর পুণ্যাত্মা সীতারামের পরোপকারিতা, স্বদেশ বৎসলতা ও মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে। অধুনা রামসাগরই তৎপার্শ্ববর্ত্তী লোকের জীবন স্বরূপ; এই দীঘির জলই জীবন রক্ষার একমাত্র উপায়, অথচ ইহার জল যাহাতে পরিষ্কৃত থাকে এবং জলাশয়টী দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, সে বিষয়ে কাহারও দৃষ্টি নাই। জলও অপেক্ষাকৃত অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে। এক্ষণ কৃষ্ণসাগরের গভীরতা ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী, জল ও উৎকৃষ্ট। রামসাগরের উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ তীরের উপরই বেশ্যা বুনা ইত্যাদি নিম্নতম শ্রেণীর লোকের বাস। পশ্চিম তীরের উপর বসতি নাই, ভয়ানক জঙ্গল পরিপূর্ণ। উল্লিখিত ইতর শ্রেণীর লোকেরা সর্ব্বদা রামসাগরে মল মূত্র ত্যাগ এবং অপবিত্র ও অপরিষ্কৃত বস্ত্রাদি ধৌত করিতেছে। স্থানীয়-লোকে গরু, ঘোড়া ইত্যাদি স্নান করায়। রজকেরা এই দীঘিতে রীতিমত কাপড় কাচিয়া ধৌত করে। জনপদের প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থই

৺কার্ত্তিক পূজা করেন, সেই সকল কার্ত্তিক-মূর্ত্তি রামসাগরে বিসর্জ্জন দিবার প্রথা আছে, তাহাতে প্রতি বৎসর অন্যূন চারি পাঁচ শত মণ মৃত্তিকা দীঘিতে পড়িতেছে। এতদ্ব্যতীত অন্য প্রতিমাদি ইহাতে বিসর্জ্জনা দেওয়া হয় না। বৎসরান্তে ৺দশহরা স্নানের দিন বহুসংখ্যক লোকে গঙ্গা স্নান কামনায়, এই রামসাগরে স্নান করে। ইহার উত্তর তীরের উপর ৺গঙ্গা-দেবীর মৃণ্ময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া পূজা করা হয়। যে সমস্ত লোকে রামসাগরে ৺দশহরা স্নান করিতে আইসে, তাহারা প্রত্যেকেই কিছু কিছু লবণ চিনি ও নারিকেল ৺গঙ্গাদেবীর উদ্দেশ্যে রামসাগরে ফেলিয়া দেয়, তাহাতেও প্রতি বৎসর অনেক লবণ ইহার মধ্যে পতিত হয় ও জল অধিকতর লবণাক্ত হয়। এই দীঘির উত্তর তীর ব্যতীত অন্য তিন ধারেই অল্পাধিক জঙ্গল, সেই জঙ্গলের পত্রাদি পঁচিয়া জল আরও অস্বাস্থ্যকর হয়। বস্তুতঃ পার্শ্ববর্ত্তী লোকে ইহাকে স্রোতস্বতী নদীর ন্যায় বিবেচনা করিয়াই যেন এইরূপ অত্যাচারাদি করে, তাহারা মনে করে যে, এই রামসাগরের জল কস্মিন্‌কালেও শুষ্ক হইবে না, তাহারা পুত্র পৌত্রাদিক্রমে এই দীঘিতে এইরূপ সুখে স্বচ্ছন্দেস্নানাদি করিবে। নানাকারণে এই দীর্ঘিকার দীর্ঘস্থায়িত্ব ও পরিষ্কৃত-জলের আশা খুব কম। স্থানীয়-ভদ্রলোকে একত্র হইয়া একটু চেষ্টা করিলেই অনায়াসে উল্লিখিত অত্যাচারাদি নিবারণ পূর্ব্বক স্বদেশ, নিজ পরিবার বর্গ ও প্রতিবেশী সকলের মহোপকার সাধন ও মহাত্মা-সীতারামের একটী কীর্ত্তি দীর্ঘকাল স্থায়ী করিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই সমস্ত বিষয়ে কাহারও মন আকৃষ্ট হয় না। সেবাইত মহারাজা নাটোরাধিপতিরও তত মনোযোগ নাই, রাজ সরকার হইতে কয়েকবার এইরূপ অত্যাচার করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল, কিন্তু কেহই সে আদেশ প্রতিপালন করেন নাহি। এইরূপ অনেক ঘটনাই আছে, সাধারণের অবগতির জন্য একটী মাত্র লিখিত হইল। বাহুল্য ভয়ে বেশী লিখিতে সাহসী হইলাম না। মহম্মদপুর অধুনা ম্যালিরিয়া পরিপূর্ণ বড়ই অস্বাস্থ্যকর, জনপদবাসী প্রত্যেকের আকৃতি দেখিলেই সহজে অনুমিত হয় যে, তাহারা কোন না কোন ব্যাধিগ্রস্ত। যাহাদের কোন ব্যাধি নাই, তাহাদের শরীরে ও উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হয় না। বস্তুতঃ সবল সুস্থকায় সুপুরুষ প্রায় নয়ন—পথে পতিত হয় না। রীতিমত চিকিৎসকাদিরও অভাব। মহম্মদপুরের জল বায়ু এতদূর খারাপ হইয়াছে যে, কেন বিদেশী সুস্থকায় ব্যক্তি কিছু দিন এখানে বাস করিলেই তাহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। একটু বিশেষ অনুধাবনা করিয়া দেখিলেই ইহার পূর্ব্ব গৌরব ও উন্নতির চিহ্ন সহজেই দৃষ্ট হয়।

১২৪৪ সালে মহম্মদপুরে মহামারী আরম্ভ হওয়ায়, জনপদটী একেবারে লোক শূন্য হয়। পূর্ব্বে যে বহুসংখ্যক লোকের বাস ছিল, তাহা জনপদ দর্শনেই সহজে বোধ গম্য হয়।

সীতারামের রাজ্য নাটোরের হস্তে গত হইলেও মহম্মদপুরের অবনতি ঘটিয়া ছিল না। নাটোরের সদর কাছারী মহম্মদপুরে

ছিল। মহম্মদপুর রাজধানীর ন্যায় উন্নত অবস্থাই ছিল, পরে নাটোরের জমিদারী বিক্রীত হইলেও মহম্মদপুরে নড়াইল, দীঘাপতিয়া, নাটোর, সাতুইর পরগণা ও নলদী পরগণার স্বতন্ত্র রীতিমত কাছারী আদি থাকায় একেবারে অবনতি হইয়া ছিল না। অবশেষে নড়াইল, দীঘাপতিয়া ও নলদী পরগণার কাছারী গুলি স্থানান্তরিত হয়, নানাকারণে এক্ষণ পূর্ব্ব গৌরব-রবি একেবারেই অস্তমিত হইয়াছে, আর উদিত হইবার আশা নহি।

সীতারাম-প্রতিষ্ঠিত কানাইনগরে ৺হরেকৃষ্ণ রায়ের মন্দিরকে পঞ্চ রত্ন বলে। এই মন্দিরটী খিলান করা; মন্দিরের উপরে চারি কোণে চারিটী ও মধ্য স্থলে একটী, মোট ৫ পাঁচটী চূড়া ছিল, এক্ষণে মধ্যের ও পশ্চিম দক্ষিণ ও পশ্চিম উত্তর কোণের ৩টী চূড়া আছে, অবশিষ্ট দুইটী ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। মন্দিরের উপর বৃক্ষাদি জন্মিয়াছে। মন্দিরটী দেখিতে অতি মনোহর, শিল্প নৈপুণ্য ও যথেষ্ট আছে। ৺হরেকৃষ্ণ রায়ের নিষ্কর সম্পত্তি অন্যান্য বিগ্রহ অপেক্ষা বেশী। প্রকাণ্ড বাড়ী ও প্রাঙ্গণ ছিল। চতুর্দ্দিকে ইষ্টকনির্ম্মিত পাকা যোড় বাঙ্গলা ও প্রাচীর ছিল, এক্ষণে সমস্ত ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। মন্দিরটীর ও ভগ্ন দশা; মন্দিরটী দেখিলেই মনে এক অনির্ব্বচনীয় ও অভূতপূর্ব্ব আনন্দ, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা ও বিষাদ একত্র এক সময়ে অনুভূত হয়। সীতারামের মন্দির ইত্যাদি দর্শনেই সহজে অনুমান করা যায় যে, তখন দেশীয় শিল্প কার্য্যের অপেক্ষাকৃত অধিক উন্নতি ছিল।

কানাইনগরে ৺হরেকৃষ্ণ রায়ের বাটীর নিকট হইতেই মহম্মদপুরের বর্ত্তমান বাজার পর্য্যন্ত একটী সুদীর্ঘ গড় দৃষ্ট হয়। এই গড়টী অত্যন্ত গভীর, সর্ব্বদাই ইহাতে বেশী পরিমাণে জল থাকে। অনেক লোকের এই গড়ের জলে উপকার হইতেছে। অনেকে বলেন যে, এই গড় নাটোরের দয়াময়ী ৺রাণী ভবানীকৃত। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, রাণী ভবানীর এতাদৃশ সুদীর্ঘ প্রকাণ্ড গড় খননের কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। তিনি লোকের উপকারার্থে বৃহৎ দীঘি পুষ্করিণী আদি খনন করাইয়া দিতে পারেন। কিন্তু এরূপ সুদীর্ঘ গড় খননের আবশ্যকতা দেখা যায় না। তাহারা বলেন যে, এই গড়টীও সীতারামের কৃত। সীতারামের বাটীর চতুঃপার্শ্বে আর একটী গড় আছে, তাহাতে সর্ব্বদা জল থাকে না, এইটীই যে সীতারামকৃত তাহাতে আর মতদ্বৈধ নাই। কানাইনগর সীতারামের রাজধানীর অন্তর্গত। শ্রুতি পরম্পরায় অবগত হওয়ায় যে, সীতারামের সময় রথ যাত্রার দিন রথ মহম্মদপুর হইতে এই গড়ের উপর দিয়া কানাইনগর পর্য্যন্ত টানিয়া লওয়া হইত, পরে নাটোর হইতেও সেইরূপ বন্দোবস্ত ছিল, এক্ষণে ততদূর পর্য্যন্ত রথ টানিয়া লওয়া হয় না। গড়ের ধারও জঙ্গলময় হইয়া রহিয়াছে। ৺রাণী ভবানীকৃত দুইটী দেব-বিগ্রহ মহম্মদপুরে ও কানাইনগরে স্থাপিত আছে। তিনি দয়াময়ী দ্বিতীয়া অন্নপূর্ণা বলিয়া বিখ্যাতা, সুতরাং তৎকর্ত্তৃক এই গড় খনিত হয়, ইহা সহজে বিশ্বাস যোগ্য হইতে পারে। সম্ভবতঃ সীতারাম এই গড় খনন করান।

এইরূপ বহুদূর ব্যাপী গড় ৺রাণী ভবানীর কাটিবার কোন কারণ দেখা যায় না, সীতরামের গড় কাটিবার অনেক কারণ ছিল। ১ম—গড় খনন করাইয়া জনপদ উচ্চ করা। ২য়—শত্রু পক্ষ হইতে সহসা আক্রমণ নিবারণ, ৩য়—লোকের উপকার, ৪র্থ—তিনি বিলাসী ছিলেন, কানাইনগর পর্য্যন্ত নৌকারোহণে জল বিহার করিতেন ইত্যাদি অনেক যুক্তি মূলক কারণ দেখা যায়। স্থানীয় অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস যে, এই গড় ৺রাণী ভবানী কৃত; স্থানীয় অল্প সংখ্যক ও কিছু দূরবর্ত্তী অধিকাংশ লোকের ধারণা যে, সীতারাম কৃত। মদীয় প্রথম প্রস্তাবে যে রাণী ভবানী-কৃত একটী গড় মহম্মদপুরে আছে লিখিত হইয়াছে, সে এই গড়। তাহার বিশেষ বিবরণ দেওয়া গেল।

সীতারামের রাজবাটীতে অদ্যাপি ৺দুর্গোৎসব পূজাদি রীতিমত হইয়া থাকে। রাজবাটীর দুর্গোৎসবের প্রতিমাতে দেবমাহাত্ম্য আছে শ্রুত হয়, কারণ ঐরূপ মনোহারিণী মূর্ত্তি অন্য কোথায়ও দৃষ্ট হয় না এরূপ প্রকাশ। যাহারা রাজবাটীর প্রতিমা প্রস্তুত করে, তাহারাই বলে যে, অন্যত্র অনেক স্থানে তাহারা অপেক্ষাকৃত বেশী যত্ন ও মনোযোগ সহকারে প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া থাকে, কিন্তু এরূপ মনোহারিণী মূর্ত্তি কোথায়ও হয় না। স্থানীয় আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই একবাক্যে এইরূপ বলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রতিমূর্ত্তি অতিশয় মনোমুগ্ধকারিণী হইয়া থাকে। প্রতিমাতে ডাকেরসাজ ইত্যাদি দেওয়া হয় না। মুকুট মালা ইত্যাদি সমস্ত আভারণই মৃণ্ময়ী প্রতিমূর্ত্তিতে অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে আরও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায়। শিল্প মহিমাও যথেষ্ট এবং বিশেষ প্রশংসনীয়। সীতারামের সময় হইতেই এই নিয়ম প্রচলিত আছে। রাজবাড়ীর প্রতিমা দর্শন করিয়া সেই প্রতিমা প্রস্তুতকারীদিগের দ্বারা মহম্মদপুরের শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয় তাঁহার নিজের বাটীর দুর্গোৎসবের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া থাকেন। কিন্তু উক্ত মূর্ত্তি রাজবাড়ীর ন্যায় মনোহারিণী ও ভক্তি প্রদায়িনী হয় না, এইটী চাক্ষুষ-প্রমাণ। আরও শুনা যায় যে, এই প্রতিমা প্রস্তুতকারীর বংশ থাকে না, তবে অর্থলোভে দূর দেশের লোকে আসিয়া প্রস্তুত করে। সীতারাম-প্রতিষ্ঠিত-বিগ্রহগুলির পূজক ব্রাহ্মণ, চাকর খানসামা ইত্যাদির বংশ থাকে না। অনেকে অনুমান করেন যে, তাহারা অপবিত্র অবস্থায় পুষ্পচয়ন ও সেবার কার্য্যাদি করে বলিয়া তাহাদের বংশ লোপ পায়। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা অপবিত্র অবস্থায় থাকে, দেব সেবার কার্য্য ভক্তি সহকারে করে না। অনেক বিষয়ে অবহেলা করে।

সীতারামের চরিত্রে কেহ কেহ দোষারোপ করেন এবং বলেন যে, তিনি অত্যন্ত বিলাসী, কামুক ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। ইহা তাঁহাদের মনের ভ্রম মাত্র। জ্ঞানী, বুদ্ধিমান্ ও প্রাচীন ব্যক্তি কেহ এরূপ বলেন না। অতি অল্প লোকে এরূপ প্রকাশ করেন। যখন কোন ইতিহাস বা জীবন চরিত নাই, শ্রুতি পরম্পরায় জ্ঞাত হইয়া লিখিতে হইতেছে, তখন লেখা কর্ত্তব্য বলিয়া বাধ্য হইয়া লিখিতে হইতেছে, নচেৎ মহৎ চরিত্রে এরূপ দোষারোপ করা নিতান্ত অবৈধ। কলঙ্ক

তাঁহার চরিত্রে কোন দোষ ছিল না থাকাও সম্ভব পর নহে। ধর্ম্মই যে একমাত্র সুহৃৎ, তাহা তিনি বিশেষরূপে জানিতেন। একমাত্র ধর্ম্ম-বলেই তিনি এতদূর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তিনি বিলাসী ছিলেন বটে, কিন্তু কখনও কোন স্ত্রী লোকের সতীত্ব নাশ বা তদ্রূপ কোন ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্য করিয়াছেন, এরূপ শ্রুতি গোচর হয় না। জনপদস্থ প্রায় সমস্ত লোকেই তাঁহাকে পুণ্যাত্মা, নির্ম্মল চরিত্র, পবিত্রচেতা, কীর্ত্তিমান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া বর্ণনা করেন। সুখসাগর ইত্যাদি বিলাসিতার চিহ্ন দেখিয়া কেহ কেহ মূল বৃত্তান্ত না জানিয়া এতাদৃশ মহাত্মার চরিত্রে কলঙ্কারোপ করেন। বিশেষতঃ তাঁহার রাজত্ব সময়ে নবাব জামাতা আবুতারা সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া আসিয়া প্রজার উপর নানা পাশব-অত্যাচার করেন। তিনি গর্ভিণী স্ত্রীলোকের গর্ভ বিদীর্ণ করিয়া দেখিতেন, অল্প বয়স্ক বালক বালিকাদিগকে জলে ফেলিয়া আমোদ প্রাপ্ত হইতেন। সীতারাম এইরূপ অত্যাচার শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া আনিতে আদেশ দেন, তদনুসারে তাহার মস্তক কাটিয়া সীতারামের সমীপে আনয়ন করা হয়। নিতান্ত সরলমতি তত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভ্রান্তি বশতঃ সেই দোষ সীতারামে অর্পণ করিতে পারেন। অথবা বাঙ্গালী অনুকরণ প্রিয় এবং কোন ব্যক্তি বিশেষে যে সমস্ত দোষ গুণ ইত্যাদি দেখে বা শুনে, তাহার সত্যাসত্য না জানিয়া বা মূল কারণ না বুঝিয়া সেই শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে সেইরূপ মনে করে। বর্ত্তমানে দেখা যায় যে, বাঙ্গালী জমিদার ইত্যাদি ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ প্রায়শঃই অত্যন্ত বিলাসিতার প্রিয় ও কামুক হয়েন। সর্ব্বদা ইন্দ্রিয় চরিতার্থের জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকেন। জিতেন্দ্রিয় জমিদার ইত্যাদির সংখ্যা অত্যন্ত বিরল। এজন্য কেহ কেহ মূল তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া মনে করেন যে, সীতারাম স্বাধীন রাজা ও অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন, সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া সর্ব্বদা কলুষিত-কার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন, তদনুসারে তাঁহারা সেইরূপ স্বকপোল কল্পিত গল্পাদি অতি রঞ্জিত করিয়া উপন্যাসের ন্যায় বর্ণনা করেন। তাঁহারা একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই সহজে বুঝিতে পারেন যে, এত অল্প কালের মধ্যে যে মহাত্মা নিজে স্বাধীন ভাবে সর্ব্বদা রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া এরূপ চিরকীর্ত্তি স্থাপনা ও অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার চরিত্রে কোন দোষ থাকা নিতান্ত অসম্ভব। তিনি একমাত্র ধর্ম্ম-বলেই এক সময়ে নবাবের সিংহাসন পর্য্যন্ত বিকম্পিত করিয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার চরিত্র অতি নির্ম্মল ছিল। তাঁহার বিবাহিতা তিনটী স্ত্রী ছিলেন। তিনি ন্যায় ও ধর্ম্ম পথে থাকিয়া বিলাসিতা উপভোগ করিতেন, কদাচ কর্ত্তব্য কার্য্যের অবহেলা বা ধর্ম্মের অবমাননা করেন নাই।

সীতারামের রাজ্য দক্ষিণে যশোহরের বঙ্গীয় বীরচূড়ামণি মহারাজাধিরাজ ৺প্রতাপাদিত্যের বংশধরের রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, অন্যদিকে কোন পর্য্যন্ত ছিল তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় না। তিনি চতুশ্চত্বারিংশৎ পরগণার রাজা ছিলেন এরূপ প্রকাশ।

সীতারামের আত্মহত্যা বা শেষ জীবনী

সম্বন্ধে আরও একটী প্রবাদ আছে যে, তিনি শেষ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া সন্ধির বাসনায় দুইটি শিক্ষিত পারাবত লইয়া মুরসিদাবাদে নবাব সমীপে গমন করেন। যাত্রা কালে বাটীতে প্রকাশ করিয়া যান যে, যদি সন্ধি হয় এবং রাজ্য রক্ষার উপায় করিতে পারেন, তবে পুনর্ব্বার রাজধানীতে আগমন করিবেন, নচেৎ পারাবত দুইটী মুক্ত করিয়া তিনি তথায় আত্মহত্যা করিবেন। যবনের অধীনতা কিছুতেই স্বীকার করিবেন না। তিনি নবাব গোচরে সন্ধির প্রস্তাব করেন এবং মণিরাম রায় নামক এক ব্যক্তিকে তাঁহার উকীল নিযুক্ত করেন। সন্ধির প্রস্তাবে নবাব প্রথমতঃ অসম্মত হন এবং সীতারামকে কিছু কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করেন। সীতারাম তাহাতে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া আর নবাব সম্মুখে না যাইয়া নিজের বাসা বাটীতে থাকেন। মণিরাম রায় অনেক তর্ক বিতর্কের দ্বারা নবাবের তৃপ্তি সম্পাদন পূর্ব্বক সীতারামের রাজ্যের বন্দোবস্তের আদেশ বাহির করেন। এদিকে রঘুনন্দন সীতারামকে বলেন যে "নবাব সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত নহেন, আগামী কল্য তোমাকে কুকুর দিয়া খাওয়াইবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন"। তচ্ছ্রবণে সীতারাম অনন্যোপায় হইয়া পায়রা দুইটী উড়াইয়া দিয়া নিজ হস্তের অঙ্গুলীতে যে বিষাক্ত-অঙ্গুরীয়ক ছিল, তাহাই চুষিয়া নিজের জীবন নিজেই নাশ করেন। আরও শুনা যায় যে, সীতারাম মুরসিদাবাদে গেলে রঘুনন্দন তাঁহাকে বলেন যে, দুই লক্ষ টাকা উৎকোচ দিলে তিনি নবাবের সহিত সন্ধি করাইয়া দিতে পারেন। তদনুসারে সীতারাম তদীয়াগজ লক্ষ্মীনারায়ণকে উক্ত টাকা লইয়া মুরসিদাবাদে যাইতে লিখেন। যখন লক্ষ্মীনারায়ণ টাকা লইয়া মুরসিদাবাদে উপস্থিত হয়েন, তখন সীতারাম আত্মহত্যা করিয়াছেন। রঘুনন্দন তাঁহার নিকট হইতে সমস্ত টাকা লইয়া বলিলেন যে, নবাব সীতারামকে হত্যা করিয়াছেন, তোমাদের সপরিবারে নবাব বধ করিবেন"। লক্ষ্মীনারায়ণও তাহা শুনিয়া তথায় আত্মহত্যা করেন। এদিকে সীতারামের পায়রা দুইটী রাজধানীতে উড়িয়া আসে এবং রঘুনন্দন লোক পাঠাইয়া মহম্মদপুরে ঘোষণা করিয়া দেন যে, নবাব সীতারাম ও তাঁহার ভ্রাতাকে হত্যা করিয়াছেন, সীতারামের স্ত্রী পুত্র সকলকেই তিনি মুরসিদাবাদে লইয়া বধ করিবেন। পায়রা দুইটী উড়িয়া আসায় এবং রঘুনন্দনের ঘোষণায় নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া সীতারামের স্ত্রী পুত্র বীর রমণী ও বীর পুত্রের ন্যায় যবনের হস্তে জীবন নাশ ভয়ে নৌকারোহণে জল মগ্ন হইয়া আত্মঘাতী হন। কেবল সীতারামের কনিষ্ঠ পুত্র শূব নারায়ণ জীবিত ছিলেন। তিনি শেষে শ্যামগঞ্জের বাড়ীতে বাস করিতেন। সীতারামের আত্মহত্যা সম্বন্ধে এই জনরব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না, অমূলক বলিয়াই ধারণা হয়। জ্ঞানী ও প্রাচীন লোকের যাহা ধারণা, তাহা প্রথম প্রস্তাবেই লিখিত হইয়াছে। উল্লিখিত প্রবাদও যে নিতান্ত অজ্ঞান ব্যক্তিরা বলেন তাহাও নহে, তবে প্রথম প্রস্তাবে লিখিত যে তিনি বন্দী হইয়া নবাব গোচরে নীত হন, তথায় বিচার কালে নবাবের কর্কশ বাক্য শুনিয়া নিজ অঙ্গুলীয় বিষাক্ত-অঙ্গুরীয়ক চুষিয়া

আত্মহত্যা করেন তাহাই যুক্তি যুক্ত বিবেচিত হয়। যখন শ্রুতি পরম্পরায় অবগত হইয়া লিখিত হইতেছে, তখন সমস্ত প্রবাদগুলি লেখাই কর্ত্তব্য। মোটের উপর তিনি মুরশিদাবাদেই আত্মহত্যা করেন তাহা নিশ্চিত।

সীতারামের উকীল মণিরাম রায় সীতারামের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন কিন্তু বৃথা হইল। মণিরাম রায় বঙ্গজ কায়স্থ। তাঁহার নিবাস মহম্মদপুরের নিকট সূর্য্যকুণ্ড গ্রামে। তিনি প্রথমে সীতারামের সভাসদ থাকেন, পরে মুরসিদাবাদে গিয়া নবাব দরবারে ওকালতী করেন। তিনি অনেক ভূসম্পত্তি করিয়া যান এবং তাঁহার বাটীতে কয়েকটী দেববিগ্রহ স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বংশে এক্ষণে জগদ্বন্ধু রায় নামক একটী নাবালক পুত্র আছেন। দেব সেবা অদ্যাপি চলিতেছে সম্পত্তি অনেক হস্তান্তরিত হইয়াছে এক্ষণেও ৭০০।৮০০৲ শত টাকার আয়ের সম্পত্তি আছে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, সীতারাম সম্বন্ধে যেরূপ শ্রুত হওয়া যায়, সে সমস্তই লিখিত হইল। সত্যাসত্য কিছুই অবগত হওয়া যায় না। সীতারামের বিবরণ উপন্যাসের ন্যায় হইয়াছে। জ্ঞানী, প্রাচীন ও অধিকাংশের কথানুসারে যাহা সত্য বলিয়া প্রতীতি জন্মে, তাহাই বিশ্বাস যোগ্য। যাহা অমূলক বলিয়া ধারণা হয়, তাহাও লিখিয়া দেওয়া হইল। সীতারাম সম্বন্ধে আর কোন জনশ্রুতি শুনিতে পাওয়া যায় না। যতদূর অবগত হইতে পারা যায় তাহা বর্ণিত হইল। সম্ভবতঃ আর কোন বিষয় জ্ঞাত হওয়া সুসাধ্য

সীতারামের পূর্ব্ব নিবাস রাঢ় দেশে গিধনা গ্রামে ছিল। ১ম প্রস্তাবে গিধোন গ্রাম লিখিত হইয়াছে, গিধোন স্থানে গিধ্‌না হইবে গিধ্‌নার এক্ষণ অন্য নাম প্রচলিত। বর্ত্তমান্ জেলা মুরসিদাবাদের অন্তর্গত কল্যাণগঞ্জ থানার অধীন গিধ্‌না গ্রাম ছিল। তাঁহার পিতা উদয় নারায়ণ নবাব-সরকার হইতে চাকলা ভূষণার কার্য্যকারক হইয়া আসিয়া ভূষণায় বাস করেন। সীতারামের উর্দ্ধতন ৪।৫ চারি পাঁচ পুরুষ দিল্লীর সম্রাট ও মুরসিদাবাদের নবাব সরকারে কার্য্য করিতেন, তাহাতে নবাব সরকারে তাঁহাদের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। সীতারামের পূর্ব্ব পুরুষ নবাব সরকার হইতেই খাস বিশ্বাস উপাধি প্রাপ্ত হন। সীতারামের মূল উপাধি দাস ছিল।

সীতারামের তিন বিবাহ। তিনি জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত ভূষণার নিকট হরিদপুর গ্রামে প্রথমে বিবাহ করেন, পরে জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত অগ্রদ্বীপের নিকট পাটুলীতে বিবাহ করেন। তৃতীয় বারে অর্থাৎ সর্ব্ব শেষে তিনি জেলা বীরভূমের অন্তর্গত দাস পলশা গ্রামে বিবাহ করেন। তাঁহাদের নাম ইত্যাদি অবগত হওয়া যায় না। সীতারাম উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ সমাজের মধ্যে বংশে তত সম্ভ্রান্ত ছিলেন না। শেষে নিজে উত্তর রাঢ়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য মুখ্য কুলীনের মেয়ে বিবাহ করেন, ক্রমশঃ নিজে সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁহার প্রথম বিবাহের স্ত্রীর গর্ভে কনিষ্ঠ পুত্র শূরনারায়ণের জন্ম হয়। দ্বিতীয় স্ত্রীর কোন সন্তানাদি জন্মে না। তৃতীয়া স্ত্রীর গর্ভে জ্যেষ্ঠপুত্র

শ্যামসুন্দর জন্ম গ্রহণ করেন। সীতারামের প্রপৌত্র ৺রাধাকান্ত রায় হইতেই তাঁহার বংশ লোপ পায়।

সীতারামের পূর্ব্বপুরুষগণ শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন, সীতারাম বিষ্ণু-মন্ত্র গ্রহণ করেন। সীতারামের রাজত্ব কালে বর্গীর ভয়ে ভীত হইয়া রাঢ়দেশ হইতে অনেক লোক আসিয়া সীতারামের রাজ্যে বাস করিতেন। বর্ত্তমান মুরসিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ভরতপুর থানার অধীন টেঁয়া গ্রামের ঠাকুর বংশের পূর্ব্বপুরুষ ৺কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর মহাশয় বর্গীর ভয়ে ভীত হইয়া মহম্মদপুর নগরে আসেন। সীতারাম তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি পূর্ব্বক আশ্রয় দান করেন। তিনি কায়স্থের দান গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক, সুতরাং সীতারামের দান তিনি গ্রহণ করিবেন না, এই বিবেচনায় মহাত্মা সীতারাম মহম্মদপুরের অনতিদূরে যশপুর গ্রামের কতক অংশ বার্ষিক সামান্য কর ধার্য্য করিয়া তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাকে তথায় বাস করান। অদ্যাপি সেই সম্পত্তি কৃষ্ণপ্রসাদের বংশধরগণের অধীনে আছে। কৃষ্ণপ্রসাদ খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন; জ্যোতিষ ইত্যাদি বহুবিধ শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। সীতারাম অনেক সময়ে তাঁহার নিকট উপদেশাদি গ্রহণ এবং শাস্ত্র-ব্যাখ্যাদি শ্রবণ করিতেন।

প্রবাদ আছে যে, একদা সীতারাম ৺কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি কি পুণ্য-বলে রাজত্ব লাভ করিয়াছেন, তদুত্তরে কৃষ্ণপ্রসাদ কিছু বিলম্বে বলিতে পারি, এইরূপ বলেন এবং তান্ত্রিক মতানুসারে একটী অবিবাহিতা ব্রাহ্মণ-কুমারীকে আনাইয়া রীতিমত পূজা ইত্যাদি করণানন্তর উক্ত ব্রাহ্মণকুমারী হস্তে খড়ি দিয়া লিখিতে বলেন। প্রশ্নের উত্তর হইল যে, সীতারাম পূর্ব্ব জন্মের জলদান-পুণ্যবলে এ জীবনে রাজত্ব লাভ করিয়াছেন। পরে প্রশ্ন করিলেন যে, কতদিন রাজত্ব স্থায়ী হইবে, তাহার উত্তর লিখিত হইল যে, চতুর্দ্দশ বৎসর রাজত্ব স্থায়ী হইবে। সম্ভবতঃ এই জন্যই সীতারাম তাঁহার রাজ্য মধ্যে বহুসংখ্যক জলাশয় খনন করিয়া গিয়াছেন। যাহাহউক, সীতারাম ৺কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর মহাশয়ের গুণগ্রাম সন্দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তাঁহার পারলৌকিক-মঙ্গল বিধানের উপদেশ দিতে অনুরোধ করেন। সীতারাম তখন অদীক্ষিত ছিলেন। কৃষ্ণপ্রসাদ তাঁহাকে দীক্ষিত হইতে উপদেশ দেন। সীতারাম কৃষ্ণপ্রসাদের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কৃষ্ণপ্রসাদ কায়স্থ প্রভৃতি জাতিকে মন্ত্রদান এবং তাঁহাদের দান গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হয়েন। সীতারাম তাঁহাকে অনেক অনুরোধ করেন, কৃষ্ণপ্রসাদ কিছুতেই স্বীকৃত না হওয়ায়, অবশেষে তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিতে আদেশ দেন। তদনুসারে কৃষ্ণপ্রসাদ সর্ব্বদা প্রহরীর দ্বারা রক্ষিত হইতেন, তাঁহাকে স্থানান্তরে যাইতে দেওয়া হইত না, কিন্তু কোনরূপ কষ্ট দিতেন না। অবশেষে ৺কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর বাধ্য হইয়া সীতারামকে বিষ্ণু-মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। সীতারামের মন্ত্রগ্রহণের পরে কৃষ্ণপ্রসাদ

তাঁহাকে বলেন যে "তুমি আমাকে যে কষ্ট দিয়াছ, এজন্য জীবনের শেষভাগে তোমাকে কষ্ট পাইতে হইবে; তচ্ছ্রবণে সীতারাম তাঁহাকে ভক্তি সহকারে বলেন যে "আমাকে আর অভিসম্পাত করিবেন না, এক্ষণ যাহাতে আমার পরকালে মঙ্গল হয়, সেইরূপ উপদেশ দেন"। কৃষ্ণপ্রসাদ তাঁহাকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করিতে আদেশ করেন। তাঁহারই উপদেশ অনুসারে সীতারাম কানাইনগরে ৺হরেকৃষ্ণ রায়ের (পানীরাধাকৃষ্ণের) মন্দির স্থাপনাপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত মন্দিরে যে সংস্কৃত কবিতাটী প্রস্তরে অঙ্কিত ছিল, তাহা প্রথম প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে। উক্ত শ্লোকে "কৃষ্ণতোষ ভিলাষ" শব্দটী দ্ব্যর্থবোধক। তদীয় গুরুদেব কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর মহাশয়ের সন্তোষ অভিলাষী হইয়াই তিনি এই মন্দির উৎসর্গ করেন। ৺হরেকৃষ্ণ রায়ের মন্দির প্রাঙ্গণ ইত্যাদি সীতারাম-প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য মন্দির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও মনোহর। ৺হরেকৃষ্ণ রায়ের নিষ্কর সম্পত্তিও বেশী। সীতারামের রাজত্বের শেষ অংশে কৃষ্ণপ্রসাদ টেঁয়ায় গমন করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণজীবনের বংশধর মহম্মদপুর থানার অধীন ঘুল্লিয়া গ্রামে সীতারামের আশ্রয়ে বাস করেন। সেই বংশধরগণই ঘুল্লিয়ার গোস্বামী বলিয়া খ্যাত।

শ্রীবরদাকান্ত দেব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষাষ্টক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

[২য় শ্লোকের আলোচনা।]

নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তবকৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

(অনুবাদ।)

আপনার বহু নাম করি বিস্তারিত।
নিজ সর্ব্বশক্তি তায় করিলা অর্পিত॥
সেই নাম-সকলের স্মরণ কারণ।
না করিলা কোনরূপ কাল-নির্দ্ধারণ॥
ভগবন্! এত কৃপা তব, কিন্তু হায়!
আমারো দুর্দ্দৈব এত, রতি নাহি তায়॥

"নাম্নামকারি বহুধা"—ভগবান আপনার বহুনাম বহু প্রকারে প্রকাশ করিয়াছেন। বহুভাবে, বহু অর্থে, বহুদেশে, বহু ভাষায় তাঁহার বহু বহু নাম বিস্তারিত, বিকাশিত ও বিদিত। ভারতবর্ষে হরি, রাম, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, নারায়ণ, গোপাল, গোবিন্দ, বাসুদেব প্রভৃতি বৈষ্ণব-তন্ত্রের মহামন্ত্রাত্মক নাম। তদ্ভিন্ন শুধু বিশেষণাত্মক নাম বিস্তর। "শতনাম" "সহস্রনাম" প্রভৃতি নাম-স্তোত্রেই তাহা বিজ্ঞেয়। শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, এই অপর চতুর্ব্বিধ উপাসনা তন্ত্রেও শিব, হর, রুদ্র; কালী, দুর্গা, তারা; সূর্য্য, রবি,

আদিত্য; গণেশ, বিনায়ক, হেরম্ব প্রভৃতি মহামন্ত্রাত্মক ইষ্টনাম। মন্ত্রাত্মক আরও বহু নাম আছে। দ্বাদশ, শত, অষ্টোত্তর শত, সহস্র, অষ্টোত্তর সহস্র, ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট গাণিতিক সংখ্যানিবদ্ধ নামাবলী মধ্যে মন্ত্রাত্মক নাম ব্যতীত বিশেষণাত্মক নামও বিস্তর। উক্ত "শতনাম" স্তোত্রাদি ব্যতীতও বিশেষণাত্মক নামের অভাব নাই। ভগবানের কত নামই "সর্ব্বনাম।" ভগবতীকে তন্ত্রে "বর্ণময়ী, বর্ণরূপা" বলা হইয়াছে। প্রতিবর্ণই তাঁহার নাম। মহাশক্তি-পূজায় স্বর-ব্যঞ্জনের প্রতিবর্ণাত্মিকারূপে প্রতিবর্ণ প্রয়োগে তাঁহার পূজা-বিধান রহিয়াছে।

সংস্কৃতের শব্দ-কল্পভাণ্ডার হইতে ঈশ্বর-বোধক অসংখ্য নাম সংগৃহীত ও সংগঠিত হইতে পারে। কিন্তু মাত্র মন্ত্রাত্মক স্বরূপে উপাস্য নামগুলিই মূল শ্লোকের লক্ষিত। বিরাট হিন্দু-উপাসক-মণ্ডলীর সেই উপাস্য নামও বহুসংখ্যক। আমরা উদাহরণ স্বরূপ কতিপয় মাত্র উল্লেখ করিয়াছি। উপাস্য বা মন্ত্রাত্মক নামই ইষ্টনাম। সাধারণ বিশেষণাত্মক নাম হইতে তাহার শক্তি অনেক অধিক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরুন—"হরি" নামের যে গুণ—যে মহিমা, "জনার্দ্দন" নামের অবশ্য তাহা নহে। "শিব" নামের যে প্রভাব, "পঞ্চানন" নামে তাহা নাই। 'দুর্গা' নামে যে শক্তি, "পার্ব্বতী" নামে তাহা অসম্ভব; ইত্যাদি। অবশ্য এসব তত্ত্ব সাধন-জীবনেই সুপরিজ্ঞেয়; আমাদের একরূপ অনধিকার-চর্চা মাত্র। তবে ভগবৎকৃপায় এইটুকু মনে হয় যে, এই সমস্ত মন্ত্রাত্মক ইষ্টনামগুলিতে কত যুগ-যুগান্তর হইতে কত আধ্যাত্মিক অমিত বল সঞ্চিত হইয়াছে; কত মুনি-ঋষি মহাপুরুষের, কত সিদ্ধ-যোগী-সাধু-ধীরের, কত ভক্ত-সাধক-মহাবীরের মহীয়সী জ্ঞান-শক্তি, কর্ম্ম-শক্তি ও ভক্তি-শক্তি সংযুক্ত হইয়াছে, তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলে বোধ করি এই মহামহিমাময় নামের স্মরণে পাষাণ-প্রাণেও পুলক-সঞ্চার হয়।

অস্মদ্দেশীয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার্থীগণ প্রথমতঃ পৌত্তলিকতার ভয়ে ঐ সমস্ত যুগ-যুগান্তের মন্ত্রাত্মক সিদ্ধ নাম ত্যাগ করিয়া, নব-কল্পিত নাম লইয়া উপসনা করিতেন। এমনকি, মন্ত্রাত্মক নাম দূরে থাক্, বিশেষণাত্মক নাম নিতেও আপত্তি হইত। সুতরাং তাঁহাদের সেই উপাস্য নামগুলি বিশেষণ শব্দ মাত্রে কল্পিত হইয়াছিল। যথা "দয়াল" "দয়াময়" "প্রেমময়" ইত্যাদি। তাঁহারা অবশ্য ব্রহ্ম, পরম পিতা, পরমেশ্বর, জগদীশ্বর প্রভৃতি পদও প্রয়োগ করিতেন; কিন্তু "দয়াল" নাম ভিন্ন তাঁহাদের যেন ভাবের জমাট হইত না। ক্রমে তাঁহাদের উপাসনায় "আনন্দময়ী মা" আসিলেন, "দয়াল" মুকুট পরিয়া "হরি" আসিলেন, "সত্যং শিবং সুন্দরং" আসিলেন। ইদানীং প্রায় সকলেই আসিয়াছেন ও আসিতেছেন। এখন প্রায় সমস্ত হরিসংকীর্ত্তন, শ্যামাসংগীত প্রভৃতি ব্রহ্ম-সংগীতের অবাধিত প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন। বোধকরি ব্রাহ্মসমাজস্থ প্রকৃত উপাসনা-পিপাসুগণের প্রতি কৃপা করিয়া ভগবান ক্রমশঃ তাঁহার নিত্য সিদ্ধ ও সফল-সাধ্য মন্ত্র-নামাবলী তাঁহাদিগকে উপহার দিতেছেন। শুনিতে পাই, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এখন যথাসম্ভব বিধিপূর্ব্বক মন্ত্রা-

ত্মক নামগ্রহণ বা মন্ত্রদীক্ষা-গ্রহণও করিতেছেন। ইহা অবশ্য সুখের বিষয় সন্দেহ নাই।

প্রায় বঙ্গীয় আদি-ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় হিন্দুস্থান, সিন্ধু, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশের "আর্য্যসমাজ।" তাহার উপাস্য নাম "ব্রহ্ম" "পরমাত্মা" প্রভৃতি বৈদান্তিক পদ। উপাসনার অতীত শুদ্ধ-তত্ত্ব-জ্ঞানাধিগম্য "অবাঙ্-মনসোগোচরম্" নির্গুণ 'ব্রহ্ম'ও এখন কালমাহাত্ম্যে সগুণভাবে উপাস্য নাম। খাঁটি হিন্দুধর্ম্মের উপাস্য ঈশ্বর নাম ব্যতীত ভারতীয় অন্যান্য প্রাচীন অপ্রাচীন শাখা-ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সমূহেও বিস্তর উপাস্য নাম, যথা — বুদ্ধ, অর্হৎ, মহাজীন, মহাবীর, পরেশনাথ, অলখ্‌নিরঞ্জন, ত্রিনাথ, বিঠোবা, কর্ত্তা প্রভৃতি। এসব ব্যতীত, ভারতীয় বিরাট আর্য্য-উপাসনা-কল্পবৃক্ষের অপর বিস্তর শাখা, প্রশাখা, অনুশাখা, উপশাখা-ভেদে আরও বিস্তর উপাস্য ঈশ্বর-নাম বর্ত্তমান। ইহার মধ্যে অনেক প্রকাশ্য উপাস্য নাম ব্যতীত গুপ্ত-সাধন-মন্ত্রাত্মক নামও অনেক; কিন্তু তৎসমস্ত সাধারণ্যে অবিদিত ও অবেদ্য।

তারপর গড্, খোদা, জিহোবা, জোভ্, করাতরা, ইত্যাদি নামমূলক উপাসনা-তন্ত্র মূলতঃ ভারত ভিন্ন অন্য দেশজ। এমন কি, দ্বীপনিবাসী আমমাংসাশী উলঙ্গ উল্কী-অঙ্কিতাঙ্গ অসভ্য-জাতীয়দেরও "সিম্‌সাক্" "খোজিন্" "পুতিয়াঙ্" "মম্বোজম্বো" প্রভৃতি উপাস্য ঈশ্বর-নাম রহিয়াছে: "মানব" সংজ্ঞায় পরিচিত জীব সংঘেরই ঈশ্বর-কৃপায় কোন না কোনরূপ ঈশ্বর-বিশ্বাস ও ঈশ্বর-নাম আছে। এই জন্যই ত মানব-জন্ম দুর্লভ জন্ম—সার্থক জন্ম—যেহেতু ভগবন্ন-জনাধিকারের জন্ম।

এস্থলে আরও একটী কথা স্বভাবতঃ মনে আসে। এই পৃথিবীর তুলনায় ইহার একটি বালুকণা যত ক্ষুদ্র, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ডের তুলনায় এই পৃথিবী তদপেক্ষা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, নগণ্য—অলক্ষ্য। ঈশ্বর সমস্তেরই কর্ত্তা; অতএব এই নগণ্য পৃথিবী-রেণুর রেণু নগণ্যতম কতিপয় মানবই কি কেবল সেই সর্ব্বব্রহ্মাণ্ড-শ্বরকে ভজে? আর এই সুপ্রকাণ্ড বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কি কেবল বিরাট বিচেতন জড়পিণ্ড মাত্র? ইহা বিশ্বাস করিতে পারা যায় কি? যোগ-সিদ্ধ সত্য-প্রসূত সর্ব্বতত্ত্বাত্মক আর্য্যশাস্ত্রও তাহা বলেন না। আর্য্যশাস্ত্রে অন্যান্য অনেক গ্রহ-নক্ষত্রবাসী উচ্চতর চেতন জীবসত্তার আভাষ-পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহাহউক, তৎপ্রসঙ্গের প্রসার এ প্রবন্ধে, প্রায় অপ্রাসঙ্গিক। ফলকথা এই যে, পৃথিবী ব্যতীত অন্যান্য গ্রহ-তারা নক্ষত্রের মধ্যে যে গুলিতে মানবের ন্যায় বা কিঞ্চিৎ তন্ন্যূন বা ততোধিক শক্তিশালী বাক্যকথনশীল বুদ্ধিমান প্রাণী আছে, তাহাদের মধ্যেও সমগ্র বিশ্বের কর্ত্তার উপাসনা ও উপাস্য নাম অবশ্য প্রচলিত আছে। ফলে অতদূর ভাবিতে বুদ্ধি অবসন্ন হয়। আর তাহা আমাদের অনেকটা অনধিকার চর্চ্চাও বটে। মোট কথা, দয়াময় ভগবান জীবের প্রতি দয়া করিয়াই আপনার বহুনাম বহুলোকে বহুপ্রকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। বিশ্বময়ের নাম বিশ্বময়!

নিজ সর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা।—নামে ভগবান নিজ সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়াছেন সিদ্ধ মন্ত্রাত্মক ভগবন্নাম সমূহ ভগবানের

সর্ব্বশক্তি সঞ্চারে স্বয়ং ভগবৎপ্রতিম! আমাদের এই ক্ষুদ্র সান্ত পৃথিবীতেই সেই অনন্তস্বরূপের অনন্ত নাম অনন্ত-শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত। আর এই ভগবন্নামতত্ত্ব ভগবৎ কৃপায় আর্য্যধাম ভারতবর্ষে আর্য্যশাস্ত্রে যেরূপ বিচিত্র রস-রহস্য-বিলোড়নে ও বিশ্লেষণে অসাধারণ ও অনুপম-ভাবে বিবৃত, এমন বুঝি আর কোনও পার্থিব জাতির কোনও সাধন-শাস্ত্রেই নাই। নাম-নামীর অভেদসত্তা, সুতরাং নামের সর্ব্বশক্তিমত্তা হিন্দু-তত্ত্ববিদ্যার অমূল্য আভরণ। ভগবন্নামতত্ত্ব হিন্দুশাস্ত্র-কল্পভাণ্ডারের মহোজ্জ্বল মণি। "হরের্নামৈব কেবলম্"—হরির অর্থাৎ পরমেশ্বরের নামই কেবল সার—সর্ব্বস্ব, কারণ নামই তিনি। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত এই মহাবাক্য হিন্দু—অহিন্দু—উপাসক মানব মাত্রেরই স্বাধিকার-ভেদে সাধ্য ও আরাধ্য;—তবে কি না, নাম-নামীর অভিন্নত্ব—নামের সঙ্গে রূপ-গুণ লীলার অপূর্ব্ব মিলনতত্ত্ব হিন্দুশাস্ত্রের অদ্বিতীয় বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বই যে কলির সাধকের আশা-ভরসার অনন্ত অবলম্বন, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মহাশক্তিময়ী শিক্ষায় এ সত্য ভারত-বক্ষে প্রকৃষ্টরূপেই পরীক্ষিত ও প্রচারিত হইয়াছে। যাহাহউক, আর প্রায় সর্ব্বত্রই নাম কেবল নামীর স্মারক—পরিচায়ক চিহ্ন বা সঙ্কেত মাত্র; সুতরাং নাম হিন্দুসাধকের সর্ব্বস্ব। হিন্দুশাস্ত্রে নামের শক্তিভেদে বর্ণ বা শব্দ-সংস্থান-ভেদ অতি গূঢ় অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান-বিহিত এবং কল্প-কল্পান্ত-ব্যাপকতায় অনাদি-কাল-বোধিত।

প্রধান-ভেদে হিন্দুর প্রতি ইষ্টনামের কত প্রতিনাম। শতনাম-সহস্র-নাম স্তোত্রাদির কথা পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি। বহুবিধ স্তব-কবচ-সূত্রে গ্রথিত হইয়া এই সর্ব্বশক্ত্যাধার নাম-চিন্তামণিহার আর্য্য-উপাসনা-দেবীর কমনীয় কণ্ঠে বিশ্বোজ্জ্বল বিভায় বিরাজমান! ভক্তের উপাসনা-লভ্য হওয়ার জন্যই ভক্তিপ্রিয় ভগবান এক হইয়াও সহস্র নামে সহস্রীকৃত। আর সিদ্ধ মন্ত্রাত্মক সর্ব্বনামেই স্বীয়-সর্ব্বশক্তি সহ অবতারিত। অতএব প্রত্যেক নাম এক একটী অবতার! সাধুগুরু-মুখে ব্যক্ত, ইহার প্রায় সর্ব্ব-নামাবতারেই ঐশ্বর্য্যশক্তি প্রকটিত। কয়েকটীতে মাত্র ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য উভয় শক্তিই সঞ্চারিত। আর দু-একটীর পূর্ণমাধুর্য্যে, মহেশ্বরও মোহিত! ফলে এ বিষয়ে অধিক অগ্রসর হওয়ার সাধ্য নাই। তবে এইটুকু মাত্র নিবেদ্য যে, আধ্যাত্মিক ইষ্টসাধন ত দূরের কথা, সামান্য বৈষয়িক ইষ্টসাধনেও বিষয়-ভেদে নাম-ভেদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা। "ঔষধে চিন্তয়েদ্ বিষ্ণুং ভোজনেচ জনার্দ্দনং" ইত্যাদি; অথবা বিভিন্ন অঙ্গ রক্ষার্থে "শিরো মে চণ্ডিকা পাতু কণ্ঠং পাতু মহেশ্বরী" ইত্যাদি কবচ-বিধিই ইহার প্রমাণ। গুহ্যাতিগুহ্য আম্নেষ্ট সাধন-তত্ত্বেও এই নামভেদ-রহস্যের অপূর্ব্ব অধ্যাত্ম-লীলা লুকায়িত!

মূলে ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য, এই উভয় শক্তি এবং তদন্তর্ভূত অনন্তশক্তি; অর্থাৎ ভগবানের সর্ব্বশক্তিই নামে নিহিত।

নামে সৃষ্টি-স্থিতি লয়, নামে সর্ব্বসিদ্ধি হয়,
নাম হয় মরণ-হরণ।
নামে আশা-পাশ খসে, পিয়ে নাম-সুধারসে,
পায় রাধা-কৃষ্ণের চরণ॥

আর চাই কি? কৃষ্ণনাম-কল্পতরুতলে কাঙ্গাল হইয়া আঁচল পাতিতে পারিলে, সেই দেবের দুর্লভ্য শিবের সেবা সুধা-ফলটীর প্রসাদ জীবের ভাগ্যেও সুখলভ্য হয়। মানবের সৌভাগ্য-সঞ্জাত এহেন সুলভ সর্ব্বশক্তিমান্ নামের আশ্রয় যাহার পক্ষে দুর্লভ হয়, তাহারই যথার্থ দুর্ভাগ্য। নাম-নামীর অভিন্নত্ব, সুতরাং নামেই সাধন, নামই সাধ্য। এই সাধ্য-সাধনের একত্ব-জনিত অপূর্ব্ব সুবিধাটী স্বতঃসুদীন কলির জীবের পক্ষে বড়ই উপযোগী; দুর্ভাগ্যবশে ও দুর্ব্বুদ্ধি-দোষে তাহাতে বঞ্চিত হওয়া যে কি দুঃখের বিষয়, মূঢ় জীব আমরা তাহা বুঝিলাম না। জীবের এই দুঃখ ভাবিয়াই দয়াল গৌরাঙ্গ কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন! আর তৎপ্রতিবিধানার্থ সাধ্য-সাধনের অভেদ রহস্য ভেদ করিয়া এই সুপ্রশস্ত ও সুগম নামসাধন-পন্থা দেখাইয়াছিলেন। বৈষ্ণব-হৃদয়রত্নস্বরূপ "হরিনাম-চিন্তামণি" গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে,—

"যেইত সাধন সেই সাধ্য যবে হৈল।
উপায় উপেয় মধ্যে ভেদ না রহিল॥
সাধ্যের সাধনে আর নাহি অন্তরায়।
অনায়াসে তরে জীব নামের কৃপায়॥"

নামে ভগবানের সর্ব্বশক্তি সমর্পিত, ইহা স্বয়ং মহাপ্রভুর শ্রীমুখের সাক্ষ্য। কলির জীবের জন্য ভগবান যাহা করিয়াছেন, স্বয়ং কলিযুগ-পাবনাবতার হইয়া সেই ভগবানই তাহা প্রচার করিতেছেন, এই পরমানন্দ-বার্ত্তায় যাঁহারা আন্তরিক বিশ্বাসী, তাঁহাদের পক্ষে আর কথা কি? তাঁহারা প্রেমানন্দে নামানন্দে মজে যাউন। আর উপাসনার্থী যাঁহারা মহাপ্রভুকে "ভগবদ্ভক্ত" মাত্র ভাবেন, তাঁহারাও বুঝিবেন যে, এমন ভক্তও "নভূতোন ভবিষ্যতি"—অতএব ভগবদ্ভজন বিষয়ে ভগবন্নাম-মহিমার অমন সত্যপূত সাক্ষ্যও আর সংসারে মিলিবেনা।

নামের মহীয়সী-শক্তি সম্বন্ধে মহাপ্রভু স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন,—

"এক নামাভাসে তব পাপদোষ যাবে।
আর নাম লৈতে কৃষ্ণ চরণ পাইবে॥"

হেলায়-খেলায়, অপ্রেমে-উপেক্ষায় গৃহীত "সাপরাধ" নামেরও পাপবিনাশিনী—সুতরাং পারত্রিক সদ্গতিদায়িনী শক্তি আছে। সুবিখ্যাত অজামিলাখ্যানই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ফলে মহাপ্রভুর মহাবাক্যই উৎকৃষ্ট আপ্ত-প্রমাণ।

"নিরপরাধেতে নামে পায় প্রেমধন।"

"নামাপরাধ"শূন্য হইয়া নামসাধন করিতে পারিলে, সেই নামের শক্তিতে প্রেমধন লাভ হয়; সুতরাং কৃষ্ণকৃপায় কৃষ্ণ-প্রেমিকের কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবার অধিকার জন্মে।

শাস্ত্রে যে ভূরি ২ স্থানে নামের মোক্ষ-দায়িনী শক্তির উল্লেখ আছে, সে এই নিরপরাধ-সাধ্য নামের। সাপরাধ নাম-করার নামকে শাস্ত্রে "নামাভাস" বলিয়াছেন। ঠিক নাম হইল না, কিন্তু নামের আভাস মাত্রেই পাপক্ষয় ও সদ্গতিসঞ্চয় হইল; কিন্তু নিরপরাধযুক্ত ও নামাসক্ত নামগ্রহণে মুক্তি এবং নামীর চরণ-সেবনের এক মাত্র উপকরণ ভক্তি লাভ হয়। মুক্তির ফল যে ভক্তি, তাহাই অহৈতুকী পরাভক্তি। যেহেতু বদ্ধ জীবে শুদ্ধ অহৈতুকতা সম্ভবেনা।

সহজ উদাহরণের ভাবেও এই টুকু বুঝা যায় যে, কেহ বদ্ধাবস্থায় থাকিয়া কাহারও সেবা

করিতে সমর্থ হয় কি? তুমি তোমার ভৃত্যকে স্কন্ধে বন্ধন করিয়া তোমার চরণ সেবা করিতে বলিয়া থাক কি? কলে বদ্ধ দাসের প্রভু-সেবা অসম্ভব। দয়াল-হরি দয়া করিয়া যাহাকে স্বচরণ-সেবার চরম চরিতার্থতা প্রদান করেন, তাহার ভব-বন্ধন মোচনের ব্যবস্থা কাজেই তাঁহাকে করিতে হয়। অহো! তাই বুঝি চতুরশীতি লক্ষ গ্রন্থিতে বিজড়িত সেই বিষম বন্ধন-বিমোচনে এই নিরপরাধ-নিশিত নামাস্ত্র-প্রয়োগের ব্যবস্থা।

এ ব্যবস্থার শুভসমাচার সর্ব্বশাস্ত্রে সুতার-স্বরে কীর্ত্তিত ও সমসুতানে সংগীত! দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটির আলোচনা করিতেছি।

নামের পাপসংহারিণী শক্তি সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন,—

"নাম্নস্তু যাদৃশীশক্তি র্পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং নশক্নোতি পাতকং পাতকীজনঃ॥"

পাপ-নাশে হরিনাম যত শক্তি ধরে।
পাপীর নাহিক শক্তি তত পাপ করে॥

কি চমৎকার! কি অভয়-আশা-আনন্দের স্বর্গীয় সুসংবাদ! কি পাপী-তাপীর প্রাণ-জুড়ানো দয়াময়ী দৈববাণী! কিন্তু হায়! গীতা-বর্ণিত অস্মদাদৃশ নরাকৃতি আসুর-প্রকৃতির ভাগ্যে ক্ষীরোদ সিন্ধুর সুরেন্দ্র-সেব্য সুধার পরিবর্ত্তে বাসুকীর বিষম বিষের ব্যবস্থা বিচিত্র নহে। আমরা হয়ত নামের অন্তরালে-পাপ-প্রলোভনে পড়িয়া নিদারুণ নামাপরাধ-গ্রস্ত হইতে পারি। নামকে "হজমী গুলি" ভাবিয়া, সারা দিন রাত পাপ-মল ভক্ষণ করি আর শেষ রাত্রি ২টা ১৫ মিনিটের সময় একবার হ আর র-এ ইকারের সেই "হজমী-গুলী" প্রয়োগ করি! অমনি সব ভস্ম! এইরূপ ভুরভিসন্ধিতে এইরূপ 'হরি' বলায় কাজেই নামাপরাধ ঘটে। এই নামাপরাধে হরি নামের পাপহারিণী শক্তি পাপ-বর্দ্ধিনীই হইয়া উঠে! ফলে এই জন্যই উহা নামাপরাধ। নামাভাসেই পাপক্ষয় হয় বটে; কিন্তু কাম বা কামনাকেই যখন পাপস্বরূপ জ্ঞান করিয়া, নৈষ্কর্ম্ম্য বা মুক্তি-সাধ্য ভগবদ্ভক্তি লাভ করিবার জন্য নামাস্ত্র লইয়া, নামী-কৃপা বল-দৃপ্ত হইয়া, সাধক যখন বীর-বিক্রমে সংগ্রাম করেন, তখন তাঁহার সেই নামাস্ত্র নিরপরাধ-নিশিত হওয়াতেই নিঃসন্দেহ বিজয় লাভ হয়। ফলে সেইরূপ নাম-করার মত নাম করিতে পারিলেই পাপের মূল ভিত্তি পর্য্যন্ত বিধ্বংসিত হয়। বাসনার বীজ পর্য্যন্ত ভস্ম হইয়া যায়।

"যদি ডাকার মত ডাকতে পারিস্, (দেখি) কেমন হরি থাকতে পারে!" বাস্তবিক নামাপরাধমুক্ত নামাসক্ত নাম-সাধনই ডাকার মত ডাক। নামে খাঁটি ভালবাসা না হইলে নামাপরাধের ভয় ছাড়ায় না। নিষ্কাম নাম-সাধন চাই: নামের জন্যই নাম-ভজন চাই। নামকে ভাঙ্গাইয়া বিষয়-ক্রয় না হয়। কৃপণের ধনের ন্যায় নামধনই যেন সর্ব্বস্বধন জ্ঞান হয়।

"বিচিন্ত্যানি বিচেয়ানি বিচার্য্যানি পুনঃ পুনঃ।
কৃপণস্য ধনানীব ত্বন্নামানি ভবন্তু মে॥"

আমাদের ভক্ত কবিবর তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় ইহার কি সুন্দর অনুবাদ-ভাষ্য লিখিয়াছেন!

"সযতনে সঙ্গোপনে কৃপণ যেমন।
বার বার গণে গাঁথে আপনার ধন॥

তাই করে তোলাপাড়া—তাই নাড়াচাড়া।
আর কিছু নাহি জানে সেই ধন ছাড়া॥
তেমনি তোমার নাম হউক আমার।
ইষ্টমন্ত্র, জপমালা, ধ্যান-জ্ঞান আর॥"

ভগবন্নামের পাপসংহারিণী শক্তি-সংঘোষক বচন-হার-বিন্যাসে পুরাণাদি ভক্তিশাস্ত্র-সমূহ সমলঙ্কৃত।

"অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে সর্ব্বপাতকৈঃ।
পুমান্ বিমুচ্যতে সদ্যঃ সিংহত্রস্তৈর্ম্মৃগৈরিব॥"

অবশেও নাম লইলে পুমান্,
সর্ব্বপাপ সদ্য যায়।
পশুরাজ-ভয়ে ভীত-চিত্ত হয়ে
পশুরা যথা পালায়।

একটী প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-গীতেও এই ভাবের উক্তি শুনা যায়, যথা—

"শুনিলে 'গোবিন্দ'রব, আপনি পালাবে সব,
সিংহনাদে যথা করিগণ।" ইত্যাদি।

পাপেই যমের ভয়, কিন্তু নামের বলে পাপ পালাইলে, সে ভয়-জয় অবহেলেই হয়; তাই স্বয়ং যমরাজের উক্তি,—

"জিতংতেন জিতংতেন জিতংতেন যগান্তরং।
জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥"

জিত তার জিত তার জিত তার যম-ভয়।
জিহ্বাগ্রে বিরাজে যার "হরি" এ অক্ষরদ্বয়॥

নারায়ণ-পরায়ণ মহামুনি গর্গ এই ভাবেই খেদ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"নারায়ণেতি মন্ত্রোঽস্তি বাগস্তি বশবর্ত্তিনী।
তথাপি নরকে ঘোরে পচন্তীত্যেতদদ্ভুতম্॥"

নারায়ণ মন্ত্র আছে, বাক্য আছে বশে।
কি আশ্চর্য্য! তবু নর নরকেতে পশে॥

মহাভাগবত গর্গমহর্ষির ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে, কিন্তু আমাদের ন্যায় মোহান্ধ জীবের বরং তদ্বিপরীত ভাবই ভাবিতে হয়। "আহা! এমন সুখের সংসার! সখের প্রাণ! তাহাতে এমন মধুর বিষয়-বিলাস-মাদকতা! তন্মধ্যে কোথাকার ভূয়া নরক-কল্পনা ও নারায়ণ-জল্পনা লইয়া জীবিত ও তৃপ্ত থাকাই জগতে আশ্চর্য্য।" এই খানেই যোগী ও ভোগী বা ভক্ত ও ভাক্তের পার্থক্য! যোগী-ভক্তের সেব্য নামামৃত বিষয়-বিষয়-কীট ভোগী-ভাক্তের ভাগ্যে ঘটিবে কেন?

তারপর, যে মুক্তি কৃষ্ণভক্তি লাভের অনন্ত-উপযোগিতা, যাহা জ্ঞান-মার্গে কঠোর-তপঃসাধ্য হইলেও, ভক্তি-মার্গে কেবল নাম-সাধন-সাধ্য, (পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে) তাহারই ভূরি ২ আর্ষ বাক্য-প্রমাণ হইতে দৃষ্টান্ত স্বরূপ দু-একটি মাত্র এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। স্বাধ্যায়-সেবী সাধকগণ পুরাণাদি ভক্তিশাস্ত্রের যত্র তত্র এবম্বিধ নাম-মাহাত্ম্যরত্ন বিকীর্ণ দেখিতে পাইবেন।

"মধুর মধুর মেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং,
সকল নিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপং।
সকৃদপি পরিগীতং হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা,
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥"

ভৃগুবর!

মধুর হতে মধুর—মঙ্গল-মঙ্গল।
সর্ব্ববেদ-লতিকার সৎচিৎ ফল॥
বারেক হেলা-শ্রদ্ধায় হেন কৃষ্ণনাম।
গীতমাত্র নরমাত্রে করে পরিত্রাণ॥

নিখিল ধর্ম্মতত্ত্ব-রত্নভাণ্ডার বেদের যে সর্ব্বস্বধন "হরিনাম," তাহাতে আর সন্দেহ কি?

"ঋগ্বেদোঽথ যজুর্ব্বেদঃ,
সামবেদোঽপ্যথর্ব্বণঃ।

অধীতাস্তেনযেনোক্তং
হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।"

ঋক্-যজুঃ সামাথর্ব্ব—ইতি বেদচতুষ্টয়—
অধীত, কথিত যায় "হরি" এ অক্ষরদ্বয়।

ভগবন্নামের গুণ বর্ণিতে ভক্ত-রসনা শত-ধারে সুধাবর্ষণ করে। মহাবীর মহাযোগী ভারত-ভাগবত-ভূষণ ভীষ্মদেব বলিয়াছেন,—

"প্রাণকান্তার-পাথেয়ং সংসারচ্ছেদভেষজম্।
দুঃখ-শোক-পরিত্রাণং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥"

জীবন-বন পাথের—ভবরোগহর।
দুঃখ-শোকহারী 'হরি'-নাম দ্ব্যক্ষর॥

বিবিধ-বিপদ-সঙ্কুল-মানব-জীবন ভীষণ অরণ্যই বটে। সে বিষম-বন-পথের পাথেয় বা সম্বল একমাত্র হরিনাম। বিকট বিকার-ভোগা দুরারোগ্য ভবরোগে মহামহৌষধ এই হরিনাম। অপ্রাপ্ত প্রিয়ের অভাবজনিত দুঃখ ও প্রাপ্ত প্রিয়ের বিয়োগজনিত শোক, এই শোক-দুঃখের নিত্য ক্রীড়া-পুত্তলী দুদীন মানবের একমাত্র শান্তি-সান্ত্বনা এই হরিনাম! অতএব হরিনাম যদি সর্ব্বদুঃখ-শোকহারী হন, তবে কৃষ্ণ-দাসত্ব অভাবে জীবের যে দুঃখ, কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-বিরহে ভক্তের যে শোক, তাহা অবশ্য হরিনামই হরণ করিবেন। ভীষ্মদেব আরো বলিয়াছেন,—

"ভক্ত্যাবেশ্য মনো যস্মিন্ বাচা যন্নাম কীর্ত্তয়ন্।
ত্যজন্ কলেবরং যোগী মুচ্যতে কাম-কর্ম্মভিঃ॥"

ভক্তিভরে হিয়ে হরিতে মজিয়ে,
'হরিনাম' গেয়ে যেই—
ভক্ত যোগিবর ত্যজে কলেবর,
কাম-কর্ম্ম-মুক্ত সেই।

শুধু মুখের হরিনাম "নামাভাস" মাত্র হওয়াতে পুণ্যের সহিত দ্বন্দ্ব-সাপেক্ষ যে পাপ, তাহারই ক্ষয় হইতে পারে; কিন্তু কৃষ্ণ-দাসত্ব লাভ করিতে হইলে, কাম-কর্ম্মের সর্ব্ববন্ধন ছেদনপূর্ব্বক সংসার-দাসত্বে "এস্তফা" দিতে হয়। স্বতঃ সকামকর্ম্মী জীব কাহার অভয় আশ্রয় পাইয়া, তাহার জন্ম জন্মান্তর-সেবিত সংসার দাসত্ব বিসর্জ্জন দিয়া, নৈষ্কর্ম্ম্য-নির্ম্মল-হৃদয়ে অন্তরাত্মার চিরবাঞ্ছিত সেই কৃষ্ণদাসত্ব লাভে সমর্থ হয়? একমাত্র ভগবন্নামেরই আশ্রয়ে, সন্দেহ নাই।

মানবের ব্যবস্থাশাস্ত্র স্মৃতিও সর্ব্ব-ব্যবস্থা-সার-স্বরূপে বলিয়াছেন,—

"সকৃদুচ্চারিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।
বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি॥"

'হরি' এ অক্ষরদুটি বারেক যে বলে।
কোমর বাঁধিয়া সে-ই মুক্তি-পথে চলে॥

মুক্তি-পথই ভক্তি-মন্দিরের পথ। অমুক্ত—বাসনা-বন্ধ-যুক্ত জীবের সে ভক্ত হওয়ার অধিকার কোথায়? সর্ব্বার্থসিদ্ধিদ একমাত্র নামই সে অধিকার দানে সমর্থ। সাধকের চির সম্বল নাম। প্রথমতঃ নামে পাপনাশ, পরে পাপ-পুণ্য উভয় কর্ম্মের বীজ বাসনার বিনাশ—অর্থাৎ মুক্তি। পরে প্রকৃত ভক্তি লাভ এবং সর্ব্বশক্তিময়ী সেই কৃষ্ণ-ভক্তির কৃপায় কৃষ্ণ-দাসত্ব লাভ। তাহাই জীবের পরমপদ, চরম সম্পদ, নিত্য সত্ত্ব, শাশ্বত স্বরূপ! আহা ভক্তচূড়ামণি ভৃগুমুনি এই ভাবটি ভাবিয়া ভগবদুদ্দেশে ভগবন্নাম-গৌরব এইরূপ গাহিয়াছিলেন,—

"নাহৈব তব গোবিন্দ কলৌ [illegible] শতাধিকম্।
দদাত্যুচ্চারণান্মুক্তিং [illegible]॥"

হে গোবিন্দ! তব নামের গৌরব
তোমাহতে শতগুণে।
উক্তি মাত্র ফলে, মুক্তি কলিকালে,
অষ্টাঙ্গযোগাদি বিনে॥

গোবিন্দ নিরুত্তর! উচিত কথার কে জবাব করিতে পারে? অথবা "মৌন-সম্মতিলক্ষণ"ও বলা যায়। কথাটা বড় ঠিক কি না। কথাটা জগৎ-জুড়ানো অভয়-বাণী—পাপী-তাপীর ভরসার ধনি! এই ভাবের একটি সুন্দর হিন্দী দোঁহা আছে।

"রাম সে রামনাম বড়া, সাগর উতারা রাম।
পেড়্-পাথরসে,'রামনাম'সেতু্ বঁধেহনুমান॥"

অর্থাৎ—

রাম হতে রামনাম, বহুগুণ গুণধাম,
শিলা-বুকে বাঁধি সিন্ধু উত্তরিলা রাম;
রামনাম মাত্র স্মরি, অপার-অর্ণব-বারি
এক লম্ফে হৈল পার বীর হনুমান!

সুবিখ্যাত সত্যভামা-ব্রতাখ্যান বর্ণনস্থলে কোন বঙ্গকবি বলিয়াছেন,—

হরি হতে হরিনাম গৌরবে প্রধান।
নিজে হরি তুলাছলে করিলা প্রমাণ॥
নিজে লঘু হয়ে নিজ নামে করি গুরু॥
ভক্তবাঞ্ছা পূরালেন বাঞ্ছাকল্পতরু।

ভক্তের আর বাঞ্ছা কি? নামই তাঁহার সর্ব্বস্ব। নামের গৌরবেই নামীর গৌরব; তাঁহার নামই সেই নামী; ইহাপেক্ষা সাধকের সুখ-সুবিধার বিষয়ই আর কি আছে? আবার সেই নামীই নামাশ্রিত ভক্তগণের প্রতি কৃপা করিয়া, আত্মাধিক সুলভতা লক্ষ্যে নামের পক্ষে অধিকতর গৌরব বিধানকর্ত্তা, ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয়ইবা কি আছে?

সাধকের নামে অনন্যগতিত্ব—অনন্যআশ্রয়িত্বপ্রবং কৃষ্ণের একান্তসাধিকা কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধিকাও দেখাইয়াছেন। কৃষ্ণ-বিরহে বিগতচেতনা শ্রীরাধার কর্ণে শ্রীকৃষ্ণনাম জপ করিলেই তিনি আগতচেতনা হইতেন। আবার নিজে শ্রীরাধা কৃষ্ণবিরহ-কালে হরিনাম জপিয়াছেন! নামেতেই কৃষ্ণ, সুতরাং নামের জপনে কৃষ্ণ-প্রাপণ সিদ্ধ হওয়ায়, তাঁহার বিরহ-বিদ্ধ হৃদয় সুস্থ হইয়াছে। তারপর কৃষ্ণের আগমনে লীলারূপের যুগল-মিলনে নামীতে নাম অভেদ মিশিয়া গিয়াছেন!

"কুঞ্জদ্বারে লতামূলে হরিনাম জপে গো।"

রাধার কৃষ্ণনাম জপ সম্বন্ধে এই বিখ্যাত পৌরাণিক সাক্ষ্য বৈষ্ণব-সমাজে অবিদিত নহে। রাধা, নামীর আসার আশায় থেকে পলকে প্রলয় দেখে, শেষে "কুঞ্জদ্বারে—লতা-মূলে" নাম নিয়ে বসে গেলেন। নামেই নামীকে পেলেন! তারপর লীলারূপে নামী এলে, নাম তাঁতে মিশে গেলেন! প্রথমতঃ নামেইত রাধা বাঁধা পড়িয়াছিলেন। সেই সুপ্রসিদ্ধ পদ-গীতি—সেই বঙ্গ-বৈষ্ণবকবির বিমোহিনী বীণাধ্বনি স্মরণ করুন।—

"সৈ! কেবা শুনাইল 'শ্যাম' নাম?
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো!
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতই মধু 'শ্যাম' নামে আছে গো!
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো!
কেমনে পাইব সৈ তারে?"

মরি মরি! কি মোহ-মন্ত্র! ভক্ত-জগৎ এই মন্ত্রে মুগ্ধ-বিবশ-বিহ্বল! নামে মধে

নাম ভজে নামীকে পাওয়া, আর নাম-নামীতে মিশে যাওয়া, এই মহাভাব-চিত্র মহাভাবরূপিণী রাধাঠাকুরাণীর চারুচরিত্রে বিচিত্রবর্ণে সুচিত্রিত! ইহা গোলকের গুপ্ত রস-তত্ত্ব, জীবের ভাগ্যে ব্রজ-লীলায় সুব্যক্ত; এবং ততোধিক কলির জীবের ভাগ্যে গৌর-লীলার উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে জগৎ ব্যাপ্ত। আহা! এই মহাভাব-রসের কণিকাঘ্রাণেও আমরা কৃতার্থ হইতে পারি। কিন্তু কর্ম্মদোষে এমন কপাল! এই গৌর-প্রেম-প্লাবিত প্রদেশে প্রসূত, পালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াও আমরা মগ্ন শৈলের ন্যায় অচল পাষাণ হইয়া আছি। এ নিরেট পঞ্জর ভেদিয়া কিছুই অন্তঃপ্রবিষ্ট হয় না; সুতরাং কি বলিব? কেবল বলিবার—গৌর-কৃপাহি কেবলম্।

গৌরাঙ্গচরিত্র-বিষয়ক গ্রন্থবিশেষ হইতে আমাদের ভক্তিভাজন ভক্ত কবিবর তারাকুমার কবিরত্নের সংগৃহীত এবং তাঁহার অমৃতভাণ্ড "পঞ্চামৃত" পুস্তকে তৎকৃত অনুবাদসহ প্রকাশিত শ্রীগৌরাঙ্গোক্ত ভগবন্নামমাহাত্ম্য সূচক কতিপয় শ্লোক এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"নরকে পচ্যমানানাং নরাণাং পাপকর্ম্মণাং।
মুক্তিঃ সঞ্জায়তে সদ্যো নামসংকীর্ত্তনাদ্ধরেঃ॥
সকৃদুচ্চারিতং যেন হরেকৃষ্ণেতি নিশ্চয়ং।
যমাধিকারং নো যাতি কাপট্যেন বিনা যদি॥
ত্রৈলোক্যে যানি পুণ্যানি ধর্ম্ম-কর্ম্ম-ফলানি চ।
তুল্যতা তানি নো যান্তি হরিনামানুকীর্ত্তনৈঃ॥"

ভক্তের প্রাণের কথাটী এখনও বাহির হয় নাই। তাই অন্তর্যামী দয়াল গৌরাঙ্গ আরো বলিলেন—

"যো ভাবগদ্গদো ভূত্বা রোদিত্যচ্যুতকীর্ত্তনম্।
তস্য কৃষ্ণঃ পরিক্রীতস্তস্মাদ্ বিভাতি দেবতাঃ॥

ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল; কিন্তু কৃষ্ণ-প্রীতিপরাঙ্মুখ পাষণ্ডের উপায় কি? অতএব তাহার প্রতি কৃপা করিয়াই তাহার গতিও বর্ণন করিয়াছেন,—

"কদাচিদ্ যো ন গৃহ্লাতি কৃষ্ণনাম সুধামৃতম্।
সূতঃ শ্বপরকোলানাং সতু যোনিষু জায়তে॥"

তারপর, আর এক শ্রেণীর ধর্ম্মকর্ম্মী লোক আছেন, তাঁহারা যাগ-যজ্ঞ দান ব্রতাদির অনুষ্ঠানে আসক্ত থাকিয়াও, অনেকে আসল বিষয়ে উদাসীন। ইঁহারা কলির সাধকের সর্ব্বস্বধন ভগবন্নামধন সঞ্চয়ে তত সমুৎসাহী নহেন। আর সব আয়োজন আছে, কেবল "নামে রুচি" নাই। তবেই ফলিতার্থে কিছুই নাই; অথবা যা আছে, তা "লেবু টেবু সব আছে" গোছ! একটি কৌতুক-প্রবাদ-বাক্য অস্মদ্দেশে প্রচলিত আছে।—

"বিয়ের সব প্রস্তুত বাবাই!
কেবল কন্যাটি আমার নাই!!"

এও ঠিক তদ্রূপ। যাহাহউক, ঐ সব বাহ্য-ধর্ম্ম-কর্ম্মীদের প্রতিও কৃপাবশে শিক্ষাদানোদ্দেশে বলিয়াছেন,—

"দানং ব্রতং তপো যজ্ঞঃ শ্রাদ্ধং বা পিতৃতর্পণং।
সকলং নিষ্ফলং লোকে হরিসংকীর্ত্তনং বিনা॥"

ভগবন্নামের শক্তি-সংঘোষিণী এই উক্তি-গুলি অতি সরল সংস্কৃতে রচিত; তথাপি এ গুলির পদ্যানুবাদ একত্রে নিম্নে প্রদত্ত হইল। পণ্ডিত তারাকুমারের পদ্যানুবাদ অতি মিষ্ট হইলেও তাহা একটু ভাবাবৎ বিস্তৃত বলিয়া তৎপরিবর্ত্তে এই যথাসাধ্য অবিকল ও অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত পদ্যানুবাদ লিখিত হইল।—

পাপেতে নরকে পচে পাপী তাপী লোক যারা।
হরিনাম সংকীর্ত্তনে সদা মুক্তি পায় তারা ॥
অকাপট্যে বারেক যে "হরেকৃষ্ণ" নাম লয়।
সে জন যমাধিকারে নাহি যায় সুনিশ্চয় ॥
ত্রৈলোক্যে যতই পুণ্য-ধর্ম্ম-কর্ম্ম-ফলোদয়।
হরিনামে কীর্ত্তনের তুলনায় কিছু নয় ॥
"যে ভাব-গদগদ হয়ে কেঁদে হরিনাম করে।
কৃষ্ণ তার ক্রীত হন—দেবেরাও তারে ডরে ॥
ভবামৃত কৃষ্ণনাম কভু না আস্বাদে যেই।
মরিয়া কুক্কুর-খর-শূকরত্ব পায় সেই ॥
স্নান-ব্রত-তপ-যজ্ঞ-শ্রাদ্ধ বা পিতৃ-র্পণ।
সকলি নিষ্ফল লোকে বিনা হরিসংকীর্ত্তন ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্র, শিক্ষা, সাধনা, নামপ্রেম-প্রচার ইত্যাদি বিষয়ক বহুসংখ্য ও বহুবিধ আবিষ্কৃত, অনাবিষ্কৃত, গুপ্ত, লুপ্ত গ্রন্থ বা সন্দর্ভ আছে ও ছিল; তৎসমুদায়ই নাম-শক্তিবর্ণিনী প্রভু-উক্তির পীযূষ-প্লাবনে প্লাবিত! সে প্লাবনে যে পশিয়াছে, সেই রসিয়াছে;—প্রেমানন্দে ডুবিয়া আবার নামানন্দে ভাসিয়াছে!

এদিকে কলির সাধনশাস্ত্র ("কলাবাগম-সম্মতা") আগম বা তন্ত্রের কর্ত্তা স্বয়ং সদাশিব বৈষ্ণব-তন্ত্র নিচয়ের যত্র যত্র হরিনাম-মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন, তত্র তত্র ভোলানাথ একেবারে ভাবে ভুলিয়া, প্রেমে গলিয়া, হৃদয়-ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন! যেখানেই হরিনাম-মাহাত্ম্য প্রসঙ্গিত, সেইখানেই দেবাদিদেব মহাদেবের মহাহৃদয়ের অজস্র অমৃত-উৎস উৎসারিত! আমাদের স্থান অল্প; তাহারই এক গণ্ডূষ মাত্র এস্থলে উপঢৌকন দিলাম। নামসাধুনের বহুবিচিত্র ফলের যাহা পরম এবং চরম ফল, ফলের যাহা সার-সম্পদ্—

প্রকৃত প্রাণের পিপাসার জল, অর্থাৎ কৃষ্ণনামে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-প্রাপ্তি ফল; তৎসম্বন্ধে স্বয়ং শিবের স্বাভিমত ইহাতেই সুবিদিত :—

"যঃ পতত্যবনৌ গীত্বা হরের্নামানি গদ্গদঃ।
তাবেন তস্য গোবিন্দঃ ক্রীতো ভবতি নান্যথা ॥"

হরি-গানে রত, ভাবে গদগদ,
ভূতলে লুণ্ঠিত যেই;
শ্রীগোবিন্দ হন তারি কেনা-ধন,
ইহাতে সংশয় নেই।

হরি-হর অভিন্ন। ভিন্ন ভাবাও "নামাপরাধ"। অতএব হরি-হর-বাক্যে আমরা কি পাইলাম? যে অকৈতব ভক্ত হরিনাম গানে ভাব গদগদ হইয়া দশাপ্রাপ্ত ও ভূপতিত হন, তাঁহারই জন্ম সার্থক; কারণ জগচ্চিন্তামণি-ধন তাঁহার "কেনা" হন! এই এক "কেনা" শব্দে যে ভাব ব্যক্ত হয়, আর কোনও শব্দের তাহা সাধ্য নয়। কেনা-বস্তুতে ক্রেতার পূর্ণাধিকার; অতএব নিরপরাধ 'নাম' মাত্র মূল্যে ভগবানে ভক্তের পূর্ণাধিকার হয়! লোকে কোন বস্তু বা বিষয়ের সামান্যত্ব বা অকিঞ্চিৎকরত্ব বুঝাইতে "নাম-মাত্র" শব্দ ব্যবহার করে, কিন্তু এস্থলে "নাম মাত্র" শব্দের অসামান্যত্ব ও মহামহিমত্ব কিরূপ! ফলিতার্থে যিনি মূল্য, তিনিই বস্তু! 'হরিমূল্য' দিয়াই হরিকে কেনা হরির বিধান! শ্রীমন্মহাপ্রভুও বহুবার বহুভাবে তাঁহার অকৈতব ভক্ত মণ্ডলীকে এই গোলক-গুহ্যতত্ত্বের উপদেশ-প্রসাদ প্রদান করিয়াছেন। তাই তাঁহার শিক্ষাষ্টকের এই দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবন্নাম-মাহাত্ম্য ঘোষণার্থ জগৎ লোমাঞ্চিত করিয়া তারস্বরে গাহিয়াছেন,—"নিজ সর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা"

"নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।"—

দয়ার সীমা নাই। ভগবান তাঁহার এহেন নামের স্মরণাদি সাধনে কোন কালাদির নিয়মাপেক্ষা রাখেন নাই। প্রাত্যহিক আহ্নিক-কৃত্যে যে ত্রিসন্ধ্যা নাম-জপাদির বিধি, সূক্ষ্ম বিচারে তাহা গৌণ; পরন্তু কালাকাল-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বকাল নাম-স্মৃতি বা নামে স্থিতিই মুখ্য বিধি।

"হরিসে লাগি রহোরে ভাই!
তেরা কাল অকাল মিটি যাই।।"

নামে লাগাই হরিতে লাগা। নামে লাগিয়াই থাকিতে পারিলে আর কালাকাল-বিচার-সাপেক্ষ নাম-জপাদির বিধি-বিশেষত্ব কোথায়? কোন যবন-যোগীর মুখে এই ভাবের একটি গান শুনা ছিল।—

"হর দমে আল্লাজীর নাম লিও।
দমে দমে লিও নাম, কামাইনা দিও।।"

ইত্যাদি। বড় প্রাণে লাগিয়াছিল; তাই যাবনিক হইলেও এবং বহুদিনের শ্রুত হইলেও আর ভুলিতে পারি নাই। কথা কটি একেবারেই খাঁটি। আহা যেন গীতা-ভাগবতের তরজমা! "সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং" "যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ" "কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং" "নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ" ইত্যাদি ঐ ভাবের ভূরি-ভূরি বাক্য জগন্মান্য পরম প্রামাণ্য গীতা গ্রন্থের অধ্যায়ে অধ্যায়ে অধীত হইয়া থাকে। উদ্ধৃতির স্থানাভাব। ভাগবতাদি পুরাণশাস্ত্র ত ঐ ভাবের উক্তি-মুক্তাহারে বিশিষ্টরূপেই বিভূষিত!

অপরন্তু যে সময়ে শুচি থাকা যাইবে, সেই সময়েই নাম লওয়া চলিবে, কিন্তু অশুচি থাকার সময়ে নহে, এসব নিম্নাধিকারী "প্রবৃত্ত" সাধকের জন্য গৌণবিধি; মুখ্যতঃ এবম্বিধ শৌচাশৌচ-সময়-সাপেক্ষতা নাম-গ্রহণ বিষয়ে বর্জ্জিত। তবে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম-কর্ম্মের অন্যবিধ অঙ্গসম্পাদনে কর্ত্তার শুচি-কালের অপেক্ষা আছে। আহা! সে শুচিত্বও সংক্ষেপতঃ নামগ্রহণেই নিষ্পাদ্য। "বিষ্ণু"-স্মৃতি-আচমনেই সর্ব্বশৌচ সম্পাদন।

"অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাংগতোঽপিবা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥"

শুচি বা অশুচি—ইতি সর্ব্বাবস্থাগত—
যে স্মরে বিষ্ণুরে—সেই বাহ্যান্তর-পূত।

তবে যে সেই নামজপেরও উপক্রমে পূর্ব্বক্ষণে আচমনে বিষ্ণু-স্মরণ, সে কেবল গঙ্গা-পূজার উপকরণ গঙ্গা-জলে ধৌতকরণ! অগ্নি স্বতঃপূত বলিয়াই পাবক। অগ্নির এক নামই "সদাশুচি"। অশেষ-কর্ম্ম-দাহক মহাঅগ্নি নামও ভুবন-পাবন ও সদাশুচি।

মনে করুন, যে সময়ে কেহ মলত্যাগ করিতেছে, আচারতঃ সে সময়টা তাহার অতি অশৌচের সময় বটে; কিন্তু তাই বলিয়া তখন কি অন্ততঃ মনে মনেও নাম স্মরিতে পারে না? ভাবুন, তখন যদি তাহার অন্তকাল উপস্থিত হয়; অন্ততঃ কোন বিপদ হয়, তখন কি সেই সাময়িক ও বাহ্যিক অশৌচের বাধায় তাঁহাকে কেহ না ডাকিয়া পারে? তখন কি আর শৌচ-সময়ের সাপেক্ষতা সম্ভবে? প্রকৃতি তখন আপনি ভগবন্নাম-স্মৃতি আনিয়া দেন। ফলে সেরূপ ঘটনা না ঘটিলেও, সে সময়ে এবং কোন-সময়েই নাম স্মরণের বাধা নাই, বরং বিশেষ আবশ্যকতাই আছে। এমন একটা কালই কল্পিত হইতে

পারে না, যে কালে সেই কালান্তকারী সদাকাল-সাধু-স্মৃতি-বিহারী শ্রীহরির শ্রীনাম, স্মরণ অযুক্ত। জগতে অযুক্ত যাহা, তাহা ভগবন্নামে অযুক্ত থাকারই ফল।

নিত্য-নাম সাধকের অভ্যাসই স্বতন্ত্র। তাঁহাদের নামের নেশা অষ্ট প্রহর লাগিয়াই আছে। তাঁহাদের নামের আমেজের বিরাম নাই। নামের ভাবের একটানা স্রোতে তাঁহাদের জীবন স্রোতে অভেদে মিশিয়াছে। তাঁহাদের প্রতি হৃদ্‌ফুস্ফুস-স্ফুরণে—প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাস বহনে নামেরই স্ফুরণ ও বহন হইতেছে! যোগশাস্ত্রোক্ত প্রাণন-ক্রিয়ার "হংস মন্ত্র" তাঁহাদের ইষ্টনামমন্ত্র সহ একীভূত হইয়া গিয়াছে। নামের কৃপায় তাঁহাদের অন্তর্বাহ্য অহর্নিশ নাম-রসে নিষিক্ত। আহা! তাঁহারা গৃহী হইলে, তাঁহাদের স্ত্রী-পুত্র-গৃহ-ক্ষেত্রে নাম মাধুর্য্য মুদ্রিত; তাঁহাদের সাধের সংসার নাম-সৌন্দর্য্যে শোভিত! আর তাঁহারা সন্ন্যাসী হইলে, তাঁহাদের আত্মসর্ব্বস্ব নামেই সংন্যাসিত। "স্মর্ত্তব্যং সততং নাম নাত্র কালবিচারণা।"

সর্ব্বদাই নাম-স্মৃতি-সার।
নাহি তার কালের বিচার॥

কি ভোজনকালে, কি শয়নকালে; কি ভ্রমণকালে, কি রমণকালে; কি যোগকালে, কি ভোগকালে; কি বাল্যকালে, কি বৃদ্ধকালে; কি ইহকালে, কি পরকালে; নাম-স্মরণ সর্ব্বকালে। ভগবৎ কৃপায় কোনরূপ কাল নিয়মের অধীনতা না থাকাতেই এই সর্ব্বসিদ্ধিদ নাম-স্মরণ জীবের ভাগ্যে এত সুলভ হইয়াছে। ভগবন্নামসাধনই অনন্ত-কাল-সাপেক্ষ কলির জীবের জীবনসর্ব্বস্ব হওয়াতেই এই সুলভতা। যাহা যত প্রয়োজনীয়, তাহা তত সুলভ হওয়াই প্রার্থনীয়। দয়াময়ের রাজ্যে ব্যবস্থাও তদ্রূপ। জগজ্জীবন বায়ুতে আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক প্রয়োজন ও সর্ব্বদা প্রয়োজন, এই জন্য সদাগতি বায়ু সদাই সর্ব্বত্র স্বতঃসুলভ। স্থান-সাপেক্ষতা না থাকায় এই ভৌতিক জগজ্জীবন বায়ু যেরূপ সুলভ, কালসাপেক্ষতা না থাকাতে আধ্যাত্মিক জগজ্জীবন নামও তদ্রূপ সুলভ। ফলকথা, ইহা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়া, সেই প্রাণাধিক নামে নিয়ত মজিয়া থাকা নিতান্তই সাধু-গুরু-কৃপাসাপেক্ষ। হায়! সাধুসেবা-দীন গুরুভক্তিহীন আমাদের উপায় কি?

"এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্।—"

হে ভগবন্! তোমার এমনি দয়াই বটে। তাই ভক্ত কবিগণ চিরকাল "দয়ার সিন্ধু" বলিয়াও তৃপ্ত হন নাই। তবে পৃথিবীতে আর উপমা দেওয়ার কিছুই নাই, অগত্যা 'সিন্ধু' পদের প্রয়োগ। ফলে সে সিন্ধুতুলনায় এ সিন্ধু বিন্দু মাত্র!

"ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্"। পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবানের কৃপাই বিশ্বের সর্ব্বস্ব। 'ব্রহ্ম' পদে এস্থলে সেই পূর্ণব্রহ্মই লক্ষিত। নির্গুণ ব্রহ্ম নির্ব্বৃত্ত; তাঁহাতে দয়াবৃত্তির কল্পনা অদার্শনিক। পরস্পরসাপেক্ষ দুই বিরুদ্ধ সত্তার নিরপেক্ষ অবিরুদ্ধ সমাবেশেই পূর্ণত্ব। অতএব যুগপৎ নির্গুণ ও সর্ব্বগুণনিধান পূর্ণব্রহ্ম ভগবানই কৃপাময়। সেই কৃপাই জগজ্জীবন—সংসার-সার ধন।

বিরাট বিশ্বের বিপুল কুক্ষিতে লুক্কায়িত এই চতুর্দ্দশভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্মাণ্ডের

প্রকাণ্ড খ-কোষে এই ক্ষুদ্র সৌরজগৎ; তাহাতে এই অতিক্ষুদ্র পৃথিবী; তাহাতে আবার এই ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র মানব! অতএব এই অখিল অনন্ত সৃষ্টির নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের বিশ্বসর্ব্বস্ব কৃপার কথা মানুষের ভাষায় প্রকাশ-প্রয়াস প্রকৃতই প্রহসন মাত্র;—বাল-বাতুলের ব্যর্থ-চেষ্টার বিড়ম্বনা মাত্র। বলিতে কি, স্বয়ংভগবানও "ঈশ্বর" স্বরূপে সে বিষয়ে হারি মানিয়াছেন!

"কে ক'বে সে কৃপা-কথা কথার চেষ্টায়?
চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ পরাঙ্মুখ যায়!
অনন্ত অনন্তমুখে অন্ত নাহি পেয়ে,
রাখিলা সে কৃপাময়ে হিয়ায় শোয়ায়ে!
বাগ্দেবী অবাক্ নিজে বর্ণনে যাহার,
নীরবতা—নীরবতা স্তুতি মাত্র তার!
যদি কিছু স্তুতি করা আবশ্যক অতি,
"নীরবতা স্তুতি তাঁর" এই মাত্র স্তুতি।"

ভগবদবতারবিশেষ ব্যাসদেব স্তুতি দ্বারা ভগবানের অনির্ব্বচনীয়তা-খর্ব্বীকরণরূপ অপরাধ চিন্তা করিয়া "স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তা-খিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া" বলিয়া ক্ষমা চাহিয়াছিলেন। অতএব অনির্ব্বচনীয় ভগবৎকৃপা-তত্ত্বের বর্ণনার্থ বচন রচনে বিরত থাকাই বিহিত। কিন্তু প্রগল্‌ভ ভক্ত তাহা ঠিক পারে কি? এই জন্যই কবি-লেখনী প্রেমিক, পাগল ও বালককে অনেকটা এক শ্রেণীভুক্ত করিয়াছে। ফলে শ্রীভগবানের নিভৃত-নিহিত সাধের ভক্ত-হৃদয় যখন ভগবৎকৃপার ভার আর বহন করিতে পারে না, তখন তাহা আপনি উচ্ছলিত হয়। ভক্ত তখন ভাবাবেগে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ হইলেও, নয়ন কোন বাধাই মানে না! সেই ভুবন-পাবন নীরব নয়নধার কবি-কোটি-কল্পিত স্তুতিগীতিকেও পরাস্ত করে!

সিদ্ধর্ষিগণের 'নিঃশ্বসিত ন্যায়' শাস্ত্রীয় আপ্তবাক্যের কথা স্বতন্ত্র। শ্রীগৌরাঙ্গ-গঠিত গোস্বামীম-গুলীর সন্দর্ভসমূহেরই বা কথা কি? কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বর্ত্তমান, স্বনাম-খ্যাত পণ্ডিতবর ও সাধকপ্রবর অধুনা নবদ্বীপনিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত ভক্তি-বিনোদ মহাশয়ের লিখিত "হরিনাম-চিন্তামণি" গ্রন্থখানি ভগবন্নাম-কৃপা-মাহাত্ম্য ও শুদ্ধ সাত্বিক ভজনতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু প্রিয় পাঠকগণকে পড়িতে অনুরোধ করি। আশা করি, তৎপাঠে তাঁহারা বুঝিবেন যে, এই বিপুল বিষয়-বিপ্লাবিত বিংশশতাব্দীর ভগবদ্ভক্তের লৌহলেখনী-মুখেও ভগবদিচ্ছায় ভগবন্নাম-কৃপা-তত্ত্বরসের কি অমল উৎস উৎসারিত হইয়াছে!

সে যাহাহউক, শ্রীভগবান স্বকর্ম্মানুসারী বহুবিধ অধিকারী জীবের সংসার-নিস্তারণার্থ নিজের বহুবিধ নাম-বিস্তারণ ও তাহাতে নিজ সর্ব্বশক্তি সমর্পণ পূর্ব্বক যে অসাধারণ কৃপা প্রকাশ করিয়াছেন; অপিচ, তাহার স্মরণ-মননাদি সাধনে কোনরূপ সময়-সাপেক্ষতাদির অধীনতা না রাখিয়া যে কৃপার উপর কৃপা বর্ষণ করিয়াছেন, তাহাই ব্যক্ত করিতে ভক্তজীবন গৌরহরি গাহিয়াছেন—"এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্!" আহা! আমরা কি কখনও এই মহাগীতির প্রতিধ্বনি করিয়া গাইতে পারিব যে, হে জীব-সর্ব্বস্বধন! মায়ানন্দ-নীরদ!' প্রেমপারাবার—অপার করুণাধার শ্রীগৌরহরি! তোমার এই

শিক্ষা-শ্লোকে আমাদিগকে সেই কৃপার আশ্রয় লইতে তুমি (আপনি দেখাইয়া) শিখাইয়াছ। আহা! "এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্!"

"মমাপি দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।"

আমারও এমন দুর্দৈব যে, ইহাতে (এমন নামে) আমার অনুরাগ জন্মিল না! জীবের দুর্দৈব ত পদে পদে। বিশেষতঃ কলির জীবের। কিন্তু ভগবৎ-বিমুখতার ন্যায় এমন দুর্দৈব আর নাই।

"সর্ব্বৈব দুর্দ্দৈব যায় যে নামেতে ঘুচি,
এ কি এ দুর্দ্দৈব হায়! সে নামে অরুচি!"

যাহাতে সর্ব্বদুর্দ্দৈব কাটে, তাহারই অভাব-জনিত যে দুর্দ্দৈব, তাহা আর কিসে কাটিবে? "হরিস্মৃতিঃ সর্ব্ববিপদ্বিনাশিনী"— তবে সে স্মৃতির বিস্মৃতি-জনিত বিপদুদ্ধারের উপায় কি? দয়াময় নিজগুণে দয়া করিয়া পায় না রাখিলে আর উপায় নাই।

"হরির কি দয়া! হরিনামে হরি পাই।
মোর কি দুর্ভাগ্য, হেন নামে মতি নাই॥"

তবে ভরসা এই যে, এস্থলে দুর্ভাগ্য অপেক্ষা দয়ার বল বেশি, এবং দুর্ভাগাদের জন্যই দয়া। দয়ায় দুর্ভাগাদেরই দাবী।

"ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ।" রোগীর হিতার্থেই ঔষধের আবশ্যকতা, অরোগীর জন্য অবশ্য নয়। যাঁহারা নিত্য নামানুরক্ত ভাগ্যবান ভক্ত, তাঁহারা ত ভগবানের প্রেমাস্পদ; কিন্তু আমাদিগকে কৃপাস্পদ হওয়ার জন্যই কাঁদিতে হইবে।

"নামেরুচি, জীবে দয়া, সাধুর সেবন" শ্রীমন্মহাপ্রভু এই তিন অঙ্গ ধর্ম্মসাধনের উপদেশ দিয়াছেন। ইহার মধ্যে নামে রুচিই প্রধানতম বলিতে হইবে। নামেরুচি—কৃষ্ণে রুচি—একই কথা। নামে রুচির সঙ্গে সঙ্গে অপর দুইটি স্বভাবতই আসে। নামে রুচি-বৃদ্ধির সহিত রজস্তমোময় অসার বিষয়-ভোগেচ্ছায় অরুচি জন্মিতে থাকে। আর সাত্ত্বিকতা সীতপক্ষের কৌমুদীবৎ ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হইতে থাকে। সাত্ত্বিকী প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ ফল "জীবে দয়া"—এই জন্য শক্তি দেবীর সাত্ত্বিকী পূজাতেও পশু-বলিদান ও আমিষ-সংস্রব নিষিদ্ধ। যথা—"সাত্ত্বিকী জপযজ্ঞাদ্যৈর্নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ" ইত্যাদি। বিষ্ণু-সেবায় আমিষ পূর্ণ-নিষিদ্ধ; কারণ বিষ্ণুসেবা পূর্ণসাত্ত্বিকী। সাক্ষাৎ বা পরম্পরা-সম্বন্ধেও আমিষ-সংস্রবে 'জীবেদয়া' ব্যাহত হয়। এক পশুঘাতনের সংস্রব-সম্পর্কে নয় জনের ঘাতকত্ব-পাপ মনুস্মৃতির সিদ্ধান্ত। একটি অবৈধ জীবহিংসার সংস্রবে যেখানেই সাত্ত্বিকতার হানি, সেখানেই ঘাতকত্ব। এই জন্যই মাতৃক্রোড়ে কন্যার ন্যায় সাত্ত্বিকতার ক্রোড়ে জীবেদয়াকে দেখিতে পাই; অতএব সাত্ত্বিকতাই জীবেদয়ার জননী। সাধু-সেবাও সাত্ত্বিকতারই মুনি-মনোমোহিনী দ্বিতীয়া দুহিতা। এই দয়াবৃত্তি ও সেবা-বৃত্তি—উভয়ই সাত্ত্বিকতার অবশ্যম্ভাবী ফল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২০ আইন মতে রেজষ্টীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৮ম বর্ষ, ৮ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা। | মাঘ। | ১৩০৮ সাল, ১৮২৩ শকাব্দা।

শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষাষ্টক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

ভগবন্নামে রুচি দ্বারাই সাত্ত্বিকতাশক্তি যেরূপ রক্ষিতা, পোষিতা ও বর্দ্ধিতা হয়, অন্য কোন সদ্গুণ বা সদ্বৃত্তি-বলেও সেরূপ হইবার নহে। আক্ষেপের বিষয়—ততোধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ হেন নামে রুচি কেবল দুর্দ্দৈব-দোষে—স্বকর্ম্মবশে ভাগ্যে ঘটিল না। এদিকে "গণা-দিন"ও ফুরাইয়া আসিল; সুতরাং কবে আর ঘটিবে বা কখনও ঘটিবে কি না—কোটি কল্পেও ঘটিবে কিনা, তাহা সেই একজনই জানেন। কিন্তু কখন না কখন—কোন না কোন জন্মে যে ঘটিবেই, শাস্ত্রে এইরূপ আভাষ-আশ্বাস পাওয়া যায়। ফলে মানবাত্মার তাহাতে নির্ভর সম্ভবে না। দুর্লভ মানব-জন্মেই ভগবদনুরাগ জাগে, ভগবৎ-বিরহ লাগে; তাই সাধন-ভজনের ব্যবস্থা। তাই বেদ-পুরাণ-তন্ত্র—স্তুতি-গীতি মন্ত্র। তাই যাগ যজ্ঞ তীর্থ-ধর্ম্ম, জ্ঞান-ভক্তি-যোগ-কর্ম্ম। তাই যুগে যুগে অবতার। কলিযুগে মহাপ্রভুর নাম-প্রেম প্রচার। নাম-নামীর সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের বিকাশ। তাই এই শিক্ষাষ্টকেরও প্রকাশ।

নামানুরাগশূন্য যে নাম-করা, তাহা "নামাভাস" মাত্র হইলেও, তাহারও যে অসাধারণশক্তি, তাহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে; কিন্তু আধুনিক যুক্তি-বিজ্ঞান-প্রিয় অনেকের তাহাতে হয়ত আস্থা নাই। এই জন্য তাঁহারা হয়ত সানুরাগ—নিরনুরাগ-

উভয়বিধ নাম-সাধন ছাড়িয়া বেশ নিশ্চিন্ত আছেন। ইহা কেবল কলি-কুহকের ক্রিয়া-ফল মাত্র। শব্দ বা বর্ণবিশেষের সংযোজনে, তদুচ্চারণে বা তন্মননে, "মূলাধারাদি আজ্ঞা-চক্রান্ত পর্য্যন্ত" কোন চিত্তাড়িম্ময়ী নাড়ী-বিশেষের বিকম্পনে, কিরূপে কোন্ বিজ্ঞানে এই নামে এবং এমন কি—নামাভাসেও যে ঐশী শক্তির বিকাশ হয়, তাহা বুঝিবার সাধ্য অস্মদাদৃশ অসিদ্ধ মানবে সম্ভবেনা। তবে শাস্ত্রের আপ্তবাক্যে যাঁহাদের দৃঢ়নিষ্ঠা বা প্রতীতি-প্রতিষ্ঠা, তাঁহারা অতএব এ তত্ত্বে বিশ্বাসবান; সুতরাং তাঁহারা পরম ভাগ্যবান, সন্দেহ নাই। আমরা যাহা বুঝিনা, তাহাই হইতে পারে না, এরূপ প্রগল্‌ভ প্রলাপ বা ধৃষ্টধারণা ফলিতার্থে মূর্খতা মাত্র। ভগবানের কার্য্য যে কোন্ শক্তির কি গুপ্তরহস্য-বলে—কোন্ বিজ্ঞানাতীত বিজ্ঞান কৌশলে সম্পাদিত হয়, তাহা তিনিই জানেন। তবে শাস্ত্রে ও মহাজন-বাক্যে যাঁহার বিসংশয় বিশ্বাস, তিনিই সত্য সুবুদ্ধিমান ও সৌভাগ্যবান, শাস্ত্রই এ কথা বলিয়াছেন। কারণ তিনি ভোজ্যের প্রস্তুতি-প্রক্রিয়ায় অজ্ঞ হইলেও ভোজনে বিজ্ঞ।

নিরনুরাগ নামে বা নামাভাসে পাপ যায়, সানুরাগ নাম-সাধনে পুণ্যও যায়! অর্থাৎ পাপ-পুণ্য-দ্বন্দ্বাত্মিকা বাসনাই যায়। "ন পাপং ন পুণ্যং ন সৌখ্যং নদুঃখং" অবস্থা অর্থাৎ মুক্তাবস্থা লাভ হয়; কিন্তু সাধককে নৈষ্কর্ম্য বা মুক্তি দিয়াই নামের কার্য্য শেষ হয় না। কাম-পাশ হইতে মুক্তি দিয়া, নাম জীব সাধককে আবার প্রেম-পাশে বন্ধনের আয়োজন করেন। কিন্তু সে বন্ধন প্রকৃত বন্ধন নহে; তাহা মুক্তিরও মুক্তি! তাহা প্রেমানন্দময়ী পরাভক্তি! সে পাশ নহে; সে পরমার্থ-পরিমলময় হরি-প্রেম-পুষ্পহার! সে হার পরিতে ব্রহ্মলোক ব্যগ্র! শিবলোক পাগল! নরলোকের আর কথা কি?

মুক্তির পর যে বাঁধন, সে যে কেমন বাঁধন—কেমন স্পৃহনীয় বাঁধন, তাহার একটা কথঞ্চিৎ পার্থিব দৃষ্টান্ত কল্পনা করা যাইতে পারে। তদ্দ্বারা আমরা কিছু আভাস পাইলে পাইতে পারি। মনে করুন, সমস্ত দিনের সর্ব্ববিধ গৃহ-কার্য্য হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, নিভৃত নিশীথে সতীকুলবতীর পতি-প্রেমালিঙ্গন-পাশ কেমন? সেও ত বন্ধন বটে, কিন্তু কি স্পৃহনীয়, প্রাণারাম ও পরমানন্দময়! সেইরূপ সিদ্ধ ভক্ত সাধুগণ সংসার-মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া, সেই গোপীকান্তের করুণ কটাক্ষে গোপী-কৃপাশ্রয় ও প্রকৃতি-ভাবাশ্রয় লাভ করিয়া, সেই পরমপুরুষ প্রাণ-পতি কৃষ্ণধনের পাদপদ্মের প্রেমালিঙ্গনে পরম-কৃতার্থ ও চরম চরিতার্থ হইতে পারেন। এ যদি বাঁধন হয়, তবে এই বাঁধনের জন্যই সকল সাধন। এই বাঁধনের জন্যই সাধকের মুক্তি বা বিষয়-বাঁধন বিমোচন। এ বন্ধনে বেদন নাই; এ পীযূষ-প্রলেপ! এ যে কৃষ্ণচন্দ্র-চন্দ্রিকার রজত-রশ্মি-রজ্জুর বন্ধন!

"যে বাঁধনে রাধা বাঁধা রাস-কেলিকুঞ্জে।
রাধা-পদরেণু হয়ে ভক্ত তাহা ভুঞ্জে॥"

কিন্তু জীব মুক্তি লাভে শিব না হলে, সে ভক্ত হতে শক্ত হয় না।

"সংসার-সন্ন্যাসী শিব নিত্যমুক্তত্ব।
হরি-প্রেমে বাঁধা পড়ে হরিনামে মত্ত॥"

নামে রুচি না হইলে কিছুই হইবে না। ভজন-পথে একপদও অগ্রসর হওয়া যাইবে না। টিকা-বাঁধা, নামাবলী-ছঁদা, কণ্ঠী-আঁটা, তিলককাটা, ছেঁড়া কাঁথা, নেড়া মাথা; গেরুয়া, করোয়া, কিছুতেই কিছু কুলাইবেনা। একমাত্র নামে রুচির অভাবে অপর কোটি উপকরণে কোটিকল্পেও কৃষ্ণ-পূজা হইবে না।

অতএব নামানুরাগের অভাবের ন্যায় দুর্দৈব জীবের আর কি হইতে পারে? "নামমাত্র" নাম ত আমরাও করিয়া থাকি। আমরাও কখনবা থিয়েটারের ষ্টেজে নিমাই, প্রহ্লাদ, বিল্বমঙ্গল বা হরিদাস সাজিয়া হরি-নামের বন্যা বহাইয়া দিই; এবং তাহাতেও অন্ততঃ নামাভাসের ফল পাই; কিন্তু যখন হয়ত কেবল মৎলবী হুজুকে মাতিয়া হরি-সংকীর্ত্তনে হদ্দ চেঁচাইয়া গলা ভাঙ্গি, লোক-দেখানো নাচ নাচিয়া পা ভাঙ্গি এবং কখন কখন সজ্ঞান "দশা" বা দুর্দ্দশায় পড়িয়া মাথা ভাঙ্গি, তখন কেবল "নাভে ব্যাং অপচয়ে ঠ্যাং" হয়। কারণ একে ত নামে অরুচি, তাতে আবার নামাপরাধ; সুতরাং সে স্থলে নামাভাসের গৌণ-ফলও আমাদের ভাগ্যে দুর্লভ হয়। 'নারায়ণ' নামাভাসে অজামিলের এবং 'রাম' নামাভাসে ম্লেচ্ছের পাপক্ষয় ও সদ্গতিসঞ্চার হইয়াছিল, তাহার হেতু-রহস্য এই যে, তাহারা "নামা-ভাস" করার পর আর "নামাপরাধ" না করায় ঐ ফলের অধিকারী হইয়াছিল। আমা-দের নামাভাসে পাপের বোঝা কমে না কেন? যদিও নামাভাসের সময়ে একটু ভার লঘু লাগিতে পারে, পরে বিবরে ঢুকিলেই আবার যেন যে সেই! হাপরের রক্তোজ্জ্বল লোহা তুলিতে তুলিতেই আবার যে কালো সেই কালো! আমাদেরও ঐ দশা। নামা-ভাসের ম্লান জ্যোৎস্নায় হয় ত সাময়িক ভাবে একটু আলো পাই; আবার পরক্ষণেই আমাদের প্রাণের ভিতর হইতে কে যেন ব্যঙ্গস্বরে বলিতে থাকে—"তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে!" এরূপ বিড়ম্বনার কারণ কেবল আমাদের নামাপরাধ। নামাভাসে একটুকু উঠি, নামাপরাধে আবার ততোধিক নামিয়া পড়ি। এইরূপে আমাদের একপদে উন্নয়ন, পরপদে অধঃপতন ঘটিতেছে।

"নামাভাসে অপরাধ এড়ি পাপ যায়।
রুচিযোগে-অনুরাগে নামে প্রেম পায়॥"

এই শিক্ষা ভুলিয়া আমরা নামাভাস-শক্তির সাহায্য লাভে অনেক সময়েই বঞ্চিত হইতেছি। একদিকে যেমন সে শক্তি সঞ্চিত হইতেছে, অপরদিকে অমনি অপ-রাধে তাহা অপব্যয়িত হইতেছে। তবে আর আশা কোথায়?

আশা আছে। আমাদেরই রুচির অভাব, অমৃতের ত অভাব হয় নাই। হরিনামের ত আর লোপ হয় নাই। যখন নাম আছে, তখন সব আছে; সুতরাং আশাও আছে। আমরা সদাই সাপরাধ হইলেও এবং নাম না পাইলেও, নামাভাসেই আমাদের নির্ভর করিতে হইবে। মগ্ন তরীর ভগ্ন কাষ্ঠখণ্ডও মজ্জমানের ত্যাজ্য হইতে পারে না। এই অধমাধিকারে নামাভাসও আমাদের আরাধ্য-ধন। 'গুরোঃ কৃপাহি কেবলম্‌" সার করিয়া, এই নামাভাস নিয়াই আমাদের

পড়িয়া থাকিতে হইবে। নামাপরাধীকে নামই নিস্তার করিবেন।

"ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্।
ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং পরম্॥"
ভূমে যে আছাড়ি পড়ে ভূমিই আলম্ব তার।
তোমাতে অপরাধীর তুমিই আশ্রয় সার॥

নামাপরাধীর নামাশ্রয়-প্রপন্নতাও এই প্রকার।

পিত্তদোষ-দুষ্ট-রসনায় মিশ্রী তিক্ত লাগে; কিন্তু তবু যেন জোর করিয়া সেই ত্রিদোষঘ্নী মিশ্রী মুখে রাখিতে রাখিতে সময়ে সেই রসনায় আবার সেই মিশ্রীই মিষ্ট লাগে!

"হরি সে লাগি রহো রে ভাই!
তেরা বনত বনত বনি যাই।"

লাগিয়া থাকিতে পারিলে একদিন বনিয়া যায়। নাম লইয়া পড়িয়া থাকিলে, নামের অমৃতমাধুর্য্য-রসে ক্রমে আপনি মন বসে। নামে মন বসিলে, অর্থাৎ রুচি আসিলে, আর নামাপরাধের ভয় থাকে না। হয়ত প্রথম প্রথম রুচির আস্বাদ ভাল বুঝা যায় না। কখনও নাম হয়, কখনও নামাভাস হয়। সে নামাভাসেরও ফল তখন ফলে; কারণ রুচির শুভ সমাগম হইতে থাকিলেই নামাপরাধ দূরে পালাইতে থাকে। এতাবতা নামেরুচি বা নামানুরাগই সাধনের মূলধন,—ভজনের অনন্য উপকরণ। এই সুসম্পন্ন সাধনযন্ত্র দুর্লভ মানব-দেহ পাইয়া, যাহার কর্ম্মদোষে একমাত্র ভগবন্নামানুরাগ-বিরহে ইহা কেবল কামারের জাঁতার ন্যায় শুধু শ্বাস-প্রশ্বাসের জড়-যন্ত্ররূপে গণিত, তাহার মত দুঃখী কে? হায়! ভগবন্নামানুরাগ-বিরহে যে মানবের স্বভাব-স্বর্গ নরকে অবরুদ্ধ, হৃদয়-নন্দন শ্মশানে পরিণত, তাহার মত অভাগা কে? ভগবন্নামানুরাগে বঞ্চিত হইয়া, যাহার সঞ্চিতধন নষ্ট, মুখের গ্রাস ভ্রষ্ট, হাসির স্থানে অশ্রুরাশি, আশা-উল্লাসের স্থানে হা-হুতাশ, তাহার মত দুর্দ্দৈব-তাড়িত—দুর্দ্দশা-পীড়িত দীনাতিদীন দয়ার পাত্র কে আছে? বিশেষতঃ কর্ম্ম-ভূমি ধর্ম্ম-ক্ষেত্র—প্রেমময় ভগবানের বিবিধ বিচিত্র প্রেম-লীলা-বিলাস-ক্ষেত্র—গোলক-গৌরবস্পর্দ্ধী ভারত-ভূলোকের লোকের পক্ষে এ দারুণ দুর্দ্দৈব জন্য উপযুক্ত আক্ষেপবাক্য ভাষা-ভাণ্ডারে দুর্লভ। হায়! আমরা—

"গঙ্গাতীরবাসী হয়ে তাপিত তৃষায়!
কল্পতরুতলে রয়ে ক্ষোভিত ক্ষুধায়!!"

জীবের এ হেন শোচনীয় দুর্দ্দশা লক্ষ্য করিয়াই আর্ত্ত জীবের অন্তরাত্মার নীরব করুণ ক্রন্দন সরব করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের উক্তি————"মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।"

এই ভাবের একটি রামপ্রসাদী সুরের বৈষ্ণব-সংগীত এই স্থানে নিবেদন করিলাম -

"(হরি) নাম-রসে মন মজ্‌লনারে॥
(এ যে) কি অমৃতে কি অরুচি, মন বুঝি তা বুঝ্‌লনারে॥
(হরি) নাম-বন্যা বহালে নিতাই, মন-মরু মোর ভিজ্‌লনারে॥
কৃষ্ণ কতই নাম নিলেন, নিজ তত্ত্ব নামে দিলেন,
যুগলরূপে নামে এলেন, এমন নাম মন ভজ্‌লনারে।
দয়াল হরির দয়া যেমন, এ দীনের দুর্দ্দৈব তেমন,
নামামৃত পেয়ে এমন, বিষয়-বিষ ত্যজ্‌লনারে॥"

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

ভ-গোল পরিচয়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কুম্ভ রাশির

পূর্ব্ব ভাদ্র পদ নক্ষত্র।

শ্রবিষ্ঠা মণ্ডলের পূর্ব্ব ভাগে যে তারাময় সমচতুর্ভুজ ক্ষেত্র লক্ষিত হয়, ঐ সমচতুর্ভুজ ক্ষেত্র পক্ষিরাজ মণ্ডলে অবস্থিত; এই সম চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের কোণ চতুষ্টয়ে যে চারিটী তারা আছে, এই তারা চতুষ্টয় গো-ক্ষুর সদৃশ, ভদ্রা বা সুরভির পদ চতুষ্টয় ভাদ্র পদ বলিয়া খ্যাত। তারা চতুষ্টয়ের পশ্চিমস্থ তারা দ্বয়ে পূর্ব্ব ভাদ্র পদ নক্ষত্র গঠিত। এই তারা দ্বয়ের উত্তরস্থটীর নাম সুরভি। এই সুরভী তারা পূর্ব্ব ভাদ্র পদ নক্ষত্রের যোগ তারা। দক্ষিণস্থ তারাটীর নাম মুরা।

কুম্ভ-রাশি।

জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে কুম্ভ রাশির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কলসধারী শীর্ষোদর চরণ রহিত পুরুষ বলিয়া বর্ণিত, কিন্তু আকাশে এরূপ কোন মূর্ত্তি লক্ষিত হয় না, তবে শতভিষা নক্ষত্রকে ঘট বা কলস বলিয়া কষ্ট কল্পনা করা যাইতে পারে।

মীন রাশির।

উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্র।

পক্ষিরাজ মণ্ডলস্থ তারাময় সমচতুর্ভুজ ক্ষেত্রের অগ্নি কোণস্থ ও ঈশান কোণস্থ তারাদ্বয়ে উত্তর ভাদ্র পদ নক্ষত্র গঠিত। তারাদ্বয়ের উত্তরস্থ তারাটীর নাম প্রতিষ্ঠাতারা। এবং এই তারা উত্তর ভাদ্র পদ নক্ষত্রের যোগ তারা, এবং দক্ষিণস্থ তারাটীর নাম গোপদ, পূর্ব্ব ও উত্তর ভাদ্র পদ নক্ষত্র দ্বয়ের তারা চতুষ্টয় পর্য্যঙ্কাকৃতি বলিয়া জ্যোতিষ শাস্ত্রে বর্ণিত।

মীন রাশিস্থ

রেবতী নক্ষত্র।

সুরভি তারা ও গোপদ তারা সংযোজিত করিয়া ঐ সংযোগ রেখা অগ্নি কোণে প্রসারিত করিলে, গোপদ তারা হইতে ছয় হাত দূরে একটী ক্ষুদ্র তারা স্পর্শ করিবে, এই ক্ষুদ্র তারার নাম মৎস্যপালক, মৎস্য পালক তারা ও তাহার পূর্ব্বস্থ অপর দুইটী ক্ষুদ্র তারা এই তারাত্রয় মৎস্যপুচ্ছাকৃতি। মৎস্য-পুচ্ছের পূর্ব্বস্থ-তারার নাম মূল কীলক, মৎস্য পুচ্ছের উত্তরে নব তারায় মৎস্য-দেহ গঠিত। এই দ্বাদশ তারায় রেবতী গঠিত। রেবতীর সম্মুখে একটী তারা-স্তবক অবস্থিত। এই তারা স্তবকের পাশ্চাত্য নাম স্তবক রাজ্ঞী, পুরাণে এই স্তবক রাজ্ঞী মাতৃকা রেবতী নামে বর্ণিত।

মূল কীলক তারা রেবতী নক্ষত্রের যোগ তারা, এবং এই তারার ১০ পল পূর্ব্বস্থ বিন্দু মেষ রাশির আদিস্থান, এই জন্য এই তারার নাম মূল কীলক, তারাময় মৎস্য উল্লম্ফন ভাবে অবস্থিত, এই জন্য মৎস্যটী রেবতী নামে অভিহিত, বেদ মতে রেবতী নক্ষত্র এক তারাময়, ক্রমে রেবতীর কলেবর বৃদ্ধি হইয়া রেবতী ত্রিতারক ময় দ্বাদশ তারকময় বা দ্বাত্রিংশৎ তারকময় হইয়াছে।

মীন রাশি।

কুম্ভ রাশির ঈশান কোণে মীন রাশি অবস্থিত। মৎস্যাকৃতি রেবতী হইতে এই রাশি মীন রাশি বলিয়া খ্যাত।

মতান্তরে মীন রাশি তারাময় মৎস্য যুগল রূপে বর্ণিত, মীনের সম্মুখে মৎস্যাকৃতি মাতৃকা রেবতী অবস্থিত। [ক]

মাতৃকা রেবতী পাশ্চাত্যে স্তবক রাজী নামে অভিহিত, এবং দেখিতে ক্ষুদ্র মেঘ-খণ্ড সদৃশ, ইহার আয়তন ২ × ৪ ইঞ্চি [খ]

মেষ রাশিস্থ

অশ্বিনী নক্ষত্র।

রেবতী নক্ষত্রের পূর্ব্ব ভাগে অশ্বিনী নক্ষত্র অবস্থিত। মূল কীলক তারা হইতে ঈশান কোণ অভিমুখে একটী রেখা টানিলে ১৬ হাত দূরে দুইটী তৃতীয় শ্রেণীর শুভ্র বর্ণ উজ্জ্বল তারা দৃষ্টি-গোচর হইবে। তারা দ্বয় পরস্পর দুই হাত ব্যবধানে অবস্থিত, এই তারা দ্বয়ের উত্তরস্থ তারাটীর নাম অমল, এবং দক্ষিণস্থ তারাটীর নাম শির-স্ত্রাণ তারা, শিরস্ত্রাণ তারার এক ফুট অগ্নি কোণে পঞ্চম শ্রেণীর একটী ক্ষুদ্র তারা আছে। এই তারাত্রয়ে অশ্বিনী নক্ষত্র গঠিত। তারা-ত্রয় অশ্বমুখাকৃতি এবং এই জন্য এই নক্ষত্রের নাম অশ্বিনী, অমল তারা অশ্বি-নীর যোগ তারা, এই তারা-ত্রয়ের আকৃতি গড্ডলিকার লাঙ্গুল সদৃশ। এবং অশ্বিনী নক্ষত্র মেষ রাশির লাঙ্গুল গঠন করিতেছে।

মেষ রাশিস্থ

ভরণী নক্ষত্র।

অশ্বিনী নক্ষত্রের পূঃ পূঃ উঃ কোণে এবং অমল তারা ও দেবসেনা তারার যোগ রেখার মধ্য ভাগের উত্তরে, একটী ক্ষুদ্র তারাময় ক্ষুদ্র সমদ্বিবাহু ত্রিভুজক্ষেত্র রক্ষিত হয়, ত্রিভুজের কোণ ত্রয়ে তিনটি ক্ষুদ্র তারা অবস্থিত, এই তারা ত্রয়ে ভরণী নক্ষত্র নির্ম্মিত, ভরণীর পূর্ণ নাম অপভরণী। ভরণীর দেবতা যম, এজন্য ভরণীর অপর নাম যাম্যা। ভরণী নক্ষত্রে মেষ-মুণ্ড গঠিত। ত্রিভুজের পূর্ব্ব কোণস্থ তারা ভরণীর যোগ তারা।

মেষ রাশি।

মীন রাশির ঈশান কোণে মেষ রাশি অবস্থিত, এই রাশিতে অশ্বিনী ও ভরণী নক্ষত্র অবস্থিত, ভরণী মেষমুণ্ড রূপে, এবং অশ্বিনী মেষ লাঙ্গুল রূপে অবস্থিত, ইহা পরিষ্কার নয়ন গোচর হয়।

তারা—নক্ষত্র।

রাত্রিকালে ভ গোলে ক্ষুদ্র হীরক-খণ্ড সদৃশ যে সকল জ্যোতিষ্ক দৃষ্ট হয়, তাহাদিগের নাম তারা সমুদ্র (অন্তরীক্ষ) সলিলে সন্তরণ কারী ঐ সকল জ্যোতিষ্ক তারা নামে খ্যাত, চলিত ভাষায় নক্ষত্র শব্দ ভ গোলস্থ ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক বা তারা অর্থে ব্যবহৃত হয়, এবং

(ক) পুরাণে তারা গুচ্ছ, তারা স্তবক, এবং বাষ্প স্তবকগণ মাতৃকা নামে বর্ণিত এবং মানব জাতির পরম শত্রু বলিয়া কথিত।

(খ) রেবতী মৎস্যের মস্তক সংলগ্ন স্তবক রাজী, পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় যেন আদিমীন মনুর নৌকা শৃঙ্গে ধারণ করিয়া সমুদ্রে (অন্তরীক্ষে) অদ্যাপি সন্তরণ করিতেছে।

বেদাদিতে নক্ষত্র শব্দ তারা-শব্দের প্রতিপদ-রূপে-ব্যবহৃত-থাকা লক্ষিত হয়। "যাঁহারা ইহলোকে পঞ্চযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা তারালোকে গমন (নক্ষণ) করেন, এজন্য তারার নাম নক্ষত্র"। (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১।৫।৩।৫; তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১।১১) যথা "অত্রি আদি সপ্ত ঋষিগণ তপশ্চরণে সৃষ্টি বিধান করিয়া অধুনা নক্ষত্র রূপে দ্যুলোকে অবস্থিতি করিতেছেন"। (তৈঃ আঃ ১।১১)। সূর্য্যালোকে বীর্য্যশূন্য বা প্রতিভা শূন্য হয় বলিয়া নক্ষত্র নাম। (শতপথ ব্রাহ্মণ ২।১।২)। অথবা "তপস্যা হইতে ক্ষান্ত নহে" এই অর্থে ন-ক্ষত্র নাম। (কাশী খণ্ড ১৫)। মৎস্য পুরাণ মতে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না বলিয়া ন-ক্ষত্র নাম। (ন ক্ষীয়তে,) আবার জর্ম্মন্ মতে নক্ (অন্ধকার) হইতে ত্রাণ করে বলিয়া নক্ষত্র নাম, এবং সমুদ্র (অন্তরীক্ষ) সন্তরণকারী বলিয়া নক্ষত্রের তারা নাম। (তৈঃ ব্রাঃ ১।৫।৩।৫)। অথর্ব্ব বেদে নক্ষত্রগণ দেবতা বলিয়া কীর্ত্তিত-(অঃ বেঃ ১৩।১।৪০)। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ-মতে নক্ষত্রগণ দেবগণের-গৃহ (তৈঃ ব্রাঃ ১।৫।৩।৫।) এবং আদি সৃষ্ট জীবগণের আবাস ভূমি (তৈঃ ব্রাঃ ১।৫।৩।৫) শতপথ ব্রাহ্মণ মতে স্বর্গগত সাধুজনের প্রতিভা নক্ষত্ররূপে লক্ষিত হয়। (শঃ ব্রাঃ ৬।৫।৪।৮) পদ্মপুরাণ মতে নক্ষত্র পূজক নক্ষত্র সদৃশ প্রভা সম্পন্ন হইয়া নক্ষত্র লোকে বাস করেন, (কাশী খণ্ড ১৫) এবং দেশীয় জন-প্রবাদ মতে তারাগণ মৃত মানবদের চক্ষু।

নক্ষত্রবিদ্যামতে তারাগণ এক এক সূর্য্য। রাশি চক্রের আয়তন-৩৬০°×১৬। সূর্য্য সিদ্ধান্ত মতে এই রাশি চক্র বা ভ-চক্রের—এক সপ্ত বিংশ অংশের এক এক অংশের নাম এক নক্ষত্র। রাশি চক্রের ২৭টী অংশ ২৭ নক্ষত্র বলিয়া গণ্য। (১) (সূঃ সিঃ ১২।২৫)। সুতরাং এক নক্ষত্র রাশি চক্রের এক অংশ যাহার দৈর্ঘ্য ১৩⅓ অংশ এবং বিস্তৃতি ১৬ গতিকে এক নক্ষত্র বহু তারকময় স্থান এবং ঐ স্থানস্থ প্রধান তারা বা তারা চয়ের নামে ঐ স্থান খ্যাত।

যথা অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী ইত্যাদি শব্দ স্থান বাচক। অশ্বিনী নক্ষত্র বলিলে ভ-চক্রের এমন একনির্দ্দিষ্ট ভাগ বুঝিতে হইবে, সে নির্দ্দিষ্ট ভাগে অশ্ব মুণ্ডাকৃতি তারাত্রয় আছে। অপভরণী (ভরণী) নক্ষত্র বলিলে রাশি চক্রের এমন এক নির্দ্দিষ্ট-ভাগ বুঝিতে হইবে, সে নির্দ্দিষ্ট ভাগে ত্রিকোণাকৃতি তারাত্রয় আছে। কৃত্তিকা নক্ষত্র বলিলে রাশি চক্রের এমন এক নির্দ্দিষ্ট ভাগ বুঝিতে হইবে, সে ভাগে ৬য়টী তারায় একখানি ক্ষুর গঠিত করিয়া রহিয়াছে। জ্যোতিষ শাস্ত্রে নক্ষত্র শব্দ সংজ্ঞা মাত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং বর্ত্তমানে নক্ষত্র শব্দের মুখ্য অর্থ তারাময় রাশি চক্রের এক বিভাগ বা খণ্ড এবং গৌণ অর্থ তারাপুঞ্জ। বর্ত্তমানে জ্যোতিষিক প্রয়োগে নক্ষত্র শব্দ তারা শব্দের প্রতি শব্দ রূপে ব্যবহৃত না হইয়া তারাপুঞ্জ অর্থেই ব্যবহৃত হইতেছে।

---

(১) পুনঃ দ্বাদশধা আত্মানং বিভজৎ রাশি সংজ্ঞকং
নক্ষত্র রূপিণং ভূয়ঃ সপ্তবিংশ আত্মকাংশী।

যথাঃ (১) গ্রহ নক্ষত্র তারাণাং
ভূমে বিশ্বস্য বা বিভুঃ। ইতি (সূঃসিঃ ১২।২৮)
(২) সূর্য্য চন্দ্রমসৌ তারা
নক্ষত্রাণি গ্রহৈঃ সহ। ইতি বিষ্ণু পুরাণ ২।১৩
(৩) এবং সূর্য্য-প্রভাবেন
সর্ব্বাঃ নক্ষত্র তারকাঃ। ইতি কৌর্ম্মে ১৮
(৪) গ্রহ নক্ষত্র তারাণাং
অধিপঃ বিশ্ব ভাবন। ইতি বাল্মীকি ৬।১০৬।১৫
(৫) নক্ষত্র তারা গ্রহ সঙ্কুলাপি
জ্যোতিষ্মতী চন্দ্রমসৈব রাত্রিঃ। রঘুবংশ ৬।২২
ইত্যাদি ভূরি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

কিন্তু এই সমস্ত ভাষাবিৎ ভাষাগঠক ভাষা বিশোধক শাস্ত্রকার ও মহাকবিগণে শাস্ত্রে শিষ্ট প্রয়োগ উপেক্ষা ও অবহেলা করি বঙ্গীয় সুলেখক ও গ্রন্থকারগণ তারা অ নক্ষত্র শব্দ ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইবে তাহা বলা বাহুল্য।

শাস্ত্রে বলে ধ্রুব তারা অগস্ত্য তার (সূঃ। সিঃ ১২। ৪৩; ৮। ১০) ধ্রুব নক্ষ বলিলে সহসা শ্রোতার ভ্রম জন্মে। শাস্ত্রে স্বাতি নক্ষত্র ধনিষ্ঠা নক্ষত্র। স্বাতি তা ধনিষ্ঠা তারা বলিলে পাঠকের মন রাশি চক্র হইতে ৩০ উত্তরে সঞ্চালিত হয়। এরূ প্রয়োগ বিশদ বা শিষ্ট নহে।

খ—গোলস্থ প্রথম শ্রেণীর তারাগণের স্থূলত্ব পর্য্যায় তালিকা।

বীথিকা।	মণ্ডল বা রাশির নাম।	তারা-নাম।	বর্ণ।
৩	মৃগব্যাধ	লুব্ধক	
৭	কুতেশ	নিষ্টা	কুঙ্কুম
"	মহিষাসুর	জয়	শুক্ল
২	ব্রহ্ম	ব্রহ্মহৃৎ	পীত
৯	বীণা	নীলমণি	জরদা
৩	কাল পুরুষ	বাণরাজ	নীলাভশুক্ল
১	স্বামী	নদীমুখ	শুক্ল
৩	অর্ণববান	অগস্ত্য	"
৪	শুনী	সরমা বা প্রভাস	নীলাভশুক্ল
৭	মহিষাসুর	বিজয়	শুক্ল
৩	কালপুরুষ	বিশাখ	রক্ত
২	বৃষরাশি	হলদ্বীবর্ণ	পীতবর্ণ
৬	ত্রিশঙ্কু	বিশ্বামিত্র	শুক্ল
৮	বৃশ্চিক রাশি	পারিজাত	রক্তবর্ণ
১০	গরুড়	বাসুদেব	নীলাভশুক্ল

ভ—গোলস্থ প্রথম শ্রেণীর তারাগণের ভূলম্ব পর্য্যায় তালিকা।

বীথী।	মণ্ডল বা রাশির নাম।	তারা-নাম।	বর্ণ।
৪	কর্কটরাশি	সৌম	শুক্ল
৬	কন্যারাশি	চিত্রা	নীলাভশুক্ল
১১	দক্ষিণমীন	মৎস্যামুখ	,,
৫	সিংহরাশি	খ্যাতি	পাণ্ডু
৩	মৃগব্যাধ	পিনাক	শুক্ল
১০	বক	পুচ্ছ	,,

ভ—গোলস্থ প্রথম শ্রেণীর তারাগণের বীথী পর্য্যায় তালিকা। (১)

বীথী	মণ্ডল বা রাশি।	তারা-নাম।	বর্ণ।
১	যামী	নদীমুখ	শুক্ল
২	ব্রহ্মা	ব্রহ্মহৃৎ	পীত
,,	বৃষরাশি	নন্দীবর্ণ	,,
৩	মৃগব্যাধ	লুব্ধক	নীলাভশুক্ল
,,	কালপুরুষ	বাণরাজ	নীলাভশুক্ল
,,	অর্ণবযান	অগস্ত্য	শুক্ল
,,	কালপুরুষ	বিশাখ	রক্তবর্ণ
,,	মৃগব্যাধ	পিনাক	শুক্ল
৪	শুনী	সরমা	নীলাভশুক্ল
,,	কর্কটরাশি	সোম	শুক্ল
৫	সিংহরাশি	খ্যাতি	পাণ্ডু
৬	ত্রিশঙ্কু	বিশ্বামিত্র	শুক্ল
,,	কন্যারাশি	চিত্রা	নীলাভশুক্ল
৭	ভূতেশ	নিষ্ঠ্যা	কুঙ্কুম
,,	মহিষাসুর	জয়	শুক্ল
,,	,,	বিজয়	শুক্ল

(১) সৌম্য হইতে যাম্য ধ্রুব পর্য্যন্ত ছেদ করিয়া ভ—গোলকে ১২ ভাগে বিভক্ত করিলে এক এক বিভাগকে বীথী বলা যায়, এক এক বিভাগ আকারে কমলা লেবুর এক এক কোষ পৃষ্ঠ সদৃশ হইবে।

ভ—গোলস্থ প্রথম শ্রেণীর তারাগণের বীথী পর্য্যায় তালিকা।

বীথী।	মণ্ডল বা রাশি।	তারা-নাম।	বর্ণ।
৮০	বৃশ্চিকরাশি	পারিজাত	রক্তবর্ণ
৯	বীণা	নীলমণি	জলদ
১০	গরুড়	বাসুদেব	নীলাভশুক্ল
„	বক	পুচ্ছ	শুক্ল
১১	দক্ষিণমীন	মৎস্যমুখ	নীলাভশুক্ল

নক্ষত্রগণ।

নক্ষত্র সংখ্যা	কৃষ্ণযজুর্বেদ মতে নক্ষত্র নাম।	অথর্ববেদ মতে নক্ষত্র নাম।	তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ মতে নক্ষত্র নাম।	তারা সংখ্যা
১	কৃত্তিকা	কৃত্তিকা	কৃত্তিকা	বহু
২	রোহিণী	রোহিণী	রোহিণী	১
৩	মৃগশীর্ষ	মৃগশিরা	ইন্বকা	বহু
৪	আর্দ্রা	আর্দ্রা	বাহু	১
৫	পুনর্ব্বসু	পুনর্ব্বসু	পুনর্ব্বসু	২
৬	তিষ্য	পুষ্য	তিষ্য	১
৭	অশ্লেষা	অশ্লেষা	অশ্লেষা	বহু
৮	মঘা	মঘা	মঘা	বহু
৯	পূঃ ফল্গুনী	পূঃ ফল্গুনী	পূঃ ফঃ	২
১০	উঃ ফল্গুনী	উঃ ফল্গুনী	উঃ ফঃ	২
১১	হস্তা	হস্তা	হস্তা	১
১২	চিত্রা	চিত্রা	চিত্রা	১
১৩	স্বাতি	স্বাতি	নিষ্ট্যা	১
১৪	বিশাখা	বিশাখা	বিশাখা	২
১৫	অনুরাধা	অনুরাধা	অনুরাধা	১
১৬	রোহিণী	জ্যেষ্ঠঘ্নী	রোহিণী	১
১৭	বিচৃত	মূল বর্হণী	মূল বর্হণী	বহু

নক্ষত্রগণ।

নক্ষত্র সংখ্যা	কৃষ্ণ যজুর্বেদ মতে নক্ষত্র নাম।	অথর্ববেদ মতে নক্ষত্র নাম।	তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ মতে নক্ষত্র নাম।	তারা সংখ্যা।
১৮	পূঃ আষাঢ়া	পূঃ আষাঢ়া	পূঃ আষাঢ়া	বহু
১৯	উঃ আষাঢ়া	উঃ আষাঢ়া	উঃ আষাঢ়া	বহু
২০	...	অভিজিৎ	...	৯
২১	শ্রোণা	শ্রবণা	শ্রোণা	বহু
২২	শ্রবিষ্ঠা	শ্রবিষ্ঠা	শ্রবিষ্ঠা	বহু
২৩	শতভিষক্	শতভিষক্	শতভিষক্	১
২৪	পূঃ প্রোষ্ঠপদ	পূঃ পোষ্টপদ	পূঃ প্রোঃ	বহু
২৫	উঃ প্রোষ্ঠপদ	উঃ পোষ্টপদ	উঃ প্রোঃ	২
২৬	রেবতী	রেবতী	রেবতী	১
২৭	অশ্বযুজা	অশ্বযুজা	অশ্বযুক্	২
২৮	অপভরণী	ভরণী	অপভরণী	১

শ্রীপতি মতে নক্ষত্র নাম।	তারা সংখ্যা।	যোগ তারা নাম। হিন্দু নাম।	পাশ্চাত্য নাম।
কৃত্তিকা	৬	প্রীতি	Merope.
রোহিনী	৫	কলন্দীবর্ণ	Aldebaran.
মৃগশিরা	৩	এণক	Heka.
আর্দ্রা	১	বিশাখ	Betelgeux.
পুনর্বসু	৪	সোমতারা	Pollux.
পুষ্যা	৩	গর্দ্দভ	S. Asellus.
অশ্লেষা	৫	বাসুকী	Delta Hydrae
মঘা	৫	খ্যাতি	Regulus.
পূঃ ফঃ	২	শিবা	Zosma.
উঃ ফঃ	২	সিংহলাঙ্গুল	Denebola.
হস্তা	৫	তর্জনী	Algoreb.
চিত্রা	১	চিত্রা	Spica.
স্বাতি	১	নিষ্ট্যা	Arcturus.

শ্রীপতি মতে		যোগতারা নাম।	
নক্ষত্র নাম।	তারা সংখ্যা।	হিন্দু নাম।	পাশ্চাত্য।
বিশাখা	৪	বামাকীলক	Zuben el Genub
অনুরাধা	৪	দিবাচঞ্চলা	Dsehubba.
জ্যেষ্ঠা	৩	পারিজাত	Antares.
মূলা	১১	শ্যাম বা শুক	Shaulah.
পূঃ আঃ	২	ভুজগী	Delta Sagittarii.
উঃ আঃ	২	লঙ্কা	Sigma Sagittarii.
অভিজিৎ	৩	নীলমণি	Vega.
শ্রবণা	৩	বাসুদেব	Altair.
ধনিষ্ঠা	৪	রক্তপুরী	Rotaner.
শত তারক	১০০	দুর্যোধন	Lambda Aquarii.
পূঃ ভাঃ	২	সুরভি	Scheat.
উঃ ভাঃ	২	প্রতিষ্ঠা	Alpheratz.
রেবতী	৩২	মূল কীলক	Zeta Piscium.
অশ্বিনী	৩	অমল	Hamal.
ভরণী	৩	অপসরণী	No. 41.

১ম বীথী।

পরশু মণ্ডল।

ব্রহ্ম মণ্ডলের পশ্চিম-ভাগে এবং মেষ ও বৃষরাশির উত্তর-ভাগে পরশু মণ্ডল অবস্থিত পরশুমণ্ডল ছায়াপথের-মধ্যগত। পরশু-মণ্ডল দেখিতে একখানি কুঠার সদৃশ-লম্বে ছয় হাত, কুঠার পঞ্চ তারায় নির্ম্মিত, কুঠারস্কন্ধে এই মণ্ডলের সর্ব্ব প্রধান তারা অবস্থিত। তারাটী দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং ইহার নাম কুঠারপৃষ্ঠ, তারা। এবং কুঠার দণ্ড মূলে একটী পীতবর্ণ দ্বিতীয় শ্রেণীর তারা অবস্থিত। এই তার টীর নাম মায়াবতী। মায়াবতী কুঠা পৃষ্ঠ তারা হইতে ছয় হাত দক্ষিণে স্থিত মায়াবতী ও কুঠারপৃষ্ঠ তারার যোগরে উত্তরে প্রসারিত করিলে ঐ রেখা ধ্রু তারার সন্নিহিত হয়। মায়াবতী বহুরূ বা কামরূপ তারাগণের শিরোমণি, ৬৯ ঘণ্ কাল মধ্যে মায়াবতী ৬০ ঘণ্টা ৪১ মিনি পূর্ণ প্রভা ধারণ করে। পরে ক্রমে মলিন প্রাপ্ত হয়, ৪½ ঘণ্টা মধ্যে মায়াবতী চতু শ্রেণীতে অবরোহণ করে। এবং ১৯ মিনি কাল অবনতি ভোগ করিয়া ২½ ঘণ্টা ক

মধ্যে পূর্ণ প্রভা পুনঃ প্রাপ্ত হয়, এইরূপে মায়াবতী সতত স্ফুলনের হ্রাস বৃদ্ধি ভোগ করিতেছে। মায়াবতীর স্ফুলনের পরিবর্ত্তন হেতু পাশ্চাত্যে মায়াবতী ভীষণা (Algol) নামে খ্যাত। মায়াবতীর দুই ফুট দক্ষিণে আর একটী বহুরূপ তারা আছে, এই তারাটী পীতবর্ণ ও চতুর্থ শ্রেণীর। এই তারাটীর নাম রেণুকা। পাশ্চাত্যে রেণুকা তারা মেডুসা (Caput Meduci) নামে খ্যাত (১) এই মণ্ডলে M ৩৪ চিহ্নিত একটী তারাস্তবক আছে। ক্ষুদ্র দূরবীক্ষণে এই তারা স্তবক অতি সুন্দর দেখায়।

১ম বীথী।

ত্রিকোণ-মণ্ডল।

অশ্বিনী নক্ষত্রের উত্তর ভাগে উত্তর ত্রিকোণ মণ্ডল অবস্থিত। তারাত্রয়ে একটী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ অঙ্কিত হইয়াছে। তারাত্রয়ের একটী তারা অতি ক্ষুদ্র। একটী তৃতীয়-শ্রেণীর এবং একটী চতুর্থ শ্রেণীর।

(১) গ্রীসীয় প্রবাদ মতে গর্গন—গণ নামে তিনটী কুমারী ছিলেন, ইহাদিগের নাম পিন, যুর্গলা এবং মেডুসা। কুমারীত্রয় মধ্যে মেডুসা মর ছিলেন। কিন্তু অতি সুন্দরী ছিলেন। মেডুসার গর্ভে নেপ্চুনদেবের দুইটী পুত্র জন্মে। এজন্য এথিনা দেবীর অভিশম্পাতে মেডুসার কেশপাশ সর্পময় হয়। এবং মেডুসার মুখ দর্শনে মানব পাষাণ হয়। পর্স্যুদেব মেডুসা-দেবীর মুণ্ড কাটিয়া এথিনা-দেবীকে উপহার দেন। এবং এথিনাদেবী স্বীয় বর্ম্মবক্ষে মেডুসা-মুণ্ড-ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। মেডুসা মুণ্ডতলে-রেণুকা-তারা। এবং কপাল দেশে মায়াবতী তারা অবস্থিত।

ত্রিভুজের সম দুইটী বাহু লম্বে ৪ হাত এবং ভূমি রেখা লম্বে ১ হাত।

১ম বীথী।

মেষরাশি।

মেষ রাশির বর্ণনা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। রেবতী নক্ষত্রের মূল কীলক-নামক তারা হইতে পূর্ব্বাদিক্রমে মেষাদি দ্বাদশ রাশি অবস্থিত (২)। প্রত্যেক রাশি লম্বে ৩০ অংশ এবং বিস্তারে ১৬ অংশ। এবং দ্বাদশ রাশিতে ভ-চক্র সমাবৃত।

১ম বীথী।

তিমি মণ্ডল।

মেষ রাশির দক্ষিণে তিমি মণ্ডল। এই মণ্ডলে পঞ্চ তারায় একটী মৎস্যাকৃতি গঠিত হইয়াছে। মৎস্য লম্বে ১৫ হাত বিস্তারে ৪ হাত, মৎস্যমুণ্ড নরমুণ্ড সদৃশ। মৎস্য দেহ মৎস্যাকৃতি, তিমি মুণ্ডে একটী রক্তবর্ণ বহুরূপ তারা অবস্থিত। কামরূপত্ব হেতু এই তারাটী দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে নবম শ্রেণীতে অবরোহণ করে। এবং মানবের অদৃশ্য হয়। এই তারাটীর নাম মায়। মায় তারা ১৫ দিবস পূর্ণ প্রভা ধারণ করে। তৎপরে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়, তিন মাস মধ্যে মায় তারা অদৃশ্য হয়। পঞ্চ মাস মায় তারা অদৃশ্য অবস্থায় থাকিয়া পরে ক্ষীণ ভাবে দৃষ্টি-গোচর হয়। এবং মাসত্রয় ক্রমে প্রভা বৃদ্ধি হইয়া মায় তারা পুনঃ পূর্ণ প্রভা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে সার্দ্ধ একাদশ মাস মধ্যে ১৫ দিবস

(২) বিষুবৎ ক্রান্তি বৃত্তো কাৎপূর্ব্ব-
ভাগ স্থিতাঃ স্থিরাঃ
মেষাদ্যাঃ রাশয়ঃ ক্রান্তিবৃত্তয়ঃ পূর্ব্বদিক্
ক্রমাৎ। মুনীশ্বর।

মাত্র মাত্র তারা পূর্ণ প্রভা ধারণ করে। মায়ার তারার পাশ্চাত্য নাম মায়া [বিস্ময়কর] এবং মবিলনে এই তারা অপ (খদ্যোত) নামে খ্যাত ছিল। মৎস্যের পুচ্ছ দেশে দ্বিতীয় শ্রেণীর একটী তারা স্থিত। এই তারার নাম মৎস্যপুচ্ছ। তারাটী দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং অতি উজ্জ্বল। মৎস্য দেহ চতুর্ভুজাকৃতি চারিটী তারায় গঠিত।

১ম বীথী।

যামী মণ্ডল।

তিমি মণ্ডলের দক্ষিণে যজ্ঞ কুণ্ড মণ্ডল ও ভাস্কর মণ্ডল। যজ্ঞ কুণ্ড মণ্ডলের দক্ষিণে যামী-মণ্ডলের দাক্ষিণাংশে অবস্থিত, যামী নদী কাল-পুরুষের দক্ষিণপদ হইতে প্রবাহিত হইয়া যজ্ঞ কুণ্ড মণ্ডলের দূর দক্ষিণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই মণ্ডলের তারাগণের মধ্যে নদীর মুখ প্রদেশে যে একটী প্রথম শ্রেণীর অতি উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ—তারা আছে, সেই—তারাটী সর্ব্ব প্রধান। এই তারাটীর নাম নদীমুখ, এই তারাটীর বর্ত্তমান পাশ্চাত্য নাম এচারনার (আখির—অল—নহর= নদীর শেষ প্রাপ্ত)। এবং আমির উলুগ-বেগের তালিকায় এই তারা অল—দালিম নামে খ্যাত। এই মণ্ডলের অপর—তারাগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, তন্মধ্যে ষোলটী তারায় একটী বৃমুণ্ডাকৃতি গঠিত হইয়াছে।

২য় বীথী।

১ম মণ্ডল—চিত্র ক্রমেল মণ্ডল।

(Camelopardalis)।

২য় বীথীর শীর্ষদেশে এই মণ্ডল অবস্থিত, চাক্ষুষ দৃষ্টিতে এই মণ্ডলের রূপ কষ্ট কল্পনা মূলক বলিয়া বোধ হয়। এই মণ্ডল আধুনিক। ১৬৯০ খৃঃ জ্যোতির্ব্বিদ (Helvelius) এই মণ্ডলের নাম করণ করেন। এই মণ্ডল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকাময়। স্থূলত্বে ইহার সর্ব্বপ্রধান তারা ৫ম শ্রেণীর।

২য় মণ্ডল—ব্রহ্ম মণ্ডল।

ব্রহ্ম মণ্ডল ইতিপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য মতে এই মণ্ডলের নামরথ (Auriga) (১)।

২য় বীথী।

বৃষ রাশি।

ব্রহ্ম মণ্ডলের দক্ষিণে বৃষ রাশি অবস্থিত, বৃষ রাশি পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

২য় বীথী।

সুবর্ণাশ্রম মণ্ডল।

বৃষরাশি দক্ষিণে যামী মণ্ডল, যামী মণ্ডলের দক্ষিণে ঘটিকা মণ্ডল। ঘটিকা মণ্ডলের দক্ষিণে-সুবর্ণাশ্রম মণ্ডল। এই মণ্ডল অগস্ত্য তারার অতি সন্নিহিত। এই মণ্ডলের পাশ্চাত্য নাম সুবর্ণ মণ্ডল (Dorado) কারণ এই মণ্ডলে একটী স্বর্ণ বর্ণের ক্ষুদ্র তারা আছে, তারাটী ৫ম শ্রেণীর। এই তারাটী বহুরূপতারা। হ্রাসকালে ষষ্ঠ শ্রেণীতে অবরোহণ করে। এই বহুরূপ

(১) কিন্তু অশ্বিদ্বয় (castor এবং pollux) হইতে এই মণ্ডল বহুব্যবধানে অবস্থিত। রথ একদেশে, রথী একদেশে থাকা অসম্ভব। এবং অশ্বিদ্বয়ের রথের বৈদিক বর্ণনা পাঠে প্রতীয়মান হয় যে, অশ্বিদ্বয়ের পুষারথ মধুচক্র নামক তারা স্তবক এবং খর ও গর্দ্দভ নামক তারাদ্বয়ে ঐ রথ সজ্জিত।

তারার নাম লোপামুদ্রা (২) কারণ হুস্বত্তনকালে এই তারা দৃষ্টি গোচর হয় না। এজন্য এই তারার নাম লোপামুদ্রা। লোপামুদ্রা তারা অগস্ত্য তারার ১০ হাত দূরে নৈঋত কোণে অবস্থিত।

৩য় বীথী।

মিথুন রাশি।

এই রাশি পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে, এই রাশির নাম করণ পরবর্ত্তী কর্কট রাশির অশ্বিদ্বয় (সৌম্যতারা ও হরিদ্বর্ণ বিষ্ণু তারা) হইতে হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কারণ এই রাশিতে হরিদ্বর্ণ কোন তারা নাই। কিন্তু রাশিগণের বর্ণ ভেদ কথনে দৈবজ্ঞ মনোহর বলিয়াছেন যে, মিথুন রাশি হরিত বর্ণ (৩) সুতরাং অশ্বিযুগল হইতে এই রাশির নাম করণ হইয়াছে বলিতে হইবে।

৩য় বীথী।

কালপুরুষ মণ্ডল।

কাল পুরুষ মণ্ডল মিথুন রাশির দক্ষিণে অবস্থিত। এই তারা মণ্ডল পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

৩য় বীথী

শশ মণ্ডল।

কাল পুরুষ মণ্ডলের দক্ষিণে শশ মণ্ডল অবস্থিত। এই মণ্ডলে ৬টী তারায় পশ্চিমাভিমুখ একটী শশবিমানে অঙ্কিত আছে।

৩য় বীথী।

কপোত মণ্ডল।

শশ মণ্ডলের দক্ষিণে কপোত মণ্ডল অবস্থিত। এই মণ্ডলে অষ্ট তারায় একটী কপোত মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে।

৩য় বীথী।

কাল পুরুষ মণ্ডল।

মিথুন রাশির দক্ষিণে কাল পুরুষ মণ্ডল এই তারা মণ্ডলের বর্ণনা করা হইয়াছে।

৩য় বীথী।

অর্ণবযান মণ্ডল।

কপোত মণ্ডলের দক্ষিণে অর্ণবযান মণ্ডল বিরাজিত। অর্ণবযান মণ্ডলে পঞ্চ তারায় একখানি নৌকার কাণ্ড। এবং তারাদ্বয় নৌকার মাস্তল। এবং তারাত্রয়ে নৌকার

---

(২) বামন-পুরাণের ১৮ অধ্যায় পাঠে দেখা যায় যে, সূর্য্যদেবের প্রার্থনায় বিন্ধ্যগিরিকে নিম্ন করণার্থে মহর্ষি-অগস্ত্য বিন্ধ্যাচলের সমীপে উপস্থিত হইয়া গিরিকে বলিলেন। আমি তীর্থে যাইতেছি, বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত বিন্ধ্য পার হইয়া যাইতে অসক্ত। অতএব তুমি নীচতর হও, বিন্ধ্যগিরি তৎশ্রবণে নীচশৃঙ্গ হইলেন। মহর্ষি অবলীলাক্রমে বিন্ধ্যপার হইয়া বলিলেন, যাবৎ তীর্থ হইতে নিজাশ্রমে প্রত্যাগমন না করি, তাবৎ তুমি উন্নত হইবে না। আমার অনুজ্ঞা অবজ্ঞা করিলে অভিশম্পাত করিব। এই বলিয়া মহর্ষি সহসা দক্ষিণ অন্তরীক্ষ আরোহণ করিলেন। এবং তথায় বিশুদ্ধ সুবর্ণময়, তোরণ পরিশোভিত রম্যতর আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া এবং ঐ আশ্রমে মুনি পত্নী লোপামুদ্রাকে রক্ষা করিয়া স্বীয় সৌম্য আশ্রমে মহর্ষি প্রত্যাগমন করিলেন। যথা—

তত্রাশ্রমং রম্যতরং হি কৃত্বা।
সংশুদ্ধ জাম্বুনদ তোরণাস্তং॥
তত্রাপি নিক্ষিপ্য বিদর্ভপুত্রীং।
স্বমাশ্রমং সৌম্য মুপাজগাম॥ ইতি বামনপুরাণ।

(৩) অরুণসিত-হরিত-পাটল পাণ্ডু বিচিত্রাঃ সিতেতর পিষঙ্গৌ। পিঙ্গল কর্ব্বুর বভ্রু মলিন রুচয়ঃ যথা সংখ্যং॥ মনোহর।

পতাকা সজ্জিত রহিয়াছে। এবং নৌকা হইতে ৬ হাত দূরে অগস্ত্য তারা নৌকার হাল (তার) রূপে তারাময় নৌনিগড়ে আবদ্ধ রহিয়াছে (৪) গ্রীসীয় প্রবাদ মতে এই অর্ণবযানের নাম আর্গো (৫)।

৪র্থ বীথী।

কর্কট রাশি।

কর্কট রাশিতে সোমতারা ও বিষ্ণু তারা অবস্থিত। সোমতারা ১ম শ্রেণীস্থ এবং নীলাভ শুক্লবর্ণ। এবং বিষ্ণুতারা ২য় শ্রেণীস্থ এবং হরিতবর্ণ। এই তারাদ্বয় সূর্য্য ও চন্দ্রের প্রতিকৃতি। এজন্য এই তারাদ্বয় অশ্বিদ্বয় বা অশ্বিযুগল নামে খ্যাত। অশ্বিযুগল রাসভযোজিত রথারোহণে সর্ব্বত্র গমনাগমন করেন। এবং তাঁহারা সুনিপুণ রথী বলিয়া বর্ণিত; কর্কট রাশিস্থ মধুচক্র নামক তারা স্তবক অশ্বিদ্বয়ের রথ বলিয়া বোধ হয়। পাশ্চাত্যে এই তারাযুগল কষ্টর (castor) এবং পলক্ষ (pollux) নামে খ্যাত। (১)।

৪র্থ বীথিকা।

শুনী মণ্ডল।

কর্কট রাশির দক্ষিণে শুনীমণ্ডল অবস্থিত। কিন্তু শুনী মণ্ডল কর্কট রাশির মধ্যগত। শুনীমণ্ডলের প্রধান তারার বর্ত্তমান নাম প্রভাব প্রভাব তারার বৈদিক নাম সরমা (১)।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকাশীনাথ দেব শর্ম্মা।

---

(৪) অথর্ব্ব-বেদপাঠে দেখা যায় যে, হিরণ্ময় খেপনি কেনিপাত আদিতে সুসজ্জিত যে হিরণ্ময় নৌকাযোগে স্বর্গ হইতে কুষ্ঠ নামক ঔষধ পৃথিবীতে-আনীত হইয়াছিল। ঐ নৌকা আকাশ মার্গে চলিয়াছিল। যথা—হিরণ্ময়ী নৌ অচরৎ হিরণ্য বন্ধনা দিবি।

(৫) থেচলী দেশের রাজ ভ্রাতা— পেলিয়স ভ্রাতৃ রাজ্য অধিকার করিয়া লইয়া ভ্রাতৃ পুত্র জেসনকে রাজ্য হইতে দূরীভূত করিবার মনন করেন। ইয়া বা কলচিশ প্রদেশে মঙ্গল গ্রহরাজের যে কুঞ্জবন ছিল ঐ বনের একটী নিম্ববৃক্ষের মস্তকে স্বর্ণ নির্ম্মিত উর্ণ ছিল। এবং তক্ষকনাগ ঐ উর্ণের প্রহরী ছিল। পেলিয়স জেসনকে ঐ উর্ণ আনয়নে আজ্ঞা দেন। বীরবর জেসন আর্গো নামক নৌযান প্রস্তুত করিয়া উর্ণ-আনায়নের যাত্রা করেন। গ্রীসীয় যাবতীয় বীরবর্গ জেসনের সহচর হইয়াছিলেন। হরকুলেশ কষ্টর পলক্ষ এবং পিডিউস্ প্রভৃতি বীর পঞ্চাশৎ এই নৌযানে যাত্রী ছিলেন। এবং জেসন তক্ষক বধ করিয়া উর্ণ আনায়ন করেন। বীরবর জেসনের নৌযান নভ-ক্রোড়ে তারাময়রূপে বিরাজমান রহিয়াছে।

(১) পাশ্চাত্য মতে অশ্বিযুগল সুরথী বলিয়া পরিচিত। কিন্তু তাহাদিগের রথের কোন স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে কোন কোন ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত অনুমান করেন যে, ব্রহ্মমণ্ডল পাশ্চাত্যে রথ auriga নামে খ্যাত। এবং ঐ রথ অশ্বিদ্বয়ের, কিন্তু ব্রহ্ম মণ্ডল হইতে অশ্বিদ্বয় বহুদূর অবস্থিত। সুতরাং একদেশে রথ একদেশে রথী থাকা অসম্ভব।

(১) কালডিয়াবাসীগণ এই তারাকে ছায়া পথের অপর পারস্থিত কুক্কুর তারা বলিয়া বর্ণনা করেন। এবং বেদে সরমা ছায়াপথের অপর পারস্থিত বলিয়া বর্ণিত আছে। বেদ মতে সরমা দেব কুক্কুর বা দেবশুনী।

ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম।

প্রথম প্রবন্ধ।

উৎপত্তি।

ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, এক্ষণে হিন্দুধর্ম্মের আস্থা যেমন হওয়া উচিত, তাহা নহে; পশ্চিমদেশের আচার জ্ঞান ও সভ্যতার আলোক দিন দিন যেমন এদেশের সামাজিকগণের হৃদয়ে নূতন নূতন ভূমি অধিকার করিয়া নব নব দৃশ্যের ছবি প্রকাশ করিতেছে, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন হিন্দু-আচার, জ্ঞান ও সভ্যতা, এক একটী চিরাধিকৃত ভূমির অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া ধীরে ধীরে অতর্কিতভাবে চির বিস্মৃতির গভীর অন্ধকারময় রাজ্যে মিশাইয়া যাইতেছে!

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার মধ্যে এই অবিশ্রান্ত সংগ্রাম, অবশেষে কোন্ পক্ষে বিজয়-লক্ষ্মীর করুণাময়-কটাক্ষের নীল কমল-মালা পরাইয়া দিবে, তাহার নির্ণয় সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত থাকিলেও বর্ত্তমানে যতটুকু দেখিবার শক্তি আমাদিগের আছে, তাহা দ্বারা ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদের প্রাচ্যসভ্যতার বল ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের আচার, আমাদের সমাজ এবং আমাদের জ্ঞান, এই চতুরঙ্গিণী সেনার উপর নির্ভর করিয়া প্রাচ্যসভ্যতা এই মহা-সংগ্রামে এইরূপ ভাবে আর অধিক কাল যে ক্রমোন্মুখ আত্ম-গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে এই প্রকার আশা ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। হিন্দু সভ্যতার প্রতি আস্থাবান্ কোন্ চিন্তাশীল ভারতবাসী আজ এই অপ্রত্যাখ্যেয় বিষাদময় ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া নীরবে দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত অশ্রু-বিন্দু বর্ষণ না করেন?

এরূপ সঙ্কটপূর্ণ-সময়ে হিন্দুর পক্ষে কি কর্ত্তব্য?—কর্ত্তব্য হইতেছে, সর্ব্বাগ্রে হিন্দু-ধর্ম্মের তত্ত্ব নির্ণয়। আমার বিশ্বাস, সত্যের গতি অপ্রতিবার্য্য, যতদিন সত্য প্রকাশ না পায়, ততদিনই ভ্রান্তি-কুহকে পতিত মানুষ অযথা মার্গে প্রবৃত্ত হইয়া আত্মবিনাশের পথকে প্রশস্ত করিয়া থাকে; কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া পরস্পর বিবাদ বাঁধাইয়া বসে, এবং উপকার বুদ্ধিতে প্রবৃত্ত হইয়াও ফলতঃ অপকারের ডালি মাথায় করিয়া বিজয়োল্লাসে নৃত্য করিতে থাকে, এই প্রকার বহুতর অনর্থই অজ্ঞানের কার্য্য। তাই আমার বিশ্বাস এই যে, আমাদের সর্ব্বাগ্রে বোধ্য, হিন্দুধর্ম্ম প্রকৃত পক্ষে বস্তুটা কি? ইহার আবির্ভাব, ইহার বিকাশ, ইহার উন্নতি, ইহার প্রতিঘাত ও ইহার অবনতির প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়, এবং কি কারণে কোন্ অবস্থায় কিরূপ সমাজে কোন্ ভাবে ইহার বিকাশ, উন্নতি, প্রতিঘাত ও অবনতি হইল বা হইতেছে, তাহাও স্পষ্ট নির্ণেয়। এই সকল বস্তুর নির্ণয় করিতে হইলে আমাদিগকে প্রাচীন ইতিহাসের ঐকান্তিক আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। যাহা সত্য, তাহা অকুণ্ঠিতচিত্তে সাধারণের সমক্ষে প্রচার করিতে হইবে। কল্পনার সাহায্যে আত্মধারণার অনুকূল-পদার্থ সাজাইয়া সাধারণের নেত্রে ধূলি প্রক্ষেপ পূর্ব্বক আত্ম-প্রতিষ্ঠার তীব্র

আকাঙ্ক্ষাকে একেবারেই বিসর্জ্জন দিতে হইবে। আধ্যাত্মিক-ব্যাখ্যার যন্ত্রে ফেলিয়া হিন্দুধর্ম্মকে তাড়িতময় করিবার বাতিকটাকে অন্ততঃ মধ্যমনারায়ণের সাহায্যেও শান্ত করিতে হইবে। শান্তভাবে অবিসংবাদিত-প্রমাণগুলির উপর নির্ভর করিয়া প্রাচীন ইতিহাসের পবিত্র পত্র হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান-অবস্থার সহিত যুক্তি ও নৈপুণ্যের সহিত মিলাইয়া দেখিতে হইবে, হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় অনাদি, অপরিমেয়, সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, মনুষ্য-কল্পনার অবিষয় এই মহাধর্ম্মের গন্তব্য পথ নির্দ্ধারণ করিবার শক্তি, তোমার বা আমার ন্যায় অল্পবিৎ মনুষ্যের আছে, এই প্রকার বিশ্বাস ন্যায়সঙ্গত নহে।

আমরা চাহি ইহার স্বরূপ দেখিতে। ইহার গতি নির্দ্দেশ করিবার ভার চিরকালই সেই এক পুরুষের উপর নিহিত আছে ও থাকিবে। সেই পুরুষ কে, ইহার উত্তর তিনিই দিয়াছেন।

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

সুতরাং আমাদের পক্ষে ধর্ম্মজগতে নূতন কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই নহে। আমাদের কর্ত্তব্য একমাত্র এই যে, হিন্দুসমাজের জীবনস্থত সেই সর্ব্বাশ্চর্য্যময় বিরাট পুরুষ-কল্প সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃত অবস্থার পরিচয়। কারণ, অবস্থার প্রকৃত পরিচয় পাইলে আর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে বিলম্ব হয়না। আমার বিবেচনায় সেই অবস্থা পরিচয়ের জন্য আমাদের প্রধানতঃ দুইটী পথ অবলম্বনীয়।

প্রথম।—বেদ, ধর্ম্মসংহিতা, পুরাণ কল্পসূত্র প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণস্বরূপ গ্রন্থনিচয়ের বিস্তৃতভাবে অনুশীলনদ্বারা তাহার সাহায্যে সাক্ষাৎ ধর্ম্মের স্বরূপ নির্ণয়ে প্রযত্ন।

দ্বিতীয়।—যে যে অপেক্ষাকৃত নূতন ধর্ম্মের সহিত দীর্ঘকাল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সর্ব্বশেষে জয়ী হইয়া হিন্দু-ধর্ম্ম এই ভারতে হৃতপ্রায় নিজ অধিকারকে সম্পূর্ণভাবে পুনর্ব্বার স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে, সেই সেই ধর্ম্মের উৎপত্তি, বিকাশ ও বিলয়াবস্থার বিস্তৃত অনুশীলন ও তাহার সহিত তত্তৎ সময়ের নিষ্প্রভপ্রায় হিন্দুসমাজ ও ধর্ম্মের কিরূপ সম্বন্ধে কোন্ অংশে সাম্য এবং কোন্ অংশে বৈষম্য এবং কি কারণে হিন্দুধর্ম্ম ঐ সকল ধর্ম্মের শক্তিকে কুণ্ঠিত করিয়া পুনর্ব্বার প্রবল হইতে পারিল, এই সকল তথ্যগুলি ইতিহাসের মধ্য হইতে যত্নের সহিত বাহির করিয়া সাধারণের সম্মুখে ও অকপটভাবে প্রচার করা।

হিন্দুধর্ম্মের সারভূত নিয়ম প্রভৃতির তত্ত্ব সাধারণ্যে প্রচার করিবার ভার অনেক দিন হইতেই যোগ্য ব্যক্তিগণ গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদেরই কৃতকার্য্যতার ফলে আজ আমরা বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যনারায়ণের কথা পর্য্যন্ত বহুতর হিন্দুগ্রন্থের প্রচার ও অনুশীলন দেখিতে পাইতেছি এবং উত্তরোত্তর যে আরও পাইব, তাহার আশাও হৃদয়ে সযত্নে পোষণ করিতেছি। কিন্তু দ্বিতীয় উপায়টীর দিকে আমরা প্রকৃত পক্ষে অল্পই অগ্রসর হইতে পারিয়াছি।

হিন্দুধর্ম্ম-মহাসাম্রাজ্যে এ পর্য্যন্ত যত বিপ্লব সাধিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে বৌদ্ধ বিপ্লবই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর এবং অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। সহস্র সহস্র বৎসর হইতে যে বৈদিক-হিন্দু

ধর্ম্ম অবিরাম স্রোতে এবং অপ্রতিহত-গতিতে, ভারতীয়-সমাজে সকল প্রকার মনুষ্যের ভাগ্যযন্ত্রের অবিসম্বাদিত নেতৃত্ব করিয়া আসিতেছিল, বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ে সেই বৈদিক হিন্দু-ধর্ম্মের মেরুদণ্ডে এমনই গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে যে, এখন পর্য্যন্তও উহা সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে নাই; কত দিনে দাঁড়াইবে অথবা আর তেমনিভাবে এযুগে দাঁড়াইতে পারিবে কি না, তাহা ভবিষ্য-ইতিহাসের অন্ধকারাবৃত পৃষ্ঠেই লিখিত আছে। বৈদিক-ধর্ম্মের পুনঃস্থাপনের কথা ত অতি দূরে, বৈদিক-ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ও এক্ষণে এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জৈমিনির মীমাংসা দর্শনে আমরা সহস্রাধিক যজ্ঞের উল্লেখ দেখিতে পাই, কিন্তু সেই সহস্রাধিক বৈদিক যজ্ঞের মধ্যে এক্ষণে অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস ও চাতুর্মাস্য প্রভৃতি চারি পাঁচটী যজ্ঞ ছাড়া অন্য যজ্ঞের তত্ত্ব নির্ণয় করিবার কোন উপায় পাই না। কেমন করিয়া, কোন্ কোন্ দ্রব্য কত পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া কিরূপ স্থান বা সভা নির্ম্মাণপূর্ব্বক কোন্ সময়ে কোন্ মন্ত্রের সাহায্যে অশ্বমেধ, রাজসূয়, বাজপেয়, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি বৈদিক যজ্ঞগুলি সাধন করিতে হয়, তাহা বিশদভাবে বুঝাইতে পারেন, এমন যাজ্ঞিক ভারতে অনেক দিন হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। মীমাংসাদর্শন পড়িলে আমরা জানিতে পারি যে "যজ্ঞকালে দ্রব্য বা দেবতাকে স্মরণ করাইবার জন্য বেদের মন্ত্রভাগকে আবৃত্তি করিতে হইত; প্রত্যেক মন্ত্র দ্বারা কোন না কোন যজ্ঞীয় দ্রব্য বা দেবতার স্মরণ করিয়া ঋত্বিক্ যজ্ঞকালে স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্মের নিষ্পাদন করিতেন," এই নিয়ম অনুসারে ঋগ্ যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব সংহিতার প্রত্যেক মন্ত্রই কোন না কোন যজ্ঞে ব্যবহৃত হইত, ইহা মানিতে হইবে; দুঃখের বিষয়, ভারতে এক্ষণে এমন কোন বৈদিক পণ্ডিত বা বৈদিক গ্রন্থ নাই, যাহার সাহায্যে আমরা অদ্য বিস্পষ্টভাবে দুর্গোৎসব বা কালীপূজার ন্যায় ঐ সকল মন্ত্রলিপিযোজিত যজ্ঞ সকলের প্রকৃত চিত্র মনোমধ্যে অঙ্কিত করিতে পারি। বৈদিক ধর্ম্মের বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল যজ্ঞক্রিয়ানিরত-যজমান-বহুল-বৈদিক গৃহস্থের চিত্রও আমাদের মানসপটে আর কিছুতেই অঙ্কিত হইতে পারেনা।

আমরা সকলেই বলিয়া থাকি যে, বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ই ক্রমে এই বৈদিকধর্ম্মের অবনতি সাধন করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের সার্ব্বজনীন অধিকার, বৌদ্ধভিক্ষুগণের অনিয়ন্ত্রিত ঔদার্য্য ও লোকচরিত্রজ্ঞতা, বৌদ্ধধর্ম্মনেতৃগণের অসীম কার্য্যকুশলতা ও নিয়ম পালনশক্তি কিরূপভাবে ধীরে ধীরে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকল জাতীয় মনুষ্যকে নূতন জীবন্ত সমাজে পরিণত করিয়া ছিল, কেমন করিয়া ভারত-সম্রাটের দুষ্প্রবেশ অন্তঃপুরের মধ্য হইতে অনাবৃতদ্বার দরিদ্রের পর্ণ-কুটীরে পর্য্যন্ত ধর্ম্ম-সঙ্ঘ ও বুদ্ধের জয়-ঘোষণার একতান স্বরলহরীতে সমাজের হৃদয়তন্ত্র বাজিতে থাকিত, তাহার প্রকৃত ইতিহাস জানিবার জন্য আমাদের মধ্যে কয়জন উদ্যত হইয়া থাকেন?

ইহা কি আমাদের পক্ষে কম লজ্জার

কথা? প্রাচীন ভারতের ধর্ম্ম সভ্যতা ও সমাজের মহাবিপ্লব করিয়া যে বৌদ্ধধর্ম্ম অনূন সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া ভারতে কত অভিনব শিক্ষার বিস্তার করিয়া গেল, ভারতের সমাজ, ধর্ম্ম ও নীতিকে আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়া গেল, সেই বৌদ্ধধর্ম্মের তত্ত্ব জানিতে গেলে আমরা আজ আমাদের ভাষায় এক খানিও ইতিহাস গ্রন্থ খুজিয়া পাই না! সামুয়েল্ বীন, বার্থ প্রভৃতি ইউরোপীয় মনীষিগণের কৃপায় পালি সংস্কৃত প্রভৃতি গ্রন্থের ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ গ্রন্থের সাহায্য ব্যতিরেকে আমাদের অবশ্য জ্ঞাতব্য প্রাচীন ইতিহাস জানিবার অন্য কোন উপায় আমরা এক্ষণও করিয়া উঠিতে পারি নাই। ফাহিয়ান্, হুয়েন্থসাঙ্গ প্রভৃতি চীন দেশীয় পরিব্রাজকগণ সহস্র সহস্র ক্লেশ সহ্য করিয়া দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত, মরুভূমি ও জঙ্গল অতিক্রমণ পূর্ব্বক এই দেশে আসিয়া স্বচক্ষে বৌদ্ধভারতের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, কই, আমাদের ভাষায় সেই সকল গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদেরও অনুবাদ করিয়া আমরা আমাদের ভাষায় এখনও কি প্রচার করিতে পরিয়াছি? যাঁহারা ঐ সকল গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ পড়িয়াছেন, তাঁহাদের নিকট ঐ সকল সত্যঘটনাময় ঐতিহাসিক চিত্র অতুলনীয় বলিয়া প্রতীত হইলেও, তাঁহারা মাতৃভাষার অলঙ্কার পরাইতে গিয়া এখনও ঐ সকল রত্নরাজির প্রতি এরূপ উপেক্ষা করিতেছেন কেন? যে জাতির আত্মপিতৃপুরুষগণের গৌরবময় ইতিহাসের প্রতি আদর নাই, তাহারা কখনও যে আপনাদের অধঃপতিত সমাজের সংস্কার সাধন করিয়া আবার সমুন্নত জাতিবৃন্দের মধ্যে আপনাদের গৌরব-ধ্বজা রোপণ করিতে পারিবে, এ কথায় কে বিশ্বাস করিবে?

প্রাচীন ইতিহাসের প্রগাঢ় অনুশীলন ব্যতিরেকে শিক্ষার অভাবে অধঃপতিত সভ্য জাতির পুনরুদ্ধারের আশা যে নিতান্ত অল্প, ইহা কে অস্বীকার করিবে?

বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃত ইতিহাস লিখিবার জন্য আমি এই প্রবন্ধের অবতারণা করি নাই। সংক্ষেপতঃ—বিশেষ ঘটনার উল্লেখ না করিয়া সাধারণ ভাবে ইহার অভ্যুদয় ও বিস্তার এবং তাৎকালিক হিন্দুসমাজের সহিত ইহার প্রকৃত সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়া আমার প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য।

যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃত ইতিহাস জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের সাহায্যের জন্য আমি এস্থলে কয়েক জন সুপ্রসিদ্ধ ইউরোপীয় পণ্ডিত ও তাঁহাদের প্রণীত বা সঙ্কলিত গ্রন্থের উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। নেপালের সুপ্রসিদ্ধ বিদ্বান্ রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত হড্‌সন সাহেব (B, H, Hodgson) তাঁহার প্রণীত ("Essays on the Languages, Literature, and Religion of Nepal and Tebet") উৎকৃষ্ট গ্রন্থে অনেক প্রামাণিক জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। যাঁহারা ইংরাজী জানেন এবং বৌদ্ধধর্ম্মের তত্ত্বান্বেষী, আমি তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থখানি পড়িতে অনুরোধ করি।

এইরূপ জি টর্‌নুর (G. Turnour) সাহেবের "Pali Literature and the Singhalese chronicles" নামক গ্রন্থ

এবং তাঁহার কৃত অনুবাদসহকৃত "মহাবংশ" নামক পালিগ্রন্থও এস্থলে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

আবেল রেমিউসাট্ (Abel Remusat) এবং Schmiat সাহেবের "Religions and literatures of High and Eastern Asia" নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থের সাহায্যও এবিষয়ে অধ্যবসায়শীল পাঠকের পক্ষে অবশ্য গ্রাহ্য।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।
অধ্যাপক, কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট-সংস্কৃত কলেজ

কর্ম্ম।

আসি এ ধরণী পরে
স্বীয় দুরদৃষ্ট স্মরে,
আপন কর্ত্তব্য হ'তে বিচলিত হয়ো না।
উৎসাহ উদ্যম ত্যজি
অলস সন্ন্যাসী সাজি
আত্ম হেতু পরমুখ পানে কভু চেয়ো না॥
দুর্লভ জনম পেয়ে
কেবল অদৃষ্ট চেয়ে
স্বীয় দুরদৃষ্ট-পথ আবিষ্কৃত করো না।
"বিফল পুরুষকার—
একমাত্র দৈব সার"
অলসের এই মন্ত্র কখনও ধরো না॥
"তনয়-তনয়া জায়া—
এ সব মায়ার মায়া";
ইহা বলি মনে কভু বিষণ্ণতা তুল' না।
এসেছ করিতে কর্ম্ম,
কর্ম্মই জীবের ধর্ম্ম,
সর্ব্বশাস্ত্রে এই মর্ম্ম কভু ইহা ভুল না॥
"জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে"
তা' বলিয়া অবসাদ মনে স্থান দিও না।
শান্তি আশে কর্ম্ম ছাড়ি
পরোনা অশান্তি-বেড়ি,
কমল-মালিকা ভ্রমে অহি করে নিও না॥
চির কুলব্রত যাহা,
পালন করহ তাহা,
আত্ম ব্রত ভঙ্গ করি পর পানে চেয়ো না।
সাহসে করিয়া ভর,
কঠোর কর্ত্তব্য কর,
শেষের নৈরাশ্য স্মরি' মনে ভয় পেয়ো না॥
কর্ম্মভূমি ধরাতল,
কর্ম্মই জীবের বল,
হেন কর্ম্ম পরিহরি নরধর্ম্ম ভুল না।
ত্যজিয়া তাড়িত প্রায়
উৎসাহ উদ্যম, হায়!
আপনার শিরে খড়্গ আত্মকরে তু'ল না॥
কর্ম্মে শান্তি—কর্ম্মে সুখ,
কর্ম্মহীন মনে দুখ,
ধর্ম্মভাবে কর্ম্ম কর, আর কিছু চেয়ো না;
সুখ লোভে হয়ে ভোর
ছিঁড়িও না কর্ম্ম-ডোর,
স্বকরে গরল তুলি', ভ্রান্তমতি! খেয়ো না॥

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।
(অধ্যাপক, মেট্রপলিটান কলেজ।)

বেদান্ত-সূত্র।

"শব্দব্রহ্ম" ও "স্ফোট"-তত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

(১০ম)

প্রথম অধ্যায়, তৃতীয় পাদ।

২৪। শব্দাদেব প্রমিতঃ।

("ঈশান") শব্দের দ্বারা "অঙ্গুষ্ঠ-প্রমিত পুরুষ" পদে পরম পুরুষ পরমাত্মাকেই বুঝাইতেছে।

কঠোপনিষদ্ (২-৪।১২) বলেন,—
"অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষঃ মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।"

অঙ্গুষ্ঠ-প্রমিত পুরুষ যিনি।
আত্মমধ্য নিত্যনিবাসী তিনি॥

অপিচ,—"অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষঃ জ্যোতিরিবাধূমকঃ ঈশানো ভূত-ভব্যস্য সএবাদ্য সউশ্ব এতদ্বৈতত।"

অঙ্গুষ্ঠ-প্রমিত পুরুষ যিনি।
অধূমিত জ্যোতিস্বরূপ তিনি॥
ভূত-ভবিষ্যের ঈশ্বর যিনি।
অদ্য-কল্য-সম, তাহাই তিনি॥

"অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ" পদে সোপাধিকত্ব ভাব থাকাতেও জীবাত্মা বুঝায় না; পরন্তু উক্ত পদে পরমাত্মা ব্রহ্মই বিস্পষ্ট বেদিতব্য, ইহাই সূত্রে আলোচিত ও সিদ্ধান্তীকৃত হইয়াছে। উক্ত উপনিষদের মূল মীমাংসিতব্য বিষয়ই ব্রহ্মতত্ত্ব। নচিকেতা যমের নিকট সেই বেদাতীত, কার্য্যকারণাতীত ও ভূত-ভবিষ্যাতীত তত্ত্বই জানিতে চাহিয়াছিলেন। যথা—"অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ অন্যত্র ভূতাশ্চ ভব্যাশ্চ যৎ তৎ পশ্যাসি, তদ্বদ।" (কঃ উঃ ১—২।১৪।)

পূর্ব্বোক্ত ঔপনিষদী শ্রুত্যুক্ত "এতদ্বৈতত" বাক্যে অনুসন্ধেয় ব্রহ্মতত্ত্বেরই নিরূপণ "অঙ্গুষ্ঠপ্রমিত" পদে নিষ্পন্ন হইয়াছে। কারণ পরে বিশদরূপেই বর্ণিত হইয়াছে যে, "অঙ্গুষ্ঠমাত্র" পুরুষ ভূত-ভবিষ্যের প্রভু। পরাৎপর পরমাত্মা পরব্রহ্ম ব্যতীত ভূত-ভবিষ্যের ভর্ত্তা কর্ত্তা আর কে হইতে পারে?

২৫। ইত্যপেক্ষয়াতু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ।

বেদবাক্যার্থ-ধারণে মনুষ্যাধিকার থাকাতেই ব্রহ্মের মনুষ্য-হৃদয়গম্যতা হেতু "অঙ্গুষ্ঠমাত্র" বিশেষণে সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই এস্থলে বিশেষিত বা বেদিত হইয়াছেন।

অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত পদে ব্রহ্মতত্ত্বই কেন বিজ্ঞেয়, এই সূত্রে সেই প্রশ্ন ও তাহার সিদ্ধান্তই সংস্থাপিত হইয়াছে। বেদ-বিদ্যায় মানবের অধিকার প্রসারিত, তাহাতেই পরমাত্মা ব্রহ্মের জ্ঞান মানবের লভ্য হইয়াছে; সুতরাং হৃদয় দ্বারা লভ্য সেই হৃদয়-বাসী হৃদয়েশ্বরের জ্ঞান তাঁহাকে এস্থলে "অঙ্গুষ্ঠমাত্র" পদেই অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত হৃদয়-স্বরূপে প্রকাশ করিতেছে। হৃদয় পরমাত্মার অধিষ্ঠানরূপেই শ্রুত্যুক্ত হইয়াছে; সেই হৃদয়ের পরিমাণ শাস্ত্রানুসারে অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত "দীপকলিকাবৎ।" অতএব এস্থলে হৃদয়স্বরূপে উপলক্ষিত ব্রহ্ম "অঙ্গুষ্ঠমাত্র" পদেই প্রতিপাদিত হইয়াছেন।

বেদবিদ্যাধিকার দ্বারা মানবের এই ব্রহ্ম-তত্ত্বজ্ঞানাধিকার বিষয়ের আলোচনায় শ্রীমচ্ছ-

ঙ্করাচার্য্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চতুর্ব্বর্ণেরই বেদাধিকার বিষয়ে বিচার করিয়াছেন। আচার্য্যপ্রবর, মহর্ষি জৈমিনি-কৃত "পূর্ব্বমীমাংসা" দর্শনের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শূদ্র বেদ-বিদ্যার অধিকারী নয়। সূত্রের "মনুষ্য" শব্দে প্রকৃতার্থে মনুষ্যাকৃতিধারী মাত্রই প্রতিপাদ্য নহে; পরন্তু "অধিকারী" মানবই প্রতিপাদ্য। সে অধিকার বা যোগ্যতা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই "দ্বিজ" ত্রিবর্ণ ব্যতীত শূদ্রে সম্ভবেনা। আমরা এই বিষয়টী ৩৪-৩৮ সূত্রের ব্যাখ্যার সময় আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। যেহেতু উক্ত সূত্রদ্বয়ে এ তত্ত্ব পুনরালোচিত হইয়াছে।

এই সূত্র প্রকারান্তরে এই শিক্ষা দিতেছে যে, জীবাত্মা পরমার্থতঃ পরমাত্মা সহ অভিন্ন; পরমাত্মা ও জীবাত্মার ঐক্যই "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যের সিদ্ধান্ত-রহস্য। পশ্চাদুক্ত বাক্যে এই সিদ্ধান্ত সুবিশদ হইতেছে যে, হৃদয়স্বরূপ অন্তরাত্মার হৃদয়-পরিমিত আয়তন অঙ্গুষ্ঠমাত্র; এই হৃদয়ায়ত্ত অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ আত্মা জীব হৃদয়াধারে নিত্যাধিষ্ঠিত। যথা—

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন মুঞ্জা-
দিবেষিকাং তং ধৈর্য্যেন বিদ্যাৎ।
শুক্রমমৃতমিতি।"
(কঃ উঃ ২-৬।১৭)

অন্তরাত্মা পুরুষ অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত।
সদা জনগণের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত॥
তৃণ হতে গর্ভ-তৃণ গ্রহণ যেমন,
তথাবৎ দেহ হতে হৃদি-উন্মোচন।
দেহ-সার হৃদি, তাই আত্মা হৃদিরূপ।
জানিবে সে ব্রহ্মজ্যোতি অমৃতস্বরূপ॥

২৬। তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ।

সম্ভাবনানুসারে মানবাধিক উন্নত প্রাণীগণেরও বেদবিদ্যায় অধিকার, ইহাই বাদরায়ণের মত বা সিদ্ধান্ত।

পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, মানবগণ বেদ-বিদ্যায় অধিকারী; কিন্তু তদ্দ্বারা এমন কোন বাধকবিধি ব্যবস্থিত হয় নাই যে, দেবগণ বেদ-বিদ্যাধিকারে বর্জ্জিত। এতাবতা মহর্ষি বাদরায়ণের বিচারিত সিদ্ধান্ত এই যে, মানবাধিক শ্রেষ্ঠতর চিৎসত্ত্ব (যথা ইন্দ্র প্রভৃতি) দেবগণ অবশ্য বেদবিদ্যাধিকারী; যেহেতু এ বিষয়ে সম্ভাবনার সুবিদ্যমানতা আছে। পক্ষান্তরে, বেদাধিকারের উপযোগিতা এইরূপে বিবেচিত হইবে, যথা—প্রথমতঃ, দেবগণেরও মানবগণের ন্যায় মুমুক্ষুত্ব থাকার সম্ভাবনা, যেহেতু একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন তাঁহারাও মায়া-সৃষ্ট, উপাধিবিশিষ্ট ও অনিত্যপ্রতিষ্ঠ। দ্বিতীয়তঃ, মন্ত্র হইতে জানা যায় যে, তাঁহারাও মানবের ন্যায় কোন না কোনরূপ অনতীন্দ্রিয় স্থূল মূর্ত্তি ধারণ করেন। তৃতীয়তঃ ইহাতে কোন বাধাই কল্পিত হইতে পারে না। চতুর্থতঃ বেদাধিকারপ্রদ উপনয়ন সংস্কার তাঁহাদের পক্ষে না থাকিলেও, উহাই যে স্বাধ্যায়াধিকারের অবশ্যনির্দ্দিষ্ট অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী প্রয়োজনানুষ্ঠান, এমন কোন কথা নহে। মানবের উপনয়ন-সাধ্য সংস্কারে দেবগণ স্বতঃশ্রেষ্ঠতা বশতঃ স্বতঃসিদ্ধই হইতে পারেন।

২৭। বিরোধঃ কর্ম্মণীতি চেন্নানেক প্রতিপত্তের্দর্শনাৎ।

দেবগণের মূর্ত্তত্ব বা সাকারত্বের সত্যতা বিষয়ে বিতর্ক উপস্থিত হইলে, তাহা অগ্রাহ্য; যেহেতু দেবগণের বিবিধ সাকারসত্ত্ব ধ্যানলভ্য ও সিদ্ধ সাধকের দ্রষ্টব্য।

অনেকে বিবেচনা করিতে পারেন যে, বর্ত্তমান ও পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রনিচয়ের সিদ্ধান্তবিচার দেবগণ পক্ষেই প্রয়োজনীয়; কিন্তু মানবগণ পক্ষে অকিঞ্চিৎকর। ইন্দ্র বা তাঁহার সজাতীয় দেবগণ বেদ-বিদ্যায় অধিকারী কি না, এবং তাঁহাদের সাকার-দেহসত্তা সত্য কি না, এসব বিষয় এতৎপূর্ব্ববর্ত্তী মধ্যযুগের বিদ্যার্থীগণের বিচার্য্য ও আলোচ্য ছিল বটে, কিন্তু বর্ত্তমান যুগের পাঠকবর্গের বোধ হয় সে সম্ভাবনা বড় কিছু নাই। ফলে যাঁহাদের এরূপ ধারণা, তাঁহাদের ভ্রান্তি-নিরসন অবিলম্বেই হইবে; কারণ পরবর্ত্তী সূত্রে এই আপাতসামান্য বিষয়টির সমস্যাতেই শব্দ-বিজ্ঞানের গুরুতম তত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে। এক পক্ষে প্রতিপক্ষীয় বিতর্ক এই যে, যদি দেবগণের মূর্ত্ত সত্তা স্বীকার করা যায়, তবে বেদোক্তি মতে দেবগণের আবির্ভাব কিরূপে সম্ভাবিত হয়? কারণ একই দেব বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন যজ্ঞাদিতে একই মূর্ত্তসত্তায় কিরূপে আবির্ভূত হইতে পারেন? উত্তর এই যে, শাস্ত্রে জানা যায়, এক দেবই বহুমূর্ত্তি ধারণে সমর্থ। অধিক কি, শাস্ত্র বলেন, মনুষ্যও যোগসিদ্ধশক্তিতে বহুমূর্ত্তি ধারণে সমর্থ। ৴ অতএব অতএব মনুষ্যাধিক শ্রেষ্ঠতর শক্তিসম্পন্ন দেবগণ যে একই সময়ে বিভিন্ন যজ্ঞাদিতে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইবেন, তাহা অসম্ভব নহে।

২৮। শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্।

যদি এরূপ বলা যায় যে, "শব্দ" পক্ষে অনুপপত্তির আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, তবে সে আপত্তি সর্ব্বথা অপ্রতিপন্ন; যেহেতু শব্দই জগতের মূলতত্ত্ব। শব্দ হইতেই জগৎ সমুৎপন্ন। প্রত্যক্ষ (বেদ-শ্রুতি) ও অনুমিতি, এতদুভয় দ্বারাই এই সত্য সিদ্ধান্তীকৃত। 'প্রত্যক্ষ' অর্থ এস্থলে শ্রুতি এবং 'অনুমান' স্মৃতি।

দেবগণের মূর্ত্তসত্তা স্বীকারে যজ্ঞকার্য্য সম্বন্ধে কোন অসঙ্গতি সম্ভাবিত নহে, কিন্তু শব্দ সম্বন্ধেই যে কিছু অসঙ্গতির আপত্তি বা প্রতিবাদ। দেবগণ মূর্ত্তসত্ত হইলে, তাঁহারা জন্ম-মৃত্যুরও বিষয়ীভূত বটে; যেহেতু সোপাধিকতা বা মূর্ত্তসত্তা অবশ্য অনিত্য; অতএব বহুদেবনামময় শব্দাত্মক বেদও অনাদি অনন্ত হইতে পারে না। নিত্য শব্দের সহিত অনিত্য বিষয়ের নিত্যসংযোগও অনিত্য অর্থাৎ নাশশীল হয়; সুতরাং বেদের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে প্রতিবাদ উত্থাপিত হইতে পারে।

শঙ্করাচার্য্য, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবগণের অনিত্য সত্ত্ব স্বীকার করেন, এবং সিদ্ধান্ত করেন যে, দেবগণ, অপর প্রাণীগণ—এক কথায়—সমগ্র জগৎই শব্দ বা বেদ হইতে সমুৎপন্ন। এই শব্দ বা বেদই ব্রহ্ম। 'শব্দ ব্রহ্ম" এই বিখ্যাত বাক্য সাধক হিন্দু মাত্রেরই বিদিত। শব্দশাস্ত্রের গ্রন্থকার পাণিনিও, "শব্দশাস্ত্রাধ্যায়ীই প্রত্যক্ষের অতীত কোষ্ঠা-

ধিকারী" এই যে মত প্রকাশ করেন, তাহারও একটী গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। শঙ্কর বলেন, প্রত্যেক পদার্থের মূলতত্ত্ব শব্দে নিহিত। ফলে উহা পদার্থের স্বাতন্ত্র্যগত ভাবে নহে, কিন্তু জাতিগত ভাবে। কারণ পদার্থ সংখ্যায় অনন্ত। স্বাতন্ত্র্যগত বা সোপাধিক বস্তু বা দেবগণের অবশ্য মূল আছে, এবং অবশ্য উৎপত্তি ও ধ্বংস আছে, কিন্তু জাতিগত মূলতত্ত্ব তদতীত। চিৎস্বরূপে এবং বাক্য রূপে তাহা প্রথমে ব্রহ্ম কর্তৃক ব্যক্ত।

যাহাহউক, ব্রহ্মকর্তৃকই এই সোপাধিক জড়জগৎ সৃষ্ট, কিন্তু শব্দ কর্তৃক নহে। শব্দ বা বেদ কেবল প্রতি বস্তুগত নিত্যতত্ত্বের অভিব্যক্তিস্বরূপ। স্বাতন্ত্র্যগত সোপাধিক বিভিন্ন পদার্থসমূহ এতদনুসারেই সমুৎপন্ন।

শঙ্করাচার্য্য শ্রুত্যুক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। "মনসা বাচং মিথুনং সমভবৎ।" (বৃঃ আঃ উঃ, ১।২।৪) অর্থাৎ তিনি মনদ্বারা বাক্যে যুক্ত হইলেন। অপিচ,—

"অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা।
আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ॥
(মঃ ভাঃ, ১১-৮৫০৪)

অনাদিনিধনা নিত্যা স্বয়ম্ভূ ভা যিনি—
বেদবাণী, বিশ্ববাণী-বিকাশিকা তিনি॥

বেদ বা বাণীর বিশ্বমূলত্ব প্রতিপাদনে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের বিচার-প্রণালী এইরূপ।— আমরা যখনই যে কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি, তখনই সেই বিষয়ের স্মরণসূচক নাম, সংজ্ঞা বা বাণী সর্ব্বাগ্রে আমাদের মনে উদয়হয়। যেই ইচ্ছার উদয়, সেই বাণীর উদয়। নির্গুণের প্রথম সগুণত্বই ইচ্ছা। আর সগুণত্বের প্রথম বিকাশই বাণী। রজোগুণে, আদি সগুণসত্ত্ব প্রজাপতি জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়াই জগদুপাদানভূত পদার্থের সংজ্ঞা স্বরূপ শব্দের স্মরণ করিয়াছিলেন। "স ভূরিতি ব্যাহরণ স ভূমিমসৃজৎ।" (তৈঃ উঃ ১১-২৪২) ভূমি-সৃষ্টির বিষয় স্মরণ করিতেই সৃষ্টিকর্ত্তার হৃদয়ে "ভূ" শব্দের উদয় হইল। অমনি তিনি ভূমি সৃষ্টি করিলেন। প্রজাপতি "ভূ" বলিয়া ভূসৃষ্টি করিলেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলেও এই তত্ত্ব এইরূপ ব্যক্ত হইয়াছে— "God said let there be light, and there was light. ঈশ্বর বলিলেন "জ্যোতি হউক" অমনি জ্যোতি হইল। ফলে শব্দাত্মক বেদের অনাদিনিধনত্ব ও জগন্মূলত্বের রহস্য "শব্দব্রহ্ম" তত্ত্বেই নিহিত।

বেদ, বাক্ বা শব্দ বস্তুতঃ বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের স্থূলতত্ত্বাতীত তত্ত্ব। এ তত্ত্ব বাক্যের বীজ-সঙ্কেতবৎ জাগতিক সৃষ্ট পদার্থের সৃষ্টিমূলক প্রয়োজনীয় জ্ঞান বা চিত্রত্ব ধারণ করে। সৃষ্টিশক্তির মূল হেতুসত্ত্ব স্বরূপ সূক্ষ্ম শব্দ-বিজ্ঞান-রহস্য পাশ্চাত্য প্লেটো-শিষ্যগণের বহু পূর্ব্বে হিন্দুর জ্ঞানাধিগত হইয়াছিল। ঋগ্বেদ ১০ম (১২৫) ও অথর্ব্ববেদ ৪র্থ (৩০) বাণীর স্বগতোক্তি এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন।—

১। অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ
অহং মিত্রা বরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥

আমি বরুণের সহিত ভ্রমণ করি, রুদ্রের সহিত ভ্রমণ করি, আদিত্যের সহিত ভ্রমণ

করি, বিশ্বদেবের সহিত ভ্রমণ করি। আমি মিত্র-বরুণ উভয়ের ভরণ করি; আমি অগ্নির ভরণ করি, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ভরণ করি।

২। অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণাং, হবিষ্মতে সুপ্রাব্যা যজমানায় সুন্বতে॥

আমি সোমকে পোষণ করি; ত্বষ্টা, পূষণ এবং ভগকে পোষণ করি। যাঁহারা সোমকে পোষণ করিয়া সোৎসাহে যজ্ঞ করেন, হোম করেন, দান করেন, আমি তাঁহাদিগকে ধন বিতরণ করি।

৩। অহং রাষ্ট্রী-সগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তঃ॥

আমি রাজ্ঞী, আমি ধনসংগ্রহিত্রী, আমি জ্ঞানবতী, আমি যজ্ঞোপাস্যগণের প্রথমা। দেবগণ আমাকে বহুস্থানে বহুবিষয়ে বহুভাবে অন্তর্নিবিষ্টারূপে প্রতিষ্ঠিতা করিয়াছেন।

৪। ময়া সোঽন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি শ্রুধিশ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি॥

যিনি দর্শন, প্রাণন, শ্রবণ ও ভোজন করেন, তিনি অজ্ঞাতভাবে ফলিতার্থে আমাদ্বারাই তৎসমস্ত করেন। তোমরা সকলে শ্রবণ কর, যাহা শ্রদ্ধেয়—অর্থাৎ সত্য, তাহাই আমি তোমাদিগকে বলি।

৫। অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবানামুত মানুষাণাম্।
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্॥

যাহা মনুষ্য ও দেবগণের পক্ষে মঙ্গলজনক, তাহাই আমি স্বয়ং বলিতেছি। আমি যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে জগন্নির্ম্মাণক্ষম ঈশ্বর করি, তাহাকে ব্রহ্মা করি, তাহাকে ঋষি করি, সুমেধা করি।

প্রাচীন টীকাকারগণের মতে "প্রত্যক্ষ" অর্থে শ্রুতি বা ঐশবাণী এবং "অনুমান" অর্থে স্মৃতি বা পুরাণ। এই পরোক্ত শাস্ত্র স্মৃতি-পুরাণ পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র বেদের অবিরোধী হইলেই প্রামাণ্য।

"শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা॥"
বেদ-স্মৃতি পুরাণে যে আপাত-বিরোধ ঘটে।
বেদই প্রামাণ্য তায়; অন্য দুয়ে স্মৃতি বটে॥

বৈদান্তিকগণ তাঁহাদের দর্শনের মুখ্যতম প্রামাণ্যরূপে বেদকেই মান্য করেন; তাঁহারা কেবল যুক্তি-তর্কমাত্রে নির্ভর করেন না। শঙ্করাচার্য্য বলেন, এক মাত্র শ্রুতি প্রমাণে নির্ভর করা যায়, কিন্তু একমাত্র যুক্তি-প্রমাণে নির্ভর করা যায় না। অতি চতুরের যুক্তি-তর্কও তদধিক চতুরের দ্বারা খণ্ডিত হয়; অতএব প্রমাণ বিষয়ে যুক্তি-তর্ককেই নির্ভর-ভিত্তি করা যুক্তিযুক্ত নহে। যুক্তি-তর্কের পরিবর্ত্তনশীল অদৃঢ় ভিত্তি উপেক্ষা করিয়া, শঙ্করাচার্য্য তৎপ্রমাণিত নিত্য অপরিবর্ত্ত্য বেদ-ভিত্তিতে স্বীয় সেব্য বেদান্তদর্শনের প্রামাণ্য স্থাপন করিয়াছেন। বেদান্ত-দার্শনিকেরা কোনরূপ অযৌক্তিক সংস্কারে

বাধ্য নহেন, কিন্তু শ্রুতির স্বয়ং-প্রামাণিকতায় তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। তাঁহাদের মত এই যে, আলোকের প্রামাণ্য যেমন আলোকান্তর-সাপেক্ষ নয়, অর্থাৎ আলোক যদ্রূপ স্বয়ম্প্রকাশ, বেদও তদ্রূপ স্বয়ম্প্রমাণ। আলোক যেরূপ আকৃতি ও বর্ণের প্রমাণ, বেদও তদ্রূপ সর্ব্বতত্ত্ব—সর্ব্বসত্যের প্রমাণ।

ভারতের প্রাচীন মহর্ষিগণ—যাঁহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অতুল্য প্রতিভায় আমরা চমকিত ও স্তম্ভিত হইয়া যাই, তাঁহারাও বেদকে অভ্রান্ত বলিয়া মান্য করেন। তবে কি না, "সংহিতা" ও "ব্রাহ্মণ" নামধেয় কতিপয় পুস্তকবিশেষের স্থূল ভৌতিক সত্তাকেই যে তাঁহারা নিত্য ও অভ্রান্ত বলেন, ইহা বলিলে, তাঁহাদের সেই বিশ্ব-বিকাশিনী বোধশক্তিকে বিদ্রূপ করা হয় মাত্র। কতিপয় জড় সন্দর্ভ বা বাক্য সমষ্টিই তাঁহাদের সেই নিত্য সত্য সনাতন "বেদ" নয়; প্রকৃত বেদতত্ত্ব অতি গভীর। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, বেদ, শব্দ বা বাক্ এবং ব্রহ্ম পরমার্থতঃ এক তত্ত্ব; এক তত্ত্বেরই ভিন্ন ২ প্রতিশব্দ-সংজ্ঞা মাত্র। "বিদ্" ধাতুর অর্থ জানা। যদ্দ্বারা জানা যায়, তাহাই বেদ। অতএব বেদই জ্ঞানস্বরূপ। শব্দই জ্ঞানের প্রবর্ত্তক, অতএব অব্যবহিত কার্য্য-কারণত্ব জন্য শব্দ ও জ্ঞান মূলতঃ এক তত্ত্বান্তর্গত। শব্দই সগুণান্বিত ঐশী ইচ্ছার আদি অভিব্যক্তি। এই সিদ্ধান্তেই প্রতিপন্ন হয় যে, শব্দ, বাক্ বা ব্রহ্ম নিত্য, সত্য, শাশ্বত, স্বয়ংপ্রকাশ ও স্বয়ংপ্রমাণ। অতএব শব্দ বা ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ; সেই জ্ঞানই বেদ; এবং নিত্য সত্যজ্ঞানস্বরূপ সেই বেদেই আর্য্যঋষিদের সিদ্ধপ্রামাণ্য স্বীকৃত। বেদান্তদার্শনিকগণ কতিপয় স্থূল গ্রন্থমাত্রেতেই যদি স্বয়ংপ্রমাণ-বেদত্ব বোধ করিতেন, তবে তাঁহাদের সুপ্রসিদ্ধ জ্ঞান-প্রতিভার প্রসূত বিষয় মাত্রই বালকত্বমাত্রে পর্য্যবসিত হইত; ফলে যাঁহারা প্রকৃত বেদবিৎ, তাঁহারাই প্রকৃত বৈদান্তিক।

তৎপর, জগদুৎপত্তির মূলতত্ত্ব শব্দের যথার্থ স্বরূপ আলোচিত হইয়াছে। বৈদিক "স্ফোট" পদের তাৎপর্য্য এই স্থলে বিচার্য্য। শঙ্করাচার্য্য বলেন, যথা কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়ার উপক্রমে সেই বিষয়ের সংজ্ঞাত্মক শব্দ আমাদের চিত্তে উদিত হয়, তদ্রূপ জগৎসৃষ্টির উপক্রমে প্রজাপতির চিত্তে শব্দের উদয় হইয়াছিল।

হিন্দু-দর্শন-শাস্ত্র সমূহে শব্দতত্ত্ব-সমস্যা বিশেষ বিচক্ষণতা ও ধীরতা সহযোগে বিচারিত হইয়াছে। "শব্দ" অর্থে পদ এবং ধ্বনি বুঝায়। অতএব প্রথমতঃ "ধ্বনি" কি, তাহাই আলোচিত হইয়াছে।

বৈশেষিক দর্শনে এবিষয় বিশিষ্ট ধীরতার সহিত এইরূপ বিচারিত হইয়াছে যে, ধ্বনি শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয় বটে; ফলিতার্থে উহা কোন বস্তু বা ক্রিয়া নহে; কিন্তু আকাশ বা ব্যোমের ভৌতিক গুণ-বিশেষ। বায়ু ইহার স্বরূপ বাহক নহে; ইহার উচ্চতা বা শক্তিযোগ্যতা বায়ুসাপেক্ষ হইলেও ইহার গুণ বা স্বরূপ বায়ুসাপেক্ষ নহে। এতাবতা ধ্বনি এবং পদ নিত্য-শব্দতত্ত্বের সাময়িক স্থূল অভিব্যক্তি মাত্র। বাদন-দণ্ডের আঘাতে একটি ঢক্কা বাদিত হইলে, ঢক্কা ও দণ্ডের সম্মিলনে ধ্বনি সমুৎপাদিত ও বায়ু দ্বারা বাহিত হয়। জৈমিনি-শিষ্য মীমাংসা

দার্শনিকগণের মত এই যে, শব্দ নিত্য। তাঁহারা প্রথমতঃ শব্দের নিত্যত্ব-নিরাসক যুক্তি এইরূপে (পূর্ব্বপক্ষ স্বরূপে) গ্রহণ করেন, যথা,—

১। শব্দ নিত্য হইতে পারেনা, যেহেতু ইহা উৎপন্ন।

২। ইহা বাহিত হইয়া বিলীন হয়।

৩। ইহা গঠিত বা কৃত হয়, তজ্জন্য বর্ণসমূহকে অকার-ককারাদি বলা যায়।

৪। ইহা বিভিন্ন ব্যক্তিকর্ত্তৃক যুগপৎ অনুভূত হয়।

৫। ইহা পরিবর্ত্তনশীল, যথা ইহা "দধি অত্র" হইয়া আবার "দধ্যত্র" রূপে পরিবর্ত্তিত হয়।

৬। ইহা শব্দকারীর সংখ্যাধিক্যে আধিক্য-প্রাপ্ত হয়।

অতঃপর মীমাংসকগণ এই সমস্ত পূর্ব্ব-পক্ষের খণ্ডনার্থ নিম্নোক্ত-প্রকার উত্তর পক্ষে উপনীত হন।—

"শব্দ নিত্যই বটে। যদিও ইহার অনুভূতি উভয় দিকেই তুল্য, তথাপি আমাদের এ সিদ্ধান্ত সত্য যে, শব্দ নিত্য অর্থাৎ সদাস্থিত বা শাশ্বত। কেবল উচ্চারক বা উত্তেজকের সাপেক্ষতায় ইহা সতত ভৌতিক সত্তায় অনভিব্যক্ত। "ক" এই শব্দটি যে শ্রুত হইল, ইহা সেই শব্দই, যাহা নিত্য শব্দিত হইয়াছে ও হইতেছে! যদি বলা যায় যে "একটি শব্দ করা হইল" তবে তাহার যাথার্থ্য এই যে, একটি শব্দকে ভৌতিক ব্যবহারে আনা হইল এবং যুগপৎ বহুব্যক্তি-দৃশ্যমান সূর্য্যবৎ ইহার অনুভূতি বা অভিব্যক্তি সিদ্ধ হইল। শব্দের বিকার বা পরিবর্ত্তনের তাৎপর্য্য এই যে, সেই এক শব্দই বিকৃত বা পরিবর্ত্তিত হয় না; পরন্তু ইহা অপর শব্দ; শ্রোতার বোধাধিকারগত ভাবে সেই একের স্থান-পূরক মাত্র। আর শব্দের যে বৃদ্ধি বা আধিক্য, তাহা বায়ুর সংযোগ-বিয়োগের পরিমাণগত বৃদ্ধি বা আধিক্য-সাপেক্ষ। অপর, শব্দ বা বাক্য যদিও বিলয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ইহার পদাঙ্ক শ্রবণকারী বা শিক্ষাকারীর হৃদয়ে রাখিয়া যায়। শব্দ একই সময়ে সর্ব্বত্রস্থিত, তবে ইহার পুনরুক্তি বা পুনরভি-ব্যক্তি সম্পাদন করিলে, ফলিতার্থে ইহা সেই শব্দই থাকে, কোন নূতনত্ব বা পরিবর্ত্ত প্রাপ্ত হয় না। শব্দ যে কেবল বায়ুরই বিবর্ত্ত-বিধায়ক, তাহা নহে; কারণ শ্রবণেন্দ্রিয় অবশ্য স্পর্শেন্দ্রিয় গ্রাহ্য পবনকে শ্রবণ করে না; কিন্তু স্পর্শেন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত আকাশের শব্দ-গুণকেই গ্রহণ করে বা শ্রবণ করে। এতদ্ব্যতীত অধিকন্তু ও প্রধানতঃ স্বয়ং শ্রুতুক্তি-প্রমাণেই শব্দের নিত্যত্ব প্রমাণিত।"

উপরোক্ত বাক্য-সমষ্টি জৈমিনি-মীমাংসা-পক্ষীয় বিচার-সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত সার। জৈমিনি-পক্ষ স্বমতানুসৃত যুক্তি-প্রমাণাদির অবতারণা করিয়া, পরে বেদোক্ত শব্দের সমর্থনার্থ বহুবিধভাবে বিচার করিয়াছেন। অতঃপর আমরা একটি পরবর্ত্তী সূত্রের বিচার-বিষয়ীভূত সেই "স্ফোট" পদের আলোচনায় প্রত্যাবৃত্ত হইব। "স্ফোট" অর্থ ফুটিয়া পড়া। পাণিনি "স্ফোট" সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই, কিন্তু প্রসঙ্গতঃ "স্ফোটায়ন" নামে এক বৈয়াকরণের উল্লেখ করিয়াছেন। পাণিনির মতে শব্দই ব্রহ্ম। এই হেতু মাধবাচার্য্য পাণিনিকে দার্শনিকগণের মধ্যে

গণ্য করিয়াছেন এবং তাঁহার দার্শনিক মত-বাদকে "বৈয়াকরণবাদ" বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন। পাণিনি যদিও স্পষ্টতঃ "স্ফোট" বিষয়ে বলেন নাই; কিন্তু তাঁহার মতাবলম্বীগণ সকলেই সমবেতমতে স্ফোটের গুরুত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, শব্দ বা বাক্যের অক্ষরসমূহ দ্বারা কোন অর্থ সিদ্ধ হয় না; উহা উচ্চারিত হইয়াই লয় প্রাপ্ত হয়, কারণ উহারা প্রত্যেক বক্তা বা শব্দকর্ত্তার উচ্চারণ বা শব্দকরণ দ্বারাই আত্ম-সত্তা অভিব্যক্ত করে; যেহেতু উহাদের নিজের কোন ব্যষ্টি বা সমষ্টি-শক্তির মৌলিকত্ব নাই। উহাদের শেষ অক্ষরেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব অক্ষর-প্রবাহিত অর্থকরী শক্তি বা তাৎ-পর্য্যবতী অভিব্যক্তি আমাদের স্মৃতিতে মুদ্রিত বা বুদ্ধিতে প্রতীত হয় না। অতএব স্থূল শব্দ বা বাক্য হইতে স্বতন্ত্র বা শব্দাতীত কোন সূক্ষ্মতত্ত্ববিশেষের সত্তা স্বীকার করিতে হয়। শব্দের সেই সূক্ষ্মতত্ত্বই "স্ফোট"। সমগ্র শব্দটি হইতে একেবারে যে তাৎপর্য্য-স্বরূপটি বোধ-বিষয়ীভূত হইয়া বিকাশিত হয়, তাহাই স্ফোট। এই স্ফোটতত্ত্বই নিত্য; ইহাই পরিবর্ত্তনশীল ও বিকাশশীল বাক্যাক্ষরের অতীত স্বতন্ত্র সূক্ষ্মতত্ত্ব।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য মীমাংসকগণের ন্যায় স্ফোটের ওরূপ গুরুত্ব স্বীকার করেন না। তিনি তৎসমর্থনার্থ "উপবর্ষ" হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। উপবর্ষের যুক্তি এইরূপ যে, অক্ষর সমূহই নিজ সত্তা দ্বারা শব্দ সংগঠন করে; যেহেতু যদিও উহারা উচ্চারণ বা ধ্বনন মাত্রই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, কিন্তু উহা পুনরাগতও হইতে পারে। দুইবার "গো" বলিলে, ঐ দুই শব্দে ভিন্ন ২ শব্দ উচ্চারিত হইল, এরূপ কেহই মনে করে না। উচ্চারণের পার্থক্য বস্তুতঃ বাগ্‌যন্ত্রগত, আর অক্ষরের প্রত্যভিজ্ঞান তাহার অন্তঃপ্রকৃতিগত।

শব্দের বর্ণসমূহ একাধিক হইলেও অর্থতঃ একমাত্র মানসিক ক্রিয়ারই বিষয়ীভূত হয়; যথা আমরা 'সারি' বা 'সৈন্য' সংজ্ঞার বস্তুগত বহুত্ব একত্বভাবেই অনুভব করি। যদি এরূপ প্রশ্ন করা যায় যে, "পিক" ও "কপি" শব্দের ন্যায় একই অক্ষর সমূহে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ কেন করে? উত্তর এই যে, যখন এক দল পিপীলিকা সারিবাঁধিয়া সুশৃঙ্খলায় চলে, তখন তদ্দ্বারা একটি শ্রেণী মাত্রের একত্বভাব উপলব্ধ হয়; তবে যখন তাহারা বিশৃঙ্খল হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে, তখন বিভিন্নত্ব ও বহুত্ববোধ ঘটে। শঙ্করের মত এই যে, স্ফোটতত্ত্বের কল্পনা বা অবতারণা অনাবশ্যক। তাঁহার মতে শব্দের বর্ণ সমূহ এক একটি নির্দ্দিষ্ট অর্থবোধের সহিত নিত্য নিবদ্ধ থাকে এবং একটি নির্দ্দিষ্ট নিয়মে বিভিন্নবর্ণ-সমবায়-সঞ্জাত একটি নির্দ্দিষ্ট তাৎপর্য্য বা অর্থবিশেষ আমাদের বোধ-বিষয়ীভূত করে। অতএব অতিরিক্ত এক স্ফোট-তত্ত্বের অনুভূতি অসিদ্ধ। এতাবতা শঙ্কর স্ফোটতত্ত্ববাদ অঙ্গীকার করেন না; কিন্তু শব্দ ও ব্রহ্মের সমত্ব প্রতিপাদন পক্ষে শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করেন এবং নিত্য ও জগন্মূল "শব্দব্রহ্ম" হইতেই যে জাগতিক অনিত্য পদার্থ—যথা দেব, নর, গো ইত্যাদি উৎপন্ন, তাহাও সিদ্ধান্ত করেন।

যোগদর্শন স্ফোটবাদ স্বীকার করেন, কিন্তু তৎসহযোগীদর্শন সাংখ্য তাহা অস্বীকার

করেন। কপিল বলেন,—যাহা কখনও অনুভূত হয় নাই, এরূপ এক নবোদ্ভাবিত তত্ত্ব স্বীকার করার আবশ্যকতা কি? "বৃক্ষ" হইতে "বন" যেমন অবিভিন্ন, তদ্রূপ শব্দ হইতে অবিভিন্ন এই স্ফোটের সার্থকতা ও প্রামাণিকতা সম্পূর্ণ অনুপপন্ন।" কপিল দেব বেদের নিত্যত্বও অস্বীকার করেন; যেহেতু বেদসমূহ স্বয়ং স্ববাক্যে তাহাদিগের উৎপন্নতা প্রতিপন্ন করিতেছে। এ স্থলে ইহা অবশ্য বুঝিতে হইবে যে, এই অনিত্যত্ব প্রতিপাদন "বেদ" নামধেয় স্থূল গ্রন্থসত্তার প্রতিই প্রয়োজ্য; ফলে বেদার্থরূপ নিত্য-জ্ঞানতত্ত্বের প্রতি নহে; কারণ "বিদ্" ধাতু উৎপন্ন বেদ জন্যতা প্রযুক্ত অনিত্য হইলেও, তদ্দ্বারা বেদ্য জ্ঞানতত্ত্ব স্বতএব নিত্য।

ন্যায়দর্শনকার গৌতমও শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে বেদসমূহের যথার্থ নিত্যত্ব তাহাদের স্মৃতি, স্বাধ্যায় ও নিয়োগের অক্ষুণ্ণ নিরবচ্ছিন্নতার উপর নির্ভর করে, এবং তাহাদের প্রামাণিকতা সম্যক্ স্বাধ্যায়-সিদ্ধ আপ্ত পুরুষের প্রমাণ-প্রয়োগতায় নির্ভর করে; অতএব বেদ-সর্ব্বস্ব শব্দের বা শব্দসর্ব্বস্ব বেদের নিত্যত্ব অনুপপন্ন। বৈশেষিকগণও শব্দাত্মক বেদের নিত্যত্ব বিষয়ে ন্যায়কার গৌতম ঋষির মতের বিশেষ বিভিন্নবাদী নহেন।

২৯। অতএব চ নিত্যত্বম্।

অতএব বেদের নিত্যত্ব সিদ্ধ। পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রে যাহা বিবৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন যে, বাক্ বা শব্দাত্মক বেদ, বিজ্ঞান বা বিদ্যার ন্যায় নিত্য। শব্দ ভিন্ন জ্ঞানোৎপত্তি সম্ভবে না। প্রাচীন গ্রীকগণের "Logos" যেমন, ভারতের জ্ঞান বা বেদ তদ্রূপ। কালক্রমে অনেক স্থলে বেদের বেদত্ব কেবল কতিপয় গ্রন্থবিশেষে এবং ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব সংহিতা এবং তাহাদের "ব্রাহ্মণ" ও "উপনিষৎ" রূপ স্থূল বিভাগ-বিশেষেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী প্রামাণিক শাস্ত্রসমূহেরও সিদ্ধান্ত এইরূপ যে, মানব-জ্ঞানের সমগ্র শাখা-প্রশাখাই বেদ-বিনির্গত। বস্তুতঃ মানব-জ্ঞানের এরূপ কোন শাখাই কল্পিত হইতে পারে না, হিন্দুগণ যাহার মূল সর্ব্বজ্ঞান-কল্পতরু বেদে প্রতিষ্ঠিত না দেখিয়াছেন।

৩০। সমান নামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্য বিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ।

নাম-রূপ-উপাধির সমত্ব বশতঃ জগতের নব সৃষ্টির সময়ে বেদ বাণীর এই নিত্যতা অনুপপন্ন নহে।

ইহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে যে, শব্দ ও জাতির সম্বন্ধ নিত্য। কিন্তু যদি জগৎ প্রতি কল্পের অবসানেই অবসান প্রাপ্ত হয় এবং পুনঃ কল্পারম্ভে পুনঃসৃষ্ট হয়, তবে শব্দ ও জাতির সম্বন্ধগত ব্যবহারিক নিত্যত্বের গতি ব্যাহত হইল, এবং তদ্ধেতু বিষয়টীও প্রতিবাদবিষয়ীভূত হইল, বলিতে হইবে। বক্ষ্যমাণ সূত্রে উক্ত প্রতিবাদের বিষয়ই এইরূপ আলোচিত হইতেছে যে—যদিও প্রতি মহাপ্রলয়েই এই সৃষ্টি-প্রপঞ্চের ভৌতিক প্রলীনতা ঘটিয়া থাকে, কিন্তু জগতের সূক্ষ্ম বীজ-শক্তি ব্রহ্মতত্ত্বগতভাবে অব্যাহত থাকে এবং জগতের পুনঃসৃষ্টিতে সেই মূল কারণ হইতে ইহাও সগুণা ও সক্রিয়া হইয়া পুনঃ প্রকাশ পায়। অন্যথা

আমাদিগকে কারণ ব্যতীত কার্য্যোৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়। জগতের বিভিন্ন সাময়িক বিভিন্ন প্রকারের শক্তি-সত্তা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। নাম ও রূপের মূলতত্বগত একত্ব শ্রুতি স্মৃতি, উভয় শাস্ত্রেই স্বীকৃত। ঋক্‌সংহিতা (১০—১৯০। ৩) বলেন—

"সূর্য্য চন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ॥"
পূর্ব্বকল্প-অনুসারে সৃজিলেন ধাতা—
চন্দ্র-সূর্য্য স্বর্গ-মর্ত্ত্য অন্তরীক্ষ তথা।

স্মৃতিও এবম্বিধ উক্তি করিতেছেন, যথা,—
ঋষীণাং নামধেয়ানি যাশ্চ বেদেষু দৃষ্টয়ঃ।
শর্ব্বর্য্যন্তে প্রসূতানাং তান্যেবৈভ্যো দদাত্যজঃ॥"
দিলা অজ নাম-রূপ-বেদবিদ্যা-অধিকার।
নিশান্তে প্রসূত পুনঃ ঋষিগণে পুনর্ব্বার॥

ঋতু যেমন ঠিক সর্ব্বস্বাভাবিক সত্ব সহ পুনরাবৃত্ত হয়, তদ্রূপ বিভিন্ন যুগ-প্রলয়ের পর পুনরাবৃত্ত নবযুগে ভৌতিক সত্ব এবং দেবগণের ঠিক পূর্ব্বযুগবৎ নাম-রূপ উপাধিসহ পুনরাবৃত্তি ঘটে।

৩১। মধ্যাদিষ্বসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ।

জৈমিনির মত এই যে, দেবগণ বেদস্বাধ্যায়শীল হইতে পারেন না, যেহেতু "মধুবিদ্যা" প্রভৃতি বিষয়ে তাহার অসম্ভবনাই প্রমাণিত।

"মধুবিদ্যা" পদের সহজ শাব্দিক অর্থ মধু সম্বন্ধীয় জ্ঞান। বস্তুতঃ ইহা শ্রুতির ব্রহ্মজ্ঞান-বিষয়ক এক বিশিষ্ট অংশ। আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩—১১) দেখিতে পাই যে, সূর্য্যই দেবগণের মধু স্বরূপ এবং আমরাও মধু স্বরূপ সূর্য্যকে ধ্যান করি। অতএব দেবগণ যদি স্বয়ংই উপাসক রূপে স্বীকৃত হন, তবে কিরূপে এই আদিত্যও স্বয়ং দেব হইয়া আপনাকে আপনি ধ্যান করিবেন? এতাবতা জৈমিনির সিদ্ধান্ত এই যে, দেবগণ বেদবিদ্যাধিকারী নহেন।

৩২। জ্যোতিষি ভাবাচ্চ।

দেব সংজ্ঞা-সূচক শব্দ সকল জ্যোতিঃ স্বরূপেই দেবতত্ব প্রকাশ করে বলিয়াও দেবগণের (পূর্ব্বোক্ত) অনধিকার প্রতিপন্ন হইতেছে।

জ্যোতিষ্ক মণ্ডল আদিত্যবৎ আকাশমণ্ডলে অবস্থিত থাকিয়া জগৎ আলোকিত করেন। এই আদিত্য একটি প্রধান দেব বলিয়া পরিচিত। ফলে হৃৎ-ফুস্ফুসাদি-সমন্বিত কোন জৈবিক শারীর সত্তা বা বুদ্ধিমত্তা জ্যোতিষ্কমণ্ডলে সম্ভবেনা; অতএব তাহাদের ব্রহ্মজ্ঞানাধিকার অনুপপন্ন। তারপর, যদিও মন্ত্র ও পুরাণ সকল দেবগণের ব্যক্তিত্ব ও মূর্ত্তসত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু ধর্ম্মোপদেশাদিবৎ মন্ত্র ও পুরাণাদি সাক্ষাৎ তত্বজ্ঞানের উপায় নহে; সুতরাং তদ্বিষয়ে তাহাদের প্রতি নিশ্চয় নির্ভর করা যাইতে পারে না।

৩৩। ভাবন্তুবাদরায়ণোঽস্তি হি।

পক্ষান্তরে, বাদরায়ণ, শ্রুত্যুক্তি আছে বলিয়াই, সেই আপ্তপ্রমাণ বলে দেবগণের ব্রহ্মবিদ্যাধিকারের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন।

বাদরায়ণ বলেন, দেবগণ জ্ঞানের অন্যান্য অবান্তর বিষয়াধিকারী না হইলেও, তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারী হইতে পারেন। এমন কি, মনুষ্য মধ্যেও সকল মনুষ্য সকল বিষয়ে সমাধিকারী হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ

কদাপি রাজসূয়যজ্ঞের অধিকারী হইতে পারেন না। ফলে দেবগণের উক্ত অধিকার প্রতিপাদক স্পষ্ট শ্রুত্যুক্তি রহিয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলেন, ইন্দ্র প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, ইত্যাদি। এতাবতা পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রের আপত্তির উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যদিও দেবগণ জ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের এরূপ বিশেষ দৈব আত্মসত্তা, বুদ্ধিমত্তা ও অব্যাহত শক্তিসম্পন্নতা আছে যে, তদ্দ্বারা তাঁহারা যে কোন অধিকার বিষয়ে যে কোন তত্ত্বমূলক মূর্ত্তিধারণে সমর্থ, সন্দেহ নাই।

এই যে আমি।

(গীতিকা)

আমারে কি খোঁজ রে জীব!
আমি যে তোর পাশে॥
(আছি) পাশে এসে, ঘেঁষে বসে,
মিশে যাবার আশে॥
১। (আমায়) খুঁজিস্ কিরে লক্ষীছাড়া!
আমি কি তোর অক্ষিছাড়া?
(আবার) শুনিস্ না যে দিচ্ছি সাড়া
প্রতি শ্বাসে শ্বাসে॥
২। (আহা) সুধার সাধে উধাও হয়ে,
বাইরে ফের চন্দ্র চেয়ে,
(আছি) মন-চকোরের চন্দ্র হয়ে
অন্তর-আকাশে॥
৩। (এ যে) পেঁচিয়ে ধরেও চেঁচিয়ে ডাকা,
মশাল জ্বেলে সূর্য্য দেখা,
আর্ নায়্ চেরা হাতের্ শাঁখা,
হাওয়ায় বসে পাখা হাঁকা!
বোকা যে, সে এম্নি ঠকা
ঠকে অনায়াসে॥—
৪। (আহা) পতিব্রতার তীর্থে যাওয়া,
তরী-বাসীর বারি চাওয়া,
মকর-মীনের গঙ্গা-নাওয়া,
পাল-পাওয়া নায়্ লগী-বাওয়া!
(ওরে) তেম্নি কি তোর্ সাধন-লওয়া
আমায় পাওয়ার আশে?
৫। (আমি) গোলকে নই, কৈলাসে নই,
বৃন্দাবনে—কাশীতে নই,
মন্দিরে নই—মস্‌জিদে নই,
রই মনের বিশ্বাসে॥
৬। (আমি) পুরাণে নই, কোরাণে নই,
গেরুয়া করোয়াতে নই,
যুক্তিতে নই উক্তিতে নই,
ভুক্তিতে নই মুক্তিতে নই,
(আমি) কেবল শুধু ভক্তিতে রই
ভক্ত-হৃদাবাসে॥
৭। (আমি) কুসুমে নই চন্দনে নই,
নমাজে নই বন্দনে নই,
মালাতে নই ঝোলাতে নই,
গাঁজায় সিদ্ধি-গোলাতে নই,
কপ্নী-কাছা-খোলাতে নই,
দোলাতে বিলাসে।
দুলি প্রেমের দোলাতে বিলাসে।
আমি নিত্য দুলি চিত্ত-দোলাতে বিলাসে॥
৮। (ও রে) গোলেমালে 'মাল' মিশেছে,
গোল পেকে মাল লওরে বেছে।
বুকের ধন রয়েছি বুকে,
বুক খুলে মুখ দেখ সুখে;
প্রেম-নয়নে দেখ সত্য,
এই যে আমি আছি নিত্য,
যুগলরূপে করি নৃত্য
ভক্ত-চিত্ত-রাসে॥

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

শ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২০ আইন মতে রেজষ্টীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৮ম বর্ষ, ৮ম খণ্ড, ১১শ সংখ্যা। | ফাল্গুন। | ১৩০৮ সাল, ১৮২৩ শকাব্দা।

আহার।

তৃতীয়-অধ্যায়।

—০:০:০—

খাদ্যাখাদ্যের সাধারণ বিভাগ।

ভারতবর্ষের উর্ব্বর-ক্ষেত্রে যত প্রকার সামগ্রী উৎপন্ন হয়, সমস্তই যে আর্য্য হিন্দুগণ ব্যবহার করিতেন, তাহা নহে। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, আহারের সহিত শরীর ও মনের বিশেষ সংযোগ আছে এবং মনের সংযোগ আছে বলিয়াই আহারের সহিত আত্মারও সম্বন্ধ, তাই সেই দিকে সতর্ক তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া আর্য্যঋষিগণ হিন্দুর—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগের খাদ্য সামগ্রী নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। সেই শ্রেণী বিভাগের মূলে যে কতখানি সত্য নিহিত রহিয়াছে, তন্নির্দ্ধারণ বক্ষ্যমাণ-প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। যে কারণেই হউক, তাঁহারা যাহা করিয়া গিয়াছেন, ধর্ম্মের আদেশ মনে করিয়া সমগ্র ভারতবাসী হিন্দু এতদিন তাহা প্রতিপালন করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন।

"মনুসংহিতার পঞ্চমাধ্যায়ের প্রথমে এইরূপ ভূমিকা আছে—ঋষিরা ভৃগুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বেদজ্ঞ-ব্রাহ্মণেরা সকলেইত আপন আপন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তবে তাঁহারা বেদবিহিত চারিশত বৎসর পরমায়ু ভোগ করিতে পারেন না কেন? কি নিমিত্ত তাহাদের অকাল মৃত্যু ঘটিতেছে? এই কথা শুনিয়া ভৃগু বলিলেন,—ব্রাহ্মণেরা আর ভাল করিয়া বেদ পড়েন না, তাঁহারা আচার-ভ্রষ্ট হইয়াছেন, দিন দিন অতিশয় অলস হইতেছেন, বিশেষতঃ তাঁহাদের খাদ্য-দোষ ঘটিয়াছে, এই

গুলিই অকাল মৃত্যুর প্রধান কারণ। তারপর মনুপুত্র ভৃগু অভক্ষ্য দ্রব্যগুলির নাম করিতে লাগিলেন।"

মনুসংহিতার 'পঞ্চম-অধ্যায়ে' আহার-সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখিত রহিয়াছে। নিম্নে কোন কোন স্থান হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

"লশুন (রসোন), গৃঞ্জন, (রক্ত মূলক শাক বিশেষ গাজোর ইতি ভাষা) ও বিষ্ঠাদিতে সম্ভূত দ্রব্যাদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্যের অভক্ষ্য জানিবে।"

মন্বাদি বিংশতি সংহিতায় এইরূপ সহস্র সহস্র বিধি নিয়মের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ অনেক দ্রব্যই নয়নগোচর হয়, যাহা হিন্দু মাত্রেরই অভক্ষ্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।

ইহা ভিন্ন আরও এমন অনেক বস্তু আছে, যাহা মাস বিশেষে ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ, যথা,—

(১) কার্ত্তিক মাসে মৎস্য, মাংস ভোজন করিলে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়।"*

(২) "আষাঢ়ের শুক্লা একাদশী হইতে কার্ত্তিকের শুক্লা দ্বাদশী পর্য্যন্ত শ্বেত শিম্বী, পটোল, বরবটী, কদম্ব, কলমীশাক, বার্ত্তাকু ও কদবেল এই সকল দ্রব্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ।"

(৩) "যদি মাঘ মাসে ব্রাহ্মণ মূলা ভক্ষণ করে, তবে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে, অন্যথা নরকে গমন করিবে; ক্ষত্রিয় ভক্ষণ করিলে শূদ্রবৎ হইবে; বরং অভক্ষ্য ভক্ষণ করিবে অথবা গর্হিত বস্তু আহার করিবে, তথাচ যত্ন পূর্ব্বক মদিরা তুল্য মূলা বর্জ্জন করিবে।"

ইত্যাদি ইত্যাদি।

আর্য্য ঋষিগণ এই স্থানেই—ক্ষান্ত হন নাই। ঋতু বিশেষে দ্রব্য বিশেষ ভক্ষণ করিবার বা বর্জ্জন করিবারও আদেশ করিয়া গিয়াছেন। তিথি বিশেষে যেমন ধা[illegible] বিকার ঘটিয়া থাকে, ঋতু বিশেষেও আবা[র] ঠিক তেমনি হয়। কোন ঋতুতে বায়ু, কোন ঋতুতে শ্লেষ্মা, কোন ঋতুতে পিত্ত প্রভৃতি কুপিত হইয়া শরীরকে আক্রমণ করে। সে[ই] আক্রমণের ফলে মানব শরীরের যন্ত্রবিশেষ ন্যূনাধিক পরিমাণে বিকার প্রাপ্ত হয়। তাই আর্য্য ঋষিগণ ঋতুবিশেষেও আবার খাদ্য দ্রব্য বিভাগ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। সুশ্রুত সংহিতায় "সূত্র স্থানের" এক বিংশ অধ্যায়ে ২৪ হইতে ৩১ শ্লোক এবং "উত্তর তন্ত্রে[র] চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ে ৪ হইতে ১২ শ্লো[ক] পাঠ করিলে ভক্ত বিষয় সম্বন্ধে সকল প্রকার তথ্য জানা যাইবে। স্থানাভাব বশতঃ কথিত শ্লোকগুলি এস্থলে উদ্ধৃত করি[তে] পারিলাম না। "স্মৃতি আহ্নিক তত্ত্বে" এই বিষয়ের দীর্ঘ আলোচনা আছে।

নরবিভাগ ও তৎসংক্রান্ত খাদ্য বিভাগ।

এইরূপ খাদ্য সামগ্রীর বিজ্ঞান করি[য়া] ঋষিগণ নর-বিভাগ করিলেন। মনুষ্যের স্বাভাবিক নিজ গুণ লইয়াই এই বিভাগ ক[রা] হইয়াছিল। মানব মণ্ডলীর ভিতর কেহ সাত্ত্বিক-গুণ সম্পন্ন, কেহবা রাজস-গুণ স[ম্পন্ন] এবং অন্য সকলে তামস গুণ-সম্পন্ন, মিশ্র সম্পন্ন মানবের সংখ্যা অল্প। এইরূপে তব [illegible] কার হিসাবে মনুষ্য সম্প্রদায় শ্রেণীবদ্ধ ব[illegible]

* মনু।

হইয়াছিল। আপন আপন চরিত্র এবং রুচি বিশেষে মানুষ আপন আপন খাদ্যসামগ্রী বাছিয়া লইত। তদ্দৃষ্টেই নরবিভাগ অনুসারে খাদ্যবিভাগও হইয়া ছিল।

যে সকল দ্রব্য কটু অম্লযুক্ত, লবণযুক্ত, অতিশয় উষ্ণবীর্য্য এবং উগ্র, যে সকল দ্রব্য অতিশয় রুক্ষতাকারক ও উত্তাপ-বর্দ্ধক তাহাই রাজস লোকের প্রিয় খাদ্য।*

আর যে সকল দ্রব্য অর্দ্ধপক, বিগতরস, পূতিগন্ধ বিশিষ্ট এবং অপবিত্র, তাহাই তামস লোকের প্রিয়।†

কিন্তু সাত্ত্বিক-খাদ্যই শ্রেষ্ঠ এবং সাধুজনোচিত। খাদ্যের সহিত স্বাস্থ্য এবং ধর্ম্মের নিত্যসম্বন্ধ। তাই ধার্ম্মিক সাধু ও সংযমী পুরুষদিগের যাহা প্রিয়, তাহাই সাত্ত্বিক-খাদ্যের অন্তর্গত। যে সকল দ্রব্য সত্ত্বগুণ, অনাময়, বল, সুখ, প্রীতি প্রভৃতি বৰ্দ্ধক, যে সকল দ্রব্য রসাল, স্নিগ্ধ, হৃদয়ানন্দোদ্দীপক এবং চিত্তের স্থৈর্য্য-বর্দ্ধক, তাহাই সাত্ত্বিক-খাদ্য *

সাত্ত্বিক-খাদ্য আবার দুই প্রকার—আশ্রমিক এবং হবিষ্যান্ন। সংসার ত্যাগী ধর্ম্মাশ্রমবাসী ঈশ্বরচিন্তানিমগ্ন ঋষিগণ যাহা আহার করিতেন, তাহারই নাম আশ্রমিক-খাদ্য। অগ্নিস্পৃষ্ট-দুগ্ধ এবং ফলমূলাদি আশ্রমিক খাদ্যের অন্তর্গত।† যাহাহউক, তাহার বিবৃত আলোচনার প্রয়োজন নাই। কেবল এইটুকু বলিলেই বর্ত্তমান-ক্ষেত্রে যথেষ্ট হইবে যে, সাত্ত্বিক খাদ্য ভোজনে চিত্ত যেরূপ পবিত্র ও নির্ম্মল থাকে, ধর্ম্মে যেরূপ মতি থাকে, শরীর ও মন উভয়ই যেমন সুস্থ থাকে অন্য (অর্থাৎ রাজস ও তামস) খাদ্য ভোজনে তাহা হয় না। কিন্তু আমরা সচরাচর যে সকল দ্রব্য ভোজন করিয়া থাকি, তাহার অধিকাংশ রাজস খাদ্যের অন্তর্গত।

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, স্থূলতঃ ত্রিবিধ উপায়েই সাধারণ খাদ্য হিন্দুর খাদ্যাখাদ্য বিভক্ত হইয়াছিল;—

১। সাধারণ বর্জ্জন, অর্থাৎ কতকগুলি দ্রব্য একেবারে অভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ।

---

* "কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণরুক্ষ বিদাহিনঃ।
আহারা রাজস সেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদা॥"
ভগবদ্গীতা।

† "যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনম্ তামসপ্রিয়ম্॥"
ভগবদ্গীতা।

* আয়ুঃ সত্ত্বলারোগ্য সুখ প্রীতি বিবৰ্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা বা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিক-প্রিয়াঃ॥"
ভগবদ্গীতা।

† স্মৃতিতে হবিষ্যান্নোক্ত দ্রব্যের একটী তালিকা আছে তাহা এইঃ—

"হৈমন্তিকং সিতাস্বিন্নং ধান্যং মুদ্গাস্তিলা যবাঃ।
কলায় কঙ্গু নীবারা বাস্তুকং হিলমোচিকাঃ॥
যষ্টিকা কালীশাকঞ্চ মূলকং কেমুকেতরং।
লবণে সৈন্ধব সামুদ্রে গব্যে চ দধি সর্পিষী॥
পয়োঽনুদ্ধৃত সারঞ্চ পনসাম্র হরীতকী।
তিন্তিড়ী জীরকঞ্চৈব নাগরঙ্গঞ্চ পিপ্পলী॥
কদলী লবলী ধাত্রী ফলান্য গুড়মৈক্ষবং।
অতৈলপক্কং মুনয়ো হবিষ্যান্নং প্রচক্ষতে॥"

২। ঋতুভেদে আহারভেদ এবং মাসভেদে আহারভেদ।

৩। তিথিভেদে আহারভেদ।

চতুর্থ-অধ্যায়।

তালিকা ও তুলনা।

শাস্ত্রকারগণ যে ত্রিবিধ উপায়ে হিন্দুদিগের আহার্য্য সামগ্রী বিভাগ করিয়াছিলেন, তাহাই সমীচীন এবং যথেষ্ট। দ্রব্যগুণ বিবেচনা করিয়া তাঁহারা কতকগুলি সামগ্রী একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং অপর কতকগুলি ঋতুভেদে ও মাসভেদে ভোজনের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন যাহা অবশিষ্ট ছিল, সেই সকল খাদ্যসামগ্রীর ভিতর যে গুলি একটু অধিক অপকারী, তাহাই তিথিভেদে ভক্ষণ করিবার আদেশ করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান অধ্যায় পাঠ করিবার সময় পাঠকদিগের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, যে সকল দ্রব্য অতিশয় সাধারণ এবং সহজেই প্রাপ্য, কেবল তাহাদিগের সম্বন্ধেই মত বিধি প্রচলিত হইয়াছিল। সমাজের সকল লোকেরই অবস্থা কোন দিনই এক রকম নহে। কেহবা দরিদ্র, কেহবা ধনী, কেহবা মধ্যবিত্ত। পৃথিবীর জন্ম হইতে মানব-মণ্ডলীর ভিতর এইরূপ একটি প্রাকৃতিক নিয়ম চলিয়া আসিতেছে; এ নিয়মের প্রবর্ত্তক কেহ নাই। যে সমাজে যেরূপ অবস্থার লোক অধিক, সেই সমাজের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ। দরিদ্রের সংখ্যা অধিক হইলে, সমাজ দরিদ্র—মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আধিক্য হইলে সমাজের অবস্থাও মধ্যবিত্ত। শাস্ত্রকারদিগের আদেশের উপর অন্ধবিশ্বাস পরিপূর্ণ হৃদয়, ধর্ম্মভীরু, সরল, নিরহঙ্কারী সেই সকল হিন্দু আর্য্য কি কি সামগ্রী আহার করিতেন, তাহাই সর্ব্বপ্রথমে বিবেচনা করা আবশ্যক। আহারের "নবাবী" বলিলে আমরা এখন যাহা বুঝি, তখন তাহার যে প্রচলন ছিল না, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের হিন্দুদিগের দিকে একবার চাহিলে দেখা যাইবে যে, এখনকার অধিকাংশ হিন্দু যাহা ভক্ষণ করে, তখনকার সেই প্রাচীন আর্য্যভূমে প্রায় সেই সমস্ত দ্রব্যই ভক্ষিত হইত।

কোন একটী দেশের কেবল মাত্র ধনী ব্যক্তিরা যে সকল দ্রব্য ভোজন করিয়া থাকেন, সেই দেশের পক্ষে সেই সকল দ্রব্য সাধারণ খাদ্য সামগ্রী নহে। দেশের মধ্যবিত্ত অবস্থার বা দরিদ্র অবস্থার লোক যে সকল দ্রব্য ভোজন করেন—যে সকল দ্রব্য সহজেই এবং অল্পব্যয়েই বা বিনাব্যয়েই পাওয়া যায়—সেই সকল খাদ্য সামগ্রীই সাধারণ খাদ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। ভারতবর্ষে ফল মূল, শাক শবজীর অভাব নাই—ভারতবাসীদের খাদ্য সামগ্রীর অধিকাংশ দ্রব্য তাহাই।

তখনকার পুরাতন ভারতবর্ষের সাধারণ আর্য্য হিন্দু যে সমস্ত খাদ্য সামগ্রী ব্যবহার করিত এবং তাহাদিগের ব্যবহার করিবার সম্ভাবনা ছিল বলিয়া মনে হয়, কেবল সেই সকল দ্রব্যই এখন আমাদিগের আলোচ্য-বিষয়।

বর্ত্তমান অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট (ক) তালিকার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই বুঝিতে

পারা যাইবে যে, সাধারণ ভক্ষ্য প্রায় সকল সামগ্রীরই (তরকারী, ফল, মূল ও শাকাদি) আমি নামোল্লেখ করিয়াছি। তবে ইচ্ছা করিলে তালিকার আকার আরও বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে। দ্রব্যগুলির নামোল্লেখ করিয়া আমি তাহাদিগের নিজস্য গুণাগুণও দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি।

উক্ত দ্রব্যগুলির ভিতর যে গুলি সাত্বিক-খাদ্যের অন্তর্গত, তাহাদিগের সম্বন্ধে কিছু বলাই নিষ্প্রয়োজন। কারণ সাত্বিক-খাদ্য-দ্রব্য সম্বন্ধে পূর্ব্বেই অনেক কথা বলিয়াছি। তাহা হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, সাত্বিক-খাদ্য দোষাবহ নহে—উহা সাধু, সন্ন্যাসীর এবং সত্বগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের আহার্য্য। (ক) তালিকার অবশিষ্ট দ্রব্যগুলি পরীক্ষা করিলেই প্রতীয়মান হইবে যে, সে গুলি তত অনিষ্টকর নহে, বরং অধিকাংশ স্থলেই উপকারী। তাই শাস্ত্রকারগণ সে সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই! তবে তাহাদিগের ভিতর যে সমস্ত দ্রব্য অপেক্ষাকৃত অপকারী, তাঁহারা কেবল তাহাদিগের কথাই বলিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। (খ) এবং (গ) তালিকা (ক) তালিকার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলেই সকল বিষয় সহজ ও সরল হইয়া আসিবে।

(খ) এবং (গ) এই দুইটী তালিকা হইতেই দেখা যাইতেছে যে, সাধারণ প্রচলিত খাদ্য সামগ্রীর ভিতর যে গুলি একটু দোষাবহ, তাহাদিগের দোষের তুলনায় কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি নিষিদ্ধ দ্রব্যাদির দোষ বহুল পরিমাণে অধিক। (গ) তালিকার দোষের সহিত (খ) তালিকার দোষের তুলনা করিলে, (গ) তালিকার দোষ, দোষ বলিয়াই বিবেচিত হইতে পারে না। দোষ অপেক্ষা এই সকল সামগ্রীর গুণের ভাগই অধিক।]

(ক) গুণাবলী সহ সচরাচর প্রচলিত অতিশয় সাধারণ খাদ্য সামগ্রীর তালিকা।

ক্রমিক সংখ্যা।	দ্রব্যের নাম।	দ্রব্যের গুণাগুণ।	মন্তব্য।
১	কুষ্মাণ্ড...	পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে	ইহারা রাজস খাদ্যের
২	বৃহতী...	ঐ	অন্তর্গত এবং তিথিভেদে
৩	অলাবু...	ঐ	ইহাদিগকে ভোজন
৪	বার্ত্তাকী...	ঐ	করিতে হয়।
৫	যজ্ঞডুমুর...	অপক্ক ফল মধুর-কষায়-রস, শীতল, রুক্ষ-গুরুপাক, এবং কফ পিত্ত, রক্তস্রাব, বমি, ও ব্রণরোগের উপকারক। ইহার পক্কফল ও উপকারী।	

(ক) গুণাগুণ সহ সচরাচর প্রচলিত অতিশয় সাধারণ খাদ্যসামগ্রীর তালিকা।

ক্রমিক সংখ্যা	দ্রব্যের নাম।	দ্রব্যের গুণাগুণ।	মন্তব্য।
৬	মোচক (মোচা)...	মধুর-কষায় রস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক এবং বায়ু, পিত্ত, রক্তপিত্ত ও ক্ষয়-রোগের হিতকর।	...
৭	থোড়...	মধুর-কষায়-রস, শীতল রুচি-কারক, অগ্নিবর্দ্ধক, এবং প্রদর ও যোনিদোষের উপ-কারক।	... ...
৮	রম্ভা...	... ...	সকল অবস্থাতেই সাত্ত্বিক খাদ্যের অন্তর্গত।
৯	কাঁকরোল...	বলকারক ও কফ	... ...
১০	শজিনার ফল...	মধুর কষায় রস, অগ্নিবর্দ্ধক কফপিত্ত নাশক এবং শল, কুষ্ঠ, ক্ষয়, শ্বাস ও গুল্ম রোগের হিতকর।	... ...
১১	রাঙ্গাআলু বা রক্তালু..	মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, স্নিগ্ধ, বলকারক, এবং হৃদয়স্থ শ্লেষ্মার নাশক। পুষ্টি-জনক, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিত-কর। ভ্রম, পিত্ত ও দাহ-রোগের উপকারক।	... ...
১২	কেমুক ফল বা গাছ আলু...	... ...	সাত্ত্বিক খাদ্যের অন্তর্গত
১৩	বেতাগা...	মধুর তিক্ত রস, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ বয়ুনাশক এবং দাহ, রক্তপিত্ত, শোথ, অর্শঃ, মূত্রকৃচ্ছ্র, বীসর্প প্রভৃতির উপকারক।	...

(খ) গুণাগুণ সহ সচরাচর প্রচলিত অতিশয় সাধারণ খাদ্যসামগ্রীর তালিকা।

ক্রমিক সংখ্যা।	দ্রব্যের নাম।	দ্রব্যের গুণাগুণ।		মন্তব্য।
১৪	মূলক বা মূলা...	পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।	...	...
১৫	পটোল...	ঐ	...	...
১৬	নিম্বুক...	ঐ	...	...
১৬	মান...	...	...	সাত্ত্বিক খাদ্যের অন্তর্গত।
১৮...	কচু...	...	...	ঐ
১৯...	ওল...	...	...	ঐ
২০	তিল...	...	...	ঐ
২১	যব...	...	...	ঐ
২২	কাউন...	...	...	ঐ
২৩	কলম্বী শাক...	পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।		তামস খাদ্যের অন্তর্গত।
২৪	হেলঞ্চা ও কালশাক...	...	...	সাত্ত্বিক খাদ্যের অন্তর্গত।
২৫	তুম্বী...	পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।		ঐ
২৬	শিম্বী বা শিম...	ঐ	...	... ...
২৭	বাথুয়া শাক...	...	...	সাত্ত্বিক-খাদ্যের অন্তর্গত।
২৮	পূতিকা...	পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।		
২৯	হৈমন্তিক অসিদ্ধ ধান্যের আতপতণ্ডুল...	...	...	সাত্ত্বিক খাদ্যের অন্তর্গত।
৩০	নীবার ধান্য...	কষায়, মধুর ও শীতপিত্ত-নাশক।		... ...
৩১	শ্যামাধান্য...	ঐ		... ...
৩২	শাশুম্ব ধান্য	ঐ		... ...
৩৩	গোধূম...	মধুর, গুরু, বলকারক, দৃঢ়তা-কারক এবং শুক্র ও রুচিকারক		... ...
৩৪	যুগ...	...	...	সাত্ত্বিক খাদ্যের অন্তর্গত।
৩৫	মটর	...	...	ঐ
৩৬	মসূর...	ভাজা মসূরের দাইল মধুর রস, শীতল, লঘুপাক, মল-রোধক, বর্ণকারক এবং কফ পিত্ত, রক্ত ও বিষমজ্বরের উপকারক।		

(ক) গুণাগুণ সহ সচরাচর প্রচলিত অতিশয় সাধারণ খাদ্যসামগ্রীর তালিকা।

ক্রমিক সংখ্যা।	দ্রব্যের নাম।	দ্রব্যের গুণাগুণ।	মন্তব্য।	
৩৭	খেসারী বা খণ্ডিকা...	মধুর কষায় রস, শীতল, লঘুপাক, রুক্ষ, এবং পিত্ত ও শ্লেষ্মার হিতকর, বাহ্য প্রয়োগেও ইহারদ্বারা পিত্ত শ্লেষ্মার উপকার হইয়া থাকে।	...	...
৩৮	মাষকলায়...	পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।	...	...
৩৯	সাকালু বা কন্দালু...	মধুর-রস, অগ্নিবর্দ্ধক, স্রোতঃ সমূহের উপকারক এবং বায়ু শ্লেষ্মা, অরুচি, কণ্ডূ ও বিষদোষের হিতকর।	...	...
৪০	ঝিঙ্গা...	মধুররস, রুচিকর, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, এবং জ্বর নাশক।		...
৪০	পনস বা কাঁটাল...	... ...	সাত্ত্বিক খাদ্যের অন্তর্গত।	
৪১	নোনা ফল...	... ...	ঐ	
৪২	আম্র...	... ...	ঐ	
৪৩	জাম...	পাকা জাম মধুর-অম্ল-কষায় রস, গুরুপাক, শীতল, রুক্ষ, রুচিকর ও বাত-কফ-নাশক।	রাজসিক খাদ্যের অন্তর্গত।	
৪৪	তাল...	পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।	...	...
৪৫	নারিকেল...	ঐ	...	...
৪৬	বেল...	ঐ	...	...
৪৭	নারঙ্গ বা কমলা লেবু...	... ...	সাত্ত্বিক খাদ্যের অন্তর্গত।	
৪৮	পানিফল বা শৃঙ্গাটক...	শীত, রুচিকর, গুরুপাক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বীর্য্যজনক, পুষ্টিকর এবং বাত-পিত্ত-কফ নাশক।	...	...

*(ক) গুণ বর্ণ সহ সচরাচর প্রচলিত তালিকার সাধারণ খাদ্যসামগ্রী তালিকা।

ক্রমিক নম্বর।	দ্রব্যের নাম।	দ্রব্যের গুণাগুণ।	মন্তব্য।
৪৯	কলিঙ্গ বা তরমুজ...	মধুর সর, শীতল, শুক্রবর্দ্ধক বলকারক ও পিত্ত দাহ প্রভৃতি নাশক। ...	...
৫০	খর্জ্জুর...	পক্কফল মধুররস, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, রুচিকর, গুরুপাক, তৃপ্তিজনক, পুষ্টিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বিষ্টম্ভজনক এবং রক্তপিত্ত, ক্ষত, ক্ষয়, কোষ্ঠগত বায়ু, অতিসার, শ্বাস, কাস, মদ, মূর্চ্ছা, মদাত্যয়, দাহ ও বাতপিত্তকফ জনিত অন্যান্য বিকারের হিতকর। ...	...
৫১	প্যারীশ ফল বা পেঁপে...	কাঁচা পাকা উভয় প্রকার পেঁপেই শীতবীর্য্য, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, সারক, পুষ্টিকর, বায়ুনাশক এবং অর্শঃ, রক্তপিত্ত, অজীর্ণ, গুল্ম, প্লীহা প্রভৃতি রোগের উপকারক। ...	...
৫২	ফুটী...	মধুররস, শীতল, রুচিকারক, মূত্রদোষ নাশক, সন্তাপ ও মূর্চ্ছা রোগের উপকারক। ...	...

* ইচ্ছা করিলে (ক) তালিকার আকার আরও বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে, কিন্তু উদাহরণ দিবার জন্য তাহার প্রয়োজন দেখি না। ফলমূলই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য-বিষয়, সেই জন্যই বর্ত্তমান তালিকায় ফলমূল ভিন্ন অন্য দ্রব্যের নাম সন্নিবিষ্ট করা হইল না।

(ক) গুণাবলী সহ সচরাচর প্রচলিত অতিশয় সাধারণ খাদ্যসামগ্রীর তালিকা।

ক্রমিক নম্বর।	দ্রব্যের নাম।	দ্রব্যের গুণাগুণ।	মন্তব্য।
৫৩	আমলকী ফল...	অম্ল, সুমধুর, তিক্ত, কষায়, কটু, সারক, চক্ষুষ্য, সর্ব্ব দোষঘ্ন ও বৃষ্য। ...	...
৫৪	নিম্বুক...	পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ...	...

(খ) তালিকা।

নিষিদ্ধ দ্রব্যের নাম।	তাহাদের প্রধান প্রধান দোষ।
কুষ্মাণ্ড...	১। অতিশয় ক্ষার গুণ সম্পন্ন। ২। কফ কারক।
বৃহতী...	১। পিত্তোত্থকারিণী। ২। ক্রূর বায়ুবর্দ্ধিনী।
পটোল...	১। শোণিতোত্থ কারক। ২। স্নিগ্ধোষ্ণ।
মূলক...	(ক) কাঁচা—বায়ু, পিত্ত, কফের ক্রূর রক্ষ প্রাবল্যাদি বিকার বর্দ্ধিনী। (খ) স্নেহসিদ্ধ—পৈত্তিক বিকার বৃদ্ধিকারিণী, (গ) সাধারণ দোষ—আমকারক।
বিল্ব...	পিত্তকারক।
নিম্বুক...	শিরানিহিত শৈত্যরস বর্দ্ধক।
তাল...	১। রক্তপিত্ত রোগ বর্দ্ধক। ২। বহুমূত্র ও তন্দ্রা উৎপাদক।
নারিকেল...	১। গুরু। ২। দুষ্পাচ্য। ৩। মলরোধক।
অলাবু...	১। শৈত্যগুণ সম্পন্না। ২। বাত শ্লেষ্ম রোগকারিণী। ৩। অধিক বিলম্বে ও অতিশয় কষ্টে জীর্ণ হয়।
কদলী...	১। অম্লপিত্ত রোগকারিণী। ২। শ্লেষ্মা এবং মল বৃদ্ধিকারিণী।
শিম্বী...	১। শৈত্যগুণ সম্পন্না। ২। রস, জ্বর ও শ্বাস রোগ কারিণী।
পূতিকা...	পিত্ত বায়ু ও রক্তকাস (যক্ষ্মাকাস) বর্দ্ধিনী।
বার্ত্তাকী...	কণ্ডু রোগোৎপাদিনী।
মাষকলায়...	১। অতিরিক্ত মল বৃদ্ধিকারক। ২। অতীসার রোগকারক।

(গ)

দ্রব্যের নাম।	(ক) তালিকার লিখিত সাধারণ ভক্ষ্য দ্রব্যের ভিতর দোষাশ্রিত দ্রব্যগুলির গুণ।	তাঁহাদিগের দোষ।
২	১	৩
রাঙ্গা আলু...	১। স্নিগ্ধ। ২। বলকারক। ৩। হৃদয়স্থ-শ্লেষ্মনাশক। ৪। পুষ্টিকারক। ৫। শুক্রবর্দ্ধক। ৬। চক্ষুর হিতকর। ৭। ভ্রম, পিত্ত ও দাহ রোগের হিতকর।	১। গুরুপাক। ২। কিঞ্চিৎ বিষ্টম্ভী।
মসুর...	১। লঘুপাক। ২। বর্ণকারক। ৩। কফ, পিত্ত, রক্ত ও বিষমজ্বরের উপকারক।	১। মলরোধক।
খর্জ্জুর...	১। স্নিগ্ধ; ২। রুচিকর; ৩। পুষ্টিকর; ৪। বলকারক ৫। শুক্রবর্দ্ধক; ৬। রক্তপিত্ত; ক্ষত, ক্ষয়, কোষ্ঠগত বায়ু, অতীসার, শ্বাস, কাস, মদ, মূর্চ্ছা, মদাত্যয়, দাহ ও বাত-পিত্ত কফজনিত অন্যান্য বিকারের হিতকর।	১। গুরুপাক। ২। কিঞ্চিৎ বিষ্টম্ভী।
পানিফল...	১। রুচিকর; ২। বলকারক ৩। শুক্রবর্দ্ধক; ৪। বীর্য্যজনক ৫। পুষ্টিকর; ৬। বাতপিত্ত; কফনাশক।	১। গুরুপাক।

ইহকাল ও পরকাল।

জীবজগতের অতীত ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হয়, আবহমান কাল হইতেই মানবমনে দ্বিবিধচিন্তাস্রোত প্রবাহিত আছে। আদিম আমলেও মনুষ্য আপন কর্ত্তব্যকে বিভিন্নমুখীন দুইটী পথের মধ্যস্থলে রাখিয়া চিন্তাক্রান্ত-নয়নে বিরস বদনে বলিত, "কোন্ পথে যাই?" "কোন্ পথে গেলে আমার কর্ত্তব্যের গায়ে কাঁটার আচড়টী লাগিবে না?" প্রাচীনকালে ও মানবাত্মা দ্বৈধতরঙ্গে হাবুডুবু খাইত, মানবীয় মন দ্বন্দ্বের যন্ত্রণায় এদিক্ ওদিক্ করিত। বস্তুতঃ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুতেই বিভিন্ন ভাবের দুইশক্তির লীলারঙ্গ মানবমনকে এই চিন্তাতরঙ্গের সঙ্গে মিশাইয়া যাইতে বাধ্য করে।

মানবের সুমুখে সন্নিকৃষ্ট চরাচরাত্মক সসীম বিশাল ব্রহ্মাণ্ডব্যাপার—দূরে অলৌ-

কিক চিন্তার বিষয় অসীম-অপার-অনন্ত। সম্মুখের সামগ্রী শতধা সহস্রধা বিভাগ করিলেও সেই পুরাতন স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ক্ষেত্র, বস্ত্র, বন্ধু, সাগর, নগর, ভূধর ইত্যাদি কত কি পাওয়া যাইবে; আর মানস-নয়নে চাহিয়া থাকিলে নয়নের অগোচর অনন্ত অলৌকিক রাজ্য ক্রমশঃ আবির্ভূত হইবে, লৌকিক শক্তি ক্লান্ত, তবুও অবিরাম সেই বিরাটচিত্র অসীম-অপার-অনন্ত অপরিবর্ত্তিতরূপে বিরাজমান। দর্শনশক্তির পরাজয়। একদিকে মানবের লৌকিক-সামর্থ্য পরাজিত তিরস্কৃত-অভিভূত, আর অলৌকিক মানসবল প্রবল, অন্যদিকে লৌকিক ইন্দ্রিয়শক্তি চরিতার্থ এবং অলৌকিক মন-শক্তির প্রবেশের অধিকার নাই। এই লৌকিক ও অলৌকিক শক্তির সম্মিলনবিন্দুই মানবের অবস্থিতি-স্থান।

মানবের উপর অনাদিকাল হইতেই উভয় শক্তির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বারম্বার আকর্ষণ, বিকর্ষণ, জয়, পরাজয়, সম্মিলন, বিয়োজনে এই উভয় শক্তিই অল্পাধিক পরিমাণে মানবাত্মার আত্মীয় হইতে পারিয়াছে। অলৌকিক ও ত্যাজ্য নহে, লৌকিক ও অগ্রাহ্য নহে, কিন্তু কখনও অধিক অনুকূল বলে চলিতে হইলে স্বভাবের সনাতন নিয়মে এক দিক আশ্রয়করিতে হয়। এই জন্যই মানব উভয় শক্তির রঙ্গালয় হইলেও সময় বিশেষে সকলের জন্য সমান অবকাশ দিতে অক্ষম। কখনও কাহার ও আধিপত্য প্রভুত্ব, কভু বা অপরের খ্যাতি প্রতিপত্তির বহুত্ব; এই চিরপরিবর্ত্তনশীল প্রথা সুতরাংই রহিয়া গিয়াছে।

এক সময়ে সন্নিকৃষ্ট সংসার রাজ্যের উন্নতি, অবনতি, রীতি পদ্ধতি, শুভাশুভ চিন্তা; অপর সময়ে অলৌকিক রাজ্যের সুখ দুঃখ লাভালাভের ভাবনা। মানবের বাহ্য লক্ষ্য সসীম সংসার, আর অন্তর্লক্ষ্য অলৌকিক অসীম অপার অবিনশ্বর। এই উভয় দিক্ ভাবিতেই ইহকাল পরকালের চিন্তায় মানুষের অধিকার হইয়াছে। শুধু বহির্জ্জগতের শয়ন ভোজন ভ্রমণ ইত্যাদি লইয়া মানুষকে ব্যস্ত থাকিলে চলে না, প্রকৃতির পরিণতি, জীবের গতি, সুখশান্তি প্রভৃতির ভাবনা ও ভাবিতে হয়। যদি জগতে বাধা বিপত্তি, ঘাত প্রতিঘাত না থাকিত, তবে একদিক নিয়া চলিলেই হইত, কিন্তু সংসার সুশ্যামল সমতল নয়, বন্ধুর। আলোকময় নয়, আলোক আঁধারের আবাসস্থান, সুখসলিলে সুধৌত নয়, দুঃখকর্দ্দমাক্ত ও বটে, কেবলই মধুর নয় নবরসের আকর। দয়াদাক্ষিণ্যও আছে, আবার কর্ত্তব্য পীড়ন তাড়নেরও অসদ্ভাব নাই। অনুগ্রহ নিগ্রহ পাশাপাশি রাজত্ব করে। চক্ষে দুঃখবারি, মুখে সুখহাস্য, কিছুরই এ অতুল ভাণ্ডারে অপ্রতুল নাই। জগতের বয়োবৃদ্ধির সহিত মানববুদ্ধিরও নব নব অঙ্কুরোদ্গম আরম্ভ হইতেছে। অনেকে আজ কাল এই অলৌকিক অপার্থিব বিষয়গুলি একেবারে বিদায় দিতে চাহেন। সর্ব্বদাই চক্ষু মেলিয়া দেখিতে চাহেন, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মানস নয়নে আপনার অলৌকিকত্ব অবলোকন করিতে তাঁহারা অনিচ্ছুক।

পাশ্চাত্যদেশে সম্প্রতি এই মতবাদের সমর্থনকারী ব্যক্তি নিতান্ত বিরল নাহেন, অস্মদ্দেশেও অর্ব্বাকবুদ্ধি চার্ব্বাক বহুবর্ষ পূর্ব্বে।

বৃহস্পতির পদাঙ্কানুসরণে এই "একচ'খো" ভাবের সমর্থন করিয়া গিয়াছিলেন। তখনকার চর্ব্বাক আর এখনকার চার্ব্বাকের উদ্দেশ্য বা আবশ্যক লইয়া ভাবাভাবের অনেক পার্থক্য। তখনকার চার্ব্বাক মহোদয়েরা স্বসম্প্রদায় গুরু বৃহস্পতি মহাশয়ের উপর ও কলম চালাইয়াছিলেন। বৃহস্পতির মতে অলৌকিক অপার্থিব পদার্থের আদর ছিল না বটে কিন্তু লৌকিক সুনীতিসমূহের বিন্দুমাত্রও অভাব বা অসম্পূর্ণত্ব ছিলনা। চাণক্যপণ্ডিত যে নীতিশাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া ছিলেন, তাহার অনেক নীতি বার্হস্পত্য নীতির অনুমোদিত। চার্ব্বাক্ সুবিধামত যুক্তিশাস্ত্রের দোহাই দিয়া অনেক অযৌক্তিক উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিতেও চেষ্টা করিয়া ছিলেন। বৃহস্পতি যুক্তিবলে ঐহিক নীতির সংরক্ষণ ও অলৌকিক পদার্থের নিরাকরণ করিতে চাহেন, চার্ব্বাক্ কিন্তু অনেক স্থানে যৌক্তিক লৌকিক নীতির ও উচ্ছেদ সাধন করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না।

বৃহস্পতি ঐহিক সুখই একমাত্র প্রার্থনীয় বলিয়াছেন। বৃহস্পতির একটী সূত্র—কাম এবৈকঃপুরুষার্থঃ"। কাম অর্থ ঐহিক সুখ। যাহা মন চায়, তাহা যে উপায়ে পাই, সেই উপায়ই অবলম্বন করিতে হইবে। ইহজীবনের সুখসাধনই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। অনিশ্চিত অলৌকিক পদার্থের আশায় বা অপার্থিব সুখের আশায় ইহজীবনে ক্লেশভোগ মহামূর্খতার পরিচয়। এই ইহকালের সুখের জন্য যেসকল নৈতিক-পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, নানা উচ্ছৃঙ্খলতা উৎপাত হইতে আত্মপাত নিবারণ করিবার জন্য যে সকল সুনীতির অনুসরণ আবশ্যক, বৃহস্পতির বার্হস্পত্য নীতিশাস্ত্রে তাহাই সন্নিহিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে পরকালবাদী স্বর্গার্থে যাগানুষ্ঠানকারী সম্প্রদায়কে তিনি তীব্র তিরস্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন, পরলোকে ফল ভোগ করা সম্ভব হইলে তাহার জন্য ইহকালে চেষ্টা করা যাইতে পারে। পরিশেষে বিপুল লাভের আশায় আপাততঃ ক্লেশ বা ক্ষতি স্বীকার করা নীতির বহির্ভূত নহে, কিন্তু পরকালে ফল ভোগ করিবে কে? "চৈতন্য বিশিষ্টো দেহঃ পুরুষ ইতি।" এই সূত্রে বৃহস্পতি সচেতন দেহকেই আত্মা বলিয়াছেন, সুতরাং মৃত্যুর পর ফল ভোগ করিবার জন্য "ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ? মৃত্যুর সঙ্গে সংসার রঙ্গ ফুরাইল, জলতরঙ্গ জলেই বিলীন হইল, আবার কে কিসের ফলাফল ভোগ করিবে? বৈদিক-ক্রিয়া কাণ্ড কেবল অকর্ম্মণ্য লোকের জীবিকার্জ্জনের উপায়। ইত্যাদি নানা কথা বৃহস্পতি বলিয়াছেন। বৃহস্পতির আর একটি উক্তি উদ্ধৃত করা আবশ্যক হইয়াছে, এটী কিঞ্চিৎ রহস্য জনক। "পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি। স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে?" যজ্ঞাদিতে পশুবধ বেদের আদেশ, অবশ্য কর্ত্তব্য। জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি নানা যাগে পশুহিংসা বিহিত আছে। পশু বিনাশের সময় "স্বর্গংগচ্ছ পশূত্তম!" বলাও হইয়া থাকে। এখানে বৃহস্পতি বলেন,—যদি হত পশু স্বর্গেই যায়, তবে যজ্ঞে পশুস্থানে যজমানের পিতাকে বলি-প্রদান করাইত অধিক সঙ্গত হয় যজ্ঞে হত

হইলে তাহার স্বর্গ অব্যর্থ, আবার কোন্ পুত্রইবা পিতার স্বর্গ গমন ইচ্ছা করে না? সুতরাং পশুকে স্বর্গে না পাঠাইয়া পিতাকে পাঠানই উপযুক্ত 'যাজ্ঞিক পুত্রের' উপযুক্ত-কর্ম্ম। এতাদৃশ অনেক কথা এবং অনেক অনুচিত তিরস্কার বৃহস্পতির গ্রন্থে পাওয়া যায়। ফলতঃ ঐহিক সুখই তাঁহার অভিপ্রেত, অপর সমস্তই অত্যন্ত অগ্রাহ্য। সুতরাং আমরা তাঁহাকে ইহসর্ব্বস্ববাদের নেতা বলিয়া বলিতে চাই।

বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্য দেশস্থ 'Secularist "সম্প্রদায় ও ইহসর্ব্বস্ববাদী। ইঁহারা ও কেবল ঐহিক সুখ লইয়া ব্যতিব্যস্ত, তবে ঘরের পরের সকলের চিন্তার জন্য ইঁহাদের একটু অবকাশ আছে। যাহাতে জগতের উন্নতি সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হয়, তাদৃশ বিজ্ঞান, গণিত, শিল্প, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতির আন্দোলন ও অনুশীলন একান্ত কর্ত্তব্য বোধ করেন। বিজ্ঞানাদির উন্নতির দ্বারা জগতের অশেষ উপকার সাধন ভূরি-অভাব মোচন করা যাইতে পারে, কিন্তু সমস্তজীবন পরমেশ্বরের উপাসনা দ্বারা সংসারের বিশেষ কোনও জাতীয় হিতসাধন করা যায় না। কোনও দরিদ্রের অন্ন সংস্থানে তাহার ঈশ্বরারাধনা সহায়তা করে না, কিন্তু অর্থনীতি বিশেষ সাহায্য করিতে পারে, সুতরাং জগতের হিতার্থে ইহকালের মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তা করাই অধিকতর মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। ধ্যান, ধারণা, সমাধি, যোগ, যাগ মানুষের প্রত্যক্ষ এবং সর্ব্বথা অনুমোদিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের জন্য নির্দ্ধারিত অমূল্য সময় নষ্ট করে মাত্র। আধ্যাত্মিক চিন্তায় অধিক পরিমাণে মনোনিবেশ করাতেই ভারতের লৌকিক-বল দিন দিন হীন হইয়া অবশেষে দুর্দ্দশার শেষাবস্থায় উপনীত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক আলোচনা যে মানুষের সুখের শান্তির পথ কণ্টকিত করে, ইহাই তাহার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রত্যুত অনিশ্চিত এবং অনাবশ্যকীয় কার্য্যে সময় নষ্ট করাই অন্যায়। ইউরোপের ইহসর্ব্বস্ববাদের ব্রাডল, হোলিওক্ প্রভৃতি অনেক সমর্থনকারী আছেন।

ইহসর্ব্বস্ববাদের উপর একটা তর্ক আছে যে, ইহলোকের উন্নতির জন্য আমরা অনেক কার্য্য করিতে পারি, অনেক সময়ে জগতের মঙ্গলার্থে কার্য্য করিতে গিয়া আমরা কৃতকার্য্যও হই, কিন্তু আমাদের এই ক্ষুদ্র ক্ষমতা অনেক কার্য্যেই অনুপযুক্ত। আমাদের চক্ষু সামান্য দূর দেখিতে পায়, আমাদের সামর্থ্যে অতি অল্প অনিষ্টেরই প্রতীকার হইতে পারে। আমাদের সকল চেষ্টা যেখানে পরাভূত, সেখানে আমাদের আধ্যাত্মিক বল বা ধর্ম্মবল আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে। বিশ্বাসীর কাছে, ভক্তের নিকট, ধার্ম্মিকের হৃদয় ফলকে ইহার উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে খোদিত শত শত দৃষ্টান্ত স্থান পাইতেছে। বিজ্ঞানের সকল জ্ঞান যেখানে পরাস্ত হইয়াছে, এরূপ মুমূর্ষু রোগী, ভক্তের প্রার্থনায়, ভগবানের দয়ায়, চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনাদর করিয়াও অনায়াসে সুস্থতা লাভ করিয়াছে। এরূপ দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই, তবে বিশ্বাসীর অল্পতায় ভক্তের বিরলতায় ধর্ম্ম জীবনের শোচনীয় অধঃপতনে এরূপ দৃষ্টান্ত ক্রমে বিরলতর হইতে চলিয়াছে মাত্র।

আধ্যাত্মিক আলোচনায় বা ধর্ম্ম-বলে,

মানবের মনোবল—শারীর-সামর্থ্য শত সহস্র গুণে বর্দ্ধিত হয়, সন্দেহ নাই। মানবের ক্ষুদ্র শক্তি, বিপুলশক্তি লাভ করিতে গেলে মানবকে সেই শক্তিসমুদ্র হইতে শক্তি সংগ্রহ করিতে হইবে। বিষয়-সুখ সাধারণ মনুষ্য যে পরিমাণে ভোগ করেন, তদপেক্ষা প্রেমিক ভক্ত, বিশ্বাসী ধার্ম্মিক লক্ষগুণ অধিক ভোগ করেন। কোনও মনোরম দৃশ্য দর্শন করিলে সাধারণ ব্যক্তি প্রীতি লাভ করেন সন্দেহ নাই, কিন্তু ধার্ম্মিক সুদৃশ্যে কুদৃশ্যে সর্ব্বত্রই মহিমান্বিত পরমেশ্বরের মহামহিমার পরিচয় পাইয়া বিপুল-আনন্দ উপভোগ করেন। অবিশ্বাসীর অভক্তের অধার্ম্মিকের অন্তঃকরণ কেবল লৌকিক নীতিবলে আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতে অক্ষম। সন্নীতি দ্বারা অনেক সময়ে সংসারের উপকার হইতেছে সত্য, কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞান ব্যতীত নীতির পবিত্রতা রক্ষা অসম্ভব হইয়া উঠে। কেবল লৌকিক বহু দর্শনের সমষ্টি মাত্রকে নীতি নাম দিলে প্রকৃত নীতির অবমাননা হয়। রাজ দণ্ডের ভয়ে, সমাজ 'কলঙ্ক' শঙ্কায় ও নিজের অনিষ্ট অপচয়ের ভয়ে লোকে যে সকল কুকার্য্য করিতে বিরত থাকে, সেই গুলি পরিহারের জন্যই নীতির আবশ্যকতা ও সম্মান রক্ষিত হইলে বাস্তবিকই নীতির মূল্য অত্যল্প। ধর্ম্মজ্ঞান রহিত নীতিজ্ঞান পশ্বাদির পিতৃ মাতৃ ভক্তির সহিত পৃথক এবং তদপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর পিতৃ মাতৃ ভক্তি বা কৃতজ্ঞতা মানুষকে দিতে পারে কি না তাহাও বিচার্য্য। ভক্তি ধর্ম্ম জ্ঞান ধর্ম্ম বিশ্বাস ব্যতীত কোনও নীতিই প্রকৃত নীতির আসনে উপবিষ্ট হইতে পারেনা।

নীতিজ্ঞানে বা নৈতিক সাধনায় মানুষকে দুষ্কার্য্যকে ঘৃণা করে, কেন না নীতিশাস্ত্র তাহাকে দুষ্কার্য্যের জন্য শত শত আপদ বিপদের দৃষ্টান্ত সহস্র সহস্র অনিষ্টের দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা দেয়। নৈতিক জ্ঞানের বহুদর্শিতা তাহাকে দুষ্কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র সাবধানে থাকিতে শিক্ষা দেয়। কিন্তু তাহার অভিজ্ঞতা কেবল মানুষের চক্ষুতে ধূলি দিতে পারিলেই শেষ হইল। নীতিজ্ঞ দশের ভয়ে দেশের ভয়ে মোটের উপর মানুষের ভয়ে কুকার্য্যে নিরস্ত, নীতি তাহাকে ইহার অধিক অর্থাৎ অমানুষ ভয় হইতে সাবধান থাকিতে শিক্ষা দেয়না। আর ধার্ম্মিক ধর্ম্ম নীতি বলে, একটী লোক চক্ষু নয় সর্ব্বব্যাপির সেই অসংখ্য চক্ষু হইতে সাবধানে থাকিতে বলে। এক কথায় বলিতে গেলে বিশ্বাসীর কুকার্য্য করিবার স্থান নাই। সে জানে "বিশ্বতশ্চক্ষুরুতবিশ্বতো মুখং" ভগবান্ সর্ব্বত্র অসংখ্য নয়ন নিঃক্ষেপ করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার অজ্ঞাতে কোথায় কুকার্য্য করিবে? সমাজের চ'খের বাহিরে রাজার চ'খের অন্তরালে, তীব্র অন্ধকারে, অন্যায় কার্য্য করিলে নীতি শাস্ত্র আর কাহার ভয় দেখাইবেন? ধার্ম্মিক দেখাইবেন "সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ" বিশ্ব-ব্যাপী পুরুষকে। নীতিজ্ঞের পাপ করিবার স্থান আছে, ধার্ম্মিক ঈশ্বর-বিশ্বাসী জানেন, তাহার অদৃশ্য অগম্য স্থান নাই। বিজ্ঞান গণিত প্রভৃতির দ্বারা সাধারণে যে উপকার প্রাপ্ত হন, ভক্ত ধার্ম্মিক তাহার পর অতিরিক্ত ভগবানের অসাধারণ মহিমা দেখিয়া অতিশয় আনন্দ ও আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

জন ষ্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিত

নৈতিক জীবন রক্ষার জন্য ধর্ম্মজ্ঞানের আবশ্যকতা দেখিতে পান নাই কিন্তু এক সময়ের কর্ত্তব্য-বুদ্ধি অপর সময়ের তুলনায় অকর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইলে স্বকীয় ভ্রমের জন্য অনুতাপ ব্যতীত অন্য আশ্রয় সে সম্প্রদায়ের ছিল বলিয়া বোধ হয় না। নৈতিক জীবন রক্ষার জন্য সাধারণ মতই যথেষ্ট সাধন এই বিশ্বাসে, ভ্রম সঙ্কুল ও পরিবর্ত্তনশীল সাধারণ মত লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে, সে ব্যক্তি নিজেকে যতই নীতিমান মনে করুক না কেন, বস্তুত তাহার নৈতিক সাধনের অনিবার্য্য অধঃপতন উপস্থিত হইবে এবং পরবর্ত্তী জগৎ তাহা দ্বারা দুর্নীতিপরায়ণ হইতে শিক্ষা করিবে ইহা সুনিশ্চিত।

ইহ সর্ব্বস্ববাদী পাশ্চাত্য দেশীয়দের মধ্যে অনেকে ঈশ্বরের অস্তিত্বে হাঁ, না, একটা কিছুই বলেন না। তাঁহাদের মতে ঈশ্বর থাকেন থাকুন, তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কিছু নাই, নীতিমার্গই জগতের আশ্রয়। আমাদের দেশীয় বৃহস্পতি মহাশয় নীতি রাখিয়া পরমেশ্বরের উপর ও কটাক্ষ করিয়াছেন। তিনি ঈশ্বর সাধনের জন্য আদৃত অনুমান প্রমাণের মস্তকেই বজ্রাঘাত করিয়াছেন।

চার্ব্বাকের ঐহিক-সুখের উপর অন্যদেশীয় পরলোকবাদী আচার্য্যগণ আপত্তি করেন যে, ঐহিক সুখ প্রায়ই দুঃখ সঙ্কুল, সংসারের সুখ চপলাচমক, দেখিতে দেখিতে চলিয়া যায়, মানুষের ভাগ্যে কেবল দুঃখের পশরাই পড়ে। যৎকিঞ্চিৎ সুখ যাহা আসে, তাহারও মধ্যে দুঃখের বিকট মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভীত হইতে হয়। স্ত্রী পুত্রাদি জনিত সুখ প্রার্থনীয় বটে, কিন্তু স্ত্রী সম্মিলনে বা পুত্র লাভে সুখ অপেক্ষা দুঃখের আশঙ্কাই অধিক, বিবেকী শিরোমিশ্র বলিয়াছেন, "পুত্রবাজমুপাগতো রিপুরয়ংমাস্যাচিন্তয়াতাং" পুত্রের মত শত্রু বস্তুতঃ বিবেকীর চক্ষে কমই আছে। যাহার জন্য যত অধিক আশঙ্কা করিতে হয়, তাহার জন্য তত অধিক অশান্তি। পুত্র জন্মের উৎসবে এখনও অনেক দেশে ক্রন্দনের নিয়ম আছে। বাস্তবিকই একটী অসমর্থ জীবের প্রতি অশেষ কর্ত্তব্য ভার মস্তকে লইবার প্রথম দিনই পুত্রোৎপত্তির দিবস আমাকে যদি অপর কাহারও মঙ্গলামঙ্গলের জন্য সতত বিব্রত থাকিতে হয়, সর্ব্বদাই অপরের চিন্তায় ক্লান্ত থাকিতে হয়, তাহার সুখ দুঃখ নিজের সুখ দুঃখ অপেক্ষা গুরুতর বলিয়া মনে করিতে হয়, তবে তাহাতে শান্তি পাইব কিরূপে বুঝিতে পারি না। জগতের যাবতীয় মানবের সুখ দুঃখের অংশী হইতে গেলে তীব্র সহানুভূতির ক্রীত দাস হইতে গেলে, দয়াপরবশ পরোপকারী নীতিমান ব্যক্তি কেবল ক্রন্দনেই দিনযামিনী ব্যয় করিতে বাধ্য হইবেন। ক্ষমতা ক্ষুদ্র, অভাব অসীম, না কাঁদিয়া আর উপায় কি? সমাজ সংস্কারে স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ও ক্ষীণশক্তি হইয়া সহানুভূতির তীব্র তাড়নায় বিরলে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে ২ জীবলীলা শেষ করিয়াছিলেন। এই সকল ব্যাপারে নীতিজ্ঞের অশ্রু মোচনের সহবর্ত্তী সুখও কেবল ভগবানে নির্ভর হইতে উৎপন্ন। অশ্রুসিক্ত লোচনে ও শান্তির স্থান ঈশ্বরে বিশ্বাস। "ঈশ্বরের মঙ্গলময় ইচ্ছারই জয় হউক" ইত্যা-

কার বাক্যই বিশ্বাসীর আত্মপ্রসাদে অবলম্বন। অবিশ্বাসীর শুধু জল মাত্র সার, আরহা হতাশ! সুতরাং বলিতে হয়, ধার্ম্মিক ব্যতীত কোন নাস্তিক নৃশংস ও পরোপকারীর দুঃখ ভোগ অসম্ভব, সুখের ও আধিক্য শই দুঃখ। যখন ধর্ম্ম বিশ্বাস ভিন্ন সুখেও সুখ নাই, বরং অধিক দুঃখ তখন এ সুখের জন্য উৎকণ্ঠার লাভ কি? প্রকৃত-সুখের জন্য ঐহিক ক্ষণস্থায়ী দুঃখ-সঙ্কুল-সুখ ত্যাগ করা কি একান্তই মূঢ়তার কার্য্য, না সহস্রবার দুঃখের তাড়না সহ্য করিতে করিতে স্বপ্নে দেখার মত একটু সুখ ভোগকেই পুরুষার্থ মনে করা মূঢ়তার কার্য্য? এ সকল কথার অস্মদ্দেশীয় চার্ব্বাকের উত্তর এই, তাহারা সুখং বিষয়সঙ্গমজন্ম পুংসাং, দুঃখোপসৃষ্টমিতি মূর্খবিচারণৈষা, ব্রীহীন্ জিহাসতি সিতোত্তমতণ্ডুলাঢ্যান্ কো নাম ভোস্তুষকণোপহিতান্ হিতার্থী। "সমস্ত বৈষয়িক-সুখই দুঃখ সংসৃষ্ট, যখন বিশুদ্ধ-বিষয়-সুখ সম্ভোগ সম্ভব নহে, তখন আর দুঃখাকুল সুখ ভোগে শান্তি কি? এতাদৃশ বিবেচনা মূর্খেরই সম্ভব পায়। উৎকৃষ্ট তণ্ডুলাধার ধান্যে তুষকণা দেখিয়া কি কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়? ইহাদের মত সংসারে অশেষ দুঃখ সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া দুঃখের ভয়ে কি সুখ সামগ্রী ও ত্যাগ করিতে হইবে! পারলৌকিক-সুখ ইহাদের সিদ্ধান্তে অসম্ভব সুতরাং উপস্থিত সুখ দুঃখ মিশ্রিত হইলেও ইহাই মানব-জীবনের যথেষ্ট বিরাম স্থান।

এখন এই সকল ইতমর্ম্মবাদির মতে দোষার্পণ করিতে হইলে পরকালবাদাকে অদৃষ্ট, জন্মান্তর ও সংসার-সুখাপেক্ষা অধিক শান্তি সুখের কথা বলিতে হইবে। অদৃষ্ট ও জন্মান্তর মানাইতে হইলে দেহাতিরিক্ত স্থায়ী আত্মা প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক হইবে। অদৃষ্ট মানিলে ঈশ্বর মানা অনেকটা সহজ হইতে পারিবে। সেই সকল সুগভীর দার্শনিক-যুক্তি জালের অবতারণা করা এ প্রবন্ধে একান্ত অসম্ভব। অদৃষ্ট, জন্মান্তর প্রভৃতির আন্দোলন আমরা প্রবন্ধান্তরে করিতে চেষ্টা পাইব, এ প্রবন্ধে পরলোকের সুখ দুঃখও অবস্থাব্যবস্থার বিষয়ে আমরা দুই চারি কথা বলিব।

আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবন নাটকের শেষ আর কিছু থাকা আবশ্যক, যদি মাত্র রায় জন্য মৃত্যুর বিকট বদনে বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য মানবাত্মার জগতে অবতারণা হয়, তবে কে সংসারে অশেষ কার্য্যজালে জড়িত হইতে চায়? আমার আরব্ধ অশেষ কার্য্য যদি এইখানে অসম্পূর্ণ ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হইল তাহা বিষ। বিশৃঙ্খলত উপস্থিত হইবার কথা। যাহা অন্যায় করিলাম তাহারও পরিণাম ফল প্রাপ্ত হইবার অবকাশ জুটিল না, যাহা শুভকার্য্য করা গেল তাহারও সুফল লাভ ঘটিল না। মোটের উপর প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হইল না। এই ব্রহ্মাণ্ডের এক বিন্দু বালুকার উপর একটী আঘাত প্রদান করিলে অনন্তকালের জন্য প্রকৃতির বক্ষে প্রতিঘাতকে আহ্বান করিবার জন্য অঙ্কিত থাকে, এখানে এ ব্যভিচার অসম্ভব, সুতরাং আমাদিগের জড়বিম্ব দেহ বিকৃত হইল, জলে মিশিল, তবুও কার্য্য প্রবাহের বিরাম হইতে

পারে না। মোটামুটি কথায় এজগতে কিছুরই বিনাশ নাই অবস্থান্তর আছে। সত্তাময়ের প্রতিভাপূর্ণ সংসারে এসত্তা স্বরূপ অনারূপ হইবে বলিয়া কখনও স্বরূপ শূন্য হইতে পারিবেনা। এ ক্রিয়াকাণ্ড এ বস্তু জাত যাইবার জায়গা নাই। উড়িয়া আসে নাই আকস্মিক হইতে পারে না। কাজেই ইহার আদ্যন্ত থাকা আবশ্যক, যুক্তি বলে প্রমাণিত হয়, অগ্র পশ্চাৎ না থাকিলে মধ্যও থাকিতে পারে না, অতএব যদি বর্ত্তমানে বিশ্বাসস্থাপন করিতে হয়, তবে অতীত ভবিষ্যতের প্রতি আস্থাবান্ হইতে হইবে। আদিতেও কিছু ছিল, পরেও কিছু থাকিবে।

এই পারলৌকিক বিধি ব্যবস্থা ভিন্ন ২ সম্প্রদায়ের কাছে ভিন্ন ভিন্ন রূপ। সম্প্রদায় বিশেষের মতে পরলোকে দুই অনন্ত জিনিষ। অনন্ত স্বর্গ, অনন্ত নরক, সংসারের কুকার্য্য সুকার্য্য যাহা হউক না কেন, বিচারের ফল দ্বিবিধ। পুণ্যের ভাগ অধিক হইলে অনন্ত স্বর্গ, পাপের ভাগ বেশী হইলে অনন্ত নরক। মাঝামাঝি একটা ব্যবস্থা কিছু করিলে আর একটু ভাল হইত। এখন যাহা ইচ্ছা কর, বিচার কিন্তু পড়ে একদিনে হইবে। সে দিন যদি তুমি ভাল উকীল দিতে পার, আর উকীল মহোদয় যদি বিচারক প্রভুকে বলেন,—Father for give them for they know not what they do, তবে তোমার পক্ষে মন্দ নয়। তোমার পাপে দয়াল উকীল বাবু জেলে যাইতে প্রস্তুত। দোষ তোমার ফল ভুগিল রামকান্ত, আহার করিল হরিহর, তৃপ্ত হইল রামপ্রসাদের। একজনের রোগ, অন্যে ঔষধ খাইল, অমনি রোগীর আরাম বমালুম সারিয়া গেল। এ সকল ব্যবস্থায় আমাদের আলোচ্য কিছু দেখি না। তবে হাঁ এই সকল সম্প্রদায়েরও স্বর্গ নরক আছে আর সে স্বর্গ নরক ইহলোকে নহে, তাহা পরলোক ব্যাপী এই টুকুই এ প্রসঙ্গে বক্তব্য। ইহাদের স্বর্গ বেশ সুন্দর সুখদ স্থান। সে বর্ণনা পাঠ করিলে স্বর্গে যাইবার জন্য সকলেরই বোধ হয় কিঞ্চিৎ আগ্রহ হয়।

মহম্মদের স্বর্গ ও প্রলোভন পূর্ণ বিরাট বিলাস নিকেতন। পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায় মহম্মদীয় ধর্ম্মের বিরোধী নহে। বিধর্ম্মী বা অবিশ্বাসীকে বিনাশ করিলেও সে স্বর্গের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়। এখানে অকর্ত্তব্য জীব হত্যা, পরিণাম স্বর্গের বিপুল সুখ। এত তীব্র প্রলোভন না থাকিলে কার্য্যক্ষেত্রে এত ক্ষিপ্রকারিতার পরিচয় পাওয়া কঠিন হইত। সে স্বর্গের দুই চারিটী নিদর্শন বলিবার লোভ সম্বরণ করা গেল না। মহম্মদীয় স্বর্গ সাতটী, পর পর সাততলা ঘরের মত একটী পর একটী স্থাপিত। প্রত্যেক স্বর্গীয় ব্যক্তি এক একটী সুবৃহৎ মুক্তানির্ম্মিত তাম্বুতে বাস করেন। স্বর্গে দাস দাসীর অভাব নাই, তথাকার দুরবস্থ ব্যক্তির ৮০০০০ দাস থাকিবে। নারী সংখ্যা ৭২ জন, প্রত্যেকেরই রূপ লাবণ্য, যৌবন, অলঙ্কার অশেষ রূপ। প্রত্যেক রমণীর মস্তকে মুকুট আছে, সেই মুকুটের অপকৃষ্ট মুক্তার আলোকেও দশদিক আলোকিত হয়। ইচ্ছা মাত্রেই মণিময় দেহ ধারণ করা যায়। গমনার্থে—উপযুক্ত বাহন সর্ব্বদা প্রস্তুত। বাহন আর

কিছুই নয় "দিদিমার গল্পের সেই পক্ষিরাজ ঘোড়া।" মাংসাদি প্রচুর ভোজন ইচ্ছা মাত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানে আর একটু রহস্য আছে। ধার্ম্মিক লোক পক্ষি মাংস আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হইলে পক্ষী-জীবিত হইয়া অশরীরে উড়িয়া বাসায় চলিয়া যায়। এমন সুভোগ্য স্বর্গ লোভনীয় নয় কি? এ অলৌকিক রাজ্যের এসব সুযোগ সমধিক মুখরোচন। নরকের বর্ণনাও সমধিক ভয়ঙ্কর। বাহুল্য ভয়ে পরিত্যক্ত হইল।

আমাদের দেশীয় পুরাণাদি গ্রন্থে স্বর্গ নরকের অনেক সুরঞ্জিত চিত্র পাওয়া যায়। স্বর্গ সুখস্থান এবং নরক ভীষণ বিভীষিকাময় যাতনা তাড়না বেদনার আবাস। যন্ত্রণা ভোগের জন্য নরকে যাওয়া শাস্ত্রের আদেশ কিন্তু হিন্দুর নরকের শেষ আছে। অনন্ত নরক অশেষ যন্ত্রণা, অনন্ত স্বর্গ—অপরিসীম সুখ হিন্দুর ভাগ্যে সুকঠিন। স্বর্গী জীব-সুকর্ম্মের অবসানে পুনঃপতিত হন। "তেতং ভুক্‌ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্য লোকং বিশন্তি। শাস্ত্রের ঘোষণা এইরূপ স্বর্গ ক্ষয়শীল, কাজেই স্বর্গবাস ও সীমাবদ্ধ। স্বর্গের বিলাস রাশির অপচয় আছে সুতরাং স্বর্গীয় অনন্তসুখ অসম্ভব। বেদে ও স্বর্গের উল্লেখ আছে। স্বর্গের অধি-স্বামী ইন্দ্রদেবের বিষয়ে বহুবিধ প্রসঙ্গ আছে। মহাভারতের পঞ্চ পাণ্ডব ও স্বর্গে যাইতে ছিলেন। যুধিষ্ঠির সশরীরেই স্বর্গে গিয়াছেন। তাঁহাদের গমন পথ হস্তিনাপুর (দিল্লী) হইতে উত্তরাভিমুখে হিমালয়ের পারে ও স্থান পাইয়াছিলেন। অনেক স্থানে স্বর্গ (দেবনিবাস) উত্তর দিকে বর্ণিত হইয়াছে। আধুনিক অনুমানে সুমেরু সন্নিকটে প্রাচীন পুণ্যপুণ্য শ্বেতকায় আর্য্য জাতি বাস করিতেন। স্বর্গ ও সুমেরু শিরে। এখন আর্য্যের অতি পূর্ব্ব বাস স্বর্গ স্থান এবং ঋগ্বেদীয় কৃষ্ণবর্ণ অনার্য্য বিজেতা ও শ্বেতকায় আর্য্য নেতা ইন্দ্রদেবই সেই স্বর্গের অধীশ্বর কি না, এবিষয়ে চিন্তা করিবার দিন আসিয়াছে। সে স্বর্গ অনাবৃতকায় ব্যক্তির প্রবেশ অসম্ভব। পথি মধ্যে ভীমার্জ্জুনের মত মহাবীর ও হিমানীর মহিমায় আত্মলীলা সম্বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এখানে বিবেচনা করা আবশ্যক, যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গে গেলেও শাস্ত্রীয় স্বর্গ পরলোকের প্রাপ্য দেহাবসানে গন্তব্য এইরূপ ঘোষণা শাস্ত্রে অনেক স্থলেই সুপরিস্ফুটভাবে বিদ্যমান। স্বর্গের সুখ ক্ষয়ী হইলেও প্রভূত। এই দুর্ল্লভ-বহুসুখ স্বর্গের জন্য বহুকাণ্ড সঙ্কুল যাগাদি কার্য্যে কষ্ট ভোগ করিতে প্রবৃত্তি হওয়া অনুচিত নয়। এখনকার সুখ সমৃদ্ধি অপেক্ষা স্বর্গ রাজ্যের সুখ শান্তি অবশ্য অনেকাংশে অভিলষিত একথা আধুনিক নীতির অনুমোদিত। ভারতবর্ষের অনেক প্রতাপান্বিত ক্ষত্রিয় নরপতি ইন্দ্র রাজ্যের সখা ছিলেন। পরস্পরের উপকার প্রত্যুপকার চলিত। কখনও বা মর্ত্ত্যের কোনও নরপতি ক্রোধপরবশ হইয়া ইন্দ্রদেবের সহিত সংগ্রাম ঘোষণা করিতেন, আবার সুযোগমত স্বর্গরাজ্যে আধিপত্য বিস্তারও করিতেন। সময়ানুসারে স্বর্গেশ্বরের সহিত সন্ধিও সংস্থাপিত হইত। এই

সম্প্রদায়ের মনুষ্য দশরথাদি জীবিতাবস্থায় স্বর্গে গিয়াছিলেন এবং স্বর্গাধিকার সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। এই সকল বৃত্তান্ত পাঠ করিলে বস্তুতঃ স্বর্গের ধারণা পরলোক-ব্যাপারী হইতে পারে না। স্বর্গে দেবগণ বসতি করেন, স্বর্গ—তাঁহাদের কৌশল বলে সুরক্ষিত। দৈত্য দানবগণ বলবান্ হইয়া অনেক সময়ে স্বর্গসিংহাসনকে বিপন্ন করিয়াছে, এরূপ উপাখ্যান পুরাণে পাওয়া যায়। দৈত্য দানবাদি প্রায়শ দেব কর্তৃক পরাজিত হইয়াছে। এই সকল কথায় অনার্য্য শক্তি দেব সম্প্রদায়ের নিকট প্রায়শই কৌশলেই পরাজিত হইত। পার্ব্বত্য দুর্গম মার্গ অতিক্রম করিয়া সুদূর স্বর্গ রাজ্যে যাইবার যে গতিরোধ দৈত্যেরই ছিল, কাজেই তাহারা সহসা দেবগণের নিকট মস্তক অবনত করিত না। নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে অনেকেই অঙ্গীকার করিতে বাধ্য হইবেন, এই সকল ব্যাপার কেবল মাত্র প্রাচীন-ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবের নিদর্শন।

প্রবল বৌদ্ধ বিপ্লবের পর যিনি এই ভারতকে পুনর্ব্বার যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মবিপাকে ফেলিয়াছিলেন এবং লুপ্তপ্রায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের পুনরুদ্দীপন সম্পাদন করিয়াছিলেন, সেই যুগপরিবর্ত্তক কুমারিল ভট্ট ভট্টবার্ত্তিকে স্বর্গ সম্বন্ধে বলিয়াছেন।

যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং নচ গ্রস্তমনন্তরং।
অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎ সুখং স্বঃ পদাস্পদং॥

সুখই স্বর্গ। তবে আমরা সর্ব্বদা যে বিজলী-বিকাশের ন্যায় ক্ষণিক সুখের আলোকে ঝলসিত নয়ন হইতেছি, তাহাই ভট্টের স্বর্গ নহে। লৌকিক-সুখে সততই দুঃখ সম্মিশ্রণ দৃষ্ট হয়। এই সংসারে অশেষ সুখ সামগ্রী আমাদিগকে সুখী করিবার জন্য উপস্থিত, কিন্তু তাহাতে আমরা সুখী হই না। বাসনার নিবাক্ত শিরাক্ষোভ প্রবাহে আমাদের অস্থি-মজ্জা অনবরত দগ্ধ হইতেছে। সংসারের কামতাপন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিলাস সামগ্রীতে ও তৃপ্ত নহে। আকাঙ্ক্ষার অবসান নাই, আশঙ্কা প্রতিপদে। সূর্য্যোদয় হইতে সন্ধ্যা-সমাগম পর্য্যন্ত অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়াও মুহূর্ত্তকালের সুখ সাধন সংগ্রহ করা কষ্টকর, আবার অভাবের কশাঘাতে ক্লান্ত হইয়া ক্রন্দনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এক কথায় সুখ দুর্লভ, দুঃখ সর্ব্বদা উপস্থিত। শুক্লপক্ষে এক দিন পূর্ণিমা, কৃষ্ণপক্ষেও এক দিন অমাবস্যা। কিন্তু অনেক পূর্ণিমাই জলদের কল্যাণে অমাবস্যা সহোদরা হইয়া দাঁড়ায়, আর একটী অমাবস্যাকেও লোক-সমাজ আলোকিত দেখিতে পান না। অ[illegible]-সাধ্য যোগের ফল একরূপ স্বপ্ন সুখ হওয়া অনুচিত, তাই ভট্ট অক্ষয় স্বর্গ সুখের ব্যবস্থা করিয়াছেন। "যে সুখ দুঃখ সংমিশ্রিত নহে, তাহাই স্বর্গ (১) যে সুখকে গ্রাস করিবার জন্য পরবর্ত্তী দুঃখ বিকট বদন ব্যাদন করিয়া বিদ্যমান নহে সেই সুখই স্বর্গ; (২) যে সুখ অভিলাষ মাত্রেই আসিয়া উপস্থিত হয় অর্থাৎ যাহার জন্য পৃথক্ আয়াস প্রয়াসের আবশ্যক হইবে না, সেই সুখই স্বর্গ (৩)" ভট্টের শ্লোকটীকে এইরূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। অনেক পণ্ডিতের মতে এই তিনটী স্বর্গের পৃথক লক্ষণ, তাঁহারা মনে করেন, তিনটীর দ্বারা একই অর্থ প্রকারান্তরে সমর্থিত।

তেছে, অতএব তিনটী পৃথক্ ভিন্ন লক্ষণ। এক লক্ষণ হইলে পুনরুক্তি হয়। এরূপ নিরবচ্ছিন্ন সুখ কি ইহসংসারে সম্ভব?

মীমাংসা ভাষ্যকার শবর স্বামী বলেন "স্বর্গ শব্দ শ্রেষ্ঠোৎকৃষ্টে সুখে রূঢ়ঃ" উৎকৃষ্ট সুখই স্বর্গ শব্দের অর্থ। বাস্তবিক উৎকৃষ্ট-সুখ স্থান বিশেষের অবস্থা বিশেষের কাল বিশেষের সহিত সম্বন্ধ হওয়া সম্ভব নহে। লৌকিক শিক্ষায় কেবল সুখের ধারণাই অসম্ভব। অনেক দার্শনিকের অভিপ্রায় সুখ দুঃখের সম্বন্ধ বড় সন্নিকৃষ্ট। জগতের সর্ব শ্রেষ্ঠ মনোবিজ্ঞানবিৎ কপিলাচার্য্য সুখ দুঃখকে এক সূত্রে বাঁধিয়াছেন। সুখ সত্ত্ব-গুণের কার্য্য, দুঃখ রজো গুণের কার্য্য। এই সংসার ত্রিগুণের (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) পরিণাম। তিনটী গুণের কেহও আবার কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। ইহারা নিত্য সহচর, "অন্যোন্যাভিভবাশ্রয় জনন মিথুন বৃত্তয়শ্চ গুণাঃ।" এই ঈশ্বর কৃষ্ণ কারিকায় দেখা যাইতেছে ত্রিগুণ নিত্য সহচর। কপিলদেবের সাংখ্য প্রবচনেও এই কথা। পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাস ভাষ্যেও ত্রিগুণ পরস্পরকে ছাড়িয়া থাকে না, এই সিদ্ধান্ত। কেবল আধিক্যবশতঃ "এটী সাত্ত্বিক-কার্য্য" "এব্যক্তি সাত্ত্বিক পুরুষ" ইত্যাকার ব্যবহার হয়। সূত্রকার মহর্ষি বলেন "যো যদ্বৈষাং গুণানামিহ সাকল্যে নাতিরিচ্যতে। স তদা তদ্গুণ প্রায়ং তং করোতি শরীরিণং।" যে দেহে যে গুণ অধিক হয়, সেই গুণ শরীরীকে সেই গুণাক্রান্ত করিয়া তুলে, বস্তুতঃ সকল বস্তু ব্যক্তি ক্রিয়াকাণ্ডই ত্রিগুণাত্মক। সুতরাং এদেহে এসংসারে শুধু সুখ সম্ভব নহে। যদি ত্রিগুণ সমষ্টি ব্যতীত অন্যবিধ শরীর সম্ভব হয় এবং কেবল সাত্ত্বিক-কার্য্য কেবল সাত্ত্বিক-ইন্দ্রিয় বা কেবল সাত্ত্বিক মন থাকা মনোবিজ্ঞানাদির অনুমোদিত হয়, তবেই কেবল সুখের উপভোগ হইতে পারে, দুঃখের বিষয় তাহা শাস্ত্রযুক্তির বহির্ভূত, কল্পনায় আশ্রয়। অতএব নিরবচ্ছিন্ন সুখ রূপ স্বর্গ ভোগ কেবল কল্পনার কোমল কুসুমস্তবক শয়নে বিশ্রাম মাত্র। এখন ভাবিয়া দেখা যাউক, তাত্ত্বিক সুখরূপ স্বর্গ কোথায়?

সাধারণতঃ আমাদের যে সুখানুভব সম্ভব, এসুখ নিরবচ্ছিন্ন হইতে পারে না। অতএব সুখ শব্দের অর্থ বিবেচনীয়। অনেক দার্শনিক অনুমান-বলে পরমেশ্বরের মস্তকে অনন্ত সুখের ভার চাপাইয়াছেন, কিন্তু জীবজগতকে নিরবচ্ছিন্ন সুখে সুখী করিতে কেহই পারেন নাই। সাংখ্যভাষ্যকার বিজ্ঞান ভিক্ষু সাংখ্যসারে বলিয়াছেন,—"সুখং দুঃখ সুখাত্যয়ঃ।" সুখ দুঃখের অত্যাভাবস্থার নামই সুখ। সুখের আগ্রহ দুঃখের আশঙ্কা এই উভয় চলিয়া গেলে তৎপরাবস্থার নাম সুখ। যিনি সুখে আকৃষ্ট নন, দুঃখে ম্রিয়মাণ হন না, তিনিই বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে সুখী। অনেকে সুখের অর্থ "দুঃখ না হওয়া" বলেন। দুঃখ ও সুখকে মনের মধ্যে সংযত করা ব্যতীত অন্য উপায়ে দুঃখদূর করা সম্ভব কি না তাহাও আলোচ্য। জ্ঞানের দ্বারা বা যোগাভ্যাসের শক্তিতে সুখ দুঃখের অতীত অবস্থায় উপনীত হওয়ার নামই বোধ হয় স্বর্গ। বোধ হয় মীমাংসকগণই সর্ব্ব প্রথম দেশে স্বর্গের ধারণা প্রচার করেন। ভারত

প্রথমে শুনিয়াছিল সেই বেদবাণী "স্বর্গকামো যজেত।" তারও স্বর্গ সুখের লোভে সর্ব্বস্বব্যয় করিতে কঠোর উপবাস ব্রত যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে শিখিয়াছিল। সে স্বর্গ সুখ কেবল কোথায়? কি কাজে? তাহা কেহই স্পষ্ট বলেন নাই। মীমাংসক স্বর্গ ধারণার আদিগুরু, তিনি স্বর্গকে দেশবিশেষ মনে করেন না, নির্দ্দোষ নিরবধি নিরবচ্ছিন্ন সুখই তাঁহার স্বর্গ। ঐ সুখই আত্মজ্ঞানীর মুক্তি, কারণ তাহাতে দুঃখশঙ্কা নাই। মীমাংসকের স্বর্গকে জ্ঞানীরা বিনাশী বলেন কেন, বুঝা যায় না। সম্ভবতঃ মীমাংসক বৈদিক কর্ম্মের দ্বারা স্বর্গ লাভ বলিয়াছেন, ইহাই কারণ। কর্ম্ম জন্য ফল সমস্তই অনিত্য, মীমাংসকের স্বর্গ যাগাদি কর্ম্মের ফল সুতরাং তাহা নিত্য নিরবচ্ছিন্ন নির্দ্দোষ হইতে পারে না। মীমাংসকের স্বর্গকে কথা না বলিয়া মীমাংসকের নিত্য সুখ স্বরূপ স্বর্গ বৈদিককর্ম্মের ফল হইতে পারে না ইহা বলিলেই ভাল হইত। তাহাতে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রামাণ্য থাকে না সুতরাং বেদ অংশত অপ্রমাণ হয়, এই ভয়েই জ্ঞানীরা মীমাংসকের স্বর্গ জিনিষ কি তাহা ভাবিতে চাহেন নাই; কেবল ভাবিয়াছিলেন মীমাংসকের স্বর্গসাধক বৈদিককর্ম্ম, কাজেই সামঞ্জস্য রক্ষা হয় নাই। মীমাংসক মহর্ষি বলেন "সস্বর্গঃ স্যাৎসর্ব্বান্ প্রত্যবিশিষ্টত্বাৎ। সুখই স্বর্গ, যেহেতু সকলের প্রতি অবিশিষ্ট হইতে পারে। স্বর্গ স্থানবিশেষ হইলে সকলের পক্ষে অবিশেষ হইতে পারে না। জ্যোতিষ্টোমকারী বহুব্যক্তি একরূপ সুখভোগ করিতে পারেন, কিন্তু এক রাজ্য বা দেশ সমভাবে ভোগ করিতে পারেন না।

সুখ ভাবিতে সুখের স্থান, প্রথা, উপকরণ সকলই ভাবিতে হইয়াছে। সেই ধারণায় সুন্দর স্বর্গ লোকের কল্পনা হইয়াছে। বৈদিক-স্বর্গ পৌরাণিক-স্বর্গের সম্পূর্ণ আদর্শ এরূপ মনে হয় না। পুরাণের বিভিন্ন স্থানের স্বর্গ বিভিন্ন। পুরাণে ঐহিক পারত্রিক উভয় স্বর্গ দেখা যায়। ফলতঃ পৌরাণিক স্বর্গ লোক বিশেষ। তথায় কেহবা মরিয়া কেবা বাঁচিয়াও যাইতে পারে। বেদের স্বর্গ ঐতিহাসিক অংশের প্রামাণ্য মানিলে স্থান বিশেষ এবং ইহকালের জিনিষ। প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি ছাড়িয়া দিলে বেদের নিকট স্বর্গের কোনও স্পষ্টস্বরূপ পাওয়া যাইবে না। পৌরাণিক স্বর্গের ইন্দ্ররাজ হইতে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ লাগিত। এক ব্যক্তি শত অশ্বমেধ করিলে ইন্দ্র হইতে পারিত। পুরাতন ইন্দ্র নূতন ইন্দ্রত্ব লাভের জন্য শতাশ্বমেধকারীর অশ্বমেধ পূর্ণ হইতে দিতেন না। অগত্যা অশ্বটীকে চুরি করিয়া নিতেন। ইহলোক পরলোকের মানব ও দেবের মধ্যে এরূপ স্বার্থসংঘর্ষ বিস্ময়জনক। ইহাতেই স্বর্গ দেশবিশেষ মনে হয়। ব্রহ্মা শতাশ্বমেধকারীর ইন্দ্রত্ব (স্বর্গের রাজা হওয়া) অনুমোদন করিতেন। প্রাচীন ইন্দ্র কৌশল, তপস্যা, দেব বল, দেবীশক্তি এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের মন্ত্রণা, কদাচিৎ যুদ্ধ সাহায্য লইয়া পুনঃ স্বর্গ অধিকার করিতেন। এ সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বর্গ। ভট্টের স্বর্গ ইহার সম্বন্ধ রাখেনা। চার্ব্বাকের স্বর্গ ও সুখ, তবে তাহা এই অঙ্গনালিঙ্গনাদি লৌকিক সুখই। ইহসংসারে পবিত্রজীবনোপভোগ অনেকের মতে স্বর্গ। ফলতঃ অনেক

স্বর্গই ইহকালব্যাপী। পরকাল বা পরলোক বলিতে মৃত্যুরপর সময়ের অবস্থা ও মরণান্তর প্রাপ্য স্বর্গ নরকাদিই বুঝা হয়। পরলোক অর্থাৎ পরে (মৃত্যুর পরে) যে লোকে স্থান যাওয়া যায়।—ভট্টের স্বর্গ সুতরাং এ অর্থে পরলোক নহে। পুরাণের স্বর্গই এরূপ অর্থ বোধক পরলোক। ভট্টের স্বর্গ মুক্তিরনামান্তর। বলিতে হইলে নিরুপদ্রব সুখের নামই ব্রহ্মানন্দ। দার্শনিকেরা পৌরাণিক স্বর্গ স্থানকে সুকর্ম্মানুসারে পরজন্মের প্রাপ্য বলেন। কর্ম্ম বিশেষ দ্বারা এই দুঃখবহুল মর্ত্তভূমি ত্যাগ করিয়া সুখ বহুল স্বর্গ স্থানে যাওয়া যায়। এখানে তাঁহারা শাস্ত্র ব্যতীত যুক্তি দেন না। অবশ্য দার্শনিক প্রথার স্বর্গ দুঃখশূন্য নহে, তবে সুখই বেশী। এই স্বর্গের সহিত মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধ পুরাণ কোথায় পাইলেন ভাবা উচিত। স্বর্গ ধারণার শুরু মীমাংসকের কাছে পান নাই। বেদের নিকট হইতেও সুস্পষ্ট পান নাই। কঠোপনিষদে আছে "স্বর্গ লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি ন তত্রত্বং ন জরয়া বিভতি, উভে তীর্ত্বা অশনায়াপিপাসে শোকাতিগো মোদতে স্বর্গ লোকে। পুরাণের স্বর্গে শোক দুঃখ নিতান্ত অপ্রাপ্য নয়। ফলতঃ এই সকল স্বর্গ জীবনের চরণ লক্ষ্য হওয়া অনুচিত। ভট্টের স্বর্গ জীবজীবনের বিরাম সন্দেহ নাই। চরমশক্তিই এক মাত্র লক্ষ্য। সুখস্থান পৌরাণিক স্বর্গ অপেক্ষাকৃত শান্তিদায়ক, সুতরাং এই অমারজনীর গাঢ় অন্ধকারে পথভ্রান্ত পথিকের মত সংসারিজীবের কাছে স্বর্গ (সুখস্থান) মন্দ লাগে নাই। জীব যদি চরমগতির দিকে লক্ষ্য নিঃক্ষেপ করেন, তবেই তিনি প্রকৃত স্বর্গ লাভ করিবেন, আসল পরকালের (জীবনের চরম সময়ের অর্থাৎ মুক্তির সন্নিকৃষ্ট কালের) চিন্তা করিলেন। নচেৎ নন্দনকাননে কিম্বা আগরার তাজমহলে কোথায় ও তাঁহার পরকালের পিপাসা মিটিবে না; কোথাও তিনি ইহসর্ব্বস্ববাদীর সুলভ সুখের মায়া ছাড়াইতে পারিলেন না। আশা থাকিতে সুখ নাই। শাস্ত্র বলেন "আশাহি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখং।" আশার আগুণ নিবাইতে হইলে জ্ঞানের মন্দাকিনী স্রোত বহাইতে হইবে, ইহ সর্ব্বস্ববাদীর সাধনের জিনিষ প্রবৃত্তির সুখ। স্বর্গেও তাহাই। স্বর্গকে পরকালের জিনিষ ভাবিবেন প্রবৃত্তিরই দাসত্ব স্বীকার করা হইল। নিবৃত্তিমার্গের স্বর্গই পরকালের লক্ষ্য হওয়া উচিত। ভট্ট তাহা বুঝিতেন, কিন্তু বৌদ্ধ সমাজে বৈদিক কর্ম্মের প্রভাব বিস্তার পূর্ব্বক হিন্দুর স্বতন্ত্রতা রক্ষা করা আবশ্যক বিধায় জ্যোতিষ্টোমের ফল স্বর্গকেও অবিচ্ছিন্ন সুখ বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, জীবনের দুই লক্ষ্য এক ভোগ সাধ্যানুসারে সামগ্রী সংগ্রহ। অপর মোক্ষ সুখ দুঃখের উপরে গিয়া পৌঁছান। ইহার পূর্ব্বটী ইহকালের, পরটী পরকালের। এইরূপ বুঝিতে বোধ হয় বিপদ্ থাকে না। পৌরাণিক স্বর্গ—এবং ইহ সংসারের পুত্রকলত্রাদি জনিত সুখ এই উভয় দ্বারা জীবনের লক্ষ্য সীমাবদ্ধ হওয়া সঙ্গত নয়। ভট্টের স্বর্গ বা জ্ঞানীর মোক্ষের জন্য অবকাশ থাকা আবশ্যক।

আমি সুখ চাহি কেন? আমার যাহা অনুকূল সংবেদন তাহাই আমার সুখ এই

জনাই ত! অনুকূল চাহি কেন? প্রতিকূলের ভয়ে। যদি প্রতিকূল আমার প্রতিকূলাচরণ পরিত্যাগ করে, তবে অনুকূলও ত্যাগ করিতে পারি। শত্রু যদি হিংসাহীন হয়, তবে আত্মীয়দলকেও বিদায় দিতে আপত্তি কি? মন মায়ামুগ্ধ, আপনার অতুলনীয়তা অনুভব করিতে পারে না। আপনাকে আপনি না জানিয়া বাতগ্রস্ত সার্ব্বভৌম ব্যক্তিও দরিদ্র। সংসারের সুখ কি প্রার্থনীয়? নিশ্চয়ই নহে। দুঃখের তাড়নায় সুখের অঞ্চল ধরিতে চাই। যদি আমাকে আমি তন্ন করিয়া জানিতাম, তখন আর দুঃখদারিদ্র্য রহিত না। তখন উপায়সাধ্য লৌকিক সুখ থাকিত না বটে কিন্তু যাহা রহিত তাহা আমার অমৃতত্ব, তাহাতে অভাব নাই আশঙ্কা উপদ্রব নাই সুতরাং শান্তি আছে। তাহাই আমার নিরবচ্ছিন্ন সুখ, তাহাই আমার সুখ দুঃখাতীত ভাব, তাহাই স্বরূপ, তাহাই কৈবল্য, তাহার পার নাই পরিমাণ নাই। তাহা আত্মস্বরূপ হইলেও পূর্ব্বে (আত্মজ্ঞানোদয়ের অগ্রে) শত যোজন দূরস্থিত স মগীর ন্যায় দূরে। শাস্ত্র বলেন "তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।" আত্মতত্ত্ব জ্ঞানে অতি নিকটে অজ্ঞানে অনেক দূরে। এই নিরতিশয় সুখই পরকালের লক্ষ্য। এই অক্ষয় সুখের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেই মানবাত্মার শান্তির পথ পরিষ্কৃত হয়। ইহকালসর্ব্বস্ববাদীর জীবনে এ আশ্বাস নাই। অনবরত দুঃখের ভীষণমূর্ত্তি দেখিয়া ইহসর্ব্বস্ববাদী চমকিতে থাকুন, পরকালবাদী পূর্ণ পবিত্র আত্মস্বরূপ অক্ষয় আনন্দ অনুভব করিয়া সেই ব্রহ্মানন্দের রসে নিরত নিমজ্জিত হউন। আমরা দূরে দাঁড়াইয়া পরস্পরের লাঠালাঠিতে সমালোচনা করিয়া আদর্শ অনুসারে জীবের জন্য পথে উপস্থিত হইতে চেষ্টা করিতে থাকি। ওঁ শান্তিঃ।

শ্রী——তারণী।

যশোহর।

বিষয় ও বিষয়ী।

বিষয়ীর কাছে বিষয়ের কথা বড় মধুর সমধিক সুখকর বিপুল প্রীতিপদ। বিষয় বিরাগীর নিকট বিষয়ের মূল্য কোটী কোটী মুদ্রা হইলেও অত্যল্প, অকিঞ্চিৎকর; আর বিষয় কথা ত্যাজ্য, কদর্য্য পরিত্যাজ্য।

রাগ বিরাগ সাধারণত মানুষের প্রকৃতির গতির উপরই সংস্থাপিত। শিক্ষা দীক্ষা, আচার, ব্যবহার, অভ্যাস বিশ্বাস ইত্যাদিকে উহার লৌকিক স্ফূর্ত্তি বা বিকাশ ক্ষেত্র বলা যাইতে পারে। প্রকৃততত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে হইলে, ত্রিগুণ তত্ত্বের আলোচনা আবশ্যক; কারণ প্রকৃতির কার্য্যকারী শক্তি ত্রিগুণতত্ত্বময় যন্ত্রেই অবস্থিত। ইচ্ছায় অনুরাগ বিরাগে পরিণত হওয়া কষ্টকর।

বিরাগী রাগী বিষয়কে অকপটে আলিঙ্গন করিতে পারেন না। রাগী বিষয়ের লোলাঞ্চল ধরিয়া অনবরত আকর্ষণ করিতেছেন, বুকে টানিয়া লইতেছেন, কত যত্ন, কত কষ্ট, কত বাধা, কত বিপদ, কত আঘাত কত বেদনা অকাতরে সহ্য করিতেছেন, কিন্তু বিষয় কিছুতেই ধরা দেয় না। দেখ যে

ধরা দেয় না। কাছে আসে, পাশে পাশে আসে, কিন্তু ধরা দেয় না। যে চায়,—আগ্রহ করে, আদর করে, তাহার নিকট ছলনা; যে চায় না, নিগ্রহ করে, উপেক্ষা করে, তারই কাছে প্রার্থনা। বিষয় এই লীলারঙ্গ দেখাইয়া জীবজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে চিরকালই ফিরিতেছে ঘুরিতেছে। কেহই ইহার প্রকৃতমূর্ত্তি দেখিতে সক্ষম হয় নাই। বিরাগীর বিশ্বাস, মনোরঞ্জনবসনভূষণের অন্তরালে গলিত কুষ্ঠ, সুরঞ্জিতপল্লবাবলীর আবরণে বিষলতা, সুধামুখ-কুম্ভের অভ্যন্তর ভাগে করালকালকূট, সুচিত্রিত পেটিকার মধ্যে ঘৃণ্য জঘন্য পূতিগন্ধময় সামগ্রীসম্ভার। রাগীর ধারণা,—বহির্ভাগ অপেক্ষা অভ্যন্তর অধিক রমণীয়, মণিমন্দিরের মধ্যে কুসুমশয়ন, ঈঙ্গিতের মধ্যে আগ্রহ, চম্‌চমের মধ্যে সুরসধারা, সুবর্ণকৌটায় মুক্তার মালা। আপন বিশ্বাসেই উভয়ে বিভোর, উভয়ে অসুখী। কেহই যথার্থ সংবাদ দেন না বা পান্ না। কাজেই এদেশে 'বিষয়' বিপন্ন।

বিষয় বলিতে আপাততঃ পরগণা, তালুক, গাঁতি, নিষ্কর ইত্যাদিই বুঝা হইয়া থাকে, কিন্তু পাঠকমহোদয়গণ! আমাদের এ প্রবন্ধের 'বিষয়' তদপেক্ষা অনেক অধিকবিস্তৃত—অনেক অধিক গভীর—ও অনেক অধিক মূল্যবান্।

বিষয় বলিলে দার্শনিকগণ বুঝেন, যাহা জ্ঞানের নিরূপক। আমরা সর্ব্বদা অশেষবিধ জ্ঞান লাভ করিতেছি, প্রতি মুহূর্ত্তে কত জ্ঞান আমাদের আয়ত্তীভূত হইতেছে; কিন্তু এই অসংখ্য জ্ঞানের তৎকালীন স্বরূপ নিরূপণ করিতেছে কে? 'বিষয়' নয় কি? জ্ঞানের যথার্থ আকার আমাদের নিকট অপরিচিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দর্শনজ্ঞানের এবং অন্যবিধজ্ঞানের বিশ্লেষণ সম্পাদন করিলে আমরা কি প্রাপ্ত হই? কতগুলি বিজাতীয় ধারাবাহিক নিয়ম, আর কতগুলি উত্তেজক কারণ, ইহাই ত? এই ধারাবাহিকনিয়মটিকে আবার উত্তেজককারণের পার্থক্যে পৃথগ্‌ভাবে প্রাপ্ত হই। উত্তেজকের অবস্থা ব্যবস্থা অনুসারে ধারাবাহিক নিয়মের শৃঙ্খলা অন্য আকার ধারণ করে। ঐ ধারাবাহিক নিয়মের অন্তরালে জ্ঞানের যে প্রকৃতলুক্কায়িত 'রূপ' আছে, তাহাকে আমরা কিছুতেই পাই না। বস্তুতঃ, জ্ঞানের যতটুকু আমাদের আলোচনায় আসিতে পারে, তাহারই যে সময়ে ২ বৈলক্ষণ্য অনুভব করি, তাহার পরিচায়ক উত্তেজক কারণ অবশ্য 'বিষয়'। দর্শন শাস্ত্রের প্রাচীন পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন,—বিষিণ্বন্তি বিষয়িণং অনুবধ্নন্তি স্বেন রূপেন নিরূপণীয়ং কুর্ব্বন্তি ইতি বিষয়াঃ।" বিষয়িকে (জ্ঞানকে) নিজরূপের দ্বারা নিরূপণীয় করে যে সে বিষয়। আমাদের দর্শন ও স্পর্শন জ্ঞানের ধারাবাহিক নিয়ম ভিন্নজাতীয়, সুতরাং ইহাদিগকে পৃথক বুঝিতে আপাততঃ 'বিষয়' চাই না। বিভিন্নসময়ের বিভিন্নবস্তুর দর্শন-জ্ঞান অবশ্য এক জাতীয় ধারাবাহিকনিয়মের অধীন, সুতরাং এখানেই শৃঙ্খলার পার্থক্য বুঝিতে হইলে 'বিষয়' আবশ্যক। এখানে প্রত্যেকদর্শনজ্ঞানের স্বরূপতঃ বা ধারাবাহিক নিয়মের ও ভেদ নাই, তবে ভেদ আছে নিয়মশৃঙ্খলার, তাহার কারণ যখন 'বিষয় অর্থাৎ' দৃষ্টবস্তু; তখন ঐ জ্ঞানের যে অংশ নিরূপণ করিতে পারা যায়, তাহাকে

ঐ উত্তেজক কারণরূপ 'বিষয়'ই নিরূপিত করিয়াছে বলিতে হইবে, অতএব ঘটজ্ঞান ও পুস্তকজ্ঞানের উভয়ত্র আকারনিরূপক 'ঘট' ও 'পুস্তক' ইহা বলা যাইতে পারে। এইরূপ সর্ব্বত্রই জ্ঞানের পরিচায়ক বা নিরূপক 'বিষয়'। এখন বুঝিয়া দেখিলে, "জগতের কোন্ টুকু 'বিষয়' কোন্ টুকু নহে" তাহা জানা যাইবে। 'বিষয়ে'র সহিত রাগী বিরাগী উভয়েরই একটা সম্বন্ধ আছে সন্দেহ নাই। সে সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য—অপরিহরণীয়। কে বিরাগী তাহা বুঝেন না, তিনিই বিষয়কে দূরে নিঃক্ষেপ করিতে চান, এবং দূরে ফেলিতেছেন মনে করেন; বস্তুতঃ তাঁহার সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ আছে, থাকিবেও চিরদিন, কিন্তু তিনি ঐ বিষয়সম্বন্ধ দ্বারা নিজের ইষ্টসিদ্ধি করিতে পারিতেছেন না। সেটা কেবল বিষয়মর্ম্ম না জানিয়া, বিষয়ের স্বরূপ না দেখিয়া, না বুঝিয়া। রাগীও তাহা বুঝেন না, বুঝিলে—জানিলে, তিনি 'রাগী' হইতেন না। আপনার অভাবকে আপনি নিমন্ত্রণ করিতেন না, আপনার পন্থা আপনি আত্মহারা হইয়া পরিত্যাগ করিতেন না। যাহা চান তাহা তিনি পাইয়াও পাইতেছেন না; চিনিতে পারেন নাই, ব্যবহার জানেন না; সুতরাংই দুঃখ দৈন্য, অভাব প্রভাব, দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। তাই হতাশপ্রাণে উদাস মনে কেহ বলিয়াছেন, 'বিষয়াবিষ্ট-চিত্তানাং কৃষ্ণাবেশঃ সুদূরতঃ। বারুণী-দিগ্‌গতং বস্তু গচ্ছন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ?" বিষয়নিবিষ্টচিত্তব্যক্তির পক্ষে কৃষ্ণানুরক্তি ক্রমশঃ দূরতর হইতে থাকে। পূর্ব্বাভিমুখ গমন করিলে, পশ্চিম দিক্‌স্থিত বস্তু পাওয়া যায় না, প্রত্যুত উহা ক্রমেই অধিকদূর পশ্চাতে পড়িয়া যায়।

পাঠকমহোদয়! একবার সমাহিত চিত্তে চিন্তা করুন। বিষয়প্রবণচিত্ত ভগবানের দিকে অগ্রসর হয় না, বরঞ্চ ভগবান্‌কে অধিক পশ্চাতে রাখিয়া দেয়। বিষয়টি কি বাস্তবিকই বিড়ম্বনা পূর্ণ নহে? বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় 'বিষয়' এমন কি প্রতি পরমাণুও সেই ভবেশের অভাবনীয়-মহিমার পরিচয় প্রদান করিতেছে। অভ্রান্তবাক্য বেদ, জলদগম্ভীর রবে জগতের কর্ণ ধ্বনিত করিয়া প্রচার করিতেছে "এতাবানস্য মহিমা।" এই বিরাট বিশ্ব বিশ্বস্রষ্টার অতুল-মাহাত্ম্যের একমাত্র পরিচায়ক প্রমাণ। জগৎ গ্রন্থের প্রত্যেক 'বিষয়' অক্ষরে পরমেশ্বরের অমর মহিমা লিখিত আছে, তাহাতে মনোনিবেশ করিলে কি ভগবান্‌কে ভুলিয়া যাইতে হইবে? ভগবানের মূর্ত্তি যদি মানব কল্পনার অতীত সামগ্রী না হয়, মানুষের জ্ঞান-মন-বুদ্ধি যদি ভগবচ্চিন্তার বা তদ্ধারণার সামর্থ্য হইতে বঞ্চিত না হয়, তবে "ভগবান্ বিশ্বরূপ" এই সিদ্ধান্তই মানবীয় চিন্তার—মানব-মনীষার—মানুষীয় গবেষণার—সুরম্য বিরাম-স্থান, সুখদ-প্রতিষ্ঠা, সংশয় নাই।

পরমেশ্বরের অস্তিত্বে উচ্ছৃঙ্খলমানব যদি সন্দিহান হন, তবে তাঁহার সংশয়নাশক অমোঘ-নিশ্চয় এই জগদ্'বিষয়ের' অধীন। যুক্তি তর্ক সমূহের দ্বারা বারম্বার বিড়ম্বিত বিভ্রান্ত মানবমন, ঈশ্বরের অস্তিত্বসন্দেহে এই বিচিত্রবিশ্ব নিপুণনয়নে অবলোকন করিলেই সান্ত্বনা পাইবে। হুতাশ হতাশ সবই পলাইবে। দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে

যাঁহারা ঈশ্বরবিশ্বাসের প্রমাণ প্রয়োগ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহারা এক বাক্যে বলিবেন "বিশ্বই বিশ্বপাতার অস্তিত্বে প্রমাণ" মহামান্য ন্যায় দর্শন প্রধানতঃ এই রীতিরই অনুসরণ করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তবে কেমন করিয়া বলিব, 'বিষয়ে' চিত্তনিবেশ করিলে কৃষ্ণচন্দ্র দূরবর্ত্তী হন? এই বিশ্ব-'বিষয়' ব্যতীত আর যে কেহই ভগবানের পরিচয় দিতে সক্ষম নহে। আচ্ছা, ভাবিয়া দেখা যাউক, শাস্ত্র—'বিষয়' দ্বারা তাঁহাকে অনুমান করে কেন? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে 'বিষয়' বিষয়ীর (জ্ঞানের) একমাত্র পরিচায়ক। এই সংসার 'বিষয়', ইহার বিষয়ী সেই চিদ্বিগ্রহ। আমরা সর্ব্বদা যে ঘটপটাদি বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিতেছি, সেই জ্ঞানের বিষয় ঐ ঘটপটাদি, এবং, ঘটপটাদি বিষয়ের বিষয়ী ঐ জ্ঞান। ঐ জ্ঞান ক্ষুদ্র, আংশিক, উহা ভগবানের চিদ্বপুর স্বরূপ নহে, আভাস ছায়া মাত্র, ইহা দর্শন শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। অন্তঃকরণে পুরুষের (আত্মার) যে ছায়াসংক্রান্তি অর্থাৎ শক্ত্যবভাস তাহাই প্রমা অর্থাৎ যথার্থজ্ঞান। "চিচ্ছায়াপত্তি" শব্দ দ্বারা দর্শনে এই কথাই স্বীকার করা হইয়াছে। ঘটাদি বিষয়ের বিষয়ী জ্ঞান, ভগবদবভাস বা আত্মপ্রকাশ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। এখন দেখা গেল, এই বিশাল বিশ্বের বিষয় সমষ্টির বিষয়ী এক অগাধ অপার জ্ঞান রাশি। সমগ্র সংসার বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা, আর এক সার্ব্বভৌম জ্ঞানরাশির কাছে উপনীত হওয়া, একই কথা হইল। এখন বক্তব্য, এ প্রবন্ধে 'অনন্তচিদ্বপু'ই ভগবানের স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা হইল। এ পর্য্যন্ত দ্বারা আমরা অবগত হইতে পারিব যে, ন্যায়শাস্ত্র কি জন্য জগতের যাবতীয় বিষয়কে 'কতকগুলি' ভাগে বিভক্ত করিয়া, ঐ সমস্ত-পদার্থ যথাযথরূপে জানিলেই মুক্তি হয়, এ কথা বলিয়াছেন। সাংখ্যদর্শন ঈশ্বরসম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়াও কেন পঞ্চবিংশতি তত্ত্ববিবেক লাভ করিলে মুক্তি হয় বলিয়াছেন, তাহা এতক্ষণে অনেকটা সুগম হইয়াছে।

মুক্তি জীবনের সমস্ত উপদ্রব নিবৃত্তি পূর্ব্বক শাশ্বত শান্তিলাভ ভিন্ন আর কিছু, বোধ হয় না। শান্তিলাভ করিতে হইলে অশান্তির কারণ অবগত হওয়া আবশ্যক। রোগ নির্ণয় না হইলে চিকিৎসা অসম্ভব। আমাদের সমস্ত দুঃখের নিদান "আমরা অজ্ঞ।" সর্পবিষচিকিৎসা জানি না, কাজেই সর্পদষ্ট হইয়া দুঃখানুভব করি, উপার্জ্জনের পন্থা অবগত নহি, সুতরাংই অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া জীবিকার্জ্জনে অক্ষম হই। বস্তুতঃ দর্শনশাস্ত্র সমস্বরে বলিয়াছেন "দুঃখমজ্ঞানমূলং"। এই অজ্ঞান নাশ করিতে জ্ঞান চাই। জ্ঞান পাইলেই সকল অভাব কমিল। অন্যরূপে বলিলে ঈশ্বর (জ্ঞান) প্রাপ্তিই মুক্তির রহস্য। সমগ্র জগৎ (বিষয়) জানিলে মুক্তি হয়। অর্থাৎ সকল বিষয়ের (জগতের) জ্ঞান (ঈশ্বর) লাভ করিলে দুঃখের মূল (অজ্ঞান) ছিন্ন হয়। এখন বুঝা গেল জগৎ ভগবানের পরিচায়ক কি প্রকারে। এদিকে শাস্ত্রবচনেই পাওয়া গেল 'বিষয়' ভগবানকে পশ্চাতে রাখে।

মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণিকে বলিয়াছেন—"লেক্‌চার দিয়ে

বিষয়ী লোকদের কিছু ক'র্‌তে পা'র্‌বেনা; পাথরের দেওয়ালে পেরেক্ মারা যায় না।” পাঠক মহাশয়! বিষয়ী লোক পাথরের দেওয়াল, চূড়ামণির বক্তৃতা পেরেকের মত প্রবেশ সমর্থ হইলেও, এ দেওয়ালে লাগিয়া ফিরিয়া আসিবে, অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে না। পরমহংস মহোদয় “বিষয়ী লোক” বলিতে কি বুঝিয়াছিলেন, তাহা জানা গেল। তাঁহার ‘বিষয়ী’ বিষয়ের যথার্থতত্ত্ব গ্রহণ করেন না। বিষয় সমুদ্রের মধ্যে বাস করিয়াও বিষয়ের মহিমার, সে সাগরের রত্নরাজীর কোনও ধার ধারেন না। ইনি প্রকৃত বিষয়ী নহেন, ভণ্ড মাত্র। ময়ুরপুচ্ছশোভিত বায়স শাবক। বিষয়ের জ্ঞান না থাকিলে ‘বিষয়ী’ নামে। বস্তুতঃ কার্য্যে বিষয় জ্ঞানের পরিচয় চাই। ‘বিষয়’ জানিতে হইলে, সঙ্গে ২ বিষয়ীর (আত্মার, জ্ঞানের, ভগবানের) স্বরূপও জানিতে হইবে, তবেই ‘বিষয়ী’ হওয়া গেল। নিজের ‘বিষয়ের’ কোনও সংবাদ যিনি রাখেন না, এমন কি, নিজের (বিষয়ীর’) কথাটাও ভালরূপ জানা নাই, তিনি কিরূপ বিষয়ী? এখন লোকে ‘বিষয়ী’ বলিলে বিষয়কাণ্ডে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকেই বুঝে। বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞকে ‘বিষয়ী’ বলিতে হইলে, দৃষ্টান্ত পৌরাণিক জনকরাজা। শ্লোকস্থ “বিষয়াবিষ্ট” শব্দের অর্থ—বিষয়ের বাহ্যভাবমাত্রপরিজ্ঞাতা এবং উহার রহস্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। বিষয়ের সদ্ব্যবহার করিতে জানিলে, গৃহস্থ সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসী গৃহস্থ। গীতাশাস্ত্র বলিয়াছেন, কর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ কর্ম্মযোগীই সন্ন্যাসী, কর্ম্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসীও নহেন, কর্ম্মযোগীও নহেন। বিষয়-নিন্দা শাস্ত্রে সহস্র সহস্র স্থলে দেখা যায়, তাহার কারণ ‘বিষয়’ বড় দুরবগাহ দুর্জ্ঞেয়। প্রকৃতরূপে জানিতে পারিলে সব যন্ত্রণার অবসান, অপব্যবহার করিলে বিপদ্ বদ্ধমূল হয়। ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বদিকে বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থিত, চক্ষু থাকিলে দেখা যায়। যিনি প্রকৃত বিষয়ী, তিনি চিন্মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আনন্দে বিভোর হন। যিনি ‘বিষয়ী’ নামধারী, অথচ বিষয় কাণ্ডে অকালকুষ্মাণ্ড(?) তিনি বিষয়ের রহস্য অবগত নহেন, এমন কি, আপনাকে (বিষয়ীকে) ও জানেন না। এই জন্য, করস্থকঙ্কণ শতযোজন দূরে, গলস্থহার সমুদ্রপারে, মনে করেন। তাই সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ ও পশ্চাতে পড়িয়া যান্। যথার্থ বিষয়ীর প্রতিবিষয়ে বিষয়িতত্ত্ব (ঈশ্বরতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব) স্ফূরিত হয়। তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ সন্দর্শন করিয়া, যিনি বিশ্বপতির বিপুল মহিমার বিজয় বৈজয়ন্তী মনে করিয়া পরমপ্রীতি প্রাপ্ত হন, সেই বিষয়রসাভিজ্ঞ ব্যক্তিই বিষয়ী। গগনমণ্ডলের অনন্ত নক্ষত্র নিকরে যিনি জগদীশ্বরের মহিমময় কিরণচ্ছটা অবলোকন করেন তিনিই বিষয়ী। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ‘বিষয়ে’ ‘বিষয়ী’রই মহিমা প্রকটিত, এই রহস্য যিনি বুঝিয়াছেন, ‘বিষয়ে’র রহস্য দ্বার তাঁহারই সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত। তাঁহার কাছেই ‘বিষয়’ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাঁহার হৃদয়ই বিষয়ের শীতলচ্ছায়ায় বিশ্রাম লাভ করিয়া, বহুজন্মের ক্লান্তি দূর করিতে পারিয়াছে। তাঁহার নয়নে এ সংসার শান্তির নিভৃত নিবাস, তাঁহার শ্রবণেই সংসার কথা অতুল অমিয়বর্ষী স্বর্গসঙ্গীত। তিনিই সংসারকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিতে

পারিয়াছেন, তিনিই ভগবানের পূজায় বিষয়াপচোর নিয়োগ করিয়াছেন, তিনিই জগতে সুখী, শান্ত, সুন্দর, তিনিই যোগী, তিনিই বিরাগী, তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই বিষয়ী।

যে সকল শক্তির সমবায় এ সমগ্র সংসার 'বিষয়', সেই শক্তি সকলও ভগবচ্ছক্তি। সেই শক্তিই তাঁহাকে বুঝাইতে জানাইতে পারে। আমাদের জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি এই সকলেরই প্রভব সেই চিদ্‌ঘন ভগবান্‌। চক্ষু আমাকে এই সংসার দেখাইতেছে, কত ফাঁদে ফেলিতেছে। কত কুদৃশ্যে আকৃষ্ট হইতেছি, কত বিপন্ন হইতেছি, ইহা কি নয়নেরই দোষ? তা নয়, দোষ আমারই অজ্ঞতার। চক্ষু আমাকে মন্দ দেখাইয়াছে, কিন্তু আমি যদি উহার উৎকর্ষ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইতাম, তবে কি চক্ষু তাহাতে বাধা দিতে পারিত? কখনই নয়। অনাচার, অত্যাচার, ব্যভিচার, কি কিছুই শিক্ষা দেয় না? যদি অগ্র পশ্চাৎ নিপুণভাবে অবলোকন করা যায়, তবে অনাচার ব্যভিচারের মধ্যে জীবন সংগ্রামের উৎকৃষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করা যায়। বিষয়ের অপরাধ নাই, দোষ আপনার। 'বিষয়' সর্ব্বকার্য্যেই সময় বা অবস্থা অনুসারে প্রযুক্ত হইতে পারে। অর্থ সাধারণ, আমি উহার সদ্ব্যয়দ্বারা অশেষ মঙ্গল সাধন করিতে পারি এবং সকলেই পারে। আবার ব্যবহার ভেদে, উহাই নরকের পুতিগন্ধময় তোরণে উপস্থিত হইবার উপায় হইতে পারে। আমার মনের সহানুভূতি ব্যতীত আমার কাছে বিষয়ের কার্য্যকারিতা নাই। আমার মন তাহাকে (বিষয়কে) যে ২ ভাবে চালিত করিবে, তদনুসারেই তাহার কার্য্যকারিণী শক্তির ও পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে। বিষয় নিরপরাধ, মুগ্ধ আমরা—অজ্ঞ আমরা, তাহার মস্তকে নিজ দোষরাশি চাঁপাইয়া নিশ্চিন্ত হই। শাস্ত্র, বয়স্থাকন্যার সহিত ও নির্জ্জনবাস নিষেধ করিয়াছেন, বস্তুগতি এবং অজ্ঞতাকৃতআত্ম-দোষ, ইহার মধ্যে কোনটী প্রবল তাহা এখানেই পরিস্ফুট।

আমাদের যাহা কিছু আছে, তাহা সকলই কাল, দেশ, পাত্র অনুসারে, অন্যবিধ আকারও আবশ্যক গ্রহণ করে। অবস্থাভিজ্ঞ যথাযথরূপে প্রয়োগ করিতে পারেন। পীড়ার প্রকৃত অবস্থাপর্য্যবেক্ষণ না করিয়া, যদি অজ্ঞ চিকিৎসক উগ্রঔষধ প্রয়োগ করেন, তবে রোগীর জীবন লইয়াই গোলযোগ ঘটে। বিষয়ের ব্যবহার না বুঝিয়া, অস্থানে প্রয়োগ করায়ই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই, আর বলিয়া উঠি "বিষয়বিষ"। মোহক্রমে ভ্রমের পক্ষ সমর্থন করিয়া কষ্ট পাই, অমনি চীৎকার করিয়া বলি "বিষয় মরীচিকা।"

আমাদের অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, মন, বুদ্ধি সবই যদি অপরাধী হয়, তবে কি আমরা অপরাধী নহি? এই সকল ভিন্ন বস্তুতঃ আমার অন্য কিছু নাই। এগুলি ছাড়িয়া দিলে আমাদের 'আমিত্ব' আয়শূন্য হইয়া দাঁড়ায়, সুতরাং এগুলিকে মন্দ বলিলে বা দোষ দিলে আমাদের অসার আত্মতিরস্কারই সার হয়। পুত্র যদি প্রকৃত পক্ষে দুর্বৃত্ত হয়, তবে সে জন্য পিতাই কি দোষী নয়? প্রজা উচ্ছৃঙ্খল, রাজভক্তি নাই, রাজশক্তি তিরস্কৃত, এসকল কি রাজার কর্ত্তব্যপরতা বুঝায়? বিষয়,

ইন্দ্রিয়, কাহাকেও আমার প্রতি অনুচিত আধিপত্য দেওয়া আমার কর্ত্তব্য কি? যথার্থই তাহাদের আধিপত্য অসম্ভব, আমার অন্ধতারই ঐরূপ বোধ হয়। আমি অক্ষম, সর্ব্বদাই মনে করি অপরে আমার উপর ক্ষমতা বিস্তার করিতেছে।

বিষয়কে সৎভাবে গ্রহণ করিলে, উহা আমার সহায়, অযথাভাবে গ্রহণ করিলে প্রবল শত্রু। এই সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিয়া গৃহীরগৃহে হাহাকার, সন্ন্যাসীর কুটীরমধ্যে অনুতাপঅগ্নির আবির্ভাব। পরমপূত গীতাশাস্ত্র এই অমূল্য সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। অজ্ঞজগৎকে, বিষয়ের ব্যবহার, কর্ম্মের রহস্য, বিরাগের স্বরূপ, জ্ঞানের গরিমা বুঝাইয়াছেন। এই সংশয়িত মতের সমালোচনা করিবার জন্যই অবতার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত। সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য এই গীতায়ই সর্ব্বত্র দেখা যায়, এমন অতুল আলোচনা, অগাধ যুক্তির অবতারণা আর কোথাও একাধারে আছে কি না সন্দেহ। সেই জন্য ইহাকে শাস্ত্রের সার বলা হইয়াছে।

এখন একটি কথা আছে, এই বিষয়ব্যবহার কোথায় শিখিব? বিষয়ের অন্তঃপুরে কে লইয়া যাইবে? বিশ্বগ্রন্থে মহেশের মহিমা আছে সত্য, কিন্তু সে গ্রন্থ কে পড়াইবে? ধরণীর নিকট ধীরতা শিক্ষা হয় বটে, কিন্তু সে ধীরতা অনুভব করিবার শক্তি নাই যে। বিশ্বব্যাপী ভগবান্ ঊর্দ্ধ অধঃ, পার্শ্বে, সম্মুখে, পশ্চাতে, সর্ব্বত্র, কিন্তু কে অন্ধের চক্ষু চিকিৎসা করিয়া দর্শনসামর্থ্য দান করিবে? শাস্ত্র অভয় দিতেছেন 'গুরু' আছেন। "অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতং যেন" তিনি আছেন। আত্মশক্তি সংমূর্চ্ছিত হইয়াছে, তিনিই উদ্দীপিত করিয়া দিবেন। তিনি ভিন্ন আশ্রয় নাই। 'বিষয়ী' গুরুর চরণে শরণাগত হও, তুমি ও বিষয়কার্য্যে পণ্ডিত হইবে, 'বিষয়ী' হইবে। তখন তোমার বিষয় কামনায় অধীর হইতে হইবে না। বিষয় আপনিই ধরা দিবে। বিষয়ীকে লক্ষ্য করিয়া পবিত্র গীতাশাস্ত্র বলিতেছেন।

আপূর্য্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামাযং প্রবিশন্তি সর্ব্বে,
স শান্তি মাপ্নোতি ন কামকামী।"

কাম্যবস্তু যাহাকে কামনা করে, তিনিই তৃপ্ত, কাম্যবস্তু কামনায় যিনি অস্থির, অসুখী আত্মহারা, তাঁহার ভাগ্যে শান্তিলাভ অসম্ভব। অগাধবারিরাশি শত শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, সেই সমুদ্রের দিকেই অগ্রসর হয়। বিষয় বারিধির দিকে, 'বিষয়ী'র দিকে, সমগ্র বিষয় অপ্রতিহত বেগে প্রধাবিত হইতেছে। সমুদ্র অসংখ্যজলরাশি গ্রহণ করিয়া বিক্ষোভ প্রাপ্ত হয় না,—বিষয়ীও অগণ্য বিষয় ভোগ করিয়াও বিচলিত হন না। বিষয় ও বিষয়ীর (আকার) চিরন্তন অচ্ছেদ্য-সম্বন্ধ দর্শনের মতে "ভোগ্য ভোক্তৃ ভাব"। দর্শনের সূক্ষ্মদর্শন সকল, বিষয়ী বিষয় ভোগে আত্মানন্দ অনুভব করুন, আমরা "বিষয়ীর" চরণে অসংখ্য প্রণাম পুর্ব্বক অদ্যকার মত বিদায় গ্রহণ করি। অবসরে 'বিষয়ী'র কথা আর একটু নিবেদন করিব।

দীন-শ্রীকেদারনাথ ভারতী
যশোহর বেদ বিদ্যালয়।

স্বপ্ন কি অতিদৃষ্টি ?

দেখিলাম দুই পার্শ্বে অত্যুন্নত পর্ব্বতশ্রেণী, মধ্যে কূপসম অতিগভীর অন্ধকারময় সংকীর্ণ উপত্যকা নদীগর্ভসদৃশ। তলদেশে অনেক প্রাণীর কোলাহল শ্রুতিগোচর হইতেছিল, সম্যক্ দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। তখন নিকটস্থ নির্ঝর সলিলে চক্ষু প্রক্ষালন করিলাম, সেই নির্ঝরণীর নাম প্রজ্ঞা। তখন চক্ষুর অপূর্ব্ব শক্তি হইল। সে নিজের আলোকে নিজে দেখিতে লাগিল। দূর নিকট রহিল না। দেখিতে পাইলাম সেই উপত্যকা, অসীম নিম্নে কালনদী প্রবাহিতা; তত্তীরে অসংখ্য প্রাণী সুখ ক্রয় করিবার জন্য স্বর্ণান্বেষণে ব্যাপৃত। আহা! কালনদীর বন্যা হইতে রক্ষার জন্য তাহারা কতই উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। কিন্তু অল্পদৃষ্টিগণ জানিতেছে না, যে অদূরে যে পর্ব্বতপ্রমাণ বন্যাতরঙ্গ আসিতেছে তাহা সমস্তই ধৌত করিয়া লইয়া যাইবে। আহা! কৃপণগণ যাহা স্বর্ণ বলিয়া অন্ধকারে সঞ্চয় করিতেছে তাহা চাক্‌চিক্যশালিনী মৃত্তিকা মাত্র। কি ভীষণ দৃশ্য! কি মর্ম্মস্পৃক্ আর্ত্তনাদ!! যেখানে দাঁড়াইয়া আছি, তাহা হইতে দূরে বন্যাতরঙ্গনিমগ্ন প্রাণীগণের কি শোচনীয়া দুর্দ্দশা! কালবারির সংস্পর্শে তাহাদের সঞ্চিত স্বর্ণ মৃত্তিকায় পরিণত হইতে দেখিয়া; জীর্ণ আবসথ ভগ্ন হইতে দেখিয়া, কি ঘোর হাহাকার করিতেছে!! সে দিক্ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া নিকটে দেখিতে লাগিলাম। একজন পরিচিত ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু মোহকর্দ্দমে এমনি আবৃত যে ঠিক চিনা যায় না। তাহাকেই দেখিতে লাগিলাম। বেচারার শীর্ণ শরীর কিন্তু আশা অতি বৃহৎ। নিজ চেষ্টায় অন্নই আহরণ করিতেছে, কালবন্যার প্রকোপ হইতে রক্ষার উপায় করিবে বলিয়া মধুর স্বরে নিজগুণগান করিয়া পরের নিকট প্রার্থনা করিতেছে। কোথাও নিকার জাতীয় কুক্কুরের দংশনে স্বর্ণ লাভ করিয়া সুখের কল্পনায় উৎফুল্ল হইতেছে। তাহার সেই গান তাহার নিজেকে খুব মিষ্ট লাগিতেছে, কিন্তু অপরে কেহ উপহাস করিতেছে, কেহ গানের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য কিছু দিতেছে, আবার কেহ দূর ২ করিতেছে। সে গান শুনিয়া গায়ককে ঠিক চিনিলাম। সে সচ্চিদানন্দ। তখন দুঃখ হইল। বলিলাম ওহে ভাই সচ্চিদানন্দ! তুমি কিরূপে এই কূপে পতিত হইয়া জীবনের ধ্রুবতারা হারাইলে। দেখিতেছ না অদূরে কালবন্যা তরঙ্গ আসিতেছে, তোমার ওই সঞ্চিত স্বর্ণ মিথ্যা তাহা কি বুঝিতেছ না। কেন ঐ ধনাশা ভারে ক্লিষ্ট হইয়া কালস্রোতের অন্ধকারময় তলে নিমগ্ন হইবে? কাল তরঙ্গে আশা ভগ্ন হইলে কি দুঃখই না পাইবে? তুমি মোহ কর্দ্দমে আবদ্ধ হইলে কিরূপে? আহা কিরূপে তোমার এই ভীষণ দুর্দ্দশা হইল! পূর্ব্বে তুমি যে সব আচরণকে হেয় জ্ঞান করিতে, এখন সেই আচরণে ঐ মিথ্যা স্বর্ণ সঞ্চয় করিতেছ? ইহাতে তাহার যেন ঈষৎ প্রবোধ হইল। সে দেখাইল। ঐ দেখ আমার অবতরণের সোপান। দেখিলাম সুন্দর সোপান, কিন্তু তাহা মোহকর্দ্দমে অতীব পিচ্ছিল। অবতরণ করা একরূপ বিনা প্রযত্নেই হয়, কিন্তু সেই পিচ্ছিলে উত্তরণ করা অতীব দুরূহ। সেই সোপানের প্রথমটিতে লেখা আছে,—পরিগ্রহ পরে, ক্রমশঃ গৃহ, সুখ, সঙ্গলিপ্সা, ক্ষুদ্র পুরুষার্থ, অবিরতি ইত্যাদি। বলিলাম ভ্রাতঃ! কি তুমি এই সাধনপ্রাগ্‌ভারের উপকণ্ঠে ছিলে? কেন এত দূর নিম্নে পতিত হইলে? দেখ আমি বিশেষ উচ্চে না উঠিলেও, তুমি নিম্নাভিমুখে গমন করাতেই এতদূর। এস একত্রে পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করি, তথায় শান্তিরাজ্য, কালবন্যা তথায় কখনও যাইতে পারে না। ধনাশ নামক ঐ মিথ্যাস্বর্ণভার পৃষ্ঠ হইতে নামাও, তাহা হইলে লঘুশরীরে এই

পিচ্ছিল সোপান অক্লেশে আরোহণ করিতে পারিবে। ঐ দেখ সন্তোষশৃঙ্গ, উহাতে অত্যুত্তম সুখ নামক ফল জন্মে, তাহার স্বাদ অনির্ব্বচনীয় মধুর। দেখ তাহার কিঞ্চিৎ ত্বক্ মাত্র আমি পাইয়াছি। এই লও তোমাকে ফেলিয়াদিতেছি—এই বলিয়া আমি সেই অত্যুত্তম সুখ ফলের কিঞ্চিৎ ত্বক্ ফেলিয়া দিলাম, কিন্তু তাহা নীচের আকাঙ্ক্ষা নদীতে নষ্ট হইয়া গেল। সচ্চিদানন্দ না পাইয়া সাক্ষেপে বলিল, এ সংসার কূপে সন্তোষ ফল কোথায়? আবার বলিল আমাদের এখানেও সুন্দর ফল জন্মে এই দেখ—দেখিলাম তাহা কিম্পাক ফল—বলিলাম তুমি কি সব বিস্মৃত হইয়াছ? ঐ কিম্পাকফলকে সন্তোষজ ফলের সহিত তুলনা করিলে? মোহ মার্জ্জিত কর, উঠিয়া আইস। সন্তোষ ফল খাইলে অতি অল্পমাত্র বাহ্যোপকরণের প্রয়োজন হয়। তখন সুখে অভ্যাস বৈরাগ্য যষ্টি লইয়া ভার শূন্য হইয়া এই সাধনপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া শান্তি রাজ্যে যাওয়া যায়। শীঘ্র এস, আমি দেখিতেছি ঐ কালবন্যা সমাগত প্রায়। এই লও রজ্জু, এই বলিয়া আমি রজ্জু খুজিতে লাগিলাম, দেখিলাম একটা পত্র রজ্জুরূপ ধারণ করিল, তাহার পংক্তি সকল রজ্জুর সূত্র স্বরূপ হইল। তাহা লইয়া বলিলাম—হে সচ্চিদানন্দ! ঐ শুন তোমাকে কি বলিয়া উপহাস করিতেছে। একজন বলিতে ছিল, বাবাজি! বড় পরার্থ-পরায়ণ, অর্থাৎ পরের যে অর্থ বা ধন বাবাজি কেবল তৎপরায়ণ। আর একজন বলিতে ছিল,—বাবাজির নিঃস্বার্থ দান, অর্থাৎ দানের ভিতর নিজের অর্থ কিছুই নাই সবই পরের ধন। আর একজন বলিতে ছিল, বাবাজি যে দেশশুদ্ধ শঠলম্পটের আশ্রয়স্থল দেখিতেছি। ভ্রাতঃ! উহা শুনিয়াও কি নির্ব্বেদ হয় না? এস এই লও রজ্জু———এখানে ধাঁধা ভাঙ্গিয়া গেল।

আহা অমন ধাঁধা ভাঙ্গিল! শেষটা কি হইল জানিতে পারিলাম না! লোকের স্বভাব হীন আচরণ করিয়া তাহাকেই ভাল বলিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া। তাহাতে নিজেকে আরও অধঃপতিত করে এবং কর্ত্তব্য জ্ঞান হারায়। সদাচরণ না করিতে পারিলেও অন্ততঃ যদি লোকে—ইহা আমার কর্ত্তব্য নহে অশক্তিবশতই এইরূপ আচরণ করিতেছি, এই ভাবে হীনাচরণ করে, তবে একদিন শুধরাইতে পারে। যাহ'ক্ কেহ কি আমার ঐ অতিদৃষ্টির শেষটা জানাইতে পারে? বোধ হয় সচ্চিদানন্দই উহা মনোনিবেশ পূর্ব্বক বার বার পাঠ করিলে শেষটা ঠিক করিয়া বলিতে পারে।

যোগিশঙ্কর গীতিঃ।

রাজসে যোগিহৃদি জ্ঞানময়োঽমলঃ
নিবাতস্থিত-দীপকইবাচলঃ।
শঙ্কর! ধৃত যোগি শরীর!
জয় পরমেশ হর! ॥ ১ ॥
দহসি নয়নজে পাবকে কামশলভং
বন্দে দেবং ত্যাগিজনসুলভং।
শঙ্কর! ধৃত যোগি শরীর!
জয় পরমেশ হর! ॥ ২ ॥
ছলয়সি তাপসী গিরিজাং বটুকবেশঃ
তদ্গতহৃদয়াং ত্বং পরমেশঃ।
শঙ্কর.........॥ ৩ ॥
লীলয়া যাসি সমাধৌপরমে
প্রাজ্ঞ স্থিতৈসি ভুবনোপরমে।
শঙ্কর.........॥৪
ভজে পরহিত হেতু পীতকালকূটং
ভুবনতত্ত্বং ত্বমেব স্ফুটং।
শঙ্কর.........॥৫
গৃহাণ সর্ব্বাত্মনা শরণমুপপন্নং
মাংনিবেদিতং ত্বয়ি প্রপন্নং।
শঙ্কর......॥৬
ইয়ং শিবাধীনজীবিত হরিহর কৃতিঃ
গেয়া শুভদা শঙ্কর গীতিঃ।
লীলাধৃত রূপারূপ!
জয় পরমেশ হর! ॥ ৭ ॥

শ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২৫ আইন মতে রেজেষ্টারীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৮ম বর্ষ; ৮ম খণ্ড, ১২শ সংখ্যা। | চৈত্র। | ১৩০৮ সাল, ১৮২৩ শকাব্দা।

সাম্যে মুক্তি।

সেই অচিন্ত্যপূর্ব্ব অতি অপরিচিত অনাদি অনন্ত অব্যক্ত অপূর্ব্ব দেশ হইতে যে দিন জগতে আসিলাম, তখী হইতে ভাবুকের মনে ভাবের, কবিরচিত্তে কাব্যের, সংসারীর হৃদয়ে সংসারের, আর ভক্তের অন্তরে ভক্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষারূপ বীজ বপিত হইল। একদিন এই বীজ উপ্ত হইয়া জীবনমহা-শ্মশানে মহামহীরুহ কল্পবৃক্ষের সৃষ্টি করিবে তাহা কেহ জানিত না। জীবনের স্রোত দ্রুত মন্দ গতিতে ক্রমশঃ প্রবাহিত হইতে লাগিল, কালের সঙ্গে হৃদয়নিহিত বীজটিও উপ্ত হইবার আয়োজন হইল। জীবের গুণ অথবা স্বভাব এই বীজ;—ইহারই অপর নাম জীবাত্মাসম্পর্কীয়ধর্ম্ম। অগ্নির উত্তাপ বায়ুর প্রবাহ, জলের শৈত্য বা আর্দ্রতা, যেমন ইহাদের স্ব স্ব স্বাভাবিক গুণ, মানবেরও তদ্রূপ ধর্ম্ম প্রবৃত্তি-স্বাভাবিক তাপবিহীন বহ্নি, প্রবাহ শূন্য পবনের ন্যায়, ধর্ম্মাসনচ্যুতআত্মা-মানব জড় বা মৃত। সুতরাং ধর্ম্ম রক্ষা করাই জীবের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। জীবের আত্মার উন্নতি অবনতি, বন্ধনমুক্তি, সকলই এই একমাত্র ধর্ম্মের ভিত্তিতে দণ্ডায়মান।

"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মঃ নিধনেহ প্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্ব মন্যত্তু গচ্ছতি॥

নশ্বর শরীরের সহিত সকলই ধ্বংশ পায়, কেবল ধর্ম্মই সত্য সনাতন। যে ধর্ম্মবলে জীব পরমাগতি লাভে সমর্থ, সে ধর্ম্ম আবার সাম্যসংশ্লিষ্ট; সুতরাং সাম্যেই মানবের পরম মুক্তি।

সাম্য বলিতে পাঠক যেন সহসা পাশ্চাত্য সাম্যবাদকে আধুনিক রুচিগত ভাবে সম্মুখে দাঁড় করাইবেন না! আধুনিক রুচি ছাড়িয়া দিলে, বাস্তবিক আমাদের সাম্য ও, পাশ্চাত্য-

সাম্যবাদের একার্থবোধক। 'সম' এই শব্দ হইতেই সাম্যের উৎপত্তি। 'সম' পদের ত্রিবিধ ব্যাখ্যা হইতে পারে;—এক, সহ এবং প্রবৃত্তি। এক বলিলে একত্ব বুঝায়। জগতের সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলাম এক—একত্র। সারাটি জীবন সংসার সংগ্রামে পরস্পরের একতায় জীবনের (যদি পারি) কার্য্যোদ্ধার করিয়া আবার চলিলাম একা! সুতরাং এক হইতে আসিলাম, আবার চলিলাম এক, মাঝের কয়টা রহিলাম একত্র। এই একত্রই একত্ব, অর্থাৎ একতা। একতার বল অসামান্য,—একতার বলে তৃণগুচ্ছ মত্তকরি বাঁধিয়া রাখে, একতার বলে এই বিপুলবপু জগৎ সংসারটা চলিয়া আসিতেছে; বাল্যকালে শিশু পাঠের পৃষ্ঠায় তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় হইয়াছিল, আজ তাহার শক্তি অনেকটা অনুভূত হইয়াছে। 'এক' কথাটা বড়ই গুরুতর। তুমি আমি এক—বলিতে পারি বটে, কিন্তু বিষয়টা ভাবিতে গেলে মাথা ঘুরিয়া যায়, যখন জীবাত্মা পরমাত্মাকে জগৎ সংসার ভুলিয়া শুধু বলিবেন 'এক' তখন বুঝিব মুক্তি। তখন তুমি আর আমি এক।

সহ,—সহবাস। ধর্ম্ম সাধনের প্রথম ও প্রধান উপায় সাধুসহবাস, সাধু ও শাস্ত্র শ্রবণ। সহবাসের গুণ অনেক;—নীচের সহবাসে নীচ, সমানে সমান এবং বিশিষ্টের সংস্পর্শে জীব বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হয়, ইহা হিতোপদেশে শিখিয়াছি। এক দিন ছিলাম তাঁর সহবাসে, জগতে আসিয়া দিন কাটাইলাম জীবের সহবাসে, আবার যে দিন তাঁহার সহিত সহবাস করিতে পারিব, সেই দিন জীবনের পরম মুক্তি।

প্রবৃত্তি,—ইহাই সম ও ধর্ম। সম মুক্তি সৌধ, দম তাহার সোপান। যে প্রবৃত্তি লইয়া জগতে আসিয়াছি, তাহার দমন করিতে পারি ভালই, অন্ততঃ সম রাখিতেই হইবে; তা'রপর যে দিন সকল সংস্কার লইয়া প্রবৃত্তিময়ে যুক্ত হইতে পারিব, সেই দিন জীবনের নিবৃত্তি।

জাহ্নবী জলাঙ্গী সঙ্গমে পূতভটে দাঁড়াইয়া প্রেমাবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য যে দিন জগৎ সংসারকে প্রেম-প্লাবনে ভাসাইয়া শিক্ষা দিলেন—

"নামে রুচি, জীবে দয়া"—

সেই দিন সাম্যবাদ জগতের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে প্রকম্পিত হইল; প্রতীচ্য ক্ষেত্রে ধ্বনি মিশিল।

"Love your neighbour!"

জীবে দয়ার নাম সাম্য। চণ্ডালে ব্রাহ্মণে এক হইবে, কুকুরে মনুষ্যে এক হইবে, ইহা সংসারবাসীর পক্ষে প্রকৃত সাম্যবাদ নহে। দৈত্যপুরোহিতগৃহে বসিয়া ভক্তাবতার শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন—

"অসার সংসার বিবর্ত্তনেষু
মা যাত তোষং প্রসভং ব্রবীমি।
সর্ব্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত
সমত্বমারাধন মচ্যুতস্য॥

এই সমত্বই তোমার সাম্য। ভগবান কহিয়াছেন,—

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবিহস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"

ইহার তাৎপর্য্য,—পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থে তোমাকে সমদর্শী হইতে হইবে, কিন্তু সকলে সমানত্ব ঘটাইবার আবশ্যকতা

নাই। জীবনের মার্গে অগ্রসর হইতে আমি ষের প্রসার করিয়া যাইব, পরস্পর প্রতি-কূল ধর্ম্মাবলম্বীকে বাহে একত্র করিতে যাইয়া, ঘাত প্রতিঘাতের উৎপাদন অনর্থক। আমিত্বে পীন হইলে পার্থিব বস্তু টানিয়া এক করিতে হয় না, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ জনিত তেজোবলে সিদ্ধ আত্মার নিকট সমস্তই সাম্যে সংলগ্ন হইয়া যায়। ভগবান তজ্জন্যই বলিয়াছেন,—

"ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাংসাম্যেস্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণিতে স্থিতাঃ॥"
ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণিস্থিতঃ॥"

এই সাম্যের পথ বহিয়া যুগযুগ তপস্যার ফলে যে দিন মুক্তপুরুষ হইবে, চণ্ডাল-ব্রাহ্মণে, কুক্কুর মনুষ্যে, সাম্য সংঘটন সে দিন আপনা হইতেই হইবে;—হে নির্ব্বিকার নিবৃত্ত! সে সাম্য অচ্যুতের আরাধনা নহে, সে সাম্যে অচ্যুত স্বয়ং সমতা-প্রাপ্ত।

হৃদয়ে সন্দেহের লেশ যত দিন থাকিবে, তত দিন মুক্তির আশা করা বৃথা। নদী পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়াই যদি সমস্ত বাধাবিঘ্ন বিধ্বস্ত করিয়া সরল পথে চলিতে থাকে, সাগরে বড়ই শীঘ্রমিশিয়া যায়। আর যদি উঁচুনীচু বাহিয়া, বাধাবিঘ্নে প্রাতহত হইতে হইতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাঁকিয়া বাঁকিয়া চলে, তবে সাগরে পড়িতে তাহার অনেক সময় লাগে। মানুষের মনও একটি মাত্র; জীবের পর-মাত্ম অবিচ্ছিন্নকর। তোমার ভাগ্য ফলে জগতে প্রথম আসিয়াই যে পথে দাঁড়াইয়াছ সেই পথ বাহিয়া চলিলেই ত হয়? অদ্য হিন্দুধর্ম্মে সুখের কিছু স্বাদ বুঝিলে না, কল্য ঈশাই শাস্ত্রে কোন সত্য পাইলে না, পরশ্ব কোরাণে মুক্তি তত্ত্বের নির্দ্দেশ হইল না এরূপে জীবনের কয়টা দিবস বিবিধ 'খেয়ালে' কাটাইয়া দিলে, সাধনার সময় পাইলে কোথায়? প্রসাদ বলিয়াছিলেন—

"অবোধ মন,
অভেদ জ্ঞানে কালোরূপে মেশামেশি,
ওরে, একে পাঁচ পাঁচেই এক, মন করোনা দ্বেষাদ্বেষী!"

মহিম্নে ধ্বনিত হইয়াছিল—

"ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণব-মিতি প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্য-মিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানাপথজুষাং নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥"

নানাস্থানে উৎপন্ন নদী সকল, নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে সেই অনাদি অনন্ত এক সাগরেই মিশিয়া যায়। সকলেরই উৎপত্তি বিভিন্ন আধারে, কিন্তু পরিণাম এক; মূল মন্ত্রও এক। কিন্তু কয়জনে সৃষ্টির এই অপূর্ব্ব সমতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে? স্তবের ভাব এই সমত্ব জ্ঞান, যে দিন হৃদয়ে উদয় হয়, 'সব দিনের এক দিন সে!'

সংসারে আসিয়াই প্রথমে জীব মুক্তির আয়োজন করিতে পারে না সত্য, কিন্তু সাধনা ত তাহার নিত্য সহচর। সাধনায় সাম্য রক্ষা করিলেই নিদান পর্য্যন্ত মুক্তির পথ প্রশস্ত হইয়া থাকে। কথাটা ভগবান্ অভিন্নরূপে বুঝাইয়াছেন—

"সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীন মধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে॥"

এই প্রবৃত্তিই যখন উচ্চতর সোপানে অধিরোহণ করে, তখনই জীব "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" দেখিতে পান।

আমাদের জীবন অভ্যাসের সমষ্টি। অভ্যাসের অপর সংজ্ঞা যোগ। স্বভাব অভ্যাসের পরিণাম। শৈশব হইতে উশৃঙ্খল জীবন পরিচালনে অভ্যস্ত ব্যক্তির স্বভাব অতীব উশৃঙ্খল হইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ। আবার প্রকৃত সাধননিরত যোগযুক্তের আত্মা যে স্বভাব প্রাপ্ত হইবেন, তাহা বিশুদ্ধ ও সংযত। আত্মার উদ্দেশ্য সৎস্বভাব প্রাপ্তি, ইন্দ্রিয় তাহার বিঘ্ন এবং সমত্ব তাহার উপায়। ভগবান ধনঞ্জয়কে এই বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন ;—

"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগউচ্যতে।"

আবার ; Trinity—ত্রিনীতি অর্থাৎ প্রণব সাম্যবাদের মূল মন্ত্র। ইহাই বীজ। শান্তিঃ—শান্তিঃ—শান্তিঃ—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ, এই ত্রিমূর্ত্তি ত্রিনীতি। ত্রিনীতি ভজনার মুক্তি, ইহাই সাম্যে মুক্তি ;—সেই ত্রিনীতিই ও তৎসৎ। সাম্যবাদের সৎ-চিৎ-আনন্দ-রূপ কল্পবৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া আর্য্যঋষিগণ যে মহামন্ত্র চয়ন করিয়াছিলেন তাহারই উপরি ব্রহ্মাণ্ডের (ধর্ম্মজগতের) মেরু সংস্থাপিত ;—তজ্জন্যই জগতে হিন্দুধর্ম্ম সনাতন। হিন্দু শাস্ত্রের প্রত্যেক উপদেশের প্রত্যেক অক্ষরে নির্ম্মল সাম্যবাদ, বিশুদ্ধ স্বার্থত্যাগ, কায়মনঃপ্রাণে পরহিত সাধন এবং সত্য সনাতন নিষ্কাম পরমধর্ম্মের অতি নিগূঢ় সূক্ষ্মতত্ত্ব নিহিত। আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য, আমরা নিতান্ত স্থূল বুদ্ধি, তাই—

"ধর্ম্মস্য তত্ত্বংনিহিতং গুহায়াং মহাজনো
যেন গতঃস পন্থাঃ—"

এই অমূল্য মহামন্ত্র নির্দ্দেশ স্বরূপ বর্ত্তমান থাকিতেও আমরা মৃগতৃষ্ণিকার আশায় বৃথা তৎপর। তত্ত্বজ্ঞানী গাহিয়াছেন—

"জগতে আরেকে সম আচরণ, সমে শ্যাম
ষায় মিল্।
আতেন ভই পাপ পরসন, আনন্দে মগন
রহে দিল্॥"

আমরা বুঝিলাম না, তাই অবনতির অতল গর্ত্তে পড়িয়া মনুষ্যত্ব লোপ করিতে বসিয়াছি। কে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবে—'সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ' জীবনযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আমাদিগকে পাপস্পর্শ করিবে না, এবং আমরা সমত্বযোগাশ্রয় করিয়া পরম অক্ষয়ানন্দ ভোগে সমর্থ হইব ?

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

আপস্তম্বীয় গৃহসূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রথম খণ্ড

অথৈনামাগ্নেয়েন স্থালীপাকেন যাজয়তি ।১

অনন্তর ঐ নববিবাহিতাবধূকে স্থালীপাক দ্বারা যাজন করাইবে। "অথ" শব্দের অর্থ এখানে আনন্তর্য্য। পূর্ব্বোক্ত বিধির অনুষ্ঠিত হইলে পরে, এই স্থালীপাকযুক্ত বধূ

দ্বারা অনুষ্ঠান করাইবে। পূর্ব্বে অর্থাৎ মন্ত্রপাঠের শেষে ধ্রুব ও অরুন্ধতী দর্শন লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। সায়ংকালে নক্ষত্রোদয় হইলে অরুন্ধতীদর্শন করিতে হয়, তদনন্তর অর্থাৎ রাত্রিতে স্থালীপাক করা উচিত, "অথ" শব্দ এই কথাই বুঝাইতেছে। হরদত্ত বলেন,—"তস্যামেব রাত্র্যাং স্থালী পাকো ভবতি, অথ ইতি বচনাৎ"। এই স্থালীপাক কার্য্যের দেবতা অগ্নি। "আগ্নেয়" শব্দ স্থালীপাকের বিশেষণ। স্থালীপাক কিরূপ? না' আগ্নেয়। যে স্থালীপাকের দেবতা অগ্নি, তাহাই আগ্নেয় স্থালীপাক। এই স্থালীপাক বধূকার্য্য। বর ও বধূর সাহচর্য্য এখানে অভিপ্রায় নহে। যাজয়তি এই নিচ্ প্রয়োগের দ্বারা বরের ঐ কার্য্যে ঋত্বিগ্ভাবে প্রযোজকত্ব বলা হইতেছে। হরদত্ত বলিয়াছেন, "বরস্যার্ত্বিজ্যমেব"। এক্ষণে অবগত হওয়া গেল এই স্থালীপাক বধূর কর্ত্তব্য। বর ইহার ঋত্বিক মাত্র; অতএব এই স্থালীপাকের ব্রীহি প্রভৃতি দ্রব্য ও দক্ষিণা বধূধন হইতেই দিতে হইবে। টীকাকার মহাশয়েরা ও তাৎপর্য্যতঃ এই কথাই প্রকাশ করিয়াছেন।

সম্প্রতি স্থালীপাকার্থ ব্রীহিকে তণ্ডুলে পরিণত করা আবশ্যক বিধায়, তণ্ডুল নিষ্পত্তির জন্য অবঘাত (উদূখল মুষল সংযোগে আঘাত অর্থাৎ কুট্টন) কার্য্য [illegible] হইতেছেন সূত্র যথা,—

পত্ন্যবহন্তি।২

পত্নী অর্থাৎ যিনি স্থালী পাক করিবেন সেই নববধূ অবঘাত কার্য্য করিবেন। এইটী অবঘাত কার্য্যে কর্ত্তৃনিয়ম। উদূখল মুষলাদির সাহায্যে ব্রীহিকে তণ্ডুলে পরিণত করিতে সকলের সামর্থ্য আছে। বধূও পারেন, বরও পারেন, অপর বা অন্য যে কেহও এই কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইতে পারে। যিনিই ঐ কার্য্য করুন, তাহাতে তণ্ডুলের কোনও হানি হইতে পারে না। শাস্ত্র উপদেশ দিয়াই নিরস্ত নহেন, অনেক স্থলে আদেশ করিয়া থাকেন। বধূ অবঘাত সম্পন্ন করিলে, যদি তণ্ডুল মন্দও হয় অর্থাৎ কণবহুলও অপরিষ্কৃত হয়, তাহাও গ্রাহ্য; তবুও অপরের দ্বারা সুপরিষ্কৃত তণ্ডুলনিষ্পাদন অন্যায়, ইহ শাস্ত্রকার মহর্ষির আদেশ। মীমাংসাচার্য্যগণ এখানে নিয়মাদৃষ্ট কল্পনা করেন। যে কার্য্য নানা প্রকারে নিষ্পন্ন হইতে পারে, তদৃশ কার্য্যে কোনও একটী নির্দ্দিষ্ট উপায় অবলম্বন করিতে বলাই সে কার্য্যের "নিয়মকরা"। নিয়মস্থলে, আদেশানুরূপ কার্য্য উপেক্ষা করিয়া, অন্য প্রকারে সম্পাদন করিলে, ঐ কর্ম্মজন্য অদৃষ্ট উৎপন্ন হইবে না, ইহাই নিয়মাদৃষ্ট স্বীকারের মর্ম্ম। "পত্নী অবঘাত করিবেন", এই নিয়মে কার্য্য করিলে তৎকার্য্যজনিত [illegible]

সহৃদয় পাঠকমহোদয়গণ! [illegible] আপ্রস্তম্ব [illegible] নাই, বাধাবিঘ্ন বিপৎপাত অতিক্রম করিতে না পারিলে কার্য্যক্ষেত্রের প্রসার ক্রমশঃ কমাইতে হয়, কাজেই আপনাদের প্রতি আত্মকর্ত্তব্যের গণ্ডীও এতদিন সঙ্কীর্ণ রাখিতে হইয়াছিল; অতঃপর আশা করি আপনাদিগকে [illegible] জানাইতে পারিব [illegible]

দীন লেখক

[illegible] নিয়মাধুই। নিয়ম ত্যাগ করিলে সুতরাংই ক্ষতি। নিয়ম রক্ষার জন্য নববধূ [illegible]ই অবহনন কার্য্য করিবেন, কদাচ [illegible] দ্বারা করাইবেন না।

[illegible] পর যাহা কর্ত্তব্য, সূত্রে মহর্ষি তাহা বলিতেছেন।

শ্রপয়িত্বাভিঘার্য্য প্রাচীনমুদীচীনং বা উদ্বাস্য প্রতিষ্ঠিতমভিঘার্য্য অগ্নে-রূপ সমাধানাদাজ্যভাগান্তেহস্বা-রক্কায়াং স্থালীপাকাজ্জুহোতি।৩

[illegible]পণ (উষ্ণকরণ অর্থাৎ সিদ্ধ করা) করিয়া, অভিঘারণ (ঘৃত প্রক্ষেপ) করিয়া, পূর্ব্বভাগে অথবা উত্তরভাগে নামাইয়া, অপর দ্বারা অগ্নিপ্রতিষ্ঠাপন পূর্ব্বক অভিঘারণ করিয়া, অগ্নির উপসমাধান (প্রজ্বলন বা সন্দীপ্তীকরণ) হইতে আজ্যভাগ নামক হোম পর্য্যন্ত কার্য্য (শ্রৌতসূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে) বধূ সম্পাদন করিলে, স্থালীপাক হইতে হোম করিবে। স্থালী শব্দের অর্থ বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন, স্থালী এখানকার পাকপাত্র। স্থালীতে ব্রীহিতণ্ডুল নিষ্পন্ন অন্নপাক করিয়া তদ্দ্বারা হোম করাই এখানকার কার্য্য। দেশে চরু বাঁধিয়া হোম করা অপ্রচলিত নহে, ইহা বুঝিতেও সুতরাং বিশেষ কষ্ট না হইবার কথা।

সকৃদুপস্তরণাভিঘারণে দ্বিরবদানং।৪

উপস্তরণ ও অভিঘারণ কার্য্য এক একবার করা উচিত, কিন্তু অবদান-কার্য্য দুইটী। যাগাদিতে [illegible] ও [illegible] পৌরো-ডাশির (পুরোডাশ নামক যজ্ঞীয় পিষ্টক-সম্বন্ধে) অবদান কল্প এখানে প্রদর্শন করা হইয়াছে। শ্রৌতসূত্রে বিশেষ দ্রষ্টব্য। গৃহ্য-কর্ম্ম প্রতিপাদক পুস্তকে এবিষয়ের বিস্তৃত আলোচনায় আবশ্যক ও অবকাশ নাই। যথাস্থানে ঐ সকল বিষয় ক্রমশঃ হিন্দু-পত্রিকার পাঠকমহোদয়েরা প্রাপ্ত হইবেন। সুদর্শনাচার্য্য বলিয়াছেন, এই সকৃৎ উপস্তরণ হোমদর্ব্বী (হোমসাধন হাতা) দ্বারা অথবা অন্য দর্ব্বি দ্বারা, কিম্বা স্রুব (ইহা স্রুব-নামেই পরিচিত, এই যজ্ঞোপকরণটী বোধ হয় উপনয়নাদিতে সকলেই দর্শন করিয়া থাকেন) দ্বারাও করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ সূত্রে কিছু বিশেষ বলা না থাকায়, সম্ভব ও সুবিধা অনুসারে কার্য্য করিবার পক্ষই প্রকারান্তরে সমর্থিত হইয়াছে।

অগ্নির্দেবতা স্বাহাকারপ্রদানঃ।৫

এই স্থালীপাক হোমের দেবতা অগ্নিও ইহার প্রদান মন্ত্র 'স্বাহা'কার। স্পষ্টার্থে-সংশয় বিনাশ জন্য বলিতেছেন, স্থালীপাকের উভয় (পূর্ব্ব ও উত্তর) হোমই অগ্নিদেবতা ও স্বাহাকার মন্ত্রে করিতে হইবে। 'স্বাহা-কার' মন্ত্রের সহিত দেবতাসম্বন্ধ করিতে হইলে, দেবতাবাচক শব্দের উত্তর চতুর্থী বিভক্তি যোগ করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়, যথা,—অগ্নয়ে স্বাহা বায়বে স্বাহা ইত্যাদি। হোম, প্রদান ও প্রক্ষেপ শব্দ একই অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে, অতএব প্রদান অর্থাৎ প্রক্ষেপ করিবার সময় 'স্বাহা' যুক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে।

আপিবা সকৃদুপহৃত্য জুহুয়াৎ।৬

অথবা একবার গ্রহণ করিয়াই হোম।

করিবে। এপক্ষে উপস্তরণ ও অভিঘারণের দরকার নাই। যে দর্ব্বী দ্বারা হোম করা হইয়াছে, তাহা দ্বারাই একবার স্থালীপাক হইতে গ্রহণ করিয়া হোম করা কর্ত্তব্য, বৃত্তিকার মহোদয়ের ইহাই অভিপ্রায়।

অগ্নিঃ স্বিষ্টকৃদ্দ্বিতীয়ঃ ।৭

দ্বিতীয় হোমে স্বিষ্টকৃৎ সংজ্ঞক অগ্নিই দেবতা। যজমানের ইষ্টসম্পাদন করেন বলিয়া অগ্নিরই স্বিষ্টকৃৎ এই নামে অভিহিত হইতে হইয়াছে। স্বিষ্টকৃত্ব অগ্নির গুণ।

প্রধান হোমের অবশিষ্ট যে কিছু হোমার্থ দ্রব্য থাকে, সেই শেষ দ্বারাই স্বিষ্টকৃৎ হোম করা হইয়া থাকে। যাগযজ্ঞাদিতেও বহুস্থলে স্বিষ্টকৃতের এইরূপ নিয়ম। এই স্বিষ্টকৃৎ হোমকে "দ্বিতীয়" বলায় প্রথমোক্ত হোমের "স্বাহাকার প্রদান" ইত্যাদি ধর্ম্ম স্বিষ্টকৃৎ হোমেও প্রতিপালন করিতে হইবে। সমধর্ম্মী না হইলে প্রথম দ্বিতীয় ইত্যাদি নাম নির্দ্দেশ অযৌক্তিক হইয়া উঠে। স্থালীপাক শেষ হইতে এই হোম করা উচিত, সুদর্শনাচার্য্যও এ বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। এই স্বিষ্টকৃৎকে কেহ কেহ স্বিষ্টকৃৎ বলিয়া থাকেন।

সকৃদুপস্তরণাবদানে দ্বিরভিঘারণম্।৮

উপস্তরণ ও অবদান এক একবার, অভিঘারণ দুইটা। পূর্ব্বে ছিল অবদান দুইটা অভিঘারণ এক, এখানে অবদান একটা অভিঘারণ দুই। এখানে পৌরোডাশিক স্বিষ্টকৃতের অবদানকল্প প্রদর্শিত হইল। শ্রৌতহোমে দ্বিগুণ আবশ্যক।

মধ্যাৎ পূর্ব্বস্যাবদানং।৯

হবির (হোমদ্রব্যের) মধ্য হইতে পূর্ব্ব দৈবত অবদান করিতে হইবে। ইহা অভিঘাতপক্ষে জানিতে হইবে বলিয়া, সুদর্শন ও হরদত্ত বলিয়াছেন। মধ্য হইতে অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বমাত্র অবদান করিতে হইবে। চতুরবত্ত-(চারি অবদান করা হইয়াছে যাহার, সে চতুরবত্ত) পক্ষীয় উপস্তরণাদি এখানে প্রবর্ত্তিত হইবে না, এইরূপ অভিপ্রায় সুদর্শনাচার্য্য প্রকাশ করিয়াছেন।

মধ্যে হোমঃ।১০

অগ্নির মধ্যে হোম করিতে হইবে। হোম শব্দের এখানে অর্থ প্রক্ষেপ। এখানেও পৌরোডাশিক হোমদেশ (যেখানে হোম করিতে হইবে সেই স্থানকে দেশ বলা হইতেছে) প্রদর্শিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই পৌরোডাশিক কাণ্ডের অনুসরণ এখানে আবশ্যক।

উত্তরার্দ্ধাদুত্তরস্য।১১

হবির উত্তরার্দ্ধ হইতে উত্তর অর্থাৎ স্বিষ্টকৃৎ দেবতার জন্য অবদান করিতে হইবে।

উত্তরার্দ্ধ পূর্ব্বার্দ্ধে হোমঃ।১২

সেই স্বিষ্টকৃৎ সংজ্ঞক অগ্নির উত্তরার্দ্ধ পূর্ব্বার্দ্ধে হোম করিতে হইবে। এখানেও পৌরোডাশিক স্বিষ্টকৃতের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে।

লেপয়োঃ প্রস্তারবৎ তূষ্ণীমঞ্জলিং অদ্ভো প্রহরতি।১৩

হে বর্হিতে হবি ও আজ্য (ঘৃত) স্থাপিত, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ লইয়া, অঞ্জলি উভয় (এখানকার হবি) এতদুভয়ের যে লেপদ্বয়;

হইবে না। প্রথম স্থালীপাকে পত্নী অধি-কারিণী, বর ঋত্বিক মাত্র একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পর্ব্বকর্ত্তব্য এই স্থালীপাকে উভয়েরই কর্তৃত্ব আছে। সূত্রে 'উপোষিতাভ্যাং' এই দ্বিবচন নির্দ্দেশ দ্বারা উহা সমর্থিত হয়। কর্তৃত্ব একজনের এবং দুইজনের, সময় অরুন্ধতীদর্শনের পর সেই রাত্রিতে ও পর্ব্বদিনে, দক্ষিণা—স্বতন্ত্র এবং এখানে দক্ষিণা লাগিবে না, ইহাই প্রথম ও পরবর্ত্তিস্থালীপাকের পার্থক্য।

পূর্ণপাত্রস্তু দক্ষিণাইত্যেকে ।১৮

কেহ কেহ বলেন, পর্ব্বকর্ত্তব্য এই পরবর্ত্তি-স্থালীপাকে পূর্ণপাত্র দক্ষিণা দিতে হয়। পূর্ণপাত্র কি? তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। পূর্ণপাত্র প্রদান সর্ব্বদা সমাজে সর্ব্বকার্য্যে দৃষ্ট হয়; কিন্তু একটু মতামতের পার্থক্য প্রদর্শন মানসে আমরা কিছু বলিতেছি। হরদত্তের মতে "ধান্য-মুষ্টিশতস্য পূর্ণং পাত্রং পূর্ণপাত্র ইত্যাহুঃ" শতমুষ্টি ধান্য দ্বারা কোনও পাত্র পূর্ণ করিলে তাহাই পূর্ণপাত্র নামে কথিত হয়। সুদর্শনাচার্য্য বলেন, "ধান্যাদে পূর্ণং যৎকিঞ্চিৎ পাত্রং" ধান্য অথবা তণ্ডুলাদির দ্বারা যে কোনও পাত্র পূর্ণ করা হইলে, তাহাকে পূর্ণপাত্র বলা যায়। পরিমাণ অনির্দ্দিষ্ট, কারণ পাত্রও অনির্দ্দিষ্ট, তবে পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। পাত্রের ছোট বড়তে কিছু আসে যায় না, তবে পূর্ণতা অপূর্ণতাই লক্ষ্য করিবার জিনিষ। কেহ কেহ বলেন "অষ্টমুষ্টি ভবেৎ কি (-ঞ্চ) কি কিঞ্চিচ্চত্বারি পুষ্কলং। পুষ্কলানিচ চত্বারি পূর্ণপাত্রং প্রচক্ষতে।" [illegible] ধান্যাদির আট মুঠ [illegible] তাহার নাম কিঞ্চি বা কুঞ্চি। চারি কুঞ্চিতে এক পুষ্কল, চারি পুষ্কল এক পূর্ণপাত্র বলিয়া বিবেচিত [illegible] অষ্টাবিংশত্যধিকশত মুষ্টির নাম সুতরাং পূর্ণপাত্র। ইহাতে পাত্র পূর্ণ হউক বা না হউক তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। এপক্ষে পূর্ণপাত্র শব্দটী পারিভাষিক। যৌগিক পক্ষ [illegible] প্রদর্শিত হইয়াছে। যোগরূঢ় পক্ষই এখানকার প্রথম পক্ষ। এই পূর্ণপাত্র দক্ষিণা ব্রাহ্মণকে দিতে হইবে। যজ্ঞের আচার্য্যকে দিতে হইবে না। এরূপ সিদ্ধান্তে হরদত্ত উপনীত হইয়াছেন। প্রমাণ তিনিই জানিতেন।

সায়ং প্রাতরত ঊর্দ্ধং হস্তেনৈতে আহুতী তণ্ডুলৈর্যবৈর্বা জুহুয়াৎ ।১৯

এই বৈবাহিক স্থালীপাকের পর হইতে সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে হস্তদ্বারা তণ্ডুল অথবা যব কর্ত্তৃক এই দুইটী আহুতি প্রদান করিবে। সায়ং প্রাতঃ এই দুই পদ দ্বারা এখানে অগ্নিহোত্র কালই উপলক্ষিত হইয়াছে। এ বিধান আজীবন অনুবৃত্ত হইতে থাকিবে। এই আহুতিতে দর্ব্বী বা স্রুব ইত্যাদির আবশ্যকতা নাই, হস্ত এখানে ঐ কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়াছে।

স্থালীপাকবদ্দৈবতম্ ।২০

স্থালীপাকে যে দেবতা এখানেও তাহাই। অর্থাৎ প্রথমাহুতিতে অগ্নি ও উত্তরাহুতিতে স্বিষ্টকৃৎ সংজ্ঞক অগ্নি দেবতা। প্রথমে মন্ত্র "অগ্নয়ে স্বাহা"। পরটিতে "অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা" এইরূপ মন্ত্র।

সৌরী পূর্ব্বাহুতি [illegible]
[illegible] রিত্যেকে ।২১

কেহ কেহ বলেন [illegible]

মধুকের কুমারিতেই এই সূত্রের অবতারণা। পার্বণে দুইটী দেবতা প্রথম অগ্নি, অনন্তর স্বিষ্টকৃৎ। এই অগ্নির পরে, ও স্বিষ্টকৃতের পূর্ব্বে, উপদিষ্ট দেবতার হোম করিতে হইবে। ইহাতে বাধা বিপত্তি নাই। দোষ বহুল (অষ্টদোষ) বিকল্প স্বীকারও করিতে হয় না। অতএব এই সূত্রের আবশ্যকতা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে।

অবিকৃতমাতিথ্যং ।২৫

আতিথ্য অর্থাৎ অতিথি আসিলে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা অবিকৃত ভাবে করিতে হইবে। সুদর্শনাচার্য্য বলেন, "অতিথির্যস্য কর্ম্মণো নিমিত্তং তৎআতিথ্যং, গবালম্ভ ইত্যর্থঃ। তৎযথোপদিষ্টং এব স্যাৎ।" আতিথ্য অর্থে গবালম্ভ বুঝা হয়। শাস্ত্রে আছে—গোমধুপর্কার্হো বেদাধ্যায়ঃ" যে ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহাকে গোমাংস দ্বারা মধুপর্ক দিতে হইবে। এ নিয়ম অবশ্য অতিথির প্রতি অবাধে খাঁটিবে। শাস্ত্রদৃষ্ট-গোবধের তত্ত্ব আমরা বিবাহ প্রস্তাবে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি; যাঁহার অভিপ্রায় হয় তিনি তত্তৎসংখ্যার হিন্দু-পত্রিকা দর্শন করিতে পারেন। অধুনা ঐ উৎসন্ন নিয়মের বিষয় বিশেষ কিছু বলিবার আবশ্যক বোধ করি না।

বৈশ্বদেবে বিশ্বেদেবাঃ ।২৬

বৈশ্বদেব নামককর্ম্মে বিশ্বেদেব নামক দেবতা উপদিষ্ট হইয়াছে। এই দেবতোপদেশ "নির্ব্বাপ সময়ে সঙ্কল্পার্থ" বলিয়া হরদত্ত বুঝিয়াছেন। "আর্য্যাঃ প্রবতা বৈশ্বদেবঃ" এই বেদবাক্য দ্বারা বৈশ্বদেব নামক কর্ম-বিশেষের বিধান আমরা বুঝিতে পারি।

শ্রাবণী পূর্ণিমায় সূর্য্য অস্ত গেলে স্থালীপাক পৌর্ণমাসীতে স্থালীপাকঃ" এই বাক্য দ্বারা যে (স্থালীপাক) উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে পৌর্ণমাসীই দেবতা। পৌর্ণমাসী কর্ম্মানুষ্ঠান কাল, সুতরাং এস্থলে শ্রাবণীপৌর্ণমাসীই দেবতা। অবগত হওয়া যায় যে, ঐ স্থালীপাক হোমে "শ্রাবণ্যৈ পৌর্ণমাস্যৈ স্বাহা" ইত্যাকার মন্ত্র প্রয়োগ আবশ্যক হইবে। দেবতার চতুর্থী প্রয়োগ করাই নিয়ম, এখানে কেবলী পৌর্ণমাসী দেবতা নহে। "যস্যাং তৎক্রিয়তে" বলায় বুঝা গেল, যে (শ্রাবণী) পৌর্ণমাসীতে তৎকর্ম্ম করিতে হইবে, সেই (শ্রাবণী) পৌর্ণমাসী দেবতা হইবে। কাজেই ঐরূপ মন্ত্র পাঠ সুসঙ্গত।

সপ্তম খণ্ড সমাপ্ত।

অষ্টম খণ্ড।

উপাকরণে সমাপনেচ ঋষির্যঃ প্রজ্ঞায়তে ।১

উপাকরণ ও সমাপনে যে ঋষি প্রজ্ঞাত অর্থাৎ অবগত, অগ্রে তাহারই হোম করিতে হইবে। উপাকরণ দুই প্রকার। কাণ্ডোপাকরণ এবং অধ্যায়োপাকরণ। এইরূপ সমাপন ও দ্বিবিধ। কাণ্ডসমাপন ও অধ্যায়সমাপন, কাণ্ডানুক্রমণীতে তৎকাণ্ডের ঋষি বলিয়া যাহাকে জানা হইয়াছে, তিনিই সেখানে দেবতা। প্রথমে তাঁহার হোম ও তৎপরে সদসস্পতির হোম করিতে হবে।

...অধ্যায়োপাকরণের সময়, সেই অধ্যায়ান্তর্গত-কাণ্ডগুলির স্বতন্ত্র ঋষির হোম করিয়া, পরে সদসম্পতির জন্য হোম করিতে হইবে। অগ্নিহোম করা বা না করায় বিশেষ কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, একথা বৃত্তিকার বলেন। সুতরাং ও উহার কর্ত্তব্যতাবিষয়ে এখানে আমরা উদাসীন।

সদসস্পতির্দ্বিতীয়ঃ ।২

প্রথম ঋষি (কাণ্ড পরিপঠিত ঋষি দেবতা) ও তৎপরে সদসস্পতির হোম দ্বিতীয় স্থানে করিতে হইবে। এখানে ... হয়,—সদসস্পতি অধ্যায়োপাকরণ প্রয়োগে নবম, এবং কাণ্ডোপাকরণসমাপনে ..., এখানে তাহাকে দ্বিতীয় বলিবার হেতু কি? প্রত্যুত্তরে বলা যায়, দ্বিতীয় স্বিষ্ট-কৃতের স্থানে 'সদসস্পতি' বিহিত হওয়ায়, তাঁহাকে দ্বিতীয় বলা হইয়াছে। 'সদসস্পতি'র দ্বিতীয় স্থান প্রাপ্তিতে "সদসস্পতি র্দ্বিতীয়ঃ" এই আপস্তম্ববচনই যথেষ্ট প্রমাণ। কাণ্ড, অধ্যায়, মণ্ডল, খণ্ড, অনুবাক, বর্গ, প্রপাঠক, পাদ ইত্যাদি নামগুলি বৈদিকগ্রন্থের উপবিভাগ, বিভাগ, অনুবিভাগ ইত্যাদি ভিন্ন আর কিছুই নহে। গ্রন্থ দেখিলে সাধারণে অবগত হইতে পারিবেন, পরিচিত অধ্যায় পরিচ্ছেদ, খণ্ড ইত্যাদির ন্যায়, কাণ্ড, মণ্ডল ইত্যাদি ও ক্ষুদ্র বৃহৎ যথাসম্ভব এক একটী বিভাগ মাত্র।

স্ত্রিয়মুপেত্যেন ক্ষারলবণাবরাম-স্যুর্ষ্টয়া চ ভোজনং পরিচক্ষতে ।৩

... হোমাদিকার্য্যে স্ত্রীসহবাস, ক্ষার, লবণ, ... ইত্যাদি ... বর্জ্জন করা উচিত; ... আচার্য্যগণ ওগুলিকে বর্জ্জন করিতে বলিয়াছেন। ... আহার্য্যজাত রস রুধিরাদিক্রমে এই দেহকে পোষণ করে। আমাদের এই স্থূল দেহের নাম অন্নময়-শরীর। ভক্ষ্য বস্তু দ্বারাই প্রধানতঃ ইহার প্রকৃতি, প্রাণালী পরিপুষ্টি লাভ করে; সুতরাং আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তি, মনঃশক্তি পর্য্যন্তও অনেকাংশে আহারের অধীন। ভক্ষ্যশক্তি, পিতৃমাতৃশক্তিও পূর্ব্বকর্ম্ম এই তিন ব্যতীত জীবজীবনের নিয়ামিকাশক্তি আর অধিক নাই, তবে কালশক্তি প্রভৃতিও পরিহরণীয় নহে। মোটের উপর, আহারের দ্বারা দৈহিক, মানসিক বল বীর্য্য, শুদ্ধি, মলিনতা ইত্যাদি নিত্যই জীবদেহে অল্পাধিক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ইহা বিজ্ঞানানুমোদিত এবং সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ। কার্য্যবিশেষে আবার রাজসিক সাত্ত্বিকাদি ভাবের উদ্রেক আবশ্যক হয়। তজ্জন্যই কার্য্যবিশেষে রজঃশক্তিসমুৎপাদকদ্রব্য ত্যাগ ও, সত্ত্বশক্তি সম্বর্দ্ধক দ্রব্য আহার্য্যরূপ গ্রহণ করিতে শাস্ত্র আদেশ দিয়াছেন। শাস্ত্র জ্ঞান বিজ্ঞানের অনন্ত আকর। ভিন্নকর্ম্মে ভিন্ন প্রকৃতির অধিকারী নির্ব্বাচন এবং বিভিন্ন ভাবের আহারাদির বিধিনিষেধ শাস্ত্রের প্রগাঢ় গৌরবেরই পরিচয় প্রদান করিতেছে। স্ত্রীসহবাস, ক্ষার লবণ ও কুলথাদি ভোজন কি জন্য নিত্যকর্ম্মে নিষিদ্ধ হইল, এখন তাহার কারণানুসন্ধান করিলে বোধ হয় নিরাশ হইতে হইবে না। অতি উত্তেজন ও অতিশয় অবসাদ, রজঃশক্তি ও তমঃশক্তির কার্য্য, উহা মানবের পবিত্র প্রবৃত্তির বিক্ষেপ করায়, কাজেই ঐরূপ গুণবর্দ্ধক খাদ্যাদি গ্রহণ অবিধেয়। ইহাতে

য়স অৰ্থক, ও প্রকৃতির অস্বাভাবিকতা উপস্থিত হয়। যাঁহারা এই বিস্তৃতগভীর বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক বোধ করেন, তাঁহারা গীতায় গুণবিভাগ পাঠ করিলে পরিতৃপ্ত হইবেন। এখানে বাহুল্য ভয়ে এবিষয়ে বিরতি লাভ করা গেল। এখানকার এই নিষেধ পাকযজ্ঞাধিকারে ই বুঝা উচিত। শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে ও বটে।

যথোপদেশং কাম্যানি বলয়শ্চ।৪

কাম্যকর্ম্মে যথোক্ত শাস্ত্রানুসারে ব্যবহার করিতে হইবে, এ নিয়ম মানিবার দরকার নাই। কাম্যকর্ম্মে যাহা বিধান আছে, তাহা এখানকার নিষেধের অন্তর্ভূত হইলেও পরিত্যাগ করিতে হইবে না, অপিচ প্রতিপালনই করিতে হইবে। বলিপ্রদানাদি কর্ম্মেও যেরূপ উপদেশ আছে, তাহাই করিবে। কাম্য কর্ম্ম কামের (ইচ্ছার) অধীন। না করিলে দোষ নাই, ইচ্ছা হইলেই করে, না হইলে করে না; অতএব তাদৃশ ইচ্ছাধীন বিষয়ে এই নিয়ম করা আবশ্যক নহে। নিত্যে (পাকযজ্ঞাধিকারে) ইহার আদর।

সর্ব্বত্র স্বয়ম্প্রজ্বলিতে হগ্নৌ সমিধাবাদধ্যাৎ।৫

সর্ব্বত্র স্বয়ম্প্রজ্বলিত অগ্নি মিলিলেই, "উদ্দীপ্যস্বমানোহিংসীঃ" (অর্থাৎ উদ্দীপিত হও, হে অগ্নে! আমাদের হিংসা করিও না) ইত্যাদি দুইটী মন্ত্র পাঠ করিয়া দুইটী সমিধ্ (বোধ হয় সকলেই হোমের উপকরণ জীবিতশাখাগ্র স্বরূপ সমিধ্ দেখিয়া থাকিবেন।) অনলে প্রদান করিবে। "সর্ব্বত্র" বলায় সকল পাকযজ্ঞেই এই নিয়ম, কেবল মাত্র বৈবাহিকপাক-যজ্ঞেই, এমন নহে, ইহা বুঝিতে হইবে। একথা না বলিলে, কেবল বিবাহসম্বন্ধিপাকযজ্ঞেই এ বিধান হয়, যে হেতু প্রকরণ প্রমাণ বলে তাহাই বুঝিতে হয়। সর্ব্বত্র' শব্দের অর্থ কাহারও মতে "আচারলক্ষণসকলকর্ম্মে।" স্বয়ং প্রজ্বলিত অর্থে বিনাযত্নে প্রজ্বলিত অগ্নিই বুঝিতে হইবে।

আপন্না শ্রীর্মাগাৎ ইতিবা।৬

পূর্ব্ব সূত্রোক্ত সমিধ্ প্রদানে 'উদ্দীপ্যস্ব' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এসূত্রে মন্ত্রের বিকল্প প্রতিপাদন করা হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে সমিধ্ না দিয়া, "আপন্না শ্রীর্মাগাৎ" (আমাদের আপদ্ না হউক শ্রী না যাউক।) ইত্যাদি মন্ত্রেও দেওয়া যাইতে পারে। 'উদ্দীপ্যস্ব' ইত্যাদি মন্ত্র ঋক্, 'আপন্না' ইত্যাদি মন্ত্র যজুঃ, এইরূপ দেখা যায়। কোন পুস্তকে "আপন্না শ্রীঃ শ্রীর্মাগাৎ" এইরূপ পাঠও আছে। তাহার অর্থ শ্রী আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন্, অপিচ শ্রী (লক্ষ্মী) না যাউন্।

এতদহর্বিজানীয়াদ্ যদহর্ভার্য্যামাবহেত।৭

যে দিনে (যে নক্ষত্রে) ভার্য্যাকে তাহার পিতৃকুল হইতে আনয়ন করিবে, অর্থাৎ যে নক্ষত্রে পাণি গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা মনে করিয়া রাখিবে, কদাচ বিস্মৃত হইবে না। প্রতি সম্বৎসরই ঐ নক্ষত্রে [illegible] বিশেষ কর্ম্ম করিতে হইবে। [illegible]

ত্রিরাত্রমক্ষারলবণাশিনৌ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ঐ আচারিক কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। কোনও টীকাকার বলেন, অহন্ শব্দের অর্থ "নক্ষত্র" হইতে পারে না, উহার অর্থ দিন। "এতদহঃ" বলিতে পাণিগ্রহণের নক্ষত্র বুঝা অতিশয় অসঙ্গত। 'যদহর্ভার্য্যামাবহতে' বলিতে যে দিন ভার্য্যাকে পিতৃকুল হইতে আনয়ন করা হয় সেই দিন অর্থাৎ বিবাহের দিন বুঝা যায় না, পরন্তু বরের বাটী আনিয়া যে দিন স্থালীপাকাদি কর্ম্ম করা হইল, সে দিনই বুঝিতে হয়। ঐ দিন জানিবে (বিজানীয়াৎ) অর্থাৎ ঐ দিন হইতেই ত্রিরাত্রব্রত পালনআরম্ভ, এটা জানিয়া ত্রতজন্য প্রস্তুত হইবে। এ ব্যাখ্যা মন্দ নয়।

ত্রিরাত্রমুভয়োরধঃ শয্যা ব্রহ্মচর্য্যং ক্ষারলবণবর্জ্জনং চ।৮

সেই হইতে তিন রাত্রি বর বধূ উভয়ে অধঃ (ভূমিতে) শয়ন করিবেন, ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ রতিরঙ্গ পরিহার করিবেন। ক্ষার লবণ বর্জ্জিত ভোজন করিবেন। এখানে সংযম শিক্ষার অবতারণা করা হইয়াছে। ত্রিরাত্র পতিপত্নী একত্র একশয়নে থাকিয়াও মৈথুন ত্যাগ করিবেন, ধৈর্য্য শিক্ষা করিবেন। এই শিক্ষা গৃহস্থের সর্ব্বপ্রথম শিক্ষা। যথেচ্ছ উপগমনে শাস্ত্রের সম্মতি নাই। ... না শিখিলে শেষে যথেচ্ছরূপ উপগমন দ্বারা ক্ষীণবীর্য্য হইতে পারে, এই ... শিক্ষার বন্দোবস্ত। ... অধঃশয়নের উল্লেখ। ... সুসজ্জিত শয্যায় রাখিলে, ... কারণ হইতে পারে, এই জন্যই অধঃশয্যা। ক্ষার লবণ, মধু, মাংস, ইত্যাদি খাদ্যও উত্তেজক, সুতরাং শাস্ত্র ঐ গুলিরও পরিত্যাগ বলিয়াছেন। বৃত্তিকার বলেন, সূত্রস্থ 'চ'কারের দ্বারা মধু, মাংস ইত্যাদি উত্তেজক খাদ্য, গন্ধ, মাল্য, অনুলেপন ও নিষেধ করা হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য পদে ঐ গুলির পরিত্যাগ সহকারে মৈথুন ত্যাগ বুঝিলেও ক্ষতি নাই, ইহা সুদর্শনাচার্য্যের অভিপ্রায়। যেরূপ হউক, সংযম শিক্ষা লক্ষ্য।

তয়োঃশয্যামন্তরেণ দণ্ডোগন্ধলিপ্তো বাসসাসূত্রেণ বা পরিবীতস্তিষ্ঠতি।৯

শয্যায় বর ও বধূর মধ্যস্থানে চন্দনলিপ্ত বস্ত্র বা সূত্র পরিবীত দণ্ড স্থাপিত হইবে। এই দণ্ড ক্ষীরিবৃক্ষ জাত হইবে এরূপ অনেকের মত। হরদত্ত বলেন, পরস্পরের সংস্পর্শ না হয় এই জন্য মধ্যে দণ্ডস্থাপন। স্পর্শশক্তি ও মনোবিকারের কারণ বটে।

তং চতুর্থ্যাপররাত্রে উত্তরাভ্যাং উত্থাপ্য প্রক্ষাল্য নিধায় অগ্নেরূপসমাধানাদ্যাজ্যভাগান্তে হস্বারক্কায়ামুত্তরা অহুতীর্হুত্বা জয়াদি প্রতিপদ্যতে, পরিচেনান্তে কৃত্বাপরেণাগ্নিং প্রাচীমুপবেশ্য তস্যাঃ শিরস্যাজ্যশেষাদ্ ব্যাহৃতীভিরোঙ্কারচতুর্থাভিরানীয় উত্তরাভ্যাং যথালিঙ্গ মিথঃ সমীক্ষ্য উত্তরয়া আজ্যশেষেণ হৃদয়দেশৌ সমজ্য উত্তরাস্তিস্রো জপিত্বা শেষংসমাবেশনে জপেৎ।১০

চতুর্থরাত্রির (চতুর্থ অহোরাত্রির) অপর রাত্রে "উদীর্ষ্বাত" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া,

ঐ শম্যাঙ্ক দণ্ড উঠাইয়া, জলদ্বারা ধৌত করিয়া, স্থাপনকরণান্তর, অগ্নির উপসমাধান হইতে আজ্যভাগহোম পর্য্যন্ত করিয়া, সপ্ত উত্তর (প্রধান) আহুতি প্রদান করিয়া জয়াদিহোম করিবে। পরিবেচনান্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া, অগ্নির পশ্চাৎদিকে পূর্ব্বাভিমুখী বধূকে উপবেশন করাইয়া, হোমাবশিষ্ট ঘৃত হইতে দর্ব্বীদ্বারা গ্রহণ করিয়া, ব্যাহৃতী দ্বারা বধূর মস্তকে আনয়ন করিবে। (ওঁকার যে ব্যাহৃতীর চতুর্থ সেই তিন 'ভূ' 'ভুব' 'স্ব' ব্যাহৃতী দ্বারা স্বাহান্ত ভাবে অর্থাৎ ভূ স্বাহা ইত্যাদিরূপে আনয়ন কর্ত্তব্য।) পরে "অপশ্যং ত্বা" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় দ্বারা বর ও বধূ পরস্পরকে দেখিয়া ('যথালিঙ্গ' বলায়, পূর্ব্বমন্ত্র দ্বারা বধূ এবং পরমন্ত্র দ্বারা বর দেখিবে এইরূপ বুঝা যায়।) 'সমঞ্জন্তু' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ঘৃতশেষ দ্বারা বধূ ও বরের হৃদয়দেশ মার্জ্জন করণানন্তর, "প্রজাপতে" ইত্যাদি মন্ত্রত্রয় জপ করিয়া, অনুবাকশেষ সমাবেশন কালে জপ করিবে। সমাবেশন অর্থ সঙ্গমার্থশয়ন। এই সমাবেশন ব্যতীত অন্য সমাবেশনে মন্ত্র পাঠ অনাবশ্যক। এই অপররাত্রে সহবাস শাস্ত্রবিহিত।

অন্যো বৈনাবন্তি মন্ত্রয়েত ১১

দম্পতী নিজে ঐ অনুবাক শেষ মন্ত্র পাঠ না করিলে, কোনও ব্রাহ্মণ সমাগমশীল দম্পতীকে ঐ অনুবাক শেষ-দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবেন। পক্ষান্তর প্রতিপাদনার্থ 'বা' শব্দ ব্যবহৃত।

যদা মলবদ্বাসাঃ স্যাদথৈনাং ব্রাহ্মণপ্রতিষিদ্ধানি কর্ম্মানি সংশাস্তি যাং মলবদ্বাসসমিত্যেতানি।১২

অনন্তর যে সময় বধূ মলবদ্বাসা হইবে, তখন পতি ঐ রমণীকে বৈদিক ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ-প্রতিপাদিত নিষিদ্ধকর্ম্ম বিষয়ে সাধারণ ভাষায় শিক্ষা দিবেন। মলবদ্বাসা বলিতে রজস্বলা বুঝায়। কালনির্গত রজঃ সংযোগে যাহার পরিধেয় বসন মলিন হইয়াছে সে 'মলবদ্বাসা'। প্রথম ঋতুমতী ভার্য্যাকে পতি ব্রাহ্মণোক্ত উপদেশগুলি শিক্ষা দিবেন বলা হইল, সেই উপদেশগুলি যথা—স্নানের পূর্ব্বে রতিক্রিয়া করিবে না। স্নানের পূর্ব্বে অরণ্যে মৈথুন কার্য্য নিষিদ্ধ। স্নাতা রমণীও অনিচ্ছায় বা পরাঙ্মুখ ভাবে কামক্রীড়া করিবে না। তিন রাত্রি অতীত না হইলে, স্নান, তৈলমাখা, মাথাআঁচড়ান, চক্ষুতে কজ্জল দেওয়া, দন্তধাবন করা, নখকাটা, কার্পাসসূত্র প্রস্তুত করা (টেঁকো বা চরখায় সুতাকাটা) ও রজ্জু প্রস্তুত করা অকর্ত্তব্য। এই একাদশ নিষেধ ঋতুমতীর সর্ব্বদা পালনীয়। হরদত্ত বলেন, "যদেতিবচনং বিবাহাদূর্দ্ধং প্রাপ্ত্যর্থং অন্যথা বিবাহমধ্যে এব স্যাৎ।" বিবাহের পূর্ব্বে রজস্বলা হইলে বিবাহ-মধ্যে তৎকৃত্য (দ্বিতীয় বিবাহ) করা উচিত। ইহাতে তাৎকালিক সমাজে রজস্বলার বিবাহ বিরল ছিল না অনুমান হয়।

রজসঃ প্রাদুর্ভাবাৎস্নাতায়ৃতুসংবেশন উত্তরয়া ভি মন্ত্রয়েত ১৩

ঋতুস্নাতা পত্নীকে ঋতু বিহিত সংবেশনকালে (চতুর্থ রাত্রিতে) "বিষ্ণু র্যোনিং কল্পয়তু"

ত্রয়োদশ মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে। ক্যালোপগমন বিধানে যাহা অতঃপর মহর্ষি বলিতেছেন, তাহা বারান্তরে আলোচ্য।

অষ্টম খণ্ড সমাপ্ত।

(ক্রমশঃ)

তীর্থপদাশ্রিতস্য কস্যচিৎ
ব্রহ্মচারিণঃ—
যশোহর।

শঙ্করগীতা।

হিন্দুরশাস্ত্র অনন্ত—মুনি ঋষিও অনন্ত, এই জন্য এক ব্যক্তির জীবনে কখন হিন্দু-শাস্ত্র অধীত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন—তাহার শিক্ষা হিন্দুর বেদবেদান্তে গিয়া সমাপ্তিতে দাঁড়ায়—পুরাণ হইতে আরম্ভ করিয়া উপ-নিষদ্, গীতায় জ্ঞানের পূর্ণ পরিণতি—কিন্তু এই পরিণতির একটা সামঞ্জস্য অন্যান্য শাস্ত্রে জ্ঞান না জন্মিলে সম্ভবেনা—তন্ত্র শাস্ত্র এবং অন্যবিধ প্রচলিত সংহিতা হইতে আরম্ভ করিয়া ষড় দর্শন, মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্রে ধর্ম্ম জাতীয় জ্ঞান নিহিত আছে।

আর যাহারা বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া পরের নিকট পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইতে অভিলাষী তাঁহারা—পল্লবগ্রাহী মাত্র। তাহাদের পক্ষে উপরোক্ত শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র গ্রন্থ-গুলির সারাংশের বিকৃত অথবা চর্ব্বিত অন্যান্য শাস্ত্রও অধ্যয়নের অন্তর্ভূত। ধর্ম্ম-জ্ঞানের মূলভিত্তি এক—এবং উপরোক্ত শাস্ত্রগুলিতেই তাহা সংবদ্ধ। অথচ হিন্দু-জাতির নিকট যাহারা আবহমানকাল পূজ্য শাস্ত্র সংজ্ঞা পাইয়া আসিতেছে—তাহা আমরা অমান্য বা অবহেলা করিয়া অশাস্ত্র জ্ঞানে উড়াইয়া দিতে পারিনা। চর্ব্বিত চর্ব্বণই হউক, অথবা বিকৃতাংশই হউক, উহাও শাস্ত্র, উহাও হিন্দুর পাঠ্য, উহার কার্য্যও হিন্দুর অনুষ্ঠেয়। এই জন্য অদ্য আমরা পরম পূজ্য সর্ব্ব জাতির আদরণীয়, মানব-জীবনের একমাত্র ধর্ম্ম জ্ঞানের শেষ শিক্ষাস্থল "শ্রীশ্রীমদভগবদগীতায়" মথিত, সংগৃহীত, উদ্গীরিত এই "শঙ্করগীতার" আশ্রয়ে জীবনকে ধর্ম্ম জ্ঞানের পূর্ণ পরিণতিতে লইবার জন্য উপস্থিত হইলাম। ভরসা শ্রীভগবান।

সাধারণের নিকট শ্রীশঙ্কর গীতার বহুল প্রচলন নাই। এই জন্য অগ্রেই আমরা শঙ্করগীতার একটি আনুষ্ঠানিক ইতিবৃত্ত অথবা পূর্ব্বাভাষ প্রকাশ করিতেছি। শিক্ষিত পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, এই প্রসঙ্গে শ্রীশঙ্করগীতার লেখক বা প্রচারক একটি "আষাঢ়ে গল্পের" অবতরণা করিয়া সর্ব্বজন আদৃত, সর্ব্বজন বন্দিত শ্রীমদ্ভগবদগীতার সারসঙ্কলন কেমন সুন্দর ভাবে করিয়া গিয়াছেন। এই ইতিবৃত্ত বা পূর্ব্বভাষ হিন্দুর শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতগণের হস্তকণ্ডূয়ণ পীড়ার একটি উপসর্গ বিশেষ। যে মহাপণ্ডিত বা মহামুনি এই শিবগীতার প্রণেতা বা প্রচারক তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান অসীম—ধর্ম্ম জ্ঞান একৈব অদ্বৈত ব্রহ্মে সংবদ্ধ। সমস্তরূপ শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র জ্ঞান পথের মধ্যে আনিয়া এই শঙ্করগীতার অবতারণা করা হইয়াছে। ইহাতে উপনিষদ্, গীতা সম্পূর্ণরূপ কথি

অতঃপর আমরা শঙ্করগীতার ইতিবৃত্ত বলিব। আমি যশোহর জেলার এক অংশে একটি দেশ বিখ্যাত ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি—ব্যক্তিগত শাস্ত্র অধ্যয়ন শক্তি লঘু নইলেও বংশগত শক্তির অতি আধিক্য আছে। আমাদিগের গৃহে অনেক হস্তলিখিত শাস্ত্র গ্রন্থ আছে—এই শঙ্করগীতা তাহার মধ্যে অন্যতর। হস্তলিখিত পুঁথি হইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিব—উহা হিন্দু-পত্রিকার পাঠকগণ দেখিয়া যদি অন্যরূপ "পাঠ" মনে করেন, তবে তাহা আমাদের জানাইলে আপ্যায়িত হইব। ভুল ভ্রান্তি সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় দেখাইয়া দিবেন—সে ভরসাও আছে।

এক সময় দাশরথি রাম সীতাবিরহশোকে অতি মাত্র কাতর হইয়া মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট কৈবল্য প্রদ বিশুদ্ধ শিব (ব্রহ্ম) ভক্তির যে মহামূল্য উপদেশ পাইয়াছিলেন—উহাকেই সাধারণতঃ "শঙ্করগীতা" কহে। এই শঙ্করগীতা ঋষিশ্রেষ্ঠ সূত, নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণের নিকট মহামুনি শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া আসিয়া কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরাশর তনয় ইহা আবার দেবসেনাপতিকার্ত্তিকেয় কর্তৃক উপদিষ্ট ব্রহ্মনিষ্ঠ সনৎকুমারের নিকট শ্রবণ করেন যথা—

পুরা সৎকুমারায় স্কন্দেনাভিহিতা হিমা—
সনৎকুমারঃ প্রোবাচব্যাসায় মুনি সত্তমাঃ!
মহং কৃপাতিরেকেণ প্রদদৌ বাদরায়ণঃ।

কিন্তু আবার আরেকস্থানে উল্লেখ আছে যে দণ্ডকারণ্যবাসী শ্রীরামচন্দ্রের নিকট স্বয়ং রুদ্রেশ্বর শিবই ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন যথা—

রামায় দণ্ডকারণ্যে পার্ব্বতীপতিনা পুরা
যা প্রোক্তা শিবগীতাখ্যা গুহ্যাৎ গুহ্যতমা-
হিমা।

এই ভাবে শঙ্করগীতার আরম্ভ হইয়া কীর্ত্তন পর্য্যন্ত আরেকটি কথার অবতারণা করা হইয়াছে। সূত যখন নৈমিষারণ্যবাসী ব্রাহ্মণগণের নিকট শঙ্করগীতা কীর্ত্তন করেন, তখন তিনি বলিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! মহামুনি ব্যাস দেব আমাকে এই মুক্তি প্রদ শঙ্করগীতা শিক্ষা দিয়া আবার অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করেন। যেহেতু এই কৈবল্যপ্রদ শঙ্করগীতা মানব জ্ঞানের গোচরী ভূত হইলে দেবগণের কল্যাণপ্রদ ক্রিয়া হয় না বলিয়া, তাঁহারা নাকি মানবগণের উপর ক্রোধ করিয়া মানবের অহিত করিয়া থাকেন। অর্থাৎ শঙ্করগীতা মানবগণ পরিজ্ঞাত হইলে সহজে ব্রহ্ম প্রাপ্তির মূল-কৈবল্য লাভ করেন, সুতরাং আর তাহারা ভক্ষ্য, ভোজ্য, পেয় প্রভৃতি বস্তু দ্বারা ঘৃত মধু সহযোগে দেবকল্যাণপ্রদ যজ্ঞ করেন না—দেবগণ অনাহারে, অপানে, গার্হস্থ্যাশ্রমবাসী অগ্নিহোত্রী সদাচার ব্রাহ্মণগণের প্রদত্ত ক্রিয়া অভাবে, কষ্ট ভোগ করেন—তাই তত্ত্বজ্ঞানী নরের উপর ক্রোধিত হন। ক্ষীরবতী গাভী অপহৃতা হইলে গৃহস্থের যেরূপ দুঃখ হয়, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণ ও দেব দুঃখের মহাকারণ। এইরূপ একটি অলৌকিক ঘটনার ইতিবৃত্ত পদ্মপুরাণের ন্যায় প্রসিদ্ধ পুরাণে ব্রহ্মকল্প বাদরায়ণ কর্তৃক গ্রথিত হইবে, ইহা সহজে নিষ্ঠাবান্ শিক্ষিত হিন্দু বিশ্বাস করিতে পারেন বলিয়া বিশ্বাস হয়না। এই জন্যই বলি যে, যে সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রে

ব্রাহ্মণগণের একদেশদর্শীচক্ষুমাত্র সংবদ্ধ ছিল—তখন অনেক শ্লোক প্রণয়নকারী ব্রাহ্মণ মস্তিষ্ককণ্ডূয়ণ পীড়ার লক্ষণ স্বরূপ কতগুলি শ্লোক পুরাণাদিতে সংবদ্ধ করিয়াছিলেন যথা—

অপপৃষ্টো ময়া বিপ্রাঃ! ভগবান্ নারায়ণঃ।
ভগবন্ দেবতাঃ সর্ব্বাঃ কিং ক্ষুভ্যন্তি শপস্থিচ॥
তাসামপ্রাপ্তি কাহানির্গয়া কুপাস্থি দেবতাঃ।
পারাশর্য্যো হপ মানাহ সং পৃষ্টং শৃণু বৎস তৎ
ত এব সর্ব্ব ফলদাঃ সুরাণাং কামধেনবঃ
ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ পেয়ঞ্চ যদ্ যদিষ্টং সুপর্ব্বণাং।
অগ্নৌহুতেন হবিষা তৎসর্ব্বং লভতে দিবি।
নাস্ত্যদস্তি সুরেশানামিষ্টসিদ্ধিপ্রদং দিবি।
দোগ্ধ্রী ধেনুর্যথানীতা দুঃখদাগৃহমেধিনাং।
তথৈব জ্ঞাতবান বিপ্রো দেবানাং দুঃখদো-
ভবেৎ॥

মহামুনি সূত ঋষিগণকে এইরূপ কহিলে পরে তাঁহারা কহিলেন, ঋষিপুঙ্গব, তবে আমরা পরম পূজ্য শঙ্করগীতা কি শুনিতে পাইব না? তখন সূত কহিলেন—না, ব্রাহ্মণগণ! ভয় নাই, মুক্তিপ্রদশঙ্করগীতা মহামতি পরাশরতনয় মানবগণের কল্যাণের জন্য আবার আমাকে ব্যাখ্যা করিবার উপায় শিক্ষা দিয়াছেন। যদি মানব—"জ্ঞান শক্তি-সর্ব্বক্রিয়াঃ শিবায় তুভ্যংনমঃ" বলিয়া সংসারে পরিচালিত হয়, অর্থাৎ কোটি জন্মের কৃত পুণ্য বলে মানবহৃদয়ে শিবভক্তি যদি সঞ্জাত হইয়া "সমস্তই শঙ্করকে অর্পণ করিলাম" এই জ্ঞান উৎপত্তি হয়, তবে দেবদেব শূলপাণি সন্তুষ্ট হইয়া মানবের মঙ্গল সাধন করেন—দেবগণ সেই স্থানে কোন ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারেন না। হে তাপসগণ! এই জন্যই জগতের লোকের মঙ্গলজনক শঙ্করগীতা আমি কীর্ত্তন করিব। আপনারা ইষ্টপূর্ত্তাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান সময়ে সমস্তই শঙ্করকে অর্পণ করিয়া এই পরম কল্যাণপ্রদ-ভবতাপনাশক সংসার ব্যাধির মহৌষধ শঙ্করগীতা শ্রবণ করুন যথা—

সূত উবাচ

কোটিজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈ শিবভক্তিঃ
প্রজায়তে।
ইষ্ট পূর্ত্তাদিকর্ম্মাণি তেনাচরন্তি মানবাঃ।
শিবার্পণধিয়া কামান্ পরিত্যজ্য যথাবিধি।
অনুগ্রহাত্তেন শম্ভোর্জায়তে সুদৃঢ়ো নরঃ।
ততোভীতাঃ পলায়ন্তে বিঘ্নং হিত্বা সুরেশ্বরাঃ।

এইরূপ দীর্ঘ ভূমিকা করিয়া ঋষিপ্রবর সূত অতঃপর শঙ্করগীতার ফলশ্রুতি ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া নৈমিষকাননে তাপসগণের মনের সন্দেহ তিরোহিত করিলেন, কিন্তু মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে সূত মুখ হইতে ভক্তির একটানা স্রোত যেন কিছু প্রতিকূলাঘাতে প্রতিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সূত বলিলেন যথা—

ততোন জায়তে ভক্তিঃ শিবে কস্যাপি দেহিনঃ
তস্মাদ বিঘ্নবাং নৈব জায়তে শূলপাণিঃ।
যথা কথঞ্চিজ্জাতাপি মধ্যে বিচ্ছিদ্যতে নৃণাং
জাতং বাপি শিবজ্ঞানং ন বিশ্বাসং ভজত্যলং।

তাহার পর যেরূপ মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলেন, তাহা যে পুরাণকার ঋষিশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন রচিত ইহা যেন বিশ্বাস করিতে স্বাভাবিক বিবেকশক্তি কেমন থতমত খাইয়া যায়। কারণ যে তাপসগণ পরম পূজ্য বেদাদি শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিয়া, দিবায় সন্ধ্যায় বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্ম

প্রাপ্তির সুগমপথ ব্রহ্মচর্য্যাব্রত অবলম্বন করিয়া, জীবনের উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন; সেই সকল জ্ঞানী ব্রাহ্মণগণের নিকট আপাতমুগ্ধকর সরল সহজ ভাবের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া শিবত্ব-লাভের আসক্তি জন্মান যেন একরূপ "ছেলেভুলান" ক্রিয়া। মাহাত্ম্য বর্ণনে উক্ত হইয়াছে যে—

"জায়তে তেন শুশ্রূষা চরিতে চন্দ্রমৌলিনঃ
শৃণ্বতো জায়তে জ্ঞানং জ্ঞানাদেব বিমুচ্যতে।
বহুনাত্র কিমুক্তেন যস্য ভক্তিঃ শিবে দৃঢ়া
মহাপাপোহপিপাপৌঘ কোটি গ্রস্তোহপি মুচ্যতে
অনাদরেণ শাঠ্যেন পরিহাসেন মায়য়া
শিবভক্তিরতশ্চেৎ স্যাদন্ত্যজোপিচপি
বিমুচ্যতে।
এবং ভক্তিশ্চ সর্ব্বেষাং সর্ব্বদা সর্ব্বতোমুখী
তস্যাং তু বিদ্যমানায়াং যস্তু মর্ত্ত্যো বিমুচ্যতে।
সংসার বন্ধনাত্তস্মাদন্যঃ কো বাস্তি মূঢ়ধীঃ।
নিয়মাদ্ যস্তু কুর্ব্বীত ভক্তিং বা দ্রোহমেব বা॥
তস্যাপি চেৎ প্রসন্নোহসৌ ফলং যচ্ছতি
বাঞ্ছিতং
পত্রং কিঞ্চিৎ সমাদায় ক্ষুল্লকং জল মেববা।
যোদদ্যান্নিয়মেনাসৌ তস্মৈ দদ্যাজ্জগত্রয়ং
তত্রাপ্যশক্তো নিয়মান্নমস্কারং প্রদক্ষিণং।
যঃ করোতি মহেশস্য তস্মৈ তুষ্টো ভবেদ্ধ্রুবং
প্রদক্ষিণেষ্বশক্তোঽপি যঃ স্বান্তে চিন্তয়েচ্ছিবং
গচ্ছন্ সমুপবিষ্টো বা তস্যাভীষ্টং প্রযচ্ছতি।
চন্দনং বিল্বকাষ্ঠস্য—পত্রং পুষ্পং বনোদ্ভবং
ফলানি বনজাতানি যস্য প্রীতিকরাণি বৈ।
দুষ্করং তস্য সেবায়াং কিমস্তি ভুবনত্রয়ে।
ইত্যাদি।

ইহার পর শিবারাধনার স্থান, দ্রব্য, পূর্ণ্য ক্ষমাভবাদ, প্রভৃতির উল্লেখ সহ কথঞ্চিৎ আশাপ্রদ আশ্বাসের আভাষ দিয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বী তাপসগণকে উৎসাহিত করা হইয়াছে। যথা—

* * * যস্যাস্তি দুরিতং কোটিজন্মসু
সঞ্চিতং
তস্য প্রকাশতে নায়মর্থো মোহান্ধচেতসঃ
ন কালনিয়মোযত্র ন দেশস্য স্থলস্যচ
যত্রাস্য রমতে চিত্তং তস্য ধ্যানেন কেবলং
ইত্যাদি।

সূত মুখ পদ্ম হইতে এইরূপে শঙ্করগীতার পূর্ব্বাভাষ আরম্ভ হইয়া "শিবজ্ঞান" লাভের উপায় শিক্ষার জন্য ব্রাহ্মণগণকে "বিরজা" দীক্ষা অবলম্বন করা এবং রুদ্রাক্ষ ধারণরূপ শৈব ভক্তিতে উপদিষ্ট করা হইয়াছে। যথা

ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষানাং পারং যাস্যথ যেন বৈ
মুনয়স্তং প্রবক্ষ্যামি ব্রতং পাশুপতাভিধং
কৃত্বা তু বিরজা দীক্ষাং ভূতিরুদ্রাক্ষধারিণঃ
জপন্তো বেদসারাখ্যং শিবনাম সহস্রকং
সন্ত্যজ্য তেন মর্ত্ত্যত্বং শৈবীং তনু মবাপ্স্যথ।
ততঃ প্রসন্নো ভগবাঞ্ছঙ্করো লোক শঙ্করঃ।
ভবতাং দৃশ্যতামেত্য কৈবল্যং বঃ প্রদাস্যতি।
ইত্যাদি।

ইহার পর প্রকৃত কথা আরম্ভ হইল। তাপসগণ একমনে হৃষ্টচিত্তে সূতমুখে শঙ্করগীতা শুনিতে লাগিলেন।

এখন কথা হইতেছে যে, এই শঙ্করগীতা প্রকৃতই পদ্মপুরাণের প্রণেতা মহামুনি শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন কর্ত্তৃক রচিত, কি উহাতে "প্রক্ষিপ্ত"; এই মহাতত্ত্বের পূর্ণ মীমাংসা সহজে হইবার কথা নহে। কেন না পুরাণ গুলিতে প্রায়ই অনেক হাতগড়া শ্লোক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। মূল পদ্মপুরাণ

এখন সহজে মিলে না। যখন দেশে মুদ্রাযন্ত্র প্রচলিত ছিল না, তখন যাহার নিকট যে শাস্ত্র গ্রন্থখানি থাকিত, সে ব্যক্তি লেখক কি কবি হইলে প্রায়ই তাহাতে নিজের রুচি অনুযায়ী শ্লোক প্রস্তুত করিয়া সংযোগ করিত। এই কারণে কোনটি মূল, কোনটি প্রক্ষিপ্ত ইহা নির্ণয় করিতে প্রধান প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র এবং শ্লোকের বাক্যবিন্যাস-প্রক্রিয়া দ্বারা তাহা স্থির করিতে হয়।

আমাদের স্থির বিশ্বাস যে, এই শঙ্করগীতা রামগীতা প্রভৃতি গীতাগুলি প্রক্ষিপ্ত। তবে তাহা স্থির ধারণা কি না ইহা শাস্ত্রজ্ঞানী পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন—কিন্তু মূলই হউক, শঙ্করগীতা যে ধর্ম্মপিপাসীগণের তৃষ্ণা নিবারণের একটি সুশীতল বারিধারা তাহার দ্বিতীয় সন্দেহ নাই। এইজন্য আমরা উহা অনুবাদসহ সাধারণের নিকট উপস্থিত করিব—শ্রীভগবান শঙ্করই আমাদের ভরসাস্থল।

শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য
মাগুরা।

ওঁ তৎসৎ
সামবেদীয়া

কেনোপনিষৎ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(মূলম্)

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

যদি মন্যসে সুবেদেতি
দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ
ব্রহ্মণোরূপং।
যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথনু
মীমাংস্যমেব তেমন্যে বিদিতম্ ॥
॥১॥

নাহং মন্যে সুবেদেতি
নোন বেদেতি বেদচ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ
নো ন বেদেতি বেদ চ ॥২॥

যস্যামতং তস্য মতং
মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং
বিজ্ঞাত মবিজানতাম্ ॥৩॥

প্রতিবোধ বিদিতং মত-
মমৃতত্বং হি বিন্দতে
আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং
বিদ্যয়া বিন্দতে হমৃতং ॥৪॥

ইহ চেদবেদীদথ সত্য মস্তি
ন চে দিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ
ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥৫॥

(অনুবাদ)

দ্বিতীয় খণ্ড

যদি মনে কর "ব্রহ্মে জেনেছি সম্যক্"
তা'হ'লে নিশ্চয় অল্প সে ব্রহ্মস্বরূপ
জানিয়াছ তুমি, যদি দেবগণ মাঝে
সে ব্রহ্ম স্বরূপ বলি জান কাহাকেও
তা'হ'লেও অল্প তুমি বুঝেছ ব্রহ্মের ;
বিদিত হলেও ব্রহ্ম বিচার্য্য তোমার ॥১॥

"সম্যক্ জেনেছি ব্রহ্ম" ভাবিনা এমন
ভাবিনা "জেনেছি তাঁরে ;" ভাবিনা "জানিনা"
জানেন তিনিই তাঁরে,—জানেন যে জন
"জানিনা—" "জেনেছি তাঁরে"—অর্থ
এ বাক্যের ॥২॥

"জানিনা"—ভাবেন যিনি, জানেন সেজন,
জানেন—ভাবেন যিনি না জানেন তিনি ;
অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাতার জ্ঞাত অজ্ঞাতার
(হয়েন সে ব্রহ্ম যিনি সর্ব্ব মূলাধার) ॥৩॥
যখন হয়েন ব্রহ্ম, প্রতিবোধজ্ঞাত
সম্যক্ দর্শন তাঁর হয় সে সময় ;
তাহে অমৃতত্ব লাভ হয় পুনরায়।
আত্মাতেই বীর্য্য লাভ অমৃত বিদ্যায় ॥৪
ইহলোকে ব্রহ্মে যদি পারে জানিবারে
তবেই সকল জন্ম ; না জানিলে এরে
মহান্ বিনাশ ঘটে ; তাই ধীরগণ
সে পরমাত্মারে চিন্তা করি সর্ব্ব ভূতে।
হয়েন অমর যেয়ে ইহলোক হ'তে ৫

(মূলম্)

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে,
তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে
দেবা অমহীয়ন্ত।
ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং বিজয়ো
ঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি ॥১॥
তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যো হ
প্রাদুর্ব্বভূব। তন্ন ব্যজানত কিমিদং
যক্ষমিতি ॥২
তেঽগ্নিমব্রুবন্ জাতবেদ!
এতদ্বিজানীহি কিমেতদ্ যক্ষমিতি।
তথেতি ॥৩
তদভ্যদ্রবৎ তমভ্যবদৎ কোঽসীতি।
অগ্নির্ব্বা অহমস্মীত্যব্রবীজ্জাতবেদা
বা অহমস্মীতি ॥৪
তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি।
অপীদং সর্ব্বং দহেয়ং
যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥৫
তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি।
তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তন্ন
শশাক দগ্ধুং, স তত এব
নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং
যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥৬
অথ বায়ুমব্রুবন্ বায়বেতদ্বিজা-
নীহি কিমেতদ্ যক্ষমিতি
তথেতি ॥৭
তদভ্যদ্রবৎ কোঽসীতি।
বায়ুর্ব্বা অহমস্মীত্যব্রবীন্মাতরিশ্বা
বা অহমস্মীতি ॥৮
তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি।
অপীদং সর্ব্বমাদদীয়ং যদিদং
পৃথিব্যামিতি ॥৯
তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি
তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তন্ন শশাকাদাতুং।
স তত এব নিববৃতে নৈতদশকং
বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥১০
অথেন্দ্রমব্রুবন মঘবন্নেতদ্
বিজানীহি কিমেতদ্ যক্ষমিতি।
তথেতি তদভ্যদ্রবৎ তস্মাত্তিরোদধে ॥১১
স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম
বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীং
তাং হোবাচ কিমেতদ্ যক্ষমিতি ॥১২

(অনুবাদ)

তৃতীয় খণ্ড

ব্রহ্মই করেন জয় দেবতার তরে,
ব্রহ্মের বিজয়ে দেবগণের মহিমা—
কিন্তু ভাবিলেন তাঁরা, এই যে বিজয়—
আমাদেরই ; মহিমাও আমাদেরি হয় ॥১

জানিলেন ব্রহ্ম তাহা ; তাঁদের সম্মুখে
হইলেন প্রকাশিত ; "এই যক্ষ কেবা"
নাহি জানিলেন কিন্তু তাহা দেবগণ ॥২
অগ্নিরে কহেন তাঁরা "ওহে জাতবেদ
বিশেষিয়া জান তুমি এই যক্ষ কেবা"
"তথাস্তু" বলিয়া অগ্নি করিলা গমন ॥৩
গেলা অগ্নি যক্ষ কাছে ; জিজ্ঞাসেন তিনি
—"কে তুমি ?" কহিলা অগ্নি "অগ্নি
জাতবেদা" ॥৪
"এমন যে তুমি—কহ কিবীর্য্য তোমাতে ?"
"পৃথিবীর যাহা কিছু পারিপোড়াইতে।"॥৫
"দগ্ধ কর ইহা" বলি তৃণ এক গাছি—
অগ্নিরে দিলেন ব্রহ্ম ; অগ্নি সে তৃণের
কাছে গিয়ে সর্ব্ববলে না পারি পোড়া'তে
হইলেন প্রত্যাবৃত্ত তার কাছ হ'তে ॥৬
বায়ুরে কহেন তাঁরা "জান ওহে বায়ো,
বিশেষরূপেতে, কে বা এই যক্ষ হ'ন।"
"তথাস্তু" বলিয়া বায়ু করিলা গমন ॥৭
গেলা বায়ু যক্ষ কাছে ; জিজ্ঞাসেনতিনি
"কে তুমি ?" কহিলাবায়ু—"বায়ু-
মাতরিশ্বা" ॥৮
এমন যে তুমি কহ—কি বীর্য্য তোমাতে ?"
"পৃথিবীর যাহা কিছু পারি উড়াইতে ॥৯"
"লও তবে ইহা"—বলি তৃণ একগাছি
বায়ুরে দিলেন ব্রহ্ম ; বায়ু সে তৃণের
কাছে গিয়ে সর্ব্ববলে না পারি নড়াতে,
হইলেন প্রত্যাবৃত্ত তাঁর কাছ হ'তে।
ফিরে এসে বায়ু, দেবগণ কাছে ক'ন
না পারি জানিতে কেবা এই যক্ষ হ'ন ॥১০
ইন্দ্রেরে কহেন তাঁরা "ওহে মঘবন্,
বিশেষিয়া জান কেবা এই যক্ষ হ'ন।"
"তথাস্তু" বলিয়া ইন্দ্র করিল গমন ;
ব্রহ্ম সমীপস্থ ইন্দ্র হয়েন যখন।
ব্রহ্মেরও তিরোধান অমনি তখন ॥১১
সেই আকাশেই দেখি বহুশোভমানা
উমা হৈমবতী স্ত্রীবে, তাহার সমীপে
যান ইন্দ্র ; জিজ্ঞাসেন "এই যক্ষ কেবা ?"
॥১২

(মূলম্)
চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

ব্রহ্মতি হোবাচ ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে
মহীয়ধ্বমিতি ততো হৈব বিদাঞ্চকার
ব্রহ্মেতি ॥১
তস্মাদ্বা এতে দেবা অতিতবামিবান্যান্
দেবান্ যদগ্নির্ব্বায়ু রিন্দ্রস্তেহেন
ন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শুস্তে হোনৎ প্রথমো
বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥২
তস্মাদ্বা ইন্দ্রো হতিতরামিবান্যান্ দেবান্
স হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পার্শ, সহ্যেনৎ
প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥৩
তস্যৈষ আদেশো যদেতদ্বিদ্যুতো
ব্যদ্যুতদা ইতীতি ন্যমীমিষদা
ইত্যাধিদৈবতম্। ৪
অথাধ্যাত্মং যদেতদ্গচ্ছতীব চ
মনোহনেন চৈতদুপস্মরত্যভীক্ষ্ণং
সংকল্পঃ ॥৫
তদ্ধ তদ্বনং নাম তদ্বন মিত্যুপাসিতব্যং
স য এত দেবং বেদাভিহেনং
সর্ব্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি ॥৬
উপনিষদং ভো ব্রূহীত্যুক্তা ত
উপনিষদ্ ব্রাহ্মীং বাবত উপনিষদ-
মব্রূমেতি ॥৭
তস্যৈ তপো দমঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা
বেদাঃ সর্ব্বাঙ্গানি সত্য মায়তনম্ ॥

যো বা এতামেবং বেদাপহত্য
পাপ্মান মনন্তে স্বর্গে লোকে
জ্যেয়ে প্রতি তিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি ॥৯
ইতি কেনোপনিষৎ সমাপ্তা।

(অনুবাদ)

চতুর্থ খণ্ড

উমা ক'ন "ব্রহ্ম ইনি ; ব্রহ্মের বিজয়ে
এরূপ মহিমান্বিত হয়েছে তোমরা ;"
তা'হ'তে জানেন ইন্দ্র "ব্রহ্ম হ'ন ইনি।"১
অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র এই সকল দেবতা
ব্রহ্ম সমীপস্থ হ'ন ; তাঁরাই প্রথমে
"ব্রহ্ম ইনি" এইরূপ, হ'ন অবগত—
অতএব এঁরা শ্রেষ্ঠ অন্য দেব হ'তে ॥২
যেহেতু হয়েন ইন্দ্র সকলের আগে
ব্রহ্ম সমীপস্থ ; পুনঃ জানেন তাঁহারে
তাই ইন্দ্র সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ দেবতা মাঝারে ॥৩
বিদ্যুৎ প্রকাশবৎ সে ব্রহ্ম প্রকাশ ;
দেবতা সমীপে সেই ব্রহ্মের প্রকাশ
চক্ষুর নিমেষবৎ (দ্রুত অতিশয়) ॥৪
অনন্তর উপদেশ আত্মবিষয়ক—
এই মনঃ যায় যেন তাঁহার নিকটে
স্মরণ তাঁহারে যেন করে বারবার ॥৫
সেই ব্রহ্ম সকলেরি হ'ন ভজনীয়,
তিনিই উপাসিতব্য সর্ব্বপূজ্যরূপে।
এরূপে তাঁহারে যিনি হ'ন অবগত,
সকল পরাণী তাঁরে চায় বিশেষতঃ ॥৬
"বলুন উপনিষদ্ ভগবন্, মোরে"
বলেছিলে তুমি, তাই তোমার নিকটে
ব্রাহ্মী উপনিষদের হইল কথন ॥৭
তপোদম কর্ম্ম বেদ বেদাঙ্গ সকল
প্রতিষ্ঠা ব্রহ্ম বিদ্যার ; সত্যই আশ্রয় ॥৮
যেই জন ব্রহ্মবিদ্যা হ'ন অবগত।
তাঁহা হতে পাপচয় হয় অপগত।
অনন্ত ও শ্রেষ্ঠ স্বর্গে তিনি প্রতিষ্ঠিত।
অনন্ত ও শ্রেষ্ঠ স্বর্গে তিনি প্রতিষ্ঠিত। ৯

শ্রীমনোরঞ্জন সরস্বতী।

আমাদের নাই কি ?

জীবজীবন চিরদিনই পরাপেক্ষী। সংসার-সংগ্রামে অশেষবিধ উপকরণের আবশ্যকতা। দেহরক্ষার জন্য আহার, বিহার, পরিচ্ছদ ইত্যাদি কত কি চাই, আর মনোবল, ইন্দ্রিয়-শক্তি ও বুদ্ধিবল বর্দ্ধিত করিবার জন্য আহারাদি ব্যতীত শিক্ষা, দীক্ষার ও বহুল-প্রয়োজন।

বর্ত্তমানভারতে উন্নতি, অবনতি, সফলতা, বিফলতা, উদাম অনুদামের একটা বিপুল আলোচনা চলিতেছে, স্ব স্ব শক্তি ও প্রবৃত্তি অনুসারে ব্যক্তিগত স্বাধীনমত প্রতি গৃহে বিভিন্ন। কেহ বা স্বীয় রাজনৈতিক শক্তির সদ্ব্যবহার করিতে না পারিয়া আকুল, আর কেহ জ্ঞানগরিমার প্রকৃতপুরস্কার না পাইয়া ব্যাকুল। কাহারও আহারে রুচি নাই, নিদ্রায় শ্রান্তিনাশ ঘটে না, ভ্রমণেও মনের জ্বালা জুড়ায় না, কারণ—"উপযুক্ত অধিকার লাভে বঞ্চিত হইতে হইতেছে।" সর্ব্বত্রই হা হুতাশ! দীর্ঘনিঃশ্বাস—নয়নবারি—বিষাদরোদন বিদ্যমান !! কিন্তু হায় ! কেন কাঁদি ? একবার কি ভাবিয়া দেখিয়াছি কেন কাঁদি ? অতীত সুখস্মৃতির বিমল-আলোকে দুর্ব্বল নয়নে ধাঁধাঁ লাগিয়া যাইতেছে, সুতরাং প্রকৃত অবস্থা লক্ষ্য করিতে

পারিতেছি না। অতীতগৌরব স্মরণ পথে আসিলে, বর্ত্তমান রৌরবকেও সুরপুরী স্বরূপ মনে করিতেছি। এ মোহস্বপ্ন সহজে ভাঙ্গিবে কি না, ভগবান্ জানেন। স্মৃতির কুহকে বর্ত্তমানকর্ত্তব্য বিসর্জ্জন দিয়া, মনে মনে গৌরবের বিজয়পতাকা উড়াইয়া দিতেছি, কিন্তু হায়! ঐ পতাকা শতচ্ছিদ্র, জীর্ণ, কীটদষ্ট, নিষ্প্রভ ও অগৌরবসূচকই হইয়া দাঁড়াইয়াছে! আমাদের মোহান্ধনয়ন দেখিল না, জগৎ উপহাসে ক্রুটী করিল না। অমাদের মানসিক আশা মরুতলে তরুর মত শুকাইয়া গেল। এখন আমাদের আর্ত্তনাদ ব্যতীত আর অবলম্বন কি? বৃথা এ আড়ম্বরে আত্মবিস্মারজনিত ক্ষোভই সার হয়। ভাবিয়া দেখি—আমরা চাই কি? এবং আমাদের নাই কি? যাহা নাই তাহাই চাই, কিন্তু দুরদৃষ্টক্রমে আমরা চাইবার বেলায় ভ্রমে পতিত হই। পীড়াপ্রকোপে ঔষধ নাই, কিন্তু হায়! আমরা ঔষধ চাই না, ঔষধ বড় তিক্ত; রসগোল্লা চাহিয়া ফেলি পাই না, পাইলেও পীড়াবৃদ্ধি ব্যতীত অন্য কিছু লাভ হয় না। পিপাসার শীতলজল নাই, ক্ষুধার অন্ন নাই! আমরা তাহা চাহি না, চাহি এক পিয়ালা 'চা'—আর একটী 'সিগারেটের চুরুট্'। শীতের বস্ত্র নাই, তখন চাহিয়া ফেলি কাঁচের বাসন! অভাবের মূর্ত্তি কাজেই শতসহস্র বাহুবিস্তার করিয়া আমার কাছে আসিতে থাকে, আর আমরা উদরান্নের অসংস্থানে ম্রিয়মান হইয়া কাতরক্রন্দনে গগণতল বিদীর্ণ করি, বলি—'কেহই আমাকে দেখিল না বাঁচাইল না।' ক্ষিপ্তহৃদয়ে জগতের উপর অভিশাপ অর্পণ করি, জগতের সর্ব্বংসহবক্ষে তাহা নীরবে লুকাইয়া যায়। আমরা ভাবি না, বুঝি না, জানি না—"তেহি নো দিবসাঃ গতাঃ।"

সিংহের অধিকার শৃগালের দ্বারা সংরক্ষিত হয় না। ভারতে যে দিন উন্নতির বিজয়-ভেরী কন্দরে কন্দরে ধ্বনিত হইত, সেই দিন পূর্ব্বপিতৃগণ অগ্নি, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি ঐশীশক্তিকে দেবতাজ্ঞানে সসম্মানে পূজা করিয়া গিয়াছেন। আজ সেই সকল দেব-শক্তি যে জাতির করে ক্রীড়াপুত্তলিকা, সেই জাতির উপর আমাদের রক্ষাভার সংরক্ষিত। আমাদের অগ্নি, বায়ু, প্রভৃতি দেবতা, যাহাদের অনুজ্ঞাপালনে আপনাদের কৃতার্থ মনে করিতেছেন, আমরা তাহাদেরই আদেশাধীনে। গর্ব্বিত হইবার কি আমাদের এখন কিছু আছে? ধনহীন—জ্ঞানহীন—ব্যক্তির কি গৌরব শোভা পায়? অভাব-অর্ণবে হাবুডুবু খাইতে খাইতে কি কোটি-পতির প্রতি কটাক্ষ করা চলে? অনেক সময় আমরা মনে করি, "আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষের পদতলে বসিয়া অনেকে ইতিপূর্ব্বে জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াগিয়াছে, আজ তাহাদের পরবর্ত্তিরাই প্রাধান্য লাভ করিতেছে। এটী আমাদের গৌরব জ্ঞাপক!" হা দুরদৃষ্ট! ইহা ও কি গৌরব! যে সন্তান পৈত্রিক-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না, সে ও কি গৌরবান্বিত? যাহার বিন্দুমাত্র সঞ্চয় করিয়া কতলোক কীর্ত্তিমন্দিরে প্রবেশ করিল, সেই জ্ঞান ভাণ্ডারের অযথাব্যবহারে অনুচিত উপেক্ষায়—আমরা আজ সর্ব্বস্বান্ত! ধিক্ এ গৌরব! যথার্থই আমরা "স্মৃতির কুহকে বর্ত্তমান ভুলে" এত বিপন্ন। ব্যাস,

বাল্মীকি, কপিল, পতঞ্জলি, আত্রেয়, কণাদ গৌতমের গরিমা কি আমরা কিছুই বুঝিয়াছি? না পরাশর, আর্য্যভট, ভাস্করাদির পূজায় জীবন সমর্পণ করিতে পারিয়াছি? অমূল্য-জ্ঞান বিজ্ঞান রাশি অযত্নসাগরে বিসর্জ্জন দিয়া আজ আমরা "সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ" দেশাচারকে, মহত্তরশাস্ত্রজ্ঞানের সুফল বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত। আজ যথার্থ শাস্ত্রের—প্রকৃত বেদ, বেদান্ত, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিতের অবমাননা করিতে কুণ্ঠিত নহি। বৈদিকউপাসনা প্রণালীর শত দোষ দেখিতে পাই, আর শাস্ত্রবিরুদ্ধ মোহমূলক লোকাচারের পদে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করি! ইহাপেক্ষা শোচনীয় দশা আর কি? ধর্ম্মবলে ভারত চিরদিন প্রশান্ত, চিরদিন বলীয়ান্; সে ধর্ম্ম এখন কেবল লাঞ্ছিত এমন নহে, বিকৃত বিতাড়িত! এ দুর্দ্দিনে কে বলিয়া দিবে "আমাদের নাই কি?" বিবেকের শরণাগত হইলে উত্তর পাওয়া যাইবে "নাই কর্ত্তব্যজ্ঞান।" আছে—অভিমান। নাই বল, আছে—বলবান্ বলিয়া অভিমান। নাই জ্ঞান আছে জ্ঞান বলিয়া অভিমান। নাই গৌরব—মোহমূলক গৌরবাভিমান। নাই ধর্ম্ম, আছে—উপধর্ম্মের মনোরমপরিচ্ছদে আবৃত পূতিগন্ধময় ব্যভিচার বা দেশাচার। পাঠক মহোদয়গণ! বঙ্গে "দেশাচার" বলিতে কি বুঝায়, একবার ভাবিয়া দেখিবেন কি?

শ্রী————ভারতী।
যশোহর।

হিন্দু রাজা সীতারাম রায়।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

টেঁয়ার ঠাকুর বংশই সীতারামের গুরুবংশ। সীতারামের অগ্রজ লক্ষ্মীনারায়ণের বংশে হরিহরনগরের দেবনাথ রায় নামক যে ব্যক্তি আছেন, তিনিও উক্ত ঠাকুর মহাশয়দের শিষ্য। উক্ত ঠাকুর মহাশয়দের বাটীতে সীতারামের কুল-বিবরণও রাজত্ব সংক্রান্ত অনেক বিষয়ে লিখিত আছে।

মহম্মদপুর রাজধানীর অন্তর্গত গোকুল নগরের ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের পূর্ব্বপুরুষ সীতারামের পুরোহিত ছিলেন। উক্ত ভট্টাচার্য্যগণই তাঁহার পুরোহিত বংশ।

সীতারামের রাজত্বকালে মুরসিদাবাদে মুরসিদ কুলি খাঁ নবাব ছিলেন। মদীয় প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাবে নবাব জামাতা আবুতোরাব উল্লেখ আছে; তাঁহার নাম আবুতোরাব, সাধারণ লোকে আবুতারাই বলেন, তদনুসারে আবুতারাই লিখিত হইয়াছে। তাঁহার নাম প্রকৃত আবুতোরাব। তিনি নবাবের দৌহিত্রী পতি। সীতারামের আদেশে তাঁহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া তৎসমীপে আনীত হয়। মুসলমান রাজত্বকালে তদানীন্তন ইতিহাস "রিয়াজুস্ সালাতিন্" ইত্যাদি গ্রন্থে সীতারাম সম্বন্ধে কিছু লিখিত আছে, তাহাতে আবুতোরাবের বিষয় বর্ণিত আছে।

সীতারামের প্রধান সেনাপতি মেনাহাতীকে কেহ কেহ মুসলমান বলেন। তাঁহাকে অনেকে মেনাহাতীও বলেন। নবাব-

পক্ষ হইতে কতিপয় সৈন্য ছদ্মবেশে রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করে, তাহা নিশ্চিত। প্রবাদ আছে যে, ছদ্মবেশী সৈনিকের গুপ্ত-অস্ত্রাঘাতে তিনি কাতর হইয়া পড়েন। তখন জীবনের আর আশা নাই বরং অধিকতর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে বিবেচনায় তিনি বলেন যে, তাঁহার দক্ষিণ হস্তের বাহুতে শিকড় ইত্যাদি পূর্ণ আছে, তাহা না ফেলাইলে তাঁহার মৃত্যুর বিলম্ব হইবে এবং যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, তদনুসারে তাঁহার বাহু হইতে শিকড় ইত্যাদি কাটিয়া বাহির করা হয়, পরে তাঁহার জীবন-বায়ু কালের অনন্ত স্রোতে মিশিয়া যায়। মহম্মদপুরে উদয়গঞ্জের হাটখোলার ধারে তাঁহাকে কবর দেওয়া হয়, অদ্যাপি তাঁহার ঐ কবর স্থান তথায় দৃষ্ট হয়।

সীতারামের অপর সেনাপতি হামনা-বাঘার প্রকৃত নাম আমলবেগ ইনি জাতিতে পাঠান ও অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ সেনাপতি ছিলেন। ইহার বীরত্ব ও অত্যন্ত প্রশংসনীয় ছিল। ইহার সম্বন্ধে আর কিছু অবগত হওয়া যায় না।

মহম্মদপুরের বর্ত্তমান বাজার হইতে কানাইনগর পর্য্যন্ত যে একটী সুদীর্ঘ-গড় বর্ত্তমান রহিয়াছে, প্রথম প্রস্তাবে উহা ৺রাণী ভবানীর কৃত" লিখিত হইয়াছে দ্বিতীয় প্রস্তাবে "সীতারাম কৃত" স্থানীয় অনেকে বলেন যে ৺রাণী ভবানী কৃত" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষ অনুসন্ধানে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, এই গড় সীতারামের কৃত। সীতারামের রাজবাড়ীর সদর গড় এইটী।

ঐ গড়ের উত্তর দিয়াই সীতারামের রাজবাড়ীর রথ টানিবার রাস্তা কানাইনগরের ৺হরেকৃষ্ণ রায়ের বাটী পর্য্যন্ত চলিয়াগিয়াছে অদ্যাপি উহা বর্ত্তমান আছে এবং রাজবাড়ীর রথ এই রাস্তার উপর দিয়াই চলিত হয়।

সীতারামের রাজত্বের অনেক দিন পরে নাটোরের ৺রাণী ভবানীর কন্যা ৺তারা ঠাকুরাণী বিশেষ কোন কারণে কিছু দিন মহম্মদপুরে আসিয়া বাস করেন। তিনি বাল্য বিধবা ছিলেন, তাঁহার পুত্র সন্তান কিছু ছিল না। তাঁহার স্বামীর নাম ৺রামচন্দ্র লাহিড়ী। ৺তারা ঠাকুরাণী তাঁহার স্বামী রামচন্দ্রের নাম অনুসারে মহম্মদপুরে ৺রামচন্দ্র বিগ্রহ স্থাপন করেন; শত্রুগণ সহসা নগরে প্রবেশ করিতে না পারে, এই জন্য তিনিই সীতারামের উক্ত সদর গড়ের পঙ্কোদ্ধার করিয়াদেন। তাহাতে গড়ের গভীরতা বৃদ্ধি হয়। বর্ত্তমানে গড়ে সর্ব্বদা বেশী পরিমাণে জল থাকিবার কারণ ইহাই দৃষ্ট হয়। স্থানীয় অধিকাংশ লোকে মূল ঘটনা সম্পূর্ণ জ্ঞাত না থাকায়, বিশেষতঃ উল্লিখিত বিগ্রহে সেবা ইত্যাদি নাটোরের বড় তরফের মহারাজার তত্ত্বাবধানে চলিতেছে দেখিয়া মনে করেন যে, উক্ত বিগ্রহ দুইটী ৺রাণী ভবানীর স্থাপিত এবং উল্লিখিত সদর গড়টীও ৺রাণী ভবানীর কৃত। প্রকৃ প্রস্তাবে তাহা সমস্তই মিথ্যা। গড়টী সীতারাম কৃত তাহাতে আর সন্দেহ নাই ৺রাণী ভবানী কখনও মহম্মদপুরে আগম করেন নাই, তাঁহার কোন কীর্ত্তিও মহম্মদপু নাই। প্রথম প্রস্তাবে লিখিত ৺রা ভবানী স্থাপিত দুইটী বিগ্রহ ও তৎকৃত গ এখানে রহিয়াছে, ইহা সম্পূর্ণ অমূলক মূল ঘটনা এই প্রস্তাবে বর্ণিত হইল।

সীতারাম নবাব সরকার হইতে প্রথ

চাকলা ভূষণার কার্য্যকারক "রায় রাঁয়া" হইয়া আসেন, তাহাই প্রকৃত, অন্য প্রবাদ অমূলক।

সীতারামের রাজ বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত ৺লক্ষ্মী নারায়ণ বিগ্রহ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, সীতারামের পিতা উদয় নারায়ণ যখন চাকলাভূষণার কার্য্যকারক ছিলেন, তখন একদিন কোন কার্য্যবশতঃ তিনি অশ্বারোহণে বর্ত্তমান মহম্মদপুরের মধ্য দিয়া গমন করিতে-ছিলেন। মহম্মদপুর তখন জঙ্গলময় ছিল। তিনি অশ্বারোহণে যাইতেছেন, হটাৎ তাঁহার অশ্বটী স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়ায়। তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক দেখিলেন যে, অশ্বের পদে একখান লৌহ বিদ্ধ হইয়াছে; অনেক কষ্টে অশ্বের পদমুক্ত করিয়া সমভিব্যাহারী লোকদিগকে লৌহ খণ্ড খুঁড়িয়া উঠাইয়া ফেলাইতে আদেশ করেন। কিয়দংশ মৃত্তিকা খননের পরে তিনি দেখিলেন যে, উক্ত লৌহ খণ্ড একখানা ত্রিশূলের অগ্রভাগ। তখন উদয় নারায়ণ বিস্ময়াতিশয় সহকারে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ খনন করিতে আদেশ দেন। ক্রমান্বয়ে খনন করিতে করিতে একটী ছোট ইষ্টক-নির্ম্মিত-মন্দির দৃষ্ট হইল। উদয়নারায়ণ সেই মন্দিরের মধ্যে একটী শালগ্রাম চক্র দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত যত্ন ও ভক্তি সহকারে স্বয়ং তুলিয়া লইয়া ভূষণায় গমন করেন। তথায় গমনা-নন্তর তিনি পণ্ডিত ব্রাহ্মণদিগকে উক্ত শাল-গ্রাম চক্র পরীক্ষা করিতে দেন। ব্রাহ্মণগণ শালগ্রাম চক্র দর্শন ও পরীক্ষা করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তোষ সহকারে এক বাক্যে বলেন যে, এইটী "লক্ষ্মীনারায়ণ" চক্র। এইরূপ চক্র প্রায়ই দৃষ্ট হয় না; ব্রাহ্মণগণ তখন লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রের মাহাত্ম্য এবং এই চক্র যে স্থানে থাকেন, তথায় রাজকার্য্য নিয়মিত ভাবে সুসিদ্ধ হয়, সে স্থানের অবনতি হয় না ইত্যাদি বিশেষরূপে উদয়নারায়ণকে বুঝাইয়া দেন। তচ্ছ্রবণে উদয়নারায়ণ আন্তরিক প্রগাঢ়-ভক্তি পূর্ব্বক অতি যত্নে এই চক্রটী নিজে রাখেন; কিন্তু তিনি নিজে স্থাপনা পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতে পারেন নাই। তৎপুত্র সীতারাম রাজত্ব লাভ করিয়া নিজের রাজবাড়ীর উপরেই লক্ষ্মীনারায়ণ স্থাপনা করেন এবং ১৬২৬ শকে তিনি লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির উৎসর্গ করেন। এই জনশ্রুতি সম্পূর্ণ অবিশ্বাসযোগ্য বিবেচিত হয় না। এই মন্দিরে যে প্রস্তরাঙ্কিত কবিতাটী প্রথম প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে, তাহার তৃতীয় চরণে "নির্ম্মিতং পিতৃপুণ্যার্থে" খোদিত ছিল, তাহাতে অনুমান করা যায় যে, উদয়নারায়ণ লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র প্রাপ্ত হইয়া স্থাপন করিয়া যাইতে না পারায় তিনি অত্যন্ত মনঃকষ্টে ছিলেন, শেষে নিজে রাজা হইয়া পিতৃপুণ্যার্থে পিতৃপ্রাপ্ত লক্ষ্মী-নারায়ণ বিগ্রহ স্থাপন ও মন্দির উৎসর্গ করিয়া যান। বস্তুতঃ এইরূপ লক্ষ্মীনারায়ণ-চক্র অন্যত্র প্রায় দৃষ্ট হয় না।

সীতারাম কৃত প্রধান জলাশয় রামসাগর সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, সীতারাম মহম্মদপুরের সর্ব্ব সাধারণের উপকার মানসে একটী সুবৃহৎ জলাশয় খনন করিতে মনস্থ করেন এবং প্রকাশ করেন যে, তদীয় প্রধান সেনা-পতি মেনাহাতী কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে তীর নিক্ষেপ করিলে যত দূর সেই তীর নিক্ষিপ্ত হইবে, ততদূর দীর্ঘ

জলাশয় খনন করা হইবে। তদনুসারে রামসাগরের উত্তরের তীর হইতে মেনাহাতী দক্ষিণাভিমুখে একটী তীর নিক্ষেপ করেন। কেহ কেহ বলেন যে, সীতারামের স্থানীয় কয়েকটী কর্ম্মচারীর কৌশলে মেনাহাতী এই স্থান হইতে তীর নিক্ষেপ করেন. কারণ উক্ত কর্ম্মচারীদের সীতারামের দেওয়ানের সহিত মনোবিবাদ ছিল, তাঁহারা মনে করিলেন যে, এইস্থান হইতে তীর নিক্ষেপ করিলে দেওয়ানের বাটী জলাশয়ের মধ্যে পড়িবে। দেওয়ানের বাটী রামসাগরের বর্ত্তমান দক্ষিণ সীমা হইতে কিছুদূরে ছিল, অদ্যাপি তাঁহার বাটীর ভগ্নাবশেষ আছে। মেনাহাতী নিক্ষিপ্ত তীর রামসাগরের দক্ষিণ সীমা হইতে দূরে উক্ত দেওয়ানের বাটী অতিক্রম করিয়া অনেক দূরে পতিত হয়। রামসাগরের দক্ষিণ তীরে তখন অনেক ব্রাহ্মণের বাস ছিল। দেওয়ানও ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব ছিলেন। এরূপ সুদীর্ঘ জলাশয় খনন করা হইলে ব্রাহ্মণগণের স্থানান্তরিত হইতে হয়, মনে করিয়া তৎপর দিন তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া সীতারাম সমীপে জানাইলেন যে, তাঁহারা তাঁহারই প্রদত্ত জমিতে তাঁহারই আশ্রয়ে বাস করিতেছেন, এক্ষণে এরূপ জলাশয় খনন করাইলে তিনি দত্তাপহারী হইবেন এবং ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য হইবেন। ব্রাহ্মণের উপর সীতারামের যথেষ্ট ভক্তি ছিল; তিনি সন্তোষ-চিত্তে ব্রাহ্মণগণের সম্পত্তি বাদ দিয়া জলাশয় খননের আদেশ দেন। কেহ কেহ বলেন যে, ব্রাহ্মণগণ রাত্রিতে তীর উঠাইয়া রামসাগরের দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত রাখিয়া যান, কিন্তু তাহা বিশ্বাসযোগ্য নয়! এরূপ প্রবল পরাক্রান্ত সাবধান রাজার তীর উঠাইতে সাহসী হওয়া অসম্ভব। মেনাহাতীর তীর যতদূরে পড়িয়াছিল সেই দূরত্বের ৪ এক-চতুর্থাংশ বর্ত্তমান রামসাগরের দৈর্ঘ্য। যদি প্রকৃত মেনাহাতী নিক্ষিপ্ত শরের দূরত্ব পর্য্যন্ত রামসাগর খনন করা হইত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে এরূপ জলাশয় কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হইত না। বর্ত্তমান রামসাগর আনুমানিক ১৬০০ ষোল শত হাত দীর্ঘ ও ৬০০ ছয়শত হাত প্রস্থ হইবে। রামসাগর সীতারামের রাজত্বের শেষ-অংশে কাটান হয়। শ্রুতি পরম্পরায় অবগত হওয়া যায় যে, সীতারাম রামসাগর উৎসর্গ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি রামসাগর উৎসর্গের শুভদিন ইত্যাদি স্থির করিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়াছেন, এই সুমহৎব্যাপার সমারোহের সহিতই সম্পন্ন হইবার কথা, তদনুযায়ী সমস্ত বন্দোবস্তই ঠিক ছিল। শুভদিনে শুভকার্য্যে ব্রতী হইবেন, মনস্থ করিয়া সীতারাম রামসাগরের উত্তর তীরে সদর বান্ধাঘাটের উপর বসিয়াছিলেন; এদিকে রাজবংশে সেই দিন একটী বালক ভূমিষ্ঠ হয়। কেহ কেহ বলেন যে, রাজার পৌত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। রাজপুরোহিত, তদীয় গুরুদেব, দেওয়ান ইত্যাদি সকলেই এ সংবাদ শুনিয়াছেন কিন্তু রাজার কর্ণগোচর তখন পর্য্যন্ত হয় নাই। অশুচি অবস্থায় রাজা এরূপ শুভ কার্য্য করিতে পারেন না, এরূপ উৎসবের দিনও রাজার নিকট এ সংবাদ প্রদান করিতে কেহই সাহসী হন না; অবশেষে,

দেওয়ান, পুরোহিত ও গুরুদেব সকলে পরামর্শ করিয়া অগ্রে কতিপয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, পরে রাজপুরোহিত, তৎপরে রাজগুরুদেব তাঁহার পশ্চাতে দেওয়ান রাজ সমীপে বিমর্ষ চিত্তে গমন করিলেন। সীতারাম তদীয় গুরুদেবকে পশ্চাতে ও অগ্রে অন্য ব্রাহ্মণ কয়েকটীকে ম্রিয়মাণ অবস্থায় আগমন করিতে দেখিয়া কোন অমঙ্গল আশঙ্কা করিতেছিলেন। সীতারাম গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে তাঁহাদিগকে প্রণামানন্তর সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলেন, অগ্রগামী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অশ্রুবিমোচন পূর্ব্বক শঙ্কিত চিত্তে অস্ফুট স্বরে সীতারামকে বালক ভূমিষ্ঠ হইবার সংবাদ বলেন। সীতারাম এই সংবাদ শ্রবণে যৎপরোনাস্তি মর্ম্মাহত হইয়া কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। শেষে দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই সংবাদদাতা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে পুরস্কার স্বরূপ কিছু সম্পত্তি নিষ্কর দান করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন ইত্যাদি অন্যান্য কার্য্যের আদেশ প্রদান পূর্ব্বক অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করেন। এই উৎসবের সমস্ত কার্য্য শেষ হইলে অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হয়েন এবং প্রকাশ করেন যে, এইরূপ শুভ কার্য্যের বিঘ্নকারী এই সন্তান নিতান্ত হতভাগ্য। যখন এরূপ মহৎ কার্য্যের সমস্ত আয়োজন করিয়াও কার্য্যোদ্ধার হইল না, তখন রাজলক্ষ্মী নিতান্তই চঞ্চলা হইয়াছেন, রাজ্যের ক্রমশঃ অবনতি ঘটিবে। তৎপরেই নবাব সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় রামসাগর প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতে পারেন নাই। রামসাগরের উত্তর দিকে সদর ঘাট ও পূর্ব্বদিকের একটী ঘাট ইষ্টক দিয়া পাকা করিয়া বান্ধান ছিল, এক্ষণ দুই একখানা ভগ্ন ইষ্টক দৃষ্ট হয় মাত্র। রামসাগরের জল যাহাতে খারাপ না হইতে পারে, এজন্য পুণ্যাত্মা সীতারাম একটী তাল বৃক্ষ ছেদন করিয়া তাহার ভিতর পারদ পুরিয়া রামসাগরে ফেলাইয়া দেন। বস্তুতঃ রামসাগরের জল পূর্ব্বে অত্যুৎকৃষ্ট ছিল, এক্ষণ নানাকারণে অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, রামসাগরে দেবমাহাত্ম্য আছে ফলতঃ সহসা রামসাগর দর্শন করিলে প্রথমে দেবকীর্ত্তি বলিয়া প্রতীতি জন্মে। সবিশেষ ১ম ও ২য় প্রস্তাবে লিখিত আছে।

সীতারামের রাজধানী ও রাজবাড়ী অতীব মনোহর ছিল। প্রশস্ত রাজপথের উভয় পার্শ্বে নানাবিধ বিপণি শ্রেণী শোভিত বাজার। রাজবাড়ীর চতুঃপার্শ্বে বিস্তৃত গড়। রাজবাড়ী দ্বিতল, ত্রিতল ও নানাবিধ কারুকার্য্যখচিত সৌধমালায় পরিশোভিত। সদর রাস্তার উত্তরদিকে বাজার, পরে দেউড়ী মালখানা কারাগার ইত্যাদি নানাবিধ অট্টালিকা। একটী মাত্র প্রবেশ দ্বার; সহসা কোন শত্রু ইত্যাদি নগর মধ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইত না। রীতিমত নগর রক্ষক ইত্যাদি প্রহরিগণ সর্ব্বদা নগর রক্ষায় ব্যাপৃত থাকিত। রাজধানীতে দৈনিক অসংখ্য লোকের সমাগম হইত। কেহ রাজদরবারে, কেহ বা ধন যাচ্ঞায় কেহ বা ভিক্ষার্থ, কেহ বা ক্রয় বিক্রয়ার্থ, কেহ বা নগর সন্দর্শনার্থ ইত্যাদি নানাকারণে প্রতিদিন বহুসংখ্যক লোক যাতায়াত করিত। নিম্নে সংক্ষেপে রাজবাড়ীর বিবরণ দেওয়া গেল।

রামসাগরের উত্তর তীরের সদর ঘাট হইতে রাজবাড়ীর সদর তোরণের কিয়দ্দূরে পূর্ব্বদিকে সীতারাম কৃত বৃহৎ পদ্মপুষ্করিণীর ধার পর্য্যন্ত বহুবিধ বিপণিরাজি বিরাজিত বাজার। বাজারের মধ্য দিয়া সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্ম উত্তরাভিমুখে কিছু দূর গিয়া পদ্মপুষ্করিণীর ধার হইতে পশ্চিম দিকে গিয়াছে। পদ্ম-পুষ্করিণী হইতে কিয়ৎ পরিমাণে পশ্চিম দিকে গেলেই সীতারামের সদর বাজ তোরণ। তথা হইতে একটু পশ্চিম দিকে গেলেই সিংহদ্বার, সিংহদ্বারের পরেই ৺দশভুজার প্রাঙ্গণ। ৺দশ ভুজার মন্দির পাকা যোড়-বাঙ্গলা ছিল, এক্ষণ ভগ্ন হওয়ায় পুনর্ব্বার অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ৺দশ ভুজার বাটীর পূর্ব্ব ও দক্ষিণে অট্টা-লিকা। দক্ষিণ পশ্চিমে নানাবিধ শিল্প কার্য্যে সুশোভিত-মন্দিরে কৃষ্ণ-প্রস্তর-নির্ম্মিত শিব এবং ঠিক এই কৃষ্ণ শিব মন্দি-রের সমসূত্রে দক্ষিণ অংশে একটী মন্দিরে শ্বেত-প্রস্তরনি-র্ম্মিত শিব স্থাপিত ছিলেন। উভয় শিব মন্দিরের মধ্যে রাস্তা ছিল, সেই রাস্তা দিয়া ৺লক্ষ্মীনারায়ণের প্রাঙ্গণ ও সীতারামের সদর কাছারী যাইতে হইত। ৺লক্ষ্মীনারায়ণের বাটীর দক্ষিণে দ্বিতল অট্টালিকায় তাঁহার সদর কাছারী ছিল। ৺লক্ষ্মীনারায়ণের বাটীর ঠিক পশ্চিম দিকে উত্তরের পার্শ্বে সীতারামের ত্রিতল বৈঠক-খানা, তাহার পশ্চাদ্ভাগেই ত্রিতল অন্দর মহল ও অন্দরের পুষ্করিণী ইত্যাদি, তাহার পশ্চাদ্ভাগেই সুদীর্ঘ গড়। পদ্মপুষ্করিণী হইতে যে সদর রাস্তা রাজবাড়ীতে গিয়াছে, তাহার দক্ষিণ দিকে মহম্মদ আলি ফকিরের আশ্রম ও কবর এবং ৺কালীবাড়ী এবং নাটোরের ৺রাণী ভবানীর কন্যা ৺ তারা ঠাকুরাণী প্রতিষ্ঠিত ৺ রামচন্দ্র বিগ্রহের মন্দির প্রাঙ্গণ ও অট্টালিকা ইত্যাদি, উত্তর দিকে পাকা প্রকাণ্ড দোলমঞ্চ; দোলমঞ্চের উত্তর ও পূর্ব্ব দিকে কেল্লাবাড়ী বা সেনা-নিবেশ। সদর তোরণ হইতে সিংহদ্বার পর্য্যন্ত রাজবর্ত্মের উভয় পার্শ্বে দেউড়ী, সালখানা ইত্যাদি অট্টালিকা, এই রাস্তার কিয়দ্দূরে উত্তরে কারাগার, তাহার উত্তর ও পশ্চিম দিকে পণ্ডিতগণের থাকিবার স্থান ছিল। সিংহদ্বারের পূর্ব্ব পার্শ্বেই একটী রাস্তা দক্ষিণাভিমুখে ছিল। সেই রাস্তা দিয়া সীতারামের গোলাবাড়ী যাইতে হইত। গোলাবাড়ীর পার্শ্বেই গড়। গড়ের অপর পার্শ্ব হইতেই বাজার রাধানগর, কানাইনগরে ৺হরেকৃষ্ণ রায়ের বাটী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ৺রাধারাণী বিগ্রহের বাজার বলিয়া এই বাজারের নাম বাজার রাধানগর। রাজ-বাড়ীর চতুঃপার্শ্বেই গড়, গড়ের দুই পার্শ্বেই বাজার। রামসাগরের কিয়ৎ পরিমাণ উত্তর দিক হইতেই সদর গড় কানাইনগরে ৺হরেকৃষ্ণ রায়ের বাটী পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ৺লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির ৺দশ ভুজার মন্দিরের পশ্চিম দিকেই। ৺লক্ষ্মী-নারায়ণ ও ৺দশ ভুজার মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগেই লক্ষ্মীনারায়ণের বৃহৎ পুষ্করিণী নিম্নদেশ হইতে চারিধার সমস্তই ইষ্টক দিয়া পাকা করিয়া বান্ধান। এই পুষ্করিণীই সীতারামের গুপ্ত কোষাগার ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। অন্তর্বিবর প্রথম প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে। এই পুষ্করিণীর পশ্চিম তীরের উপর সীতা-

রামের অন্দরমহল, ইহার উত্তর পূর্ব্ব তীরের উপর পণ্ডিতদিগের বাসস্থান ছিল।

রাজবাড়ীর উত্তর দিকের গড় একেবারে রামসাগরে আসিয়া মিশিয়াছে৷ বিপরীত দিকে সদর গড় কানাইনগর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। রামসাগরের সদর ঘাট হইতে প্রশস্ত রাজপথ বাজারের মধ্য দিয়া পদ্মপুষ্করিণীর নিকট রাজবাড়ীর পূর্ব্বদিকের গড় অতিক্রম করিয়া সিংহ দ্বার পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। রাজবাড়ী যাইতে হইলে সদর রাস্তা ব্যতীত অন্য পথ ছিল না। এক্ষণও বর্ষ.কালে সীতারামের রাজবাড়ীতে যাইতে হইলে সদর রাস্তা ব্যতীত অন্য পথে যাওয়া যায় না। অন্য পথে যাইতে হইলে নৌকারোহণে যাইতে হয়। পরে মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া স্বতন্ত্র কাগজে দেওয়ার ইচ্ছা আছে, তদ্দৃষ্টে রাজবাড়ীর অবস্থা সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। দুঃখের বিষয় এক্ষণ প্রায় সমস্তই লয় প্রাপ্ত হইয়াছে, ভগ্নাবশেষ মাত্র রহিয়াছে। এক্ষণে রাজবাড়ীর অবস্থা দেখিলে হৃদয় শোক, দুঃখে অভিভূত হয়। ভয়ানক জঙ্গল পরিপূর্ণ স্থানে স্থানে ইষ্টক রাশি স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্ব-সৌন্দর্য্যের কিছুই নয়নগোচর হয় না। কেবল দুইটী দেব মন্দির অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় রহিয়াছে। রীতিমত তাঁহাদিগের পূজা ইত্যাদি হইতেছে বলিয়া সেই স্থানটী অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত রহিয়াছে। যে স্থানে স্বাধীন রাজা সুসজ্জিত সুরম্যহর্ম্ম্যে-দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিতেন, যে স্থান রাজকুল বধূগণের বিচরণ ক্ষেত্র ইত্যাদি ছিল, আজ সেই স্থান শার্দ্দূল, বরাহ ইত্যাদি বন্য জন্তুর রঙ্গভূমি। হায়! কালের কি অপ্রতিহত প্রভাব। কালে সমস্তই লয় প্রাপ্ত হয়। কালকে কেহই পরাজয় করিতে পারেন না: অতিপ্রবল প্রতাপান্বিত ভূপতি কালের নিকট যেমন, একজন দীনহীন চির ভিখারীও তাঁহার নিকট সেইরূপ। কালের চক্ষুতে ধনী, দরিদ্র, রাজা, প্রজা, সুখী দুঃখী, বিদ্বান্ মূর্খ, সকলেই সমান। সকলেই কালের করাল-কবলে নিপতিত হয়েন। যে সীতারাম সামান্য অবস্থা হইতে নিজে রাজা হইয়া স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়াছেন, যাঁহার কীর্ত্তি অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। যিনি এই মানব জীবনে বহুবিধ সৎকার্য্য করিয়া অক্ষয়-পুণ্য সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, আজ সেই সীতারাম কোথায়? কোথায় তাঁহার সেই রাজ সিংহাসন? কালে সমস্তই অপহরণ করিয়াছে।

এই নশ্বর জগতে চিরস্থায়ী কিছুই নয়। আমরা অনিত্যকে নিত্য জ্ঞান করিয়া বৃথা কুহকজালে আবদ্ধ হইয়া কত কষ্টই পাইতেছি। সংসারের অনিত্যতা প্রতি মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারিয়াও মায়ার মোহিনী শক্তিতে সমস্তই বিস্মৃত হইয়া অজর অমর ভাবে কাল যাপন করিতেছি। রাজত্বই হউক, বা ধন জন ইত্যাদিই হউক, এমন কি নিজের দেহ পর্য্যন্ত কালে লয় প্রাপ্ত হইবে। মহাজনেরা বলিয়া গিয়াছেন যে "কীর্ত্তি র্যস্য স জীবতি"। শুদ্ধ সেই কীর্ত্তির জন্য মহাত্মা, স্বাধীন চেতা, পরোপকারী ও স্বধর্ম্মানুরাগী সীতারামের নাম অদ্যাপি জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে, সুতরাং আরও দীর্ঘকাল তাঁহার নাম নিরবচ্ছিন্ন

স্থানে স্থানে ঘোষিত হইবে। সীতারাম ধর্ম্ম বলে বলীয়ান্ ছিলেন। ধর্ম্মই জগতে একমাত্র সহায়, এক ধর্ম্ম বলেই মনুষ্য ইহ জীবনে সুখ শান্তিতে ও পরকালে শান্তি রাজ্যে গিয়া চির শান্তিতে থাকিতে পারেন।

সীতারাম প্রতিষ্ঠিত ৺ হরেকৃষ্ণ রায়ের আবাসস্থান কানাইনগর ইত্যাদি বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে সহজে প্রতীতি জন্মে যে, মহাত্মা সীতারাম কানাইনগরকে ব্রজধাম সদৃশ স্থাপনা করিয়াগিয়াছেন। সচ্চিদানন্দ পূর্ণ-ব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অংশ সম্ভূতা আদ্যাশক্তি পরমা প্রকৃতি শ্রীমতী রাধিকা সহ গোপকুলে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে লীলাচ্ছলে কিছু দিন বাস করিয়া-ছিলেন। সীতারাম ও তৎপ্রতিষ্ঠিত বিগ্র-হকে ব্রজধামের কানাই সাজাইয়া গ্রামের নাম কানাইনগর রাখিয়াছিলেন। কানাই-নগরে পঞ্চরত্ন মন্দিরে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম, অনঙ্গ মোহন ভবজলধিতারণ, বংশীবদন, শ্যাম-সুন্দর নন্দনন্দন পূর্ণব্রহ্ম মুরলীহস্তে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার বাম পার্শ্বে আদ্যাশক্তি মহামায়া পরমাপ্রকৃতি জগৎজননী বরাভয় প্রদায়িনী বৃকভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকা বিরাজিতা। ভক্তে যে মূর্ত্তি দেখিতে, পূজা করিতে, সেবা করিতে ও ধ্যান করিতে সতত ভালবাসে, সেই মূর্ত্তিতেই পরম পুরুষ পরমা প্রকৃতি সহ বিরাজিত। এই মূর্ত্তি দর্শনে ভক্তের হৃদয় প্রেমরসে দ্রবীভূত হয়। পাষণ্ডের হৃদয় ও অনেক সময়ে বিগলিত হয়। ব্রজধামে গোপ গোপীগণের অব্যভিচারিণী ভক্তি ছিল, তাঁহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদা দাস্যভাবে ভক্তি পূর্ব্বক সেবাশুশ্রূষা দ্বারা সাধনাদি করিতেন। সীতারামও ৺হরেকৃষ্ণ রায়ের (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ) বাটীর চতুঃপার্শ্বে গোয়ালাদিগকে উক্ত বিগ্রহের চাকর খান-সামা ইত্যাদি রূপে চাকরান জমি দিয়া বাস করাইয়াছিলেন। অদ্যাপি গোয়ালাগণ সেই জমিতে বাস করিয়া বিগ্রহের দাসত্ব করিতেছে। কানাইনগরের একটী পাড়ার নাম গোকুলনগর। গোকুলেই গোয়ালাগণ ছিল, এক্ষণে সীতারামের পুরোহিত বংশ তথায় বাস করিতেছেন। কানাই বাড়ীর পশ্চিমে অনতিদূরে কালীয় হ্রদ সদৃশ সীতা-রাম কৃত বৃহৎ কৃষ্ণসাগর। ৺ শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের জলাশয় বলিয়া ইহার নাম কৃষ্ণ-সাগর। ৺হরেকৃষ্ণ রায়ের বাটীর নিকট হইতেই মহম্মদপুরের বর্ত্তমান বাজার পর্য্যন্ত পুণ্যসলিলা যমুনা নদীর স্থায় অন্যূন এক মাইল দীর্ঘ সীতারামের সদর গড়। গড়ের অত্যুচ্চ তীরই কানাইনগর বৃন্দাবনের গোবর্দ্ধন। ৺হরেকৃষ্ণ রায়ের বাটীর পূর্ব্বেই বাজার রাধানগর সীতারামের রাজবাড়ীর গড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ৺রাধারাণীর বিগ্রহের এই বাজার। কানাইনগরের পার্শ্বেই মথুরানগর, উত্তরে শ্যামনগর দক্ষিণে ৺গোপালপুর। প্রকৃত পক্ষে সীতারাম কানাই-নগরকে বৃন্দাবনই সাজাইয়া গিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া একপদও কোথায়ও গমন করেন না। নিত্যধাম শ্রীবৃন্দাবনে মহারাসেশ্বরী বৃন্দাবন বিলাসিনী শ্রীমতী রাধিকা সহ বিরাজ করিতেন, তাঁহার উক্তি আছে "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং নগচ্ছামি। কানাই-

নগরেও সর্ব্বদা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় প্রকৃতি সহ বিরাজমান রহিয়াছেন। তাঁহাদের বৃন্দাবনের নিত্যপর্ব্বই সম্পাদিত হইতেছে। অনেক দেব মাহাত্ম্যও শ্রুতিগোচর হয়।

(ক্রমশঃ)
—বরদাকান্ত দেব
কমলাপুর নড়াইল।

কোথায় তুমি ?*

১

(আমি) খুঁজে খুঁজে হ'চ্ছি সারা—
তোমার পাবার আশে ;
(আছ) আশে "পাশে" ঘটাকাশে-
দিচ্ছ সাড়া "শ্বাসে"।

২

(তুমি) হ'তে যদি "অক্ষিছাড়া,"
তা' হ'লে কি "লক্ষ্মীছাড়া"
সঙ্গে সঙ্গে খুঁজি ঝাঁড়া
করতে পার মোরে ?
(আমার) জ্ঞান অক্ষিটী ল'য়ে কেড়ে,
আঁধার ঘরে দিয়ে ছেড়ে,
মুক্তি দ্বারটী দিয়ে নেড়ে,
ঘুরাও ভবঘোরে।

৩

জ্ঞান আঁখিটী ছাড়লে পরে,
ঘুরতাম্ কি এতব ঘোরে,
সিঁদ মোহাড়ায় ধরে চোরে
হৃদয় কারাগারে,—
মোক্ষ ফলটী লাভের আশে,
শক্তি খোঁটায় ভক্তি পাশে,
রাখতাম্ বেঁধে অনায়াসে,
ছাড়তাম্ না তোমারে।

৪

(কিম্বা) কর্ণ দুটী বধির ক'রে,—
পাশে দিয়ে সাড়া ?
চক্ষু দুটী অন্ধ ক'লে-
বিফল চস্‌মা জোড়া !

৫

(আছ) "মন চকোরের চন্দ্র হ'য়ে-
অন্তর অকাশে,"—
(তবে) কেন অজ্ঞানতা অন্ধকারে
হারাচ্ছে সে দিশে ?

৬

(বল) অন্ধজনের কি ভেদাভেদ
দিবাতে নিশাতে ?
কি ফলোদয় পঙ্গুজনের
যষ্টি দিলে হাতে ?

৭

আলোয়ায় যে দিক ভুলে যায়,—
(তা'র) সহজে কি যায় ধাঁধা ?
রসনা যা'র নিয়েছ কেটে,—
কাজ কি তাহার সুধা ?

৮

(আমার) প্রেমনদীটী ভাটার টানে-
শুকিয়ে হলো সারা ;
(শেষে) কাদায় প'ড়ে ছট ফটিয়ে-
মীনটী যাবে মারা।

৯

এটী তোমার কেমন ধারা,—
ডুবিয়ে দেলা মেঘেলা করা,
অন্ধক'রে মশাল ধরা,
ছাদ ফেলে'দে ছাতা ধরা,
মুখটী বেঁধে প্রশ্ন করা—
উত্তর পাবার আশে ;—
(এযে) ঘুমিয়ে রেখেচুপিয়ে ডাকা,
চুরির পরে সজাগ রাখা,

* ১৩০৮ সালের পৌষ মাঘ সংখ্যা হিন্দু-পত্রিকায় "এই যে আমি" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

গাছটি কেটে পোতা শাখা,
বাঘ ছেড়ে দে ছাগল রাখা,
চতুর যে সে এমনি ঠকা—
ঠকায় অনায়াসে।

১০

গোলক ধাঁধাঁয় রেখে ফে'লে,
লুকো চুরি খুব খাচ্ছেলে;
বল্‌ছ ত্বরায় আয়্‌রে চলে,
ঠক্‌বি অবশেষে;
ভুলিস্‌নে আর মোহের ছলে
পড়্‌বি আটক্ দেরী হলে,
মায়ার ফাঁসী লাগ্‌বে গলে,
কাট্‌বি বল কিসে?

১১

কোন পথেতে তোমায় পাব—
জান্‌ব বল কিসে?
(আমি) মহামায়ার মায়ার ঘোরে-
হইছি হারা দিশে।

১২

(তোমার) পথের কোন (ও) নাইকো ঠিক্
কোন্‌টায় বল যাই;
চিরকালটা কর'ছ বাস—
(কিন্তু) আবাসের ঠিক নাই।

১৩

প্রকাণ্ড এই ব্রহ্মাণ্ড মাঝে—
কোথায় হেন স্থান,—
(তোমার) তিলেক তরে যেই স্থানেতে
নাহয় অবস্থান?

১৪

সর্ব্বদেশে বাড়ী তোমা'র,
সব্ দিকে পথ তা'র,
কোন্‌টী বাঁকা কোন্‌টী সোজা
চিনে লওয়া ভার।

১৫

(বাড়ীর) পাঁচীল গুলো ঠিক যেন সব—
ভোজভেল্‌কী মত;
(তারা) দেখায়ে ফাঁকা লাগায় ধোকা,
ঘুরায় অবিরত।

১৬

যে জন ধোকা বিষম ঠকা
ঠকে অনায়াসে;
ঢুক্‌তে গিয়ে গুঁতোটী খেয়ে—
পিছু হ'টে আসে।

১৭

দরজা গুলি লুকিয়ে থাকে—
বহুরূপীর সাজে;
চতুর হ'লে (ও) চিনে লওয়া
যায় নাকো সহজে।

১৮

যে মহাজন তোমার পথে
হয়েছেন গত,
(তাঁর) চরণ চিহ্ন স্মরণ ক'রে'
যাত্রী চলে কত।

১৯

(চলে) মহা আশায় বাঁধিয়ে বুক
রাখিয়ে সুঠিক তাক্;
(শেষে) বাড়ীর কাছে হাজির হ'য়ে
পায়না পায়ের দাগ।

২০

এম্নি তোমার স্থপতিগিরি,
এমনি গড়্‌ন ধার,
হাজার লোক হাঁটিগেলেও
দাগ থাকেনা পা'র।

২১

দ্বারবান্‌টী (ও) তোমার মত,—
পথটী না দেখ্‌ব'লে;
(বলে) দেখে শুনে লওগে যাদু
হইয়ে চালাক ছেলে।

২২

(তখন) অন্ধপথিক ভ্রান্ত হ'য়ে
আশা লাঠি ধরে',—

বিবেক ছেলের হাত ধরিয়ে
কাঁদে দ্বারে দ্বারে।

২৩

(তুমি) কাঁদাতে বড় ভাল বাস,
কান্নাই তুমি চাও।
অন্ধ হ'লেও কেঁদে কেঁদে
দেখাটী না দেও।

২৪

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি
চারটি যুগ ধ'রে',
কাঁদায়ে মারলে কত জনে
দেখ মনে করে,।

২৫

(আমার) চিরকালটী কাঁদ্‌তে গেল,
তবু তোমার দয়া না হ'ল;
চক্ষেতে নাই অশ্রু জল,
কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে নিঃসম্বল।
উপার্জ্জনের নাই শকতি,
নিজের কেবল হচ্ছে ক্ষতি।

২৬

(আবার) ছটা ডাকাত ঢুক্‌লো ঘরে,
(তারা) জ্ঞান আলোটী নির্ব্বাণ ক'রে'
ধৈর্য্য খোঁটা ভেঙ্গে জোরে,
ধ'রে আমার কেশে,
মোহের গর্ত্তে ফেলে মোরে',
যা কিছু সব নিল হ'রে,'
কেমন করে যাব পারে —
চরণ ভেলায় ভেসে?

২৭

তুমিতো নও তেমন মেয়ে,—
(দিবে) বিনা দানেই পার করে;
ক্রান্তি কড়া হিসেব ক'রে,
তুলে দিবে নায়ের' পরে।
একটি কড়া কম্‌তি হ'লে,
মাঝ দরিয়ায় দিবে ফেলে।
কেমন করে ত'রব শেষে,
সার কাটি তাই ভাব্‌ছি ব'সে।

শ্রীচন্দ্রভূষণ লাহিড়ী
ছাত্র, আগর দাঁড়ী সাস্কৃত
চতুষ্পাঠী।
(খুলনা)

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

বঙ্গপরিবার। শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা। বঙ্গপরিবারের চাকচিক্য এই উপন্যাসের উপকরণ। গ্রন্থখানিতে নূতনলেখকের প্রতিভার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, নবীন-লেখকগণ ভাব ও ভাষার সামঞ্জস্য সংরক্ষণে সর্ব্বদা যেরূপ অকৃতকার্য্য হন, সুরেন্দ্র বাবু অনেকাংশে সেই অসম্পূর্ণতাস্পর্শ হইতে নির্ম্মুক্ত। চরিত্রচিত্রণেও নবীনগ্রন্থকার কথঞ্চিৎ প্রবীণতার পরিচয় দিয়াছেন। "বঙ্গ-পরিবার" পাঠে বঙ্গপরিবার শিক্ষা, সাধুতা, নীতি ও শক্তি লাভ করিবে, আশা করা যায়। অতএব বঙ্গপরিবারের এই নূতন-লেখক বঙ্গপরিবারের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে অকৃতার্থ হইলে, উহা উপন্যাস-পাঠক পাঠিকার কলঙ্কের কথা। সুরেন্দ্র বাবুর নিকট আমরা আরও অধিকতর আশা রাখি, অনুশীলন অভ্যাস থাকিলে তিনি ভবিষ্যতে ঔপন্যাসিক কুলের মধ্যে উপযুক্ত আসন অধিকার করিতে পারিবেন। মুদ্রাঙ্কণ পরিষ্কৃত, কাগজ ভাল।

সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী। পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বেদান্ত চুঞ্চু, সাংখ্যভূষণ

সাহিত্যাচার্য মহাশয়ের দ্বারা সঙ্কলিত। মূল্য দেড় টাকা। এই গ্রন্থে ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত সাংখ্যকারিকা, সংস্কৃতে কারিকার সরল ব্যাখ্যা, বাঙ্গলাভাষায় কারিকার তাৎপর্য্য ও বাচস্পতি মিশ্রকৃত তত্ত্বকৌমুদী, তত্ত্বকৌমুদীর ক্রমিক সরল অবিকল বঙ্গানুবাদ, এবং প্রতিকারিকায় তাৎপর্য্যবোধে উপযোগী গভীর দার্শনিক সমালোচনাপূর্ণ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য পরিচায়ক সুবিস্তৃত মন্তব্য আছে। মন্তব্যভাগ পাঠ করিলে বস্তুতঃই কঠোরদার্শনিকতত্ত্বের সহজ সুখবোধ্য সমাবেশ দর্শন করিয়া বিস্মিত ও প্রীত হইতে হয়। পণ্ডিত পূর্ণচন্দ্র বঙ্গীয় সমাজে সম্পূর্ণ পরিচিত; তাঁহার পাতঞ্জলদর্শন ইতিপূর্ব্বে বঙ্গীয় পাঠকের দর্শনপাঠ পিপাসার সুশীতল সলিলরূপে উপস্থিত হইয়াছিল, সাংখ্য ও তদনুরূপ হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনের জ্ঞাতব্যবিষয়সমূহ ইহাতে বিশেষরূপে বিচারিত ও বিবৃত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় এরূপ প্রকারে শাস্ত্রীয় গ্রন্থ সকলের প্রচার অত্যধিক অভিলষিত। এই মহৎকার্য্যের দ্বারা পণ্ডিত পূর্ণচন্দ্র বাস্তবিকই বঙ্গীয়সমাজের পরমোপকার সাধন করিতেছেন। আমরা আশা করি, স্বধর্ম্মপরায়ণ হিন্দুমহোদয়দের নিকট এই পুস্তক পরমাদরে গৃহীত হইবে, না হইলে সমাজের কলঙ্কের কথা সংশয় নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য, পণ্ডিত-পূর্ণচন্দ্রের নিকট এজন্য অবশ্য ঋণী। মুদ্রাঙ্কণও কাগজ উৎকৃষ্ট। বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

তন্ত্রসার। কৃষ্ণানন্দকৃত তন্ত্রসার বহুবার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। এসংস্করণটী মন্দ নয়। ইহাতে অনেকগুলি তান্ত্রিক-যন্ত্র ও কুণ্ডাদির চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা উত্তম। বঙ্গানুবাদটীতে সকল বুঝিবার পথ পরিস্কৃত হয় নাই। অনেক স্থলে মূলের শব্দটী অনুবাদে অবিকল লিখিত আছে, ইহাতে সংস্কৃতানভিজ্ঞ-পাঠকের একটু অসুবিধা হইবার কথা। বস্তুতঃ শাস্ত্রগ্রন্থের অধিক মুদ্রণ ও প্রচলন আনন্দের কথা। বরাহনগর ষষ্ঠীতলা শ্রীযুক্ত হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের বাটী শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়। মূল্য ৬৲ টাকা।

নব্য ভারতে আর্য্য ধর্ম্ম। প্রথম ভাগ। ছাত্রধর্ম্ম। কালনার ডেপুটী কালেক্টর ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত বি, এ বিরচিত। মূল্য ॥• আনা। বাঁধাই ॥৶• আনা। বর্ত্তমান ভারতীয় সমাজে প্রাচীন আর্য্য প্রথাপদ্ধতি কিরূপ ভাবে প্রচলিত হইলে মঙ্গলদায়ক হয়, গ্রন্থকার তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রধানত বিদ্যালয়ের ছাত্রই তাঁহার লক্ষ্যস্থান। কোনও প্রথা অধিক দিন অপরিবর্ত্তিতরূপে থাকিলে সমাজের মঙ্গলকর হয় না, যেহেতু সমাজ কালধর্ম্মের অধীন, সুতরাং পরিবর্ত্তনশীল। বর্ত্তমানকালে নানাকারণে অর্থাৎ দৈহিক, মানসিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার অন্যথা হওয়ায় সমাজ পূর্ব্বাপেক্ষা স্বতন্ত্রাকার ধারণ করিয়াছে সন্দেহ নাই, কাজেই প্রথার ও সংস্কার আবশ্যক। এ পুস্তকে অতি অল্প বিষয়ই সামান্যরূপে বিবেচিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের কথা আলোচ্য ও বিবেচ্য বটে। তাঁহার মত সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য না হইলেও বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ এই পুস্তক দ্বারা উপকৃত হইবে নিঃসন্দেহ। ইহা পাঠ্য হইলে মন্দ হয় না। প্রধানতঃ স্নান, আহার ইত্যাদির স্বাস্থ্যনীতি, সুকর্ম্ম কুকর্ম্মাদির ধর্ম্ম বা সমাজনীতি, ও ব্রহ্মচর্য্য বা ছাত্রজীবনের কর্ত্তব্য ইহাতে আংশিকরূপে আলোচিত। গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ।

হিন্দু-পত্রিকা।

১৩০৯ সালের সূচীপত্র।

on the Bible and Biblical Subjects, Religious Sects and Doctrines, Household Matters, Education, Music, Games, &c.

You pay a few Rupees down; and receive the Voloumes at once. No waiting!

READ WHAT THE PRESS SAYS

The TIMES says:

"The *Modern Cyclopedia* is portable and compact. It keeps pacee with the rapid progress of the age, and observes a due proportion in dealing with the different subjects."

St. JAMES'S GAZETTE says:

"An exceedingly useful work of reference. It is modern in the sense that its information is carefully brought up to date. The facts given, so far as we have tested them, are wonderfully accurate."

SCIENCE AND ART says:

"This amazingly cheap and handy volune of reference reflects the greatest credit upon all concerned in its production. It should find a place in the homes of rich and poor alike."

The PRACTICAL TEACHER says:

"Again and again have we been asked for a compact handy, reliable cyclopedia at a reasonable price. Here is the very thing"

NATURE says:

"The articles are short but clear, Especial attention has been given to matters which are of living interest in our own day, and we are glad to see that many scientific articles haue been written or revised by specialists."

The BRITISH WEEKLY says:

"It is cheap, unambitious, practical, full, and, so far as we have tested it, accurate. The illustrations are plentiful and generally useful."

The SATURDAA REVIEW says:

"Some handy form of cyclopedia has long wanted. This is comprehensive without being bulky. The information is succinctly given, sufficiently copious and strictly relevant."

The SPECTATOR says:

"The articles are distinguished by accuracy not less

succinctness. We have been particularly struck with the scientific geographical, and legal articles."

The SCHOOL GUARDIAN says:

"For the teacher a work of this kind is almost indispensable, and we know of no other that combines in so high a degree the qualities of conciseness, comprehensiveness, and cheapness."

UP-TO-DATE, CONCISE, RELIABLE.

ORDER FORM.

To The GRESHAM PUBLISHING Company, 49. Fort St, Bombay.

PLEASE supply me with one copy of THE MODERN CYCLOPEDIA in eight volumes, latest edition, on account of which I send you the initial payment herewith of Rs. 5 - and agree to pay the same amount per month for seven more months to whomsoever you may depute. I undertake not to part with the work until paid for.

Signature...

Rank or Profession ....

Address...

Date.......................1902.

ADDRESS ALL COMMUNICATIONS TO
THE GRESHAM PUBLISHING COMPANA
49, Fort St. BOMBAY.

"আমিত্বের প্রসার"১— ১মখণ্ড। ইহাতে ভূতযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ও ব্রহ্মযজ্ঞ এই পঞ্চযজ্ঞ, ব্রহ্মচারি, গৃহস্থ বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারি আশ্রমী; এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি বর্ণের শাস্ত্র ও যুক্তিসঙ্গত বিষদ ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ডিমাই ৮ পেজি ১৩০পৃষ্ঠা, কাগজে বাঁধান। মূল্য সমেত ডাক মাশুল ৸০ আনা মাত্র। হিন্দুর দৈনিক কার্য্যাবলী কিরূপে আত্মপ্রসারের অনুকুল এই গ্রন্থে তাহা চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া দেখান হইয়াছে!

যশোহর হিন্দুপত্রিকার ম্যানেজারের নিকট প্রাপ্তব্য।

The work (আমিত্বের প্রসার) states that amitva, egoism or selflove is the root of all evil in this world and hence its annihilation is taught in the Sastras as the means of attaining summum bonum. Now this annihilation can be effected not only by foregoing all love of self, but also by extending it indefinitely to nonself, or in otherwords not by not loving self, but by loving others like self. And all pre eminently Hindu institutions like the the five sacrifices, the four asramas and the four

castes have all been fromed with a view to attaining this very object and lead, when the duties and injunctions relating there to are obeyed in practice to more or less liberalisation of a person's sympathies and the increase of love for other. Let all Hindus, therefore remember this cardinal teaching of the sastras and carry it out in life by consecrating them selves to the service of their fellow creatures. The Book is exeed ingly well written and its altruistic teaching cannot fail to have a salutary and ennobling effect on the reader.

CALCUTTA GAZETTE. 4th April 1900 Bengal Library Catalogue for the 4th qr. 1899. pp. 18-19, No. 7271.

———o———

ভূগোলচিত্র।—(খগোল-চিত্র ও সূচিকা সহিতসিদ্ধান্ত সম্মত) দেবনাগর অক্ষরে লিখিত শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল, কৃত, থ্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোং-কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৩৲ টাকা। কলিকাতা সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারি অথবা যশোহর ব্রহ্মচারি আশ্রমের ম্যানেজারের নিকট প্রাপ্তব্য।

———

হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহকগণকে নিম্নলিখিত পুস্তক গুলি সুলভমূল্যে উপহার দেওয়া হইয়া থাকে ১। ঋগ্বেদভাষ্যোপোদ্ঘাত প্রকরণম্ ২৲ টাকা স্থলে ১৲ ২। আমিত্বের-প্রসার ৸৹ স্থলে ‖৹ ৩। শাণ্ডিল্যসূত্র ১৲ স্থলে ৸৹ ৪। ৺প্রভাবতী দেবীর কৃত অমল-প্রসূন ১৲ স্থলে—৸৹ ৫। শ্রীযুক্তবাবু শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত দার্শনিকমীমাংসা ১৲ স্থলে ৸৹ মোট ৩৸৹। যাঁহারা ৪খানা পুস্তক একসঙ্গে লইবেন, তাঁহারা ৩৸৹ স্থলে ২৸৹ আনায় পাইবেন। হিন্দু-পত্রিকার মূল্য প্রেরণের সময় সহৃদয় গ্রাহকগণ দরিদ্র আশ্রমকে যেন স্মরণ করেন। শ্রীকালী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

———:———

ম্যানেজারের বিজ্ঞাপন।

হিন্দুপত্রিকা নবমবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। সহৃদয় গ্রাহকগণের অনুগ্রহেই হিন্দুপত্রিকা এতদিন জীবিত থাকিয়া হিন্দুসমাজের ও হিন্দুধর্ম্মের সেবা করিতে পারিতেছে। হিন্দুপত্রিকার মূল্য সামান্য বার্ষিক ১‖৹ টাকা মাত্র। মনিঅর্ডারে পাঠাইতে ⁄৹ আনা লাগে মাত্র। পত্রিকার মূল্য অগ্রিম দেয়। গ্রাহকগণ স্বীয় স্বীয় মূল্য পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
ম্যানেজার, হিন্দুপত্রিকা।

যশোহর
১লা আষাঢ়

শ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২০ আইন মতে রেজেষ্টীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৯ম বর্ষ, ৯ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা।	বৈশাখ।	১৩০৯ সাল, ১৮২৪ শকাব্দা,

ওঁ তৎসত্।

মঙ্গলাচরণ।

—— •:o:• ——

ওঁ শান্তিঃ।

নমো ধর্ম্মায় মহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে।

ওঁ বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা; মনোমে বাচি প্রতিষ্ঠিতং, আবিরাবীর্ম্ম এধি, বেদস্য ম আণীস্থঃ শ্রুতম্মে মাপ্রহাসীরনেনাধীতেন অহোরাত্রান্ সন্দধামি, ঋতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি তন্মামবতু তদ্বক্তারমবত্ববতু মামবতু বক্তারং। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। ওঁ হরিঃ।

জগৎ যাঁহার করুণাচ্ছায়ায় লালিত, পালিত, সঞ্জীবিত-সম্বর্দ্ধিত, সেই মহামহিম পরমেশ্বরের চরণকমলে প্রণিপাত করি। জীব-জীবনের মানদণ্ডস্বরূপ পরমপবিত্র, মহৎ হইতে মহীয়ান, গুরু হইতেও গরীয়ান্ 'ধর্ম্ম'কে নমস্কার করি। পরমারাধ্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, বাক্য যেন অকপটতা অবলম্বন করিতে পারে। মনে যে সত্যতত্ত্ব যেরূপে প্রতিভাত হয়, বাক্যও যেন তাহাতেই পর্য্যবসিত হয়; মনের নিকট হইতে যাহা প্রাপ্ত হয়, বাক্য "চৌর্য্যবলে" যেন তাহার অতিরিক্ত কিছুই সংগ্রহ করে না। সত্য যেন আমার নিকট স্বরূপে আবির্ভূত

হয়। যেন জ্ঞানপ্রদ সত্য অধ্যয়নেই দিন-যামিনী যাপন করিতে পারি। সত্যের দ্বার যেন সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত থাকে। এই অতীত-শ্রুতসত্তা যেন আমাদিগকে পরিত্যাগ করে না বা ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় না। সত্য বলিব, সত্য বলিব। সত্যই জীবনের একমাত্র শান্তি। সত্য বক্তাকে রক্ষা করুন। সত্য-স্বরূপ ভগবান্ আমাদিগকে রক্ষা করুন।

বর্ষপ্রারম্ভে।

পুরাতন বর্ষের অবসান। শত আদর-অভ্যর্থনায় দৃক্‌পাত করিল না. কত ক্রন্দন, কত মর্ম্মপীড়াপ্রকাশ, কিছুই শুনিল না: নীরবে জগতের চ'খে ধূলি দিয়া পুরাতন-বর্ষ "মহাকালের বিরামমন্দিরে অন্তমিত হইল। বর্ষ গেল বটে, কিন্তু প্রাণের জ্বালা, মনের বেদনা, চিত্তের অশান্তি, সংসারের উপদ্রব, কিছুই লইয়া গেল না! পতিবির-হিণী রমণীর আকুল আর্ত্তনাদ, পুত্রহারা মাতার হৃদয়ের তীব্র অনল, বন্ধুহীন স্বজনের সুতপ্ত অশ্রুবারি, রুগ্নব্যক্তির পীড়াপ্রদাহ, যেমন তেমনি রহিল! কালের গতি অনি-বার্য্য, সুতরাং সহস্র অনুরোধেও মুহূর্ত্তমাত্র অবস্থান করা সম্ভব হইল না। কিছুরই প্রতিবিধান কি করিয়া গেল না? অবশ্যই গেল। মানবের উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিবিধানে প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেখাইয়া চলিয়া গেল। কতক-গুলি স্মৃতি-কন্টক মর্ম্মস্থানে বিঁধাইয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। যে কণ্টকগুলি কর্ত্তব্যের তাড়নায় অবিমৃশ্যকারী মানবের পথ পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে পারিবে, সেই স্মৃতিকণ্টক আমূল হৃদয়ে বিদ্ধ করিয়া রাখিয়া গেল। অজ্ঞতার অন্ধকারে দৃষ্টিহারা, আত্মহারা আমরা দেখিতে পাই না, পুরাতন বর্ষ আমাদের কি মহোপকার করিয়া গেল। অবশ্য অনেকাংশে অতীতের ব্যবহার নির্ম্মম, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে "নির্+মম" ব্যবহারই সুচারু-কর্ত্তব্যের পরিচয়। "মম" জ্ঞানই জগৎকে কর্ত্তব্য-বহির্ভূত পন্থায় লইয়া যায়। অনুচিত পক্ষপাত অবলম্বন করিতে, মানব কেবল একমাত্র 'মমত্বের' নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হয়। যেখানে কর্ত্তব্যসাধন, সেইখানেই নির্ম্মমতা, সেইখানেই তীব্রতা; কর্ত্তব্যের মার্গ বড় দুর্গম--বড় দুরারোহ। শাস্ত্র বলেন, "ক্ষুরস্য ধারানিশিতা দুরত্যয়া" কর্ত্তব্যপথ ক্ষুরধারের ন্যায় দুরত্যয়ই বটে। সুতরাং কেমন করিয়া বলিব, কঠোরতায় শিক্ষা নাই। পুরাতন বর্ষ নীরবভাষায় বলিয়া গেল, "জাগ, কর্ত্তব্যের অনুশরণ কর।" ভ্রান্ত আমরা শুনিতে পাইলাম না, সে নীরব-অপূর্ব্ব ভাষার অপূর্ব্ববাণী কর্ণগোচর হইল না! তাই পুরাতন বর্ষ স্মৃতিকণ্টক হৃদয়-দেশে বিঁধাইয়া রাখিয়া গেল! যদি এ নেশা ছুটে, যদি এ দশার পর্য্যবসান ঘটে, তবে সেই এক একটী কণ্টকের একটু একটু বেদনা আমাদিগকে অকর্ত্তব্য মার্গে পদার্পণ করিতে সহস্রঅসুরবলে বাধা দিবে। তাই বলিতেছি, পুরাতন বর্ষ অনেক শিক্ষা ও কর্ত্তব্যের উপদেশ দিয়া গিয়াছে। সেই কর্ত্তব্য জীবনে প্রতিপালন করিতে হইবে। সেই কল্পিত আদর্শের প্রতিকৃতিরূপে জীবন গঠন করিতে হইবে। নচেৎ যে তিমিরে, সেই তিমিরে, সেই অঘোর নিদ্রায়!

বর্ষপ্রারম্ভে ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করি, সেই উপদেশই যেন কার্য্যে পরিণত হইতে পারে। হিন্দু-পত্রিকা নববর্ষে নব নব কর্ত্তব্যভার মস্তকে বহন পূর্ব্বক ইষ্টনিষ্ঠ হিন্দু-সমাজের নিকট উপস্থিত। ধার্ম্মিকের আশীর্ব্বাদে, পূর্ব্বাচার্য্য মহর্ষিগণের অপূর্ব্ব-মাহাত্ম্য-বলে, যেন কর্ত্তব্যের তীব্র অগ্নি-পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারে, ইহাই পরমেশ-পদে প্রার্থনা। হিন্দু পত্রিকা যেন সাধু-অসাধু শত্রু-মিত্র সকলকেই সমস্নেহে আলিঙ্গন করিতে পারে। সকলেরই প্রীতির কারণ হইতে পারে। হিন্দু-পত্রিকা হিন্দু-সমাজের পরিচর্য্যাব্রতে যে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা যেন সম্পূর্ণ করিতে পারে; দেশের দশের কাছে, হিন্দু-শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ও হিন্দু-পত্রিকার প্রতি স্নেহশীল মহাত্মাদের কাছে এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে। সাম্প্রদায়িকতার পঙ্কিলপ্রবাহে যেন হিন্দুপত্রিকার কলেবর কর্দ্দমাক্ত না হয়। নিন্দাপ্রশংসার পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া কেবল বিশুদ্ধ কর্ত্তব্য পালনেই যেন ইহার জীবন অতিবাহিত হয়, সকলের নিকট এই আশীর্ব্বাদ চাই। সমাজের দ্বেষ-বিদ্বেষের অংশ গ্রহণে যেন হিন্দু-পত্রিকার অধিকার না থাকে, ইহাই চাই। বন্ধুগণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা, গুরুজনের আশীর্ব্বাদ যেন অক্ষয় কবচরূপে হিন্দু পত্রিকার অঙ্গে লগ্ন থাকে। মঙ্গলময়ের চরণে প্রার্থনা করি, হিন্দু-পত্রিকার অনুগ্রাহক গ্রাহকমণ্ডলী যেন হিন্দুধর্ম্মের আলোচনায় ও অনুষ্ঠানে তৎপর থাকিয়া আর্য্যধর্ম্মের মহামূল্য সত্যগুলির সম্মান সংরক্ষণে কৃতকার্য্য হন। হিন্দু-পত্রিকার সহিত তাঁহাদের যে সম্বন্ধ, তাহাও যেন তাঁহারা বিস্মৃত না হন। আমরা স্বধর্ম্মপরায়ণ মহোদয়গণের প্রতি ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদের উদ্দেশে যথোচিত সম্মাননা প্রদর্শন পুরঃসর "পরস্পরের কর্ত্তব্যবিনিময়ই প্রার্থনীয়" এই অনুরোধ করিয়া নববর্ষের কর্ত্তব্যপালনে মনোনিবেশ করিলাম।

ওঁ শান্তিঃ।

ধর্ম্ম কল্পিত বস্তু নহে।

(ধর্ম্ম-সম্বন্ধে মহর্ষি মনুর মতের সংক্ষিপ্ত আলোচনা।)

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থ—, উৎকৃষ্টই হউক আর অপকৃষ্টই হউক, সকলই কাল-ধর্ম্মের অধীন। মহাকালের সর্ব্বগ্রাসী কবলে বিলীন না হইবে, এমন বস্তু, ব্যক্তি, গুণ, ক্রিয়া, কিছুই এ সংসারধামে সম্ভবে না। অল্পাধিক ভাবে সকলের উপরই কালচক্রের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যথা কথঞ্চিৎ বিকৃতি বা অন্যথাভাবও সঙ্গে সঙ্গেই সংঘটিত হইয়া থাকে; ক্রমশঃ পরিবর্ত্তনের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইলে, শেষে আমাদের স্থূল-দর্শী লোচন উহা গ্রহণ করিতে পারে। সূক্ষ্ম বা দুর্লক্ষ্য ভাব গ্রহণে আমরা সততই অপারগ, এইজন্য বিশেষ বিশৃঙ্খলার মধ্যে প্রকৃত-পদার্থের প্রকৃতরূপ পরিগ্রহে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির অপারগতা পরিলক্ষিত হয়। কালমাহাত্ম্যে ধর্ম্মজ্ঞানের অবস্থা-ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; আকার প্রকার অন্য-ভাব ধারণ করায়, বাহ্যদর্শী বৈদেশিক

পণ্ডিতগণ বস্তুতঃ উহার তত্ত্ব অবধারণ করিতে পারিতেছেন না।

পাশ্চাত্য দেশীয় কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে, জগতের আদিম বয়সে জীবকুল ধর্ম্ম-প্রিয়, সঙ্গীতপ্রিয় ইত্যাদি কত কিসের প্রিয় ছিল; আবার অধুনাতন সময়ে লৌকিক সুখ বা বিলাস-তরঙ্গেই ডুবিতে ভালবাসে। তাঁহারা ইহাদ্বারা সময় সময় এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তে (!) উপনীত হন যে, ধর্ম্ম বস্তুতঃ কাল্পনিক ভিত্তির উপর স্থাপিত, উহার কোনও যৌক্তিকতা নাই; জনসমাজের বয়োবৃদ্ধি এবং জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত ধর্ম্মের প্রতিও শ্রদ্ধাহ্রাস হইতেছে; অতএব ধর্ম্ম কেবল সমাজের শৈশবাবস্থার চিত্রক্রীড়া মাত্র, বুদ্ধিমান্ মানব উহার কোনও অস্তিত্ব পাইবেন না।"

পণ্ডিতপ্রবরের তর্কবিতর্ক উল্লেখ করা ও তাঁহার খণ্ডন মণ্ডনে প্রবৃত্ত হওয়া এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। মহর্ষি মনুর নিকট আমরা ধর্ম্মের যে লক্ষণ পাইয়াছি, তাহা যে জনসমাজের শৈশবাবস্থার ক্রীড়ামাত্র নহে, এবং তাহাই যে মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শ বলিয়া জগৎ গ্রহণ করিতে ন্যায়তঃ বাধ্য, এই কথাই এ প্রসঙ্গে বক্তব্য। যদি জগতে ধর্ম্ম' নামে পরিচিত পদার্থ বুদ্ধির বালক্রীড়া ভিন্ন আর কিছুই না হয়, যদি কল্পনা ব্যতীত সত্তা উহার সংস্পৃষ্ট না হয়, তবে উহা যে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর, ইহা বলিবার আবশ্যকতা দেখি না।

কল্পনার কুহকে অন্ধসন্ধিৎসু বিংশ শতাব্দীর মানব বাস্তবিকই ভুলিতে চাহে না। বিজ্ঞতার অভিমান এখন সমাজের মজ্জায় মজ্জায় খর-বেগে বৈদ্যুতিক শক্তির ন্যায় ক্রীড়া করিতেছে। এদিনে কেহই আর ভিত্তিশূন্য বস্তুর প্রতি বিশ্বাসবান হইতে চাহে না। প্রাচীন তন্ত্র, মন্ত্র, বচন রচন আর এখনকার গণ্য মান্য জনসমাজে আদর পায় না! অবশ্য যুক্তির আড়ম্বর, তর্কের কর্কশতা না হইলে এখন চলিতে পারে না। অতএব বাধ্য হইয়া আমরা তাহার বিবেচনা করিতেছি।

ধর্ম্ম শব্দ 'ধৃ' ধাতুর উত্তর 'মন্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহার দ্বারা যে বস্তু ধৃত হয়, তাহাই সেই বস্তুর ধর্ম্ম। যে শক্তি-বলে পদার্থ ধৃত অর্থাৎ অবস্থিত থাকে, সংক্ষেপে বলিতে গেলে, পদার্থের স্বরূপ যাহাদ্বারা রক্ষিত হয়, যে অনির্ব্বচনীয় বলে পদার্থ আপন প্রকৃতরূপ বা অস্তিত্ব সংরক্ষণে সমর্থ হয়, অর্থবা বিরূপতার (ধ্বংসের) করাল-কর হইতে আপনাকে রক্ষা করে, পদার্থের সেই অন্তর্নিহিত মেরুদণ্ডের মত শক্তি-বিশেষই ধর্ম্ম শব্দের অর্থ। ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে আমরা এই স্থানে আসিতে পারি। অগ্নির ধর্ম্ম দাহকতা, দাহকতাই অগ্নির স্বভাব রক্ষা করিয়াছে, দাহকতার বিগমে আর আমরা অগ্নির অনুসন্ধান পাই না। অগ্নির দাহকতাই ধর্ম্ম। অগ্নির স্বরূপ রক্ষা আবশ্যক হইলে, দাহকতার পরিরক্ষণ বা পরিবর্দ্ধনে যত্ন করাই সঙ্গত হয়। প্রত্যেক বস্তুর ধর্ম্মই তাহার আত্মরক্ষার উপায়। মানব সমাজেও 'ধর্ম্ম' বলিলে ঐরূপ বুঝা আবশ্যক হয়। যে শক্তি আছে বলিয়া আমরা মানুষ, যাহার অপগমে আমরা আর মানুষ থাকিতে পারি না, তাহাই আমাদের (মানুষের) ধর্ম্ম।

এই ধর্ম্ম সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান থাকে না। কখনও ইহা কোনও মানবে পরিস্ফুটরূপে পরিদৃষ্ট হয়, আবার কোনও স্থানে ইহাকে নিদ্রিত ভাবে আমরা লাভ করি। মনে করা উচিত, উপযুক্ত উপকরণের সাহায্য ব্যতীত আমরা বহ্নির দাহকতাও সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারি না। আবার কোনও পদার্থবিশেষ দ্বারা অগ্নির দাহকতা প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে, তাহাতেই 'দাহকতা নাই' এরূপ অনুমান সঙ্গত নয়। অবশ্যই ইহা স্বীকার করিতে হইবে, যেখানে আমরা স্পষ্টতঃ ধর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারি না, সেখানে ঐ ধর্ম্ম বীজভাব বা সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করিয়া ঐ বস্তুকে বিজাতীয় পরিবর্ত্তন হইতে রক্ষা করিতেছে। যদি ঐ ধর্ম্ম বস্তুতই বিদ্যমান না থাকিত, তবে ঐ বস্তুর জাত্যন্তরপরিণাম সংঘটিত হইত। এখন বলা যাইতে পারে, মনুষ্যত্ব রক্ষা করিবার জন্য যে "মনুষ্যধর্ম্ম" স্বীকার করিতে হয়, তাহা কোনও মনুষ্যে অল্প, কোথাও তদপেক্ষা অধিক, আবার অন্যত্র অধিক বা অল্প মাত্রায় বিরাজ করিতেছে। এক কথায়, মানুষ নামে যাহারা পরিচিত, তাহারা প্রত্যেকেই বিকাশিত মনুষ্যধর্ম্ম লাভ করিতে পারে নাই, অর্থাৎ সম্পূর্ণ মানুষ হইতে পারে নাই। ধর্ম্মের বিকাশের সহিতই তাহাদের মনুষ্য নামের সার্থকতা সুসম্পন্ন হইতে পারিবে।

এই মনুষ্যত্ববিকাশের জন্যই ধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক অংশের আবশ্যকতা। ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ভাগ অশেষ শাখায় বিভক্ত হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব এক বই নানারূপ হইতে পারে না। যে সকল অনুষ্ঠানের সাহায্যে মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়, অর্থাৎ ধর্ম্ম নিদ্রিতাবস্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক বিকাশদশা প্রাপ্ত হয়, সেই সকল অনুষ্ঠান দেশ, কাল, পাত্র ভেদে অসংখ্য বিভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সমাজের অদূরদর্শিতায়, অশিক্ষায় কুশিক্ষায়, অজ্ঞতায় অকৃতায়, উপায় অনুষ্ঠান অনুপযুক্ত পাত্রে, অস্থানে অসময়ে প্রবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিয়াছে। আর্য্যশাস্ত্রের গম্ভীর গৌরবময় অধিকার-নির্ব্বাচন বৌদ্ধবিপ্লবে বিপর্যস্ত হওয়ায়, অনুচিত অধিকার অনুপযুক্তপাত্রে অর্পিত হইয়া, উদ্দেশ্যের মূলদেশ দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে; কাজেই ধর্ম্মভাবের বিকাশ সুদূরপরাহত হওয়ায় ক্রমে নিদ্রিতভাবের আধিক্য উপস্থিত হইতেছে। তবে এখনও ধর্ম্মজীবনের বিকাশাবস্থা বহুজনাকীর্ণ মহানগরীতে বিরল বলিয়া, একেবারে বিরল হইতে পারে নাই।

এখন আমরা দেখিব, মহর্ষি মনুর ধর্ম্মলক্ষণ মানবজীবনে অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত কি না। ধর্ম্মলক্ষণ যথা,—

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং ॥

(৬ অঃ ৯২ শ্লোক মনুসংহিতা।)

ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ, এই দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ। ধর্ম্ম এই দশ আকারে মানবদেহে বিরাজিত। প্রাচীন পণ্ডিত কুল্লূকভট্ট বলেন— ধৃতি অর্থ সন্তোষ। ক্ষমা অর্থ অপকারীর প্রতি প্রত্যপকার না করিয়া হৃদয়ের উদারতা প্রকাশ। চিত্তবিকারের নানাবিধ প্রলোভক উপকরণ উপস্থিত

হইলেও, অন্তঃকরণকে স্বাভাবিক সংযত ভাবে রাখার নাম দম। অস্তেয় শব্দের অর্থ অন্যায়রূপে পরধন গ্রহণ না করা। আর শৌচ অর্থ দেহশুদ্ধি। (এখানে অন্তঃশুদ্ধির কথাও বুঝিতে হইবে) ইন্দ্রিয়গণের অধীনরূপে বিষয়চর্য্যা না করিয়া ইন্দ্রিয়কে নিজের অধীন করার নাম ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। ধীঃ অর্থে শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া যে জ্ঞান লাভ করা যায় এবং বিদ্যা অর্থ আত্মজ্ঞান। (আত্মার স্বরূপ কি? এই দার্শনিক মহারহস্যের আবিষ্কার) সত্য অর্থ যথার্থ কথন, অক্রোধ অর্থ ক্রোধের কারণ বিদ্যমান থাকিলেও অসাধারণ ধৈর্য্য-বলে ক্রোধের নিবারণ করা।

এই দশটী দ্বারা বাস্তবিকই মনুষ্যত্ব রক্ষিত হয়। মানুষের স্বতন্ত্রতা-অসাধারণতার মূলাধার এই দশটী। ইহারই নাম 'মনুষ্য-ধর্ম্ম"। সন্তোষের অভাবে জীবন শ্মশানে পরিণত হয়, সন্তোষ বড় সুখদ, বিশৃঙ্খল-সংসারে মানবাত্মার একটু বিরাম। এ বিশেষত্ব কল্পিত নহে, সমাজের শৈশব জীবনের খামখেয়ালীও নহে। ক্ষমা যথার্থই মানবের মহত্ব, ক্ষমাহীন মানব দানবের জ্যেষ্ঠভ্রাত। এ তত্ত্ব অবশ্য বুঝা আবশ্যক, ইহা জগতের অত্যুচ্চ নীতি। ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় কর্ত্তব্যজ্ঞান বিসর্জ্জন দিয়া, তাহারই কথায় তাহার পাছে যাইতে লাগিলে, প্রকৃতির স্রোতে ভাসমান পশুর সহিত মানব স্বীয় বিন্দুমাত্র পার্থক্য দেখাইতে পারিবেন না। ব্যবহার নীচতায় মনের সহিত দেহেরও পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবিত হয়। শাস্ত্রে "তদ্ভাবভাবিত" হইলে তদ্দেহলাভের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সুতরাং ইন্দ্রিয়পরবশ না হওয়া মনুষ্যের আত্মরক্ষা ব্যতীত আর কিছুই নহে। চিত্তদমনও এইরূপ। অন্তঃকরণে কলুষিত চিন্তার আবির্ভাবে বাধা দেওয়াই মনুষ্যের কর্ত্তব্য, লোভের সামগ্রীতে উচ্ছৃঙ্খল মন না যাইতে পারে, ইহাও ন্যায়তঃ দেখিবার বিষয়, ইহা আলঙ্কারিকের কল্পিত-তত্ত্ব নহে। শরীরের শুচিতা ও মনের শুচিতা উন্নতির সোপান। মন অশুচি অবনত হইলে নৈতিক অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। দেহ অশুচি থাকিলে আবার মন শুচি থাকিতে পারে না; সুতরাং মনুষ্যত্ব লাভ করিতে, শুচিসম্পন্ন হইতে হয়। গ্রন্থের অনুশীলন দ্বারা আমরা যে পরোক্ষজ্ঞান লাভ করি, তাহাও আমাদের মনুষ্যত্ব রক্ষার উপায়। অবশ্য পুস্তকে বৈজ্ঞানিক সত্য পাঠ করা এবং অপরোক্ষপরীক্ষিত সত্য লাভ, ভিন্ন পদার্থ; কিন্তু পূর্ব্বোক্তটী অপরোক্ষ জ্ঞানের উপকরণ, সুতরাং স্বরূপরক্ষার অনুকূল। ইহা ত্যাগ করিলে মানুষের মনুষ্যত্ব মলিন হইতে থাকে, ক্রমশঃ অনুশীলনহীন পশুপ্রকৃতির সন্নিকৃষ্ট হইতে থাকে। এ বিষয়ে প্রমাণ দিবার আবশ্যকতা নাই, সভ্যজগতে ইহা সর্ব্বতোভাবে স্বীকৃত। বিদ্যা অর্থ আত্মজ্ঞান, এই "আমি কি?" চিন্তার একমাত্র মানুষের অধিকার। এতাদৃশ মস্তিষ্কশক্তি বা স্নায়বিকশক্তি আপাততঃ অন্য কোনও জীবের দেখা যায় না, যাহা আত্ম-স্বরূপ নির্ব্বাচনরূপ গুরুতর চিন্তার স্থান দিতে পারে। যদি আমাকে আমি না চিনিলাম, তবে আমার মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণ কিসে? সত্যের কথা বলিতে চাহি না।

সমগ্রজগৎ সমস্বরে সত্যের মহিমা ঘোষণা করে। সত্য যে মনুষ্যত্ববিকাশের একান্ত অনুকূল, যথার্থ ব্যতীত কৃত্রিম উপকরণ আত্মরক্ষায় উপায় হইতে পারে না, ইহা নীতিবাদের বিজয়দুন্দুভিতে মহারবে ঘোষিত হইতেছে, এখানে উহা বক্তব্য নহে। উদাষ নীতির মধ্যে অক্রোধ শ্রেষ্ঠাসনে বসিবার যোগ্য। এই সকল গুলির নাম ধর্ম্ম, ইহাই মানুষের মনুষ্যত্ব রক্ষা করে। এগুলিকে ত্যাগ করিলে মানুষ আর মানুষ থাকে না, পশুর সহিত মানুষের বিশেষ কিছু পার্থক্য আর তখন দেখান যায় না।

তাই আমরা বলিতে চাহি, লৌকিক-যুক্তি-বলেই এগুলি দ্বারা মনুষ্যত্ব রক্ষিত ও বিকশিত হয়, ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে, কল্পনার উত্তাল তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতে হয় না। পাশ্চাত্য দেশীয়েরা ধর্ম্মের এই লৌকিক-আদর্শই অনেকে গ্রহণ করেন, তজ্জন্য অনেকে নীতিবাদী হন। তাঁহারা ইহার অলৌকিক তত্ত্ব আত্মস্বরূপ লাভটা একেবারে উড়াইয়া দিতে চাহেন। তাঁহাদের যুক্তি-তর্কের বিচার করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে, নীতি কেবল সংসারের চ'খে ধূলি দেওয়া মাত্র হইলে চলে না, উহাতে নীতির মূল্য অত্যল্পই থাকে। মহাসত্তায় বিশ্বাস করিতে হইবে। ধর্ম্মহীন নীতি কুনীতি, নীতিহীন ধর্ম্ম অধর্ম্ম। ধর্ম্ম ও নীতি একই দ্রব্যের লৌকিক এবং অলৌকিক দুই পৃষ্ঠ। একটী ছাড়িলে অপরটীর গুরুত্ব ও পবিত্রতা নষ্ট হয়, পাশ্চাত্য দেশীয় কোনও কোনও পণ্ডিত ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন। ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যার (১৩০৮) হিন্দু-পত্রিকায় 'ইহকাল পরকাল' প্রবন্ধে "নীতি ও ধর্ম্মের অপেক্ষা পারস্পরিক, যেহেতু দুইটী একই জিনিষের অবস্থাদ্বয়" ইহা সংক্ষেপতঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে, অনুসন্ধিৎসু তাহা দেখিতে পারেন।

সময়ান্তরে আমরা দেখাইব "নীতি-বিজ্ঞান ধর্ম্মের অনুকূল। কেবল লৌকিক মানিলে চলিবে না, ধর্ম্মের অলৌকিক স্বরূপও যুক্তি দ্বারা প্রদর্শিত হইতে পারে" বর্ত্তমান প্রবন্ধে ইহাই বলা আবশ্যক, মনূক্ত দশলক্ষণধর্ম্ম মানবের আত্মোন্নতির উৎকৃষ্ট লৌকিক কারণ। ঐ ধর্ম্ম বীজভাবে আমাদিগের সত্তায় অবস্থান করিতেছে বলিয়াই আমরা মানুষ। প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে, ঐ বীজভাবাপন্ন ধর্ম্মকে জাগাইতে হইবে; তাহাহইলে মনুষ্যত্বও জাগিবে। নামে মানুষ, কার্য্যেও মানুষ হওয়া যাইবে। মনুষ্যত্ব প্রস্ফুটিত না হইলে, মানুষ নাম ধারণ বৃথা। ধৃতি, ক্ষমা প্রভৃতিকে পরিপক্ক অবস্থায় না লইতে পারিলে, ধর্ম্ম বিকশিত হইল না। ধর্ম্মজীবন পূর্ণতা লাভ করিল না, প্রকৃত ধার্ম্মিক হওয়া গেল না; এক কথায়, প্রকৃত মানুষ হওয়া গেল না; তাই নানাবিধ আনুষ্ঠানিক পন্থা অবলম্বন করিয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। আমাদের প্রত্যেক আচার ব্যবহারই আত্মবিকাশের অনুকূল, মানবাত্মার উন্নতির উৎকৃষ্ট উপকরণ। তবে সময়বিশেষে গৃহীত আচার, আবশ্যক অতীত হইলেও কুলক্রমাগত ভাবে চলিত হইয়া গিয়াছে।

একটী বাল্যকালের গল্প মনে আসিল, পাঠকগণ চপলতা মার্জ্জনা করিবেন। কোনও

গৃহস্থের গৃহে পালিত কতকগুলি মার্জ্জার ছিল, তাহারা ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবহার্য্যসামগ্রী-গুলি অপবিত্র করিবে মনে করিয়া গৃহস্বামী ধর্ম্মকার্য্যের দিনে তাহাদিগকে বন্ধন করিতে বাধ্য হইতেন। অপরিণত-বুদ্ধি বালক পুত্র পিতার এই কার্য্য শিক্ষা করিল, কিন্তু কারণ অনুসন্ধান করিল না। পরে পিতার মৃত্যুর পর, ধর্ম্মকার্য্যমাত্রেই সে মার্জ্জার বন্ধন করিত; গৃহে পালিত মার্জ্জার না থাকিলেও অন্য বাটী হইতে সংগ্রহ করিয়া বন্ধন করিয়া রাখিত; মনে করিত উহা ধর্ম্মের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ! বর্ত্তমান অনেক আচার ঐ প্রকার কারণ হইতে আসিয়াছে। উহারা প্রকৃত ধর্ম্ম নহে। কোনও প্রথা সর্ব্বদা সমভাবে কার্য্যকারী হইতে পারে না, এই জন্য অনেক শাস্ত্রীয় প্রথাও আত্মবিকাশের প্রতিকূল হইয়াছে। দেশ, কাল, পাত্র-ভেদ না ভাবিয়া, কেবল উপধর্ম্মকে ধর্ম্মের আসনে বসাইয়া, আমাদের ধর্ম্মজীবন ক্ষীণ করিতেছি। অবসরে আমরা প্রকৃত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান অর্থাৎ মনুষ্য-ধর্ম্মবিকাশের জন্য যে আনুষ্ঠানিক উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহার কতকগুলির উল্লেখ করিব এবং উপযোগিতা বুঝাইতে প্রয়াস পাইব।

দীন শ্রী————ভারতী।
(যশোহর, বেদবিদ্যালয়।)

বর্ণশ্রেষ্ঠত্ব নির্ব্বাচন।

জাতি-বিভাগ নির্ব্বাচন তত্ত্ব লইয়া আজ আমরা হিন্দু-সমাজে, ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, মহাব্যতিব্যস্ত দেখিতে পাইতেছি। মহামান্য শ্রী মাধবরাও এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে "যতই অধিক দিন বাঁচিয়া থাকা যায় এবং যতই অধিক পর্য্যালোচনা করা যায়, ততই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই পৃথিবীতে অন্য কোন জাতিই, হিন্দু-সমাজের ন্যায় নিজেদের স্বইচ্ছায় সৃষ্ট সুতরাং সহজেই পরিহার্য্য সামাজিক আচার ব্যবহারের নিয়ম পদ্ধতি হইতে যত অধিক দুঃখ কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করেন, রাজনৈতিক কার্য্যাবলী হইতে সেরূপ বিশেষ কোন অসুবিধা ভোগ করেন না।" আত্মসৃষ্ট বিপদাবলীর মধ্যে জাতিপ্রথা অন্যতম বিপদ। হিন্দু-সমাজে ইহা অভিশাপের ন্যায় কার্য্য করিয়াছে। প্রত্যেকে জাতিগর্ব্বে গর্ব্বিত। স্বদেশহিতৈষিতা ভারত হইতে তিরোহিত হইয়াছে। হিন্দুগণ সাধারণতঃ স্বজাতি ব্যতীত, অন্য কোন জাতি বা শ্রেণীরে সুখ-দুঃখের প্রতি আদৌ লক্ষ্য করেন না। জাতিভেদ-প্রথা পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক সহানুভূতি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। ইহাতে লোকে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদিগকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতি স্বরূপ গণ্য করিয়া থাকে। উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা নিম্ন শ্রেণীর চাষার প্রভৃতি জাতিকে স্পর্শ করাও অপবিত্র বোধ করেন। ত্রিবাঙ্কুড় দেশে কোন কোন নীচ জাতি ব্রাহ্মণের পাঁচাত্তর পদ পরিমিত স্থান অপেক্ষা নিকটে আসিতে পারে না। উচ্চ-বংশের কোন লোক তাহাদের নিকট আসিতে লাগিলে তাহারা রাস্তা হইতে দূরে চলিয়া যায়। যদিও বর্ত্তমানে সামাজিক আচার ব্যবহারের অনেকটা শৈথিল্য দৃষ্ট

হয়, তথাপি কোন কোন নীচ জাতীয়ের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করাহয়, তাহা ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোন দেশে কেহই সহ্য করিতে পারেনা। এমনকি, বঙ্গদেশের প্রসিদ্ধ ধনশালী সুবর্ণবণিক ও সাহাদিগের প্রতি এতদূর অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার করাহয় যে, উচ্চ শ্রেণীর কেহই তাহাদের জল পর্য্যন্ত ব্যবহার করেন না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শিক্ষিত হিন্দুসম্প্রদায়ের কার্য্য কলাপ দেখিয়া বোধ হইয়াছিল যে, জাতিপ্রথাই যে জাতীয় অবনতির প্রধান কারণ, তাহা যেন তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সমাজ এখন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব ধারণ করিয়াছে। হিন্দু জাতির অবনতির প্রধান কারণ সেই জাতিপ্রথা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রায় সকলকেই বদ্ধপরিকর দেখা যাইতেছে। নীচ জাতিদিগের প্রতি আমরা যেরূপ অবজ্ঞা ও ঘৃণার ভাব প্রদর্শন করি, তাহা একান্ত অন্যায়। বরঞ্চ তাহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া থাকা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। হিন্দু ধর্ম্মানুরাগী নিকৃষ্ট জাতি সকল সমাজে যে অবস্থায় পরিণত ও যে যে কার্য্যে নিয়োজিত আছে, তাহারা যদি সে অবস্থায় থাকিতে ও সেই সব কার্য্য করিতে অস্বীকৃত হয়, তবে তখন যে সমাজে কিরূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। রজকের জল কোন হিন্দুই ব্যবহার করে না এবং কাহার ঘরেও সে প্রবেশ করিতে পায় না। যদি সে তাহার পৈতৃক বস্ত্রধৌত-করণ ব্যবসায় করিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে আমাদিগকে কত অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। এইরূপ আরও বহুতর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

বোম্বে হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব চন্দ্র বার্কর এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে "জাতি-প্রথার পক্ষপাতীদিগকে আমি অনেক সময়ে এরূপ প্রশ্ন করিতে শুনিতে পাই যে— "ইংলণ্ড দেশেও কি জাতিপ্রথা প্রচলিত নাই ?" আভিজাত্যাভিমানী কোন ব্যক্তি কৃষকের কন্যাকে বিবাহ করিতে অপমান বোধ করেন না কি ? এই প্রশ্নোত্তরে আমি এই কথা বলি যে, ভারতবর্ষে যে আকারে ও যেরূপ ভাবে জাতি-প্রথা প্রচলিত আছে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশেই সেরূপ দৃষ্ট হয় না। বিলাতের কোন লর্ড কোন কৃষকের কন্যার পাণিগ্রহণ করা অপমানসূচক বোধ করিতে পারেন বটে, কিন্তু সেই কৃষক আবার সময়ে নিজেই একজন লর্ড হইতে পারেন। কার্ডিন্যাল নিউম্যান সাহেব খৃষ্টিয়ানদিগের সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, সমস্ত ইংরাজ জাতি সম্বন্ধেও সেই কথা প্রযুক্ত হইতে পারে। 'যাহারা এখন খৃষ্টিয়ান দলভুক্ত নহে, তাহারা যে কোন সময়ে ঐ দলভুক্ত হইতে পারিবেন না, এরূপ বলা যাইতে পারে না।' কিন্তু ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই থাকিবে, শূদ্র শূদ্রই থাকিবে। শূদ্র কস্মিন্ কালেও ব্রাহ্মণ হইবার আশাও করিতে পারে না। এইজন্য পরস্পরের মধ্যে আদৌ সৌহৃদ্য ভাবও দৃষ্ট হয়না। ষাট বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার কোন হিন্দু-সভাতে বারন্স সাহেবের নিম্নলিখিত কথাগুলি অতি সমাদরের সহিত গৃহীত হইয়াছিল :—

অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থার লোকের প্রতি আমাদের কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে কবি কারলাইল বলেন যে—"কঠিন পরিশ্রমকারী, বক্রিম দেহধারী সদাশয় শ্রমজীবীগণকে আমি বিশেষ শ্রদ্ধা করি। প্রখর রৌদ্রতাপে শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা সাধুভাবে নিজেদের জীবিকা অর্জ্জনকারী শ্রমজীবীদিগকে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা করি। ভ্রাতাগণ! লোকে তোমাদের প্রতি বড়ই নির্দ্দয় ব্যবহার করে। তোমাদের শারীরিক পরিশ্রমের জন্য তোমাদিগকে অবশ্য আমরা দয়া করিব এবং ভাল ও বাসিব। আমাদিগের জন্যই তোমার পৃষ্ঠদেশ এরূপ ন্যুব্জভাব ধারণ করিয়াছে। আমাদিগের জন্যই তোমার সরল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল এরূপ বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। আমাদিগের জন্যই পরিশ্রম করিতে করিতে তোমার শরীর এরূপ বিবর্ণ ও বিকৃত হইয়াছে। তোমার সুন্দর আকৃতি আদৌ বিকাশিত হইতে পারে নাই। অনবরত শারীরিক পরিশ্রমে ইহা বিকৃত হইয়া রহিয়াছে। তোমার আত্মা এবং শরীর কখনও স্বাধীনতার বিমল আনন্দ অনুভব করিতে পারে নাই। অনবরত পরিশ্রম করাই তোমার জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য কার্য্য। দলিল জাল, মিথ্যা সাক্ষ্য ও মিথ্যা মোকদ্দমা দ্বারা জীবিকা অর্জ্জনকারী, আলস্যপরায়ণ, ভদ্রবংশীয় ব্যক্তি অপেক্ষা কঠিন শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা সাধুভাবে জীবিকা অর্জ্জনকারী চণ্ডালও শতগুণে শ্রদ্ধাস্পদ ও মাননীয়।

বর্ত্তমানে শিক্ষিত হিন্দুসমাজকে জাতি-প্রথার প্রতি বিশেষ অনুকূল দেখা যাইতেছে। এই জাতিপ্রথার আন্দোলনে গভর্ণমেণ্টের নিরপেক্ষভাবে থাকা উচিত। কিন্তু ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, গভর্ণমেণ্ট পরোক্ষভাবে ইহা আরও উত্তেজিত করিয়া দিতেছেন। শিক্ষিত হিন্দু-সমাজে যে নব জাতীয় ভাবের বিকাশ দেখা যাইতেছে, তাহাতে গভর্ণমেণ্ট যে অসন্তুষ্ট হইবেন, একথা আমরা আদৌ বিশ্বাস করিতে পারি না। জাতি-প্রথার তথ্য অনুসন্ধানে, গভর্ণমেণ্টের রাজ্য-শাসন সম্বন্ধীয় কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। জমির সহিত বিভিন্ন জাতির সংস্রব, তাহাদের খাজনা পাওয়ার অধিকার, বাণিজ্যের সহিত তাহাদের সংস্রব, এবং তাহাদের আভ্যন্তরিক অন্যান্য বন্দোবস্ত, এই সমস্ত বিষয় রাজ্যশাসন প্রণালীর সহিত অচ্ছেদ্য রূপে সম্বন্ধ রহিয়াছে। জাতিপ্রথার বিশেষ অনুসন্ধানে আধুনিক মানববিজ্ঞান [anthropology] শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত স্যার জন লাবক, স্যার হেনরী মেন, টেলর সাহেব প্রভৃতি মহোদয়গণও বিশেষ সাহায্য ও উপকার পাইতে পারেন। কিন্তু বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পরের প্রতি একটী বিদ্বেষ ভাবের উৎপত্তি না করিয়াও এই সমস্ত অনুসন্ধান করা যাইতে পারে। যদিও স্যার লিপেল গ্রিফিন এক সময় বলিয়াছিলেন যে, "জাতি প্রথা এখনও বিশেষ বলবৎ আছে এবং সুবিজ্ঞ শাসনকর্ত্তা ঐ জাতীয় বিদ্বেষভাব একেবারে উন্মূলিত না করিয়া বরঞ্চ আরও বর্দ্ধিত করিতে চেষ্টা করিবেন।" তথাপি গভর্ণমেণ্টের জানা উচিত যে, এই জাতিপ্রথা এবং ইহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য কুসংস্কারই ইহার প্রধান শত্রু। সেই

সেপাহীবিপ্লবও জাতিপ্রথা হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। ভারতবাসীদিগের স্বাধীনতা ও স্বত্বাধিকারের প্রধান সনন্দস্বরূপ সেই ১৮৫৮ সালের সুবিখ্যাত ঘোষণাপত্রে গবর্ণমেণ্টের শাসনপ্রণালী সুবিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। গবর্ণমেণ্ট অবশ্য জাতিপ্রথা উঠাইয়া দিতে পারেন না। কিন্তু ইহাকে কোনরূপে বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়াও গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নহে। সমস্ত জাতির প্রতি গবর্ণমেণ্টের নিরপেক্ষ ভাব অবলম্বন করাই উচিত।

জাতিবিভাগের অবশ্য অনেক প্রকার সুবিধা আছে। যখন কোন একটী ব্যবসায় বংশপরম্পরা চলিয়া আসিতে থাকে, তখন সে ব্যবসায়ে পিতার উপার্জ্জিত জ্ঞান ও নৈপুণ্য সহজেই পুত্রে আসিয়া বর্ত্তায়। অসভ্য মনুষ্যগণ পশুদিগের ন্যায় স্বতন্ত্র ভাবে বাস করিতে ভালবাসে। কিন্তু বিভিন্ন ব্যবসায়ানুযায়ী জাতিবিভাগে পরস্পরের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি জন্মিয়া থাকে। ইহাতে মানব একই স্বার্থবিশিষ্ট বৃহত্তর একটী পরিবারভুক্ত হওয়ায় পরস্পরকে সাহায্য করিতে বাধ্য হয়। ইহাতে মানবকে শান্তস্বভাববিশিষ্ট এবং কর্ত্তৃপক্ষদিগের প্রতি সম্ভ্রমশীল করে। এক পক্ষে যেমন এই সব সুবিধা আছে, অন্যপক্ষে ইহাপেক্ষা অনেক বেশী অসুবিধাও আছে। জাতীয় উন্নতির প্রথম অবস্থায় জাতিবিভাগ আবশ্যকীয় হইতে পারে, কিন্তু চরম উন্নতির পক্ষে ইহা চরমে বিঘ্নকর হইয়া দাঁড়ায়।

আমাদিগের শিল্পবিদ্যা, বিজ্ঞান এবং সামাজিক রীতি নীতি সম্বন্ধে আমরা কতকটা উন্নতি করিয়া ক্ষান্ত আছি। দুই তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে আমাদের শিল্পবিদ্যা ও বিজ্ঞান যে অবস্থায় উন্নত হইয়াছিল, তাহা এখনও সেই অবস্থায় আছে। ইউরোপ ও আমেরিকা দেশে বাষ্পীয় যন্ত্র ও সূত্রপ্রস্তুতির যন্ত্রাদি যে মহাত্মারা করিয়াছেন, তাঁহারা সেই২ ব্যবসায়ী লোক ছিলেন না। এদেশে আমরা শিল্প কার্য্য ও ব্যবসায়কে বিশেষ ঘৃণা করি। সূত্রধর, চিত্রকর, স্বর্ণকার প্রভৃতি জাতি নীচ জাতি মধ্যে গণ্য। অন্যান্য শ্রমজীবী ব্যক্তিগণও বিশেষ সম্মানিত বলিয়া বিবেচিত হন না। সমাজ যে ব্যবসায়কে সম্মানিত বিবেচনা না করেন, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই সেরূপ ব্যবসায় অবলম্বনে স্বীকৃত হইবেন না। বৈদেশিক বাণিজ্যের পথেও জাতিপ্রথা নানারূপ বাধা বিঘ্ন উপস্থিত করে। বোধ হয়, কেবল একমাত্র হিন্দু-জাতিরই কোন বৈদেশিক বাণিজ্য নাই। ইহাতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইয়াছে, ইহা বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে নানারূপ বিবাদ উপস্থিত করিয়াছে এবং জাতীয় ভাবের উন্নতি বিষয়ে বিঘ্ন করিয়াছে। ইহাতে সমস্ত জাতিকে অবনত করিয়াছে এবং কোন কোন শ্রেণীকে পশু অপেক্ষাও অধম করিয়া রাখিয়াছে। মনুসংহিতা পাঠে চণ্ডাল ও শূদ্রদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহারের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ঋষিদিগের কথা দূরে থাকুক, কোন মানবে যে সেরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা আদৌ বিশ্বাস হয় না। কতকগুলি পশুবধে যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা, একটী শূদ্র হত্যাতেও সেই প্রায়শ্চিত্তের

বিধান রহিয়াছে। শূদ্র হত্যা করিলে যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে, বিড়াল, নকুল, কুকুর, ভেক, সরীসৃপ, পেচক বা কাক মারিলেও সেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। মনু বলেন, উচ্চ শ্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগের দাসত্ব করার জন্যই শূদ্রের জন্ম। ক্রীত বা অক্রীত শূদ্রকে ব্রাহ্মণ দাসত্ব করিতে বাধ্য করিতে পারেন। তাহার প্রভু তাহাকে মুক্তি দিলেও সে দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারে না। শূদ্রের দ্রব্যাদি ব্রাহ্মণে নিরুদ্বেগে দখল করিতে পারেন। যদি কোনরূপ অসম্ভ্রমসূচক ভাবে সে উচ্চ শ্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগের নামোল্লেখ করে, তবে দশ অঙ্গুল পরিমাণ তপ্ত লৌহশলাকা তাহার মুখের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিবে। সে যদি তাঁহাদিগকে গালাগালি করে, তবে তাহার জিহ্বা কাটিয়া ফেলিবে। সে যদি তাঁহাদিগের সহিত একাসনে উপবেশন করে, তবে তাহার পশ্চাদ্‌ভাগে তপ্ত শলাকা দ্বারা দাগ দিয়া তাহাকে দূরীভূত করিয়া দিবে অথবা সেই পশ্চাদ্‌ভাগ একেবারে কাটিয়া ফেলিবে। মৃত ব্যক্তিদিগের ত্যক্ত পরিচ্ছদাদিই চণ্ডালেরা বস্ত্ররূপে ব্যবহার করিবে এবং ভগ্ন পাত্রে তাহারা আহার করিবে। লৌহের গহনা পরিধান করিবে এবং অনবরত ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে। এই সমস্ত বিধান পাঠকরিতেও শরীর কম্পিত হয়। জাতিপ্রথানুযায়ী উচ্চশ্রেণীস্থ সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য সকল লোকই একরূপ অজ্ঞ থাকিবে। উচ্চশ্রেণীর লোক অপেক্ষা অন্যান্য শ্রেণীর লোক বোধহয় শতগুণ অধিক। জাতিপ্রথানুসারে তাহারা সকলেই অজ্ঞ থাকিবে।

জাতিপ্রথা প্রকৃত ধর্ম্মবিরুদ্ধ এবং প্রাচীন শাস্ত্রবিরুদ্ধ। ভারতবর্ষে ইহা বহু শতাব্দী ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে এবং হঠাৎ ইহা রহিত করা যাইতে পারে না। আমাদিগের ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, এই জাতিবিভাগই আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক, শারীরিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অবনতির প্রধান কারণ এবং সমাজকে একেবারে বিধ্বস্ত না করিয়া সকবিষয় সংশোধন করিতে হইবে। ভারতমাতার সন্তানগণ জাতীয় বিদ্বেষভাব আর বর্দ্ধিত না করিয়া সকলেই কমাইতে চেষ্টা করিবেন। একজন মহাত্মা বলিয়াছেন যে "জাতিপ্রথা মানবমণ্ডলীর ভ্রাতৃভাব নষ্ট করিয়া দেয়। ইহাতে সামাজিক পার্থক্যকে ঐশ্বরিক বিধানরূপে পরিণত করে এবং ঈশ্বরের দোহাই দিয়া পরস্পরের মধ্যে নানারূপ শত্রুতা ও বিবাদের সূচনা করিয়া দেয়। ইহাতে এক সম্প্রদায়কে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করে। তাহাকেই শিক্ষা দীক্ষার ভার এবং সামাজিক প্রাধান্যের অন্যান্য যাবতীয় সুবিধা অর্পণ করে। তাহাকে লক্ষ লক্ষ দুর্ভাগা মানবকে চিরদাসত্বে আবদ্ধ করিয়া যথেচ্ছভাবে পদদলিত করিবার ক্ষমতা দান করে। ইহাতে ব্রাহ্মণদিগকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া পরিচয় দেয় এবং অন্যান্য লোকদিগকে স্বর্গের বা মনুষ্যত্বের অযোগ্য, অপবিত্র নীচজাতীয়রূপে পরিগণিত করে। এইরূপ ঘৃণিত দাসত্বের বিধান এবং এইরূপ কষ্টকর যথেচ্ছাচার কে সহ্য করিতে পারে? অপর, আর একজন পণ্ডিত

ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন যে, 'জাতিপ্রথা যুক্তি এবং বিবেকবিরুদ্ধ এবং ইহাতে নানারূপ অবনতি ঘটে। ইহাতে সমাজের অধিকাংশ লোক বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্ম, অর্থ ও পবিত্রতাশূন্য হইয়া পড়ে। ইহাতে পরম পিতা পরমেশ্বরকে পক্ষপাতী ও রাগ-দ্বেষপূর্ণ বলিয়া পরিচয় দেয়। আমি এজন্য পুনর্বার বলিতেছি যে, আমরা যদি মানবপ্রকৃতি এবং ঈশ্বরের চিরন্তন নিয়মের প্রতি লক্ষ্য এবং দেশের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষা করি, তাহা হইলে জাতিভেদ প্রথা উঠাইয়া দেওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য"।

বনপর্ব্বে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন যে "সকল মনুষ্যেরই জন্ম, মৃত্যু ও সন্তানোৎপত্তি একইরূপ। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যাঁহার চরিত্র পবিত্র, তিনিই ব্রাহ্মণ"। যুধিষ্ঠিরের মত বুদ্ধদেবও বলিয়াছেন যে "জন্ম, বংশ বা জটাজুটদ্বারা কেহই ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না। যাঁহাতে সত্যতা ও ধর্ম্ম বিরাজমান, তিনিই ব্রাহ্মণ।" বর্ত্তমানে যাঁহারা জাতিপ্রথা ও বর্ণশ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বিবাদ করিতেছেন, তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, জাতিপ্রথা হইতে কোনরূপ সুফল লাভের আশা করা একরূপ বিড়ম্বনা মাত্র। বর্ত্তমানে যেরূপ জাতিভেদপ্রথা প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মবিরুদ্ধ। অধ্যাপক মোক্ষমূলর সাহেব বলিয়াছেন যে, মনুসংহিতায় উল্লিখিত এবং বর্ত্তমান সমাজে প্রচলিত জাতিপ্রথা বৈদিক সময়ে বিদ্যমান ছিল না। কি বিভিন্ন জাতিবিভাগ, কি ব্রাহ্মণদিগের নানারূপ স্বত্বাধিকার, কি শূদ্রদিগের নীচ অবস্থা, ইহার কোন বিষয়েরই বেদে কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। বিভিন্ন শ্রেণীস্থ লোকদিগের একত্র বাস করা, পান আহার করা কিংবা পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি করা সম্বন্ধে নিষেধসূচক কোন বিধান ছিল না। বর্ত্তমানে প্রচলিত জাতিবিভাগ বৈদিক সময়ে ছিল না, কিন্তু মনুসংহিতায় উহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা ক্রমশঃ দেখাইব যে, জাতিবিভাগ অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে হইয়াছে এবং ইহা বেদবিধানানুযায়ী নহে। শ্রুতিশাস্ত্রের সহিত পুরাণ বা স্মৃতিশাস্ত্রের অনৈক্যস্থলে শ্রুতিই প্রামাণ্য।

ক্রমশঃ—

শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষাষ্টক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তৃতীয় শ্লোকের আলোচনা।

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

তৃণ হতে নিজকে যে নীচ মনে করে।
তরু হইতেও যেবা সহিষ্ণুতা ধরে॥
নিজে যে অমানী হয়ে অন্যে মানদাতা।
তারি দ্বারা হরি হন কীর্ত্তনীয় সদা।

এই শ্লোকটির দ্বারা প্রকৃত হরিসংকীর্ত্তনকারীর উপযোগিতা বা লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। শুধু শব্দের "হরি" হয়ত

অনেকের দ্বারাই কীর্ত্তিত হন, কিন্তু অর্থের হরি— ভাবের হরি— রসের হরি— স্বয়ং হরি কেবল উপরোক্ত লক্ষণালঙ্কৃত নিরীহ নিষ্কিঞ্চন সুদীন ভক্তের পবিত্র কণ্ঠেই প্রকীর্ত্তিত।

"হরি" ত অনেকেই বলে, কিন্তু বলার মত বলিতে পারে কজনে? শিক্ষিত পক্ষীও ত হরি বলে। শুকের মুখে সুখের সময়েই কৃষ্ণনাম,—বিড়ালে ধরিলে কেবল ক্যাঁ ক্যাঁ—! সে অন্তিমে আর সে 'অন্তিমের ধন কৃষ্ণনাম' মুখে আসেনা। মনে যাহা নাই, তাহা কি আর তখন মুখে আসে? ভগবন্নামকে যে অন্তিমের সম্বল বলিয়া ঠিক চিনিয়াছে, অন্তিমকালে নাম তাহাকে ত্যাগ করেন না। আমাদের 'হরি' বলা একরূপ সখের হরি বলা; সুতরাং তাহাও শুকের হরিবলা-বিশেষ। আমাদের হরিনাম যেন পোষাকী, সুদীন ভক্তের হরিনাম প্রকৃত "আটপহুরে।" "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" বাক্যের তাহাই তাৎপর্য্য। কাহারও অন্তরে নিরন্তর হরি-সংকীর্ত্তন হইতেছে, যিনি শুনিবার তিনি শুনিতেছেন; বাহিরের লোকের শ্রুতি-নিরপেক্ষ-নীরবতায় সে সংকীর্ত্তন সংহত হয় না। সে অন্তঃশীলা সুধা-স্রোতস্বতী সদাকালই বহিতে থাকে।

"লোক-প্রতীতি বিষয়ে প্রবদামি কৃষ্ণং।
চেতঃ পুন র্বিষয়রাশি-নিবেশিতং মে॥
ভ্রষ্টাবধূর্নিজকরেণ পতিং স্পৃশন্তী।
গোপ্যাঙ্গমর্পয়তি জারজনায় সুপ্তং॥"

লোকেরে বুঝাতে বৈষ্ণবতা মোর
"কৃষ্ণ" বলি রসনায়।
কিন্তু মম চিত্ত নিত্য নিবেশিত
বিষয়রাশিতে হায়॥
ভ্রষ্টাবধূ যথা করি আলিঙ্গন
করে সুপ্ত স্বপতিরে।
স্বগোপ্যাঙ্গ করে গোপনে অর্পণ
আপন উপপতিরে॥

আমাদের হরিবলা এইরূপ। ভক্তের হরি স্বয়ং হরি, আর আমাদের হরি যেন 'হ' আর 'র' এ "ইকার" ধারীমাত্র। দীনের হরি রাসবিহারী, আর দাম্ভিকের হরি কেবল রসনা-বিহারী!

"অন্তরে বিষয়াসক্তি, বাহ্যে ভাক্ত হরিভক্তি,
দেখে শুনে 'হরিভক্তি উড়ে।'
ভাক্ত স্বর্ণ-অলঙ্কারে, আশু অঙ্গ শোভা করে,
পরীক্ষা-অনলে মরে পুড়ে॥"

অতএব শিক্ষাষ্টকের ৩য় শ্লোকে হরি-কীর্ত্তনের যথার্থ অধিকারী নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। ভাক্ত অনধিকারীর হরি-কীর্ত্তন-হুঙ্কারে কণ্ঠ বিদারিত, বায়ু বিকম্পিত, এবং নভোস্থল নিনাদিত হইলেও তাহা ভূলোকের ব্যোমভূতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ভক্ত অধিকারীর নীরব অন্ত-কীর্ত্তনও ভূলোক এড়াইয়া, দ্যুলোক ছাড়াইয়া, গোলকের সেই মোহন-মুরলী-তানে মুখরিত হয়! তাহাতে গোলকেশ্বরীর পুলক-নৃত্য-বিলাস বর্দ্ধিত হয়। হরিসংকীর্ত্তনের সার্থকতা ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? যে যে লক্ষণে অধিকারী হইলে, এহেন সার্থক-সংকীর্ত্তন-সাধনের অধিকার সুলভ ও স্বাভাবিক হয়, তাহারই শিক্ষা দেওয়া এই শিক্ষাশ্লোকটির উদ্দেশ্য।

'তৃণাদপি সুনীচেন।'—দীনতায় তৃণ হইতেও নীচ ভক্তের দ্বারা হরি কীর্ত্তনীয় হন। তৃণ হইতেও নীচ হওয়া কি? রূপকার্থ আলোচনায় ইহাই বলা যায়, তৃণ হইতে নীচ মাটি; অতএব তৃণ হইতে নীচ হওয়াই মাটি হওয়া। আপাততঃ তৃণ সকলেরই নীচে, সকলেরই পায়ের তলে। বিষ্ঠার কৃমিটাও তৃণের উপর দিয়া যায়। তৃণ যেন দীনতার আদর্শ হইয়াই জীব-জগতের পদতলে পড়িয়া আছে। কিন্তু মাটি এই তৃণেরও নীচে, সুতরাং মাটি দীনের দীন। সকলের পদানত যে তৃণ, মাটি সে তৃণেরও পদানত! মাটি চরম দীনতার পরম উদাহরণ। মাটির মত বিনীতা বৈষ্ণবী কে? "সর্ব্বংসহা" মাটির দৈন্যের উপমা মাটির উপরে নাই! হরিকীর্ত্তনকারীকে মাটি হইতে হইবে অর্থাৎ মাটির প্রকৃতি সাধন করিতে হইবে। মাটির আদর্শে "মাটি" হইয়া মাটিতে থাকিতে হইবে।

নিন্দার্থক ভাবে 'মাটি' শব্দও অস্মৎসমাজে প্রচলিত আছে। যথা—"লোকটা সঙ্গদোষে মাটি হইয়া গেল" ইত্যাদি। কিন্তু সঙ্গগুণে স্তুত্যর্থক মাটি হওয়াই সাধনের মাটি হওয়া। সাধুসঙ্গ-গুণে তৃণাদপিসুনীচত্ব-সম্পন্ন নাম-সাধক ভক্তের অনায়াসলভ্য হয়।

একটা "নেড়ার তুক্কো" গানে আছে,—

"যদি হবে খাঁটি, হওরে মাটি,
নৈলে মাটি হবে জান্।
হয়ে আছে মরা, তাজ স্বরা,
মাটির দেহের অভিমান॥"

ফলে বক্ষ্যমাণ শিক্ষাশ্লোকের তাৎপর্য্যালোচনেও এই উপদেশ লভ্য হয় যে, মাটি না হলে খাঁটি হওয়া যায় না। উদারতায় ও দীনতায় মাটি না হইতে পারিলে সাধন-ভজন সব মাটি হয়—মানবজীবনটাই মাটি হয়। "মাটির মানুষ' কথাটি অস্মদ্দেশে সাধারণতঃ স্তুত্যর্থক বটে, কিন্তু কখন কখন সাত্ত্বিক আত্মসম্মানবোধ, সদ্বুদ্ধিবিবেক ও সাধন-ভজনের অভাবে এই মাটিরমানুষতা অকর্ম্মণ্যতা বা অপদার্থতায় পরিণত হয়। সুকৃষিকার্য্যের অভাবে উর্ব্বর ক্ষেত্র আগাছায় পরিপূর্ণ হয়। কেবল ভগবন্নামকীর্ত্তনাদিতেই সে আশঙ্কা থাকেনা।—অতএব মাটির মানুষ হইবার জন্যও যেখানে নামকীর্ত্তন আবশ্যক, সেখানে স্বভাবতঃ মাটির মানুষ হইয়া যে ভগবন্নাম কীর্ত্তন না করে, সে বড়ই দুর্ভাগা। সে হেলায় "নাল জমী পে-ভাগাড়" করিয়া ফেলে।—সে 'হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে'!

যাহাহউক, আপনাকে অতীব দীন হীন অকিঞ্চন জ্ঞান করাই এস্থলে মাটি হওয়া বা তৃণেরও নীচ হওয়া। আমি কিছু না, আমার কিছু নাই; আমি পদে২ অপরাধী! নীতি-পুণ্য-পবিত্রতা, জ্ঞান-ভক্তি--বৈষ্ণবতা, আমার কিছু নাই। আমি এমন দীন—যে দীনতা-বোধেও হীন। আমার এমন অভাব—যে অভাব-বোধেরও অভাব! আমি কৃষ্ণ-বিরহে কাঙাল, কিন্তু ততোধিক কাঙাল সেই বিরহ-বোধ-বিরহে! আমি যে আমার সর্ব্বস্ব কৃষ্ণধন হারাইয়াছি, হায়! সে জ্ঞানও হারাইয়া বসিয়াছি! তাই এত দুঃখেও বুক ফাটেনা, প্রাণ

কাঁদে না, মন গলেনা, নয়ন ঝরে না। কাঁদিলে দুঃখীর দুঃখের লাঘব হয়; যাহার কাঁদিবারও অধিকার নাই, তাহার মত দুঃখী কে? কৃষ্ণ-বিরহে যে আমার কান্না আসে না, এ দুঃখেও যদি একটু কান্না আসিত, তবু কৃতার্থ হইতাম। দুঃখ আমার দূর হওয়া দূরে থাক্‌, দুঃখ বুঝিলেও একটু বাঁচিতাম। আমি কৃষ্ণধনের কাঙ্গাল বলিয়া যে আমার দুঃখবোধ নাই, ইহাই আমার একমাত্র দুঃখ!" ইত্যাকার ভাবানুবন্ধ যাহার মনে জীবন্ত হইয়া উঠে, যাহার মনের প্রতিকৃতি গঠে, সে-ই যথার্থ মাটি হওয়ার যোগ্য; হরি-কীর্ত্তন তাহারই ভাগ্যে ভোগ্য।

শ্রীশ্রী৺রামকৃষ্ণ পরমহংস যখন তখন প্রায়ই বলিতেন, "আমি দীনের দীন হীনের হীন।" আহা! অমন দীন হইয়াছিলেন বলিয়াই তিনি দীননাথের ইচ্ছায় সাধন-জগতে অমন ধনী মহাজন হইয়াছিলেন। তাই ভগবান রামকৃষ্ণ আজ তাঁহার ভক্ত-মণ্ডলে রাম-কৃষ্ণের অবতাররূপে অর্চ্চিত। দীন দেখিলে দীননাথ দান করেন; আর তাঁহার দানে সকল অভাবের অভাব হয়। দীনবন্ধু, কৃপা-সিন্ধু, অনাথশরণ, অধম-তারণ, পতিতপাবন, কাঙ্গালের ঠাকুর, এই সমস্ত আশাময় মধুময় শ্রীভগবন্নাম দীন ভক্তেরই প্রাণের প্রদত্ত; এ অমৃতের প্রকৃত রসাস্বাদ দীন ভক্তেরই ভাগ্যায়ত্ত।

"কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীহরি, সবে বলে।
কে পায় সে হরি-কৃপা কাঙ্গাল না হলে॥
কাঙ্গাল হইয়া দ্বারে আঁচল যে পাতে।
দয়াময় প্রসাদায় ভিক্ষা দেন তাতে॥
অদীন উদ্ধত যেবা যায় হরি-দ্বার।
দ্বারী-হস্তে "অর্দ্ধচন্দ্র" ভাগ্যে ঘটে তার।
দীন হীন হয়ে চেয়ে থাক যার পানে।
দেখা দিবে দীনবন্ধু দিবা অবসানে॥"

এই কণ্টকাযিনী আয়ু-দিবার অবসান সময়ে,—সেই কাল-যামিনীর ঘোর তিমিরা-ঞ্চল-সঞ্চালন-সময়ে—দীনবন্ধু-দর্শন ভক্তি-দৈন্যবানের ভাগ্যেই ঘটে। দৈন্যই ভক্তের ভূষণ, দৈন্যই সাধুর সম্পদ, দৈন্যই সেবকের শোভা। আর সেই শোভা স্বয়ং সেবক-বৎসল মনোমোহনের মনোলোভা। দৈন্য চাই। দৈন্য ভিন্ন মানুষ নরম হয় না। নরম না হলে গঠা হয় না। যুত যেমন ময়দার "ময়ান"—দৈন্য তেমনই মানব-মনের ময়ান। ময়ান-শূন্য মনো-পিষ্টক ইষ্টকবৎ অখাদ্য হয়। তাহা ঠাকুর-সেবায় দেওয়া যায় না। মোলায়েম হওয়া চাই। শক্তের সুগঠন সম্ভবে না। নর-মের প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্ত্তন পরিগঠন চলে। অতএব "তৃণাদপি সুনীচ" মাটি হইতে হইবে। মৃদবস্থা ভিন্ন মৃদুতা অর্থাৎ কোমলতা আর কোথায় পাওয়া যাইবে? কৃষ্ণ-সেবার সর্ব্বোপকরণের মৃদুতার প্রয়ো-জন। সাধুগণের হৃদয় "বজ্রাদপি কঠো-রাণি মৃদূনি কুসুমাদপি"। যখন বিষম বিষয়-বিগ্রহে বাসনা-নিগ্রহের প্রয়োজন, তখন কঠোর বজ্র, আর যখন আনন্দে-আগ্রহে ভগবচ্চরণার্চ্চনের আয়োজন, তখন কোমল কুসুম!

কৃষ্ণ বড় কোমল ভালবাসেন। গোপীরা তাঁহাদের প্রাণ-কৃষ্ণকে "নিপট-কপট-শঠ-কঠিন কালিয়া" বলিয়া গালি

দিতেন। কোনং রসিক ভক্ত বলেন, "উহা গালি নহে, স্তুতি; কারণ স্বরূপ-বর্ণনা।" তাই বুঝি কৃষ্ণ নিজে কঠিন বলিয়াই নিজ অভাব পূরাইতে ব্রজগোপীশ্বরী কমলিনীর কমলাধিক সুকোমল হৃদ্‌-কমলবিলাসী! কোমলের কাছে কঠিন পরাস্ত, কঠিন আয়ত্ত। দয়া ন্যায়কে আয়ত্ত করে, ভক্তি জ্ঞানকে অধীন করে। শীতলতায় হৃদয় গলে; চন্দ্রিকায় সিন্ধু উথলে। প্রবাহে পর্ব্বত কাঁদে; লতা তরুকে বাঁধে। তাই প্রকৃতিতে পুরুষ পরিচিত; শক্তিতে চৈতন্য নিয়মিত; ভক্তিতে ভগবান বশীভূত। তাই মহাশ্মশানে রণরঙ্গে শিব-হৃদয়ে শ্যামার নর্ত্তন; আর তাই মদনমোহন-মোহিনীর মানভঙ্গে শ্যামের শ্রীমুখে "দেহি পদপল্লবমুদারম্!"

সে যাহাহউক, দৈন্য ভজনের একান্ত আবশ্যকীয় অঙ্গ; অথচ তাহার স্বাভাবিক সম্প্রাপ্তি ভিন্ন সাধন-সম্প্রাপ্তি সহজ নহে। কেবল করযোড়, গলবস্ত্র, শিরাবনতি, বাক্য-বিনতি, অঙ্গ-সঙ্কোচন, আত্মনিন্দন, ভূ-লুণ্ঠন, ভূরি-অভিবাদন প্রভৃতিতেই প্রকৃত দৈন্য প্রকটিত হয় না। দৈন্য অন্তরের বস্তু। উহার বহির্বিকাশ কেবল শিক্ষাসাধ্য হইলে, তাহা দৈন্যের অভিনয় মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। অন্তরে অকৃত্রিম দৈন্যের উদয় হইলে, তাহার ঐ সমস্ত বাহ্যলক্ষণ স্বতঃ বিকসিত হয়। সাধুসঙ্গ, ভগবৎপ্রসঙ্গ, ভক্তিশাস্ত্র-সেবন, তীর্থভ্রমণ, অনুতাপ বা আত্মাপরাধ-চিন্তনে নিরন্তর অন্তর্বিলাপ, এই সমস্ত অকৃত্রিম আন্তরিক দৈন্য-সিদ্ধির সাধন। ব্যাপার বস্তুতঃ সহজ নহে। একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদপদ্য এই,—

'বৈষ্ণব হইতে বড় মনে ছিল সাধ।
'তৃণাদপি সুনীচে' ঘটালে পরমাদ॥"

যথার্থ দৈন্য বহু-পুণ্য-প্রেরিত, কৃপাময়ের বহুকৃপা-প্রসাদিত, সন্দেহ নাই। কণ্ঠী-তিলক-মালার থলী, কোপীন-করোয়া-নামাবলী, বৈষ্ণবভাব এই সব বাহ্যসজ্জা সহজেই সংগৃহীত হয়, কিন্তু দুর্লভ দৈন্যই একমাত্র অন্তঃসজ্জা। সে সজ্জার অভাবে ভজনপথে পদার্পণ কেবল সাধু-সমাজে লজ্জার কারণ হয় মাত্র।

লোকে বলে "কষ্ট ভিন্ন কৃষ্ণ পায় না" তাহা সত্য, কিন্তু দৈন্যশূন্য কাষ্ঠ-বৈষ্ণবের তপস্যাজাতীয় শতসহস্র কষ্টেও কৃষ্ণ মিলাইতে পারেনা, কিন্তু দীনতার একটু কাতর ক্রন্দনও নন্দ-নন্দনের পদারবিন্দে প্রেম-বন্ধন প্রদান করে! বলিয়াছিত কৃষ্ণ কেবল কোমল ভালবাসেন।

"কোমল-নয়না,		কোমলবয়না,
কোমল-হৃদয়া রাধা!
(ওতার—)
কোমল প্রেমের		কোমল বাঁধনে
কঠিন কৃষ্ণ বাঁধা!"

তাই কোমল-বিলাসী কৃষ্ণ নারীচিত্ত-হারী—ভক্তহৃদ্বিহারী! তাই কৃষ্ণের নিত্য ননী-চুরী। তাই বুঝি কৃষ্ণাকৃষ্ট-মতি গোপ-যুবতীরা প্রাণেশ্বরের পাদপদ্ম হৃদ্‌পদ্মে ধারিতেও সঙ্কুচিতা; আর প্রৌঢ়া গোপিকারা কোমলবক্ষ-বিলেপিত কুঙ্কুম-চন্দনে শ্রীনন্দ-নন্দনের পদ-প্রসাধন-নিরতা। অতএব কেবল কোমলতায় কৃষ্ণ-সেবার ব্যবস্থা।

"চাঁদ নিঙাড়িয়া,		অমিয়া ছানিয়া,
রাধা-হৃদি বিধি গঠিল তায়।

তাই দিবানিশি, কোমল বিলাসী,
শ্যাম প্রেম-শশী তাহে লুটায়॥"

দিশাহারা কবি-লেখনী অগত্যা রাধা-হৃদয়ের সৌকুমার্য্য শশী সুধা সহ কথঞ্চিৎ উপমিত করিয়াছে। ফলে যেখানে সাত্ত্বিক সুকুমারতার চরম পরিণাম, সেইখানেই শ্রীনন্দকুমার সানন্দে বিরাজমান! তাই বিশুদ্ধ দৈন্যের সাত্ত্বিক সৌকুমার্য্যময় ভক্ত-হৃদয় সেই সুখময়েরই সুখাধিষ্ঠান।

শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য, এই যুগলতত্ত্বেরই পূর্ণবিকাশ। তন্মধ্যে ব্রজ-লীলায় মাধুর্য্যের পূর্ণতম পরিণতি, আর ঐশ্বর্য্যে সকল লীলারই গতি ও নিয়তি; কেননা তাহাতেই বহিরঙ্গ সাধক-সাধারণের ঈশ্বরত্ব বা অবতারত্বের প্রতীতি। কেবল মধুর-রসতত্ত্বাধিকারী অন্তরঙ্গ সাধকেরই আস্বাদ্য ভগবন্মাধুর্য্য। শ্রীকৃষ্ণের অতুল কোমলাঙ্গের সুকোমল অঙ্গুলিতে গিরি-গোবর্দ্ধন ধারণ ঐশ্বর্য্য-ভক্তের অতুল আনন্দের কারণ; কিন্তু সেই প্রসিদ্ধ নবনীত-চোরের নবনীতাধিক কোমল করে মা যশোদার বন্ধন-চিন্তনও মাধুর্য্য-ভক্তের সহনাতীত! কঙ্কর-কুশ-কণ্টকিত গোকুল-গোষ্ঠে গোপালের গোচারণ ভ্রাম্যমান পদযুগলে মাধুর্য্য-ভক্তের হৃদয় পাদুকারূপে পরিবেষ্টিত। মাধুর্য্য-ভক্ত মাথুর-কীর্ত্তনের মর্ম্মভেদী কৃষ্ণবিরহ-বর্ণন আকর্ণন করিতেও অক্ষম! কবি উক্তি বুঝি এ হেন ভক্তের মুখেই বলিয়াছিলেন,——

"বিনয়ে বারণ করি, এসনা এসনা হরি!
এ হিয়ার মাঝে।
কঠিন পাষাণ সঙ্গে সুকোমল ও শ্রীঅঙ্গে
ব্যথা লাগে পাছে॥"

ভক্তের কি সুন্দর ভয়! ভক্তের সবই সুন্দর। ভয়ও সুন্দর, সাহসও সুন্দর। কৃষ্ণ-পদ-স্পর্শের সাহসও সুন্দর এবং নিজের খর-কর-স্পর্শের ভয়ও সুন্দর! ভব-ভয়-ভয়যুক্ত মুক্ত পুরুষও ভক্তের এবম্বিধ মধুময় ভয়ে ভীত হইবার জন্য লালায়িত! সে যাহাহউক, ফলতঃ কি ঐশ্বর্য্য-ভক্তি, কি মাধুর্য্য-ভক্তি, কিছুতেই তৃণাদপি সুনীচতা ভিন্ন অধিকার লাভ অসম্ভব। অকিঞ্চনতা—দীনতা ভিন্ন কোনরূপ ভক্তি-ভজনেরই অধিকার হয় না। অদীন অনধিকারীর নৃত্য-কীর্ত্তনাদি ভক্তিচর্চ্চা কেবল ভাক্তায় পরিণত, সুতরাং বিনাশের হেতুভূত।

"অধিকারী নহে চাহে ভক্তি আচরিতে।
অচিরে বিনাশ পায় নাচিতে গাইতে॥"

বিদ্যা-বুদ্ধি গুণ-জ্ঞান বিশেষ কিছু না থাকিলেও, একমাত্র দৈন্য থাকিলেই, ভজনাধিকার থাকে; তদ্ভিন্ন অপর সহস্র উপযোগিতাতেও সে অধিকার অধিগত হয় না; সুতরাং অনধিকার চর্চ্চার বিষময় ফল অনিবার্য্য—অপরিহার্য্য।

দৈন্য বৈষ্ণবের বর্ম্ম। অনেক অপরাধের আঘাত উহাতে ব্যাহত হয়। যশের-আকাঙ্ক্ষা বা প্রতিষ্ঠা ভজনের প্রধান শত্রু। অনেক সাধক অনেকদূর উঠিয়াও আবার এই শত্রুর আক্রমণ-আকর্ষণে অধঃপতিত হন। একমাত্র দৈন্য-সৈন্য-সহায়েই এই শত্রুর সংহার-সাধন সুসাধ্য। যে ঠিক ভাবিতে পারে যে, আমি কিছু না, আমার কিছু নাই, তাহার প্রতিষ্ঠা বা যশ-তৃষ্ণা কিরূপে ও কোথা হইতে আসিবে?

"প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচরমণী মে হৃদি নটেৎ।
কথং সাধুপ্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্ননু মনঃ।"
প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচী কেবল
নাচে মম হৃদাগারে।
শুদ্ধ সাধু-প্রেম সে অশুচি স্থল
পরশিবে কি প্রকারে॥"

তাই এই প্রতিষ্ঠা-পিশাচীকে সুদীন সাধুরা বড় ভয় করেন। সবলাধিকারী সিদ্ধভক্ত মহর্ষিগণ ইহাকে বড় ঘৃণা করেন।
"অভিমানং সুরাপানং গৌরবং রৌরবং ধ্রুবং।
প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা ত্রয়স্ত্যক্ত্বা হরিং ভজেৎ॥
অভিমান হয় হায়! সুরাপান সম।
গৌরব জানিবে ঠিক রৌরব-উপম॥
প্রতিষ্ঠারে শূকরীর বিষ্ঠা জ্ঞানকরি।
এই তিন পরিহরি ভজ সে শ্রীহরি॥

ভজন-বাধক এই তিনের পরিহারে সাধকের দৈন্যই উত্তম উপায়। যে জানে যে আমার কিছু নাই, তাহার কিসের অভিমান হইবে? সে কিসের গৌরব করিবে? সে কিসের জন্য প্রতিষ্ঠাশা করিবে? যেখানে বিষ-বৃক্ষের মূলের অভাব, সেখানে আর ফলের ভয় কি? তাই বলিতে হয়, দৈন্যই সাধকের ধর্ম্ম-রক্ষার বর্ম্ম, আত্মরক্ষার অভয়-আশ্রয়।

দৈন্য বৈষ্ণবের লাবণ্য। বিশুদ্ধ দৈন্য ভিন্ন আর কোন গুণেও বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-কান্তি বিকসিত হয় না। তবে দৈন্যের আবার বিশুদ্ধাবিশুদ্ধি কি? স্বতঃসিদ্ধ স্বাভাবিক দৈন্যই বিশুদ্ধ দৈন্য। আর শিক্ষিত—অভ্যস্ত বা সাধিত দৈন্যও অকৃত্রিমতায় শুদ্ধ ও মধ্যম; কিন্তু বাহ্যদর্শিব আভিনয়িক ভাক্তদৈন্যই অবিশুদ্ধ ও অধম। উহা দৈন্যই নহে। কৃত্রিম দৈন্য ও "গিল্টী-সোণা" এক জাতীয় বস্তু। উহা স্বার্থ-সংরচিত চপল চাতুর্য্যের ছদ্মবেশ মাত্র। বরং উলঙ্গ ঔদ্ধত্য ভাল, তবু দৈন্য-ছদ্মবেশিনী ধূর্ত্ততা ভাল নয়। সাধক সর্ব্বদা হরিনাম করিয়া উহা হইতে আত্মরক্ষা করিবেন। কৃত্রিম দৈন্য বৈষ্ণবের আত্মহত্যা মাত্র।

জন্মান্তরীণ সংস্কার-সিদ্ধ স্বাভাবিক দৈন্য নিখুঁত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেও তাহা কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? ফলে সাধারণতঃ দৈন্য শিক্ষণীয় ও সাধনীয় বটে। অকৃত্রিম দৈন্যের ঐকান্তিক আবশ্যকতাবোধ অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হইলে, উহা অন্তর্যামী কৃপাময়ের কৃপায় সময়ে সহজেই শিক্ষাধিগত ও সাধিত হয়; আর উহাতেই সাধকের স্বভাব-দৈন্যের অভাব পূর্ণ হয়। এই ঔদ্ধত্য, উদ্দামতা, ধৃষ্টতা, ব্যাপকতা ও প্রগলভতার যুগে সাবধানে সাধুসঙ্গে ভগবৎপ্রসঙ্গে আত্ম-দীনতাবোধের সাধনা বর্দ্ধন ও পোষণ করিতে হইবে।

যে কোন বিষয়ের অভ্যুদয়-সাধনে অভাববোধই আদি-মূল। অভাববোধ ভিন্ন উপার্জ্জনের আবশ্যকতাই প্রতীত হইতে পারে না। এই দৈন্যও অভাব-বোধময়। যথার্থ অভাববোধ ব্যতীত অকৃত্রিম দৈন্য সম্ভবেনা। অকৃত্রিম দৈন্য ভিন্ন সাধনোন্নতি সম্পন্ন হয় না।

"দুর্লভ জনম পেয়ে কিছুই না করিলাম
অলসে অবশে হায়! গিছে কাল হরিনাম
কিছুই না জানি হায়! কিছুই না বুঝি
খুঁজিতে এসেছি যারে, তারেও না খুঁজি
হৃদয় শ্মশান মোর——মন মরুভূমি॥

কড়ার ভিখারী হয়ে ভব-হাটে ভ্রমি॥
ঘুটাতে খেয়ার কড়ী নাহিক যোক্তর।
মানস-প্রদেশে মোর মহা মন্বন্তর॥
নৈতিক-নগরে মোর মহামারী ঘোর।
বিরাজে অরাজকতা হৃদিরাজ্যে মোর॥
অবিচার-অত্যাচার—নিত্য হাহাকার।
নিরাশ্বাস—দীর্ঘশ্বাস—সার অশ্রুধার॥
কিছুনই—কিছুনই—কিছু আমি নই।
দীনহীন অধীন হইনু হায় কই॥
দীন হয়ে না ভজিনু দীননাথ হরি।
মিছে কাল হরিলাম, হরি হরি হরি॥"

এইরূপ জীবন্ত ভাব-প্রবাহ, চিন্তা চর্চ্চা, ভাবণা ও সাধনাভিব্যঞ্জনাই দৈন্যের চারু-চিত্র। এবম্বিধ অকিঞ্চনতা-বোধ প্রাণে প্রতিষ্ঠিত হইলেই দৈন্যের প্রকৃত মূর্ত্তি খোলে। কিন্তু দৈন্যের সঙ্গে আশা চাই। আত্মোন্নয়নে উৎসাহ চাই। সাধন-ভক্তিতে আশ্বাস ও দৈন্যের শক্তিতে বিশ্বাস চাই। নচেৎ অসহায় দৈন্য সাধককে অবসন্ন করিয়া বরং হিতে বিপরীত ঘটাইতে পারে। "আশাবন্ধতা" সিদ্ধির প্রধান উপাদান। এইজন্য আশার আহার দিয়া দৈন্যের পালন আবশ্যক। আত্মউর্দ্ধে অনন্ত বিস্তারিত উচ্চাদর্শ দর্শনে দৈন্যের বিবর্দ্ধন প্রয়োজন। সাংসারিক সন্তোষ সাধনে যেমন নিম্নাদর্শ দর্শন প্রয়োজন, দৈন্যের বিকাশ-বিবর্দ্ধনে তদ্রূপ উচ্চাদর্শ দর্শনের প্রয়োজন। সাংসারিক সন্তোষ সাধনার্থে নিম্নে তাকাইলে যদি দৈন্যের অঙ্গে আঘাত লাগে, তবে অমনি উপরে চাহিয়া সে আঘাত সামলাইয়া নিতে হয়। সর্ব্বোপরি ভগবন্নামই দৈন্যের পরম রক্ষাকর্ত্তা জানিতে হইবে। দৈন্যবধার্থে অহঙ্কার তাহার যে কোন সৈন্যই প্রেরণ করুক, ভগবন্নাম-দুর্গাশ্রয়ে তাহা নিশ্চিত নিরাপদে থাকে।

অধুনা কালধর্ম্ম-বশে বোধহয় অনেক সাধকবেশীর স্বগত আত্মোক্তি এইরূপ,—"আমি বাস্তবিক দীন নহি; ধনী না হইলেও অন্ততঃ 'মধ্যবিত্ত' সন্দেহ নাই। পড়া-শুনা লেখাপড়া একরূপ মন্দ হয় নাই। গীতাখানি প্রায় আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ; অন্যান্য অনেক শ্লোক-শাস্ত্রে মুখস্থ। মাসিক পত্রিকায় (লোকে বলে) সুলেখক। আবার প্রয়োজনমত ধর্ম্মপ্রচারক, সুতরাং (লোকে বলে) সুবক্তা। আমার মুখে হরিকথা শুনে অনেক পাষাণ-চক্ষেও ভাসান আসে। আমার মুখের কীর্ত্তন গানে অনেক শুষ্ক হৃদয় সুধায় ভাসে। আর মোটামুটি পাপ একরূপ করি না বলিলেই হয়। মাছ-মাংসে লোভ থাকা সত্ত্বেও জোর করে ছাড়িয়া দিয়াছি। প্রায় মশা-পিপড়াটিও মারি না। মিথ্যা কথার হাত এড়াইবারও বিশেষ চেষ্টায় আছি। গুরু কৃপায় ইন্দ্রিয় সংযমাদিও যৎকিঞ্চিৎ সুসাধ্য হইয়াছে। ভগবৎপ্রসঙ্গে কখন কখন বেশ কান্না পায়। চেহারাটাও আমার বিবেচনায় (ভগবৎ কৃপায়) অন্ততঃ অভক্তের মত নয়। কয়েকবার কয়েকজনে আমায় শিষ্য হতেও চাহিয়াছিল। তবে যেন আমি কিঞ্চিৎ হইয়াছি। অন্ততঃ নেহাৎ দীন নিশ্চয়ই নহি। আমি ইহা জানি, লোকেও জানুক; কিন্তু আমি যে জানি, তাহা লোকে না জানুক; আমাকে লোকে ধনসত্ত্বেও পরম দৈন্যপরায়ণ সাধু বলিয়া জানুক। এই "সাধু" শব্দটি মনে আমাতেও একটু লজ্জা আসে বটে, কিন্তু

নির্লজ্জ, মন লোক সাধুবাদেরই চির-ভিখারী। ভগবান যাহা ভাবুন, সে ভাবনা বড় আসেনা, লোকে ভাল ভাবিলেই যেন ভবের লোকযাত্রা সার্থক হইল! এটী যে মহাভুল, তাহা বুঝি, কিন্তু মনের সঙ্গে যুঝিয়া পারিয়া উঠিনা। প্রতিষ্ঠা-মদিরার মোহ-মাদকতায় অনায়ত্ত হইয়াও দৈন্যের অভিনয় করিতে থাকি। অন্ততঃ সামাজিকতার শিষ্টাচারের প্রতিষ্ঠাশাবিষ্ট হইয়াও আভিনয়িক দৈন্যবিশিষ্ট হইয়া পড়ি। নিজকে নিষ্কিঞ্চন না জানিলে খাঁটি দৈন্য আসেনা, তবে সুকিঞ্চন জানিয়াও এই যে দর্পিত দৈন্য, ইহা অতি অদ্ভুত পদার্থ বটে! ইহার অভিনয়ের নেশা এ জন্মে কাটিবে কিনা, তাহা সেই জন্ম-জন্মান্তর-নিয়ন্তাই জানেন। কখনও বা আপন কৃত্রিমতায় আপনি বিরক্ত হইয়া বলি, "ভগবন্! রক্ষা কর, একটু শুদ্ধদৈন্যের স্বর্গীয় সমীরণ দিয়া এ অভিমানতপ্ত হৃদয় জুড়াও।" তা এই খাঁটি দৈন্যের প্রার্থনাটিও একটু খাঁটি দৈন্য কিনা; তাই ভগবান একটু শুনেন; তাই একটু উঠি; কিন্তু আবার ভুলি, আবার পড়ি, আবার ভুগি। এই দশাতেই দিনে দিনে দিন যাইতেছে।" বস্তুতঃ অনুতাপ ব্যতীত যথার্থ দীনতারূপ বৈষ্ণবী ধনবত্তা লাভ হয় না। অনুতাপ, সাধকের আধ্যাত্মিক জন্মের প্রসব-বেদনা। আধ্যাত্মিক জাতকই "তৃণাদপি সুনীচ"—সদা হরিকীর্ত্তনাধিকারী সুদীন বৈষ্ণব। অদৈন্য-দোষে যে অহঙ্কারী, সে তত্ত্বতঃ নামকীর্ত্তনে অনধিকারী, সুতরাং রসাস্বাদনে তাহার অধিকারিত্ব সদূর-পরাহত।

"অহঙ্কারী পাপী যারা,
আমার নাগাল্ পায়না তারা,
দীনজনের বন্ধু আমি জগতে জানে"।

ভগবদুক্তি স্বরূপ এই গীতি দীনভক্তের প্রীতি-প্রতিধ্বনিময়ী আশার ভাষা। এতৎ-প্রত্যুত্তর স্বরূপ ভগবানের প্রতি অদীন অধমের একটি উক্তি-গীতিও এইস্থলে নিবেদন করিলাম।

'দীনবন্ধু তুমি হরি জানে জগতে॥
হও এবার অদীনের বন্ধু, পার তুমি সব হতে!
দীন যে, সে ভাগ্যবান, তার বোঝা ভগবান!
বহ যে আবমান কালক্রমাগতে।
ভাগ্যবানের মুটেগিরি, চিরকাল্টা করলে হরি
হত ভাগ্যের বেলায় বুঝি হতবল হে গিরিধারি!
দেখাও এবার নূতন হাত,
নূতন নাম "অদীননাথ;"
তেল-মাথা রেখে এ হাত,
ঢাল নেহাৎ রুক্ষ মাথে॥
দীনতা-ধনে যে ধনী,
দীন সেত নয়, সেইত ধনী,
অদীন যেজন, সুদীন সেজন,
মহাজনের বিচার মতে।
(এবার) আসল দীনের হওহে নাথ,—
এই মিনতি ওপদে॥"

"তরোরপি সহিষ্ণুনা।"——

তরু হইতেও সহিষ্ণু ভক্তের দ্বারাই হরি সদা কীর্ত্তনীয় হন। সহিষ্ণুতাও দৈন্যেরই অঙ্গবিশেষ। অসহিষ্ণুতায় দীনতা রক্ষা পায়না। উদ্বেগ, উত্তেজনা, চাঞ্চল্য প্রভৃতি অসহিষ্ণুতার ফল দীনতার শীতল-শান্তিময়-পবিত্রতাময় ভাবকে নষ্ট করে। দীনতার রক্ষণ-পোষণার্থে সহিষ্ণুতার অত্যাবশ্যকতা

যদৃচ্ছা লাভ-সন্তুষ্টতা ভিন্ন দৈন্য টিঁকেনা। যে ভক্তিভরে যথার্থ দীন, সে তাহার ভাবেই লীন, তার কি আর মাথা তুলিবার যো আছে? অসহিষ্ণুতার তরল চাপল্য তাহাতে সম্ভবে না; সুতরাং——

"কর যাহা ইচ্ছা যায়।
অধমেরে রেখো পায়॥"

দৈন্যসম্পন্ন শান্ত ভক্তের এই ভাব। "কর যাহা ইচ্ছা যায়"—অতএব ঈশ্বর-কৃত জগতের যে কোন ঘটনায় অধৈর্য্য-চঞ্চল হইতে আর ভক্ত দীনের অধিকার নাই।

অসহিষ্ণুতা অবশ্য দুঃখের অনুভূতি। ভগবদিচ্ছাকৃত কোন ঘটনা বা কার্য্যেই অসহিষ্ণুতাবশে দুঃখিত হওয়া দীন ভক্তের পক্ষে অসম্ভব; সুতরাং অসহিষ্ণুতার অভাব অর্থাৎ সহিষ্ণুতা যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট—সত্বগুণ-ভূয়িষ্ঠ সুদীন সাধকের স্বাভাবিক। অতএব স্বভাব সহিষ্ণুতার অভাবে যদি সহিষ্ণুতা শিখিয়া সাধিয়া নিতে হয়, তবে তরুই তাহার স্বাভাবিক শিক্ষাগুরু। তরুই অনুপম আদর্শ প্রদর্শনে ত্যাগস্বীকার, নিঃস্বার্থ পরোপকার ও ঔদার্য্যভূষিত ধৈর্য্যগুণের নৈসর্গিক নীরব আচার্য্য।

"শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় এ বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন,——

"উত্তম হৈয়া আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুইরূপে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছুনা বলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পাণি না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেই আপন ধন।
ঘর্ম্ম-বৃষ্টি সহ আনে করয়ে রক্ষণ॥"

আমরা বাল্যকালে পদ্যপাঠে কবিবর কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের রচিত "বৃক্ষশ্রেণী" প্রবন্ধে পড়িয়াছি,—

"কঠিন অপ্রিয়ভাষ করিলে শ্রবণ,
রক্তজবা-রাগ ধরে মনুজ-লোচন;
ইহাদের শিরোপরে লোষ্ট্র নিক্ষেপণে,
সুফল প্রদান করে বিনম্র বদনে!"

ইত্যাদি। ফলে বৃক্ষের এই সমস্ত নব শিক্ষণীয় স্বাভাবিক সাধু-গুণাবলী অনেক কবিই আনন্দে গাহিয়াছেন।

"তরুর কি সহিষ্ণুতা——উদারতা ব্রত,
ছেদকেও ছায়া দানে নাহয় বিরত!
মার খেয়ে ফল দেয় রসনা-তোষণ;
মার খেয়ে নাম দেন নিতাই যেমন!
কীট-পক্ষী-কতপ্রাণী—শ্রান্ত পান্থ কত,
শিরে-উরে-ক্রোড়ে নিয়ে সেবে সাধ্যমত।
রোদ বৃষ্টি-শীত-বাত সহি শিরোপরে।
রোদ-বৃষ্টি-শীত-বাতে বাঁচায় অপরে!
নিঃস্বার্থ সর্ব্বসেবক—সর্ব্বহিতকারী,
শুকায়ে মলেও নাহি চাহে বিন্দুবারি।
উদারতা-সহিষ্ণুতা-শিক্ষা-আবশ্যক—
হয় যার, তরু তার সুযোগ্য শিক্ষক।
বিনা বাক্যে বৈষ্ণবতা প্রচারে নিরত;
সাধকের শিক্ষাগুরু তরু স্বভাবতঃ।"

আর্য্য-নীতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,——

"অরাবপ্যুচিতং কার্য্যমাতিথ্যং গৃহমাগতে।
ছেত্তুঃপার্শ্বগতাচ্ছায়াংনোপসংহরতিদ্রুমঃ॥
অতিথিসৎকার কর শত্রুও আসিলে ঘরে।
ছেদকের পার্শ্বগতা ছায়া তরু নাহি হরে॥

তরুর নিকট গৃহী-সন্ন্যাসী উভয়বিধ সাধকেরই অনেক শিখিবার আছে। সাধু-সেবা বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাণ। আবার সাধারণতঃ

অতিথিসেবা গৃহীর পরমধর্ম। স্বগৃহাগত আততায়ী শত্রুরও সেবারূপ উচ্চনীতির তরুই নীরব শিক্ষাদাতা।

তরুর অভিনন্দনসূচক কতিপয় ভাবময় পরমার্থ-সংগীতও বঙ্গীয় সংগীতকাব্যকে সুশোভিত করিয়াছে।

"তরু বলরে বল।
কে তোরে সাজা'ল দিয়ে পত্র-পুষ্প-ফল॥
১। বলরে তরু কার উদ্দেশে,
গগন ভেদ করে যাস্ ঊর্দ্ধদেশে,
হ'লি সংসারে এসে কার প্রেমে অচল॥
২। কার প্রেমে প্রভাতকালে,
ধরা ভেসে যায় তোর নয়নজলে?
না জেনে লোকে বলে শিশির-পড়া-জল॥'
(ইত্যাদি।)

আবার——"বল্ দেখিরে তরু-লতা!
(আমার) জগৎজীবন রৈল কোথা?
(তোরা) পেয়ে বুঝি কস্‌নে কথা,
তাই তোদের কুসুম হাসে!"
(ইত্যাদি।)

আহা! গান ত নয়, যেন মোহ-মন্ত্র! ভক্ত সাধকের কি হৃদয়তর্পণ! প্রেমিক-প্রাণের কি পীযূষ-প্রলেপন!

সে যাহাহউক, তরুর কাছে যত ভাব, যত শিক্ষা বা যত সাধনাই আমাদের লভ্য হউক, মুখ্য লক্ষ্য বা লভ্যই সহিষ্ণুতা। সহিষ্ণুতা তৎসমস্তেরই সার স্বরূপ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নির্গত শিক্ষাষ্টকের এই তৃতীয় শ্লোকে তরুর নিকটে পরম প্রয়োজনীয় দৈন্যের মূলভিত্তি স্বরূপ—সাধকের আত্মরক্ষাকবচ স্বরূপ এই সহিষ্ণুতা শিক্ষারই বিশিষ্ট আদেশ উপদেশ।

সহিষ্ণুতা অর্থ সহ্যকরার শক্তি। সাধারণতঃ "ধৈর্য্যগুণ" পদও প্রায় ঐ তত্ত্বেরই প্রকাশক। লোকে প্রায়শঃ প্রবাদ-কথায় বলে "যে সয়, সেই রয়।"* এস্থলেও সেই তাৎপর্য্য খাটে।

জগতে সহ্য করিতে হয় দুঃখ। "অসহ্য সুখ"ও একরূপ আছে, কিন্তু তাহা অনুভূতির তীব্রতায় দুঃখেরই প্রকারভেদ মাত্র। ফলে যে অনুভব দুঃখধর্ম্মী, তাহাই অপ্রিয়; যাহা অপ্রিয়, তাহাই অসহ্য। অসহ্যকে সহ্যকরাই ধৈর্য্যগুণ বা সহিষ্ণুতা। সহিষ্ণুতা-সাধন ভিন্ন এই অসংখ্য পাপ-তাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা, রোগ-শোক-দুর্ভোগ সঙ্কুল সংসারে চিত্তের শান্তি ও আনন্দ স্থির রাখিয়া, সেই শান্তিস্বরূপ আনন্দময়ের উপাসনা কিরূপে সম্ভবে? সহিষ্ণুতার ফলে চিত্ত-প্রসন্নতা না পাইলে, সেই চিত্তচোর হরির নিত্যপ্রসন্ন মুখ দর্শন বিষণ্ণ ও অসম্পন্ন ভূরিভজনেও ভাগ্যে ঘটেনা। অসম্পন্ন ভজন আর উন-মাপের ওজন ফলিতার্থে ভজনও নহে, ওজনও নহে।

"সংসারের উচ্ছিষ্ট প্রেম দিস্‌নে আমারে।
ও তা ছোঁবনা করে।
না পেলে প্রেম ষোলআনা,
আমারত মন ওঠেনা;
(আমি) ষোলকলা কালোশশী
প্রেমের অম্বরে॥"

প্রাণেশ্বরকে ষোলআনা প্রাণটাই দেওয়া চাই। গোটা প্রাণটা তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে নিবেদন করিয়া, পরে সেই প্রসাদ সকলকে দাও,—সংসারে বিলাও। ভগবান্ পাট্টাই স্বত্ব চাননা, মূল-মালেকত্ব চান; সুতরাং

একেবারে দানপত্র উৎসর্গ করিতে হইবে। তবে কিনা, তাঁর জিনিস তাঁরেই দেওয়া—ফলিতার্থে গ্রহণ মাত্র। আমার অন্তর-রাজ্য ভগবদ্‌গ্রাহি হইলেই, আমি যাহা পাইবার তাহা পাইলাম। কৃতার্থতাই বলুন আর চরিতার্থতাই বলুন, মানুষের ভাষায় যে শব্দ উপযুক্ত বুঝেন, তাহাই ব্যবহার করুন, মোটকথা, জীবের একটা আত্মগত চরম ও পরম লাভের কল্পনা আমিত্বসর্ব্বস্ব জীবত্ব-ধর্ম্মে স্বাভাবিক। ভগবানকে দেওয়া হইলেই আমারও পাওয়া হইল।

ভগবানকে আত্মসর্ব্বস্ব সমর্পণের প্রক্রিয়াই ভজন। অষ্টপ্রহর ভজনে না থাকিলে তৎসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই।

"উঠিতে বসিতে খাইতে শুইতে
উপাসনা মানা নাই।
ওঠা বসা খাওয়া শোয়া এ সবাইতে
উপাসনা আনা চাই॥
ভোজন আমার আহুতিপ্রদান,
শয়ন আমার সাষ্টাঙ্গপ্রণাম,
ভ্রমণ আমার প্রদক্ষিণ তাঁর,
প্রতি কথা মোর মন্ত্র।
প্রতি অঙ্গভঙ্গি মুদ্রা-বিরচন,
যে ভাবেই বসি, সেই ত আসন,
যে চিন্তাই করি, তাঁরি ধ্যান ধরি;
এ জীবন তাঁরি যন্ত্র।"

ইহাই আত্মসমর্পণ। সবেতেই আছি, অথচ কিছুতেই নাই—কেবল ভগবানেই আছি। অর্থাৎ সবই ভগবান অথবা ভগবানেই সব। এ বিশ্বের নিমিত্তকারণ ও উপাদান-কারণ—সবই তিনি। এই জগৎ-রূপ ঘটের তিনিই কুম্ভকার, তিনিই মাটি। ফলে তিনিই সর্ব্বকারণ-কারণ। এই ভাব সিদ্ধ হইলেই জীবন উপাসনাময় হয়। নিবেদিতায় সিদ্ধ ভক্তের সর্ব্বকার্য্যই ভগবদ্ভজন মাত্র।

"প্রাতরারভ্য সায়ান্তং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্নাথ তদেব তব পূজনম্॥"

প্রাত হতে সন্ধ্যাকাল, সন্ধ্যা হতে প্রাতঃকাল,
যাহা কিছু করি,
সে সকলি সুনিশ্চয়, তোমারি পূজন হয়,
জগন্নাথ হরি।

ইহাই আমাদের আদর্শ। তবে কিনা, আত্ম-নিবেদন ভিন্ন এ উক্তির উপযুক্ত অধিকারী হওয়া যায়না। আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া, গুরু-কৃপা অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে; তারপর যত দিনে বা যত জন্মেই হউক, ভগবদিচ্ছায় যথাসময়েই ভগবানের সর্ব্বকাল, সর্ব্বভাব ও সর্ব্বকর্ম্মগত ভজন-সম্পদ লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। এই জন্যই সহিষ্ণুতার আবশ্যক। সহিষ্ণুতা ভিন্ন এ নিত্য ভজনের আশা নাই। দিবারাত্রির মধ্যে কয়েক বার কয়েক মিনিটের জন্য একটু সাময়িক ভজনে বসিলেও, যত রাজ্যের বিঘ্ন, বাধা, উৎপাত, উন্মনস্কতা যেন পরামর্শ করিয়া দল বাঁধিয়া আসিয়া উপস্থিত হয়! সব সময়ে সব কাজের মধ্যেই উপাসনা চালান কি সহজ কথা? তবে কিনা গুরুকৃপা হইলে, সকল অসাধ্য সিদ্ধ ও সকল অসম্ভব সম্ভাবিত হয়।

এ সাধনে সহিষ্ণুতা প্রধান উপকরণ; অসহিষ্ণুতা প্রধান অন্তরায়। সংসার-সমুদ্র, সংসার অরণ্য, সংসার মরুভূমি, ইত্যাদি অনেক বাক্য সাহিত্যের বাজারে প্রচলিত

আছে। অর্থাৎ কিনা সংসার কষ্টময়, বিপদ-সঙ্কুল, সুতরাং পদে পদে সহিষ্ণুতার প্রকট পরীক্ষাস্থল। সহিষ্ণুতার সহায়তায় সংসার-সঙ্কটে শান্ত সমাহিত না থাকিতে পারিলে সেই সংসার-সারধনের সাময়িক সাধনও সম্ভবেনা; তবে সর্ব্বকাল, সর্ব্বভাব ও সর্ব্বকার্য্যগত সাধনের আর কথা কি?

সত্বাদি গুণত্রয় ভেদে সহিষ্ণুতাও তিন-প্রকার। কষ্টের অনুভূতি স্পষ্ট বিদ্যমান, অথচ ভয়াদি হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ফলে অধিকতর কষ্টের আশঙ্কায় বা ঐহিক স্বার্থসিদ্ধির আশায় কোন উত্তেজনা সহিয়া থাকা তামসী সহিষ্ণুতা। আর কষ্টানুভূতি সত্বেও যশের আশায় বা পুণ্যাদির আশায় যে সহিষ্ণুতা, তাহা রাজসী। ফলতঃ সর্ব্বমঙ্গলময় ভগবানের মঙ্গলেচ্ছা-সঞ্জাত শুভাশুভ সমস্ত ঘটনাতেই যে সহিষ্ণু ভক্ত সাধকপ্রবরের স্বতঃসিদ্ধ নিষ্কাম সহিষ্ণুতা, তাহাই সাত্বিকী-সহিষ্ণুতা। তরু-গুরুর কাছে সেই সহিষ্ণুতাই শিক্ষণীয়। নিত্য ভজনার্থ চিত্ত-গঠনের প্রয়োজনে সেই সহিষ্ণুতাই সাধনীয়।

ভক্ত কেন অসহিষ্ণু হইবেন? ভক্ত জানেন, অসহিষ্ণুতার উত্তেজক সংসারের যাবতীয় দুঃখ-কষ্টই সেই বিশ্বগুরুর হাতের বেতের বাড়ি! সেই বিশ্ব-চিকিৎসকের বিকট বিষ-বড়ী! বুদ্ধিমান ছাত্র এবং জ্ঞানবান রোগী কখনও শিক্ষক-দত্ত দণ্ড পাওয়ায় এবং বৈদ্য-দত্ত বিস্বাদ ঔষধ খাওয়ায় অসহিষ্ণু হন না। পতিপ্রেম-বিহ্বলা সতী স্বীয় প্রিয়তমের প্রতিকার্য্যই প্রেম-মন্ত্র-মুগ্ধ নয়নে সতত সুন্দর দেখে। সুন্দরতম প্রিয়তমের প্রতি কার্য্য সুন্দর, প্রতি কথা সুন্দর; চক্ষের দৃষ্টি, অঙ্গের ভঙ্গি, সব সুন্দর! প্রিয়তমের নিশ্বাসটি—আভাসটি পর্য্যন্ত সুন্দর-সুমধুর!

আহা! বঙ্কিমচন্দ্র কি মধুরই গাহিয়া-ছেন,——

"এই মধুমাসে, মধুর বাতাসে,
শোনলো মধুর বাঁশী।
এই মধুবনে শ্রীমধুসূদনে
দেখলো সকলে আসি॥
মধুর সে গায়, মধুর বাজায়,
মধুর মধুর হাসে।
মধুর আদরে মধুর অধরে
মধুর মধুর ভাসে॥
মধুর শ্যামল বদন-কমল,
মধুর চাহনী তায়।
কনক নূপুর যেন মধুকর,
মধুর বাজিছে পায়॥
মধুর ইঙ্গিতে আমার সঙ্গেতে
কহিল মধুর বাণী।
সে অবধি চিতে মাধুরী হেরিতে
ধৈরয নাহিক মানি॥"

সতীধর্ম্মী ভক্তের নিকট প্রিয়তম পতি ভগবানের সবই সুন্দর। তাঁহার দণ্ড-পুরস্কার, নিগ্রহ-অনুগ্রহ, সব সুন্দর। তাঁহার কার্য্য, তাঁহার তত্ত্ব বা তাঁহার স্বরূপ নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গলময়—মধুময়! তাঁহার সর্ব্বতত্ত্বসমন্বিত নামতত্ত্ব——

"মধুর মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং।"

ভগবানের নাম-রূপ (ধ্যান-মন্ত্র) সাধকের সর্ব্বস্ব। তাঁহার বিশ্ববিমোহন রূপও অনন্ত মধুময়।

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরং।

মধুগন্ধী মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্।"
মধুর মধুর বপুটি বিভুর,
মধুর মধুর বদন মধুর।
মধুগন্ধী মৃদু হাসি সুমধুর,
মধুর মধুর মধুর মধুর!

যাঁহার সব মধুময়, সব মঙ্গলময়, তাঁহার কার্য্যে কি কখনও দুঃখ হয়? দুঃখদ কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব কি সে সুখস্বরূপে সম্ভবে? অমৃত-বৃক্ষে কি বিষফল ফলে? জীবের যে দুঃখ, তাহা কেবল অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার ফল। ভক্তিভরে ভগবৎপদে প্রপন্ন হইলে সে অবিদ্যা কাটে। ভগবান নিজেই কাটিয়া দেন। অবিদ্যা ভগবানেরই জীবাবরণী মায়া। প্রপন্ন ভক্তের জৈবিক তত্ত্বের উপর হইতে ভগবান আপনি আপনার সে জাল গুটাইয়া লন। শ্রীভগবান শ্রীমুখেই বলিয়াছেন,—

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।"
আমাতে প্রপন্ন যারা।
এ মায়ায় তরে তারা॥

অবিদ্যা-মায়ামুক্ত সাত্ত্বিকীসহিষ্ণুত্ব'-শক্তিযুক্ত মুগ্ধ ভক্তের আর দুঃখের হেতু থাকেনা। সে নিত্য প্রসন্নচিত্তে স্বচ্ছভাবে প্রতিকার্য্যেই ভগবানের নিত্যভজনের অধিকারী হয়। যাহা মন্দ, তাহাই দুঃখদ; যাহা দুঃখদ, তাহা অবশ্য অপ্রিয়; সুতরাং যাহা অপ্রিয়, তাহাই অসহ্য। ভক্তের চক্ষে ভগবানের বিশ্বৈশ্বর্য্য-লীলা-মূর্ত্তি স্বরূপ এই জগতের কিছুই মন্দ বোধহয়না। সবই সুন্দর-মধুর-সুখদ; সুতরাং কদাচ কিছুতেই অপ্রিয়তার আশঙ্কা নাই; অতএব অসহিষ্ণুতার অবকাশ কোথায়? এইজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু সাত্ত্বিক সহিষ্ণু দীন ভক্তকেই নিত্য হরি-সংকীর্ত্তনের উত্তম অধিকারী বলিয়াছেন। বিশেষতঃ অসহিষ্ণুতায় চিত্ত উদ্বিগ্ন ও অপ্রসন্ন হয়। ঐহিক বিষয়ে উদ্বিগ্ন ও অপ্রসন্ন চিত্তের উপাসনা সে নিত্যানন্দধামে পঁহুছায় না। সংকীর্ত্তন অতি শ্রেষ্ঠ উপাসনা। অন্তরে বাহিরে সদা স্থূল ও সূক্ষ্মসংকীর্ত্তন ভক্তের জীবনাবলম্বন। সেই অবলম্বন সুদৃঢ় রাখিবার জন্যই এই সহিষ্ণুতার সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজন। এতাবতা শত দার্শনিকতত্ত্ব-বিচার অপেক্ষা একটি উপযুক্ত উদাহরণের ফলোপধায়কতা অধিকতর বলিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু এই সুগহন শিক্ষা-বিষয়ে কেবলমাত্র বলিয়াছেন, "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।"

তবে অসহিষ্ণুতার একটি অবকাশ আছে;—সেটি ভগবদ্বিরহ। বিরহ সহজে সহ্য হইলে আর মিলনের জন্য ব্যগ্রতা থাকে না। "লালসা" হইতে "মৃত্যু" পর্য্যন্ত বিরহীর উত্তরোত্তর দশা-বিপর্য্যয় কেবল অসহিষ্ণুতার ফল। ভগবদ্বিরহে অস্থির-ব্যাকুল-উন্মত্ত হইয়া মহাপ্রভু যে "ন ভূত ন ভবিষ্যতি" ভক্ত-লীলা দেখাইয়াছেন, তাহাতেই সাধকের পক্ষে অসহিষ্ণুতার সাত্ত্বিকী কার্য্যকারিতা সর্ব্বতোভাবে শিখাইয়াছেন। ঐহিক বিষয়ে মহাপ্রভুর যেমন অসাধারণ হইতেও অসাধারণ সহিষ্ণুতা, ভগবদ্বিরহে তদ্রূপ উন্মাদিনী অসহিষ্ণুতা!

ঐহিক বিষয়ে ভক্তের অসহিষ্ণুতা অসম্ভব। ঐহিকে ভক্তের বাসনাই নাই। বাসনা কেবল সেই কমলাসনার কোমল-ক্রোড় লাভি

শ্রীপদকমলে! ঐহিক বিষয়ে যা হবার তা হউক, কিন্তু শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্ম হৃদ্‌পদ্মে চিরবিরাজিত রহুক্, ভক্তের ইহাই আশা; আর সর্ব্বাশা ইহাতেই কেন্দ্রীভূত।

ঐহিক লোক ঐহিক সামান্য বিষয়ের বিরহে অসহিষ্ণু হয়। কিন্তু ভাগবত জন ঐহিক বস্তুর বিরহ-মিলনে সমভাবাপন্ন।

"সুখ-দুঃখে সমে কৃত্বা
লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।" (গীতা)

কিন্তু ভগবদ্বিরহ ভক্তের অসহ্য; কারণ মঙ্গলমধুময় ভগবানের বিরহটিই কেবল অমধুর, অপ্রিয়, অরুন্তুদ।

উত্তরচরিতের শ্রীরামচন্দ্র সীতার সর্ব্বপ্রিয়তা ও সর্ব্বমধুরতা বর্ণন করিয়া অবশেষে বলিলেন,——

"কিমস্যা ন প্রেয়ো যদি পরমসহ্যস্তু বিরহঃ।"

অর্থাৎ আমার প্রিয়াতে অপ্রিয় কিছুই নাই, কেবল প্রিয়ার বিরহই অতি অসহ্য;— সুতরাং অপ্রিয়। ভগবান সম্বন্ধেও ভক্তের প্রাণও এইরূপ বলে;——আমার প্রাণবন্ধুর সকলই প্রাণতোষক, কেবল বিরহই প্রাণ-শোষক; সুতরাং অসহ্য। ভক্তের অসহিষ্ণুতা এই স্থানে। এখানে বরং সহিষ্ণুতারই নিন্দা।

এ বিষয়ে স্বয়ং শ্রীমতীর শ্রীমুখের "করুণ ভাষা" বিদগ্ধমাধবের বিশ্ব-বৈষ্ণব-বিমোহিনী বীণাধ্বনিতে শুনুন,—

"যস্যোৎসঙ্গসুখাশয়া শিথিলিতা
গুর্ব্বী গুরুভ্যস্ত্রপা।
প্রাণেভ্যোঽপি সুহৃত্তমাঃ সখি তথা
যূয়ং পরিক্লেশিতাঃ॥
ধর্ম্মঃ সোঽপি মহান্ ময়া ন গণিতঃ
সাধ্বীভিরধ্যাসিতো।
ধিক্ ধৈর্য্যং তদুপেক্ষিতাপি যদহং
জীবামি পাপীয়সী॥"

যা'র আলিঙ্গন-সুখসঙ্গ-আশাভরে।
গুরু-গঞ্জনার লজ্জা গণিনি অন্তরে॥
প্রাণাধিকা সখী তোরা—তোদিগেও হায়!
দিয়েছি কতই কষ্ট তাহারি আশায়॥
সাধ্বী রমণীর যাহা পরম ধরম।
তাহারি আশায় তাও করিনি গণন॥
তবু বেঁচে আছি হয়ে উপেক্ষিতা তার।
পাপীয়সী আমি—ধিক্ ধৈরযে আমার॥

এ বিষয়ে আধুনিক বঙ্গ-কবিও রাধা-উক্তিতে ভক্ত-হৃদয় কাঁদাইয়া গাইতেছেন,—

"প্রাণাধিক শ্যাম-নাগর বিরহে,
দহে দাবানল সম।
নিলাজ এ প্রাণ তবু দেহে রহে,
ধিক্! এ ধৈরযে মম॥
যেত যদি প্রাণ প্রাণনাথ সনে,
চকোরী পাইত চন্দ।
চিত-চাতকিনী পেত নবঘনে,
বিরহে মিলনানন্দ॥
ধৈরয আমার বিষম বিপক্ষ,
দেহে প্রাণ রাখে মোরে।
আছে অভাগীর কে হেন স্বপক্ষ,
বধিয়া বাঁচাবে মোরে॥"

অথবা——

"মরণরে! তুঁহু মম শ্যাম সমান।
মেঘবরণ তুঝ, মেঘ জটা-জুট,
মৃত্যু অমৃত করে দান।
মরণরে! তুঁহু মম শ্যাম সমান॥"

যেখানে মৃত্যুই প্রার্থনীয়, সেইখানেই

সহিষ্ণুতা অনাদরণীয়। তখন অসহিষ্ণুতার বিহ্বলতা ও উন্মত্ততাই সাধকের সর্ব্বস্ব। সে অসহিষ্ণুতায় স্বয়ং ভগবানের সহিষ্ণুতা পরাস্ত হয়! ভক্তপ্রেমাধীন ভক্তিপ্রিয় ভগবান সেধে এসে আপনি ধরা দেন। তখন ভক্তপ্রেম-পদ্ম-মধুপ মধুর হরি আপনি ভক্তের হৃদয়মাঝে উদয় হন।

হায়! কোথায় আমরা, আর কোথায় সেই পরমর্ষিজন-স্পৃহণীয় "ভগবদ্বিরহ"! আমাদের এখন বিরহেরই বিরহ! আমাদের এখন কৃষ্ণ-বিরহের সঙ্গেই মিলনের প্রয়োজন। কৃষ্ণ-মিলন হয়ত আমাদের শতজন্মাদূরবর্ত্তী নিশার স্বপন!. আমরা কৃষ্ণ-বিরহ-বিরহী বলিয়াই ঐহিক অসংখ্য বিরহে অনুক্ষণ অসহিষ্ণু। অতএব সহিষ্ণুতাব শিক্ষা আমাদেরই একান্ত কর্ত্তব্য। হরিবিরহ জাগাইতে হরিনামই আমাদের সম্বল। বিরহ ত আছেই, কেবল বোধের অভাব। বলিতে কি, হরি যেন এখনও আমাদের "হরির খুড়ো"! নামেতে তিনি এবং নামই তিনি বলিয়াই ক্রমিক নাম সাধনে "নাম রুচি" অর্থাৎ তাঁহাতে রুচি হইলেই, তাঁহাকে ক্রমে প্রিয় লাগিবে, মধুর লাগিবে, আর ক্রমে বিরহও জাগিবে। বিষয়-বিক্ষুব্ধ চিত্তে নাম-সাধন শুধু শব্দ-সাধন হইয়া পড়ে; এই জন্যইত সহিষ্ণুতার আবশ্যকতা। ঐহিক ভোগ-লুব্ধ বিষয়-বিক্ষুব্ধ অসহিষ্ণু জীবের হরি সংকীর্ত্তন ঠিক হয় না। তাই গৌরহরি শিক্ষাষ্টকে বলিতেছেন,—— "তরোরপি সহিষ্ণুনা———কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"

অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ
সদা হরিঃ'—

নিজের মান যাঁহার তুচ্ছ জ্ঞান, অথচ অন্যকে মান দিতে যিনি নিত্য যত্নবান্, তিনিই নিত্য হরিকীর্ত্তনের অধিকারী। শ্লোকের এই শেষাংশেও ফলিতার্থে দৈন্যেরই উপদেশ। দাম্ভিকেরই প্রতিপদে আত্মমানের অপেক্ষা, কিন্তু ভক্ত দীনের তাহাতে অতীব উপেক্ষা। আত্ম-শ্রেষ্ঠতা-বুদ্ধিই মান-লাভেচ্ছার জনয়িত্রী। দীন আপনাকেই হীন জানিয়া নিজ নিকৃষ্টতারই চিন্তা করেন, সুতরাং স্বীয় অমানীত্ব-বোধই তাঁহার স্বাভাবিক। অপিচ, যিনি আত্মবিনয়বৃত্তির নিত্য-নমনীয়তায় সকলকেই— অন্ততঃ অনেককেই আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করেন এবং ভগবদধিষ্ঠান ভাবিয়া জীব মাত্রকেই আদর করেন, তিনিই যথার্থ মানদ। পরকে মান না দিলে যেন পরাৎপরকেই মান দেওয়ার ত্রুটি হইল, এইরূপ তাঁহার মনে হয়। যিনি আপনার কৃষ্ণদাসত্ব কল্পনায় কৃতার্থ হন, তিনিই জগতের দাসত্বে আগ্রহে অগ্রসর। সুদীন ভক্ত অমানী মানদের এইখানেই বৈষ্ণবতা। এই বৈষ্ণবতার বলেই তাঁহার নিত্য হরি কীর্ত্তনের অধিকারিতা।

স্বয়ং মহাপ্রভু নিজে অমানী হইয়া জগৎকে মান দিয়াছেন। এই জন্যই বলা হইয়াছে, "আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখাইলা জীবে।" শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে প্রভুর স্কন্ধারোহণে সেই প্রেমবিহ্বলা জরতীর জগন্নাথ-দর্শনের ঘটনা স্মরণ করুন। এইস্থানে অসাধারণ অমানীত্ব ও মানদত্বের উদাহরণ উদ্ভাসিত! হরিভক্তি-দীনতার সুদীপ্ত দৃষ্টান্ত

প্রদর্শিত। যেমন দীনতা, তেমনি সহিষ্ণুতা; যেমন অমানীত্ব, তেমনই মানদত্ব। ফলে "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোক এইখানে যেন মূর্ত্তিমন্ত। মহাপ্রভুর মহতী চরিত-লীলায় এ জাতীয় শত ২ দৃষ্টান্ত দেদীপ্যমান। প্রভুত্বই মানের হেতু, কিন্তু যিনি প্রভুর প্রভু, যাঁহার আখ্যাই "মহাপ্রভু"—তিনি মূর্ত্তিমান অমানীত্ব। সাধারণতঃ যিনি প্রভু তিনি মানাদ (মান-গ্রহীতা), কিন্তু যিনি আমাদের মহাপ্রভু, তিনি মানদ (মানদাতা)।

"অমানিত্বমদাম্ভিত্বমহিংসাক্ষান্তিরার্জ্জবম্"

দৈন্যের এই পঞ্চ উপকরণ শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-প্রপঞ্চে এই পঞ্চের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত। দৈন্যপোষণের উপাদান নির্দ্দেশে গীতা বলেন,——'মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্।' মহাপ্রভুর মহোপদেশে এ উপাদান অজস্র বিতরিত। মহাপ্রভু স্বয়ং দৈন্যের প্রশান্ত মহাসিন্ধু; আর তাঁহার পরিকর ভক্তনিকরও এক এক জন মূর্ত্তিমান দৈন্য। এই বর্ত্তমান দাম্ভিকতার যুগে তাঁহাদের এক এক জনের অসামান্য দৈন্য দৃষ্টান্ত "পাগ্‌লামী বিশেষ" বোধ হওয়াও অসম্ভব নয়। হরিদাস ও শ্রীরূপ-সনাতন—ইঁহারা তিনজন আত্মদৈন্যের আবেগে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিতেন না। তাঁহারা তাঁহার ধ্বজা ও চক্র দেখিয়াই প্রণিপাতপূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হইতেন। শ্রীসনাতন শ্রীশ্রীগোপীনাথ দেবের মন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গ-দর্শনে যাইতে স্বীয় দৈন্যের আবেগে শ্রীজগন্নাথ-পুরীর সিংহদ্বারের পথ দিয়া যাইতেন না; প্রচণ্ড প্রতপ্ত বালুকাকীর্ণ সিন্ধু-তীর-পথে যাইতেন; তাহাতে পদতল বিদগ্ধ ও ব্রণপীড়িত হইলেও গ্রাহ্য করিতেন না। সনাতন ভাবিতেন, তিনি অতি অপবিত্র, অধম, সিংহদ্বার-পথে শুদ্ধ সাধুগণের সর্ব্বদা যাতায়াত; পাছে তাঁহার অশুচি-সঙ্গে তাঁহাদের অসেবা ঘটে! ধন্য এই অপূর্ব্ব দৈন্য! গৌর-লীলায়, গলিতকুষ্ঠী বাসুদেবের কি অলৌকিক দৈন্য! এহেন মহাব্যাধির মুক্তি হইলেও, তাহাতেও যেন সুখ নাই; পরন্তু পাছে তজ্জন্য অদৈন্য আসিয়া তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব বৈষ্ণবতার আধার স্বরূপ দৈন্যকে দূরীভূত করে, এই ভয়! তাই মহাপ্রভুর প্রতি মহাব্যাধিমুক্ত বাসুদেবের উক্তি এইরূপ,—

"মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পামর।
হেন মোরে স্পর্শ তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
কিন্তু আছিলাম ভাল অধম হইয়া।
এবে মোর অহঙ্কার জন্মিবে আসিয়া॥"

চমৎকার! এমন না হইলে মহাপ্রভুর আলিঙ্গনই বা পাইবে কেন? কুষ্ঠমুক্তই বা হইবে কেন? আহা! অব্যাহত দৈন্যে কুষ্ঠব্যাধিও স্বীকার্য্য, কিন্তু ব্যাহত দৈন্যে কন্দর্পকান্তিও অগ্রাহ্য! দৈন্য বৈষ্ণবের বিষ্ণু-সেবাগ্রাহ্য অন্তঃ-সৌন্দর্য্য; তাহাই যদি নষ্ট হইল, তবে কুষ্ঠমুক্তি জনিত বাহ্য সৌন্দর্য্যে প্রয়োজন? বাসুদেবের এই ভাব! অতএব ধন্য তাঁহার দৈন্য-প্রভাব!

তৃণাদপি সুনীচত্ব, তরোরপি সহিষ্ণুত্ব, আত্ম-অমানীত্ব ও পরমানদাতৃত্ব, এই চতুরঙ্গসমবায়ই দৈন্যের প্রধান উপাদান। বৈষ্ণবের অত্যাবশ্যকীয় দৈন্যের শিক্ষাই শিক্ষাষ্টকের এই তৃতীয় শ্লোকটির সমগ্র উদ্দেশ্য। এই দৈন্যের চরমফল পরমাত্মা হরিতে আত্মসমর্পণ।

"আমি কিছু নই, তুমিই সকল।
তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র কেবল॥
তুমি খেলোয়াড়, আমি পুতুল।
'আমি আমি' শুধু আমারি ভুল॥"

সকলই তোমার, ভুলটি কেবল আমার! তা এটিও তুমি গ্রহণ কর, সকল লেঠা চুকিয়া যাউক্। আত্মনিবেদনার্থী ভক্তের ভগবৎপ্রতি এইরূপ আত্মোক্তি। ভগবান কিন্তু ঐটি নিতে সহজে সম্মত নহেন। জ্ঞান যোগে ওটি ভগবানে সমর্পণ কলিযুগে বড় কঠিন, তাই ভক্তিযোগের সুলভ ব্যবস্থা। আর একমাত্র ভগবন্নাম-সাধনেই সে ভক্তি-যোগের সিদ্ধি; কিন্তু নিরপরাধ নামসাধন চাই। এই নাম-সাধনে শ্রবণ-কীর্ত্তনই সর্ব্বাগে। বিশেষতঃ কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রবণ-মনন সবই হয়; সেইজন্যই হরি-সংকীর্ত্তনের এই বিশ্বব্যাপী গৌরব। তার-পর, এই হরিসংকীর্ত্তন বাহিরে সাময়িক ভাবে থাকিলেও, অন্তরে নিরন্তর থাকা চাই। কেবল গান গাওয়াই হরি-কীর্ত্তন নয়; কেবল বাগিন্দ্রিয়-সঙ্গে হরিপ্রসঙ্গই 'কীর্ত্তন' নয়, হরির নাম-রূপ-গুণ লীলার স্মরণ মননাদি অন্তশ্চর্চ্চা বা মানস-বর্ণনও হরি-কীর্ত্তন। এবম্ভূত হরি-কীর্ত্তন সিদ্ধ হই-লেই সাধকের অন্তরকন্দরে নিরন্তর নাম-নির্ঝরিণী ঝরিতে থাকে। ফলে হরি-কীর্ত্তনের উপযুক্ত অধিকার লাভ ভিন্ন এই দেবদুর্লভ নিত্য নাম-সেবা কাহার ভাগ্যে ঘটে? এই অধিকার লাভে সাত্ত্বিক দৈন্যই সাধকের সর্ব্বপ্রধান সহায়। তাই শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার শিক্ষাষ্টকের এই তৃতীয় শ্লোকে হরিকীর্ত্তনের যোগ্যাধিকারপ্রদ দৈন্য-সাধনের শিক্ষা দিয়াছেন।

যে প্রভুর জীবের প্রতি এই দৈন্য-শিক্ষাদান, তাঁহার নিজের দৈন্যলীলা কাজেই প্রকৃত দৈন্যের পূর্ণাদর্শস্থান। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন স্বীয় প্রিয়পার্ষদ ভক্তগণের কণ্ঠ ধরিয়া কাতর কণ্ঠে কৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা করিতেন, যখন নয়ন-জলে চন্দ্রবদন ভাসাইয়া বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতেন------"আমি অতি দীন হীন ---ভজনবিহীন, আমাকে তোমরা কৃপা কর। আমি কৃষ্ণ প্রেমের কাঙাল, তোমরা আমারে কৃষ্ণ-প্রেম-ধন দান কর"—তখন বুঝি পাষাণও গলিয়া যাইত, মরুভূমেও বারি আসিত! একবার মানসচক্ষে সে দৃশ্য ধ্যান করিলে দৈন্য-সাধক কৃতার্থ হইবেন।

যে প্রভুর কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনে জগৎ মাতিয়াছে, যে প্রভুর কৃষ্ণপ্রেম-প্লাবনে জগৎ ভাসিয়াছে, যে প্রভু কৃষ্ণপ্রেমে বিবশ-বিহ্বল, উন্মত্ত-উদ্ভ্রান্ত ও মূর্চ্ছিত-মৃতবৎ, তিনিই অসামান্য দৈন্যাবেশে বলিতেছেন, "হায়! কৃষ্ণ-প্রেমের লেশমাত্র আমি পাইলামনা।"

"ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরোঽপি মে হরৌ,
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।
বংশী-বিলাস্যানন-লোকনং বিনা,
বিভর্ম্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা॥"
হরিতে প্রেমের মম নাম-গন্ধ নাই।
তবে যে কাঁদি, সে শুধু সৌভাগ্য জানাই।
যেহেতু না হেরে বংশীবিলাস-বদন।
করিতেছি বৃথা প্রাণ-পতঙ্গ পোষণ।

পুনশ্চ,—

'মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধীচ কশ্চন।
পরিহারেঽপিলজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম'

আমার সমান পাপী নাহি হয়।
মম সম কেহ অপরাধী নয়॥
কি আর কহিব হে পুরুষোত্তম।
পরিহারেতেও লজ্জা হয় মম।

অপিচ,——

"শ্রীকৃষ্ণরূপাদি নিষেবনং বিনা,
ব্যর্থানি মেঽহান্যখিলেন্দ্রিয়াণ্যলম্।
পাষাণ-শুষ্কেন্ধন-ভারকাণ্যহো,
বিভর্ম্মি বা তানি কথং হতত্রপঃ।"
শ্রীকৃষ্ণরূপাদি নিষেবন বিনা,
বৃথা মোর দিন গেল।
শিলা-শুষ্ককাষ্ঠ সম দেহেন্দ্রিয়
ভার মাত্র সার হল॥
কেন তবে আর বিলজ্জ হয়ে,
বৃথা ফিরি হায়! সে ভার বয়ে?

লোকশিক্ষার্থ মহাপ্রভুর দৈন্য-প্রকাশক এইরূপ অনেক উক্তি প্রচারিত আছে। ফলে মহাপ্রভুর কৃষ্ণভক্তি ভাবান্বিষ্ট দৈন্য যে কি অসাধারণ অনুপম অপূর্ব্ব বস্তু, তাহা তাঁহার কৃপা ভিন্ন কে বুঝিতে পারে? কেবা বুঝাইতে পারে? যাঁহার কৃষ্ণ-বিরহ-বিলাপের অজস্র অশ্রুজলে সত্য সত্য শুষ্ক ভূমি কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে, তাঁহার অমানুষী দীনতা মানুষের ভাষায় বুঝাইবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। কলিপাবন কৃষ্ণনাম প্রচারার্থই যিনি অবতীর্ণ, যাঁহার শ্রীমুখে একবার শ্রীনাম শ্রবণ মাত্র প্রচণ্ড পাষণ্ডও সুদান বৈষ্ণব হইয়াছে, যাঁহার উত্থাপিত নাম-বন্যার উচ্ছ্বাস আজ সমস্ত পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইতে চলিল, তিনি নিজে কাঁদিয়া বলিতেছেন,—

"আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ।"

আমরা আর কি বলিব? যাহাহউক, ভুবনপাবন শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন-লীলামৃত সেবন করিলে, বোধ হয় মূর্ত্তিমান ঔদ্ধত্য ও দম্ভেরও দৈন্যলাভ অসম্ভব নহে। ফলকথা "গৌরকৃপাহি কেবলম্।" তবে শ্রীগৌরের শ্রীচরণোদ্দেশে আমাদের ন্যায় অদৈন্য-দীনদলের জন্য একটি আর্ষ আদর্শ আবেদন এই যে,——

"মৎসমঃ পাতকী নাস্তি ত্বৎসমো
নাস্তি পাবনঃ।
ইতি চিত্তে সমাধায় যথেচ্ছসি
তথা কুরু।"
মম সম নাহি পাপীজন।
তব সম নাহিক পাবন॥
ইহা চিত্তে সমাধান করি।
যাহা ইচ্ছা তাহা কর হরি॥

এ প্রার্থনাটীও কিন্তু দৈন্যপূর্ণ! দৈন্য ভিন্ন প্রার্থনাই হইতে পারে না; "হুকুম" হইতে পারে বটে। "অনুরোধ" জন্যও কিছু দৈন্য চাই। তবে অদীনের দৈন্য-প্রার্থনার্থ যেটুকু অগ্রিম দৈন্য চাই, তাহা গৌর-কৃপায় দৈন্য-প্রার্থনার প্রয়োজন-বোধের পুরস্কার স্বরূপেই পাওয়া যায়।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, ঐ প্রয়োজন-বোধের উপায় কি? এইরূপে "শিকলি-গাথা" প্রশ্নপরম্পরা চলিতে পারে। শাস্ত্র, যুক্তি ও মহাজনবাক্য অনুসারে তাহার উত্তর-পরম্পরাও পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু তাহা অনন্ত——অফুরন্ত। ফলিতার্থে এই অনন্তশাস্ত্র কেবল প্রশ্নোত্তরই মাত্র। অতএব এ বিষয়ে উপসংহারে আমাদের এই মাত্র নিবেদন যে, ধর্ম্মজীবন লাভার্থে 'আদৌ

শ্রদ্ধা' ইহাই শাস্ত্রোক্তি ; সাধুসঙ্গাদি ক্রমে তাহার পরে পরে। অতএব এই শ্রদ্ধাটি যেন স্বয়ম্ভূতা বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। সাধারণতঃ "শ্রদ্ধা" অর্থ বিশ্বাস। এই বিশ্বাসকে চলিত কথায় 'মনের টান' বা 'ঝোঁক' বলা যায়। (ইংরাজীতে Tendency বলা যাইতে পারে।) এইটিকে আপাততঃ যেন স্বভাব-সম্ভাব্য বলিয়া বোধ হয়। শাস্ত্রও সাধন-ক্রম প্রদর্শনের একটা মূল ভিত্তির আবশ্যকতায় সেইরূপই ধরিয়া লইয়াছেন ; ফলে কিন্তু কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না। শ্রদ্ধারও কারণ আছে। অনাদি-অনন্ত প্রবাহরূপে নিত্য সৃষ্টির সহিত সৃষ্ট জীবের কর্ম্মবন্ধ-পরম্পরাও অনাদি অনন্ত প্রবাহরূপে নিত্য! দর্শনশাস্ত্র এখানে হাবু ডুবু খাইয়াছেন ; অগত্যা 'অনাদি অনন্ত' তত্ত্বেই 'ইতি' দিতে বাধ্য হইয়াছেন। জ্ঞান-মার্গের এই জটিল কুটিল সিদ্ধান্ত-রহস্য ভক্তিমার্গে আসিয়া ভগবদিচ্ছা-তত্ত্বে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে। তারপর ভক্তিভজ-নার্থীর অত্যাবশ্যকীয় "আশাবন্ধ" বিধানার্থে কৃপাময় ভক্তিশাস্ত্র বলিয়াছেন "ভগবৎকৃপা"। যদি "শ্রদ্ধা" এই ভগবৎকৃপার হেতু বলা যায়, তবে শ্রদ্ধার হেতুও আবার এই ভগবৎকৃপা! ফলে ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই ভগবৎকৃপা! ভক্তিমার্গীয় সিদ্ধান্তে মূল ভিত্তিই ভগবৎকৃপা। অখিল ধর্ম্ম-মূল বেদ ঘোষণা করিলেন,—"ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্"। এ ব্রহ্ম অবশ্য নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম নহেন। নির্গুণে কৃপা-গুণ অসম্ভব। তাই পুরাণাদি ভক্তিশাস্ত্র বেদ ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন,—সর্ব্বগুণনিধান পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের কৃপা বা সংক্ষেপতঃ ভগবৎকৃপাই সার। এই ভগবৎকৃপাবলে চরমে কৃষ্ণদাসত্ব বা ভগবৎসেবানন্দ লাভই জীবের চরমসিদ্ধি বা পরমপ্রাপ্তি। কলিযুগ-পাবনাবতার কৃপাময় শ্রীগৌরহরি কৃপা করিয়া ইহার কালোপযোগী সুগমপথ প্রদর্শন করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং সেই পথের সম্বল হরি-নাম প্রদান করিয়াছেন ও করিতেছেন। কেবল গৌর-কৃপা-বলেই জীবের সে সম্বল লাভ হয়। অতএব "গৌরকৃপাহি কেবলম্।"

"গৌর-কৃপা সর্ব্বসার।
গৌরকৃপায় জীবোদ্ধার॥
গৌর-কৃপা-বলে ভবে গৌর-কৃপা চাই।
গৌরকৃপা পেলে কৃষ্ণ-সেবানন্দ পাই॥
গৌরপ্রেমানন্দে সবে হরি বল ভাই॥"

—:—

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।
(যশোহর।)

শ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৯ম বর্ষ, ৯ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ। | ১৩০৯ সাল, ১৮২৪ শকাব্দা,

বেদান্ত-সূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

শূদ্রের বেদাধিকার-বিচার।

১ম অধ্যায়। ৩য় পাদ।

(১১। ১২)

৩৪। শূদ্রস্য তদনাদর শ্রবণাত-দাত্রবণাৎ সূচ্যতে হি।

৩৫। ক্ষত্রিয়ত্ব গতেশ্চোত্তরশ্চ চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ।

৩৬। সংস্কার পরামর্শাৎ তদ-ভাবাভিলাপাচ্চ।

৩৭। তদভাব নির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ।

৩৮। শ্রবণাধ্যয়নার্থ প্রতি-ষেধাৎ স্মৃতেশ্চ।

৩৯। কম্পনাৎ।

৪০। জ্যোতিদর্শনাৎ।

৪১। আকাশোঽর্থান্তরত্বাদি ব্যপদেশাৎ।

৪২। সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভে-দেন

৪৩। পত্যাদি শব্দেভ্যঃ।

৩৪। আত্ম অপ্রশংসা শ্রবণে দুঃখকর্তৃক প্রচালিত হওয়াতেই 'জনশ্রুতি' 'রৈক' কর্তৃক "শূদ্র" সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছিলেন, কিন্তু শূদ্র-জাতীয়ত্ব-হেতুতে নহে।

৩৫। চৈত্ররথের সহিত একত্রে উল্লেখিত হওয়াতেই জনশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্ব অনুমিত হইয়াছে।

৩৬। উচ্চ ত্রিবর্ণের উপনয়ন-সংস্কার থাকায় এবং শূদ্রের তাহা না থাকায়, শূদ্রের বেদে অনধিকার বিহিত হইয়াছে।

৩৭। সত্যকাম জাবাল শূদ্র নহে, বুঝিয়াই গৌতম তাঁহাকে দীক্ষা দিয়াছিলেন; এই জন্যও শূদ্রের বেদে অনধিকার প্রতিপন্ন হইতেছে।

৩৮। স্মৃতিশাস্ত্রদ্বারাও শূদ্রের বেদ-শ্রবণ-অধ্যয়ন বারিত হওয়াতে, শূদ্রের বেদে অনধিকার প্রতিপন্ন হইতেছে।

৩৯। প্রাণই ব্রহ্ম, যেহেতু বিশ্বস্থ তাবৎপদার্থই ইহাতে কম্পিত হয়।

৪০। ব্রহ্মই জ্যোতিঃস্বরূপ, শ্রুতিতে এইরূপ উক্ত হওয়াতে "জ্যোতি" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

৪১। আকাশ নাম-রূপ-উপাধির অতীত উক্ত হওয়ায়, "আকাশ" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

৪২। সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মায় ভেদ বোধ হইলেও, তত্বতঃ উভয়ের একত্ব উক্ত হওয়ায়, জীবাত্মা না বুঝাইয়া পরমাত্মা ব্রহ্মকেই বুঝায়।

৪৩। "পতি" প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হেতু পরমাত্মা ব্রহ্মকেই বুঝায়।

———o———

৩৪হইতে ৩৮সূত্র পর্য্যন্তের বিষয়, শূদ্র যে বেদাধ্যয়নে অনধিকারী, তাহা প্রমাণ করা। ফলে এ প্রামাণিকতা "শূদ্র" পদের প্রকৃত তাৎপর্য্যবোধের প্রতিই নির্ভর করে। যাহারা আধ্যাত্মিক, নৈতিক বা মানসিক শিক্ষার কোন নির্দ্দিষ্ট আদর্শে উপনীত হইতে পারেনাই, তাহারাই যদি প্রকৃত পক্ষে "শূদ্র" পদবাচ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে সেরূপ শূদ্র-লক্ষণ অপর উচ্চতর ত্রিবর্ণের মধ্যেও বিস্তর লক্ষিত হইবে। যদি কেবল গুণানুযায়ী জাতিবিচার না ধরিয়া জন্মানুযায়ী জাতি-বিচারই ধরিতে হয়, তবে প্রাচীন কালে অনেক অনার্য্য জাতীয় ব্যক্তিও যে উচ্চতর আর্য্য-বর্ণত্রয় মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, ইহার ভূরি দৃষ্টান্ত-প্রমাণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হইবে। পুরাকালে যখন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ে প্রাধান্য লইয়া বিবাদ হইয়াছিল, এবং তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের অবনয়ন ও স্বজাতীয় উন্নয়নে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, সেই সময়ে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মা ব্রাহ্মণ বীর পরশুরামাবতারের অভ্যুদয়। তিনি অনার্য্য জাতীয়কেও গুণোন্নয়ন মতে ব্রাহ্মণত্ব দিয়া স্বীয় সম্প্রদায়ের সম্পোষণ ও বলবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। এবম্বিধ উদাহরণ ভূরি পরিমাণে প্রদর্শিত হইতে পারে।

বেদ-স্বাধ্যায়ের সহুপযোগিনী বিদ্যা-শিক্ষার অভাবই যদি শূদ্রত্ব হয়, তবে তাহা সর্ব্ববর্ণের প্রতিই খাটে, এবং তাহাহইলে শূদ্রের বেদাধিকারের নিষেধবিধির কোন সার্থকতা থাকেনা। মূর্খেরা ত বেদের কাছে ঘেঁষিতেই পারে না, ঘেঁষিবেও না। তবে আর কাহাদিগকে নিবারণ করিতে উক্ত নিষেধ-বিধির প্রয়োজন হইবে? প্রথমে আমরা দেখিব যে, উক্ত বিষয়ে বাস্তবিক সূত্রসমূহের তাৎপর্য্য কি এবং শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য, তাঁহার স্বাভাবিকী সহৃদার-নীতি সত্বেও উক্ত সূত্রাবলীর ভাষ্যে উক্ত বিষয়ে তাৎকালিক সমাজ ও কালধর্ম্মের বশবর্ত্তিতায় কিরূপ সংকীর্ণতায় পড়িতে বাধ্য হইয়াছেন।

২৫শ সূত্রের উক্তি এইরূপ যে, মনুষ্যগণ বেদ-স্বাধ্যায়ের অধিকারী; কিন্তু এই 'মনুষ্য'

পদে উপযুক্ত শিক্ষাধিকারসম্পন্ন মনুষ্যকেই, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই দ্বিজ ত্রিবর্ণের মনুষ্যকেই বুঝাইতেছে। মীমাংসা দর্শন বলেন যে, দ্বিজাতির উপনয়নসংস্কারই বেদ-স্বাধ্যায়ে প্রবৃত্ত হইবার অবশ্য-কর্ত্তব্য প্রাথমিক অনুষ্ঠানবিশেষ; উহা দ্বিজ ত্রিবর্ণের জন্য; উহা শূদ্রজাতির জন্য বিহিত হয় নাই।

৩৪ হইতে ৩৮ সূত্র পর্য্যন্ত, এই পঞ্চ সূত্রের প্রতিজ্ঞাও ঐ একই বিষয়ের প্রতিপাদ্য, এবং শূদ্রের বেদাধিকার প্রতিপাদনের অনুকূল তর্কসমূহের খণ্ডনই তাহার বিষয়। উক্ত খণ্ডনসমূহ বক্ষ্যমাণ বেদান্তসূত্রে যে ভাবে পরিব্যক্ত বা প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, এমন কি, সূত্রগুলির সংগঠন-সময়েও শূদ্রগণের বেদাধিকারের অনুকূল অভিমত সূত্রকারের সশ্রেণীস্থ অনেকের মধ্যেও বর্ত্তমান ছিল; নচেৎ উক্ত খণ্ডনসমূহের কোনই কার্য্যকারিতা থাকে না।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ৪র্থ অধ্যায়োক্ত জনশ্রুতি ও রৈক-আখ্যান দ্বারা ইহাই প্রমাণিত করার চেষ্টা হইয়াছে যে, "শূদ্র" পদের ব্যুৎপত্ত্যর্থ যাহাই হউক, উক্ত পদে পরিচিত জাতীয়ের বেদে অনধিকার; কিন্তু উক্ত জনশ্রুতি ও তৎপরবর্ত্তী সত্যকাম জাবালের আখ্যানে শূদ্র যে বেদে অনধিকারী নয়, তাহারই বরং অনুকূলতা পাওয়া যায়। কিন্তু সূত্র-ভাষ্যকার স্বকপোল-কল্পিত ব্যাখ্যায় তাহার বিপরীত প্রমাণেরই প্রযত্ন করিয়াছেন।

আখ্যানটি এইরূপ,—— জনশ্রুতি নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি অতি দয়ালু, পরোপকারপরায়ণ ও অতিথেয় ছিলেন। তাঁহার পুরী হইতে কেহই অভুক্ত যাইতে পারিত না। একদা একদল রাজহংস তাঁহার রাজপুরীর মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপশ্চাদ্‌টি রাজা জনশ্রুতির প্রশংসাবাদে প্রবৃত্ত হইলে, সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী রাজহংসটি তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিল যে, "রাজা জনশ্রুতির যশ রৈকের যশের সহিত কোন ক্রমেই তুলনীয় নহে।" পরদিন প্রাতঃকালে যখন প্রাচ্য রীত্যনুসারে ঐ রাজা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার সময়ে বন্দীগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইতেছিলেন; তৎকালে সেই রাজহংসের বাক্য তাঁহার বিশেষ স্মরণ থাকায়, তিনি রৈকের সহিত সাক্ষাতের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন; এবং তাঁহার উদ্দেশ পাইয়া, ছয় শত পালিত গবাদি, একগাছি কণ্ঠহার ও যুগল-বড়ব-বাহিত এক রথ উপহার স্বরূপ লইয়া, রৈক-পূজিত দেবতার সাধনশিক্ষা লাভের প্রার্থনায় রৈক-সন্নিধানে সমাগত হইলেন। তখন রৈক প্রায় অর্থলোভী বর্ত্তমান পুরোহিত দলের প্রাচীন আদর্শ স্বরূপে বলিয়া উঠিলেন—"হে শূদ্র! এই সমস্ত পশ্বাদি, কণ্ঠহার ও রথ তোমারই থাকুক্‌" জনশ্রুতি ইহাতে ভগ্নোৎসাহ হইলেন না; পরন্তু পুনরায় সহস্র পশু, কণ্ঠহার, বড়বযুগ-বাহিত রথ এবং অধিকন্তু তাঁহার এক রূপসী যুবতী কন্যা উপহার দিতে উদ্যত হইলেন। তখন এই তথাকথিত ঋষি রৈক পশু ও স্বর্ণাদির লোভ সংবরণ করিতে পারিলেও এই মোহিনী কন্যার মোহ অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইয়া কহিলেন "হে শূদ্র! তুমি

কি ইহাকেও আমার জন্য আনিয়াছ? যদি তাহা হয়, তবে এই কন্যাই তোমার সহিত আমার আলাপের হেতুভূতা হইবে। যাহাহউক, ইহাতেই তিনি জনশ্রুতিকে "সম্বর্গবিদ্যা" শিক্ষা দিলেন। আদি তত্ত্বের জ্ঞানই সম্বর্গবিদ্যা। তাহার মর্ম্ম এই যে, অগ্নি, সূর্য্য এবং জলের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় বায়ুতত্ত্বগত এবং বায়ুর মূল সত্তা ব্যোমই জড় জগতের আদি মূল সত্তা। জীব পক্ষে জীবনই জৈবিক তত্ত্বের মূলতত্ত্ব। বাক্য, চিন্তা, সংকল্প, মন, এ সমস্তই মূলজীব-তত্ত্বগত; তাহাতেই উদ্ভূত, তাহাতেই বিলীন। বায়ু এবং প্রাণ যুগল মূলতত্ত্বো-দ্ভূত যুগল তত্ত্ব, ইত্যাদি। যাহা হউক, এই প্রকার সম্বর্গবিদ্যার উপদেশ জন-শ্রুতির প্রদত্ত মহার্হ উপহার নিচয়ের সমযোগ্য হইয়াছিল কি না, তাহার কিছুই উল্লেখ নাই। যদি তিনি তাহাতেই তৃপ্ত হইয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে আমাদের কোন বিতর্ক নাই; কিন্তু অধ্যাপক মোক্ষমূলর অতি সুযোগ্যভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, রৈকের প্রদত্ত শিক্ষা জনশ্রুতির প্রদত্ত বৃহৎ উপহারের যোগ্য হয় নাই। সে যাহাই হউক, বিচার্য্য বিষয় এই যে, জন-শ্রুতি বাস্তবিক শূদ্র, কিম্বা কেবল রৈক কর্তৃক অবজ্ঞার সহিত "শূদ্র" আখ্যায় অভি হিত। জনশ্রুতি বাস্তবিক শূদ্র, অথবা ক্ষত্রিয়, তাহা ছান্দোগ্য উপনিষদে কিছুই স্পষ্টীকৃত হয় নাই। ৩৫ সূত্রে উক্ত হই-য়াছে যে, তিনি ক্ষত্রিয়ই হইবেন; নচেৎ সেই একই অধ্যায়ে রৈকপ্রদত্ত সম্বর্গ-বিদ্যার উপদেশ দান প্রসঙ্গে জনশ্রুতির সহিত ক্ষত্রিয় চৈত্ররথের নামোল্লেখ হইবে কেন? কারণ, একই বিষয়ে পরস্পর সমধর্ম্মী বস্তুদ্বয়েরই একত্রে উল্লেখ হইয়া থাকে। কিন্তু রামায়ণে, মহাভারতে এবং এমন কি, বেদেও আর্য্য ও অনার্য্যের বহু স্থলে একত্রে উল্লেখ দৃষ্ট হয়; পরন্তু তদ্দ্বারা পরস্পরের জাতি বিপর্য্যয়-সংঘটন অপ্রমাণিত।

অতঃপর ইহা বলা যাইতে পারে যে, জনশ্রুতির বন্দী, দূত, রথ, ধনসম্পদ ইত্যাদি রাজন্য-জন-সুলভ যত কিছু ছিল, তদ্দ্বারা তিনি ক্ষত্রিয়ই প্রতিপন্ন হইতে পারেন। এ যুক্তিও অদৃঢ়, কারণ পুরাকালে ভারত-বর্ষে অনেক অনার্য্য রাজা ছিলেন এবং তাঁহারা তাৎকালিক ক্ষত্রিয় রাজগণের সহিত বন্ধুতাদি বিবিধ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ ছিলেন। আমাদের জগদ্বিখ্যাত রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনার্থ বনগমন কালে জনৈক অনার্য্য রাজা গুহকের ভবনে কি ভাবে উপনীত ও তৎকর্তৃক গৃহীত হইয়াছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। নীচ ব্যক্তি উচ্চ ব্যক্তির সমাগমে যেরূপ তাঁহাকে অভিভাবক তুল্য গুরু-গৌরব দানে সমাদরে সসম্ভ্রম-সম্বর্দ্ধনা করে, গুহক ঠিক সে ভাবে রামচন্দ্রের অভ্যর্থনা করেন নাই; পরন্তু পরমপ্রেমা-স্পদ প্রাণপ্রিয় বন্ধু জ্ঞানেই হৃদয়াসনে বসাইয়াছিলেন। অস্মদ্দেশীয় প্রচলিত যাত্রার আসরে বা থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চে গুহককে অতি নীচ চণ্ডাল রূপে প্রদর্শিত ও রাম চন্দ্রকে সমুচ্চ ক্ষত্রিয়রাজ রূপে প্রদর্শিত করা হয়। এতদ্দেশে এবম্বিধ অভিনয় সচরাচর সকলেই দেখিয়াছেন। বস্তুতঃ রাম-গুহক-মিলন পরস্পর সমযোগ্য বন্ধু

ভাবেরই মিলন; আর্য্য-অনার্য্যের গুরুত্ব-লঘুত্বগত উচ্চ-নীচ মিলন নহে।

অপর, ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, জনশ্রুতি শূদ্র হইলে কদাচ ব্রাহ্মণ রৈক তাঁহার কন্যাকে গ্রহণ করিতেন না। এ যুক্তিরই বা দৃঢ়তা কোথায়? আর্য্য-অনার্য্যের বৈবাহিক সম্বন্ধের উদাহরণ বিস্তর বর্ত্তমান। অনার্য্য দাসরাজের কন্যা সত্যবতীকে ঋষিরাজ পরাশর বিবাহ করিলেন এবং তাঁহাদেরই সুবিখ্যাত পুত্র মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস। মাতৃবর্ণানুসারে বেদব্যাসের অনার্য্যত্ব থাকিলেও, তিনিই তৎসাময়িক ঋষিবর্গের শীর্ষস্থানীয় হইয়া অসংখ্য শাস্ত্র-পুরাণাদি প্রণয়ন করেন এবং বেদের 'ব্যাস' অর্থাৎ বিভাগ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ 'বেদব্যাস' উপাধি লাভ করেন। জরৎকারু ঋষি অনার্য্য রাজা বাসুকির ভগিনীকে বিবাহ করেন এবং এই দম্পতীর পুত্র আস্তিকই আর্য্যানার্য্যের বিখ্যাত বিবাদ-বিগ্রহে সন্ধি ও শান্তি সংস্থাপন করেন। ভারতীয় পুরাণশাস্ত্রের বিরাট ভাণ্ডারে এবম্বিধ ভূরি দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হইতে পারে।

সূত্রকার এবং টীকাকারের মত এই যে, জনশ্রুতি বাস্তবিক শূদ্র নহেন; কিন্তু হংস-মুখে আপন অপেক্ষা রৈক্বের প্রশংসাবাদ শুনিয়া তিনি যে তামসধর্ম্মরূপ দুঃখে বিচলিতচিত্ত হইয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার "শূদ্র" অভিধানের হেতু। "শুচাদ্রবতীতি শূদ্রঃ"—অর্থাৎ যে শোকের দ্বারা প্রচালিত, সেই শূদ্র। এই ব্যুৎপত্ত্যর্থ অনুসারেই জনশ্রুতির পূর্ব্বোক্ত দুঃখ-দ্রবিতচিত্ততা জন্যই তাঁহার শূদ্রাখ্যা; ফলিতার্থে তিনি প্রকৃত শূদ্রজাতীয় নহেন। শঙ্করাচার্য্য বলেন,—

"কথং পুনঃ শূদ্র শব্দেন সুশুৎপন্না সূচ্যতে ইতি উচ্যতে তদা দ্রবণাচ্ছুচমভিদুদ্রবে শুচা বাভি সুদ্রুবে শুচা বা রৈকমভিদুদ্রাবেতি শূদ্রাবয়বার্থ সম্ভবাৎ রূঢ়ার্থস্য চাসম্ভবাৎ।"

এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, জনশ্রুতির অন্তরোদ্ভূত শোক তৎপ্রতি প্রযুক্ত "শূদ্র" শব্দ দ্বারা সূচিত হইতে পারে কিনা? বাস্তবিক 'শূদ্র' শব্দের ব্যুৎপত্তি দ্বারা শোক সূচিত হয়, সন্দেহ নাই। জনশ্রুতি সেই শোকের দ্বারা বিচলিত ও অভিভূত হইয়াছিলেন। শোক তাঁহাতে প্রাদুর্ভূত বা তিনি শোকে সমাহিত হইয়াছিলেন, অথবা তাঁহার শোকবেগ তাঁহাকে রৈক-সমীপগত করিয়াছিল। আমাদের মতে শঙ্করের ইহা শূদ্রত্ব সূচিকা কষ্ট কল্পনা মাত্র। আলোচ্য-স্থলের শূদ্র-সম্ভাষণ অনেকটা আলঙ্কারিক ভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে। ফলে বর্ত্তমান বিতর্কে শঙ্করের যুক্তির সার এই যে, জনশ্রুতি রাজহংস সম্বাদে বাস্তবিক বিষাদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কথিত রৈক ঋষি তাহা যোগবলে জানিতে পারিয়া তাঁহাকে "শূদ্র" সম্বোধন করিয়াছিলেন। এইরূপ ব্যাখ্যায় যিনি পরিতৃপ্ত হইতে পারেন, তিনি হউন, কিন্তু আমাদের মনে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, এতদ্বারা শূদ্রের বেদাধিকার-প্রতিপাদনের সম্ভাবনা নিবারণোদ্দেশেই ভাষ্যকার ঐ প্রকার অসরল ব্যাখ্যায় কষ্টকল্পিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে কার্য্যতঃ সুযোগ্যাধিকারী শূদ্রগণ কদাচ বেদ-স্বাধ্যায়ে বঞ্চিত হন নাই। যজুর্ব্বেদে স্পষ্টই উক্ত

হইয়াছে,——"যথেমং বাচং কল্যাণীম্ বদানি ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায়।"

এ কল্যাণী বেদবাণী
উচ্চারিয়া বলি আমি—
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় গণে,
শূদ্র আর বৈশ্য জনে।

স্বর্গীয় স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী এই শ্রুতির এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। ভারতের আদিম অধিবাসী অনার্য্যজাতিই শূদ্র হউক, আর মূল আর্য্যজাতিরই কোন অধস্তন শাখাবিশেষই শূদ্র হউক, ফলে শূদ্রের বেদাধিকার যে বৈদিক সময়ে বারিত হইয়াছিলনা, তাহার বিস্তর প্রমাণ আছে। এমন কি, বেদাধিকারে শূদ্র-বারণ বিধির প্রবর্ত্তনা হইলেও, তাহা কার্য্যতঃ সেরূপ ছিলনা। তখনও স্বীয়গুণে সুযোগ্যাধিকারী শূদ্র বেদ-সাধারে সমর্থ হইতেন, তাহা ছান্দোগ্য উপনিষদুক্ত সত্যকাম-জাবাল-সংবাদে সুপ্রতিপন্ন। অধ্যাপক মোক্ষমূলার এই শূদ্র-বেদ-বারণ-বিধি বিষয়ে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,———"ইহা সাধারণতঃ অনুমিত হয় যে, ভারতীয় চতুর্থ জাতি শূদ্র প্রাচীন অনার্য্য অধিবাসী বলিয়া জাত্যংশে বস্তুতঃ তাহাদের বিজেতা আর্য্যজাতি হইতে বিভিন্ন, এবং এরূপও হইতেপারে যে, (কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নাই) প্রকৃত আর্য্য-সন্তান হইয়াও কার্য্যদোষে গুণাবনতির ফলে তাহারা বিশুদ্ধ আর্য্যাধিকার-বিচ্যুত ও শূদ্রত্ব তুল্য সামাজিক নীচত্ব অথবা তদধিক অতিনীচত্ব বা পাতিত্যপ্রাপ্ত। বাদরায়ণ বলেন, যাহারা দারিদ্র্য ও অন্যান্য বিবিধ দোষদুষ্ট অবস্থায় পড়িয়া দ্বিজ ত্রিবর্ণের নিম্নে শূদ্রস্থানীয় হইয়াছে, তাহারা বেদান্ত-বিদ্যায় বারিত হয়নাই। অনেক সময়ে অনেক বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের মনে প্রকৃত শূদ্রের বেদাধিকার বিষয়ে বিতর্ক উঠিয়াছে, কিন্তু অবশেষে তাঁহারা সেই নিষেধ-বিধিতেই লাগিয়া রহিয়াছেন। ফলে উপনিষদের বিবিধ বাক্য-প্রমাণে ইহা অনুমিত হয় যে, অন্ততঃ পুরাকালে উক্ত নিষেধ-বিধির বিশেষ দৃঢ়তা ছিলনা। ঋগ্বেদের একটি স্তোত্র আমরা অবশ্য বিস্মৃত হইবনা, যাহাতে স্পষ্টই এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, অন্যান্য জাতির ন্যায় ব্রহ্মা হইতে শূদ্রেরও উৎপত্তি হইয়াছে। অপর, ইহা অবশ্য অপ্রকাশিত নহে যে, তাঁহারা ব্রাহ্মণের সহিত সমভাষাভাষীই ছিলেন। উপনিষদে অন্ততঃ জনশ্রুতি ও সত্যকাম, এই দুইজন সম্বন্ধে শূদ্রের বেদান্তাধিকার স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে, সন্দেহ নাই।"

এক্ষণে ৩৫ সূত্র ও তাহার শাঙ্করভাষ্য আলোচনায় এইরূপ বিতর্ক উপস্থিত হইতে পারে যে, শূদ্র শব্দের সাধারণ নির্দ্দিষ্ট অর্থ জনশ্রুতি বিষয়ক উদাহরণে প্রচলিত ও প্রবল থাকার কোন সুযুক্ত কারণ দৃষ্ট হয়না। ছান্দোগ্য উপনিষদে ঐরূপ কোন শূদ্রত্বসূচক রূপক অর্থ পরিগৃহীত বা প্রতিপন্ন হয় নাই। যদি শূদ্র শব্দের প্রচলিত অর্থ স্বীকার না করিয়া, ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থই গ্রহণ করিতে হয়, তবে যাঁহারা শূদ্র বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা যে কোন কারণে শোকাভিভূত হওয়াতেই শূদ্রত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন, এরূপ কেন না বলা হয়? "শূদ্র" শব্দে এমন কিছুই নাই, যাহাতে উদাত্ত

ধানীগণ বেদাধিকার-বঞ্চিত হইতে পারে। আর বেদেও তাহার সমর্থক কোন বচন-প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। শঙ্করাচার্য্য বলেন, জনশ্রুতির শূদ্রাভিধান প্রচলিত অর্থানুসারে পরিগৃহীত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু অসম্ভবইবা কেন? বর্ত্তমান প্রচলিত অর্থানুসারে জনশ্রুতি কোন অনার্য্যবংশ-সম্ভূত শূদ্র রাজা হওয়া কি অসম্ভব? আর তিনি ব্রহ্ম-বিদ্যালাভের জন্য উপযুক্ত গুরু-প্রণামী সহ রৈকের শিষ্যত্বপ্রার্থী হইয়াছিলেন, কিন্তু রৈক্ক আধুনিক লুব্ধ ও কোপন গুরু-পুরোহিতের ন্যায় প্রথমে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াও অবশেষে সেই শূদ্ররাজের সুন্দরী কন্যার সুন্দর মুখের মোহে পড়িয়া পরে তাঁহাকে বিদ্যা দান করিয়াছিলেন, ইহাই বা অসম্ভব কি?

অধুনা ভারতীয় অনেক জাতিই "শূদ্র" বলিয়া অবজ্ঞাত হইয়া থাকে। তর্কস্থলে যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, যাঁহাদিগকে আমরা বিশুদ্ধ আর্য জাতি বলিয়া স্বীকার করি, তাঁহারা তদিতর একটি ভিন্ন জাতি, তাহা হইলেই বা সেই শূদ্র-জাতীয়ত্ব কোনরূপ লজ্জার বিষয় কিরূপে হইতে পারে? ভারতবর্ষের একজন সর্ব্বপ্রধান সম্রাট অশোক শূদ্র চন্দ্র গুপ্তের পৌত্র। যে বাসুকির সহিত বিখ্যাত আর্য্যরাজগণের বিবিধ বৈবাহিক সম্বন্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, তিনি শূদ্র ছিলেন। শূদ্র অনার্য্য হইলেও বেদে তাহাদিগকে শক্তিশালী জাতি বলিয়া উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের সুন্দর নগর সমূহ, সুবিস্তীর্ণ সুখদ উদ্যান সমূহ, সুদৃশ্য অট্টালিকা সমূহ এবং পাষাণ বা লৌহময় দুর্গ-সমূহের বর্ণনা বেদে দৃষ্ট হয়। ফলে ভারতবর্ষে প্রাধান্য লইয়া যে আর্য্য জাতির সহিত তাহাদের সমর-সংঘর্ষ চলিয়াছিল, তাঁহাদের অপেক্ষা সভ্যতায় তাহারা অত্যধিক হীন বলিয়া বোধ হয়না। যদি বাস্তবিক বর্ত্তমান শূদ্রগণ তাহাদেরই উত্তর পুরুষ হন, তবে তাহাতেও কিছু মাত্র লজ্জা বা হীনতার কারণ নাই। ভারতের সুপ্রসিদ্ধ বীর ভীম ও অর্জ্জুনের অনার্য্যবংশীয়া সহধর্ম্মিণী ছিল এবং তাঁহাদের প্রপিতামহী সত্যবতী স্বয়ং অনার্য্য রাজার কন্যা ছিলেন। আমাদের জগদ্বিখ্যাত রামচন্দ্র বিভিন্ন অনার্য্য জাতির সামরিক সহায়তা গ্রহণ করিয়াই সেই অশেষশক্তিসম্পদ-সম্পন্ন অনার্য্য রাজা রাবণকে সবংশে সংহার করিয়াছিলেন। ফলে এই আর্য্য-অনার্য্য, দেব-অসুর বা নর-রাক্ষস প্রভৃতি জাতি আদিমূলে একই সাধারণ পূর্ব্বপুরুষ হইতে উদ্ভূত; সুতরাং রাবণাদির জাতীয়তাও তদুদ্ভূত বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। বিভিন্নতা বা বৈপরীত্য, ক্রমে উত্তর পুরুষ-পরম্পরায় বিবিধ কারণে সংঘটিত হইয়াছে। ফলতঃ সুপ্রাচীন সময়ে আর্য্য-অনার্য্যের ভেদ অতি সামান্য বা অকিঞ্চিৎকর। যদি পুরাকালে তাই হয়, তবে প্রকৃত পক্ষে উক্ত ভেদের বর্ত্তমান কার্য্যকারিতা কিছুই নাই, এবং শতশত শতাব্দী হইতে বিবিধ কারণে শতশত জাতির মিশ্রিত শোণিত আজ ভারতীয় হিন্দু-ধমনীতে প্রবহমান। জাঠ, রাজপুত, গুর্খা, এখন সকলেই হিন্দু। রাজপুতেরা রামচন্দ্রের উত্তরপুরুষত্ব দাবী করেন,

কিন্তু ইতিহাস দ্বারা কি ইহা ঠিক প্রমাণিত হয়? যাহাহউক, রাজপুত যদি এক্ষণে নিজ জাতিতে সূর্য্যবংশীয়শোণিতের অবিকৃত অস্তিত্ব ঠিক প্রমাণ করিতে না পারেন, তবে কি তিনি হেয় বলিয়া বিবেচিত হইবেন? বাস্তবিক ইহা বিস্ময়ের বিষয় যে, এই পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিস্তারের যুগে মানবের বিবিধ-বিষয়িণী উদারতা বিবিধ প্রকারে বর্দ্ধিতা হইলেও, জাতীয়তার অধিকার-অনধিকারের ঘোঁট বাড়িতেছে বৈ কমিতেছে না; বরং যখন ভারতীয় জন-সমাজ আপনাদের জাতীয় সাহিত্য ভিন্ন আর প্রায় কিছুরই সংবাদ রাখিত না, তখন যেন ইহার এত বাহ্যিক বাঁধাবাঁধি বা বাড়াবাড়ি ছিলনা।

যাহাহউক, আমরা আবার শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যালোচনায় প্রত্যাবৃত্ত হইতেছি। ৩৮ সূত্রের ভাষ্যে তিনি বলেন যে, স্মৃতি শূদ্রের বেদাধিকার বারণ করিতেছেন, যথা— "যেষাং পুনঃ পূর্ব্বকৃত সংস্কারবশাৎ বিদুর-ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতীনাং জ্ঞানোৎপত্তিস্তেষাং ন শক্যতে ফলপ্রাপ্তি প্রতিবন্ধং, জ্ঞানস্যৈকান্তিক ফলত্বাৎ। শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণানীতি চেতিহাস পুরাণাধিগম চাতুর্ব্বর্ণ্যাধিকার-স্মরণাৎ। বেদপূর্ব্বকস্তু নাস্ত্যধিকারঃ শূদ্রাণামিতি।" অর্থাৎ বিদুর ও ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতির ন্যায় যে সমস্ত শূদ্র পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার-সিদ্ধ, তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানার্জ্জনে স্বতএব অবারিত; কারণ ঐকান্তিক জ্ঞানের ফল জন্ম-জন্মান্তর-নির্ব্বিশেষে অবিধ্বংসী। স্মৃতি চতুর্ব্বর্ণকেই পুরাণেতিহাসাদির অধ্যয়নে তুল্যাধিকার প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু বেদে শূদ্রের অধিকার বিধান করেন নাই।

"শূদ্র" শব্দের যেরূপ অর্থই গৃহীত হউক না কেন, মন্বাদি স্মৃতি যে শূদ্রের বেদাধিকার নিষেধ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু শূদ্রের ইতিহাস-পুরাণাদিতে অধিকার অব্যাহত রাখিয়াছেন। ফলে ইতিহাস-পুরাণইবা কি? মনে করুন, মহাভারত এক মহা ইতিহাস এবং' শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' সেই মহাভারতেরই অন্তর্গত সুতরাং শূদ্রের গীতাধ্যয়নে অনধিকার নাই। এই গীতা উপনিষৎসমূহের সারসংগ্রহ স্বরূপ। কঠ, শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি বিস্তর উপনিষদের বিস্তর বচন প্রায় অবিকল গীতায় উদ্ধৃত। গীতা-মাহাত্ম্যে ত স্পষ্টই লিখিত হইয়াছে যে,

'সর্ব্বোপনিষদোগাবো দোগ্ধাগোপালনন্দনঃ।
পার্থোবৎসঃসুধীর্ভোক্তাদুগ্ধংগীতামৃতংমহৎ"
সর্ব্বোপনিষদ্ গাভী, দোহাল গোপাল সুত।
পার্থ বৎস, সুধী ভোক্তা দুগ্ধ মহাগীতামৃত॥

ফলে সাক্ষাৎ ঔপনিষদী শ্রুতি-সমূহ-সমন্বিত গীতাশাস্ত্র তবে কিরূপে শ্রুতি-অনধিকারী শূদ্রাদির অধীত হইতে পারে? বেদান্তের সূত্র ও টীকাকারের মতে তাহা হইলে গীতাধ্যয়নও শূদ্রাদির পক্ষে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত; কিন্তু তাহাত হইতেছে না। গীতাতে শূদ্রাদি স্বচ্ছন্দে শ্রুতি আবৃত্তি করিতেছেন! এখন মনে করুন, গোলাপকে অন্য নামে ডাকিলে কি তাহার গোলাপত্ব নষ্ট হয়? যাহা কার্য্যতঃ সংঘটন, তাহা শত শাস্ত্রবচনেও ব্যাহত হয় না। "বচন-শতেন বস্তুনোঽন্যথা কর্ত্তুং ন শক্যতে।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যে শ্রুতিসারসংগ্রহ, তাহা পণ্ডিতগণের সুবিজ্ঞাত; অথচ এই গীতা প্রতিদিন স্ত্রী-শূদ্রাদির পাঠার্থ অনুমোদিত

বা ব্যবস্থিত রহিয়াছে! বস্তু একই, কেবল "বেদ-বেদান্ত" না বলিয়া "পুরাণ-ইতিহাস" বলা হইতেছে মাত্র! শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণেও কতিপয় ঔপনিষদী শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং তাহা অবাধে শূদ্রাদির অধীত হইতেছে। কঠশ্রুতির নচিকেতোপাখ্যান ও তাহার কতিপয় শ্লোক অগ্নিপুরাণে উদ্ধৃত এবং সেই অগ্নিপুরাণ শূদ্রাদির অবাধিত পাঠ্য; কিন্তু সেই মূল কঠশ্রুতিই মাত্র শূদ্রের অধিকারাতীত! ইহা অপেক্ষা অদ্ভুত বিধান আর কি হইতে পারে? ফলিতার্থে ইহা সাধারণ-জ্ঞান-বিস্তারের প্রতিরোধী সামাজিক সঙ্কীর্ণতা ও একদেশদর্শিতার কুফল মাত্র। কতকগুলি লোক এই জ্ঞান-বিস্তার বিরোধিনী সঙ্কীর্ণা নীতির চিরপক্ষপাতী; আবার কতকগুলি উদারনৈতিক লোক ইহার বিরুদ্ধবাদী। একটি সমগ্র জাতিকে জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের সুপবিত্র শিক্ষায় চিরবঞ্চিত রাখা কদাচ তাঁহাদের অভিপ্রেত হইতে পারেনা। তাঁহারা কদাচ এই বিদ্বেষ-বিদূষিত স্বার্থসঙ্কুচিত সাম্প্রদায়িক মতের পরিপোষক নহেন।

ভারতবর্ষে এমন এক সময় আসিয়াছিল, যৎকালে ক্ষত্রিয়গণ বেদান্ত-বিদ্যা হইতে ব্রাহ্মণকে বঞ্চিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তাৎকালিক গর্ব্বিত-বিপ্রপুত্রও করযোড়ে ক্ষত্রিয়ের নিকট বেদবিদ্যালাভার্থে প্রপন্ন হইতেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ৫ম অধ্যায়ে ৩য় পরিচ্ছেদে যে শ্বেতকেতু আরুণি এবং পাঞ্চালরাজ প্রবাহণের আখ্যান বর্ণিত আছে, তদ্দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্ম বিদ্যালোচনার কতদূর অধিকার ছিল, তাহা জানা যায়। আখ্যানটি এইরূপ, ব্রাহ্মণ শ্বেতকেতু একদা রাজন্য প্রবাহণের রাজসভায় উপনীত হইয়াছিলেন। রাজা তাঁহাকে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ বালক তদুত্তরদানে অসমর্থ হইয়াছিলেন। তখন ঐ ব্রাহ্মণ বালক শ্বেতকেতু স্বীয় পিতৃ সন্নিধানে আসিয়া, অভিমান ব্যথিত-ভাবে-রাজার কৃত-প্রশ্ন ও স্বকীয় উত্তরদান-অক্ষমতা নিবেদন করিলেন। তাহাতে পিতা বলিলেন, এমন কি, তিনিও তৎসমস্ত প্রশ্নের উত্তর জানেন না। তৎপর পিতা উক্ত রাজসমীপে গমন করিলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, আমার ভাণ্ডারের ঐহিক-দ্রব্যরাশির মধ্যে আপনি যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচনা করেন, তাহাই প্রার্থনা করুন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, ও সব অনিত্য ধন আপনাতেই থাকুক, আমি উহার প্রার্থী নহি। হে রাজন্! আমার পুত্রকে আপনি কি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহারই ব্যাখ্যা করুন। "রাজা কহিলেন" কোন ব্রাহ্মণই ইহা পূর্ব্বে জানিতেন না, পৃথিবীতে সমগ্র মানব জাতির মধ্যে একমাত্র ক্ষত্রিয়েরাই এই বিষয়ে শিক্ষাদানে সমর্থ।

"সহ কৃচ্ছ্রী বভূব তংহ চিরং বসেত্যাজ্ঞাপয়াঞ্চকার তং হোবাচ যথা মা ত্বং গৌতমাবদো যথে যম প্রাকত্যত্তঃ পুরা বিদ্যা ব্রাহ্মণান্ গচ্ছতি তস্মাদু সর্ব্বেষু লোকেষু ক্ষত্রস্যৈব প্রশাসনমভূদিতি তস্মৈ হোবাচ।

শঙ্করাচার্য্য ইহার ভাষ্যে এরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, ব্রাহ্মণেরা তৎকালে উক্ত বিষয়ের কিছুই জানিতেন না ; ক্ষত্রিয়েরাই উহার একমাত্র উপদেষ্টা ছিলেন এবং উহা পুরুষ পরম্পরাক্রমে ক্ষত্রিয় জাতিতেই নিবদ্ধ ছিল। এতাবতা ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তৎকালে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য ক্ষত্রিয় কর্তৃক অভিভূত হইয়াছিল। কতিপয় ক্ষত্রিয় উক্ত-বিদ্যা হইতে ব্রাহ্মণকে বঞ্চিত রাখারই পক্ষপাতী ছিলেন, তবে কেবল প্রবাহণের ন্যায় উদারচেতা রাজন্যগণই তদ্বিষয়ে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে কোন পার্থক্য বিধান করেন নাই।

তৎপর ছান্দোগ্য উপনিষদের ৫ম অধ্যায়ের ১২শ পরিচ্ছেদে ঐরূপ আখ্যান বিবৃত হইয়াছে। কতিপয় ব্রাহ্মণ 'আত্মা কি ও ব্রহ্ম কি" এই তত্ত্ব জানিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন এবং তাঁহারা আপনারা কোন সিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়া উদ্দালক সমীপে গমন করিলেন। উদ্দালকও তাঁহাদের জিজ্ঞাসার প্রকৃত-উত্তর দানে অক্ষম হইলেন ; সুতরাং তাঁহারা সকলে মিলিয়া রাজা অশ্বপতির সন্নিধানে উপনীত হইলেন ; রাজা অশ্বপতিও তাঁহাদিগকে সমুচিত সমাদরে গ্রহণ করিলেন। পরদিবস রাজা তাঁহাদিগকে ধনদানে উদ্যত হইলে, তাঁহারা তৎপ্রতিগ্রহে অসম্মত হইলেন। ইহাতে রাজা ভাবিলেন যে, হয়ত তাঁহার রাজ্যপালন সম্বন্ধীয় কোন ত্রুটি বা দোষের প্রতীকারার্থে তাঁহারা আসিয়াছেন, এই মনে করিয়া তিনি বলিলেন, "আমার রাজ্যে কোন দস্যু তস্কর নাই, কোন কৃপণ নাই, মদ্যপ নাই, অনাহিতাগ্নি নাই; মূর্খ নাই, ব্যভিচারী নাই, ব্যভিচারিণীও নাই" ইত্যাদি। তাঁহারা বলিলেন যে, তাঁহারা সে সব কোন কারণেই আসেন নাই ; তাঁহারা ধনের প্রার্থী নহেন ; তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যা লাভের প্রার্থী। এতচ্ছ্রবণে রাজা বলিলেন, "আমি আগামি কল্য এ বিষয় আপনাদিগকে বলিব। তদনুসারে তৎপরদিবস তাঁহারা শিক্ষালাভার্থে গুরুসমীপার্থী শিষ্যবৎ হোম-সমিধাদি সহকারে তাঁহারা রাজা অশ্বপতির নিকট আগমন করিলেন এবং অশ্বপতিও যজ্ঞোপবীত দ্বারা উপনয়ন বিধান না করিয়াই তাঁহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিলেন।

"তান্ হোবাচাশ্বপতির্বৈ ভগবন্তোঽয়ং কৈকেয়ঃ সম্প্রতীমমাত্মানং বৈশ্বানরং মধ্যেতি তং হন্তাভ্যাগচ্ছামেতি তং হাভ্যাজগ্মুঃ। তেভ্যো হ প্রাপ্তেভ্যঃ পৃথগর্হাণি কারয়াঞ্চকার স হ প্রাতঃ সঞ্জিহান উবাচ ন মে স্তেনো জনপদে ন কদর্য্যো ন মদ্যপো নানাহিতাগ্নি র্নাবিদ্বান্ন স্বৈরী স্বৈরিণী কুতো যক্ষ্যমাণো বৈ ভগবন্তোঽহমস্মি যাবদেকৈকস্মা ঋত্বিজে ধনং দাস্যামি তাবদ্ভগবদ্ভ্যো দাস্যামি বসন্তু ভগবন্ত ইতি॥ তে হোচুর্যেন হৈবার্থেন পুরুষশ্চরেত্তং হৈব বদেতাত্মানমেবেমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধ্যেষি তমেব নো ব্রূহীতি তান্ হোবাচ প্রাতর্বঃ প্রতিবক্তাস্মীতি তে হ সমিৎপাণয়ঃ পূর্ব্বাহ্ণে প্রতিচক্রমিরে তান্ হানুপনীয়ৈব বৈ তদুবাচ।"

এই সমস্ত দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, কোন এক সময়ে ব্রাহ্মণেরাও ক্ষত্রিয়সমীপে ব্রহ্মবিদ্যা লাভার্থ উপস্থিত হইতেন; কিন্তু অধুনা কেবল শূদ্র নহে, পরন্তু

পুরাণাদি সহ বেদাধ্যয়নে অধিকার থাকা সত্বেও বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয় পর্য্যন্তও বেদ-বিদ্যায় অনধিকারী হইয়া পড়িয়াছেন। অদৃষ্টের কি রহস্য, শূদ্রজার পুত্র বেদব্যাস হইলেন বেদের বিভাগ কর্ত্তা, এবং তাঁহারই প্রামাণিক নায়কত্ব মতে শূদ্রগণ বেদাধিকারে বঞ্চিত! যাহাহউক, সত্য কদাচ অভিভূত থাকিবার নহে। সংস্কারান্ধ ভাষ্যকার প্রভৃতিরা যতই চেষ্টা করুন, সত্যাধিকারের জয় অপ্রতিহত; এই জন্যই বিদুর ও ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতির বেলায় "পূর্ব্বজন্মসিদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যার সংস্কার লুপ্ত হইবার নহে" অগত্যা ইহাই সমাধান। অথবা সোজা কথায় এরূপ বলিলেও হয় যে, "যে শিখিয়াছে, সে শিখিয়াছে, তার আর হাত কি? কিন্তু সাবধান! আর যেন কেউ না শিখে। ইহা কি অদ্ভুত ন্যায়ের যুক্তি! এবং সেই জগদ্বিখ্যাত শঙ্করাচার্য্যের পক্ষে ইহা কি অযোগ্য নীতি! ফলে তাৎকালিক-সমাজের উক্তবিষয়িণী সংস্কারান্ধতা এতই প্রবল ছিল যে, স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যকেও তৎসমর্থনে বাধ্য করিয়াছিল।

যে সমস্ত জাতি বর্ত্তমানে বেদাধিকার-বিচ্যুত হইয়া আছে, তাহারা অনেকেই জাতিতেও বস্তুতঃ শূদ্র নহে; অথচ তাহারাও যেন শাস্ত্র কর্ত্তৃকই বেদ বারিত, এইরূপ সংস্কারান্ধ হইয়া তদ্বিষয়ে নীরব ও নিশ্চেষ্ট আছেন! ফলে যাহারা বাস্তবিক "শূদ্র" অভিধেয় জাতিতে উৎপন্ন, তাহাদেরও বেদাধিকার নিশ্চিত অবারিত। স্মৃতি-শাস্ত্রে যে শূদ্রের বেদাধিকার বারিত হইয়াছে, বেদ-বিরোধিতায় তাহা অপ্রামাণ্য, ইহাই শাস্ত্র সিদ্ধান্ত। অথবা অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, এবং তাহাই সমীচীন বোধ হয়; যথা—স্মৃতিশাস্ত্রে যে শূদ্রের বেদাধিকার নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা জন্ম বা জাতিগত শূদ্রত্বকে লক্ষ্য করে না পরন্তু গুণ-কর্ম্মগত শূদ্রত্বকেই লক্ষ্য করে! এইরূপ সিদ্ধান্তই সরল, অকষ্টকল্পিত, যুক্তিযুক্ত, ন্যায়বিচারপূত ও বেদের অবিরুদ্ধ। মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, মনুসংহিতা এবং অন্যান্য স্মৃতি সমূহের উক্ত নিষেধোক্তি আলোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তই অবিতর্কিতভাবে প্রতিপন্ন হইবে, সন্দেহ নাই। প্রকৃতপক্ষে ঐ সমস্ত শাস্ত্রে তাহাদিগকেই শূদ্র বলা হইয়াছে, যাহারা নীচপ্রকৃতিধারী ও হীনকার্য্যকারী, অতএব তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, ঐ সমস্ত ব্যক্তি উচ্চতম বেদবিদ্যায় অতএব অনধিকারী সুতরাং তাহাদের জন্য অন্য সুগম শিক্ষাশাস্ত্র ব্যবস্থেয়। বস্তুতঃ ব্যাপার এই; কিন্তু কালসহকারে এই শূদ্রত্ব জন্ম ও জাতিগত হইয়া পড়াতেই যত গোল বাধিয়াছে; এমন কি এহেন শঙ্করাচার্য্যকেও এই ধাঁধায় পড়িয়া সময়ের পদে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হইয়াছে।

আরও দেখুন, গীতায় শ্রীভগবান্ স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ"। অর্থাৎ গুণ ও কর্ম্মানুসারেই আমি বর্ণবিভাগ করিয়া এই চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, উৎকৃষ্টগুণ সত্ত্বগুণ যাঁহাদের মধ্যে প্রবল, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ, যাঁহাদের মধ্যে মধ্যমগুণ—অর্থাৎ রিপুর উত্তেজনা—অথচ

কর্য্যকারিতা প্রদ রজোগুণ প্রবল, তাঁহারা ক্ষত্রিয় এবং রজস্তম মিশ্রিত মধ্যমাধম-গুণ-সম্পন্নগণ বৈশ্য, আর অজ্ঞানতাপ্রদ সর্ব্বাধম তমোগুণ ভূয়িষ্ট মানবগণই শূদ্র। আবার শিক্ষার উন্নতি-অবনতিতে ইহার বিপর্য্যয় ঘটিতেছে। কখনও সাত্বিক ব্যক্তি শিক্ষা ও সঙ্গদোষে রাজস—তামস হইয়া পড়িতেছে; কখনও বা শিক্ষা ও সঙ্গাদিগুণে রাজস তামসগণও সাত্বিক হইতেছে। এই তিনগুণ দেশ কাল পাত্র বিশেষে পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করিয়া প্রবল হইতেছে। যথা গীতা—(১৪।১০)

"রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্বংতমশ্চৈব তমঃসত্বং রজস্তথা॥
অভিভূত করি রজস্তম গুণদ্বা।
হে ভারত! সত্বগুণ প্রাদুর্ভূত হয়॥
রজোগুণ বাড়ে যার সত্ব তম পড়ে।
সত্ব রজ অভিভবে তমোগুণ চড়ে॥

অতএব তমোগুণ প্রধান শূদ্রদেরও একেবারে নিরাশ হইবার কথা নহে; তাঁহারাও শিক্ষা সঙ্গগুণে তমোভাবকে অভিভূত করিয়া এবং উন্নততর গুণসম্পন্ন হইয়া বেদবিদ্যাধিকার লাভ করিতে পারেন। ইহাই শাস্ত্রের প্রকৃত-তত্ত্ব এবং পুরাকালে এইরূপ ব্যবস্থাই ছিল।

মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বের ১৮৮। ৮৯ অধ্যায়ে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

"ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ ব্রহ্মণা পূর্ব্বং হি সৃষ্টং কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্
ছিলনা বর্ণের ভেদ ছিল সব ব্রহ্মময়।
ব্রহ্মার এ পূর্ব্বসৃষ্ট কর্ম্মে ক্রমে জাতি হয়॥

এইস্থলে জিজ্ঞাস্য হইয়াছে, শাস্ত্র মতে প্রকৃত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র কিরূপে নির্ব্বাচিত হইবে? তদুত্তরে উক্ত হইয়াছে, যাঁহারা সত্য ও অপর আধ্যাত্মিক গুণনিচয় অধিকার করিয়াছেন, এবং বেদাধ্যয়ন করেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ। যাহারা বীরধর্ম্মের সাধক ও তদানুষঙ্গিক গুণাবলীধারক, এবং বেদাধ্যয়নশীল, তাহারা ক্ষত্রিয়। যাহারা কৃষি বাণিজ্য পশুপালনকারী এবং আনুষঙ্গিক অপর কতিপয় গুণাধিকারী বেদাধ্যয়নশীল, তাহারা বৈশ্য, কিন্তু যাহারা একেবারে বেদ-বিদ্যা-বিমুখ ও বিবর্জ্জিত এবং অন্তর্ব্বাহ্য শুদ্ধ বর্জ্জিত, তাহারাই শূদ্র। শূদ্রের একটি বিশেষণ "ত্যক্তবেদঃ" অর্থাৎ ত্যক্ত হইয়াছে বেদ যৎকর্তৃক, অর্থাৎ বেদাধ্যয়নে-বিমুখ, কিন্তু বেদ-অধ্যয়নেই অনধিকারী উক্তপদের এরূপ অর্থ কদাচ সরল ও সঙ্গত হইতে পারে না।

সর্ব্বভক্ষ্যারতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ।
ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ সবৈ শূদ্র ইতিস্মৃতঃ।
সর্ব্ব ভক্ষ্যে সদা যার রুচি,
সর্ব্বকর্ম্মকারী যে অশুচি;
ত্যক্তবেদ অনাচারী যেই,
স্মৃতি মতে শূদ্র বটে সেই।

"বেদোঽখিলধর্ম্মমূলম্" বেদই অখিল ধর্ম্মের মূল। ধর্ম্মার্থ বেদাধ্যয়ন; অতএব যে অন্তর্বাহ্যে অশুচি ও অনাচারী হইয়া স্বভাবতই ধর্ম্ম বিমুখ, বেদাধ্যয়নের তাহার প্রবৃত্তি কেন হইবে, সুতরাং সেই "ত্যক্তবেদ" শূদ্র। সে আপন স্বভাবদোষে স্বেচ্ছায় স্বীয় বেদাধিকার হারাইয়াছে, সঙ্কীর্ণ শাস্ত্র সঙ্কীর্ণসমাজ বিধিরূপে তাহাকে বেদ-বর্জ্জিত

করে নাই। শাস্ত্রের প্রকৃত-তাৎপর্য্য বিকৃত ভাবে বুঝিয়া টীকা ভাষ্যকারগণও সাধারণকে তদ্রূপ বুঝাইয়াছেন। সেই মূল শাস্ত্রবোধের ভুলক্রমে সমাজে বদ্ধমূল হইয়া, "আকৃতি-প্রকৃতি-গ্রাহ্যজাতি কর্ম্মানুসারিণী" এই বিস্পষ্ট শাস্ত্রীয় জাতিতত্ত্ব ক্রমে অস্পষ্টতা পাইয়া শুধু জন্মগত জাতীয়ত্বই সমাজে সুদৃঢ় সংবদ্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমানে উপযুক্ত অধিকারী শূদ্রেরও বেদাধ্যয়নে সামাজিক অনভিমত। ফলিতার্থে তাহারই তিক্তবিষাক্ত ফল।

শূদ্রেচ যদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ॥

শূদ্র-বংশে জাত ব্যক্তি যদি ব্রাহ্ম-লক্ষণান্বিত হয়, আর ব্রাহ্মণ-বংশে জাত ব্যক্তি যদি শূদ্র-লক্ষণাক্রান্ত হয়, তবে সে শূদ্র শূদ্র নহে, সে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নহে। অর্থাৎ সেই ব্রাহ্মণ-লক্ষণ শূদ্র ব্রাহ্মণ বটে, এবং সেই শূদ্র লক্ষণ ব্রাহ্মণ শূদ্রই বটে।

গুণে শূদ্র ব্রাহ্মণ হইতে পারে এবং দোষে ব্রাহ্মণ শূদ্র হইতে পারে। পুরাণরাজ শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্ব্বর্ণের সাধারণ লক্ষণ বর্ণন করিয়া পরে বলিলেন,—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥"

যেরূপ বর্ণলক্ষণ বর্ণিত হইল, তদনুসারে এক বর্ণের লক্ষণ অপর বর্ণজ-পুরুষে লক্ষিত হইলে, তাহার লক্ষণানুসারেই বর্ণবিনির্ণয় কর্ত্তব্য। তারপর স্মৃতিরাজ মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র কি বলিতেছেন, দেখুন;—

"প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ"

যাহার জন্ম প্রচ্ছন্ন বা যাহার কুল অজ্ঞাত, তাহার স্বকর্ম্মদ্বারাই বর্ণ-বিনির্ণয় হইবে। মনু আরও বলেন,—

তপোবীর্য্যপ্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে
উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ॥

তপস্যা ও জ্ঞান-বলেই মানব যুগে২ জন্মগত উৎকর্ষাপকর্ষ প্রাপ্ত হয়। অতএব গুণই শ্রেষ্ঠজাতীয়তার হেতু এবং দোষ বা গুণাভাবই নিকৃষ্টজাতীয়তার হেতু। স্থলান্তরে মনুও স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্"

শূদ্রও ব্রাহ্মণ হয়, ব্রাহ্মণও শূদ্র হয়। অপর একস্থলে মনু বলিয়াছেন,—

জাতো নার্য্যামনার্য্যায়ামার্য্যাদার্য্যো ভবেদ্ গুণৈঃ।"

আর্য্যপিতা ও অনার্য্যমাতার পুত্রও গুণের দ্বারা আর্য্যই হইতে পারে। সুবিখ্যাত ধর্ম্মশাস্ত্র-কর্ত্তা মহর্ষি গৌতম বলেন, "বর্ণান্তরগমনমুৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাম্।" গুণের উৎকর্ষাপকর্ষতা ফলেই মনুষ্যের বর্ণান্তর প্রাপ্তি হয়; অর্থাৎ গুণোৎকর্ষে উৎকৃষ্ট বর্ণান্তর প্রাপ্তি ও গুণাপকর্ষে অপকৃষ্ট বর্ণান্তর প্রাপ্তি ঘটে। অপর, মনুর পরেই বিখ্যাতনামা ব্যবস্থাশাস্ত্রকার মহামুনি অত্রি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন-যুক্ত ও অনিত্য-সংসার মোহ-মুক্ত, সেই ব্রাহ্মণ। যে বীর-ধর্ম্মা ও সর্ব্ববিধ ক্ষত্রিয়কর্ম্মা, সেই ক্ষত্রিয়। যে কৃষি-বাণিজ্য-গোরক্ষাকারী বিহিত বৈশ্যাচারী, সেই বৈশ্য। যে মধু-মাংস-লবণ-বিক্রয়ী, অজ্ঞ, অনয়ী, সেই শূদ্র। আর যে সর্ব্বধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত, মহামূর্খ ও সর্ব্বপ্রাণী

হিংসন-দক্ষ, সেই চণ্ডাল। অত্রির এই অভিমতে গুণ-ক্রিয়াগত জাতীয়ত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে। অপিচ, বায়ুপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশ একবাক্যে বলিতেছেন যে, ঘৃৎসমদের পৌত্র, শুনকের পুত্র শৌনক আপন পুত্রগণকে স্ব স্ব কর্ম্ম-ভেদে বিভক্ত করিলেন। যথা বায়ুপুরাণ——

"পুত্রো ঘৃৎসমদস্য শুনকো যস্য শৌনকঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈবচ ॥
এতস্য বংশসম্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভির্দ্বিজাঃ ॥

বিষ্ণুপুরাণ——ঘৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং প্রবর্ত্তয়িতাভূৎ" ইত্যাদি।

হরিবংশ অবিকল বায়ুপুরাণের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

ঋগ্বেদের যে প্রসিদ্ধ "পুরুষসূক্ত" প্রাচ্য পাশ্চাত্য সর্ব্বপণ্ডিত-সমাজেই রূপক-সিদ্ধান্তে সমাদৃত, তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষের বিভিন্ন-অঙ্গ হইতে বিভিন্ন-বর্ণের উৎপত্তি। যথা পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্র সমুদ্ভূত। এস্থলে প্রশ্ন করা হইয়াছে কি প্রকারে পুরুষের বিভিন্ন-অঙ্গে বিভিন্ন বর্ণের পরিচয় প্রতিপন্ন হইবে? মুখ কাহাকে বলা যায়? বাহু কাহাকে বলে, উরু এবং পদইবা কাহাকে বলা যায়? যথা—"যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্। মুখং কিমস্য, কৌ বাহূ, কা উরু-পাদা উচ্যেতে।" উত্তর পক্ষ পরিষ্কার।—যথা ব্রাহ্মণই তাঁহার মুখ স্বরূপ, বাহু ক্ষত্রিয় স্বরূপ এবং উরু ও চরণই বৈশ্য ও শূদ্র স্বরূপ।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন বৈদিক-যুগের পরবর্ত্তী সময়ে ক্রমে বর্ণভেদ প্রথা গঠিত হইয়া আসিলে, বর্ণভেদের পক্ষপাতিগণ ঋগ্বেদে উক্তবাক্য প্রক্ষিপ্ত করিয়া আত্মমতস্থ বর্ণভেদ-বিধির প্রাচীন ও সমীচীন সমুৎপত্তি সপ্রমাণিত করিয়াছেন। যাহাহউক, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এ সিদ্ধান্ত আমরা সমর্থন করিতেছি না। আমরা বলি, পুরুষসূক্তের উক্তবাক্য জাতিভেদের মৌলিক-অস্তিত্বের কোন পরিষ্কার প্রমাণ নাই এবং সায়ন ও মহীধর প্রভৃতি প্রাচীন বৈদিক টীকাকারগণও উহাকে রূপকার্থ ভিন্ন অন্যার্থে গ্রহণ করেন নাই। পুরুষসূক্তের উক্তবাক্যে মাত্র এই তাৎপর্য্যটুকু ব্যক্ত হইয়াছে যে, চতুর্ব্বর্ণের সর্ব্বোত্তম ব্রাহ্মণ, উত্তম ক্ষত্রিয়, মধ্যম বৈশ্য, এবং অধম শূদ্র। আর্য্য সমাজ দেহের অঙ্গ বিভাগ এইরূপ। সূক্তে উক্ত হইয়াছে,

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥"
বদনে ব্রাহ্মণ জাত, ক্ষত্র বাহুদ্বয়।
উরুতে উৎপন্ন বৈশ্য, পদে শূদ্র হয়॥

যদি কেহ বলে স্বর্ণ অলঙ্কাররূপে পরিণত হইল, তবে বুঝিতে হইবে যে, অবশ্য অলঙ্কারের পূর্ব্বেই স্বর্ণ, তদ্রূপ যদি বলা যায়, ব্রাহ্মণ মুখরূপে পরিণত হইল, তবে মুখের পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। যাহাহউক, ব্রাহ্মণও মুখ, এই উভয় শব্দই একবচনান্ত হওয়াতে মুখ শব্দকেও কর্ত্তৃকারক ধরা যাইতে পারে, এরূপ বলা যায়; কিন্তু তৎপরেই দেখা যায় যে, রাজন্য "পদ একবচন" কিন্তু বাহু

দ্বিবচন এবং "কৃতঃ" পদও একবচন, সুতরাং একবচনান্ত কৃতের সহিত বাহুর যোজনা হইতে পারে না, রাজন্যের সহিত উহার অন্বয় হইবে। অতএব "বাহূ রাজন্যঃকৃতঃ" বাক্যে, বাহুর পূর্ব্বেই রাজন্যের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইয়া পড়ে!

উক্ত-সূক্তি দ্বারা বস্তুতঃ বর্ণ-ভেদের উৎপত্তি প্রমাণিত হয় না; কেবল এতদ্দ্বারা এইমাত্র প্রকাশ পায় যে, একই সমাজ-দেহের চতুরঙ্গ এই চতুর্ব্বর্ণ; ফলে পরবর্ত্তী অপর সমস্ত শাস্ত্রদ্বারাই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, এই চতুর্ব্বর্ণ এক মূল বর্ণ হইতে কর্ম্ম ভেদে উৎপন্ন। মহাভারত বলেন, চতুর্ব্বর্ণের সকলেই এক পবিত্র ভাষাভাষী। যথা— "ইত্যেতে চতুরোবর্ণা যেষাং ব্রাহ্মী সরস্বতী" যদি শূদ্র অপর দ্বিজ ত্রিবর্ণ হইতে প্রকৃত স্বতন্ত্র মৌলিক জাতি হইত, তবে তাহারা কখনও দ্বিজ-ভাষিত-ভাষায় সমভাষী হইতে পারিত না। আমরা দেখিতে পাই যে, মূল আর্য্য ও আর্য্যজাতি পরস্পর বিভিন্ন ভাষা-ভাষী কিন্তু শূদ্র অপর আর্য্য বর্ণত্রয়সহ সম্পূর্ণ সমভাষা-ভাষী। বেদে দেখা যায় যে, অনার্য্যেরা "শূদ্র" সংজ্ঞায় অভিহিত হয় নাই; তাই পাশ্চাত্য অধ্যাপক-প্রবর মোক্ষমূলর বলেন যে, শূদ্র যে স্বীয় জাতীয়ত্বে আর্য্যজাতি হইতে বিভিন্ন, তাহা প্রমাণিত হয় নাই। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে, যাহারা বেদ পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারাই শূদ্র; কিন্তু তাহাদের কোনরূপ ধর্ম্ম ক্রিয়াদি চিরকালের জন্য প্রতিষিদ্ধ হয় নাই। যথা—

"ধর্ম্মযজ্ঞো ক্রিয়াস্তেষাং নিত্যং ন প্রতিষিধ্যতে" ইত্যাদি।

"বজ্রশুচি" উপনিষদে ব্রাহ্মণত্ব বিষয়ে একটি আলোচনা দৃষ্ট হয়। যথা—জীব বা দেহী আত্মা ব্রাহ্মণ নহে; কারণ জীব বহুবিধ-দেহ ধারণ করেন। দেহও ব্রাহ্মণ নহে, কারণ মানুষ মাত্রেরই দেহ সাধারণতঃ এক প্রকার এবং উহা জরা মৃত্যুর অধীন; অপিচ, ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ এবং শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ, এইরূপই শাস্ত্রে নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা দৃষ্ট হয় না। জন্ম জাতিগত ভাবেই ব্রাহ্মণত্ব নিরূপিত হয় না; কারণ ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগী-গর্ভজাত হইয়াও ব্রাহ্মণ, তদ্রূপ ব্যাস কৈবর্ত্ত কন্যার গর্ভসম্ভূত, বশিষ্ঠ উর্ব্বশীর অপত্য, তথাপি ব্রাহ্মণ। অপর কেবল বিদ্যা বা জ্ঞানের দ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব হয় নাই; যেহেতু ক্ষত্রিয়গণ অপরাপর অনেক মনুষ্য ও বিশিষ্ট বিদ্বান্ ও জ্ঞানী হইয়া থাকেন। কর্ম্ম ও ব্রাহ্মণত্বের হেতু নহে, কারণ প্রত্যেকেই কর্ম্মের অধিকারী। ধর্ম্ম বা পুণ্যের দ্বারাও ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ নহে; ধর্ম্ম বা পুণ্য কার্য্য অপরেও করিয়া থাকেন ও করিতে পারেন। অতএব কেবল জগৎ-কারণ ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। সংস্কারান্ধ টীকা ভাষ্যকারগণের সমক্ষে বজ্রশূচি বস্তুতঃ এক দুর্ভেদ্য সমস্যা সংস্থাপন করিয়াছেন। এ বিষয়ে বজ্রশূচী বস্তুতঃই বজ্রশূচী।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ পাদে সত্যকাম জাবালের যে আখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা বুঝা যায় যে,

বেদ কোন নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর একচেটীয়া বস্তু নহে। গুণের দ্বারা যিনি উপযুক্ত হইবেন, তিনিই বেদ অধ্যায়ের সমাদৃত-অধিকার প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই আখ্যান শূদ্রের বেদে অনধিকারের প্রমাণ স্বরূপে গৃহীত হইয়াছে।

সত্যকাম-জাবালের বংশ-পরিচয় অজ্ঞাত ছিল। সে গুরু-সমীপে ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বনের আকাঙ্ক্ষায় নিজ মাতার নিকট স্বীয় গোত্র জানিতে চাহিয়াছিল। মাতা বলিলেন- "বৎস! তোমার জন্মের পূর্ব্ব হইতে আমি বহুগোত্রীয় পুরুষের পরিচর্য্যায় ছিলাম, সুতরাং তুমি কোন্ গোত্রজ তাহা অনির্দ্দিষ্ট। যাহাহউক, তোমার নাম সত্যকাম এবং আমার নাম জবালা; অতএব জবালার পুত্র স্বরূপে তুমি সত্যকাম জাবাল নাম ব্যবহার করিও। তৎপর সত্যকাম জাবাল ঋষি হরিদ্রুম গোতমের নিকট ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম লাভের প্রার্থনায় উপনীত হইলে তৎকর্ত্তৃক তাঁহার গোত্র জিজ্ঞাসিত হইল; তখন সত্যকাম মাতৃসকাশে শ্রুত বিবরণ অবিকল নিবেদন করিলেন। ঋষিবর সত্যকামের সম্পূর্ণ সরল সত্যবাদিতা এবং নিজের লজ্জাজনক জন্মকুৎসা বর্ণনেও অপূর্ব্ব অকুণ্ঠতা দেখিয়া বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, ব্রাহ্মণ ব্যতীত এরূপ কেহ বলিতে পারেনা। তুমি ব্রাহ্মণের লক্ষণ সত্য নিষ্ঠা হইতে ভ্রষ্ট হও নাই; অতএব আমি তোমাকে দীক্ষা দিব। যাও বৎস! সমিধ আনয়ন কর।

এই আখ্যানে যদি কিছু প্রমাণিত হয়, তবে তাহা এই যে, পুরাকালে এক মাত্র সত্যনিষ্ঠাই ব্রাহ্মণত্বের বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল। পিতা মাতা যে বর্ণেরই হউন, যিনি সত্যনিষ্ঠ, তিনিই সত্য ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাদৃত। তাই অজ্ঞাত-পিতৃগোত্র-সত্যকাম কেবল স্বীয় সত্য-নিষ্ঠ-প্রভাবেই ব্রাহ্মণ পদে পরিগৃহীত হইল। ৩৭ সূত্রে সূত্রকার বলিতেছেন যে, সত্যকাম শূদ্র নহে, ইহা বুঝিতে পারিয়াই গৌতম তাহাকে দীক্ষাদানে উদ্যত হইলেন। তিনি সত্যকামের সত্যপরায়ণতা দ্বারাই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যাহাহউক, সত্যপরায়ণতা দ্বারা যদিও ব্রাহ্মণত্ব সূচিত হয়, তথাপি উক্ত গুণ যে অবশ্য কেবল ব্রাহ্মণাখ্যা একচোটিয়া শ্রেণীবিশেষেই থাকিবে, এমন কোন কথা নহে। তবে যদি বলা যায় যে, যে সত্যপরায়ণ, সেই ব্রাহ্মণ; তবে ত বর্ণ-ভেদকে নিরাপদে বিদায় দেওয়া যাইতে পারে। বস্তুতঃ সত্যকাম-জাবালের ঘটনায় ইহাই ঘটিয়াছে। এই আখ্যানটিতে এমন কিছু প্রকাশ পায় না যে, সত্যকামের জনয়িতা ব্রাহ্মণ ছিলেন, বা তৎপরবর্ত্তী অপর বর্ণদ্বয়ের কোন বর্ণীয় ছিলেন; এমন কি, ইহার মাতৃবর্ণ পর্য্যন্ত ইহাতে কিছু মাত্র প্রকাশ পায় নাই; বরং ইহার মাতার বর্ণিত-বিবরণে তাহাকে নিচজাতীয় বলিয়াই অনুমান হইতে পারে। আচার্য্য গৌতম বালকের সত্যনিষ্ঠা দেখিয়াই "ব্রাহ্মণ ভিন্ন এরূপ সত্য কেহ বলিতে পারে না" এই সমাধানে তিনি তাহাকে শিষ্য করিলেন। এস্থলে অনুসন্ধান দ্বারা সত্যকামের জন্মবৃত্তান্ত জানিয়া তাহার জাতি-নির্ণয় হইল না; পরন্ত তাহার আভ্যন্তরিক-চরিত্র

গৌরবেই তাহার ব্রাহ্মণত্ব নির্ণীত বা স্বীকৃত হইল। যদি কতিপয় নির্দ্দিষ্ট সদ্গুণই বেদাধিকারপ্রদ ব্রাহ্মণত্বের হেতুরূপে ধরা যায়, অথচ শূদ্রের বেদে অনধিকার নির্ণীত হয়, তবে নিশ্চয় এই বিধিদ্বয়ের সামঞ্জস্য বা সদুপপত্তি রক্ষিত হইতে পারে না; কেননা শূদ্রবংশীয় যে, সেও নির্দ্দিষ্ট সদ্গুণের অধিকারী হইতে পারে, ব্রাহ্মণত্ব ও বেদাধিকারত্ব অবশ্য তাহার পক্ষে অবারিত। তথাপি যদি গুণ ধরা যায় যে, উক্ত নির্দ্দিষ্ট গুণপ্রাপ্ত শূদ্র স্বীয় শূদ্রত্বমুক্ত ও ব্রাহ্মণত্ব যুক্ত হইয়া তবে বেদাধিকারী হইতে পারে, তাহাতে ফলিতার্থে শূদ্রপক্ষই সমর্থিত হয়। সে হিসাবে বিদুর ও ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতি শূদ্রই নহেন, তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব এবং এইরূপে হীন জন্ম হইতেও অনেকের কার্য্যতঃ ঋষিত্ব ব্রাহ্মণত্ব ও বেদাধিকারত্ব লাভ হইয়াছে, তাহার পৌরাণিক সাক্ষ্যের অভাব নাই।

৩৬ সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, যজ্ঞোপবীত প্রাপ্তির অভাবও শূদ্রের বেদাধিকার বারণের আনুসাঙ্গিক কারণ। উক্ত যজ্ঞোপবীত ত্রিদণ্ডী যুক্ত এবং বস্ত্র, সূত্র বা কুশ নির্ম্মিত হওয়াই বিধি। যাহাহউক, যজ্ঞোপবীতের প্রকৃত তাৎপর্য্যের বিষয়ে মনু বলেন,——

"বাগ্দণ্ডোহথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈবচ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি সউচ্যতে
সেই ত "ত্রিদণ্ডী" বাচ্য বুদ্ধি সিদ্ধ যার—
বাগ্দণ্ড মনদণ্ড কায়দণ্ড আর।

অর্থাৎ কায়, মন ও বাক্য যাহার শাসিত ও সংযত, তিনিই যথার্থ যজ্ঞোপবীতধারী! যজ্ঞোপবীতের স্থূল ত্রিদণ্ড এই সূক্ষ্ম ত্রিদণ্ডের বাহ্য নিদর্শন মাত্র। ফলিতার্থে ব্রাহ্মণত্ব বা বেদাধিকরিত্ব কোন স্থূল বাহ্যলক্ষণের অধীন হইতে পারে না। উহা বরং মনূক্ত সূক্ষ্মযজ্ঞসূত্রেরই অধীন বলা যাইতে পারে। পুরাকালে স্থূল যজ্ঞোপবীত গ্রহণ অনেক স্থলে ইচ্ছানুযায়ী ছিল মাত্র। পিতৃযজ্ঞ ও দেবযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে উহা সাময়িকভাবে ব্যবহৃত হইত মাত্র। যাঁহারা ইহা ধারণ করিতেন, তাঁহারাও ঠিক সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্যেই ধারণ করিতেন। যাহা হউক, এই যজ্ঞসূত্র কেবল একটি স্থূল বাহ্য চিহ্নমাত্র; সুতরাং অভাব কদাচ প্রকৃত গুণের অভাব বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। যজ্ঞোপবীত ত অদ্যাপি তথাকথিত শূদ্র সংজ্ঞিতগণেরও দেব-পিতৃ কার্য্যে স্কন্ধদ্বয় লগ্নভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়রাজ অশ্বপতি অনেকগুলি ব্রাহ্মণের আচার্য্যত্ব করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে বাহ্য সূত্রাদির কোন অপেক্ষা রাখেন নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদুক্ত সেই আখ্যান ইতঃপূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে।

অতঃপর শূদ্রের বেদাধ্যয়ন বিষয়িণী আলোচনার সার সংগ্রহ করা যাইতেছে। শূদ্র বেদাধিকার বর্জ্জিত, এ সিদ্ধান্ত স্বীকার্য্য বা পরিগ্রাহ্য নহে।

বেদে এমন কোন শ্রুতি বা নিষেধ বিধি নাই, যদ্দ্বারা শূদ্রজাতির বেদাধিকার বারিত হয়। বরং বেদে তদ্বিপরীত অর্থাৎ শূদ্রের বেদাধিকার বিষয়িণী শ্রুতিই দৃষ্ট হয়। জনশ্রুতি, সত্যকাম জাবাল, বিদুর, ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতির বেদাধিকারের অনুকূল

দৃষ্টান্ত দ্বারা শূদ্রের বেদাধিকার সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হইয়াছে। আর যখন সংস্কারান্ধতা ও স্বমত মত্ততার পূর্ণ প্রভাব ভারত-বক্ষে প্রবল ও প্রকট ছিল, সেই সময়েও ইতিহাস, পুরাণ, স্মৃতি, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রাধ্যয়নে শূদ্রগণের অবারিত অধিকার ছিল। আর তত্তৎশাস্ত্রগত অনেক শ্রুতিবাক্য সুতরাং তাঁহারা অবশ্য অব্যাহতভাবে আবৃত্তি ও শিক্ষা করিতেন এবং এখনও করিয়া থাকেন। বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায় এবং অনেক ব্রতাদি দেবকার্য্যেও বিবিধ মন্ত্রাদিতে শ্রুতি উচ্চারণে শূদ্রদের বাধা ছিলনা এবং এখনও নাই। যদি শূদ্র শব্দে অনার্য্য জাতি বুঝায়, তবে আর্য্যজাতির ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ে বেদ বারণ বিধি প্রযুক্ত হইতে পারে; যেহেতু ভারতীয়-প্রাচীন-সাহিত্যাদি পাঠে জানা যায় যে, আর্য্যজাতির সহিত অনার্য্য জাতির বিবিধ-ঘটনায় বহুসংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। তারপর, যদি মানসিক ও শিক্ষাগত গুণাপকর্ষই শূদ্রত্বের হেতু হয়, তবে সে হেতু দ্বিজ ত্রিবর্ণেও অর্থাৎ সর্ব্ববর্ণেই বর্ত্তিতে পারে। বর্ত্তমানে যে সমস্ত জাতি 'শূদ্র' সংজ্ঞায় অভিহিত, এবং বেদে অনধিকারী বলিয়া বিবেচিত, তাহাদের মধ্যে অনেকেই কি জাতিতত্ত্ব বিচারে, কি মানসিক-সদ্‌গুণাধিকারে, কি শিক্ষা--সাধনায়, কি কর্ম্ম-মর্য্যাদায়, কোন বিষয়ে কোন অংশেই তাহারা শূদ্র নহে, সুতরাং প্রকৃত পক্ষে বেদ-বারণ-বিধি তাহাদের প্রতি প্রযোজ্য হইতে পারে না।

যাঁহারা শাস্ত্রীয়-লক্ষণালঙ্কৃত যথার্থ ব্রাহ্মণ, তাঁহারা জ্ঞান-বিস্তারের বিরোধী হইতে পারেন না, কারণ উহা অনুদার-নীতি ও হীন-বিদ্বেষ-দূষিত-স্বভাবের ফল। বেদ বিদ্যা, ব্রহ্ম-বিদ্যা বা তত্ত্ববিদ্যা ব্রাহ্মণের একচেটিয়া থাকা কদাচ বিশুদ্ধ-ব্রাহ্মণের বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। সাধারণে বেদ-বিদ্যা বিস্তারিতা হইলে, তাঁহাদের প্রাধান্য কমিবে এরূপ কল্পনা ও হীন আশঙ্কা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ হৃদয় দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক। যে ব্রাহ্মণেরা বেদ-বারণ বিধির পক্ষপাতী, তাঁহাদের হৃদয়-দৌর্ব্বল্যই উক্ত পক্ষপাতের একমাত্র হেতুভূত। যাহাদিগকে তাঁহারা অনধিকারী বিবেচনা করেন, তাঁহারা যদি বেদাধ্যয়নে রত হন, তবে ব্রাহ্মণেরাও বরং তাঁহাদের সামাজিক শ্রেষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে অন্ততঃ প্রতিযোগিতা ভাবেও বেদাধ্যয়নাদিতে অধিকতর প্রযত্নশীল হইলেও তাহাতেও সমাজে সুফল ফলিবে। এখন ব্রাহ্মণেরাই প্রায় বেদালোচনার বহির্ভূত হইয়া পড়াতে আপনারাই যথার্থ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেছেন; অতএব যদি বেদপাঠী শূদ্রাপেক্ষা আপনাদের বেদ-জ্ঞান বর্দ্ধিততর রাখিবার অনুরোধেও তাঁহারা উপযুক্ত অধ্যবসায় সহকারে বেদবিদ্যার সাধক হন, তাহাতে সমাজে অতি স্বাস্থ্যকর-পরিবর্ত্তন আসিয়া সমগ্র সমাজের সমুন্নয়নই বিধান করিবে, সন্দেহ নাই। তাহা হইলে ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্র-সাহিত্যাদির প্রকৃত পুনরুদ্ধার হইয়া ভারতের লুপ্ত গৌরব পুনঃ প্রাদুর্ভূত হইতে পারিবে। তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, যিনি তাঁহার পরিচিত ভ্রাতাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া লন, কিন্তু যিনি সেই পতিতের চিরপতিতাবস্থারই প্রয়াসী

তিনি যে কিরূপ ব্রাহ্মণ লক্ষণাক্রান্ত, তাহা সহজে অনুমেয়।

অধুনা অস্মদ্দেশে শত শত শাস্ত্র গ্রন্থাদি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ইহার কারণ আর কিছুই নহে। বহুদিন হইতে ঐ সমস্ত গ্রন্থাদির ব্যবসায় কেবল সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-নীতি ফলে কতিপয় নির্দ্দিষ্ট পরিবার মধ্যে নিবদ্ধ থাকিয়া তত্তৎ পরিবারের ধ্বংসের সহিতই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। যদি ঐ সমস্ত গ্রন্থাদি সমাজ মধ্যে উদারভাবে সাধারণ্যে ব্যবহৃত ও বিস্তারিত থাকিত, তবে অবশ্য শত বিপ্লবেও কোথাও না কোথাও অদ্যাপি তৎসমস্তের অস্তিত্ব অবিলুপ্ত রহিত। সংস্কার-অন্ধতা বা গোঁড়ামীর হুজুকে দেশের মঙ্গল ত কিছুই হয় না, অধিকন্তু যাহারা সমাজে অজ্ঞাত ও অধঃপতিত জাতি, উহা তাহাদের উন্নয়নের প্রবল প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। কি পরার্থপরতা, কি স্বার্থপরতা, কি শাস্ত্রীয়-বিধান, অপক্ষপাতবিচার ও যুক্তিপ্রমাণ এ সমস্তই 'সমাজের সর্ব্বসাধারণের জ্ঞানোন্নতি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক" এই অভিমতি বা নীতির উপর সমস্তই নির্ভর করিতেছে। পরার্থপরতার অব্যাঘাতেই যথার্থ স্বার্থপরতা সিদ্ধ হয়। মনুষ্য মাত্রেরই জ্ঞানোন্নতি আবশ্যক, এই সাধারণ ও স্বাভাবিক নীতির উপরই শূদ্রের বেদাধিকার স্থাপিত। ২৫সূত্রে "মনুষ্যাধিকারাৎ" বাক্যে এই সিদ্ধান্তই সূচিত। কিন্তু তৎপরবর্ত্তী সূত্র নিচয়ে যে এই 'মনুষ্য' শব্দের সঙ্কীর্ণার্থ ঘটাইয়া দ্বিজত্রিবর্ণের মধ্যেই যে উক্ত বেদাধিকার বদ্ধ রাখার চেষ্টা হইয়াছে, তাহা কদাচ প্রশস্ত বা পরিগ্রাহ্য হইতে পারে না; ফলে সম্ভবতঃ উক্ত পদ গুলি প্রক্ষিপ্ত।

৩৯ সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, কম্পন হেতু প্রাণই ব্রহ্ম। কঠোপনিষদে (১১।৬-২) উক্ত হইয়াছে—"যদিদংকিঞ্চ জগৎসর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।"

যাহা কিছু এই সর্ব্বজগন্ময়।
প্রয়াণেতে প্রাণ প্রকম্পিত হয়॥
মহদ্ভয় সমুদ্যত বজ্র প্রায়।
যারা জানে তারা অমৃতত্ব পায়॥

এ স্থানে 'প্রাণ' পদের অর্থ প্রাণ-বায়ু অথবা ব্রহ্ম, তাহাই এই সূত্রের বিচার্য্য বিষয়। ইহার ভীষণসত্তা উক্ত হওয়াতেই যে এতদ্দ্বারা ব্রহ্মই বিজ্ঞেয় হইতেছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই অধ্যায়ের মুখ্য আলোচ্য বিষয়ই ব্রহ্মতত্ত্ব; অতএব ইহা বিবেচনা করাই অসঙ্গত যে, মূল-বিষয় ছাড়িয়া এতদ্দ্বারা কেবল বাতাসেরই স্তুতি করা হইয়াছে। আর বাতাসকে জানিয়াই বা কে অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে? কঠোপনিষদে আর একটি এইরূপ শ্রুতি আছে, তদ্দ্বারাও ব্রহ্মের ভীষণ-সত্ত্ব-প্রাধান্যই প্রতিপন্ন হয়। যথা—

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥"
এঁর ভয়ে ভীত হয়ে, বৈশ্বানর বিশ্ব দহে,
ভয়ে ভানু তাপে বসুধায়।
এঁর ভয়ে ইন্দ্র ভীত, ভয়ে বায়ু প্রবাহিত,
পঞ্চমতঃ ভয়ে মৃত্যু ধায়॥

বেদে ঠিক এই তাৎপর্য্যের আর একটি শ্রুতি এই যে,—

ভীষস্মাদ্বাত পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥
এঁর ভয়ে হয়ে ভীত, বায়ু হয় প্রবাহিত,
এঁর ভয়ে সূর্য্য সমুদিত।
ভীত ইন্দ্র এঁর ভয়ে, এঁর ভয়ে অগ্নি দহে,
পঞ্চমতঃ মৃত্যু প্রধাবিত॥

কোথাওবা আলঙ্কারিকভাবেও 'প্রাণ' পদের প্রয়োগ হইয়াছে; যথা—"প্রাণস্য প্রাণম্" এই স্থলে এই প্রাণের প্রাণাটিকেও ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে।

৪০ সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, জ্যোতিই ব্রহ্ম; যেহেতু উপনিষদী শ্রুতিতে ব্রহ্মতত্ত্বই দৃষ্ট হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৭। ১২-৩) দৃষ্ট হয়,—

এষ সম্প্রসাদস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপং সম্পদ্য স্বেন রূপেণ বিনিষ্পদ্যতে

এ শরীর হতে সমুত্থান করি,
সেই সম্প্রসাদ স্ব স্বরূপ ধরি,
সে পরমজ্যোতিঃ স্বরূপ তখন,
করে সে অমনি আত্মসমর্পণ।

এই সূত্রের মীমাংসিতব্য বিষয় এই যে, শ্রুত্যুক্ত "জ্যোতি" শব্দ সূর্য্যাদির জ্যোতির ন্যায় সাধারণ আলোক বুঝাইবে না। এতদ্দ্বারা সেই ব্রহ্মকেই বুঝাইবে। অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়ই ব্রহ্ম এবং শ্রুতিতে পরজ্যোতি পদে পরব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন।

৪১ সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, আকাশই ব্রহ্ম; যেহেতু নাম-রূপ-উপাধির অতীত রূপেই এ তত্ত্ব পরিচিত। "ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮। ১৪-১) উক্ত হইয়াছে,—

আকাশো হ বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্মতদমৃতং স আত্মেতি শ্রূয়তে।"

আকাশ পদেতে হন পরিচিত যিনি।
নাম-রূপ-উপাধির প্রকাশক তিনি॥
এই সর্ব্ব নাম রূপ যাঁর অন্তর্ভূত।
ব্রহ্ম-আত্মা-অমৃত স্বরূপে তিনি স্তুত॥

এখানে স্পষ্টই পরিব্যক্ত হইয়াছে যে, সমস্ত নাম রূপ-উপাধির প্রকাশক স্বরূপে উক্ত এই "আকাশ" পদ "ব্রহ্ম" পদেরই প্রতিশব্দ বিশেষ। পরন্তু উহা এস্থলে অনিত্য ভৌতিক-আকাশ বা ব্যোম-বাচক হয়। ব্রহ্মকে যেমন ইতঃ পূর্ব্বে আলঙ্কারিকভাবে 'জ্যোতি' বলা হইয়াছে, এস্থলেও তদ্রূপ আলঙ্কারিকভাবে 'আকাশ' বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ নাম রূপ-উপাধির পূর্ণ প্রকাশ স্বয়ং পূর্ণ নিরুপাধিক ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কোন সৃষ্ট বস্তুর দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না। ছান্দোগ্যোপনিষদ্ (৭। ৩-২) বলেন—"অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম রূপে ব্যাকরবাণীতি।

এই সর্ব্ব জীবেতে জীবাত্মা সম্বিত—
প্রবেশিয়ে নাম-রূপ করি প্রকাশিত।

উপরোক্ত-শ্রুতিতে অতি বিশদরূপেই ব্যক্ত হইয়াছে যে, একমাত্র ব্রহ্মই যাবদীয় নাম-রূপ-উপাধির প্রকাশক। এস্থলে জীবাত্মা কর্ত্তৃকই নাম রূপাদি-প্রকাশক কথিত হওয়াতেও উক্ত তাৎপর্য্যের কোন বিপর্য্যয় ঘটে নাই; যেহেতু পরমাত্মাই জীবাত্মারূপে জীবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপাদির প্রকাশ করিতেছেন। ফলতঃ

জীবাত্মা পরমাত্মা ব্রহ্ম হইতে তত্ত্বতঃ পৃথক স্বরূপ নহেন।

৪২ সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, জীবের সুষুপ্তি সময়ে ও মৃত্যুতে জীবাত্মা দেহ হইতে উৎক্রান্ত হইয়া যান; অতএব জীবাত্মা হইতে পরমাত্মা পৃথক্তত্ত্ব, এরূপ সিদ্ধান্ত অবিশুদ্ধ; যেহেতু জীবাত্মা ও পরমাত্মা পারমার্থিক একত্বই শ্রুতি সিদ্ধান্ত সম্মত।

বর্ত্তমান শ্রৌত-প্রসঙ্গের উদ্দেশ্যই পরমাত্মতত্ত্ব প্রতিপাদন, সুতরাং সুষুপ্তি সময়ে দেহ হইতে দেহীর অর্থাৎ জীবাত্মা উৎক্রামণ জন্য উক্ত জীবাত্মার কোন স্বতন্ত্র প্রসঙ্গ শাস্ত্রের অভিপ্রেত নাহে; যেহেতু জীবাত্মা ও পরমাত্মার পার্থক্য প্রতিপাদন শ্রুতিবিরুদ্ধ।

৪৩ সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, পতি প্রভৃতি পদের প্রয়োগ থাকায় তদ্দ্বারা ব্রহ্মই বোধিতব্য।

"স সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ" ইত্যাদি শ্রৌতবাক্যে পরমাত্মাই প্রতিপাদিত; যেহেতু 'সর্ব্ব' অর্থাৎ বিশ্বের নিয়ামক, বিশ্বের প্রভু ও বিশ্বের পাতা সেই বিশাত্মা বা পরমাত্মা ভিন্ন জীবাত্মা কদাচ হইতে পারে না, ইতি।

(৩য় পাদ সমাপ্ত।)

(ক্রমশঃ)

আহার।

পঞ্চমাধ্যায়।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

তবে এখন দেখা যাউক কি বিশেষ কারণ বশতঃ কুষ্মাণ্ডাদি সম্বন্ধে এত বাঁধাবাঁধি নিয়ম করা হইয়াছে। এই সকল বিধির মূলে যে একটি গূঢ় অভ্রান্ত সত্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা আর হয়ত এখন কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তবে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে যাঁহার বিশ্বাস নাই, তিনি যেন আমার এই প্রবন্ধ পাঠ না করেন, আমি তাঁহার জন্য এত কথা লিখি নাই।

(কুষ্মাণ্ডাদি সম্বন্ধে বিশেষ নিয়মের বিশদ যুক্তি।)

প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড।

পূর্ব্বেই আমরা দেখাইয়াছি যে, শুক্ল এবং কৃষ্ণ উভয় প্রতিপদেই শ্লৈষ্মিক-ধাতু অপেক্ষাকৃত লবণরসাশ্রিত হইয়া থাকে। কিন্তু শ্লেষ্মা স্বভাবতঃই লবণরসাত্মক।* রসাদির গুণাবধারণ করিবার সময় দেখা গিয়াছে যে, লবণরস ব্রণাদি ক্লেদরোগবর্দ্ধক। কুষ্মাণ্ডে ও আবার লবণের ভাগ (ক্ষার) অত্যধিক পরিমাণে আছে। অতএব কুষ্মাণ্ড যদি প্রতিপদে ভক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে তিথির ক্রিয়ানুসারে বর্দ্ধিত-লবণরসের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ব্রণাদি ক্লেদরোগ উৎপন্ন করিতে পারে। এই জন্যই প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

দ্বিতীয়ায় বৃহতী।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে তিথিগত ধাতুবিকার নির্ণয় করিবার সময় দেখা গিয়াছে যে, দ্বিতীয়ায় স্বভাবতঃই পৈত্তিকধাতু অতীব উষ্ণ হয় এবং বায়ুও রুক্ষ হয়। অতএব পিত্তে এবং ক্রূরাদি বায়ুবিকারে 'অর্ব্বুদ-রোগ' জন্মিয়া থাকে। অর্ব্বুদরোগকে

---

* শ্লেষ্মা শ্বেতো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ পিচ্ছিলঃ শীতলস্তথা।
তমোগুণাধিকঃ স্বাদুর্বিদগ্ধো লবণো ভবেৎ॥
ভাব প্রকাশ।

ইংরাজি ভাষায় বোধ হয় "cancer" বলে। যাহা হউক, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্রেই অর্ব্বুদরোগের উক্ত হেতু নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। সাধারণ কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, উষ্ণগুণবিশিষ্ট বীর্য্যবর্দ্ধক কোন দ্রব্য ভোজন করিলে দৈহিক-উত্তাপ স্বভাবাপেক্ষা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই অপরিমিত দৈহিক-উত্তাপ এবং বায়ুর রুক্ষতায় কি ক্রূরতায় রক্ত ও মজ্জা (মেদ) দূষিত হইয়া পড়ে। সেই সময় যদি পিত্ত সমধিক উষ্ণ অথবা শ্লেষ্মা ক্রূর থাকে, তাহা হইলে সেই বিকারগুলির পরস্পর সংক্রমণে "অর্ব্বুদরোগ" জন্মিয়া থাকে।

বৃহতীর গুণানুধাবন করিবার সময় আমরা দেখাইয়াছি যে, বৃহতী পিত্তোষ্ণকারিণী এবং ক্রূরবায়ুবর্দ্ধিনী। সুতরাং দ্বিতীয়ায় বৃহতী ভক্ষণ করিলে উক্ত তিথিসম্ভূত-পিত্তের উষ্ণতা এবং বায়ুর ক্রূরতা আরও অধিক প্রবল হইবার সম্ভাবনা। যদি দুরদৃষ্টক্রমে তাহাই হইয়া উঠে, তাহা হইলে অর্ব্বুদ-রোগাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা বলিয়াই সূক্ষ্মদর্শী মহাপুরুষগণ দ্বিতীয়ায় বৃহতী ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন।

তৃতীয়ায় পটোল।

তিথি সম্ভূত ধাতুবিকার নির্ণয় করিবার সময়-দেখা গিয়াছে যে, তৃতীয়ায় শোণিত অত্যন্ত উষ্ণ হয় এবং বায়ু ক্রূর ভাব ধারণ করে। বায়ুর ক্রূরতায় শোণিত অতিশয় সাচীভাবে চালিত হইয়া ধমনীর ভিতরে প্রবাহিত হইতে থাকে। যদি কেহ ঐ সময় শোণিতোষ্ণতাবর্দ্ধক অথচ স্নিগ্ধোষ্ণ কোন দ্রব্য ভোজন করেন, তাহা হইলে তাহার ফলে সেই স্বভাবাতিরিক্ত উষ্ণ সাচীগামী, বাতাক্রান্ত রক্ত আরও অধিক উষ্ণ হয়। বিকারভাবাপন্ন-রক্তের এই ক্রিয়াবৈষম্য রক্তবাতব্যাধি জন্মে। পটোল যদিও বাতাদি ত্রিদোষনাশক, কিন্তু শোণিতের উষ্ণবিকার বৃদ্ধি করিতে সম্যক্ পারগ। আরও একটী কথা আছে,—বায়ুর ক্রূরতা বা রুক্ষতানাশক কোন একটী দ্রব্য ভোজন মাত্রেই কি বায়ুর-বিকার সম্যক্ উপশমিত হয়? দ্রব্যের লঘু গুরু ভেদে, ন্যূনাতিরিক্ত বিলম্বে ক্রূর বায়ুর সারল্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। স্নিগ্ধোষ্ণ বীর্য্যবর্দ্ধক দ্রব্য ক্রূরবায়ু বিলম্বে সরল হয়। কিন্তু শীতলদ্রব্যে অতি সহজেই সে কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। বীর্য্যবর্দ্ধক এবং স্নিগ্ধোষ্ণগুণ সম্পন্ন বলিয়াই, ত্রিদোষনাশক হইলেও পটোলে অতিবিলম্বে যে ক্রূর বায়ুর সারল্য সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহা অভ্রান্ত ও সত্য। বায়ু স্বয়ং সম্পূর্ণ সরল না হওয়া পর্য্যন্ত ধমনীর ভিতর প্রবাহিত সেই সাচীগামী শোণিত কি প্রকারে সরলপথে নীত হইতে পারে? সুতরাং যে দ্রব্যে বায়ুর ক্রূরতা নাশও হয় অথচ রক্তও উষ্ণ হয়, যদি বায়ু ও রক্তের বিকারের সময় তাহাই ভোজন করা যায়, তাহা হইলে এতদুভয়ের বিকার-ভাব নষ্ট করিতে করিতে যে কালবিলম্ব হইয়া থাকে, তাহাতেই ঐ দ্রব্যবিশেষের গুণে তিথি সঞ্জাত উষ্ণরক্ত অপেক্ষাকৃত অধিক উষ্ণ হইয়া তৎকালিক বায়ুর সংমিশ্রণে রক্তবাতরোগে পরিণত হইতে

পারে। উক্ত কথার প্রমাণ দিবার জন্য আমি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া এস্থলে ক্ষান্ত হইতে পারি।

চতুর্থীতে মূলক।

চতুর্থীতে শ্লৈষ্মিক ও পৈত্তিক উভয় ধাতুই রুক্ষ হয়। সেই সঙ্গে বায়ুও ক্রূর-ভাব ধারণ করে। তদ্ধেতু মলাধারস্থ-মল ভালরূপ নিঃসৃত হইতে না পারিয়া দূষিত হয়। ধাতুত্রয়ের উক্ত বিকার বশতঃ মলাধারে বেদনা ও উদ্বেগ অনুভূত হয়। ইহাই আমরোগের পূর্ব্ব লক্ষণ। এই সময় যদি বায়ুর ক্রূরতা এবং পিত্ত ও শ্লেষ্মার রুক্ষতা নাশক কোন দ্রব্য ভোজন করা না যায়, তাহা হইলে অবিলম্বে আমরোগ জন্মে। মূলক সম্বন্ধে আমাদিগের অভিজ্ঞতা-ফলে আমরা বেশ বলিতে পরি যে, ইহা বাতাদি দোষের সর্ব্বপ্রকার বিকার বর্দ্ধক এবং আমরোগ কারক। মূলকের গুণনির্দ্ধারক-শ্লোক হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং চতুর্থীতে মূলক ভোজন করিলে বাতাদি ত্রিদোষ অস্বাভাবিকরূপ বিকার গ্রস্ত হইয়া আমোৎপাদন করিতে পারে বলিয়াই ঐ তিথিতে মূলক ভক্ষণ নিষেধ।

পঞ্চমীতে বিল্ব।

পঞ্চমীতে পিত্ত অতিশয় প্রবল হয়। বিল্ব ও পিত্তবর্দ্ধক, সুতরাং পঞ্চমীতে বেল ভক্ষণ করিলে তপ্তাঙ্গারে ঘৃতাহুতি দেওয়া হয়। তাহার ফলে, পিত্তসম্বন্ধীয়-রোগ হইবার সম্ভাবনা। তাই পঞ্চমীতে বিল্ব ভক্ষণ নিষেধ।

ষষ্ঠীতে নিম্বুক।

নিম্বুক শৈত্যরসপরিবর্দ্ধক এবং অম্লগুণ-সম্পন্ন। ষষ্ঠীতে শিরাসমূহ অতিশয় শৈত্য-রসাশ্রিত হইয়া থাকে। তাই তিথিসম্ভূত শৈত্যরসের সহিত নিম্বুকের শীতাম্লরস যখন শিরার ভিতর মিশ্রিত হয়, তখনই জলব্যাধি (কোষরোগ প্রভৃতি) জন্মিবার সম্ভাবনা।

সপ্তমীতে তাল।

সপ্তমীতে পিত্ত এবং রক্ত এতদুভয়েই যুগপৎ তরল হয়। রক্তপিত্ত রোগবর্দ্ধক তাল যদি এই সময় ভক্ষণ করা হয়, তাহা হইলে তিথিসম্ভূত ঐ তরলপিত্ত এবং রক্ত সেই তালরস সংমিশ্রণে রক্তপিত্তরোগে পরিণত হইবার আশঙ্কা করা যায়।

অষ্টমীতে নারিকেল।

যে সময় অগ্নি মৃদুভাবাপন্ন এবং পাকস্থলী দুর্ব্বল থাকে, সেই সময় রেচকগুণ-সম্পন্ন, অগ্নি উদ্দীপক লঘুপাক দ্রব্য ভোজন করাই বিধেয়। অষ্টমী তিথিতে পাকস্থলী এবং অগ্নি উভয়ই বিকারপ্রাপ্ত হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কিন্তু নারিকেল অতি-শয় দুষ্পাচ্য, মলরোধক এবং গুরু। এই প্রকারের একটি গুরুদ্রব্য দুর্ব্বল পাক-স্থলীতে যাইয়া কিছুতেই জীর্ণ হইতে চাহে না। সুতরাং অজীর্ণ রোগ আসিয়া দেখা দিতে পারে। এই সকল কারণেই অষ্টমীতে নারিকেল খাওয়া উচিত নহে।

নবমীতে অলাবু।

নবমী তিথিতে বায়ু কুপিত এবং শ্লেষ্মা উষ্ণ হয়। অলাবু বাতশ্লৈষ্মিক রোগকারিণী

সুতরাং নবমীতে অলাবু ভক্ষণ করিলে সেই কুপিত বায়ু এবং উক্ত শ্লেষ্মা আরও অধিক বিকার প্রাপ্ত হয়। এতদুভয়ের সংক্রামণে বাতশ্লৈষ্মিক রোগ জন্মিতে পারে।

দশমীতে কলম্বী।

কলম্বী অম্লপিত্ত রোগকারিণী! দশমীতে আবার ক্রূরপিত্ত এবং অম্লের ভাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এতদুভয়ের সংক্রামণেই অম্লপিত্ত রোগ জন্মিয়া থাকে। যদি এই ধাতুবিকারের সময় কলম্বী ভক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে বিকার প্রশমিত না হইয়া যে আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, ইহাতে আর সন্দেহ কি। সুতরাং অবশেষে অম্লপিত্ত রোগ জন্মিয়া থাকে। এই কারণেই দশমীতে কলম্বী ভক্ষণ করিবার আদেশ নাই।

একাদশীতে শিম্বী।

বাতশ্লৈষ্মিক, শ্লৈষ্মিক এবং জ্বরকারক রসে একাদশী তিথিতে নাড়ী ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। ইহা স্বভাবের নিয়ম। শিম্বী জ্বরকারিণী, তাই একাদশীতে শিম্বী উদরস্থ করিলে জ্বর হইবার সম্ভাবনা।

দ্বাদশীতে পূতিকা।

আমরা পূর্ব্বেই জানাইয়াছি যে, দ্বাদশীতে রক্ত এবং ক্রূর-শ্লেষ্মা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বায়ুও ক্রূর হয় ধাতুদিগের এইরূপ বিকার উপশম করিবার চেষ্টা না করিলে, সেই ক্রূর শ্লেষ্মা প্রোক্ত ক্রূরবায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া কণ্ঠদেশ অধিকার করিয়া বসে এবং অবশেষে কাসরোগাঙ্কুরে পরিণত হয়। এদিকে পূতিকা আবার ত্রিদোষবর্দ্ধিনী অর্থাৎ যক্ষা কাস এবং বাতাদি ত্রিদোষ, পূতিকা সংযোগে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, দ্বাদশী তিথিতে কাসের সঞ্চার কালে যদি যক্ষাকাস উৎপাদক কোন দ্রব্য ভোজন করা যায়, তাহা হইলে সেই ভুক্ত দ্রব্যের রস ক্রূর বায়ুর সাহায্যে হৃৎপিণ্ডস্থিত রক্তের সহিত শ্লেষ্মার সংযোগ করিয়া দেয়। রক্ত এবং বিকার ভাবাপন্ন শ্লেষ্মার এই ভয়াবহ সংমিশ্রণে যক্ষাকাসের অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া থাকে।*

ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকী।

বার্ত্তাকী বায়ুপ্রকোপনাশিনী, রক্তবর্দ্ধিনী, কণ্ডুকারিণী। কিন্তু তিথ্যানুক্রমেই ত্রয়োদশীতে বায়ু মন্দগামী হয় এবং রক্ত অত্যন্ত গাঢ় হয়। বায়ুর মন্দগতি বশতঃ সেই গাঢ় শোণিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যথোপযুক্ত ভাবে চালিত হইতে পারে না। তাই স্থানে স্থানে বদ্ধ হইয়া দূষিত হইয়া থাকে। কিন্তু দূষিত রক্তই যে কণ্ডু রোগোৎপাদনক্ষম, তাহা আর কাহারও অবিদিত নাই। সুতরাং ত্রয়োদশীতে প্রোক্ত রক্তদোষ নিবারক, বাতোদ্দীপক কোন দ্রব্য ভোজন করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু বার্ত্তাকী ভক্ষণে

* পূতিকা ত্রিদোষকারিণী, সুতরাং কোন তিথিতেই পূতিকা ভক্ষণ করা উচিত নহে। তাই শাস্ত্রে আছে:—
'কুষ্মাণ্ডং নালিকাশাকং বৃন্তাকং পূতিকা তথা
ভক্ষয়ন্ পতিত স্বস্থাদপি বেদান্তগদ্বিজঃ॥'
উশনা।

সেই বার্ত্তাকীর রস শরীরস্থিত তিথিসম্ভূত গাঢ়রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া গাঢ় ভাবেই পরিবর্দ্ধিত হয় এবং উপযুক্ত বাতাভাবে স্থানে স্থানে বদ্ধ হইয়া দূষিত হয়। সেই সকল দূষিত রক্ত হইতে কণ্ডুরোগ জন্মিতে পারে।

চতুর্দ্দশীতে মাষকলাই।

তিথিগত ধাতুবিকার নির্ণায়ক-শ্লোক হইতে জানা যায় যে, চতুর্দ্দশীতে অপান বায়ু ঊর্দ্ধগামী হওয়ায় কোষ্ঠবদ্ধ (আনাহ) রোগ প্রাদুর্ভূত হয় এবং উদরও স্ফীত (স্তম্ভিত) হইয়া পড়ে। কিন্তু মাষকলাই বহুমলবর্দ্ধক, অতিসার রোগোৎপাদক এবং গুরুপাক। চতুর্দ্দশীতে মাষকলাই ভক্ষণ করিলে সেই ভুক্ত দ্রব্যের রসের সহিত মলাধারস্থ পূর্ব্বসঞ্চিত মল সংক্রামিত হইয়া আরও অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত ও দূষিত হইয়া থাকে। ইহাই অবশেষে অতিসারাদি উদরাময়ে পরিণত হইতে পারে।

পূর্ণিমা এবং অমাবস্যায় মাংস।

কোন অত্যাচার না করিলেও, উক্ত দুই তিথিতে কফের সঞ্চার হয়। কফ সঞ্চারিত হইলে পাচিকা শক্তি দুর্ব্বলা হয়। তখন শরীর উষ্ণ বোধ হয় এবং জ্বরের লক্ষণ সকল কতকাংশে অনুভূত হয়। মাংসের গুণাবধারণ করিবার সময় আমরা দেখাইয়াছি যে, ইহা গুরু এবং কফ ও পিত্তবৃদ্ধিকারক। অবশ্য একথা কেহ অস্বীকার করিবেন না যে, যদি ভোজনান্তে মাংস পরিপাক করিতে পারা যায়, তাহা হইলে ইহা শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী। কিন্তু অমাবস্যা এবং পূর্ণিমায় পাচিকা শক্তি অতিশয় দুর্ব্বল থাকার জন্য পরিপাকের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। পরিপাকের ব্যতিক্রম ঘটিলেই পাকস্থলী দূষিত হইয়া বিষময় ফল প্রসব করে। ইহা ভিন্ন যে সময় নাড়ীতে কিছু প্রবল ভাবে কফের সঞ্চার হয়, সে সময়ে মাংস ভোজনে উক্ত নাড়ীসংস্থিত কফ, মাংসের কফপিত্তরস সংমিশ্রণে অতিশয় কুপিত হইয়া পড়ে। তাহারই ফলে পিত্তশ্লৈষ্মিক পীড়া উৎপাদিত হইবার সম্ভাবনা। সেই জন্যই অমাবস্যায় এবং পূর্ণিমায় মাংস ভোজন করা উচিত নহে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

রতন সুত্ত।

যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভূম্মানি বা যানি ব অন্তলিক্‌খে।
সব্বেব ভূতা সুমনা ভবন্তু
অথো পি সক্কচ্চ সুণন্তু ভাসিতং ॥১॥
তস্মা হি ভূতা নিসামেথ সব্বে
মেত্তং করোথ মানুসিয়া পজায়।
দিবা চ রত্তো চ হরন্তি যে বলিং
তস্মাহি নে রক্‌খথ অপ্পমত্তা ॥২॥
যং কিঞ্চি বিত্তং ইধ বা হুরং বা
সগ্‌গেসু বা যং রতনং পণীতং ॥
ন নো সমং অত্থি তথাগতেন
ইদং পি বুদ্ধে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু ॥৩॥
খয়ং বিরাগম্ অমতং পণীতং

যদ্ অজ্ঝগা সক্যমুনি সমাহিতো।
ন তেন ধম্মেন সমত্থি কিঞ্চি
ইদং পি ধম্মে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু ॥৪॥
যং বুদ্ধসেট্ঠো পরিবণ্ণয়ী সুচিং
সমাধিম্ আনন্তরিকঞ্ঞম্ আহু।
সমাধিনা তেন সমো ন বিজ্জতি
ইদং পি ধম্মে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু ॥৫॥
যে পুগ্গলা অট্ঠ সতং পসত্থা
চত্তারি এতানি যুগানি হোন্তি।
তে দক্খিণেয্যা সুগতস্স সাবকা
এতেসু দিন্নানি মহপ্ফলানি।
ইদং পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু ॥৬॥
যে সুপ্পযুত্তা মনসা দল্হেন
নিক্কামিনো গোতমসাসনম্হি।
তে পত্তিপত্তা অমতং বিগয্হ
লদ্ধা মুধা নিব্বুতিং ভুঞ্জমানা ॥
ইদং পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু ॥৭॥
যথিন্দখীলো পঠবিং সিতো সিয়া
চতুব্ভি বাতেভি অসম্পকম্পিয়ো
তথূপমং সপ্পুরিসং বদামি
যো অরিয়সচ্চানি অবেচ্চ পস্সতি ॥
ইদং পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু ॥৮॥
যো, অরিয়সচ্চানি বিভাবয়ন্তি
গম্ভীরপঞ্ঞেন সুদেসিতানি।
কিঞ্চাপি তে হোন্তি ভুসপ্পমত্তা
ন তে ভবম্ অট্ঠমম্ আদিয়ন্তি
ইদং পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং

এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু ॥৯॥
সহাবস্স দস্সনসম্পদায়
তয়স্স ধম্মা জহিতা ভবন্তি।
সক্কায়দিট্ঠি বিচিকিচ্ছিতঞ্চ
সীলব্বতং বা পি যদত্থি কিঞ্চি ॥
চতূহপায়েহি চ বিপ্পমুত্তো
ছ চাভিঠানানি অভব্বো কত্তুং
ইদং পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু ॥১০॥
কিঞ্চাপি সো কম্মং করোতি পাপকং
কায়েন বাচা উদ চেতসা বা।
অভব্বো সো তস্স পটিচ্ছাদায়
অভব্বতা দিট্ঠপদস্স বুত্তা ॥
ইদং পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু ॥১১॥
বনপ্পগুম্বে যথা ফুস্সিতগ্গে
গিম্হানমাসে পঠমস্মিং গিম্হে।
তথূপমং ধম্মবরম্ অদেসয়ী
নিব্বানগামিং পরমং হিতয় ॥
ইদং পি বুদ্ধে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু ॥১২॥
বরো বরঞ্ঞূ বরদো বরাহরো
অনুত্তরো ধম্মবরম্ অদেসয়ী।
ইদং পি বুদ্ধে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু ॥১৩॥
খীণং পুরাণং নবং নত্থি সম্ভবং
বিরত্তচিত্তা আয়তিকে ভবস্মিং।
তে খীণবীজা অবিরূল্হিচ্ছন্দা
নিব্বন্তি ধীরা যথায়ং পদীপো ॥
ইদং পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু ॥১৪॥
যানীধ ভূতানি সমাগতানি

ভুম্মানি বা যানি ব অন্তলিক্খে।
তথাগতং দেবমনুস্সপূজিতং
বুদ্ধং নমস্সাম সুবত্থি হোতু॥১৫॥
যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভুম্মানি বা যানি ব অন্তলিক্খে।
তথাগতং দেবমনুস্সপূজিতং
ধম্মং নমস্সাম সুবত্থি হোতু॥১৬॥
যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভুম্মানি বা যানি ব অন্তলিক্খে।
তথাগতং দেবমনুস্সপূজিতং
সঙ্ঘং নমস্সাম সুবত্থি হোতু॥১৭॥

ভাবানুবাদ।

যত জীবগণ হেথা সমাগত,
ভূমিতলে কিবা অন্তরীক্ষগত —
সকলে সুমনা হইয়া পর,
শাক্যের বচন শুন অনন্তর॥১॥
শুন, জীবদল! শুন, হে মানবগণ!
সর্ব্বভূতে কর সবে মিত্রতাবন্ধন,
দিবানিশি করে যারা বলি আহরণ
তাহাদের হ'তে কর মোদের রক্ষণ।২
যাহা কিছু বিত্ত দূরে বা এখানে,
উৎকৃষ্ট রতন যাহা স্বর্গস্থানে
তথাগত সম কিছুই নয়।
ইহাও বুদ্ধে পরম রতন
এই সত্যে হ'ক স্বস্তি সংঘটন।৩
ক্ষয় ও বিরাগ, পবিত্র অমৃত —
যাহা শাক্য পান হয়ে সমাহিত;
সে ধর্ম্ম সমান কিছুই নয়।
ইহাও ধরমে পরম রতন
এই সত্যে হ'ক স্বস্তি সংঘটন।৪
পূতপ্রজ্ঞ বুদ্ধশ্রেষ্ঠ "অনন্তবিজ্ঞান"
সেই শুচি সমাধিকে দিয়াছেন নাম,
কিছু নাই বিশ্বে সেই সমাধি সমান।
ইহ'ও ধরমে পরম রতন
এই সত্যে হ'ক স্বস্তি সংঘটন।৫
চারিযুগধরি সেই অষ্টজন
সুগত সেবক প্রশংসিত হন,
দক্ষিণা দানের যোগ্য তাঁরাই কেবল;
তাঁদের করিলে দান হবে মহাফল।
ইহাও সঙ্ঘে পরম রতন
এই সত্যে স্বস্তি হ'ক সংঘটন।
দৃঢ় চিত্তে অনুসরি গৌতমশাসন
সুপ্রযুক্ত সুনিষ্ক্রান্ত যত মহাজন,
পরম অমৃত পেয়ে করিয়া গ্রহণ
আনন্দে নির্বৃতি ভোগে প্রীতচিত্ত হন।
ইহাও সংঘে পরম রতন,
এই সত্যে হ'ক স্বস্তি সংঘটন॥৮
যথা ভূমে সুপ্রোথিত শ্বেতস্তম্ভচয়
ইতস্ততঃ বায়ুভরে প্রকম্পিত নয়,
সেইরূপ সাধুজন নিষ্কম্পহৃদয়
আর্য সত্য অবেক্ষণে কাটান সময়।
ইহাও সংঘে পরম রতন,
এই সত্যে স্বস্তি হ'ক সংঘটন॥৮
গম্ভীরপ্রজ্ঞের উপদেশ মত
আর্য সত্য যাঁরা ভাবেন সতত
তাঁরা যদি (ও) হন প্রমাদময়,
অষ্টম জনম তবুও নয়।
ইহাও সঙ্ঘে পরম রতন
এই সত্যে হ'ক স্বস্তি সংঘটন ৯
স্বভাবদর্শনসম্পদের বলে,
তিন ধর্ম্ম হয় বিনষ্ট সমূলে।
বিচিকিৎসা আর স্বকায় দর্শন,
যত কিছু আছে নিয়ম বন্ধন,

সকলি তখন টুটিয়া যায়।
চারি উপায়ের গিয়া বাহিরেতে
ছয় অভিমান না পারে করিতে।
ইহাও সঙ্ঘে পরম রতন,
এই সত্যে হ'ক স্বস্তি সংঘটন ॥ ১০
এই সত্য যেই করে দরশন
কেমনে সে করে পাপ আচরণ?
শরীরে বচনে অথবা মনে
যা করে, রাখেনা কভু গোপনে।
ইহাও সংঘে পরম রতন,
এই সত্যে হ'ক্ স্বস্তি সংঘটন ॥ ১১
গ্রীষ্মের প্রথমে গ্রীষ্ম মাসে
বনে অগ্রে যথা কুসুম বিকাশে,
সেইরূপ হিতার্থে দেন উপদেশ
নির্ব্বাণদ শ্রেষ্ঠধর্ম্ম সে বুদ্ধেশ।
ইহাও বুদ্ধে পরম রতন,
এই সত্যে স্বস্তি হ'ক সংঘটন ॥ ১২
শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠজ্ঞানময় বরদ মহান্
অনুত্তর বরাহর ক'রেছেন দান
পূত ধর্ম্ম উপদেশ।
ইহাও বুদ্ধে পরম রতন,
এই সত্যে হ'ক্ স্বস্তি সংঘটন ॥ ১৩
পূর্ব্বজন্ম ক্ষীণ, নবজন্ম নাহি রয়,
আগামি জনম হ'তে সুবিরক্তচিত্ত
অবিরূঢ়ছন্দ ক্ষীণবীজ ধীর যত
প্রদীপ সমান চির নির্ব্বাপিত হয়।
ইহাও বুদ্ধে পরম রতন,
এই সত্যে হ,ক্ স্বস্তি সংঘটন ॥ ১৪
শুন, যত জীবগণ হেথা সমাগত,
ভূতলে বা অন্তরীক্ষে যারা অবস্থিত,—
দেবনরপূজ্য সেই বুদ্ধ তথাগতে
করি নমস্কার হ'ক্ স্বস্তি বিধি মতে ॥ ১৫

শুন, হেথা সমাগত ভূতগণ যত
ভূমে কিম্বা অন্তরীক্ষে যারা অবস্থিত—
দেবতামানবপূজ্য ধর্ম্মে তথাগতে
করি নমস্কার; হ'ক্ স্বস্তি সংঘটিত। ১৬
হেথা আছ সমাগত জীবগণ যত,
ভূতলে বা অন্তরীক্ষে যারা অবস্থিত,—
শুন, দেবনরপূজ্য সংঘে তথাগতে
করি নমস্কার, হ'ক্ স্বস্তি বিধি মতে ॥ ১৭
ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।

শ্রী———ভারতী।

হরিবোল!

(১)

জেগেছে মুক্তির যুগ,
লেগেছে ঘোর হুজুগ,
তর্ক-তেজে ভরা বুক,
তর্কের তরঙ্গ।
"আধ্যাত্মিক আধ্যাত্মিক"
এই বুলি দিগ্বিদিক্,
মূলে কিন্তু ভুলে ঠিক
ভৌতিকের রঙ্গ।

(২)

কি করবে তর্ক ছার,
"পুতুল" আর "নিরাকার"
তুমি যে দুয়ের বা'র,
হায়রে বুঝিলে না!
এটা ভাল—ওটা মন্দ,
এইরূপে করে দ্বন্দ্ব,
ওতে গোবর্দ্ধনের গন্ধ,
সে ধনে খুঁজিলে না।

(৩)

হিন্দু-ব্রাহ্ম-খ্রীষ্টিয়ান্,
বৌদ্ধ-জৈন-মুসলমান্,
সকলেই যারে চান,
তুমি যদি তারে চাও।

মতের গুণে পথের গুণে,
না মিলে সে কুলে মানে,
কেনা সে ধন ভক্তি-ধনে,
এই সার সত্য লও।

(৪)

গালাগালি দলাদলি,
কেন আর সে ঢলাঢলি?
কোলাকুলি গলাগলি,
করে দেখ কি মধুর!

সাধা-সুধা ফেলে দাও,
জেদ্ করে বিষ খাও,
সগর্ব্বে গোল্লায় যাও,
যেন কত বাহাদুর!

(৫)

গলাবাজি—কলমবাজি,
মন-পাজী তায় বড়ই রাজী,
আসল্ কাজের নয় সে কাজী,
এ দিকে যে বাজী ভোর।

ক্রমে ছায়া হেল্‌ছে পূবে,
অতল-তলে চল্‌ছে ডুবে,
পতন্-পাতালপুরে নেবে,
চৌদিকে ঘেরিল ঘোর!

(৬)

খেলায় ভুলে বেলা গেল,
আঁধার লয়ে সন্ধ্যা এল,
চোখের দৃষ্টি ঝাপ্সা হ'ল,
পন্থা গেল হারায়ে!

"হচ্চে হবে—কচ্ছি করি"—
সেই খেদে যে এখন মরি;
আছে লবণ হরি হরি!
পান্তা গেল ফুরায়ে!

(৭)

উদ্দেশ্যে ঔদাস্য ভারি,
উপায় লয়ে মারামারি,
ননী ফেলে কাড়াকাড়ি,
কচ্ছ খালি নিয়ে ঘোল।

শাঁসের তত্ত্ব নাহি জানি,
খোসা নিয়ে টানাটানি,
গম্যস্থান নাহি চিনি,
শুধুই পথের গণ্ডগোল।

(৮)

ঢের হয়েছে, আর কি চাই?
অধঃপাতের বাকি নাই;
নাক জিনে জল উঠ্‌ল ভাই!
আর কি আশা আছে?

আছে বৈকি, প্রাণ আছেত,
হয়নি সেত কণ্ঠাগত,
দশেন্দ্রিয় অব্যাহত
আছে দেহেব মাঝে!

(৯)

আজও ভাব বহে স্নায়ু,
ফুস্ফুসে সঞ্চরে বায়ু,
বুঝি একটু আছে আয়ু,
আছে একটু আশ।

খোলা আছে কাণের খোল,
ঐ শোনাযায় 'হরিবোল'!

আর কেন ভাই গণ্ডগোল?
হয়ো না নিরাশ।

(১০)

রসনা রয়েছে বশে,
রসাও সে নাম-রসে,
বাসনা-বিষ-বিরসে
মজোনারে আর;
বাজা করতাল খোল,
হরি-হরি হরিবোল!
হরিবোল!—হরিবোল!
সর্ব্বসিদ্ধি-সার।

(১১)

হুজুগ! তফাৎ যাও,
তর্কবাদ! দূর হও,
বক্তৃতা! বিলয় পাও,
সভা! রও চুপ্।
পদে দল দলাদলি,
গলে পর গলাগলি,
প্রেমে কর ঢলাঢলি,
হরি বল খুপ!

(১২)

বল্ হরি—হরিবোল!
ভাবেতে হয়ে বিভোল,
প্রেমে সবে দাও কোল,
ধন্য হ'ক্ প্রাণ;
বল্ হরি—হরিবোল!
হৃদয়-দুয়ার খোল্,
হরি-হরি—হরিবোল!
কি মধুর নাম!

(১৩)

যেম্নি হবার তেম্নি হবে,
যেটি পাবার সেইটি পাবে,
আর কিছু না করতে হবে,
কেবল হরিবোল্!
আপ্‌নি হরি নিবেন্ ভার,
কি ভয়-ভাবনা আর?
তোমার শুধু নামটি সার,
হরি-হরিবোল!

(১৪)

হরিবোল সত্য,
হরিবোল পথ্য,
হরিবোল নিত্য,
হরিবোলে তরি।
হরিবোল চাও,
হরিবোল দাও,
হরিবোল গাও,
হরিবোল হরি!

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

——:০:——

সংস্কারকর্ম্ম।

——০——

চিত্রংকর্ম্ম যথানেকৈরঙ্গৈরুন্মীল্যতে শনৈঃ।
ব্রহ্মণ্যমপি তদ্বৎস্যাৎ সংস্কারৈর্বিধিপূর্ব্বকৈঃ॥

কোনও একটী চারু চিত্র নির্ম্মাণ করিতে হইলে, নির্ম্মাতা এক সময়ে একভাবে একরূপ কার্য্য করিয়া ঐ চিত্রটীর সকল অবয়বের সকল ভাব পরিস্ফুট করিতে পারেন না। তাঁহাকে এক এক শ্রেণীর সংস্কারের দ্বারা ঐ চিত্রের এক একটী ভাব ফুটাইতে হয়। চিত্রারম্ভেই উহার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাবগুলি স্ফূর্ত্তি পায় না। সাময়িক

সংস্কার বিশেষ দ্বারা ক্রমশঃ উহার উদ্বোধ হয়। উন্নতি ক্রমশঃ এক সোপান হইতে উৰ্দ্ধতর সোপানে আরোহণ করিতে পারে। কিন্তু ক্রম ভঙ্গ করিয়া অনিয়তভাবে একপদও অগ্রসর হইতে পারে না! কার্য্য কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রমের সমষ্টি মাত্র। একটী ক্রম অতিক্রম ত্যাগ করিলে অন্য ক্রম সন্নিকৃষ্ট হয়, একটীকে বাদ দিলে অন্যটীকে পাওয়া বড় কষ্টকর। সুতরাং চিত্তের সৌন্দর্য্য বিবিধ সংস্কার কার্য্য দ্বারা যথোচিত ভিন্ন সময়ে পুষ্টিলাভ করে। প্রত্যেক কার্য্যের বিভিন্ন অংশই এইভাবে উদ্ভূত হয়। প্রত্যেক বস্তুর বিভিন্ন স্বতন্ত্রতা বা বিশেষত্ব এইরূপে উৎপন্ন হয়। ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, ইত্যাদিকে বিকসিত করিতে হইলেও উহার ক্ষুদ্র২ আংশিক সংস্কারের সহায়তা গ্রহণ আবশ্যক হয়। ব্রাহ্মণত্ব বিকাশের আশা করিলে, উহার ক্ষুদ্র ভূমিকা অতিক্রম করা প্রয়োজন। জাতবালক যাহাতে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর উন্নতির অধিকারী হইতে পারে, তজ্জন্য তাহার একটী সংস্কার আবশ্যক। ঐ সংস্কার দ্বারা সে ক্রমশঃ আপনার ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট দেখিতে পারিবে। যাদৃশ সংস্কার সম্পন্ন হইলে জ্ঞানার্জ্জনে অধিকার হয়, তাদৃশ সংস্কারের দ্বারা জ্ঞানার্জ্জনোপযোগী আত্মকর্ষণ প্রসন্ন করিয়া জ্ঞানোপার্জ্জনে প্রয়াস পাইতে হয়। সৈনিক পুরুষকেও স্বীয় উপযোগিতার পরিচয় স্বরূপ কিছু কিছু সংস্কার-সম্পন্ন হইতে হয়, নচেৎ প্রবেশাধিকার লাভ অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। বি এ পরীক্ষা দিবার জন্য আদেশ লাভ করিতে হইলে, এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণতাসূচক নিদর্শন আবশ্যক, আবার এফ এ পরীক্ষা দিবার অধিকার পাইতে হইলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক। সম্প্রতি আবার প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান করিতে হইলে মাইনর পাশ করা প্রয়োজন হইয়াছে। এইরূপ প্রত্যেক কার্য্যেই সকল অধিকারেই নিম্নাধিকারী তদধিক অধিকার লাভের জন্য এক একটী সংস্কার গ্রহণ করেন। গৃহস্থোচিত ধর্ম্মের স্ফুরণই গার্হস্থ্য লাভ। গৃহস্থতা লাভ করিতে হইলে, যে সংস্কার যাদৃশ শিক্ষা আবশ্যক, উদ্বাহ প্রথা তাহাই শিক্ষা দেয়, তাদৃশ উপযোগিতা আনয়ন করিতে আরম্ভ করে। প্রত্যেক ভূমিকায় উপস্থিত হইলেই উৎকর্ষ লাভের জন্য অপর ভূমিকার যোগ্য হইবার জন্য এক এক প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠানও তাদ্বারা নিজের কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পাদন আবশ্যক হয়। সর্ব্ববিধ সংস্কার লাভের পর সুসংস্কার মানব ভগবানের অমৃতময় রাজ্যে যাইবার অধিকারী হইয়া পরম পুলক প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সংস্কার অত্যাবশ্যক, সংস্কার ব্যতীত মানব কোনও বিষয় পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না।

শ্রী——ভারতী, যশোহর।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

চরিত্র গঠন। শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস প্রণীত; এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা।

চরিত্র গঠন পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। ক্রমশঃ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যেরূপ অমুদার এবং উচ্ছৃঙ্খল হইতেছে, ইহাতে পরীক্ষার প্রতিযোগিতার লক্ষ্য করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে কর্ত্তব্যপালন হইবে না। বর্ত্তমান বিপর্য্যস্ত ভাবের সংস্কারার্থে ইহাদিগকে বহুবিধ নৈতিক শিক্ষা প্রদান আবশ্যক হইয়াছে। বিদ্যালয়ে নৈতিকপুস্তক পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলে অনিষ্টাশঙ্কার মূলে আঘাত লাগিতে পারে এই বিবেচনায় আমরা ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক পুস্তক প্রচলনের পক্ষপাতী। চরিত্রগঠন পুস্তকখানিতে নৈতিক জীবনগঠনের উপযোগী প্রায় সমস্ত উপকরণই সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থকার সঙ্কলনে বিশেষ ধীরতার পরিচয় দিয়াছেন। বঙ্গের অনেক সুসন্তান প্রবাসে থাকিয়াও বঙ্গভাষার পদ পূজনে বিরত নহেন, বরংচ অধিক উদ্যম আগ্রহ সহকারে প্রয়াস পান। গ্রন্থকার জ্ঞানেন্দ্র বাবু বঙ্গমাতার পরিচার্য্যাগ্রহণ করিয়া সেই সম্প্রদায়ের অন্যতম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইহা বঙ্গদেশের গৌরবের ও বাঙ্গালী জাতির বঙ্গভাষানুরাগের পরিচয়স্থল। গ্রন্থখানিতে ভাষার সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য আছে। বিষয়গুলির উৎকর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য না থাকিলেও স্থানে স্থানে সাম্প্রদায়িকতার প্রমাণ পাইয়া মনে কেমন একটু খট্‌কা লাগিয়া যায়। মোটের উপর গ্রন্থখানি পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলে গ্রন্থকারের অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়। আমাদের মনে হয়, উদীয়মান বঙ্গসন্তান যে উপায়েই হউক না কেন সমীতির আধার হন, তাহাই ভবিষ্যত সংগণের আশার আলোকের আভাস। পুস্তকের কাগজ ভাল, মুদ্রাঙ্কণও বেশ পরিষ্কার।

দ্রষ্টব্য।

খুলনা জেলার বাগেরহাট মহাকুমার অন্তর্গত লাউপালা গ্রামে স্বর্গীয় বালকদাস বাবাজীর স্থাপিত শ্রীশ্রীগোপাল জীউর মন্দিরটী জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঐ প্রদেশে এই শ্রীগোপাল-বিগ্রহ বড়ই প্রসিদ্ধ, অনেক মাহাত্ম্য সংবাদও প্রচারিত আছে। এখানে শ্রীশ্রীগোপালের রথোৎসব বিশেষ প্রসিদ্ধ ব্যাপার। প্রাচীন আর্য্যকীর্ত্তিরক্ষণের জন্য প্রত্যেক স্বধর্ম্মপরায়ণ আর্য্যগৌরবহিতৈষী ব্যক্তি সাধ্যোচিত যৎকিঞ্চিৎ দান করিতে বোধ হয় কুণ্ঠিত হন না। এই মন্দিরটীর জীর্ণ সংস্কার যে কত প্রয়োজনীয় এবং ইহার জন্য যৎকিঞ্চিৎ দান যে কত পুণ্যপ্রদ, দেবমন্দির নির্ম্মাতা ধর্ম্মানুরাগী হিন্দু সম্প্রদায়কে বোধ করি একথা বিশেষ রূপে বুঝাইতে হইবে না। প্রাচীনকীর্ত্তি যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, দেশের সকল সুসন্তানই সমবেত চেষ্টা বলে তাহা সম্পাদন করিতে সতত মনোযোগী হইবেন আশা করা যায়। শ্রীশ্রীগোপাল মন্দিরের সংস্কারার্থে যে মহাত্মা যাহা দান করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি তাহা মহাকুমা বাগেরহাটের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকা চরণ কর্ম্মকারের নিকট পাঠাইবেন। অলংবহুনা।

সম্পাদকের রাজ-সম্মান।

প্রতিষ্ঠালাভের প্রত্যাশায় মানব প্রাণ সতত ব্যাকুল। প্রতিপত্তির জন্য যদি বিবেক বুদ্ধির পৃষ্ঠদেশে পদাঘাত করিতে হয়, তাহার জন্যও মানব প্রস্তুত। মনুষ্যত্বের নির্ব্বাসনে অনুমোদন করিতে হয়, তাহাতেও পশ্চাৎপদ হইবার প্রয়োজন নাই। সমাজে শতকরা ৯৯ জনের আকাঙ্ক্ষার পরিতোষ প্রতিষ্ঠায়, আশার পর্য্যবসান প্রতিপত্তিতে, মনের তৃপ্তি মানে, প্রাণের প্রীতি যশে। এক কথায় লৌকিক সর্ব্ববিধ তৃপ্তি বা তুষ্টির মূলাধার খ্যাতি-মান-যশ-প্রতিষ্ঠা। যশের আশায় সংসারে না সম্পন্ন হয়, এরূপ কঠোর কার্য্য কি আছে? মানব যতই আশা কুহকে মুগ্ধ হউক না কেন, শেষে ইহার অসারতা দর্শনে আপনিই বৈরাগ্যের চরণে শরণাগত। কবি বলিয়াছেন "যেই শিরে বাঁধ সোণার পাগড়ী শ্মশানে যাইবে গড়াগড়ি।" আজ যে মুকুটধারী রাজা, যিনি স্তাবকগণ কর্ত্তৃক স্তুত, অধীন গণের নিকট প্রশংসিত ও পূজিত, দেশের নিকট, দশের কাছে মহামহিমান্বিত, তাঁরও চরম দশা দীনহীন ক্ষীণ কুটীরবাসী প্রজার সহিত বিভিন্ন নহে। "আমি" "আমার" জ্ঞানে—এই মহামোহজনক অহঙ্কারে জগৎ প্রমত্ত, তাই প্রতিষ্ঠার চঞ্চল অঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া কষ্ট পায়। জ্ঞানীর নয়নে 'প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা' "মানং গর্হ্যা সুরাপানং।" সংসারের প্রশংসা, নিন্দা, সম্মাননা, অবজ্ঞা, তিরস্কার, পুরস্কার সকলেরই মূল্য তত্ত্বদর্শীর নিকট একরূপ। জ্ঞানী, প্রশংসা বা নিন্দার দিকে লক্ষ্য না করিয়া, প্রতিষ্ঠার আশা মনে না রাখিয়া নীরবে আপনার কর্ত্তব্যপথে পদচারণ করেন, কর্ত্তব্যের বিন্দুবিসর্গও স্খলিত না হয়, এজন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন। পরোপকার করেন, প্রত্যুপকার প্রার্থনায় বা প্রশংসা কামনায় নহে, কর্ত্তব্য জ্ঞানে; অপরের নয়নের বারিবিন্দু দর্শন করিলে অবিরল দরদর ধারে অশ্রুপাত করেন এবং প্রতীকারের প্রযত্ন করেন, মোহমূলক দুর্ব্বলতায় নহে, মানবোচিত গভীর সহানুভূতিবশে। কর্ত্তব্যের অনুসরণ করিতে, নিন্দুকের অহেতুক উপহাস ও সজ্জনের স্বভাব-সুলভ সমাদর ইহার কোনটীতে তিনি বিচলিত হন না। প্রকৃত কর্ত্তব্যপরায়ণের কর্ত্তব্যজ্ঞান এতই অচল, এতই সুদৃঢ়। সাধারণতঃ কোনও প্রকার অভিসন্ধিমূলকভাব ত্যাগ করিয়া কেবল নিষ্কামভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিলে ও জনসাধারণে তাহার প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাবান্ হইতে পারে না, মনে করে তিনিও কামনার অধীন! কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, যে ব্যক্তি কেবল কর্ত্তব্যজ্ঞানে ধর্ম্মসম্মত কার্য্যসম্পাদন করে, তাহার ন্যায়তঃ প্রাপ্য পুরস্কার ভগবান অযাচিতভাবেই তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন। প্রমাণ স্বয়ং সম্পাদক মহাশয়। গবর্ণমেণ্ট স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই তাঁহাকে সম্মান অর্পণ করিয়াছেন। তিনি ইহার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করেন নাই। সংসারে এইটুকু কর্ত্তব্যের মহিমা, ইহা সদনুষ্ঠানের মর্ম্ম। বর্ত্তমানকালের রাজ-সম্মান অনেকস্থলে অনুচিত পাত্রে পতিত হওয়ায় সমাজের অহিতকর হইয়া থাকে। বস্তুতঃ দেখিতে গেলে আমরা বুঝিতে পারিব যোগ্য পাত্রে সম্মান অর্পিত হইলে, উহাদ্বারা দেশেরই উপকার করা হয়। প্রকারান্তরে সৎকর্ম্মকারীর সমাদর দর্শনে সাধারণের সদনুষ্ঠানে অনুরাগ বৃদ্ধি হয়। 'সম্মান' সৎপাত্রে অর্পিত হইলে সৎকার্য্যের প্রবোচক হয়। আমরা পরম পুলকিত হৃদয়ে যশোহর বারের সুপ্রসিদ্ধ উকিল ও যশোহর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান "হিন্দু-পত্রিকা" এবং "ব্রহ্মচারির" সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এম্. এ, বি, এল্ মহাশয়ের রাজকীয় রায় বাহাদুর উপাধিলাভ উপলক্ষে যোগ্যজনের প্রতিষ্ঠার

পরিচয় পাইয়া সর্ব্বফলদাতা ভগবানকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি, এবং সুবিজ্ঞ রাজকীয় প্রধান পুরুষগণের নির্ব্বাচন চাতুর্য্য ও গুণগ্রাহিতার প্রশংসা করিতেছি। অযাচিতভাবে গবর্ণমেণ্ট যে সম্মান প্রদান করিয়াছেন তাহার প্রত্যাখ্যান করিলে ন্যায়বান্ গবর্ণমেণ্টের অপমান করা হয় মনে করিয়া, সম্পাদক মহাশয় ইহা প্রত্যাখ্যান করিতে ইচ্ছা করেন না। যদিও গবর্ণমেণ্ট "মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান্" বলিয়াই তাঁহাকে একরূপ সম্মান প্রদান করিয়াছেন, তথাপি আমরা বিশ্বাস করি, শ্রীযুক্ত যদু বাবুর সাহিত্যসেবা ও হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুসমাজ ও হিন্দুশাস্ত্রের অশেষ উপকার সাধন ও অকৃত্রিম স্বদেশ-হিতৈষিতা ইত্যাদি ও গবর্ণমেণ্টের অবিজ্ঞাত নাই।

সম্পাদক মহাশয়ের রাজকীয় সম্মান প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে, বঙ্গের নানাস্থান হইতে অস্মদ্দেশের প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ আনন্দ প্রকাশ করিয়া যে সকল পত্র ও বৈদ্যুতিক সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন তাহা প্রাপ্ত হইয়া সম্পাদক মহাশয় তাঁহার প্রতি স্বদেশের সর্ব্বশ্রেণীর প্রধান ব্যক্তিগণের অনুগ্রহ ও স্নেহ দেখিয়া, স্বীয় অযোগ্যতা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছেন। বঙ্গের প্রজাবৎসল ছোটলাট মহামান্য সারজন উড্‌বরণ কে, সি, এস্. আই, মহোদয় স্বহস্তে লিখিয়াছেন,—

The Shrubbery,
Darjeeling.
29th June 1902.

DEAR SIR,

I offer you my hearty congratulations on the title given you in to-day's Honours list. It is the recognition of the active and effective work you have done in the Municipality of Jessore and I am glad of the opportunity of giving you my personal thauks.

Believe me, sincerely yours,
J. Woodburn.

বঙ্গের প্রেসিডেন্সি ডিভিসনের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার এবং লণ্ডন পোলিসের ভূতপূর্ব্ব চিফ্‌কমিশনার, যিনি পূর্ব্বে যশোহরের মাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং এইক্ষণ রাণাঘাটে চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া প্রত্যহ শতং দীনদুঃখী রোগীকে নিজে এবং নিজের পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ ও জামাতার দ্বারায় চিকিৎসা করাইয়া তাহাদের আশীর্ব্বাদের ভাজন হইতেছেন, সেই সুনামখ্যাত জে, মনরো সি, বি, মহাশয় লিখিয়াছেন,—

Locknagar.
Darjeeling.
27-6-02

My dear sir,

I am very glad that the son of my old friend, Tara Prasanna Babu has been distinguished in this manner. I know that you have well deserved the honour May you long live to enjoy the distinction which will show people that Government is not blind to good work done by those who are not officials.

প্রেসিডেন্সি বিভাগের বর্ত্তমান কমিশনার এম্ ফিনুকেন্ সি আই ই মহোদয় লিখিয়াছেন,—

Dear sir,

I congratulate you on the well deserved honour of Rai Bahadurship conferred upon you, and hope you will live long to enjoy it.

Yours sincerely, M. Finucane.

প্রেসিডেন্সি বিভাগের ভূতপূর্ব্ব স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টর রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর সি আই ই মহোদয় লিখিয়াছেন,—

My dear Jadu,

It is a sincere pleasure to me to see your name in the Coronation Honours list as Chairman of the Jessore Municipality, but the Govt. must have been well aware of your other distinguished services to our country, as an expounder of Hinduism and elevator of the educated classes to a higher sphere of thought.

Long may you live to enjoy your present honour as well as any future honours that may come unasked.

Your sincere will wisher,
Radhika Prasanna Mukerjee.

স্বদেশ এবং ধর্ম্মবৎসল 'ইণ্ডিয়ান মিররের' সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্র নাথ সেন এটর্ণি মহোদয় আনন্দ প্রকাশ করিয়া এক পত্র লিখিয়াছেন তিনি ইণ্ডিয়ান মিররে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে,—

We do not know if Babu Jadu nath Mozoomdar cares to have and to keep the title Rai Bahadurship which a discerning Government has conferred on him as a gift. This honour is in recognition of his valuable services as Chairman of Jessore Municipality. The people have honoured our friend these many years for his many learned contributions in regard to Hindu religion.

There is no more earnest religions reformer in Bengal than Babu Jadu nath Mozoomdar.

লাহোরের ট্রিবিউন পত্রিকা লিখিয়াছেন,

One of these is that of Babu Jadu Nath Mojumdar, Chairman of the Jessore Municipality, one of the ablest and most independent of non-official Municipal Chairmen in Bengal, and for some time Editor of the Tribune. A devoted worker in the cause of social and religious progress of his people, Babu Jadn Nath honours the title of Koy Bahadur rather than being honoured by it?

বঙ্গ সাহিত্যের মহারথী বান্ধব সম্পাদক রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর লিখিছেন,—

The elevation of a man of your worth to the rank raises the title itself in the estimation of all intelligent man. You have been doing yeoman's service to the cause of Literature in Bengal.

এতদ্ভিন্ন তিনি অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তির নিকট হইতে পত্র পাইয়াছেন, স্থানাভাবে তাঁহাদের পত্র প্রকাশ করা গেল না, নিম্নে তাঁহাদের মধ্যে কয়েকটী নাম মাত্র লিখিত হইল। যথা,—

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী এম্ এ গবর্ণমেণ্ট লাইব্রেরিয়ান্। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রিন্সিপাল সংস্কৃত কলেজ। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রফেসর সংস্কৃত কলেজ কলিকাতা বাবু পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ এম্ এ বিএল্, গবর্ণমেণ্ট প্লীডার বাঁকীপুর। বাবু বিপিন

বিহারী বসু জমিদার শ্রীধরপুর। মিঃ এফ্ এল্ মোর্শহেড্ যশোহরের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রের এইক্ষণ কলিকাতার কষ্টমের কলেক্টর, বাবু হরিচরণ সেন এল্ এম্ এস্, ডাক্তার বৈদ্যনাথ। বাবু ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী এম্ এ বিএল্, উকিল হাইকোর্ট। বাবু হৃদয়নাথ মজুমদার বি এল্. মুনসেফ্ পিরোজপুর। বাবু রাজেন্দ্র লাল আচার্য্য বি এ, রাজসাহী। বাবু নরেন্দ্রভূষণ রায় জমিদার নড়াইল। বাবু গোবিন্দচন্দ্র ভাওয়াল বিএল্, উকিল ঢকা। বাবু দেবেন্দ্র প্রসাদ্ ঘোষ জমিদার চৌগাছা যশোহর। বাবু প্রমথনাথ দত্ত এম্ এ বিএল্. সব্ ডিভিশনাল ম্যাজিষ্ট্রেট উলুবাড়িয়া। বাবু প্রসন্ন চন্দ্র রায় এম্ এ বিএল্. উকীল হাইকোর্ট। বাবু সুরেন্দ্র কুমার দেবরায় জমিদার ছান্দড়া যশোহর। বাবু যোগেন্দ্র নাথ সেন এম্ এ বিএল্, উকীল হাইকোর্ট। বাবু রাখাল মোহন বানার্জ্জি এম্ এ, সব্ ডিভিশনাল ম্যাজিষ্ট্রেট নড়াইল। বাবু শ্রীনাথ দত্ত স্বর্গীয় গোপাল লাল শীলের ওয়ার্ড ষ্টেটের ম্যানেজার। মিঃ জে প্রেটল্ সেসন্স জজ বরিশাল। খাঁ বাহাদুর আব্দর রহমান কলিকাতার স্মলকজকোর্টের জজ। পণ্ডিত রাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ অধ্যাপক মেট্রপলিটান কলেজ। বাবু বিধুভূষণ গাঙ্গুলী বিএল্ হাইকোর্ট উকীল। বাবু নরেন্দ্র কুমার বসু এম্ এ বিএল্। বাবু কৈলাশ চন্দ্র কাঞ্জিলাল বিএল্, উকীল আলিপুর। বাবু কৈলাশ চন্দ্র বসু উকীল আলিপুর। বাবু চারু চন্দ্র বসু মহাবোধি পত্রিকার সম্পাদক। বাবু রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী ভাগলপুর। মৌলাবী আব্দুল ছালাম সব্ রেজেষ্টার। ডক্টর আর ম্যাগ্ডোনাল্ড যশোহরের ভূতপূর্ব্ব সিবিলসার্জ্জন বর্ত্তমান কলিকাতার বন্দরের স্যানিটারি অফিসার। মিঃ এফ্ রডিস্ যশোহরের ভূতপূর্ব্ব ও বর্ত্তমান মেদিনীপুরের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেডেণ্ট পুলিস। মিঃ এ চৌধুরী এম্ এ ব্যারিষ্টার হাইকোর্ট কলিকাতা। মিঃ জে চ্যাটার্জ্জি ব্যারিষ্টার হাইকোর্ট কলিকাতা। মিঃ সৈয়দ সামসুল হুদা হাইকোর্টের উকীল ইত্যাদি।

যোগ্যপাত্রে সম্মান অর্পিত হইলে, সমাজ তাহাতে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে আনন্দিত। আমরা আশা করি, হিন্দু-পত্রিকার প্রত্যেক অনুগ্রাহক গ্রাহক হিন্দুধর্ম্মের সহায় স্বরূপ হিন্দু পত্রিকার সম্পাদকের সম্মানলাভ শ্রবণে আমাদের ন্যায় আনন্দ অনুভব করিতে পারিবেন। হিন্দু-পত্রিকা-সম্পাদকের নিকট সমগ্র হিন্দু সমাজ ঋণী। ইঁহাকে সম্মানিত করায় হিন্দুধর্ম্মানুরাগের পুরস্কার প্রদান ও হিন্দুসমাজের স্বধর্ম্ম-পরায়ণতার প্রেরোচনা করা হইয়াছে মনে হয়। কর্ত্তব্যমার্গে পদচারণা করিতে যেন শত বাধা বিপদে তাঁহাকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করিতে নাপারে, উত্তরোত্তর অশেষ সম্মানের অধিকারী হইয়া দেশে স্বধর্ম্মানুরাগীর পুরস্কারের দৃষ্টান্ত স্বরূপে সুখে কালাতিপাত করুন ইহাই ঐকান্তিক প্রার্থনা। আমরা বুঝিব, ভগবানের সূক্ষ্ম বিচারের এক অধ্যায় "যোগ্যতমের প্রতিষ্ঠা।"

শ্রীকেদারনাথ ভারতী,
যশোহর।

on the Bible and Biblical Subjects, Religious Sects and Doctrines, Household Matters, Education, Music, Games, &c.

You pay a few Rupees down; and receive the Voloumes at once. No waiting!

READ WHAT THE PRESS SAYS

The TIMES says:

"The *Modern Cyclopedia* is portable and compact It keeps pace with the rapid progress of the age, and observes a due proportion in dealing with the different subjects."

St. JAMES'S GAZETTE says:

"An exceedingly useful work of reference. It is modern in the sense that its information is carefully brought up to date. The facts given, so far as we have tested them are wonderfully accurate"

SCIENCE AND ART says:

"This amazingly cheap and handy volume of reference reflects the greatest credit upon all concerned in its production It should find a place in the homes of rich and poor alike"

The PRACTICAL TEACHER says:

"Again and again have we been asked for a compact handy reliable cyclopedia at a reasonable price. Here is the very thing"

NATURE says:

"The articles are short but clear, Especial attention has been given to matters which are of living interest in our own day, and we are glad to see that many scientific articles have been written or revised by specialists."

The BRITISH WEEKLY says:

"It is cheap, unambitious, practical, full, and, so far as we have tested it, accurate. The illustrations are plentiful and generally useful."

The SATURDAY REVIEW says:

"Some handy form of cyclopedia has long wanted. This is comprehensive without being bulky The information is succinctly given, sufficiently copious and strictly relevant."

The SPECTATOR says:

"The articles are distinguished by accuracy not less than by

succinctness. We have been particularly struck with the scientific geographical, and legal articles."

The SCHOOL GUARDIAN says:

"For the teacher a work of this kind is almost indispensable, and we know of no other that combines in so high a degree the qualities of conciseness, comprehensiveness, and cheapness."

UP-TO-DATE, CONCISE, RELIABLE.

ORDER FORM.

To The GRESHAM PUBLISHING Company, 19, Fort St, Bombay.

PLEASE supply me with one copy of THE MODERN CYCLOPEDIA in eight volumes, latest edition on account of which I send you the initial payment herewith of Rs. 5 and agree to pay the same amount per month for seven more months to whomsoever you may depute. I undertake not to part with the work until paid for.

Signature. ....

Rank or Profession ....

Address ....

Date........................ 1902.

ADDRESS ALL COMMUNICATIONS TO

THE GRESHAM PUBLISHING COMPANA

49, Fort St. BOMBAY

"আমিত্বের প্রসার"— ১মখণ্ড। ইহাতে ভূতযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ও ব্রহ্মযজ্ঞ এই পঞ্চযজ্ঞ, ব্রহ্মচারি, গৃহস্থ বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারি আশ্রমী; এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি বর্ণের শাস্ত্র ও যুক্তিসঙ্গত বিষদ ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ডিমাই ৮ পেজি ১১০পৃষ্ঠা, কাগজে বাঁধান। মূল্য সমেত ডাক মাশুল ।৴০ আনা মাত্র। হিন্দুর দৈনিক কার্য্যাবলী কিরূপে আত্মপ্রসারের অনুকূল, এই গ্রন্থে তাহা চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া দেখান হইয়াছে!

যশোহর হিন্দুপত্রিকার ম্যানেজারের নিকট প্রাপ্তব্য।

The work (আমিত্বের প্রসার) states that amitva, egoism or selflove is the root of all evil in this world and hence its annihilation is taught in the Sastras as the means of attaining summum bonum. Now this annihilation can be effected not only by foregoing all love of self, but also by extending it indefinitely to nonself, or in otherwords not by not loving self, but by lving others like self. And all pre eminently Hindu institutions like the five sacrifices, the four asramas and the four

castes have all been fromed with a view to attaining this very object and lead, when the duties and injunctions relating there to are obeyed in practice to more or less liberalisation of a person's sympathies and the increase of love for other. Let all Hindus, therefore remember this cardinal, teaching of the sastras and carry it out in life by consecrating themselves to the service of their fellow creatures. The Book is exceedingly well written and its altruistic teaching cannot fail to have a salutary and ennobling effect on the reader.

CALCUTTA GAZETTE. 4th April 1900 Bengal Library Catalogue for the 4th qr. 1899. pp. 18-19, No. 7271.

———o———

শ্রীহরিঃ।
১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজষ্টীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৯ম বর্ষ, ৯ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা।	আষাঢ়।	১৩০৯ সাল, ১৮২৪ শকাব্দা,

জাতিভেদ।

(পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধ।)

প্রথম অধ্যায়।

আর্য্য হিন্দু।

আর্য্যজাতির আদিম নিবাস যে কোথায় ছিল, সে সম্বন্ধে অনেক যুক্তিতর্ক হইয়া গিয়াছে। হিন্দু পণ্ডিতগণ বলেন আর্য্যগণ ভারতবর্ষেরই কোন স্থানে বাস করিতেন। কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত বাল্টিক সমুদ্রের তীরবর্ত্তী দেশকেই আদিম আর্য্য-নিবাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাহেন। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতদিগেরই এইরূপ মত যে, মধ্য এসিয়াই আর্য্যজাতির নিবাসভূমি ছিল। তাঁহারা সেই স্থান হইতেই ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ভট্ট মোক্ষমূলর প্রমুখ পণ্ডিতগণ যে সকল যুক্তিবলে উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

"প্রথমতঃ, আর্য্যজাতিদিগের দুইটী প্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটী ভারতবর্ষাভিমুখে, অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে এবং আর একটী ইউরোপের অভিমুখে অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিমদিকে। এই দুইটী প্রবাহের সংযোগস্থল এসিয়া মহাদেশ।"

"দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীনতম কালের সভ্যদেশ সমূহ এসিয়াখণ্ডেই অবস্থিত। আর্য্যভাষা সমূহের মধ্যে ঋগ্বেদের ভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম। সুতরাং এসিয়াখণ্ডের মধ্যে এবং ঋগ্বেদের জন্মস্থান পঞ্জাব প্রদেশ হইতে অনতিদূরে কোনও প্রদেশে আর্য্যজাতির আদিম বাসস্থান হওয়াই সম্ভব।"

"তৃতীয়তঃ, অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে মধ্য এসিয়া হইতে বার বার অনেক পরাক্রান্ত জাতি উদ্ভূত হইয়া ইউরোপ মহাদেশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর হূনজাতি ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর মোগলজাতি তাহার উদাহরণস্থল। অতএব, প্রাচীনকালেও আর্য্যগণ মধ্য এসিয়া হইতে উদ্ভূত হইয়া ইউরোপ নিবস্ত্র করিয়াছিলেন, ইহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।"

"চতুর্থতঃ, যদি ইউরোপ বিশেষতঃ স্কাণ্ডেনেভিয়া হইতে আর্য্যজাতির উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে আর্য্যভাষা সমূহে সমুদ্রসম্বন্ধীয় বহু সংখ্যক সাধারণ শব্দ পাওয়া যাইত। এই সকল ভাষায় পশু বিশেষ বা পক্ষী বিশেষের সাধারণ নাম পাওয়া যায়, কিন্তু এই সকল ভাষায় সমুদ্র বা জলচর জীবের সাধারণ নাম পাওয়া যায় না।"*

যে সকল যুক্তি উদ্ধৃত হইল তাহা হইতেই বেশ প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রাচীন আর্য্য হিন্দুগণ মধ্য এসিয়া হইতেই ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। সুন্দর সুখপ্রদ আহার্য্য, শস্যশ্যামল গোচরভূমি, ধনবত্নশালী নূতন নূতন রাজ্যাদির লোভেই আর্য্যগণ দলে দলে পিতৃগৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানে স্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা বোধ হয় প্রথমে দুই দলে বিভক্ত হইয়া আদিম গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। একদল দক্ষিণ এসিয়া এবং অপর দল ইউরোপ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইহাই তাঁহাদিগের চিরবিচ্ছেদ; তাহার পর আর সাক্ষাৎ হয় নাই।

তখনকার সেই প্রাচীন ভারতবর্ষে যাহারা বাস করিত, তাহারা কৃষ্ণবর্ণ, অধর্ম্মপরায়ণ, নীচ, ম্লেচ্ছভাষী, ছাগনাসাবিশিষ্ট ও আমমাংসাশী ছিল।

"They (the Aryans) called their adversaries (the aboriginal tribes) "Dasyus" "Rakshs" &c. They are described as irreligious, impious, and the lowest of the low ; they are also in some texts contemptuously called black-skinned. Thus, during the Rigvedic period, there were, if we may so express ouoselves, two 'colors'—the fair (Aryan), and the black (Dasyu or Dasa)."*

আরও।—

"The Dasyus are contrasted with the Aryans and are represented as people of a dark complexion who were unbelievers, ie, did not worship the gods of the Aryas and perform the scrifices, but followed another law. The Aryan gods Indra and Agni are frequently praised for having driven away the black people, destroyed their strongholds and given their possessions to the Aryas."†

ঋগ্বেদের প্রাচীনতম মন্ত্র সকল পাঠ করিলেই সকল স্থানে 'দস্যু' এবং 'আর্য্য' এই দুই শ্রেণীর লোকেরই পরিচয় পাওয়া যায়। আর্য্যগণ দেখিতে গৌরবর্ণ, শোভন নাসিকাযুক্ত, এবং পক্কমাংসাশী ছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে। সে যাহা হউক, এই দুই শ্রেণীর লোকের ভিতর ভাষা-

* শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, আই, ই।

*'Hindu civilization under British Rule.' By Mr. P. N. Bose. Bse, FGs, MRAs, &c. &c.

† Social History of India—by Ramkrishna Gopal Bhandarkar, M A., PH. D., C. I. E., Late Professor of oriental Languages Deccan college, Poona.

গত এত পার্থক্য ছিল যে ইহাদিগকে কোন ক্রমেই এক বংশজ বলা যাইতে পারে না।

এই সকল আদিম আর্য্য হিন্দুগণ প্রধানতঃ কৃষিকার্য্য করিয়াই জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন।* কৃষি কার্য্য হইতেই কর্ষক ধাত্বর্থ মূলক আর্য্য নাম হইয়া থাকিবে। লাঙ্গল, শকট প্রভৃতি কৃষিকার্য্যের উপকরণ সমূহের নাম তাঁহাদিগের ভাষায় পাওয়া যায়। প্রকৃতির লীলাভূমি ভারতবর্ষের লগ্ন সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহারা মোহিত হইতেন। সেই সকল অভিনব প্রাকৃতিক দৃশ্য সমূহ তাঁহাদিগের সরল কোমল হৃদয় মধ্যে এমন সুন্দর সুশোভন চিত্রগুলি অঙ্কিত করিত এবং এমন স্বাভাবিক ভাবের সঞ্চার করিত, যে তাহা হইতেই তাঁহাদিগের ধর্ম্ম-প্রণালী গঠিত হইয়াছিল। চন্দ্র, সূর্য্য, মেঘ, বজ্র, উষা, সন্ধ্যা প্রভৃতি এ সকলেরই তাঁহারা উপাসনা করিতেন। তখন ধর্ম্মভাব নিতান্ত সরল ও অকপট ছিল—তখন পর্য্যন্ত যাগ যজ্ঞাদির আড়ম্বর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেই আদিম আর্য্য জাতির একদল দক্ষিণ এসিয়া অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। সেই এসিয়া-যাত্রিক-আর্য্যেরা ক্রমান্বয়ে দক্ষিণদিকে ভ্রমণ করিতে করিতে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। পঞ্জাবকে তখন সপ্তসিন্ধু বলিত। সপ্তসিন্ধু দেশে আসিয়াও সেই হিন্দু ও ইরাণী জাতি এক সঙ্গেই ছিল। কিন্তু কালক্রমে ধর্ম্মাদি বিষয়ে বিবাদ হওয়ায় সেই একই জাতি দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। "দেবোপাসক" হিন্দুরা পাঞ্জাবে রহিলেন, আর "অসুরোপাসক" ইরাণীরা পারস্যে গমন করিলেন। এই দেবোপাসক হিন্দু আর্য্যই বেদের স্রষ্টা।

ঔপনিবেশক আর্য্য হিন্দুগণ সপ্তসিন্ধু দেশে উপনিবেশ স্থাপনের প্রথম যুগে খরপ্রবাহিত সিন্ধু তীরে বাস করিতেন। ক্রমে যতই ঔপনিবেশিকগণের সংখ্যা অধিক হইতে লাগিল, তাঁহারা ততই নূতন নূতন স্থান অধিকার করিতে লাগিলেন। এইরূপে সিন্ধু এবং তাহার পঞ্চশাখাতীরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ আর্য্য হিন্দু কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া গেল। নবীন উৎসাহ, অসীম বিক্রম, অদম্য সাহস, অজেয় বাহুবল, ও জাতীয় মুক্ত জীবনের অনুরূপ মুক্ত স্বাধীন চিত্ত হইয়া আর্য্য ঔপনিবেশকগণ যুদ্ধে মনোযোগী হইলেন। হিন্দুর দুর্জ্জয় বাহুবলের নিকট অনার্য্য দস্যুদিগের বিক্রম টিকিতে পারিল না। আর্য্যগণ অনার্য্যদিগের সকল দেশ জয় করিয়া লইলেন। অনার্য্য দস্যুগণ কেহ বা পলায়ন করিল, কেহবা দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল।*

* কৃষি সম্বন্ধীয় একটী মন্ত্রের অনুবাদের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল:— 'লাঙ্গলগুলি যোজন কর; যুগগুলি বিস্তারিত কর; এইস্থানে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহাতে বীজবপন কর; আমাদিগের স্তবের সহিত আমাদিগের অন্ন পরিপূর্ণ হউক ও শূনিগুলি নিকটবর্ত্তী পক্ক শস্যে পতিত হউক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের বঙ্গানুবাদ।

* "Those who submitted were reduced to slavery, and the rest

আর্য্যদিগের বিজয় পতাকা দেশ হইতে দেশান্তরে উড্ডীন হইতে লাগিল। অনার্য্যগণ পদে পদে বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। যাহারা এই নূতন শত্রুর সম্মুখ হইতে কাননে, প্রান্তরে, দুর্গম গিরিগহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করিল, তাহারা স্বাধীনতা বিস্মৃত হইতে পারিল না। দলে দলে আসিয়া আর্য্যদিগের অধিকৃত গ্রাম, জনপদ প্রভৃতি আক্রমণ করিতে লাগিল। তাঁহাদিগের লাঙ্গল, গো, গোবৎস প্রভৃতি অপহরণ করিতে আরম্ভ করিল—আর্য্য ঔপনিবেশকগণ অস্থির হইয়া উঠিলেন। হয়ত কখন অন্ধতমসাচ্ছন্ন গভীর রজনীতে এক দল অনার্য্য দস্যু আসিয়া নিশ্চিন্ত, সুপ্ত আর্য্যদিগের গৃহাদি লুণ্ঠন করিয়া খাদ্যাদি যাহা পাইত লইয়া পলায়ন করিত। ঋগ্বেদে তাহার বিস্তর প্রমাণ আছে—(প্রথম মণ্ডলের ১৭৩।৭ ৮)।

"হে অগ্নিদ্বয়! জঘন্য শব্দ করতঃ কুকুরের ন্যায় যাহারা আমাদিগকে বিনাশ করিতে আসিতেছে, তাহাদিগকে বিনাশ কর। তাহারা সংগ্রাম করিতে চাহে, তাহাদিগকে মারিয়া ফেল। তাহাদিগকে মারিবার উপায় তোমরা জান। তোমাদিগকে যাহারা স্তুতি করে, তাহাদের প্রত্যেক কথা রত্নবতী কর। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা উভয়ে আমার স্তুতি রক্ষা কর।" ইচ্ছা করিলে এরূপ অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। দস্যুদিগের পরাজয় ও বিনাশের কথা পঞ্চম মণ্ডলের ৭০।৩; ষষ্ঠ মণ্ডলের ১৮।৩ প্রভৃতি স্থলেও দেখিতে পাওয়া যায়।

যে সকল বীরগণ পঞ্চনদস্থ সমস্ত দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা সরস্বতী শতদ্রুর শ্যামল তীরে শান্তভাবে বসিয়া থাকিবার লোক নহেন। ভারতভূমির আদিম নিবাসীদিগের সহিত নিরন্তর অবিশ্রান্ত যুদ্ধ কলহ করিয়াও আর্য্যগণ ত্রিহুত পর্য্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মর্ষি (গাঙ্গ্য) প্রদেশ অধিকার করিয়া ফেলিলেন। যখন গাঙ্গা প্রদেশে ঔপনিবেশের সূত্রপাত দেখা গেল, তখনই নানাস্থান হইতে দলে দলে আর্য্যগণ আসিয়া দোয়াব প্রদেশে বসতি করিতে লাগিল।

আর্য্যদিগের মধ্যে তখন পর্য্যন্ত কোন প্রকার জাতি বিচার ছিল না। কিন্তু "আর্য্য" ও "অনার্য্যের" মধ্যে যে প্রভেদ "আর্য্য" ও "দস্যু" মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা তখন ছিল—"কৃষ্ণ" এবং "গৌরের" ভিতর যে প্রভেদ তাহাও তখন ছিল।

"But before the last notes of the last hymn were chanted by the last of the Rigvedic bards, his brethren had established a caste-system—a system composed of two well-defined, exclusive ethnological castes." *

অন্যত্র আছে:—

were driven to the fastnesses of mountain."

Social History of Indra—by Ramkrishna Gopal Bhandarkar, M.A. &c.

* Hindu civilization under British Rule by Mr. P. N. Bose.

"In the very early times the system of castes did not prevail, and it seems to have developed about the end of the Vedic period. It arose from a difference of avocations or professions. The feeling of a father that a son should follow his trade or calling is natural, and it is this which in the beginning, at least when unchecked by other influences, gives rise to separate castes." *

কৃষি, যাজন, যুদ্ধাদি জীবিকাভেদজনক বর্ণ বিচার বা বংশানুক্রমে পুরোহিত বা রাজার প্রথা তখন ছিলনা। শ্যামল শস্য ভরা প্রভৃত ক্ষেত্রের অধিবাসী যেমন স্বহস্তে ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেন আবার তেমনি বাহুবলে স্বগ্রাম, আত্মজীবন ও অর্থ প্রভৃতি রক্ষাও করিতেন। যুদ্ধান্তে গৃহে ফিরিয়া তাঁহারাই আবার সুন্দর ভাষায় মন্ত্র রচনা করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের উপাসনা করিতেন। তখন দেবমূর্ত্তিও ছিলনা, দেব গৃহও ছিলনা, পূজা বিধির নানাবিধ আড়ম্বরও ছিল না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তিরাই তখন রাজা ছিলেন।

"আর্য্যেরা কোন সময়ে এইরূপ পঞ্চনদ অধিকার করিয়াছিলেন? শ্রীযুক্ত কোলব্রুক ইউরোপীয় সমাজে প্রথমে বেদের একটি বিবরণ প্রচার করেন। তাঁহার মতে খৃষ্টাব্দের ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে বেদ মণ্ডলাদি আকারে সংগৃহীত হইয়াছিল। বেদবিৎ পণ্ডিতেরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, ন্যূনাধিক ৫০০ কি ৬০০ বৎসরে হিন্দু আর্য্যগণ সিন্ধু ও পঞ্চনদ সন্নিহিত প্রদেশ সমূহ অধিকার করিয়া তাহাতে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ২০০০ হইতে ১৪০০ বৎসর পর্য্যন্ত বৈদিক যুগ বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। এই মত এক্ষণে প্রায় সর্ব্ব পণ্ডিত সম্মত; ভট্ট মোক্ষমূলর তদীয় নূতনতম গ্রন্থে লিখিয়াছেন খ্রীষ্টের পূর্ব্বে পঞ্চদশ শতাব্দীতে বেদ প্রণীত হইয়াছিল। অধ্যাপক ওয়েবর বলেন, সিন্ধু হইতে গণ্ডকী পর্য্যন্ত ভূভাগ পরাজয় অধিকার ও কর্ষণ করিয়া হিন্দুত্ব সংস্থাপন করিতে সহস্র বৎসর (খৃঃ পূঃ ১৫০০-৫০০) প্রয়োজন হইয়া থাকিবে। অধ্যাপক হুইটনী খৃষ্টের ২০০০ হইতে ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে ঋগ্বেদমন্ত্র প্রণয়নের সময় বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। পণ্ডিতবর মার্টিনহগ খৃঃ পূঃ ২৯০০ হইতে ১৪০০ বৎসর পর্য্যন্ত ঋগ্বেদ প্রণয়ন সময় অবধারণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য বেদবিৎ পণ্ডিতদের মতামত উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। খৃষ্টের পূর্ব্বে ২০০০ হইতে ১৪০০ অব্দ মধ্যে ঋক্ প্রণীত হইয়া থাকিবে, এইটি বহুপণ্ডিত সম্মত মত।"*

দ্বিতীয় অধ্যায়।

১। হিন্দুর ঋগ্বেদ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ২০০০ হইতে ১৪০০ অব্দ মধ্যে ঋক্ প্রণীত

* Dr. R. G. Bhandarkar PHD, C. I. E., on 'social Reform and the Programme of the Madras Hindu Social Refrom Association."

* শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই।

হইয়াছিল। হিন্দুদিগের নিকট মহা আদরের গ্রন্থ। ইহার অবশ্য সম্যক্ কারণও আছে। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন :—

"মানব জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতির ইতিহাস লেখক এই ঋক্‌বেদে মনুষ্যের ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্ম বিশ্বাসের কারণ দেখিতে পাইবেন। কেবল মাত্র এক বেদপাঠেই জানা যায়, কিরূপে মনুষ্যহৃদয় সর্ব্বপ্রথমে প্রকৃতির সমুজ্জল ও জ্যোতির্ম্ময়, শক্তিশালী ও বিস্ময়কর ক্রিয়ার স্তব স্তুতি করে। ...... কিন্তু ঋগ্বেদের সমাদর ও গৌরবের আরও বিশিষ্ট কারণ রহিয়াছে।' কি প্রকারে মানব হৃদয়ে প্রকৃতি হইতে প্রকৃতির নিয়ন্তা ঈশ্বরের জ্ঞান জন্মে ঋগ্বেদ তাহার প্রমাণ স্বরূপ। ঋগ্বেদ আর্য্যজাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ। আর্য্যেরা পৃথিবীর নানা স্থানে যে সভ্যতা লাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে যাহা প্রাচীনতম ঋগ্বেদে তাহার চিহ্ন রহিয়াছে। ঋগ্বেদে আধুনিক হিন্দু ধর্ম্মের উৎপত্তির ব্যাখ্যা রহিয়াছে। অতি প্রাচীনতম হইতে অধুনাতন সময় পর্য্যন্ত হিন্দু জাতির মানসিক ভাবের বৃত্তান্ত, ঋগ্বেদ না পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় না। কেবল আধ্যাত্মিক কেন, ঋগ্বেদ পাঠে ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিষয়ও অনেক জানিতে পারি।"

তাহা হইলেও দেখা যাইতেছে যে, সেই প্রাচীনতম আর্য্য হিন্দু সমাজের অবস্থা জানিবার জন্য ঋগ্বেদই একমাত্র পথ। জাতিভেদ প্রভৃতি সামাজিক বিষয়ের অস্তিত্ব ঋগ্বেদ হইতেই প্রামাণ্য। যেহেতু ঋগ্বেদে তাৎকালীক সমাজের সকল কথাই বিশেষভাবে লিখিত রহিয়াছে— কেমন করিয়া ক্ষেত্রে লাঙ্গল দেওয়া হইত, কেমন করিয়া সোমরস প্রস্তুত হইত, কি উপায়ে যবাদি পেষণ কার্য্য সম্পন্ন হইত প্রভৃতি প্রাত্যহিক জীবনের প্রত্যেক খুঁটি-নুটি পর্য্যন্ত যে ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়— জাতিভেদের কথাও নিশ্চয়ই সেই স্থানে থাকিবে। কিন্তু যে ঋগ্বেদের সূক্ত সংখ্যা ১০২৮ এবং ঋক্ সংখ্যা ১০৪০২ অথবা ১০৪২২ সেই ঋগ্বেদে জাতিভেদ সম্বন্ধে অতি সামান্য কয়েকটী কথা লিখিত রহিয়াছে।*

পাঁচশত কি ছয়শত বৎসর ব্যাপিয়া এই মহাগ্রন্থ ঋগ্বেদের প্রণয়ন কার্য্য চলিয়াছিল। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহাতে আর্য্যদিগের আচার নীতি, ব্যবহার, বিশ্বাস প্রভৃতির ভূরি ভূরি বর্ণনা আছে। আর্য্যদিগের গার্হস্থ্যনীতি, স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা, বিবাহ পদ্ধতি, যজ্ঞাদি, ধর্ম্মাচার, জ্যোতিষ আর্য্যদিগের শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য দস্যুদিগের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি সমস্তই বিশেষরূপে বর্ণিত রহিয়াছে; কিন্তু এই জাতিভেদের কথাই তেমনভাবে লিখিত নাই। ইহাও কি সম্ভব?

এই স্থলে পাঠকদিগকে শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। তিনি বলিতেছেন।— "পরবর্ত্তী সংস্কৃত ভাষায় যে 'বর্ণ' শব্দ জন্মগত জাতি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা ঋগ্বেদে আর্য্য ও অনার্য্যে (গৌর ও কৃষ্ণ)

* ঋগ্বেদের "পুরুষ সূক্ত" দ্রষ্টব্য।

বিভিন্ন শারীরিক বর্ণ (রং) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আর্য্যেরা তিন বর্ণে বিভক্ত ছিলেন এমন কুত্রাপি উল্লেখ নাই। 'ক্ষত্রিয়' শব্দ পরবর্ত্তী সংস্কৃতে জন্মগত জাতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে; কিন্তু ঋগ্বেদে ইহা বিশেষণ মাত্র, অর্থ "বলশালী" দেবতাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণনা আছে। ৭।৬৪।২ শ্লোকে মিত্র ও বরুণকে "সিন্ধুপতি ও ক্ষত্রিয়, ৭।৮৯ সূক্তের প্রথম চারি মন্ত্রের শেষে বরুণ দেবকে 'সুক্ষত্র' বলিয়া সম্বোধন রহিয়াছে। পুরোহিত জাতি বুঝাইতে আধুনিক সংস্কৃতে 'বিপ্র' শব্দের ব্যবহার আছে; ঋগ্বেদে 'জ্ঞানী' 'বিজ্ঞ' এই অর্থে 'বিপ্র' শব্দ দেবতাদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। ৮।১১।৬ শ্লোকে 'বিপ্রং দেবং অগ্নিং' আছে, অর্থাৎ "মেধাবী অগ্নিদেব"। পুরোহিত জাতি বোধক 'ব্রাহ্মণ' শব্দও ঋগ্বেদের শত শত স্থানে শুধু শ্লোক্ প্রণেতা কবি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

"Any one who had the gift and the talent to compose hymns which attracted the attention and commanded the admiration of his brethren, might be honoured with the appellation of 'Brahman", that is, a sage, an offerer of prayer. Any one who rose to distiction in the profession of arms might he eulogised under the epithet of 'Kshatriya'—that is, a man possessing power. But 'Brahman' or 'Kshatriya' wise man, or powerful man, he was a 'vis' that is, one of the people," *

ভট্ট মোক্ষমূলর বলিয়াছেন,—

If then with all the documents before us, we ask the question, does caste, as we find it in Manu and at present day, form part of the most ancient religious teaching of the Vedas? We can answer with a decided 'No'" *

আমরা অন্যত্র দেখিতে পাই,—

"There are no castes as yet, the people are still one united whole, and bear but one name, that of visas." †

শ্রীযুক্ত রমেশ বাবু একস্থানে বলিয়াছেন, ৭।১০৩।৮ শ্লোকে 'ব্রহ্মকৃণ্বন্ত ব্রাহ্মণাসঃ' আছে। ইহার অর্থ 'স্তুতিকারী স্তোতৃগণ ১০।৭১।৯ শ্লোকে আছে "যাহারা দৈবস্তুতি করেনা এবং সোম যাগ করেনা, তাহারা পাপযুক্ত হইয়া কেবল লাঙ্গল চালনার উপযুক্ত হয়। অর্থাৎ যাহারা ইহকাল পর্য্যালোচনা করিতে ও স্তুতি অভ্যাস ও সোম যাগ করিত, তাহারাই স্তোতা হইত, জন্মগুণে স্তোতা হইত না। যাহারা ঐ ধর্ম্মক্রিয়া সাধনে অসমর্থ, তাহারা কৃষক বা তন্তুবায় হইত। জন্মদোষে কৃষক বা তন্তুবায় হইত না।

২। ঋগ্‌বেদে বর্ণ বিচার।

ঋগ্বেদে বর্ণবিচার সম্বন্ধে স্থূলতঃ কিছু বলা হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান বিষয়টীর

* "Hindu civilization under British Rule" by Mr. P. N. Bose. Vol II.

* Maxmuller's Chips from a German Workshop" Vol II.

† "Indian Literature" (translation) Weber. c.f. in the connection. 'Muir's sanscrit Texts.' Vol I.

বিশদ আলোচনা আবশ্যক। আমরা ইতঃপূর্ব্বেই একবার বলিয়াছি যে ঋগ্বেদের কেবলমাত্র একটি সূক্তের একটী শ্লোক জাতিভেদ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা আছে। আলোচ্য সূক্তে বিশ্ব নিয়ন্তা পরমেশ্বরকে পুরুষ কল্পনায় যজ্ঞীয় পশুর স্বরূপ যজ্ঞীয় বহ্নিতে পূজা দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া কথিত হয়।

"যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞ মতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ।
তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন পুরুষং জাতমগ্রতঃ
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চয়ে॥"
ইত্যাদি।

"যখন পুরুষকে হব্যরূপে গ্রহণ করিয়া দেবতারা যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, তখন বসন্ত ঘৃত হইল, গ্রীষ্ম কাষ্ঠ হইল, শরৎ হব্য হইল।"

"যিনি সকলের অগ্রে জন্মিয়াছিলেন, সেই পুরুষকে যজ্ঞীয় পশুরূপে সেই বহ্নিতে পূজা দেওয়া হইল। দেবতারা ও সাধ্যবর্গ এবং ঋষিগণ উহা দ্বারা যজ্ঞ করিলেন।"

এইরূপে সেই প্রথম পুরুষকে যজ্ঞীয় পশু কল্পনা করিয়া যে বলি দেওয়ার কথা আছে, সেই সূত্রে ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তের বর্ণভেদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা অনুবাদ সহ সেই স্থানটী উদ্ধৃত করিতেছি।

"যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা উরূ পাদা উচ্যেতে
ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ॥
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥"

অর্থাৎ "পুরুষকে খণ্ড খণ্ড করা হইল, কয় খণ্ড করা হইয়াছিল, ইহার মুখ কি হইল, দুই হস্ত, দুই উরু, দুই চরণ কি হইল।"

"ইহার মুখ ব্রাহ্মণ হইল, দুই বাহু রাজন্য হইল, যাহা উরু ছিল তাহা বৈশ্য হইল, দুই চরণ হইতে শূদ্র হইল।"

ইহাই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মূলভিত্তি। এই কথায় উপরই প্রাচীন সমাজের জাতিভেদ নির্ভর করে। এখন এই সূক্তের বিচারে অগ্রসর হওয়া যাউক।

"তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদ জায়ত।"

অর্থাৎ সেই সর্ব্বহোম সম্বলিত যজ্ঞ হইতে ঋক্ ও সাম সমূহ উৎপন্ন হইল, ছন্দ সকল তথা হইতে আবির্ভূত হইল, যজুও তথা হইতেই জন্ম গ্রহণ করিল।" এই সমস্ত হইতেই বেশ দেখা যাইতেছে ঐ দেবযজ্ঞ হইতে সাম, ঋক্ ও যজুঃ এই তিনটী বেদও প্রসূত হইয়াছে।

কিন্তু মহাভারতের কবি কর্তৃক যে বেদ বিভক্ত হইয়াছিল এবং সেই সময় কিম্বা তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই যে ভারতে ব্রাহ্মণপ্রাধান্য স্থাপন করিবার বিশেষ যত্ন হইতেছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই এবং মহাভারতই তাহার অন্যতম প্রমাণ।

সেই ৯০।১২ শ্লোকের টীকায় শ্রীযুক্ত রমেশ বাবু লিখিতেছেনঃ—ঋগ্বেদের রচনা কালের অনেক পরে এই অংশ রচিত হইয়া ঋগ্বেদের ভিতর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে

* শ্রীযুক্ত রমেশ বাবুর বঙ্গানুবাদ।

তাহার সন্দেহ নাই। ঋগ্বেদের অন্য কোন অংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি জাতির উল্লেখ নাই। এই শব্দগুলি শ্রেণী বিশেষ বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয় নাই। ব্যাকরণাদি পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই ঋকের ভাষাও বৈদিক ভাষা নহে। ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃত। ঋগ্বেদে এই কুপথার একটী প্রমাণ সৃষ্টি করিবার জন্য এই অংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।'

সেই প্রাচীনকালের শ্লোকগুলি সমস্তই মৌলিক কি তাহার ভিতর প্রক্ষিপ্ত শ্লোকও আছে, এখন একমাত্র ভাষার পরীক্ষা ভিন্ন তাহা স্থির করিবার আর অন্য উপায় নাই। প্রকৃতই উক্ত-সূক্তটীর ভাষা দেখিলেই মনে হয়, উহা আধুনিক-সংস্কৃতের মত। ঋগ্বেদের অন্যান্য মন্ত্র গুলির ভাষা আধুনিক সংস্কৃতের মত নহে, তাহা অতি শক্ত কঠোর এবং তাহার ব্যাকরণও স্বতন্ত্র। শব্দ ব্যাকরণ বিভিন্ন নহে, ছন্দও আবার অন্যরূপ। তাহাতে যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ শব্দই এখন একেবারে অপ্রচলিত—তাহাদিগের ব্যবহার আর নাই। ঋগ্বেদের একটী মন্ত্র উদ্ধৃত হইল। যাঁহারা শুধু আধুনিক-সংস্কৃতে অভিজ্ঞ, তাঁহারা যে টীকাকারের বিনা সাহায্যে উক্ত মন্ত্রটীর অর্থ সম্যক্ বোধ করিতে পারিবেন এরূপ মনে হয় না।

মন্ত্রটী এই:—

'অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং। হোতারং রত্নধাতমম্।' ইহাই ঋগ্বেদের প্রথম সূক্তের মন্ত্র প্রথম ঋক্।

"There can be little doubt, for instance, that the 90th. hymn of the 10th Book. is modern both in its character and in its diction'*

আবার অন্যত্র আমরা দেখিতে পাই:—

"All that is found in the Veda at least in the most ancient portion of it, are the hymns in a verse in which it is said that the priest, the warrior, the husbandman and the serf, formed all alike part of Brahman. European critics is are able to show that even this verse is of later origin than the great mass of the hymns and that it contains modern words such as Sudra and Rajanya, which are not found again in the other hymns of the Rig-Veda." †

ইতঃ পূর্ব্বেই একবার বলিয়াছি যে, "তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ" প্রভৃতি পাঠ করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, "এই মন্ত্র যিনি রচনা করিয়াছিলেন, তিনি বেদ বিভাগ করার পর অর্থাৎ বেদমন্ত্র সকল সংগৃহীত হইয়া ঋক্, সাম ও যজুঃ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবার পর এই অংশটুকু রচনা ও প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন।"

মন্বাদিসংহিতাকারদিগের অভ্যুত্থানের এবং মহাভারতাদি লিখিত হইবার পূর্ব্বেই যে এই সূক্ত রচিত হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ মহাভারত প্রভৃতিতে এবং

* Ancient Sanskrit Literature p. 570 cf. Elphinstone's History of India—p. 280.

† Chips from a German worshop Vol II.

স্মৃতি গ্রন্থেও এই সূক্তের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়।—

(১) "লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥"*

(২) "বিধিনা পুরুষসূক্তস্য গত্বা বিষ্ণুং সমর্চ্চয়েৎ।"†

(৩) "পুষ্করদ উবাচ। কুতশ্চৎ ব্রাহ্মণো জাতো, বর্ণশ্চাপি কুতস্ত্রয়ঃ। কস্মাচ্চ ভবতি শ্রেষ্ঠস্তন্মে ব্যাখ্যাতু মর্হসি।"

"মাতঙ্গিশ্চোবাচ। ব্রাহ্মণো মুখতঃ সৃষ্টো ব্রহ্মণো রাজসত্তম। বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়ঃ সৃষ্ট উরুভ্যাং বৈশ্য এবচ। বর্ণানাং পরিচর্য্যার্থং ত্রয়াণাং ভরতর্ষভ, বর্ণশ্চতুর্থঃ সম্ভূতঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো বিনির্ম্মিতঃ।"‡

এখন বোধ হয় বেশ দেখা যাইতেছে যে, এই সকল বচন পূর্ব্বোক্ত পুরুষ সূক্তের বর্ণানুসারে লিখিত হইয়াছে। হিন্দুর গ্রন্থে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কিন্তু পূর্ব্বেই ইহা দেখাইয়াছি যে, পুরুষ সূক্তের উক্ত অংশ ঋগ্বেদের অন্যান্য মন্ত্রের তুলনায় অতিশয় আধুনিক। ঋগ্বেদের পর আমরা আর যে সকল গ্রন্থ পাই, তাহাতেই জাতিভেদের কথা বিশেষরূপে বিবৃত আছে। অথচ ঋগ্বেদেই কেবল নাই। ইহা হইতেই বেশ প্রমাণিত হয় যে, সেই প্রাচীনকালের পুরাতন সমাজে জাতিভেদ ছিলনা।

"The Rigveda shows beyond the shadow oi a doubt that until towards the very close of the Rig-vedic period, the Indo Aryans were strangers to any kind of caste distinictions among themselves."

"In writing a foot note to the above passage Mr Bose says:—,We do indeed, in certain texts. meet with such expressions as PANCHAJANA. But panchajana can no more be intelpreted to allude to the four VARNAS and the Nishadas, than to Gandharvas, Pitris, Devas, Asuras and Rakshas. The very existance of these two interpretations of the term would show that thy were mere suppositions put forword by Brahmanaical writers long after the composition of the Vedic hymns" ¶

শ্রীযুক্ত রমেশ বাবু লিখিয়াছেন:—'বিশ্বনিয়ন্তাকে বলি স্বরূপ অর্পণ করা অনুভবটীও ঋগ্বেদের আর কোথাও ইহা পাওয়া যায় না। ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের অনুভব।"

মুয়ার সাহেব বলেন যে, বলি প্রথা অতিশয় বিস্তৃতি লাভ করিলেই বর্ত্তমান কল্পনা সম্ভব হয়, নতুবা নহে। এই বলির প্রথার আনুসঙ্গিক ক্রিয়া কলাপ সম্বন্ধে যাহার সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা আছে, যিনি এই প্রথার পবিত্রতা এবং সফলতা বিশ্বাস করিয়া থাকেন, শুধু সেইরূপ পুরোহিত কবিই কল্পনা করিতে পারেন যে, পরম পুরুষ

* মনু। ১। ৩১
† হারিত সংহিতা।
‡ মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব।

¶ Hindu civilisation under British Rule" by Mr. P. N. Bose.
cf. also 'Muir's Sanskrit Texts—Vol I.

পরমেশ্বরকেও বলি দেওয়া যাইতে পারে। অন্যের পক্ষে এরূপ কল্পনা ধর্ম্মবিগর্হিত।

"It was evidently produced at a period when the ceremonial of sacrifice was largely developed ... penetrated with a sense of the sanctity and efficacy of the rites, the priestly poet to whom we owe this hymn has thought it no profanity to represent the supreme Purush himself as forming the victim." §

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ।

———o———

আহার।

ষষ্ঠ-অধ্যায়।

প্রতিপদাদি তিথিতে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য ভোজন করা নিষিদ্ধ বলিয়া শাস্ত্রকারগণ আদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা যে অন্ধবাতুলতা নহে, বর্ত্তমান প্রবন্ধ পাঠ করিলে বোধ হয় বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। কিন্তু এইস্থলে সকলেরই একটী কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, যে তিথিতে যে দ্রব্য ভোজনে কোন ব্যাধি হইবার সম্ভাবনা, তাহা যে সেই দিন বা সেই তিথিতেই হইয়া থাকে, তাহা নহে। তিথিবিশেষে ধাতু দূষিত হয়। সেই সময় যদি সেই দোষকে দমন না করিয়া তাহার পোষকতা করা যায়, তাহা হইলেই স্বাস্থ্যের পক্ষে তাহা মঙ্গলজনক নহে। এক কথায় বলিতে গেলে তাহা হইতেই স্বাস্থ্য মন্দ হয়— অর্থাৎ মানব-শরীরের যন্ত্র বিশেষ দুর্ব্বল এবং হীনতেজ হইয়া পড়ে এবং আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য বা ক্রিয়া ভাগ করিয়া করিতে পারে না। পূর্ব্ব কথিত সেই এক দিবার অত্যাচার শরীরের এরূপ অনিষ্ট করে এবং সহজে ব্যাধি আকর্ষণ করিবার এমন একটী বিষময়-বিষম-শক্তি শরীরকে প্রদান করে যে, তাহার ফল প্রাণান্তকারী হইয়া উঠে।

শাস্ত্রকারদিগের নিষেধ অন্ধবাতুলতা নহে।

মানুষ চিরদিনই মানুষ—দেবতা নহে। যে ব্যক্তি খুবই সৎ, খুবই সাবধান, সেও কিছু না কিছু অত্যাচার করিয়া থাকে। আমি যে অত্যাচারের কথা কহিতেছি, তাহা শুধু শরীরেই নিবদ্ধ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবশ্য এক দিনের অত্যাচারে কোন ব্যাধিই হয় না কিন্তু প্রতিদিন এইরূপ অত্যাচার করিতে থাকিলে, শরীরের একটী দূষিত-যন্ত্র সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত হইতে না হইতেই আর একটী বা সেইটী পুনশ্চ দূষিত হইলে পীড়িত হইতেই হইবে। অপচার যে শুধু আহারেই নিবদ্ধ তাহা নহে। নানারূপে এবং বিবিধ-কার্য্যে শরীরের উপর কত প্রকারের অত্যাচার করা যাইতে পারে, এবং মানুষ তাহা করিয়াও থাকে। সুতরাং তিথিবিশেষে আহারের অত্যাচারের সহিত সেই দিনকৃত অন্য প্রকার অত্যাচার যুক্ত হইয়া অত্যাচারের অনিষ্টকারিণী শক্তি বাড়াইয়া দেয়। তাহা হইলেই ব্যাধি হইবার সম্ভাবনা।

§ Muir's Sanskrit Texts—Vol V.

অনেক বৈজ্ঞানিক-যন্ত্র এমন আছে যে, তাহাদের সামান্য একটু এদিক্ ও'দক্ হইলে আর সে সকল যন্ত্রের দ্বারা কোন কার্য্য হয় না, তাহারা একেবারেই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। আমাদিগের এই শরীর-যন্ত্র সম্বন্ধেও সেই কথা। ইহার কোন একটি একটু বিগড়াইয়া গেলে তাহার সংশোধন করা কঠিন। এমন কি একটী যন্ত্রের দোষে অপরগুলিও ক্রমে ক্রমে দুষ্ট হইয়া উঠে। সেই জন্যই যতদূর সম্ভব সাবধান সতর্ক থাকা প্রয়োজন। সেই জন্যই শাস্ত্র কারদিগের এত নিষেধ বাক্য এত মাথা ভাঙ্গাভাঙ্গি।

এইস্থানে আর একটী কথা বলা উচিত। আমি পূর্ব্বেও একবার বলিয়াছি যে, শরীরের সহিত মনের খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এবং মনের সহিত আত্মারও সম্বন্ধ বড় ঘনীভূত। খাওয়া অখাওয়াও এতদ্ উভয়েরই শরীরের মঙ্গলের জন্য। "আহারের তারতম্য বা ভিন্নতা অনুসারে আমরা কেবল যে শারীরিক অবস্থার ভিন্নতা অনুভব করি তাহা নয়, মানসিক-অবস্থার ভিন্নতাও উপলব্ধি করিয়া থাকি। ফলতঃ আমাদের মানসিক-অবস্থা যে বহুল পরিমাণে আমাদের শারীরিক অবস্থা অনুসরণ করিয়া থাকে, তাহা আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। আহারের ফলে উদরাময়, শিরঃপীড়া প্রভৃতি শারীরিক-অবস্থার নানাবিধ বিকৃতি ঘটিয়া থাকে। ...... যে কোন ব্যাধি উপস্থিত হইলেই মনের অবস্থারও ব্যত্যয় বা বিপর্য্যয় ঘটে, মনের শান্তি, স্থৈর্য্য প্রভৃতি স্বল্পাধিক পরিমাণে বিনষ্ট হইয়া যায়। আহার বিশেষে রাগদ্বেষাদি বৃদ্ধি হয়, মনের শান্তি, স্থৈর্য্য প্রভৃতি নষ্ট হয়। কিন্তু যেখানে রাগদ্বেষাদি প্রবল বা মনে শান্তি স্থৈর্য্য প্রভৃতির অভাব, সেখানে ধ্যান, ধারণা, যাগ, যজ্ঞ প্রভৃতি ধর্ম্মচর্য্যায় বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। চিত্তস্থৈর্য ও চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত ধর্ম্মচর্য্যা হয় না। অতএব যে আহার চিত্তস্থৈর্য ও চিত্তশুদ্ধির বিরোধী, সে আহার ধর্ম্মচর্য্যারও আত্মারও বিরোধী। এইজন্যই আমাদের মহাজ্ঞানী ও সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকারেরা আহারকে ধর্ম্মের অন্তর্গত করিয়া গিয়াছেন।"*

নিষেধ প্রতিপালনার্থ সকল বাক্যের আবশ্যকতা কি?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যেকালের সেই ভারতভূমির আর্য্য-সমাজে সকলেই শিক্ষিত ছিলনা। কেহবা শিক্ষিত, কেহবা অর্দ্ধশিক্ষিত, আর কেহবা একেবারেই মূর্খ ছিল। তখন যাহার যে কার্য্য সে তাহাই করিত। যে লাঙ্গল ধরিত সে বেদ পাঠ করিত না। শাস্ত্রকারদিগের এই সকল বিধিনিয়ম সেই সময়ের সরলচিত্ত ভারতবাসী হিন্দুদিগের জন্য। ইহা অবশ্য একটী সরল সত্য যে, শিক্ষার পুণ্যোজ্জ্বলকিরণ সম্পাতে মানুষের মনের অন্ধকার দূর হয়, কুসংস্কার পলায়ন করে, অন্ধবিশ্বাস লজ্জায় অন্ধকারে লুকায়িত হয়। আবার ইহাও সত্য যে, অশিক্ষিতের নিকট সকল কথার অর্থ বুঝাইয়া বলিতে গেলে, সে পরিশ্রমের কোন ফল হয় না। তাহারা যুক্তি চাহে না, তাহারা চাহে আদেশ। তাহারা বুঝিতে চাহে না, তাহারা কেবল

* সাহিত্য, ফাল্গুন ১২৯৮।

জানিতে চাহে, কিরূপ ব্যক্তির নিকট হইতে সেই আদেশটির আগমন। ইহাই তাহাদিগের অনাবিল জীবন নদীর বাধা-বন্ধবিহীন ধীর স্রোতের পক্ষে যথেষ্ট। আবার ইহাও সত্য যে "ন ব্যাপার শতে-নাপি শুকবৎ পাঠতে বকঃ"। তাই শাস্ত্রকারগণ যুক্তি দিতেন না, কেবল আদেশ করিতেন। যাহারা শিক্ষিত ছিল, যাহারা বুঝিবার উপযুক্ত ছিল, তাহারা লেখিত বুঝিত সিদ্ধান্ত করিত।

ব্যাধিশয্যায় শায়িত হইলে আমরা ঔষধ খাইয়া থাকি। কোন ঔষধের কি প্রক্রিয়া, কোনটী হৃদয়ের উপকারক, কোনটী বা ফুসফুসে যাইয়া নিজশক্তি বিস্তার করিবে প্রভৃতি তথ্য, ঔষধ খাইবার সময় কি আমাদের জানিবার আবশ্যকতা হয়? তাহা হয় না। তখন আমরা কি দেখি? আমরা কেবল দেখি যে একজন বিদ্বান বুদ্ধিমান; চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শী চিকিৎসক আমাদিগকে ঔষধ দিতেছেন—আমরা তাঁহারই ব্যবস্থার অধীন। তাহাই কি আমাদিগের পক্ষে যথেষ্ট নহে?

পূর্ব্বকালেও তাহাই হইত। ঋষিগণ ব্যবস্থা করিতেন, সমাজ ব্যাধি পীড়িতের ঔষধ সেবনের ন্যায় তাঁহাদিগের সকল আজ্ঞা মানিয়া চলিত।

কিন্তু কেবলমাত্র আদেশেই কি সকল কার্য্য হয়? ইংরাজরাজ যদি কেবলমাত্র এই আদেশ করিতেন যে, কেহ চুরি করিওনা, তাহা হইলেই কি দেশের যত চোর হাত পা গুটাইয়া নীরবে বসিয়া থাকিত? তাহা নহে। ইংরাজ আদেশ করিলেন চুরি করিলে ৩বৎসর কারাবাস। অমনি লোকের মনে ভয় হইল, মানুষ সাবধান হইল। যে হয়ত একবার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল, সে আর দ্বিতীয়বার চুরি করিল না—একবার দাগা পাইয়া যে আপনার প্রবৃত্তিকে দমন করিতে পারিল, সে সাধু হইল। তাই বলিয়া কি সকলেই সাবধান হইয়াছে? দস্যুর রাজত্ব উঠিয়া গিয়া এখন কি কেবল হবিষ্যান্নভোজী সাধুর সংসার? তাহা নহে। সাধুও আছে, অসাধুও আছে। তবে অনেকেই সাবধান হইয়াছে, অনেকে হইতেছে, ভবিষ্যতেও হয়ত অনেকেই হইবে। সুতরাং আদেশের সহিত আরও কিছু চাই। ঔষধের সহিত অনুপানের প্রয়োজন। অনুপানভেদে আবার ঔষধের ক্রিয়ার তারতম্য হয়।

সমাজের অবস্থা চিরদিনই এক রকম থাকে না। একই সমাজ, কখনও বা খুবই উন্নত হয়, কখনও সাধারণ ভাবে চলে, আর কখনও বা একেবারেই অধঃপতনের সর্ব্বনিম্ন-সোপানে আসিয়া দাঁড়ায়। সমাজের এই তিন অবস্থাতেই কি ঠিক একইরূপ শাসন বাক্যে স্বর্ণফল প্রসব করে। ব্যাধির তারতম্য অনুসারে ঔষধেরও তারতম্য হয়। সুতরাং সমাজের সকল অবস্থাতেই প্রয়োজ্য এমন একটী ঔষধ দিবার পূর্ব্বে এই সমস্ত কথাই সম্যক্ বিবেচনা করা উচিত। তত্ত্বদর্শী আর্য্যশাস্ত্রকারগণ তাহাই করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে, সকলকে যুক্তি তর্ক দিয়া সমস্ত কথা বুঝাইয়া দেওয়া অসম্ভব, দিলেও হয়ত সকলে বুঝিবে না।

তাই তাঁহারা কতকগুলি কার্য্য করিবার জন্য আদেশ করিলেন। তাঁহারা জানিতেন লোকে বা তাৎকালিক সমাজ তাঁহাদিগকে দেবতার মত ভয় ভক্তি করিত সুতরাং তাঁহাদিগের আদেশ অবশ্যই প্রতিপালিত হইত। তথাচ সাবধান হইবার জন্য ভবিষ্যতের কাল্পনিক উচ্ছৃঙ্খল সমাজের দিকে চাহিয়া তাঁহারা ঔষধের সহিত অনুপানের ব্যবস্থা করিলেন অর্থাৎ প্রত্যেক আদেশের সহিত এক একটী ভীতিমূলক শপথ বাক্যও সংযোজিত করিলেন, তাঁহাদিগেরই জয় হইল! আজ পর্য্যন্তও সেই শপথ বাক্যের ভয়ে সকলেই যথাসাধ্য তাঁহাদিগের আদেশ প্রতিপালন করিতেছে! সেই সকল আদেশের মূলে কোন যুক্তি আছে কিনা, বা থাকা সম্ভব কিনা, তাহা বিবেচনা করিবার আর দরকার হয় না।

দুগ্ধপানে অস্বীকৃত শিশু মাতৃক্রোড়ে বসিয়া যখন আবদার করিয়া কাঁদিতে থাকে, তখন স্নেহময়ী জননী পুত্রকে ভয় দেখাইবার জন্য বলিয়া থাকেন—'দুধ খা দুগ্ধ না খেলে বাঘে ধরিবে"! ব্যাঘ্রের নাম শুনিয়াই বালক ক্রন্দনের কথা একবারে ভুলিয়া যায় এবং বিনা আপত্তিতে দুগ্ধ পান করিয়া থাকে! এইরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত প্রতিদিন দেখিতে পাওয়া যায়! সেই জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ সংযমী শান্ত আর্য্য ঋষিদিগের চরণমূলে দাঁড়াইয়া আমরাও শিশু মাত্র। তাই শপথ-বাক্য আমাদিগকে ভয় দেখাইয়া দুগ্ধ পান করায়।

"এক সময়ে ব্রাহ্মণেরা আমিষ ত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু একমাত্র ব্রাহ্মণের দ্বারা কোন সমাজ রচিত হইতে পারে না। ভারতবর্ষে কেবল বিংশতিকোটি অধ্যাপক পুরোহিত এবং তপস্বীর প্রাদুর্ভাব হইলে অতি সত্বরেই সেই সুপবিত্র জনসংখ্যার হ্রাস হইবার সম্ভাবনা। প্রাচীন ভারতবর্ষে ধ্যানশীল ব্রাহ্মণও ছিল এবং কর্ম্মশীল ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রও ছিল, মাংসত্যাগীও ছিল মাংসভোজীও ছিল; সুতরাং স্বাভাবিক আবশ্যক অনুসারে আমিষও ছিল, নিরামিষও ছিল, আচারের সংযমও ছিল, আচারের অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতাও ছিল। যখন সমাজে ক্ষত্রিয়তেজ ছিল, তখনই ব্রাহ্মণের সাত্ত্বিকতা উজ্জ্বলভাবে শোভা পাইত। শক্তি থাকিলে যেমন ক্ষমা শোভা পায়, সেইরূপ। অবশেষে সমাজ যখন আপনার যৌবনতেজ হারাইয়া আগাগোড়া সকলে মিলিয়া সাত্ত্বিক সাজিতে বসিল, কর্ম্মনিষ্ঠ সকল বর্ণ ব্রাহ্মণের সহিত লিপ্ত হইয়া লুপ্ত হইয়া গেল, এই বৃহত ভূভাগে কেবল ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণের পদানুবর্ত্তী একটী ছায়া মাত্র অবশিষ্ট রহিল, তখন প্রাচীন ভারতবর্ষের বিনাশ হইল। তখন নিস্তেজতাই আধ্যাত্মিকতার অনুকরণ করিয়া অতিসহজে মন্ত্রচারী এবং কর্ম্মক্ষেত্রের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইয়া উঠিল। ভীরুর ধৈর্য্য আপনাকে মহত্তের ধৈর্য্য বলিয়া পরিচয় দিল, নিশ্চেষ্টতা বৈরাগ্যের ভেকধারণ করিল এবং দুর্ভাগ্য অক্ষম ভারতবর্ষ ব্রহ্মণ্যহীন ব্রাহ্মণের গরুটি হইয়া তাহারি ঘানি-গাছের চতুর্দ্দিকে নিয়ত প্রদক্ষিণ করিয়া পবিত্র চরণতলের তৈল যোগাইতে লাগিল।"*

* সাধনা, ১২৯৮-৯৯।

ভারতের এই দুর্দ্দিনে পর্যান্ত ঋষিদিগের আদেশ প্রতিপালিত হইত। শপথবাক্য-ভীতি তখন ভারতহৃদয়ে তপ্ত অগ্নির মত দিবানিশি জ্বলিত। তখনকার সময়ে যদি প্রত্যেক আদেশের সহিত এক একটি করিয়া শপথবাক্য সংযোজিত না থাকিত, তাহা হইলে হয়ত আচার নিয়মের এত বাঁধাবাঁধি আমরা দেখিতে পাইতাম না। এখনও হিন্দু সমাজের প্রায় সেই একই অবস্থা। অমুক কার্য্যটি করিতে হইবে—কিন্তু কেন করিতে হইবে, তাহা আমরা জানিনা। কেবল এই টুকুমাত্র জানি যে, না করিলে হয়ত সপ্ত জন্ম নরক হইবে—কি হয়ত পিতৃপুরুষ মোক্ষলাভ করিতে পারিবেন না, কি অমন আর একটা কিছু হইবে। তাই আমরা সেই কার্য্যটী করিয়া থাকি। সংক্ষেপে বলিতে গেলে শপথবাক্যের ভয়েই আদেশ প্রতিপালন করা হয়। অগ্নির উত্তাপে জল উষ্ণ হইয়া বাষ্পে পরিণত হয়; আর সেই বাষ্পের শক্তিতে এন্‌জিন্ চলিয়া থাকে। শপথ-বাক্যের উত্তাপে আমরা ঋষিদিগের সেই সকল অনুশাসন প্রতিপালন করিয়া থাকি, আর সেই আদেশ প্রতিপালনের ফলেই আমাদিগের শরীরযন্ত্র বেশ নির্ব্বিবাদে চলিয়া যায়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে লিখিত রহিয়াছে:—

"কুষ্মাণ্ডেচার্থহানিঃ স্যাদ্‌বৃহত্যাং নস্মরেদ্ধরিং
বহুশত্রুঃ পটোলেস্যাদ্ধনহানিস্তু মূলকে॥"
কলঙ্কী জায়তে বিল্বে তীর্য্যগ্‌যোনিশ্চ নিম্বকে
তালে শরীর নাশঃস্যান্নারিকেলে চ মূর্খতা॥
তুম্বী গোমাংস তুল্যাস্যাৎ কলম্বী গোবধাত্মিকা
শিম্বী পাপকারী প্রোক্তা পুতিকা ব্রহ্মঘাতিকা
বার্ত্তাকৌ সুতহানিঃ স্যাৎচিররোগী চ মাষকে
মহাপাপকরং মাংসং প্রতিপদাদিষু বর্জ্জয়েৎ॥

আর্য্যজাতি চিরদিনই বড় ধর্ম্মভীরু। কোন একটা কার্য্য করিলে যদি অধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে প্রাণান্তেও তাহারা সে কার্য্য করিতে চাহেন না। সাধারণতঃ লোকচরিত্র আলোচনা করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কাহাকেও শপথ-বাক্যে কোন কার্য্য করিতে অনুরোধ করিলে বা করিতে নিষেধ করিলে, সে তাহা সম্পাদন করে বা সেই কার্য্য হইতে বিরত হইয়া থাকে। একটি অতিশয় সাধারণ উদাহরণ দিতেছি। মনেকর যদি তোমার ষোড়শী সুন্দরী গৃহিণী, তাহার কোমল বাহুপাশে তোমাকে আবদ্ধ করিয়া বিষণ্ণবদনে করুণনয়নে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে তোমার মুখের দিকে চাহিয়া তোমাকে বলে "আমার মাথা খাও, মরা মুখ দেখ—এ কাজটা করো না"। তখন তুমি কর? সেই কার্য্যটি করিতে যদি তোমার একান্ত বাসনাও থাকে, তাহা হইলেও সেই কুঞ্চিত কৃষ্ণকুন্তল স্তবক শোভিত ক্ষুদ্র কচি মস্তক-টীকে তোমার নিষ্ঠুর কঠিন দন্তদ্বারা চর্ব্বণ করিবার ভয়ে, এবং তোমার হৃদয়ের হৃদয়, প্রাণের প্রাণ, জীবন সঙ্গিনীর মৃত বদনখানি দেখিবার ভয়ে তুমি সেই কার্য্য হইতে বিরত থাক। সংসার ভাসিয়া যাউক, পৃথিবী রসাতল যাউক, তোমার তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই; তুমি সেই সুন্দর সুকোমল সরল মুখখানি, সেই গোলাপী-অধর সেই তাম্বুলরাগরঞ্জিত প্রোজ্জ্বলকুসুম-

কালকাবৎ ওষ্ঠদ্বয় মৃত্যুর কালছায়ার আচ্ছন্ন দেখিতে পারিবে না! তাই তুমি তোমার ঈপ্সিত কার্য্যটী আর কর না। এ ক্ষেত্রে অবশ্য তোমার আরও একটি উদ্দেশ্য থাকে। তোমার গৃহিণীর মনোরঞ্জন। শপথবাক্যের এত শক্তি!

এখন ভাবিয়া দেখ আর্য্যহিন্দু চিরদিনই বড় ধর্ম্মপ্রাণ। সেই ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর নিকট ধর্ম্মের দোহাই যেন অগ্নিময়ী বাধা। কিছুতেই অতিক্রম করিবার যো নাই। এখন প্রতিদিন প্রতিহিন্দুর গৃহে ইহার লক্ষলক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। শাস্ত্রের প্রকৃত নিগূঢ় অর্থ-পরিগ্রহে যাহারা অক্ষম, তাহারা অন্ততঃ ধর্ম্মরক্ষার ভয়ে কখনও শাস্ত্রোক্ত বিধি নিয়ম মানিয়া চলে। আর সেই শপথবাক্য রক্ষা করিলেই শাস্ত্রোক্ত নিষিদ্ধ কার্য্য সকল করা হইল না। বর্ত্তমানযুগে যাহারা শিক্ষিত তাহাদিগের কথা ছাড়িয়া দি। যাহারা অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত তাহাদিগের নিকট ধর্ম্মের দোহাই বড় মূল্যবান্, তাহাদিগের জীবনপথের মধ্যস্থলে যেন পর্ব্বত প্রমাণ দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। বর্ত্তমান যুগের শিক্ষার মত শিক্ষা তখনকার যুগে ছিলনা। সুতরাং এখনকার হিসাবে দেখিতে গেলে সেই সকল বৃদ্ধ মুনিঋষিদিগের পরিশ্রম একেবারে পণ্ড না হইলেও সম্পূর্ণ ফলপ্রদ নহে। কারণ আলোক প্রাপ্ত শিক্ষিতের নিকট তাঁহাদিগের বিধি নিষেধ প্রভৃতির তত মূল্য নাই,--অনেকস্থলে বাতুলের অসংলগ্ন উন্মত্ত প্রলাপমাত্র।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য, বি, এ।

হিন্দু রাজা সীতারাম রায়।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

সীতারামের সময় ইহা প্রকৃত বৃন্দাবন সদৃশই ছিল, তখন কানাইনগর রাজধানী ভুক্ত ছিল। অনেক ধনী ও জ্ঞানী লোকের বাস ছিল। কানাই নগরের শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ ইত্যাদি দর্শনে মন স্বভাবতঃই ভক্তিরসে আপ্লুত হয়। সীতারাম যে এক জন ভক্তপ্রবর ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি স্বর্গধামে গিয়াছেন, তাঁহার কীর্ত্তি অদ্যাপি মানব-মনকে ভক্তিপথে ধাবমান করাইতেছে। ব্রজধামে নন্দগোপ ইত্যাদি বৈশ্য শ্রেণীর আহীরিগোপ ছিলেন কানাই নগরের গোয়ালাগণ বর্ণসঙ্কর জাতি। শ্যামনগর, মথুরানগর, গোপালপুর, গোকুলনগর ইত্যাদি সীতারামের কানাইনগর বৃন্দাবনের তালবন, ভাণ্ডীবন সদৃশ এক একটী পাড়া। কালে সমস্ত সৌন্দর্য্যই অপহরণ করিয়াছে, এক্ষণ সমস্তস্থানেই প্রায় বনতুল্য জঙ্গলময় হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে লোকের বাস আছে।

সীতারামের গুরুবংশ টেঁয়ার ঠাকুরগণ। শ্রীধামনবদ্বীপ চন্দ্র ভগবান্ মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের পার্শদ দ্বিজ হরিদাস ঠাকুর মহাশয়ের সন্তান!

পুণ্যশ্লোক সীতারাম একজন ভক্তাগ্রগণ্য স্বাধীনচেতা মহান্ পুরুষ ছিলেন।

সীতারামের রাজত্বকালে মহম্মদপুর নগরের মধ্যে কালীগঙ্গা নাম্নী একটি ক্ষুদ্রানদী প্রবাহিতা ছিল। এই কালীগঙ্গা নদীরতীরেই মেনাহাতীর কবরস্থান রহিয়াছে। সীতারাম তাঁহার পিতা উদয় নারায়ণের

নামানুসারে রাজবাটীর সন্নিকটে উক্ত কালীগঙ্গা নদীর তীরে একটী প্রধান গঞ্জ ও হাট স্থাপনা পূর্ব্বক তাহার নাম উদয়গঞ্জ রাখেন, বর্ত্তমানে সে গঞ্জ বা হাট নাই বটে কিন্তু অদ্যাপি লোকে উদয়গঞ্জের হাটখোলা বলিয়া থাকে। কালীগঙ্গা নদী এক্ষণে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, স্থানে স্থানে সামান্য অস্তিত্ব মাত্র রহিয়াছে।

বাত্রৈজানী, ধুপড়িয়া, মুগলাইন, রামপাশা, নৈহাটী, জাঙ্গালিয়া, ঘুঙ্‌ইচ্, মালিকপুর, নারায়ণপুর, কোঠাবাড়ী, গোয়ালবাড়ী, বাজার বাধানগর বা পুরাতন বাজার, কানাইনগর, গোকুলনগর, মথুরানগর, শ্যামনগর ও গোপালপুর গ্রাম মহম্মদপুর রাজধানীর অন্তর্গত ছিল। মহম্মদপুরের পূর্ব্বদিকে মধুমতী নদী প্রবাহিতা ছিল ও আছে।

সীতারাম-প্রতিষ্ঠিত ৺দশভুজা পিত্তল-নির্ম্মিত। কেহ কেহ অষ্টধাতু নির্ম্মিত বলেন, তাহা অমূলক। প্রবাদ আছে যে, মহম্মদপুরে অনেক শিল্পনিপুণ কর্ম্মকার বাস করিত। সীতারাম ৺দশভুজা মূর্ত্তি স্বর্ণ দ্বারা নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তখন রাজধানীস্থ একটী প্রাচীন কর্ম্মকারের নিকট তিনি শুনিতে পান যে, তাহার পুত্র কারুকার্য্যে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছে এবং এরূপ কৌশলে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে পারে যে, সম্পূর্ণই চুরি করিবে অথচ জিনিষ দেখিয়া কেহ তাহার চুরি ধরিতে পারিবে না। তচ্ছ্রবণে সীতারাম কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তাহাকে বলেন যে, তিনি সেই কর্ম্মকারের দ্বারা স্বর্ণময়ী ৺দশভুজা-মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইবেন। যদি সে অজ্ঞাতসারে স্বর্ণ চুরি করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দান করা হইবে নচেৎ, তাহার সমুচিত দণ্ড বিধান করিবেন। পরে সীতারাম সেই কর্ম্মকারকে ডাকাইয়া নিজ বাড়ীর উপর স্বর্ণের ৺দশভুজা মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে আদেশ দেন এবং এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দেন যে, যতক্ষণ কর্ম্মকার কার্য্য করিবে, ততক্ষণ উপযুক্ত প্রহরিবর্গ সর্ব্বদা তাহার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত থাকিবে, যাহাতে কোনরূপ চতুরতা না করিতে পারে। এবং তাহার দৈনিক কার্য্য অন্তে সেই গৃহ উত্তমরূপে আবদ্ধ করিয়া প্রহরীর দ্বারা রক্ষণ করিতেন। কর্ম্মকার রাজবাড়ীতে রীতিমত কাঞ্চন-মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। এদিকে সে নিজ বাড়ীতে সুবিধামত অবকাশ সময়ে রাজবাড়ী অনুরূপ একটী ৺দশভুজা মূর্ত্তি পিত্তলের দ্বারা নির্ম্মাণ করিতে বিশেষ যত্ন সহকারে উদ্যোগী হইল। ক্রমশঃ এক দিনেই দুই মূর্ত্তি প্রস্তুত শেষ হইল। তৎকালীন নিয়ম ছিল যে, বিগ্রহ উৎসর্গের পূর্ব্বে মূর্ত্তি প্রস্তুতকারীরই প্রতিমূর্ত্তি স্নান করাইয়া আনিতে হইত। তদনুসারে স্নানের দিন প্রথমেই কর্ম্মকার তাহার বাটীতে নির্ম্মিত পিতলের মূর্ত্তি পুষ্করিণী মধ্যে নিমগ্ন রাখিয়া পরে যথা সময়ে রাজবাটীর নির্ম্মিত স্বর্ণ মূর্ত্তি স্নান করাইতে গিয়া উক্ত পিতলের মূর্ত্তি উঠাইয়া স্বর্ণ মূর্ত্তি তথায় রাখিয়া আইসে। পিতলের মূর্ত্তি এরূপ রঞ্জিত করিয়া ছিল যে, দেখিলেই স্বর্ণ

বলিয়া প্রতীতি জন্মিত। সীতারাম ও অন্যান্য দর্শকমণ্ডলী পিতলের মূর্ত্তিই স্বর্ণ বলিয়া স্থির করিলেন। শেষে উৎসর্গ করিবার পূর্ব্বে সীতারাম কর্ম্মকারের পিতাকে ডাকাইয়া বলিলেন যে, তাহার পুত্র কিছুই অপহরণ করিতে পারে নাই অতএব সে দণ্ডনীয় হইবে। প্রত্যুত্তরে কর্ম্মকার বিনীতভাবে নিবেদন করিল যে, তাহার পুত্র সম্পূর্ণ চুরি করিয়াছে। মহারাজের অভয় পাইলে সমস্তই প্রকাশ করিতে পারে। সীতারাম বিস্ময়াতিশয্য সহকারে তাহাকে অকুতোভয়ে বিস্তারিতরূপে প্রকাশ করিতে আদেশ দিলেন। তখন কর্ম্মকার আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলে সভায় সকলেই যৎপরোনাস্তি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সীতারাম সহাস্য বদনে বলিলেন যে, মার পিতল নির্ম্মিতা হইতেই বাসনা, নতুবা এরূপ ঘটিবে কেন? তদনুসারে তিনি পিতলের মূর্ত্তিই প্রতিষ্ঠা করেন, স্বর্ণমূর্ত্তি কর্ম্মকারকে পুরস্কার স্বরূপ দান করিলেন।

৺ হরেকৃষ্ণ রায়ের কাষ্ঠ (নিম্ব) নির্ম্মিত সীতারাম কর্ত্তৃক স্থাপিত যুগল মূর্ত্তি ভগ্ন হইয়া যাওয়ার পরে নাটোর মহারাজের তত্ত্বাবধানে নূতন মূর্ত্তি প্রস্তুত করা হইয়াছে। সমস্ত বিগ্রহগুলিকেই দ্বিপ্রহরে অন্ন ও রাত্রিতে রুটির ভোগ দেওয়া হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ৺ হরেকৃষ্ণ রায় ও ৺ লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহের প্রাতে দৈ, মুড়কী, চিড়াভাজা, ছোলাভাজা ইত্যাদি বাল্য সেবা ও বৈকালে সন্দেশ জল সেবার বন্দোবস্ত আছে।

৺ লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের প্রত্যহ রীতিমত উষাকালে মঙ্গল আরতি হইয়া থাকে। দেবসেবা আদির যেরূপ নিয়ম সীতারামের সময় প্রচলিত ছিল, অদ্যাপি সেইরূপ চলিতেছে কিন্তু সেবাইত মহারাজার সে সমস্ত বিষয়ে তত লক্ষ্য নাই। ভোগের বন্দোবস্ত ইত্যাদি অনেক কমিয়া গিয়াছে। কোন রূপে দেব সেবা চলিতেছে। মহারাজ অনেক ব্যয় কমাইয়া দিয়াছেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে যে, ৺ হরেকৃষ্ণ রায়ের বাটীর তিন পার্শ্বেই পাকা যোড় বাঙ্গলা ছিল, তাহা ভ্রমবশতঃ লেখা হইয়াছে। ৺ হরেকৃষ্ণ রায়ের প্রাঙ্গণের পশ্চিমের দিকে পঞ্চরত্ন মন্দিরে ৺ হরেকৃষ্ণ রায় বা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিরাজিত। দক্ষিণের দিকে বৃহৎ পাকা শিবমন্দির, উত্তর ও পূর্ব্ব দিকে পাকা যোড় বাঙ্গালা ছিল। চতুর্দ্দিকে প্রাচীর ইত্যাদি। পঞ্চরত্ন মন্দিরটী ব্যতীত অন্য মন্দির ইত্যাদি ভগ্ন হইয়াগিয়াছে। পঞ্চরত্ন মন্দিরটীরও ভগ্ন দশা। উত্তরের দিকের পাকা যোড় বাঙ্গলায় ৺ মহারাণী ভবানীর কন্যা ৺ তারা ঠাকুরাণী ৺ বলরামজী স্থাপনা করেন। শেষে যোড় বাঙ্গলা ভগ্ন হইয়া যাওয়ায় অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

মহম্মদপুরে যখন দীঘাপতিয়ার রাজার সদর কাছারী ছিল, তখন দীঘাপতিয়ার রাজ কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিগ্রহ স্থাপিত হয়। সীতারাম-প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহগুলির ন্যায় শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিগ্রহের সেবা ও ভোগের উত্তম বন্দোবস্ত ছিল। পরে দীঘাপতিয়ার সদর কাছারী যশোহর জেলার অন্তর্গত বুনাগাতীতে স্থানান্তরিত হইলে বিগ্রহটী মহম্মদপুরেই রক্ষিত হইয়াছিল। কিছু দিন

পূর্ব্বে উক্ত বিগ্রহ দীঘাপাতিয়ার রাজ বাটীতে নীত হইয়াছে। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিগ্রহের পাকা মন্দির, প্রাঙ্গণ ইত্যাদি জঙ্গলময় হইয়া রহিয়াছে।

১ম প্রস্তাবে চিত্তবিশ্রামের পশ্চিমে ছত্রাবতী নদী প্রবাহিত ছিল লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রকৃত নয়। দক্ষিণ দিকে উক্ত নদী প্রবাহিত ছিল।

সীতারামের শেষ জীবনী সম্বন্ধে তদীয় সহোদর লক্ষ্মীনারায়ণ রায়ের বংশধর বর্ত্তমান দেবনাথ রায় এবং সীতারামের প্রপৌত্র রাধাকান্ত রায়ের দৌহিত্র পুত্র উমাচরণ দাস মহাশয়ের নিকট অবগত হওয়া যায় যে, শেষে নবাব সৈন্য মহম্মদপুর রাজধানী আক্রমণ করিলে সীতারাম অন্তঃপুর মধ্যেই থাকিতেন। তখন তাঁহার সৈন্য বল হ্রাস হইয়াছে, সম্মুখ যুদ্ধে নবাব সৈন্যগণকে পরাজয় করিতে অসমর্থ, এজন্য কোন বিহিত উপায় স্থির করণাভিপ্রায়ে বিমর্ষচিত্তে অন্তঃপুরেই থাকিতেন। মুরসিদাবাদ গিয়া নবাব দরবারে সন্ধির প্রস্তাবনা করিবেন সংকল্প করিতে ছিলেন। এই সময়ে কনিষ্ঠারাণী তাঁহাকে বিদ্রূপ ব্যঞ্জক স্বরে রাজার এরূপ সময়ে অন্তঃপুরে থাকা নিতান্ত কাপুরুষতার লক্ষণ এবং ক্রমশঃ তাঁহারা বিপদ সাগরে নিমজ্জিত হইতেছেন ইত্যাদি বাক্য বলায় তিনি তৎক্ষণাৎ নবাব সেনার সম্মুখীন হয়েন এবং বিপক্ষগণ তাঁহাকে বন্দীভাবে লইয়া যায়। সীতারাম নবাব দরবারে উপস্থিত হইলে নবাবের দেওয়ান রঘুনন্দন তাঁহাকে বলেন যে, দুইলক্ষ টাকা এক্ষণ দিলে তিনি মুক্ত হইতে পারেন এবং তাঁহার জমিদারী তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা যাইতে পারে। কেহ কেহ বলেন যে, রঘুনন্দন উৎকোচ স্বরূপ উল্লিখিত টাকা প্রার্থনা করেন, কেহ বলেন যে, গত চতুর্দ্দশ বৎসরের করস্বরূপ উক্ত টাকা দিতে বলেন। যাহাহউক সীতারাম উল্লিখিত টাকার জন্য মহম্মদপুরে লোক প্রেরণ করেন। মহম্মদপুর হইতে দুইলক্ষ টাকা নৌকা পথে কতিপয় লোক সহ মুরসিদাবাদে প্রেরিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে মুরসিদাবাদ রাজধানীর অনতিদূরেই রঘুনন্দন চক্রান্ত করিয়া নৌকা আক্রমণ পূর্ব্বক সম্পূর্ণ টাকা আত্মসাৎকরেন। এদিকে সে সংবাদ সীতারাম বা মহম্মদপুরস্থ কেহই জানিতে পারেন নাই। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীতারামের টাকা মুরশিদাবাদে উপস্থিত না হওয়া বশতঃ এবং রঘুনন্দনের বাক্য শ্রবণ করিয়া সীতারাম মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, নবাবের সহিত সন্ধি বা তাঁহার হস্ত হইতে মুক্তি লাভের কোন আশা নাই। যবন হস্তে অবমানিত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়স্কর বিবেচনায় তিনি আত্মহত্যা করেন। সীতারামের পরিবারবর্গ তখন হরিহরনগরের বাটীতে ছিলেন। সীতারাম বন্দীভাবে মুরসিদাবাদে নীত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ-পুত্র শ্যামসুন্দর রায় নৌকারোহণ পূর্ব্বক দিল্লীর সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইয়া আনুপূর্ব্বিক বাদসাহকে বলিয়া তাঁহার করুণা ভিক্ষা করেন। বাদসাহ সীতারামের কীর্ত্তি কলাপ ইত্যাদি অবগত হইয়া কৃপাপরবশ হইয়া শ্যামসুন্দর রায়কে আশ্বাস বাক্য প্রদান পূর্ব্বক সীতারামের রাজ্য প্রত্যর্পণ

করিতে মুরসিদাবাদে নবাবের নিকট আদেশ পত্র দান করেন এবং শ্যামসুন্দরকে মুরসিদাবাদ নবাবের নিকট পাঠাইয়া দেন। শ্যাম সুন্দর মুরসিদাবাদে উপনীত হইয়া তাঁহার পিতা সীতারামের আত্মহত্যার সংবাদ শ্রবণ করেন। শ্যামসুন্দর যৎপরোনাস্তি দুঃখিত, শোকার্ত্ত ও মর্ম্মাহত হইয়া নবাব গোচরে উপস্থিত হয়েন। নবাব শ্যামসুন্দরের সহিত সীতারামের জমিদারী বন্দোবস্তের আদেশ প্রদানের ইচ্ছুক হইলেন কিন্তু রঘুনন্দন তখন নবাবকে বলেন যে, সীতারামের তিনটী স্ত্রী, তাঁহার মধ্যমাস্ত্রীর জ্যেষ্ঠ পুত্র এই শ্যামসুন্দর, এরূপ স্থলে অন্য রাণীদের মত লওয়া আবশ্যক। রাজ্ঞীদের যদি মত হয়, তবে শ্যামসুন্দরের সহিতই জমিদারী বন্দোবস্ত করা যাইবে। নবাবও তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। শ্যামসুন্দর মুরসিদাবাদেই রহিলেন। এদিকে নাকি রঘুনন্দন মহম্মদপুরের রাজ্ঞীদিগের নিকট লোক প্রেরণ পূর্ব্বক সংবাদ প্রদান করেন যে, সীতারামকে নবাব হত্যা করিয়াছেন, শ্যাম সুন্দর মুরসিদাবাদে আছেন। যদি তাঁহারা জমিদারী প্রার্থনা করেন, তবে শ্যামসুন্দরকেও নবাব বধ করিবেন অতএব তাঁহারা যদি রঘুনন্দনের উপর সমস্ত ভারার্পণ করেন এবং লিখিয়া দেন যে, তাঁহাদের বংশধরগণ জমিদারী চালাইতে অক্ষম, রঘুনন্দনই সমস্ত জমিদারী নিজহাতে রাখিলে তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকেন এবং তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে, তাহা হইলে শ্যামসুন্দর রায়ের জীবন রক্ষা হইতে পারে এবং তিনি মহম্মদ পুরে প্রত্যাগমন করিতে পারেন। রাজ্ঞীত্রয় সীতারামের হত্যা সংবাদ, রাজত্বনাশ ইত্যাদি কারণেই অত্যন্ত শোকার্ত্তা, ভীতা, দুঃখিতা ও কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ়া হইয়া উন্মাদিনী তুল্যা হইয়াছিলেন। পরে এইরূপ সংবাদে পুত্র-স্নেহ বশতঃ রঘুনন্দনের আদেশ মত লিখিয়া পাঠান। তখন রঘুনন্দন নবাব গোচরে সীতারামের বংশধরগণের জমিদারী চালাইতে অক্ষমতা ইত্যাদি কারণ দর্শাইয়া নিজে সমস্ত জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া লয়েন। শেষে সীতারামের বংশধরগণের কোন কষ্ট না হয়, এরূপ যৎসামান্য কিছু সম্পত্তি দান করেন। শ্যামসুন্দর রায় মুরসিদাবাদ হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক মহম্মদপুরের নিকট শ্যামগঞ্জের বাটীতে বাস করিতেন।

সীতারামের গুরুদেব ভবনে গুরুকুলপঞ্জীতে যেরূপ লিখিত আছে, তাহা এতৎসহ পরিশিষ্টে লিখিত হইল। সীতারাম সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রবাদ আছে এবং বিশেষ অনুসন্ধানে যত দূর জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে সমস্তই বর্ণিত হইল।

ক্রমশঃ

শ্রীবরদাকান্ত দেব।

বর্ণশ্রেষ্ঠত্ব নির্ব্বাচন।

শুক্ল যজুর্ব্বেদ ঋগ্বেদের অনেক পরে প্রণীত হইয়াছে। ঋগ্বেদের অনেক সূক্ত ইহাতে দৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থ যে সময়ে রচিত হইয়াছিল, সেই সময়কার সামাজিক-অবস্থা

সম্বন্ধেও ইহা হইতে অনেকটা জানা যায়, ইহার শত রুদ্রীয় নামক ষোড়শ-অধ্যায়ে অনেক ব্যবসায়ের উল্লেখ আছে, কিন্তু কোন জাতি বিভাগের উল্লেখ নাই। আদিম অধিবাসী নিষাদদিগেরও ইহাতে উল্লেখ আছে। আমরা আরও দেখিতে পাই যে, পরবর্ত্তীকালে এই নিষাদেরাই ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রাণীর গর্ভজাত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই সূক্তে রুদ্রদেব সমস্ত ব্যবসায়াদির অধিষ্ঠাতৃ দেবতা স্বরূপ পূজিত হইয়াছে।

পুরুষমেধ নামক ত্রিংশৎ অধ্যায়ে আমরা ব্রাহ্মণ, রাজন্য, বৈশ্য, শূদ্র এবং অন্যান্য কতকগুলি ব্যবসায় এবং আদিম অধিবাসীর নামোল্লেখ দেখিতে পাই। পৌরাণিক সময়ে তাহাদিগকেই কতকগুলি বিভিন্ন জাতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পুরুষ মেধের অর্থ নরমেধ যজ্ঞ। অশ্বমেধ যজ্ঞের সহিত ইহার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। অশ্বমেধে যেরূপ অশ্ব বলিদানের বিধান, পুরুষমেধে সেইরূপ প্রকৃত পক্ষে বা অনুকল্পভাবে নরবলি দেওয়ার বিধান এবং বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায় হইতে পুরুষ ও স্ত্রীলোক আনিয়া যুগকাষ্ঠে বাঁধিয়া রাখা হইত। ত্রয়োদশ ও ষোড়শ অধ্যায়ে আমরা নিম্নলিখিত ব্যবসা ও আদিম অধিবাসীর নাম দেখিতে পাই—স্থপতি, স্তেন, স্তায়ুঃ, তস্কর, মুষ্ণুঃ, কুলঞ্চ (বিভিন্ন প্রকারের চোর ডাকাইতের নাম), সারথি, তক্ষার (সূত্রধর) রথকার, কুলাল, কর্ম্মার নিষাদ। এই সমুদায় ব্যবসায়ীরা স্মৃতি এবং পুরাণাদিতে সঙ্কর বর্ণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আর্য্য সমাজে কি বিভিন্ন শ্রেণীর স্ত্রী পুরুষ অবৈধ-প্রণয় করিবার পূর্ব্বে কুলাল, কর্ম্মকার, সূত্রধর প্রভৃতি ব্যবসা আদৌ ছিল না?

(আদিম অধিবাসী), পুঞ্জিষ্ঠের (আদিম অধিবাসী) শ্বনিন (অনার্য্য জাতি বিশেষ) মৃগায়ু (অনার্য্য জাতি বিশেষ) মাগধ (অনার্য্য জাতি বিশেষ) পুরাণে এই জাতি বৈশ্য পিতা ও ক্ষত্রিয় মাতা হইতে সম্ভুত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সূত (সূত্রধর) সূতও ঐরূপ সঙ্করবর্ণ বলিয়া উল্লিখিত আছে, কোন স্থানে ক্ষত্রিয় পিতা ব্রাহ্মণ মাতা ও কোন স্থানে বৈশ্য পিতা ক্ষত্রিয় মাতা হইতে সম্ভুত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অযোগ (খনিতে কার্য্যকারী) পুংশ্চলু (পরদার অভিমর্ষকা) শৈলুষ) (নট) মণিকার, বপ (কৃষক), ইষুকার, ধনুষ্কার, ভিষক, (জাতি প্রথা প্রচলিত হওয়ার পরেও ব্রাহ্মণেরাই চিকিৎসক ছিলেন। কিন্তু এখন চিকিৎসক ব্যবসায়ীকে ব্রাহ্মণ পিতা বৈশ্য মাতা হইতে সম্ভুত বলিয়া বলা হইয়া থাকে) নক্ষত্র দর্শ। হস্তিপ, অশ্বপ, গোপাল, সুরাকার, গৃহপ (দ্বারবান) বিত্তধ, (খাজাঞ্চী) অনুক্ষত্তা (চাকর) দার্ব্বাহার (কাঠুরিয়া) অগ্ন্যেধ (আলোওয়ালা) অভিষেক্তা (পাচক) পরিবেশন কর্ত্তা, পেশিত, (চিত্রকর) প্রকরিতা (খোদাইকর) উপসেক্তা (স্নানকারক) উপমন্থিতা (তৈল মর্দ্দনকারী) বাস পুলালী (রজক) রজয়িত্রী (রঙ্গদার) স্তেন হৃদয় (নরসুন্দর), ক্ষত্তা (সারথি) চর্ম্মম্ন (চর্ম্মকার) ধৈবর, কৈবর্ত্ত (ইহাদিকেও পুরাণে বর্ণ সঙ্কর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।) কিরাত (অনার্য্য জাতি বিশেষ) পৌল্কস অনার্য্য জাতি বিশেষ) দুর্ম্মদ,

ভিমল (অনার্য্য জাতি বিশেষ)। উপরের লিখিত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, কতকগুলি অনার্য্য জাতি এবং কতকগুলি ব্যবসায়ের নাম মাত্র ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে গায়ক, কবি, বিভিন্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোক, বোবা, অন্ধ, কালা, এবং অন্যান্য নানারকম লোকের নামোল্লেখও আছে। মগধ, নিষাদ, ভীমল, মৃগয়ু এবং শ্বনীন্ প্রভৃতিরা অনার্য্য জাতি। যজুর্বেদের ঐ দুই অধ্যায়ে যে সমস্ত ব্যবসায়ের উল্লেখ আছে, তাহা হইতে আর্য্য জাতির ঐ সময়ে সভ্যতার কতদূর উন্নতি হইয়াছিল, আমরা তাহাই অবগত হই। কিন্তু সঙ্কর জাতি বিভাগের সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই। আদিম চারি জাতির স্ত্রী পুরুষের মিশ্র-সংযোগে শঙ্কর জাতির উৎপত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আর্য্যদিগের মধ্যে কর্ম্মকার, কুম্ভকার সূত্রধর, রত্নাকর প্রভৃতি ব্যবসায়ী লোক ছিল না, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত ও অন্যায়। বৈদিক সময়ে যে কেবল কোন জাতি বিভাগ ছিল না, তাহা নহে, কিন্তু সে সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র নির্দ্দিষ্ট ব্যবসাও ছিল না। পরবর্ত্তী সময়ে যদিও ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়েরা বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন, তথাপি তখনও বিভিন্ন ব্যবসায়াবলম্বী আর্য্যেরা একই জাতি ছিলেন। আদিম অধিবাসীরা তখন স্বতন্ত্র সম্প্রদায় ছিলেন বটে, কিন্তু পৃথক জাতি বলিয়া পরিচিত হইতেন না। কিন্তু স্মার্ত্ত ও পৌরাণিক সময়ে বিভিন্ন ব্যবসায়াবলম্বী আর্য্যদিগের সহিত তাহারাও স্বতন্ত্র জাতিরূপে পরিণত হইয়াছিলেন। প্রাচীন সময়ে পৌরহিত্য ও যুদ্ধব্যবসায়িগণ অবশ্য বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিলেন কিন্তু জাতি শব্দে বর্ত্তমান সময়ে আমরা যাহা বুঝি, প্রাচীন ভারতে সেরূপ কোন জাতি প্রথা প্রচলিত ছিল না। অনেক ব্যবসায় বংশগত হইয়া উঠিলেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকে জানিত যে, তাহারা একই জাতি। তাহারা একত্র পানাহার করিত, পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি কার্য্য হইত, একই ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হইত। তাহারা একই জাতীয় ইতিহাস ও একই পূর্ব্ব পুরুষের গৌরবে গৌরবান্বিত বোধ করিত। আপনাদিগকে তাহারা আর্য্য নামে অভিহিত করিত। প্রাচীন ভারতে কেবল বৈশ্যদিগের এক নাম ছিল আর্য্য, অন্যান্য জাতিকেও আর্য্য বলা যাইত, দেশের কৃষিকার্য্য ও ব্যবসা বাণিজ্য ইহাদেরই হস্তে ছিল। এখন ইহারা নীচ জাতি মধ্যে গণ্য হইতেছে। ইহাদিগকে আর্য্য জাতির চতুর্থ শ্রেণী শূদ্রদিগের দলভুক্ত করা হইয়াছে। আবার শূদ্রগণকে আদিম অধিবাসীর দলভুক্ত করা হইয়াছে। সমস্ত বৈশ্য ও শূদ্রদিগকে আবার জারজ বলিয়া গণ্য করা হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদের সত্যকাম জাবাল ঋষির উপাখ্যানে দেখা যায় যে, জাতি ভেদ প্রথা রীতিমত প্রচলিত হওয়ার পরও এখনকার মত সে সম্বন্ধে তত বাঁধা বাঁধি ছিল না।

জবলাপুত্র সত্যকাম মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল যে "আমি কোন্ গোত্র? আমি ব্রহ্মচারী হইব"। মাতা বলিলেন যে, তোমার গোত্র আমি জানি না। যৌবন কালে আমি যখন বিভিন্ন লোকের দাস্যবৃত্তি করিতাম, তুমি সেই সময়ে হইয়াছিলে।

আমি তোমার গোত্র জানি না। আমার নাম জবলা, তোমার নাম সত্যকাম জাবাল।" পরে সত্যকাম গৌতম ঋষির নিকট যাইয়া ব্রহ্মচারী হইবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। ঋষি তাহার গোত্র জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি মায়ের নিকট যেরূপ শুনিয়াছিলেন তাহাই বলিলেন। তখন ঋষি বলিলেন যে "যথার্থ ব্রাহ্মণ ব্যতীত এরূপ সত্য কথা আর কেহই বলিতে পারে না। তুমি সমিধ সংগ্রহ করিয়া লইয়া আইস, আমি তোমাকে দীক্ষিত করিব। তুমি সত্য ভ্রষ্ট হও নাই।"

এখানে আমরা দেখিতে পাই যে, সত্যই ব্রাহ্মণত্ব লাভের একমাত্র উপায় ছিল। সত্যকামের জাতি বা বংশের প্রতি আদৌ লক্ষ্য করা হয় নাই। বালক সত্য কথা বলিল; অমনি তাহাকে ব্রহ্মচারী করিয়া লওয়া হইল। পরে তিনি একজন মহর্ষি হইয়াছিলেন। অজ্ঞাত কুলশীল দাসী পুত্রও যখন ঋষি হইতে পারিয়াছিলেন, তখন প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের উদারতা সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। কিন্তু ইহা কি দুঃখের বিষয় নহে যে, পরবর্ত্তী কালের পুরোহিতগণ, সব জ্ঞান একচাটিয়া করিয়া লইয়া, সমস্ত জাতিকে অজ্ঞানান্ধকারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন? কোন উদ্দেশ্য কোন বিষয় একচাটিয়া করিয়া লইলে সে উদ্দেশ্য কখনও সফল হয় না, পরিণামে সমস্তই নষ্ট হয়। পুরোহিতগণও এবিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, ব্রাহ্মণেরা এখন আর তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষের গুণে গুণবান নহেন এবং শূদ্রের বাড়ীতেও সামান্য চাকরের কার্য্য করিতেছেন। ভারতীয় সিভিলিয়ানদিগের কার্য্য যদি বংশগত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমানে যে সমস্ত উপযুক্ত ও কার্য্যদক্ষ কার্য্যকারক আছেন, তাঁহাদের বংশধরগণ অচিরে ঐ কার্য্যের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এবং এই অনুপযুক্ত ব্যক্তিগণই এই সম্প্রদায়কে অবিলম্বে অতি হীন অবস্থায় উপনীত করিবেন। তাঁহাদিগকে আর কেহ সেরূপ মান্য করিবে না। তাঁহারা আপনাদিগকে এবং সমস্ত দেশকে সত্বরই ধ্বংশ করিয়া ফেলিবে। অবশ্য ব্রাহ্মণ নামেরও গৌরবের উপযুক্ত অনেক ব্রাহ্মণ আছেন। কিন্তু ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা হীন জাতি অপেক্ষাও হীনাবস্থাপন্নও শত শত ব্রাহ্মণ বিদ্যমান রহিয়াছেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও কৌশিতকি ব্রাহ্মণের কবস ঋষির উপাখ্যানে দেখা যায় যে, তিনি শূদ্রবংশজাত হইয়াও ঋষি হইয়াছিলেন। ইহাতে আমরা আরও দেখিতে পাই যে, ভারতে জাতি প্রথা প্রচলিত হওয়ার পরও প্রাচীন কালে বর্ণ ভেদ প্রথার নিয়মাবলীর তত বাঁধা বাঁধি ছিল না। সে সময়ে অশ্বপতি রাজা, প্রবাহন জাবালি রাজা এবং জনক রাজাও আরও কতকগুলি ক্ষত্রিয় ব্রহ্মবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। অনেক বিখ্যাত ব্রাহ্মণ ঋষিও তাঁহাদের শিষ্য হইয়াছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে এই সমস্ত উপাখ্যান আছে।

শতপথ ব্রাহ্মণে আমরা দেখিতে পাই যে, জনক রাজা যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিকে অনেক নূতন বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি

রাজর্ষিকে বর প্রদান করিতে চাহিলে রাজর্ষি বলিয়াছিলেন যে, যথেচ্ছ বিষয় আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করার অনুমতি আমাকে দিন। অতঃপর রাজর্ষি ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

১০। ১। ৬। ২। ১ শতপথ ব্রাহ্মণ।

বর্ণসঙ্কর সম্বন্ধে মনুসংহিতাই প্রধান পুস্তক। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ইহা একখানি আধুনিক পুস্তক। পণ্ডিতগণ বলেন যে, ইহা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে। মনুসংহিতাই ভারতের প্রাচীনতম ব্যবহার শাস্ত্র নহে, আপস্তম্ব, বৌদ্ধায়ন অশ্বলায়ন প্রভৃতি ধর্ম্ম শাস্ত্র অতি প্রাচীনকালে অর্থাৎ খৃষ্টীয় শতাব্দীর ২০০ হইতে ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। পদ্য মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক। মনুসংহিতা অনুষ্টুপচ্ছন্দে রচিত। কিন্তু সূত্রশাস্ত্র রচনাকালে অনুষ্টুপছন্দ বিস্তৃত গ্রন্থ রচনাকালে ব্যবহৃত হইত না। এই পদ্যময় স্মৃতিগুলি প্রাচীন সূত্রশাস্ত্রের পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আধুনিক সংস্করণ মাত্র। মনুসংহিতা কৃষ্ণযজুর্বেদান্তর্গত মৈত্রায়ণ শাখার উপবিভাগ, মানব সূত্রচারণের ধর্ম্ম সূত্র হইতে পদ্যে রচিত হইয়াছে। আমরা বর্ত্তমানে মনুসংহিতা বলিয়া যে গ্রন্থ দেখিতে পাই তাহা ভৃগুর রচিত, কিন্তু তাহা মনুর রচিত বলিয়া উহাতে উল্লিখিত আছে। মনু বলেন যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরুদেশ ও পদতল হইতে যথাক্রমে উৎপন্ন হইয়াছেন। (১-৩১) এইটী তিনি পুরুষ সূক্তাবলম্বনে লিখিয়াছেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, উহাতে জাতি প্রথা সৃষ্টির মূল কারণ কিছু পাওয়া যায় না, তবে সমাজে কোন্ জাতির কিরূপ অবস্থা ছিল তাহাই উল্লিখিত আছে। তিনি পরে বলেন যে, ব্রহ্মা আপনি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া অর্দ্ধেকে পুরুষ, অপরার্দ্ধে স্ত্রী হইলেন। সেই স্ত্রীর গর্ভে বিরাজের উৎপত্তি হয় এবং বিরাজ হইতে মনুর উৎপত্তির হয়। তিনি দশ জন ঋষির সৃষ্টি করিয়াছিলেন যথা, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরস, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু এবং নারদ। এই দশ জন ঋষি দেবতা, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, নাগ, সর্প, সুপর্ণ, কিন্নর এবং মনুষ্য প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

যদি ব্রহ্মাই চারি জাতির সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে তাহাদিগকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করার কি দরকার হইয়াছিল? শাস্ত্র সমূহে জাতি সৃষ্টির বিবরণ সম্বন্ধে নানাবিধ অনৈক্য দৃষ্ট হয়। শত পথ ব্রাহ্মণে (২—১—৪) আমরা নিম্নলিখিত বিবরণ দেখিতে পাই, প্রজাপতি "ভূঃ" এই কথা বলিয়া পৃথিবী, "ভুবঃ" এই মন্ত্র উচ্চারণে বায়ু, "স্বঃ" উচ্চারণে আকাশ, 'ভূঃ' উচ্চারণে ব্রাহ্মণ, ভুবঃ উচ্চারণে ক্ষত্রিয় এবং 'স্বঃ' উচ্চারণে বিশের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলেন সমস্ত জগৎ ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়াছেন। ঋগ্বেদ হইতে বৈশ্য, যজুর্বেদ হইতে ক্ষত্রিয় এবং সামবেদ হইতে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছেন (৩-১২-৯)। ইহার অন্যত্র (১-২, ৬, ৭) দেবতা হইতে ব্রাহ্মণ এবং অসুর হইতে শূদ্রের জন্ম হইয়াছে এরূপ বর্ণনাও আছে।

মুদ্রিত হরিবংশে দেখা যায় যে, বিষ্ণু দক্ষ প্রজাপতিরূপে এই পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি অক্ষর হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষর হইতে ক্ষত্রিয়, বিকার হইতে বৈশ্য এবং ধূম-বিকার হইতে শূদ্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঋক্‌, সাম, যজুব ও অথর্ব্ব বেদের প্রধান ব্রাহ্মণগণকে ব্রহ্মা তাহার মুখ ও বাহু হইতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বেদের অন্যান্য ব্রাহ্মণগণও ব্রহ্মার শরীরের অপরাপর অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, মহাভারতে শান্তি পর্ব্বে ভৃগুমুনি বলিয়াছেন যে, তখন কোন জাতি বিভাগ ছিল না। একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই ছিলেন। তাহা হইতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে। আবার ঐ শান্তি পর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণ চারি জাতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এরূপ লিখিত আছে। শ্রীকৃষ্ণ মুখ হইতে একশত ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে এক শত ক্ষত্রিয়, উরুদেশ হইতে একশত বৈশ্য এবং পদতল হইতে একশত শূদ্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, শ্রীমৎ-ভগবদ্গীতায় ভগবান্ গুণ ও কর্ম্মানুসারে সমস্ত লোককে চারি জাতিতে বিভাগ করিয়াছেন।

বায়ু পুরাণের অষ্টমাধ্যায়ে দেখা যায় যে, সে সময়ে কোন জাতি বিভাগ ছিল না। কেহ কাহাকেও ভালবাসা বা ঘৃণার চক্ষে দেখিত না। কৃত যুগে সব লোকের আয়ু ও আকৃতি একইরূপ ছিল। উচ্চ-নীচ ভেদ ছিল না।

এস্থলে একজন প্রাচীন গ্রন্থকার স্পষ্টই বলিতেছেন যে, জাতি-ভেদ-প্রথা বিদ্বেষ ভাবের সৃষ্টি করে। তবে যাঁহারা বলেন যে, ইহাতে সদ্গুণের উৎপত্তি হয়, তাঁহাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতা অবশ্য স্বতন্ত্র বলেনের বলিতে হইবে।

বিষ্ণুপুরাণে (১—৬) জাতি ভেদ প্রথা সৃষ্টির এইরূপ বিবরণ আছে:—ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করার ইচ্ছা করিলে সত্ত্বগুণাবলম্বী প্রাণিগণ তাঁহার মুখ হইতে, রজ প্রধান প্রাণিগণ তাঁহার বক্ষস্থল হইতে, তম এবং রজ উভয় প্রধান প্রাণিগণ তাঁহার উরুদেশ হইতে এবং অন্যান্য প্রাণিগণ তাঁহার পাদদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহা হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

ভাগবৎ পুরাণের দ্বিতীয়-ভাগে ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু এবং পাদ হইতে চারি জাতির উৎপত্তির বিবরণ দিয়া, দশম-ভাগে বলেন যে, প্রথমে এক বেদ, এক নারায়ণ দেবতা, এক অগ্নি এবং এক জাতি ছিল। ত্রেতা যুগের প্রারম্ভে পুরুরবা হইতে তিন বেদের সৃষ্টি হয়।

ভাগবৎ পুরাণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কতকগুলি গুণ নির্দিষ্ট আছে। এবং যাহার যেরূপ গুণ দৃষ্ট হয়, তাহার তদনুরূপ হইবে। মহাভারতে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র সংবাদে চীনবাসী, কিরাত, দ্রাবিড়বাসী এবং অন্যান্য জাতিকে বশিষ্ঠের ধেনু নন্দিনী হইতে উৎপন্ন হওয়ার কথা লিখিত আছে।

জাতি প্রথা সৃষ্টির বিবরণ অন্যান্য গ্রন্থ হইতে আনা দেওয়া অনাবশ্যক। যাহা দেওয়া হইল, তাহা হইতে স্পষ্টই দেখা

যাইতেছে যে, কোনটীর সহিত অন্য কোনটীর আদৌ সামঞ্জস্য নাই। বরঞ্চ অনেক অনৈক্য আছে। এই জন্যই বলা হইয়া থাকে যে, নানা মুনির নানা মত।

মনুর লিখিত সঙ্কর জাতির তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

পিতা	মাতা	জাতি
ব্রাহ্মণ	বৈশ্য	অম্বষ্ঠ।
ঐ	শূদ্র	নিষাদ বা পারশব।
ক্ষত্রিয়	ঐ	উগ্র।
ঐ	ব্রাহ্মণ	সূত।
বৈশ্য	ক্ষত্রিয়	মাগধ।
ঐ	ব্রাহ্মণ	বৈদেহ।
শূদ্র	বৈশ্য	আয়োগব।
ঐ	ক্ষত্রিয়	ক্ষত্তা।
ঐ	ব্রাহ্মণ	চণ্ডাল।
ব্রাহ্মণ	উগ্র	আবৃত।
ঐ	অম্বষ্ঠ	আভীর।
ঐ	আয়োগব	ধিগ্বান।
নিষাদ	শূদ্র	পুক্কস।
শূদ্র	নিষাদ	কুক্কুটক।
ক্ষত্তা	উগ্র	শ্বপাক।
বৈদেহিক	অম্বষ্ঠ	বেণ।
দস্যু	আয়োগব	সৈরিন্ধ্র।
বৈদেহ	ঐ	মৈত্রেয়ক।
নিষাদ	ঐ	মার্গব, দাস বা কৈবর্ত্ত।
ঐ	বৈদেহিক	কারাবর।
বৈদেহিক	কারাবর	অন্ধ্র।
ঐ	নিষাদ	মেদ।
চণ্ডাল	বৈদেহ	পাণ্ডুসোপাক।
ঐ	নিষাদ	অন্ত্যাবসায়ী।

সংস্কার সমস্ত ত্যাগ করিয়া প্রথম তিন জাতি ব্রাত্য হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ব্রাত্য হইতে ভূর্জ্জকণ্টক, আবন্ত্য, বাটধান, পুষ্পধ এবং শৈখ জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। ক্ষত্রিয় ব্রাত্য হইতে ঝল্ল, মল্ল, লিচ্ছিভী, নট, করণ, খশ এবং দ্রাবিড় জাতি হইয়াছে। এবং বৈশ্য ব্রাত্য হইতে সুধন্বান, আচার্য্য, কারুষ, বিজন্মান মৈত্র সাত্বত জাতি হইয়াছে।

নীচ ক্ষত্রিয় জাতি—পৌণ্ড্রক, উড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত দরদ। মনু বলেন, ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু এবং পাদ হইতে জাত জাতিদিগের মধ্যে যে সমস্ত জাতিকে গণ্য করা হয় নাই, তাহারা ম্লেচ্ছভাষী হউক, কি আর্য্যভাষী হউক, দস্যু নামে পরিচিত।

মনুতে ইহার কোন কোন জাতির ব্যবসায়ের উল্লেখও আছে। সূতগণের প্রতি সারথী ঘোড়ার তত্ত্বাবধানের ভার থাকিত। অম্বষ্ঠের প্রতি চিকিৎসা ভার থাকিত। বৈদেহিকগণ স্ত্রীলোকের পরিচর্য্যা করিত। মাগধেরা ব্যবসায়ী ছিলেন। নিষাদেরা মৎস্য ধরিত। আয়োগবেরা সূত্রধরের কার্য্য করিত। মেদ, চুঞ্চু, অন্ধ্র, মদ্গুগণ বন্যজন্তু ধরিত। ক্ষত্তা, উগ্র, পুক্কশগণ গর্ত্তস্থ জন্তু ধরিত। ধিগ্বানেরা চর্ম্ম ব্যবসায়ী ছিল, বেণেরা ঢাক বাজাইত। চণ্ডাল ও শ্বপাকদের ধনসম্পত্তি স্বরূপ কুকুর ও গর্দ্দভ ছিল। ব্রাহ্মণেরা অন্যের যজ্ঞাদি করিবে এবং দান গ্রহণ করিবে। ক্ষত্রি

অস্ত্র শস্ত্রাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। বৈশ্য বাণিজ্য, কৃষিকার্য্য, গোপালন দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিবে। শূদ্র অপর তিন জাতির দাসত্ব করিবে। কিন্তু ব্রাহ্মণের সেবা করাই শূদ্রের প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যে কোন ফল পাইবে না।

উপরোক্ত তালিকার মধ্যে কিন্তু আমরা বৈদ্য ও কায়স্থের কোন উল্লেখ দেখিতে পাই না। নবশাখের ও কোন উল্লেখ নাই। আদিম বৈশ্যদিগের ব্যবসা ইহারাই চালাইত। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, বঙ্গবাসী বৈদ্যগণ বুদ্ধিমান ও বিদ্বান হইয়াও মনুর উদ্দেশ্য বুঝিতে অক্ষম হইয়া আপনাদিগকে অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। অম্বষ্ঠ একটী স্থানের নাম ছিল এবং ইহার অধিবাসীদিগকে অম্বষ্ঠ বলা হইত। বর্ত্তমান চাতোর জেলাকেই প্রাচীনকালে অম্বষ্ঠ দেশ বলিত। সম্ভবতঃ অম্বষ্ঠেরা চিকিৎসার জন্য বিখ্যাত ছিল বলিয়া মনু চিকিৎসাই তাহাদের ব্যবসা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কলিকাতার চীনবাসীরা উৎকৃষ্ট সূত্রধর। যদি এখনকার কোন মনু তাহাদের সামাজিক অবস্থা নির্ণয় করিতে যান, তবে তিনি তাহাদিগকে অন্য জাতি হইতে উৎপন্ন এবং সূত্রধর বলিয়া পরিচয় দিলেও দিতে পারেন। বঙ্গদেশের বৈদ্য সম্প্রদায় যে আপনাদিগকে অম্বষ্ঠ বলিয়া প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এত চেষ্টা করিতেছেন, ইহাও শোচনীয়। আর যদি তাঁহারা অম্বষ্ঠই হন, তবে তাঁহারা মনুর উল্লিখিত সঙ্কর জাতির অন্তর্ভুক্তই বা কেন হইতে যান?

নিষাদ জাতি ভারতের আদিম অধিবাসী ছিল। মৎস্য ও মৃগাদি শিকার দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিত। মনু তাহাদিগকে সঙ্কর জাতির তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। নিষধ নামে একটী দেশ ও একটী জাতিও ছিল। নৈষধ চরিতের নলই তাহার রাজা ছিলেন। নিষাদ আর নিষাদ একই জাতি কিনা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কিন্তু ই দুটী একই জাতির বিভিন্ন নাম বলিয়া বোধ হয়। সঙ্গীত শাস্ত্রের সপ্তম স্বরকে নিষাদ এবং নিষধ এই দুই নামই দেওয়া হইয়া থাকে।

উগ্র—বঙ্গদেশের আগুরীরা এই উগ্র বলিয়া পরিচয় দেয়। কেরল অর্থাৎ আধুনিক মালাবার দেশের নাম উগ্র। মনু বলেন যে, উগ্রেরা উগ্রস্বভাবান্বিত ক্ষত্রিয়। যে দেশের লোকেরা উগ্র স্বভাববিশিষ্ট, তাহাদিগকে আমরা এই উগ্র নাম দিয়া থাকিতে পারেন। গহ্বরস্থ জন্তুদিগকে বধ করাই ইহাদিগের ব্যবসায় ছিল, কিন্তু আগুরিদের অবশ্য সেইরূপ কোন ব্যবসায় নাই।

সূত—জাতি হয়ত গাড়ী চালাইতে সুদক্ষ থাকায়, জাতি বিভাগে এরূপ আখ্যা পাইয়াছে। ইহা বাস্তবিক আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় এক মুহূর্ত্তের জন্যও একবার চিন্তা করিয়া দেখেন না, যে এই সমস্ত ব্যবসায় কখনই মিশ্র বিবাহের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল না। কোন ক্ষত্রিয় কোন ব্রাহ্মণীর সহিত মিলিত হওয়ার পূর্ব্বে আর্য্যদিগের রথচালক কেহই ছিল না এরূপ অনুমান করা কি মূর্খতা নয়?

বৈদেহ—জাতির ব্যবসায় স্ত্রীলোকের পরিচর্য্যা করা। বিদেহ নামে একটী দেশ ছিল। নেপালের জনকপুরী ও ইহার রাজধানী মিথিলা একই নগর। প্রাচীন কালে আধুনিক ত্রিহুত ও নেপালের কতকাংশ লইয়া বিদেহ রাজ্য বিস্তৃত ছিল। জনক ইহার রাজা ছিলেন। ইহাদিগকে এইরূপ ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যেন, কোন বৈশ্য কোন ব্রাহ্মণীর সহিত বিবাহিত হইবার পূর্ব্বে, ভদ্রবংশীয় স্ত্রীলোকদিগের পরিচর্য্যা করার কোন লোকই ছিল না।

অযোগব—যজুর্ব্বেদে অযোগের উল্লেখ আছে। তাহারা খনিতে লৌহখননকারী অনার্য্য জাতি বিশেষ ছিল। কিন্তু মনুর অযোগবেরা সূত্রধর। বস্ত্রবয়নব্যবসায়ী আধুনিক যোগীদের সহিত ইহাদের তুলনা করা হইয়া থাকে।

ক্ষেত্রী—আমাদিগের বিশেষ সন্দেহ হয় যে, রাজপুতেরা যখন প্রাচীন ক্ষত্রিয়দিগের সিংহাসনে অধিরোহণ করে, তখন গোঁড়া হিন্দু ধর্ম্ম হইতে পৃথক ভাবে থাকায়, ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণদিগের বিরাগ-ভাজন হওয়ায়, তাহাদিগকে সমাজে নীচ অবস্থাপন্ন করিয়া সেইরূপ একটী নামও দিয়াছিলেন। পঞ্জাবে বহুতর ক্ষেত্রী আছে। বীরবর শিখজাতিদিগের গুরুকুলও ক্ষেত্রী। গুরুনানক ও তৎপরবর্ত্তী অন্যতম নয় জন গুরু এবং তাহাদের বংশধরগণ, শিখদিগের বংশগত গুরু পঞ্জাবের বেদি ও শোধিগণ, যদিও সাধারণতঃ ক্ষেত্রী বলিয়া পরিচিত, তাহা হইলেও তাহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভূত বলিয়া পরিচয় দেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে, আবু পর্ব্বতের উপর বশিষ্ঠ ঋষি একটী যজ্ঞ করিয়া চারিটী বীর পুরুষের সৃষ্টি করেন, তাহা হইতে পরিহর, প্রমার, চালুক্য ও চোহান এই চারি জাতির উৎপত্তি হয়, পরে তাহাদিগের হইতে আর ৩৬টী রাজপুত জাতির উদ্ভূত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে রাজপুতগণ সূর্য্য ও চন্দ্র বংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া পরিচয় দেন। কোন প্রাচীন গ্রন্থে রাজপুতদিগের কোন উল্লেখ নাই। ক্ষেত্রিগণ কেবল ব্যবসায়ী নহে। শিখদিগের ইতিহাসে দেখা যায় যে, ক্ষেত্রী বংশীয় হরিসিংহ নলুয়া অপেক্ষা পঞ্জাবী সিংহদিগের মধ্যে অধিকতর সাহসী সেনাপতি আর কেহই ছিলেন না। দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ এবং তাঁহার পুত্রগণ সকলেই সাহসী সৈনিক পুরুষ ছিলেন।

চণ্ডাল—অনার্য্য জাতি বিশেষ। বর্ত্তমানে তাহারা নমশূদ্র বলিয়া পরিচয় দেয়। ১৮৯১ সালের আদমসুমারী বিবরণীতে তাহাদের সংখ্যা ১, ৭৬১, ৩৬৫ ছিল এবং তাহারা যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ এবং ঢাকা এই কয় জেলাতেই তাহাদের অধিকাংশ বাস করে। তাহারা কঠিন পরিশ্রমকারী। এ প্রদেশে অধিকাংশ জমি তাহারাই চাষ করে। মনু বলেন শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে চণ্ডালের উৎপত্তি।

অধ্যাপক রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার Ancient India নামক গ্রন্থে এই জাতি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—"চণ্ডালদিগের পরস্পরের মধ্যে এরূপ একটী শারীরিক ও মানসিক সাদৃশ্য আছে যে, তদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তাহারা একটী স্বতন্ত্র জাতি।

এই জাতি কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে? মনু বলেন, শূদ্রের ঔরষে, ব্রাহ্মণীর গর্ভে তাহাদের জন্ম। প্রাচীনকালে দক্ষিণ পূর্ব্ব বঙ্গে কোন সময়েও ব্রাহ্মণের সংখ্যা বেশী ছিল না; এবং বর্ত্তমান সময়েও উপরোক্ত পাঁচ জেলাতে ২৫ লক্ষ ব্রাহ্মণও হইবে না; এরূপ অবস্থায় ঐ সব জেলাতে এক নিযুত চণ্ডাল কিরূপে জন্মিল? মনুর মতে এই প্রশ্নের কি সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া যাইতে পারে? আমরা কি অনুমান করিব যে সুন্দরী ব্রাহ্মণীগণ অনবরত কৃষ্ণকায় শূদ্র কৃষকের প্রতি অনুগ্রহ দেখাইয়া আসিয়াছেন? আমরা কি অনুমান করিব যে স্ফূর্ত্তিবান শূদ্রেরা একটী নূতন জাতি সৃষ্টি করার অভিপ্রায়ে, সহস্র সহস্র সুন্দরী অথচ দুর্ব্বলচিত্ত ব্রাহ্মণ কন্যাকে কুপথে আনয়ন করিয়াছে? অথবা আমরা কি ইহাই অনুমান করিব যে, রাজানুগৃহীত ও পৌরহিত্য ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ সন্তান অপেক্ষা এই চণ্ডাল দিগের বংশধরগণ মৎস্যবহুল জলাভূমি ও গণ্ডগ্রামে, নানারূপ দুঃখ কষ্টের মধ্যে থাকিয়াও সংখ্যায় বেশী হইয়া পড়িয়াছিল? ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এই অনুমান গুলিও যেরূপ অসম্ভব, মনুর প্রচারিত সঙ্কর জাতির বিবরণও সেইরূপ অস্বাভাবিক। সাধারণ বুদ্ধিতেই সহজে বুঝা যায় যে, বঙ্গদেশের চণ্ডালেরাই পূর্ব্ববঙ্গের আদিম অধিবাসী ছিল। ইহারা অসংখ্য নদী নালাতে মৎস্য ধরিয়া তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। পরে আর্য্যজাতি আসিয়া যখন বঙ্গদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন তখন তাহারা স্বভাবতঃ হিন্দুদিগের ভাষা, ধর্ম্ম এবং সভ্যতা অবলম্বন করিয়াছিল।

আমরা পুরাণে দেখিতে পাই যে, দেবী চণ্ড ও মুণ্ড নামক দুইটী অসুর সেনাপতিকে বধ করিয়াছিলেন, তাহারা হয়ত এই চণ্ডাল ও ছোট নাগপুরের মুণ্ডাদিগের দলপতি ছিল।

হিন্দুদিগের মধ্যে চণ্ডাল এই শব্দটী বড়ই ঘৃণাব্যঞ্জক হইয়া পড়িয়াছে। এই কঠিন পরিশ্রমী অনার্য্য জাতি চণ্ডাল এই ঘৃণিত আখ্যায় অভিহিত হইতে বড়ই মর্ম্মাহত হইয়া ছিল। ১৮৯১ সালের আদম সুমারীর সময় এসম্বন্ধে তাহারা সরকার বাহাদুরের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিল যে, পূর্ব্বাপর তাহারা নমশূদ্র নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে সুতরাং তাহাদিগকে চণ্ডাল বলিয়া না লিখিয়া নমশূদ্র বলিয়া লেখা হয়। হিন্দু-পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় তাহাদিগকে এসম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। যশোহর, খুলনা ও ফরিদপুর হইতে তাহাদের দলপতিরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল। এবং তাঁহার পরামর্শানুসারে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছিল। চণ্ডাল দিগের শরীর খুব বলিষ্ঠ! তাহাদের সংখ্যা ১৭ লক্ষাপেক্ষাও অধিক। তাহারা কষ্ট-সহিষ্ণু এবং কঠিন পরিশ্রমী। তাহারা কোনরূপ মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে না। তাহাদিগকে নানারূপে উৎপীড়ন করা ভিন্ন উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ তাহাদিগের বিষয় আর কখন কোনরূপ চিন্তাও করেন নাই। এক সময়ে তাহারা ধর্ম্মঘট করিয়া অন্যান্য জাতির সব রকম কাজ করা বন্ধ

করিয়া দিয়াছিল, তাহাতে উচ্চ শ্রেণীর লোকদের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছিল। তখন উচ্চ শ্রেণীদের নরম হইতে হইয়াছিল। তাহাদিগকে উচ্চশ্রেণীরা আর কখন চণ্ডাল বলিবেন না এইরূপ প্রতিশ্রুত হইলে সে ধর্ম্মঘট উঠিয়া গিয়াছিল।

মনু সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্যকে হেয় করিয়া রাখিয়াছেন। চিকিৎসক, গায়ক, ধনুষ্কার, ইক্ষুকার, অট্টালিকানির্ম্মাতা, সংবাদ-বাহক, সূত্রধর, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, রজক, তৈলকার, ইত্যাদি সকলেই অপবিত্র ও হীনজাতি (৩-৪ অধ্যায়)। তিনি কৃষি-কার্য্যকেও ঘৃণিত বলিয়াছেন, কারণ লাঙ্গল ফলকে পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ জীবকে কষ্ট দেয়। (১০-৮৪), অতএব পৌরাণিক সময়ে হিন্দু জাতি যে কোন বিষয়ে কোনরূপ উন্নতি করিতে পারে নাই, ইহা আশ্চার্য্যের বিষয় নহে।

সমস্ত পৃথিবীও যখন অসভ্যতার অন্ধকারে আচ্ছাদিত ছিল, ভারত তখন সুসভ্য ছিল। কিন্তু কালের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! সেই ভারত এখন সমস্ত দেশ অপেক্ষা হীনাবস্থাপন্ন। দৈনিক ব্যবহারোপযোগী জিনিষের জন্যও তিনি এখন বিদেশীয় জাতির মুখাপেক্ষী। কোটী কোটী সন্তান থাকিতেও ভারতমাতা স্বাধীনতারত্ন হারাইয়াছেন। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই। ভারতের ভাগ্য পুরোহিতগণের হস্তে ন্যস্ত ছিল; তাঁহারা ব্যবসা, বাণিজ্য ও কৃষি-কার্য্যকে ঘৃণিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আপনাদিগকে বড় দেখাইবার জন্য সমস্ত জাতিকে হীনাবস্থাপন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার ফলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সমস্ত জাতির সমানভাবে অধঃপতন হইয়াছিল।

যদি সমস্ত দেশ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে, তবে রাজধানীতে কি করে? সমস্ত জাতি যদি মূর্খ থাকে, তবে তোমার নিজের বিদ্যা বুদ্ধিতে কি ফলোদয় হয়? সমস্ত জাতিকে অনবরত অবনত করিয়া রাখায় শীঘ্রই হউক, বিলম্বেই হউক, যে বিপদের আশঙ্কা আছে, তৎসম্বন্ধে গোঁড়া হিন্দুদিগের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সমস্ত ব্যবসায়কে ঘৃণিত ও বংশগত করিয়া রাখা হইয়াছে। যে ব্যক্তি জাতিতে পরামাণিক কিংবা রজক নহে, সে কখনই ঐ ঐ ব্যবসায় অবলম্বন করিবে না। যদি এই সমস্ত এবং অন্যান্য অসংখ্য জাতি, যাহাদিগের কার্য্য ব্যতীত আমাদিগের এক দিনও চলিতে পারে না, যদি তাহারা ধর্ম্মঘট করিয়া আমাদিগের কার্য্য করিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে তজ্জন্য কেহই তাহাদিগকে দোষী বলিতে পারেন না। এবং যদি তাহাদের বুদ্ধি থাকিত, তবে অনেক পূর্ব্বে তাহাদিগের অবনতকারীদিগকে এইরূপে শিক্ষা দিত। দেশের আইন লঙ্ঘন না করিয়া, যাহার যেরূপ ইচ্ছা, সে সেইরূপ কার্য্য স্বাধীনভাবে করিতে পারে। সুতরাং সেরূপ একটা বিভ্রাট হওয়া এখন অসম্ভব নয়। এখনই নীচ জাতি অনেকটা উচ্চ জাতির বিদ্রোহী দেখিতে পাওয়া যাইতেছে এবং বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা যদি আমরা ঠিক পর্য্যালোচনা করিতে পারিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদের বোধ হয় যে, যদি এখন হইতে নিম্নশ্রেণীর

জাতিদিগের প্রতি আমরা অপেক্ষাকৃত ভাল ব্যবহার না করি, তবে খুব ভয়ানক একটী সামাজিক বিদ্রোহে হিন্দু সমাজকে অচিরে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিবে। এক জনে বংশপরম্পরা বাধ্য হইয়া, কষ্ট স্বীকার করিয়া তোমাদের পাইখানা পরিষ্কার করিবে, আর তোমরা তাহার এই কার্য্যের জন্য তাহাকে আন্তরিক ঘৃণা করিবে, এ বন্দোবস্ত অবশ্য অতি সুন্দর। আমাদের দেশের অনেক জাতির প্রতি আমরা যেরূপ ব্যবহার করি, তদপেক্ষা বিড়াল কুকুরের প্রতিও আমরা ভাল ব্যবহার করি। এবং এই সমস্ত লোক ইহাদের পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম ফল ভোগ করিতেছে, এই বলিয়া আমাদের বিবেককে সহজেই প্রবোধ দিয়া থাকি। তবে রাজনৈতিক সত্বাধিকারের জন্যই বা এত আন্দোলন কেন? চুপ করিয়া বসিয়া থাক, এবং পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মানুযায়ী ফল সব ভোগ কর।

এইরূপে আর কতকগুলি অনার্য্য জাতি যে যে প্রদেশে বাস করিত, সেই দেশের নাম অনুসারে তাহাদের নাম হইয়াছে। আভিরা দেশের লোককে আভির, উত্তর বঙ্গের প্রাচীন অধিবাসীদিগকে পুণ্ড্রক, উড়িষ্যা দেশবাসীকে উদ্র, দক্ষিণ ভারতের লোককে দ্রাবিড়, কাবুলবাসীকে কাম্বোজ, ব্যাকট্রীয়ান গ্রীকদিগকে যবন, টিউরেনিয়াবাসীকে শাক, পারস্যবাসীকে প্লভ, চীনবাসীকে চীন, আদিম পার্ব্বত্য জাতিকে কিরাত, উত্তর ভারতীয় পর্ব্বতবাসীকে খস জাতি বলা হইয়াছে। কাশ্মীরের নিকটস্থ বর্ত্তমান দার্দিস্থানবাসীকে দারদ, পশ্চিম মালববাসীকে অবন্তা, দক্ষিণ নেপালবাসীকে লিচ্ছিভি এবং নেপালবাসীকে মল্ল বলা হইত। বর্ত্তমান তেলাঙ্গনাই প্রাচীন অন্ধ্রদেশ। অন্ধ্রগণ এ দেশবাসী ছিলেন। গোদাবরী নদীর প্রান্তস্থ ভূমি সকল তাহাদের দখল ছিল।

কৈবর্ত্ত—একটী স্বতন্ত্র জাতি ছিল।

উহারা সঙ্কর জাতি নহে। যজুর্ব্বেদে কৈবর্ত্ত জাতির উল্লেখ আছে। বঙ্গদেশের কৈবর্ত্তগণের সংখ্যা দুই নিযুত অর্থাৎ বঙ্গের হিন্দুদিগের অষ্টমাংশেরও অধিক হইবে। মেদিনীপুর, হুগলী এবং হাবড়ায় তাহাদের অধিকাংশের বাস। এই জাতি সম্বন্ধে অধ্যাপক রমেশচন্দ্র দত্ত বলিয়াছেন যে, "মনুর মতে একই আকৃতি ও প্রকৃতি বিশিষ্ট এবং বঙ্গের একই নির্দ্দিষ্ট অংশের অধিবাসী এই অসংখ্য লোক, সহস্র সহস্র অযোগব স্ত্রীলোক স্বীয় স্বীয় স্বামী পরিত্যাগ করিয়া নিষাদ পুরুষের সহিত মিলিত হওয়ায় যে সব সন্তান হয়, তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এ কথা কি কোন বিজ্ঞ পাঠক বিশ্বাস করিবেন? অযোগব স্ত্রীলোকদিগের প্রতি নিষাদদিগের এই অস্বাভাবিক অত্যাচারের তুলনায়, সাবাইন স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচারের বিষয় অতি সামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এসম্বন্ধে আদৌ কোন কিম্বদন্তীও দেখিতে পাই না। আর্য্যগণের আগমনের পূর্ব্বে এই কঠিন পরিশ্রমী কৈবর্ত্তগণ বঙ্গদেশের আদিম অধিবাসী ছিল। পরে বিজেতা হিন্দুদিগের ধর্ম্ম, ভাষা এবং সভ্যতা তাহারা অবলম্বন

করিয়াছিল। পূর্ব্বে তাহারা মৎস্যশিকার ও মৃগয়া দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিত, পরে তাহারা আর্য্যদিগের নিকট কৃষিকার্য্য শিক্ষা করিয়াছিল।”

উপরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, মনুর প্রদত্ত জাতির তালিকা ভিন্ন ভিন্ন বংশের তালিকা মাত্র। যে সমস্ত অনার্য্য জাতি আর্য্যদিগের অধীনে আসিয়া ছিল, তাহাদিগকে তাহাদের সেই সময়ের সামাজিক অবস্থানুসারে, সমাজে বিভিন্ন স্থান প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্তু মনুর মতে মানব সমাজ চারি জাতিতে বিভক্ত ছিল বলিয়া, এই সমস্ত জাতিকে ঐ চারি জাতির পরস্পর অথবা সম্মিলনে উৎপন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছিল। চীন বাসীদিগকে ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমরা জানি যে, তাহারা একটী সম্পূর্ণ পৃথক জাতি। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, মনু যে সমস্ত জাতির বিষয় জানিতেন, তাহাদের উৎপত্তির বিবরণ দিবার উদ্দেশ্যেই, তাঁহার এই বর্ণ সঙ্করের প্রস্তাবনা।

মনুর তালিকায় আমরা বঙ্গের এবং অন্যান্য দেশের বর্ত্তমান জাতিদিগের নাম দেখিতে পাই না। বৈদ্য, কায়স্থ, নবশাখ এবং অন্যান্য অনেক ব্যবসায়ী জাতির কোন উল্লেখ আমরা পাই না। মনুর সময়ে যে স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, কুম্ভকার কি তন্তুবায় ছিল না এরূপ অনুমান করা অসম্ভব। এই সব ব্যবসায়ী লোক তখনও ছিল কিন্তু তখন তাহারা স্বতন্ত্র জাতিরূপে পরিণত হইয়াছিল না। তখন তাহারা কেবল বৈশ্যদিগের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় মাত্র ছিল কিন্তু পৃথক জাতি ছিল না। মনুর তালিকায় যে সব জাতির উল্লেখ নাই, তাহাদের সম্বন্ধে আমরা কি এই অনুমান করিব যে, তখন তাহারা ছিল না পরে ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরস্পর অথবা সম্মিলনে তাহাদের উৎপত্তি হইয়াছে? মনুর সময়ে তাহা হইলে এই সব ব্যবসায় কে করিত? ব্রাহ্মণদিগের মতে সত্যযুগে কেবল মাত্র চারিটী জাতি ছিল কিন্তু বিভিন্ন অনার্য্য জাতিকে আর্য্য সমাজ-ভুক্ত করায় এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত করায় প্রকৃত পক্ষে সমাজে অনেক জাতির অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। এই দুই বিষয়ের সামঞ্জস্য করিবার নিমিত্তই বর্ণ সঙ্কর-প্রস্তাবনার অবতারণা করা হইয়াছে। গোঁড়া হিন্দুদিগের মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটী মাত্র জাতি প্রথমে ছিল। আর কোন পঞ্চম জাতির অস্তিত্ব ছিল না।

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে বর্ণ-সঙ্করের প্রস্তাবনা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজষ্টরীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।

৯ম বর্ষ, ৯ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা। | শ্রাবণ। | ১৩০৯ সাল, ১৮২৪ শকাব্দা,

আপস্তম্বীয় গৃহ্যসূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

(তৃতীয় পটল)

(নবম খণ্ড)

অতঃপর গর্ভাধান ব্যাপারে স্থূলতঃ নিয়মাদি উল্লিখিত হইতেছে।

১। চতুর্থী প্রভৃত্যাষোড়শীং উত্তরামুত্তরাং যুগ্মাং প্রজানিঃশ্রেয়ং ঋতুগমন ইত্যুপদিশন্তি।

এই সূত্রে বেদশাস্ত্রপারগ মহামুনি আপস্তম্ব, মহর্ষি মন্বাদিপ্রাচীনআচার্য্যমণ্ডলীর গর্ভাধান বিষয়ক অভিমত ইঙ্গিতে প্রকাশ, ও ভঙ্গ্যান্তরে উহাই আপন মত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

"রজঃ প্রাদুর্ভাবের চতুর্থ রাত্রি হইতে ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত পর পর যুগ্ম-রাত্রিতে ঋতুগমন নিষ্পন্ন হইলে তাহাতে সন্তানের আয়ুর্বৃদ্ধি ও সৌভাগ্যাতিশয় হয়, পূর্ব্বাচার্য্যগণ এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন।

প্রথম রজস্বলা হওয়া, স্ত্রীজাতির যৌবনোদয়ের প্রকৃষ্ট পরিচয় না হইলেও, আর্যশাস্ত্রকারগণ নানাবিধ মঙ্গলময় উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া, প্রথম-রজস্বলাকে সঙ্গমার্থে আহ্বান করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। ভারতীয় আর্য্য মনীষী মহাশয়েরা ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির যন্ত্ররূপে নারীজাতির ব্যবহার বা বিলাস-বাসনার উচ্ছৃঙ্খল স্রোতে ভাসিবার প্রধান সাধন অথবা উপকরণ ভাবিয়া রমণী গ্রহণের বিধান করেন নাই।

ভারতবর্ষের পুণ্যপুঞ্জস্বরূপ পবিত্রমূর্ত্তি মহাত্মাদের প্রত্যেক কার্য্যই ধর্ম্মের সহিত সংসৃষ্ট ছিল। শয়নে, স্বপনে, বিচরণে, ভোজনে সততই তাঁহারা ধর্ম্মজীবনের পরিপুষ্টি লাভের জন্য ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহারা জানিতেন, জগতে সকল পদার্থেরই স্বাধ্য ব্যবহার আছে, সকল বস্তুই সময়ে আমাদের জীবাত্মার উৎকর্ষ সাধনে ন্যায়ত প্রযুক্ত হইলে সহায়তা করিতে পারে। যাহাকে আমরা পরম পবিত্র পূজার উপচার বোধে যত্ন করি, প্রয়োগ বিশেষে তাহাই আমা-

দিগকে কলুষিত করিতে পারে। আবার যাহাকে কুৎসিত কার্য্যের কদর্য্য উপকরণ মনে করিয়া ঘৃণা করি, তাহাই সময়ে পবিত্রতার আধার স্বরূপে আমাদিগের সৌন্দর্য্য পিপাসুগণের কাছে উপস্থিত হয়। হলাহল ও প্রাণ বাঁচায়, সুধার জন্যও সময়বিশেষে মরণকে আলিঙ্গন করিতে হয়। জগতে প্রত্যেক বস্তুরই দুইটী পৃষ্ঠ আছে। কোনও কিছু একান্ত মন্দ বা একান্ত ভাল হইতে পারে না। বিধাতার পবিত্র অভিপ্রায় সর্ব্বত্রই বিরাজিত। আর্য্য মহাত্মাগণ এই মহারহস্য বুঝিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা গোপনীয় কার্য্যের দ্বারাও মহামহিম পরমেশ্বরের মঙ্গলময় অভিসন্ধির জয় ঘোষণা করিতেন।

হিন্দুজাতির প্রত্যেক সংস্কার কার্য্যে তাহাদের পবিত্রতার প্রসার বৃদ্ধি করে। এক একটী সংস্কার দ্বারা হিন্দুর সামাজিক, নৈতিক ও ধর্ম্মজীবনে ক্রমশঃ উচ্চতর এক এক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া, তাহাদিগের মনুষ্যত্ব সমধিক বিকাসিত হইবে; ইহাই পূর্ব্বাচার্য্যদিগের অভিসন্ধি। এই অভিসন্ধি বলেই হিন্দুর জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্মজীবন নানাসংস্কারকার্য্যের দ্বারা বারম্বার সংস্কৃত হয়।

বিবাহ একমাত্র অপত্যোৎপাদন দ্বারা ঈশ্বরের মঙ্গলকর অভিপ্রায়ের সমীপস্থ হইবার জন্য, এবং ধর্ম্মকর্ম্মে একজন নিয়তসঙ্গিনী লাভ করিবার জন্য। তাই হিন্দুর গৃহে পত্নীর নাম "সহধর্ম্মিণী"। হিন্দু পত্নীকে কেবল মাত্র "শয্যা সঙ্গিনী" মনে করেন না। স্ত্রীসংসর্গ কেবল মাত্র 'সন্তানকামনায়, ইহাই প্রকৃত হিন্দুর হৃদয়ের কথা! হিন্দু পরিব্রাজক বলেন, "রমণাধিকৃতির্নাস্তি জননাধিকৃতিংবিনা।" সন্তান জনন বাসনা ব্যতীত অন্য কারণে হিন্দুদের স্ত্রীসঙ্গমের ন্যায়তঃ অধিকার নাই, ইহাই পরিব্রাজকের মত।

অপত্যার্থে বিবাহ, ধর্ম্মকার্য্যে সাহায্য প্রার্থনায় বিবাহ, এরূপ যাঁহারা ভাবিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা অবশ্যই অসদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া পৈশাচ প্রবৃত্তির অকাণ্ডতাণ্ডবে যোগদান করিতে পারিবেন না। যে পুরুষ সুকঠোর ব্রহ্মচর্য্য অতিক্রম করিয়া, বিন্দুধারণ মহাব্রত পালন করিয়া আসিতেছেন, এবং যে নারী ব্রহ্মচর্য্য বলে কালোচিত বয়োযোগপর্য্যন্ত পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা প্রথম ঋতুতেই পবিত্রভাবে অপত্যার্থে সঙ্গত হইবেন, ইহা দোষের মনে হয় না। যাঁহারা আত্মবৈর্য্যে অবিশ্বাসী কলুষিত প্রকৃতির দাস, সেরূপ দম্পতি কখনও ইহার মাধুর্য্য চিন্তা করিতে পারিবেন না। প্রথম কথা হিন্দুরা, প্রত্যেক ব্যক্তির ত্রিবিধ অবশ্যপরিশোধ্য ঋণের উল্লেখ করেন,—দেবঋণ, পিতৃঋণ ও ঋষিঋণ। এই তিনটী ঋণ পরিশোধ করা একান্ত আবশ্যক। সন্ততি না হইলে পিতৃঋণ শোধ হয় না, তজ্জন্যই অপত্যোৎপাদনে ইচ্ছা, ঐ ইচ্ছাবশেই সংসর্গ প্রবৃত্তি। সুতরাং দেখা গেল, পিতৃঋণ পরিশোধেচ্ছু পুরুষ স্বীয় সংযম বলে ও পত্নীর ব্রহ্মচর্য্য-সাধনে সন্তান সম্ভাবনায় দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়া প্রথম পুষ্পবতী পত্নীর সহিত সঙ্গত হন। পিতৃঋণ শোধের প্রতি শৈথিল্য করা হইবে, এইরূপ

শঙ্কায় হিন্দুশাস্ত্র বলিয়াছেন, ঋতুস্নাতাপত্নীকে উপেক্ষা করিলে ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হয়। কাজেই প্রথম ঋতুতে গর্ভাধান ব্যবস্থা।

এই গর্ভাধানের সময় ঋতুকাল। ষোড়শ দিবস পর্য্যন্ত (প্রথম রজঃস্রাবের দিন হইতে) ঋতুকাল বলিয়া বিবেচনা করা হয়। ইহার মধ্যে সকল তিথি নক্ষত্রে গর্ভাধান করিলে সুফল হইবে বলা যায় না।

মনুষ্য শরীরের সহিত গ্রহোপগ্রহ জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ও বৈদ্যুতিক-আদান প্রদান, আকর্ষণ বিকর্ষণ সংঘটিত হইতেছে, এবং তদ্দ্বারা মানব দেহে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাহা অনেক সময়ে উপলব্ধি করি। এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বালকজড়-বিজ্ঞানের হস্ত ধারণ করিয়া আমরা এই সকল তত্ত্ব নিঃসংশয় রূপে সিদ্ধান্ত করিতে পারি না। সম্ভবতঃ বৈজ্ঞানিক যুগের পরিবর্ত্তনের সহিত জগতের বক্ষের এই সকল লুক্কায়িত রত্ন আবিষ্কৃত হইবে; তখন হিন্দুশাস্ত্রের অগাধ রহস্য মানব সমাজ বুঝিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবে। মোটের উপর, সকল দিন বা সকল সময়ে মানবশরীর সমানভাবে থাকে না, গ্রহ নক্ষত্রাদির আকর্ষণাদি দ্বারা উহা অবস্থান্তরিত হয় ইহা নিশ্চিত, সুতরাং সকল তিথি নক্ষত্র বা বার, সকল কার্য্যে উপযুক্ত হইতে পারে না।

ঋতুর প্রথম তিন রাত্রি রমণী অস্পৃশ্যা। প্রধান এবং প্রকৃত উদ্দেশ্য সন্তানোৎপাদন ঐ সময়ে সুসম্পন্ন হইতেই পারে না। প্রবল-বেগান্বিত রক্তোধারাসংসর্গে গর্ভাশয়ের আবিলতাই উহার অত্যধিক প্রতি বন্ধক। চতুর্থ রাত্রি হইতে পর পর যুগ্ম রাত্রিতে গমন উচিত। তাহাতে সন্তান দীর্ঘজীবী ও গুণান্বিত হয়। আপস্তম্বের "উপদিশন্তি" বাক্য দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহার আচার্য্যের মত এরূপ। সাধারণতঃ তৎকালে আচার্য্যের নিকটই উপদেশ পাওয়া যাইত।

অস্মদ্দেশীয় ফলিতজ্যোতিষ ভ্রম শূন্য কি না, তদ্বিষয়ে এ প্রসঙ্গে কিছু বলিবার আবশ্যক দেখা যায় না। তবে এ ফলিত জ্যোতিষ প্রথম ঋতুযোগের ও তিথি বার পার্থক্যে কিরূপ বিভিন্ন ফলের কথা বলিয়াছেন, এবং গর্ভাধান বিষয়ে কিরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এখানে বলা বোধ হয় অনাবশ্যক নহে।

"আদিত্যে বিধবানারী সোমেচৈব পতিব্রতা। বেশ্যা মঙ্গলবারে চ বুধে সৌভাগ্যমেবচ। বৃহস্পতৌ পতিঃ শ্রীমান্ শুক্রে চাপত্যমেব চ, শনৌ বন্ধ্যাং বিজানীয়াৎ প্রথমস্ত্রীং রজস্বলাং। এই বচনে অবগত হওয়া যায়, রবিবারে স্ত্রী প্রথম ঋতুমতী হইলে ফল দুঃখকর বৈধব্য, সোমবারে পাতিব্রত্য, মঙ্গলে বেশ্যাত্ব, বুধে সৌভাগ্য, বৃহস্পতিতে পতির শ্রীবৃদ্ধি, শুক্রে সন্তান লাভ (অচিরকাল মধ্যে) ও শনিবারে বন্ধ্যাত্ব। এইরূপ তিথি ভেদেও ফলভেদ শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, আর নক্ষত্রভেদে ও ফল পার্থক্যের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। ক্রমে উদাহরণ যথা,—প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, ষষ্ঠী, সপ্তমী, একাদশী ও দ্বাদশীতে অদ্য ঋতু হইলে রমণী পতিব্রতা হয়। তৃতীয়া অষ্টমী, ত্রয়োদশীতে সম্মানিতা ও পঞ্চমী

দশমী, পূর্ণিমা, অমাবস্যায় পুত্র ও কন্যাবতী, চতুর্থী, নবমী, চতুর্দ্দশীতে আদ্য ঋতু হইলে নারী যমভবনে আতিথ্য গ্রহণ করে। পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্র পদ, পূর্ব্বফাল্গুনী, ভরণী, অশ্লেষা, আর্দ্রা নক্ষত্রে আদ্য ঋতু হইলে ফল বৈধব্য, মঘায় শোকান্বিতা, পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে কুলটা হয়, কৃত্তিকা ও জ্যেষ্ঠায় প্রথম ঋতু হইলে নারী দরিদ্রা হয়। এইরূপ বৈশাখ মাসে প্রিয়বাদিনী, জ্যৈষ্ঠে বিধবা, আষাঢ়ে ধনবতী, শ্রাবণে মৃতবৎসা, ভাদ্রে রোগিনী, আশ্বিনে স্বামি ঘাতিনী, কার্ত্তিকে কুলনাশিনী, অগ্রহায়ণে ধর্ম্মশীলা, পৌষে কামবিহ্বলা, মাঘে পতিব্রতা ফাল্গুনে বহুপুত্রবতী ও চৈত্রে আদ্যঋতু হইলে রমণী মদনমত্তা হয়। এবিষয়ে বিস্তর মতান্তর আছে, বিস্তরভয়ে শ্লোকাদি উদ্ধৃত হইল না।

আমরা যদিও সর্ব্বদা এইরূপ আদ্য-ঋতু-ফল প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি না, তথাপি এই সকল প্রাচীনধারণার মূলে নিশ্চিত কোনও সত্য নিহিত আছে কি না, তাহা অবগত হইবার জন্য এই সব বিষয় সর্ব্বদা আলোচিত হওয়া আবশ্যক মনে করি। মহামান্য আর্য্যমহর্ষিগণ যে প্রভূতভ্রান্ত-ধারণার অধিকারী ছিলেন, একথা সহসা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। গণিতের আকরস্থান ভারতের ফলধারণা ভিত্তিশূন্য নয়, ইহা অন্যপ্রসঙ্গে অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অনেক স্থানে কল্পনাতীত প্রশ্নের সদুত্তর পাইয়া বিস্মিত ও চমকিত হইয়াছি। পাঠক মহোদয়গণ যদি উপহাস করিয়া মনোযোগ করিতে অনিচ্ছুক না হন, তবে বলি, সেরূপ অবস্থায় পতিত হইলে, আপনারা ও আমার ন্যায় স্বাধীন "মানিনা" বাক্যের দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে অবনত-মস্তকে অগ্রসর হইতেন। দীন লেখকের এ বিষয়ে বিশেষ কিছু অভিজ্ঞতা নাই, কিন্তু যাহা এক একটু বিস্ময়ের স্থানে উপস্থিত হইয়া বুঝাগিয়াছে, তাহাতেই অনুরোধ করিতে প্রবৃত্তি হয়। অবজ্ঞা না করিয়া অনুসন্ধান করিলে হয়ত "মিলিলে মিলিতে পারে লুকান রতন।" আমরা কথা প্রসঙ্গে বহু দূরে আসিয়াছি। এখন প্রকৃত বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে হইবে।

জ্যোতিষ গর্ভাধানের কাল সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা এই, "পাপসংযুত মধ্যগেষু দিন-কৃল্লগ্নক্ষপাস্বামিষু, তদ্দ্যূনেষশুভোজ্ঝিঝতেষু বিকুজে ছিদ্রে বিপাশে সুখে, সদ্যুক্তেষু ত্রিকোণ কণ্টকবিধুষ্যায়ত্রিষষ্ঠান্বিতে পাপে যুগ্মনিশাসগণ্ড সময়ে পুংশুদ্ধিতঃ সঙ্গমঃ।

অর্থাৎ সূর্য্য লগ্ন ও চন্দ্র পাপযুক্ত বা পাপ মধ্যগত না হইলে, ইহাদের সপ্তম স্থান শুভগ্রহ যুক্ত ও অষ্টম স্থান মঙ্গল গ্রহ হীন হইলে, সুখস্থান পাপ শূন্য হইলে, নবম, পঞ্চম, লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম স্থান শুভ গ্রহযুক্ত এবং তৃতীয় ষষ্ঠ একাদশ স্থান পাপযুক্ত হইলে, যুগ্মদিবসে গণ্ড ত্যাগ করিয়া, চন্দ্রতারা শুদ্ধিযুক্ত পুরুষ গর্ভাধান-সম্পন্ন করিবেন। ইহা দ্বারা সুস্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, জন্ম পত্রিকা দ্বারা এই সকল নির্ণয় করা এখানে একান্ত আবশ্যক, নচেৎ ইহার কিছুই সম্ভব নহে। গণ্ড ত্যাগ করিতে বলায় গণ্ডের উল্লেখ আবশ্যক। "মূলা মঘাশ্বিনীনাং আদ্যং জ্যেষ্ঠান্তসর্পানাং, অন্ত্যং গণ্ডপদং ত্যক্ত্বা ষোড়শাহে ধৃতৌ

ব্রজেৎ” মূলা, মঘা ও অশ্বিনী নক্ষত্রের আদ্যপাদে গণ্ড, জ্যেষ্ঠা, রেবতী ও অশ্লেষার শেষ পাদ গণ্ড, এই গণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ষোড়শাহ মধ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রকার দিবসই ঋতু গমনে প্রশস্ত কাল। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, একাদশ ও ত্রয়োদশ দিবস ত্যাগ করিতে অনেক জ্যোতিঃশাস্ত্রকার পরামর্শ দিয়াছেন। নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে জানা যায়, আর্য্য শাস্ত্রকারগণ অধিক সময় দেন নাই। এরূপ লক্ষণাক্রান্ত বিশুদ্ধ সময় লাভ করা সতত সকলের পক্ষে দুষ্কর।

২। অর্থ প্রাধ্বস্য পরিক্ষবে পবিকাসনে চ অপ উপস্পৃশ্য উত্তরে যথালিঙ্গং জপেৎ॥

এই গর্ভাধান বিহিতকালে যদি কোনও ব্যক্তি স্বভবনে উপস্থিত থাকিতে না পারেন, প্রয়োজনবশে দূরতর স্থানে থাকিতে হয়, এবং তাঁহার ক্ষবথু ও কাস উপস্থিত হয়, তবে তিনি “অমুহবং পরিহবং” ইত্যাদি ঋকৃমন্ত্রদ্বয় আচমনান্তে জপ করিবেন। ইহাই পূর্ব্বোক্ত দুর্নিমিত্তনিবন্ধন কর্ত্তব্য কার্য্যের ব্যাঘাত হইলে প্রায়শ্চিত্ত। “যথালিঙ্গ” কথাটী দ্বারা বুঝা যায়, যে মন্ত্রে পরিক্ষব বাচক শব্দ আছে সেই মন্ত্র পরিক্ষবে এবং অপরটী কাসে জপ করিতে হইবে।

চকার দ্বারা বুঝা যায় অন্য অমঙ্গলেও যথোচিত মন্ত্রজপ আবশ্যক।

৩। এবমুত্তরৈ র্যথালিঙ্গং চিত্রিয়ং বনস্পতিং শকৃদ্রীতিং সিগ্বাতং শকুনিমিতি।

ঐ প্রাধ্ব ব্যক্তি “আরাত্তে অগ্নিরস্তু” এই মন্ত্র দ্বারা চিত্রবনস্পতির উপস্থান করিবে। “নমঃ শকৃৎসদঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে শকৃৎ সমূহের উপস্থান করিবে, “সিগসীতি” এই মন্ত্র দ্বারা সিগ্বাত (কাপড়ের বাতাস) লাগাইবে। “উদ্গাতেব শকুনঃ” এই মন্ত্রে শুভ সূচক শকুনির উপস্থান করিবে। বনস্পতি শব্দের অর্থ যে বৃক্ষের ফুল নাই অথচ ফল হয়, তাদৃশ বৃক্ষ।

অতঃপর গর্ভাধান সংস্কারের বরবধূ প্রেম-কামনায় প্রদত্ত বৈদিক আহুতি প্রণালীর বিষয় বিবেচিত হইতেছে।

৪। উভয়োর্হৃদয় সংসর্গেপ্সুঃ ত্রিরাত্রাবরং ব্রহ্মচর্য্যং চরিত্বা স্থালীপাকং শ্রপয়তি, শ্রপয়িত্বাগ্নেরূপ সমাধা নাদ্যাজ্য ভাগান্তে স্বারব্ধায়াং স্থালীপাকাদুত্তরা আহুতীর্হুত্বা জয়াদি প্রতিপদ্যাতে পরিষেচনান্তংকৃত্বা তেন সর্পিষ্মতা যুগ্মান্ দ্ব্যবরান্ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা সিদ্ধিং বাচয়ীত।

বর বধূর সমধিক প্রীতিকামী (বধূর পিতা প্রভৃতি) ত্রিরাত্র ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়া, স্থালীপাক করণান্তর অগ্নির উপসমাধানাদি আজ্যভাগহোমান্ত সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া, স্থালীপাক হইতে সপ্ত আহুতি প্রদান করিয়া, জয়াদিহোম করিবেন। পরে পরিষেচন পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া, ঐ স্থালীপাক (অন্ন) ঘৃত সংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা দুইটীর অধিক ব্রাহ্মণ মিথুনকে ভোজন করাইয়া তাহাদের দ্বারা স্বস্তি বাচন করাইবেন, এইরূপ করিলে বর বধূর প্রেম সুদৃঢ় হইবে। এই কার্য্য বরবধূর হিতার্থী ব্যক্তি করিবেন, বরবধূ কেবল ফলের ভাগ পাইবেন। এই সূত্র পাঠ করিলে বুঝা যায়, আপস্তম্বের সময়ে দাম্পত্য প্রেম দৃঢ় করিবার জন্য দৈব-চেষ্টার ও ত্রুটী হইত না। সমাজের এই সকল ব্যাপার ক্রমশঃ বিলীন হইলেও স্থানে

স্থানে স্মারক লাভ করা যাইতেছে। যুগলের ভোজনে ও আশীর্ব্বাদে যুগলের প্রেম বৃদ্ধি বেশ সুন্দর অনুষ্ঠান ফল বটে!

৫। স্বস্তিযোনৌতি ত্রিঃসপ্তযবৈঃ পাঠাং পরিকিরতি যদি বারুণ্যসি বরুণা ত্বা নিষ্ক্রীণামীতি যদি সৌম্যসি সোমাত্বা নিষ্ক্রীণামীতি।

অতঃপর পত্নী স্বামীর প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া স্বামিকে বশীভূত করিবার জন্য যে সকল কার্য্য করিবে, তাহারই উপক্রম বলা হইতেছে। পরদিনে যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য, তিষ্য-নক্ষত্রেই তাহার উপক্রম করিতে হইবে। বধূ যেখানে পাঠা (ওষধি বিশেষ) আছে, সেখানে গমন করিয়া "যদি বারুণ্যসি" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় দ্বারা পাঠার চতুর্দ্দিকে পরি-বপণ করিবে অর্থাৎ পাঠার চারি পাশে যব ছড়াইয়া দিবে।

৬। শ্বোভূতে উত্তরয়া উত্থাপ্য উত্তরা-ভিস্তিসৃভিরভিমন্ত্র্য উত্তরয়া প্রতিচ্ছন্নাং হস্তয়োরাবধ্য শয্যাকালেভর্ত্তারং বাহুভ্যাং পরিগৃহ্ণীয়াৎ উপধানলিঙ্গয়া।

এই পরিকিরণ কার্য্য সম্পাদন করিয়া, উপবাস অবলম্বন পূর্ব্বক সেই দিন অতি-বাহিত করিয়া, পরদিনে খনিত্রদ্বারা সেই পাঠা ওষধি বিশেষকে খুঁড়িয়া উঠাইবে, তখন "ইমাংখনামি" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে অনন্তর "উত্তানপর্ণ" ইত্যাদি তিনটী মন্ত্র পাঠ করিয়া ঐ পাঠাকে অভিমন্ত্রিত করিতে হইবে। "অহমস্মি" এইমন্ত্রে ঐ পাঠার মূলদেশ দ্বিখণ্ড করিয়া, যাহাতে স্বামী সহসা না দেখিতে পায় এইরূপে হস্তদ্বয়ে বন্ধন করিয়া রাখিবে। পরে শয্যায় স্বামীকে "উপতে ধামা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিবে, তাহা হইলে স্বামী সমধিক বশীভূত হইবে। তান্ত্রিক বশীকরণ দেশে বড় বিরল নহে। প্রায়শঃ পুরাতন পল্লীতে বহুবিবাহের অনুগ্রহে গাছ গাছড়া, মাহুলি দ্বারা স্বামী বশীকরণ অনু-ষ্ঠিত হয়। নবাশিক্ষালোকের ছটা অন্তঃপুরে উপস্থিত হইবার পর ঐ সকল কাণ্ড একটু কমিয়াছে। সহরে উহার প্রচার নাই, পল্লীতেও বড় নাই, তবে স্থানে স্থানে তন্ত্র মন্ত্র ছিঁটে ফোঁটার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। বৈদিককালেও ইহার বেশ আমদানি ছিল, গৃহ্যসূত্র তাহার সাক্ষী দিতেছে। গৃহ্যসূত্র আমাদের প্রাচীন আচার ব্যবহারের প্রকৃষ্ট পরিচয়। পূর্ব্বকালের অবস্থা জানা-ইবার জন্য আমরা তৎকালীন সমাজ চিত্র সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। দেখিতে পাইলাম, বৈদিককালে যে বশীকরণ বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল বলিয়া অনুমান করা যায় তান্ত্রিক বশীকরণ বোধ হয় ইহারই অত্যধিক পরিণতি।

৭। বশ্যোভবতি।

এইরূপে ওষধিবন্ধন করিয়া পত্নী পতিকে যদি আলিঙ্গন করে, তবে পতি বশ্য হন। হরদত্ত মহাশয় ব্যাখ্যায় যাহা লিখিয়াছেন, পাঠ করিলে একটু হাসির উদয় হয়। হর দত্তের বাক্য এই "বশ্যঃ পতির্ভবতি ভার্য্যায়াঃ ন ভার্য্যা ভর্ত্তুরিতি।" পতিই পত্নীর বশ্য হইবেন, পত্নী নিজে পতির বশ্যা হইবেন না। বেশ কথা! পত্নী উপবাস করিয়া ঔষধ সংগ্রহ করিল কি স্বামী ভুলাইয়া বাঁধিতে, না নিজে ভুলিতে বা বাঁধা

পড়িতে! ইহা সহজে অবগত হওয়া যায়। হরদত্ত মহাশয় শুধু এই টুকু বুঝাইতে হইলে বোধ হয় ওরূপ লিখিতেন না। তাঁহার বাক্ কৌশল বেশ কার্য্যযুক্ত বটে!

৮। সপত্নী বাধনং চ।

কেবল যে স্বামীই বশীকৃত হইবেন এমন নহে, সপত্নীর প্রতিও স্বামীর ভালবাসা দূরীভূত হইবে। রমণী সমাজে সপত্নীর ন্যায় শত্রু বোধ হয় আর নাই। সকলই অকাতরে সহ্য করা সম্ভব, কিন্তু নারীজীবনের এক মাত্র অবলম্বন স্বামী অপরের হয়, ইহা সহ্য করা স্ত্রীলোকের অসম্ভব। সপত্নীবিদ্বেষ ও বহু বিবাহ আপস্তম্বের সময়ে সমাজশরীরে স্থান পাইত। তখন ভারতীয় সভ্যতার কোনও উন্নতযুগ চলিতেছিল কি না, নির্ণয় করা দুঃসাধ্য, তবে এই মাত্র বলা যাইতেছে যে, দেশের বা সমাজের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায়, সমাজের অবস্থাবিশেষে বহুবিবাহ দেশের উন্নতির নিমিত্তরূপে অবধারিত হইতে পারে; আবার সময় বিশেষে "একাভার্য্যা সুন্দরীবাদরী বা" এই বাক্যটী দেশের উৎকৃষ্ট আদর্শ উপদেশরূপে গণ্য হওয়ার দরকার হয়। সুতরাং বহুবিবাহ নিয়ম দ্বারা সভ্যতার স্তরকল্পনা সম্পূর্ণ যৌক্তিক নহে।

৯। এতেনৈব কামেন উত্তরেণ অনুবাকেন সদাদি ত্যমুপতিষ্ঠতে।

বধূ প্রতিদিনই সপত্নীবাধন কামনায় উত্তর অনুবাক (উদসৌ সূর্য্য অগাৎ ইত্যাদি মন্ত্র সমূহ) দ্বারা আদিত্যের উপস্থান করিবে। সপত্নীবাধন কামনায় প্রত্যহ একটা অনুষ্ঠানের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

১০। যক্ষ্ম গৃহীতামন্যাং বা ব্রহ্মচর্য্যযুক্তঃ পুষ্করসম্বর্ত্তমূলৈকত্তরৈর্যথালিঙ্গং অঙ্গানি সংমৃশ্য প্রতীচীনং নিরস্যেৎ।

যদি বধূর ক্ষয়কাশরোগ বা অন্য কোনও কুষ্ঠাদি রোগ থাকে, তবে তাহার হিতৈষী ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া পুষ্কর সম্বর্ত্তমূল (পদ্মের গোলাকার মূলদেশ) সকল দ্বারা বধূর সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জনা করাইবেন, তাহা হইলে নিরাময় ভাব দেখাদিবে। পরে ঐ পুষ্কর মূল প্রতীচীন ভাবে নিঃক্ষেপ করিতে হইবে। "অক্ষিভ্যাং তে নাসিকাভ্যাং" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া ঐ মার্জ্জনা করিতে হইবে। যে মন্ত্র নাসিকা বাচক শব্দ আছে তাহা দ্বারা নাসিকা এবং মুখবাচকশব্দযুক্তমন্ত্র দ্বারা মুখ মার্জ্জনা ইত্যাদি প্রকারে মন্ত্র প্রয়োগ করিতে হয়। বধূ রোগাক্রান্তা হইলে সে স্বামীর প্রেম লাভে সমর্থা হইতে না পারে, এই আশঙ্কায় বধূর হিতকামী ব্যক্তি মন্ত্রবলে রোগ সারিয়া দিবেন। আপস্তম্বের সময়ে পদ্মমূল গায়ে বুলাইয়া মন্ত্র পাঠ করিয়া ক্ষয়কাশ কুষ্ঠাদি রোগ আরোগ্য করিবার চেষ্টা করা হইত এইরূপ বুঝা গেল।

১১। বধূবাস উত্তরাভিরেতদ্বিদে দদ্যাৎ।

যে বধূর পীড়া প্রশমন জন্য এই কার্য্য অনুষ্ঠান করা হইবে, তাহার পরিহিত বসন "পরাদেহি" ইত্যাদি চারিটী মন্ত্র পাঠ করিয়া, এই ভৈষজ্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতকে প্রদান করিবে। ইহা ভৈষজ্য কার্য্যের দক্ষিণা স্বরূপ। গৃহ্যসূত্রে অনেক স্থানে তত্তৎকর্ম্মাভিজ্ঞ ব্যক্তিকে দক্ষিণা দিবার কথা বলা হইয়াছে। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য

কি, তাহা বুঝা দুরূহ। বোধ হয়, অভিজ্ঞকে দান করিলে অধিক ফল লাভ নিশ্চিত হয়। বৈদিকমন্ত্রচিকিৎসা প্রণালীর আভাস এই স্থানে প্রাপ্ত হওয়া গেল। বারান্তরে অপরাপর গৃহকর্ম্মের আলোচনা করা যাইবে।

নবম খণ্ড সমাপ্ত। তৃতীয় পটল সম্পূর্ণ।

তীর্থপদাশ্রিতস্য কস্যচিদ্ দীনস্য

যশোহর বেদ বিদ্যালয়।

(ক্রমশঃ)

সাধক-প্রার্থনা।

যখন নানাবিধ অসার কার্য্যেই দিন রাত্রি বিফলে চলিয়া যায়, যখন শৈশব, যৌবন ও বার্দ্ধক্য সময় বহুবিধ উপদ্রবেই নষ্ট হইয়া যায়, যখন এই দুর্ব্বল দেহ স্বভাবতঃই ক্ষণভঙ্গুর, তখন বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া একমাত্র ভগবানের চিন্তায় নিরত থাকিয়া মোক্ষ লাভ করাই এই অসার মানব দেহের একমাত্র সার কর্ম্ম। ইহাই নিম্নলিখিত শ্লোক গুলির ফলিতার্থ :—

(১)

প্রাতর্মূত্রপুরীষাভ্যাং মধ্যাহ্নে ক্ষুৎপিপাসয়া।
তৃপ্তাঃ কামেন বাধ্যন্তে প্রাণিনো নিশি নিদ্রয়া॥

মল-মূত্র-ত্যাগে প্রাতঃকাল নষ্ট হয়,
ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় নষ্ট মধ্যাহ্ন সময়,
নিদ্রা গিয়া কিংবা আর বিহার করিয়া
রাত্রকাল নষ্ট হয়, দেখ রে ভাবিয়া।
বিফলে সময় গেল, রে অবোধ নর!
বুঝে দেখ, কিবা তোর হবে অতঃপর!

(২)

নির্বিবেকতয়া বাল্যং কামমদেন যৌবনম্।
বৃদ্ধত্বং বিফলত্বেন সদা সোপদ্রবং নৃণাম্॥

হিতাহিত-জ্ঞানাভাবে কাটে-বাল্যকাল,
মদন যৌবন-কালে ঘটায় জঞ্জাল,
বৃদ্ধকালে জীর্ণ শীর্ণ হয় কলেবর,
এক এক কালে এক বিঘ্ন ঘোরতর!

(৩)

উদ্ঘাটিত নবদ্বারে পিঞ্জরে বিহগোহনিলঃ।
যত্তিষ্ঠতি তদাশ্চর্য্যং প্রয়াণে বিস্ময়ঃ কুতঃ॥

অতি জীর্ণ শীর্ণ এই শরীর পিঞ্জর,
নবদ্বার খোলা তার আছে নিরন্তর।
প্রাণবায়ু পক্ষী এক ভিতরে তাহার
দিবানিশি ঘুরিতেছে এধার ওধার।
ইহাই আশ্চর্য্য সে যে থাকেও তথায়,
পলাইয়া গেলে আর বিস্ময় কি তায়!

(৪)

প্রচণ্ডবাসনাবাতৈ রুদ্ধূতা নৌর্মনোময়ী।
বৈরাগ্য কর্ণধারেণ বিনা বোদ্ধুং ন শক্যতে॥

প্রচণ্ড-বাসনা-বায়ু বিষম প্রবল,
মনঃ-নৌকা খানি করে টল্ টল্ টল্।
হায়রে বৈরাগ্য-কর্ণধার না থাকিলে,
এ বিপদে কেবা রাখে এই ভূমণ্ডলে!

(৫)

শান্তিকন্থালসৎকণ্ঠো মনঃস্থালীমিলৎকরঃ।
ত্রিপুরারিপুরদ্বারি কদাহং মোক্ষভিক্ষুকঃ॥

হেন দিন ভাগ্য মোর ঘটিবে কখন,
যে দিন এরূপ কার্য্যে যাবে মোর মন;—
শান্তি কন্থা খানি আমি কণ্ঠে জড়াইয়া
মনঃ—ভিক্ষা-পাত্র করে ধারণ করিয়া
শিবের দুয়ারে এই বলিব বচন;—
"মোক্ষ ভিক্ষা দাও মোরে ওহে ত্রিলোচন!"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর, বি, এ
২৬।২ বৃন্দাবন পালের গলি। শ্যামবাজার।
কলিকাতা।

শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষাষ্টক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

চতুর্থ শ্লোকের আলোচনা।

———o———

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাংবা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

জগদীশ! ধন-জন-সুন্দরী-কবিত্ব।
এ সকল কামনা না করে মম চিত্ত॥
তুমি হে ঈশ্বর—যেন তোমাতে নিশ্চয়।
জন্মে জন্মে অহৈতুকী ভক্তি মোর হয়॥

জগতে সর্ব্বাপেক্ষা ঐহিক আকর্ষণের বস্তু যা কিছু, তা কিছুই চাহিনা। সেগুলি আপাতচিত্তহারী হইলেও নিত্য নহে, ধন, জন, সুন্দরী স্ত্রী ও কাব্য-রস, এই চারিটির ন্যায় ঐহিক আকর্ষণী আর নাই; কিন্তু ভগবচ্চরণে অহৈতুকী পরাভক্তিপ্রার্থী ভক্তের চক্ষে একান্ত-পক্ষেই অকিঞ্চিৎকর। পার্থিব ধন-জনাদি সম্পদ ত সামান্য কথা, ভক্তের কাছে অপার্থিব সম্পদ কর্ম্মীর স্বর্গ ও জ্ঞানীর মোক্ষও তুচ্ছ! প্রথম শ্লোক-আলোচনা-প্রবন্ধে উদ্ধৃত একটি শ্লোক এস্থলে পুনঃস্মরণ করুন।

"যদি ভবতি মুকুন্দে ভক্তিরানন্দসান্দ্রা।
বিলুঠতি চরণাব্জে মোক্ষসাম্রাজ্যলক্ষ্মীঃ॥"
সান্দ্রানন্দা ভক্তি যদি হয় শ্রীমুকুন্দে।
মোক্ষ-রাজলক্ষ্মী লুটে চরণারবিন্দে॥

ভক্ত মোক্ষ চান না, কিন্তু মোক্ষ ভক্তকে চান! ভক্তিবাধ্য ভক্তারাধ্য ভগবান স্বয়ং প্রিয় ভক্ত উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

"নকিঞ্চিৎসাধবো ধীরাভক্তাহ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্॥"
মম ঐকান্তিক ভক্ত ধীর সাধু যারা।
মদ্দত্ত মোক্ষাদি কিছু নাহি চাহে তারা।
"ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যং।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ॥"
কিবা সে ব্রহ্মত্ব—কিবা সে ইন্দ্রত্ব।
কি সার্ব্বভৌমত্ব—পাতালাধিপত্য॥
কিবা যোগসিদ্ধি—মুক্তি চতুর্ব্বিধ।
কিছুই ভক্তের নহে আকাঙ্ক্ষিত॥
আমাতে অর্পিত চিত্ত যে জনার।
আমা বিনা কিছু চাহেনা সে আর॥

সংসারের সকল সুখ সেই সুখসিন্ধুর বিন্দু মাত্র। যে সিন্ধু পায়, সে বিন্দু চাহিবে কেন? ভক্তের বণিগ্‌বৃত্তি বা "ব্যবসাদারী" নাই। ভক্ত ভগবানের বিনিময়ে কিছুই চাহেন না। ভক্ত ভগবানকে ভাঙ্গাইয়া স্বর্গ-মোক্ষাদি বিষয় ক্রয় করেন না। ভক্ত-প্রধান প্রহ্লাদ ভগবানকে ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলেন, যথা—"যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্।" ইত্যাদি।

আবার ভক্তি-বৃদ্ধ বয়ঃশিশু ধ্রুবও ভগবান বর দিতে চাহিলে, বলিয়াছিলেন,—

"স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোহহং।
ত্বাং প্রাপ্তবান দেব মুনীন্দ্র গুহ্যং॥
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্য রত্নং।
স্বামিন্! কৃতার্থোহস্মি বরং ন যাচে॥"
স্থান-অভিলাষী হয়ে রহিয়ে তপ-সাধনে।

হে দেব মুনীন্দ্র গুহ্য! পেলাম যে তোমাধনে॥
খুঁজিতে খুঁজিতে কাচ, পেলাম রতন-সার।
স্বামিন্! কৃতার্থ আমি, বর নাহি চাহি আর॥

অর্গমাতার সিদ্ধভক্ত সর্বানন্দও ঠিক এই ভাবেই দেবীকে বলিয়াছিলেন,—

"মাতঃ কিম্বরমপরং যাচে,
সর্ব্বং সম্পাদিতমিহ সত্যম্।
যত্তচ্চরণাম্বুজমতিগুহ্যং
দৃষ্টং বিধি-হর-মুরহর-জুষ্টম॥"

জননি গো! তোর ঠাঁই, অপর কি বর চাই?
সমস্তই সিদ্ধ আজি মোর।
যেহেতু পরম গুহ্য বিধি-বিষ্ণু-শিব পূজ্য
হেরিলাম পাদপদ্ম তোর॥

সে পাদপদ্ম-মধু ভিন্ন ভক্ত ভৃঙ্গের তৃষা আর কিছুতেই মিটে না!

"গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী—
সাত সমুন্দর্ ভরপূর।
তুলসী চাতককে মতি—
সোয়াৎ বিন্ সব্ ধূর্॥"

আহা! ভক্ত তুলসীদাসের মতি-চাতকিনীর প্রাণের পিপাসা সেই নবজলধরের প্রেমবারি বিনে আর ঐহিক ভোগরূপ কোন বারিতেই বারিত হয় নাই। আর সব বারি তাঁহার নিকট বারি নহে—ধূরি (ধূলা) মাত্র!

আমাদের বঙ্গীয় ভক্তরাজ রামপ্রসাদও মুক্তি চান নাই; তিনি ভক্তির জোরে জগদম্বার পাদপদ্মই চাহিয়াছিলেন ও পাইয়াছিলেন। "আমি ভক্তির জোরে কিনতে পারি ব্রহ্মময়ীর জমীদারী।" ব্রহ্মময়ীর জমীদারীই তাঁহার পাদপদ্ম। তাই ভক্তির গৌরবে মুক্তির লাঘব ঘোষণা করিয়া শ্রীরামপ্রসাদের সেই সুপ্রসিদ্ধ সংগীত ঝঙ্কারিত হইয়াছিল।—

"সকলের মূল ভক্তি—মুক্তি তার দাসী।"
"চিনি হতে চাইনে মা! চিনি খেতে ভালবাসি॥"

এস্থলে মুক্তিলাভই চিনি-হওয়া, আর ভক্তিযোগে ভগবৎসেবানন্দ লাভই চিনি-খাওয়া। অবশ্য বিষয় বাসনা-বিমোচন রূপ যে মোক্ষ, তাহা অহৈতুকী পরা ভক্তিলাভের প্রধান উপাদান বা উপযোগিতা বটে, কিন্তু উপাস্য তত্ত্ব সহ একত্ব বা সমত্বরূপে কল্পিত যে মোক্ষ, তাহা ভক্তি-রাজ্যের বিদ্রোহ বিপ্লব স্বরূপ; তাই ভক্তের তাহাতে বড় ভীতি—বিরক্তি। তবে মহাভাব-তন্ময়তা জনিত যথার্থ সোঽহংতত্ত্ব পরাভক্তিরই চরম ও পরম পরিণতি। ভক্ত বলেন,—

"চাইনা হরিত্ব-পদ—হরি-পদ চাই।
হরিদাস হয়ে যেন হরি গুণ গাই॥"

ভব-বন্ধন-মোচনই প্রকৃত মুক্তি—অর্থাৎ নিবৃত্তি-মার্গীয় মুক্তি এবং ভক্তের চরম সাধনার্থ তাহার পরম প্রয়োজন; কিন্তু সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য প্রভৃতি যে মুক্তি, তাহা প্রবৃত্তি মার্গের মুক্তি, অর্থাৎ তাহা ফলার্থী সকাম সাধকের চরম ও পরম পুরস্কার। তাহাতে যে না ভুলিল, তাহা যে না চাহিল, নিবৃত্তিমার্গের মুক্তি তাহারই জন্য। প্রেম-ভক্তি-বিপ্লাবনে, সর্ব্বাত্ম-সমর্পণে ও সেবানন্দ আস্বাদনে সে-ই ধন্য!

শাস্ত্রের ভক্তি মুক্তি-বিতর্ক-বাদে ইহাই সমন্বয়—ইহাই সিদ্ধান্ত। বেদান্ত-শাস্ত্রোক্ত "প্রমাতা"র যে সাধন-চতুষ্টয়ের অন্যতম মুমুক্ষুত্ব, তাহা বিষয়-বাসনা-পরিহারেরই তীব্র ইচ্ছা; নচেৎ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক ইহামুত্রার্থফলভোগ-বিরাগ ও শম-দম-তিতিক্ষা-উপরতি-শ্রদ্ধা-সমাধান, এই

সম্পত্তিরূপ যে অপর সাধন-ত্রিতয়, তাহার সহিত সমধর্ম্মিতা থাকে না। ফলিতার্থে বেদান্তের সাধনচতুষ্টয়ের সিদ্ধি যে মুক্তি, তাহা সর্ব্বাত্মসমর্পণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ বেদান্তের সেইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াই তদানীন্তন পণ্ডিত-সাধক-সমাজকে চমকিত, স্তম্ভিত ও মোহিত করিয়াছিলেন। ভজন-প্রয়োজন-বিধ্বংসী স্থূল মায়াবাদের ব্যাখ্যা বেদান্তের অপব্যাখ্যা বা অপবাদ মাত্র।

সে যাহাহউক, এ হেন মোক্ষও যে ভক্তের কাছে তুচ্ছ, সামান্য ঐহিক ধন-জনাদিতে তাহার আসক্তির লক্ষ্য যে অসম্ভব, তাহা বলাই বাহুল্য। তবে কি না, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক সর্ব্বসাধক-সাধারণেরই স্বাধিকারানুযায়ী শিক্ষাবিধায়ক; এই জন্য সর্ব্বসাধারণ-সাধনাস্তরায় ঐহিক ভোগ-বাসনায় নিবৃত্তি ও বৈরাগ্য-পথে অহৈতুকীভক্তি-ভজনে প্রবৃত্তি শিক্ষা দিতেই এই শিক্ষা শ্লোকটির অবতারণা।

"ন ধনং ন জনং"—ভক্ত বলিতেছেন, আমি ধনও চাই না, জনও চাই না। সংসারে সাধারণতঃ সকলেই ধন-জন চায়। সংসারে উভের প্রয়োজনও আছে। জন ভিন্ন সংসার শূন্য; ধন ভিন্ন সংসার অচল। একা একা জনশূন্য সংসার-করা অজিন-কৌপীন-দণ্ড-কমণ্ডলুরূপ পরিবার-পরিবৃত সন্ন্যাসীর সংসার মাত্র! স্ত্রী-পুত্রাদি হইতে ভ্রাতা-মাতা-বন্ধু-বান্ধব-কুটুম্ব প্রভৃতি "জন" সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। এই সমস্ত প্রায় সকল সংসারীরই অল্প বিস্তর কিছু না কিছু আছে। স্ত্রী-পুত্রাদি হইতেই সংসার-সম্বন্ধে জনতার বৃদ্ধি হয়। এই জনতার বিভিন্ন প্রয়োজন-আয়োজনে সংসারীকে বিবিধ বন্ধনে বদ্ধ হইতে হয়। ফলে সংসারী সাধিয়া এই বন্ধনরাজি ফুলমালার ন্যায় কণ্ঠে ধারণ করে। একটি জন-বন্ধন ছিঁড়িলে হয়ত কাঁদিয়া মরে! এমনই অবস্থা! সংসার মোহের এমনই ঐন্দ্রজালিক কুহক-বিস্তারের ব্যবস্থা! সংসারী লোকে কিন্তু এই ইন্দ্রজাল জালে বদ্ধ থাকিতে বড়ই ভালবাসে। জন এই জালের তন্তু, ধন এই জালের গ্রন্থি। এই ধন-জন-রচিত সংসার-বন্ধন বেড়া-জাল এড়াইবার শক্তি কেবল ভগবদ্ভক্তি হইতেই লাভ করা যায়। ভগবদ্ভক্তি বিরহে বরং এই জালে চিরবদ্ধ থাকাই স্পৃহণীয় ও প্রার্থনীয় বোধ হয়। তাই ধন-জন সংসারাসক্তের পক্ষে সার, ভগবদ্ভক্তের পক্ষে ছার! ভক্তিই ভক্তের সর্ব্বধন, কিন্তু ধন-জনাসক্তি সেই ভক্তির উন্মেষকেও নিমেষে নষ্ট করে। সুতরাং ধন-জন-প্রার্থনা ভক্তের আত্মহত্যা বিশেষ! কাজেই ভক্ত বলেন, "ন ধনং ন জনং—জগদীশ কাময়ে।"

"মা কুরু ধন-জন-যৌবন-গর্ব্বম্।
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্॥"
ধন-জন-যৌবনের করোনা গরব।
এক নিমেষেই কাল হরে লয় সব॥

"মোহমুদ্গরের" এই মৃদু আঘাতে জগতে কয়জন মূঢ়ের চৈতন্যোদয় হয়?

সকলেই কিছু সত্যের 'বিপশ্চিৎ,' ত্রেতার 'জনক', দ্বাপরের 'যুধিষ্ঠির' ও কলির 'রায়-রামানন্দ' হইয়া "বিকার-হেতৌ সতি বিক্রীয়ন্তে—যেষাং ন চেতাংসি তয়েব ধীরাঃ" এই মহতী উক্তির উদাহরণস্থল হইতে পারে

না। দুর্ব্বলাধিকারীর পক্ষে সাধারণতঃ ধন-জনাদি সাধনের নিধন স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়।

"যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ প্রভুত্বমবিবেকতা।
একৈকমপ্যনর্থায় কিমু যত্র চতুষ্টয়ম্॥"

যৌবন-ধনসম্পত্তি-প্রভুত্ব-অবিবেকতা ;
একেই অনর্থ বটে, কি না ঘটে চারি যথা?

এক ধনসম্পত্তির সহিত কেবল যৌবন সর্ব্বদা বর্ত্তমান না থাকিলেও, প্রভুত্ব ও অবিবেকতা প্রায় ইহার নিত্য সহচর: সুতরাং এক অনর্থরূপ ধন বা অর্থ তিন অনর্থে পরিণত হইয়া মানুষের সর্ব্বনাশ করে ; এহেন আধ্যাত্মিক-নিধন-সাধন ধনকে ভক্ত কেন চাহিবেন ?

রাজা পরীক্ষিৎ কলিকে নিগৃহীত করিয়া, পরে তাহার শরণাগতি ও কাতরোক্তিতে তাহার জন্য, দ্যূত মদ্য, স্ত্রী ও জীবহিংসা, এই চারিটী স্থলে স্থাননির্দ্দেশ করিয়া দেন ; কিন্তু কলি চারি স্থানে অবস্থিতি অসুবিধাজনক বিবেচনায়, ঐ অনর্থকর চতুঃস্থানের ফল একস্থানে পাওয়ার মত স্থানের নির্দ্দেশ-প্রার্থী হইলে, রাজা পরীক্ষিৎ বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক স্বর্ণকে অর্থাৎ ধনকে সেই স্থানরূপে নির্দ্ধারণ করিলেন। অতএব ধনই কলির সর্ব্বশক্তির আকরস্বরূপ হইল। এই পৌরাণিক আখ্যায়িকার শিক্ষা-সার-নিষ্কর্ষ এই যে, একমাত্র ধন বা অর্থই কলি-কল্মষ-জনিত সকল অনর্থের হেতুভূত। অতএব এহেন পরমার্থ-প্রণাশিনী অর্থ-স্বার্থ-বুদ্ধি কি ভক্ত-সাধকের শোভা পায় ?

তবে কি না, "ধন চাই না"—এ কথার অর্থ অবশ্য এমন নয় যে ভগবন্! এই স্ত্রী-পুত্রাদি অবশ্য পোষ্য-পরিজন-পরিবৃত করিয়াও ধনাভাবে আমাকে পথের ভিখারী কর। এরূপ প্রার্থনা বাতুলতা মাত্র। গার্হস্থ্যাশ্রমে ধনার্জ্জন একটি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পোষ্য-পোষণ গৃহীর নিত্য নিয়মিত ধর্ম্ম ; তদুপেক্ষায় প্রবল প্রত্যবায় ও নিশ্চিত নিরয়। এই পোষ্য-পোষণ অবশ্য ধন-সাপেক্ষ সুতরাং ধন চাই ; কিন্তু চাই না ধনের আসক্তি। অতএব "ধন চাই না" কথার প্রকৃত অর্থ—আমার মন যেন ধন চায় না, অর্থাৎ ধনে আসক্ত হয় না। নিষ্কাম ভাবে—কেবল সংসার-ধর্ম্মের কর্ত্তব্য-বুদ্ধিবশে ধনার্জ্জন ধর্ম্মার্জ্জন মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভু উপদেশ করিয়াছেন,—"যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া।" অনাসক্ত হইয়া যথাযোগ্য বিষয়-ভোগ গৃহীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম ধনই বিষয়ভোগের অনন্যসাধন ; অতএব ধনের প্রতি মোহাসক্তি-মুক্ত চিত্তে ধনার্জ্জন প্রয়োজনীয় ও প্রার্থনীয়, দারিদ্র্য কদাচ সাধনীয় বা প্রার্থনীয় নহে। তবে তপস্বী সন্ন্যাসীদের ধনবত্তা বিড়ম্বনা বটে। নীতিশাস্ত্রে ছয়টী বিড়ম্বিতের উদাহরণ প্রদর্শনে "ধনবান্ তপস্বী" তাহার অন্যতম, নির্দ্দেশিত হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসীর সঞ্চয় নিষেধ ও গৃহীর অবশ্য সঞ্চয়ের বিধি বহুস্থানে বলিয়াছেন। "সঞ্চয়ী নাবসীদতি" এই আর্যনীতিবাক্যটী গৃহাশ্রমীরই জন্য। অতএব ধন অর্জ্জনীয়, কিন্তু ধনের আসক্তিই বর্জ্জনীয়।

কোন গৃহী পণ্ডিত বোধহয় মা লক্ষ্মীর সপত্নী-পুত্র বলিয়াই অর্থকষ্টে অবসন্ন হইয়া, যেন অর্থের প্রতি অভিসম্পাত স্বরূপে সখেদে বলিয়াছিলেন,—

"অর্থানামর্জ্জনে দুঃখমর্জ্জিতানাঞ্চ রক্ষণে।
নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থং দুঃখভাজনম্।

ধনের অর্জ্জনে দুঃখ,
রক্ষণেও ততোধিক্।
নাশে দুঃখ, ব্যয়ে দুঃখ,
দুঃখদ এ ধনে ধিক্॥

ভাবিয়া দেখিলে কথাগুলি ঠিক; অথচ সংসারীর এ অর্থ-সংগ্রহ অনিবার্য্য—অপরিহার্য্য। সংসারে যে অর্থের সদ্ভাবও এতগুলি দুঃখের কারণ, তাহার অভাবও আবার অনন্ত দুঃখময়; অতএব সংসারীর অর্থ আবশ্যক।

"টাকা দেখ্‌তেও গোল,
থাক্‌লেও গোল,
না থাক্‌লেও গোল!"

এ কথায় কোন গোল নাই, কিন্তু সংসারের সহস্র গোলের মধ্য হইতেও এই 'গোল' সংগ্রহ না করিতে না পারিলে সকল বিষয়েই গোল বাধিয়া যায়। তারপর "দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী"——এটিও আমাদের চিরপ্রসিদ্ধ নীতিবাক্য। অর্থাভাবে পোষ্যপীড়ন অবশ্যম্ভাবী। শাস্ত্র স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন "নরকং পীড়নে তস্য"। পোষ্যবর্গের পীড়ন গৃহীর নিশ্চিত নরকের কারণ। ধন ও তাহার সদ্ব্যবহারই এই নরক-কারণের বারণ; অতএব ধন চাই, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ধনের আসক্তি চাই না; আসক্তিই বিষয়ের বিষাংশ; আসক্তি-আবর্জ্জনা ছাঁকিয়া, বিমল বিষয়-ভোগ বিপজ্জনক নহে।
"বাহিরে বিষয় রবে, আসক্তি ঈশ্বরে যাবে,
অনাসক্ত বিষয়ীরা বিষেই অমৃত পাবে।"

শাস্ত্র এই নির্লিপ্ত বিষয়-ভোগের একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়াছেন,—

"পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়ানুপসেবমানো
ধীরো ন মুঞ্চতি মুকুন্দপদারবিন্দং।
সংগীত-বাদ্যলয়-তান-বশংগতাপি
মৌলিস্থ কুম্ভপরিরক্ষণধীর্নটীব॥"

বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ সেবিয়াও ধীর।
মুকুন্দ-পদারবিন্দ হৃদে রাখে স্থির॥
গীত-বাদ্য-তান-লয়ে নেচে ঘুরে ফিরে।
নটী যথা শির-কুম্ভ স্থির রাখে শিরে॥

জগদাদৃত গীতাশাস্ত্রের সার উপদেশই নিষ্কাম ধর্ম্ম। এই নিষ্কাম ধর্ম্মতত্ত্বানুসারে গৃহাশ্রমীর আসক্তিশূন্য ধনার্জ্জন অবশ্য কর্ত্তব্য। তবে কথা এই যে, ধন অর্জ্জনীয় হইলেও ঈশ্বর-সমীপে প্রার্থনীয় কি না? এ প্রশ্নের সারবত্তা নাই। যাহা প্রয়োজনীয়, তাহাই প্রার্থনীয়। মনে মনে প্রয়োজন-বোধ ও প্রার্থনা—ফলিতার্থে একই কথা। ভক্তের প্রয়োজন-চিন্তা-মাত্রকেই 'প্রার্থনা' বলা যাইতে পারে। তবে কিনা, ভক্তের মূল প্রয়োজন ভগবদ্ভজন; তাহারই সাধন বা বিঘ্ন-নিবারণ উদ্দেশে যে কোন বিষয়ের প্রয়োজন-বোধ, তাহাই প্রার্থনা। ধনাভাবে যদি গৃহী ভক্তের গার্হস্থ্য অভাব-অশান্তি উৎপন্ন হইয়া তাঁহার ভজনের ব্যাঘাত ঘটে, তবে সেই ধনেরই প্রয়োজনবোধ ও ধন-প্রার্থনা, ফলিতার্থে একই কথা। এ ভাবের ধন-প্রার্থনা ভক্তি-বিরোধিনী বা ভজন-পথ-পরিপন্থিনী নহে। সংসারাশ্রমী সাধুর পক্ষে এই সিদ্ধান্ত ধন সম্বন্ধে যেরূপ, জন সম্বন্ধেও সেইরূপ; ফলে বিষয় মাত্রেরই সম্বন্ধে সমান।

তারপর, সকাম-বিষয়-প্রার্থনাও ভজনের নিম্নস্তরে—অর্থাৎ নিম্নাধিকারী সাধক-সমাজে অস্বাভাবিক নহে।

'আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানীচ ভরতর্ষভ।"

গীতাশাস্ত্র এই যে চারিভাগে উপাসকের শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন, তন্মধ্যে "অর্থার্থী" উপাসকেরা ভগবৎসকাশে সকাম-বিষয়-প্রার্থী হন। তাঁহাদের ভক্তি হৈতুকী। উপাসনা সকামা—প্রবৃত্তি-মার্গানুসারিণী। তাঁহারা ভগবানের জন্যই ভগবানকে না ভজিলেও বিষয়ের জন্যও ভগবানকে ভজেন বলিয়া "উপাসক" আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন।

দুর্গোৎসবের প্রার্থনা মন্ত্র স্মরণ করুন,—

"রূপন্দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহিমে।
পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্ব্বান্ কামাংশ্চ দেহিমে।"

ইত্যাদি ক্রমে সর্ব্ববিধ ঐহিক অভ্যুদয়-প্রার্থনাই সর্ব্বশক্ত্যাত্মিকা বাঞ্ছাকল্পলতিকা জগদম্বিকা শ্রীদুর্গার চরণে নিবেদিত হইয়া থাকে। ইহাও উপাসনা, কিন্তু সকাম; এবং ইহাতেও ভক্তির প্রয়োজন, কিন্তু সে হৈতুকী ভক্তি। আলোচ্য শিক্ষা-শ্লোক-টিতে ভগবৎসকাশে অহৈতুকী ভক্তি-প্রার্থনা করা হইয়াছে; সুতরাং ঐহিক ধন জনাদির কামনা এ ক্ষেত্রে অসম্ভব ও অস্বাভাবিক। তবে কিনা, ধন-জনাদি-বিষয়িণী সকামতা মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিকী বৃত্তি বলিয়াই তাহার হাত এড়ান কঠিন; তাই শত জন্মের সুকৃতিমান সাধক যখন অহৈতুকী ভক্তির গোলকীয় সৌরভে পুলকিত হইয়া তল্লাভার্থই উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন; তখন ধন-জনাদি ঐহিক অভ্যুদয় একান্ত অকিঞ্চিৎকর বোধ হওয়া-তেই তিনি তাঁহার মনোমোহনের কাছে মনের কথা খুলিয়া বলিতেছেন,—"ন ধনং ন জনং———জগদীশ কাময়ে।"

"ন সুন্দরীং———জগদীশ কাময়ে।"

সুন্দরী কামিনীর কামনা মানব-মনে সময়-বিশেষে সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী। এই সুন্দরী-ত্বের কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ নাই। দেশ ভেদে রুচিভেদে ও সংস্কার-ভেদে ইহার বিভিন্নতা বিশিষ্ট বৈচিত্র্যময়ী। বিড়ালাক্ষী বিদ্যুৎ-কুন্তলা বিলাতিনী বৃটেনের বীর-বক্ষ বিলাসিনী। এদিকে ক্ষুদ্র-খঞ্জন-চরণা খর্ব্বাঙ্গিনী চিনাঙ্গনা চৈনিক প্রেমিকের চিরচিত্ত-বিনোদিনী! আবার নীলোৎপলাক্ষী নীরদকেশী নিবিড়াঙ্গী অঙ্গনাই বঙ্গবাসীর অন্তরঙ্গিণী ও সুখ-সঙ্গিনী। সে যাহাহউক, ফলে সুন্দরী সঙ্গিনীর সাধ সংসারে সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই স্বাভাবিক। এই "সুন্দরী" অর্থে যে কেবল বাহ্যিক আদর্শ-রূপে রূপসী বুঝায়, তাহা নয়। বাহিক রূপের যে কোন সর্ব্বসাধারণ-স্বীকৃত নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ বা আদর্শ নাই, তাহাত পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। এইস্থলে একটি কৌতুকাবহ প্রাচীন "মেয়েলী" মনে পড়িল,—

"লোকে বলে টিয়ে-ঠোঁটী টীকেলো নাক ভাল।
আমি দেখি আমার খেঁদীর রূপে জগৎ আলো॥"

ফলে যে যায় মনোরমা, সে-ই তার কাছে সুন্দরতমা। জগন্মাতার কাছে এই জন্যই "ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি" এই প্রার্থনা-মন্ত্র পাঠের ব্যবস্থা।

এ সুন্দরীত্ব বয়সেরও অপেক্ষা রাখেনা।

"বয়সে কি রূপ রয়? রূপ রয় মনে;
অন্তরের রূপ ফোটে বয়নে নয়নে!"

বাস্তবিক রূপ অন্তরের সম্পত্তি। আমাদের সামুদ্রিক জ্যোতিষ-শাস্ত্র বলেন—"যত্রাকৃতিস্তত্র গুণা বসন্তি।" গুণবান-গুণবতীদের আকৃতির প্রতি লক্ষ্য করিলেই ইহার যাথার্থ্য প্রায় স্থলেই প্রতীত হয়। যেখানে নির্গুণতা সত্ত্বেও রূপ বা রূপ সত্ত্বেও নির্গুণতা, সেখানে সে রূপ অসার—ফিঁকে; তাহাতে পাকা লাবণ্য লক্ষিত হয় না। তাহার আকর্ষণী বা মোহিনী যেন "পলকে-পলকে পুরাতনী।" "নিতুই নব" ভাব সে সৌন্দর্য্যে সম্ভবেনা। সে সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য নাই; কেবল কিঞ্চিৎ আপাত-প্রাখর্য্য আছে। যেমন ঝুঁটা মুক্তা, নকল-হীরা, গিল্টি-সোণা ইত্যাদি, তেমনই সে রূপও যেন ঝুঁটা রূপ; দুদিন ব্যবহারেই তাহাতে বিরূপতার মালিন্য পড়িয়া যায়। "যত্রাকৃতিস্তত্র গুণা বসন্তি" সামুদ্রিক শাস্ত্রের এ সিদ্ধান্ত যেখানে ব্যভিচার-প্রাপ্ত, সেখানে তাহা প্রায়শঃ কুসঙ্গ-কুশিক্ষার ফল, সন্দেহ নাই। সেরূপ উদাহরণস্থলে অভ্রান্ত অনুসন্ধান লইতে পারিলেই, তাহার সত্যতা সুপ্রতীত হইতে পারে। সে যাহা হউক, ফলে আপন মনোরমতার আদর্শ অনুসারেই সুন্দরী সঙ্গিনীর প্রার্থনা মানব-হৃদয়ে স্বাভাবিক।

তারপর, স্ত্রী পুরুষের মধ্যে স্বভাবতঃ পরস্পর মোহের সম্বন্ধ। স্ত্রীজাতির চক্ষে পুরুষ জাতি সর্ব্বসৌন্দর্য্যের সমষ্টি, আর পুরুষ জাতির নিকট স্ত্রীজাতি বিধাতার বিরলের সৃষ্টি! বুঝি বিশ্ব-প্রদর্শনীতে বৃদ্ধ ব্রহ্মা রমণী-মূর্ত্তি গড়িয়াই বড় বাহাদুরী লইয়াছিলেন!

"কমলিনী মলিনী দিবসাত্যয়ে,
শশিকলা বিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে।
ইতি বিধিবিদধে রমণীমুখং,
ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ॥"

নলিনী মলিনী দিবা-অবসানে হয়।
শশীকলা বিকলা ক্ষণদা পেলে ক্ষয়॥
গড়িলা রমণী-মুখ বিধি ইহা দেখে।
ক্রমে লোক বিজ্ঞতম হয় ঠেকে শিখে।

শ্লোকটি অবশ্য পুরুষের রচিত। ফলে সাধারণতঃ ও স্বভাবতঃ পুরুষের সিদ্ধান্তে নারী সুন্দরী।

স্ত্রীজাতির এই স্বভাব-সৌন্দর্য্য-মোহে জগৎ মুগ্ধ।

"গৌড়ী মাধ্বী তথা পৈষ্টী বিজ্ঞেয়া-
ত্রিবিধাঃ সুরাঃ।
চতুর্থী স্ত্রী-সুরা জ্ঞেয়া যয়েদং মোহিতং
জগৎ।"

গৌড়ী, মাধ্বী, পৈষ্টী আর—সুরা এই
ত্রিপ্রকার।
স্ত্রী-সুরা চতুর্থ সুরা, যাহে মুগ্ধ এ সংসার।

স্ত্রীতে যে মত্ততা জন্মে, সর্ব্বপ্রকার মত্ততা অপেক্ষা সেই মত্ততাই সর্ব্বনাশিনী। অতএব জগতে তাহাই মহাসুরা। স্ত্রী-সৌন্দর্য্য-সুরার মত্ততায় রাবণ সবংশে মজিল। স্ত্রী-সৌন্দর্য্য শিখায় লঙ্কা পুড়িল, ট্রয় ভস্ম হইয়া উড়িল; কত দেশ, কত রাজা, কত জাতি কেবল স্ত্রী-রূপানলে অস্তিত্ব আহুতি দিল! তিলোত্তমার রূপে সুন্দ-উপসুন্দের সর্ব্বনাশ ঘটিল, বিশ্বরূপেশ্বরী দুর্গার রূপে শুম্ভ-নিশুম্ভের সংহার হইল। স্বয়ং মদনান্তক মহাদেব হরির মোহিনী মূর্ত্তির মোহনরূপে মত্ত হইয়া প্রচণ্ড তাণ্ডবকাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড বিকম্পিত

করিলেন! আর রাধা-রূপে বাধা স্বয়ং রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ নাকি রাধার রূপ-সাগরে ডুব দিয়াই গৌর হইয়া উঠিলেন! স্ত্রী রূপের এমনই প্রভাব—এমনই স্বভাব! অতএব সামান্য কাঁচা জীব কাম-কিঙ্কর মানব যে সুন্দরী সঙ্গিনীকেই সংসারের সর্ব্বস্ব স্বরূপ বুঝিবে, তাহার আর কথা কি?

শাস্ত্র ও মহাপুরুষের উপদেশে জানা যায় যে, "কামিনী-কাঞ্চন" সাধনের স্বভাব-শত্রু। অবশ্য গার্হস্থ্যাশ্রমে সাধ্বীসহধর্ম্মিণীকে সাধন-শত্রু বলা শাস্ত্রাদির উদ্দেশ্য নহে; শাস্ত্র-প্রচারিত "সহধর্ম্মিণী" পদেই তাহার পরিচয়। সাধ্বী স্ত্রীকে শাস্ত্র 'পতির ধর্ম্ম-সহায়িনী—এমন কি, উদ্ধারকারিণী—অর্থাৎ পারলৌকিক সদ্গতিবিধায়িনী পর্য্যন্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অসৎপতির সাধ্বী স্ত্রী কি করেন?

"ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাদুদ্ধরতে বিলাৎ।
তদ্বৎ ভর্ত্তারমাদায় তেনৈব সহ মোদতে॥"
যথা গর্ত্ত হতে সাপ সাপুড়িয়া উদ্ধারয়।
পতিকে উদ্ধারি তথা তৎসহ আনন্দে রয়॥"

সাধ্বী স্ত্রী এইরূপে নরকের গভীর গর্ত্ত হইতে দুরাচার পতিকে সবলে টানিয়া তুলিবার শক্তি ধরেন। মৃত্যুর পরে কর্ম্মানুসারে পারলৌকিক সুগতি-দুর্গতি ভোগের বিধান; কিন্তু দেখুন, সাধ্বীর জগদাদর্শরূপিণী সাবিত্রী পতিকে প্রকারান্তরে মরিতেই দিলেন না! একথা এখন কেহ২ পৌরাণিক উপকথা বলিয়া উড়াইয়া দিলে দিতে পারেন, কিন্তু বিজ্ঞান এখন জড়সর্ব্বস্বতা ছাড়িয়া ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিকতত্ত্বে প্রবেশ করিয়া, স্বীকার করিতে উদ্যত হইতেছেন যে, সাধু-চিত্ত-বলের অধ্যাত্ম-তাড়িতে তাড়িত হইয়া মৃত্যুও ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইতে পারে! আধুনিক অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানবাদ বা "থিয়সফী" এ সত্যের সাক্ষ্য দিতে সোৎসাহে দণ্ডায়মান। স্বস্ত্যয়ন, তুলসীদান, 'ধর্ণা' দেওয়া, মাথা-কোটা, 'মানসা' করা ইত্যাদির দ্বারা যে জীবন-সঙ্কট ব্যাধির বিমুক্তি হয়, তাহাও উক্ত তত্ত্বেরই দীপ্ত দৃষ্টান্ত-ফল! সে যাহা হউক, ফলে যথার্থ সাধ্বী স্ত্রীর হৃদয়-বলে প্রকৃতির অব্যাহত বিধানও বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়।

"রুগ্নপতি লয়ে সতী প্রবেশিল ঘরে।
রজনী প্রভাত আর কার সাধ্য করে।
চন্দ্র-সূর্য্য লুকাইল সুমেরুর আড়ে।
সত্য-বাক্য রক্ষা হেতু বেদ-বাক্য নড়ে॥"

বাল্যকালে একখানি প্রাচীন বাঙ্গালা পয়ারে রচিত পৌরাণিক গ্রন্থে এই কয়টী কথা পড়িয়াছিলাম, কিন্তু আর ভুলি নাই। উহাতে কেমন যে সত্যের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য, দার্শনিকতার গাম্ভীর্য্য ও কবিত্বের মাধুর্য্য মিশিয়া আছে, তাহা একটু বুঝা গেলও যেন বুঝাইবার যো নাই; তাই আর ভুলিতে পারি নাই।

যাঁহারা হাসিতে হাসিতে জীবন্ত দেহ পতির জলন্ত চিতায় সমর্পণ করিতে পারেন, তাঁহাদের প্রবল চিত্তড়িৎ তরঙ্গিত অলৌকিক মনোবল স্বপ্রাণসর্ব্বস্ব সুদুর্ব্বলচেতা আমরা কিরূপে ধারণা করিতে সক্ষম হইব? পাতঞ্জল দর্শনের বিভূতিপাদে যে সমস্ত অত্যদ্ভুত বিভূতি বা যোগ-শক্তির বিষয় ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা এই সুসংযত কেন্দ্রীভূত মনোবল বা ইচ্ছা-শক্তিরই ফলমাত্র। স্বতঃসিদ্ধা সতীগণ পতিতত্ত্বে

আর যে নারী স্বভাবতঃই "কামিনী" শব্দের ব্যুৎপত্ত্যর্থানুসারিণী, সেই নারীই "কামিনী কাঞ্চনের" কামিনী। সাধারণতঃ অধিকাংশ নারীই 'কামিনী'। ভক্ত সাধকগণের মুখে এবং নীতিশাস্ত্রাদিতে যে নারী-নিন্দা, তাহা বস্তুতঃ এই কামিনীকেই লক্ষ্য করে। এই ভাবে ভক্তপ্রবর তুলসীদাস, সাধারণতঃ বিবাহের উপরেই রাগ করিয়া বলিয়াছেন,—

"বেহা বেহা সব্ কোই কহে
মেরা মনমে ভার্।
চড় চৌদোলী ধো ধো লগ্‌ড়ি,
জেহেল্ মে লে যায়্॥"
'বিয়ে বিয়ে' বলে বিষয়ী সকলে,
আমি মনে ভাবি তায়,—
চড়ায়ে চৌদোলে, ঢাকে ঢোলে বোলে
জেলে দিতে নিয়ে যায়।

আবার একটি দোঁহায় সাধারণতঃ স্ত্রী মাত্রেরই উপর এই ভাবে রাগ করিয়া বলিয়াছেন,—

"দিন্‌কা মোহিনী, রাত্‌কা বাঘিনী,
পলক্ পলক্ লহু চোষে।
দুনিয়া সব্ বাউরা হোকে
ঘর্ ঘর বাঘিনী পোষে॥"
দিনের মোহিনী, রেতের বাঘিনী,
পলকে ২ শোণিত শোষে।
সংসার সকল হইয়া পাগল,
প্রতি ঘরে ২ বাঘিনী পোষে॥

তন্ত্রশাস্ত্রীয় বিখ্যাত 'দত্তাত্রেয় সংহিতা'র নারী-নিন্দায় ইহা অপেক্ষাও ভীষণ উক্তি দৃষ্ট হয়; যথা—

"স্বর্গ-মোক্ষ সুখঘ্নী চ সাক্ষাদিন্দ্রিয়রূপিণী।
প্রত্যক্ষ রাক্ষসী নারী দেহিনঃ পিশিতাশিনী॥"
স্বর্গ-মোক্ষ-সুখ সংহারিণী।
সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়স্বরূপিণী॥
প্রত্যক্ষ রাক্ষসী নারী হয়।
দেহি দেহ-ভক্ষিণী নিশ্চয়॥

আর একস্থলে বলিয়াছেন,—"বিশ্বাস-ঘাতকী সিদ্ধি-স্বর্গ-মোক্ষ-সুখার্গলা।" ইহা অপেক্ষা কুলীশ-কঠোর গালি-বর্ষণ আর কি হইতে পারে? তবে কিনা, নারীজাতি মাত্রেই সর্ব্বশাস্ত্র ও সর্ব্বতত্ত্ববিৎ মহর্ষির এ গালির লক্ষ্য নহে; কেবল কাম-কিঙ্করী পুরুষ প্রলয়ঙ্করী প্রমোদারাই ইহার বিশদ-বিষয়ীভূতা। পাছে সাধনযোগ্য পুরুষেরা ইহাদের কাম কুহক-কবলিত হইয়া নিধন-প্রাপ্ত হন, এই জন্যই এমন নিদারুণ নারী নিন্দন।

সুবিখ্যাত নীতিশাস্ত্রকার শিহ্লন মিশ্র পুরুষের মিথ্যামোহকর কামকল্পিত নারী-যৌবন-সম্ভোগের অসারতা প্রতিপাদনার্থে বলিয়াছেন,—

"সমাশ্লিষ্যাত্যুচ্চৈর্ঘনপিশিতপিণ্ডং স্তনধিয়া।
মুখং লালাক্লিন্নং পিবতি চষকং সাসবমিব॥
অমেধ্যে ক্লেদার্দ্রে পথি চ রমতে স্পর্শরসিকো
মহামোহান্ধানাং কিমপি রমণীয়ং ন ভবতি॥"

অর্থাৎ—

আশ্লেষয় ঘনমাংসপিণ্ড স্তনজ্ঞানে।
মুখ ক্লেদ-লালা পিয়ে মধুতুল্য মানে॥
ঘৃণিত ক্লেদার্দ্র পথে রমি হর্ষ পায়।
মহামোহে অন্ধদের কিনা রম্য হায়॥

তত্ত্ববিৎ আচার্য্যগণ চক্ষে অঙ্গুলি দি দেখাইয়া দিলেও,—বস্তুতত্ত্ব তন্ন ২ করি

বুঝাইয়া দিলেও তাহা মহামোহান্ধ মনশ্চক্ষের লক্ষ্যে আসেনা। শাস্ত্রকারেরা নানারূপেই বুঝাইয়াছেন। ফলে ভাগ্যবানেরাই বুঝে; অভাগারাই মজে। এই অসার শরীরের স্বভাব-জঘন্যতা ও তৎসম্ভোগের ঘৃণনীয়তা বুঝাইতে "যোগোপনিষৎ" বলিতেছেন,—

অমেধ্যপূর্ণে কৃমিজাল সঙ্কুলে,
স্বভাবদুর্গন্ধিবিনিন্দিতান্তরে।
কলেবরেঽমূত্র পুরীষভাবিতে,
রমন্তি মূঢ়া বিরমন্তি পণ্ডিতাঃ॥

অর্থাৎ—

অপবিত্রতায় পূর্ণ কৃমিকীটময়।
স্বভাবতঃ ক্লেদযুত দুর্গন্ধ-নিলয়॥
মল-মূত্র-পূরিত এ ঘৃণিত শরীর।
মূর্খই আসক্ত ইথে—বিরক্ত সুধীর॥

এই অসার মলসার শরীরের প্রতি আসক্তি-বিরক্তির বিচারেই যথার্থ মূর্খ ও পণ্ডিতের পার্থক্য প্রতীত হয়। যে শাস্ত্র জানেনা, সে-ই যে মূর্খ, তাহা নয়; কিন্তু যে শাস্ত্র মানেনা, সে-ই প্রকৃত মূর্খ। কেহ হয় ত শাস্ত্র জানিয়াও মানেনা, কেহ আবার না জানিয়াও মানে; সুতরাং ফলিতার্থে পূর্ব্বোক্তই মূর্খ, পরোক্তই পণ্ডিত।

এই অসার শরীরের শেষ পরিণামইবা কি? শ্মশানের অস্থিসার নর-মুণ্ড-মালার কোনটিতে পূর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য কিছু মাত্র অনুভূত হইতে পারে কি? একটি সুন্দরী যুবতীর-মুণ্ড-কঙ্কাল এক শ্মশান-খট্টাঙ্গে আটকিয়া ছিল। সেই কপাল-কুহরে বায়ু-প্রবাহ প্রবিষ্ট হইয়া গুন্ ২ ধ্বনি হইতে-ছিল। আমাদের নীতিবিজ্ঞানাচার্য্য শিহ্লন কবিবরের মনে এই ভাব আসিল, যেন বায়ু সুন্দরীর মুণ্ড-কঙ্কালটি সম্বন্ধে ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেছে,—

"কৈতদ্বক্ত্রারবিন্দং ক্ব তদধর-মধু
কায়তাস্তে কটাক্ষাঃ।
কালাপাঃ কোমলাস্তে ক্ব চ মদন-ধনু-
র্ভঙ্গুরো ভ্রূবিলাসঃ॥"

অর্থাৎ—

কোথা সেই মুখপদ্ম—সে অধর-সুধা?
নয়নে বিশাল সেই কটাক্ষ বা কোথা?
কোথা সেই মৃদু মিষ্ট বাণী বদনের?
কোথা সে ভ্রূভঙ্গ-রঙ্গ ধনু মদনের?

যে মুখ দেখিবার জন্য দুদিন আগে কত মুখ উন্মুখ হইত, সে মুখ দেখিয়া আজ লোকে ঘৃণায় বিমুখ হয়! সংসারের নারীর রূপজ মোহের অসারতা এখানে যেন খিল ২ করিয়া হাসিয়া মুগ্ধকে মর্ম্মান্তিক উপহাস করিতেছে!

মুগ্ধের চৈতন্য নাই। সে নরককে স্বর্গ ভাবিতেছে; শ্মশানকে নন্দনকানন দেখিতেছে; আস্তাকুড়কে দেবায়তন মনে করিতেছে। নারী-রূপজ মোহের এমনি বিশাল-বিক্রম! ইহারই আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া, পরমাত্মা হরির চরণে অহৈতুক ভক্তিভরে আত্মসমর্পণই জীবের একান্ত প্রয়োজনীয় ও প্রার্থনীয়। যত প্রকার জাগতিক মোহের আকর্ষণ ও প্রলোভন সাধককে ভজন-পথভ্রষ্ট করে, তন্মধ্যে স্ত্রী-সৌন্দর্য্য-সংসক্তিই সর্ব্বপ্রধান। বড় বড় মুনি-ঋষিরাও এই টানে অনেক উচ্চ হইতে পড়িয়া গিয়াছেন; ভারতীয় পুরাণ-ইতিহাস স্পষ্টরূপে তাহার সাক্ষ্য দিতেছেন। ফলে সাধুগুরু-কৃপায় এই একটির উপরে বিজয়

আমাদের সংজ্ঞা, সংস্কার ও বেদনা মনের দ্বারা শাসিত, মনই তাহাদের পরিচালক, তাহারা মনোময়। 'যদি প্রসন্ন বা বিশুদ্ধ মনের দ্বারা কোন কার্য্য করা যায়, তাহাহইলে ছায়া যেমন শরীরের অনুগমন করে, সুখ তদ্রূপ বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির অনুসরণ করে। ২

অক্কোচ্ছি মং অবধিমং অজিনিমং অহাসিমে
যেচ তং উপনয়্হন্তি বৈরং তেষাং ন শাম্যতি।৩
অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজিনি মং অহাসিমে
যে তং ন উপনয়্হন্তি বৈরং তেষ্পশাম্যতি।৪

তিনি আমার প্রতি ক্রোধ করিয়াছিলেন, তিনি আমাকে প্রহার করিয়াছিলেন, তিনি আমার ধনাদি অপহরণ করিয়াছিলেন, এইরূপ যাহারা সর্ব্বদা চিন্তা করে, তাহাদের বৈরভাব কখনও শমতাপ্রাপ্ত হয় না।৩

তিনি আমার প্রতি ক্রোধ করিয়াছিলেন, তিনি আমাকে প্রহার করিয়াছিলেন, তিনি আমাকে জয় করিয়াছিলেন, তিনি আমার ধনাদি অপহরণ করিয়াছিলেন, এইরূপ যাহারা সর্ব্বদা চিন্তা করে না, তাহাদের বৈরভাব প্রশমিত হয়।

নহি বৈরেণ বৈরাণি শাম্যন্তীহ কদাচন
অবৈরেণ চ শাম্যন্তি এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।৫
পরে চ নবিজানন্তি মৃত্যুমেত্থ গচ্ছামহে
(যমামসে)
যে চ তত্থং বিজানন্তি ততঃ শাম্যন্তি
মেধগাঃ।৬

বৈরভাব দ্বারা বৈরভাব কখনও নষ্ট হয় না, অবৈরভাব অর্থাৎ প্রেমের দ্বারা বৈরভাব নষ্ট হয়, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।৫

এখান হইতে আমরা যমসদনে গমন করিব, ইহা মূর্খেরা জানে না। যে সমুদায় পণ্ডিতগণ ইহা অবগত হন, তাঁহাদের সংসারে কলহ থাকে না।৬

শুভানুপশ্যিং বিহরন্তং ইন্দ্রিয়েসু অসংযতং
ভোজনংহি অমত্তঞ্ঞুং কুসীদং হীনবীরিয়ং
তং বৈ পসহতি মারো বাতো রুক্খং বৈ
দুর্ব্বলং।৭

"অশুভানুপশ্যিং বিহরন্তং ইন্দ্রিয়েসু সুসংযতং
ভোজনং হি চ মত্তঞ্ঞুং শ্রদ্ধং আরদ্ধবীরিয়ং
তং বৈ ন পসহতি মারো বাতঃ শৈলং বৈ
পর্ব্বতং।৮

যিনি সাংসারিক সুখ অন্বেষণ করিয়া অসংযতেন্দ্রিয় হইয়া, ভোজনে অসংযত ও অলস এবং হীনবীর্য্য হইয়া বিচরণ করেন, বায়ু যেরূপ দুর্ব্বলবৃক্ষকে বিনাশ করে, তদ্রূপ মারও তাহাকে অভিভব করে।

যিনি সংসার সুখ অন্বেষণ না করিয়া ইন্দ্রিয়ার্থে সংযত হইয়া ভোজনে সংযত শ্রদ্ধাবান্ বীর্য্যবান্ হইয়া বিচরণ করেন, মার তাহার অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না; যেমন সামান্য বায়ু শিলাময় পর্ব্বতের কোনও ক্ষতি করে, না তদ্রূপ।

অনিক্কাষায় কাষায়ং যো বত্থং পরিদহেস্সতি
অপেতো দমসচ্চেন ন সঃ কাষায়মর্হতি।৯
যশ্চ বান্তকষায়ঃ স্যাৎ শীলেষু সুসমাহিতঃ
উপেতো দমসচ্চেন স বৈ কাষায়মর্হতি।১০

যিনি নিক্কাষায় অর্থাৎ পাপশূন্য হইতে পারেন নাই, তিনি যদি কাষায় বস্ত্র পরিধান করেন, তাহাহইলে তিনি দম ও সত্য হইতে বিযুক্ত হইয়া কাষায় বস্ত্রের অনুপযুক্ত হইয়া থাকেন। মহাভারতে এইরূপ একটী শ্লোক আছে, যথা,—

অনিষ্কাষায় কাষায়ং ঈহার্থং ইতি বিদ্ধি ত্বম্
ধর্ম্মধ্বজানং মুণ্ডানং বৃত্ত্যর্থং ইতি মে মতিঃ।

ইহার অর্থ এই, যে ব্যক্তি অপবিত্র কিন্তু কাষায়বস্ত্র পরিধান করে, তাহা তাহার বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য করে বলিয়া জানিবে। এই সকল ধর্ম্মধ্বজী মুণ্ডিতকেশেরা অর্থোপার্জ্জনের জন্যই এইরূপ বেশ ধারণ করে বলিয়া আমার মনে হয়।

যিনি কাষায় অর্থাৎ পাপ বিমুক্ত হইয়াছেন, (বমন করিয়া ফেলিয়াছেন) যিনি শীলতায় সুসমাহিত আছেন, তিনি দম ও সত্য দ্বারা যুক্ত হইয়া কাষায় বস্ত্রের উপযুক্ত হইয়া থাকেন। ১০

অসারে সার মতয়ঃ সারে চাসার দর্শিনঃ
তে সারং নাধিগচ্ছন্তি মিথ্যাসংকল্প গোচরাঃ।১১

সারঞ্চ সারতো জ্ঞাত্বা অসারঞ্চ অসারতঃ
তে সারমধিগচ্ছন্তি সম্যক্ সংকল্প গোচরা॥১২

যাহারা অসারে সার বলিয়া মনে করে, এবং সারকে অসার মনে করে, তাহারা সার কখনও প্রাপ্ত হয় না, তাহারা মিথ্যা সঙ্কল্প অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়।১১

যাহারা সারকে সার বলিয়া জানেন এবং অসারকে অসার বলিয়া জানেন, তাহারাই সার প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের সম্যক সঙ্কল্প সুসিদ্ধ হয়।১২

যথা অগারং দুশ্ছন্নং বৃষ্টিঃ সমতি বিঝতি
এবং অভাবিতং চিত্তং রাগঃ সমতি বিঝতি।১৩
যথা অগারং সুচ্ছন্নং বৃষ্টিঃ ন সমতি বিঝতি
এবং সুভাবিতং চিত্তং রাগঃ ন সমতি বিজ্ঝতি॥১২

যেমন দুশ্ছন্ন (যাহা ভাল রূপে ছাওয়া হয় নাই অর্থাৎ যাহাতে ছিদ্র আছে) গৃহে অতি বেগে বৃষ্টি প্রবেশ করে, সেইরূপ চিন্তা-বিহীন চিত্তে রাগ (অনুরাগ বা তৃষ্ণা) প্রবল বেগে প্রবিষ্ট হয়।

আর যেরূপ সুচ্ছন্ন (ভালরূপে ছাওয়া) গৃহে বৃষ্টি প্রবেশ করিতে পারে না, সেইরূপ চিন্তাশীল-চিত্তে রাগ অর্থাৎ তৃষ্ণা প্রবিষ্ট হইতে পারে না॥

ইহ শোচতি প্রেত্য শোচতি পাপকারী উভয়ত্র শোচতি।
স শোচতি স বিহন্যতে দৃষ্ট্বা কর্ম্ম কিলিষ্-মাত্মনঃ।১৫।
ইহ মোদতে প্রেত্য মোদতে কৃতপুণ্য উভয়ত্র মোদতে—
স মোদতে স প্রমোদতে দৃষ্ট্বা কর্ম্ম বিশুদ্ধি মাত্মনঃ।১৬

পাপ কার্য্যকারী ব্যক্তি ইহকালে শোক করে, পরকালে শোক করে, উভয়ত্রই সে শোক করে। সে নিজের কিলিষ কর্ম্ম—অর্থাৎ কলুষিত কার্য্য দর্শন করিয়া শোক করে এবং সেই শোকাবেগ কষ্টে সহ্য করিতে থাকে।

পুণ্যকারী ব্যক্তি ইহলোকে আনন্দ প্রাপ্ত হয়, পরলোকেও আনন্দ প্রাপ্ত হয়, উভয় লোকেই সে আনন্দ প্রাপ্ত হয়, সে নিজের কর্ম্মবিশুদ্ধি দর্শন করিয়া আনন্দিত হয়, প্রমুদিত হয়।

ইহ তপ্যতে প্রেত্য তপ্যতে পাপকারী উভয়ত্র তপ্যতে,
পাপং মে কৃতমিতি তপ্যতে ভূশং তপ্যতে দুর্গতিংগতঃ।১৭

ইহ নন্দতি প্রেত্য নন্দতি কৃতপুণ্য উভয়ত্র
নন্দতি,
পুণ্যং মে কৃতমিতি নন্দতি ভূয়ঃ নন্দতি
সুগতিংগতঃ। ১৮

পাপানুষ্ঠানকারী ইহলোকে পরলোকে উভয়ত্রই তাপ প্রাপ্ত হয়। "আমি পাপ করিয়াছি" এইরূপ ভাবিয়া তাপ প্রাপ্ত হয়, দুর্গতি (নিকৃষ্ট নরকাদি কিম্বা নীচজন্মাদি) প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় পরিতপ্ত হয়।

পুণ্যকারী ইহলোকে পরলোকে উভয়ত্রই আনন্দিত হয়। "আমি পুণ্য করিয়াছি" মনে করিয়া আনন্দিত হয়, সুগতি (উৎকৃষ্ট অথবা উর্দ্ধ লোক গমনাদি) প্রাপ্ত হইয়া আরও আনন্দিত হয়।

বহ্বপি চেৎ সংহিতাং ভাষমাণঃ ন তৎকরো
ভবতি নরঃ প্রমত্তঃ।
গোপো বা গাঃ গণয়ন্ পরেষাং ন ভাগবান্
শ্রামণ্যস্য ভবতি। ১৯
অল্পমপি চেৎ সংহিতাং ভাষমাণঃ ধর্ম্মস্য
ভবত্যনুধর্ম্মচারী।
রাগঞ্চ দ্বেষঞ্চ প্রহায় মোহং সম্যক্ প্রজানন্
সুবিমুক্তচিত্তঃ।
অনুপাদিয়ান ইহবামুত্র বা স ভাগবান্ শ্রামণ্যস্য
ভবতি। ২০

প্রমত্ত ব্যক্তি যদি বহুল পরিমাণে সংহিতা (সূত্র পরিতৃৎ আছে ; বুদ্ধদেবের উপদেশকে পালিভাষায় ঐ নাম দেওয়া হয়, ত্রিপিটক গ্রন্থেরই উহা নামান্তর।) উচ্চারণ করে, তথাপি কখনই সে ধর্ম্মকারী হইতে পারে না। যেমন গোপ অপরের গোরু গণনা করে, নিজে তাহার ফলভাগী হয় না, তদ্রূপ প্রমত্ত ও পঞ্চস্কন্ধ ধর্ম্মের ভাগী হয় না।

যে ব্যক্তি ধর্ম্মাচরণ করে, ধর্ম্মের অনুগমন করে, রাগ, দ্বেষ, মোহ ত্যাগ করিয়াছে, সম্যক জ্ঞানে সুবিমুক্ত চিত্ত হইয়াছে, ইহলোকে বা পরলোকে যাহার গ্রহণ লালসা নাই, সে যদি অল্প মাত্রও সংহিতা উচ্চারণ করে, তথাপি সে পঞ্চস্কন্ধ ধর্ম্মের ভাগী হয়।

যমকবর্গঃ প্রথমঃ।*

(ক্রমশঃ)

দশম মণ্ডল।

১৪ সূক্ত। (১)

১-৫, ১৩—১৬ যম। ৬ লিঙ্গোক্ত দেবতা। ৭—৯ লিঙ্গোক্ত দেবতাগণ বা পিতৃগণ। ১০—১২ শ্বানদ্বয়।

যম ঋষি।

যিনি মহৎ সাধুদেশে গমন করিয়াছেন
অনেকের পথ মুক্ত করিয়াছেন যাঁহারা,
যাঁহার নিকটে মানব অবশ্য যাইবে, সেই
তিনি বৈবস্বত যম হোম কর তাঁরে।

* এই যমকবর্গ পাঠে দেখা যায় দুইটি দুইটি শ্লোক দ্বারা এক একটী বিষয়ের উত্তর প্রত্যুত্তর প্রদর্শিত হইয়াছে। এই জন্যই ইহাকে "যমকবর্গ" বলা যায়।

(১) এই সূক্তে ধার্ম্মিক লোকদিগের পরকালে সুখলাভের বিবরণ আছে। তাহাদিগের সুখবিধান কর্ত্তাকে যম নাম দিয়া স্তব করা হইল। সুতরাং পৌরাণিক যমের ন্যায় বৈদিক যম দণ্ডদাতা নহেন। তিনি মাত্র সুখবিধাতা। পাঠক দেখিবেন, এই সূক্তের কুত্রাপি যমের মুহুরি চিত্রগুপ্তের কথা নাই। ১০ম মণ্ডলের আরও কয়েকটী সূক্তে যমের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহার কোথাও চিত্রগুপ্তের কথার উল্লেখ নাই।

কোথায় যাইতে হবে তিনিই দেখান আগে
সে পথের নাহি হয় কখন অন্যথা ;
আমাদের পিতৃগণ করিলা যত্র গমন
কর্ম্ম অনুসারে লোক যাইবেক তথা।২
মাতলী কব্য সকলে, অঙ্গিরনিকরে যম,
দেব বৃহস্পতি ঋক্কগণে সম বর্দ্ধিত ;
যাঁহাদিগে দেবগণ, যাঁহারা বা দেবগণে
সম্বর্দ্ধনা করে, হয় সকলে বর্দ্ধিত ,—
কেহ বা 'স্বাহায়' কেহ 'স্বধা'য় হ্লাদিত।৩
এই যজ্ঞে এসে যম বস তুমি যজ্ঞবিৎ
অঙ্গিরা নামক পিতৃ লোকের সহিত।
কবিদের মন্ত্র সব তোমাকে করুক স্তব
হোম পানে হে রাজন্ হও আমোদিত।৪
সে অঙ্গিরা পিতৃগণ যজ্ঞীয় নিজগানন
তাঁহাদের সহ বসে আমোদ করহ।
তব পিতা বিবস্বতে করিতেছি আবাহন
এই যজ্ঞে এসে সবে কুশেতে বসহ ৫ ॥
অঙ্গিরা, অথর্ব্বা, ভৃগু আমাদের পিতৃগণ
এই মাত্র সবে উপস্থিত সোমপানে।
যজ্ঞায় সে পিতৃগণ করিয়া শুভ মনন
প্রসন্ন হইয়া যেন রাখেন কল্যাণে ॥৬
যাও যাও সেই পথে পূর্ব্ব পিতৃগণ যাতে
বিগত সে পথে তুমি করহ গমন।
স্বধায় হ্লাদিত হয়ে আছেন রাজা উভয়ে—
যম ও বরুণে গিয়া করহ দর্শন (১)।৭
পিতৃগণ সহকারে যমে কর্ম্মে মিলিবারে
যাও স্বর্গে যাও সেই ধামে চমৎকার।
অবদ্য (২) ত্যাগ করিয়া পুনরস্ত (৩) প্রবেশিয়া
উজ্জ্বল তনু ধরিয়া যাও পর পার ।৮

(১) মৃত ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া এই মন্ত্র এবং পরবর্ত্তী মন্ত্র। (২) অবদ্য-পাপ। (৩) অস্ত অস্তনামক গৃহ।

দূরে যাও, যাও, সর এই লোক মনোহর
পিতৃলোক ইঁহাকেই করিছেন দান।
দিবা দ্বারা জল দ্বারা শোভিত আলোক দ্বারা
প্রদান করেন যম মৃতকে সেস্থান ॥৯
চতুরক্ষ সারমেয় শবল কুকুর দ্বয়
সাধু পথে তাহাদিগে অতিক্রমি ধাও।
মৃত ! বিজ্ঞ পিতৃগণে যেথানে যমের সনে
আমোদে নিরত রত সেইখানে যাও ॥১০
প্রহরী স্বরূপ তব যাহারা নেহারে সব
চতুরক্ষি পথরক্ষী সে যুগ্ম কুকুর,
তাহাদের কোপ হ'তে যম ! রক্ষ এই মতে
রাজন্ কল্যাণ কর, রোগ কর দূর ॥
সেই দুই যমদূত বৃহন্নাসা অতদ্ভুত,
অতৃপ্ত—সবার করে পশ্চাদে ধাবন ;
আমাদিকে অদ্য তারা দেয় যেন স্বল বাড়া
করে যেন ভদ্র, পাই সূর্য্যের দর্শন ।১২
যমের জন্যেতে সোম কর অভিষব ;
হোম কর তাঁর জন্যে হোম দ্রব্য সব।
এই সুসজ্জিত যজ্ঞ অগ্নি দূত যার,
যম অভিমুখে তাহা করে অভিসার ।১৩
সেবা কর যমরাজে হোম কর তার,
ঘৃতযুক্ত দ্রব্য তাঁকে দেও উপহার ;
দেবগণ মাঝে তিনি দিয়ে দীর্ঘ-আয়ু,
আমাদিগে, যেন যম করেন চিরায়ু ।১৪
যমরাজে সুমধুর হব্য কর হোম ;
যে সকল ঋষি পূর্ব্বে লভিল জনম,
যাঁহারা করিলা ধর্ম্মপথ আবিষ্কার,
তাদিগেও আমাদের এই নমস্কার ।১৫
(১) ত্রিকদ্রুক নামে যজ্ঞ পান যমরাজ,
ষড়েক বৃহত স্থানে তাঁহার বিরাজ ;
ত্রিষ্টুপ গায়ত্রী আদি ছন্দ আছে য ত,
যম প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে তাহা ।১৬
শ্রীমধুসূদন সরকার।

(১) ষট্ ও এক বৃহৎস্থান। ছয় স্থান যথা ; দ্যুলোক, ভূলোক, জল, উদ্ভিজ্জ, ঊক্ ও সুনৃত।

সামবেদ সংহিতা।

———o———

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

অথ চতুর্থ খণ্ডে।

সেয়ং প্রথমা।

(শংযুঋর্ষিঃ)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যজ্ঞা যজ্ঞা বো অগ্নয়ে গিরা গিরা চ দক্ষসে।
১ ২ ১ ২৩১২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র
প্র প্র বয়মমৃতং জাত বেদসং প্রিয়ং মিত্রং
২র
ন শংসিষম্

যজ্ঞা যজ্ঞা—যজ্ঞে যজ্ঞে সর্ব্বেষু যাগেষু ।১॥

বঃ—যূয়ং। অগ্নয়ে—অগ্নির বৃদ্ধির জন্য (কর্ম্মণি চতুর্থী) গিরা গিরা—স্তুতিরূপয়া বাচা।

দক্ষসে—প্রবৃদ্ধায়।

প্র প্র শংসিষম্—(প্র শব্দের দ্বিরুক্তি পাদ পূরণার্থ) প্রশংসামঃ।

অমৃতং—মরণ রহিতং।

জাত বেদসং—জাতানাং বেদিতারং; জাত প্রজ্ঞানং জাতধনং বা জন্তুগণের জ্ঞাতা

মিত্রং ন—মিত্রমিব প্রিয়মনুকূলম্—বন্ধুর ন্যায় প্রিয় ও অনুকূল।

হে স্তোতাগণ! তোমরা স্তুতিরূপ বাক্যে অমর, প্রাণিগণের জ্ঞাতা, ও বন্ধুর ন্যায় অনুকূল অগ্নিকে প্রবৃদ্ধ করিবার জন্য প্রতি যজ্ঞে তাঁহাকে প্রশংসাকর এবং আমরাও প্রশংসা করিতেছি ।১।

অথ দ্বিতীয়া।

(ভর্গ ঋষিঃ)

৩ ১ ২ ৩ ১২ ৩ ১ ২
পাহি নো অগ্ন একয়া পাহ্যূত ত
৩ ১ ২
দ্বিতীয়য়া।
৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
পাহি গীর্ভি স্তি স্‌ভিরূর্জাম্পতে পাহি
২ ৩ ১ ২
চতসৃভির্বসো (ক) ॥২॥

হে অগ্নে! নঃ—অস্মান্।

একয়া—ঋচা গিরা—স্তুতিবাক্য দ্বারা।

পাহি—রক্ষ। উত—অপিচ।

দ্বিতীয়য়া—ঋচা—দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা।

পাহি—পালয়।

তিসৃভিঃ গীর্ভিঃ—স্তুতিভিঃ।

ঊর্জাম্—অন্নানাং বলানাং বা।

হেপতে!—স্বামিন্!

চতসৃভিঃ—গীর্ভিঃ।

হেবসো—বাসক!—গার্হপত্যাগ্নে!

হে অগ্নি! তুমি আমাদিগকে একটী স্তুতি বাক্য দ্বারা স্তুত হইয়া রক্ষা কর; এবং দ্বিতীয় স্তুতিবাক্য দ্বারা রক্ষা কর। অন্ন-স্বামিন্! তুমি আমাদিগকে তৃতীয় বাক্য দ্বারা স্তুত হইয়া রক্ষা কর; হে গার্হপত্যাগ্নি! তুমি আমাদিগকে চতুর্থ বাক্য দ্বারা স্তুত হইয়া পালন কর ।২॥ (খ)

অথ তৃতীয়া

(শংযুঋষিঃ)

৩ ২ ১ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বৃহদ্ভিরগ্নে অর্চিভিঃ শুক্রেণ দেব শোচিষা।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ভরদ্বাজে সমিধানো যবিষ্ঠ রেবৎ পাবক
দীদিহি ॥৩॥

হে দেব!—দানাদি গুণযুক্ত! যবিষ্ঠ—যুবতম।

(ক) এই মন্ত্রটি উত্তরার্চ্চিকে ৭।২।৪।১।

(খ) স্তব করিতে হইলে চারি প্রকার শব্দের আবশ্যক হয় যথা বর্ণস্ফোট, পদস্ফোট, বাক্যস্ফোট ও অখণ্ড বাক্যস্ফোট।

পাবক—শোধক! অগ্নে!
শুক্রেণ—নির্ম্মলেন।
শোচিষা—তেজসা।
ভরদ্বাজে—অস্মাস্ত্রাতরি।
সমিধ্বানঃ—সমিধ্যমানস্বং—তুমিকাষ্ঠ যুক্ত হইয়াছ।
বৃহদ্ভিঃ—মহদ্ভিঃ।
অর্চিভিঃ—তেজোভিঃ।
নঃ—অস্মদর্থং।
রেবৎ—ধনযুক্তং যথা ভবতি তথা।
দীদিহি—দীপ্যস্ব—প্রদীপ্ত হও।

হে দেব! হে যুবতম! হে শোধক! হে অগ্নি! তুমি কাষ্ঠযুক্ত হওয়াতে বৃহৎ তেজের সহিত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছ; তজ্জন্য তুমি (আমার ভ্রাতা) ভরদ্বাজে স্বীয় নির্ম্মল তেজের সহিত ধনশালী হইয়া আমাদের জন্য প্রদীপ্ত হও।৩॥

অথ চতুর্থী।

(বসিষ্ঠ ঋষিঃ)

১ ২   ১ ২ ২   ৩ ১ ২
ত্বে অগ্নে স্বাহুতঃ প্রিয়াসঃ সন্তু সূরয়ঃ।
৩১ ৩ ২ ৩ ১২ ৩ ১ ২   ৩ ১ ২৩
যন্তারো যে মঘবা নো জনানা মূর্ব্বং দয়ন্ত
১ ২
গোনাম্॥

হে অগ্নে! স্বাহুত—যজমানৈঃ সুষ্ঠুভিঃ হুত! যজমানগণ কর্ত্তৃক শোভনরূপে আহুত!
ত্বে—তব। সূরয়—প্রেরকাঃ—স্তোতারঃ—স্তোতাগণ;
প্রিয়াসঃ—প্রিয়াঃ সন্তু ভবন্তু।
যে মঘবানঃ—ধনবন্তঃ।
যন্তারঃ—প্রদাতারঃ—প্রদাতাগণ।
জনানাং—অস্মদীয়ানাং—অস্মদীয় জন সকলকে।
ঊর্ব্বং—সমূহং।
দয়ন্ত—প্রযচ্ছন্তি।

হে অগ্নি! হে সম্যক আহুত! তোমার স্তোতাগণ প্রিয় হউন ও যাঁহারা ধনবান ও অস্মদীয় জন সকলকে ও গো সকলকে দান করিতেছেন, তাহারাও তোমার প্রিয় হউন।

অথ পঞ্চমী।

(ভারদ্বাজ ঋষিঃ)

১ ২ ১ ২   ৩১   ২   ৩ ১ ২
অগ্নে জরিত র্বিশ্‌ পতি স্তপানো দেব
৩ ১ ২
রক্ষসঃ।
১ ২   ৩১   ২
অপ্রোষিবান্ গৃহপতে মহা ঽ অসি
১ ২ ৩ ১ ২   ৩ ২
দিব্যপায়ুর্দুরোণয়ুঃ ৫॥

হে অগ্নে!
জরিতঃ—স্তোতঃ—স্তুতা!
বিশ্‌পতিঃ-প্রজানাং পালকঃ—প্রজাসকলের পালক।
রক্ষসঃ তপান—রাক্ষসানাং সন্তাপকঃ অসি—রাক্ষসগণের সন্তাপক হও।
হে গৃহপতে। যজমান গৃহস্য পালকাগ্নে!
ত্বং অপ্রোষিবান্—যজমানস্য গৃহং-মত্যজন্—যজমানের গৃহ ত্যাগ করিয়া।
মহান্ অতিশয়েন পূজ্যো হসি—অত্যন্ত পূজ্য হও, দিবঃ—দ্যু লোকস্য।
পায়ুঃ—পাতা—রক্ষক।
দুরোণয়ুঃ—যজমান গৃহস্য মিশ্রয়িতা—সর্ব্বদা বর্ত্তমান ইত্যর্থঃ ৮

হে অগ্নি! হে স্তুতা! তুমি প্রজাগণের পালক ও রাক্ষসগণের সাম্ভপক। তুমিদ্যু-লোকের রক্ষক; তুমি যজমান গৃহে সর্ব্বদা থাক, তজ্জন্য হে যজমান গৃহপতে! তুমি যজমান গৃহ পরিত্যাগ না করিয়া তাঁহাদের অত্যন্ত পূজ্য হও।৫॥

অথ ষষ্ঠী।

(প্রাকণ্ব ঋষি)

২ ৩ ১ ২ ৩১২ ৩ ১র ২র
অগ্নে বিবস্ব দুষস শ্চিত্রং রাধো অমর্ত্ত্য।
২ ৩ ১ ২ ৩ ২৩২ ৩১
আদাশুষে জাতবেদো বহা ত্বমদ্যা দেবা৺
২৩ ১ ৩
উষর্বুধঃ॥৬।

হে অগ্নে!

ত্বং উষসঃ—উষো দেবতায়াঃ সকাসাৎ।

রাধঃ—ধনং।

দাশুষে—হবি র্দত্তবতে যজমানায়—হবি র্দানকারী যজমানকে।

আবহ—অনীয় প্রাপয়—আনিয়া দাও।

অমর্ত্ত্য—মরণ রহিত। হে জাতবেদ!—জন্তানাং বেদিতঃ!—প্রাণিগণের জ্ঞাতা।

বিবস্বৎ—বিশিষ্ট নিবাসোপেতং।

চিত্রং—নানাবিধং। অদ্য—অস্মিন্ দিনে।

উষর্বুধঃ—উষঃ কালে প্রবুদ্ধান্। দেবান্—দেবতা সকলকে।

হে অগ্নি! তুমি হবির্দানকারী যজমানকে উষাদেবতার নিকট হইতে উৎকৃষ্ট নিবাসোপেত নানাবিধ ধন আনিয়া দাও হে অমর! হে প্রাণিগণের জ্ঞাতা! অদ্য উষাকালে যে সকল দেবতা জাগরিত হইয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগকে আনিয়া দাও।৭॥

অথ সপ্তমী।

(তৃণ পাণি ঋষিঃ)

১ ২ ৩১ ২উ ১উ ৩ ১২
ত্বং নশ্চিত্র উত্যা বসো রাধা ৺সি চোদয়।
৩ ২ ৩১র ২র ৩ ১১ ৩২ ৩২ ৩১র
অস্য রায়স্ত্বমগ্নে রথোরসি বিদা গাধং তুচে
২র
তু নঃ॥৭॥

হে বসো!—বাসকাগ্নে!

চিত্রঃ—বিচিত্র দর্শনীয় স্তং।

উত্যা—রক্ষয়াসহ—সাবধানের সহিত।

রাধাংসি—ধনানি। নঃ—অস্মভ্যং।

চোদয়—প্রেরয়।

অস্য—লোকে পরিদৃশ্যমানস্য। রাধঃ—ধনস্য।

ত্বং রক্ষেঃ অসি—বংহিতা নেতা ভবসি। অতঃ কারণাৎ অস্মভ্যং ধনানি প্রেরয়েত্যর্থঃ

নঃ—অস্মাকং। তুচে—অপত্যায় অপত্য হেতু ভূতায় পুত্রায়।

গাধং—প্রতিষ্ঠাং। তু—ক্ষিপ্রং—শীঘ্রং।

বিদাং—লম্ভয়—দাও।

হে বাসকাগ্নি! তুমি বিচিত্র দর্শনীয় তুমি লোকে পরিদৃশ্যমান ধনের নেতা হও; তজ্জন্য আমাদিগের জন্য সাবধানে ধন সকল প্রেরণ কর ও আমাদিগকে পুত্রোৎপাদন জন্য শীঘ্র ক্ষমতা দাও।৭।

অথাষ্টমী।

বিরূপ ঋষিঃ।

২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
ত্বমিৎ সপ্রথা অস্যগ্নে ত্রাতর্ঋতঃ কবিঃ।
১র ২ ৩ ১ ২
ত্বাং বিপ্রাসঃ সমিধান দীদিব আ বিবাসন্তি
৩ ১২
বেধসঃ।৮।

হে অগ্নে!

ত্রাতঃ—রক্ষক! ঋতঃ—সত্যভূতঃ।

কবিঃ—ক্রান্ত প্রজ্ঞঃ—বহুদর্শী।

ত্বমিৎ—ত্বমেব—তুমিই।

সপ্রথাঃ—সর্ব্বতঃ পৃথুঃ—সকলদিকে ব্যাপিয়া আছ।

অসি—ভবসি।

হে সমিধান—সমিধ্যমান! যিনি কাষ্ঠ পাইয়াছেন, তৎসম্বোধনে হে প্রাপ্ত কাষ্ঠ!

হে দীদিবঃ—দীপ্যাগ্নে।

বিপ্রাসঃ—বিপ্রাঃ বিধাতারঃ।

আবিবাসন্তি—বিচরন্তি।

বেধসঃ—মেধাবিনঃ স্তোতারঃ।

হে অগ্নি! হে রক্ষক! তুমি সত্য স্বরূপ, বহুদর্শী ও তুমিই সকলদিক ব্যাপিয়া আছ। হে সমিধামান! হে দীপ্ত! তোমার বিধাতা মেধাবী স্তোতা সকল তোমাকে সম্পূর্ণরূপে সেবা করিতেছেন ৮॥

অথ নবমী।

(শুনঃ শেপঋষি)

১ ২ ৩ ১২ ৩১২ ৩১
আ নো অগ্নে বয়ো বৃধ ং রয়িম্পাবকশ

২
ং সাম্।

১২ ৩২৩ ১২৩
রাস্বা চন উপমাতে পুরুস্পৃহ সুনীতী

১২
সুয়শস্তরম্ ॥৯॥

হে অগ্নে!—পাবক!—শোধক!

বয়োবৃধং—অন্নস্য বর্দ্ধকং

শংস্যং—স্তবস্তং। রয়িং—ধনং।

নঃ—অস্মভ্যং আভরেতি শেষঃ—আমাদিগকে আনিয়া দাও।

হে উপমাতে!—উপাস্যাং সমীপে মাতি ঘৃতমিত্যু পমাতিঃ—যিনি নিকটে ঘৃত রাখিয়া মাপিয়া গ্রহণ করেন।

চ—আহৃত্যচ।

নঃ—অস্মভ্যং।

সুনীতী—সুনীত্যা—শোভন নয়নেন—নিয়ম দ্বারা।

পুরুস্পৃহং—বহুভিঃ স্পৃহণীয়ং।

সুয়শস্তরং—অত্যন্ত স্বভূতং কীর্ত্তিধনং।

রাস্ব—দেহি।

হে অগ্নি! হে শোধক! তুমি আমাদের জন্য অন্নের বর্দ্ধক লোকের প্রার্থিত ধন আনিয়া দাও। হে উপমাতে! তুমি এরূপ ধন আনিয়া দিয়া এরূপ সুনিয়ম করিয়া দাও, যাহাতে ঐ ধন অনেক লোকের স্পৃহণীয় ও অত্যন্ত কীর্ত্তিযুক্ত হয় ।৯॥

অথ দশমী।

(সোভরি ঋষি)

২উ ৩ ১২৩ ২৩ ১ ২ ৩১র ২র
যো বিশ্বা দয়তে বসু হোতা মন্দ্রোজনানাম্।

৩১র ২র ৩১২ ৩ ১র ২র
মধোর্ন পাত্রা প্রথমান্তস্মৈ প্র স্তোমা

৩ ১২
যন্ত্যগ্নয়ে ॥১০॥

হোতা—দেবানামাহ্বাতা।

মন্দ্রঃ—মোদনঃ...আনন্দদাতা।

বিশ্বা—সর্ব্বাণি।

বসু—বসূনি—ধনানি।

জনানাং—জনেভ্যঃ।

দয়তে—প্রযচ্ছতি—দান করিতেছেন।

তস্মৈ অস্মৈ অগ্নয়ে—সেই সকল অগ্নিকে।

মধোঃ ন—মদকরস্য সোমস্যেব—মদক বস্তু সোমের ন্যায়।

প্রথমানি—মুখ্যানি।

পাত্রা—পাত্রাণি।

স্তোমাঃ—স্তোত্রাণি।

প্রযন্তি—গচ্ছন্তি—যাইতেছে।

দেবগণের আহ্বান কর্ত্তা আমাদের আনন্দদাতা অগ্নি, সকল জনকে সমস্তধন দান করিতেছেন। আমাদিগের এই মাদক বস্তু সোমের ন্যায় মুখ্য পাত্র সকল এবং মুখ্য স্তোত্র সকল সেই এই অগ্নি দেবে যাইতেছে।১০॥

চতুর্থ দ্ব শতি সম্পূর্ণ।

পঞ্চম খণ্ডে।

সেয়ং প্রথমা।

(বামদেব ঋষিঃ)

৩ ১ ২ ৩১র ২র ৩ ১ব ২র৩
এ না বো অগ্নিং নম সোর্জ্জো নপাত

১ ২
মাহুবে।

৩ ১স্ব ২র ৩১ ২ ৩১র ২র
প্রিয়ং চেতিষ্ঠ মরতিং স্বধ্বরং বিশ্বস্য

৩২৩১২
দূতমমৃতম্ ॥১॥

উর্জ্জঃ—বলস্য। নপাতং—পুত্রং (অগ্নি বলের পুত্র, কারণ অরণী মন্থন করিলে অগ্নি নির্গত হয় উহা বলের প্রয়োজন)

প্রিয়ং—অস্মাকং প্রিয়মিত্যর্থঃ—আমাদের প্রিয়।

চেতিষ্ঠং—অতিশয়েন জ্ঞাতারং—প্রজ্ঞাতারং—প্রজ্ঞাপকং বা—অতিশয় প্রকাশক।

অরতিং—গন্তারং স্বামিনং বা স্বধ্বরং—সুযজ্ঞং বিশ্বস্য দূতং—সর্ব্বস্য যজমানস্য দূতং।

অমৃতং—নিত্যং অগ্নিং।

এনা—এনেন ("ইদং" শব্দের "এন" আদেশ ছন্দঃজন্ত)

আহুবে—আহ্বয়ামি।

অগ্নি বলের পুত্র তিনি আমাদের প্রিয়, তিনি আমাদের স্বামী ও অতিশয় প্রকাশক। তিনি সকল যজ্ঞে গিয়া যজমানগণের দূত হইয়া থাকেন, তিনি নিত্য অর্থাৎ তাঁহার বিনাশ নাই হে স্তোতৃগণ! আমি তোমাদের জন্য সেই অগ্নি দেবকে এই স্তোত্র দ্বারা আহ্বান করিতেছি।১॥

অথ দ্বিতীয়া।

(ভর্গ ঋষি)

২ ৩ ১২ ৩২৩ ২ ৩ ১২
শেষে বনেষু মাতৃষু সং ত্বা মর্ত্তাস ইন্ধতে।

১২ ৩১ ২ ৩২৩ ২উ ৩১২
অতন্দ্রো হব্যং বহসি হবিষ্কৃত আদিদ্দেবেষু

রাজসি ॥২॥

বনেষু মাতৃষু চ ত্বং শেষে স্বপিষি বর্ত্তসে—বনে ও মাতা সকলের ক্রোড়ে তুমি শুইয়া আছ (অরণী কাষ্ঠ হইতে যখন অগ্নি না নির্গত হন, তখন তিনি যেন মাতৃ ক্রোড়ে শয়ন করিয়া থাকেন)

ত্ব—ত্বাং। মর্ত্তাসঃ—মনুষ্যাঃ—অধ্বর্য্যাদয়ঃ।

সংইন্ধতে—মন্থনেনোৎপাদ্য সমিন্ধতে—মন্থনদ্বারা উৎপন্ন করিয়া প্রবৃদ্ধ করিতেছে।

অতন্দ্র—অনলসঃ সন্।

হবিষ্কৃতঃ—যজমানস্য।

হব্যং—হবিঃ। বহসি—দেবান্ প্রতি ইত্যর্থঃ।

আদিদ্—অনন্তরমেব।

দেবেষু—দেবেষু মধ্যে ইত্যর্থঃ—অর্থাৎ ঋত্বিক্‌গণের মধ্যে।

রাজসি—দীপ্যসে—দীপ্তি পাইতেছ।

হে অগ্নি! তুমি বনে ও মাতা সকলের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া আছ; অধ্বর্য্যুগণ মন্থন দ্বারা তোমাকে প্রবুদ্ধ করিয়া কাষ্ঠ সকল দ্বারা প্রবৃদ্ধ করিতেছে। তুমি প্রবুদ্ধ হইয়া আলস্যশূন্য হইয়া যজমানের হবি বহন করিতেছ ও অনন্তরই ঋত্বিকগণের মধ্যে দীপ্তি পাইতেছ।২।

অথ তৃতীয়া।

(সোভরি ঋষিঃ)

১২ ৩ ১ ২ ৩ ১২ ৩ ১ ২ ৩ ২
অদর্শি গাতু বিত্তমো যস্মিন্ ব্রতান্যাদধুঃ।
৩ ২৩১র ২র ৩ ১২ ৩১ ২
উপো ষু জাতমার্য্যস্য বর্দ্ধনমগ্নিং নক্ষন্ত
৩ ১ ২
নো গিরঃ ৩।

যস্মিন্—অগ্নৌ ইত্যর্থঃ। ব্রতানি—কর্ম্মাণি।

আদধুঃ—যজমানাঃ আহিতবন্তঃ—যজমানগণ রাখিয়াছেন।

গাতুবিত্তমঃ—অতি শয়েন মার্গাণাং জ্ঞাতা।

আদর্শি—প্রাদুরভূৎ।

সুজাতং—সম্যক্ প্রাদুর্ভূতম্।

আর্য্যস্য—উত্তমবর্ণস্য। বর্দ্ধনং—বর্দ্ধয়িতারং।

নঃ—অস্মাকং।

গিরঃ—স্তুতিরূপা বাচঃ।

উপোনক্ষন্ত—উপগচ্ছন্ত—উপগত হউক।

যে অগ্নিতে যজমানগণ কর্ম্ম সকল রাখিয়াছেন, সন্মার্গের উত্তমরূপ জ্ঞাতা সেই অগ্নি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। আর্য্যগণের উন্নতিকারক সেই অগ্নি-প্রাদুর্ভূত অগ্নিদেবে আমাদিগের স্তুতিবাক্যগুলি উপগত হউক। (আর্য্যগণ অগ্নি লইয়া যজ্ঞ করিতেন, অন্য কার্য্য করিতেন না, সুতরাং তাহাতে তাঁহারা নিজের উন্নতি করিতেন; ফলতঃ সংসারেরও উন্নতি-সাধন হইত। ব্রাহ্মণের জীবন ক্ষুদ্র কামনার জন্য নহে—তাঁহাদের জীবন তপস্যার জন্য;—

"ব্রাহ্মণস্য দেহোহং ক্ষুদ্র কামায় নেষ্যতে।
কৃচ্ছ্রায় তপসে চেহ প্রেত্যানন্তসুখায়চ
শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে, ৮১ অধ্যায়ে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

আনন্দোচ্ছ্বাস!

(বর্ত্তমান ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৯ই আগষ্ট দিবসে আমাদের রাজরাজেশ্বর সপ্তম্ এডোয়ার্ডের শুভরাজ্যাভিষেক-উৎসব উপলক্ষে।)

পৃথিবী ব্যাপিয়া, উঠিল ছাপিয়া
উত্তাল-আনন্দ-তরঙ্গ-ভঙ্গ!
রাজরাজেশের রাজ্যাভিষেকের
মহাউৎসবের মহান্ রঙ্গ!
গ্রেটবৃটানিয়া, এ ভারতদেশ,
ব্রহ্মদেশ, অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ,
প্রকাণ্ড কানাডা, প্রায়ার্দ্ধ-আফ্রিকা,
সিন্ধু-ক্রোড়ে শতদ্বীপা সাগরিকা,
রাজভক্তি-রসে প্লাবিত কায়!
পঞ্চমাংশ-পৃথ্বীরাজ-অধিরাজ
শুভক্ষণে রাজসিংহাসনে আজ
করিলেন নব শুভ-সুবিরাজ,
নিরখিয়ে ভক্ত প্রকৃতিসমাজ—
উৎসব উল্লাসে উন্মত্ত প্রায়!

শুভ অভিষেক আজি শুভক্ষণে,
কি আনন্দ তায় মর্ত্ত্যের 'নন্দনে'!
সুবিপুল-সমারোহ-সমীরণে
উৎসব উদধি উথলে কিবা!

প্রদেশে প্রদেশে প্রবাহ-প্রসার;
নগরে নগরে নিদর্শ যাহার;
সদনে সদনে শোভার বাহার;
বদনে বদনে বিজলি-বিভা!

ভারতের কথা কি কহিব আর?
ভারতে ভূপাল ঈশ্বরাবতার!
অষ্টদেবতার অষ্ট-শক্তি সার,
সৃষ্ট ভারতের ভূপতি তায়!
"নরাণাঞ্চ নরাধিপ" এই বাণী—
গীতায় গোবিন্দ গেয়েছেন জানি;
সে ধ্বনির আজ শত প্রতিধ্বনি
ভারত হৃদয়-গগনে ধায়!
ভারত ঈশ্বরী ভিক্টোরিয়া মাতা
ছিলেন ভারতে আরাধ্যা দেবতা;
ঈশ্বরেচ্ছা-বশে এবে স্বর্গগতা;
সে শোকাশ্রু মুছে ফেলেছি আজ।
তাঁরি সে প্রসাদী সিংহাসন-পর,
তাঁরি প্রিয়তম পুত্র গুণধর—
বসিলেন হয়ে রাজরাজেশ্বর,
ধরি জন মন-মোহন সাজ!
ভারতের সেই মহামণিরাজ
কোহীনুর করে কিরীটে বিরাজ!
বসন-ভূষণ-আসনের সাজ—
ভূতলে অতুল শোভার সেরা।
বিরাজিতা বামে রাজেন্দ্রাণী অই,—
শ্রীমতী আলেক্জান্দ্রা শোভাময়ী!
ও যুগলরূপ দরশনে হই—
মানস নয়নে মোহিত মোরা?
সূর্য্য নাহি অস্তে যান রাজ্যে যাঁর,
ছয় মহাদেশে যাঁর অধিকার,
আজি শুভরাজ্য-অভিষেক তাঁর,
পৃথিবী ব্যাপিয়া উৎসব তায়!
বিংশ শতাব্দীর শুভ সংঘটন,
ভাবী-ইতিহাস-অঙ্গ সুশোভন,
এডোয়ার্ড সপ্তমের সিংহাসন
শুভসংস্থাপন আজি ধরায়!
বাজাও আনন্দে ঢক্কা-তুরী-ভেরী,
বাজাও বিগল্-বেহালা-বাঁশরী;
সাজাওরে পল্লী-নগর-নগরী;
উৎসব-উল্লাসে নাচাও দেশ।
গভীর গরজি উঠুক্ কামান,
উৎসব-নির্ঘোষে ফাটুক্ বিমান,
ছুটুক্ প্রমোদ-তরঙ্গ-তুফাণ,
টুটুক্ প্রজার বিষাদ-ক্লেশ।
কর জয়ধ্বনি মাতায়ে মেদিনী,
"জয় রাজরাজ—জয় রাজেন্দ্রাণী!"
এডোয়ার্ড সপ্তমের জয়ধ্বনি—
সপ্তমে চড়িয়া ছুটুক্ নভে।
মাতা ভিক্টোরিয়া স্বর্গাসনে বসি,
পিতা এল্বার্ট সহ সুখে ভাসি,
দেখুন পুত্রের পৃথ্বী উল্লাসী
রাজ্য অভিষেক-উৎসব ভবে।
"স্বর্গে হ'ক জয় শ্রীমহারাণীর,
মর্ত্ত্যে হ'ক জয় নবভূপতির"
এ বাসনা দীন ভারতবাসীর—
পূরাও দয়ায় দয়াল হরি!
আমাদের রাজরাজেশ্বরে পদে
রেখো চিরদিন সম্পদে বিপদে;
এ প্রার্থনা অই অভয় শ্রীপদে
সবে সর্ব্বান্তরে কাতরে করি।
কর "হিপ্ হিপ্ হুরে হুরে" ধ্বনি—
কাঁপায়ে ছাপায়ে গগন-মেদিনী!
কর পরে বিশ্বরাজ-জয়ধ্বনি—
'হরিধ্বনি' সর্ব্বধ্বনির সার!
উৎসবে উল্লাসে হইয়ে বিভোল,
প্রেমানন্দে সবে বোল্ হরিবোল!
বোল হরিবোল! হরিহরিবোল!
হরিবোল হরিবোল আবার!

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।
(যশোহর)

শ্রীহরিঃ।

(১৮৬৭ সালের ২৫ আইন মতে রেজষ্ট্রীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।

৯ম বর্ষ, ৯ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা। | ভাদ্র। | ১৩০৯ সাল, ১৮২৪ শকাব্দা,

জাতিভেদ।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

৩। ঋগ্বেদে প্রক্ষিপ্ত-শ্লোক।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ঋগ্বেদ-প্রণয়ন অল্প দিনে হয় নাই। ঋগ্বেদ-প্রণয়নে প্রায় ছয় শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছিল। সুতরাং ঋগ্বেদের প্রণেতা যে একজন নহেন, তাহাব আর সন্দেহ নাই। আমরা মৎস্য পুরাণেও ৯১ জন বৈদিক ঋষির নামোল্লেখ দেখিতে পাই। ইঁহারাই ঋক্ সমূহ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।*

"ঋগ্বেদের মন্ত্র দশমণ্ডলে বিভক্ত। প্রথম ও দশমমণ্ডল ভিন্ন অপর আট মণ্ডল ৮ জন ঋষির রচিত। একজন ঋষি বলিতে বোধ হয়, সেই ঋষির বংশীয় ব্যক্তি অথবা তদনুসারী শিষ্য পরম্পরা বুঝিতে হইবে। দ্বিতীয় মণ্ডলের প্রণেতা গৃৎসমিৎ। এই গৃৎসমিৎ ও শৌনক একই ব্যক্তি বলিয়া প্রবাদ আছে। তৃতীয়-মণ্ডলের প্রণেতা বিশ্বামিত্র, চতুর্থ-মণ্ডলের প্রণেতা বামদেব; পঞ্চম-মণ্ডলের প্রণেতা অত্রি; ষষ্ঠ-মণ্ডলের প্রণেতা ভরদ্বাজ; সপ্তম মণ্ডলের প্রণেতা বশিষ্ঠ; অষ্টম-মণ্ডলের প্রণেতা অঙ্গিরা। প্রথম-মণ্ডলে ১৯১ সূক্ত; ১০ম মণ্ডলেও ১৯১ সূক্ত। তাহা নানা কাল্পনিক ঋষির প্রণীত বলিয়া পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিয়াছে।"†

যাঁহারাই ঋগ্বেদ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিয়া থাকিবেন যে, ইহার দশম মণ্ডল অন্যান্য নয় মণ্ডল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। ইহা যেন সেই মহাগ্রন্থের পরিশিষ্ট মাত্র। এই দশম মণ্ডলের অধিকাংশ সূক্তই অপ্রাচীন। এই সূক্ত হইতেই তাৎকালিক সমাজে স্বাধীন চিন্তা শক্তির বিকাশ, সাম্য-

---

* মৎস্যপুরাণ। ১৩২ অধ্যায়।

† শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই।

জিক উন্নতি, সমাজান্তর্গতঃ নানাবিধ জটিল অবস্থা প্রভৃতির সমূহ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিবাহ প্রভৃতির বর্ণনা ও মন্ত্র এবং পরলোকের বর্ণনা এই দশম মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত অংশ।

সকলেই অবগত আছেন যে, অথর্ব্ববেদ ঋগ্বেদের তুলনায় তত প্রাচীন নহে। এই অথর্ব্ববেদে রোগ প্রতিকারের উদ্দেশ্যে রচিত অনেক মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদেও তাহা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রমেশ বাবু বলিয়াছেন :—"আবার দশম মণ্ডলের অনেক মন্ত্রের প্রণেতা স্ব স্ব নাম গুপ্ত রাখিয়া মন্ত্রগুলি দেবতাদের নামে প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। দেবতাদের রচিত বলিলে এই সকল মন্ত্র প্রাচীন বলিয়া প্রমাণিত হইয়া যাইবে, বোধ হয় এইরূপ অভিপ্রায়।"

অন্য এক স্থানে তিনি বলিতেছেন—"যে সময় মন্ত্রগুলি মণ্ডলাদিতে বিভক্ত হইয়া সংগৃহীত হয়, সেই সময় দশম মণ্ডলের অধিকাংশ মন্ত্র রচিত হইয়া থাকিবে, সেই সময়েই তাহা সঙ্কলিত ও ঋগ্বেদের শেষ ভাগে সংযুক্ত হইয়া যায়।"

বর্ত্তমান যুগের ন্যায় বৈদিক যুগে সাহিত্য চর্চ্চা এত বিস্তৃতি লাভ করিতে পারিয়াছিল না। ঋগ্বেদের সময়ে বর্ণমালার সৃষ্টি হয় নাই, তাই লিখন পঠন তখন ছিল না। আর্য্যগণ লীলাময়ী প্রকৃতির সুন্দর সুন্দর বিচিত্র দৃশ্য সকল দর্শন করিয়া আপন আপন সরল হৃদয়ের সাময়িক ভাবানুযায়ী গীত রচনা করিতেন, মন্ত্র রচনা করিতেন; কখনও বা সামাজিক অভাব অভিযোগ, রীতিনীতি সম্বন্ধেও শ্লোকাবলী রচিত হইত—আর সেই সকল গীত বা মন্ত্র বা শ্লোক আবহমান কাল পর্য্যন্ত শ্রবণ মাত্রেই আবদ্ধ ছিল, পিতার নিকট পুত্র তাহা শিক্ষা করিত, গুরুর নিকট শিষ্য তাহা শিক্ষা করিত।

এই সকল হইতেই বেশ অনুমিত হইতে পারে যে, ঋগ্বেদের মত একখানি অতিশয় প্রাচীন গ্রন্থে—যে গ্রন্থের রচয়িতা ভিন্ন ভিন্ন এবং সংগ্রহ কর্ত্তাও তাহাই, যে গ্রন্থ প্রণয়নে প্রায় ছয় শতাব্দীকাল ব্যয়িত হইয়া থাকিবে, যে গ্রন্থের শ্লোকগুলি সর্ব্ব প্রথমে কেবল মাত্র শুনিয়াই শিখিয়া রাখিতে হইত, কারণ লিখিত ভাষার বা অক্ষরের সৃষ্টি তখনও হইয়াছিলনা—সেই প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদের অনেক শ্লোক সংগ্রহকারক কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে। এরূপ হওয়া অসম্ভবও নহে। প্রথমতঃ শ্লোকগুলি শুনিয়া শুনিয়া শিক্ষা করিবার পর হয়ত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইয়া গেলে স্মরণ শক্তির দৌর্ব্বল্য বশতঃ বা নিয়ত আবৃত্তি না থাকিবার জন্য তাহাদিগের স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন ঘটা অসম্ভব নহে। সুতরাং প্রথম যুগের পরবর্ত্তী যুগ সমূহে অনেকে হয়ত একেবারে মৌলিক শ্লোকগুলি শিক্ষা করিবার আদৌ সুযোগ পান নাই। তাহার পর, যিনি যখন যে শ্লোক সংগ্রহ করিয়াছিলেন (এখনও আমরা অনেক পুস্তকে পাঠান্তর গ্রহণ করিয়া থাকি), এবং যিনি যখন যে নূতন শ্লোক রচনা করিয়া, তাহা সেই ঋগ্বেদের যুগের প্রাচীন আর্য্যদিগের রচিত শ্লোক বলিয়া ঋগ্বেদের কলেবরে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, সেই নবরচিত

শ্লোক সমূহে নিশ্চয়ই তাৎকালিক অভাব, অভিযোগ এবং সামাজিক চিত্রের ছায়া থাকিবেই থাকিবে। কারণ সমাজ মানব-হৃদয় গঠন করে, আর ভাষাও ভাব সেই হৃদয়ের অবিকৃত চিত্র।

আমরা পূর্ব্বেই একবার বলিয়াছি যে, ঋগ্বেদ-প্রণয়নের যুগে আর্য্যভূমে ব্রাহ্মণ প্রাধান্য বিস্তার করিবার একটী বিশাল তরঙ্গ রঙ্গে ভঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া গ্রামে গ্রামে জনপদে জনপদে বাত্যাসংক্ষুব্ধ লবণাম্বুরাশিবৎ ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য স্থাপয়িতৃগণের যত্নে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অনেকগুলি সূক্ত প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ভট্ট মোক্ষমূলর, মিঃ ওয়েবর, মিঃ কোলব্রুক, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে আর তিলমাত্রও সন্দেহ করেন না। রমেশ বাবু এবং মুয়ার সাহেবের মত ও ইতঃপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। শুধু ঋগ্বেদ বলিয়া নহে, হিন্দুর গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের অভাব নাই। অধুনা রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থেও প্রক্ষিপ্ত শ্লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। বহুদিন পূর্ব্বে সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায়' এই বিষয়ের একবার আলোচনাও হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

কেবল ভারতবর্ষে কেন, পাশ্চাত্য জগতেও এরূপ ঘটনা দুর্লভ নহে। একবার ইংরাজের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলকেও নাকি উন্নত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল! তাহারই সমালোচনায় Distaeli সাহেব বলিতেছেনঃ—

"He (Selastian castillion) fancied he could give the world a more classical version of the Bible and for this purpose introduces phrases and entire sentences from profane writers into the text of the holy writ. His whole style is finically quaint, overloaded with prettinesses and all the ornaments of false tastes. Of noble simplicity of the "scripture he seems to have not had the remotest conception."* বলা বাহুল্য যে ফরাসি লেখক Pere Berrenyer ও একবার এই প্রকার উদ্যম করিয়াছিলেন, Disraili সাহেব তাহারও সমালোচনা করিয়াছেন।

তাহাহইলেই দেখা যাইতেছে যে, বর্ণ-ভেদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যাঁহারা ঋগ্বেদের দোহাই দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের সে নজীরের শক্তি কিছু নাই—আমরা অনায়াসে সে নজীর অবহেলা করিতে পারি।†

৪। পুরুষ সূক্তের ছায়া।

ঋগ্বেদে চতুর্ব্বর্ণ মনুষ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা স্থূলতঃ তাহা দেখাইয়াছি। হিন্দুর গ্রন্থ একখানি নহে। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি মন্থন করিলে আরও অনেক রহস্য প্রকাশিত হইতে পারে।

মানব ধর্ম্ম-শাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ের ৩১

---

* "Curiosities of Literature"—Disraeli ; Vol II.

† "In the Rigveda the caste system of later times is wholly unknow." Elphinstone's History of India—Appendix VIII.; p. 286.

শ্লোক পুরুষ সূক্তাবলম্বনে লিখিত হইয়াছে।

"লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ-
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥"

অর্থাৎ "সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর প্রজা বৃদ্ধি করিবার মানসে আপন মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে ক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ-মনুষ্য সৃষ্টি করিলেন।" কিন্তু মনুসংহিতার তৎপরবর্ত্তী অন্যান্য শ্লোক সমূহ পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উক্ত ৩১ শ্লোকের সহিত তাহাদিগের সামঞ্জস্য নাই। বরং মুষা লিখিত ধর্ম্ম গ্রন্থের মানবসৃষ্টি প্রকরণের সহিত পরবর্ত্তী শ্লোক সমূহে বর্ণিত মানব-সৃষ্টি প্রকরণের অনেক মিল দেখিতে পাওয়া যায়।

বাজসনেয় সংহিতা (৩১। ১৬) এবং অথর্ব্ববেদেও (১৯।৬।৬) আমরা এই পুরুষ সূক্তের ছায়া দেখিতে পাই।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথম অধ্যায় "পুরুষসূক্ত" অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। তাহাতে আছে "বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বমূর্ত্তি সহস্র শিরা পুরুষের মুখ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় তাঁহার ভুজ, বৈশ্য তাঁহার উরু এবং কৃষ্ণবর্ণ-শূদ্র তাঁহার পদ।" অন্যত্র—

"বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বিট্-শূদ্রা মুখবাহূরুপাদজাঃ।
বৈরাজাৎ পুরুষাজ্জাতা য আত্মচার লক্ষণাঃ॥"*

আমরা বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাইঃ—

"সত্যাভিধ্যায়িনঃ পূর্ব্বং সিসৃক্ষোর্ব্রহ্মণো জগৎ।
... ...
ব্রাহ্মণা ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রাশ্চ দ্বিজসত্তম।
পাদোরু বক্ষঃস্থলতো মুখতশ্চ সমুদ্গতাঃ॥
যজ্ঞ নিষ্পত্তয়ে সর্ব্বমেতদ্ ব্রহ্মা চকার বৈ।
চতুর্ব্বর্ণ্যং মহাভাগ যজ্ঞ-সাধন মুত্তমম্॥"†

মহাভারতেও যে এই পুরুষসূক্তের আভাস আছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি।*

"বিধিনা পুরুষসূক্তস্য গত্বা বিষ্ণুং সমর্চ্চয়েৎ"

প্রভৃতি শ্লোক হইতে জানিতে পারিতেছি যে, হারিত সংহিতাতেও পুরুষসূক্তের ছায়া আছে। এতদ্ভিন্ন বিবিধ হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থে এমন আরও অনেক শ্লোক আছে, যাহা পুরুষ-সূক্তাবলম্বনে রচিত হইয়াছে।

কিন্তু ঋগ্বেদই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। সেই ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তও যে প্রক্ষিপ্ত মধ্যে গণ্য, তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং সেই পুরুষসূক্তের ছায়া লইয়া পরবর্ত্তী শাস্ত্রকারগণ যে সকল শ্লোক রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল শ্লোকও জাতিভেদের প্রাচীনত্ব সমর্থন করিতে নিতান্ত অক্ষম। পুরুষসূক্ত আলোক—পরবর্ত্তী শাস্ত্রকারদিগের রচিত শ্লোক তাহার ছায়া মাত্র। যদি আলোকই না থাকিল, তবে ছায়ার অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভব হইবে?

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রাচীন আর্য্যসমাজের জাতিগত পার্থক্য।

প্রাচীন আর্য্যসমাজের যে জাতিগত কোন পার্থক্য ছিল না, তাহার প্রমা[ণ]

* শ্রীমদ্ভাগবত। ১১। ১৭। ১১
† শ্রীমদ্ভাগবত ১১। ৫। ২

* মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব।
† বিষ্ণুপুরাণ। ১। ৬

নির্দ্দেশ করা কঠিন নহে। আমরা সংক্ষেপে তদ্বিষয়ের আলোচনা করিব, কারণ আলোচ্য-বিষয়ের সত্যতা অনেক দিনই নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে।

(১) "ন বিশেষোস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টংহি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতং॥"*

অর্থাৎ বর্ণ-ভেদ নাই, সমস্ত জগতে এক ব্রাহ্মণ মাত্র ব্রহ্ম কর্ত্তৃক পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছিল, তৎপরে কর্ম্মের বিভিন্নতা বশতঃ বর্ণের বিভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান জাতিভেদের প্রথা জাতিগত বা জন্মগত নহে—ইহা কর্ম্মের বিভিন্নতা বশতঃই অভ্যুদিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের প্রাচীন মন্ত্র সকল পাঠ করিলেও কেবল "আর্য্য" ও "দস্যু" এই দুই শ্রেণীর লোকের উল্লেখই দেখিতে পাওয়া যায়।

(২) পূর্ব্বে একমাত্র জাতিই বর্ত্তমান ছিল, তাহা হইতেই ক্ষত্র প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছে।

"ব্রহ্মবা ইদমগ্রে আসীৎ একমেব, তদেকং সৎ নব্যভবৎ। তচ্ছ্রেয়োরূপং অত্যসৃজত ক্ষত্রং।"*

অর্থাৎ—অগ্রে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই ছিল। ঐ জাতি একাকী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল না সুতরাং সেই শ্রেষ্ঠ বর্ণ (ব্রাহ্মণ) ক্ষত্রকে সৃষ্টি করিলেন।

বর্ত্তমান শ্লোকে "ব্রহ্ম" শব্দের অর্থ লইয়া একটু গোলযোগ হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারাই বেদ বা স্মৃতির সামান্যও পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে 'ব্রাহ্মণ' অর্থে "ব্রহ্ম" শব্দের প্রয়োগ অনেক স্থলেই আছে। যিনিই ব্রহ্মকে জানেন বা ধারণ করেন, তিনি ব্রাহ্মণ। ইহাই "ব্রাহ্মণ" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহে "ব্রহ্ম" শব্দের অনেক অর্থ দৃষ্ট হই থাকে যথা—

১। ঈশ্বর।	৪। বেদ।
২। ব্রাহ্মণ জাতি	৫। তপঃ।
৩। বেদ মন্ত্র।	৬। ব্রহ্মতেজ।

ইত্যাদি।

ঋক্‌সংহিতার ১।৮০।১; ১।১৬৪।৩৫; ২।৩৯।১; ২।১২।৬; ৫।১০।৮; ৯।১১৩।৬ প্রভৃতি মন্ত্রে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ স্তোতা বা ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।

"উপরোক্ত ঋক্ সংহিতার প্রমাণ দ্বারা বোধ হইবে, যাঁহারা বেদের মন্ত্র দ্বারা স্তুতি করিতেন বা বেদমন্ত্রের প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা বা তাঁহাদের অপত্যগণই ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইয়াছেন। ঋষিগণই বেদ মন্ত্রের প্রকাশক ও স্তোতা, কাজেই ঋষি বা ঋষিপুত্রগণই ব্রাহ্মণ পদলাভ করেন। যখন নির্ম্মল চেতা আর্য্য ঋষিগণ শীতপ্রধান হিমালয় প্রদেশে সাত্বিক ভাবে বনবাস করিতেন, যখন তাঁহাদের উপাস্য বা আরাধ্য দেবগণের স্তোত্র উচ্চারণই তাঁহাদের জীবনের প্রধান কার্য্য বলিয়া গণ্য ছিল, যখন

* মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব। শান্তিপর্ব্ব ১৮৮ এবং ১৮৯ অধ্যায়ে বর্ণভেদের আলোচনা আছে। এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করা বাহুল্য মাত্র। "ভৃগু-ভরদ্বাজ সংবাদ" দ্রষ্টব্য।

* বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

শীতাতিশয্যে তাঁহাদের শ্বেত-মূর্ত্তি বিকৃত ভাব ধারণ করে নাই, যখন তাঁহাদের মধ্যে সমাজ বন্ধনের জন্য শ্রেণীবিভাগরূপ বিশেষ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন হয় নাই, যে সময়ে তাঁহারা তাঁহাদের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী অসভ্য বর্ব্বরদিগকে মানব মধ্যেই গণ্য করিতেন না, সেই অতি প্রাচীনকালে আর্য্যগণ সম্ভবতঃ কেবল ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ নামেই পরিচিত ছিলেন ... ...।"*

বেদমন্ত্র যাঁহারা ধারণ করেন, তাঁহারাও ব্রাহ্মণ। মনু বলিয়াছেনঃ—

"উত্তমাঙ্গোদ্ভবাৎ জ্যৈষ্ঠ্যাৎ ব্রাহ্মণ শ্চৈব ধারণাৎ।
সর্ব্বস্যৈবাস্য সর্গস্য ধর্ম্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ॥"

অর্থাৎ—উত্তমাঙ্গ হইতেই উৎপন্ন হওয়াতে, জ্যেষ্ঠতা নিবন্ধন এবং বেদ মন্ত্রের ধারণ নিবন্ধন, ব্রাহ্মণ এই সমুদয় সৃষ্টির প্রভু।

সুতরাং পূর্ব্বোক্ত "ব্রহ্ম বা ইদমগ্রে..." প্রভৃতি শ্লোকে "ব্রহ্ম" শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ জাতি করা অসঙ্গত নহে।

(৩) "একএব পুরাবেদ প্রণব সর্ব্ব বাঙ্ময়ঃ।
দেবনারায়ণোনান্য একাগ্নি র্বর্ণ এবচ॥*

(৪) "ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্ব সৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতম্॥†"

(৫) "এক বর্ণ মিদং পূর্ণং বিশ্বমাসীৎ যুধিষ্ঠির।*
ইত্যাদি।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কর্ম্মের বিভিন্নতা বশতঃ বর্ণের বিভিন্নতা হইয়াছিল। কিন্তু কেবল তাহাই নহে, গুণানুসারেও আবার বর্ণের বিভাগ হইয়াছিল। এমন কি গুণের দ্বারা নিম্ন শ্রেণীর লোকও উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইতে পারিত।

(৬) যে মনু শূদ্রের উপর একেবারে খড়্গহস্ত ছিলেন, যিনি শূদ্রদিগকে সর্ব্ব প্রকার সামাজিক সুখাস্বাদন হইতে চির দিনের জন্য বঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন—যিনি ধর্ম্মের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, স্বোপার্জ্জিত ধনের অধিকার প্রভৃতি সকল প্রকার অধিকার হইতেই তাহাদিগকে দূরে রাখিয়াছিলেন, তিনিই আবার বলিতেছেনঃ—

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণ শ্চৈতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাৎ বৈশ্যাত্তথৈবচ॥*

(৭) শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন :...

নজাত্যা ব্রাহ্মণাশ্চাত্র ক্ষত্রিয় বৈশ্য এব বা
ন শূদ্রো নচ বা ম্লেচ্ছো ভেদিতা গুণকর্ম্মভিঃ।†

(৮) তিনিই আবার অন্যত্র বলিয়াছেন—

জ্ঞান কর্ম্মোপাসনাভি র্দেবতারাধনে রতঃ
শান্তো দান্তো দয়ালুশ্চ ব্রাহ্মণশ্চ গুণৈঃ কৃতঃ।†

(৯) চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ।*

(১০) ভট্ট মোক্ষমূলের কৃত ধর্ম্ম সূত্র বচনে আমরা দেখিতে পাইঃ—

* বিশ্বকোষ প্রণেতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবুর "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস"।

* শ্রীমদ্ভাগবত।

† পদ্মপুরাণ স্বর্গ খণ্ড-২৫ অ,

* মহাভারত।

* মনু, ১০। ৬৫;

† শুক্রনীতি।

* ভগবদ্গীতা।

"ধর্ম্মচর্য্যয়া জঘন্যো বর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণ মাপদ্যতে জাতি পরিবৃত্তৌ, অধর্ম্মচর্য্যয়া পূর্ব্বো বর্ণো জঘন্যং জঘন্যং বর্ণমাপদ্যতে জাতি পরিবৃত্তৌ।"

মহর্ষি আপস্তম্ব শূদ্রের প্রতি কঠিন বিধি বিধান করিতে ত্রুটি করেন নাই, তথাপি তিনিও বলিতেছেন যে "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অধর্ম্মাচরণ দ্বারা পর পর বা একেবারে অধম জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেইরূপ শূদ্র বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় ক্রিয়াবান হইলে পর পর বা একেবারে উচ্চ জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

(১১) শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদির ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ সমূহ বর্ণনার পর আমরা দেখিতে পাই :—

'যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥"

অর্থাৎ—"যে পুরুষের বর্ণজ্ঞাপক যে লক্ষণ বলিলাম, অন্য বর্ণেও যদি সেই লক্ষণ দেখা যায়, তাহা হইলে তাহাকেও ঐ বর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইবে।"

(১২) আজিও যে গায়ত্রীর দ্বারা ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্ব রক্ষিত হইতেছে, সেই বেদমাতা গায়ত্রীর রচয়িতা বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ সন্তান নহেন—ক্ষত্রিয়ের সন্তান। তিনি স্বীয় তপস্যা বলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

"Gayatri itself, the most sacred symbol in the universe, is a verse in a hymn by an author not a Brahman by birth, but a Kshatriya, who is represented in iater legends as extorting his admission into the Brahman caste"......*

(১১) "করূষাৎ মানবাৎ আসন্ করূষাঃ ক্ষত্রজাতয়ঃ।
উত্তরাপথগোপ্তারো ব্রহ্মণ্যা ধর্ম্মবৎসলাঃ॥†

মনুর পুত্র করূষ হইতে কারূষ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়, ইহারা ক্ষত্রজাতীয়। ইহারা উত্তরাপথের রক্ষক, ব্রহ্মণ্য এবং ধর্ম্মবৎসল ছিল।

(১২) পৃষধ্রস্তু হিংসয়িত্বাতু গুরোর্গাং জনমেজয়। শাপাৎ শূদ্রত্বমাপন্নঃ॥*

পৃষধ্র রাজা গুরুর গো হত্যা করিয়া শাপ বশতঃ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(১৩) "নাভাগারিষ্ট পুত্রৌ-দ্বৌ-বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।"* নাভাগারিষ্ট পুত্র বৈশ্য হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(১৪) ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব ঋষভের একশত পুত্রের মধ্যে একাশীতি জন কর্ম্ম-তন্ত্র প্রণেতা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন এবং কবি হবিঃ প্রভৃতি নয় জন পরমার্থ নিরূপক মুনি হইয়াছিলেন †

(১৫) গার্গ্য ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন হইলেও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।*

(১৬) দুরিত ক্ষয়ের তিনটী পুত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন *

---

* Exphinstones Histroy of India—p. 282.
† শ্রীমদ্ভাগবত। ৯। ২
* হরিবংশ। ৯ম অধ্যায়।
* হরিবংশ। ১১। ৬৫৮
† শ্রীমদ্ভাগবত ১১। ২
* শ্রীমদ্ভাগবত ৯। ২১

(১৭) অজমীঢ়ের বংশে প্রিয় মেধাদি দ্বিজগণ উৎপন্ন হন।*

(১৮) কক্ষিবান বৈদিক ঋষিদিগের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ঋষি। তিনি কলিঙ্গ দেশীয় রাজপুত্র এবং ক্ষত্রিয়। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১১৬ হইতে ১২৫ এবং নবম মণ্ডলের ৭৪ সূক্ত তাঁহার রচিত।

(১৯) কবষ ঐলুষ ঋষি একজন শূদ্র। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ এবং ৩৪ সূক্ত এই ঋষির প্রণীত। যে শূদ্রের বেদ প্রণয়ন দূরে থাকুক বেদ পাঠ শ্রবণের অধিকারও ছিল না, বলিয়া বর্ণিত আছে সেই শূদ্রই বেদের শ্রেষ্ঠ ঋগ্বেদের প্রণেতা!* এই ঋষি ব্রাহ্মণদিগের সহিত কলহ করিয়া স্বয়ং ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

(২০) প্রধান প্রধান পুরাণ মতে বিতথের পঞ্চ পুত্র—সুহোত্র, সুহোত্র, গয়, গর্গ ও মহাত্মা কপিল। সুহোত্রের দুই পুত্র কাশক ও রাজা গৃৎসমিত। এই গৃৎসমিতের পুত্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতীয় ছিলেন।

(২১) একই পিতার পুত্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবার প্রমাণ ভূরি ভূরি প্রদর্শিত হইতে পারে। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি ভয়ে তাহা হইতে ক্ষান্ত থাকিতে বাধ্য হইলাম †

(২২) মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গতঃ অজগার পর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত আছে:—"শূদ্রবংশজ হইলেই যে শূদ্র হয় এবং ব্রাহ্মণ বংশীয় হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে। যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয় না, তাহারাই শূদ্র।"

(২৩) পরশুরামের সাহায্যে যে কেবল দেশীয় ধীবরগণও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, ইহা সকলেই অবগত আছেন।*

(২৪) মৌদগল্য ও কাণ্বায়ণ গোত্রজ সমস্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বংশজাত। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মুদ্গল হইতে ব্রাহ্মণ জাতির মৌদ্গল্য গোত্র সম্ভূত হইয়াছিল।†

(২৫) কর্ম্মদ্বারাই যে সঙ্কীর্ণ বর্ণ প্রভৃতি বিভক্ত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ তাহা না হইলে বশিষ্ট, ব্যাস, শুক, মন্দপাল, কণাদ প্রভৃতি ভারত বিখ্যাত ঋষিগণ কেহই ব্রাহ্মণ হইতে পারিতেন না। ইঁহাদিগের মাতাগণ সকলেই নীচ জাতীয়—শূদ্র কুল সমুৎপন্না।

দার্শনিক মহর্ষি কণাদের জননী অনার্য্যা জাতীয়া—তাহার নাম উলকী। এই জন্যই কণাদ দর্শনের অপর নাম ঔলক্য দর্শন। বশিষ্ঠ পত্নী অক্ষমালা শূদ্রা হইয়াও পরে ব্রাহ্মণী হইয়াছিলেন। ম্লেচ্ছ রমণী শুকীর গর্ভে অসাধারণ জ্ঞানী ভারত বিখ্যাত শুকদেবের জন্ম। মহর্ষি বেদব্যাসের জননী সত্যবতী ধীবর কন্যা। সত্যবতী পরাশরের ঔরসে যে সন্তান প্রসব করেন, তিনিই ক্ষমতা বলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহারাজ যযাতি ব্রাহ্মণ কন্যা দেবযানির গর্ভে

* ঐতরেয় এবং কৌষতকী ব্রাহ্মণ

† শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

* স্কন্দপুরাণ।

† শ্রীমদ্ভাগবত ৯। ২১

যে দুইটী সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ভারত-বিখ্যাত-ক্ষত্রিয়-বংশের আদি পুরুষ।

(২৬) মনু তাঁহার গ্রন্থে সঙ্কীর্ণ-বর্ণের উৎপত্তি অতিশয় বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিয়া-গিয়াছেন। সেই বর্ণনার শেষ ভাগে তিনি বলিয়াছেন—

"সঙ্কর জাতয় স্ত্বেতাঃ পিতৃমাতৃপ্রদর্শিতাঃ।
প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ॥*

অর্থাৎ—পিতা মাতার নাম নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক এই সকল জাতি বলিলাম, যাহাদিগের পিতা মাতার নাম জানা যায় না, এরূপ গূঢ় কিম্বা প্রকাশ্য বর্ণের কর্ম্ম দ্বারা জাতির নির্ণয় করিবে।"

(২৭) আমরা মন্বাদি গ্রন্থ হইতে এতক্ষণ যাহা দেখাইতেছিলাম, ঋগ্বেদেও সেরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ঋগ্বেদে সরল ভাবে একজন ঋষি বলিতেছেন:—দেখ আমি স্তোত্রকার, আমার পিতা চিকিৎসক, আমার মাতা প্রস্তরের উপর যবভর্জ্জন-কারিণী। আমরা সকলে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করিতেছি। যেরূপ গাভীগণ গোষ্ঠ মধ্যে তৃণ-কামনায় ভিন্ন দিকে বিচরণ করে, তদ্রূপ আমরা ধন-কামনায় তোমার পরিচর্য্যা করিতেছি। অতএব হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।"

তাই রমেশ বাবু বলিতেছেন "যাঁহারা বৈদিক-সময়ে জাতিভেদ-প্রথা ছিল মনে করেন, তাঁহারাই বলুন, যে পরিবারের পুত্র মন্ত্রপ্রণেতা ঋষি, পিতা বৈদ্য এবং মাতা মর্য্যাদাস্থায়ী, তাঁহারা কোন্ জাতি ভুক্ত?"

(২৮) 'ব্রহ্মা স্বয়ম্ভুর্ভগবান্ দৃষ্ট্বা বিভিন্ন কর্ম্মজাম্।
ততঃ প্রভৃত্যেবেধাঃ সৃষ্টপচ্যস্তু জজ্ঞিরে।"*
ইত্যাদি—

'ভগবান স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা সেই কর্ম্মমূল সৃষ্টি-পদ্ধা প্রত্যক্ষ দৃষ্টি করিলেন। এইরূপে প্রজা-দিগের বৃত্তি উৎপাদিত হইলে স্বয়ম্ভু তাহা-দিগের মধ্যে মর্য্যাদা স্থাপন করিলেন। প্রজাসমূহ মধ্যে যাহারা পরিগৃহীতা এবং অপর প্রজার রক্ষাকর্ত্তা, তাহাদিগকে ক্ষত্রিয়, যাহারা ক্ষত্রিয়গণের আশ্রয় নির্ভর করিয়া কেবলমাত্র 'সর্ব্বভূতেই ব্রহ্ম বিদ্যমান' এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিত, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ, যাহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল এবং কৃষি-কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাহা-দিগকে বৈশ্য এবং যাহারা শোকদুঃখ পরায়ণ, নিস্তেজ, অল্পবীর্য্য এবং অন্য জাতি ত্রয়ের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিত, তাহা-দিগকে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিলেন।"

(২৯) "বায়ুপুরাণে লিখিত আছে, কৃত-যুগে বা সত্যযুগে অর্থাৎ বৈদিক-যুগে বর্ণ-ভেদ ছিল না। পরে গুণ ও কর্ম্ম বিচার করিয়া ব্রহ্মা বর্ণভেদ সৃষ্টি করেন। যাঁহাদের আদেশে সকলে চলিত, এবং যাঁহারা সাহসী ও বীরপ্রকৃতি ছিলেন, অপরকে রক্ষা করিতে পারিতেন, ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় শ্রেণী-ভুক্ত করিলেন। যে সকল সত্যবাদী,

* মনু, ১০।৪০।

* ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। পূর্ব্বভাগ।৮।১৫৪-১৬০
মার্কণ্ডেয় পুরাণ, মৎস্যপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণেও ঠিক এইরূপ বর্ণনাই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সেবাধ্যায়ী, নিঃস্বার্থ ব্যক্তি ক্ষত্রিয়ের সহচর ছিলেন, ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ করিলেন। যে সকল দুর্ব্বল ব্যক্তি কৃষি ও বাণিজ্য পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাহারা বৈশ্য হইল। যে সকল দুর্ব্বল ব্যক্তিরা পরসেবা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাহারা শূদ্র শ্রেণীভুক্ত হইল।'*

(৩০) "রামায়ণের উত্তর কাণ্ডের ৭৪ম সর্গে লিখিত আছে 'কৃতযুগে শুদ্ধ ব্রাহ্মণেরা তপস্যা করিতেন। ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয়ের প্রথম উৎপত্তি হয়, তখন বর্ণভেদের সৃষ্টি হয়।' ইহার অর্থ এই যে, বৈদিক সময়ে আর্য্যেরা এক জাতি ভুক্ত ছিলেন, এবং সকলেরই আচার ব্যবহার একরূপ ছিল। দ্বিতীয় যুগে ব্রাহ্মণ ও রাজন্যেরা পৌরহিত্য ও রাজ্য শাসন কার্য্যে একাধিকার লাভ করিয়া আপনাদিগকে সাধারণ লোক হইতে স্বতন্ত্র জাতিরূপে বন্ধনের চেষ্টা করেন।"*

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য, বি এ।

(ক্রমশঃ)

আহার।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

যাহাহউক, পূর্ব্বেও এই সকল কথা চিন্তা করিয়া ঋষিরা এত শপথ-বাক্যের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। কোন একটী কার্য্য করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও সেই সকল শপথ-বাক্যের দিকে চাহিলে আমাদিগের অন্তরাত্মা শুকাইয়া উঠে—মনে হয়, বুঝি এ সমস্তই দেবতার নিষ্ঠুর অভিসম্পাত। আমরা আর বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারি না। মন্ত্রবদ্ধ সর্পের মত আমাদিগের উন্নত গর্ব্ব-স্ফীত-মস্তক ধীরে ধীরে ভূমি চুম্বন করে। এই সকল শপথ বাক্যও আবার এমন যে, তাহাদিগের অধিকাংশ ফলাফলেই মৃত্যুর পর সেই অন্ধকার অজ্ঞাত রাজ্যে গিয়া ভোগ করিতে হইবে—এজন্মে নহে। মৃত্যুর পর কাহার অদৃষ্টে কি আছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু হিন্দু মৃত্যুর পর জন্মান্তর বিশ্বাস করে—পুনর্জ্জন্ম বিশ্বাস করে, স্বর্গ বিশ্বাস করে—নরকও বিশ্বাস করে; সুতরাং পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্মও তাহার নিকট প্রহেলিকাপূর্ণ-কল্পনা নহে—সরল সত্য। তাই সেই ভয়ানক জন্মান্তরের কথা স্মরণ করিয়াই আর্য্য হিন্দু শপথ-বাক্য লঙ্ঘন করে না।

যদি আজ আমরা বঙ্গ কুলললনাদিগকে বুঝাইতে চাহি যে, প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ করিলে ব্রণাদি ক্লেদ রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা,—তাঁহারা নিশ্চয়ই আমাদিগকে বাতুল মনে করিবেন আর বলিবেন যে—"রোগ হয় না, অর্থ-হানি হয়"। শত সহস্র চেষ্টা করিয়া লক্ষ লক্ষ যুক্তি দেখাইলেও তাঁহারা তাহা বুঝিবেন না—অনেক স্থলেই বুঝিতে পারিবেন না এবং বিশ্বাসও করিবেন না। যখন এই সকল বিধি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখনও রমণী ছিল—তখনও তাহারাই সংসারের গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিত—তখনও তাহারা এইরূপেই বিশ্বাস করিত।

---

* শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, আই, ই।

* শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, আই, ই।

কেবল স্ত্রীলোক কেন, সাধারণ লোকেরও এইরূপই বিশ্বাস যে, তিথি বিশেষে পটোল ভক্ষণে শত্রু বৃদ্ধি হয়, মূলা ভক্ষণে ধন-হানি হয়, ইত্যাদি। কুষ্মাণ্ড, মূলা প্রভৃতি তিথি বিশেষে ভক্ষণ না করা সম্বন্ধে ইহাই তাহাদিগের যুক্তি; আর এই সকল শপথ-বাক্য লঙ্ঘন করিলে পাছে প্রকৃতই ধনহানি বা পুত্রহানি হয়, এই জন্যই তিথি বিশেষে হিন্দু পটোল খায় না, বেগুণ খায় না, লাউ খায় না।

একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে, এই সকল শপথ-বাক্য বা শাসনের মধ্যেও একটা শৃঙ্খলা আছে।

নিষিদ্ধ দ্রব্যের নাম।	তিথির নাম।	উক্ত দ্রব্য ভক্ষণে কি ব্যাধি হইবার সম্ভাবনা।	শপথ-বাক্য।
পুতিকা	দ্বাদশী	যক্ষ্মাকাস।	সুরাপান তুল্য পাপ।
অলাবু	নবমী	বাতশ্লেষ্মক পীড়া।	গোমাংস বৎ।
কলম্বী	দশমী	অম্লপিত্ত।	গোবধ তুল্য পাপ।
বৃহতী	দ্বিতীয়া	অর্ব্বুদ রোগ।	হরিস্মরণে অযোগ্য
মাংস	অমাবস্যা ও পূর্ণিমা	শ্লৈষ্মিক পীড়া।	মহাপাপ।
নিম্বুক	ষষ্ঠী	জলব্যাধি (কোষবৃদ্ধি, গণ্ডমালা প্রভৃতি)।	পশুযোনি প্রাপ্ত হওয়া
বার্ত্তাকী	ত্রয়োদশী	কণ্ডুরোগ।	পুত্রহানি।
মাষকলায়	চতুর্দ্দশী	অতিসারাদি উদরাময়।	চিররোগী।
শিম্বী	একাদশী	জ্বর।	পাপকারী।
নারিকেল	অষ্টমী	অজীর্ণ।	মূর্খতা।
তাল	সপ্তমী	রক্তপিত্ত।	শরীর নাশ।
বিল্ব	পঞ্চমী	পিত্ত সম্বন্ধীয় পীড়া।	কলঙ্কী।
মূলক	চতুর্থী	বায়ুব্যাধি	ধনহানি।
পটোল	তৃতীয়া	রক্তবাত	বহুশত্রু।
কুষ্মাণ্ড	প্রতিপদ	ব্রণাদিক্লেদ রোগ।	অর্থহানি।

উপরে যে তালিকা প্রদত্ত হইল, তাহা হইতেই দেখা যাইতেছে যে, যে স্থানেই কোন কঠিন পীড়া হইবার সম্ভাবনা, সেই স্থানেই শপথ বাক্যও তত গুরুতর। দ্বাদশীতে পুতিকা ভক্ষণ করিলে যক্ষ্মাকাস হইবার সম্ভাবনা। যক্ষ্মাকাস যে কি ভয়ানক ব্যাধি, তাহা আর বোধ হয় বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। তাই যাহাতে, আর্য্য-হিন্দু দ্বাদশীতে পুতিকা ভক্ষণ না করে, সেই জন্যই শাস্ত্রকারগণ বলিয়া রাখিয়াছেন যে, দ্বাদশীতে পুতিকা ভোজনে ব্রহ্মবধ তুল্য পাপ হয়। হিন্দুমাত্রেই এই কথা জানিলে শিহরিয়া উঠিবে। পুতিকা ভক্ষণ করা দূরে থাকুক, কেহ পুতিকার আঘ্রাণ পর্য্যন্তও লইবে না। নবমীতে অলাবু ভক্ষণে বাতশ্লৈষ্মিক পীড়া হইবার সম্ভাবনা। তাই শপথ বাক্য আছে, অলাবু ভক্ষণে গোমাংস ভক্ষণ করা হইবে। ইহা শুনিয়া কোন্ হিন্দু নবমীতে অলাবু ভক্ষণ করিতে অগ্রসর হইবে?

সকল তিথি সম্বন্ধেই এইরূপ বলা যাইতে পারে। যে স্থানেই ব্যাধির কাঠিন্য, সেই স্থানেই শপথ-বাক্যও তত গুরুতর, আর যে স্থানে ব্যাধি তত কঠিন বা সাংঘাতিক নহে, সেই স্থানে শপথ-বাক্যও তত গুরুতর নহে।

তবে "মূর্খতা" "শরীর-নাশ" বা "চির-রোগী" এই তিনটী শপথ বাক্য সম্বন্ধে অন্য কথা বলিলেও বলা যাইতে পারে।

অষ্টমীতে নারিকেল ভক্ষণে অজীর্ণ-রোগ জন্মে। অজীর্ণ-রোগ অধিক দিন স্থায়ী হইলে মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হয়। মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইলেই অধ্যয়নের ব্যাঘাত ঘটে। ধারণা শক্তি কমিয়া যায়, চিন্তা করিবার ক্ষমতা যেমন থাকে না, ইহাকেই মূর্খতা বলা যাইতে পারে।

সপ্তমীতে তাল ভক্ষণে রক্তপিত্ত ব্যাধি হইবার সম্ভাবনা। এই ব্যাধি হইলে ধীরে ধীরে শরীর ক্ষয় হইতে থাকে এবং অবশেষে মৃত্যুকে ডাকিয়া লইয়া আইসে। ইহাইত শরীর নাশ।

চতুর্দ্দশীতে মাষকলায় ভক্ষণে উদরাময় হইবার সম্ভাবনা। পাকস্থলীর এতদ্রূপ দুর্দ্দশা ঘটিলেইত ধীরে ধীরে সকল প্রকার ব্যাধিই জন্মিতে পারে। যাহাই ভোজন করা যায়, তাহাই যদি জীর্ণ না হয়, তাহা হইলে শরীর সুস্থ এবং সবল হইতে পারে না, সেই ভুক্ত সামগ্রী শরীরের আলস্য প্রভৃতি অনিষ্ট ঘটায়, সেই জন্যই ব্যাধিও ছাড়িতে চাহে না, ভাঙ্গা শরীরে বাসা বাঁধে।

যে সকল শপথ-বাক্য প্রদত্ত হইল, তাহা হইতেই দেখা যাইতেছে যে, কয়েকটী মাত্র ভিন্ন তাহাদিগের ভিতর অধিকাংশ হিন্দু আর্য্যের নিকট বড় গুরুতর — বড় ভয়ঙ্কর। হিন্দু জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারে—ধর্ম্ম দিতে পারে না, আহারের লোভে ধর্ম্ম নষ্ট করিতে বড়ই ব্যাকুল। তাই এই শপথ-বাক্য লঙ্ঘন করিতে হিন্দু আর্য্য অশক্ত, শপথ মানিয়া চলিলেই শাস্ত্র নিষিদ্ধ দ্রব্য সকল ব্যবহার করাও হয় না। তাহা হইলেই শাস্ত্রকারদিগেরও উদ্দেশ্য সফল হইল। তাঁহাদিগের গূঢ় উদ্দেশ্য—লোকের স্বাস্থ্য রক্ষা, সমাজের মঙ্গল বিধান। হিন্দু-শপথ বাক্য লঙ্ঘন না করিলেই—এতদুভয় উদ্দেশ্যই সফল [illegible], সকল দিক বজায় রহিল।

ইহা ভিন্ন শপথ বাক্যগুলির যে কোন বিশ্বাস সার্থকতা আছে, তাহা আমার বোধ হয় না, যদি প্রত্যেক দ্রব্য সম্বন্ধেই একই রকম শপথবাক্য দেওয়া হইত, তাহা হইলে শপথবাক্যের মূল্য কমিয়া যাইত, লোক তাহা বিশ্বাস করিতে চাহিত না, সেই জন্যই এত ভিন্ন ভিন্ন শপথ-বাক্যের অবতারণা। সাধারণ লোকে এই শপথবাক্যগুলিকেই, তিথিভেদে নিষিদ্ধ দ্রব্য সকল ভক্ষণ না করিবার একমাত্র কারণ বলিয়া মনে করে, কিন্তু শপথবাক্যের উদ্দেশ্য কেবল লোকের মনে, সমাজের মনে, একটা ভীতি উৎপাদন করা এবং ভীতি উৎপাদন করিয়া অন্যায় বা অনিষ্টকর কার্য্য হইতে তাহাদিগকে বিরত রাখা।

ধর্ম্মই জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত। মানবজীবন ধর্ম্মোপার্জ্জনের জন্য এবং জ্ঞান লাভের জন্য। আত্মার উন্নতিই জীবন-যজ্ঞের শ্রেষ্ঠফল। শরীর রক্ষা না হইলে ধর্ম্ম কর্ম্ম হইতে পারে না। তাই শরীর রক্ষা ধর্ম্ম—তাই স্বাস্থ্য রক্ষা জীবনযজ্ঞানুষ্ঠানের একটী অতি মহৎ, অতি পবিত্র, অতি গুরুতর অঙ্গ। সেই জন্যই আহার বিহার সম্বন্ধে এত তীক্ষ্ণ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

যখন ভারতে মুসলমান শাসন ছিল—যখন মোগল সম্রাটগণ ভারতবর্ষের অধীশ্বর ছিলেন, তখনও তাঁহারা যে সকল রাজবিধি প্রচলন করিয়াছিলেন, তাহাদিগের সহিত কোন প্রকার হেতুবাদ সংযুক্ত হইত না। "আবুল ফজেল" পাঠ করিলেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

রাজার আজ্ঞা অবজ্ঞা করিবার যো নাই। "কেন ইহা করিব" তাহাও জিজ্ঞাসা করিবার সাহস নাই—ক্ষমতা নাই। তাই সকলে সকল বিধিই মানিয়া চলিত। মুসলমান রাজাগণ হেতুবাদ দিতেন না আবার মুসলমানের 'কোরাণে," খ্রীষ্টানের "বাইবেলে" যত কথা লিখিত রহিয়াছে, তাহাদিগের কোনটীর সহিতই হেতুবাদ দেখিতে পাওয়া যায় না। মুসলমান, "কোরাণকে" ভক্তির সহিত মস্তকের উপর স্থাপন করে—হেতু জিজ্ঞাসা করে না পূর্ব্বেও করিত না।

এখন ইংরাজ-রাজত্ব। যে বিধিই প্রচলিত হইয়াছে, তাহার সহিত হেতুবাদ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইংরাজ আমাদিগের রাজা। "কেন অমুক রাজাজ্ঞা মানিয়া চলিব" এ কথা আমরা কহিতে পারি না। রাজ-আজ্ঞা সর্ব্বদাই প্রতিপাল্য, তাই আমাদিগকে মানিয়া চলিতে হয়—তাই আমরা সকল বিধিই মাথায় করিয়া বহিয়া থাকি।

পূর্ব্বে ভারতে হিন্দুর রাজত্ব ছিল—ব্রাহ্মণ শাসন ছিল। তখনও কেহ হেতুবাদ জিজ্ঞাসা করিতে পারিত না। তাই যে কোনরূপ বিধির প্রচলন করিলেও সঙ্গে সঙ্গে তাহার হেতুবাদ দিবার আবশ্যক হইত না। রাজার আজ্ঞা—ধর্ম্মের আজ্ঞা——দেবতার আজ্ঞা বলিয়া সকলে তাহা মানিয়া চলিত। যে অবজ্ঞা করিত, সে শাসিত হইত। সমাজ তখনকার শাসন কর্ত্তা ছিল—রাজা তখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিতেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ,

ওঁ তৎসৎ

অথর্ব্ববেদীয়া।

মুণ্ডকোপনিষৎ।

(মূলম্)

তৃতীয় মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তা-
নশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥১
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো-
ঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশ-
মস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥২
যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণ-
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্য পাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥৩
প্রাণোহ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি
বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবা-
নেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥৪
সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্।
অন্তঃ শরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণ দোষাঃ ॥৫
সত্যমেব জয়তে নানৃতং
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা
যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্ ॥৬
বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্য রূপং
সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ
পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্ ॥৭
ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধ সত্ত্ব—
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥৮
এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো
যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ।
প্রাণৈশ্চিত্তং সর্ব্বমোতং প্রজানাং
যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা ॥৯
যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি
বিশুদ্ধ সত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্।
তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামাং
স্তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েদ্ভূতিকামঃ ॥১০

ইতি তৃতীয় মুণ্ডকে
প্রথম খণ্ডঃ সমাপ্তঃ

তৃতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম
যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্।
উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামা
স্তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরাঃ ১
কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ
স কামভির্জ্জায়তে তত্র তত্র।
পর্য্যাপ্ত কামস্য কৃতাত্মনস্তু
ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ ॥২
নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥৩

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো
ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাং-
স্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্ম ধাম ॥৪
সম্প্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি ॥৫
বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ
সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে
পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে।৬
গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা
দেবাশ্চ সর্ব্বে প্রতিদেবতাসু।
কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা
পরেঽব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি ॥৭
যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
ঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥৮
স যো হবৈ তৎপরমং ব্রহ্ম বেদ
ব্রহ্মৈব ভবতি।
নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি।
তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং
গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি ॥৯
তদেতদৃচাভ্যুক্তম্——
ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ
স্বয়ং জুহ্বত একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ।
তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত
শিরোব্রতং বিধিবদ্ যৈস্তু চীর্ণম্ ॥১০
তদেতৎ সত্যমৃষিরঙ্গিরাঃ পুরোবাচ
নৈতদচীর্ণব্রতোঽধীতে।
নমঃ পরম ঋষিভ্যো
নমঃ পরম ঋষিভ্যঃ ॥১১
ইতি তৃতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ
ইতি মুণ্ডকোপনিষৎ সমাপ্তা

(অনুবাদ)

তৃতীয় মুণ্ডক-প্রথম খণ্ড

সতত একত্র স্থায়ী, সখ্যভাবান্বিত
দুই পক্ষী এক বৃক্ষ করেছে আশ্রয়;
তাহাদের এক জন খায় মিষ্ট ফল
অন্যে অনশনে থাকি দেখয়ে কেবল।১
একই বৃক্ষে নিমগন হইয়া পুরুষ,
মুহ্যমান হ'য়ে শক্তি হীনতা বশতঃ
করে শোক; কিন্তু যবে সাধক সেবিত
দেখে সে ঈশ্বরে, আর মহিমা তাঁহার
তখন তাহার শোক নাহি র'য় আর।২
দ্রষ্টা যবে, জ্যোতির্ম্ময় কর্ত্তা ও ঈশ্বর,—
ব্রহ্ম যোনি পুরুষেরে করে বিলোকন,
পুণ্য পাপ দূর করি বিদ্বান্ তখন
পরম সমতালাভ হ'য়ে নিরঞ্জন ॥৩
প্রাণ তিনি, যিনি, সর্ব্বভূতে প্রতিভাত
তাঁহারে জানেন যিনি, সে বিদ্বান্ জন
নাহি হ'ন অতিবাদী; আত্ম ক্রীড় আর
আত্ম রতি, ক্রিয়াবান্ হ'ন সেই জন
ব্রহ্মবিদ্‌গণ মাঝে শ্রেষ্ঠ তিনি হ'ন ॥৪
এই আত্মা লভ্য সত্য তপস্যার বলে,
সম্যক্ জ্ঞানেতে; নিত্য ব্রহ্মচর্য্যে পুনঃ।
তাঁহারে নেহারে ক্ষীণ-দোষ যতিগণ-
কায় মধ্যে, যিনি জ্যোতির্ম্ময় শুভ্র হ'ন ॥৫
সত্যেরই জয়লাভ, না হয় মিথ্যার;
সেই পথে আপ্তকাম ঋষিগণ যা'ন
সেথা, যথা সত্যের সে পরম নিধান,
সত্যেই বিস্তৃত সেই পথ দেব যান ॥৬

সে দিব্য অচিন্ত্যরূপ হয়েন বৃহৎ
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর তিনি পুনরায়;
দূরে—অতি দূরে—পুনঃ নিকটেও স্থিত
হেথাও দর্শক হৃদে আছেন নিহিত ॥৭
চক্ষু কিম্বা বাক্য গ্রাহ্য নাহি হ'ন তিনি;
অন্য অন্য ইন্দ্রিয়েও গ্রাহ্য তিনি ন'ন
তপস্যায় বা কর্ম্মলভ্য নহেন কখন;
হইয়া বিশুদ্ধ সত্ত্ব জ্ঞানের প্রসাদে
সে নিষ্কলে দেখা যায় ধ্যান যোগে শুধু ॥৮
এই সূক্ষ্ম আত্মা বেদ্য জ্ঞানেতে কেবল
পঞ্চধা—প্রবিষ্ট যথা রহিয়াছে প্রাণ;
প্রাণেতেই প্রাণি সব্ব চিত্ত ব্যাপ্ত রয়
সে চিত্ত বিশুদ্ধ হ'লে আত্মা প্রকাশয় ৯
শুদ্ধ সত্ত্ব জন যে যে লোক মনে মনে
চিন্তা করে; চাহে পুনঃ কামনা যে সব;
পায় সেই সেই লোক, সে সব কামনা
করিবে ইষ্টপ্রীত'ই আত্মজ্ঞ'কে ॥১০

ইতি তৃতীয় মুণ্ডক
প্রথম খণ্ড

তৃতীয় মুণ্ডক দ্বিতীয় খণ্ড।

সে পরম ধাম ব্রহ্মে, আত্মজ্ঞ পুরুষ
জানেন, যাঁহাতে বিশ্বনিহিত থাকিয়া
প্রতিভাত শুদ্ধরূপে; যে ধীমদ্গণ—
অকাম হইয়া তাঁর করে উপাসনা—
তারা শুক্র অতিক্রমে; ভবে জনমে না ॥১
যেই জন চিন্তা করে কাম্যবস্তু চয়,
সে সব কামনা সহ জনমে সেজন
সে কাম ভোগোপযোগী ভিন্ন২ লোকে;
যে জন পর্য্যাপ্ত কাম আত্মবিৎ আর
হেথাই সকল কাম বিলীন তাঁহার ॥২
এই আত্মা নহে লভ্য বেদ-অধ্যাপনে
মেধা কিম্বা বহুশাস্ত্র জ্ঞানে লভ্য নয়;

এ আত্মা আপনি যারে করেন বরণ—
সে লভে ইঁহারে, ইনি সমীপে তাহার,
প্রকাশ করেন নিজে তনু আপনার ॥৩
বলহীন জন লভ্য নহে আত্মা এই,—
প্রমাদে বা অসন্ন্যাস জ্ঞানে লভ্য নয়।
এ সব উপায়ে যত্ন করে যে বিদ্বান
প্রবেশ করয়ে তার আত্মা ব্রহ্ম ধাম ॥৪
ইঁহারে পাইয়া জ্ঞানতৃপ্ত ঋষিগণ
কৃত কৃত্য, বীতরাগ, প্রশান্ত হৃদয়;
যুক্তাত্মা যে ধীরগণ সে সর্ব্বগামীরে
সর্ব্বতঃ পাইয়া তাহে করেন প্রবেশ ॥৫
বেদান্ত-বিজ্ঞান অর্থে সুনিশ্চিত করি,
সন্ন্যাস যোগেতে শুদ্ধ সত্ত্ব যোগিগণ,—
লভিয়ে পরমামৃত, পরমান্ত কালে,
সম্যক্ রূপেতে মুক্ত হয়েন সকলে ॥৬
পঞ্চদশ কলা যায় কারণে তাদের,
সকল ইন্দ্রিয় যায় নিজ নিজ দেবে;
সমুদয় কর্ম্ম, আর আত্মা জ্ঞানময়,
সে শ্রেষ্ঠ অব্যয় সহ একীভূত হয় ॥৭
বহমান্ নদীচয় স্ব স্ব নাম রূপ—
ত্যজিয়া, সমুদ্রে যথা যায় মিশাইয়া,
তথা নামরূপ হ'তে বিমুক্ত বিদ্বান্
পরাৎপর পুরুষেতে যায় মিলাইয়া ॥৮
যে জন জানেন সেই পরম ব্রহ্মেরে
হয়েন ব্রহ্মই তিনি; কুলেতে তাঁহার
ব্রহ্মজ্ঞান হীন কেহ নাহি হয় আর;
হয়ে শোক পাপোত্তীর্ণ, হইয়া বিমুক্ত
হৃদয়ের গ্রন্থি হ'তে হয়েন অমৃত ॥৯
প্রকাশিত ঋকে ইহা——
ক্রিয়াবান্, শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্ম নিষ্ঠ যাঁরা
শ্রদ্ধাবান্ হয়ে নিজে করেন প্রদান
অগ্নিতে আহুতি; আর বিধি অনুসারে

করেন যাঁহারা শিরোব্রত অনুষ্ঠান,
তাঁহাদিগে ব্রহ্ম-বিদ্যা করিবে প্রদান ॥১০
এ সত্য, অঙ্গিরা ঋষি ক'ন পূর্বকালে
এই গ্রন্থ পড়িবেনা কভু সেই জন,
করে নাই যেই জন ব্রত আচরণ,—
সে পরম ঋষিগণে করি নমস্কার।
সে পরম ঋষিগণে করি নমস্কার ॥১১

ইতি তৃতীয় মুণ্ডক দ্বিতীয় খণ্ড।

মুণ্ডকোপনিষৎ সমাপ্তা—

শ্রীমনোরঞ্জন সরস্বতী।

বারৈখালী (যশোহর)

বর্ণভেদ-তত্ত্ব।

(বর্ণ ও জাতি শব্দ।)

বেদাদি প্রাচীন ও পুরাণাদি পরাচীন শাস্ত্র গ্রন্থে বর্ণ ও জাতি এই উভয় শব্দ পরিদৃষ্ট হয়। শাস্ত্রীয় পুস্তকের পর্যালোচনায় প্রতীত হয়, এই শব্দদ্বয় একার্থক। শব্দের প্রকৃতিগত তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে, ইহাদের কথঞ্চিৎ পার্থক্য পরিজ্ঞাত হওয়া যায় বটে, কিন্তু ব্যবহার ক্ষেত্রে ইহাদের অর্থ অভিন্ন, এরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ণ শব্দের অর্থ রঙ্। দৃষ্টান্ত স্বরূপে সিত, অসিত, লোহিত, পীত ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই বর্ণ কোনও সময়ে সামাজিক সম্প্রদায় বিভাগের কারণরূপে গৃহীত হইয়াছিল। বিভিন্নবর্ণবিশিষ্টব্যক্তিগণ বিভিন্নসম্প্রদায়ভুক্ত হইবার প্রমাণ প্রাপ্ত হইলে, তাহা দ্বারা অনুমিত হইতে পারে যে, বর্ণ-ভেদই তাৎকালিক শ্রেণীবিভাগের কারণ। মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বে দৃষ্ট হয় —

ব্রাহ্মণানাং সিতোবর্ণঃ ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ লোহিতঃ। বৈশ্যানাং পীতকো বর্ণঃ শূদ্রাণামসিতস্তথা ॥॥

ব্রাহ্মণগণের বর্ণ শুভ্র, ক্ষত্রিয়ের বর্ণ লোহিত, বৈশ্যগণ পীতবর্ণ ও শূদ্রের বর্ণ কৃষ্ণ। সুতরাং শারীরিক-বর্ণানুসারে যে কোনও কালে ব্রাহ্মণাদি বিভাগ সংস্থাপিত হইয়াছিল, ইহা শাস্ত্র-সঙ্গত। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণীকৃত হইল, বর্ণ শব্দের অর্থ শরীরের রঙ্।

অতঃপর জাতি শব্দ। জাতি শব্দ "জন" ধাতু হইতে উৎপন্ন। বৈয়াকরণপদ্ধতি পরিত্যাগ না করিলে, জাতি বলা মাত্রই যেন জন্মের সহিত ইহার সম্পর্ক সমধিক সন্নিকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। জাতি শব্দে বিভিন্নভাবাপন্ন দার্শনিক মহোদয়েরা বিভিন্ন বস্তু বুঝিয়াছিলেন, সকল অর্থের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি না থাকিলেও, উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূল কয়টী মত এ প্রসঙ্গে অত্যধিক আলোচিত হইলে অসঙ্গত হইবে না, এই আশায় আবশ্যকীয় মতবাদ বিচার করা যাউক।

শব্দশাস্ত্রের পারদর্শনকারী প্রাচীন বৈয়াকরণকুল বলিতেন, "আকৃতিগ্রহণা জাতিঃ।" তাঁহাদের লক্ষণ আরও বিস্তৃত, আমরা আবশ্যকানুরোধে এই অংশের আলোচনা করিব।

আকৃত্যা গ্রহণং যস্যাঃ সা আকৃতিগ্রহণা, এইরূপ তাঁহারা ব্যাখ্যা করেন। আকৃতির দ্বারা যাহার গ্রহণ অর্থাৎ প্রতীতি হয়, তাহাই জাতি। মনুষ্যাকৃতি দর্শন মাত্রেই ইহা মনুষ্য জাতি বলিয়া বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

আকার প্রকারের বিভিন্নতায় মানব জাতি গবাদি জাতি হইতে পৃথক্। তজ্জাতীয় আকৃতি দর্শনেই আমরা তজ্জাতির জ্ঞান লাভ করি। শাস্ত্রীয়-জাতিশব্দ বুঝিতে এই লক্ষণের আবশ্যকতা আমরা পরে প্রদর্শন করিব। দার্শনিক সম্প্রদায় সমস্বরে ঘোষণা করেন, "মীমাংসকগণ জাতি শক্তিবাদী"। মীমাংসক গুরু আচার্য্য-চূড়ামণি মহর্ষি জৈমিনি মীমাংসাদর্শনে বলিয়াছেন,—"আকৃতিঃ শব্দার্থঃ"। ইহাদ্বারা অনায়াসে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, আকৃতির সহিত জাতির সম্বন্ধ নিকট।

মীমাংসাদর্শনের প্রথমাধ্যায়চতুর্থপাদ-চতুর্বিংশতিতম সূত্র—"জাতিঃ"। ভাষ্যকার পরমপূজনীয় প্রজ্ঞাপুঞ্জ শবরস্বামী কণ্ঠতঃ সূত্র ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন "অগ্নি ব্রাহ্মণয়োরেকা জাতিঃ"। অগ্নি ও ব্রাহ্মণের জাতি এক, এই কথা প্রতিপাদন প্রয়াসে তিনি ব্রহ্মার মুখ হইতে অগ্নি ও ব্রাহ্মণ জন্মিয়াছিল, এতৎপ্রমাণক একটী বেদবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা যথাস্থানে সেই বাক্যের বিচার করিব। আগ্নেয়ো বৈ ব্রাহ্মণঃ, এই শ্রুতিবাক্যে আগ্নেয় শব্দ ব্রাহ্মণের স্তুতি বুঝাইতেই ব্যবহৃত, ইহাই ঐ অধিকরণের রহস্য। আগ্নেয় শব্দ ব্রাহ্মণ-স্তুতি বুঝাইবে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর ঐ সূত্রে দেওয়া যাইতেছে। অগ্নি ও ব্রাহ্মণের উৎপত্তি এক স্থানে, সুতরাং এক অপরের স্তাবক হইতে পারে। বস্তুতঃ এই সূত্রে ভাষ্যের আশয় যে, জাতি অর্থ জন্ম।

বেদবাক্য বিচারধুরীণ অশেষধিষণ আচার্য্য সায়ণ মাধব ও ন্যায়মালায় ঐ অধিকরণ সংগ্রহ করিতে গিয়া "অগ্নিব্রাহ্মণয়োর্মুখজন্যত্বং কস্মিংশ্চিদর্থবাদে সমাম্নায়তে" লিখিয়াছেন। তৎপরে ভাষ্যোদ্ধৃত অর্থবাদ বাক্যটীরও বিচার করিয়াছেন। তাঁহার মতেও ঐ সূত্রে জাতি অর্থে জন্মই বিবেচিত হইয়াছে; অতএব সম্প্রতি আমরা জাতি অর্থাৎ জন্মানুসারে সমাজের যে শ্রেণী-বিভাগ সমর্থিত হইয়াছিল, তাহাই জাতিভেদ বুঝিয়া রাখি। শব্দ শাস্ত্রের সাহায্য এইস্থলে বিশ্রাম লাভ করিল, অতঃপর আমরা বেদাদি শাস্ত্রের ভূয় আলোচনায় "শাস্ত্রীয় জাতিভেদ কি?" বুঝিতে প্রয়াস পাইব।

(শাস্ত্রীয়-বর্ণভেদ)

জাতি শব্দ যৌগিক কি রূঢ়, তাহা বিচার করিবার অবসর আপাততঃ উপস্থিত হইয়াছে। যদি আমরা ব্রাহ্মণাদি জাতির জাতিত্ব জন্মের সহিত সংসৃষ্ট, ইহা প্রমাণ করিতে পারি, তবে ঐ শব্দ যৌগিক শব্দ, ইহা সঙ্গত হইবে না। শব্দ শাস্ত্রের গূঢ় রহস্যোদ্ভেদ এ প্রসঙ্গে অসম্ভব, সুতরাং সংক্ষেপে বলিতে হইবে, যৌগিক শব্দের যোগার্থ চিরদিনই সমান, উহার প্রকৃতি প্রত্যয় লভ্য অর্থ আবহমানকাল একভাবে চলিতেছে। রূঢ় শব্দের অর্থে একটু বিশেষত্ব আছে। যে গুণ বা ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া প্রতিপাদ্য পদার্থে রূঢ়শব্দ পূর্ব্বে প্রযুক্ত হইত, পরবর্ত্তী কালে সেই গুণ ক্রিয়া লক্ষ্য করা হয় না বটে, কিন্তু প্রতিপাদ্য পদার্থে পূর্ব্বকার মত প্রযুক্ত হয়। প্রাচীন ব্যুৎপত্তি উহার মধ্যে আছে, আপাতত গৃহীত হয় না, এই জন্য নাম 'রূঢ়'। প্রত্যুত কোনও শব্দ ব্যুৎপত্তি শূন্য ভাবে কোনও বুদ্ধিন

ব্যবহৃত হইত না, বা হয় না। জাতি শব্দ যৌগিক। বেদে এবং অন্যান্য শাস্ত্র গ্রন্থে ব্রাহ্মণাদির জন্মের বিবরণ পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের জাতি অর্থাৎ জন্ম বিভিন্ন, সুতরাং ইহারা ভিন্নজাতি। মহাভারতীয় শান্তি পর্ব্বে ব্রহ্মা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন দেখা যায়।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াবৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ দ্বিজসত্তম।
যে চান্যে ভূতসঙ্ঘানাং বর্ণাস্তাংশ্চাপি নির্ম্মমে॥

ব্রহ্মা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্যান্য ভূত সঙ্ঘের বর্ণ সকল ও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই নির্ম্মাণ প্রণালী সম্বন্ধে শাস্ত্রে নানারূপ লিখিত আছে, আমরা ক্রমে ক্রমে সকলগুলির অল্পাধিক অনুশীলন করিব।

যজুর্ব্বেদ সংহিতার সপ্তমকাণ্ডে দেখা যাইতেছে। প্রজাপতিরকাময়ত প্রজাঃ-সৃজয়মিতি, স মুখতস্ত্রিবৃতং নিরমিমীত তমগ্নির্দেবতা অন্বসৃজ্যত, গায়ত্রীছন্দঃ, রথন্তরংসাম, ব্রাহ্মণো মনুষ্যাণাং অজঃপশূনাং তস্মাত্তে মুখ্যাঃ মুখতোহি অসৃজ্যন্ত। উরসো বাহুভ্যাং পঞ্চদশং নিরমিমীত, তং ইন্দ্রো দেবতা অন্বসৃজ্যত। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ বৃহৎসাম রাজন্যো মনুষ্যানাং অবিঃপশূনাং তস্মাত্তে বীর্য্যবন্তঃ বীর্য্যাদ্ধি অসৃজ্যন্ত। উরুভ্যাং মধ্যতঃ সপ্তদশং নিরমিমীত, তং বিশ্বদেবা দেবতা অন্বসৃজ্যন্ত, জগতীচ্ছন্দঃ বৈরূপং সাম বৈশ্যো মনুষ্যানাং গাবঃ পশূনাং ইত্যাদি। "প্রজা সৃজন করিব" মনে করিয়া প্রজাপতি মুখ হইতে ত্রিবৃৎস্তোম, অগ্নিদেবতা, গায়ত্রীছন্দ, রথন্তর সাম, মনুষ্য মধ্যে ব্রাহ্মণ ও পশুর মধ্যে অজ এই গুলি নির্ম্মাণ করিলেন। এই অর্থবাদ বাক্যে উরু হইতে বৈশ্য ও বাহু হইতে ক্ষত্রিয়াদির ও উৎপত্তি কীর্ত্তন দৃষ্ট হইতেছে। এই উৎপত্তিবাক্য অর্থবাদ, সুতরাং ইহার তাৎপর্য্য বিশেষ বিবেচ্য; কিন্তু বেদশাস্ত্রে এই ভিন্ন প্রকার ভিন্ন স্থান হইতে উৎপত্তি কীর্ত্তিত হওয়ায়, উহাদের জাতি অর্থাৎ জন্ম ভিন্ন, ঈদৃশ অভিপ্রায়েই প্রাচীন সময়ে ব্রাহ্মণাদি ভিন্ন জাতি বলা হইত। বর্ত্তমান যুগে ঐ শব্দে যাহাই কেন বুঝি না; প্রাচীন প্রতীতি ঐ প্রকার ছিল, সন্দেহ নাই।

ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তে "মুখং কিমস্যাসীৎ কৌ বাহু?" ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ উরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত।" এই মন্ত্র দৃষ্ট হয়। প্রাচীন পণ্ডিত মণ্ডলী ও পূর্ব্বতনটীকাকারগণ ঐ মন্ত্রে ও ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ ও বাহু হইতে ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি, উরু হইতে বৈশ্য, পাদ হইতে শূদ্রের জন্ম বুঝিয়াছিলেন। "মুখং কিমস্য" ইত্যাদি মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে প্রথমেই সায়ণাচার্য্য বলিতেছেন, "প্রশ্নোত্তররূপেণ ব্রাহ্মণাদি সৃষ্টিং বক্তুং ব্রহ্মবাদিনাং প্রশ্না উচ্যন্তে।" ইহা হইতে প্রতীত হয় সায়ণ ঐ মন্ত্রে ব্রাহ্মণ প্রভৃতির উৎপত্তিই বুঝিয়াছেন। "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখং আসীৎ" এই টুকুর ব্যাখ্যায় সায়ণ বলিতেছেন "ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণত্বজাতিবিশিষ্টপুরুষো মুখমাসীৎ মুখাদুৎপন্নঃ" ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির বেলায় ও ঐরূপ অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্রের (অর্থবাদের) সহিত এক বাক্যতা করিয়া অর্থ করিতে হইবে। এস্থ

উত্তর, উভয়ই ঐরূপে ব্যাখ্যা করিতে তিনি পরামর্শ দিয়াছেন। বস্তুতঃ মূলে "ব্যকল্পয়ন্" পদ আছে, তাহা দ্বারা কল্পনা করার কথাই বুঝা সঙ্গত। "মুখং কিং?" অর্থ "মুখ কি?" ভাষ্যকারের মতে "মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল কি?" এরূপ শত শত নূতন অর্থ ভাষ্যকার শুনাইয়াছেন। "পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত" এই অংশের দিকে নয়ন নিঃক্ষেপ করিয়াই তাঁহাদের এরূপ মতবাদ প্রচারে প্রবৃত্তি হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। "পদ হইতে শূদ্র জন্মিয়াছিল," এই চতুর্থ পাদ এখানে বড় বিপজ্জনক ও ভ্রান্তিনিদান। বাক্যশেষের অনুরোধে সকল স্থানে অন্যার্থ করা অপেক্ষা "বহূনাং অনুগ্রহো ন্যায়ঃ" এই ন্যায়ানুসারে "অজায়ত" পদের অন্যার্থ করাই সঙ্গত, এরূপ অনেক পণ্ডিতের অভিপ্রায়। এই সকল বাক্য অর্থবাদ। এই বাক্যে মুখ হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি কথিত হইলেও তাহা দ্বারা তাহাই বুঝিতে হইবে না। অর্থবাদ বাক্যের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা পরে আলোচ্য। আপাততঃ বুঝা গেল, ভাষ্যকার সায়ণ-আচার্য্যের মতে ব্রহ্মার মুখ এবং বাহু প্রভৃতি ভিন্ন স্থান হইতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদির ভিন্ন জাতি অর্থাৎ জন্ম বেদে উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ের ৩৮ শ্লোকে ঐরূপ দেখা যায়। "পুরুষস্য মুখং ব্রহ্ম ক্ষেত্রমেতস্য বাহবঃ। ঊর্ব্বো বৈশ্যো ভগবতঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো ব্যজায়ত," ব্রাহ্মণ পুরুষের মুখ, ক্ষত্রিয় ইঁহার বাহু, ইঁহার ঊরু বৈশ্য ও পদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছিল। এ শ্লোকে পুরুষের মুখ ব্রাহ্মণ না বুঝিয়া মুখ হইতে ব্রাহ্মণ জন্মিয়াছিল এইরূপ বুঝিতে হইবে। টীকাকার পরম-পণ্ডিত শ্রীধর স্বামী এই শ্লোক ব্যাখ্যায় বলিতেছেন, "বর্ণানাং তত উৎপত্তিং দর্শয়তি পুরুষস্যেতি।" ৩৭ শ্লোকে মূলে আছে "যস্যেহাবয়বৈ র্লোকান্ কল্পয়ন্তি মনীষিণঃ।" মূলে কল্পনার কথা রহিল, টীকাকার পরার্দ্ধ অনুসারে পূর্ব্বার্দ্ধেরও 'উৎপত্তি'ই অর্থ করিয়াছেন। যাহা হউক, ঐ শ্লোকের যদি উৎপত্তিই অর্থ হয়, তাহাও অবগবে আন্দোলিত হইবে।

শ্রীধর স্বামী দ্বিতীয়স্কন্ধ ষষ্ঠাধ্যায়ের চতুর্দশ শ্লোকের ব্যাখ্যায়, ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসী-দিত্যাদি ঋক্ত্রয়স্যার্থঃ পূর্ব্বাধ্যায় এব দর্শিতঃ।" এইরূপ লিখিয়াছেন। সুতরাং পুরুষ সূক্তের অর্থ সায়ণাচার্য্যের মতই শ্রীধর স্বামী বুঝিয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী টীকাকার সকলেই এমতের পোষক।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্থাধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকের শাঙ্করভাষ্যে দেখিতে পাই, "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া ঈশ্বরেণ সৃষ্টং উৎপাদিতং ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদিত্যাদি শ্রুতেঃ।" চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টির প্রমাণরূপে শঙ্করাচার্য্য ও পুরুষ সূক্তের "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ" এই বাক্য উদ্ধৃত করিতেছেন। সায়ণাচার্য্য এবিষয়ে শঙ্করের সহিত একমতই হইলেন।

মনুসংহিতায় "মুখবাহূরুপজ্জানাং যা লোকে জাতয়োবহিঃ" এই শ্লোকে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণকে "মুখবাহূরু-পজ্জ" বলা হইয়াছে। মুখবাহূরুপদ্ভ্যঃ জায়ন্তে এই অর্থেই ঐরূপ শব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে; সুতরাং প্রকারান্তরে মহর্ষি মনু ও ব্রাহ্মণ মুখজ অর্থাৎ মুখ হইতে উৎপন্ন একথা স্বীকার করিয়াছেন। পুরাণান্তরে ও 'মুখজো

ব্রাহ্মণো যস্ত্তে বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়ো বিরাট। উরুভ্যামৃত্তুতো বৈশ্যঃ পদ্‌ভ্যাং শূদ্রো বাজায়ত।" ইত্যাদি প্রমাণ পাওয়া যায়। এতাবৎ বেদাদি পুরাণান্ত শাস্ত্রের সমালোচনায় বুঝা গেল, জাতি ভিন্ন হইবার তাৎপর্য্য জন্মবিভিন্নতা।

মন্বাদিসংহিতা শাস্ত্র এবং পুরাণাদিতে যে বহুবিধ জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়, সে জাতি বৈচিত্রে জন্মবৈচিত্র একমাত্র কারণস্বরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। মনুও স্পষ্ট বলিয়াছেন।

লোকানাং তুবিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥

লোক বৃদ্ধির জন্য প্রজাপতি স্বীয় মুখ, বাহু, উরু, পাদ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মনু আরও বলিতেছেন,—

ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠোনামজায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং য পারশব উচ্যতে॥
ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং ক্রূরাচার বিহারয়াম্।
ক্ষত্র শূদ্র বপুর্জন্তুরুগ্রোনাম প্রজায়তে॥
ক্ষত্রিয়াদ্বিপকন্যায়াং সূতোভবতি জাতিতঃ।
বৈশ্যান্মাগধবৈদেহৌ রাজবিপ্রাঙ্গনাসুতৌ॥
শূদ্রাদাযোগবঃ ক্ষত্রাচাণ্ডালশ্চাধমোনৃণাম্।
বৈশ্যরাজন্য বিপ্রাসুজায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥
একান্তরেতানুলোমাদম্বষ্ঠোগ্রৌযথাস্মৃতৌ।
ক্ষত্তৃবৈদেহকৌ তদ্বৎ প্রাতিলোম্যাপিজন্মনি॥
ব্রাহ্মণাদুগ্রকন্যায়ামাবৃতোনামজায়তে।
আভীরোঽম্বষ্ঠ কন্যায়ামাযোগব্যাংতুধিগ্বণঃ॥
আযোগবশ্চক্ষত্তা চ চণ্ডালশ্চাধমোনৃণাম্।
প্রাতিলোম্যেন জায়ন্তে শূদ্রাদপসদাস্ত্রয়ঃ॥
বৈশ্যান্মাগধ বৈদেহৌক্ষত্রিয়াৎসূত এবতু।
প্রতীপমেতে জায়ন্তেঽপরেঽপসদাস্ত্রয়ঃ॥
জাতো নিষাদাচ্ছূদ্রায়াং জাত্যা ভবতিপুক্কশঃ॥
শূদ্রাজ্জাতো নিষাদ্যাংতু সবৈকুক্কুটকঃস্মৃতঃ।
ক্ষত্তুর্জ্জাত স্তথোগ্রায়াং শ্বপাকইতিকীর্ত্তিতঃ॥
বৈদেহকেনত্বম্বষ্ঠ্যামুৎপন্ন বেণ উচ্যতে।
দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তুযান্॥
তান্ সাবিত্রী পরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যানিতিবিনির্দ্দিশেৎ॥
ব্রাত্যাত্তুজায়তেবিপ্রাৎ পাপাত্মাভূর্জ্জকণ্টকঃ।
হ্বল্লমল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেবচ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রাবিড় এবচ॥
বৈশ্যাত্তু জায়তে ব্রাত্যাৎ সুধন্বাচার্য্য এবচ।
কারুষশ্চ বিজন্মাচ মৈত্রসাত্বত এবচ।
সূতো বৈদেহিকশ্চৈব চণ্ডালশ্চ নরাধমঃ।
মাগধঃ ক্ষত্তৃজাতিশ্চ তথাযোগব একচ॥

হারীতসংহিতায় দেখা যায়—

বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তস্তু ক্ষত্রিয়ায়ামজায়ত,
বৈশ্যায়ান্তু তথাম্বষ্ঠো নিষাদঃ শূদ্রয়া তথা।
রাজন্যাদ্ বৈশ্যশূদ্রাস্তু মাহিষ্যোগ্রৌতু তৌ স্মৃতৌ।
শূদ্র্যাং বৈশ্যাত্তু করণ এত এবানুলোমজাঃ।
বিপ্রায়াং ক্ষত্রিয়াৎ সূতঃ বৈশ্যাদ্বৈদেহিক স্তথা
চণ্ডালস্তু তথা শূদ্রাৎ সর্ব্বকর্ম্মসু গর্হিতঃ।
মাগধঃ ক্ষত্রিয়ায়াং বৈ বৈশ্যা ক্ষত্রাত্তু শূদ্রতঃ
শূদ্রাদাযোগবং বৈশ্যোজনয়ামাস বৈ সুতম্।
রথকারঃ করণ্যাস্তু মাহিষ্যেণ প্রজায়তে,
অসৎ সন্ততয়ো জ্ঞেয়াঃ প্রতিলোমানুলোমজাঃ।
প্রতি লোমসু বৈ জাতাগর্হিতাঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্॥

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে জাত্যৎপত্তি প্রক্রিয়া যথা—

শূদ্রায়াং বৈশ্যতোঽস্তে করণো নামসঙ্করঃ।

বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতোঽম্বষ্ঠোঽথ গান্ধি-
কোবণিক্।
কাংসকারশঙ্খকারৌ ব্রাহ্মণাৎ সংবভূবতুঃ।
উগ্রশ্চ রাজপুত্রশ্চ তস্যাং ক্ষত্রাৎ বভূবতুঃ॥
কুম্ভকারতন্তুবায়ৌ ক্ষত্রপত্ন্যাং বভূবতুঃ।
কর্ম্মকারশ্চ দাসশ্চ শূদ্রাৎ তস্যাং বভূবতুঃ॥
বৈশ্যাদ্বভূব ভূবঙ্গো মাগধো গোপ এব চ।
ক্ষত্রিয়াৎ শূদ্রকন্যায়াং জাতৌ নাপিতমো-
দকৌ॥

ব্রাহ্মণাৎ শূদ্রকন্যায়াং বারুজীবী বভূবহ।
ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াৎ সূতো মালাকারস্তথা মুনে॥
বৈশ্যাত্তু দ্বিজকন্যায়াং জাতৌ তাম্বুলিতৈ-
লিকৌ।

বিংশতি সঙ্করা এতে জাবালে কথিতাস্তব॥
উত্তমা সঙ্করা এতে মধ্যমাধমে শৃণু।
বৈশ্যায়াং করণাজ্জাতৌ তক্ষা রজক এব চ॥
স্বর্ণকারঃ স্বর্ণবণিক তস্যামম্বষ্ঠসম্ভবৌ।
বৈশ্যায়াং গোপতোজাত আভীরতৈলকারকৌ।
গোপাৎ শূদ্রাগর্ভজাতো ধীবরশৌণ্ডিকৌ।
মালাকারাৎসম্ভূতো নটঃ শাবক এবচ॥
মাগধাদপি শূদ্রায়াং শেখরজালিকৌ।
এতে বৈ মধ্যমাঃ প্রোক্তা অন্ত্যজানপি মেশৃণু॥
বৈশ্যপত্ন্যাং স্বর্ণকারান্ মলেগ্রাহিরজায়ত।
কুড়বঃ স্বর্ণবণিজো বৈশ্যপত্ন্যাং বভূবহ॥
শূদ্রাচ্চ ব্রাহ্মণীগর্ভাচ্চণ্ডালস্য চ সম্ভবঃ।
আভীরাদ্গোপকন্যায়াং বরুড় সমজায়ত॥
তুক্কোঽভূদ্বৈশ্যকন্যায়াং চর্ম্মকারশ্চ শিল্পবিৎ।
ঘটজী বীতুরজকাদ্বৈশ্যায়াং সংবভূবহ॥
বৈশ্যায়াঞ্চ তৈলকারা দোলবাহী বভূবহ।
ধীবরাদপি শূদ্রায়াং মল্লজাতির্ভূবহ॥
ইত্যাদয়ো হ্যন্ত্যজাঃ প্রোক্তা বর্ণাশ্রম বহিষ্কৃতাঃ
ষট্‌ত্রিংশজ্জাতকর্ম্মাণি সাধিকাঃ কথিতাস্তব।

*　　*　　*　　*

দেবলাদ্গণকোজাতো বৈশ্যায়াং বারকোঽ-
পিচ।
বেণস্যাঙ্গাত্তু সম্ভূতো ম্লেচ্ছো নাম সুতোধরঃ,
পুলিন্দঃ পুকশ শৈচব খসো বৈ যবনস্তথা।
শুক্ষ কম্বোজশবরাঃ খরশ্চৈত্যাদয়ঃ স্মৃতাঃ।
বিংশতি সংহিতাকারের অন্যতম উশনা জাতি
সম্বন্ধে বলিতেছেন,—
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি জাতিবৃত্তবিধানকং
অনুলোম বিধানঞ্চ প্রতিলোম বিধিস্তথা।
সান্তরালক সংযুক্তং সর্ব্বং সংক্ষিপ্য চোচ্যতে,
নৃপাদ্ ব্রাহ্মণকন্যায়াং বিবাহেষু সমন্বয়াৎ
জাতঃ সূতে ত নির্দ্দিষ্টঃ প্রতিলোমবিধের্দ্বিজঃ
বেদানর্হস্তথা চৈষাং ধর্ম্মানামনু বোধকঃ।
সূতাদ্বিজ প্রসূতায়াং সুতো বেণুক উচ্যতে।
নৃপায়ামেব তস্যৈব জাতো যশ্চর্ম্মকারকঃ।
ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রসংসর্গাজ্জাতশ্চণ্ডাল উচ্যতে।
চণ্ডালাদ্বৈশ্যকন্যায়াং জাতঃ শ্বপচ উচ্যতে।
নৃপায়াং বৈশ্যসংসর্গাদায়োগব ইতি স্মৃতঃ।
আয়োগবেন বিপ্রায়াং জাতাস্তাম্রোপজীবিনঃ।
তস্যৈব নৃপকন্যায়াং জাতঃ সুণিক উচ্যতে,
সুণিকস্য নৃপায়ান্তু জাতা উদ্বন্ধকাঃ স্মৃতাঃ।
নৃপায়াং বৈশ্যতশ্চৌর্য্যাৎ পুলিন্দঃ পরি-
কীর্ত্তিতঃ।

নৃপায়াং শূদ্র সংসর্গাজ্জাত পুক্কশ উচ্যতে॥
পুক্কশাদ্বৈশ্যকন্যায়াং জাতো রজক উচ্যতে।
নৃপায়াং শূদ্রতশ্চৌর্য্যাজ্জাতোরঞ্জুক উচ্যতে॥
বৈশ্যায়াং রঞ্জকাজ্জাতো নর্ত্তকো গায়কো
ভবেৎ।

বৈশ্যায়াং শূদ্রসংসর্গাজ্জাতো বৈদেহিকঃ
স্মৃতঃ॥

বৈদেহিকাত্তু বিপ্রায়াং জাতশ্চর্ম্মোপজীবিনঃ।

নৃপায়ামেব তস্যৈব স্বচিকঃ পাচকঃ স্মৃতঃ।
বৈশ্যায়াং শূদ্রতশ্চৌর্য্যাজ্জাতশ্চক্রী উচ্যতে।
বিধিনা ব্রাহ্মণঃ প্রাপ্য নৃপায়াস্তু সমন্ত্রকম্॥
জাতঃ সুবর্ণইত্যুক্তঃ সানুলোমদ্বিজঃ স্মৃতঃ।
নৃপায়াং বিপ্রতশ্চৌর্য্যাৎ সংজাতোভিষকস্মৃতঃ
নৃপ রাং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতো নপইতি স্মৃতঃ।
নৃপায়াং নৃপসংর্গাৎ প্রমাদাদ্গূঢ়জাতকঃ॥
সোঽপিক্ষত্রিয় এব স্যাদভিষেকেচবর্জ্জিতঃ।
অভিষেকং বিনা প্রাপ্য গোপ ইত্যভিধায়কঃ॥
বৈশ্যায়াং বিধিনাপ্রাপ্য বিপ্রাজ্জাতোঽম্বষ্ঠ উচ্যতে
বৈশ্যায়াং বিপ্রতশ্চৌর্য্যাৎ কুম্ভকারঃস উচ্যতে
কুলালবৃত্ত্যা জীবেৎ নাপিতা বা ভবন্ত্যতঃ।
সূতকে প্রেতকে চাপি দীক্ষাকালেঽথবাপনম্॥
নাভেকর্দ্ধন্তু বপনং তস্মান্নাপিত উচ্যতে।
কায়স্থ ইতিজীবেত্তু বিচরেচ্চ ইতস্ততঃ॥
কাকাল্লৌল্যং যম ৎক্রৌর্য্যং স্থপতেরথকৃন্তনম্।
আদ্যাক্ষরাণি সংগৃহ্য কায়স্থইতি কীর্ত্তিতঃ॥
শূদ্রায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতঃ পারশবোমতঃ।
তস্যাং বৈ চৈবশো বৃত্ত্যা নিষাদো জাত উচ্যতে।
নৃপাজ্জাতো হথ বৈশ্যায়াং গৃহ্যায়াং বিধিনা স্মৃতঃ।
তস্যাং তক্ষ্ণৈব চৌরেণ মণিকারঃ প্রজায়তে,
শূদ্রয়া বিপ্রসংসর্গাজ্জাত উগ্রইতি স্মৃতঃ।
তস্যৈবচাবসৎ বৃত্ত্যা জাতঃ শুণ্ডিক উচ্যতে।
শূদ্রায়াং বৈশ্যসংসার্গাদ্বিধিনা সূচকঃ স্মৃতঃ।
সূচকাদ্বিপ্রকন্যায়াং জাতস্তক্ষক উচ্যতে।
নৃপায়ামেব চৈতস্য জাতো যো মৎস্যবন্ধকঃ।
শূদ্রায়াং বৈশ্যতশ্চৌর্য্যাৎ কটকার ইতি স্মৃতঃ।
বশিষ্ঠ শাপাৎ ত্রেতায়াং কেচিৎ পারশবস্তথা॥
বৈখানসেন কেচিত্তু কেচিদ্ভাগবতেন চ।
বেদশাস্ত্রাবলম্বাস্তে ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে॥

পদ্ম পুরাণ মতে জাতির উৎপত্তি যথা,—

কুলটায়াঞ্চ শূদ্রায়াং চিত্রকারস্য বীর্য্যতঃ।
বভূবাট্টালিকাকারঃ পতিতো জারদোষতঃ॥
অট্টালিকাকার বীর্য্যেণ কুম্ভকারস্যযোষিতঃ
বভূব কোটকঃসদ্য পতিতো গৃহকারকঃ॥
কুম্ভকারস্য বীর্য্যেন সদ্যঃ কোটকযোষিতঃ।
বভূব তৈলকারশ্চ কুটীলঃ পতিতোভুবি॥
সদ্যঃক্ষত্রিয় বীর্য্যেণ রাজপুত্রস্যযোষিতঃ।
বভূব পতিতো দস্যু লেটশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
লেট তীবরকন্যায়াং জনয়ামাস জাতীন্।
মালং মল্লং মাতরশ্চ ভড়ং কোলং কলন্দরং॥
ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রবীর্য্যেণ পতিতো জারদোষতঃ।
সদ্যোবভূব চাণ্ডালঃ সর্ব্বস্মাদধমোঽশুচিঃ॥
তীবরেণ চাণ্ডাল্যাং চর্ম্মকারো বভূবহ।
চর্ম্মকার্য্যাঞ্চ চাণ্ডালাৎ মাংসচ্ছেদী বভূবহ।
মাংসচ্ছেদ্যাং তীবরেণ কোচশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কোচস্ত্রিয়াস্তু কৈবর্ত্তাৎ কাণ্ডারঃপরিকীর্ত্তিতঃ॥
সদ্যশ্চণ্ডাল কন্যায়াং লেটবীর্য্যেণ শৌনক!
বভূবতুস্তৌ দ্বৌ পুত্রৌ দুষ্টৌ হড্ডি ডোমৌ তথা।
ক্রমেণ হড্ডি কন্যায়াং সদ্যশ্চণ্ডাল বীর্য্যতঃ।
বভূবুঃ পঞ্চপুত্রাশ্চ দুষ্টা বনচরাশ্চ তে।
লেটাত্তীবর কন্যায়াং লেটবীর্য্যেণ শৌনক!
বভূব সদ্যো জালানো গঙ্গা পুত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
গঙ্গা পুত্রস্য কন্যায়াং বীর্য্যেণ বেশধারিণঃ—
বভূব বেশধারীচ পুত্রো যোগী প্রকীর্ত্তিতঃ।
বৈশ্যাত্তীবর কন্যায়াংসদ্য শুণ্ডী বভূবহ।
শুণ্ডীযোষিতো বৈশ্যাত্তু পৌণ্ড্রকশ্চ বভূবহ॥

ক্ষত্রাৎ করণ কন্যায়াৎ রাজপুত্রো বভূবহ।
রাজপুত্র্যাস্তু করণাদাগুরীতি প্রকীর্ত্তিতঃ।
কন্যৌ তীবর সংসর্গাদ্ধীবরঃ পতিতোভুবি।
তীবর্য্যাং ধীবরাৎ পুত্রো বভূব রজকঃ স্মৃতঃ।
রজকাং তীবর্য্যা চৈব কোদালীতি বভূবহ॥
নাপিতাদ গোপ কন্যায়াং সর্ব্বস্বী তস্য যোষিতঃ।

শ্রীনির্ম্মলানন্দ ভারতী।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষাষ্টক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

চতুর্থ শ্লোকালোচনার পরিশিষ্ট।

কবিতাংবা (ন কাময়ে)—আমি কবিতাও চাই না। কবিতা মানুষের আর একটি বিশেষ ঐহিক প্রিয় বস্তু। রস বা প্রিয়তাই মানবাত্মার স্বাভাবিক প্রীতির নিদান। এই জন্যই স্বয়ং ভগবানকেও শাস্ত্রে রসস্বরূপ বলা হইয়াছে। স্বয়ং শ্রুতি তাঁহাকে "রসো বৈ সঃ" বলিয়া অভিনন্দন করিয়াছেন। আবার বাক্যই জীব-জগতে মানুষের সুবিশিষ্ট সম্পদ। মহাবাক্য স্বরূপ বেদই মানুষের "শব্দ ব্রহ্ম।" ইহাই বাক্যের বিশেষ গৌরব; যাহাহউক, সাধারণতঃ বাক্য ও রসের একত্র সমাবেশই কাব্য বা কবিতা। শাস্ত্রও বলিয়াছেন—"কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং।" রসাত্মক যে বাক্য, তাহাই কাব্য। এই জন্যই কাব্য বা কবিতা মানুষের স্বতএব প্রিয়।

"কাব্যশাস্ত্রবিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্।" বুদ্ধিমান ব্যক্তি কাব্যশাস্ত্র-রসাস্বাদনেই কালক্ষেপ করেন। অর্থাৎ যিনি কাব্যশাস্ত্রে উদাসীন, তিনি জগতের একটি সার রসে বঞ্চিত; সুতরাং তিনি সুবুদ্ধিমান জীব মানব হইয়াও এ বিষয়ে বুদ্ধিহীন।

কাব্য এই সংসার-বিষবৃক্ষের অমৃত-ফল।
"সংসার-বিষবৃক্ষস্য দ্বে অত্র রসবৎ ফলে।
কাব্যামৃত রসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সুজনৈঃ সহ॥

অর্থাৎ—

সংসার বিষের তরু; সুধা ফল দুটি তার।
কাব্যামৃত-রসাস্বাদ, সুজন-সঙ্গম আর॥

সুপ্রাচীন কাল হইতেই ভারতে কাব্যের এইরূপ অসাধারণ গৌরব প্রথিত আছে। স্বয়ং বেদই আদি কবি লোকপিতামহ ব্রহ্মার আদি কাব্য; অধিক কি, আজ বেদের মাত্র আধিভৌতিক অর্থেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অসাধারণ কবিত্ব দেখিতেছেন। ভারতের সর্ব্ব শাস্ত্রেই কবিত্ব, সর্ব্ব শাস্ত্রেরই কথা কবিতা-সূত্রে গাঁথা। আমাদের ঋগ্বেদের মন্ত্র হইতে পাঠশালার "শিশুবোধ" পর্য্যন্ত কবিতাচ্ছন্দে গ্রথিত। মহাকাব্য রামায়ণ মহাভারত হইতে আমাদের মেয়েলী শিশুর সোহাগ পর্য্যন্ত কবিতাময়। ফলে কবিত্ব ভাব স্বভাবতই ভারতের চির-ধাতুগত বা মজ্জাগত বস্তু; সুতরাং ভারতবাসীর কবিত্বপ্রিয়তা একান্ত স্বাভাবিক।

সত্বাদি গুণত্রয়-ভেদে কবিতাও ত্রিবিধা। কবিতাশ্রিত নয়টি রস যথাক্রমে ত্রিতয়রূপে এই ত্রিগুণ বিভাগে বিভক্ত। আদি, শান্ত, করুণ, এই তিন রসে সাত্বিকী কবিতা; বীর,

রৌদ্র, হাস্য, এই রসত্রয়ে রাজসী কবিতা; এবং ভয়, বিস্ময়, বীভৎস, এই ত্রি রসে তামসী কবিতার পরিচয় পাওয়া যায়। ফলে এ সম্বন্ধে বিচারগত মতভেদ আছে। আদিরস কিরূপে সাত্ত্বিক রস হইতে পারে, হাস্য ও ভয়ানক রসের কোন্‌টি রাজস, কোন্‌টি তামস, এ সব কথা লইয়া অনেক আলোচনা চলিতে পারে; কিন্তু বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে মূল প্রসঙ্গ ছাড়িয়া ও বিষয়ে অধিক অগ্রসর হওয়া অপ্রাসঙ্গিক বোধ হয়।

যাহাহউক, কাব্য বা কবিতার আকর্ষণ, আমাদের সাধারণতঃ এক প্রধান আকর্ষণ, সন্দেহ নাই। ভোগের যত কিছু বাছা বাছা পার্থিব প্রলোভন আছে, সুকবির কবিতাও তাহার মধ্যে সুগণ্য; এমন কি, স্থলবিশেষে অগ্রগণ্য। একটি প্রাচীন ব্যক্তিগত রুচির ঐহিক ভোগ্য-তালিকা দেখুন।—

"কালিদাস-কবিতা নবং বয়ঃ,
মাহিষং দধি সশর্করং পয়ঃ।
এণ-মাংসমবলাচ কোমলা
সম্ভবন্ত মম জন্ম জন্মনি॥"

অর্থাৎ—

কবিতা কালিদাসের, নবীন বয়স।
মহিষের দধি, আর চিনির পায়স॥
হরিণের মাংস, আর সুকুমারী নারী।
জনমে জনমে লাভ হউক আমারি॥

এই জাতীয় একটি মৌলিক বাঙ্গালা-পদ্য এইরূপ,—

"গব্য-কাব্য-নব্যকাল আর নব্যা নারী।
মরতে স্বরগ-সুখ সঞ্চারে এ চারি॥"

এ সব রুচির ভাব অবশ্য অনেকটা ব্যক্তিগত, কিন্তু কাব্য-কবিতা সাধারণতঃ সকলেরই বিষাদভঞ্জিনী ও চিত্তরঞ্জিনী, সুতরাং একান্ত আকর্ষিণী, সন্দেহ নাই; অতএব ভক্ত বলিতেছেন,—হে জগদীশ! এমন যে সর্বমানব মোহিনী কবিতা, তাহাও আমি চাই না। অর্থাৎ শুদ্ধ কেবল কাব্য-রসপ্রিয়তার বশেই কবিতা-কামনা যেন আমার হয় না। তবে কি না, যে কবিতায় তোমার কথা, তাহা আমার হৃদয়ের স্তরে২ গাঁথা থাকুক্। তাহা ত কবিতা বলিয়াই আমার প্রিয় নয়, কিন্তু তাহা স্বয়ং আগম-নিগমের কবি শিব-ব্রহ্মার হৃদি-বাঞ্ছিত-নিধির কথা বলিয়া! বস্তুতঃ ভগবৎ সম্বন্ধীয় ব্যতীত যদি শিব-ব্রহ্মার কথিতও অপূর্ব্ব কবিত্বপূর্ণ অন্যবিধ শাস্ত্র-পুরাণাদি থাকে, তবে তাহাতেও ভক্তের রুচি-মতি যায় না।

"যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণেবা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে।
ন শ্রোতব্যং ন মন্তব্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥"

অর্থাৎ —

যে শাস্ত্রে বা পুরাণেতে হরিভক্তি নাহি র'ন॥
শুনিবেনা—মানিবেনা, যদি ব্রহ্মা নিজে ক'ন॥

তবে সুখের বিষয় এই যে, ব্রহ্মাদি কেহই ফলিতার্থে হরি-কথা ছাড়া অন্য কথা ক'ন নাই। তবে কোন কথাবা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হরি-কথা, কোন কথাবা পরোক্ষ-পরম্পরাভাবে হরি-কথা। স্বয়ং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর বা ব্রহ্মর্ষি-সিদ্ধর্ষি-মহর্ষিনিকর, সকলেই ভগবদ্ভজনকেই মুখ্য লক্ষ্য করিয়া সকল শাস্ত্র কহিয়াছেন। যিনি যত দূরই আপাত-ঐহিক আলাপে অগ্রসর হইয়া থাকুন, সকলেরই বিষয়ের মূলগতি-পরিণতি স্থূলতঃ না হইলেও সূক্ষ্মতঃ ভগবদভিমুখিনী, সন্দেহ নাই। ফল-কথা, সর্ব্বগত ভাবে যে ভাগবতধর্ম্ম চায়,

সে সকল শাস্ত্রেই তাহার অনুকূলতা পায়; কারণ প্রায় ভারতীয় শাস্ত্র মাত্রই ভাগবত-ভিত্তিমূলে গঠিত বা গ্রথিত। তারপর ভক্তের আর কথা কি? তিনি হয়ত ভূগোল পড়িয়াও কাঁদেন; প্রাণীবিদ্যা উদ্ভিদবিদ্যা পড়িয়াও ভাব-রসে ভাসেন; জ্যোতিষ পড়িয়াও ধ্যানানন্দে মজেন! তাঁহার হয়ত "টপ্পা" শুনিয়াও অশ্রু ঝরে; মাঝার 'সারী'তেও শরীর শিহরে! সুতরাং সেরূপ নিত্য ভাগবতী নেশায় বিভোর ভক্তের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু আহা! তথাপি আমাদের দয়াময় শ্রীগৌরাঙ্গের সুধাময় শিক্ষা-শ্লোক সাধককে সাবধান করিয়া দিতেছেন যে, কেবল কিঞ্চিৎ কাব্যরসপ্রিয়তার বশেই যেন সেই শিব-সেব্য পরম রসে বঞ্চিত না হইতে হয়। তাই কেবল মাত্র অনিত্য কাব্য-রসের প্রতিই লক্ষ্য করিয়া ভক্ত-প্রার্থনা-বাক্যে ব্যক্ত করা হইয়াছে—"কবিতাং বা (ন) জগদীশ কাময়ে।"

তবে কামনা কি কিছুই নাই? আছে বৈ কি। যতক্ষণ আমিত্ব বা অহংতত্ত্ব, তত-ক্ষণই মনের অস্তিত্ব। মন কেবল ইচ্ছাত্মক চিত্তত্ত্ব মাত্র। জীবের সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মিকা বৃত্তিই মন, ইহাই শাস্ত্র সিদ্ধান্ত; অতএব মন যতদিন, সঙ্কল্প বিকল্পরূপা ইচ্ছা অনিচ্ছাও ততদিন। তবে ভক্তের ইচ্ছা অনিচ্ছা কখনও বাহ্যতঃ ও স্থূলতঃ বিবিধ ঐহিকবিষয়িণী হইলেও মূলতঃ ও সূক্ষ্মতঃ সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছারই একান্ত অনুবর্ত্তিনী। ভক্তের এই ভগবদিচ্ছানুবর্ত্তিতা একমাত্র অহৈতুকী ভক্তিরই ফল। সুতরাং ভগবচ্চরণে অহৈ-তুকী ভক্তিই ভক্তের একমাত্র সাধনা ও কামনার বিষয়।

"মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভব-তাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।"

জগদীশ! আমার জন্মে ২ ঈশ্বরে,—অর্থাৎ তোমাতে যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি হয়।

অহৈতুকী ভক্তির মাহাত্ম্য অনির্ব্বচনীয়। অহৈতুকী ভক্তিই ভক্তি। হৈতুকী ভক্তি ত বণিগ্‌বৃত্তি মাত্র। তবে যদি বলা যায় যে, হেতু অর্থাৎ কারণ ভিন্ন কদাচ কার্য্যোৎপত্তি সম্ভবেনা; আর অহৈতুকী ভক্তির ভগবদা-কর্ষিণী ক্রিয়া বা কার্য্যশক্তির ব্যাপারও অতি অসাধারণ, সন্দেহ নাই; অতএব এতবড়—এমন কি—সর্ব্বাপেক্ষা বড় কার্য্যটীর কারণ বা হেতু নাই, ইহাও অসম্ভব। তদুত্তরে নিবেদন এই যে, যেখানে বিষয়ই ভগবদ্-ভজনের হেতু, সেখানে সেই ভজন-শক্তিমূলা ভক্তিই হৈতুকী ভক্তি; আর যেখানে ভগবানই ভগবদ্ভজনের হেতু, সেইখানে সেই ভজন শক্তিমূলা যে ভক্তি, তাহাই অহৈতুকী ভক্তি।

অহৈতুকী ভক্তিই, প্রকৃত রাগানুগা ভক্তি—মুখ্যা ভক্তি—পরাভক্তি—নির্গুণা ভক্তি। আর হৈতুকী ভক্তিই "প্রবৃত্ত" সাধকের বৈধীভক্তি,—গৌণী ভক্তি—সগুণা ভক্তি—ভক্ত্যাভাস মাত্র। যেখানে কেবল বিষয় আদায় করিবার জন্যই ভগবানকে ভজন, সেখানে সেই ভজনের ভক্তিকে 'ভক্তি' না বলিয়া তোষামোদবিশেষ বলিলেও বলা যায়। যেখানে ভগবান কেবল 'মারফৎদার' অথবা আরও প্রগল্‌ভ-ভাষায় বলিলে বল [illegible], "মুটে-মজুর"—সেখানে ভক্তির ভজন ধর্ম্মের নমনীয়তা আর থাকিল কৈ? কেবল পরমধনকে খাটাইয়া—তাঁহার দ্বারা পুরি

বেশন করাইয়া, বিষয়-ভোজে বসা গেল মাত্র! যেন কোহীনুর বিনিময়ে কাচকয় হইল; যেন সোণার থালে ছাই ভক্ষণ হইল! যেখানে ভজনের কোন ঐহিক হেতু বর্ত্তমান, সেখানে সেই ভজনের ভক্তিই (ভক্তি ভিন্ন ভজন হয় না) হৈতুকী ভক্তি, এবং ঐহিক হেতু-পরিশূন্য ভজনের যে ভক্তি, তাহাই অহৈতুকী ভক্তি। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই চারিভাগে ভজনাধিকারী ভক্তের বিভাগ বিবৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রথম তিন প্রকার ভক্তই হৈতুকভক্তিমান। আর শেষোক্ত 'জ্ঞানী' ভক্তই অহৈতুকভক্তিমান।

"জ্ঞানকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ড, সকলি বিষেরি ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়,
মিছে মায়ায় ঘুরে মরে, নানাযোনি ভ্রমণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়।"

জ্ঞান ও কর্ম্মের এইরূপ যে সব ভীষণ নিন্দা, ইহা কোন্ জ্ঞান ও কর্ম্মের? শ্রীভগবানের মুখপদ্ম-মধুচক্র শ্রীগীতায় কর্ম্ম ও জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা। অতএব উহা অবশ্য সেই ভগবদভিনন্দিত জ্ঞান-কর্ম্ম হইতে পারে না। যে জ্ঞান ও কর্ম্ম ভক্তিশূন্য শুষ্ক তত্ত্বপ্রতীতি-মূলক ও অস্থায়ী ফলাভিসন্ধায়ী, তাহাই বস্তুতঃ উক্ত নিন্দার লক্ষিত জ্ঞান-কর্ম্ম। "কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ" পূর্ব্বক কেবল "শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকাম" যে নিষ্কাম কর্ম্ম, তাহাই গীতার আদর্শ কর্ম্ম, এবং উহারই ক্রিয়া-শক্তিস্বরূপিণী যে ভক্তি, তাহা অবশ্য অহৈতুকী ভক্তি; সুতরাং তাহা "বিষের ভাণ্ড" না হইয়া দেব-দুর্ল্লভ অমৃতভাণ্ডই বটে। সত্যের ধ্রুব-প্রহ্লাদ, পরে ক্রমে জনকাদি হইতে কলির রায় রামানন্দ পর্য্যন্ত সংসার-ধর্ম্মী হইয়াও অনাসক্ত, সুতরাং ভগবানের গীতোক্ত প্রিয় কর্ম্মী ভক্ত। ইহাঁরা নিষ্কাম-কর্ম্মী হইয়া গীতার চতুর্দ্ধা-বিভক্ত উপাসকের মধ্যে 'জ্ঞানী ভক্ত' বিভাগেরই জগদুজ্জ্বল আদর্শ। খুব সোজা কথায় বলা যায়, জ্ঞান অর্থে জানা। গীতোক্ত এই 'জ্ঞানী' ভক্ত কি জানেন? তিনি জানেন,—ভগবানই সর্ব্বস্ব। ভগবানই প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয়, আত্মার আত্মা। ভাষা আর কি বলিবে? ভাষা সে ভাব-তরঙ্গে ভাসিয়া যায়!

"তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যোহি যস্য প্রিয়ো জনঃ।"
সে যে তার কি যে ধন,
যে যাহার প্রিয় জন!

ভগবান যে ভক্তের কাছে কি, তাহা অপূর্ণ মানুষের ভাষা আর কি বুঝাইবে? তবে আমাদের স্থূল নিম্নাধিকারের উপযোগী-ভাবে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, জীবের যদি কিছু সাধ্য থাকে, প্রাপ্য থাকে বা ভোগ্য থাকে, তাহা কৃষ্ণ-দাস্য; অর্থাৎ ভগবানে আত্মসমর্পণ; ইহা জানাই গীতোক্ত ঐ জ্ঞানী ভক্তের জ্ঞানের 'জ্ঞা' ধাতুর সার্থকতা। ইহা জানিলে, ভগবত্তত্ত্বে যে ভজনা-শক্তি-প্রবাহ সতত স্বতঃপ্রসারিত হয়, ঐহিক হেতুর একান্ত অভাব থাকায়, উহাই অহৈতুকী ভক্তি। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থীর ভজন-শক্তিরূপিণী যে ভক্তি, তাহা হৈতুকী। পদ্মানদীর তুফানে পড়িয়া যখন ভগবানকে "পরিত্রাহি" ডাকিতেছি, তখন আমি "আর্ত্ত" উপাসক হইয়াছি। কিন্তু মন বলিতেছে, "এই উপাসনার গুণেই এই উপাসনার

বিদ্যুৎ-ত্রস্ত হস্ত হইতে নিস্তার পাইলে বাঁচি! এই দুর্গানাম-জপ ও "ত্রাহি মধুসূদন" রব, মা দুর্গা ও মধুসূদনের কৃপায় শীঘ্র শেষ করিয়া, খালে নৌকা নিয়া, একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি" ইত্যাদি। কালী-দুর্গা-মনসার জন্য হয়ত অনেক 'পাঁঠা মানসা' হইল। হরিরও অনেকগুলি বাতাসা পাওনা হইল। কিন্তু ইহাও উপাসনা। ইহাতেও পূর্ব্বোক্তরূপা ভক্তি আছে এবং সে ভক্তিরও উপাসকের অভীষ্ট-প্রদায়িনী শক্তি আছে। সাধারণ সংসারী মাত্রকেই এই রোগ-শোক-দুঃখ-দুর্ভোগ ও বিবিধ বিঘ্নবিপদ-সঙ্কুল সংসারে অনেক সময়েই "আর্ত্ত" ভক্ত হইতে হয়। বিপন্ন বিলাতী নাস্তিকও বলেন—"O God! Save me, if there is any God." দয়াময়ের কি বিধান, বিপদে ফেলিয়াও আস্তিকতা ও আর্ত্ত উপাসকতা দান করেন! যাহাহউক, আর্ত্ত উপাসকের এই ভক্তি বিপদ্মুক্তিরূপ হেতুমূলকতায় হৈতুকী। আর দেহতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব ও বিশ্বতত্ত্বে ভগবত্তত্ত্ব বুঝিবার জন্য যিনি সাধনা করিতেছেন, তিনি 'জিজ্ঞাসু' উপাসক। সাধারণতঃ জ্ঞানমার্গীয় তপস্বীদের সাধন এই জাতীয়। এই সাধনের ভাব-শক্তিরূপিণী ভক্তি তত্ত্বজিজ্ঞাসারূপ হেতুবশে হৈতুকী। অপর, ধন-জন-পুত্র-বিত্তাদি কামনায় যিনি ভগবদারাধনাপরায়ণ, তিনি "অর্থার্থী" উপাসক। ঐহিক স্বার্থের হেতুত্ব-বশে তৎক্রিয়াশক্তিরূপিণী ভক্তিও হৈতুকী। ফলে চরম-পরমার্থ-প্রদায়িনী অহৈতুকী ভক্তির ভাগ্যবান অধিকারী শ্রীভগবানের শ্রীমুখোক্ত সেই 'জ্ঞানী'-ভক্ত। তাঁহার ভগবদ্গত চিত্তের বিশুদ্ধ বিষয়বৈরাগ্য জন্য ঐহিক হেতুত্ব অভাবে বা একমাত্র ভগবত্তত্ত্বগত হেতুত্ব-প্রভাবে তাঁহার ভক্তি সাধন-রাজ্যের সম্রাজ্ঞী। তিনি সেই মন-চোরা ধনের পায়ে প্রেম-ডোরের বাঁধন দিয়া হৃৎকারাগারে রাখিতে সমর্থা। অধ্যাত্মলীলায় তিনিই কৃষ্ণপ্রিয়া 'সমর্থা।' মহাভাবময়ী হইয়া তিনিই রাধাতত্ত্বে পরিণতা! যদি বিষয়-বিতৃষ্ণ উপাসকের কোন তৃষ্ণা থাকে, তবে সে এই অহৈতুকী ভক্তির তৃষ্ণা। যদি নিষ্কাম-সাধকের কোন কামনা থাকে, তবে এই অহৈতুকী ভক্তির কামনা। তাই শিক্ষা-শ্লোকোক্ত ভক্ত সংসারের সর্ব্বপ্রধান কামনা-কলাপে জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল সেই "কামনা-সাগর" কৃষ্ণের কৃপা-সাগরে অহৈতুকী-ভক্তি রত্নেরই ভিখারী হইয়াছেন।

এই ভক্তির লক্ষণ-দর্শনে শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্ল্লভা।
সান্দ্রানন্দস্বরূপা চ শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা॥"

অর্থাৎ—

ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকারিণী।
সুদুর্ল্লভা নিত্যানন্দা কৃষ্ণ-আকর্ষিণী॥

শুদ্ধ ভক্তির সুশীতল ছায়ায় ক্লেশের প্রবল তাপও পরাস্ত। ভক্ত সেই ভক্তির শক্তিতেই অক্লেশে ক্লেশজয়ী। অহৈতুক ভক্ত ঐহিক সুখ-দুঃখের কোন ধারই ধারেন না। ভজনেই তাঁহার সুখ; ভজন-ভঙ্গেই তাঁহার দুঃখ। এমন কি, বরং দুঃখে ভগবানকে ভাল করিয়া প্রাণ ভরিয়া ডাকা যায় ভাবিয়া কোন ভক্ত বা সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখেরই প্রার্থী! আহা! সেই তুলসী-বিলাসীর প্রিয় দাস তুলসীদাসজী বলিয়াছেন'—

"সুখ-শের্ মে বাজ্ পড়্ হো,
দুখে বলিহার্ যাই।
আসা দুখ্ আওয়ে যো,
ঘড়ী ২ (হরি) নাম সোঁরাই ॥"

অর্থাৎ—

বজ্রাঘাত হ'ক্ সুখের মাথায়,
দুঃখে বলিহারি যাই।
হেন দুঃখ মোর হউক্, যাহায়—
ঘড়ী ২ 'হরি'বলে' চেঁচাই ॥

দেখুন অহৈতুকী ভক্তির ক্লেশনাশিনী শক্তির কি চারু চিত্র। তারপর, অশুভের লেশ থাকিতে যে ভক্তির উদয়ই হয় না, সে ভক্তি যে 'শুভদা,' তাহা বলাই বাহুল্য। আর সে ভক্তি যে 'মোক্ষলঘুতাকৃৎ', তদ্বিষয় পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। শাস্ত্র বলেন, "ভক্তস্য পদপদ্মস্য মুক্তিহি মধু-লুব্ধিকা"—

অর্থাৎ—

ভক্ত-পাদ-পদ্ম-মধু আশা করি।
লালায়িতা সদা মুক্তি-মধুকরী ॥

ইহার উপরে আর কথা কি? অতএব এ হেন ভক্তি যে 'সুদুর্ল্লভা'—বহুসুকৃতি-সাধন-সম্ভবা, তাহা বুঝাইতে আর বাগাড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন। অপর, সুখের প্রতিশব্দ সাধারণতঃ "আনন্দ" হইতে পারে; কিন্তু সুখ-দুঃখ ত পরস্পর সাপেক্ষ; সুতরাং সুখ-দুঃখের অতীত যে আনন্দ, তাহাই 'সান্দ্রানন্দ'; ভগবানে অহৈতুকী ভক্তির ফল এই সান্দ্রানন্দ; কেননা, এই ভক্তির ভগবদ্বিজয়িনী মহাশক্তিতেই আনন্দময় ভগবান্ অবশে আকৃষ্ট! তাই ইহা "শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী।" স্বৰ্ণাক্তিতে কবি গাহিতেছেন,—

"অখিল আকৃষ্ট করি নাম মোর 'কৃষ্ণ,'
ভক্তি-আকর্ষণে আমি আপনি আকৃষ্ট!
'কৃষ্' আকর্ষণ-অর্থে আমি শুধু কৃষ্ণ।
আমারে আকর্ষি মোর ভক্ত কৃষ্ণ-কৃষ্ণ!"

হৈতুকভক্তের ভক্তি বা অনুরক্তি বিষয়ে। তবে "মায়ফৎদারী" সূত্রে উক্ত বিষয়ের বিধানকর্ত্তা ঈশ্বর যেটুকু ভালবাসা পাইতে পারেন, তাই পান। ভক্তি-দর্শন শাণ্ডিল্য-সূত্রের "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে" সূত্রে যে ভালবাসা সূচিত হয়, তাহাই অহৈতুকী ভক্তি বা ভালবাসা। হৈতুক ভক্তের প্রকৃত পরানুরক্তি বিষয়ে; আর ভগবানে সেই পরানুরক্তির, অনুরোধেই বড় জোর অনুরক্তি; এবং উহা কেবল কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম-বুদ্ধি-সঞ্জাত। অনন্যমমতা ভিন্ন অহৈতুকী ভালবাসা হইতেই পারে না।

"অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥"

ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব, নারদ প্রভৃতি অহৈতুক ভক্তগণ ভগবানে প্রেম-সঙ্গতা অনন্যমমতাকেই ভক্তি বলিয়াছেন। ভগবানে অনন্যমমতাযুক্ত অন্যাভিলাষিতামুক্ত ভক্ত কেবল তাঁহারই সেবার্থ তাঁহাকে ভজেন; তাঁহারই রূপ-গুণে তাঁহাতে মজেন! ভগবান ঠিক যেন অহৈতুক ভক্তের "কৃপণের ধন!" সুতরাং সে ধন ব্যয়ের বা বিনিময়ের জন্য নহে; কেবল হৃদয়-ভাণ্ডারে চিরসঞ্চিত রাখার ধন। "কৃপণস্য ধনানীব ত্বন্নামানি ভবন্তু মে" ভক্তের প্রার্থনাই এই।

কোন বঙ্গ-কবি বলিয়াছেন, "ভালবাসার অর্থ ভালবাসা।" বাঞ্ছিত ধনকে হৃদয়-

মধ্যে ভাল বাসা—অর্থাৎ উত্তম বাসস্থল না দিয়া লাঞ্ছিত করা প্রেমের ধর্ম্ম নহে।

"ভালবাসা দেও যারে, দেও তারে ভাল বাসা।
ভাল যার হৃদাগার, তাঁরি সার ভালবাসা॥"

কামনা-কর্দ্দম-ক্লেদিত, আকাঙ্ক্ষার আবর্জ্জনায় আচ্ছাদিত, বিষয়-বিষজীর্ণ, মোহ-মলাকীর্ণ হৃদয়ে প্রেমাস্পদকে কে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রীত হইতে পারে? যে পারে, সে প্রেমিক নহে—কামুক মাত্র। আমাদের মানসাগার সাধারণতঃ দুর্গন্ধ অন্ধকূপতুল্য। অহৈতুকতার আলোক-বিস্তার ও স্বার্থশূন্য-তার সমীর-সঞ্চার ভিন্ন তাহা 'ভাল বাসা' বা ভালবাসার যোগ্যতা পায় না। কোন ভক্ত ভগবদুদ্দেশে বলিতেছেন,—

"ক্ষীর সারমপহৃত্য শঙ্কয়া
যদি পলায়নং স্বীকৃতং ত্বয়া।
মানসে মম নিতান্ত-তামসে,
নন্দনন্দন কথং ন লীয়সে॥"

অর্থাৎ—

হরি ক্ষীর-ননী, শঙ্কা মনে গণি,
পলাইতে যদি চাও,
নন্দসুত! মম চিত অন্ধতম,
তাতে কেন না লুকাও?

ইহা কেবল ভক্তের ভাব বিকাশ ও দৈন্য-প্রকাশ মাত্র। বাস্তবিক উক্ত ভক্ত হৃদয় অবশ্য অন্ধতমসাচ্ছন্ন নহে; বরং ভগবানের প্রতি অহৈতুকী ভালবাসার গোলোকীয় আলোকে উহা সতত সমুদ্ভাসিত। সুতরাং উহাই ভাল বাসা এবং উহাতে যাঁহার বাসা, সর্ব্ব ভালবাসার সারই তাঁহাকে ভাল বাসা!

সতীস্ত্রীর পতি-প্রেম অহৈতুকী ভাল-বাসার একটি অলৌকিক লৌকিক উদাহরণ। পতিব্রতার প্রেমে কোন ঐহিক স্বার্থের হেতু নাই। যাঁহার স্বার্থেরই সার্থকতা নাই, যাঁহার পরার্থই পরম স্বার্থ, সেই উৎসর্গিতাত্মিকা রমণীমণির প্রেমের খনি চেতনা কলঙ্কপাংশুশূন্য। আহা! একটি মধু হইতে মধুর "নিধুর টপ্পা" বা প্রেম-সঙ্গীত মনে পড়িল। উহাতে পরম পদার্থ 'পিরীতি'র অমিয়-অহৈতুকতার কি চমৎকার চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে! গানটি পুরাতন ও বহুজন-বিদিত বটে, কিন্তু ভাবোৎকর্ষে চিরনূতন ও রসাস্বাদ-রহস্যে অনেকের অবিদিত।

"ভালবাসিবে বলে' তোমায় ভালবাসিনে॥
আমার স্বভাব এই—তোমা বই আর জানিনে॥
বিধু মুখে মধুর হাসি দেখ্‌তে বড় ভালবাসি,
তাই তোমারে দেখ্‌তে আসি,
দেখা দিতে আসিনে॥
বাস বা না বাস ভাল, ভালবেসে থাকি ভাল;
তোমার ভালই আমার ভাল;
(আমি) অন্য ভাল বুঝিনে॥" (ইত্যাদি)

বলিতে কি, ইহার তুলনা কোন ভাষার কোন সাহিত্যে আছে কি না, সন্দেহ। বুঝি এই এক গানেই বঙ্গ সঙ্গীত-সাহিত্য ধন্য! আজ্ কাল্ কার প্রেমসঙ্গীতে "আমি নিশি-দিন ভালবাসিব তোমায়, তুমি অবসর মত বাসিও"—এই সব গানেরই বড় বাহার; কিন্তু উহার কাছে ইহা কোথায় লাগে? উহাতে 'বাসিও' নাই—কেবল 'বাসিব'! সুতরাং উহার কাছে ইহা চন্দ্রোদয়ে নক্ষত্র-ভাতিবৎ অভিভূত। আসলের কাছে নকল যেমন, ওস্তাদের কাছে সাকরেদ্ যেমন, পাকার কাছে কাঁচা যেমন, উহার কাছে

ইহা তেমন। আহা! কি মাহেন্দ্রক্ষণেই বিধু-বাবুর মধুময়ী লেখনী এই অমিয়-ধারাটি উদ্গীরণ করিয়াছিল। এই ভাবের আর একটি আধুনিক গানও অতি উপাদেয় লাগিয়াছিল। এই গীতিদ্বয় প্রায় পরস্পর জ্যেষ্ঠা-কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায়।

"হায়রে হায়! প্রেমিক যে জন,
সে কেন চায় ভালবাসা?
দিলে—নিলে, বদল পেলে,
ফুরিয়ে গেল প্রেম-পিপাসা!
প্রেম চায় ভালবাসি, পরাব না,—পর্‌ব
ফাঁসি;
চায়না প্রেম কেনা-বেচা;
ভালবেসেই পুরায় আশা।" (ইত্যাদি)

যে বঙ্গে শত-সহস্র সতী অলৌকিক প্রেম-রঙ্গে পতির চিতার জ্বলন্ত অনল-তরঙ্গে জীবন্ত দেহ আহুতি দিয়াছেন, সে বঙ্গের কবি-কল্পনায় অহৈতুকী প্রীতির এরূপ আলোক-চিত্র বিচিত্র কি? অহৈতুক প্রেম প্রেমের "রাজ সংস্করণ।" ইহা নিখুঁত, নির্ম্মুক্ত, নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষ। ইহাতে প্রতিদানের প্রতীক্ষা নাই। ইহাতে কেবল দান—প্রেমিকের আত্মসর্ব্বস্ব দান; আর সেই দানই ইহার প্রাণ। অপর পক্ষে, হৈতুক প্রেম সাধারণ 'বাজার-চল' প্রেম। ইহা সংকীর্ণ, স্বার্থসীমাবদ্ধ, সসীম ও সাপেক্ষ। প্রতিদানে ইহার পরমায়ু। ইহা প্রেমের বেণেগিরি বা দোকানদারী। সংসার-সম্বন্ধে এই সকাম প্রেমের প্রায় একাধিপত্য। ভগবৎসম্বন্ধেও পৃথিবীতে ইহারই প্রবল প্রসার। তবে ইহার অবশ্য উন্নয়ন (Promotion) আছে; সে কথা পরে বলিব। এক্ষণে নিবেদন এই যে, ভাবেতে অহৈতুকী প্রেম-ভক্তির পূর্ণ পরিণতি ও প্রকৃত পরিচয় শ্রীকৃষ্ণের ব্রজরসে বা ব্রজলীলায়।

"নিত্য ব্রজের-প্রেম—ব্রজেই উপমা।
অনুপমা রতি সে আপনি আত্মসীমা॥
যে ভজেছে, সেই বুঝেছে, বুঝাবে কে কারে?
যে বুঝেছে, সেই মজেছে ঐ প্রেম-পাথারে!"

বাস্তবিক সে প্রেম অতুল। তাহার অতুলতাকে ভাষায় বুঝাইবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। বৃন্দাবনের প্রেমের উপমা ধরাধামে নাই। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল, এ ত্রিধামেই নাই; বুঝি বৈকুণ্ঠধামেও নাই! বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্য-প্রেম, আর গোলোক বৃন্দাবনে মাধুর্য্য-প্রেম। মাধুর্য্য প্রেমেই অহৈতুকতার পূর্ণ পরিণতি। তাই বুঝি ব্রজরসাস্বাদনও অহৈতুক ভক্ত তুলসীদাস ব্রজ-গৌরব-ভাবে 'গর গর' হইয়া গাইয়াছিলেন,—

"বৃন্দাবন ঔর্ বৈকুণ্ঠকো তৌলে তুলসীদাস।
ভারি যো, সো ভূতল্ বৈঠে হাল্কা চড়্ আকাশ।"

চমৎকার! বৃন্দাবন ও বৈকুণ্ঠকে তুলসীদাস তৌল করিয়া দেখিলেন, ভারি যিনি, তিনি (অর্থাৎ বৃন্দাবন) ভূতলে পড়িলেন; আর হাল্কা যিনি, তিনি (অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ) কাজেই আকাশে চড়িলেন! প্রেম গৌরবেই ব্রজের এ গৌরব।

বৃন্দাবনে কৃষ্ণাত্মিকা গোপিকারা কৃষ্ণ-সুখেই সুখিনী! কৃষ্ণ সুখেচ্ছা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া গোপ যুবতী সাজিয়াছেন!

"আত্মসুখে ভুঞ্জে রতি, তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

এই কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছাই কৃষ্ণরস-জীবিকা গোপিকার যথাসর্ব্বস্ব। তাই

তাঁহারাই ভূলোকে ও গোলোকে অহৈতুক প্রেমের একাধীশ্বরী। তবে যে শ্রীকৃষ্ণের মাথুর লীলা বিলাসে গোপিকার বিষম বিরহ-বিকার; তাহাও তত্ত্বতঃ কৃষ্ণসুখেচ্ছাবৃত্তির বিরোধী নয়; কেন না সে যে অপূর্ব্ব বিরহ, তাহা এক ভাবে আবার মিলনের চূড়ান্ত! এ চূড়ান্তত্ব কিন্তু সে চূড়াধারীর পক্ষেও বটে; শুধু কেবল গোপীপক্ষেই নয়; আর গোপীদের তাহা অবিদিতও নয়। গোপীকান্তের গুপ্ত মর্ম্ম গোপীর ন্যায় আর কে জানিবে? যে বিরহে বিরহের মহাপ্রলয়—ত্রিভুবন তন্ময়, সে বিরহ কি মহামিলনময়!

"সঙ্গম-বিরহ-বিকল্পে;
বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গে সৈব তথৈকা,
ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥"

অর্থাৎ—

মিলন-বিরহ, এই উভয় মাঝারে,
বিরহই শ্রেষ্ঠতর বিহিত বিচারে;
যেহেতু মিলনে মাত্র মিলে একজন,
বিরহেতে ত্রিভুবন তন্ময়দর্শন!

মিলনের কৃষ্ণ কিরূপ? না—কৃষ্ণ যখন সম্মুখে, তখন আর পশ্চাতে নহেন। কৃষ্ণ যখন গুরুজন-বেষ্টিত গৃহ-প্রকোষ্ঠে, তখন আর সখাগণ-সম্মিলিত গোচারণ-গোষ্ঠে নহেন। কৃষ্ণ যখন নন্দের বক্ষে, তখন আর যশোদার কক্ষে নহেন। আর যখন কৃষ্ণধন শ্রীমতীর হৃদে, তখন আর শ্রীদামের কাঁধে নহেন। মিলনের এক কৃষ্ণ এইরূপ; কিন্তু বিরহের অনন্ত কৃষ্ণ যুগপৎ দূরে—অদূরে, অন্তরে—বাহিরে; জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে! যুগপৎ কক্ষে, বক্ষে, গোষ্ঠে, প্রকোষ্ঠে, হৃদে, কাঁধে, সর্ব্বত্র! তাই "ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে।"

প্রেম যেখানে অহৈতুক, সেখানে বিরহেও স্থূল মিলনাধিক সূক্ষ্ম সুখ। কারণ তখন বাহ্যিক সসীম বিরহে আন্তরিক অসীম মিলন! কিন্তু হৈতুকতার সীমার মধ্যে এ অধিকার একান্তই অসম্ভব। হৈতুক প্রেমের বিরহে স্বার্থহানি-জন্য এক আপাত-তীব্র রাজস দুঃখ। আর অহৈতুক প্রেমের বিরহে সমাধিময় সাত্ত্বিক শোকেও সাক্ষাৎ-সূক্ষ্ম স্মরণানন্দ! কিন্তু তাহা চিনিবার জহুরী এ জগতে বড় কম।

"যে জন চিনিতে জানে, বিষ হতে সুধা আনে,
শীতের সন্ধ্যায় আনে শরতের শতদল।
মরুভূমি হতে আনে নিদাঘ-মধ্যাহ্নে জল!
খোদিয়া অঙ্গার-খনি, লভে সে হীরক-মণি,
মহানিম্বে মধুবত্ত—দ্রবত্ব পাষাণে!
নন্দনের পারিজাত পায় সে শ্মশানে!"

ব্রজগোপমণ্ডলে ঘরে ঘরে নারী-নরে অন্তরে বাহিরে এই অপূর্ব্ব অধিকার। তাই বিচ্ছেদে আচ্ছাদিত বিরাট মিলন!

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজেষ্টরীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।

৯ম বর্ষ, ৯ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। | আশ্বিন। | ১৩০৯ সাল, ১৮২৪ শকাব্দা,

শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষাষ্টক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজজনের সম-সুখ-দুঃখতার যে আপাত-বিরোধ এই মাথুর বিরহে প্রতীয়মান হয়, সেই অপূর্ব্ব রসময় দুর্ভেদ্য রহস্যটির আর এক প্রকার পরিস্ফূর্ত্তির প্রয়োজন। কবি বলিতেছেন,—

"ব্রজের নির্হেতু-প্রেম কৃষ্ণ-সুখে সুখী;
সুখী কৃষ্ণ মথুরায়,—ব্রজ কেন দুখী?
হৃষ্ট মধুপুর কৃষ্ণ-অভিষেক-ধূমে;
হাহাকার—অশ্রুধার সার ব্রজভূমে!
কৃষ্ণানন্দে মথুরায় মহামহোৎসব।
নিরানন্দ-বৃন্দাবনে সব যেন শব!
সুখে সুখ দুখে দুখ পিরীতের রীত;
হাসে কৃষ্ণ, কাঁদে ব্রজ, একি বিপরীত!
আনন্দিত বাসুদেব বসুদেব-কোলে;
পিতা নন্দ কেঁদে অন্ধ 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বোলে!
শ্রীঅধরে রাজভোগ দেন দেবকিনী;
মূর্চ্ছাগতা মা যশোদা হাতে লয়ে ননী!
কুব্জাপানে চেয়ে বঁধু মৃদু মধু হাসে;
ব্রজ-বধূ-নেত্র-নীরে যমুনা উচ্ছ্বাসে।
মথুরা-মোহিনী-মোহে কৃষ্ণ কুতূহলী;
'হরি' স্মরি করে সখী রাধা-অন্তর্জ্জলী!
নব সখা সহ শ্যাম সুখ-সম্মিলিত;
শ্রীদাম সুদাম হায় ধূলায় লুণ্ঠিত!
অশ্ব গজে এবে পশু-পালন-বিলাস;
শ্যামলী ধবলী ত্যজে অন্ন-জল ঘাস!
সুখী কৃষ্ণ সূত-বন্দী-স্তুতি-গীতিকাস;
ব্রজে শুক-পিক-অলি মূক—মৃতপ্রায়!
সিংহাসনে কুব্জা-কান্ত বিলাসে বিলীন;
কাঁদেরে কদম্ব তলা—কালিন্দী-পুলিন!"

কবির এই বিস্ময় আপাততঃ কাব্য-শোভায় সুন্দর; কিন্তু অহৈতুক-ব্রজ-প্রেম-রস রহস্যবিৎ ভক্ত ইহাতে বিস্মিত হন না। কে বলে ব্রজ-বিরহী কৃষ্ণ মথুরায় সুখী? শ্রীমতী রাধা, মা যশোদা, পিতা নন্দ, গোপ-সখা-সখীবৃন্দ, কাহারই সে বিশ্বাস নাই। কৃষ্ণ মথুরায় রাজা হইয়াছেন বটে, কিন্তু

তিনি যে ব্রজের হৃদয়-রাজ্যের রাজা। সেই মধুর রাজত্বে তাঁর যে সুখ, মাথুর রাজত্বে কি সেই সুখ? আত্মসমর্পণ-চালা অহৈতুকী, কৃষ্ণসেবার মর্ম্ম মথুরায় কে জানে? হউক্ তাহার ষোড়শোপচার-সজ্জিত রাজভোগ, কিন্তু মা যশোদার সেই "ক্ষীর-ননী" সে চাঁদবদনে তেমন করিয়া আর কে দিবে? থাকুক্ তাঁহার জরী-জহরৎ-জড়িত জামা-যোড়া, কিন্তু মা যশোদার স্বহস্তের সাধের সজ্জা সেই পীত-ধড়া-মোহন চূড়া ভিন্ন সে অঙ্গ কি সাজিবে? আহা! সঙ্কেত-কুঞ্জে, নব-কিশলয়-কুসুম-পুঞ্জে বিরচিত সেই বিলাস-শয্যায় রসিক-শেখরের যে রসোল্লাস, তাহা কি রাজপ্রাসাদের স্বর্ণ-পালঙ্কের দুগ্ধফেণনিভ শয়নে সম্ভবে? আবার শ্রীদাম সুবলের কাঁধে চড়িয়া রাখাল-রাজের যে আনন্দ, গজ-বাজি-বাহনে বা চতুর্দ্দোলে সাজনে সে নন্দনন্দনের সে আনন্দ কি মিলিবে? অধিক কি, প্রাণ-নাথকে পায়ে ধরাইয়াও যে রাধা কৃষ্ণ-সেবার চূড়ান্ত করিয়াছিলেন, কংস-দাসী নিবানিশি বুকে রাখিয়াও কি তাহা পারিবে? আহা! বিলাস-বিহ্বল প্রেম-টল-টল গোপাল কৃষ্ণের যে সুখাস্বাদন, শত-বিষয়-চিন্তা-বিধ্বস্ত ব্যতিব্যস্ত ভূপাল-কৃষ্ণের দুর্গে তাহা নিশার স্বপন! তাই কৃষ্ণ সুখে নাই। ক্রূর অক্রূর তাঁহাকে ভুলাইয়া নিয়া, কংস বধিয়া, রাজ্যভার ঘটাইয়া, বাপ্-মা যোটাইয়া, নানা বাধায় বাঁধিয়া ফেলিয়াছে; তাই ব্রজের জীবন কৃষ্ণ মথুরার রাজ-ভবনেও ব্রজবনের জন্য আকুল, গোকুলের বিচ্ছেদে আকুল! কে বলে কৃষ্ণ সুখী? এখন ব্রজের ধনকে আবার ব্রজে আনিতে পারিলে, সেই ধনেরই সুখ-সাধন হয়; আর তাতেই ব্রজের সর্ব্বসুখোদয়। কৃষ্ণ-সুখে সুখভাগী অহৈতুক কৃষ্ণানুরাগী ব্রজের এই ভাব, এই বিশ্বাস। তবে কৃষ্ণ যে রথ-যাত্রাকালে বিধুমুখে মধুর হাসি হাসিয়া "আবার আসিব" বলিয়া গিয়াছেন, এই বিরহ-বিষাদ-রাশি বহিয়াও ব্রজবাসীর কথঞ্চিৎ জীবনধারণের সেই একমাত্র আশ্বাস। এস্থলে অবিকল এই ভাবের দীনদাসের একটি পদ-গীতিকায় ভক্ত পাঠকের কর কমলে উপহার দিতেছি।—

"কি হ'ল! ব্রজে কি হ'ল!
কাষ্ঠ হাস মুখে, কষ্ট চেপে বুকে,
কৃষ্ণ মথুরায় গেল!
বধি ব্রজপুর, ক্রূর সে অক্রূর
হরিল ব্রজ জীবনে।
ঐশ্বর্য্যে রঞ্জিত, মাধুর্য্যে বঞ্চিত,
করিল সে হরি-ধনে।

কৃষ্ণ যে রতন, তাহার যতন
যতন কেহই না জানে?
হায়! কৃষ্ণ-সেবা- মর্ম্ম জানে কেবা
নির্ম্মম মথুরাধামে?

ষোড়শোপচারে রাজভোগাহারে
হয় কি কৃষ্ণের সুখ?
মা যশোমতীর ননী-সর ক্ষীর
চায় যে সে চাঁদ-মুখ!

কেলি-কুঞ্জ-বনে কুসুম-শয়নে,
কি সুখে যামিনী যায়!
ভূপতি-ভবনে পালঙ্ক-শয়নে,
নয়নে কি ঘুম পায়?

ব্রজাঙ্গনা'সন যাহার আসন,
সিংহাসন তার সয় কি ?
সেই সকৌতুক কাঁধে-চড়া-সুখ
গজ-বাজি-রথে হয় কি ?
সে পীতধড়ায় কি শোভা চড়ায় !
জামায় যোড়ায় সাজে কি ?
নয়ন জুড়ায় মোহন চূড়ায়,
কনক-কিরীটে কাজ কি ?
মানের দায়েতে প্রিয়ার পায়েতে,
কেঁদেও কত না সুখ !
এবে রাজপদে শত প্রজা পদে,
তাতে সুখ কতটুক ?
'গোপাল—ভূপাল। কি ভোর-কপাল !'
ভাবে ভাবহীন ভ্রান্ত।
দীনদাস কহে, ব্রজের বিরহে
দীনহীন ব্রজকান্ত॥"

সোজা বুদ্ধিতে কিন্তু এ রহস্য বোঝা একটু কঠিন। সোজা বুদ্ধি সোজা ভাষায় বলে—"কৃষ্ণ রাজা হয়েছেন, রাজভোগে রয়েছেন, সোনার থালে খাচ্চেন, ছাপর খাটে শুচ্চেন, জামাযোড়া পর্‌ছেন, হাতী-ঘোড়া চড়্‌ছেন, শত সেবা পরে ধরে, শত দাস দাসী যোড়করে! এত সুখ কি ব্রজে ছিল ? বরং ব্রজে কত কষ্ট পেয়েছেন, কত বিপদ-বিভ্রাট সয়েছেন। কতবার কত সঙ্কট হয়েছে; প্রাণ যেতে যেতে রয়েছে! আর কাজটাই বা কি ছিল ? গরু চরাতে যেতেন, এঁটো ফল খেতেন, কদম গাছে ঝুল্‌তেন, লুকোচুরী খেল্‌তেন, যমুনার জল ঘোলাতেন, আর যুবতীর মন ভোলাতেন! অবস্থাই বা কি ছিল ? ননী চুরী করে, নন্দরাণীর কাছে মার খেয়েছেন, নিশি-শেষে কুঞ্জে এসে বৃন্দা-দূতীর কাছে গাল খেয়েছেন! নন্দের বাধা মাথায় করে মোহন চূড়া খসে গিয়েছে; গোয়ালার মেয়ের পায়ে ধরে চাঁদ-বদন ভেসে গিয়েছে! এই ত দশা! তবু বলিবে মথুরায় কৃষ্ণ সুখী নহেন ? হয় ব্রজবাসী বড় বোকা, নয় বড় স্বার্থপর; নচেৎ আজ কৃষ্ণের এত সুখে ব্রজবাসী কেঁদে মরে! প্রচলিত প্রবাদের সুরে বলা যায়, আজ "কৃষ্ণের জ্যৈষ্ঠ মাস, ব্রজবাসীর সর্ব্বনাশ!" 'সোজা বাঙ্গালী'র সোজা সমালোচনা এই রকম বটে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যেভাবে ব্রজের এ ভাব, তাহা পূর্ব্বোক্ত দীনদাসের পদ্যগীতির ভাবেই পরিব্যক্ত। আমরা অধিক আর কি বলিব ? বলিবার অধিকারইবা কোথায় ? বৈষ্ণব-জগতে "মাথুর" যে কি বস্তু, কি যে তাহার সুগূঢ় রস-রহস্যতত্ত্ব, তাহা ভাগ্যবান রাগানুগ বা অহৈতুক ভক্তেরই ভোগ্য; কিন্তু অস্মদ্‌দৃশ ভাগ্যহীন ভক্তিহীন ভজন-বিহীন অভাজন তদাস্বাদনের একান্তই অযোগ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতিমানুষী অন্ত্যলীলা এই মাথুরভাবেরই মহোন্মাদিনী শক্তিতে সুপ্রকাশিত। প্রকৃত অহৈতুক প্রেমের বিরহ কিরূপ, তাহা মধুপুরগত-মাধব-বিরহহত ব্রজের দশায়, এবং পরে গৌরাঙ্গ প্রভুর চরম লীলায় পরম পরাকাষ্ঠায় পরিব্যক্ত। গৌরাঙ্গ প্রভু তাঁহার মধ্যলীলায় অর্থাৎ গার্হস্থ্যলীলার সময়েও নিজ নবদ্বীপ-ধামে ভক্তমণ্ডলী-মণ্ডিত হইয়া, একদিন মাথুর-বিরহ-বিকলা শ্রীরাধার ভাবাবেশভরে

গলদশ্রু-লোচনে গদ্গদবচনে বলিয়াছিলেন "কৃষ্ণ আমার কত যতনের ধন। মথুরা স্বার্থপর স্থান, সেখানে তাঁহার যত্ন হইবেনা। আমার কৃষ্ণের মনটি ভালবাসায় গড়া, ব্রজ ছাড়িয়া মথুরায় তিনি মর্ম্মাহত হইবেন।" (অমিয় নিমাই-চরিত) অতএব মহামাথুর বিরহেও কৃষ্ণসেবা-সর্ব্বস্ব ব্রজের অপূর্ব্ব অহৈতুক কৃষ্ণপ্রেম-রহস্য স্বয়ং রাধা-ভাবাবিষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমুখেই সুব্যক্ত।

অতঃপর আর একটি তত্ত্ব একটু বিচার্য্য। ব্রজের কৃষ্ণ ব্রজেই থাকিলে আর বিরহ কি? "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি" এই যে প্রসিদ্ধ পৌরাণিক উক্তিটি বৈষ্ণব-সমাজে অনেক সময়েই আলোচিত হইয়া থাকে, ইহার তাৎপর্য্য-বিচারে অনেক বিতর্ক চলে; কিন্তু বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা সে বিষয়ে অধিক অগ্রসর হইবনা; তবে সংক্ষেপে এইটুকু মাত্র নিবেদন যে, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য, এই দুই ভাবের মধ্যে বৈকুণ্ঠে নারায়ণরূপে ঐশ্বর্য্য-প্রধান ভাব এবং গোলোকে কৃষ্ণরূপে মাধুর্য্য-প্রধান ভাব। ব্রজলীলায় মাধুর্য্যই মুখ্য, কিন্তু ঐশ্বর্য্য গৌণ। আর মথুরা-লীলা ও দ্বারকা-লীলায় ঐশ্বর্য্য-ভাবই মুখ্য, মাধুর্য্য গৌণ। এখন যমুনা-জীবনে ঐশ্বর্য্য-কৃষ্ণের মাধুর্য্যরূপ ধারণ অথবা নন্দ-নিকেতনে যুগল কৃষ্ণের একীভবন বা একই কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-গত রূপ, লীলা ও ধাম-ভেদে দ্বিধা-বিভাজন, ইত্যাদি যে সব পৌরাণিক জটিল বিতর্ক-বিচার বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত আছে, আমাদের তাহার মধ্যে যাওয়ার ইচ্ছা নাই, আবশ্যকও নাই। আমরা দেখিতে পাই, বিবিধ পুরাণশাস্ত্রে ভগবানের ঐশ্বর্য্য-লীলা বর্ণনেও তাঁহাকে গোলোকেশ্বর বলা হইয়াছে এবং অনেক স্থলে মাধুর্য্য-লীলা-বর্ণনেও (এমন কি, মাধুর্য্য-লীলার সারাৎসার রাস বর্ণনেও) তাঁহাকে বৈকুণ্ঠেশ্বর বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ফলে এ সব লইয়া খুঁটিনাটি কেবল আসল কাজ মাটি করা মাত্র। যাঁর গোলোক, তাঁরই বৈকুণ্ঠ; যাঁর মাধুর্য্য, তাঁরই ঐশ্বর্য্য; তবে লীলা-ভেদে লোক-ভেদ এবং উপাসনা-ভেদে নাম-রূপ অর্থাৎ ধ্যান-মন্ত্রাদির ভেদ অবশ্য শাস্ত্রসম্মত; কিন্তু মূল সেই "অবতারাবলীবীজং" এক ভগবৎতত্ত্ব! তবে স্থূলতঃ যার যে ভজন, অধিকারানুসারে তার তাই উত্তম। অনধিকার-চর্চ্চায় হয়ত স্বাধিকারও হারাইতে হয়, হয়ত হাতের—পাতের, দুইই যায়। বৈধী বা হৈতুকী ভক্তিযোগে ঐশ্বর্য্যতত্ত্বে ভগবদ্ভজনের অধিকার ক্রম-সাধনোন্নয়নে উত্তীর্ণ হইলে, পরে শনৈঃ শনৈঃ রাগানুগা বা অহৈতুকী ভক্তিযোগে মাধুর্য্যতত্ত্বে ভগবদ্ভজনের অধিকার জন্মে। শনৈঃ শনৈঃ জন্ম-জন্মান্তর-ক্রমে এই অধিকার পুষ্ট হইতে থাকে। যতদিন গোপ্যানুগত্য লাভে মধুরভাবে ব্রজেন্দ্রনন্দনের ভজনানন্দের অণুমাত্র আস্বাদনও ভাগ্যে না ঘটে, ততদিন স্বয়ং ভগবানের হ্লাদিনীশক্ত্যাত্মিকা অহৈতুকী ভক্তির পূর্ণ দর্শন কোথায় পাওয়া যাইবে? ব্রজের মাধুর্য্য-ভজনে এই হ্লাদিনী শক্ত্যাত্মিকা অহৈতুকী ভক্তির পূর্ণ পরিণতিই স্বয়ং তত্ত্বতঃ "মহাভাবস্বরূপিণী রাধা ঠাকুরাণী"; সুতরাং যেখানে

মহাভাবস্বরূপা রাধা, সেইখানেই রসরাজরূপী কৃষ্ণ। কাজেই তত্ত্বতঃ 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি' এ বাক্য সিদ্ধ! "রসরাজ মহাভাব দুয়ে একরূপ"—শ্রীরায় রামানন্দের শ্রীগৌরাঙ্গ-দর্শনরূপ এই যে যুগলরূপ দর্শন-বর্ণন, ইহা উক্ত তত্ত্বেরই সুমহান্ সাক্ষ্য। বস্তুতঃ অহৈতুকী প্রীতির প্রকৃত পূর্ণ স্বরূপই রাধা-তত্ত্ব, তাহা কৃষ্ণ-তত্ত্ব সহ চিরঅবিচ্ছিন্ন; তবে লীলার যে বিরহ, তাহা কেবল রস-পুষ্টির নিমিত্ত মাত্র। গোমুখী-মুখ-মুক্ত গঙ্গার পূত প্রবাহ যদ্রূপ প্রচণ্ড শিলাখণ্ড-বাধায় ব্যাহত হইয়া, উদ্বর্দ্ধিত বেগে উচ্ছ্বসিত হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণাভিমুখিনী অহৈতুকী ব্রজ-প্রীতির ভুবনপাবন প্রবাহ 'জটিলা' 'কুটিলা', লজ্জা, ভয়, মান, বিরহ প্রভৃতি বহু শিলাখণ্ডে ব্যাহত হইয়া উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে পাবন-জগৎ প্লাবিত করিয়াছে! ফলে বিরহ প্রেমলীলার প্রধান সহায়, প্রধান উপকরণ ও প্রধান পোষণ। পরমার্থতঃ গোলোক-মিলনে বিরহ নাই, কিন্তু লীলার্থতঃ ব্রজ-মিলনে বিরহ আছে। অতএব ব্রজের যাহা গোলোকত্ব, তদবলম্বনেই "পাদমেকং ন গচ্ছতি" শ্লোকের প্রতিষ্ঠত্ব।

শাস্ত্র, সংস্কার ও অন্তরঙ্গ-সমাচার, এই সর্ব্ব বিষয়েই ভক্ত বৈষ্ণবের বিশ্বাস, শ্রীগৌরাঙ্গ একাধারে রাধা-কৃষ্ণের যুগল তত্ত্বরূপী! রসাস্বাদন-ভেদে তাই তাঁহাতে রাধা-কৃষ্ণ উভয় ভাবেরই বিকাশ! রাধার ভাব-কান্তিবিলাসরূপী শ্রীকৃষ্ণই গৌরাঙ্গ হইলেও, তত্ত্বতঃ তিনি রাধা ছাড়া নহেন। "রাধা কৃষ্ণ-প্রণয় বিকৃতিহ্লাদিনী শক্তিরূপা"। কৃষ্ণের প্রেমরূপা হ্লাদিনী শক্তিই মহাভাবময়ী রাধারূপে মূর্ত্তিমতী! অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন-বৃন্দাবনে যেমন 'পাদমেকং ন গচ্ছতি'ভাবে অবিচ্ছিন্ন কৃষ্ণত্ব থাকিলেও, তাহাতে লীলারস পোষণ ও প্রসারণ জন্য উৎকট কৃষ্ণবিরহ, তজ্জনিত দিব্যোন্মাদ ও পর্য্যায়ক্রমে দশ দশারই অলৌকিক প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তদ্রূপ পূর্ণমাধুর্য্যলীলা-ক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবনে "পাদমেকং ন গচ্ছতি"ভাবে অবিচ্ছিন্ন কৃষ্ণতত্ত্ব তত্ত্বতঃ প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও, লীলারসের পোষণপ্রসারণার্থই এই মহামাথুর-বিরহ! অতএব লীলার্থতঃ প্রভাসে রাধা কৃষ্ণের পুনর্ম্মিলন হইলেও, পরমার্থতঃ উহা মাধুর্য্য-কৃষ্ণের সহিত ঐশ্বর্য্য-কৃষ্ণের পূর্ণমিলন মাত্র! কৃষ্ণহৃদয়ে রাধার অন্তর্ধান এই তত্ত্বেরই ব্যাখ্যান মাত্র! সে যাহা হউক, অহৈতুকী ভক্তি ভিন্ন আর কোন মতেই স্বয়ং কৃষ্ণ-গৌরাঙ্গসেবিত এই অতুলামৃত ব্রজলীলা-রসের কণিকাস্বাদনেও অধিকার হয় না। এই জন্যই এই শিক্ষাষ্টকের চতুর্থ শ্লোকে কেবল সর্ব্বসিদ্ধিস্বরূপিণী অহৈতুকী ভক্তিরই ঐকান্তিক প্রার্থনা।

এক্ষণে ব্রজের অহৈতুক প্রেমের দু-চারিটি উদাহরণ নিবেদন করিয়া প্রবন্ধের উপসংহারে উপনীত হইব। যাহা আপাত দৃষ্টিতে কৃষ্ণকে কেবল কষ্ট দেওয়া মাত্র, তাহাও ব্রজের স্বাভাবিকী কৃষ্ণসুখৈক-পরায়ণতায় কেবল অহৈতুক প্রেমের কার্য্য মাত্র। মনে করুন, ছার একটুকু ননীর জন্যে হয়ত যশোদা কৃষ্ণকে কখনও তাড়নপীড়ন, কখনও বা ভর্ৎসন-বন্ধনও করিতেছেন; কিন্তু তাহাও বাৎসল্য-প্রেমে

ডগমগ হইয়া! যশোদা জানেন, "কৃষ্ণ আমার চুরী করে খেতে ভালবাসে; সাধা-ননী অপেক্ষা যেন চোরা-ননী কৃষ্ণের বেশী ভাল লাগে।" ভৎসন-বন্ধনাদিতে যে সে চৌর্য্যের পর্য্যবসান হইবে, নন্দরাণীর অবশ্য সে আশা ছিল না; কারণ শ্রীমান তেমন ছেলেই নয়! তবে তদ্দ্বারা কৃষ্ণের চৌর্য্য-চাতুর্য্য—সাবধান-সঙ্গোপন আরো বাড়িবে, এবং তল্লব্ধ নবনীত কৃষ্ণকে বেশী প্রীত করিবে, এ বিশ্বাস থাকায়, নন্দরাণীর কৃষ্ণ-বন্ধনাদি ফলিতার্থে কৃষ্ণসুখান্বেষী অহৈতুক স্নেহেরই লীলা-বিলাস! কৃষ্ণও তাই চোর-চূড়ামণি। ননী-চুরী, বসন-চুরী, সঙ্গে সঙ্গে মন-চুরী! চুরী কৃষ্ণের ব্যবসায়। আহা! ভক্ত কবি কৃষ্ণকমল গোস্বামী কৃষ্ণের এই মন-চুরী বর্ণনে কি মন-চোরা গানই গাহিয়াছেন!—

"(ও তার)
বাঁশীটি না সিঁধ-কাঠি!
নারীর বুকে সিঁধ কাটি,
মরমের গাঁটি কাটি,
নিয়েছে সব লুটিপাটি।"

"কৃষ্ণ" নামের "কৃষ্" ধাতুর অর্থই আকর্ষণ; তবে আকর্ষণটি একটু গোপনে হয়, কাজেই চুরী! বিগ্রহমূর্ত্তি ধারণ করিয়াও কৃষ্ণ চুরী-স্বভাব ছাড়িতে পারেন নাই; "ক্ষীরচোরা গোপীনাথ" তাহার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ! যাহা হউক, আমরা মূল প্রসঙ্গ হইতে একটু অধিক আসিয়াছি। তবে কিনা, কৃষ্ণকথার 'ফাও' দিতেও সুখ, নিতেও সুখ।

তারপর, নন্দের একটি কার্য্য দেখুন। কৃষ্ণের মস্তকে নিজের "বাধা" (পাদুকা-বিশেষ) বহাইতেন। কৃষ্ণ নিজেই জগৎকে পিতৃভক্তি শিখাইতে পিতৃবাধা মাথায় বহিতেন। নন্দ সে বাধা বহনে বাধা দিতেন না। নন্দ জানিতেন যে, তাঁর প্রাণ-নন্দন কৃষ্ণ তাঁহার বাধা-বহনে বড়ই আনন্দিত; সুতরাং সে আনন্দে নন্দের আনন্দ শত-ধারায় উছলিত। অতএব কৃষ্ণানন্দপরায়ণতাই মূল বলিয়া, অহৈতুক-কৃষ্ণ-বাৎসল্য-বিভোর নন্দের এ কার্য্য নিন্দনীয় নহে; বরং ব্রজভজন ভক্তের সানন্দ-বন্দনীয়।

আবার শ্রীদাম সুবল প্রভৃতি কৃষ্ণ-সখা ব্রজবালকগণ কৃষ্ণকে উচ্ছিষ্ট ফল খাওয়াইতেন, কৃষ্ণের কাঁধে চড়িতেন কৃষ্ণের সঙ্গে ঝগড়া ঝগড়ি, রগড়া রগড়ি, হুড়হুড়ি জড়াজড়ি করিতেন। সৌভাগ্য আর কাহাকে বলে?

"কাঁধে চড়ে কাঁধে চড়ায় করে প্রেম-রণ।
কৃষ্ণে সেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবন॥"

ফলে এ সমস্তই কেবল কৃষ্ণ-সুখাভিসন্ধিমূলক অহৈতুক সখ্য-প্রেমের ফল। কৃষ্ণকে কাঁধে করিয়া ব্রজবালকেরা অতুলানন্দে অমৃতাভিষিক্ত হইত; কিন্তু তাহারা ত কৃষ্ণকে না দিয়া কোন আনন্দ ভোগ করিতে পারে না। কৃষ্ণের অনাস্বাদিত আনন্দ তাহাদের পক্ষে নিরানন্দ মাত্র। তাই শ্রীর অধিক ভাগ্যধর শ্রীদামাদি ভাবিত, "কাঁধে চড়ার সুখ ত কৃষ্ণকে দিলাম, কিন্তু কাঁধে চড়াইয়া যে সুখ, সে অতুল্য সুখ কি তাই কানাইকে দিব না? অতএব চড় কানাইর কাঁধে!" আর

উচ্ছিষ্ট ফল কি সাধে খাওয়ায়? মিষ্ট লাগিলে যে আর মুখে যায় না! আর কৃষ্ণকে না দিয়া নিজেদের খাওয়া চলে না।

"বড় সুমিষ্ট ফল, খাওরে কৃষ্ণ!
আমরা খেয়েছি॥
মধুর পেয়ে, আর না খেয়ে,
(তোমার) বেঁধে এনেছি॥"
(ইত্যাদি।)

আর একটি গানে আছে,—

"(ও ফল) খেতে খেতে যখন মিঠা লাগে,
বলে আর খাবনা, কানাই খাবে।"

আহা! এই সব গান যেন ব্রজের অহৈতুক সখ্যপ্রেমের মধুর 'মোরব্বা'!

ভক্ত পাঠক! তবে একবার "দেহি পদপল্লবমুদারম্" পালায় আসুন। মান বস্তুটি কি? প্রেমের মান অবশ্য লৌকিক সম্মানার্থক মান নহে। উহা প্রেম-সিন্ধুর তরঙ্গ-রঙ্গ বিশেষ। রসশাস্ত্রে বলেন,—

"কার্য্যকারণভাবোহন্যোন্যং মতঃ প্রণয়মানয়োঃ"

অর্থাৎ প্রণয় ও মান, উভয়ই উভয়ের কারণ ও কার্য্য। প্রণয়েই মানের আবির্ভাব, আবার মানেই প্রণয়ের প্রভাব! তাই শ্রীমতীর সেই মানও শুধু শ্রীকৃষ্ণসুখৈষণা বৃত্তিরই ফল। চন্দ্রাবলী কৃষ্ণ-সেবার মর্ম্ম জানেনা। তাহার 'সাধারণী' নারীর ন্যায় নির্দ্দয় কৃষ্ণ সম্ভোগ শ্রীরাধার অসহ্য। 'রাধ্' ধাতুর মূর্ত্তিমতী অর্থরূপিণী রাধা ভিন্ন সেই জগদারাধ্য কৃষ্ণধনের আরাধনা বা সেবা জগতে আর কে জানে? তাই ব্রজ-সখীগণ রাধাকৃষ্ণের মিলন করাইয়াই কৃতার্থা। যুগল-সেবার ভজনেই তাঁহারা চরমচরিতার্থা। তাই কৃষ্ণসেবাস্বরূপিণী কৃষ্ণপ্রিয়া রাধিকা মহামাথুর বিরহে মরিতে যাইয়াও যেন সাহস করিয়া মরিতে পারিতেছেন না। বলিতেছেন—"মরিব মরিব আমি নিশ্চয় মরিব"। অমনি তখনি আবার ভাবিতেছেন "কাহু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব?" তবে যদি এই অসহ্য বিরহ-বিষে নিতান্তই মরণ হয়, তবু কৃষ্ণ-সেবার এই অদ্বিতীয় উপাদান রাধা-অঙ্গ যেন নষ্ট না হয়। তাই সখীদিগকে উপদেশ করিতেছেন—

"না পোড়ায়ো রাধা-অঙ্গ, না ভাসায়ো জলে।
মরিলে বাঁধিয়ে রেখো তমালেরি ডালে॥"

অর্থাৎ এ কুঞ্জে তমালতরুটি শ্যামসুন্দরের ন্যায় শ্যামাঙ্গ। তাই অন্ততঃ শ্যামানুকৃতিতনু শ্যামল তমাল-ডালেই শ্যাম সোহাগিনীর শ্যাম-সেবাঙ্গ বাঁধিয়া রাখার অনুরোধ। আর একটি আশাও আছে। সেটি কৃষ্ণের আসার আশা।

"যদি কভু পিয়া মোর আসে বৃন্দাবনে।
মৃতদেহে প্রাণ পাব পিয়-পরশনে॥"

ইহার আর ব্যাখ্যায় কাজ নাই; রসভঙ্গ হইবে। কেবল নয়ন-নীরে নীরব আস্বাদনই এখানে প্রার্থনীয়। যাহাহউক, এহেন রাধার যে কৃষ্ণসেবা, চন্দ্রা তাহা কোথায় পাইবে? তাই হয়ত চন্দ্রার স্বসুখপরা কৃষ্ণসেবায় বা সম্ভোগে কৃষ্ণসুখৈকপ্রাণা রাধার এই প্রণয়-কোপ বা মান। তদ্ভিন্ন রাধার প্রেম-পাথারে হয়ত আরও কত ভাব-পবনোচ্ছ্বাসে যে এই মান-তুফান উঠিয়াছিল, তাহা তিনিই জানেন। পূর্ব্বরাগ, মিলন, মান, বিরহ, পুনর্ম্মিলন, এসব প্রেম-তরঙ্গেরই বিচিত্র রঙ্গভঙ্গ মাত্র। এই

জন্যই শাস্ত্র বলেন, "অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ" অর্থাৎ প্রেমের গতি-ভুজঙ্গবৎ। অতএব এই মান প্রেমের একটি মোহন অঙ্গভঙ্গি। কষ্টার্জ্জিত বস্তু বড় প্রিয়; সুতরাং মানভঞ্জনার্জ্জিত মিলনে কৃষ্ণের বড় লোভ। ক্ষুধায় খাওয়া, গ্রীষ্মে হাওয়া, পিপাসায় পান, আর শীতার্ত্তায় দান, বড় প্রিয়—বড় প্রাণারাম; তদ্রূপ প্রিয়-সুখৈক-পরায়ণা প্রিয়ার "স্মরগরল-খণ্ডন" চারু চরণ ধারণেও মান-ভঞ্জনান্তে মিলন প্রেমিকের পরমানন্দ-প্রস্রবণ; আর সেই লোভেই বুঝি রাধার নব নটবর প্রেমিক নাগর কৃষ্ণচন্দ্রের চন্দ্রার মন্দিরে নৈশ-নিমন্ত্রণ গ্রহণ! অতএব কৃষ্ণসুখৈষণা-সঞ্জাত রাধার মানও অহৈতুক প্রেমের এক মহার্হ দান। উহা কৃষ্ণের পক্ষে বাহিরে প্রচণ্ড দণ্ডবিধান হইলেও, অন্তরে অখণ্ড আনন্দ-নিদান! ফলে শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র ব্রজলীলা কেবল মাধুর্য্যরসের মেলা—অহৈতুক প্রেমের খেলা! ব্রজভূমির প্রত্যেক অণু-পরমাণুও বুঝি অহৈতুক প্রেমমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত! আহা! স্বয়ং অহৈতুক প্রেমের অতল অনন্ত উচ্ছ্বসিত সিন্ধু জীবের বন্ধু শ্রীগৌরাঙ্গ জীবকে কৃপা করিয়া ব্রজ-রসাস্বাদনে অধিকারী করিবার জন্যই এই শিক্ষা-শ্লোকে সেই দেব-দুর্লভা অহৈতুকী ভক্তির প্রার্থনীয়তা শিখাইয়াছেন।

আমাদের পক্ষে এই শিক্ষা-শ্লোকের শিক্ষা হৃদয়ের সম্মুখে উচ্চতম ও পূর্ণতম আদর্শ-রূপে রাখিয়া ভজনপথে অগ্রসর হওয়ার উপায় বটে; কিন্তু আমাদের স্বাভাবিক সাধনাধিকার-সম্ভাবনা প্রথমতঃ বৈধী বা হৈতুকী ভক্তিমার্গে। শাস্ত্র বলেন,—

"বৈধী ভক্ত্যধিকারীতু ভাবাবির্ভাবনাবধি।
তত্রঃ শাস্ত্রং তথাতর্কমনুকূলমপেক্ষতে॥"

অর্থাৎ—

ভাব-আবির্ভাবাবধি বৈধীভক্তি-অধিকার।
শাস্ত্র আর অনুকূল তর্কের অপেক্ষা যার॥

অতএব অনুকূল শাস্ত্র-যুক্তির আশ্রয়ে ভাবের আবির্ভাবনা করা বৈধী বা হৈতুকী ভক্তির অধিকার। ভাবোদয়ে রাগানুগা বা অহৈতুকী ভক্তির স্বতঃসঞ্চার। অধিকারের ক্রমোন্নতি অবশ্য অব্যাহত সাধনগতিতে শনৈঃ শনৈঃ সিদ্ধ হয়। ফলে কাহারই নিরাশ হইবার কথা নহে। দুরাশাই নিরাশার জননী। স্বাধিকারগত গুরু-প্রদর্শিত পথে চলিলে, আর অনধিকার-চর্চ্চামূলক দুরাশার ভয় থাকেনা; গুরু-কৃপায়, আজ যাহা দুরাশা, কাল তাহা সুআশায় পরিণত হইতে পারে। হৈতুকী ভক্তি হইতেই ক্রমে অহৈতুকী ভক্তি লাভ। পূর্ব্বনিবেদিত ধ্রুবচরিত্রের উদাহরণই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। হৈতুকী ভক্তিযোগে কোন ফলাভিসন্ধিমূলক সকাম কৃষ্ণভজন করিলেও, কৃষ্ণ স্বয়ং কৃপা করিয়া ক্রমে সেই উপাসককে নিষ্কাম ভজনাধিকারী করিয়া অহৈতুক-ভক্তি-ধন দানে কৃতার্থ করেন। শ্রীভাগবতে কৃষ্ণকৃপাময়ের সেইরূপ কৃপা-ভরসা স্পষ্ট পরিব্যক্ত; যথা—

"সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্॥"

আমরা আর এ শ্লোকের অবিকল

আস্বাদন করিলামনা। শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে" ইহার ভাষ্যরূপে যে মধুর তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি :—

"কৃষ্ণ কহে আমা ভজে মাগে বিষয়-সুখ।
সুধা ছাড়ি বিষ মাগে এত বড় মূর্খ॥
আমি বিজ্ঞ এই মূর্খে বিষয় কেন দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥
কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণরসে।
কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে॥"

কাম—অর্থাৎ কামনা ছাড়িতে পারিলেই কৃষ্ণ দাস্য প্রদায়িনী অহৈতুকী ভক্তি লাভের অধিকার হয়। তাই আলোচ্য শিক্ষা-শ্লোকে প্রধান পার্থিব কামনার বিষয় ধন-জন-সুন্দরী-কবিত্ব প্রভৃতির নিষ্কামনা বা নিবৃত্তি জানাইয়া, ভগবচ্চরণে অহৈতুকী ভক্তি-প্রার্থনাই করা হইয়াছে।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ঐরূপ ভক্তিপ্রার্থীর কাছে কি আর প্রয়োজনীয় ধন-জনাদি আসিবেনা? তাহা আসিবার বাধা কি? বরং অবাধে আসিবে। ভগবান নিজে তাঁহার প্রয়োজনীয় বিষয় বহন করিবেন। গীতায় ভগবান স্পষ্ট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন ;—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ
পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং
বহাম্যহম্॥"

অর্থাৎ—

যারা মোরে ভজে নিত্য একচিত্তে রহি।
সে নিত্যযোগীর বিত্ত নিজে আমি বহি॥

ইহার উপর আর কথা কি? ধান পাওয়ার দাবী থাকিলে আর নাড়ার ভাবনা ভাবে কে? নাড়ার জন্য কেহত ধান বোনে না; ধানের জন্যই ধান বোনে। তথাপি প্রয়োজনানুরূপ নাড়া অযাচিত অপ্রত্যাশিত ভাবেই পাওয়া যায়। অতএব অহৈতুকী ভক্তিযোগে ভগবানের জন্যই ভগবানকে ভজিতে হইবে। বিষয়বাঞ্ছা না থাকিলেও, প্রয়োজনীয় বিষয়-সিদ্ধি ভগবৎকৃপাতেই স্বভাবতঃ সম্পন্ন হইবে। অতএব যে দিক দিয়াই দেখুন, যে ভাবেই বিচার করুন, বুঝিতে হইবে যে, অহৈতুকী ভগবদ্ভক্তিই জীবের একমাত্র সাধনীয় ও প্রার্থনীয়। যতদিন সকাম ভজনা, ততদিনই হৈতুকী ভক্তির ক্রিয়া। ক্রমে, যখন ভক্তি মাত্র থাকেন, কিন্তু কামনা উড়িয়া যায়, তখনই সেই ভক্তি অহৈতুকী হন। একটা অতি স্থূল লৌকিক উদাহরণ দেখুন। যেমন কেহ কাশ, বাত, শূল বা উদরাময় প্রভৃতি রোগা-রোগ্য কামনায় আফিং খায়, এবং ক্রমে রোগ হয়ত সংপূর্ণ সারিয়া যায়; কিন্তু আফিং আর সে ছাড়িতে পারে না। তখন সে আফিঙ্গের নেশায় পড়িয়া আফিঙ্গের জন্যই আফিং খায়। তদ্রূপ সাধক বিষয়-কামনায় হৈতুকী ভক্তিযোগে ভগবানকে ভজিলেও, ভগবানেরই কৃপা-বিধানে সে বিষয়-কামনা তিরোহিত হয়; কিন্তু সে ভজনের নেশা লাগিয়া যায়; তখন আর সে ছাড়িতে পারে না। বিষয়ের জন্য যে ভগবানকে ভজিত, সে-ই তখন ভগবানের জন্যই ভগবানকে ভজে। ভগবানকে না ভজিয়া তখন আর সে থাকিতে পারেনা। ভগবান ভিন্ন তাহার তখন অন্য কিছুই ভাল লাগে না। কোন বিষয়-

বিষয়-বিলাস-বেষ্টিত ভোগী ভোগকামনা-মূলক কৈতুক ভজন করিতে করিতে ক্রমে ভগবৎ কৃপায় অহৈতুকী ভক্তি লাভ করিয়া, তাঁহার সকল বিলাসই তখন সেই রসবিলাসী হরিতে বিলসিত বা পরিণামিত দেখিতেন। তাই ভাবভরে বলিয়াছিলেন,—

"হরি মেরা ধনদৌলৎ, হরি মেরা জান।
হরি মেরা তাম্বাকু, হরি মেরা পান॥
হরি মেরা গোলাব-পাশ, হরি আতরদান।
হরি মেরা সঙ্গত্ ওর্ সঙ্গীত্ কি তান্।"

অনুবাদ অনাবশ্যক। ফলে হরিতে মন মজিলে, জগতের আর কোন মজাই সাধককে মজাইতে পারে না। অথবা সকল মজাই সে হরিতে পায়। সংসারের সারাৎসার 'আসল মজাদার' জিনিস পাইলে বাজে মজায় আর কে মজে? একমাত্র অহৈতুকী ভক্তিতেই সেই আসল মজার আস্বাদন লাভ হয়। অতএব সেই বাঞ্ছা-কল্পতরু হরির চরণে জীবের যদি কোন বাঞ্ছা নিবেদন করিবার থাকে, তবে বিষয়-বাঞ্ছা বর্জ্জনেই সেই বাঞ্ছা,—আর অহৈতুকী ভক্তিযোগে সেই বিবিক্তি-বাঞ্ছিত ধন অর্জ্জনেই বাঞ্ছা। বলিয়াছি ত, যতদিন জীবের আমিত্বধর্ম্ম থাকে, ততদিন বাঞ্ছারও অস্তিত্ব থাকে; অতএব আমিত্বধর্ম্মী জীবের সর্ব্ব-বাঞ্ছার সারনিষ্কর্ষ বা চরমোৎকর্ষ যাহা হইতে পারে বা হওয়া উচিত, তাহাই শ্রীগৌরাঙ্গোক্ত এই চতুর্থ শিক্ষাশ্লোকে চিত্রিত। কিন্তু কেবল ভগবানে বাঞ্ছা নিবেদন করিয়া রাখিলেই হইবেনা; জীবেরও তৎসম্পূরণার্থে একটি ভগবদুদ্দিষ্ট কর্ত্তব্য আছে; সেটি ভগবন্নাম গ্রহণ। ইহাই জীবের অহৈতুকী ভক্তি-বাঞ্ছা পূরণের ঐকান্তিক উপায়—বিশেষতঃ কলির জীবের একমাত্র উপায়। তাই সন্দর্ভ-শেষে ভক্তপাঠককে একটি ভগবন্নাম-কীর্ত্তন উপহার দিয়া এবারের মত সাভিবাদন বিদায় গ্রহণ করিলাম।

(কীর্ত্তন-গীত)

"হরে কৃষ্ণ হরি বল্‌রে ভাই।
হরিনাম বিনে আর গতি নাই॥
যদি অহৈতুকী ভক্তি-লতার
বীজ দিলেন গুরু গোসাঁই;
(দিয়ে) নয়ন-আসার, হরিনাম-সার,
আয় দেখি তায় ফুল ফুটাই॥
ও তার উৎকৃষ্ট ফল কৃষ্ণ-সেবার
মিষ্টতার তুলনা নাই॥
হরি বল্‌রে—
(হরিনামে প্রেমে যুগল-মিলন!)
হরি বল্‌রে—
(আহা!) হ-কারে শ্রীমতী রাধা,
রি-কারে শ্রীকৃষ্ণ পাই॥
(ওরে) আর কিছু ত লাগ্‌বেনারে ভাই!
(নিলে) নামটি শুধু, পরাণ-বঁধু
পায়ে দিবেন ঠাঁই।
(ও সেই ভবার্ণবের)
নায়ে দিবেন ঠাঁই।
(জীবের) দুঃখ দেখে, গোলোক থেকে
নাম এনেছেন গৌর-নিতাই॥
(হরি) নাম এনেছেন গৌর-নিতাই॥
(ধর) নেও হরিবোল, দেও হরিবোল,
হরি-হরি-বোল গাও সবাই॥"

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।
(বহরমপুর)

বেদান্ত-সূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

প্রথম অধ্যায়।

চতুর্থ-পাদ।

প্রথমাধ্যায়ের এই চতুর্থ পাদে ২৮টী সূত্র আছে। ইহার প্রথম সপ্তসূত্র-রচিত একটি অধিকরণে কঠোপনিষদুক্ত "অব্যক্ত" শব্দে সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত "প্রধান" অথবা "সূক্ষ্মশরীর" সূচিত হয়, তাহাই বিচারিত হইয়াছে। তৎপরবর্ত্তী তিন সূত্রে (৮ম হইতে ১০ম) দ্বিতীয় অধিকরণ গঠিত। তাহাতে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদুক্ত "অজা" পদে যে সাংখ্যোক্ত প্রধানকে বুঝায়না, পরন্তু ব্রাহ্মীশক্তি অথবা আদি-কারণ-শক্তিকেই যে বুঝায়, তাহা সিদ্ধান্তীকৃত হইয়াছে। তৎপর আর তিন সূত্রে—অর্থাৎ ১১শ হইতে ১৩শ সূত্রে তৃতীয় অধিকরণ অধিষ্ঠিত। বৃহদারণ্যক উপনিষদুক্ত "পঞ্চ-পঞ্চজন" পদে যে সাংখ্যদর্শনোক্ত পঞ্চ-বিংশতি তত্ত্ব বুঝায় না, এই অধিকরণে তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। চতুর্থ অধিকরণটি ১৪শ ও ১৫শ, এই সূত্রদ্বয়গত। এই অধিকরণের বিচারিত বিষয়, ব্রহ্মের চৈতন্যস্বরূপতাই যে বিশ্বের কারণস্বরূপ, এ তত্ত্বে সর্ব্বোপনিষদের সিদ্ধান্তই অবি-সংবাদে সমন্বিত। ১৬শ, ১৭শ ও ১৮শ সূত্র-সংগঠিত পঞ্চম অধিকরণে ইহাই প্রতি-পাদিত হইয়াছে যে, কৌশিতকী উপনি-ষদের কতিপয় শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মই বিজ্ঞেয়, কিন্তু প্রাণবায়ু বা জীবাত্মা নহে। ১৯শ হইতে ২২শ সূত্র পর্য্যন্ত ষষ্ঠ অধিকরণ; তাহাতে বৃহদারণ্যক উপনিষদুক্ত "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্ম-তত্ত্বই বিজ্ঞেয়, পরন্তু জীবাত্মতত্ত্ব কদাচ নহে, ইহাই সিদ্ধান্তীকৃত। তৎপর ২৩শ সূত্র হইতে ২৭শ সূত্র পর্য্যন্ত সপ্তম অধিকরণ কল্পিত; তাহার সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্ম এই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেবল মাত্র "নিমিত্ত কারণ" নহেন, কিন্তু "উপাদান কারণ"ও বটে। অবশেষে ২৮শ সূত্রাত্মক অষ্টম অধিকরণের সিদ্ধান্ত এই যে, সাংখ্যমতের খণ্ডন বিশ্ব-সৃষ্টির মূলকারণনির্ণায়ক অপর মতবাদের প্রতিও প্রযোজ্য, যথা পরমাণুবাদ।

বৈদান্তিকগণের সহিত সাংখ্যবাদি-গণের অবিশ্রান্ত বিচারসংগ্রাম চলিয়া ছিল। এই অধ্যায়ের অধিকাংশ কেবল সাংখ্যদর্শনের 'প্রধান'বাদের খণ্ডনেই প্রায় পর্য্যবসিত। বৈদান্তিকগণ বলেন যে, বিশ্বের কারণ একমাত্র ব্রহ্ম বা পরমাত্মা; পরন্তু সাংখ্যোক্ত 'প্রধান'কে বিশ্বের কারণ বলিয়া উপনিষৎ অর্থাৎ বেদান্তের কুত্রাপি কোন শ্রুতিতে স্বীকৃত বা বিবৃত হয় নাই। ফলে সাংখ্যোক্ত প্রধানই বেদান্তোক্ত ব্রাহ্মী-শক্তি বা মায়ারূপে বৈদান্তিকগণ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত। তবে পার্থক্য এই যে, বৈদান্তিক-গণের মতে ঐ মায়া ব্রহ্মের শক্তি বিধায়, উহা শক্তিমান ও জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের অধীন, কিন্তু সাংখ্যবাদিগণের সিদ্ধান্তে জড়জগতে প্রধানই হেত্বন্তর-নিরপেক্ষ স্বাধীন ও স্বক্ষে সর্ব্বা। জড়জগতের হেতু যে মায়া, তাহা বৈদান্তিকগণ স্বীকার করেন, কিন্তু উহা ব্রহ্মের শক্তি মাত্র জানিয়া, উহাকে অতন্ত্র

ক্রম করিয়া, তাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হন। পক্ষান্তরে, সাংখ্যবাদিগণ প্রধানকে অতিক্রম করেন না; পরন্তু সৃষ্টিমূলতত্ত্ব-সিদ্ধান্তে উহাতেই উপসংহৃত হন।

বাস্তবিক কতিপয় উপনিষদে এই উভয় মতেরই সমীকরণ দৃষ্ট হয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু বৈদান্তিকগণ স্বমতদার্ঢ্যে এই স্থির সিদ্ধান্তে সমাগত যে, কোন উপনিষদের কোন শ্রুতির কুত্রাপি সাংখ্যোক্ত 'প্রধান-বাদ' প্রশ্রয় পায় নাই। ফলে যেখানে যেখানে যে কোন উপনিষদী শ্রুতির যে কোন উক্তিতে সাংখ্যমত সমর্থনের সন্দেহ হইয়াছে, সেই স্থানেই তাঁহারা সেই শ্রুতির সেই উক্তির বেদান্ত-মতানুকূলে ব্যাখ্যা করিয়া সাংখ্যমত খণ্ডন করিয়াছেন।

বাস্তবিক ভারতের ষড়দর্শন প্রকৃত সমাহিতভাবে অধীত ও আধ্যাত্মিকধীষণা সহযোগে সূক্ষ্মভাবে বিচারিত হইলে, তাহাদের স্ব স্ব মতসিদ্ধান্তে পরস্পর কোন বিরোধ বা বিসম্বাদিতা দৃষ্ট হইবে না। বাস্তবিক ছয়টি দর্শন যেন একটি সোপানেরই ছয়টি পদ্ধতি বা ধাপ। ব্রহ্মমীমাংসা বা বেদান্তদর্শন যেন তাহার সর্ব্বোচ্চ বা শেষ ধাপ। ক্রমশঃ পদ্ধতি-পরম্পরায় এই সোপান অতিক্রম করিয়া, তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান-সৌধে সমারোহণ করা যায়। একেবারেই কেহ সর্ব্বোচ্চ ধাপে উঠিয়া সৌধপ্রবেশে সমর্থ হয়না; সুতরাং উদ্দেশ্যের অভিন্নতার প্রকৃতপক্ষে দর্শনশাস্ত্রগুলি পরস্পরে অবিরোধী। এই মূল সত্য বিস্মৃত বা উপেক্ষিত হইলে, আমরা চিরকাল দর্শনশাস্ত্রের 'গোলোক-ধাঁধায়' পড়িয়া ঘুরিব; কদাচ সর্ব্বমতসমন্বিত সারসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া স্বাধ্যায়ের প্রকৃত সুফললাভে সমর্থ হইব না; অথবা কোন একটি বিশিষ্ট দার্শনিক মতবাদের মৌলিকত্ব অনুভবে অধিকারী হইতে পারিবনা।

কোন একটি সত্য হইতে অধিকার-ক্রমানুসারে উচ্চতর সত্যে আরোহণ স্বাভাবিক নিয়ম; অতএব নিম্নস্থ সত্য সত্যই নহে, অথবা উচ্চতর সত্যের অস্তিত্বই নাই, এরূপ কোন সিদ্ধান্ত দার্শনিক বিচারে স্বতই অনুপপন্ন ও অসঙ্গত। যাহাহউক, এক্ষণে বেদান্তসূত্রের চতুর্থপাদের সূত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

১ম। আনুমানিক মপ্যে কেষা-মিতি চেন্ন শরীররূপক বিন্যস্ত গৃহীতে দর্শয়তি চ।

২য়। সূক্ষ্মন্তু তদর্হত্বাৎ।

৩য়। তদধীনত্বাদর্থবৎ।

৪র্থ। জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ।

৫ম। বদতীতি চেন্ন প্রাজ্ঞোহি প্রকরণাৎ।

৬ষ্ঠ। ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাস প্রশ্নশ্চ।

৭ম। মহদ্বচ্চ।

৮ম। চমসবৎ বিশেষাৎ।

৯ম। জ্যোতিরুপক্রমাত্তু তথা হ্যধীয়ত একে।

১০ম। কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বা-দিবদবিরোধঃ।

(ভাষ্যানুবাদ।)

১। কতিপয় ঔপনিষদী শ্রুতিদ্বারা যে সাংখ্যোক্ত প্রধানের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে, তাহা অসিদ্ধ; যেহেতু আপাততঃ প্রধান-লক্ষণ-প্রতিপাদক শ্রৌত বাক্য যে প্রকৃত পক্ষে সূক্ষ্ম শরীরের রূপক রূপেই বিন্যস্ত, তাহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত।

২। লক্ষণের উপযোগিতা হেতু "অব্যক্ত" শব্দে সূক্ষ্ম শরীরই সূচিত হইতেছে, কিন্তু "প্রধান" নহে।

৩। শাস্ত্র যুক্তিমতে অব্যক্ততত্ত্ব ব্রহ্মের অধীন বিধায়, তদ্দ্বারা সাংখ্যোক্ত স্বাধীন "প্রধান" প্রতিপাদিত হইতে পারে না।

৪। অব্যক্তের জ্ঞেয়ত্ব শাস্ত্রে উক্ত না হওয়ায় "অব্যক্ত" পদে "প্রধান" প্রতিপাদিত হইতে পারে না।

৫। সাংখ্যোক্ত "প্রধান" অপ্রাজ্ঞ বিধায়, শাস্ত্রোক্তি দ্বারা তাহা প্রতিপাদিত হয় না; পরন্তু প্রাজ্ঞ আত্মাই প্রতিপাদিত হন।

৬। প্রশ্নানুসারে তিনটি তত্ত্বমাত্রের উপন্যাস হইয়াছে। সুতরাং তন্মধ্যে অব্যক্ত স্বরূপে প্রধান সূচিত হয় নাই।

৭। "অব্যক্ত" পদ "মহৎ" পদের ন্যায় প্রযুক্ত হওয়াতে, তদ্দ্বারা প্রধান পরিব্যক্ত হইতে পারে না।

৮। "চমস" পদের প্রয়োগবৎ "অজা" পদ রূপকার্থে প্রযুক্ত হওয়ায়, তদ্দ্বারা প্রধান প্রতিপাদিত হইতে পারে না।

৯। কতিপয় শাখাতে ভূত-সৃষ্টির উপক্রম স্বরূপ জ্যোতিরাদি "অজা" পদে অধীত হওয়ায়, "অজা" পদে "প্রধান" প্রতিপাদিত হইতে পারে না।

১০। শ্রুতিবিশেষে রূপকভাবে 'মধু' শব্দে সূর্য্য সূচিত হওয়ায়, এবং শাস্ত্রে ঐরূপ আরও রূপকোক্তি থাকায়, ছাগী-অর্থ-প্রকাশক "অজা" শব্দ দ্বারাও রূপক-রূপে সৃষ্টির মূল ভৌতিক কারণত্ব অবিরোধীভাবেই সূচিত হইয়াছে; কিন্তু তদ্দ্বারা সাংখ্যোক্ত "প্রধান" সূচিত হয় নাই।

বৈদান্তিকেরা বলেন যে, সাংখ্যমতের কোন বেদানুমোদিত প্রামাণিকতা নাই। এতৎপ্রতিবাদে সাংখ্যমতাবলম্বিগণ কঠোপনিষদুক্ত (১-৩-১১) একটি শ্রুতি নির্দ্দেশ করেন, যথা—"মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ"। অর্থাৎ মহত্তত্ত্বের পর অব্যক্ত, অব্যক্তের পর পুরুষ। সাংখ্যশাস্ত্রেও এই ত্রিতত্ত্ব স্বীকৃত; সুতরাং উক্ত ঔপনিষদী শ্রুতি দ্বারা সাংখ্যমতের মূলতত্ত্ব বেদ-প্রমাণে প্রমাণিত হইতেছে, ইহাই সাংখ্য-বাদিগণের সিদ্ধান্ত। মূল জ্ঞানতত্ত্ব বা অন্তর্দৃষ্টিই মহৎ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতত্ত্বই অব্যক্ত। এই অব্যক্তস্বভাবাত্মিকা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিই মূলতঃ ও মূলতঃ সমগ্রজগতের সৃষ্টিশক্তিস্বরূপিণী; আর পুরুষ জীবাত্মা। সাংখ্যের সিদ্ধান্ত এইরূপ। বেদান্তবাদীরা বলেন, "সাংখ্যবাদীরা শ্রৌতবাক্যের সহিত কেবল তাঁহাদের সিদ্ধান্তের কতিপয় শব্দ-সাম্য পাইয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের সহিত প্রকৃত অর্থসাম্য অবশ্য পান নাই। ফলে ঐ সমস্ত শব্দগুলির যথার্থ তাৎপর্য্য বা অর্থ কি, তাহা প্রকৃত পক্ষে অনবধারণ

করিতে হইলে, মূল আলোচ্য বিষয়টি কি, তাহা বুঝিতে হইবে, এবং সমগ্র উপনিষদ খানি অধ্যয়নপূর্ব্বক প্রকরণ ও উপক্রম-উপসংহার বিচার করিয়া প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু শুধু এখানকার ওখানকার দুচারিটা ছুটা ছুটা উক্তির শাব্দিক অর্থের দ্বারা সে উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। আলোচ্য শ্রুতিটির অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে একটি রূপকোক্তির শ্রুতি দৃষ্ট হয়। উহাতে আত্মাকে রথী এবং শরীরকে রথ বলা হইয়াছে, ইত্যাদি। শ্রুতিটি এই;—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥"

অর্থাৎ—

আত্মাকে জানিবে রথী, রথ জান দেহ।
বুদ্ধিকে সারথি জান, মনকে প্রগ্রহ॥
ইন্দ্রিয়েরা অশ্ব তার বিষয়ের পথে।
দেহ-মনযুক্ত আত্মা 'ভোক্তা' জ্ঞানী-মতে॥

তৎপরে উক্ত হইয়াছে যে, যে সাধক ইন্দ্রিয়-সংযম-সিদ্ধ, সেই সর্ব্বতত্ত্বাতীত তত্ত্ব পরমাত্ম-তত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব লাভে অধিকারী। শ্রুতি যথা—

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরমর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ॥"

অর্থাৎ—

ইন্দ্রিয়ের পরে অর্থ; অর্থ-পরে মনস্তত্ত্ব।
মনের পরেতে বুদ্ধি, বুদ্ধি-পরে মহত্তত্ত্ব॥
মহৎ-পরে অব্যক্ত, পুরুষ পরেতে তার।
সেই কাষ্ঠা, পরাগতি, তারপর নাহি আর॥

আমরা পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রৌত বাক্যটির ন্যায় পরোদ্ধৃত শ্রৌত-বাক্যটিতেও ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি পাইলাম। আবার পরোদ্ধৃত বাক্যটিতে পূর্ব্বোদ্ধৃতের ন্যায় 'আত্মা' শব্দটিও পাইলাম। কিন্তু পার্থক্য মাত্র এই যে, প্রথমোক্ত বাক্যটির আত্মা জীবাত্মা ও পরবর্ত্তী বাক্যোক্ত আত্মা পরমাত্মা। ফলে জীবাত্মা ও পরমাত্মা যে পরমার্থতঃ অভিন্ন এ সিদ্ধান্তে কোন আপত্তি হইতে পারে না। তবে কেবলমাত্র প্রথমের ন্যায় দ্বিতীয় বাক্যটিতে শরীরের উল্লেখ নাই। অতএব ইহার সমাধান এই যে, দ্বিতীয় উক্তির "অব্যক্ত" পদেই প্রথমোক্তিস্থ 'শরীর' সূচিত হইতেছে। সুতরাং এ স্থলে অব্যক্ত পদে সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত বিশ্ব-মূল-কারণরূপে প্রধানকে বুঝায় না। তবে কি প্রকারে এই স্থূল সুব্যক্ত ভৌতিক শরীর "অব্যক্ত" শব্দে সূচিত হইতে পারে? তদুত্তরে (২য় সূত্র) বলা যায় যে, উক্ত বাক্যে "কারণ-শরীর" বা "লিঙ্গশরীর"কে বুঝাইতেছে। এই 'লিঙ্গশরীর' হইতেই ভৌতিক স্থূলদেহ সঞ্জাত। কখন কখন কারণবাচক শব্দ কার্য্যবাচকরূপে গৃহীত হয়। যথা স্বয়ং ঋগ্বেদ (৯-৪৬৪) বলিতেছেন,—"গোভিঃ শ্রীণীত মৎসরং"—অর্থাৎ গরুর সহিত সোম মিশাও। এস্থলে 'গরু' অর্থেই গরুর দুগ্ধ। ফলে দুগ্ধসহ সোমমিশ্রণেরই বিধি। অতএব "অব্যক্ত" পদ প্রয়োগে ভৌতিক স্থূল শরীর-সূচনায় বাধা কি?

"বৃহদারণ্যক উপনিষদ্" (১।৪।৭)

বলেন,—"তদ্বেদম্ তর্হ্যব্যাকৃতমাসীদিতি।" অর্থাৎ এ সব কিছুই ছিল না; সমস্ত অব্যক্ত ছিল। তাৎপর্য্য এই যে, এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান নামরূপউপাধিযুক্ত বহুভেদ-বিশিষ্ট সুব্যক্ত জগৎকেও অব্যক্ত বলা যায়; যেহেতু ইহা সৃষ্টির পূর্ব্বে নামরূপাদির সর্ব্ববিধ ভেদশূন্য হইয়া বীজশক্তিরূপে অবস্থিত ছিল। অতএব যেমন এই সুব্যক্ত জড়-জগতের একটি অব্যক্ত বীজীভূত অবস্থা আছে, তদ্রূপ এই সুব্যক্ত স্থূল শরীরেরও একটি অব্যক্ত অবস্থা বা কারণ-শরীর আছে।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, (৩য় সূত্র জগতের অব্যক্ত কারণাবস্থাই সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত প্রধান কিনা? ইহাতে সাংখ্যবাদিগণ বলেন যে, "হে বৈদান্তিকগণ! নাম-রূপ-উপাধি প্রকাশ পাওয়ার পূর্ব্বে যে এই জগতের অব্যক্তাবস্থা ছিল, তাহা তোমরা স্বীকার করিলে, তদ্দ্বারা আমাদেরই মত সমর্থন করা হয়।" তদুত্তরে বৈদান্তিকেরা বলেন যে, "না, তাহা নহে। যদি আমরা জগতের আদি অব্যক্ত অবস্থাকে ব্যক্ত জগতের স্বাধীন কারণ-রূপে স্বীকার করিতাম, তবে তোমাদের মত সমর্থন করা হইত বটে, নচেৎ নহে।" বাস্তবিক বৈদান্তিকেরা জগতের পূর্ব্ববর্ত্তী অব্যক্ত কারণাবস্থা স্বীকার করিলেও, সেই অব্যক্ত তত্ত্বকে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করেন না; পরন্তু তাহা পরমাত্মা ব্রহ্মেরই অধীন বলেন। ফলে যদি এই ভৌতিক জগতের কারণস্বরূপ একটা পূর্ব্ববর্ত্তী বীজীভূত অব্যক্তাবস্থা স্বীকার না করা যায়, তবে ঈশ্বর 'সৃষ্টিকর্ত্তা' বলিয়াই অভি-হিত হইতে পারেন না। তবে ঈশ্বরের কোন কার্য্যই থাকে না; সুতরাং কার্য্যের কারণরূপিণী বীজশক্তির অভাবে কার্য্য-রূপ সৃষ্টিও থাকেনা। অতএব ঐ কারণ-রূপা বীজশক্তিই বৈদান্তিকগণের মতে মায়া। 'আকাশ' 'অক্ষর' এবং ঐরূপ সমতাৎপর্য্যবোধক পদেও মায়াই সূচিত হইয়া থাকে। "এতস্মিন্নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি শ্রুতেঃ।" (বৃঃ উঃ ৩।৮।২) অর্থাৎ—হে গার্গি! এই অক্ষরে নিশ্চয় আকাশ ওতঃপ্রোতঃ ভাবে থাকে, ইহাই বেদবাক্য। "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" (মুঃ উঃ, ২—১।২) অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠতর। "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্ধি, মায়িনন্তু মহেশ্বরং" (শ্বেঃ উঃ—৪।১০) অর্থাৎ মায়াকেই প্রকৃতি জানিবে এবং মায়া যাঁহার, তাঁহাকেই মহেশ্বর জানিবে। কঠোপনিষদের পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতিস্থ 'মহৎ' শব্দে যদি জীবাত্মা বুঝায়, তবে "অব্যক্ত" শব্দেও বেদান্তদর্শনের "মায়া" বুঝাইবে। অতএব "অব্যক্ত" শব্দের অর্থ যেরূপই গৃহীত হউক; অর্থাৎ উক্ত শব্দে জীবের সূক্ষ্ম কারণ-দেহকেই বুঝাউক বা এই স্থূল ভৌতিক জগতের বীজীভূত সূক্ষ্ম কারণাবস্থাই বুঝাউক, ফলে তদ্দ্বারা সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত জগতের স্বাধীন আদিকারণরূপে কথিত প্রধানকে কখনও বুঝাইবেনা।

৪র্থ সূত্র।—কঠোপনিষদুক্ত ঐ 'অব্যক্ত' পদে সাংখ্যদর্শনের "প্রধান" প্রতিপাদিত হইতে পারে না। যেহেতু পুরুষের মুক্তি-লাভার্থ প্রকৃতিকে জানা আবশ্যক; কিন্তু কঠ শ্রুতির "অব্যক্ত" কোনরূপেই জ্ঞেয়

না বেদরূপে উক্ত হয় নাই; অতএব এই "অব্যক্ত" ও সাংখ্যের প্রকৃতি বা "প্রধান" কদাচ এক তত্ত্ব হইতে পারে না।

৫ম সূত্র।—এক্ষণে সাংখ্যপক্ষ এক তর্কে অবতীর্ণ হইয়া বলিতেছেন যে, "প্রধান" জ্ঞাতব্যরূপে বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। তাহাতে বৈদান্তিকেরা বলেন যে, সাংখ্যপক্ষের প্রমাণ শাস্ত্রোক্তিতে প্রধান সূচিত হয় নাই; পরন্তু পরমাত্মাই সূচিত হইয়াছেন।

সাংখ্য পক্ষীয় সেই প্রমাণ শ্রুতিটি এই, যথা কঠোপনিষদ (১।৩।১৫)—

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥"

অর্থাৎ—

অশব্দ-অস্পর্শ-অরূপ অব্যয়।
অরস-অগন্ধ-নিত্য সত্ত্বময়॥
অনাদ্যন্ত-ধ্রুব মহত্তের পর।
যাঁরে জেনে মৃত্যু-মুখ-মুক্ত নর॥

সাংখ্য পক্ষীয় সিদ্ধান্ত এই যে, এই শ্রুতি তাঁহাদের "প্রধান"কে প্রতিপাদন করিতেছেন, কিন্তু বেদান্তপক্ষীয়েরা বলেন যে, না, তাহা হইতে পারে না; যেহেতু সমগ্র অধ্যায়টির মূল আলোচ্য বিষয়ই ব্রহ্মতত্ত্ব; সুতরাং ব্রহ্মকে ছাড়িয়া প্রধানকে বুঝাইলে, স্পষ্টতঃ বিষয়বিপর্যয় দোষ ঘটে; অর্থাৎ অমীমাংসিত আরব্ধ বিষয় ত্যাগ করিয়া, এক নব বিষয়ের অবতারণা হইয়া পড়ে। সমগ্র অধ্যায়টিতে ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, মানব ব্রহ্মকে জানি-লেই—অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেই মুক্তিলাভে সমর্থ হয়; কিন্তু সাংখ্যশাস্ত্র-মতে কেবল প্রধানকে জানিলেই জীবের মুক্তি হয়না, পরন্তু সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত 'পুরুষ'কেও জানিতে হইবে; অর্থাৎ পুরুষের আত্ম-জ্ঞান ভিন্ন মোক্ষলাভ সম্ভাবিত নহে; বৈদান্তিক মতে আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান পরমার্থতঃ এক; যেহেতু আত্মা ও পরমাত্মা পরমার্থতঃ এক; মায়া-মুক্তাবস্থায় সেই একত্বানুভূতি এবং একত্ব পরিণতিই মুক্তি।

৬ষ্ঠ সূত্র।—এ সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, আলোচ্য "অব্যক্ত" পদে কদাচ "প্রধান" ব্যক্ত হইতে পারে না। যেহেতু কঠোপনিষদেই উক্ত হইয়াছে যে, যম নাচি-কেতাকে মাত্র তিনটি তত্ত্বের বিষয় বলি-য়াছেন, যথা:—অগ্নিচয়ন, জীবাত্মা ও পর-মাত্মা। নাচিকেতা কর্ত্তৃক "প্রধান" সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উত্থাপিত হয় নাই, সুতরাং তদ্বিষয়ে কোন উত্তরও সম্ভাবিত নহে; অতএব 'অব্যক্ত' কদাচ 'প্রধান' হইতে পারেনা। তদুত্তরে সাংখ্যপক্ষ বলেন যে, নাচিকেতা প্রকৃত পক্ষে অগ্নিচয়ন, এবং আত্মা, এই দুই বিষয়ে মাত্র প্রশ্ন করিয়া-ছিলেন; কিন্তু তোমরা বেদান্তপক্ষীয়েরাই স্বীকার করিতেছ যে, যম তিনটি তত্ত্ব বলিয়াছিলেন; সুতরাং নাচিকেতা কর্ত্তৃক প্রধানতত্ত্ব জিজ্ঞাসিত না হইলেও, যম-কথিত ঐ অতিরিক্ত তত্ত্বটিকে 'প্রধান' বলিয়া বুঝিতে বাধা কি? এতৎ প্রত্যু-ত্তরে বৈদান্তিকগণ বলেন যে, যদিও জীবাত্ম ও পরমাত্মা, এই দুইটি বিষয়ই যম কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে, তথাপি বুঝিতে হইবে

যে, উহা আপাততঃ গণনায় দুইটি বিষয় হইলেও, ফলিতার্থে একটি বিষয়ই বটে; কারণ জীবাত্মা ও পরমাত্মা পরমার্থতঃ এক বা অভিন্ন।

৭ম সূত্র।—সাংখ্যদর্শনে 'মহৎ' পদটি যে অর্থে গৃহীত ও ব্যবহৃত হইয়াছে, বেদান্তের দার্শনিক পরিভাষায় তাহা তদর্থে গৃহীত বা প্রযুক্ত হয় নাই। সাংখ্যমতে 'মহৎ' বুদ্ধি বা জ্ঞানতত্ত্বের প্রথম বিকাশ; কিন্তু বেদান্তশাস্ত্রে তদ্দ্বারা পরমাত্মাই প্রতিপাদ্য; যথা—"বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ" (কঃ উঃ ১—৩।১০) অর্থাৎ মহৎ আত্মা বা পরমাত্মা বুদ্ধিতত্ত্বের অতীত তত্ত্ব। 'মহান্তং বিভুমাত্মানং"। (কঃ উঃ ১—২।২৩) সর্ব্বব্যাপী আত্মাই মহৎআত্মা। 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং' (শ্বেঃ উঃ, ৩।৮) অর্থাৎ এই মহৎ পুরুষ কিনা পরম পুরুষ পরমাত্মাকে আমি জানি; ইত্যাদি। যাহাহউক, "মহৎ" শব্দের তাৎপর্য্য সাংখ্যে যেরূপ, বেদান্তে তাহাহইতে ভিন্নরূপ; এবং তদ্রূপ "অব্যক্ত" শব্দের তাৎপর্য্য সাংখ্যে যেরূপ, বেদান্তে তাহাহইতে ভিন্নরূপ; সুতরাং বেদান্ত-মতে "অব্যক্ত" পদে কদাচ সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত "প্রধান" প্রতিপাদিত হইতে পারেনা।

৮ম সূত্র।—যে শ্রুতিটি মূল আলোচ্য বিষয়ের মেরুদণ্ড স্বরূপ, তাহা এই,—

অজামেকাং লোহিত শুক্ল কৃষ্ণাং।
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ ॥
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে।
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥

অর্থাৎ—

এক অজা রক্ত-শ্বেত-কৃষ্ণবর্ণ ধরে।
স্ব-রূপ বিবিধ প্রজা প্রসব সে করে ॥
এক অজ ভালবেসে তার পাশে থাকে।
অন্য অজ উপভোগি ত্যাগ করে তাকে ॥

এই আপাতপ্রতীয়মান রূপকরূপী শ্রৌতবাক্যটির শাব্দিক অর্থ অবশ্য পরিষ্কার, কিন্তু ইহার তাৎপর্য্যার্থের রহস্য-ব্যাখ্যায় সাংখ্য-সম্প্রদায় বলেন যে, 'অজা' পদে প্রধানই প্রতিপাদ্য; যেহেতু ইহাই জগতের আদিকারণ। লোহিত, কৃষ্ণ ও শুক্ল, এই তিন বর্ণ প্রকৃতি বা প্রধানের রজঃ, তমঃ ও সত্ত্ব গুণের লক্ষণ। এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাই প্রধানের স্বরূপ। ইহা হইতে ত্রিগুণাত্মক জগতের সৃষ্টি। আর বদ্ধ ও মুক্ত ভেদে পুরুষ (তত্ত্বতঃ এক হইয়াও) দ্বিবিধ। ইহাই দুই অজ। প্রকৃতিও স্বয়ম্ভূতা বলিয়া অজা এবং এই আত্মারূপী পুরুষও স্বয়ম্ভূত বা স্বয়ম্ভু, সুতরাং অজ। এই দুয়ের মধ্যে বদ্ধ পুরুষ প্রকৃতির প্রেমাধীন হইয়া প্রকৃতিতেই লাগিয়া থাকে; সুতরাং মুক্তিলাভ করিতে পারেনা। আর মুক্ত পুরুষ প্রকৃতিকে সম্ভোগ করিয়া, অর্থাৎ তাহার তত্ত্ব জানিয়া, তাহাকে ত্যাগ করে। বদ্ধজীব তত্ত্বজ্ঞানাভাবে আপনার স্বরূপ চিনিতে না পারিয়া প্রকৃতির ভোগে ভুলিয়া থাকে; আর তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ আত্মতত্ত্ব লাভে অভ্রান্ত ও বলবন্ত হইয়া, প্রকৃতির প্রেমজাল ছিন্ন করিয়া, অবাধে মোক্ষপদের যোগ্য হয়। এতাবতা সাংখ্যবাদীদের সিদ্ধান্ত এই যে, এই 'অজা' পদে প্রকৃতি বা প্রধানই পরিব্যক্ত।

বৈদান্তিকগণ এতদুত্তরে বলেন যে, একটি মন্ত্র আছে, যথা—"অর্বাগ্‌বীলস্ চমস ঊর্দ্ধবুধ্ন" অর্থাৎ অধোমুখ ঊর্দ্ধতল একটি চমস (হাতা বা বাটীর ন্যায় যজ্ঞীয় পাত্র-বিশেষ) আছে ইহার অর্থ কি? বাস্তবিক এতদ্দ্বারা কি বস্তু বুঝাইতেছে, তাহা জানা যায় না। তদ্রূপ আলোচ্য মন্ত্রের কেবল ঐ 'অজা' শব্দের দ্বারা উহাকে "প্রধান" বলিয়া সিদ্ধান্ত করা সমুচিত নহে। "চমস" শব্দে উক্ত মন্ত্রেরই পরবর্ত্তী একটি শ্রুতিতে মস্তক বা মুণ্ডকে বুঝায়। 'চমস' সম্বন্ধে যেমন, 'অজা' সম্বন্ধেও তদ্রূপ যদি আর একটি পরবর্ত্তী শ্রৌতবাক্য পাওয়া যায়, তবে উক্ত 'অজা' পদের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রতীত হইতে পারে। কঠোপনিষদে একটি শাখায় বলা হইয়াছে যে, জলন্ত স্থূল অগ্নির রক্তবর্ণই মৌলিক তেজের বর্ণ। আর স্থূল অগ্নির শ্বেতবর্ণই মৌলিক রসভূতের বর্ণ; এবং স্থূল অগ্নির কৃষ্ণবর্ণ মৌলিক ক্ষিতির বর্ণ। বেদান্তবাদিগণ বলেন যে, পূর্ব্বোক্ত ঐ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের শ্রৌত বাক্যটির প্রতিপাদ্য বিষয় এই ক্ষিত্যপতেজ-তত্ত্ব। উক্ত উপনিষদেই স্থলান্তরে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, পরমাত্মা ব্রহ্মের শক্তিরূপিণী মায়া বা প্রকৃতি কর্ত্তৃক এই ত্রিগুণাত্মক জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে।

বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত এই যে, মুখ্য মীমাংসিতব্য-বিষয় অনুসারে আলোচ্য মন্ত্রটিতে সেই ব্রহ্মশক্তিই সূচিত হইতেছেন, এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক শ্রৌত বাক্যেও তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। উহাই সৃষ্টির অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বীজ বা কারণ-তত্ত্ব এবং ক্ষিত্যপতেজের জননিত্রীত্ব হেতু উহাকেই ত্রিবর্ণাত্মিকা অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা বলা হইয়াছে। এক্ষণে এই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, তবে ইঁহাকে "ছাগী" অর্থে গ্রহণ করিব না কেন? অজা শব্দের দুটি অর্থ; ছাগী এবং যাহা জন্মে নাই। "ক্ষিত্যপ্‌তেজ" ভৌতিক পদার্থ। "ভূত" শব্দের অর্থই জাত; অতএব উহা কদাপি অভূত বা অজাত হইতে পারে না। তদুত্তরে বলা যায়, উক্ত "অজা" শব্দটি আলোচ্যস্থলে রূপকভাবেই ব্যবহৃত হইতে পারে। উপনিষদে এরূপ উদাহরণের অভাব নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদে সূর্য্যকে এইরূপ রূপকভাবে "মধু" বলা হইয়াছে; আবার তদ্রূপ বৃহদারণ্যক উপনিষদে বাণীকে "গাভী" বলা হইয়াছে! অতএব আলোচ্যস্থলেও যদিও জগতের মূল ভৌতিকতত্ত্ব ছাগী নহে, তথাপি ঐরূপ রূপকভাবেই "অজা" অর্থাৎ ছাগী বলা হইয়াছে।

যাহাহউক, এই সমস্ত বিতর্ক-বিচারের বৈদান্তিক সারনিষ্কর্ষ বা সিদ্ধান্ত এই যে, যদিও সচরাচর বেদান্ত-শাস্ত্রে সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত "প্রধান" বৎ একটি তত্ত্ববিশেষ সূচিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা সাংখ্যের সেই স্বপ্রধান স্বাধীন প্রধান নহে; তাহা "মায়া" অর্থাৎ ব্রহ্মের শক্তি; তাহা ব্রহ্মসাপেক্ষ; সুতরাং স্বপ্রধানা বা স্বাধীনা নহে। কিন্তু নিরপেক্ষ-বিশ্ব-বিধাতৃত্বহেতু সাংখ্যের "প্রধান" বাস্তবিকই প্রধান; উহা স্বাধীন, স্বসাপেক্ষ ও স্বয়ম্ভূতত্ত্ব। সাংখ্যশাস্ত্রে কোন ভাবেই উহা ব্রহ্মের অধীন বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। (ক্রমশঃ)

শ্রীশঃ——

কর্ম্মবীর বিবেকানন্দ।

মহাপ্রাণতার সুন্দর সুস্পষ্ট সুচিত্রিত মহান্ আদর্শ সমগ্রজগতের সমস্ত জাতির সম্মুখে সংস্থাপিত করিয়া মহাত্মা বিবেকানন্দ নরসংসারের সমস্ত বন্ধন, সমস্ত আকর্ষণ সম্পূর্ণ ছেদ করিয়া, মহাসমাধি-সোপানের সাহায্যে মহাশান্তি-ধামে গমন করিয়াছেন। স্থূলদর্শীর জন্য তাঁহার স্থূলদেহের কয়েক মুষ্টি ভস্মমাত্র অবশেষ রহিয়াছে, কিন্তু জ্ঞানীর নয়নে এক বিরাট্ বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানময় মহাসত্তা অনন্তকালের জন্য অবিকৃতভাবে অবস্থিতি করিতেছে। তাঁহার বিজয়ভেরীর ধীরগম্ভীররবে জগতের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইতেছে, প্রত্যেক অণু সাকাঙ্ক্ষকর্ণে সেই মন্ত্রমধুর সঞ্জীবনশব্দ শ্রবণ করিতেছে, নবজগৎ নববিজয়ের জন্য তাঁহাকে নবপ্রীতিপূর্ণবচনে বারম্বার আহ্বান করিতেছে, এদিকে পাপতাপহারিতরঙ্গরঙ্গবিলাসিনী সুরধুনীর পবিত্র প্রবাহের অনতিদূরে অবস্থিত সেই মহাপুরুষের মস্তকে শতধা উচ্ছলিত জননীর শতধার স্নেহের ন্যায় মহাকালের মাঙ্গল্য আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইল। পবিত্রতাময়ী জন্মভূমি জননীর সুস্নিগ্ধ-অঙ্কে নিরাতঙ্ক-মনে মহাত্মা পরমশান্তি-লাভের জন্য মহানিদ্রার্থে প্রস্তুত হইয়া শয়ন করিলেন। উজ্জ্বল মধুর মহিমান্বিত-আলোক স্থূল-দৃষ্টির দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইল। মহাপুরুষ বিবেকানন্দের কর্ম্ম জীবন তীব্রতার আবর্ত্ত সঙ্কুল বহুলঘটনভাবর ঝটিকাপ্রবাহ স্বরূপ নানাভাবপূর্ণ হইলেও, চরম বড় স্থির, বড় গভীর, বড় সামঞ্জস্যযুক্ত, বড় মধুরিমাময়, বড় আনন্দময়, বড় নিরাবিল। মৃত্যু সংসারের সুখদবিশ্রাম। মৃত্যু বাধা বিপত্তি ঘাত প্রতিঘাতময়বিশৃঙ্খলজীবনের একমাত্র সুব্যবস্থা। অজ্ঞজনের মস্তকতাড়ন বক্ষোবিদারণের কারণ হইলেও বিজ্ঞের নিকট উহাতে বেশ সামঞ্জস্য আছে। কোনও স্বদেশপ্রাণ পরহিতরত মহাত্মার মরণে তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রের প্রসার, বৃদ্ধি ব্যতীত সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয়না। স্বদেশবৎসল ব্যক্তি মৃত্যুর পরই স্বদেশবৎসল বলিয়া পরিচিত হন। কেবল ফল দ্বারাই কর্ম্মের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। অন্য কোনও রূপে উহার মর্ম্মবোধ হয় না। মহাপুরুষ বিবেকানন্দ যে কর্ম্ম আপনার প্রতিভূরূপে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা এখনও বীজভাব অতিক্রম করে নাই। সময়ে ঐ বীজ বৃক্ষে পরিণত হইয়া এক অপূর্ব্ব অমৃতফল প্রসব করিবে। যাহাতে সমস্ত জগৎ পরিতৃপ্ত হইতে পারিবে। এই মহাপুরুষের জীবনবৃত্ত আলোচনা করিলে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাইয়া চমকিত বিস্মিত এবং অলৌকিক স্বাধীনতাপূর্ণকার্য্যকলাপ দর্শন করিয়া স্তম্ভিত আশ্বস্ত, আর স্বদেশ-স্বজাতির প্রতি অত্যধিক অনুরাগ চিন্তা করিয়া আনন্দে গৌরবে প্রাণ পুলকিত ও প্রেমে ভক্তিতে হৃদয় বিগলিত হয়। বিবেকানন্দ উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্তপরিবারের সন্তান হইলেও শিক্ষায় সম্পদে তিনি পরিতৃপ্ত হইতে পারিয়াছিলেন না। জাতীয়ধর্ম্মভাবেরপ্রবল প্রবাহ তাঁহার প্রাণের উপর ভাগীরথীর পূত

ধারার ন্যায় বহিতেছিল, জাতীয়ভাবের সাগর-সঙ্গমে তাঁহার প্রাণটীও সেই তরঙ্গে আপন রঙ্গে অপার আনন্দে ছুটিল। ত্রয়োদশবর্ষব্যাপী অবিশ্রান্তগমনে গন্তব্য-সমীপে উপস্থিত হইল। হিমালয় হইতে কুমারিকা বিরাট্ ভারতবর্ষের প্রতি স্থানে প্রত্যেক সম্প্রদায়ে পৃথক্ নামে পরিচিত হইয়া পদচারী গৈরিকধারী কম্বলসম্বল বিবেকানন্দ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, ভারতের সকলধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মূল-ভিত্তি কি? ভারতীয়-ধর্ম্মের সার্ব্বজনীন-সত্য কি? এই বিষম-সমস্যার বিপুল-গবেষণায় তিনি যে পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন, চিকাগোর ধর্ম্ম মহাসমিতিতে সমগ্র সভ্য-জগৎ তাহার সুচারু-পরিচয় পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছে। তাঁহার প্রদর্শিত-ভিত্তির নিকট অপর সকল দেশের সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ভিত্তিই অদৃঢ় অমার্জ্জিত এবং অল্প মূল্য ইহা সভ্য-জগৎ অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। বিবেকানন্দের জীবনে ইহাই প্রথম সাধনা এবং বর্ত্তমান ভারতের ইহাই প্রধান সাধনা। ঈশ্বর বিশ্বাস এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁহার কোনও ব্যক্তিগত স্বাধীন মত ছিল না। উত্তুঙ্গ-পর্ব্বতের তুহিনসঙ্কুল-স্থল হইতে যেমন নানাদিকে নানা নদ নদী প্রবাহ ছুটিতে থাকে, অথচ কাহারও বিরোধ নাই, সকলেই আপন আপন অধিকারে থাকিয়া গন্তব্যের দিকে চলিয়া যাইতেছে, তদ্রূপ একই মহাপুরুষের নিকট হইতে হিন্দু-ধর্ম্মের বিভিন্নরূপ সত্যগুলি ভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যাত হইত, অথচ পরস্পর বিরোধ সম্পর্ক নাই, স্ব স্ব অধিকারে সকলেরই সমান মূল্য, সকলেরই লক্ষ্যস্থির, সকলের মধ্যেই যেন এক অলক্ষ্য সামঞ্জস্য বিরাজমান। তাঁহার অনেক বক্তব্য আপাততঃ বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও নিপুণ-পর্য্যালোচনায় বিশেষচিন্তায় উহার অভ্যন্তরে যৌক্তিকতা এবং মৌলিক একতা দর্শন করিয়া অনেক পাশ্চাত্যদেশীয় বিশ্ব-বিখ্যাত পণ্ডিত ও বিস্ময় প্রাপ্ত হইতেন। বিবেকানন্দ কখনও কপোলকল্পিত যুক্তি-জাল ও কূটতর্করাশির সমাবেশ করিয়া স্বমত পোষণ করিতেন না। তিনি বিরুদ্ধ-বাদীর যুক্তিতর্ক বা বিশ্বাস সিংহবেগে আক্রমণ করিতেন, যখন পরাজিত প্রতি-দ্বন্দ্বী স্বপক্ষরক্ষণে অক্ষমতা প্রকাশ পূর্ব্বক উপদেশ প্রার্থনা করিত, তখন উপনিষদের গভীর রহস্য বেদান্তের অমূল্য-তত্ত্ব বলিয়া দিতেন, ইহাপেক্ষা অন্যরূপ ধর্ম্ম উপদেশ বা শিক্ষা তাঁহার নিকট পাওয়া যাইত না। পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে একদিন বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "আমি পুণ্য-পুঞ্জ পূজ্যপাদ মহর্ষিগণের প্রাণের প্রিয় পরমপবিত্র উপনিষদের মহাসত্য ব্যতীত আর কিছু শিখি নাই বা জানি না।" বিবেকানন্দ বলিতেন, "ভারত ধর্ম্মক্ষেত্র। ধর্ম্মে—এদেশের বা এজাতির অধিকার স্বাভাবিক। যদি পাশ্চাত্য-দেশের সহিত এই প্রাচ্যভূখণ্ডের কোনওরূপ ধর্ম্মবিষয়ক সম্বন্ধ কখনও থাকে, তবে তাহা এই, ভারত আচার্য্য পাশ্চাত্যদেশ শিষ্য, ভারত আদর্শ পাশ্চাত্যদেশ অনুকারী, ভারত

শিক্ষক, পাশ্চাত্যদেশ শিক্ষার্থী, ভারত সেব্য পাশ্চাত্য-দেশ সেবক।" ভারতবাসীর ইহাই সান্ত্বনা, মহাত্মা বিবেকানন্দের জীবনেই ঐ সকল দৈববাণী সফলতা লাভ করিয়াছে। ভারতের উন্নতি ধর্ম্মে "এই কথা তাঁহার মুখে সকলেই শুনিতেন। তিনি বলিতেন "ভারত পশুবলে বলীয়ান্ ছিলনা, ধর্ম্মবলই ভারতের চিরসম্বল, ভারত কখনও পাশ্চাত্যের স্থূল-উন্নতির অনু-করণে শান্তি পাইবে না, আধ্যাত্মিকতাই ভারতের অক্ষয়কবচ উহাই ভারতের চরম আশ্রয়।" চপলাবার্ত্তায় কি বাষ্পীয়-যন্ত্রে ভারত উন্নত বা আদর্শ হইতে পারে না, ধর্ম্মবলেই জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া প্রকৃত উন্নতির ভাজন হইতে পারে। অকৃতকার্য্যতা কি, তাহা তিনি নিজ জীবনে কোন সঙ্কীর্ণ-মুহূর্ত্তেও কোনও প্রসঙ্গে উপলব্ধি করিয়া যান নাই। শঙ্কা কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না। পরাধীনতার কদর্থনা কিরূপ, তাহা তিনি অণুমাত্রও মনে করিতে পারেন নাই। তাঁহার পাশ্চাত্যপ্রদেশীয় বন্ধুগণ প্রতি-পদেই লক্ষ্য করিতে পারিতেন যে, সত্য-প্রচারে তিনি রাজশক্তির নিকটও ক্ষণ-কালের জন্য মস্তক অবনত করেন নাই। জাতি, কুল, পাণ্ডিত্য এবং ধন-গৌরবের প্রতি তিনি কখনও সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। কর্ত্তব্যপালনে তিনি এতই নিবিষ্ট হইতেন যে, তাঁহার বিদেশীয় স্নেহাস্পদ-শিষ্যমণ্ডলীর প্রতি ও সহানুভূতিপ্রকাশ করিতে পারিতেন না। তাঁহার বিদেশীয়-বন্ধুগণ অনেক সময় তাঁহার স্বদেশ স্বধর্ম্ম প্রেমের প্রবলতার পক্ষপাতে তীব্র অপ্রিয়-ভাবে সমালোচিত হইয়া মর্ম্মাহত ও বিরক্ত হইত, কিন্তু তাঁহার অলোকসামান্য-প্রতিভার নিকট আপনা হইতেই নত-মস্তক হইয়া যেন কোনও অনিবার্য্য অনির্দ্দেশ্য কারণে সকল ভুলিয়া যাইত। স্বদেশের প্রতি অসাধারণ সহানুভূতিবশে তিনি বিদেশীয়ের গুণ গৌরব অপেক্ষা স্বদেশীয়ের দোষ বা অসম্পূর্ণতাকে ও উচ্চাসন প্রদান করিতেন। ভারতবর্ষ, জগতের কোনও অংশে ন্যূন বা অনুন্নত এ ধারণা তাঁহার মনের শত হস্ত দূরে স্থান পাইত না। পাশ্চাত্যদেশের এমন অনেক মহাত্মার নাম করা যাইতে পারে যাঁহারা বিবেকানন্দের অতুল গরিমায় অসীম মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে দেবতার ন্যায় রাজোপচারে আজীবন সেই দেশে রাখিয়া সেবা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, কিন্তু মহাত্মা বিবেকানন্দের হৃদয়ে স্বদেশের কোটী কোটী [illegible]ভ্রাতার দুঃখদারিদ্র্য অনুন্নতির বিষমচিন্তার প্রবল-তুফান বহিতেছিল তিনি পাশ্চাত্যের বিলাস-ঝটিকার কুসুম-সুবাসে মৃদুমধুর-মলয়-হিল্লোলে বিমল নির্ম্মল জ্যোৎস্নায় নীরবে নিরাবিলচিত্তে কাল কাটাইতে পারিলেন না। জন্মভূমি-জননীর কোটী কণ্ঠের ক্রন্দন অসীম আর্ত্তনাদ অনবরত তাঁহার হৃদয়ের তারে ধ্বনিত হইতে লাগিল। ভাগীরথী তীরে বেলুড়মঠে অরণ্যচরতির্য্যগ্‌জাতি প্রতিবেশী লইয়া সহকারিগণও এবং শিষ্যদল সঙ্গে লইয়া স্বদেশের ভবিষ্যত চিন্তা এবং শিষ্য-

মণ্ডলীর পরিগণিত বিবেচনায় তিনি প্রায় শেষ জীবনের পঞ্চমবর্ষ অতিবাহিত করিয়াছেন। বিদেশের স্বদেশের বহুপ্রাজ্ঞ তত্ত্বানুসন্ধিৎসুব্যক্তি তাঁহার সহিত ও উপদেশ প্রার্থনায় আগমন করিতেন। নানা প্রসঙ্গে নানা ভাব-তরঙ্গে সকলেই বিভোর হইতেন, সকলেই যেন এক ঐন্দ্রজালিক-শক্তি-বলে আত্মহারা হইতেন। আনন্দের প্রবাহ, প্রীতির পরাকাষ্ঠা তৃপ্তির প্লাবন দেখাদিত। বহির্ভাব পরিত্যাগ করিয়া আভ্যন্তর-ভাব বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইত, স্বামী বিবেকানন্দের হৃদয়ে সেই পুরাতনস্বদেশের ভবিষ্যতসমস্যা ভিন্ন আর কোনও উদ্বেগ-ভাব নাই। তাঁহার চিন্তা যেস্থানে বিশ্রাম লাভ করিয়াছে, তাহাতে তিনি দেখিতেন "ভারতের ভবিষ্যগগন অতুল আলোকময় সজ্জিত। ভারতের ভবিষ্যত মঙ্গলময় আনন্দময়!" তিনি বলিতেন, "ভারত কাহারও নিকট প্রত্যা[illegible]বা প্রার্থনা করে না। ভারতের জাতীয়-জীবন আপনা আপনি অসংখ্য-বাধা অতিক্রম করিয়া ক্রমে প্রবলতা লাভপূর্ব্বক মহানদীর ন্যায় সাগর সঙ্গম প্রাপ্ত হইবে। যদি কোনও বিদেশীয়-জাতি ভারতের হিতার্থে স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিতে প্রস্তুত হন, তবে সে অযাচিত-দান তাঁহাদেরই মহত্বের পরিচয়, ভারত জগতের কাছে সহানুভূতি চায় না।" বিবেকানন্দ ভারতীয়-ভাবের সমষ্টি ছিলেন। বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মগধ, দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ কর্ণাট, রাজপুতনা, মহারাষ্ট্র যে প্রদেশে যখন তিনি যাইতেন, সে প্রদেশবাসীরা তাঁহাকে সেই প্রদেশবাসী বলিয়া ভ্রমে করিত। যদি ভারতের সকল বিভাগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব ও সংস্কার এক শরীরে একত্রিত করিয়া সঞ্জীবন-মন্ত্র-বলে জীবিত করা যায়, তবে বোধ হয় বিবেকানন্দের প্রতিরূপ পাওয়া যায়।" সকল প্রদেশের সর্ব্ববিধ সংস্কার বা ধারণার প্রতি তাঁহার সমান সহানুভূতি ছিল। বঙ্গীয়ভাবের সঙ্কীর্ণতা তাঁহার সার্ব্বভৌমতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে নাই। স্বার্থ ত্যাগের আদর্শস্তরে তিনি উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বলিতেন "ত্যাগই সার্ব্বজনীন-উন্নতির উপায়। বুদ্ধদেবের ত্যাগ শিক্ষায় সহস্রাধিকবর্ষ মধ্যে সমগ্র ভারত এক বিশাল-সাম্রাজ্যে পরিণত হইতে পারিয়াছিল। ত্যাগ সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। আশা-কশাঘাতে কামনার চঞ্চল-অঞ্চল ধরিয়া ছুটাছুটি করিয়া কেহ কখনও শান্তির অধিকারী হইতে পারে নাই। ত্যাগই শান্তি, ত্যাগই বিশ্রাম।" এই সত্য এই মহাত্মার জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছিল। যশের আশা তাঁহার সম্মুখে যাইতেও লজ্জিত হইত। তিনি আত্ম-প্রশংসারূপ পঙ্ক স্পর্শ হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ছিলেন। অন্যান্য গুরুভাইদের অপেক্ষা তাঁহার শক্তি সামর্থ যে বিন্দুমাত্র ও বেশী ছিল, একথা স্বপ্নেও তাঁহার মুখে কেহ শুনিতে পায় নাই। তিনি পরমহংসদেবের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। গুরুর শিক্ষা দীক্ষায় লক্ষ্য স্থাপন করিয়া তিনিও পবিত্র জীবনোপভোগ করিয়া গিয়াছেন। শিষ্য-মণ্ডলীর নিকট সময় সময় বলিতেন 'কামিনী

কাঞ্চনের প্রবঞ্চনা এড়াইয়া যশের আশা-শূন্য হইয়া যেন কেবলমাত্র কর্ত্তব্যের পথে পদচারণ করিয়া মরিতে পারি।” যে সময় তিনি জগতীতলে অবতীর্ণ হন, সে দিন ভারতের বড় দুর্দ্দিন। ভারতের হতভাগ্য-সন্তানগণ যে দিন সঞ্চিত অমূল্য পৈতৃক-ধনে অতুল বেদ বেদান্ত-জ্ঞানে বঞ্চিত হইয়া পথভ্রমে বিড়ম্বনার বিলাস-বনে উপনীত হইতে ছিলেন, সেই সময় বিবেকানন্দ প্রাচীন পবিত্র আদর্শ আনিয়া তাহাদিগকে প্রদান করিলেন, ভারতের জাতীয়-জীবন তখন খণ্ডশঃ বিভক্ত হইতে ছিল দেখিয়াও তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়েন নাই। ধৈর্য্য, ত্যাগ, কর্ত্তব্য পরতার উচ্চ আদর্শ তাঁহার অন্তঃকরণে নিহিত ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের শিষ্য এবং তাঁহার উপদেশ পরিচালিত কর্ম্মবীর বিবেকানন্দ বঙ্গের আর এক অতুল-গৌরব-প্রদীপ্ত-প্রতিভার অনুকারী ছিলেন আমরা স্বর্গীয় গুণসাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা বলিতেছি। বিদ্যাসাগর মহাশয় ছোট-লাট মহোদয় কর্ত্তৃক আহূত হইয়াও সেই স্বভাবসিদ্ধ স্বদেশীয়-বেশ সামান্য ধুতি চাদর পরিধান করিয়াই গমন করিতেন। তাহাতে কদাচিৎ অসুবিধার কারণ হইলে বলিয়াছিলেন “আমাকে ডাকিলে আমি এই ভাবেই আসিব, এভাবে অসুবিধাবোধ হইলে আমাকে ডাকা কেন?” বিবেকানন্দ ও পাশ্চাত্য-দেশের সুসভ্য সুবেশকুলের নিকট নিজের গৈরিক-বসনে অঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া কোনও সময় ঐ প্রকার প্রত্যুত্তর দিবার অবকাশ পাইয়া-ছিলেন। তাঁহার পাশ্চাত্য-দেশীয় শিষ্য সমূহের মধ্যে ভারতীয় ভাব প্রচলনে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন, তিনি বলিতেন “যদি তোমরা ভারতকে ভাল বাসিতে চাও, ভারত যেমন আছে, তাহাকে তেমনি রাখিয়া ভালবাসিতে হইবে। ভারতকে হ্যাট কোট পরাইয়া কাঁটা চামচ ধরাইয়া টুল টেবিলে বসাইয়া বিদেশীয়-বেশে বিদেশীয়-ব্যবহারে বিকৃত সাজাইয়া ভালবাসিতে চাও, তবে তোমরা প্রকৃত পক্ষে ভারতকে ভালবাসিতে চাওনা।” তাঁহার বিদেশীয় ভক্তগণ শক্তিমতে ভারতের আচার ব্যবহার প্রথা পদ্ধতি অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, ইহা তাঁহার উপদেশের অতুল সম্মান। ভারতের অনুন্নত সাধারণের উন্নয়ন বিবেকানন্দের জীবনের মহাব্রত ছিল। তাঁহার সর্ব্বতো-মুখী হিতৈষণাসংকল্পই তাঁহাকে ঐরূপ মহদুদ্দেশ্যের সন্নিহিত করিয়াছিল। তাঁহার এবং তাঁহার সহকারী সতীর্থ সম্প্রদায়ের সমবেত সঙ্ঘের ফল শ্রীরামকৃষ্ণমিশন ঐ উদ্দেশ্যেই কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। বিবেকানন্দ যে সমদর্শিতার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, ইহার একটী প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ না করিয়া পারিলাম না। একদা আমেরিকার কোনও প্রখ্যাতনামা ধনীর ভবনে বিবেকানন্দ অতিথি হয়েন, ভারতের নয়নে বিবেকানন্দের প্রতিভাপূর্ণ-মুখমণ্ডল সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক হইলে ও আমেরিকা সেই ধনি-সন্তানের নিকট তিনি নিগ্রোরূপে বিবেচিত হন। নিগ্রোকে অতিথিরূপে গ্রহণ করিতে সভ্যতা ও আভিজাত্যাভি-

মানী ধনিসুত সঙ্কুচিত হইলেন। নিগ্রো-ভ্রমে বিবেকানন্দের আতিথ্য প্রত্যাখ্যাত হইল। তিনি যথেচ্ছ যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দিন পরে ঐ ব্যক্তি বিবেকানন্দের গুণগরিমায় মুগ্ধ হইয়া সযত্নে তাঁহাকে স্বগৃহে লইয়া যান, এবং জিজ্ঞাসা করেন, "মহাশয় আমি যখন ভ্রমক্রমে আপনাকে নিগ্রো বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম, তখন আপনি কেন বলিলেন না যে, আমি নিগ্রো নহি।" বিবেকানন্দের সরস সুহাস সুপ্রকাশ বদনে ধ্বনিত হইল "ঐরূপ বলিলে যে আমার নিগ্রোভ্রাতাকে অস্বীকার করা হয়না। পাঠক মহোদয়! আমি নিগ্রো নহি বলিলে সর্ব্বজন ভ্রাতৃভাব সর্ব্বত্র আসিদ্ধের সুপসার ও সঙ্কীর্ণ হয়, নিগ্রোভ্রাতার ভ্রাতৃত্ব অস্বীকার করা হয়না ইহাই বিবেকানন্দের অভিপ্রায়। নিগ্রোকেও যদি ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন না করা যায়, তবে সাম্য বৈষম্যে পরিণত হয়, ইহাতে মহাপুরুষ প্রকৃতই ব্যথিত হইতেন। ইহাপেক্ষা সার্ব্বজনীন সমদর্শনের দৃষ্টান্ত আর সুলভে মিলিবে কি? বিবেকানন্দের মুখে সর্ব্বদা বিষ্ণু, শিব, হরি, কালী, নারায়ণ মধুসূদন ইত্যাদি দেবনাম এবং শঙ্কর বুদ্ধ নানক গুরুগোবিন্দ ইত্যাদি ধর্ম্মাচার্য্যগণের নাম শুনা যাইত। বিবেকানন্দ ভারতের সর্ব্ব প্রদেশের সর্ব্ববিধ আচার ব্যবহারই বেশ স্নেহের চক্ষে দর্শন করিতেন এবং প্রত্যেকটীরই সম্মান করিতেন। হিন্দুশাস্ত্র তাঁহার নিকট অতি উচ্চ পূজা পাইত। একদা কোনও সাহেব তাঁহার নিকট হিন্দুর পুরাণ প্রসঙ্গের নিন্দা করেন, প্রত্যুত্তরে বিবেকানন্দ বাইবেলের বহুল গলদ উল্লেখ করিয়া তাঁহার বিষদন্ত বেশ সুকৌশলে ব্যথিত করেন। পক্ষান্তরে বেদ এবং উপনিষদের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বলেন যে, যদি সহস্র সহস্র বৎসর দোষানুসন্ধান ও অনুশীলন করা যায়, তাহা হইলেও এই মূল্যবান্ বিশ্বাসের বিন্দুমাত্র স্থান চ্যুত হইবে না যে, বেদ উপনিষদের সহিত বাইবেলের তুলনাই হইতে পারে না। বেদ উপনিষদের উচ্চভাব ধারণা করিতে পারিলে বাইবেলের উপর বুদ্ধিমান ব্যক্তি সহজেই বীতশ্রদ্ধ হইতে বাধ্য হইবেন। পুরাণের পবিত্রতা এবং মৌলিকতাসম্বন্ধেও তিনি অশেষবিধ আবশ্যকীয় উপদেশদ্বারা সাহেবের গর্ব্বজাত বর্ব্বরতার সর্ব্বনাশসাধন করিয়াছিলেন। সংস্কৃতকে দেববাণী বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন। সংস্কৃতের আলোচনায় অধ্যাপনায় তাঁহার এতাদৃশ অনুরাগ ছিল যে, চরম দিনেও তিনি ৩ ঘণ্টা পাণিনীয় ব্যাকরণের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। মহাপুরুষ চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু অতীতের সাক্ষ্যদিতে জগতের বিশালকুক্ষিতে তাঁহার অতুল কার্য্যাবলী সংরক্ষিত রহিয়াছে। তিনি জীবনে স্বাধীন শান্ত পবিত্র ছিলেন, মরণেও সেইভাবে দেদীপ্যমান! ভারত-সন্তান! তোমার অগ্রগামী উন্নতিকামী বিবেকানন্দ তোমাকে যাহা দিয়া গেলেন, তুমি কি তাহার সদ্ব্যবহার করিবে না? তুমি কি গুণের আদর, জ্ঞানের মর্ম্ম, ধর্ম্মের মহিমা, কর্ম্মের গরিমা বুঝিবে না? তুমি স্বর্গাত-বিবেকানন্দের পূত-দেহের পবিত্র-ভস্ম - বিভূতিরাগে

ললাটে লেপন কর, আর তাঁহার পরিত্যক্ত গৈরিকবসনে জাতীয় নিশান নির্ম্মাণ করিয়া সাদরে জীবন-যুদ্ধে অগ্রসর হও। আলস্য ঔদাস্য করিলে বুঝিব, তুমি বিবেকানন্দের সহোদর হইবার অযোগ্য এবং অজ্ঞ। বিবেকানন্দের প্রতি সমাজ-সাধারণের স্নেহ বা সহানুভূতি সমান ছিল না, থাকিতেও পারে না। গীতাপ্রবর্ত্তক জগন্নাথ কৃষ্ণচন্দ্রের আলোক সকলের হৃদয়ে সমান প্রতিবিম্বিত হয় নাই। শঙ্করাবতার শঙ্করদেবের চারুচরিত্রচিত্র সকলের নিকট সমানরূপে গৃহীত হয় নাই, ইহাই জগতের সনাতন নিয়ম। মহাযোগী মহেশ্বরকেও কেহ পিশাচ, কেহ পাগল, কেহ লম্পট, কেহ কপট, কেহ বা সত্যশিবসুন্দর বলিয়া আসিতেছে। ভাবিয়া দেখিলে, পাগলামীতে ও শিবত্বে বেশ সুন্দর স্বাভাবিক-সামঞ্জস্য আছে। যুগপ্রবর্ত্তক মহাত্মা বিবেকানন্দের সম্বন্ধেও আমরা সেরূপ সামঞ্জস্যের অসদ্ভাব দেখি না। নিন্দুকের নির্দ্দয়-আক্রমণ, সহৃদয়ের সহজ সহানুভূতি, শুভাকাঙ্ক্ষীর অশেষ শুভ-শংসন কিছুতেই তাঁহার স্বরূপের বিরূপতা ঘটিবেনা। বিবেকানন্দের অসাধারণত্ব ধারণা করিতে পারিলে এবং অলৌকিক কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিলে, কেহই বোধ হয় তাঁহার প্রতি প্রবলতর পক্ষপাত-পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। প্রথমতঃ—বিবেকানন্দ সম্ভ্রান্ত বংশীয়, সঙ্গীত-বিদ্যায় সুশিক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধিধারী ব্যক্তি ছিলেন। যে যৌবনে কদর্য্যবাসনার জীবমাত্রকেই কদর্থিত করে, সেই নব যৌবনের ললিত লাবণ্য শারদীয় জ্যোৎস্নার ন্যায় যাঁহার সকল শরীরে তরঙ্গায়িত, যৌবনোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অশেষ বিলাস-পিপাসা ক্রমশঃ পরিপুষ্টি প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে; বিদ্যা, বয়স, রূপ, যাঁহার নিকট সম্মিলিত হইয়াছে, কামিনী-কাঞ্চন-যশঃ যাঁহার করতলগত, সেই যুবক ভোগসঙ্গ-রঙ্গ দূরে নিঃক্ষেপ করিয়া, খ্যাতি প্রতিপত্তি-প্রত্যাশা বিদায় দিয়া, সন্ন্যাসাবলম্বন করিলেন, ইহা কি অসাধারণতা নহে? এ সন্ন্যাস, কদর্য্য স্বার্থবশে নহে, কুকার্য্য-গোপনমানসে নহে, তাড়নায় বিড়ম্বনায় নহে, জরাজীর্ণ-দেহে নহে, কর্ত্তব্যজ্ঞানে—ধর্ম্মপ্রাণতায়; ইহাও কি উন্নত আদর্শ নহে? দ্বিতীয়তঃ--বাল্যাবধি স্নেহের ক্রোড়ে লালিত, এমন কি পথ-কষ্ট পর্য্যন্তও অনুভব না করিয়া, সন্ন্যাসের পর হিমাচলের গুহা-মন্দিরে, বিশাল প্রান্তরে, মরুভূমির অভ্যন্তরে নিঃসম্বল অবস্থান এবং পাদচারে সমগ্র-ভারত পর্য্যটন ও এই ভ্রমণ সময়ে ভারতের সর্ব্ব প্রদেশের আচার ব্যবহার, ধর্ম্মের মৌলিকতা অনুসন্ধান, সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র-পাণিনীয় ব্যাকরণ এবং বেদ-বেদান্তাদিশাস্ত্রের অধ্যয়ন, এ সকল কি কিছুই অসাধারণতার পরিচয় নয়? তৃতীয়তঃ—চিকাগোর ধর্ম্ম-মহামেলায় সমস্ত দেশের সকল ধর্ম্মপ্রতিনিধির সমাগম সত্বেও, যে ভারত জড়োপাসকজ্ঞানে অবজ্ঞাত হইয়াছিল এবং আহূতও হয় নাই, সেই ভারতের কৃষ্ণকায় অজ্ঞাতনামা অশ্রুতকীর্ত্তি গৈরিকধারী যুবক সন্ন্যাসী, চিকাগো-মেলায় প্রাণপণ-পরিশ্রমপ্রাপ্ত দশ মিনিট বক্তৃতাবসরে

জগৎ বিচলিত করিতে পারিয়াছিলেন! যেন কোনও মহাসত্তা তাঁহাকে বৃহস্পতির ন্যায় বিদ্যাবুদ্ধি এবং সহস্র-বদনের কথন-শক্তি এক মুখে প্রদান করিয়াছিলেন! কেবল যে সে বক্তৃতা চপলা-চমকের মত একবার বিস্ময় উৎপাদন করিয়া চলিয়া গেল, তাহা নহে, এখনও তাহা সমগ্র সভ্য-জগতে পূজিত হইতেছে! ইঁহাকে কি মহাপুরুষ বলিব না? "বিগতগর্ব্ব হীনসর্ব্বস্ব দুর্ব্বল ভারত কেবল এক ধর্ম্মবলেই জগতে অতুলনীয় জগতের গুরু;" নব্যসভ্যতার শীর্ষস্থানীয় মার্কিণে জগতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণকে যে ব্যক্তি ইহা দেখাইয়া দিলেন, তিনি কি শ্রদ্ধার অযোগ্যপাত্র? চিকাগো-মেলার ভারতীয় মুটে মজুর মিঠাইওয়ালাও যাঁহার তেজস্বিতায়, আমেরিকার অভিজাত গণ্য মান্যগণের নিকট আদর ও একত্র ভোজনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তিনি কি স্বদেশবৎসল মহাত্মা নহেন? সভ্যতাভিমানী মার্কিণজন যাঁহার মাহাত্ম্যে উচ্চাসন ত্যাগ করিয়া ভূমিতে বসিয়া, হস্তদ্বারা, ভারতীয় প্রণালীতে প্রস্তুত নিরামিষ-ভোজ্য গ্রহণ করিয়া, ভারতের শিষ্যত্ব প্রচার করিতেছে, সেই মহাত্মা কি অসাধারণ নহেন? প্রার্থনা করিতে যিনি জানিতেন না, তাঁহার চরিত্রও কি জাতীয়-আদর্শরূপে গৃহীত হইবার অযোগ্য? ভারতের হিতকর্ম্মে, ভারত জগতে গণ্য হউক, এই আশা লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, যে মহাত্মা উহা অনেকাংশে সুসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, এবং যাঁহার কালিফর্ণিয়ার বেদান্ত-মঠে সহকারি সন্ন্যাসিগণ এখনও ভারত আমেরিকার ধর্ম্মগুরু হইবার যোগ্য, এই সত্য প্রত্যক্ষরূপে প্রমাণিত করিতেছেন, তিনি কি ভারতের প্রত্যেকের মাননীয় নহেন? ভাবিলে মনে হয়—'যেন বিবেকানন্দের জীবনই ভারতের ভবিষ্যবেদ!" বিবেকানন্দ কর্ম্মবীর ছিলেন; কর্ম্মেই তাঁহার পর্য্যবসান, ফলের ভার ভগবানের হাতে। আমরা অভাবের অভাবনীয়-পীড়নে দণ্ডিত হইয়া সন্তপ্ত-প্রাণে ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করি, যেন বিবেকানন্দের পবিত্র আত্মা পরম শান্তি-সরোবরের রাজহংসরূপে বিরাজ করিতে পারেন। ওঁ শান্তিঃ॥

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ভারতী।

অন্নপূর্ণা-স্তোত্রম্।

(মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখাল দাস ন্যায়রত্ন-বিরচিতম্)

(১)

ত্বৎপাদকিঙ্করসমোঽস্ত্যমরোঽপি নিত্যং
যৎ সর্ব্বশংকৃতিগুণৈ ত্বয়ি শঙ্করীত্বম্।
কৃত্বা কৃপাময়ি কৃপাং জগতাং শরণ্যে
পূর্ণং কুরুষ্ব মম বাঞ্ছিতমন্নপূর্ণে॥

জীবের মঙ্গল কর সকল সময়,
তাই মা! শঙ্করী-নামে তব পরিচয়!
একারণ ত্রিসংসারে যত দেবগণ
তোমার শ্রীপদে নিত্য ভৃত্যের মতন।
তুমি কৃপাময়ী, তুমি ত্রিলোক-শরণ,
তাই ওমা অন্নপূর্ণে! এই নিবেদন,—

কৃপা করি এ দাসের মনের বাসনা
পূর্ণ করি দাও তুমি, ইহাই প্রার্থনা!

(২)

সৃষ্ট্যাদিকালসমবস্থতয়া ত্বমাদ্যা
ত্বাং মাতরং জগুরতোঽপি পিতামহাদ্যাঃ।
কৃত্বা কৃপাময়ি কৃপাং জগতাং শরণ্যে
পূর্ণং কুরুষ্ব মম বাঞ্ছিতমন্নপূর্ণে॥

কিবা সৃষ্টি স্থিতি, কিবা প্রলয়ের কালে
সমভাবে থাক তুমি এই ভূমণ্ডলে।
তাই মা গো! বিধি-বিষ্ণু-আদি দেবগণ
"মা" বলিয়া তোমাকেই করে সম্বোধন।
তুমি কৃপাময়ী, তুমি ত্রিলোক-শরণ
তাই ওমা অন্নপূর্ণে! এই নিবেদন,—
কৃপা করি এ দাসের মনের বাসনা—
পূর্ণ করি দাও তুমি, ইহাই প্রার্থনা!

(৩)

ঈশোঽপি যৎ তব করাম্বুজভোজনার্থী
ব্যক্তির্ন তৎ ত্বদপরা কচিদন্নদাত্রী।
কৃত্বা কৃপাময়ি কৃপাং জগতাং শরণ্যে
পূর্ণং কুরুষ্ব মম বাঞ্ছিতমন্নপূর্ণে॥

জীবের জীবন রক্ষা করিবার তরে
তোমা বিনা অন্নদাত্রী কে আছে সংসারে?
তুমি নিজ হস্তে দিলে আহার তুলিয়া
তবেই শিবের তৃপ্তি আহার করিয়া!
তুমি কৃপাময়ী, তুমি ত্রিলোক-শরণ
তাই ওমা অন্নপূর্ণে! এই নিবেদন,—
কৃপা করি এ দাসের মনের বাসনা
পূর্ণ করি দাও তুমি, ইহাই প্রার্থনা!

(৪)

কৈলাসমুজ্ঝিতবতী বসসীহ নিত্যং
দীনেষু যৎ তব সদৈব দয়ার্দ্রচিত্তম্।
কৃত্বা কৃপাময়ি কৃপাং জগতাং শরণ্যে
পূর্ণং কুরুষ্ব মম বাঞ্ছিতমন্নপূর্ণে॥

এ সংসারে যেই জন দীন-হীন অতি।
তোমার পরম কৃপা সদা তার প্রতি।
এ কারণ তুমি মা গো! ছাড়িয়া কৈলাস
পুণ্যময় কাশীধামে থাক বার মাস!
তুমি কৃপাময়ী, তুমি ত্রিলোক-শরণ,
তাই ওমা অন্নপূর্ণে! এই নিবেদন,—
কৃপা করি এ দাসের মনের বাসনা
পূর্ণ করি দাও তুমি, ইহাই প্রার্থনা!

(৫)

আকীটমাশিবমশেষজনেষু শক্তি—
র্যাদৌ ত্বমেব তব এব সদা সভক্তি।
আরাধয়ন্ত্যপি সুরা জগতাং শরণ্যে
পূর্ণং কুরুষ্ব মম বাঞ্ছিতমন্নপূর্ণে॥

কীট হ'তে মহেশ্বর পর্য্যন্ত সকলে
তোমারি শক্তিতে শক্তি ধরে ভূমণ্ডলে!
তাই মা গো! ভক্তি ভরে দেবতা সকল
আরাধনা করে তব চরণ-কমল!
ওমা অন্নপূর্ণে! তুমি ত্রিলোক-শরণ,
এ দাসের মনোবাঞ্ছা কর মা পূরণ!

(৬)

ইচ্ছামি নাপরপদং ন চ কল্পবৃক্ষং
সংকাময়ে জননি তাবকপাদযুগ্মম্।
নিঃশ্রেয়সান্তকফলানি চতুর্ব্বিধানি
শ্রীপাদপাদপগতস্য ন দুর্লভানি॥

কিবা অন্য পদ, কিবা কল্পতরু আর,
কিছুই না চাই মা গো! কভু একবার।
একমাত্র সেই তব চরণ-কমল,
আমার আরাধ্য বস্তু, জানি অবিরল।
তোমার শ্রীপাদ-তরু-তলে যেই জন

আশ্রয় লইয়া মা গো! রহে সর্ব্বক্ষণ,
অতি ভাগ্যবান্ ভবে সে জন কেবল,
মুষ্টির ভিতর তার চতুর্ব্বর্গ-ফল।

(৭)

হে মাতরস্তকৃদিতান্যখিলস্য যানি
সর্ব্বাণি সন্তি চ ভবদ্বিদিতানি তানি।
অভ্যাসদোষবশগেন কৃতার্থনায়াং
বাচালতৈতদপরাধমুমে ক্ষমস্ব॥

হৃদয়ের ব্যথা যত হৃদয়ে রাখিয়া
ক্রন্দন করুক জীব গোপন করিয়া,
তোমার নিকট কিছু নহে অগোচর,
সকলি জানিছ মা গো! তুমি নিরন্তর।
যা কিছু বাচালতা-ভাবে করিনু প্রার্থনা,
সেই বাচালতা-দোষ কর মা মার্জ্জনা!

(৮)

গায়ন্তি কেচন জনা গিরিরাজপুত্রীং
দক্ষোদ্ভবাঞ্চ ভবতীং ভবদুঃখহন্ত্রীম্।
রাখালদাস ইদমেব চ বেত্তি তত্ত্বং
মাতা ত্বমেব জগতাং জগদীশ্বরী ত্বম্।

একমাত্র তুমি ভব-দুঃখ-বিনাশিনী,
কত লোক কত কথা কিন্তু বলে শুনি,—
কেহ বলে তুমি মাগো! হিমালয় সুতা,
কেহ বলে তুমি মাগো! দক্ষের দুহিতা।
অজ্ঞান রাখাল-দাস সন্তান তোমার,
মনে বুঝিয়াছে কিন্তু এই কথা সার,—
তুমিই ত্রিলোক-মাতা, ত্রিলোক-ঈশ্বরী,
এ তত্ত্ব পরম সত্য চিরদিন ধরি!

(৯)

চক্রুশ্চ যে বহুষু জন্মসু যোগযুক্তা
ভক্ত্যা চ ভুক্তিরহিতা স্তব সাধনানি।
হে সর্ব্বশক্তিময়ি! বালা মনোজ্ঞমূর্ত্তিং
ধৃত্বা স্বয়ং সমকরোস্তদভীষ্টপূর্ত্তিম্॥

ত্রিলোক ঈশ্বরী তুমি ত্রিলোকের মাতা,
তোঁরে না সম্ভবে মাগো! গর্ভবাস-ব্যথা!
ভোগসুখ বিসর্জ্জিয়া বহু জন্ম ধ'রে
যেবা কন্যারূপে পেতে আরাধনা করে,
মধুর-মনোজ্ঞ-রূপে বালিকা সাজিয়া
ভোলাও তাহার মন "মা" ব'লে ডাকিয়া।
পুরাও ভক্তের মনে অভিলাষ যেবা,
সর্ব্বশক্তিময়ি! তোর অসম্ভব কিবা?

(১০)

হে সর্ব্বগে শতসমাঃ সততং তপোভি—
র্যা নির্ম্মলত্বমগমৎ ত্বয়ি সানুরাগা।
তদ্গর্ভদর্পণ নিজ প্রতিবিম্ব মাত্রং
সন্দর্শ্য মাতরখিলস্য কৃতার্থিতা সা॥

শত শত জন্ম ধ'রে আরাধি সতত
চির তরে মলিনতা যার অপগত,
তুমি তার গর্ভ-রূপ-দর্পণ মাঝারে
নিজ প্রতিবিম্ব দিয়া ধন্য কর তারে।
হে সর্ব্বগে! সর্ব্বভূতে বিহার তোমার,
গর্ভে নেহারিলে তোরে কি বৈচিত্র্য তার?

(১১)

মঞ্চে বিরিঞ্চিমুখদেববরাঃ শিরঃস্থে
ধৃত্বার্দ্ধমুদ্রিতদৃশস্তব সাধনানি।
কুর্ব্বন্ত কিন্তু গতিহীনসুতে জনন্যা
নিত্যং কৃপাস্থিতিরিতি প্রণতিং গৃহাণ॥

বিধি বিষ্ণু মহেশ্বর মস্তক উপরি
ধরি তব সিংহাসন রাজরাজেশ্বরি!
অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে করেন সাধন,
আমি কিন্তু মূঢ়মতি, অতি অভাজন।

তা ব'লে নিগ্রহ যেন না হয় তোমার,
গতিহীন সুতে সদা করুণা মাতার!
দাসের প্রণতি মাগো! করহ গ্রহণ,
শ্রীচরণে এই ভিক্ষা মাগে অকিঞ্চন!

(১২)

ত্বত্তা সমাধিসুরথাচরিতং ভবত্যাঃ
শ্রীপাদপঙ্কজযুগং ত্রিজগৎসুসারম্।
নিশ্চিত্য মাতরধুনা শরণাগতোঽস্মি
ত্বৎকিঙ্করস্য তু কুরুষ তবোচিতং যৎ॥

সমাধি সুরথ আদি যত ভক্ত জন,
সে সবার ইতিহাস করে আলোচন,
জননি গো! এই জ্ঞান হ'য়েছে আমার
শ্রীপাদ-পঙ্কজ তব জগতের সার।
সেই পাদ-পদ্ম তব করেছি শরণ,
যাহা ইচ্ছা হয়, তুমি কর মা! এখন।

(১৩)

ত্বমেব বিশ্বজননি ত্রিজগৎ প্রভুত্বং
ভৃত্যা বয়ন্তু ভবদঙ্ঘ্রিযুগস্য নিত্যম্।
ইত্থং চিরাবগতি খণ্ডনপণ্ডিতানাং
নাদ্বৈতবাদগহনং বয়মাশ্রয়ামঃ॥

ত্রিলোক-জননি তুমি ত্রিলোক-ঈশ্বরী—
আর সবে তব পদে কিঙ্কর কিঙ্করী।
ইহা ভিন্ন আর কিছু নাহি জানে দাস,
জন্মে জন্মে থাক্ এই পবিত্র-বিশ্বাস।
"সবাই পরম ব্রহ্ম" এ পাপ কথন
"অদ্বৈত বচনে" ঘোষে যে পণ্ডিত জন,
তাদের সে তর্ক-রূপ-গহন ভিতরে
যেন মা! জীবাত্মা মোর কভু না বিচরে!

(১৪)

চিরং ধ্যাত্বা ধাত্রাদিকতনুমংশৈরবয়বৈ—
র্ভক্তে কল্যাণং তব তু করুণৈবাস্তুতকরী।
স্বদঙ্গানাং পীঠস্থলগকিয়দংশার্চ্চনবশা—
দসীমং ক্ষেমং স্যাৎ সকলমনুজে দক্ষ-
তনুজে॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যেবা আছে আর,
পরম কঠিন মা গো! সেবা সে সবার।
মনে মনে সর্ব্ব অঙ্গ করিয়া গঠন,
সুন্দর সাজায়ে তাঁরে শাস্ত্রের মতন,
বহুকাল সেইরূপ করে যদি ধ্যান,
তবে ত পাইবে লোক অশেষ কল্যাণ
কিন্তু কি কল্যাণময়ী তুমি ওগো উমা,
বিচিত্র নেহারি ভবে তোমার মহিমা!
পুণ্যময় কত শত শত পীঠস্থানে
মা! তোর অঙ্গুলি নখ যা আছে যেখানে,
সেই ক্ষুদ্র অঙ্গ মাত্র করিলে অর্চ্চন,
কি মঙ্গল নাহি লভে ভবে ভক্ত জন?

(১৫)

গীতো যঃ প্রথয়াঽক্ষপাদ ইতি যঃ খ্যাতঃ
কণাদাখ্যয়া
যুঞ্জানেন চ তদ্দ্বয়েন মুনিনা জীবাত্মনাং
ব্রহ্মণা।
পার্থক্যং প্রতিপাদিতং স্ববচনৈর্বেদাবিরু-
দ্ধার্থকৈ—
র্মাতস্ত্বৎপদদাসতা ময়ি ততঃ সিদ্ধেতি
তৃপ্তং মনঃ॥

মহাযোগী,—যোগবলে এই ত্রিভুবন
তন্ন তন্ন করি যাঁরা করিত দর্শন,
বেদের বিরুদ্ধ বাণী মুখে না আনিত,
নাহি ছিল ভ্রান্তি, নাহি লোকে প্রতারিত,
সে সর্ব্বজ্ঞ অক্ষপাদ, সর্ব্বজ্ঞ কণাদ,
ঘুচায়ে দিয়াছে মা গো! দাসের বিষাদ,

দার্শনিক-ঋষি-বাক্যে বুঝেছি মা! বেদ,
জীবাত্মা পরাত্মা দোঁহে আছয়ে প্রভেদ।
করুক যতই তর্ক তর্কপটু জন;
প্রভু ভৃত্য এক বস্তু হয় মা কখন্?

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি, এ,
২৬। ২ বৃন্দাবন পালের লেন।
শ্যামবাজার। কলিকাতা।

এস মা!

(দুর্গোৎসবে—"আগমনী")

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥"

বর্ষা-বারি-স্নাত শরৎ আগত,
সাজায়ে কুসুম সাজীতে।
ওমা দুর্গে! তব শ্রীপদ-পল্লব
মনসাধে পুন পূজিতে।

তবে—

এস দুর্গে! এস, শ্রীমণ্ডপে বস,
"দশভুজা" রূপ ধরি।
আজি বর্ষ-পরে, সাজি হর্ষভরে,
ও রূপ দর্শন করি।
দশ হস্তে কিবা দশ অস্ত্র-বিভা!
ঝলমল দশদিশি!
বাণী বামপাশে, দক্ষিণে শ্রী হাসে;
ধনে জ্ঞানে মিশামিশি!
গুহ-গজানন দুদিকে দুজন,
সিদ্ধি ও শূরত্ব সাজে।
বল-নিদর্শন শ্রীপদ-বাহন
চতুষ্পদরাজ রাজে।
অসুর সুশাক্ত, শত্রুরূপী ভক্ত,
শক্তি-শেল সহে বুকে;
দেবী-পদস্পর্শে হিয়া হাসে হর্ষে,
বাহিরে ভ্রূকুটি মুখে।
অপরূপ রূপে— দশভুজা-রূপে
সর্ব্বরূপ সুবিকীর্ণ।
সেবিতে সে রূপ, ভাবে ভব-ভূপ
সিংহরূপে অবতীর্ণ!
মতান্তরে বলে, শক্তি-পদতলে
মহাবিষ্ণু হন হরি;
বিচিত্র কি তা'তে? পঞ্চ-ঈশ-মাথে
রাজে রাজরাজেশ্বরী!
পুরুষে প্রকৃতি গুণ-ক্রিয়াবতী,
পুরুষ অগুণাক্রিয়;
অতএব হন পুরুষ পরম
শক্তির বাহন স্বীয়।
ষড়্দরশন— শুভসম্মিলন
দশভুজা-রূপে হয়,—
শ্রুতি-স্মৃতি-বিধি, তন্ত্র-পুরাণাদি—
সর্ব্বশাস্ত্র-সমন্বয়!
সর্ব্বতত্ত্ব-সার রূপে মা তোমার,
সর্ব্ব-দৃষ্টি সমাকৃষ্ট।
সর্ব্বানন্দময়, সর্ব্বশুভোদয়,
সর্ব্বসিদ্ধি সমাবিষ্ট!

কিবা!

বাণী-বীণা-তানে শুভ বেদ-গানে,
বিমোহিত বিশ্বসৃষ্টি!

সুসম্পদরাশি বৃষ্টি করে হাসি
কমলার-কৃপাবৃষ্টি!
সিদ্ধিদাতা সিদ্ধি, শুহ গোত্র-বৃদ্ধি-
বিধান-নিদান হন।
আপনি শঙ্কর সর্ব্বশুভঙ্কর,
স্বরূপে অরূপে র'ন!
এ রূপ সেবনে ভজনে স্তবনে,
সর্ব্বদেব সুকৃতার্থ।
গন্ধর্ব্ব-কিন্নর, যক্ষ-বিদ্যাধর,
নাগ নর চরিতার্থ!
হেন আয়োজন, লীলা-প্রয়োজনে,
এস লীলাময়ী মাগো!
নিদ্রাভঙ্গে রঙ্গে, সাঙ্গোপাঙ্গ-সঙ্গে
বঙ্গের বোধনে জাগো।
হেন আয়োজনে, ভক্তি-নিমন্ত্রণে,
মহাশক্তি! এস তবে।
ভক্ত একজন মর্ত্ত্যে যদি র'ন,
তবু মা! আসিতে হবে।
মোরা কুসন্তান, নাই ভক্তি-জ্ঞান;
তাই হেন শক্তিহীন।
শোকে দুঃখে রোগে, দুর্ভিক্ষে দুর্ভোগে,
ধ্বংসপুর-সম্মুখীন!
দুর্গোৎসব যার সর্ব্বোৎসব-সার,
তবু এ দুর্গতি তার!
ভক্তি-বহির্ম্মুখ ভজন-হুজুক
ভস্মে ঘৃতাহুতি সার।
তাই মা কাতরে, আজি বর্ষ-পরে,
যাচি পুন পদার্পণ।
চাবনা এবার শ্রীপদে তোমার,
ভক্তি ভিন্ন অন্য ধন।
দুঃখ-রোগ-শোক যত হয় হোক্,
পাই যদি ভক্তি-বিন্দু,
পুন সব হবে, সব দুঃখ যাবে,
উথলিবে সুখসিন্ধু।
এ সব উৎসব, পাবে প্রাণ নব,
শক্তি-ভক্তি-সমুদ্ভবে;
সংক্রান্ত পরে পুনঃ বঙ্গ-ঘরে
সত্য দুর্গোৎসব হবে!

ওমা!

হয়োনা কৃপণা সে অমৃত-কণা
দিতে মৃত সুতগণে।
কুপুত্রই হয়, কুমাতা ত নয়,
জানে মা! জগৎ-জনে।
কৃপা যদি কর, কি না দিতে পার?
নিজে যে মা! তুমি শক্তি।
স্বর্গ-মোক্ষ ছার! কৃপায় তোমার
লভে জীবে কৃষ্ণভক্তি।
তোমারি সাধনে, লভি কৃষ্ণধনে,
গোপী পিয়ে প্রেমামৃত।
তোমারেই ভজি, হরি-প্রেমে মজি,
হর হরি-সম্মিলিত!
সর্ব্বসিদ্ধি-শক্তি— পেতে তব ভক্তি,
যে প্রার্থনা প্রাণগতা,
অপূর্ণ কি রবে? তুমি যে মা! ভবে
ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পলতা!
এস গো মা! তবে এ মনোমণ্ডপে,
বস মা! করুণাভরে।
করিতে পূজন, কিছু আয়োজন
নাই মা! এ শূন্য ঘরে।
নাহি সাজ সজ্জা, নাহি তাহে লজ্জা;
সজ্জা পায় লজ্জা রূপে!
ও রূপ-কিরণে, নিষ্কপকরণে,
পদে দিব প্রাণ সঁপে।

এস মা! এবার সম্বল সেবার—
কেবল নয়ন-বারি;
কিছু নাই আর, এস মা! এবার—
জলে জলে পূজা সারি।
যে ছেলে আদরে যা দেয় মা তোরে,
তাই সে মা! তুই নিস্।
যা'ই মা যাহার আশার আহার,
তাই মা! তাহারে দিস্!

মাগো!

তাই আশাভরে, কাতরে মা তোরে
চাই দেখা দিন তিন।
এ ত্রিদিন স্মরি, কত কষ্টে হরি
তিনশ 'বাষট্টি দিন।
বিষাদ-বিকারে, থাকি অন্ধকারে,
'সারাটি বছর ভরে'।
ত্রিদিন পুলকে রহি মা আলোকে,
ও পদ-নখেন্দু-করে!
দুঃখে বক্ষ ফাটে, কত কষ্টে কাটে
উনদিনত্রয় বর্ষ।
তব শুভোদয়ে, এ সুদিনত্রয়ে,
ধরায় ধরেনা হর্ষ!

এবার আবার কি ভাগ্য অপার!
তিনদিনে চারিদিন!*
পেলাম প্রশ্রয়, বুঝি পদাশ্রয়
পাবে নিরাশ্রয় দীন।
তাই মা! আহ্বানি, উর হর-রাণি!
পূর অবনীর আশ।
এ সুখ-শরতে, এস মা ভারতে,
মরতের মহোল্লাস!
এস মা শঙ্করি! সর্ব্বশুভঙ্করি!
কিঙ্করে করুণা করি।
এস জগদম্বে! জগদবলম্বে!
অবিলম্বে অবতরি।
অকৃতী সন্তানে মাতৃস্নেহ দানে
মাতৃভক্তি দেহ শিক্ষা।
এস মা! অন্তরে, থেকনা অন্তরে,
অন্তরের এই ভিক্ষা॥

শ্রীশঃ—

* তিথিরহস্য-বশে এবার এই ১৩০৯ বঙ্গাব্দে, আশ্বিনের ২২শে, ২৩শে, ২৪শে, ও ২৫শে, এই চারিদিন দুর্গোৎসব। (হিং সঃ)

—:•:—

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজষ্টীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।

৯ম বর্ষ, ৯ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা।	কার্ত্তিক।	১৩০৯ সাল, ১৮২৪ শকাব্দা.

জাতিভেদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

(৩১) "মহাভারতেও জাতিভেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক সদ্বিচার দৃষ্ট হয়। শান্তি পর্ব্বের ১৮৮ম অধ্যায়ে লিখিত আছে—"রক্তবর্ণ দ্বিজেরা ভোগবিলাসী, তেজস্বী, ক্রোধী, হঠকারী, বৈদিক আচার-ভ্রষ্ট হইয়া অবশেষে ক্ষত্রিয় শ্রেণীভুক্ত হইল। লোহিত বর্ণ দ্বিজেরা গোচারণ ও কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ এবং বৈদিক আচার পরিত্যাগ করাতে বৈশ্য-শ্রেণীভুক্ত হইল। কৃষ্ণবর্ণ, অশুচি, মিথ্যাবাদী ও ক্রূরস্বভাব লোভী দ্বিজেরা নীচ উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত; তাহারা শূদ্র-শ্রেণীভুক্ত হইল। এইরূপে গুণানুসারে জাতিভেদ হওয়াতে, দ্বিজেরা নানা জাতিভুক্ত হইলেন। মহাভারতের সময়ে কয়েক জন পুরোহিত ও রাজন্য ভিন্ন অপর সকলেই এক বৈশ্য শ্রেণীভুক্ত ছিল। কায়স্থ, বৈদ্য, কুম্ভকার, স্বর্ণকার, তৈলিক, তাম্বুলি প্রভৃতি স্বতন্ত্র জাতি ছিলনা, এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ন্যায় বৈশ্যেরা সকলেই বেদপাঠ ও স্বহস্তে যজ্ঞাদি সম্পাদন এবং গৃহাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে পারিত। পুরোহিতদের বেদে একাধিপত্য এবং বৈশ্যদের নানা জাতিতে বিভাগ, এই সকল আধুনিক পৌরাণিক যুগের সৃষ্টি।"*

(৩২) 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (১। ১৬ এবং ২। ১৭) যে অব্রাহ্মণোক্ত ব্যক্তি (ব্রাহ্মণ নয়, এমন ব্যক্তি) যাজন করিতে পারিত, তাহার প্রমাণ আছে। উক্ত ব্রাহ্মণের অপর অংশে (৭। ২৯) দেখাযাইতেছে যে, জন্মে ব্রাহ্মণ না হইয়াও লোকে গুণবলে ব্রাহ্মণ-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিত। কোন যজ্ঞে ব্রাহ্মণের নির্দ্দিষ্ট ভাগ ক্ষত্রিয় ভোজন করিতে পাইলে, তাঁহার সন্তানেরা

* শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই।

ব্রাহ্মণ-গুণবিশিষ্ট হইয়া প্রতিগ্রাহসমর্থ, সোম-পিপাসু, ক্ষুধার্ত্ত, সর্ব্বত্রগামী হইতেন। দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষে তাঁহাদের সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণত্ব জন্মিত। কোন ক্ষত্রিয় যজ্ঞে বৈশ্যের অংশ ভোজন করিলে, তদ্বংশীয়েরা বৈশ্য গুণোপেত হইয়া জন্মিত, এবং রাজাকে কর প্রদান করিত, এবং তাহার দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষ বৈশ্য জাতির উপযুক্ত হইত। যদি যজ্ঞে ক্ষত্রিয় শূদ্রের অংশ গ্রহণ করিত, তবে তাহার সন্তানেরা শূদ্র-গুণোপেত হইয়া জন্মিত। তাহারা পরের সেবা করিত এবং প্রভুর ইচ্ছানুসারে তাড়িত ও প্রহারিত হইত। দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষে তাহারা শূদ্র-শ্রেণীর যোগ্য হইত।"*

(৩২) বিদেহরাজ রাজর্ষি জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রাহ্মণের অজ্ঞাত উপনিষদ্-তত্ত্ব শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য মহা আনন্দিত হইয়া রাজাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তাহাতে জনক কহিলেন "আমি যাহা অভিলাষ করিতেছি, আমাকে তাহা প্রদান করুন।" তদবধি জনক ব্রাহ্মণ হইলেন।†

(৩৪) ব্রাহ্মণকুলে না জন্মিয়াও অনেকে বিদ্যাবলে এবং যশঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। জনক তাহার একটী অন্যতম উদাহরণ। এরূপ উদাহরণের অভাব নাই। 'দ্যূতক্রীড়াসক্ত, দাসীপুত্র, অব্রাহ্মণ আমাদের মধ্যে আসিয়া যজ্ঞ-কার্য্যে দীক্ষিত হইবে'—এই বলিয়া ঋষি-গণ ইলূষর পুত্র কাকষকে যজ্ঞীয় ভূমি হইতে অপমানিত করিয়া বিতাড়িত করিয়াছিলেন। কিন্তু দেবতাগণ কাকষকে জানিতেন এবং কাকষও দেবতাদিগকে জানিতেন; তাই কাকষ ঋষি মধ্যে গণ্য হইলেন।*

(৩৫) পূর্ব্বকালে সত্যপ্রিয়তা ও বিদ্যাবত্তার উপরেই যে ব্রাহ্মণত্ব লাভ অনেকাংশে নির্ভর করিত, তাহা সত্যকাম জাবালের উপাখ্যান হইতেই জানিতে পারা যায়। এই উপাখ্যানটী অতিশয় চিত্তরঞ্জক; তাই পাঠকদিগকে উপহার দিতেছি।*

জাবালার পুত্র সত্যকাম একদিন মাতাকে কহিল "মা! আমি ব্রহ্মচারী হইব। কোন্ বংশে আমার জন্ম?" মাতা সে কথার উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন "আমি তোমায় গর্ভে ধরিয়া, যৌবনেই দাসীরূপে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতাম; কাহার ঔরসে যে তোমার জন্ম, তাহা আমি জানি না। তোমার নাম সত্যকাম, আমার নাম জবালা। তুমি এখন হইতে "সত্যকাম জাবাল" বলিয়া আত্মপরিচয় দিও।"

সত্যকাম গৌতমের নিকট উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মচারী হইবার বাসনা জানাইল; কিন্তু গৌতমকর্ত্তৃক বংশ-পরিচয় জিজ্ঞাসিত হইয়া, সত্যকাম মাতার নিকট যাহা শুনিয়াছিল, তাহাই বলিল। সত্যকামের সত্যনিষ্ঠায় হরিদ্রুমত গৌতম মহা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,

* শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত। দি, আর, হ।
† শতপথ ব্রাহ্মণ।

* ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।
* ছান্দোগ্য উপনিষৎ। ৪র্থ অধ্যায়, ৪,৫,৬,৭,৮,৯ খণ্ড।

"তং হোবাচ নৈতদ্‌ব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি সমিধং সৌম্যাহরোপত্বা নেষ্যোন সত্যাদগা"
.........." ইত্যাদি।

অর্থাৎ "ব্রাহ্মণ ভিন্ন এমন করিয়া আর কেহ সত্য কথা বলিতে পারে না। তুমি সমিধ আহরণ কর, আমি তোমাকে উপনীত করিব।" সেই অবধি সত্যকাম ব্রাহ্মণ হইল।

(৩৬) ক্ষত্রিয় পুরুর বংশ সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখিত রহিয়াছে। এক স্থানে আছে,—"এই বংশে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জন্মিয়াছেন, অনেক রাজর্ষি এই বংশকে পবিত্র করিয়াছেন। কলিযুগে ক্ষেমকের পর এই বংশ লোপ পাইবে।*

(৩৭) অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায়,—"এই বংশে গর্গের জন্ম। গর্গ হইতে শিবির জন্ম। তাঁহা হইতে গার্গ্য ও শৈব্যের জন্ম। গার্গ্য ও শৈব্যেরা ক্ষত্রিয়-গুণবিশিষ্ট হইয়াও অবশেষে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন †

(৩৮) গর্গের ভ্রাতা মহাবীরের তিন পৌত্র--ত্রয্যারুণ, পুষ্করি এবং কপি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন।†

(৩৯) আমরা মৎস্য পুরাণে ৯১জন বৈদিক ঋষির নামোল্লেখ দেখিতে পাই। কিন্তু সেই পুরাণের ১৩২ অধ্যায়ে আবার লিখিত আছে "এই ৯১ জন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ঋক্‌সমূহ প্রণীত বা সৃষ্ট হইয়াছিল। এই সকল ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ছিলেন; তাঁহারা ঋষিকদিগের সন্তান; ঋষিকেরা বৈদিক ঋষিদিগের সন্তান। শ্লোকটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"ভলন্দশ্চৈব বন্দশ্চ সংকৃতিশ্চৈব তে ত্রয়ঃ।
তে চ মন্ত্রকৃতো জ্ঞেয়াঃ বৈশ্যানাং প্রবরাঃ সদা।
ইত্যেক নবতিঃ প্রোক্তাঃ মন্ত্রাঃ যৈশ্চ
বহিষ্কৃতাঃ॥"*

(৪০) অণু পুরুর ভ্রাতা। অণুর বংশেই বলির জন্ম। মৎস্য পুরাণে এবং বায়ু পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই বলি রাজাই সর্ব্বপ্রথমে চারি জাতি বা চারি বর্ণের নিয়ম প্রচলিত করিয়াছিলেন। হরিবংশের ৩১ অধ্যায়েও এই কথা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

(৪১) এক বর্ণভুক্ত ব্যক্তির বর্ণান্তর-প্রাপ্তির প্রমাণাদি পূর্ব্বেও একবার প্রদত্ত হইয়াছে।

"শূদ্রে চৈব ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
নবৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো নচ ব্রাহ্মণঃ॥†"

ব্রাহ্মকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া যদি কেহ শূদ্রের ন্যায় লক্ষণযুক্ত হয়, তাহা হইলে সে শূদ্ররূপে পরিগণিত হইবে, এবং যদি কেহ শূদ্রবংশে জন্মিয়াও ব্রাহ্মণের লক্ষণযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

(৪২) "যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র
কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি
সান্বয়ঃ॥"*

* বিষ্ণু পুরাণ।
† বিষ্ণু পুরাণ।

* মৎস্য পুরাণ।
† মহাভারত।
* মনুসংহিতা।

যে সকল দ্বিজ বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অন্যত্র অর্থাৎ ঐহিক বিদ্যাদি লাভে যত্নবান হয়,তাহারা জীবিতাবস্থাতেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

(৪৩) ক্ষত্রিয় হইতে অপর বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ আছে। আমরা তাহার দুই একটী এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। 'ধৃষ্টাদ্ধার্ষ্টমভূৎ ক্ষত্রং ব্রহ্মভূয়ং গতং ক্ষিতৌ'*

মনুর পুত্র ধৃষ্ট, তাহা হইতেই ধার্ষ্ট নামক ক্ষত্রিয় বংশের উৎপত্তি হয়। ধার্ষ্টগণ ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন

(৪৪) রাজা অম্বরীষের পুত্র বিরূপ, বিরূপের পুত্র পৃষদশ্ব, তাঁহার পুত্র রথীতর ক্ষত্রিয়—অথচ অঙ্গিরস বলিয়া তাঁহাদিগকে ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ বলা হয়।†

(৪৫) আমরা নিম্নে বিনা অনুষ্ঠানে একজন ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণ হইবার উপাখ্যান সংক্ষেপে দিতেছি:—

বীতহব্যের পুত্রগণ কাশীরাজ দিবোদাসকে আক্রমণ করেন। সেই যুদ্ধে কাশীরাজের আত্মীয়গণ প্রাণত্যাগ করেন। রাজা দিবোদাস ভরদ্বাজের আশ্রমে গিয়া বাস করিতে থাকেন। ভরদ্বাজ দিবোদাসের জন্য এক যজ্ঞ করিলেন, তাহাতে প্রতর্দ্দন নামে দিবোদাসের এক পুত্র জন্মিল। যথাকালে প্রতর্দ্দন পিতা কর্ত্তৃক বীতহব্যের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। বীতহব্য পলায়ন করিয়া মহর্ষি ভৃগুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। প্রতর্দ্দন তাহা জানিতে পারিয়া ভৃগুর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং ক্ষত্রিয় বীতহব্যকে দেখাইয়া দিতে বলিলেন। ভৃগু মিথ্যা করিয়া বলিলেন 'এখানে কোন ক্ষত্রিয় নাই।' প্রতর্দ্দন প্রস্থান করিলেন। কিন্তু ভৃগুর কথায় ক্ষত্রিয় বীতহব্য সেই অবধি ব্রাহ্মণ হইলেন।

(৪৬) ভগবান মনুর দৌহিত্র পুরুরবা। বিষ্ণুপুরাণ মতে এই পুরুরবার পুত্র আয়ু। আয়ুর পঞ্চ পুত্র মধ্যে ক্ষত্রবৃদ্ধ একজন। এই ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র শুনহোত্র। শুনহোত্রের তিন পুত্র—কাশ, লেশ ও গৃৎসমদ। গৃৎসমদ হইতে চতুর্ব্বর্ণ-প্রবর্ত্তয়িতা শৌনক জন্ম গ্রহণ করেন।

'পুত্রো গৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈবচ॥'*

(৪৭) ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেও এইরূপ শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। হরিবংশে লিখিত আছে, গৃৎসমদের পুত্র শুনক। এই শুনক হইতে শৌনিক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি জাতি জন্মিয়াছিল।

(৪৮) 'বৎসস্য বৎসাভূমিস্তু ভার্গভূমিস্তু ভার্গবাৎ।
এতেত্বঙ্গিরসঃ পুত্রা জাতা বংশেঽথ ভার্গবে।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ ভরতর্ষভ।'

বৎস হইতে বৎসাভূমি এবং ভার্গব হইতে ভার্গভূম। ভার্গবের বংশে অঙ্গিরস-পুত্রগণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ জন্ম গ্রহণ করেন।

(৪৯) পুরাণাদির মতে আয়ুর পুত্র রাজা নহুষ, তৎপুত্র যযাতি, তাঁহার পুত্র অণু। অণু হইতে অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ

---

* শ্রীমদ্ভাগবত ৯।২।১৭

† বিষ্ণুপুরাণ ৪।২

* হরিবংশ। ২৯ অধ্যায়

বলি। বিষ্ণুপুরাণের মতে, এই বলির পত্নীর গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র এই পঞ্চ পুত্র জন্মে। ইহারা বালেয় ক্ষত্রিয়। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ এবং মৎস্য পুরাণের মতে সেই রাজা বলি হইতেই চারি বর্ণ উৎপন্ন হয়।

পৌরাণিক শাস্ত্র হইতে আর অধিক উদ্ধৃত করিতে চাহিনা, এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেরূপ স্থানও নাই। তবে এইরূপ উদাহরণের সীমা নাই। পুরাণাদি অনুসন্ধান করিলে, আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।*

(৫০) যদিও মনুর পূর্ব্বে আমরা সংকীর্ণ বর্ণের আর তেমন উল্লেখ দেখিতে পাই না; কিন্তু পুরাকালে 'পঞ্চমবর্ণ'ও যে শিক্ষা, চরিত্র, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতির জন্য যথারীতি পূজিত হইত, তাহারও প্রমাণ আছে—

'There is evidence to show, that in early times there were Panchamas distinguished for their genius, learning and piety, and their names are venerated by the Hindus up to the present day. If tradition may be believed, Valmiki, the author of the Ramayana, which is considered to be the first and certainly one of the finest epic poems in Sanskrit, is said to have been a Panchama. This tradition is supported by the Padma purana and Jnana Vasishtha, both of which are regarded as words of authority by learned Brahmins. The immortal author of Kural, known as Tiruvalluvar and Tiruppanlyalwar, one of the twelve saints worshipped by the Vaishnava community, are both supposed to have been men of Panchama origin. Marner Numbiyar, a disciple of Yamunacharya, one of the greatest Vaishnava scholar saints of antiquity, though a Panchama by birth, received all the high funeral honors of a Brahman saint on his death.'*

(৫১) 'Neither birth, nor study, nor learning constitutes Brahmanhood; character alone constitutes it.†

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য, বি, এ।

* হরিবংশ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ দেখ।

* "The condition of low castes"—by K. Ramanu achari, Esq., M. A, B. L., Principal, Maharaja's college. Vizianagram.

† মহাভারত। বনপর্ব্ব, ৩১৩। ১০৮

e. f. মহাভারত, মোক্ষধর্ম্ম ১৮৮ অধ্যায়।

৺স্বামী বিবেকানন্দ।

বঙ্গের সুকীর্ত্তিমান সুসন্তান স্বামী বিবেকানন্দ ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের সেই নবোদীয়মান মূর্ত্তিমান প্রতিভা আজ অকাল-অস্তমিত।

স্বামী বিবেকানন্দের এই অকাল-কাল-প্রাপ্তিতে আজ পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত শোক-স্পৃষ্ট। ফলে "অকালমৃত্যু" কথাটা লৌকিক বিচারের কথা মাত্র। যে কোন কালের মৃত্যুই সেই মৃতের পক্ষে কাল-মৃত্যু। অকালে মহাসংহারিণী সাংঘাতিকতাও অনায়াসে অতিক্রান্ত হয়; কিন্তু কালে অতি দুর্লক্ষ্য সামান্য সূত্রেও অলক্ষ্যে জীবন-সূত্র ছিন্ন হয়।

"নাকালে ম্রিয়তে কশ্চিদ্বিদ্ধঃ শরশতৈরপি।
ছিন্নকুশাগ্রমাত্রেণ প্রাপ্তকালো ন জীবতি॥"

অর্থাৎ—

অকালে না মরে যদি বিঁধে শত শরে।
কালপূর্ণ হলে ছিন্ন কুশাগ্রেও মরে॥

কে ভাবিয়াছিল যে, এত শীঘ্র এই পৃথিবী-প্রখ্যাত নবকীর্ত্তিমান ধর্ম্মপ্রচারক পরলোকপ্রাপ্ত হইবেন? কোন উৎকৃষ্ট অভিনেতা জন-রঞ্জন অভিনয় করিতেং যদি অকস্মাৎ কোন অপরিহার্য্য কারণে সূত্রধার কর্ত্তৃক নেপথ্যে আহূত হন, তবে সেই আকস্মিক অভিনয়-ভঙ্গের অনিবার্য্য-হেতুত্ব-বোধাভাবে দর্শকমণ্ডলীতে যেমন বিক্ষোভ উপস্থিত হয়, স্বামী বিবেকানন্দের এই আকস্মিক তিরোধানে অস্মদ্দেশে অনেকের অন্তরে সম্ভবতঃ সেই ভাব লাগিয়াছে। অবশ্য পরলোকগত স্বামীজীর সম্বন্ধে সকলের অভিমত সমান নহে; আর তাহা হওয়াও অসম্ভব। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই নিন্দকের অভাব নাই। আজ যাঁহার গীতার সর্ব্বজাতি-নির্ব্বিশেষে জগদ্ব্যাপী গৌরব, তাঁহারই সেই অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যময়ী মহালীলা বিষয়ে আজিও এই ভারতেই শত মতভেদ বর্ত্তমান। এ হেন পরম-প্রেমবিতার অকলঙ্ক চন্দ্র গৌরচন্দ্রের চরিত্র-চন্দ্রিকাও অনেকের হৃদয়ান্ধকূপে প্রবিষ্ট হইতেছে না! তবে বিবেকানন্দ আর কোন্ ছার? অতএব বিবেকানন্দের বিশিষ্টতা সম্বন্ধে সহস্র মতভেদ থাকিলেও, তিনি যে অন্ততঃ একজন সুপণ্ডিত, সুবক্তা, সুলেখক ও সুপ্রতিভাবান শক্তিমান পুরুষ ছিলেন, তাহা প্রায় সর্ব্ববাদী-সম্মত। পাশ্চাত্য ভূমে তাঁহার ন্যায় সুগৌরব-সমাদর লাভ অতি অল্প ভারতবাসীর ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। মহাত্মা রাজা রাম মোহন রায় ও স্বনামধন্য কেশব চন্দ্র সেন ইউরোপে 'বাঙ্গালী' নাম উজ্জ্বল করিয়াছেন বটে, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের—বিশেষতঃ বেদান্তবিদ্যার বা ব্রহ্মবিদ্যার অপূর্ব্ব তত্ত্বব্যাখ্যায় যুগপৎ ইউরোপ ও আমেরিকাকে এরূপ বিস্মিত ও বিমোহিত করিতে বিবেকানন্দের ন্যায় কেহই কৃত-কার্য্য হয়েন নাই। আজ নিত্য-নবোন্নতি-বিলাসী—সর্ব্বোন্নতিপ্রয়াসাভিলাষী মার্কিন-সমাজে আমাদের দরিদ্র বিবেকানন্দ বেদান্ত-তত্ত্ব চর্চ্চার তুমুল তরঙ্গ তুলিয়া, নবধর্ম্মোন্নতির যে উদ্যম উৎসারিত করিয়া দিয়া আসিয়াছেন, তাহা কাল-ক্রোড়-পোষণে কালে কি আকার ধারণ করিবে, কে জানে? সে তরঙ্গ আজ অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মস্তিষ্ক তরঙ্গায়িত করিতেছে।

চিকাগোর সেই সর্ব্বধর্ম্ম-সমালোচনী মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের সেই পাশ্চাত্য-চিত্ত-চমৎকারিণী বক্তৃতা আমরা মুদ্রিত পুস্তিকায় পাঠ করিয়াছি; তাহা বাস্তবিকই এক অভিনব মৌলিকতাময়ী, অথচ সার্ব্ব

শাস্ত্রানুসারিণী এবং অধ্যাত্মজ্ঞানানুরাগিগণের বাস্তবিক হৃদয়গ্রাহিণী। তারপর ইংলণ্ড এবং মাদ্রাজ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্নস্থানে তিনি যে সব বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে অনেক জানিবার, শিখিবার ও ভাবিবার বিষয় ছিল। অপর, স্বামী বিবেকানন্দ অত্যল্প কাল মধ্যে যে কতিপয় গ্রন্থ, প্রবন্ধ, নিবন্ধাদি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা বঙ্গ সাহিত্য-ভাণ্ডারে মূল্যবান সম্পত্তি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। তাঁহারই অভিভাবকতায় উদ্ভূত ও পরিচালিত "উদ্বোধন" নামক সাময়িক পত্রটিও বেশ চলিয়াছিল। আশা করি, তাঁহার শিক্ষিত সতীর্থ ও সহকারিগণের সম্যক্ সাত্ত্বিক যত্ন থাকিলে, এখনও উহা ভাল চলিতে পারিবে। বিবেকানন্দ আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহারই প্রতিভা ও মহাপ্রাণতায় অনুপ্রাণিত "রামকৃষ্ণ মিসন্" এখনও আমাদিগের আশাস্থল। আশা করি, বিবেকানন্দের সংক্ষিপ্ত অথচ সমুজ্জ্বল জীবনের সুমহান্ উদ্দেশ্যের অনুসরণেই রামকৃষ্ণ-মিসনের কার্য্য চলিবে।

আমাদের বোধহয়, স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম, ভারতের সেই লুপ্ত গুপ্ত প্রাচীন বেদান্তবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যার পুনরুদ্ধার ও প্রচারণ; দ্বিতীয়, উন্নততম আধ্যাত্মিক আদর্শে ভারতীয় জাতিসাধারণের সমুন্নয়ন; এবং তৃতীয়, পাশ্চাত্য প্রদেশে ভারতের ধর্ম্ম-গুরুত্ব প্রতিষ্ঠাপন। বেদান্ত—বেদের অন্ত, বেদের শেষভাগ; অর্থাৎ বেদান্ত বা উপনিষৎ বেদের শিরোভাগ বা সার ভাগ। "বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলম্।" বেদই অখিল ধর্ম্মের মূল। এই মূলেরই সর্ব্বশেষ-পরিণতি বেদান্তামৃত-ফল। যে বেদান্তবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যার বলে ভারত একদিন জগৎ-গুরুত্ব পদ লাভ করিয়াছিল; যে ব্রহ্মবিদ্যার অবনয়নে আজ ভারতের এই অত্যবনতি; এবং যে ব্রহ্মবিদ্যার পুনরুন্নয়নেই কেবল ভারতের পুনরুন্নয়নের আশা, সেই ব্রহ্মবিদ্যা বা বেদান্তবিদ্যার পুনঃসঞ্জীবন সুসাধ্য, দুঃসাধ্য বা অসাধ্যই হউক, বিবেকানন্দের জীবন তৎসঙ্কল্পেই উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল।

তারপর, বর্ত্তমান ভারতের জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সৎশিক্ষা প্রচারের একদেশদর্শিতার পরিবর্ত্তে স্বাধিকারানুযায়ী সর্ব্বসাধারণে তৎপ্রচারই বিবেকানন্দের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের যথার্থ তাৎপর্য্য না বুঝিয়া, অনেকে হয়ত তাঁহাকে হিন্দুসমাজ-বিপ্লাবক ভাবিয়াছেন; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। সামাজিক বিপ্লব না ঘটাইয়া, ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যকরভাবে যেরূপ সংস্করণ বা পরিবর্ত্তন সমাজোন্নয়নার্থ আবশ্যক, তাহাই তাঁহার উদ্দিষ্ট ও কর্ত্তব্যক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট ছিল। তিনি অংশ্য জন্মদাচার্য্য ব্রাহ্মণ জাতির অবনয়ন-অভিলাষী ছিলেন না। ব্রাহ্মণ আপন অধিকারে উন্নতই থাকুন, বরং আত্মসংস্কার পূর্ব্বক বর্ত্তমান অবনতির প্রতীকার করুন; শূদ্রত্ব ও পাতিত্য হইতে আত্মরক্ষা করুন; আর সঙ্গে সঙ্গে শূদ্রাদিও ব্রাহ্মণত্বের আদর্শে আত্মগঠন পূর্ব্বক উন্নত হউন; বিবেকানন্দের তাহাই আশা। গুণ, জ্ঞান, সদাচার, এই তিন লইয়াই সভ্যতা। অতএব

সভ্যতাই মনুষ্যত্বের মূলধন। এই মূলধন কেবল কতিপয় "ভদ্র" আখ্যাধারী সম্প্রদায়-বিশেষে চিরনিবদ্ধ না থাকিয়া, অবিকার-ভেদে আচণ্ডাল সর্ব্বজাতি-সাধারণেই বিতরিত হউক, ইহাই বিবেকানন্দের উদার উদ্দেশ্য বা অভিমত।

সৃষ্টি ক্রমোন্নতিশীল; মানব মাত্রেই মুক্তির অধিকারী। অতএব অবনতের উন্নয়ন বিপ্লবের কারণ নহে; উহা স্বাভাবিক। কিন্তু উন্নতের অবনয়নই জগতের সর্ব্ব-বিপ্লবের হেতু। অতীতসাক্ষী ইতিহাসের কুক্ষিতে ইহার শত উদাহরণ সুরক্ষিত। যাহাহউক, সাধারণতঃ লৌকিক নিয়মেও দেখা যায় যে, অজ্ঞান জ্ঞানী হইলে, দরিদ্র ধনী হইলে বা রোগী সুস্থ হইলে, তাহাতে কোন সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হয় না; কিন্তু ধনী দরিদ্র হইয়া পড়িলে, জ্ঞানী জ্ঞানভ্রষ্ট বা সুস্থ রোগগ্রস্ত হইলেই যত বিপদ-বিপ্লব-বিড়ম্বনা ঘটে। ব্রাহ্মণ শূদ্রত্বে অবনত হইলেই সমাজের অনিষ্ট; কিন্তু শূদ্র ব্রাহ্মণত্বে উন্নত হইলে, তাহাতে সমাজের বিশিষ্ট ইষ্টই হইবার কথা। অতএব ব্রাহ্মণাদি স্বপদে স্বপথে থাকুন, শূদ্রাদিও ব্রাহ্মণাদির আদর্শে আত্মোন্নয়ন সাধনে যত্নবান হউন; এই নীতিসূত্রই বিবেকানন্দের দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের নিয়ামক।

তারপর, আমাদের এই গতগর্ব্ব হত-সর্ব্ব অধঃপতিত ভারত আজ জগতের চক্ষে অপর সমস্ত বিষয়ে দীন হীন হইলেও, তথাপি একটি বিষয়ে ইহা আজিও ভূতলে অতুল। সেটি ইহার আধ্যাত্মিকতা রূপ অমূল্য সম্পদ। সাধারণ গ্রাম্য প্রবাদ-কথায় বলে "রাজার হাতী মলেও লাক্ টাকা" এ বিষয়ে সেই প্রবাদ প্রকৃষ্টরূপেই প্রমাণিত। ভারত এখনও আধ্যাত্মিকতায় মানবজাতির শিক্ষা-গুরুত্বের অধিকারী। এই অধিকার পৃথিবীর এই নবযুগে আবার পরিজ্ঞাত, প্রচারিত ও কার্য্যে পরিণত হউক, এতদিচ্ছাই বিবেকানন্দের সর্ব্বোদ্দেশ্যের সারতম তৃতীয় উদ্দেশ্য বা শেষ উদ্দেশ্যের জনয়িত্রী। অধুনা পাশ্চাত্য সমাজ হইতে ভারতের অনেক ঐহিকশিক্ষার আবশ্যকতা আছে, এবং তদ্ভিন্ন ভারতের এই নব-যুগানুসারী পুনরুন্নয়ন একান্তই অসম্ভব। কিন্তু পাশ্চাত্যভূমি ভারতকে আর তুচ্ছ না করিয়া, পরন্তু গুরু-গৌরবের চক্ষে দেখিলেই তাহার নিকট হইতে সে গুরু-দক্ষিণা অনায়াস-লভ্য হইতে পারে। এই জন্যই দরিদ্র বিবেকানন্দের বেদান্ত-বিদ্যালোকিত ক্ষুদ্র জীবনে বিশাল ও বিপুল আয়োজনের আশা জাগিয়াছিল। এই জন্যই চিকাগোর ধর্ম্ম-মহাসভার সু-যোগ বুঝিয়া, সুযোগ্য বিবেকানন্দের ছুটিয়া আমেরিকায় গমন এবং ভগবৎকৃপায় তথায় আশাতীত সুকৃতকার্য্যতার ফলে তাঁহার সেই সুমহদুদ্দেশ্যের শুভ বীজবপন। এই জন্যই তাঁহার ইউরোপ-পরিভ্রমণ; ভারতের তীর্থপর্য্যটন; হিমালয়ের সাধু-সিদ্ধ-নিষেবিত দুর্গম প্রদেশ পরিদর্শন।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যত্রয় সাধনার্থ তিনি ভারতে আবার সেই শঙ্করাচার্য্যের সুপ্রতি-ষ্ঠিত প্রথায় কালোপযোগীভাবে বেদান্ত-বিদ্যার বিস্তার ও তদর্থে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয় বিদ্যার ম-

বিধান সন্ন্যাসীমণ্ডলী-মণ্ডিত মঠস্থাপনাদি-রূপ কার্য্যক্ষেত্রে অক্লান্ত অধ্যবসায় ও অমিত উৎসাহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু হায়! বুঝি এই অভিশপ্ত দেশেরই দুর্ভাগ্য-দোষে এহেন ধর্ম্ম-বীর ও কর্ম্ম-বীরের আকস্মিক তিরোধান হইল। আর তাইবা বলি কেন? প্রকৃতির রীতিই যেন এই। তৃণের জনন বা ওষধির ফলনের ন্যায় যাহার প্রতিভার শীঘ্র শীঘ্র অতি অভ্যুদয় হয়, তাহার শীঘ্র শীঘ্র অবসানও প্রায় অবশ্যম্ভাবী। ইহা আমাদেরই যুগযুগান্তরের পরীক্ষাপূত "ফলিত জ্যোতিষ" শাস্ত্রেরই সিদ্ধান্ত। অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি মাত্রেই যেন পৃথিবীর অত্যল্পকালস্থায়ী অতিথি। যেন তাঁহারা পথ ভুলিয়া পৃথিবীতে আসিয়া, আবার শীঘ্রই সে ভ্রম সংশোধন করেন! সেই শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি হইতে আধুনিক রামকৃষ্ণ, কেশব চন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি পর্য্যন্ত ইহার প্রমাণ দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। অন্ততঃ এ দেশে ত প্রকৃতির এই নিয়মই দেখিতেছি। ভগবদিচ্ছায় আমাদের বিবেকানন্দও একটু অসাধারণত্বের অধিকারী হইয়াছিলেন, অতএব তিনিই বা কিরূপে সে নিয়মের বহির্ভূত রহিবেন?

চিকাগোর সেই বিখ্যাত বক্তৃতার পূর্ব্বে আমাদের সেই নরেন্দ্রনাথ দত্তের এই বিবেকানন্দত্ব কলিকাতার কোন্ কোণে কয়জনে জানিত? কিন্তু চিকাগোর সেই কাণ্ডের পরে, এমন একজন শক্তিশালী বাঙ্গালী যে এতদিন স্বদেশে লুক্কায়িতপ্রায় থাকিয়া অকস্মাৎ ঐ দূরাতিদূর বিদেশে উদিত হইয়াছেন, ইহা বস্তুতঃ অনেকেরই বিস্ময়ের বিষয় হইয়াছিল। বিবেকানন্দকে দেখিতে, তাঁহার কথা শুনিতে, তাঁহার শিক্ষা-সঙ্গ পাইতে অনেকেরই অন্তরে ঔৎসুক্যের উৎস ছুটিয়াছিল। তারপর, সেই বিবেকানন্দ দেশে ফিরিলেন। সেই সময়ে কলিকাতায় তাঁহার অভ্যর্থনার্থ মহালোকারণ্যের কৌতূহল-কোলাহলময়ী যে মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল, আমরা তাহাতে উপস্থিত থাকিয়া, সে সমারোহ স্বচক্ষে দেখিয়া বাস্তবিকই আশ্বাসিত ও উৎসাহিত হইয়াছিলাম। তখন জানিতাম না যে সেই বৃহচ্চক্ষু-বিভাসিত প্রতিভা-প্রদীপ্ত মুখচ্ছবি এত শীঘ্র কাল-যবনিকার অন্তরালে লুকাইবে। ফলে ভগবদিচ্ছাই পূর্ণ হইয়াছে; তাহাতে আর আক্ষেপের অপেক্ষা কি? তবে আমরা নাকি সংসার-মোহের দাস, তাই শোক-দুঃখ, দুরাশা-নিরাশা, সব আমাদেরই চিত্তের নিত্য ভোগ্য দণ্ড। বিবেকানন্দ চলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সতীর্থ, সঙ্গী, সহকারী ও শিষ্যবর্গ; এবং তাঁহার সমর্থক, সহানুভাবক ও সাহায্যকারকগণ ঈশ্বরেচ্ছা জানিয়াও নিরাশা ও নিরানন্দের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছেন না। যাহা হউক, আশা করি, ভগবৎকৃপায় ক্রমে তাঁহাদের শোক-ভগ্ন ও নিরাশা নিমগ্ন হৃদয় প্রকৃতিস্থ হইবে; ক্রমে তাঁহারা তাঁহাদের সেই স্বর্গগত প্রিয় অধিনায়কের প্রদর্শিত পথে স্ব স্ব ধর্ম্ম, জ্ঞান, শিক্ষা ও সহৃদয়তার বলে অগ্র-

লিত পাদক্ষেপে পুনরগ্রসর হইতে পারি-বেন। তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে সুযোগ্য, সুবিদ্বান, সুপ্রতিভান্বিত ও সুধী-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত; অতএব ঈশ্বরেচ্ছায় আমরা বিবেকানন্দকে হারাইয়াও তাঁহাদের দিকে আশ্বাসিত চক্ষে চাহিতেছি।

আমাদের পরমধামগ পরমহংস শ্রীমৎ রামকৃষ্ণদেবের শিষ্য বলিয়াই বিবেকানন্দ পরিচিত। ফলে তিনি উক্ত পরমহংসদেবের নিকট রীতিমত কোন ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্য বা সাধারণতঃ কৃপাশ্রিত জ্ঞানোপ-দিষ্ট শিষ্য, তাহা আমরা অবগত নহি; আর তদবগতির বিশেষ আবশ্যকতাও নাই। তবে যুবক বিবেকানন্দ যখন বালক নরেন্দ্রনাথ ছিলেন, তখনই তিনি পরমহংস দেবের বিশেষ স্নেহাশ্রয় লাভ করেন। তাঁহার বালক-কৃপাশ্রিতগণের মধ্যে নরেন্দ্র নাথই নাকি অগ্রগণ্য ছিলেন। যাহা-হউক, উক্ত মহাপুরুষের মহাশীর্ব্বাদ ও মহতী কৃপাশক্তি যে নরেন্দ্রনাথের এই বিবেকা-নন্দত্ব লাভের অন্ততঃ বিশিষ্ট হেতু, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। 'মহৎ-কৃপা-লেশ" ভিন্ন সাধারণতঃ কেহই কোনরূপ অসা-ধারণতা লাভে অধিকারী হয় না। যাহা-হউক, বুঝি গুরু রামকৃষ্ণের বিরহ অধিক দিন সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়াই, প্রিয়-শিষ্য নরেন্দ্রনাথ তাঁহার চিরকুমার-জীবনের একান্ত আকাঙ্ক্ষিত ও আরব্ধ প্রিয় কার্য্য-নিচয় অসমাপ্ত ফেলিয়াই গুরু-চরণানুসরণ করিলেন। অতএব আমরা আশা করি, পরলোকে সেই গুরুকৃপা-বলেই আমাদের বিবেকানন্দের আত্মা বিশ্বগুরু শ্রীভগবানের শ্রীপদাশ্রয়ে চিরশান্তি লাভ করুন।

শ্রীশঃ—

জ্ঞান-কর্ম্ম-সমন্বয়। *

গীতাতে দ্বিবিধ বৈদিক ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে। সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস পূর্ব্বক আত্ম-জ্ঞান-নিষ্ঠা এক; আর বর্ণাশ্রম-বিহিত কর্ম্মনিষ্ঠা এক। ফলাভিসন্ধি সহিত যে কর্ম্মনিষ্ঠা, তাহা ঐ জ্ঞাননিষ্ঠার বিরোধী। তাহা ভিন্নপথবাহী। আর ফলাভিসন্ধি-বর্জ্জিত ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে অনুষ্ঠীয়মান যে চিত্তশুদ্ধিকল্প কর্ম্ম, তাহাই ঐ ব্রহ্মবর্ত্মবাহী; কেননা, তাহা জ্ঞাননিষ্ঠার যোগ্যতা ও জ্ঞানোৎপত্তির হেতু। কর্ম্মসন্ন্যাসী আত্ম-জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তিও ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিত ও

* বঙ্গ-সাহিত্য-সংসারে সুপ্রতিষ্ঠ স্বনামখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু মহাশয় এত দিন দ্বারবঙ্গ রাজের প্রধান মন্ত্রীত্ব পদে নিযুক্ত থাকায়, ইদানীং সাহিত্য-সেবা-কার্য্যে কিছু অনবসরযুক্ত ছিলেন; অধুনা পেন্‌সিয়ন গ্রহণপূর্ব্বক কলিকাতায় অবস্থিত হইয়াছেন; অতএব এই অবসর-সুযোগে আমরা তাঁহার নিকট তাঁহার মহার্হ চিন্তা উপহার যথাসম্ভব পুনঃপ্রাপ্ত হইবার আশা করি। যদিও এক্ষণে তিনি বৃদ্ধ, কিন্তু অবশ্য জ্ঞান-বৃদ্ধও বটেন; সুতরাং সেই প্রাচীন পাকা-হাতের সমীচীন দান অধিকতর উপাদেয় ও উপকারী হইবে, সন্দেহ নাই। বিষয়-কার্য্যে অবসর গ্রহণের পর এই প্রথমেই তিনি হিন্দু-পত্রিকায় এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ-রত্নটি উপহার দিয়াছেন। আমরা সাদরে উহা প্রকাশ করিলাম। আশা করি, হিন্দু পত্রিকার প্রতি চন্দ্রশেখর বাবুর এই সানুগ্রহ অভিভাবকতা অব্যাহত থাকিবে। (হিঃ পঃ সঃ)

লোক-সংগ্রহচিকীর্ষু হইয়া কর্ম্ম করিবেন। তাদৃশ জ্ঞানীর কর্ম্মনিষ্ঠাও কেবল মাত্র জ্ঞানপরতা-হেতু ঐ একই ব্রহ্মপথ-বাহী। এই উভয় ফলত্যাগস্থলে কর্ম্ম মৃত, জ্ঞানই জীবিত। সুতরাং মৃত, জীবিত সমুচ্চিত অভিপ্রেত নহে।

এস্থলে অনেক ছিদ্র আছে; বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই তাহা বুঝিতে পারেন। যদি ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, আর হৃদয়ে ফলকামনা না থাকে, তবেই তো ফলাভিসন্ধি-বর্জ্জিত হইয়া ঈশ্বরার্পণ পূর্ব্বক যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্ম করা যাইতে পারে; এবং তাহা হইতে ক্রমে আত্মজ্ঞান জন্মিতে পারে। আর আত্মজ্ঞানী পুরুষ লোকসংগ্রহ-চিকীর্ষু হইয়া ঐরূপ ক্রিয়া করিতে পারেন। তাদৃশ উভয় অধিকারীরই মোক্ষ নিশ্চয়। কিন্তু ফলকামনা নাই, এমন লোক তো প্রায় দৃষ্ট হয় না। বরং ফলকামনা আছে, ঈশ্বরে ও দেবতাতে বিশ্বাস নাই, এমন লোক অনেক। আবার ক্রিয়া মানেনা, দেবতা মানেনা, প্রার্থনা মানেনা, অথচ এক নিরাকার ঈশ্বর মানে, এমন লোকও আছে। এই উভয় শ্রেণী পুরুষকার অবলম্বন পূর্ব্বক ফল লাভের যত্ন করেন। আবার এমন লোকও আছেন, যাঁহারা একমাত্র নিরাকার ঈশ্বরকে মানেন, প্রার্থনার ঔচিত্য স্বীকার করেন এবং হৃদয়ে ফলকামনাও অপার। স্বর্গ-লাভের কারণ প্রায় নহে; সাংসারিক সুবিধার কামনাই সব। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঈশ্বরের নিকট সেই সব ফল চান। তজ্জন্য বন্ধু-বান্ধবে মিলিয়া প্রার্থনা করেন। আর কেহবা অপেক্ষাকৃত সদ্বিবেচনা সহকারে ঈশ্বরের নিকট ফল চাওয়া যুক্তিযুক্ত বোধ করেন না। কিন্তু ফল অবশ্য চাই। অতএব তন্নাত জন্য কেবল পুরুষকার অবলম্বন করেন। সার কথা এই যে, স্বর্গ-কামনাই হউক, সগুণ মুক্তির কামনাই হউক, সাংসারিক বিপদ, আপৎ হইতে উদ্ধারের কামনাই হউক, এবং আপনার ও সন্তানাদি পরিবার বর্গের ও আত্মীয় স্বজনের আয়ু, আরোগ্য, বল, বুদ্ধি, সুখ, শান্তির কামনাই হউক,—এই সকল সুসিদ্ধির নিমিত্তই বৈদিক প্রবৃত্তিধর্ম্ম-বিধি কর্ম্মকাণ্ডের অভ্যুদয়। এ সমস্ত সত্ত্বে বিধিবিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করা সম্ভব নহে। পুরুষকার-ফলে বঞ্চিত হইলেই সাধক দেবের ও দৈবানুষ্ঠানের শরণাপন্ন হন। যদি তাদৃশ পুরুষকার-বঞ্চিত ব্যক্তি, বেদবিহিত দেবতা ও দৈব-ক্রিয়া না মানেন, কিন্তু কেবল একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখেন, আর কেবল সেই ঈশ্বরের নিকট ফল চান, তবে তাদৃশ ঈশ্বর সেস্থলে কেবল ফলদাতা দেবতামাত্র। তথা ক্রিয়ার সহিত এবং বিধিবিহিত নামের সহিত প্রার্থনা হইল না, এই প্রভেদ। সংক্ষেপতঃ বক্তব্য এই যে, ঈশ্বর-বিশ্বাসী পুরুষ যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়া কর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত এবং আমন্ত্রিত দেবতা সমূহকে একমাত্র ঈশ্বরের সহ অভেদ জ্ঞান করিয়া, ফল অথবা সগুণ মুক্তি প্রার্থনা করিবেন। আর ফলের ইচ্ছা না থাকে তো লোক-সংগ্রহার্থ তাহাতে যোগ দিবেন।

সম্পদে বিপদে ঈশ্বর-স্মরণই মনুষ্যত্ব। মঙ্গল লাভে সেই মঙ্গলময়ের পূজা দেওয়া সমস্ত গৃহীর কর্ত্তব্য। বিপদ ও সঙ্কট

হইতে ত্রাণের নিমিত্ত তাঁহারই পূজা উচিত। যিনি ভগবানের ভক্ত ও শরণাগত, ঐ সমস্ত অবস্থায় তিনি তাঁহারই সকাশে ভজন ও যাচন পরায়ণ হন। কিন্তু সেই সকল কাম্য পূজা শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী আচরিত হওয়া প্রয়োজন। যে যে দেবতার নামোল্লেখ পূর্ব্বক সেই সমস্ত ক্রিয়াচরণের বিধি আছে, তৎসাধনের যে সমস্ত পদ্ধতি আছে, তাহারই অনুষ্ঠান উপাদেয়। কেননা নামের ভেদে অর্চ্চনার মূলতত্ত্ব-ভেদ হয় না। কালী, দুর্গা, চণ্ডিকা, লক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা, শিব, বিষ্ণু, গণেশ প্রভৃতি সর্ব্ব দেবতার নাম ও রূপ, সেই রূপ-নাম-বিশেষণ-বিবর্জ্জিত ভগবানেতে সমন্বিত। অতএব ভগবৎভক্ত সাধু গৃহস্থ দেব-দেবীর পূজার সহ ঈশ্বরোদ্দেশে মঙ্গলাচরণ করিবেন। তাঁহার গৃহের মঙ্গলার্থে গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজার সহিত মহামায়ার পূজা দিবেন। ভদ্রাসনের শ্রীমন্দিরে বিগ্রহ-মূর্ত্তি ও শালগ্রাম শিলা প্রভৃতি যত দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তাঁহাদের অর্চ্চনা করিবেন, এবং স্বকীয় পরকীয় কল্যাণার্থে তত্তৎ যজ্ঞোপলক্ষিত বাসরে ব্রাহ্মণ-ভোজন প্রদান পূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণকে অন্নদান করিবেন।

গৃহপতি যদি নিষ্কাম হইয়া থাকেন, তথাপি সকামী পরিবারের অধিকার পূরণার্থে এইরূপ কাম্য এবং বিধিবিহিত কর্ম্ম সকল করিবেন এবং করাইবেন। তাহাতে স্বয়ং ফলাফলে নির্লিপ্ত থাকিবেন। অতএব আত্মজ্ঞানী ও ব্রহ্মোপাসক হইলেও প্রকৃতিবর্গের অধিকারতত্ত্বজ্ঞ সাধুপুরুষের সহ কাহারো বিরোধ সম্ভবে না। আর যদি ফলকামনা পূর্ব্বক কৃত হয়, তবে সেই কাম্য কর্ম্মই শাস্ত্রীয় প্রবৃত্তি-ধর্ম্ম। ফলে ঈশ্বরোদ্দিষ্ট যোগরূপ প্রবৃত্তি-ধর্ম্ম, ঈশ্বর-স্মরণহীন প্রবৃত্তিধর্ম্ম অপেক্ষা উপাদেয়। কেননা একমাত্র ঈশ্বরের স্মরণই নির্ম্মলচিত্ততা ও বৈরাগ্য লাভের হেতু।

অতএব একমাত্র ঈশ্বরে সমন্বিত দেবোদ্দিষ্ট ব্যতীত ক্রিয়া করিবেনা; এবং ক্রিয়াবিহীন ঈশ্বর স্মরণ, দেবাবাহন, এবং মঙ্গল-প্রার্থনা করিয়া সন্তুষ্ট হইবে না। এই সমস্ত স্থলে দেবজ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় বিহিত। কিন্তু মোক্ষ স্বরূপ যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহা কর্ম্মবন্ধনের বিরোধী বিধায়, তাহার সহ কর্ম্মের সমুচ্চয়াভাব। তাদৃশ আত্মজ্ঞানের নাম সাংখ্যজ্ঞান। সাংখ্যজ্ঞান ও কর্ম্মযোগ ফলকামনা শূন্য বিধায়, তত্ত্বতঃ পরস্পর সমন্বিত এবং উভয়ই মোক্ষপথবাহী। আর প্রবৃত্তি-ধর্ম্ম ফলজনকত্ব হেতু বন্ধনপর। ফলে সে বন্ধন আমরা দেখিতে পাই না; কেননা তাহাই 'অদৃষ্ট'। অদৃষ্ট শুভাশুভ উভয়রূপী। শুভ আপাততঃ যত রুচির ও প্রার্থনীয় হউক, কিন্তু বন্ধন মাত্র। ব্রহ্মদৃষ্টি ব্যতীত—আত্মজ্ঞান ব্যতীত সে মায়া তিরোহিত হয় না।

শ্রীচঃ শেঃ বঃ।

বর্ণভেদ-তত্ত্ব।

(বর্ণ ও জাতিশব্দ)

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

ক্ষরাদ্ বভূব ব্যাধশ্চ বলবান্ মৃগহিংসকঃ।
ভীবরাৎ শুণ্ডিকন্যায়াং বভূবুঃ সপ্ত পুত্রকাঃ।
তে কলৌ হড্ডিসংসর্গাদ্বভূবুর্দস্যবঃ সদা।
ব্রাহ্মণ্যাং ঋষিবীর্য্যেণ ঋতোঃ প্রথম বাসরে।
কুৎসিতশ্চোদরে জাতঃ কুদরস্তেন কীর্ত্তিতঃ।
তদশৌচং বিপ্রতুল্যং পতিত ঋতুদোষতঃ।
সদ্যঃ কোটীক সংসর্গাদধমো জগতীতলে।
ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং ঋতোঃ প্রথমবাসরে।
জাতঃ পুত্রো মহাদস্যুর্বলবাংশ্চ ধনুর্দ্ধরঃ।
আকারেণ তথা বাচা হ্যতীতঃ ক্ষত্রিয়ং যতঃ,
তেন জাত্যা সপুত্রশ্চ বাগতীতঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
ক্ষত্র-বীর্য্যেণ শূদ্রায়ামৃতুদোষেণ পাপতঃ।
বলবন্তো দুরন্তাশ্চ বভূবুর্ম্লেচ্ছ জাতয়ঃ।
অবিদ্ধকর্ণাঃ ক্রূরাশ্চ দুর্দ্ধর্ষা ধর্ম্মবর্জ্জিতাঃ।
শৌচাচারবিহীনাশ্চ নির্ভয়া রণদুর্জ্জয়াঃ।
ম্লেচ্ছাৎ কুবিন্দকন্যায়াং জোলাজাতির্বভূব হ।
জোলাৎ কুবিন্দ কন্যায়াং সরাকঃ পরি-
কীর্ত্তিতঃ।

বৈদ্যোঽশ্বিনীকুমারেণ জাতশ্চবিপ্রযোষিতঃ।
বৈদ্যবীর্য্যেণ শূদ্রায়াং বভূবু র্বহবো জনাঃ॥
তে চ গ্রাম্যগুণজ্ঞাশ্চ মন্ত্রৌষধপরায়ণাঃ।
তেভ্যশ্চ জাতয়ঃ শূদ্রাস্তেব্যালগ্রাহিণো ভুবি॥
বিপ্রস্য জ্যোতির্গণনাদ্বেতনাচ্ছ নিরন্তরং।
বেদধর্ম্মপরিত্যক্তো বভূব গণকো ভুবি॥
লোভাবিপ্রশ্চ শূদ্রাণামগ্রে দানং গৃহীতবান্।
গ্রহণে মৃতদানানামগ্রদানী বভূব সঃ॥

কিঞ্চিৎপুমান্ ব্রহ্মযজ্ঞে যজ্ঞকুণ্ডাৎসমুত্থিতঃ।
সসূতো ধর্ম্মবক্তাচ মৎ পূর্ব্বপুরুষঃ স্মৃতঃ॥
পুরাণং পাঠয়ামাস তঞ্চ ব্রহ্মাকৃপানিধিঃ।
পুরাণপ্রবক্তাশ্চৈব সু যজ্ঞকুণ্ডসম্ভবঃ॥
বৈশ্যায়াং সূতবীর্য্যেণ পুমানেকো বভূব হ।
স ভট্টো বাবদূকশ্চ সর্ব্বেষাং স্তুতিপাঠকঃ॥"

মতান্তরে কয়টী জাতির উৎপত্তি-প্রকার প্রদর্শিত হইতেছে, যথা—

"পট্টিকারশ্চ মালিন্যাং স্থপতিশ্চ বভূব হ।
স্থপতেরপি গন্ধিকাং চিত্রকারোঽপ্যজায়ত॥
গোপালিন্যাং চিত্রকারাৎপ্রতিমাগঠকঃ স্মৃতঃ।
প্রতিমাগঠাদেব কন্যায়াং নাপিতস্য চ॥
সূত্রধারস্য সম্ভবঃ সোপন্ গৃহকারকঃ॥
করণস্ত্রিয়াঞ্চ মাহিষ্যাদ্ রথকারস্য সম্ভবঃ।
সরাক্যাং স্থপতেশ্চাপি স্বর্ণকারস্য সম্ভবঃ॥
স্বর্ণকারাচ্চ কৈবর্ত্তঃ কুবেরিণ্যাং বভূব হ।
তত গান্ধিককন্যায়াং কৈবর্ত্তাদেব শুণ্ডিকাঃ॥
শৌণ্ডিক্যাং শরাকাজ্জাতো রজকো মল-
নাশকঃ।

শৌণ্ডিকাং রজকাজ্জাতো নটো গরুড় এবচ॥
গরুড়ান্নটকন্যায়াং শৃঙ্গকারস্য সম্ভবঃ।
শৃঙ্গকার্য্যাং নটাজ্জাতো গণিগ্রামীতি
বিশ্রুতঃ॥

তস্য পুত্রাৎ শৃঙ্গকার্য্যাং ভূমিমালীতি বিশ্রুতঃ॥
অনয়োর্হ্যভবৎ পুত্রঃ পুণ্ডকশ্চ তথৈবচ॥
বর্দ্ধকারাঙ্গকাকার কাচকারকচক্রিকঃ
এতে বৈ পুণ্ডকাজ্জাতাঃ কন্যায়াং নাপি-
তস্য চ॥

চক্রিকাং গাঙ্গপুত্রোঽপি কন্যায়াং পুণ্ডকস্য চ
গঙ্গাপুত্রাৎ পুণ্ডজীবী নটকন্যায়াং সম্ভবঃ॥
পুণ্ডজীবাদ্ গণ্ডকায়ো রজককন্যা সম্ভবঃ।
গণ্ডকারাদ্ বাদ্যকার বর্দ্ধকানাঞ্চ সম্ভবঃ॥

পুক্কুজীবাদ্ ভড় জাতির্নট্যা বৈ শববাহকঃ।
ভড়াত্তু চূর্ণকারো বৈ জাদরস্তীবরস্তথা,
কপালী চর্ম্মকারশ্চ কুরাব সরবৌ তথা,
পুলিন্দো মেরুবিন্দশ্চ শুন্দো মল্লস্তথাবকঃ।
কুম্ভকারঃ কর্ণিকারো ভোখলোহমৃতপস্তথা,
এতে বৈ তীবরাজ্জাতা কন্যায়াং ব্রাহ্মণস্য চ॥
ব্রাহ্মণ্যাং বৃষলাদেব চণ্ডালস্য চ সম্ভবঃ,
চত্বারিংশৎ পঞ্চমাসু জাতাঃ পুত্রা বিলোমজাঃ॥

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য পুরাণ, উপপুরাণ ও স্মৃতিসংহিতায় আরও বহুবিধ জাত্যুৎপত্তি-প্রক্রিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। সকলগুলির স্থান সঙ্কুলন হইলেও, আবশ্যক হইবে না ভয়ে, এ প্রসঙ্গে উহা যথোচিতরূপে উদ্ধৃত করিয়া দেখান সম্ভব হইল না।

বিভিন্ন পুরাণমতে বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি বিভিন্নভাবে সমর্থিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই যে সমান রীতির অনুসরণ করা সম্ভব হয় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য।

এই সকল শ্লোকের যথাযথ অনুবাদ প্রবন্ধ-কলেবরে স্থান পাইবেনা বলিয়া আপাততঃ বিরত হইলাম। বস্তুতঃ এই সকল শাস্ত্রবাক্য দৃষ্টে বুঝা যায়,—অনুলোম, প্রতিলোম বিবাহ ও ব্যভিচার দোষ বশতঃ জাত সন্তানেরাই চতুর্ব্বর্ণাতিরিক্ত সমস্ত জাতির প্রবর্ত্তক। যাহাদের জন্ম একরূপ, তাহারা এক জাতি। শূদ্র-সংসর্গে ব্রাহ্মণীর গর্ভোদ্ভূত সন্তান 'চণ্ডাল' নামধারী। এইরূপ সংসর্গবশে যত সন্তান জন্মিয়াছিল, তাহারা এই চণ্ডাল জাতি। অন্যবিধ সংসর্গজাত সন্তানের জাতি অন্য। শাস্ত্র-প্রমাণ-বলে বুঝিতে হয়, জাতি জন্মের অধীন।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় দ্বিজ, দ্বিজাতি, দ্বিজন্মা ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়; ইহার অর্থ, তাহাদের দুই প্রকার বা দুইবার জন্ম আছে। মাতৃগর্ভ হইতে এক জন্ম, উপনয়ন-সংস্কারে দ্বিতীয়বার জন্ম। বৈদিক "ব্রাহ্মণ" গ্রন্থে উপনয়নের সময় মৃগচর্ম্মের উপর গর্ভবাসী শিশুর মত ভাবে ব্রহ্মচারীর উপবেশনের কথা আছে। ঐ ব্রহ্মচারীকে কৃষ্ণাজিন দ্বারা আবৃত করা হইত। পরবর্ত্তিকালে কৃষ্ণাজিনের স্থানে বস্ত্রব্যবহার নিয়ম হইয়াছিল। তাহার পর ব্রহ্মচারী ঐ কৃষ্ণাজিনাচ্ছাদন হইতে প্রসূত হইতেন; তখন তাঁহার দ্বিতীয় জন্মের চিহ্নস্বরূপ মৃগচর্ম্ম-তন্ত্রী তাঁহার গলায় দেওয়া হইত। উহাকে (যজ্ঞোপবীতকে) বেদে নাড়ীস্বরূপ বলা হইয়াছে। মৃগচর্ম্ম অধুনাও ব্যবহৃত হয়। যজ্ঞোপবীত বিষয়ের বেদবাক্য (ব্রাহ্মণবাক্য) বিস্তারভয়ে উদ্ধৃত হইল না। ফলতঃ দ্বিজন্মা ও দ্বিজাতি একার্থক হইলে, জাতি-জন্মের সম্বন্ধ বড় কাছাকাছি। শাস্ত্রান্তরে দেখাযায়—"জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ" জন্ম দ্বারা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পিতা মাতা হইতে উৎপন্ন বলিয়াই সন্তান ব্রাহ্মণ হয়। এই অভিপ্রায়ানুসারেই "ব্রাহ্মণীভূতমাতাপিত্রোরুৎপদ্যমানত্বং ব্রাহ্মণত্বং" এই লক্ষণ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন। সুতরাং জন্মানুসারে জাতি হইবে, এই পর্য্যন্ত অনুশীলনে বুঝা গেল। এ সকল শাস্ত্রতত্ত্বের যৌক্তিকতা পরে বিবেচিত হইবে।

বর্ণপ্রসঙ্গে মহাভারতের শান্তিপর্ব্বোক্ত যে বচন পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহারও মূলে জন্মতত্ত্ব বিদ্যমান। ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ,

কৃত্রিম রক্তবর্ণ, ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্য কি, দেখা যাউক্। স্বাস্থ্য, আহার, বিহার, দেশের প্রকৃতিগত শীতাতপের ন্যূনাধিক্য অনেক সময়ে শারীরিক বর্ণবিভেদের কারণ হইয়া থাকে; কিন্তু উহাই বর্ণভেদের মুখ্য কারণ নহে; শুক্র-শোণিতই বর্ণভেদের প্রকৃষ্ট কারণ। আমাদের দেশে আমাদের চক্ষে শ্যাম, গৌর ও কৃষ্ণবর্ণের লোক থাকিলেও, বস্তুতঃ আমাদের জাতীয়বর্ণ শ্বেতাভ-কৃষ্ণ। এক পিতার সন্তান একজন শ্যাম ও অপর গৌরবর্ণ দেখা যায়; ইহারা এক মাতারই গর্ভজাত সন্তান। যমজ সন্তানেরও বর্ণভেদ হয়; কিন্তু এই বর্ণভেদ ইহুদী ও কাফ্রিজাতির বর্ণভেদের মত নহে। জগতের ইতিহাসে একজাতি একবর্ণের অধিকারী। অপর জাতীয় লোক অপর দেশে সুদীর্ঘকাল বাস করিলে, বা আহার-পরিচ্ছদাদির নিয়ম তদ্দেশ-প্রচলিত প্রথানুসারে পালন করিলে, তাহার বর্ণের যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে, তাহাও সহোদরদ্বয়ের শ্যামাঙ্গ গৌরাঙ্গ হইবার মত। শ্বেতদ্বীপে বহুবর্ষ পুরুষানুক্রমে বাস করিলেও শোণিতসম্বন্ধ ব্যতীত কাফ্রীজাতি তদ্দেশীয়ের ন্যায় বর্ণলাভ করিতে পারিবে না। শোণিতসম্বন্ধেও বহুপুরুষ পরে আনুপাতিক অল্পতালাভ করিয়া, ক্রমে পূর্ব্ববর্ণ অদৃশ্য হয়। বিভিন্ন শোণিতসম্বন্ধে আপাততঃ এক অভিনব বর্ণ উৎপন্ন হয়; পরে তজ্জাতীয় শোণিত বহুপুরুষ পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে সংসৃষ্ট হইলে, বর্ণান্তর পরিত্যাগ পূর্ব্বক তদ্বর্ণপ্রাপ্তি হওয়া সম্ভব। বর্ত্তমান ভারতীয় সমাজে আর্য্য ও অনার্য্য-শোণিতের বহুকালবর্ত্তী সংমিশ্রণের ফলে শ্বেতাভ কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হইতেছে। বহুপূর্ব্ব হইতেই এই ব্যাপারের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, পরে প্রদর্শিত হইবে। ফলতঃ জন্ম অর্থাৎ শুক্রশোণিতসম্বন্ধই বর্ণপার্থক্যের কারণ; দেশ, কাল, আহার, পরিচ্ছদাদি সহকারী মাত্র। এতাবৎকাল আমরা জন্মানুসারে জাতিব্যবস্থার আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি অন্যবিধ আন্দোলনে অগ্রসর হইতে হইবে।

গুণ কর্ম্মানুসারে বর্ণভেদ শাস্ত্রের বিষম রহস্য। এই রহস্যের গভীর তলদেশ দর্শন অসম্ভব হইলেও, উহাই জাতিতত্ত্বের প্রধান আলোচ্য বিষয়। কিন্তু এখানে স্মরণ রাখা আবশ্যক, গুণ-কর্ম্মানুসারে বর্ণভেদ কেবল চতুর্ব্বর্ণ সম্বন্ধেই পাওয়া যায়।

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"
(গীতা ৪।১৩।)

গুণ-কর্ম্মের বিভাগানুসারে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ আমি সৃষ্টি করিয়াছি; ইহা শ্রীভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীমুখের উক্তি। "গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" এই অংশই এখানকার সংশয়-তরঙ্গমালার একমাত্র নিদান।

কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন "গুণকর্ম্মবিভাগাভ্যাং সহ"। তাঁহাদের মতের তাৎপর্য্য গুণকর্ম্মানুসারে জাতিভেদ নহে। ভগবান্ বলিতেছেন—"আমি গুণকর্ম্মবিভাগের সহিত চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি করিয়াছি। কেবল বর্ণ সৃষ্টি করিয়াই নিরস্ত হই নাই, তাঁহাদের গুণ ও কর্ম্মবিভাগও আমি করিয়াছি।" ইহাতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি যেমন হউক্ না কেন, ভগবান্ তাঁহার গুণ-কর্ম্ম নির্দ্দেশ

করিয়াছেন। অন্ত বর্ণ ব্রাহ্মণের গুণ পাইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণ হইতে পারে না, এইরূপ বুঝা যায়। আমরা এ ব্যাখ্যার সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারি না; কারণ ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ পক্ষ।

শঙ্করাচার্য্য ভাষ্যে বলেন, "গুণবিভাগশঃ কর্ম্মবিভাগশশ্চ, গুণাঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি, তত্র সাত্ত্বিকস্য সত্ত্বগুণপ্রধানস্য ব্রাহ্মণস্য শমোদমস্তপ ইত্যাদীনি কর্ম্মাণি; সত্ত্বোপসর্জ্জনরজঃপ্রধানস্য ক্ষত্রিয়স্য শৌর্য্যতেজ-প্রভৃতীনি; তমউপসর্জ্জনরজঃপ্রধানস্য বৈশ্যস্য কৃষ্যাদীনি; রজউপসর্জ্জনতমঃপ্রধানস্য শূদ্রস্য শুশ্রূষৈব কর্ম্ম, ইত্যেবং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।" সত্ত্বগুণ, ও শম দম ইত্যাদি ব্রাহ্মণের কর্ম্ম। এই গুণকর্ম্মবিভাগানুসারে জাতিবিভাগ; অর্থাৎ এতাদৃশ গুণ ও কর্ম্মসম্পন্ন ব্যক্তিকেই ব্রাহ্মণজাতি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি। ইহার অর্থ অনেকাংশে সঙ্গত; যেহেতু শাস্ত্রান্তরে "কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতং" অর্থাৎ কর্ম্মানুসারেই বিভিন্ন বর্ণপ্রাপ্তি হইয়াছে, এইরূপ দেখা যাইতেছে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কে কীদৃশ গুণসম্পন্ন হইবেন, তাহা আলোচিত হইবে। এখন টীকাকারগণের মত পর্য্যালোচনা করা যাউক। শ্রীমৎ আনন্দগিরি বলেন, "গুণবিভাগেন কর্ম্মবিভাগস্তেন।" গুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, ইহাদের পার্থক্য অনুসারে যে কর্ম্মের (শম-দম, যুদ্ধ, কৃষি প্রভৃতির) পার্থক্য, তদ্দ্বারা চারিজাতি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি, এইরূপ গিরিমহাশয়ের মতের অর্থ। অনেক বচনের সংহিত একবাক্যতা হয়, এইজন্য গিরির ব্যাখ্যা সমধিক সঙ্গত বোধ হয়।

শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যাও শঙ্করের মতের অভিন্ন। গিরি শঙ্করের ভাষ্যের টীকাকার। স্বামী মূলের টীকা করিলেও, ভাষ্য ও গিরিকৃত টীকা পর্য্যালোচনা করিয়াই যে তিনি টীকা করিয়াছেন, একথা তাঁহার নিজোক্তিতেই জানা যায়; অতএব গুণানুযায়ী কর্ম্মঅনুসারে বিভিন্ন জাতিচতুষ্টয় উৎপন্ন হইয়াছে, ইঁহাদের সকলেই এই মতের সমর্থক। পরে যুক্তির চর্চ্চা করা যাইবে। গুণ তিনটী; সত্ত্ব, রজ ও তম। মানব কেন, জগতের যাবতীয় বস্তুজাতই এই ত্রিগুণের সংযোগে উৎপন্ন। প্রত্যেক শরীরই তিন গুণের সংযোগে উৎপন্ন। প্রত্যেক শরীরেই তিনগুণ আছে, তবে যে দেহে যে গুণের আতিশয্য দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি তদ্‌গুণাবলম্বী বলিয়া বিবেচিত হয়। মহর্ষি মনু বলেন,—

> যো যদৈষাং গুণো দেহে সাকল্যেনাতিরিচ্যতে।
> স তদা তদ্‌গুণপ্রায়ং তং করোতি শরীরিণম্।

সত্ত্বগুণের আধিক্যে মানব সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হইবে; আবার রজঃপ্রকৃতির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইলে রাজস হইবে। অধুনা দেখা যাউক, সত্ত্ব প্রভৃতি গুণের লক্ষণ কি? সত্ত্বগুণের পরিচয় পাইব কি উপায়ে?

মহামান্য মনুসংহিতায় দেখা যাইতেছে—

> বেদাভ্যাসস্তপো জ্ঞানং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
> ধর্ম্মক্রিয়াত্মচিন্তা চ সাত্ত্বিকং গুণলক্ষণম্॥ ১২। ৩১

যৎসর্ব্বেণেচ্ছেতি জ্ঞাতুং যন্ন লজ্জতি চাচরন্।
যেন তুষ্যতি চাত্মাস্য তৎসত্ত্বগুণলক্ষণম্॥
১২।৩৭২

আরম্ভরুচিতা ধৈর্য্যমসৎকার্য্যাপরিগ্রহঃ।
বিষয়োপসেবা চাজস্রং রাজসং গুণলক্ষণম্॥১২৩

যেনাস্মিন্ কর্ম্মণা লোকে খ্যাতিমিচ্ছতি পুষ্কলাম্। যচ্চ শোচত্যসম্পত্তৌ তদ্বিজ্ঞেয়ন্তু রাজসম্॥১২।৩৬

লোভঃ স্বপ্নোঽধৃতিঃক্রৌর্য্যং নাস্তিক্যং ভিন্নবৃত্তিতা। যাচিষ্ণুতা প্রমাদশ্চ তামসং গুণলক্ষণম্॥ ১২।৩৩

যৎকর্ম্ম কৃত্বা কুর্ব্বংশ্চ করিষ্যংশ্চৈব লজ্জতি।
তজ্জ্ঞেয়ং বিদুষা সর্ব্বং তামসং গুণলক্ষণম্ ১২।৩৫

তমসো লক্ষণং কামো রজসস্ত্বর্থ উচ্যতে।
সত্ত্বস্য লক্ষণং ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠমেষাং যথোত্তরম্॥১২।৩৮

মানবীয় সত্ত্বগুণের লক্ষণ, বেদাভ্যাস, তপ, জ্ঞান, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধর্ম্মকার্য্য, আত্মচিন্তা ইত্যাদি। রাজসগুণলক্ষণ—আরম্ভপ্রিয়তা, অধৈর্য্য, অসৎকার্য্য, পরিগ্রহ, সর্ব্বদা বিষয়সেবা, খ্যাতিজনক কর্ম্মানুষ্ঠান ও দৈন্যাবস্থায় শোকপ্রকাশ ইত্যাদি। তমোগুণের লক্ষণ—লোভ, স্বপ্ন, অধৈর্য্য, নাস্তিকতা, অনধিকারকার্য্য করা, যাচ্ঞাশীলতা, প্রমাদ, লজ্জাকরকর্ম্ম করা ইত্যাদি। প্রধানতঃ ধর্ম্মই সত্ত্বগুণের লক্ষণ, রজোগুণের লক্ষণ অর্থ; এবং কাম বা কামনাই তমোগুণের লক্ষণ।

ক্রমশঃ—

শ্রীনির্ম্মলানন্দ ভারতী।
যশোহর।

কাল্যপরাধ-ক্ষমাপণ-স্তোত্রম্।

(শঙ্করাচার্য্য-কৃতম্।)

(১)

প্রাগ্দেহস্থো যদাহং তব চরণযুগং নাশ্রিতং নার্চ্চিতং মে,
তেনাহং দুঃখবর্গৈর্জঠরজননজৈর্বাধ্যমানো বলিষ্ঠৈঃ।
নীত্বা জন্মান্তরং মে পুনরিহ ভবিতা কাশ্রয়ো নেতি জানে,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে॥

পূর্ব্ব জন্মে কখনই তব শ্রীচরণ
আশ্রয় না করিয়াছি, অথবা অর্চ্চন।
তাই মাগো! মাতৃগর্ভে করিয়া প্রবেশ,
জঠর-যন্ত্রণা আমি সহিনু অশেষ।
পর জন্মে কোথা গিয়া লইব আশ্রয়,
তাহার কিছুই আমি না জানি নিশ্চয়।
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
ক্ষমা কর অপরাধ আমার জননি!

(২)

বাল্যে বালাভিলাষৈর্জড়িত জড়মতির্বাললীলাপ্রসক্তো,
ন ত্বাং জানামি মাতঃ কলিকলুষহরাং ভোগমোক্ষৈকদাত্রীম্।
নাচারো নাপি পূজা ন চ যজনকথা ন শ্রুতির্নৈব সেবা,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে॥

বাল্যকালে বাল্যকাল-সুলভ-ইচ্ছায়
জড়িত হইয়া ছিনু জড়বৃদ্ধি তায়।
কলি-পাপ-হরা ভোগ-মোক্ষ-বিধায়িনী
তোমারে না চিনিলাম কভু গো জননি!
আমার আচার নাই, পূজাও না হয়,
পূজার কথাও কভু মনে নাহি হয়।
শাস্ত্রজ্ঞান কিছু নাহি জন্মিল আমার,
সেবাও না করিলাম কদাপি তোমার।
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
ক্ষমা কর অপরাধ আমার জননি!

(৩)

প্রাপ্তোঽহং যৌবনং তৎ বিষধরসদৃশৈরিন্দ্রিয়ৈর্দষ্টগাত্রো,
নষ্টপ্রজ্ঞঃ পরস্ত্রী-পরধন-হরণে সর্ব্বদা সাভিলাষঃ।
ত্বৎপাদাম্ভোজযুগ্মং ক্ষণমপি মনসা ন স্মৃতোঽহং কদাপি,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে॥

যৌবন সময়ে পঞ্চ ইন্দ্রিয়-ভুজঙ্গ
দংশন করিল মাগো! এই মোর অঙ্গ।
অমনি চৈতন্য মোর পাইল বিনাশ,
পরস্ত্রীতে পরধনে হ'ল অভিলাষ।
হায়রে শ্রীপাদপদ্ম যুগল তোমার
স্মরণ না করিলাম কভু একবার!
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
ক্ষমা কর অপরাধ আমার জননি!

(৪)

প্রৌঢ়ে ভিক্ষাভিলাষী সুতদুহিতৃকলত্রার্থমন্নাদিচেষ্টঃ,
ক প্রাপ্স্যামি ক যামীত্যনিশমনুদিনং চিন্তয়া জীর্ণদেহঃ।
নো তে ধ্যানং ন চাস্থা ন চ ভজনবিধির্নাম-সঙ্কীর্ত্তনং বা;
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে॥

প্রৌঢ়কালে পুত্র-কন্যা-ভার্য্যার কারণ,
অন্ন বস্ত্র হেতু মোর ব্যস্ত ছিল মন।
কোথা যাব, কোথা পাব, ভাবি নিরন্তর,
জীর্ণ শীর্ণ হ'য়ে গেল মোর কলেবর।
চিন্তা নাহি করিলাম বারেক তোমার,
চিন্তা করিতেও শ্রদ্ধা না ছিল আমার।
না করিনু কভু হায় তোমার ভজন,
না করিনু কভু তব নাম-সংকীর্ত্তন।
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
ক্ষমা কর অপরাধ আমার জননি!

(৫)

বৃদ্ধত্বে বুদ্ধিহীনঃ কৃশবিবশতনুঃ শ্বাসকাশাতিসারৈঃ,
কর্ণঘ্রাণাক্ষিহীনঃ প্রগলিতদশনঃ ক্ষুৎপিপাসাভিভূতঃ।
পশ্চাত্তাপেন দগ্ধো মরণমনুদিনং ধ্যেয়মাত্রং ন চান্যৎ,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে॥

বৃদ্ধকালে বুদ্ধিটুকু না রহিল আর,
আসিয়া যুটিল কাশ-শ্বাস-অতিসার।
অবশ হইল অঙ্গ, হলো অতি ক্ষীণ,
হইলাম চক্ষু-কর্ণ-ঘ্রাণ-শক্তিহীন।
দন্তগুলি একে একে খসিয়া পড়িল,
ক্ষুধা-তৃষ্ণা আসি মোরে চাপিয়া ধরিল।
অনুতাপানল শেষে দহিল আমার,
চিন্তিনু মরণ-চিন্তা না চিন্তি তোমায়।
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
ক্ষমা কর অপরাধ আমার জননি!

(৬)

কৃত্বা স্নানং দিনাদৌ কচিদপি সলিলং নাহৃতং নৈব পুষ্পং,
নো নৈবেদ্যাদিচেষ্টা কচিদপি চ কৃতা নৈব ভাবো ন ভক্তিঃ।
ন ন্যাসো নৈব পূজা ন চ গুণকথনং নাপি চর্চ্চা কৃতা তে!
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে॥

প্রাতঃকালে করি স্নান তোমায় কখন
পুষ্প-জল দিয়া নাহি করিনু অর্চ্চন।
নৈবেদ্যাদি সংগ্রহেও নাহি ছিল মতি,
না ছিল সাত্ত্বিক ভাব, না ছিল ভকতি।
কিবা ন্যাস, কিবা পূজা, গুণ-সঙ্কীর্ত্তন
কোনরূপ চর্চ্চা নাহি করিনু কখন।
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
ক্ষমা কর অপরাধ আমার জননি!

(৭)

জানামি ত্বাং ন চাহং ভবভয়শমনীং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাত্রীং,
নিত্যানন্দোদয়েশীং নিগমফলময়ীং নিত্যলীলাদয়াঢ্যাম্।
মিথ্যাকার্য্যাভিলাষৈরনুদিনমভিতঃ পীড়িতো দুঃখসংঘৈঃ,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে॥

সর্ব্ব-সিদ্ধি-দাত্রী ভব-ভয়-বিনাশিনী,
বেদ-সারভূতা নিত্য-আনন্দ-দায়িনী।
নিরন্তর লীলাময়ী করুণা-শালিনী।
চিনিতে না পারিলাম তোমায় জননি!
দিন দিন বৃথা কার্য্যে সঁপে দিয়া মন,
জীর্ণ শীর্ণ হ'য়ে আমি পড়িনু এখন।
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
ক্ষমা কর অপরাধ আমার জননি!

(৮)

কালাভ্রশ্যামলাঙ্গী বিগলিতচিকুরা খড়্গমুণ্ডাভিরামা,
ত্রাসত্রাণেষ্টদাত্রী কুণপকুলশিরোমালিনী দীর্ঘনেত্রা।
সংসারস্যৈকসারা মনসি ন চ কদা ভাবিতা ভাবনাভিঃ,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে॥

শ্যামল-জলদ-সম-শ্যামাঙ্গ-ধারিণী,
মুক্তকেশী, খড়্গ-মুণ্ড-মানস-মোহিনী,
ভক্ত-ভয়-বিনাশিনী, ইষ্ট-বিধায়িনী,
দুর্জ্জয়-রাক্ষসগণ-মস্তক-মালিনী,
ত্রিসংসার-সারভূতা, আয়ত লোচনা,
চিন্তিতে তোমারে নাহি জন্মিল বাসনা।
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
ক্ষমা কর অপরাধ আমার জননি!

(৯)

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথেশঃ পরিণমতি সদা ত্বৎপদাম্ভোজযুগ্মং,
ভাগ্যাভাবান্ন চাহং ভবজননি ভবৎপাদপদ্মং ভজামি।
নিত্যং লোভৈঃ প্রমোহৈঃ কৃতবিবশমতিঃ কামুকস্ত্বাং প্রযাচে,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে॥

কিবা ব্রহ্মা, কিবা বিষ্ণু, কিবা মহেশ্বর,
তব পাদ-পদ্ম-যুগ সেবনে তৎপর।
পরম দুর্ভাগা আমি, তাই গো জননি!
তব পাদ-পদ্ম নাহি পূজিনু কখনি।

লোভ-মোহ-বশে আমি পার্কিয়' সদাই,
হইনু বিকৃতবুদ্ধি,—তাই ভিক্ষা চাই,—
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
ক্ষমা কর অপরাধ আমার জননি!

(১০)

রাগদ্বেষৈঃ প্রমত্তঃ কলুষযুততনুঃ কামভোগ-
প্রলুব্ধঃ,
কার্য্যাকার্য্যাবিচারী কুলমতিরহিতঃ কৌল-
সংঘৈর্বিহীনঃ।
ক ধ্যানন্তে ক চর্চ্চা ক চ মনুজপনং নৈব
কিঞ্চিৎ কৃতং মে;
ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতবদনে কাম-
রূপে করালে॥

রাগ-দ্বেষে মত্ত, পাপ-পূর্ণ কলেবর,
নানা কাম্য-বস্তু ভোগে লুব্ধ নিরন্তর।
হিতাহিত-বিচারের না আছে শকতি,
তন্ত্রোক্ত আচার নাই, নাই ত'য মতি।
কিবা ধ্যান, কিবা পূজা, মন্ত্রজপ আর,
কিছুই না করিলাম কদাপি তোমার।
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
ক্ষমা কর অপরাধ আমার জননি!

(১১)

রোগী দুঃখী দরিদ্রঃ পরবশকৃপণঃ পাংশুলঃ
পাপচেতা
নিদ্রালস্যপ্রসক্তঃ স্বজঠরভরণে সর্ব্বদা
ব্যাকুলাত্মা।
কিং তে পূজাবিধানং ক চ মনুজপনং
কানুরাগঃ ক চাস্য,
ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতবদনে কাম-
রূপে করালে॥

কিসে তব পূজা করি, মন্ত্র জপি আর,
কিসে বা অনুরাগ দেখাই তোমার!
করিতে তোমার কার্য্য মন নাহি সরে,
ছট্ ফট্ করে প্রাণ উদরের তরে!
রোগী দুঃখী পরাধীন অবোধ নির্ধন,
পাপিষ্ঠ কুমনা নিদ্রালস্য পরায়ণ!
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
ক্ষমা কর অপরাধ আমার জননি!

(১২)

মিথ্যাব্যামোহরাগৈঃ পরিবৃতমনসঃ ক্লেশ-
সংঘাবৃতস্য,
ক্ষুন্নিদ্রাম্বিতস্য শ্রবণবিরহিণঃ পাপকর্ম্ম-
প্রবৃত্তেঃ।
দারিদ্রস্য ক ধর্ম্মঃ ক চ ভজনবিধিঃ ক
স্থিতিঃ সাধুসঙ্গে;
ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতবদনে কাম-
রূপে করালে॥

মিথ্যা মোহ-অনুরাগে মুগ্ধ মোর মন,
নানাবিধ ক্লেশে আমি ক্লিষ্ট অনুক্ষণ।
ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিদ্রা ল'য়ে ব্যাপৃত সদাই,
তত্ত্ব-কথা-শ্রবণেও শ্রদ্ধা মোর নাই।
পাপ-কর্ম্মে লিপ্ত আমি, পরম নির্ধন,
ভজনেতে সাধুসঙ্গে ধর্ম্মে নাহি মন।
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
ক্ষমা কর অপরাধ আমার জননি!

মাতস্তাতস্য দেহাজ্জননিজঠরগস্থাবদালক্ক
দেহ-
স্ত্বং কর্ত্রী কারয়িত্রী করুণগুণময়ী কর্ম্ম-
হেতুস্বরূপা।
ত্বং বুদ্ধিশ্চিত্তসংস্থা জগদিদমখিলং ত্বামৃতে
নাস্তি মাতঃ।
ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতবদনে কাম-
রূপে করালে॥

পিতার শরীর হতে জনম লভিয়া,
মাতৃগর্ভে রহিলাম শয়ন করিয়া।

তার পর তথা হ'তে দেখিনু সংসার ;
তুমিই স্বয়ং কর, করাও আবার!
তুমি দয়াময়ী, কর্ম্ম-হেতু-স্বরূপিণী,
তুমিই স্বয়ং বুদ্ধি-চিত্ত নিবাসিনী।
তোমা বিনা মাগো! এই অনন্ত ভুবন
থাকিতে না পারে হায় কিছুতে কখন!
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
ক্ষমা কর অপরাধ আমার জননি!

(১৪)

ত্বং ভূমিস্ত্বং জলোঘস্ত্বমসি হুতবহো-
গন্ধবাহস্ত্বমেব
ত্বঞ্চাকাশো মনশ্চ প্রকৃতিরপি মহৎপূর্ব্বিকা-
হহঙ্কৃতিশ্চ।
আত্মাপ্যোবাসি মাতঃ পরমিহ ভবতী
ত্বৎপরং নৈব কিঞ্চিৎ ;
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কাম-
রূপে করালে॥

তুমি ভূমি, তুমি জল, তুমিই অনল,
তুমি বায়ু, তুমি পুনঃ আকাশ-মণ্ডল,
তুমিই মহৎতত্ত্ব, তুমিই প্রকৃতি,
তুমি মন, তুমি আত্মা, তুমি অহঙ্কৃতি।
তুমিই সংসারে মাগো! একমাত্র সার,
তোমা বিনা সার বস্তু কিছু নাই আর!
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
ক্ষমা কর অপরাধ আমার জননি!

(১৫)

ত্বং কালী ত্বঞ্চ তারা ত্বমসি গিরিসুতা সুন্দরী
ভৈরবী ত্বং,
ত্বং দুর্গা ছিন্নমস্তা ত্বমসি চ ভুবনা ত্বঞ্চ লক্ষ্মীঃ
শিবা ত্বম্।
মাতঙ্গী ত্বঞ্চ ধূমা ত্বমসি চ বগলা মঙ্গলা
হিঙ্গুলাগ্যা,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কাম-
রূপে করালে॥

তুমি কালী তারা দুর্গা ভৈরবী সুন্দরী,
তুমি লক্ষ্মী ছিন্নমস্তা ত্রিভুবনেশ্বরী,
তুমি গিরিসুতা ধূমা শিবানী বগলা,
তুমিই মাতঙ্গী তুমি মঙ্গলা হিঙ্গুলা।
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
ক্ষমা কর অপরাধ আমার জননি!

(১৬)

স্তোত্রেণানেন দেবীং পরিণমতি জনো যঃ
সদা ভক্তিযুক্তো,
দুষ্কীর্ত্তিং দুর্গসংঘং পরিভবতি সদা বিঘ্নতা-
নাশমেতি।
নাধির্ব্যাধিঃ কদাচিৎ ভবতি যদি পুনঃ
সর্ব্বদা সাপরাধঃ
সর্ব্বং তৎ কামরূপা ত্রিভুবনজননী ক্ষাময়েৎ
পুত্রবুদ্ধ্যা॥

ভক্তিভরে এই স্তব পঠি মনে মনে,
যে জন প্রণাম করে দেবীর চরণে,
দুর্গতি দুষ্কর্ম্ম তার সব দূরে যায়,
যত কিছু বিঘ্ন তার সকলি পলায়।
আধি ব্যাধি কিছু তার না থাকে কখন;
যদিও তাহার দোষ রহে সর্ব্বক্ষণ,
তবু সেই কামরূপা ত্রিলোক-জননী
তার প্রতি তুষ্ট থাকি দিবস-যামিনী,
আপনার পুত্র বলি ভাবিয়া তাহায়,
মার্জ্জনা করেন তার দোষ সমুদায়।

(১৭)

জেতা শক্ত্যা কবীনাং ভবতি ধনপতির্জ্ঞান-
শীলো দয়াত্মা,
নিষ্পাপো নিষ্কলঙ্কঃ কুলমতিকুশলঃ সত্যবাক্
ধার্ম্মিকশ্চ।

নিত্যানন্দো গুণাঢ্যঃ পশুজমিবিমুখঃ সং-
পথাচারশীলঃ,
সংসারাব্ধিং সুখেন প্রতরতি গিরিজাপাদ-
পদ্মাবলম্বাৎ ॥

পার্ব্বতীর পাদ পদ্মে যে লয় আশ্রয়,
নিজবলে রিপুগণে সেই করে জয়।
ধনবান্ জ্ঞানবান্ দয়াবান্ হয়,
পাপ নাহি থাকে তার, কলঙ্ক না রয়।
কুলাচার-যুত সদা, সত্য-পরায়ণ,
সুধার্ম্মিক, সদানন্দ, গুণ-নিকেতন।
মূর্খের সংসর্গে তার নাহি থাকে মতি,
নিরন্তর থাকে তার সাধুপথে গতি।
সংসার-সাগর এই অগাধ অপার,
অনায়াসে সেই জন হ'য়ে যায় পার।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর
বি, এ,

সামবেদ সংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ।)

অথ চতুর্থী।

(মন্ত্রঃ প্রার্থয়তে)

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
অগ্নি রুক্থে পুরোহিতো গ্রাবাণো বর্হিরধ্বরে।
৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ৩
ঋচা যামি মরুতো ব্রহ্মণস্পতে দেবা অবো
১ ২
বরেণ্যম্। ৪ ॥

উক্থে—স্তোত্র শাস্ত্রাত্মকে—স্তবরূপ শাস্ত্রাত্মকে।

অধ্বরে—হিংসা রহিতে অস্মিন্ যজ্ঞে (১)

অগ্নিঃ পুরোহিতঃ—যজ্ঞাৎ পুরস্তাৎ উত্তর-বেদ্যাং ঋত্বিগ্ভির্নিহিতোভূৎ—যজ্ঞের সম্মুখে উত্তরবেদীতে ঋত্বিক্গণ কর্ত্তৃক নিহিত হইয়াছিলেন। (পুরোহিত অর্থ সম্মুখে স্থিত।)

(১) ভগবান্ সায়নাচার্য্য যজ্ঞ মাত্র হিংসারহিত, এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। পশুহনন ব্যতিরেকে যজ্ঞ সম্পন্ন হয়না এবং তজ্জন্যই "অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত" এই শ্রুতিবাক্য আছে। কিন্তু উহা রাজসী বৃত্তি—
"হিংসাচৈব ন কর্ত্তব্যা বৈধহিংসা তু রাজসী।
ব্রাহ্মণৈঃ সন কর্ত্তব্যাং যতস্তে সাত্ত্বিকামতাঃ ॥"
বাচস্পত্যাভিধানধৃত (হিংসা শব্দ ব্যাখ্যানে) বৃহন্নারদ্ধৃত বচনং।

যদি হিংসা দোষ না হইত, তাহা হইলে "মা হিংসাৎ সর্ব্বভূতানি" এরূপ শ্রুতি থাকিত না। যাজ্ঞিকদিগের বৈধহিংসা কর্ত্তব্য কিন্তু পশুবধ-জনিত পাপ ভোগ করিতে হয়; তৎপরে যজ্ঞকর্ম্ম জন্য কিছুদিন স্বর্গ ভোগ করেন। ইহা আমার পূজ্যপাদ বিদিধাগুরণি গুরুদেব স্বামীজীরও মত; কারণ তিনি যৎকালে রেওয়াঁ রাজ্যে মহা-রাজার অনুরোধ ক্রমে কিছু দিনের জন্য বাস করেন, তখন মহারাজ রঘুরাজ সিংহ যজ্ঞ কামনা করেন। স্বামীজী জানিতে পারিয়া, ভাবি হিংসা জন্য, রাজ্য হইতে এক ক্রোশ দূরে গিয়া বাস করেন। মহা-রাজ জানিতে পারিয়া স্বামীজীর নিকট গিয়া রাজ্য-ত্যাগ-কারণ জিজ্ঞাসা করেন। স্বামীজী কহেন "আমি বৈষ্ণব, আমার স্বর্গ-কামনা নাই"। মহারাজ কহেন "সভা-পণ্ডিতের আদেশ ক্রমে করিতেছি"। স্বামীজী কহেন—"আপনি স্বর্গ ভোগ করি-বেন, কিন্তু প্রথমে পশু-হনন পাপ জন্য নরক ভোগ করিতে হইবে; আরও এ যজ্ঞ

প্রাবাণঃ—সোমাভিষবার্থং পুরতো নিহিত ইত্যর্থঃ—সোমে সিক্তিত করিবার জন্য অগ্রে রক্ষিত প্রস্তর সকল।

বর্হিশ্চ পুরতো নিহিতং আসাদিতং—দর্ভাসনও অগ্রে রক্ষিত হইয়াছে।

হে মরুতঃ—একোনপঞ্চাশন্মরুদ্গণাঃ!

হে ব্রহ্মণস্পতে—স্তোত্রস্য পালক।

হে দেবাঃ—দ্যোতনাদিগুণযুক্তা ইন্দ্রাদয়ঃ!

বরেণ্যং—বরণীয়ং—ভজনীয়ম্।

অবঃ—রক্ষণম্।

ঋচা—স্তুক্তরূপয়া স্তুত্যা।

য়ামি—যাচামি (বর্ণলোপশ্ছান্দসঃ—ছন্দ জন্য বর্ণ লোপ করা হইয়াছে) প্রার্থনা করিতেছি।

স্তোত্র শাস্ত্রাত্মক, হিংসাবর্জিত এই যজ্ঞে অগ্নিদেব পুরোহিত হইয়াছেন; সোম সিঞ্চন করিবার জন্য প্রস্তর সকল পুরোহিত হইয়াছে; দর্ভাসনও পুরোহিত হইয়াছে। হে মরুদ্গণ! হে স্তোত্রপালক! হে দ্যোতনাদিগুণযুক্ত ইন্দ্রাদি দেবগণ! তোমাদিগের নিকট স্তুক্তরূপ স্তুতিদ্বারা এই প্রার্থনা করি যে, আমাদিগের এই সকল দ্রব্যগুলি এইরূপে রক্ষা কর, যাহাতে ভজনীয়ই থাকে। ৪॥

সম্পূর্ণ হইবে না"; পরিশেষে আচার্য্যকে কহেন যে "আপনি লোভে মহারাজকে পাপে প্রেরণা করিতেছেন, কিন্তু সেই পাপ আপনাকে ভোগ করিতে হইবে।" স্বামীজী পরদিন প্রত্যূষে রাজ্য ত্যাগ করিয়া প্রয়াগ গমন করেন। মহারাজ যজ্ঞ আরম্ভ করেন—সাতলক্ষ মুদ্রা যজ্ঞে ব্যয় হয়; তন্মধ্যে তিনলক্ষ আচার্য্য প্রাপ্ত হন; কিন্তু যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় নাই। আচার্য্য যজ্ঞায় অগ্নিশিখা-বেষ্টিত হইয়া দগ্ধ হন।

অথ পঞ্চমী।

(সুদীতি ঋষিঃ পুরুমীঢ়ো বা)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অগ্নি মীড়িষ্বাবসে গাথাভিঃ শীর শোচিষম্।
৩ ১ ৩ ১ ২ ৩২উ ৩ ১
অগ্নি এ রায়ে পুরুমীঢ় শ্রুতং নরোঽগ্নিঃ
২ ৩ ১ ২ ৩ ২
সুদীতয়ে ছর্দিঃ। ৫॥

হে পুরুমীঢ়! (এক ঋষির নাম)।

অগ্নিং অবসে—অগ্নিং রক্ষণায়।

ঈড়িষ্ব—স্তুহি গাথাভিঃ ইতি শেষঃ—গাথাদ্বারা স্তব কর। (গাথা অর্থাৎ মন্ত্ররূপ বাক্য দ্বারা)

শীর শোচিষং—শয়ন-স্বভাব সোচিষং—শয়ন স্বভাব প্রভাশালী, অর্থাৎ যে অগ্নির দীপ্তি উর্দ্ধদিকে না গিয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে)

রায়ে—ধনায়। নরঃ—অন্যেঽপি যজমানাঃ স্তুবন্তি স্বার্থং।

সুদীতয়ে—মহ্যং—আমাকে।

অগ্নিঃ ত্বয়া অভিষ্টুতঃ সন্ ছর্দিঃ গৃহং প্রযচ্ছতু।

হে পুরুমীঢ়! নিজের রক্ষার জন্য অগ্নিকে গাথাদ্বারা স্তব কর; সেই শয়ন-স্বভাব প্রভাশালী অগ্নিকে ধনের জন্য স্তব কর। শুন, অন্যান্য যজমানগণ আপন স্বার্থের জন্য তাঁহাকে স্তব করিতেছেন; তজ্জন্য অগ্নি তোমাকর্ত্তৃক স্তুত হইয়া আমাকে একটি গৃহ প্রদান করুন। ৫॥

অথ ষষ্ঠী।

(প্রাকণ্ব ঋষিঃ)।

৩ ১ ২ ৩ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
শ্রুধি শ্রুৎ কর্ণ বহ্নিভির্দেবৈরগ্নে সয়াবভিঃ।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
আসীদতু বর্হিষে মিত্রো অর্য্যমা প্রাত-
১ ২ ৩ ২
র্য্যাবভিরধ্বরে ॥ ৬ ॥

হে শ্রুৎকর্ণ!—শ্রবণসমর্থাভ্যাং কর্ণাভ্যাং যুত!

হে অগ্নে!

শ্রুধি—শৃণু। যঃ মিত্রঃ অর্য্যমা দেবশ্চ।

অগ্নৈঃ প্রাতর্যাবভিঃ—প্রাতঃকালে দেবযজনং গচ্ছদ্ভিঃ।

দেবৈঃ—সর্ব্বৈঃ দেবৈঃ ইত্যর্থঃ।

সয়াবভিঃ—আহবনীয়াগ্নিনা ত্বয়া সমান গতিভিঃ।

বহ্নিভিঃ—অগ্নৈঃ বহ্নিভিঃ দেবৈশ্চ সহ।

অধ্বরে—ক্রতু নিমিত্তে ইত্যর্থঃ।

বর্হিষি—দর্ভে।

আসীদতু—উপবিশতু—উপবেশন করুন।

হে শ্রবণসমর্থ কর্ণযুক্ত অগ্নি! তুমি আমাদের বাক্য শ্রবণ কর। যাঁহারা প্রাতঃকালে দেবযজন-স্থানে গমন করিয়া থাকেন, সেই সকল দেবগণের সহিত ও তোমার সমান গতিশীল অন্যান্য বহ্নিগণ সহিত মিত্রদেব ও অর্য্যমাদেব আমাদের যজ্ঞ-নিমিত্ত রক্ষিত এই কুশাসনে উপবেশন করুন। ৬ ॥

অথ সপ্তমী।

(সৌভিরি ঋষিঃ)

১২ ২র ৩ ২ ৩ ২উ ৩ ২
প্র দৈবোদাসো অগ্নির্দেব ইন্দ্রো ন
৩ ১ ২
মজ্মনা।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১র
অনু মাতরং পৃথিবীং বিবাবৃতে তস্থৌ
২র ১ ২
নাকস্য শর্ম্মণি ॥ ৭॥

দেবঃ—দ্যোতমানঃ। ইন্দ্রঃ—পরমৈশ্বর্য্যযুক্তঃ।

দৈবোদাসঃ—দিবোদাসেনাহূয়মানঃ অগ্নিঃ—দিবোদাস দ্বারা আহূয়মান অগ্নি।

মাতরং—সর্ব্বস্য লোকস্য ধারণাৎ পৃথিবী-মাতা তাং পৃথিবীং অনু প্রবিবাবৃতে দেবান্ প্রতি হবির্বোঢ়ুং বিশেষেণ প্রবর্ত্তয়তি—সমুদয় লোক ধারণ বশতঃ পৃথিবী-মাতা—সেই পৃথিবীকে—ইন্দ্রাদি দেবতার নিকট হবি বহন করিতে বিশেষরূপে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন।

মজ্মনা—বলেন আজুহাব—বলপূর্ব্বক আহ্বান করিয়াছিলেন।

নাকস্য—স্বর্গস্য। শর্ম্মণি গৃহে স্বায়তন এব তস্থৌ—অতিষ্ঠৎ—ছিলেন।

দ্যোতমান পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত দিবোদাস ঋষি ইন্দ্রাদি দেবতার নিকট হবি বহন করিবার জন্য মাতা পৃথিবীকে বিশেষরূপে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন; দিবোদাস অগ্নিকে বলপূর্ব্বক আহ্বান করিয়াছিলেন; সুতরাং অগ্নি স্বর্গের কল্যাণ-গৃহে অথবা নিজ আয়তন স্থানে পুনর্ব্বার আগমন করিয়াছিলেন ॥৭॥

অথ অষ্টমী।

(মেধাতিথি মেধ্যা তিথিশ্চ)।

২৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২৩১র ২র
অধ জ্মো অধবা দিবো বৃহতো রোচনাদধি
৩ ১ ২ ক২র ৩২উ ৩ ১ ২
অয়াবর্দ্ধস্ব তন্বা গিরা মমা জাতা সুক্রতে
পৃণ ॥৮॥

হে ইন্দ্র!

অধ—অধুনা।

ভূমঃ—অমন্তি গচ্ছন্ত্যস্যামিতি ভূমা পৃথিবী তস্যাঃ সকাশাৎ—পৃথিবী হইতে।
অথবা—অপিবা—কিম্বা।
দিবঃ—অন্তরিক্ষাৎ।
বৃহতঃ—মহতঃ।
রোচনাৎ—নক্ষত্রৈর্দীপ্যমানাৎ স্বর্গাৎ বা আগত্য—স্বর্গ হইতে।
অধি – পঞ্চম্যর্থানুবাদোহয়ম্—অধিশব্দ পঞ্চমীর অর্থানুবাদ।
অয়া—অনয়া তন্বা—এই শরীর দ্বারা।
মম। গিরা—মদীয়য়া বিস্তৃতয়া স্তুত্যা—আমার বিস্তৃত স্তুতি দ্বারা।
বর্দ্ধাব—বৃদ্ধো ভব—বর্দ্ধিত হও। (অগ্নি দুই প্রকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন; এক শরীর দ্বারা—অর্থাৎ বেদী মার্জ্জনাদি ক্রিয়া দ্বারা, দ্বিতীয়তঃ স্তুতি দ্বারা।
হে সুক্রতো!—শোভন কর্ম্মবনিম্ন!
জাতা—জাতান্ অস্মদীয়ান্ জনান্—আমাদের হইতে উৎপন্ন প্রাণিগণকে পৃণ—অভিলষিতৈঃ ফলৈরাপূরয়—অভিলষিত ফল দ্বারা পূর্ণ কর। হে মহৈশ্বর্য্যশালী অগ্নি! অধুনা তুমি পৃথিবী হইতে, অথবা মহৎ অন্তরিক্ষ হইতে, কিম্বা নক্ষত্র দ্বারা দীপ্তিমান স্বর্গ হইতে আগমন কর ও আমার শরীর দ্বারা ও বিস্তৃত স্তুতি-বাক্য দ্বারা বর্দ্ধিত হও। হে শোভন কর্ম্মবান্! তুমি আমাদের হইতে উৎপন্ন প্রাণিগণকে অভিলষিত ফল দ্বারা পূর্ণ কর। ৮॥

অথ নবমী।

(বিশ্বামিত্র ঋষিঃ)

১ ২ ৩২উ ৩১র ২র ৩২
কাময়মানো বনা ত্বং যন্মাতৄরজগন্নপঃ।

বনা—বনানি—কাননানি।
কাময়মানঃ—ভক্ষিতুং কাময়মানঃ—ভক্ষণ করিতে ইচ্ছুক।
যৎ—যস্মাৎ কারণাৎ তানি বিহায়—যে কারণে তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া।
মাতৄঃ—মাতৃভূতা অপঃ—মাতৃভূতজল।
অজগন্—অগমঃ—গতবানসি; অপ্সু প্রবিষ্টত্বাৎ শান্তো বর্ত্তসে—জলে প্রবেশ হেতু শান্ত হইয়াছ।
তৎ—তস্মাৎ। তে—তব।
নিবর্ত্তনং—নিতরাং তত্রৈব বর্ত্তনং—সর্ব্বদা তথায় থাকা।
ন প্রমৃষে—ন প্রমৃষ্যতে—ন সহ্যতে—সহ্য করিতে পারি না।
যৎ—যস্মাৎ কারণাৎ।
দূরে সন্—দূরে অদৃশ্যতয়া বর্ত্তমানস্ত্বং—অদৃশ্য বশতঃ দূরে থাকাতে।
ইহ—অস্মৎ সম্বন্ধিষ্বরণী রূপেষু কাষ্ঠেষু—আমাদের অরণী কাষ্ঠে।
আভুবঃ—সমন্তাৎ ভবেঃ—মথনাৎ ক্ষণমাত্রেণাস্মাকং সমীপে ভবসি। মন্থন হেতু ক্ষণমাত্রেই আমাদের নিকটে হইয়াছ।

তস্মাৎ তব দূরতো বর্ত্তনং অস্মভ্যং
১র ২র ৩১২
রোচতে—তজ্জন্য (ন তৎ তে অগ্নে! প্রমৃষে
৩১২৩১৩২ ৩১ ২
নিবর্ত্তনং যদ্দূরে সন্নিহাভুবঃ ৯।। তোমার দূরে থাকা আমাদের ভাল লাগে না!

হে অগ্নি! তুমি বন সকল ভক্ষণ করিতে ইচ্ছুক, তথাপি ঐ সকল দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া মাতৃভূতজলে প্রবেশ-

করিয়া শান্ত হইয়া আছ। (১) তোমার তথায় ঐরূপ থাকা সহ্য করিতে পারি না; যেহেতু দূরে থাকাতে তুমি অদৃশ্য হইয়াছ। অদৃশ্য ভাবে দূরে থাকা বশতঃ অরণি হইতে ঈষৎ আবির্ভূত হইয়াছ।

অথ দশমী।

(কণ ঋষিঃ)

নিত্বামগ্নে মনুর্দধে জ্যোতির্জনায় শশ্বতে।
দীদেথ কণ্বঋতজাত উক্ষিতোয়ং
নমস্যন্তি কৃষ্টয়ঃ॥১০॥

জ্যোতিঃ—প্রকাশরূপং—প্রকাশরূপ-জ্যোতিঃ।

শশ্বতে—বহু বিধায় যজমানায়।

মনুঃ—প্রজাপতিঃ।

নিদধে—দেবযজনদেশে স্থাপিতবান্—দেবযজনস্থলে রাখিয়াছেন।

ঋতজাতঃ—তেন ঋতেন যজ্ঞেন নিমিত্ত ভূতেনোৎপন্নঃ—যজ্ঞের নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়া থাক।

উক্ষিতঃ—হবির্ভিস্তৃপ্তঃ সন্—হবির্দ্বারা তৃপ্ত হইয়া।

কণ্বে—এতন্নামকে মহর্ষৌ ময়ি—কণ্বনামে মহর্ষি-আমাতে।

দীদেথ—দীপ্তবানসি।

য়ং—অগ্নিং।

কৃষ্টয়ঃ—মনুষ্যাঃ।

নমস্যন্তি—নমস্কুর্ব্বন্তি। (সন্তমিতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ।)

ইতি সামবেদ সংহিতায়াং প্রথমাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

অগ্নি! (১) প্রজাপতি মনু বহুবিধ যজমানের জন্য তোমায় জ্যোতি দেবযজনস্থলে রাখিয়াছেন। তুমি যজ্ঞকার্য্যজন্য প্রাদুর্ভূত হইয়া থাক, তজ্জন্য এক্ষণ হবির্দ্বারা তৃপ্ত হইয়া কণ্ব আমাতে দীপ্ত হও। তুমি সেই অগ্নি, যাহাকে মানবগণ নমস্কার করিয়া থাকে।

(পঞ্চমখণ্ড সম্পূর্ণ।)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

---

(১) অগ্নি জলে কি প্রকারে প্রবেশ করিবে? কারণ উহারা পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মবান্; তজ্জন্য কারণাত্মক জল অর্থ করিলেই সুসঙ্গত হইবে। কারণাত্মক জলের বিষয় মনুসংহিতার প্রথমাধ্যায়ে সৃষ্টি-প্রকরণে বিবৃত আছে, যথা—

"ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদং।
মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীৎ
তমোনুদঃ ইত্যাদি"॥৬॥"

(১) অগ্নি শব্দে এখানে পঞ্চমহাভূতাত্মক অগ্নি অপেক্ষা "পরমাত্মা" অর্থ যুক্তিযুক্ত। অগ্নি শব্দে পরমাত্মা, যথা—

"অঙ্গয়তি প্রাপয়তি [illegible] কর্ম্মণঃ [illegible] ফলং ইতি অগ্নিঃ পরমাত্মা, প্রমাণং—বেদান্তদর্শনে, ১ম অধ্যায়ে—২য় পাদে—২৮শ সূত্রভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যঃ "অগ্নিশব্দোঽপ্যগ্রণীত্বাদি যোগাশ্রয়ণেন পরমাত্মবিষয় এব ভবিষ্যতি।"

তদ্ভিন্ন সম্মানাস্পদ শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় হিন্দুপত্রিকা প্রথমবর্ষের—২ পৃষ্ঠায় অন্যান্য ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন।

ঋগ্বেদ-৩য় মণ্ডল।

৩৪ সূক্ত।

ইন্দ্রদেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

পুরোভেদী জ্ঞাত বসু ইন্দ্র-চিরশত্রু হিংসু
তেজে দাসগণে তিনি করিলেন জয়।
ব্রহ্মাকৃষ্ট, ভুরিদাত্র প্রবর্দ্ধিত যাঁর গাত্র,
পূরিত তাঁহার দ্বারা রোদসী উভয়॥ ১
হে ইন্দ্র! বলিন্ পূজিত! তোমায় করি ভূষিত,
অন্নাশায় তব স্তুতি করি উচ্চারণ।
মনুজাত মানুষের অথবা দৈব বিশের,
সকলের অগ্রে তুমি করহ গমন॥ ২
হে ইন্দ্র! প্রবৃদ্ধনীতি অরাতিগণের ভীতি
মায়াবীদিগকে তুমি করেছ সংহার।
বলে স্কন্ধহীন করি বিনাশ করেছ অরি,
রামাগণ-ধেনু সব কৈলা আবিষ্কার॥ ৩
দিবস সৃজন করি যুদ্ধার্থীর সহচরি
স্বর্গপ্রদ ইন্দ্র সেনা করিলেন জয়।
দিবসের কেতু দীপ্ত করিলা মনু-নিমিত্ত,
হইল রণের জন্য জ্যোতির উদয়॥ ৪
রণযোগ্য বহু ধন করিয়া ইন্দ্র গ্রহণ,
প্রবল শত্রুর সেনা করিলা প্রবেশ।
এই সব উষা হায় জাগ্রত হ'ল স্তোতায়,
তাঁহাদের শুভ্রবর্ণে বৃদ্ধি পেল তেজ॥ ৫
মহনীয় কর্ম্ম তাঁর সুকৃত অনেক আর,
মহান্—তাঁহাকে করে সকলে স্তবন।
বলিগণে বল দ্বারা চূর্ণ করিলেন পুরা
শত্রুহা মায়ায় দস্যু করিলা নিধন॥ ৬
দেবপতি, নরে যিনি বরপ্রদ ইন্দ্র তিনি,
মহাযুদ্ধে দেবগণে দিলা বহু ধন।
তাই বিপ্র কবিগণে বিবস্বতের সদনে
উক্থ দ্বারা করিতেছ তাঁহার স্তবন॥ ৭
সকলের বরণীয় বলপ্রদ সে স্বর্গীয়
জলাধিপ, স্বর্গাধিপ, জেতা সে ইন্দ্রের।
পৃথ্বী, অন্তরীক্ষ স্বর্গ যাঁর দান—স্তোতৃবর্গ
হৈলা আনন্দিত—সহ তাঁর আনন্দের॥ ৮
তিনি দিয়াছেন অশ্ব, দিয়াছেন হরিদশ্ব
বহুলোক-উপভোগ্য তাঁহারই গোধন।
দিয়ে হিরণ্ময় ধন, করিয়ে দস্যুহনন,
করেছেন আর্য্যবর্ণে তিনিই পালন॥ ৯
ওষধি ও বনস্পতি তাঁর দান—দিবা-ভাতি
প্রদত্ত এ অন্তরীক্ষ কর্ত্তৃক তাঁহার।
তিনি করি মেঘ ভেদ, বিপক্ষ করি উচ্ছেদ,
করেছেন অগ্রগামী শত্রুর সংহার॥ ১০
যুদ্ধোৎসাহে বলীয়ান্ অন্নবান্ ধনবান্
মঘবান্ যুদ্ধে শত্রু করেন হনন।
আমরা যে করি স্তব, শ্রবণ করেন সব;
আশ্রয় পাইতে করি তাঁরে আবাহন॥ ১১

এই সূক্তে ব্যবহৃত ৫টি শব্দের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য অনূদিত হইল। যথা—

১ম ঋক্—দাসং
২য় ঐ মানুষাণাং ক্ষিতিনাম (মনুজাত মানুষের)
ঐ ঐ দৈবীনাং বিশাং (দৈব বিশের)
৭ম ঐ বিপ্রাঃ কবয়ঃ
৯ম ঐ আর্য্যং বর্ণং।

প্রথমোক্ত দাস শব্দ অনার্য্যার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সেইরূপ ৯ম ঋকের দস্যু শব্দও অনার্য্যার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। মনুষ্যত্ব সহকারে ক্ষেত্রের অধিপতিত্ব রক্ষার জন্য

যে এক শ্রেণীর লোক ছিলেন, তাঁহাদিগকে ক্ষিতি বলিত। এই ক্ষিতি শব্দ হইতে ক্ষেত্রী, ক্ষত্র ও ক্ষত্রিয় শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। "বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়ঃ জাতঃ" ইহা পৌরাণিক কল্পনা; পুরুষ সূক্তের প্রসিদ্ধ রূপক হইতে উদ্ভূত। যে কেহ পুরুষত্ব সহকারে ক্ষেত্রস্বামী হইবে, সেই ক্ষত্রিয়, ইহাই প্রকৃত বৈদিক মত। বৈশবিশ শব্দে "Enlightened" বৈশ্য অর্থাৎ আর্য্য জাতীয় বৈশ্য বুঝাইতেছে। ২য় ঋকে বলা হইতেছে, ক্ষিতি (ক্ষত্র) গণের ও বিশ্ বৈশ্যগণের অগ্রে, অগ্রে ইন্দ্র চলেন, অর্থাৎ তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন। ৭ম ঋকে বিপ্রকবিগণ অর্থাৎ মেধাবী স্তোতাগণ যে উক্থ দ্বারা ইন্দ্রের স্তবন করেন, তাহাতে যে পুরোহিত শ্রেণী লক্ষ্য করিতেছে, তাহাও বেশ বুঝা যাইতেছে। কিন্তু তাহা হইলেও, এই দাস, ক্ষিতি, বিশ্ ও বিপ্র শব্দ দ্বারা পরস্পর পানাহার বর্জ্জিত ৪ জাতির লোক বুঝাইতেছে না; কেবল চারি শ্রেণীর লোক বুঝ ইতেছে, এই মাত্র। তবে ৯ম ঋকে 'আর্য্যং বর্ণং' শব্দে শ্বেত বর্ণের লোকে কৃষ্ণবর্ণের লোকের বিরুদ্ধ ভাব স্থাপিত করা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপে (২। ১২। ৪) ঋকে "দাসবর্ণ" শব্দের ব্যবহার আছে। সুতরাং এই "আর্য্য-বর্ণ" ও "দাসবর্ণ" শব্দে মাত্র Fairskinned ও dark-skinned বুঝাইত। আমরা যেমন এক্ষণ শ্বেত ইংরেজকে শ্বেত ও জিত আমাদিগকে কৃষ্ণবর্ণ জাতি বলি, (হেম বাবু বলিয়াছেন "এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি এক দিন") "আর্য্য বর্ণ" ও "দাস বর্ণ" শব্দ ঠিক্ তাহাই বুঝাইত। এতদপেক্ষা জাতিত্বের অন্য কোন ভাব প্রকাশ করিত, এরূপ অনুভব হয় না। যখন বেদ রচনার বহুশত বর্ষ পরেও আর্য্যানার্য্যের পরিণয় ও তাহাদের পরস্পরের অন্ন-ব্যবহারের কথা পাই, তখন আর্য্যবর্ণ ও দাসবর্ণে দ্বিবিধ বর্ণের লোক বুঝাইলেও 'caste' বলিতে আমরা এক্ষণ যাহা বুঝি, অর্থাৎ আদান-প্রদান ও পরস্পর পানাহার বর্জ্জিত সম্প্রদায়, তাহা বুঝাইত না।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

বিল্বপত্রিকা-সমর্পণ-স্তোত্রম্

(শঙ্করাচার্য্য-বিরচিতম্।)

(১)

দ্রষ্টা চ দর্শনং দৃশ্যমিতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে প্রথমা বিল্বপত্রিকা॥

দর্শক-দর্শন-দৃশ্য,—এই পত্রত্রয়,
যে প্রথম বিল্বপত্রে অবস্থিত রয়,
ভক্তিভরে তাহা শিবে করিনু অর্পণ,
জ্ঞানময়ী মূর্ত্তি যিনি করেন ধারণ!

(২)

কর্ত্তা কার্য্যঞ্চ করণমিতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে দ্বিতীয়া বিল্বপত্রিকা॥

কর্ত্তা ও করণ কার্য্য,—এই পত্রত্রয়,
যে দ্বিতীয় বিল্বপত্রে অবস্থিত রয়,
ভক্তিভরে তাহা শিবে করিনু অর্পণ,
জ্ঞানময়ী মূর্ত্তি যিনি করেন ধারণ!

(৩)

ভোক্তা চ ভোজনং ভোজ্যমিতি পত্র-
ত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে তৃতীয়া বিল্বপত্রিকা॥
ভোক্তা ও ভোজন, ভোজ্য,—এই পত্রত্রয়
যে তৃতীয় বিল্বপত্রে অবস্থিত রয়,
ভক্তিভরে তাহা শিবে করিনু অর্পণ,
জ্ঞানময়ী মূর্ত্তি যিনি করেন ধারণ!

(৪)

ভূর্ভুবশ্চ তথা স্বশ্চ ইতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে চতুর্থী বিল্বপত্রিকা॥
ভূলোক ও স্বর্গ, ভুবর্লোক,—পত্রত্রয়
যে চতুর্থ বিল্বপত্রে অবস্থিত রয়,
ভক্তিভরে তাহা শিবে করিনু অর্পণ,
জ্ঞানময়ী মূর্ত্তি যিনি করেন ধারণ!

(৫)

জাগ্রৎ স্বপ্নঃ সুষুপ্তিশ্চ ইতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে পঞ্চমী বিল্বপত্রিকা॥
জাগ্রৎ-সুষুপ্তি-স্বপ্ন,—এই পত্রত্রয়
যে পঞ্চম বিল্বপত্রে অবস্থিত রয়,
ভক্তিভরে তাহা শিবে করিনু অর্পণ,
জ্ঞানময়ী মূর্ত্তি যিনি করেন ধারণ!

(৬)

স্থূলং সূক্ষ্মং মহাসূক্ষ্মমিতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে ষষ্ঠিকা বিল্বপত্রিকা॥
স্থূল, সূক্ষ্ম, মহাসূক্ষ্ম—এই পত্রত্রয়
যেই ষষ্ঠ বিল্বপত্রে অবস্থিত রয়,
ভক্তিভরে তাহা শিবে করিনু অর্পণ,
জ্ঞানময়ী মূর্ত্তি যিনি করেন ধারণ!

(৭)

অবিদ্যা সংসৃতির্জীব ইতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে সপ্তমী বিল্বপত্রিকা॥
অবিদ্যা, সংসার, জীব,—এই পত্রত্রয়
যে সপ্তম বিল্বপত্রে অবস্থিত রয়,
ভক্তিভরে তাহা শিবে করিনু অর্পণ,
জ্ঞানময়ী মূর্ত্তি যিনি করেন ধারণ!

(৮)

উৎপত্তিশ্চ স্থিতির্নাশ ইতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে অষ্টমী বিল্বপত্রিকা॥
সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়,—এই পত্রত্রয়
যে অষ্টম বিল্বপত্রে অবস্থিত রয়,
ভক্তিভরে তাহা শিবে করিনু অর্পণ,
জ্ঞানময়ী মূর্ত্তি যিনি করেন ধারণ!

(৯)

সত্ত্ব রজস্তম ইতি গুণ-পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে নবমী বিল্বপত্রিকা॥
সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণ,—এই পত্রত্রয়
যে নবম বিল্বপত্রে অবস্থিত রয়,
ভক্তিভরে তাহা শিবে করিনু অর্পণ,
জ্ঞানময়ী মূর্ত্তি যিনি করেন ধারণ!

(১০)

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ইতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে দশমী বিল্বপত্রিকা॥
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর,—এই পত্রত্রয়
যে দশম বিল্বপত্রে অবস্থিত রয়,
ভক্তিভরে ইহা শিবে করিনু অর্পণ,
জ্ঞানময়ী মূর্ত্তি যিনি করেন ধারণ!

(১১)

ত্বমহংস্তথা তত্ত্বা ইতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে রুদ্রাখ্যা বিল্বপত্রিকা॥
ত্বং ও অহং, তৎ,—এই পত্রত্রয়
একাদশ বিল্বপত্রে অবস্থিত রয়;
ভক্তিভরে ইহা শিবে করিনু অর্পণ,
জ্ঞানময়ী মূর্ত্তি যিনি করেন ধারণ!

(১২)

একাদশৈতাঃ কথিতাঃ শাস্তবো বিল্বপত্রিকাঃ
এতাভিরর্চিতঃ শম্ভুঃ সদ্যো মুক্তিং প্রযচ্ছতি॥
একাদশ বিল্বপত্র শিবপূজা তরে
সর্ব্বদাই অনুকূল, জানিও সংসারে।
ইহা দিয়া শিব-পূজা যে করে সাধন,
শিব তারে সদ্যমুক্তি করেন অর্পণ!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি, এ,।

বিজয়া-গীতি।

কেমনে বিদায় দি'ব মায়াময়ি! মা তোমায়?
(হেরি)
বিজয়ার বিসর্জ্জনে বিশ্ব বিসর্জ্জিত হায়!
যেন আর কিছু নাই!
ধূ ধূ শুধু সর্ব্ব ঠাঁই!
মা-হারা সংসার যেন 'সাহারা' মরুর প্রায়!

(২)

সত্য বটে সর্ব্বঘটে আছগো মা! সর্ব্বদায়;
আবাহন-বিসর্জ্জন সম্ভবেনা মা তোমায়।
কিন্তু মা সে ব্রহ্মজ্ঞান,
অজ্ঞানে না পায় স্থান;
তাই মাতৃশোকরাশি বাসি আজি বিজয়ায়।

(৩)

মৃণ্ময়ী ডুবিল জলে,
চিন্ময়ী ত জলে স্থলে;
অন্তরীক্ষে অন্তস্তলে অনন্তরূপিণী মায়—
দেখেনা এ ভ্রান্ত চিত, শান্ত নয় সান্ত্বনায়।
স্থূলে ভুলে ভোলা মন
সূক্ষ্মে না করে গমন;
আগমন-নির্গমন অনন্তের নাহি, হায়!
বুঝে না এ ভ্রান্ত চিত—"মা-হারা হ
বিজয়ায়!

(৪)

প্রতিমারি বিসর্জ্জন,
প্রতিমায় মা সদা র'ন,
প্রকৃতির প্রতি রূপে মা'রি প্রতিরূপ তায়
রবিতে মা-রূপরাশি,
শশীতে মায়ের হাসি,
নদীতে মায়ের হৃদি-সুধা-ধারা ব'য়ে যায়
পবন-প্রবাহময়
মায়েরি নিশ্বাস বয়;
বিশ্বাস-বিরহে মন আশ্বাস না লভে তায়।

(৫)

(যার)
লোম-কূপে বিশ্ব ডুবে, তারে কি ডুবা
যায়?
কারণ-বারিধি-বপু—
বারিতে ডোবে কি কভু?
প্রবোধ না মানে তবু অবোধ সন্তান তায়
মাতৃশোক-বৃদ্ধি-ভয়ে অসিদ্ধেরা সিদ্ধি খায়
সে দীন সন্তান সবে,
তোমারি কৃপায় ভবে,
বিজয়া-বিষাদে লভে প্রসাদ সে বিজয়ায়।

(৬)

মা তোমার বিজয়ার মহিমা কি মোহময়!
সহসা সবার যেন কি অপূর্ব্ব ভাবোদয়!
শত্রু-মিত্র-ভেদ ভুলি,
সবে করে কোলাকুলি!
প্রণিপাত—আশীর্ব্বাদ কেহ করে, কেহ পা

সমানে সমানে আর—
নমস্কার—নমস্কার!
ঘরে ঘরে নারী-নরে নব সম্মিলন প্রায়!
কি যেন উচ্ছ্বাস রঙ্গে
তরঙ্গিত বঙ্গ-অঙ্গে!
কি যেন ভাবের ঢেউ লেগেছে সবের গায়!
দশমী-দিবাবসানে,
কি যেন কি হয় প্রাণে;
হঠাৎ কি যেন সবে হারায়ে, কি যেন পায়!
তাই এত কোলাকুলি—গলাগলি বিজয়ায়॥

(৭)

ভুলি যদি ত্রিদিনের মহোৎসব মা তোমার,
ভুলিব না তব এই মহাভাব বিজয়ার।
ক্ষীরের মন্থনে যথা নবনীর আবির্ভাব,
দুর্গোৎসব-মন্থনেতে তথা বিজয়ার ভাব!
বিজয়া-বিজিত-চিত্ত
শিখে এ সুন্দর সত্য—
মা' হয়ে মা আছে নিত্য, মেয়ে হয়ে আসে যায়!
তাই মা! বিদায় দিতে কি দায় এ বিজয়ায়!

(৮)

মেয়েরা বরণ করি,
আদরে গলাটি ধরি;
কাতরে কেঁদে বলে "মা! আবার আসিস্";
তাতে নাকি আঁখি-নীরে তুইও ভাসিস্!
দেখালি যা এ আঁখিতে,
আর কি প্রাণ থাকিতে—
ভুলিব চিন্ময়ী মূর্ত্তি মৃণ্ময়ীর প্রতিমায়?
মূর্ত্তিপূজা-মহাতত্ত্ব শিখালি মা! বিজয়ায়।

(৯)

"স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু" এ বাণী,
তোমারি 'চণ্ডী'তে শুনি চণ্ডিকে! ভবানি!
মেয়েদের কথা শুনো,
এসগো মা! এস পুনঃ,
ভাসি পুন ভবে যেন সে ত্রিদিন-ভরসায়;
তিনশ বাষট্টি ঢেউ ঠেলে ফেলে হাতে পায়!
পুন যেন নবমীতে হাসি-খেলি-নাচি-গাই;
দশমীতে দিয়ে জলে, আঁখিজলে ভেসে যাই!
সে ক্রন্দনানন্দরাশি,
সে অশ্রু-আবৃত হাসি
কে বুঝিবে, না বুঝিলে মা তোমারি করুণায়?
কিঞ্চিতে বঞ্চিত তাই করনি মা! বিজয়ায়।

(১০)

শুধু চিন্মণ্ডপে পূজি চিন্ময়ীরূপিণী মায়,
নহে চিত তিরপিত শুধু আধ্যাত্মিকতায়।
মেটে মণ্ডপেতে মম,
মেটে মূর্ত্তি অনুপম!
স্বচ্ছ প্রাণে "ইহাগচ্ছ' আহ্বানে আগচ্ছ তায়।
"গচ্ছ গচ্ছ পরং ধাম" বিসর্জ্জনে বিজয়ায়;
"সম্বৎসরব্যতীতে চ,
পুনরাগমনায় চ"
দেখো মা! থেকনা ভুলে, রেখ মা! এ প্রার্থনায়।
বিজয়া-প্রণতি-গীতি ইতি সমর্পিত পায়॥

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

প্রশ্নোত্তরম্।

যক্ষ উবাচ।

কেনস্বিৎ শ্রোত্রিয়ো ভবতি কেনস্বিদ্বিন্দতে মহৎ।
কেনস্বিদ্ দ্বিতীয়বান্ ভবতি রাজন্ কেন চ বুদ্ধিমান্ ॥১॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শ্রুতেন শ্রোত্রিয়ো ভবতি তপসা বিন্দতে মহৎ।
ধৃত্যা দ্বিতীয়বান্ ভবতি বুদ্ধিমান্ বৃদ্ধসেবয়া ॥২॥

যক্ষ উবাচ।

কিং ব্রাহ্মণানাং দেবত্বং কশ্চ ধর্ম্মঃ সতামিব।
কশ্চৈষাং মানুষো ভাবঃ কিমেষামসতামিব ॥৩॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

স্বাধ্যায় এষাং দেবত্বং তপ এষাং সতামিব।
মরণং মানুষোভাব পরীবাদোঽসতামিব ॥৪॥

যক্ষ উবাচ।

কিং ক্ষত্রিয়াণাং দেবত্বং কশ্চ ধর্ম্মঃ সতামিব।
কশ্চৈষাং মানুষো ভাবঃ কিমেষামসতামিব ॥৫॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ইষবস্ত্রমেষাং দেবত্বং যজ্ঞ এষাং সতামিব।
ভয়ং বৈ মানুষো ভাবঃ পরিত্যাগোঽসতামিব ॥৬॥

ক্রমশঃ।

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

যক্ষ প্রশ্ন করিলেন, কি প্রকারে শ্রোত্রিয় হয়, কি প্রকারে মহৎ দ্রব্য লাভ করা যায়; কি প্রকারে দ্বিতীয় হয় ও কি প্রকারে বুদ্ধিমান হয়? ১।

যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন।—শ্রুতের দ্বারা শ্রোত্রিয় হয়; তপস্যা দ্বারা মহৎ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়; ধৃতির দ্বারা দ্বিতীয়বান হয় ও বৃদ্ধ-সেবা দ্বারা বুদ্ধিমান হয়।

(জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে। বিদ্যাভ্যাসী ভবেদ্ বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়স্ত্রিভিরেব চ॥ একাং শাখাং সকল্পাং বা ষড়্ভিরঙ্গৈরধীত্য চ। ষট্‌কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিৎ)

যক্ষ কহিলেন।—ব্রাহ্মণদিগের দেবত্ব কি? কোন্ ধর্ম্ম সাধুদিগের ন্যায়? ইহাদিগের মানুষ-ভাব কি? এবং অসতের ন্যায় ইঁহাদিগেরই বা কি কার্য্য? ৩॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, স্বাধ্যায় (বেদাধ্যয়ন) ইঁহাদের দেবত্ব; তপস্যা ইঁহাদিগের সাধুদিগের ন্যায় ধর্ম্ম; মরণ ইঁহাদের মানুষ-ভাব ও পরীবাদ ইঁহাদের অসৎ ব্যক্তির ন্যায় কার্য্য। ৪॥

যক্ষ কহিলেন,—ক্ষত্রিয়গণের দেবভাব কি? কোন্ ধর্ম্ম সাধুগণের ন্যায়? ইঁহাদের মানুষ-ভাব কি ও অসৎ লোকের ন্যায় ইঁহাদের আচরণ কি? ৫॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—ধনুরূপ অস্ত্র ইঁহাদের দেবত্ব; যজ্ঞ ইঁহাদের সাধুদিগের ন্যায় আচরণ; ভয় ইঁহাদের মানুষ-ভাব এবং শরণাগত ব্যক্তির পরিত্যাগ ইঁহাদের অসৎ ব্যক্তির ন্যায় আচরণ। ৬॥

শ্রীহরিঃ

(১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজুষ্ট্রীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।

৯ম বর্ষ, ৯ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা।	অগ্রহায়ণ।	১৩০৯ সাল, ১৮২৪ শকাব্দা,

প্রশ্নোত্তরম্।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

যক্ষ উবাচ।

কিমেকঃ যজ্ঞিয়ং সাম কিমেকং যজ্ঞিয়ং যজুঃ।
কাচৈকা বৃণুতে যজ্ঞং কাং যজ্ঞো নাতিবর্ত্ততে ৭॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

প্রাণো বৈ যজ্ঞিয়ং সাম মনো বৈ যজ্ঞিয়ং যজুঃ।
ঋগেকা বৃণুতে যজ্ঞং তাং যজ্ঞো নাতিবর্ত্ততে ॥৮॥

যক্ষ উবাচ।

কিং স্বিদাপততাং শ্রেষ্ঠং কিং স্বিন্নিব পতাং বরম্।
কিং স্বিৎ প্রতিষ্ঠমানানাং কিং স্বিৎ প্রসবতাং বরম্ ॥৯॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

বর্ষমাপততাং শ্রেষ্ঠং বীজন্নিবপতাং বরম্।
গাবঃ প্রতিষ্ঠমানানাং পুত্রঃ প্রসবতাং বরম্ ॥১০॥

যক্ষ কহিলেন, যজ্ঞিয় সাম কোন্ পদার্থ? কোন্ বস্তু যজ্ঞিয় যজুঃ? কোন্ বস্তু যজ্ঞকে বরণ করে এবং যজ্ঞ কাহাকে অতিক্রম করে না?।৭॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—প্রাণই যজ্ঞিয় সাম, মনই যজ্ঞিয় যজুঃ; একমাত্র ঋক্ যজ্ঞকে বরণ করেন এবং যজ্ঞ তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারেন না।৮॥

যক্ষ কহিলেন, পতনকারীদিগের শ্রেষ্ঠ কি? নিবপনকারীদিগের শ্রেষ্ঠ কি? প্রতিষ্ঠমানদিগের শ্রেষ্ঠ কি? ও প্রসবকারীদিগের শ্রেষ্ঠ কি? ৯॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, বৃষ্টি পতনকারীদিগের শ্রেষ্ঠ; বীজ নিবপনকারীদিগের শ্রেষ্ঠ; গো প্রতিষ্ঠমানদিগের শ্রেষ্ঠ এবং পুত্র প্রসবকারীদিগের শ্রেষ্ঠ।১০॥

যক্ষ উবাচ।

ইন্দ্রিয়ার্থাননুভবন্ বুদ্ধিমান্ লোকপূজিতঃ।
সম্মতঃ সর্ব্বভূতানামুচ্ছ্বসন্ কো ন জীবতি ॥১১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

দেবতাতিথিভৃত্যানাং পিতৄণামাত্মনশ্চ যঃ।
ন নির্বপতি পঞ্চানামুচ্ছ্বসন্ন স জীবতি ॥১২॥

যক্ষ উবাচ।

কিংস্বিৎ গুরুতরং ভূমেঃ কিংস্বিদুচ্চতরঞ্চ খাৎ:
কিংস্বিচ্ছীঘ্রতরং বায়োঃ কিংস্বিদ্ বহুতরং তৃণাৎ ॥১৩॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মাতা গুরুতরা ভূমেঃ খাৎ পিতোচ্চতরস্তথা।
মনঃ শীঘ্রতরং বাতাচ্চিন্তা বহুতরা তৃণাৎ ॥১৪

যক্ষ কহিলেন, কোন্ বুদ্ধিমান্ লোকপূজিত, সর্ব্বজীবের সম্মত ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সকলের বিষয় অর্থাৎ শব্দ-স্পর্শাদি অনুভব করিয়া ও নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াও জীবিত নহেন? ১১

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, পিতৃলোক ও আপনার, এই পঞ্চজনের তৃপ্তি সাধন যে না করে, সে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ করিয়াও মৃত। ১২

যক্ষ কহিলেন, পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর কি? আকাশ হইতে উচ্চতর কি? বায়ু অপেক্ষা শীঘ্রগামী কে? ও তৃণাপেক্ষা বহুতর কি? ১৩

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—মাতা পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতরা; আকাশ হইতে পিতা উচ্চতর; বায়ু অপেক্ষা মন শীঘ্রগামী; এবং চিন্তা তৃণ হইতেও বহুতরা॥ ১৪

যক্ষ উবাচ।

কিংস্বিৎ সুপ্তং ন নিমিষতি কিংস্বিজ্জাতং নবেপতি।
কস্যস্বিদ্ হৃদয়ং নাস্তি কিংস্বিদ্বেগেন বর্দ্ধতে ॥১৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মৎস্যঃ সুপ্তো ন নিমিষত্যণ্ডং জাতং ন বেপতি।
অশ্মনো হৃদয়ং নাস্তি নদী বেগেন বর্দ্ধতে ॥১৬

যক্ষ উবাচ।

কিংস্বিৎ প্রবসতো মিত্রং কিংস্বিন্মিত্রং গৃহে সতঃ।
আতুরস্য চ কিং মিত্রং কিংস্বিন্মিত্রং মরিষ্যতঃ ॥১৭॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সার্থঃ প্রবসতাং মিত্রং ভার্য্যা মিত্রং গৃহে সতঃ।
আতুরস্য ভিষঙ্ মিত্রং দানং মিত্রং মরিষ্যতঃ ॥১৮॥

যক্ষ কহিলেন, কে নিদ্রিত হইয়া নেত্র নিমীলন করে না? কে জন্মিয়া স্পন্দিত হয় না? কাহার হৃদয় নাই ও বেগের দ্বারা কি বর্দ্ধিত হয়? ১৫॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মৎস্য নিদ্রিত হইয়া চক্ষু নিমীলন করে না; অণ্ড জন্ম গ্রহণ করিয়া স্পন্দিত হয় না; প্রস্তরের হৃদয় নাই এবং নদী বেগের দ্বারা বর্দ্ধিত হয়।১৬॥

যক্ষ কহিলেন, প্রবাসীর মিত্র কে? গৃহবাসীর মিত্র কে? পীড়িত ব্যক্তির মিত্র কে এবং যাহাকে মরিতে হইবে, তাহার মিত্র কি? ১৭॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, প্রবাসীর মিত্র সার্থসঙ্গী; গৃহবাসীর মিত্র ভার্য্যা; পীড়িতের

যক্ষ উবাচ।

কোঽতিথিঃ সর্ব্বভূতানাং কিং স্বিদ্ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
অমৃতং কিং স্বিদ্রাজেন্দ্র কিং স্বিৎ সর্ব্বমিদং জগৎ ॥১৯॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অতিথিঃ সর্ব্বভূতানামগ্নিঃ সোমঃ গবামৃতম্।
সনাতনোঽমৃতো ধর্ম্মো বায়ুঃ সর্ব্বমিদং জগৎ ॥২০

মিত্র বৈদ্য ও মরণ-ধর্ম্মশীল ব্যক্তির মিত্র দান। গৃহীর মিত্র ভার্য্যা, যথা—

পুত্র-পৌত্র-বধূ-ভৃত্যৈরাকীর্ণমপি সর্ব্বতঃ।
ভার্য্যাহীনং গৃহস্থস্য শূন্যমেব গৃহং ভবেৎ ॥
ন গৃহং গৃহমিত্যাহু গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
গৃহং তু গৃহিণীহীনমরণ্যং সদৃশং মতম্ ॥

* * * *

নাস্তি ভার্য্যা সমো বন্ধুর্নাস্তি ভার্য্যা সমা গতিঃ
নাস্তি ভার্য্যা সমো লোকে সহায়ো ধর্ম্মসংগ্রহে ॥

ভারতে শান্তিপর্ব্বণি আপদ্ধর্ম্মে ১৪৩ অধ্যায়ে)

তজ্জন্য দান শিক্ষার আদেশ দিয়াছেন—
এতৎ ত্রয়ং শিক্ষেদ্দমং।

দানং দয়ামিতি। বৃহদারণ্যোকাপনিষদি ৫ অঃ ২ ব্রাহ্মণে ৩। অর্থদান অপেক্ষা জীবের জীবনদানকে শ্রেষ্ঠ দান ' কহিয়াছেন—

'দণ্ডন্যাসঃ পরং দানং————"
শ্রীভাগবতে ১১ স্কন্ধে ১৯ অঃ ভূতদ্রোহরূপ দণ্ডের পরিত্যাগকে দান কহে; ধনদান নহে) ১৮॥

যক্ষ কহিলেন, সকল জীবের অতিথি কে? সনাতন ধর্ম্ম কি? হে রাজেন্দ্র! অমৃত কি ও এই জগৎ কি? ১৯॥

যক্ষ উবাচ।

কিং স্বিদেকো বিচরতে জাতঃ কো জায়তে পুনঃ।
কিং স্বিদ্ধিমস্য ভৈষজ্যং কিং স্বিদাবপনং মহৎ ॥২১॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সূর্য্য একো বিচরতে চন্দ্রমা জায়তে পুনঃ।
অগ্নি হিমস্য ভৈষজ্যং ভূমিরাবপনং মহৎ ॥২২॥

যক্ষ উবাচ।

কিং স্বিদেকপদং ধর্ম্ম্যং কিং স্বিদেকপদং যশঃ।
কিং স্বিদেকপদং স্বর্গ্যং কিং স্বিদেকপদং সুখম্ ॥২৩॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, অগ্নি সর্ব্বভূতের অতিথি; গাভীর দুগ্ধ অমৃত; ঐ অমৃতই অমৃত-সমানধর্ম্ম; কারণ গাভীর দুগ্ধ হইতে ঘৃত, ঐ ঘৃত অগ্নিতে আহুত হইয়া চন্দ্রকে প্রাপ্ত হয়, সুতরাং গোদুগ্ধই চন্দ্র, অর্থাৎ অমৃত ও মোক্ষের হেতু হওয়াতে উহাই সনাতন ধর্ম্ম; এবং বায়ুই এই সমুদায় জগৎ।২০॥

যক্ষ কহিলেন, একা কি বিচরণ করে? কোন্ বস্তু পুনর্বায় জন্ম গ্রহণ করে? হিমের ঔষধ কি? ও কোন্ বস্তু মহৎ আবপন? ২১।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, সূর্য্য একা বিচরণ করেন; চন্দ্র পুনর্বায় জন্ম গ্রহণ করেন; অগ্নি হিমের ঔষধ এবং ভূমি মহৎ আবপন।২২।

যক্ষ কহিলেন, ধর্ম্মের একমাত্র আশ্রয় কি? যশের একমাত্র আশ্রয় কি? স্বর্গের একমাত্র আশ্রয় কি? এবং সুখের একমাত্র আশ্রয় কি? ২৩।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

দাক্ষ্যমেকপদং ধর্ম্ম্যং দানমেকপদং যশঃ।
সত্যমেকপদং স্বর্গ্যং শীলমেকপদং
সুখম্ ॥২৪॥

যক্ষ উবাচ।

কিং স্বিদাত্মা মনুষ্যস্য কিং স্বিদ্দৈবকৃতঃ সখা।
উপজীব্যং কিং স্বিদস্য কিং স্বিদস্য
পরায়ণম্ ।২৫॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

পুত্র আত্মা মনুষ্যস্য ভার্য্যা দৈবকৃতঃ সখা।
উপজীবনং পর্জ্জন্যো দানমস্য পরা-
য়ণম্ ।২৬॥

যক্ষ উবাচ।

ধন্যানামুত্তমং কিং স্বিদ্ধনানাং স্যাৎ কি-
মুত্তমম্।
লাভানামুত্তমং কিং স্যাৎ সুখানাং স্যাৎ
কিমুত্তমম্।২৭॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দক্ষতা ধর্ম্মের এক-মাত্র আশ্রয়; দান একমাত্র যশের আশ্রয়; সত্য একমাত্র স্বর্গের আশ্রয় এবং শীল একমাত্র সুখের আশ্রয় ।২৪।।

যক্ষ কহিলেন, মনুষ্যের আত্মা কি? দৈবকৃত সখা কে? ইহার উপজীবন কি? ও ইহার পরম আশ্রয় কি? ২৫॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পুত্র মনুষ্যের আত্মা; ভার্য্যা দৈবকৃত সখা, পর্জ্জন্য ইহার উপজীবন এবং দান ইহার আশ্রয় ।২৬॥

যক্ষ কহিলেন, ধনের মধ্যে উত্তম কি? ধনের মধ্যে উত্তম কি? লাভের মধ্যে উত্তম কি ও সুখের মধ্যে উত্তম কি? ২৭॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ধন্যানামুত্তমং দাক্ষ্যং ধনানামুত্তমং শ্রুতম্।
লাভানাং শ্রেষ্ঠমারোগ্যং সুখানাং তুষ্টি-
রুত্তমা। ২৮॥

যক্ষ উবাচ।

কশ্চধর্ম্মঃ পরোলোকে কশ্চধর্ম্মঃ সদা ফলঃ।
কিং নিয়ম্য ন শোচন্তি কৈশ্চসন্ধির্নজীর্য্যতে।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

আনৃশংস্যং পরোধর্ম্ম স্ত্রয়ীধর্ম্মঃ সদাফলঃ।
মনো যম্যা ন শোচন্তি সন্ধিঃ সদ্ভির্ন-
জীর্য্যতে ।৩০।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দক্ষতা ধন্যের মধ্যে উত্তম; শাস্ত্রজ্ঞান ধন সকলের মধ্যে উত্তম; লাভের মধ্যে আরোগ্য শ্রেষ্ঠ এবং সুখের মধ্যে সন্তোষই শ্রেষ্ঠ। ২৮।

যক্ষ কহিলেন, লোকের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কি? কোন্ ধর্ম্ম সর্ব্বদা ফলপ্রদ? কি দমন করিলে শোক করিতে হয় না ও কাহার সহিত সন্ধি করিলে জীর্ণ হয় না? ২৯।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আনৃশংস্য শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; ত্রয়ী (অকার, উকার ও মকার-বিশিষ্ট শব্দ-প্রণব) ধর্ম্ম সর্ব্বদা ফলদাতা, মনকে সংযত করিলে শোকাবসন্ন থাকে না এবং সাধুর সহিত সন্ধি করিলে নষ্ট হয় না।

(অহিংসাধর্ম্ম যথা—অহিংসা পরমো-ধর্ম্মস্তথাহিংসা পরন্তপঃ। অহিংসা পরমং সত্যং যতো ধর্ম্মঃ প্রবর্ত্ততে। (অনুশাসন পর্ব্বণি ১১৫ অধ্যায় ২৫।) প্রণবমাহাত্ম্য যথা—সর্ব্বং হ্যেতদ্ব্রহ্মায়মাত্মাব্রহ্ম-সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ॥ মাণ্ডুক্যোপনিষদি ২।

যক্ষ উবাচ।

কিন্নু হিত্বা প্রিয়ো ভবতি কিন্নু হিত্বা ন শোচতি।
কিন্নু হিত্বার্থবান্ ভবতি কিন্নু হিত্বা সুখী ভবেৎ। ৩১।

অন্যত্র যথা—যোহধীতেহহন্যহন্যেতাং ত্রীণি বর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ।
স ব্রহ্ম পরমভ্যেতি বায়ুভূতঃ খমূর্ত্তিমান্।
মনু ২ অঃ ৮২।

যিনি প্রতিদিন আলস্যশূন্য হইয়া তিন বৎসর প্রণব-ব্যাহৃতিযুক্ত সাবিত্রী জপ করেন, তিনি বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্র গমন করিতে পারেন ও পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।

তজ্জন্যই কহিয়াছেন, মনকে বশ করা ক্লেশ-সাধ্য।

চঞ্চলংহি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥
গীতা ৬অঃ ৩৪।

তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ কহেন—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে॥ ঐ ঐ ৩৫।

পাতঞ্জলিও কহেন—

অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ। ১২॥
পাতঞ্জলদর্শনে-যোগপাদে।

অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়।

সাধু লোকের সহিত মিত্রতা যেরূপ শিলায় রেখা——

"উৎকৃষ্ট মধ্যম জঘন্য জনেষু মৈত্রী
যথাচ্ছিলাসু সিকতাসু জলেষু রেখা।"

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মানং হিত্বা প্রিয়োভবতি ক্রোধং হিত্বা ন শোচতি।
কামং হিত্বার্থবান্ ভবতি লোভং হিত্বা সুখী ভবেৎ। ৩২।

যক্ষ উবাচ।

কিমর্থং ব্রাহ্মণে দানং কিমর্থং নটনর্ত্তকে।
কিমর্থং চৈব ভৃত্যেষু কিমর্থং চৈব রাজসু। ৩৩।

"সৌহৃদাৎ সর্ব্বভূতানাং বিশ্বাসো নাম জায়তে।
তস্মাৎ সৎসু বিশেষেণ বিশ্বাসং কুরুতে জনঃ॥"
বন পর্ব্বণি ২৯৬অঃ ৪২॥

সংসারেহস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোহপি সৎসঙ্গ সেবধি নৃণাং॥
শ্রীভাগবতে ১১স্কন্ধে ২অঃ ২৮।

সাধূনাং হৃদয়ং ধর্ম্মো বাচোদেবাঃ সনাতনাঃ।
কর্ম্মক্ষয়াণি কর্ম্মাণি যতঃ সাধুর্হরিঃ স্বয়ম্।
কল্কিপুরাণে ১৬অ ২১।

সাধূনাং বাপ্যসাধূনাং সন্ত এব সদা গতিঃ।
মৎস্যপুরাণে ২১০অঃ।

যক্ষ কহিলেন, কি ত্যাগ করিলে প্রিয় হয়, কি ত্যাগ করিলে শোক করে না, কি ত্যাগ করিলে অর্থবান্ হয় ও কি ত্যাগ করিলে সুখী হয়? । ৩১।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মান ত্যাগ করিলে প্রিয় হয়, ক্রোধ ত্যাগ করিলে শোক করিতে হয় না; কাম ত্যাগ করিলে অর্থবান্ হয় এবং লোভ ত্যাগ করিলে সুখী হয়। ৩২।

যক্ষ কহিলেন, কি জন্য ব্রাহ্মণকে দান করে, কি জন্য নট ও নর্ত্তককে দান করে,

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ধর্ম্মার্থং ব্রাহ্মণে দানং যশোঽর্থং নট-নর্ত্তকে।
ভৃত্যেষু ভরণার্থং বৈ ভয়ার্থং চৈব
রাজসু। ৩৪।

যক্ষ উবাচ।

কেনস্বিদাবৃতো লোকঃ কেনস্বিন্ন প্রকা-
শতে।
কেন ত্যজতি মিত্রাণি কেন স্বর্গং ন
গচ্ছতি। ৩৫।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অজ্ঞানেনাবৃতো লোকস্তমসা ন প্রকাশতে।
লোভাৎ ত্যজতি মিত্রাণি সঙ্গাৎ স্বর্গং ন
গচ্ছতি। ৩৬।

কি জন্য ভৃত্যকে দান করে ও কি জন্য রাজাকে দান করে? ৩৩।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ধর্ম্মার্থ ব্রাহ্মণকে দান করে; নট ও নর্ত্তককে যশের জন্য দান করে, ভরণার্থে ভৃত্যসকলকে ও ভয় জন্য রাজাকে দান করে। ৩৪।

যক্ষ কহিলেন, কোন্ বস্তু দ্বারা লোক আবৃত, কোন্ বস্তু দ্বারা জগৎ প্রকাশিত হয় না, কি কারণে মিত্রগণ ত্যাগ করে ও কি কারণে স্বর্গগমন করে না? ৩৫।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, অজ্ঞান দ্বারা লোক আবৃত থাকে; অন্ধকার দ্বারা জগৎ প্রকাশিত হয় না, লোভবশতঃ মিত্রগণ ত্যাগ করে এবং সঙ্গবশতঃ স্বর্গগমন করে না। ৩৬।

যক্ষ উবাচ।

মৃতঃ কথং স্যাৎ পুরুষঃ কথং রাষ্ট্রং মৃতং
ভবেৎ।
শ্রাদ্ধং মৃতং কথং বা স্যাৎ কথং যজ্ঞো-
মৃতো ভবেৎ। ৩৭।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মৃতো দরিদ্রঃ পুরুষো মৃতং রাষ্ট্রমরাজকম্।
মৃতমশ্রোত্রিয়ং শ্রাদ্ধং মৃতো যজ্ঞস্ত্বদক্ষিণঃ।

যক্ষ কহিলেন, পুরুষ কি প্রকারে মৃত হয়, কি কারণে রাজ্য মৃত হয়, কি কারণে শ্রাদ্ধ মৃত হয় ও কি জন্য যজ্ঞ মৃত হয়? ৩৭।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দরিদ্র পুরুষ মৃত, অরাজক রাজ্য মৃত, অশাস্ত্রীয় শ্রাদ্ধ মৃত এবং যজ্ঞে দক্ষিণা দান না করিলে যজ্ঞ মৃত হয়। ৩৮।

(সুখাত্তু যো যাতি নরো দরিদ্রতাং ধৃতঃ
শরীরেণ মৃতঃ স জীবতি।
মৃচ্ছকটিকে ১ অঙ্কে।)

দারিদ্র্যান্মরণাদ্বামরণং মম রোচতে ন
দারিদ্র্যম্।
অল্পক্লেশং মরণং দারিদ্র্যমনন্তকং দুঃখম্।
মৃচ্ছকটিকে ১ অংকে।

রাজারক্ষণ—

সংস্তাতু প্রযত্নেন স্বরাষ্ট্রস্য চ রক্ষিতা।
নিত্যং স্বেভ্যঃ পরেভ্যশ্চ যথা মাতা যথা
পিতা। মৎস্য পুরাণে ২১৯ অঃ।
যদি ন স্যান্নরপতিঃ সম্যঙ্নেতা ততঃ
প্রজা।
অকর্ণধারা জলধৌ বিপ্লবেতেহ নৌরিব।
কামন্দকী ১সর্গে। শুক্রনীতিসারে ১অং

যক্ষ উবাচ।

কাদিক্ কিমুদকং প্রোক্তং কিমন্নং কিঞ্চ বৈ বিষম্।
শ্রাদ্ধস্য কালমাখ্যাহি——। ৩৯।

* যুধিষ্ঠির উবাচ।

সন্তো দিগ্‌জলমাকাশং গৌরন্নং প্রার্থনা-বিষম্।
শ্রাদ্ধস্য ব্রাহ্মণঃ কালঃ——। ৪০।

যক্ষ উবাচ।

তপঃ কিং লক্ষণং প্রোক্তং কো দমশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ।
ক্ষমা চ কা পরা প্রোক্তা কা চ হ্রীঃ পরি-কীর্ত্তিতা। ৪১।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

তপঃ স্বধর্ম্মবর্ত্তিত্বং মনসো দমনং দমঃ।
ক্ষমা দ্বন্দ্বসহিষ্ণুত্বং হ্রীরকার্য্যনিবর্ত্তনম্। ৪২

নিরাহারাঃ প্রজাঃ শোচ্যাঃ শোচ্যং রাষ্ট্র-মরাজকম্।
উদ্যোগপর্ব্বণি ৩৮ অঃ ১৮।

অরক্ষিতাত্মা যো রাজা প্রজাশ্চাপি ন রক্ষতি।
প্রজাশ্চ তস্য ক্ষীয়ন্তে ততঃ সোঽনুবিনশ্যতি।
রাজধর্ম্মে—শান্তি পর্ব্বণি ৯০অঃ

অরক্ষ্যমাণাঃ কুর্ব্বন্তি যৎকিঞ্চিৎ কিল্বিষং প্রজাঃ।
তস্মাচ্চ নৃপতেরর্দ্ধং যস্মাদ্ গৃহ্নাত্যসৌ করান্।
যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিঃ ১অঃ ৩৩৩

শ্রাদ্ধে লক্ষণক্রান্ত ব্রাহ্মণ না হইলে শ্রাদ্ধ-ফল হয় না, তজ্জন্য শাস্ত্রে দোষিত ব্রাহ্মণ নিষেধ করিয়াছেন। দোষিত ব্রাহ্মণ যথা,—

ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য মহারোগিন এবচ।
যথেষ্টাচারণস্যাহুর্ম্মরণান্তমশৌচকং।
আহ্নিকতত্ত্বে।

শ্রোত্রিয়-লক্ষণ যথা,—

একাং শাখাং সকল্পাং বা ষড়্‌ভিরঙ্গৈর-ধীত্য বা।
ষট্‌কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিৎ॥
ব্যবহারতত্ত্বে দেবলধৃত বচনং।

শ্রোত্রিয়ায় কুলীনায় দরিদ্রায় চ বাসব।
সন্তুষ্টায় বিনীতায় সর্ব্বভূতহিতায় চ॥
বেদাভ্যাসস্তপোজ্ঞানমিন্দ্রিয়াণাং চ সংযমঃ।
ঈদৃশায় সুরশ্রেষ্ঠ যদ্দত্তংহি তদক্ষয়ং।
বৃহস্পতি-স্মৃতিঃ।

বলিং প্রতি শ্রীভগবদ্ বাক্যং—

অশ্রোত্রিয়ং শ্রাদ্ধমধীতমব্রত
যদক্ষিণং যজ্ঞমনর্ত্বিজাহুতম্।
অশ্রদ্ধয়া দত্তমসংস্কৃতং হবি-
রেতে প্রদত্তাস্তব দৈত্যভাগাঃ॥
শ্রীহরিবংশে—ভবিষ্যপর্ব্বণি ৭২। ৪৭।

ন যজ্ঞা দক্ষিণাহীনাস্তারয়ন্তি কথঞ্চন।
শান্তি পর্ব্বণি ৭৯ অঃ ১১।

যক্ষ কহিলেন, কোন্ দিক, কোন্ জল, কোন্ অন্ন, কি বিষ, শ্রাদ্ধের কাল কি? ৩৯।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, সাধু সকল দিক্, আকাশই জল; ইন্দ্রিয়ই অন্ন, প্রার্থনাই বিষ এবং ব্রাহ্মণই শ্রাদ্ধের কাল। ৪০।

যক্ষ কহিলেন, তপস্যার লক্ষণ কি, দম কাহাকে কহে, ক্ষমা কাহাকে কহে, এবং লজ্জা কাহাকে কহে? ৪১।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, স্বধর্ম্মের অনুবর্ত্তী থাকাকে তপস্যা কহে; মনের দমনকে

যক্ষ উবাচ।

কিং জ্ঞানং প্রোচ্যতে রাজন্ কঃ শমশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ।
দয়া চ কা পরা প্রোক্তা কিঞ্চার্জ্জবমুদাহৃতম্। ৪৩।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

জ্ঞানং তত্ত্বার্থসম্বোধঃ শমশ্চিত্তপ্রশান্ততা।
দয়া সর্ব্বসুখৈষিত্বমার্জ্জবং সমচিত্ততা। ৪৪।

যক্ষ উবাচ।

কঃ শত্রুর্দুর্জ্জয়ঃ পুংসাং কশ্চ ব্যাধিরনন্তকঃ।
কীদৃশশ্চ স্মৃতঃ সাধুরসাধুঃ কীদৃশঃ স্মৃতঃ। ৪৫।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ক্রোধঃ সুদুর্জ্জয়ঃ শত্রুর্লোভো ব্যাধিরনন্তকঃ
সর্ব্বভূতহিতঃ সাধুরসাধুর্নির্দ্দয়ঃ স্মৃতঃ। ৪৬

দম কহে; শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতাকে ক্ষমা কহে এবং অকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হওয়াকে লজ্জা কহে। ৪২।

যক্ষ কহিলেন, হে রাজন্! জ্ঞান কাহাকে কহে; শম কাহাকে কহে; দয়া কাহাকে কহে এবং আর্জ্জব কাহাকে কহে? ৪৩।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, তত্ত্বার্থের সম্যক্ বোধকে জ্ঞান কহে; চিত্তের প্রশান্ততাকে শম কহে; সকলের সুখৈষী হওয়াকে দয়া এবং চিত্তের সমতাকে আর্জ্জব কহে। ৪৪

যক্ষ কহিলেন, মনুষ্যের দুর্জ্জয় শত্রুকে? অনন্ত ব্যাধি কি? সাধু কাহাকে কহে এবং অসাধু কাহাকে কহে? ৪৫।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ক্রোধ দুর্জ্জয় শত্রু; অনন্ত ব্যাধি লোভ; সর্ব্বভূতের হিতরত ব্যক্তিকে সাধু কহে ও নির্দ্দয় ব্যক্তিকে অসাধু কহে। ৪৬।

"ক্ষান্তিশ্চেৎ কবচেন কিং কিমরিভিঃ ক্রোধোঽস্তি চেদ্দেহিনাম্" পঞ্চরত্নে।

ষড়্ দোষাঃ পুরুষেনেহ হাতব্যাভূতিমিচ্ছতা
নিদ্রা তন্দ্রা ভয়ং ক্রোধং আলস্যং দীর্ঘসূত্রতা
উদ্‌যোগপর্ব্বণি ৩২ অঃ ৮১।

লোভোঽস্ত্যস্তি গুণেনকিং পিশুনতা যদাস্তি কিং পাতকৈঃ। ষড়্‌রত্নে।

হন্যন্তে পশবো যত্র নির্দ্দয়ৈরজিতাত্মভিঃ।
মন্যমানৈরিমং দেহমজরামৃত্যুনশ্বরম্॥

শ্রীভাগবতে ১০ স্কঃ, ১০ অঃ ৯।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।*

(শ্রীম—কথিত।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আজ শনিবার, ২৪শে চৈত্র, ইংরাজি ৫ই এপ্রিল, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। প্রাতঃকাল; বেলা আন্দাজ ৮টা। মাষ্টার দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণ সহাস্য বদনে কক্ষ মধ্যে ছোট খাটটীর উপর উপবিষ্ট; মেঝেতে কয়েকটী ভক্ত বসিয়া আছেন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

প্রাণকৃষ্ণ জনাইয়ের মুখুর্য্যেদের বংশসম্ভূত। কলিকাতায় শ্যামপুকুরে বাড়ী, ম্যাকেঞ্জি লয়াল এবং কোর Exchange নামক নীলাম-ঘরের কার্য্যাধ্যক্ষ। তিনি গৃহস্থ, কিন্তু বেদান্ত-চর্চ্চায় তাঁহার বড় প্রীতি। পরমহংসদেবকে বড় প্রীতি করেন ও মাঝে মাঝে আসিয়া দর্শন করেন। ইতিমধ্যে একদিন নিজের বাটীতে ঠাকুরকে লইয়া গিয়া মহোৎসব করিয়াছিলেন। তিনি বাগবাজারের ঘাটে রোজ প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করিতেন ও নৌকার সুবিধা হইলেই একেবারে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতেন। আজ এইরূপে নৌকা ভাড়া করিয়াছিলেন। মাষ্টারকেও তুলিয়া লইয়াছিলেন। নৌকা কূল হইতে একটু অগ্রসর হইলেই ঢেউ হইতে লাগিল। মাষ্টার বলিলেন, "আমায় নামাইয়া দিতে হইবে।" প্রাণকৃষ্ণ ও তাঁহার বন্ধু অনেক বুঝাইতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি কোন মতে শুনিলেন না, বলিলেন "আমায় নামাইয়া দাও, আমি হেঁটে দক্ষিণেশ্বরে যাব"। অগত্যা প্রাণকৃষ্ণ তাঁহাকে নামাইয়া দিলেন।

মাষ্টার পেঁছিয়া দেখেন যে, তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে পেঁছিয়াছেন ও ঠাকুরের সঙ্গে সদালাপ করিতেছেন। ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া তিনি একপাশে বসিলেন।

(অবতারবাদ।)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—(প্রাণকৃষ্ণের প্রতি) কিন্তু মানুষে তিনি বেশী প্রকাশ। যদি বল, অবতার কেমন ক'রে হবে, যাঁর ক্ষুধা-তৃষ্ণা জীবের ধর্ম্ম অনেক আছে, হয়ত রোগ, শোকও আছে; তার উত্তর এই যে, "পঞ্চ-ভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম প'ড়ে কাঁদে।"

"দেখ না, রামচন্দ্র সীতার শোকে কাতর হয়ে কাঁদতে লাগিলেন। হিরণ্যাক্ষ বধ কর্‌বার জন্যে বরাহ-অবতার হ'লেন। হিরণ্যাক্ষ বধ হ'লো, কিন্তু নারায়ণ স্বধামে যেতে চান না। বরাহ হ'য়ে আছেন। কতকগুলি ছানাপনা হ'য়েছে। তাদের নিয়ে এক রকম বেশ আনন্দে রয়েছেন। দেবতারা বল্‌লেন, একি হ'লো, ঠাকুর যে আর আস্‌তে চান না! তখন সকলে শিবের কাছে গেলেন ও ব্যাপারটী নিবেদন কর্‌লেন। শিব গিয়ে তাঁকে অনেক জেদাজিদি কর্‌লেন। তিনি ছানাপনাদের মাই দিতে লাগ্‌লেন। তখন শিব ত্রিশূল

* প্রথম ভাগ ছাপা হইয়াছে। মূল্য ১ টাকা ১৩।২ গুরুদাস চৌধুরীর গলি, কলিকাতা।

ধনে শরীরটা ত্যেগে দিলেন। ঠাকুর হি হি ক'রে হেসে তখন সখানে চ'লে গেলেন।"

প্রাণকৃষ্ণ। (ঠাকুরের প্রতি) মহাশয়! অনাহত শব্দটা কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। অনাহত শব্দ সর্ব্বদাই ধ্বনি হ'চ্ছে। প্রণবের ধ্বনি, এই ধ্বনি পরব্রহ্ম থেকে আসছে। যোগীরা শুনতে পায়। বিষয়াসক্ত জীব শুনতে পায় না। যোগী জানতে পারে যে, সেই ধ্বনি নাভি থেকে একদিকে উঠে ও আর একদিকে সেই ক্ষীরোদশায়ী পরব্রহ্ম থেকে উঠে।

(পরলোক।)

প্রাণকৃষ্ণ। মহাশয়, পরলোক কি রকম?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেশব সেনও ঐ কথা জিজ্ঞাসা ক'রেছিল। যতক্ষণ মানুষ অজ্ঞান থাকে, অর্থাৎ যতক্ষণ ঈশ্বরলাভ হয় নাই, ততক্ষণ আবার জন্ম গ্রহণ কর্ত্তে হবে। কিন্তু জ্ঞান লাভ হলে আর এ সংসারে আসতে হয় না। পৃথিবীতে বা অন্য কোন লোকে আর যেতে হয় না।

"কুমারের হাঁড়ী রৌদ্রে শুকুতে দেয় দেখনি? তার ভিতর পাকা হাঁড়ীও আছে, আবার কাঁচা হাঁড়ীও আছে। গরু টরু চ'লে গেলে হাঁড়ী কতক কতক ভেঙ্গে যায়। পাকা হাঁড়ী ভেঙ্গে গেলে, কুমোর সেগুলিকে ফেলে দেয়; তার দ্বারার আর কোন কাজ হয় না। পাকা হাঁড়ীর আর কুমোরের চাকে আসতে হয় না। কাঁচা হাঁড়ী ভাঙলে, কুমোর তাদের আবার লয়; নিয়ে, চাকেতে তাল পাকিয়ে দেয়, নূতন হাঁড়ী তৈয়ার হয়।"

"তাই যতক্ষণ ঈশ্বর-দর্শন হয় নাই, ততক্ষণ কুমোরের হাতে যেতে হবে, অর্থাৎ এ সংসারে ফিরে ফিরে আসতে হবে।

"সিদ্ধ ধান আর পুঁতলে কি হবে? তাতে আর গাছ হয় না। জ্ঞানাগ্নিতে সিদ্ধ হ'লে, তার দ্বারা আর নূতন সৃষ্টি হয় না, সে মুক্ত হ'য়ে যায়।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(বেদান্ত ও অহঙ্কার।)*

পুরাণ-মতে ভক্ত একটী, ভগবান একটী, আমি একটী, তুমি একটী; শরীর যেন সরা; মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার যেন জল; ব্রহ্ম যেন সূর্য্য। এই শরীর-সরা মধ্যে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার রূপ জল রয়েছে। আর ব্রহ্ম সূর্য্য-স্বরূপ, তিনি এই জলে প্রতিবিম্বিত হচ্ছেন। ভক্ত তাই ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করে।

বেদান্ত-মতে ব্রহ্মই বস্তু, আর সমস্ত মায়া, স্বপ্নবৎ। অহংরূপ একটা লাঠি সচ্চিদানন্দ-সাগরের মাঝখানে প'ড়ে আছে।

(মাষ্টারের প্রতি) এইটে শুনে যাও— অহং লাঠিটী তুলে নিলে এক সচ্চিদানন্দ-সমুদ্র। অহং লাঠিটী থাকলে, দুটো দেখায়। এ এক ভাগ জল, ও এক ভাগ জল; ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে সমাধিস্থ হয়, তখন এই অহং পুঁছে যায়।"

"তবে লোক-শিক্ষার জন্য শঙ্করাচার্য্য বিদ্যার 'আমি' রেখেছিলেন।

(প্রাণকৃষ্ণের প্রতি) কিন্তু জ্ঞানীর লক্ষণ আছে। কেউ কেউ মনে করে, আমি জ্ঞানী হ'য়েছি।

লক্ষণ কি? জ্ঞানী কারু অনিষ্ট করতে পারে না। বালকের মত হ'য়ে যায়।

লোহার খড়্গো যদি পরশ-মণি ছোঁয়ান হয়, তখন খড়্গ সোণা হ'য়ে যায়। সোণার খড়্গো হিংসার কাজ হয় না। তবে বাহিরে হয়ত দেখায় যে রাগ আছে, কি অহংকার আছে; কিন্তু বস্তুতঃ জ্ঞানীর ও সব কিছুই থাকে না।"

"দূর থেকে পোড়া দড়ি দেখ্‌লে বোধ হয় যে ঠিক এক গাছা দড়ি প'ড়ে আছে। কিন্তু কাছে এসে ফুঁ দিলে সব উড়ে যায়। ক্রোধের আকার—অহংকারের আকার কেবল, কিন্তু সত্তি কার ক্রোধ নয়, অহংকার নয়।"

"বালকের আঁট থাকে না। এই খেলা-ঘর ক'র্‌লে, কেউ হাত দেয়, ত ধেই ধেই ক'রে নেচে কাঁদ্‌তে আরম্ভ ক'রে। আবার নিজেই ভেঙ্গে ফেল্‌বে সব। এই কাপড়ে এত আঁট, ব'ল্‌ছে "আমার বাবা দিয়েছে, দেবো না।" আবার একটা পুতুল দিলে পরে ভুলে যায়, কাপড়খানা ফেলে দিয়ে চ'লে যায়।"

"এই সব জ্ঞানীর লক্ষণ। হয় ত বাড়ীতে খুব ঐশ্বর্য্য। কোচ, কেদারা, ছবি, গাড়ি, ঘোঁড়া; আর সব ফেলে কাশী চ'লে যাবে।

(বেদান্ত ও অবস্থাত্রয় সাক্ষী।)

"বেদান্ত-মতে জাগরণ কিছু নয়। এক কাঠুরে স্বপন দেখেছিল। একজন লোক তার ঘুম ভাঙ্গানতে সে বিরক্ত হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লো "তুই কেন আমার ঘুম ভাঙ্গালি? আমি রাজা হ'য়েছিলুম। সাত ছেলের বাপ হ'য়ে ছিলুম। ছেলেরা সব লেখা পড়া, অস্ত্রবিদ্যা, সব শিখ্‌ছিল। আমি সিংহাসনে ব'সে রাজত্ব কচ্ছিলুম। কেন তুই আমার সুখের সংসার ভেঙ্গে দিলি?" সে ব্যক্তি বল্‌লে "ও ত স্বপন, ওতে আর কি হ'য়েছে?" কাঠুরে বল্‌লে, "দূর তুই বুঝিস্‌না, আমার কাঠুরে হওয়াও যেমন সত্যি, স্বপনে রাজা হওয়াও তেমনি সত্যি। কাঠুরে হওয়া যদি সত্য হয়, তা হ'লে স্বপনে রাজা হওয়াও তেমনি সত্য।"

প্রাণকৃষ্ণ জ্ঞানি জ্ঞান করেন, তাই বুঝি ঠাকুর জ্ঞানীর অবস্থা বলিতেছিলেন। এই বারে ঠাকুর বিজ্ঞানীর অবস্থার কথা বলিতেছেন। ইহাতে কি তিনি নিজের অবস্থা ইঙ্গিত করিতেছেন?

(জ্ঞান ও বিজ্ঞান।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। নেতি নেতি ক'রে আত্মাকে ধরার নাম জ্ঞান। নেতি নেতি বিচার ক'রে সমাধিস্থ হ'লে আত্মাকে ধরা যায়।

"বিজ্ঞান কি, না বিশেষরূপে জানা। কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে। যে শুনেছে, সে অজ্ঞান; যে দেখেছে, সে জ্ঞানী; যে খেয়েছে, তারই বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষরূপ জানা হ'য়েছে। ঈশ্বর দর্শন ক'রে, তাঁর সহিত আলাপ; যেন তিনি পরম আত্মীয়; এর নাম বিজ্ঞান।

"প্রথমে নেতি নেতি কর্ত্তে হয়। তিনি পঞ্চভূত নন, তিনি ইন্দ্রিয় নন, তিনি মন, বুদ্ধি, অহংকার নন, তিনি সকল তত্ত্বের অতীত। অর্থাৎ ছাতে উঠ্‌তে হবে। সব সিঁড়ী একে একে ত্যাগ ক'রে যেতে হবে। সিঁড়ী কিছু ছাত নয়। কিন্তু ছাতের উপর পৌঁছে দেখা যায় যে, যে জিনিসে ছাত তৈয়ারী,—ইট, চুণ, সুরকি,—সেই জিনিসেই সিঁড়িও তৈয়ারী। যিনি পরব্রহ্ম,

তিনিই জীব-জগৎ হ'য়েছেন; চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হ'য়েছেন। যিনি আত্মা, তিনিই পঞ্চভূত হ'য়েছেন। মাটী টাটী এত শক্ত কেন—যদি আত্মা থেকেই হ'য়েছে? তাঁর ইচ্ছাতে সব হ'তে পারে। শোণিত-শুক্র থেকে যে হাড়-মাস হচ্ছে। সমুদ্রের ফেণা কত শক্ত হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(গৃহস্থ ও বিজ্ঞান।)

"বিজ্ঞান হ'লে সংসারেও থাকা যায়। তখন বেশ অনুভব হয় যে, তিনিই জীব-জগৎ হ'য়েছেন। সংসার, তিনি ছাড়া নন। তাই রামচন্দ্র যখন জ্ঞান লাভের পর "সংসারে থাক্‌বো না" বল্লেন, দশরথ বশিষ্টকে তাঁর কাছে পাঠিয়েদিলেন, বোঝা-বার জন্যে। বশিষ্ট ব'ল্লেন "রাম! যদি সংসার ঈশ্বর-ছাড়া হয়, ত তুমি ত্যাগ ক'র্‌তে পার।" রামচন্দ্র তখন চুপ্ করে রৈলেন। তিনি বেশ জানেন যে, ঈশ্বর-ছাড়া কিছুই নাই। তাঁর আর সংসার ত্যাগ করা হ'লো না।

(প্রাণকৃষ্ণের প্রতি) কথাটা এই, মন শুদ্ধ হলেই সেই চক্ষু হয়। দেখনা কুমারী-পূজা। হাগা-মোতা মেয়ে, তাকে ঠিক দেখ্‌লাম—সাক্ষাৎ ভগবতী! এক দিকে স্ত্রী, এক দিকে ছেলে; দুজনকেই আদর কর্‌চে, কিন্তু ভিন্ন ভাবে। তবেই হ'লো মন নিয়ে কথা। শুদ্ধ মনেতে এক ভাব হয়, সেই মনটী পেলে, সংসারেই ভগবান-দর্শন হয়। তবে সাধন চাই।

(গৃহস্থ ও "কামিনী")

সাধন চাই। এইটী জেনো যে, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সহজেই আসক্তি হয়। স্ত্রীলোক স্বভাবতঃই পুরুষকে ভালবাসে। পুরুষও স্বভাবতঃই স্ত্রীলোক ভালবাসে। তাই শীগ্‌গির পড়ে যায়। কিন্তু সংসারে তেমনি খুব সুবিধা। বিশেষ দরকার হ'লে, হ'লো একবার স্বদারায় গমন ক'র্‌লে।"

(মাষ্টারের প্রতি)। মাষ্টার হাস্‌চো কেন?

মাষ্টার (স্বগত) সংসারী লোক একেবারে পেরে উঠ্‌বে না ব'লে ঠাকুর এই পর্য্যন্ত অনুমতি দিলেন। ষোল আনা ব্রহ্মচর্য্য সংসারে থেকে কি একেবারে অসম্ভব?

হঠযোগীর প্রবেশ।

পঞ্চবটীতে একটী হঠযোগী কয়দিন ধরিয়া আছেন। তিনি কেবল দুধ আর আফিং খান, আর হঠযোগ করেন, ভাত টাত খান না। আফিংএর ও দুগ্ধের পয়সার অভাব হইয়াছিল। ঠাকুর যখন পঞ্চবটীর কাছে গিয়াছিলেন, তখন হঠযোগীর সহিত আলাপ করিয়া আসিয়াছিলেন। হঠযোগী রাখালকে বলেন যে "পরমহংসজীকে ব'লে যেন আমার কিছু ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়।" ঠাকুর বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "কল্‌কাতার বাবুরা এলে ব'লে দেখ্‌বো।"

হঠযোগী। (ঠাকুরের প্রতি)। "আপ্ রাখালসে ক্যা বোলা থা"?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, ব'লেছিলুম, দেখ্‌তে, যদি কোন বাবু কিছু দেয়। তা কৈ, (প্রাণকৃষ্ণ আদি ভক্তদের প্রতি) তোমরা বুঝি এঁদের like কর না?" প্রাণ-

কৃষ্ণ চুপ করিয়া রহিলেন। (হঠযোগীর প্রস্থান)।

ঠাকুরের কথা চলিতে লাগিল।

(ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও সত্য কথা।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (প্রাণকৃষ্ণ আদি ভক্তদের প্রতি) "আর সংসারে থাকতে গেলে সত্য কথায় খুব আঁট চাই। সত্যতেই ভগবানকে লাভ করা যায়। আমার সত্য কথার আঁট তবু একটু কম্‌ছে। আগে ভারী আঁট ছিল। যদি ব'ল্‌তুম নাইবো। গঙ্গায় নামা হ'লো, মন্ত্রোচ্চারণ হ'লো, মাথায় একটু জলও দিলুম, তবু সন্দেহ হ'লো, পূরো নাওয়া বুঝি হ'লোনা। অমুক জায়গায় হাগ্‌তে যাব, তো সেইখানেই যেতে হবে। রামের বাড়ী গেলাম, কল্‌কাতায়, ব'লে ফেলেছি রুটী খাব না। যখন খেতে দিলে, তখন আবার খিদে পেয়েছে! কিন্তু রুটী খাবনা ব'লেছি, তখন মিঠাই দিয়ে পেট ভরাই।

"এখন তবু একটু আঁট ক'মেছে। বাহ্যে পায় নাই, যাবো ব'লে ফেলেছি, কি হবে? রামকে* জিজ্ঞাসা ক'ল্লুম। সে ব'ল্লে, গিয়ে কাজ নাই, তখন বিচার ক'ল্লুম, ভাবলুম, সব ত নারায়ণ। রামও নারায়ণ, ওর কথাটাই বা না শুনি কেন?

"হাতী নারায়ণ বটে, কিন্তু মাহুতও ত নারায়ণ। মাহুত যেখানে ব'ল্‌ছে, "হাতীর কাছে এসনা" সেখানে মাহুতের কথা না শুনি কেন?

"এই রকম বিচার ক'রে আগেকার চেয়ে একটু আঁট কমেছে।

(ক্রমশঃ)

(শ্রীম-কথিত)

* রাম চাটুয্যে, ঠাকুরবাড়ীর পূজারি।

আপস্তম্বীয় গৃহ্যসূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

দশম খণ্ড।

এই খণ্ডে দ্বিজত্বনিষ্পাদক উপনয়ন নামক শ্রৌতসংস্কার ব্যাখ্যাত হইতেছে। উপনয়ন শব্দের অর্থ, সমীপে লইয়া যাওয়া; বেদপাঠার্থী বালককে গুরুসমীপে লইয়া যাওয়া ব্যাপার যে সংস্কার দ্বারা সংসাধিত হয়, তাহারই নাম উপনয়নসংস্কার।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিনবর্ণ দ্বিজাতি। আচার্য্য মনু বলেন "ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিশস্ত্রয়োবর্ণাঃ দ্বিজাতয়ঃ।" দ্বিজাতি বা দ্বিজ শব্দের অর্থ যাহাদের দুইবার জন্ম হয়। একবার মাতৃগর্ভ-বিচ্যুতি প্রথম জন্ম, উপনয়ন সংস্কার দ্বারা দ্বিতীয় জন্ম সমর্থিত হয়। উপনয়ন কালে, সন্তান যে ভাবে গর্ভে অবস্থিত হয়, ঠিক সেইভাবে উপনয়নার্হ বালক পবিত্রকৃষ্ণসারচর্ম্মে উপবিষ্ট হইবে এবং তাহার পৃষ্ঠোপরিও কৃষ্ণসারচর্ম্ম আস্তৃত রহিবে। ইহাই দ্বিতীয়বার গর্ভবাস। পরে ঐ গর্ভনিষ্ক্রান্তি সংঘটিত হইবে, তখন দ্বিতীয়জন্মের চিহ্নস্বরূপ কৃষ্ণসারচর্ম্মনির্ম্মিত উত্তরীয় বা পবিত্র গলদেশে শোভমান থাকিবে; ইহাই প্রাচীনকালের উপনয়ন-প্রথার দ্বিতীয়জন্ম এবং পবিত্ররহস্য। পরে সময়চক্রের অসাধারণ পরিবর্ত্তনে ব্যবহার-ব্যতিক্রম

উপস্থিত হইয়াছে; পরিবর্ত্তনের অনুসারে সেই আস্তরও একটু এদিক্ ওদিক্ অনুকল্প বিকল্পের আভাসে আবৃত হইয়াছে। গোপথ ব্রাহ্মণে ব্রহ্মচারী গর্ভস্থ শিশুর মত পবিত্র-কৃষ্ণসার-চর্ম্মাবৃত থাকিয়া, পরে প্রসূত হইবেন, এরূপ উক্তি দেখা যায়। অধুনাতন সমাজে ও উপনয়নকালে ব্রহ্মচারীকে বস্ত্রাবৃত থাকিতে দেখিতে পাই, আর কৃষ্ণসারচর্ম্ম একটুক্‌রা পবিত্রে (পৈতায়) বাঁধিয়া দেওয়া হয়। স্রোতস্বতীর বেগ মন্দীভূত হইলে বহুকাল পরেও তাহার পূর্ব্বাবস্থার পরিচয় পাইতে নিদর্শন সহায়তা করে; আমাদের দেশে আর্য্যাচার বিষয়ে অনেক সময় এইরূপ জরৎকঙ্কাল নিদর্শন অস্পষ্ট পূর্ব্বাবস্থার একটা আব্‌ছায়া মত অনুস্মৃতি আনিয়া দেয়। এই পবিত্র যজ্ঞোপবীত নামে পরিচিত।

অনেকে 'যজ্ঞোপবীত' নাম দেখিয়া অনুমান করেন, ইহা যজ্ঞকালে ধারণ করা হইত, অন্য সময়ে গলে রাখা হইত না; বস্তুতঃ ইহা উপনয়ন সংস্কারের বা ব্রাহ্মণ্যের পরিজ্ঞাপক অসাধারণ চিহ্ন, সুতরাং সততই ধারণ করা হইত বোধ হয়; বিশেষতঃ আর্যজীবন যজ্ঞময়; প্রতিদিন নিত্যকর্ম্ম যজ্ঞগুলিও করিতে গেলে অত্যল্প অবসর মাত্র লাভ করা যায়; কাজেই যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগের সময় তাঁহাদের মতেও দুষ্প্রাপ্য। কৃষ্ণাজিন সর্ব্বদা সুলভ না হওয়ায়, আর্য্যগণ উপনিবেশ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এবং সামাজিক শিল্পোন্নতির ক্রমানুসারে, ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যে যজ্ঞোপবীত নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। গোভিলদেবের গৃহ্যসূত্রে দেখিতে পাই, "যজ্ঞোপবীতং কুরুতে সূত্রং বস্ত্রং বাহপি কুশরজ্জুমেব।" সূত্র, বস্ত্র, কুশরজ্জু সম্ভব এবং সুবিধা অনুসারে যজ্ঞোপবীতরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। বর্ত্তমান সমাজে কেবল সূত্র সকলগুলির স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। হয়ত সভ্যতাভিমানী সমাজ কুশরজ্জু বা বস্ত্রনির্ম্মিত যজ্ঞোপবীত গ্রহণে অসুবিধা অনুভব করিয়াই সূত্রগ্রহণে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছিল; তখন সূত্রই সর্ব্বপ্রথম যজ্ঞোপবীত মনে করা হইল এবং গৌণভাবে বস্ত্র বা কুশরজ্জু অগত্যা গ্রহণ করিতে হইবে, এইরূপ স্থির হইল। গোভিলাচার্য্যের সূত্রে প্রথমেই সূত্রের নাম থাকিবার বোধ হয় উদ্দেশ্য এইরূপ। সূত্র বা বস্ত্রব্যবহার সমাজে প্রচলিত হইলে, পরে কুশরজ্জু স্থান পাইতে পারে, এরূপ মনে হয় না; পরন্তু সূত্র বা বস্ত্র প্রণয়নের পূর্ব্বেও আর্য্যস্থানে কুশরজ্জু বেমিল হইত না। আরও দেখা যায়, সমাজ ক্রমশঃ রুচির অনুগামী হইতে বাধ্য হয়। এতাবৎকালে বুঝা গেল, চর্ম্ম, কুশরজ্জু, বস্ত্র, ক্রমশঃ বর্জ্জিত হইল এবং সূত্র পবিত্ররূপে ব্যবহৃত হইল। তখন যজ্ঞোপবীত 'যজ্ঞসূত্র' নাম ধারণ করিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের দ্বিতীয়-জন্ম সূচক অর্থাৎ দ্বিজত্বজ্ঞাপক বাহ্যচিহ্ন স্বরূপ যজ্ঞোপবীতে এই সময় হইতে আধ্যাত্মিক ভাব অর্পিত হইল। তখন ইহা অনেকের নিকট 'ব্রহ্মসূত্র' নামে পরিচিত হইল। এই যুগ ভারতের দার্শনিকযুগ, এই সময়ে সংহিতা বা ব্রাহ্মণ ভাগের প্রাধান্য সঙ্কুচিত এবং উপনিষদের আধ্যাত্মিকতা প্রচারিত হইতেছিল। "ব্রহ্মসূত্র"

পরমপদ ব্রহ্ম সূচনা করে, এই সূত্র-মর্ম্ম যিনি জ্ঞাত আছেন, তিনিই প্রকৃত বেদজ্ঞ*। এই আধ্যাত্মিক ভাব ব্রহ্মোপনিষদে দেখা যায়।

এতদিনও 'সূত্র' উল্লেখ দেখা যায়। ইহার পর তিন সূত্র একত্র করিয়া একটী গ্রন্থি রচনা করিবার আভাস পাওয়া যাইতেছে। ছন্দোগ পরিশিষ্টে "উর্দ্ধন্তু ত্রিবৃতং কার্য্যং তন্তু ত্রয়মধো'বৃতং ত্রিবৃতঞ্চোপবীতং স্যাৎ তস্যৈকোগ্রন্থিরিষ্যতে" দেখা যায়। ইহার পূর্ব্বে তিনটী সূত্র একত্রিত করিয়া একটী ত্রিদণ্ডী বা গ্রন্থি প্রস্তুত করিবার উল্লেখ কোনও গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। মহর্ষি মনুও স্মৃতিশাস্ত্রে ত্রিবৃৎ যজ্ঞসূত্রের কথা বলিয়াছেন।

মহর্ষি দেবলের সময়ে এই সূত্র এক গাছি প্রস্তুত করিতে আবার নয়টী ক্ষুদ্র সূত্রের আবশ্যক হইয়া উঠিল। দেবল বলিয়াছেন "নয় গাছি তন্তু দ্বারা প্রস্তুত সূত্র দ্বারা যজ্ঞোপবীত করিতে হইবে। ঐ সূত্র ব্রহ্মা উৎপন্ন করিয়াছেন, বিষ্ণু ত্রিগুণিত করিয়াছেন, শিব উহার গ্রন্থি রচনা করিয়াছেন এবং সাবিত্রী দ্বারা উহা অভিমন্ত্রিত হইয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, বাসুকি, পবন, অগ্নি, শুক্র, সূর্য্য এবং সুরাচার্য্য, ইঁহারা নয়জনই নয় তন্তুর অধিষ্ঠাতা নব দেবতা।" এই সকল প্রমাণে অবগত হওয়া যায়, দার্শনিকযুগে যজ্ঞোপবীতের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আরম্ভ হইয়া স্মার্ত্তযুগে সমধিক পরিপুষ্ট হইয়াছিল। তখন ত্রিদণ্ডীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও, আরম্ভ হইয়াছিল। বাগ্দণ্ড, কায়দণ্ড, মনোদণ্ড, এই তিন দণ্ড থাকিলেই ত্রিদণ্ডী, এইরূপ কথা স্বয়ং মনুই বলিয়াছেন।

ব্রাহ্মণের কার্পাসসূত্রনির্ম্মিত, ক্ষত্রিয়ের শণসূত্রনির্ম্মিত এবং বৈশ্যের মেষলোম-রচিত যজ্ঞোপবীত হইবে, এইরূপ পার্থক্য মনু উল্লেখ করিয়াছেন। বিস্তার শঙ্কায় উপনয়নে যজ্ঞোপবীত ধারণের আরও অনেক রহস্য প্রকাশ করিবার অবকাশ হইল না।

দার্শনিকযুগে যজ্ঞোপবীত কেবল দ্বিজত্বের চিহ্নমাত্র রহিল না, উহার সহিত সুন্দর ধর্ম্মভাবের সংশ্রব হইল, এবং উহার গৌরব বর্দ্ধিত হইল। ধর্ম্মভাবহীন সূত্রমাত্র পরিজ্ঞাপক না হওয়া উচিত। উপনয়নের উদ্দেশ্য, বেদাদি জ্ঞানবিকাশক শাস্ত্রতত্ত্ব শিক্ষা করিতে গুরুর নিকট গমন। গুরু-গৃহে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক সংযত, শিক্ষিত, তেজস্বী ব্রহ্মচারী নানাশাস্ত্রালোচন ও বহুজ্ঞান সঞ্চয় করিয়া, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গের উন্নতি সাধন পূর্ব্বক সমাজের—দেশের—অভাব মোচন করিয়া, জাতীয় জীবনের পূর্ণতা সম্পাদন করিবেন; এরূপ ব্যক্তির বাহ্য-চিহ্নের সহিত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মধারণার সংমিশ্রণ বেশ 'সোনায় সোহাগা' হইয়াছিল। দার্শনিক মস্তিষ্কের বড়ই সম্মানিত সিদ্ধান্ত বলিয়া ইহা সমাজের মধ্যে বেশ পবিত্রতা বা ধর্ম্ম-ভাবের প্রসার বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছিল। কালের কুটিল গতিতে উপনয়ন কেবল

---

*সূচনাৎ সূত্রমিত্যাহুঃ সূত্রং নাম পরংপদং
তৎসূত্রং বিদিতং যেন স বিপ্রো বেদপারগঃ।
ব্রহ্মোপনিষদ্।

অনুশীলন মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। গুরু-গৃহ-বাস কেবল তিন রাত্রি চখ্ নাক্ বুজিয়া ঘরের ভিতর বসিয়া খোঁস গল্প করায় পরিণত হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য, ইন্দ্রিয়সংযম, শক্তিলাভ, সবই কথামাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ অধঃপতিত দেশে ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর সাধন চাই, বেদাধ্যয়ন (জ্ঞানশিক্ষা) অবিরত আবশ্যক। যজ্ঞসূত্র পুনর্ব্বার ব্রহ্মণ্যের অসাধারণ নিদর্শনে পরিণত হওয়া দরকার; নচেৎ বৃথা অর্থব্যয়, বৃথা পরিশ্রম, ব্রত, উপবাস; জাতীয় ভাব কিছুতেই উদ্দীপিত হইবে না। কথাপ্রসঙ্গে আমরা বহু দূরে আসিয়াছি। এখানে বিরাম লাভ করা গেল।

আপস্তম্বের উপনয়নব্যাখ্যার প্রথমে প্রতিজ্ঞাজ্ঞাপক সূত্র।

১। উপনয়নং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

অর্থাৎ এই পরিচ্ছেদে আমরা উপনয়ন সংস্কারের বিষয় বলিব।

উপনয়নের কাল নির্ণয় প্রসঙ্গে অর্থাৎ উপনয়নার্হ কুমারের বয়স সম্বন্ধে গৃহ্য-সূত্রকারপ্রধান আপস্তম্বের মত,—

২। গর্ভাষ্টমেষু ব্রাহ্মণমুপনয়ীত।

৩। গর্ভৈকাদশেষু রাজন্যং গর্ভদ্বাদশেষু বৈশ্যং॥

গর্ভাষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণকুমারকে উপনীত করাইবে। গর্ভ একাদশবর্ষে ক্ষত্রিয় এবং গর্ভদ্বাদশবর্ষে বৈশ্যকুমারের উপনয়ন হওয়া উচিত। যে সময় প্রথমে সন্তান গর্ভস্থ হয়, সেই সময় হইতে গণনা করিয়া অষ্টম-বর্ষ পূর্ণ হইলে, ব্রাহ্মণ-সন্তানের উপনয়ন কাল উপস্থিত হয়। ক্ষত্রিয় বৈশ্যের গর্ভ হইতে গণনা করিয়া একাদশ এবং দ্বাদশ বর্ষে উপনয়ন কাল। এই কাল-নির্ণয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন, গর্ভাষ্টমে অথবা অষ্টমবর্ষে ব্রাহ্মণের উপনয়ন কাল। ক্ষত্রিয়ের কেহ দশ—একাদশবর্ষ, বৈশ্যের কেহ একাদশ—দ্বাদশবর্ষ বলেন। তিন জাতির মধ্যে উপনয়ন-কালের পার্থক্য হওয়ার কারণ আছে। ব্রাহ্মণসন্তান বাল্যাবধি ব্রাহ্মণসমাজে বাস করে, অনিচ্ছায় বা যদৃচ্ছায় তাহারা অনেক জ্ঞান লাভ করে, যেহেতু ব্রাহ্মণেরাই অধ্যয়নের গুরু, অব্যাহত পঠন পাঠন তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত। সংসর্গজাত শিক্ষা এবং বাল্যাবধি অনিচ্ছা প্রাপ্ত অনুশীলনের ফলে তাহারা সত্বর শিক্ষার্হ হয়; বিশেষতঃ ব্রহ্মচর্য্যের কঠোরতা ব্রাহ্মণসমাজে ব্রাহ্মণকুমার বাধ্য হইয়া শিখিয়া ফেলে এবং সহজতঃ কষ্ট-সহিষ্ণু হয়। এরূপাবস্থায় তাহাকে গুরু-গৃহে ব্রহ্মচারী হইয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে যত অল্প বয়সে অধিকার দেওয়া যায়, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যসন্তানকে তত সত্বর দেওয়া হয় না। ক্ষত্রিয় অপেক্ষা বৈশ্যের সহিত ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধ কিছু দূরবর্ত্তী, কাজেই ক্ষত্রিয় বৈশ্যের পূর্ব্বে অধিকারী। ব্রাহ্মণ আচার্য্যের গৃহে বাস করিতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অপেক্ষা আগে যোগ্য হইবে, কারণ ক্ষত্রিয়সন্তান বৈশ্য অপেক্ষা অনেক সময় অধিক ব্রাহ্মণসংসর্গ লাভ করে। রাজশক্তির অধিকারী হইয়াও ক্ষত্রিয়, কঠোরতার শিক্ষায় এবং ব্রাহ্মণ-সংসৃষ্টঅভিজ্ঞতায়, বৈশ্যকে পশ্চাতে রাখিতে পারে। পূর্ব্বাপরতার একমাত্র কারণ অধিকার-যোগ্যতা; ঐ যোগ্যতা যাহার যত

দিনে উৎপন্ন হইবে, সে ততদিনেই অধিকারী; সুতরাং সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণের, পরে রাজন্যের, অনন্তর বৈশ্যের অধিকার যুক্তিযুক্ত।

উপনয়নের সময় অর্থাৎ ঋতু-মাসাদির বিবেচনা করিতে গিয়া আপস্তম্ব বলিতেছেন।—

৪। বসন্তো গ্রীষ্মঃ শরদিত্যৃতবো বর্ণানুপূর্ব্বেণ।

ব্রাহ্মণ-কুমারের উপনয়নকাল বসন্ত, ক্ষত্রিয়ের গ্রীষ্ম এবং বৈশ্যের শরৎ। এই ঋতুভেদের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও গূঢ়রহস্য আছে, তবে অনভিজ্ঞ লেখকের সে বিষয়ে কিছু জ্ঞান নাই। গ্রীষ্মকাল উগ্রতার নিদর্শন; গ্রীষ্মের বিভীষণভাব মনে চিন্তা করিলে, সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন। গ্রীষ্মে উগ্রতার অবতার ক্ষত্রিয়জাতি উপনীত হইবেন। সময়ের প্রকৃতি উগ্রতাময়ী; ঐ সময়ের সাধক-ব্রহ্মচারী উগ্রতেজা ক্ষত্রিয়কুমার। সন্তাপযুক্তকালে তেজস্বী সাধক তেজের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে পারেন। বসন্ত মধুরতার নিদর্শন। প্রকৃতির জীর্ণ-পরিত্যাগের এবং নূতন পবিত্র পরিচ্ছদ পরিধানের অবসর সুবসন্ত; সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণব্রহ্মচারী এই শান্ত, স্নিগ্ধ, সুন্দর সময়ে নিজের শান্তিপ্রিয়তা, ক্ষমাশীলতা ইত্যাদি স্নিগ্ধগুণের উদ্বোধনে কৃতসংকল্প হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। সময় ও উদ্দেশ্যে সাম্য চাই। ভীষণা রণরঙ্গিণী নৃমুণ্ডমালিনীর পূজার ব্যবস্থা অমানিশার নিবিড় অন্ধকার রজনীতে, আর ব্রজবিলাসিনী মধুরিমময়ী গোলোকেশ্বরী পূর্ণশক্তি রাধার পূজাকাল রাসপূর্ণিমার জ্যোৎস্নাধবলা অনুলবামিনী। কালে ও কার্য্যে সামঞ্জস্য থাকা আবশ্যক। দ্বিপ্রহরের পক্ষে যে সঙ্গীত ভাবোদ্দীপক, প্রভাতের পক্ষে তাহা অরুচিকর। শরতে বৈশ্যের চিরসম্বল কৃষি ও বাণিজ্য, উভয়েরই অনুকূলতা আছে। যে সময় স্বশক্তির অনুকূল ও স্বজাতীয়জীবনের সমধর্ম্মী, সেই সময়ই জাতীয় শক্তির উদ্বোধনের জন্য প্রশস্ত হইবার প্রকৃষ্টকাল। এইরূপ ব্যাখ্যা একদা এক বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ ত্যাগশীল মহোদয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম; যোগ্যাযোগ্য বিচারের ভার সুযোগ্য পাঠকগণের উপর অর্পণ করিলাম।

জ্যোতিঃশাস্ত্রের মতে উপনয়নের দিন হইবে—বৃহস্পতি, রবি, চন্দ্র ও তারা-শুদ্ধি থাকিলে, শুক্লপক্ষে, স্বাধ্যায়দিনে, উত্তরায়ণকালে; রবি, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে; অশ্বিনী, মৃগশিরা, পুষ্যা, উত্তরফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী নক্ষত্রে, কালশুদ্ধিতে। ইহাতে হরিশয়ন, যুতবেধ, যামিত্রবেধ, দশযোগভঙ্গ ও গলগ্রহ প্রভৃতি দোষ না থাকে, এটুকু লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আমরা এইরূপ ভাবের একটী জ্যোতিষের বচন উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, যথা,—

জীবার্কেন্দুভশুদ্ধৌ হরিশয়নবহির্ভাস্করে চোত্তরস্থে,
স্বাধ্যায়ে বেদবর্ণাধিপ ইহ শুভদে স্বোবতে। নাদিতোচ।
শুক্রার্কেজার্ক্কলগ্নে রবিমদনতিথিং প্রোজ্‌ঝ্যবষ্টাষ্টমেন্দুং
নোজীবাস্তাক্তিচারেহর্কসিতশুক্লদিনে কাল-শুদ্ধৌ ব্রতং স্যাৎ॥

উপনয়নের ব্যাপারাদি কিরূপভাবে অনুষ্ঠিত হইবে, তাহার আভাস দিতে গিয়া আপস্তম্ব বলিতেছেন।—

৫। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা আশিষো বাচয়িত্বা কুমারং ভোজয়িত্বা অনুবাকস্য প্রথমেন যজুষা আপঃ সংসৃজ্য উষ্ণাঃশীতা-স্বানীর উত্তরয়া শির উনত্তি।

ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহাদের দ্বারা আশীর্ব্বাক্য উচ্চারণ করাইয়া, (পুণ্যাহ স্বস্তি ঋদ্ধি বাচনই বৃত্তিকার হর দত্তের মতে আশীর্ব্বাক্য-উচ্চারণ,) অনন্তর উপনয়নযোগ্য কুমারকে ভোজন করাইবে। অনন্তর আচার্য্য উত্তর অনুবাকের প্রথম যজুর্মন্ত্র (উষ্ণেন বায়ো' ইত্যাদি) দ্বারা উষ্ণ এবং শীত জল সংগ্রহ করিবেন। উষ্ণজল শীত জলের পাত্রে আনিবেন, পরে ঐ মিশ্রিত জল দ্বারা কুমারের শিরঃ অর্থাৎ মাথার চুলগুলি ভিজাইয়া দিবেন, এই সময়ে "আপউন্দন্তু" ইত্যাদি ঋক্ মন্ত্র পাঠ করিবেন।

কুমারকে উপনয়নের দিন প্রাতঃকালে ভোজন করাইবার কথা গৃহ্যসূত্রকার লিখিতেছেন, উপনয়নাদি কর্ম্মের পদ্ধতিতেও দেখা যায়, কিন্তু উহা অনুষ্ঠিত হয় না। উপনয়নের পূর্ব্বদিন শেষরাত্রিতে কুমারকে দুগ্ধাদি প্রচুর ভোজন দিবার প্রথা দেখা যায়। ঐ সময়ে বা তৎপূর্ব্বে ব্রাহ্মণ-ভোজন প্রথা প্রচলিত নাই, ব্রাহ্মণী-ভোজন দৃষ্ট হয়। কুমারের শেষ রজনীতে দুগ্ধ দধ্যাদিযুক্ত ভোজন এবং রমণীগণের দধ্যাদিযুক্ত ভোজন-প্রদান কার্য্যকে 'দধিমঙ্গল' বলা হয়; ইহা বোধ হয় অনুকল্প ব্যবস্থা হইবে। ঐ সময়ে কুমারের কপালে দধিতিলক প্রদান করিতে দেখা যায়।

নান্দীশ্রাদ্ধ বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ বিষয়ে সুদর্শনাচার্য্যের মত "পূর্ব্বেদ্যুর্নান্দীশ্রাদ্ধং কুরুতঃ।" অর্থাৎ নান্দীশ্রাদ্ধ পূর্ব্বদিনে করিতে হয়। পরদিন প্রাতে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইতে হয়। হর দত্ত বলেন "শ্বোভূতে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা আশীর্ব্বাচয়তি।" অধুনাতন সমাজে পূর্ব্বদিনে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে দেখা যায় না। সেই উপনয়ন-দিনেই প্রাতে ঐ শ্রাদ্ধ করা হয়। ব্যবহার, শাস্ত্রকে চিরদিন পশ্চাতে রাখিয়া থাকে। কুমার-ভোজনের পর হইতে আচার্য্যের কার্য্য আরম্ভ।

চুল ভিজাইয়া, পরে যাহা করিতে হইবে, আপস্তম্ব তাহা বলিতেছেন।

৬ ত্রীংস্ত্রীন্ দর্ভানন্তর্ধায় উত্তবাভিশ্চতসৃভিঃ প্রতিমন্ত্রং প্রতিদিশং প্রবপতি।

প্রত্যেক দিকে তিনটী তিনটী কুশ মধ্যে রাখিয়া, এক এক মন্ত্রে এক এক দিকের কেশ ছেদ করিবেন। প্রথম কেশগুলিকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া, আচার্য্য পূর্ব্ব দিকের কেশ মধ্যে তিনটী কুশ দিয়া "যেনাবপৎ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া, কএক গাছি কেশ ক্ষুর দ্বারা ছেদন করিবেন। অনন্তর বৃষগোময়-পরিপূর্ণ সন্নিহিত পাত্রে ঐ কেশ ও যব প্রক্ষেপ করিবেন। পরে জলস্পর্শ পূর্ব্বক আচমন করিবেন। অনন্তর দক্ষিণ দিকের কেশে কুশ দিয়া 'যেন পূষা' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক কএকটী কেশ ছেদ ও পূর্ব্ববৎ বৃষগোময়ে নিঃক্ষেপ করিবেন। পরে আচমনান্তর পশ্চিমদিকের কএকটি কেশ ঐভাবে "যেনভূয়ঃ" ইত্যাদি

মন্ত্রে বৃষগোময়ে রাখিবেন। তৎপরে উত্তর দিকের কএকটী কেশ ঐরূপে 'যেন পূষা' ইত্যাদি মন্ত্রে ছেদ করিয়া বৃষগোময়ে নিঃক্ষেপ করিতে হইবে। প্রতিবারেই যব দিতে হইবে। এইরূপে আচার্য্য প্রত্যেক দিকের কয়টী কয়টী কেশ ছেদ করিলে, পরে নাপিত সমস্ত কেশ উত্তমরূপে মুণ্ডন করিবে। বপতি শব্দের অর্থ বপন করা। প্র শব্দের অর্থ আরম্ভ। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, আচার্য্য ক্ষুর দ্বারা বপনের আরম্ভ করিবেন, পশ্চাৎ নাপিত তাহা নিঃশেষরূপে সম্পাদন করিবে।

৭। বপন্তমুত্তরয়ানুমন্ত্রয়তে।

নাপিত কেশ বপন করিবে, আর আচার্য্য তাহাকে 'যৎ ক্ষুরেণ' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অনুমন্ত্রিত করিবেন। সুদর্শনাচার্য্য বলেন, যখন আচার্য্য কুমারের কেশ ছেদ করিবেন, তখনই কুমারের দক্ষিণদিকে বসিয়া কুমারের মাতা বা অন্য কোনও ব্রহ্মচারী আচার্য্যকে অনুমন্ত্রিত করিবেন। অনুমন্ত্রণ নাপিত কর্তৃক বপনে নহে। হরদত্ত কিন্তু আচার্য্যের অনুমন্ত্রণের কথাই বলিয়াছেন। সুদর্শন বলেন, 'আয়ুর্ম্মা প্রমোষী' ইত্যাদি অনুমন্ত্রণ-বাক্যে নামপুরুষলিঙ্গকতা রহিয়াছে। আচার্য্য বপনে ব্যাপৃত, সুতরাং অনুমন্ত্রণে তাঁহার কর্তৃত্ব সম্ভব নয়; অতএব মাতা বা অন্য ব্রহ্মচারী অনুমন্ত্রণ করিবেন। উভয় নিজক্ষেত্রে সামঞ্জস্য আছে।

(ক্রমশঃ)

তীর্থপদাশ্রিতস্য কস্যচিৎ
দাহর-বেদবিদ্যালয়স্থস্য—

ওঁ নমস্তত্ত্বেভ্যঃ।

তত্ত্বসমাস।

যে মহাপুরুষের মহতী প্রতিভা সমগ্র-জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছিল, যাঁহার হৃদয়ের ধন চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব উপনিষৎ, পুরাণ, তন্ত্রাদি বিরাট হিন্দুশাস্ত্রের বিশাল কলেবরে সুন্দররূপে খচিত রহিয়াছে, যিনি স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানবৈরাগ্যসম্পন্ন জন্মযোগী; বিপুল গৌরবময় স্বরে বেদ যাঁহার অগাধ-জ্ঞান ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন "ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ" সেই আদিগুরু, জগতের সর্ব্বপ্রধান মনোবিজ্ঞানবিৎ আচার্য্য কপিল আসুরি মহোদয়কে সর্ব্বপ্রথমে সংক্ষেপে যে পদার্থতত্ত্ব কহিয়াছিলেন, তাহারই নাম তত্ত্বসমাস।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবন্নারায়ণের দ্বাবিংশতি অবতারের মধ্যে মহর্ষি কপিল পঞ্চমাবতার, এরূপ উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। "পঞ্চমঃ কপিলো নাম সিদ্ধেশঃ কালবিপ্লুতং প্রোবাচাসুরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রামবিনিশ্চয়ং।" অর্থাৎ শ্রীমন্নারায়ণের পঞ্চম অবতার কপিল নামক সিদ্ধ-শ্রেষ্ঠ আসুরিকে কাল-মহিমায় বিপ্লবপ্রাপ্ত তত্ত্বসমূহনিশ্চয়স্বরূপ সাংখ্য অর্থাৎ আত্মজ্ঞান বলিয়াছিলেন। এই বচনে জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে, কপিল যখন আসুরিকে সাংখ্য শাস্ত্রের উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বে সাংখ্য অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লইয়া বড়ই বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় স্পষ্টই বলিয়াছেন, "যদা যদাহি-

ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত! অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং।" কেবল কৃষ্ণচন্দ্রের পরবর্ত্তী সময়ের জন্য এই কথা, তাহা নহে, চিরদিনই ভগবানের অবতীর্ণ হইবার কারণ ধর্ম্মবিপ্লব। আত্মজ্ঞানই মুক্তির সর্ব্বসম্মত উপায়। আত্মজ্ঞান বিলুপ্ত হইলে, বস্তুতই সেই সময়ে অবতারের আবশ্যকতা।

সাংখ্য বলিলে সাধারণতঃ অনেকেই মনে করেন, কপিল-কথিত ষড়্দর্শনান্তর্গত দর্শনশাস্ত্রবিশেষ, কিন্তু ঐরূপ ধারণার মূলভিত্তি দৃঢ় নহে। আমরা শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ তন্ত্রাদি শাস্ত্রে সর্ব্বদাই 'সাংখ্য' শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাই; বস্তুতঃ সর্ব্বত্র কপিলপ্রণীত শাস্ত্র লক্ষ্য হইতে পারেনা। বেদ বলিতেছেন "তৎকারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং" এখানে বোধ হয় কপিলের সাংখ্য এবং পতঞ্জলির যোগদর্শনকে লক্ষ্য করা হয় নাই। আত্মজ্ঞান, বহুপূর্ব্বে শ্রীভগবান্ চতুর্ম্মুখ দেবকে বলিয়াছিলেন, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে বিশেষরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উল্লেখও দৃষ্ট হয়। সেই আত্মজ্ঞান সময়বশে পঙ্কিল হইলে, সত্য প্রচারের জন্য কপিলদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যোগশাস্ত্রও প্রথমে ব্রহ্মা ব্যাখ্যা করেন। পুরাণে দেখা যায় "হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বক্তা নান্যঃ পুরাতনঃ।" পরে ঐ যোগশাস্ত্র মহর্ষি পতঞ্জলি কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়। পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রকে 'যোগানুশাসন' বলে। কথিতের পুনঃকথন হইলে অনুকথন এবং শিষ্টের পুনঃশাসন হইলে অনুশাসন বলে; সুতরাং অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে, পতঞ্জলি-রচিত চতুষ্পাদ গ্রন্থ মূল যোগোপদেশ নয় এবং কপিল-রচিত ষড়ধ্যায় বা তত্ত্বসমাস, কিছুই প্রকৃত সাংখ্য নহে। যুগযুগান্তব্যাপী মহাসত্য কপিলাবতারে জগৎ যেরূপ ভাবে সর্ব্বপ্রথমে শুনিয়াছিল, সেরূপ আর শুনে নাই বলিয়া, কপিলের চরণে প্রণত হয়। আর অনাদি যোগ—যাহা স্বয়ং ব্রহ্মা অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, যে যোগ—মহেশ্বরের চিরসম্বল, অধিক কি, শ্রীভগবান্‌ও যে যোগনিদ্রা অবলম্বন করিতেন, সেই জীবন্ত সত্য মহর্ষি পতঞ্জলির নিকট জীবজগৎ প্রথমে শুনিতে পায় বলিয়াই 'পাতঞ্জল' নামে তাহাদের হৃদয়ধমনী নাচিতে থাকে। খনির অন্ধকারে, পর্ব্বতের গহ্বরে আপনার আলোকে মণি যখন আপনি আলোকিত হয়, অথচ জগৎ তাহার সংবাদ পায় না, তখনও মণি যেরূপ মণিই, পরে ধনীর প্রাসাদে, অপূর্ব্ব পরিচ্ছদে, দশ জনের নয়ন ঝলসাইয়া যখন বিরাজমান, তখনও মণি মণির অধিক কিছু নহে; কিন্তু সংস্কার উহার মহিমা বুঝিতে দেয়। যখন সাংখ্য (আত্মজ্ঞান) মলীমসভাবে আঁধারে আবৃত ছিল, সমাজ সে তত্ত্বে অন্ধ হইয়া ছিল, তখনও উহা সাংখ্য, পরে কপিলের অপূর্ব্বপরিচ্ছদে উহার সংস্কারশুদ্ধি সম্পন্ন হইলে, উহাই জগতের চক্ষু ঝলসাইয়াছিল। কোনও সত্য নবাগত নহে। সত্যসমুদ্র শ্রীভগবান্ হইতেই উহাদের আবির্ভাব; তবে অবতারে প্রচারিত হয় বলিয়াই অবতারের পদে জগৎ লুণ্ঠিত হয়। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্য এবং গীতাদি সমস্ত শাস্ত্রে "সাংখ্য" অর্থে আত্মজ্ঞান বুঝা হইয়াছে। আত্মজ্ঞানের নাম সাংখ্য আত্মজ্ঞান বিষয়ে কপিলই সর্ব্বপ্রথম

উপদেষ্টা। কপিল আদি বিদ্বান্, সুতরাং কপিলের আত্মজ্ঞানোপদেশ 'সাংখ্য' নামে জনসমাজে পরিচিত হইতে বাধা নাই। সাংখ্যসূত্র অর্থে আত্মতত্ত্ববিষয়ক সূত্র। কপিল একটী নূতন নাম প্রচার করেন নাই। সাংখ্য বলিলে শাস্ত্রকারগণ জ্ঞান-মার্গই বুঝিয়াছেন। কপিল নিজে দুইখানি সাংখ্যগ্রন্থ বলেন। একখানি অতিক্ষুদ্র, দ্বাবিংশতি সূত্রে সম্পূর্ণ, ইহারই নাম তত্ত্ব-সমাস; অপর খানি বিস্তৃত, নাম সাংখ্য প্রবচন। তত্ত্বানুসন্ধিৎসু আসুরিকে এই তত্ত্বসমাস বলা হয়।

আসুরি আমাদের পরিচিত মহর্ষি। আমরা তর্পণকালে "সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব" ইত্যাদি মন্ত্রে কপিলের পরেই আসুরির নাম পাঠ করি। আসুরি কোনও গ্রন্থ লেখেন নাই। তৎ-শিষ্য পঞ্চশিখ অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আমরা পঞ্চশিখের কতকগুলি সূত্র এখনও দেখিতে পাই; অপর মহামূল্য-গ্রন্থগুলি মহাকালের বিশাল কুক্ষিতে স্থান পাইয়াছে।

তত্ত্বসমাসে সংক্ষেপে কেবল মাত্র পদার্থ-তত্ত্ব ও পদার্থস্বরূপজ্ঞান লাভ করিলে কৃতকৃত্য হওয়া যায় অর্থাৎ মুক্তি হয়, এই কথা বলা হইয়াছে। এই সংক্ষিপ্তগ্রন্থে বিচার-বিবাদ-বিতর্কের উল্লেখ নাই। মতান্তর, যুক্তিবিস্তার, ঝগড়া ইত্যাদিও দেখা যায় না, যেহেতু জিজ্ঞাসু বিশ্বাসী জ্ঞানপিপাসু শিষ্য আসুরি বিচার দশা অতিক্রম করিয়া, কেবল মাত্র বিশ্বাসের ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া, উপদেশপ্রার্থনায় কপিলদেবের নিকট গিয়াছিলেন। কপিলদেব যে তত্ত্ব-সমাস কহিয়াছিলেন, তাহাই আকণ্ঠ পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্ণকুম্ভের মত নিস্তব্ধ ভাবেই তিনি উপদেশ গ্রহণ ও আলোচনা করিয়াছিলেন।

আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখ বড় প্রতিভাবান্ ঋষি ছিলেন; তিনি উপদেশ গ্রহণের পর উহার বিস্তৃত আলোচনা বিচারাদি করেন; তাঁহার তর্ক-জালের বিচার বিভ্রাটের অনুরোধেই কপিলদেব দ্বিতীয়বার সাংখ্য-প্রবচন সূত্র রচনা করিতে বাধ্য হন। প্রথমে তত্ত্বসমাসে যাহা বলেন, পরে মূলতঃ তাহাই প্রকৃষ্টরূপে যুক্তি তর্ক দ্বারা স্থির বলিয়া প্রতিপাদন করেন; কাজেই দ্বিতীয় খানির নাম হইল "প্রবচন"। ষষ্ঠিপদার্থ প্রতি-পাদন করায়, ঐ গ্রন্থের আর এক নাম হইল ষষ্ঠিতন্ত্র।

সাংখ্যপ্রবচন যে কপিল-প্রণীত, ইহা আমরা ১৩০৬ সালের হিন্দু পত্রিকায় "সাংখ্য-দর্শন ও বিজ্ঞানভিক্ষু" প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। এই প্রবন্ধে উহার ষষ্ঠিপদার্থপ্রতিপাদন-প্রণালী এবং সাংখ্যমত যে শ্রৌত, তাহা পরিশেষে দেখান যাইবে। কপিল-রচিত এই প্রথম গ্রন্থ 'তত্ত্বসমাস' আমরা সম্প্রতি প্রকাশ করিব। কপিলের প্রথম সূত্র—

অথাতস্তত্ত্বে সমাসঃ ॥১॥

অথ শব্দের অর্থ মঙ্গল, অধিকার, আনন্তর্য্য। এখানে অথ শব্দের অর্থ মঙ্গল। সূত্রের অর্থ,—এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া তত্ত্ববিষয়ে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। এখানে তত্ত্বপ্রতিপাদনই লক্ষ্য বিষয়, কিন্তু সংক্ষেপ করাও তাহার বহির্ভূত নহে। "অধিকারশ্চ

"আধিক্যেন আরম্ভণং" অধিকার অর্থ প্রধানভাবে আরম্ভ করা। এই অধিকার প্রতিপাদনের ফলে গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়ের উপস্থিতিতে অসঙ্গতি নিবারিত হয়। অথ শব্দের অর্থ 'অধিকার' এখানে গৃহীত হইতে পারে না, কারণ অতঃশব্দই আরম্ভ সূচনা করিতেছে। শাস্ত্রে আছে, "মঙ্গলাদীনি প্রথয়িতব্যানি" সাংখ্যপ্রবচনে স্বয়ং কপিলাচার্য্য "মঙ্গলাচরণং শিষ্টাচারাৎ ফলদর্শনাৎ শ্রুতিতশ্চেতি" বলিয়াছেন, অতএব এখানে অথ শব্দের অর্থ মঙ্গল বলা যাইবে। অথশব্দ উচ্চারণ করিলেই মঙ্গলাচরণ সিদ্ধ হয়। শাস্ত্র বলিতেছেন—"ওঁকারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রাহ্মণঃ পুরা কণ্ঠং ভিত্বা বিনির্যাতৌ তেন মাঙ্গলিকাবুভৌ।" ওঁকার এবং অথ শব্দ সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মার কণ্ঠদেশ ভেদ করিয়া উচ্চারিত হইয়াছিল, এজন্য উহারা মাঙ্গলিক। এই শ্লোকের ভাবে স্পষ্টই বুঝা যায়, অথ শব্দের উচ্চারণ মাঙ্গলিক। অথ শব্দ মঙ্গল সূচনা করিতেছে; সুতরাং আনন্তর্য্য অর্থও এখানে সঙ্গত নহে। যদিও শিষ্য আসুরি জিজ্ঞাসা করিলে, তদনন্তরই কপিলদেব বলিতে আরম্ভ করেন; বিশেষতঃ শাস্ত্রেও আছে "নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্ ব্রুয়াৎ" এই জন্য জিজ্ঞাসার আনন্তর্য্য ধর্ত্তব্য হয়; কিন্তু উহার কোনও দৃঢ়তা নাই। প্রশ্ন করিলে পর যে উত্তর দেওয়া হইতেছে, ইহা অনায়াসগম্য, এজন্য একটা অথ শব্দের আবশ্যকতা নাই। মিত্রভাবে বিনা জিজ্ঞাসায়ও বলা যাইতে পারে; কিন্তু শিষ্যভাবে উহা একান্ত দুর্ঘট; অতএব "জিজ্ঞাসার পর" এরূপ অকিঞ্চিৎকর আনন্তর্য্য এখানে মূল্যবান্ নহে। আনন্তর্য্য পূর্ব্বাপর সঙ্গতির জন্য অনেক স্থানে দরকার হয়, এখানে জিজ্ঞাসার আনন্তর্য্য আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে; উহা প্রকাশ করিবার জন্য স্বতন্ত্র প্রযত্ন অনাবশ্যক।

আর্য্যগণ সর্ব্বকার্য্যে প্রথমে মঙ্গলের অবতারণা করিতেন; ভবিষ্যতেও মঙ্গল হইবে, এইরূপ আশা তাঁহাদের প্রণোদনার কারণ। নির্ব্বিঘ্নে গ্রন্থ-পরিসমাপ্তি জন্য অনেক স্থানে মঙ্গলাচরণের কথা বলিতে দেখা যায়।

মঙ্গলাচরণ ত্রিবিধ; বাচিক, মানসিক এবং আনুষ্ঠানিক। "ওঁ", "অথ," "স্বস্তি" দেবতাবাচক, কুশলবাচক শব্দোচ্চারণ এবং শ্লোক দ্বারা দেবতা গুরু প্রভৃতির নমস্কার করাই বাচিক মঙ্গল। মানসিক মঙ্গল—মনে মনে পবিত্র মঙ্গলবাচক শব্দ, দেবতাদির রূপ ও মাঙ্গল্যদ্রব্যের চিন্তা করা। আনুষ্ঠানিক মঙ্গল—কদলীবৃক্ষ রোপণ, পূর্ণকুম্ভস্থাপন, মালিকাবন্ধন, শঙ্খাদি বাদন, লাজবর্ষণ প্রভৃতি। প্রত্যেক ব্যাপারে সজাতীয় মঙ্গলচর্য্যা আবশ্যক। কপিলদেব বাঙ্ময় উপদেশ দিতে গিয়া, বাচিক মঙ্গল অথ শব্দোচ্চারণ করিয়াছেন। বিষয়—তত্ত্বোপদেশ বাচিক, মঙ্গল—অথ শব্দোচ্চারণও বাচিক।

'অতঃ শব্দের অর্থ, এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া। তত্ত্ব কথাটীর অর্থ যথার্থবস্তু। কপিলদেব যে কয়টী পদার্থকে যথার্থ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তিনি তাহারই উপদেশ দিয়াছিলেন। পদার্থপ্রতিপাদন করিতে হইলে, পদার্থের উপযোগিতা, তাহাদের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ ও কার্য্য-প্রণালী

সম্বন্ধে বলা আবশ্যক হয়; ঐগুলি বলিতে হইলে যে সকল প্রমাণ, যুক্তি ও ক্রম আবশ্যক হয়, তাহাও একান্ত অপরিহার্য্য; সুতরাং এই সকল বিষয়ের বিবরণ দেওয়ারও দরকার হইয়াছে।

কপিলদেবের "তত্ত্ব" কথাটীর একটু রহস্য বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। তাঁহার প্রচারিত চতুর্ব্বিংশতি জড়তত্ত্ব এবং পুরুষ চৈতন্যতত্ত্ব, এই পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের মধ্যে কোনওটীকে তিনি আকাশকুসুম, শশশৃঙ্গ বা মরুমরীচিকা অথবা শুক্তি-রজতের মত বলিয়া স্বীকার করিবেন না, ইহার আভাসস্বরূপ তত্ত্বশব্দ উচ্চারণ করিয়াছেন। এই সূত্রে তত্ত্বোপদেশ দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া দ্বিতীয়সূত্রেই প্রধান তত্ত্বের উল্লেখ করিতেছেন।

কথয়ামি অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ। ২

সূত্রার্থ,—আমি বলিতেছি—প্রকৃতি অষ্টপ্রকার। প্রকৃতি বলিলে, অনেকে বুঝেন 'স্বভাব', কিন্তু এখানে অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় কোনও স্বভাব-বিশেষকে প্রকৃতি বলা হইতেছে না। সমস্ত সংসার বিশ্লেষণ করিলে, দুই প্রকার পদার্থের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়, এক চেতন, অন্য জড়। এই জড়তত্ত্ব জগতের দৃশ্যমানমূর্ত্তি হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মস্তরে বিভক্ত হইতে পারে। বহুদূরে গিয়া ইহা দৃশ্যমান জগৎ ছাড়িয়া সূক্ষ্মজগতে প্রবেশ করে। আণবিক সংস্থান হইতে সেই জগৎ আরম্ভ হয়। সাধারণতঃ আমরা সেই জগতের ক্রিয়াপ্রণালী এরূপজ্ঞান লইয়া বুঝিতে পারি না। আমাদের দৃষ্টি সে সূক্ষ্মজগতে যাইতে পারে না। আমাদের চক্ষুর শক্তি সামান্য, যন্ত্র-সাহায্যে এই সামান্য শক্তিরও উদ্বোধন হইতে পারে; এই চক্ষুরও শুদ্ধি ঘটিয়া সামর্থ্য বর্দ্ধিত হইতে পারে; কিন্তু এরূপ যন্ত্র বা প্রক্রিয়ার সাহায্য লওয়া দরকার, যাহাতে সূক্ষ্মজগৎও দৃষ্টিশক্তির অধীন হয়। বর্ত্তমান জড়বিজ্ঞান, যেখানে সূক্ষ্ম অর্থাৎ তন্মাত্রজগতের আরম্ভ, সেই পর্য্যন্ত অস্পষ্টরূপে কতক কতক দেখিতে পাইতেছেন; বহুসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে অলৌকিক দৃষ্টিসম্পন্ন মহর্ষি কপিল উহার অনেক উপরে উঠিয়াছিলেন এবং অমোঘ সত্য দর্শন করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। সূক্ষ্মজগতের যেখানে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাকে 'তন্মাত্র' বলিয়া অভিহিত করা যায়। সূক্ষ্মজগৎ স্থূল জগতের কারণ অর্থাৎ পূর্ব্বতন-অবস্থা। তন্মাত্র-জগৎকে কপিল পাঁচভাগে বিভক্ত করেন, এবং ঐ তন্মাত্রজগৎ হইতে আরম্ভ করিয়া, আরও তিনটী সূক্ষ্মতম স্তরের বর্ণনা করেন; শেষস্তরেই জড়তত্ত্বের পর্য্যবসান স্বীকার করেন। ঐ স্তরকে কপিল 'অব্যক্ত' নাম দিয়াছেন। কপিলের শেষজড়তত্ত্ব দেখা যায় না, শুনা যায় না, শব্দস্পর্শরূপরসাদিশূন্য, আমাদের এই ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ অনধিকৃত স্থানে। কেবল মাত্র কয়েকটী কারণ হইতে কপিল এরূপ পদার্থের অনুমান করিয়াছেন। এই 'অব্যক্ত' শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, অনেকে কপিলদেবকে অজ্ঞেয়বাদী বলিতে চাহেন, কিন্তু আমরা তাহাতে সম্মত হইতে পারি না। কপিল যেখানে গিয়া বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন, তাহাকে তিনি 'অজ্ঞেয়' বলেন নাই। বেদান্তের মায়াদেবীর মত কপিলের প্রকৃতি অনির্ব্বাচ্য

নহে; তবে ব্যক্ত দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের সহিত তাহার সাদৃশ্য অনেকাংশে অল্প। কতকগুলি ব্যক্ত, কতকগুলি অব্যক্ত, এই দুই ভাগে তিনি জড়ের বিভাগ করিয়াছেন। ব্যক্ত অর্থ স্থূল, অব্যক্ত অর্থ সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম তন্মাত্র হইতে তাঁহার সূক্ষ্মজগৎ বা অব্যক্তজগৎ আরম্ভ হইয়া, চরমঅব্যক্তপ্রকৃতিতে উপনীত হইয়াছে। অব্যক্ত জগতের আটটী বিভাগের মধ্যে, পূর্ব্বতন সাতটী আমাদের নিকট অব্যক্ত হইলেও, মূল বা শেষঅব্যক্ত হইতে ব্যক্ত, এই জন্য একমাত্র শেষতত্ত্বই 'অব্যক্ত' নাম পাইয়া থাকে। প্রথম সাতটীকে সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ মহাশয় 'প্রকৃতি বিকৃতি' এবং মূল অব্যক্তকে "মূল প্রকৃতি" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মোটের উপরলক্ষ্য করিতে গেলে বলা যায়, বাহ্যস্থূল জগৎ বিকৃতি এবং সূক্ষ্ম তন্মাত্র বা অব্যক্তজগৎ প্রকৃতি। প্রত্যেক অব্যক্ত পদার্থ মূলতত্ত্ব হইতে অপেক্ষাকৃত স্থূল, এজন্য প্রকৃতপক্ষে শেষতত্ত্বই প্রকৃতি শব্দের লক্ষ্য। এ সূত্রে অবশ্য কপিলদেব অব্যক্তজগৎকেই প্রকৃতি শব্দে বলিয়াছেন। জগন্নির্ম্মাণকারণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মহৎপুনঃ্জ যখন বেশ সাম্য অর্থাৎ পরস্পরাসঙ্গবিরহিত ভাবে অবস্থিতি করে, সেই সময়ে সেই স্তরের নাম মূল প্রকৃতি।

পরে সম্মিলন, সংযোজন ও সংবর্দ্ধণের ফলে অবস্থান্তরিত হইলে, নাম হয় প্রকৃতি-বিকৃতি। এই নাম সাতটী স্তরের পর আর থাকে না। তখন শুধু বিকৃতি, প্রকৃতি বা অব্যক্ত মূল প্রকৃতির নাম, অব্যক্তজগতে অপর সাতটী পদার্থের নাম যথাক্রমে স্থূলতা অনুসারে মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র।

এতক্ষণে কপিল অষ্ট প্রকৃতির কথা বলিয়া, অব্যক্তজগৎ সংক্ষেপতঃ ব্যাখ্যা করিয়া, ব্যক্তজগৎ ব্যাখ্যা-নিমিত্ত বিকারতত্ত্বের উল্লেখ করিতেছেন।

ষোড়শকস্তু বিকারঃ ॥৩

সূত্রার্থ—বিকার ষোড়শ প্রকার। পূর্ব্বোক্ত অষ্ট প্রকৃতির বিকৃতি অর্থাৎ কার্য্য বা ব্যতিক্রম বশতঃ প্রাপ্ত অবস্থা ষোড়শ প্রকার বিকার। চক্ষুরাদি দশ ইন্দ্রিয় এবং মন ও পঞ্চ স্থূলভূত, এই ষোলটীর নাম বিকার। মনের ক্রিয়া-গতি যদিও দুর্লক্ষ্য এবং মনের স্বরূপ যদিও বেশ সূক্ষ্ম অনুভব দ্বারা সমর্থিত হয়, তথাপি মন স্থূল এবং বিকার। মন অহঙ্কারতত্ত্বের কার্য্য বা বিকৃতি, কিন্তু মন হইতে অন্য কোনও তত্ত্ব উৎপন্ন হয় নাই, এজন্য মন মাত্র বিকৃতি, প্রকৃতি নহে। বিশেষতঃ প্রকৃতি আটটী অপেক্ষা মন নিশ্চয়ই স্থূল। ইন্দ্রিয়গুলি সূক্ষ্ম পদার্থ হইলেও, উহাদের অধিষ্ঠান অর্থাৎ যে সকল স্থানকে আশ্রয় করিয়া ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তি বিকসিত হয়, তাহারা স্থূল বলিয়া ইন্দ্রিয় একভাবে স্থূল; বিশেষতঃ অহঙ্কারের কার্য্য ইন্দ্রিয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের কার্য্য অন্য কোনও তত্ত্ব নহে। পঞ্চমহাভূত—আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও মৃত্তিকা, ইহারা স্থূল; পরন্তু তন্মাত্রের স্থূল বিকাশই ইহাদের স্বরূপ। আমাদের পাঁচটীর অধিক জ্ঞানেন্দ্রিয় নাই, এজন্য এ জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চকের অনুভূতির বিষয়ও পঞ্চভূত বা তাহার গুণ।

প্রকৃতির ব্যাখ্যায় রূপতন্মাত্র, শব্দতন্মাত্র, ইত্যাদি নাম দেখিয়া যেন কেহ মনে না করেন যে ঐগুলির অর্থ রূপ বা শব্দ গুণ। তন্মাত্র নামের অর্থ অমিশ্রতানিবন্ধন কেবল মাত্র সেই এক প্রকারের অণুসমাবেশ। ভূততন্মাত্র সকলের মধ্যে ভিন্ন ২ শ্রেণীর অণুসমূহের সম্মিলনজাত নানাগুণ সম্পন্ন মিশ্রস্থূল ভাবের পদার্থই ভূত। ভূত পদার্থে গুণের অনুভূতি আছে; তন্মাত্রের গুণ আমাদের অনুভবের অযোগ্য; তন্মাত্র সূক্ষ্মভূত আর মহাভূত স্থূলভূত, এই টুকু রহস্য। এই ভূতপঞ্চকের দ্বারা কোনও নবতত্ত্ব উৎপন্ন হইতে পারে না। অবয়বসংস্থানের ব্যতিক্রম-ভেদে কেবল নাম ও কার্য্যকারিতার বৈলক্ষণ্য হয় মাত্র, বস্তুতঃ পদার্থ একই থাকে। যেমন হার-বলয় কেয়ূর কুণ্ডলে সুবর্ণ অভিন্ন, তেমনি।

এতাবৎ কাল জড় চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়া, পরে মহর্ষি কপিল জড়ের পরিচালক চেতনতত্ত্বের কথা বলিতেছেন। জড়ের সংখ্যা অধিক, এজন্য তাহাই অগ্রে বলা হইয়াছে।

পুরুষঃ। ৪

সূত্রার্থ—অপর চেতনতত্ত্বের নাম পুরুষ। জড়ের কার্য্যকারিতা চেতনের অনুগ্রহাধীন। চেতন ব্যতীত জড়জগৎ যে কি এক অবাচ্য অননুভাব্য দশায় উপনীত হয়, তাহা বলা যায় না। চেতন অনুভবের মূলাধার; অনুভব ব্যতীত বিশ্বসংসারের অস্তিত্বের আর কোনও সাক্ষী নাই। 'আমি' এই কথার যাহা লক্ষ্য, তাহাকেই সাধারণতঃ চেতন বলা হয়; যদি 'আমি'র অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইতে হয়, তবে নিরনুভব নিবিড় অন্ধকারের রাজ্য অগ্রসর হয়।

জগতের সমস্ত জড় পদার্থই যে এক সর্ব্বব্যাপী চেতন সত্তার অনুগ্রহে জীবিত আছে, তাহা এই হিন্দুদেশে বহুসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ছন্দবিনির্ঘোষে বিঘোষিত হইয়াছিল। সম্প্রতি নবাভ্যুদিত পাশ্চাত্য দেশ এই অমূল্যতত্ত্ব, জড়াধিষ্ঠাতা সার্ব্বজনীন চেতনের সত্তা বিশ্বাস করিয়াছেন।

এই বিশ্ব চৈতন্যময়; এই বিশ্বের মূল উপাদান গুলিতে যখন চেতন সত্তা স্ফূর্ত্তি পায়, এই বহুধা বিভক্ত জড়জগতে যখন কার্য্যকারণস্রোত উথলিয়া উঠে, তখনই জগৎ কর্ম্মপ্রবাহের মধ্যে ভাসিয়া বেড়ায়; এই অমূল্য সত্য মহর্ষি কপিল এই সূত্রে প্রকাশ করিয়াছেন।

"পুরুষ" শব্দে সাধারণতঃ পুরুষ জাতি বুঝা হয়, এখানকার পুরুষ অর্থ চেতন সত্তা। পুর অর্থাৎ জড় শরীরে ঐ চেতন সত্তা স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, এজন্য উহার নাম পুরুষ, এরূপ কথা ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, কিন্তু বিশ্বের পিতা এবং মাতাস্থানীয়রূপে পুরুষ এবং প্রকৃতির রূপক-কল্পনাই চেতনকে পুরুষ বলিবার কারণ বলিয়া অনেক পণ্ডিত মনে করেন। এবার এখানে বিশ্রাম। বারান্তরে তত্ত্বসমাসের অপরাপর সূত্র ব্যাখ্যাত হইবে।

(ক্রমশঃ)

কপিলসেবকস্য

কস্যচিৎ।

(যশোহর-বেদবিদ্যালয়।)

শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষাষ্টক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

পঞ্চম শ্লোকের আলোচনা।

"অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত-ধূলীসদৃশং বিচিন্তয়॥"

(অনুবাদ।)

অয়ি নন্দতনুজ! এ ভবাব্ধি বিষম,
হয়েছি পতিত তাহে আমি ভৃত্যাধম;
তব পদ-পঙ্কজের রেণু-কণা প্রায়—
ভাবি মোরে কৃপা করি রাখ (হরি) পায়।

ভগবচ্চরণে ভগবচ্চরণ-প্রার্থনাই এই শ্লোকের সর্ব্বস্ব। পূর্ব্বালোচিত শিক্ষা-শ্লোকটিও প্রার্থনা-বাক্য মাত্র; কিন্তু তাহা বিষয়-বিষ-বিতৃষ্ণ ও অহৈতুক-ভক্তি সুধা-সুতৃষ্ণ উচ্চাধিকারী ভক্তের প্রার্থনা। শ্রীগৌরাঙ্গ পূর্ব্ব শ্লোকে উচ্চাধিকারের আদর্শ-প্রার্থনা সম্মুখে রাখিয়া, পরে এই শ্লোকে একেবারে সর্ব্বাধিকার-নির্ব্বিশিষ্ট,—অথচ নিম্নাধিকার-সুবিশিষ্ট এই প্রার্থনা-বাক্য ব্যক্ত করিয়াছেন।

সাধারণ সংসারী জীবের ত কথাই নাই; সমুন্নত সাধকগণেরও চরম ও পরমসিদ্ধি লাভ পর্য্যন্ত সংসার-সিন্ধুর তরঙ্গ-তাড়ন অল্পাধিক ভোগ করিতেই হয়। পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব বলিয়াছিলেন,—

"পঞ্চভূতের ফাঁদে—
ব্রহ্মা পড়ে কাঁদে।"

বাস্তবিক এই পাঞ্চভৌতিক দেহ-মন-প্রাণ লইয়া, এই মায়া-প্রপঞ্চ-রঞ্জিত ছায়া-বাজীর সংসারে কে না অল্পাধিক প্রতত, প্রবঞ্চিত বা বিড়ম্বিত হন? আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত দেহাবলম্বী মাত্রই এই ভীম ভবাম্বুধির ভোগাবিগত। তবে কেহবা মজ্জিত, কেহ মজ্জমান, কেহবা সাধন-সন্তরণে ভাসমান। এক মাত্র ভগবচ্চরণাশ্রয় ভিন্ন এ ভব-নীরধি-নিরাশ্রয়ে আর উপায় কি? উপায় কেবল ও পায়! ওপায়ে স্থান না পেলেই একান্ত অনুপায়। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার প্রসিদ্ধ "প্রশ্নোত্তর" সন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—

"অপার সংসার-সমুদ্র মধ্যে
নিমজ্জিতোঽহং শরণং কিমস্তি।
গুরো কৃপালো কৃপয়াবদৈতৎ;
বিশ্বেশপাদাম্বুজ-দীর্ঘ নৌকা॥"

অর্থাৎ—

ডুবে মরি হায়! কি আছে আশ্রয়—
অপার সংসার-সমুদ্র-মধ্য?
কহ কৃপা করি গুরো! কৃপাময়!
মহাতরী হরি চরণ পদ্ম।

এ প্রশ্নের চিরকাল এ-ই উত্তর। তবে কিনা, এই প্রশ্নোত্তর চিরপুরাতন হইলেও আবার ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের পক্ষে নিত্য নূতন।

"পেলে হরি-পদ-তরী,
হেলে ভব-সিন্ধু তরি।"

ইত্যাদি এই একই ভাবান্বিত—একই তত্ত্বাশ্রিত শত সহস্র বাক্যাবলী শত সহস্র গানে, কবিতায়, পুস্তকে, পত্রিকায়, সন্তত

পড়িতেছি, শুনিতেছি, গাহিতেছি, কহিতেছি; কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত! কেবল মুখেই সর্ব্বস্ব; বুকে শুধু ছাই ভস্ম! 'ভব-সিন্ধু' এবং "হরি-পদ তরী" এ কথা দুটা খুব জানা শুনা আছে; কিন্তু উক্ত বাক্যদ্বয় লক্ষিত বস্তু দুটি যে বাস্তবিক কি, তাহা বুঝা দূরে থাক্, বুঝিবার অন্ততঃ আবশ্যকতাও বুঝি না! আমরা যেন বেশ নিরুদ্বেগে নিশ্চিন্ত আছি। কে জানে তোমার 'ভব-বারি'—কে জানে 'হরি-পদ-তরী'? আমরা যেন ও দুয়ের একটীরও ধার ধারি না। আমাদের কাছে ও সব কেবল যেন কবি-কল্পনা। লিখিতে ভাল, পড়িতে ভাল, বক্তৃতায় কহিতে ভাল, সংগীতে গাহিতে ভাল; তা ছাড়া বাস্তবতায় ভব বারিতে বিশ্বাস ও পদ-তরীতে আশ্বাস আমাদের কোথায়? মূলতঃ ভব বারির ভীষণতা-বোধ না থাকিলে, পদ-তরীর আবশ্যকতা-বোধইবা থাকিবে কেন? অতএব আমরা নিশ্চিন্ত—নিঃশঙ্কিত; সুতরাং নিশ্চেষ্ট—নিদ্রিত!

মনে করুন, নদী বাহিয়া একখান নৌকা যাইতেছে। আরোহী অভ্যন্তরে নেশার ঘোরে নিদ্রিত। বাতাস উঠিল, নদীতে তুফাণ ছুটিল, তরঙ্গ-তাড়নে তরী নাচিতে লাগিল। বাহ্য বিজ্ঞানহীন নিদ্রাবেশ-বিলীন আরোহীর তাহাতে বরং আরো যেন ঘুমের ঘোরে দোলার দোলনের ন্যায় আরাম বোধ হওয়ায়, নিদ্রা গাঢ়তর হইল। এ দিকে তরী ডুবু২! বাতাস উদ্ভ্রান্ত, নদী উচ্ছ্বসিত, তরঙ্গ উন্মত্ত! তীব্র তাড়নে জীর্ণ তরী বিদীর্ণ প্রায়! প্রচণ্ড প্লাবনে ভগ্নতরী মগ্ন হয় হয়! আরোহী তথাপি ঘুম ঘোরে অভিভূত; যেন কালনিদ্রায় কবলিত! ক্রমে তরীও সেই করালিনী কল্লোলিনীর কবলিত হইতে লাগিল! নৌকার 'ডওরা' ডুবাইয়া, 'পাটাতন' ভাসাইয়া জল যখন হতভাগা আরোহীর শয্যা ভিজাইল, শরীর ভিজাইল, কাণের কাছে 'কল কল' জল-কল্লোল গর্জ্জিল, তখন সে জাগিল। অকস্মাৎ চারিদিকে কৃতান্তের করাল গ্রাসের কাল-অন্ধকার দেখিল! তখন যে আতঙ্ক, আকুলতা, বিহ্বলতা; তখন যে উন্মাদনা ও উৎকট যাতনা, দুঃখ-জগতে তাহার তুলনা কোথায়? তারপর সেই অভাগ্য যাত্রী উন্মত্ত-নদী-বক্ষে ভাসিল! তখন তাহার যে অবস্থা, সে অবস্থায় সংজ্ঞা আছে কি নাই! এই নাই, এই আছে! তখন যদি সেই 'আছে' ভাবটুকুর সময়ে, চকিতে সম্মুখে একখানি সাক্ষাৎ পরিত্রাণ-রূপিণী বিচিত্র-তরণী-দর্শন হয়, তবে তখন তাহার যে অপূর্ব্ব অতুল্য অসাধারণ আনন্দ, এই মায়া-মোহ, পাপ তাপ, রোগ-শোক, জ্বালা যন্ত্রণা প্রভৃতি অনন্ত তরঙ্গ-তাড়ন-বিক্ষুব্ধ ভবাব্ধিতে পতিত জীর্ণ তরীর শীর্ণ আরোহী জীবের সেই 'অভয় পদ তরী' দর্শনের আনন্দ ততোধিক—ততোধিক!—অনির্ব্বচনীয় অধিক!!

(কিন্তু) হায়! অনির্ব্বচনীয় অধিকাধিক আমাদের দুর্ভাগ্য, যে আমরা তাহা কিছুই বুঝি না। ব্যাপরটা কবি-কল্পনার থাতায় তুলিয়া, নির্ভাবনায় নিদ্রা দিতেছি! গায়ে এখনও জল লাগে নাই কি না, তাই ঘুমও ভাঙ্গে নাই। কিন্তু লাগিতেও বড় বাকি নাই। এ 'নবছিদ্রান্বিত' তনু তরী আর

কতক্ষণ ভাসিবে? মানবের পূর্ণায়ু একশ বিশ বর্ষও অনন্ত কাল সিন্ধুতে একশ বিশ বীচি-পলকেরও যোগ্য নহে! তারপর থাক্ 'একশ বিশ,'—ইদানীং একশ বিশের অর্দ্ধকাল ভাসিতে পারিলেও সে তরীর 'তারিফ্' দিতে হয়। এ কালটুকুও যদি ঘুমে যায়, আর পিঠে জল লাগিলে তবে যদি জাগিতে হয়, তাহা হইলে সাবধান হওয়ার সময় বা উদ্ধার পাওয়ায় উপায় আর থাকে কি? সময়ে একটা সাধন স্বরূপ বোঁচ্‌কা—বালিস্ বা বাঁশ—তক্তা, যা কিছু একটা অবলম্বন যোগাড় করার আর যো থাকে না। তখন কেবল হাবুডুবু—কেবল প্রাণ-যায়। কেবল হায় হায়! যদি বল, 'পদ-তরী'ত সম্মুখেই আছেন, তবে আর ভাবনা কি? কিন্তু হায়! সকলের ভাগ্যে সে অভয়-আলম্ব-লাভ সহসা ঘটে কৈ? "প[illegible] আনা বাড়ে উনিশ গণ্ডা'ই যে ডুবিতেছে! সে তরী আজও পর্য্যন্ত পেয়েছে কজনে?

"শুকো মুক্তো প্রহ্লাদো বা"

এই সুবিখ্যাত শাস্ত্রোক্তি আমাদিগকে বুঝাইতেছে যে, অন্ততঃ বর্ত্তমান শ্রুতি-শাসিত যুগে এ যাবত্ অতি অল্প মনুষ্যই সে 'তরী' পাইয়া তরিয়াছে। তবে অবশ্য আশা আছে। যেহেতু "আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত" সকলেই পরিত্রাণের অধিকারী। "অনন্ত নরক" হিন্দুশাস্ত্রে অদার্শনিক—অস্বাভাবিক, সুতরাং অযুক্ত। তবে কি না, ডুবিয়া আবার ভাসিতে হইবে। এইরূপ জন্ম-জন্মান্তররূপ ডোবা-ভাসা "কল্পকোটি শতৈ-রপি"ও চলিতে পারে। কবে একবার না একবারের ভাসায় পদ-তরী ধরিবার আলম্ব মিলিবে। ভক্তি-ভজনরূপ আলম্ব চাই। ব্যাকুল প্রাণে সেই অকূলের কাণ্ডারীকে ডাকিলে, আলম্ব অবশ্য মিলিবে। পদ-তরীর কাছে আরও বড় তুফাণ; 'আলম্ব' অবলম্বন ভিন্ন সে তরী লাভ কেহ করিতে পারে নাই। কারণ তরীস্বামীর তাহাই বিধান। শাস্ত্রে যাঁহাদিগকে "কৃপা-সিদ্ধ" বলা হইয়াছে, তাঁহারাও পূর্ব্বজন্মের সাধন-বলে ইহজন্মে যেন অযাচিত অপ্রত্যাশিত ভাবেই কৃপা-সিদ্ধ হইয়া ভবাব্ধিতে অভয়তরী পাইলেন। যেন তিনি একেবারে "হেলডুব" দিয়া তরীর কাছে ভাসিয়া উঠিলেন! অতএব সাধন চাই। তবে কিনা, তাঁহার কৃপা ভিন্ন যেখানে সব অসম্ভব, সেখানে সিদ্ধ মাত্রেই একরূপ 'কৃপা সিদ্ধ'—সন্দেহ কি? আলম্ব-লাভই তাঁহার পক্ষে প্রথম কৃপা-সিদ্ধি; পরে চরম ও পরম কৃপা-সিদ্ধি সেই চরণ-লাভ। ফলে এই আলম্ব লাভের জন্য ব্যাকুলতা চাই, ব্যাকুলতার জন্য ঘুম-ভাঙ্গা চাই; ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। তবে ঘুম ভাঙ্গা অবশ্য নিজের সাক্ষাৎ আয়ত্তাধীন নহে; কিন্তু না শোয়া অবশ্য অন্ততঃ 'আমিত্ব' যতদিন, ততদিন কল্পিত আয়ত্তাধীন। অতএব এ ঘোর তরঙ্গ-তুফাণে জীর্ণতরীর আরোহীর না শোয়া বা অতি অবসাদক বিষয়-বিষ মাদক না খাওয়া উচিত। তাহাই "প্রবৃত্ত" সাধকের প্রথম সাধন-পুরুষকার। তারপর ক্রমশঃ উপরের কৃপার সাহায্য আসিতে থাকে। তাহারই আধ্যাত্মিক আনুকূল্যে উপাসক অগ্রসর হইতে হইতে অচিরাৎ আলম্ব লাভ করেন। আলম্ব পাইলে, তরী-লাভের আশা আসিবার আর [illegible] থাকে

না। কিন্তু হায়! আমরা ঘুমেই বিভোর! আকণ্ঠ মোহ-মদিরা পান করিয়া, আমরা যেন কলির কুম্ভকর্ণত্ব পাইয়া, নিঃসাড়ে নিদ্রাভূত রহিয়াছি! সংসারের রহস্য কিছুই যেন দেখিয়াও দেখিতেছি না, বুঝিয়াও বুঝিতেছি না!

"আদিত্যস্য গতাগতৈরহরহঃ
সংক্ষীয়তে জীবনম্।
ব্যাপারৈর্ব্বহু কার্য্য-কারণশতৈঃ
কালোঽপি ন জ্ঞায়তে॥
দৃষ্ট্বা জন্ম-জরা বিয়োগ-মরণং
ত্রাসশ্চ নোৎপদ্যতে।
পিত্বা মোহময়ীং প্রমোদ-মদিরাং
মোহাভিভূতং জগৎ॥"

অর্থাৎ—

আদিত্যের অস্তোদয় সহ অহরহ হায়!
এ জীব-জীবন ক্ষয় পায়।
বহুবিধ ব্যাপারেও, শত কার্য্য-কারণেও,
বোধ নাই—কাল কিসে যায়॥
দেখেও জনম-জরা, জীবের বিয়োগ-মরা,
চিত তাহে নহে ত্রাসযুত।
মোহ-মাদকতা পূরা, পিয়ে সে প্রমোদ-সুরা,
এ জগৎ মোহ অভিভূত॥

এটি জগতের জ্যোতি-চিত্র, সন্দেহ নাই। আমরা যদি দিনান্তেও একবার একান্তে আপন দশা ভাবিতে পারি, তাহা হইলেও ভগবৎ-কৃপায় দুর্দ্দশার অনেক প্রতীকার-পথ পরিদৃষ্ট হয়; কিন্তু আমরা মোহ-মদিরা পানে মোহাভিভূত। আমরা যেন মোহ মদিরার নেশার ঘোরে আমাদের সাধের সংসার-শয্যায় বিষয়-বালিস বুকে করিয়া বিভোর হইয়া পড়িয়া আছি! আমাদিগকেই চেতাইবার জন্ম ভক্ত তুলসীদাস হাঁকিতেছেন,—

"শোতে ২ ক্যা করো ভাই! উঠ্ ভজ মুরার।
আসা দিনে আওতেহেঁ—লম্বা পা-পসার!"

অর্থাৎ—

শুয়ে শুয়ে কি কর ভাই!
ওঠ—ভজ হরি।
আস্‌ছে সে দিন, শোবে যে দিন
পা লম্বা করি!

আমাদের হুঁস নাই! মোহ নিদ্রার বশে সে মহানিদ্রার কথা একেবারে ভুলিয়া আছি। হায়! সামান্য একটু কিছু বিপদ-সম্ভাবনা বুঝিয়াও লোক কত সতর্ক—কত ব্যস্ত হয়; ভগবানের কাছে কত কাতর হয়; কিন্তু মৃত্যু সম্ভাবনা নিশ্চয়াতিনিশ্চয়রূপে জেনেও আমরা নিশ্চিন্ত! মোহ-মদিরার এমনই মাদকতা।

ভবসিন্ধু-তুফানে আমরা সকলেই হাবুডুবু খাইতেছি। ডুবিতেছি আর ভাসিতেছি; কিন্তু বাহ্যসংজ্ঞা-বিহীনতায় তাহার কিছুই যেন অনুভব নাই। বলিয়াছি ত, এই ভাসা-ডোবাই জীবের জন্ম-জন্মান্তর। ঐ সমুদ্রে অনন্ত কর্ম্মাবর্ত্ত-চক্রের পাকে পাকে পড়িয়া এইরূপ শত কোটি কল্পও ডোবা-ভাসা চলিতে পারে। তারপর ভগবৎকৃপায় যে বারের ভাসায় সংজ্ঞার উন্মেষ হয়, সেই বারই পারে যাইতে ও সেই 'পদ-তরী' পাইতে যথার্থ ব্যাকুলতা জন্মে এবং গুরু-কৃপায় আলম্ব লাভও হয়। আলম্ব পাইলে, উদ্ধারের আর বড় বিলম্ব থাকে না। ভগবদ্ভজনই সেই আলম্ব। উহা প্রাণপণে ভক্তি-ভুজ-লতা-বন্ধনে দৃঢ়রূপে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে

পারিলে তার ডুবিবার ভয় থাকে না। ভক্ত তখন আনন্দে ভাসিতে ভাসিতে সেই ত্রাণ তরণীর দিকে আসিতে থাকে।

সংজ্ঞা যে আমাদের একেবারেই নাই, তাহাও নহে। যখন ভগবান "দুর্লভ মানব-জন্ম" দিয়াছেন, তখন মানুষের সেই অনন্য-সাধারণ মূলধন সেই সংজ্ঞা অবশ্য কিঞ্চিৎ আছেই; কিন্তু মোহাভিভূত বলিয়াই এ হেন বিপদেও ব্যাকুলতা নাই; সুতরাং ভগবদুদ্দেশে উদ্ধার-প্রার্থনাও নাই। ব্যাকুলতাই প্রার্থনার প্রাণ। আমাদের হয় ত মৌখিক প্রার্থনা—প্রার্থনার শব মাত্র। তাই শ্রীমন্মহা-প্রভু এই শিক্ষা-শ্লোকে জীবের ভব-নীরধি-নিমজ্জনরূপ বিষম বিপদ বুঝাইয়া, ভগবচ্চরণাশ্রয়-লাভের জীবন্ত প্রার্থনা জীবকে শিখাইয়াছেন।

এইখানে শ্রীগৌরাঙ্গ "অতিশয়োক্তি" অলঙ্কারে শ্লোকটিতে একটু অভিনব ভাব দিয়াছেন। জলমগ্নের উদ্ধারার্থ তরী বা তজ্জাতীয় অবলম্বনবিশেষেরই আবশ্যকতা। আমরাও পূর্বে উদ্ধৃত শঙ্করাচার্য্যের শ্লোক এবং সাধারণতঃ প্রচলিত সংস্কারগত ভাবেই ভবাব্ধি-মগ্ন জীবের ত্রাণার্থ ভগবচ্চরণ-তরীর কথাই বলিয়াছি। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার এই শিক্ষা-শ্লোকে ভগবদুদ্দেশে তৎপদ-পঙ্কজের রেণুত্ব-প্রাপ্তির প্রার্থনা করিয়াছেন। এখন, আপাততঃ ইহাতে একটু আলঙ্কারিক অসঙ্গতির উপলব্ধি হয়। সমুদ্রে পদ্ম ফোটে না, এবং সমুদ্রে পতিত জনের পদ্মে স্থান পাইবারও সম্ভাবনা বা স্বাভাবিকতা কিছু নাই। এই জন্যই এই শ্লোকটির আলঙ্কারিক সঙ্গতি-সাধনার্থ "অতিশয়োক্তি"র কল্পনা। অর্থাৎ কোন অনন্য-সাধারণ ব্যাপার-বর্ণনে অসম্ভব-সম্ভাবনাই অতিশয়োক্তির লক্ষণ। সাধারণ সমুদ্রে সাধারণ পদ্ম ফোটে না বটে, কিন্তু ভব-সমুদ্রে ভগবৎপাদপদ্ম ফোটে। আর সাধারণ পদ্মের মূল জলের নীচে নিবদ্ধ থাকে, ফুল উপরে ফোটে; কিন্তু এ অসাধারণ পদ্মের মূল উপরে, ফুল নীচে! অথচ উৎফুল্ল জলের উপরে বটে। অর্থাৎ ভগবান যেন ভক্তের চক্ষে সাক্ষাৎ উদ্ধার-মূর্ত্তিতে ভব-বারিধি-বক্ষে বিরাজমান! এ অপূর্ব্ব কল্পনায় 'পদপঙ্কজ'ই শোভা পায়, "পদ-তরী" মানায় না। তবে কি না, জলমগ্নের তরিবার জন্য তরীরই প্রয়োজন! একটি কীট হয় ত পদ্ম প্রভৃতি কোন জল-পুষ্প বা সামান্য একটি পল্লবাদির আশ্রয় পাইলেই তরিতে পারে, কিন্তু মানুষ পারেনা; তাই পদ-তরীর রূপকই চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে, যে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে ত্রিভুবন স্থান পাইতেছে, মানুষ ত তার পক্ষে কীটপতঙ্গ-কাটেরও অধম। অতএব মানব কীটপতঙ্গ তাহার রেণুত্ব পাইলেই কৃতার্থ। আর জলাশয়ের আয়তন ও তদাশ্রিত পদ্মের আয়তন পার্থিব প্রকৃতিতে যেরূপ স্বাভাবিক, তাহারই আনুপাতিক বিচারানুমানে অনন্ত-প্রসারিত ভব-পারাবারে প্রজ্ঞান-পরিকল্পিত ত্রিজগতের আশ্রয়ীভূত ভগবৎপাদপদ্ম কি বিরাট আয়তনে বিশ্বোজ্জ্বল-বিভায় বিকসিত! তাই নৌকার রূপকেও শঙ্করাচার্য্য "দীর্ঘনৌকা" ("বিশ্বেশপাদাম্বুজ") বলিয়াছেন। 'অম্বুজ"— অর্থাৎ পদ্মও বলিয়াছেন, নৌকাও বলিয়াছেন। সৌন্দর্য্য, সৌকুমার্য্য ও মধু-মাধুর্য্য-

হেতু পদ্মই যেন ভগবানের চরণের চিরসংলগ্ন! সুতরাং নৌকার রূপকেও ভগবানের ভাগাধম কিঙ্কর শঙ্করাচার্য্য 'পাদাম্বুজ' বলিতে ছাড়েন নাই। আর ভব-ত্রাণার্থী সর্ব্ব লোকের স্থান সঙ্কুলন-সুজ্ঞাপনার্থেই "দীর্ঘ নৌকা" পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। সে যাহাহউক, স্বয়ং সরস্বতী-পতিরূপে পূজিত শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ দেবের শ্রীমুখোক্ত শিক্ষা-শ্লোকে অবশ্য আলঙ্কারিক অসঙ্গতি অসম্ভব; এই জন্যই আমাদের বোধ হয় যে, উহা "অতিশয়োক্তি" অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়াই এইরূপ দৃশ্য শোভা প্রকাশ করিতেছে. যেন—অনন্ত বিস্তারিত দুস্তর ভীম ভবার্ণব তুমুল তরঙ্গ-রঙ্গের উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে উথলিতেছে; আর কোটি ২ নিরা-শ্রয় নর-কীটাণু সেই অকূলে আকুল ও অচেতন-প্রায় হইয়া হাবু ডুবু খাইতেছে। অদূরে—অথচ যেন দূরাতিদূরে মূর্ত্তিমান-পরিত্রাণ ভবতারণ ভগবান সেই সংক্ষুব্ধ সিন্ধু-হৃদয়ে দীনবন্ধুরূপে দণ্ডায়মান! তাঁহার রাতুল চরণ-পদ্ম অতুল শোভায় তাহাতে ফুটিয়াছে! তদ্দর্শনে—স্পর্শনে সিন্ধু-হৃদয়ে প্রেমানন্দোদয়ে তুমুল তুফাণ উঠিয়াছে! আর তাহাই ভেদ করিয়া, সে দুস্তরে নিস্তার-প্রার্থী নর-কীট-নিকর নিরন্তর সেই দিকে ছুটিয়াছে! সক-লেরই আশা, প্রযত্ন ও প্রার্থনা—সেই ভক্ত-হৃৎকমল-বিলাসী হরির মরণ হরণ-চরণ-কমলে শরণ-লাভ। মহাপ্রভুর এই শ্লোকের তত্ত্ব-স্বরূপ ধ্যান করিতে পারিলে, এই মহাদৃশ্যই মনোনয়নে প্রকটিত হয়!

তারপর আর একটি কথা। শ্রীভগবানের শ্রীচরণ-কমলে রেণু-কণা হইয়া থাকিতেই ভক্তের অভিলাষ ও আব্দার। ইহাতে যেমন ভক্তি-বিনতি, তেমনি আত্ম-বিস্মৃতি। কোন জলমগ্ন স্থল-কীটাদি একটি পদ্মে আশ্রয় পাইলে বাঁচিতে পারে; তাহাতে হয়ত বাসা করিয়া কথঞ্চিৎ বাস করিতেও পারে; ফলে তাহাতে পদ্মের সহিত তাহার কোন স্থায়ী বা নিত্য সম্বন্ধ হয় না; কিন্তু রেণুর সহিত পদ্মের নিত্য সম্বন্ধ; রেণু পদ্মেরই অঙ্গীভূত। তাই ভক্তের আশা, তিনি ভবাব্ধি-নিমগ্ন নর কীট হইলেও, ভগবৎপাদ-পদ্ম লাভে পরিত্রাণ পাইয়া, ভগবৎকৃপা-তেই সেই পাদপদ্মের রেণুরূপে পরিণত হইবেন।

অপর, কীটাদির কিছু না কিছু অহম্বুদ্ধি আছেই; কিন্তু সহজ সিদ্ধান্তানুমোদিত জড়ত্ববশে ধূলী বা রেণু-কণাদির তাহা নাই। আর জলমজ্জমান কীটাদি জলপুষ্প-বিশেষের আশ্রয়ে আপাততঃ প্রাণ-ত্রাণ পাইলেও, ঐ জলপুষ্পই স্বভাবতঃ তাহার চরমাশ্রয় নহে। জল হইতে বাঁচিবার জন্যই তাহার জল-পুষ্পাশ্রয় পাওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল। পরে সেই পুষ্পাশ্রিত হইয়া, তখন আবার হয়ত সে তাহা ছাড়িয়া মৃত্তিকাশ্রয় পাওয়ার প্রয়োজন বোধ করে। সুতরাং এই কীটো-দ্ধার-উদাহরণ ঠিক ভক্তের পক্ষে খাটে না। ভক্ত ভগবৎপাদপদ্মাশ্রয় লাভে তাহাতেই তাঁহার স্বৈরসার্থানুসারিণী অহম্বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া কৃতার্থ হন। ইহাই 'আত্মনিবেদন'। ইহাই নবধা ভক্তির নবম, চরম ও পরম লক্ষণ। ভক্ত তাই ভগবৎ-পদারবিন্দের রেণু-কণা হইবার প্রার্থী। রেণু যেরূপ পদ্মেরই একান্ত অধীন, অঙ্গীভূত ও চিরাশ্রিত, ভক্তও ভগ-বানের চরণ-পদ্মে সেইরূপে পরিণত হইবার প্রার্থী।

এস্থলে আর একটি নবভাব-রসাভিষিক্ত মধুর বিচার আছে। ভবসিন্ধু-ভাসমান ভক্ত ভগবানের সেই জগত্তারণ অভয় চরণকে

নৌকারূপে কেন চাহিবে? এস্থলে কেবল অনিত্য লৌকিক অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধীন রূপকের যৌক্তিকতা দেখিলেই চলিবে না; ইহার আমূলভাব-রস-রহস্যের বিচার প্রয়োজন; যেহেতু বিষয়টি কেবল 'ভাবের বিষয়'। অথচ ইহাতে লৌকিক অলঙ্কার-শাস্ত্রের সঙ্গতিও একেবারে অরক্ষিত নহে। মনে করুন, জলময়ের নৌকার প্রয়োজন কেবল পারের জন্যই। প্রথমতঃ জল হইতে নৌকার, পরে নৌকা হইতে পারেরই সে প্রার্থী। জলমগ্ন কীটাদির দৃষ্টান্তে পুষ্প-পত্রাদি যেমন, জলমগ্ন মানুষের দৃষ্টান্তে নৌকাদিই তদ্বৎ। কীট ফুল পেলেও কূল চায়; মানুষ তরণ পেলেও অবতরণ চায়; অথবা তরী পেলেও তীর চায়। শাস্ত্র বলেন,—

"নাবার্থীহি ভবেত্তাবদ্যাবৎ পারং ন গচ্ছতি।
উত্তীর্ণে তু সরিৎপারে নাবা বা কিং প্রয়োজনম্॥"

অর্থাৎ—

তাবৎ নৌকার প্রয়োজন সার,
যাবৎ পারে না যায়।
হলে নদী পার, কে তখন আর,
নৌকায় থাকিতে চায়?

কিন্তু এ তরী ত সে তরী নয়; এ যে জীবের জন্য চির-শরণ চরণ-তরী! এ তরীকে ছাড়িয়া আবার তীর কে চায়? সিন্ধু-তরিতে তরীর প্রয়োজন; আবার তরী হইতে অবতরিতে তীরের প্রয়োজন। এ তরীতে সিন্ধু হইতে উত্তরণই জীবের স্বার্থ; কিন্তু এ তরী হইতে অবতরণ আর অসম্ভাবিত ও অপ্রার্থিত; যেহেতু ভগবচ্চরণই ভবত্রাণার্থীর চরমাতিচরম পরমতম আশ্রয়।

"যৎপ্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।"

যাহা পাইলে জীবের আর পুনঃসংসারাবৃত্তি হয় না, তাহাই পরাৎপর ভগবানের পরমাধারতত্ত্ব। পায়ের উপরই জীবের দেহের সমস্ত ভর; এই সত্যের ঔপমিকসাম্যে বলা যায় যে, ভগবানের চরণই ভগবত্তত্ত্বাধার, তাহাই জীবের স্বার্থ সারাৎসার; তাহা পাইবার জন্যই জীবের যত সাধন-ভজন; আর তাহা পাইলেই জীবের পুনঃসংসারাবৃত্তির পূর্ণ-পরিমোচন। অতএব এই "চরণ-তরী" কথাটি সাধন-ভক্তি-সাহিত্যে সুচির-প্রসিদ্ধ রহিলেও, এই রূপকালঙ্কারে তরীর সহিত ভগবচ্চরণের অনুরূপ ঔপমিক সাম্য সম্ভাবিত নহে। এতাবতা শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্ত আলোচ্য শিক্ষা-শ্লোকটিতে ভবাব্ধি-মগ্নের ভগবৎ-পাদপদ্মের রেণুত্ব-প্রার্থনায় একভাবে অলঙ্কার-শাস্ত্রের অবিরোধিতাই রক্ষিত হইতেছে।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের সহিত মহাপ্রভুর বিচারে মহাপ্রভু দিগ্বিজয়ীর রচিত ও পঠিত গঙ্গাস্তবে একটি আলঙ্কারিক ভুল এই ধরিয়াছিলেন যে, দিগ্বিজয়ী গঙ্গাকে "শ্রীবিষ্ণোশ্চরণ-কমলোৎপন্না" বলিলেন কি প্রকারে? জল হইতেই কমলের উৎপত্তি, কিন্তু কমল হইতে জলের উৎপত্তি অবশ্য অস্বাভাবিক; সুতরাং বিষ্ণুর চরণ-কমল হইতে জলময়ী জাহ্নবীর উৎপত্তি বলায় আলঙ্কারিক দোষ ঘটিতেছে। ফলতঃ এইরূপ বৈয়াকরণ-চতুষ্পাঠীর বালক ছাত্রের যোগ্য বিতর্ক-বিবাদে মহাপ্রভু আপনিই আবার এইরূপ সুমধুর সমাধান করিলেন যে, কৃষ্ণ পাদপদ্মের অতি অচিন্ত্য-শক্তি; স্বভাবের নিত্যপ্রসিদ্ধ স্বাধীনতা ইহারই অধীন; অতএব শ্রীবিষ্ণুর চরণরূপ কমল হইতে জলরূপা গঙ্গার উদ্ভব কখনও অস্বাভাবিকতা-জনিত আলঙ্কারিক অসঙ্গতির উদাহরণ নহে। অতএব ঐরূপ অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের অন্তর্গতিতে ভবসমুদ্রে ভগবৎ-পাদপদ্মের বিকাশ ও ভবাব্ধি-মগ্নের তদ্ধূলী-কণত্ব-প্রাপ্তির অভিলাষ অসঙ্গত নহে। যাহাহউক, অতঃপর আমরা মূল শ্লোকের পদ-পদার্থালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৬৭ সালের ২৫ আইন মতে রেজেষ্ট্রী কৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।

৯ম বর্ষ, ৯ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা। | পৌষ। | ১৩০৯ সাল, ১৮২৪ শকাব্দা,

জাতিভেদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

চতুর্থ অধ্যায়।

১। আহার ও বিবাহ।

জাতিভেদ-প্রথা বর্ত্তমান আকার ধারণ করিবার পূর্ব্বে আহার ও বিবাহ সম্বন্ধে তেমন কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না।

যে পরাশরস্মৃতি কলির ধর্ম্ম-শাস্ত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহাতেই লিখিত আছে :—

"ক্ষত্রিয়োবাপি বৈশ্যোবা ক্রিয়াবন্তৌ শুচিব্রতৌ।
তদ্‌গৃহেষু দ্বিজৈর্ভোজ্যং হব্যকব্যেষু নিত্যশঃ॥"

যে সকল ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ক্রিয়াবান এবং শুচিব্রতধারী, তাঁহাদের গৃহে ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদা "হব্য কব্য" ভোজন করিবে।

"But in the olden times we see from the Mahabharata and other works, that Brahmans, Kshatriyas and Vaisyas could eat the food cooked by each other. Manu lays down generally that a twice-born should not eat the food cooked by a Sudra (IV 223); but he allows that prepared by a Sudra, who has attached himself to one, or is one's barber, milkman, slave, family-friend, and co-sharer in the profits of agriculture, to be partaken (IV. 253). The implication that lies here is that the three higher castes could dine with each other. Gautama, the author of a Dharmasutra, permits a Brahman's dining with a twice-born (Kshatriaya or Vaisya) who observes his religious duties (17,1). Apastamba, another writer of the class, having laid down that a Brahman should not eat with a Kshatriya and others, says that according

to some, he may do so with men of all the varnas, who observe their proper religious duties, except with the Sudras. But even here there is a counter-exception, and as allowed by Manu, a Brahman may dine with a Sudra, who may have attached himself to him with a holy intent (I-18. 9, 13, 14)"*

আমরা বর্ত্তমান সময়ে দেখিতে পাই যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিতর একত্রে আহার-নিষেধই জাতিভেদের প্রথম নিদর্শন। সেকালে আহার সম্বন্ধে এরূপ হইত না, তাহা শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকর মহোদয়ের উক্তি হইতেই প্রমাণিত হইবে। মনু, আপস্তম্ব, গৌতম প্রভৃতি শাস্ত্রকারদিগের মতামত উদ্ধৃত করিয়াই শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকর মহাশয় তাঁহার নিজাভিমত পোষণ করিয়াছেন।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত এল্‌ফিনষ্টোন সাহেব বলিয়াছেন—"But there is no prohibition in the code against eating with other classes, or partaking of food cooked by them (which is now the great occasion for loss of caste), except in the case of Sudras ; and even then the offence is expiated by living on water-gruel for seven days (ch XI. 153)."†

শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকর মহাশয় বলিয়াছেন—

"Even in the time of the epics, the Brahmans dined with the Kshatriyas and Vaisyas, as we see from the Brahmanic-sage-Durvasa, having shared the hospitality of Draupadi, the wife of Pandavas." *

মন্বাদির সময়েই জাতিভেদ এত কঠিন হইয়াছে। কিন্তু আমরা এখনই দেখিলাম, এমন কি—সে সময়েও আহারাদি সম্বন্ধে অনুশাসন কঠোর ছিল না, বরং শিথিলই ছিল। সুতরাং হিন্দুসমাজে যখন জাতিভেদের বন্ধনই শিথিল ছিল, তখন আহারাদি সম্বন্ধে যে কিরূপ নিয়ম ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রাচীন আর্য্য-সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এবং শেষে কখন কখনও শূদ্র, এই চতুর্ব্বর্ণের ভিতর আহারাদি চলিত, ইহাই সেই তাৎকালিক-সমাজের উদার-ভাবের পরিচায়ক। সেই সময় ক্ষত্রিয়-রাজগণ যজ্ঞ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেন এবং তাঁহারাও সেই সকল যজ্ঞ-স্থলে উপস্থিত হইয়া আনন্দের সহিত ভোজন করিতেন। মহাভারত পাঠ করিলেই জানিতে পাওয়া যায় যে, পাণ্ডবদিগের বনবাস কালে স্বয়ং দ্রৌপদী রন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইতেন। বৈদিক-সময় হইতে মন্বাদির সময় পর্য্যন্ত খাদ্যাদি কিরূপ ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সে বিষয়ের আলোচনা করিবার আমার আবশ্যকতা আছে বলিয়া বোধ হয় না।

* "Social History of India" by Ramkrishna Gopal Bhandakar. M. A., PHD, C I E.

† Elphinstone's History of India P. 20.

* Dr. R. G. Bhandarkar on "Social Reform and the programme of the Madras Hindu social Reform Association."

তবে আমরা পাঠকদিগকে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

১। ঋগ্বেদ—১০৬১।২; ২।৭।৫; ৫।২৯।৭ প্রভৃতি শ্লোক।

২। Muir's Sanskirt Text-vol V. pages 463-64.

৩। Dr. Rajendralal Mitters "Indo Aryan" vol I; pages 354-421.

৪। Mr. R. C. Dutt's "History of civilisation in Ancient India" vol I, pages 41-44.

৫। Mr. P. N. Boses' "History of civilisation under British Rule" vol II; pages 84-85.

৬। মনুসংহিতা—৫।১২১৮ প্রভৃতি শ্লোক।

অনুলোম এবং প্রতিলোম বিবাহের কথা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। উচ্চ জাতীয় পুরুষ ও নিম্ন জাতীয়া স্ত্রীলোকে যে বিবাহ হইত, তাহারই নাম অনুলোম বিবাহ এবং উচ্চ জাতীয়া স্ত্রীলোক ও নিম্ন জাতীয় পুরুষে যে বিবাহ হইত, তাহাকেই প্রতিলোম বিবাহ বলিত। যদিও প্রতিলোম বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ বলিয়া বর্ণিত আছে, কিন্তু মনু অনুলোম বিবাহের বিধি দিয়া গিয়াছেন।

প্রতিলোম বিবাহ নিষিদ্ধ সত্ত্বেও আমরা দেখিতে পাই যে, প্রতিলোমজ-রোমহর্ষণ বেদব্যাসের শিষ্য ছিলেন। যখন নৈমিষারণ্যে ঋষিগণ কুলপতি শৌনকের দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, তখন বেদব্যাস-শিষ্য রোমহর্ষণ বিপ্রগণ মধ্যে উচ্চ আসনে উপবিষ্ট ছিলেন।*

* শ্রীমদ্ভাগবত, ১। ৭৮। ১৩, ১৪

আবার অন্যত্র দেখিতে পাই:—

"শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ॥"*

শূদ্র কেবল একমাত্র শূদ্রের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবে, বৈশ্য শূদ্র ও বৈশ্যের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের কন্যা এবং বৈশ্য ও শূদ্রের কন্যা বিবাহ করিতে পারিবে, এবং ব্রাহ্মণ চারি জাতিরই কন্যা বিবাহ করিবে।

"Men of the three first-classes are freely indulged in the choice of woman from any inferior caste, provided they do not give them the first place in their family. But no marriage is permitted with woman of a higher class."†

শূদ্রাদি নিকৃষ্ট বর্ণের অন্তর্গত বংশসমূহ ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বংশের সহিত বৈবাহিক-সূত্রে বদ্ধ হইয়া উচ্চ বংশত্ব প্রাপ্ত হইত।

"শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ শ্রেয়সা চেৎ প্রজায়তে।
অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যাসপ্তমাদ্‌যুগাৎ॥"
"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাৎ তথৈবচ॥"‡

বিবাহিতা শূদ্রাতে ব্রাহ্মণের ঔরসজাতা পারশব নাম্নী কন্যা যদি অন্য ব্রাহ্মণ বিবাহ করে এবং তাহার কন্যাকে যদি অপর ব্রাহ্মণে বিবাহ করে, এবং এই প্রকার ব্রাহ্মণ-সংসর্গ যদি ধারাবাহিক ক্রমে সাত পুরুষ

* মনুসংহিতা ৩য় অধ্যায়।

† Elphistone's History of India.

‡ মনুসংহিতা ১০। ৬৪, ৬৫

পর্য্যন্ত চলে, তাহা হইলে সপ্ত জন্মে উপরোক্ত পারম্পর্য্য বর্ণ, বীজের উৎকর্ষ হেতু ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। এই পদ্ধতি ক্রমে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হয়, এবং ব্রাহ্মণও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে; সেইরূপ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যও শূদ্র হয় এবং শূদ্র ও ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদি জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

২। সংক্ষিপ্তসার।

এতক্ষণ আমরা কি দেখাইলাম, তাহা সংক্ষেপে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমরা দেখাইলাম যে, হিন্দু আর্য গণ দলে দলে মধ্য এসিয়া হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের অমিতবিক্রমের নিকট সেই প্রাচীন ভারতের অসভ্য সন্তানদিগের বাহুবল অধিক দিন টিকিতে পারিল না, তাই তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে লাগিল। কেহ কেহ বা পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিল। যাহারা পলায়ন করিতে পারিল না বা যাহাদিগের পলায়নের কোন সুযোগ ঘটিল না, তাহারা বিজেতৃগণের অনুকম্পায় উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

কিন্তু যাহারা পলায়ন করিয়াছিল, যাহারা দুর্গমকাননে, দুরারোহ শৈল-শিখরে অন্ধতমোরাশিব্যাপ্ত গিরিগহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা কতক বা স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্ত হইবার জন্য এবং কতক বা শত্রুনিপীড়ন ও প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার মানসে হিন্দু আর্য্যদিগের নব উপনিবেশ সমূহ আক্রমণ করিয়া তাঁহাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদিগের বিক্রম তৃণসংলগ্ন অগ্নিবৎ অধিক দিন বর্ত্তমান ছিল না।

আমরা দেখাইয়াছি যে, এই সময়ে, আর্য্য-হিন্দুদিগের এই সন্ধ-প্রথমযুগে—ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথা ছিল না। বেদোপাসক আর্য্যগণই বেদের স্রষ্টা। বেদের মধ্যে ঋগ্বেদই সর্ব্বপ্রধান। সেই ঋগ্বেদে হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি প্রভৃতি সমস্তই বিশদরূপে বিবৃত রহিয়াছে। কিন্তু তাহাতে জাতিভেদ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না।

এক পুরুষসূক্তেই জাতিভেদের কথা দৃষ্ট হয়। কিন্তু আমরা দেখাইয়াছি যে, সেই শ্লোকাবলী ঋগ্বেদের অন্যান্য শ্লোকের তুলনায় তত প্রাচীন নহে—অপ্রাচীন ও আধুনিক। ঋগ্বেদের ভাষা কঠোর ও তাহার শব্দ-সঙ্কলন এবং ব্যাকরণবিধিও স্বতন্ত্র। কিন্তু পুরুষসূক্তের ভাষা অনেকটা আধুনিক-সংস্কৃতের মত। ঋগ্বেদে অন্যান্য যে সকল শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই অধুনা অপ্রচলিত। কেবল পুরুষসূক্ত সম্বন্ধেই সে কথা খাটে না। এইরূপ আরও অন্যান্য যুক্তিবলে আমরা দেখাইয়াছি যে, পুরুষসূক্ত ঋগ্বেদে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

আমরা দেখাইয়াছি যে, ঋগ্বেদের যুগে অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছিল না। সুতরাং আর্য্যদিগের রচিত স্বভাবসুন্দর সরল মন্ত্রগুলি তখন সকলে মুখে মুখে শিখিয়া রাখিত। তাহার পর আমরা দেখাইয়াছি যে, সমগ্র ঋগ্বেদ প্রণয়নে প্রায় ৬০০ শত বৎসরেরও অধিক কাল ব্যয়িত হইয়াছে এবং এই প্রণয়নকার্য্য একজন বা দুইজন বা তিনজনে হয় নাই।

এই সকল এবং অন্যান্য কারণেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, ঋগ্বেদ-মধ্যে প্রক্ষিপ্ত শ্লোক থাকা অসম্ভব নহে এবং প্রকৃতও তাহাই আছে।

আমাদিগের বেদ আছে, বেদান্ত আছে, স্মৃতি আছে—পুরাণ আছে, তন্ত্র আছে, ইতিহাস আছে, কাব্য আছে—আমাদিগের আরও অনেক গ্রন্থ আছে। এই সকল প্রাচীন এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক উভয়-বিধ গ্রন্থেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ের হিন্দু-সমাজের আচার-ব্যবহার প্রভৃতি বর্ণিত আছে। আমরা সেই সকল গ্রন্থ হইতে দেখাইয়াছি যে, ঋগ্বেদে বর্ণিত চতুর্ব্বর্ণ-মনুষ্যের উৎপত্তি হইতে অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত চতুর্ব্বর্ণ-মনুষ্যের উৎপত্তি অনেক স্বতন্ত্র। যে সকল গ্রন্থের স্থানবিশেষে পুরুষসূক্তের ছায়া আছে, সে সকল স্থান বিশ্বাস্য নহে—কারণ পুরুষসূক্তই প্রক্ষিপ্ত, তাহারই মৌলিকতা নাই।

জাতিভেদ বলিলে আমরা এখন যাহা বুঝি, প্রাচীন ভারতের আর্য্যসমাজে তেমন একটা কিছু ছিল না। এখনযেমন জাতিভেদ বংশগত হইয়াছে, তখন তাহাও ছিল না। মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, পদ্মপুরাণ, ঐতরেয় ও কৌষিতকী ব্রাহ্মণ, স্কন্দ পুরাণ, শতপথ ব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্য উপনিষৎ, কৌষিতকী উপনিষৎ প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থরাশি হইতে নানাবিধ শ্লোক এবং উপাখ্যান উদ্ধৃত করিয়া, বায়ু পুরাণ, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি এবং Mr. Elphinstone কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস, মিঃ পি এন্ বোস (BSC, FES, MRAS &c) কৃত "ইংরাজ শাসনে হিন্দুসভ্যতা" (History of civilisation under British Rule) নামক পুস্তক, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি আই ই মহাশয়ের "হিন্দু আর্য্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস," শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর M.A., PHD, C. I. E., মহাশয়ের "ভারতের সামাজিক ইতিহাস" (Social History of India) এবং "Social Reform and the Programme of the Madras Hindu Social Reform-Association," অধ্যাপক কে, রামানুজাচারী মহোদয়ের "নিম্ন-জাতির অবস্থা" (The condition of Low castes) প্রভৃতির সাহচর্য্যে আমরা দেখাইয়াছি যে, পূর্ব্বে জাতিভেদ গুণগত এবং কর্ম্মগত ছিল। তখন ব্রাহ্মণ সন্তান কর্ম্মদোষে বা স্বভাব দোষে অনায়াসেই নিম্নস্তরে নামিয়া যাইত এবং শূদ্র বা বৈশ্য, ক্ষত্রিয় অনায়াসেই স্বভাব-গুণে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারিত।

সর্ব্বশেষে আমরা দেখাইয়াছি, তখন বিবাহ-পদ্ধতি এরূপ ছিল না। অনুলোম বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া পরিগণিত হইত। যদিও প্রতিলোম বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু এমনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন প্রতিলোমজ ঋষি একটী ব্রাহ্মণ-সভায় উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। আহারাদি সম্বন্ধেও প্রাচীনভারতে এখনকার মত এমন সকল নিয়ম ছিল না। এমন কি, শুদ্ধ, শান্ত, ক্রিয়ানিরত, ধর্ম্মপরায়ণ শূদ্রের গৃহে ব্রাহ্মণের আহারও দূষণীয় বলিয়া পরিগণিত হইত না, বরং শাস্ত্রানুমোদিতই ছিল।

পঞ্চম অধ্যায়।

হিন্দুসমাজে জাতিবিভাগ।

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, মধ্য এসিয়া হইতে আর্য্যগণ ভারতভূমে আসিয়া অবতীর্ণ হইয়া অনার্য্যদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত করিলেন। অনার্য্যগণ যুদ্ধে পরাজিত হইল।

আর্য্যেরা অপ্রতিহত গতিতে দেশের পর দেশ অধিকার করিয়া গঙ্গা যমুনার দোয়াব খণ্ডে বসবাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা অধিক সাহসী ও বলশালী ছিলেন, তাঁহারা দলে দলে ভাগিরথী-তরঙ্গ অতিক্রম করিয়া তৎপূর্ব্ব-দেশে উপস্থিত হইয়া নূতন নূতন অধিনিবেশ সমূহ স্থাপন করিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে আর্য্য-আচার-ব্যবহার দেশের মধ্যে সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়া উঠিল।

এইরূপে অসংখ্য নদ নদী অতিক্রম করিয়া নূতন নূতন উপনিবেশ সমূহ স্থাপন করিবার সময় আর্য্যদিগের যে কত যুদ্ধ বিগ্রহ করিতে হইয়াছিল, তাহার আর সংখ্যা নাই। অবশেষে এই সকল হিন্দু অধিনিবেশ সমূহই ভারতের সমৃদ্ধিশালী রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। এই সকল প্রাচীন উপনিবেশ হইতেই অযোধ্যায় কোশল, উত্তর বিহারে বিদেহ, এবং বারাণসীতে কাশীবংশের উদয় হইয়াছিল। সমকালীন ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইতঃপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ভারতের সেই বৈদিক যুগের প্রারম্ভে বর্ণ-ভেদ ভিন্ন, জাতিভেদ ছিল না। আর্য্য ও অনার্য্যের ভিতর যে প্রভেদ—গৌর ও কৃষ্ণের ভিতরে যে প্রভেদ—বিজেতৃ ও বিজিতে যে প্রভেদ, সর্ব্বপ্রথমে শুধু তাহাই ছিল। তখন জাতিভেদ ছিল না। তবে কি প্রকারে এই জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি হইল? আমরা সংক্ষেপে তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

আমরা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই যে, যখনই কোন দেশে একটী নবাগত দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর আবির্ভাব হইয়াছে, তখনই তাহাদিগের সহিত আদিম অধিবাসীদিগের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া সেই পরাজিত আদিম অধিবাসীদিগের ভিতর কতক কতক নূতন শত্রুর পদানত হইয়াছে, আর কতক বা স্বাধীনতার মায়া কাটাইতে না পারিয়া বিজন অরণ্যে বা দুরধিগম্য গিরিশৃঙ্গে পলায়ন করিয়াছে।

আমেরিকার দিকে দৃষ্টিপাত কর—বেশী আর অধিক দিনের কথা নহে, তিন চারি শত বৎসরের কথা মাত্র যখন শ্বেতকায় ইউরোপীয় দল আমেরিকায় আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন আদিম অধিবাসীদিগের কি দশা ঘটিয়াছিল? ইতিহাসের পত্রে লিখিত আছে যে, তাহাদিগের মধ্যে যাহারা অধিক শান্তিপ্রিয়, যাহারা অপেক্ষাকৃত হীনবল, তাহারা বিজেতৃগণের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া শ্বেতাঙ্গদিগের বিজিত গ্রাম ও জনপদে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিল; আর যাহারা স্বাধীনতাপ্রিয়, অপেক্ষাকৃত অধিক বলবান ও সাহসী,

তাহারা উচ্চ উর্দ্ধ "আল্পিস" পর্ব্বতের বিস্তীর্ণ উপত্যকায় আশ্রয় লইয়াছিল।

সেই প্রাচীন স্যাক্সনদিগের আগমনের কথা স্মরণ করিয়া দেখ। দেখিবে, তখন ব্রিটনের আদিম অধিবাসিবৃন্দ পরাভূত হইয়া কতক বা দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া ক্রীতদাসের ন্যায় বিজেতৃগণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়াছিল আর অবশিষ্টাংশ ওয়েলস ও স্কটলণ্ডের পার্ব্বত্য প্রদেশে পলায়ন করিয়াছিল।

গ্রীসেও ঠিক এইরূপ ঘটিয়াছিল। আবার যখন লেসিডোমনিয়গণ সদল-বলে স্পার্টা প্রদেশে উপস্থিত হইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন আদিম অধিবাসীদিগের কিয়দংশ হেলট্ বা দাসরূপে পরিণত হইয়া দাসত্ব স্বীকার করিল, আর কতক মেসিনা প্রদেশের পর্ব্বত ও বনশ্রেণীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

আমাদিগের ভারতবর্ষেও তাহাই হইয়াছিল। অনার্য্যদিগের মধ্যে কতক আর্য্যের দাসত্ব স্বীকার করিল, আর কতক পর্ব্বত-শৃঙ্গে, বনশ্রেণীতে আশ্রয় লইয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিল। ইহারাই আর্য্যকর্ত্তৃক দস্যু বলিয়া অভিহিত হইতে লাগিল। এইরূপে সেই সময়ে "গৌরবর্ণ" আর্য্য "কৃষ্ণবর্ণ" দস্যু, এই দুই বিভাগে সমাজ বিভক্ত হইয়াছিল। সুতরাং বলিতে গেলে বৈদিক যুগেই জাতিভেদ প্রথার বীজ সর্ব্ব প্রথমে অঙ্কুরিত হয়। সেই সমাজে যাহারা দাসত্ব স্বীকার করিল তাহারা "দাস" ও যাহারা উপদ্রবকারী হইয়া দাঁড়াইল, তাহারা "দস্যু" নামে পরিচিত হইল। কিন্তু উভয়েই এক জাতির লোক। অবশেষে যে সকল অনার্য্যেরা বিজিত হইয়া আর্য্যদিগের আচার, নীতির অনুকরণ করিল, তাহারা শূদ্র নামে অভিহিত হইল। কিন্তু কোন প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান বা শাস্ত্রের জ্ঞান লাভে তাহাদিগের অধিকার জন্মিল না।*

যাঁহারাই রোমান নগরের প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, রোমে বর্ষে বর্ষে যে সকল অসভ্য জাতীয় পুরুষ ও স্ত্রী বন্দীকৃত হইয়া আনীত হইত, রোমের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে ক্রীতদাসরূপে ক্রয় করিতেন। সেই ক্রীত দাসগণ সর্ব্ব প্রকার সামাজিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হইত।

"In the early Roman republic, the principle of the absolute exclusoin of foreigners pervaded the Civil Law no less than the constitution. The alien or denizen could have no share in any institution supposed to be coeval with the state......They refused, as I have said before, to decide the new cases by pure Roman Civil Law. They refused, no doubt because it seemed to involve some kind of degradation, to apply the law of the particular state from which the foreign litegant came ...they set themselves to form a system answering to the primitive and literal meaning of Jus Gentum, that is, Law common to all nations."†

* শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত।

† "Ancient Law" by Sumner Maine; PP 48-49.

ভারতবর্ষেরও যে এই প্রথার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। আদিম অধিবাসীদিগের ভিতর যাহারা আর্য্যদিগের দাস হইল, তাহারা শীঘ্রই সকল প্রকার সামাজিক সুখ-স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে যুদ্ধের কোলাহল, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা বাতাসের সহিত মিলিয়া গেল। আর্য্য ও দস্যুর শোণিতে সিক্ত যুদ্ধ-ক্ষেত্র আবার শুষ্ক ও কঠিন হইয়া উঠিল; উচ্ছ্বসিত চঞ্চল সমাজ আবার শান্ত হইল—এক কথায় বলিতে গেলে আর্য্যগণ আর্য্যভূমির রাজা হইলেন। কিন্তু সেই পলায়িত দস্যুদিগের উপদ্রব কমিল না।

আর্য্যগণ নূতন নূতন গ্রাম, নূতন নূতন জনপদ সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। নূতন ক্ষেত্র কর্ষিত হইয়া শস্যোৎপাদন করিতে লাগিল—কিন্তু অনার্য্য দস্যুদিগের সাময়িক অত্যাচার ও আক্রমণের বিরাম হইল না।

অবশেষে যখন নির্ব্বিঘ্নে হোমাদি সম্পন্ন করা দুষ্কর হইতে লাগিল—নিশ্চিন্তে বিনিদ্র হইয়া রজনী যাপন করা কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল, তখন আর্য্যগণ আত্মরক্ষার আয়োজন করিতে তৎপর হইলেন। তাঁহারা আপনাদিগের ভিতর কতকগুলি সবলকায় সাহসী ব্যক্তি বাছিয়া লইয়া আপনাদিগের গ্রাম ও জনপদ, ধন ও রত্ন, সুখ ও শান্তি রক্ষার্থ নিযুক্ত করিলেন। ইহারাই অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আপন আপন অধিকার মধ্যে বাস করিতে লাগিল।

যাহারা ক্ষত হইতে ত্রাণ করে, তাহারাই ক্ষত্রিয়। তাই উল্লিখিত অস্ত্রধারী পুরুষগুলি ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত হইতে লাগিল। আমরা পূর্ব্বেই বৃহদারণ্যক উপনিষৎ হইতে দেখাইয়াছি—

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্রে আসীৎ একমেব তদেকং সন্ন ব্যভবৎ। তচ্ছ্রেয়ো রূপং অত্যসৃজত ক্ষত্রং"

অগ্রে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই ছিল। কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণ জাতি একাকী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল না, সুতরাং সেই শ্রেষ্ঠ বর্ণ (ব্রাহ্মণ) ক্ষত্রকে সৃষ্টি করিল।

এই ক্ষত্রিয় বা রাজন্য জাতির সৃষ্টি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রমেশ বাবু বলিতেছেন:—

"পঞ্চনদের প্রাদুর্ভাবের সময় রাজপদের তত সম্মান হয় নাই। সকলেই যোদ্ধা, তাঁহাদের মধ্যে যিনি প্রধান, যাঁহার অধিনেতৃত্বে দেশ প্রদেশ করায়ত্ত হইত, তিনি নেতার স্বাভাবিক সম্মান পাইতেন, এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতেন। কিন্তু গাঙ্গপ্রদেশে প্রাধান্য লাভ সময়ে আর্য্যদের এই ভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়। সাধারণ লোকেরা রাজাদের আড়ম্বর ও স্ব স্ব অবস্থা হইতে তাঁহাদের ভোগ-বিলাসাদির বিষয়ে অত্যন্ত প্রভেদ দেখিয়া তাঁহাদিগকে এক শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর মনুষ্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে লাগিল। এক দিকে সাধারণ লোকের অবনতি, অপর দিকে রাজাদের আড়ম্বরপ্রিয়তা, তাহার উপর পুরোহিতদিগের কল্পনা, এই তিনে মিলিয়া ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টি করিল। তখন রাজারা কোন সম্ভ্রান্ত কৃষক বা ধনাঢ্য বণিকের সহিত বিবাহ-সম্পর্ক রক্ষা করা লজ্জাকর বোধ করিতে লাগিলেন।"

(ক্রমশঃ।)

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বিএ

স্বরজ্ঞান। ‡

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

মহাযোগী মহেশ্বর বলিয়াছেন,—

স্বরজ্ঞানং শিরো যস্য লক্ষ্মীঃ করতলে ভবেৎ।
এতত্তু শরীরে যস্য সুখং তস্য সদা ভবেৎ।

যে ব্যক্তি স্বরশাস্ত্রকেই সকল শাস্ত্রের শিরোমণি স্বরূপ জ্ঞান করিয়া স্বরশাস্ত্রানুসারে চলেন, লক্ষ্মী তাঁহার করতলগত এবং যাঁহার স্বরজ্ঞান আছে, তাঁহার সর্ব্বদা সুখ হইয়া থাকে।

এতজ্জানাতি যো যোগী এতৎ পঠতি নিত্যশঃ।
সর্ব্বদুঃখৈর্ব্বিনির্ম্মুক্তো লভতে বাঞ্ছিতং ফলং॥

যিনি স্বরজ্ঞানে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং নিত্য যিনি ইহা পাঠ করেন, তিনি সর্ব্বদুঃখহীন হইয়া বাঞ্ছিত ফললাভ করেন।

প্রণবঃ সর্ব্ববেদানাং ব্রহ্মাণ্ডে ভাস্করো যথা।
মর্ত্তালোকে তথা পূজ্যঃ স্বরজ্ঞানী পুমানপি॥

সমস্ত বেদের মধ্যে প্রণব যেমন শ্রেষ্ঠ এবং জগতের মধ্যে সূর্য্য যেরূপ, তদ্রূপ স্বরজ্ঞানী ব্যক্তি মর্ত্তালোকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সকলেরই পূজনীয় হইয়া থাকেন।

নাড়ীত্রয়ং বিজানাতি তত্ত্বজ্ঞানং তথৈবচ।
নৈব তেন ভবেত্তুল্যং লক্ষকোটি রসায়নম্॥
একাক্ষর প্রদাতারং নাড়ীভেদবিবেদকম্।
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্দত্বা চানৃণী ভবেৎ॥

ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না—এই তিন নাড়ী ও ক্ষিত্যাদি পঞ্চতত্ত্ব যিনি জ্ঞাত আছেন, লক্ষকোটি রসায়নবেত্তাও তৎসদৃশ হইতে পারেন না। এ হেন অনুপমের অমূল্য স্বরশাস্ত্রের একাক্ষর এবং উক্ত নাড়ী তিনটির স্বরূপ উপদেশ যিনি প্রদান করেন, পৃথিবীতে এমন কোন দ্রব্য নাই, যাহা সেই উপদেষ্টাকে দান করিলে উপদিষ্ট ঋণমুক্ত হইতে পারে।

স্বর, তত্ত্ব, গর্ভ, বর্ষ, রোগ ও চিকিৎসা, কাল, দেববশীকরণ ও স্ত্রীবশীকরণ—এই দশ প্রকরণ স্বরশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে স্বর ও তত্ত্বের বিষয় সংক্ষেপে বলিয়াছি (১)। এক্ষণ গর্ভাদি অন্যান্য বিষয় ক্রমে বলিতেছি।

বন্ধ্যা নারীর পুত্র লাভ করিবার উপায়।

ঋতুরক্ষা কালে পুরুষের দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময়ে এবং স্ত্রীর বাম নাসিকায়

‡ সন ১৩০৮ সালের মাঘ মাসের হিন্দু পত্রিকায় স্বরজ্ঞান প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপরে আর লিখিতে পারি নাই। কেন না, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা না হইলে আমাদের ইচ্ছায় কোন কায হয় না। সুতরাং ইচ্ছা সত্বেও এতদিন লিখিতে পারি নাই।

(১) স্বর ও তত্ত্ব সম্বন্ধে বলিবার এখানে অনেক বাকি আছে; তাহা যথাসময়ে বিশদ রূপে বিবৃত করিব। আর স্বরোদয় ইহা চিকিৎসা কেবল কৌশল মাত্র। ইহার সুফল অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় অধিকাংশ লোকের ঔষধ কি মন্ত্র এবং অর্থব্যয় না হইলে বিশ্বাস হয় না।

নিশ্বাস বহন কালে গর্ভ ধারণ করিলে বন্ধ্যা নারীর গর্ভ সঞ্চার হয় (২)

ঋতুকালে রবিঃ পুংসাং স্ত্রীয়াঞ্চৈব সুধাকরঃ
উভয়ো......প্রাপ্তে বন্ধ্যাপুত্রমবাপ্নুয়াৎ॥

পুরুষের দক্ষিণ নাসিকায় ও স্ত্রীলোকের বাম নাসিকায় শ্বাস বহন সময়ে পৃথ্বী অথবা জলতত্ত্বের উদয় কালে ঋতু রক্ষা করিলে, বন্ধ্যা নারীও গর্ভ ধারণ করিবে। যথা—

ক্ষিতি অপ্ তত্ত্বেষু বন্ধ্যা পুত্রমবাপ্নুয়াৎ।

অর্থাৎ পৃথ্বী কিম্বা জলতত্ত্বের উদয় কালে গর্ভাধান হইলে বন্ধ্যা স্ত্রীলোকও গর্ভবতী হইবে। আর ঐ দুই তত্ত্বের উদয় কালে গর্ভাধান হইলে, সেই গর্ভস্থ সন্তান সুখী ও সৌভাগ্যবান্ হইয়া থাকে।

গর্ভাধানং যাকতে স্যাচ্চ দুঃখী,
দিশাখ্যাতো বারুণে সৌখ্যযুক্তঃ।
গর্ভস্রাবী স্বল্পজীবী চ বহ্নৌ,
ভোগী ভব্যঃ পার্থিবেনার্থযুক্তঃ॥

ইহার অর্থ—জলতত্ত্বের উদয়কালে গর্ভাধান হইলে, সেই গর্ভের সন্তান সুখী হয়, এবং তাহার সুখ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হইয়া থাকে। আর পৃথ্বী তত্ত্বের উদয় কালে গর্ভাধান হইলে, সেই সন্তান সুন্দর, ভোগী ও ধনবান্ হইবে। বায়ু তত্ত্বের উদয়কালে গর্ভ হইলে, সেই সন্তান দুঃখী হইবে। অগ্নি তত্ত্বের উদয়কালে গর্ভ হইলে, গর্ভস্রাব হয় কিম্বা অল্পায়ুবিশিষ্ট সন্তান জন্ম গ্রহণ করে।

অতএব পুরুষের দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস এবং স্ত্রীলোকের বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময়ে পৃথ্বী ও জলতত্ত্বের উদয়কালে গর্ভাধান করিলে সুসন্তান লাভ হয়। কিন্তু পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়কালে পুত্র এবং জলতত্ত্বের উদয়কালে কন্যা জন্মিয়া থাকে।

মাহেয়ে চ সুতোৎপত্তির্ব্বারুণে দুহিতা ভবেৎ।
শেষেষু গর্ভহানিঃ স্যাজ্জাত মাত্রস্য বা মৃতিঃ॥

পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়কালে গর্ভ হইলে পুত্র জন্মিয়া থাকে। জলতত্ত্বের উদয়কালে কন্যা হয়। এই দুই তত্ত্ব ব্যতিরেকে অগ্নি, বায়ু, আকাশ—এই তিন তত্ত্বের কোন তত্ত্বের উদয়কালে গর্ভ হইলে গর্ভ নষ্ট হয় কিম্বা সন্তান জন্মিবামাত্রেই মরিয়া যায়।

যাঁহাদের সন্তান হয় নাই, স্ত্রী বন্ধ্যা বলিয়া ধারণা হইয়াছে, কিম্বা যাঁহাদের উপর্য্যুপরি কন্যা জন্মিয়া থাকে, তাঁহারা ঋতুরক্ষা কালে উপরোক্ত নিয়মে পৃথ্বী তত্ত্বের উদয়কালে গর্ভাধান করিলে সুন্দর সুপুত্র লাভ করিবেন, সন্দেহ নাস্তি। ইহা আমাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

(২) পূর্ব্বে প্রবীণা গিন্নিরা নববধূকে স্বামীর বামপার্শ্বে শয়ন করিবার জন্য বিশেষরূপে উপদেশ দিতেন। এখনকার তীক্ষবুদ্ধি সম্পন্ন নব্যগণ প্রাচীন সকল প্রথাকেই কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান্। কিন্তু আমরা ঐরূপ শয়নের প্রথার মধ্যে গভীর উদ্দেশ্য দেখিতেছি; এইরূপ আমরা ভূয়োদর্শনে বুঝিতেছি যে, হিন্দুর গৃহে আবহমান প্রচলিত কোন প্রথা অনর্থক কি অনাবশ্যকীয় নহে। বামপার্শ্বে শয়নের উদ্দেশ্য বিজ্ঞ পাঠকগণ পশ্চাদুক্ত "নিশ্বাস পরিবর্ত্তনের উপায়" পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন।

যাহার কন্যা লাভের ইচ্ছা থাকে, তিনি জলতত্ত্বের উদয়কালে ঋতুরক্ষা করিলে সুখী ও ভাগ্যবতী কন্যা লাভ করিবেন।

এরূপ নিয়মেও যদি কাহারও ভাগ্যে পুত্র বা কন্যা লাভ না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার স্ত্রী বন্ধ্যা নহে, সেই পুরুষ নিজেই বন্ধ্যা। অর্থাৎ পুরুষের শুক্রে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম এক প্রকার জীবন্ত কীটাণু থাকে, তাহাকে ইংরাজী চিকিৎসা শাস্ত্রে স্পারমাটোজিয়া কহে। ঐ Spermatozea (শুক্রকীট) যাহার অচেতন ও শক্তিবিহীন হয়, তিনি সহস্র চেষ্টা করিলে এবং শতনারী বিবাহ করিলেও সন্তান লাভে বঞ্চিত থাকিবেন।

যাঁহারা স্ত্রীকে বন্ধ্যা মনে করিয়া পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য পাগল হইয়া থাকেন; কেহ বা বিবাহ করিয়া শেষে সংসার অশান্তির আগার করিয়া নিজেও আমরণ জ্বালাতন হইয়া থাকেন; তাঁহারা স্বরমতে উক্ত নিয়ম পালন করিয়া বিফল হইলে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিজ শুক্রে জীবন্ত কীটাণু আছে কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। নিজের বন্ধ্যাত্ব না বুঝিয়া, কেবল অবলা সরলা স্ত্রীর স্কন্ধে বন্ধ্যাত্ব দোষ চাপাইয়া নববরবেশে রসের বাসর-ঘরে আবার আসর জমকাইয়া বসিবার আশা করিলে ভগবানের নিকট দোষী হইতে হয়।

স্বর মতে উপরোক্ত নিয়মে গর্ভাধান করিবার পূর্ব্বে একটি ঔষধ সেবনের বিধি আছে, যথা—

শঙ্খবল্লী গবাং দুগ্ধং পৃথ্ব্যাপো বহতে যদা।
ভর্ত্তুরগ্রে বদেৎ বাক্যং গর্ভং দেহি ত্রিভির্ব্বচঃ
ঋতুস্নাতা পিবেন্নারী ঋতুদানকর্মোজ্বলেৎ।
রূপলাবণ্য সম্পন্নং নরসিংহং প্রসূয়তে॥

স্ত্রীলোক ঋতুস্নানান্তে পতির সম্মুখে "গর্ভং দেহি" এই বাক্য তিনবার বলিয়া পুত্রার্থে পৃথ্বীতত্ত্বের বহন কালে এবং কন্যার্থে জলতত্ত্বের বহন কালে গোদুগ্ধ ও শঙ্খবল্লী পান করিবে (৩)। পরে রাত্রিকালে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে গর্ভাধান হইলে রূপলাবণ্যসম্পন্ন মহাবলিষ্ঠ পুত্র লাভ করিতে পারে।

যদি ও এই ঔষধটি স্বরশাস্ত্রে আছে; কিন্তু স্বরজ্ঞ গুরুদেবেরা বলেন যে, বাধকাদি স্ত্রীজাতীয় কোন পীড়া না থাকিলে এ ঔষধ সেবন করিবার আবশ্যক হয় না।

গর্ভাধান সময়ে যেমন তত্ত্ব বিচার করিয়া কার্য্য করিতে হইবে, তেমনি স্বরের বাল্যাদি অবস্থা বিচার করিয়া অনুকূল অবস্থায় কার্য্য না করিলে সুফল লাভের সম্ভাবনা নাই।

---

(৩) দুগ্ধ ও শঙ্খবল্লী কত পরিমাণে পান করিবে, তাহা স্বরশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট নাই; কিন্তু স্বরজ্ঞ গুরুদেবেরা পরিমাণ জ্ঞাত আছেন। পরিমাণটি আমার ঠিকস্মরণ নাই। আমি চট্টগ্রামে ৺চন্দ্রনাথ দর্শনে যাইতেছি; শিক্ষার সময়ে যে খাতায় ঐ গুলি লিখিয়া লইয়াছিলাম, তাহা এখন সঙ্গে আনি নাই। এজন্যে পরিমাণ লিখিতে পারিলাম না।

যদি এই ঔষধ সেবন করিতে হয়, তবে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন কালে সেবন করিতে হইবে। যে কোন পীড়ায় যে কোন ঔষধ অর্থাৎ ঔষধ মাত্রই দক্ষিণ নাসিকার শ্বাস বহন সময় সেবন করিতে হয়। ইহাই স্বরশাস্ত্রের নিয়ম।

কৃপণঃ কাতরো মূর্খঃ কৃপণশ্চাজিতেন্দ্রিয়ঃ।
অসত্য বহুভাষী চ জাতো বাল স্বরোদয়ে॥
ব্যবসায়ী কলাভিজ্ঞঃ শ্রীরতঃ সুভগঃ সুখী।
দীর্ঘায়ুরদ্রিজিঃ শূরঃ কুমারোদয় সম্ভবঃ॥
সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণো রাজা ভবতি বিশ্রুতঃ।
সর্ব্বকাল জয়ী যুদ্ধে জাতো যুবোদয়ে শিশুঃ॥
শ্রীজিতো ধার্ম্মিকঃ কামী বিবেকী স্থির-
সাহসঃ।
সত্যবাদী সদাচারঃ পুমান্ বৃদ্ধোদয়োদ্ভবঃ॥
ক্লেশী সমৎসরঃ ক্রূরো বিভ্রমো বিকলেন্দ্রিয়ঃ
সর্ব্বকার্য্যালসো দুষ্টো জন্ম যস্য মৃতোদয়ে॥

ইহার ভাবার্থ এই যে, বালস্বরে গর্ভাধান হইলে, সেই গর্ভস্থ সন্তান চঞ্চল প্রকৃতি, মূর্খ, কৃপণ, অজিতেন্দ্রিয়, মিথ্যাবাদী, বহুভোগী ইত্যাদি দোষবিশিষ্ট হয়।

কুমারস্বরোদয়ে জন্মগ্রহণ করিলে দীর্ঘায়ু ও কলাভিজ্ঞ, শূর, সুখী ইত্যাদি হয়।

যুবাস্বরে জন্ম গ্রহণ করিলে, সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন রাজা হয় অথবা রাজা সদৃশ হয় এবং সর্ব্বকাল যুদ্ধে ও মোকদ্দমা মামলায় জয়লাভ করে।

বৃদ্ধস্বরোদয়ে জন্ম হইলে সদাচারী, সত্যবাদী, ধার্ম্মিক ও বিবেকী ইত্যাদি হয়।

মৃতোদয়ে জন্মিলে দুঃখী, ক্রূর, অলস ইত্যাদি হইয়া থাকে।

স্বরের উক্ত পঞ্চাবস্থা বিচার করিয়া গর্ভাধান এবং অন্যান্য সকল কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

পুত্র সুকবি, পণ্ডিত ও বাগ্মী হইবার উপায়।

জাত মাত্র বালকং পিতা স্বর্ণং দত্বা পশ্যেৎ।
ততো গৃহান্তরে গর্ভাধান পঞ্চভূত্বাকং
পঞ্চদেবতা পূজাদি ধারা হোমান্তং কর্ম্মকৃত
পঞ্চাহুতীদদ্যাৎ। "হ্রীং অগ্নয়ে স্বাহা"
ইত্যাদি ইত্যেভির্ম্মন্ত্রৈরিতি।
ততঃ কাংস্যপাত্রে সমাংশেন মধুসর্পিষী
সমানীয় তদুপরি ঐমিতি সপ্তধা লিখ্য।
"হ্রীং আয়ুর্ব্বর্চ্চাদি" ইতি মন্ত্রেণর্দ্দক্ষিণ হস্তানামিকায়াৎ শিশুং প্রাশয়েৎ।
ইত্যায়ুর্জ্জননং কৃত্বা পিতা গুপ্তং নাম কুর্য্যাৎ
ততো জন্মদিনাবধি ত্রিদিনাভ্যন্তরে কর্ত্তব্যং
কথা—
বালকস্য তু জিহ্বায়াং ত্রিদিনাভ্যন্তরে
মাসেৎ।
মধুনা শ্বেত দূর্ব্বাভিঃ সুবর্ণস্য শলাকয়া।
ইদং বাগ্‌ভব কূটস্থ* লিখেদ্বৈ জননান্তরে।
সএব পণ্ডিতো ভূয়াত্তু মূর্খো ভবেদ্ ধ্রুবং।
বাগ্‌ভবকূটমপি তত্রৈব যথা।—
কামদেবস্ততো যোনিস্তূর্য্যা স্বর পুরন্দরী।
ভুবনেশী ততঃ পশ্চাৎ পঞ্চবক্ত্র বিভূষিতঃ।*
অয়ংস বাগ্‌ভবো দেবী বাগীশত্ব প্রদায়কঃ।
অনেন বাগ্‌ভব কূটেন বালকঃ পণ্ডিতঃ
সুকবিঃ শব্দালঙ্কারবিচ্চ ভবতি।
যদীমং মন্ত্রং কৃতপুরশ্চরণো বালিশস্যাপি (৪)
মূর্দ্ধনি হস্তং দত্বাষ্টোত্তর শতং জপেত্তদা
সোঽপি শ্লোকং করিষ্যতি। যদিচেমং
মূকস্য জিহ্বায়াং প্রসেত্তদা সোঽপি কবির্ভবতি।

* "এই মন্ত্রটি ক্লীং হ্রীং ঈং শ্রীং হ্রীঃ হেসৌঃ।" ইহার নাম বাগ্‌ভবকূট।

(৪) বালিশস্য—মূর্খস্য।

বাগ্‌ভ কূট—মন্ত্র অষ্টাধিক সহস্র জপ করিলে পুরশ্চরণ হয়।

জিহ্বাং সম্মার্জ্জ্যদেবেশি লিখিদ্ধেম-শলাকয়া
দূর্ব্বায়া বা মহাদেবি জিহ্বোর্দ্ধয়োঃ
সমালিখেৎ।
পংক্তিদ্বয়েন সংলিখ্য কুর্য্যাচ্চ বালসংস্ক্রিয়াং
একাদশাহে দেবেশি দ্বাদশাহেঽথবা পুনঃ।
স্বর্ণ স্বাত্যাদি স্তেদেন মাসান্তঃ সম্ভবিব্যতি।
যথা শক্ত্যুপচারেণ দেবতাং পূজয়েৎ পুনঃ।
সংপূজ্য দেবতাং ভক্ত্যা লিখেৎ মন্ত্রং মহেশ্বরী
যদি পিতা ন দেশস্থো পিতৃব্যো মাতুলোঽপি
বা।
লিখিত্বা পরমেশানি কুর্যাচ্চ বালসংস্ক্রিয়াং
মূলমন্ত্রং লিখেন্মন্ত্রী যস্তোষ্ঠে শ্বেতদূর্ব্বায়া।
বাক্যোচ্চারণতো বালো বাগ্মী দ্রুত কবি-
র্ভবেৎ।
জিহ্বায়াঞ্চ লিখেদ্ মন্ত্রং যত্নে দারুকুশেন বা
বারত্রয়ন্তু সম্মার্জ্জ্য দক্ষিণেনৈব পাণিনা।
মন্ত্রমুচ্চার্য্য প্রত্যেকং পংক্তিং কুর্য্যাৎ
সুশোভনং।
আদৌ স স্কার কর্ত্তব্যস্তদন্তে বিলিখেন্মনুং।
কবির্বাগ্মী ভবেৎপুত্রঃ সর্ব্বকাম প্রকারকঃ
জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী ধার্ম্মিকো জায়তে
মহান্।

ইহার প্রয়োগ এইরূপ—

পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র, পিতা স্বর্ণ দ্বারা পুত্রের মুখাবলোকন করিয়া গৃহান্তরে গমন পূর্ব্বক পঞ্চ দেবতাদি পূজা করিয়া ধারা হোম করিবেন (৫)। পরে পঞ্চাহুতি দিতে হইবে (৬) তৎপর কাংস্যপাত্রে ঘৃত ও মধু সমানাংশে লইয়া তদুপরি ক্রীং মন্ত্র সাতবার জপ করিয়া আয়ুর্বর্চ্চাদি মন্ত্রে (৭) দক্ষিণ হস্তের অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা ঐ ঘৃত মধু লইয়া শিশুর মুখে দিবেন। ইহাকে আয়ুর্জ্জনন কহে। এই সময়ে পিতা মনে মনে শিশুর একটি নাম রাখিবেন।

ইহার পর তৃতীয় দিনে শ্বেত দূর্ব্বা অথবা স্বর্ণশলাকা দ্বারা মধু লইয়া বালকের জিহ্বাতে বাগ্‌ভবকূট অর্থাৎ ক্লীঁ হ্রাঁ ঐঁ শ্রীং হ্রীং হেসৌঃ—এই বীজ লিখিয়া দিবেন।

তৎপর জাতি অনুসারে শুভশৌচান্ত দিনে পিতা অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে পিতৃব্য কিম্বা মাতুল অবস্থানুসারে উপচার দ্বারা দেবতা পূজা করিয়া নিজ কুলদেবতার মন্ত্র ওষ্ঠে লিখিবে এবং জিহ্বাতে পূর্ব্বোক্ত বাগ্‌ভবকূট লিখিবে। অগ্রে

(৫) হিন্দুর গৃহে অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহাদি কার্য্যে দেওয়ালে ঘৃত দ্বারা ধারা দেওয়া রীতি আছে। তাহাকে বসু-ধারা বলে। এখানে ধারা হোমের নিয়ম বলিয়াছেন। ধারা হোম যথা—দেহলাং নাভিমাত্রায়াং প্রাদেশ পরিমাণতঃ সপ্তধা পঞ্চধা বিন্দূন্ দদ্যাৎ সিন্দূর চন্দনৈঃ। প্রত্যেকবিন্দৌ মতিমান্ কামং মায়াং রমাং স্মরন্। ঘৃতধারামবিচ্ছিন্নাং দদ্যা। কাম, মায়া, রমা অর্থে—ক্লীং হ্রীং শ্রীং হইবে,

(৬) পঞ্চ আহুতি যথা—হ্রীং অগ্নয়ে স্বাহা হ্রীং ইন্দ্রায় স্বাহা, হ্রীং প্রজাপতয়ে স্বাহা, হ্রীং বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো স্বাহা, হ্রীং ব্রহ্মণে স্বাহা।

(৭) হ্রীং আয়ুর্বর্চ্চো বলং মেধা বর্দ্ধতাং তে সদা শিশো।

স্বর্ণ দ্বারা জিহ্বা তিনবার মার্জ্জনা করিবে, পরে স্বর্ণশলাকা কিম্বা শ্বেত দূর্ব্বা দ্বারা ওষ্ঠে মন্ত্র লিখিবে এবং কাষ্ঠ অথবা কুশ দ্বারা জিহ্বাতে লিখিতে হইবে; কিন্তু প্রথমোক্ত প্রকারে ধারাহোমাদি সমস্ত কার্য্য করিয়া বালকের সংস্কার করিতে হইবে। এইরূপ করিলে শিশু সুপণ্ডিত সুকবি, বাগ্মী, শব্দালঙ্কারবিৎ হইবে।

এইরূপ করিবার দিন পূজোপকরণ ও অন্ন বস্ত্রাদি এবং দক্ষিণা ব্রাহ্মণকে দিবার বিধি আছে। আর ঐ সকল কার্য্য নিজে করিতে না পারিলে ব্রাহ্মণের দ্বারা সম্পন্ন করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ ব্যতীত জাতির পক্ষে ব্রাহ্মণের দ্বারা সমস্ত সম্পন্ন করিতে হইবে। কারণ,— "মন্ত্রাধীনাশ্চ দেবতাঃ, তে মন্ত্রা ব্রাহ্মণাধীনাঃ।" এ কথা যেন মনে থাকে।

ইহা ব্যতীত গর্ভাধান করিবার আরো নিয়ম স্বরশাস্ত্রে ব্যক্ত আছে। অতঃপর তাহা বলিব; কিন্তু আমি প্রথমে যে স্বরশাস্ত্র গ্রন্থ দৃষ্টে শিক্ষা করিয়াছিলাম, তাহাতে ইহা পাই নাই। জ্বালামুখী তীর্থে অবস্থিতি সময় পঞ্জাব দেশীয় এক পরমহংস বাবার নিকট স্বরশাস্ত্রে নিম্নের লিখিত বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।* পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহা প্রকাশ করিতেছি।

চতুর্থ প্রহরে রাত্রে যো গচ্ছেৎ রমণীং নরঃ
হরিভক্তিরতং সুতং লভতে স মহামতিঃ।
তনয়া জায়তে তস্য ধর্ম্মশীলা পতিব্রতা।
রাত্রিগত ফলং দেবি ইতিতে কথিতং ময়া।

রাত্রির চতুর্থ প্রহরে গর্ভাধান করিলে হরিভক্তি পরায়ণ মহামতি পুত্রলাভ করিয়া থাকে অথবা কন্যা সমুৎপন্ন হইলে, সেই কন্যা পতিব্রতা ও ধর্ম্মশীলা হয়।

অতএব সুপুত্র লাভের আশা করিলে রাত্রির চতুর্থ প্রহরে গর্ভাধান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কোন কোন দিনে গর্ভাধান করিতে নিষেধ আছে।

শ্রীহরি বাসরে তথা অমাবস্যা দিনে চৈব
অথবা পূর্ণিমা তিথৌ চতুর্দ্দশী দিনে চৈব
তথা চৈ অষ্টমী তিথৌ রবিবারে চ সংক্রান্ত্যাং
পরিত্যজেৎ মহাদেবি যদিচ্ছেদাত্মনো হিতং

যদি আপনার হিত কামনা থাকে, তবে হরিবাসর, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী ও রবিবার এবং সংক্রমণ (সংক্রান্তি) দিনে গর্ভাধান করিবে না। (৮)

---

* এই পরমহংস বাবার হস্তে একটি অলাবু পাত্র সর্ব্বদা থাকিত। তিনি যতবার ঐ পাত্রের মধ্যে হাত দিতেন, ততবার পাঁচটি টাকা বাহির করিতেন এবং তাহা দ্বারা মিষ্টান্ন কিনিয়া বালকদিগকে দিতেন ও অন্যান্য প্রকারে দান করিতেন। বাঙ্গলা সন ১২৮২ সালের পূর্ব্বে অনেক দিন লাহোর সহরে ছিলেন এবং সকলে তাঁহাকে "তুম্বুরো বাবাজি" বলিয়া ডাকিত।

(৮) স্বরমতে গর্ভাধান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ কবি, বাগ্মী ও পণ্ডিত হইবার যে উপায় লিখিত হইয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করি। ইহার প্রকরণ যিনি বুঝিতে না পারিবেন, তিনি আমাকে লিখিলে নিয়ম প্রকরণ সমস্ত বুঝাইয়া দিতে সম্মত আছি।

স্বরের যে পঞ্চাবস্থা বলিয়াছি, তাহা বিচার করিয়া সর্ব্ব কার্য্য করা কর্ত্তব্য। ঐ অবস্থা এবং কোন অবস্থায় কোন্২ কার্য্য করা উচিৎ, তাহা বলিতেছি।

স্বরাণাং বালদ্যাবস্থা ফলঞ্চ।
উদিতস্য স্বরস্য স্থানাম স্বর বশেনতাঃ।
পঞ্চবালাদিকাবস্থাঃ স্ব স্ব কাল প্রমাণতঃ।
আদৌ বালঃ কুমারশ্চ যুবা বৃদ্ধো মৃতস্তথা।
নিজাবস্থা স্বরূপেণ ফলদা নাত্র সংশয়ঃ।
কিঞ্চিল্লাভ করো বালঃ কুমারশ্চার্দ্ধ লাভদঃ
সর্ব্বসিদ্ধিং যুবাদত্তে বৃদ্ধেহানি মৃতে ক্ষয়ঃ।
যাত্রা যুদ্ধে বিবাদে চ নষ্টে দুষ্টে কৃতাম্বিতে।
বালস্বরো ভবেদ্দুষ্টা বিবাহাদি শুভেহশুভঃ।
সর্ব্বেষু শুভ কার্য্যেষু যাত্রাকালে তথৈব চ।
কুমারঃ কুরুতেসিদ্ধিং সংগ্রামে সঙ্কতো জয়ী
শুভাশুভেষু সর্ব্বেষু মন্ত্র যন্ত্রাদি সাধনে।
সর্ব্বসিদ্ধিঃ যুবাদত্তে যাত্রাযুদ্ধে বিশেষতঃ।
দানে দেবার্চ্চনে দীক্ষা গূঢ়মন্ত্র প্রজল্পনে।
বৃদ্ধ স্বরো ভবেত্তবো র ণ ভঙ্গোভয়ঙ্গমে।
বিবাহাদি শুভং সর্ব্বং সংগ্রামাদ্য শুভং তথা
নকর্ত্তব্যং নৃভিঃ কিঞ্চিদ্যাতে মৃত্যু স্বরোদয়ে
মৃতো বৃদ্ধস্তথা বালঃ কুমার স্তরুণঃ স্বরঃ।
যথোত্তর বলাঃ সর্ব্বে জ্ঞাতব্যাঃ স্বরবেদিভিঃ

ভাবার্থ—পূর্ব্বে বলিয়াছি, এক এক নাসিকায় এক ঘণ্টা হিসাবে শ্বাস বহন হয়। ঐ এক ঘণ্টার মধ্যে স্বরের পাঁচটি ভাব বা অবস্থা হয়। যথা—বাল, কুমার যুবা, বৃদ্ধ ও মৃত। এই পাঁচ প্রকার অবস্থা ও নামানুসারে কার্য্যের ফল প্রদান করিয়া থাকে। আমরা কোন কার্য্যোদ্দেশে গমন করিয়া কিম্বা ব্যবসায়াদি কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া বিফলমনোরথ হই এবং অদৃষ্ট পূর্ব্ব অদৃষ্টকে ধিক্কার দেই, কিম্বা সমস্ত দোষ বিধাতার ঘাড়ে চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হই। কিন্তু স্বরের উক্ত পঞ্চাবস্থা ও তত্ত্ব বিচার না করিয়া কার্য্য করি, এ জন্য আমাদের আশানাশ মনস্তাপ হয়; ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ সিদ্ধ; সুতরাং ইহাতে সংশয় করা উচিৎ নহে। বালস্বরে কার্য্য করিলে কিঞ্চিল্লাভ, কুমার স্বরে অর্দ্ধ লাভ, যুবাস্বরে সর্ব্ব সিদ্ধি হয় এবং বৃদ্ধ ও মৃত্যু স্বরে কার্য্য করিলে হানি ও ক্ষয় হয়।

যাত্রা, যুদ্ধ, বিবাদ, বিবাহাদি কার্য্য বাল স্বরে করিলে অশুভ হয়।

যাত্রা, সংগ্রামে এবং সর্ব্ব প্রকার শুভকার্য্য কুমার স্বরে হইলে শুভ হয়।

মন্ত্র যন্ত্রাদি সাধন, কোন কার্য্যোপলক্ষে যাত্রা, যুদ্ধ ও সর্ব্বপ্রকার শুভাশুভ কার্য্য যুবাস্বরে করিলে সিদ্ধি হয়। যুবা স্বরে যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, তাহা সিদ্ধি হইয়া থাকে।

দান, দেবার্চ্চনা, দীক্ষা, গূঢ় মন্ত্র সাধন বৃদ্ধস্বরে ভাল। তদ্ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যে বৃদ্ধ স্বর ভাল নয়।

মৃত্যু স্বর উদয়ে কোন কার্য্য করিতে নাই। ইহাতে যে কার্য্য করিবে, তাহা নষ্ট হইবে।

যে জন্য কোনস্থানে যাইতে হইলেও কুণ্ঠিত নহি। ফল কথা একবার পরীক্ষা দ্বারা স্বরশাস্ত্রের সত্যতা প্রত্যক্ষ করুন, ইহাই প্রার্থনা।

স্বরের এই পঞ্চাবস্থা বিচার করিয়া সকল কার্য্য করা কর্ত্তব্য। (৯)

স্বরের এই পঞ্চাবস্থা বিচার করিয়া সকল কার্য্য করিতে হইবে। আর নাড়ী সংক্রমণ ও তত্ত্ব সংক্রমণ কালে কোন কার্য্য করিতে নাই। সংক্রমে যে কার্য্য করিবে, তাহাই নষ্ট হইবে।

নাড়ী ও তত্ত্ব সংক্রমণে কর্ত্তব্য।

এক নাসিকা হইতে নিশ্বাস অন্য নাসিকায় বহন আরম্ভ হইবার সময় নাড়ী সংক্রমণ বলিয়া কথিত হয়। যথা— বাম নাসিকায় একঘণ্টা বহন শেষ হইয়া দক্ষিণ নাসিকায় বহন আরম্ভ হইবে, ইহাকে নাড়ী সংক্রমণ বলে। অর্থাৎ যে মুহূর্ত্ত এক নাসিকা হইতে অন্য নাসিকায় শ্বাস যায়, সেই মুহূর্ত্তেই নাড়ী সংক্রমণ তত্ত্ব সংক্রমণ ও এইরূপ। একতত্ত্ব শেষ হইয়া আর এক তত্ত্ব আরম্ভ হইবার সময় তত্ত্ব সংক্রমণ বলিয়া থাকে। নাড়ী ও তত্ত্ব সংক্রমণ কালে কোন শুভ কার্য্য করিবে না।

নাড়ী সংক্রমণ কালে তত্ত্ব সংক্রমণে তথা।
শুভং কিঞ্চিন্ন কর্ত্তব্যং পুণ্যদানাদি কোটিধা

নাড়ী সংক্রমণ কালে ও তত্ত্ব সংক্রমণ কালে শুভ কার্য্য মাত্রেই করিবে না এমন কি, সংক্রমণ কালে দানাদি পুণ্য-কর্ম্ম করিতে নাই।

সংক্রমণ সময়ে গর্ভাধান হইলে, সেই গর্ভস্থ সন্তানের মাতার মৃত্যু হয়। যথা—

যুগ্মে যুগ্মং জয়ো নষ্টে মাতুর্মৃত্যুশ্চ সংক্রমে।

আমাদের দেশে মা খেগো ছেলে মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। বালক ভূমিষ্ঠ হইয়া কিছুদিন পরে তাহার মাতার মৃত্যু হইলে তাহাকে মাতৃরিষ্টি বা মাখেগো ছেলে বলিয়া থাকে। কিন্তু আমরা নিজের অজ্ঞতা ও দোষ না বুঝিয়া বালককে মাখেগো বলিয়া সমস্ত দোষ তাহার স্কন্ধে চাপাই। (১০)

সংক্রমণ কালে কোনস্থানে যাত্রা করিলে যাত্রা হানিকরী হইয়া থাকে—

যাত্রা হানিকরী তত্র মৃত্যুকালে নসংশয়ঃ।

এক নাসিকা হইতে অন্য নাসিকায় নিশ্বাস বহন আরম্ভ হইবার সময় সংক্রম বলিয়া মন্দফল প্রদান করে কেন, তদ্বিবরণ বলিতেছি।

পিঙ্গলায়াং স্থিতা রুদ্র ইড়ায়াং সংস্থিতাঃ পরে
সুষুম্না মধ্যগা জ্ঞেয়াশ্চত্বারো যে নপুংসকাঃ

অত্র প্রকারো—বাম নাসাতো দক্ষিণ নাসা প্রবেশ প্রারম্ভ সময়ে দেহ বায়ুঃ

---

(৯) এই পঞ্চ অবস্থা চিনিবার উপায় পরে বলিব।

(১০) সৃষ্টিরাজ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্যের সুখ সুবিধার জন্য ভগবান নানা উপায় করিয়াছেন; কিন্তু আমরা তাহা বুঝিনা, জানিনা এবং জানিতে চেষ্টাও করি না। বাস্তবিক মানুষ ইচ্ছা করিলে—শাস্ত্রোক্ত নিয়ম পালন করিলে সুন্দর, সুখী, ধর্ম্মশীল, দীর্ঘজীবী ও ভাগ্যবান সন্তান উৎপাদন করিতে পারে। ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। সুসন্তান লাভের উপায় স্বতন্ত্র প্রস্তাবে বিশদভাবে বলিবার ইচ্ছা আছে।

কিঞ্চিৎকালমুত্তরত্র বহতি স-দক্ষিণায়ন-কারম্ভসময়স্তদানাং, শ্লো. ৯ কারায়কং ভুবনম্মুদেতি এবং দক্ষিণনাসাতো। বাম-নাসাগমনকালেঽপি স-উত্তরায়ণপ্রারম্ভ-কালস্তদানীং শ্লো ৯ রূপ দর্শয়ন্ মুদেতি।

পুনঃ, উক্ত হইয়াছে যে,—

অবং সপ্তমমারভ্য চত্বারশ্চ নপুংসকাঃ।
তে সুষুম্নাশ্রিতে প্রাণে প্রোদ্যন্ত্যয়ন-
সংক্রমে। ইতি।

সংক্রমণ কালে আকাশ তত্ত্বের উদয় হয়, কিন্তু আকাশ তত্ত্বে কেবল যোগ-সাধন ও তত্ত্বজ্ঞানসিদ্ধি হয়। তদ্ভিন্ন সকল প্রকার কার্য্য আকাশতত্ত্বে নষ্ট হইয়া থাকে। এজন্য বলিয়াছেন "নভো বহতি সংক্রমে।" অর্থাৎ সংক্রমণ কালে আকাশ তত্ত্বের উদয় হয়, এজন্য কোন কার্য্য করিলে আকাশতত্ত্বের ন্যায় বিফল হয়। (১১)

(ক্রমশঃ।)

শ্রীউমানাথ চট্টোপাধ্যায়

---

(১১) স্বরজ্ঞান পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা কোন বিষয় জানিবার জন্য আমাকে পত্র লিখিয়া থাকেন, তাঁহারা স্বরের বাদ্যাদি অবস্থা ও অন্যান্য বিষয় জানিবার উদ্দেশ্যে অতঃপর পূর্ব্ব ঠিকানায় পত্র না পাঠাইয়া "জেলা নোয়াখালি সদর কোর্টের হেড কনেষ্টবল বাবু দ্বারকানাথ মিত্রের কেয়ারে" আমাকে লিখিবেন। তাহা হইলে পূর্ব্বের ন্যায় উত্তর পাইতে অবশ্য বিলম্ব হইবে না।

তত্ত্ব-সমাস।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

মহর্ষি কপিলদেবের তত্ত্ব-সমাসের চারিটী সূত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সম্প্রতি পঞ্চম-সূত্রের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। চতুর্থ-সূত্রে চেতন বিশ্বাবভাসক 'পুরুষ' নামক অবিকৃততত্ত্বের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে; এই পঞ্চম সূত্রে মূলপ্রকৃতির স্বরূপশক্তির পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে। কপিলদেব বলিতেছেন,

ত্রৈগুণ্যং। ৫

মূলপ্রকৃতির স্বরূপ ত্রৈগুণ্য। ত্রিগুণ-ভাব এই সৃষ্ট সংসারের সূক্ষ্ম-সীমা। এই বিরাট বিশ্বের তাবৎবস্তুতেই ত্রিগুণ-ভাবের উপলব্ধি করা যাইতেছে। ইহা হইতে মনে করা যাইতে পারে, জগতে সর্ব্বানুস্যূত ত্রিগুণভাব, জগৎকারণ মূল-প্রকৃতির ত্রিগুণভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অনুমান-জগতে তথ্যাবিষ্কারের প্রণালী দ্বিবিধ। অনুমানক্রমের অনুলোমপ্রবাহ এবং বিলোমপ্রবাহ। অনুমানের প্রণালী যখন ক্রমস্ফুট অবস্থায় গমন করে, তখন তাহা হইতে অনুলোমক্রম আবিষ্কৃত হয়, আর যখন ক্রমশঃ সূক্ষ্মাবস্থায় বা বিপরীত-নিয়মে, বিকাশেরপ্রতিকূলপথে গমন করে, তখন উহাদ্বারা বিলোমপ্রবাহ অবগত হওয়া যায়। কার্য্য দ্বারা ক্রমশঃ সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম কারণস্তরে উপনীত হইতে এই প্রণালী সহায়তা করে। কারণদর্শনে কার্য্যের সম্ভাবনাকল্পনায় অন্যবিধ উপায় উপকারী।

উভয়ের প্রকারগতপার্থক্যের ন্যায় ফলগত-পার্থক্যও যথেষ্ট।

ব্যক্তকার্য্যজগৎ ত্রিগুণাত্মক, সুতরাং ইহা হইতে অব্যক্ত-জগতের পরমকারণ প্রকৃতিতে ও ত্রিগুণভাব কল্পনা করিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে এই ত্রিগুণময় জগতের সূক্ষ্মতমস্তর-কল্পনা যেখানেই না কেন বিশ্রাম লাভ করুক্, তাহাকে ত্রিগুণময় না বলিলে [illegible]ক্ষেনা। কপিলদেব বলিতেছেন, বাহ্য এবং আন্তর উভয়জগতের মূলকারণ এক ত্রিগুণময় বিকারশীল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব।

ত্রিগুণ কি, তাহা এখন বিবেচনা করা যাউক। ত্রিগুণ শব্দের অর্থ তিনটী গুণ। উহাদের স্বরূপ স্থির করিবার জন্য শব্দার্থের আলোচনা আগে করা যাউক। শব্দের অর্থ সাধারণতঃ যেরূপভাবে গৃহীত হয়, দার্শনিকগণ তদপেক্ষা ভিন্ন অর্থে সেই সকল শব্দ ব্যবহার করেন, এইজন্য ইহাদের "পারিভাষিকঅর্থ" নামক একটী নূতন আভিধানিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে।

'গুণ' বলিলে ন্যায়বৈশেষিকদর্শন-রচয়িতা গৌতমকণাদমহর্ষিদ্বয়, দ্রব্যাশ্রিত-ভাব বিশেষ বুঝিতেন। ইঁহাদের মতে গুণ শব্দ যে ভাবের পরিজ্ঞাপক, ইংরেজী Quality শব্দ সেইরূপ ভাব বুঝায়। কণাদ বা গৌতম লঘুত্ব, গুরুত্ব, রূপ, রস ইত্যাদি দ্রব্যাশ্রিত ভাব সকলকে 'গুণ' শব্দে বুঝিলেও, কপিল তাহা বুঝেন নাই। কপিলের গুণ স্বয়ং দ্রব্য, দ্রব্যাশ্রিত ভাববিশেষ নহে। কণাদ ও গৌতমের 'গুণ' এই কপিলের 'গুণে' বিদ্যমান, কিন্তু কণাদ ও গৌতমের 'গুণে' আর 'গুণ' থাকেনা।

মীমাংসকগণ 'গুণ' বলিতে দ্রব্যগতভাব বা ধর্ম্মবিশেষকে বুঝেন নাই, তাঁহাদের মতে 'গুণ' অর্থ অঙ্গ। কোনও প্রধান কার্য্যের দশটী অঙ্গ আছে, ঐ অঙ্গগুলিও কার্য্য, প্রধানকার্য্য ও কার্য্য, ইহাদের পার্থক্য এই যে, উহাদের প্রাধান্য নাই, আর প্রধান বা মূল কার্য্যের প্রাধান্য আছে। 'গুণ' শব্দের অর্থ সুতরাং অপ্রধান। অপ্রধান-কার্য্য প্রধানকার্য্যের অনুরোধেই করিতে হয়, অতএব অপ্রধানকার্য্যের কোনও স্বার্থ নাই, কেবল পরার্থতা (প্রধান কার্য্যার্থতা ই) উহাদের জীবন। প্রধানের জন্য অঙ্গ, প্রধান নহিলে অঙ্গ অনাবশ্যক। মীমাংসা শাস্ত্রে 'গুণ' নামের মূলতত্ত্ব পরার্থতা। কপিলদেব প্রকৃতির পরিচয়ে ত্রিগুণ-ভাবের কথা বলিতেছেন। ত্রিগুণ আর প্রকৃতি কিছুই পৃথক্ নহে। তিনটী গুণ অর্থাৎ পরার্থপদার্থসমবায়ই কপিলদেবের প্রকৃতি। জগতের সমস্ত পদার্থ বিশ্লেষণ করিয়া, তিনি তিনটী সাধারণ ধর্ম্ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এবং সেই তিনধর্ম্মযুক্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মমহদ্গুণত্রভাবকেই জগৎকারণ বলিয়াছিলেন; এই পর্য্যন্ত অনুমান শাস্ত্রের সহায়তায় অবগত হওয়া যায়। প্রকৃতির পরার্থতাই প্রধান পরিচয়। প্রকৃতি বা গুণত্রয় ভোগ্যবস্তু, আর পুরুষ বা চৈতন্য-তত্ত্ব ভোক্তা। সাংখ্যশাস্ত্রে সর্ব্বত্রই প্রকৃতির পরার্থতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। সাংখ্য-প্রবচনে পুরুষতত্ত্বের অনুমান করিতে গিয়া কপিলদেব "সংহত পরার্থত্বাৎ" এই সূত্রে প্রকৃতি পর্য্যন্ত জড় তত্ত্বের পরার্থতা প্রতিপাদন, এবং তাহাই পুরুষানুমানে

[illegible]গ, ইহা বলিয়াছেন। "ভোক্তৃভাবাচ্চ" এই সূত্রে পুরুষের ভোক্তৃত্ব ও বলিয়াছেন। প্রকৃতি অর্থ গুণত্রয়। প্রকৃতি পদার্থ অর্থাৎ গুণত্রয় পদার্থ; এখন বুঝা গেল পদার্থতাই মীমাংসকগণের ন্যায় কপিলাচার্য্যের মতেও 'গুণ'শব্দ প্রয়োগের হেতু।

সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে আচার্য্যপ্রবর বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন যে, সাংখ্যাচার্য্যগণ যে 'গুণ' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা নৈয়ায়িক বা বৈশেষিক মতের 'গুণ' পদার্থের বাচক নহে। 'গুণ' শব্দের অর্থ তাঁর। ত্রিগুণরজ্জু বলিলে বুঝা যায়, যাহাতে তিনটী গুণ বা তাঁর আছে তাদৃশ রজ্জু। এখানে 'গুণ' শব্দ অপ্রধান বাচক হইলেও সাধারণতঃ বন্ধক অর্থেই ব্যবহৃত। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন যে, ত্রিগুণই পুরুষ বা জীবের বন্ধের কারণ। ত্রিগুণের প্রকৃত তত্ত্ব না বুঝিয়াই আপনাকে (ত্রিগুণাতীত পুরুষস্বরূপকে) গুণাত্মক মনে করেন, এবং মোহবশতঃ বদ্ধ হন; প্রকৃতপক্ষে পুরুষের বন্ধ মোক্ষ কথার কথা। পুরুষ যে ভ্রমবশতঃ বাঁধা পড়েন, সেই বন্ধনের উপকরণ ত্রিগুণময়রজ্জু প্রকৃতি। এরূপভাবে ও 'গুণ' শব্দের রূপকগত অর্থ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে; বস্তুতঃ দার্শনিক ক্ষেত্রে রূপকের প্রাবল্য কল্পনার তারল্য প্রবেশ করিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তিগণের পন্থা কণ্টকিত করিয়া রাখিয়াছে।

এক্ষণে ত্রিগুণ কথাটির অর্থ এবং তদানুষঙ্গিক দার্শনিকভঙ্গিমা আলোচিত হইল। সম্প্রতি দেখা যাউক্, ত্রিগুণের কার্য্যপরিচয়াদি কি প্রকার। শাস্ত্রে দেখিতে পাইতেছি "সত্ত্বরজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ"। ত্রিগুণ—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। এই ত্রিগুণ যখন সমভাবে সমবেতশক্তিতে অবস্থান করে, তখন এই ত্রিগুণেরই নাম প্রকৃতি, যখন পৃথক্ অবস্থায় ন্যূনাধিক ভাবে থাকে, তখন তাহারাই প্রত্যেকে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ; তাহারাই সৃষ্টিমুখী প্রকৃতি। সাংখ্যপ্রবচনে আছে, "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ।" সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জগৎকারণীভূত জড়পদার্থ; এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া হয়।

সত্ত্ব গুণের ধর্ম্ম প্রকাশ, লঘুতা ইত্যাদি; রজোগুণের ধর্ম্ম প্রণোদনা ও চলত্ব প্রভৃতি; তমোগুণের ধর্ম্ম গুরুত্ব ও আবরকতা বা অপ্রকাশক ভাব। ঈশ্বর-কৃষ্ণ সাংখ্যকারিকায় এই কথা বলিয়াছেন, যথা—"সত্ত্বং লঘু প্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ, গুরুবরণকমেব তমঃ।" সাংখ্যশাস্ত্রের ভূয়ঃ প্রচারকর্ত্তা আচার্য্য পঞ্চশিখ বলিয়াছেন, সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম—প্রীতি, তিতিক্ষা, সন্তোষ, লাঘব, অভিষঙ্গ ইত্যাদি। সংক্ষেপে বলিলে সত্ত্বগুণ সুখাত্মক। রজোগুণ—রাগ, চপলতা, ক্রোধ, দুঃখ, উদ্দীপনা প্রভৃতি বহুগুণবিশিষ্ট, কিন্তু সংক্ষেপে রাগাত্মক। তমোগুণ—নিদ্রা, আলস্য, প্রমাদ, মোহ, ভীতি প্রভৃতি অশেষ গুণশালী হইলেও সংক্ষেপতঃ মোহাত্মক।

গীতা, মনুসংহিতা, মহাভারত ও ভাগবতাদি অশেষ গ্রন্থে গুণত্রয়ের নানাবিধ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, অনুসন্ধিৎসু পাঠক তথায় অনুসন্ধান করিবেন, এখানে সাধারণতঃ

ইহাই বক্তব্য, সুখ দুঃখ মোহই ত্রিগুণের অসাধারণ ধর্ম্ম।

জগতের সমস্তকার্য্যকারণশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, সুখ দুঃখ মোহ এই তিনে জগৎ আবৃত। জগতে যাহা কিছু, প্রত্যেক পদার্থই হয়ত সুখ, নয় দুঃখ, নয় মোহ উপস্থিত করিবে; ইহা ছাড়া এ জাগতিকপদার্থের অন্যবিধ সামর্থ্য নাই। কোনও একটী রম্যবস্তু দর্শনে একজন সদাশয়ব্যক্তি দর্শনসুখ লাভ করেন, অন্যআকাঙ্ক্ষা তিনি ত্যাগ করিতে পারেন। অপর কামী ব্যক্তি ঐ বস্তু দর্শনে সাতিশয় মর্ম্মপীড়া পায়, যেহেতু সে উহা লাভ করিতে চায় এবং অকৃতকার্য্য হয়। আর এক ব্যক্তি মূঢ়, উহাতে মোহ প্রাপ্ত হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার-পরাঙ্মুখদশায় উপনীত হইবে; ইহাই সংসারে ত্রিগুণের রঙ্গ। জড়জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তি বা মানস ব্যাপারের দ্বারা উপলব্ধ; এই জড়জগৎ আমাদিগকে সুখ, দুঃখ ও মোহ ব্যতীত অন্য কিছু অনুভব প্রদান করে না; আর আমাদিগের মানসশক্তিও এই ত্রিবিধভাবেরই দ্বারা অনুপ্রাণিত। অনুকূলতাজ্ঞান, প্রতিকূলতাবোধ এবং সম্মুগ্ধভাব, এই তিন ভাবই সত্ত্ব, রজঃ, ও তমোগুণের কার্য্য ইহা সুখ-দুঃখমোহাত্মক গুণত্রয়ের কথা বলায়, স্পষ্টতঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে। এখন আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম, জড়জগতের জ্ঞান এবং ঐ জ্ঞানের উপকরণ মানসদ্রব্য ত্রিগুণাত্মক। আমরা ক্রমশঃ জড়ের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম অবস্থার আলোচনা করিয়া, যতই দূরে অগ্রসর হই না কেন, জড়জগতের জড়ত্ব পরিহার করিতে পারিবনা, ত্রিগুণাত্মকভাবও ছাড়িতে পারিব না, সুতরাং আমাদের কল্পনা বা অনুমান সে সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্মান্তরে—সে অনুমিতির রাজ্যে ও জড়-ধর্ম্ম ত্রিগুণাত্মকভাব—সুখদুঃখমোহময়তা দেখিতে পাইবে। কার্য্য স্থূল ব্যক্ত, কারণ সূক্ষ্ম অব্যক্ত, কিন্তু উভয়ই জড়, উভয়েই ত্রিগুণভাবের দ্বারা পরিব্যাপ্ত।

জড়জগতের মূল কারণ জড় অব্যক্ত ত্রিগুণাত্মক, এই পর্য্যন্ত এ সূত্রে অবগত হওয়া গেল। অতঃপর সাংখ্য-দর্শনের সৎ-কার্য্যবাদ বা কার্য্যকারণের অভিন্নভাব-পরিজ্ঞাপক ষষ্ঠ সূত্রের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। ইহাতে জগৎসৃষ্টিই সাধারণতঃ প্রতিপাদ্য, কিন্তু ভঙ্গ্যন্তরে সৎকার্য্যবাদ সমর্থিত।

সঞ্চরঃ প্রতিসঞ্চরঃ। ৬

কার্য্য জগৎ, কারণ অব্যক্ত ত্রিগুণময় মহতী জড়সত্তা। এই ব্যক্ত এবং অব্যক্তের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য, সঙ্কোচ বিকাশ এই দুইটী কার্য্যের আবশ্যক হয়।

মহামুনি কপিল বলিতেছেন, সৃষ্টি রহস্য আর কিছুই নয়—কার্য্যকারণের ভিন্নতা-অনুভব আর কিছুই নয়, কেবল 'সঞ্চর' এবং 'প্রতিসঞ্চর'। কূর্ম্ম তাহার হস্তপদাদি এবং গুণ্ডটী যখন শরীরাভ্যন্তর হইতে বাহির করিয়া দেয়, তখন বোধ হয়, ঐ অঙ্গগুলি পূর্ব্বেও কূর্ম্মের শরীরে ছিল, কিন্তু এখন তাহার সঞ্চর অর্থাৎ বিকাশ উপস্থিত হইল। যখন কূর্ম্ম হস্ত পদ গুণ্ড শরীরাভ্যন্তরে লুকাইয়া রাখে, উহা

আমাদের অনুভবের বিষয় হয় না, তখন উহার প্রতিসঞ্চর বা লুক্কায়িতভাব আমরা অনুভব করি।

সৃষ্টি অর্থ বিকাশ, বিনাশ অর্থ সঙ্কোচ। সৃষ্টিতে ব্যক্তভাব, বিনাশে অদর্শন। যখন ব্যক্ত কার্য্যভাবে আমরা উপলব্ধি না করি, অর্থাৎ কারণভাব বা অব্যক্তভাবশতঃ অনুভব করিতে পারিনা, তখন আমরা ভ্রমবশতঃ মনে করি উহা 'নাই'। আর যখন কার্য্যরূপে ব্যক্তভাবে অনুভব করি, তখন মনে করি উহা 'জন্মিল', কিন্তু বস্তুতঃ পদার্থের উৎপত্তি বিনাশ কিছুই নহে। যখন পদার্থ অদর্শন অবস্থায় উপনীত হয়, তখন আমরা বিনষ্ট বলিয়া মনে করিলেও, উহার তিরোভাব ব্যতীত আর কিছুই হয় না। পদার্থমাত্রের স্বভাব, কখনও ব্যক্তদশায় উপনীত হইবে, আবার কখনও অব্যক্ত অবস্থায় পৌঁছিবে। কার্য্য এবং কারণ একই পদার্থ, তবে প্রকটিতঅবস্থায় তাহাকে কার্য্যবলে, এবং তিরোভূত অবস্থায় তাহাকে কারণ বলে। 'উৎপত্তি হইল' বলিলে একটা নূতন কোথাও হইতে আসিল, এবং পূর্ব্বে ছিলনা, সংপ্রতি জগতে আসিল, এরূপ মনে করা অসঙ্গত।

সাংখ্যাচার্য্য বলেন—ঘট নির্ম্মিত হইল, ইহার অর্থ ঘটের আবির্ভাব হইল। এই আবির্ভাবের পূর্ব্বেও ঘট ছিল, কিন্তু সংপ্রতি যে আকারে সেসকল কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে, সেই আকারে সেইভাবে ব্যবহৃত হইত না। প্রত্যেকপদার্থেরই তিনটী ভাব আছে, একটী কারণভাব, আর একটী কার্য্যভাব, আর একটী সংহারভাব। ঘট, যখন মৃত্তিকা ছিল, তখনও ঘট ছিল, কিন্তু তাহাদ্বারা জলআনয়ন প্রভৃতি ঘটের বর্ত্তমানকার্য্য হইত না, যেহেতু তখনও তাহার কার্য্যাবস্থা নহে, কারণাবস্থা। যখন ঘট ঘটেরকার্য্য জলানয়নাদি করিতে পারে, অর্থাৎ যে অবস্থা বা আকার দেখিলে, আমরা তাহাকে 'ঘট' বলিয়া থাকি, উহা ঘটের কার্য্যাবস্থা; এই অবস্থাতে ব্যবহারনিষ্পাদন করা যায় বলিয়া, ব্যবহারিকজগতে এই অবস্থাকেই 'ঘট' সংজ্ঞা দেয়। যখন ঘট ভাঙ্গিয়া গিয়া কেবল চাঁড়া খোলা রূপে পড়িয়া রহিয়াছে, তখন ঘটের সংহারভাব; তখনও ঘট আছে, কিন্তু কার্য্যকারিতা নাই। এই ঘটের সংহারভাবকে সাংখ্যাচার্য্যগণ ঘটের ধ্বংস, সংহার বা অতীতাবস্থা বলিয়া থাকেন। সাংখ্যমতে মাটী এবং শেষ চাঁড়া খোলা উভয়ই ঘট, মধ্যাবস্থাও ঘটই। কার্য্যনিষ্পাদন দ্বারাই সংসারে পরিচয়, কাজেই বিস্তৃতঘটসত্তা কেবল মাঝখানে কতটুকুকাল 'ঘট' নাম লাভ করিতেছে।

কার্য্য কারণ এক হইলে প্রকৃতি ও জগৎ একই হইল। জগতের অব্যক্তভাব প্রকৃতি, প্রকৃতির ব্যক্তভাব জগৎ। কার্য্য আর কারণ এক না হইলে, কার্য্য কারণাত্মক হইবার হেতু থাকে না। কারণ বলিলে অবশ্য এখানে উপাদান কারণই বুঝা হইতেছে, ইহা মনে রাখা দরকার। মৃত্তিকা হইতে ঘট উৎপন্ন হয় সূত্র হইতে হয় না, অতএব ঘট ও মৃত্তিকা একই জিনিষ, কেবল মৃত্তিকার অবস্থাসংস্কারবিশেষ ঘট, এবং অনংস্কৃতস্বভাবসিদ্ধভাব মৃত্তিকা।

কূর্ম্মকর প্রতিপক্ষের দৃষ্টান্তে দেখা গেল—কার্য্য, কারণ হইতে একটু বিকসিতভাব। কোনও পদার্থ অসৎ নহে। সবই ছিল এবং থাকিবে। জগতে অসৎ কিছুই নাই, সবই সদ্ভাব; তবে উপলব্ধিকালে "আছে" বলা আমাদের ভ্রমাত্মক সংস্কার। আমরা অনুভব করিতে না পারিলেও, যেমন কূর্ম্মের শরীরাভ্যন্তরস্থ অঙ্গটী বিনষ্ট হইয়াছে মনে করিতে পারিনা, তদ্রূপ যখন ঘটকে কার্য্যভাবে ব্যক্তদশায় ব্যবহারিকজগতে কার্য্যসম্পাদকরূপে দেখিতে না পাই, তখন 'ঘট নাই', এরূপ মনে করাও আমাদের অন্যায়। সাংখ্যাচার্য্যগণ এই কার্য্যকারণের অভেদবাদ এবং সৃষ্টি-বিনাশ আবির্ভাব তিরোভাব ভিন্ন কিছুই নহে, এই রহস্য কূর্ম্মশরীরাবয়বের সঙ্কর প্রতিপক্ষ দ্বারা দেখাইয়া, তাঁহাদের অভিমত জগৎকারণ অব্যক্ত তত্ত্বের সহিত ব্যক্তজগতের সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন।

সপ্তমসূত্রে ভগবান্ কপিলাচার্য্য সমস্ত-জিজ্ঞাসার মূলকারণ ত্রিতাপবাধার বিবরণ পরিস্ফুটরূপে বলিয়াছেন। যে ভয়ে ভীত—যে কষ্টে ক্লিষ্ট হইয়া, মহর্ষি আসুরি কপিলের নিকট তত্ত্ব কথা শুনিতে গিয়াছিলেন, সেই সংসারজ্বালামালারজনক——অশেষ অশান্তির উৎপাদক—ত্রিবিধ দুঃখ স্বরূপের পরিচয় না দিলে, সমস্ত বক্তব্যই উদ্দেশ্যশূন্য হইয়া যায়, সুতরাং আচার্য্য বলিতেছেন,—

অধ্যাত্মমধিভূতমধি দৈবঞ্চ ।৭

দুঃখ ত্রিবিধ, অধ্যাত্ম, অধিভূত এবং অধিদৈব। সংসারে কোনও কার্য্য করিতে হইলে পূর্ব্বে তাহার অভাব অনুভব করিতে হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সুনিয়ম। অভাবে না পড়িলে, কেহই উপযোগিতা বুঝিতে পারে না। অভাব জগতের শিক্ষক, অভাবের নিকটই প্রবৃত্তির উন্মেষ লাভ। আহারের প্রবৃত্তি কেন? ক্ষুধা উপস্থিত হইয়াছে। ক্ষুধা কি? আহার্য্যের আবশ্যকতা জ্ঞাপক এক রকম অভাবের আহ্বান। "নাই চাই" এই প্রাকৃতিক [illegible] আমাদের ক্ষুধা। সর্ব্বত্রই অভাবের আহ্বানে জগতের নিদ্রাভঙ্গ হয়, এবং জগৎ কর্ত্তব্য পথে চলিতে থাকে। আসুরি দেখিলেন—জগতে শান্তির অভাব, সংসার মরুস্থানের মত ভয়াবহ। সংসারের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত-পর্য্যন্ত অভাবের ঘনরোলকল্লোল কর্ণ বিদীর্ণ করিতেছে। সংসারে শান্তির অভাব! তৃপ্তির অভাব!! শান্তি পাইনা কেন? দুঃখ আসিয়া পীড়ন করে। শান্তির উদ্দেশে ছুটিতে থাকি, সহসা পৃষ্ঠদেশ হইতে দুঃখ আসিয়া ভীষণ আঘাত করে। দুঃখের তাড়নায় সংসারের সর্ব্বত্র যন্ত্রণা অনুভব করিতে হয়। এই দুঃখ কতপ্রকার, এবং কি কি কারণ হইতে উৎপন্ন, তাহা জানা আবশ্যক। শত্রুর প্রকৃত পরিচয় না পাইলে তাহাকে পরাস্ত করা যায় না; রোগের প্রকৃতি না বুঝিলে চিকিৎসা করা অসম্ভব। দুঃখের প্রতীকার অবশ্যই অভিপ্রেত। সংসারের সকল শ্রেষ্ঠধর্ম্মাচার্য্য এবং মনস্বীগণই একবাক্যে সংসারের দুঃখবহুলতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। জগতের [illegible] বুদ্ধদের সংসারে অসংখ্য দুঃখ দেখিয়া, তাহার প্রতীকারার্থে [illegible] হইয়াছিলেন। [illegible] কপিল,

ত্রিবিধ দুঃখ পরিহারই জীবজীবনের উদ্দেশ্য-রূপে বর্ণনা করেন। পাশ্চাত্যপণ্ডিত সোপেনহার ও সংসারের দুঃখবহুলতা বেশ ভাল রূপে বুঝিয়াগিয়াছেন। সকল জীবেরই বাসনা, দুঃখে পতিত না হই। স্তন্যপায়ী শিশু হইতে গঙ্গাযাত্রী বৃদ্ধ পর্যন্ত দুঃখের ভাবনায় আকুল। এই দুঃখকে ভালরূপ চিনিতে না পারিলে ইহাকে বিনাশ করা যাইতে পারে না, কাজেই পরিচয়—দুঃখ ত্রিবিধ।

সম্প্রতি দুঃখের নিমিত্তব্যাখ্যাদ্বারা দুঃখের ত্রিবিধ বিভাগের সার্থকতাসম্পাদন করা হইতেছে। প্রথম দুঃখ অধ্যাত্ম। অধ্যাত্ম যাহা আত্মাকে অধিকার করে। আত্মা অর্থ শরীর এবং মন, শারীর এবং মানস দুঃখ সুতরাং অধ্যাত্ম। যদিও সমস্ত-দুঃখই মনে অনুভূত হয়, অর্থাৎ মন ব্যতীত কোনও প্রকার দুঃখানুভব হয় না; তথাপি শরীরে রোগাদিজনিত দুঃখ শারীর এবং মনের কামাদিজন্য দুঃখ মানস; এরূপ শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন। দ্বিতীয় দুঃখ অধিভূত। ভূত অর্থাৎ প্রাণিসমূহ হইতে আগত দুঃখ অধিভূত। ব্যাঘ্রচৌরাদি-প্রাণিজন্যদুঃখ যেরূপেই অনুভূত হউক না কেন, উহাদের উৎপত্তিহেতু ভূত বা প্রাণী (ব্যাঘ্র চৌরাদি) নিশ্চিত, সুতরাং ঐ দুঃখ অধিভূত। কেহ কেহ 'ভূত' অর্থাৎ অগ্নি বায়ু জলাদি হইতে উৎপন্ন দুঃখকে অধিভূত বলেন। অনন্তর তৃতীয় দুঃখ অধিদৈব সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যাইতেছে যে, দেব অর্থাৎ দেবযোনি ভূতপিশাচাদি হইতে উৎপন্ন দুঃখ অধিদৈব। দেব অর্থ দেব-যোনি, দেবযোনির মধ্যে ভূত, প্রেত, পিশাচাদি মনুষ্য শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া মানবকে অশেষ ক্লেশ প্রদান করে, এরূপ বিশ্বাসসম্পন্ন আচার্যগণ এই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। এক সম্প্রদায় 'ভূত' শব্দে অগ্নি বায়ু বুঝেন নাই, প্রাণিজাত বুঝিয়াছেন। এই দলই "অধিদৈব" শব্দের ব্যাখ্যায় 'দেব' শব্দে অগ্নি বায়ু প্রভৃতিকে বুঝেন। উভয় মতের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম, এক মতে 'ভূত' প্রাণী, ও 'দেব' অগ্ন্যাদি। অপর মতে 'ভূত' অগ্ন্যাদি, এবং 'দেব' ভূতাদি দেবযোনি। জগতের সমস্ত প্রকার দুঃখই এই তিনভাগে বিভক্ত হইতে পারিবে। স্বশরীরের অথবা নিজ চিত্তের অবস্থান্তর প্রাপ্তিজনিত স্বজাত দুঃখ অধ্যাত্ম, অন্যহেতু হইলে, হয় তাহা অধিভূত; নয় অধিদৈব; সুতরাং জগতের যাবতীয় দুঃখানুভব এই গণ্ডীর মধ্যে পড়িয়া গেল। দুঃখহেতু, দুঃখস্বরূপভেদ বুঝা গেল, এখন দুঃখের প্রতীকার বেশ সহজসিদ্ধ হইল। বারান্তরে কাপিল তত্ত্বসমাসের অপর অংশ ব্যাখ্যাত হইবে।

(ক্রমশঃ)

তীর্থপদাশ্রিতস্য।
কপিল সেবকস্য কস্যচিৎ
বেদবিদ্যালয় মহোদয়স্য।

শঙ্কর-গীতা।

——:•:——

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

অতঃপর, শঙ্কর-গীতার মূলতত্ত্ব আরম্ভ। সর্ব্বাগ্রেই বৈরাগ্যোপদেশ লিখিত। নৈমিষ-কাননের মুনিগণ সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ঋষি পুঙ্গব। মহর্ষি অগস্ত্য শ্রীরামচন্দ্রের নিকট কি জন্য কোথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন? সূত তদুত্তরে কহিলেন—তাপসগণ! দণ্ডক অরণ্যে ভার্য্যাবিয়োগকাতর শ্রীরামচন্দ্রকে উপদেশ দিতে অগস্ত্যঋষি আপন ইচ্ছায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। অগস্ত্য রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়াই কহিলেন—হে রাজন্। আপনি বৃথা আশা করিতেছেন। লঙ্কা-দুর্গ অজেয়—মহাবল পরাক্রান্ত দশানন তাহার অধিপতি, বৃত্র-নিধনকারী ইন্দ্রবিজয়ী মেঘনাদ তাহার পুত্র, দেবগণত্রাস কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা, দিব্যাস্ত্রধারী অতিকৌশলী বিভীষণ অপর অনুজ। লঙ্কাপতি রাবণ শঙ্কর-দত্ত বরলাভে মহাদর্পিত হইয়া এই স্বর্ণলঙ্কা উপভোগ করিতেছে। বালকে যেমন চন্দ্র ধারণ করিতে ইচ্ছা করে, তুমিও সেইরূপ লঙ্কা-বিজয় আশা করিতেছ। আমি দেখিতেছি, মুমূর্ষু ব্যক্তির ঔষধ গ্রহণ অনিচ্ছায় ন্যায়, তুমি কামক্রোধাদি দ্বারা পীড়িত হইয়া হিতকর বাক্য গ্রহণ করিতেছ না। ইত্যাদি প্রকার কতকগুলি ভয়সূচক কথায় অগস্ত্য রামচন্দ্রকে লঙ্কাবিজয়কার্য্যে অনুৎসাহিত করিয়া তাহার পর মূলতত্ত্ব আরম্ভ করিলেন যথা—

"ন গৃহ্লাতি বচঃ পথ্যং কামক্রোধাদিপীড়িতঃ
হিতং ন রোচতে তস্য মুমূর্ষোরিব ভেষজম্ ॥১
মধ্যেসমুদ্রং যানীতা সীতা দৈত্যেন মায়িনা
আয়াস্যতি নরশ্রেষ্ঠ! সা কথং তব সন্নিধিং ॥২
বধ্যন্তে দেবতাঃ সর্ব্বা দ্বারি মর্কটযূথবৎ
কিঞ্চ চামরধারিণ্যো যস্য সন্তি সুরাঙ্গনাঃ ॥ ৩
ভুংক্তে ত্রিলোকী মখিলাং যঃ শম্ভুবরদর্পিতঃ
নিষ্কণ্টকং তস্য জয়ঃ কথং তব ভবিষ্যতি।
ইন্দ্রজিন্নাম পুত্রো যস্তস্যাস্তি স বলোদ্ধতঃ
তস্যাগ্রেসমরে দেবা বহুবারং পলায়িতাঃ
কুম্ভকর্ণোঽনুজো ভ্রাতা যস্যাস্তি সুরসূদনঃ
অন্যো দিব্যাস্ত্র সংযুক্তশ্চিরজীবী বিভীষণঃ
দুর্গং যস্যাস্তি লঙ্কাখ্যং দুর্জ্জয়ং দেবদানবৈঃ
চতুরঙ্গ বলং যস্য বর্ত্ততে কোটি সংখ্যয়া।
একাকিনা ত্বয়া জেয়ঃ স কথং নৃপনন্দন।
আকাঙ্ক্ষতে করে ধর্ত্তুং বালশ্চন্দ্রমসং যথা
তথাত্বং কাম মোহেন জয়ং তস্যাভিকাঙ্ক্ষসি।

এইরূপ কথা বার্ত্তার পর যখন রামচন্দ্র সীতা শোকে অভিভূত হইয়া ক্রোধে লঙ্কা জয় করিতে প্রস্তুত হইতে ইচ্ছা করিতে লাগিলেন—তখন অগত্যা অগস্ত্য ঋষি বৈরাগ্যোপদেশ দ্বারা শত্রুমিত্রসমজ্ঞানতা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। প্রথমেই মুনিবর কহিলেন—

কিং নির্বেদসি রাজেন্দ্রকান্তাকস্য বিচার্য্যতাং
জড়ঃ কিংনুবিজানাতি দেহোঽয়ং পাঞ্চভৌতিকঃ
নির্লেপঃ পরিপূর্ণশ্চ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ
আত্মা ন জায়তে নৈব ম্রিয়তে নচ দুঃখভাগ্॥

অর্থাৎ হে রাজেন্দ্র! এই দেহ পঞ্চভূতের—কেহ কাহারো প্রিয় অপ্রিয় নহে।

বিবেচনা করিলে কে কার কান্তা? তবে আপনি এত ম্লান হইতেছেন কেন? যিনি সর্ব্বদা পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ স্বরূপ আত্মা, তাঁহার সহিত কাহারো সংযোগ বিয়োগ নাই; অথবা তাহার জন্ম মৃত্যু নাই। তিনি কিছুতেই দুঃখের ভাগী নন।

সূর্য্যোহসৌ সর্ব্বলোকস্য চক্ষুষ্টেন ব্যবস্থিতঃ
তথাপি চাক্ষুষৈ র্দোষৈর্নকদাচিদ্বিলিপ্যতে।
দেহোঽপিমলপিণ্ডোঽয়ং মুক্ত জীব জড়াত্মকঃ
দহ্যতে বহ্নিনাকাষ্ঠৈঃ শিবাদ্যৈর্ভক্ষ্যতেঽপিবা
তথাপি নৈবজানাতি বিরহে তস্য কা ব্যথা।

অর্থাৎ সূর্য্য যেমন সকলের চক্ষুর উপর অবস্থিত থাকিয়াও, চাক্ষুষ-দোষসংশ্লিষ্ট নহেন, তদ্রূপ আত্মা সর্ব্বঅন্তরগত হইয়াও, দৃশ্যমানদোষদ্বারা বিলিপ্ত হন না। জীবন বিনষ্ট হইলে, এই জড়াত্মক, মলভাণ্ডপূর্ণ দেহ কাষ্ঠাদি উদ্ভিদ্‌দ্বারা ভস্মীভূত হয় অথবা শৃগাল আদি জীবকর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়—দেহ-বিনাশবেদনা কেহ অনুভব করেনা।

সুবর্ণ গৌরী দূর্ব্বায়া-দলবচ্ছ্যামলাপিবা
পীনোত্তুঙ্গস্তনাভোগভুগ্নসূক্ষ্মবিলগ্নিকা॥
বৃহন্নিতম্বজঘনা রক্তপাদসরোরুহা।
রাকাচন্দ্রমুখী বিম্বপ্রতিবিম্বরদচ্ছদা॥
নীলেন্দীবর নিকাশ নয়নদ্বয় শোভিতা
মত্তকোকিল সংলাপা মত্তদ্বিরদগামিনী॥
কটাক্ষৈ রনুগৃহ্লাতি মাং পঞ্চেষু শরোত্তমৈঃ
ইতি যাং মন্যতে মূঢ়ঃ স তু পঞ্চেষুশাসিতঃ॥
তস্যাবিবেকং বক্ষ্যামি শৃণুষ্বাবহিতোনৃপ
ন চ স্ত্রী ন পুমানেষ নৈব চায়ং নপুংসকঃ॥
অমূর্ত্তঃ পুরুষঃ পূর্ণো দ্রষ্টা দেহী স জীবিনঃ।
যা তন্বঙ্গী মৃদুর্বালা মলপিণ্ডাত্মিকা জড়া
সা ন পশ্যতি যৎ কিঞ্চিন্ন শৃণোতি ন জিঘ্রতি
চর্ম্মমাত্রা তনুস্তস্যাবুদ্ধা ত্যক্ত্ব রাঘব॥ ১৬

হে রঘুকুলশেখর রাম! যে মূঢ় ব্যক্তি কামের বশবর্ত্তী হইয়া দূর্ব্বাদল প্রভ শ্যামলাঙ্গী, রক্ত কোকনদ তুল্য চরণতল ধারিণী, চন্দ্র-মৌলিশুভ্রদশনপংক্তি শোভিনী, নীলোৎপল-সদৃশ নয়না, সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিহিতা, পীনোন্নত-পয়োধরা, কোকিলকলনাদিনী, দ্বিরদগামিনী রমণীর পূর্ণকামকটাক্ষপরিপূরিতদৃষ্টি ইচ্ছা করে, তাহার যেরূপ নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ পায়, তাহা তোমাকে ক্রমে শুনাইয়া সত্য পথে আনিতেছি—শ্রবণ কর। এই বিশ্বে স্ত্রী পুরুষ ক্লীব কেহ নহে, পরিপূর্ণ সর্ব্ব-ব্যাপী আত্মাই সমগ্র বিষয় দৃষ্টি করিতে-ছেন। যাহাকে মূঢ়গণ কোমলহৃদয়া কৃশাঙ্গী বালা বলিয়া বিবেচনা করে, তাহার কোন রূপ শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শন, এবং ঘ্রাণ শক্তি নাই। সেই মলপিণ্ডময়ী জড়াত্মিকা রমণী কেবল রক্তমাংসময়চর্ম্মেরদেহ ধারণ করে মাত্র। হে রাম! এই সকল জানিয়া শুনিয়া ভ্রম জ্ঞান বিদূরিত কর—ভার্য্যা-সীতাবিয়োগদুঃখ দূর কর।

যা প্রাণাদধিকা সৈব হন্ত তে স্যাদ্ ঘৃণাস্পদং
জায়ন্তে যদি ভূতেভ্যো দেহিনঃ পাঞ্চ
ভৌতিকাঃ॥
আত্মা যদেকলস্তেষু পরিপূর্ণঃ সনাতনঃ।
কা কান্তা তত্র কঃ কান্তঃ সর্ব্ব এব
সহোদরাঃ॥
নির্ম্মিতায়াং গৃহাবল্যাং তদবচ্ছিন্নতাং গতং
নভস্তস্যাং তু দগ্ধায়াং ন কাঞ্চিৎ ক্ষতি-
মৃচ্ছতি॥

ত্বদাত্মাপি দেহেষু তেষেব ন স্বয়ং নৈব হন্যতে।

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতং
তাবুভৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে
অস্মান্ পতি দুঃখেন কিং খেদস্যাস্তি কারণং
স্ব স্বরূপং বিদিত্বেদং দুঃখং ত্যক্ত্বা সুখী ভব॥

হে রাম! যখন এই দেহ পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন, তখন যে নারীকে অতি আদরের বলিয়া বোধ করা হয়—সে অতি ঘৃণাস্পদ।

একমাত্র পরিপূর্ণ সনাতন আত্মাই যখন সকল বস্তুতে নিত্য বিরাজমান, তখন কেহ কাহারও স্ত্রী নহে অথবা কেহ কাহারও স্বামী নহে। ধরিতে হইলে, সকলি একস্থান হইতে উদ্ভূত বলিয়া সহোদর স্বরূপ। হে রাজেন্দ্র! সর্ব্বগত আত্মা অবিনাশী তাহার বিনাশ নাই। শূন্যের উপর যেমন গৃহের ভিত্তি ক্ষণভঙ্গুর হয়, সেইরূপ জগতের সমস্ত দৃশ্যমান পদার্থ মাত্রেই ক্ষণ ভঙ্গুর। আবার শূন্যে অবস্থিত গৃহ দগ্ধ হইলে, যেমন শূন্যের কোন অনিষ্ট নাই সেইরূপ দেহীর দেহ বিনাশ হইলে, আত্মারও কোনরূপ ক্ষতির কারণ নাই। আবার হত্যাকারী হত্যা করিয়া, এবং আহত ব্যক্তি হত হইয়া, কেহই "আমি হত্যা করিতেছি, কি, আমি হত হইতেছি" ইহা অনুভব করিতে পারেনা; সুতরাং হে রঘুকুল ভূষণ! আত্মার এই রূপ স্বরূপতত্ত্ব অবগত হইয়া, বিষাদভাব পরিত্যাগ করিয়া, সুখী হইতে চেষ্টা কর।

তপোবননিবাসী চিরব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী আত্মতত্ত্বজ্ঞ অগস্ত্য যখন মায়িকজগতের একটি সাংসারিককামক্রোধাদি পীড়াগ্রস্তজীবকে; সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা বিষয়ে, এইরূপ একটি নাতিহ্রস্ব নাতি দীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা, ভার্য্যা কিছু নহে, জগত মিথ্যা, আত্মা সত্য, এই উপদেশ দিতে লাগিলেন, তখন শ্রোতা রাম কহিলেন—হে ভগবন! আপনি বলিলেন যে, দেহের কোনরূপ সুখ দুঃখ নাই, এবং আত্মারও তদ্রূপ অবস্থা। তবে আমি এইমাত্র কেন সীতার বিরহানলে দগ্ধীভূত হইতেছি! আমি যাহা সর্ব্বদা অনুভব করিতেছি, আপনি তাহা বলিতেছেন, "কিছুই না"। মুনিবর! ইহা আমি কিরূপে বিশ্বাস করিব?

মুনে দেহস্য নো দুঃখং নৈব চেৎ পরমাত্মনঃ
সীতাবিয়োগদুঃখাগ্নির্মাং ভস্মীকুরুতে কথং?
সদানুভূয়তে যোঽর্থঃ স নাস্তীতি ত্বয়েরিতঃ
জায়তাং তত্র বিশ্বাসঃ কথং মে মুনি সত্তম!
অন্যাত্র নাস্তি কো ভোক্তা যেন জন্তুঃ প্রতপ্যতে
সুখস্য বাপি দুঃখস্য তদ্‌ব্রূহি মুনিপুঙ্গব!

শিষ্যের কঠোর প্রশ্ন শুনিয়া, গুরু বা উপদেষ্টা ঋষি অগস্ত্য কহিলেন শুন—

দুর্জ্ঞেয়া শাম্ভবী মায়া তয়া সংমোহ্যতে জগৎ
মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরং॥
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ
সত্যজ্ঞানাত্মকোঽনন্তো বিভুরাত্মা মহেশ্বরঃ॥
তস্যৈবাংশো জীবলোকে হৃদয়ে প্রাণিনাং স্থিতঃ
বিস্ফুলিঙ্গা যথা বহ্নের্জায়ন্তে কাষ্ঠযোগতঃ॥
অনাদি কর্ম্ম সম্বন্ধাত্তত্ত্বদংশা মহেশিতুঃ।
অনাদিবাসনাযুক্তাঃ ক্ষেত্রজ্ঞা ইতি তে স্মৃতাঃ॥

মনো বুদ্ধি রহঙ্কারশ্চিত্তং চেতি চতুষ্টয়ং
অন্তঃকরণ মিত্যাহুস্তত্র তে প্রতিবিম্বিতাঃ॥

এই জগত শম্ভুর শাম্ভবী মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন, ইহা অতীব দুজ্ঞেয়, স্থূল কথা মায়াই মা প্রকৃতি, মায়ী ই মহেশ্বর। আবার সর্ব্বজ্ঞানময় অনন্তআত্মাই মহেশ্বর; সুতরাং মহেশ্বরের সকল অবয়বময় ভূতগণদ্বারা এই চরাচর বিশ্ব পরিব্যাপ্ত। এই মহেশ্বরের অংশই জীবহৃদয়ে অবস্থিত। অগ্নিস্ফু-লিঙ্গ যেমন কাষ্ঠাদি দাহ্যপদার্থ সংযোগে উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ লোকের হৃদয়স্থিত অনাদিকালপ্রবর্ত্তিত শৈবাংশ অনাদি বাসনাযুক্ত হইয়া, ক্ষেত্রজ্ঞ নামে পরিচিত হয়। চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধিও মন লইয়া অন্তঃকরণ গঠিত হইয়া থাকে। মহেশ্বর রূপ আত্মার অনন্ত অংশ, এই অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হইয়া আছে।

জীবত্বং প্রাপ্নুয়ুং কর্ম্ম ফল ভোক্তার এব তে
ততো বৈষয়িকং তেষাং সুখং বা দুঃখমেববা
ত এব ভুঞ্জতে ভোগায়তনেঽস্মিন্ শরীরকে
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চেতি দ্বিবিধং বপুরুচ্যতে
স্থাবরা স্তত্র দেহাঃ স্যুঃ সূক্ষ্মা গুল্মলতাদয়ঃ
অণ্ডজাঃ স্বেদজাস্তদ্বদুদ্ভিজ্জা ইতি জঙ্গমাঃ
যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণু মন্যেঽনু সংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতং
সুখ্যহং দুঃখ্যহঞ্চেতি জীব এবাভিমন্যতে।
নির্লেপোপি পরং জ্যোতির্মোহিতঃ শম্ভু-
মায়য়া
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভো মদোমাৎসর্য্যমেব চ
মোহশ্চেত্যরিষড়্‌বর্গমহঙ্কারগতং বিদুঃ।
স এব বধ্যতে জীবঃ স্বপ্ন জাগ্রদবস্থয়োঃ।
সুষুপ্তৌ তদভাবাচ্চ জীবঃ শঙ্করতাং গতঃ॥
স এব মায়াসংস্পৃষ্টঃ কারণং সুখদুঃখয়োঃ
শুক্তৌ রজতবদ্বিশ্বং মায়য়া দৃশ্যতে শিবে।
ততো বিবেকজ্ঞানেন ন কোহপ্যত্রাস্তি
দুঃখভাক্
ততো বিরম দুঃখাত্ত্বং কিং মুধা পরিতপ্যসে।

উক্ত প্রতিবিম্বিত অংশই জীবত্ব পাইয়া প্রারব্ধকর্ম্মের ফল ভোগ করে। কেননা উহারাই সুখ দুঃখাদি সাংসারিক ঘটনার-কারণ। স্থাবর জঙ্গম ভেদে শরীর দুই রূপ—লতাদিগণ স্থাবর। আর অণ্ডজ স্বেদজাদিই জঙ্গম নামে পরিচিত। এই দ্বিবিধ শরীরে মহেশ্বরের সেই কথিত অংশই সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। আবার কোন কোন জীব কর্ম্মানুসারে স্থাণুশরীর এবং যোন্যন্তর আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু জ্যোতির্ম্ময় জীব নির্লিপ্ত হইলেও, শৈব মায়ায় অভিভূত হইয়া "আমি সুখী" আমি দুঃখী" ইত্যাদি রূপ অহঙ্কার বা অভিমান প্রকাশ করিয়া থাকে। কামাদি-ষড়রিপুর সমষ্টিকে অহঙ্কারতত্ত্ব কহে। জীব-গণ স্বপ্ন আর জাগ্রদবস্থায় উক্ত অহঙ্কা-রের বশীভূত হয়, সুষুপ্তি অবস্থায় ঐ জ্ঞান তিরোহিত হইয়া জীব শিবত্বপদ প্রাপ্ত হয়। মায়ার মোহিনীশক্তিতে যেরূপ শুক্তিকে রজত জ্ঞান হয়, সেইরূপ মায়াবশে বিশ্ব আরোপিত হয়। স্থূল কথা এই যে—জীব মায়াকর্ত্তৃক সুখদুঃখ উপভোগ করে। কিন্তু পরমমঙ্গলাস্পদ আত্মতত্ত্বজ্ঞানউন্মেষি-বিবেকবুদ্ধি উপস্থিত হইলে, আর দুঃখাদি অনুভব হয় না—সুতরাং হে রামচন্দ্র! তুমি এই সকল জানিয়া শুনিয়া বৃথা বিলাপা[. পরিত্যাগ কর।

যখন আত্মারূপী মহেশ্বর সতত জীবদেহে নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থান করিতেছেন, শীতাতপাদিদ্বন্দ্ব যখন তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারেনা, তখন— ইহা আমার, উহা আমার, ইত্যাদি জ্ঞান করিয়া, ভার্য্যাদি-বিনাশরূপ অনিত্যচিন্তা হইতে বুদ্ধিকে সত্য স্বরূপ অব্যয় চিন্ময় সদাশিবের প্রতি বিনিযুক্ত করিয়া বিগতক্লেশ হও। ইত্যাদি। তখন শ্রীরামচন্দ্র আবার বলিলেন, হে ব্রহ্মন্ আমি সকল বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু প্রারব্ধভোগ আমাকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতেছেনা। ইহার যদি অন্য কোন উপায় থাকে, তাহাই আমায় বলুন। মদ্য যেমন নিরহঙ্কারী ব্রাহ্মণকে উন্মত্ত করে, সেইরূপ কর্ম্মফল ও বিবেকিকে পরিত্যাগ করিতে চাহেনা।

মত্তং কুর্য্যাদ্ যথা মদ্যং নিরহঙ্কারিণং দ্বিজং
তদ্বৎ প্রারব্ধভোগোঽপি ন জহাতি বিবেকিনং

তখন রামচন্দ্র আবার কহিলেন—হে ব্রহ্মন্! আমি আর সহ্য করিতে পারি না—প্রপীড়িত হইয়া জীব স্থূলদেহ বিনাশ করিয়া থাকে—আমারও তদ্রূপ প্রজ্ঞা উপস্থিত। এখন ইহার উপায় করুন।

আমি ক্ষত্রিয় হইয়া স্ত্রী হরণকারী দুরাচার-আততায়ী রাক্ষসকে বিনাশ করিতে না পারিলে আমার জীবনে প্রয়োজন কি?

ক্ষত্রিয়োঽহং মুনিশ্রেষ্ঠ ভার্য্যা মে রক্ষসা হৃতা
যদি তং ন নিহন্ম্যাশু জীবনে মেঽস্তি কিং ফলং।

এইরূপ কহিয়া, অতঃপর রামচন্দ্র সীতাহরণ জনিত শোকমিশ্রিত ক্রোধের অনুগত হইয়া, আবার কহিলেন—মহর্ষে! আমার আর তত্ত্বজ্ঞানোপদেশের আবশ্যক নাই। ক্রোধাদিরিপুগণ নিয়ত আমাকে দগ্ধ করিতেছে। নিজস্ত্রী শত্রুকর্ত্তৃক পীড়িতা হইলে, যে পুরুষ তত্ত্বজ্ঞান অবলম্বন করিয়া, তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করে, তাহাকে পুরুষাধম ভিন্ন আর কি বলিব? যাহাতে রাবণবিনাশ হয় আমাকে সেইরূপ উপদেশ প্রদান করুন, দণ্ডকারণ্যে দ্বিতীয় গুরু কেহ নাই।

কামক্রোধাদয়ঃ সর্ব্বে দহন্তোতে তনুং মম
অহঙ্কারোঽপি মে নিত্যং জীবনং হন্তুমুদ্যতঃ।
হৃতায়াং নিজকান্তায়াং শত্রুণাবমতস্য বা
যস্য তত্ত্ববুভুৎসা স্যাৎ স লোকে পুরুষাধমঃ।
তস্মাত্তস্য বধোপায়ং লঙ্ঘযিত্বাম্বুধিং রণে।
ব্রূহি মে মুনিশার্দ্দূল ত্বত্তো নান্যোঽস্তি মে গুরুঃ॥

ইহার পর অগস্ত্য ঋষি প্রদত্ত শৈবাস্ত্র-"বিরজা"দীক্ষাপদ্ধতি আরম্ভ। এই বিরজা দীক্ষা অরাতিবিজয় কার্য্যে সহায়। শাস্ত্রে দীক্ষার অনেকরূপ ক্রম আছে। তাহার মধ্যে, ভবিষ্য পুরাণের মতে দীক্ষাপদ্ধতি চারি প্রকার। বিরজা দীক্ষা তাহার অন্যতর। এই পর্য্যন্ত শঙ্করগীতা কীর্ত্তন করিয়া তাপসপ্রবর সূত সেদিনের মত নৈমিষকাননের তাপসগণের নিকট বিদায় লইয়া, সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতে গমন করিলেন। মহাগুহ্যবিরজাদীক্ষাপদ্ধতি তাহার পরদিন পবিত্রভাবে উপবেশন করিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

তন্ত্রে দীক্ষা বলিতে—

দীয়তে জ্ঞান মত্যন্তং ক্ষীয়তে পাপসঞ্চয়ঃ
তেন দীক্ষেতি সা প্রোক্তা পাপচ্ছেদক্ষমা ক্রিয়া।

অর্থাৎ যে ক্রিয়া দ্বারা জ্ঞান দান করা হয় এবং পাপ ক্ষয় হয় তাহাকে দীক্ষা কহে। কিন্তু শঙ্করগীতার এই বিরজা দীক্ষা ক্রিয়া অন্যরূপ। এইরূপ দীক্ষায় দীক্ষিত হইলে

লোকের পাপবিনাশকরা দূরে থাকুক, বরং প্রাণীহত্যা জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়। অগস্ত্যপ্রদত্তদীক্ষার গুণে রামচন্দ্র নাকি রাবণবিনাশ করিয়াছিলেন। তাই এই শঙ্করগীতা গ্রন্থে উহার উল্লেখ আছে। সূতমুখপদ্ম হইতে ব্রাহ্মণগণ অতঃপর বিরজাদীক্ষাপদ্ধতি শুনিতে লাগিলেন।

আমরাও অদ্য হিন্দু-পত্রিকার পাঠকের নিকট হইতে বিদায় লইলাম। শঙ্করের ইচ্ছা হইলে আবার তাঁহার বিরজাদীক্ষা-পদ্ধতি বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইব। (ক্রমশঃ)

ডাক্তার—শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য—মাগুরা।

চারুচর্য্যা।

শ্রীলাভসুভগঃ সত্যাসক্তঃ স্বর্গাপবর্গদঃ।
জয়তাৎ ত্রিজগৎপূজ্যঃ সদাচার ইবাচ্যুতঃ॥ ১
ব্রাহ্মেমুহূর্ত্তে পুরুষস্ত্যক্তেন্নিদ্রামতন্দ্রিতঃ।
প্রাতঃ প্রবুদ্ধং কমলমাশ্রয়েচ্ছ্রী গুণাশ্রয়া॥ ২

লক্ষ্মী লাভে সৌভাগ্যবান, সত্যে আসক্ত কৃষ্ণপক্ষে—সত্যভামায় আসক্ত, স্বর্গ ও মোক্ষ-দাতা ও ত্রিজগৎপূজ্য শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সদাচার জয়যুক্ত হউন। ১

মনুষ্য আলস্য ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে নিদ্রা ত্যাগ করিবেন; গুণের আশ্রয়ীভূত লক্ষ্মী (শোভা) প্রাতঃকালের সুহাসিনী সরোজিনীকে আশ্রয় করে। ২

[এ বিষয়ে মনু যথা—

ব্রাহ্মো মুহূর্ত্তে বুদ্ধ্যেত ধর্ম্মার্থৌ চানুচিন্তয়েৎ।

পুণ্যপূত শরীরঃ স্যাৎ সততং স্নান নির্ম্মলঃ।
তত্যাজবৃত্রহাস্নানাৎপাপংবৃত্রবধার্জ্জিতম্॥ ৩
নকুর্বীত ক্রিয়াং কাঞ্চিদনভ্যর্চ্য মহেশ্বরম্।
ঈশার্চনরতং শ্বেতং নাভূন্নেতুং যমঃ ক্ষমঃ॥ ৪

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে অর্থাৎ রাত্রির শেষযামে জাগরিত হইয়া ধর্ম্ম ও অর্থের বিষয় চিন্তা করিবে।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে তূত্থায় ধর্ম্ম মর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।
কূর্ম্ম পুরাণে ১৮ অধ্যায়।

ব্রাহ্মেমুহূর্ত্তেউত্থায়মূত্রপুরীষোৎসর্গং কুর্য্যাৎ।
বিষ্ণুসংহিতা ৬০ অধ্যায়ে।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত ধর্ম্মার্থৌ চানুচিন্তয়েৎ।
মহাভারত অনুশাসন পর্ব্বাণ ১০৪ অধ্যায়।

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত যথা—

রাত্রেশ্চ পশ্চিমে যামে মুহূর্ত্তো ব্রাহ্ম উচ্যতে।
আহ্নিক তত্ত্বধৃত পিতামহ বচনং।

রাত্রেশ্চ পশ্চিমে যামে মুহূর্ত্তো যস্তৃতীয়কঃ।
স ব্রাহ্ম ইতি বিখ্যাতো বিহিতঃ সংপ্রবোধনে॥
ঐ ভবদেবীয় নির্ণয়ামৃতে স্মৃতম্ভ বচনং।

পশ্চিমে যামে পশ্চিমার্দ্ধপ্রহরে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত ইত্যর্থঃ।

মদন পারিজাতে প্রথমস্তবকে উচ্চারবিধি-প্রকরণে।]

সর্ব্বদা স্নানদ্বারা নির্ম্মল হইয়া পুণ্য পূত শরীর হইবে; ইন্দ্র স্নানদ্বারা বৃত্রবধার্জ্জিত পাপ দূর করিয়াছিলেন। ৩

মহাদেবকে অর্চ্চনা না করিয়া কেহ কোন কার্য্য করিবে না; মহাদেব অর্চ্চনায় রত শ্বেত মুনিকে যম লইয়া যাইতে পারেন নাই। ৪ (এই উপাখ্যানটি লিঙ্গ পুরাণের পূর্ব্বভাগে ৩০ অধ্যায়ে আছে উহার তাৎপর্য্য এই—শ্বেতনামা মুনি মহাদেবের পূজা অর্চ্চনায় রত থাকিতেন, কালক্রমে দেহ-পরিবর্ত্তনের সময় হওয়াতে, যম আসিয়া তাঁহাকে বদ্ধ করিলেন। তিনি কহিলেন যে,

শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধান্বিতং কুর্য্যাচ্ছাস্ত্রোক্তেনৈববর্ত্মনা।
ভুবিপিণ্ডং দদৌ বিদ্বান্‌ভীষ্মঃ পাণৌ ন শন্তনোঃ॥ ৫

নোত্তরস্যাংপ্রতীচ্যাংবাকুর্ব্বীতশয়নেশিরঃ।
শয্যাবিপর্য্যয়াদ্গর্ভোদিতেঃশক্রেণপাতিতঃ॥ ৬

আমায় কে বদ্ধ করিবে? আমি মৃত্যুঞ্জয়ের ভক্ত। যম কহিলেন শ্বেত! আমি তোমাকে যমালয় লইতে আসিয়াছি মহাদেব তোমার কি করিবেন? এই শুনিয়া শ্বেতমুনি 'হা রুদ্র' হা রুদ্র' বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া মহাদেব সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মৃত্যুঞ্জয়কে দর্শন করিয়া, ভয়ে যম শ্বেতমুনিকে ত্যাগ করিয়া মুনির নিকট পড়িয়া গেলেন ও চীৎকার করিতে লাগিলেন—

সসর্জ জীবিতং ক্ষণাৎ ভবং নিরীক্ষ্য বৈ ভয়াৎ।
পপাতচাশু বৈ বলী মুনেস্তু সন্নিধৌ দ্বিজাঃ॥

পরে যম মৃত্যুঞ্জয়ের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়াছিলেন। মহাদেবও মুনির প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন।)

শাস্ত্রোক্ত নিয়মে শ্রদ্ধান্বিত শ্রাদ্ধ করিবে; বিদ্বান্ ভীষ্ম মৃত্তিকায় পিণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন, শান্তনু রাজার হস্তে দান করেন নাই। ৫ (এই উপাখ্যান শ্রীহরিবংশে প্রথম পর্ব্বে ১৬ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।)

উত্তর কিম্বা পশ্চিম দিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিবেনা; শয্যাবিপর্য্যয়ে দিতির গর্ভ ইন্দ্র কর্ত্তৃক পাতিত হইয়াছিল। ৬

(উদক্ শিরা ন স্বপেত তথা প্রত্যক্-শিরা ন চ।
মহাভারতে অনুশাসন পর্ব্বণি ১০৪ অধ্যায় ৪৯।

নোত্তরাভি মুখঃস্বপ্যাৎ পশ্চিমাভিমুখো ন চ।
কূর্ম্ম পুরাণে, ১৯ অধ্যায়।

অর্থি ভুক্তাবশিষ্টং যৎ তদশ্নীয়ান্মহাশয়ঃ।
শ্বেতোঽর্থি রহিতং ভুক্ত্বা নিজমাংসাশনোঽভবৎ॥ ৭

নার্দ্রপাদঃ স্বপ্যাৎ। নোত্তরাপরাবাক্‌শিরাঃ।
বিষ্ণুস্মৃতৌ ৭০ অধ্যায়।

আর্দ্র পদে, উত্তর পশ্চিম ও নিম্ন মুখে নিদ্রা যাইবে না। একদিন দিতি সন্ধ্যা বেলায় ব্রতকর্শিত হইয়া উচ্ছিষ্ট ও পদ ধৌত না করিয়া নিদ্রা গিয়াছিলেন, ইন্দ্র এই অবসরে দিতির গর্ভ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বজ্রদ্বারা গর্ভ সাত খণ্ড করিয়াছিলেন—

একদা সাতু সন্ধ্যায়াং মুচ্ছিষ্টা ব্রত কর্শিতা।
অস্পৃষ্টবার্য্যধৌতাঙ্ঘ্রিঃ সুষ্বাপ বিধিমোহিতা॥
লব্ধ্বা তদন্তরং শক্রো নিদ্রাপহৃত চেতসঃ।
দিতেঃ প্রবিষ্ট উদরং যোগেশো যোগমায়য়া।
চকর্ত্ত সপ্তধা গর্ভং বজ্রেণ কণকপ্রভং॥
শ্রীভাগবতে ৬ স্কন্ধে ১৮ অধ্যায়।)

মহাশয় ব্যক্তি যাচকের ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিবেন; শ্বেতরাজা যাচককে না দিয়া ভক্ষণ করিয়া, নিজের মাংস ভক্ষক হইয়াছিলেন। ৭

(দেবান্ পিতৄন্ মনুষ্যাংশ্চ ভৃত্যান্ গৃহ্যাশ্চ দেবতাঃ।
পূজয়িত্বা ততঃ পশ্চাদ্ গৃহস্থঃশেষভুগ্ ভবেৎ॥
বিষ্ণুস্মৃতৌ ৬৭ অধ্যায়।

দেবগণ, পিতৃগণ, মনুষ্যগণ, ভৃত্যগণ ও গৃহ দেবতাগণের পূজা করিয়া তদনন্তর গৃহস্থ অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিবেন।

মাতরং পিতরং পুত্রং দারানতিথি সোদরান্।
হিত্বাগৃহী ন ভুঞ্জীয়াৎ প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি॥
মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে ৮ উল্লাসে।

গৃহী কণ্ঠগত প্রাণ হইলেও, মাতা, পিতা পুত্র, স্ত্রী, অতিথি ও সহোদরকে ত্যাগ করিয়া ভোজন করিবে না।

শ্বেত রাজার উপাখ্যান বাল্মিকীয় রামায়ণে উত্তরকাণ্ডে ৭৮ সর্গে।)

জপহোমার্চ্চনং কুর্য্যাৎ সুধৌতচরণঃ শুচিঃ।
পাদশৌচবিহীনং হি প্রবিবেশ নলং কলিঃ॥ ৮
ন সঞ্চরণশীলঃ স্যান্নিশি নিঃশঙ্ক মানসঃ।
মাণ্ডব্যঃ শূললীনোঽভূদ চোরশ্চৌরশঙ্কয়া॥ ৯

চরণ উত্তমরূপে ধৌত করিয়া শুচি হইয়া জপ ও হোমার্চ্চনা করিবে; কলি, নলের শৌচপদ না থাকাবশতঃ নলের শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ৮

(সুস্নাতঃ প্রক্ষালিত-পাণিপাদঃ স্বাচান্তো দেবতার্চ্চায়াং স্থলে বা ভগবন্ত মনাদি নিধনং বাসুদেবমভ্যর্চ্চয়েৎ।

বিষ্ণুস্মৃতৌ ৬৫ অধ্যায়।

উত্তমরূপে স্নান, হস্তপদপ্রক্ষালন, পরে আচমন করিয়া, দেবপ্রতিমাদিতে অথবা স্থলে, অর্থাৎ ঘটাদিতে জন্মমৃত্যুরহিত ভগবন্ বাসুদেবের পূজা করিবে।

নল রাজার শরীরে কলির প্রবেশ উপাখ্যান—

কৃত্বা মূত্রমুপাস্পৃশ্য সন্ধ্যামন্বাস্ত নৈষধঃ।
অকৃত্বা পাদয়োঃশৌচং তত্রৈনংকলিরাবিশৎ॥

মহাভারতে বন পর্ব্বণি ৫৯ অধ্যায়।

নিষধাধিপতি মূত্র পরিত্যাগ করিয়া, পদ ধৌত না করিয়া, আচমনপূর্ব্বক সন্ধ্যোপাসনা করিতেছিলেন দেখিয়া, কলি তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন।)

নিঃশঙ্ক মনে রাত্রে গমন করিবেনা। সাধুমাণ্ডব্য চোর বিবেচনায় শূলে আরোপিত হইয়াছিলেন। ৯

(নৈকোধ্বানং প্রপদ্যেত। নাধার্ম্মিকৈঃ সার্দ্ধম্।......নাতি প্রত্যুষসি। নাতিসায়ং। ন সন্ধ্যয়োঃ। ন মধ্যাহ্নে ন সন্নিহিত পানীয়ম্। নাতিতূর্ণং। ন রাত্রৌ। ন সন্ততং ব্যাল ব্যাধিতার্দ্দৈর্ব্বাহনৈঃ।

বিষ্ণুস্মৃতৌ ৬৩ অধ্যায়।

একা পথে চলিবে না, অধার্ম্মিকের সহিত না, অতি প্রত্যুষে না, অতি সন্ধ্যাকালে না, উভয় সন্ধ্যায় নয় অর্থাৎ সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে না, মধ্যাহ্নে না; জলের নিকটে না, অতি শীঘ্র না; রাত্রে না, সর্ব্বদা সর্প পীড়িত কিম্বা পরিশ্রান্ত বাহন দ্বারা না।

মাণ্ডব্যোপাখ্যানং মহাভারতে আদি পর্ব্বণি ১০৭ অধ্যায়—

মাণ্ডব্য নামে ব্রাহ্মণ স্বীয় আশ্রমস্থ-বৃক্ষনিম্নে মৌনব্রতাবলম্বন করিয়া, ঊর্দ্ধ-বাহু হইয়া তপস্যা করিতে ছিলেন। এক দিন কতকগুলি দস্যু অপহৃত দ্রব্য লইয়া, রক্ষকের অনুসরণ ভয়ে সেই আশ্রমে ধন লুকাইয়া আপনারাও সেই স্থানে থাকিল। পরে রক্ষকগণ সেই স্থানে আসিয়া, মুনিকে কোন পথ দিয়া দস্যুগণ গিয়াছে জিজ্ঞাসা করায়, মুনি কোন উত্তর প্রদান না করিলে, রক্ষকগণ সেই আশ্রমে অনুসন্ধান করাতে অপহৃত দ্রব্য সহিত দস্যুগণকে দেখিতে পাইল। রক্ষকেরা মুনিকেও বন্ধন করিয়া রাজসমীপে লইয়া গিয়াছিল। রাজা মুনিকেও বধের আজ্ঞা দিলেন। রক্ষকেরা মাণ্ডব্যমুনিকে জানিতে না পারিয়া, শূলে আরোপণ করিয়াছিল—

তং রাজাসহতৈশ্চৌরৈরন্বশাদ্বধ্যতামিতি।
স রক্ষিভি স্তৈরজ্ঞাতঃ শূলে প্রোতো মহা-তপাঃ॥)

ন কুর্য্যাৎ পরদারেচ্ছাং বিশ্বাসং স্ত্রীষু বর্জ্জয়েৎ।
হতোদশাস্যঃ সীতার্থে হতঃ পত্ন্যা বিদূরথঃ॥১০

অন্যের স্ত্রীতে স্পৃহা করিবে না ও স্ত্রীকে বিশ্বাস করিবে না; সীতার জন্য রাবণ হত হইয়াছিলেন ও বিদূরথ রাজাকে তাঁহার রাণী হনন করিয়াছিলেন। ১০

(পরান্নঞ্চ পরস্বঞ্চ পরশয্যাঃ পরস্ত্রিয়ঃ৭
পরবেশ্মনি বাসশ্চ শক্রাদপি হরেচ্ছ্রিয়ম্॥

গরুড় পুরাণে পূর্ব্বার্দ্ধে ১১৫ অধ্যায় ৫

পরান্ন, পরদ্রব্য, পরশয্যা, পরস্ত্রী ও পর গৃহে বাস ইন্দ্রেরও লক্ষ্মী হরণ করে।

নমদাবাসনী ক্ষীবঃ কুর্য্যাদ্ বেতালচেষ্টিতম্।

তজ্জন্যই কহিয়াছেন—

মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥
ঐ ১১১ অধ্যায় ১২।

স্ত্রীতে অবিশ্বাস কর্ত্তব্য যথা—

নখীনাঞ্চ নদীনাঞ্চ শৃঙ্গিনাং শস্ত্রপাণিনম্।
বিশ্বাসোনৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ॥
ঐ ১০৯ অধ্যায় ১৪।

স্ত্রীষু বাহ্ন্যগ্নি সর্পেষু স্বাধ্যায়ে শস্ত্র সেবনে।
ভোগাস্বাদেষু বিশ্বাসং কঃ প্রাজ্ঞঃ কর্ত্তুমর্হতি॥
ঐ ১১৪ অধ্যায় ৪৬।

স্ত্রীষু রাজসু সর্পেষু স্বাধ্যায় প্রভুশত্রুষু।
ভোগেষ্বায়ুষি বিশ্বাসং কঃ প্রাজ্ঞঃ কর্ত্তুমর্হতি॥
মহাভারতে উদ্যোগ পর্ব্বণি ৩৬ অধ্যায় ৫৭।

তজ্জন্য শান্তিশতকে কহিয়াছেন—

আবর্ত্তঃ সংশয়ানামবিনয়ভবনং পত্তনং সাহসানাং
দোষানাং সন্নিধানং কপটশতময়ং ক্ষেত্র-
মপ্রত্যয়ানাং।
দুর্গ্রাহ্যং যন্মহদ্ভিঃ সুরনরবৃষভৈঃ সর্ব্বমায়া-
করং তৎ।
স্ত্রীরূপং কেন লোকে বিষমমৃতময়ং ধর্ম্ম-
নাশায় সৃষ্টং॥

সংশয়ের উদ্যম, অবিনয়ের ভবন, সাহসের আদিস্থান, দোষের আকর, কপটময়, অবিশ্বাসের ক্ষেত্র, দেবতা নর, বৃষ ও মহৎ ব্যক্তিও ত্যাগ করিতে পারেন না; এই অমৃতময় স্ত্রীরূপ বিষকে ধর্ম্মনাশের জন্য কে সৃষ্টি করিয়াছেন!

বিদূরথ উপাখ্যান বৃহৎসংহিতায় ৭৮ অধ্যায়ে আছে—

'শস্ত্রেণ বেণীবিনিগূহিতেন বিদূরথং স্বা
মহিষী জঘান।'

বেণীতে লুক্কায়িত শস্ত্র দ্বারা বিদূরথকে তাঁহার মহিষী হত্যা করিয়াছিলেন।

'বেণীনিগূঢ়েন চ শস্ত্রেণ বিন্দুমতী বৃষ্ণিং
বিদূরথং (জঘান)
হর্ষচরিতে ৬ষ্ঠ উচ্ছ্বাসে।

বৃষ্ণয়ো হি যযুঃ ক্ষীবাস্তৃণপ্রহরণাঃ ক্ষয়ম্॥ ১১
(ক্রমশঃ) শ্রীবিধুভূষণ দেব।

মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া ভূতের ন্যায় কার্য্য করিবে না; কারণ বৃষ্ণিগণ মত্ত হইয়া পরস্পর তৃণদ্বারা প্রহার করিয়া নষ্ট হইয়াছিলেন। ১১

(হিন্দুশাস্ত্রে মদ্যপান মহাপাপ। মহাপাপ পঞ্চ যথা—

ব্রহ্ম হত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পানকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ॥
মনুঃ ১১ অধ্যায় ৫৫

ব্রহ্ম-হত্যা, সুরাপান, ব্রাহ্মণের ৮০ তোলা স্বর্ণ চুরি, বিমাতৃ গমন এই চারিটি মহাপাপ ও তাহাদের সহিত যিনি এক বৎসরকাল বাস করেন তিনিও মহাপাপী মধ্যে পরিগণিত।

ব্রহ্মহামদ্যপঃ স্তেনো গুরুতল্পগ এব চ।
এতে মহাপাতকিনো যশ্চ তৈঃ সহ সংবসেৎ
৩য় অধ্যায় যজ্ঞবল্ক স্মৃতৌ উশনঃস্মৃতৌ

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং ব্রাহ্মণ সুবর্ণ হরণং গুরুদার গমনমিতি মহাপাতকানি। তৎসংযোগশ্চ। বিষ্ণুস্মৃতৌ ৩৫ অধ্যায়। সম্বৎসরেণ পততি পতিতেন সহাচরন্। ঐ

এই যদুবংশক্ষয় কথা মহাভারতে মৌষলপর্ব্ব ১ম অঃ। শ্রীভাগবতে ১১ স্কন্ধে ৩০ অঃ ব্রহ্মপুরাণে ১০০ অঃ। শ্রীদেবী ভাগবতে ২ স্কন্ধে ৮ অঃ। ইতিহাস এই—একদিন কতিপয় মুনিকে যদুবংশীয় কতিপয় বালক জিজ্ঞাসা করেন, আমাদের এই স্ত্রীলোকটি কি প্রসব করিবে?' বালকগণ একটি বালককে গর্ভবতী স্ত্রী সাজাইয়াছিলেন। মুনিগণ জানিতে পারিয়া ক্রোধে কহিয়াছিলেন 'ইনি নাশন মুষল প্রসব করিবেন।" কালক্রমে একটি মুষল প্রসূত হইল। মুষল চূর্ণ করিয়া সমুদ্রে ক্ষিপ্ত হইল। চূর্ণভাগ তীরে লাগিয়া উহা হইতে এরকা উৎপন্ন হইয়াছিল; যদুগণ মত্ত হইয়া উহাদ্বারা পরস্পর বিবাদ করিয়া হত হন।

(১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজেষ্ট্রী কৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।

৯ম বর্ষ, ৯ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা।	মাঘ।	১৩০৯ সাল, ১৮২৪ শকাব্দা,

বর্ণভেদতত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

(বর্ণ ও জাতি শব্দ।)

মনুসংহিতায় আরও দেখা যায়।—

সত্ত্বং জ্ঞানং তমোঽজ্ঞানং রাগদ্বেষৌ রজঃ স্মৃতম্। এতদ্ব্যাপ্তিমদেতেষাং সর্ব্বভূতাশ্রিতং বপুঃ॥ ১২।২৬

তত্র যৎ প্রীতিসংযুক্তং কিঞ্চিদাত্মনি লক্ষয়েৎ।
প্রশান্তমিব শুদ্ধাভং সত্ত্বং তদুপধারয়েৎ॥ ১২।২৭

যত্তু দুঃখসমাযুক্তমপ্রীতিকরমাত্মনঃ।
তদ্রজোঽপ্রতীপং বিদ্যাৎ সততং হারিদেহিনাম্॥ ১২

যত্তু স্যান্মোহসংযুক্তমব্যক্তং বিষয়াত্মকম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং তমস্তদুপধারয়েৎ॥ ১২।২৯

সত্ত্বগুণের লক্ষণ জ্ঞান, তমোগুণের অজ্ঞান ও রজোগুণের লক্ষণ রাগ-দ্বেষ। সকল প্রাণীরই এই তিনগুণ আছে। যখন আত্মায় প্রীতিকর শুদ্ধাভ, প্রশান্ত কোনও ভাবের উদয় হইতে দেখা যাইবে, তখন বুঝিবে, তাহা সত্ত্ব। যাহা নিজের অপ্রীতিকর, দুঃখযুক্ত ও প্রতিকূল, তাহাকেই অনিষ্টোৎপাদক রজ বলিয়া জানিবে। যাহা মোহযুক্ত, অব্যক্ত, বিষয়াত্মক, অপ্রতর্ক্য, অজ্ঞেয়, তাহাই তম বলিয়া ধারণা করিবে।

সাংখ্য পাতঞ্জল শাস্ত্রে সত্ত্বাদিগুণত্রয় বিষয়ে বিপুল গবেষণা আছে, তাহা এস্থানে অতিরিক্ত; সংক্ষেপে ঐ শাস্ত্রের রহস্য—পঞ্চশিখসূত্র,—

"সত্ত্বং নাম প্রসাদ লাঘবাভিষ্বঙ্গ প্রীতিতিতিক্ষা সন্তোষাদিরূপানন্তভেদং সমাসগতঃ সুখাত্মকং, এবং রজোঽপি শোকাদি নানাভেদং সমাসতো দুঃখাত্মকং এবং তমোঽপি নিদ্রাদি নানাভেদং সমাসতো মোহাত্মকমিতি।"

প্রসাদ, লাঘব, অভিষ্বঙ্গ, প্রীতি, তিতিক্ষা, সন্তোষ ইত্যাদি বহুবিধ লক্ষণ সত্ত্ব গুণের,

সংক্ষেপে সত্ত্ব সুখাত্মক। এইরূপ রজো-গুণের শোকাদি নানা লক্ষণ, সংক্ষেপে রজ দুঃখাত্মক। ঐরূপ তমোগুণের নিদ্রাদি নানা লক্ষণ, সংক্ষেপে ঐ গুণ মোহাত্মক।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দেখা যায়—

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ।

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং,
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয়! কর্ম্মসঙ্গেন দেহি-নম্॥১৩৭

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহি-নাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত।॥১৪৮

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত॥১৪৯

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত॥১৪।১১

লোভ প্রবৃত্তিরারম্ভকর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ! ১৪ ১১

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন!১৪১৩

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ। প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ॥১৪।১৭

সত্ত্বগুণ নির্ম্মলতা হেতু প্রকাশক অনাময়; এ গুণ সুখসঙ্গ ও জ্ঞানসঙ্গ দ্বারা বন্ধন করে। অর্থাৎ সুখে আকৃষ্ট করে। রজোগুণ অনুরাগাত্মক ও তৃষ্ণাসঙ্গোত্থ, উহা কর্ম্মসঙ্গ দ্বারা জীবের বন্ধন নিষ্পাদন করে। জীব ঐ জন্য কর্ম্মপর হয়। তমোগুণ অজ্ঞান হইতে জাত, উহা সকল জীবের মোহজনক। প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রা প্রভৃতির দ্বারা ঐ গুণ জীবকে বন্ধন করে; অর্থাৎ তমোগুণবশতঃ নিদ্রাদির আধিক্য হয়। সত্ত্ব সুখের দিকে চালিত করে, রজোগুণ কর্ম্মে ও তমোগুণ জ্ঞান আবৃত করিয়া প্রমাদের পথে জীবকে পরিচালিত করে। যখন সকল ইন্দ্রিয়ে জ্ঞানাত্মক প্রকাশের আধিক্য অনুভূত হইবে, তখন সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। যে সময় লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্মারম্ভ, (যাহা লৌকিক প্রতিষ্ঠাজনক, তাদৃশ কর্ম্মারম্ভ) স্পৃহা, অশম ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন রজোগুণের বৃদ্ধি হইয়াছে, জানা যায়। তমোগুণ আতিশয্য লাভ করিলে, অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ, মোহ ইত্যাদি উদ্ভূত হয়। সত্ত্ব হইতে জ্ঞান, রজ হইতে লোভ, তম হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান উৎপন্ন হয়। সত্ত্বপ্রকৃতির কর্ত্তা, কর্ম্ম, দান, যজ্ঞ, তপস্যা ও জ্ঞান কিরূপ, আবার রজঃপ্রকৃতির ও তমঃপ্রকৃতির জ্ঞান কর্ত্তা ইত্যাদি কি প্রকার, এ সকল বিষয় গীতাশাস্ত্রে বহুল পরিমাণে বিচারিত হইয়াছে। সে সকলের অবতারণা এ প্রসঙ্গে অত্যাবশ্যক। সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের লক্ষণ বুঝা গেল, এখন সত্ত্বাদি গুণানুসারে শাস্ত্রে ব্রাহ্মণাদির কি প্রকার কর্ম্ম কথিত হইয়াছে, তাহাই আলোচনা করা যাউক। সংক্ষেপে ব্রাহ্মণ সত্ত্বপ্রধান, ক্ষত্রিয় সত্ত্ব-উপসর্জ্জন রজঃপ্রধান, বৈশ্য রজউপসর্জ্জন তমঃপ্রধান এবং শূদ্র তমঃপ্রধান।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যাইতেছে,—

শমোদমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জবম্।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্॥
৭।১১।২১

শৌর্য্যং বীর্য্যং ধৃতিস্তেজস্ত্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা।
ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্রলক্ষণম্॥
৭।১১।২২

দেবগুর্ব্বচ্যুতে ভক্তিস্ত্রিবর্গপরিপোষণম্।
আস্তিক্যমুদ্যমো নিত্যং নৈপুণ্যং বৈশ্য-
লক্ষণম্॥ ৭।১১।২৩

শূদ্রস্য সন্নতিঃ শৌচং সেবা স্বামিন্যমায়য়া।
অমন্ত্রযজ্ঞোহ্যস্তেয়ং সত্যং গোবিপ্ররক্ষণম্॥
৭।১১।২৪

বৃত্ত্যা স্বভাবকৃতয়া বর্ত্তমানঃ স্বকর্ম্মকৃৎ।
হিত্বা স্বভাবজং কর্ম্ম শনৈর্নির্গুণতামিয়াৎ॥
৭।১১।৩২

ইন্দ্রিয়সংযম, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, সরলতা, ক্ষমা, জ্ঞান, দয়া, ঈশ্বরপরতা ও সত্য, এগুলি ব্রাহ্মণের লক্ষণ। শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৃতি, তেজ, ত্যাগ, আত্মজয়, ক্ষমা, ব্রহ্মণ্যতা, প্রসাদ ও সত্য, এগুলি ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ। দেবতা, গুরু ও পরমেশ্বরে ভক্তি, ধর্ম্মার্থকাম, এই ত্রিবর্গের পরিপোষণ, আস্তিকতা, নিত্য উদ্যম ও নৈপুণ্য, বৈশ্যের লক্ষণ। সন্নতি, শুচিতা, অকপট-প্রভুসেবা, মন্ত্রহীন যজ্ঞানুষ্ঠান, চুরি না করা ও সত্য এবং গো-ব্রাহ্মণের রক্ষণ, এই সকল শূদ্রের লক্ষণ। স্বভাববিহিত বৃত্তিদ্বারা সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া বর্ত্তমান পুরুষ ক্রমে স্বভাবজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নির্গুণত্ব (মোক্ষ) লাভ করে। শ্রীমদ্ভাগবতের এই প্রমাণগুলি পাঠকরিলে ব্রাহ্মণাদির পরস্পরের শ্রেষ্ঠতা যে গুণকর্ম্মানুসারী, তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকে না।

মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বে ভৃগু-ভরদ্বাজ-সংবাদে দেখিতে পাই—

ভরদ্বাজ উবাচ।

ব্রাহ্মণঃ কেন ভবতি ক্ষত্রিয়ো বা দ্বিজোত্তম।
বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ বিপ্রর্ষে তদ্ব্রূহি বদ-
তাম্বরং ॥২১॥

ভৃগুরুবাচ।

জাতকর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ
শুচিঃ। বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ ষট্সু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ ॥২২॥

শৌচাচারস্থিতঃ সম্যগ্ বিঘসাশী গুরু-
প্রিয়ঃ। নিত্যব্রতো সত্যপরঃ স বৈ ব্রাহ্মণ
উচ্যতে ॥২৩॥

সত্যং দানমথাদ্রোহ আনৃশংস্যং ত্রপা ঘৃণা।
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ ॥২৪॥
ক্ষত্রজং সেবতে কর্ম্ম বেদাধ্যয়নসঙ্গতঃ।
দানাদানরতির্যস্তু স বৈ ক্ষত্রিয় উচ্যতে ॥২৫॥
বিশত্যাশু পশুভ্যশ্চ কৃষ্যাদানরতিঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি সংজ্ঞিতঃ ॥২৬॥
সর্ব্বভক্ষ্যরতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ।
ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি
স্মৃতঃ ॥২৭॥

ভরদ্বাজ ঋষি ভৃগুর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাহ্মণ কিরূপে হয়, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য ও শূদ্রইবা কিরূপে হয়, আমাকে বলুন। ভৃগু বলিলেন, জাতকর্ম্মপ্রভৃতি সংস্কার দ্বারা যে ব্যক্তি সংস্কৃত ও শুচি, বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন, ষট্কর্ম্মশালী (সন্ধ্যা-বন্দনা, জপ, হোম, দেবপূজা, অতিথিসৎকার, এই ছয়টী, অথবা যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, সৎপাত্রে দান ও সৎপ্রতিগ্রহ,

এই ছয়টী ষট্‌কর্ম্ম। শেষোক্ত ছয়টী অধিক সঙ্গত। যে শৌচাচারস্থ, দেবপ্রসাদ-ভোজী, গুরুপ্রিয়, নিত্যব্রতপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, সে ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ এই সকল গুণ থাকিলে ব্রাহ্মণ হয়। সত্য, দান, অদ্রোহ, অনৃশংসতা, লজ্জা (অকার্য্য করিতে লজ্জা) ঘৃণা (নিন্দ্য কর্ম্মে ঘৃণা) ও তপস্যা যাহাতে দেখিবে, সেই ব্রাহ্মণ জানিবে। যিনি বেদাধ্যয়ন করেন এবং ক্ষত্রোচিত বিপন্ন রক্ষায় দীক্ষিত হয়েন, সৎপাত্রে দান ও প্রজার নিকট হইতে যোগাকর গ্রহণ করেন, তিনি ক্ষত্রিয়। বৈশ্যও বেদাধ্যায়ী হইবে। পশুরক্ষা, কৃষি, ধনোপার্জ্জন, প্রিয় ও শুচি হওয়া বৈশ্যের লক্ষণ। যে ব্যক্তির সকল খাদ্য গ্রাহ্য অর্থাৎ খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই, আর যাহার ভাল মন্দ কর্ম্মের বিচার নাই, এবং যে বেদত্যাগী, আচাররহিত, সে শূদ্র বলিয়া কথিত হয়। এই সমস্ত শ্লোকে সুস্পষ্ট প্রতিপাদিত হইল যে, কর্ম্মভেদেই ব্রাহ্মণাদির ভেদ। জন্মভেদের কোনও কথা এ সকল স্থানে প্রাপ্ত হওয়া গেলনা। যদি গুণ-কর্ম্মই বর্ণভেদের কারণ হয়, জন্মের সহিত উহার কিঞ্চিন্মাত্রও সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে সমাজের আদিম অবস্থায় বর্ণ-ভেদের কারণ পাওয়া কষ্টকর এবং বর্ত্তমান জাতিভেদ বৃথা। মানব স্ব স্ব কর্ম্মানুসারেই যদি ব্রাহ্মণাদি হইল, তবে এ সকল কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে সে কি ছিল? সৃষ্টিপ্রবাহের আদি অন্ত নাই, সুতরাং চির-স্তন অনাদি অদৃষ্ট আশ্রয় করিয়া দার্শনিক সহজ উত্তর দিতে পারিবেন। সামাজিক স্তর কল্পনা করিয়া ক্রম-পরি-বর্ত্তন-বাদী আধুনিক অবশ্য এ প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য। তিনি সুতরাং বলিবেন, প্রথমে সকলেই সমান ছিল, বর্ণভেদ ছিল না; স্বীয় কর্ম্মানুসারে মনুষ্য ব্রাহ্মণত্বাদি লাভ করিয়াছে; তাহা পরবর্ত্তিসময়ের সামা-জিক নির্দ্দেশমাত্র। সমাজে সম্মান, স্বাতন্ত্র্য-রক্ষা, উচ্চনীচতার পরিমাণানুসারে যোগ্য-তমের প্রতিষ্ঠা ও অধিকারলাভ, দোষের প্রশ্রয় না দেওয়া, বরঞ্চ দোষসংস্কারে যত্নবান হওয়া ইত্যাদি কতকগুলি যুক্তি দ্বারাই জাতি বা বর্ণভেদ সমর্থিত হইয়াছিল। গুণ-কর্ম্ম ত্যাগ করিলে, সে জাতীয় যুক্তি-বিকাশের অবকাশ থাকিবে না, সুতরাং বর্ণভেদ প্রহেলিকা মাত্রে পরিণত হইবে। বস্তুতঃ জাতিভেদ প্রথমে ছিল না, মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে।

ভৃগুরুবাচ।

নবিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্ ॥১০

কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়-সাহসাঃ। ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ ॥১১॥

গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ। স্বধর্ম্মান্ নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং-গতাঃ ॥১২॥

হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ। কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ ॥১৩॥

ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ। ধর্ম্মো যজ্ঞক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিষিধ্যতে ॥১৪॥

ইত্যেতে চতুরো বর্ণা যেষাং ব্রাহ্মী সরস্বতী। বিহিতা ব্রাহ্মণা পূর্ব্বং লোভাত্বজ্ঞানতাং গতাঃ ॥ ৫॥

ভৃগু বলিলেন, বর্ণ বা জাতির কোনও বিশেষ অর্থাৎ পার্থক্য নাই, সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময়, তৎকর্ত্তৃক পূর্ব্বে সৃষ্ট। কর্ম্মানুসারে বিভিন্ন বর্ণপ্রাপ্তি হইয়াছে। যে সকল ব্রাহ্মণ কাম-ভোগপ্রিয়, তীক্ষ্ণ ক্রোধপরবশ, সাহসপ্রিয়, স্বধর্ম্মত্যাগশীল, রক্তবর্ণ, তাঁহারা ক্ষত্রত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে। যে সকল ব্রাহ্মণ গোরক্ষাদিবৃত্তি আশ্রয় করিয়াছে, পীতবর্ণ দেহ, কৃষিজীবী, ব্রাহ্মণোচিত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করে না, তাহারা বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যে সকল ব্রাহ্মণ হিংসা ও মিথ্যা পরতন্ত্র, লোভী, শুচিতাবিহীন, সর্ব্বকর্ম্মজীবী, কৃষ্ণবর্ণ, তাহারা শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছে। ইত্যাদি বাক্য আলোচনা করিলে বোধ হয়, প্রথমে একমাত্র ব্রাহ্মণই ছিল, অর্থাৎ জাতিভেদ ছিল না, পরে কর্ম্মানুসারে তাহারাই ক্ষত্রিয়ত্বাদি লাভ করিয়াছে। ইহার অন্যতম প্রমাণ যথা,—

এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ।
দেবো নারায়ণো নান্য একোঽগ্নির্বর্ণ এব চ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের এ বচন হইতে অবগত হওয়া যায়, পূর্ব্বে এক বেদ, এক নারায়ণ দেবতা, এক অগ্নি ও একমাত্র বর্ণ ছিল। বাস্তবিকও এক প্রকারের বহু ব্যক্তি বহু কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া উৎকর্ষ অপকর্ষ লাভ করিলে, উৎকৃষ্ট নিকৃষ্টের জন্য সমাজ স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইবেন; নচেৎ গুণের পূজা এবং দোষের সংশোধন হয় না; তাহাতে সমাজ উচ্ছিন্ন যায়। সমাজের মজ্জাগত দোষ দূর করিতে হইলে উত্তমাধম বিভাগ আবশ্যক হয়। মহাভারত ও ভাগবত মতে বর্ণভেদ সমাজ শাসন বা সম্বর্দ্ধনের জন্য আবশ্যক বলিয়াই হইয়াছিল, এরূপ মনে হয়। গুণ বংশগত হওয়া অত্যন্ত অসঙ্গত নয় বলিয়া, বংশগত জাতিভেদ গুণ-কর্ম্ম জন্য জাতিভেদের ফলস্বরূপ সমাজে দেখা দিয়াছিল। জাতি বংশগত থাকিলে, গুণ-কর্ম্মানুসারে শরীরের বর্ণ-পার্থক্য বিশেষ সম্ভব নয়। ক্ষত্রিয়োচিত আচরণে মহাভারতের দ্রোণগুরু বা কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামার সিত ভিন্ন রক্তবর্ণের উৎপত্তি কোনও স্থানে পাওয়া যাইতেছে না। কর্ম্মত্যাগ এবং অন্য কর্ম্ম গ্রহণ করিলে, শরীরের রঙ সহসা পরিবর্ত্তিত হইবে, ইহার বিশেষ কারণ অনুসন্ধান করিয়া মিলান কষ্টকর।

শরীরের বর্ণে ব্রাহ্মণ না হইলেও কর্ম্মে ব্রাহ্মণ অনেকে ছিলেন। রক্তবর্ণ ব্রাহ্মণ ও শ্বেতবর্ণ ক্ষত্রিয় অসবর্ণ বিবাহের ফল বলিয়া মনে হয়। শরীরের বর্ণ বংশগত সামগ্রী, ভিন্ন বর্ণে বিবাহ হইলে সন্তান অন্যতরবর্ণ হইবে। এইরূপ ত্রিজাতীয় আদান প্রদানে ব্রাহ্মণ রক্ত, পীত হইয়াছিল, ক্ষত্রিয় শ্বেত ও পীত এবং বৈশ্য শ্বেত-রক্ত হইতে পারিয়াছিল বোধ হয়। কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ, রক্তবর্ণ ক্ষত্রিয় হইয়াছিল, শাস্ত্রের এ কথার অর্থ বিবেচ্য। শুধু ক্ষত্রিয় হইয়াছিল বলিলে কর্ম্মানুসারে বর্ণভেদের সমর্থন হইত। রক্তবর্ণ ব্রাহ্মণ ছিল, তাহার প্রমাণ,—

ভরদ্বাজ উবাচ।

চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য বর্ণেন যদি বর্ণো বিভিদ্যতে।
সর্ব্বেষাং খলু বর্ণানাং দৃশ্যতে বর্ণসঙ্করঃ ॥

শরীরের বর্ণানুসারে যদি ব্রাহ্মণাদি জাতি-বিভাগ হয়, তবে সকল বর্ণেরই শারীর বর্ণ সঙ্কর দেখা যাইতেছে। এই বচন পাঠে বুঝা যায়, 'সর্কেষা'' পদ থাকায় চারি বর্ণের বর্ণগত সাঙ্কর্য্য ঘটিয়াছিল ; তাহা হইলে শূদ্রের সহিত ত্রিবর্ণের বিহিত অবিহিত যেমন হউক, শোণিত-সম্বন্ধ সংঘটিত হইয়াছিল অনুমান করা অনুচিত নয়। ভরদ্বাজের সময়ে অবশ্য গুণের আদর ছিল, শরীরের রঙের আদর ছিল না,; তাহা হইলে রক্তবর্ণ ব্রাহ্মণ হইতে পারিত না।

মোটের উপর জাতিভেদের মূলতত্ত্ব শাস্ত্রকারগণ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া ধারণা হয় না। ভাগবতের শূদ্র বিনয়ী, শুচি, সত্যবাদী, গোব্রাহ্মণরক্ষক ও অকপট-প্রভুসেবক, আর মহাভারতের শূদ্র অনাচারী, খাদ্যাখাদ্য-বিচারহীন, সর্ব্বকর্ম্মকারী। সম্ভবতঃ উভয় লক্ষণের লক্ষ্য এক না হইতে পারে। শূদ্র-লক্ষণ যেখানে থাকুক না কেন, তিনি শূদ্র ; ব্রাহ্মণে থাকিলেও ব্রাহ্মণ শূদ্র হইবেন। গুণকর্ম্মের রাজপূজা যুক্তিযুক্ত বটে, কিন্তু সর্ব্বত্র শাস্ত্রবাক্যে যুক্ত্যনুসরণ বৃথা প্রয়াসে পর্য্যবসিত হয়, এই টুকুই সান্ত্বনার স্থান।

শ্রীমদ্ভাগবতে—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদান্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ॥৩৫

পুরুষের জাতিপরিচায়ক যে সকল লক্ষণ বলা হইল, তাহা যদি অন্যত্র অর্থাৎ ভিন্ন জাতিতে দেখা যায়, তাহাহইলে সেই লক্ষণ দ্বারা সেই ব্যক্তিকে তজ্জাতি বলিয়াই নির্দ্দেশ করিবে। ব্রাহ্মণের লক্ষণ যদি বৈশ্য জাতিতে দৃষ্ট হয়, তবে বৈশ্যকেও ব্রাহ্মণ-লক্ষণানুসারে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। কথাটী বড় বিষম। সমাজে অনেক স্থানে অনেক সময় এ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, শাস্ত্রে তাহার প্রমাণের অসদ্ভাব নাই। আরও দেখা যায়—

শূদ্রেচৈতদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ ॥২৮॥

শূদ্রের লক্ষণ যদি শূদ্রে এবং ব্রাহ্মণের লক্ষণ যদি ব্রাহ্মণে না থাকে, তবে সে শূদ্র শূদ্র নহে এবং সে ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ নহে। ব্রাহ্মণের গুণ যদি ব্রাহ্মণে না থাকে, এ কথায় বুঝা যায়, জন্ম-বলে যিনি ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, তাঁহাতে ব্রাহ্মণের গুণ না থাকে। নচেৎ গুণ-কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলে তাহাতে গুণ থাকিবেনা কেন ? গুণকর্ম্ম-বাদীও এখানে জন্মমাহাত্ম্যে ব্রাহ্মণ, শূদ্রাদি হইতে পারিবেনা, এই কথা বলিতেছেন। গুণ থাকিলে জন্মমাহাত্ম্যের আবশ্যকতা নাই, এরূপ বলিলে বুঝা যায়, জন্মানুসারে জাতি-ভেদ প্রচলিত থাকার সময় যৌক্তিকতা অবলম্বন করিয়া গুণকর্ম্মানুসারী জাতিভেদ ব্যবস্থাপিত হয়। অতএব উভয়বিধ জাতি-ভেদ সময়ানুসারে আবশ্যক মতে অবলম্বিত হয়। এইরূপ বুঝিতে বিশেষ বাধা নাই।

গুণ-কর্ম্মের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ অনুসারে বর্ণান্তর-প্রাপ্তির আরও পরিচয় শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,—

তপোবীজ-প্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ॥

মনু তপোবীজপ্রভাবের সহিত "জন্মত"ও লিখিয়াছেন। গৌতম বলেন, "বর্ণান্তর-গমনং উৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাম্।"

গুণোৎকর্ষে উৎকৃষ্ট বর্ণ হওয়া যায়, ইহা মহর্ষিগণের মত।

অত্রিসংহিতায় দেখা যাইতেছে,—

বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজেৎ।
সাংখ্যযোগবিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে॥
অস্ত্রাহতাশ্চ সংগ্রামে ধন্বানঃ সর্ব্বসম্মুখে।
আরম্ভে নির্জ্জিতা যেন স বিপ্রঃ ক্ষত্র উচ্যতে॥
কৃষিকর্ম্মরতো যশ্চ গবাঞ্চ প্রতিপালকঃ।
বাণিজ্যব্যবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্য উচ্যতে॥
লাক্ষা লবণ সম্মিশ্রং কুসাম্ভং ক্ষীরসর্পিষঃ।
বিক্রেতা মধুমাংসানাং সবিপ্রঃ শূদ্র উচ্যতে॥
ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চণ্ডাল উচ্যতে॥

বেদান্তানুশীলনরত, সঙ্গত্যাগী, সাংখ্য-যোগবিচারনিরত, বেদপাঠী ব্যক্তি দ্বিজ। যুদ্ধে অস্ত্রধারী বিপ্র ক্ষত্রিয়; বাণিজ্যশীল, কৃষিকারী গোরক্ষক বিপ্র বৈশ্য, লাক্ষালবণ-মধুমাংস-দধিদুগ্ধাদি বিক্রেতা বিপ্র শূদ্র। ক্রিয়াহীন, মূর্খ, সর্ব্বধর্ম্মবির্জ্জিত, সকল প্রাণীর উপর নির্দ্দয় বিপ্র চণ্ডাল। বেদ-পাঠীই বিপ্র। সংস্কারসম্পন্ন দ্বিজ। এখানে বুঝা গেল, বেদপাঠীও যদি উক্ত হীনকর্ম্মশীল হন, তিনিও শূদ্র বা চণ্ডাল বলিয়া গণ্য। পূর্ব্বে শূদ্রের যে লক্ষণ পাওয়া গিয়াছে, এ লক্ষণ তাহা অপেক্ষা অন্যরূপ। এই লক্ষণে বেদাধ্যায়ীবর্গকে স্বধর্ম্মনিরত হইতে বলা হইয়াছে। না হইলে তাঁহাদিগকে নিম্নবর্ণ বলিয়া গণ্য করা হইবে, এইরূপ ভীতি-প্রদর্শন ব্যতীত এ শ্লোকের অপর কোনও মূল্য আছে, বোধ হয় না। দ্রব্য বিক্রয় বাণিজ্য, তাহা অবলম্বন করিলে বেদাধ্যায়ী শূদ্র হইবে কেন, বুঝা যায় না। নিন্দিত দ্রব্য বিক্রয় বাণিজ্যের বহির্ভূত এবং সেবা-মাত্রাবলম্বী শূদ্রের একটা লক্ষণ, একথা শাস্ত্রের হইতে পারে, কিন্তু বিবেচনায় বলিয়া মনে হয় না। সাংখ্যযোগ-বিচার ব্যাপারটা কি; বুঝিতে হইলে, সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণের লক্ষণ একরূপ লেখা হয় নাই, বলিতে হয়। ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের লক্ষণ স্থির। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের লক্ষণ সময় মত পরিবর্ত্তিত হইত বোধ হয়। এ বিষয়ের বিচার এ প্রবন্ধে সম্ভব নহে। আর একটী বচন আছে "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে। বেদপাঠী ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥" জন্মে শূদ্র হইয়া, সংস্কারের পর নাম দ্বিজ, বেদপাঠে বিপ্র এবং ব্রহ্ম জানিলে ব্রাহ্মণ নামে বিখ্যাত হয়। এ শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝা দুষ্কর। বেদপাঠী ও সংস্কার-সম্পন্ন হইলেও তিনি ব্রাহ্মণ নামের যোগ্য নন, যদি ব্রহ্ম না জানিয়া থাকেন। অন্য-শাস্ত্রের বহুবিধ ব্রাহ্মণলক্ষণ সাংখ্যযোগ-বিচার পর্য্যন্তেও কুলাইল না। ব্রহ্মকে জানা চাই। ব্রাহ্মণ তবে বড় বড় মহর্ষিরাও হইতে পারিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। তাঁহাদেরও অনেকের ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত সামান্য পরিচয় ছিল না, ইহার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। নামজাদা ঋষি মহাশয়েরাও রাজা অশ্বপতির নিকট ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে গিয়াছিলেন। রাজা দেখিলেন, ঋষিরা বেশ বুদ্ধিমান, সুতরাং তাঁহাদিগের উপনয়নাদি না দিয়া কেবল ব্রহ্মজ্ঞানই দিলেন। উপনিষদের

এই সুদীর্ঘ গল্পের অবতারণা করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক। মোটের উপর অলঙ্কারের আতিশয্যে, ও গোঁজামিলের প্রাচুর্য্যে শাস্ত্রের জাতিতত্ত্ব অপরের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য। বহুদিন পরে আলোচনা করিয়া ইহার শৃঙ্খলা সংগ্রহ করা কষ্টকর।

জন্মানুসারে অর্থাৎ বংশগত ও গুণগত জাতিভেদ শাস্ত্রে পাওয়া যায়। বংশগত জাতিভেদ এখনও বিদ্যমান, গুণ-কর্ম্মগত জাতিভেদ দৃষ্টান্ত পুরাণে পাওয়া যায়।

হরিবংশ ২৯ অধ্যায়ে দেখুন—

পুত্রো গৃৎসমদ স্যাপি শুনকো যস্য শৌনকাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ॥

গৃৎসমদের পুত্র শুনক, শুনকের পুত্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হইয়াছিল। এক পিতার পুত্রগণ গুণ-কর্ম্মানুসারে ভিন্ন জাতি হয়, ইহার আরও প্রমাণ আছে। যথা বায়ু পুরাণে—

পুত্রো গৃৎসমদস্য চ শুনকো যস্য শৌনকাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ॥
এতদ্ বংশে সমুদ্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভির্দ্বিজাঃ।

শুনকের বংশে বিভিন্ন কর্ম্ম দ্বারা দ্বিজগণ কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ শূদ্র হইয়াছিল। আরও বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায়—

গৃৎসমদস্য শুনকশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং প্রবর্ত্তয়িতা'ভূৎ।
শুনক চারিবর্ণের প্রবর্ত্তয়িতা হইয়াছিলেন। আরও আছে।—

শৃণু রাজন্ যথা রাজা বীতহব্যো মহাযশাঃ।
রাজর্ষিত্বং প্রাপ্তো ব্রাহ্মণ্যং লোকসৎকৃতম্॥

রাজা বীতহব্য যেরূপে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন্। এ প্রমাণে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হইবার দৃষ্টান্ত মিলিল না কি? আরও হরিবংশ ১১ অধ্যায়ে।—

নাভাগারিষ্ট পুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।

বৈশ্য নাভাগারিষ্টের দুই পুত্র ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ভারতীয় সমাজে সুপরিচিত বিশ্বামিত্র মহোদয় যে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবগত। শাস্ত্রে, তাঁহার দেহ বিনাশ করিয়া পুনর্দ্দেহে ব্রাহ্মণত্ব লাভ কথিত আছে। সেরূপ অদ্ভুত কর্ম্ম সম্ভব বা অসম্ভব, তাহা এখানে আলোচ্য না হইলেও বুঝা যায়, ঐ টুকু বংশগত জাতিভেদের খাতিরে গোঁজামিল। বর্ত্তমান যুগেও কৌলিন্য-প্রথার কুবাতাসে কত নিম্নজাতি, ঘটকের অঘটন ঘটাইবার ক্ষমতায়, রজতচন্দ্রের কল্যাণে একেবারে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ হইয়াছে! তবে ইহাতে গুণ-কর্ম্মের কিছু নাই; আর এ নিম্নতা গোপনে রক্ষিত হইয়াছিল, এই মাত্র পার্থক্য। এখনও—অল্পদিনের কথা,—

"* * * আমি যে কৈবর্ত্ত সেই কৈবর্ত্ত।" ইত্যাদি শ্লোক আবালবৃদ্ধ বঙ্গীয় জনের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। ভারতের শুভাদৃষ্টবশতঃ ভারতীয় সমাজের উদরাগ্নিতে অনেক কোটি বৌদ্ধ জাতিভেদ ত্যাগী ব্যক্তির গুণ-কর্ম্ম-জন্ম সবই পরিপাক পাইতে পারিয়াছে! বংশগত জাতিভেদ যে কতরূপে তিরস্কৃত হইয়াছে, তাহা অল্পদিন পূর্ব্বের "ভরার মেয়ে বিবাহে" অনেক বুঝা যায়। ব্যভিচারের কথা বলিতে চাহি না। গুণ, কর্ম্ম এবং জন্ম, এই মাত্র শাস্ত্রীয় জাতিভেদের নিদান। তাহার কোনওটী বর্ত্তমান

সমাজে অক্ষুণ্ণ নহে; সুতরাং বর্ত্তমান জাতিভেদ, না জন্মানুসারে, না গুণ-কর্ম্মানুসারে; বস্তুতঃ অশাস্ত্রীয়; যেহেতু শাস্ত্রে ঐ উভয়বিধ ব্যতীত অন্য উপায়ে জাতিভেদ সমর্থিত হয় নাই।

শাস্ত্রের জাতিভেদে যুক্তি আছে কি না, তাহা আমরা এখন দেখাইব। সম্প্রতি দেখা যায়, গুণ, কর্ম্ম এবং জন্মানুসারে জাতিভেদ হইয়াছিল, ইহা শাস্ত্রে আছে।

যখন দেশের আকাশে স্বাধীনতার পতাকা পত্‌পত্ রবে উড্ডীন থাকে, তখন দেশীয় ব্যক্তিবর্গের চতুর্দ্ধাবিভাগ নিতান্ত অসঙ্গত নয়। ব্রাহ্মণশ্রেণী জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনা দ্বারা দেশের মহোপকার সাধন করিতেন। ক্ষত্রিয়-শক্তি বাহুবলে অস্ত্রতেজে স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও প্রকৃতিপুঞ্জের শান্তি সংস্থাপনে প্রয়াস পাইতেন। বৈশ্য জাতি ধন-ধান্য দ্বারা দেশ সমৃদ্ধ রাখিতেন। বাণিজ্য ও গো-রক্ষায় দেশের অসংখ্য অভাব পূরণ ও বিদেশীয় বিজাতীয় উন্নতির অংশ গ্রহণ করাতে বিবিধ হিত সাধন হইত এবং কৃষিবল অক্ষুণ্ণ থাকিত। এই তিন সম্প্রদায়ই দেশের কর্ম্মযোগী। চতুর্থ শূদ্রগণ জ্ঞানচর্চ্চা, রাজনীতি, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতির অযোগ্য বলিয়া কেবল ত্রিবর্ণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিত। দেশে যখন শান্তির সুবাতাস বহিতে থাকে, তখন এই অপূর্ব্ব প্রথাই দেশের অশেষ মঙ্গল নিদান হয়। বিদেশীয় বিজাতীয় জনের নিকট পরাজিত পদদলিত ঘৃণিত দেশের পক্ষে ক্ষত্রিয়-শক্তি স্বপ্নদর্শন। কৃষি-বাণিজ্য আবশ্যক, কিন্তু তাহাকেও বর্ত্তমান সমাজ উদর-পোষণ করিতে পারিতেছেনা। গ্রাসাচ্ছাদন নিষ্পন্ন হওয়াও যখন কৃষি-বাণিজ্য দ্বারা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে, তখন দেশের বৈশ্য-বল বৃথা হইয়া গিয়াছে। শূদ্রকর্ম্ম পরিচর্য্যা। এখন সকলেরই তাহাই সম্বল; কিন্তু ইহাতে জাতীয় জীবন উন্নতির স্রোতে নীত হয় না; অতএব রন্ধনকারী 'পশ্চিমে ব্রাহ্মণ' কায়স্থ প্রভুর পদমর্দ্দন করুক, আর কায়স্থ স্বজাতি অথবা পরজাতির বাটীতে খানসামাগিরিই করুক, কিছুতেই দেশের জাতীয় উপকারের প্রত্যাশা নাই। অধিকন্তু উদরান্ন সংস্থানের সম্ভাবনা থাকিলেও, স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা অতিক্রম করেন নাই; এই জন্য শ্বেতাঙ্গ, গৌরাঙ্গ, কাহারও সেবায় আমাদের জাতিভেদের মর্ম্ম রক্ষিত হইতেছে না। ব্রাহ্মণবল এখন কেবল সমাজের গলগণ্ডে দিব্য টিক মাত্র। যে জ্ঞানের আলোচনায়, যে দর্শন-বিজ্ঞানের গৌরবে, যে গণিতের, যে সমাজনীতির—অর্থনীতির মাহাত্ম্যে ভারতের নাম জগতের মুখে শুনা যায়, যে জন্য ভারত জগতের সম্মানার্হ, যে ধর্ম্মবিজ্ঞানে ভারত সমগ্র সভ্যজগতের আচার্য্য, সেই জ্ঞান, সেই শক্তি ব্রাহ্মণ-শক্তি। সেই শক্তি কুশিক্ষায়—কুদীক্ষায়, অনাচারে, অত্যাচারে, ব্যভিচারে, ভারতের ভবিষ্যৎ আশা কলঙ্কিত করিয়া, সেই কলঙ্ক-মসী স্বীয় গাত্রে মাখিয়া মলিন দীন ক্ষীণ পরাধীন হইয়াছে। বলিতে গেলে, এক কথায়—ভারতের জাতীয় জীবনের মূলদেশ দৃঢ়রূপে আঘাতিত, এমন কি—অকর্ম্মণ্য অবস্থায় অবস্থিত। সুতরাং ভারতীয় বর্ত্তমান সমাজে শাস্ত্রোক্ত উভয়বিধ জাতিভেদই

বিড়ম্বনা ব্যতীত কিছু নয়। আমরা বর্ত্তমান কালোপযোগী জাতিভেদ বুঝিবার জন্য শাস্ত্রীয় জাতিভেদের যৌক্তিকতা ও মৌলিকতা এবং বর্ত্তমান জাতিভেদের মৌলিকতা বিচার করিব। পরে উহার পরিণাম চিন্তা করিয়া, এই প্রবন্ধের অবসানে উপস্থিত হইব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনির্ম্মলানন্দ ভারতী।
যশোহর।

আপস্তম্বীয় গৃহ্যসূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

ব্রহ্মচারীর কেশবপন ব্যাপার পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে, সম্প্রতি তাহার প্রকার-বিশেষ প্রতিপাদিত হইতেছে। আপস্তম্ব বলিতেছেন,—

দক্ষিণতো মাতা ব্রহ্মচারীবানডুহে শকৃৎপিণ্ডে যবান্ নিধায় তস্মিন্ কেশান্ উপযম্য উত্তরয়া উদুম্বরমূলে দর্ভস্তম্বে বা নিদধাতি। ৮

যে ব্রহ্মচারীর কেশবপন করা হইতেছে, তাহার মাতা অথবা অন্য কোনও ব্রহ্মচর্য্য-সম্পন্ন ব্যক্তি তাহার দক্ষিণদিকে উপবেশন করিয়া, কোন পাত্রে বৃষগোময়পিণ্ড স্থাপন করিয়া, তাহাতে কতকগুলি যব ছড়াইয়া দিবেন; এবং ঐ পাত্রে কেশসমূহ উপযমন পূর্ব্বক "উপ্ত্বায়কেশান্" ইত্যাদি ঋক্মন্ত্রদ্বারা উদুম্বরমূল বা কুশস্তম্বে কেশরাশি রক্ষণ করিবেন। কুমারের মস্তকমুণ্ডন ব্যাপারে মন্ত্রপাঠ আবশ্যক। যদি কুমারের মাতা এই কার্য্যে প্রস্তুত হন, তবে অপর যে কেহ তাঁহাকে মন্ত্র পড়াইয়া দিবেন। ব্রহ্মচর্য্যবান্ ব্রাহ্মণ হইলে, তিনি স্বাধ্যায়শীল, সুতরাং তাঁহাকে অপরের পড়াইবার অপেক্ষা নাই।

স্নাতমগ্নেরুপসমাধানাদ্যাজ্যভাগান্তে পালাশীংসমিধমুত্তরয়াধাপ্য উত্তরেণাগ্নিং দক্ষিণেন পদাশ্মানমাস্থাপয়তি আতিষ্ঠেতি। ৯

কেশবপনানন্তর স্নাত অলঙ্কৃত বদ্ধশিখ সুবাসা কুমারকে "যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা যজ্ঞোপবীত প্রদান করিবে। তৎপরে অগ্নির উপসমাধান হইতে আরম্ভ করিয়া, আজ্যভাগহোম পর্য্যন্ত শ্রৌতসূত্র-প্রতিপাদিত কার্য্যসকল সম্পন্ন করিয়া, পরে কুমারের দ্বারা পলাশনির্ম্মিত সমিধ প্রদান করাইবেন। আচার্য্য মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক (আয়ুর্দাদেব ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক) কুমারের দ্বারা সমিধ্ প্রদান করাইবেন। মতান্তরে কুমার মন্ত্রপাঠ করিবে, আচার্য্য তাহাকে পড়াইবেন। পাঠের পর অগ্নির উত্তরদিকে স্থাপিতশিলা দক্ষিণচরণের দ্বারা ব্রহ্মচারী আক্রমণ করিবেন; এই সময় আচার্য্য ব্রহ্মচারীকে লক্ষ্য করিয়া "আতিষ্ঠেমং" ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ করিবেন। সূত্রে "স্নাতং" এই কথাটীর দ্বারা যজ্ঞোপবীত প্রদানাদি সমস্ত কর্ম্মের কথা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে, ইহা বৃত্তিকার হরদত্ত স্বামীর অভিপ্রায়। তিনি বলিতেছেন, "ততস্তং যজ্ঞোপবীতিনং দেবযজনমপয়নতি

ইতি বোধায়নঃ, তত্সর্ব্বস্ত উপলক্ষণং স্নাতবচনং।" বোধায়ন বলেন, অনন্তর যজ্ঞোপবীতীকে দেবযজনে উপনয়ন করিবে; সুতরাং এ সূত্রে দেবযজন উপনয়নের পূর্ব্বে যে স্নানের কথা বলা হইয়াছে, তাহাই 'যজ্ঞোপবীতদানাদির উপলক্ষক। কেশবপনের পরেই স্নান করান, এবং সুবাস পরিধান পূর্ব্বক ব্রহ্মচারিরূপ ধারণ, ও তদনন্তর যজনস্থানে আচ্ছাদিত দেহে গমন, উপবীত ধারণ, এই সকল কার্য্যের পরেই সমিৎপ্রদানাদি কার্য্য সম্পাদিত হইতে দেখা যায়। ইহার মধ্যে কুমারকে আচমন করাইবার কথা বলা হয় নাই; কিন্তু বোধায়ন-গৃহ্যসূত্রমতে তাহাও স্নানের পর যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া করিতে হইবে। বৌধায়ন বলিতেছেন, "যজ্ঞোপবীতিনং অপ আচময্য দেবযজনমুপনয়তি" অর্থাৎ যজ্ঞোপবীতধারী ব্রহ্মচারীকে জল দ্বারা আচমন করাইয়া দেবযজন জন্যে লইয়া যাইবে।

অশ্মারোহণের সময় হরদত্তমতে আচার্য্য মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ব্রহ্মচারীর দক্ষিণপদ দুইহাতে ধরিয়া লইয়া তাহাকে শিলায় উঠাইয়া দিবেন। ব্যবহার-বুদ্ধিতে ইহা বড়ই বিসদৃশ দৃশ্য, তবে পরিবর্ত্তনশীল ব্যবহারিক জগতে হয়ত কোনওকালে এরূপ প্রথাও প্রচলিত ছিল। শাস্ত্র স্পষ্টাক্ষরে একথা বলেন নাই, তথাপি যখন হরদত্ত বলিয়াছেন, তখন হরদত্তের সমসাময়িক ব্যবহার-বৃত্তান্তে তৎকালীন সমাজের একটা চিত্র ইহা হইতে গ্রহণ করা নিতান্ত অন্যায় নহে। সাধারণের অবগতির জন্য হরদত্তের বাক্যটুকু উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না। হরদত্ত বলেন "আচার্য্যো মন্ত্রমুক্ত্বা দক্ষিণং পদং হস্তাভ্যাং গৃহীত্বা অশ্মনি নিধাপয়তি।"

বাসঃসদ্যঃকৃত্তোতমুত্তরাভ্যামভিমন্ত্র্য উত্তরাভিস্তিসৃভিঃ পরিধাপ্য পরিহিতং উত্তরয়ানুমন্ত্রয়তে। ১০

"সদ্যঃকৃত্তোতবস্ত্র রেবতীস্ত্বা" ইত্যাদিমন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া 'যা অকৃন্তন' ইত্যাদি তিনটী মন্ত্রপাঠ করিয়া পরিধান করাইবে এবং 'পরীদং বাসঃ' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা সদ্যঃকৃত্তোতবস্ত্র পরিধানকারী ব্রহ্মচারীকে অভিমন্ত্রিত করিবে। যে বস্ত্র সদ্যঃকৃত্তোত নামে এই সূত্রে অভিহিত হইয়াছে, তাহার সূত্রনির্ম্মাণ ও বয়নক্রিয়া একই দিনে করিতে হইবে, এইরূপ কথা হরদত্ত বলিয়াছেন।

সদ্যঃকৃত্তোত শব্দের অর্থ সদ্যনিষ্পন্ন সূত্রজাত বসন। এইরূপ বস্ত্র পরিধান করিতে সম্প্রতি দেখা যায় না। অস্মদ্দেশে ইহার স্থানে বহুমূল্য পট্টবস্ত্রই ব্যবহৃত হইতে চলিয়াছে; তবে পূর্ব্ববঙ্গে কোনও কোনও স্থানে "জোলার কাপড়" ব্যবহৃত হইয়া থাকে, শুনিয়াছি। অনুসন্ধিৎসু পাঠক উপনয়নার্থ ব্রহ্মচারীর পরিধেয়রূপে "জোলার কাপড়" পূর্ব্ববঙ্গে ব্যবহৃত হয় কিনা, জানিতে পারিবেন; দীন লেখকের পূর্ব্ববঙ্গের অভিজ্ঞতা অতল্প মাত্রই সম্বল, সুতরাং শ্রুতমাত্র বিষয়ে বিশেষ নির্ভর করা চলে না।

মৌঞ্জীং মেখলাং ত্রিবৃত্তাং ত্রিঃ প্রদক্ষিণং উত্তরাভ্যাং পরিবীয়াজিনমুত্তরমুত্তরয়া॥১১॥

অনন্তর আচার্য্য কুমারকে মুঞ্জনির্ম্মিত মেখলা দ্বারা 'দুরুক্তাৎ' ইত্যাদি

মন্ত্রপাঠ সহকারে তিনবার প্রদক্ষিণ পরিবাস করিবেন। মেখলা ত্রিবৃতা, অর্থাৎ ত্রিরাবৃত্তা, তিন তারওয়ালা। এই মেখলা ধারণ করিবার মন্ত্র বলা হইল। অজিন অর্থাৎ কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম "অজিনং কৃষ্ণং ব্রাহ্মণস্য" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা ধারণ করাইবেন। মেখলা ও অজিনধারণ বিনিযুক্ত মন্ত্র কুমার পাঠ করিবেন, আচার্য্য স্বয়ং তাহাকে পড়াইবেন। মেখলা ধারণ সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে, কিন্তু কোথাও মুঞ্জনির্ম্মিত, কোথাওবা কুশনির্ম্মিত মেখলা ধারণ করা হইয়া থাকে। অজিনধারণ এখন সংক্ষিপ্ত ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। একটী সূত্ররচিত যজ্ঞোপবীতের একস্থানে একটী সর্ষপপরিমাণ চর্ম্মের টুকরা বাঁধিয়া তাহাই ধারণ করা হয়। ঐ চর্ম্মটুকু প্রায়ই যজমানকে সংগ্রহ করিতে হয় না। পুরোহিত ঠাকুরের পুঁথির গাত্রে উহার বড় একটা টুকরা সহস্র ব্রাহ্মণ-সন্তানের যজ্ঞোপবীত পবিত্র করিবার জন্য বহুকাল হইতেই বাঁধা থাকে, তদ্দ্বারাই কার্য্য সম্পন্ন হয়। আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যার হিন্দু-পত্রিকায় উপনয়ন-প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি, কৃষ্ণাজিন ধারণের উদ্দেশ্য এবং শাস্ত্রীয়তা কি। সম্প্রতি অজ্ঞাতপূতাস্থ চর্ম্মখণ্ডবিশেষ সূত্রে নিবদ্ধ হইয়া উহার মহিমা এবং কুসংস্কারের প্রাবল্য ও শাস্ত্রমর্ম্মের অবমাননার প্রমাণ স্পষ্টরূপে উপস্থিত করিতেছে। অধঃপতিত সমাজ আর কৌলিক মার্জ্জার-বন্ধন প্রথার অনুসরণ না করিয়া পারিবে কেন? উদ্দেশ্য ভুল হইলে কাজটা একটা খেলার সামগ্রী হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের সংস্কারানুষ্ঠানাদি বিকৃত হইতে হইতে একেবারেই কিছু নয় মত হইয়া পড়িয়াছে; আমাদের এদিকে লক্ষ্য নাই। শাস্ত্রমর্ম্ম উদ্ঘাটন, প্রাচীন প্রথা-পদ্ধতির অনুসরণ ও তাহার মৌলিক সত্যাবিষ্কার এখন পণ্ডিত-সমাজের কর্ত্তব্যের বাহিরে গিয়াছে। এখন 'বিদায়' ভিন্ন অন্যদিকে লক্ষ্য নিক্ষেপের সময় নাই। হা আর্য্যাচার! তুমি এখনও হতভাগ্য সমাজের উপর করুণাকটাক্ষপাত কর।

উত্তরেণাগ্নিং দর্ভান্ সংস্তীর্য্য তেষ্বেনমুত্তরয়াবস্থাপ্যোদকাঞ্জলিমাস্যা অঞ্জলাবানীয় উত্তরয়া ত্রিঃ প্রোক্ষ্য উত্তরৈর্দক্ষিণে হস্তে গৃহীত্বা উত্তরৈ দেবতাভ্যঃ পরীদায়োত্তরেণ যজুষা উপনীয় সুপ্রজা ইতি দক্ষিণে কর্ণে জপতি ১২

অনন্তর আচার্য্য অগ্নির উত্তরদিকে কুশ বিস্তৃত করিয়া সেই কুশসমূহের উপরিভাগে উপনেতব্য কুমারকে অবস্থিত করাইবেন। তৎকালে আচার্য্য "আগন্ত্রা সমগন্মহীং" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিবেন। কুমারকে কুশে বসাইয়া, নিজে ভূমিতে অবস্থান করিয়া, নিজের হস্তের অঞ্জলি জলদ্বারা পূর্ণ করিয়া, সেই জলাঞ্জলি কুমারের হস্তে দিবেন। অনন্তর ঐ জলাঞ্জলিদ্বারা "সমুদ্রাদূর্ম্মিঃ" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক তিনবার প্রোক্ষণ করিতে হইবে। (প্রোক্ষণ শব্দের অর্থ জল ছিটাইয়া দেওয়া।) অনন্তর ব্রহ্মচারীকে দক্ষিণহস্তে ধারণ করিয়া আচার্য্য "অগ্নিষ্টে হস্তমগ্রহীৎ" ইত্যাদি দশমন্ত্র পাঠ করিবেন। কুমার আচার্য্যের অনুমতিমতে স্বপাঠ্য মন্ত্র পড়ি-

বেন। তৎপরে তাহাকে "অগ্নয়েত্বা পরিদদামি" ইত্যাদি একাদশমন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক দেবতাদিগকে দান করিবেন। তদনন্তর "দেবস্যত্বা সবিতুঃ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা উপনয়ন করিবে। হরদত্ত বলেন "যজুরুচ্চারণমেব তত্র ব্যাপারো নান্যঃকশ্চিৎ"। এখানে যজুর্বেদীয় "দেবস্যত্বা" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ ব্যতীত আর কিছুই করিতে হইবে না।

পূর্ব্বকালে ব্রহ্মচারীকে এই মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক গুরুকুলে লইয়া যাওয়া হইত; হরদত্তের সময়ে গুরুগৃহে বাস প্রথা বিলুপ্ত হইয়া স্বগৃহে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করা প্রচলিত হইয়াছিল, কাজেই তিনি লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, মন্ত্রপাঠ ভিন্ন কিছু করিতে হইবে না।

উপনয়নের পর ব্রহ্মচারীর দক্ষিণকর্ণে আচার্য্য 'সুপ্রজা' ইত্যাদি মন্ত্রজপ করিবেন। উপনয়ন কথার অর্থ গুরুগৃহে শিক্ষার্থ লইয়া যাওয়া, একথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সম্প্রতি অস্মদ্দেশে কোন কোন প্রদেশে গুরুগৃহবাস ও বেদপাঠ প্রচলিত নাই, তবে স্থানে স্থানে দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে দুইচারি লোকে বেদপারায়ণ দেখা যায়। ভারতের অন্যস্থলে ইহা প্রচলিত নাই; সুতরাং উপনয়ন এখন নাই, তবে উপনয়নকালে যে সকল যাগদানাদি ও পূজার্চ্চনাদি অনুষ্ঠিত হইত, ভারতের প্রদেশসকলে ব্রাহ্মণ-সন্তানেরা অদ্যাপি তাহাদের যথাকথঞ্চিৎ বিকৃত নিয়ম সকল ও পূজাদির অনুষ্ঠান করিয়া ঐ প্রথার স্মৃতি জাগাইতেছেন।

দশমখণ্ড
সম্পূর্ণ

একাদশখণ্ড, চতুর্থপটল।

এইখণ্ড উপনয়নের প্রকৃত মৌলিক উদ্দেশ্য বিবৃত হইতেছে। উপনয়ন কেবল ব্রহ্মচর্য্য বা বেদাধ্যয়নের সূচনা করিয়া দেয়, তজ্জন্যই এই সংস্কারের এত গৌরব। জীবনে ব্রহ্মচর্য্যই পবিত্রতার জনক—ব্রহ্মজ্যোতির আবির্ভাবসম্পাদক। এতক্ষণ এই প্রধান কার্য্যের জীবনোন্নয়নের—জ্ঞানবিকাশের এই মূল রহস্যের পূর্ব্বকার্য্য সকলই কথিত হইতেছিল, এই সূত্রে সেই ব্রহ্মচর্য্য-বৃত্তান্তের পরিচয় দেওয়া হইবে। গুর্ব্বভিবাদন ইহার "প্রারম্ভ।" আপস্তম্ব দেখাইতেছেন,——

ব্রহ্মচর্য্যমাগামিতি কুমার আহ।১

কুমার গুরুগৃহে গিয়া" ব্রহ্মচর্য্যমাগাং" ইত্যাদি "সবিত্রাপ্রসূত" ইত্যন্ত মন্ত্র উচ্চরবে উচ্চারণ করিবে। হরদত্ত বলেন "আহ" কথাটির অর্থ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করা।

পৃষ্টং পরস্য প্রতিবচনং কুমারস্য।২

'কোনামাসি' ইত্যাদি মন্ত্ররূপ আচার্য্যের প্রশ্নে, 'শ্রীঅমুকনামাস্মি' এইরূপ কুমার প্রতিবচন প্রদান করিবেন। আচার্য্য পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিবেন "কস্য ব্রহ্মচার্য্যসি অমুক!" (ওহে! তুমি কাহার ব্রহ্মচারী? এইরূপ অর্থ।) ব্রহ্মচারী বলিবেন, "প্রাণস্য ব্রহ্মচার্য্যস্মি।" (আমি প্রাণের ব্রহ্মচারী) এক কথায় সূত্রের অর্থ বলিতে হইলে বলিতে হইবে, "কোনামাসি" ইত্যাদি প্রশ্নোত্তর বোধক চারিটী মন্ত্রের মধ্যে প্রশ্নবোধক মন্ত্র আচার্য্যের প্রশ্ন এবং উত্তরবোধক মন্ত্র কুমারের প্রত্যুত্তর বলিয়া বুঝিতে হইবে। গৃহ্যসূত্রে সাধারণতঃ মন্ত্রবিনিয়োগ-

প্রণালীর অনুসরণ করায় ক্রিয়া-প্রতিপাদনের ক্রম-ভঙ্গ হয়।

শেষং পরো জপতি।৩।

শেষ অর্থাৎ অনুবাক শেষ পর্য্যন্ত মন্ত্র আচার্য্য পাঠ করিবেন। সুদর্শনাচার্য্যের-মতে শেষ অর্থ অনুবাকশেষৈকদেশ "বিষ্ণুশর্ম্মবত্তে দেব" ইত্যাদি "অমুসঙ্কর বিষ্ণুশর্ম্মন্" ইত্যন্ত মন্ত্রই আচার্য্যের পাঠ্য।

প্রত্যগাশীষং চৈনং বাচয়তি ৪

তৎপরে আচার্য্য কুমারকে প্রত্যগাশীমন্ত্র পড়াইবেন। "অধ্বনামধ্বপতে" ইত্যাদি মন্ত্রই প্রত্যাগাশীর্মন্ত্র, এইরূপ হরদত্ত বলেন। সুদর্শনাচার্য্য বলেন, 'অধ্বনাঃ" ইত্যাদি মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া উপনয়ন-সমাপ্তি পর্য্যন্ত "যোগেযোগঃ" ইত্যাদি যে সকল প্রত্যগাশীর্মন্ত্র অর্থাৎ আত্মগামী আশীর্ব্বাদবোধকমন্ত্র আছে, তাহা সকলই পাঠ করাইতে হইবে। আচার্য্য নিজে পাঠ করিবেন, কুমার শ্রবণ করিয়া অনুচ্চারণ করিবেন।

উক্তমাজ্যভাগান্তং।৫

আজ্যভাগান্ত উক্ত করিয়া পশ্চাৎ যে প্রত্যগাশীর্মন্ত্র মেখলা পরিধাপনাদি ব্যাপারে উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই "ইয়ং দুরুক্তাৎ" ইত্যাদি মন্ত্রও পাঠ করাইতে হইবে, ইহাই সূত্রার্থ।

অর্থৈনমুত্তরা আহুতীর্হাবয়িত্বা জয়াদি প্রতিপদ্যতে।৬।

প্রত্যগাশীর্ব্বাচনের পর "যোগেযোগঃ" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ সহকৃত একাদশটী প্রধানাহুতি আচার্য্য কুমারের দ্বারা প্রদান করাইবেন। প্রকৃতপক্ষে কুমার ঐ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ঐ একাদশটী প্রধান আহুতি দিবে আচার্য্য কেবল প্রযোজককর্ত্তা মাত্র। মন্ত্র পড়াইয়া দিলেই তাঁহার প্রযোজকত্ব সিদ্ধি হইল। একাদশ আহুতি শেষ হইলে, আচার্য্য স্বয়ংই জয়াদিহোম সম্পাদন করিবেন। এখানে ব্রহ্মচারীর দ্বারা করাইলে চলিবে না।

পরিষেচনান্তং কৃত্বা অপরেণাগ্নিমুদগগ্রং-কূর্চং নিধায় তস্মিন্ উত্তরেণ যজুষোপনেতোপবিশতি।৭

জয়াদিহোম ও পরিষেচনান্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া, অগ্নির অপরদিকে কূর্চনামক কুশময় আসন স্থাপন করিয়া, 'রাষ্ট্রভৃদসি' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক আচার্য্য ঐ কূর্চাসনে উপবেশন করিবেন।

পুরস্তাৎ প্রত্যঙ্ভাসীনঃ কুমারো দক্ষিণেন পাণিনা দক্ষিণং পাদমন্বারভ্যাহ সাবিত্রীংভো-অনুব্রূহীতি।৮।

আচার্য্যের সম্মুখে প্রত্যঙ্মুখ উপবিষ্ট কুমার দক্ষিণকরদ্বারা আচার্য্যের দক্ষিণ-চরণ ধারণ করিয়া বিনীতভাবে বলিবে, "সাবিত্রীংভোঅনুব্রূহি।" (সাবিত্রী মন্ত্রটী আমাকে একবার বলুন, এইরূপ অর্থ।) সাবিত্রী মন্ত্র গ্রহণই উপনয়নের দীক্ষাংশ। সবিতা অর্থ সূর্য্য অথবা জগৎপ্রসবকর্ত্তা পরমেশ্বর পরব্রহ্ম, তৎসম্বন্ধী মন্ত্রকেই সাবিত্রী মন্ত্র বলা সঙ্গত। আমরা দেখিতে পাই গায়ত্রী মন্ত্রই সাবিত্রী মন্ত্র নামে আখ্যাত হয়। এই মন্ত্রে সেই শ্রেষ্ঠাৎশ্রেষ্ঠতর জগৎ-প্রসবকর্ত্তার মহামহিম তেজঃ, মহিমা অথবা অলৌকিকজ্যোতি একমাত্র ধ্যেয় পদার্থ রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেই পরম

তেজঃ যে জীবজ্ঞানের বিবেকবুদ্ধির প্রণোদক, ইহাও ঐ মন্ত্রে ব্যক্ত হইয়াছে, এজন্য এই মন্ত্রকে পণ্ডিতেরা সাবিত্রীমন্ত্রই বলেন। সাবিত্রী বেদত্রয়ের সারসংকলন। ইহাই সর্ব্বপ্রথম শ্রোতব্য এবং শিক্ষণীয়। বেদাধ্যায়ী বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য পরমেশ্বরের পরমজ্যোতির বিষয়ই সর্ব্বপ্রথমে জানিয়া, পরে বেদবিচার-বেদাধ্যয়নে ব্যাপৃত হইলে, কোনমতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবেন না, এইজন্যই সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বসারভূত ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ তাঁহাকে দেওয়া হইতেছে। প্রকৃত বিদ্যা বা জ্ঞান হিন্দুশাস্ত্রের মতে ব্রহ্মজ্ঞান, সুতরাং সর্ব্বাগ্রে সেই উপদেশই অপেক্ষিত, অতএব সর্ব্বতোভাবেই প্রথমে সাবিত্রী শিক্ষা করা সঙ্গত। প্রথমে মূলতত্ত্ব বুঝাইয়া দিলে, আর কেহ সহসা ভ্রমে পতিত হয় না।

তস্মা অন্বাহ তৎসবিতুরিতি ॥৯

ব্রহ্মচারী সাবিত্রী শুনিতে চাহিলে, আচার্য্য তাঁহাকে "তৎসবিতুঃ" ইত্যাদি সাবিত্রী মন্ত্র অর্থাৎ সবিতৃদৈবত ঋক্ মন্ত্র উপদেশ দিবেন। এই "তৎসবিতুঃ" ইত্যাদি মন্ত্র কিরূপে পড়াইবেন, তাহার প্রণালী কথিত হইতেছে। প্রথম শিশিক্ষু কুমার একেবারে সমগ্র মন্ত্রটী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে কিনা, এই আশঙ্কায় উহা অংশ অংশ করিয়া ক্রমে ক্রমে শিখাইয়া, পরে সমগ্র মন্ত্র পাঠ করান উচিত বিবেচনা করিয়াই মহর্ষি আপস্তম্ব উহার প্রণালী লিপিবদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

পচ্ছোঽর্দ্ধর্চ্চশস্ততঃ সর্ব্বাং। ১০।

প্রথম 'পচ্ছঃ, অর্থাৎ পাদে পাদে পরিসমাপ্তি করিয়া। একপাদ একপাদ ভিন্ন ভিন্ন বারে উচ্চারণ করিয়া, পরে "অর্দ্ধর্চ্চশঃ" অর্থাৎ সমগ্র ঋক্‌টীর অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক একএকবারে উচ্চারণ করিয়া, অনন্তর সমগ্র মন্ত্রটী একেবারে উচ্চারণ করিতে হইবে। ইহাই "তৎসবিতুঃ" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠের ক্রম।

এই পাঠের বিশেষ নিয়ম বর্ত্তমান সূত্রে বলা হইতেছে,—

ব্যাহৃতীর্বিহৃতাঃ পাদাদিষন্তেষু বা ।১১।

প্রথমে যেবার এক একপাদ করিয়া পাঠ করিতে হইবে, সেইবারে প্রত্যেক পাদের শেষে অথবা প্রথমে একএকটী ব্যাহৃতি সংযোগ করিয়া পাঠ করিতে হইবে।

অর্দ্ধ অর্দ্ধ করিয়া পাঠের সময় এবং সমস্ত পাঠ কালে কিরূপে ব্যাহৃতিযোগ করিতে হইবে, তাহা এতৎসূত্রে মহর্ষি আপস্তম্ব বলিতেছেন।

তথার্দ্ধর্চ্চয়োরুত্তমাং কৃৎস্নায়াম্।১২

দ্বিতীয়বার পাঠকালে অর্থাৎ যেবার অর্দ্ধর্চ্চ অর্দ্ধর্চ্চ করিয়া পাঠ করিতে হইবে, সেবার অর্দ্ধর্চ্চ দুইটীর পূর্ব্বে বা পশ্চাতে প্রথম দুইটী ব্যাহৃতি যথাক্রমে যোগ করিয়া পাঠ করিতে হইবে। আর অবশিষ্ট তৃতীয় ব্যাহৃতিটী সমগ্র মন্ত্রপাঠ সময়ে সংযোগ করিতে হইবে। প্রত্যেকবার পাঠকালেই সর্ব্বসারভূত প্রণব অর্থাৎ "ওঁ" এই বাক্যটী সর্ব্বাগ্রে যোজনা করিতে হইবে। এখন পাঠের রীতি হইল "ওঁ ভূঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং" "ওঁ ভুবঃ ভর্গোদেবস্য ধীমহি" "ওঁ স্বঃ ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ" এইরূপ

প্রথমপাদশঃ পাঠকালে। "ওঁ ভূঃ তৎসবিতু-র্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি" "ওঁভূবঃ ধিয়ো-য়োনঃ প্রচোদয়াৎ" এইরূপ দ্বিতীয়বার পাঠসময়ে। তৃতীয়বার পাঠ সময়ে "ওঁ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ।" এইরূপ ক্রম ঋগ্বেদীয়গণের সাবিত্রীপাঠে ব্যবহৃত হয়, অন্যবেদীয় প্রথায় শাখান্তরে ব্যাহৃতিপাঠে একটু বিশেষত্ব কদাচিৎ উপলব্ধ হয়, বিস্তারভয়ে সে সকল বিধান বিবেচিত হইল না। বৃত্তিকার হরদত্ত এইরূপ ক্রমপ্রণালী উল্লেখ করিয়াছেন; তাঁহার বাক্য হইতেই আমরা রীতি অনুবাদ করিলাম। সুধীগণ জানিবেন, সুদর্শনাচার্য্য এখানে অন্যপ্রকার মত অবলম্বন করেন নাই, এইমতেই অনু-মোদন করিয়াছেন।

কুমার উত্তরেণ মন্ত্রেণোত্তরমোষ্ঠমুপ-স্পৃশতে।১৩

অনন্তর সেই স্থানে উপবিষ্ট কুমার "অবৃধমসৌ" ইত্যাদি উত্তরমন্ত্র দ্বারা নিজের ওষ্ঠ উপস্পর্শন করিবে। মন্ত্রে যে 'অসৌ' শব্দটী রহিয়াছে, তাহার অর্থ প্রাণ কুমার বা আচার্য্য কেহই এই 'অসৌ' শব্দের বাচ্য নহে। যদি কুমার হইত, তাহাহইলে নামোল্লেখ করা হইত, অর্থাৎ 'অসৌ' শব্দের স্থানে কুমারের নামটী নিবেশ করিয়া, সেই কুমার নামযুক্ত মন্ত্রটী পাঠ করিতে হইত। সূত্রের "উপস্পৃশতে" এই আত্মনেপদ বিধান ছান্দসত্বপ্রযুক্ত। বেদে সর্ব্বত্র ব্যাকরণ-নিয়ম প্রতিপালিত হয় না। কেহ কেহ বলেন, বেদ অতি প্রাচীন ভাষা, জগতের যাবতীয় সভ্য-জাতির মধ্যে সর্ব্বাগ্রে রচিত গ্রন্থই বেদ। জগতে পুস্তকপ্রণয়নের ইতিহাস লিখিতে গেলে হিন্দুর ঋগ্বেদকে সর্ব্বপ্রথমস্থানে উল্লেখ করিতে হইবে। এহেন বেদরচনার কালে ব্যাকরণের নিয়ম বড়ই শিথিল ছিল। ভাষার প্রথমদশায় বা বর্দ্ধনশীল অবস্থায়, তাহা ব্যাকরণের শাসন মানিয়া চলিতে পারে না। বস্তুতঃ তখন ভাষার ব্যাকরণও সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। কাজেই বেদের ভাষা সর্ব্বদা ব্যাকরণের নিয়মের ধার ধারিতে বাধ্য হয় না। অপর কেহ বলেন যে, সাধারণতঃ প্রচলিত ব্যাকরণের নিয়মদ্বারা বৈদিকভাষা শাসিত হয় না বটে, কিন্তু বৈদিকব্যাকরণের দ্বারা উহা নিয়-মিত হয়। আমরা দেখিতে পাই, প্রচলিত কলাপ, সংক্ষিপ্তসার, সুপদ্ম, মুগ্ধবোধ, প্রক্রিয়াকৌমুদী, রত্নমালা, হরিনামামৃত, লঘুকৌমুদী এবং মধ্যকৌমুদী প্রভৃতি ব্যাকরণ দ্বারা যে সমস্ত বৈদিকপদ সাধিত হয় না, তাহারাই আবার পাণিনীয় ব্যাক-রণের দ্বারা সমর্থিত হয়। সকল মতেই সামঞ্জস্য অল্লাধিক আছে।

কর্ণাবুত্তরেণ।১৪

অনন্তর কুমার "ব্রহ্মণ আণীস্থ" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক এককালীন স্বকীয় কর্ণযুগল দুইহস্তে স্পর্শ করিবে। পূর্ব্বসূত্রের "উপ-স্পৃশতে" পদের সহিত এই সূত্রের অন্বয় করিয়া অর্থ করিতে হইবে।

দণ্ডমুত্তরেণাদত্তে।১৫

"সুশ্রবঃ সুশ্রবসং" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা দণ্ডগ্রহণ করিবে। ব্রহ্মচারীর দণ্ডগ্রহণ প্রথা বর্ত্তমানকালে প্রচলিত রহিয়াছে, তবে

দণ্ডধারণের সময় অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যকাল তিন রাত্রিতে শেষ হওয়ায়, প্রায় সর্ব্বত্রই তৎপরে দণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে এখনও সাতরাত্রি ঘরে থাকিবার প্রথা আছে।

কোন্ অধিকারীর দণ্ড কিরূপ কাষ্ঠজাত হইবে, তাহার সবিশেষ বিবরণ বর্ত্তমান সূত্রে বলা হইতেছে।

পালাশো দণ্ডো ব্রাহ্মণস্য নৈয়গ্রোধস্কন্ধজোবাঙ্গ্রো রাজন্যস্য বাদর ঔদুম্বরো বা বৈশ্যস্য। ১৬

পলাশবৃক্ষজাত দণ্ড ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী ধারণ করিবেন। ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী স্কন্ধজ অবাচীনাগ্র ন্যগ্রোধবৃক্ষজাত দণ্ডগ্রহণ করিকরিবেন। বৈশ্যব্রহ্মচারী বদর বা উডুম্বর বৃক্ষজাত দণ্ড গ্রহণ করিবেন। বর্ণগত পার্থক্যের সহিত দণ্ডেরও পার্থক্য বিধান উক্ত হইল।

পার্থক্য কথনের পর এই সূত্রে যাহা বলা হইতেছে, তাহা অধিকারিবিশেষের জন্য নহে; এই বিধি সর্ব্বসাধারণ। এখানে বিধর্ করিতে হইলে অনুবাদ পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক ইষ্টসিদ্ধি করিতে হয়।

বার্ক্ষো দণ্ড ইত্যবর্ণ সংযোগেনৈকে উপদিশন্তি। ১৭

যজ্ঞীয় বৃক্ষবিকারজ দণ্ড কোনও বর্ণের সহিত সংযুক্ত নহে, অর্থাৎ সর্ব্ববর্ণসাধারণ, এইরূপ কোনও কোনও আচার্য্য উপদেশ দিয়া থাকেন। বর্ণত্রয়ের মধ্যে পূর্ব্বসূত্রোক্ত বিশেষভাব পরিহারপূর্ব্বক এই সূত্রের বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে।

স্মৃতং চ ম ইত্যেতদাচরিত্বা গুরবে বরং দত্বা উদায়ুষেত্যুত্থাপ্য উত্তরৈরাদিত্যমুপাতিষ্ঠতে॥ ১৮

কুমার দণ্ডগ্রহণ পূর্ব্বক সেইস্থানে উপবেশন করতঃ 'স্মৃতং চ ম' ইত্যাদি ব্রত সংকীর্ত্তন করিবে। এই 'স্মৃতং চ ম' ব্রতসংকীর্ত্তন মন্ত্র আচার্য্য কুমারকে পড়াইবেন। অনন্তর ব্রহ্মচারী "গুরো! বরং তে দদামি" ইত্যাদি মন্ত্রে আচার্য্যকে বর দিবেন। তৎপরে আচার্য্য কুমারকে "উদায়ুষা" ইত্যাদি মন্ত্রে উত্থাপিত করিবেন। "তচ্চক্ষুঃ" ইত্যাদি সূর্য্যদৃশঃ" ইত্যন্ত মন্ত্রসমূহ দ্বারা আদিত্যোপস্থান করিতে হইবে। এই মন্ত্রসকল আচার্য্য পড়াইবেন, ব্রহ্মচারী পাঠ করিবেন। 'ণিচ্' প্রত্যয়ের অর্থ এখানে বিবক্ষিত নহে,' প্রযোজকত্বরূপে আচার্য্যের কর্তৃত্ব-প্রতিপাদনও এখানকার লক্ষ্য নহে।

যঃ কামযেত নায়মস্মিদোত্তেতি তমুত্তরয়া দক্ষিণে হস্তে গৃহ্নীয়াৎ। ১৯

যে কুমার সমাবর্ত্তন (ব্রহ্মচর্য্য সমাপন পূর্ব্বক গৃহগমনকালে সমাবর্ত্তন নামক হোম করিতে হয়।) পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট হইতে ছিন্ন হইবে না, অর্থাৎ বিপ্রযুক্ত হইবে না (অন্যত্র চলিয়া যাইবে না) বলিয়া আচার্য্য মনে বাঞ্ছা করিবেন, তাহার দক্ষিণহস্ত "যস্মিনভূতং" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা গ্রহণ করিবেন। ছাত্র ব্রহ্মচারী অন্যের নিকট বেদাধ্যয়ন করিতে না যায়, সমাবর্ত্তন পর্য্যন্ত পূর্ব্বব্রহ্মচর্য্যকাল আমার নিকটই পড়িবে, এইরূপ ইচ্ছা থাকিলে, আচার্য্য ঐ মন্ত্রপাঠ করিয়া শিষ্যের দক্ষিণহস্ত ধারণ করিবেন। প্রাচীনকালে শিষ্য বড় সম্মানের সম্পত্তি ছিল। শিষ্য যাহাতে অপরের শিষ্যত্ব গ্রহণ

করিতে না পারে, তাহার জন্য বৈদিক মন্ত্রাদি-চেষ্টাও করা হইত। শিখা ভাগিয়া না যায়, ইহা এখনও বেশ লক্ষ করিবার জিনিষ; যখন শিখাই সম্বল ছিল, তখন যে উহা কত অধিক মাত্রায় ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। সময়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে, ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে অধিক বেগ পাইতে হইবে না। ছাত্রসংরক্ষণ আবশ্যকও বটে।

ত্র্যহমেতমগ্নিং ধারয়ন্তি । ২০

ব্রহ্মচারীকে তিনদিবস পর্য্যন্ত উপনয়নাগ্নি ধারণ করাইবে।

ক্ষারলবণবর্জ্জনংচ । ২১

ক্ষারলবণাদিশূন্য ভোজন অর্থাৎ (তাৎপর্য্যাধীন) হবিষ্যান্ন গ্রহণ করাইবে।

ব্রহ্মচর্য্য-জীবন কঠোরতার সুযোগ্য শিক্ষাস্থল। মনোমত আহার্য্যগ্রহণ ও বিলাস-বাসনার চরিতার্থতা সাধন করিতে লাগিলে, মানব পৌরুষশক্তিহীন হইয়া ক্রমশঃ অলস অবস্থায় উপনীত হন এবং জীবনের উন্নতির আশা ভাসাইয়া দিতে বাধ্য হন। সুতরাং কর্ত্তব্যের কুটিল ও কণ্টকিত পথে পদার্পণ করিতে তিনি অপারগ হইয়া উঠেন। ব্রহ্মচর্য্য এইজন্য মানবকে শিক্ষা দেয় যে, কষ্ট-দুঃখকে তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া, বিপদের প্রতি-কূলে অবিচলিতভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া, স্বকার্য্য সাধন করিতে হইবে। আহার-নিয়ম-সঙ্কোচ লাভ না করিলে, মানব ঔদ্ধত্য নামক রজোগুণের কার্য্য অতিক্রম করিয়া ধীর, স্থির, শান্তিপ্রিয়তারূপ সাত্ত্বিক-গুণের অধিকারী হইতে পারেন না। ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মাবলী এখানে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা অনাবশ্যক। প্রথমবর্ষের হিন্দু-পত্রিকায় "ব্রহ্মচারীর প্রতি গোভিলের উপদেশ" নামক প্রবন্ধে উহা বিস্তৃতরূপে বিবৃত হইয়াছে। সে সকল প্রবন্ধে ঐ সকল নিয়মের বৈজ্ঞানিক মৌলিকতা সম্বন্ধেও কিছু কিছু সাধারণ ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ সেই সংখ্যা দর্শন করিলেই জানিতে পারিবেন। এখানে সে বিষয়ে আমরা বিরতিলাভ করিলাম।

পরিত্বেতি পরিমৃজ্য তস্মিন্নুত্তরৈর্মন্ত্রৈঃ সমিধ আদধ্যাৎ । ২২

"পরিত্বা" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক উপনয়নাগ্নির চতুর্দ্দিকে জলদ্বারা মার্জ্জন করিয়া, "অগ্নয়ে সমিধং" ইত্যাদি দ্বাদশমন্ত্র দ্বারা দ্বাদশখানি সমিধ অগ্নিতে প্রদান করিবে। এই সমিৎপ্রদান কার্য্য নিত্যকর্ম্ম। হরদত্ত-মতে প্রত্যহই দ্বাদশখানি সমিৎপ্রদান করিতে হইবে। উপনয়নাগ্নিধারী ব্রহ্মচারীর উপনয়নাগ্নিতে এই হোমকার্য্য সমাবর্ত্তন পর্য্যন্ত করিতে হইবে।

এতমন্যস্মিন্নপি । ২৩

অন্য অগ্নিতেও এই সমিৎপ্রদান করিতে হইবে। উপনয়নাগ্নি চিরকাল ধারণ করাই কর্ত্তব্য; অপারগ হইলে, কেবল তিন দিনেই চলিবে। পূর্ব্বে যে তিনদিন ধারণের কথা বলা হইয়াছে, তাহা অপারগতা পক্ষে বুঝিতে হইবে। যাঁহারা নিত্য উপনয়নাগ্নি ধারণ করিবেন, তাঁহারা তিন দিন ঐ উপনয়নাগ্নিতে সমিধ্ দিবেন, পরে অন্য অগ্নিতে সমিধ্ দিবেন। যে অগ্নিতে হউক না কেন, সমিৎপ্রদান নিত্যকর্ম্ম, উহা করিতেই হইবে। উপনয়নাগ্নি ধারণ করা হয়, তাহই

নচেৎ অন্য আয়তে দিলেও চলিবে। ফলে সমিধ্ দেওয়াটা বাদ না পড়ে।

ক্রমশঃ--

তীর্থপদাশ্রিতস্য কস্যচিৎ।

(বেদবিদ্যালয়, যশোহর।)

আত্মজ্ঞান।

জীবাত্মা দেহ হইতে স্বতন্ত্র, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। স্থূল দেহের সহিত যেমন তাঁহার সম্পর্ক নাই, সেইরূপ সূক্ষ্ম ও কারণদেহের সঙ্গেও তাঁহার সম্বন্ধ নাই। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সমষ্টিকে 'সূক্ষ্ম-দেহ' কহে এবং আদ্য-উপাদান স্বরূপিণী অব্যক্ত-প্রকৃতিকে 'কারণ-শরীর' কহে। অতএব স্থূলদেহ জীবাত্মা নহেন; সূক্ষ্মদেহ অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, প্রাণাদিও জীবাত্মা নহেন। কেহ কেহ মন-বুদ্ধিকে জীবাত্মা বলিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু মহর্ষি ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রে ইহা মীমাংসিত হইয়াছে যে, মনোবুদ্ধি, জীবাত্মারূপ কর্ত্তার করণমাত্র; সুতরাং মনোবুদ্ধ্যাদি সহিত সূক্ষ্ম দেহ এবং প্রকৃতি বা স্বভাবরূপী কারণ-দেহও জীবাত্মা নহেন। উক্ত কোনরূপ দেহ তাঁহার উপাদান নহে এবং তিনিও কোনরূপ দেহের উপাদান নহেন। মাতা-পিতা, পুত্র-কন্যা প্রভৃতির স্থূল সূক্ষ্ম কারণ-দেহ তাঁহার স্বজাতীয় ও আত্মীয় স্থান নহে। সেই সব দেহ হইতে তাঁহাদের প্রত্যেকের জীবাত্মা স্বতন্ত্র এবং সে প্রত্যেক দেহই অনাত্মা। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কোন জীবের দেহ, বৃক্ষাদি কোন স্থাবর পদার্থের দেহ, অথবা দৈব ও আসুরিক কোন মূর্ত্তি জীবাত্মা নহে। জীবাত্মা, জন্ম-বৃদ্ধি-অপক্ষয়-পরিণামশূন্য এবং অনাদি অনন্তকাল স্থায়ী। রথচক্রের নাভিদেশে অর সকল যেমন প্রতিষ্ঠিত থাকে, জীবাত্মা সকল সেইরূপ ভূতেন্দ্রিয়-প্রাণ-মন-বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত কলার অর্থাৎ করণের সহিত পরমাত্মাতে চিরপ্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক সৃষ্টি-কালে তাঁহারা ঐ সকল কলার সহিত সেই ব্রহ্মচক্রে প্রকটিত ভাবে ঘূর্ণ্যমাণ হন, এবং প্রত্যেক প্রলয়কালে সেই চক্রেতেই অপ্রকটিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। এই প্রকটাবস্থা উপলক্ষে তাঁহাদের জন্ম এবং তাঁহাদের হৃদয়ে অন্তর্যামী, চিদাভাস বা আভাস-চৈতন্যরূপে পরমাত্মার অনুপ্রবেশ পরিকল্পিত হয়; নতুবা পরমার্থতঃ তাঁহাদের জন্ম নাই এবং পরমার্থতঃ জ্যোতিঃ-সম্পন্ন নয়নের ন্যায় তাঁহারা নিত্যকাল কূটস্থ ব্রহ্মের রত্নকল্প চিদাভাস সমন্বিত। এই পরমাত্মা ও জীবাত্মার আত্মীয় সম্বন্ধ অতি নিগূঢ়তত্ত্ব এবং প্রাকৃত-বুদ্ধি যুক্তির অগম্য। জীবাত্মার ন্যায় ঐ সমস্ত উপাধির আদি-বীজস্বরূপিণী প্রকৃতিও ব্রহ্মচক্রের অন্তর্গত। জীবতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব এবং ব্রহ্মতত্ত্ব স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে, কিন্তু এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব।

"তদেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিপদ্যতে।"

সেই একমাত্র ব্রহ্মতত্ত্ব-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিপাদিত হয়। যে জীবাত্মার ঐ ব্রহ্মচক্রে, অর-স্বরূপে পরিভ্রমণ সাঙ্গ হয়, তিনি ঐ চক্রের নাভিদেশে স্থান লাভ করেন; আর তাঁহাকে ঘূর্ণ্যমান হইতে হয় না। ইহাই শান্তি;

ইহাই মোক্ষ। ইহারই নাম ব্রহ্মভাব। এই ব্রহ্মভাব প্রত্যেক মুক্ত আত্মার পক্ষে জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্ত ও প্রলয়ের মহানন্দময় মহা জাগ্রত অবস্থা। যদিও সমস্তই ব্রহ্ম, কিন্তু যতদিন চক্ষে পরিদর্শন, ততদিন আত্মহারা হইয়া, জীব, প্রকৃতিকে আত্মত্বে বরণ করেন; কেননা প্রকৃতি ফল-ফুলে পরম শোভাময় এবং দেহ, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি সচেতন উপাধি দ্বারা পরমসুখের প্রস্রবণ। এই-রূপে আত্মতত্ত্ব রূপ নিজস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া এবং আত্মতত্ত্বরূপ নিবাসে নিরাশ হইয়া, জীবাত্মা প্রবাসে ভ্রমণ করেন। আত্মতত্ত্বের অন্বেষণ করেন না। ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম ও স্থূল সম্পর্কে পরাধীন তিনি আপনাকে কর্ত্তা ভোক্তা রূপে অভিমান করেন। কিন্তু যখন আত্মরতি নিবন্ধন প্রকৃতি-পুরুষের ভেদ-জ্ঞান জন্মে, দেহ আত্মা নহে, এই বিবেক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম হয়, সর্ব্বপ্রকার ফলভোগে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় এবং "আমি হই—আমি করি" এই অভিমান বিদূরিত হয়, তখন জীবাত্মা আপনার উৎসস্বরূপ একমাত্র সার্ব্বভৌমিক ভূমা পরমাত্মাতে আত্মবুদ্ধি করেন। পরমাত্মাই জীবাত্মার আত্মা, জগতের আত্মা, জগদ্‌যোনি, সকল আত্মার একাধার ও মহাসদ্ভাব। জীবাত্মা, এইরূপে দেহাত্মজ্ঞান ও নানাপ্রকার দেহসম্পর্কীয় জীবভাব, কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, বিসর্জন দিয়া, পরমাত্মাকে যে আত্মধাম ও আত্ম রূপে জ্ঞান করেন, সেই জ্ঞানের নাম আত্মজ্ঞান, আত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞান।

(২) কেবলমাত্র জীবাত্মার অমরত্ববোধ বা লোকান্তরে পরিগমনের বিশ্বাস আত্ম-জ্ঞান নহে। কেননা, সে জ্ঞানে মোক্ষ হয় না। জীবাত্মাতে ঐহিক পারত্রিক কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বে তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হইলেই তাঁহার স্বীয় হৃদয়-গুহাতে আত্মারূপে ব্রহ্মের স্বয়ম্প্রকাশ-অধিষ্ঠান দৃষ্ট হয়। ঐ জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, আত্মপ্রত্যয়সার, এবং ব্রহ্মাত্মার পুরাতন সম্পত্তি। উহা "জীবাত্মকোষে ছিল না, কোন প্রকার যত্ন বা ক্রিয়া দ্বারা দেশান্তর হইতে আনিলাম" এমন নহে, সুতরাং উহা কোনরূপ পুরুষকার দ্বারা উৎপাদ্য বা অবতরণীয় নহে। আর এমনও নহে যে, অবহেলায় বা যত্নের ত্রুটিতে উহা মলিন ভাবে আছে, আমি গুণাধান ও সংস্কার দ্বারা উহাকে মাজিয়া ঘষিয়া রসান দিয়া নির্ম্মল করিয়া লইলাম; সুতরাং উহা বিকার্য্য বা সংস্কার্য্য নহে। "আত্মাতে আত্মাকে করা ব্রহ্মের সাধন।" (রাঃ মোঃ রায়) তাহাই জীবাত্মার পরম পুরুষার্থ।

"ব্রহ্মাত্মৈকজ্ঞানে জাতে সতি-
সর্ব্বাত্মনা অবিদ্যানিবৃত্তিঃ।"

একমাত্র ব্রহ্মই আত্মা, এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে সর্ব্বতোভাবে অজ্ঞান-নিবৃত্তি হয়। তদ্ভিন্ন অন্য কোন সাধন দ্বারা জীবাত্মার কোনরূপ সংস্কার ও উন্নতি করা যায় না। জীবাত্মা স্বরূপতঃ নির্ম্মল। প্রকৃতি ও দেহরূপ আবরণ সরিয়া গেলেই তাঁহার নির্ম্মল তত্ত্ব ব্রহ্মাত্মজ্ঞানে মগ্ন হইয়া যায়। তখন এক অদ্বয় আত্মজ্ঞান শুদ্ধ, স্বপ্রকাশ ও দ্বিধাশূন্য আনন্দরূপে প্রতিভাত হন। ঐ আত্মজ্ঞান শুদ্ধ, নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, অপাপবিদ্ধ, অশরীরী, সর্ব্বগত, নিত্য, প্রপঞ্চোপশম, এক, অদ্বিতীয়। উহা ব[illegible]

ভোক্তৃ, দ্রষ্টা, দৃশ্য ইত্যাদি প্রাকৃতিক লক্ষণাক্রান্ত নহে। কিন্তু সৃষ্টি ও প্রকৃতির অতীত এক স্বতন্ত্র আনন্দনিকেতন।

(৩) এত বড় মহা কর্ম্মস্থান যে ভারত কর্ম্মভূমি, যেখানে দ্বিজাতি প্রভৃতি জাতিদিগের অসংখ্য অসংখ্য বৈদিক, তান্ত্রিক প্রভৃতি শাখা সম্প্রদায় সকল, হিমাদ্রি হইতে কুমারিকাখণ্ড পর্য্যন্ত এবং পশ্চিম সাগরাবধি পূর্ব্বসমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত, এমন ক্রিয়াক্ষেত্রে, ক্রিয়াসংস্পর্শবিহীন আত্মজ্ঞানের উপদেশ স্থান পাইয়াছে, ইহাই আশ্চর্য্য! কিন্তু তাহার বলবৎ কারণ আছে। তাহা এই যে, ভারতবর্ষে বেদের অসামান্য সম্মান। কর্ম্মী ও জ্ঞানী বেদশাস্ত্রকে সমভাবে "শব্দ-ব্রহ্ম" অভিধানে আদর করেন। কর্ম্মই হউক আর জ্ঞানই হউক, তাহাকে অগ্রাহ্য করিবার সাধ্য কাহারই নাই। তবে অধিকার বিশেষে যথা যেমন প্রয়োজন, উহার প্রথম বা দ্বিতীয় বিভাগ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কর্ম্মীগণ অনাদর না করিয়া, ঐ অক্রিয়াপর আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানকে স্ব স্ব অধিকারে ক্রিয়ার লক্ষণ মধ্যে গ্রহণ করেন, এবং অনেক জ্ঞানীও সেইরূপ অখিল কর্ম্ম-কাণ্ডকে জ্ঞানে পরিসমাপন করেন। ভগবদ্গীতা—"সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে" হে পার্থ! ফল সহিত শাস্ত্রবিহিত সকল ক্রিয়াই জ্ঞানের অন্তর্ভূত আছে। কিন্তু উপনিষৎ শাস্ত্রসমূহ ও তাহার মীমাংসা স্বরূপ বেদান্তদর্শনে ব্রহ্ম-জ্ঞান বা আত্মজ্ঞানকে ক্রিয়াসংস্পর্শরহিত রূপেই উপদেশ করেন। ইহাই কর্ম্ম, দেহ ও প্রবৃত্তিসংস্পর্শশূন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানদৃষ্টি।

(৪) ঐ সমস্ত শাস্ত্রের মীমাংসা এই যে, আত্মজ্ঞান কর্ম্মাঙ্গ নহে। যজ্ঞ, দান, ব্রত, অনশন, তপস্যা প্রভৃতি বৈদিকী বা তান্ত্রিকী ক্রিয়াই হউক, আর পুরুষকাররূপ সাংসারিক ক্রিয়াই হউক, তাহার ফল প্রকৃতির অধিকারে ইহকাল বা পরকালে শরীর, ইন্দ্রিয়, মনোবুদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা ভোগ হয় এবং জীবাত্মা সেই সকল ক্রিয়ার কর্ত্তা ও ফলভোক্তা। কোন ফলই শরীর ও মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির সংযোগ ব্যতীত জীব ভোগ করিতে পারেন না। যত প্রকার ভোগ আছে, স্থূলই হউক আর সূক্ষ্মই হউক, পার্থিবই হউক আর স্বর্গীয়ই হউক, তাহার ভোক্তাস্বরূপ দেহেন্দ্রিয়মনোযুক্ত জীবাত্মার প্রয়োজন। কিন্তু তাদৃশ অবস্থাপন্ন জীব, দেহাদিতে আত্মজ্ঞান এবং স্বীয় কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বিস্মৃত হইতে পারেন না। শ্রুতি কহেন, কেবল ব্রহ্মকে আত্মজ্ঞান জন্মিলেই দেহাদি উপাধি বিগত হয়। সেই আত্ম-জ্ঞানোদয়ে সর্ব্বপ্রকার দেহেন্দ্রিয়, মনোবুদ্ধি, ফলকামনা, কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, পরব্রহ্মজ্ঞানা-নন্দ-সুধার্ণবে বিলীন হইয়া যায় এবং জীবাত্মা তখন জীবভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বকীয় অসাধারণ আত্মউৎস স্বরূপ ব্রহ্মেতে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করেন। অতএব আত্ম-জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে, আর কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব ও কর্ম্মফল জন্মে না এবং কোন-রূপ কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব ও ক্রিয়া দ্বারাও ব্রহ্ম-জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় না। এতাবতা ক্রিয়া ও আত্মজ্ঞানের মধ্যে পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাব নাহি।

(৫) ক্রিয়ার লক্ষণ এই যে, তাহা

বিধিপরতন্ত্র, কর্ত্তৃতন্ত্র এবং মানসব্যাপারাধীন। শাস্ত্রবিধি অনুসারে ক্রিয়া আচরিত হয়, অতএব তাহা বিধিপরতন্ত্র। কর্ত্তার ইচ্ছাই ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক, অতএব তাহা "কর্ত্তৃতন্ত্র"। ধ্যান-ধারণা-উপাসনা-প্রার্থনা প্রভৃতি উপাসকের মানসিক কর্তৃত্বাধীন, অতএব তাহা "মানসব্যাপারাধীন"। ক্রিয়া কখনও বস্তুতত্ত্বকে অপেক্ষা করে না, কিন্তু কেবল মানসিক সাধনা এবং শাস্ত্রবিধির উত্তরসাধকতা অনুসারে সাধিত হয়। অতএব ক্রিয়া বেদের দাসত্ব, বিধিকৈঙ্কর্য্য এবং কর্ত্তৃতন্ত্র বলিয়া অভিহিত হয়। জ্ঞানের লক্ষণ এই যে, তাহা বস্তুতত্ত্বস্বরূপ। সূর্য্যের প্রকাশ যেমন সত্যবস্তু-স্বরূপ স্বপ্রকাশ সূর্য্যপরতন্ত্র; কোন পার্থিব আলোক বা মানসকর্ত্তৃত্ব তাহা প্রকাশ করিতে পারে না; সেইরূপ, জ্ঞান স্বয়ম্প্রকাশ পরমাত্মরূপ পরম সত্যবস্তুর অধীন। তাহা মানসব্যাপার, বেদবিধি ও ক্রিয়ার অতিক্রান্ত। শাস্ত্রানুসারে যাহা জ্ঞান, তাহা ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত অন্য জ্ঞান নহে। তাহা স্বতঃসিদ্ধ ও স্বয়ম্প্রকাশ। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই পরমাত্মা। তিনিই জীবের মুখ্যাত্মা।

(৬) দেহ হইতে যে আত্মা স্বতন্ত্র, এই পরমার্থতত্ত্ব কেবল জীবের ব্রহ্মেতে আত্মজ্ঞান জন্মিলেই অনুভূত হয়; নতুবা পরমাত্মাকে ব্যতিরেক করিয়া, বহু তর্ক-যুক্তি ও প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা জীবাত্মার অমরত্ব এবং এই মর্ত্য শরীরান্তে তাঁহার স্থায়িত্ব নিরূপণ করিলেও, তাঁহার দেহ-সম্পর্কবিবর্জ্জিত নিরবচ্ছিন্ন পরম কৈবল্য-সত্তা অনুভূত হইতে পারে না। কেননা, এই মর্ত্যদেহের অভাবেও তাঁহার মনো-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় রচিত সূক্ষ্ম কলেবর এবং প্রকৃতিরূপী কারণ-শরীর তাঁহার সহগামী হয়, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ঐ সূক্ষ্ম কলেবর ও কারণ-শরীর অবচ্ছেদাবচ্ছেদে অসংখ্য স্থূল শরীরের বীজস্বরূপ। অতঃপর জীবাত্মা দেহ-বিনাশের উত্তরকালে, দেহ হইতে উড্ডীন হইলে, নানা সম্প্রদায়ের বাদীরা তাঁহাকে নানাপ্রকার দেহ ও অবস্থার মধ্যে স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন, এবং তাঁহার অনেকরূপ সুখ-দুঃখ কল্পনা করেন। জীবাত্মার এই সকল ঊর্দ্ধদৈহিক কোন অবস্থা হইতে তাঁহার চূড়ান্ত দেহবিরহিত তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। তাঁহাকে পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলেই, মনোবুদ্ধি-দশেন্দ্রিয়াদি-সূক্ষ্মদেহ ও প্রাকৃতিক স্নেহ-মমতা তাঁহাকে অপহরণ করিবে; এবং তিনি মহা মোহে তাহাদের সমষ্টিকে আমি ও আমার বলিয়া জ্ঞান করিবেন। অতএব তাঁহার তাদৃশ অবস্থাপন্ন অমরত্ব প্রকৃত অমরত্ব নহে; বিশুদ্ধ দেহবিহীন ভাব নহে।

(৭) কেবল যে জীবাত্মার পরমাত্মাতে আত্মজ্ঞান জন্মে, তিনি স্বকীয় পরকীয় আর কোন দেহকে আত্মজ্ঞান করেন না; কেননা পরস্পর দুটী বিরুদ্ধ জ্ঞান জীবাত্মার পক্ষে এক কালে সম্ভব হয় না। যদি পরমাত্মাকে আত্মজ্ঞান করেন, তবে দেহ-মনাদিকে আত্মজ্ঞান করিতে পারেন না; আর যদি দেহাদিকে আমি বলিয়া ভাবেন, তবে তো পরমাত্মা পরিত্যক্ত হইলেন। অতএব পরমাত্মাতে জীবের যে আত্মজ্ঞান, তাহাই

বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব। সেইজন্য আত্মজ্ঞান প্রতিপাদক যত শাস্ত্র আছে, সর্ব্বত্রে জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে একাধারে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাকে দ্বৈতবাদই বল, আর অদ্বৈতবাদই বল, কিন্তু এ আত্মজ্ঞান মহামোক্ষস্বরূপ স্বয়ম্প্রকাশ ব্রহ্মজ্ঞান মাত্র। জীবতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব একীকৃত না হইলে মোক্ষ হয় না। আর ব্রহ্মেতে আত্মজ্ঞান জন্মিলে, ব্রহ্মই জীবাত্মার অবলম্বন স্বরূপ একমাত্র আত্মারূপ প্রাধান্য লাভ করেন। সেই প্রাধান্যের গ্রহণে মোক্ষপ্রাপ্ত নিরুপাধিক জীবাত্মারও গ্রহণ সিদ্ধ হয়। মোক্ষাধিকারে "আত্মজ্ঞান" শব্দ প্রকৃতির সহিত দেহাদি-উপাধি-বিনির্ম্মুক্ত আত্মার একমাত্র অবলম্বন ও পরমলোক স্বরূপ কেবল পরমাত্মাকে প্রতিপাদন করে। কিন্তু ক্রিয়ার অধিকারে উহা কেবল সোপাধিক জীবাত্মাকে বুঝায়। ফলে পরমাত্মার আত্মজ্ঞানই সত্য, আর জীবাত্মজ্ঞান, নানাপ্রকার ক্রিয়া, কারক, ফল, কল্পনা অধ্যারোপিত বিধায় অসত্য। কেননা, পরমাত্মাকে লাভ করিলে এ সমস্ত আরোপ তিরোহিত হয়। অতএব মোক্ষশাস্ত্রে জীবাত্মজ্ঞানকে কোথাও আত্মজ্ঞানরূপে গ্রহণ করেন নাই। কেবল উপাধিকল্পনাশূন্য ব্রহ্মাত্মজ্ঞানকেই আত্মজ্ঞানরূপে মানিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।
২৩।৩ নং বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট,)
কলিকাতা।)

চাটুপুষ্পাঞ্জলিঃ।

(শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-বিরচিতঃ।)

(১ম হইতে ১২শ শ্লোকে কবি শ্রীমতী রাধিকার রূপবর্ণনচ্ছলে তাঁহার স্তুতি করিতেছেন।)

(১)

নবগোরোচনাগৌরীং প্রবরেন্দীবরাম্বরাম্।
মণিস্তবকবিদ্যোতিবেণীব্যালাঙ্গনাফণাম্॥

নব গোরোচনা সম তব কলেবর
গৌরবর্ণে কিবা শোভা পায় নিরন্তর।
তোমার সুরমা-বেণী-কৃষ্ণসর্পী কণা
মণিগুচ্ছ বলিয়াই হয় বিবেচনা।
রম্য নীলপদ্ম সম তোমার বসন;
বৃন্দাবনেশ্বরি! বন্দি তোমার চরণ!

(২)

উপমানঘটামানপ্রহারিমুখমণ্ডলাম্।
নবেন্দুনিন্দিভালোদ্যৎকস্তূরীতিলকশ্রিয়ম্॥

সেই পদ্ম সেই চন্দ্র, কিংবা আর আর
যত কিছু বস্তু আছে উপমা দিবার,
সেই সবাকার গর্ব্ব খর্ব্বের কারণ,
বিরাজ করিছে তব সুন্দর বদন;
অষ্টমীর চন্দ্র-নিন্দি-ললাট উপর
কস্তূরী-তিলক-বিন্দু থাকি নিরন্তর
তোমার অঙ্গের শোভা করিছে বর্দ্ধন,
বৃন্দাবনেশ্বরি! বন্দি তোমার চরণ!

(৩)

ভ্রূজিতানঙ্গকোদণ্ডাং লোলনীলালকাবলিম্
কজ্জলোজ্জ্বলতারাজচ্চকোরীচারুলোচনাম্

তোমার দুইটী ভুরু রম্য অতিশয়,

মদনের ধনুকেও করে পরাজয়;
তুমি সে ভ্রূভঙ্গ-বাণ বারেক হানিয়া,
সে ত্রিভঙ্গ শ্যামে রাখ বিমুগ্ধ করিয়া!
পরম শ্যামল—পুনঃ পরম চঞ্চল
তোমার অলকাবলী শোভে অবিরল;
কজ্জলে উজ্জ্বল তব নয়ন-চকোরী—
যত দর্শনীয় বস্তু—সব পরিহরি,
শুধু কৃষ্ণচন্দ্রে লক্ষ্য রাখে সর্ব্বক্ষণ;
বৃন্দাবনেশ্বরি! বন্দি তোমার চরণ!

(৪)

তিলপুষ্পাভনাসাগ্রবিরাজদ্বরমৌক্তিকাম্।
অধরোদ্ধূতবন্ধূকাং কুন্দালী-বন্ধুরদ্বিজাম্॥
তিলপুষ্প সম তব নাসাগ্রে নিয়ত
কনক-জড়িত-মুক্তা রহে সুশোভিত;
বন্ধূক-কুসুমে তব লোহিত অধর
রাখিয়াছে পরাজিত করি নিরন্তর;
কুন্দমালা সম তব বন্ধুর দশন,
বৃন্দাবনেশ্বরি! বন্দি তোমার চরণ!

(৫)

সরত্নস্বর্ণরাজীবকলিকাকৃতকর্ণিকাম্।
কস্তূরীবিন্দুচিবুকাং রত্নগ্রৈবেয়কোজ্জ্বলাম্॥
হীরকাদি-রত্ন যুত স্বর্ণ-রচিত
পদ্মকলি কর্ণে তব শোভে অবিরত;
অধরের অধোভাগে তব নিরন্তর
কস্তূরী-তিলক-বিন্দু শোভে মনোহর!
রত্নময় কণ্ঠহার তোমার ভূষণ;
বৃন্দাবনেশ্বরি! বন্দি তোমার চরণ!

(৬)

দিব্যাঙ্গদপরিষ্বঙ্গলসদ্ভুজমৃণালিকাম্।
বলারিরত্নবলয়কলালম্বিকলাচিকাম্॥
সুন্দর কেয়ূরে ভুজ মৃণাল তোমার—
পরম সুন্দর শোভা ধরে অনিবার।
ইন্দ্রনীল-মণি-যুত পরম সুন্দর
তোমার বলয় মণিবন্ধের উপর
করিতেছে সুমধুর শব্দ অনুক্ষণ,
বৃন্দাবনেশ্বরি! বন্দি তোমার চরণ!

(৭)

রত্নাঙ্গুরীয়কোল্লাসিবরাঙ্গুলিকরাম্বুজাম্।
মনোহরমহাহারবিহারিকুচকুট্মলাম্॥
তব কর-কমলের অঙ্গুলি সকল
রত্নময় অঙ্গুরীতে শোভে অবিরল!
মহামূল্য মুক্তাহার পরম সুন্দর—
তোমার কমল-কলি-কুচের উপর
পড়িয়া করিছে তার শোভা বিবর্দ্ধন,
বৃন্দাবনেশ্বরি! বন্দি তোমার চরণ!

(৮)

রোমালিভুজগীমূর্দ্ধরত্নাভতরলাঙ্কিতাম্।
বলিত্রয়ীলতাবদ্ধক্ষীণভঙ্গুরমধ্যমাম্॥
সর্পীর মস্তকে শোভে মাণিক যেমন,
সেইরূপ রোমাবলী তব সর্ব্বক্ষণ—
হার-মধ্য-মণি-যোগে নিত্য শোভা পায়,
তব ক্ষীণ কটিদেশ পাছে ভেঙ্গে যায়,
ত্রিবলী লতায় বদ্ধ আছে একারণ;
বৃন্দাবনেশ্বরি! বন্দি তোমার চরণ!

(৯)

মণিসারসনাধারিবিস্ফারশ্রোণিরোধসম্।
হেমরম্ভামদারম্ভস্তম্ভনোরুযুগাকৃতিম্॥
তোমার বিশাল কটি তটের উপর
মণিময় চন্দ্রহার শোভে নিরন্তর;
সুবর্ণ-রম্ভার গর্ব্ব করিবে বিনাশ,
তব ঊরু-যুগ করি এই অভিলাষ,
আপনার শোভা সদা করে প্রদর্শন;
বৃন্দাবনেশ্বরি! বন্দি তোমার চরণ!

(১০)

জানুদ্যুতিজিতফুল্লপীতরত্নসমুদ্গকাম্।
শরদম্বুজনীরাজ্যমঞ্জীরবিরণৎপদাম্॥

ফুল্ল সম্পুটক পীতরত্ন-বিনির্ম্মিত—
তোমার জানুর কাছে হয় পরাজিত;
পরম সৌন্দর্য্যময় তব পদদ্বয়
শরতের কোকনদে করে পরাজয়।
করিছে চরণ তব নূপুর-স্বনন;
বৃন্দাবনেশ্বরি! বন্দি তোমার চরণ!

(১১)

রাকেন্দুকোটিসৌন্দর্য্যজৈত্রপাদনখদ্যুতিম্।
অষ্টাভিঃ সাত্ত্বিকৈর্ভাবৈরাকুলীকৃতবিগ্রহাম্॥

পূর্ণিমার কোটি চন্দ্রে যে শোভার স্থিতি,
তাহাকেও জিনে তব পদ-নখ-দ্যুতি;
শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি পানে রাখিলে নয়ন,
যে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব দেয় দরশন,
তাহাতে ব্যাকুল হয় তব দেহ-মন;
বৃন্দাবনেশ্বরি! বন্দি তোমার চরণ!

(১২)

মুকুন্দাঙ্গকৃতাপাঙ্গামনঙ্গোর্ম্মিতরঙ্গিতাম্।
ত্বামারব্ধপ্রিয়ানন্দাং বন্দে বৃন্দাবনেশ্বরি॥

হানিলে কৃষ্ণের পানে কটাক্ষের বাণ,
মদন-তরঙ্গে তুমি হও ভাসমান;
তোমার এরূপ ভাব হেরিলে নয়নে,
পরম আনন্দ হয় শ্রীকৃষ্ণের মনে;
তুমি বৃন্দাবনেশ্বরী, বলে ত্রিভুবন,
ভক্তিভরে বন্দি আমি তোমার চরণ।

(১৩শ হইতে ১৭শ শ্লোকে সাধক কবি শ্রীমতী রাধিকাকে বিনয় সহকারে সম্বোধন করিয়া তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছেন।)

(১৩)

অয়ি প্রোদ্যন্মহাভাবমাধুরীবিহ্বলান্তরে।
অশেষনায়িকাবস্থাপ্রাকট্যাদ্ভুতচেষ্টিতে॥

তব স্থায়ী-রতি-রস-ভাব নিরন্তর
বিহ্বল করিয়া দেয় তোমার অন্তর।
নায়িকা নারীর যে যে অষ্ট ভাব রয়,
সে সব তোমার যবে উপস্থিত হয়,
তখন তোমার কথা কি বলিব আর,
কর নানা চমৎকার বিলাস-সঞ্চার!

(১৪)

সর্ব্বমাধুর্য্য-বিঞ্ছোলীনির্ম্মঞ্ছিতপদাম্বুজে।
ইন্দিরামৃগ্যসৌন্দর্য্যস্ফুরদঙ্ঘ্রিনখাঞ্চলে॥

ধন্য ধন্য ধন্য তব চরণ-কমল,
সর্ব্ব মাধুর্য্যের স্থিতি যথা অবিরল।
তব পদ-নখ-প্রান্তে যে শোভা সতত,
লক্ষ্মীও তাহার জন্য সদা লালায়িত!

(১৫)

গোকুলেন্দুমুখীবৃন্দসীমন্তোত্তংসমঞ্জরি।
ললিতাদিসখীযূথজীবাতুস্মিতকোরকে॥

গোকুল নগরে শত শত চন্দ্রাননা
বসতি করেন সদা গোপের ললনা;
সেই সব ললনার তুমিই সুন্দরি!
সীমন্ত-ভূষণ-ভূত-কুসুম-মঞ্জরী।
তব মৃদু-মন্দ হাস্য-কলিকার বলে
ললিতাদি সখীগণ বাঁচে ভূমণ্ডলে!

(১৬)

চটুলাপাঙ্গমাধুর্য্যবিন্দূন্মাদিতমাধবে।
তাতপাদযশস্তোমকৈরবানন্দচন্দ্রিকে॥

তব কটাক্ষের বিন্দুমাত্র মধুরস
কৃষ্ণকে করিয়া দেয় আনন্দে অবশ;
বৃষভানু-রাজ-কীর্ত্তি-রাশি-কুমুদিনী,
তুমিই কৌমুদী তার উল্লাস-কারিণী!

(১৭)

অপারকরুণাপূরপূরিতান্তর্মনোহ্রদে।
প্রসীদাস্মিন্ জনে দেবি নিজদাস্যস্পৃহাজুষি॥

অগাধ অপার তব কৃপা-জল-রাশি—
তব মনোত্থ পূর্ণ রাধে দিবানিশি।
দাসী ভাবে রাখিয়াই মোরে বারমাস
সুপ্রসন্ন থাক রাধে! এই অভিলাষ।

(১৮শ হইতে ২১শ শ্লোকে শ্রীমতী রাধিকার দাসী-ভাব-প্রার্থী ভক্ত কবি স্বীয় অভিলাষ জ্ঞাপন করিতেছেন।)

(১৮)

কচ্চিত্বং চাটুপটুনা তেন গোষ্ঠেন্দ্রসূনুনা।
প্রার্থ্যমানচলাপাঙ্গপ্রসাদাদ্রক্ষ্যসে ময়া॥

এ মোর মনের সাধ মিটিবে কখন,—
যখন দেখিব, সেই নন্দের নন্দন
শত শত প্রিয়বাক্যে করিয়া সাধনা,
করিবেন তব কৃপা-কটাক্ষ প্রার্থনা।
তুমিও তাঁহারে কৃপা করি প্রদর্শন,
চঞ্চল কটাক্ষ-শর করিবে ক্ষেপণ!

(১৯)

ত্বাং সাধু মাধবীপুষ্পৈর্মাধবেন কলাবিদা।
প্রসাধ্যমানাং স্বিদ্যন্তীং বীজয়িষ্যাম্যহং কদা॥

এ মোর মনের সাধ মিটিবে কখন,—
যখন দেখিব, শিল্পী শ্রীমধুসূদন
মাধবী কুসুম দিয়া যতন করিয়া
দিবেন তোমার দেহখানি সাজাইয়া।
তাঁর স্পর্শে তব স্বেদ ঝরিবে যখন,
বীজন করিব আমি তোমায় তখন!

(২০)

কেলিবিস্রংসিনো বক্রকেশবৃন্দস্য সুন্দরি।
সংস্কারায় কদা দেবি জনমেতং নিদেক্ষ্যসি॥

এ মোর মনের সাধ মিটিবে কখন,—
কৃষ্ণ সনে কেলি-কালে তোমার যখন
আলুথালু হবে বক্র অলক-সম্ভার,
আদেশ করিবে মোরে তাহার সংস্কার!

(২১)

কদা বিম্বোষ্ঠি তাম্বূলং ময়া তব মুখাম্বুজে।
অর্প্যমাণং ব্রজাধীশসূনুরাচ্ছিদ্য ভোক্ষ্যতে॥

এ মোর মনের সাধ মিটিবে কখন,—
সুলোহিত ওষ্ঠাধরে তোমার যখন
প্রদান করিব এক মধুর তাম্বূল,
অমনি দেখিয়া তাহা, হইয়া ব্যাকুল
ব্রজধাম-পতি সেই নন্দের নন্দন
কাড়িয়া লইয়া সুখে করিবে ভক্ষণ!

(২২শ হইতে ২৩শ শ্লোকে সাধক কবি শ্রীমতীর দাসীভাব প্রার্থনা করিয়া স্তুতি সমাপ্ত করিলেন।)

(২২)

ব্রজরাজকুমারবল্লভা-
কুলসীমন্তমণি প্রসীদ মে।
পরিবারগণস্য তে যথা
পদবী মে ন দবীয়সী ভবেৎ॥

শ্রীকৃষ্ণের আছে বহু প্রিয়সীমন্তিনী,
কিন্তু তুমি তাঁহাদের সীমন্তের মণি!
প্রসন্ন হইয়া রাধে! আমার উপরি,
দাসীভাবে লও মোরে বিলম্ব না করি।

(২৩)

করুণাং মুহুরর্থয়ে পরং
তব বৃন্দাবনচক্রবর্ত্তিনি।
অপি কেশিরিপোর্যয়া ভবেৎ
সচটুপ্রার্থনভাজনং জনঃ॥

বৃন্দাবনে একমাত্র তুমি সর্ব্বেশ্বরী,
দাসী ভাবে লও দেবি! মোরে কৃপা করি।
তা হ'লে হইব আমি অবশ্য তখন
কেশি-প্রাণ-নাশি-কৃষ্ণ-প্রার্থনা-ভাজন!
(এই শ্লোকে ফলশ্রুতি প্রদত্ত হইয়াছে।)

(২৪)

ইদং বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা জনো যঃ পঠতি স্তবম্।
চাটুপুষ্পাঞ্জলিং নাম স স্যাদস্যাঃ কৃপাস্পদম্।

রাধিকার এই স্তব "চাটুপুষ্পাঞ্জলি"
যেই জন পাঠ করে হ'য়ে কুতূহলী,
অমনি তখন সেই বৃন্দাবনেশ্বরী
নিজ-দাসী-পদ তারে দেন কৃপা করি।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি এ।
(২৬।২ বৃন্দাবন পালের লেন।
শ্যামবাজার, কলিকাতা।)

শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা-

স্মরণ-মঙ্গল-স্তোত্র।

(সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত।)

(১)

রাহুগ্রস্ত হ'ত শশধর যবে,
ফাল্গুনী পূর্ণিমা প্রকাশিত ভবে;
চতুর্দ্দশ শত সাত গৌড়-সালে,
মায়াপুরে শচী-গর্ভে সায়ংকালে;
চিচ্ছক্তি-প্রকট-লীলা-মূর্ত্তি ধরি
অবতীর্ণ সেই মিশ্র-সুতে স্মরি।

(২)

বিশ্বম্ভর হরি-প্রিয়-গৌরাঙ্গ প্রভৃতি—
ক্রমে যাঁর ইত্যাকার নামের বিস্তৃতি,
নবখণ্ড-বিমণ্ডিত ধন্য এই বঙ্গে,
স্মরি সদা সে কলিপাবন শ্রীগৌরাঙ্গে,

(৩)

স্বস্থধনা রাধা-ভাব-কান্তি লয়ে,
বিপ্রবাসে শ্রীশ্রী গৌরহরি হয়ে,
পল্লীবাসিনীর উল্লাস-বৰ্দ্ধিনী
বাল্যক্রীড়া কত করিলেন যিনি,
হামাগুড়ি দিলা অঙ্গনেতে রঙ্গে;
বন্দি আমি সেই স্বর্ণবর্ণ-অঙ্গে।

(৪)

সর্পাঙ্গ অনন্ত হলে স্বাঙ্গন প্রবিষ্ট,
তদঙ্গ আসন করি যিনি উপবিষ্ট!
স্বজনানুরোধে যিনি ত্যজিলেন তাঁরে,
নমি আমি নিত্য সেই দেব বিশ্বম্ভরে।

(৫)

"হরিবোল—হরিবোল" বাল্যে শুনি,
রোদন নিবৃত্ত হইতেন যিনি;
তাই নারীদলে সদা নাম-গান!
মাটি খেয়ে যিনি মায়ে দিলা জ্ঞান;
নাম-গানাশ্রয়—কলিমলহর,
বন্দি আমি সেই গৌরাঙ্গসুন্দর।

(৬)

বাল্যে দ্বিজগৃহে চাপল্য-বিস্তারী,
বিদ্যারম্ভে শিশু-বেষ্টন-বিহারী;
গঙ্গাস্নানে রঙ্গে অঙ্গে দিয়ে বারি,
দ্বিজপাত্রগণ উদ্বেজনকারী,
চপলের চূড়া—কৌতুকিপ্রধান,
স্মরি আমি সেই গৌর ভগবান।

(৭)

তীর্থাটক এক দ্বিজকুল-মণি,
তাঁহার পকান্ন ভক্ষিলেন যিনি;
পরে স্বরূপায় দিলা জ্ঞান গূঢ়।
মোহি চৌরদ্বয়ে হৈলা স্কন্ধারূঢ়!
সুজন-সুখদ—দুর্জ্জন-দণ্ডদ—
বন্দি আমি সেই শ্রীগৌর-শ্রীপদ।

(৮)

শিবভক্ত ভিক্ষু পৃষ্ঠ-আরোহণে,
আনন্দিত রুদ্র-গুণানুকীর্ত্তনে;

মহানন্দধাম,
নমি আমি সেই গৌর ভগবান।

(৯)

শ্রীলক্ষ্মীদেবীর প্রণয়-বিহিত
মিষ্টান্নাদি যিনি করি অঙ্গীকৃত,
দিলা শুভবর চিত্ত-সন্তোষণ ;
মদীচিহ্নে যিনি তুষিলা স্বজন ;
স্মরণ করি সে পরম রসিকে,
চিত্তচোর সেই শ্রীগৌর হরিকে।

(১০)

একদা উচ্ছিষ্ট ভাণ্ডে হয়ে অধিষ্ঠিত,
অদ্বৈতমার্গের পথিকের উপাসিত—
মত-জ্ঞান যাকে যিনি দিলা সে প্রসঙ্গে,
নমি আমি নিত্য সেই বরাঙ্গ গৌরাঙ্গে।

(১১)

নিজ লোষ্ট্রাঘাতে দেখে মাতৃ-ক্লেশদশা,
বাৎসল্য-ভকতিভবে সে শিশু সহসা—
শ্বেত নারিকেলদ্বয়ে মায়ে তুষ্ট করে,
নমি আমি নিত্য সেই মাতৃভক্তবরে।

(১২)

ত্যজি গৃহবাস, লইলে সন্ন্যাস
বিশ্বরূপ যদগ্রজ,
মিষ্টালাপে যাঁর, শমিত পিতার
শোক সুত-বিরহজ।
বিয়োগে পিতার, শোকার্ত্তা মাতার,
শোক নিলা যিনি হরি,
পরম সুখদ সে মাতৃভকত
শ্রীগৌরাঙ্গে আমি স্মরি।

(১৩)

বিপ্র-পরিবৃত, গয়াতীর্থগত
সর্ব্বদেব-বন্দ্যমান—
যিনি নীলাচলে পুরী-গুরু-স্থলে
দশাক্ষর মন্ত্র পান ;
এসে বঙ্গধামে, চিত্বিকৃতি ভাবে
আত্মতত্ত্ব ব্যক্তকারী—
নবরসধর, ভক্তমূর্ত্তিধর
সে গৌরাঙ্গে আমি স্মরি।

(১৪)

বিপ্র পদ-বারি যিনি পান করি,
হইলা নীরোগ বপু ;
বর্ণাশ্রমাচার সুপালিত যাঁর,
স্মরি সেই মহাপ্রভু।

(১৫)

যথাবিধি শ্রীবল্লভআচার্য্যের মেয়ে
শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে শুভবিবাহ করিয়ে,
গৃহস্থ হইয়ে যিনি পূর্ব্বদেশে যান ;
শাস্ত্রবৃত্তি—বিদ্যালাপে বহুধন পান ;
গৃহস্থপ্রধান যিনি—ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান,
স্মরি আমি সেই শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান।

(১৬)

সুজন তপনমিশ্রে কাশী পাঠাইয়া,
দেশে এসে লক্ষ্মীর বিয়োগ-দগ্ধ-হিয়া
স্বীয় প্রসূতিরে শান্তি-সুখদ বচনে—
সান্ত্বনা দিলেন যিনি তত্ত্বআলোচনে ;
বিরক্তি সুখদ যিনি—শান্তি মূর্ত্তিমান,
স্মরি আমি সেই শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান।

(১৭)

মাতৃবাক্যবশে যিনি পুনরায়
বিবাহ করিলা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ায় ;
গঙ্গাতীরে যিনি নিজগণ সঙ্গে,
দিগ্বিজয়ী-দর্প হরিলেন রঙ্গে ;
অধ্যাপকসিংহ সকল সম্বন্ধে ;
বন্দি সুধীশ্বর সে নদীয়া-চন্দ্রে।

(১৮)

স্মার্ত্ত, নৈয়ায়িক, অথবা তান্ত্রিক,
সর্ব্বাদিকে জয় করি,

বিদ্যার বিলাসে নদীয়া-নিবাসে
বিরাজিত গৌরহরি!
সাক্ষাৎ যে জ্ঞান মূর্ত্তিমান,
নমি সে গৌরাঙ্গ ভগবান।

(১৯)

ওঁদা সদা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে,
কৃষ্ণভক্তি-রস আলাপনে,
অদ্বৈতাদি মুখ্য মহাজন
যাঁর পদাশ্রয় প্রাপ্ত হন;
যাঁর মৈত্রীচেষ্টা-যোগে হয়—
নিত্যানন্দ চন্দ্রের উদয়!
সুদর্শন ষড়ভুজধারী,
বন্দি সে দয়াল গৌরহরি॥

(২০)

সহসা মুবরণীয় বরাহ শরীরে
করিলা করুণা যিনি গুপ্ত মুরারীরে;
ব্যাসপূজাচ্ছলে বলদেব-ভাব ধরি,
মধুযাজ্ঞাকারী সেই পরতত্ত্বে স্মরি।

(২১)

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু নিজগণ-সহকারে,
ভক্তিভরে কৃষ্ণমন্ত্রে পূজিলেন যাঁরে;
শ্রীবাস-মন্দির-নিধি পরিপূর্ণ তত্ত্ব,
শ্রীধরাদি-মোহান্ত-শরণে স্মরি নিত্য।

(২২)

যে প্রভু স্বকীয় গুণগণ-প্রদর্শনে
বিশোধিয়া শ্রীবাসের পালিত যবনে,
সাধু ভক্ত বিষয়-বিরক্ত প্রেম-মত্ত
করিলেন, স্মরি সেই গৌরাচাঁদে নিত্য।

(২৩)

শ্রীমুরারি গুপ্তের শ্রীরঘুনাথ-স্তুতি—
শ্রীরামস্বরূপে শুনি সুখী যি'ন অতি;
কৃপায় মুকুন্দে যিনি ছাড়ান কুসঙ্গ;
শুদ্ধভক্তিরসদাতা স্মরি সে গৌরাঙ্গ।

(২৪)

অবধূতে, হরিদাসে, যেই ভগবান
আদেশিলা নগরে বিলাতে হরিনাম,
সর্ব্বত্রই—ছোটবড় সর্ব্বজীবে আর,
সে মহাপুরুষ স্মরি করুণাবতার।

(২৫)

নিত্যানন্দ সহ যেতে অদ্বৈত-মন্দিরে,
ধর্ম্মরক্ষী সুরাসক্ত ভাক্ত সন্ন্যাসীরে
দিলেন ললিতপুরে যিনি তত্ত্বজ্ঞান,
স্মরি সেই শিবদাতা শুদ্ধভক্তিধাম।

(২৬)

কপট অদ্বৈতবাদী অদ্বৈতের পৃষ্ঠ
সহসা চাপড়ি প্রেমে, ভক্তিপথ-নিষ্ঠ
করিলেন তাঁরে যিনি, সেই গৌরহরি,
মায়াহর সুবিমল, সদা তাঁরে স্মরি।

(২৭)

লক্ষ্মীমূর্ত্তি ধরি চন্দ্রশেখরের ঘরে,
দিলা নিজ দুগ্ধ ভজনাব্ধি-মগ্ন নরে;
উদ্ধারিলা স্ববিভূতি দেখায়ে বিজয়ে;
স্মরি সেই সর্ব্বশক্তি-বিভব-আশ্রয়ে

(২৮)

নিদ্রোত্থান, স্নানাহার, পূর্ব্বাহ্নে গোক্রমে;
সংকীর্ত্তন-বিচরণ ক্রমে গ্রামে গ্রামে;
অল্পনিদ্রা, ইত্যাদি নিয়মধারী হয়ে,
যামে যামে লীলা যাঁর ভক্তগণে লয়ে,
সেই প্রভু গৌরাঙ্গ ভজন-সুখধাম,
স্মরণ তাঁহারে আমি করি অষ্টযাম।

(২৯)

শ্রীনিবাস আদি সংকীর্ত্তন-সঙ্গিগণ-
সঙ্গে রঙ্গে করিলেন, পতিতোদ্ধারণ;
জগাই মাধাই আদি দুর্ব্বৃত্ত পতিত
দ্বিজগণ-হৃদিবর প্রেমেতে পূরিত
করিলা যে প্রেমসিন্ধু পতিত-শরণ
করি সেই শ্রীগৌরাঙ্গে সতত স্মরণ।

(৩০)

-ধান ভাবভরে সর্ব্ব সুজনেরে
শিখালেন ভক্তিতত্ত্ব ;
সদয় হৃদয়ে দোষ সমুদয়ে
ক্ষমিলেন যিনি সদা ;
সজ্জন-সভায় ভক্তির ব্যাখ্যায়
বিখ্যাত যে গৌরহরি,
স্বজন-দুষ্কৃতি- মার্জ্জন-মুরতি—
সে মহাপ্রভুরে স্মরি।

(৩১)

কীর্ত্তন-সুধারি চাঁদকাজী উদ্ধারিয়া,
নগরে নগরে সুখে নাচিয়া নাচিয়া,
করি হরিসংকীর্ত্তন কলি-মলহারী,
বারম্বার নদীয়ায় নদীয়া-বিহারী,
নর্ত্তন-বিবশ অঙ্গ দীর্ঘভুজবান,
স্মরি আমি সেই শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান।

(৩২)

গঙ্গাদাস, শ্রীধর, মুরারি,
ভিক্ষু শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী,
সবে যাঁর প্রেমে হয়ে বদ্ধ,
প্রেমপূর্ণ হইলেন সদা ;
যাঁহার শ্রীমুখোচ্ছিষ্ট সেবি,
সুব্রতিকা নারায়ণী দেবী ;
পরম পুরুষ দিব্যাকার,
স্মরি সেই শ্রীগৌরাঙ্গরায়।

(৩৩)

শ্রীবাস-প্রণয়ে বশীভূত হয়ে,
মৃত-সুত-মুখে তার,
বিকাশিয়া বাণী, শুনালেন যিনি
শুভদ সুতত্ত্বসার !
ভক্তহৃদয়ে আর সুমতি-সঞ্চার
করিলা যে গৌরহরি।
সেই অকুহক জীব-নিস্তারক—
শ্রীমহাপ্রভুরে স্মরি।

(৩৪)

লভি গোপীভাবাবেশ, আবিষ্ট যে পরমেশ,
মুষ্টিবদ্ধ যষ্টি-দণ্ড ধরি,
বাদাসক্ত জড়মতি মূঢ়ছাত্রগণ-প্রতি
তাড়ন করিলা কোপ করি ;
তাই সে মূঢ়েরা হায় ! বিস্তারিয়া বৈরতায়
হ'ল যাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আর,
বিমুখ-দমনে যেই দিব্যসিংহ সম, সেই
শ্রীগৌরাঙ্গদেবে আমি স্মরি।

(৩৫)

তা সবার পাপরাশি- প্রশমন-অভিলাষী,
অকস্মাৎ কাটোয়ায় আসি,
সিতপক্ষে মাঘমাসে, কেশবভারতী-পাশে,
সাজিলেন নবীন সন্ন্যাসী !
বিদ্বৎসমাজে যিনি সুবিদ্বান-শিরোমণি,
পণ্ডিতের যিনি অগ্রগণ্য,
আহা ! সে মুণ্ডিতমুণ্ড ধৃত-কমণ্ডলু দণ্ড,
স্মরি প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

(৩৬)

স্বজন-সগৃহ নবদ্বীপে ত্যজি,
নিতাইচাঁদের প্রেমানন্দে মজি,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কাটোয়া ত্যজিয়ে,
শান্তিপুরে যিনি উদিলা আসিয়ে ;
ব্রজ-গমনেচ্ছাবিষ্টমূর্ত্তি যাঁর,
স্মরি সেই শ্রীচৈতন্য অবতার।

(৩৭)

হর্ষ শোকাহতা সে অদ্বিত-মাতা
তথায় আনীতা হয়ে,
দিনকত ধরি, ভিক্ষা দান করি,
পালিলেন যে তনয়ে ;
মাতৃভক্ত্যাবেশে, মাতার আদেশে,
যিনি ক্ষেত্রধামগামী,
ভ্রমণতৎপর ভাগীকুলেশ্বর,
স্মরি সে গৌরাঙ্গে আমি।

(৩৮)

সাধু হরিদাস, দামোদর, নিত্যানন্দ,
সেবক মুকুন্দ, সুধী শ্রীজগদানন্দ,

এ পঙ্ক-ভকত-পদ-ভৃঙ্গ-গজগামী—
প্রণত-প্রিয়াঙ্গ—স্মরি সে গৌরাঙ্গে আমি।

(৩৯)

ত্যজি গঙ্গাদেশ, দেখি অম্বুলিঙ্গেশ্বরে,
উড়িষ্যায় বেমুণায় দেখি ক্ষীরচোরে,
কটকনগরে যিনি করিয়া গমন,
আত্মরূপ গোপালকে করিলা দর্শন;
স্বভজন-পরায়ণ ভক্তমূর্ত্তিধর,
স্মরি আমি সেই প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।

(৪০)

ক্ষত্রলিঙ্গ দেবে করিয়া প্রণাম,
শিবের একাম্রবনে,
নিজ দণ্ড রেখে, পুনঃ যিনি যান
কপোতেশ-দরশনে;
এই অবসরে নিত্যানন্দ যাঁর—
করিলা সে দণ্ড-ভঙ্গ;
ভক্ত-ভক্ত যিনি চন্দনরাকার,
স্মরি সেই শ্রীগৌরাঙ্গ।

(৪১)

দণ্ডভঙ্গে হয়ে কপট-কুপিত,
ভক্তগণে ত্যাগ করি,
একাকী যে প্রভু লভিলা ত্বরিত
নীলাচল-পতি-পুরী;
কৃষ্ণরূপ তথা হেরিয়া যে প্রভু
মহাভাবাবিষ্ট-অঙ্গ;
বিরহিতদণ্ড, স্বর্ণবর্ণ বপু,
স্মরি সেই শ্রীগৌরাঙ্গ।

(৪২)

ভাবাস্বাদাবেশ প্রকট যখন,
সার্ব্বভৌম যাঁরে সেবিলা তখন;
সে সেবার ফলে স্বাভাবিক যত
অনর্থ যাঁহার কৃপায় বিগত;
যাঁহার বিপুল কৃপার বৈভব
লভি সার্ব্বভৌম হইলা বৈষ্ণব;
প্রকৃত বেদার্থ-প্রচার-প্রসঙ্গে
তৎমূর্ত্তি সেই—স্মরি শ্রীগৌরাঙ্গে।

(৪৩)

দিনকত করি তথা অধিষ্ঠান,
দাক্ষিণাত্যে যিনি করিলা প্রয়াণ;
যিনি কূর্ম্মক্ষেত্রে কুষ্ঠরোগভোগী
বাসুদেব দ্বিজে করিলা অরোগী;
বিজয়নগরে রায় রামানন্দে
প্রেমসিন্ধু যিনি দিলা প্রেমানন্দে;
জন-সুখকর তীর্থমূর্ত্তিমান!
স্মরি আমি সেই গৌর ভগবান।

(৪৪)

দেশে দেশে সাধুগণে প্রেম বিতরিয়া,
রঙ্গক্ষেত্রে ভট্টদের পল্লীতে আসিয়া,
কিছুদিন রহি তথা, ভট্টাচার্য্যগণে—
করিলেন কৃষ্ণভক্ত কৃপাবিতরণে;
শ্রীগোপাল-আলয়ের আনন্দের নিধি,
স্মরি সেই গৌরাঙ্গমূরতি নিরবধি।

(৪৫)

বৌদ্ধ-জৈন—যারা ভক্তি-ভজন-বিহীন,
তত্ত্ববাদীতে—মায়াবাদ-হ্রদ-লীন,
শুদ্ধভক্তি প্রচারিয়া—দিয়া আত্মবল,
করিলা তাদের যিনি ভজন-কুশল,
এইমতে বহুমত-বোদ্ধা-উদ্ধারণ—
স্মরি সে গৌরাঙ্গচন্দ্র পতিতপাবন।

(৪৬)

সে ঈশ্বর, বিতরিয়া দাক্ষিণাত্য-জনে
কলিমং হবানন্দ, কৃষ্ণদাস-সনে,—
ভজনের গ্রন্থদ্বয় সংগ্রহ করিয়া,
আলালনাথের মন্দিরের পথ দিয়া,
প্রত্যাগত নীলাচলে প্রমোদিতমতি,—
ভক্তপাল সে গৌরাঙ্গে স্মরি নিরবধি।

(৪৭)

কাশীমিশ্র-গৃহে যেই হেমকান্তিধর,
স্বরূপ-প্রমুখ সহ স্বজন-নিকর,
করি অধিষ্ঠান, সর্ব্বজীবে সর্ব্বক্ষণ
করিলেন কৃষ্ণনামানন্দ বিতরণ;
স্বজন-সহিত সেই প্রফুল্লমূরতি
শ্রীগৌরাঙ্গদেবে আমি স্মরি নিরবধি।

(৪৮)

নীলাচল-নাথ যবে বিরাজিত রথে,
বেষ্টিত-বৈষ্ণববৃন্দ—যিনি তদগ্রেতে,
প্রেমানন্দে নেচে নেচে গেয়ে হরিনাম,
প্লাবিত করিলা প্রেমে সবাকার প্রাণ!

গজপতি-প্রমুখ উড়িয়া ভক্তগণে—
শুদ্ধভক্ত করিলেন প্রেম বিতরণে;
স্বসুখ-জলধি যিনি ভাব-মূর্ত্তিমান,
স্মরি আমি সদা সে গৌরাঙ্গ ভগবান।

(৪৯)

উড়িয়া পার্ষদগণে উড়িষ্যা-সীমায়
পরিহার করি, পরে যিনি পুনরায়,
গেলা গৌড়দেশে ওড্রদেশ পরিহরি,
শচীসুত সে গৌরাঙ্গদেবে আমি স্মরি।

(৫০)

শ্রীবাসে ও শ্রীরাঘবে, আর দত্ত বাসুদেবে,
গিয়ে সে সবের স্বমন্দিরে,
দিয়ে দরশন-দান, যিনি শান্তিপুরে যান,
স্মরি সেই গৌরাঙ্গসুন্দরে।

(৫১)

বিদ্যানগরাখ্য গ্রামে, বিদ্যাবাচস্পতি-ধামে
করিলেন যিনি আগমন;
নদীয়ার কুলিয়াতে গেলা যিনি তথা হতে,
করি সেই গৌরাঙ্গ ভজন

(৫২)

বিদ্যা-রূপ-জন্ম-ধন-জনে ভবে
যে দুর্লভ ধন না লভে মানবে,
শ্রীমহাপ্রভুর কৃপাই সে ধন!
দেবানন্দ যাহা করিলা অর্জ্জন,
কেবল সরল দীনতার বলে,
পূজিয়া যাঁহার ভকতমণ্ডলে;
কুলিয়ানগরে যাঁহার কৃপায়—
মদমুক্ত সাধু সুধীসমুদায়—
এক শুদ্ধভক্তিযোগে যাঁরে পান,
বন্দি আমি সেই গৌরভগবান।

(৫৩)

বৃন্দাবন-দরশন ছলে গৌড়দেশে
মাতৃদরশন যিনি করিলেন এসে;
স্নেহে রূপ-সনাতনে করিয়া উদ্ধার
যবন-কবল হতে, উৎকলে আবার
আসিয়া, স্বজন-ত্রাণে যিনি হৃষ্টচিত্ত,
স্বতন্ত্র পরাত্ম, স্মরি সে গৌরাঙ্গে নিত্য।

(৫৪)

ব্রজে যেতে পুনঃ দৃঢ়মতিমান—
হয়ে যে স্বতন্ত্র পুরুষপ্রধান,
বহুবিধ-জন-সঙ্গ পরিহরি,
একমাত্র বলভদ্রে সঙ্গী করি,
বন-পথে ব্যাঘ্র আদি পশুদলে—
প্রেমে মাতাইয়া যিনি আত্মবলে,
চলিলেন আত্ম-আনন্দ বিতরি!
পশুমতিহর সে গৌরাঙ্গে স্মরি।

(৫৫)

গিয়ে বৃন্দাবন, গিরি-নদী-বন,
গ্রাম-কুঞ্জ দরশনে,
স্মরি পূর্ব্বলীলা মূর্চ্ছিত হইলা
ভাবপুঞ্জাবিষ্ট মনে!
বলভদ্র তা'তে ব্রজ-বন হ'তে
বাহির করিলা যাঁয়;
নিজ-জনাধীন মূরতি সুদীন!
স্মরি সে গৌরাঙ্গরায়।

(৫৬)

করি যাঁরে দৃষ্ট মহাভাবাবিষ্ট,
পথিমধ্যে, কতিপয়
শুভমতিমান ম্লেচ্ছ ভাগ্যবান
কৃপা যাঁর প্রাপ্ত হয়;
তারা তত্তিপূত, প্রেম-বশীভূত,
হ'ল যাঁর পরসাদে,
জন্ম-মলহর শুদ্ধমূর্ত্তিধর,
স্মরি সে গৌরাঙ্গচাঁদে।

(৫৭)

শ্রীজাহ্নবী-যমুনার মিলনে উদ্ভব যাঁর,
পুণ্যতীর্থ সে প্রয়াগধামে,
রূপে করি কৃপালেশ, প্রসাদিলা যে পবেশ,
পররসময়ী বিদ্যা দানে।
যিনি বুধ বল্লভেরে করিলা করুণাভরে
গোকুলপতির প্রেম দান,
রস-গুরু-শিরোমণি, মূর্ত্তিমান শাস্ত্র যিনি,
স্মরি সে গৌরাঙ্গ ভগবান।

(ক্রমশঃ—)

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

(১৮৬৭ সালের ২৫ আইন মতে রেজেষ্টরী কৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।

৯ম বর্ষ, ৯ম খণ্ড, ১১শ সংখ্যা। | ফাল্গুন। | ১৮২৩ শকাব্দা।

জাতিভেদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

যাহারাই একটু প্রণিধান পূর্ব্বক মহাভারত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিয়াছেন যে, গাঙ্গ্যপ্রদেশের প্রথম যোদ্ধৃ-জাতিরা কিরূপ সৎসাহসী, তেজস্বী, মহাবলশালী ও স্ব স্ব অধিকার রক্ষায় কৃতসঙ্কল্প ছিলেন। যে সকল জাতি গাঙ্গপ্রদেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, তাহাদিগের অসীম-কীর্ত্তিসমূহ হিন্দুদিগের মহাকাব্যে বর্ণিত রহিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ কুরু ও পঞ্চালের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহাদিগের যুদ্ধ-বিবরণই হিন্দুর মহাকাব্য।

কিন্তু ভাগীরথীবিধৌত শস্যশ্যামল উর্ব্বর সুরম্য গাঙ্গপ্রদেশে কয়েক শতাব্দী বাস করিতে করিতে হিন্দুদিগের ভিতর যেমন বিদ্যাচর্চ্চা ও সামাজিক রীতি নীতির পরিবর্দ্ধন হইতে লাগিল, তেমনি আবার অপরদিকে তাঁহাদিগের সাহস ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া আসিতে লাগিল। যতই তাঁহারা নিম্নতর প্রদেশে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন, ততই যোদ্ধৃজাতির বীরত্ব, সাহস ও তেজস্বীতার লক্ষণগুলি তাঁহাদিগের স্বভাব হইতে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। তখন বিদেহ ও কাশী পণ্ডিতে পরিপূর্ণ, কিন্তু তখনকার ইতিহাসে বীরত্বের কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না। রামায়ণ পাঠে সামাজিক ও পারিবারিক কার্য্যনিচয়ের যথেষ্ট সবিচার দেখিতে পাওয়া যায়। কোশল রাজ্যের মনুষ্যগণ যে একটী সুমার্জ্জিত জাতি হইয়াছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। তখন যে পৌরহিত্যের প্রাধান্য হইয়াছিল, তাহাও জানিতে পারা যায়। ধর্ম্মের বাহ্যিক আচার নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা ও অন্ধবিশ্বাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও প্রমাণ আছে। কিন্তু মহাভারতে বর্ণিত সেই বীরত্বের কাহিনী তখন শুনিতে পাওয়া যায় না। তখনকার সময়ে তাহারই অভাব হইয়াছিল

ক্রমে ক্রমে হিন্দুদিগের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। ধর্ম্মপ্রণালীর পর্য্যন্ত কতকটা পরিবর্ত্তন ঘটিল।

পঞ্চনদের সেই সকল বিজয়ী আর্য্যগণ যে সকল সরল ঋক্ উচ্চারণ করিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে সরলহৃদয়ে ভক্তিভরে দেবতাদিগকে আহ্বান করিতেন, গাঙ্গপ্রদেশের শান্ত, সুপ্ত, কর্ম্মকাণ্ডপ্রিয় হিন্দুদিগের হৃদয়ে তাহাদিগের স্থান ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে লাগিল। তাঁহারা এখন ধীরে ধীরে বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়াপদ্ধতি অবলম্বন করিলেন। তখনকার সেই সকল সরল ক্রিয়াকাণ্ড আর যেন তাঁহাদিগের মনঃপূত হইত না। ক্রমশঃ পুরোহিতদিগের সংখ্যা ও প্রতাপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। অবশেষে বংশানুক্রমে পৌরহিত্যের নিয়ম সৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণজাতির সৃষ্টি হইল।

ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, আর্য্যগণ যখন মধ্য এসিয়া হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া উপনীত হইলেন, তখন তাঁহাদিগের জীবনে একটা ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটিল। সেই অত্যুন্নত তুষারধবল শৈলশিখর—সেই কলনাদিনী খরগামিনী তরঙ্গিনী—সেই অসংখ্য ফলফুল-শোভিত সুন্দর সুন্দর বনশ্রেণী—সেই উর্ব্বর ক্ষেত্রপরিপূর্ণ শ্যামল শস্য-সম্ভার, সেই বিহগকূজন, ভ্রমরগুঞ্জন, সেই রক্তিম রাগরঞ্জিত সুন্দর প্রভাত—সেই কুয়াসাবিমুক্ত জলদজালপরিমুক্ত সুনীল আকাশ—সেই শুভ্র-জ্যোৎস্নাময়ী পুলকিতা যামিনী—সেই নাতিশীতোষ্ণ মৃদুমন্দপবন সঞ্চালন,—এই সমস্তই একে একে আর্য্যদিগের হৃদয়ে কবিত্বের সৃষ্টি করিল। সেই মিদাঘতপ্ততপনবিকীরিত কিরণ সম্পাতে সমুজ্জ্বল প্রকৃতির রুদ্রমূর্ত্তি, প্রাবৃটের ঘনজলদজালাচ্ছন্ন প্রকৃতির গম্ভীরা মূর্ত্তি প্রভৃতি সমস্তই তাঁহাদিগের নয়ন-পথের পথিক হইতে লাগিল। বালকের জগৎদর্শনের ন্যায় তাঁহারা বিমুগ্ধ চিত্তে সমস্তই অবলোকন করিতে লাগিলেন। যখন নির্গলিতাম্বুগর্ভ মেঘবিমুক্ত বিমল শারদাকাশে শরতের পূর্ণচন্দ্র হাসিয়া হাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইত, তখন তাঁহাদিগের সরল হৃদয়ের মধুর বাঁশরী আপনি বাজিয়া উঠিত। তাঁহারা মন্ত্রের পর মন্ত্র রচনা করিয়া, ঋকের পর ঋক্‌সমূহ সৃষ্টি করিয়া, সেই সরল হৃদয়ের সরল কোমল চঞ্চল ভাবসকল গাহিয়া উঠিতেন। তাই তাঁহারা যাহা দেখিতেন, তাহারই মন্ত্র রচনা করিতেন। প্রকৃতি দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া প্রকৃতি-নিরন্তর স্তোত্র গাহিতেন। ভারতবর্ষের জগৎ তাঁহাদিগের নিকট বড় সুন্দর বোধ হইয়াছিল। সুন্দরে গরলে মিশিল—আর্য্যগণ উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। ঋকের স্রোত বর্ষার জলপ্লাবনের ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তখনকার যুগে বর্ণমালার সৃষ্টি হইয়াছিল না, তখন লিখিত ভাষা ছিল না। কিন্তু এই সকল মন্ত্রগুলি অভ্যাস করিয়া আয়ত্ত করিয়া রাখা নিতান্ত আবশ্যক ছিল। কারণ তখনকার ধর্ম্ম বল, যাগ বল, যজ্ঞ বল—তখন আর্য্যদিগের দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক কার্য্যই এই সকল মন্ত্রের শাসনে চালিত হইত। তাই তাঁহারা বাল্যকাল হইতেই এই সকল মন্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

যজ্ঞস্থলে ঐ সকল মন্ত্ররাশি উচ্চারণ করিয়াই যজ্ঞের সহায়তা করা হইত।

কিন্তু আর্য্যগণ স্বস্ব কার্য্য স্বহস্তে করিতেন। তাঁহারা যেমন হলচালনা করিতেন, তেমনি আবার হোমাগ্নিতে আহুতি প্রদানও করিতেন। তাই সকলের পক্ষে বেদের এতগুলি মন্ত্র শিক্ষা করা ঘটিয়া উঠিত না; অনেকের সেরূপ সুযোগও ছিল না এবং অনেকের পক্ষে তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির অভাবও আসিয়া শিক্ষার পথ রোধ করিত। অন্যান্য সহস্র কার্য্যের মধ্যে মন্ত্র শিক্ষার সময় এবং ধৈর্য্য ক্রমশঃই অনেকটা হ্রাস পাইতে ছিল। কারণ জন-সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত জীবন-সংগ্রামও ক্রমশ: অপেক্ষাকৃত আয়াসসাধ্য হইতেছিল। তাই সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য তাঁহাদিগের চিন্তা সহস্র পথে ধাবিতা হইত।

"There were over a thousand of them (the hymns); and each would on the average fill one page of an octavo volume. This was not all; every hymn must be recited in a particular manner—every word, every syllable must be pronounced in a prescribed way. Besides many idioms of the ancient hymns gradually became obsolete. The Aryan territories gradually covered a considerably wider area; population increased ....Every Aryan was expected to have gone through hymns once. But very few of those, who were engaged in the ordinary occupations of life could afford room in their brains, for a thousand and odd long hymns, with obsolete idioms and expressions, so as to be able to reproduce them at notice. All these circumstances tended to create a class of men, the Brahmans."*

সহস্রাধিক মন্ত্র শিক্ষা করিবার মত ক্ষমতাও তখন সকলের ছিল না। কারণ প্রত্যেক মন্ত্রই অতিশয় দীর্ঘ, তাহার উপর সেই সকল মন্ত্রগুলির উচ্চারণ ভিন্ন২ প্রকার এবং তাহাদিগের আবৃত্তি-পদ্ধতিও একই রকম ছিল না। এই সকল কারণে সকলেই মন্ত্রগুলি শিক্ষা করিতে পারিল না। অথচ সামাজিক ক্রিয়া কর্ম্মের জন্য প্রত্যহই মন্ত্রগুলি আবশ্যক। তাই যাহারা শিক্ষা করিল, তাহারাই সমাজের শীর্ষ-স্থান অধিকার করিল। এক বৎসরে বা দুই বৎসরে সমাজের এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল না।

এখনও আমরা এমন অনেক 'ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত' দেখিতে পাই, যাঁহারা ব্রাহ্মণ বটেন, কিন্তু পণ্ডিত নহেন। অথচ সামাজিক কর্ম্মকাণ্ডের আবশ্যক মন্ত্রগুলি তাঁহারা যেমন শিক্ষা করিয়াছিলেন, তেমনি আবৃত্তিও করিতে পারেন—এদিকে মন্ত্রার্থবোধ তাঁহাদিগের নাই। তখন দিন দিন আর্য্যগণের অধিকৃত জনপদসমূহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। দেশে শিল্প প্রভৃতির উন্নতি হইল—আর্য্যগণ ধনসম্পদ (wealth) প্রাপ্ত হইলেন; এতদ্ভিন্ন এক সহস্রেরও অধিক মন্ত্র এরূপ ভাবে স্মরণ করিয়া রাখা সকলের

* Hindu civilisation under British Rule.

পক্ষে যে সম্ভব হইয়াছিল না, তাঁহা আমরা ইতঃপূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু দৈনিক ধর্ম্মচর্য্যার জন্য প্রত্যহই সেই সকল মন্ত্র আবশ্যক হইতে লাগিল। অথচ তাহাদিগের শব্দ-বিন্যাস স্থির, যতি ভিন্ন, ছন্দ ভিন্ন—আবার দিনে দিনে তাহাদিগের মধ্যে অনেক শব্দ পর্য্যন্ত অপ্রচলিত হইয়া উঠিল. তখন কতকগুলি লোক সেই সকল মন্ত্ররাশি প্রাণপণ-যত্নে শিক্ষা করিলেন। তাঁহারাই তখন হইতে যজ্ঞাদির সময়ে উপস্থিত হইয়া সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তখনকার সমাজের ইহাতে কোন অনিষ্ট হয় নাই।

একই ব্যক্তি যুগপৎ সহস্রবিধ-চিন্তা ও লক্ষবিধ কার্য্য লইয়া ব্যস্ত থাকিতে পারে না। তাহা থাকিলে, কোন কার্য্যই করা হয় না। তাই তখনকার আর্য্যসমাজে যাঁহারা মন্ত্রগুলি শিক্ষা করিলেন, তাঁহারা কেবল তাহা লইয়াই থাকিলেন। বরং অবসর পাইয়া তাঁহারা দিবানিশি অধ্যাত্ম চিন্তাতেই মগ্ন হইলেন ; দার্শনিক তত্ত্ব সকল আবিষ্কারে মনোযোগ করিলেন। তাঁহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণের ভার পূর্ব্বেই এক দল লোক গ্রহণ করিয়াছিলেন—তাঁহারাই ক্ষত্রিয়।

কিন্তু আপন প্রাধান্য বিস্তারের জন্য এবং ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার মানসে ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় ধীরে ধীরে ক্রিয়াকলাপ দুরূহ করিয়া তুলিলেন ; প্রত্যহই নানাবিধ খুঁটি নাটি সংযোজিত হইতে লাগিল। কেমন করিয়া কোন্ কোন্ কার্য্য করিতে হইবে, ব্রাহ্মণগণ তাহার নূতন নূতন নিয়ম করিতে লাগিলেন। তাহারই ফলে 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থ। এক-সম্প্রদায়কে এই সকল কার্য্যে ব্যাপৃত দেখিয়া অন্যান্য সকলে নূতন নূতন কার্য্যে মনোনিবেশ করিল—আর তাহাদিগের ক্রিয়া কর্ম্ম প্রভৃতি সমুদয় ধর্ম্মসংক্রান্ত কার্য্যগুলি ব্রাহ্মণের হস্তেই অর্পিত হইল।

এই স্থলে আর একটী কথা বলা প্রয়োজন। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষার রীতি যেরূপ, তখন তেমন ছিল না। অর্থাৎ তখন শিক্ষা দিবার নিমিত্ত বিদ্যালয় ছিল না, গুরুগৃহই তখনকার শিক্ষা-মন্দির ছিল। শিষ্যগণ গুরুগৃহে বাস করিতেন, তাঁহারই কার্য্য আচরণ করিতেন, গোসেবা করিতেন, আর অভীষ্ট বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। তখনকার গুরুগণ নিয়মিতরূপ দক্ষিণা গ্রহণ করিতেন না, পরন্তু শিষ্যদিগকে আহার ও থাকিবার স্থান দিয়া প্রতিপালন করিতেন। তখনকার শিক্ষক ও শিষ্যের ভিতর পিতা ও পুত্রের ভাব বিদ্যমান ছিল। মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতির অভাবে বিদ্যার্থীদিগের যে কি কষ্ট ও অসুবিধা হইত, তাহা অবর্ণনীয়। যখন পর্য্যন্ত বর্ণমালার ও সৃষ্টি ছিল না, তখনকার কথা ত তুলনাহীন। তাই সেকালে ব্যুৎপন্ন গুরুর সংখ্যাও কম হইত এবং উৎসাহী, উদ্যমপূর্ণ বিদ্যাভ্যাসেচ্ছু কষ্টসহিষ্ণু শিষ্যের সংখ্যাও তখন অল্প হইত। যে সকল গুরু শাস্ত্রবিশারদ বলিয়া খ্যাত হইতেন, নানা দিগ্দেশ হইতে শিষ্যগণ আসিয়া তাঁহাদিগের আশ্রমে উপস্থিত হইত। গমনাগমন সুগম ও সহজ না হওয়াতেও অনেকে আসিতে পারিতনা।

মনুষ্যের স্বভাব এই, যে বিষয়ে যে পারদর্শী ও ব্যুৎপন্ন হয়, তাহার স্বতঃই স্বার্থ

হয় যে, সেই বিদ্যা আপন পরিবারেই নিবদ্ধ থাকুক'। সেই জন্যই এখন পর্য্যন্ত অনেক বিদ্যাই আমাদের দেশে কৌলিক অবস্থায় আছে। উদাহরণ স্বরূপ চাঁদশির ডাক্তার দিগের অস্ত্রচিকিৎসার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখনও যেমন, তখনও তেমনি। মনুষ্য-স্বভাব চিরদিনই প্রায় একই রকম। সুতরাং গুরুগণ সর্ব্বদা হয়ত এই চেষ্টাই করিতেন যে, বেদবিদ্যা তাঁহাদিগের আপন আপন বংশেই বদ্ধ থাকুক। এইরূপে ধীরে ধীরে পৌরহিত্য কৌলিক হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ হইতে লাগিলেন।

আমরা ইতঃপূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, এক সম্প্রদায়ের লোক সর্ব্বদা যুদ্ধার্থে সজ্জিত থাকিতেন। তাঁহারাই আর্য্যভূমির রক্ষক ছিলেন; সুতরাং তাঁহাদিগের সম্মানও বড় কম ছিল না। কালক্রমে এই যুদ্ধ-বিদ্যাও তাঁহাদিগের কৌলিক হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণদিগের শিক্ষা এবং কার্য্যও যে কৌলিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাও আমরা দেখাইয়াছি। তখন দেশের অবশিষ্ট লোকগুলি কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতিতে মনোনিবেশ করিল। ইহাদিগের সংখ্যাই তখন অধিক ছিল। সকল সময়েই দেশে সাধারণ লোক-সংখ্যা অধিক থাকে। বেদে এই সকল ব্যক্তিই "বিশ্" বলিয়া পরিচিত। "বিশ্" অর্থে সাধারণ প্রজাবর্গ বুঝায়। এই কারণেই "বিশাম্পতি" অর্থে 'প্রজাদিগের প্রভু'— অর্থাৎ রাজা বুঝায়।

শ্রীযুক্ত রমেশ বাবু বলিতেছেন,— "পঞ্চনদে থাকিয়া যোদ্ধৃপুরুষেরা কৃষি ও গোচারণে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন; কিন্তু গাঙ্গা প্রদেশে যোদ্ধা ও নরপতিদিগের সৈন্য-আড়ম্বর এবং ভোগবিলাস প্রভৃত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। তাঁহারাও সাধারণ লোক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক বংশানুক্রমিক ভিন্ন জাতি হইয়া পড়িলেন। ঋগ্বেদে যাহাদিগকে বৈশ্য বা বিশ্ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, যাহাদের দ্বারা প্রকৃত পক্ষে হিন্দুজাতি গঠিত, পঞ্চনদে থাকিতে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের যে সাহস ও বীর্য্য ছিল, এক্ষণে তাহারা সে সাহস ও বীর্য্য হারাইয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের অধীনতা স্বীকার করিল।..........ইহার পর হিন্দু-রাজা-সমূহে রাজা ও যোদ্ধাদিগের বীর্য্য লক্ষিত হয়। কিন্তু প্রকৃতিপুঞ্জের ও জনসাধারণের বীর্য্য, ক্ষমতা বা রাজনৈতিক প্রভাব আর লক্ষিত হয় না।"

এই সকল অপরিহার্য্য কারণে ভারতবর্ষে চারিজাতির সৃষ্টি হইল। কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে যখন ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন, তখন জাতিভেদের বর্ত্তমান চিহ্ন সকল কিছুই লক্ষিত হইয়াছিল না। বর্ত্তমান সময়ে জাতিভেদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে তিনটী প্রধান বিষয় আমাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করে।—

* (১) নিম্নজাতীয় ব্যক্তির অন্ন-পান গ্রহণ নিষেধ।

---

* জাতিভেদ সম্বন্ধে বহুদিন পূর্ব্বে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় যে বক্তৃতা

(২) ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিতর এবং এক জাতির অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন নিষেধ।

(৩) জাতিগত পার্থক্য অনুসারে ব্যবসায়ের পার্থক্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

১। বেদোক্ত জাতিভেদ বর্ণনা রূপক।

অধুনা অনেকেই বলিয়া থাকেন, বেদে এবং শাস্ত্রাদিতে জাতিভেদ-প্রথার যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহা রূপক মাত্র। আমরা সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করিব। 'বিশ্বকোষ' প্রণেতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "জাতি বিভাগের কারণ নির্ণয়" করিতে যাইয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহারই কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলেই আমাদিগের কার্য্য সিদ্ধ হইবে বলিয়া মনে হয়। তিনি বলিতেছেন,—*

"সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় যখন মানবগণ সংখ্যায় অতি অল্প; যখন জীবিকার চিন্তা ছিল না, সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা মেদিনী প্রচুর আহারসামগ্রী যোগাইতেন; হিংসা, দ্বেষ, লোভ যখন মানবকে স্পর্শ করিতে পারে নাই; যখন সত্যভাষী সরল মানব কেবল স্বভাবজাত ফলমূলাহারে পরিতৃপ্ত হইত, মানবের সেই প্রকৃত সুখশান্তির যুগে সমাজবন্ধনের কোন প্রয়োজন হয় নাই। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে উচ্চ-নীচ-ক্রমে শ্রেণী বা বর্ণ-বিভাগেরও আবশ্যকতা ছিল না। এই কারণে এক দিন মহর্ষি ভরদ্বাজ এইভাবে ভৃগুকে বলিয়াছিলেন, 'বর্ণ সকলের ইতর বিশেষ নাই। পূর্ব্বে যখন ব্রহ্মা সৃষ্টি করিলেন, তখন সমস্তই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।' সৃষ্টির প্রথম যুগই পুরাণেতিহাসে সত্যযুগ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সত্যযুগের যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই আর্য্যজাতির আদিম অবস্থার পরিচয়।"

"প্রথমে সমস্তই ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মণাত্মক ছিল" এরূপ কথা বলিবার তাৎপর্য্য কি? সর্ব্বপ্রথমে যদি কেবল ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে অন্য জাতির অস্তিত্ব আপনি আসিয়া পড়ে। যদি ব্রহ্মণেতর বর্ণই না থাকিত, তাহা হইলে বৃথা 'ব্রহ্ম' বা 'ব্রাহ্মণ' শব্দ প্রয়োগের আবশ্যকতা কি? এখানে মনে করিয়া রাখ, প্রাচীনতম আর্য্যঋষিগণের সমাজ, ধর্ম্ম ও বিশ্বাসের কথাই বৈদিক মন্ত্রে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহারা আর্য্য ভিন্ন অপর কোন মর্ত্ত্যবাসীকে মনুষ্য মধ্যেই গণ্য করেন নাই; সুতরাং তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে যে বর্ণ বা শ্রেণীর কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের নিজস্ব—তাঁহাদেরই সমাজের, বৈদেশিক জাতির কথা নহে।"

* * * *

"যখন মহাভারত ও রামায়ণে ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি স্থিরীকৃত হইয়াছে, তখন

করিয়াছিলেন, তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই স্থলে তাহা দ্রষ্টব্য।

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু।

উভয় গ্রন্থের মতেই স্বীকার করিতে হইবে, সত্যযুগে ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি হয় নাই, কেবল ব্রাহ্মণই ছিলেন। বেদমন্ত্রোচ্চারণ রূপ মুখের কার্য্যই ব্রাহ্মণের মুখ্য ধর্ম, তাই ব্রাহ্মণ বিরাট পুরুষের মুখ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছিল।"

"যখন পূজ্যপাদ আর্য্যগণ হিমালয়ের তুষারশিখর পরিত্যাগ করিয়া ভারতের সমতল ভূমে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা রজোগুণিক হইয়া রাজ্যবিস্তার, বলবীর্য্য সঞ্চার ও সাত্ত্বিক বেদস্তোতাগণের রক্ষা বিধানে অগ্রসর হইলেন, তাঁহারাই শেষে 'ক্ষত্রিয়' উপাধি লাভ করিলেন।* পুরাণেতিহাসে সেই সময়ই ত্রেতাযুগ নামে বর্ণিত হইয়াছে† ওজ বা বীর্য্য রজোগুণের পরিচায়ক। তাই পুরাণে ক্ষত্রিয়ের রক্তবর্ণতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বাহুর কার্য্যই ক্ষত্রিয়ের মুখ্য, তাই ক্ষত্রিয় বা রাজন্য বিরাট পুরুষের বাহু বা বাহুজ বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন।"

ঋক্‌সংহিতার অনেক মন্ত্রেই "বিশ" বা বৈশ্যের উল্লেখ আছে কিন্তু ঐ সকল স্থানে 'বিশ' শব্দের অর্থ প্রজা-সাধারণ, উহা জাতিবাচক অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই। বাস্তবিকই বেদসংহিতার পুরুষসূক্ত ব্যতীত আর কোথাও জাতিবাচক বৈশ্য শব্দের উল্লেখ নাই।* এতদ্দ্বারা অনুমিত হয়, যে সময়ে সেই মন্ত্রসমূহ ঋষিগণের হৃদয়াকাশে সমুদিত হইয়াছিল, তখনও বৈশ্য নামক এক বিভিন্ন জাতি সমাজবদ্ধ হয় নাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ পাঠে স্পষ্ট বোধ হইবে, যাহারা কৃষি, গোরক্ষা, সুজল-ধন ও ধান্যের উপায় সর্ব্বদা চিন্তা করিত, তাহারাই বৈশ্য বলিয়া পরিগণিত হইল† বেদ, স্মৃতি ও পুরাণের বর্ণোৎপত্তি প্রকরণ মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে মনে হইবে, মন্ত্র ও স্তোত্র পাঠ এবং যাগ ও যজ্ঞাদিতে যাঁহারা নিরত থাকিতেন, তাঁহারা বা তাঁহাদের সন্তানেরা ব্রাহ্মণ। যাঁহারা যাগ যজ্ঞাদির উৎসাহদাতা, ব্রাহ্মণের রক্ষাকর্ত্তা, রাজা বা জনপদের অধিকারী ও বলবীর্য্যশালী, তাঁহারাই ক্ষত্রিয়; এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের সুখশান্তির জন্য যাঁহারা কৃষি দ্বারা শস্যাদি উৎপন্ন করিতেন, পশ্বাদি পালন করিতেন ও ধন দ্বারা রাজার অভাব পূরণে চেষ্টা করিতেন, তাঁহারা বা তাঁহাদের সন্তান

* ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ সর্ব্ব প্রথমে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এইরূপ পাওয়া যায়।—
"ত্রৈষ্টুভো বৈরাজন্য ওজো বা ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যং ত্রিষ্টুবোজসৈবৈনং তদিন্দ্রিয়েণ সমর্দ্ধয়তি।"
(১।৫।২)

† এ সম্বন্ধে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের পূর্ব্বভাগ ৮ম অধ্যায় ১০০—১০২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

* অথর্ব্বসংহিতায় (৫।১৭।৯) এক স্থলে কেবল বৈশ্য শব্দের উল্লেখ আছে।

† মন্ত্রটী এই—"সর্ব্বা বিশঃ বদন্তে স্বস্তি নঃ পিপ্যান্তধর্মস্বিতাস্বাহ স্বস্ত্যাপ্সু বৃজনে স্বর্বতি স্বস্তি নঃ পুত্র কৃথেষু যোনিষু স্বস্তিরায়ে মরুতো দধাতনেতি মরুতা বৈ দেবানাং বিশঃ।" ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ১।২।৩

অন্যস্থানে আছে—
"ন গতীং বৈশ্যাস্যানুরূয়রাজ্জাগতা বৈ বৈশ্যো জাগতাঃ পশবঃ পশুভিরেবৈনং তৎ সমর্দ্ধয়তি।" (১।৫।২)

সন্তানগণ বৈশ্য নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বৈশ্য বর্ণের স্বরূপ এইরূপ লিখিত হইয়াছে।—

"যাঁহারা ক্ষত্রিয়গণের আশ্রয়ে নির্ভর হইয়া কেবল মাত্র সত্ত্বগুণেই ব্রহ্ম বিদ্যমান, এইরূপ চিন্তায় দিনপাত করিতেন; তাঁহারা ব্রাহ্মণ; তাঁহাদের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল, বৈশস্য কর্ম্মে নিযুক্ত, কৃষকরূপে যাহারা অনিষ্ট উৎপাদন (?) করিত এবং ভূমি সম্বন্ধে যাহারা কার্য্যকারী হইয়াছিল, তাহারাই বৃত্তিসাধক কৃষক বৈশ্য।[1] বৈশ্যে রজঃ ও তমোগুণের একত্র সংযোগ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও শূদ্র উভয়ের ভাব বিদ্যমান। বৈশ্যের প্রধান অবলম্বন কৃষি। শস্য পরিপক্ক হইলেই তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি ও কামনা পূর্ণ হয়. এইজন্য পরিপক্ক শস্যের রূপ পীতবর্ণই হিন্দুশাস্ত্রে বৈশ্যের লক্ষণ, বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।"

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে পাওয়া যাইতেছে, গুণকর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণের মধ্য হইতেই বৈশ্য জাতি উৎপন্ন হয়। পুরাণাদি পাঠে বোধ হয়, ত্রেতাযুগের শেষভাগে ও দ্বাপর যুগের প্রথমে বৈশ্যসমাজ গঠিত হইয়াছিল। ব্রহ্মাণ্ড, বিষ্ণু প্রভৃতি মহাপুরাণে দ্বাপর যুগের যে সকল লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে বৈশ্য সমাজের ছবিই প্রকটিত হইয়াছে। কৃষ্যাদি লোক-জীবিকার হেতু বৈশ্য; উরুই তাহাদের প্রধান অবলম্বন; সেই জন্যই বৈশ্য বিরাট পুরুষের উরুদেশজাত, এইরূপ কল্পিত হইয়াছিল।"

[1] ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, পূর্ব্বভাগ, ৮ম অধ্যায়।

"পুরাণেতিহাসে বৈশ্যসমাজ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই শূদ্রোৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ নির্দ্দেশ করিতেছেন,—

"পূর্ব্বে যে সকল ব্রহ্মোৎপন্ন সিদ্ধাত্মা মানবগণের বিষয় কথিত হইয়াছে, তাঁহারাই ত্রেতাযুগে পূর্ব্বজন্মের শুভাশুভ কর্ম্মফল ভোগের জন্য যথাক্রমে, শান্তচিত্ত, তেজস্বী, কর্ম্মী ও দুঃখী—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন।' অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রগণ চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত হইলেন।"

* * * *

"দ্বিজাতির পদসেবাই শূদ্রের মুখ্য ধর্ম্ম—তাই শূদ্র বিরাটপুরুষের পাদজ বলিয়া কল্পিত হইলেন।"

"The Vedas and the Epics carry us back to the good old days of India, when there were no castes and the whole world consisted of Brahmans only. Created equally by Brahma, men have in consequence of their acts, become distributed into different orders. Those who became fond of indulging their desires and were addicted to pleasure and were of a severe and wrathful disposition, endowed with courage and unmindful of piety and worship............those Brahmans possessing the attributes of Rajas (passion) became Kshatriyas. Those Brahmans again, who, without attending to the duties, laid down for them, became possessed of the attributes of goodness (Satwa) and passion and

took to the practice of rearing of cattle and agriculture, became Vaisyas. 'Those Brahmans again, who were addicted to untruth and injuring others and engaged in impure acts and had fallen from purity of behaviour on account of possessihg the attribute of darkness (Tamas), became Sudras. Separated by occupation, Brahmans became members of the other three orders.' (Mahabharata, Moksha Dharma, chap. 188). 'Niether brith, nor study, nor learning constitutes Brahmanhood, character alone constitutes it. (Mahabharata, Vana Parva, chap 313 Vers 108.)"*

(ক্রমশঃ—)

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ,

রাজভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি।

যে অনন্ত প্রকৃতির অভ্যন্তরে সর্ব্বজ্ঞান ও সর্ব্বমঙ্গলময়ের সর্ব্ব সামঞ্জস্য সূচক অভ্রান্ত সাম্যনীতি ও সনাতন নিয়মাবলী দ্বারা সমগ্র বিশ্বরাজ্য নিয়মিত, পরিচালিত এবং সমতা-সূত্রে গ্রথিত হইয়া ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, সেই বিশ্বনিয়ন্তার সর্ব্বসামঞ্জস্য ও মঙ্গলময় সনাতন উদার সাম্য-আদর্শনীতির অনুকরণে যে রাজ্যের রক্ষণ, পালন ও শাসন-নীতির ভিত্তি, সেই রাজ্যই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম রাজ্য। যে রাজ্যের বল একতা, আইন সাম্যনীতি, উদ্দেশ্য জগতের হিত সাধন, সেই রাজ্যই ধর্ম্মরাজ্য। সেই রাজ্যের ভিত্তি অক্ষয়, অচল ও অটল।

আমরা ভারতীয় প্রজা, চিরকাল রাজভক্ত। রাজা আমাদের নিকট ঈশ্বরতুল্য। ভারতে মুসলমান-রাজত্বকালে মহামহিমান্বিত আকবর সাহের লোকহিতকর নূতন সাম্যনীতির আলোক যখন প্রথম ভারতবাসীর চক্ষে প্রতিভাত হইয়াছিল, তখনই ভারত সমস্বরে বলিয়া উঠিয়াছিল যে "দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা"। ভারতে ঐতিহাসিক কালের মধ্যে বিশ্বনিয়ন্তার সাম্যনীতির আদর্শে প্রথম রাজকৃত শুভ্র উদার নীতির জ্যোতির্ম্ময় আভাস যখন ভারতবাসীর চক্ষে প্রতিভাত হইয়াছিল, তখনই ভারতীয় রাজভক্ত প্রজাবৃন্দের অন্তরে ঐ মহান্ ভাব উদিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, ভারত-গগনে বিদ্যুতের ন্যায় ঐ শুভ্র জ্যোতি অল্পকাল মধ্যেই অন্তর্হিত হওয়ায়, ভারতবাসী পুনঃ গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন। যেমন প্রাচ্য গগনস্থ সূর্য্যদেব পৃথিবীর পূর্ব্বভাগ হইতে অস্তমিত হইয়া পাশ্চাত্য গগনে উদিত এবং সেই পাশ্চাত্য সৌরজ্যোতি প্রাচ্য গগনস্থ চন্দ্রে প্রতিবিম্বিত করিয়া, প্রাচ্য ভূমিস্থ নৈশ অন্ধকার বিদূরিত করিয়া স্নিগ্ধ শুভ্র কিরণজাল বিতরণ করেন, সেইরূপ ভারতের নিয়ন্তা তেজোময় বৃটিশ-সূর্য্যের উদার নীতির স্নিগ্ধ শুভ্র জ্যোতিতে

---

* "Fusion of sub-castes in India"—by Rai Bahadur Lala Baij Nath, B. A.
Judge, court of small causes, Agra.

এই হতভাগ্য ভারতভূমি আজ শতাধিক বর্ষ আলোকিত হইয়াছে, এবং সেই সাম্য-নীতির শুভ্র আলোক শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় ক্রমেই উজ্জ্বল ও বর্দ্ধিত হইতেছে।

প্রকৃতি-রাজ্যের অভ্যন্তরে সর্ব্বসামঞ্জস্যময়ী সাম্য-উদারনৈতিক শক্তির ন্যায় মূর্ত্তিমতী সর্ব্বজ্ঞান, সর্ব্বমঙ্গল ও সর্ব্বসামঞ্জস্যের আধারভূতা শ্রীশ্রীমতী মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়া, এই বিপুলা পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধাংশ সুশাসন পূর্ব্বক একই সাম্য-উদারনীতিসূত্রের দ্বারা গ্রথন ও ন্যায়-রজ্জুর দ্বারা আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

যেমন প্রকৃতির মধ্যে সেই সর্ব্বনিয়ন্তার তন্ত্রের সর্ব্বসামঞ্জস্যসূচক বিধি, নিয়ম ও ক্রিয়া দ্বারা নিয়ন্তাকে আমরা অনুভব করি, সেইরূপ শাসন, পালন ও উদারনীতির আধারে স্বরূপিণী আমাদের মহারাজ্ঞী বহু দূরস্থিত হইলেও, তাঁহার উদারনীতিমূলক শাসনদণ্ড ও রক্ষণ-যন্ত্রের প্রত্যেক ক্রিয়া দ্বারা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া আসিয়াছি। যিনি রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তিতে পৃথিবীর শীর্ষদেশাধিরোহণ ও সর্ব্বোপরি সিংহাসনারূঢ়া হইয়া পৃথিবীর অর্দ্ধভাগে সুনিয়ম সংস্থাপন ও সার্ব্বভৌমিক উদারনীতির অনুসরণ পূর্ব্বক লোকরক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, যাঁহার একই শাসন-বন্ধন একই সূত্রে সেই বিপুল সাম্রাজ্য নিনাদিত এবং কৃষি, বাণিজ্য, ধনসম্পদ ও ঐশ্বর্য্য-সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে, সেই রাজরাজেশ্বরীর যশঃস্বরূপ মূর্ত্তি চিরকাল আমাদের হৃদয়পটে অঙ্কিত থাকিবে। তাঁহার রাজনিয়ম যে সমগ্র পৃথিবীর আদর্শ স্বরূপ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সভ্য রাজ্য মাত্রেই রাজতন্ত্র, অভিজাত নিয়মতন্ত্র বা সাধারণ প্রজাতন্ত্র (Kingly form—aristocracy—democracy) এই তিন প্রকারের মধ্যে কোন একপ্রকারে শাসন কার্য্য সম্পন্ন হয়; কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ বৃটিশ শাসননীতির মধ্যে ঐ তিন প্রকার আদর্শই বিদ্যমান আছে। রাজা আছেন, অভিজাত সমিতি, সাধারণ সমিতি, সমস্তই আছে।

আমাদের মহারাণী ভিক্টোরিয়া ১৮১৯ খ্রীঃ অব্দে ২৪শে এপ্রেল জন্ম গ্রহণ করেন, ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ২০শে জুন উইলিয়ম দি ফোর্থের মৃত্যুর পর ২১শে জুন ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে রাজ্ঞীপদে বরিতা হয়েন। ১৮৪০।১০ই ফেব্রুয়ারি বিবাহ হয় এবং ঐ অব্দের নভেম্বর মাসে প্রথম কন্যা এডিলেড মেরিয়া লুইসার ও ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ৯ই নভেম্বর আমাদের বর্ত্তমান রাজাধিরাজ সপ্তম এডওয়ার্ডের জন্ম হয়, এবং ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে ১০ই মার্চ্চ তারিখে বর্ত্তমান রাজ্ঞীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

আমাদের ভূতপূর্ব্বা মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যগ্রহণের সময় আর্চবিসপ প্রত্যুষে যখন তাঁহাকে এই সংবাদ দেন, তখন তিনি আনন্দ প্রকাশ না করিয়া স্থির কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "আপনি তবে আমার জন্য প্রার্থনা করুন, আমি যেন রাজদায়িত্ব বহনে সক্ষম হই।" ঈশ্বর তাঁহার প্রার্থনা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ করিয়াছিলেন; তাঁহার রাজত্বকালে বৃটিশরাজ্যের সর্ব্ব প্রকারে যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বে কোন সময়ে তদ্রূপ উন্নতি সংঘটিত হয় নাই।

ভাষা অনভিজ্ঞ, তবে আজ ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে পরস্পর ভ্রাতার ন্যায় যে সম্ভাষণ হইতেছে, সেই বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন-ভাষী ভ্রাতাদিগের শিক্ষয়িত্রী জননী কে? সেই মূর্ত্তিমতী জ্ঞানদেবী মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়াই এই অজ্ঞান শিশুসন্তানগণের শিক্ষয়িত্রী জননী। তাই ভারতবাসী মাতৃহীন বালকের ন্যায় সকলেই সমস্বরে এবার মা মা বলিয়া ডাকিয়া হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে।

হে মহারাজাধিরাজ সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড! আপনার মা ইংলণ্ডেশ্বরী, আর আমরা আপনার অনুগত ও পদাশ্রিত শিশু ভ্রাতাগণ, আমাদের মাও সেই ভারতেশ্বরী; তিনি প্রকৃত পক্ষে মরেন নাই। তাঁহার যশোরূপী সূক্ষ্ম দেহ কখনও ধ্বংস প্রাপ্ত হইবার নহে। যতকাল পৃথিবী থাকিবে, ততকাল তাহা অক্ষয় ও অমর থাকিবে।

"এই যে গোলাপপুষ্প অতীব সুন্দর হায়!
বিতরি সুগন্ধ ভূমে শুষ্ক হয়ে ঝরে যায়॥
কিন্তু তার সার অংশ সহজে পায় কি ধ্বংস,
যদ্যপি প্রস্তুত হয় সুবাস আতর তায়?
যায় বটে পুষ্প-রূপ, গুণ নাহি ধ্বংস পায়॥
গোলাপী আতর যাহা বিতরে সৌরভামৃত।
স্থূলরূপ ত্যজি তাহা সূক্ষ্ম গুণে বিবর্দ্ধিত॥"

এইরূপ সেই মহাদেবীর স্থূল পার্থিব দেহ অন্তর্হিত হইয়াছে বটে; কিন্তু তাঁহার যশোদেহ সম্মুখে বর্ত্তমান রহিয়াছে। হে মহারাজাধিরাজ! আপনি তাঁহার যশঃস্বরূপ দেহের আদেশে তাঁহার সার্ব্বজনীন উদার সামানীতির অনুকরণে আমাদিগকে এবং আপনার আসমুদ্র-মহা-মহা-দেশবাসী প্রজাবর্গকে পালন করিয়া, যশস্বী হইয়া, দীর্ঘজীবন লাভ করুন, এই আমাদের প্রার্থনা। আমরা মাতৃহীন হইয়াছি, এইক্ষণ আপনার সুশীতল ক্রোড়ে যাহাতে স্থান পাই এবং সর্ব্বক্ষণ আপনার পূজা করিতে পারি, ইহাই আমাদের শেষ প্রার্থনা। আপনার নামে বুয়ার-যুদ্ধ তিরোহিত হইয়াছে, বুয়ারগণ আপনার পদাশ্রিত হইয়াছে। ভরসা করি, আপনি পৃথিবীস্থ সমগ্র রাজন্যবর্গের শিক্ষার আদর্শ হইয়া, আসমুদ্র-বিপুলা পৃথিবী শাসন, পালন ও নব নব শুভসংঘটন সম্পাদন করিয়া, এই পৃথিবীকে অনাস্বাদিত ফল প্রদান করুন, এবং আপনার স্বদেশীয় ভ্রাতা বুলার লিটন প্রণীত "Comi g Race" নামক গ্রন্থের নিম্নোক্ত উক্তির সার্থকতা সম্পাদন করুন।

"Obedience to the rule adopted by the Government, has become, as much an instinct as if it were implanted by nature.

There being no apprehention of war, there were no armies to mentain.

Being no Government of force, there was no police to appoint and direct, what we call crime was utterly unknown to them."

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের শেষে বর্ত্তমান ভারত-সম্রাট যখন যুবরাজ ছিলেন, তখন ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। ভারতবাসিগণ তাঁহাকে দেখিয়া যে কিরূপ সুখানুভব করিয়াছিলেন এবং কিরূপ আগ্রহ ও রাজভক্তি সহকারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনার অতীত। ভারত-ভুবন সেই কয়েক দিন যেন আনন্দসাগরে ভাসিয়া

ছিল। নগরে নগরে আলোকমালা, অগ্নি-ক্রীড়া প্রভৃতি আনন্দপ্রদ কার্য্যের ভূরি অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল।

আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট ১৮৭৫ খৃঃ অব্দশেষে যখন ভারতে পদার্পণ করেন, তখন ভারতের প্রধান কবি ভারত-মাতাকে সম্বোধনে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই আমাদের আশার সম্বল।

কেঁদনা কেঁদনা আরগো জননি!
মহিষী-নন্দন কোলেতে এল।
আঁধার রজনী এবার তোমার
বিধির প্রসাদে ঘুচিয়া গেল।
মহিষী তোমার—যাঁহার আশ্রয়ে,
এ শোক সহিয়ে আছ মা জীয়ে,
পাঠাইলা তব অশ্রু মুছাইতে
আপন নন্দনে বিদায় দিয়ে।
ত্যজ শয্যা মাতঃ! অরুণ উঠিল,
কিরণ ছড়াতে তোমার ভূমে।
কেঁদনা কেঁদনা আরগো জননি!
আচ্ছন্না হইয়া শোকের ধূমে॥

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
(সাতক্ষিরা।)

পঞ্চকোষ-বিবেক।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

১১। নম্বু দেহমুপক্রম্য নিদ্রা-
নন্দান্তবস্তুষু।
মাভূদাত্মত্ব মন্যস্তু ন কশ্চিদনু-
ভূয়তে॥

বঙ্গানুবাদ। দেহ হইতে আনন্দময় কোষ পর্য্যন্ত যদি আত্মা বলিয়া মনে না কর, তবে আর কিছুইত অনুভূত হয় না।

১২। বাঢ়ং নিদ্রাদয়ঃ সর্ব্বেঽনু-
ভূয়ন্তে ন চেতরঃ।
তথাপ্যেতেঽনুভূয়ন্তে যেন তং
কো নিবারয়েৎ॥

বঙ্গানুবাদ। আনন্দময় কোষ প্রভৃতি সমস্তই অনুভূত হয়, আর কিছুই অনুভূত হয় না বটে, তথাপি যৎকর্ত্তৃক ঐ পঞ্চকোষ অনুভূত হয়, তাহাকে আত্মা বলিতে বাধা কি?

১১।১২ শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ।——যদি স্থূলদেহ স্বরূপ অন্নময় কোষাদি আনন্দময় কোষান্ত সকলেরই অনাত্মত্ব স্বীকার কর, তাহাহইলে এই পঞ্চকোষের অতিরিক্ত আর কোন বস্তুকে আত্মা বলিয়া অনুভূত হয় না কেন? এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত স্বরূপে বলিতেছেন,—তুমি যে বলিলে, স্থূলদেহ স্বরূপ অন্নময়াদি আনন্দময়ান্ত পঞ্চকোষেরই অনুভব হয়, তদতিরিক্ত আর কোন পদার্থই আত্মস্বরূপে অনুভূত হয় না, ইহা সত্য; কিন্তু যে নিত্য চৈতন্য দ্বারা সেই স্থূল দেহাদির অনুভব হয়, তাঁহাকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করিতে কে নিবারণ করে? অর্থাৎ যিনি সেই অনুভবের আশ্রয়, তাঁহাকেই তুমি আত্মা বলিয়া স্বীকার কর।

১৩। স্বয়মেবানুভূতিত্বাৎ বিদ্য-
তে নানুভাব্যতা।
জ্ঞাতৃ জ্ঞানান্তরাভাবাদজ্ঞেয়ো
নত্বসত্তয়া॥

বঙ্গানুবাদ। আত্মা স্বয়ং অনুভূতি, ইঁহার অনুভাবক নাই। জ্ঞাতা জ্ঞানান্তর অভাবে অজ্ঞেয়; কিন্তু তিনি অসত্তা নহেন, অর্থাৎ তিনি আছেন।

তাৎপর্য্যার্থ। যদি স্থূল শরীর স্বরূপ অন্নময় কোষাদি আনন্দময়ান্ত পঞ্চকোষের অতিরিক্ত নিত্যজ্ঞান স্বরূপ সর্ব্বনিয়ন্তা আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ থাকে, তবে তাহার উপলব্ধি হয় না কেন? কি কারণে আমরা তাহা লাভ করিতে পারি না? আত্মা বলিয়া যদি কোন অতিরিক্ত পদার্থ থাকিত, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই তাঁহাকে জানিতে পারিতাম। এই সংশয়ের নিবারণাভিপ্রায়ে সিদ্ধান্ত করিতেছেন।— পরমাত্মা স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ, তাঁহাকে সচরাচর কেহই জানিতে পারে না; কিন্তু তিনিই সকলের জ্ঞাতা, অর্থাৎ তিনিই সকলকে জানিয়া থাকেন। জ্ঞানান্তরের অভাব হেতু তিনি অজ্ঞেয়; যদি অন্য কোন পদার্থের নিত্য জ্ঞান থাকিত, তবে তাঁহাকে সকলেই জানিতে পারিত। যখন আত্মাভিন্ন অন্য কোন পদার্থে নিত্য জ্ঞান নাই, তখন তাঁহাকে আর কে জানিতে পারে? এই নিমিত্তই তাঁহাকে অজ্ঞেয় বলে, নচেৎ তাহার অসত্তা হেতু তিনি অজ্ঞেয় নহেন।

১৪। মাধুর্য্যাদি স্বভাবানামন্যত্র স্বগুণার্পিণাম্।
স্বস্মিন্ তদর্পণাপেক্ষা নো ন চাস্ত্যন্যদর্পকম্॥

বঙ্গানুবাদ। মধু-শর্করা প্রভৃতি স্বভাবতঃ মিষ্ট হেতু অন্য বস্তুতে সংসর্গ জনিত তাহাকে মিষ্টত্ব অর্পণ করে; আপনাতে মিষ্টত্ব অর্পণ জন্য অন্য কোন বস্তুর অপেক্ষা করে না।

১৫। অর্পকান্তর রাহিত্যেপ্যস্ত্যেষাং তৎ স্বভাবতা।
স্যাদ্ভূৎ তথানুভাবাত্মঃ বোধ্যা জ্ঞাতুর্ন হীয়তে।

বঙ্গানুবাদ। যেরূপ মধু-শর্করার মিষ্টত্ব গুণ অর্পণকারী অন্য কোন বস্তু না থাকায় স্বভাবতঃ মধু-শর্করাই মিষ্ট, সেইরূপ পরমাত্মার অন্য জ্ঞাতা না থাকায়, তাঁহার অস্তিত্ব নাই, বলা যায় না।

১৪ ১৫শ শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ—আত্মা সকল পদার্থের অনুভব করিয়া থাকে, তাঁহাকে অনুভব করে, এমন কোন পদার্থই নাই, এই নিমিত্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা সে বিষয় প্রমাণীকৃত করিয়া, আত্মার বিদ্যমানতাকে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতেছেন যেমন মাধুর্য্য গুণশালী মধু ও শর্করা প্রভৃতি বস্তু সকল স্বীয় সংসর্গ বশতঃ অন্য বস্তুতে আপন মাধুর্য্য-গুণ অর্পণ করে, আপনাতে সেই মাধুর্য্য গুণ স্থাপনার নিমিত্ত অন্য কোন বস্তুর অপেক্ষা করে না এবং মধু-শর্করা প্রভৃতি বস্তুকে মাধুর্য্য গুণ অর্পণ করিতে পারে, এমত অন্য কোন পদার্থই নাই সুতরাং সেই মধুশর্করাদির মাধুর্য্য গুণ স্বতঃসিদ্ধ। সেই প্রকার পরমাত্মারও জ্ঞাতা কেহ নাই এবং তাঁহাকে জানিবার অন্য জ্ঞানও নাই; সুতরাং তিনি অজ্ঞেয় হইলেন; কিন্তু ইহাতে তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ নিত্য জ্ঞানস্বরূপের কোন হানি হয় না।

১৬। স্বপংজ্যোতির্ভবত্যেষ
পুরোঽস্মাৎভাসতেঽখিলাৎ।
তমেব ভান্তমন্বেতি তদ্ভাসা
ভাসতে জগৎ॥

বঙ্গানুবাদ। আত্মা স্বয়ং প্রকাশক, যাহিতে তাঁহা হইতে সকল বস্তু প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহাকেই সর্ব্বপ্রকাশক বলিয়া জানিবে; তাঁহার প্রকাশে জগৎ প্রকাশিত।

তাৎপর্য্যার্থ। পূর্ব্বকথিত শ্লোকার্থের সামান্য বিজ্ঞাপনার্থ শ্রুতি সকলের তাৎপর্য্যার্থ নিরূপণ করিয়া বলিতেছেন। শ্রুতিতে বর্ণিত আছে যে, এই আত্মা স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ, তাঁহার প্রকাশক আর কেহই নাই। এই সচরাচর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির পূর্ব্বেও সেই একমাত্র পরমাত্মাই বিদ্যমান ছিলেন এবং এই জগতের প্রলয়াবসানেও তিনিই বর্ত্তমান থাকিবেন; তিনি ভিন্ন আর কিছুই থাকিবে না। এই অশেষ জগৎ সেই নিত্য জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার প্রকাশের অনুগামী, তাঁহার প্রকাশ দ্বারাই এই জগৎ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

১৭। যেনেদং জানতে সর্ব্বং তৎ
কেনান্যেন জানতাম্।
বিজ্ঞাতারং কেন বিদ্যাৎ শক্তং
বেদ্যেতু সাধনম্॥

বঙ্গানুবাদ। যৎ কর্ত্তৃক এই সমগ্র জগৎ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাঁহাকে অন্য কর্ত্তৃক কি প্রকারে পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে? জ্ঞাতাকে কে জানিবে বা জ্ঞাতাকে অনুভব করিবার জন্য ইন্দ্রিয়গণকে কে নিয়োজিত করিবে?

তাৎপর্য্যার্থ। যে নিত্যচৈতন্য দ্বারা এই পরিদৃশ্যমান অখিল ব্রহ্মাণ্ডকে জানিতে পারা যায়, সর্ব্বসাক্ষীস্বরূপ সেই নিত্যচৈতন্যকে অন্য কোন অনিত্য বস্তু দ্বারা পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে? এই জগতে এমন কোন পদার্থই নাই যে, তদ্দ্বারা তাঁহার তত্ত্ব জানা যাইতে পারে। যিনি এই জগতের পরিজ্ঞাতা, সেই পরমাত্মাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা কোনরূপেই জানা যাইতে পারে না। যে হেতু ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব জ্ঞেয় বিষয়ে আসক্ত হয়, কিন্তু জ্ঞাতার প্রতি অনুসরণ করিতে পারে না। পরমাত্মাই ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব জ্ঞেয় বিষয়ে নিয়োজিত করেন, কিন্তু সেই আত্মাকে কে আর ইন্দ্রিয়গণকে নিয়োজিত করিবে?

১৮। স বেত্তি বেদ্যং তৎ সর্ব্বং
নান্যস্তস্যাস্তি বেদিতা।
বিদিতা বিদিতাভ্যাং তৎ
পৃথগ্ বোধস্বরূপকম্॥

বঙ্গানুবাদ। তিনি সমস্ত পদার্থকে জানেন, তাঁহার অন্য পরিজ্ঞাতা নাই। বিদিত ও অবিদিত পদার্থ হইতে তিনি পৃথক্ জ্ঞানস্বরূপ।

তাৎপর্য্যার্থ। পরমাত্মা যে স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ এবং তাঁহার প্রকাশক আর যে কেহ নাই, এতদ্বিষয়ের প্রমাণ এই, এই পরিদৃশ্যমান সচরাচর জগতে যত কিছু জ্ঞেয় পদার্থ আছে, সেই সমুদায়কেই পরমাত্মা জানেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় বিদিত পদার্থ আছে, সেই পরমাত্মা তাহা হইতে

পৃথক্‌ এবং যত কিছু অবিদিত পদার্থ আছে, তাহা হইতেও সেই পরমাত্মা বিভিন্ন। তিনি নিত্য-সিদ্ধ-জ্ঞানস্বরূপ, পরম পিতা পরমেশ্বর।

১৯। বোধেঽপ্যনুভবো যস্য ন কথঞ্চন জায়তে।
তং কথং বোধয়েৎ শাস্ত্রং লোষ্টং নরসমাকৃতিম্‌॥

বঙ্গানুবাদ। যাহার (উপযুক্ত) বোধ থাকা সত্ত্বেও হৃদ্‌গম্য হয়না, সেই মৃৎপিণ্ডবৎ নরাকৃতি এই শাস্ত্র কি প্রকারে বুঝিবে?

তাৎপর্য্যার্থ। যাহারা বিদিতাবিদিত হইতে অতিরিক্ত সেই পরমাত্মা পরমব্রহ্মকে বুদ্ধিযোগ সত্ত্বেও অনুভব করিতে পারেনা, তাহারা নরাকৃতি মৃৎপিণ্ডবিশেষ ও জড় পদার্থের ন্যায় সর্ব্বকর্ম্মের অযোগ্য পাত্র। যাহারা জড়বুদ্ধিবিশিষ্ট, তাহাদিগকে কি প্রকারে শাস্ত্রীয় যুক্তিসিদ্ধ অনুভবস্বরূপ পরমাত্মতত্ত্বের বোধভাগী করা যাইতে পারে? যাহাদিগের বুদ্ধি জড়তাদ্বারা সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহারা কোনরূপেও শাস্ত্রীয় যুক্তি হৃদয়ঙ্গম করিয়া পরমাত্মতত্ত্ব বোধের অধিকারী হইতে পারেনা।

২০। জিহ্বা মেঽস্তি ন বেত্যুক্তি-র্লজ্জায়ৈ কেবলং যথা।
ন বুধ্যতে ময়া বোধো বোধব্য ইতি তাদৃশী॥

বঙ্গানুবাদ। আমার জিহ্বা আছে কিনা, এই কথা যেরূপ লজ্জাজনক, আমার জ্ঞান আছে, আমি জানিনা, এই জাতব্য সেইরূপ।

তাৎপর্য্যার্থ। যিনি পরমাত্মা, সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্ম, নিত্য বোধস্বরূপ, তিনি কোন প্রকারেও আমাদের বোধগম্য হন না; অর্থাৎ তাঁহাকে আমরা কোন উপায়েও জানিতে পারিনা, এই প্রকার উক্তিকরা নিতান্ত অসঙ্গত। যেমন "আমার জিহ্বা আছে কিনা, তাহা আমি বলিতে পারিনা" এই বাক্য নিতান্ত লজ্জাজনক, কারণ জিহ্বা না থাকিলে কেহই কথা কহিতে পারেনা, এই জ্ঞান সকলেরই আছে, তথাপিও জিহ্বার প্রতি সংশয় করা যেরূপ লজ্জাকর, "নিত্য-জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাকে আমি জানি না" এই বাক্যও তদ্রূপ নিতান্ত লজ্জাকর। "নিত্য-বোধস্বরূপ পরমাত্মা বোধগম্য হন না" এই যে বাক্য, ইহা "জ্ঞানকে জানিনা" এই বাক্যের ন্যায় অলীক॥

২১। যস্মিন্‌ যস্মিন্নস্তি লোকে বোধস্তত্তদুপেক্ষণে।
যদবোধ মাত্রং তদ্‌ ব্রহ্মেত্যেবংধী-র্ব্রহ্ম নিশ্চয়ঃ॥

বঙ্গানুবাদ। যে যে বস্তু পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, সেই সেই বস্তু পরিত্যাগ করিয়া, অবশিষ্ট যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানই ব্রহ্ম।

তাৎপর্য্যার্থ। লৌকিক ব্যবহার বিষয়ে যে যে বস্তু পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, সেই সমুদয় পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল সেই সেই বস্তু বিষয়ক যে "জ্ঞান" তাহাকেই পরমাত্মা পরমব্রহ্ম বলিয়া জান, এবং সেই জ্ঞানকেই 'ব্রহ্মজ্ঞান' বলা যায়। জ্ঞানই ব্রহ্মের স্বরূপ, জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন বস্তুই তাঁহার স্বরূপ নহে।

২২। পঞ্চকোষপরিত্যাগে সাক্ষি-
বোধাবশেষতঃ।
স্বস্বরূপং স এব স্যাৎ শূন্যত্বং তস্য
দুর্ঘটম্॥

বঙ্গানুবাদ। পঞ্চকোষ পরিত্যাগ করিলে তাহার যে সাক্ষীবোধ অবশিষ্ট থাকে, সেই বোধই ব্রহ্মস্বরূপ, অতএব পঞ্চকোষের অতিরিক্ত শূন্য হইতে পারে না।

তাৎপর্য্যার্থ। যদিও তৎ ত্বম্ রূপে ঘটাদি বিষয় সকলকে পরিত্যাগ করিয়া সেই অদ্বৈত পদার্থ বিষয়ক জ্ঞান মাত্রকে পরমব্রহ্মরূপে জানিলে, পরমাত্মজ্ঞান সিদ্ধ হয়, তথাপিও পঞ্চকোষ বিচার নিষ্প্রয়োজনীয় নহে। যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত সংসার-নিবৃত্তি হয় না; পরন্তু সেই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি পঞ্চকোষ-বিচারের উপযোগিতা আছে। বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক অন্নময়াদি পঞ্চকোষের বিচার পূর্ব্বক তাহাদিগের অনাত্মত্ব স্থিরীকৃত হইলে পর, সেই অন্নময়াদি পঞ্চকোষ পরিত্যাগ করিলে, অবশিষ্ট সাক্ষী স্বরূপ যে "জ্ঞান" থাকে বা জন্মায়, তাহাই পরমব্রহ্ম স্বরূপ। যদি বল, অন্নময়াদি পঞ্চকোষ পরিত্যাগ করিলে কেবল শূন্য মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহা নহে; পঞ্চকোষ বিচার পূর্ব্বক তাহা পরিত্যাগ করিলে, তাহাদিগের সাক্ষী স্বরূপ যে জ্ঞান বিদ্যমান থাকে, সেই জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান বা পরব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞান; সুতরাং পঞ্চকোষের বিবেচনা আবশ্যক। অগ্রে পঞ্চকোষ-জ্ঞান না হইলে, তাহার অবশিষ্ট জ্ঞান হইতে পারে না।

উপরোক্ত পঞ্চকোষ-বিবেকের ১ম শ্লোক হইতে দ্বাবিংশ শ্লোক পর্য্যন্তের তাৎপর্য্য এই যে, অন্নময় কোষাভ্যন্তরে প্রাণময়, প্রাণময় কোষাভ্যন্তরে মনোময়, মনোময় কোষাভ্যন্তরে ধীময়, তদভ্যন্তরে আনন্দময় কোষ রহিয়াছে; ঐ আনন্দময় কোষই আত্মার স্থান-স্বরূপ। আত্মাই যে ব্রহ্ম, তাহা এই পঞ্চকোষবিবেকের প্রথম শ্লোকেই প্রকাশ। ঐ শ্লোকে পঞ্চকোষবিচার দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, বর্ণিত আছে।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে ভূতবিবেকের প্রথম শ্লোকেও বর্ণিত হইয়াছে, বেদোক্ত সৎ অদ্বৈততত্ত্ব পঞ্চভূতবিচার দ্বারা বুঝিতে পারা যায়; সেই জন্য পঞ্চভূতের বিচার আবশ্যক। ঐ পঞ্চভূত বিচারকালে প্রমাণিত হইয়াছে যে, "ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম" এই পঞ্চভূতাশ্রয়-জ্ঞানের মধ্যে ঐ ভূত সকল বা ভৌতিক সমস্ত পদার্থ ত্যাগ করিলে, অবশিষ্ট যে নিত্য জ্ঞান বা চৈতন্য থাকে, সেই নিত্য সৎ পদার্থই জ্ঞানময় ব্রহ্ম। এক্ষণে এই পঞ্চকোষবিবেকের প্রথম শ্লোক হইতে দ্বাবিংশ শ্লোক পর্য্যন্তের মীমাংসার স্থূল অর্থ যে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষের অতিরিক্ত নিত্য চৈতন্য বা নিত্যানন্দই আত্মা,—যে নিত্য চৈতন্যের বা জ্ঞানের ছায়া (আভাস) প্রাপ্ত হইয়া বিজ্ঞানময় কোষ কর্ত্তা স্বরূপে এবং যে নিত্যানন্দের প্রতিবিম্ব প্রাপ্ত হইয়া আনন্দময় কোষ ভোক্তা স্বরূপে বিরাজমান, সেই নিত্য অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই আত্মা। নিত্যজ্ঞানই যে নিত্যানন্দ সৎ পদার্থ, তাহা তত্ত্ববিবেকের প্রথমেই

প্রদর্শিত হইয়াছে; সুতরাং সৎই চিৎ বা জ্ঞান এবং সৎই আনন্দ। ঐ জ্ঞান বা আনন্দই যে আত্মা, তাহাও ঐ তত্ত্ববিবেকের স্থানে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। যদি তাহাই হয়, তবে ভূতবিবেক বিচার কালে যাহা পঞ্চভূত-বিচার দ্বারা মীমাংসিত ও স্থিরীকৃত হইয়াছে, পুনর্ব্বার পঞ্চকোষবিচার দ্বারা তাহার মীমাংসা ও সিদ্ধান্ত করার প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, ভূতবিবেক ও পঞ্চকোষবিবেকের মধ্যে পার্থক্য কি, নির্ণয় আবশ্যক। ঐ পার্থক্য নির্ণয়ের পূর্ব্বে পাঠকগণের একটী বিষয় স্মরণ করা আবশ্যক যে, ভূতবিবেক বিচার কালে সূক্ষ্মতম আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমে ক্রমে স্থূলতম পৃথিবী প্রভৃতি চতুর্দ্দশ ভুবন এবং ঐ ভুবনস্থ জড়, উদ্ভিদ, জীব-জন্তু পর্য্যন্ত বিচার ও সেই সকল সূক্ষ্মতম হইতে স্থূলতম পদার্থের জড়ত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক চিন্ময় ব্রহ্মের স্বরূপ মীমাংসিত হইয়াছে, কিন্তু পঞ্চকোষ বিচারকালে স্থূলতম দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্মতম আনন্দময় কোষ পর্য্যন্ত বিচার করিয়া, ঐ সকল কোষের অনাত্মত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক আত্মার স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে। অতএব ভূতবিবেক দ্বারা সূক্ষ্ম হইতে স্থূল এবং পঞ্চকোষবিবেক দ্বারা স্থূল হইতে সূক্ষ্ম পদার্থের মীমাংসা দ্বারা আর্য্যঋষিগণ সৃষ্টির গূঢ় রহস্য অতি সুকৌশলে বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই সৃষ্টি-রহস্যের গূঢ় অর্থ বুঝিতে পারিলে, উভয়ের পার্থক্য-নির্ণয় ও ঐ উভয় বিচারের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইবে। ইহাদ্বারা কেবল সৃষ্টির গূঢ় রহস্য নহে, সৃষ্টির উদ্দেশ্যও বিশদ ও স্পষ্টীকৃত হইবে।

সৃষ্টির বিবর্ত্তবাদের (Evolution theory) তাৎপর্য্য এই যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে অব্যক্ত অনভিজ্ঞান বা চৈতন্য অপ্রকাশ অবস্থায় কেবল বীজ মাত্রে পর্য্যবসিত থাকে। বিষয় অবলম্বনেই জ্ঞান বা চৈতন্য প্রকাশিত হয়। জ্ঞানের মধ্যে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তু না থাকিলে জ্ঞানের সার্থকতা থাকে না। জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়, জ্ঞানের দুইটী পার্শ্ব মাত্র। যে শক্তি দ্বারা জ্ঞাতার সহিত জ্ঞেয় বস্তুর সংযোগ হয়, সেই শক্তির নাম জ্ঞানশক্তি। যেমন জ্ঞান ব্যতীত বিষয়ের বিকাশ বা বিষয় উপলব্ধ হয় না, সেইরূপ বিষয় ব্যতীত জ্ঞাতারও বিকাশ বা জ্ঞানেরও স্ফুরণ হয় না। এতাবতা সাব্যস্ত হইতেছে যে; জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তু লইয়াই জ্ঞান। যখন জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তু নিষ্ক্রিয়াবস্থায় লুক্কায়িত থাকে, তখন জ্ঞানশক্তিও অবিকাশিত বীজ মাত্রে পর্য্যবসিত থাকে।

মনুর যে শ্লোকে বর্ণিত আছে, যথা—

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ ॥৫

বঙ্গার্থ। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব সংসার এককালে গাঢ় তমসাচ্ছন্ন ছিল; তখনকার অবস্থা প্রত্যক্ষের গোচরীভূত নহে; কোনও লক্ষণ দ্বারাও অনুমেয় নহে; তখন ইহা তর্ক ও জ্ঞানের অতীত হইয়া সর্ব্বতোভাবে যেন প্রগাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল। ৫।

ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্
মহাভূতাদি বৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীৎ তমোনুদঃ ॥

পরে স্বয়ম্ভু অব্যক্ত ভগবান মহাভূতাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে প্রবৃত্তবীর্য্য হইয়া, এই বিশ্ব সংসারকে ক্রম-প্রকটিত করিয়া, সেই

তমোভূত অবস্থায় ধ্বংসক রূপে প্রকাশিত হন। ৬।

স্বয়ম্ভূর্ভগবান অব্যক্তকে ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত মহাভূতে প্রবৃত্তবীর্য্য হইয়া থাকেন। পূর্ব্বকথিত মত সমস্ত জগৎ অব্যক্ত থাকিলে, তাহার বীজ ঐ অব্যক্তের মধ্যে অবশ্য থাকে। ঐ অব্যক্তের মধ্যে ভগবান ও আদি মহাভূত না থাকিলে, "স্বয়ম্ভূ" ও "মহাভূতাদি বিত্তৌজাঃ" শব্দের কোনও অর্থ থাকে না। ঐ স্বয়ম্ভূর্ভগবানই জ্ঞাতা এবং আদি মহাভূতই জ্ঞেয়। ঐ জ্ঞাতাই জ্ঞানশক্তি দ্বারা, যাহা অপ্রকাশ ছিল, তাহা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত জ্ঞেয় বস্তুতে প্রবৃত্তবীর্য্য অর্থাৎ কার্য্যপ্রবৃত্ত হইয়া, অজ্ঞান বা অপ্রকাশ রূপ তমোনাশক স্বরূপে প্রকাশিত হইলেন। গীতায় কথিত হইয়াছে "প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদি উভাবপি" প্রকৃতি-পুরুষ উভয়ই অনাদি বলিয়া জানিও; এই পুরুষই জ্ঞাতা এবং প্রকৃতিই বিশ্বের বীজস্বরূপিণী। এই পর্য্যন্ত যাহা বর্ণিত হইল, তাহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়, উভয়ই নিত্য; উহার উৎপত্তি-বিনাশ নাই। পূর্ব্ববর্ণিত জ্ঞানের মধ্যে উভয়ই বিদ্যমান আছে। ঐ জ্ঞাতার নিকট যখন জ্ঞেয় বস্তু প্রতিভাসিত হয়, তখন উভয় সম্মিলিত হইয়া মানসাকারে (Ideal form এ) ব্রহ্মাণ্ড প্রকটন করেন, ইহাই বেদান্তোক্ত মায়াবাদ; এই মায়াবাদই বিবর্ত্তবাদের মূল। উহা হৃদয়ঙ্গম হওয়া অতীব কঠিন; কিন্তু যতই কঠিন হউক, ঐ মায়াবাদ বা বিবর্ত্তবাদ হৃদয়ঙ্গম না হইলে, এই পঞ্চকোষবিবেকের প্রকৃত মর্ম্মের কখনই ধারণা হইতে পারে না; এই জন্য গ্রন্থকার প্রথমে তত্ত্ববিবেক দ্বারা মায়াবাদ, তৎপরে ভূতবিবেক দ্বারা বিবর্ত্তবাদ বুঝাইয়া, এই পঞ্চকোষ-বিবেকের অবতারণা করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মাণ্ড কেহ হাতে গড়াইয়া সৃষ্টি করেন নাই, এবং ঈশ্বর কোন বিশেষ ব্যক্তি নহেন। অনাদি চিৎ বস্তুর মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভাবিত লুক্কায়িত থাকে; উহার বিকাশ বা প্রকাশই সৃষ্টি, অবিকাশ বা অপ্রকাশই প্রলয়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, ব্রহ্ম যখন বিশেষ কেহ নহেন, তবে সৃষ্টির বিকাশ অবিকাশ কাহার নিকট এবং কেইবা তাহা অনুভব করে? ইহার উত্তর এই যে, চৈতন্যের মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভাবের যখন স্ফুরণ হয়, তখন ঐ চৈতন্যই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তু ভাবে বিকাশিত হন। ভাষান্তরে বলিতে হইলে, ঐ চৈতন্যই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভাবানুভূতির সহিত মানসাকারে বিকাশিত হন। আপনার দেহ চৈতন্য নহে, দেহ ধ্বংসশীল; দেহাতিরিক্ত যে চৈতন্য আছে, তাহা তত্ত্ববিবেক ও ভূতবিবেক মীমাংসা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। ঐ চৈতন্য জাগ্রতাবস্থায় জ্ঞাতা স্বরূপে কেবল উপস্থিত জ্ঞেয় বস্তু বাহেন্দ্রিয়ের দ্বারা, অনুপস্থিত বস্তু অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা এবং স্বপ্নকালে কেবল অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞেয়বস্তু যখন অনুভব করেন, তখন জ্ঞেয় বস্তু জ্ঞাতার নিকট মানসাকারে প্রকটিত হয়; অর্থাৎ মনের মধ্যে রাম, শ্যাম, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, দ্বার, বৃক্ষ, লতা, চন্দ্র, সূর্য্য, প্রভৃতি প্রতিভাসিত বা প্রকটিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ঐ বস্তু সকল বাহ্য না

তেজ বিকাশিত হয়। ঐ তেজের সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ হইতে যথাক্রমে জল ও ক্ষিতি রূপ ভাবের বিকাশ হয়, এবং ঐ ঐ ভাব-গ্রাহিকা শক্তি পৃথক্ পৃথক্ রূপে তত্তৎভাব গ্রহণের নিমিত্ত সজীব সূক্ষ্ম পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় সহ জৈবতত্ত্বে পরিণত হইয়া, পূর্ব্বোক্ত আকর্ষণ এবং বিয়োজন প্রভৃতি ক্রিয়াদ্বারা ঐ মানসপ্রোথিত ভাবসমূহকে নানাকারে গঠন করিয়া জড় জগদাকারে ভাসমান হয়। ঐ পঞ্চভূত এবং ভৌতিক জড়-জগতের ক্রমিক সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ভূতাদিবেক ব্যাখ্যাকালে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ জড়াভ্যন্তরে পূর্ব্বোক্ত জীবত্ব-সংশ্লিষ্ট মানস-শক্তি গুপ্তভাবে থাকায় এবং পূর্ব্বোক্ত আকর্ষণী ও বিয়োজনী প্রভৃতি সজীব-শক্তির আভ্যন্তরিক ক্রিয়া চলিতে থাকায়, ঐ জড়ের উপাদান সকল উদ্ভিদের উপাদানে এবং উদ্ভিদের উপাদান সকল জৈবোপাদানে পরিণত হইয়া, স্বেদজ কীট পতঙ্গাদি রূপে বিকাশিত হয়। ঐ সকল কীট পতঙ্গ রূপ ভাবের মধ্যে ভাবগ্রাহিকা-শক্তি অনন্যুভবনীয় রূপে স্ফুরিত হওয়ায়, ঐ স্থান হইতে চক্রের গতি পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হয়; অর্থাৎ কল্পরূপ ভাবপ্রবাহ পূর্ব্বোল্লিখিতমত ভূত ও ভৌতিক তত্ত্বে পরিণত এবং জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়া, যেন কর্ত্তৃশক্তি রূপে পরিণতির জন্য অগ্রসর হইতে থাকে। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত মহা মানস-ক্ষেত্রস্থ ভাব ভিন্ন ভিন্ন আকারে বিভক্ত ও এক একটি জড় বা জড়তত্ত্বাশ্রিত জীবরূপে বিকাশিত হয়। ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব রূপ বস্তুর মধ্যে জৈবতত্ত্ব বিকাশিত হইয়া, পূর্ব্বোক্ত চিতত্ত্বযুক্ত মানসশক্তি স্ফুরিত হইতে থাকে। ঐ এই কল্পিত ভাব-রূপ বস্তু যেন সজীবত্ব প্রাপ্ত হইয়া কল্পনা-কারী মনরূপে নব নব ভাব গ্রহণ ও উৎপাদন করিতে যেন ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হয়। যেন কল্পরূপ ভাবের মধ্য দিয়া অহং চিহ্নিত ভাবগ্রাহক ও ভাবউৎপাদক কর্ত্তা শনৈঃ শনৈঃ বিকাশিত হন।

পাঠকগণ! যদি পৌরাণিক-রতি-পরিণয় উপাখ্যানটি বিশ্লেষ করিয়া, উহার রূপক-গুলির প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করেন, তবে সৃষ্টিরহস্য এবং ঐ সৃষ্টিরহস্যের মধ্যে স্বেদজ জীবের উৎপত্তি এবং ঐ স্বেদজ জীব হইতে সৃষ্টিচক্রের গতির পরিবর্ত্তন স্পষ্ট-রূপে বুঝিতে পারিবেন। উদ্ভিদ এবং স্বেদজ জীবের মধ্যে উৎপত্তির প্রক্রিয়ার কিছু প্রভেদ থাকিলেও, উভয়ই প্রায় একই নিয়-মের অধীন; কিন্তু অণ্ডজ ও জরায়ুজ জীব-সৃষ্টির বাহ্য প্রক্রিয়া উদ্ভিদ ও স্বেদজ জীবের উৎপত্তি-প্রক্রিয়া হইতে ভিন্নরূপ। উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলে, অন্নময় কোষের মধ্যে প্রাণময় কোষ এবং প্রাণময় মধ্যে মনোময় কোষ কিরূপে উৎপন্ন এবং প্রস্ফুটিত, তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইবে।

এখন একটি কথা বুঝিবার আবশ্যক। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, সমস্ত দৃশ্য বস্তু সেই নিরাকার চিৎক্ষেত্রস্থ বিরাট মানস-কল্পিত এক একটি ভাব ভিন্ন প্রকৃত কোন বস্তু নহে। এক চৈতন্য ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। ঐ চৈতন্যই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভাবে বিকাশিত হন মাত্র। যদি তাহাই হয়, তবে ঐ কল্পিত ভাবরূপবস্তু (যাহা প্রকৃতবস্তু নহে) প্রথ-মতঃ অন্নময়কোষে অর্থাৎ আকারবিশিষ্ট

দেহরূপে কিরূপে পরিণত হয়, এবং তন্মধ্যে প্রাণময়, মনোময়, ধীময় ও আনন্দময় কোষের বিকাশই বা কি প্রকারে হয়, যাহা প্রকৃত কোন বস্তু নহে, কল্পিত ভাবমাত্র, তাহা কি প্রকারে দৃশ্য আকার অর্থাৎ স্থূল দেহ ধারণ করে? ইহার উত্তর এই যে, ঐ কল্পিতভাব প্রথমেই স্থূল আকারবিশিষ্ট কখনই হইতে পারে না। প্রথমতঃ চিৎ-ক্ষেত্রস্থ মহৎ বুদ্ধিতত্ত্ব ক্রিয়া ও গতিশীল হইয়া সূক্ষ্ম জগৎরূপ মানসাকারবিশিষ্ট হন; অর্থাৎ অনন্ত চিৎক্ষেত্রে মানসকল্পিত জগৎ প্রকটিত হয়, এবং ঐ মানসক্ষেত্রস্থ জগৎ বাহ্যপ্রকাশের জন্য তাহাতে ব্রহ্মচৈতন্য চিদণুরূপে প্রবিষ্ট হইয়া, আকর্ষণীশক্তি-প্রভাবে ঐ সকল কল্পিত ভাব সত্যের ন্যায় প্রকাশ করিয়া অনুভব করেন; ইহারই নাম সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বা বিবর্তবাদ।* ঐ সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার প্রথমতঃ অবনয়ন-প্রণালী অনুসারে চৈতন্যশক্তি জড়ভাবে মগ্ন হইয়া পুনরুন্নয়ন প্রণালী অনুসারে ঐ জড়ের মধ্য হইতে চৈতন্যরূপে স্ফুরিত হন; কিন্তু মহামানস গঠিত ভাবরূপ জগৎ প্রথমতঃই স্থূলাকারে বা অন্নময়কোষে পরিণত হয় না। ঐ মানসগ্রথিত ভাবসমূহ মানসক্ষেত্রে পৃথক্ পৃথক্ সূক্ষ্মাকারে পরিণত ও গতিবিশিষ্ট হইয়া, পূর্বোক্তমত আকর্ষণী ও বিকর্ষণী ক্রিয়া দ্বারা স্থূল জড়াকারে পরিণত বা উপলব্ধ হয়। ঐ স্থূল জড়ভাবের মধ্যে সুপ্ত-স্থিত চিৎশক্তি কর্তৃক জড়ের উপাদান সকল গতিবিশিষ্ট হইয়া জীবভাবে পরিণত হইলে, যথাক্রমে অন্নময় ও প্রাণময় কোষের বিকাশ হয়। ঐ অন্নময় ও প্রাণময় কোষের মধ্যে মানসশক্তি অঙ্কুরিত হইলে, মনোময় কোষ-প্রস্ফুটিত বিজ্ঞানময় জ্ঞাতার আবির্ভাব হয়। প্রথমতঃ সমষ্টি-ব্রহ্ম-চৈতন্য মহামানসক্ষেত্রস্থ বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে স্থূল জড়াকারে অর্থাৎ জড়জগতে পরিণত পর্যন্ত সৃষ্টির অবনয়ন-প্রণালী, এবং পার্থিব বা ভৌতিক জগতস্থ জড়ভাবের মধ্য দিয়া অন্নময় কোষ হইতে আনন্দময় কোষের বিকাশ পর্যন্ত (অর্থাৎ পার্থিব জীবজগতের প্রারম্ভ হইতে চরম উন্নতি পর্যন্ত) উন্নয়ন-প্রণালী। অবনয়ন-প্রণালীর ভাব পর্যন্ত সূক্ষ্ম হইতে স্থূল পরিণতি। উহার নিয়ম এইরূপ, যথা—প্রথমতঃ চিৎক্ষেত্রে মহৎ বুদ্ধিতত্ত্বরূপে বিকাশিত হয়, ঐ বুদ্ধিতত্ত্বই ব্রহ্মচৈতন্যের প্রথম কোষ, উহাই দর্শনশাস্ত্রোক্ত মহত্তত্ত্ব। ঐ মহৎ বুদ্ধিতত্ত্বে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভাবের স্ফুরণ হয়, অর্থাৎ বিরাট পুরুষ প্রকৃতির গর্ভে মহামানসাকারে ঈ ও বিশ্বাত্মরূপে প্রকটিত হয়েন। কিন্তু ঐ জ্ঞাতার জ্ঞেয় বস্তু প্রকাশের (সৃষ্টির) অভিমানরূপ অহংত্ব বা আমিত্ব-ভাব প্রকটিত না হইলে, অনুভাবক ও অনুভাব্য বিষয়ের পার্থক্য-উৎপত্তি হইবে কেন? আমিত্ববোধই ব্রহ্মের মায়াশক্তির কার্য। ঐ আমিত্বভাবের স্ফুরণ হইতেই সৃষ্টি-আরম্ভ। উহাই দার্শনিক হিরণ্যগর্ভ ও পৌরাণিক

---

* প্রকৃতপক্ষে দৃশ্য জগৎ একেবারে মিথ্যা বা অস্তিত্বহীন নহে। বিবর্তবাদ অর্থে এক পদার্থের পদার্থান্তর-বিকাশ বুঝায়; এই জন্যই দার্শনিকগণ দৃশ্য জগৎ ইন্দ্রজালের সহিত তুলনা করেন না রজ্জুতে সর্পভ্রম বলেন; বস্তুতঃ [illegible] নাই, তাহার বিকাশ সম্ভব।

ব্রহ্মা। এই মহামানস ক্ষেত্রস্থ বুদ্ধিতত্বে সৃষ্টির অভিমান রূপ আমিত্ব (ভাব) বা অহং-তত্ত্ব ব্রহ্মচৈতন্যের দ্বিতীয় কোষ; অতএব চৈতন্য, বুদ্ধি, মানস, এই ত্রিতত্ব হইতেই মহাআমিত্বের বিকাশ হয়, এবং আমিত্বের বিকাশ মাত্রেই মহা মানসক্ষেত্র কম্পিত অর্থাৎ গতিশীল হইয়া, ঐ আমিত্ব বোধের বা জ্ঞানের নিকট শব্দের ভাবরূপ আকাশ স্ফুরিত হয়; ঐ মহাকাশই ব্রহ্মচৈতন্যের তৃতীয় কোষ; ইহাই বিশ্বের আদি ভূত। ঐ আকাশে পূর্ব্বোক্ত গতিবিশিষ্ট স্পর্শের ভাব রূপ বায়ুর যে বিকাশ হয়, ঐ বায়ু ব্রহ্মের চতুর্থ কোষ; ঐ বায়ুতে রূপপ্রকাশক তেজ বা তৈজসতত্ব পঞ্চম কোষ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরব্রহ্ম-স্তোত্রম্।

(মহানির্ব্বাণতন্ত্রোক্তম্।)

(১)

নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়,
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্বায় মুক্তিপ্রদায়,
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়॥

তুমি নিত্য, তুমি সর্ব্বলোকের শরণ,
তোমায় প্রণাম করি আমি অনুক্ষণ।
তুমিই নিখিল আত্মা, তুমি জ্ঞানময়,
তোমায় প্রণাম করি হইয়া তন্ময়।
তুমিই অদ্বৈত তত্ব, মুক্তিদাতা তুমি,
তোমায় প্রণাম করি ভক্তিভরে আমি।
তুমিই নির্গুণ ব্রহ্ম ব্যাপ্ত চরাচর,
তোমায় প্রণাম করি আমি নিরন্তর।

(২)

ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং,
ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃ-পাতৃ-প্রহর্ত্তৃ,
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্॥

একমাত্র তুমি হও সবারি শরণ,
একমাত্র তুমি হও ভবে শ্রেষ্ঠ ধন।
একমাত্র তুমি হও হেতু জগতের,
একমাত্র তুমি বিশ্বরূপ এ বিশ্বের।
একমাত্র তুমি কর সৃষ্টি স্থিতি লয়,
একমাত্র তুমি হও নিশ্চল নিশ্চয়।
একমাত্র তুমি সদা পূজ্য পরাৎপর,
একমাত্র তুমি নির্ব্বিকল্প নিরন্তর।

(৩)

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং,
গতিঃ প্রাণীনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃপদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং,
পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকানাম্॥

ভয়-সমূহের তুমি ভয় অনুক্ষণ,
ভীষণের মধ্যে তুমি পরম ভীষণ।
তুমিই জীবের এক গতি সর্ব্বক্ষণ,
পাবন-গণের মধ্যে তুমিই পাবন।
তুমিই মহোচ্চ পদ দাও নিরন্তর,
রক্ষকের রক্ষাকর্ত্তা, তুমি পরাৎপর।

(৪)

পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপাবিনাশিন্,
অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।

অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ততত্ত্ব,
জগদ্ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ॥

ওহে প্রভু! পরাৎপর! সর্ব্ব-রূপ ধর!
অক্ষর! অজ্ঞের সত্তা! ইন্দ্রিয়াগোচর!
হে অচিন্ত্য! হে অক্ষর! সর্ব্ব-বস্তু-চর!
হে অব্যক্ত-তত্ত্ব! ভব-ভাসক! ঈশ্বর!
করুণা করিয়া তুমি আমাদের প্রতি,
দূর করি দাও যত দুরিত-দুর্গতি।

(৫)

তদেকং স্মরামস্তদেকং জপাম-
স্তদেকং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥

সেই এক বস্তুকেই মনে মনে স্মরি,
সেই এক বস্তুকেই সদা জপ করি;
জগতের সাক্ষী যিনি রন অনিবার,
সেই এক বস্তুকেই করি নমস্কার;
সবাই আশ্রয়ে যাঁর বহে সর্ব্বক্ষণ,
অথচ কাহারো যিনি আশ্রয় না লন;
বিসংসারে স্থিতি যাঁর চিরদিন ধরি,
ভব-সাগরের যিনি একমাত্র তরি;
যাঁহাকেই পরব্রহ্ম বলে ত্রিভুবন,
লইলাম একমাত্র তাঁহারি শরণ।

(৬-৭)

পঞ্চরত্নমিদং স্তোত্রং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
যঃ পঠেৎ প্রযতো ভূত্বা ব্রহ্মসাযুজ্যমা-
প্নুয়াৎ॥
প্রদোষেঽদঃ পঠেন্নিত্যং সোমবারে
বিশেষতঃ।
শ্রাবয়েদ্ বোধয়েৎ প্রাজ্ঞো ব্রহ্মনিষ্ঠান্
স্ববান্ধবান্॥

পরম ব্রহ্মের এই পঞ্চরত্ন স্তুতি
যেই জন পাঠ করে হয়ে একমতি,
যে জন সন্ধ্যায় ইহা নিত্য পাঠ করে,
বিশেষতঃ যেই জন ইহা সোমবারে,
ব্রহ্মনিষ্ঠ নিজ বন্ধু সকলে ডাকিয়া,
শ্রবণ করায় কিম্বা দেয় বুঝাইয়া;
কিবা সে পরম ব্রহ্ম, কিবা সেই জন,
উভয়ের মধ্যে ভেদ না রহে কখন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন,
উদ্ভটসাগর, বি-এ

শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা-

স্মরণমঙ্গল-স্তোত্র।

[সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত।]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কাশীধামে রসহীন অদ্বৈতবাদ বিলীন
প্রেমহীন সন্ন্যাসীসমাজে
প্লাবি কৃষ্ণ-প্রেমরসে, স্বজন-কৃপার বশে,
অবশেষে রূপের অগ্রজে—
হয়ে যিনি কৃপাবান, স্বশক্তি করিলা দান,
বিষ্ণুভক্তি-স্মৃতি রচনায়;
ভজন বিষয়ে যিনি সাধুগুরু-শিরোমণি,
বন্দি সেই শ্রীগৌরাঙ্গরায়। ৫৮

"ধিক্ শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রতি প্রণতিবিহীন!
ধিক্ শুষ্ক-তর্কবাদদক্ষ রসহীন!"
এইমত বাক্য কত লাগিল চলিতে
শঙ্কর-মতাবলম্বী ন্যাসীবৃন্দটিতে। ৫৯

তাঁহার সে অপ্রাকৃত নিত্যপ্রকটিত
শ্রীলীলাচরিত মম নিয়ত বন্দিত। ১০১
সর্ব্বদা সর্ব্বত্র—গৌরকীর্ত্তি বিশেষতঃ,
সে ভক্তেরা হয় ভক্তি-বিশ্বাসরচিত,
এ দেশের গৌর-গাথা গান উচ্চরবে,
যুগপৎ-ভজনে সিদ্ধ করিতে আমায়,
শ্রীমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পাদপদ্ম—
প্রদান করেন তাঁ প্রেমাবেশ-মধু। ১০২

শ্রীশরচ্চন্দ্র মিত্র,
(অনুবাদক।)

বিপ্লব।

কোন নগরাদিতে মহামারী প্রবর্ত্তিত হইলে, সামান্য সাংসারিক ঔষধ, প্রতিষেধ বা সতর্কতাদি অবলম্বনে বিশেষ কিছুই ফলোদয় হয় না; তখন কোন একটা প্রবল প্রাকৃতিক বিপ্লব, যথা—মহাঝটিকা বা অতিবৃষ্টি প্রভৃতি উপস্থিত না হইলে, অথবা কোনরূপ কাণ্ড অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়া নগর দগ্ধ না করিলে, কিম্বা নগরবাসিগণ একেবারে নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বাস্থ্যকর স্থানান্তরে প্রস্থান না করিলে, মহামারী বিপদের কোন রূপ বিশিষ্ট প্রতীকার হইতে পারেনা। সচরাচর দেখা যায়, যে কোন বিষয়ে যে কোন উপদ্রব উপস্থিত হয়, তন্নিবারণার্থ তদুপযুক্ত উপায়াবলম্বনই আবশ্যক হয়। একখানি প্রাচীন গৃহ পুনঃ২ জীর্ণসংস্কার দ্বারা রক্ষা করিলেও, কিছুতেই তাহা সুরক্ষিত হইতে পারেনা; উহার আমূল পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক উহাকে নূতন করিয়া গড়িতে চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য।

এক মণ ভারবিশিষ্ট একটি বস্তু উত্তোলন করিতে হইলে, একমণ উত্তোলনী শক্তিই আবশ্যক। যত কোমল-উত্তোলনী শক্তি উদ্ভিন্ন নাই, এমন কি—শত সহস্র বারও প্রয়োগ করা যায়, তথাপি উহা উত্তোলিত হইবে না। উহার উত্তোলনার্থে একেবারেই একমণ-উত্তোলনী শক্তি আবশ্যক। অনুপযুক্ত শক্তির প্রয়োগ আজীবন করিলেও কোন কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না। কতিপয় অঙ্গার খণ্ড একেবারে ধরাইয়া দিলে যেস্থলে আগার তাপ হইয়া যায়, সেস্থলে এক একখানি করিয়া বহুসংখ্যক অঙ্গার খণ্ড পোড়াইলেও আমার চাউল সিদ্ধ হইবেনা। বহু দিনের পুরাতন দামদলাবৃত পুষ্করিণীর সংস্কার করিতে হইলে, শুধু উপরের উদ্ভিজ্জ-আবর্জ্জনাদি তুলিয়া ফেলিলেই ফল হয়না; নীচের পূতিপঙ্কে দামদলের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া, আবার উহা পূর্ব্ববৎ হয়; সুতরাং তাহার সেই দামপচা জল সম্পূর্ণ সেঁচিয়া পঙ্কোদ্ধার করা ব্যতীত পূর্ণসংস্কার সম্ভবেনা।

যেখানে কোন বিশেষ প্রাকৃতিক বিপ্লব সংঘটিত হয়, সেখানে তৎপ্রতীকারোপযোগী বিশেষ উপায় অবলম্বন ভিন্ন উদ্দেশ্যসিদ্ধি অসম্ভব। যাহার শরীরটি একেবারে পূর্ণরূপেই "ব্যাধিমন্দিরং", তাহার সামান্য টোটকা টাটকা ঔষধে কিছু হইবেনা; তাহার রেচক আমূল সংশোধক, সর্ব্বসন্তাপহারক ও বহ্নি-বিকারক রসায়ন মহৌষধের প্রয়োজন।

কোন স্থান মল-মূত্রাদি দূষিত গলিত অমেধ্য পদার্থে পূর্ণ হইলে, সামান্য জল-

তাৎকালিক ভারতের প্রায় সর্ব্বাংশে বিস্তারিত ও বিতরিত হইয়াছিল।

এগুলি প্রায় সমস্তই সমাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক বিপ্লবের মঙ্গল-পরিণামিতার মনোজ্ঞ [illegible] ভারতের একটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেই [illegible] নিকট [illegible] যবনের রাজন- [illegible] অত্যাচারে ভারতীয় [illegible], সমাজ, শরীর, মন, ধন, প্রাণ, সমস্তই বিপন্ন ও অবসন্ন হইতেছিল; এবং তখনই ভারতে সেই মহারাষ্ট্রমহাবীর, মহাশক্তি ভবানীর সার্থক সাধক শিবপ্রসাদ-প্রাপ্ত শিবজীর অভ্যুদয় হইয়াছিল; আর সেই হইতে ক্রমে ভারতে যে মহারাষ্ট্র-শক্তি-সৃষ্ট রাষ্ট্রবিপ্লব ঘনীভূত ও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, ভাবিয়া দেখিলে, তাহারই শেষ শুভপরিণাম এই ইংরাজরাজ্য! মহারাষ্ট্রবিপ্লবের প্রবল প্লাবনোচ্ছ্বাসে ভারতাকাশে ভীষণ রাজনৈতিক কৃষ্ণমেঘমালা দিগন্তে অপসারিত হইলে, এদেশে নবযুগের সুপ্রকাশ হইয়াছে, তাহারই অপূর্ব্ব আলোকে আজ ভারত-ভূলোক আলোকিত এবং আবার প্রগল্ভ আমোদে পুলকিত!

ভারতে আবার এখন যেন একটি আসন্ন বিপ্লবের সূচনা শনৈঃ শনৈঃ সঞ্চারিত হইতেছে। সেটি অবশ্য ধর্ম্মবিপ্লব। ইংরাজ-রাজের সুশাসনে কোনরূপ রাজনৈতিক বিপ্লবের আশঙ্কা বা আবশ্যকতা নাই, কিন্তু আবার একটি ধর্ম্মনৈতিক বিপ্লবের আশঙ্কা না হউক, কিন্তু আবশ্যকতার সূচনা অনুমিত হইতেছে। অবশ্য ভগবদিচ্ছায় তাহা যথাসময়েই সম্পাদিত হইবে, ইহাই হিন্দুর বিশ্বাস। ফলে বর্ত্তমান ভারতে জন-সাধারণ-সমাজে ধর্ম্মের যেরূপ শোচনীয় অধঃপতন উপস্থিত, তাহাতে এই ধর্ম্ম ও কর্ম্মক্ষেত্রে ভারতে সর্ব্বযোগোপযোগী ধর্ম্ম-কর্ম্মের সংস্থাপনায় আবার কোন অবতার বা [illegible] মহাপুরুষের সমুত্থান ও [illegible] [illegible] বলিয়াই বোধ হয়। ভারতের [illegible] বীজ ধর্ম্মেই নিহিত। এই ধর্ম্মের চরম ও পরম অভ্যুদয়ের ফলেই ভারত একদিন এ মর্ত্ত্যভুবনের মুক্তি-মার্গরূপে শোভা পাইয়াছিল এবং সেই ধর্ম্মের পতনেই ভারতের আজ এই পতন, সুতরাং সেই ধর্ম্মের পুনরুত্থানেই ধর্ম্ম সর্ব্বস্ব ভারতের পুনরুত্থান অভিন্ন সূত্রে অনুস্যূত। অতএব এই মহাপতনের পর মহৎ-পুনরুত্থান সাধনার্থেই বোধহয় আবার একটি মঙ্গল-পরিণাম মহা ধর্ম্ম-বিপ্লব আবশ্যক ও অবশ্যম্ভাবী। তবে কিনা, সুধু ভগবদিচ্ছা বা ভবিতব্যতা।

হিন্দু-পত্রিকা।

৯ম বর্ষ, ৯ম খণ্ড, ১১শ সংখ্যা।	চৈত্র।	১৩১৯ সাল, ১৮৩৪ শকাব্দা,

শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষাষ্টক।

([illegible])

([illegible])

"অয়ি নন্দতনুজ" [illegible] "আমন্ত্রণ"—যাঁহাকে অতি কোমলভাবে ডাকিতে হয়, তাঁহার প্রতিই "অয়ি" শব্দ প্রযোজ্য। সাধারণতঃ এবং সংস্কৃতের স্বভাব-সুকুমারী সুন্দরী প্রেয়সী রমণীগণের প্রতিই "অয়ি" সম্বোধনের প্রয়োগ হইয়া থাকে। তবে যেখানে আবার বড় স্নেহাদরের বিশেষত্ব হইয়া পড়ে, সেখানে অবশ্য পুরুষের প্রতিও ঐ সম্বোধনটি নর-নারীর নবনীতনিন্দিত হৃদয়-বিশেষ হইতে উছলিয়া উঠে। মহাকবি কালিদাস রতির মুখে হরকোপানলদগ্ধ পতির উদ্দেশে "অয়ি জীবিতনাথ।" বলাইয়াছেন। ভারতীয় কাব্য-পুরাণাদিতে এরূপ উদাহরণ অপ্রচুর হইলেও অপ্রাপ্য নহে।

এখানে কোমল আমন্ত্রণের পাত্র কে? সেই জগজ্জীবিতনাথ নন্দতনুজ। আহা! যাঁহার তুলনা সুন্দর নাই, যাঁহার তুল্য মধুর নাই; যাঁহার তুল্য প্রিয়তম—প্রাণপ্রতিম—প্রাণাধিক কেহ নাই, এখানে কোমল আমন্ত্রণসূচিত 'অয়ি' সম্বোধনের পাত্র সেই জগদানন্দ নন্দতনুজ।

"হে" ঐশ্বর্য্য-সম্বোধন; "অয়ি" মাধুর্য্য-সম্বোধন। কৃষ্ণকৃপায় "হে কৃষ্ণ" অনেকে বলিয়াছে; কিন্তু "অয়ি কৃষ্ণ" বলার লোক বড় কম। তবে অবশ্য কৃষ্ণকৃপায় সবই হইতে পারে। মাধুর্য্যাধিকারী সাধক যা খুসি তাই বলিতে পারেন। তাঁর ভগবানের কাছে আদব্ কায়দার দরকার নাই। আদব্ কায়দার সীমা ঐশ্বর্য্যভক্তেই সমাপ্ত। মাধুর্য্যাধিকারী ভক্ত 'অয়ি' 'হে' সবই বলিতে পারেন। অধিক কি, 'রে'

বলিতেও পারেন। ব্রজমায়ীরা ও ব্রজভাইরা ত সদাই 'রে' বলিতেন। 'বাৎসল্য' ও 'সখ্য' রসের সাধকেরা মাধুর্য্যাধিকার-বলে মুখে সর্ব্বদা 'রে' বলুন আর না বলুন, তাঁদের সেই চঞ্চল প্রাণ-কৃষ্ণটির প্রতি কেবল প্রাণেরই টান,—সম্ভ্রমের ভাব কিছুই নাই। ভগবানও মুখের কথার ধার ধারেন না। সে চিরপ্রসিদ্ধ চিত্তচোরের চিত্তটি লইয়াই কারবার। অতএব মাধুর্য্যাধিকারী ভক্তেরা মুখে যাহাই বলুন আর না বলুন, বাহিরে কিছু ভজনাঙ্গের ক্রিয়া করুন বা না করুন, ভগবান তাঁহাদের 'হে' 'রে' 'অয়ি'—সকল সম্বোধনেরই পাত্র। ভগবৎকৃপায় মাধুর্য্য-ভক্ত 'বৈধী' উপাসনার সীমা অতিক্রম করিয়া "রাগানুগা" উপাসনায় পঁহুছিয়াছেন। তখন তাঁহার কথাই বিধি। তখন তাঁহার কথাই ভগবানের কথার পার্থিব ভাবানুবাদ বলিয়া গ্রহণ করাই সাধু-গুরু কৃপা-পিপাসু সাধকসমাজে সাদরস্বীকৃত। যাহা হউক, ভগবানের মাধুর্য্যতত্ত্বে সাধনাধিকারী ও রাগানুগভক্তিপথানুসারী ভাগ্যবানই ভগবানকে মাধুর্য্যসম্বোধনে "অয়ি" বলিবার স্বাভাবিক অধিকারী।

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে মাধুর্য্যভাবেই প্রাণপ্রিয়তম সখাজ্ঞানে কৃষ্ণপ্রেমে প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন; তারপর যখন কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে ভুবনপাবনী ভগবদ্গীতার মধুবর্ষণ মধ্যে অকস্মাৎ তাঁহার সেই প্রাণকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনে তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া নিঃসংশয়ে বিশ্বাস হইল, তখনই কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যতত্ত্বের চমক্ আসিয়া অর্জ্জুনের চিত্তে লাগিল; অমনি কৃষ্ণবিষয়ে অর্জ্জুনের ভয়-বিস্ময়-সম্ভ্রম-সমাদরের ভাব যেন যুগপৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল! তখন অর্জ্জুনের সেই স্থির ধীর নীরব নিশ্চল মাধুর্য্য-ক্ষীরোদহ্রদে অকস্মাৎ ঐশ্বর্য্যের প্রবল প্রমত্ত বন্যাপ্রবাহ মহা কল কল কল্লোলগর্জ্জনে যেন দিগন্ত ভাসাইয়া আসিয়া পড়িল! অমনি কৃষ্ণের প্রতি অর্জ্জুনের পূর্ব্বব্যবহার স্মরণ হওয়ায়, অর্জ্জুনের ঐশ্বর্য্যস্পর্শাহত মনশ্চক্ষে যেন আঁধার লাগিল! অর্জ্জুন ভীত, বিস্মিত, অবনত ও করযোড়যুক্ত হইয়া, "ঈশ্বর" কৃষ্ণের উদ্দেশে পুনঃ২ প্রণাম করিয়া, তাঁহার সেই "মধুর" কৃষ্ণের প্রতি আপনার পূর্ব্বব্যবহার স্মরণে আপনাকে অপরাধী বোধে কহিয়াছিলেন,—

"সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং,
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং,
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥"

অর্থাৎ —

সখা জ্ঞানে যত বলেছি তুচ্ছিয়া,
হে কৃষ্ণ! হে সখে! হে যাদব! ইতি।
প্রমাদে অথবা প্রণয়ে ভুলিয়া,
না জানিয়া তব মহিমা এমতি॥

অতএব অর্জ্জুন 'হে' বলিয়াই ডাকিয়াছেন। সখা হইয়াও অর্জ্জুন ব্রজসখাদের মত 'রে' কখনও বলেন নাই। শুদ্ধ মাধুর্য্য কেবল ব্রজ-জনেরই হৃদয়-সৌন্দর্য্য; উহা জগৎপূজিত গীতার "পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ" এই ভগবদ্বাক্যে অভিনন্দিত অর্জ্জুনেও দুর্লভ! সে যাহা হউক, মূলতঃ অর্জ্জুন স্বভাব-সুনিপুণ কবিদ্বয়োক্ত আর ব্রজ-সখারা

অনক্ষর অমার্জ্জিত গ্রাম্য গোয়ালা জাতীয় রাখালসমাজ; অর্জ্জুনের মুখে 'রে' সাজে না, ব্রজ-রাখালদের মুখে 'হে' আসেনা। কিন্তু "অয়ি" সম্বোধন, সম্ভ্রমার্থক 'হে' ও তুচ্ছার্থক 'রে'—এ দুয়ের মধ্যগত, কেবল "কোমলামন্ত্রণে" ব্যবহৃত। ভগবানের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত "অয়ি" সম্বোধনসুধা ভারতীয় পুরাণসাহিত্য-সিন্ধুমন্থনে বোধ হয় অতি অল্পই মিলে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীমুখের এই শুভশিক্ষাষ্টক শ্লোকে মিলিয়াছে; আর একবার মহাপ্রভুরই মধুরমূর্ত্তিলীলার "পরম গুরু" অর্থাৎ গুরুর গুরু শ্রীমৎ ঈশ্বরপুরীর গুরু হরিভক্তিরসকল্পতরু শ্রীশ্রীমৎ মাধবেন্দ্র পুরীর সেই শুদ্ধ-মাধুর্য্য-নির্ঝর-স্নাত—

"অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ!"—

শ্লোকটিতে ভারতীয় বৈষ্ণবজগতের ভাগ্যে মিলিয়াছিল।

আর একটি কথা, মুখে আমরা কে কি না বলি? আমরা যে গান গাই, বক্তৃতা করি, রচনা লিখি, তৎসমস্তের বিষয়বিচার ও সিদ্ধান্তগুলি যদি আমাদের জীবনে ফলিত হইত, তবে ত আমরা কৃতার্থ হইয়া যাইতাম। মুখে আমরা হয়ত ধ্রুব-প্রহ্লাদকেও অতিক্রম করিতে পারি, বুকে কিন্তু বাল্মীকি-জগাই-মাধাইর পাপপ্রমত্ত প্রথম জীবনকেও পরাস্ত করিয়া বসিয়া আছি। বক্তৃতার ব্যাপকতায় হয়ত আমি তাঁহাকে "অয়ি প্রাণাধিক!" বলিয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি হয়ত আমার অভ্যাসযোগার্জ্জিত অহিফেণ-বটকাধিকও নহেন! সে কালাচাঁদ হইতে এ কালাচাঁদের ভাবনা বেশি ভাবি।

যাহাহউক, মহাপ্রভুর "কাঙ্গালীভোজন" স্বরূপ এই শিক্ষাষ্টকে আমরা তাঁহার শ্রীমুখের প্রসাদ পাওয়ার ন্যায়ই "অয়ি-নন্দতনুজ" সম্বোধনে এ জনমের আসল আবেদনটি যে চরণ দরবারে নিবেদন করিতে পারিলেও কৃতার্থ হইতে পারি।

শ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং তাঁহার চরম ও পরম ভক্তভাব-লীলায় যে মহামাধুর্য্যময় কৃষ্ণ প্রেমোৎসবের চরম ও পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার শ্রীমুখোক্ত শিক্ষাশ্লোকেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 'অয়ি' সম্বোধন কেমন সাজিয়াছে? যেমন কম্বু কণ্ঠে অম্বুজমালা! যেমন হিরণ্ময় করপ্রকোষ্ঠে হীরার বালা!

তারপর, শ্রীকৃষ্ণকে এখানে "নন্দ-তনুজ" বলা হইয়াছে। "তনুজ" শব্দের অর্থ ঔরস বা গর্ভজাত অপত্য। তবে মহাপ্রভুর মুখ হইতে কৃষ্ণের "নন্দতনুজ" নাম নির্গলিত হওয়ার কোন হেতু-রহস্য আছে কি? কৃষ্ণকে যদি কাহারও 'তনুজ' বলিতে হয়, তবে তিনি বসুদেব-তনুজ বাসুদেব, ইহাই সাধারণতঃ পৌরাণিক প্রচলিত সংস্কার। আর বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, এই চতুর্ব্যূহ পরতত্ত্বের পরাৎপর "বাসুদেব" আখ্যাতেও কৃষ্ণের বসুদেব তনুজত্বই প্রকৃষ্ট প্রমাণিত হইতেছে। অতএব মহাপ্রভুর মুখের "নন্দতনুজ" বাক্যে কোন তত্ত্বরহস্যগত বিশেষত্ব আছে কিনা, কেহ২ তাহার অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। কেহ২—(ফলে অনেকেই) বলেন, 'নন্দসুত' প্রভৃতি পদের প্রয়োগ পুরাণাদিতে ভূরি পরিদৃষ্ট হয়; তবে 'সুত' শব্দে জাত অর্থ

দৈত্যভয়ে ভীত হয়ে যত দেবগণ।
ভূভার হরণ হেতু করিয়া চিন্তন॥
মন্ত্রণা করিয়া সবে ক্ষীরোদ যাইয়া।
মহাবিষ্ণু আরাধিলা প্রণত হইয়া॥
দেবগণ প্রতি দেব হইয়া সদয়।
অবতার হব বলি দিলেন অভয়॥
দেবকীর গর্ভবাস করিয়া স্বীকার।
ভূভার হরিতে বিষ্ণু হন অবতার॥
বিষ্ণুর কামিনী লক্ষ্মী-সরস্বতী দ্বয়।
রুক্মিণী ও সত্যভামা হয়ে জন্ম লয়॥
রুক্মিণীর পতি কৃষ্ণ দেবকীনন্দন।
এক্ষণেতে শুন রাধা-কৃষ্ণ-বিবরণ॥
শ্রীদাম-শাপগ্রস্তা হয়ে রাধা সে সময়।
ব্রজে আসি বৃষভানুগৃহে জন্ম লয়॥
রাধা হেতু কৃষ্ণচন্দ্র ব্রজে অবতরি।
বিষ্ণুর সাহায্য হেতু দুর্গা সঙ্গে করি॥
যমজ হইয়া জন্মে গর্ভে যশোদার।
যামলে শিবের বাক্যে প্রমাণ তাহার॥

যথা—

"নন্দপত্ন্যা যশোদায়াং মিথুনং সমপদ্যত।
বাসুদেবো বিশেত্তস্মিন্ ঘনে সৌদামিনী যথা॥"

যশোদায় জন্ম নিলা যমজ হইয়া।
নন্দালয়ে নিদ্রা দিয়া সবারে মোহিয়া॥
যশোদার কোলে খেলা করেন যখন।
আইলেন বসুদেব লইয়া নন্দন॥
আসিয়া দেখেন তথা অপূর্ব্ব বালক।
হইয়াছে শ্রীনন্দের সুখের পুলক॥
আপন বালকসম বালকে দেখিলা।
বালিকা দেখিয়া বসু অবাক্ হইলা॥
তবে বসু বালকে লইয়া সেইক্ষণ।
একত্রে রাখিয়া দোঁহে করেন দর্শন॥
যেইমাত্র দুই শিশু একত্র হইল।
বসুদেবসুত নন্দসুতেতে মিলিল॥
যেইরূপে সৌদামিনী মেঘেতে মিলায়।
বসুদেবসুত নন্দসুতেতে লুকায়॥
তাহা দেখি বসুদেব অনেক ভাবিয়া।
বালকে রাখিয়া গেল বালিকা লইয়া॥
সেই সে বালিকা কংস হাতে নিবর্ত্তিয়া।
অনেক নিন্দিল কংসে উদ্ধেতে উঠিয়া॥
বিন্ধ্যাচলে অধিবাস হইল তাঁহার।
ব্রহ্মা আসি করিলেন পূজার প্রচার॥
স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান ব্রজে অবতার।
আনন্দক্রীড়ন বিনা কর্ম্ম নাহি তাঁর॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্মে ফল নাহি লন।
ভক্তিগুণে ভক্তগণে ফলপ্রদ হন॥
স্বয়ংএর কর্ম্ম নহে ভূভারহরণ।
অংশ অবতারে করে এ সব করণ॥
যদি বল ভিন্নরূপ নহে কি কারণ।
কংসভয়-লীলায় গোপন প্রয়োজন॥
অথবা কৃষ্ণের কর্ম্ম কে বুঝিবে ভবে।
কি ইচ্ছায় কি লীলায় কি হয় কিভাবে॥
অক্রূরের সঙ্গে যবে করিলা গমন।
তখন বিভিন্ন দেহ হৈলা দুই জন।
বাসুদেব মথুরাতে করেন গমন।
নন্দসুত ব্রজধামে অলক্ষিতে রন॥

যথা—

"কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি॥"

পাঠান্তরং—"পাদমেকং ন গচ্ছতি।"

শ্রীদামের বাক্য হরি করিতে পালন।
চক্ষুর অদৃশ্য হয়ে রন বৃন্দাবন॥
ব্রজবাসীগণ-চক্ষে অলক্ষ্যে রহিয়া।
পুনশ্চ মিলিত হন প্রভাসেতে গিয়া॥"

ভক্ত কবিবর শিশুরামের এই মধুমতী ও প্রসাদগুণবতী গাথায় কৃষ্ণলীলাতত্ত্বের যে রহস্যভেদ হইয়াছে, তাহাতে ইহার ঐতিহাসিকতার সমস্যা সমাধান বিষয়ে অনেকের আপত্তি হইতে পারে। তদুত্তরে আমাদের নিবেদন এই যে, ঐতিহাসিকতার সমাধান সম্বন্ধে এক-কৃষ্ণত্ব স্বীকারে কোন পক্ষের কোন আপত্তির কারণ নাই; বরং তাহাই আবশ্যক। "একমেবাদ্বিতীয়ম্' কৃষ্ণতত্ত্বেরই ঐশ্বর্য্যাংশ বৈকুণ্ঠবিলাসী, আর মাধুর্য্যাংশ গোলোকবিহারী। বৈষ্ণবী উপাসনার এই সুসূক্ষ্ম অন্তর্লক্ষ্য ভাবতত্ত্ব ভেদের সহিত লৌকিক স্থূল ঐতিহাসিকতার কোন সম্বন্ধ নাই। দ্বিকৃষ্ণত্বের জগতে একমাত্র ঐতিহাসিক সাক্ষী বসুদেবও যোগমায়া প্রভাবে তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। অতএব ঐতিহাসিকতা পক্ষে এবং এমন কি, "চতুর্ব্যূহতত্ত্ব"বিচারবিলাসিনী বৈষ্ণবী দার্শনিকতার পক্ষেও বোধ হয় এককৃষ্ণত্ব স্বীকারে কোন অনুপপত্তির অবকাশ নাই।

এক্ষণে কথা এই যে,- বৈষ্ণবধর্ম্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, অর্থাৎ কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ ও কৃষ্ণলীলাস্বাদসর্ব্বস্ব কৃষ্ণভজনের নিগূঢ় রসরহস্যভেদ শ্রীগৌরাঙ্গাবতারে যেরূপ হইয়াছে, তাহা "ন ভূত ন ভবিষ্যতি"—ইহাই গৌরহরিবিশ্বাসী বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতের বিশ্বাস। তাহা হইলে, গৌরাঙ্গের এই সুবিখ্যাত শিক্ষাশ্লোকে যে "নন্দতনুজ" পদের প্রয়োগ, তাহা সেই গোলোকবিহারী, দ্বিভুজ মুরলীধারী, সেবানন্দ-ভিখারী ভক্তের শুদ্ধমাধুর্য্য ভজনগ্রহণকারী, চিরবৃন্দাবনচারী হরির প্রতিই হইয়াছে, বলিতে হইবে। অতএব এই মতে, মূর্ত্তিমান বেদ-বেদান্ত-বিজ্ঞান স্বয়ং সরস্বতীপতিরূপে সেব্যমান শ্রীগৌরচন্দ্রের শ্রীমুখ-বাক্যই সর্ব্ব প্রমাণাধিক প্রমাণ। অপর, শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ স্পষ্টই এই তত্ত্ব বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বিবিধশাস্ত্রবিশারদ শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় স্বীয় সন্দর্ভে সুবিশদ শাস্ত্রীয়তা সহযোগে এই তত্ত্বই বুঝাইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলা-খণ্ডের প্রারম্ভেই দৃষ্ট হয়, শ্রীবৃন্দাবনপ্রত্যাগত, চৈতন্য-চরণ-মিলনাশায় শ্রীক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিত শ্রীরূপ গোস্বামী উড়িষ্যাদেশে পঁহুছিয়া, "সত্যা-ভামাপুর" নামক গ্রামে এক রাত্রি যাপন করেন। তথায় শ্রীসত্যভামাদেবী তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া, একপ আদেশ করেন যে, "তুমি যে কৃষ্ণলীলার নাটক রচনা ইচ্ছা করিয়াছ, তাহাতে আমার কৃষ্ণের লীলা স্বতন্ত্রভাবে রচনা করিও।" এ আদেশের অর্থ শ্রীরূপ তখন যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, শ্রীক্ষেত্রে শ্রীগৌরাঙ্গাশ্রয়ে আসিয়া, তাঁহারি শ্রীমুখে আবার যাহা শুনিলেন, তাহাতে লীলাগত দ্বিকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীরূপের আর সন্দেহ রহিল না, এবং তিনিও "ললিতমাধব" ও "বিদগ্ধমাধব" নামে দুইখানি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাটক—মায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র "নান্দী প্রস্তাবনা" দিয়া রচিবার সংকল্প করিলেন। এই স্থানে চরিতামৃতের সেই স্থান একটু উদ্ধৃত করিতেছি,—

"আর দিন প্রভু রূপে মিলিয়া বসিলা।
সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি প্রভু কহিতে লাগিলা॥

তথাকথিত (So-called) পুরুষকার ভক্তদিগের আলোচ্য শিক্ষাশ্লোকে ভবকাতর ভক্তের প্রার্থনা টুকুই সেই পুরুষকার। ভক্ত বুঝেন, জীবের পুরুষকারের অহঙ্কার কেবল অবিদ্যার উদগার, তাই তিনি আপনার ভগবৎপদধূলিত্ব-পরিণতি কৃপাপূর্ব্বক চিন্তা করিতে ("কৃপয়া—বিচিন্তয়") ভগবানকে অনুরোধ করিলেন। এখন ভগবদিচ্ছা পূর্ণ হউক। সমর্পিতাত্মা ভক্তের আর ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য কোথায়?

অহঙ্কারে জীব কর্ত্তা, অহঙ্কারে জীব ভোক্তা; ভগবান কেবল ফলদাতা বা বিধাতা। ভক্ত কিন্তু ফল চান না, বরং ফল না চাওয়াই চান। আলোচ্য শিক্ষাশ্লোকে ভক্ত ভগবৎপদধূলিত্ব চাহিয়াছেন। ফলে ভগবৎপদধূলিত্ব ও অহঙ্কারাস্ফো-ফলাতিরিক্তপুরুষত্ব একই কথা। কেবল ভক্তিমার্গ ও জ্ঞানমার্গের আপাতভেদ-বোধক ভাষাভেদ মাত্র। কিঙ্করের প্রভু-পদাশ্রয় চাওয়া কর্ম্মফল চাওয়া নহে। কিঙ্করের কর্ম্ম নিজ জীবত্ব পক্ষে নিষ্কাম; উহা ঈশ্বরার্থক—কেবল প্রভুপ্রীতিকাম। তবে এই যে চরণরেণুর প্রার্থনারূপ কর্ম্ম-বিশেষ, ইহাও ভগবৎপ্রীতিকাম; কারণ ভগবান ইহাতেই প্রীত। "ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ" এ কথা তাঁহার শাস্ত্রেই তিনি নিজ শ্রী-মুখে বলিয়াছেন। ভক্তি কি? তাঁহার শাস্ত্রেই তিনি বলাইয়াছেন—"পরানুরক্তিরীশ্বরে।" ফলে ভগবৎপদরেণুর প্রার্থনা সেই পরানুরক্তিরই ফল। ভগবৎপদরেণুর সেই পরানুরক্তিরই পরম পরিণাম।

স্বয়ং ভগবানের কথা কি, আহা! ভক্তি-কাঙাল আমরা ভগবদ্ভক্তের পদরেণুও পাইলেই কৃতার্থ হইতাম। অহো! সুদীন ভক্তোক্তিতেই ব্যক্ত হইয়াছে,—

তদ্দাসদাসদাসানাং দাসত্বং দেহি মে প্রভো!

অর্থাৎ—

তব দাস, তাঁর দাস, তাঁর দাস যত আর,
কৃতার্থ কর হে প্রভো! দিয়ে দাস্য তাঁসবার।

চরণরেণুত্বই চিরদাসত্ব বা চরম দাসত্ব। আহা! পরাৎপর পরমপ্রিয়তম প্রভুর দাস্যানন্দ-কৃতার্থ দাসের দাসত্বই সর্ব্বস্ব-অবিদ্যাপ্রতারিত, প্রভুপ্রত্যাখ্যাত পরিতাপিতচিত্ত ভব-ভীত ভক্তের প্রভু-পদে পুনঃপদাশ্রয়প্রার্থনাসূচক এই শিক্ষা-শ্লোকটি ভাব সুধার কণিকা-প্রসাদ পাইয়া দীনদাস গাইয়াছেন,—

নাথ হে!
নিত্য ও চরণে, ভৃত্য জীবগণে,
মানব-দানব-দেবা।
মায়ায় মজিয়ে, রয়েছি ভুলিয়ে,
সেহেন চরণ-সেবা॥
ছিনু পদাশ্রয়, হনু ভবময়,
ডুবে গেল ভয়তরা।
হায় কি উপায়! কিঙ্করে কৃপায়,
রাখ পায় প্রভু হায়॥
মায়া-মদে নার আর যেন হরি!
শ্রীপদ ছাড়া না হই।
পদ্মে রেণু যথা, অনুদিন তথা
পদরেণু হয়ে রই॥
অধম তারণ সে চারু চরণ
সুচির শরণ করি।
মনোপ্রাণ খুলি, প্রেমানন্দে গলি,
বল হরেকৃষ্ণ হরি॥

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।
(যশোহর।)

জরাগ্রহণে তুষ্টেন নিজযৌবনদঃ সুতঃ।
কৃতঃ কনীয়ান্ প্রণতশ্চক্রবর্ত্তী যযাতিনা ॥
১৭ ॥ যুগ্মকম্।

দানং সাত্ত্বিকং দত্বা ন পশ্চাত্তাপ দুঃখদম্।
বলিমাত্মার্পিতো বদ্ধো দানশেষস্য তৎকৃতে ।১৮

নাগ উৎপন্ন হইয়াছিল। এক দিন বিনতা-উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বকে দেখিয়া কহিয়াছিলেন—"এ অশ্ব শ্বেতবর্ণ।" কদ্রু কহিলেন "এ অশ্বের পুচ্ছ কৃষ্ণ বর্ণ।" উভয়ে পণ হইয়াছিল যে "কল্য অশ্ব দেখা যাইবে, যে হারিবে সে দাসী হইবে।" কদ্রু প্রতারণা করিবার জন্য পুত্রগণকে ডাকিয়া কহিয়াছিলেন "পুত্রগণ! তোমরা কৃষ্ণবর্ণ লোমদ্বারা উচ্চৈঃশ্রবাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখ, নচেৎ আমাকে দাসী হইতে হইবে।" যে সমুদয় সর্প তাঁহার আজ্ঞাপালন করে নাই, তিনি তাঁহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, ধীমান পাণ্ডবের রাজর্ষি জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে অগ্নি তোমাদিগকে দগ্ধ করিবে।"

"নাবপদ্যন্ত যে বাক্যং তান্ শশাপ ভুজঙ্গমান্।
সর্পসত্রে বর্ত্তমানে পাবকো বঃ প্রধক্ষ্যতি ॥
জনমেজয়স্য রাজর্ষেঃ পাণ্ডবেয়স্য ধীমতঃ ॥৮॥
২০ অধ্যায়ে।)

এ বিষয়ে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে অষ্টমোল্লাসে—
মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাং।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ। ২৫
কুরুতে নর বৃদ্ধৌ মাতরং পিতরং গুরুং।
অবগতস্য সর্ব্বত্র বিঘ্ন এব পদে পদে ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণম্—শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ডং—৬০ অধ্যায়ে।]১৬

কনিষ্ঠ প্রণত পুত্র (পিতা) যযাতির জরা গ্রহণ ও নিজ যৌবন দানে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, তজ্জন্য যযাতি (পুরুকে) চক্রবর্ত্তী রাজা করিয়াছিলেন [এ বিষয়ে মহাভারতে আদি পর্ব্বে ৭৮। ৮৫ অধ্যায়ে, বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে ১০ অধ্যায়ে ও মৎস্যপুরাণে ২৭। ৩৪ অধ্যায়ে একটি উপাখ্যান আছে যে, রাজা যযাতি শুক্রাচার্য্য-শাপে জরা-গ্রস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যযাতিকে বলিয়াছিলেন যে, এই জরা যাহাকে হউক, দিয়া তাহার যৌবন ভোগ করিতে পার। যযাতির যদু তুর্ব্বসু দ্রুহ্যু অনু নামে কয়টি পুত্র ছিলেন। তিনি সকলকে জরা দিতে চাহিলে, সকলে জরাকে দোষ প্রদর্শন করিয়া, কেহ লইতে চাহিলেন না। কনিষ্ঠ পুত্র পুরু তাঁহার জরা গ্রহণ করিয়া নিজ যৌবন দান করিয়াছিলেন। ভোগ-বাসনা কখন তৃপ্তিলাভ করে না। ইহা অগ্নিতে ঘৃত প্রদানের ন্যায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়। যযাতি বিষয়ভোগে তৃপ্তি লাভ না করিয়া পুরুকে যৌবন প্রত্যর্পণ করিয়া, নিজ জরা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন ও তাঁহাকে রাজ্য দান করিয়াছিলেন।

পুরো প্রীতোঽস্মি ভদ্রং তে গৃহাণেদং স্ব
যৌবনম্।
রাজ্যঞ্চৈব গৃহাণেদং ত্বং হি মে প্রিয়কৃৎ
সুতঃ ॥ মৎস্যে ৩৪ অঃ ১৩।
ভারতে—আদিপর্ব্বণি ৮৫ অঃ ১৭]১৭

সাত্ত্বিকদান করিবে, দান করিয়া পশ্চাৎ অনুতাপ করিবে না। বলি রাজা শেষ দান-তদ্ধের জন্য শ্রীভগবানে শরীর অর্পণ করিয়া বদ্ধ হইয়াছিলেন (এই উপাখ্যান শ্রীভাগবতে অষ্টম স্কন্ধে ১৯ অধ্যায়ে আছে।)

সাত্ত্বিক দান যথা—
দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং
স্মৃতং ॥ ২০
শ্রীভগবদ্ গীতায়াং ১৭ অধ্যায়ে।

অনুপকারী ব্যক্তিকে কিংবা দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া যাহা দেওয়া যায়, তাহাকে সাত্ত্বিক দান কহে॥

ত্যাগে সর্ব্বনিধিঃ স্তুপাদ্ শক্র-পক্রজিগীষুতাম্।
কর্ণঃ কুণ্ডলদানেহপ্যভূৎ কলুষ-পক্তিষাক্রম ॥ ১৯ ॥

ব্রাহ্মণাবমানেন্তু ব্রহ্মশাপোহি দুঃসহঃ।
তক্ষকাদৌ ব্রহ্মশাপাৎ পরীক্ষিদগমৎ ক্ষয়ম্ ॥ ২০

বলি রাজার গুরু শুক্রাচার্য্য বলিকে কহিয়াছিলেন যে "তোমার গৌরিক্রম জনপদ ভূমি বামন দেবকে অর্পণ করিও না; করিলে তোমার মহান অনিষ্ট হইবে, কারণ—

ন তদ্দানং প্রশংসন্তি যেন বৃত্তি বিপদ্যতে
৮ স্কন্ধ ১৯ অধ্যায়ে ১৮

যাহাতে বৃত্তি বিপন্ন হয়, এরূপ দানকে প্রশংসা করা যাইতে পারেনা।

সত্ত্বানুত্যাগী-দোষ যথা—

সম্ভোগ সবিদ্ বিষমোহভিমানী সত্ত্বমুত্যাগী কৃপণো বলীয়ান্।
বর্গপ্রশংসী বনিতাসুদ্বেষ্টা এতে পরে সপ্ত নৃশংসবর্গাঃ ॥ ১৯

উদ্যোগ পর্ব্বণি ৪১ অধ্যায়।

অংশাং সত্ত্বাদনাত্তাবং দানকালে নিবেধকম্।
সদা সত্ত্বপাতে দত্ত শুমাচরবেক্ষণাৎকম্ ॥
[সমস্তিঃ] ৮।

সাত্ত্বিক ত্যাগ করিবে, তাহাতে উপকারের স্পৃহা করিবে না। কর্ণ কুণ্ডলদান কালে শক্তি যাচ্ঞা করিয়া কলুষ চক্র হইয়াছিলেন, [এ বিষয়ে মহাভারতে বন পর্ব্বে ৩০৯ অধ্যায়ে উপাখ্যান যথা,—

হস্তিনাপুরে কর্ণ মধ্যাহ্ন কালে জল হইতে উঠিয়া যখন কৃতাঞ্জলি হইয়া সূর্য্যদেবের স্তব করিতেন, তখন ধনের নিমিত্ত যে কেহ তাঁহার নিকট যাইতেন, সকলকে প্রার্থনানুযায়ী দ্রব্য দান করিতেন। এই দেখিয়া ইন্দ্র ব্রাহ্মণের বেশে তাঁহার নিকট গিয়া, তাঁহার শরীরজাত কবচ ও কুণ্ডল প্রার্থনা করিলেন; কবচ ও কুণ্ডল জন্য কর্ণ সকলের অবধ্য হইয়াছিলেন, সুতরাং দিতে স্বীকার না করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে অন্য বহু মূল্য দ্রব্য লইতে কহিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ স্বীকার পাইলেন না। পরিশেষে কর্ণ ইন্দ্রকে চিনিতে পারিয়া কহিলেন "বাসব! আমার কবচ ও কুণ্ডল পরিবর্ত্তে আপনি আমার সেনামধ্যে শত্রুসংহারকারিণী অমোঘা শক্তি প্রদান করুন"।

"বর্ম্মণা কুণ্ডলাভ্যাঞ্চ শক্তিং মে দেহি বাসব।
অমোঘাং শত্রু সৈন্যানাং ঘাতিনীং পৃতনামুখে ॥" ২১ ॥

উপকার আশা না করিয়া দান করা কর্ত্তব্য—

দাতব্যো দীয়তে নিত্যমনপেক্ষ্য প্রয়োজনম্।
কেবলং ধর্ম্মবুদ্ধ্যা যৎ ধর্ম্মদানং প্রচক্ষতে ॥
(দেবলস্মৃতিঃ।)

উপকার আশায় যে দান, উহা অদান—

অনৃতঞ্চ ভয়ক্রোধদ্বেষশোকরুগন্বিতৈঃ।
* * *
বালমূঢ়া, স্বতন্ত্রার্ত্তমত্তোন্মত্তাপবর্জ্জিতম্।
কর্ত্তা মমেদং কর্ম্মেতি প্রতিদানেচ্ছয়া চ যৎ ॥ ১০
নারদস্মৃতি। ৫।] ১৯।

ব্রাহ্মণের অবমাননা করিবে না, কারণ ব্রহ্মশাপ দুঃসহ। ব্রহ্মশাপে তক্ষকাদিতে পরীক্ষিৎ বিনষ্ট হইয়াছিলেন (এই উপাখ্যান মহাভারতে আদি পর্ব্বে ৪১ অধ্যায়ে—একদিন রাজা পরীক্ষিৎ মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। একটী পলাতক মৃগের অন্বেষণে শমীক মুনির আশ্রমে গমন করিয়া ধ্যানস্থিত মুনিকে মৃগের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনি কোন বাক্য উচ্চারণ না করাতে, ক্ষুৎপিপাসাশ্রমাতুর রাজা মৌনব্রতধারী ঋষির গলে ধনুর দ্বারা একটি মৃত সর্প যোজনা করিয়া দিলেন। ঋষিপুত্র শৃঙ্গী সহক্রীড় বালকের মুখে সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, আশ্রমে পিতাকে তদবস্থ দেখিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া পরীক্ষিৎকে শাপ দিয়াছিলেন যে, যে রাজশাংকুল আমার পিতার স্কন্ধে মৃতসর্প যোজনা

পরপ্রাণপরিত্রাণপরঃ কারুণ্যবান্ ভবেৎ ।
মাংসং কপোতরক্ষার্থে স্বং শ্যেনায় দদৌ
শিবিঃ ॥ ২৩

বধ করিবে না ; ভীষ্ম-দ্রোণাদি দুর্য্যোধনের আশ্রয় লইয়া বিনষ্ট হইয়াছিলেন [(দুর্য্যোধনের স্বভাব যে অত্যন্ত নীচ, তাহা তাঁহার মাতা গান্ধারী দেবীও ধৃতরাষ্ট্রকে কহিয়াছিলেন, যথা—"হে রাজন্ ! সেই পাপাত্মা দুর্য্যোধন কাম ও ক্রোধের বশ ও সম্পূর্ণ মোহযুক্ত হইয়াছে—

স এব কামমন্যুভ্যাং প্রলব্ধো লোভমাস্থিতঃ ।

উদ্যোগ পর্ব্বণি ১২৮ অধ্যায়ে ।

শ্রীকৃষ্ণ যখন সন্ধির জন্য দুর্য্যোধনের সমীপে গমন করিয়াছিলেন, তখন দুর্য্যোধন কহিয়াছিলেন—

যাবদ্ধি তীক্ষ্ণয়া সূচ্যাবিধ্যেদগ্রেণ কেশব ।
তাবদপ্যপরিত্যাজ্যং ভূমের্নঃ পাণ্ডবান্ প্রতি ॥

২৬ ঐ ১২৬ অধ্যায়)

নীচসেবা-দোষ যথা—গরুড়পুরাণে ১১৫ অধ্যায়ে——

দাতা দরিদ্রঃ কৃপণোঽর্থযুক্তঃ
পুত্রোঽবিধেয়ঃ কুজনস্য সেবা ।
পরাপকারেষু নরস্য মৃত্যুঃ
প্রকারতে দুশ্চরিতানি পঞ্চ ॥ ১৭ ।
কান্তাবিয়োগঃ স্বজনাপমান-
মৃণস্য শেষঃ কুজনস্য সেবা ।
দরিদ্রভাবাৎ বিমুখাশ্চ মিত্রা
বিনাগ্নিনা পঞ্চ দহন্তি তীব্রাঃ ॥ ১৮ ।
মৃত্যুঃ কিং যদি দুর্জ্জনেষ্বনতিঃ——"

সংগ্রহম্ ।] ২২

অন্যের প্রাণ পরিত্রাণ জন্য করুণাবান্ হইবে ; কপোতরক্ষার জন্য শিবি রাজা নিজ মাংস শ্যেন পক্ষীকে দান করিয়াছিলেন। (এ বিষয়ে মহাভারতে বনপর্ব্বে ১৩১ অধ্যায়ের আখ্যায়িকা—

মহাত্মা রাজা শিবিকে পরীক্ষা করিবার জন্য একদিন ইন্দ্র শ্যেনপক্ষীরূপ ও অগ্নি কপোতরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কপোত শ্যেনপক্ষীর ভয়ে শিবি রাজার উরুদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্যেন কহিলেন "রাজন্ ! আপনি ধার্ম্মিক রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ, তবে আপনি আমার আহার না দিয়া আমায় কষ্ট দিতেছেন কেন ?" শিবি কহিলেন "এই পক্ষী ভীত হইয়া আমার শরণাগত হইয়াছে—শরণাগতকে রক্ষা করা ধার্ম্মিকের কার্য্য।" শ্যেন কহিলেন "রাজন্ ! আমার অনেকগুলি পরিবার ; আমি অনাহারে প্রাণত্যাগ করিলে তাহাদের গতি কি হইবে ?" শিবি কহিলেন "ইহার পরিবর্ত্তে যাহা রুচি হয়, বল, আমি তৎক্ষণাৎ দিব।" শ্যেন কহিলেন "আমার অন্য মাংসের রুচি নাই, যদি তোমার শরীরের মাংস এই কপোতের সহিত তুলায় ওজন করিয়া দাও, তাহা হইলে, লইতে পারি।" রাজা শিবি কপোতের সহিত তৌল করিয়া নিজ শরীর হইতে মাংস কর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলেন। যখন সমুদায় শরীরের মাংস দিয়াও কপোতের সমান হইল না, তখন রাজা স্বয়ং তুলায় আরোহণ করিয়াছিলেন—

ন নিস্তুতে যদা মাংসং কপোতেন সমং ধৃতম্ ।
উৎকৃত্তমাংসোঽসাবারুরোহ স্বয়ং তুলাম্ ॥

শরণাগতকে ত্যাগ করা পাপ, যথা—

যোহি কশ্চিদ্দ্বিজান্ হন্যাদ্ গাং বা লোকস্য মাতরং ।
শরণাগতঞ্চ ত্যজতে তুল্যং তেষাং হি পাতকম্ । ৬

বনপর্ব্বণি ১৩১ অধ্যায়ে ।

যে কেহ ব্রাহ্মণ অথবা লোকমাতা গাভী বধ করে কিম্বা শরণাগতকে ত্যাগ করে, সকলেরই তুল্য পাপ ।] ২৩

কুসুমের ন্যায় কোমল মনকে যেন

অন্যের পেশলং ক্রোধাঢ্যং কুসুম-কোমলম্ ।
বজ্রং যেন ময়েন সেবিনায় প্রাজ্ঞঃ ॥ ২৪

ক্ষিপেদ্ বাক্যশরাংস্তীক্ষ্ণান্ পারুষ্যপূর্ণান্।
বাক্‌পারুষ্যরুষাচক্রে ভীমঃ কুরুকুলক্ষয়ম্॥ ২৯

কার্কশ্যপূর্ণ তীক্ষ্ণ বাক্যশর ক্ষেপণ করিবে না ; ভীম বাক্যপারুষ্যক্রোধে কুরুকুলকে ক্ষয় করিয়াছিলেন।

[দুর্যোধন ভীমকে অত্যন্ত দুর্ব্বাক্য কহিয়াছিলেন, ভীম তজ্জন্য কোপে কুরুকুল ধ্বংস করিয়াছিলেন]

"কাহাকেও কর্কশ বাক্য বলা উচিত নহে। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে নীতি কহিয়াছিলেন "রাজন্! পরশুদ্বারা বৃক্ষচ্ছেদন করিলে, তাহা হইতে অঙ্কুর নির্গত হয় না ; সুতরাং কাহাকেও দুর্ব্বাক্য কহিবে না—

রোহতে সায়কৈর্বিদ্ধং বনং পরশুনা হতং।
বাচা দুরুক্তং বীভৎসং ন সংরোহতি বাক্‌ক্ষতম্॥ ৭৭

উদ্যোগপর্ব্বণি ৩০ অধ্যায়।

সংরোহতীষুণা বিদ্ধং বনং পরশুনা হতম্।
বাচা দুরুক্তং বীভৎসং ন প্ররোহতি বাক্‌ক্ষতম্।

বামন পুরাণে ৫৪ অধ্যায়ে।

সংক্রান্তিশলাদুরুক্তৈঃ ন শক্যং মানসং বহুঃ।

শুক্রনীতি, ৩ অধ্যায়ে।

মহাদেবও সতীকে কহিয়াছিলেন—

তথারিভির্ন ব্যথতে শিলীমুখৈঃ শেতেহর্দিতাঙ্গো হৃদয়েন দূয়তা।
স্বানাং যথা বক্রধিয়াং দুরুক্তিভির্দিবানিশং তপ্যতি মর্ম্মতাড়িতঃ॥ ১৯

শ্রীভাগবতে ৪ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়।

শত্রুর শরে হৃদয় যেরূপ বিদ্ধ হয় না, সেরূপ আত্মীয় ব্যক্তির দুর্ব্বাক্যে হৃদয় বিদ্ধ হয় ; কারণ প্রথমোক্ত ব্যক্তি হৃদয়ে ব্যথা পাইয়াও নিদ্রা যায়, কিন্তু শেষোক্ত দিবানিশি মর্ম্মে ব্যথা পায়।] ২৯

পরেষাং ক্লেশদং কুর্য্যান্ন পৈশুন্যং প্রভোঃ প্রিয়ম্।
পৈশুন্যেন গতৌ রাহোশ্চন্দ্রার্কৌ ভক্ষণীয়তাম্॥ ৩০

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

পরের নিন্দাচরণ করিতে গিয়া কাহাকেও কখনো ক্লেশ দিবে না। সূর্য্য ও চন্দ্র খলতা করায় রাহুর ভক্ষণীয় হইয়াছিলেন। (সমুদ্র মন্থনে অমৃত উৎপন্ন হইয়াছিল। দেবগণ সেই অমৃত পান করিতেছিলেন, ইত্যবসরে রাহু দেবরূপ ধরিয়া অমৃত পান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অমৃত রাহুর কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে, এরূপ সময়ে সূর্য্য ও চন্দ্র ঐ বিষয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিষ্ণু সুদর্শনচক্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ রাহুর মস্তক ছেদন করিয়া দিলেন। ছিন্ন মস্তক আকাশে উঠিয়া ভয়ানক শব্দ করিতে লাগিল। এই অবধি রাহুর মুখের সহিত সূর্য্য-চন্দ্রের চিরশত্রুত্ব নিবন্ধন রাহু মধ্যে মধ্যে সূর্য্য-চন্দ্রকে গ্রাস করিয়া থাকে—

ততো বৈরবিনির্ব্বন্ধঃ কৃতো রাহুমুখেন বৈ।
শাশ্বতশ্চন্দ্রসূর্য্যাভ্যাং গ্রসত্যদ্যাপি চৈব তৌ॥

আদি পর্ব্বণি ১৯ অধ্যায়ে

পিশুনতা দোষ যথা—

লোভোহপ্যস্তু পরেণ কিং পিশুনতা যদ্যস্তি কিং পাতকৈঃ।

ভর্তৃহরিঃ।

যদি লোভ থাকে, শত্রুর আবশ্যক কি ? যদি পিশুনতা থাকে, পাপের প্রয়োজন কি ? ৩০

কামকলা-তত্ত্ব।

"যৎকণ্ঠে গরলং বিরাজতি সদা মৌলৌচ
মন্দাকিনী,
যস্যার্দ্ধে গিরিজাননং কটিতটে শার্দ্দূল-
চর্ম্মাম্বরম্।
যন্মায়া হি করোতি বিশ্বমখিলং পায়াৎ স বঃ
শঙ্করঃ
অম্বুবৎ জলবিন্দুবৎ জলজবৎ জবালবৎ
জালবৎ।"

সর্ব্বযোগাধার মহাযোগী মহেশ্বরের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া, তৎকৃপায় তৎকথিত কামকলাতত্ত্ব—যতদূর সম্ভব প্রকাশযোগ্য—সংক্ষেপে বলিতেছি * (১)। যোগী ও সাধক ব্যতীত অন্যের নিকট ইহা দুর্ব্বোধ্য এবং অপ্রকাশ্য ও অতি গোপনীয়। শ্রীক্রমে বলিয়াছেন,—

"গোপনীয়ং হি প্রযত্নেন যদিচ্ছেদাত্মনো হিতং।"

যদি আপনার হিতকামনা থাকে, তবে অতি যত্নের সহিত ইহা গোপন রাখিবে।

যামলে বাক্য আছে—

"এতৎ কামকলা-ধ্যানং গুহ্যাৎ গুহ্যতমং
মহৎ।
নাশিষ্যায় প্রবক্তব্যং নাভক্তায় কদাচন।
এতৎ প্রকাশনং মাতরুচ্চাটনকরং পরম্।
সোঽচিরাৎ মৃত্যুমাপ্নোতি সত্যং সত্যং বিধ্য-
সিদ্ধিঃ॥"

স্থূল তাৎপর্য্য—কামকলা ধ্যান গুহ্যাদপি গুহ্য। ইহা অশিষ্য বা অভক্তের নিকট কখনই বলিবে না,—বলিলে শীঘ্র মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয়।

আমি পর্য্যটন সময় দেখিয়াছি যে পরমহংস ও যোগী মহাত্মাগণ ভক্ত ও পূর্ণাভিষিক্ত উপযুক্ত সাধক ব্যতীত অন্যের নিকট কামকলার নাম মুখে আনেন না। আমিও কামকলা-বিষয়িণী গুহ্য তত্ত্বকথা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। তাহা বলিতে হইলে যোগের আভ্যন্তরিণ অনুষ্ঠান প্রকাশ হইয়া পড়ে।

কামকলার স্বরূপ জানিয়া, কামকলা ধ্যান করা যোগী ও সাধকগণের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। কামকলাতত্ত্ব না জানিলে প্রকৃত যোগ হয় না। কামকলার স্বরূপ ও কামকলাতত্ত্ব যে যোগীর অজ্ঞাত, তিনি কখনই যোগী নহেন। এরূপ ব্যক্তি যোগী নামধারী ভেকধারী মাত্র। সাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগসাধনা; যোগেরও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধ্যান-ধারণা—কামকলা। এই কামকলা যোগী ও ভোগী সকলেরই সুখোক্ত ও

---

(১) সন ১৩০৮ সালের আষাঢ় মাসের হিন্দু-পত্রিকায় 'স্বরজ্ঞান' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম—"প্রত্যেক বার শ্বাস-প্রশ্বাসে 'হংস' উচ্চারিত হয়। হংসের মুণ্ড ও নেত্র কামকলা।" এই কামকলাতত্ত্ব জানিবার জন্য পাঠকগণ আগ্রহ সহকারে আমাকে পত্র লিখিয়াছেন। সুশিক্ষিত ও বিজ্ঞ পাঠকগণের নিকট হইতে ৬৭ খানি পত্র পাইয়াছি; কিন্তু প্রত্যেক পত্রের উত্তরে কামকলাতত্ত্ব বর্ণন করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া দুঃসাধ্য। এজন্য স্বতন্ত্ররূপে কামকলা-তত্ত্ব বর্ণন করিলাম। ঘটনা-চক্রনেমির অনবরত আবর্ত্তনে পড়িয়া এতদিন লিখিব লিখিব মনে করিয়াও লিখিতে পারি নাই। জিজ্ঞাসু পাঠকগণ দীর্ঘকাল বিলম্ব জন্য ত্রুটী ক্ষমা করিবেন।

তাব চূড়ামণিতে ব্যক্ত আছে, যথা—

"মুখং বিন্দুবদাকারং তদধঃ কুচযুগ্মকম্।
সর্ব্ববিদ্যামৃতাপূর্ণং সর্ব্ববাগ্বিভবপ্রদম্।
সর্ব্বার্থসাধকং দেবি সর্ব্বরঞ্জনকারণং।
তদধঃ সপরার্দ্ধঞ্চ সপরিস্ফুরিতি মণ্ডলীম্।
সর্ব্বদেবাদিভূতং তৎ সর্ব্বদেবনমস্কৃতম্।
সর্ব্বাহ্লাদিন সম্পূর্ণং সর্ব্ব বশ্যপ্রবর্ত্তকম্।
এতৎ কামকলা-ধ্যানং সুগোপ্যং সাধকোত্তমৈঃ॥"

ঊর্দ্ধস্থিত একবিন্দুকে মুখ কল্পনা করিয়া, নিম্নস্থিত বিন্দুদ্বয়কে স্তনযুগল কল্পনা করিবে। এই বিন্দুত্রয় অমৃতে পরিপূর্ণ ও সর্ব্ব বিদ্যারূপ, সর্ব্ববিধ বাক্‌শক্তি ও সর্ব্ববিধ অভীষ্টপ্রদায়ক। বিন্দুত্রয়ের নিম্নে হকারের উত্তরার্দ্ধ * * * কল্পনা করিতে হইবে। ইহা সর্ব্বদেবের আদি, সর্ব্বদেবের পূজ্য ও সকলের আনন্দকর। সাধকের কর্ত্তব্য এই যে, কামকলা-ধ্যান যত্নপূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখিবে।

শ্রীতন্ত্রার্ণবে কথিত আছে—

"এবং কামকলারূপং মুখবিন্দোঃ সমুত্থিতম্
নাসাদ্যঙ্গং স্তনদ্বন্দ্বাৎ বাহুর্যোনি পদদ্বয়ম্।
অনাদিনিধনং যত্তৎ পরাশক্ত্যাখ্যমব্যয়ম্।
লাবণ্যলহরীসাররূপমানন্দ-বারিধিঃ।"

কামকলা মূর্ত্তির বিন্দুত্রয় মধ্যে ঊর্দ্ধস্থিত মুখবিন্দু হইতে নাসিকা প্রভৃতি উত্তমাঙ্গ সমুদয় ও স্তনবিন্দু-যুগল হইতে বাহুযুগল প্রভৃতি এবং হকারার্দ্ধ কটিদেশ হইতে চরণযুগল প্রভৃতি হইবে। ইনিই অনাদি পরাশক্তি ও এই রূপই লাবণ্য-লহরীসার ও আনন্দজনক।

যামলে বর্ণিত হইয়াছে যে—

"তথা কামকলাং বক্ষ্যে তদেব দেবরূপকম্।
বীরেন্দ্রৈর্যোগিনীবৃন্দৈর্ম্মানিতা ব্রহ্মরূপিণী।
পারম্পর্য্যেণ বিজ্ঞাতা ভববন্ধবিমোচিনী॥
বিন্দুনা নিষ্কলেনৈব সকলাক্ষররূপিণী।
ত্রিবিন্দুঃ সা ত্রিশক্তিঃ সা ত্রিমূর্ত্তিঃ সা পুরাতনী।
নভো ভিত্বা বিন্দুমুখী চন্দ্রসূর্য্যাস্তনদ্বয়ী।
পৃথিবীহার্দ্ধকলা সা ত্রিলোকীনাং তবাত্মিকা।
এবং কলাময়ী রূপা জাগর্ত্তি সা চরাচরম্।

* * * * *

ইতি কামকলা বিদ্যা চক্রবিদ্যাস্বরূপিণী।
যেন পুণ্যবতা লব্ধা স মুক্তো নাপরঃ শিবে।
স সেব্যঃ খলু লোকেষু স যোগী স চ কৌলিকঃ
বাহ্যাভ্যন্তরভেদেন যো বেত্তি কামিনীং কলাং।
তদ্রূপঞ্চ গুরোর্জ্ঞাত্বা কর্ম্মবর্ন্ধাদ্বিমুচ্যতে।
সত্যঃ পন্থাঃ সমীচীনো বর্ণিতস্তব সুন্দরি।
এতৎ কামকলাধ্যানং গুহ্যাৎ গুহ্যতমং মহৎ।
নাশিষ্যায় প্রবক্তব্যং নাভক্তায় কদাচন।
এতৎ প্রকাশনং মাতঃ উচ্চাটনকরং পরম্।
প্রকৃত্যাচ্ছাদনমিব তস্মান্নৈতৎ প্রকাশয়েৎ।
সোঽচিরান্মৃত্যুমাপ্নোতি শস্ত্রৈর্ব্বেতি-বিধাদিভিঃ।"

এই কামকলাই সকলের ইষ্টদেবতা-রূপিণী ও ব্রহ্মস্বরূপা। কামকলার ধ্যান করিলে ভব-বন্ধন বিমোচন হয়। গুরু-পরাম্পরা ক্রমে ইহার তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। ইহা নিষ্কল বিন্দুরূপা হইয়াও সমুদয় মাতৃকা-বর্ণ-স্বরূপা। ইহার ত্রিবিন্দু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এই ত্রিমূর্ত্তি এবং ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, মাহেশ্বরী ও ইচ্ছা, ক্রিয়া, জ্ঞান, এই

ত্রিশক্তি (৩৯)। ইহার নভোমুখী বিন্দু মুখস্বরূপ, নিম্নে শশী-সূর্য্যরূপ বিন্দুযুগল স্তনযুগলস্বরূপ কল্পনা করিতে হয়। নিম্নে যে হ-কারার্দ্ধ আছে, তাহা সর্ব্বশক্তিস্বরূপা পৃথিবী। কামকলা চরাচর জগতে জাগরূকা আছেন। কামকলাবিদ্যা চক্রেশ্বিদ্যা স্বরূপিণী। যে পুণ্যবান্ ব্যক্তি কামকলার স্বরূপ বুঝিয়াছেন, তিনি মুক্তি লাভ করিতে পারেন এবং তিনিই যোগী, তিনিই সেব্য।

যিনি বাহ্য ও অভ্যন্তর ভেদে কামকলা অবগত হইয়াছেন, তিনি সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন। এই আমি সত্য ও সমীচীন পথ বর্ণন করিলাম। ইহা অতি গুহ্য। শিষ্য ও ভক্ত ব্যতীত অন্য কাহারো নিকট কখনই প্রকাশ করিবেনা।

বৃহৎ শ্রীক্রমে আছে—

"বিন্দোরঙ্কুরভাবেন সর্ব্বাবয়বসুন্দরী।
বিন্দ্বগ্রে কুটিলীভূয় যাম্যাদীশানমাগতা॥
সা বামা শক্তিরূপাচ সা শিখা চিৎকলাপরা।
শক্রোশানগতা রেখা প্রত্যাগাগ্রেয় মাত্রগা॥
জ্যেষ্ঠা সা পরমেশানী ত্রিপুরা পরমেশ্বরী।
বক্রীভূতা পুনর্ব্বামে প্রথমাঙ্কুরমাগতা॥
ইচ্ছা নাদ সমাযোগে রৌদ্রা শৃঙ্গারমাগতা।
পরব্রহ্মস্বরূপা সা ত্রিপুরা পরমেশ্বরী॥"

কামকলার বিন্দু তিনটীর মধ্যে কুণ্ডলিনী প্রাদুর্ভূতা। দক্ষিণস্থিত বিন্দু অঙ্কুরিত হইয়া ঈশানকোণস্থিত বিন্দু পর্য্যন্ত গমন করিলে একটী রেখা হইবে। ঐ রেখার নাম বামাশক্তি ও চিৎকলা। ঈশানকোণস্থিত বিন্দু হইতে ঐ রেখা বায়ুকোণস্থিত বিন্দু পর্য্যন্ত গমন করিবে। ঐ রেখার নাম জ্যেষ্ঠা শক্তি, ত্রিপুরা ও পরমেশ্বরী। বায়ুকোণ হইতে ঐ রেখা প্রথমোক্ত দক্ষিণদিক্‌স্থিত বিন্দুতে গমন করিবে। এই রেখা ইচ্ছাশক্তি ও নাদ (৪০) এবং

---

(৩৯) এই শক্তিত্রয়ই প্রণবের জ্যোতিঃস্বরূপ এবং ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানশক্তি ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, মাহেশ্বরী নামে অভিহিতা হয়েন। যথা—

'ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং গৌরী ব্রাহ্মীতু বৈষ্ণবী।' (জ্ঞানং গৌরী শক্তিরিচ্ছা ব্রাহ্মী শক্তিঃ ক্রিয়া বৈষ্ণবী শক্তিরিতি ত্রিধা ত্রিপ্রকারা।)

(গোরক্ষ সংহিতা।)

ইচ্ছাশক্তি ব্রহ্মার সহিত সংযুক্ত হইয়া সাবিত্রী বা গায়ত্রী নামে অভিহিতা ও ক্রিয়াশক্তি বিষ্ণুর সহিত সংযুক্তা হইয়া বৈষ্ণবী এবং জ্ঞানশক্তি জ্ঞানযোগী মহাদেবের সহিত সংযুক্ত হইয়া কালী, দুর্গা প্রভৃতি নামে অভিহিতা হয়েন।

এই তিন প্রকার শক্তি মনুষ্য-শরীরের স্থান বিশেষে ঊর্দ্ধশক্তি মধ্যশক্তি, অধঃশক্তি রূপে বিরাজিতা আছেন।

"ঊর্দ্ধশক্তির্ভবেৎ কণ্ঠঃ অধঃশক্তির্ভবেদ্ গুদঃ।
মধ্যশক্তির্ভবেন্নাভিঃ শক্ত্যতীতং নিরঞ্জনং।"

মানবদেহের কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধচক্রে ঊর্দ্ধশক্তি, নাভিমূলে মণিপুরচক্রে মধ্যশক্তি, গুহ্যদেশে মূলাধারে অধঃশক্তি বিরাজিত আছেন।

এই তিন প্রকার শক্তিকে বন্ধনত্রয় বলে। যথা—

উড্ডীয়নান বন্ধ, জালন্ধর বন্ধ, মূলবন্ধ।

(৪০) নাদ সম্বন্ধে যোগশাস্ত্রে কথিত আছে যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকৃতি-পুরুষ মূর্ত্তিহীন কেবল এক জ্যোতি মাত্র ছিল। সেই সর্ব্বব্যাপক জ্যোতিঃ-আত্মা অভেদভাবে নাদ-বিন্দুরূপে প্রকাশমান হয়। বিন্দু-পরমশিব। মানবের শিরোদেশে যে সহস্র-

দল পদ্ম আছে; তন্মধ্যে ঐ বিন্দুরূপী পরম-শিব বর্ত্তমান রহিয়াছেন। যোগশাস্ত্রে ব্যক্ত আছে যে,—"মধ্যাহ্নকালীন কোটি মার্ত্তণ্ড-ভাস্বর, বিন্দুরূপ তেজোময় শুদ্ধ-স্ফটিক-নির্ম্মল শ্বেতবর্ণ পরম শিবাভিধেয় জগদুৎপত্তি-পালন-নাশ-করণশীল জগদীশ্বরো বর্ত্ততে।" লিঙ্গেশ্বর তন্ত্রোক্ত শিব-শতনামে সদাশিব বলিয়াছেন—

"সহস্রারে মহাপদ্মে ত্রিকোণ নিলয়ান্তরে।
বিন্দুরূপে মহেশানি পরমেশ্বর ঈরিতঃ।"

শিরস্থিত সহস্রদল পদ্মে বিন্দুরূপ মহেশ্বর আছেন, তাহা যোগীর অবশ্য জ্ঞাতব্য এবং প্রকৃত যোগীগণ জ্ঞাতও আছেন। মূলাধার হইতে কুণ্ডলিনীকে উত্থাপিত করিয়া, সহস্রারে ঐ পরমশিবের সহিত সংযুক্ত করিতে হয়। বিন্দুরূপ পরমশিবের নাম পরমাত্মা। ইঁহাকে বৈষ্ণবগণ পরমপুরুষ বলেন। শাক্তগণের কেহ কেহ শক্তিস্থান, বা দেবীস্থান; শৈবেরা শিবস্থান; কেহ কেহ পরমাত্মা, কেহ কেহ পরমজ্যোতি এবং সাংখ্যগণ প্রকৃতি-পুরুষ-স্থান বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ অকুল, কেহ কেহ কুলস্থান বলিয়া থাকেন। অতএব বিন্দু পরমশিব বা পরমাত্মা। আর কুণ্ডলিনী ত্রিপুরাদেবী স্বয়ং নাদরূপা। শাস্ত্রে আছে যে "নাদাত্মকং জগৎ।" এবং—

"ন নাদেন বিনা জ্ঞানং ন নাদেন বিনা শিবঃ।
নাদরূপং পরং জ্যোতির্নাদরূপী পরঃ হরঃ।"

নাদ হইতে সমস্ত সৃষ্ট হইয়াছে। মূলাধার পদ্মে কুণ্ডলিনী হইতে প্রথম উদিত প্রণব বর্ণ নাদ উত্থিত হইয়া হৃদয়গামী হইয়াছে। তাহাকে 'পশ্যন্তি' বলে। যথা—

"সূক্ষ্মা কুণ্ডলিনী মধ্যে জ্যোতির্ম্মাত্রা স্বরূপিণী।
অশ্রোত্রবিষয়া তস্মাদ্গচ্ছন্ত্যূর্দ্ধগামিনী।
স্বয়ং প্রকাশা পশ্যন্তী সুষুম্নায়া শ্রিতা ভবেৎ।
সৈব হৃৎপঙ্কজং প্রাপ্য মধ্যমা নাদরূপিণী।"

হৃদয়স্থিত দ্বাদশদলবিশিষ্ট অনাহত নামক পদ্মে এই নাদধ্বনি স্বতঃই হইয়া থাকে। গুরূপদেশে অতি সামান্য চেষ্টায় নাদধ্বনি কর্ণগোচর হয়। নাদ সঙ্গীতের প্রাণ। নাদের অন্য নাম পরা। পরা প্রকৃতি আদ্যাশক্তি নাদের অন্ত নাই,—অসীম অপার। তজ্জন্য আচার্য্যশঙ্করও বলিয়াছেন,—

"নাদাত্মকস্য পরপারং ন জানাতি সরস্বতী।
অদ্যাপি মজ্জনভয়াৎ তুম্বং বহতি বক্ষসি।"

ক্রিয়াযোগসারে কথিত আছে—"বিন্দুঃ শিবাত্মকং বীজং শক্ত্যাত্মকং * * * ভবেযুস্তাভ্যো জাতাস্ত্রিশক্তয়ঃ।" এই ত্রিশক্তির নাম ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানশক্তি। (ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।)

কান্যকুব্জবাসী জগদ্গুরু লক্ষ্মণাচার্য্য বলিয়াছেন—নাদ ও বিন্দু সগুণ শিব-শক্তি।

"বিন্দুঃ শিবাত্মকো বীজং শক্তির্নাদ" ইত্যাদি। বায়বী সংহিতায় উক্ত আছে—

"আসীদ্বিন্দুস্ততো নাদো, নাদাচ্ছক্তিঃ সমুদ্ভবা।
নাদরূপা মহেশানি চিদ্রূপা পরমাকলা।"

রৌদ্রীশক্তি। কামকলা এইরূপে ত্রিকোণাকারা হইয়া পরম শিবের সহিত মিলিতা। তিনিই ব্রহ্মস্বরূপা ত্রিপুরা ও পরমেশ্বরী।

কামকলার ত্রিকোণাকার হওয়ার সম্বন্ধে কামকলাবিলাসে ব্যক্ত আছে—

"বিন্দুস্ফুরত্তৌ উচ্ছূনং তচ্চ যদা
ত্রিকোণরূপেণ পরিণতং স্পষ্টম্।"
(কামকলা বিলাস।)

অর্থাৎ—এক বিন্দু হইতে অপর বিন্দু পর্য্যন্ত রেখা টানিলে, ত্রিকোণাকার হয়।

(কামকলা ভাষ্যকার বলেন, উচ্ছূন শব্দের অর্থ বিন্দুরূপের স্ফূর্ত্তি।)

প্রপঞ্চসারে ব্যক্ত আছে যে, কামকলা ত্রিরেখা প্রণবস্বরূপা, ত্রিমূর্ত্তি ও কুণ্ডলিনী

এবং ত্রিবর্ণা, ত্রয়ী, ত্রিলোকী," পরমব্রহ্ম-স্বরূপা মহাত্রিপুরসুন্দরী।

প্রথমে বলিয়াছি যে, জীবের মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনীই কামকলারূপা। কামকলার ন্যায় কুণ্ডলিনীও ত্রয়ী, ত্রিরেখা ইত্যাদি নামে বর্ণিতা হইয়াছেন। যথা—

"আধারে সর্ব্ব ভূতানাং স্ফুরন্তী বিদ্যুদাকৃতিঃ
শঙ্খাবর্ত্তক্রমাদ্দেবী সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
ত্রিগুণা সা ত্রিদোষা সা ত্রিবর্ণা সা ত্রয়ী চ সা।
ত্রিলোকা সা ত্রিমূর্ত্তিঃ সা ত্রিরেখা সা বিশিষ্যতে।"

কুণ্ডলিনী ও কামকলার আকৃতিগত বিভিন্নতা নাই এবং কামকলা ও কুলকুণ্ডলিনী অভিন্ন—এক। কুণ্ডলিনী সার্দ্ধ তিন কুণ্ডলাকারে আছেন, তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু তাহা সার্দ্ধ তিন বিন্দু।

"সার্দ্ধ ত্রিতয় বিন্দুভো ভুজঙ্গী কুলকুণ্ডলী।
নির্গুণা সগুণা দেবী ব্রহ্মরূপা সনাতনী।
চৈতন্যরূপিণী দেবী সর্ব্বভূতপ্রকাশিনী।
আনন্দরূপিণী দেবী ব্রহ্মানন্দপ্রকাশিনী।"

(বায়বী সংহিতা।)

কুণ্ডলিনীর ত্রিবিন্দু কামকলা ও অর্দ্ধবিন্দু কামকলার নিম্নোক্ত হকারার্দ্ধ। সুতরাং কামকলা ও কুণ্ডলিনী এক ও অভিন্ন এবং নাদরূপা আদ্যাশক্তি ত্রিপুরা দেবী। কামকলা অতিগুহ্য ও সাধারণের নিকট অপ্রকাশ্য এবং প্রকৃতযোগী ও সাধনার-সর্ব্বোচ্চ সোপানে অধিষ্ঠিত সাধক ব্যতীত, অপরের ধারণা করা ও প্রকৃততত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া সুকঠিন।

যোগসার ও রুদ্রযামল প্রভৃতি গ্রন্থে কুণ্ডলিনীর ধ্যান, কবচ, স্তোত্রাদি আছে; পাঠকগণের অবগতির জন্য একটি ধ্যান বলিতেছি।

"ওঁ প্রসুপ্ত ভুজগাকারাং স্বয়ম্ভূলিঙ্গমাশ্রিতাং।
বিদ্যুৎকোটিপ্রভাং দেবীং বিচিত্র বসনান্বিতাং।
শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসাং সর্ব্বদা কারণপ্রিয়াং।"

(যোগসার।)

এইরূপ ধ্যানাদি পুঁথিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কামকলার ধ্যানাদি গুরু-মুখ-গত। উপযুক্ত গুরুর প্রমুখাৎ ব্যতীত কামকলার স্থূল ও সূক্ষ্ম ধ্যান এবং প্রকৃত তত্ত্ব কোনমতেই পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না।

যতদূর বলা হইল, ইহাতে বুঝা যায়, কামকলার আকৃতি ত্রিবিন্দু ও ত্রিকোণাকার এবং ইহাই অনাদি পরাশক্তি কুণ্ডলিনী ত্রিপুরাসুন্দরী। প্রকৃত যোগীর ধ্যানধারণা ঐ কামকলা। যে যোগী কামকলাতত্ত্ব অনবগত, তিনি যোগ-পাঠশালে হাঁড়ী-কলসী লিখিতেছেন মাত্র।

কামকলার বাহ্যাকৃতি বলিলাম এবং বাহ্যরূপ বর্ণন করিলাম; কিন্তু যোগীর করণীয় ধ্যান ধারণা এবং ক্রিয়ানুষ্ঠান প্রভৃতি গুহ্য বিষয় প্রকাশ করিতে পারিলাম না; সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিবার আজ্ঞা নাই; বরং বিশেষরূপে অতি নিষেধই আছে। ভিতরের আভাষ একটু দিতেছি। এ পথের পথিকগণ অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন; তদ্ভিন্ন অন্য কেহ ইহার মর্ম্ম অবধারণ করিতে পারিবেন না।

কামকলার ত্রিবিন্দুর নাম ত্রিপুর। মহাদেব ঐ ত্রিপুর বিজয় করিয়াছেন। এজন্য তাঁহার নাম ত্রিপুরবিজয়ী

মানব-দেহের নাভিপ্রদেশে দশদল বিশিষ্ট মণিপুর নামক যে পদ্ম আছে, তাহার মধ্যে ত্রিকোণাকার মণ্ডল রহিয়াছে। এই চক্রের নাম ব্রহ্মগ্রন্থি। সাধক যখন কুণ্ডলিনী উত্থাপিত করিয়া ষট্‌চক্রভেদ করেন, তখন প্রথমে এই ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করিতে হয়। ইহা ভেদ করিতে সাধকের বিলক্ষণ কষ্ট হয় এবং প্রথমে উদরাময় হয়। প্রত্যুত, সাধক এই সময় কৃশ হইয়া পড়েন।

হৃদয়ে দ্বাদশদল বিশিষ্ট অনাহত নামক পদ্মে যে ত্রিকোণ-মণ্ডল আছে, তাহাকে ত্রিকোণাশক্তি বলিয়া থাকে। এই চক্রের নাম বিষ্ণুগ্রন্থি। প্রথমোক্ত ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করিয়া এই বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ করিতে হয়।

ভ্রূমধ্যে দ্বিদলযুক্ত আজ্ঞাচক্রে ত্রিকোণ মণ্ডল আছে। এই ত্রিকোণ মণ্ডলের তিন কোণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আছেন। এই চক্রকে রুদ্র-গ্রন্থি বলা যায় (৫)। রুদ্রগ্রন্থি ভেদ করিতে পারিলে কুণ্ডলিনী স্বয়ং উত্থিত হইয়া শিরঃস্থিত সহস্রারে পরমশিবের সহিত সংযুক্ত হন (৬)।

(৫) এই চক্রে জীবের মন আছে এবং ষট্‌চক্রের মধ্যে এই চক্র ভেদ করাই সুকঠিন। গুপ্ত তিন চক্র সহিত সর্বশুদ্ধ নবচক্র আছে; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মণিপুর, অনাহত ও আজ্ঞা চক্র, এই তিন চক্র ভেদ করিয়া কুণ্ডলিনী উত্থাপন করিতে হয়। এই চক্রস্থিত ত্রিকোণ মণ্ডলে শ্বেতবর্ণ বিন্দুরূপ বীজ আছে। সেই বীজ প্রতিপাদ্য মন ও জ্ঞানশক্তিময় শিবলিঙ্গ আছেন। তিনিই জীবের সর্বকর্ম্ম-প্রযোজক। যোগশাস্ত্রে এইরূপ ব্যক্ত আছে যে,—

"আজ্ঞা নাম পদ্ম-কর্ণিকায়াং তেজোময়ং শুক্লবর্ণং ত্রিকোণ মণ্ডলমস্তি। তদেকদেশে শ্বেতবর্ণং বিন্দুমাত্রং বীজমস্তি। তৎপার্শ্বে তদ্বীজ প্রতিপাদ্য মনঃ প্রবর্ত্তক মহাসিত্যাভিধান * * দেব-বিশেষোঽস্তি * * * মণ্ডলাপরদেশে মৃহৎ-সান্নিধানে অতিশয় সূক্ষ্ম জ্ঞানজনকং সর্ব্বকর্ম্মাণি তাবস্য প্রয়োজকং মনোঽস্তি। মণ্ডল মধ্যে তেজঃপুঞ্জরূপং অতিশয় সূক্ষ্ম জ্ঞানশক্তিময়ং শিবলিঙ্গং বর্ত্ততে।"

(৬) ইহার নাম লয়যোগ। যোগশাস্ত্রে জপ ও ধ্যানাপেক্ষা লয়যোগের শ্রেষ্ঠত্ব বলিয়াছেন।

"জপাচ্ছতগুণং ধ্যানং, ধ্যানাচ্ছতগুণং লয়ঃ।"

লয়যোগ অনন্ত প্রকার।

"লয়যোগশ্চিত্ত যোগাৎ সঙ্কেতৈশ্চ প্রজায়তে।
আদিনাথেন সঙ্কেতানন্তকোটিঃ প্রকীর্ত্তিতা।"
(দত্তাত্রেয় সংহিতা।)

লয়যোগ অনন্ত প্রকার। বাহ্যাভ্যন্তর ভেদে যত প্রকার পদার্থ আছে, তৎসকলেতে লয়যোগ সাধনা হইতে পারে।

যোগতারাবলীতে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"সদাশিবোক্তানি সপাদ লক্ষ
লয়াবধানানি বসন্তি লোকে।"

সদাশিব-কথিত এক লক্ষ পঁচিশ হাজার প্রকার লয়যোগ জগতে বিদ্যমান আছে।

সকল প্রকার লয়যোগের মধ্যে মানবদেহস্থিত নবচক্রে মনোলয় করিয়া কুণ্ডলিনী উত্থাপন-ক্রিয়া শ্রেষ্ঠ ও পরমানন্দ দায়ক। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঐরূপ লয়যোগ সাধন করিয়াছিলেন।

"কৃষ্ণ দ্বৈপায়নাদ্যৈস্তু সাধিতো লয় সংজ্ঞিতঃ।
নবস্বেব হি চক্রেষু লয়ং কৃত্বা মহাত্মভিঃ"

কলিকালে স্বল্পায়ু-শরীরী-মানবের পক্ষে ঐ প্রকার লয়যোগ সুপ্রশস্ত এবং স্বল্পদিনের চেষ্টায় সহজে সিদ্ধ হয়। ইহা পরমার্থ-দায়ক ও রোগের আকর ক্ষণভঙ্গুর শরীরের সর্বাংশে উপকারক ও হিতজনক। লয়যোগ

এই রুদ্রগ্রন্থি ভেদ করিতে পারিলে, সাধকের আহার ও মল অতি কম হয়। অল্পাহার জনিত দৌর্ব্বল্য বা কৃশতা হইবে না; প্রত্যুত, শরীর কান্তি ও লাবণ্যবিশিষ্ট হইবে।

উপরোক্ত ত্রিচক্রস্থিত ত্রিকোণ মণ্ডলের নাম ত্রিপুর। যে যোগী-লয়যোগ দ্বারা ঐ তিন চক্র ভেদ করিতে সমর্থ হন, তিনিও মহাযোগী মহেশ্বরের ন্যায় ত্রিপুর-বিজয়ী।

আমাদের নিত্যপূজা কিম্বা নৈমিত্তিক ও কাম্য—দুর্গোৎসবাদি পূজা করিতে হইলে অর্ঘ্য স্থাপন করিবার সময় ভূমিতে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিতে হয়। পুথিতে লেখা আছে "স্ববামে ত্রিকোণ মণ্ডলং কৃত্বা।" তদনুসারে পুরোহিত ও পূজক একটা ত্রিকোণ করিলেন; কিন্তু স্ত্রী-দেবতার পূজার্থে ত্রিকোণ মণ্ডলের কোণ নিম্নদিকে হইবে, পুং-দেবতার পূজার্থে কোণ উর্দ্ধদিকে হইবে; দুঃখের বিষয়, ইহা অনেকেই করেন না, বা জানেন না দেখিয়াছি। অর্ঘ্য স্থাপনের ঐ ত্রিকোণ, দেহস্থিত তিন চক্রে পূর্ব্বকথিত ত্রিকোণ ও কামকলার ত্রিকোণ—এই তিন প্রকার ত্রিকোণের একই অর্থ; কিন্তু প্রকৃত অর্থ, উদ্দেশ্য ও গূঢ়তত্ত্ব প্রকৃত যোগী ভিন্ন অন্যের অজ্ঞাত।

কামকলা বা ত্রিবিন্দু-ত্রিকোণ বিষয়ে যাহা যথাসম্ভবপ্রকাশযোগ্য, তাহা বলিয়া নিরস্ত হইলাম। ত্রিবিন্দু বা ত্রিকোণরূপিণী কামকলা অথবা ত্রিবিন্দু বা ত্রিকোণ লইয়া যোগীরা কি করেন এবং কিরূপেইবা সাধন করেন, তাহার কিছুই প্রকাশ করিবার উপায় নাই। উপযুক্ত ক্ষেত্র ব্যতীত বীজবপন যেমন বৃথা ও অনর্থক পণ্ড-শ্রম মাত্র; সেইরূপ উপযুক্ত অধিকারী ব্যতীত সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে শাস্ত্রে এবং গুরুদেবদিগের একান্ত নিষেধ আছে।

আজ কাল যোগীর অভাব নাই। কিন্তু যাঁহারা ভাগ্যবলে যথার্থ যোগীর নিকট যোগোপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যাঁহারা প্রকৃত যোগী, তাঁহারা কামকলার প্রকৃততত্ত্ব সূক্ষ্মধ্যানাদি ও কামকলা লইয়া কিরূপে সাধন করিতে হয়, তৎসমস্তই অবগত আছেন। আসল কথা, কামকলা এক প্রকার লয়-যোগ।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যোগ প্রধানতঃ দশ প্রকার। যোগের গুরু মহাযোগী মহেশ্বরের পঞ্চমুখ। ঐ পঞ্চমুখের নাম পঞ্চাম্নায়। কারণ, মহাদেবের মুখকে আম্নায় কহে। পঞ্চাম্নায়ের নাম—তৎ-পুরুষ, অঘোর, সদ্যোজাত, বামদেব, ঈশান। এইমুখ হইতে দশ প্রকার যোগ প্রকাশ করিয়াছেন। যে আম্নায় যে দিকে, এবং যে আম্নায় হইতে যে যে যোগ ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা বলিতেছি।

"মন্ত্রস্যোপাসনা দেবি পূর্ব্বমুখে ময়োদিতা।
প্রেমভক্তি দশাদিভিঃ দক্ষিণে প্রকটীকৃতং।
ধ্যান পূজা দান যজ্ঞ জপ হোমাদিকা ক্রিয়া।
ক্রিয়াযুক্তিরিয়ং দেবি পশ্চিমায় ঈরিতা।
জ্ঞানোপদেশ বিধিশ্চ কথিতশ্চ তথোত্তরে।
বিবক্তং সন্ন্যাসং দেবি উর্দ্ধম্নায়ে উদীরিতং।

সাধনকালীন মনে অব্যক্ত অভূতপূর্ব্ব পরমানন্দ উপভোগ হয়।—(ইহা পরীক্ষিত সত্য)।

সর্ব্বদীক্ষাদিকা দেবি যোগদাক্ষা অধোমুখে।"
(ষড়াম্নায় তন্ত্র।)

তৎপুরুষ নামক পূর্ব্বাম্নায়ে—মন্ত্রযোগ হঠযোগ

অঘোর নামক দক্ষিণাম্নায়ে—ভক্তিযোগ, লয়যোগ।

সদ্যোজাত পশ্চিমাম্নায়ে—লক্ষ্যযোগ, ক্রিয়াযোগ।

বামদেব উত্তরাম্নায়ে—উরযোগ (৭), জ্ঞানযোগ।

ঈশান উর্দ্ধাম্নায়ে—বাসনাযোগ ও পরাযোগ (৮)।

এই দশ প্রকার যোগ পঞ্চাম্নায়ে (পঞ্চমুখে) প্রকাশ করিয়াছেন। এই দশটিই মুখ্য। ইহার শাখা-প্রশাখায় যোগ অনেক প্রকার আছে। যেমন লয়যোগ অনেক প্রকার। হঠযোগও কয়েক প্রকার আছে।

প্রাণায়াম এক প্রকার হঠযোগ। কিন্তু আমাদের দেশে যোগী-ভেকধারী ব্যবসায়ীর যোগীর ভাণ করিয়া পাত্রাপাত্র অবিচারে যে প্রাণায়াম শিক্ষা দেন, তাহা হঠযোগ নহে বা প্রকৃত প্রাণায়ামও নহে। প্রাণায়াম সকল শরীরে সুহ্য হয় না। যোগশাস্ত্রে কথিত আছে যে,—

"আসনে প্রাণ-সংযমে ন শক্তাঃ সুকুমারকাঃ"

এই জন্য যোগী গুরুদেবেরা বলেন যে, হঠযোগ করিবার উপযোগী শরীর বাঙ্গালীর মধ্যে অতি কম। কথাটা প্রকৃত বটে। যোগী ভেকধারী ব্যবসাদার অজ্ঞ ব্যক্তির নিকট যোগ নামে প্রাণায়াম বা কুম্ভক করিবার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, কুম্ভক করিতে করিতে অনেকেই কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া শরীর অকর্ম্মণ্য করিয়াছেন।—ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট অতি সত্য।

প্রাণায়ামের প্রধান উপাদান প্রাণাপান ও ইড়া-পিঙ্গলার নাম গন্ধ না জানিয়া, সচরাচর প্রচলিত রেচক, পূরক, কুম্ভক করিলে, প্রকৃত প্রাণায়াম হয় না। প্রকৃত প্রাণায়ামের রীতি নীতি না জানিয়া, রুদ্ধদ্বার গৃহের মধ্যে বসিয়া কেবল নিশ্বাস বন্ধ করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিলে যদি প্রাণায়াম বা যোগ হইত, কিম্বা—"মনে কর মূলাধারে কুণ্ডলিনী প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসে সাপের ন্যায় মাথা তুলিতেছেন, নামাইতেছেন" বলিয়া উপদেশ দিলে যদি যোগ হইত এবং শরীরের স্থান-বিশেষ টিপিয়া একটু জ্যোতি কখন কখন দেখিতে পাইলে, সেই জ্যোতিকে পরমাত্মা বলিয়া, পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ হইল (৯) ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইলে যোগশাস্ত্রাদির আবশ্যক হইত না এবং প্রকৃত যোগী গুরুও লোকালয়ে দুর্লভ হইতেন না।

---

(৭) উরযোগ—রাজযোগ।

(৮) পরাযোগ—সমাধিযোগ।

(৯) ২৫। ২৬ বৎসরের অধিক হইল, কলিকাতার সন্নিকট শ্রীরামপুর নিবাসী ছবি ও পট নির্ম্মাতা কেশবচন্দ্র কর্ম্মকার সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতেন, যে, ৫৲ টাকা দিলে পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিবেন। অনেক বাবু শেষে ঐ সূত্র ধরিয়া ৫৲ টাকা লইয়া পরমাত্মা দেখাইয়া দিতেন। আমি প্রথমে কর্ম্মভোগ করিয়া কর্ম্মকারের নিকট গিয়া পাঁচ টাকা দিই। তাহার ৬।৭ বৎসর পরে দূরদেশে দ্বিতীয়োক্ত বাবুকেও পঞ্চমুদ্রা

প্রাণায়াম বড় সোজা নহে; প্রকৃত প্রাণায়াম হঠযোগ। প্রাণায়াম শিক্ষা দিবার উপযুক্ত গুরু সহরবাসী বনিতা-বিলাসী গৃহস্থের মধ্যে আদৌ নাই,—

"আক্কেল সেলামী" দিই। তাহাতেই জানি, ঐ দুই ব্যক্তি একই প্রকারে প্রকর-ব্যবস্থা দেখাইয়া দিতেন। কর্ম্মকার অন্যান্য ব্যবসায় কার্য্যে রত থাকায়, এ ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু সুচতুর বাঙ্গালী বাবুটি কর্ম্মকারের নিকট সূত্র লাভ করিয়া, শুভক্ষণে ঐ ফন্দি ধরিয়া বহুশিষ্য প্রশিষ্য করিয়া বেশ জাহির হইলেন। বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত অনেকেই প্রথমে প্রলোভনে ভুলিয়াছিলেন; শেষে কিছুদিন ঐ অনুষ্ঠান করিয়া বৃথা কর্ম্মভোগ অনর্থক ভুগিয়া ঐ কার্য্য ও দল ছাড়িয়া দিয়াছেন। হায়রে কলি! ঘরের মধ্যে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিলে যদি যোগ বা প্রাণায়াম হইত,—যদি ৫৲ টাকার কিম্বা পাঁচ মিনিটে পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ হইত, কিম্বা সংসার-লিপ্ত চিত্তে সহরে বাস করিয়া, কুলটকোঁ আঁটিয়া, ফুল খেলিয়া বেড়াইলে যদি যোগ-সিদ্ধ মহাপুরুষ ও ভূত-ভবিষ্যৎবেত্তা সবজ্ঞ হওয়া যায়, তাহা হইলে যোগী-ঋষিগণ সংযমী হইয়া দীর্ঘকাল বনে ও নিভৃত গুহায় বাস করিয়া কঠোর তপস্যা করিতেন না। প্রকৃতযোগী ও যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ নাম জাহির করিতে চাহেন না কিম্বা বুড়া বয়সে বিবাহ করিয়া রসের বাসর ঘরে আসর জমকাইয়া বসেন না। যিনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, কিম্বা পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তিনি কি অর্থ স্পর্শ করেন? না, লোকালয়ে থাকিয়া অর্থাগমের চেষ্টা করেন, না, বুড়ো বয়সে বিবাহ করেন? ইহার বিস্তারিত কথা পরে প্রস্তাবে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

একথা উন্নত কণ্ঠে বলিতে পারি। হঠযোগ-রূপ প্রাণায়াম কাহাকে বলে, শুনুন।

"হকারঃ কীর্ত্তিতঃ সূর্য্যষ্ঠকারশ্চন্দ্র উচ্যতে।
সূর্য্য-চন্দ্রমসো র্যোগাদ্ধঠযোগো নিগদ্যতে॥"

(গোরক্ষনাথকৃত সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি।)

(হশ্চ ঠশ্চ—হঠ, সূর্য্য-চন্দ্রৌ তয়োর্যোগো হঠযোগঃ। এতেন হঠ শব্দ বাচ্যয়োঃ সূর্য্য-চন্দ্রাখ্যায়োঃ প্রাণাপানয়োরৈক্যলক্ষণঃ প্রাণায়ামো হঠযোগ ইতি হঠযোগ-লক্ষণং সিদ্ধম্)।

হ—সূর্য্য, ঠ—চন্দ্র, হঠ শব্দে সূর্য্য ও চন্দ্রের একত্র সংযোগ—অর্থাৎ প্রাণ ও অপান, এই উভয় বায়ুর একত্র মিলন। হঠযোগ শব্দে চন্দ্র-সূর্য্যের একত্র সংযোগ করণ। প্রাণ বায়ুর নাম সূর্য্য, অপান বায়ুর নাম চন্দ্র। আর ইড়া নাড়ীর নাম চন্দ্র, পিঙ্গলার নাম সূর্য্য। "যোগ-স্বরোদয়" মতে ইড়া ও পিঙ্গলার একত্র সংমিলনকে হঠযোগ বলে।

প্রাণায়ামের বিধি শাস্ত্রে আছে বটে, কিন্তু ইহার কৌশল, কারণ অর্থাৎ ইড়া-পিঙ্গলার ও প্রাণ-অপান বায়ুর সংযোগাদি-কৌশল গুরুমুখে শিক্ষা করিতে হয়। দুঃখের বিষয় এরূপ গুরু লোকালয়ে দুর্লভ।

[ক্রমশঃ—]

শ্রী উমানাথ চট্টোপাধ্যায়।
৮নং হ্যারিসন রোড্
কলিকাতা।